মাসিক মোহাম্মদী

৩০শ বর্ষ

[কার্ত্তিক ১৩৬৫—আশ্বিন ১৩৬৬]

সম্পাদক

মুজিবুর রহমান খাঁ

কার্য্যালয় :
আজাদ অফিস
রমনা, ঢাকা

বার্ষিক মূল্য সডাক—৭৷৷০ সাড়ে সাত টাকা : ষাণ্মাসিক তিন টাকা বার আনা : প্রতি সংখ্যা দশ আনা

বর্ষ-সূচী

৩০শ বর্ষ

কার্ত্তিক ১৩৬৫—আশ্বিন ১৩৬৬

লেখকদের প্রতি

আরজ

● রচনাসমূহ কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং রচনা সম্পর্কে কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহা পত্রাকারে লিখিয়া রচনার সঙ্গেই পাঠাইতে হইবে।

•

● অমনোনীত রচনা ফেরত লইতে হইলে রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডাকটিকেট পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত কবিতা কোন অবস্থাতেই ফেরত পাঠানো হয় না, সুতরাং কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং ডাকে কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

*

● রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য থাকিবেন না। তবে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

আরজগোজার—

সম্পাদক, মাসিক মোহাম্মদী

মাসিক মোহাম্মদী

কার্তিক, ১৩৫৫
৩০শ বর্ষ, : ১ম সংখ্যা

হজরত ইদরিস আলাইহেস্ সালাম

মুস্তাফিজুর রহমান

হজরত ইদরিস আলাইহেস্ সালামের নাম, বংশ-পরিচয় ও জামানা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ রহিয়াছে। কোরআন মজীদ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসসমূহে কেবল তাহার নবুয়ৎ, মর্য্যাদা ও গুণাবলীর বর্ণনা থাকায় তাহা হইতে আমরা তাঁহার বিষয়ে মোটেই বিস্তারিত রূপে কিছুই জানিতে পারিনা। এই সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কোরআন মজীদ একখানা ধর্মগ্রন্থ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও জীবন তথ্য সমূহ তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে প্রসঙ্গতঃ মাত্র। কোন বিষয়ের বিস্তারিত ও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা কোরআনের লক্ষ্য নহে। যাহা হউক, হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার জামানা হজরত নূহ আলাইহেস সালামের জামানারও পূর্বে ছিল। তাঁহার হিব্রু নাম ছিল উখ্‌নূক— আর আরবী নাম ছিল ইদরিস। ইবনে ইসহাক তাঁহার বংশ-নামা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন: উখ্‌নূক ইবনে ইয়ারু, ইবনে মাহ্‌লায়েল, ইবনে কীনান, ইবনে আমুশ, ইবনে শীস, ইবনে আদম আলাইহেস সালাম। কাহারও কাহারও মতে হজরত ইলিয়াস এবং হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম একই ব্যক্তি। অবশ্য কোর-আন মজীদের বর্ণনা অনুযায়ী এই মত মোটেই নির্ভর-যোগ্য নহে।

এক দল ঐতিহাসিকের মতে তাঁহার জন্মস্থান মিসরের অন্তর্গত মোমাক নামক গ্রাম। তথায় তিনি আগুসাজীন নামক জনৈক ব্যক্তির কাছে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অনেকে আগুসাজীনকে নবী বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মতে হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম পাঠ শেষ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন।

আর এক দল ইতিবৃত্তকারের মতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন বাবেল শহরে। লেখাপড়া শিক্ষা করেন হজরত শীস আলাইহেস সালামের কাছে। আল্লামা শহরস্তানী বলেন: আগুসাজীন হজরত শীস আলাইহেস সালামের নাম।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে মে'রাজের হাদিসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চতুর্থ আসমানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লেল্লাহু আলাইহেস সালামের সাথে হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামের সাক্ষাৎ হয়।

পরিণত বয়সে হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম নবুয়ৎ লাভ করেন। যখ সময়ে তিনি তাঁহার দেশবাসীকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান জানান। তাঁহার দেশ-বাসীদের মধ্যে অসৎ লোকগণ তাঁহার কথায় মোটেই কান দিলনা; ফলে তাঁহার প্রচারে মাত্র মুষ্টিমেয় লোকই তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

দেশবাসীর অবিশ্বাস ও হঠকারিতার ফলে হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি তাঁহার অনুসারিগণকে দেশ হইতে হিজরত করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা প্রথমতঃ দেশ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। তাহারা বলিল: বাবেলের মত সুন্দর

দেশ আমরা কোথায় পাইব? হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বলিলেন: আল্লার নিকট নেয়ামতের অভাব নাই। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা যদি এই দেশ ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট দেশ দান করিবেন।

হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার অনুসারিগণ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রওয়ানা হইলেন। দিনের পর দিন তাহারা দেশ-দেশান্তর সফর করিয়া মিসরের অন্তর্গত নীলনদের উপকূলে উপনীত হন। এই স্থানটি ছিল বেশ মনোরম। হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামের পরামর্শ অনুযায়ী তাহারা তথায় বসবাস আরম্ভ করিল।

এখান হইতে হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম যথারীতি প্রচার কার্য্য চালাইলেন। ভাল কাজের নির্দ্দেশ এবং মন্দ কাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখাই ছিল তাঁহার প্রচারের মূল বিষয়। কথিত আছে যে, হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামের জামানায় মোট বাহাত্তরটি ভাষা প্রচলিত ছিল। আল্লার অসীম কুদরতে তিনি সব ভাষায়ই ছিলেন পারদর্শী। আবশ্যক মত সব ভাষায়ই তিনি প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকিতেন।

আল্লার প্রেরিত নবী রসুলগণ এক একটি বিশেষ গুণ ও মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন। হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম মিসরে একটী বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় ছাত্রদিগকে নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়া থাকিতেন। নবুওতের দায়িত্ব—ভাল কার্য্যের নির্দ্দেশ এবং মন্দ কাজ হইতে লোকদিগকে বিরত থাকার উপদেশ দান করা ব্যতীতও তিনি শিক্ষা দিয়া থাকিতেন—ইঞ্জিনীয়ারিং এবং তামদ্দুনিক বিষয়সমূহ। তা' ছাড়া বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যায়ও তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। দেশ-বিদেশের ছাত্রগণ তাঁহার নিকট এই সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিত। কথিত আছে যে, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ প্রায় দুই শত উন্নত নগর গড়িয়া তুলিয়াছিল। কালচক্রে এই সব নগর পৃথিবীর বুক হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ উহার একটিরও কোন নাম নিশানা অবশিষ্ট নাই।

হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম অঙ্ক এবং ভূগোলেও ছিলেন দক্ষ। তা' ছাড়া সেই সময়কার দুনিয়ায় তাঁহার শাসনক্ষমতাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দুনিয়াকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে তাহার অধীনস্থ ইলাওস, জুস, সাকীবুস, ও আমুন এই চার জন শাসকের অন্তর্ভূক্ত করিয়া ছিলেন।

আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একেশ্বরবাদী হওয়া, বিশ্ব-স্রষ্টার ইবাদাত করা, নেক কার্য্যসমূহকে মুক্তির অবলম্বন মনে করা, দুনিয়ার ক্ষণ-স্থায়িত্বে বিশ্বাস করা, সর্ব্ব-বিষয়ে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের পথ অবলম্বন করা। নির্দ্দিষ্ট প্রথায় ইবাদৎ করা, রোজা রাখা, জেহাদ করা, জাকাত দেওয়া—পাক-সাফ থাকা, নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ না করা, এবং সর্ব্ব প্রকার মাদক দ্রব্য হইতে বিরত থাকাই ছিল হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম-এর শিক্ষার মূল কথা।

তিনি আল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার উম্মতের জন্য বৎসরে কয়েকটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন ঈদের জন্য, কয়েকটি দিন মান্নত ও কোরবানীর জন্য। এই সকল উৎসবের কোন কোনটা সম্পন্ন করা হইত—রুইয়াতে হেলালের পর। আবার কোন কোনটা সম্পন্ন করা হইত—সূর্য্যের আহ্নিক গতির সাথে।

হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামের উম্মতগণ সাধারণতঃ খুশবুর ধুনা, পশু এবং ফল ও ফুল আল্লার রাহে মান্নত আদায় করিয়া থাকিত। ফল-মূলও শাক-শবজীর মধ্যে মওসুমের প্রথম ফসল আল্লার রাহে দান করার প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই মান্নত সম্পন্ন করার ব্যাপারে ফলের মধ্যে সেব, শস্যের মধ্যে গম এবং ফুলের মধ্যে গোলাপের গুরুত্ব ছিল সর্ব্বাধিক।

হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম তাঁহার উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মানুষের ইহ-পারলৌকিক সংস্কার ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই দুনিয়ায় আমার ন্যায় বহু নবী-রসুলের শুভাগমন হইবে। তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্ন বর্ণিত গুনাবলী সম্পন্ন হইবেন:

(১) তাঁহারা সকল প্রকার মন্দ বাক্য ও মন্দ কাজ হইতে মুক্ত হইবেন; (২) সকল প্রকার প্রশংসিত কার্য্যাবলী তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে; (৩) আল্লার পয়গাম অনুযায়ী তাঁহারা আকাশ-পৃথিবীর যাবতীয় জরুরী বিষয়সমূহ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হইবেন; (৪) আল্লাহ তাঁহাদের সকল প্রার্থনা মনজুর করিবেন ও (৫) বিশ্ব-মানবের মঙ্গল সাধনই হইবে তাঁহাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'লা হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামকে পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমাজকে জ্যোতিষী, বাদশা ও প্রজা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। জ্যোতিষীরা জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন বিধায় তাঁহাদের মর্য্যাদা ছিল সকলের উপরে। তার পরে বাদশাহের স্থান। দেশ রক্ষা ও জনসাধারণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা ইহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। হজরত ইদরিস আলাইয়েস সালাম এর মতে ইহাদের স্থান ছিল জোতিষীদের পরে। তা' ছাড়া তাহাদের মতে প্রজাদের স্থান ছিল সকলের

পরে—কেননা নিজেদের দায়িত্ব ব্যতীত তাহাদের অপর কোন কর্ত্তব্য নাই।

হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম এর জামানায় চার জন বাদশাহের মধ্যে আস কালীবুস ছিলেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত—এবং স্বীয় সঙ্কল্পে অটল। তিনি সাধ্য মত হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম-এর বিধান সমূহের রক্ষনাবেক্ষন করিতেন। পরবর্ত্তীকালে হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম এর শোকে তিনি খুবই চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম-এর স্মৃতি বিজড়িত বহু চিত্র অঙ্কিত হয়।

ঐতিহাসিকদের মতে যে জনপদে আসকালীবুস অবস্থান করিতেন—পরবর্ত্তীকালে তথায় হজরত নূহ আলাইহেস সালাম-এর মহা প্লাবন অনুষ্ঠিত হয়। প্লাবন শেষে উক্ত অঞ্চলে আস্কালীবুসের একটি মর্মর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। আবার কেহ কেহ আসকালীবুসকেই হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম মনে করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে আসকালীবুসকেই আসমানে তুলিয়া লওয়া হয়। হজরত ইদরিস আলাইহেস সালামকে নহে। অবশ্য কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার শরীর ছিল সুগঠিত, চক্ষু দীর্ঘ ও চিত্তাকর্ষক, তিনি অত্যন্ত ধীরে সুস্থে কথা বলিয়া থাকিতেন। কদাচিৎ কোন বিষয়ে রাগান্বিত হইলে তর্জ্জনী হেলাইয়া তাঁহার বক্তব্য সম্প্রমানিত করার চেষ্টা করিয়া থাকিতেন। কথিত আছে যে, তাঁহার আঙ্গুটীতে নিম্ন লিখিত উপদেশ খোদিত ছিল :—

الصبر مع الايمان بالله يورث الظفر

"ঈমানের সাথে ধৈর্য্য সাফল্য দান করে।"

তা' ছাড়া তাঁহার কমরবন্দে নিম্নলিখিত উপদেশ খোদিত ছিল :—

الاعياد فى حفظ الفروض - والشريعة من تمام الدين وتمام الدين من كمال المروة -

"ধর্মীয় কর্ত্তব্যসমূহ সম্পন্ন করাই প্রকৃত ঈদ। ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে শরীয়ত পালনে। ধর্মের পূর্ণতা শালীনতার পূর্ণতায়।"

হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম মানুষকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার কয়েকটী উপাদেয় বাণী উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। আল্লার অসংখ্য নেয়ামতের শোকরগুজারী করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

২। যে ব্যক্তি চিন্তা ও কর্মে পবিত্র হইতে চাহে, সে যেন অন্যায়ের কাছেও না যায়। যে যাহা করিতে চাহে সে তাহার উপকরণই হস্তগত করে, দর্জি সুঁই দিয়া কাজ করে হাতুড়ি দিয়া নহে।

৩। দুনিয়ার সাফল্য পরিণামে আক্ষেপ আর অন্যায় লজ্জার কারণ।

৪। আল্লার ইয়াদ এবং নেক কাজের জন্য সাচ্চা নিয়ামতের দরকার।

৫। মিথ্যা শপথ করিওনা। আল্লার নামকে কসমের উপকরণ করিওনা। মানুষকে মিথ্যা কসম করিতে উদ্বুদ্ধ করিওনা—কেননা তা হইলে তোমরাও তাহাদের সাথে গুনাহে শরীক হইবে।

৬। তুচ্ছ পেশা অবলম্বন করিলে মানুষ কখনও উচ্চাভিলাষী হইতে পারে না।

৭। ধর্মীয় নেতাদের অনুগামী হও।

৮। বিজ্ঞানই প্রকৃত শক্তি।

৯। পরের সুখ-স্বাচ্ছন্দে ঈর্ষা করিও না।

১০। লোভী কখনও সুখী হইতে পারে না।

তারীখুল খোলাফা ৩৪৮পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নূহের প্লাবনে পূর্বে দুনিয়ায় যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হইয়াছিল, সেই সবের মূলে ছিলেন হজরত ইদরিস আলাইহেস সালাম। তিনি তাঁহার জাতিকে ভবিষ্যাতের মহা ধ্বংসলীলা সম্পর্কেও সতর্ক করিয়াছিলেন।

এই মহান পয়গম্বর সম্পর্কে কোরআন মজীদে দুই স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে :—

واذكر فى الكتاب ادريس - انه كان صديقا نبيا - ورفعنه مكانا عليا -

"আর স্মরণ করুন কোরআনে ইদরিসকে নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্য-নবী—আর আমরা তাকে দিয়াছি বড় মর্য্যাদা।" (মরইয়াম)

واسمعيل وادريس وذالكفل كل من الصابرين -

"আর ইসমাইল, ইদরিস এবং জালকাফল প্রত্যেকই ছিলেন ধৈর্য্যশীলদের দলভুক্ত।" (আম্বিয়া)

বিরাশী বৎসর বয়সে হজরত ইদরিস আলাইহেস্ সালাম এন্তেকাল করেন।

বন্দী

তালিম হোসেন

আমাকে রেখেছে বন্দী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে
নির্বাক জনতা—
ঘিরেছে দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে চারিভিতে
উচ্চকিত ক্ষুব্ধ নীরবতা।
তাদের অন্তরভেদী দৃষ্টির সঙ্গীনে বিদ্ধ আমি ;
তাদের সে-মৌনতার উত্তুঙ্গ প্রাচীরে আছে থামি'
আমার আনন্দ-আশা কাব্য-কলা-গীত—
হারায়ে সম্বিত !

রম্যতা-প্রয়াসী মোর মন
ভুলে গেছে কল্পনার ধন
সন্ধানের আকুলি-বিকুলি,
সে-মন হয়েছে বন্দী রাজপথে ষড়ৈশ্বর্য ভুলি'
ভিখারী মেয়ের দীনতায়—
অঙ্গে যার অকালে যৌবন-দিন অপগত-প্রায়
(কীটদষ্ট সে-কোরক অসময়ে মেলেছিল দল,
কেননা ঝরার আগে ফোটা তার পুষ্প-জন্ম-ফল) !
সে আমার সুচিস্মিতা প্রিয়া হয়ে চেয়েছে আশ্লেষ,
যৌবন-রঙ্গিনী হয়ে পরতে চেয়েছে
স্বপ্ন-মোহিনীর বেশ :
আমার কল্পনা
প্রশ্রয় দেয়নি তারে, হয়েছে উন্মনা—
শূণ্য ভিক্ষা-ভাণ্ডে তার হতে সে চেয়েছে শুধু
কৃপা এক কণা।

রম্যতা-প্রয়াসী মোর মন—
সে-মন হয়েছে বন্দী শিশু আর বৃদ্ধ আর
তরুণের চোখে :
সে-শিশু আমার স্নেহ-বাৎসল্যের ধন ;
সে-বার্ধক্য কভু কোন লোকে
আমার পিতার আর আমার মাতার
স্নেহের নীড়ের স্মৃতি-মাধুর্য-সম্ভার
ভুলতে দেবেনা মোরে ; সে তারুণ্য মোর
অনুজ-চিত্তের সাথে বন্ধনের ডোর।
সে-বন্ধন ছিন্ন করি—এত বল পাইনা বাহুতে ;
এত দূরে গ্রন্থি তার, উদ্বাহু প্রয়াস নিয়ে
পারিনাকো ছুঁতে।
দেখি শুধু—মুক্তি নাই, শক্তি নাই আনন্দ-মেলায়
ভিড়ে যাই নন্দন-খেলায়।

অগণিত নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও তরুণ চারিপাশে
প্রিয়া-ভগ্নী পুত্রকন্যা পিতামাতা ভ্রাতা হয়ে আসে—
আমি শুধু মরি দেখে—
আমার সংসার থেকে
নির্বাসিত এ-সব স্বজন
আবার এসেছে ফিরে, ঘিরেছে আমার পথ
রম্যতা-প্রয়াসী মোর মন।
তাদের অন্তরভেদী দৃষ্টির সঙ্গীনে বিদ্ধ আমি ;
তাদের সে-মৌনতার উত্তুঙ্গ প্রাচীরে আছে থামি'
আমার আনন্দ-আশা কাব্য-কলা-গীত—
হারায়ে সম্বিত !

পাণ্ডুর আকাশ

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ
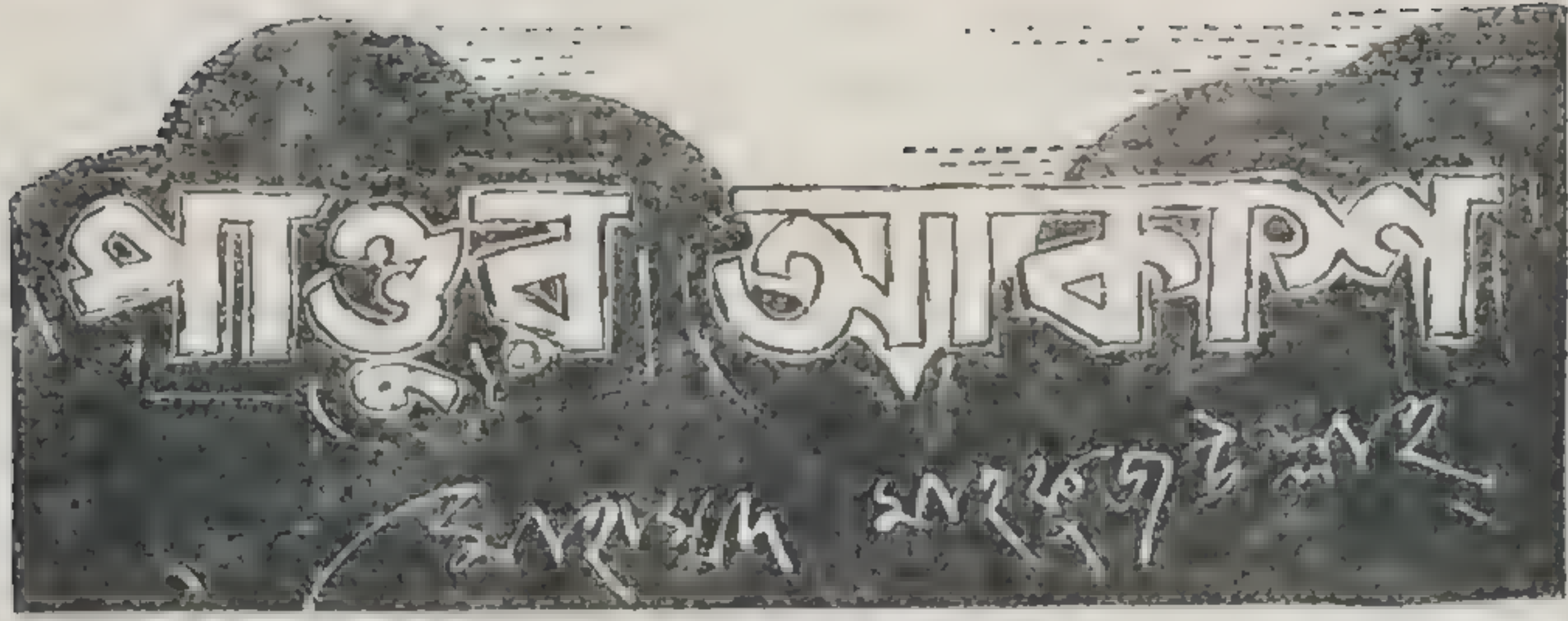
রাতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার আর স্তব্ধতার মধ্যে রিজিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটু আগেও আকাশে ছিল অজস্র তারার জৌলুষ আর রূপালি রেখার ঝিলিমিলি। দূরের তালবনের মাথায় ছিল ক্ষীণ চাঁদের ফ্যাকাশে আলো—আলোর মায়াবী অভিসার। জানালার একফালি আকাশে যে আলোর ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল, তারি স্রোত ঝরে পড়ছিল বিছানায়, বালিশে, আর রিজিয়ার চুলে। আকাশে তারার চুমকির দিকে তাকিয়ে এ পাশ ও পাশ ক'রে কাটিয়েছে রিজিয়া; কিন্তু ঘুম আসেনি তার চোখের পাতায়। এমন তারাঝরা রাতে ঘুমের বন্যা নেমে এসেছে কতোবার, চোখের পাতায় লেগেছে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ। কিন্তু আজ! আজ কেন তার এমন হলো? এক কোঁটা ঘুমের আর্তি নিয়ে কখন্ যে রাত গভীর হয়ে নেমে গেছে শেষ প্রহরের গহীনে, একবারও তা টের পেলোনা রিজিয়া! শেষ রাত্রির চাঁদ বিদায় নিয়েছে তালবনের আড়ালে, সারা আকাশ জুড়ে নেমে এসেছে ভৌতিক অন্ধকার। এমনি অন্ধকারময় নিঃসঙ্গতায় তার মনের সমস্ত চিন্তা নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে ধীরে ধীরে—যেন কোন অজানা পথের দিকে!

তবুও ঘুমভাঙ্গা রাতের মাদকতা কাটিয়ে উঠতে পারলোনা রিজিয়া। সিনেমার রূপালি পর্দার ওপর চলমান ঘটনারাজির মতো তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল তার জীবনের কাহিনীর এক একটা অধ্যায়! রিজিয়া যেন তার নির্বাক দর্শক। অতীতের কাহিনী ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারলো না রিজিয়া; সহজে যে তা ভোলা যায় না!

নির্মেঘ নীল আকাশের প্রীতি ভালো লেগেছিল রিজিয়ার, তাই বিদ্যুতের ঝলক সে প্রার্থনা করেনি কোন দিন। এই সুন্দর নীল আকাশ বিদ্যুতের কষাঘাতে চৌচির হতে পারে—জলে যেতে পারে অঙ্গারের মতো ছাই হয়ে, তা-ই কি সে জানতো? জানতো না। আর জানতো না বলেই আঘাতটা তার মনের তন্ত্রীতে আরো বেশী করে বাজলো।

সন্ধ্যার একটু আগে অফিস থেকে ফিরে এলো মামুন। ঠিক পাঁচটায় সে কোন দিনই বেরুতে পারে না। এই নিয়ে রিজিয়ারও অভিযোগের অন্ত নেই। কোন দিন হয়তো দেখা গেল রিজিয়া সেজেগুজে বসে আছে বাইরে যাবে বলে, অথচ মামুনের দেখা নেই। আবার কোন দিন মামুন ফিরে আসে সন্ধ্যার আগেই—কিন্তু রিজিয়ার মনে সেদিন নবমেঘ ভার—আষাঢ়ের প্রথম পদধ্বনি। রিজিয়া ভাবে স্বামী তাকে ফাঁকি দিচ্ছে দিনের পর দিন, কিন্তু মামুনের অনুভূতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কাছে এ-ধরণের আকাঙ্খা বিলাসেরই নামান্তর।

সেদিন ছিল শনিবার। পরের দিন রবিবার অফুরন্ত অবসর, তাই অফিস থেকে একটু দেরী করেই ফিরল মামুন সচরাচর সে আরো আগেই ফিরতে চেষ্টা করে—যদিও রিজিয়ার মন তাতেও খুশী হয়না। রিজিয়া বলে, 'অফিস কি তোমার একার? এমন করে গাধার মতো খাটতে তো আর কাউকে দেখিনা! একটু সকাল সকাল ফিরলে দুনিয়া এমন কি উল্টে যেতো!'

কিন্তু মামুনের কণ্ঠ তবুও নিরুত্তাপ। স্ত্রীর এ অভিযোগ তার কাছে নতুন নয়। বড় চেনা কণ্ঠস্বর—যেন মুখস্থকরা কয়টি বুলি। গলায় গাম্ভীর্যের রেশ টেনে মামুন জবাব দেয়, 'কেন, হয়েছে কি? বাইরে বেরুবার ইচ্ছা ছিল নাকি?' রিজিয়া যেন এরই প্রতীক্ষা করছিল। মামুনের কথা কয়টি শেষ না হতেই নতুন দেয়াশলাইর কাঠির মতো ফস্ করে জলে উঠলো, বললো, 'কবে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলে, শুনি? সোহাগ দেখাবার আর জায়গা পাওনা, না?' স্ত্রীর এই অপ্রত্যাশিত জবাবে মামুন আহত হলো, কিন্তু কণ্ঠে যথাসম্ভব কোমলতা এনে বললো, 'আহা! চটলে কেন রিজিয়া! আমি তো তোমাকে কিছু মন্দ বলিনি, বলছিলাম কি, বাইরে যাবার ইচ্ছা থাকলে আগে বলে রাখলেই হতো, একটু তাড়াতাড়িই না হয় চলে আসতাম।' যেন আকাশ থেকে পড়লো রিজিয়া! একি পরিহাস, না কৌতুক! এমন কথা তো সে কোনদিন

শুনেনি স্বামীর মুখে! খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কথাটা ভাবলো রিজিয়া, তারপর মুখ খুললো। সে মুখ থেকে যা' ঝরে পড়লো তা মধু নয়—মধু মিশ্রিত বিষ। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে সে বললো, 'বলি, এ-সোহাগ কাকে দেখাও তুমি? ভাবছো, আমি কিছু বুঝি নে, না? তাই যখন যা খুশী তাই বলে মন ভুলাতে চাও! মোমের পুতুল নই যে তোমার কথায় গলে যাবো। ভালো চাও তো, কালই আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, নইলে এর একটা বিহিত আমি করবোই।'—বলে একটু থামলো রিজিয়া, হয়তো নিঃশ্বাস নিলো।

ধীরে ধীরে চিন্তার জটিল রেখা ফুটে উঠলো মামুনের কপালে—মুখের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। অফিস থেকে ফিরে কাপড়ও ছাড়েনি মামুন, তবুও কেন তাকে এই বিদ্যুত কষাঘাত! এমনি করে যদি প্রতিদিন স্ত্রীর অভিযোগের চাবুকের আঘাতে তাকে আহত হতে হয় আর মনের নীরবে নিভৃতে ঝরে রক্তের ফোয়ারা, তা হলে? তা' হলে কেমন করে কল্পনা করা যায় স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসার? মামুনও কল্পনা করতে পারেনা, কেবলই মনের অনুতাপের অঙ্গারে জ্বলে পুড়ে মরে। তবু খুব সহজে মুখ খোলেনা সে, নিরুপায় হয়ে সহ্য করে যায় স্ত্রীর উদ্ধত অহঙ্কার। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। রিজিয়ার ব্যবহার যেদিন সহ্যের সীমা পার হয়ে যায় সেদিন মুখ খোলে মামুন। অষ্টপ্রহর কানের কাছে রিজিয়ার অভিযোগ অনুরণিত হয়ে উঠে—মামুনের কাছে তা অসহ্য। মাঝে মাঝে নিরুপায় হয়ে মৌনীর ভূমিকা নেয় মামুন—কিন্তু রিজিয়া কিছুতেই থামে না—তার মনের আকাশে মেঘ-বিদ্যুতের খেলা আরো ঘন হয়ে উঠে।

রিজিয়া ভাবে মামুনের এ-মৌনতা তাকে ঠকাবারই কৌশল মাত্র, এতে মামুনের মনে কোন সহানুভূতি মিশ্রিত নেই—নেই কোন ভালোবাসার প্রলেপ। সংসারের চারিদিকে অভাবের যে মুখ ব্যাদান রূপ ছড়ানো, রিজিয়া তা অনুভব করেও নিজের অভিযোগের রাশ টানে না বরং দিন দিন তা বেড়েই চলে। আশৈশব সুখের সংসারে মানুষ হয়েছে রিজিয়া, ভেবেছিল স্বামীর সংসারেও সে তেমনিভাবে আরাম-আয়াসে জীবন কাটিয়ে দেবে। কল্পনায় সে এমনি ধরণের সংসারে ঘুরে বেড়িয়েছে—কামনা করেছে স্বামীর সহানুভূতির ছোঁয়া। কিন্তু যেদিন বাস্তবের সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় হলো, সেদিন তার কল্পনার তাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে গেলো এক মুহূর্তে। স্বপ্নের এই সংঘাতে আহত হলো রিজিয়া, মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো নিজের মনের প্রাঙ্গণে।

অতীতের অনেক কথাই আজ মনে পড়ে তার।

আস্তে আস্তে উঠে খোলা জানালাটার কাছে সরে এলো রিজিয়া। বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনের অন্ধকারকে অনুভব করলো সে। অন্ধকার নাকি চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু রিজিয়া যেন আজ অন্ধকারকে স্পর্শ করলো, তার হাতের মুঠোয় যেন লেগে আছে অন্ধকারের সজল স্পর্শ। আশ্চর্য, রাতের আকাশে এত অন্ধকার, যেন অন্ধকারের স্তূপ। একটু দূরের জারুল গাছটা এখন মিশে আছে অন্ধকারের গায়ে, অথচ সন্ধ্যায় তাকে দেখা যেতো ভূতের মতো থমকে দাঁড়ানো। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই রিজিয়ার শরীরটা যেন ছম ছম করে উঠলো। একবার তাকালো সে সদ্য পরিত্যক্ত বিছানাটার দিকে। এখানেও অন্ধকার! ছাদের ওপর থেকে অন্ধকার যেন ঝুলে পড়ছে বিছানায়, চাদরে—অথচ এ-অন্ধকারকে জড়িয়েই এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল রিজিয়া!

বাইরের জারুল গাছটা এখন অন্ধকারের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে। বিছানার কাছে আর একবার ফিরে এলো রিজিয়া—হাত দিয়ে আস্তে আস্তে অনুভব করলো এখানকার অন্ধকার শূন্যতা! বিছানায় যেন এক স্তূপ অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। রিজিয়া ভাবলো, সকালে আবার সূর্যের আলো নেমে আসবে পৃথিবীতে, এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের জানালা গলিয়ে ছড়িয়ে পড়বে সবখানে; কিন্তু তার মনের অন্ধকার কাটবে কি? হয়তো কাটবে—হয়তো কাটবে না।

পাশের বাসার খালা আম্মা বলেছিলেন, রিজিয়া একবার স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, 'তোমার সংসার দেখে খুশী হলাম মা, স্বামী-স্ত্রীতে এমন না হলে কি চলে!' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খালা আম্মা বলেছিলেন, 'তোমাদের সংসার দেখে আমার প্রথম জীবনের কথা মনে পড়লো। আমরাও ভেবেছিলাম স্বামী-স্ত্রীতে সুখে থাকবো, সংসারের এতসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো না, কিন্তু পারলাম কই?'—খালা আম্মার কণ্ঠ থেকে একটা অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে এলো, ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরে। কথাটা শুনে মনে মনে খুশী হয়েছিল রিজিয়া। হয়তো খালা আম্মা সত্য কথাই বলেছিলেন, হয়তো বা তার কথায় মিশানো ছিল অনেকটা ব্যঙ্গ, খানিকটা উপহাস। রিজিয়া লজ্জায় মাথা নুয়ে একটু হেসেছিল, সে হাসিতে ছিল প্রশান্তির স্পর্শ।

কলোনীর বাসায় এসে খালাম্মার সহানুভূতিই পেয়েছিল রিজিয়া। প্রথম দিনের আলাপেই বুঝতে পেরেছিল এ-মহিলার মনের পরতে পরতে একটা মাতৃত্বের ছোঁয়া সজীব হয়ে আছে।

একপাল সন্তানের জননী হয়েও তার মন মরে যায়নি,

তাই রিজিয়াকে তিনি নিজের সন্তানের মতো'ই আপন করে নিয়েছিলেন। তার কথায় বার্তায় চলনে-বলনে ছিল তারই সহজ প্রকাশ। হয়তো তিনি তাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবেসেছিলেন, কিংবা এমনও হতে পারে সদ্যবিবাহিতা রিজিয়াকে দেখে তার বধূজীবনের স্মৃতি সজীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি কি জানতেন তার এ-কামনা কোনদিন সফল হবেনা। যে মেঘহীন নির্মল আকাশকে তার ভালো লেগেছে, যে নীলাভাকে তিনি অন্তর দিয়ে কামনা করছেন, তাতে একদিন দেখা দেবে ঝড়ের তাণ্ডব! হয়তো তিনি ভাবতে পারেননি, পারলে এই শুভ কামনাকে তিনি ফিরিয়ে নিতেন, হয়তো একটু ম্লান হাসি হাসতেন। সে হাসিও ছিল ঢের ভালো।

শান্ত পুকুরের নীল জলে হঠাৎ ঢিল পড়ার মতো রিজিয়ার শরীরটা আবার কেঁপে উঠলো। পাশের কামরায় নিদ্রামগ্ন মামুনের কথা মনে পড়লো তার। খালা আম্মার চিন্তার রেখাটা নিমেষে মিলিয়ে গেল তার মন থেকে। সেখানে দেখা দিল আর একটা চিন্তার ছায়া। খোকন হয়তো তার বাপের পাশে এখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন—হয়তো রিজিয়ার কথা অস্পষ্ট রেখার মতো জেগে আছে তার মনের কোন এক পরতে। হয়তো 'আম্মা' বলে এখনই জেগে উঠবে—ছুটে আসবে তার কাছে! না আসবে না, একবার ভাবলো রিজিয়া, যেমন বাপ তেমনি ছেলে! সাধে কি বলে কাকের ছা কাকের মতোই হয়। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নইলে ওরা না হয় ঝগড়াই করেছিল, তাই বলে কি ছেলেটাও গিয়ে আশ্রয় নেবে তার বাপের কোলে? কেন, রিজিয়া কি তাকে আদর করেনি? আদর দিয়েই তো তার মাথা খেয়েছে সে, নইলে এত সাহস ও পেলো কোথায়?

সাত-দিন ধরে স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি। এক বিছানা এখন দু'ভাগ হয়ে দু'কামরায় জায়গা নিয়েছে। এতদিন দু'জনের মাঝখানে শুধু খোকনই ছিল না, তার সঙ্গে মিশে ছিল একটা বিবাদের কালো ছায়া। ছায়াটা এখন ধীরে ধীরে সরে গেছে, যদিও মিশে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।—রিজিয়ার তাতে আপত্তি নেই, নেই কোন অনুশোচনা। তেলে-জলে মিশ খাবেনা, এটাতো জানা কথা। তবে আগে থেকে আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল তার, তা হলে আজ এমন করে দুঃখের দহনে পুড়ে মরতে হতো না। অনায়াসে যাকে কাছে পাওয়া যায়না তাকে ছলনার মালা দিয়ে জড়িয়ে রাখা যায় কি? যায়না। আর যায়না বলেই আজ রিজিয়ার কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু খোকন? খোকনকে সে পর করে দেবে কেন? কিন্তু গতিক দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। ছেলেটাকে ও যত কাছে টেনে নিতে যায়, ও যেন ততই দূরে সরে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ও যাকে ফুল ভেবে গলায় জড়াতে চায়, তা কি শেষে কাঁটা হয়ে ফিরে আসবে? না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না। নিজের মনেই যেন অস্ফুট শব্দ করে ওঠে রিজিয়া। ছেলে কি মামুনের একার? রিজিয়া কি খোকনকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে নি?

তার মনের মাটিতে আর এক পশলা ভাবনার বৃষ্টি হলো। শেষ রাত্রির অন্ধকার যেনো আরো ঘন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। চারিদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই, সারা শহর যেন অন্ধকারে গা ঢেকে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কলোনীর ওপর জমে উঠেছে অন্ধকারের পুরো আস্তরন। এখন কি একটা শব্দ হতে পারেনা, পারেনা আকাশের বুক চিরে একটা শব্দের পাখী উড়ে যেতে? শব্দের পাখীটা যদি অন্ধকার আকাশকে দু'ভাগ করে দিয়ে শাঁই শাঁই করে উড়ে যেতো তা হলে হয়তো রিজিয়ার মনের অন্ধকার মুছে যেতো তার ডানার আঘাতে। না, কোন শব্দ নেই। একটু আগে হয়তো মামুনের নাক ডাকছিল ওপাশের কামরায় এখন তাও থেমে গেছে। দেয়ালের গায়ে কান দিয়ে ও শুনেছিল সে শব্দ, মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকার রাত্রির সমুদ্র সাঁতরিয়ে একটা ঢেউ এসে লেগেছে এ পাশের কামরায়। এখন সব চুপচাপ, বাইরের নিঃসীম অন্ধকার পুরনো ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

এমন কতো রাতে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে রিজিয়া। পাশে হাতড়িয়ে আলগোছে ছুঁয়েছে মামুনের কবোষ্ণ শরীর। বিছানায় শায়িতা স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে তখন ছিল না কোন ব্যবধানের চিহ্ন, তবু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ওরা যেন কতো দূরে! তাই হাত দিয়ে ওরা অনুভব করেছে পরস্পরের সান্নিধ্য। ভাবনার সেতু বেয়ে রিজিয়া ওঠে গেল তার বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরে!

আঙ্গুলে গুনতে গেলে ছ'বছর, তবু মনে হয় যেন এই সেদিন। এমন অনেক ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে যা' কখনো সময়ের ধূলিতে ম্লান হয় না, মুছে যায় না। বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরটি তেমনি ভোরের শুকতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে রিজিয়ার মনের আকাশে। ফুর-ফুরে হাওয়ার মতো ওদের মন তখন নির্মল, পবিত্র। একই বৃন্তে ফোটা ভোরের দু'টি মালতীর মতো সুরভিতে আচ্ছন্ন, সজলতায় কোমল। ওদের মনের বীণায় তখন সপ্ত-সুরের দোলা, নানা ভাবনার অনুরণন। যে বয়সে মানুষের মনের কিনারে যৌবনের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ওরা তখন সে বয়সে পা দিয়েছে। রিজিয়া ভাবতো জীবনটা যদি এমনি একটা উপন্যাসের কাহিনীর মতো বয়ে যেতো

তা হলে কি আনন্দই না হতো। স্বপ্নের অতলে ডুব দিয়ে ও পেয়েছিল জীবনের মুক্তার সন্ধান, তাই জেগে ওঠে হাহাকার করা ছাড়া আর কোন উপায় রইলো না তার। স্বপ্নে যাকে কাছে পাওয়া যায়, জীবনে তাকে খুঁজতে গেলেই নেমে আসে বিড়ম্বনা। রিজিয়াও যেন এই বিড়ম্বনারই নির্জীব শিকার।

চিন্তার জটিল রেখাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার ললাটে। অন্ধকারেও রিজিয়া তা টের পেলো। হারানো অতীতের কথা ভাবতে কার না ভালো লাগে। ওতে যে মিশে আছে রোমান্সের সোদাঁলো গন্ধ, আর সেই গন্ধই যে খুঁজে বেড়ায় রিজিয়া।

হঠাৎ একটা শব্দ হতেই চমকে ওঠল রিজিয়া। মনে হলো যেন একটা শব্দের তীর তার কানের কাছ দিয়ে বিদ্যুতগতিতে ছুটে গেল। তার সারা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে গেল রক্তের শিহরণ। নিজের অনুভূতিকে সজাগ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো রিজিয়া—শব্দটা ওদিক থেকেই যেন ছুটে এসেছে। দূরের জামরুল গাছটা কি কাঁপছে! অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে চেষ্টা করলো রিজিয়া।

না, এতক্ষণে ভুল ভাঙলো রিজিয়ার। ওপাশের ফ্লাটে আলো জ্বলে উঠেছে। তা হলে শব্দটা ওখান থেকেই ছুটে এসেছিল। খুট করে আর একটা শব্দ হতেই রিজিয়া তাকিয়ে দেখলো, ও ফ্লাটে কারা যেন পায়চারী করছে। না, ভুল। পায়চারী করবে কে? হয়তো ওরা স্বামী-স্ত্রী জেগে উঠেছে। ওদিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলো সে, সারা শরীর দিয়ে অনুভবের চেষ্টা করলো সেই শব্দ। হঠাৎ কি ভেবে জানালা থেকে সরে এলো রিজিয়া। ছিঃ ছিঃ, ও কেন এমন করে তাকিয়ে ছিল!—নিজের মনকেই ধিক্কার দিল রিজিয়া, মনে মনে বললো, ছিঃ, কি ভাববে ওরা!

কিন্তু নিজেকে যতই ধিক্কার দিকনা কেন, একটা উৎসাহ যেন হঠাৎ স্রোতের মতো বয়ে গেল রিজিয়ার মনে আর শরীরে। আস্তে আস্তে ও আরো নিবিড় হয়ে দাঁড়ালো জানালার কাছে—অনুভব করতে চেষ্টা করলো ও-বাড়ীর নব-দম্পতির মৃদু পায়চারী। হ্যাঁ, নব দম্পতিই বটে! এই তো আট নয় মাস আগে ওরা ঘর বেঁধেছে—এখনও নতুন জামার মতো বাসর-রাত্রির গন্ধ গা থেকে মুছে যায়নি—মিলিয়ে যায়নি নিঃশেষে।

ওরা কতো সুখী! নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে এলো রিজিয়ার মন থেকে! অনুভূতি সজাগ হতেই এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলো রিজিয়া। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের পিচ্ছিল সাপটা তখন তার সারা শরীর জড়িয়ে ধরেছে—চেষ্টা করেও ঝেড়ে ফেলতে পারলো না রিজিয়া। ভাবনার স্রোতে ও আবার পাল তুলে দিল নিশ্চিন্তে।

'হ্যাঁ, ভাই, স্বামীর পায়ের নীচেই স্ত্রীর বেহেস্ত —' কথাটা বলেছিল ও-বাড়ীর নতুন বউ। শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল রিজিয়া। নতুন বউয়ের মুখে কি একথা মানায়! আঁচলে মুখ ঢেকে হাসি সংবরণ করেছিল রিজিয়া। কথাটা ভালো হলেও বড় পানসে শুনিয়েছিল তার মুখে। বয়সের তুলনায় মুখ যার পাকা তার মুখেই শোভা পায় এসব নীতি-বাক্য। মনে মনে ভেবেছিল, একদিন সে সুযোগ পেলে নিশ্চয় ঢিল ছুঁড়বে। প্রথম প্রথম এমন নির্জলা স্বামী-ভক্তি কার না থাকে? কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বামী-ভক্তির তরী কি কূলে ভিড়তে পারে? পারেনা, অন্ততঃ রিজিয়ার তা-ই অভিমত। এমন কতো তরীই তো রিজিয়া ডুবতে দেখেছে চোখের সামনে—বাকী রইলো ওই নতুন বউ, আশ্চর্য!

রিজিয়া ভাবতো, ন্যাকামী ছাড়া এ-আর কি? স্বামীকে অষ্ট-প্রহর আঁচলে বেঁধে রাখতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। স্বামীর কাজ স্বামী করবে—তা নিয়ে স্ত্রীর এত মাথা ব্যথা কেন? কিন্তু ও-বাড়ীর নতুন বউয়ের কাণ্ডই যে আলাদা। এমন স্বামীগতা প্রাণ আর দেখিনি বাপু—রিজিয়া ভাবতো।

পাশের বাসার খালা আম্মার সঙ্গে এ-নিয়ে কত কথা হয়েছে রিজিয়ার। রিজিয়া শুধু একাই ভাবেনি, খালা-আম্মাও ভেবে তাজ্জব বনে গেছেন, হালকা রসিকতার আমেজ মিশিয়ে মন্তব্য করেছেন—'কালে কালে আরো কতো কি দেখবো মা, সাধে কি বলে এটা কলিকাল!' বলে হাসিতে ফেটে পড়েছেন কখনো, কখনো মুচকি হেসে শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেছেন তিনি। রিজিয়াও সায় দিয়েছে খালাআম্মার সঙ্গে, গলার সুর বাঁকা করে যোগ করেছে—'এই রঙ্গ-রস কয়দিন থাকে, তাই দেখছি খালাআম্মা, হাজার হলেও এতটা ভাল নয়,'—বলে আত্মতৃপ্তির নিশ্বাস টেনেছে রিজিয়া।

এই নিয়ে মামুনের সঙ্গেও কথা কাটাকাটি হয়েছে কতোদিন। মামুন বলেছে, 'নিজের সংসার দেখতে পারো না, পরের ব্যাপার নিয়ে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? না, ওটা মেয়েদের একটা স্বভাব। পরচর্চায় তোমরা পঞ্চমুখ।' রিজিয়া সহজেই বুঝতে পেরেছে কথার তীরটা কোথায় গিয়ে লাগবে। ততক্ষণ অপেক্ষা না করে তুবড়িবাজির মতো ফেটে পড়েছে রিজিয়া, মামুনের মুখের ওপরই ছুঁড়েছে প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ-বাণ। ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিয়েছে, 'ওদের কথা বললে তোমার এমন আঁতে ঘা পড়ে কেনো? মানুষ কি চোখের মাথা খেয়েছে যে ওদের ন্যাকামী দেখতে পাবে না? স্বামী-স্ত্রী বলেই কি সারাদিন

দরজা-জানালা বন্ধ করে সোহাগ দেখাতে হবে ?' কথা শেষ না করেই রিজিয়া দৃপ্তভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়েছে যেন একটা আসন্ন যুদ্ধের জন্যে সে তৈরী। মামুন এই ঝড়ের মুখে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো মিইয়ে গেছে। তার আর কোন প্রতিবাদ করতে সাহস হয়নি। কিইবা প্রতিবাদ সে করতে পারে। দিনের মধ্যে আঠার ঘণ্টা যার মুখে প্রশ্নের তুবড়িবাজি ফুটে বেরোয় তার কথার প্রতিবাদ করা কি সহজ !

যে নব-দম্পতির ভবিষ্যত ভেবে একদিন রিজিয়া শঙ্কিতা হয়ে উঠেছিল, তাদের জীবন এখন সোনায় মোড়ানো আর স্বপ্নের আলোকে উজ্জ্বল। রিজিয়ার আশঙ্কা আর আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি, ওদের জীবনে নেমে আসেনি দুর্যোগের কালোছায়া। কিন্তু রিজিয়া ! তার কথা ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে—অনুভূতি হয়ে আসে স্তব্ধ।

এতক্ষণে যেনো ওর চেতনা ফিরে এলো। খুট করে আর একটা শব্দ হতেই ও তাকিয়ে দেখলো ও বাসার আলো নিভে গেছে, তার বদলে নেমে এসেছে অন্ধকারের নিবিড় আবরন। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে আবার হয়তো যেয়ে শুয়েছে একই বিছানায়, পাশাপাশি। ওদের মাঝে নেই কোন ব্যবধানের চিহ্ন, পরস্পরের বুকের মৃদু শ্বাসের ধ্বনি হয়তো ওরা এখন শুনতে পায়।

আর রিজিয়া ? নিজের কথা ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, মনে হলো যেন একটা লিক-লিকে সাপ তার গা বেয়ে উপরে ওঠে আসছে। রিজিয়া আর দাঁড়াতে পারলো না, তার পায়ের তলার মাটি যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। দু'হাতে ঝট করে জানলাটা বন্ধ করে দিলো সে, তারপর এক লহমায় এসে লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। কিন্তু এখানেও কি শান্তি আছে, বিছানার চাদরটা যে আগুনের সুতো দিয়ে তৈরী ! এই আগুনে লাগলো শুয়ে ছটফট করতে রিজিয়া।

—ক্রমশঃ
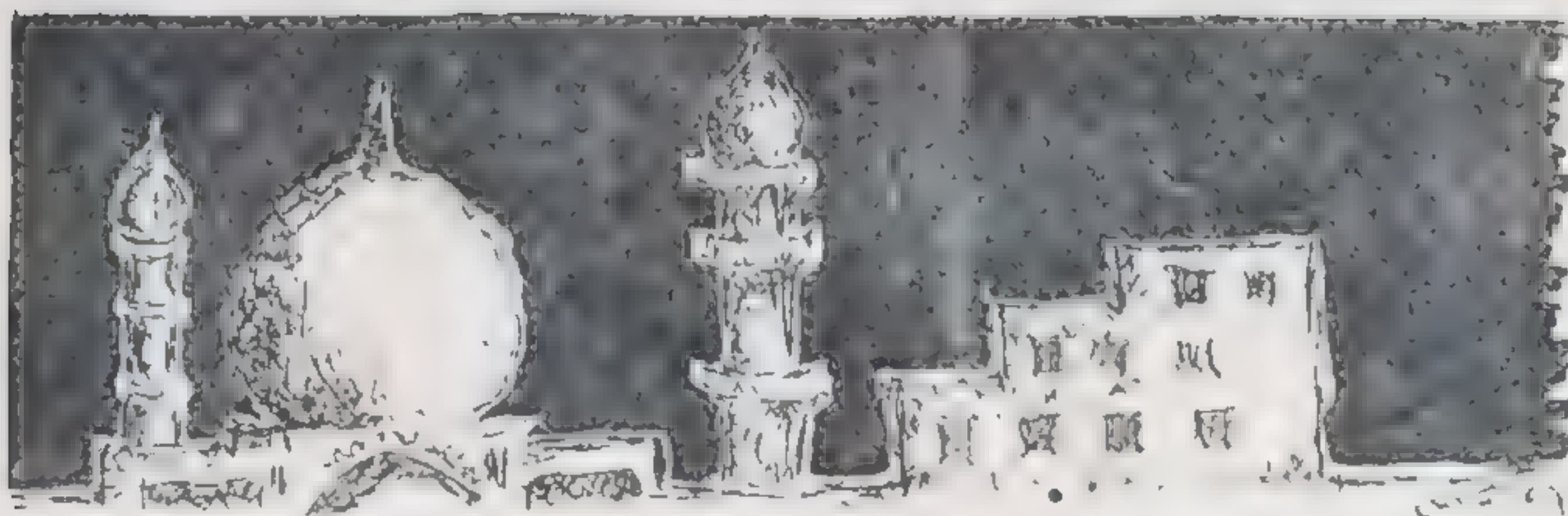
সোয়ারী ঘাটের সন্ধ্যা

আজিজুর রহমান

অবসন্ন অপরাহ্ণ গড়িয়ে পড়লো
রাত্রির তিমির-সীমিত সীমানায়।
দিবসের আলোর হ'ল শেষ, আর
শুরু হল রাত্রির আদিম আঁধারের সীমাহীন সঙ্কেত।

ওপারের বনের শ্যামলে আর
আকাশের ধুসরাভ নীলে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা নেমে এলো।
নীড়মুখী পাখীদের
কল-কাকলী, রাখালী গানের রেশ
শির্ শিরে হাল্কা হাওয়ায় ভেসে আসে।
মাঠের কৃষাণ
আর,
জল নিয়ে ঘরে ফেরা মেয়েদের ছবি
পাতলা আঁধারে ঢেকে যায় অস্পষ্ট ঝাপ্সা
হয়ে হয়ে।
অদূরের ঘাট থেকে "নাইওরের নাও"
একটী বধুকে নিয়ে নোঙ্গর তুলে
ক্রমে ক্রমে দূরে চলে যায়।
নৌকার ক্রমাগ্র গতিতে
ছায়া-বিন্দু ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে একেবারে
নিশ্চিহ্ন হলো
নিঃশব্দ বিষন্নতা বাতাসে বাতাসে
কেঁদে কেঁদে চারদিকে পড়লো ছড়িয়ে।

এপারের সান্ধ্য-নগরীতে
জ্বলে ওঠে সারি সারি পীতাভ-আলোক।
অদূরের শাহী সড়কের খোয়া ও কাঁকরে
চঞ্চলিত কল মুখরতা, চক্রধ্বনি, হট্টগোল
ছেদহীন মিশ্র-কোলাহল—
অসংখ্য পোকার মত মানুষেরা কিল্‌বিল্ করে।

শহরের রুদ্ধ হাওয়ায়
নানাবিধ খনিজ তেলের বিভিন্ন মস্‌লা আর
টিনে প্যাক আল্‌কাতরার
ধূপের ধোঁয়ার সাথে মরিচের গন্ধ ছড়ানো।

বহু পদাহত জীর্ণ পাটাতনে,
বহুল ব্যবহৃত পেরেক খসা সিঁড়ি,
আর
সাঁকোর নড়বড়ে বাঁশগুলি
বহুবার পিষ্ট হয়ে আর্ত্তনাদ করে।

মহাজনী "গোদারা"য় কেরোসিন কুপীর আলোতে
গুড়গুড়ি,—ডাব্বা হুকোর, অবিরাম হাত ফিরতিতে
জমে উঠে তীক্ষ্ণ ও তরল ব্যবসিক মনের আলাপ।

বিষধর সাপিনীর মতো আঁকাবাঁকা গলিগুলি যেন
নদীব পানির মাঝে মুখ লুকিয়েছে
যান্ত্রিক নগরীর বিশীর্ণ, মলিন আকাশে ঘুনে ধরা চাঁদ,
বিবর্ণ রাত্রির বোর্খা সরিয়ে
উঁকি দিলো নিষ্প্রভ নিরানন্দ হয়ে।

অতর্কিতে ষ্টীমারের রূঢ় আলিঙ্গনে
নির্জ্জীব নদীর চূর্ণিত ঢেউয়ের কণারা,
তীরে ছুটে পড়ে
বিগত যৌবনার লিপ্‌ষ্টিক রাঙানো ঠোঁটের
অনুত্তাপ হাসির মতই

নদী ও নগরীতে
কৌতূহলী কামনার ভীড়ে
বাহুলগ্না রাত্রির তনু
অশুচি-দেহ স্পর্শে বহু ইচ্ছার উপাদান হয়ে
অশালীন, বিশ্রস্তা হলো।

এই ছায়া-ম্লান জনস্রোত,
এই রাত,
আর দীর্ণ আকাশের ঐ ক্ষয়িত চাঁদের আলো,
মনে হয়,
আজকের পৃথিবীতে যেন ক্রমশঃ আস্‌ছে নেমে
একখানা শ্বেত-শুভ্র শব-আবরণ।

পূর্ব-পাকিস্তানী কবিতার দশ বছর

আবদুল কাদির

পূর্ব-পাকিস্তানের গত দশ বছরের কাব্য-সাধনার প্রকৃতি, পরিমাণ ও মূল্যায়ণ সম্বন্ধে খবর-খতিয়ান বাঞ্ছনীয়। কাব্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ বিতরণ; কিন্তু তাতে গৌণভাবে কাব্যের ভবিষ্যৎ বিকাশ-পথ প্রসারণের সহায়তা হয়। একটা ধরতাই বুলি আছে যে, এক বোঝা সমালোচনার অপেক্ষা এক তোলা সৃষ্টির দাম অনেক বেশী। কথাটা নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু তাতে কাব্যালোচনা অসার্থক প্রমাণিত হয় না।

কাব্য-সাহিত্যের সাধনার জন্য কিছুটা স্বস্তি ও অবকাশ প্রয়োজন। সেই স্বস্তি ও অবকাশ বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্য কতখানি দুর্লভ হয়েছে, তা অনুমেয়। আজকের পৃথিবী সংশয় ও নৈরাশ্যে এত বেশী পীড়িত যে, মহৎ কাব্য রচনার মহান প্রচেষ্টা সর্বত্রই খণ্ডিত। মানুষের হাজার বছরের শ্রম ও সাধনায় গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ ভীষণ সংকটের সম্মুখীন। এরূপ উদ্বেগজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই দশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কাব্য যদি বেশী সংরচিত না হয়ে থাকে, তবে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। পক্ষান্তরে আশার কথা এই যে, কাব্যের ভাববস্তু ও রূপাবয়ব নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস এখনও এখানকার কোনো মহলেই স্তিমিত হয়ে যায়নি। অবশ্য তা শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে ও কোন্ রূপে সার্থকতার সন্ধান করবে, তা ভবিতব্যই বলতে পারেন।

কবির কাজ তাঁর অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিকে রসমূর্তি দান করা। প্রকাশের আনন্দেই তিনি জন্ম দেন তাঁর কবিতার। কবিতা তাঁর জীবন-বৃক্ষের পুষ্প। এই পুষ্প-জন্মের উদ্দেশ্য মানুষের আনন্দ বিধান, সৌন্দর্য ও সৌরভে জীবনকে মধুর ও মঙ্গলময় করা। আধুনিক কবি এ-বিষয়ে সচেতন যে, সে-মানুষ শুধু বিদগ্ধ সুধীবৃন্দ নন, আজ প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই সে-আনন্দ লাভের দাবীদার। তাই কবি আজ শুধু মষ্টিমেয় বিদগ্ধ জনের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাব্য-প্রণয়নের প্রেরণা পাচ্ছেন না, তাঁর বাণীকে করতে হচ্ছে আপামর-সাধারণের চিত্ততোষিনী। কিছুদিন আগে 'নূতন কবিতা', 'কাব্য-বীথি', 'সবুজ নিশান', 'পূর্ব-বাংলার কবিতা'--নামে যে চার-খানি কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখলেও এ সত্য স্পষ্ট হবে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের নবীন কবিগণ দেশের সর্ব সাধারণের বাস্তব সুখ-দুঃখ ও কামনা-বঞ্চনার রসরূপ অংকনেই সচেষ্ট। মেহনতী জনতার হাসি-অশ্রু ও আশা-নৈরাশ্যের রূপাংকন করতে গিয়ে তাঁদের সম্মুখে নূতন কাব্য সৃষ্টির এক বিরাট সম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলে গেছে। অবশ্য তাঁরা এ-কথাটিও বিস্মৃত হননি যে, মহৎ কাব্যে থাকে মহৎ গুণের প্রকাশ,—মহৎ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। বিরাট ভাব ও মহান ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে আমাদের কাব্য-সাহিত্য কালক্রমে শুধু কলেবরের প্রসারতাই লাভ করবে না, তাতে বলিষ্ঠতারও সঞ্চার হবে।

বিরাট ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম ও মধুর স্পর্শে কাব্যে কিরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার বড় নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল। পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য এই দুই প্রতিভার আলোকেই অনেকখানি উদ্ভাসিত। আজও বাঙলায় অগণন গীতিকবিতা উৎসারিত হচ্ছে। সেগুলি ব্যক্তিত্বের রসে সমৃদ্ধ, ব্যক্তিত্বের ছায়ায় মায়াময়।

গীতি-কবিতা ও খণ্ড-কবিতার পাশাপাশি মহাকাব্য বা লিরিক্যাল এপিক রচনার অনুকূল পরিবেশও পূর্ব-পাকিস্তানে অদ্যাবধি বিদ্যমান। যে প্রতিবেশে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' প্রণয়ন করেছিলেন, তা কৃষি-নির্ভর পূর্ব-পাকিস্তানে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি। মধুসূদন চৌদ্দ অক্ষরের প্রচলিত পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের প্রেরণায় বাংলা কাব্যে নূতন প্রবাহ এনেছিলেন; আঠারো অক্ষরের অমিল পয়ারে প্রবাহমানতা এনে পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায় বড় কাব্য রচনার প্রচেষ্টা এখানে কেউ কেউ করছেন। এ-প্রচেষ্টা সফল হলে এ-কবিরা একটি নূতন পথ নির্দেশের অধিকারী হবেন।

কাব্যসৃষ্টির জন্য ঐতিহ্য চাই,—সাহিত্যের ঐতিহ্য। প্রতীক, অলংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বাক্-বৈদগ্ধ, ছন্দঃ রীতি প্রভৃতি আমাদের পৌরাণিক কাব্য-কাহিনী থেকে আহরণ করার পন্থা এখনও প্রশস্ত। মধুসূদন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মঙ্গলকাব্য', 'বৈষ্ণব পদাবলী' প্রভৃতিতে পেয়েছিলেন সাহিত্যের ঐতিহ্য। তাঁর 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-তে সেই ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে তিনি স্বকীয় ভঙ্গীতে গ্রহণ করেন। পূর্বপাকিস্তানের অধুনাতন সাহিত্যের প্রধান ঐতিহ্য হিসেবে 'কাসাসোল্-আম্বিয়া', 'আলেফ-লায়লা', 'তাজ-কেরাতুল-আউলিয়া', 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই', 'শাহ্‌নামা', 'ইউসুফ-জোলেখা,' 'জঙ্গনামা', 'আমীর-সওদাগর-ভেলুয়া-সুন্দরী', 'মদনকুমার-মধুমালা' প্রভৃতি প্রাচীন পুথিগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে ফররুখ আহমদ,

সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখ্খারুল ইসলাম, কাজী আবুল হুসেন, রওশন ইজদানী, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মফিজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ নূতন আঙ্গিকে কাব্য প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, লিরিক-এপিক রচনার উপযোগী চরিত্র ও ঘটনাবলী এ-সব পুরাতন পুঁথিকাব্য থেকে আহরণের সুবিধা যথেষ্ট।

উপরোক্ত পুঁথিগুলি তথাকথিত 'মুসলমানী বাঙ্গলা'য় বিরচিত। ভারতচন্দ্র তাঁর 'মানসিংহ' কাব্যে বিষয়-বিশেষে এই 'যাবনী-মিশাল ভাষা' ব্যবহারের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর সমসময়ে ও পরে রাঢ়ের শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়দ হামজা এবং বরেন্দ্র ভূমির হায়াত মাহমুদ এই ভাষার বিস্তার সাধন করেন। কিন্তু মূল পূর্ব-বঙ্গ অঞ্চলের (ঢাকা-চট্টগ্রাম বিভাগের) প্রাচীন পুঁথিতে সৈয়দ সুলতান, সাবিরিদ খান, শেখ চান্দ, মোহাম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, আলাওল প্রভৃতির ব্যবহৃত সাধু ভাষাই সমধিক প্রচলিত। সৈয়দ সুলতানের 'ওফাতে-রসুল' এবং দৌলত-উজীর বাহরাম খানের 'লায়লা-মজনু' যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী আহমদ ও আহ্মদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে; ফলে এ-সব পুঁথির সাবলীল ভাষাভঙ্গী নূতন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুখের বিষয় যে, এ-দুই বাক্-রীতির একটা সুন্দর সমন্বয়-চেষ্টা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠছেঃ পূর্বপাকিস্তানের কাব্যের ভাষা পশ্চিম-বঙ্গের কাব্যের ভাষা থেকে শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে যাবে কি? এর জওয়াব নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপর। সে-সৃষ্টির জন্য প্রত্যাশা করা ভিন্ন আমাদের আর কী করবার আছে?

এ-প্রসঙ্গে 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' গুলোর কথা আসে। এ-সকল লোকগাথা ও পল্লীগানে আমাদের ঐতিহ্যের একটা বড় পরিচয় নিহিত রয়েছে। অসংখ্য বাউল-ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া, জারি-সারি-মুর্শিদী, বিচ্ছেদী-বারমাসী একদা আমাদের পল্লীজীবনকে করেছিল মুখর ও আনন্দময়। সেই আনন্দকণা আহরণ ক'রে সৃষ্টিধর্মী কবি যে কালজয়ী কাব্য রচনা করতে পারেন, জসীম উদ্দীনে তার প্রমাণ আছে।

অবশ্য বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যে অতি-আধুনিক বাঙলা কাব্যের উত্তর-তিরিশের ধারার অনুকরণ চলছে বেশি। অনুকরণ প্রস্তুতির লক্ষণ; সেই প্রস্তুতি যদি সারা জীবন ধ'রে চলে তবে নব-সৃষ্টির আশা দুরাশা মাত্র। যে-অর্থে মধুসূদন করেছিলেন মিলটন ও কৃত্তিবাসের অনুসরণ, ইকবাল করেছেন রুমীর অনুসরণ, সে অর্থে অনুসরণ সৃষ্টিশীল। কিন্তু আমাদের কোনো কোনো অত্যাধুনিক কবি যেভাবে জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো অপ্রধান (Minor poets) কবিগণের অনুকরণ করছেন, তাতে সৃষ্টিমুখিতা কতখানি আছে, তা বিচার্য। আসল কথা, অনুকরণের দ্বারা সাহিত্যে মহৎ মর্যাদার আসন লাভ হয় না; সেজন্য চাই স্বকীয়তার পরিচয়। আমাদের সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী কবি-প্রতিভার আবির্ভাব অবারিত হোক এই-ই কামনা। এই কামনা যাতে ফলবতী হয়, সেজন্য কবি প্রতিভার আবির্ভাব-পথ প্রশস্ত করার দায়িত্ব সমাজের। সমাজ যদি হয় সহানুভূতিশীল, তবে নূতন শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব অধিক বিলম্বিত হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অবশ্য নূতন কবির আগমন-পথের পানে অনিমেষ চেয়ে একটানা হাহুতাশ না করলেও আমাদের চলে। গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, মঈনুদ্দীন, বেনজীর-আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, আবুল হাশেম, মহীউদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ, সুফী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, আজহারুল ইসলাম, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহ্সান, তালিম হোসেন, মুফাখ্খারুল ইসলাম, মতিউল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, মুযহারুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, আজিজুর রহমান, আবদুল হাই মাশরেকী, রওশন ইজদানী, প্রজেশ কুমার রায়, সানাউল হক, শামসুর রহমান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আল্-মাহ্মুদ, আবদুস সাত্তার প্রভৃতি প্রবীন ও নবীন কবিগণ যে ভাবে কাব্যসাধনা করছেন, তাতে আমাদের হতাশায় একেবারে মুহমান না হলেও চলে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে গোলাম মোস্তফার কাব্য-সংকলন 'বুলবুলিস্তান' প্রকাশিত হয়েছে; তাতে অনেক নূতন কবিতার সন্নিবেশে সময়ের দাবী অনেকখানি মিটেছে। তাঁর 'তারানা-ই-পাকিস্তান' দেশ প্রেমমূলক গীতি কবিতার সমষ্টি। তাঁর 'বনি-আদম' লিরিক-এপিক হিসাবে বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে এক নূতন সংযোজন। 'বনি-আদম' থেকে একটু রূপ-বর্ণনা শুনুন :—

> "অপরূপ ভঙ্গিমায় স্নিগ্ধ হাসি হেসে'
> তরুণী মেলিল আঁখি। কী সুন্দর চোখ!
> কী সুন্দর চোখের পলক! মনে হয়
> কোন্ যেন সীমাহীন সমুদ্রের তীরে
> দাঁড়াইয়া আছে দু'টি চপলা খঞ্জন
> উড়্-উড়্ ভঙ্গিমায়, অথবা আকাশে

চাঁদের সুধার লোভে দুইটি চকোর
ঘন ঘন ডানা মেলি' উড়িতেছে যেন
ভুরুর দিগন্ত-টানা নীল নীলিমায় !
অথবা দুইটি ছোট কাজল-ভ্রমর
সুধার ভাণ্ডারে যেন গিয়াছে পড়িয়া,
বদ্ধ পাত্র হতে তাই মুক্তির আশায়
এদিক-ওদিক পানে কাটিছে সাঁতার।

এ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র প্রভাব লক্ষ্যনীয়। সম্প্রতি ইকবাল থেকে অনূদিত গীতি-কবিতা-গুলি সংগ্রথিত করে তাঁর 'কালাম-ই-ইকবাল' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনুবাদে ছন্দ-ঝঙ্কার ভাব-ব্যঞ্জনার সহায়ক। ইতিপূর্বে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় 'ইকবালের কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ; তাতে অন্তর্ভুক্ত ফররুখ আহমদের অনুবাদগুলোতে বলিষ্ঠ ভাবকল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ আনন্দদায়ক ; আবুল হোসেনের অনুবাদ গুলোর আবেদন প্রত্যক্ষ, আর আলী আহ্‌সনের পরোক্ষ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, আবদুল হক ফরিদী, মির্জা সুলতান আহ্‌মদ, আবুল কালাম মুস্তফা, মীজানুর রহমান প্রভৃতি ইকবাল থেকে অনেক অনুবাদ করেছেন ; কিন্তু সে-সব নিছক অনুবাদ বলেই মনে হয়। অনুবাদ যেখানে মূল রচনার পর্যায়ে উঠেছে সেখানেই তা রচনা হিসেবে সার্থক। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ওমর খৈয়ামের ১৫১টি রুবাইয়ের পদ্যানুবাদ করেছেন মূল ছন্দে। তাতে-ও মূল ভাব হয়তো রক্ষা পেয়েছে; কিন্তু কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কতখানি সম্ভব হয়েছে, তা কাব্য রসিকেরাই ভালো বলতে পারেন।

জসীমউদ্‌দীনের 'মাটির কান্না' সহজ কবিত্বের দীপ্তিতে মাঝে-মাঝে বেশ ঝলমল্‌। তার প্রধান সুর মানবিকতা। তার 'গাঙের পার' পুস্তিকাটিতে দেশপ্রীতি অধিকতর প্রকট। 'কোরবানীর জারি' এ-পুস্তিকার একটি উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায়। 'গাঙের পার' থেকে একটি চমৎকার গীতি কবিতা শুনুন :—

আমার সোনার পাকিস্তান
　　আমার পূর্ব-পাকিস্তান !
নীল-সবুজের দোলে দোলাও
　　তোমার ক্ষেতের ধান।
গাছের পাতায় শীতল বাতাস
ছড়ায় বনের ফুলের সুবাস ;
কুটির-ভরা স্নেহে উদাস
　　ভায়ের মায়ের প্রাণ।
আয়নামতি পদ্মা নদীর
　　বক্ষেতে রূপ ধরি'
ধান-কাঁওনের করছে সাজন
　　এই রূপসী পরী।
ঝাঁকিয়ে দূরে আকাশ-তীর
কে ছুঁড়িয়া মেঘের নীর
অপরূপা শ্যামলীরে
　　করিয়ে যায় স্নান।

জসীমউদ্‌দীনের রচনায় আমাদের পল্লী-জীবনের আনন্দ-বেদনা মধুর সুরভি বিস্তার করেছে। বন্দে আলী মিয়ার পরিবেশনায় পাই তার শহুরে রূপ। তাঁর 'পদ্মা-নদীর চর' ও 'মধুমতীর চর' এর সাক্ষ্য। তার রচিত Pastoral Poems আমাদের সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেছে।

মঈনুদ্দীনের 'পালের নাও' কাব্যের প্রথম চারিটি কাহিনীতেই আছে আমাদের পল্লীজীবনের ছায়াপাত। তাঁর 'আর্তনাদ' ১৪-মাত্রার অমিল মাত্রিক-ছন্দে রচিত। মানবিকতা তাঁর মূলীভূত প্রেরণা।

মহীউদ্দীনের 'গরীবের পাঁচালী' প্রচারণা-পুস্তিকা। তাতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার রঙ্গিনস্বপ্ন তাঁর কবিকল্পনাকে করেছে বল্গাহীন। তাঁর অনেক কবিতায় দেখা যায়, জগৎ-লীলার রহস্য-সন্ধানে তিনি তৎপর। সেখানে তিনি এক ধরণের দার্শনিক। তাঁর সম্বন্ধে বড় কথা এই যে, বর্তমান জীবনের বহু অপূর্ণতা ও অখণ্ডতা সত্ত্বেও তিনি এ-জীবনকে ভেবেছেন বিধাতার পরম দান ব'লে।

প্রকৃতি যাঁর দুই নয়নে কল্পনার 'মায়া-কাজল' পরিয়ে দিয়েছেন পরম বদান্যতা-ভরে, তিনি বেগম সুফিয়া কামাল। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'মন ও জীবন' দুর্বার আবেগের স্বাক্ষর বহন করলেও সমাজ-সচেতন মনের স্পর্শ তাতে প্রচুর।

সুফিয়ার মতো মতিউল ইসলামও প্রেম ও প্যাশনের কবি। তাঁর 'সপ্তকন্যা' রবীন্দ্রনাথের 'মানস সুন্দরী' 'বিজয়িনী'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৪-অক্ষরের পয়ার যে ভাব-প্রকাশের কত অনুকূল, তার পরিচয় এখানে উজ্জ্বল। তাঁর 'কায়েদে আজম তোমার জন্য' স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় বাঙ্‌-মুখর। 'প্রিয়া ও পৃথিবী'র কতকগুলো কবিতায় তাঁর দেশপ্রেমিক চিত্তের তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি সনেট বেশ আঁটসাট।

কে. এম. শমসের আলীর 'স্বাক্ষর'—৭২টি সনেটের সমষ্টি ; কিন্তু খাঁটী পেত্রার্কীয় ছাঁচে রচিত একটি সনেটও তাতে নাই। মিল-বিন্যাসে নীতি-নিরপেক্ষতার দরুন তাঁর প্রায় সনেটেই ছন্দঃধ্বনি হয়েছে বিরল।

আজিজুল হাকিমের 'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর' কোথাও কোথাও আধুনিক আঙ্গিকের ছায়ায় আচ্ছন্ন হলেও তাঁর অন্তরের যোগ গত যুগের রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে।

নুরুন্নাহারের 'অগ্নি-ফসল', সদরুদ্দীনের 'এক ফালি চাঁদ', 'সংগ্রাম' ও 'পয়গাম', সুবোধরঞ্জন রায়ের 'পঙ্কজ', প্রজেশকুমার রায়ের 'এক যে ছিল,' আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর 'নজরানা' ও 'কিশ্ তী,' আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর 'জওয়ার', তৈয়বউদ্দীনের 'নক্শা', ফয়েজ আহমদের 'জোনাকি', আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীর 'যেহেতু,' মহম্মদ মহসীনের 'কবিতা ও শো-রুম,' মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাকের 'সুরমার মাঝি,' আ, ক, শ, নুর মোহাম্মদের 'বুনো মেঘ,' আবু নছর শহীদুল্লার 'জীবন-স্বপ্ন', কাজী গোলাম আহমদের 'ঈদের চাঁদ,' শেখ সাইফুল্লার 'গুলবাগ' 'দিলবাগ,' 'সঙ্গীত-লহরী,' 'ঝঙ্কার' ও 'অভিযান' প্রভৃতি পুস্তকে পদ্যের আমেজ একেবারে দুর্লভ নয়। সদরুদ্দীনের 'নয়া আসমান' ও 'চাতক' সম্বন্ধেও এ-কথা বলা চলে। তাঁর 'বঙ্গগীতি' ও 'আজব খবর' কবিতা হিসেবে উপাদেয়। কিন্তু আগাগোড়া কবি-মেজাজ বজায় রেখেছেন আ, ন, ম বজলুর রশীদ। তাঁর 'মরুসূর্য' লিরিক কাব্য হিসেবে সুখপাঠ্য। তাতে হজরত রসুলে-আকরমের মহাজীবনের পুণ্য-আদর্শকে পরম আন্তরিকতা-সহকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, মহৎ আদর্শের প্রতি অনুরক্তি বা গভীর প্রত্যয় কাব্যের বিষয়বস্তুকে উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে; তার ভাবদেহের রূপসজ্জা শালীন ও সুষ্ঠু হলে সে কাব্য মহৎ সাহিত্যের কোটায় সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ফররুখ আহমদের 'হাতেম-তাই', 'হাতেম ও নৌফেল' প্রভৃতি রচনার অন্তর্নিহিত ভাব-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ-উক্তির তাৎপর্য বোঝা যাবে। তাঁর 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্যে' স্থানে-স্থানে তালভঙ্গ হয়েছে এজন্য যে, তাতে অতীতের মূঢ়তাকে বর্তমানের অন্ধতার সাফাই দিয়ে লঘু করার বিরক্তিকর প্রচেষ্টা প্রশ্রয় পেয়েছে। ফররুখ আহমদের "দীর্ঘ কবিতাগুলোতে নজরুলের উচ্ছ্বাস ও উচ্চ সুর" একদা আবু রুশ্ দের কাছে দুঃখদায়ক মনে হয়েছিল। তিনি বলেন: "আধুনিক কোনো কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থাকে তো তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।" (সওগাত, ভাদ্র, ১৩৪৮)। কিন্তু ফররুখ আহমদের সাম্প্রতিক রচনাগুলোতে মধুসূদনের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। মধুসূদন দুরুচ্চার সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দাবলীর মাঝে মাঝে চলতি ভাষা ব্যবহার করেন। আর ফররুখ আহমদ সাধু ভাষার কঠিন বাঁধনের মধ্যে দুরুহ আরবী-ফারসী জবান প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সনেটে তিনি মধুসূদনের মতো ব্রাকেট ব্যবহার করেছেন; অথচ তিনি ইংরেজী সনেটের মুক্তবন্ধ আদলই বেশী অনুসরণ করেছেন। তাঁর 'ময়নামতীর মাঠে' সনেটপরম্পরা (Sonnet Sequences) হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'দিলরুবা' সনেটগুচ্ছে'র সনেটগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবেও সুখপাঠ্য; কিন্তু একটি মূলভাব তাতে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়নি। তিনি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক সংখ্যক সনেট রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর সকল সনেটের গঠন আশানুরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ নয়—অন্তর-আকুতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের ব্যাকুলতায় তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সনেটের সুনির্ধারিত নিয়ম-নিগড় লঙ্ঘন করেছেন।

ফররুখ আহমদের উপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সামান্য প্রভাবও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি; কিন্তু আহসান হাবীবে তার জের আজো চলেছে। ভাবের শালীন প্রকাশ আহসান হাবীবের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য; আবেগের পরিমিতি বিধানের জন্য অতিরিক্ত সচেতনতা তাঁর রচনার পরিমাণ সীমিত করেছে।

তালিম হোসেনও রোমান্টিক; তাঁর 'দিশারী'তে পালিশও যথেষ্ট। তবে মানস-গঠনের দিক দিয়ে ফররুখ আহমদের সঙ্গেই তাঁর মিল বেশী। মুফাখখারুল ইসলাম চিন্তাদর্শের দিক দিয়ে হয়তো তাঁর সগোত্র; কিন্তু তাঁতে অনুরূপ পালিশ বিরল। আবদুর রশীদ খানের 'নক্ষত্র, মানুষ মন' প্রতিশ্রুতিশীল। তিনি বলেন—"একটি তারকা লয়ে আমার জগত।" এই তারকা কোনোদিন ভাস্কররূপে প্রদীপ্ত হবে কিনা তা ভবিতব্যই জানেন।

মুযহারুল ইসলামের 'মাটীর ফসল' ভাবাবেগের আতিশয্যে অনেক স্থলে অতিশয় তরল। এই রোমান্টিক কবি মাঝে মাঝে বাস্তবতার বালুচড়ায় নামতে চান। তিনি বলেন:

"হে রাজহাঁসেরা, এবার তোমরা থামো;
আমার মনের নরম মাটিতে নামো।"

কিন্তু এ-মাটি যেখানে কঠিন হয়েছে, সেখানে গড়ে' ওঠেছে বাক্যপিণ্ড।

মুফাখখারুল ইসলাম ও মুযহারুল ইসলামের মতন দুরুহ শব্দপিণ্ড ব্যবহারের প্রতি আবুল হোসেনের চিরদিন বিতৃষ্ণা। চলতি কথার সীমানার মধ্যে বিচরণ করতেই তিনি সোৎসাহী। এই প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান বলেছেন: "আবুল হোসেন ......বিশেষ ক'রে অমিয় চক্রবর্তীর নিকট পাঠ নিচ্ছেন বহুদিন ধরে।" (সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৬০) শুধু আবুল হোসেনই নন, আমাদের অনেক তরুণ কবিও উত্তর-তিরিশের অতি-আধুনিক লেখকদের কাছ থেকেই বিষয়-বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে আজও প্রেরণা আহরণ করছেন।

অন্য পক্ষে আবদুল হাই মাশরেকী ও রওশন ইজদানী পূর্ব-পাকিস্তানের লোক-সংস্কৃতি ও গ্রাম্য-বাকরীতির আশ্রয় ক'রে আমাদের সাহিত্যের সুপরিচিত দিগন্তের দিকে নূতন ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। মাশরেকীর

'দুঃখু মিয়ার জারী' এবং ইজদানীর 'বন্ধের বাঁশী', 'রঙ্গিলা বন্ধু' ও 'চিনু-বিবি' সরল অনুভূতির রসে অনেক স্থানেই বেশ স্নিগ্ধ ও মধুর। ইজদানী তাঁর 'খাতেমুন-নবীঈন্' সংরচন করেছেন গ্রাম্য লোক-গীতিকার ছন্দে। এরূপ চটুল ছন্দে বিশ্বনবীর বিরাট ও বিচিত্র জীবন-মাহাত্ম্যের গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ দুঃসাধ্য।

এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠ কবি আশরাফ সিদ্দিকী; তাঁর 'তালেব-মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা', 'সাত ভাই চম্পা', 'বিষ-কন্যা' ও 'উত্তর-আকাশের তারা' স্বীকৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর 'আষাঢ়', 'ষ্টাডি', 'সম্রাট শাহজাহান' প্রভৃতি কবিতা উপভোগ্য। তাঁর 'তালেব-মাষ্টার' রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির রূপ-পরিকল্পনা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য আবেগের তারল্য তাঁর অনেক রচনাকে দুর্বল করেছে। তাঁর 'গোধূলি-নদীর মাঝি-কে' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি লাইন—

"মেহগিনীর বনের ধারে কৃষ্ণচূড়ার লালে
কে তুমি মাঝি বিজলী বসন ভাটিয়ালীর গানে

* * *

বলেছি তাকে তুমিই আলো তুমিই মায়া মণি!

* * *

আজকে দেখি ভানুমতীর খুলেছে মাঠের দ্বার।"

এইখানে যে ছন্দপতন ঘটছে, আবেগের উচ্ছলতায় তিনি তা কানেই নেননি।

সানাউল হকের 'নদী ও মানুষের কবিতা' থেকে কয়েক লাইন শুনুন:—

তেমনি তুমিও মেয়েরে তোমার অন্ধ আশে
বেচে ফেলো যদি জনৈক অচেনা ক্রেতার কাছে;
চোখ-উপড়ানো কান্নার রোলে
তোমার মেয়েটি মাথা কুটে কুটে পড়বে ঢলে!
যে-পথ দিয়ে আমারে নেবে টানি'
সেখানে রুয়ো কাঁটার ঝাড় আনি'।
মাগো! দেখবে যখন সে-ঝাড় গেছে নুয়ে
ভেবো তখন আমি আছি কফিনে-ঢাকা-শুয়ে!!

এখানেও ছন্দের কান প্রতারিত হয়েছে।

নিখুঁত ছড়ার ছন্দে চমৎকার দক্ষতা দেখিয়েছেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্। তাঁর 'সাত নরীর হার' থেকে দু'টি ছড়া শুনুন:

"কুঁচ বরণ কন্যা তোমার
মেঘ বরণ চুল,
চুলগুলো সব ঝরেই গেল
গুঁজবো কোথায় ফুল!

* *

একটা ছেঁড়া গামছা ছিল,
তাই দে' দিলে ফাঁস,
মরেও মেয়ে দায় ঠেকালে
ঢাকবো কী দে' লাশ!

আমাদের অনেক কবিই অধুনা কাব্য-রচনা ছেড়ে ছড়া কাটতে শুরু করেছেন। সাহিত্যের এই সংক্রান্তি-সীমায় দাঁড়িয়ে নবীন কবি আতাউর রহমান তাঁর 'দুই ঋতু'-তে বলছেন:

"কাব্যের সুরভি-মাখা মুগ্ধ দিন হয়েছে উধাও,
পদতলে রূঢ় পথ, নভে রুদ্র মেঘের বিদ্বেষ;
স্বপ্নেরা শ্মশানশায়ী, মরুপথে নদী গতিহারা;
আশার বীজেরা ব্যর্থ-অনুর্বর নিঠুর মাটিতে।,'

কিন্তু জগত ও জীবন সম্বন্ধে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্বন্ধে আশা ও আনন্দের অনুভূতি হবে যত বেশী প্রবল ও গভীর, কাব্য-সৃষ্টির দিগন্ত-পথ হবে তত বেশী প্রসারিত। সুন্দর পৃথিবী, বিচিত্র তার মানুষ, মধুময় এ-জীবন, এই উপলব্ধি আমাদের নবীন কবিদের মানস মণ্ডলে নূতন স্বপ্নলোক সৃষ্টি করুক।

শিল্প আর প্রেম

চৌধুরী লুৎফর রহমান

একটি সকাল আর একটি সন্ধ্যা পাই রোজ
আপিসের অপ্রিয় হাওয়ার ভিড় ঠেলে
বিবেকী শিখায় নিয়ে লেলিহান গ্লানি।
বিদ্বেষের মারীরূপে ভালবাসা সযত্ন বর্জিত
মনুষ্যত্ব ইয়ার্কির বাজারে বিকালো তাই
প্রত্যহের নির্মম প্রবাহে তাই জান্তব জীবন ধর্ম রত
সহস্রের হিসেব জর্জর মনে তাই শ্রেষ্ঠ সুখ।

রাজনীতি দুর্নীতির ভঙ্গুর পাঁজর
জর্জ্জর হয়েছে এই দুর্দ্দিনের গদী আগ্‌লাতে
জঙ্গম জীবন যুদ্ধে জনতার নেতা।
তুড়ি মেরে এগ্‌জামিন চর্বিত চর্বনে
দর্শনের দারুচিনি দাঁতে কাটি রোজ
রেষ্টুরেন্টে রমনীয় চায়ের পেয়ালা আর
মেলে ধরি দৈনন্দিন এডিটরিয়্যাল।
দেশবিদেশের যতো বস্তাপচা জবর খবর।
চিত্রতারকার সেই অর্দ্ধনগ্ন বিজ্ঞাপনে
রতিস্নান—উদ্ধশ্বাস নাগরিক মন।
বান্ধব গোত্রের চক্রে চক্রান্তের জাল
হেমিংওয়ে, মম্‌ নিয়ে বিস্বাদ বিবাদ
কাঁটা চামচের মৃদু টুংটাং সৌখিন আওয়াজ
প্লেটের নিটোল খাদ্য, প্রচুর আস্বাদ
লাল পানি, সির্‌কার সাজানো সিরাপ।

কথামুখ গড়ি রোজ, শিল্প আর প্রেম
জীবনের মাঝে সার সত্য জেনে তাই
কৃচ্ছতার মাঝে গড়ি মখ্‌মলের নরোম বিলাস
কৃষ্টিতে মিটাই সাধ প্রগল্‌ভ ইচ্ছার।
আজকের নায়ক আমি শরীরী প্রণয়ে
গভীর মোহন এই অনুভব সুখে
অভিজ্ঞান বসন্তের পরিচ্ছেদ লিখি,
প্রেক্ষিতের ভিড়ে শুধু নিপুনিকা নায়িকার মুখ,
শিখরের শুভ্রতায় সৃষ্টির নিভৃত সূর্য্যপট
প্লেসিয়ারে কোথায় হারালো তাই
আশাবরী উষা কাঁপে খামারের পাশে এই
হলুদ, সবুজ, কালো, খয়েরী এ-মাটির অঙ্কুরে॥

একটি প্রেমের কবিতা

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

যার চোখ জুড়ে তোমার স্বপন
তুমি যার ধ্যান জীবনে-মরণে,
সকালের রোদ ফিকে মনে হয়
তোমার হাসির উজ্জলতায়
সে-খোঁজে নিত্য নতুন পৃথিবী।

নতুন পৃথিবী, নতুন আকাশ,
যেখানে হৃদয়—হৃদয়-পাগল ঃ
হাসবে নীরবে, জ্বলবে নীরবে
দেহের সুবাস ছড়িয়ে বাতাসে,
ঝাঁজালো দুপুর বন্দী করে বা
সাঁতার কাটবে স্বর্ণ মরালী!

পদ্মের কুঁড়ি ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা
ফুটিওনা ফুল, চাইনে গন্ধ,
তোমার দেহের সুবাস-মাতাল
আমার পৃথিবী হলো যে অন্ধ!
সকালের রোদ নেই প্রয়োজন
তোমার এ-হাসি হোক অনন্ত।

আজকে বাতাসে কিসের কান্না?
জানালায় নাচে কাল বৈশাখী!
চৈত্রের সাঁঝে চ্যুত মুকুলের
অভিশাপ বুঝি লাগলো এবার?
ঝড় বয়ে যায়—হৃদয়ে হৃদয়ে
ঝড় বয়ে যায়, কাঁপি থর্‌ থর্‌।

যাযাবর

মূল : মুরাদ খান শিন্‌ওয়ারী

অনুবাদ : কাজী মাসুম

যখন সূর্যের উত্তপ্ত কিরণজাল তেরাই-এর পর্বতশ্রেণী হতে বরফের সাদা চাদর সরিয়ে দিল এবং পেশোয়ারের বিস্তৃত প্রান্তরে গ্রীষ্মের আগমন হল তখন তেরাই-এর হিম-শীতল বায়ু আমার মনে শিহরণ জাগালো। আমরা খচ্চর, গাধা ইত্যাদি জানোয়ারের পিঠে আমাদের মালপত্র বোঝাই করে তেরাইয়ের দিকে অগ্রসর হলাম।

পেশোয়ারের মাঠের পথে তখন মেয়েরা বুনো শাকে ঝুড়ি ভর্তি করে রাস্তা চলছিল। রাস্তার উপরের চলমান পুরোনো টাঙ্গার ঘড় ঘড় শব্দে আমাদের আন্‌কা খচ্চর, গাধাগুলো ভড়কে যাচ্ছিল বার বার। দুপুরের পরই আমরা যাযাবরদের এলাকায় পৌঁছে গেলাম। পাথরের টুকরোর মেটে রঙা দেয়াল ঘেরা বাড়ীগুলো যেন পাহাড়ের আঁচলে অলসভাবে শুয়ে হাই তুলছিল, আর তার মাঝে মাঝে বর্ষণ-সৃষ্ট খালগুলো আলেফ-লায়লার কাহিনীর কল্পিত অজগরের মত ঘুরপাক খেয়ে অনেক দূরে মাথা লুকিয়ে পড়েছিল। বাঁ দিকে আখরোটের বন জঙ্গল, তার নীচে ধ্বস—একটা পরিত্যক্ত গ্রাম—এখন শুধু বাড়ীর ভিৎ আর দেয়ালের ইঁটগুলো দেখা যাচ্ছে। আমার পা কাঁপছিল থর থর করে আর মাথায়ও চক্কর আসছিল।

আমার ছোট পৌত্র যেতে যেতে একটু দাঁড়াল, তার-পর হঠাৎ প্রশ্ন করল : "দাদা, সামনে যে ছাড়া-গাঁ আর ধ্বস দেখা যাচ্ছে, এটা নজীব খানের গ্রাম না ?"

"হ্যাঁ ভাই, এই সেই নজীব খানের গ্রাম।"

তার প্রশ্নের জওয়াব পেয়ে সে সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল : "কি হয়েছে দাদা ? তোমার পা কাঁপছে কেন ? তুমি কি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ?"

"হ্যাঁ, মনে করছি এখানে একটু বসে জিরিয়ে নিই।"

তারপরই আমরা রাস্তার মাঝখানে বসে পড়লাম।

"দাদা ! নজীব খান বেঁচে আছেন ?"

"হ্যাঁ, ভাই ! তিনি বেঁচে আছেন !"

"তাহলে গাঁয়ে ফিরে আসেন না কেন ? তুমি তো বলতে তিনি খুবই সাহসী আর নির্ভীক ছিলেন !"

"নিরুপায় হয়েই তিনি আসতে পারছেন না।"

"কিন্তু দাদা ! তুমি তো তাঁর সাথে অনেক দিন কাটিয়েছ, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, কোন্ এমন শক্তি তাঁকে বাধ্য করেছে নিজের গ্রাম ছেড়ে পালাতে ?"

আমার পৌত্রের এই প্রশ্নে আমার মনে অতীতের কথা জেগে উঠল। নজীব খানের শক্ত-সমর্থ দেহ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুস্থ সবল হাত-পা, চিতা বাঘের মত উজ্জ্বল লাল চোখ, আর তাঁর দক্ষিণ-হস্ত খানজাদা—তাঁর ছোট ভাই, এক আকর্ষক পৌরুষমণ্ডিত, গোলাপের মত রং, সবল দেহ, লম্বা ঘন গুম্ফ আর হাসিমাখা ওষ্ঠদ্বয় আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"দাদা, তুমি আমার কথার জওয়াব দিলেনা তো ?" আমার পৌত্র আমার অতীতের সোনালী স্বপ্নকে ভেঙে দিল।

"ভাই, সেকথা অনেক লম্বা-চওড়া।"

"তা হোক, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে, আর আমাদের এত তাড়া কিসের ? ঘরেই তো যাবো !"

"আচ্ছা, তাহলে শোন !" তার অনুরোধের কাছে আমাকে হার মানতে হল।

: একুশ বছর আগে, তখন আমি আর যুবক ছিলাম না, বরং প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছতে যাচ্ছি ; আর লড়াইতে বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য আমার নামও বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এইজন্যই নজীব খান আমাকে খুব আদর করতেন এবং প্রতিটি কাজেই আমার পরামর্শ নিতেন। তারই অনুরোধ-উপরোধে পড়ে শেষে আমিও সেই ডাকাত দলে ভিড়ে গেলাম। আমরা প্রায়ই ইংরেজ সিপাইদের উপর হামলা করতাম।

একবার এমনি একটা ফৌজী ছাউনীতে ডাকাতি করায় অনেকগুলো বন্দুক আমাদের হাতে আসে। এ খবরটা কি করে যেন গাঁয়ের মালিকের কানে গিয়ে পৌঁছল, আর খবর শুনেই তার জিবেয় পানি টপকাতে শুরু করল। সে নজীব খানকে ডেকে পাঠাল। নজীব খান এইসব মালিকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। তিনি নিজে না গিয়ে আমাকে আর খানজাদাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা মালিকের ঘরে গিয়ে দেখলাম, তিনি একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। একটা অর্ধনগ্ন ছোকরা চাকর হাতে কলকে নিয়ে মাটিতে বসে ছিল। মালিক হুঁকোর নইচের উপর হাত রেখে তার সামনে উপবিষ্ট লোকদের সাথে আলাপ করছিল। ছেলেটা অনেকক্ষণ বসে বসে উত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। সে একদৃষ্টে মালিকের মুখের দিকে চেয়েছিল, মনে মনে যেন বলছিল : হে নিষ্ঠুর মালিক, আমার দুর্বল হাতের উপর একটু দয়া কর। হাতটা কল্‌কি ধরে ধরে অবশ হয়ে গেল।

আমরা ঘরে ঢুকতেই মালিক চমকে উঠলো। সে

হুঁকোর নইচেটা ছেড়ে দিয়ে চারপাই ছেড়ে উঠে পড়ল। অত্যন্ত আনন্দের সাথে করমর্দন করে আমাদের অভিনন্দন করল। খানজাদা লাল রঙা একটা বালিশ টেনে নিয়ে চারপাই-এর উপর এমনিভাবে বসে পড়ল যেন তার নিজেরই ঘর।

"নজীব খান কেমন আছেন?" মালিক তার বগলের বালিশটা হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে খানজাদাকে জিজ্ঞেস করল।

"ভালোই আছেন, আপনাকে সালাম বলেছেন, মালিক বাবা!"

"ভাই, আমাদের মত গরীবরা তো তার চোখে পড়বার নয়, তাকে কতবার যে ডাকলাম, তবু একদিনও তার দেখা পেলাম না।" মালিকের ঠোঁটের ফাঁকে একটু মুচকি হাসি দেখা গেল।

"আমি কি করব মালিক বাবা, একথা সে জানে আর আপনি জানেন।"

"কিন্তু কবিলায় বাস করা তো অত সোজা নয়, আজ তোমার পালা, কাল আমার পালা। ঠিক বলিনি খানজাদা খান?"

"আপনি এত সুন্দর কথা বলেন, আপনাকে ছেড়ে কি আমরা দূরে থাকতে পারি কখনো। বলুন, কি করতে হবে, আপনার দড়ির জন্য আমার গলা সব সময়ই হাজির।"

"কথা হল এই যে, তোমরা বার বার সরকারী অস্ত্র লুঠ করেছ, এরজন্য পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে আমাকে জওয়াবদিহি করতে হয়েছে। আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু অস্ত্রগুলো যখন ভাগ করা হলো তখন আমাকে কেউ জিজ্ঞেসও করল না!"

মালিকের শেষের কথাগুলো বিদ্রূপপূর্ণ ছিল। খানজাদার প্রশস্ত ললাটে ক্রোধের রেখা ফুটে উঠল এবং সে একটু শক্তভাবে বলল: "মালিক সাহেব, এতো সেই কথা হল যে, দুঃখ করে ঘুঘু বিবি, ডিম খায় কাক!" মৃত্যুর মুখে আমরা যাই, প্রাণ নিয়ে খেলা করি, আর যদি কিছু লুটে আনি তার ভাগ চাইবে তারা, যারা দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবে। আপনি যে সরকার থেকে বৃত্তি পান, যদি বলি আমরা তার বখরা চাই; তাহলে আপনার মনে কি হবে, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো?"

ঘরে যারা উপস্থিত ছিল, তারা বিস্মিত হয়ে গেল। তারা মুখ নীচু করে খানজাদা আর মালিকের দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখতে লাগল। মালিক কেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠল, বালিশটা হাঁটুর নীচে থেকে বের করে এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল: "আচ্ছা, ঠিক আছে, ফকিরের লাঠি হল শত্রু, যদি আমি শিয়াল হয়ে বাঘের ছাল না পরতাম, তাহলে এই এত লোকের সামনে আমার অপমান!"

"আর আমরা যদি এই দুঃসাহসী সংগ্রাম না চালাতাম, তা' হলে আপনাকে কেই বা জিজ্ঞেস করত? আমাদের বীরত্বের জন্যই তো আপনি ইংরেজদের কাছে মরতবা পেয়েছেন। আমাদের ডাকাতিই আপনার সরদারির স্থায়িত্বের জামানত।" খানজাদা মালিকের ঢিলের জওয়াবে পাটকেল ছুঁড়লেন। মালিক খাটিয়া ছেড়ে ছিলে ছেড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"তুমি আমার ঘরে বসে এই কথা বলতে সাহসী হলে? আচ্ছা, ঠিক আছে, বিষের পেয়ালা পান করবই আমি। আর ইংরেজদের সব মাল তোমরাই হজম কর। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, মানুষ যখন ঘরের শত্রুর সন্ধান পায় তখন তার গলা না টিপে ছাড়ে না। শোন, এখন থেকে তোমরা হুঁশিয়ার থেকো।" মালিকের মুখ দিয়ে রাগেরচোটে ফেনা বের হচ্ছিল।

"দৈবের লেখা কে খণ্ডাতে পারে মালিক সাহেব!" খানজাদা জওয়াব দিল। তারপর আমরা আমাদের বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

এক রাত্রে আমরা নজীব খানের ঘরে বসে লালশের রবাবীর কাছে কেচ্ছা শুনছিলাম। সেই কেচ্ছার মজলিসে আমরা তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে যেন দরজায় করাঘাত করল, খানজাদা উঠে বাইরে গেল, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দেরী হয়ে গেল; সে ফিরছে না দেখে নজীব খানও উঠে গেলেন। তারা দু'জন যখন ফিরে এল তখন সবার দৃষ্টিই তাদের দিকে নিবদ্ধ হল। নজীব খান ঘরের মাঝখানে যে আগুনের কুণ্ড ছিল তার পাশে এসে বসে পড়লেন।

"পিঁপড়ের মরণ এলে খোদা তার পাখা গজিয়ে দেন।" নজীব খান শান্তস্বরে বললেন।

"ভাইজান, এখন কথা বলবার সময় নেই।" খানজাদা নজীব খানের কথায় বাধা দিয়ে বললেন: "এমন না হয় যেন সকাল হতে না হতেই আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে ফেলে।"

আমরা একে অপরের দিকে দেখছিলাম, যেন চোখে চোখে জিজ্ঞেস করছিলাম, "ব্যাপার কি?" এমনি সময় খানজাদা নিশ্চিত দৃঢ়তার সাথে বলল, "সকাল হওয়ার আগেই আমাদের গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। কেননা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সেনা এসে গ্রাম ঘিরে ফেলবে। তখন আমাদের বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবে না।"

"কিন্তু এও হতে পারে যে, মামজু মিথ্যে কথা বলেছে। মালিকের এতটা সাহস নাও হতে পারে যে, সমস্ত গ্রাম

সৈন্যরা ঘিরে ফেলবে, আর তার ফল কিছুটাও সে ভোগ করবে না। যদি আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, আর তারপর কিছুই না হয়, তা হলে সারা জীবন নিন্দার ভাগী হয়ে কাটাতে হবে। লোকে বলবে—"বকরির কলিজা, কাপুরুষ, পালিয়েছে!" নজীব খান গর্জন করে বললেন।

"ভাইজান! মামজু মিথ্যেবাদী নয়। এখন অর্ধেক রাত কেটেছে, সময় খুবই কম। এরপর হাত খাপড়িয়ে কোন লাভ হবে না।" খানজাদা বিপদ আসন্ন বুঝে বলল।

রাত্রির সেই ভয়ংকর আঁধারে আমরা যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও শিশুর এক কাফেলা নিয়ে আমাদের গ্রামের জংগল ও পাথরকে আলবেদা বলে রওয়ানা হলাম। আমরা আমাদের এলাকার সীমান্ত পার হয়ে অপরিচিত দেশের পাহাড়ের বিপদসংকুল গুহায় যখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিচ্ছিলাম, তখনই সূর্যের সোনালী কিরণ আমাদের অভিনন্দন জানালো। অচেনা পাথর, আঁধার গুহা আর ভিন্ন দেশের মাটিতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু এই বিদেশকে নিজের দেশ স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলতেই খবর পেলাম—শুধু নজীব খানের গ্রাম নয়, বরং সমস্ত এলাকাতেই জোর তল্লাশী চলেছে আর ইংরেজ সিপাইরা এলাকার মাঠ-ঘাট, অলি-গলি নিজেদের ব্যারাকের মত মনে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল, যেন লোকের খুন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং কবিলার জোয়ান বাহাদুরদের সাপে কেটেছে।

"যখন আত্মীয়ই পর হয়ে যায় তখন আর ইংরেজ সিপাইদের দোষ দিয়ে কি লাভ?" নজীব খান এক ঠাণ্ডা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললেন।

"তিরাই-এর মুক্ত প্রান্তরে পালিতা নির্দোষ কুমারীদের অপমান করার ঘটনা এই প্রথম দেখা গেল। আমাদের আপনজনেরাই ফিরিঙ্গীদের বিনা বাধায় নিজেদের ঘরে ডেকে এনেছে।" খানজাদা তার ধূসর ঘন গুম্ফের মাঝে আঙ্গুল চালাতে চালাতে ক্রোধের সাথে বলল।

"আমি বলছি যে, আমাদের স্বার্থপর সরদার আর ইংরেজ ঘুমন্ত বাঘকে খুঁচিয়ে নিজেদের বিপদই ডেকে আনবে।" এ-কথা বলল ডেরাণ্টে—আমাদের দলের সবার চেয়ে লম্বা, চওড়া এবং প্রশস্ত সিনাওয়ালা নির্ভীক যুবক।

এরপর আমাদের দিন আর রাত সেই অন্ধকার গুহায় কাটতে লাগল। আমাদের রক্তে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। অবশেষে এক রাতে আমরা ইংরেজদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের প্রতিশোধ নিতে রওয়ানা হলাম।

আমাদের দু'শ বলিষ্ঠ সঙ্গী পাহাড়ী চড়াই-উৎরাইয়ের পথে নির্ভীক বকরির মত লাফিয়ে চলছিল। যখন আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চলছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ী গাছ, লতা, গুল্ম সবাই আমাদের সাথে কোমর বেঁধে অভিযানে চলেছে। আমাদের সঙ্গীরা এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন শত শত অজগরকে খুঁচিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে আর তাদের নিঃশ্বাসে আগুনের হলকা ছুটছে।

আমরা ক্রমাগত একদিন আর একরাত চলার পর নেমে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমাদের শরীর ভেঙে পড়ছিল। আমাদের সামনে গভীর অন্ধকারের একটা মোটা চাদর বিছানো ছিল। আর তার মাঝখানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর জোনাকী দেখা যাচ্ছিল। আমি আমার সাথীদের বলছিলাম যে, আমরা কোথায় এসে পড়েছি। এমন সময় একজন জওয়াব দিল, "এই আলোগুলো ফৌজী ছাউনীর।" দমকা পাহাড়ী বাতাসের ঝাপটায় সঙ্গীদের গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমরা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু কথা বুঝতে পারছিলাম না।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পরই আমাদের বীর যোদ্ধারা নীচে নামতে লাগল। কালো পাথরের চোখা চোখা টুকরো গুলো আমাদের পায়ের নীচে পড়ে ঘর ঘর শব্দ করায় রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন আরও বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের পা স্থির হয়ে কোথায়ও দাঁড়াচ্ছিল না, পিছনে গড়িয়ে পড়ছিলাম। একজন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলে আর সকলের চাপা হাসি যেন শূন্যতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। পাহাড়ের পাশে গিয়ে নজীব খান পাথরের দেয়ালের মত দাঁড়ালেন এবং পর মুহূর্তেই আমরা সবাই গিয়ে তাঁর চারপাশে চক্রাকারে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছিল, যেন পাহাড়ী বেগবতী স্রোতস্বতী কোন প্রবল বাধার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

নজীব খান প্রত্যেক লোককে উপযুক্ত জায়গায় দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিপুণভাবে সবাইকে সেই অপরিচিত পাহাড়ে মোর্চা বন্দী করে দিলেন। মনে হল এটা যেন তাঁর অতি পরিচিত জায়গা। শেষে তিনি আমাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমার খড়ের তৈরী পাদুকা পায়ের সাথে জোরে কসে বাঁধলাম। আবছা বৈদ্যুতিক আলোর কাছে যেতে লাগলাম আমরা। যতই আমরা যেতে লাগলাম, বৈদ্যুতিক আলো ততই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখন আমরা শুধু পাঞ্জার উপর চলছিলাম। কাঁটা তারের ঘেরাও-এর বাইরে একটা খাদের আঁধারকে আমাদের আড়াল করে নিলাম। আমাদের সামনেই লোহার ফটক। ভিতরে সৈন্যদের ব্যারাক, সামনে প্রশস্ত বারান্দা, দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি ঝুলছিল। এক

লাইনে ছয়টি খাটিয়া বিছানো ছিল। সশস্ত্র সিপাই ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল এবং যখনই তার ভারী বুটের শব্দ কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে ফৌজী ছাউনীর পিছনের প্রান্তর হতে শৃগালের চীৎকার ভেসে আসছিল। নজীব খান আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন: "উত্তরের খাটিয়ায় যে লোকটা শুয়ে আছে দেখেছ, যার পাশে দেয়ালে বিউগল ঝুলছে, তার উপর লক্ষ্য করে বন্দুক ধর। যখন আমি গুলী করব তখন যেন ব্যর্থ না হয়।"

পরক্ষণেই দুটো গুলী ছোঁড়া হল। সশস্ত্র পাহারাদার ঢলে পড়ল সে গুলীতে, আর মাটিতে পড়ে খানিকক্ষণ জবেহ্ করা মুরগীর মত ছটফট করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার দেহ। অন্য প্রহরী উঠবার আগেই আমরা কাঁটাতারের বেড়ার উপর লেপ বিছিয়ে তার উপর দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সিপাইরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে পালাচ্ছিল। এই আকস্মিক বিপদে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল না যে, কি করবে? সারা ক্যাম্প যেন নীরব হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই যেন ক্যাম্পে কেয়ামত শুরু হল। আমরা নজীব খানের পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম। ডেরাণ্টে আর নজীব খান একটা বাংলোর ভিতর ঢুকে পড়ল। একটু পরেই তারা বেরিয়ে এল। ডেরাণ্টের ঘাড়ে সেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা দেখলাম। নজীব খান একটু রহস্যজনক ভাবে এদিক-ওদিক দেখলেন, তারপর আমাকে ইশারায় আগে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা একে-অপরের পিছনে খুবই নিঃশব্দে চলছিলাম। আমরা তাড়াতাড়ি কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছিলাম। পাহাড়ের চূড়া থেকে আমাদের সাথীরা অনবরত গুলী বর্ষণ করছিল। ডেরাণ্টে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার বোঝা নিয়ে কাঁটা তারের বেড়া পার হয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা একটা পরিখা অতিক্রম করলাম, সেখানে আলোয় আলোয় দিনের মত দেখাচ্ছিল। মেশিনগান আর বন্দুকের গুলীর কোন হিসাব ছিল না। যেন তেন প্রকারে আমরা সেই জায়গাটুকু অতিক্রম করে এক পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এই গোলাগুলীর আগুন নিভতেই আবার আঁধার ছেয়ে এল। আমরা আবার ফিরে এলাম। পাহাড়ের চূড়া, জংগল ইত্যাদি লাফিয়ে দৌড়ে আমরা ইংরেজদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে এসে পড়লাম।

নজীব খান খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন আজ। তাঁকে বসন্তের তাজা গোলাপের মত দেখাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, ব্যাপার কি! যেদিন আমরা ইংরেজদের বড় এক ম্যাগাজিন লুঠ করেছিলাম সেদিনও নজীব খান অতটা খুশী ছিলেন না। আজ তো মাত্র পাঁচ ছ'টা বন্দুক পেয়েছি। আমার দিকে চেয়ে নজীব খান বললেন, "আজ আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। যদিও প্রতিশোধ নেয়ার কথা কখনও ভুলিনি আমি, তবু আজকার প্রতিশোধে আমি খুব খুশী হয়েছি।"

"কি ব্যাপার?" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের কবিলার বেইজ্জতির প্রতিশোধ। এস, দেখে যাও।"

ডেরাণ্টে আমাদের অনেক আগে চলে গেছল। সে একটা পাথরের উপর বসে আমাদের অপেক্ষা করছিল। যখন আমরা তার কাছে পৌঁছলাম তখন নজীব খান তাকে ঘড়িটা খুলবার আদেশ দিলেন। আমরা সবাই নিঃশব্দে তাকে দেখছিলাম, আর ডেরাণ্টে তার গাঁঠরীর গিরোগুলো একে একে খুলছিল। খোলা শেষে সে যখন চাদর সরাল তখন আমাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল! সবার মুখ থেকেই একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল! ফিরিঙ্গিনী! বিড়ালের মত নীল চোখো ফিরিঙ্গিনী। ভয় ও বিস্ময়ে আমাদের দিকে দেখছিল। ডেরাণ্টে একবার হো হো করে হেসে উঠল। তার সেই অট্টহাসি পাথরের মত আমাদের মাথায় ঠোকর খাচ্ছিল। তারপর সে চেঁচিয়ে বলল—"ভাইসব! তোমরা তোমাদের দলপতি নজীব খানের পাত্রী দেখে নাও।" তারপর সকলের মিলিত অট্টহাসি আশপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। নজীব খান তখনই ভ্রূকুঞ্চন করে বললেন; "বাজে কথা বলছ কেন ডেরাণ্টে! মেয়েটাকে আমাদের থেকে একটু আলাদা জায়গায় বসাও। আমি তোমাকে শুধু দেখাতে বলেছিলাম; তুমি দেখছি একটা তামাশা খাড়া করেছ!"

এখনও আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিনি। তাই লোকালয় ছেড়ে দুরতিক্রম্য পাহাড়ী পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে আমাদের গুহায় পৌঁছলাম। ফিরিঙ্গিনীকে একটা আলাদা গুহায় মেয়েদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং নজীব খান নির্দেশ দিলেন, এই ফিরিঙ্গী মেয়েটা আমাদের মেহমান। তার সেবা-যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। যদি এর কোন অসুবিধে হয়; তাহলে তোমাদের মঙ্গল নেই। আর আমরাও অপর একটা গুহায় জিরোতে গেলাম।

সমস্ত গুহায় স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। খানজাদা একপাশে বসে ছোট ছোট পাথর দিয়ে বেল্লা বানাচ্ছিলেন। অপর দিকে নজীব খান বসে একটা পাথরের টুকরো দিয়ে মাটিতে আঁক কষছিলেন। তিনি যেন এক গভীর চিন্তায় পড়েছেন। তাঁর মন যেন কোন ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছিল। খানজাদা তার বেল্লাকে একটা বড় পাথরের ঘায়ে ভেঙে ফেলে মাথা

উঁচু করে বলল : "ভাইসব! তোমরা জান যে, আমরা খুবই ভয়ানক শত্রুতা সাধন করেছি। ইংরেজরা এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। তারা এবার তেরাই-এর সব কিছু নষ্ট করে ফেলবে। এখন আমাদের কি করা উচিত।"

প্রথমতঃ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর শেরমস্ত বলল : ইংরেজরা একটা মেয়ে লোকের জন্য এতটা সাহসী হবেনা যে, কবিলার সবার উপর অত্যাচার করবে।"

নজীব খান বললেন : "কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু যতদিন তেরাই-এ ইংরেজের বৃত্তিভোগী বেঁচে থাকবে ততদিন ইংরেজকে তোমরা ঘরের উনুনের পাশে বসে আছে মনে করবে।"

"তা হলে সবার আগে ইংরেজের বৃত্তিভোগীর সাথেই বোঝাপড়া হওয়া উচিত।" গুহার এক কোণ থেকে ডেরাণ্টে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু আমাদের একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ বললেন, "ছেলে মানুষের মত কথা বলছ কেন ডেরাণ্টে, উট পালতে হলে দরজা বড় রাখা দরকার। আমার কথা মত কাজ করলে খোদা চাহে তো এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পার।"

নজীব খান হাসি মুখে বলল : "হ্যাঁ, আপনি বলুন। আমরা পরামর্শ করবার জন্যই তো এখানে জমায়েত হয়েছি।"

বৃদ্ধ বললেন : "বর্তমানে আমি মনে করি যে, প্রতিটি বৃত্তিভোগী লোকের বাড়ীতে আমাদের বিশ্বস্ত লোক পাঠানো উচিত। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র পাকাবে, তা যেন আমরা তাদের মারফত পেতে পারি।" সকলেই এই পরামর্শ উত্তম মনে করল এবং পরস্পর মঙ্গল কামনা করবার পর জির্গা ভঙ্গ হল।

এক সপ্তাহের পর গ্রাম থেকে খবর এল যে, কতিপয় ইংরেজ এজেণ্ট অপহৃতা ইংরেজ মহিলার সন্ধানে তেরাই-এ আগমন করেছেন এবং খানকিবাজারের মুল্লা সাহেবের সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। যখন আমাদের গুপ্তচর এই খবর শুনাল, তখন আমরা বললাম, আমাদের কবিলার ইজ্জত নষ্ট হয়ে চলেছে এবং আমরা খুবই ব্যথিতও হলাম এই খবরে। আমরা একথাও শুনলাম যে, মুল্লা সাহেবের পুত্র প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন : "নজীব খান ইংরেজ মহিলা অপহরণ করে শরীয়তের খেলাফ কাজ করেছে, সে গোনাহ্ গার, কেননা সে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করেছে—"। আমাদের খুব রাগ হল। এই মুল্লা সাহেবরা তখন কোথায় ছিলেন যখন ইংরেজ সিপাইরা আমাদের মা-বোনকে অপমান করেছিল। তখন কি শরীয়তের কথা মনে ছিল না?"

মামজু, আমাদের সবচেয়ে বড় কর্মী বলল : "আর এই মুল্লার বাচ্চা গোনাহ্ গার নয়? যারা ইংরেজদের ঘুষ খেয়ে মিথ্যে ফতোয়া দেয়।"

আরেকজন সাথী বলল : "চুপ কর মামজু! তুমি কি জানো কিতাবের খবর! হয় ত' এই মামলা কিতাবের কোন কোণে লিখিত ছিল। আমরা মূর্খ তার কি জানবো!"

ইংরেজ সমস্ত এলাকায় তার মায়াজাল বিস্তার করল। ফিরিঙ্গী, বৃত্তিভোগী মালিক আর বেতন ভোগী মুল্লা এই তিনজন সম্মিলিত হয়ে গেল। তারা এবার আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ল। কেননা আমাদের এই ক্ষুদ্র দলটি এখন এই তিন প্রধানের শত্রু হয়ে পড়ল। মুল্লা সাহেবের ছেলে আমাদের সাথে ফিরিঙ্গিনীর ফেরৎ দেয়া সম্বন্ধে কথা চালাতে লাগলেন। কিন্তু নজীব খান কোন শর্তেই তাকে ফেরৎ দিতে রাজী হলেন না।

"তারপর কি হল, দাদা?" আমার পৌত্র আমাকে প্রশ্ন করল।

"আর কি হবে ভাই! দিন এমনি কাটতে লাগল। আমরা স্থির করেছিলাম, ইঁটের জওয়াব পাথরে দেব। যদি শত্রুপক্ষ জয়ী হয়, তাহলে দেশ ছেড়ে চলে যাব। আমাদের প্রতিপক্ষেরও সন্দেহ হয়েছিল যে, নজীব খান অন্যত্র চলে গেলে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে যাবে। তাই হঠাৎ বড় কিছু করবার আগেই ব্যাপারটার আগাগোড়া বিবেচনা করে দেখছিল। যদিও তেরাই-এর অলিগলিতে আমাদের জন্য আগুন বিছিয়ে রাখা হয়েছিল, তবু নজীব খান হতাশ হননি। তিনি চারদিকেই আশার আলো নিরীক্ষণ করছিলেন। তেরাই-এর মুল্লাদের ভিতর এক বড় মুল্লাই ছিলেন ইংরেজের শত্রু এবং তিনি কোন শর্তেই ইংরেজদের সাথে সমঝোতা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, একজন ইংরেজ লেডী ডাক্তার আর কয়েকজন অফিসার তেরাই-এ আগমন করছে তখন তিনি তাদের লিখে পাঠালেন, "যদি আপনাদের কোন ক্ষতি হয়, তার জন্য আমি দায়ী নই, আফ্রিদীরা কিছুতেই তাদের পবিত্র মাতৃভূমির উপর ইংরেজের পদক্ষেপ সহ্য করবে না।"

"কিন্তু ভাই, শয়তান তো বেহেশ্ তেও থাকে। ইংরেজদের এক বড় অফিসার, যিনি রাজনৈতিক চালবাজীতে খ্যাতিলাভ করে ছিলেন, তিনি একদিন বড় মুল্লা সাহেবকে দেখবার বাহানায় গিয়ে হাজির হলেন। একে মুসলমান, তদুপরি মেহমান—মুল্লা সাহেব তাঁর খুব খাতির করলেন। লোকে বলে : এই সাহেব যখন মুল্লা সাহেবের কাছে উপস্থিত হন তখন হাজার দানার তসবিহ তাঁর হাতে ছিল, আর তার উপর বিদ্যুৎগতিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন

করছিলেন। হাত দুটো বক্ষসংলগ্ন ছিল। মুল্লা সাহেবের উপর চোখ পড়তেই সে মাথা নীচু করল, চোখে অশ্রু নির্গত হল। সিক্ত কণ্ঠে বলল: ধন্যবাদ, মুল্লা সাহেব! আপনাকে দেখে আমার জীবন ধন্য হল। এই পাপ চোখে আপনার দর্শন লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।" এইভাবে প্রতি দিন সে তার মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল। মুল্লা সাহেব তাঁকে ধার্মিক মনে করেছিলেন, কিন্তু সে নিতান্তই বক-ধার্মিক ছিল। কিছু দিন সে এখানেই রইল, রাতদিন এবাদৎ করে, কোরান মজিদ তেলাওয়াৎ করে, এইভাবে যখন তার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তার লক্ষ্য এবার অব্যর্থ হবে তখন সে একদিন বলল: "ইংরেজ লেডী ডাক্তার যদি দু'একদিনের জন্য এখানে আসে তাহলে ক্ষতি কি? একথা ঠিকই যে, আমাদের তেরাই-এর পবিত্র ভূমিতে ইংরেজ না আসাই উত্তম; কিন্তু এই নজীব খান কি করছে বলুন তো? আপনি তেরাই-এর পাক জমিনে তাকে কেন ইংরেজ মহিলা নিয়ে বাস করবার আদেশ দিলেন?"

মুল্লা সাহেব সত্যিকার ধার্মিক আর সরল প্রাণ লোক ছিলেন। এই কুচক্রীর ষড়যন্ত্রপূর্ণ চালের সামনে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এবং তখনই নজীব খানকে বলে পাঠালেন: "এখনই ইংরেজ মহিলাকে আমার কাছে নিরাপদে পাঠিয়ে দাও।" খানজাদা একথা শুনতেই তার সমস্ত শরীরে আগুন লেগে গেল। সে গর্জে উঠল: "না, আমরা মুল্লা সাহেবের এই কথা শুনতে রাজী নই! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে তার কোন চুক্তি না হয় তার আগে আমরা ইংরেজ মহিলাকে ফেরৎ দেব না। নতুবা ইংরেজরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে।"

নজীব খান খানজাদার কথা সমর্থন না করে বললেন: "মুল্লা সাহেব আমাদের ধর্মীয় নেতা। এটা তো একটা ফিরিঙ্গিনী—তিনি যদি আমার প্রাণ দিতেও বলেন, তা দিতেও কার্পণ্য করবনা।"

"ইংরেজ মহিলাকে মুল্লা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিল?" আমার পৌত্র প্রশ্ন করল।

"হাঁ ভাই, কিন্তু এর প্রতিদানে নজীব খান কি পেল, তা জান? আহা! সত্যি দিনকাল এতই খারাপ হয়ে গেছে। পরদিনই খবর এল, খানান খানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী আমাদের এলাকার দিকে আসছে। খবর শুনে খানজাদা ক্রোধে অধীর হয়ে গেল, আর নজীব খান রাগে দুঃখে অভিভূত হয়ে জোরে জোরে হুকা টানছিলেন। আমরা ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম যে, এখন কি হবে? তীর ছোড়া হয়ে গেছে—ইংরেজ মহিলা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। যে কবিলার ইজ্জত-আবরুর জন্য আমরা জীবন পণ করেছিলাম, তারাই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজের চাল সফল হয়ে গিয়েছিল আর আমাদের কবিলার ইজ্জত-আবরু নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমরা এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি, এমনি সময় খবর এল, সেনাবাহিনী খানকি বাজারে এসে গেছে। প্রত্যেক কবিলার লোকেরা মুল্লা সাহেবের হুজরার সামনে তাদের গোত্রের ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে পরিকাররূপে মুল্লা সাহেবকে জানিয়ে দিল যে, ইংরেজ রমণীকে বিনা শর্তে ছেড়ে দেয়া হোক, আর নজীব খানকে তার সব সঙ্গীসহ তেরাই থেকে বের করে দেয়া হোক।"

"তারপর কি হল দাদু?" আমার পৌত্র প্রশ্ন করল।

'হল তাই, যা ইংরেজরা চেয়েছিল। নজীব খান তো ইংরেজের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সগোত্রের লোকদের সাথে লড়তে চাইলেন না। তিনি চান না যে, ইংরেজের সাথে লড়াইতে তাঁর গুলীতে তাঁর নিজের কোন আত্মীয় মারা পড়ুক। তিনি হতভাগা গোত্রীয়দের আচরণে কেঁদে ফেল্লেন। কিন্তু কি করবেন তিনি। অবশেষে একদিন নিজের মুষ্টিমেয় সাথীদের জমায়েত করে বল্লেন: "আমার বীর সাথীরা! তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, নজীব খান যা কিছু করেছে—তার নিজের জন্য নয়—সমস্ত দরিদ্র গোত্রের জন্যই তা করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তারা বুঝতে পারল না, তারা বিধর্মী ইংরেজের বৃত্তিভোগী আর ঘুষখোরকে আমার চেয়ে বেশী আপন করে নিল। আমি যত কিছু করেছি, সব তাদের জন্যই করেছি। ইংরেজদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি, আমার গোত্রের লোকদের ইজ্জতের জন্য। আমি ইংরেজকে জানিয়ে দিয়েছি যে, সে যেন আমাদের এই পাকজমিনে না আসে এবং আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে যেন সে কোন দখল না দেয়।" সবলেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল। এটা খুবই দুঃসময় ছিল। নজীব খান বলতে লাগলেন: "আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, ইংরেজের বিলাস ও সম্পদ আমার আত্মীয়দের অন্ধ করে ফেলেছে এবং এই ইংরেজ শাসনই আমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা করতে শিখিয়েছে! নিরুপায় হয়ে কবিলার মঙ্গলের জন্য আমাকে তেরাই ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এই উঁচু পাহাড়ের চূড়া, প্রশস্ত ঝিল এবং বিস্তৃত প্রান্তরকে চিরদিনের মত ছেড়ে দেব আমি।" নজীব খান একথা বলতেই আমাদের সবাই গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল, যেন আমরা কোন সদ্য মৃতের ঘরে বসে আছি।

"কিন্তু আমার ভাইগণ! মনে রেখ, জঙ্গল কখনও ব্যাঘ্র শূন্য হয়না—শিয়ালের রাজত্ব অল্পদিনেরই—আর এই বনে এক নয়, বরং অনেক বাঘ একদিন গর্জে উঠবে।

তোমরা আমার এই কথা লোকের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিও যে, নজীব খান তোমাদের সাথে অভিমান করে চলে গেছে। সে ইচ্ছে করেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে।" তার পরই নজীব খান তাঁর ভাই খানজাদার সঙ্গে তেরাই-এর সীমান্ত ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা দেখছিলাম, কিন্তু তাঁকে বাধা দিতে পারলাম না।

"তার পর কি হল দাদু?" আমার পৌত্র কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল। "বাঘ বন ছেড়ে দিল, শিয়ালের রাজত্ব কায়েম হল। ইংরেজের কর্মচারীরা পর দিন নজীব খানের গ্রাম জ্বালিয়ে দিল। আমাদের বৃত্তি ভোগী ভাইরা নিজের ঘর জ্বলতে দেখে আনন্দিত হলেন। ইংরেজের ঘরে ঘিয়ের চেরাগ জ্বলতে লাগল। সাধারণ লোকে এই দুঃখজনক ঘটনা বুকে হাত দিয়ে দেখতে লাগল। তাদের চোখে যদিও পানি ছিল তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। আমাদের আত্মীয়েরা এক অনৈক্যের অন্ধকার গুহায় ডুবে যেতে লাগল।"

'আর এই বড় বাড়ীটা কার দাদু?"

"এ সেই মালিকের বাড়ী, যিনি নজীব খানের কাছে অতিরিক্ত একটা বন্দুক দেখে সহ্য করতে পারেন নি। আর ইনি ইংরেজদের কাছে সমস্ত তেরাইকে বিক্রি করে দিতে ইচ্ছে করেন।"

বাড়ীর সামনে ধূলিমলিন কালো একটা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ছোকরা চাকর ঝাড়ন দিয়ে সেটা পরিষ্কার করছিল।

দুই পথ

শামসুদ্দীন

॥ এক ॥

বিনিদ্র রাত্রির শেষ : আসিলাম সমুখ প্রান্তরে
কতনা অরণ্য পথ উতরিয়া লংঘি গিরি চুঁড়া ;
দুস্তর বিস্তৃত ধূলি, বালুস্তূপ, চূর্ণ চূর্ণ গুঁড়া
কংকালের ছিল বাধা চলিবার প্রথম প্রহরে।
রবির রক্তিম আভা বৃক্ষ শীর্ষে স্বপ্নের মঞ্জরী
রাতের তুহিন কণা শষ্পদলে স্বর্ণের কাহিনী
ক্ষণিক করিল মুগ্ধ, দূরপথে দেখি হাতছানি
ডাকিল দিগন্ত রেখা অকস্মাৎ আলোক সঞ্চরি।

কোন্ পথ নেব চিনে, কোন্ পথে হব আগুয়ান !
স্তূপিকৃত কংকালের অস্থি গুঁড়া কাঁদিছে যেথায়
একটু পিপাসা বারি, এতটুকু রুটির কারণ,
সেইখানে, অথবা সু-গন্ধ যেথা পাতিছে আসন
রেস্তরাঁ বা গর্বোন্নত লীলায়িত প্রাসাদ-সেবায়
জীবন করিতে ধন্য অমরত্ব সুধা করি পান ?

॥ দুই ॥

কংকালের মাঝে আছে অস্থি মজ্জা, তাই সারাক্ষণ
সুধারস করে পান পৃথিবীর অমৃত সন্তান ;
স্মিত হাসি করে ভোগ, প্রতিপলে জীবন, সন্ধান
মেলেনা যাহার এই রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে কখন।
তুমি চাহ সেই পথে করিতে ভ্রমণ, পিছনে ফেলিয়া
আমাদেরে—যারা এই রূপরস জেনেছে হারাম
জীবন ভরিয়া তার, ভুলিয়াছে যতেক আরাম
ধরণীর প্রতি রন্ধ্রে প্রতি কাজে বিলাস ভুলিয়া।

আকাশ চুম্বিত ঘর বাঁধিবার সাধ যে তোমার,
মাটিতে বসেনা মন উড়ি উড়ি ভাব জাগে তাই ;
আকাশে কুসুম রচ—শ্বেতপদ্ম হৃদয় মোহন।
আমরা চলিতে থাকি সেই পথে আলোক যখন
ঢেকে দেয় ধূলি রথ তোমাদের চলার পাথায়
খরস্রোতা আঁসুধারা বহে চলে জীবন ধারার।

শিল্পসৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য বিচার

শ্রী কুমুদ রঞ্জন সিংহ

শিল্প সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ঐতিহ্য জাতীয় মানদণ্ড। অগ্রগতির পথে মানুষ তার মননশীলতা—রেখায়, লেখায়, সুরে, ঝংকারে, তালে, নৃত্য-গীতে, উৎকর্ষ সাধন করে তোলে; এ-সাধনা একক হয়না। গোটা জাতির ধ্যান-ধারনা এই মুখী হতে হবে। তবেই তার সার্থকতা। সুতরাং সংস্কৃতির ইতিহাস জাতির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংস্কৃতির ইতিহাসকে পৃথক করে জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করা যায় না। কারণ "মানুষের জীবনের সংগে শিল্প চেতনা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে" (বার্ণাড শ)। সুতরাং সমগ্রভাবে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির আলোচনা করতে হলে পাক-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় খুঁজতে হবে শিল্প-কলার রূপ-রেখার লিপি আর লাবণ্য বিলাসের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব; আর সেই দৃষ্টির পথে ইউরোপের ইতিহাসকে পর্য্যালোচনা করে ঘুরে আসতে হবে আমাদের আজকের জীবন পদসঞ্চারের অগ্রগতিতে।

এশিয়ার সংগে ইউরোপের যোগ আধুনিক ইতিহাসের কালের বহু পূর্ব থেকেই আছে। কিন্তু মাত্র এক শতাব্দী আগে হঠাৎ ইউরোপ আবিষ্কার করেছে যে, তারা নাকি এশিয়াবাসীদের চেয়ে সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। প্রাচ্য দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়াই নাকি ইউরোপের কঠিন কর্ত্তব্য। যন্ত্রশিল্পে এবং বিজ্ঞানে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকেই তারা বিচারের মাপকাঠি বলে ধরে নিয়েছে। এদিকে ভাগ্যের পরিহাসে যেমন করে হোক প্রাচ্যের স্বাধীনতাও ইউরোপের কাছে বাধা পড়ল। এতকাল প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে তারা প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতেই বিচার করে এসেছে। তার জীবিত অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি। তা ছাড়া ইউরোপের প্রভাবে প্রাচ্য দেশের বিশেষ করে পাক-ভারতের, ইন্দোচীনের আর ইন্দোনেশিয়ার কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির বুনিয়াদ ক্রমে ক্রমে ধ্বসে গেছে। প্রাশ্চাত্যের কীর্তি কলাপে প্রাচ্যবাসী আমরা এমনই বিমূঢ় হয়ে গেছি যে, আমাদের অতীতকে নিয়ে আমাদের লজ্জার সীমা নেই। পশ্চিম দেশের টুকরো টাকরা কুড়িয়ে নেবার জন্যে আমরা লালায়িত হয়ে উঠেছি।

আমাদের এই মানসিক অস্বাস্থ্যের দিকে স্বদেশী ও বিদেশী চিন্তাবিদরা যে মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ না করেছেন, তা নয়; কিন্তু সফল হননি। এশিয়ায় শিল্পবোধ আজো জনকয়েক বিশেষজ্ঞের আয়ত্তেই আছে। রাশিয়া যেদিন পরাধীন ছিল, সেদিন রাশিয়ার শিল্পেরও এমনি অধোগতি হয়েছিল। একজন শিল্প সমালোচক ভবিষ্যবানী করেছিলেন, "বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই রাশিয়া সকল দেশের পুরোভাগে চলে যাবে। দেশ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হলে, দেশের সামাজিক জীবনে যে সুস্থতার বিকাশ হয়—তার সার্থক ছাপ পড়ে দেশের শিল্প রচনার মধ্যে। কেননা শিল্প সৃষ্টিতেই জাতির গভীর প্রাণস্পন্দনের পরিচয়। রাশিয়ার সেই বুদ্ধি এবং মনের মুক্তি হয়েছে।" (William Sharp: Progress of Art in the 19th Century)

এই ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যে হয় নি। ইতিহাসের দিকেও তাকিয়ে দেখি, মানুষের শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধির কালেই শ্রেষ্ঠতম শিল্প রচনা সম্ভব হয়েছে। শিল্পের অবনতি জাতির জীবনের অবনতিরই লক্ষণ মাত্র। শিল্প রচনা দুজ্ঞেয় কোন রহস্য সম্ভূত নয়। তার জন্য মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক সচেতন কঠোর প্রয়াসের প্রয়োজন। দেশ-বাসীর জীবন্ত আগ্রহ ব্যতীত শিল্পের সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়।

পেরিসেস্থের সময়কার গ্রীসের কথা ভেবে দেখলে একথার তাৎপর্য বুঝা যাবে। সত্য সুন্দরের তরঙ্গ যখন শিল্পীর প্রাণতটে আঘাত করে, তখনই শিল্পীর মধ্যে জেগে ওঠে সৃজন আবেগ বা স্পন্দন;—এই গতি লাস্য থেকে উঠেছে শব্দ, ধ্বনি, মূর্ছনা!

পাক-ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপের নব্য-শিল্প রীতির অন্ধ অনুকরণে মত্ত—এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়। নতুন পথের সন্ধান প্রসংশনীয় সন্দেহ নেই; কিন্তু এ-কথাও বলতে হয় যে, ইউরোপ আজ ভ্রান্ত পথে চলেছে। তাছাড়া, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিল্পের স্বরূপই ভিন্ন। এ-দেশের শিল্পকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলেই আমরা চিরদিন মেনেছি। ইউরোপের মত স্বল্প সংখ্যক শিল্প রসিকের জন্যে আমাদের শিল্প উদ্দিষ্ট নয়। গত এক শতাব্দী ধরে ইউরোপের শিল্পের যত নতুন ধারার জন্ম হয়েছে, সেগুলি পর্য্যায় ক্রমে পূর্বতন ধারারই তীব্র প্রতি-ক্রিয়া মাত্র। পূর্বতনদের সকল কিছু ভালো-মন্দকে পুরোপুরি অস্বীকার করেই এই সকল নতুন রীতির জন্ম। বলতে গেলে পশ্চিমের কোন নির্দ্দিষ্ট রসশাস্ত্র নেই। ফটোগ্রাফি আবিষ্কার হওয়ার পরে বহুকাল শিল্পে 'বাস্তবিকতা'র ফ্যাশান প্রচলিত ছিল। তারপর যখন চিত্র শিল্পকে শিল্পীর মনের ভাব প্রকাশের বাহন করার কথা

মনে এল, তখন পশ্চিমী দেশে ইঙ্গিতপ্রধান যে সকল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছিল, তাদের কারো সংগে কারো মিল নেই। সকলেই দাবী করতে থাকেন শিল্পে একমাত্র তাঁরাই বিশিষ্ট এক বাণী বহন করে এনেছেন। 'ইম্প্রেসনিজম্' থেকে আরম্ভ করে 'কিউবিজম,' 'সুররিয়ালিজম,' ইত্যাদি কত পদ্ধতি এবং তার প্রত্যেকটিকে নিয়ে আবার কত রসিক প্রশস্তি! আমাদের দেশীয় শিল্পীরা কিইবা শিখতে পারেন এঁদের কাছ থেকে? ইউরোপের বাস্তবিকতা কিংবা অতি আধুনিকতাকে অনুকরণ করলে আমাদের আর কোন আশাই থাকবেনা। জন মার্শাল মৌর্য শিল্প কলা সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন এই বলে যে, "মৌর্যযুগের শিল্পে বাস্তব প্রকৃতি পুরোপুরি ছাপ পড়েনি। এ-যেন স্মৃতি থেকে তৈরী ছবি।"

কিন্তু এই ভুল ইউরোপবাসীদের কাছে অল্প কিছু দিন পূর্বে ধরা পড়েছে। ডি-লা ক্রয় লিখেছেনঃ "যথাযথ প্রকৃতির অনুকরণ করাই শিল্পীর সাধনা হতে পারেনা। বিষয়ের ভাবরূপের সৃষ্টি করাই তার সাধনা।" রাস্কিন তাঁর Modern painters-এ লিখেছেন—"যে কোন বঙ্কিম রেখার সৌন্দর্য্য সরল রেখার চেয়ে অনেক বেশী।" আধুনিক 'কিউবিষ্টরা' বলেছেন—"সরল রেখার মধ্যেই জোর। আর জোরই তো সৌন্দর্য্য।" উদাহরণ স্বরূপ কিউবিষ্টরা এক তন্বী মেয়ের কিউবিষ্ট ধারায় আঁকা ছবি উপস্থিত করেছেন। বলা বাহুল্য সেটি যেন এক পাঁজা ইঁটের ছবি। সুররিয়ালিষ্ট এবং কিউবিষ্টরা চান, ছবি দিয়ে তাঁরা দর্শককে একটা কঠিন আঘাত দিয়ে চমকে দেবেন। তাই স্পষ্টতঃই কার্টুন আর ক্যারিকেচারের ভংগি এসে পড়েছে তাঁদের ছবিতে। সুররিয়ালিষ্টরা বাস্তবের পরবর্তী আরো বাস্তবের অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে কল্পনাকে উপস্থিত করেন, তা উন্মাদ অথবা আদিম শিশু মনের পরিচায়ক। ফলে দর্শকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে, তাঁর তথাকথিত শিষ্যেরা পাক-ভারতীয় শিল্পের মূল রস ধারায় আর অবিচল থাকতে পারেনি। "আমাদের আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ছাত্রদের বাস্তব পোর্ট্রেট আঁকবার বা ব্যবহারিক শিল্পের সুন্দর পরিকল্পনা করার ক্ষমতা সাধারণতঃ থাকেইনা। তারা কেবলই ভাবপ্রবণ, কাহিনীগত দুর্বল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অথচ এই সব বিষয়ের সংগে তাদের জীবন্ত কোন অনুভূতির যোগ থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তারা কঠিন কোন সাধনাই করেনা, এমন কি শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন থেকে যতটুকু শিক্ষালাভ করা সম্ভব, তা থেকেও তারা বঞ্চিত। তারা নির্বিচারে প্রাচীন রীতিনীতি পদ্ধতির অন্ধ পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। এককালে এই সব রীতিনীতিই ছিল জীবন্ত। কিন্তু আজ তারা মৃত সংস্কার ছাড়া তো আর কিছু নয়।"—এই সংকটকে আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।

এশিয়ায় বহু জাতির বাস। তবু প্রাচীন কাল থেকেই এশিয়ায় নানা দেশের শিল্পের ইতিহাসে পাক-ভারতের দান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট অশোকের এক পুত্র বৌদ্ধ ধর্মের বাণী বহণ করে একদিন সুদুর খোটান এবং তারিমবাসিনে গিয়েছিলেন। সে সমস্ত স্থানে মন্দির ও বিহারে আজো বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনেক চিহ্নই বর্তমান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং মালয়েও একদিন বহু শিল্প-সংস্কৃতির আশ্চর্য্য মিলন সম্ভব হয়েছিল।

আজ ইন্দোচীন, জাভায়, আঙ্কারায়, বরবুদুরে যে বিশাল পাথরের মন্দির রয়েছে তার মত মন্দির পৃথিবীতে আর কোথাও নেই, পাক-ভারতীয় শিল্পীরাই সে সব মন্দির তৈরী করেছিলেন। চীনে সুং চিত্র শিল্পীদের পরে যখন শিল্পের অধোগতি হয়েছিল তখন ইসলামের ধ্বজাবাহকরাই জীবন্ত ধারার প্রবর্তন করেন। ইরানেই আরব পারস্যের বহুখ্যাত মিষ্টিক সাহিত্যে এই ছাপ থেকে গেছে। আবার পারস্যের শিল্পের রেখাসুষমা ও বর্ণসুষমা এসে পাক-ভারতীয় শিল্পের ধারার সংগে মিলিত হয়। স্থপতি বিদ্যায় ইরাণের অলঙ্করণ ও পাক-ভারতের গঠন সুষমা মিলিত হয়েছিল বলেই একদিন মর্মর স্বপ্ন তাজমহলের রচনা সম্ভবপর হয়।

এশিয়ার ভাবী শিল্প সাধনা কোন পথে যাবে, সে কথা আলোচনা করতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেরই শিল্পের প্রাচীন ইতিহাস ও ধারা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের মত ভাবুকদের চিন্তাধারার সংগেও পরিচিত হওয়া দরকার।

পশ্চিমের রিয়ালিষ্ট এবং ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পের সংগে পরিচিত হওয়া আমাদের শিল্পের পক্ষে ভালোই। পিকাসোর মত বিশিষ্ট চিত্রকরকে বিরূপ সমালোচনা করার সাহস রয়্যাল একাডেমির সদস্যদেরও নেই। কেননা পিকাসো রিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের সকলকে তাঁদের অস্ত্রেই তাঁদের পরাজিত করার ক্ষমতা রাখেন। আমাদের মোগল—সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্যার টমাস রো-ও অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন এই দেখে যে, পাক-ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম চিত্রধারায় শিল্পীদের পক্ষে সমসাময়িক ইউরোপীয় রিয়ালিজমের সাধকদের পরাজিত করা মোটেই কঠিন নয়। পূর্ব দেশের আবহাওয়া এবং অর্থনৈতিক কারণেই আমাদের পক্ষে তৈল এবং প্যাষ্টেল-পদ্ধতি উপযোগী নয়। কেননা এই পদ্ধতিতে আমাদের গভীর

অনুভূতিকে রূপ দেওয়া দুরূহ। ফ্রেস্কো এবং জলের রং এ অঙ্কন পদ্ধতিই আমাদের বৈশিষ্ট্য। এশিয়ার অনেক দেশেই এখনও দৃশ্য চিত্র কিংবা সমুদ্রের ছবি আঁকার রীতি নেই। এটা আমাদের দুর্বলতা। পশ্চিম দেশে যে যে উপায়ে শিল্পে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব হয়েছে, আমাদেরও তার অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি আমেরিকার ফেডারেল আর্ট প্রজেক্ট একহাজার ডলার ব্যয়ে পাঁচ হাজার শিল্পীকে দিয়ে এক লক্ষ ছবি আঁকিয়ে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। তাছাড়া আমেরিকার বহু আর্ট গ্যালারি ও শিল্পী-সংঘও শিল্পীদের কম উৎসাহ দেয় না। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা বোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। শৈশবের শিক্ষা থেকেই তার আরম্ভ হওয়া উচিত। শিশুর মনে সুন্দরের অনুভূতি এবং সহজ অনুকরণের ক্ষমতা অসীম। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অন্তত পক্ষে ভাল ভাল ছবির রঙিন প্রতিলিপি এবং ভাস্কর্যের নমুনা রক্ষা করা উচিত। বিশেষ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে না। শুধু চোখ মেলে দেখলেই হবে। অবশ্য শিল্প শিক্ষকদের জন্য ভালো শিক্ষা কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। স্থপতির প্রতিভাকেও এবার আমাদের স্বদেশের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। সুন্দর পরিকল্পনা এঁরা সহজেই করতে পারেন। এক দিকে অট্টালিকা, সুদীর্ঘ রাজপথ; অন্যদিকে নোংরা বাসের অযোগ্য কদর্য বস্তি—এই অসঙ্গতিকে দূর করতে হবে। যাঁরা দেশের ধন-উৎপাদনের কারণ, সেই সব শ্রমজীবি কৃষকদের বাসস্থানের দুর্গতি লজ্জাকর। আধা ইউরোপীয় ধরনের তৈরী বাড়ী দিয়ে সাজানো শহরকে আমরা বলতে শিখেছি—সুন্দর শহর। মিসর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি যে দেশেই স্থাপত্যের উৎকর্ষ হয়েছিল, সর্বত্রই ব্যবহারিক উপযোগীতা এবং সুসামঞ্জস্যের অপূর্ব মিলন দেখতে পাই। সেই আদর্শই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

আধুনিক কালের স্থাপত্যের সম্বন্ধে মিগফ্রিড গিডিয়ন লিখেছেন:—"যন্ত্র বিপ্লবের সময় থেকে মানুষ ধনের লোভে একবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলেছে। অর্থ-উপার্জনই জীবনের লক্ষ্য হয়েছে। ফলে একধারে গড়ে উঠেছে কদর্য বস্তি, অন্যদিকে বিশাল কদাকার অট্টালিকা শ্রেণী। বিশ্রাম জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। জীবন যে সুন্দর হতে পারে সে কথাই ভুলে গেছি আমরা। বস্তু জগতের যে জ্ঞান আমরা আরহণ করেছি, তা আমাদের মনো জগৎকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। মানুষ হিসাবে তা নিয়ে আমরা উর্ধ্বে উঠিনি। পরিকল্পনা পুনর্গঠনের সকল কথাই ব্যর্থ হবে যদি আমরা আবার পরিপূর্ণ মানুষকে ফিরিয়ে আনতে না পারি।" পশ্চিম দেশের এবং তথা কথিত সভ্য পূর্ব দেশের এই হচ্ছে স্বরূপ। নিজের হাতে গ্রাম ও নগরের সংস্কার করতে হবে আমাদের। না হলে সৌন্দর্যও হারাব, স্বাস্থ্যও হারাব।

এক সময় ধারনা ছিল যে, বুঝি গ্রীকরাই তাঁদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের চর্চা করতে শিখেছিলেন। তাঁদের আসবাব-পত্র, বাসন-কোসন পর্যন্ত তাঁরা শিল্পান্বিত করেছিলেন। কিন্তু অনেকের মনে এ-সন্দেহও হয়েছিল যে, হয় তো গ্রীকেরা নানা জাতের সৌন্দর্য্য চর্চার দ্বারা লাভবান হতে পেরেছিলেন; এবং হয়তো প্রাচ্য দেশ থেকে তাঁরা অনেক কিছু শিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রাচ্য দেশে সুকুমার শিল্প ও ব্যবহারিক শিল্পের মধ্যে কোনকালে জাতিভেদ করা হতো না। চিত্রকর স্থপতি ভাস্করের যে শিল্প-আদর্শ, গজদন্ত শিল্পী, কুমোর, কামার, তন্তুবায় তাঁদেরও সেই আদর্শ ছিল। আজ আমাদের ছোট ছোট কত সুন্দর কারুকার্য্যের ধারাই লুপ্ত হয়ে গেছে। কেন না, আমাদের দেশের বিদগ্ধ সমাজ আর প্রাচীন কারুকার্য্যের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান না। তাঁরা বিদেশী শিল্পের ভক্ত। তা ছাড়া, দেশব্যাপী দরিদ্রের কথা তো বলাই বাহুল্য। ফলে আমাদের কারুশিল্পের ধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। হার্মান্ গোয়েৎস্ মডার্ণ রিভিউ কাগজে লিখেছিলেন: "আমরা যে সব ইউরোপীয় কারুশিল্পের নিদর্শন পছন্দ করি, সে গুলো সবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—যেমন ইউরোপীয় জীবনের সেই সব জঞ্জাল ও দেশের জাহাজী সৈনিক আর খুনীরা সাধারণতঃ উল্কি দিয়ে শরীর এঁকে নেয়, আমাদের প্রাচীন প্রাত্যহিক ব্যবহারের সুন্দর নিদর্শনগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। তার জায়গায় আমরা গ্রহণ করেছি ও-দেশী সিগারেট কেস, টীনে ভর্তি খাদ্য, দেশীয় কারু শিল্পের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। বোধহয় এক যুগের কঠোর পরিশ্রমে এই সব কলঙ্ক দূর করা সম্ভব হতে পারে।

বিদেশী আর্টের ও সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্বগুলি বুঝে নিতে হবে। নচেৎ কিসের ভিত্তির ওপর আমাদের শিল্প চর্চা গড়ে উঠবে? একটি নিকৃষ্ট আর্টের বদলে আর এক ধরনের নিকৃষ্ট আর্টের জন্য যেন আমরা না দেই। বিনা প্রয়োজনের যে আনন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশ-গুপ্ত বলেন,—"সৌন্দর্য্য যে কেবল প্রয়োজনবিহীন তাহা নহে, এক হিসাবে তাহা সত্যবিহীন ও ভালমন্দ মর্য্যাদা বিহীনও বটে।...সৌন্দর্য্যের সহিত আনন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, অথচ এ-আনন্দ সাধারণ প্রয়োজন সিদ্ধির আনন্দ নয়। এ-আনন্দের মধ্যে চাওয়ার তৃপ্তি নাই, কেবল পাওয়ার তৃপ্তি আছে। কিন্তু সেই সংগে এ-কথাও বলিতে হয় যে, সৌন্দর্য্যের সহিত চাওয়াও জড়িত আছে। আমরা সুন্দর গান শুনিতে চাই, সুন্দর কবিতা

শুনিতে চাই, সুন্দর ফুল দেখিতে চাই, সুন্দর ছবি দেখিতে চাই; কিন্তু এখানে চাওয়াটা অন্তরঙ্গ নয়, বহিরঙ্গ। আগে সৌন্দর্য্যের তৃপ্তি, তারপর সেই তৃপ্তিকে আরো দীর্ঘকাল পাইবার জন্য চাওয়া। সৌন্দর্য্যের তৃপ্তি পাওয়ার পরিপূরক নহে।"

রবীন্দ্রনাথ এই কথাই একটি কবিতায় বলেছেন ঃ—

"রহস্যে নিমগন।
এ যে সংগীত, কোথা হতে ওঠে,
এ যে লাবণ্য, কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন, কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।"

মোট কথা অন্তরের প্রেরণাই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূল উৎস।

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

রাসবিহারী ঘোষ

বাঙ্গালী আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সে কালে যাঁরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতাম স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও মিঃ এ, রছুলকে। রাসবিহারী ঘোষকে একদিন এলবার্ট হলের সভায় দেখলাম। দেহে পোষাকের জাকজমক নাই; অথচ মুখচ্ছবিতে, চলায় ফেরায়, এমন একটা আভিজাত্যের দ্যুতি ফুটে ওঠে যে জনসাধারণ তাঁকে একান্ত আপন জেনেও তার কাছে ভিড়তে ভয় পায়। তাঁর আমলে কলকাতা হাইকোর্টে আইন-জ্ঞানে তাঁর জুড়ি কেউ ছিলনা। আমরা তাঁর সম্বন্ধে নানা গল্প শুনতাম।

একবার তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করতে গিয়েছেন। তরুণ বিলাতী জজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লেন, 'ডাক্তার ঘোষ, আপনি যে কি বলছেন, আমি তার কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।' ডাক্তার ঘোষ অমনি উত্তর দিলেন, 'হুজুর, আমি আইনের ব্যাখ্যা করতে পারি, আপনার মাথায় মগজ দিতে পারিনা'। জজ সাহেব চুপ। আর এক বারের কথা। কলকাতা হাইকোর্টে তিনি মামলা করছেন। একটি আইনের তর্ক নিয়ে এক বিলাতী জজ ধমকের সুরে তাঁকে বল্লেন, 'ডাক্তার ঘোষ, আপনি কার সঙ্গে তর্ক করছেন জানেন?' রাসবিহারী বাবু উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ, হুজুর জানি, আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করছি যাঁর ঐ পদ আমাকে গ্রহণ করতে সরকার তিনবার খোশামুদী করেছেন, আর আমি তিনবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছি।' জজ অবাক। আরো একটি ঘটনা। প্রথম যুদ্ধের কাল। জার্মানদের যুদ্ধ জাহাজ এমডেন বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে; কয়েকটি বৃটীশ জাহাজও ডুবিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগের সর্বত্র একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে; কখন বা কোথায় এসে এমডেন হানা দেয়। স্যার রাসবিহারী ঘোষ স্বদেশী করেন আর এদেশ হতে ইংরেজ তাড়াতে চান; তাঁরই দিকে কটাক্ষ করে এক বিলাতী জজ হাইকোর্টে একদিন বল্লেন, 'আমি ভাবি, আজ এমডেন এসে গঙ্গার ঘাটে লাগলে স্যার ঘোষ কি করবেন?' স্যার ঘোষ তৎক্ষনাৎ জওয়াব দিলেন, 'কেন হুজুর? আমি কতকটি লোক জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে এমডেনের লোকদের সাদর অভ্যর্থনা করে আনব। আপনাদের রাজত্ব কাল মধ্যে এই কাজ ছাড়া বাঙ্গালীদেরকে আর কি আপনারা শিখিয়েছেন?' জজ সাহেব নিরুত্তর।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের দান ছিল অফুরন্ত। যত দূর মনে হয়, তাঁর নিজের রোজগার হতে তিনি ৪১ লক্ষ টাকা বিভিন্ন জনহিতকর কাজে দান করে গেছেন।

লোকে তাঁর অদ্ভুত দানশীলতার প্রশংসা করত, তারচেয়েও প্রশংসমান ভাষায় বর্ণনা করত তাঁর আইন জ্ঞানের নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

শোনা যায়, এক মক্কেল কাগজ দিয়ে গেছে; তাতে তার নিজ পক্ষের নথীও আছে, বিপক্ষের নথীও আছে। সেদিন স্যার রাসবিহারী ঘোষকে কি দার্শনিক অন্য মনস্কতায় পেয়ে বসেছিল, কে জানে? তিনি বিপক্ষের কাগজ পড়ে আদালতে দাঁড়িয়ে বিপক্ষকে সমর্থন করে জোর বক্তৃতা শুরু করলেন। পক্ষ হায় হায় করতে লাগল। জুনিয়ার উকীল স্লিপ দিল; তিনি সে স্লিপ পড়লেন; কিন্তু তাঁর বক্তৃতার গতি আগের দিকেই চল্ল। টিফিনের জন্য জজ যখন উঠি উঠি করছেন সেইসময় তিনি বল্লেন, 'হুজুর, বিপক্ষের অনুকূলে যা কিছু আছে, হুজুরের সুবিধার জন্য এতক্ষণ আমি তাই বল্লাম। টিফিনের পর হুজুরের কাছে আমার মক্কেলের পক্ষের কথা পেশ করব।' তিনি তাই করলেন। মামলায় তাঁরই পক্ষের জয় হল।

বিপত্নীক, বন্ধু বিরল, নির্জনতা প্রিয়, কাঞ্চন-জঙ্ঘার মত তিনি আপন একক মহিমায় সাধারণের উর্ধ্বে বিরাজ করতেন।

মিঃ এ, রছুল

মিঃ এ, রছুলের কাছে ছাত্র আমলে কয়েকবার

গিয়েছি। ছোট্ট দেহ, মস্ত মাথা, বাঘা গোঁফ, দুর্জয় সাহস, উন্নত মন, দেশ-গত প্রাণ—সংক্ষেপে এই ছিল তাঁর পরিচয়। 'দি মুছলমান' পত্রিকা তাঁরই বাড়ী হতে বের হত। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তিনি পুলিসের লাঠীও খেয়েছেন। কিন্তু এ-পীড়নে তাঁর মন দমে নাই, তাঁর সংকল্প টলে নাই। তাঁর চেয়ে ছোট ছোট ব্যারিষ্টার হাইকোর্টের জজ হয়েছেন; কিন্তু তিনি কখনো সে পদের ভিখারী হন নাই; সরকারও তাঁকে ডাকা নিরাপদ মনে করেন নাই। গুণগ্রাহী আশু মুখার্জীর আহবানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু পড়াতেন। তখন বড়লাট ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার; তিনি মিঃ এ, রছুলকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সরিয়ে দিলেন। যত দুর মনে হয়, তিনি এ-জন্য বড়লাটের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।

মিঃ এ, রছুলের প্রতি আমাদের মনোভাব ছিল বিপুল বিস্ময় ও বিপুল শ্রদ্ধার। তখনকার দিনে মুছলমান সমাজের কাণ্ডারীদের বেশীর ভাগই কংগ্রেসী মুছলমানদেরে দেখতে পারতেন না। কিন্তু মিঃ এ, রছুলের প্রতি তাদের সম্ভ্রম ভাব অক্ষুন্ন ছিল।

তাঁর এন্তেকাল ছিল পরম বেদনাদায়ক। এক মাত্র সন্তান-মেয়ে। তারই বিয়ে ঠিক হয়েছে। তিনি আগের দিন নিজে তাঁর উকীল ব্যারিষ্টার বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দাওয়াত করে এসেছেন। বিয়ের আঞ্জাম সম্বন্ধে রাত বারোটা পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তারপর গেছেন বিছানায়। সকালে চা তৈরী করে বিবি বসে আছেন তাঁর প্রতীক্ষায়; কিন্তু এ-প্রতীক্ষার কাল আর ফুরালনা। তাঁর দেরী দেখে বিবি গিয়ে তাঁর গায় হাত দিয়ে ডাকলেন। দেখলেন সব শেষ! ঘুমের মধ্যেই তাঁর প্রাণ-পাখী খাঁচা ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

তাঁর লাশ সরকারী গোরস্তানে যাবে, এমন সময় একজন এসে বল্ল, আমি একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি: লাশটি আমায় দিন; আমার নিজ গোরস্তানে আমার আব্বার পাশে এঁকে রাখব, একই সঙ্গে উভয়ের কবর ঝাড় পোছ করব।' সকলে রাজী হলেন। লাশ চল্ল। খানিক দূর গেলে দেখা গেল, স্যার রাসবিহারী ঘোষ খালি পায় দৌড়িয়ে আসছেন। তিনি কাছে এসে লাশবাহী একজনকে সরিয়ে দিয়ে বল্লেন,—'ওঁর লাশটা আমাকে খানিক্ষণ বইতে দাও ভাই; ইনি যে আমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।' উপস্থিতদের কেউ কেউ চোখে রুমাল দিল।

মাহমুদুল হাসান

আমরা সেন্টপলসে থাকতেই কাগজে নানা দিক হতে শুনতে পেতে লাগলাম ইংরেজ সরকারের পীড়ন ও আজাদীর বিপ্লবাত্মক আয়োজনের কথা।

শায়খুল ইছলাম মওলানা মাহমুদুল হাসান তৎকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম বলে সকলের ভক্তিভাজন ছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজের এ-যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ এবং তুরস্কের পরাজয়ের জন্য ভারতীয় মুছলমানদের পক্ষে ইংরেজ সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা উচিৎ, এই মর্মে তাঁর নিকট সরকার তরফ হতে এক ফতোয়া দাবী করা হল। এ-ফতোয়া দিতে তিনি অস্বীকার করে বসলেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাঁকে গেরেফতার করে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিল। মুছলিম ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভের দরিয়া উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

বাইরে ইংরেজ তাড়ানোর আয়োজন

ইতিমধ্যে ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের আয়োজন হতে লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে সব ভারতবাসী জার্মানীতে ছিলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁরাও দেশ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। মৌলভী বরকতউল্লা, ডাক্তার তারকদাস হরদয়াল ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর চেষ্টায় বার্লিনে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এর পরই বরকত উল্লা কাবুলে চলে আসেন। এখানে মওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী ও আরো কয়েকজন মুছলমান যুবক তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

বরকত উল্লা ওবায়েদুল্লা সিন্ধী

বরকত উল্লা তাঁর সহযোগী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বীরেন চ্যাটার্জীর সঙ্গে মিলে কাবুলে স্বাধীন ভারতের একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন। হরদয়াল বার্লিন হতে এই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ রক্ষার ভার নেন। ফলে কাবুল হতে বহু অস্ত্রশস্ত্র গোপনে ভারতে আসতে শুরু করে। অবশেষে ইংরেজরা টের পাওয়ায় এ-পথ বিঘ্ন সঙ্কুল হয়ে ওঠে।

মহেন্দ্র প্রতাপ ও তারকদাস

জার্মানী আশা করেছিল, বরকত উল্লা ও মহেন্দ্র প্রতাপের পরামর্শে আমীর হবিবুল্লা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসেন, তবে তার ফলে ভারত স্বাধীন হোক আর নাই হোক, ইংরেজের বহুসৈন্য সে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হবে। আর সেই সুযোগে তুর্করা মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করতে পারবে।

হবীবুল্লা চালাক ঘুঘু; তিনি ভারতের উপর হামলা করতে রাজী হলেন না। তরুণ-আফগানদের মন এতে

বিস্মিত হইল। তারা আশা করেছিল, এই সুযোগে আফগানিস্তান ইংরেজের মুরুব্বিয়ানার অধীনতা হতে মুক্তি লাভ করবে। হবিবুল্লার কনিষ্ঠ পুত্র নওজোয়ান আমানুল্লা এ-মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে রাজী ছিলেন। শা'জাদার মনের এ-সংবাদ যারা জানত, তারা হবীবুল্লাকে তাদের আজাদীর পথের কাঁটা মনে করতে লাগল। এই অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করে হবীবুল্লার দুশমনেরা তাঁকে গুপ্তঘাতকের হাতে জালালাবাদে নিহত করল।

কাবুলের ষড়যন্ত্র কেন্দ্রের সাথে সাথে শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক ও ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী বাটাভিয়াতে আর দুটি ষড়যন্ত্র কেন্দ্র স্থাপিত হয়। রাসবিহারী ঘোষ আগেই জাপান চলে গিয়েছিলেন—জাপানের সাহায্য পাওয়ার ভরসায়। বিদেশের বহু স্থানে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সহানুভূতি পাওয়া গেলেও বাস্তব কার্যকরী সাহায্য কোন স্থান হতেই পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নাই।

রাসবিহারী ঘোষ ও মানবেন্দ্র রায়

রাসবিহারী বাবু আশা করেছিলেন, রুশ বিজয়ী জাপান অতঃপর প্রাচ্যের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করবে। তিনি জাপানে গিয়ে বুঝলেন, জাপানও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ইংরেজ পক্ষে যোগ দিল; এবং ইংরেজ সরকারের অনুরোধে রাসবিহারীকে জাপান ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিল। নিরুপায় হয়ে তিনি আত্মগোপন করলেন। সেই অবস্থায় দশ বছর কেটে গেল। ১৯৪১ সালে জাপান যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল, তখন রাসবিহারী ঘোষ ভারতবর্ষ উদ্ধারের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

বাংলা হতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাটাভিয়ায় গমন করেন; কিন্তু কাজে সুবিধা করে উঠতে পারেন না; ফলে তিনি ইন্দোনেশীয়া ছেড়ে গিয়ে য়ুরোপ আমেরিকায় দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। এর পর তিনি মানবেন্দ্র রায় (এম-এন রায়) নামে আত্মপ্রকাশ করেন ও ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামে বিপ্লবাত্মক বই-পত্র পাঠাতে থাকেন। আমাকেও তিনি অনেক দিন বই-পত্র পাঠিয়ে ছিলেন এবং তার ফলে আমি বহুদিন পর্যন্ত বিনা পয়সায় পুলিশ পাহারা পেয়েছিলাম। আমি যেখানেই যেতাম, বন্ধুরা সাথে সাথে যেতেন।

কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ভারতে যে বিপ্লব ঘটান সহজ নয়, একথা বিপ্লববাদীরা জানতেন। তাই তাঁরা জাপান, জার্মানী ও তুরস্কের সাহায্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিণামে অমন কোনই কার্যকরী সাহায্য পাওয়াই সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। ফলে সন্ত্রাসবাদীরা আবার গোপন পথে চলতে শুরু করল।

পিতার প্রয়াণ

১৯১৫ সালের আশ্বিনে পূজার ছুটি। বাড়ীতে আছি। সামনে বি-এ পরীক্ষা; ম্যালেরিয়ায় শরীর কঙ্কাল সার; যা পারি পড়ি। পিতার শরীরটা ভাল নয়। আগে অমন শরীর খারাব তাঁর অনেকবার হয়েছে। কাজেই আমি সেদিকে বিশেষ নজর দেই নাই। বড় চার ভাই,—এসব দেখাশুনা তাঁরাই করে থাকেন।

একদিন বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম। কথা শুরু হল।

'ছুটির আর কয় দিন আছে, বাবা?

'সাত দিন।

মাত্র সাত দিন?

'তাই।

'সামনে তোমার পরীক্ষা; আটকে রাখবনা। কিন্তু আমার সাথে এই-ই তোমার আখেরী দেখা।'

'কেন অমন কথা বলছেন আপনি? অনেক বার তো এমন অসুখে আপনি পড়েছেন, আবার ভাল হয়েছেন? এবারো নিশ্চয় আপনি ভাল হয়ে যাবেন।'

'পুত্রের মায়ার ডোর যদি পিতাকে বেঁধে রাখতে পারত, বাবা, তবে বোধহয় এ-দুনিয়া হতে কোন পিতাই বিদায় হতে পারত না।'

'কিন্তু আপনার সময় তো এখনো আসে নাই।'

'সময় আসা না আসা যার বিবেচনার অধীন তার কাছে থেকে যে শমন এসে পড়েছে, এ-তো আমি স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি।'

'কিন্তু……'

'আর কিন্তু নয়, বাবা। অন্য একটা কথা তোমায় বলব।'

'হুকুম করুন।'

'তুমি বিয়ে না করে থাকবে, ঠিক করেছ?'

'জি, তাই।'

'একান্ত মনে দেশের কাজ করবে, এই জন্য?'

'তাই ভেবেছি।'

'আমার কথা রেখো: বিয়ে করো: গৃহী জীবনে মানুষের যে সেবা, সেবা-ধর্মের তার চেয়ে সহজ ও প্রশস্ত পথ আর নাই।'

'বড় কঠিন হুকুম, বাবা; বহু দিনের সংকল্পকে ভাঙ্গতে হবে; কিন্তু তবু কবুল করলাম, আপনার হুকুম তামিল করবো।'

'খুশী হলাম। আরো শোন! দোওয়া করি,

জীবনে বড় হও। কিন্তু বড় হয়ে ভাই বেরাদর, আত্মীয় স্বজন, পয়পড়শী—এদের কখনো ভুলোনা। এদেরে বাদ দিয়ে দেশের সেবা হয় না।'

'এই উপদেশের মর্যাদা আমি রক্ষা করতে চেষ্টা করব, বাবা।'

'বেশ। আর কিছু বলবনা। বড় হয়েছ, এখন সব বোঝ। বুঝে শুনে নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মত হামেশা হক পথে চলতে চেষ্টা করো। আর শোন, যাওয়ার আগে এক মুঠো মাটি আলাদা করে রেখে যেয়ো ঃ আমার কবরে দেওয়ার জন্য।'

চোখে পানি নিয়ে উঠে এলাম। মাটি রেখে যাওয়ার কথা মনে ছিল; কিন্তু মন উঠলনা, মাটি আলাদা করে রাখতে পারলামনা।

দিন তিনেক পরের কথা। পাটের পাইকার এসে বাইর বাড়ী কথা শুরু করেছে মেজ ভাইর সাথে। বাবা তাদেরে ডাকলেন। তারা বিছানার কাছে বসল। বল্ল ঃ

'কেমন আছেন, খাঁ সাব ?'

'আল্লা যে হালে রাখেন, তাতেই শোকর। এ ভবের হাটে তোমাদের সাথে অনেক বেচা-কেনা করেছি ভাই-য়েরা ; দোষ ত্রুটিও নিশ্চয় করেছি অনেক, মাফ করো।'

'আপনি বয়সে মুরুব্বি, আপনিই আমাদের মাফ করবেন।'

'আল্লা সবকে যেন মাফ করেন। আচ্ছা শোন, আমার এ-সংসারের অনেক পাট তো তোমরা কিনেছ—কখনো কিনেছ বাড়ীতে, কখনো হাটে ?'

'তা কিনেছি।'

'আমার পাট ওজনে কখনো কম পেয়েছ ?'

'কখনো না। আপনার পাট ওজন দিলে মণকে এক সের সোয়া সের বেশী হয়, এই তো এ-অঞ্চলের সমস্ত ফরীয়ারা জানে।'

'আমার পাট কখনো ভিজা পেয়েছ ?'

'না। এদেশে এমন শুকনা পাট আমরা আর কোথাও কখনো পাইনা।'

'আমি তো ভাই, চল্লাম ; আবার হয়তো দেখা হবে সেই হাশরের ময়দানে। আচ্ছা, তখন আল্লার আরশের তলে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে ও সাক্ষ্যটা দিতে পারবে না, ভাই ?'

'নিশ্চয় পারব, নিশ্চয় পারব।'

বাবার মুখ মণ্ডলের উপর দিয়ে একটা নির্মল প্রশান্তির আলো ঝিলিমিলি খেলে গেল।

ছুটি শেষে কলকাতা চলে এলাম। বড় ভাই এমাদত আলী খাঁ থাকেন বৈঠক খানায় ইউনিভার্সিটি মেসে, ল' পড়েন, আমি থাকি সেন্টপলস্ কলেজের হোষ্টেলে।'

একদিন বাদ মগরেব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সহপাঠী আজহার মিঞার কামরায় বসে গল্প করছি ; সাথে আরো তিন-চার জন সহপাঠী। একটু পর আজহার মিঞা একটা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্ল,—তোমার ভাইয়ের কাছে এসেছে, তিনি তোমার হাতে দিতে সাহস না পেয়ে আমাকে দিতে বলেছেন।

পড়ে দেখি, পিতার মৃত্যু-সংবাদ। আমি নীরবে চিঠিটা পকেটে রেখে আগের মতই নির্বিকার আলাপ শুরু করলাম। মিনিট পনর পর আমার কামরায় ফিরে এলাম।

বুঝলাম, আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আজহার মিঞা ঐ সহপাঠীদেরে ডেকে এনেছিল। কিন্তু আমি মন আগে হতেই ঠিক করে ফেলেছিলাম। সংকল্প করেছিলাম, পিতার এন্তেকাল জনিত আমার যে পবিত্র গভীর ব্যথা, তাকে অন্যের মৌখিক সহানুভূতি দিয়ে অবমানিত হতে দেবনা, এমন কি আমার চোখের পানি দিয়েও নয়।

সত্যি কাউকে কিছু বলবার অবকাশ দিলামনা ; চোখকে এক ফোটা পানি ফেলতেও নিষেধ করে দিলাম।

পাশের কামরায় থাকে সহপাঠী ভবেশ চৌধুরী— অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। সে অধীর হয়ে বারান্দা দিয়ে ঘোরে, একবার এসে জানালায় ফুচকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

'কেমন আছ ইব্রাহীম ভাই ?'

'ভাল আছি।'

সে চলে যায়। আবার আধ ঘণ্টা খানিক পরে সে আসে। বলে ঃ 'আজ এখনো শুতে যাও নাই, ভাই ?'

'এই যাচ্ছি, দাদা।'

ফের সে নীরবে চলে যায়।

চোখ শাসন মেনে ছিল, ঘুম শাসন মানল না। তাকে বার বার ডেকেও সহজে কাছে আনতে পারলাম না। বিছানায় চুপ করে পড়ে রইলাম ; স্মৃতির পরদায় একে একে ভেসে উঠতে লাগল পিতার সম্পর্কিত হাজারো ছোট বড় কথা। বাইরের লোকের কাছে সে কথার মূল্য নাই, তা বুঝি ; কিন্তু আমার কাছে যে তার কত মূল্য সে কথা কেমনে বুঝাই ?

ছয়টি ছেলে আর একটি মেয়ে রেখে যখন মা চলে গেলেন, তখন সংসার রক্ষার জন্য পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের জন্য তিনি আমরণ ছেলে-মেয়েদের কাছে যেন অপরাধী হয়ে থাকতেন। দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তিনি ছেলে-মেয়েদের অনাদর করছেন, পাছে তাদের মনে এই সন্দেহ জন্মে, এই ভয়ে তিনি নীরবে তাদের বহু অভিমান আদরের অত্যাচার সয়ে গেছেন। তাঁর মাকে আমরা

দেখি নাই; কিন্তু ফজর ও মগরেবের নামাজ অন্তে কতবার যে তাঁকে মায়ের জন্য দোওয়া করতে শুনেছি তার হদ নাই। শুনেছি, তিনি অনেক সময় নিজ হাতে দাদীর পা ধুইয়ে দিতেন। ছয় ফুট লম্বা জোয়ান, পাতলা শরীর, মোটা হাড্ডি, বুলন্দ আওয়াজ—দিনে তিন চার বারের কম খেতেন না: ফজরের আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়েই কিছু খেতেন, আবার এশার নামাজের পর শোয়ার আগে কিছু খেতেন। প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন; অথচ দাঁত তার একটিও নড়ে নাই, পড়তে চশমা লাগে নাই, চলতে লাঠির দরকার হয় নাই, দাড়ি চুল সিকি পরিমাণের বেশী পাকে নাই। অনেক সময় রাত্রিতে দরবার করতে ভিন গাঁয়ে যেতেন। গভীর রাতে বাড়ী ফিরবার কালে সিকি মাইল দূর হতে তিনি যে কাশি দিতেন, বাড়ী হতে তা শোনা যেত। তাঁর মত নিরপেক্ষ, হক বিচারী ও অসহায়ের বন্ধু আমাদের অঞ্চলে সে আমলে আর কেউ ছিল না।

তাঁর শরীর মন উভয়েরই জোর ছিল অসাধারণ। কোন মানুষকেই তিনি ভয় করে চলেন নাই, কোন মেহ্-নতকেই গ্রাহ্য করেন নাই। মাত্র দেড় খাদা জমি সম্বল করে তিনি এক সঙ্গে চারটি ছেলেকে বাইরে পড়তে পাঠিয়ে ছিলেন—একজন হেমনগর হাই স্কুলে, একজন ময়মনসিংহ কলেজে, একজন ঢাকা কলেজে, একজন হুগলী মাদ্রাছায়। লোকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত: 'খাঁ সাহেব, এ হাতীর খোরাক কি করে চলবে?' তিনি শান্ত কণ্ঠে বলতেন, আমি তো নাহক পথে চলি নাই, খোদা আমায় মদদ না করবেন কেন?'

একটি মাত্র ছাড়া তাঁকে কখনো কোন অন্যায় কাজ করতে দেখি নাই। শিক্ষার জন্য তাঁর দরদ ছিল অন্ত-হীন। আশেপাশে সে আমলে যাঁরা আলেম ফাজেল ছিলেন, আমাদের বাড়ীতে তাঁদের আম-দাওয়াত ছিল। তিনি তাঁদের মজলিসে বসে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। তাঁর পরিচিতের মহলে তাঁর স্পষ্টবাদীতার জন্য সকলে তাঁকে সমীহ করে চলত। বিয়ে ঠিক করার বৈঠক। বাবা বর পক্ষে। গড়গড়া মজলিস। মেয়ের বাপের ঐশ্বর্য আছে এবং ঐশ্বর্য সুলভ গর্বও আছে। তিনি কথায় কথায় সেই গর্ব প্রকাশ করে ফেল্লেন। বাবা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আরে সেই জন্যই তো চন্দন তলা থুয়ে এই শেওড়া গাছের তলে এসে বসেছি।' একদিন তিনি গেছেন এক দরবারে। নালিশ—একজন তার প্রতি-বেশীর মুরগী ধরে জবে করেছে, এখন খাওয়া বাকী। আসামী পক্ষে চার পাঁচ জনে এসে সাক্ষ্য দিল যে আসামী তার পালা মোরগ ধরে জবে করেছে। মামলা ফেঁসে গেল। মাতবরেরা দরবার হতে উঠি উঠি করছেন। বাবা বল্লেন—'আমি রান্না করা গোশত্ একটু দেখে আসি দেখে বুঝতে পারব যে সেটা মুরগীর গোশত্ না মোরগের গোশত্।' গোশত্ চামচ দিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে বেরিয়ে পড়ল ছয় সাতটা আণ্ডার এক আস্ত ছড়া। বাবা চামচে করে সেই আণ্ডা দরবারে নিয়ে এলেন। আসামীকে বল্লেন—

'তুমি তো জীবনে কখনো মিছা কথা কওনা?'

'না', কখনো কইনা।

'তোমার সাক্ষীরাও মিছা কথা কয় না?'

'না, তারাও কয়না।'

'কাজেই তুমি যে শুধু একটা মোরগ জবে করেছ, এতে তো আর কোন সন্দেহ নাই?'

'সন্দেহ নাই।'

'বেশ, তোমার কথা আমরা সবাই বিশ্বাস করলাম। তুমি ফরিয়াদীর নালিশ হতে মুক্ত।'

'আপনার মত হক বিচারক আর নাই।'

'কিন্তু এই যে একটা আণ্ডাপাড়া মোরগ তোমার পালে ছিল যা হাজার বছরে একটা পাওয়া যায় না—সেই মোরগ তুমি আমাদের দশজনের অনুমতি ছাড়া যে জবে করেছ, তার জন্য জরিমানা দশ টাকা দিবে কি বিশ টাকা দিবে, তা এখনই আদায় কর।'

আসামী কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দুই মুরগীর দাম এনে ফরিয়াদীকে দিয়ে সকলের হাতে পায়ে ধরে তবে খালাস।

পরীক্ষা শেষে সে মাসে বাড়ী এলাম। পিতার কথা আমি কাউকে পুছ করলাম না; আমাকেও কেউ পুছ করলনা। আমার চোখে পানি নাই দেখে সবাই আত্ম সম্বরণ করে নিল। বাপের কবরের কাছে গেলাম; দোওয়া করলাম। কেউ সাথে গেলনা; কেবল দূর হতে চেয়ে রইল।

কয়েকদিন পর বোনের বাড়ী গেলাম। আমার চোখ শুকনা দেখে তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন, পিতার প্রসঙ্গ কেউই তুল্লাম না। খেতে বসলাম। বোন আমার সামনে বসা। খাওয়া শেষ হয় হয় সময় হঠাৎ চোখ তুলে দেখি, তাঁর চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে। এবার আর আমার চোখ শাসন মানল না। কোন কথা নয়—দুই ভাই-বোন মিলে নীরবে কাঁদলাম।

অনেক ক্ষণপর। বোন দুটো মুখে দিয়ে এসে কাছে বসলেন। বল্লেন, 'বাপের মরণ কালের দুটো কথা শোন।' বল্লাম—'বলুন।'

তিনি বলতে লাগলেন,

'সেদিন শুক্রবার। ভোরে চেতন পেয়েই বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বল্লেন, 'আজ ভাল দিন: আমি যেতে চাই।

'কি যে বলছেন আপনি ?'

'আমি সত্যি বলছি। এ-শুভদিনে তোমরা আমায় বাধা দিয়োনা। আমাকে গোছল দাও; ঘরে আতর আছে—আমার গায় আর কাপড়ে মেখে দাও।'

'আচ্ছা, তাই দিচ্ছি।'

* * *

'হ্যাঁ, মা, ঘাটে কিশতী বাঁধা দেখছি, কিন্তু উঠবার জন্য ডাক তো শুনতে পাচ্ছিনা ?'

'আপনি ভুল দেখছেন।'

'ভুল নয় রে মা, ভুল নয়। আচ্ছা, ঐ আজান পড়ল বুঝি ?'

'হ্যাঁ, জুমআর আজান।'

'তবে জুমআর আগে আর যাওয়া হলনা। আচ্ছা, মা, বাড়ীর সবাইকে বল, মছজিদে যাক; এ-বেলা যখন যাত্রা হলনা, তখন আছরের আগে আমি তরী ছাড়ব না।'

'আচ্ছা, আমি ভাইদের সবাইকে জুমআয় যেতে বলছি।'

'হ্যাঁ; বল।* * বলেছ ? বেশ। একটা কথা মা: এত দীর্ঘ দিনের মেহ্‌নত এই যে আমি বাগান করে গেলাম, এর ফুল তো একদিন ফুটবেই ?

'নিশ্চয় ফুটবে।

'শুধু আমি সে ফুটন্ত বাগান দেখে যেতে পারলাম না।'

'কিন্তু দেশের হাজারো লোক দেখবে, আপনাকে দোওয়া করবে।'

'দোয়া করবে! ভাল। কিন্তু মা, ওপর হতে কোন ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে একটু দেখতে পাবনা ?'

'কেন পাবেন না ? আল্লার রহমত হলে সব দেখতে পাবেন।'

'তাই, মা; আল্লার রহমতে সবই সম্ভব হয়।'

* * * * * *

'মা, আমার পরম ডাক তো যেন শুনতে পাচ্ছি। তোমার মাকে আসতে বল; বাবা কাজিমুদ্দীন কোরান শরীফ নিয়ে কাছে বসুক। বাকী সবাইকেও আসতে বল।'

'আমি ডাকছি তাদেরে।'

'এসেছে ওরা ?

'হ্যাঁ, এসেছে।

'তোমাদের এই যে মা: ওর পেটের ব্যাটা পুত্তুর নাই; তোমাদের জন্য, তোমাদের এ-সংসারের জন্য অনেক খেটেছেন উনি। ওঁকে আপন মায়ের মত আদর যত্নে রেখ।'

'তা, আমরা রাখব, বাবা, নিশ্চয় রাখব।'

'তোমার মায়ের হাতটা আমার হাতে দাও তো, মা ?'

'এই দিচ্ছি।'

'কেঁদনা। তোমার সাথে আমার এই আখেরী বিদায়। আবার আমাদের দেখা হবে—ওপারে। তারই প্রতীক্ষায় থেকো।* * * মরণ ক্ষণে তুমি সরে যেয়ো: আমার বিদায় মুহূর্তে যদি তুমি হাহাকার করে ওঠ, তবে আল্লার পাক কালাম হয় তো কানে নিয়ে যেতে বাধা হবে।* * মা, বাবা সকল, তোমাদের সবারই কাছে আমার বিদায়। কাজিমুদ্দীন, জোরে কোরান তেলাওত কর—আরো জোরে।

আল্লা—আল্লা—আ—ল্—লা.. ..

আদম খাঁর গীত

চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর, সাহিত্যভূষণ

বাংলার 'বারভূঁইয়া'র নাম সর্বজনবিদিত। তন্মধ্যে দেওয়ান ঈশা খাঁ ছিলেন 'মসনদে আলা' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু ভূস্বামীই ছিলেন না, দৈহিক বলেও ছিলেন বলীয়ান। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাহিনীর সহিত যুঝিয়া ও সম্রাট আকবরের প্রবল প্রতাপ জাতযোদ্ধা রাজপুত সেনাপতি রাজা মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বীর্য্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম সোনার অক্ষরে লিখাইয়া বাংগালী জাতিকে চির গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

লোককবি 'মসনদেআলা'কেই অপভ্রংশ 'মছলন্দ আলী' পাঠান্তরে 'মকছন্দ আলী'রূপে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া কাহিনী রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য গীতিকাহিনীর নায়ক গীতিকারের মতে দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদে আলার কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ান আদম খাঁ। ইনি দেওয়ান ঈশা খাঁর ঔরসে ও শ্রীপুরের কেদার রায়ের ভগিনী স্বর্ণময়ীর (গীতিকারের ভাষায় 'অলির নিয়ামত বিবি')' গর্ভজাত কনিষ্ঠ সন্তান।

আদম খাঁ স্বপ্নযোগে তদীয় মামা "কেদাই রাজার (কেদার রায়) কন্যা "উদয়তেরা" (ডাক নাম সুমিত্রা)র রূপদর্শনে তাহার প্রতি আশিক হন এবং মাতার আদেশ নিয়া "ভাটিপাড়া" সেই কন্যার তাল্লাসে গেলে "কেদাই রাজা" বিষপ্রয়োগে আদম খাঁকে মারিয়া পুরাতন জিদ (ঈশা খাঁ কর্তৃক স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করা) মিটাইবার চেষ্টা করিলে "গরিধর মাঝি"র অপার বুদ্ধিমত্তা ও বীর্য্যবলে আদম খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাত্রয় 'বিরাইম খাঁ', 'আবদুল খাঁ', 'জমসর খাঁ' দেওয়ানের সহযোগে ভীষণ লড়াইর পর "কেদাই রাজা" পরাজিত হইয়া "আদম খাঁ"র সহিত "উদয়তেরা"র বিবাহ দিয়া সন্ধি ও পুরাতন কুটুম্বিতা নূতন করেন। গীতিকাহিনীটি মুসলিম বীরত্বব্যঞ্জক ও তমদ্দুনের ধারকবাহক। পাঠক যথাস্থানে তার পরিচয় পাইবেন।

কাহিনী আরম্ভ

নাইরিয়া নাইরিয়া না রে
নারির ভালা না রে—রে
আইজ মায়ের দেওয়ান
ও কি—রে— । ধুয়া।

ভাওয়াল শহরে বা
দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
ধনে জনে আছিলা যে পুরা রে।
ছয় কুড়ি আত্তি (১) বা
ছয় কুড়ি বাব বা
আর আছিল 'বাওন কাহন' ডিংগা রে।
বাইট হাজার পৈলন (২) বা
গরিধর মাঝি বা
আর তিন বেটা (৩) তান ছিল রে।
বিরাইম খাঁ বড় বা
আবদুল খাঁ তান ছোট বা
তান ছোট জমসর খাঁ দেওয়ান রে।
মহা মহা বলী বা
ছিলা তিন ভাই বা
মছলন্দ আলীর বুক আছিল পুরা রে।
তিন তিন বেটায় বা
তিন রাজ্যে দিয়া বা
নিজে রইলা ভাওয়ালপুর শহরে রে।
তিন রাজ্যে রাজত্বি বা
তিন ভাইয়ে করেন বা
বাপের খবর সব সময় না লয় রে।
দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
বুড়া (৪) হৈয়া গেছেন বা
বুড় কালো (৫) ভাবেন মনে মনে রে।
তিন বেটা ছিলা বা
তিন দেশে গেলা বা
মরবার কালো (৬) কে চাইতে আমারে রে।
ভাওপুর রাজত্বি বা
কুনে বা (৭) চালাইত বা
কুনে করতো দফন কাফন রে।
বিরদ (৮) মছলন্দ আলী বা
এই চিন্তা করেন বা
দোয়া মাংগেন আল্লার হুজুরে রে।
শুন দয়াল আল্লা বা
বহুত তুমি দিছো বা
তোমার কাছে কি চাইমু আর আমি রে।

---

(১) হাতী (২) বীর (৩) পুত্র (৪) বৃদ্ধ (৫) বৃদ্ধ বয়সে (৬) সময়ে (৭) কোন জনে (৮) বৃদ্ধ

তোমার কাছে নাহি বা
যদি আমরা চাইমু বা
আর ত চাইবার জাগা নাহি রে।

তিন বেটা দিছ বা
তিন রাজ্য দিছ বা
আছে তারা তিন রাজ্য লইয়া রে।

দুনিয়ার জঞ্জালে বা
তারারে (৯) বেরিছে বা
বিরধ কালে আমার উপায় কি রে।

শুন দয়াল আল্লা বা
তোমার কাছে চাহি বা
এক বেটা দিবায় দয়া করি রে।

মছলন্দ আলী কান্দে বা
আল্লায় তারে শুনে বা
মঞ্জুর তারে করিল আল্লায় রে।

আল্লার হুকুমে বা
অলির নিয়ামত বিবি বা
হামিল (১০) হৈল আল্লার দয়ায় রে।

এক মাসের কালে বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
গর্ভধারী মায়ে তান জানে বা না জানে রে।

দুই মাসের কালে বা
কচু পাতার পানি বা
তিন মাসে লউয়ে (১১) বান্দে গোলা রে।

চারি মাসের কালে বা
হাড়ে মাংসে জোড়া বা
পঞ্চ না মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফুটে রে।

ছয় মাসের কালে বা
ছয় দণ্ড জোটে বা
সাত না মাসের কালে সপ্তগিয়ান থিতি রে।

আট মাসের কালে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
থীর হইল তান মায়ের গতি রে।

নয় মাসের কালে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
পুরা হইলা তান মা'র উদরে রে।

দশ মাস যাইতে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
জন্ম লইলা শুক্কুরবারী রাইতে রে।

এমন ছুরত আল্লায় বা
আদম খাঁরে দিছে বা
আন্ধাইর হইল পশর (১২) রে।

দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
যার বাড়ীতে ছিলা বা
খবর গেল মছলন্দ আলীর আগে রে।

মছলন্দ আলী দেওয়ান বা
তুরিত আন্দর আইবায় বা
দেখবায় আইয়া তোমার সোনার চান্দ্ রে।

খবর শুনিয়া বা
দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
তুরিত গেলা আন্দরে চলিয়া রে।

আতরি (১৩) ঘরে গিয়া বা
দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
দেখে চাইয়া আপন বিবির কুরে (১৪) রে।

সোনার পুতুলা বা
এমন দেখা যায় বা
আন্ধাইর ঘর করিয়াছে পশর রে।

পুতের (১৫) মুখ দেখিয়া বা
দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
খুশীতে হইলা ডগ মগ রে।

খুশী হইয়া দেওয়ান বা
আদম খাঁ নাম থৈলা বা
দাদা আদমের নামে নাম মিলাইয়া রে।

খুশী হৈয়া দেওয়ান বা
দুই রেকাত নমাজ বা
মজিদে (১৬) গিয়া করিলা আদায় রে।

নামাজ আদায় করিয়া বা
দেওয়ান মছলন্দ আলী বা
মালখানাতে গেলা যে চলিয়া রে।

মালখানাতে গিয়া বা
কুঠী দিলা খুলিয়া বা
লুটাই দিলা লক্ষ কড়ুর ধন রে।

ধন দৌলত পাইয়া বা
গরীব কাংগাল বা
দুই হাত উঠাইয়া করেন দোওয়া রে।

ছয়দিন যাইতে বা
দেওয়ান মকছন্দ আলী বা
নাপিত ধুপা কইলা আদম খাঁর রে।

(৯) তাহাদেরে (১০) গর্ভবতী (১১) বক্ষে (১২) আলোকিত (১৩) অতুড় (১৪) কোলে (১৫) পুত্রের (১৬) মসজিদে

বড়র ঘরর পুলা বা
যেমন কুড়র মুলা বা
দিনে দিনে লাগিলা বাড়িতে রে।
এক দুই করি বা
দিন লাগিল যাইতে বা
চান্দের মতন বাড়েন আদম খাঁ রে।
ছয় মাসের কালে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
বসিয়া খেলাইন মায়ের কিনারে রে।
হুরু (১৭) মুখে হাসে বা
যেমন ফুল ফোটে বা
দেখি মায়ের ভরি উঠে বুক রে।
এক বছরের কালে বা
মা ও বাপ ডাকে বা
শুনতে লাগে কোয়িলার (১৮) বুলি রে।
মিঠা মিঠা বুলে বা
মাই বাবা ডাকে বা
শুনি মায়ে পাশরে সকল দুঃখ ওরে।
ঘুর ঘুরাইয়া দৌড়ে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
ধপ ধপাইয়া দলান ধছিয়া পড়ে রে।
পাচ বছর বয়সে বা
ওস্তাদ ডাকিয়া বা
হাওলা কৈলা বিদ্যা শিখিবারে রে।
কোরান কিতাব বা
আদম খাঁয় পড়েন বা
মছলন্দ আলী মারা গেলা এমন সময় কালে রে।
মছলন্দ আলী মৈলা বা
অলির নিয়ামত বিবি বা
অধিকারী হৈল সোনার গাউর রে।
আদম খাঁর নামে বা
বিবির হুকুমত চলে বা
বাড়েন দেওয়ান চান্দের মতন রে।
দশ বছরের কালে বা
দেওয়ান আদম খাঁ
সব বিদ্যা শিখিয়া যে লৈলা রে।
বার বছরের কালে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
ঘুমাই ছিলা মক্তবখানা ঘরে রে।

স্বপন এক দেখিয়া বা
চমকিয়া উঠিয়া বা
দৌড়ে যায় আন্দর বাড়ী চলি রে।
দৌড়ে দেখি আদম খাঁ
চমকিয়া উঠেন তান মা
ত্বরিত করি জিকাইন (১৯) আদম খাঁরে রে।
জলদি করি কও বা
যাদু বাছা আমার বা
কেনে আইলায় কহিবায় আমারে রে।
আদম খাঁয় কৈন গো
অলির নিয়ামত মাই গো
শুইয়া ছিলাম মক্তবখানা ঘরেতে।
স্বপন দেখিলাম গো
মামুর ঘরর ভইন গো
বিয়া কৈলাম শ্রীপুর শহরে রে।
উদয়তেরা নাম গো
সুমিত্রা ডাক নাম গো
রূপে যেমন ফুটাইল চাম্পার কলি রে।
অলির নিয়ামত মাই গো
কহি তোমার আগে গো
বিদায় দিবায় ভাটিপাড়া যাইতে রে।
মামুর বাড়ী যাইমু গো
তকিত (২০) করি চাইমু গো
স্বপন আমার হাছা নি না মিছা রে।
এই কথা শুনিয়া রে
অলির নিয়ামত বিবি রে
পরমাদ গনৈন আপন মনে মনে রে।
তোর বাপ মছলন্দ আলী
ভাওয়ালে বানছিল বাড়ী
গিয়াছিল ভাটিপুর ছয়লাবে রে।
ভাটিপুর গিয়া বা
আমারে দেখিয়া বা
আশিক হইয়া আমার উপরে রে।
আশিক হইয়া বা
বিয়ার পয়গাম দিয়া বা
তোরই মামু কেদাই রাজার আগে রে।
জাতি ধ্বংসের ভয়ে বা
না মানে কেদাইয়ে বা
জোরে আনল ধরিয়া আমারে রে।

(১৭) ছোট (১৮) কোকিলার (১৯) জিজ্ঞাসা করেন (২০) অনুসন্ধান

বাওন কাহন ডিংগা বা
গরিধর ধর মাঝি বা
আর আনছিল সোনা রতন ভাণ্ডারী রে।
সেই বাপের বেটা বা
তুমি না আদম বা
জাতের ধারা যাইব নি মরিলে রে।

আদম খাঁ কইন গো
অলির নিয়ামত মাই গো
দিবায় কি না দিবায় হুকুম জলদি করি কও রে।

অলির নিয়ামত বিবি বা
বিষম ঠেকায় পড়ল বা
কিবা কইতা না পাইন তুকাইয়া রে।

বহুত চিন্তা করিয়া বা
কৈন বাবা আদম খাঁ
তুমি এবো (২১) নিশক্তি ছাবাল রে।

শ্রীপুর গেলে বা
বিপদ যদি পড়ে বা
নিজের বলে পারবায় নি বাঁচিতে রে।

কেদাইর বাড়ী গেলে বা
বাপের কালি দাদ (২২) বা
যদি কেদাই চায়রে লইতে রে।

নিজের বলে ও রে বা
শুনরে আদম খাঁ
লড়িয়া তুমি পারবায় নি আইতে রে।

এ কথা শুনিয়া বা
কৈন দেওয়ান আম খাঁ
শুন শুন অলির নিয়ামত মাই রে।

আশি মালের (২৩) জোর গো
আল্লায় মোরে দিছে গো
কেউ মোরে পারবো নি আটকাইতে রে।

এ কথা শুনিয়া বা
অলির নিয়ামত বিবি বা
কৈন শুন ও পুত আদম রে।

আশি মালের জোর বা
তোমার যদি আছে বা
আওগি দেখি এখান (২৪) কাম করিয়া রে।

তোমার বাপর আমলী বা
ছয় কুড়ি 'আত্তি' বা
দক্ষিণাল জংগলে গেছৈন অরনা হইয়া রে।

তুমি যদি পারবা
ছয় কুড়ি 'আত্তি' বা
দক্ষিণাল জংগল তনে (২৫) আনিতে তুকাইয়া (২৬) রে।

তবে তুমি যাইবায় বা
ভাটিপুর ছয়লাবো বা
যাইবায় তুমি সেই কন্যার তল্লাসে রে।

এই কথা শুনিয়া বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
রয়ানা হৈলা দক্ষিণাল জংগলে রে।

দক্ষিণাল জংগলে গিয়া
দেখৈন দেওয়ান আদম খাঁ
ছ' কুড়ির লগে তিন কুড়ি বাচ্চা রে।

আত্তির পালে যাইতে বা
হকল বড় দাতলা (২৭) বা
কুদিয়া আইল আদম খাঁয় মারিতে রে।

হাত বাড়াইয়া আদম খাঁ
আত্তির হুড় (২৮) ধরিয়া বা
শূন্যে তুলি লাগিল ঘুরাইতে রে।

কুমারের চাক বা
এমন ঘুরায় আদম খাঁ
ঘুরাইতে ঘুরাইতে দিল শূন্যেতে ছাড়িয়া রে।

মাটিতে পড়িয়া বা
হকল বড় দাতলা বা
হাড়ে মাংসে হইয়া গেল গুড়া রে।

'আত্তি' পালে দেখিয়া বা
ডরাইয়া গেলা বা
ন' কুড়ি আত্তি থর থরাইয়া কাঁপে রে।

পরে গিয়া আদম খাঁ
'আত্তি' রে ডাক দিলা বা
ন' কুড়ি 'আত্তি' চললা আগে আগে রে।

বস্তিত যবে আমম খাঁ
'আত্তি' লই বারৈলা বা
বস্তির মানষে এ-কাণ্ড দেখিয়া রে।

দুয়ার বেন্দা দিয়া বা
ঘরে হামায় হকলে বা
দেশ উজাড় করব আইজ মহম্মদ আলীর পুতে রে।

বাড়ীতে আসিয়া বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
বনে ডাকৈন অলির নিয়ামত মাই রে।

(২১) এখনও (২২) প্রতিশোধ (২৩) পালোয়ানের (২৪) একটি (২৫) হইতে (২৬) অনুসন্ধান করিয়া (২৭) পুং হাতী (২৮) শুড়

অলির নিয়ামত মাই গো
বাহির হৈয়া দেখ গো
ন' কুড়ি 'আত্তি' দুয়ারেতে খাড়া রে।
'আত্তি'র পাল দেখিয়া রে
অলির নিয়ামত বিবি রে
পরমাদ গণৈন আপন মনে মনে রে।
বাপের ঘরের বেটা বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
উজাড় করব শ্রীপুর গেলে রে।
এই না কথা ভাবি রে
অলির নিয়ামত বিবি রে
কৈবার লাগৈন আদম খাঁর আগে রে।
আত্তি তুমি আনছ বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
এতে কোন না হৈল বেটাগিরি রে।
নয় কুড়ি বাঘ বা
আনতায় যদি পার বা
তবে যাইবায় ভাটিপুর সয়লাবে রে।
এ রে শুনি আদম খাঁ
খল খলাইয়া হাসে বা
চলি গেলা দক্ষিণাল জঙ্গলে রে।
জংগলেতে গিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
নিরখি নিরখি ঘুরি ঘুরি চায় রে।
তুকাইতে তুকাইতে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
বাঘের পাল পাইল দেখিতে রে।
বাঘের পালে গিয়া বা
সামাইল আদম খাঁ
বেরিয়া লৈলা নয় কুড়ি বাঘে রে।
সংকট দেখিয়া আদম খাঁ
কিনা কাম কৈলা বা
বড় বাঘার ধরিয়া লেংগুড়ে রে।
শূন্যেতে তুলি বাঘে
পালের মাঝে উড়াই মারে
পড়িয়া বাঘা হৈল গুড়া গুড়া রে।
এ রে দেখি বাঘের পাল
ডয়ে কম্পমান বা
ন' কুড়ি বাঘ থর থরাইয়া কাঁপে রে।

করে (২৯) গিয়া আদম খাঁ
বাঘের পাল ডাকায় বা
ন' কুড়ি বাঘ চললা আগে আগে রে।
বস্তিত যবে আদম খাঁ
বাঘ লৈ বাইরলা বা
হিদৈস (৩০) পড়িল সারা দেশ জুড়িয়া রে।
দুয়ার বেন্দা দিয়া বা
মানু গরু লুকায় বা
দেশ উজাড় করব আদম খাঁয় রে।
বাড়ীতে আসিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
মনে ডাকৈন অলির নিয়ামত মাই রে।
অলির নিয়ামত মাই বা
বাহির হৈয়া দেখ গো
ন' কুড়ি বাঘ আনিয়াছি তুকাইয়া রে।
বাঘের পাল দেখিয়া রে
মায়ে পরমাদ গণৈন রে
উজাড় করব শ্রীপুর গেলে রে।
এই না কথা ভাবি রে
অলির নিয়ামত বিবি রে
কৈবার লাগেন আদম খাঁর আগে রে।
বাঘ ডাকাই আনছ বা
এতে পয়লানী বা
শুন্ আদম কইয়া বুঝাই তোরে রে।
তোর বাপের আমলী রে
৮০ মণি খাম্বা (৩১) রে
পার যদি খাড়া যে করিতে রে।
শুন রে আদম খাঁ
তবে তুমি যাইবায় বা
যাইবায় তুমি সেই কন্যার তাল্লাসে রে।
মায়ের কথা শুনিয়া বা
কুদিয়া (৩২) গেলা আদম খাঁ
টান দি তুলে ৮০ মণি খাম্বা রে।
ভুন ভুনাইয়া ঘুরায় বা
যেমন কুমারের চাক বা
ডরে ডরাইল অলির নিয়ামত বিবি রে।
কৈন শুন আদম খাঁ
লম্লম্বা সায়র বা
ডুবাইল আছে 'বাওন কাওন' ডিংগা রে।

(২৯) পিছনে (৩০) হুলস্থূল (৩১) থুনি (৩২) সরবে

সেই ডিংগা যদি বা
তুলি আনতায় পার রা
তবে যাইবায় উদয়তেরার দেশে রে।
এ রে শুনি আদম খাঁ
উঠিয়া লড় দিল বা
চলি গেলা লম্‌লম্বা সায়রে রে।
লমলম্বার পারে বা
গিয়া দেখে আদম খাঁ
জলকুণ্ডুলি এক মাইল জুড়িয়া রে।
হাজারমণি ডিংগা বা
লহমায় তল হয় বা
কুবাই (৩৩) যায় নামিল উদ্দেশ রে।
মনে আল্লায় ভাবিবা
হাতে লইয়া 'কাছি' বা
ঝাপ দি পড়ে লমলম্বা সায়রে।
পানির ঔ যে ঠেলায় বা
পাতাল পুরী নিল বা
গিয়া দেখে তথায় আর এক দেশ রে।
'বাওন কাওন' ডিংগা বা
মাটিত গাড়ি রৈছে বা
চাইয়া দেখে মছলন্দ আলীর পুত্ত রে।
হাজারে বিজারে বা
কত নাও নাকড়া বা
আছে দেখে তথায় গাড়িয়া রে।

'বাওন কাওন' ডিংগায় বা
খেচিয়া কাছি বান্দে বা
বান্‌দিয়া ভাসে দেওয়ান আদম খাঁ রে।
পানির উপরে ভাসিয়া বা
হুকনার (৩৪) ভরে গিয়া বা
কাছিত ধরি খেচিয়া টান দিল রে।
ভুরভুরি ডাকিয়া বা
ডিংগায় উঠিল ভাসিয়া বা
অবাক হইয়া দেশের লোকে চায় রে।
ডিংগা ভাসাইয়া বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
টানিয়া নিলা আপন বাড়ীর ঘাটে রে।
বাড়ীর ঘাটে ডিংগা বা
থৈয়া দেওয়ান আদম খাঁ
ঘনে ডাকৈন অলির নিয়ামত মাই রে।
অলির নিয়ামত মাই গো
বাহির হৈয়া দেখ গো
'বাওন কাওন' ডিংগা আনছি বাড়ীর ঘাটে রে।
অলির নিয়ামত বিবি রে
'বাওন কাওন' ডিংগা রে
দেখি বিবি ভাবৈন মনে মনে রে।
বাপের ঘরের বেটা রে
দেওয়ান বা আদম রে
উজাড় করব শ্রীপুর গেলে রে।

(ক্রমশঃ)

(৩৩) কোথায় (৩৪) শুকনায়।

ডায়েরীর কয়েক পাতা

হাসিব চৌধুরী

॥ এক ॥

প্রথম কলেজে ঢুকি। কয়েক মাস আগে। অবশ্য পড়তে নয় পড়াতে। জীবনের সে-এক অভূত-পূর্ব আনন্দ শিহরণ। এতদিনের আশা আমার—এম, এ, পাশ করব; করব অধ্যাপনা। না! বড় চাকরী চাইনে আমি। চাইনে হতে অজস্র টাকা পয়সার মালিক। কলেজে আমি গড়ে তুলব একটা পরিবেশ। একটা আদর্শ-গত পরিবেশ? আগামী-দিনের নায়ক-নায়িকা—আজকের তরুণ-তরুণী—আমার ছাত্র-ছাত্রী দেশ ও জাতির সেবার আদর্শে হয়ে উঠবে উদ্বুদ্ধ। তাদের গৌরবে গৌরবান্বিত হবে দেশের প্রতিটি মানুষ!

সেশনের শেষ-শেষ! কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ অফ্। শুধু প্রথম আর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের আনাগোনা। ষ্টাফ্ রুমে বসে আছি আমি। উদ্বিগ্ন-মনের উত্তাপে ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাই;—অপেক্ষা করি,—কখন্ থার্ড-পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়বে;—শুরু হবে আমার কর্ম-জীবনের প্রথম পথ-চলা।

এর মধ্যে সহ অধ্যাপক-বন্ধুদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। তাদের হৃদ্যতায় মুগ্ধ হয়ে যাই আমি। ওৎসুক্য নিয়ে তাদের কেউ-কেউ কাছে বসেন—আলাপ করেন দু'চার কথা।

—ডন্ট্ মাইন্ড্। আপনার নামটা প্লিজ্।

—জি, আমার নাম খালেদ।

—পাশ করেছেন?

—গত বছর।

—এর আগে কি কোথাও কোন কলেজে

—না, ফার্ষ্ট এপয়েন্ট্মেন্ট্!

—বেশ! বেশ! তা কেমন লাগছে কলেজ?

—ভালই।

আরও কিছু কিছু আলাপ হয়। ক্রমে সময় এগিয়ে আসে। হৃদয়ের মধ্যে যুগপৎ একটা আনন্দ এবং সংশয়ের মিশ্র অনুভূতি অনুভব করি। মনে মনে বক্তৃতার কথাগুলো গুছিয়ে নিই। প্রথম দিন! খুব জোরালো একটা বক্তৃতা করতে হবে। হ্যাঁ, খুব জোরালো। একটা স্মরণীয় কিছু।

ঢং করে ঘণ্টা বাজে। একের শেষ, অপরের শুরু ঘোষণা করে। রুটিন্টা দেখে নিই একবার। থার্ড-পিরিয়ড্। ফার্ষ্ট ইয়ার আর্টস ক্লাস। রুম নং ইলেভেন। 'রোল-কল'-এর খাতাটা টেবিলের স্তূপ থেকে বেছে নিই আমি। আমার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অধ্যাপক-বন্ধু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান ক্লাসে। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।...

ক্লাসে ঢুকি আমরা। ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়। তাদেরকে বসতে বলে বন্ধু আমার পরিচয় পেশ করেন।

নতুন পাশ করেছেন ইনি। সাহিত্যিক মানুষ। ইত্যাদি ইত্যাদি...

বন্ধু আমাকে রেখে ফিরে আসেন। আমি শক্ত হয়ে বসি পড়ি চেয়ারটায়। বুকের মধ্যে কেমন-যেন তোল পাড় শুরু হয়ে যায়। একেবার সামনের দিকে তাকাই। আন্দাজ করে নিই ছাত্রদের সংখ্যাটা। বক্তৃতার কথা গুলোও আর একবার আওড়ে নিই মনে মনে। তারপর শুরু করি নাম-ডাকা।

—ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর...টেন্...টুয়েনটি... হান্ড্রেড্...

বিচিত্র কণ্ঠস্বরে বিচিত্র-ভঙ্গিতে উত্তর দিয়ে যায় ছাত্রেরা।

প্রেজেন্ট্ স্যার। হেয়ার স্যার, প্রেজেন্ট্ প্লিজ্, হেয়ার প্লিজ্, আই এ্যাম প্লিজ্।...

ভালই লাগে আমার। নাম-ডাকা শেষ করি। এবার উঠে দাঁড়াই। বেশ সোজা হয়ে। এখন সেই বক্তৃতা। (কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে মধ্যম পুরুষের সম্বোধন করতে গিয়ে কেন যেন কথা আট্কে যায় মুখে। জানিনা, সামনের বেঞ্চে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমবয়েসী যে কয়টি ডেক্‌রা জোয়ান ছেলে বসেছিল, তাদের দেখে আমি কিছুটা ভড়্কে গে'ছিলাম-কিনা!)

হ্যাঁ, এখন সেই জোরালো বক্তৃতা। কিন্তু গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে যে! বুকের স্পন্দনটাও বেড়ে চল্‌ছে দ্রুততর। না! ঘাবড়ালে চলবেনা। কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য স্বাভাবিকতা আনতে চেষ্টা করি আমি। তারপর শুরু করি।

"ক'টি মাস আগে ঠিক তোমাদেরও মত আমিও ছিলাম ছাত্র। অম্নি করেই সামনের বেঞ্চিতে বসে আমাকেও শুনতে হয়েছে আমার অধ্যাপকের বক্তৃতা। ছাত্র-জীবনের সেই মধুরতম স্মৃতির কথা স্মরণ করে আজ কেমন যেন মনে একটু বেদনা লাগ্‌ছে।

এরপর একটা ঢোক গিলে নিয়ে আবার বলতে থাকি।

"অবশ্য আনন্দের স্রোতও যে আমার হৃদয়কে আজ

প্লাবিত করে না দিচ্ছে, এমন নয়। বিশেষ করে কর্ম-জীবনের এই প্রথম দিনটিতে বেদনার চেয়ে আনন্দ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আর তা'ছাড়া এ-জগতের কিছুই স্থবির নয়। এখানে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘট্‌ছে। সব কিছুই এগিয়ে চলছে সামনের দিকে।'

কিছুক্ষণ অনর্গল বলে যাই। হঠাৎ এক সময় মনে হয় বক্তৃতায় খেই হারিয়ে ফেল্‌ছি যেন। তাইতো! সবই যে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! কিছুই আর মনে পড়্‌ছেনা দেখছি। কিন্তু এমন তো হয়নি কখনো! বক্তৃতা তো আর আজ নতুন নয়! কত পলিটিক্যাল মিটিং-এ বক্তৃতা দেওয়ার নাম আছে আমার। একটু শক্ত হতে চেষ্টা করি। ঢোক গিলে মুখের জড়তাটা দূর করে নিতে চাই। কিন্তু একি! জিভ্ যে শুকিয়ে একেবারে কারবালা মাঠ! শত চেষ্টা করেও সেখান থেকে এক বিন্দু রস আহরণের আশা বৃথা! তবু জোর করেই কি যেন বলে যেতে থাকি। পা দুটো কেমন টল্‌তে থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রগের বাঁধনগুলো মনে হয় কে যেন ছুরি দিয়ে দিয়ে কেটে কেটে দিচ্ছে! বুকের স্পন্দনটা আরও দ্বিগুণতর হয়ে উঠে। আমার দেহ ও মন এমন করে যে আমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে, এ-আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তবু শেষ পর্য্যন্ত বলেই চলি আমি। কিন্তু কি বলি খেয়াল থাকেনা কিছুই। হঠাৎ এক সময়ে ঘণ্টার শব্দে চেতনা ফিরে পাই। দেখি, নিষ্পলক চোখে ছাত্রেরা চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি তাড়াতাড়ি এ্যাটেন্‌ডেন্‌স্ রেজিষ্টারটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ক্লাস থেকে।

॥ দুই ॥

একটা ক্লান্ত অবসাদে শরীরটা নেতিয়ে পড়ে। ষ্টাফ রুমে এসে কোন রকমে একটা চেয়ারে এলিয়ে দিই শ্রান্ত দেহখানা। লজ্জায় আকর্ণরঞ্জিত হয়ে উঠি বার বার। কেন অমন ঢঙ্ করে বক্তৃতা দিতে গেলাম! সোজাসুজি দু'চার কথা ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করলে এমন কি দোষের হত! সেদিন আর ক্লাস ছিল না আমার। ষ্টাফ্ রুমেও আর বসে থাকা ভাল লাগছিল না মোটেই। সুতরাং হোষ্টেলে রওয়ানা হয়ে পড়ি। রুমে গিয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নে'য়া দরকার। মনটা হাল্‌কা হবে হয়ত।

কিন্তু ঘুমাতে চাইলেই কি সব সময় ঘুম আসে চোখে? না! দুনিয়ার রীতিটাই 'তেলে মাথায় তেল বষা।' মন যখন এম্‌নিই থাকে হালকা-নিরুদ্বেগ, ঘুমের জন্যে তখন চেষ্টাই করতে হয়না কিছু। কিন্তু মন যখন উদ্বেগ পূর্ণ, অস্থির—যখন একমাত্র ঘুমই মানুষের জীবনে (অন্ততঃ ক্ষণিকের জ'ন্যও) এনে দিতে পারে-শান্তি সোয়াস্তি, তখন হয়ত হাজার কসরৎ করেও তার পাত্তা মেলা ভার। বিছানা আঁকড়ে চোখ বুঁজে পড়ে ছিলাম আমি। বক্তৃতার কথাটা ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই! নির্জনতার সুযোগে বরং ওটা মনকে অধিকার করে বসেছিল আরও পুরোপুরি। কি একটা শব্দে হঠাৎ চোখ মেলে তাকাই।

'মে উই কাম্ ইন্ স্যার।'

তাকিয়ে দেখি, খোলা-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কয়েক-জন ছাত্র। হ্যাঁ, ছাত্রই ওরা। হাতে যখন বই রয়েছে।

'ইয়েস্, কাম্ ইন্।' আমি উঠে বসি এবং সম্মতি জানাই।

ওরা আস্তে আস্তে সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। তারপর পরিচয় দেয় নিজেদের।

'আমরা স্যার, ফাষ্ট ইয়ার আর্টসের ছাত্র। আজকে আমাদের সঙ্গেই আপনার প্রথম ক্লাস্ ছিল।'

'অ্যাঁ'—আঁতকে উঠি আমি। যেন সামনে ভূত দেখ্‌তে পাচ্ছি। এতক্ষণ ধরে যে লজ্জাটা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধ্‌ছিল, সেটা যেন আরো তীব্রতর হয়ে উঠে। ওরা এখন কি বল্‌বে কে জানে। হয়ত এখনি ওরা আমার সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করে এসেছে।

—'আপনার বক্তৃতা শুনে, স্যার, আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি।' ওদের কণ্ঠে আন্তরিকতার আমেজ। কিন্তু এ কি বিভ্রান্ত! শেষ পর্যন্ত ওরা ঘরে বয়ে আমাকে ঠাট্টা করতে এলো না কি! আধুনিক যুগের ছেলে-পেলে! বলা যায় না কিছু!

—'এমন করে, স্যার, কেউ কখনো আমাদের উপদেশ দেয় নি।' আমার বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বেরোয় না আমার মুখ থেকে।

—'পড়াশোনার বাইরের জগত সম্পর্কে আপনি স্যার, যা' বলেছেন, তা' যেন আমাদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে আলোর ঝলকানির মত।'—

ওরা আবোল তাবোল বকছে নাকি? কেমন যেন মনে হয় আমার।

—'দেশ জাতির কল্যাণাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র-গঠন, শিক্ষার সাথে বাস্তব-জীবনের যোগ-সম্পাদন,—এসব কথা নতুন না হলেও আপনার কণ্ঠে, স্যার, নতুন করেই যেন এ-সব আজ শুনলাম আমরা।'

অবাক! অবাক!! এসব তো আমি বলতে চেয়ে-ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো সব গোলমেলে হয়ে যায়।

—'আপনাকে ছাত্রেরা সবাই প্রশংসা করছে। আপনি কিন্তু, আমাদের কলেজ ছেড়ে যাবেন না স্যার।' শেষের দিকে ওরা আবদার জানায়।

এতক্ষণ পর আমার মুখ থেকে কথা বেরোয়। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি:

—'না! না! ছেড়ে যাব কেন? আমিতো আপনাদের এখানে থাকতেই এসেছি।'

ওরা আরও কিছুক্ষণ আলাপ করে। তারপর বিদায় নেয়। কিন্তু দু'য়েক পা অগ্রসর হয়েই কি মনে করে ফিরে আসে আবার।

—'স্যার!'

—'অন্য কথা আছে?' জিজ্ঞেসা করি আমি।

—'না, স্যার।' ওরা লজ্জিত হয়।

—'তবে?'

—'আমাদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না, স্যার।'

হেসে উঠি আমি।

—'কি হয়েছে তাতে? ওতে দোষের নেই।'

ওরা জিদ্ ধরে।

—'না স্যার!'

—'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' আশ্বাস দেই ওদের।

ওরা চলে যায়। এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকি ওদের গতি-পথের দিকে। সত্যি! কি অপূর্ব ব্যবহার ওদের! আধুনিক যুগে কলেজের কোন ছাত্রের ব্যবহার যে এমন মিষ্টি-মধুর হতে পারে, তা যেন জানাই ছিল না আগে।..

মনটা তখন হালকা হয়ে গেছে বেশ। যেন বিশ-মণ ওজনের পাথর নেমে গেছে বুকের ,পর থেকে। এতক্ষণে আবার আত্মবিশ্বাসটাও ফিরে পাই আমি। না, আমার দেহ-মন কি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে আমার সঙ্গে!

॥ তিন ॥

কয়েকদিন বেশ কেটে যায়। রোজ ক্লাস নিই দু'য়েকটা। নিজেকে বেশ সহজ মনে হয় এখন। দেহ-মনের আড়ষ্টতা নেই আর। মোটামুটি ভালই লাগে। কিন্তু লজ্জাটা কেটে উঠতে পারি না যেন। বিশেষ করে, ওই যে কয়েক শ' জোড়া চোখ রোজ আমাকে নিরীক্ষণ করে—সেইটে। হ্যাঁ, সত্যি! ভারি লজ্জা লাগে আমার। অসংখ্য জোড়া চোখ। ছোট-বড় নানা আকারের। খালি অথবা চশমা-ঢাকা। চাহনির নানা ভঙ্গি। বক্র, তির্যক, তীক্ষ্ণ কিংবা স্বপ্নালু। নিবদ্ধ আমার মুখে। কি আছে মুখে আমার? অমন করে কি দেখে ওরা? আমি যেন কেমন আল্‌গা হয়ে পড়ছি ধীরে ধীরে। 'ফেস্ ইজ্ দি ইন্‌ডেক্‌স্ অব্ মাইন্‌ড্।' মুখেই নাকি ধরা পড়ে মনের কথা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তবে কি ওরা আমার মনের সীমা খোঁজে? আমারও ইচ্ছে করে অনেক সময়, ওদের মুখের দিকেও অমনি করে অপলক তাকিয়ে দেখে নিই ওদের কোমল বুকের তলটা—যেখানে 'পাঁপড়ি-পাতার বন্ধনে' ঘুমিয়ে আছে ওদের কল্পনা-বিভোর মন!

ধ্যেৎ! মিথ্যে ভাবনা। ওরা আমার মুখের দিকে তাকায়,—কিন্তু আমাকে দেখতে নয়! আমার মনের সীমাও খোঁজে না ওরা। ওরা শোনে আমার কথা। হ্যাঁ, কান দিয়ে আর চোখ দিয়েও। আমরাও শুনেছি অমন!...

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে আসি। দু'মাস। ষ্টাফের সবার সঙ্গে ক্রমে বন্ধুত্ব জমে উঠে। ছাত্রদের দু'চারজনের সঙ্গেও হয় জানা শোনা। দেখতে দেখতে কেটে যায় আরও দু'মাস। কলেজে এখন নতুন সেশনের শুরু। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করি ক্লাস আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিনটির। ঠিক যেন প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মতই। অবশেষে আসে সে দিন। হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়—নতুনের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের।

ঢং করে ঘণ্টা বাজে। রুটিন আগের থেকেই মুখস্থ। তবু দেখে নিই আর একবার। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। সেকেণ্ড্ পিরিয়ড্। ফার্ষ্ট-ইয়ার কম্‌বাইন্‌ড্ ক্লাস। রুম নং টেন্। ক্লাসে উপস্থিত হই। ঘর-ভরা ছেলে উঠে দাঁড়ায়। কচি-কচি অনেকগুলো মুখ। সদ্য স্কুল থেকে এসেছে ওরা। আশা-আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ ওদের বুকে। আজ ওদের নতুন লক্ষ্যে পথ-চলার প্রথম পদক্ষেপ! সুতরাং সংশয়-দ্বিধার দোলাও আছে ওদের মনে। হাত নেড়ে সবাইকে বসবার ইঙ্গিত জানাই। ওরা বসে পড়ে। কিন্তু একি! মেয়েদের যে দেখ্‌ছিনে! ফার্ষ্ট ইয়ার এবার তা হলে 'নিল' নাকি? যাক্ গে মেয়েরা! রোল-কলটা সেরে নিই। ওয়ান—

—'আমি স্যার'—বাইরের থেকে ভেসে আসে মিহিন কণ্ঠস্বর।

ফিরে-তাকাই। দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দশ-বারোটি মেয়ে—যেন এক গুচ্ছ রাঙা গোলাপ।

—'আমি স্যার!'—মিহিন স্বরের পুনরাবৃত্তি ওদের একজনের কণ্ঠে।

'আমি স্যার'—ওদের মাতৃ-মুখে ওই মাতৃ-ভাষার কথাটুকু খুব ভাল লাগে আমার। ভাবিঃ ওরা কি অন্ প্রিন্‌সিপ্‌ল্ বাংলা বলছে? 'মে আই কাম ইন্ স্যার' শুনে শুনে তো কান দুটো একেবারে ঝালাপালা!

—'হ্যাঁ, এসো।' অনুমতি জানাই আমি।

ওরা একে একে ঢুকে পড়ে ক্লাসে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে এক নজর তাকাই ওদের দিকে।

বিচিত্র বেশ-ভূষা ওদের পরণে। সাড়ি-ব্লাউজ, পা,-জামা-ওড়না সবাকেই মানিয়েছে বেশ! দুটো বেঞ্চিতে ভাগাভাগি করে বসে পড়ে ওরা। গায়-গায় ঘেঁষে। তখন

আর ও দু'টো বেঞ্চ নয় আমার চোখে। যেন আকাশের পটে আঁকা সাত-রঙা দুই রঙধনু রেখা।

পুনরায় রোল-কল শুরু করি।

—'ওয়ান, টু, টেন ··টুয়েন্টি···হান্ড্রেড়'। সেই বিচিত্র কণ্ঠে, বিচিত্র উত্তর।

—'ইয়েস স্যার, প্রেজেন্‌ট্ স্যার, হেয়ার প্লিজ্‌···' অবাক হই! ওরা কি রিহার্সাল দিয়ে এসেছে নাকি? সবই যে মুখস্থ!

এবার বক্তৃতা। প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু আজকে আর ঘাবড়াইনে তেমন। স্বাভাবিক কণ্ঠে শুরু করি। বলি অনেক কিছু।

···'তোমরা এতদিন ছিলে নৌকোর যাত্রী। মাঝি তোমাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সে মাঝির ইচ্ছেমত। এখন তোমরা নিজেরাই মাঝি। নৌকোর হাল তোমাদের নিজেদের মুঠোয়। যে দিকে ইচ্ছে সে দিকেই তোমরা এখন নৌকো চালাতে পার। কিন্তু মনে রেখো, জীবনের এক তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ গর্জন-মুখর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হবে তোমাদের। সুতরাং বে-খেয়াল হলে তরী বানচাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।—'

চেয়ে দেখি ওরা যেন আমার কথাগুলো গিলছে। আর একটা অজানা আশংকার ছাপ ভেসে উঠেছে ওদের চোখে-মুখে। হঠাৎ মনে হয় আমার, কাজটা যেন ভাল করছিনে মোটেই। এতসব সাবধানবাণী উচ্চারণ করে ওদের প্রথম দিনের আনন্দটাই যেন মাটি করে দিচ্ছি আমি। তাড়াতাড়ি তাই বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে নিই। চেষ্টা করি ওদের কিছুটা আশ্বাস দিতে।

'ভয় নেই। তোমাদের ভরা-ডুবি হবে না কখনো। আমরা আছি। আমরা তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব সামনের দিকে।'

জানি না, আমার এ-কথায় ওরা শেষ পর্যন্ত কতটুকু আশ্বস্ত হল। কিন্তু আমি সেদিন ক্লাস থেকে ফিরে এসে, আমার এই বক্তৃতার জন্যে একমুহূর্ত-ও প্রসন্ন হতে পারিনি।

॥ চার ॥

নতুন আর পুরাতনের মিলনে কলেজ এখন সরগরম। —সরগরম এর প্রতিটি কক্ষ, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, অপ্রশস্ত বারান্দা। সিঁড়িতে সারাদিন খস্‌-খস্‌ পায়ের শব্দ! একটা এলোমেলো স্রোত যেন। বেশ লাগে আমার। অসংখ্য মনের একটা গতিপ্রবাহ এখানে লক্ষ্য করি আমি। পরিচিত হই এক নতুন পরিবেশের সঙ্গে। পুরাতন ছেলেরা কাছে আসে, আলাপ করে।—আসে নতুন ছেলেরাও। কিন্তু মেয়েরা যেন ডিঙ্গাতে পারে না ওদের স্বাতন্ত্র্যের সীমা। বিশেষ করে নতুনেরা। সুদীর্ঘ দশ বছরের বেড়া-ঘেরা স্কুল-জীবন থেকে হঠাৎ কলেজের এই মুক্ত-প্রাঙ্গণ। অনভ্যস্ত পরিবেশ। খাপ.খাইয়ে নিতে কষ্ট হয় ওদের। তাই দূরে দূরেই থাকে ওরা। একটা অবিশ্বাসের ছাপ ওদের চোখে-মুখে। হরিণীর মত ভীরু ওদের পদচারণা। টানা টানা চোখের দৃষ্টি অস্থির, চঞ্চল। তুলনায় পুরাতনেরা অনেকটা সহজ। ওদের চাঞ্চল্যও কিছুটা কম। কেউ কেউ ওরা কাছেও আসে। কথা বলে। ওদের দিকে তাকাই। লক্ষ্য করি, এই দু'এক বছরেই ওদের কোমল কচি মুখে যেন নেমে এসেছে তাপ-দগ্ধ বৈশাখের দ্বি-প্রাহরিক দাব-দাহ। কেমন মায়া লাগে আমার। মাঝে মাঝে তাই ভাবি ওদের কথা। হ্যাঁ, ভাবি মেয়েদের কথাই! আধুনিক সভ্যতার কি-এক উৎকেন্দ্রিক গতি-স্রোতে ওরা ছিট্‌কে পড়েছে শান্তিময় গৃহের পরিবেশ থেকে। পুরুষের তালে তালে পা ফেলে আজ ওদের পথ-চলার প্রচেষ্টা। কিন্তু তবু নারী জীবনের মাধুর্যটুকু রক্ষা করবার জন্যে কি বিচিত্র প্রয়াস ওদের। বাস্তবতার রূঢ়-স্পর্শে ওদের ভেতরটা পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু বাইরে সেই রঙ-বেরঙের সাজ-পোষাক—সেন্ট-স্নো-পাউডার—অপরূপ প্রসাধন। ওদের প্রকৃতির দু'টো রূপ যেন প্রত্যক্ষ করি আমি। বাইরে ওরা শান্ত। পরিমিত হাসি, পরিমিত কথা—পরিমিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওদের জীবন। কিন্তু ভেতরে ওরা পুরো-পুরি অশান্ত। উচ্ছ্বাস প্রবণ। অতলোত্তাল। আবেগ-মুখর। বারান্দায় যখন ওরা ছন্দোময় পা ফেলে ফেলে হাঁটে—তার স্পর্শ বারান্দাই জানে কি না, কে জানে? কিন্তু ওদের বিশ্রাম-কক্ষ অবিরাম হাসির হুল্লোড়ে জম-জমাট। ওদের প্রকৃতির এই বৈপরীত্যে আমি কেমন যেন কৌতুহল অনুভব করি। ওদের সঙ্গে তাই অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে আমি নিজেই চাই আলাপ করতে। কিন্তু এ-নিয়ে যে কথা উঠতে পারে, তা বুঝতেই পারিনে তখন।

হ্যাঁ, বুঝতে পারি, কয়েক দিন পর।···

সেদিন দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফোর্থ-ইয়ারের একটি মেয়ের সঙ্গে এমনি কি যেন আলাপ করছিলাম। দূর থেকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে দেখছিল কয়েকটি ছেলে। ষ্টাফ-রুম থেকেও মনে হয় কেউ-কেউ লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই উচ্চরোলে সবাই হেসে উঠে একসঙ্গে। আমি কেমন ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে যাই। হাসির উপলক্ষ্যটা যে আমি, তা বুঝতে পারি। কিন্তু কারণটা কেমন অস্পষ্ট থেকে যায়।

তখন ক্লাস ছিল সবার। সবাই ক্লাশে চলে যায়।

রুমে থাকি শুধু আমি আর আমাদের 'বিদু ভাইয়া'। আমাদের অফ-পিরিয়ড্।

বিদু ভাইয়া দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর পুরো নাম সৈয়দ বদরুল আহ্সান। দর্শনের অধ্যাপক হলেও চিন্তাকীট দার্শনিক নন তিনি। বরং বেশ রসিক মানুষ। বয়স পঞ্চাশের উপর। সাদা-সিধে চেহারা। স্ফূর্তি-ভরা মন। সবার সাথে সমান আলাপ। আমি গিয়ে তাঁর পাশের চেয়ারটায় বসতেই একগাল হাল্‌কা-হাসি হেসে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

—'কি রে খালেদ, ব্যাপার কি?'

—'কি বিদু ভাইয়া?' আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাই।

—'ইয়ে, এটা যে কো-এডুকেশন কলেজ জানিস্ তো?'

রসের-ভিয়ানে মাত্রা চড়াতে শুরু করেন বিদু ভাইয়া। সহসা এ-কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি না আমি। জিজ্ঞাসা করি—'কি বলছেন, বিদু ভাইয়া?'

বিদু ভাইয়া মুখ-ভেঙচান।

—'ও—বুঝতে পারছো না? সাদা কথা, তা-ও বুঝতে কষ্ট। বলি, এটা যে মেয়েদেরও কলেজ; মানে—মেয়েরাও এখানে পড়ে, তা জানো তো?'

হেসে উঠি এবার আমি।

—'তা আবার বলতে হবে কেন। হরদম দেখ্‌ছি। নিজেও পড়াচ্ছি!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলছি। তা' বাপু একটু সাবধান। যখন-তখন অত আলাপ-টালাপ—'

বিদু ভাইয়ার ইঙ্গিত বুঝতে পারি। তাই বাধা দিয়ে বলে উঠি—

—'না-না। আলাপ-টালাপ আর কি। ও-একটা কাজের কথা বলছিলাম।'

—'আরে, আরে, জানি। ও-সব কাজের কথা জানি। ইয়ঙ্ ম্যান তোরা কিনা!'

হঠাৎ বিদু ভাইয়া যেন একটু গম্ভীর হয়ে উঠেন। ঠোঁটের কোণ থেকে তার হালকা হাসির রেখাটি মিলিয়ে যায়। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তিনি তাকান আমার মুখে। তারপর জিজ্ঞাসা করেন—'আমি যে তোর বয়সে বড় তা' মানিস্?'

—'মানব না মানে!' উত্তর দিই আমি।

—'তোর চেয়ে এখানে বেশি দিন ধরে চাকরি করছি।'

—'আমি তো সেদিন আসলাম মাত্র।'

—'তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি—'

—নিশ্চয়ই।

—'তাহলে শোন্।' বিদু ভাইয়া বলতে থাকেন। 'বলছিনা, ইয়ঙ্ ম্যান তোরা। কিন্তু তবু মনে রাখিস্, একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্ এ্যান্ড্ রেসপন্‌সিব্‌ল্ পোষ্ট হোল্‌ড্ করছিস। বড় দায়িত্ব-পূর্ণ। পোষ্টের ডিগ্‌নিটি বজায় রেখে চলতে হবে। তাই পারত-পক্ষে নিজেকে একটু দূরে-দূরে রাখতেই চেষ্টা করিস্।'

—'পোষ্টের ডিগ্‌নিটি রেখে চলতে হবে, একথা মানি। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে দুটো কথা বললেই কি ডিগ্‌নিটি নষ্ট হয়ে যায়।'

বিদু ভাইয়ার কথার প্রতিবাদ জানাই আমি।

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ হয়, আলবত হয়।'

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলে উঠেন বিদু ভাইয়া।

—'এ কিন্তু বিদু ভাইয়া দুর্বলতার পরিচয়, আর সংকীর্ণতারও বটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ-কথা সত্য হলে হয়ত হতে পারত; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এ-অকেজো। আজকের দিনে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে মেয়েদেরও চলতে হচ্ছে পথে। সুতরাং একটা পারস্পরিক সমঝোতা, কিছুটা মন জানা-জানির প্রয়োজন আছে বৈ কি।'

এক চোটে কথাগুলো বলে দম নিই আমি।

বিদু ভাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন যেন।

—'আরে, এ যে বক্তৃতা শুরু করলি। নাহ্, তোদের নিয়ে আর পারা যাবেনা দেখছি।'

তাঁর মুখে কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠে।

আমি চুপ করে থাকি।

হঠাৎ কণ্ঠ-স্বরে পরিবর্তন এনে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

—'ইয়ে, তুই কবিতা লিখিস্‌নে?

—'হ্যাঁ, লিখি? সংক্ষিপ্ত উত্তর আমার।

—'বর্ণচোরা, বর্ণচোরা—সব বর্ণচোরার দল।'

আবার বিদু ভাইয়ার অট্টহাস্য।

—'তার অর্থ?'

কৌতূহলী মনের প্রশ্ন আমার।

—'তার অর্থ? দেখ্, যদিও চিরকালটা দর্শনের গুরু-ভার-তত্ত্ব নিয়েই রইলাম, তবু তোদের ওই রবি ঠাকুর-টাকুর কিছুটা পড়া আছে আমার। তার ওই কি সমস্ত কবিতা—'সুপ্তপ্রেম' নাকি 'গুপ্তপ্রেম'—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিরুদ্দেশ যাত্রা—

'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?

বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমারে—'ইয়ে কি যেন—সোনার তরী।'

আমি বাধা দিই। হ্যাঁ, তাই কি হয়েছে?

'আরে থাম্‌না !' ধমকে উঠেন বিদু-ভাইয়া। তারপর আবার বলতে থাকেন।

ইয়ে, আর একটা কবিতা কি যেন ?

ও, হ্যাঁ,—'মানস সুন্দরী'—

'আজ কোন কাজ নয় সব ফেলে দিয়ে আজন্ম সাধনার প্রেয়সী কাছে এস'—

দেখলাম, এ-কবিতাটিও বিদু-ভাইয়ার মুখস্থ নেই তেমন। তবু মিলিয়ে মিলিয়ে তিনি আবৃত্তি করতে থাকেন।

আমি মিটি-মিটি হাসি।

হঠাৎ আমার হাসি দেখে বিদু-ভাইয়া লজ্জিত হয়ে পড়েন। তিনি যে ভুল আবৃত্তি করেছেন তা' বুঝতে পারেন। তাই দুর্বলতা চাপা দেবার জন্যে একেবারে বিকৃত কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠেন যেন।

—'হাস্‌ছিস যে বড়। ভুল হয়ে গেছে, না ? তা তোদের ও-ই সমস্ত অশ্লীল কবিতা আমার মুখস্থ করে রাখা দায়-ই পড়েছে !'

—'অশ্লী-ল !' আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পুরোপুরি।'

মোটা মানুষ বিদু-ভাইয়া। মোটা তার বুদ্ধি। আর মোটা দেহ-খানি সজোরে দুলিয়ে দুলিয়ে কথার জবাব দেন আমার। আমিও সহজে ছাড়তে নারাজ।

—'কি রকম ?'

—'বর্ণচোরা, বর্ণচোরা—সব বর্ণচোরার দল।'

আবার বিদু-ভাইয়ার সেই স্বভাব সুলভ অট্ট হাসি।

ভারি মুস্কিলতো। বিদু-ভাইয়াকে যে বোঝাই দায় ! কথায়-কথায় শুধু ঘোরপ্যাঁচ। একটু বিরক্ত হই।

বলি—'হেয়ালি রেখে আসল কথাটা একটু বুঝিয়ে দিন না—'

কিন্তু বিদু-ভাইয়ের সঙ্গে পেরে উঠবার জো নেই। রসিক মানুষ। রসিকতা নিয়েই মাতাল।

—'হেঁয়ালি ? তোদের তো হেঁয়ালি নিয়েই কারবার হে। তা বাপু, রবি ঠাকুরকে যাই বলি, তবু তাকে বোঝা যায়। কিন্তু তোরা যে একেবারে দুর্বোধ্য।'

—'মানে, আধুনিক কবিতার কথা বলছেন তো ? ও আপনার দর্শনের তত্ত্ববোঝাই বৃহৎ মস্তিষ্কে কুলোবেনা। সূক্ষ্ম অনুভূতি চাই।'—ফোড়ন কাটি আমি।

'কি বললি ?' কৃত্রিম গাম্ভীর্য বিদু-ভাইয়ার মুখে।

হেসে উঠি আমি।

—'না-না, কিছু না। বলি ও-ই বর্ণচোরা কথার অর্থটা কি ?'

—'সেনচুয়াস্‌নেস্। উপরে তিলক কাটা সাধু, ভিতরে চোরের লুব্ধ-মন।'

বিদু-ভাইয়ার গাম্ভীর্য পূর্ববৎ।

—'দোহাই বিদু-ভাইয়া আর একটু বিশ্লেষণ।'

আমার কণ্ঠে মিনতির সুর।

হেসে ফেলেন বিদু-ভাইয়া। মুহূর্তে ই মিলিয়ে যায় তার কৃত্রিম-গম্ভীরতা।—'বিশ্লেষণ আর কিরে, ও-ই 'কবিতা-কল্পনালতা' আর 'মানস-সুন্দরী'—আসলে সব বাস্তব জগতের অপ্সরী।—হ্যাঁ, তোদের-ও ঠিক ওই রকমই অবস্থা।'

—'কি রকম ?' প্রশ্ন করি আমি।

—'এই, আধুনিক যুগ-পারস্পরিক সমঝোতা—মন জানাজানি। কিন্তু আসলে'—

—'মানে বলতে চান, আমরা চান্‌স্ খুঁজি, কেমন ?' বিদু-ভাইয়ার কথার জের টানি আমি।

কিন্তু বিদু-ভাইয়া এ-কথার আর উত্তর দেন না।

হঠাৎ অন্য প্রশ্ন করেন।

—'ইয়ে, তুই বিয়ে করেছিস্ ?'

—'না, ছোট্ট জবাব আমার—

—ওই হয়েছে বাপু, মন উড়ু-উড়ু। তা দেখো, বে-ঘোরে পড়বে বলছি।

'ভয় নেই।' আশ্বাস দিই আমি।

—'শেষ পর্যন্ত আর ও-সব থাকবেনা কিন্তু। তখন বলা হবে,—রক্ত-মাংসের মানুষ তো! মনের বিক্ষেপ স্বাভাবিক। ইত্যাদি-ইত্যাদি। তা' বাপু অত শত দরকার নেই। তুমি সাবধান হও আগের থেকেই।'

এসব কথা অপরের মুখে শুনলে অবশ্যই রাগ হতো। কিন্তু বিদু-ভাইয়ার রসিকতায় রাগ-ক্ষোভ যেন একেবারে ফিকে হয়ে যায়। তার কথায় তাই আর প্রতিবাদ করিনা আমি।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ তিনি অন্য প্রসঙ্গে যান। (কথা বলতে বলতে এভাবে প্রসঙ্গ-পরিবর্তন বিদু-ভাইয়ার স্বভাব।)

—'শোন, ও-ই যে তখন গোলাপী-রঙের যার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলি তার জন্যে কিন্তু অলরেডি তিন-জন কেঁদে গেছে !'

—'কে তারা ? ছাত্র নাকি ?' ঔৎসুক্য আমার কণ্ঠে।

—না-না। সবাই প্রফেসর। তোর মত চেহারা-জোয়ান।'

—'বলেন কি ? তি-ন জন !'

—'হ্যাঁ, তি-ন জন।'

—'কারুর-ই কোন উপায় হল না ?'

—'উপায় আর কি হবে। প্রস্তাব ফেরত এসেছে!'

—'ওরা বুঝি খুব বড় লোক,—আর খান্দানী।'

—'খান্দানী কিনা জানি নে। তবে বড় লোক আর কি! মিলের খাজাঞ্চি।'

—'ওর বাবা?'

—'হ্যাঁ।'

—'ওর আত্মীয়স্বজনেরা বড়-লোক নিশ্চয়ই।'

—'তা হতে পারে। কিন্তু প্রফেসর হলে কি আর বড় লোকের ঘরে বিয়ে করতে পারে না?'

—'পারবে না কেন? ওদের বোধহয় অন্য কারণ-টারণ ছিল।

তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে উত্তর দিই আমি।

—'কারণ-টারণ না রে। আসলে এও জগতের একটা বিশেষ নিয়ম।'

শেষের কথা কয়টি কেমন টেনে-টেনে উচ্চারণ করেন বিদু ভাইয়া। তার কণ্ঠও যেন মনে হয় বেদনা-করুণ!

কিন্তু অতটা খেয়াল করি না আমি। তার 'বিশেষ নিয়মের' প্রতিও জোর দিই না মোটে। সোজা জিজ্ঞাসা করি—

—'আচ্ছা, বিদু ভাইয়া, মেয়েটি কি ওদের কাউকে ভালবেসেছিল?'

—'তা তো জানি নে। তবে একজনকে বোধহয় বেসেছিল কিছুটা। কিন্তু তাই বা বলি কি করে। একটা কথা আছে না—

'রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।'

'কিচ্ছুটি বোঝবার জো নেই ভাই। সব রহস্যময়। কুহেলিকাচ্ছন্ন।'

কথাগুলো শেষ করে বিদু ভাইয়া হাসেন। কিন্তু কেমন যেন নিস্তেজ সে-হাসি। মনে হয়, বর্ষার উচ্ছ্বল-নদী হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাভাবিক স্রোত ধারা।

তবু আমি টিপ্পনী কাটি।

—'রমনীর মন' নিয়ে বোধহয় বিদুভাইয়া এক সময় গবেষণা করেছেন খু-ব।'

—'গবেষণা আর কি রে। তবে ও-ই যে বলেছি,—তোদের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে ঢের। হ্যাঁ, দেখেছি, জীবনে অনেক দেখেছি।'

বিদু ভাইয়ার কণ্ঠস্বরে বেদনা আরো গাঢ়তর হয়ে উঠে। অলক্ষ্যে তার মন যেন কোন অতীত-ইতিহাসের টুক্‌রা-কাহিনী বলি-বলি কয়ে।

হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে যাই।

বিদু ভাইয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর এক সময় বলে উঠেন—

—'অনেক দিন আগের ঘটনা। বলিই তা হলে, শোন্—'সদ্য পাশ করে উত্তরবঙ্গের এক কলেজে চাকরী নিয়েছি তখন। দেহ আর মন দুই-ই বেশ তাজা। রঙীন কল্পনায় জীবনটা একেবারে ছাওয়া যেন। ওটাও ছিল কো-এডুকেশন কলেজ। ফার্ষ্ট-ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারে মেয়ে ছিল অনেকগুলো। হঠাৎ ওদের একজনকে ভাল লেগে যায় আমার।'

কিছুক্ষণ থেমে বিদু ভাইয়া যেন কি চিন্তা করেন। বোধ করি, তার পঞ্চশোর্দ্ধ মনের পর্দায় ভেসে উঠে বহুদিন আগে মিলিয়ে-যাওয়া একখানি মুখ। আবার বলতে শুরু করেন তিনি।

—'সত্যি! আমি ভালবেসেছিলাম তাকে। তারও হয় ত ছিল কিছুটা দুর্বলতা। অন্ততঃ আমার মনে হত তাই।...আমাদের দেখা হত দু'জনের। রোজ। আলাপ হতো। ওই যে, তুই যেমন দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলি, ঠিক অমনি।'

অজ্ঞাতে বিদু ভাইয়ার বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘশ্বাস।

আমি নির্বাক।

বিদু ভাইয়া বলে চলেন—

—'কয়েকদিন পর। শুনলাম ষ্টাফে গুঞ্জন উঠেছে। আর দেখলাম ছেলেরাও কেমন বিষ নজরে তাকাতে শুরু করেছে আমার দিকে।

একদিন ক্লাসে যেয়ে তো একেবারে হতভম্ব! দেখি, ওকে আর আমাকে ইঙ্গিত করে বোর্ডে যা-তা লেখা। বুঝলাম, এ ছেলেদের কাজ। আরও বুঝলাম, ব্যাপারটা জানাজানি হতে আর বাকি নেই মোটে।

কি করা যায়! একটু চিন্তায় পড়ি।

পরদিন কলেজে দেখলাম না মেয়েটাকে। বুকটা কেমন যেন খালি-খালি বোধ হতে লাগল। খবর নেবার জন্যে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বিকেলে খবর পেলাম—

শেষের দিকে বিদু ভাইয়ার গলাটা একেবারে ধরে আসে। জড়িত কণ্ঠে টেনে-টেনে তিনি বলে যান—'খবর পেলাম তাকে টি-সি দিয়ে দে'য়া হয়েছে।'

—'টি, সি? কলেজ থেকে?' এতক্ষণে কথা বলি আমি।

—'হ্যাঁ, টি-সি। আর আমাকেও সমঝে দে'য়া হয়েছিল ভবিষ্যতের জন্যে।'

—'তারপর? সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠের প্রশ্ন আমার।'

—'সেদিনই রেজিগ্‌নেশন সাবমিট্ করি।'

—'আর মেয়েটা ?'

—'ভেবেছিলাম, দেখা করবে হয় ত। অন্ততঃ সংবাদ দেবে। কিন্তু দু'দিন অপেক্ষা করেও তার খবর পেলাম না কিছু।'

কথা ফুরিয়ে যায়। দু'জনে বসে থাকি চুপচাপ। উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন বিদু ভাইয়া বাইরের দিকে। একটা নিবিড়-নিস্তব্ধতা শুধু জেগে রয় দু'জনের মাঝখানে।

বেশ কিছুক্ষণ।··

টং টং করে দে'য়ালের ঘড়িটায় দুটো বাজার সংকেত জানায়। বিদু ভাইয়া সম্বিত ফিরে পান। তাড়াতাড়ি বলে উঠেন—'ও-ই রে ঘন্টা-পড়ার সময় হয়ে গেছে! আমার তো আবার ক্লাস আছে এ-পিরিয়ডে।'

আমি চুপ করেই থাকি। কিছু বলবার মন ভাষা খুঁজে পাই নে। শুধু ভাবি: সত্যি একজন মানুষকে আমরা কতটুকু-ই জানি। এই-যে যাকে অহরহ হাস্য-পরিহাস-মুখরিত দেখছি, কল্পনা করেছি একান্ত সুখী মানুষ বলে' তার জীবনের অন্তরালেও যে এমন একটা বেদনার ক্ষত লুকিয়ে থাকতে পারে, তা' কি চিন্তা করেছি কখনো ?

বিদু ভাইয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। কি মনে করে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর অত্যন্ত স্নেহ-জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠেন :

'শোন্, খালেদ, তোর বিরুদ্ধেও কিছু গুঞ্জন উঠেছে ষ্টাফে। তুই একটু সাবধান হয়ে-ই চলিস্।'

সহসা চমকে উঠি আমি। ষ্টাফে গুঞ্জন উঠেছে ? হ্যাঁ, ছেলেরাও তো তখন কি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

কেমন খারাপ লাগে আমার। সবাই কি ভাবছে আমার সম্পর্কে ? কোনদিন যা' কল্পনা করিনি, তাই ? ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম! ছি! ছি!! কি লজ্জা!!!

তোমাকে

আ. ফ. ম. সিরাজ-উদ্‌দউলা চৌধুরী

কখনো আকাশ পথে ডানা মেলে মরালীর মতো
তুমি যদি উড়ে যাও দিগন্তরে জনহীন দেশে,
যেখানে স্বপ্নের মতো সন্ধ্যা নামে, তারা শত শত
ঘুম ঘুম স্বপ্ন বোনে ; চাঁদ জাগে
কোনো রাত্রি শেষে।

সকাল আসার আগে বনে বনে ফুল পাতা ঝরে,
অসংখ্য ঝর্ণার ধারা বয়ে যায় তোমার প্রান্তরে।
গাইবে কি গান তুমি সংগোপনে তা'র সুরে সুরে ?
আমার নিকটে এসো ! সূর্য থেকে আরো বহু দূরে—

আরেক নতুন গ্রহে একপ্রান্তে আমার আবাস,
এখানে রঙিন ফুল ফোটে নাকো—নাইতো সুবাস।
নয়তো তোমার গানে অকস্মাৎ জাগ্‌বে নতুন
আরেক পৃথিবী ; মনে কামনার অনেক আগুন।

তুমি আমি রাত জেগে বুনে যাবো কতো কথা আর
গেঁথে যাবো ফুলগুলো মালা করে ভুলে বার বার।

ইসলামী চিত্রশিল্প

মাওলা বখ্‌শ

পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইসলামী চিত্রশিল্প পাশ্চাত্য জগতের নিকট একরূপ অজ্ঞাত ছিল। এই জাতীয় শিল্প বলে কোন কিছুর যে অস্তিত্ব থাকতে পারে, ঐ-ধারণা ছিল তাদের স্বপ্নাতীত। পবিত্র কোরআনে চিত্র বা প্রতিমূর্তি অংকনের বিরুদ্ধে কঠোর বাধানিষেধ থাকায় তাহারা মনে করতেন যে, চিত্রশিল্পে ইসলামের কোন অবদানই নেই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ এফ, মারটিনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে কিছু সংখ্যক উন্নত ধরণের ইসলামী চিত্রশিল্পের অস্তিত্বের তথ্য প্রকাশ করেন। ডাঃ মারটিন বহুকাল যাবত ইস্তাম্বুলে সুইডেন কূটনৈতিক দফতরের সাথে জড়িত ছিলেন। শিল্পকলায় তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। বহু বছর যাবত তাই তিনি বিভিন্ন ধরণের ইসলামী চিত্রকলা-বিষয়ক অধ্যয়নে গভীরভাবে ব্যাপৃত থাকেন। তুরস্কের রাজপ্রসাদ 'এসকী সারারীতে' (বর্তমান টোপকাপু) সংরক্ষিত বহু সংখ্যক ঐশ্বর্যশীল ও জমকাল উন্নত ধরণের চিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। পারস্য ও তুরস্কের শাসকরা পুরুষানুক্রমে আলবামে বাঁধাই এই উন্নত চিত্রগুলো সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থা করে আসছেন। এরপর তিনি এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করেন। সাধারণ, সরকারী ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রক্ষিত চিত্রগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের সাথে লেগে যান। অজানাকে জানবার কামনা যেন তাঁহাকে পেয়েই বসলো। স্বীয় গবেষণার ফলাফল তিনি "The Miniature Paintings of Persia, India and Turky" নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। উনিশ শ' বার খৃষ্টাব্দে Quatrich কর্তৃক লণ্ডনে এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হয়। এর দু'বছর আগে উনিশ শ' দশ সালে মিউনিসে তিনি প্রথম ইসলামী শিল্পকলাপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অজ্ঞাতপ্রায় ও কল্পনাতীত উন্নত ধরণের নানা চিত্রশিল্প প্রদর্শিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্ব অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে মার্টিনের প্রচেষ্টায় ইসলামী চিত্রশিল্প ইউরোপ ও আমেরিকার মানচিত্রে সর্বপ্রথম স্থান পায়। প্রসঙ্গক্রমে মার্টিন মন্তব্য করেন: প্রদর্শনীতে আমি ষোড়শ শতকের পারসিক "হান্টিং কার্পেট" আনার জন্য বড় উদগ্রীব ছিলাম। ভিয়েনার 'হাপমবার্গ' যাদুঘরে সরকারী তত্ত্বাবধানে রক্ষিত বস্তুসমূহের ভেতর এটিই সবচেয়ে মূল্যবান। সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ এই অমূল্য সম্পদ হস্তান্তর করিতে সম্মত হবেন না ভেবে তিনি উচ্চ পর্য্যায়ের সুপারিশক্রমে তাঁহার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে মনস্থ করেন। এজন্য তিনি তাঁহার পরম বন্ধু ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক সুইডেন রাজ গাষ্টাভকে জোসেফের নিকট ব্যক্তিগত সোপারেশপত্র বিনিময়ের জন্য আবেদন জানান। কয়েক দিন পর বড় বিস্ময়কর উত্তর এলো। সম্রাট লিখলেন: কার্পেট খানা দিতে পারলে তিনি বড়ই আনন্দ অনুভব করতেন। কিন্তু সত্যসত্যই এটির কোন অস্তিত্ব আছে কিনা এবং কোথায় আছে, তা' তখনও তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মোদ্দা কথা, সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের স্বভাবচরিত্রই ছিল এই রকম। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন সংকীর্ণ ও অনুদার। আর শিল্পকলার প্রতি তাঁহার বিরাগ ও বৈরতা তখনকার দিনে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল।

যাহোক্ মার্টিনের "Islamic Miniature"কে অবলম্বন ও অনুসরণ করে এই সময় একই বিষয়ে বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়। তার ভেতর Armeank Sakisian এর La Miniature Persane এবং Sir Thomas Arnold এর Painting in Islamই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সমধিক প্রসিদ্ধ। একটা প্রশ্ন অবশ্য স্বাভাবিকভাবে গণমনে সাড়া না দিয়ে পারে না। সে হলো: ধর্মীয় বাধানিষেধ সত্ত্বেও কিভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যে চিত্রশিল্পের অনুশীলন প্রসারিত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করলো? পবিত্র কোরআন ঘোষিত চিত্র বা প্রতিমূর্তি অংকনের ঘোর বিরোধী—একথা সত্য; কিন্তু চিত্রশিল্প সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট কোনই বাধানিষেধের উল্লেখ ইহাতে নেই। এ-ছাড়া কতকগুলো ছহি হাদীসে এ-বিষয়ে আঁ-হজরতের সুস্পষ্ট বাণীও রয়েছে। এই হাদীসগুলি নিয়ে অনেকে অনেক রকম বাকবিতণ্ডা করেন। যাহোক্, এই হাদীসগুলির মৌলিকত্ব সম্পর্কে কোনই বিতর্কের অবসর যে নেই, এ-বিষয়ে প্রায় সবলেই একমত। নবম শতকের বিখ্যাত মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবেত্তা হজরত বোখারী এ-সম্পর্কে অনেকগুলি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। ইহাতে প্রতিমূর্তি অংকনকারীদের প্রতি অভিসম্পাত এবং মূর্তি অংকনবৃত্তিকে সর্বাপেক্ষা নিম্ন খ্যাতিসম্পন্ন বৃত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুসলিম ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের দৃষ্টিভংগী এ-পর্য্যন্ত তাই একই ধারায় চলে আসছে। আর মনুষ্য কিংবা অন্যান্য পশুপক্ষীর প্রতিকৃতি, ইমারত, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ বিশেষ

করে প্রায় সব মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীন যে কোন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও এ-কারণে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রায় সব মুসলমান রাজ্য বলছি এই হেতু—পারস্যে তখন এত কড়া বাধানিষেধ পুরাপুরি পালন করা হত না। সেখানে ইসলাম-পূর্ব যুগের স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্য্য বহু প্রচলিত ছিল। আর একমাত্র মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও চিত্রপ্রদর্শনীর ওপর এত কঠোর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু আরব কিংবা তুরস্কে ধর্মীয় বাধানিষেধ অমান্য করলে জনগণের হাত থেকে আর নিস্তার থাকত না। আরনোল্ড অবশ্য আরব সাম্রাজ্যের অধীন একটি মাত্র দেশে এই ধর্মীয় প্রথার ব্যতিক্রম দেখাতে সমর্থ হয়েছেন—সে হলো স্পেনের অধীন কর্দোভার প্রসিদ্ধ মসজিদ। বাইবেলের অপ্রমান্য অংশগুলো থেকে কিছু সদৃশ্য চিত্র এই মসজিদে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। মনুষ্যাকৃতির চিত্ররূপের প্রতি এই যে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা—এ শুধু আজ কেন, সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে এমন কি ইসলাম ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ সুকৌশলে পরিহার ও লংঘন করার প্রয়াস পেয়ে আসছে। দামাস্কাস ও বাগদাদের খলিফাদের আমলে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে এক সময় অভাবিতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করেছে।

কনস্তান্তিনোপল ও আলেকজান্দ্রিয়ায় অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী পাওয়া গেছে। এগুলো আরবীয় পণ্ডিত ও সুধীমণ্ডলীর নিকট এক সময় বেশ পরিচিতি লাভ করে। সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পের আদর্শ ও নমুনা হিসাবে এগুলোই আরবদের সামনে তুলে ধরা হয়।

প্রাগ্রসর গ্রীক শিল্পকলা ও ক্রমবর্ধমান ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে কয়েক শতাব্দী যাবত খলিফারা রোমান ও বাইজানটাইন সম্রাটদের অনুকরণে মুদ্রার ওপর নিজেদের প্রতিকৃতি অংকিত করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। তাই আবদুল মালেক, ৬৮৫—৭০৪), আল মোতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭), আল মোকতাদির (৯০৮-৯৩২) এবং আল মুতির (৯৪৬-৯৭৪) আমলে মুদ্রাদির ওপর খলিফাদের প্রতিকৃতির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। স্যার টমাস আরনোল্ড অবশ্য এই ভাবে ইসলামের মৌলিক আইন—আহকাম লংঘন ও অমান্য করার কারণ প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁহার মতে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য কয়েক শতাব্দী যাবত তাদের শাসক—বাইজানটাইন, রোমান ও মেসিডন সম্রাটগণের রীতি অনুযায়ী মুদ্রার ওপর প্রতিকৃতি অংকনের ভাবধারায় বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত ও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। পারস্যের সাসানীয় রাজারা অংকিত প্রতিকৃতিকে প্রত্যেক মুদ্রার বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করতে লাগলেন। খলিফারা তাই বাস্তব কারণে বাধ্য হয়ে এই পদ্ধতি ও প্রথার প্রবর্তন করেন। একটা মজার ব্যাপার এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুদ্রার ওপর প্রতিকৃতির এই ছাপ নিয়েই—৬৯৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালিক ও বাইজানটাইন সম্রাটের ভেতর পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়। ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে উভয়ের ভেতর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং খলিফা সম্রাটকে বার্ষিক ৪০০,০০০ বাইজানটাইন মুদ্রা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিক নিজের মুদ্রা দিয়ে কর পরিশোধের দাবী উত্থাপন করেন। সম্রাট দ্বিতীয় জাষ্টিনিয়ন সন্ধি ভংগের দাবীতে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসার প্রচেষ্টা হয়। বাইজানটাইন সম্রাট পরাজয় বরণ করেন। এর পর থেকে খলিফারা নিজেদের প্রতিকৃতিসহ মুদ্রা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দশ শতকের পর এই প্রথা বিলুপ্ত হয়। ষোল শতকে মোগল সম্রাট আকবরই এই প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন।

দশ শতকের পরে ইরাকে এক ধরনের আরবীয় আদর্শের উন্নত চিত্রশিল্প প্রসারলাভ করে। এর ভেতর আরবের ওয়াসিতে অংকিত ও প্যারিসের Bibdothque Nationale তে সংরক্ষিত 'মোকামাত আল হারীরির' সুদৃশ্য পাণ্ডুলিপিখানাই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। পারস্যে বার শতকের দিকে ইসলামী আদর্শে প্রভাবান্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পের প্রচলন ছিল। কিন্তু আরবীয়দের বিরোধিতার ফলে এখানে চীনদেশীয় উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্প প্রভাব বিস্তার করে। তের শতকের শেষভাগে মঙ্গলদের পারস্য বিজয়ের পর—চীন ও ইরাণে ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পরস্পর শিল্পকলা, আদর্শ, কৃষ্টি, ভাবধারার আদান-প্রদান চলতে থাকে। তাইমুর প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল বংশের উত্তরাধিকারী তাতার ও তুরকী সম্রাটরা শিল্পকলা—বিশেষ করে চিত্র-শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চীনাশিল্পীরা বিজয়ী মঙ্গলদের অনুসরণ করে পারস্যে আগমন করে। ধর্মীয় কঠোর বাধানিষেধ সত্ত্বেও নিজেদের চিত্রাংকন করা শাসকদের যেন ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ালো এবং বিং রাজ দরবারের আমীর ওমরাহরা—তাদের পদাংক অনুসরণ করতে আদৌ। কুণ্ঠিত হলেন না।

আলোচ্য প্রবন্ধে চিত্রশিল্প বলতে আমরা ক্ষুদ্র চিত্র বা ছবির কথাই বুঝতে চেয়েছি। মুসলমান সাম্রাজ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় বাধানিষেধ ও জনগণের অসন্তুষ্টি উদ্রেকের ভয়ে তাই এ-যাবত ব্যাপকভাবে চিত্রশিল্প আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি—একথা বলাই বাহুল্য। তাই অন্যান্য দেশের স্থাপত্য শিল্পের ন্যায় এই সমস্ত দেশে ইহার

প্রদর্শনীর—ব্যবস্থাও খুব কঠোরভাবে সংরক্ষিত ছিল। ছোট ছোট ছবি বা চিত্র তখন আলবামে রাখা হতো—নির্জনকক্ষে বা জনচক্ষুর অন্তরালে অন্য কোন নিভৃত স্থানে দেখার জন্য। ধর্মীয় বাধানিষেধ ব্যাহত হতে পারে, এমন কোন স্থানে এগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হতনা।

পনের শতকে হিরাতে (তখন পূর্ব পারস্যের রাজধানী) অতি উন্নতধরনের একপ্রকার ইসলামী চিত্রশিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। পারস্য ইতিহাসে ইহাই চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ। পারস্যের ফ্লোরেন্সের মেডিসি সুলতান হুসেন বাইকারা ছিলেন শিল্পকলার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বাহজাদ তাঁহার দরবারে অবস্থান করতেন। ইস্তাম্বুলের টোপকাপু যাদুঘরে এই সময়ের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর চিত্র রয়েছে। সতের শতকের তুরকী পর্যটক এভলিয়া চেলেবী উল্লেখ করেন: সুলতান বাইকারার আতিথেয়তা, ঐশ্বর্য ও শিল্পানুরাগ সে সময় রূপকাহিনীর মতো লোকমুখে প্রচলিত ছিল। ধর্মীয় বাধানিষেধ না থাকলে হিরাতের এই অভিজ্ঞ মহাশিল্পীদলই একদা নিঃসন্দেহে এমন সব উৎকৃষ্ট চিত্র অংকন করতে সমর্থ হতেন—যা একমাত্র ইটালি ও হোলবিয়ান চিত্রশিল্পের সাথেই তুলনা করা চলতো।

এগার শতকে তাতার অভিযানকারী বাবুর কর্তৃক হিন্দুস্তান বিজিত হলে বহুসংখ্যক পারসিক শিল্পী দিল্লীর মোগল দরবারে আগমন করেন। তাহারা পারস্য ও হিন্দুস্তানী শিল্প আদর্শের সংমিশ্রনে এক নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। এই আদর্শই মোগল বা ইন্দো—পারসিক ষ্টাইল নামে খ্যাত। এই আদর্শে অংকিত মোগল সম্রাট ও তাদের প্রধান প্রধান পারিষদবর্গের—বহুসংখ্যক চিত্র আমরা এখনও দেখতে পাই। কিন্তু ইহাদের ভেতর অধিকাংশ চিত্রই মামুলী ধরনের হওয়ায় হিরাতের চিত্রশিল্পের সাথে কোনক্রমেই তুলনা চলেনা। তুর্কী সুলতানরাও শিল্পকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলে স্থাপিত হওয়ার পর দলে দলে ইরানী শিল্পীরা—বিজয়ী দ্বিতীয় মোহাম্মদের দরবারে আগমন করে। সম্রাট স্বীয় চিত্রাংকনের নিমিত্ত প্রখ্যাত ভিনিসীয় শিল্পী জেনটাইল বেলেনীকে রাজদরবারে আমন্ত্রন জানান।

এই প্রসিদ্ধ চিত্রখানা পরে উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরী লেয়ার্ডের হস্তগত হয়। আজও পর্যন্ত ইহা ন্যাশনাল গ্যালারীতে টানানো আছে। টোপকাপুর সরকারী যাদুঘরে ভিন্ন ভিন্ন সুলতান ও সমসাময়িক কালের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনেক সুন্দর সুদৃশ্য চিত্র এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। এ-ছাড়া ষোল শতকের তুর্কী নৌ-সেনাধ্যক্ষ খয়ের-উদ্দীন বারবারোসার অনেক মনোমুগ্ধকর উৎকৃষ্ট চিত্র, প্রতিকৃতিও রয়েছে। এগুলো রং করে যাদুঘরে পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, তুর্কীবংশের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের (১৫৭৪-১৫৯৫) পর থেকে সমস্ত সুলতানদের চিত্ররূপও সযত্নে সংরক্ষনের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রথম যুগের সুলতানদের চিত্রগুলো পুরান ঢঙে ও মামুলী আদর্শে অংকিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সুলতান তৃতীয় সেলিমের আদর্শে গোপনে এই চিত্রগুলো খোদাই করা হয়; কিন্তু এই মহান কার্য্যের জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।
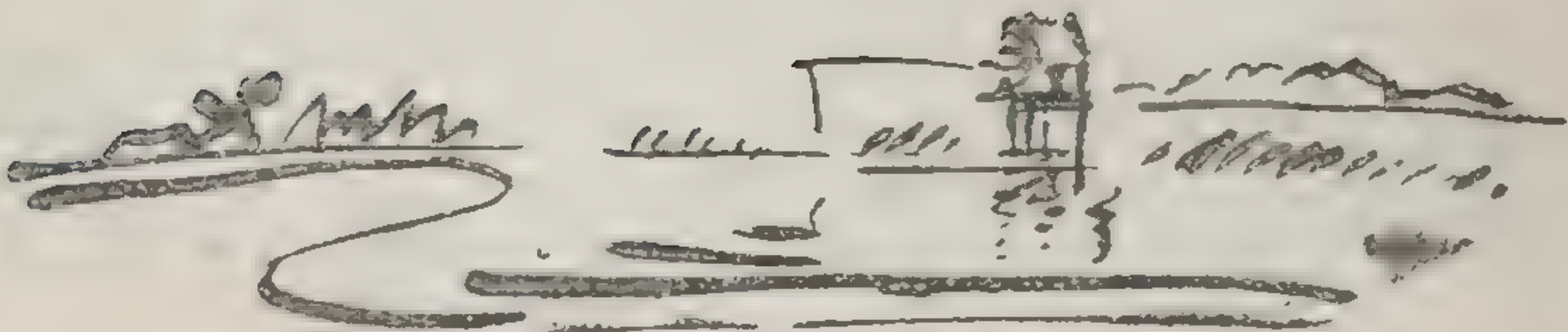
ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

হিজরী সাত-শো চৌত্রিশ সাল। মহরম মাসের পয়লা রাত্রি * মাথার ওপর মহরমের নূতন চাঁদ। আমরা এসে পৌছিলাম সিন্ধু ও ভারত সাম্রাজ্যের সীমান্তে পাঞ্জাব (সিন্ধু) নদীর তীরে। প্রথমেই এসে দেখা করলেন সুলতানের গোয়েন্দা কর্ম্মচারীরা। তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের লিখিত বিবরণী পাঠিয়ে দিলেন মুলতানের শাসনকর্তার কাছে। সিন্ধু থেকে রাজধানী দিল্লী পদব্রজে পঞ্চাশ দিনের পথ। কিন্তু সরকারী ডাক ব্যবস্থায় গোয়েন্দা কর্ম্মচারিদের পত্র সুলতানের হাতে পৌঁছতে লাগে মোটেই পাঁচ দিন। ভারতে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা দুই প্রকার। প্রথমতঃ ঘোড়সওয়ার দূতের সাহায্যে চালিত ডাক। প্রতি চার মাইল পথ অন্তর অন্তর তাকে অপর দূতের সঙ্গে বদলী হইবার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় প্রকার হলো পদব্রজে চালিত ডাক। প্রতি মাইল পথের এক তৃতীয়াংশ গেলেই পাওয়া যায় একটি করে লোকালয়। লোকালয়ের বাইরে তিনটি তাঁবু খাটানো। তাঁবুর মধ্যে তৈরী হয়ে বসে থাকে ডাক হরকরা। তাদের প্রত্যেকের হাতেই দেড় গজ লম্বা একটা লাঠি। লাঠির মাথায় পিতলের ঘণ্টা বাঁধা। এক হাতে পত্র আর অপর হাতে ঘণ্টা বাঁধা লাঠি নিয়ে প্রথম ডাক হরকরা শহর থেকে বেরিয়েই প্রাণপণে দৌড়তে আরম্ভ করে। এদিকে ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতেই তাঁবুর হরকরা তৈরী হয়ে দাঁড়ায় দৌড়বার জন্য। তারপর আগের লোকটা পৌছতেই পত্রখানা ছিনিয়ে নিয়ে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সেও দৌড়তে আরম্ভ করে। এমনি করেই পত্রখানা গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছে। ঘোড় সওয়ার ডাকের চেয়েও শেষোক্ত ডাক বিস্তু দ্রুতগামী। অনেক সময় এ-উপায়ে সুলতানের জন্য খোরাসান থেকে ভারতবর্ষে ফল আমদানী করা হয়। ভারতে খোরাসানী মেওয়ার কদর খুব বেশী। ঠিক একই উপায়ে আবার নামকরা অপরাধীরে (Criminals) এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। অপরাধীকে খাটিয়ার উপর তুলে বাহকরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। সুলতান যখন দৌলতাবাদে বাস করেন তখন কংক (গঙ্গা) নদী থেকে তাঁর পানীয় জল বাহকেরা এই উপায়েই বয়ে নিয়ে আসে। অথচ দৌলতাবাদ থেকে গঙ্গা চল্লিশ দিনের পথ।

গোয়েন্দা কর্ম্মচারী কোনো নবাগতের বিষয় লিখে পাঠালে সুলতান তা, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষন করেন। কর্ম্মচারীরাও এ-ব্যাপারে খুব যত্ন নিয়ে থাকেন। নবাগত বিদেশীর চেহারা ও পোষাকপরিচ্ছদ কেমন, সঙ্গে কত লোকজন, ক'টি বাঁদী, চাকর, পশুই বা ক'টি সব কিছুর বিবরণ সুলতানকে লিখে পাঠানো হয়। তাঁর আচার ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে হাবভাবের খুঁটিনাটি কিছুই বাদ পড়েনা।

সিন্ধুর রাজধানী মুলতানে পৌঁছে নবাগত ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় সুলতানের অনুমতি পত্রের জন্যে। তাকে কতোটুকু আতিথেয়তা দেখাতে হবে অনুমতি পত্রের সঙ্গে তারও নির্দেশ সুলতানের কাছ থেকেই আসে। এখানে বিদেশী লোকদের মর্য্যাদা ঠিক করা হয় তার কাজকর্ম্ম ও চলাফেরার হাবভাব দেখে। কারণ, তার বংশ পরিচয় থাকে সকলের অজ্ঞাত। সুলতান মাহমুদ বিদেশীদের সম্মান করেন নিজের অধীনে তাঁদের শাসনকর্ত্তা বা অপর কোনো উচ্চপদে বহাল করে। তাঁর সভাসদ, রাজকর্ম্মচারী, উজির, হাকিম ও আত্মীয় স্বজনের অধিকাংশই বিদেশাগত। তাঁর হুকুম অনুসারেই এখানে বিদেশীদের উপাধি হয়েছে 'আজিজ' বা মাননীয়।

বাদশার কোনো অনুগ্রহ লাভের জন্য দরবারে হাজির হলেই কিছু না-কিছু উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। প্রতিদানে বাদশা সেই উপঢৌকনের বহুগুণ ফিরিয়ে দেন। প্রজাসাধারণ যখন এই উপঢৌকন আদান-প্রদানের ব্যাপারে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো, ভারত ও সিন্ধুর মহাজনগণ তখন প্রজাদের হাজার হাজার দিনার ধার দিয়ে অথবা উপঢৌকনের সামগ্রী জোগান দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। মহাজনরা বিদেশী আগন্তুকদের প্রয়োজন মতো টাকা তো ধার দেয়ই; অধিকন্তু নিজেরাও খাটে। তারপর নবাগত ব্যক্তি একদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা করে যে মূল্যবান উপঢৌকন পায় তার থেকেই তাদের দেনা পরিশোধ হয়। মহাজনদের এ ব্যবসায়টি বেশ লাভজনক। সিন্ধুতে পৌঁছে আমাকেও এই পন্থাই অনুকরণ করতে হলো। একজন মহাজনের কাছ থেকে আমি ঘোড়া, উট ও শ্বেতকায় গোলাম এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করে নিলাম। এ-ছাড়া গাজনার এক ইরাক সওদাগরের কাছ থেকে আগেই আমি ত্রিশটি ঘোড়া, একটি উট এবং এক বোঝা তীর কিনেছিলাম। সেগুলোও পরে সুলতানের দরবারে সওগাত দিয়েছি। এই মহাজনটি কিছুদিনের জন্য খোরা-

* মোতাবেক ইংরেজী ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর।

সানে চলে যায় এবং ভারতে ফিরে এসে আমার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। একমাত্র আমাকে দিয়েই সে বহু টাকা মুনাফা করে একজন খ্যাত-নামা মহাজন বা সদাগর বলে গণ্য হয়। এ-ব্যাপারের বহু বছর পরে এই মহাজনটির সঙ্গে আমার একবার দেখা হয় আলেপ্‌সো বন্দরে। আমার যথাসর্বস্ব তখন বিধর্মীরা লুট করে' নিয়ে গেছে। সে অবস্থায় এ-লোকটির শরণাপন্ন হয়ে কোনো সাহায্যই আমি সেদিন পেলাম না!

সিন্ধু নদী পার হয়ে আমাদের পথ আরম্ভ হলো নল-খাগড়ার বনের ভিতর দিয়ে। এই বনেই জীবনের প্রথম আমি একটি গণ্ডার দেখতে পেলাম। ক্রমাগত দু'দিন হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছলাম জানানী নামক এক শহরে। সিন্ধু নদীর তীরে জানানী সুন্দর একটি শহর। এর অধিবাসিদের বলা হয় সামিরা। সাতশো বারো খৃষ্টাব্দে আল-হাজ্জাজ এর কাল থেকে এদের পূর্ব্ব-পুরুষরা এখানে বসবাস করেছে। এরা কারো সঙ্গেই কখনো একত্র আহার করতে রাজী হয় না। এমন কি আহারের সময় কাউকে দেখাও দেয় না। তা' ছাড়া নিজেদের গণ্ডীর বাইরে কখনো বিয়ে থা করতে বা দিতে রাজী হয় না। জানানী ছেড়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সিওয়াসিতান (সেহ্‌ওয়ান) নামক এক বড়ো শহরে। শহরটার বাইরেই বালুকাময় মরুভূমি। একমাত্র বাবলা জাতীয় গাছ ছাড়া এ-মরুভূমিতে অপর কোনো গাছ-পালার চিহ্নই নেই। এখানকার নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলেও একমাত্র লাউ ছাড়া বড়ো একটা কিছুই ফলে না। অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য যোয়ার ও মটরের তৈরী রুটি। তা' ছাড়া এখানে পাওয়া যায় প্রচুর মাছ আর মোষের দুধ, এরা ছোটো এক প্রকার টিকটিকি জাতীয় জীবের মাংস খায়। এ-ক্ষুদ্র জীবটিকে এদের খেতে দেখেই আমার কিন্তু ঘৃণার উদ্রেক হয়। আমি কখনো ও-জিনিষ খেতে রাজী হইনি।

আমরা সিওয়াসিতানে এসে পৌঁছি গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরমের সময়টায়। অসহ্য গরম। আমার সঙ্গীরা তো প্রায় উলঙ্গই কাটাতে লাগলো। তারা শুধু কোমরে জড়াতো এক টুকরা কাপড় আর কাঁধে ভিজিয়ে রাখতো একটুকরা। গ্রীষ্মের প্রবল উত্তাপে অল্প ক্ষণের মধ্যেই কাপড় শুকিয়ে যেতো, অনবরত তারা সে কাপড় পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতো।

এই শহরেই আমি খোরাসানের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আলা-অল্‌-মুলকের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এক সময়ে তিনি ছিলেন হিরাতের কাজী। সেখান থেকেই ভারতে আসেন এবং সিন্ধুর লাহারী সহরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। আমি তাঁর সঙ্গেই এ-অঞ্চলে ভ্রমণে বের হব সঙ্কল্প করি। শাসনকর্ত্তা আলা-অল্‌-মুলকের পনর-খানা জাহাজ। নিজের লটবহর এবং লোকজন নিয়ে এই সব জাহাজের সাহায্যে তিনি নদী পথে যাতায়াত করেন। জাহাজগুলোর একখানার নাম 'আহাওড়া'—দেখতে ঠিক আমাদের দেশের এক মাস্তুল ও ছোট্ট পালওয়ালা জাহাজের মতো কিন্তু পাশে চওড়া, লম্বায় ছোট। আহাওড়ার মধ্যখানে সিঁড়িওয়ালা কাঠের তৈরী একটি কেবিন। কেবিনটির উপরিভাগে স্বয়ং আলা-অল-মুলকের বসবার আসন। তাঁর সামনে বসেন আমীর ওমরাগণ, দক্ষিণে ও বামে বসে ক্রীত-দাসের দল, নীচে দাঁড় টানে চল্লিশজন দাঁড়ী। আহাওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু'পাশে চলতে থাকে অপর চারখানা জাহাজ। তার দু'খানায় থাকে পতাকা এবং দামামা শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র আর গায়কের দল। প্রথমেই বেজে ওঠে দামামা আর শিঙ্গা, তারপর আরম্ভ হয় গান। এমনি করে একটার পর একটা চলতে থাকে ভোর হতে শুরু করে মধ্যাহ্ন আহারের সময় অবধি। আহারের সময় হলেই জাহাজগুলো একত্র সংলগ্ন করা হয়। গায়ক ও বাদকের দল আহাওড়ায় গিয়ে ওঠে। শাসনকর্ত্তার আহার শেষ না হওয়া অবধি সেখানে একটানা গান বাজনা চলতে থাকে। শাসন-কর্ত্তার আহার শেষ হলে অপর সবাই আহার করে। তারপর জাহাজ আবার চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা হলে নদীর তীরে তাঁবু খাটানো হয়। শাসনকর্ত্তা তীরে অবতরণ করলে পুনরায় নৈশ আহারের আয়োজন হয়। নৈশ আহারে দলের প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে যোগদান করে। রাত্রে এশার নামাজের পর তাঁবুতে পালা করে প্রহরীদল স্থাপন করা হয়। এক দলের কাজ শেষ হলেই দলের একজন চীৎকার করে সময় ঘোষণা করে। তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে ওঠে দামামা আর শিঙ্গা। ফজরের নামাজ শেষ হলেই আহারের পর আবার যাত্রা শুরু হয়।

এমনি করে পাঁচদিন চলার পর আমরা এসে পৌঁছলাম আলা-অল-মুলকের এলাকা লাহারী শহরে। সমুদ্রতীরে সিন্ধুনদীর মোহনায় লাহারী একটি চমৎকার শহর। এখানে বড়ো রকমের একটি পোতাশ্রয় আছে। য়েমেন, ফার এবং অন্যান্য বহু দেশের লোকজন সর্ব্বদা এখানে যাতায়াত করে। এজন্য এখানকার খাজাঞ্চী-খানার আয় খুব বেশী। আলা-অল-মুলক আমাকে বলেছিলেন, শুধু এই শহরের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ষাট লক্ষ মুদ্রা। এ-আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগই স্বয়ং শাসনকর্ত্তার প্রাপ্য। একদিন ঘোড়ায় চড়ে আলা-

অল-মূলকের সঙ্গে আমি লাহারীর শত মাইল দূরে তারানা নামক এক সমতল ভূমিতে বেড়াতে যাই। সেখানে দেখতে পেয়েছিলাম বিভিন্ন জানোয়ার ও মানুষের অসংখ্য প্রস্তর-মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলোর অধিকাংশই তখন বিকৃত ও বিধ্বস্ত—কোনটার মাথা, কোনটার বা পা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যব, মটর কলাই, মসুর প্রভৃতি শস্যের আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলো পাথরও সেখানে রয়েছে। আর রয়েছে শহরের ও গৃহের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। খোদাই-করা পাথরের প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটী অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে খোদাই করা পাথরের একটী বেদী। বেদীর উপরে পিঠমোড়াভাবে বদ্ধ অবস্থায় একটি মানুষের মূর্ত্তি। জায়গাটায় দুর্গন্ধময় পানির একটা নহরও আছে। একটি দেয়ালের গায়ে রয়েছে ভারতীয় অক্ষরে শিলালিপি।

এ-শহরে পাঁচদিন কাটাবার পর আলা-অল-মুলক রাহা খরচ বাবদ প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। অতঃপর আমি রওয়ানা হলাম বাকার শহরের উদ্দেশ্যে। সুন্দর শহর এই বাকার। সিন্ধু নদীর একটি খাল বাকার শহরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। খালের উপরে চমৎকার একটি মুসাফিরখানা। রাহাগীরদের এখানে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। বাকার ছেড়ে আমি উপস্থিত হই উজ (উচ্) শহরে। শহরটি অপেক্ষাকৃত বড়ো। চমৎকার বাজার এবং কোঠাবাড়ী বিশিষ্ট এই শহরটি নদীর পারে অবস্থিত। সে সময় শরীফ জালাল উদ্দিন আল-কিজি এখানকার শাসনকর্ত্তা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক আর দয়ালু। আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা জন্মেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়—আমি যখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলাম তখন। সুলতান মাহমুদ দৌলতাবাদ রওয়ানা হবেন, আমাকে বলে গেলেন রাজধানীতে অবস্থান করতে। শরীফ জামাল উদ্দিন সে সময় আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, সুলতান ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাঁর নিজের জমিদারীর আয়ে আমার ব্যয় নির্ব্বাহ করতে। কারণ আমার নিজের খরচের জন্যে অনেক টাকার দরকার। আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মোট পাঁচ হাজার দিনার তাঁর জমিদারীর আয় থেকে পেয়েছিলাম। খোদা যেন শত গুণে এর প্রতিদান তাঁকে দেন।

উজ থেকে আমি হাজির হই মুলতানে। মুলতান সিন্ধুর রাজধানী এবং প্রধান আমীরের বাসস্থান।

মুলতান যেতে দশ মাইল দূরে একটি নদী, নাম খুসরু-আবাদ। নদীটি বড়ো। নৌকার সাহায্য ছাড়া পার হবার উপায় নেই। যারা এখানে নদী পার হতে আসে, তাদের জিনিষ পত্র তল্লাশী করা হয়। সওদাগররা এ পথে যা কিছু নিয়ে আসে তার এক চতুর্থাংশ এখানে কর বাবদ দিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি ঘোড়ার জন্য দিতে হয় সাত দিনার। আমার জিনিষপত্রও তল্লাশী হবে এ-প্রস্তাব আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হল। সাধারণ লোকে যাই মনে করুক, আমার সঙ্গে মূল্যবান তেমন কিছুই ছিল না। খোদার অনুগ্রহে সে সময়ে মুলতান শাসনকর্ত্তার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সেখানে এসে হাজির হন। তাঁর হুকুমে আমি সেবার তল্লাশীর হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাই। নদীর তীরেই আমাদের রাত্রি কাটাতে হল। পরদিন ভোরে দেখা হল স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে। শহরে বা জেলার যেখানে যা-কিছু ঘটে বা বিদেশের যে-কেউ আসে আগে তার সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ সুলতানকে পৌছে দেওয়া এ-ব্যক্তির কাজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় জমে ওঠে। তাঁকে সঙ্গে করেই আমি মুলতানের শাসন-কর্ত্তা কুতুব-আল্-মুলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই।

কুতুব-আল্-মুলকের সম্মুখে হাজির হতেই তিনি নিজে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং করমর্দ্দন করে পার্শ্বে আসন গ্রহণ করতে বললেন। আমি তাঁকে উপহার দিলাম শ্বেতকায় একজন গোলাম, একটি ঘোড়া এবং কিছু কিসমিস্ ও বাদাম। কাউকে উপহার দেওয়ার পক্ষে এসব জিনিষই উত্তম। কারণ, কিস্‌মিস্, বাদাম এ-দেশে জন্মায় না, খোরাসান থেকে আমদানী করতে হয়। শাসন কর্ত্তার আসনটি কার্পেট মোড়া বেদীর উপরে। সিপাহসালাররা বসেন তাঁর দক্ষিণে ও বামে, সাধারণ সৈনিকরা পশ্চাতে। সৈনিকদল পর্য্যবেক্ষণের কাজ তাঁর সাক্ষাতেই হয়ে থাকে। তিনি কতকগুলো ধনুক রাখেন কাছে। কোনো সৈনিক তীরন্দাজের দলে ভর্ত্তি হতে এলে তাকে একটা ধনুক দেওয়া হয় টানতে। ধনুকগুলো দৃঢ়তার তারতম্য হিসাবে পর পর সাজানো থাকে। ধনুক ব্যবহারে সৈনিক যে পরিমাণ শক্তির পরিচয় দেয় তার প্রাপ্য বেতন সেই অনুপাতে নির্দ্ধারিত হয়। কেউ ঘোড়সওয়ার সৈনিক হতে এলে তাকে দেওয়া হয় একটা ঘোড়া। ঘোড়াটা কদমে চলতে থাকবে, সে অবস্থায় সৈনিক তার হাতের বর্শা দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করবে তা'ছাড়া নীচু দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটা আংটা। ঘোড়সওয়ার চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে চেষ্টা করে বর্শার সাহায্যে আংটাটা তুলে নিতে। চেষ্টা যার সফল হয় সেই সবচেয়ে ভাল ঘোড়সওয়ার। যারা ঘোড়সওয়ার তীরন্দাজ হতে চায় তাদের জন্য মাটিতে ফেলে রাখা হয় একটা বল। চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে বলটাকে বিদ্ধ করতে হবে তীর দিয়ে। এ-ব্যাপারে যে যতটুকু সফলকাম হবে তার বেতন সে অনুপাতে কম বেশী হবে।

আমাদের মুলতান পৌঁছবার ছ'মাস পরে একদিন বাদশার একজন কর্ম্মচারী এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে এলেন পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। তাঁরা এলেন আমাদের দিল্লী যাত্রার আয়োজন করতে। প্রথমেই তাঁরা আমার ভারত আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ভারতের সুলতানকে সম্মান করে বলা হতো খোন্দআলম বা দুনিয়ার প্রভু। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বল্‌লাম, খোন্দ-আলমের খেদমতে এসেছি তাঁর অধীনে চাকুরী করব বলে। সুলতানের হুকুম ছিল, ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে না এলে খোরাসানের কাউকে ভারতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। আমার উত্তর শুনে তাঁরা একজন কাজী এবং একজন দলিল লিখককে ডাকলেন। আমার ও আমার সঙ্গীদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাক্ষী সাবুদ রেখে রীতিমত একটা দলিল তৈরী হল। সঙ্গীদের কেউ কেউ অবশ্য স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাবে অসম্মত হল। অতঃপর আমাদের মধ্যে সুরু হল রাজধানী দিল্লী যাত্রার আঞ্জাম। মুলতান থেকে দিল্লী বিভিন্ন জনপদের মধ্যে দিয়ে একাটানা চল্লিশ দিনের পথ। আমার সহযাত্রীদের মধ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন তিরমিজের কাজী খোদাওন্দজাদা। তিনি রওয়ানা হয়েছেন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে। মুলতানের, চল্লিশ জন বাবুর্চি এসেছে তাঁর সঙ্গে। প্রতি রাতে তারা আহার্য্য প্রভৃতি তৈরী করে।

(ক্রমশঃ)

শুকতারা শুধু জাগে

কাদের নওয়াজ

চাঁদ ডুবে যায় দূর-নীলিমায়,
শুকতারা শুধু জাগে,
রজনীর শেষে নীল-কুমুদী সে
কাঁদিয়া বিদায় মাগে।
সারা নিশি জাগি নিশি-গন্ধার,
ঢুলে পড়ে আঁখি বুঝি বারে বার,
হে প্রিয়! আমার যূথিকার হার
ধূলায় দিওনা ফেলি;
বেণু বন পড়ে হেলি—
দীপ নিবে যায়, বাঁশীটী ফুঁপায়,
শেষের করুণ রাগে
শুকতারা শুধু জাগে।

বিধুরা চকোরী, যামিনীর অবসানে,
চেয়ে অনিমেষ অস্ত-চাঁদের পানে,
গেয়ে ওঠে গান—'পীলু-বারোয়া'র তানে,
সে গান তাহার, কাঁদনের সম লাগে
শুকতারা শুধু জাগে।

প্রেম নহে কভু শুধু ক্ষণিকের তৃষা প্রিয়!
উষসীর রঙে হৃদয় রাঙিয়া দিয়ো;
মাঝখানে নদী, মোরা দোঁহে দুই তীরে,
দুজনেই ভাসি' অঝোর অশ্রু-নীরে,
কি জানি কি অনুরাগে,
শুকতারা শুধু জাগে।

মেঘ

মুজীবুর রহমান

শহরের সম্ভ্রান্ত রেঁস্তোরার সাদা উর্দী পরা বেয়ারা হাশেমের দুই চোখ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসে। বাইরে বেজে ওঠে কলিং বেল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে ফেলে দেয় মুখের নোণা আর্দ্রতা।

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না হাশেম এ-মিথ্যা সন্দেহের উৎস কোথায়। কেন এমনি ভাবে কাউকে দেখলেই তার মন দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে। সে অতীতকে ভুলেই যেতে চায়। সমস্ত জঞ্জালকে সে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে আবার নূতন করে শুরু করতে চায় জীবন। কিন্তু পারে না। হাজার চিন্তার স্রোত তার মনকে আবিষ্ট করে তোলে; অনভিলষিত কাঁটার মতোই খচ্ খচ্ করে তার হৃদয়কে যেনো ক্ষতবিক্ষত করে চষে ফেলে। তার মনের খোলা আকাশে ধূমকেতুর মতোই উদয় হয় অতীতের বিষময় অভিজ্ঞতার দু'একটি পুচ্ছ!

রেস্তোঁরায় এক একজন করে লোক বাড়তে থাকে ঠিক সন্ধ্যার আকাশের তারাদের মতো। হাশেম প্রতিদিনকার মতো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে আজও। নতুন মুখের দেখা পেলেই তার মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। হৃদপিণ্ডে তার কে যেনো ঘা মারতে থাকে হাতুড়ি দিয়ে। অজানা আশঙ্কার ঢেউ তার মনে বয়ে চলে অবিরামগতিতে। বিষাদ-কালো দৃষ্টিতে তার সন্দেহের তীক্ষ প্রতিফলন আরও সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে রেস্তোঁরার ফ্লোরেসেণ্ট বাতির উজ্জল আলোকে।

আজও সে কাউণ্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। একটু গলার স্বরটা নিচু করে—চেনেন্ নাকি? ঐ যে তিন নম্বর কেবিনে এসে বসল। ম্যানেজার ধমক দিয়ে বলে ওঠে আগের মতো আজকেও—তুমি কি খুনী আসামী? এত কিসের ভয় তোমার?

পাণ্ডুর হাসি হেসে বলে ওঠে হাশেম—না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। ম্যানেজার তাকে পাঠিয়ে দেয় তিন নম্বর কেবিনে—যাও তুমি তোমার কাজ করগে। মলিন মুখখানা নিয়ে সে এগিয়ে যায় সামনে। কাঁপা কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দেয় বইএর আকারে হাতের ছোট্ট মেন্যুটা।

হাশেমের সময় যেনো কাটতেই চায় না। ধীরে ধীরে চলে। ঠিক শান্ত নদীর উপরিতলের মতো স্থির গতিতে।

আর ভেতরে সন্দিগ্ধ হৃদয়ের একটা যন্ত্রণা তাকে অবিরত চঞ্চল করে তোলে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কি রহস্য লুকিয়ে আছে। অনভিব্যক্ত অভিজ্ঞতার একটা পরিচ্ছন্ন ছাপ একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যায় তার মুখে চোখে আর চলার ভঙ্গিতে।

পরিপূর্ণ স্বস্তিতে সন্ধ্যার এই সময়টা সে একদিনের জন্যও কাটাতে পারল না। প্রায় প্রতিদিনই এ-সময় তার মনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো সন্দেহের দোলা দুলতে থাকে। অজানা অদেখা ভয়ের রোষপ্রদীপ্ত অনুভূতি তার সমস্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে। বাঁশ বনের মতো একটু বাতাসেই তার মনও কাঁপতে শুরু করে। কোনো পুলিশের লোক হয় তো সাদা পোষাকে এসে তাকে চিনে ফেলবে। সন্দেহভরা দুই চোখ রেস্তোঁরার চার-দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

তার আসল পরিচয় গোপন করে এমনি করেই সে লুকিয়ে আছে এই শহরে গত এক যুগ ধরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিনও জীবনকে উপভোগ করতে পারেনি। শহরের রাজপথে বেরোলেই তার মনে হয়েছে কেউ বুঝি তাকে অনুসরণ করছে। হয় তো বা মনের ভুল; কিন্তু তবুও তার মনে হয়েছে কে যেনো তাকে দেখছে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে। আচমকা আকস্মিকভাবে তাকিয়েছে পেছন ফিরে অনেক দিন। এমনি অনেক হঠাৎ দেখার মতোই রেস্তোঁরাতে সে চমকে উঠেছে। কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়েছে ইচ্ছে করে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

হাশেম মনে মনে হিসেব করতে থাকে। তিন বছর হোল এই রেস্তোঁরাতে সে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এ-দুঃসহ চিন্তার পাহারা থেকে কবে যে পরিত্রাণ পাবে তারই একটা খসড়া সে প্রস্তুত করে চলে মনে মনে। ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করে কাজ করে চলেছে সে। হয় তো একদিন সে মুক্তি পাবে এ-বোঝা থেকে। তার মনকে সে সান্ত্বনা দেয়। পরিত্রাণ পেতে হলে একটু সংযমের প্রয়োজন বই কি। মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সে। মুক্তি পেতে সে বদ্ধপরিকর আজ। বাইরের সবুজ পৃথিবীকে তার ঠিক মনে পড়ছে না এখন।

নানা ধরনের লোক আসে এই রেস্তোঁরায়, আবার চলে যায়। হাশেম আপন মনে চিন্তার জাল বুনে চলে। সে শুনেছে সাদা পোষাকে পুলিশের লোকও আসে এখানে পলাতক খুনী আসামীদের সন্ধানে। তার মন সন্দেহে দুলতে থাকে আবার। নতুন মুখ দেখলেই সন্দেহ হয় হয় তো ছদ্মবেশী কোনো পুলিশ এসেছে তার সন্ধানে।

অধীর ব্যাকুলতা তার দৃষ্টিতে। বুঝি কার প্রতীক্ষায় সময় গুনছে। সত্যিই সে দেয়ালের ঘড়িতে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে কখন আটটা বাজবে। প্রতিদিনকার মতো এখানে চা খেতে আসবেন আলম সাহেব। আজ কতদিন ধরে দেখে আসছে তাকে সে। একদিন ও চা না খেয়ে যেতে দেখেনি।

আলম সাহেবের আসার পথ পানেই চেয়ে থাকে হাশেম উদ্‌গ্রীব হয়ে। দরজার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কেন জানি আলম সাহেবকে তার ভাল লাগে। উনি এলেই যেনো সমস্ত চিন্তা কর্পূরের মতো কোথায় উড়ে চলে যায়। বসন্তের নূতন কচি পাতার স্নিগ্ধতা এক অনাবিল সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে সারা মুখে। দলিত শ্যামল ঘাসের সবুজ পাতার মতোই সমস্ত দুঃশ্চিন্তাকে ঝাড়া মেরে ফেলে দিয়ে আবার সহজ হয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য। ঐ সময়টুকুই তার সব চেয়ে ভালো লাগে। ভুলে যায় অতীতের দুর্বিসহ গ্লানি। তাই ঘন ঘন সে তাকায় দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে। ঘন ঘন সেদিনও সে তাকিয়েছিলো তবে ঘড়ির দিকে নয়, দরজার দিকে।

হাজার কথার ভিড় আজ জমা হতে থাকে হাশেমের মনে ডাষ্টবিনের ময়লা আবর্জ্জনার স্তূপের মতো।

গ্রীষ্মের কৃষ্ণ পক্ষের এমনি এক রাতের অন্ধকারে সে করিম হাজীর বুকে বসিয়েছিল তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি। টাকার বদলে প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এক জনের। বৃদ্ধ করিম হাজীকে সে পাঠিয়ে হয়তো দিয়েছিল এ-জগত থেকে অন্য জগতে। চিরনিদ্রায় সে আজ শান্তিতে আছে অথবা মিশে গেছে মাটির সাথে। করিম হাজীর দেহটা একটু বুঝি কেঁপে উঠেছিল সেদিন। তারপর সমস্ত কিছু শান্ত হয়ে গিয়েছিল চিরতরে আর কাঁপেনি। শুধু তার নিজের অন্তরেই তুলেছিল আর এক কাঁপন। সে কাঁপন আজও থামেনি, হয়তো থামবেওনা কোন দিন।

সেই রাতকে হাশেম ভুলতে চেষ্টা করেছিল অনেক আগে কিন্তু পারেনি। সে আজও ভুলতে পারেনি ঐ রাতের কথা।

তখন অনেক রাত। গভীর নিদ্রায় সমস্ত পৃথিবী অচেতন হয়ে পড়েছিল। শুধু বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার এক টানা শব্দ আর রাতের আকাশে এক ঝাঁক তারা-দের মেলা। চারদিকে নির্জনতার এক অমূর্ত্ত অভিব্যক্তি প্রতীয়মান হচ্ছিল সমস্ত গ্রাম জুড়ে। মাঝে মাঝে তাঁতী পাড়া থেকে তাঁত্‌ চালানোর খট্‌ খট্‌ শব্দ ভেবে আস-ছিল বাতাসে।

মুন্সি জয়েনদ্দির খাস কামরায় দুজন বসে বসে কথা বল্‌ছিল গলার স্বর নীচু করে। দু'জনই নির্বিকার ভাবে একে অন্যের দিকে চেয়ে নির্ণিমেষ চোখে। আহত হিংস্র বাঘের মতো থেকে থেকে চক্‌ চক্‌ করে উঠছিল হাশেমের দুই চোখ। নজর তার পড়ে থাকে এক থোকা নোটের উপর। এত টাকা সে জীবনেও দেখে নি। টাকা তার প্রয়োজন। মনে মনে সে চিন্তা করেছিল তাদের রক্তজল করা পরিশ্রমে করিম হাজির পাকা ইমারত গড়ে উঠেছে। টাকার তোড়া হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে।

কত আছে?—

এই পাঁচ শো নাও। পরে কাজ হাসিল হ'লে আরো দেবে। মুন্সির গলার স্বর বোধকরি একটু একটু কাঁপছিল সে রাতে। হাশেম তবুও হাত ঘস্‌তে থাকে মাথার। মুন্সি জিজ্ঞেস করে, কি হোল আবার?

না, এই একটু মাল টানতে চেয়েছিনু আর কি। মুন্সির বুঝতে অসুবিধা হয় না এ সব। এমনি অনেক কাজ সে সম্পন্ন করেছে দু'চার টাকা খরচ করে। একটা দশ টাকার নোট বের করে দিয়ে বলে—এই দিয়ে এক বোতল কিনে দিও। হ্যাঁ, দেখো বাছা একটু সাবধান। টের পায় না যেনো কেউ। প্রত্যুত্তরে হাশেম সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ঘাবড়াবেন না, ভয়ের কিছু নেই। বেরিয়ে আসে সে খুশী মনে। নিশাচরের মতো কুটিল কালো দৃষ্টিতে তার ফুটে ওঠেছিল জিঘাংসা মনোবৃত্তি। কাজ সমাধা করতে তার দেরী হয়নি মোটেই। কিন্তু সময় পায়নি আর বাকি টাকা চেয়ে নিয়ে আসতে। চিরদিনের মতোই তাকে দেশ ছাড়া করিয়েছিল মুন্সি জয়নদ্দি। রাতের অন্ধকারেই মুন্সি জয়নদ্দি তাকে বলেছিল—আর দেরী করোনা হাশেম, পালিয়ে যাও। পরে চিঠি লিখলেই আমি তোমাকে টাকা দেবো। অনেক, অনেক দিনের পরিচিত পরিবেশকে তার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। পেছনে পড়েছিল বৃদ্ধা মায়ের চোখ ভরা পানির বন্যা।

মাত্র কয়েক শো টাকা সম্বল করেই সে আস্তানা গেড়েছিল এই শহরে। সে প্রায় বার বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্তনই না হয়েছে এ-শহরের। কোথায় সেই পাথর উঠে যাওয়া রাস্তা। হাঁটতে গেলেই খেতে হতো হোঁচট। পায়ে জখম না করে কোন দিনই ঘরে ফিরে আসা যেতো না।

আগের পুরানো শহরকে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করে। কতদিন সে গল্প করেছে তার সংগীদের সাথে। তাদের চোখে সে লক্ষ্য করেছে সন্দেহের কালো ছায়া। বলেছে—বিশ্বাস করার মতো নয় এ-সমস্ত। রূপকথার মতোই তারা শুনেছে হাশেমের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী। তারা শুনেছে এ-শহরের ইতিহাস। ঐ, ঐ যে ছ'তলা প্রকাণ্ড বাড়ীটা দেখ্‌ছ। হাত দিয়ে অদূরে 'মাসুম ম্যানসন্‌'কে দেখিয়ে বলেছে সে—'ওখানে রাতে ভয়ে কেউ

যেতো না। শেয়ালের আখড়া ছিল ওখানে। রাস্তাগুলির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলত—মোটর গাড়ী গেলে এই সামনের রাস্তায় কেউ পথ চলতে পারত না। ধুলায় চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে আসত চারদিক থেকে। অল্প বয়সী নতুন সংগীরা তার সামনের পীচঢালা রাস্তার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আর কল্পনা করতে চেষ্টা করত আগের অবস্থা।

—আর দেখো মানুষের মনও বদলিয়েছে অনেক। এখনকার সাহেবরা আর আগের মত সরল না। হাশেম বলতে থাকে প্রবীণতার দাবী নিয়ে। তার রসিকতাপূর্ণ রসাল কথাগুলো তাদের শুনতে ভাল লাগে। শুনতে থাকে তারা একান্ত একাগ্র মনে। জিজ্ঞেস করে—তারপর কি হয়েছে হাশেম চাচা।

— আগে কোন মেয়ে মানুষ আসত না রেষ্টুরেণ্টে চা খেতে। হাশেম বলতে থাকে। তার কণ্ঠ কেমন শ্লেষপূর্ণ। আর এখন? আজকালকার মেয়েরা মদও খায়। আমি নিজের হাতে তাদের দিয়েছি। নিজের চোখকেও আর অবিশ্বাস করতে পারি না। কত ঢলাঢলি করে কেবিনের ভেতর। দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে দিন দিন। শুনলাম মালিক নাকি বলেছে সামনের মাস থেকে মেম রাখবে কাউণ্টারে।

বয়সে নবীন বাকী হঠাৎ বলে ওঠে—কেন হাশেম চাচা?

—তা আর বুঝলে না। ওতে লোক হবে কত? হাশেম বেশী জনসমাগম যেনো পছন্দ করতে চায় না। যা ইচ্ছা করুক গে তারা।

সমস্ত সংগীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনে চলে।

ফেলে আসা অনেক দিনের খণ্ড খণ্ড ছবি আজ ভেসে ওঠে হাশেমের স্মৃতিপটে। অতৃপ্ত আত্মার মতোই হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়ায় তার চিন্তিত মনের প্রতিচ্ছবি-গুলো। আর অন্তর দিয়ে সে ধরে রাখতে পারেনা দিব্য আলোকের নম্র স্বচ্ছল গতিকে। বারবারই তার সর্বক্ষণ মনে জাগে সীমাহীন সন্দেহের দোলা। সমস্ত শিরায় শিরায় অনুভব করে অনভিজ্ঞাত শিহরণ। ভীতি বিহ্বল চোখে প্রতিদিনকার মতো আজও এগিয়ে যায় কেবিনের ভেতর। হাতে তার ছোট্ট কাগজের বিল।

বেরিয়ে এসে আবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়। না, আটটা বাজতে এখনও কিছু সময় বাকি। সময় বুঝি কাটতেই চায়না। মনে মনে ঠিক করে আজ সমস্ত কথাই প্রকাশ করে সে বলবেই আলম সাহেবের কাছে। এই মানসিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবার নিশ্চয়ই কোন একটা উপায় বলে দিতে পারবে। পরিতৃপ্তির সাথে সবুজ পৃথিবীর খোলা হাওয়া বুকের ভেতরে টেনে নিতে বদ্ধ-পরিকর সে।

কেমন চঞ্চল হয়ে পড়ে হাশেম। অধীর ব্যগ্রতার সুপরিস্ফুট চিহ্ন ফুটে উঠে তার সমস্ত চেহারায়। নিশ্চল পাথরের মতো তার চোখ দুটো যেনো কোন বিচিত্র অভিজ্ঞতার উজ্জল দৃষ্টান্তে ভাস্বর।

হাশেম আবার তাকায় দরজার দিকে। হঠাৎ হাসির তীর্যক রেখা ফুটে ওঠে তার মুখে। সাদা লম্বা দাড়ি আর শিথিল হয়ে ঝুলে পড়া মুখের চামড়ায় উছলে পড়তে চায় আশার দীপ্তি। হাত তুলে সালাম জানিয়ে নিয়ে আসে আলম সাহেবকে দু'নম্বর কেবিনে।

হঠাৎ সে হেসে ফেলে আলম সাহেবের দিকে চেয়ে। বুঝতে পেরে তিনি জিজ্ঞেস করেন—কি হাশেম মিঞা, কিছু বলবে?

কিছু যদি মনে না করেন স্যার, তবে একটা কথা বলব। হাশেমের গলার স্বরে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব লক্ষ্য করেন আলম সাহেব। বলেন—বলনা, অত ভয়ের কি আছে?

নিজের নাম গোপন করে হাশেম অতীতের সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করে আলম সাহেবের কাছে। মানসিক যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করতে সে ভোলে না। বার বার জিজ্ঞেস করে এর থেকে বাঁচবার কি উপায় আছে। আলম সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনে চলেন তার সমস্ত কাহিনী। কণ্ঠে তার সহানুভূতির প্রতিধ্বনি অণুরণিত হয়ে বেজে উঠে—আচ্ছা, সে তোমার কি হয়?

স্যার আমার এক আত্মীয় সে। কাল আমার কাছে এসে সমস্ত কথা বলেছে খুলে। আমি ত কিছুই বলে দিতে পারলাম না। তাই আপনাকেই সমস্ত কথা বললাম।

ভাবনার এমন ত কিছু দেখলাম না। আলম সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাশেমের দিকে তাকায়। এখন আর ভয়ের কি আছে। কেস্‌টা তো এখন আর নিশ্চয় নেই। অনেক বছর ত হয়ে গেছে। কি বল?

তা, স্যার, আজ প্রায় এক যুগের উপর হলো—হাশেম বলতে থাকে হাতের আঙ্গুল গুণতে গুণতে।

ও যায়গা ত এখন হিন্দুস্থান। আলম সাহেব নির্বিঘ্নে বলে যান কথাগুলো। কেস্‌ তো সাত বছর আগেই শেষ হয়ে যাবার কথা।

হাশেমের দুই চোখের বিস্ময়ের আভাষ পরিস্ফুট হয়ে উঠে—সত্যি, সত্যি বলছেন স্যার!

আলম সাহেব অধৈর্য্য হয়ে পড়েন। বলেন—হ্যাঁ,

হ্যাঁ সত্যি। আমি নিজে পুলিশের লোক আর এটা বলতে পারব না আমি।

হাশেম নিজের দুই কানকে আজ বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখ দুটোকে সে থেকে থেকে হাত দিয়ে ঘসে দেখতে থাকে আলম সাহেবকে। বেশিক্ষণ সে দাঁড়াতে পারেনা কেবিনের ভেতর। বেরিয়ে যাবার আগে আবার সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে আলম সাহেবকে। ইনি সত্যিই পুলিশের লোক কি না। এঁকেই কি সে মনে মনে পরিহাস করে চলে এসেছে এই এক যুগ ধরে ?

বেরিয়ে এসে টয়লেট রুমে ঢুকে পড়ে। আয়নায় সে দেখতে চায় আজ তার চেহারার পরিবর্তন। মন থেকে দুশ্চিন্তার কাল মেঘ যেনো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে পূবের বাতাস। সে দেখতে আসে চেহারায় আর তার মনের ইতিহাসে কোন সামঞ্জস্য আছে কি না।

চমকে ওঠে তার নিজের চেহারার প্রতিচ্ছায়া আয়নার বুকে দেখে। মাথার আর দাড়ির সমস্ত চুলই সাদা হয়ে গেছে কার্পাস তুলোর মতো। মুখের চামড়াও ঝুলে পড়েছে শিথিল হয়ে। চোখের দৃষ্টিশক্তিও বুঝি একটু কমে এসেছে আগের চেয়ে। সে বুঝতে চেষ্টা করে নূতন জীবনের সূচনা শুরু হয়েছিল কবে থেকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় তার বৃদ্ধা মার কথা, তার অতীত জীবনের কথা, তার ফেলে আসা রঙ্গিন স্বপ্ন ভরা গ্রামের কথা। চোখ থেকে অজান্তেই এক ফোঁটা স্বচ্ছ বিন্দু গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। শিশিরের মতোই চোখের ফোটা চিক্ চিক্ করতে থাকে রেঁস্তোরার উজ্জ্বল আলোকে।

বাইরে আবার কলিং বেল্ বেজে ওঠে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে ফেলে দেয় মুখের নোনা আর্দ্রতা। মুছে ফেলে দেয় তার সংগে ফেলে আসা অতীতকে। আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে টয়লেট রুম থেকে আগের মতোই। কাউন্টারে বসে ম্যানেজার ইশারা দিয়ে দু'নম্বর কেবিন দেখিয়ে দেয়।

নাতীয়া

মুহম্মদ আবুবকর

আমার নবী দোস্ত খোদ খোদার ;
রোজ-হাশরে নেইক ডর আমার !!
আছে শুধু সেই হবীবের
অধিকার শেষ সুপারিশের
খোদার সাথে মধুর মিলন ঘটাতে বান্দার ॥
রোজ-হাশরের কঠিন দিনে
খোদার আরশ লইব চিনে
সেই ছায়াতে নেবেন টেনে নবীজী আমার !!

আমার বন্ধু—বন্ধু খোদার,
এই পরিচয় ঢের যে আমার ;
ওরি বলে খসবে আমার গোনা'র গুরুভার !!
ওরি বলে জাগ্‌বে ঈমান
পুলসিরাতে কাঁপবে না প্রাণ
নূরের ফরাশ দেবেন পেতে নবীজী আমার !!

বাংলা সাহিত্যে ইসলাম

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য গড়ে উঠেছে; বাংলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাচীনতম বাংলার নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধর্ম সাধন মন্ত্র মাত্র। মধ্যযুগের বিরাট বাংলা সাহিত্যও গড়ে উঠেছে ধর্মকে আশ্রয় করেই। একদিকে রামায়ন মহাভারত ভাগবত আর একদিকে বৈষব ও রাধাকৃষ্ণ পদাবলী-মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, মুসলিম রাজশক্তি তখন বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন গৌড়েশ্বর নাসির খাঁ, গিয়াসউদ্দীন, সামসউদ্দীন, ইউসুফ শাহ, রোকনউদ্দীন, বারবক শাহ, হুসেন শাহ্, নুসরাৎ শাহ, ফীরুজ, পরাগল খাঁ এবং ছুটি খান প্রমুখ রাজপুরুষ।

প্রথম যুগে বাংলা সাহিত্যের চর্চায় অবশ্য হিন্দু কবিদেরই দেখতে পাই; কিন্তু অচিরেই মুসলিম কবিরাও বাংলা সাহিত্য চর্চায় রত হলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদির পাশাপাশি নবীবংশ, কাসাসুল আম্বিয়া, জঙ্গনামা ইত্যাদি পুস্তক রচিত হতে থাকে। অবশ্য শুরুতে ইসলামী-আদর্শ মূলক গ্রন্থ রচনার মারফৎ মুসলিম সাহিত্য সাধকগণ বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, না ইরানীয় রোমান্স কাহিনীর প্রবর্তনে প্রথম সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের সংশয় রয়েছে। অবশ্য আমরা সে তর্কে প্রবেশ না করেও বলতে পারি যে, একদিকে যেমন প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা মুসলিম কবিরা বাংলাতে প্রবর্তন করেন অন্যদিকে যুগপৎ তাঁরা ইসলামী তাহজীব তমদ্দুনমূলক গ্রন্থাদিও রচনা করতে থাকেন।

হিন্দু পাঠক সাধারণের জন্য রামায়ন মহাভারত রচিত হলেও প্রথমদিকে মুসলমান জনসাধারণ ধর্মকর্ম বিষয়ক পুস্তকের অভাব বোধ করছিল। সৈয়দ সুলতানই প্রথম কবি—যিনি এদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁর রচনায় এমন উক্তি পাওয়া যায় যে, তৎকালে হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণও রামায়ন-মহাভারতাদি ধর্ম পুস্তকগুলো পাঠ করতো—

> "হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
> খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।"

মুসলমানদের এহেন অভাব দূরীকরণার্থেই সৈয়দ সুলতান বাংলাভাষায় নবীবংশ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন—

> "কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালী উৎপন্ন
> না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন
> আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল
> ... ...
> এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রচিল।"

দীন ইসলামের কথা বাংলাভাষায় রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সৈয়দ সুলতান এবং এদিকে তাঁর প্রথম-পদক্ষেপ সত্যি প্রশংসার ব্যাপার, সন্দেহ নাই। সৈয়দ সুলতান কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে,—নবীবংশ, জ্ঞান-প্রদীপ, শবে মে'রাজ (মেরাজ নামা)। তাঁর আবির্ভাব কাল ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। কবি জৈনুদ্দিন রচনা করেন 'রসুল বিজয়'। অবশ্য এই কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে মতান্তর দেখা যায়। শবে মেরাজ, ওফাতে রসুল তাঁর অন্য দুটি গ্রন্থ।

উত্তর বঙ্গের প্রখ্যাত কবি হায়াত মাহমুদের 'সর্বভেদ-বাণী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'হিতজ্ঞানবাণীতে' ইসলামী শরা-শরীয়তের অনেক বিষয় বিবৃত হয়েছে, আর 'আম্বিয়া-বাণীতে' পয়গাম্বর-রসুলদের কীর্তিকলাপ ও জীবনাদর্শ ব্যক্ত করা হয়েছে। মহাকবি আলাওল বাংলাকাব্যে রোমান্টিক কাব্য কাহিনীর প্রবর্তনের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর রচিত তোহফা (তত্ত্বোপদেশ) অনুবাদ গ্রন্থ হলেও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আলী-রাজার (কানু ফকীর) জ্ঞান সাগর, সিরাজ কুলুব, যোগ-কালান্দর প্রভৃতি গ্রন্থে ইসলামী তত্ত্ব কথা বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী-আদর্শের ব্যাখ্যা, সরা-শরীয়ৎ ইত্যাদির ব্যাখ্যামূলক প্রভূত গ্রন্থ প্রণীত হতে থাকে। এদের অধিকাংশই ফারসী বা আরবী বা উর্দুর অনুবাদ কিংবা কোরান-হাদিসের মর্ম অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল। শেরবাজ খানের ফক্কর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল, শেখ মোত্তালিবের কেফায়াতুল মুছাল্লিন, নসরুল্লার মুসার সওয়াল, নসীয়ৎ নামা; বুরহানউল্লার কেয়ামত নামা, আবদুল হাকিমের শিহাবুদ্দিন নামা, শাহ বদিউদ্দীনের চিপ্ত ইমান, সৈয়দ নূরদ্দিন রচিত দাফায়েতুল মোকায়াৎ, মালে মোহাম্মদ প্রণীত আহকামোলজোমা, জোনাব আলীর হকিকছ্ছালাত, মোহাম্মদ সাদেকের জামালাতন ফোকরা, মোহাম্মদ খাতেরের আকবারুল ওজুদ, আকবারুস সালাত, সাওয়াল জওয়াব, নসীহাতুল মোসলেমীন, এবং মে'রাজ নামা—

ইসলামী সাহিত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থবলীর মধ্যে মীর মুহম্মদ সাফী কৃত নূরকান্দিম, তারই অনুসরণে নূরই মুহম্মদী, নূর ফরামিস নামা, নূর জামাল, হোরান জরীপ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত এমন কি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফসিহ উদ্দিনের মেসবাহুল ইসলাম, সামসামুল মুওয়াহেদীন, মিনহাজুল ইসলাম, তারাক্কিয়ে মুস্তফা, ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

উনবিংশ শতকের একবারে শেষের দিকে আমরা পাই মৌলানা ইব্রাহিমের গুলজারে মুমেনীন, হলাহলে মুশরেকীন, হিদায়েতুল ফুসযাক, এলাহি বখ্শের জায়রুল ফাসেকীন, হিদায়তুল মুত্তাকিন ইত্যাদি গ্রন্থ। ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়া সাআদৎ গ্রন্থের মির্জা ইউসুফ আলী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (৫ খণ্ড) এ-যুগের উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা এ-গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

বিংশ শতকের শুরুতে মোহাম্মদ আবদুল করিমের এরসাদে খালেকিয়া, ছমীরুদ্দীনের মোহাম্মদীয় ধর্ম সোপান; শেখ হাবিবুর রহমানের ইসলাম ধর্মতত্ত্ব, গোলাম মোহাম্মদের ইসলাম সার সংগ্রহ—ইসলামের আদর্শ বাখ্যা-মূলক গ্রন্থ। পরবর্তীকালে এ-ধরনের আরও অনেক পুস্তকাদি রচিত হতে থাকে যেমন—মোহাম্মদ ইয়াছিনের ইসলামের বিশেষত্ব; রুহুল আমিন রচিত তরিকতদর্পণ (মলফুজাতে ছিদ্দিকিয়া), সায়েকাতুল মোসলেমিন, বোর-হানোস মোকাল্লেদীন, কামেয়োল মোতাদেয়িন, ছেয়ানতল মোকাল্লেদ্রীন, হানাফী ফেকাহ, জরুরি মাসায়েল, কেয়াসের অকাট্য দলীল, সত্য ফেরকা নির্বাচন, বঙ্গেবেদাত, আখেরে জোহর, দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা, এহকাকোল হক, এবতালোল বাতেল, তরদিদোল মোবতেলিন, গ্রামে জোমা, এজহারুল হকের কলেমাতুল কোফর, ইসলাম ও সঙ্গীত; হাজি আবু জাফর প্রণীত আল মউজুয়াত, খোন্দকার আমীনউদ্দীনের দাওয়াতে ইসলাম, মোজাফ্ফর হোসেনের ইসলামের পার্থিব উন্নতি, মোহাম্মদ কোরবান আলীর উমদাতুল ইসলাম, আযহার আলীর মাসনবীর অনুবাদ, গোলাম রহমানের মকসুদুল মোমেনিন; নূর-আহমদের কুরআনের কথা, মুহাম্মদ মুছা কর্তৃক অনুবাদিত বেহেশতি জেওর (৪ খণ্ড), মওলানা আবদুল খালেক প্রণীত সেরাজুছ ছালেকিন; নকীবউদ্দিন কৃত কোর-আনের দোয়া বহু পঠিত নাম করা বই।

প্রাক-পাকিস্তান ও পাকিস্তানোত্তর যুগেও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়; এবং নূতন রাষ্ট্রিয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এ-ধরনের বহু গ্রন্থ রচিত হয় এবং অদ্যাবধি রচিত হইতেছে। আবদুল হাকিমের ইসলামের আদর্শ, হজের বিবরণ, ইসলাম ও পর্দা, হক্কুল এবাদ, হেদায়ত; শামসুল হক প্রণীত তালিমুদ্দীন, ফরউল ঈমান, ছাফায়িয়ে মোয়ামেলাত, কছদোছ ছবীল, নামাজের ফজীলত, জাজাউল আমাল, আমালে কোরআনী, তবলিগে দীন (৩খণ্ড), হায়াতুল মুছলেমিন; মোছলেহুদ্দীন প্রণীত মেফতাহুল জান্নাত, শেষ বিচারের আগে (নুরুছ ছুদুরের অনুবাদ); নুরুল হকের জিনাতোল মুছাল্লী, ডক্টর মহীউদ্দিন সম্পাদিত এ-যুগের চিন্তাধারা—আজকের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আদর্শের ব্যাখ্যা।

এ-সমস্ত গ্রন্থাদির মোটামুটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—বিশ্ব সৃষ্টি ও বিশ্ব ধ্বংসের বিবরণ, মানুষের শেষ বিচারের দিনে (রোজ হাশরের) তার কৃত কর্মের জন্য অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তি। ইসলামী ধর্মের আবির্ভাব ও হজরতের প্রচারিত নীতি আদর্শ অনুযায়ী জীবনাচরণের জন্য উপদেশ এবং ইসলামের আদর্শের ব্যাখ্যা এবং আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশশতকের বৈজ্ঞানিক আলোকদীপ্ত মানুষের ইসলামের আদর্শ অনুসরণ।

বালি ও ফেনা

[খলীল জীবরানের মূল "রুম্মাল্ 'ওয়া জাবেদ"-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ]

আবদুস্ সাত্তার

আমি চিরদিন এই সাগর তীরে ভ্রমণ করবো,
এই বালি এবং এই ফেনার তন্ময়ে।
উন্মত্ত জোয়ার এসে আমার পদ-চিহ্ন মুছে দেবে,
দুরন্ত মরু হাওয়ায় উবে যাবে ফেনার ঐতিহ্য,
কিন্তু অনন্ত কালের মাঝে চির-বর্তমান থাকবে
এই সমুদ্র আর এই সমুদ্রের তীর।

একদা আমি হাতের মুঠোয় কুয়াশা আবদ্ধ করেছিলাম। অতঃপর সেই মুঠি খুলে দেখি, কুয়াশা—কুয়াশা নয়; একটা সামান্য পোকা।
আবার আমি হাতের মুঠি বদ্ধ করেছিলাম এবং খুলে দেখলাম সেখানে একটা চড়ুই পাখী।
তৃতীয়বার হাতের মুঠি বদ্ধ করেছিলাম এবং খুলে দেখলাম সেখানে একজন মানুষ বিমর্ষ মুখে হা-করে উপরের দিকে চেয়ে আছে।
চতুর্থবার হাতের মুঠি বদ্ধ করলাম এবং খুলে দেখলাম সেখানে কুয়াশা ছাড়া কিছুই নেই।
অথচ একটা মধুর গানে বেশ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

গতকল্য আমি যখন জীবন সম্বন্ধে ভাবছিলাম,
একটা অমোঘ আয়োজন ছাড়া কিছুই দেখতে পাই নি।
আজকে আমি বুঝতে পারলাম
আমার ভেতরের প্রত্যেক গুপ্ত-রহস্য একটা বস্তুসাপেক্ষ আর সেই জীবন তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভ্রাম্যমান আলোড়িত ছন্দ।

তারা সজ্ঞানে আমাকে বললো:
তুমিও যে পৃথিবীতে বাস করো তা' বালুকার কণা ছাড়া আর কিছুই নয়।
চির-বর্তমান সমুদ্র এবং সমুদ্রের তীর সেই সব ধরে রেখেছে।
আমি স্বপ্নের ভেতর তাদেরকে বলে দিলাম:
না, আমিই সমুদ্র আর আমার তীরে গোটা পৃথিবীটাই অজস্র বালুকার কণা।

একদা আমাকে নিশ্চুপ হ'তে হয়েছিল,
কেননা একজন মানুষ এসে আমাকে বললো:
'তুমি কে?'

আল্লার প্রথম ধ্যান একজন ফেরেশতা।
আল্লার প্রথম কথা একজন মানুষ।

সৃজিত মানব সমুদ্রের সম্মুখে হাজার হাজার বছর ঘুরলো, তখন কত আশা-নৈরাশ্যের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল।
অবশেষে একদিন বনের হাওয়ার মর্মরে
তাদের বাসা খুঁজে পেলো।

আমরা কী করে গত কালের সামান্য ইঙ্গিতে পুরা-অতীতের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে পারি?

স্ফীংক্স একবার মাত্র তার জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিল: এক কণা বালিই মরুভূমি ও মরুভূমিও এক কণা বালির সমষ্টি। এখন আমরা আবার নীরব হই।
স্ফীংক্স যা' বললো মন দিয়ে শুনলাম; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

একদা আমি একজন রমনীর মুখ দর্শন করেছিলাম তখন তার কোলে কোন সন্তান-সন্ততি আসে নি।
একজন রমনী আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, সে-আমার প্রত্যেক পূর্ব-পুরুষদেরকে জানতো।
তার জন্ম হওয়ার আগেই তারা সব মারা গেছেন।

নিজের বাসনা চরিতার্থ করবার একটা আকুল আগ্রহ আমাকে মগ্ন করলো। কিন্তু একটা আকর্ষণযুক্ত জ্যোতিষ্ক না হয়ে কী করে সেখানে বাস করবো?
এটাই কী প্রত্যেক মানুষের মূল উদ্দেশ্য নয়?

এক খণ্ড মুক্তো বালির চত্বরে কষ্ট-বর্দ্ধিত একটা গৃহ।

কোন্ আশায় আমাদের দেহ গঠিত
এবং কোন বালুকার কণা ঘিরে?

যখন আল্লাহ্ আমাকে একটা মুক্তো খণ্ডের মতো আশ্চর্য হ্রদে নিক্ষেপ করলেন, আমি অসংখ্য ঘূর্ণনে হ্রদের জলে আলোড়ন তুলেছিলাম মাত্র।
যখন আমি গভীরতায় পৌঁছলাম তখন একেবারে স্থবির।

আমাকে নির্জনতা দাও, আমি রাত্রির নায়ক হবো।

দ্বিতীয় বার জন্ম নিয়েছিলাম; কেননা আমার আত্মা ও
দেহ পরস্পর ভালবাসায় মিলিত হয়েছিল,
এবং পরে বিবাহিত।

আমার জীবনে একজন মানুষকে আমি চিনতাম,
তার শ্রবণ-শক্তি ছিল খুবই সূক্ষ্ম অথচ সে বোবা।
আমি অত্যন্ত খুশী যে সে মারা গেছে।
আমাদের দুই জনের পক্ষে পৃথিবীটা তত বড় নয়।

সুদীর্ঘ কাল মিশরের মাটীতে নিমগ্ন ছিলাম।
তখন সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নীরব।
অতঃপর সূর্যের হাতে আমার জন্ম হলো।
জীবন পেয়ে নীল নদের তীরে বেশ ভ্রমণ করলাম।
তখন দিনের উজ্জল আলোয় আমার গান,
রাত্রির নিভৃতে মধুর স্বপ্ন।
এখন সেই সূর্য আমার দেহের উপর সহস্র পা'য়ে চলমান,
আমি যেন আমার মিশরের মাটিতে শুয়ে পড়ি।
এবং সেই অবস্থা যেন একটা চকমকে পাথর, মূল্যবান।
সেই সূর্য আমাকে একত্রীভূত করেছে
এখন বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।
তাই আমি খুব সোজা, এবং নীল নদের ধারে ভ্রমণ সম্বন্ধে খুবই সচেতন।

স্মৃতি এক প্রকারের মিলন।

বিস্মৃতি স্বাধীনতার নামান্তর।

অসংখ্য সূর্যের গতি থেকে আমরা সময় নির্দ্ধারণ করে থাকি। তারা সময় নির্দ্ধারণ করে তাদের থলের ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্যে।
এখন আমাকে বলো কী করে আমরা একস্থানে একই সময়ে পৌঁছতে পারি?

জানলার ফাঁকে ছায়াপথ ধরে সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্য পথে যে স্থান দেখা যায়, সেটা আসলে কোন স্থানই নয়।

মনুষ্যত্ব একটা আলোর নদী,
পুরা-অনন্ত কাল থেকে অনন্ত কালের দিকে চির-বহমান।

ঈশ্বরের বুকে সজীব আত্মার অবস্থান,
সেই সব কী মানুষের কষ্টের কারণ নয়?

পবিত্র মক্কার পথে আমি একজন হজ্ যাত্রীর সাক্ষাত পেলাম। তাঁকে বললাম: এটা কী সত্যি পবিত্র শহরে পৌঁছার রাস্তা?
তিনি বললেন: আমাকে অনুসরণ করুন। এক রাত্রি এবং এক দিনেই আপনি সেই পবিত্র শহরে পৌঁছতে পারবেন।
তাঁকে অনুসরণ করলাম। বহু দিন, বহু রাত্রি ঘুরেও সেই পবিত্র শহরে পৌঁছতে পারি নি।
আশ্চর্য! তিনি আমার উপর রাগান্বিত হলেন।
কেননা তিনি আমাকে যে পথ দেখিয়েছিলেন সেটা সোজা পথ নয়।

হে আল্লাহ্, আমাকে সিংহের শিকার করো।
আমার শিকার হোক একটা মাংশল শরীর-পূর্ণ খরগোস।

আমার গৃহ আমাকে বলে: আমাকে পরিত্যাগ করো না। এখানে তোমার অতীত বাস করে।
এবং রাস্তা আমাকে বলে: দেখ এবং আমাকে অনুসরণ করো।
আমি তোমার ভবিষ্যৎ।
আমি এক সঙ্গে আমার গৃহ এবং রাস্তাকে বলি: আমার কোন অতীত অথবা ভবিষ্যৎ নেই।
যদি আমাকে এখানে অবস্থান করতে হয়, আমার অবস্থানের একটা কারণ থাকে।
যদি আমাকে ওখানে অবস্থান করতে হয়, তখনও অবস্থানের একটা কারণ বর্তমান থাকে।
কেবল ভালবাসা ও মৃত্যু প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে।

কী করে আমি জীবনের ন্যায় বিচারে অবিশ্বাসী হবো যখন জানতে পারি যে সেই সব জীবনের স্বপ্ন নরম বিছানায় আরামে ঘুমোনো, কঠিন মাটিতে ঘুমোনোর চেয়ে মোটেই সুন্দরতম নয়?

আশ্চর্য! কোনও উপভোগের আশা করাটা আমার যন্ত্রণার অংশ।

আমি সাতবার আমার আত্মাকে অবজ্ঞা করেছি।
প্রথমত: যখন আমি তাকে উচ্চতায় পৌঁছতে বিনম্র দেখেছি।
দ্বিতীয়ত: যখন আমি তাকে খোঁড়ার সম্মুখে নিস্তেজ দেখেছি।
তৃতীয়ত: কষ্ট এবং আরামের মধ্যে আমি তাকে যখন আরামের অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি।
চতুর্থ: সেই এই ধারণায় পাপ করে যেহেতু পৃথিবীর অন্যান্য লোকেরাও পাপ করে।

পঞ্চম : যখন তাকে দুর্বলতার ইচ্ছা নিয়ে সমস্ত ধৈর্যকে শক্তির সম্মুখে আরোপ করতে দেখেছি।
ষষ্ঠ : যখন তাকে কুৎসিৎ মুখ-মণ্ডলকে ঘৃণা করতে দেখেছি, কেননা সে জানে যে এটা তার মুখোশের মধ্যে একটি।
সপ্তম : যখন সে প্রশংসার গান গেয়েছে এবং এটাকে মনে করেছে মহৎ গুণ।

নিছক সত্যের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।
কিন্তু আমি এই মূর্খতার কাছে বিনত্র
যেহেতু সেখানেই আমার সম্মান ও পুরস্কার নিহিত।

মানুষের কল্পনা ও উন্নতির মধ্যে একটা জায়গা আছে।
আকাঙ্খা সেইখানে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

সেখানে বেহেশ্‌ত।
পরবর্তী ঘরের পেছনেই তার দরজা।
আমি তার চাবি হারিয়ে ফেলেছি,
যেহেতু আমি পথ-ভ্রষ্ট হয়েছি।

তুমি অন্ধ।
আমি বোবা ও কালা।
তোমার হাত দাও
আমরা স্পর্শের ভেতর পরস্পর অনুভব করি।

মানুষ যা অর্জন করে তার মধ্যে কোন তাৎপর্য নেই।
তাৎপর্য নিহিত আছে তার সে অর্জনের আকাঙ্খায়।

আমরা কাগজ ও কালি সদৃশ।
আমরা যদি অন্ধকারের পক্ষপাতি না হই
তবে অনেকেই বোবা হয়ে যাবো।
আবার যদি আলোকের পক্ষপাতি না হই,
অনেকেই অন্ধ হয়ে যাবো।

আমাকে কর্ণ দাও।
আমি তোমাকে কথা দোবো।
আমাদের জ্ঞান হলো জল-শোষক পদার্থ
এবং অন্তকরণ স্রোতস্বিনী।
এটা কী আশ্চর্য নয় যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবাহ-মানের চেয়ে শোষন পছন্দ করে?

যখন তুমি আশীর্বাদের আকঙ্খা করো,
তুমি তার নাম জানো না।
যখন তুমি দুঃখ প্রকাশ করো,
কারণ সম্বন্ধে তুমি মোটেই অবহিত নও।
তা'হলে তুমি প্রত্যেক বর্দ্ধমান জিনিষের সাথে ক্রমশ: বর্দ্ধিত হবে

তুমি কোনও উদ্দেশ্যে শারাব পান করো
এবং তোমার অচৈতন্য শারাবের কারণ বলে মনে করো।
তোমরা উত্তেজনার জন্যে শারাব পান করো,
আমি শারাব পান করি অন্য শারাব থেকে আমাকে নমনীয় করার জন্যে।

যখন আমার পিয়ালা শূন্য হয়—
আমি সেই শূন্যতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।
যখন সেই পিয়ালা অর্ধ-পূর্ণ থাকে
আমি সেই অর্ধ-পূর্ণতায় বিরক্তি প্রকাশ করি।

তার জীবন-কথা যা তোমার কাছে প্রকাশ করে,
আসল বস্তু নয়;
যা সে পারেনা তাই তোমার কাছে বলে বেড়ায়।
যদি তুমি তাকে জানতে চাও,
সে যা' বলে তা' শুনতে যেয়ো না।
বরং সে যা' না বলে সেই সম্বন্ধে তত্ত্ব গ্রহণ কর।

অর্ধেক কথা যা তোমাকে বলি
তার কোন অর্থই হয় না।
কিন্তু বলার অর্থ বাকী অর্ধেক তুমি বুঝে নাও।

কৌতুকের উপলব্ধি মনোভাব জানার সহায়ক।

তখনই নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে করেছি
যখন মানুষেরা আমার বাচালতার প্রশংসা করেছে
এবং নীরবতার জন্য টিটকারী দিয়েছে।

যখন জীবন তার আত্মার জন্যে গায়ক খুঁজে পায় না
তখন সে মনের খোরাকের জন্যে দার্শনিক খোঁজে।

সত্য সব সময় চেনা যায় তবে ধরা দেয় কদাচিৎ।

আসল বস্তু আমাদের ভেতরেই ঘুমন্ত।
অর্জনের বেলায়ই যা কষ্ট।
আমার জীবনের কথা তোমার জীবনের কানে
পৌঁছতে পারে না।
চলো, আমরা পরস্পর আলাপ করি।
এখন কোন নিঃসঙ্গতাই আমাদের ধার মাড়াতে পারবে না।

যখন দুই জন মহিলা আলাপ করে,
আসলে তারা কিছুই বলে না।
যখন একজন মহিলা কথা বলে,
সে যেন গোটা জীবনটাই প্রকাশ করে দেয়।
ভেকের গর্জন গাভীর গর্জনের চেয়ে মৃদু।
তথাপি এটা মনে রাখবে যে ভেক ক্ষেত চাষ করতে

অথবা মদ-তৈরীর আঙুর-ভাড়ার চাকা ঘুরাতে সমর্থ হয় না।
অথবা তার চামড়া থেকে মসৃণ জংগো তৈরী হয় না।

কেবল মাত্র বোবারাই বাচালদেরকে হিংসা করে।

যদি শীত বলে : 'বসন্ত আমার আত্মা।'
তা'হলে শীতকে কে বিশ্বাস করবে ?

প্রত্যেক বীজেই আকাঙ্খা বর্তমান।

যদি তুমি চোখের পাতা খোল এবং ধীরভাবে দেখো,
দেখবে তোমার চেহারা প্রত্যেক চেহারায় বিদ্যমান।
যদি তুমি সত্যি কান পাত এবং শোনো,
শুনবে তোমার কথাগুলো সব কথাতেই আন্দোলিত।

সত্য জিনিষটা দুই জনের মধ্যে বিরাজমান।
একজন বলে আর দ্বিতীয় জন তা' অনুধাবন করে।

শব্দের ঢেউ আমাদের অন্তরে চির-বর্তমান,
কিন্তু আমাদের গভীরতা সেখানে চির-নীরব।

অনেক তত্ত্বই জানালার কাচের সদৃশ।
এর ভেতর দিয়ে আমরা প্রকৃত সত্য দেখতে পাই,
কিন্তু সেটা আমাদেরকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

চলো, আমরা লুকোচুরি খেলি।
যদি তুমি আমার অন্তরে পলায়ন করো,
তোমাকে খুঁজে বের করা আমার পক্ষে মোটেই কষ্ট হবে না।
যদি তুমি তোমার অন্তরে পলায়ন করো
তা'হলে তোমাকে খোঁজা ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নয়।

মেয়েদের হাসি তা'দের পোষাকের প্রতীক।

সেই দুঃখিত অন্তঃকরণ কত সুখী,
যে অন্তঃকরণ আনন্দ-হৃদয়ে আনন্দের গান গায়।

সেই ব্যক্তি যে নারী-হৃদয় জানে,
অথবা তার প্রতিভা বিভক্ত করে
অথবা তার নীরবতার রহস্য উদ্ঘাটন করে,
সে যেন এই মাত্র ঘুম থেকে মধুর স্বপ্ন দেখে জাগলো।
এখন তার সামনে সকালের রুচিপূর্ণ খাবার প্রস্তুত।

যারা হাঁটে
আমিও তা'দের সাথে পায়ে পায়ে হাঁটি।
কাফেলার যাত্রা দেখে নিশ্চল হয়ে থেমে পড়ি না।

যে তোমার সেবা করে
তাকে তুমি স্বর্ণের চেয়েও মূল্য দিয়ে থাকো।
তাকে তুমি অন্তর দাও,
অথবা নির্বিঘ্নে তার সেবা করো।

না, আমরা এখানে অনর্থক বাস করি না।
আমাদের অস্থি দিয়ে তা'রা কী দুর্গ তৈরী করে নাই ?

আমরা যেন পরস্পর বিভক্ত না হই।
কবির মন এবং বৃশ্চিকের লেজ
একই পৃথিবী থেকে গৌরবের উচ্চতায় পৌঁছে।

প্রত্যেক অজগর সেণ্ট জর্জের (جرجیس) জন্ম দেয়
যখন সে তাকে হত্যা করে।

বৃক্ষ রাজি কবিতা।
পৃথিবী আকাশের খাতায় সব লিখে রেখেছে।
আমরা সেই সব নীচে নামিয়ে কাগজ তৈরী করি
যেন আমরা আমাদের শূন্যতার স্বাক্ষর আঁকতে পারি।

তুমি মনে মনে কিছু লিখতে ইচ্ছা করো
(অথচ সেই বিষয়ের কোন গোপনতা তোমার জানা নেই, কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানে)
তোমার জ্ঞান, কলা এবং ছন্দ জানা দরকার।
জ্ঞান তত্ত্বের প্রাচুর্যের জন্যে,
কলাহীনের জন্যে কলা
এবং পাঠকদের মন-তুষ্টির জন্যে ছন্দের কৌশল।

আমাদের অন্তরের গভীরে তারা কলম ডুবায়
এবং চিন্তায় অনুপ্রেরণার সংহতি খোঁজে।

একটা বৃক্ষ যদি তার আত্ম-জীবনী লেখে
একটা জাতির ইতিহাসের চেয়ে তা' কোন অংশেই খারাপ হবে না।

যদি আমাকে একটা কবিতা লেখা
এবং অলিখিত একটা কবিতায় আনন্দের কথা বলা হয়,
আমি সেই আনন্দটাকেই পছন্দ করবো।
ইহা কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।
তুমি এবং তোমার প্রতিবেশীরা একমত,
আমি কদাচিৎ এইরূপ পছন্দ করে থাকি।

কবিতা প্রকাশিত মতবাদ নয়।
ইহা এমন একটা গান যা বিক্ষত-আঘাতের রক্ত-প্রবাহ অথবা হাস্যোজ্জ্বল মুখ থেকে উত্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ঝাঁকে ঝাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন
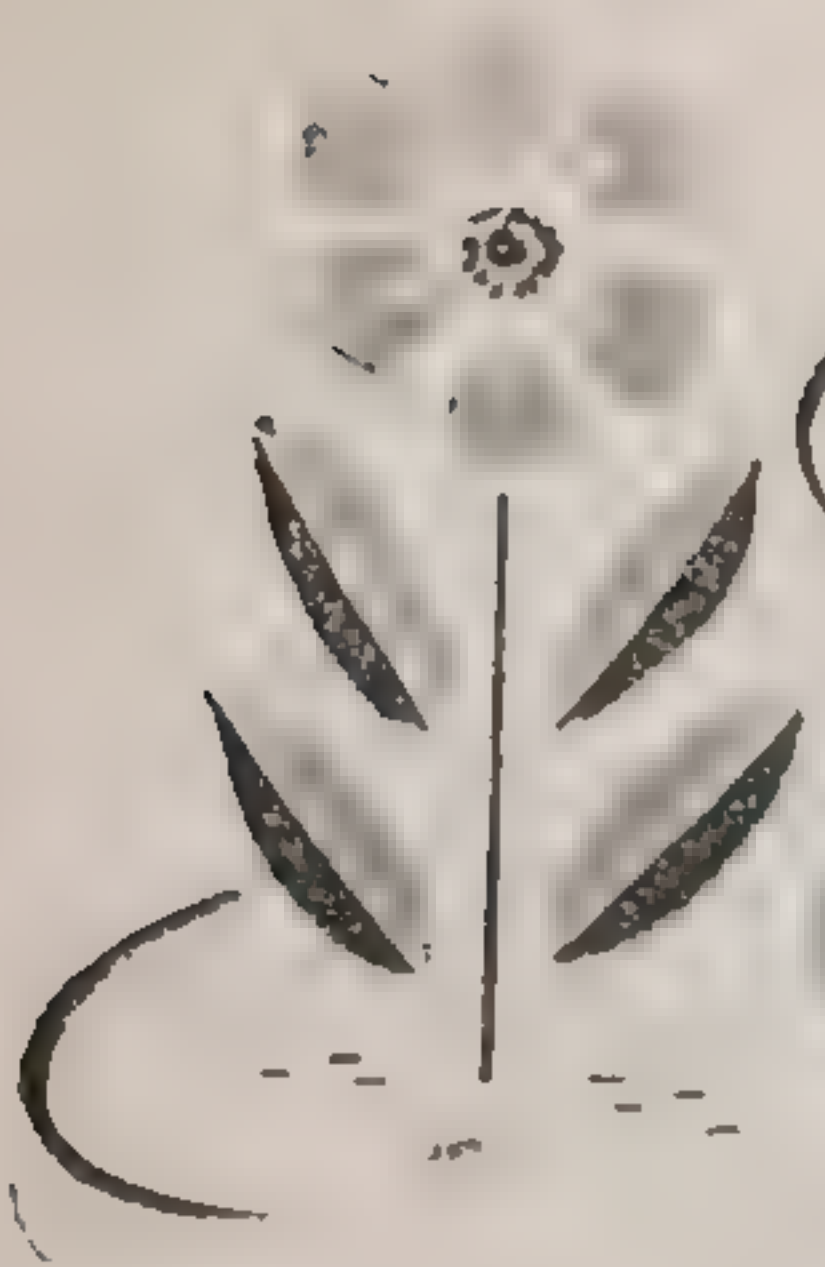
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ষোল ॥

নানা, ও নানা!

ইজি চেয়ারে গা এলাইয়া হাসান সাহেব চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝার উপায় নাই। বয়সের গাম্ভীর্য মনের অবস্থা লুকাইয়া রাখার মতই কঠিন ও নির্লিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তের আনাচে-কানাচে কোন চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইলেও সে সম্পর্কে হাসান সাহেব সচেতন ছিলেন না। নিজের মাঝে তিনি মগ্ন হইয়া রহিয়াছিলেন।

তহমিনার ডাকে তাঁহার তন্দ্রার ভাব কাটিয়া গেল। উপল উপকূলে চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ হাসি তাহার সারা মুখে ছড়াইয়া পড়িল।

তহমিনা ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসান সাহেবের গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। তিনি গদগদ কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, কি ভাই?

তহমিনা হাসান সাহেবের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছিলেন, নানা সাব?

হাসান সাহেব বলিলেন, ভাবছিলাম! কৈ, না ত!

নিশ্চয়ই ভাবছিলেন।

ও হ্যাঁ, তাই। মনে পড়েছে। এই তোমার কথাই ভাবছিলাম, বোন।

তহমিনা অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, না, মোটেই না। আমার কথা ভাবলে মুখ অন্ধকার হবে কেন? আমি বুঝিনা বুঝি!

হাসান হালকা ভাবে হাসিয়া বলিলেন, আর বুঝলে কোথায়, বোন! তুমি স্কুলে চলে গেলে এ-বুড়োর সময় কাটে কি করে বলো? কাজেই মুখ অন্ধকার হবে না ত হবে কি?

তহমিনা বলিল, সত্যি? তা হলে আমি আর স্কুলে যাবো না।

হাসান হাসিয়া বলিলেন, এখন না হয় স্কুলে না গিয়ে বুড়ো নানাকে আগলে বসে থাকলে, কিন্তু—

কিন্তু কি, নানা সাব?

হাসান বলিলেন, বলছি কি, যখন দুলা এসে নিয়ে যাবে, ভাই, তখন তোমাকে আটকাবো কি করে!

তহমিনা রাগিয়া বলিল, যান, আপনি যা তা বলেন।

হাসান সাহেবের গলা ছাড়িয়া দিয়া অভিমান করিয়া তহমিনা দূরে সরিয়া গেল। হাসান তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, রাগ করলে, ভাই?

তহমিনা গাল ফুলাইয়া বলিল, রাগ করার কথা হলে রাগ করবো না?

হাসান হাসিয়া বলিলেন, ঠিক আছে, দুলা এলে মেরে তাড়িয়ে দেব।

তহমিনা আবার নানার গলা জোরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল. আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

হাসান চোখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, তা ভাই এক কাজ করলেও চলতে পারে। তোমার সাথে আমিও না হয় তোমার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উঠবো।

যান, শুধু ঠাট্টা! সত্যি বলুন না, নানা সাব!

হাসান বলিলেন, তাই হবে। আমি কি আর বলবো, বোন! তবে একটি শর্ত্ত আছে, তোমাকে আমার সব কথা মানতে হবে।

তহমিনা মুখ ভার করিয়া বলিল, আমি কি আপনার কোন কথা না মানি, নানা সাব।

হাসান নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, ঠিকই বলেছ, বোন। বুড়ো হয়ে গেছি কিনা, তাই কখন কি বলি, ঠিক থাকে না। বুড়োদের কথায় দুঃখ পেতে নাই, বোন।

তহমিনা হাসান সাহেবের দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আপনি আর তেমন কি বুড়ো হয়েছেন, নানা সাব, খামাখা বাড়িয়ে বলেন।

হাসান বলিলেন, দুঃখ তা হলে তুমি বুঝেছ।

তহমিনা জিজ্ঞাসা করিল, বুড়ো হলে কি দুঃখ হয়?

হবে না! বুড়োকে যে কেহ কোন দাম দেয় না, বোন। সবাই আপদ মনে করে।

আমি ত করি না, নানা সাব।

ঠিক! আমার এ-বোনটির মত কি কেউ হয়?

প্রশংসায় শরম পাইয়া তহমিনা মুখ লুকাইল। হাসান বলিলেন, একটি গান শোনাও, বোন।

গান গাইবো? কোন গান, নানা সাব?

এই বাকুম বুকুম তাক ঢুনাঢুম না কি যেন বলে, ঐটি।

নানার ফরমায়েশ শুনিয়া তহমিনা লজ্জা পাইল। সে বলিল, আমি কি বাচ্চা যে এ-সব গান করবো?

নানা মাঝে মাঝে এরকম ফরমায়েশ করিয়া বসেন। তহমিনা আর্দৌ গান গায় না, তাই সে প্রতিবাদ করে। তবু শুধু নানাকে গান শুনাইতে তাহার ভাল লাগে। কিন্তু নানা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না যে, সে আর ছোট্টটি নয়, সে বড় হইয়াছে, সে এখন অষ্টম শ্রেণীর একজন বিশিষ্ট ছাত্রী। তাই ফরমায়েশ করার সময় বাছবিচার করেন না। সেও এ-সম্পর্কে খুবই সতর্ক। সে নানাকে যথাসময় স্মরণ করাইয়া দেয়।

হাসান সাহেব বলেন, ও—তাই ত!

তহমিনার মুখের দিকে চাহিয়া হাসান আনমনা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তুষার শৈলের উপর সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হইয়াছে। এ যে হোমায়েরারই অবিকল ছায়া! হোমায়েরার বয়স কমিয়া গিয়াছে। ছোটটি হইয়া তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন হয়, এ-যেন ঠিক তেমনি। কত ভিন্ন দুইজনে! হোমায়েরার মা তাঁহার প্রাণঢালা সকল স্নেহ মমতার একমাত্র ওয়ারেস করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন হোমায়েরাকে। হাসানের অন্তর ছিল হোমায়েরাময়। কিন্তু কেন এমন হইল? তবে লোক-চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার সকল জ্ঞানই কি মিথ্যা? তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহার সমস্তই কি ভুল? আগাগোড়া সমস্তই যেন ধাঁধা হইয়া আছে। তিনি নিজেও কিছুতেই নিজের মনকে বিস্ময়মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। কত রূপান্তরিত হইয়াই না হোমায়েরা তহমিনার ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছে। তবু আশার জাল বুনিয়া আঘাত ডাকিয়া আনিতে আজ আর তাঁহার ইচ্ছা নাই। একটি সংশয় সবসময়ই তাঁহার মন খুঁড়িয়া খাইতেছে। যাহা হইবার হইবে! কিন্তু এই বুড়ো বয়সে বিশ্বাসই যদি না থাকিল তাহা হইলে থাকিল কি? দীর্ঘ অসাক্ষাতেও হোমায়েরার অম্লান ছবি যখন আজকের টুকরো কাহিনী আর হাজারো রকম মন্তব্যের মাঝখানে ফুটিয়া উঠে তখন দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিয়াও তিনি বিশ্বাস অবিচালিত রাখিতে পারেন না। তাঁহার পিতৃত্বের গর্ব ধুলায় লুটাইতে থাকে।

হোমায়েরা এখন কোথায়? এটা জানার কোন দরকার হাসান সাহেবের ছিল না। এর চেয়ে হোমায়েরার মরাই ভাল ছিল।

কিন্তু হোমায়েরা মরে নাই। সে বাঁচিয়া আছে। তাহার মরার চেয়ে তাহার এই বাঁচিয়া থাকাই যে অধিক দুঃখের!

ছিঃ ছিঃ, এটা কি ভাবিতেছেন! হাসান সাহেবের তন্দ্রালস মন মোচড় খাইয়া সচেতন হইয়া উঠে। না, না, হোমায়েরা যেমন থাকুক—বাঁচিয়া থাকুক। নিজের আদর্শকে তিনি মানদণ্ড ধরিয়া আছেন, তাই হয়ত বিচার বিভ্রাট হইতেছে। হোমায়েরা নিজের মতে হয়ত সুখেই আছে। যদি তাই হয়, তাহলে তাহার মৃত্যু কামনা করার কি অধিকার তাঁহার আছে?

যুগ বদলাইতেছে। নিজের চার পাশে পাচিল গাঁথিয়া তুলিয়া সে পরিবর্ত্তনের হাওয়া হইতে গা বাঁচাইতেছেন সত্য; কিন্তু হাওয়ার গতি ত ইহাতে বন্ধ হইবার নয়! তবে ইহাতেই বা সান্ত্বনা কোথায়? ভালমন্দের দ্বন্দ্ব সে ত প্রত্যেক যুগেই চলিয়াছে। আজ যাহাকে তিনি মন্দ জানিতেছেন, তাহাকে যুগধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া স্বস্তি লাভ করার পথ আছে কি? না, না, ইহাতে কোন আপোষ নাই।

কিন্তু হোমায়েরা! ভাবিতেও হাসানের চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। দুই হাত তুলিয়া তিনি আল্লার দরগায় মোনাজাত করেন, হে পরোয়ারদেগার, তার অশান্ত মনে শান্তি দাও, হে রাব্বুল আলামিন!

তহমিনা অবাক হইয়া হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে হাত দিয়া তাঁহার মুখ ফিরাইয়া বলিল, রাগ করেছেন, নানা সাব?

কেন বোন?

এই গান করলাম না বলে?

ও হো হো! তা একটু রাগ হয়েছে বৈ কি বোন, একটু রাগ হয়েছে বৈ কি!

আমি কি না করলাম গান করবো না !

তাও ত ঠিক ! তুমি ত না বলো নাই। সে আমারই ভুল !

গান করি, নানা সাব ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হাসানের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কোন আকর্ষণ না থাকিলে বাঁচিয়া থাকার প্রবৃত্তি থাকে না। হাসান জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত হইয়া উঠুন খোদারই হয়ত সে মর্জ্জি নাই। তাই খোদা আবার বাজার সাজাইতেছেন। তহমিনার দিকে চাহিয়া হাসান কৌতুক করিলেন, রাগ করলেই কি, বোন ? বুড়ো মানুষের রাগে কি আসে যায় ?

কি যে বলেন, নানা সাব ! আপনার কথাই যেন কেমন !

হাসান বলিলেন, এ-কালের কথাও জানি না, কাজেই ভালকথা বলবো কেমন করে ?

তহমিনা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, এ-ভাবে যদি বলেন তা হলে ত আপনার সাথে আর কথা বলবো না, একদম বলবো না।

হাসান নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, তা হলে ত মুশকিল ! আমাকে নতুন করে এ-কালের জবান শিখতে হয়।

মুশকিল টুশকিল বুঝিনা। আমার ভাল লাগেনা এমন কথা বলবেন না। ব্যাস্।

হাসান বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই সই।

ডাক পিয়নের সাড়া পাইয়া তহমিনা দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিলে হাসান সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি, বোন ?

হাসান আবার বলিলেন, আব্বার ?

তহমিনা কোন কথা না বলিয়া খামখানা হাসান সাহেবের হাতে তুলিয়া দিল। হাসান খুশী হইয়া বলিলেন, তাই ত আমি যা ভেবেছি তাই। পড়, বোন, পড় শুনি ?

হাসান নিজেই চিঠি খুলিয়া পড়িতে শুরু করিলেন। চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, আব্বার আগের চিঠির জওয়াব দাওনি, বোন ?

না ?

কেন, বোন ?

তহমিনা নাক ফুলাইয়া বলিল, আমি লিখতে জানি না।

হাসান হাসিয়া বলিলেন, এত বড় কথা কে আমার বোনকে বলতে পারে ?

তহমিনা বলিল, যাই বলেন, নানা সাব, আমি চিঠি লিখবো না।

এত রাগ কেন, বোন ?

তহমিনা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, আব্বাকে আমি আসতে লিখেছিলাম, তার জওয়াবে তিনি পাঠালেন শুধু চিঠি। এবারও আমার কোন কথাই লিখেন নাই।

হাসান বলিলেন, ওঃ। তা নিশ্চয়ই রাগ হবার কথা। তবে সময় করে ত আসতে হবে বোন!

না, এখানে আসতে আব্বার সময় নাই!

হাসান বলিলেন, তা নয়। এখানে তার যে একটা মা আছে সে কথা কি সে ভুলতে পারে ? তবে কত কাজ তার। সেখানে তার সংসারও রয়েছে।

তহমিনার স্বর কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিল, আমি তাঁর কেউ না। সেখানে ওরাই তার আসল ছেলে মেয়ে।

হাসান তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, পাগলী বোন আমার। আব্বা তোকে কত স্নেহ করে, তাই ত হাজার কাজ ফেলেও ছুটে আসে। এবার হয়ত বিশেষ অসুবিধায় আসতে পারে নাই।

মনের টান থাকলে কাজ কি আটকায় ?

পাগলি !

তহমিনা মুখ তুলিয়া বলিল, আব্বা আমাকে ত কখনও যেতে বললেন না, নানা সাব ?

হাসান বলিলেন, সে হয়ত আমারই দোষ, বোন। আমার জন্যই হয়ত যেতে বলেন নি। তা ছাড়া, তিনি হয়ত ভাবছেন, তুমি শহরেরই মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে না।

তহমিনা বলিল, কেন ? আব্বা যদি থাকতে পারেন, আমি থাকতে পারবো না কেন ?

হাসান তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, ঠিক ত বোন, ঠিকই। তুমি ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। আমি বুড়ো মানুষ, এ-কথাটি আমার মনেই ছিল না।

হাসান মনে মনে খুবই খুশী হইলেন। তবে ইহার বাস্তব দিক লইয়া তহমিনার সহিত আলাপ করার ইচ্ছা তাহার হইল না। মোবারকের অবস্থা ভাল নয়। মেয়েকে লইয়া গিয়া শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করার সামর্থ্য তাহার নাই। দ্বিতীয় পক্ষের দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে লইয়া সে বিব্রত আছে বলিয়াই তাঁহার ধারণা। মোবারককে কোন রকম সাহায্য করেন, সে সামর্থ্যও হাসান সাহেবের নাই। তাছাড়া মোবারকের আত্মমর্যাদাবোধকে হাসান সাহেব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। এ দিকে তহমিনা নিজেও এক বড় সমস্যা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। স্নেহের বাঁধন যে কি, এটা অনুভব করার দুর্ভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, হাসান সাহেব আজ আর তাঁহাদের দলে পড়েন না।

হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে ছেড়ে তুমি গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে?

তহমিনা বলিল, আপনিও চলেন না কেন, নানা সাব?

তা যাবো বোন। তুমি আমি একবার আব্বার ওখানে যাবো। কিন্তু আমি ত সব সময় সেখানে থাকতে পারবো না?

তহমিনা বলিল, আব্বা কেন শহরে চলে আসেন না, নানা সাব?

ম্লান হাসি হাসিয়া হাসান সাহেব বলিলেন, শহর যাদের জন্য তৈরী হয়েছে, তোমার আব্বা সে জাতের লোক নন, বোন। তোমার আব্বার হৃদয় এখনও মরে যায়নি ভাই।

তহমিনা অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছুই বুঝলাম না, নানা সাব। আপনি আছেন, আমরা আছি, আর আব্বা থাকতে পারেন না।

হাসান সাহেব বুঝিলেন তহমিনার সরল যুক্তির কাছে তাঁহার পাকা বুদ্ধি হার মানিতে বসিয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তবে কথা কি জানো, বোন, তোমার নানা সাব শুধু কথাই বলেন, কাজ করার সামর্থ্য তাঁর নাই। কিন্তু তোমার আব্বা আলাদা ধাতুর তৈরী। তিনি কথা বলেন না। যা বিশ্বাস করেন, সে ভাবে কাজ করার চেষ্টা করেন।

হাসান সাহেবের চোখে-মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে দেদীপ্যমান লোকটি। অনাবিল গর্বের মাঝে যেন আত্মস্থ হইয়া আছেন। কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কয়টা লোক পারে, বোন, স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নিতে? ন্যায়-অন্যায় বোধ ত একেবারে মরে যায়নি; কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে অলসের ফিসফিসানি ছাড়া, রুখে দাঁড়াবার মত মনের জোর কয়জনের আছে? তোর আব্বা আমার চোখ খুলে দিয়েছে, বোন। ব্যক্তিজীবনে বিদ্রোহ আর আড়ম্বরহীন কর্ম্ম-প্রেরণার মাঝ দিয়েই জাতি ও দেশ বড় হয়ে উঠে। হাজারো লোকে এজিটেশন দ্বারা যা করতে পারে না, একটি লোক সাধনা দ্বারা তা করতে পারে।

তহমিনা অবাক হইয়া হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। হাসান নিজের ভুল ধরিতে পারিয়া বলিলেন, এই দেখ বোন, বলছিলাম না, তোমার নানা সাব বাক্যবাগিশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই তার প্রমাণ দেখ। কথার সূত্র পেলে মনের হাজার মুখ যেন খুলে যায়।

হাসান হাসিলেন। তহমিনা বলিল, কি যে বলেন, নানা সাব। আমার খুবই ভাল লাগছিল। আব্বা খুবই ভাল, তাই না, নানা সাব?

হাসান বলিলেন, ভাল-মন্দের বিচার করার আমরা কে, বোন! আরামে ঘরের কোণে বসে থেকে সে বিচারের দায়িত্ব না লওয়াই ভাল।

তহমিনা নানার রহস্যময়তার দিকে না গিয়া বলিল, আমি আব্বার মত হলে আমার তারিফ করবেন, নানা সাব?

হাসান একখানা হাত তহমিনার মাথায় তুলিয়া দিলেন। তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ছায়াবাজির মত কত ঘটনা তাঁহার চোখের সামনে ঘটিয়া গিয়াছে। সে কত বছর, কত বছর! অথচ মনে হয়, এ যেন সে দিনের কথা!

সাদা কাগজের উপর কালো কালীর দাগ ঝড়জলে বছরে বছরে অস্পষ্ট হইতে হইতে মুছিয়া আসে। কিন্তু কালের পটে আগুনের রেখায় আঁকা চিত্র কখনও ম্লান হয় না। হাসান সাহেবের স্মৃতি শক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও চোখ বুজিলে চিত্রগুলি তিনি পরিষ্কার দেখিতে পান।

হোমায়েরা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, খবরটি নীল আসমান হইতে বজ্রের মতই নামিয়া আসিল। ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে হাসান সাহেব উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্রোধ ক্রমে শঙ্কায় পরিণত হইল, দুঃখের জায়গায় দুশ্চিন্তা দেখা দিল। মেয়েটি গেল কোথায়? তাঁহার কাছে না আসিয়া আশ্রয়হীন ভাবে কোথায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে? অথবা—। হাসান সাহেব শিহরিয়া উঠেন।

আত্মগোপন করার ইচ্ছা হোমায়েরার ছিল না। সে নিজেই খবর পাঠাইয়া জানাইয়াছিল, তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নাই।

রহিমা কাঁদিয়া পড়িলেন, ভাইজান!

হাসান গভীর ভাবে বলিলেন, বুঝি, বোন, কিন্তু যে পথ তার জন্য উন্মুক্ত ছিল সে পথ ইচ্ছা করেই সে যখন মাড়ালো না, তখন আর আহ্বান করতে যাওয়া বৃথা।

কিন্তু রহিমা কিছুতেই সান্ত্বনা মানিলেন না। হাসান রহিমাকে পাঠাইয়া দিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিজের জেদে সে যে অন্যায়ের পথে চলিয়াছে, হোমায়েরা তাহা হয় ত বুঝিতে পারিবে। কিন্তু রহিমা একা ফিরিয়া আসিলেন, হোমায়েরা আসিল না।

মোবারকের জন্য অপেক্ষা করিয়াও হাসান সাহেব অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। মোবারক আসে নাই। এক রকম রাগ করিয়াই হাসান নিজেই মোবারকের সাথে দেখা করিতে গেলেন। মোবারক হাসানের সামনে মাথা তুলিতে পারিল না। হাসান মোবারকের কাঁধে হাত

রাখিয়া বলিলেন, তুমি আমায় মাফ করো, মোবারক। আমিই তোমার জীবন বিষিয়ে দিলাম।

হাসানের কণ্ঠস্বরে মোবারকের মন সচকিত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবার পথ আমি রাখিনি। নিজকে আমি নিজেও কখনও এ-ভাবে ভাবতে পারিনি।

হাসান বলিলেন, খামাখা নিজেকে অপরাধী মনে করে কষ্ট পেয়ো না। বুঝি ত সবই। তকদিরের উপর মানুষের হাত নাই। একদিন ভাবতাম, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। আজ আমার সব ভুলই ভেঙ্গে যাচ্ছে।

মোবারক বলিল, আপনার বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমি রাখতে পারিনি, এর চেয়ে অপরাধ আর আমার কি হতে পারে?

হাসান বলিলেন, তুমি অমানুষ বা অতিমানুষ হবে, সেটাই কি আমি চাইব, তুমি মনে করো? আমার ধারণা. তুমি আমাকে কিছু কিছু জানো।

হাসান সাহেবকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারে মোবারক ফাঁক কোথাও রাখে নাই। কিন্তু সেদিন তাহার শুধুই মনে হইতেছিল, যে শ্রদ্ধা এই লোকটিকে করিয়া আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড়। তাহার দুই চোখ হইতে কৃতজ্ঞতা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে হাসান সাহেবের সামনে আরও তুচ্ছ হইয়া গেল। হাসান দুই বাহু বাড়াইয়া মোবারককে আলিঙ্গন করিলেন।

শহরে জীবন বলিতে যাহা বুঝা যায়, মোবারকের তাহা ছিল না। সে শহরে থাকিত মাত্র। শহরের জন্য এমন কোন আকর্ষণও সে বোধ করিত না। হোমায়েরা চলিয়া যাওয়ার পর ছেলে পড়ানো সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এক হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। মোবারক মনের দিক হইতে বড়ই একা হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য শহর ছাড়িয়া যাওয়ার তাগিদ যে সে বোধ করিতেছিল তাহাও নয়। চাকুরী তাহাকে করিতেই হইবে। তবে চাকুরীর ব্যাপারে ইচ্ছা আর দরকারই যে সব নয়, তাহাও সে হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছিল। মোবারক সেই যে এ্যাসিষ্টাণ্ট টিচার হইয়া ঢুকিয়াছিল, সেখানেই সে ঝুলিয়া আছে। দড়ি বাহিয়া উপরে সে উঠিতে পারিল না। মুরব্বীর জোর তাহার কোথায়?

চোখের সামনেই-ত দেখিতে পাইতেছে দিন কি ভাবে রাত আর রাত কি ভাবে দিন হইয়া যাইতেছে। মোবারক কাজ করিতে পারে; কিন্তু দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া নেকনজর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা তাহার নাই। আর নেকনজরই যদি ভিক্ষা করিতে না পারিল ত হইলে কাজের দাম কি? অবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখ স্বীকার করিতে সে রাজী থাকিলেও অপমানবোধ হইতে মন তাহার মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠে। হেড মাষ্টারের কাছে একবার সে নালিশ করিতেও গিয়াছিল। প্রসঙ্গটি তুলিতেই হেড মাষ্টার মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, একটি পিওনের চাকুরী হলেও চার পাঁচটা উজীরের সোপারেশ আসে। আর এ হচ্ছে প্রমোশন। চুপ করে থাকতে চান, তাই থাকুন।

হেড মাষ্টার লোকটি মন্দ নন। তবে ইঙ্গিত করা অপেক্ষা আর বেশী কি তিনি করিতে পারেন? মাথা নীচু করিয়া তিনি কাজে মনযোগ দিলেন, আর মাথা তুলিলেন না। সালাম করিয়া মোবারক উঠিয়া আসিল।

কিন্তু হিড়িকের মত একসাথে অনেকগুলি প্রামশেন যখন হইয়া গেল তখন মোবারক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার আত্মমর্য্যাদায় কঠিন আঘাত লাগিল; নিজের ন্যায়সঙ্গত দাবীটি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সে দ্বার হইতে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু তাহার কথা শোনার কেহ ছিল না। ইন্সপেক্টার হইতে শিক্ষা উজীর তক নানা জনের জোর সোপারেশ আদায় করিয়া তবেই না তাহারা কাজ হাসেল করিয়াছে। মোবারক সোপারেশের জন্য দৌড়াদৌড়ি না করিয়া ন্যায়বিচারের জন্য পেরেশান হইতেছে। ন্যায়বিচার কি গাছে ফলে? কাজেই কে আর তাহার কি করিতে পারে!

তবু ডিরেক্টার সদয় হইয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, এখন ঘরে যান। পরে যাতে আপনার প্রতি অবিচার না হয় আমি দেখবো।

মোবারক ঘরেই গিয়াছিল। তবে যাবার পথে স্কুলে সে ইস্তেফা পত্র রাখিয়া গিয়াছিল। পরে আর স্কুলমুখো সে হয় নাই।

হাসান সাহেব শুনিয়া ভালমন্দ কিছু বলিলেন না। শেষে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি করবে স্থির করেছ?

মোবারক বলিল, কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি। তবে দেশে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।

হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, দেশে গিয়ে চলবে কেমন করে?

মোবারক চুপ করিয়া রহিল।

হাসান বলিলেন, গাঁয়ের কোন স্কুলে মাষ্টারী নিয়ে যেতে পারো নাকি?

মোবারক বলিল, গ্রামে গেলে নিজের গাঁয়েই যাওয়ার ইচ্ছা। আমাদের গ্রামে কোন স্কুল নাই।

হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজেরা চেষ্টা করলে কি স্কুল করা যায় না।

জওয়াবে মোবারক বলিল, বলতে পারি না। আমার

মত অবস্থার লোককে বিশ্বাস করে সেখানে কেউ অগ্রসর হবে মনে হয় না।

শেষ পর্য্যন্ত মোবারককে গ্রামেই চলিয়া যাইতে হইল। সে গ্রামে থাকার জন্যই মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

মোবারক চলিয়া যাওয়ার পর একদিন আশরাফ আসিয়া উপস্থিত। হাসান সাহেব কোথাও বাহির হইতেন না। পুরাতন বন্ধু আবদুল জলিল সাহেবের পীড়াপীড়িতে সেদিন তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন। হাসান ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, মাথায় পাগড়ী, গায়ে ঢিলাজামা, পরণে পাজামা, পায়ে নাগরাই এক যুবক বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তহমিনা পরম নির্ভাবনায় যুবকের ঘাড়ে সওয়ার হইয়া তাহার ঝাকড়া চুলে দুই হাতদিয়া থাবা মারিতেছে। যুবক অর্থহীনভাবে আবোলতাবোল করিয়া তহমিনাকে হাসাইতেছে।

হাসান আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এটা আবার কি হল? যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকেই যান। এটা সার্কাস মার্কাস নয়।

তহমিনা নানাসাব বলিয়া ঘাড় হইতে নামিয়া যাইতে চাহিল। যুবক—'নানাসাব, এ্যা' বলিয়া বিস্ময়সূচক-ধ্বনি করিয়া তহমিনাকে তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিল। বলিল, আপনি—

কথা শেষ না করিয়াই সে হাসানের পা ছুঁইয়া সালাম করিল। হাসান ব্যস্ত হইয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি?

সে দুইহাত নাড়িয়া বলিল, আপনি নয় আপনি নয়। আমি আপনাদের আশরাফ। মোহাম্মদপুর থেকে আসছি।

আহা। তুমি মোহাম্মদপুরের আশরাফ! চল, বাবা, ভেতরে চল।

আশরাফ বলিল, আমি এসেছি অনেক্ষণ। তা মা'টির সাথে আলাপ জমাতে আমাকে কি কম বেগ পেতে হয়েছে! আমি যে তার চাচা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। আর করবেই বা কেমন করে বলুন? কি এমন কাজটা করেছি যে, আজ চাচা বলে দাবী করতে পারবো। চাচা যদি তাহলে এতদিন দেখিনি কেন, তার এ-প্রশ্নের জওয়াবই ত আমি দিতে পারিনি।

হাসান বলিলেন, না না, ও কিছু না, বাবা। বোন আমার একটু লাজুক কিনা। তোমার কথা ত, বাবা, মোবারকের কাছে অনেক শুনেছি। কিন্তু তোমার সাথে দেখার সুযোগ হয়নি।

সে আমারই দোষ, সে আমারই দোষ।

না, না, দোষ আর কি! আমি জানতাম একদিন দেখা হবেই।

আশরাফ বলিল, শহরের বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নাই। তবে শহরকে আমার ভারী ভয়। কখন যে কোন দিকে কার গাড়ী চাপা দিয়ে দেয় তার ঠিক কি। ওখানে কার হিসেব কে রাখে বলুন!

হাসান হাসিয়া বলিলেন, ঠিকই বলেছ, বাবা। তা রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়নি ত?

আশরাফ বলিয়াছিল, জি না, অসুবিধা তেমন হয়নি। মোবারকের কাছে সব জেনে নিয়ে আঁটঘাট বেঁধেই তবে আমি বেরিয়েছি। তা অসুবিধা একটু হয়েছিল বৈ কি! ও বেটাকে তাড়াতে চাইলেই কি তাড়ানো যায়!

হাসান উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অসুবিধা?

আশরাফ বলিল, দুই ষ্টেশন আগেই নেমে গেছলাম। আধাদিন বসে থেকে তারপর অন্য ট্রেনে এসেছি।

হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, পাশের কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলে না?

আশরাফ বলিল, জেনেইবা কি হবে বলুন? এক বেটা নচ্ছার গাড়ীতে উঠেছে ত আর নামতে পারে না। কেন যে জর নিয়ে গাড়ীতে মরতে উঠেছিল। দিলাম তাকে নামিয়ে। কিন্তু এদিকে গাড়ী দিল ছেড়ে। কত হাঁকাহাঁকি করলাম; কিন্তু বেটা ড্রাইভার কানেই তুললনা।

আশরাফের কথার ধরণ দেখিয়া হাসান সাহেব হাসিলেন। তিনি আফসোস করিয়া বলিলেন, এদিকে যে এখন তোমার নাওয়া-খাওয়া হলো না। জলদি মাথায় পানি দিয়ে এসো।

আশরাফ নির্ব্বিকারভাবে বলিল, ব্যস্ত হবেন না। নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়েও দিন দুই চালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস আমার আছে।

আশরাফ দুইদিন ছিল। বারবার সে হাসান সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। হাসান সাহেবও একই কথা বারবার তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এতে তাঁহার হাত ছিল না।

হাসান সাহেবের আপত্তি কানে না তুলিয়া আশরাফ বলিয়াছে, স্রেফ আপনার জন্যই মোবারককে ফিরে পেয়েছি। বলুনত সবাই যদি গাঁয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তা হলে গাঁয়ের লোকগুলো যায় কোথায়?

হাসান সাহেব বলিয়াছিলেন, কথা সত্যি। তবে মোবারক নিজেকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাবে, কি যে আর করতে পারবে তাও বুঝিনে।

আশরাফ বলিয়াছিল, ওকে গাঁয়ে থাকতে দেন, আর

কোন ভাবনা ভাবতে হবে না। কাজ আমরা করিয়ে নেব। এ-রকম একজন লোক না হলে আমাদের চলছিল না। যে কথা বলবে না কাজ করবে, রাগ করবে না, সহ্য করে যাবে, এমন লোকের অভাবে সবই আমাদের পণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। আমি কাজ করতে পারি; কিন্তু ঝগড়া না করে পারি না। ফলে কাজের চেয়ে অকাজই হয়ে যায় বেশী।

হাসান সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, যাতে ঝগড়া হয় না সেভাবে কাজ করলেই পারো।

আশরাফ বলিয়াছিল, পারি না, কিছুতেই পারি না। কি না বলে, স্বভাব যায় না মলে, আমারও হয়েছে তাই।

হাসান বলিয়াছিলেন, কাজ করার অনেক আছে সে আমি বুঝি; কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে, কাজের লোককেই সবাই সন্দেহ করতে চায়।

আশরাফ বলিয়াছিল, সন্দেহ করে তা ঠিকই। তবে এটাও আমি বলি, সন্দেহ করা কি অন্যায়? জনদরদের বন্যা বেয়ে কি যে এসেছে তা ত চোখের উপর আমরা দেখেছি। জুয়ার আড্ডার দিকে সন্দেহের চোখে তাকানই ত স্বাভাবিক। তবে সকল বাধা তুচ্ছ করেই আমাদের কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক জুয়াড়ীর দিকেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

কিছু সময় থামিয়া আশরাফ বলিয়াছিল, কাজ আমাদের করতেই হবে। গ্রাম যে মানুষের বাসের অনুপযোগী হয়ে পড়লো। এভাবে চলতে থাকলে গ্রামে শিয়াল-শকুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। অর্দ্ধেক মরে শেষ হবে, আর অর্দ্ধেক পালাবে। কোথায় পালাবে? শহরে এদের জায়গা দেবেন কোথায়? পল্লী মরে গেলে শহর বাঁচবে কেমন করে? তেল, সাবান, আর স্নো, পাউডার খেয়ে ত বাঁচবে না।

গাঢ় স্বরে হাসান বলিয়াছিলেন, তোমার সাথে আমার মতের অমিল নাই; কিন্তু মনে জ্বালা থাকলেই কাজ হয় না, এটাই আমি ভাবছি।

আশরাফ বলিয়াছিল, আপনারা দোয়া করেন, আমাদের কাজ আমরা করার চেষ্টা করবো। আমি যখন অবস্থা ভাবি, আমার তখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আপনি বিশ্বাস করবেন না, কত রাত যে আমি কেঁদে কাটিয়েছি। তবে এ-ও আমি বিশ্বাস করি চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। নিশ্চেষ্ট থাকলে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। আর লড়াই করলে দুদিন পরেই হউক, বা দশদিন পরেই হউক স্বপ্ন একদিন সার্থক হয়ে উঠবেই।

নিজের প্রাণের আবেগ দিয়া আশরাফ হাসান সাহেবকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এমন উজ্জ্বল প্রাণের পরিচয় আর কোথাও তিনি পান নাই। ইহাতে সম্মোহন শক্তি রহিয়াছে। আশরাফ যখন বিদায় চাহিল, সে সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল, তাহাকে আরও কিছুকাল আটকাইয়া রাখেন। কিন্তু হাসান সাহেব তাহাকে বাধা দিলেন না। শুধু দুই হাত তুলিয়া মোনাজাত করিলেন, এই আগুন যেন অনির্বান থাকে, প্রাণে প্রাণে এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন ছড়াইয়া পড়ে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করিয়া প্রাণ রাখার গ্লানি বহন করার পরিবর্ত্তে এমনি পায়ে দাঁড়াইবার প্রেরণা যেদিন সারা দেশের আত্মমর্য্যাদার উৎস হইতে সঞ্জীবিত হইবে, সেদিনই দেশ বাঁচার সত্যিকার পথ খুঁজিয়া পাইবে।

যাবার সময় হাসান সাহেবের পা ছুঁইয়া সালাম করিতে করিতে আশরাফ বলিয়াছিল, আপনাকে দেখে শহরের ভয় একটু কেটেছে। পরে দরকার হলেই ছুটে আসবো।

হাসান সাহেব তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন, তাই এসো, বাবা, তাই এসো। তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারলে আমার দুশ্চিন্তার বোঝাও কিছুটা হালকা হবে।

অনেকদিন মোহাম্মদপুরের বিশেষ কোন খবর হাসান সাহেব পান নাই। মোবারক মাঝে মাঝে আসিয়াছে; কিন্তু তাহার-জবানী বেশী কিছু জানার উপায় ছিল না। সে-নিজে হইতে কিছু বলে না, এবং জিজ্ঞাসা করিলে হ্যাঁ, না বলিয়া সংক্ষেপে জওয়াব সারে।

আশরাফ আরেকবার আসিয়াছিল অন্য এক সমস্যা লইয়া। আশরাফের কাছে হাসান সাহেব অনেক খবরই পাইয়াছেন। গ্রামে হাইস্কুল করার সখ আশরাফের অনেকদিনের। হাতের কাছে রেডীমেড মাষ্টার পাইয়া এ সুযোগ সে ছাড়িতে পারিল না। এ-বাড়ী ও-বাড়ী হতে ভাঙ্গাচুরা চেয়ার বেঞ্চ জোগাড় করিয়া তাহারা একটি স্কুল খুলিয়াছে। বাঁশের মাচা বাঁধিয়া বাকি বেঞ্চ টেবিলের কাজ চালাইতেছে। স্কুলটিকে দাঁড় করাইবার জন্য সে আর মোবারক প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে আরও অনেকে জুটিয়াছে।

হাসান সাহেব তাহার কাছে তাহাদের আরও অনেক পরিকল্পনার কথা শুনিলেন। তাহাদের সাধ্য অনুসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করিতে তাহারা তৈয়ার হইতেছে।

আশরাফের আশাবাদের শেষ নাই। তাহার উৎসাহ অফুরন্ত। সে আত্মতৃপ্তির সুরে বলিয়াছিল, কে বলে গ্রামের লোকের প্রাণ নাই? তারা ঝগড়া করে, মাথা ফাটিয়ে মামলা করে, কুচক্রীর পাকে পড়ে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করে, জেদের বসে সর্ব্বস্বান্ত হয়। কিন্তু সারা গাঁ'ই ত আর কুচক্রীতে ভরা নয়। এদের বাইরে অসংখ্য লোক প্রাণের আলো সযত্নে বাঁচিয়ে চলেছে। এদেরে

বুঝিয়ে ভাল পথে আহ্বান করার মত মানুষের অভাব না হলে, এরা যে মুখের গ্রাসও তুলে দিতে পারে, এমন প্রাণের পরিচয়ও আমরা পাচ্ছি।

তবে আশরাফ যে সমস্যা লইয়া আসিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অন্যধরণের। মোবারকের ব্যক্তিগত জীবন লইয়া এ-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং আশরাফ এ-ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী।

হাসান সাহেব অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। কি পরামর্শ যে তিনি আশরাফকে দিবেন তাহা স্থির করা তাহার পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আশরাফ মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইয়া বলিল, আমি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, আমার এ-অপরাধের অন্ত নাই। তবে আমিও আর কোন পথ খুঁজে না পেয়েই আপনার কাছে দৌড়ে এসেছি। মোবারক আপনার কথা ছাড়া আর কারো কথা শুনবে না।

হাসান সাহেব বলেছিলেন ত বেশ করেছ, বাবা, বেশ করেছ।

আশরাফ বলিয়াছিল, সখিনাকে আমি যদি বিয়ে করে ফেলতে পারতাম তাহলে কোন সমস্যাই থাকত না। কিন্তু ও-বড় দুঃখী। আমার যা হালহকিকত, আমার কাছে এলে ওর দুঃখ বাড়বে ছাড়া কমবে না। এমন ভাল মেয়ে আর হয় না। এজন্যই মোবারককে সবাই ধরেছে।

হাসান সাহেব বলিয়াছিলেন আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেললে, আশরাফ!

আশরাফ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, আমাকে মাফ করবেন। এ-ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারবেন না, সবাইকে আমি এ কথাই জানাবো। আপনার যাতে স্পষ্ট মত নাই, মোবারক কেন, আমাদের কেহই তা করতে এগুবে না।

হাসান সাহেব আশরাফকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, না, না, আমাকে মুখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে হোমায়েরাকে মোবারকের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম এক, খোদার বিধান হল অন্য। আজও কিছু করতে হলে আমাকে উদ্যোগী হয়েই করতে হবে। চুপ করে থাকলে আমার দায়িত্ব পালন করা হবে না।

অনেকটা স্বগতভাবেই হাসান সাহেব বলিতেছিলেন, উভয়ে সুখী হবে এই আশা নিয়েই দুজনকে এক করে দিয়েছিলাম; কিন্তু কেহই সুখী হল না। আমি বসে বসে এক পরিকল্পনা করেছিলাম, খোদার হাতে ছিল উল্টো পরিকল্পনা। খোদা, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

আশরাফের দিকে চাহিয়া হাসান বলিয়াছিলেন, তোমাদের এন্তেজাম শেষ করে ফেল। কিছুতেই আটকাবে না।

তারপর হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, সবদিক ভাল করে দেখে শুনে, বিচার বিবেচনা করে ঠিক করো। চোখ আমার অন্ধকার হয়ে আসছে, ভাল দেখতে পাই না। তোমাদের বিচার-বিবেচনার উপরই আমি নির্ভর করবো। আমি নিজে উপস্থিত থেকে বিয়ে পড়িয়ে আসবো।

হাসান সাহেব নিজে যে তালাকনামা মুসাবিদা করিয়া-দিয়াছিলেন, তাহা দস্তখত হইয়া কয়েকদিনের মাঝেই মোহাম্মদপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)
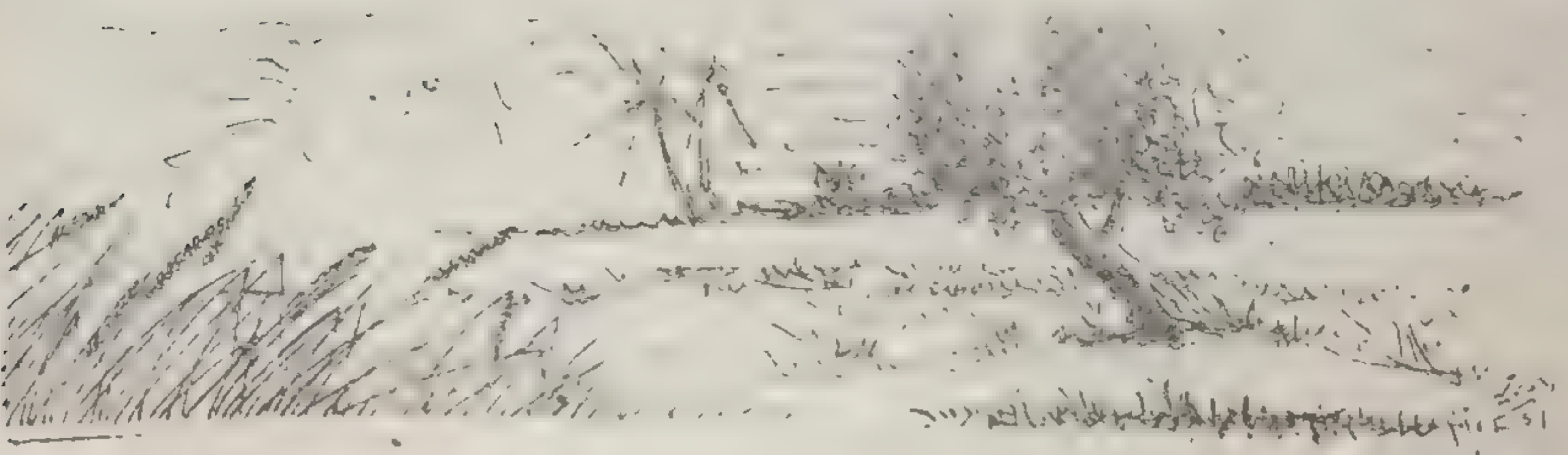
আমি

রওশন ইজদানী

আমিই আমারে চিনিনা কে আমি—চিনে না
আমারে কেউ
উত্তাপ মহা বারিধির বুকে আমি এক ছোট ঢেউ।
সিন্ধু জাগায় আমি তাই জাগি, জাগিনি কো
আমি নিজে
তারি বুকে ফের আমি পাই লয়, জানিনা খেয়াল কি যে
কেন সে বিশাল হয় উত্তাল—কেন সে শান্ত হয়
কেন এই বুকে উঠে ঢেউ কোটি, কেন বুকে পায় লয়?
আমি নহি পানি, আমি নহি বায়ু,
আমি নহি আর কেউ,
উত্তাল মহা বারিধির বুকে আমি এক ছোট ঢেউ॥

সিন্ধুর বুকে জাগিয়াছি আমি আপন খেয়ালে তার
জাগি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ, লয়ে হব একাকার!
আমি সিন্ধুর, সিন্ধু আমার, সিন্ধুতে আমি বাঁচি,
ঢেউ যতক্ষণ, আমি ততক্ষণ "আমি" রূপে
বেঁচে আছি।
সিন্ধুর বুকে জনম আমার নহি সে সিন্ধু আমি,
লীলার খেলায় আমি লীলা কণা, সে যে মোর
প্রিয় স্বামী।
নহি সে বারিধি, নহি তার বারি, নহি আমি আর কেউ,
উত্তাল মহা বারিধির বুকে আমি এক ছোট ঢেউ।
সাগরের বুকে জেগে উঠে আমি, সাগরে মিলাতে চাই,
জাগি যতক্ষণ আমি ততক্ষণ, না মিলালে সুখ নাই॥

আমি উত্তাল উর্ম্মিমাতাল বারিধির কল্লোল,
মহা বারিধির এক লাহজার আমি এক ছোট রোল।
আমি কল্লোল, আমি কলরোল, আমি গর্জ্জন ধ্বনি
মিলাইলে মোর সকলি মিলায়,
মিলাই আমিও 'মনি।
আমি শুধু ধ্বনি বাজি তাই আমি,
"আমি" দেই পরিচয়,
মিলাইলে আমি ধ্বনির সায়রে হয়ে যাই ধ্বনিময়।
আমি কে শুধাই ধ্বনিলোকে ডাকি'
মিলেনা জবাব তার,
ধ্বনির সায়রে মোর সব ধ্বনি হয়ে যায় একাকার।
আমি কে শুধাই কেউ শুনেনা-কো,
শুধু বাজে তালগোল,
মহা বারিধির এক লাহ্‌জার আমি এক ছোট রোল॥

উঠে ঢেউ কোটি, লুটে পড়ে কোটি,
সংঘাতে আমি জাগি,
সংঘাত-খন পরমায়ু মোর—সংঘাত মোর লাগি।
ছিল মহা অধি প্রশান্ত যবে ছিলনা এ মাতামাতি
পাত্তা আমার মিলিত কি খুঁজি মহাকাল দিবারাতি?
ভূধর-কানন, আছমান-জমি কোথা না মিলিত সাড়া,
সীমাহীন এই মহাপারাবারে আমি ছিনু আমি-হারা।
উঠিল দুলিয়া আপন খেয়ালে আপনি-সে পারাবার,
চঞ্চল-বীচি-সংঘাতে অব্ধি রূপ দিল আপনার.
সেই রূপে হলো আমার প্রকাশ—
আমি তার কল্লোল;
মহা বারিধির এক লাহ্‌জার আমি এক ছোট রোল।

ধর্ম্মই মোর জাগিলেই আমি মরিতে কাঁদিয়া মরি
জাগি যেথা হতে আমি সেথা পুনঃ
কাঁদিয়া লুটায়ে পড়ি।
ধ্বনি পারাবারে জেগে উঠি আমি,
জাগিলে মিলাতে চাই,
জাগি যতক্ষণ আমি ততক্ষণ, না মিলালে সুখ নাই॥

আমিই আমারে চিনিনা 'কে আমি'
চিনেনা অন্যজনা,
আমি ক্ষণদ্যুতি, মহাপাবকের চিন্‌কারী এক কণা,
ছুটে আসি যবে আমি ততক্ষণ, না ছুটিলে আমি নাই,
বের হয়ে আসি মহাশিখা হতে,
বাহিরে হারিয়ে যাই।
আমি ক্ষণদ্যুতি অশনি-চমক, জলদের বিদ্যুৎ
মিলাইতে শুধু প্রকাশ আমার—রহস্য অদ্ভুৎ!
যদি দিবারাতি খোঁজো পাতি পাতি সাগর-ভূধর-ক্ষিতি
লাহ্‌জার তরে আমি অবিচল পাবেনা এমন স্থিতি।

তিমিরের বুকে রহিয়াছে লুকি মহা জ্যোতিঃ-পারাবার
ক্ষীণ দীপশিখা তারি জ্যোতিঃ আলো,
নিভে যদি নাই আর;
টেনে লহে বুকে সহসা পলকে মহা জ্যোতিঃ চুম্বক,
জ্যোতির পাথারে জ্যোতিঃ শিখা এক
করে উঠে লক্ লক্।

জ্বলি যতক্ষণ আমি ততক্ষণ আমি রূপে বেঁচে রই
"আমি" রূপে তার গান গেয়ে যাই,
আমি তারে প্রভু কই।

আমি রূপে তার বিরহ অনলে
তিলে তিলে পুড়ে মরি,
পতঙ্গ হয়ে আমারি অনলে আপনি ঝাঁপায়ে পড়ি।

আমিই আমারে চিনিনা 'কে আমি'
কি সে-বল তারে চিনি?
মহাবীণকারে বাজাইছে বীণা আমি সে-সুর রাগিণী।
নিরলে বসিয়া বাজাইছে বীণা, বাজিতেছি আমি তাই
বাজি যতক্ষন আমি ততক্ষণ, না বাজালে
'আমি' নাই।

জানিনা কি বাজি, কেন সে বাজায়,
বাজিতেছি তার সুর
বাজি সারাক্ষণ সজন বিজন বাহির অন্তঃপুর।
বীণা ও করের সংঘাতে আমি আপনি জাগিয়া উঠি
সুর-পারাবারে একটি সুরের শতদল হয়ে ফুটি।
সংঘাতে রূঢ় আমার জনম, সংঘাত শেষে মরি
বাঁচি যতক্ষণ আমি বিরহিনী, কেঁদে যাই প্রাণ ভরি।
তিমির-পাথার মন্থিয়া যথা আলোকের জাগে বান,
সংঘাতে হেন সুর অধি হতে আমি জাগি নিয়ে প্রাণ।
সংঘাতে মোরে ছিটকিয়া আনে চুম্বক হতে দূর
ফিরে যেতে সেই চুম্বকে ফের কেঁদে মরি নিঝ্‌ঝুর।

আমি বেণুসুর আমি গাহি তাই আমারি বিরহ-গাথা,
ছুটি নিশিদিন সে-সায়র পানে,
কেঁদে মরি কুটে মাথা।
খুঁজে মরে তাই তটিনীর স্রোত
কোথা প্রিয় পারাবার,
মিলনে সকল থেমে যায় ধ্বনি, হয়ে যায় একাকার।
আমি নহি বীণা, নহি বীণাকার, আমি সে বীণার সুর
আমি লাহ্‌জার ঝংকার এক মহাসুর সিন্ধুর॥

পলাশীর পর ও সিপাহী যুদ্ধের আগে

হায়দার আলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

সুচতুর হাণ্টার সাহেব তাঁর যাদুকরী লেখায় যেভাবে Rajas of Nagar-এর বর্ণনা দিয়েছেন; কিন্তু তার নাম না দেয়া নগরটির নাম শুনলেই বীরভূমের রাজাদের নগরের কথাও মনে হয় বটে; তবে বীরভূমের নগর না হয়ে এ-নগর কামালের নগরই হবে বলে আমরা মনে করি এবং এদিকে যে কোন চিন্তাবিদ ও আগ্রহশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তৎসহ আর দু'একটি কথা নিবেদন করতে চাই—তা'হলো এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঝুনা শাসক লর্ড মেয়ো ও অন্যান্য সুচতুর উচ্চপদস্থ ইংরাজদের পরামর্শক্রমে প্রসিদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যিক ও ঝুনা সাম্রাজ্য-বাদী উচ্চ রাজকর্মচারী W. W. Hunter সাহেব 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্' গ্রন্থখানি সংকলিত করেন ১৮৭১ খৃঃ। যিনি এই বইখানা মনোযোগ সহকারে আদ্যপান্ত পাঠ করেছেন, তিনিই লক্ষ্য করেছেন লেখকের চাতুর্য্যপূর্ণ লেখার কৌশল; আসলে 'সাম্রাজ্য' দীর্ঘস্থায়ী করার সংকল্প নিয়েই উক্ত বইখানা সংকলিত করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠার ফুটনোটে ওহাবী আন্দোলনের শেষের দিক্‌কার জেনারেল নসির উদ্দিনের নামটি ফুটনোটে বলা হয়েছে—"Wilayet Ali and Inayat Ali, the former, after a missionary tour through Bengal, took Bombay, the Nizamat, and Central India, as his special field. Inayat concentrated his efforts on Middle Districts on the Lower Provinces Malda, Bogra, Rajshahi .." প্রভৃতি দিয়ে বলা হয়েছে—'কেরামত আলী অব্ জৌনপুর'। কিন্তু ইনায়েৎ, বিলায়েৎ আলীর কথা অনেক বলা হয়েছে, অথচ of Rangpur কি of Dinajpur বলা হয় নি। কারণ বিলায়েৎ আলী, ইনায়েৎ আলীর বাড়ী রঙ্গপুর দিনাজপুরের বর্ডারে ছিল।

আর যিনি একটি বিরাট সশস্ত্র বিদ্রোহ বা যুদ্ধের প্রধান নায়ক (নসিরউদ্দিন) তাঁর নামটা দিলেন ফুট-নোটে। যে কোন গৃহকর্ত্রী তার আঙ্গিনা সম্পূর্ণটা দেখতে পায়, একটা সুসভ্য রাজ্য শাসকও তদ্রূপ তার রাজ্যের খবর রাখে। উপরে যেমন হাণ্টার সাহেব ইচ্ছাকৃতভাবে উহাদের বাড়ী, বংশ পরিচয় প্রভৃতি দেন নি, এই নগরের বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে। 'নগর, ইনায়েৎ আলী, বিলায়েৎ আলী, নাসরউদ্দিন'—ইঁহাদের আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়লে অনেক কিছু গোপন কথা ফাঁস হবার আশংকায়ই এই ব্যবস্থা হয়েছে। তবে হাণ্টার সাহেবকে ধন্যবাদ এইজন্য যে, মিথ্যা কথা তিনি কিছু বলেন নি। কৌশলে তাঁর উদ্দেশ্য তিনি সিদ্ধ করেছেন। হাণ্টার সাহেব লিখিত 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্' গ্রন্থের ১৪৭-১৪৯ পৃঃ নগর সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"মুরশিদাবাদে এখনো একটি মুসলিম রাজদরবার এক রাজত্বের প্রহসন খেলছে এবং প্রত্যেক জিলাতেই কোনো না কোনো শাহী খান্দানের বংশধর বিষণ্ণভাবে কোনো ছাদহীন ইমারতে আর খাগড়া-বোঁজা দীঘির ধারে তার আত্মনাশ করে যাচ্ছে। এই রকম অনেক পরিবারের কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি; তাদের ধ্বসে য্যাওয়া দালান-কোঠা, বয়স্ক ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী; ভাই-ভাতিজা, ভাগিনা-ভাগিনীতে ভরে গেছে আর এই ভুখা জনতার একজনও জীবনে তার নিজের জন্যে কিছু করবার মওকা পায়না। তারা অসংখ্য নামে-মাত্র অস্তিত্বকে জরাজীর্ণ বারান্দা আর ফুটা ছাদের তলে টেনেই চলে এবং ঋণের অতলে গভীর হতে গভীরতর-ভাবে নিমজ্জিত হতে থাকে, অবশেষে প্রতিবেশী হিন্দু-মহাজন তাদের সঙ্গে একটা ঝগড়া ফাঁদে এবং তখন এক মুহূর্ত্তে এক তাড়া বন্ধকীনামা দাখিল হয়ে তাদেরকে সম্পত্তি থেকে উৎসন্ন দিয়ে দেয় আর প্রাচীন মুসলমান পরিবারটি হঠাৎ রাহুগ্রস্ত হয়ে চিরদিনের জন্য লোপ পায়।

একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত যদি চাওয়া হয় তবে আমি নগরের রাজাদের কথা উদ্ধৃত করতে পারি। যখন বৃটীশ পহেলা তাঁদের সম্পর্কে আসে তখন দুই শতাব্দীর অনাচার-অপব্যয় সত্ত্বেও তাঁদের আয় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। খিলান শোভিত বালাখানার বারান্দা থেকে এই রাজারা এমন একটি রাজ্যের উপরে চেয়ে থাকত যা' এখন ইংরাজের দুই জিলা হয়েছে। তাঁদের মসজিদগুলি আর অসংখ্য গ্রীষ্মাবাস একটি কৃত্রিম হ্রদের (ঝিলের) হাশিয়ার উপরে চারিদিকে ঝলমল করত এবং ঝিলের বুকে তার প্রতিবিম্ব পড়তো, তাতে কোন খাগড়া নলের একটু প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। জরীন একটি বাজরা

বিশেষ গর্ভভরে পানি কেটে খিড়কির ঘাট থেকে বাগান-শোভিত ঝিল মধ্যস্থ একটি দ্বীপে (১) যাতায়াত করত। নগরবেষ্টিত দুর্গে সৈন্যেরা প্রহরায় বদলী দিত। আর সূর্য্য যখন নেমে আসৃত অনেক শিশুর হাসি এবং পুর-মহিলাদের সেতাঙ্গীর আওয়াজ উঠ্‌ত আন্দরে বেগমদের বাগানের কুয়ার পার থেকে। নগর বেষ্টিত দুর্গের এখন আর কিছুই নাই—বিরাট তোরণটি (২) ছাড়া। ছাদহীন মস্‌জিদের দেয়াল থেকে শেষ চুণকাম শোভা অনেকদিন ধ্বসে গেছে। বিরাট বিরাট বাগান তার পরিপাটি নালা-সহ জঙ্গলে (৩) পরিণত হয়েছে অথবা পরিণত হয়েছে ধানক্ষেতে (৪)। তাদের মাছভরা দীঘি-গুলি এখন এঁদোডোবা। ই'ট ভাঙ্গার স্তূপটিলা থেকে গ্রীষ্মের সেই আবাসগুলির চিহ্ন বুঝা যায়, মাঝে মাঝে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেয়াল এখানে সেখানে রয়েছে, মূর স্থাপত্যপদ্ধতিতে বাঁকানো সেই ঝরোকাগুলি এখনো যেন এই দৃশ্যের পানে করুণভাবে চেয়ে আছে।

কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক হল প্রাচীন সেই শাহী সরো-বরের অবস্থা। বালাখানা উঠেছে এর প্রান্ত থেকে, তা' সে প্রাচীনকালের স্তম্ভশোভিত পরীকাহিনীর ইমারত নয়, বরং অন্ধকার কারাগারের (৫) মত সে ইমারত, কালপ্রভাবে বিবর্ণ এর দেয়ালগুলি একটা যোগ্য পারম্পর্য্য রক্ষা করেছে সবুজ শ্যাওলা পর্য্যন্ত যা নীচে পানিতে পচে যাচ্ছে। [পাদটিকা: আমি ইমারত ও দীঘিগুলি ১৮৬৪ খৃঃ যেমন দেখেছি তেমন বর্ণনা দিচ্ছি; এরপরে আমি শুনেছি দীঘিগুলি পরিস্কার হয়েছে আর ইমারতগুলি (৬) আরো অতলে ধ্বসে পড়েছে।] বারান্দা পরিত্যক্ত নড়বড়ে অবস্থায় আছে। রাণী বা বেগম খিতাবধারিনী সেই হতভাগিনীরা সন্ধ্যাবেলায় আর পর্দা করা বজরায় চড়ে বেড়ান না। তাঁদের ঐশ্বর্যময় জেনানা এখন ছাদহীন আর এর বাসিন্দারা খুব নীচুস্তরের এক বসত বাটীতে স্থানান্তরিত হয়েছেন—যেখান থেকে এক জীর্ণ আস্তাবলের আঙিনা দেখা যায়। নগরের এই শাহী পরিবারের অতীত ঐশ্বর্য্যের সব কিছুই নষ্ট হয়েছে, খালি একটি ছোট নহর অপরিবর্তিত থেকে এখনো ভিজে মাটি পথে সেই নালা পথেই বয়ে চলেছে যেখান দিয়ে প্রাচীন বালাখানায় বইতো এবং এটাই যে কোনো দর্শককে রোমনগরস্থ ঐতিহাসিক ধ্বংসা-বশেষের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের * মত (স্পেনসারের 'Ruins of Rome' কবিতা) স্মরণ করিয়ে দেয়: (যার অর্থ দাঁড়ায়):—

'টাইবার নদ তার মোহনার দিকে দ্রুত বইছে,—এ-ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। হায় দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব। ব্যবসায়ের মোকাম কুঠি উঠে আর পড়ে এবং যা অস্থির চঞ্চল তাই থাকে আর অপেক্ষা করে।'

ধ্বংসস্তূপীকৃত ইমারতের এক কোণে সেই বংশের প্রতিনিধি হতবুদ্ধির মত দিন গুজরান করছে, চিবাচ্ছে আফিংমেশা মিঠাই, স্বপ্নালুভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের সেই খাগড়াবোঁজা (১) ঝিলের দিকে। কোন রাজ-নীতিবিদ যদি 'হাউস অব কমন্সে' একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে চান, তাহলে কেবল বাংলার একটি মুসলমান খান্দানের ইতিহাস হুবহু উল্লেখ করে গেলেই হয়। তাঁকে প্রথম চিত্রিত করতে হবে একটি প্রাচীন সম্মানিত রাজার চিত্র—যিনি প্রাচ্যের আনুষ্ঠানিক শাহীয়ানা আদব-লেহাজ সম্বলিত রাজদরবারে সারাজীবন বিপুল সংসার পরিবার সমৃদ্ধ, নিজের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে বিরাট এলাকা শাসন করেছেন এবং মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা পাচ্ছেন মসজিদ স্থাপন করে আর ধর্মকার্য্যের জন্যে সম্পত্তি ওয়াকৃফ্‌ দিয়ে। তারপর তাঁকে চিত্রিত করতে হবে এই রাজার আধাবোকা বর্তমানের বংশধরকে, যে নাকি তাঁর জঙ্গলে কোনো ইংরাজ শিকারীদল আসার খবর শুনে লুকিয়ে থাকে এবং বিদেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভদ্রতার খাতিরে যখন তাঁর চাকর-বাকর তাকে একরূপ টেনে (২)

(১) এই দ্বীপটি এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এ-স্থানটিতে আসলে যে কোন পথিকের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

(২) শিল্পীর অত্যাশ্চর্য্য গঠননৈপুণ্য যুক্ত সিংহ গেট বা তোরণটি প্রায় বিশ বৎসর হয় ঐ বংশীয় লোকেরা উহা ভেঙ্গে ইট খুলে প্রাচীর গেঁথেছে।

(৩) দীর্ঘ ৭ বৎসরের মধ্যে এই স্বর্গসদৃশ স্থানটির অনেকাংশ বিরাট জংগলে পরিণত হয়।

(৪) উভয় সরোবরের অনেক স্থানই ঐ সময় ধানক্ষেতে পরিণত হয়।

(৫) একটি নহে দু'টি। একটিকে এখনও বলা হয় আন্ধার কুঠরী এবং অপরটিকে বলা হয় আন্ধারকোঠা। এ-স্থানটী এখন লোকালয় হয়েছে; কিন্তু লোকালয়টীর আন্ধারকোঠা নামই প্রচলিত রয়েছে।

(৬) ইমারতগুলির মূল প্রাসাদটী নসিরউদ্দিন জঙ্গ বাহাদুর মেরামত করে নিজে বসবাস করেন। হান্টারের উক্ত উক্তি ঠিক।

* প্রাচীন রোমনগরীর খবর আমরা জানিনা তবে এই নগরটিকে পুরাণা দিল্লীর ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। দিল্লীতে যেমন শীশমহল, খাসমহল, রংমহল, বালাখানা, সরাই, কেল্লা প্রভৃতি ছিল, এখানেও তেমনি শীশমহল, (কাসানা), খাসমহল (খাসবাগ); রংমহল (রঙ্গপুর), অসংখ্য বালাখানা, সরাইখানা, কেল্লা মুগলীগড় (মসিমপুর), আন্ধারকোঠা মোগলকোট; প্রভৃতি ছিল (এখনো এই নামগুলি প্রচলিত আছে) প্রতিটী জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের এ-স্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। —লেখক।

(১) ঐ-সময় ঐ-সব এলাকা খাগড়ায় পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু পরে ঐগুলিও ধানক্ষেতে পরিণত হয়।

(২) যে নামহীন লোকটির কথা হান্টার সাহেব উল্লেখ করেছেন, তিনিই হ'লেন ব্রিটিশ বিরোধী নসির উদ্দিন। এবং সেই নসির উদ্দিন যদিও তখন পথের ফকির কিন্তু কিভাবে তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের অভ্যর্থনা করতে পারেন?

বের করে আনে তখন আস্তে আস্তে কোনো এক ব্যবসায়ীকে কয়েক শত টাকার ব্যাপারে গেরেফতার করার জন্যে এক ঘেঁয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে আসে, এ-টাকা হয়তো তখনি তার বালাখানায় আনা হয়েছে।"

স্বর্গীয় প্রাসাদাদির অত্যাশ্চর্য্য অভিভূত হ'য়ে কবি জামালউদ্দিন 'প্রেমরত্নে'র ৫৫ পৃঃ বলেছেন—

"দেখিয়া কুসুম্ভ দেশ (১) উল্যাসিত মনে ॥
মনে কহে থাকি ধনি কুসুম্ভর বনে *
কুসুম্ভ ভুবন নাম বসতি সেস্থান ॥
কুসুম্ভ কানন বন পুষ্পের বাগান *
... ...
কুসুম্ভ ভুবন ধাম, তত্তুল্য কি ইন্দ্রধাম,
সুরপুর জিনিয়া সুবেস ॥
কুসুম্ভ কানন বন, নানা পুষ্পে সুসোভন,
ভূতলে সাজিছে স্বর্গদেশ *
দেখি কুসুম্ভ কানন, কুঞ্জ ও নিকুঞ্জবন,
লাজে গিয়া রহে বৃন্দাবনে ॥
গন্দময় পারিজাত, পাইলে লজ্জা ঘাত,
লুকায়া রহিল দেবস্থানে *
নিলকান্তি শ্বেত ছিল, ভাবিয়া কজ্জল হৈল,
শতদলে ছিল শত রঙ্গ ॥
সর্ব্ব রঙ্গ গেল তার, এক রঙ্গ হৈল সার,
সে ভাবিছে কুমদিনি সঙ্গ *
পদ্দ পুষ্প জলে ভাসে, ছিল সেই বার মাসে,
লজ্জা পায়া ডুব দিল জলে ॥
পাতা পুষ্প হৈল নাস, না রহিল বার মাস,
ভাসিছে কেবল গ্রিশ্মকালে *
চিন্তিয়া কেতকি ফুলে, অন্তর পুরিল ধুলে,
মধু তারে গেল সুখাইয়া ॥
কি কব পলাস গুন, পুষ্পে মধু পরিপূর্ণ,
মধু তারে পড়িল টলিয়া *
কন্নসিষ্টা নিচে ছিল, মুখ পসারিয়া নিল,
মধুমক্ষি নৈলে কতগুলা ॥
শ্রীমল সুরঙ্গ ফুলে, মিষ্ট মধু বহু ছিলে,
লাজে সুখাইয়া হৈল তুলা *
গন্দহীন পুষ্প চয়, চিন্তাযুক্ত অতিশয়,
লজ্জা সোকে শুখাইল কলি ॥
কুসুম্ভ ভুবন মাঝ, রহিল কুসুম্ভ রাজ (২),
সেখানে জাইবে শ্রেষ্ঠ অলি *
গোলাব সেওতি জুতি, কস্তরী বেলি মালতী,
চামিলি কামিনী সুসোভন ॥
যত পুষ্প গন্ধ ধারি, চারি পাশে সারি সারি,
মনোহর কুসুম্ভ কানন *
কুসুম্ভ কানন বনে, দিনবন্ধু বন্ধুসনে,
পিরিতে মজিবে দিনমণি (৩)।
জামালউদ্দিন কহে তায়, না বাচিবে প্রেমদায়,
পিরিতি করিতে হবে ধনি *"

ফুলচৌকিকে ঐ সময় নগরও বলা হ'ত। নগর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলছেন—

"কহিলে নগর বানি কবি হয় ভারি ॥
কহিবাতে ক্ষেন্ত হৈনু ধিক কৈতে নারি *"

ছোটবেলার এক ঘটনা নিয়ে কবি নগরের তুলনা দিয়ে বলছেন :

"পিতা মোরে দীন বন্ধু নগরে প্রধান ॥
তাহার সন্তান আমি এত অপমান *"

ফুলচৌকিকে যেমন নগর বলা হ'ত তেমনি ইহাকে রাজধানীও বলা হ'ত। কবি তাঁর 'প্রেমরত্ন' গ্রন্থে বলেছেন :

"এক দিনা দিনমনি আপনার কামে ॥
নাহি যায় রাজধানী আছে নিজ ধামে *"

কবি নগরের অতুলনীয় সৌন্দর্যরাজির বর্ণনা দিতে অক্ষম হয়ে বলেছেন—

"কহিবারে নারি ব্যাক্ষা কুসুম্ব ভুবনে ॥
করিয়াছে অতি সোভা কুসুম্ব কাননে *
কহিতে অক্ষম আমি রাগবের (৪) ঠাট ॥
কত দিগি সরবর বান্দা চারি ঘাট *"

নগরে বা রাজধানীতে বহু গুণী, জ্ঞানী ও ধনপতির সমাবেশ সম্বন্ধে এবং রাবণের স্বর্ণ লঙ্কার তুলনা দিয়ে কবি বলেছেন—

"কনক নগর জিনি কুসুম্ব ভুবন ॥
করিয়াছে বাস কত পণ্ডিত সজ্জন *
কত লোক ধনবন্ত কত সাধুপতি ॥
করিলে তাহার বাসে বাস কবিপতি *
কহিলে নগর বানি কবি হয় ভারি ॥
কহিবাতে ক্ষেন্ত হৈনু ধিক কৈতে নারি *"

বিপুল ধনৈশ্বর্যশালী কামাল উদ্দিনের চাকুরী স্বীকার করে কবি বলেছেন :—

"চাকুরি সিকার করে সাধুর সংসারে ॥
ক্রেমে যত কার্য্য সাধু অপি দিলে তারে *
* * *
বিদ্যাগুণে দিমমনি বুদ্ধি অতি থির ॥
কমলা কিসোর (৫) হৈল ধনের কুবির *"

(১) ফুলচৌকি। (২) কামাল উদ্দিন। (৩) কবি স্বয়ং। (৪) কামাল উদ্দিন। (৫) কামাল উদ্দিনের কবিকৃত নাম।

ক্ষাত্র শক্তির অধিকারী ইংরাজ কোম্পানী বাকের মোহাম্মদ নূর উদ্দিনকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় (১) সুবাদার বলে স্বীকার করে নেয়নি। কামাল উদ্দিনকে শুধু রঙ্গপুর ও গোয়ালপাড়া জিলাদ্বয়ের রাজা স্বীকার করে নেয়। বাকের, কামাল ও নিজের সম্পর্কে কবি বলেছেন—

"বিধাতারে দয়া দৃষ্টে ভাগ্য হৈল রাজা ॥
সে রাজ্যে ভূপতি মৈল সাধু হৈল তেজা *
মন্ত্রি হৈল দিনমনি নিরৈক্ষ কৃপাতে ॥
সকলি করিতে পারে সয়ালের নাথে *
সেকালে বিদ্যার জন্যে দুরু গিছে বৈয়া ॥
বিদ্যাগুণে রাজমন্ত্রি হৈল নারী (২) হৈয়া *"

গুণী-জ্ঞানী, ফকির-সন্ন্যাসী নেতৃবৃন্দ ও আর আর বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে কামাল উদ্দিনের রাজসভা সাজান এবং তাঁর দান ধর্ম ও প্রজাপালনের মনোনিবেশ করা সম্বন্ধে কবি বলেন :—

"সাজাইল রাজসভা নিপি মহামতি ॥
জেন সভা সাজাইলে উজ্জল অধিপতি *
দানধর্ম্মে সদারত ধর্ম্ম পথে মন ॥
দুষ্টের নাশক ভুপ সিষ্টের পালন *
সুবিচারে প্রজাগণ শুখি রাত্রদিন ॥
গহনি গম্ভির জলে জেনানন্দমিন *
পাত্র দিনমনি মনে করি নানা আশা ॥
কুশুম কানন পাশে (৩) নির্ম্মাইলে বাসা *
জন চারি দাসি রাখে নিজ অন্তপুরে ॥
পুরি মধ্যে অন্য কেহ জাইতে না পারে *"

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সাহেবের অন্যতম খলীফা মওলানা কেরামত আলী তাঁর ১৬।১৭ বৎসর বয়সে প্রথম যখন ফুলচৌকিতে আসেন ব্রেলভী সাহেবের দূত হিসাবে, ঐ সময় কেরামত আলী সাহেবের গোঁফ-দাড়ি হয়নি এবং তিনি দার পরিগ্রহও করেননি—এ সম্বন্ধে কবি তাঁর কাব্যের ৫৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"বৈকালিতে উপনিত এক ব্রহ্মচারী ॥
পুরুষ আকৃত কায়া মুখ জেন নারী *
বয়সে অধিক নহে রুপে মনুহর ॥
কাচলি কসন বস্ত্রে ঢাকা কলেবর *
বিদ্যারত্নকর (৪) নাম বিদ্যা বিভোসিত ॥
প্রেমসাস্ত্র গুরু ৫, ভক্তি সকলি বিদিত *
সাধুবালা (৬ বাসে বাসা করে ব্রহ্মচারি ॥
ক্রমে ক্রমে দু'জনে প্রণয় হৈল ভারি *"

ফুলচৌকি বা নগরে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সাহেব (৭) দু'বার আসেন। প্রথমবার যখন তিনি বিকাল বেলা এখানে এসে রাজবাড়ীতে উঠেন এবং কবির সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"উঙ্গি দেখ ভঙ্গি নাথে রঙ্গ ভাবে খেলা ॥
গগনে যখন শেষ এক দণ্ড বেলা *
আসিল পুরুষ এক মোহন মুরতি ॥
ললাটে সোনার চন্দ্র প্রকাসিছে জুতি *
কন্যা অঙ্গে অঙ্গ ধজা দেখিতে সুন্দর ॥
মোহনিয়া ছন্দে রমনির মনহর *
দেখিয়া দাড়ায় রামা পুরুষ সমুক্ষে ॥
দু'জনে দু'জনা পানে চাহে চক্ষে চক্ষে *
না বলে বচন কিছু নিশব্দ সেজনে ॥
প্রিয়াভাবে কহে ধনি পুরুষের সনে *"

শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সৈয়দ ব্রেলভী সাহেব 'নগরে' যখন দ্বিতীয়বার আসেন—সেই সময়ের কথায় কবি সৈয়দ সাহেবের পরিচয় ও হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ও মিলন সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—

"স্তবে তুষ্ট হৈল তবে নিরৈক্ষের শ্বামি ॥
উপনিত এক জোগি সেই অন্তগামি *
দুটি চক্ষে ভুরু তার মানেন্দ হিল্লোল ॥
চৌদ্দ'াহি বদর জিনি বদন উজ্জল *
হরিদ্রা চাঁপার রঙ্গ সর্ব্বাঙ্গে শরীর ॥
চল্লিশে বয়সাধিক (৮) ধ্যানে অতি ধীর *
জাবন মুনির (৯) বংশে জনব তাহার ॥
সে বটে জাবন জোগি দু'ভাবে আচার (১০) *
তৌরিত শাস্ত্রের বানী কিছু কিছু মানে ॥
তা-কহিলে দাগা পড়ে দিনের আইনে *
ঐক্যতা করিলে মারফত সঙ্গে মিলে ॥
প্রচার করিতে তাহে গুরু নিসেধিলে *
তাহে যদি প্রচারিয়া কহি গোটা গোটা ॥
হিন্দু ও জাবনি শাস্ত্রে দোহে পড়ে খোঁটা *
হিন্দু কহে সাকার জাবনে স্থুলাকার ॥

(১) উড়িষ্যা বলিতে তখন কেবল—মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জিলার একাংশ বুঝাইত'। (ডকটর কে, নাগ)
(২) কবির দৃষ্টিতে যিনি কামেল নন, তিনি পুরুষ হলেও নারী।
(৩) কবি মন্ত্রী হওয়ার পর বর্তমান জাফরাপুর নামক স্থানে বাস করতেন। সে স্থানে কবির প্রসাদ, দীঘি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। সিপাহী যুদ্ধে কবি ব্যতীত পরিবারের সকলকে নিহত করা হয় এবং ঐগুলি ধ্বংস করা হয়।
(৪) মওলানা কেরামত আলীর কবিকৃত নামে। (৫) সৈয়দ ব্রেলভী সাহেব (৬) কবি স্বয়ং।
(৭) স্থানীয় ফকির বংশীয়রা বলেন যে ব্রেলভী সাহেব ফুলচৌকিতে দুবার আসেন। প্রেমরত্ন পুঁথিতেও তাই পাওয়া যায়।
(৮) এই বয়সে সৈয়দ আহমদ শহীদ হন। (৯) হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বংশধর। (১০) সংস্কারক—মুজাদ্দিদ।

কোন সাস্ত্র (১) মিথ্যা নহে মিথ্যা অনাচার *
জা কহিলেন পাপ জন্মে চুপে থাকা তাথে ॥
সাস্ত্রের অন্যথা বানী কহিব কি মতে *
কদাশ্চ সাকার নহে নিরাকার অহি ॥
আপনা কুলের শাস্ত্র বলবর্ত্ত কহি *
না বলে অধিক বাক্য অহি জোগিবর (২) ॥
দিবা বিভাবরি ধ্যানে রহে নিরন্তর *
... ...
যে গুরুর পদ সেবিয়'ছে গুরুদাস ॥
জন্ম তারে হিন্দুস্তানে এবে স্বর্গবাস *"

কবি কামেলিয়াৎ হাসিলের পর কখনও 'কুসুম ভূবনে' অর্থাৎ নগরে রাজার সদনে থাকেন ও কখনও নিজের পৈতৃক বাড়ী ঘিরলাই গ্রামে থাকেন—তা' নিম্নোক্ত উক্তি হতে বুঝা যায়—

"কিছু দিবা গৃহে থাকি রাজপাত্রবর ॥
কুসুম ভূবনে গেল যথা দণ্ডধর *
রহিল হোছেন (৩) মন্ত্রি রাজমন্ত্রি কামে ॥
কখন নিবাসে রহে কভূ রাজধামে *
('প্রেমরত্ন', পৃঃ—১১৮)।

কৃষ্ণপন্থী বৈষ্ণব মহাবীর মহারাজ ভবানী পাঠক (৪) (ভবানন্দগিরি) এর সহিত কবি 'প্রেম' (বৈষ্ণব ও সুফীবাদ) সম্বন্ধে আলোচনা করছেন অপ্রাপ্ত বয়সের তুলনা দিয়ে—

"অরণ্যেতে কন্যার (কবি) নিকটে যেইজন ॥
দাড়াইছে দৈবিজনা হস্তে সরাসন *
তাহারে জিজ্ঞাসে রামা মিন্ততিয়া বানি ॥
ব্যাঘ্র মুখে বাচাইলে কে বটে আপনি *
• • • • • •
কিন্তু প্রিয়ভাবে প্রেম সজে নিরাকারে ॥
প্রেমতুল্য ধন নাহি ত্রিভব সংসারে *
সৃষ্টি করিয়াছে প্রভু প্রেমভাবে মজি ॥
প্রেম গুন জানা চাহি প্রেমি গুরু ভজি *
কন্যা কহে আপনি কদাচ নহ নর ॥
প্রভু কোপে রক্ষা পাই দেহ এই বর *
... ...
বাঙ্গলা কেবল বিদ্যা ইহা কিছু নয় ॥
আরবি পারসী আদি সবি বিদ্যা হয় *
কোন বিদ্যা তুমি নাহি জান দিন মণি ॥
ছি ছি তোরে বৃথা জন্ম মনুষ্য নাগনি *"

কবি কামেলিয়াৎ হাসিলের পর নিজ পিতৃভূমি ঘিরলাই হ'তে নগর বা রাজধানীতে আসা এবং 'কমলা কিসোর'—কামাল উদ্দিন জঙ্গ বাহাদুর কবির হস্তে রাজকার্য্য চালাবার ভার দিয়ে নিজেও 'মারফৎ' হাসিলের জন্য মনোযোগ দেন—

"ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে রহে সাধু বালা ॥
প্রেমদায় থাকিল মিটিল নারি জালা *
দিবা চারি গত করি সাধুর নন্দন (৫) ॥
চলিলেন রাজধামে রাজার সদন ·
আদব দস্তর মত দাড়াইল আগে ॥
দেখি অতি তুষ্টমতি নৃপ মহাভাগে *
কহে ভূপ এত দিবা ছিলে কিবা রসে ॥
করম কহিল মোর করমের দোষে *
পাগল উন্মাদ হৈয়ে ছিল এতকাল ॥
এক জোগি চিকিৎস্যাকে করিলেন ভাল *
এত শুনি কমলা কিসোর মহারাজে ॥
আজ্ঞা দিল দিনমণি থাক পূর্ব্বকাজে *

কামাল উদ্দিনের সহধর্মিণীর নাম বেগম জৈতুন বিবি। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কামালউদ্দিনের পুত্র নসির উদ্দিন শেষের দিকে ওহাবী যুদ্ধের 'জেনারেল' Com mander-in-Chief নিযুক্ত হন ব্রেলভী সাহেবের খলিফাগণ কর্ত্তৃক। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, টঙ্কের নবাব ওহাবী যুদ্ধের খলিফাগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করবার পর নসির উদ্দিনই জেনারেল নিযুক্ত হন। যা হোক, নসির উদ্দিন জেনারেল নিযুক্ত হবার পূর্ব হ'তে ব্রেলভী সাহেবকে কামাল উদ্দিন অর্থাদি দিয়ে সাহায্য ক'রে এসেছেন। শান্তিপ্রিয় কামাল উদ্দিন লোভী ইংরাজদের কুৎসিত আচরণে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেন। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হ'য়েছে যে, কামাল উদ্দিনের ভগ্নীপতি সম্রাট দ্বিতীয় আকবর। এই আকবর শাহ্‌র দুত নিযুক্ত হ'য়ে ইংল্যাণ্ডে যান রাজা রামমোহন রায় (৬)। ইহা না বললেও চলে যে, মাহিগঞ্জে ইঁনি কয়েক বৎসর ইংরাজের কেরাণী ও দেওয়ান ছিলেন। ঐ সময় রামমোহনের সাথে কামাল উদ্দিন ও তৎপরিবারদের আলাপ-পরিচয়, বন্ধুতা ও মতের আদান-প্রদান হয়। এখানকার প্রাচীন বৃদ্ধরা

(১) ধর্ম গ্রহন্থ—কোরান, বেদ। (২) ব্রেলভী সাহেব।

(৩) কামেলিয়াৎ হাসিলের পর কবি দিনমনি প্রভৃতি নামগুলি ত্যাগ করে মোসলমানি এহ নামে গ্রহণ করেন।

(৪) 'প্রেমরত্ন' গ্রন্থখানিতে প্রকাশ্যে কাহারও নাম দেয়া হয়নি। কৌশলে প্রধান প্রধান লোকদের নাম সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অথচ সে সম্বন্ধে স্থানীয় পাঠকগণ প্রায় সবাই অবহিত।—লিখক।

(৫) মুসা শাহের পুত্র।

(৬) রাজা রামমোহন রায়, দয়দুর্গা দেবি চৌধুরানী, জমিদার শিবচন্দ্র রায়, শেঠ ভগবান চন্দ্র সিং প্রভৃতির কথা পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

বলতেন ও এখনও বলেন যে, রামমোহন রায় এখানেই 'একেশ্বরবাদী' হ'য়ে পড়েন—সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতির সহিত আলাপ আলোচনায়।

দ্বিতীয় আকবরের দৌত্যকার্য্য করার মধ্যে ফুলচৌকি রাজপরিবারের লোকেরা তাঁকে ঐ কার্য্য করার জন্য অনুরোধ করেন ও রাজী করান; এবং ইংল্যাণ্ড যাওয়ার খরচপত্রাদি ইঁহাদের কলিকাতাস্থ 'সুতানটি' কুঠি থেকে সরবরাহ করা হয়। এ স্থানের তৎকালীন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে রামমোহন রায়ের স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের আকাংখা প্রবল হ'য়ে উঠে। যা-ই হোক, রামমোহনের ইংল্যাণ্ডে হঠাৎ মৃত্যুর খবর এখানকার অনেককেই চঞ্চল করে ও ইঁহারা ব্রিটিশের উপর ক্রোধান্বিত হ'য়ে উঠে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, অনুমান ব্রিটিশ-আফগান যুদ্ধের সময় (সম্ভবতঃ ১৮৩৭ অব্দে) সম্রাট মহিষী লাল বিবি পিত্রালয় 'নগরে' আসেন। পিতার বৃদ্ধ সেনাপতি ভবানী পাঠক সহ মীরগঞ্জ আসার কালে অন্যায়ভাবে ইংরাজ সেনানী কর্ত্তৃক অতর্কিত আক্রমণে উভয়ে নিহত হন; এবং সম্রাট ও তৎবংশীয়দের উপর ইংরাজদের তাচ্ছিল্যভাব, লাখেরাজ-বাজেয়াপ্তি প্রভৃতি কারণে কামাল উদ্দিন ইংরাজদের উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেন। এতদঞ্চলের দেশপ্রেমিকগণ তো ইংরাজদের বিরোধী ছিলেনই এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহীগণের সহিত ইঁহারা মতের আদান-প্রদান করতে থাকেন। কি ভাবে ব্রিটিশদেরকে এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে তার জন্য ধনকুবের কামালের প্রাসাদে ১২৬০ সালের শেষ দিকে একটি মহা সম্মেলন হয় বলে' এখনও স্থানীয় বৃদ্ধরা বলেন। ঐ সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয় যে, প্রত্যেক দেশীয় নৃপতিগণ স্ব স্ব প্রধান হ'য়ে থাকবেন, সম্রাট আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না; সম্রাট নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট থাকবেন। আকবর সানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল ফজল মোজাফ্‌ফর হোসেন সিরাজ উদ্দিনকে সম্রাট নিযুক্ত করা হবে। এ-সব কথা তৎকালিন শিক্ষিত, অশিক্ষিত লোক বলেছেন ও এখনও কেহ কেহ বলেন। যা' হো'ক ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহে এই নগরের অধিপতি ও তৎবংশীয়রা এবং অন্যান্য হিন্দু-মুসলিম বিপ্লবীগণ ইঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।

দিল্লী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত বিদ্রোহী দলে এই পরিবারের লোকেরা নেতৃত্ব করেন। পরে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। পরিবারের অন্যান্য সকলেই 'দিল্লী চলো', 'চলো দিল্লী' ধ্বনি নিয়ে বিপ্লবীগণ সহ সশস্ত্রভাবে দিল্লী ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ইংরাজগণ এই সুযোগ নিয়ে রাজধানী 'ফুলচৌকী' আক্রমণ করে বসে এবং কামাল উদ্দিনকে ধরে নিয়ে মাহিগঞ্জ আসার কালে রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজের অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে 'বালাটারী' নামক গ্রামে মৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। মহিপুর নিবাসী এক আরব গোত্রীয় ফকির উক্ত লাশ কবরস্থ করেন। পরে উক্ত ফকির ঐ কবরটি পাকা ক'রে বেঁধে দেন। এখনও লোকে ঐ কবরটিকে 'নবাব কামালের কবর' বলে উল্লেখ ক'রে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী ছড়া গানের কবি জহুর উদ্দিন, এঁর ভগ্নি আছিরণ সতী—সিপাহী বিদ্রোহের সময় কি ভাবে ধনকুবের কামাল উদ্দিনের প্রাসাদে রাত দুই প্রহরে ইংরাজ ডাকাতগণ আক্রমণ করে এবং স্বর্গতুল্য প্রাসাদটির অনেক স্থান কামানের গোলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলে তা' এঁদের ছড়া গানে গেঁথে রেখেছে। এই ছড়া গান ও নগরের বিভিন্ন লোকের ছড়া গান গাইতেন বলে চৌকিদারের সাহায্যে জহুর উদ্দিনকে থানার দারোগা রঙ্গপুর জেল হাজতে ৭ দিন আটক রেখে ছেড়ে দেয়। পরে ইঁনি নিষিদ্ধ বিষয়ের কবিতাগুলি খুব কম গাইতেন। ইহাও লক্ষ্য ক'রবার বিষয় যে, ১৮৫৭র বিপ্লবের মধ্যে এ দেশীয়রা ইংরাজদিগকে রাজা ব'লে স্বীকার করেন নি—ডাকাত বলেই অভিহিত ক'রতেন—তা' ছড়াতেই জানতে পারবেন। ইংরাজ সেনাপতি যে সমস্ত আদেশ (কমাণ্ড) দিয়ে রাজধানী আক্রমণ ক'রেছিলেন—কবি তা ঠিক বুঝতে না পেরে উহাকে শ্লোক বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত ছড়া গানেওয়ালাদের একটু ইতিহাস বলে নিয়ে, পরে গানগুলি যা' পাওয়া গেছে তা' উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

এই গানগুলি নাকি দু'রাত ধরে বলা চলতো; কিন্তু তা' এখন আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। জহুর উদ্দিনের পিতার নাম জব্বার উদ্দিন। এর বাড়ী রাজবাড়ীর পূর্বপ্রান্তে ছিল; কাটা খালের যে স্থানটিকে 'কচুয়া' বলা হয় ঐ স্থানে এঁর বাড়ী ছিল। ইঁহারা গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ক'রে বেড়াতেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, নূতন হাট-বাজার বসান, প্রভৃতি চোখে দেখা বিষয় নিয়ে এঁরা ছড়া গাঁথতেন। জহুর উদ্দিন, এঁর পিতা, ভগ্নি ইঁহারা সকলেই ছড়া গান রচনা করতেন ও গাইতেন। জহুর উদ্দিনের পৌত্র ও দৌহিত্ররা এখন লোকের বাড়ীতে মজুরী করে খায়। লোকে পিতাপুত্রকে 'ওয়াজী ফকির' ও আছিরণকে 'মাতমী বুড়ী' বলত। কারণ আছিরণ নেছা 'মরছিয়া'ও গাইতেন।

যাহোক রাজ প্রাসাদের দ্রব্য-সামগ্রী ও মণি-মুক্তাদি লুণ্ঠন ক'রে এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত নগরের এই প্রাসাদটি ইংরাজ সেনারা ঘিরে রাখে।

জন্ম-বিধবা

গজনফর আলী

উত্তীর্ণ-প্রায় গোধূলি-লগ্নে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব শেষে ধীরে ধীরে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে সুশান্ত অন্ধকার। ঘরের উজ্জ্বল বিজলী-বাতিটা জালিয়ে দিলাম।

আবু আবদুল্লা বসে আছে আমার সামনে। চেয়ারে। বিমর্ষ-বদন। উস্কোখুস্কো চুল। নীরব।

এক আদর্শবান শিক্ষাব্রতীর জীবনে ত্রয়ীর দ্বন্দ্ব নেমে এসেছে আপন মনের অজান্তে অতর্কিতে। কে জানত রঙ্গমঞ্চের বাইরে ছাত্রদের নিয়ে যে ব্যস্ত ছিল, তাকেও জীবন-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে হবে একদিন? 'সু'র প্রভাবে পরিচালিত হয়েছে যার জীবন, জীবন-রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘশ্বাসের সাথে উপলব্ধি করল, 'কু' গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে 'সু'কে বিশালকায় বাহু বিস্তার করে। এতদিনের শিক্ষা, সংযম, ঔদার্য্য, চরিত্রমাধুর্য্য সব বিনষ্ট হতে চলেছে এক নারীর চরমতম ধৃষ্টতায়। শিউরে উঠেছে। ছুটে এসেছে আমার কাছে।

কিন্তু আমি কি বিহিত করতে পারি এর? অপমানিত হৃদয়ের প্রতিকার কোথায় মিলবে? বিচারালয়ে? জানিনা। কুৎসায় কলঙ্কে যে হৃদয়ে জ্বালা ধরেছে তার শান্তি-প্রলেপ কোথায় আছে? জানিনা। শুধু জানি, আবু আবদুল্লা কেন এই মুহূর্ত্তে ছুটে এসেছে আমার কাছে। বেদনার জ্বালা উন্মোচন করে লাঘব করতে চায় চিত্তভার। লঘু করতে চায় চিত্তবেদনা।

ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলোকের প্লাবন। ঘরের বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। আবু আবদুল্লা একটা সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করলো। বার দুই ধূম্রও উদগীরণ করলো। তারপর সেই অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ সিগারেটটা সজোরে বাইরের অন্ধকার-গহ্বরে নিক্ষেপ করলো। আত্ম-ভোলার মত, প্রায় আত্ম-অচেতন অবস্থায় দ্রুতপদে ঘর থেকে অন্তর্হিত হল আবু আবদুল্লা।

বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের বেদনা-ভারাক্রান্ত গোপন কথা, জীবনের দুর্বলতম ক্ষণে প্রকাশ করে গেছে আবু আবদুল্লা। আমি শিল্পী। শিল্পীর দরদ-মাখা হৃদয় নিয়ে কান পেতে শুনেছি। শুনেছি সহানুভূতির ছায়াম্লান মাখানো দু'টি শান্ত স্থির আঁখি মেলে। মন্তব্য করিনি। মন্তব্য করার অবকাশ ছিলনা। হয়ত প্রয়োজনও ছিলনা। শুধু কান পেতে শুনেছি আর হৃদয়-কন্দরে উজ্জ্বলতম স্মৃতি হিসেবে একে বাঁচিয়ে রেখেছি।

যেমন যেমন শুনেছি তেমনটি লিখে যাব আমি। একটুও অদল-বদল নয়।

কলেজের চাকুরির দু'বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ-দু'বছরে সুনাম পেয়েছি। পেয়েছি ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসা। ভালবেসেছি তাদের।

তৃতীয় বর্ষে, প্রথম বর্ষ শ্রেণীতে নূতন ছাত্রছাত্রীর আগমন হল। কলেজের পুরনো ছাত্রদের তরফ থেকে খোশ-আমদেদ জানানো হলো নবাগতদের। সেই সভায় নবাগত ছাত্রীদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যে মহিলা প্রাঞ্জল ভাষায় কলেজী-শিক্ষার উপর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করল, তাকে দেখে হতবাক হলাম। অবাক হলাম বয়স অনুমানে। বেশভুষা অবলোকনে। ত্রিশোর্দ্ধ বৎসর বয়স্কা মহিলার পরিধানে হিন্দু বিধবার পাড়বিহীন সাদা ধুতি। গায়ে মুড়ো চাদর জড়ানো। কৃষ্ণবর্ণ গোলগাল মুখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা। বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কেটে যাবার পর, বয়স্কা বিধবা এ-হিন্দু মহিলার উপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলাম। সারা জীবনটাই মানুষের জ্ঞানার্জনের জন্যে—ভদ্রমহিলা হাতে-কলমে কথাটা প্রমাণ করবার জন্যে সশরীরে কলেজ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত। এমন ছাত্রীকে শিক্ষক হয়েও শ্রদ্ধা না করে কি পারা যায়?

ক্লাশে নাম ডাকতে গিয়ে দ্বিতীয়বার চমকিত হলাম। নাইট ক্লাস। একমাত্র মুসলমান ছাত্রীর নাম ধরে ডাকতেই যিনি জবাব দিলেন, তিনি সেদিনকার ছাত্রছাত্রী সমাগমে বক্তৃতারত আমার প্রথম বিস্ময়ের মহিলা। আমি একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম।

ক্লাশ থেকে বেরিয়ে বারান্দাটা অতিক্রম করতে করতে মহিলা বললেন, 'আপনার লেকচারের দু' একটা কথা ঠিক বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করতে সংকোচ বোধ হয়েছে।' আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'সংকোচের কিছু নেই। বুঝতে না পারলেই জিজ্ঞেস করবেন।' জবাবে মহিলা বললেন, 'এত ছেলের মাঝে সংকোচ হওয়াটা স্বাভাবিক। বুঝতে যদি না পারি'—একটু থেমে বললেন, 'আপনার অনুমতি পেলে আপনার বাসাতেই যাব।' যিনি ছাত্রছাত্রী-সমাগমে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে পারেন অসংকোচে, তিনি ক্লাশে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করেন কেন, বুঝতে পারলাম না। শুধু বললাম, 'বেশ তো আসবেন।' আমার ঠিকানাটা চেয়ে নিলেন মহিলা।

এর কয়েকদিন পর তিনি সশরীরে এসে হাজির হলেন আমার বাসায়। সেদিন আলাপ হল অনেক। মহিলার কলেজের লেখাপড়া এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ে। পারিবারিক প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। স্থানীয় বালিকা-

বিদ্যালয়ে চাকুরী করেন মহিলা দিনের বেলা। বৃদ্ধ কর্ম্মশক্তিরহিত পিতা ও বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে স্কুল-সংলগ্ন বাসভবনে থাকেন। রাত্রে কলেজ ও লেখাপড়ার গুরুভার। মহিলা বললেন, 'আমাকে যদি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য না করেন, তাহলে আমি পিছিয়ে যাব স্যার।' বললাম, 'বেশ তো, সময় করে সপ্তাহে একদিন আসবেন।' মহিলা আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ দু'টো নামিয়ে অসংকোচে বললেন, 'কিন্তু আপনাকে পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা আমার নেই স্যার।' অভয় দিলাম, 'তার প্রয়োজন হবেনা। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরে নানাভাবে সাহায্য করা আমার অভ্যাস।' মহিলা সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

এর পর সপ্তাহে একদিন করে মহিলার আগমন শুরু হল আমার গৃহে। বই-খাতা-কলম নিয়ে আসেন। যথাসম্ভব সাহায্য করি, বুঝিয়ে দি। প্রতিদানে কিনা জানিনে, মহিলা আমার অগোছালো ঘরখানাকে তার সুনিপুন সুঠাম হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেই। প্রতিবাদ করি; কিন্তু উদ্দাম জলস্রোতের মুখে শেওলার মত হারিয়ে যায় সে কণ্ঠ।

মহিলা একদিন স্বহস্তে পাক করে আমায় খাইয়ে দিলেন। মানা যখন মানল না, তখন হাসতে হাসতে বললাম, 'ছাত্রীর ভূমিকা থেকে গৃহিণীর ভূমিকায় পদার্পন করলেন নাকি?' মহিলা চটপট মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?' এখন বুঝি ছাত্রীর সাথে এ-ধরনের হাস্য রসিকতা করাটা ঠিক শোভন হয়নি।

এ-সময়ে আমি একখানা নাটক প্রযোজনা করবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। শিক্ষক জীবনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে লিখিত নাটক 'মেরুদণ্ড।' বার্ষিক শিক্ষক সম্মিলনী উপলক্ষ্যে স্থানীয় রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নায়িকা প্রয়োজন একজন। বললাম, 'দেখুন তো, শিক্ষক-গৃহিণীর ভূমিকায় আপনি অভিনয় করতে পারবেন কিনা?' মহিলা বললেন, 'আমার অভিনয়ে অভ্যেস নেই।' পরক্ষণেই ভেবে বললেন, 'আমাদের শিক্ষয়িত্রী সুলেখা বিশ্বাস ভাল অভিনয় করে। সৌখিন রংগমঞ্চেও অভিনয় করে অভ্যেস আছে ওর।' বললাম, 'বেশ তো, নিয়ে আসুন না ওকে একদিন।' মহিলা জবাবে বললেন 'তাই হবে।'

সুলেখা বিশ্বাসকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এলেন তিনি। সুশ্রী তন্বী-চেহারা সুলেখা বিশ্বাসের। খৃষ্টান কুমারীর শরীরের কানায় কানায় উপচে-পড়া ভরা যৌবন। শিক্ষক-গৃহিণীর ভূমিকার জন্য এতটার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই এমন সু-চেহারার, এমন উপচে-পড়া ভরা যৌবনের। তবু বাচনভংগি, কণ্ঠস্বর ও অংগভংগি যাচাই করে সুলেখাকেই শিক্ষক-গৃহিণীর ভূমিকায় চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচিত করলাম। চেহারাটা পেইন্ট করে বদলিয়ে দিতে হবে; আর অগোছালো শরীরের আড়ালে লুকিয়ে দিতে হবে উপচে-পড়া যৌবন লালিত্যকে। তা'হলেই কৃতিত্ব অনিবার্য্য। সুলেখা বিশ্বাস বললে, 'আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকায় কাকে নির্ব্বাচিত করলেন?' বললাম, 'আমিই স্বয়ং।' সুলেখা হেসে বললে, 'কিন্তু আপনাকে তো শিক্ষক না ভেবে দর্শকবৃন্দ সুখী-চেহারার অহঙ্কার-মত্ত বণিক-কুমার বলেই ভ্রম করবে।' বললাম, 'আপনাকেও সুখী-চেহারার অহঙ্কার-মত্তা বণিক-কুমারী বলে ভ্রম করবে। ভ্রম যাতে না করে, সেজন্যে পেইন্ট আর শাড়ীর আড়ালে সর্ব্বপ্রযত্নে বদলিয়ে দিতে হবে সর্ব্ব-অবয়ব।' প্রথম বিস্ময়ের মহিলা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল 'মেরুদণ্ড' নাটকের নায়ক আর নায়িকাকে। আর কি ভাবছিল কে জানে। বললে, 'সুলেখা চল। স্যারের সাথে আলাপ তো করলে। আর কত করবে!' সুলেখা বিশ্বাস বার বার প্রযোজিত 'মেরুদণ্ড' নাটকের প্রশংসা করতে করতে প্রথম বিস্ময়ের মহিলার সাথে বিদায় নিল।

পূর্ণোদ্যমে মহড়া চলছিল 'মেরুদণ্ড' নাটকের। সুলেখা বিশ্বাস রোজ আসে। মহড়ায় অংশ নিতে। প্রথম বিস্ময়ের মহিলাও আসে। সুলেখার সাথী হয়ে।

সেদিন গৃহে পদার্পণ করেই বিস্ময়ের মহিলা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিমর্ষ মলিন মুখ। বললেন, 'আজ আর পড়া হবেনা স্যার। এখুনি ফিরে যেতে হবে। আব্বা রোগ-শয্যায় শায়িত।' বললাম, 'আপনার আজকে আসা ঠিক হয়নি।' মহিলা বললেন, 'আপনিও চলুন না স্যার, আব্বাকে একবার দেখে আসবেন?' না বলতে পারলাম না। যেতে হল এবং রোগীর শয্যাপাশে বসে বসে থেকেই শুধু কর্তব্য সমাধা করতে পারলাম না। ভাল ডাক্তার ডেকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হল এবং নিজেই ছুটোছুটি করে রোগীর ঔষধ ও পথ্যের সুবন্দোবস্ত করলাম। হয়ত সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে থাকবে, করুণায় উদ্বেলিত হয়ে থাকবে হৃদয়, তাই পর পর কয়েক দিন রোগীর শয্যাপাশে ছুটে গেলাম। ভুল বুঝেছিলেন বৃদ্ধ। মৃত্যু-শয্যায় যিনি শয়ান তার জীবন-লাভের সম্ভাবনা ছিল সুদুর পরাহত। মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ শেষ দীর্ঘশ্বাসের পূর্ব্বে তার বিধবা মেয়ের হাত আমার হাতে তুলে দিয়ে অশ্রু-ঝরঝরনেত্রে কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'শুনেছি, তোমার সব কথা শুনেছি। তোমার মত ভাল মানুষ হয়না। আমার মেয়ে তো তোমার প্রশংসায় আত্মহারা। শুনেছি

তুমিও নাকি। আমার খুশনসিব শেষ-নিঃশ্বাসের পূর্ব্বেই তোমাকে এমন হাতের কাছে পেলাম। একে তোমাকেই দিয়ে গেলাম। এদের তুমি দেখো।' আশ্চর্য্য, আমি মূঢ় বিস্ময়ে মূক হয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে 'টু' শব্দটী পর্য্যন্ত বেরোল না।

এরপর মহিলা আমার উপর যেন কর্তৃত্ব পেয়ে বসলেন। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এলেন। স্যার বলতে ভুলে গেলেন। অভিমান করে কথা বলেন। আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে সোহাগিনী স্ত্রীর মত মৃদু অনুশাসন করেন। 'আমি তো আগেই বলেছি এটা করা তোমার ঠিক হবেনা। কিন্তু আমার কথা তুমি শুনবে কেন। আমাকে আপন বলে ভাবতেও তোমার সংকোচ বোধ হয়।' পরমুহূর্ত্তেই প্রশংসা শুরু করেন গদগদকণ্ঠে। 'সত্যি তুমি বলেই ওটা করতে পেরেছ। আর কেউ পারত না; অন্য কেউ না। সত্যি!' মাঝে মাঝে রঙ্গীন লোভনীয় ছবি আঁকেন মহিলা, 'আমাদের গ্রামের জায়গা-জমিগুলো বিক্রী করে দিয়ে শহরে একটা বাড়ী কিনব। বাড়ীটা তোমার নামেই রাখব ভেবেছি। তুমি ছাড়া আর আমাদের আপন বলে কেই-বা আছে!' আশ্চর্য্য, মহিলা ভুলে গেলেন ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্ক, ভুলে গেলেন বয়সে অন্যূন পাঁচ বছরের বড় হবেন তিনি আমার। তিনি বিধবা. আমি শুধুই কুমার, শুধুই অকৃতদার—এও ভুলে বসে রইলেন। কিন্তু মনে মনে রাগ করা ছাড়া, মুখ ফুটে একবারও বিরক্তি প্রকাশ করতে পারলাম না। মহিলা নীরব সম্মতি ভেবে এটাকে আত্ম-প্রসাদে ধন্য হলেন। বললেন, 'না, না, সুলেখাকে তোমার কাছে আর আসতে দিয়োনা।' এটাকে অন্যায় আবদার ভেবে আমি নীরব রইলেম।

নাটকের মহড়া এগিয়ে চলছিল সুচারুরূপে।

এতদিন সুলেখা বিশ্বাস আর সেই মহিলা একই সাথে আমার গৃহে আগমন করেছে। এখন বিভিন্ন সময় পদার্পণ হয় দু'জনের। সুলেখার অভিনয়-মহড়া কালে অনুপস্থিত থাকেন বিস্ময়ের মহিলা। বিস্ময়ের মহিলার আগমন হলে বেরিয়ে যায় সুলেখা বিশ্বাস কাজের ছুঁতোয়। একের উপস্থিতি অসহ্য অপরের কাছে। একদিন সুলেখাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল বিস্ময়ের মহিলা, আজ সুলেখাকে আমার কাছ থেকে তাড়াতে পারলে সবচেয়ে সুখী হন।—শিক্ষক-গৃহিণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়তো মঞ্চে গিয়ে কর; শিক্ষক গৃহিণী সাজতে হয়তো মহড়ায় সাজ। এর বাইরে আর তোমার কোন স্থান নেই সুলেখা। এর বাইরে শিক্ষকের সর্ব্বজীবন ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে বিস্ময়ের মহিলা। ভাবী-গৃহিণী। কিন্তু একি অন্যায় আচরণ তোমার সুলেখা! অভিনয়ের জীবন, মঞ্চের জীবন, মহড়ার জীবন থেকে তুমি অন্দরে প্রবেশ করতে চাও? হৃদয়ের প্রবেশাধিকার চাও? কেন, কেন তুমি তোমার আলোকচিত্র উপহার দিলে ওকে, কেন বিনিময়ে ওর আলোকচিত্র চেয়ে নিলে তুমি। জানি, মালা পরিয়ে পূজো করবে না ও-চিত্র, কিন্তু টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে সকাল-সন্ধ্যায় অপলক আঁখি মেলে চেয়ে থাকবে। তোমায় চিনতে আমার বাকী নেই সুলেখা। মহড়া শেষ হয়ে গেলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কেন চা খাও, আর গল্প-গুজবে মত্ত হয়ে থাকো, সেকি জানিনে! জানি, জানি, সব জানি। সিনেমায় যাও আজকাল তোমরা জুটি সেজে, সাজগোজ করে, পরিপাটি হয়ে ছিমছামবেশে, সে-খবরও কানে এসেছে। ঘর-ভাংগানির চেয়ে বড় দুশমন মেয়ে মানুষের আর নেই। তুমি আমার সেই দুশমন। তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারব না; কখনই ক্ষমা করব না সুলেখা।—অন্তরের অন্তঃস্থলে এ-তিক্ততা পোষণ করে চলেছে বিস্ময়ের মহিলা। অনুরূপ তিক্ততা সুলেখাও মনে পোষণ করে কিনা জানিনে। সুলেখাকে কোনদিন অন্যায় আচরণ, অন্যায় মন্তব্য করতে দেখিনি। অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখিনি কখনো কোনদিন কোন কারণে। প্রবল উত্তেজনার মুখেও তাকে দেখেছি স্থির অচঞ্চল। শুধু একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বিস্ময়ের মহিলার এ-বয়সেও লোভটা বড় প্রবল।'

সেদিন কিছু রাতে গৃহে ফিরে অবাক হলাম। যা কিছু ছিল গোছানো-সাজানো তাই হয়ে আছে হ-য-ব-র-ল-ব। বিছানাটা টেবিলের উপর, বইগুলো, ড্রয়ারখানা, সুটকেসটা—এ সব কিছুর উপরই মনে হয় কারও অসংযত হাত পড়েছে। সুলেখার যে আলোক চিত্রটা আমার কাছে ছিল, যা' টেবিলের উপরেই রাখা ছিল সযত্নে, সেটাও হয়েছে উধাও। চাকরকে ডাকলে সে বললে, বিস্ময়ের মহিলা এসেছিল। কতক্ষণ বসে থেকে আমার খোঁজ নিয়ে ফিরে গেছে। বুঝলাম, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে সুনিশ্চিত কোন প্রমাণ। সন্ধান করে গেছে সুলেখার প্রেমপত্র। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার মুখে, টেবিলের উপর সযত্নে রাখা সুলেখার সুশ্রী চেহারার আলোকচিত্র অব-লোকনে অসহ্য ক্রোধে গুমরে মরেছে। শাড়ীর আঁচলে লুকিয়ে ওটা গোপনে হয়েছে নিষ্ক্রান্ত। অনুমান করি, প্রতিদ্বন্দ্বীর আলোকচিত্র ধ্বংস হয়েছে উপেক্ষা ভরে বিস্ময়ের মহিলার হাতে।

'মেরুদণ্ড' নাটকের মহড়া সুচারুরূপেই এগিয়ে চলে-ছিল। এক পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত দিনে শিক্ষক-সম্মিলনী উপ-লক্ষে স্থানীয় রংগমঞ্চে সমাগত সুধীবৃন্দের সামনে অভিনীত হল এ-নাটক। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভেংগে

পড়ল দর্শক; ভেংগে পড়ল উপস্থিত সুধীরা। অজস্র ধন্যবাদে মুখর হল প্রেক্ষাগৃহ। অনেকে বলতে বলতে বেরিয়ে গেল নায়ক-নায়িকা অপূর্ব্ব অভিনয় করেছে। প্রশংসায় প্রশংসায় ভরে উঠল দৈনিকের প্রদেশের সংস্কৃতি সংবাদের কলম। সারা শহরে লোকের মুখে মুখে শুধু 'মেরুদণ্ড' নাটকের তরুণ প্রতিভাশালী নায়ক আর উদীয়মানা তরুণী নায়িকার যশ। আমি আর সুলেখা বিশ্বাস—এ-অপূর্ব্ব জুটিকে নিয়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কাল্পনিক নানা প্রকারের আলাপ আলোচনা।

বিস্ময়ের মহিলার কানেও এ-সব কথার ছিঁটে-ফোঁটা গিয়ে থাকবে। অনুমান করি সুখী হননি তিনি। মহিলা অভিনয় রজনীতে রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন; প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। কিন্তু নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যের যবনিকা উঠার সাথে সাথে দ্রুতপদে প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রস্থান করেছিলেন। সম্ভবতঃ, গৃহিণীর ভূমিকায় অভিনয়রত সুলেখাকে সহ্য করতে পারেননি আমার পাশে। অসহ্য ক্রোধে দ্রুতপদে তাই বেরিয়ে গেছেন। এরপর দু'দিন আর বিস্ময়ের মহিলার দেখা পাইনি। তৃতীয় দিনে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বিস্ময়ের মহিলার চিঠি। লেখা রয়েছে, 'আমি রোগশয্যায় শায়িতা। বিগত দুই দিন ধরিয়া উচ্চ-তাপ যাতনায় ভুগিতেছি। তুমি একবার আসিয়া দেখিয়া যাইও।' বিস্ময়ের মহিলা রোগ-শয্যায় তাপ যাতনায় ভুগছে। ছুটে গেলাম তাকে দেখতে। কিন্তু একি, দরজাতেই যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিস্ময়ের মহিলা। বিধবার পোষাক ছেড়ে সধবার সাজে আজ সুসজ্জিতা তিনি। পরিধানে লাল ঢাকাই সিল্ক। হাতে চুড়ি, গলায় হার। খোপায় ফুলের মালা। প্রণয়িনীর বেশ। মৃদু হেসে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন, 'এস। তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।' আমিও কিছু বুঝতে না পেরে ঘরের একটা চেয়ারে বসলাম। 'আমি আসছি। এক মিনিট। তুমি বস।' বলে মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন যে বৃদ্ধা মহিলা তিনি বিস্ময়ের মহিলার জন্মদাত্রী। বৃদ্ধা বসলেন আমার সামনে। বললেন, 'তোমার বৌকে কবে নিয়ে যাচ্ছ?' আমি অবাক হয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বৃদ্ধা হতবাক করে দিয়ে আমাকে পুনর্বার বললেন, 'অবাক হচ্ছ কেন জামাই। অবাক হবার তো কিছু নেই। তিনি মরবার সময় রিজিয়াকে তোমার হাতেই দিয়ে গেছেন। তখন তো অস্বীকার করনি। এখন এত কিছুর পর অস্বীকারের প্রশ্নই উঠেনা। তবে হাঁ, কলমাটা এখনও পড়োনি এই যা। ওটা আজই পড়ে নাও। রিজিয়ারও ইচ্ছা শুভকাজ আজই সমাধা হয়ে যাক।' কল্পনা করতে পারেনি এখানে এসে এমন সব উদ্ভট কথা শুনতে হবে। আমার শরীরে শিহরণ খেলে গেল। আতঙ্ক হল কোন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি ভেবে। কণ্ঠে শক্তি জড়ো করে বললাম, 'এ-হয়না। এ-কিছুতেই হতে পারে না। বিয়েটা পুতুল খেলা নয়।' বৃদ্ধা বললেন, 'তা নয় স্বীকার করি। আমার মেয়েকেও আমি পুতুল করে গড়ে তুলিনি।' বলে ডাকলেন, 'রিজি, ও মা রিজি, একবার আয় তো মা এদিকে।' দরজার কাছে কোথায়ও দাঁড়িয়েছিলেন বিস্ময়ের মহিলা। ঘরে প্রবেশ করতেই বৃদ্ধা বললেন, 'তোর জামাইর সাথে তুই-ই বোঝাপড়া করে নে বাপু।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসলেন বিস্ময়ের মহিলা। বললেন, 'তোমার অমত কিসে?' বললাম, 'তুমি বয়স্কা, তুমি বিধবা; আমি তরুণ এবং কুমার।' 'আমি বয়স্কা কে বললে। উনিশে পা দিয়েছি সবে। ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট থেকে বয়সটা যাচাই করে নিতে পার।' 'না, আর প্রয়োজন হবেনা।' 'আমি বিধবা তাই-বা কে বললে তোমাকে?' 'তুমি কি সধবা?' 'না, তাও না।' 'তবে।' 'শুনতে চাও, শুনতে চাও কি আমার জীবনের সবকথা?' কেন জানিনে, আমার মুখ দিয়ে চেঁচিয়ে এল, 'হাঁ।' মহিলা ধীরে ধীরে বলে গেলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে শুনে গেলাম।

দশ বছর বয়সে আমার প্রথম বিয়ে হয়। তখনও আমার যৌবনোদ্গম হয় নি। অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা আমি। বদ্ধ-পাপড়ি ফুলের কুঁড়ি। আর সহযোগী পঁচিশ বছরের প্রাপ্ত বয়স্ক সুঠামদেহ তরুণ। প্রস্ফুটিত-পাপড়িতে উড়ে উড়ে বসে যে ভ্রমর সুখ-লালসায়, সেই ভ্রমর সে। প্রকৃতির বিধানে লেখা নেই, বদ্ধ-পাপড়ি কুঁড়ির সাথে তার মিলন। প্রথম রজনীর অভিজ্ঞতা তিক্ততা, বিষাদে ও গ্লানিতে ভরপুর হল। অবাঞ্ছিত ঘটনায়, অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতিতে থমথমে হল ঘরের আবহাওয়া। আমি ভাবলাম, ও একটা পশু। আর স্বপ্ন-রঙ্গিন মুহূর্ত্তে ব্যর্থ-আশায় ও ভাবলে, মাটির ঢেলার চেয়ে কানাকড়ি মূল্যও আমার বেশী নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও, আর আমি বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে যন্ত্রনায় গোংগালাম সারারাত। অসন্তুষ্ট ভ্রমর প্রস্ফুটিত-পাপড়ি যৌবনাবতীর সন্ধানে লোক নিয়োগ করল। গুনগুন করে মওসুমে মধু আহরণে সে লিপ্ত হবার পূর্ব্বেই জীবন-নাট্যের একটি দৃশ্যের যবনিকাপাত করে প্রস্থান হল আমার পিত্রালয়ে এবং চিরতরে। এ জন্যে কাকে দোষ দেব ভেবে পেলাম না। বিচার-বুদ্ধি তখন আমার মাথায় গজায়নি। শুধু পুরুষের পশুত্বের

এক নগ্ন বিভীষিকাময় রূপ মনে জেগে ছিল। এর অনেক দিন পর আশ্চর্য্য এক যাদু বলে মন থেকে পুরুষ বিভীষিকা সমূলে বিদূরিত হল। দেহে যৌবন সঞ্চারে চঞ্চল হয়ে উঠলাম আমি। আমার ভাল লাগতে লাগল পৃথিবীর সবকিছু। কোকিলের ডাক, আমের মুকুল, ফুলের সৌরভ, বসন্তের মৃদু-সমীরণ; এবং এ-সবের চেয়েও ভাল লাগতে শুরু করল সুঠাম-দেহ তরুণের কান্তিময় মুখ। আব্বা-আম্মাও সম্ভবতঃ এরই অপেক্ষায় বসেছিলেন। আমার মনে রং ধরেছে এবং দেহে যৌবন-চাঞ্চল্য উপস্থিত—এটা জ্ঞাত হয়ে পাত্রের সন্ধানে নিয়োজিত হলেন। বদ্ধ কুঁড়ি পাপড়ি মেলেছে। যৌবনবতী হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে ভ্রমরের উড়ে এসে বসতে বাধা নেই আর। প্রচলিত বিধি-নিয়মে শাদী-মোবারক সুসম্পন্ন হল। আবার সেই রজনী। প্রথম রজনীর কথা স্মরণে এল। চিত্ত-চাঞ্চল্য ছিলনা, বক্ষ-স্পন্দন ছিলনা, আশা-নিরাশায় উদ্বেলিত হয়নি হৃদয়। এই দ্বিতীয় রজনীতে মধুর এক কল্পনার পুলকে রোমাঞ্চিত হল সর্ব্বঅবয়ব। কত কি ভাবলাম। মিষ্টি মধুর মৃদু কণ্ঠ কর্ণ থেকে মরমে পশবে আমার, মৃদু মধুর সম্ভাষনে পাশে বসাবে আমায়। ভাবতে ভাবতে রক্তিম হল কর্ণমূল; রক্তিম হল শরমে শুভ্রগণ্ডদেশ। পুলকিত চরণে ধীরপদে প্রবেশ করলাম গৃহে। তুলতুলে শয্যায় আল-গোছে বসলাম মিহি শাড়ীর প্রান্তটা মুখের উপর টেনে দিয়ে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত হল বিলীন। এক সময় দরজার ফাঁকে আবির্ভূত হল আমার কল্পনার রংগে রংগীন প্রতীক্ষিত মানুষটি। আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'তোমায় আবার ফিরে পাব সেকি ভেবেছি কখনো। একি নিয়তির খেলা বলতো প্রিয়ে?' বলতে বলতে মুখের উপর থেকে ঘোমটাখানা সরিয়ে দিলে। শূন্য ঘোলাটে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলে আমার মুখের দিকে। গভীর ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখলে কি যেন। আঁৎকে উঠে, ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মত শিউরে উঠে, এক পা দু' পা করে পেছিয়ে গেল—'না, ন', তুমি না, তুমি না। ঝুট, সব ঝুট, দুনিয়া ঝুট।' বলে অট্টহাসিতে হেসে উঠলে, 'ওরা ভেবেছে আমি পাগল। বুঝতে পারব না এই ফাঁকি। চিনতে পারব না। কিন্তু আমি ঠিক চিনেছি, তুমি না, তুমি না।' বলে পাগলের মত আবার এক অট্টহাসি হেসে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শয্যায় দেহ এলিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রভাত হল। ধীরে ধীরে কানে এল অনেক কথা; শুনতে পেলাম অনেক কিছু। সুন্দরী প্রথমা-পত্নীর প্রণয়-বিমুগ্ধ হৃদয় বিয়োগ-বেদনায় বিধুর; গভীরতম শোকে বিকৃতির লক্ষণাক্রান্ত মস্তিষ্ক। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব ভেবেছিল, দ্বিতীয়ার নবপ্রেমে বিকৃত মস্তিষ্ক আবার সুস্থ হবে, শোকে উদ্বেলিত হৃদয় আবার সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। পাগলকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছে, 'তোমার প্রিয়-তমা মরেনি। সে জীবিত আছে। তাকে পুনর্বার বিয়ে করে তোমায় ফিরিয়ে আনতে হবে।' ভেবেছিল বুঝি ফিরিয়ে এনেছে প্রিয়তমাকে! কিন্তু ঝুট, ঝুট, সব ঝুট। সব মিথ্যা পাগলের কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিগত রজনীতে। ব্যর্থ হল আত্মীয়-স্বজনের প্রচেষ্টা, বিফল হল বন্ধু-বান্ধবের শুভাকাঙ্খা। যে শাড়ী-ব্লাউজ পরিধান করে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করেছিলাম, সেই বসন-ভূষণেই একরাত্রি যাপন করে বাপের বাড়ী ফিরে এলাম; এবং চিরদিনের মত।'

মহিলা শ্বাস নেবার জন্যে থামলেন। আকাশ ছিল মেঘে কালোয় কালো। ঝমঝম করে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির ছিটে ঘরের ভেতর এসে পড়ল। কিন্তু আমরা কেউই উঠে গিয়ে জানালাগুলো বন্ধ করে দেবার কষ্ট স্বীকার করলাম না। মহিলা তার ভাগ্য-বিদ্রূপ জীবনকথা শান্ত কণ্ঠে পুনর্বার বলে চললেন, 'এর কিছুদিন পর আবার আমার বিয়ে হয়। আবার স্বামীগৃহে যাত্রা করলাম। আবার সেই রজনী। প্রথম ও দ্বিতীয় রজনীর কথা স্মরণ করে পুলকে আত্মহারা হলনা হৃদয়। আনন্দে বিভোর হলনা চিত্ত। ধীর শান্তপদে প্রবেশ করলাম গৃহে। ঘোমটাটা একবার মাথার উপর তুলে দিয়েও ফেলেছিলাম। নববধূ তো আর নই। পুরনো অভিশপ্ত পাপী। একটু পরেই কক্ষে প্রবেশ করলেন পঞ্চাশোর্ধ বয়-সের, মাথায় কাচা-পাকা চুল, মুখে সুদীর্ঘ জীবনের ক্লান্তির ছায়ামণ্ডিত এক প্রৌঢ়। দেখলে শ্রদ্ধা জাগে, পায়ে মাথা নত করা চলে; কিন্তু মোহ জাগেনা, দেহ অর্পণ করা চলেনা। আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে সে বসলে। বললে, 'এ-বয়সে দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করবার ইচ্ছে আমার ছিলনা। কিন্তু কি জান, সাবের আর শাহানা আমার বড্ড ছোট। দু'বছরের আর সাড়ে চার বছরের। ওদের মা তো ওদেরে ছেড়ে পরপারে চলে গেল। আজ থেকে তুমিই ওদের নতুন মা। আপন সন্তান ভেবে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে এদেরে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে তোমায়। তোমার বড় ছেলে বি, এস-সি পড়ে; মেজো ছেলে দশম শ্রেণীর ছাত্র। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। স্বামীর সাথে চাটগাঁতে আছে। ছোট মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী। এদেরে মায়ের চোখে তুমি দেখো। মায়ের মতই এরা তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। রাত বোধহয় অনেক হল, তাই না? তুমি শুয়ে পড়। আমি সাবের আর শাহানাকে নিয়ে পাশের ঘরেই আছি। কাল থেকে ওরাও তোমার কাছেই থাকবে।' বলে স্বামী উঠে কক্ষ

থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজাটা বন্ধ করে বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম। এর পরের রাত্রিতে সাবের-শাহানা আমার ঘরে এল। ওদেরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। স্বামী বললে, 'আমি পাশের ঘরেই আছি। ওদেরে নিয়ে রাত্রে কষ্ট হলে আমায় ডেকো।' স্বামী বেরিয়ে গেল। সাবের-শাহানার পাশে আমিও শুয়ে পড়লাম। ওরা আমার শয্যাসাথী। মা না হয়েও মা হলাম আমি; কিন্তু বঞ্চিত রইলাম বিবাহিতা নারী স্বামীগৃহে যে ব্যবহার পেতে আশা করে, সেই ব্যবহার থেকে। কোন এক রজনীতেও শয্যাপাশে দেখা পেলাম না স্বামীর; মিলন হলনা আমাদের। শয্যা মনে হল কণ্টকাকীর্ণ; সাবের-শাহানা দু' চোখের বিষ। অশান্তিতে জ্বলে-পুড়ে মরলাম; নিরাশায় অতীত হল সপ্তম রজনী। পিতৃগৃহে আগমন হল আমার এবং স্বামীগৃহে দাসীবৃত্তি করবার জন্যে পুনরায় ফিরে গেলাম না।'

মহিলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলতে বলতে। থামলেন। আমার মুখের উপর চোখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবারে তুমিই বল, আমি সধবা, বিধবা, না কুমারী?' আমি নিশ্চুপ বসে রইলাম। নারীর যৌন-জীবনকে বিশ্লেষণ করে প্রত্যুত্তর দেবার মত প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা কোনটাই আমার নেই। মহিলা নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'এরপর প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ-চিত্তে ভেবেছি, বিধাতার অভিশাপে আমি জন্ম-বিধবা। মিলনের সুখ আমার বিধিতে লেখা নেই। প্রজাপতি-নির্বন্ধ আমার জন্যে নয়। আমি সেইভাবেই চলব। বিধবার বসনই তো আমার মানানসই বেশ, যুতসই পরিধান। পাড়-বিহীন সাদা ধুতি, মুগার চাদর, নিকেলের ফ্রেমের চশমা পরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, স্বাবলম্বী হব, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব। মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেললাম; ছিঁড়ে ফেললাম টুকরো টুকরো করে কালো বোরখাটা। পুরুষের করুণায় নির্ভর করে জীবনকে ভাসিয়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমি স্কুল-পাঠ্য বই পড়তে শুরু করলাম এবং যথাসময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম। স্বাবলম্বী হবার ভরসায় স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলাম। উচ্চ-শিক্ষা লাভের আশায় নাইট কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু—' বলে গভীরতর আবেগে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন মহিলা, 'দেখা পেলাম তোমার। কান্তিমণ্ডিত লাবণ্যঢালা মুখখানি তোমার বার বার চুরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম। অস্বাভাবিক এক পুলকে শিহরণ খেলে গেল সমস্ত দেহ-মনে। মন-প্রাণ সমস্বরে বলে উঠল,—'না', না, আমি বিধবা নই, বিধবা নই আমি; আমি কুমারী, বিয়ে হয়নি আজও আমার।' আমি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়লাম। প্রথম প্রেম। জীবনে এ-এক নূতন উপলব্ধি, নবতম স্বাদ! আমি প্রথম সুযোগেই তোমার সাথে আলাপ করলাম এবং তোমার ঠিকানা চেয়ে নিলাম। তুমি আমাকে পড়াতে রাজী হলে; আমি মনে মনে প্রফুল্ল বোধ করলাম। তোমার সাহচর্য লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হৃদয় আমার ধন্য হল। অস্বীকৃত-প্রণয়িনীর ভূমিকা থেকে ধীরে ধীরে আমি অস্বীকৃত-গৃহিণীর ভূমিকায় পদার্পণ করলাম। তোমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তোমার ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে, তোমাকে স্বহস্তে পাক করে খাইয়ে মনে মনে আনন্দ পেলাম। মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল, প্রণয়িনী থেকে জায়াত্বে হবে আমার পদার্পন, জায়া থেকে জননীত্বে পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু পথের মাঝে কাঁটা এসে দাঁড়াল। নিজেরই ভুলে। শিক্ষয়িত্রী সুলেখা বিশ্বাস আমার সেই পথের কাঁটা। আমার স্বপ্ন-সুখ-স্বাদ আহ্লাদের সামনে পর্ব্বত-প্রমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওগো, তুমিও ভুল করে বসে আছ। তোমারও দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে; মতিভ্রম হয়েছে। সুলেখাকে তুমি চেননা, চিনতে পারনি। খৃষ্টান মেয়েরা তুক-তাক জানে, মন্ত্র-তন্ত্র জানে; পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখে ওরা। আইবুড়ো সুলেখার প্রেমের জ্বালায় স্বজাতি-বিজাতি কত ছেলে আত্মহত্যা করেছে, বিতৃষ্ণায়, উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় কত ছেলে দেশান্তরী হয়েছে, বিন্দুতম আশ্বাসের লোভে কত ছেলে যৌবন-মন-প্রাণ-ধন অর্পন করে রিক্ত হয়ে সুলেখার চরণের দাসানুদাস হয়ে আছে, এ-খবর তুমি জাননা। কিন্তু যেদিন জানবে, সেদিন আর তোমার আত্মরক্ষার পথ থাকবেনা, পরিত্রাণ হবে সুদূর পরাহত। ওগো, ওদের ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়, কাছে বসলে মন অপবিত্র হয়। আমায় আশ্বাস দাও সুলেখাকে তুমি আর প্রশ্রয় দেবেনা, এ-আমার আর তোমার উভয়েরই মংগলের জন্যে। আমাদের ভবিষ্যত দাম্পত্য জীবনকে সুখী করে গড়ে তুলবার জন্যে এ-একান্ত অপরিহার্য্য।'

কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোন আশ্বাস বানীই উচ্চারিত হলনা। আমি নির্বাক নিস্পন্দ বসে রইলাম। মুষলধারায় ঝমঝম করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়েছে বাইরে। মৃদু হাওয়ায় গাছের পত্র-পল্লব-শাখা প্রশাখা কাঁপছে। আর ঘরের ভেতর, কম্পিত-কণ্ঠে যৌবন ভাটাক্রান্ত মহিলা বলে গেলেন জীবন-সাধের কথা গভীরতর আবেগে'—ওগো, বিধবার বসন ছেড়ে রংগীন সাজে সাজিয়েছি আজ নিজেকে মনের মাধুরী মিশিয়ে। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করোনা। আমাকে নিয়ে চল তোমার গৃহে বধূবেশে বরণ করে। শুধু

জায়ার মর্য্যাদা দাও। আর কিছু না, আর কিছু চাইনে।'

আমি তড়িৎবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু অথচ সবল কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, 'বিয়েটা পুতুলখেলা নয়।' আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। মহিলা সরোষে উচ্চারণ করলেন, 'শুনে যাও। নারীর কাছে সবচেয়ে যা' মূল্যবান, কোন এক বাদলা রাত্রিতে নানা লোভে আমায় প্ররোচিত করে তুমি তাই হরণ করেছিলে। এর জন্যে কি মূল্য দেবে?' আমি অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। আমি যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়লাম। বলে কি নির্লজ্জা মহিলা উন্মাদের মত! আমি শান্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, 'তুমি আজ সুস্থ নও। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। শান্ত হও।' মহিলা অধিকতর উত্তেজনায়, রোষে, ব্যর্থ-আশার গ্লানিতে, কল্পনার স্বপ্নসৌধ ভেংগে পড়ার দুঃখে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন। চোখ দু'টো বাঘিনীর মত জ্বলে উঠল। 'না, না, তোমায় আর সান্ত্বনা দিতে হবেনা আমায়। প্রবঞ্চক, মিথ্যুক, ভণ্ড কোথাকার! কেন দিনের পর দিন বিনা-পয়সায় আমায় পড়িয়েছো, সেকি জানিনে। শুধু আমার দেহের জন্য, শুধু আমার যৌবনকে ভোগ করবার মত্ত লালসায়। যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। না, না, শুনে যাও, শুনে যাও আরও একটা কথা'। পুরুষের কাছ থেকে আমি শুধু প্রবঞ্চিতই হয়ে এসেছে চিরদিন। প্রতিশোধ নেই নি। আমার ভেতরের আহত নাগিনী মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে বারবার। আমি বারবার তাকে শান্ত করেছি। কিন্তু আর কত! প্রবঞ্চনায় ব্যর্থ হয়েছে যৌবন, ব্যর্থ হতে চলেছে জীবন। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেংগেছে, সহ্য-সীমা হয়েছে অতিক্রান্ত। প্রতিশোধ এবার নিতেই হবে। প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ; প্রবঞ্চকের উপর প্রতিশোধ। আমার ভেতরের আহত ক্রুদ্ধ ফণিনী বিষ ছড়াবে দিকে দিকে। আমি বাধা দেবনা; চেয়ে চেয়ে শুধু হাসবো। সাবধান হয়েও পরিত্রাণ পাবেনা। যাও, এবার যেতে পার, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে হৃদয়হীন।'

বাইরে তখনও মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পেছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। এবং তারও পরে বৃষ্টির শ্রান্তহীন ধারার মাঝেই শুনতে পেলাম এক ব্যর্থ-যৌবন নারীর নিরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত হলেও অকিঞ্চিতকর নয়। মিথ্যা দম্ভ প্রকাশ করেননি মহিলা। কানে কানে গুঞ্জন উঠল একটা কথার; মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা দিকে দিকে বনাগ্নির মত। ছাত্র-ছাত্রীদের কানে গেল। অতি-শ্রদ্ধার শিক্ষক তাদের এতদিনের হয়ে উঠল অশ্রদ্ধেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের কক্ষ পর্য্যন্ত পৌছুল কথাটা। ডাকা হল আমাকে; তলব হল কৈফিয়ত। ছাত্রীর সাথে নিম্নস্তরের ব্যবহারের ফলে যে শিক্ষক কলেজের পবিত্রতাকে ম্লান, শিক্ষকমণ্ডলীর সুনামকে কলংকিত এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে বিকার গ্রস্ত করেছে, তাকে কেন কর্ম্ম থেকে পদচ্যুত করা হবেনা—এর কারণ দর্শাতে বলা হল। প্রবলভাবে মিথ্যার করেছি প্রতিবাদ আমার কৈফিয়তে। যুক্তি দিয়ে মিথ্যাকে করেছি খণ্ডন। ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্ক আমাদের কোনদিনও নিম্নস্তরের ব্যবহারের ফলে কলুষিত হয়নি—এ-কথাটা সম্ভবতঃ আমি প্রমাণ করতে পেরেছি। তবু পদত্যাগপত্র পেশ করে এসেছি স্বেচ্ছায় শুধু একটি কথা ভেবে। ছাত্র আর শিক্ষকের সম্পর্কের মাঝে রয়েছে একটি মূল জিনিষ—সেটা শ্রদ্ধা। মিথ্যায় সংঘটিত হলেও, ছাত্রদের চোখে আমি সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে নীচে নেমে গেছি। এ-অবস্থায় আপন মর্য্যাদা নিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই চিরতরে মায়া কাটিয়েছি এখানকার। এ-শহরের বিষ-বাষ্পে আমার নিঃশ্বাস নিতেও এখন কষ্ট হয়। আজই, হয়ত আজ রাত্রেই সকলের চক্ষুর আড়ালে গোপনে বিদায় নেব এ-শহর থেকে এবং চিরদিনের মত। যদি পারিস তো এ-নিয়ে একটা গল্প লিখিস। লিখবি তো? আর শেষদিকে অন্ততঃ এ-কথাটা জুড়ে দিবি। পুরুষের কলংক নেই, এ-কথাটা আবু আবদুল্লার জীবনে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এখন উঠি বন্ধু, বিদায়।'

আবু আবদুল্লা দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। আমি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সুলেখা বিশ্বাসের শেষ সংবাদ জ্ঞাত না হয়ে, এ-গল্পের জন্যে হাত দেওয়া চলেনা।'

ম্লান হেসে আবু আবদুল্লা বললে, 'সেই অভিনয়-রজনীর পর সুলেখা বিশ্বাসের সাথে আমার আর দেখা হয়নি। নাটকের চরিত্র চিত্রনের প্রয়োজনে আমরা কাছাকাছি এসেছিলাম। অভিনয়-রজনীতে সে প্রয়োজনের হয়েছে নিঃশেষ, সেই সাথে সুলেখার সাথে সাক্ষাতেরও। সৌখিন অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাইরে ভিন্ন কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি আমাদের। এক সন্দেহবাদিনী সংশয়চিত্ত দুর্ব্বল-মতি নারীর বিভ্রান্ত কল্পনায় শুধু আমাদের সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে এক রোমান্টিক জুটির আকারে বিরাজ করছে।'

বলে আবার একটু ম্লান হাসলো। তারপর ঘরের বাইরের অন্ধকারের ভেতরছায়ার মত দ্রুত মিলিয়ে গেল।

সম্পাদকীয়
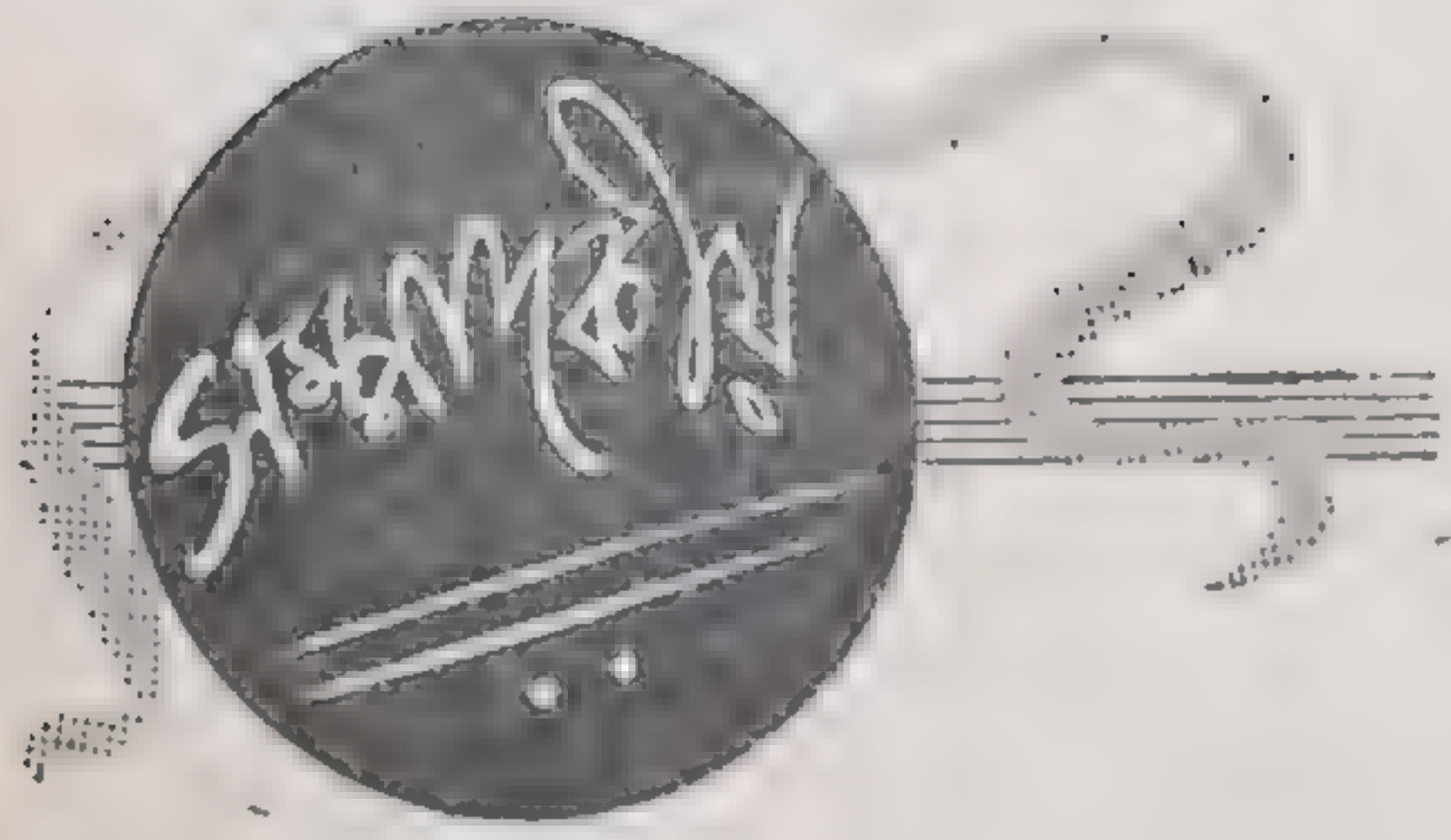
নয়া-ব্যবস্থা

দেশ যখন চরম দুরবস্থায় নামিয়া আসিয়াছিল, তখন পাকিস্তানের সদর আঘাত করিয়া পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়া শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। দেশে জঙ্গী আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তার সাথে বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থাকে নূতন ভাবে চালু করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, পার্লামেণ্টারী শাসনের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন, শাসন যন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা ও আর্থিক অচলাবস্থা এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্ব্বক্ষেত্রে এই অব্যবস্থার কুফল জন-সাধারণই ভুগিতেছিল। দুর্নীতিতে দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার-দর সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কালোবাজার, চোরাবাজার, মুনাফাখোরী ও গোপন-মওজুদ আসিয়া সৎ ব্যবসায়ের স্থান পুরাপুরি দখল করিয়াছিল। দেশের প্রচলিত শাসনযন্ত্রের গলদ ও ব্যর্থতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় একদল লোকের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতাও মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং দেশে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, তা লইয়া দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। দেশের এই দুরবস্থার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়া সদর নূতন ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছেন। আমরা এ-অবস্থার প্রতিকার চাই; এবং তাই নয়া ব্যবস্থার কামিয়াবি কামনা করি।

সদর মেজর জেনারেল এস্কান্দর মীর্জ্জা ও মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আইয়ুব খাঁ জানাইয়াছেন যে, তাঁরা দুঃখের সাথেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ; এবং অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে যতশীঘ্র সম্ভব তাঁরা দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন করিবেন। দেশবাসীও ইহাই চায়। নয়া ব্যবস্থায় মোটামুটি তিনটি ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁরা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য দমন, দুর্নীতির উচ্ছেদ ও শাসনতান্ত্রিক কার্য্য ত্বরান্বিত করণের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ

রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপকে আমরা এখানে দুই ভাগে ভাগ করিয়া বিচার করিতে পারি ঃ রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক। রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া যে-সব রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ দেখা যায়, সে-সব ধরা সহজ এবং সোজাসুজি মোকাবেলা করার সুবিধাও রহিয়াছে। এ-ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের তৎপরতাও লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু তামদ্দুনিক পথে যে-সব রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি দমন করা ততটা সহজ নয়। অনেক সময় সেগুলি আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য, বন্ধুত্ব, শান্তি ও প্রতিবেশীত্বের রূপ ধরিয়া আসে। তাদের চাতুর্য্যপূর্ণ উদার আবেদনে ভুল করিয়া মানুষ ভুল করে। আসলে তারা বর্ণচোরা, রাষ্ট্রবিরোধী। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও শিক্ষায় এই সব বর্ণচোরা রাষ্ট্রবিরোধীদের যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে, তা লক্ষ্য করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণ-কামী ব্যক্তি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রবিরোধীদের কার্য্যকলাপের উৎখাত করিতে হইবে। এই জন্য চাই দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গত ১১ বৎসরের মধ্যে অনেক গভর্ণমেণ্ট আসিয়াছে এবং গিয়াছে। কেউই এ-দিক হইতে তেমন কিছু করিতে পারেন নাই। ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনা গড়িয়া উঠে নাই, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তামদ্দুনিক জীবন হইতে অ-পাকিস্তানী ক্ষতিকর ভাবধারার উৎখাত করার কাজ নেতিমূলক। নেতিমূলক কাজ শেষ করার পর গঠনমূলক কাজে হাত দিয়া আমাদের তামদ্দুনিক জীবনকে জাতীয় ঐক্যাভিসারী ও কল্যাণধর্ম্মী করিয়া তুলিতে হইবে। নয়া ব্যবস্থা এ-দিক হইতে যদি বাস্তব কাজে যথাসময়ে হাত দেন, তবে সুখের হইবে।

দুর্নীতি দমন

দুর্নীতির আবিল স্রোতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের একটি অংশ এর সাথে জড়াইয়া গিয়াছিল। ব্যবসায়, বাণিজ্যে

চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশার অন্ত ছিল না। নয়া কর্তৃপক্ষ এই দুরবস্থার অবসান ঘটাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং কঠোর হস্তে দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা এ-কাজে তাঁদের সাফল্য কামনা করি। আশা করা যায়, শীঘ্র দেশের আর্থিক জীবনে স্বস্তা ও সুষ্ঠুতা ফিরিয়া আসিবে।

শাসনযান্ত্রিক শৃঙ্খলা

দেশের শাসনযন্ত্র যে ঠিক মত চলিতেছিল না, তা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাহিরের হস্তক্ষেপ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত ব্যাপার ছিল তার জন্য দায়ী। বকেয়া কাজ সমাপ্ত করার জন্য ও শাসনযান্ত্রিক সুশৃঙ্খলা আনয়নের জন্য কঠোর নির্দেশ জারী করা হইয়াছে। প্রকাশ, এত দিন সরকারী দফ্‌তরে সকল ফাইলই চাপা পড়িয়া থাকিত। এ-সকল ফাইল এখন শেলফ হইতে টেবিলে আসিয়া উঠিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা আগে দেরীতে অফিসে যাইতেন এবং সকাল সকাল বাসায় ফিরিতেন। এখন তাঁরা সকাল সকাল অফিসে যান এবং দেরীতে বাসায় ফিরিতেছেন। এ-সব সুখবর। তবে সরকারী বিভাগের এই নবজাত তৎপরতা স্থায়ী হইলেই দেশের লোক সুখীও হইবে; এবং উপকৃতও হইবে।

মাসিক মোহাম্মদী

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫
৩০শ বর্ষ, : ২য় সংখ্যা

সার্পেন্টাইন লেক ঃ রমনা

মুফাখ্খারুল ইস্লাম

॥ এক ॥

জ্বালা করে দুই চোখ, মাথা মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলে,
সীসা-গলা দুপুরের আতশ-অতলে
নিঃশেষ হয়েছে সারা চরাচর ;
লুপ্ত হল বোধ,
কানে তালা লাগিয়েছে অসহ্য এ-রোদ !
এরি মাঝে
রমনার সব চেয়ে জনহীন পথ ধ'রে একা
দল ছাড়া এ-কোন্ হরিণী
পুঁথি-ভারে নুয়ে-পড়া শীর্ণ তনুলেখা
টেনে চলে ক্লাশ ফেলে রেখে
এই অসময়ে উদাসিনী
সর্পিল ঝিলের পারে পদচিহ্ন এঁকে
চামেলি মহল পানে ;
সংগিনীর কারো কাছে না ব'লে সে কথা !
তনুযষ্ঠি হতে বৃথা গলে গেছে যৌবনের জতু,
কোলে তার আঁকেনি ত হাসি তবু দীপস্ত চেরাগ
একটি মানব কলি ফুল্ল রূপরাগ !
নীল দরিয়ার তীরে শুধু হল জমা
কংকালের স্তূপ—নারী-হাড়,
শুক্না পুঁথির পাতা শুষে গেল জীবন সুষমা
লুটে নিল মুখ হ'তে প্রাণদীপ্ত লাবণ্য-প্রভাব !
মিসর রাজের মত দেখেছে কি হরিণী এ-খাব্ ?

নিশ্চিন্তে ঝিলের কাচে রাজহাঁস একান্ত বিরলে
সারা বেলা ছায়া ফেলে নিস্তরংগ জলে
ফুটন্ত শাপলা দুটী—বিভোর মিলনসুখে ছিল
মগ্ন মনে ;
সহসা প্রেতাত্মা দেখে বুঝি এতক্ষণে
আতংকিত পাখশাট মারি'
হৃদয়ে জখম পেয়ে---আর্ত হাহাকারে
উভয়ে চম্‌কে গেল ভেসে ছু'টে ঝিলের দু'ধারে !
উৎকণ্ঠ গ্রীবায় ওই ভীরু চোখে ফির্‌ছে সাঁতারি' !
ঝিলের প্রশান্ত পানি এরি মাঝে ওলট পালট !
হরিণীও খেয়েছে হোচট
আপনাতে দেখে সেই ছবি প্রেতাত্মার !

আগের সংগিনীদের যার যত রূপ ছিল দেহে
সেই তত আগে গেছে ছেড়ে এ-অসহ্য পুঁথি-ভার ;
এ-হংসমিথুন যেন তারি ছায়া আঁকে প্রেমে স্নেহে !

বিশ্বের কল্যাণকামী পুত্রার্থে যে বাঁধেনি মিথুন
সে-নারী নিজেরে শুধু নয়, বিশ্বমানবেরে করেছে সে
খুন !

প্রেতাত্মা ফেলেছে চিনে ঝিলের ও-হাঁস,
আর্তনাদে চিঁড়ে তাই দুপুরের কঠিন আকাশ।

॥ দুই ॥

কবে সূর্য অস্ত গেছে হিরাঝিল-মোতিঝিলে ডুবে।
এ-আকাশ সে-আকাশে হাজার তারার জাল ফেলে
কখনো পশ্চিমে খুঁজে—কখনো বা পূবে
শামুক গুগ্‌লি টেনে তুলে আর ঢেলে
পেরেশান ; সেই কালে সর্পিলঝিলের পারে এসে
জিন্দান-নন্দিনী মুক্ত কলা-মায়াবিনী
সে এক শংখিনী—
তার সর্পগ্রাসে অস্ত গেল অবশেষে
পেতে-নাহি-পেতে সেই হারানো দিনের পাওয়া
'বয়জা'-মানিক।

শংখিনী শিকার-শোষা ফেলে এতক্ষণে
চরম পাওয়ার তৃপ্তি নিয়ে গেল···
এখন নিস্তব্ধ চারিদিক,
রেশমী আকাশ এসে বুক দিয়ে পড়েছে এখানে,
তার নীল সিনাবন্দ্ অন্ধকারে ভিজে
ঢেকে গেছে রাতের শেমিজে।
মুক্তাঝরা মউজের উৎকর্ণ বিতানে
আঁধারের বুক-কাঁপা নিরিবিলি কথা
উভয়ের হৃদয় বিশ্লেষা,
একের নৈরাশ্যে যেন অপরের আর্দ্র সমব্যথা!

সর্পিল ঝিলের পানি বহুদিন পরে আজ চাহে
নীল নেশা!
কবে কোন্ টানে প'ড়ে এসেছিল ছিঁড়ে
ও আকাশ থেকে ছু'টে উতলা সমীরে
বিশ্বখালিকের আর্শ বুকে করে
যেন গুপ্তধন পেয়ে বুকে
মউজে মউজে আঁকা মনোরম স্বপ্ন হেরি' অসংখ্য
সুমুখে।
বিচিত্রের স্তরে স্তরে কার চিত্রপ্রতিষ্ঠার জুশে
কাউস্-কাঞ্চনে খচা সে-বুকের তখ্‌তে তাউসে।
ঢেউ-এ ঢেউ-এ কত ব্যথা পড়েছে আছাড়ি'
আরো আছে কত দুঃখ বেদনার বারি,
কে তা জানে ?—কে রেখেছে সলিলের
অতল খবর ?
নতুন জীবন তার, তাই এত দায়িত্ব দুর্ভর!
প্রাচীন আকাশ আছে, ঢেউ তায় নাই তো কখনো,
নাই তার ব্যথাদুখ কোনো,
রয়ে গেছে চিরকাল অপরিবর্তন,
বক্ষে নাই আশংকার ব্যাকুল স্পন্দন!

সময়ের জোনাকিটী কবে থেকে নিভজ্বলা খেলি'
ছেপে দিল কত রাত, কত দিন দিল শূন্যে মেলি'
থরে থরে সিঁড়ি গেল গড়ি'
সাহানে সাহানে তার তালে তালে মউজ দুলিয়ে
এ-পানি এসেছে উঠে কত পথ দিয়ে
কত পথ পিছে ফেলে রেখে
বুকে সেই দিনরাত এক আশা মেখে
সেই চির কামনার ধন
আজো সে পেল কি ?
শুধু টলমল করে মন,
জলে ভ'রে আসে দুই চোখ
অশ্রুতে কুয়াশা রচে; আসমানে শুধুমাত্র ঝলসে
আলোক।
আকাশ এখনো ছায়া তেমনি-ত ফেলে
মাঝে মাঝে মেঘ আসে ভেসে চলে গেলে
তেমনি সুনীল স্বচ্ছ আঁখি স্নেহে সুবিমল আবার
বিস্তার।
কেন এসেছিল তবে ওই নীল শান্তি পিছে ফেলে
সৃজন ব্যাকুল পানি-ধার ?
আজো তাই এ-নিশীথে বুকে বুক রেখে
গভীর আবেগে
সর্পিল ঝিলের পানি সে-নীলের স্পর্শসুখ চায়,
আকাশের সনে তাই অধরে অধর পাতি' মগ্ন আছে
লেগে।
কাঁদ্‌ছে জড়িয়ে কণ্ঠ ব্যাকুল ব্যথায়,
এ-দায়িত্ব আর কত দিন বুকে ধ'রে রাখা যায় ?

হামিদ আলীর "কাসেম বধ কাব্য"

অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান

আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী প্রণীত "কাসেম বধ কাব্য বা সাহাদতে ইমাম কাসেম (আঃ)" ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর গ্রন্থটি তদানীন্তন 'চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর, 'সুকীর্তি মুকুট বিভূষিত স্বনামধ্যাত মহাত্মা মৌলবী আবদুল করিম, বি, এ' সাহেবের নামে একটি কবিতা লিখে উৎসর্গ করেছিলেন। কাব্য প্রকাশ কালে তিনি নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে কাজ করতেন। কিন্তু কাব্যের ভূমিকার শেষে আছে, 'কুষ্টিয়া ১৫ই পৌষ, ১৩১১ সাল।' মনে হয় ভূমিকা লেখা কালে কবি কুষ্টিয়ায় ছিলেন।

"কাসেম বধ কাব্যে"র ভূমিকায় কবি তাঁর কাব্য রচনার মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথমেই তিনি লিখেছেন—"১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের "মিহির ও সুধাকরে" বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের "মাতৃভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ;—মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য পাঠে,—হিন্দু অচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে, তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিত নহে।

১৩১০ সালের 'ভারতী'তে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয়ের "মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—"মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্য বর্জ্জন করিতে পারি না...পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-সময়ে মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় আসিয়াছে।—তাই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়া উচিত।"(১)

কবির ভূমিকা পাঠে মনে হয়, তখনকার দিনে মুসলমান সমাজের সামনে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করাই ছিল একটা বড় সমস্যা। কারণ, হিন্দু সাহিত্যিকগণের সৃষ্টিতে তাঁদের নিজস্ব ধ্যান ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছিল। সে সাহিত্যের ভাব, গঠন এবং বিষয়বস্তু মূলতঃ হিন্দু ধর্ম, পুরাণ ও সমাজকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়েছিল। মুসলমানরা তার মধ্যে না পেতেন নিজের ধর্মকে না পেতেন নিজের সমাজকে। উপরন্তু তাঁদের ইতিহাসকে দেখতেন বিকৃত ও কদর্যরূপে। বিশেষ করে রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণ ইতিহাস অবলম্বনে যে সাহিত্য রচনা করেন তার অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানদের মনে পীড়া সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান ছিল। মুসলমানগণ তখন সাহিত্যে একটা নিজস্ব পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করছিলেন। এবং তারই ফলে মুসলমানী কথা, কাহিনী এবং ইতিহাস কেন্দ্র করে কাব্য, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি গড়ে উঠতে থাকে। আধুনিক যুগের মুসলমান সাহিত্যিকগণের সৃষ্টিতে কমবেশী এ-প্রয়াসেরই স্বাক্ষর পাওয়া যায়। মোশাররফ হোসেনের 'এসলামের জয়', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান', মোজাম্মেল হকের 'তাপস কাহিনী'; শিরাজীর 'স্পেন বিজয়', ইয়াকুব আলীর 'শান্তিধারা' প্রভৃতি গ্রন্থে আর যাই থাক, অন্ততঃ 'মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়ার' প্রয়াসটি সুপ্রকট।

"কাসেম বধ কাব্য" উপরোক্ত প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মহাকাব্যের ঢংএ লিখিত এটি একটি আখ্যান কাব্য। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"রাম রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত।" একটি বিরাট ও বিস্তৃত কাহিনীর কোন বিশেষ অংশ কবি কল্পনায় ধৃত হয়ে কাব্য-রূপ লাভ করে প্রথম মেঘনাদ বধ কাব্যে। অবশ্য মহররম সাহিত্যে ও পুঁথি সাহিত্যে এ-ধরণের আংশিক ঘটনা অবলম্বনে 'কাসেমের লড়াই' বা অমনি ধরণের কাব্য রচনার নিদর্শন আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেখতে পাই। তবে কাহিনীর অন্তর্গত বিশেষ ঘটনা বা চারিত্রিক অভিব্যক্তি

(১) ১৩০৭ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলমানদের বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে উর্দুতে একটি বক্তৃতা দেন। সে বক্তৃতা 'The Vernacular Education in Bengal' নামে ইংরেজীতে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাটির উপর তখন বিভিন্ন পত্রিকায় বেশ কিছু সমালোচনা হয়। ইমদাদুল হক সাহেব ভারতীতে (বৈশাখ, ১৩১০) ঐ বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু লেখকগণের, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি এক স্থানে মন্তব্য করেন—"বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যোগদান করেন না বলিয়া হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলুন দেখি, মুসলমানেরা বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িবে কি কেবল গালি খাইবার জন্য ?"

শিল্পী চেতনায় যে অভিনব রূপ গ্রহণ করে তার প্রথম পরিচয় পাই রাবণকে আশ্রয় করে মাইকেলের সৃষ্টিতে। কাসেম বধ কাব্যেও শিল্পী চেতনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। সে আলোচনা আমি পরে করব। এখন, সময়ের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়—নবীন সেনের মহাকাব্য শেষ হয়েছে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যের প্রকাশ হয়েছে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, শিরাজীর স্পেন বিজয় কাব্য প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এবং যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বিরাজ কাব্য প্রকাশিত হয়েছে আরও পরে—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক ধারাকে অনুসরণ করেই যে কাসেম বধ কাব্য লেখা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-কথা সত্য যে আমাদের সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান লেখকগণ নানা কারণে পেছিয়ে পড়েছিলেন। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে ক্লাসিক ধারার প্রবর্ত্তন হয়, মুসলমান কবিগণ তাকে অনুশীলন করেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। কায়কোবাদকেই আমরা এ-ধারার প্রথম কবি মনে করি। কিন্তু হামিদ আলী সমসাময়িক কালেই ক্লাসিক রীতি অনুসরণ করে কাব্য লিখেছেন। 'কাসেম বধ' কাব্যের কয়েক বছর আগেই তিনি 'ভ্রাতৃ-বিলাপ' কাব্য লেখেন এবং প্রকাশ করেন। ক্লাসিক ধারার শ্রেষ্ঠ ও সার্থক কাব্য মেঘনাদ বধের প্রভাব হেমচন্দ্র, কায়কোবাদ প্রভৃতি কবির কাব্যে দেখা যায় এবং কাসেম বধ কাব্যও তার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টি, উপমা প্রয়োগ ও ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ-কাব্য 'মহাশ্মশান' থেকে শ্রেষ্ঠ ত বটেই; অনেক ক্ষেত্রে 'বৃত্রসংহারের' চেয়েও নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কাব্যের মধ্যে কবির দুর্লভ সংযম, প্রদীপ্ত বুদ্ধি এবং চমৎকার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে কাব্যটি দুর্লভ এবং ইচ্ছা থাকলেও অনেকের পক্ষে সেটি পড়া সম্ভব নয়। কাজেই কাব্যের মূল্য বিচারের আগে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

কাব্য সংক্ষেপ

কাব্যের প্রথমে 'প্রস্তাবনা' লিখে কবি কারবালা-ঘটনার পূর্বে বিবি জয়নবের প্রতি এজিদের আকর্ষণ, বিষ প্রয়োগে এমাম হাসানকে হত্যা ও পথ ভুলে এমাম হোসেনের কারবালা উপস্থিতির কথা সংক্ষেপে বলে নিয়েছেন।

দিবাবসানের বর্ণনা দিয়ে প্রথম সর্গ আরম্ভ। 'হেমাঙ্গি সঙ্গিনি' কল্পনা দেবীকে অনুরোধ করে কবি বলেছেন—

'বিতরণ কর মধু বঙ্গের পাঠকে
মধুর লেখনী হস্তে মধুময়ী ভাষে!'

ব্যর্থ প্রেমিক এজিদের আক্ষেপ ও মন্ত্রী মারোয়ানের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রণা প্রথম সর্গের মূল কথা। রাজধানী দামেস্ক নগরে গভীর রাত্রে—'নীরব নিস্তব্ধ সবে নিদ্রার ক্রোড়েতে' অথচ সে নগরীর যিনি অধিপতি তাঁর চোখে ঘুম নেই। কবি বলেছেন—

'কিন্তু এক দগ্ধ প্রাণ বিরহ অনলে
জ্বলিতেছে মুহুর্মুহুঃ স্মৃতিবায়ু বেগে,
ভস্মোন্মুখ গৃহ যথা মন্দ সমীরণে।'

জয়নবের স্মৃতি এজিদের প্রাণে দারুণ দাহ সৃষ্টি করেছে। মারোয়ানের কাছে তিনি আক্ষেপ করে বলছেন—

'হায় কি কুক্ষণে
হেরেছিনু অপরূপ সে-রূপ মাধুরী
আভাময়, জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র যথা।'

সংশয় ভরা মনে তিনি ভাবছেন হয়ত কারবালার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। মারোয়ান তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—

'মনোরথ তব
পূর্ণ হইবার চিহ্ন যাইতেছে দেখা।'

কারণ, 'কুফাধিপ জেয়াদ শঠের' অতি ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে হোসেন যখন কুফা যাত্রা করে পথ ভুল করলেন এবং কারবালায় পৌচেছেন, তখন তার মধ্যে এজিদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। না হলে 'বিজ্ঞজন ভুলে কভু অতীব ভক্তিতে?' এতেও এজীদ ভরসা পাচ্ছেন না। হোসেন পরিবারের বীরত্ব তাঁর অজ্ঞাত নয়। কাসেম ও অন্যান্য 'সিংহশিশু' তাঁর সঙ্গী। কূটবুদ্ধি মারোয়ান বলেন 'নবীবংশ মহারথী' বটে তবে—

'যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব বিক্রমে
তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল কল্যাণে।'

তিনি জানেন, নবীবংশ অচিরে 'সবংশে নির্ব্বংশ হবে কার্বালা প্রান্তরে জলাভাবে—'

কারবালার সন্নিকটে ফোরাত নদী অবরোধ করে তিনি তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মারোয়ানের কৌশল জেনে এজিদ প্রশংসা করেছেন—'ধন্য হে খেলওয়াড় তুমি, ধন্য খেলা তব।' জয়নবের অভাব এজিদের জীবনকে অর্থহীন করে ফেলেছে—

'রাজপুরী, রাজভোগ, রাজার সম্মান,
রাজসভা, রাজসজ্জা, রাজ্যের সৌন্দর্য্য
সকলি আমার কাছে সে রত্ন অভাবে
আভা শূন্য, শোভা শূন্য যথা বনস্থলী
কুসুম-রতন বিনে শীত ঋতু কালে।'

সত্বর এ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি মারোয়ানকে কারবালায় দ্বিগুণ সৈন্য পাঠাতে বলেছেন। মারোয়ান সে আদেশ শিরোধার্য করে—

'বাহিরিলা ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে
কীটগ্রস্ত কুসুমেরে রাখিয়া কাননে।'

চিন্তাগ্রস্ত এজিদকে কক্ষে একাকী রেখে প্রথম সর্গ শেষ হয়েছে।

কারবালার 'মহামরু ভয়ঙ্কর' রূপ বর্ণনা করে দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ। মরুভূমির বাতাসে কবি হায় হায় শব্দ শুনে ভেবেছেন, নবীবংশের আসন্ন বিপদ স্মরণ করেই যেন সে বিলাপ করছে। তিনি জানেন মানুষের ভাগ্যলিপি খণ্ডাবার নয়—

'এ-সংসার মায়াস্থল বড়ই ভীষণ
ভীষণ, ভীষণতর লীলা বিধাতার।
বিজ্ঞ হইলেও নর না পারে মুছিতে
ললাট লিখন।'

কারবালায় পৌঁছে এমাম হোসেনের ঘোড়ার পা বালিতে পুঁতে গেছে, তিনি মাটি রক্তবর্ণ দেখছেন। সঙ্গীদের ধৈর্য্য ধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন—

'কিন্তু বিধি যদি বাম, দুর্ব্বল আমরা
যুঝিতে সে আজ্ঞা সনে, কবে প্রবাহেরে
ফিরাতে পেরেছে কেবা নিজ ভুজ বলে?'

সেই ভয়াবহ মরুভূমিতে পানি লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে এমাম ব্যাকুল হয়েছেন। নিজের চেয়ে সঙ্গের নারী, শিশু, জীবজন্তুর জন্য তিনি চিন্তিত হয়েছেন বেশী। এ-সঙ্কটের জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করেছেন—'আমা হেন পাপী—পাপ করেছে পরশ', আর তাতেই সকলের জীবনে দেখা দিয়েছে এ-ভয়াবহ বিপদ। তিনি ভৃত্যদের জলের সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন, তারা এসে সংবাদ দিয়েছে যে এজিদের সৈন্যরা ফোরাত নদী অবরোধ করে রেখেছে। এ সময় কুফা থেকে দূত এসে খবর দিল যে মোসলেম শহীদ হয়েছেন—ফলে, 'উথলিল চারিদিকে বিপদ সাগর।' বিপদে তিনি আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করেছেন—

'দয়াময়! তব ইচ্ছা সদা বলবতী
ভাসায়ে দিয়েছি দেহ সে ইচ্ছা-প্রবাহে।'

কিন্তু বিপদেরও যেন আর শেষ নেই। শাহেরবানু 'দুগ্ধ-পোষ্য শিশু লয়ে অঙ্কে আপনার' এমামকে জানালেন—

'কৃপণ আজি জননীর স্তন
স্বীয় সুতে দুগ্ধ দানে।'

পানির সন্ধানে তাঁর চেষ্টার কথা বলে তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন। কারবালা প্রান্তরের এই বিপদকে একাকী বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি সঙ্গীদের ফিরে যেতে বলেছেন; কিন্তু কেউ তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। অগত্যা সেদিনের মত সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্গ এখানে শেষ হয়েছে।

যুদ্ধ পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণনা করে তৃতীয় সর্গ আরম্ভ হয়েছে—

'নীরব নিস্তব্ধ সবে কার্ব্বালা প্রান্তরে
মহাঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমনি।'

শত্রুর আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ওহাব নামে এমামের এক সহচর প্রথম যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তাঁর পত্নী সজল নয়নে তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে চুম্বন করলেন, এক ফোটা চোখের জল তাঁর কপোলে পড়ল। কবি এ দৃশ্যের উপর মন্তব্য করেছেন—

'হে মানব, স্বার্থ-দাস কেমনে বুঝিব,
এক বিন্দু অশ্রু সতী নারীর আপন
পতির উদ্দেশে কত মূল্যে মূল্যবান।'

ওহাব যুদ্ধ ক্ষেত্রে 'একে একে সত্তর কাফেরে' নিধন করে ক্ষত-বিক্ষত দেহে শিবিরে ফিরে প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁকে দেখে তাঁর পত্নী—

'বিলাপিলা, নিনাদিলা সকরুণ স্বরে
পতির বিরহে, যথা বসে শূন্য নীড়ে
কপোত বিলাপে, যবে নির্দ্দয় কিরাত
বিনাশয়ে সহচরে।'

এমাম হোসেনের সঙ্গীগণ প্রায় সকলেই যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন এবং এজিদের 'লক্ষাধিক সৈন্য' প্রাণ হারিয়েছে। খণ্ড যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় সর্গ শেষ হয়েছে।

চতুর্থ সর্গের শুরু হয়েছে, মধ্যাহ্নকালে মরুভূমির ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করে। প্রকৃতির উগ্রতার সঙ্গে তাল রেখেই যেন—'বাজিছে তুমুল বাদ্য উভয় শিবিরে'! সঙ্গীরা শহীদ হয়েছেন কাজেই এমাম নিজে যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করছেন এমন সময় কাসেম এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন। কাসেম নিজে যুদ্ধ যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি মনে করেন যে এজিদ পক্ষে এমন কোন যোগ্য বীর নাই যাঁর সঙ্গে এমাম যুদ্ধ করতে পারেন—'যুঝে কি শৃগাল সনে সিংহ নরত্রাস?' কিন্তু এমাম হোসেন তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে কি করে এজিদের বিপুল বাহিনীর সামনে পাঠাবেন—'কে ফেলে অমূল্য নিধি অতল সাগরে?' উত্তরে কাসেম বল্লেন, শত্রু যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, তখন—

'বীরসুত, বীর আমি, বীর কুলোদ্ভব
বীর-ধর্ম্মে কি প্রকারে দিব জলাঞ্জলি;'

শেষে এমাম কাসেমকে বললেন, একান্তই যদি যুদ্ধে যাবে তবে 'লভ অগ্রে অনুমতি তব জননীর'। জননী তাকে অনুমতি দিতে গিয়ে বললেন:

'নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাতে তোমায়
এ-কাল সমরে; কবে অমূল্য রতনে
অঁযতনে দীন? কিন্তু বিদরে হৃদয়

প্রাণীসমূহের শুনে' ঘোর আর্তনাদ
পানীয় জলের তরে—'

যে কাপুরুষেরা পানি বন্ধ করে মানুষের উপর জুলুম করছে তাদের প্রতি তাঁর ঘৃণার শেষ নেই। তাই 'কর্ত্তব্যের অনুরোধে' তিনি পুত্রকে বলেন—

'যাও সিংহসুত
দেখাও বীরের বীর্য, আক্রম শত্রুরে
শৃগালের পাশে যথা সিংহ নরত্রাস।'

মায়ের অনুমতি নিয়ে কাসেম যুদ্ধে যাওয়ার উপক্রম করছেন এমন সময় তাঁর চাচা এসে বললেন—

'তিষ্ঠ ক্ষণকাল
হয়েছে স্মরণ এক কথা গুরুতর।'

সে কথা হচ্ছে, এমাম হাসান মৃত্যুকালে ভ্রাতৃকন্যা সখিনার সঙ্গে কাসেমের বিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কাজেই তিনি বিয়ে সমাধা করে কাসেমকে যুদ্ধে যেতে বললেন—'কেননা যুদ্ধের ফল অজানা, অজ্ঞাত।' কাসেমের মাও তাকে বললেন—'পিতা ও পিতৃব্যাদেশ করিতে পালন'। এ-কথা শুনে হতবাক কাসেম মার দিকে তাকালেন অবোধ দৃষ্টি দিয়ে—

'কুরঙ্গ-কিশোর যথা কুরঙ্গিনী পানে
হেরে স্নেহ-আবাহন শুনয় যখন।'

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে নবযুবকের কাছে এ-কি সম্ভাবনা! এ যে মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে পেছন থেকে মধুর জীবনের আহ্বান! তাঁর অন্তরে শুরু হয়েছে আন্দোলন। জীবনের পেছন ফিরে তিনি দেখেছেন—সেই তাঁর আবাল্যের সঙ্গিনী—

'বহুযত্নে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে,
মোহিনী-মূরতি যাঁর হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপিয়া পূজেছে সদা নিভৃত-নীরবে
মাতা ও পিতৃব্য মতে সে আশা-লতায়
ফলিতে চলিল আজি মনোবাঞ্ছা ফল!'

তিনি যে সখিনার কাছে 'সঙ্গোপনে বিনামূল্যে অমূল্য হৃদয়' বিক্রি করে গিয়েছেন অনেক আগেই। তবে কি তিনি তাঁর বীর ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে প্রণয় এবং ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন? তা হতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হয় 'গুরুজনাদেশ হায় লঙ্ঘি কি প্রকারে।' এ-ঘোর সংশয় হতে মুক্তির জন্য তিনি পিতৃপ্রদত্ত কবচ খুলে দেখলেন তাতে লেখা—

'অতীব সত্বর
করহ গ্রহণ পাণি বিবি সখিনার।'

নাঃ, আর কোন দ্বিধা নেই। বিয়ে করা তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য, তিনি অশ্ব থেকে নেমে পড়লেন।

এতক্ষণে কবি পড়লেন সঙ্কটে। একে ত কারবালার রুদ্র ভয়ঙ্কর প্রকৃতি তার উপর—

'রমণী, পুরুষ, শিশু, যুবা বৃদ্ধ যথা
নিমজ্জিত শোক-নীরে, হ'তেছে উত্থিত
আর্তনাদ হাহা রব জল-বিন্দু তরে—'

যেখানে পতিহীনা নারী, সন্তান হারা মাতা কাতর ক্রন্দন করছেন—

'সেই স্থানে কি প্রকারে কহলো কল্পনে!
কবির আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?'

তবু কবির ভরসা কল্পনা দেবীর কৃপা লাভে যখন অনেকে স্বর্গের পারিজাত মর্ত্তে ফুটাতে পেরেছেন, স্রোতস্বতী উজান বহিয়েছেন, তখন তিনিও অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। হোলই না হয় ক্ষণিক আনন্দ তবু—

'বিবাহ উৎসব-বাদ্যে ভাসাই সকলে
কাল্পনিক সুখনীরে ক্ষণকাল তরে।'

কাসেম ও সখিনার বিয়ের খবর শিবিরে প্রচারিত হলে—

'সকলে এই নব সমাচার
শুনিলা স্বপনে যেন, ক্ষণেক নীরবে,
চাহিলা এ-ওর পানে—সম্বোধি কহিলা—
বিধাতার একি লীলা, একি অভিনয়?'

নিদারুণ দুঃসময়ে এ-অভিনব সংবাদ শিবিরের নরনারীকে হতবাক করেছে। মুহূর্তের জন্যে একে অন্যের মুখ চেয়ে কথা খুঁজছে এবং তা না পেয়ে সকলে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা স্মরণ করেছে।

অবশেষে 'শুনিলা সখিনা দেবী বার্ত্তা অভিনব'। এমন সংবাদ শোনার জন্য তিনি তো প্রস্তুত ছিলেন না, তাই 'নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল ক্ষণেক'; তার পর চোখে এল দু' ফোটা জল, সে জল গড়িয়ে পড়ল কপোলে—

'সুন্দর কপোলে
মুক্তা বিনিন্দিত বিন্দু শতদল দলে
শোভিল সুন্দর ভাবে; তারা রত্ন যথা
গগণ-ললাটে শোভে সন্ধ্যা সমাগমে।'

আসন্ন দুঃখের সন্ধ্যায় তারার মত এ-কোন্ আনন্দের উজ্জ্বল বিন্দু! এ-কান্না সুখের না দুঃখের! প্রথম আনন্দ বেদনার ঘোর কেটে গেলে সখিনা দাম্পত্য জীবনের মহিমা বোঝার চেষ্টা করলেন। নিজের সুখ-সম্ভাবনার মধ্যে সকলের সুখ-কামনা করলেন—

'রণজয়ী হয়ে
ফোরাতের জলে এবে করিবে শীতল
তৃষাতুর যোধ যত স্ব স্ব দগ্ধ প্রাণ।'

কিন্তু অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠছে—তিনি ভাবছেন—'বামেতর আঁখি মোর কি হেতু নাচিছে?'

এমনি ভাবে কখন আশায়, কখন নিরাশায় সখিনা আন্দোলিত হচ্ছেন, এমন সময়—'রমণীবৃন্দ' এসেছে তাঁকে বধূবেশে সজ্জিত করতে। তারা তাঁকে সাজাল—

'কঙ্কণ মৃণাল ভুজে, হীরকের হার
উরসে, মুকুতাবলী, নিতম্বে মেখলা
চরণে নুপুর।'

নিরানন্দ পরিবেশে বিয়ে সমাধা করে এমাম হোসেন নবদম্পতিকে উদ্দেশ করে বলেন—

"ছিল আশা মম হৃদে" কহিলা নৃমণি
"সুসম্পন্ন করে এই বিবাহ উৎসব
মদিনায় সবান্ধবে যথা সমারোহে
এ-পোড়া হৃদয়-জ্বালা জুড়াব হেরিয়ে
তোমরা দুজনে সুখী।"

এমামের আক্ষেপের পর একটি গান দিয়ে চতুর্থ সর্গ শেষ হয়েছে।

কাসেম ও সখিনার দাম্পত্য জীবনের মর্মভেদী পরিণতি পঞ্চম সর্গের মূল কথা। 'বীরত্ব বিক্রমে' কাসেম অদ্বিতীয়। তাঁকে দেখে এজিদের সৈন্যরা ভয়ে পালায়—'কুরঙ্গ পালায় যথা কেশরী দর্শনে'। এ হেন বীর সখিনার সামনে বিদায় প্রার্থনা করে অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার তিনি—

'চুম্বিলা সাদরে
অশ্রুমাখা চন্দ্রানন বিবি সখিনার
চুম্বে যথা মুগ্ধ অলি অরুণ-উদয়ে
শিশিরাক্ত গোলাপের কোমল কোরক।'

স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সখিনা ভয়াবহ বাস্তবকে ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়েছেন, ডুবে গেছেন অতীতের সহস্র স্মৃতির মধ্যে। কিন্তু তার অবকাশই বা কোথায়। এমাম পক্ষের কোন যোদ্ধাকে না দেখে বিপক্ষ শিবিরে 'বাজিছে সমর-বাদ্য দ্বিগুণ উৎসাহে'। তিনি বীরজায়া। শত্রুর স্পর্ধিত আহ্বান উপেক্ষা করে বীর স্বামীকে প্রেম বন্ধনে বেঁধে রাখতে তিনি পারেন না। সখিনার কাছে বিদায় নিয়ে কাসেম—

'অশ্বে সুসজ্জিত
আরোহিল এক লম্ফে বীর চূড়ামণি!'

অমনি 'সখিনার অন্তস্থল কাঁপিলা সবেগে'।

যুদ্ধক্ষেত্রে এজিদ পক্ষের মহাবীর বর্জ্জখ কাসেমের হস্তে নিহত হলে বিপক্ষ সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লেগেছে—

'যথা জাঙাল ভাঙ্গিলে
বাধা বিঘ্ন অতিক্রমি মহা কোলাহলে
ছুটে জল মহাবেগে, কিংবা বনবাসী
উর্দ্ধশ্বাসে মহাতঙ্কে পালায় চৌদিকে
ভীমাকৃতি মৃগকুল কবিরাজ হেরে,
তেমতি দামস্ক সৈন্য ছুটিলা মুহূর্তে
বাঁচাতে অমূল্য প্রাণ; ভীত চিত্ত সবে
যমাকৃতি বীরর্ষভ কাসেমের ভয়ে।'

এ ভাবে 'ফোরাতের কূল প্রায় হলো প্রাণী শূন্য' এমন সময় দামেস্ক থেকে এক নতুন বাহিনী এসে উপস্থিত হয়ে কাসেমের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লেগেছে। সহসা একটি তীর তাঁর দেহে গভীর ভাবে বিদ্ধ হয়েছে। সে মুহূর্তে—

'সখিনার অন্তস্থল কাঁপিলা অজ্ঞাতে
পতিগতা সতী চক্ষে পড়িলা পলক।'

আহত কাসেম শিবিরে ফিরে সখিনার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত স্বামীকে দেখতে দেখতে সখিনা—

'মুদিলা নয়নদ্বয় চিরতরে, যথা
প্রদোষ কমল হেরে অস্তগামী ভানু
মুদয় নয়ন ধীরে সন্তপ্ত-হৃদয়ে।'

নব দম্পতির এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—

'রে দুরন্ত কাল! তোর প্রভাবেই আজ
গগণ-রতন শশী ভূতলে লুণ্ঠিত।'

এখানে পঞ্চম সর্গ শেষ হয়েছে। ষষ্ঠ সর্গের শুরুতেই প্রভাত বর্ণনা। পূর্ব্বদিন কাসেম ও সখিনার শোচনীয় পরিণাম দেখে—

'সারা রাত কেঁদে যেন ধীরে দুঃখ ভরে
দেখা দিলা প্রভাকর রক্তাক্ত নয়নে।'

ভ্রাতৃহত্যার পরিশোধ নেওয়ার জন্য আলী আকবর ও আসগর পিতা হোসেনের অজ্ঞাতে যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। শিবিরে এখন রুগ্ন জয়নাল ছাড়া আর কোন পুরুষ অবশিষ্ট নেই। কাজেই এমাম হোসেন যুদ্ধ-যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি মহানবীর শিরস্ত্রাণ, হজরত আলীর কবচ, হজরত দাউদ (আঃ) কোমরবন্ধ পরিধান করে 'দোল দোল' নামক অশ্বে আরোহণ করলেন। যাত্রা কালে স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে 'হস্নুফা নগরে' তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মহম্মদ হানিফা আছেন, তিনি কোন সূত্রে কারবালার ঘটনা জানতে পারলে এজিদকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে—

'উদ্ধারিবে নবীবংশে, বসাবে জয়নালে
মদিনার সিংহাসনে ঘুচিবে সংকট।'

যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে এমাম শত্রুদের নির্মূল করে 'নামিলা ফোরাত নদে তৃষ্ণা নিবারিতে' কিন্তু আত্মীয় স্বজনের কথা মনে পড়ায় পানি পান না করে, ; ওজু করে তীরে উঠে এলেন। নামাজান্তে শিরস্ত্রাণ, কবচ প্রভৃতি খুলে

ফেলেছেন। এ-অবস্থায় শত্রুরা দূর থেকে তাঁকে তীর বিদ্ধ করেছে এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলে 'সমুর' নামে এক সৈনিক—'বিচ্ছিন্ন করিলা শির—দেহতরু হতে।'

আরোহীশূন্য 'দোল দোল' শিবিরে ফিরে এলে সকলে পরিণাম বুঝে হাহাকার করে উঠলেন। বিবি জয়নব তাঁর রূপের জন্য আক্ষেপ করেছে—

'এ-রূপের মোহে মজি' দুর্ম্মতি এজিদ
ঘটাইল অঘটন।'

এরপর কবি 'কল্পনা দেবী'কে আহ্বান করেছেন এবং 'মানস চক্ষুতে' শহিদগণের স্বর্গারোহন অবলোকন করে কাব্য শেষ করেছেন—

'শহিদানের অগ্রগামী মহাত্মা হোসেন (আঃ)
হেরিয়া জুড়াও চক্ষু ; তাহার পিছনে
নব দম্পতীরে দেখ—কি ফুল্ল বদন।
চলন-ভঙ্গিমা, কিবা মৃদুল গমন।
পরিশেষে ওই দেখ আকবর, আসগর
কাসেম-সখিনা সনে চলেছে আহ্লাদে
দেখিছ কি অগণন 'শহিদ' আত্মায়
প্রবেশিছে সুরপুরে জয় জয় রবে।

"কাসেম বধ কাব্যে" দু'টি গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায়। কাহিনী রচনার দিক দিয়ে মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধুর' এবং ছন্দ ও উপমা প্রয়োগের দিক দিয়ে মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের। এক জায়গায় কবি মেঘনাদ বধ ও বৃত্রসংহার কাব্যের ঘটনাকে উপমা হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। কাসেমকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিদায় দিয়ে সখিনা—

'অতঃপর শূন্য হৃদে পশিয়ে শিবিরে
মুছিলা আঁখির জল—কাতরা বিরহে
কাঁদিলা নীরবে, যথা প্রমীলা সুন্দরী
বিদায়িয়ে ইন্দ্রজিতে সৌমিত্রি বিনাশে,
(কিম্বা যথা ইন্দুবালা বীর রুদ্রপীড়ে
হারাইয়া কেঁদেছিলা বিবশা স্বগৃহে।
কেঁদেছিলা শূন্য মনে প্রাণপতি তরে)।'

মেঘনাদ বধ কাব্যের ন্যায় মানুষের জীবনে নিয়তির অনিবার্য্য বিধানকে কবি এ-কাব্যে বার বার স্মরণ করেছেন।

কারবালা ট্রাজেডির যে কাহিনী শিল্পীর কল্পনায় পল্লবিত হয়ে বাংলা ভাষায় বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তারই একটি খণ্ড ঘটনা কাসেম বধ কাব্যের উপাদান। এ-কাব্য ইতিহাসকে অনুসরণ করেনি বরং ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেগকে অবলম্বন করেই স্ফূর্তি লাভ করেছে। কবি ভূমিকাতে তার আভাষ দিয়েছেন। কাব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না—কাব্যের পথ নিষ্কণ্টক।' বস্তুতঃ কাব্যের নিষ্কণ্টক পথে আবেগ ও অনুভূতির বাধাহীন প্রকাশের মধ্যে কাসেম বধ কাব্যের প্রধান গৌরব প্রকাশ পেয়েছে।

নারীরূপের যে সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণ পুরুষ চিত্তে নিদারুণ প্রদাহ সৃষ্টি করে তারই পরিচয় দিয়ে এ-কাব্যের সূচনা। জয়নবের রূপশিখা এজিদের অন্তরে যে লালসার বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিল তা ব্যর্থতার ঘৃতাহুতিতে তাণ্ডব মূর্তি ধারণ করেছে এবং কারবালা প্রান্তরে এমাম পরিবারকে ধ্বংস করেছে। আবার এই ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্যে, পুরুষের এই পৈশাচিক ক্ষুধা এবং লালসার প্রলয় নৃত্যের মধ্যে জীবনের এক করুণ অথচ মধুর রূপকে কবি অবলোকন করেছেন। একদিকে জীবনের প্রদাহ অন্য দিকে তারই প্রশান্তি। একদিকে কাম আর একদিকে প্রেম। নর-নারীর যে প্রেম মাধুর্য্য ও কল্যাণের মধ্যে বিকশিত, তাকেই কবি কারবালা প্রান্তরে সর্ব্বনাশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বৃহৎ আখ্যানের অংশ বিশেষকে গ্রহণ করলেও এ কাব্যে যুগ মানসের বিশেষ প্রতিফলন ঘটেনি। যুগ চেতনার কোন বিক্ষোভ বা সেই বিক্ষোভ সঞ্জাত শিল্পী চিত্তের ভাবনা এ-কাব্যের মূল প্রেরণা নয়। সে জন্য কাব্যে নাটকীয় সংঘাত ও বিস্ময়ের অভাব না থাকলেও এতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী Objective নয়। একটা প্রেম-আখ্যান সুলভ emotion সমগ্র কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কবি কারবালা কাহিনীর রোমান্সকেই কাব্যের প্রধান উপজীব্য করেছেন। বীর রসের যেটুকু প্রকাশ ঘটেছে তা ঐ রোমান্টিক পরিবেশ রচনার জন্যই দুর্ব্বল ও প্রাণহীন। একটা পরিণতির মধ্যে কাব্য সমাপ্ত করার জন্য কবি কোন মতে তার জের টেনে গেছেন।

কাব্যের স্থানে স্থানে ছন্দের ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। কাহিনী রচনা ও উপমা প্রয়োগে কবি অন্যান্য গ্রন্থের কিছুটা অনুকরণ করেছেন। কিন্তু আমি কাব্যের যে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়েছি তাতে কবি-কল্পনার সমৃদ্ধিও উপমা প্রয়োগে মৌলিকত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে চরিত্র অঙ্কনে এবং ঘটনা সংস্থাপনের মধ্যে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম সর্গে এজিদ ও মারোয়ানের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে একদিকে জয়নব-লাভে ব্যর্থ এজিদের চিন্তাক্লিষ্ট মূর্তি ও অন্যদিকে মারোয়ানের শঠতা ও কুটিলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জয়নবকে পাওয়ার জন্য এজিদ বহু ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছেন কাজেই কারবালায় তাঁর সৈন্যবাহিনী যে সফল হবে, এ-সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয়ের অবধি নেই। মারোয়ান কিন্তু সাফল্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত তিনি জানেন—

'যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব বিক্রমে
তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল কল্যাণে।'

এমাম হোসেনের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবি অপূর্ব্ব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। কারবালা প্রান্তরের সংকটে হোসেন নিজের জন্য চিন্তিত হননি। খোদার অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন—

'এ তুচ্ছ জীবন
বিসর্জ্জিব অকাতরে ; যেমতি পতঙ্গ
নির্ব্বানে জীবন দীপ দীপ-প্রীতিভরে।'

একাকী বিপদের সম্মুখীন হতে চেয়ে তিনি সঙ্গীদের ফিরে যেতে বলেছেন; কিন্তু তাঁরা সম্মত হন নি। অবশেষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর আস্ফালনের জবাবে তিনি শুধু বলেছেন—'তোর অভ্যর্থনা তরে নরক সজ্জিত' এবং পরক্ষণেই তাকে নরকে প্রেরণ করেছেন। সমসাময়িক কালের মহাশ্মশান কাব্যে বীরত্ব প্রকাশের নামে যে বাহুল্য বক্তৃতা, আস্ফালন দিতে দেখা যায় তা এ-কাব্যে নেই। কারবালা প্রান্তরে এমাম হোসেন ছিলেন নেতা। কবি তাঁর চরিত্রে নেতাসুলভ উদারতা, গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রস্ফুটিত করেছেন। এমামের সংযত, বীর এবং গম্ভীর মূর্ত্তি কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাসেমকে বিদায় দিতে গিয়ে তিনি যে কাতরতা প্রকাশ করেছেন, তাতে উচ্ছ্বাসের আধিক্য নেই বরং মানবীয় হৃদয়বৃত্তির সকরুণ অভিব্যক্তি ঘটেছে।

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে বিয়ের আয়োজন কাসেমের মনে যে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, সখিনার প্রাণে যে আশা-নিরাশার আন্দোলন এবং শিবিরের নর-নারীর মধ্যে যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, কবি তাকে সংযত বর্ণনায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। কারবালার ভয়াবহ পরিবেশে কাসেম ও সখিনার মধ্যে শাশ্বত নরনারীর যে মধুর আকর্ষণ চিত্রিত হয়েছে, তা পাঠককে অভিভূত করে। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নব দম্পতির প্রেমালিঙ্গন যেন মানুষের ক্ষনিক জীবনের ক্ষণিকতর আনন্দকে প্রবলভাবে আস্বাদনের চিরন্তন ব্যাকুলতা। একটির পর একটি সংক্ষিপ্ত ও গতিশীল দৃশ্য অঙ্কন করে, সর্ব্বোপরি পরিবেশকে যথার্থভাবে চিত্রিত ও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, কবি কাসেম ও সখিনার মর্মান্তিক পরিণতিকে কাব্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন; এবং এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

'কাসেম বধ কাব্য' কারবালা কাহিনীকে অবলম্বন করে, ক্লাসিক রীতিতে রচিত একটি আখ্যান কাব্য।

চতুর্দশপদী

আবদুল কাদির

শুক্লা-চতুর্দশী নিশি আসিয়াছে ফিরে',—
চন্দ্রমার জ্যোৎস্না নামে আমার অঙ্গনে
চতুর্দশপদী রচি ক্ষণসিন্ধু-তীরে
বাণীর বিস্রস্ত বেণী বিনায়ে যতনে॥
অবগাহি' কল্পনার মন্দাকিনী-নীরে
আহরিয়া আনি ছন্দ-উপমা-রতনে।
সে-ঐশ্বর্য অঙ্গে শোভে ; প্রাণের গভীরে
প্রাণ পায় সঙ্গীতের নিপুণ নিস্বনে॥

হেন রাতে কোথা তুমি নির্জন কুটীরে
চিকনি' গাঁথিছ হার একা এক মনে !
উড়িছে পুষ্পের রেণু উদ্‌ভ্রান্ত সমীরে,—
আমার বিরহ আনে সলিল নয়নে॥

সে-মালিকা তিতি' হায় অশ্রুর শিশিরে,
সুগন্ধি বিস্তারে মোর বাণীর মন্দিরে॥

পলাতক

কাজী আবদুল ওয়াদুদ

—সলিম ভাই, পালাও। পালাও সলিম ভাই।

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল সলিম।

এতক্ষণে হুশ হইল তাহার, চকিতে কামরুনের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া পলায়ন করিল সলিম।

ঝোপ ঝাড় ভাঙ্গিয়া দুই রাত্রি পার করিয়া মেঘনার ধারে আসিয়া যখন সে পৌছিল বেলা তখন প্রায় শেষ।

অস্তায়মান সূর্য্য কাৎ হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে পশ্চিম দিগন্তে; গাঢ় সোনার বরণ ফিকা হইয়া আসিতেছে ক্রমান্বয়ে। চোখ ঝল্‌সানো তেজটা আগের মত তেমন আর নাই, তবে একেবারে শেষ হইতে আরও খানিকটা বাকী। কাকের দল এরই মধ্যে ফিরিয়া চলিয়াছে নিজের নিজের আবাসে।

খেয়া ঘাটটা এখনও অনেকটা দুরে।

চলার গতিবেগ দ্রুত হইতে আরও দ্রুততর করিয়া দিল সলিম। সামনেই সাজদিয়া গ্রাম, ত'রপর খানিকটা আবাদী জমি, তারপর ঘাট।

এপারে সাজদিয়া ওপারে চর মানিকপুর। মাঝখানের ব্যবধানে বিশাল মেঘনা।

কাঁচা মেঠো সড়কটি বরাবর যাইয়া বাঁক ঘুরিয়াছে সাজদিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে; তারপর গ্রামের কোল ঘেঁসিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে ঘাট পর্য্যন্ত।

রাস্তার দুই ধারে মাথা সমান পাট আর ধান ক্ষেতের জন্য আশে পাশের কিছুই নজরে পড়েনা, শুধু গ্রামের গাছ-পালার মাথা আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নতুন-পুরাতন টীনের চাল ও ছনের তৈরী ঘরের ছাদগুলো দেখা যায়।

কাছাকাছিই পদশব্দ পাওয়া গেল, অথচ লোক দেখা যাইতেছেনা। কাহারা যেন এদিকেই আসিতেছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল সলিম।

তিনজন লোক পাটক্ষেতের আলপথে বাহির হইয়া আসিল। একজনের মাথায় একটী বড় বেতের ধামা, আরেকজনের হাতে মাছের খলুই, তৃতীয় জনের কাঁধে একটী খালি দুধের বাঁক।

বোধ হয় বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সলিম তখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ী কোথায়?

গ্রামের নাম বলিল সলিম।

আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

অনর্থক ভয় পাইয়া গিয়াছিল-সে। বুকটা দুরু দুরু করিয়া তখনও কাঁপিতেছে। একটু আশ্বস্ত হইয়া আবার চলিতে লগিল সলিম।

ঘাট আসিয়া গিয়াছে; কিন্তু খেয়া নৌকাটা এপারে নাই, ওপার হইতে ছাড়িয়াছে মাত্র। এপারে আসিতে অন্ততঃ আধঘণ্টা সময় লাগিবে।

লোক কয়েকজন গিয়া ঢুকিল ঘাটপারের তর্জ্জার বেড়া দেওয়া ছোট্ট দোকানটাতে। আরও কয়েকজন ভেতরে বসিয়া গল্প ফাঁদিয়াছে। দোকানী চা তৈরী করিতে করিতে মাথা তুলিয়া তাকাইল আগন্তুকদের দিকে। তারপর ধামাওয়ালা লোকটীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, চা দেব সিরাজ ভাই?

—না, তবে তামাক খাওয়াও।

—কি এনেছিলে?

—চাল ছিল সের দশেক।

—দর কত গেল আজকে?

—বার টাকা।

—চালটা আরও নামবে মনে হয়।

—তাইতো দেখছি, শালার এবার পাটেরও দর পেলাম না, চালেরও না।

একটু বিরক্ত ভাবেই বলিল সিরাজ।

ছোকরা চাকরটা হুকাটা সাজাইয়া তাহাদেরই একজনের হাতে দিয়া গেল।

দূর হইতে দোকানের ভেতরটা একবার দেখিয়া লইল সলিম। তারপর যাইয়া বসিল দোকানের বাইরে চেরা বাঁশের তৈরী মাচাটার ওপর।

কড়া তামাকের গন্ধে তাহার পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠিল। বহুদিন তামাক খাওয়া হয় নাই। ইচ্ছা হইল হুকাটা চাহিয়া নেয়। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল তাহার। অজানা অচেনা লোক সে। কিইবা মনে করিবে তাহারা। অবশ্য মনে করিবার কিছুই নাই। কারণ গ্রাম্য পরিবেশে হুকা চাহিয়া লওয়াটা দোষনীয় নয়। তবু খানিকটা ইতস্তত করিয়া ফিরিয়া দেখিল সলিম। তখনো জন দুয়েক যাওয়ার বাকী। তারপর যে অংশটা তাহার ভাগে আসিবে সে আর সুবিধার হইবেনা। কারণ ইতিমধ্যেই পোড়া গন্ধ ছুটিয়াছে।

নৌকা পারে ভিড়িয়াছে।

ওপারের যাত্রীরা নামিয়া যাইতে না যাইতেই একযোগে সবাই হুড় মুড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার

করিয়া উঠিল মাঝি, আস্তে আস্তে। নাওটা ভাঙ্গবে নাকি আমার।

নৌকাটা ঠেলা দিয়া সবশেষে উঠিয়া আসিল সলিম। এমন সময় হাঁক শোনা গেল দুর হইতে। দাঁড়াও জমিরের বাপ, দাঁড়াও।

বস্তা মাথায় একজন লোক আসিতেছে।

লগি ঠেলিয়া নৌকার মুখটা ঘুরাইয়া দিল মাঝি।

মণ খানেক ওজনের ছালাটা ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া সলিমের পাশেই উঠিয়া বসিল লোকটা।

ছ'ফুট লম্বা, চল্লিশ ইঞ্চি চওড়া বুকওয়ালা, কালো মিশ মিশে লোকটা তখনও বসিয়া হাঁফাইতেছে। তাহার সবল পেশীবহুল শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে থাকিয়া থাকিয়া।

সলিম একবার আড়চোখে তাকাইল তাহার দিকে।

—কি আনলে রহমত ভাই?

নৌকার একজন জিজ্ঞাসা করিল।

—মাশ কলাই।

—তুমি নিজে যে—

—কি আর করি, সাদুকে বলেছিলাম বস্তাটা ঘাটে পৌঁছে দেবার জন্য, বলে কিনা, তিন আনা লাগবে। কুলিরাও দিন পেয়েছে আজকাল।

—তাই বুঝি নিজেই নিয়ে এলে।

—ঐযে বলেনা "আপন চাষে উত্তম ক্ষেতি" সে রকম আর কি। কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম, অন্য কাউকে পেলাম না, ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কাজেই দিলাম ঘাড়ে চাপিয়ে, বেটা মনে করেছিল ঐটুকু বোঝার জন্য তাকে আবার তোয়াজ করতে যাবো।

—সাদুকে আজ তাহলে খুব নাকাল করেছ দেখছি।

—উঁ!

ঘাড়টা কাৎ করিয়া চোখ মুখ বিকৃত করিয়া এমন ভাবে কথাটা উচ্চারণ করিল রহমত, যা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল সবাই।

উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমিয়াছে। হয়তো ঝড় উঠিবে। এতক্ষন খেয়াল হয়নি কারুর। বুড়া নৈমুদ্দি বসিয়াছিল তালুইর ধারে। আকাশের দিকে প্রথমে নজরটা পড়িল তাহারই। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল সে-দেখেছো কি কালো হয়েছে।

সবাই তাকাইয়া দেখিল সেদিকে।

মাঝিকে তাড়া দিল রহমত। একটু তাড়াতাড়ি বাও জমিরের বাপ।

বৈশাখের শেষ।

এরই মধ্যে নতুন পানির আগমনে মেঘনার নতুন রূপ খুলিয়াছে। কুমারী বালিকা প্রথম যৌবন সমাগমে যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, মেঘনার কালো কুচকুচে পানির ছোট ছোট ঢেউগুলিও তেমনি চঞ্চল হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে কোন্ অনির্দ্দিষ্টের পথে।

ঝড় উঠিল।

হুঁ হুঁ করিয়া বাতাস বহিছে সমান গতিতে। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল সবাই।

নদীর রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এরই মধ্যে। বড় বড় ঢেউ গড়াইয়া চলিয়াছে সাপের মত ফণা তুলিয়া।

কোন কোনটা নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেছে তাহাদেরই গায়ের ওপর।

বাতাসের গতিবেগ আরও বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল বৃষ্টি।

আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ওদিকে পাড় আর ভাল করিয়া নজরে পড়েনা। বৃষ্টিতে ভিজিয়া গা মন্ন সপ্ সপ্ করিতেছে। শীত লাগিতেছে সলিমের। আরও একটা ভাবনা আসিয়া ফিরিয়া ধরিল তাহাকে। এই দুর্যোগের রাতে দশ মাইল পথ অতিক্রম করিবে কি করিয়া? রাতের মত আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভিজা কাপড়ে রাত কাটাইবো কি ভাবে? চিন্তিত হইয়া উঠিল সলিম।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বহিয়া গেল। টাল সামলাইতে না পারিয়া নৌকাখানা কাৎ হইয়া ছুটিয়া চলিল বাতাসের অনুকূলে। রহমত পড়িয়া যাইতেছিল, সলিম ধরিয়া ফেলিল তাহাকে।

নৌকা যাইয়া ঠেকিল পাড়ে।

কালো অন্ধকার আরও কালো হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়াছে; কিন্তু বাতাস বহিতেছে ঠিক তেমনি ভাবেই, তবে গতিবেগটা যেন শিথিল হইয়াছে মনে হয়।

জনকয়েক নামিয়া গেল ডানদিকের পথে, রহমত যাইবে সোজা। সলিম আর মাঝি ধরাধরি করিয়া তাহার বস্তাটা তুলিয়া দিল মাথায়। পানিতে ভিজিয়া ওজন বাড়িয়াছে দ্বিগুণ। লইতে একটু কষ্টই হইবে রহমতের। কিন্তু উপায় কি! মুনী চাকরটা ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছে, ফিরিয়া আসিবে কাল সন্ধ্যায়। দুপুর বেলা গরু খাওয়াইতে গিয়া রহমত দেখিল মাশ কলাইয়ের বস্তা খালি। রাগ হইল তাহার। হতভাগা বলিয়া গেলেই পারিত। আজ হাটবার। আবার সেই সোমবারে হাট। আজ না কিনিলে চারটে দিন বাদ পড়িয়া যায় মাঝখানে অথচ মাশকলাই না দিলে দুধ বাড়েনা গরুর। অগত্যা নিজেই বাহির হইল ছালা লইয়া।

এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল রহমত। পাশের বাড়ীর হারুকে আসার সময় বলিয়া আসিয়াছিল এ-পারে থাকিতে;

কিন্তু তাহাকেও দেখা যাইতেছে না। বোধহয় বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই। তবু নাম ধরিয়া দু'তিনবার চীৎকার করিয়া ডাকিল; কিন্তু বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসিল না। নিজের মনেই বিড়বিড় করিতে করিতে চলিতে লাগিল রহমত। সলিম চলিল পিছু পিছু। সড়কের ধারে আসিয়া খেয়াল হইল রহমতের। অপরিচিত লোকটী দু'তিনবার সাহায্য করিয়াছে তাহাকে অথচ কোন খোঁজ খবরই লওয়া হয় নাই তাহার। দাঁড়াইয়া পড়িল রহমত, সলিম কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল যাবে কোথায় ভাই ?

—মজিদ পুর।

নিজের গ্রামের নামটা ইচ্ছা করিয়াই গোপন রাখিয়া পাশের গ্রামের নামটা বলিল সলিম।

—সেকি! সে যে বহু দূর এখান থেকে।

—হ্যাঁ!

মাথা নাড়িয়া সায় দিল সলিম।

—এই জল ঝড়ের রাতে সেখানে যাবে কি করে?

—না গিয়েই বা উপায় কি।

একটু ভাবিয়া লইল রহমত। তারপর বলিল, তার চেয়ে চলো আমার ওখানে রাতটা থেকে সকালে চলে যেও।

অকূলে কূল পাইল সলিম।

—কি বল? পাল্টে প্রশ্ন করিল রহমত।

—বেশ।

—তাহলে এসো।

দু'জনে আগাইয়া চলিল নিঃশব্দে।

শীত করিতেছে। বিড়ি একটা ধরাইতে পারিলে শরীরটা একটু গরম হইবে; কিন্তু ম্যাচ বাহির করিতে যাইয়া নিরাশ হইল সলিম। পানিতে ভিজিয়া কাঠিগুলি খুলিয়া গিয়াছে। রহমতের কাছেও হয়তো ম্যাচ আছে। কিন্তু রহমত খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। নতুন জায়গা আর অন্ধকারের ফলে সলিমের হাঁটিতে একটু অসুবিধাই হইতেছিল। তবু কয়েক পা জোরে জোরে হাঁটিয়াই রহমতকে ধরিয়া ফেলিল সলিম।

—ম্যাচ আছে ?

—আছে। কিন্তু ধরলেই হয়।

—আমারও তো সে অবস্থা।

পকেট হইতে ম্যাচটা বাহির করিয়া দিল রহমত। বিড়ি একটা নিজে ধরাইয়া আরেকটী জ্বালাইয়া দিল রহমতকে।

কয়েক টান মারার পর শরীরটা বেশ চাঙ্গা মনে হইল সলিমের।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল অনেক আগেই; এবার বাতাসও পড়িয়া গেল।

দূরে একটা আলোর শিখা দেখাইয়া রহমত বলিল, ওই আলোটার ডানদিকের বাড়ীটাই আমার।

ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। রাস্তার একটা গর্তে পা পড়িয়া গিয়াছে সলিমের। শব্দটা রহমতের কানেও পৌঁছাইল।

—পড়ে গেলে নাকি ?

—হাঁ।

—একটু সামলে এসো। আরও কয়েকটা গর্ত আছে সামনে।

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। হঠাৎ মাঝখানে জিজ্ঞাসা করিল রহমত, মজিদপুর কার বাড়ী তোমাদের ?

একটা পরিচিত লোকের নাম করিল সলিম।

নাম শুনিয়া চিনিতে পারিল না রহমত। হাসিয়া বলিল, আমার শ্বশুর বাড়ীও তো ওদিকেই।

—কোথায় ?

—সালকিয়া।

চমকিয়া উঠিল সলিম।

—সালকিয়া গ্রামে ?

—হ্যাঁ। জামাল মুন্‌শীর মেয়েকে বিয়ে করেছি আমি।

—জামাল মুন্‌শীর মেয়েকে ?

আরও আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল সলিম।

—কেন, চেন নাকি তাদের ?

—হাঁ, না, নাম শুনেছি তবে।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল সলিম।

আয়েশা—আয়েশাকে তাহলে বিয়ে করেছে রহমত! মনে মনে কথাটাকে আওড়ে নিল সলিম।

বছর তিনেক আগের একটা সূক্ষ্ম পর্দা আপনা আপনিই উঠিয়া গেল সলিমের চোখের সামনে।

মনে পড়িয়া গেল বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা।

আয়েশা তাদেরই গ্রামের মেয়ে। তাহাদের বাড়ী আর আয়েশাদের বাড়ীর ব্যবধান ছিল এপাড়'—ওপাড়া। ছোট বেলায় আয়েশার বাপ জামাল মুন্সীর হাতেই সলিমের প্রথম হাতে খড়ি। তখন তাহার বয়স বারো—আয়েশার সাত। দু'জনেই পাশাপাশি বসিয়া লেখাপড়া করিত।

সলিম যেবার তৃতীয়ভাগ পড়া শুরু করিয়াছে, আয়েশা তখন প্রথম ভাগে প্রমোশন পাইয়াছে।

একদিনের ঘটনা।

দু'জনেই বসিয়া পড়া করিতেছিল। জামাল মুন্সী তক্তপোষটায় বসিয়া নিজের ফতুয়াখানা সেলাই করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে ঘুমে তাহার দুই চক্ষু বুজিয়া আসিলে

কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া তাহাদের পড়া করিতে বলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

পড়িতে পড়িতে সোনাবানদের বাগানে গতকাল দেখা পাকা আমগুলির কথা মনে পড়িল সলিমের। সলিম বই বন্ধ করিয়া তাকাইল আয়েশার দিকে। আয়েশা চোখ টিপিয়া ইশারা করিল, চল পালাই।

মুন্সী সাহেব তখন অঘোরে ঘুমাইতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া নাক তাঁহার ডাকিতেছে। ঘণ্টা দু'য়ের আগে ঘুম ভাঙ্গিবার আশঙ্কা নাই জানিয়া চুপি চুপি পা টিপিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল তাহারা। তারপর সোজা হাজির হইল গাছতলায়। ইত্যবসরে তাদেরই সমবয়সী আরও দু'য়েকজন জুটিয়াছে। দেরী করিলে লোকসানের ভাগী হইতে হইবে, তাই আয়েশাকে নীচে রাখিয়া গাছে উঠিয়া গেল সলিম।

ঘুমটা হয়তো দু'ঘণ্টার আগে ভাঙ্গিত না মুন্সী সাহেবের। কিন্তু কালুর বাপের ডাকাডাকিতে জাগিয়া গেলেন মুন্সী সাহেব।

কালুর বাপ কর্জ্জ নেওয়া টাকাগুলি মুন্সী সাহেবের হাতে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেই ওপাশের দিকে নজর পড়িল তাহার। বইগুলি বন্ধ পড়িয়া আছে; কিন্তু মালিকদের পাত্তা নাই। মুন্সী সাহেব চটিখানা পায়ে দিয়া তাহাদেরই খোঁজে বাহির হইতেছিলেন এমন সময় সোনাবানের মা আসিয়া হাজির। হাতে তাহার কতকগুলো কাঁচা পাকা আম। মুন্সী সাহেবের সামনে সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া আয়েশা আর সলিমের মিলিত আজকের দুষ্কর্ম্মের কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া গেল।

শুনিয়া মুন্সী সাহেব রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাহাদের হাতের কাছে পাইলে হয়তো একটা কিছু অঘটন করিয়া বসিতেন। কিন্তু বহুক্ষণ তাহাদের নাগাল পাওয়া গেলনা। আয়েশা ফিরিয়া আসিল ঘণ্টাখানেক পরে। সলিম তখন পালাইয়াছে।

আয়েশাকে তিনি বলিলেন না কিছুই, সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল সলিমের ওপর। পরদিন সলিমকে হাতের কাছে পাইয়া ছড়িগাছটা গুড়া গুড়া করিলেন।

বাপের সামনে সেদিন কিছুই বলে নাই আয়েশা; কিন্তু পরের দিন সলিমকে ধরিয়া খুবই কাঁদিয়াছিল সে, আদর করিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছিল। চুরি করিয়া নারিকেল তেল আনিয়া লাগাইয়া দিয়াছিল সলিমের পিঠের কালসিরে দাগ গুলির উপর। বলিয়াছিল, খুব লেগেছে বুঝি ?

সলিম হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, না। ও কিছু না, দু'দিনেই সেরে যাবে। তুই ভাবিসনে কিছু।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

সলিম মাইনর পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল। মুন্সী সাহেব পরামর্শ দিলেন হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্যে। এমন কি শহরে যাইয়া নিজেই সবকিছু ঠিক করিয়া দিয়া আসিলেন।

আয়েশা ইতিমধ্যেই বেশ বড় হইয়াছে। অন্ততঃ বুঝিতে শিখিয়াছে সব কিছু। সলিমের রওয়ানা হইবার দিন-তারিখ ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল আয়েশা বাড়ীতে নাই। মনটা তাহার দমিয়া গেল খানিকটা, বিষন্ন মুখেই বাড়ী ফিরিতেছিল। হঠাৎ ঘরের পেছন দিককার কাঁঠাল গাছের আড়াল হইতে ডাক শোনা গেল,—সলিম ভাই!

আয়েশা দাঁড়াইয়া আছে চিন্তিত মুখে।

সেদিনও তাহাকে ধরিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়াছিল আয়েশা। বলিয়াছিল, তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। তুমি না থাকলে যে আমার মোটেই ভাল লাগবেনা।

—আচ্ছা।

তারপর আরও দুইটী বছর কাটিয়া গিয়াছে। এর মাঝে কয়েক বারই দেখা হইয়াছে আয়েশার সঙ্গে। আলাপও হইয়াছে। কিন্তু আগের মত মন খুলিয়া আলাপ করা হইয়া উঠে নাই। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে লজ্জার একটা সুক্ষ্ম আবরণ ঘিরিয়া ধরিয়াছিল তাহাদের উভয়কেই। তাছাড়া লোকচক্ষুর সজাগ দৃষ্টিও বাধাস্বরূপ পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের অবাধ মেলামেশার মাঝখানে। তখন বাইরের আলাপ চলিত সকলের সামনেই; কিন্তু মনের আদান-প্রদান হইত চোখের ভাষায়, হাতের ইশারায়। কখনো কাগজে কলমের বিনিময়ে।

ক্লাস নাইনে পড়াকালীনই শহরে থাকিয়া খবর পাইল সলিম—মুন্সী সাহেব মারা গিয়াছেন। হাঁপানী রোগটা আগে হইতেই ছিল; ইদানিং সেটা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। শেষ বয়সে এই রোগেই কাল হইল তাহার।

শুনিয়া দুঃখ করিয়াছিল সলিম। কিন্তু বাড়ী যাইবার উপায় ছিল না, কারণ সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। পরে অবশ্য চিঠি লিখিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিল আয়েশাকে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে সকাল বেলায়ই বাড়ী পৌঁছিল সলিম। মা বসিয়াছিলেন বাইরের বারান্দায়, তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—এসেছিস বাবা, আয়। কালকেই তোর চিঠি পেয়েছি।

সলিম যাইয়া কদমবুছি করিয়া বসিয়া পড়িল মায়ের পাশেই।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের জন্য তোর মন কেমন করতো, নারে ?

—হাঁ।

মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল সলিম।

অনেক কথাই আলোচনা হইল মায়ের সঙ্গে। কিন্তু আয়েশাদের কথা কিছুই বলিলেন না মা। সলিমের মনে হইল কথাটা জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু কেমন যেন লজ্জা বোধ হইল তাহার। অথচ খবরটা জানিবার জন্য ভেতরে ভেতরে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল সে।

—মুখ হাত ধুয়ে নে, আমি খাবার বের কর্‌ছি। বলতে বলতে মা উঠিয়া গেলেন ঘরের ভেতরে। সলিমের ইচ্ছা হইল এখুনি একবার ছুটিয়া গিয়া খবরটা লইয়া আসে আয়শাদের কিন্তু মা ওদিকে খাইতে বলিয়া গিয়াছেন। মনের বিরুদ্ধেই এক রকম জোর করিয়া বারান্দা হইতে বদনাটা তুলিয়া লইয়া হাত মুখ ধুইতে উঠানের দিকে নামিয়া গেল সলিম।

বিকেল বেলা কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল সলিম। তাড়াতাড়ি পার হইয়া আসিল এ-অংশটুকু।

আয়েশাদের দরজাটা খোলা। উঠানেও কাউকে দেখা যাইতেছেনা। একটু ইতস্তত করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল সলিম। আয়েশা ঘরে বসিয়া রান্নার আয়োজন করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—একি, সলিম ভাই তুমি!

—কেন বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

—বিশ্বাস হবে না কেন? তবে কোন খবর-টবর না দিয়ে এলে কিনা, তাই বলছি।

—আমার আসাটা পছন্দ হলো না বুঝি?

—আমি কি তাই বলেছি, তুমি মিছেমিছি খোঁচা দিতে পার মানুষকে।

অভিমানে ভারী হইয়া আসিল আয়েশার কণ্ঠস্বর। তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল সলিম। আয়েশাও সে হাসিতে যোগ দিল।

—খালা কোথায়?

—এই মাত্র কোথায় যেন গেল।

—ভালই হলো, দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাবে। কিন্তু কই, আমাকে তো বসতেও বললেনা।

—ইস্‌, নতুন লোক কিনা? উনাকে আবার পান পিঁড়ি এনে দিয়ে খাতির করে বসাতে হবে!

—বসাবে বৈকি! আমি যে নতুনের চেয়েও বেশী।

হঠাৎ মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল আয়েশার। কিন্তু সলিম সেটা লক্ষ্য করিল না, পুনরায় হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল চৌকিটার ওপর। পাশেই আলমারীর উপর ঢাকা দেওয়া বাসনটার প্রতি নজর পড়িল তাহার। এটা কি আমার জন্যে নাকি? বলিতে বলিতে ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিল সলিম। কয়েক রকমের মিষ্টি রহিয়াছে তাহাতে। মুখের ভেতর ফেলিয়া দিল সলিম। আয়েশা এতক্ষণ নতমুখেই বসিয়াছিল, এবার মাথা তুলিয়া চাহিল। চোখ তাহার সজল হইয়া উঠিয়াছে তবু নিজেকে যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া বলিল,—একটাই খেলে আরও খাওনা। এ যে আমার বিয়ের মিষ্টি। কাল যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। দেখেছো কথাটা তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি।

সঙ্গে সঙ্গে সলিমের মনে হইল, মিষ্টিটা তাহার গলার মাঝপথে যেন আটকাইয়া গিয়াছে। সেটাকে আঙুল দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিলেই সে যেন বাঁচিয়া যায়। তবু একবার চেষ্টা করিল কাশিবার জন্য, তারপর গলা ঝাড়ার শব্দ করিতে করিতে উঠিয়া আসিল বাহিরে।

আয়েশা চাহিয়া রহিল তাহার গমন পথের দিকে। একটি কথাও বাহির হইল না তাহার মুখ দিয়া। কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে সে।

মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল আয়েশার। দৌড়াইয়া যাইয়া জানালা খুলিয়া ডাকিল, সলিম ভাই!

সলিম তভক্ষণে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। তাহার ডাক সলিমের কানে পৌঁছিল কিনা, কে জানে! ধীরে ধীরে গ্রামের শেষ প্রান্তে সলিমের চলমান দেহখানা মিলাইয়া গেলে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল আয়েশা।

এ-শহর ও-শহর করিয়া বহু জায়গাই ঘুরিয়া বেড়াইল সলিম—তারপর হাজির হইল ময়মনসিংহে।

দিন কয়েক চেষ্টার পর একটা কারখানায় কাজও জুটিয়া গেল তাহার। থাকার ব্যবস্থা কারখানার সুপার ভাইজার আফতাব মিয়াই করিয়া দিলেন তাহার নিজের বাড়ীতে।

জায়গাটা শহরের উপকণ্ঠেই, বেশ নিভৃত অঞ্চল। হৈ হল্লার বালাই নেই, অথচ শহরও একেবারে কাছে। হাঁটিয়া গেলে মাত্র ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে সেখানে পৌঁছান যায়। অবসর সময়ে দিনের বেলায় গাছতলায় বসিয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কবিত্ব করার প্রেরণা পাওয়া যায় ঢের, সন্ধ্যা শেষে শীতল স্নিগ্ধ মুক্ত হাওয়ায় কচি ঘাসের বুকে মাথা রাখিয়া নীল আকাশের গায়ে ফুটে থাকা হাজারো হাজারো তারা গুনিয়া রাত কাটানো চলে। কিন্তু এ-সব করার অবসর কোথায় সলিমের। পেটে যার ভাত নাই, মনে যার শান্তি নাই, কবিত্ব করা তাহার ধাতে পোষায় না. বরং হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া দু'বেলা অন্নের সংস্থান করিবার ফিকির খুঁজিতে হয়।

রবিবার ছুটির দিন।

সেদিন পুঁথি পড়িয়া, পাড়া-পড়শীদের সাথে গল্প

করিয়া, না হয় সারাদিন বিছানায় শুইয়া দিন কাটে সলিমের।

বহু আগেই এ-জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া যাইত সলিম। কিন্তু আফতাব মিয়ার স্ত্রী সলিমন বিবি তাহাকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করিতেন, কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন কখনো কখনো মাথায় হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিতেন। আর সে-জন্যেই বোধহয় মায়ের অভাবটা তাহার মনকে বিশেষ নাড়া দিত না! এ-কারণেই এতদিন সে টিকিয়া রহিল। টিকিবার আরও একটা কারণ ছিল, সে হইলো কামরুন। আফতাব মিয়ার মেয়ে। এই ক্ষীণাঙ্গ শ্যামলী মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিত। ছোট বেলায়ই কামরুনের বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু বয়স্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্বামী তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে সে কথা আজও কেউ জানেনা। কামরুনের রূপ ছিল না; কিন্তু গুণ ছিল ঢের আর সে-জন্যেই হয়তো মানুষকে আপন করিয়া নিতে পারিত অতি সহজেই। সলিমকেও সে আপন করিয়া নিয়াছিল প্রথম দিন থেকেই। কাজ সারিয়া সে যেদিন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিত সেদিন কামরুণ তাহাকে ধরিয়া বসিত গল্প করিবার জন্যে। তখন সে বিরক্ত না হইয়া বরং খুশী মনেই গল্প শুরু করিত। দেশ-বিদেশের গল্প, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আরও অনেক কিছু। আর কামরুন নিতান্ত সমঝদার শ্রোতার মত পাশে বসিয়া শুনিয়া যাইত।

এমনি ভাবেই দিন কাটিতেছিল।

হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

সেদিন ছিল সোমবার।

একটু দেরী করিয়াই বাড়ী ফিরিল সলিম। আফতাব মিয়া ছুটি নিয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। আর সলিমকে বলিয়া দিয়াছিলেন তাহার অবর্ত্তমানে কাজগুলি দেখা শোনা করার জন্য। সেগুলি শেষ করিয়া সলিম যখন বাড়ী ফিরিল রাত তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। পথের মধ্যে এক বন্ধুর বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া না খাইয়াই শুইয়া পড়িল সলিম। কামরুন আসিয়া কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও তুলিতে পারিল না সলিমকে।

শেষ রাতে হঠাৎ একটা চাপা গোঙানীর শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তাহার। কান দুইটা সজাগ করিয়া উঠিয়া বসিল সে। মনে হইল, পাশের ঘর হইতেই আওয়াজটা আসিতেছে। মুহূর্তে মনে পড়িয়া গেল, পাশের ঘরটাই কামরুনের থাকিবার ঘর। একটা কিছু হইয়াছে মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সলিম। বিছানার তলা হইতে টর্চ্চ আর মাথার কাছে হেলান নেওয়া লাঠিটা টানিয়া লইয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময় কামরুণের মিনতি পূর্ণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—তুমি এমন করে আমার সর্ব্বনাশ করোনা সামাদ, তোমার পায়ে পড়ি তুমি চলে যাও এখান থেকে। যাও, দেরী করোনা, কেউ হয়তো দেখে ফেলবে। তা'হলে কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না আমি।

সাথে সাথে একটা চাপা গর্জ্জন ভাসিয়া আসিল, না।

এবার যেন ক্ষেপিয়া উঠিল কামরুন,—যাও বলছি, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। নইলে চীৎকার করে সবাইকে ডেকে তুলবো আমি।

—তাহলে সকাল বেলা তোমার কলঙ্কের মিথ্যা কাহিনী আমিও সবার কাছে রটিয়ে দেব।

প্রথম হইতেই সলিমকে এ-বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শের কারণ ও কামরুণের সাথে সামাদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে ধরা পড়িল সলিমের কাছে।

হঠাৎ যেন খুন চাপিয়া গেল তাহার মাথায়। মনে হইল, তাহার আয়েশাকে কেউ যেন ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িল সলিম।

পদশব্দ পাইয়া সামাদও পলায়ন করিতেছিল; কিন্তু পড়িয়া গেল একেবারে সলিমের মুখোমুখি।

সলিম তৈরীই ছিল, কাছে পাইয়া কয়েক ঘা বসাইয়া দিল সামাদের মাথায়। একটা আর্ত্ত চীৎকার রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ছড়াইয়া পড়িল চারিদিকে। আওয়াজ শুনিয়া লোকজন ছুটিয়া আসিল। হারিকেনের আলোতে দেখা গেল সামাদের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে পড়িয়া আছে। স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল সলিম। হঠাৎ কামরুনের চীৎকার তাঁহার কানে পৌঁছিল,—পালাও সলিম ভাই। সলিম ভাই পালাও।

—এদিক দিয়ে এসো।

সলিমের চিন্তাশক্তি ছিন্ন করিয়া বলিয়া উঠিল রহমত।

—ও হ্যাঁ।

হঠাৎ যেন সচকিত হইল সলিম।

রহমতের বাড়ীর দোরগোড়ায় পৌঁছিয়া খেয়াল হইল তাহার, এটা যে আয়েশার স্বামীর বাড়ী। এখানে সে রাত কাটাইবে কি করিয়া! যাহাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে সেখানে আবার আশ্রয় লইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইল সলিমের। তাই রহমতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমার তো এখানে থাকা চলে না।

—কেন?

—রাতের মধ্যেই আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

অবাক হইয়া তাকাইল রহমত। লোকটার মাথা

খারাপ নাকি? সারাপথ সঙ্গে আনিয়া এখন বলে কিনা বাড়ী যাবে। পাগল ছাড়া এমন কথা কে বলিবে। কিন্তু এই অল্পক্ষণের পরিচয়ের মাঝে সে রকম লক্ষণ তো নজরে পড়ে নাই তাহার। হয়তো পরের বাড়ীতে থাকিতে হইবে, এ-কথা চিন্তা করিয়াই থাকিতে অস্বীকার করিতেছে।

কথাগুলো মনে মনে আওড়ে নিল রহমত।

তবুও একবার প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—দেখেছো আবার বৃষ্টি আসবে। তাছাড়া এই ক্ষেত পাথার ভেঙ্গে অন্ধকারে যাবেই বা কি করে? পথে-ঘাটে সাপটাপও তো থাকতে পারে।

মাথা তুলিয়া তাকাইল সলিম। সত্যিই তো আকাশটা আবার কালো হইয়া উঠিয়াছে। টুকরো টুকরো মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে উত্তরের দিকে। এ-ছাড়া পথ ঘাটের কথাটা এতক্ষণ চিন্তাই হয়নি তাহার। এবারে যেন মনে মনে ভয় পাইল সলিম। পেটেও ক্ষুধা লাগিয়াছে বড় জোর। সেই সকালে দু'আনার মুড়ি খাইয়াছিল, আর এখনও পেটে কিছু পড়ে নাই। নানা কথা চিন্তা করিয়া মত পরিবর্তন করিল সলিম। তবুও একবার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, আমার মত একজন অপরিচিতকে বাড়ীতে জায়গা দেবেন?

—দেবার জন্যেই তো এনেছিলাম। এখন আর সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। এসো।

আয়েশা বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াইয়া বাতি জ্বালিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। রহমতের সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিল।

—এতো দেরী হলো যে।

আরও হয়তো কিছু বলিত আয়েশা; কিন্তু আরেকজন অপরিচিতকে রহমতের সঙ্গে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজাইয়া দিল।

ভাত খাওয়ার সময় বেড়ার ফাঁকে সলিমের দিকে নজর পড়তেই চমকিয়া উঠিল আয়েশা। একি, সলিম ভাই এখানে? এই জল ঝড়ের রাতে? চোখ দুইটাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না সে। মনের ভুলটাকে দূর করার জন্যে আরেকবার তাকাইয়া দেখিল।

সলিম খাওয়া সারিয়া হাত ধোয়ার জন্য ঘুরিয়া বসিয়াছে। হারিকেনের স্পষ্ট আলো সলিমের চেহারার একাংশে পড়িয়া চক্‌ চক্‌ করিতেছে। এক গাল দাড়ি গোঁফের মাঝে কয়েক বছর আগে দেখা সলিমকে খুঁজিয়া লইতে দেরী হইল না আয়েশার

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কোথা হইতে কেমন করিয়া সে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা কোনদিন চিন্তাও করে নাই। কিন্তু আয়েশা কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে? বোধ হয় না। যা চেহারা হইয়াছে তাহার। চিনিলে নিশ্চয়ই সে দেখা দিত। যোগ জিজ্ঞাসা করিত। কিম্বা আয়েশা হয়তো তাহাকে লক্ষ্যই করে নাই।

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল সলিম।

সারারাত ঘুম হইল না আয়েশার। এ-পাশ ওপাশ করিয়া কাটাইয়া দিল। রহমত না থাকিলে এখুনি গিয়া দেখা দিয়া আসিত সলিমের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করিত, কোথায় ছিলে এতদিন, বাড়ী গিয়াছে কিনা? মা কেমন আছে, খালার খবর কি? অনেকগুলি কথা এক সঙ্গে মনে হওয়াতে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল আয়েশা। উঃ, কতকাল দেখা হয় নাই সলিমের সঙ্গে, বেচারায় কি চেহারা হইয়াছে, হয়তো অসুখ-বিসুখ ছিল, কিম্বা হয়তো তাহার চিন্তাতেই এমন হইয়া গিয়াছে।

সলিমের প্রতি একটা মমত্ববোধে আয়েশার মনটা গলিয়া গেল।

সারা রাত ঘুম হইল না সলিমেরও। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল সমস্ত কথা। এক সময়ে সে উঠিয়া বসিল বিছানার উপর, পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইয়া লইয়া ভাবিতে বসিল, একি ভুল সে করিয়া বসিল। কেন সে এখানে থাকিয়া গেল, আয়েশা যদি সত্যিই তাহাকে চিনিয়া থাকে তাহা হইলে হয়তো আবার কোন কাণ্ড করিয়া বসিবে। নিজে তো শেষ হইয়াছে। আবার আয়েশার গোছানো সংসারে আগুন ধরাইতে আসিয়াছে।

না, না, আয়েশা সুখে থাক, শান্তিতে থাক। তাতেও যে তার সুখ।

বিড়বিড় করিয়া আপন মনেই বকিয়া চলিল সলিম।

খুব ভোরেই আয়েশা রহমতকে পাঠাইয়া দিল মাছ আনিতে। জেলে পাড়া বেশী দূর নয়. তবু রহমতের ফিরিতে আধ ঘণ্টার কম লাগিবে না ভাবিয়া উঠিয়া আসিল আয়েশা। অনেক দিন পরে প্রাণ ভরিয়া আলাপ করা যাইবে সলিম ভাইয়ের সাথে। সলিম ভাই হয়তো তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্যই হইবে। এমনি অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে বন্ধ দরজাটা ঠেলিয়া দিল ভেতরের দিকে। একটা ক্যাচ শব্দ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল।

খালি বিছানাটা আয়েশার চোখের সামনে পড়িয়া আছে। সমস্ত দৃষ্টি মেলিয়া আয়েশা আরেকবার তাকাইল শূন্য ঘরটার দিকে। তার হৃদয়ের শূন্যতার সঙ্গে তাল মিলাইয়া ঘরের শূন্যতাও যেন এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল

ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

দস্যু কবলে

মুলতান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা এসে পৌঁছি আবুহার নামক শহরে। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে ঐটিই আমাদের প্রথম শহর। এ-শহরের পরেই এক দিনের পথব্যাপী বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। সমতল ভূমির শেষপ্রান্তে দুরধিগম্য পর্ব্বতশ্রেণী—হিন্দু বিধর্ম্মীদের বাস স্থান। তাদের অনেকে মুসলমান শাসনাধীনে রায়ত। শাসনকর্তার নিযুক্ত একজন মুসলিম সর্দারের অধীনস্থ গ্রামে তারা বাস করে। আর অবশিষ্ট সবাই বিদ্রোহী এবং যোদ্ধা। পার্ব্বত্য দুর্গে বসবাস করে এবং লুটতরাজের জন্যে দলবেঁধে বেরিয়ে আসে। এ-পথে আসতেই আমা-দের সঙ্গে একদল দস্যুর সাক্ষাৎ হয়। ভারতবর্ষে আমার সঙ্গে দস্যুর সংঘর্ষ এই প্রথম। আমাদের প্রধান দলটি আবুহার ত্যাগ করে এসেছিল খুব ভোরে। আমি আমার ক্ষুদ্র দলবল নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম মধ্যাহ্ন অবধি। আরবী, পারশী ও তুর্কি মিলিয়ে আমাদের দলে ছিলাম মোট বাইশ জন ঘোড়-সওয়ার। সমতল ভূমিতে পৌঁছতেই আশি জন বিধর্ম্মী এসে আমাদের আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিল ঘোড় সওয়ার। আমার সঙ্গীরা সবাই ছিল সাহসী এবং সুদক্ষ। যুদ্ধে বিপক্ষের একজন ঘোড় সওয়ার এবং বার জন পদাতিক মারা গেল। শত্রু পক্ষের একটি তীরে আমি এবং অপর একটি তীরে আমার ঘোড়াটি আহত হয়ে পড়ল। খোদা আমাকে রক্ষা করলেন,—তাদের তীরগুলো মোটেই দ্রুতগামী ছিল না। আমাদের দলের আরও একজনের ঘোড়া আহত হয়েছিল। শত্রুদের যে ঘোড়াটা আমরা ধরেছিলাম সেটাই তাকে দেওয়া হলো। আহত ঘোড়াটা হত্যা করে আমাদের দলের তুর্কীদের দেওয়া হলো খেতে। মৃত বিধর্ম্মীদের মাথাগুলো কেটে নিয়ে আমরা আবুবকরের প্রাসাদে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। মাথাগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

সতীদাহের দৃশ্য

দু'দিন পরে আমরা হাজির হলাম আজুদাহান (পাক্‌পত্তন) শহরে। ছোট এই শহরটির মালিক ধর্মপ্রাণ শেখ ফরিদউদ্দীন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁবুতে ফিরছিলাম, দেখতে পেলাম আশেপাশের লোকজন সবাই ছুটাছুটি করে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দলেরও অনেকে তাহার মধ্যে আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, একজন হিন্দু কাফেরের মৃতদেহ দাহ করবার আয়োজন হয়েছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকেও সেই সঙ্গে দাহ করা হবে। দাহকার্য্যের পর আমার সঙ্গীরা এসে বলল, এই হিন্দু নারী শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত মৃতদেহটি আলিঙ্গন করেইছিল।

এ-ঘটনার পর প্রায়ই দেখেছি মূল্যবান পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে চলেছে ঘোড়-সওয়ার হিন্দুনারী। তার পশ্চাতে থাকে অনুসারী দল; সম্মুখে বাজ্‌তে থাকে দামামা ও জয়ঢাক। তার সঙ্গে থাকে ব্রাহ্মণগণ। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। সুলতানের রাজত্বে হিন্দুদের সতীদাহের জন্য সুলতানের অনুমতি চাইতে হয় এবং চাইলেই তাঁর অনুমতি পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে স্ত্রীকে দাহ করা হিন্দুদের পক্ষে একটি প্রশংসনীয় কাজ; কিন্তু অবশ্য কর্তব্য নয়। কোনো পরিবারে সতীদাহ হলেই সে পরিবারের সম্মান বেড়ে যায় এবং সতীত্বেরও প্রশংসা হয়। কোনো বিধবা সহমরণে সম্মত না-হলে তাকে মোটা কাপড় পরাতে হয়, এবং আত্মীয় পরিজনের মধ্যে থেকেই বিষাদময় জীবন যাপন করতে হয়; কিন্তু কেউ সহমরণে বাধ্য করতে পারে না।

একবার আমজরি (ধর এর নিকটবর্ত্তী আমঝেরা) শহরে আমি তিনজন বিধবাকে দেখেছিলাম। তাঁদের তিনজনেরই স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং তারা সহমরণে স্বীকৃত হয়েছে। মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে এবং গন্ধদ্রব্য মেখে তারা এক একটী ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে। প্রতিজনের ডান হাতে একটী নারকেল, বাঁ হাতে মুখ দেখবার আর্শি। তাদের ঘিরে চলেছে ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনের দল। আগে আগে চলেছে জয়ঢাক, দামামা আর শিঙ্গা বাদকের দল। সঙ্গের বিধর্ম্মীরা প্রত্যেকেই বিধবাদের মারফত স্ব স্ব মৃত পিতা, মাতা বা বন্ধুর কাছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের অনুরোধ জানাচ্ছে। বিধবারাও মৃদু হেসে সম্মতি জানাচ্ছে। সতীদাহ কি ভাবে করা হয় দেখবার জন্যে সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। তিন মাইল পথ গিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম একটা অন্ধকার জায়গায়। জায়গাটা সেঁতসেঁতে এবং ঝাকড়াগাছে পূর্ণ। তার মধ্যে রয়েছে চারিটি বেদী। বেদীর ওপর একটি করে পাথরের

মূর্ত্তি। বেদীগুলোর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। গাছের নিবিড় ছায়ায় জলাশয়টি এভাবে ঢেকে আছে যে, সূর্য্যের আলো সেখানে কখনও প্রবেশ করতে পারে না। জায়গাটা মনে হয় নরকের মত—খোদা আমাদের সে নরক থেকে রক্ষা করুন।

সেখানে গিয়েই জলাশয়ে নেমে বিধবারা তাদের কাপড় জামা ও গহনা খুলে ফেল্‌ল। সেগুলো সবই ভিক্ষাস্বরূপ দান করা হলো। তারপর তাদের প্রত্যেককে একখানা করে মোটা কাপড় দেওয়া হলো। তারই এক অংশ কোমরে জড়িয়ে বাকি অংশে তারা মাথা কাঁধ ঢাক্‌লো। জলাশয়ের কাছে নীচু জায়গায় আগুন জ্বালা হয়েছে। আগুনের শিখা যাতে বেড়ে ওঠে সেজন্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে তিলের তেল। জন পনর লোক দাঁড়িয়ে আছে সরু কাঠ নিয়ে আর জন দশেক রয়েছে কাঠের মোটা মোটা টুকরো নিয়ে। জয়ঢাক ও দামামা বাজনা ওয়ালারা বিধবাদের আসবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আগুন দেখে যাতে বিধবারা ভয় না পায় সেজন্যে কয়েকজনে কম্বল ধরে আগুন ঢেকে রেখেছে। বিধবাদের একজনকে দেখলাম, এসে তাদের হাত থেকে কম্বলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর বলে উঠল, আগুন দেখিয়ে আমাকে ভয় পাওয়াবে? এ যে আগুন তা আমি জানি। আমাকে ছেড়ে দাও। এই বলে সে জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে আগুনকে নমস্কার করে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে জয়ঢাক, দামামা আর সিঙ্গা বেজে উঠল। প্রথমে সরু কাঠগুলো নিক্ষেপ করা হলো অতঃপর বিধবা নারী যাতে না নড়তে পারে সেজন্যে মোটা কাঠগুলো তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। সবাই ভীষণ সোরগোল করে উঠ্‌ল। আমার সঙ্গীরা যদি তাড়াতাড়ি করে পানি এনে আমার মুখে ছিটিয়ে না দিতো তাহলে আমি ঘোড়া থেকে পড়েই যেতাম। এরপরই সেখান থেকে চলে এলাম।

গঙ্গানদীতে ডুবে আত্মাহুতি দেবার প্রথাও ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে। গঙ্গানদীতে হিন্দুরা তীর্থস্নানে যায় এবং চিতাভস্ম নিক্ষেপ করে। তারা বলে থাকে, গঙ্গা স্বর্গের নদী। গঙ্গায় ডুবে যারা আত্মাহুতি দিতে যায় তারা বলে যে, কোনো পার্থিব কারণে তারা ডুবে মরছে না, ডুবে মরছে কুসাই (গোঁসাই) এর সান্নিধ্য লাভের জন্যে। তাদের ভাষায় গোঁসাই ঈশ্বরের নাম। গঙ্গায় ডুবে যারা মরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে দাহ করা হয় এবং দেহাবশেষ পুনরায় গঙ্গায়ই নিক্ষেপ করা হয়।

মাসুদাবাদ

এবার আমাদের পূর্ব্বের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আজুদাহান থেকে রওয়ানা হয়ে চার দিন চলার পর আমরা এসে হাজির হলাম সারাসাতি (সারসুতি বা সিরসা) শহরে। এখানে উৎকৃষ্ট ধরণের একপ্রকার চাউল পাওয়া যায়। সে চাউল রাজধানী দিল্লীতে রপ্তানী হয়। এ-শহরের রাজস্বের আয় খুব বেশী; কিন্তু আয়ের সঠিক পরিমাণ কত তা আমার স্মরণ নেই। সেখান থেকে আমরা যাই হান্‌সিতে। হান্‌সি সুন্দর ভাবে তৈরী জনবহুল একটী চমৎকার শহর। শহরটী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দু'দিন পরে হান্‌সি থেকে আমরা এসে হাজির হলাম মাসুদাবাদে। মাসুদাবাদ দিল্লী থেকে দশ দিনের পথ। সেখানে আমরা তিন দিন কাটাই। সুলতান সে সময় রাজধানীর বাইরে কনৌজে ছিলেন। কনৌজ দিল্লী থেকে দশ দিনের পথ। সুলতানের উজির এবং বেগমমাতা তখন রাজধানীতে হাজির ছিলেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে উজির কয়েকজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী পাঠিয়েছিলেন। দূতের সাহায্যে পত্র দিয়ে সুলতানকে তিনি আমাদের আগমন সংবাদও পাঠিয়েছিলেন। মাসুদাবাদে আমরা যে তিনদিন কাটালাম তারই মধ্যে সুলতানের জবাব এসে হাজির হল। কাজী, চিকিৎসক, শেখ আর আমীরদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অতঃপর আমরা মাসুদাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে পালাম নামক একটী গ্রামের কাছে এসে বিশ্রাম করলাম। পরের দিন পৌঁছলাম দিল্লীতে।

দিল্লী

ভারতের প্রধান নগর দিল্লী যেমনি বিশাল, তেমনি ঐশ্বর্য্যশালী। শক্তি ও সৌন্দর্য্যের চমৎকার সমন্বয়। দিল্লী নগর যেরূপ প্রাচীরে ঘেরা, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। শুধু ভারতেরই নয়—সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যের বৃহত্তম নগর দিল্লী।

দিল্লী নগর আশেপাশের চারটি শহর নিয়ে গঠিত। প্রথমটি হিন্দু বিধর্ম্মীদের তৈরী খাঁটী দিল্লী। এ-শহরটি মুসলমানের দখলে আসে ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় শহরটির নাম সিরি। সিরি খলিফার বাসস্থানরূপেও পরিচিত ছিল. আব্বাসীয় বংশের খলিফা মুস্তানসিরের পৌত্র গিয়াসউদ্দিনকে সুলতান এ-শহরটি দান করেছিলেন। তৃতীয় শহরটির নাম তোগলকাবাদ। বর্ত্তমান সুলতানের পিতা সুলতান তোগলক এ-শহরের নির্ম্মাণকর্ত্তা। শহরটি নির্ম্মাণের একটি বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক সুলতান মোহাম্মদ তোগলককে একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ঠিক এ-জায়গাটিতে একটি শহর

তৈরী করতে। সুলতান তোগলককে সেদিন পরিহাস করে বলেছিলেন, তুমি যখন সুলতান হবে তখন এখানে শহর তৈরী করো। খোদার ইচ্ছায় কালক্রমে তিনি সুলতান হলেন এবং এখানে সত্যই একটি শহর নির্ম্মাণ করে নিজের নামে তার নামকরণ করলেন। চতুর্থ শহরটির নাম জাহানপানা। বর্তমান সুলতানের বাসস্থান স্বরূপ এটি পৃথক করা। তিনিই এ-শহরটি নির্ম্মাণ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি প্রাচীর দিয়ে তিনি শহর চারিটি একত্র ঘিরে ফেলবেন। এ-প্রাচীরের কিছুটা তৈরী হলে তার বিপুল ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করে তিনি সে কাজ ত্যাগ করেন।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ মসজিদটি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তৈরী। মসজিদের দেয়াল, ছাদ ও মেঝে সাদা মার্ব্বেলের তৈরী। সুন্দরভাবে চৌকোণ ক'রে কাটা পাথরগুলো সীসা দিয়ে আঁটা। মসজিদের কোথাও কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। এবং তেরটি গুম্বুজ, সবই পাথরের তৈরী। মিম্বরটিও পাথরের তৈরী। মসজিদের মধ্যস্থানে বিস্ময়কর একটি মিনার। মিনারটি কি ধাতুর তৈরী কেউ তা বলতে পারে না। এখানকার একজন বিদ্বান ব্যক্তি বলেছেন মসজিদের মিনারটী 'হাফ্‌ত কুশ' বা সপ্ত ধাতুর মিশ্রণে প্রস্তুত। মিনারের এক আঙ্গুল চওড়া একটি অংশ পালিশ করা হয়েছে। সে অংশটি বেশ চকচকে। লোহা এর উপর কোন দাগ কাটে না। মিনারটি ত্রিশ হাত লম্বা। পূব দিকের প্রবেশ দ্বারে পাথরের উপরে দু'টি পিতলের মূর্ত্তি ফেলে রাখা হয়েছে। যে-কেউ মসজিদে ঢুকতে বা বেরিয়ে যেতে মূর্ত্তিগুলির উপর পা দিয়ে যায়। পূর্ব্বে এ-স্থানটিতে একটি দেব-মন্দির ছিল। পরে দিল্লী মুসলমান অধিকারে এলে এটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়। মসজিদের উত্তরাংশে মিনার। এর সঙ্গে তুলনা হয় এমন একটি মিনারও ইসলাম জগতে আর নেই। সুউচ্চ এ-মিনারটি লাল পাথরের তৈরী এবং কারুকার্য্যময় লিপি-শোভিত। মিনারের মাথার গোলকটি উজ্জ্বল শ্বেত পাথরের তৈরী এবং উপরের ছোট গোলক গুলো স্বর্ণ-নির্ম্মিত। উপরে উঠবার সিঁড়িটি এত প্রশস্ত যে, একটি হাতী উপরে উঠে যেতে পারে। একজন বিশ্বাস যোগ্য লোকের মুখে শুনেছি পাথর নিয়ে একটি হাতীকে তিনি ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে দেখেছেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন মসজিদের পশ্চিমাংশে এর চেয়েও উচ্চ একটি মিনার প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার এক তৃতীয়াংশ তৈরী হতেই তিনি এন্তেকাল করেন। এ-মিনারটি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু। এ-মিনারের সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি তিনটি হাতী উপরে উঠে যেতে পারে। এ-অসমাপ্ত মিনারের এক তৃতীয়াংশই উচ্চতায় অপর মিনারটির সমান। কিন্তু অসমাপ্ত মিনারটি প্রশস্ত বলে দেখতে এতটা উচ্চ মনে হয় না।

জলাশয়

দিল্লীর বাইরে প্রকাণ্ড একটি জলাশয়ের নাম করণ হয়েছে সুলতান লালমিশের নাম। দিল্লীর অধিবাসীরা এখান থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে। বৃষ্টির জলে পূর্ণ এ-জলাশয়টি দু'মাইল লম্বা এবং এক মাইল চওড়া। এর মধ্যস্থলে চৌকোণ পাথরে তৈরী দু'তলা একটি অট্টালিকা। জলাশয়টি যখন পরিপূর্ণ থাকে তখন শুধু নৌকাযোগে এ-অট্টালিকায় যাওয়া যায়, অন্য সময় সর্ব্ব সাধারণ নৌকার সাহায্য ছাড়াই যেতে পারে। এর ভেতর একটি মসজিদও আছে। প্রায় সর্ব্বদাই মসজিদটি মুছল্লিদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। জলাশয়ের পাড়গুলো শুকিয়ে গেলে এখানে ইক্ষু, শশা, তরমুজ ও লাউ প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। তরমুজ ও লাউগুলো আকারে ছোট কিন্তু খেতে মিষ্টি। দিল্লী ও খলিফার আবাসস্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বৃহত্তর আরও একটি জলাশয় আছে। এর চারি-পার্শ্বস্থ চল্লিশটি অট্টালিকায় গায়ক ও বাদ্যকরগণ বাস করে।

এমাম কামালউদ্দিন

দিল্লীর জ্ঞানী ও ধার্মিক অধিবাসীদের মধ্যে এমাম কামালউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নম্র। দিল্লী নগরের বাইরের এক গুহায় তিনি বাস করতেন এবং গুহাবাসী বলে পরিচিত ছিলেন। আমার একজন ক্রীতদাস বালক একবার পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর তাকে আমি দেখতে পাই একজন তুর্কীর গৃহে। আমি বালকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি। কিন্তু শেখ কামালউদ্দিন আমাকে সে কাজে নিরস্ত করেন। তিনি বলেছিলেন বালকটি তোমার পক্ষে ভাল হবে না, তাকে না আনাই উচিৎ। তুর্কী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে রফা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আমাকে একশত দিনার দিয়ে বালকটিকে নিজের কাছে রেখে দেন। এর ছয় মাস পরে একদিন ঐ বালক তার মনিবকে হত্যা করে। সুলতানের বিচারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তুর্কীর পুত্রদের হাতে। অবশেষে তারাও বালকটিকে হত্যা করে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। শেখের এ অলৌকিক শক্তি দেখে আমি তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং পার্থিব জগৎ ছেড়ে নিজের যা-কিছু ছিল সব গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেই। কিছু দিন আমি তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলাম; তাঁকে দেখতাম তিনি দশ দিন রোজা রাখেন এবং রাত্রি অধিকাংশ সময়

দাঁড়িয়ে এবাদৎ করেন। এমাম কামালউদ্দিনের সঙ্গে কিছু দিন কাটানোর পর সুলতান আমাকে ডেকে পাঠান এবং তার ফলে আমি পুনরায় পার্থিব জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি।

সুলতান মাহমুদ

সমস্ত মানুষের মধ্যে এই সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল একাধারে রক্তপাত করা এবং দান খয়রাত করা। তাঁর দ্বারে হয়ত দেখা যেত একজন দরিদ্রকে বিত্তশালী হতে অথবা একজন জীবন্ত লোককে প্রাণদান করতে। এর কোন ব্যতিক্রম প্রায়ই হতো না। তাঁর দানশীলতা ও সাহস এবং অপরাধীদের প্রতি অত্যাচার ও নির্ম্মম ব্যবহারের অনেক গল্প পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা হলেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে নম্র এবং সাম্য ও সুবিচার দেখতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর দরবারে ধর্ম্মীয় সব অনুষ্ঠান গুলোই কঠোর-ভাবে পালন করা হতো। নামাজ আদায়ের জন্যও তিনি কঠোর ব্যবস্থা করতেন এবং নামাজে অবহেলা দেখালে কঠিন শাস্তি বিধান করতেন।

তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর দানশীলতা। এ-সম্বন্ধে এমন কতকগুলো গল্প আমি বলব, যার চমৎকারিত্ব অপর যে-কোন গল্পকে ছাড়িয়ে যায়। আমি খোদা, ফেরেস্তাগণ এবং পয়গম্বরকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি,—সুলতানের অসাধারণ দয়া-দাক্ষিণ্যের সে সব গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি জানি, যে-সব কাহিনীর বর্ণনা আমি দেব, তার কিছুটা অনেকেরই কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কেউ কেউ অসম্ভব বলেও মনে করবেন। কিন্তু যা-কিছু আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যার ভেতর আমি নিজেও অংশতঃ জড়িত ছিলাম, তার সম্বন্ধে সত্য কথা না বলে উপায় কি ?

(ক্রমশঃ)

সবই ত রবে শুধু

আবু বকর সিদ্দিক

শরতের শাদা মেঘে কামনারা দিশাহারা মোর
মনের বলাকা পাখা মেলে দিয়ে হারায় কোথায়,
জানি না ত কোন্ দেশে ভিন্ গাঁয়ে উড়ে চলে যায় ;
নটিনী নদীর বোলে এ-হৃদয় নিঝুম বিভোর।

দিন রাত শুনি গান এ-নদীর বুকে পেতে কান
ঘাসকুঁড়ি কাশফুল তীরে তীরে এই সীমানায়
শরতের ঢেউভাঙ্গা কামনারা এই মোহনায়
নূপুরের বোল শুনি—প্রতি সন্ধ্যা শুনি তার তান।

সবই ত রবে শুধু রবে না এ-হৃদয় আমার
এই মন যাবে ঝরে শরতের নীল নদী হতে,
পাখীর পালক ঝরে যাবে হায় পৃথিবীর পথে
নির্ম্মম মৃত্যুর হাত মুছে দেবে সব রং তার।

শরত নদীর গান—ঢেউভাঙ্গা নূপুরের ধ্বনি
সবই ত রবে শুধু শুকাবে এ-হৃদয়ের খনি।

পাণ্ডুর আকাশ

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ
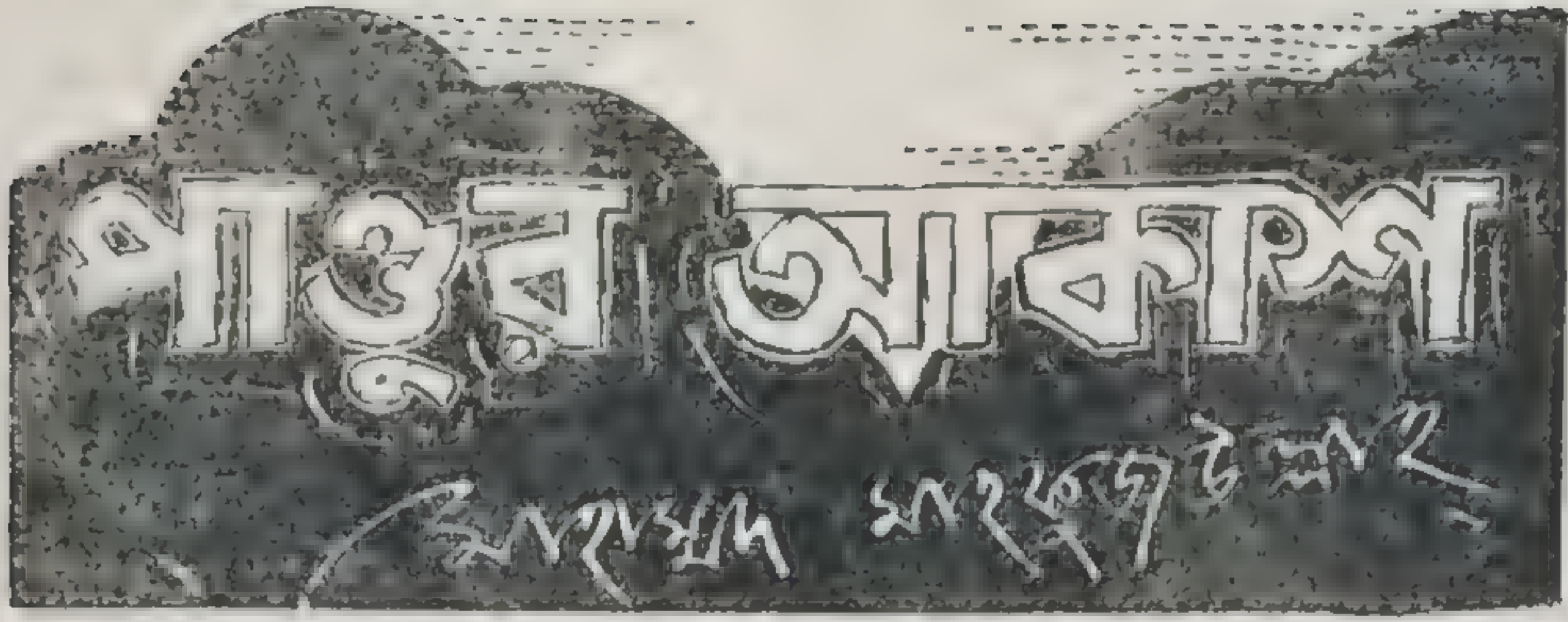
[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ দুই ॥

স্বামী-স্ত্রীতে এখন ওদের প্রায়শঃই কথা বন্ধ থাকে। মামুন মাঝে মাঝে তবু দুই বিপরীতমুখী বিন্দুর সংযোজনের চেষ্টা করে; কিন্তু কোথায় যেন এমন একটা ত্রুটী লুকিয়ে আছে যার জন্যে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। অভিমানে হাল্কা মেঘ ছায়া ফেলে দু'জনের মনের আকাশে, আর অপরাহ্নেই নেমে আসে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। কেন এমন হয়? মামুন মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করে; কিন্তু কোন কূল-কিনারা পায়না। মেঘ-মেদুর আকাশ কি নির্মল হয় না, শ্রাবণের অবিরাম বৃষ্টিধারা থেমে গিয়ে আশ্বিন কি নেমে আসে না পৃথিবীর আঙ্গিনায়! নিশ্চয় আসে। তাই নিজের মনের আকাশেই মামুন খুঁজে বেড়ায় সান্ত্বনার অফুরন্ত আলো।

রিজিয়ার মনেও ছায়া ফেলে ভাবনার লঘুপক্ষ মেঘ। কোন দিন হয়তো মনের কানায় কানায় ভরে ওঠে একটা অজানা আকাঙ্খার ঢেউ। যেদিন মনের একটা দিক কোমল হয়ে আসে, সেদিন রিজিয়ার চেহারায়ও ঘটে পরিবর্তন। কঠিন-রুক্ষ চেহারার ভাঁজে ভাঁজে ধরা দেয় আনন্দের সোনালী রেখা আর অকারণ উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য।

মামুন সহজেই টের পায় রিজিয়ার মন আজ চঞ্চল। ও যেন কোন দূর আকাশের হালকা-ডানার পাখী, ধরা দেয় দেয় করেও যেন নিমেষে মিলিয়ে যায়। কথা বলার একটা প্রবল আকাঙ্খা যেন আজ রিজিয়াকে পেয়ে বসেছে। সত্যিই তো, একই ঘরে কথা বন্ধ করে কয়দিন থাকা যায়! কিন্তু অভিমানের ঢেউটা যেন হঠাৎ তার সারা তনু-মন ডুবিয়ে দেয়। কূলে ভিড়ে ভিড়ে করেও যেন সোহাগের তরীটি হঠাৎ ডুবে যায় কঠিন আবর্তে।

ঘণ্টা খানেক পরে পা টিপে টিপে রিজিয়া আবার ফিরে আসে মামুনের কামরায়। ও তখন অফিসের ফাইলের ভেতরে ডুবে গেছে। রিজিয়ার সারা শরীরে আবার খেলে গেলো একটা অবজ্ঞার ঢেউ। নিজে নিজেই একবার হাসলো রিজিয়া, সে হাসি ঝর্ণাধারার মতো ছড়িয়ে পড়লো না চারিদিকে, শব্দ করলো না এতোটুকু। 'এ না হলে আর কেরানী!'—নিজের মনেই যেন কথাটা আওড়ালো রিজিয়া। রবিবারেও যে অফিসের ফাইলে ডুবে থাকে অষ্টপহর, তার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী আর কি ভাবা যায়!

খালা আম্মা প্রায়ই বলতেন, মনে মনে ভাবলো রিজিয়া, "মাছি মারা কেরানীর সংসারে একবার যে ঢুকেছে তার আর নিস্তার নেই। হাড়মাংস পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এ-আগুনের কুণ্ড থেকে তুমি পালাবে কোথায়?" খাঁটি কথা বলেছিলেন খালাআম্মা। হাজার হোক বয়সেরও একটা দাম আছে। পঁয়ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে চল্লিশে পা দিয়েছেন খালাআম্মা। অভিজ্ঞতার বৃত্তে অবিরাম পাক খেয়ে খেয়ে ঝানু হয়ে গেছেন একেবারে। শুধু তাই বা কেন! নিজেও তো তিনি প্রথম জীবনে কেরানীর হেঁসেলেই ঢুকেছিলেন, এখন না হয় প্রমোশনের সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে ওঠে গেছেন। কিন্তু প্রথম বয়সের সে দাগ কী মুছে গেছে? যায়নি নিশ্চয়—গেলে তিনি এ-কথা এমন করে বলতেন না। না হয় রিজিয়াকে উদ্দেশ করেই তিনি এ-প্রসঙ্গ তুলতেন, কিন্তু তবু তার নিজের জীবনের হারানো অতীত কি তাতে কথা কয়ে উঠতো না একবারও?

আর একটা ভাবনার রেখা যেন কুঞ্চিত হলো রিজিয়ার ললাটে।

তবু সে শেষ পর্যন্ত কথা না বলে পারলো না। উৎসাহটা যে হঠাৎ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে। একই ঘরে পায়চারী করতে হয় যাদের, তারা কি কথা বন্ধ করে থাকতে পারে? পারেনা। রিজিয়া দেখলো, মামুন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক গাদা ফাইলের মধ্যে, হয়তো সব কাজ এখনো তার শেষ হয়নি। কাল হয়তো অফিসে যেয়ে

বড় সাহেবের দমক খেতে হবে। আচমকা একটা সহানুভূতির স্রোত তার মনে করুণা-ঘন হয়ে এলো। এত পরিশ্রম কার জন্যে করছে মামুন? সে কি তার নিজের সুখের জন্যে? কিন্তু সুখই বা সে পাচ্ছে কৈ?

অবশেষে পা টিপে টিপে আরো কাছে এগিয়ে গেলো রিজিয়া। হয়তো ইচ্ছা করেই একটু শব্দ করলো, এতে যদি মামুনের তন্ময়তা ভাঙ্গে! কিন্তু কাছে এগিয়ে গিয়ে আর কথা খুঁজে পায়না রিজিয়া। কি বলে মুখ খুলবে সে? সাত দিন ধরে যে মুখ বন্ধ। ভয়ে ভয়ে সে একটা হাত রাখলো ঝুকে-পড়া মামুনের কাঁধে—মনে হলো যেন কত দূর থেকে সে কারো গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করছে—ছুঁতে গিয়েও যেন ছোঁয়া যায় না।

বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো মামুন। রিজিয়ার চোখে তখন সন্ধানী আলোর ঝলকানি। মামুন দেখলো রিজিয়া তার সামনে নিষ্করুণ পাথরের মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে! দু'টি ঠোঁট তার কাঁপছে আবেগে, চোখের কোণায় দেখা দিয়েছে অশ্রুর ফোঁটা। এ-দৃশ্য মামুনের চোখে নতুন, রিজিয়াকে সে এমন রূপে দেখেনি কোন দিন। পাথরের মূর্তির চোখ বেয়ে পানির স্রোত বয়ে যাওয়াও হয়তো সম্ভব; কিন্তু রিজিয়ার চোখে পানি! আশ্চর্য!

মামুনের সব ভাবনা যেন হঠাৎ মিইয়ে গেল, ও শুধু নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো রিজিয়ার চোখের দিকে, মুখের দিকে। মামুন দেখলো, কি একটা কথা বলতে গিয়ে যেন রিজিয়ার ঠোঁট বারবার কেঁপে উঠছে। সকালের ঝরা শিউলির মতো মুখ তার ম্লান। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন ও রিজিয়া নয়, অন্য কেউ—কোন অল্প বয়েসী অপরিচিতা নারী। মামুন যে রিজিয়াকে জানতো, সে-তো ছিল একটি বৃন্তে সদ্যফোটা সূর্যমুখী ফুল—না, ভোরের মালতী! হঠাৎ যেন উপমাটা ঠিক মতো খুঁজে পেলোনা মামুন।

একি হয়েছে রিজিয়ার চেহারা! অনুতাপে, অনুশোচনায় সে যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! মামুন যেন হঠাৎ সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে এলো। না হয় ঝগড়াই হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর, হয়তো বা কথাই বন্ধ থেকেছে পরস্পরের—কিন্তু তার জন্যে এ অনুশোচনা কেন! আর একবার ভাবতে চেষ্টা করে মামুন।

এক সময়ে আচমকা মুখ খুললো রিজিয়া, আর মামুনের মনে হলো যেন পাথরের নিরেট মূর্তি কথা কয়ে উঠেছে। 'আমাকে কয়েকদিনের জন্যে ছুটি দিতে পারো না',—বলে ঠোঁট চেপে থেমে গেলো রিজিয়া। মনে হলো যেন একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছে সে, তাই নিজের ভুল নিজে শুধরাতে গিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে। ভুল থেকে যে তীর ছুঁড়ে, সে কি আর তা ফিরিয়ে নিতে পারে? পারেনা। রিজিয়া যে তার কথার তীর ছুঁড়ে মেরেছে, তা কি আর ফিরিয়ে নিতে পারবে? পারলে হয়তো তাই করতো রিজিয়া।

প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেনি মামুন, তাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিসের ছুটি চাচ্ছে রিজিয়া? ভাবতে পারলো না মামুন। রিজিয়ার মুখে আজ হঠাৎ এমন কথা কেন? ভুল ভাঙ্গালো শেষ পর্যন্ত রিজিয়াই। বললো, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো, তবে আমি কয়দিন ওদের ওখানে বেড়িয়ে আসি। সেদিন আম্মা এসেছিলেন বেড়াতে, অনেক অনুরোধ করে বলে গেছেন। তা'ছাড়া এত কাছাকাছি থেকেও তো ওদের ওখানে যাওয়া হয়না অনেক দিন।' কথাটা শেষ না করেই আর একবার ঢোক গিললো রিজিয়া। তারপর আবার বললো, 'তা'ছাড়া সংসারে যখন শান্তি নেই তখন মিছেমিছি ভাত ধ্বংস করারই বা কি অর্থ থাকতে পারে? তোমার একার জন্যে তো একটা চাকর হলেই চলবে।' কথাটা শেষ করেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো রিজিয়া, হয়তো মনে মনে লজ্জিত হলো সে।

মামুন স্তম্ভিত, মামুন নির্বিকার। কি বলবে সে, কি-ইবা সে বলতে পারে? নিজের মনের অতলে আবার ডুব দিলো সে, কিন্তু না, এখানেও সে-ই নিঃসীম শূন্যতা। সে মুক্তা সাগরের জলে হারিয়ে যায় তা কি সহজে কুড়িয়ে আনা যায়? যায় না। মামুন ভেবেছিল, রিজিয়া হয়তো তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, তাই অনুশোচনার আগুনে পুড়িয়ে দূর করে নিচ্ছে মনের সব আবিলতা। কিন্তু, না, এ যে তার চাইতেও অসহ্য। এমন আবদার আশা করেনি মামুন, তাই সহজে কোন জবাব দিলনা সে।

রিজিয়া যেন আজ বেপরোয়া, হয়তো বেপথুমনা। এক-দৃষ্টে সে তাকিয়েছিল মামুনের মুখের দিকে, হয়তো তার মুখের রেখা দেখছিল এতক্ষণ। মামুনকে নিরুত্তর থাকতে দেখে রিজিয়া আবার মুখ খুললো, বললো, 'কিছু বলছো না যে?'—

মামুন আবার নড়েচড়ে বসলো। হাতের সামনে থেকে আপিসের ফাইলটা সরিয়ে রাখলো এক পাশে। তারপর ছোট্ট টিনের কৌটো থেকে বের করলো একটা আস্ত সিগারেট। সিগারেটের ধোঁয়া তার ভাবনার দ্বার খুলে দেয়, যে কোন জটিল সমস্যার সমাধানে এ যেন তার অকৃত্রিম বন্ধু। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো মামুন, মনে হলো যেন সব সমস্যাকে সে ধোঁয়ার সাথে উড়িয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ যেন আকাশের রং বদলে গেলো। নীল শূন্যতার বুকে দেখা দিলো কালো মেঘের ভ্রূকুটি। মামুনের

মুখের দিকে তাকিয়ে সহজেই তা টের পেলো রিজিয়া। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আরো গম্ভীর হয়ে গেলো মামুন, তারপর টেনে টেনে বললো, 'হঠাৎ তোমার আবার বাপের বাড়ী যাবার সাধ হলো কেন? গত কয় বছরে তো একবারও ও-বাড়ীর নাম মুখে আনো নি?' বলে আর একবার নিঃশ্বাস নিল মামুন। হয়তো রিজিয়ার উত্তরের প্রতীক্ষা করলো। কিন্তু রিজিয়া তখন নির্বিকার।

ভাব-গম্ভীর স্বরে আবার বললো মামুন, 'বেশ, যেতে চাও তাতে আমার আপত্তি নেই—তবে মনে রেখো এর পর থেকে এ-বাড়ীর দ্বার তোমার জন্যে বন্ধ।' কথা শুনে রিজিয়ার মনে হলো কে যেন তাকে একটা চাবুক মেরেছে, আর তা থেকে রক্ত ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

রিজিয়ার গত সাতদিনের ব্যবহার মামুনকে উত্যক্ত করে তুলেছিল, তাই শেষ মুহূর্তে আজ এই অগ্ন্যুৎগার না করে পারলো না সে। বিবাহিত-জীবনে ওদের শান্তি নেই এক কণাও, কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংসার চালিয়ে এসেছে মামুন, হয়তো ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু কাটা ডিমে তা দিয়ে কি আর সুফল পাবার আশা আছে?

শ্বশুর বাড়ীর কথায় মামুনের মনে তীক্ষ্ণ চাবুকের ঘা পড়ে। রিজিয়া বাপের বাড়ীর গরবে গরবিনী, কথায় কথায় সে তাদের ঐশ্বর্যের দোহাই দেয়, হয়তো তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে তীব্র ব্যঙ্গের হাসি। বড় লোকের মেয়ে রিজিয়া, আর বিত্তহীন পরিবারের শিক্ষিত ছেলে মামুন। বড় লোক নয়তো কি, ওদের সংসারে তো দারিদ্র্যের কালো ছায়া মুখ ব্যাদান করে থাকে না। শিক্ষিত ছেলে বলেই তো ওদের বিয়ে হতে পেরেছে, নইলে কি তা সম্ভব ছিল?

ভাবতে গিয়ে আগুনের মতো হয়ে যায় মামুন, তার অভিমানে আঘাত লাগে। হোক না ওরা বড় লোক, তাই বলে কি এমন করে অপমান করতে হবে? অপমান নয় তো কি? বিয়ের পর থেকে রিজিয়া যেন আমূল বদলে গেছে। কথায় কথায় ঝগড়া বাধানো যে তার একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরুপায় হয়ে মামুন কতোবার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কাছে ছুটে গিয়েছে, আশা করেছে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান, কিন্তু কৈ, তারা তো কোন দিন এতটুকুন সহানুভূতিও প্রকাশ করেনি, বরং পাল্টা করুণার হাসি হেসেছে। সে হাসির শব্দ মামুনের ঝাঁঝরা বুকের পাঁজরা ভেদ করে যেন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে।

অভিমানাহত রিজিয়া নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো মামুনের কামরা থেকে। তারপর বিছানার বুকে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। তার হালকা শরীরটা কান্নার আবেগে বেতস লতার মতো দুলে উঠল কয়েকবার।

দূরের আকাশে তখন সন্ধ্যার ম্লান-ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এসেছে, হয়তো একটু পরেই ছড়িয়ে পড়বে অফুরন্ত অন্ধকার।

॥ তিন ॥

এতোকাল যেমন করে কেটেছে, ঠিক তেমনি করে কেটে গেলো আরো কয়েকটি দিন। হয়তো বৈচিত্র্য ছিল, ছিল কিছুটা পরিবর্তনও; কিন্তু ওদের চোখে তা ধরা দিলো না।

ঠিক পাঁচটায় অফিস থেকে বেরুলো মামুন। সচরাচর এ সময়ে সে ঘরে ফেরেনা, তাই পাশের সহকর্মী হালকা হাসির আমেজ দিয়ে বললো, 'কি ভায়া, আজ এত সকাল সকাল যে? কোন এনগেজমেণ্ট আছে নাকি? সিনেমা-টিনেমা...'

অন্য সময় হলে হয়তো রসিকতাটা হেসে উড়িয়ে দিতো মামুন, কিন্তু আজ কোন কথা বললো না সে।

প্রতিপক্ষের কোন জওয়াব না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো সহকর্মী, হয়তো কিছুটা দুঃখিতও হলো। শেড থেকে বেরিয়ে মুক্ত আলোতে নিঃশ্বাস নিলো মামুন, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

পিপীলিকার সারির মতো তখন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে অফিস-ফেরত কেরানীর দল। দশটা-পাঁচটার ঘানি টেনে এরা এখন ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। রমনার আকাশে তখন কণে-দেখা আলো ফুরিয়ে এসেছে। রাস্তার দু'পাশের প্রাসাদোম অট্টালিকার ওপর নেমে এসেছে বিকেলের ম্লান ছায়া। হয়তো একটু পরেই অন্ধকার নামবে হামাগুড়ি দিয়ে, ঝুলে পড়বে রাস্তার পাশের শিরীষ গাছের ডালে ডালে।

কার্জন হলের সামনে এসে আর একবার আকাশের দিকে তাকালো মামুন, দেখলো হাইকোর্টের চূড়াটা আকাশের নীল ছুঁয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে কীনা। অবাক করা নীলের বন্যা মাঝে মাঝে ছড়িয়ে থাকে আকাশে, যেদিন মন ভালো থাকে সেদিন চোখ মেলে দেখতে পায় মামুন। ছোট বেলায় কবিতা লিখতো সে খানিকটা কবি-খ্যাতিও সে পেয়েছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া কবিতা সে খুঁজে বেড়ায় আকাশের অবারিত নীলে আর কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে।

ফাল্গুনের এক ঝলক মদির হাওয়া বয়ে গেল তার সারা দেহ ছুঁয়ে, শিরীষের ডাল-পালায় কাঁপন জাগিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মামুন, ফুরফুরে হাওয়ায় তার সম্বিৎ যেন ফিরে এলো। পকিনে

দেখলো, তাকে পিছনে ফেলে অফিস-ফেরতা পিপীলিকার দল এগিয়ে গেছে বহু দূরে। আরো একটু জোরে পা চালাতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারলো না। পা দু'টি যেন তার জড়িয়ে আসতে চায়, থেমে যেতে চায় মাঝপথে। বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কিনারে এসে দাঁড়ালো মামুন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কি যেন ভাবলো। বুক পকেটটার দিকে তাকালো কয়েকবার। ওখানে একটা ইনভেলাপ দুমড়ে লেপ্টে আছে। হাত দিয়ে আস্তে আস্তে স্পর্শ করলো সে, একবার ভাবলো ওটা বের করে আবার পড়বে; কিন্তু পারলো না। হাতটা আবার ফিরে এলো শূন্য।

সামনে রাস্তা ধরে ঝুঁকতে ঝুঁকতে এগিয়ে চললো মামুন। আকাশের দিকে তাকালো আবার। শিরীষের ডাল-পালায় তখন অন্ধকারের নাচন শুরু হয়েছে—একটু পরেই জ্বলে উঠবে রাস্তার পাশের বৈদ্যুতিক আলো।

রমনা গেটের কাছে আসতেই তার ভাবনার মোড় ঘুরে গেলো। এখন বাসায় ফিরে গিয়ে কি হবে, রিজিয়ার মুখে হয়তো ফুটবে অভিযোগের খৈ, তার চাইতে রমনার মাঠে বসে একটু বিশ্রাম নেওয়া যায় না কি? ভাবলো মামুন। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল রমনার মাঠের দিকে।

রমনার সবুজ মাঠে তখন বেনামী বাতাস বাউল হয়ে উঠেছে। কোমল গালিচার মতো বিছানো ঘাসের ওপর পা রেখে বসে পড়লো মামুন, মনটা যেন তার খানিকটা হাল্‌কা হয়ে এলো। আবছা অন্ধকারে ও তাকিয়ে দেখলো, অভিসারিকার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে আনমনা। তাদের শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় দুলছে, যেন খেলা করছে। এক ঝলক তীব্র প্রসাধনের গন্ধ এসে লাগলো তার নাকে, কেমন একটা আমেজ যেন ছড়িয়ে দিলো চারিদিকে। মামুন টের পেলো, খুব কাছে যারা বসেছিল গন্ধটা তাদের দিক থেকেই এসেছে। কড়া হলেও মোলায়েম। ভাবনার লাগাম ছেড়ে দিলো সে।

বিয়ের প্রথম প্রথম ওরাও আসতো রমনার মাঠে বেড়াতে। 'সিনেমা দেখতে যাওয়ার চাইতে রমনার মাঠে বেড়ানো ভালো নয় কি, এতে পয়সাও বাঁচে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে'—রিজিয়াকে বুঝাতো মামুন। রিজিয়া জানে, স্বামীর আসল উদ্দেশ্যটা কি। তবু সে প্রতিবাদ করতো না। ওরা আসতো সন্ধ্যার পর। রমনায় তখন নামতো অন্ধকার, কখনো বা জ্যোৎস্নার রূপালি অভিসার। আজিমপুর থেকে রমনার মাঠ অনেক দূরে, শিরীষ গাছের আড়াল দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে। সন্ধ্যার পর ওরা সে রাস্তা ধরেই এগিয়ে যেতো, তারপর বসতো যেয়ে মাঠের মাঝখানে। ফিরতো অনেক রাতে।

পকেটের দুমড়ে যাওয়া ইনভেলাপটার কথা আবার মনে পড়লো মামুনের। চিন্তার একটা জটিল রেখা যেন কুঞ্চিত হয়ে উঠলো কপালে। মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। অফিসে যেয়ে চিঠিটা যখন পড়ে শেষ করেছিল তখনও তার দেহের প্রতিটি শিরা শির শির করে উঠেছিল। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে পাশের সহকর্মী চিন্তিত হয়েছিলেন, হয়তো ভেবেছিলেন দেশের বাড়ী থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে। ওর অবস্থাও যে মামুনের মতোই—সপ্তাহে তিনবার বরে আসে টাকা পাঠাবার তাগিদ। ভাবতে গিয়ে চিঠির প্রত্যেকটি কথা আবার বিশেষ করে মনে পড়লো মামুনের।

'তোমার আম্মার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ, ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন, টাকার অভাবে চিকিৎসা বন্ধ, পত্রপাঠ টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'—চিঠির লেখাগুলো আবার মনে মনে পড়ে নিলো মামুন। শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠলো কয়েকবার, মনে হলো রমনার মাঠে যেন তুফান শুরু হয়ে গেছে। ওর চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে এলো, খুব কাছের মানুষকেও যে আর দেখতে পাচ্ছেনা সে। এতক্ষণ ওর কানে ভেসে আসছিল একটু দূরে বসা প্রেমিক-প্রেমিকার মৃদু-গুঞ্জন-ধ্বনি, ওরা তখন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এখন ওরা কোথায়? মামুন যে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা! ওরা কি রমনার সবুজ ঘাসে মিশে গেছে! একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে এলো নাকে, মনে হলো, বড় তীব্র—বড় ঝাঁঝালো!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মামুন। অনুতাপের একটা শিহরণ বয়ে গেলো ওর সারা শরীরে। একি করছে সে! এমন করে সময় নষ্ট করা তো উচিত হয়নি তার—পলায়নী মনোবৃত্তি ছাড়া একে আর কি বলা যায়? চিঠিটা পকেটে নিয়ে বসে থাকলে কি হবে? যেমন করে হোক রিজিয়াকে বুঝিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। রিজিয়া হয়তো সহজে রাজি হবে না, কিন্তু উপায়? না, তাকে রাজি করাতে হবে। আম্মার অসুখের কথা বললে ও হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারে। আপত্তি করলেই কি, তার কথা কে শুনতে যাবে—মনে মনে সান্ত্বনা পেল মামুন। তারপর ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চললো বাসার দিকে। তার মনের মেঘভার এখন খানিকটা হাল্‌কা হয়ে এসেছে, খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন সে নিতে পারছে।

॥ চার ॥

রিজিয়া তখন হেঁসেলে।

খোকন ঘুমিয়ে আছে ও-কামরার বিছানায়। ছেলেটা সারাদিন দুষ্টুমি করে, তাই সন্ধ্যা না হতেই তার চোখে নেমে আসে তন্দ্রা। কোনোদিন হয়তো মামুন আদর দিয়ে দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করে; কিন্তু পারে না। রং-চঙ্গা ছবির বইয়ে ওর যা নেশা! হাতে পেলে তো আর রক্ষা নেই। পাঁচ মিনিটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে তবে শান্তি। মামুন কিছু বলে না, রিজিয়া মারতে এলে পাল্টা তাকে দমকে দেয়। বলে, 'এমন ছেলে বয়সে একটু-আধটু দুষ্টুমি কে না করে শুনি? তোমার নিজের কথা চিন্তা করে দেখো, তা' হলে আর খোকনকে মারতে আসবে না।'

রিজিয়া জ্বলে উঠে, বলে, "আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ছেলেটার মাথা খেয়েছো, এমন লক্ষীছাড়া ছেলে দেখিনি বাপু! এতো বড় হলো, আজো ক, খ, টা শিখতে পারলো না। পারবে কি করে, আদর দিয়ে দিয়ে তুমি যে ওর সর্ব্বনাশ করছো।' বলে এক পাক ঘুরে রিজিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করে।

মামুন কিছু বলে না, ও জানে, রিজিয়ার এই স্বভাব। ফাঁক পেলেই দু'কথা শুনিয়ে দেয়। ছেলের পড়া হলো কি হলো না, সে নিয়ে ওর মাথা-ব্যথা নেই, ও চায় ঝগড়া করতে, ঝগড়াতেই যে ওর আনন্দ। রিজিয়া চলে গেলে খোকনকে আবার কোলে তুলে নেয় মামুন, ওর চুলে হাত বুলায়।

* * * *

আজ ওর ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন?—রিজিয়া ভাবে। হেঁসেল থেকে ওঠে খোকনের কাছে যেয়ে দাঁড়ায়—ও তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে, হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত খোকনের মুখ দেখে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা, দুধে-আলতা রং! ও এতো সুন্দর হলো কি করে। —রিজিয়া ভাবে, কার রং পেয়েছে খোকন? ওরা কেউ তো এতো সুন্দর নয়! আনমনেই একটা তৃপ্তির স্রোত বয়ে যায় রিজিয়ার শরীরে, মনে। হাসির হালকা ঢেউ জাগে ওর চোখে-মুখে।

হঠাৎ রিজিয়ার ভাবনা মোড় নেয়। না, না,—অস্ফুট শব্দ করে ওঠে রিজিয়া, কি হবে ওর দিকে তাকিয়ে! ছেলে তো তার বাপের মতোই হয়েছে, নইলে খোকন তার কাছে আসে না কেন? ও কি খোকনকে মামুনের চেয়ে কম আদর করে? আদর করে কাছে টানতে গেলেই দৌড়ে পালায়। যা সেয়ানা হয়েছে ছেলেটা!—নিজের মনেই মন্তব্য করে রিজিয়া। তারপর আস্তে আস্তে আবার যেয়ে ঢুকে হেঁসেলে।

* * * *

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

রিজিয়া টের পেলো মামুন ফিরে এসেছে। কিন্তু তবু কি ভেবে সে ওঠে এলো না। হেঁসেলেই চুপ করে বসে রইলো। চাকর যেয়ে দরজা খুলে দিলো।

মামুন ঘরে ঢুকে অন্যদিনের মতো খোকনের তালাস করলো না, ডাকলো না রিজিয়াকে। গায়ের আধভেজা জামাটা খুলে রাখলো আলনায়, তারপর যেয়ে বসলো বারান্দায়।

বারান্দায় তখন দক্ষিণের হাওয়া দিয়েছে। কিন্তু মামুনের মনে হলো কোথাও যেন হাওয়া নেই, আগুনের লকলকে জিভ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। খুব বেশীক্ষণ বসতে পারলো না সেখানে, কি ভেবে আবার ফিরে এলো আলনাটার কাছে। আস্তে আস্তে জামাটা খুলে নিলো, বুকের পকেট থেকে বের করলো দুমড়ে যাওয়া, লেপ্টে থাকা সেই চিঠিটা। তারপর যেয়ে বসলো চৌকিতে।

পাশের কামরায় তখন রিজিয়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। অনেকক্ষণ থেকে সে স্বামীর ঘুরাফেরা লক্ষ্য করছিল, মনে মনে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তাই সোজাসুজি সে স্বামীর সামনে আসতে সাহসী হলো না, হয়তো বিরক্ত হতে পারে।

মামুনই প্রথম মুখ খুললো, অনুচ্চস্বরে ডাকলো, 'রিজিয়া।'

রিজিয়া তড়িৎ গতিতে এসে দাঁড়ালো স্বামীর সামনে তারপর বললো, 'ডাকছো কেন?'

মামুন বেশী কিছু বললো না, হাতের চিঠি এগিয়ে দিলো, 'এ চিঠিটা এসেছে বাড়ী থেকে, পড়ে দেখো।'

এসব চিঠি রিজিয়ার পড়তে হয় না। এর ভাষা তার প্রায় মুখস্ত। একটু শঙ্কিত হলো সে, মুখে যদিও কিছু বললো না। কারণ, ও জানে এসব চিঠির ভেতরই পুরা থাকে যতো অশান্তির হাওয়া। এ ধরণের চিঠি নিয়েই তো তাদের সংসারে ফাটল ধরেছে, খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, নইলে রিজিয়ার অশান্তির আর কিইবা কারণ থাকতে পারে? মুখে বললো, 'কি লিখেছে তাই বলো, আমার এখন পড়বার সময় নেই।'

মামুন জানতো একথাই বলবে রিজিয়া। তবু আস্তে আস্তে বললো, 'আম্মার ভীষণ অসুখ, তাই কিছু টাকার জন্যে লিখেছেন।'

তপ্ত কড়াইয়ে ঠাণ্ডা পানি পড়লে যেমন করে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি করে জ্বলে উঠলো রিজিয়া, বললো, "অসুখ তো আর নতুন নয়? আজ আম্মার, কাল ছোট ভাইয়ের, পরশু ভাবীর, সারা বছর তো বাড়ীতে অসুখই লেগে আছে।" একটু থেমে আবার বললো, "তা বেশ,

অসুখ যখন তখন টাকা পাঠিয়ে দাও—হয় ডাক্তার ডাকুন, নয় যত খুশী খরচ করে উড়িয়ে দিন।" কথা শেষ করে মুখ মুচকালো রিজিয়া। দৃশ্যটা কাঁটার মতো ঠেকলো মামুনের চোখে।

রিজিয়ার মুখের ভাষা মামুনেরও মুখস্ত। বাড়ী থেকে কোন চিঠি এলে এমনি করে সে জ্বলে উঠে, এও তার অজানা নয়; কিন্তু আজকের মুখভঙ্গীটা বড় নতুন ঠেকলো তার চোখে। তবুও যথাসম্ভব সংযত হয়ে মামুন বললো,—"তবে তাই লিখে দিই। কালকেই না-হয় মনি-অর্ডার করে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই। কি বল?"

: "হ্যাঁ, সে-কথাই ভালো করে গুছিয়ে লিখো। আর এও লিখে দিও যে, এমন করে আমরা মাসে মাসে কাউকে টাকা পাঠাতে পারবো না; আমরাই বা এত পাচ্ছি কোথায়?"

: "কিন্তু আমরা টাকা না পাঠালে ওদের চলবে কেমন করে?" বলে একটু গম্ভীর হয়ে গেলো মামুন। হয়তো ভাবনার গভীর জলে ডুব দিলো আর একবার।

বাড়ীতে টাকা পাঠাবার কথা শুনলে অস্থির হয়ে ওঠে রিজিয়া। তার বিশ্বাস, স্বামী তাকে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে বাড়ীতে টাকা পাঠায়। আর সে জন্যেই তার সংসারে এত অভাব, এত অনটন। কলোনীতে আরো দশজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়, কই তাদের স্বামী তো এমন করে ফাঁকি দেয় না, তাদের কি বাড়ীতে কেউ নেই? না, এ অসহ্য, আস্কারা পেয়ে পেয়ে স্বামী তার মাথায় উঠে গেছে। এ অন্যায়ের মূল এখানেই শেষ করে দিতে হবে—মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠে রিজিয়া, মুখে বলে,—"সে কথা ভাবতে হয় তুমি ভাবো গিয়ে। আমাদের জন্যে কি কেউ দানসত্র খুলে দিয়েছে যে, আমরা যাবো দুনিয়াশুদ্ধ লোককে টাকা বিলাতে?—এ মাসের সব কর্জ শোধ করতেই তোমার বেতনের টাকা ফুরিয়ে যাবে।"—ভারিক্কী চালে কথাটা শেষ করে আত্মতৃপ্তির নিঃশ্বাস নিলো রিজিয়া।

মামুন বললো, "টাকা আমাকে যেমন করেই হোক পাঠাতে হবে। আম্মার অসুখে টাকা পাঠাবো না এ-তুমি কেমন করে ভাবতে পারো। সংসার আমাদের কোন-রকম কষ্টে-সৃষ্টে চলে যাবেই, কিন্তু ওরা বাড়ীতে কি উপায় করবে বল? ওদের কথাও তো ভাবতে হবে?"

বারুদের মতো জ্বলে উঠলো রিজিয়া, বললো, "কে বলে ওদের কথা ভাবিনা? টাকা কি বাড়ীতে তুমি কিছু কম পাঠিয়েছো?"

মামুনের ব্যক্তিত্বে যেন প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। অফিস-প্রত্যাগত ক্লান্ত মুখে দেখা দিলো আরো এক স্তর কালো আবরণ, রিজিয়া তা সহজেই টের পেলো, তবু চমকালো না সে। মামুন স্বক্রোধে বলে উঠলো, "পাঠিয়েছি, বেশ করেছি। এতে তুমি বাধা দেবার কে? কোন্ অধিকারে তুমি মুখ খুলছো, শুনি! আস্কারা পেয়েছো বলে দিনের পর দিন মাথায় উঠতে চাও?"—কথা শেষ করে থামলো মামুন।

রিজিয়া বললো, "থামলে কেন? বলো, আরো বলো, যত খুশী বলতে পারো তুমি।" একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার স্তিমিত গলায় বললো, "তুমি জানতে চেয়েছ তাই বললাম, নইলে এ-সব নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা কি, তোমার সংসার তুমি চালাবে, মাঝখানে আমি জ্বলে মরতে যাবো কোন্ দুঃখে?"—রিজিয়ার গলা যেন কয়েক পর্দা নেমে এসেছে। আবার হয়তো এক্ষুনি ওঠে যাবে সপ্তমে। রাগলে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলে।

কণ্ঠে একটু সহানুভূতির আমেজ এনে মামুন বললো, "মিছামিছি কথা বাড়াচ্ছ রিজিয়া! আম্মার অসুখ—এ-খবরটাই শুধু তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম।"

: "কে তোমাকে জানাতে বলেছিল? ওরা টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, তুমি পাঠিয়ে দিলেই পারতে।" বলে থামলো রিজিয়া।

মামুন বললো, "পারতাম কি না পারতাম, তা তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।"—মামুন থামলো।

: "আমি যা' ভালো মনে করি তা বলবো না? আমি না হয় তোমার ঘরে এসেছি, তোমরা না হয় আমাকে কলের পুতুল ভাবো, কিন্তু আমিও তো একটা রক্তমাংসের মানুষ।"—একটা আর্ত সুর যেন অনুরণিত হয়ে উঠলো রিজিয়ার কণ্ঠে।

মামুন ঘাবড়ে গিয়ে সমঝোতার চেষ্টা করে। সে জানে রিজিয়ার সঙ্গে পেরে উঠা সহজ নয়। এখনই হয়তো সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে, বাড়ীঘর তোলপাড় করে তুলবে।

মামুন বললো, "দেখো রিজিয়া, বাজে কথা টেনে এনো না। বলি, তুমিও যে একটা মানুষ এ কথা অস্বীকার করছে কে?"

: "স্বীকারই বা করছে কে।"

: "দেখো রিজিয়া, কথায় কথায় তর্ক তোলা তোমার একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তির কোন ধার ধার না বলেই তোমাকে নিয়ে এত মুস্কিল।"

: "যারা যুক্তির ধার ধারে তেমন একজনকে নিয়ে এলেই তো পারো।"

: "তেমন মেয়ের আজকাল অভাব নেই...কিন্তু।"

: "বেশ তো, যাও না তাদেরই একজনকে নিয়ে এসো,...আমি আর পারছি না। এতো জ্বালাও

মানুষের সহ্য হয়। তুমি যে আমাকে দেখতে পারো না তা আমি বেশ জানি।"

: "তা জানো বৈকি, এমন মেয়ের কি কিছু জানতে বাকী থাকে? তুমিও জেনে রেখো রিজিয়া—তোমাকেও চিনতে আর আমার বাকী নেই।"

: "চিনেছ, বেশ করেছো, এখন মানে মানে বিদায় করে দিলেই আমার হাড়-মাংস জুড়োয়। ইচ্ছে হয় আমাকে বিদায় করে দাও, আজই আমি চলে যাই।"

: "দেখো রিজিয়া, তোমাকে একশ' বার বলেছি, কথায় কথায় বাপের বাড়ীর গরব করো না। তোমায় আমি যেচে বিয়ে করে আনিনি। তোমার মা-বাবা সে-কথা জানেন।"

বারুদের স্তূপে যেন আগুন লাগলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো রিজিয়া। মামুনের আরো কাছে এগিয়ে এলো সে, তারপর মুখ ঝামটা দিয়ে বললে:

: "ছাই জানেন, জানলে আর তোমার মতো লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতেন না। মা-বাবা বাইরের খোলসটাই দেখেছিলেন, ভেতরের খবর তাঁরা নেন নি। তাঁরা জানতেন না যে..."

: "তাঁরা কি দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি, তাঁরা ভেবেছিলেন আমি নিশ্চয় একটা মস্তবড়ো অফিসার হবো, আর তোমাকে খোলা-গাড়ীতে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবো...এই তো?"

: "তাঁরা জানতেন না যে, তুমি বিয়ে করে এনে বউকে একটা ভাল শাড়ী পর্যন্ত দিতে পারবে না। কেন, তোমার মতো ছাপোষা কেরাণী কি এ-তল্লাটে আর কেউ নেই? তারা তো এমন করে রাতদিন বউয়ের সাথে ঝগড়া করে কাটায় না।"

: "আমার মতো কেরাণী এ-এলাকায় ঢের আছে, কিন্তু তোমার মতো দজ্জাল বউ আর একটিও নেই।"

: "তোমার মতো স্বামীর ঘরে যারা বউ হয়ে এসেছে তাদের দজ্জাল না হয়ে উপায় কি? তারা তো আর বউকে উপোষ রেখে বাড়ীতে টাকা পাঠায় না? তাদের আমোদ আছে, আহ্লাদ আছে, জীবনে শান্তি আছে। তুমি আমাকে কি দিতে পেরেছ শুনি?"

: "কিছু দিইনি, দেবো না। তোমার যা খুশী, তাই করতে পারো। যার মা-বাবা না খেয়ে মরছে, বউ নিয়ে তার ঢং দেখানো শোভা পায় না—এই তুমি জেনে রেখো।"

কথা শেষ করে মামুন উঠে গেল বারান্দায়। রিজিয়া আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলো না। তীর বেগে ছুটে গেলো পাশের কামরায়। হয়তো সে বালিশে মুখ ঢেকে এখুনি কান্নায় ভেঙে পড়বে। তার সারা দেহ কেঁপে উঠবে আশ্রয়হীন লতার মতো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর আকাশের দিকে তাকালো মামুন। দেখলো, ঘন কালো মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে উত্তর আকাশের দিকে।

(ক্রমশঃ)

যৌবনোত্তর

হাসান আজীজুর রহমান

তোমার ঐ চোখে আরো কত নেশা আছে—
ঐ চোখ ঐ কাজল-অতল চোখ?
বলতে কি পারো, তোমার চোখের সাগরে আমাকে
আরো কতকাল নীল-স্বপ্নের ঝিনুক কুড়াতে হবে?

কালের চক্রে কোনদিন এই রঙিন মনের
পাপড়ি ঝরার দিন যদি আসে,
মধু-অতীতের হাঁটুজলে নেমে পাখী গোসলের
সান্ত্বনাটুকু
দুর্লভ যদি হয়—
বলো বলো মেয়ে, সে দিনও আমার মনের ময়ূর
গত-বর্ষার স্মৃতির স্মরণে এমনি করে কি নাচবে?

শুক্লারাতের যুবতী চাঁদের হাসির মতন স্নিগ্ধশীতল
আপেলী গালের মেয়ে পেয়ে কেউ
কোনদিন যদি জীবন ধন্য মানে
সে কি তার ভুল? চঞ্চল-পাখা যৌবন গত হ'লে
থাকবেনা আর সে-মধুদিনের এতটুকু স্মৃতি
বাকী জীবনের একফালি চাঁদ হয়ে?

নিত্য কেবল ভীতু মনে সংশয়।
মন-পবনের পানসী ভাসায়ে পারবো কি যেতে
আবার তোমার চোখের সাগরে ঝিনুক কুড়াতে
যৌবন গত হলে?

পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষা প্রসঙ্গে

অধ্যাপক মাইজুদ্দিন আহমদ

বিচিত্র এই দেশ। নদনদী, ফুলফল, পাখীর কাকলী ও নদীর কলতান সমস্ত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে এদেশ চিরদিনই মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এর ময়ূরকণ্ঠি রঙের আকাশ, শিশিরসিক্ত হেমন্ত গোধুলি, পুষ্পিত বসন্তের উল্লাস আর পদ্মা-মেঘনার ভাঙন ধরা কূলের করুণ-মধুর জীবনযাত্রা প্রণালী—সমস্ত কিছু মিলিয়ে দুঃখে-সুখে ঢেউ খেলানো, শ্যামশ্রী এই পাক বাঙলাকে ভাল না বেসে থাকা যায় না!

এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি জিনিষ হঠাৎ চোখে পড়েনা। সে হচ্ছে আমাদের কথ্যভাষার বৈচিত্র্য। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের চেহারায় যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য আছে এদের কথাবার্তায়। সতের জেলার সতের জন লোক যদি এক সাথ হয়ে নিজ নিজ কথ্য ভাষায় কথা বলে, তাহলে কেউ কাউকে পুরোপুরি বুঝতে পারবেনা। একথা ভাবতে মজা লাগে।

ভাষা বলতে সাধারণতঃ কথ্য ভাষাই বোঝায়। লিখিত ভাষা কথ্য ভাষারই স্থায়ী ও সর্বজন গ্রাহ্য রূপ। লিখিত ভাষা একটি হলেও বিভিন্ন জেলায় এক বা একাধিক কথ্য রীতির প্রচলন আছে। এর কারণ কি? ভাষার ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি-সমষ্টি ব্যবহারকারী জনমণ্ডলী (Speech-Community) লিখবার বেলায় উক্ত নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি-সমষ্টির ব্যবহার করলেও, কথা বলার সময় তাদের অনেকেই অবিকৃত ভাবে সেই ভাষা (বা ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ) ব্যবহার করেনা। মুখের ভাষার দিক থেকে বিচার করলে একই ভাষা-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনমণ্ডলীর কথ্য ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়। বাঙলা ভাষার লিখিত রূপ একটি; কিন্তু এই দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে মুখের ভাষার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। এই কথ্য ভাষারই নাম উপভাষা (dialect)। উপভাষার কোন স্থায়ী রূপ নেই।

বাঙলা দেশের সব লোক যেহেতু একই সময়ে সকলে সকলের সাথে বাক্যালাপ করতে পারেনা, তাই বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ছোট জনসমষ্টি বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টি বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকের আওতায় পরিপুষ্ট হয় এবং পরস্পরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের বেশী সুযোগ পায় বলে তাদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য বা বিশেষত্ব এসে যায়। এ-ভাবেই উপভাষার সৃষ্টি হয়।

আজাদীপূর্ব বাঙলা দেশের উপভাষাগুলির যে রূপ আমারদেখতে পাই, তা অনেক বিবর্তনের ফল। আদি কালে যারা বাঙলাদেশে অর্থাৎ রাঢ়, পুণ্ড, সুহ্ম, বঙ্গাল, হরিকেল, নাব্য, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করত, সেই নিগ্রোবটু প্রভৃতি অনার্য জাতীয় লোকদের কথ্য ভাষার সাথে উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত আর্যদের মুখের ভাষা 'পূর্বী প্রাকৃত বা প্রাচ্যা' ক্রমে মিলে মিশে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে এই মিশ্রিত কথ্য ভাষাগুলিই বাঙলা দেশের উপভাষাগুলির জননী।

বাঙলা দেশের উপভাষাগুলি ভাল করে বিশ্লেষণ ও বিচার করলে এদের মধ্যে প্রাচীন বাঙলার ব্যাকরণ, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, অনার্যদের রহস্যময় জীবন যাত্রা প্রণালী, ও বিদেশী জলদস্যুদের অত্যাচারের নানা স্মৃতি হীরক চূর্ণের মত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে। উপভাষাগুলি যেন অতীত স্মৃতির যাদুঘর। দুঃখের বিষয়, পাক-বাঙলার উপভাষা নিয়ে এ-পর্যন্ত তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা বা আলোচনা হয়নি। যতই দিন যাচ্ছে উপভাষার ধ্বনি ও পদপ্রকরণে অনিবার্যভাবে নানা পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। ফলে অনেক উপভাষার প্রাচীন মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলি, বা অলিখিত ইতিহাসের মতই দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। লিখিত ভাষা যুগে যুগে উপভাষা থেকে রস নিয়েই পুষ্ট ও মার্জ্জিত হয়ে উঠে। তাই বলা যায় উপভাষাগুলির মধ্যেই ভাষার আসল প্রাণরস সঞ্চিত রয়েছে। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর বলেন—The real and natural life of language is in its dialects.

কিন্তু বর্তমানে আমরা যে লিখিত ভাষা (Standard dialect) ব্যবহার করি, তা হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা ভিত্তিক। পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষার ছোঁয়াচ যে তাতে একদম নেই, তা নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষা ভিত্তিক কোন সাহিত্যিক ভাষা আজ পর্যন্তও গড়ে উঠেনি। তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে। আর তা গড়ে নেবার দায়িত্ব পড়েছে আমাদের শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের উপর। কোন কোন চিন্তাশীল লেখকের মতে—"পূর্ব-বাঙলাতেও একটা উর্দু-মেশানো 'বাঙ্গাল বাঙ্গলা-ভাষা' ও সেরূপ বাঙলা সাহিত্য গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক, তাতে বর্তমান বাঙলা সাহিত্য অন্ততঃ পুষ্ট হবেনা।" (সংস্কৃতির রূপান্তর: গোপাল হালদার)।

পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এমন উন্নাসিক মন্তব্য করতে পারিনা। বরং আমরা বিশ্বাস করি—"পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক, ভাব-তাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক বলিয়া এখানকার সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে নানা দিক দিয়া কালক্রমে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িতে বাধ্য। ভবিষ্যতে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য হইতে পৃথক হইয়া এক নূতন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবেই।" (ডঃ মুঃ এনামুল হক)

পূর্ব-পাকিস্তানের লোকের আচার-ব্যবহার কথাবার্তা ভাবনা-চিন্তার উপযুক্ত বাহন স্বরূপ, পাক বাঙলার উপ-ভাষার রসে পুষ্ট ও সামাজিক পরিবেশে লালিত এক নূতন সাহিত্যিক ভাষার অভ্যুদয় ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। ভাষা নদীর স্রোতের মত নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের ভাবনা-কামনার উপযুক্ত ভাষ ও ক্রমে ক্রমে স্থান-কাল-পাত্রগত বিবর্তন ধারায় স্বাভাবিক ও অনিবার্য অনুসরণে রূপলাভ করিতে বাধ্য। বর্তমান বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ সে ভাষার অভ্যুদয়ের পথে কোন বাধা জন্মাতে পারবেনা। যেহেতু, মানুষের মনের চাহিদার ফলেই কোন ভাষা তার ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করেই রূপান্তর লাভ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন পথের দিক্-চিহ্ন হিসাবে পড়ে থাকে। ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেলে সে ভাষাকে সুশৃঙ্খল করার জন্যই ব্যাকরণের জন্ম হয়। আমাদের বর্তমান বাঙলা ভাষার যে অংশ সংস্কৃতের দ্বারা পুষ্ট, সে অংশের ব্যাকরণ মাত্র আছে; কিন্তু যে অংশ খাঁটী বাঙলা ভাষা সে অংশের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ কি এখনও গড়ে উঠেছে? তাই বলে বাঙলা ভাষা বা সাহিত্য কি অগ্রগতির পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেনা? এ-কথার দ্বারা আমরা ভাষার পরিণতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা অস্বীকার কচ্ছিনা। তবে ব্যাকরণের কড়া বাঁধাবাঁধির অভাবেই যে কোন ভাষা বিশৃঙ্খল হয়ে এলিয়ে পড়বে, সে ভয় না করেই পাক-বাঙলার অপেক্ষিত সাহিত্যিক ভাষা গড়ে উঠতে পারবে, এ-টুকুই আমাদের বক্তব্য।

বাঙলা ভাষার আর্যীকরণের ফলে ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের গোঁড়ামীর ফলেই বাঙলা ভাষায় দেশী শব্দের স্থলে তৎসম তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য ঘটেছে এবং খাঁটী বাঙলা ব্যাকরণের স্থলে আমরা পেয়েছি আধা-সংস্কৃত ব্যাকরণ। খৃঃ পূঃ ৪ শতকের পূর্বে, আর্যেরা যখন এদেশে আসেনি, তখন পাণ্ডুয়া, গৌড়, লক্ষ্মণাবতী অর্থাৎ সমগ্র হরিকেল, নাব্য, সমতট, বঙ্গাল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষারই কিছু অংশ আজও আমাদের উপভাষা-গুলিতেই ছড়িয়ে আছে; এবং সে ভাষারই কিছু চিহ্ন পাই ময়নামতী ও মানিকচাঁদ রাজার গানে, গোপী চাঁদের সন্ন্যাসে, বিভিন্ন বারমাসীতে ও মৈমনসিংহ গীতি-কার বিভিন্ন লোকগাথার মধ্যে; এই প্রাচীন ভাষার, (যা পূর্ব পাকিস্তানেরই সম্পদ) প্রভাব বর্তমান সাধু ও চলিত সাহিত্যিক ভাষায় নেই বল্লেই চলে।

তখনকার আর্যেরা এ-দেশীয় লোককে অসুর, তস্কর, দস্যু প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করে ও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আসুরিক, পৈশাচিক প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে হীন প্রতিপাদন করতে চেয়েছিল। এদের সাথে মেলামেশা করা বা আত্মীয়তা করাকে তারা খুবই খারাপ চক্ষে দেখত। (চর্য্যাপদ দ্রষ্টব্য)।

এ-ভাবে এ-দেশে প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করেই 'বাঙলা ভাষা' রাঢ় অঞ্চলের উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই বাঙলা ভাষার প্রাচীন ও আসল রূপের সন্ধান একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের উপভাষাগুলোতেই পাওয়া যাবে।

এ-পর্যন্ত বাঙলা দেশের উপভাষাগুলোকে বৈজ্ঞানিক-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন অনেক ভাষাতাত্ত্বিক। জর্জ গ্রীয়ারসনের অনুসরণে ডাঃ মুঃ শহীদুল্লার বাঙলার উপভাষাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী-ভাগ করেছেন,—

১। পাশ্চাত্য ২। প্রাচ্য।

পাশ্চাত্য বিভাগে তিনি কামরূপ, বরেন্দ্র, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অধিকাংশ উপভাষাগুলোকে ফেলেছেন। প্রাচ্য বিভাগের উপভাষাগুলোকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (১) দক্ষিণ-পূর্ব গুচ্ছে—২৪ পরগণার কিয়দংশ, যশোহর, খুলনা, ঢাকা বিভাগ এবং নোয়াখালী জেলার উপভাষাগুলো। (২) পূর্ব প্রান্তিক গুচ্ছে পড়ে কাছাড় হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত জনপদ। অপরপক্ষে ডাঃ সুকুমার সেন বাঙলার উপভাষাগুলোকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করেছেন—১। রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিম-বঙ্গের উপভাষা) ২। ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা) ৩। বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গের উপভাষা) ৪। বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের উপভাষা) ৫। কামরূপী (উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষা)।

আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষাগুলির ধ্বনির উচ্চারণে, বাক্যরীতি, রূপতত্ত্ব ও শব্দের বুৎপত্তিগত প্রাচীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপভাষাগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে ইচ্ছা করি। যে প্রাচীনতার লক্ষণ-গুলোকে আমরা নিরিখ বা মান হিসাবে গ্রহণ কচ্ছি, সে বৈশিষ্ট্যগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে চর্য্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তন, মানিকচাঁদ রাজার গান ও মৈমনসিংহ গীতিকা এবং দু' একটি প্রাচীন চিঠিপত্রের ভাষা থেকে।

বাঙ্গলা দেশের বাব্য ও চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল তুলনামূলকভাবে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের পরে গঠিত হয়েছিল। তবুও আশ্চর্য এই যে, নিম্নবঙ্গের চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর উপভাষায় উত্তর ও উত্তর পূর্ববঙ্গের রঙ্গপুর ও শ্রীহট্টের উপভাষার মতই প্রাচীনতার লক্ষণ বিদ্যমান। এর কারণ বোধ হয় এই যে, যখন ভাগিরথী অঞ্চলের উপভাষাকে কেন্দ্র করে কলিকাতায় নূতন চলিত ভাষার সৃষ্টি হলো, যার প্রভাবে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ যশোহর, কুষ্টিয়া, খুলনার উপভাষার প্রাচীনতা অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে; চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, রঙ্গপুর সে প্রভাব থেকে অনেক দূরে ছিল বলে তাদের উপভাষাগুলি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেনি।

সে যাক্, ভাষায় প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমানতার দিক থেকে আমরা (১) চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট ও রঙ্গপুরের উপভাষাকে অধিক প্রাচীন বলে মনে করি। (২) বরিশাল, পাবনা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় প্রাচীনতার লক্ষণ প্রথমগুচ্ছের প্রাচীনতার চাইতে কম। (৩) যশোহর, খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় প্রাচীনতা অনেকটা চাপা পড়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার প্রভাবে।

অবশ্য আমাদের এই গুচ্ছ-বিভাগ যে সঠিক ও নির্ভুল এমন দাবী করা চলেনা। ভাষা মানুষের মানসিক ব্যাপার। এখানে কড়া বাঁধাবাঁধি রকমের ভাগ (Water tight compartment) করা চলেনা। তবুও আমাদের যা মনে হয়েছে, তাই প্রকাশ করলাম। এরপর শ্রদ্ধেয় ভাষাতাত্ত্বিকগণ ও কৌতুহলী পাঠকবৃন্দ পাক-বাংলার উপভাষার প্রাচীনতা ও বৈচিত্র্যের উপর আলোকপাত করলে আমাদের উপভাষাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণার কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে ঢাকা-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা-বিভাগ এবং বাংলা একাডেমীর যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। সাধারণ পাঠক ও ছাত্র সম্প্রদায়ও এ-ব্যাপারে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে তথ্য সরবরাহ করে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক ভাষা গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে পারেন।

অভিনয় নয়

তপন ভট্টাচার্য্য

যে হৃদয় ভালোবাসে সবকিছু : এই মাঠ,
এই নদী বন
এই পৃথিবীর আলো, এই ঘন সবুজ প্রান্তর ;
মাটির মানুষ আর স্বাতীর ঝিনুক গড়া হাসি
যে হৃদয়ে শতাব্দীর মুক্তো হয়ে জ্বলে
নিজের হৃদয়ে জ্বলে যুগ যুগ আলোক ছড়ায়
সে হৃদয় পৃথিবীর ভালোবাসা চায়।

অনেক অনন্ত, স্তব্ধ স্মৃতির আগল খুলে বেরিয়ে এলুম
দূরের মাঠের পানে অজানারে পেতে
পুনঃ চেয়ে দেখলুম—
যেখানে গোলাপী আভা রঙের প্রলেপ দেয় ধীরে
ফাগুন আগুন হোল যে মাটির ছোঁয়া পেতে চেয়ে
সেখানে অনেক কথা—অনেক স্মৃতির জাল বুনে
যে হৃদয় মিলে গেল স্বপ্নের প্রসবী ফল পেতে
সে হৃদয় এল পুনঃ স্মৃতির শিকলখানি গেঁথে।

ভালোবেসে ভালোবাসা পায়নি হৃদয়
আলোর ফসল বুনে সে-হৃদয় পেল শুধু
আঁধারের রূপ
প্রেত আর কঙ্কাল পেলো—পেলো শুধু
ফসিলের স্তূপ।
তবুও মহান সত্য আকাশ উদার মূর্ত্ত রূপে
অনেক শান্তির ভীড়ে সে হৃদয় দীপ্ত হয়ে জ্বলে।
আজো সে পবিত্র প্রেম, অটুট অক্ষুণ্ণ স্নেহ তার
মাটির মানুষে দিতে পেয়েছে সম্পূর্ণ অধিকার।

তাই আজি শূন্য লগ্নে চেয়ে দেখলুম
অনেক ভুলের শেষে তাকে আজ ভালোবাসলুম
যে হৃদয় একদিন পায়নি হৃদয়
সে হৃদয় জানে আজ অভিনয় নয়।

ঋণ-শোধ

সৈয়দ শামসুল খালেক

বর্ষার ভরা পদ্মা। যৌবন সুধায় তার দেহ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যে-টুকু উপছে পড়ে, সে-টুকু ছড়িয়ে পড়ে মাঠে, ঘাটে, বাটে—শ্যামল প্রান্তরে। পদ্মার বুক থেকে বেরিয়ে এসে এই খালটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই সুধা, পৌঁছে দিচ্ছে কদমতলী বিলে। ধীর-স্রোতে এই খাল অবিরাম বয়ে চলেছে কাজী বাড়ীর ঝাউতলা দিয়ে,—খাঁ বাড়ীর ঘাট আর নন্দী বাড়ীর পুকুর ঘেঁসে।

খালের এ-ধারে তিন বিঘে জমির ওপর কয়েকখানা টিনের ঘর আর নানা রকম গাছ-গাছালি সমৃদ্ধ ছমির ব্যাপারীর বিরাট বাড়ীখানি আর ওপারে বাছের সর্দারের বাস্তুভিটে। মাঝখানে এই সরুখাল যে ব্যবধানটুকু রচনা করে আসছে বাপদাদার আমল থেকে, সেটা দুটো বাঁশ এপার ওপার করে ফেলে দিলেই দূর হয়ে যায়। মেয়েরা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে, পুরুষদেরও ভেলা ঠেলতে হয় না।

কিন্তু সে ব্যবস্থা করা হয় নি; কেননা আসা-যাওয়ার প্রশ্নই যেখানে ওঠে না, সেখানে ব্যবস্থা আবার কিসের। এই দুই বাড়ীর কর্তাদের বা ছেলেমেয়েদের ভেতরে কোন কালেই যে আসা-যাওয়া ছিল না, এমন নয়। এই তো সেদিন পর্য্যন্তও বাছের সর্দারের প্রতি ছমির ব্যাপারীর দরদের অন্ত ছিল না; ছমির বাছেরকে মুখে ডাকতো বেহাই; কিন্তু মনে মনে পেতেছিল তার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক। কিন্তু সে কথা থাক!

এই দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠবার ছিল, তা কয়েকদিন আগে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেলেও ছমিরের কানে এলো আজ—উলাডাঙ্গার মোল্লাজীর মুখ থেকে শুনে এসেছে সে; মোল্যাজীর ছেলে ঢাকা থেকে বয়ে এনেছে এই খবর।

মোল্যাবাড়ী থেকে ফিরবার পথেই ছমির মুখটাকে শান দিতে দিতে এসেছে। লগ্যির পর লগ্যি ফেলে সে নৌকা চালিয়েছে আর বিড় বিড় করে বলেছে, 'শালা বজ্জাত, আমার লগে করবা তুমি বেইমানি। দেহাইয়া আইনা ছাড়ুম, সবুর কর।'

বাড়ী এসে গায়ের ফতুয়াটা খুলে বারান্দার বেড়ার সঙ্গে গুঁজে রাখলো ছমির, পরনের লুঙ্গিখানা হাঁটুর ওপরে তুলে ত্রস্তপদে এসে দাঁড়ালো তার রান্না ঘরের পেছনে, খালের পারে।

ছমির বেঁটে মানুষ। গায়ের রং কালো কুচকুচে। সম্প্রতি পাটের ব্যবসায় যথেষ্ট মুনাফা পেয়েছে এবং পাচ্ছে। থলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তার ভুঁড়িটাও বেশ পরিপুষ্টি লাভ করছে। থুতনির ওপরে যে অল্প কয়টি দাড়ি গজায় তাও ছেটে কেটে যা অবশিষ্ট থাকে, তাতে এবং মাথায় বারো আনি পক্ককেশে অনবরত খেজাব দিয়ে তার জীবনের উনষাটটি বছর গোপন করবার যথাসম্ভব চেষ্টা সে করে আসছে। তার ঐ ছাটাকাটা দাড়ি আর পাকানো গোঁফের সঙ্গে চিলের মত দুটি চোখকে এক করে দেখলে শয়তানির সুস্পষ্ট আভাস মেলে চেহারায়। ওর মুখখানি যেন ইবলিসের প্রতিকৃতি।

ওপারেই বাছের সর্দারের খড়ের বৈঠকখানা। রান্না ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছেড়ে ছমির ডাকলো,—"বাছের মিঞা, বাড়ী আছাও নি?"

ওপারের বৈঠকখানার ভেতর থেকে সাড়া এলো, 'হ মিঞা আছি, আহ না!'

ছমির জবাব দিল, 'যাইবার সুমায় নাই। বাইরে বার অও, এউগ্যা কথা কমু।'

বাছের তামাক কাটছিল বসে বসে। ছমিরের আহ্বানে বেরিয়ে এলো সে। ছমির শুধালো, 'পোলা নাহি তোমার শাদি করছে?'

বাছের একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'হ ব্যাপারী, তাই তো হুনলাম।'

ছমির কথায় তেজ মিশিয়ে বলল, 'খালি হুনলা, জানো না তুমি কিছু?'

—'আমি কেমন কইর‍্যা জানুম। পোলা শাদী করছে ঢাহা সহরে। দ্যাশে থনে আমি জানুম কিবায়?'

ছমির তার কথা শুনে জ্বলে উঠলো, বলল, 'বুইড়া অইলা, মিছা কথা ছাড়লা না। মইলি (মরলে) তো কুত্তায়ও খাইবো না মিঞা, জানো?'

এইবার বাছেরের কথায়ও ঝাঁজ প্রকাশ পেলো। সে জবাব দিল, 'ত্যারা ত্যারা কথা কও ক্যান্ মিঞা? আমি মিছা কথা কইবার যামু কিয়ের লিগ্যা। পোলা কি শাদীর আগে আমারে জানাইছে?'

ছমির ক্ষুব্ধ হল। উত্তেজিত কণ্ঠেই সে বলল, 'আইচ্ছা আইচ্ছা, ভাল অইছে। তুমি জানো না, ভাল। তোমার পোলা ব্যাগর আমার মাইয়ার শাদী আটকাইব না, জাইনা রাইহো। কিন্তুক মিঞা, আমার টাহাগুলা আজই দিয়া দেও।'

বাছের কণ্ঠস্বর নিচু করে বলল, 'টাহা দিছাও, পাইবাই একদিন। টাহা কি তোমার খোয়া যাইবো?'

—'হেই সব ভক্কর চক্কর বুঝি না আমি। টাহা আমার আজ দিতিই অইবো।" হাত পা নেড়ে কথাগুলো বলল ছমির।

তেজাল স্বরে উত্তর দিল বাছের, 'টাহা কি তোমার লিগ্যা গাঁটে জমা কইরা রাখছি যে যহন চাইবা, তহন দিয়া দিমু।'

ছমির রাগে জ্বলে উঠলো, 'ক্যান্ টাহা নিবার সময় ত'র মনে আছিল না। হারামজাদা নিমকহারাম শুয়ারের বাচ্চা...

ছমিরের গালিগালাজ শুনে বাছেরের রক্ত টগবগ করতে লাগলো। তার সত্তর বছরের দেহখানি উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো থর থর করে। কি করবে সে, তার সেই দিন নেই। বাইশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত বাবুদের জমিদারীতে সর্দ্দারের চাকুরী করেছে সে। সেই জীবনে এ-রকম কত ছমির অক্কাপ্রাপ্ত হয়েছে বাছেরের লাঠির মাত্র এক আঘাতে। কিন্তু আজ?... আজও তার নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে তার সেই পদবীটা; কিন্তু দিনগুলো ভেসে গেছে কালের প্রবল স্রোতে, নইলে মুখের সামনে ছমির তাকে গাল দেয়, সড়কীর এক আঘাতে ওর ভুড়িটা ফাঁসিয়ে ফেলতো না সে?

চিৎকার করে বলল বাছের, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইছ ছৈমা। মনে করছস্ বাছের সর্দার বুইড়া অইয়া গেছে; হ, বুইড়াই অইছি কিন্তুক মইরা যাই নাই। বাপ তুইলা গাইল দ্যাছ, কল্লাডা কাইটা খালে ভাসাইয়া দিমু।'

ছমির দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'চুপ কর্, শালা বেইমান, কার কল্লা কেডা কাইটা ভাসায় দেহন যাইবো। আমার নাম ছমির সেক, ত'র চৌদ্দ পুস্তিরে লাল ঘর দেহাইয়া আইনা ছাড়ুম রহ্।'

ছমির ব্যাপারী ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। বাছের তীব্র আক্রোশে শুধু ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। ইচ্ছা হ'ল তার এক লাফে খালটা পার হয়ে ছমিরের গর্দানটা ধ'রে নিয়ে আসে, খালের পানিতে আচ্ছা করে চুবিয়ে দেয়।

বেকী বেড়ার আড়াল থেকে মেয়ে ডাকলো বাছেরকে, 'বাজান শুইনা যাও।'

বিড় বিড় করে ছমিরের উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে বাছের ভেতরে এলো। মেয়ে বলল, 'মানুষটা আমাগো কাছে টাহা পাইবো, তা তো দিতিই অইবো, ঝগড়া ঝাটি কইরা লাভ কি, বাজান?'

—'আমি কি না করছি যে টাহা দিমু-না। দেহছ্ ন', হারামজাদা কেমন ত্যারা ত্যারা কথা কয়।'

—'তা বুইলা আর কি করবা। যত দিন টাহা না দিতে পারবা, ততদিন মুখ কান বুইজ্জা সইতে অইবো।'

—'ক্যান আমি সইতি যামু? 'টাহার টাহাও দিমু আবার গাইলও হুনুম। আমি কি তার কাছে টাহা চাইছিলাম? ওই না গরজো কইরা দিছে। আমি য্যান পারুম, ত্যান অর টাহা দিমু।'

বুড়ো বাছের আবার ফিরে গেল বৈঠকখানা ঘরে। তার কাটা তামাক পড়ে রয়েছে। মেয়ে 'পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে, উনুনে ওর রান্না।

বাছের সর্দার আবার তামাক কাটতে বসে; কিন্তু হাত কাঁপছে তার থর থর করে। তামাকগুলো তার কাটা হ'ল না। যে গুলো কেটেছে, সেই গুলোই নোচা দিয়ে মাখতে শুরু করলো সে।

ছমির ব্যাপারীর কথাগুলো এখনও তার কানে বাজছে। বাছেরের প্রথম পক্ষের দশটি আর দ্বিতীয় পক্ষের সাতটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র দুটি। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলে রশিদ আর দ্বিতীয় পক্ষের এই মেয়ে হালিমা। ছেলেটা ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বাছেরের ইচ্ছা ছিল না ছেলেকে আর সে পড়ায়। সে যে বাবুদের সরকারে চাকুরী করতো, সেই বাবুর বড় ছেলেও ছিল ম্যাট্রিক পাশ, কাজেই তার ছেলে বাবুদের সমান লেখাপড়া করেছে, এই যথেষ্ট! কিন্তু স্কুলের মাষ্টার সাহেবরা দশমুখে বলতে লাগলেন, ছেলেটির মেধা অসামান্য, আরও পড়ালে সে একটা কিছু হবে। তা ছাড়া ছমির ব্যাপারীও যেন উঠে পড়ে লাগলো; বাছেরকে সে বলল, 'বাই, চিন্তা কর ক্যান্। টাহা যা লাগে আমি আছি। তোমার ছাওয়াল আর আমার পোলা বেশ কম আছে না হি?' রশিদকে ডেকে সে বলল, 'যাও বা'জান, সহরে যাইয়া কলেজে পড় গা। টাহার জন্যি বাইবো না। আমি তোমার চাচা, আমি বাইচা থাকতি চিন্তা কিযের?'

বাছের তবুও এ-প্রস্তাব সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারলো না। জীবনে সে বহু কষ্ট করেছে; কিন্তু কারো কাছে একটি পয়সাও ধারে নি কোনদিন, অথচ এই বৃদ্ধ বয়সে ধার করে ছেলে পড়ানো—তার সরল মনটি সহজে যেন এতে সায় দিতে পারলো না।

ছমির বুঝেছিল বাছেরের এ-মনোভাব; তাই সে বাছেরের হাত ধরে বলেছিল,—'বাই, তুমি ঘাবরাও ক্যান্? টাহা তুমি য্যান পারো দিও। না পারো, ছাওয়াল দিও।' হেসে হেসে আরো সে বলেছে, 'আর না দিলিও কোর্ট করুম ন', বুঝছাও?...

ছমিরের দুরভিসন্ধিটা প্রকাশ পেলো মাস ছ'য়েক পরেই। গাঁয়ে, আমিরুদ্দি মোড়লকে দিয়ে একদিন সে

প্রস্তাব পাঠালো বাছেরের কাছে, বাছেরের ছেলের সঙ্গে সে তার মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। তার একই মাত্র মেয়ে সলিমা। দেখতে রূপসী নয়। তাতে কি হয়েছে! বাপের এত সম্পত্তি। পিতার অবর্ত্তমানে সে-ই তো পাবে সব কিছুর মালিকানা। ছমিরের যে বউ রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়ে আইন করে মাসে মাসে খোরাকী আদায় করছে, তাকে তো সে কিছুই দেবে না। অতএব, সলিমাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে না কে,—বাছেরকে প্রচুর লোভ দেখালো আমিরদ্দি মোড়ল। কিন্তু কিছুতেই যখন সর্দ্দারের মন গলে না, তখন দেখানো হল ভয়। ছেলেকে দিয়ে ছমিরের মেয়ে বিয়ে করাবে এই শর্ত্তে ছমির তার ছেলের পড়ার খরচ চালাচ্ছে—এই সাক্ষ্য দেবে গ্রামের সবাই। ছমির কোর্ট করবে, উকিলের বাড়ী যাবে।

বাছের বোধহয় ভয় পেলোনা মোড়লের এই হুমকীতে। তবে তার মন আস্তে আস্তে ভিজে এলো অন্য কারণে। পরের মেয়েকেই ছেলের বৌ করে আনতে হবে ঘরে। ছমির এত টাকা-পয়সা খরচ করছে তার ছেলের পেছনে। সে তো দাবী করতে পারেই। হোক মেয়ে কালো, মানুষের বাচ্চা তো বাছেরের প্রথম পক্ষ রশিদের মাও ছিল কালো। তাই বলে কি তার স্বামী জোটেনি? তবে এ-ব্যাপারে ছেলের মতামত, হ্যাঁ সে-ই এক কথা। গাঁয়ের আরো পাঁচজন যখন বাছেরকে এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে চেপে ধরলো, সে তখন এই কথাই দিল, ছেলের যদি এ-বিয়েতে ইচ্ছা থাকে, তা হলে তার আপত্তি থাকবে না। ছমিরও এ-শর্ত মেনে নিল। মোড়ল বলল, তাই হবে।

সেই থেকে চালু হল এদের বেহাই সম্পর্ক। দুই বেহাইয়ের পীরিত যখন চরমে উঠলো, সেই সময় একদিন নয়ান ভূঁইয়ার মারফৎ ছমির আরেকটা জঘন্য প্রস্তাব পাঠালো বাছেরের কাছে। তার মেয়ে তো দু'দিন বাদে বাছেরের ঘরেই যাচ্ছে, তখন ছমিরের এ-বিরাট সংসার আগলাবে কে? বাছেরের মেয়েটাও তো সেয়ানা হয়ে উঠেছে,—যদি সে রাজী থাকে ছমির বাছেরের মেয়ের নামে সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা লিখে দিতে প্রস্তুত আছে। দু'দিক থেকেই ছমিরের পুরো সম্পত্তিটা বাছেরের হাতে চলে আসবে।

বাছের তো এ-প্রস্তাব শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। ছমিরের উদ্দেশ্যে গালাগালি করে নয়ান ভূঁইয়াকে তাড়িয়ে দিল সে। সেই দিন খালের ওপর থেকে বাঁশের সাঁকোটা তুলে দিল বাছের। পাশাপাশি দুটি বাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন হল।

কথাটা এক সময়ে হালিমার কানেও এলো। গাঁয়ের সমবয়সী মেয়েরা এসে খোঁচা দিয়ে বলতে লাগল, 'কি রে, তুই না হি রাজরাণী অইবার চল্লি, তা ভাল, বুইড়া রাজা, হুক্কা সাইজা দিবি। গুরু গুরু কইরা টানবো আর তরে পাতালপুরীর কেচ্ছা শুনাইবো।'

হালিমা হাসে ওদের কথা শুনে, কারণ সে জানে, সে যতই ক্ষেপবে ওরা ওকে ততই ক্ষেপাবে। ফলে কথাটার ছড়াছড়ি হবে বেশী। তাতে বরং ওর নিজেরই ক্ষতি।

দিন সাতেক পরের কথা। আদালত থেকে বাছেরের কাছে পরোয়ানা এলো, সাত হাজার টাকার দাবীতে তার বিরুদ্ধে ছমির শেখ সরকার বাহাদুরের দরবারে নালিশ জানিয়েছে। শনিবার বেলা দশটায় আদালতে তাকে হাজির হতে হবে।

গ্রামের সরকারী পেয়াদা পরোয়ানা পত্রখানা বাছেরের হাতে দিয়ে বলে গেল, 'যাইও মিঞা, সময়মত আদালতে যাইও। নইলে দারোগা-পুলিশ আইয়া আবার হাঙ্গামা করবো।'

কাগজখানা হাতে নিয়ে বাছের গুম হয়ে বসে রইল। ছমিরের মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে যে ভুল সে করেছে, তার হলো এই পরিণতি—বুড়ো বয়সে তার কপালে লেখা ছিল এই অপমান!

বাছের স্বপ্নাবিষ্টের মত কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর সে নিঃশব্দে বাড়ীর ভেতরে গেল। কাগজখানা দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখলো সে। মেয়ে যেন দেখতে না পায়।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শেষ রাত্রে যাত্রা করলো বাছের সর্দার। গাঁয়েরই একখানা একমাল্লাই নৌকা ভাড়া করেছে সে। যাবার সময় মেয়েকে ব'লে গেল, 'সহরে চল্লাম মা। আজই ফির‍্যা আইয়া পড়ুম। ভাবনা করিস্ না মা।'

বাপ কেন অকস্মাৎ শহরে চলল, তা মেয়ের কাছে রইল অজ্ঞাত। কিন্তু ব্যাপারটা হালিমার গোচরীভূত হল একটু পরেই। প্রভাতের নবীন রবি তখন পূব দিগন্তে রাঙা রঙ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে; ছমিরের রান্না-ঘরের পেছনে এসে সলিমা ডাকলো হালিমাকে। একখানা নূতন শাড়ী পরেছে সে। পায়ের আলতা শাড়ীর রঙের সঙ্গে মিশে গেছে; নাকে ঝুলছে ওর মায়ের নোলকখানা। বাছেরের বহির্বাটীর বেকী বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালো হালিমা। শুধালো ওকে, 'কি রে, কোন্ হানে যাস্?

সলিমা জবাব দিল, 'মামুর বাড়ী যামু। বা'জান যাইবার লইছে সহরে, আদালতে। যাওন কালে পথে মামুর বাড়ী আমারে নামাইয়া দিয়া যাইবো গা।'

ছমির ব্যাপারী আদালতে যাচ্ছে শুনে হালিমার কচি বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো সে, 'চাচা আদালতে যায় ক্যান ?'

সলিমা যেন অবাক হ'ল, বলল, 'ক্যান্ তুই কিছু জানছ্ না ? তর বা'জান যায় নাই আদালতে ?'

—'বা'জান সহরে গেছে, ক্যান্ গেছে, তা তো কইয়া যায় নাই।

সলিমা মৃদু হেসে বলল, 'তুই কান্দাকাটি করবি, যাইবার দিবি না, তাই কইয়া যায় নাই। আমার বা'জান লগে তর বা'জানের না আজকা মামলার তারিখ।'

হালিমার রাঙা মুখখানি কালো মেঘে যেন ছেয়ে গেল। চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললো সে। বেড়ার খুটীটা আঁকড়ে ধরে কোন রকমে সে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সলিমার দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে।

সলিমা বলল, 'হেইয়ার লিগ্যাই তরে ডাকছি। আমার বাপ আর তর বা'জান যা-ই করুক, আমরা দুই সই য্যামন আছিলাম, ত্যামনই থাকমু। আমাগো দুই সইর মনের মধ্যে কোন ফারাক নাই। এই কথা মনে কইরা রাহিছ।'

কথাগুলো কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে সলিমা চোখ মুছলো আঁচলে। বান্ধবীর স্নেহবাক্যে হালিমার মন ভিজলো প্রীতিরসে আর চোখ সিক্ত হলো আঁখি জলে। তার মুখে একটি কথাও সরলো না। আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলো সে। ওপার থেকে সলিমা বলল, 'যাই গা, বা'জান নায় উইঠা বইসা রইছে। ডাকবার লাগছে আমারে। আবার তর লগে কতদিন বাদে দেহা অইবো, ক্যামন কইরা কমু, তয় মন আমার পইড়া রইল তর কাছেই জানিছ।'

সলিমা চলে গেল। হালিমা চোখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বালিশের ভেতর মুখ গুঁজে ফু'লে ফু'লে কাঁদতে লাগলো সে।

রাত দশটা নাগাদ বাছের সর্দার বাড়ী ফিরে এলো। বুড়ো বাপের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল হালিমার। একটি কথাও সে শুধাতে পারলো না। বাছের তার সর্দারী আমলের কোটটা এবং জামাটা খুলে রেখে ঘরের দাওয়ায় পাতা পাটিতে গিয়ে বসলো। মেয়ে একখানা হাতপাখা হাতে নিয়ে বসে পড়লো ক্লান্ত পিতার পাশে।

দু'টি ব্যথাতুর হৃদয়ের মাঝখানে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা পরিবেশটাকেও অস্বস্তিকর করে রাখলো কিছুক্ষণ। হালিমার উদ্বিগ্ন মন শুধু ছট্ ফট্ করছে কিছু বলতে আর কিছু শুনতে না পেয়ে। বৃদ্ধ বাছেরের হৃদযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোথাও যেন কাঁপছে তালে তালে। মনের গুপ্ত কোঠা থেকে সে ব্যথাটা কথা হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, তা যেন কণ্ঠ দেশে এসে বাধা পায়। মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। শুধু জরাজীর্ণ বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বেদনাবাহী দীর্ঘনিঃশ্বাস।

হালিমা আর চাপতে পারে না। অনেক কষ্টে বাপকে সে শুধায়, 'সহরে গেছিলা ক্যান্, বা'জান ? এত দেরী কইরা আইলা যে ?'

বাছের যেন হঠাৎ পথ খুঁজে পায় মেয়ের জিজ্ঞাসায়। অস্বস্তি বোধটা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় মেয়ের মমতামাখা সাড়া পেয়ে। সর্দার বলতে থাকে, 'মা যার নছীবে যা আছে, তা খণ্ডাইবো কেডা। বুঝবার ভুলে যে কামডা করলাম, তার অইলো এই ফল। নইলি—

—'কি অইছে, বাজান ?' হালিমা শুধালো পিতার কথার মাঝখানে।

সর্দার বলল, 'ছমির ব্যাপারী টাহার দাবীতে আমার নামে নালিশ করছে মা।'

—'মামলায় কি অইলো বাজান ?'

বাছেরের ঘুনে ধরা বুকে বেশ খানিকটা সাহসের সঞ্চার হল। তার আশঙ্কা হয়েছিল, মামলার কথা শুনে মেয়ে না জানি কতটা মুষড়ে পড়বে। কিন্তু মেয়ের কণ্ঠ স্বরে তেমন কিছু মালুম হল না বাছেরের। সে বলতে লাগলো, 'শহরের উকিল বাবু কইলো, মিঞা তুমি ঘাবরাইও না। হুজুরের ছ্যামায় খালি কইবা যে হুজুর আমি ছমিরের ধনে একটা পয়সাও নেই নাই। তার পরে যা কইবার আমি কমু নে।'

—'তুমি তাই কইলা নি বাজান ?'

—'না রে মা, তাই কি কওন যায় নি ? এমন ডাহা মিছা কথা আমি কইতি নি পারি। তাই তো উকিল বাবুরে কইলাম যে, বাবু যহন জমিদার বাবুগো সর্দার আছিলাম, তহন একবার বাবুগোই এক বিবাদে কয়েক-জনের মাথা ফাটাইয়া পার কইরা দিলাম। জমিদার বাবু কইল, সর্দার আদালতে যাইয়া কইবা যে আমি মারি নাই, কেডা মারছে তাও জানি না। তারপর আমি দেহায়া' দিমু মামলায় জেতে কোন্ শালায়। কিন্তুক বাবু, আদালতে যাইয়া জমিদার বাবুর হেই কথা ভুইলা গেলাম, হুজুরের কাছে কইলাম, হ হুজুর, মানুষ আমিই খুন করছি। আমার সাত বছরের ফাটক অইলো।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো বাছের সর্দার। আবার সে বলতে লাগলো, 'আমার এই কথা হুইনা উকিল বাবু হাসবার লাগলো, 'কইলো, আরে মিঞা আদালতে যাইয়া কি অত হাছা কথা কইতি আছে।' আমি কইলাম, 'তা ক্যামন কইরা কমু উকিল বাবু ?

আদালতে আপনারাই কন হাচা কথা কইতি আবার আপনারাই কন মিছা কথা কইতি। কারডা হুমুম ?'

বৃদ্ধ বাছের কিছুক্ষণ নীরব রইল। হালিমা আবার শুধালো বাপকে, 'তারপর কি অইলো বাজান ?'

—'কি আর অইবো মা' যা আমার নছীবে আছিল, তাই। জনমডা কাটাইয়া দিলাম বাপের এই ভিটায়। এ-বাড়ীর মাটীর দরদ আমি বেগর কেও বুঝবো না। এ বাড়ীর কত গাছ গাছালি আমার সমবয়সী—তোর দাদীর হাতে বোনা। হেইগো মায়াও ত্যাগ করতি অইবো মা। কাল সহালেই ছমির আইবো পেয়াদা পুলিশ নিয়া; বাড়ীঘর বেবাক নিলামে উঠাইবো।'

বাছেরের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠছিল। তার শেষের কথাগুলো যেন কান্না হয়ে বেরিয়ে এলো। হালিমাও অশ্রু গোপন করবার ব্যর্থ প্রয়াস পেলো না। সে আঁচলে আঁখিধার মুছতে লাগলো। বাপ ও মেয়ের এই বেদনা বিধুর হৃদয় দুটির মাঝখানে আবার এসে আসন করলো সেই পাষাণ নিস্তব্ধতা।

সুকঠিন নিস্তব্ধতা আবার ভঙ্গ করলো হালিমা। বলল, 'বাজান, যা অইবার অইবো। এ-নিয়া আর ভাইবো না। তুমি তো অন্যায় কর নাই। তোমার এ-পাক মাট্টি তোমারই থাকবো, কেও নিতি পারবো না। যাও, ওঠো, হাত মুখ ধুইয়া দুইডা ভাত খাইয়া শোও গা।'

হালিমা উঠে গেল। বৃদ্ধ পিতার হাতমুখ ধো'বার পানি এগিয়ে দিয়ে সে গেল ঘরে, বাপের জন্যে ভাত বাড়তে।

মেয়ের অনুরোধে আর জোর জবরদস্তি উপেক্ষা করতে না পেরে বাছের সর্দার দু'চারটে ভাত কোন রকমে গিলে বারান্দার এক কোণে পাটি পেতে শুয়ে পড়লো। হালিমা দরজায় খিল এঁটে দিয়ে এলিয়ে পড়লো বিছানায়।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতের চাকা মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো প্রভাতে তরুণ রবির রাঙা আলোর ছটায় উদ্ভাসিত পৃথিবীর দিকে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে ডুবে গেল। মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে রাত জাগা পাখীর উদাস ডাক ভেসে আসছে। খালের পানিতে খালপারের গাছ-গাছালি থেকে ফলমূল পড়ার টুপটাপ শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। হালিমা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালো কিছুক্ষণ। ভাবনার কালোমেঘে তার মনের আকাশ ছেয়ে গেছে। যে পথে সে পা বাড়াতে চাইছে, তাতেও তার বাপ মনে আঘাত পাবে; কিন্তু বাস্তুভিটে হারানোর আঘাতের চাইতে সে আঘাত হয়ত কিছুটা কম হতে পারে।

বিছানার 'পরে উঠে বসলো হালিমা। পূর্ব দিকের জানালাটা দিয়ে নারিকেল আর সুপারী গাছের ফাঁকে ফাঁকে তার দুটি শ্রান্ত আঁখি মেলে ধরলো সে।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদ তখন পূর্বাকাশে হামাগুড়ি দিচ্ছে। আলোয় আঁধারে মিলে প্রকৃতিকে টেনে এনেছে যেন প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মাঝখানে। হালিমা মুহূর্ত-মাত্র বিমনা হয়ে দেখে নিলো প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ রূপ, তারপর অকস্মাৎ যেন চেতনা ফিরে পেলো সে, বিছানা ছেড়ে পা ঠেকালো মাটিতে, নিঃশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে—কম্পিতপদে এসে দাঁড়ালো সে খালের পারে।

খাল পারে দাঁড়িয়ে হালিমা আরো একটুখানি ভেবে নিলো। তারপরে পানিতে ডুবালো পা। খালের মাঝ-খানে পুরুষ মানুষের গলাপানি,—হালিমার ডুবু ডুবু। সে সাঁতরিয়ে পার হয়ে এলো ঐ খাল। কোমর অবধি পানিতে ডুবিয়ে সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তার পা আর সরছে না, বুকের ভেতরটা ধপ ধপ করে কাঁপছে; শরীরের সবটুকু শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে ঐ টুকু খাল পার হতে।

হঠাৎ মাছের ছটফটানিতে থলথল্ শব্দ হল খালের পানিতে। হালিমা তাকালো সেই দিকে। কাছে একেবারে হালিমার কাছেই। স্পষ্ট সে দেখতে পেলো একটা বিরাট বোয়াল মাছ আটকে গেছে জিয়ালা বড়শীতে। এখন কি করবে সে, তা ভাববার আগেই লণ্ঠন হাতে নিয়ে খালপারে এসে দাঁড়ালো ছমির ব্যাপারী।

পানিতে অর্দ্ধনিমজ্জিত নারীমূর্তি দেখে সে শুধালো, 'তুমি কেডা গো ? পানির মধ্যে খাড়াইয়া রইছ ক্যান্ ?'

হালিমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাছের লোভে অনেক সময় অশরীরি অনেক কিছু নারী মূর্তি ধ'রে আসে, এ-কথা যে ছমিরের স্মরণ হল না, তা নয়। বোধ হয় সেই কথা মনে করেই ছমির ব্যাপারীর গা'টা ছমছম করে উঠলো একবার। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভয় পেলে আর নিস্তার নেই, তা সে জানে। তাই হারিকেনের শিখাটি আরো একটু বড় করে দিয়ে এগিয়ে এলো সে, মনে মনে কলেমা পড়ে মুখে বলল, 'কেডা গো তুমি, হালিমা নাহি ?'

—'হ।'

—'এত রাইতে যে! পানির মধ্যে ক্যান্ ?'

ছমির আরো দু' পা এগিয়ে এলো। হালিমা ছমিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে পারে উঠে এলো। ছমিরের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো সে। তার দু'হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো

হালিমা। কেঁদে কেঁদে বলল, 'আমি তোমার কাছেই আইছি। আমারে তুমি নেও। আমারে নিয়া আমার বা'জানরে দেনা থিকা খালাস দেও।'

হতবাক ছমির শেখ। মুহূর্তে আনন্দের বারিধারায় ছমিরের মন প্লাবিত হয়ে গেলো। হালিমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সে বলল, 'কাইন্দো না। কান্দো ক্যান্? আমি তোমার বাপের কাছে আর এক পয়সাও দাবী করুম না। ওঠো, ঘরে আহ।'

হালিমার ভূলুণ্ঠিত কোমল দেহখানি বুকে তুলে নিলো ছমির। আরেক হাতে তুলে নিলো বড়শীতে আটকে যাওয়া বোয়াল মাছ। দুটি জিয়ালার দু'টি শিকার ঘরে তুলে নিয়ে এলো সে।

অব্যক্ত

মুয্হারুল ইস্লাম

যে-কথা বলতে চেয়েছি সে-কথা না বলাই থেকে যাক
কে জানে কত যে ব্যথার আগুন কত অঙ্গার থাক
হিমালয় বুকে জমা আছে,—আমি তাই
হিমালয় হবো, হিমালয় হতে চাই।
এই জানো আর এই-ই শুধু জেনে রাখো
মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাধ ক্ষান্ত সে হবেনাকো
কোনদিন, কোন ব্যথা বেদনায় প্রত্যাখ্যানে নয়
আমি বেঁচে রবো মানুষের মত—আমি হবো দুর্জয়।

যে মোরে দিয়েছে বেদনা আঘাত—সেই তো দেখালো পথ
যে মোরে হেনেছে কৃপাণ কুঠার সেই তো দিয়েছে শক্তি অব্যাহত,
যে মোরে শুধুই ভুল বুঝে নিলো প্রতি ক্ষণে প্রতি কাজে
সে-ই মোরে দিলো প্রজ্ঞা আলোক হৃদয় শোনিত মাঝে।
যার কৃপা আঁখি লাগি সাধ ছিল, ধ্যান ছিল জীবনের
অথচ যে শুধু আঁখির আগুনে জ্বালা দিল দাহনের;
সে মোরে শিখালো দুর্জয় হতে জীবনের প্রতিকূল
ব্যর্থ সে-চাওয়া খুলে দিল শত পাওয়ার উৎস-মূলে।

প্রেম-প্রীতি আর স্নেহ মমতায় নিকটে বেঁধেছি যারে
প্রতিদানে সেও পদাঘাত দিলো,—মোহের অন্ধকারে
আলো দিল সে-ই;—এসব জীবনে পেয়েছি যা কিছু কিছু নয় বৃথা তার
এই সঞ্চয় খুলে দিল দ্বার;—সম্মুখে মহাজীবনের পারাবার।
কারো তরে তাই ক্রোধ নেই.— নেই বিদ্বেষ ব্যথা বিষ
সুখী হোক সবে, সকলের তরে থাক মোর শুভাশীষ।
কি পেয়েছি আর কি যে পাইনিকো হেঁয়ালী সে-সব হিসেবের খাতা খুলে
দেখে কিবা লাভ বলো
আজ দেখি সব পাওয়া ও না-পাওয়া জীবনেরই অনুকূলে
এনে দিলো নয়া ইঙ্গিত ঝলোমলো।
আর কিছু নয়, চাই সেই প্রাণ চাই সে বক্ষপট,
যেখানে আঘাত ফুল হয়ে ওঠে, কেটে যায় সঙ্কট।
যে-কথা বলতে চেয়েছি সে-কথা না বলাই থেকে যাক
এই বক্ষেই আগুনের মত সেই কথা চাপা থাক।

পাগল

মোহাম্মদ মোশ্‌তাক ডিপ ইন্ এড্

—'অমুকের ছেলেটি 'পাগল' হয়ে গেছে। আহা, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিল ছেলেটি! কত ডাক্তার কবরেজ-ওঝা-বৈদ্যের চিকিৎসা করালো—কিছুতেই কিছু হলো না!...'

আবার—'সেই ফিরু মেয়েটি! সেবার মাত্র ওর বিয়ে হলো। এখন নাকি 'মাথা খারাপ' হয়ে গেছে! লোকে বলে জীনে পেয়েছে! ও পাড়ার হানিফ মৌলবী সাব দু'দুবার চালানও দিয়েছেন—কিছুই হলো না।' এমনি ধরনের পাগল নিয়ে কাহিনী ও আক্ষেপ আজকাল আমাদের দেশে প্রায়ই শোনা যায়।

সাধারণ লোকের ধারনা যে মানুষ বুঝি কোন নৈসর্গিক (Spiritual) কারণেই এমনিতর পাগল হয়। তাই তারা অধিকাংশই বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার স্থলে ঝাড়-ফুক, মন্ত্রতন্ত্রের ঝুঁকি নেয় বেশী। ফলে প্রায় ক্ষেত্রে পাগল পাগলই থেকে যায়—মাঝখানে অভিভাবকদের শারীরিক শ্রম ও আর্থিক ব্যয়ই হয় যথেষ্ট।

তেমনি আবার সমাজে যাঁরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত তাঁরাও অনেকে তাঁদের পাগলদেরকে নিয়ে সমস্যা মুক্ত হতে পারছেন না। তাঁরা অবশ্য সাধারণ লোকদের ন্যায় পাগলামিকে কোন নৈসর্গিক কারণ জনিত ব্যাপার বলে না ভাবলেও—সাধারণ বাহ্যিক আচরণ দেখে যে স্থূল ধারনার বশবর্তী হয়ে চিকিৎসা করাবার প্রয়াস পান, তাও উন্মাদগ্রস্তদের জন্য বিজ্ঞান সম্মত নয়। তাঁরা ওটাকে অন্যান্য শারীরিক রোগেরই মত মস্তিষ্কের একটি ব্যাধি মনে করে শরীর বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রে—স্নায়ুবিক উত্তেজনাকে কারণ ধরে দিব্যি চিকিৎসা চালিয়ে থাকেন। ফলে এক্ষেত্রে শক্তি এবং অর্থের অপচয় হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু রোগীর রোগ সারছে খুব কমই।

তাই আমাদের দেশের কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—প্রায় সবার মনে পাগল সমস্যা সম্বন্ধে এ-ধারনা বদ্ধ মূল হয়ে গেছে যে, এর বুঝি কোন বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা নেই? সাধারণ ঝাড়-ফুক, মন্ত্রতন্ত্র ও শারীরিক চিকিৎসায় যদি এ-অদ্ভুত রোগটি না সারে, তবে বুঝতে হবে ওটা নিরারোগ্য (incurable)। তখন হয় ওকে আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দাও—ঘুরুক, নতুবা শিকল বেঁধে তালা-চাবির ভিতর রেখে দাও নিশ্চিন্ত মনে। এমনিতর বিষয়টির অজ্ঞানতাবশতঃ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বছরের পর বছর কত অভিশপ্ত জীবনই যে আমাদের দেশে অধঃপাতে যাচ্ছে, তার হিসাব নেই!

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'উন্মত্ততা' (madness) রোগটি কোন কোন সময় 'দুরারোগ্য' (Hard curable) হলেও একেবারে 'নিরারোগ্য' নয়। প্রাথমিক অবস্থা থেকেই যদি উপযুক্ত বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তবে জটিল উন্মাদগ্রস্তরাও যে ভাল হতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু বিশেষজ্ঞের।

প্রকৃত পক্ষে এ-রোগটির 'কারণ ও ধরণ' (cause and conditions) অন্যান্য শারীরিক রোগগুলোর অনুরূপ নয়। ইহা সম্পূর্ণ একটি আলাদা জগতের বিশেষ জটিলতর রোগ। এখানে তাঁরাই চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হতে পারেন যাঁরা উক্ত বিশেষ জগতের সহিত পরিচিত এবং উন্মত্ততার স্বরূপ, কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান সম্পন্ন।

যা হোক, এখন পাগলামি কি এবং উহা কোন জগতের রোগ, কেন মানুষ পাগল হয়, পাগল কত প্রকারের হতে পারে, পাগল চিকিৎসার বিশেষ পদ্ধতি কি, কারা পাগল চিকিৎসায় সক্ষম, ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

(ক) পাগলামি কি এবং উহা কোন্ জগতের রোগ—উন্মত্ততা বা পাগলামি সম্পূর্ণ ভাবে মনোজগতের রোগ (mental disease)। ইহা একটি মানসিক গূঢ়ৈষণা (mental complex); ব্যবহারে অস্বাভাবিকতাই হলো এর প্রধানতম লক্ষণ।

তবে এক দিক দিয়ে ভাবলে দেখা যায় যে, মানুষ মাত্র সবাই আমরা ব্যবহারে কিছু না কিছু অস্বভাবী (abnormal), অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে কোন না কোন গূঢ়ৈষণা যুক্ত (complexed)। বাতিক, ছিট, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি জটিল মনের (complex mind) পরিচায়ক গুলোই এর প্রমাণ। এ-গুলোর একটি না একটি সমস্যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে। অতএব, আমরা হচ্ছি সবাই পাগল। আর এ পৃথিবীটা হচ্ছে নির্ঘাত একটি 'পাগলা গারদ' (Lunatic asylum)।

সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে বিষয়টি অবশ্য সত্যি। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের ও সব পাগলামি বা অস্বভাবী ব্যবহার গুলো পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তেমন কোন

বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে না বলে মোটা কথায় আমরা আর পাগল নই—পৃথিবীটাও আর পাগলা গারদ নয়। আমাদের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে জটিলতার দিক দিয়ে যারাই সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করছে, তারাই আমরা 'সুস্থ-পাগল'দের কাছে 'বদ্ধ-পাগল' এবং তাদের জন্যেই প্রয়োজন হয় চিকিৎসার।

(খ) কেন মানুষ পাগল হয় পূর্বেই বলা হয়েছে যে পাগলামি একটি মানসিক গূঢ়ৈষণা। এই গূঢ়ৈষণা মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহারে বিপর্য্যয় টেনে আনে বলে সে হয় অস্বভাবী পাগল।

এমন প্রশ্ন উঠবে যে, মানুষের মনে এই গূঢ়ৈষণার সৃষ্টি হয় কি করে? মানুষের মনে এই জটিলতার সৃষ্টি হয় অন্তর্দ্বন্দ্বের (mental conflict) ফলে। কোন দুর্দমনীয় ইচ্ছা (desire) বা ভাব (feeling) যখন মানুষের মনে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে, তখন সকল সম্ভাব্য উপায়ে সর্ব শক্তি নিয়োজিত করে মন চায় ওটাকে চরিতার্থ (satify) করতে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, বিবেক (concience) বা অন্য কোন সামাজিক কারণ (social factor) উক্ত ইচ্ছা বা ভাবটির প্রকাশ (expression) বা পরিণতিতে (satistaction) এমনি বাধার সৃষ্টি করে যে, ইচ্ছার প্রাবল্য থাকা সত্ত্বেও মন আর কোন রকমেই ওটাকে চরিতার্থ করতে পারে না। ফলে এক দিকে ইচ্ছার প্রকটতা, অপর দিকে পরিণতিতে বাধার কাঠিন্য মনের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। মনের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের (conflict) মধ্যে যারাই নানা ভাবে ইচ্ছা বা ভাবটির প্রকাশনায় ((expression), পূর্ণতায় (satisfaction), 'উন্নতি'তে (sablimation), বা 'নিরোধে' জয়ী হতে পারে, তারাই সুস্থ অবস্থায় টিকে থাকতে পারে—আর যারা এর কোনটাই পারে না তারাই জটিল গ্রন্থি (complex) যুক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহারে অস্বভাবী (abnormal) হয়ে সমাজে পাগলের স্থান দখল করে বসে।

তা'ছাড়া কখনো কখনো আবার 'অবচেতন' (unconscious) বা 'অর্ধ-চেতন' (sub conscious) মনের কোন 'নিরুদ্ধ' (suppressed) বা 'অবদমিত' (repressed) ভাব জট (feeling complex) বা প্রক্ষোভ কূটৈষণা (emotional complex) ও পাগলামির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জাগ্রত জীবনে (conscious life) মানুষ অনেক সময়ই নানা প্রতিকূল অবস্থার ফলে মনের ছোট-খাট বাসনা, অতৃপ্ত আকাঙ্খা, শোক-দুঃখ, ঘৃণা-ভয়, আঘাত প্রভৃতি অবচেতনে নিরোধ করে রাখে বা ভুলে যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন নিরুদ্ধ বা বিস্মৃত (forgotten) ভাবই মন থেকে একে বারে মুছে যায় না,—অর্ধচেতন বা অবচেতন মনের গুহায় পড়ে থাকে মাত্র। তবে অনেক সময় মনের অতলে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকেনা। চেতন মানসে (conscious mind) অনুরূপ কোন ভাবের প্রভাবে বেশ পুষ্ট হতে থাকে এবং সুযোগ মত একদিন আত্মপ্রকাশ করে মনের সমুদয় স্বাভাবিকতাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে।

এমনিতর অবচেতন মনের কোন নিরুদ্ধ ভাব জট বা জাগ্রত জীবনের কোন জটিলতর সমস্যা,—যা মানুষের মনে প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি করে অথচ মন এর কোন কিনারাই করতে পারে না, প্রভৃতির কারণেই মানুষ পাগল হয়ে যায়।

(গ) পাগল কত প্রকারের হতে পারে? সমাজে সাধারণতঃ দু'প্রকারের পাগল দেখা যায়—স্থায়ী পাগল (actual mad) এবং সাময়িক পাগল (occasional mad)। উভয় প্রকারের পাগলরাই মানসিক দিক দিয়ে অনুরূপ জটিল গ্রন্থি যুক্ত। তবে স্থায়ী পাগলদের মানসিক সংঘাত এত জটিলতর ও সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে যে, তাদের মন আর সহজে পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। কিন্তু সাময়িক পাগলদের মন সময়ান্তরে কোন জটিলতার ফলে অস্বাভাবিক হয়ে পড়লেও সংঘাতটি তেমন দুর্দমনীয় নয় বলে মনের পাহারাদারীর (censors of mind) চাপে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে।

তা'ছাড়া পাগলামির মূল 'মানসিক জট' আবার দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—মনোবিকার (psychosis) এবং মনোবৈকল্য (psycho neurosis)। স্থায়ী পাগলদের মধ্যে যারা পাগলামি করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে অন্যান্যদের মত সুস্থ ভাবে—অর্থাৎ নিজদের সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাদের জটিলতা মনোবিকার (psychosis)। মনে অনেক দিনের পুরনো অত্যন্ত গভীর ও জটিল কোন সংঘাতের ফলেই এর সৃষ্টি হয়। ইহা একটি অত্যন্ত মারাত্মক জটিলতা—বহু চিকিৎসা করেও একে অনেক সময় সারানো সম্ভব হয় না।

অন্যান্য পাগলদের জটিলতা মনো বৈকল্য (psychoneurosis)। তাদের মানসিক জট তত গভীর ও জটিল নয়। তারা নিজেরাও অনেক সময় তাদের সমস্যা বুঝতে পারে। তাদের চিকিৎসা অনেকটা সহজ সাধ্য।

সাময়িক পাগলদের সমস্যাও এই মনোবৈকল্য। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকের ধারণা যে তাদের পাগলামির কারণ অনেক ক্ষেত্রে আর সব পাগলদের মত নয়।

সময়ান্তরে বিশেষ কোন নৈসর্গিক দুষ্ট প্রভাবের ফলেই তারা পাগল হয়। বিশেষ করে মেয়েদের সাময়িক পাগলামির কারণ তো জীন-পরী-ভূত প্রভৃতির প্রভাবই নতুবা তারা এমনি একজনের মনের গোপন কথাও বলে ফেলতে পারে কি করে?

কিন্তু আসলে সাময়িক পাগলিনীরাও কোন ভূতে ধরা বা জীন-পরীতে পাওয়া রোগী নয়। তাদের পাগলামির মূলেও মনোবৈকল্য। এখানে তাদের মনের কোন অতৃপ্ত, নিরুদ্ধ বা অবরুদ্ধ কামনা বা ভাবাবেগ (emotion) স্বজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, মনে খবরদারীর অন্তরালে জট পাকাতে থাকে এবং যখনই সুযোগ পায় চেতন মানসে আত্মপ্রকাশ করে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

এখন হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে ওরা যদি মনো বৈকল্য পর্য্যায়ের রোগীই হয়, তবে তারা কোন গোপন বা আগাম কথা বলে কি ভাবে এবং ঘটনা ক্ষেত্রে ওঝা কবরেজের মন্ত্র তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াই বা সৃষ্টি করে কেন?

এ-ক্ষেত্রে রোগীর বিশ্বাস এবং মনের অসীমত্ব (infinity) ই হচ্ছে মূল কারণ।

মন স্বভাবতঃই অসীম (infinite)। অসীমের সব জ্ঞানই এর আয়ত্তাধীন। তবে ইহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ-বাহ্য জগতে স্বাভাবিক অবস্থায় সসীমের মধ্যে জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এর ক্ষমতা থাকে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনকে যদি সসীম দেহে থাকা সত্ত্বেও সাধনা বলে তার আসল রূপ অসীমত্বে (infinity) উন্নয়ন করা যায় তবে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব কালের সব জ্ঞানই চেতন মানসে লাভ করা সম্ভব হয়। ফকির-দরবেশ, যোগী-সন্ন্যাসীরাই এর প্রমাণ।

তেমনি পাগল জীবনেও মন কখনো কখনো অসীমত্বের গুণ লাভ করে। তবে ইহা ফকির-দরবেশদের মত স্বাভাবিক সাধনার জন্যে নয়,—জাগ্রত জীবনে মনের অস্বাভাবিকতার দরুণ। জাগ্রত জীবনে মনের অসীমত্বের পরিচায়ক কোন বিশেষ গুণ বা কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিশেষ রূপের (conditions) বিশ্বাস যদি কারো চেতন বা অবচেতন মনে বদ্ধমূল থাকে, তবে ঐ মনে অস্বাভাবিক অবস্থায় সেই 'বিশ্বাস' ব্যবহারে রূপায়িত হয়। আমাদের দেশে তেমনি মেয়েদের মনে জীন-পরী প্রভৃতির কাহিনী,—যেমন জীন-পরী-ভূতেরা অজ্ঞাত কথা বলতে পারে, সরষে দেখলে পালায়, মন্ত্রের কাছে মাথা নত করে, জীনে পাওয়া পাগল এমনি ব্যবহার করে প্রভৃতি—নিয়ে বহু কথাই বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মনের অস্বাভাবিক অবস্থায় ওগুলো রূপায়িত হয়।

(ঘ) পাগল চিকিৎসার বিশেষ পদ্ধতি কি? পাগলামির চিকিৎসা শারীরিক রোগের চিকিৎসার অনুরূপ নয়। শারীরিক রোগের বেলায় আমরা নির্দিষ্ট একটি বাস্তব ক্ষেত্র পাই, যার উপর ব্যবহারিক পরীক্ষা চালিয়ে রোগের কারণ. ধরণ, ও প্রতিষেধক নির্ণয় করতে পারি। কিন্তু পাগলামি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে মনোজগতের রোগ। এখানে ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালাবার মত কোন বাস্তব ক্ষেত্র নেই। এ-ক্ষেত্রে রোগীর ব্যবহারই হবে কারণ অনুসন্ধানের একমাত্র সূত্র এবং তার মানসিক সংঘাতটির সমাধানই হবে একমাত্র ঔষধ।

তবে পাগলদের ব্যবহার এত অস্বাভাবিক ভাবে বিক্ষিপ্ত, অসংহত ও সমস্যামূলক যে, মূল কারণটির অনুসন্ধান তত সোজা নয়। ওটা সবসময়ই অবচেতনের অতলে লুকিয়ে থাকে এবং যদি মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশেষ উপায়ে না এগুনো যায়, তবে ওকে টেনে বের করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে।

অথচ পাগলামির মূল কারণটি বের করার মধ্যেই রয়েছে পাগলের চিকিৎসা। পাগল যে পর্য্যন্ত না তার অবরুদ্ধ সমুদয় ভাবজট প্রকাশ করে পাগলামির আসল কারণ সম্বন্ধে অবহিত হতে না পারবে,—সে পর্য্যন্ত তার এ-রোগ থেকে অব্যাহতি নেই। চেতন মানসে সম্পূর্ণ সমস্যাটিকে পুনরুদ্ধার করা, স্বাভাবিক মনে ওগুলোকে ঝেড়ে ফেলা বা সমাধান করাই হলো পাগলের একমাত্র ঔষধ।

এখন কি ভাবে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাগলের এই অবরুদ্ধ ভাবটিকে টেনে বের করে মনকে স্বাভাবিক জটিলতা মুক্ত করা যায়, তাই আলোচনা করা যাক।

পাগল-মনের অবরুদ্ধ ভাব-জটকে মুক্তি দেবার একমাত্র উপায় হলো মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিশ্লেষণ (psycho-analysis)। ইহা দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) সম্মোহন (hypnotism) পদ্ধতির দ্বারা এবং (২) 'মুক্ত-অনুষঙ্গ-প্রণালী' (free association method) এর মাধ্যমে।

(১) সম্মোহন পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে রোগীকে সম্মোহিত (hypnotised) করে অভিবাবণ (suggestion) দিয়ে তার মনের অবরুদ্ধ বা বিস্মৃত ভাব-জটকে বলতে উৎসাহিত করতে হয় (the talking out method)। এতে ওগুলো অবচেতন মন থেকে ক্রমে বেরিয়ে এসে মুক্তি লাভ করবে। ফলে রোগীর মনের ভার লাঘব হবে, রোগী নিরাময় হবে। আগেকার দিনে চিকিৎসকরা অধিকাংশই এ-পদ্ধতিতে পাগল চিকিৎসা করতেন।

তবে এ-পদ্ধতিতে কতগুলো অসুবিধে রয়েছে। রোগী খুব গভীরভাবে সম্মোহিত না হলে চিকিৎসায় অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় না। সব রোগীকে এক রকম সম্মোহন করা যায় না, রোগী সম্মোহন অবস্থায় পূর্ণ

চেতনায় থাকে না বলে সাময়িক ভাবে ভাল হলেও পুনরায় পাগলামি দেখা দিতে পারে। সম্মোহিত অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের ইঙ্গিতে চালিত হয় বলে রোগ মুক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে চিকিৎসকের উপর। রোগীর অতৃপ্ত আকাঙ্খাটি পাত্রান্তর (transfer) হবার সম্ভাবনা থাকে, ইত্যাদি।

(২) মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী—তবে আধুনিক পাগল চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণের বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো ডাঃ ফ্রয়েডের শ্রেষ্ঠ অবদান—"মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী" (method of Free Association)। রোগীকে সম্মোহিত না করে, আরামে শুইয়ে, মন শান্ত হলে—যা' যা' তার মনে আসে, তা সে যত তুচ্ছ, অর্থহীন, অসঙ্গত, অসংযত এবং অশ্লীলই হোক,—বলতে উৎসাহিত করাই হচ্ছে এ-পদ্ধতির মূল নীতি। এই নীতি অনুযায়ী পরম ধৈর্য্য ও সহানুভূতি সহকারে রোগীকে কথা বলালে বা তার কথার দরদপূর্ণ শুনানী দিলে দেখা যাবে যে প্রথম প্রথম বহু আবোল-তাবোলের পর ক্রমে এক কথা থেকে আর কথা, এক ভাবের সঙ্গে আরেক ভাব যুক্ত হয়ে তার বর্ণনা অজ্ঞাতসারেই একটি কাহিনী ধরে এগিয়ে চলছে। পাগল মনের নিরুদ্ধ এই কাহিনীটির মধ্যেই রয়েছে তার মূল জটিল গ্রন্থিটি এবং এর পুনরোদ্ধার ও প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি।

তবে তাদের অবেচতন মনের এই অবরুদ্ধ কাহিনীটি কথা বলিয়ে চেতনায় এনে মুক্তি দিতে হলে বিশেষ জ্ঞান ও নিপুনতার দরকার। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগীর কথাবার্তা যখন কোন কাহিনীতে রূপ নিয়ে এগোতে থাকে, তখন তার বর্ণনার মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে যায়। এখানে তার মনে অজ্ঞাতেই তার সামাজিক বুদ্ধি (Ego) এবং মনের খবরদারী (censor) আসল ব্যাপারটির প্রকাশনায় প্রবল বাধা দিচ্ছে। ফলে সে হয়তো ভুলে যাচ্ছে নতুবা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। কিন্তু রোগীর মনের অবরুদ্ধ ভাবটিকে টেনে বের করতে হলে এই 'ফাঁক' গুলোকে উদ্ধার করতেই হবে। চিকিৎসক পরম ধৈর্য্যের সহিত স্নেহ দিয়ে, দরদ দেখিয়ে, উৎসাহিত করে—নানাভাবে বিশেষ কৌশল ও চাতুর্য্যের সহিত এই 'পড়ে' যাওয়া নিরুদ্ধ অংশগুলো রোগীর চেতনায় এনে প্রকাশ করতে বাধ্য করবেন। ফলে এমনি এক সময় দেখা যাবে যে রোগীর মনের আসল গ্রন্থিটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং রোগীও মনে স্বাভাবিক চেতন অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

এই পদ্ধতিতে সম্মোহন পদ্ধতির ত্রুটি গুলো নেই। এখানে রোগী স্বজ্ঞানেই তার সমস্যা বুঝতে পারে; এবং সে এও বোঝে যে, তার এ-সমস্যার সমাধানও নির্ভর করছে তার নিজের উপর। সুতরাং সে মনের ময়লা নিজের চেষ্টায় বা চিকিৎসকের পরামর্শে নিজেই দূর করে নির্মল হয়ে উঠবে।

(৬) কারা পাগল চিকিৎসায় সক্ষম? এতক্ষণ আলোচনার পর ইহা বলা বাহুল্য যে পাগল চিকিৎসায় সাধারন চিকিৎসকরা অপারগ। মনো বিজ্ঞানে যাঁদের প্রচুর দখল আছে—মানসিক রোগ ও তার চিকিৎসা ব্যাপারে যাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত (trained) তাঁরাই পাগল চিকিৎসায় সক্ষম ব্যক্তি। এঁদেরকে বলা হয় psychiatrist. তাঁরা এক দিকে যেমন সাধারন ও অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানে বিশারদ, তেমনি অন্যদিকে 'অস্বাভাবিক শরীর বিজ্ঞান' (pathology) লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। তাঁদেরকে স্বভাবতঃই উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। ধৈর্য্যশীল, সহানুভূতি পূর্ণ ও অতি বিচক্ষণ সুব্যবহারী বন্ধু ভাবাপন্ন হতে হয়। তাছাড়া যদি তিনি একজন ভাল সম্মোহনকারীও হতে পারেন, তবে তো কথাই নেই। সম্মোহ-সক্ষম psychiatrist রা দুরন্ত পাগলদের মনে সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এ-ধরনের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অতি নগন্য, এক রকম নেই বললেও চলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতরা এদিকে বড় একটা মাথা ঘামান না। ফলে বিশেষজ্ঞের অভাবে আমাদের সমাজে পাগলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান জগতে, সভ্য সামাজিক ক্ষেত্রে কোন জাতির পক্ষে ইহা যে কত অকল্যাণকর, তা সহজেই অনুমেয়।

যে ফুল না ফুটিতে

অধ্যাপক আলমগীর জলীল

["Our sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts."]

সৃষ্টি অপূর্ণ। স্রষ্টার মানস সৌকর্যের জন্যে এই বিশ্ব ভূমণ্ডল সৃষ্টি। আলো-ছায়া, সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ, বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা লীলাবিলাস করছেন অহরহ। স্রষ্টা স্বীয় প্রতিভূ স্বরূপ জীবকে সৃষ্টি করে ছায়ার ভেতরে কায়ার স্বাদ অবলোকন করতে চান। পরমাত্মা-জীবাত্মার এই তত্ত্ব প্রতিটি ধর্মেই প্রায় স্বীকৃত। বৈষ্ণব, সুফী, সাধকরা যুগ যুগ ধরে আর্তি জানিয়েছে পরমাত্মার প্রতীক ধরে—

আমার হিয়ার ভিতর হ'তে কে কৈল বাহির !

অথবা

দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া। (চণ্ডীদাস)

রাধা-কৃষ্ণ, আশেক-মাশুক, ভক্ত-ভগবান, স্রষ্টা-সৃষ্টি, জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপেভাবে, সীমায়-অসীমে, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই ব্যাকুল মিলন প্রচেষ্টা আছে বলেই ব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ণ স্বাদ—তার জন্যেই এত ক্রন্দন, বিরহ, মৃত্যু। পূর্ণ অপূর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে, পুরুষ প্রকৃতির অনুষঙ্গ নিয়ে 'আনন্দ' পেতে চান। জীবের কর্তব্য এই আনন্দ বিধান করা। যে বাঁশী তিনি দিয়েছেন, যে পতাকা কাঁধে দিয়েছেন, তাকে বইতে হবে, পুষ্পের মত সংগীতগুলি আকাশ ভালে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই জীবজন্ম তথা মানব ধর্ম সার্থক, পূর্ণ, সুন্দর।

জ্ঞান কর্ম ভক্তির মারফত আমরা সেই পরম শক্তিকে পাই। প্রজ্ঞার আলোকে, অনুষ্ঠানের ভূমিকায়, আত্ম-নিবেদনের স্থৈর্যের মধ্য দিয়ে সুরে সুরে গানে গানে নিত্য বেদনার বাঁশী শুনে আকুল প্রতীক্ষায় দিনক্ষণ গুনি, নিত্য পথের পথীর তবু সাক্ষাৎ মেলেনা। যেন —

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে
আমার স্বরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে

জীবলীলার অভাব, বিরহ, ক্ষোভ বা বৈষম্যের পরি-সমাপ্তি হবে না কোন দিন। ব্যক্ত, সান্ত, সসীমের পক্ষে অসীম, অব্যক্ত অনন্তের রূপে রসে-গন্ধে লাবণ্যে অতৃপ্তির ছেদ পড়ে না। তাই মানব জীবনের অতৃপ্ত কামনা অশান্ত বেদনা ও চির আকুলতার অনুশীলন মত্ততা আজো ফুরোলনা।

যাকে পাওয়া যায়না তার নিমিত্ত তখন অন্য পন্থা খুঁজতে হয়। তার তৃপ্তি বিধান, তার শান্তি, তার হৃদয়াসুগ হয় এমন কোন বিষয় বৈভব আবিষ্কার করতে অপূর্ণ পূর্ণের নিকট আত্ম নিবেদন করে। শাশ্বত আনন্দময়ের আনন্দ চরিতার্থ করবার জন্যে সৃষ্ট জীব তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে আর কঁকিয়ে উঠে :

সেই সিরাজী তুর্কী বালা নেয় যদি মোর
এ হিয়ারে
তার এক তিলে বিলিয়ে দেবো সমরখন্দ
বোখারারে। (হাফিজ)

জীবের ধ্যান-জ্ঞান সাধনা, মান-অভিমান, অর্থ-বিলাস সকল কিছুর নিয়ন্তা হিসেবে মহান খোদার কাছে নতি-স্বীকার, কর্ম প্রেরণা ও কর্ম ফলের আশা-আকাঙ্খার মালিক বা প্রভু অদ্বিতীয় খোদার নিকট সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্তির চরম ফানা'র স্বীকারোক্তি নিয়ে বলে ওঠে সে :

আমি যন্ত্র তুমি গো যন্ত্রী
আমি মন্ত্র তুমি গো মন্ত্রী
আমি তন্ত্র তুমি গো তন্ত্রী
আর তো কিছু নয় গো।

(সিরাজী)

জীব আজীবন কর্মের মধ্যে তার জৈবিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চায়। পরম মঙ্গলময়ের নির্দেশ মাথায় করে প্রতিশ্রুতি পালন মানসে মানুষ স্বীয় ব্যক্তিক সত্তার উপলব্ধির ভেতর দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পুষ্টি বিধান করে ছুটে যেতে চায় মহাপ্রস্থানের পথে। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু 'নিজেকে জানতে' চায় প্রথমে ; তারপর পরস্পরকে জানার ভেতর দিয়ে পায় অজানাকে —তথা পাবার চেষ্টা করে। নিগূঢ় ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ সেই অরূপের প্রেম বৈচিত্র্যের জন্যে জীবের কামনা বাসনা মোহ মদিরা ; সবকিছুর ভেতর তবু না পাওয়ার বেদনা— অনুপলব্ধির অনুশোচনা। এমন করে জীব তথা মানুষ বাঁচেনা। অবলম্বন চাই একটা। সেই অবলম্বনই হলো প্রজ্ঞালোকের ব্যক্তি পুরুষের অনুসন্ধিৎসা। ঈপ্সা, আকাঙ্খা আর আসক্তির ব্যাপকতা দিয়ে খুঁজে পেতে নিতে চায় সে অজানাকে, আপনার জীবন দেবতাকে— আপনার স্বাধীন সত্তাকে। অনেক সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। জীব-জন্মের সীমিত অনুশীলনের দ্বারা অসীমের বিস্তৃত ভাবকে আয়ত্তাধীন করা অসম্ভব। দুস্তর ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাকে পেতে সাধক দরবেশ ফকীর আউলিয়া কত রকমে কত আবেগেই মিলনের চেষ্টা করেছে। তবু দূর শুধু নিকট থেকে দূরে যাচ্ছে অহরহ। দয়িত-দয়িতার

কত পূর্বানুরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, বিরহ—অপার অতল বিরহের অকূল জলরাশি। পরিশেষে ভাব সম্মিলনের 'মারফত' সহযোগে 'শরিয়তে' উন্নীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা।

কোন সাধনাই ব্যর্থ হয়না। কর্ম প্রেরণার পারস্পরিক শৃঙ্খল দিয়ে জীবের জয়যাত্রা সুরু। কর্মব্রত উদ্‌যাপন জীবের প্রধান ও প্রথম ধর্ম। সবিনয় সাধনায় ক্লান্তি শ্রান্তি বা ক্লৈব্য আসতে পারে। মধ্য দিনের আলোকে অথবা অনালোকে মুষড়ে যেতে পারে পেলব কোমল সাধনার পুষ্প। জীবনের প্রাচুর্য্যে যে স্রষ্টার আনন্দ বিধান করে যেতে পারতো, তাকে প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে অকালেই শুকে মরতে হয়। সর্ব গর্ব টুটে যায়, প্রতিশ্রুতির মহনীয়তা হয় অরক্ষণীয়া। ফুল পাখী নদী আত্মনিবেদনে সকল বাধা বিঘ্ন দুর্বার বেগে পিছে ফেলে আপন আপন পথে আপন আপন অনুভূতির রসে সিক্ত করতে চায় তাদের Elan Vital শক্তি। অতিলৌকিক পরিবেশের সকল ঐশ্বর্য্য পই পই করে খোঁজে তারা। ম্রিয়মান হয় তাদের অপূর্ণ সাধনা—অনাহত, অনাগত হয় বোধ। অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল বাসনা রাশি নিয়ে তবু তখন শুধু এই কথা বলে উঠে, এই বলে আর্তনাদ করে:

ভুল করে যদি এসে থাকি বন্ধু, ছিঁড়িয়া থাকি
মুকুল
আমার বরষা ফুটায়েছে তার
অনেক অধিক ফুল।
(চক্রবাক: নজরুল)

অসাধ্য সাধন করবার মানসিকতাই সকল অপূর্ণতা, স্খলন পতন, বিফলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিপূরক। এক জীবনে কারু পক্ষেই স্রষ্টার পরিপূর্ণ লীলা সঙ্গিনী সেজে তার আনন্দ বিধান করা দুঃসাধ্য। বঞ্চিত যখন ভক্তের এই আকুল ক্রন্দনধ্বনি শুনে অপারগ হয়ে নিজেও করুনায় বিগলিত হন, সেখানেই তো পরম ও চরম সার্থকতা লুক্কায়িত। বিরহ, দুঃখ, শোক, বিষন্নতার আয়াস সাধ্য পরিচর্য্যা দিয়ে তার মোহনমালার ফুল কুড়োতে হয়, বহ্নিদাহ নিয়ে তাঁর ফুলসেজ রচনা করে তবেই তাকে হৃদয়ে ঠাঁই দেওয়া যায়। তার স্রোতকে মুক্তি দিয়ে ভক্ত যদি নিজে স্রোতের তোড়ে ভেসে গিয়ে সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা-পাতার নীড় রচনার আবেশময় জগৎ বেঁধে দিয়ে যেতে পারে শুধু অপরাধ নিয়ে, সেখানেই তবে পূণ্যতীর্থ রচিত হতে পারে—নইলে নয়। ভক্তের ভাবনা:

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে—
নাকাসুন নিঃ।

সমুখের বানী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।
(রবি ঠাকুর)

দর্শনের অভিব্যক্তি হয় জীবনে। 'চলতা' শক্তির উদ্‌গাতা হিসাবে যত মনীষী পুরুষই যত কথাই বলুন না কেন তাদের মূল প্রেরণা ছিলো: গতিবাদ। এই গতিতে আছে সত্য, আছে সুন্দর। গতি থেকেই জীবনের উন্মেষ বিকাশ, বিলয়। গতিমানকে অনেক প্রকার দুঃখ-নিশার কারসাজিতে পড়ে পথ হাতড়াতে হতে পারে, তবু সে জানে:

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল।
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল॥

দুঃখ-বিরলম্ব বা ক্ষোভ-বিরহিত জীবন দেবতার জন্যে। কিন্তু মানুষ যে দেবতার চেয়েও বড়। তাই তাকে অন্তরের 'বোধি' দ্বারা খুঁজতে হয়—দুঃখ-দারিদ্র। অভাবের মধ্যে জীবনের তথাকথিত জীবনকে—জীবনের মৌল প্রেরণাকে। আত্মস্ফূর্তির বেদনা তার ভালো লাগে—ভালো লাগে কাঁটায় ঘেরা পথে চলতে। কারণ:

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথ চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা পথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

গ্যেটের মত: Life is action not contemplation। ধ্যান নয় কর্মই জীবন। অতি-সীমাবদ্ধ জীবনে নিতান্ত ক্ষুদ্র-পরিবেশে যার যেটুকু সাধ্য কর্ম করে যাওয়াই তার ধর্ম। জীবনের মূলমন্ত্র, আত্মার জ্ঞান, শুদ্ধি, নির্মলতা তাতেই নিহিত।

সৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকৃত্রিম কার্য্যকারিতা মুগ্ধ করে স্রষ্টাকে। রূপজগতের অক্লান্ত মুহূর্তগুলো ভিড় করে মহাকালের আরশিতে আপন আসন করে নিতে। কেউই উপেক্ষিত নয়, অবহেলিত নয়। সৌন্দর্যের ধ্যানী-তাপসের দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যে নির্মাল্য, তা অক্ষয় হয়ে থাকে মহাকালের মহামানবের জীবনের প্রতিটি স্তরে। পৃথিবীর পরতে পরতে সীমা-অসীমের ছন্দময় জীবন-রসে রসায়িত হয় প্রতিটি প্রেরণা, প্রতিটি সদিচ্ছা। উত্তর পুরুষ আসে: অনুপ্রাণিত হয় পূর্বসূরীর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে। আনুপূর্বিক সমতার সহায়তায় গড়ে ওঠে জাগৃতির সৌধ, মানুষের অতুল সৃষ্টি সুলভ মনোভাব কবীর তৃপ্তি পান তাতেই:

মন্দির ঝরোখে রাবটি গুল চমন মেঁ রহতে সকা।
কহতে কবীর হেঁ সাহী হরদম মেঁ সাহির রমরহা।
[যেখানেই থাকি প্রতি মুহূর্তে স্বামী আমাতে আত্ম ভাগ করছেন]

গগনেভুবনে, স্থলে-জলে সর্বত্র সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ণতাই পরিপূর্ণতার স্বাদ আনে। ব্যক্তিক, সামগ্রিক বা জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে এই দর্শনের অভিব্যক্তি শুধু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নয়—জাগতিক বা বস্তু-বিশ্বের সাধারণ প্রেক্ষনায় মধ্যে দিয়েও আমরা এ-ভক্তির যথার্থ নিরীক্ষণ করতে পারি। আপাত স্থূল অসমাপ্তির মধ্যেই সকল সমাপ্তির বীজ লুক্কায়িত থাকে—থাকে গঠনোপকরণ। আমাদের স্নেহে প্রেমে প্রীতিতে শ্রদ্ধায় বিরহে মিলনে এই বার্তা। ক্ষোভের চঞ্চলতায় আনে ভূমার স্পর্শসুখ, বিশ্বের তারে তারে বাজায় মহা সিদ্ধির রাগিনী, ভরে দেয় ধরনীর শ্যাম করপুট খানি। কারণ তার অন্তরদেবতা কাজ করছে। এক সুস্মিত প্রাণের মহাবেগভরা মহাজীবনের ইঙ্গিত নিয়ে :

এ-দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বানী।

●

এই দেশ—এই মানুষেরা

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

মায়ের বোনের আর মাটির মমতা দিয়ে গড়া
আমার স্বদেশ,
প্রাণের দরদ দিয়ে, হৃদয়ের ছন্দ ডোরে বাঁধা
আমার স্বদেশ ;
লক্ষ যুগ সাধনার স্বর্ণপ্রসূ নিত্য গতিশীল
আমার স্বদেশ :
তুমি আমি অনেকেই এ-দেশের সজাগ প্রহরী
এই দেশ চির মানুষের।
আকাশ সম্ভ্রমে নত এই মানুষের পদতলে
সমুদ্র গুটায় তার বিদ্রোহ নিশান ॥

মাটির মমতা আর আকাশের বজ্র দিয়ে গড়া
এই মানুষেরা,
হাঙর-বাঘের সাথে নিত্যদিন পাঞ্জা ধরে লড়া
কালজয়ী এই মানুষেরা—
জীবনের জঙ্গে যারা মানে নাই কোনো পরাভব
তারার আগুনে যারা অন্ধকারে কেটে গেছে পথ
প্রভাত যাদের নাম লিখে ধন্য সোনালী আখরে
তাদের বুকেতে ধরে গর্বিত এ-দেশ :

এই দেশ—তোমার আমার,
এই দেশে আর তার মানুষের মাঝে মরা-বাঁচা
কত আরামের !
কত না আরাম এর ছায়ায় মায়ায় পথ হাঁটা !

সুবিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে জীবনের যৌবনের আর
ছয়টি ঋতুর পাকে ফুল-ফসলের সমারোহ
কোথাও তো নেই—নেই ; এমন জীবন-বোধ আর
হৃদয়-গভীরে ডুবে হৃদয়ের এমন সন্ধান
কোথাও পাবেনা তুমি,
সব প্রাণ এক হ'য়ে সারা দেশ কথা কয়ে উঠে
সে-দেশ আমার দেশ—আমার স্বদেশ ॥

আবার সন্ধ্যায়, কী আশ্চর্য, দিবসের শ্রমক্লান্ত—
মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে জীবনের বলিষ্ঠ সংগীত !
সুরে সুরে পাড় ভাঙ্গে, পাড় গড়ে মেঘনা-তিতাস :
পদ্মার প্রমত্ত ঢেউ কেটে চলে সদাগরী নাও
এবং দু'তীরে তার রাত জাগে বিরহিণী বধু ;

নায়ের পালের হাওয়া বয়ে নেয় তাহার খবর—
আপন জনের কাছে !

ভাটিয়ালী মুর্শিদীর সুরে
ঘর-মাঠ ভরে উঠে, দিকে দিকে সবুজের হাসি :
একতারা হাতে নিয়ে শূন্য নভে উধাও বাউল।

পুঁথির আসরে, রাতে, জ্যোছনার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
নেমে আসে কোকাফের পরীদের রাণী !
সঙ্গে তার লাস্যময়ী লাল-নীল শত সহচরী,
যৌবনের ভারে নত ; আঁখি-ঠারে, ইতিউতি চায়,
চাঁদ-মুখে মুক্তো ঝরে, ভরে যায় সফেদ উঠোন,
সেই মুক্তো দুই হাতে লুঠ করে' ভরে রিক্ত ঝুলি—
বিমুগ্ধ শ্রোতার দল !

পরীদের নৃত্য শেষ হলে,
শাড়ীর শাসন-মুক্ত আঠারো বসন্ত দেহে ধরে
আসে কন্যা 'শামরোখ' 'মধুমালা' 'বদিওজ্জামাল' :
হরিণ চোখের বাণে পুরুষের কঠিন হৃদয়
মুহূর্তে শিকার করে চলে যায়। কিংবা 'সোনাভান'
'হাজার মণের গুর্জ্জ' হাতে নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে
হাঁক ছাড়ে, কেয়ামত ভ্রমে কাঁপে আলীর নন্দন :
শাবাশ, শাবাশ নারী,—প্রশংসায় মুখর আসর।

আকাশে সিঁদুরে মেঘ : মর্সিয়ার এই তো সময়।
অবাক এ-মানুষেরা আবার কখন্ চলে যায়—
সুদূর ফোরাত তীরে, সে-কথা জানেনা তারা নিজে।
আসুঁভরা চোখে চায় লোহুরাঙ্গা কাসেমের পানে,
সকিনার সাথে সাথে তারি শোকে কাঁদে মহফিল।
লালে লাল দুল্ দুল্ ফিরে আসে···কোথায় এমাম ?
তাঁবুতে মাতম উঠে : সে-মাতম হাওয়ার ঈথারে
প্রতি রাতে ভেসে আসে এই সব মানুষের মাঝে ;
গামছার খোঁট দিয়ে চোখ মুছে' দৃশ্যান্তরে যারা
হানিফার সাথী হয়ে লড়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে।

বিচিত্র আমার দেশ, বিচিত্র এ-দেশের মানুষ,
তুমি আমি সেই সব মানুষের উত্তর-সাধক।

দীনতায় মূহ্যমান নই, নুয়ে পড়িনা বজ্রেও
জীবন বিপন্ন জেনে কেঁদে ভরে তুলিনা আকাশ :
সকল বাধার মুখে লড়ে যাওয়া—আমার জাতির
মহান আদর্শ নিয়ে পথ চলি ঝড়ের নায়ক।
কন্টকে আকীর্ণ-পথ পেতে দেয় ফুলের জাজিম
আমাদের পদতলে ;

সুনিশ্চিত মউতের মুখে
আমরা নির্ভয়ে গাই প্রাণবন্ত জীবনের গান,
গান গায় এই দেশ, গান গায় এই মানুষেরা।

বালি ও ফেনা

[খলীল জীবরানের মূল "রুম্মাল্ ওয়া জাবেদ"-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ]

আবদুস্ সাত্তার

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কথারা সময়ের কারাগারে বন্দী নয়।
তুমি যখন কথা বলো কিম্বা কোনো কিছু লিখবার চেষ্টা করো,
সেই সবে সময়ের অভিজ্ঞতার জ্ঞান থাকা দরকার

কবি হলো সিংহাসন-চ্যুত রাজা।
ছাইয়ের প্রাসাদে বসে সেই ছাই থেকে
সুন্দর প্রতিমূর্তি গড়বার চেষ্টা করে।

কবিতার ভেতর আনন্দ, দুঃখ এবং বিস্ময় নিহিত;
কিন্তু অভিধান থেকে ফাঁক।
বৃথাই কবিরা তা'দের আত্মার গানের মাতাকে খোঁজে।

একবার এক কবিকে আমি বলেছিলাম:
'আপনি না মরলে আপনার কোন মূল্য আমরা বুঝব না।'
উত্তরে তিনি বললেন: উত্তম বলেছেন, নিশ্চয় মৃত্যুই সত্যের বিমূর্ত প্রকাশ।
যদি তুমি আমার মূল্য বুঝ তবে মনে রাখবে,
আমার জিহ্বার চেয়ে আকাঙ্খাই প্রবলতর বৃত্তি।

যদি তুমি সৌন্দর্যের গান গাও,
মরুভূমির শূন্য হৃদয়ে হলেও সেখানে যথেষ্ট শ্রোতা পাবে।

কবিতা এমন জ্ঞান যা' আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।
কবিতা এমন আনন্দ যা মনের মিষ্টি গান।
যদি আমরা মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারি,
সেই সঙ্গে তা'দের মনের গানও হতে পারি।
তা' হলে, সত্যি কথা বলতে কী, আমরা তখন আল্লার ছায়ায় বাস করি।

অনুপ্রেরণা সর্বদা গান গায়;
কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে না।

আমরা অনেক সময় আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ঘুম-পাড়ানী গান গাই,
যেন আমরাও সেই সঙ্গে ঘুমোতে পারি।

আমাদের সব কথাই রুটির টুক্‌রো মাফিক;
মনের ভোজ থেকে সেই সব বাইরে আসে।

চিন্তা কাব্যের পথে বাধার পাথর।

সেই সব চেয়ে বড় গায়ক
নীরবতায় যার সুরেলা গান।

তোমার মুখ খাদ্যে পরিপূর্ণ,
কী করে তুমি মধুর গান গাবে?

তোমার দু'হাত স্বর্ণে ভর্তি,
কী করে তুমি সেই হাত আশীর্বাদের জন্য উঁচু করবে?

তারা বলে: বুলবুল যখন মধুর গান গায় কাঁটা দিয়ে যেন তার বুক বিদ্ধ করে।
আমরা সকলেই একই পথের যাত্রী।
যখন এইরূপ ঘটে,
আমরা কী করে গান গাই?

প্রতিভা বসন্তের আগমনে ছোট্ট পাখীর গান।

নিশ্চয়, গতিশীল আত্মাও প্রয়োজনের হাত থেকে মুক্ত নয়।

পাগল তোমার আমার চেয়ে কম সঙ্গীতও নয়;
মাঝখানে কেবল যন্ত্রের তফাৎ।
কারণ সুরে সেটা খুব নিকৃষ্ট।

যে গান মায়ের অন্তরে সুপ্ত থাকে,
সেই গানই আবার তার সন্তানের মুখে গীত হয়।

কোন আশাই পৃথিবীতে অপূর্ণ থাকেনা।

আমি আমার দ্বিতীয় সত্তার সাথে সম্পূর্ণ একমত নই।
তার নিছক আনন্দ আমাদের মাঝেই বর্তমান।
তোমার দ্বিতীয় সত্তা সব সময় তোমার জন্য দুঃখিত।
কিন্তু এই দুঃখ থেকে সেটা ক্রমশঃ বাড়ে।
সুতরাং সবই ভাল।

যাদের আত্মা ঘুমন্ত এবং দেহ সুরহীন—
তাদের আত্মা ও দেহের মাঝে কোন যুদ্ধ নেই।

জীবনের গভীরে অনাবিল সৌন্দর্য বর্তমান ;
সেখানে প্রবেশ করলে সব কিছুই সুন্দর মনে হয়,
এমন কী যে চোখ সৌন্দর্যে অন্ধ, সেইটেও।

আমরা বেঁচে আছি সৌন্দর্য আবিষ্কারের জন্য,
বাকী অন্য কিছু প্রতীক্ষার নামান্তর।

পৃথিবীকে বীজ দাও,
পৃথিবী তোমাকে সুন্দর ফুল দেবে।
আকাশে তোমার স্বপ্ন ছড়িয়ে দাও,
আকাশ তোমাকে প্রেমিক জুটিয়ে দেবে।

যে দিন তোমার জন্ম হলো
সে দিনই শয়তানের মৃত্যু হয়েছে।
এখন তোমাকে ফেরেশতার দর্শন লাভের জন্য
দোজখে যেতে হবে না।

অনেক রমনীই পুরুষদের অন্তর ধার করে
কিন্তু রক্ষা করতে পারে খুব সংখ্যক রমনী।

যখন তুমি আকাঙ্খিত বস্তু পেয়ে গেলে,
আর বেশী কিছু দাবী করা তোমার উচিত নয়।
যখন পুরুষের হাত রমনীর হাত স্পর্শ করলো,
তা'রা দু'জনেই যেনো অনন্তের অন্তর স্পর্শ করলো।

ভালবাসা
প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝখানে এক যোগ সূত্র।

প্রত্যেক পুরুষ দুই জন রমনীকে ভালবাসে।
একজন তার কল্পনার সৃষ্টি,
দ্বিতীয়জন তখনও জন্মায়নি।

যে পুরুষ নারীকে ক্ষমা করতে জানে না
তার সামান্য ভুল মহৎ গুনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

ভালবাসা দৈনন্দিন রূপ না বদলালে
প্রথমে অভ্যাস পরে দাসত্বে পরিণত হয়।

প্রেমিকরা কেবল প্রেমের সাথেই আলিঙ্গন করে
থাকে, পরস্পরের মধ্যে নয়।
ভালবাসা এবং সন্দেহ পরস্পর বিরোধী।

ভালবাসা আলোর কথা,
আলোর হাতে, আলোর কাগজে অম্লান স্বাক্ষর।

বন্ধুত্ব মধুর দায়িত্ব ; সুযোগের অন্বেষন নয়।

সব অবস্থাতে যদি তুমি তোমার বন্ধুকে বুঝতে না পার
তা'হলে কখনো তাকে বুঝতে পারবেনা।

অন্যের তৈরী কাপড় তোমার সব চেয়ে-পছন্দ সই
পোষাক ; অন্যের প্রদত্ত বিছানাই তোমার সব চেয়ে
আরাম-প্রদ বিছানা।
এখন আমাকে বলতে পারো কী করে অন্য লোক
থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হবে ?

তোমার মন এবং আমার মন কখনো একমত হবেনা,
যে পর্যন্ত না তোমার মন অসংখ্যের মাঝে বাস করতে
ক্ষান্ত না হবে এবং আমার মন কুয়াশায়।

আমাদের পরস্পরকে বুঝতে হলে আমাদের ভাষাকে
সাত ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে।

আমার অন্তর না ভাঙলে অমোহর মুক্ত থাকবে কী
করে ?

গভীর দুঃখ অথবা গভীর আনন্দ
তোমার হৃদয়ের সত্য প্রকাশ করতে পারে।

নিজেকে প্রকাশ করার দুটো মাত্রই পথ।
হয় উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রে নাচতে হবে,
নইলে ধর্ম্মের পোষাক গায়ে জড়াতে হবে।

নদী যদি সমুদ্র না খোঁজে,
শীত যদি বসন্তে পরিণত না হয়,
আমরা যা বলি প্রকৃতির সেদিকে মনোযোগ দেওয়া
উচিত।
যদি প্রকৃতি মনোযোগ দেয় তবে আমরা সমুদ্র-সৈকতে
ফুটন্ত ফুলের খবর বলি ;
কিন্তু আমাদের ভেতর কয়জন এই হাওয়ার ঘ্রাণ
নেবে ?

তোমার পশ্চাত অংশ সূর্যের দিকে ফিরালেই তোমার
ছায়া তোমার দৃষ্টি গোচর হবে।

তুমি দিনে সূর্যের সম্মুখে স্বাধীন,
এবং রাত্রিতে তারকারাজির সম্মুখে স্বাধীন।
যখন সূর্য, চন্দ্র এবং তারকা থাকে না
তখনও তুমি স্বাধীন।
এমন কী সব কিছুর কথা মনে করে যখন তুমি
চোখ বন্ধ কর,
তখনও তুমি স্বাধীন।
কিন্তু যাকে তুমি ভালবাস
এবং কেবল মাত্র ভালবাসার জন্যেই তুমি তার কাছে
দাস।
তার কাছেও তুমি দাস যে তোমাকে ভালবাসে
কেবল মাত্র ভালবাসার জন্যে।

প্রাসাদের সদর দরজায় আমরা সকলেই ভিক্ষুক।
প্রত্যেকেই দাক্ষিণ্যের অংশ পাবার জন্যে উদগ্রীব,
রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করেন
অথবা প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।
কিন্তু আমরা যদি পরস্পর ঈর্ষাপরায়ণ হই
তবে সেইটেই রাজাকে তাচ্ছিল্য করার একমাত্র পথ।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত তোমার ব্যয় করা উচিত নয়।
রুটির অন্য অর্ধাংশ অন্য একজনের প্রাপ্য;
বাকী যদি সামান্য কিছু থাকে তা' হঠাৎ আসা অতিথির জন্যে।
যদি তা' অতিথির জন্যে না হয় তবে সমস্ত ঘরই কবরে পরিণত হবে।

একটা সদাশয় ব্যাঘ্র একটা মেষকে বললো:
'তুমি কী একবার আমার গৃহে দর্শন দিয়ে আমাকে সম্মান করতে পার না?'
মেষ বললো: সেই সম্মান যদি আপনার পাকস্থলির পূর্তি না হয় তবে আপনার গৃহে যেতে আপত্তি কী?

প্রবেশ পথেই আমার অতিথিকে নামিয়ে বললাম:
'না, প্রবেশ করার সময়ই আপনার পা পরিষ্কার করুণ,
অনুরূপ আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন।

সদাশয়তা যা আমার ভেতর নেই, তা তোমার চেয়ে আমার জন্যেই বেশী দরকারী। কিন্তু যদি আমার ভেতরে থাকে, তবে তা' আমার চেয়ে তোমার জন্যেই বেশী দরকারী।

দান করার সময় সত্যি তুমি দানশীল।
যখন মুখ ফিরাও তখন গ্রহণকারীর লজ্জা যেন দেখতে পাও না।

ধনী ও দরীদ্র।
মাঝখানে তফাৎ শুধু এক দিনের উপবাস ও কয়েক ঘণ্টার তৃষ্ণা।

অনেক সময় আমরা আগামী দিন থেকে কিছু ধার করে থাকি
অতীত দিনের ঋণ শোধ দেবার জন্যে।

ফেরেশ্‌তা ও শয়তানের সাক্ষাত পাওয়া আমার উচিত।
আমি তা'দেরকে এড়িয়ে চলি।
হঠাৎ যদি ফেরেশতার সাক্ষাত পাই,
তাঁর কাছে আদিম প্রার্থনা জ্ঞাপন করি,
তিনি এখন বিক্ষত।
আবার শয়তানের সাক্ষাত পেলে
মস্ত বড় পাপ করে ফেলি।
সে তখন পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

আপাততঃ এই কারাগার মন্দ নয়;
কিন্তু আমি আমার প্রকোষ্ঠ ও পরবর্তী বন্দীর প্রকোষ্ঠের দেয়াল পছন্দ করি না।
তথাপি তোমাকে অভয় দিচ্ছি,
কারাগারের প্রহরী ও তার নির্মাতাকে আমি গালি দেব না।

মৎস্য প্রার্থনা করলে যারা তোমাকে সর্প প্রদান করে,
সর্প ছাড়া তা'দের কিছু দেবার নেই।
এইটেই তা'দের পক্ষে সদাশয়তা।

ফাঁকি বাজি কচিৎ সফলতা পায়,
অধিকাংশ সময়ই এটা আত্ম-হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সত্যি তুমি ক্ষমাশীল;
কেন না যে খুন করে নাই সেই খুনীকে
যে চুরি করে নাই সেই চোরকে
যে মিথ্যা বলে নাই সেই মিথ্যাবাদীকে—
তুমি ক্ষমা করে দাও।

হাতের আঙুল দ্বারা যে ব্যক্তি ভাল ও মন্দকে বিভক্ত করতে জানে, সে যেন সেই আঙুল দিয়ে মহান আল্লার সুন্দর পোষাক স্পর্শ করলো।

তোমার অন্তর আগ্নেয়-গিরি;
কী করে তোমার হাতে সুন্দর ফুটন্ত গোলাপ আসবে?

অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চনা!
যখন আমি বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হই
এই নিয়ে অন্যেরা আমাকে ঠাট্টা করে,
কী জন্য আমি বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলাম তার কারণ আমি জানি না।

তাকে আমি কী বলবো
যে অনুসরণ কারীর অনুসরণ করে?

যে তোমার জামায় তার হাত পরিষ্কার করে, তাকে তুমি তোমার জামাটা দিয়ে দাও। এটা হয়তো পুনরায় তার প্রয়োজনে লাগতে পারে,
কিন্তু তোমার তা' নয়।

বড়ই আক্ষেপ,
দালালরা কখনো বাগানের রক্ষক হ'তে পারে না।

তোমার অর্জিত গুনাবলী দিয়ে সহজাত ভুলের চুনকাম করতে যেয়ো না।
আমার নিজের ভুল একান্ত নিজস্ব।

যে অন্যায় আমি করিনি, অধিকাংশ সময় তার জন্যে দায়ী হয়েছি।
অন্য লোকেরা এতে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে।

জীবনের মুখোশ গভীর গোপন রহস্যের মুখোশ।

নিজের জ্ঞান দিয়েই অন্যকে যাচাই করতে পার।
এখন আমাকে বলো, আমাদের ভেতর কে দোষী এবং কে নির্দোষী?

সেই একমাত্র ন্যায় বিচারক যে তোমার অন্যায় কার্যের জন্য নিজেকে অর্ধ-দোষী মনে করে।

নির্বোধ ও গুণীরাই মনুষ্য-রচিত আইন ভঙ্গ করে।
তা'রা কিন্তু আল্লার অন্তরের খুব কাছাকাছি থাকে।

অনুধাবন করতে গেলেই চঞ্চল হতে হয়।

আমার শত্রু নেই।
যদি আমার শত্রু হয়—
হে আল্লাহ্, তার শক্তি আমার শক্তির সমান করে দাও; সত্য আপনা আপনি জয়ী হবে।

মৃত্যুই শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব আনয়ণ করে।

আত্ম-প্রতিরোধই সম্ভবতঃ আত্ম-হত্যার কারণ।

বহুদিন আগে একজন মহামানবকে হত্যা করা হয়েছিল।
তিনি ছিলেন প্রেমময় ও মানুষকে অত্যধিক ভালবাসতেন।
তোমাকে সংবাদ দিতেই আমার কৌতূহল হচ্ছে,
আমি গত কাল তাঁর তিনবার সাক্ষাৎ পেয়েছি!
প্রথম বার: তিনি পুলিশকে বলতেছিলেন, সে যেন কোন বেশ্যাকে বন্দী না করে।
দ্বিতীয় বার: তিনি একজন সমাজ-চ্যুৎ ব্যক্তির সাথে মদ পান করছিলেন।
তৃতীয় বার: ধর্ম্ম-মন্দিরের ভেতর কথকের সাথে তিনি প্রথম দর্শন দিলেন।

তা'রা বললে: 'ভালো ও মন্দ উভয়ই সত্য।'
তা'হলে বলতে পারি, আমার সমস্ত জীবনই একটা লম্বা পাপ।

দুঃখ প্রকাশ অর্ধেক বিচার।

যে ব্যক্তি আমার উপর বিরূপ,
আমি তার ভাইয়ের উপর বিরূপ।

একজন মানুষকে কারাগারে নিতে দেখলে তুমি বলো:
'সম্ভবতঃ সে ক্ষুদ্র কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছে।'
একজন মানুষকে মদ পান করতে দেখলে তুমি বলো:
'সম্ভবতঃ সে আরও অসুন্দর কিছু থেকে মুক্তি খুঁজছে।'

অনেকবার আমি আত্ম-প্রতিরোধকে ঘৃণা করেছি;
যদি শক্তিশালী হতাম তা'হলে এই অস্ত্রধারণ করতাম না।

সে নির্বোধ।
কেননা সে মুখের উজ্জ্বল হাসিতে চোখকে ঘৃণা করে তালি দেয়।

যারা আমার চেয়ে নিকৃষ্টতর,
তারাই আমাকে ঈর্ষা অথবা ঘৃণা করে।
আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে ঈর্ষা কিম্বা ঘৃণা করে নাই;
আমি কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই।
কেবল মাত্র তারাই আমাকে প্রশংসা কিম্বা ঠাট্টা করতে পারে,
যারা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
আজ পর্যন্ত কেউ আমার প্রশংসা ও ঠাট্টা করে নাই;
আমি কারও চেয়ে নিকৃষ্ট নই।

তোমার বক্তব্য: 'আমি তোমাকে চিনতে পারি নি,'
এই কথা আমার মূল্যের চেয়ে প্রশংসা,
এবং একটা অপমান যা তুমি পছন্দ কর না।

আমি কত নীচ!
জীবন আমাকে স্বর্ণ দান করে,
আর আমি তাকে রূপো দিয়ে থাকি;
অথচ নিজেকে দানশীল মনে করি।

যখন তুমি জীবনের অন্তর-রাজ্যে পৌঁছে যাও,
নিজেকে গুরুতর অপরাধী ছাড়া বড় কিছু ভাবো না
অথবা পয়গম্বরের চেয়ে ছোট মনে করো না।

ধীরে চলমান ব্যক্তির জন্য তোমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত,
কিন্তু কখনো ধীর-মনা ব্যক্তির জন্য নয়।

সে মস্ত বড় অন্ধ ;
যেহেতু, সে তার থলে থেকে তোমাকে কিছু দিয়ে তার পরিবর্তে তোমার অন্তর থেকে কিছু গ্রহণ করতে চায়।

জীবন একটা চলমান কাফেলা।
ধীর গতি অতিশয় দ্রুততা পছন্দ করে এবং পা' চালায়।
আবার অতিশয় দ্রুত পদক্ষেপ ধীর গতি পছন্দ করে এবং পা চালায়।

যদি পাপের মত কিছু থাকে,
সে হলো আমাদের অনেকেই পশ্চাত দিক ফিরে
আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে অনুসরণ করে থাকে।
আবার আমাদের অনেকেই সম্মুখ দিকে চলে
সন্তানদেরকে পরাস্ত করে সেই পাপ করে থাকে।

বহু মন্দের ভেতর থেকেও যে পবিত্র থাকে
সেই ব্যক্তিই আসল মানুষ।

আমরা সবাই বন্দী ;
কারও কারাগারে জানলা আছে, কারো নেই।

আমরা সকলেই ন্যায়ের চেয়ে সমস্ত শক্তি খাটিয়ে ভুলের প্রতিরোধ করে থাকি। এটা খুবই আশ্চর্য কথা।

যদি আমরা সবাই পরস্পর পাপ স্বীকার করি,
আমরা পরস্পর হাসবো ;
যেহেতু আমাদের সবারই মৌলিকত্ব কম।
যদি আমরা সবাই নিজেদের গুণ প্রকাশ করি,
তা'হলে আমরা একই শরণে হাসবো।

একজন মানব যে পর্যন্ত না মানব রচিত নীতির
বিরুদ্ধে অন্যায় করে, সে মানব রচিত আইনের উপরে।
তার পরে সে কারও উপরেও নয়, কারও নীচেও নয়।

রাজা হলো
তোমার আমার মাঝখানের এক স্বীকারোক্তি।
তুমিও আমি অনেক সময় ভ্রান্ত হতে পারি।

অন্যায়ের অপর নাম প্রয়োজনীয়তা
অথবা রোগের এক চিহ্নও বলা যেতে পারে।

যদি কেউ তোমাকে ঠাট্টা করে
তুমি তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে পার ;
যদি তুমি তাকে ঠাট্টা করো
তা' হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পার না।

অন্য কেউ যদি তোমাকে আঘাত দেয়,
তুমি সেই আঘাত ভুলে যেতে পার ;
কিন্তু তুমি যদি তাকে আঘাত দাও,
চির দিন তুমি স্মরণের আকর হয়ে থাকবে।
সত্য কথা বলতে কী অন্যলোক অনুভব পূর্ণ দ্বিতীয় দেহ।

তখন তুমি কত উদাসীন,
মানব গণ তোমার পাখায় উড়ে
অথচ তুমি তাদেরকে পালক দিতে পারনা।

একদা একজন লোক
আমার পাশে বসলো,
আমার রুটি ভক্ষন করলো,
আমার শরাব পান করলো,
এবং আমাকে ঠাট্টা করে চলে গেলো।
আবার সে রুটি ও মদের জন্য আসলো,
আমি তাকে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করলাম।
ফেরেশ্তারা আমাকে ঠাট্টা করলেন।

ঘৃণা মৃত বস্তু ; কে এর সমাধি স্তম্ভ হবে ?

নিহিত ব্যক্তির এইটাই সবচেয়ে সম্মানের কথা,
সে খুনী নয়।
মানুষের উপযুক্ত বক্তৃতা-মঞ্চ তার নীরব হৃদয় ;
বাচাল মন নয়।

তারা আমাকে পাগল সাব্যস্ত করলো
কারণ আমি আমার দিন গুলোকে স্বর্ণের মূল্যে বিক্রী করি নাই।
আমি তাদেরকে পাগল সাব্যস্ত করলাম
কারণ তারা মনে করে যে আমার দিনের মূল্য আছে।

তারা আমাদের সম্মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিল,
আমরা ছড়িয়ে দিলাম আমাদের হৃদয় এবং আত্মা।
তথাপি তারা নিজেদেরকে মনে করলো অতিথি-সেবক
আর আমাদেরকে অতিথি।

আমি তাদের কাছে ছোট হতে ভালবাসি ;
কেননা তারা আমার স্বপ্নে ও ইচ্ছায় সুখী হয়।
আমার তা'দের কাছে বড় হতেও ইচ্ছে নাই
যাদের জন্য আমার স্বপ্ন ও ইচ্ছা বর্তমান নয়।

মানুষের মধ্যে সেই সবচেয়ে ঘৃণার্হ
যে তার স্বপ্নকে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত করে।

একটি দুর্ঘটনা

মূল : মাহমুদ তৈমুর
অনুবাদ : কাজী মাসুম

[মাহমুদ তৈমুর মিসরের জনপ্রিয় গল্প লেখক। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মিসরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের সকলেই সাহিত্য ও শিল্পের জন্য বিখ্যাত। তাঁর পিতা তৈমুর পাশাও একজন উঁচুদরের লেখক ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার মিসরে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ভাণ্ডার বলে খ্যাত। মাহমুদ তৈমুরের ফুফু আয়েশা ইসমত তৎকালীন আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ছিলেন—যখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা কড়ে আঙুলে গনা যেত। তিনি আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায়ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর বড় ভাই—যাঁর অকালমৃত্যু হয়েছে—তিনিও আরবী সাহিত্য ও কথা শিল্পের একজন বড় সমঝদার ছিলেন।

মাহ্‌মুদ তৈমুর আরবী গল্প লেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনি তাঁর ছোট গল্প মারফত ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন, তাদের সংগঠন এবং একে-অপরের জীবনকে গভীরভাবে জানবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। একবার আমেরিক্যান ইউনিভারসিটি কায়রোর প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডাঃ কিরোমত স্কুনোফর পণ্ডিত ও সাহিত্যিক সমাজের নিকট নতুন আরবী সাহিত্যের পুস্তক সম্বন্ধে রায় চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যুত্তরে তিনি জানতে পারলেন যে, মাহমুদ তৈমুর মিসরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক এবং তাঁর উপন্যাস "ঝড়ের মুখে সলওয়া" (সলওয়া একটি মেয়ের নাম) সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থের টিকাও তিনি বের করেছিলেন। তাতে গল্প লেখকের শিল্পচাতুর্য ও তার সৌন্দর্যের সমালোচনা ছিল। সেই টিকা জার্মান ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মাহমুদ তৈমুরের অনেক গল্প প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মাহমুদ তৈমুরের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ এবং বাস্তবধর্মী। তাঁর কাহিনীতে জনগণের অভিব্যক্তি প্রকট। তিনি অধিকাংশ গল্পে আরব বেদুইন ও মিসরীয় পল্লী অঞ্চলের লোকের ছবি এঁকেছেন। তিনি গ্রাম্য মিসরীয়দের দোষ-ত্রুটিরও রসালো সমালোচনা করে থাকেন। যদিও প্রচার ও সমালোচনাই তাঁর গল্পের প্রাণ, তবু তিনি প্রাচীন মিসরের রাণী ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধেও দু'টি ব্যঙ্গ গল্প লিখেছেন। প্রথম গল্প "ক্লিওপেট্রা খলিলী সরাইতে" দ্বিতীয় গল্প "বাজারে ক্লিওপেট্রা"। মাহমুদ তৈমুরের "ঝড়ের মুখে সলওয়া" বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি তাতে মিসরের ধনিক সমাজের বিলাসিতাকে নগ্ন রূপে তুলে ধরেছেন। এ-ছাড়া তাঁর আরও অনেক উপন্যাস ও নাটক রয়েছে।—অনুবাদক]

আমি প্রায়ই জমিজমা দেখাশোনার জন্য গ্রামে আসতাম। গ্রামেই শেখ এসাফ নামক একটি লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে জাতিতে তাঁতী ছিল। আমি কয়েকবার তার বাড়ীতে কাপড় বোনা দেখতেও গিয়েছি। আমাকে দেখেই সে আনন্দে নেচে উঠত এবং তার গ্রাম্য চায়ের এক পেয়ালা আমাকে দিয়ে প্রতিবারই আপ্যায়িত করত।

শেখ এসাফ সৎ ও মিষ্টভাষী ছিল। তার দাড়ি কামানো ছিল এবং মাথার চুল একেবারে সাদা ছিল না। কয়েক বছর আগেই তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু সে একমাত্র পুত্র তার স্মৃতিস্বরূপ রেখে গিয়েছিল। এই পুত্রই বংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারী; তাই তাকে সুশিক্ষা দেওয়া এবং নিজের ব্যবসায় শিখানোর জন্য তার পিতা সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করত। এমন কি ছেলেটাও জাত ব্যবসায়ে দক্ষ হয়ে বাপের কর্মসঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। দেখতে শুনতেও অতিশয় সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ছিল ছেলেটা। তার দু'চোখে প্রতিভা ও দৃঢ়তার ছাপ ছিল। এই সব গুণাবলীর জন্য তার বাপও তাকে অপরিসীম স্নেহ করত এবং প্রায়ই তার ছেলের গুণাবলী গর্বিতভাবে সকলকে শুনাতো।

একবার যখন আমি পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে এসাফের গ্রামে পৌঁছলাম তখন একটা মর্মান্তিক খবর শুনতে পেলাম। আমার মন সেই জন্য বিষাদে ভরে গেল। আমি শুনতে পেলাম যে, শেখ এসাফের একমাত্র পুত্র রেলের চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। এই দুঃসংবাদ শোনার পরই আমি সান্ত্বনার জন্য তার বাড়ীতে গেলাম। চিরাচরিত নিয়মে শেখ এসাফ আমাকে অভিনন্দন জানালো এবং সেই গ্রাম্য চা পরিবেশন করল। তখনও সে তার কাজ করছিল। কিন্তু তার কাজ যেন প্রাণহীন যন্ত্রচালিতের ন্যায় মনে হচ্ছিল। তার চেহারাও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল অনেক চেষ্টার পর সে কয়েকটা শব্দ চয়ন করে আমাকে বলেছিল। আরও উত্তম আলোচনার প্রসঙ্গ সে সন্ধান করতে করতে নিজের

অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অথচ এই লোকটার কথা বলার ভঙ্গী এবং মিষ্টভাষিতা সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আমি নির্বাক, অবচেতন, স্মৃতিভ্রংশের লক্ষণও দেখলাম। কেননা সে মাঝে মাঝে ভীত হয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল এবং জিগ্যেস করছিল: "আমি কি বলেছি, আর এখনই বা কি বলছি?" একথা বলার পর অতি কষ্টে সে তার আলাপের গতি বজায় রাখছিল। অতএব, কয়েক মুহূর্তেই বিবরণ শেষ করলাম এবং আমিও নিঃশব্দে তার সাথে করমর্দন করে বিদায় নিলাম।

এই ঘটনা অনেক দিন আগে অতীত হয়েছে। তবুও আমি যখনই গ্রামে যাই শেখ এসাফের সংবাদ নিয়ে থাকি। সে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল তাই আমি তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য কিছু সময় সেখানে কাটাতাম। কিন্তু আমার দুঃখ হত এই দেখে যে, তার স্বাস্থ্য ক্রমাগত খারাপ হয়ে পড়ছে। তার পরিধেয় বস্ত্র ময়লা ও ছেঁড়া এবং সে সকলের সাথেই নিস্পৃহও বিরক্তির সাথে আলাপ করত। তার তাঁতখানার যন্ত্রপাতি সব ধূলি মলিন ও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কোথায়ও মাকড়সা জাল বিছিয়েছিল। আর এই ব্যাপার দেখে আমার দুঃখ হল যে, তার আর্থিক অবনতি ঘটেছে, গৃহপালিত পশুপক্ষী সব বিক্রি করে দিয়েছে, তার বাসগৃহ যেন শূন্য কবরস্থান—যেখানে মৃতেরও বাস করা অসাধ্য।

শেখ এসাফ আমার সাক্ষাতের প্রতিদানে আমার বাড়ীতেও এল; কিন্তু এখানে এসেও সে মুখ নীচু করে বসে রইল। সম্পূর্ণ উদাস ভাবে। সে তার ছেলের কথা একবারও উল্লেখ করল না।

একবার আমার কাছে এসে চা-পানের পর মাথা তুলে আমাকে বলল: "আপনি বলতে পারেন, যে ব্যক্তি রেলের চাকার নীচে পড়ে তার কতদূর কষ্ট হয় এবং কত যন্ত্রণা সে পায়?"

এই বিচিত্র প্রশ্ন শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। তবুও আমি আমার মানসিক সন্দেহ নিরর্থক গোপন করলাম এবং উত্তর দিলাম: "আমার ধারণা এই যে, তার কোন অনুভূতিই তখন থাকে না; কেননা সে অতি শীঘ্রই মারা যায়।"

এ কথা শুনে সে জোরের সাথে বলল: "আমার মনে হয় যে, তার অপরিসীম যন্ত্রণা হয়।" এ কথা বলার পরই তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ দুটো লাল হল। ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠল এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। এই প্রাণান্তকর অবস্থা কিছুক্ষণ তার উপর স্থায়ী রইল। পরক্ষণেই সে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হল।

এরপরও কয়েকবার আমি গ্রামে গিয়েছি। শেখ এসাফের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল, কয়েক পা চলবার পরই শ্রান্ত হয়ে পড়ত আর সব সময় চুপচাপ বসে থাকত। অপর এক সময় আমি স্বগ্রামে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করলাম; কিন্তু শুধু সেই রাত্রে যার পরদিন সকালেই শহরে ফিরে যাবার কথা শেখ এসাফ আমার কাছে এল। সেই সময় আমি বাগিচায় একা বসেছিলাম। শেখ এসাফ সালাম করার পর আমার সামনে বসে পড়ল। পথ চলার শ্রমে সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে হাঁপাচ্ছিল। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে আমাকে বলল: "আমি আপনার কাছে একটা দরকারী কাজে এসেছি, আপনি কি আমার কাজটি করে দেবেন?" আমি ভাবলাম, লোকটা হয়ত অভাবে পড়েছে। তাই বললাম: "শেখ এসাফ, তোমার যত টাকার দরকার, আমি দিতে প্রস্তুত।" এ-কথায় সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল এবং পরে বলল: "আমার টাকা-পয়সার কোন দরকার নেই।"

"তবে কি চাও?" আমিও আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম।

"আপনি কি আগামী কাল আমাকে সাথে করে শহরে নিয়ে যেতে পারেন?"

তার কথায় আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। আর আমি তার কথার কোন জওয়াব দিলাম না। সে একটু নিরস হাসি হেসে বলল: "আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, একটু দুনিয়াটা ঘুরে দেখি, ভ্রমণ করি। অর্থাৎ খোদার সৃষ্ট জীব ও বড় বড় শহর দর্শন করি। যেমন, প্রথম জীবনে আমি একবার দেখেছিলাম। আমার কথা কি অশোভন হয়েছে?"

সে প্রচুর গাম্ভীর্য ও স্থৈর্যের সাথে বলল। তার কথা-বার্তায় প্রথম জীবনের আনন্দ ধারা ঝরে পড়তে লাগল। তারপর সে আমার হাত ধরে বারবার অনুনয় করতে লাগলো। বলল: "আপনি আমার এই অনুরোধটা রাখবেন কি?"

তার কথার আন্তরিকতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা দেখতে পেলাম, তাই আমি বলতে বাধ্য হলাম: "যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।"

এ-কথা শুনে তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আমি আপনার সাথে গিয়ে খুব আনন্দিত হব।"

এরপর সে তার সাবেকী দিনের কাহিনী শুনাতে লাগল। এ-সব কাহিনী অনেক কাল পরে তার মুখে

শুনলাম—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম এই কাহিনীগুলো। আমার মনে হচ্ছিল, সে যেন কোন মূল্যবান উপহারের সামগ্রী থেকে মরচেগুলো সরিয়ে দিয়ে তাকে ঘষে চকচকে করছে। কিন্তু তার এই আনন্দোচ্ছল ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী রইল না। পরক্ষণেই সে উদাস হয়ে পড়ল। তাই আমি তাকে বাড়ী যেতে বললাম এবং সে আমাকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ও আমার সাথে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় হল।

পরদিন সকালে দুই খচ্চরের গাড়ী আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ীর কোচোয়ান একজন চাষী। তার গায়ে চাদর ছিল এবং হাতে লম্বা হালকা একটা কাঠের টুকরো ছিল—যা চাবুকের কাজে ব্যবহার করত। আমি আর আমার ক্ষেতের চৌধুরী গাড়ীতে বসে শেখ এসাকের অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর চৌধুরী বলল: "আমার মনে হয়, লোকটা আসবে না। তার অপেক্ষায় শেষে গাড়ী ফেল না হয়ে যাই আমরা।"

"হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।"

আমি কোচোয়ানকে গাড়ী চালাবার হুকুম দিলাম। হঠাৎ আমরা একজনকে শ্রান্ত ক্লান্ত স্বরে চীৎকার করতে শুনলাম—সে আমাদের ডাকছিল, জানা গেল যে লোকটা শেখ এসাক—সে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল। সে আমাদের দাঁড়াতে ইশারা করল। সুতরাং আমরা গাড়ী দাঁড় করালাম। একটু পরেই শেখ এসাক উঠি-পড়ি করে দৌড়ে এসে গাড়ীতে উপবেশন করল এবং ভগ্নকণ্ঠে বলল: "হায়! এই সুযোগটাও আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল!"

রাস্তায় সে আলাপ করবার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হল। কেননা তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত ছিল। আর এক প্রকার আত্মভোলা ভাব বিরাজ করছিল তার দৃষ্টিতে। কখনও কখনও অজ্ঞাতে সে কেঁপে উঠছিল। যেন তার জ্বর হয়েছে। অবশেষে ষ্টেশনে পৌঁছলাম আমরা এবং গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে সময় আমি তার মুখের অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপছিল। গাড়ী আসার আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব ছিল। একথা শুনে শেখ এসাক মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করল এবং বলল: "চলুন, আগে যাই।" এখন আমরা প্লাটফরমের উপর পৌঁছে গেলাম। একটু পরই গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণে ইঞ্জিন একজন বিজয়ী সৈনিকের মত তার দলবল সহ এগিয়ে এল। আমি কুলির সাথে মালপত্র উঠাতে ব্যস্ত ছিলাম। অকস্মাৎ এক মর্মভেদী চীৎকার শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জমে গেল এবং ভীড়ের মধ্য হতে কে যেন বলছে: "লোকটা গাড়ীর চাকার তলে পিষ্ট হয়ে গেছে দেখছি।"

আমিও ভীড়ের দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম গাড়ীর চাকার নীচে রক্তস্রোত বইছে আর কোন ব্যক্তির দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখার পর আমি শেখ এসাককে খুঁজলাম; কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আদম খাঁর গীত

চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর, সাহিত্যভূষণ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

এই না কথা ভাবি রে
অলি নিয়ামত বিবি রে
কৈবার লাগৈন আদম খাঁর আগে রে।
ডিংগা ভাসাই আনছ বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
এতে কুছু না হৈল বেটাগিরি।
দেওজাতি ঘোড়া বা
আস্তাবলে আছে বা
তারে যদি দৌড়াই আনতায় পার রে।
ঘোড়া যদি পার বা
দৌড়াইয়া আনতায় বা
তবে যাইবায় ভাটিপুর ছয়লাবে রে।
এ রে শুনি আদম খাঁ
আস্তাবলে গেলা বা
২০ মণি লোহার কেওড় উষ্ঠায় ভাংগিল রে।
কেওড় ভাংগিয়া বা
আস্তাবলে হামায় (১) বা
হামাইয়া নিরখিয়া চায় রে।
দেওজাতি ঘোড়া বা
খাড়া হৈয়া আছে বা
আগ হাতে পিঠ লাগাল না মিলে রে।
লটকালটকি করি বা
জিন গাদ্দি লাগাইয়া বা
উঠিয়া বৈসে 'হাওই ঘোড়া'র পিঠে রে।
ঘোড়ার উপর উঠিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
চাবুক মারে এইনা ঘোড়ার পিঠে রে।
বাড়ি (২) খাইয়া ঘোড়া বা
শূন্যে উড়া করল বা
পলকে উঠে দুই মাইল উপরে রে।
উপরে উঠিয়া বা
সোনার গাউর উপরে বা
হাওই ঘোড়া শূন্যেতে ঘুরায় রে।
দেশের যত মানু বা
ছাবাল কিবা বুড়া বা
বাইর অইয়া আজব তামসা দেখে রে।

দুই পাক দিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
ঘোড়ার লাগাম ধরিল খেচিয়া রে।
দুই পাক দিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
লামায় ঘোড়া নিজ বাড়ীর উঠানে রে।
ঘোড়া যে লামাইয়া বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
ঘনে ঘনে ডাকৈন আপন মায়ে রে।
অলির নিয়ামত মাই গো
বাইর হৈয়া দেখ গো
পুত আইছৈন ঘুড়িয়া দৌড়াইয়া রে।
অলির নিয়ামত বিবি বা
বাইর হৈয়া দেখি বা
দেখি বিবি ভাবৈন মনে মনে রে।
বাপের ঘরের বেটা বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
ওইছে বেটা রাখব বাপের নাম রে।
এই বেটা যদি বা
শ্রীপুর যায় বা
কি কাম করব আল্লায় জানে তারে রে।
কৈল শুন আদম খাঁ
সাবাস বাপের বেটা বা
গোছল কার খানা খাও আসিয়া রে।
ভাটিপুরা যাইবায় বা
গারধর মাঝি রে বা
খবর দেও ডিংগা সাজাই আনতে রে।
এ কথা শুনিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
ছাউলিয়া পুলা (৩) বুলাইলা (৪) হুজুরে রে।
শুন ছাওলিয়া পুলা বা
জলদি (৫) করি যাও বা
গিয়া কৈবায় গরিধর মাঝিরে রে।
ডিংগা সাজাই লৈয়া বা
জলদি করি আইতা বা
যাইবাম আমি শ্রীপুর মামুর বাড়ী রে।

---

(১) প্রবেশ করে (২) আঘাত (৩) খবরিয়া (৪) ডাকাইয়া আনিল। (৫) শীঘ্র

ছাউলিয়া পুলায় শুনিয়া (৬) বা
দৌড়ে ধাপে চলে বা
হাজির হইল গরিধরের বাড়ী রে।
গরিধরের বাড়ী বা
ছাউলিয়া পুলা গিয়া বা
ঘনে ঘনে ডাকে গরিধর মাঝিরে।
এক ডাক দুই বা
তিন ডাক দিতে বা
শুনে গরি ভিতর বাড়ী থাকিয়া রে।
গরিধর শুনিয়া বা
ফুলি ফুলি উঠে বা
কোন্ বান্দীর পুতে মোরে নাম ধরিয়া ডাকে রে।
এক ডাকতে পারে বা
বিরধ মাই বাপে বা
আর পারে গুরু আর উস্তাদে রে।
আর ডাকতে পারে বা
দেওয়ান বা আদম খাঁ
জোরে সোর ডাকতে পারে আদম খাঁর
ছাউলিয়ায় রে।
চারির বাড়া পাঁচ বা
কেও যদি হয় বা
বলি দিমু চণ্ডি ভাংগা থালে রে।
ঘর থনে বারৈয়া বা
গরিধর মাঝি বা
কে ডাকিল তকিত করি চায় রে।
গরিধর মাঝি বা
তকিত করি দেখে বা
খাড়া আছে আদম খাঁর ছাউলিয়া রে।
ছাউলিয়ারে দেখিয়া বা
গরিধর জিকায় বা
কিবা হুকুম আনছ ছাউলিয়া ভাই ওরে।
ছাউলিয়া বলে মাঝি বা
ডিংগা লইয়া যাইতায় বা
যাইতা দেওয়ান ভাটিপুর ছয়লাবে রে।
গরিধর শুনিয়া বা
মনে খুশী হইলা বা
দেখি আইবা (৭) বাপদাদার ভিটা রে।
গরিধর মাঝি বা
ডনকায় বাড়ি দিলা বা
চলি আইলা দুই হাজার দাড়ি রে।

দাড়ি সবে কৈন বা
কেনে ডাকলায় মাঝি বা
জলদি করি কহিবায় বুঝাইয়া রে।
গরিধর কয় বা
শুন শুন দাড়ি বা
সাজাও ডিংগা ত্বরিত করিয়া রে।
শুন শুন দাড়ি বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
যাইতা দেওয়ান শ্রীপুর মামুর বাড়ী রে।
দাড়ি মাঝি শুনিয়া বা
ডিংগা সাজায় হকলে বা
যাইতা সবে ভাটিপুর সয়লাবে রে।
পরথমে ডিংলায় বা
সাজাইয়া লইল বা
নাম তার 'আউল ঝাউল' রে।
ধান আর চাউল বা
এই ডিংগায় তুলিয়া বা
সাজায় ডিংগা নামে 'হুরুমুরু' রে।
এমন মোটা ডিংগা বা
তার গোড়ার তলে বা
নির্ভয়ে বাথে দৌড়ায় গরু রে।
এই ডিংগার মাঝে বা
গরু ছাগল তুলিয়া বা
সাজায় ডিংগা নামে 'থলই পেটী'।
এইমতে দাড়ি বা
বার ডিংগা সাজাইয়া বা
চলি গেলা যার যার বাড়ী রে।
গরিধর মাঝি বা
বাড়ীত আইয়া দেখে বা
৮০/০ মণ চাউলের ভাত রান্ধি থৈছে মায়রে।
গরিধর মাঝি বা
ভাতরাজি দেখিয়া বা
সিনান করতে চলিলা ত্বরিতে রে।
এক পুরা (৮) হইরো (৯) বা
মুঠিত করি লৈল বা
চলি গেলা লমলম্বা সায়রে রে।
লমলম্বার পারে বা
গরিধর গিয়া বা
মুঠির হইরোও দিলা এক চিপা রে।

(৬) শুনিয়া (৭) আসিবা (৮) ওজনের পাঁচসের (৯) সরিষা

মাথার উপরে তুলিয়া বা
চিপা যবে দিলা বা
তেল বাইয়া পড়ে সর্ব গায় রে।

গরিধর মাঝি বা
তেল গায়ে দিয়া বা
ঝাঁপ দি' পড়ে লমলম্বা সায়রে রে।

সায়রে পড়িয়া বা
গাও মর্দন করিয়া বা
ডুব দি' মাঝি উঠলা যে পারে রে।

পারেতে উঠিয়া বা
৮০ হাত ধুতি বা
পিন্দে গরি 'উবা লেমটি' করি রে।

বাড়ীত আইয়া গরি বা
১০ মণি পীড়ায় বা
বয় (১০) গরি ভাত যে খাইতে রে।

৮০ মণ চাউলের ভাত বা
লহমার মাঝে খায় বা
চায় গরি মায়ের মুখ পানে রে।

শুন শুন মাই গো
কি ভাত খাওয়াইলায় গো
পেটের মোর না ভরিল পুরা রে।

এরে শুনি তান মা
আধ মণ চিড়া বা
দিলা আনি গরির সাক্ষাতে রে।

দই চিড়া মাখিয়া বা
গরিধরে খায় বা
খাইয়া খাইল ৮০ ঘড়া পানি রে।

খানা সারি গরি বা
আড়াই সের গুয়া বা
আর দিল 'আড়াই বিড়া' পান রে।

আস্তা আস্তা গুয়া বা
আস্তা আস্তা পান বা
মুখে দিয়া গালে 'আটাই' থইল রে।

শত মণি বৈঠা বা
কান্দেতে লইয়া বা
ডিংগায় গিয়া ধরিল কাড়ার রে।

কাড়ারে বসিয়া বা
গরিধর মাঝি বা
আস্তে আস্তে গুয়া পান চাবায় রে।

আস্তে বৈঠা টানে বা
আস্তে গুয়া চাবায় বা
ধীরে ধীরে ডিংগা ভাসিয়া চলে রে।

পান কিনি খাইতে বা
আদম খাঁর ঘাটে বা
গিয়া ডিংগা পৌছিল যখন রে।

ঘাটে ডিংগা থৈয়া বা
গরিধর মাঝি বা
চলি গেলা আদম খাঁর বাড়ী রে।

গরিধরে দেখিয়া বা
অলির নিয়ামত বিবি বা
কৈবার লাগৈন বুঝাইয়া সুজাইয়া রে।

ছাবাল মোর আদম খাঁ
মামুর বাড়ী যাইতা বা
শুন শুন দাদারকালি মাঝি রে।

আপাংরা (১১) মন বা
সয়ারীচিতি (১২) রাখবায় বা
জলদি জলদি লৈ আইবায় ফিরাইয়া রে।

অলির নিয়ামত বিবি বা
আল্লার নাম না লয় বা
বেজার হৈলা তক্তের আল্লাজি রে।

গরিধর মাঝি বা
দেওয়ানরে লৈয়া বা
পাড়ি দিলা ভাটিপুর সয়লাবে রে।

---

(১০) বসে (১১) শিশুহেন মন (১২) সামালিয়া

বাঁকে বাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সতর ॥

আশরাফ আসিলে হাসান মোহাম্মদপুর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আশরাফ খুশীতে লাফাইয়া উঠিল। সে উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, সাহস করে বলতে পারিনি, তা না হলে কতবার ভেবেছি এ-সৌভাগ্য কি আমাদের হবে না? আমি এখনই চলে যাচ্ছি। আপনাদের জন্য এন্তেজাম আয়োজন—

হাসান বাধা দিয়া বলিলেন, না, না, কোন এন্তেজাম আয়োজন নয়, এমনি আমরা যাবো।

আশরাফ হাসিয়া বলিল, তাই হবে। মনে মনে বলিল, সে আমি দেখবো। সে বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কখন কি হইয়া যায়, বলা ত যায় না। কাজেই যা করিতে হয় তাড়াতাড়ি করাই ভাল।

আশরাফকে নিভৃতে পাইয়া তহমিনা বলিল, চাচা নানা যেতে চান যান, আমি যাবো না।

আশরাফ বলিল, কেন মা?

তহমিনা বলিল, গাঁয়ের কাদামাটি আমার ভাল লাগবে না। শহর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না।

আশরাফ অবাক হইল। মেয়েটিকে সে গত আট বছর হইতে দেখিয়া আসিতেছে! এ-কথাগুলির সহিত তাহার যেন মিল নাই। আশরাফ হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, মা'টির আবার অভিমান হয়েছে। কিন্তু কেন, মা?

তহমিনা বলিল, অভিমান আবার কার উপরে হবে চাচা। আমি সত্যি কথা বলছি।

আশরাফ বলিল, অভিমান নিশ্চয়ই হবে মা। একশ বার তুমি অভিমান করবে। কবে তোমাকে আমরা নিয়ে গেলাম যে, আজ তুমি হুট করে চলে যাবে? তবে আমাদের শত অপরাধ হলেও ত, মা, তোমাকে তা মাফ করতে হবে।

তহমিনার কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি মিলাইয়া গেল। সে বলিল, না, না, চাচা, এভাবে বলবেন না। হাজার হলেও আমি আপনাদেরই মেয়ে। আমাকে যা হুকুম করবেন, তা করবো।

আশরাফ হাসিয়া বলিল, লক্ষী মা'টি আমার!

আশরাফ চলিয়া গেল। তাহার অনেক কাজ। হাসান সাহেব তাহাদের গাঁয়ে তশরিফ নিবেন, এ সুযোগকে সে বৃথা যাইতে দিতে পারে না। এই অবকাশে নূতন কর্ম্ম-মুখরতা সৃষ্টির জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। পল্লী মঙ্গল সমিতির তরফ হইতে সভার এন্তেজাম করা তাহার পয়লা কাজ। স্কুল কমিটিকেও ছেলেদের খেলা-ধূলা সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথা বলিয়া দিতে হইবে। পল্লী মঙ্গল সমিতির সদস্য স্কুলের ছেলেদের দ্বারা হাসান সাহেবকে এস্তেকবাল জানাইবার আয়োজনও আশরাফ গোপনে করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তাহারা যে চেষ্টা করিতেছে হাসান সাহেব তাহা সচক্ষে দেখিবেন বলিয়া সে আশা করিতেছিল। তাঁহার মূল্যবান উপদেশ তাহাদের চলার পথে পরম সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়া সে আনন্দ আর নিজের মাঝে আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

কথা ছিল আশরাফ নিজে গিয়া হাসান সাহেব ও তহমিনাকে লইয়া আসিবে। সকল এন্তেজাম আয়োজন শেষ করিয়া সে যখন রওয়ানা হওয়ার জন্য তৈয়ার, এমনি সময় হঠাৎ একখানা চিঠি পাইয়া সে সম্পূর্ণ নিভিয়া গেল। চিঠিখানা লিখিয়াছেন হাসান সাহেব এবং তিনি লিখিয়াছেন যে, কথামত মোহাম্মদপুর আসা তাঁহার পক্ষে

সম্ভব নয়। খোদা চাহে ত পরে তিনি নিজের আশা পূর্ণ করিবেন। মত পরিবর্তনের কারণ হিসাবে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু চিঠিখানা বারবার পড়িয়াও আশরাফ এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি কি হইতে পারে, তাহা আন্দাজ করিতে পারিল না। ফলে আশঙ্কায় আশঙ্কায় মন তাহার ভরিয়া উঠিল।

হাসান সাহেব আসিবেন না, খবরটি ত্বরিৎ সারা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েকটি দিন গিয়াছে সখিনার বিশ্রাম নেওয়ার উপায় ছিল না। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝেও তাহার হাসিটি ঠোঁটের কোণে লাগিয়া রহিয়াছিল। আজ আর হাতে তেমন কাজ ছিল না; কিন্তু হাসিটি তাহার ঝরিয়া পড়িল। মোবারকের কাছে আসিয়া শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি সত্যি ?

সখিনা কি জানিতে চায় মোবারক বুঝিতে পারিয়াছিল, তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌টি ?

সখিনা বলিল, মেয়েটি কখনও এদিকে এলো না, আমরা ত আনাতেই পারলাম না। এবার যাও আসার কথা হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। বলুনা না, সত্যি কি ওরা আসবেন না ?

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মোবারক জিজ্ঞাসা করিল, কেন, বিশ্বাস হতে চায় না ?

সখিনা বলিল, আশরাফ ভাইকে একবার ডেকে আনুননা, কেন আসবেন না শুনি।

মোবারক বলিল, আশরাফ ফিরে এলে শুন। সে চলে গেছে।

ব্যাপারটি হাসান সাহেবের কাছে শুধু অচিন্ত্যনীয়ই নয়, মর্ম্মান্তিক ও। বশীর আহমদকে তিনি ছোট বেলা হইতেই জানেন। সংসারে একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ভালমন্দ, ন্যায়, অন্যায় সম্পর্কে নির্ব্বিকার মনোভাব পোষন করিয়া থাকে। অবস্থা গতিকে ইহারা ভালও হইতে পারে, আবার মন্দ জানিয়াও কোনদিকে পা বাড়াইতে ইহাদের তেমন আপত্তি নাই। বশীর আহমদ সে জাতের লোক। মেডিক্যাল কলেজ হইতে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়া গতানুগতিক জীবনের সূত্র ধরিয়াই তিনি অবিচলিত পদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। যে সুযোগ আসিয়াছে তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিয়াছেন। বিবেক লইয়া বাড়াবাড়ি করার মত অবকাশ তাহার হয় নাই। অবশ্য সুযোগ না পাইলে এ জন্য অস্বাভাবিক কিছু করিয়া বসিতেন তাহা নয়। ছাত্রজীবন হইতে মতের অমিল তাহাদের শুরু হইয়াছিল, সেটা আর গেল না, বরঞ্চ উত্তর উত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। অবশ্য মতটা একতরফা হাসান সাহেবেরই। বশীর আহমদের মতামতের কোন দৃঢ়তা নাই। তবু গরমিলটা দুইজনেই ধরিতে পারেনি। এই গরমিলটাকে স্বীকার করিয়া নিয়াই বন্ধুত্বকে তাঁহারা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছেন। বশীর আহমদের অর্থলিপ্সা হাসান সাহেবের মন ক্ষুন্ন করিলেও বন্ধুত্বকে ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া কৈশোর যৌবনের স্নেহ-প্রীতিকে তাঁহারা উভয়েই অধিকতর আবেগের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

কিন্তু ডাঃ বশীর আহমদের চরিত্রের অপর একটি দিক হাসান সাহেবের কাছে সম্পূর্ণ আবৃত ছিল। সেটা প্রকাশ পাওয়ায় ধিক্কারে তাঁহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। এতদিনকার সুদৃঢ় বন্ধুত্বের যে শীলাভিত্তি, তাহাও যেন নড়িয়া উঠিল। আতিয়া সোফার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। চাপা কান্নায় তাঁহার শরীর দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। সেদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও হাসানের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

হাসান মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, অমানুষ, অমানুষ !

প্রৌঢ় বয়সে বশীরের মতিভ্রম বলিলেও ইহাকে ঠিক মত বলা হয় না। চারিদিকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানেও আতিয়ার মুখে বেদনার ছাপ একটি অতিসূক্ষ্ম আবরণের মত কেন পড়িয়া থাকিত, আজ তাহা দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। হাসান অনেক সময় তাহা দেখিতে পাইয়াও দেখেন নাই, ভাবিতে গিয়াও ভাবিয়াছেন, হয়ত বা মনের ভুল। আজ সেই পাথর চাপা বেদনাই চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতেছে। বশীরকে আজ নূতন উন্মত্ততায় পাইয়া বসিয়াছে।

আতিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন নাই। কিছুটা ভাষায় আর কিছুটা আভাসে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। বশীরের চরিত্রের দুর্ব্বলতার ছিদ্র পথে তাঁহার জীবনে অনেক অনাচার ঢুকিয়াছে। নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া অনেকরাত আতিয়া চোখের পানিতে বালিস ভিজাইয়াছেন, খোদার কাছে মোনাজাত করিয়াছেন, সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বশীর এখন নূতন পথ ধরিয়াছেন। তিনি আবার বিবাহ করিবেন। গোপন দুঃখ আতিয়ার গা সহা হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রকাশ্য অপমান অসহনীয় হইয়া উঠিল। আতিয়া অভিমান করিয়াছেন, চোখের পানি ফেলিয়াছেন, মাথা কুটিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই বশীরের মন ভিজে নাই।

মেয়ে-দামাদ নাতি-নাতনী লইয়া এক নূতন দুনিয়ার কেন্দ্রস্থলে তিনি; কিন্তু সে দুনিয়াকে কক্ষচ্যুত করিয়া দিতেও তাঁহার বেপরোয়া মন দ্বিধাগ্রস্ত নয়। সহ্য না হইলে বিদায় গ্রহণের পথ খোলা আছে বলিয়া আতিয়া

বেগমকে জানাইয়া দিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। এই অসহ্য অপমানও আতিয়া বেগমকে হজম করিতে হইতেছে। উপয়ান্তর না দেখিয়া তিনি হাসান সাহেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

রাগে হাসান সাহেব জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াও বসিয়াছিলেন, দেখি সে এ-কুকর্ম্ম করে কেমন করে। কিন্তু পরে তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে হইল তাহার জোর কোথায়। যে সংসারের এতদিনের দৃঢ় বন্ধন নির্ম্মম হাতে কাটিয়া দিয়া ঝড়ের মুখে যাত্রা করিতে উদ্যত, বন্ধুত্বের আকর্ষণে তিনি তাঁহাকে কি ভাবে ফিরাইবেন? নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিয়া হাসান সাহেবের ক্রোধ বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

তাঁহার মুখে সান্ত্বনার কথাও জোগাইতেছিল না। আতিয়াকে তিনি কি বলিতে পারেন? সব কিছুরই একটা সময় থাকে। কিন্তু আজ এমন সময় এমন একটি ঝড় উঠিয়াছে যে, এ সম্পর্কে রাগ দুঃখ ঘৃণা ভয় সমস্ত মিলিয়া একাকার হইয়া নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছে।

আতিয়াকে বিদায় করিয়া দিয়া হাসান উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন তিনি নিজেই একবার ডাক্তারের কাছে যাইবেন।

হাসান পায়চারি করিতেছিলেন, রহিমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, ভাইজান!

হাসান রহিমার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, বল, বোন।

আতিয়া আসিয়াছিলেন এবং পিছনে দুঃখের তরঙ্গ রাখিয়া গিয়াছেন। দুই কূলে তাহাই এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রহিমার চোখের ম্লান দৃষ্টির অর্থ তাই হাসান সাহেবের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। রহিমা নীরব রহিয়াছেন দেখিয়া হাসান বলিলেন, আমরা কি করতে পারি, বোন? রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে; কিন্তু সেটা মনে মনে পোষণ করা ছাড়া আমাদের আর কিই বা করার আছে! বশীর নিজে অবিবেচক নয়। এই ঝড়ের আকস্মিকতার মাঝে তার জন্যও আমাদের বেদনাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

রহিমার অব্যক্ত কথা অব্যক্তই রহিয়া গেল। তিনি যে হাসান সাহেবের যুক্তি অন্তর দিয়া মোটেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার মুখ দেখিয়া হাসান সাহেব তাহা ভাল করিয়াই বুঝতে পারিলেন। হাসান আবার পায়চারি করিতে লাগিলেন।

রহিমা দাঁড়াইয়াই রহিয়াছিলেন। কিছু সময় পর হাসান তাঁহার সামনে আসিয়া বলিলেন, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। মানুষের জীবনে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক ঘটনা এই যে, সে যখন ভুল করে তখন তা তার কাছে ভুল বলে মনে হয় না।

হাসান কিছু সময় থাকিয়া আবার বলিলেন, হ্যাঁ, আমাদের যথাসাধ্য আমাদেরে করতে হবে। ভুল ভাঙ্গার জন্য আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে।

রহিমা এতক্ষণে কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের একবার সেখানে গেলে হয় না?

হাসান বলিলেন, সেটা আমিও ভাবছি। কিছু হউক আর না-ই হউক, আমাদের কাজ আমরা করবো।

রহিমা এই টুকুতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আর কথা বাড়াইলেন না। তবে ব্যাপারটিকে এ-ভাবে তিনি গ্রহণও করিলেন না। আতিয়ার জীবনকে প্লাবিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য যে দুঃখের বান ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো, প্রাণপণ লড়াই করা তাঁহাদের নৈতিক কর্তব্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইতেছিল। নিজেদেরে তিনি আতিয়ার জীবন রঙ্গমঞ্চের বাহিরে শুধুমাত্র সহানুভূতিশীল দর্শক বলিয়া ভাবিতে পারিতেছিলেন না। নাই থাকিল কোন রক্তের বন্ধন, তবু তাঁহারা এদের সুখের দুঃখের সমান শরিকান।

দুই দিন হইতে যাই যাই করিয়াও হাসান ডাক্তারের ওখানে যাইতে পারেন নাই। রহিমা মনে মনে উদ্বিগ্নবোধ করিলেও চুপ করিয়া ভাইয়ের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আশরাফ আসিয়া পৌঁছিল।

আশরাফ আসিবেই, এটা যেন হাসান সাহেবের কেমন এক বিশ্বাসের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাইবেন না, এই চিঠি পাইয়া আশরাফ যে সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা তিনি মনে করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ জানিতে আশরাফ নিজেই ছুটিয়া আসিবে সেটা তিনি ধরিয়াই রাখিয়া ছিলেন।

আশরাফ আসিয়া মহা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সে আশঙ্কা করিয়াছিল শারীরিক কারণে হয়ত তাঁহাদের যাওয়া হইবে না; কিন্তু খোদার ফজলে তাঁহাদিগকে যখন সুস্থ দেখাইতেছে তখন সে তাঁহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িবে না, লইয়া যাইবেই যাইবে। বলা ত যায় না, এবার বাধা পড়িলে কখন্ আর যাওয়া হইবে।

ক্রমে আশরাফ তাঁহাদের না যাওয়ার যথার্থ কারণ শুনিল এবং শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

হাসান সাহেবের সহিত তাহার পরিচয় আন্তরিকতার সূত্র ধরিয়া স্বল্প কালের মাঝে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। তবে ডাঃ বশীর আহমদ সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের মানুষ। আশরাফ তাঁহার সামনে কয়েকবার পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। অমার্জ্জিত গ্রাম্য যুবকের প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উন্নাসিক ভাব ছিল। তা'ছাড়া, আশরাফের প্রাণখোলা হাসি গল্পে তিনি একটু বিরক্তই ছিলেন। আশরাফ স্থান কাল

পাত্র বুঝিয়া রাশ টানিয়া চলিতে জানিত না। বশীর সাহেবের মুখে তাচ্ছিল্যের কুঞ্চিত রেখাগুলি ঘন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়াও সে নিজের কথা সরবে ও সোচ্ছ্বাসে বলিয়া যাইত। আশরাফ সম্পর্কে বশীর সাহেবের তাচ্ছিল্যের মনোভাব থাকিলেও বশীর সাহেব সম্পর্কে আশরাফের কোন মনোভাব গড়িয়া উঠে নাই। ইনি ভালও হইতে পারেন, মন্দও হইতে পারেন বা দুইই, অথবা কিছুই না। বস্তুতঃ লোকটি সম্পর্কে যে কিছু ভাবিয়া দেখা দরকার, তাহা তাহার মনেই হয় নাই।

আশরাফের মনে হইল এখন কিছু ভাবিয়া দেখা দরকার। তবে ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করিতেই সে ভালবাসে। বলিল, লোকটি খুব বদ ত।

হাসান সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বদ ?

আশরাফ জওয়াব দিল, আমি ডাক্তার সাহেবের কথা বলছি।

হুঁ।

আশরাফ বলিল, তবে বোধহয় যতটুকু বদ মনে করছি ততটুকু বদ তিনি নন। তাঁর দিকটাও ত ভেবে দেখা দরকার।

হুঁ।

আশরাফ আবার বলিল, কাজ যা করছেন, সেটা হয়ত খারাপ করছেন। তবে এ-বয়সে তার জীবনে এই যে প্লাবন এর মর্মান্তিক বেদনার দিকটিও ত আছে। সত্যি আমার বড় রাগ হয়েছিল, এখন দেখছি দুঃখ হচ্ছে।

হাসান সাহেব কাষ্ঠ হাসি হাসিলেন। তিনি বলিলেন, সত্যি ব্যাপারটি ভেবে দেখার মত।

আশরাফের উৎসাহ মুহূর্তে নিভিয়া গেল। বলিল, এটা ত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এ-বয়সে কিনা একটা নার্সের জন্য এত! গৃহ সংসার ভাসিয়ে দিতে বসেছেন। নাঃ, চরিত্রে গোড়াতেই দুর্বলতা না থাকলে খামকা বিপর্যয় আসে না।

আশরাফ নিজের অলক্ষ্যে যে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, দু'দিন আগে হইলে হাসান সাহেব ইহাতে নাখোশ হইতেন। কিন্তু আতিয়া তাঁহার এতদিনের বিশ্বাসকেই ভুল প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। বন্ধু হিসাবে জোর করিয়া কিছু বলার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হাসান সাহেবকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আশরাফ বলিল, তবে এটাও ভেবে দেখা দরকার, এ-জায়গায় অন্যে কি করত। ডাক্তার সাহেব প্রলোভন আর প্রভাবের অপব্যবহার করেন নাই, তিনি একটি অসহায় মেয়েকে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে তাকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছেন। দস্তুর মত মহৎ কাজ বলে এটাকে আমার মনে হচ্ছে। ঠিকই, তিনি প্রশংসনীয় ব্যক্তি।

হাসান মৃদু হাসিয়া বলিলেন, অথবা কারো বিচারক আমরা নই। খোদা হাকিমের হাকিম। সব বিচারের ভার তাঁর উপর। কারো বিচার করতে বসা আমাদের উচিত নয়।

আশরাফ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, অতি খাঁটি কথা! আমার মনে হচ্ছিল যেন এমনি কি একটা আমি বলতে চাই; কিন্তু বলতে পারছিলাম না। অতি সত্য কথা। কারো বিচার করার আমরা কে ? আমরা দেখছি, একটি পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে যেতে বসেছে। আমাদের মানদণ্ডে এটা আমাদের ভাল লাগছে না। এর প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করবো, আমরা বিচার করতে যাবো কেন ?

আশরাফের মন অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সত্যই যেন সে স্বস্তি খুঁজিয়া পাইল।

আশরাফ কয়েকদিন সেখানে রহিয়া গেল। অন্য সময় এলে শুধু যাই যাই করে, কাজের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া ছুটিয়াও যায়।

সেদিন তাহাকে খাইতে দিয়া রহিমা বলিলেন, তবু ভাগ্য এবার কিছুদিন তুমি থাকলে, আশরাফ।

আশরাফ হাসিয়া বলিল, এমন যত্ন ফেলে যেতে যে ইচ্ছে করে না, খালাআম্মা।

রহিমাও হাসিলেন। বলিলেন, কথাটি তুমি ঠিক বলনি। আচ্ছা, অন্যান্যবার আমি কি অযত্ন করি ?

আশরাফ বলিল, কি যে বলেন, খালাআম্মা! আমি আগপিছে ভেবে কথা বলিনা।

রহিমা হাসিয়া বলিলেন, সেই ভাল। এখনি একটা কাজ জুটে গেছে, তাই সমাজ কর্মের ক্ষতির আর ত ভাবনা নাই, এই ত ?

আশরাফ বলিল, সত্যি, খালাআম্মা, মানুষ নিয়েই ত সমাজ, একটি মানুষকে সুখী করতে পারার বড় সমাজকর্ম আর নাই। খালাআম্মা, আমার কি মনে হয় জানেন ? এত যে পাণ্ডিত্য, শিল্প সম্পদ সভ্যতার বড়াই মনুষ্যত্বের কাছে সবই তুচ্ছ। আমি মুর্খ, খালাআম্মা, বললে লোকে বলবে, নিজের সাধ্য নাই বলে অপরের সাধনাকে আমি তুচ্ছ করছি, তবু আমার মনে হয়, হাজার হাজার কেতাব লেখার চেয়ে একটি মানুষকে সুখী করা অনেক, অনেক বড় কাজ।

রহিমা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে তাহার জন্য দোয়া করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, আল্লা সবাইকে সুমতি দিন।

আশরাফ খুশী হইয়া বলিল, আমার কথা ভাল লেগেছে আপনার?

ভাল?

রহিমার কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল। বলিলেন, ভাল লেগেছে বৈ কি, বাবা, ভাল লেগেছে বৈ কি! আমি আল্লার কাছে রাতদিন দুনিয়ার সকলের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ সকলের সাথে আমার মা'য়ের মনেও যেন সুখ দেন, এই আমার মনের মকসুদ।

মা'টি! আশরাফ রহিমার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রহিমা বলিলেন, আমি তার মা নই; কিন্তু খোদা দিলের বাদশাহ্, তিনি আমার দিল জানেন। এই ছোট্টটি আমার কোলে ফেলে তার মা চলে গিয়েছিল, সে সময় থেকে আমি আছি এত জ্বালা সহ্য করার জন্য!

রহিমা আঁচলে চোখ মুছিলেন। আশরাফ তাঁহাকে এমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে আর কখনও দেখে নাই। সে অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। বলিল, খোদা যা করেন তার উপর কারো হাত নাই।

রহিমা বলিলেন, কেউ হোমায়েরাকে বুঝতে পারলো না, বুঝার চেষ্টা করলো না। তারদিকে সবাই মুখ ফিরিয়ে রইল। আর মেয়েটিও নিজের অভিমানে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে। কিন্তু কিছুতেই মচকাবে না, দোষ হলে এই তার দোষ। সেই শুধু বুকে জ্বালা পোষণ করছে, অন্যদের ত দিব্যি সংসার চলছে।

শেষের খোঁচাটি যে মোবারকের প্রতি—আশরাফ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আশরাফ জানিত, মোবারকের উপর রহিমা সন্তুষ্ট ছিলেন না। নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক একতরফা স্নেহের ইহা অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া বলিয়া আশরাফ ইহাকে মনে করিত, সে জন্য দুর্ভাবনা বিশেষ ছিল না। তবু সঙ্কোচ সে কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কতকগুলি ঘটনার সহিত সে নিজেও জড়িত রহিয়াছে এবং তাহাতে হোমায়েরার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করা হইয়াছে কি না, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও তাহার মনে হইয়া উঠে নাই। রহিমা হোমায়েরার প্রসঙ্গ তুলিল, তাই সে রীতিমত ভীত হইয়া উঠিত। আলোচনার যবনিকা টানার জন্য সে বলিল, চলুন খালাআম্মা ভাবীর ওখানে একবার যাই। তাঁর সাথে আমার কোনদিন দেখা হলো না, তাতে আমার ভারী দুঃখ।

রহিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু আশরাফ কথাটি বলিয়া ফেলিয়াই কোথায় যে তাহার ভুল হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল। সে মনে মনে লজ্জিত হইল। তাহার স্মরণ হইল, হোমায়েরার ওখানে যাওয়া আসার পথ বন্ধ হইয়া আছে। বিষাক্ত হাওয়া যেদিন শহরের আনাচে কানাচে কুণ্ডলী পাকাইয়া ফিরিতেছিল সেদিন হাসান সাহেবের চোখ ফাটিয়া পানি বাহির হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন হোমায়েরা কোনদিন ছিল না, আজও নাই, এই আমার চূড়ান্ত কথা।

রহিমা বলিলেন, একই শহরে আছে, অথচ যেন কত দূরে! জামাল ছিল, তাও কিছু কিছু খবর পেতাম। সে বদলি হয়ে যাওয়ার পর আর কোন খবরই পাই না। আর কাকেই বা কি বলি! ভাইজান ত আর সাধে নিষেধ করেন নাই। তিনি নিজেই যে কত দুঃখ পাচ্ছেন তাতো আমি দেখছি। আর মেয়েটিও হয়েছে এমন, নিজে যে ভুলে একবার আসবে, তা কিছুতেই করবে না। বাপের বাড়ীর সাথে কেন যে এত জেদ ধরেছে তা এক আল্লাই বলতে পারেন।

আশরাফ বলিল, এখন অনেক বড় চাকুরী করেন, বহু টাকা রোজগার করেন।

রহিমা বলিলেন, এটাতে কি আর সুখ আছে। মেয়ে মানুষ, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, হ্যাঁ, একরকম সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈ এটা আর কি, সুখ কোথায় পাবে? রাতে আমি ঘুমাতে পারিনা, সব সময় মনে হয় তার বিষন্ন মুখ যেন আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আশরাফ চুপ করিয়া রহিয়াছিল! তাহার মনে ভাল মন্দ যুক্তিতর্কের নানা কথা নানাভাবে চরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু রহিমার মনের বেদনা তাহার সব কিছুকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

রহিমা বলিলেন, ভাইজানই বা কি করতে পারেন! তাঁর মন ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা, একটি কথাও বিশ্বাস করি না। যে যত কথাই বলুক না কেন, হোমায়েরার বিরুদ্ধে একটি কথায়ও কেহ আমায় বিশ্বাস জন্মাতে পারবে না। আমি তার মা নই, কিন্তু মায়েরা মেয়েদের যতটুকু জানে তার চেয়েও তাকে আমি ঢের বেশী জানি।

(ক্রমশঃ)

মুসলিম সাহিত্যের ধারা

খন্দকার আবদুর রহিম

'বাংলার ইতিহাস চাই' বলে এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র খেদ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ১২০২ খৃষ্টাব্দে সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরস্ক সেনার সঙ্গে এ দেশীয় ক্ষমতালোভীদের যোগাযোগে যে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের অবলুপ্তি হয়েছে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু কৃষ্টির প্রসার লাভের মওকা বিদ্যমান ছিল না। মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে এ-ধরনের বঙ্কিমী খেদ অনেকেই সমালোচনা করেছেন। আজকেও তাঁর সমালোচকের অভাব হয়না।

মুসলিম উদারতা এবং মুসলিম শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ধারনা ইতর-বিশেষ থাকতে পারে; কিন্তু ইংরেজের ছত্রছায়ায় শাসনের গদা হাতে নিয়ে বঙ্কিমবাবু যেভাবে সামাজিক উদাসীনতার কথা উল্লেখ করেছেন কিংবা সে-সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েই যেভাবে তার বিজাতীয় মনোভাব নগ্ন করে তুলেছেন, তা আপাতদৃষ্টিতে যত খারাপই হোক, গুরুত্তর নয়! জাতির প্রতি দরদ কিছু বাড়তি হলেই তার অবনতি-অবলুপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং সচেতনতা স্বাভাবিকভাবেই জাগে। কোনো জাতির ঘাড়ে যদি বাইরের ভূত চেপে বসে তাহলে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন, কৃষ্টি চেতনা ব্যাহত হতে বাধ্য।

আমরা জানি, সেদিন বঙ্কিমবাবু 'বাংলার ইতিহাস চাই' বলে যেভাবে গভীর বিজাতীয়তা-বোধ বাঙ্গালী হিন্দুর মনে জাগাতে চেষ্টা করেছেন, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছি আমরা। হিন্দুগণ ঋষিও বলেছেন তাঁকে তাদের নিজেদের ঐতিহ্য-চেতনার দিক দিয়ে হিসেব করে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী হিন্দুর মনে যে জাতীয় এবং বিজাতীয়বোধ জাগিয়ে দিয়েছেন, সজ্ঞানে হোক কিংবা ইংরেজের মনোরঞ্জনের চাপা অভিপ্রায়ে হোক, সবশেষ তার যে ফলটা আমরা ভোগ করছি সেটা কিন্তু বড্ড বেশী তিক্ত নয়—বরঞ্চ অভিপ্রেত। 'খাল কেটে কুমীর আনা' সম্বন্ধে প্রবাদটি বাঙ্গালী শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই ঠোঁটে ঠোঁটে প্রবাহিত থাকা সত্ত্বেও সময়মত কেউ ঠাহর করতে পারে না—কোন্ দিক দিয়ে খালটা কাটা হচ্ছে। কিন্তু খাল চিরদিনই কাটা হবে। তা না হলে অনেকগুলো ধর্মের অস্তিত্ব থাকতো না। নতুন যখন আসতো তখন পুরোনোকে একঠেলায় পচা অতীতের খড়-গাদায় চড়িয়ে একদিনে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খতম করে ছাড়তো। কিন্তু দুনিয়ার সভ্য সমাজে যে ধর্ম বিশ্বাস, যে ঐতিহ্য-চেতনা রয়েছে, তা টিকে আছে বলেই টিকে থাকবে।

সে জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখেছেন তার হিন্দু-ঐতিহ্য চাপা পড়ে গেছে মুসলিম-ঐতিহ্যের চত্বরের তলে, তখন তিনি খোন্তা-কোদাল নিয়ে খুঁড়তে লেগে গিয়েছেন। সঙ্গী সাথী ডেকেছেন, রঙ্গলাল-হেম-নবীন,—এরাও এসে জুটেছেন; তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরে হয়রান পেরেশান হয়ে পাথরচাপা হিন্দু-ঐতিহ্যের খোলসটা মুক্ত করেছেন। এটুকু তাঁর মহৎ কাজ।

হিন্দু-ঐতিহ্য খুঁড়তে যেয়ে যে সব ভাঙা ইঁটপাটকেল জমা হয়েছে, সেগুলো রাখবেন কোথায়? ইংরেজ তখন এদেশের বিধাতা। তাদের মনোমত ব্যাপারটি করতে হলে তাদেরই প্রতিপক্ষের ঘাড়ে ওগুলো চাপাতে হয়। তাতে কর্তাও খুশী হন, কর্মও সুসম্পন্ন হয়। আর এই কাজটা করেই তিনি কীর্তিনাশা হয়েছেন। মহত্ত তাঁর ঐ ফুটো দিয়েই ঘুচে গেছে।

এখানেই ভাবনার বিষয় আছে। বঙ্কিমবাবু এক হাতে ঢোলে কাড়া দেন নি। সত্য কিছু না থাকলে এত রটনা হয়না। বাঙ্গালী হিন্দুর ঐতিহ্য আগেও যেমন ছিল স্বতন্ত্র, তখনো ছিল ঠিক তেমনি; মুসলমানের বেলাতেও ঐ একই কথা। দুটো পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্য-চেতনার মধ্যে কোনো কালে কোথায়ও গা ঘেষাঘেষির অভাব ছিল না; কিন্তু তাই বলে এক হতে পেরেছে—কোনো শক্ত নজীর নেই। কেউ কেউ বলবেন, গ্রাম-দেশে হিন্দু-মুসলমান এত স্বাতন্ত্র্যহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, হিন্দুর পূজোপার্বনে আর মুসলমানের ঈদমেলায় কিংবা ইমামযাত্রায় হিন্দু-মুসলমান কোনরূপ বাছ বিচার করে যোগদান করার কথা ভাবতো না। মুসলমানগণ অনেক সময় পকেট শূন্য করে হিন্দু পার্বনে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেত গেল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামাজিক দিক। তাদের ঐতিহ্যের ভাবনা—সেখানটায় তারা নিজেদের ঐতিহ্য-চেতনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। সাহিত্যে এই চেতনার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

এই দু'দিক্‌কার বিষয় বঙ্কিমবাবু নিজেও ভেবে দেখেননি কিংবা তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যেও এমন কোনো সজাগ প্রহরী ছিলেন না যিনি ঘোষণা করে জানিয়ে দেন। তবে একদিকের খবরটা জানাবার তক্‌লিফ বঙ্কিমবাবু নিয়েছিলেন; তার ফলেই একটা অনাবিষ্কৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হলো—সে এই যে, হিন্দু ঠিক হিন্দুই আর মুসলমান এ-দেশী হলেও ঠিক মুসলমানই—সে হিসেবে

বিদেশী। কিন্তু বাকী রইলো ঐতিহ্যের পরিমাপ করার কাজটি।

সেই পরিমাপটি হিন্দুদের হাতে যথেষ্ট হয়েছে। প্রারম্ভে রাজানুকুল্যে এবং তার পরে পরে সুযোগ সুবিধার প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে। বাংলার গদ্য সাহিত্য যে মণ্ডলীর হাতে প্রথম রূপ লাভ করতে থাকে, তার মধ্যে হিন্দু ছাড়া মুসলমান নেই, আবার সেই সময় রামায়ন-মহাভারত, ভাগবত-গীতার অনুবাদ ব্যতীত কোরান-হাদিসের অনুবাদের সাক্ষাৎ ঘটে না। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায়, কিছুদিন যে সব বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে কোনো মুসলমান কৃতিপুরুষের পরিচয় নেই। পরিতাপের সঙ্গে এখানেই একটা কথা বলে রাখা যায়, এখন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস, নাট্য, কাব্য ইত্যাদি গদ্য-পদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে হিন্দু গ্রন্থকারদের হাতে যা কিছু ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার মধ্যে মুসলমান কোনো কৃতি লেখকের পরিচয় মেলে না। কোনো কোনো ইতিহাসে মীর মোশারফ হোসেন এবং আজকের কালে নজরুল ও জসীমউদ্দিন প্রসংগ বাদ দিলে একথাই ভাবতে হয়। বাংলা সাহিত্যের জগতে যেন একটি মাত্র জাতিই আদিম-কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এদেশের বাইরে বিদেশে বিভুঁয়ের যারা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে উৎসুক, তারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করে আন্দাজ করতে পারবেন না—এদেশে মুসলমান নামে কোনো কীর্তিমান জাতি বাস করে। এটা ভূয়ো কথার পরিতাপ নয়। হাতে গোণা গোটা কয়েক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাদ দিলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শুরু করে আজতক বাংলা সাহিত্যের ফিরিস্তিতে কোনো মুসলমান সাহিত্যিকের খবর জোটান যায় না।

এর জন্য কোনো জবাব-দিহি নেই।

তবে রবীন্দ্রনাথ একভাবে একটা জবাব দিয়েছেন। তিনি এক সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এভাবে বলেছেন, মুসলমান প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহু বলে সে রাজ্য-সংঘটন করেছে, কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টি বৈচিত্র্য ছিলনা। আবার এদেশের হিন্দুও প্রাচীন, তাই এক চির প্রথার সঙ্গে আর এক চির প্রথার এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর এক বাঁধা-মতের সংঘর্ষ। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে।

বিশ্ব কবির এই দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন দৃষ্টিতে দুটো জাতির সত্যিকার মনোগত দিকটাই ধরা পড়েছে। সনাতন জাতি দুটোই। সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশও আছে; কিন্তু সেটা সনাতন জাতির সনাতন মহল থেকে। যেখানটায় দুটো জাতির কোনো কোনো মিছিল বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল বিকাশের আকাশমণ্ডলে বিচরণে বেরিয়েছে তাদের মধ্যে একথার যোলআনা ভোটার সংখ্যা আছে।

বিশ্বজাতির সভায় একজাতির ঐতিহ্য অন্যজাতির সঙ্গে মোকাবেলায় ধরা পড়ে। বিশ্বের এক বৃহত্তম অংশে যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের নব নব পক্ষ নীল দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, সে সময় ভারতের হিন্দুমুসলমান দুটো জাতিই পুরানো ঐতিহ্যের সনাতন ভিটেয় পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পদগর্বকে সম্বল করে অভিজাত সম্প্রদায় বলে আত্মতুষ্টি লাভ করেছে। এবং একজন আর এক জনের দিকে মুখোমুখো বসতে ঘৃণা বোধ করেছে। এভাবে প্রাচীনতা আরো বড় করে ঠুলি লাগিয়েছে তাদের চোখে। নিজের প্রাচীন জীর্ণ গৃহটির মৃত প্রদীপ দ্বারা আঙিনার যতটুকু দেখা যায়—তাকেই বিশাল বিশ্বের প্রতিভূ ভেবে আশ্বস্ত হয়েছে।

এভাবে দৃষ্টির প্রসারতা গিয়েছে ঘুচে। বাংলা সাহিত্যের গোড়ায় বঙ্কিম না জন্মে যদি রবীন্দ্রনাথ জন্মলাভ করতেন এবং নজরুল ইসলাম পর্যন্ত আরো কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের আগমন ও তিরোভাব হয়ে যেত তা হলে বোধহয় বাংলার মুসলমানের কিছু জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু বঙ্কিম বাবু থেকেই আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি এবং আজকের যুগে রঞ্জন বাবু পর্যন্ত সেই নিরিখ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেজন্য এক প্রাচীন আর এক প্রাচীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য কোনো পথ খোলা দেখে না।

উনবিংশ শতক থেকে বাংলা দেশের সাহিত্যের সুরে আমরা বিরাট মনুষ্যত্বের জয়গানের নামে খণ্ডিত গোত্র-প্রীতিরই রাগিনী শুনতে পাই। শুধু তাই নয়, সংগে-সংগে দেখি অস্বীকৃতির একটা মস্তবড় কাণ্ডকারখানা। এ-দেশের মত এতবড় লোভনীয় বাসস্থানে একজনও মুসলমান পণ্ডিত জন্মেনি যিনি দু'কলম লিখতে পারেন—এইরূপ একটা ইতিহাস আমরা পাই গদ্য সাহিত্যের গোড়া থেকেই। পরিতাপের কোনো দরকার পড়েনা এখন। কারণ যুগের চাকা এমন পথেই ঘুরে চলেছে যাতে করে সেই একটানা ঢাকনা-চাপার যুগ আপন বেইজ্জতি নিয়ে আপনি নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আজকাল একথা যদি কেউ বলেই ফেলে,—ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত নিয়োগ করার সমকালে মুসলমানদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ছিলেন, চাই-কি সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, পার্শি এবং পর্তুগীজ, ইংরেজী ইত্যাদি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন; কিন্তু তাদেরকে নিয়োগ করা হয়নি, বরঞ্চ যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে

তাদের বিস্তার বহর ছিল মাত্র একগজ—তাহলে কথাটাকে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। অন্যান্য প্রমাণের দ্বারাই কথাটি ঐতিহাসিক সত্যে দাঁড়াতে পারে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইংরেজ যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তার অংশগুলোর অধিকাংশই মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া,—মুসলমানগণই ওদের পরম শত্রু। এক প্রতাপশালী আর এক প্রতাপশালী সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু সে কথা যাক, আদ্দিকালের কথা বাদ দিলেও আজো তো দেখা যায় মুসলিম ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেবার সৎসাহস অনেক হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে নেই। কখনো যারা বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখে শীর্ষস্থানটি আগলে বসে আছেন তারা মুসলমান কৃতি-লেখকদের প্রশংসাবিমুখ।

এই জড়ত্বটা এলো কোথা থেকে? অনায়াসে বলা যায়, এটাও ইংরেজের রেখে যাওয়া শেষ-দাওয়ার অবশিষ্ট ঝিমুনী। যে জন্যে হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলিম সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ বোধ করেন সেটা স্বভাবের গোড়া থেকে ধাতে বসে গেছে। অথচ এই প্রসংগে বলতে হয়, আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সাহিত্যিক হিন্দু সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে সন্দেহবশতঃ নিরুত্তর থাকেন নি। বরঞ্চ রচনারীতি ও শিল্পরীতির দিক থেকে মুসলমানগণ কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যের ভঙ্গিটাকেই সাদরে গ্রহণ করে হিন্দু সাহিত্যিকগণের পদাংকই অনুসরণ করেছেন,—কখনো অস্বীকৃতির সংকীর্ণ মানসিকতার ঔদার্য এবং বলিষ্ঠতা খর্ব করেন নি। আজো আমরা একথা অস্বীকার করার দরকার মনে করিনে, ইংরেজ ও হিন্দু পণ্ডিতগণের পাথর-খোদাই করা পরিশ্রমেই বাংলা গদ্যের উৎপত্তি এবং এর প্রসার মিলিত হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকগণের দ্বারাই। অবশ্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে।

সত্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে মনের যে প্রসারতা এবং বলিষ্ঠতা রয়েছে, এ-যুগের কোনো মুসলমান লেখকের মধ্যেই তার অভাব নেই এবং অভাব নেই তাদের হাতে যে সাহিত্যের ধারা গঠিত হয়ে উঠছে তা রীতিমত স্বতন্ত্র বস্তুরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তার ভেতরে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান সবারই যথাযোগ্য পরিচয়। প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সংগে। 'বাংলার ইতিহাস চাই,' বলে বঙ্কিমী-খেদ কোনো মুসলিম সাহিত্যিকের অন্তরে আপনসেরে প্রেরণা যোগাতে পারেনি, পারেনি আচ্ছন্নতার সৃষ্টি করতে।

গীতিমালা

সিরাজুল ইস্‌লাম

॥ এক ॥

আমার বাঁশী তোমায় খোঁজে
ব্যথার করুণ সুরে সুরে,
কানন গিরি সাগর নদী
আকাশ পাতাল বেড়ায় ঘুরে ॥

বানী হারা এ-সুর মম
ঝরা ফুলের সুবাস সম
কখন্ জানি মিলিয়ে যাবে
জানিনা কোন্ আঁধার পুরে ॥

মনে পড়ে সেদিন রাতে
আমার বাঁশীর বিরহী সুর
তোমার বানীর মিলন মায়ায়
হয়েছিল কতই মধুর ॥

হায়গো প্রিয়া তোমার দেশে
আজ কি এ-সুর যায়না ভেসে ?
আমার বাঁশী এমনি একা
আর কতদিন মর্‌বে ঝুরে ? ॥

॥ দুই ॥

হায়রে বেভুল নেশায় আকুল
ভাঙ্গলোনা তোর ঘুম ?
বৃথাই পাওয়ার স্বপন দেখিস্
দূর আকাশ কুসুম ॥

ভরা ভুলের ঘোর আঁধারে
হারালি তুই আপনারে
বিফল ব্যথায় যায় কেটে তোর
ফাল্গুনী মৌসুম ॥

আশার ঘুড়ি আকাশ পানে
উড়িয়ে কেন হায়
আছিস্ বসে সব ভুলে তুই
এমন দুরাশায় ? ॥

মাটির পানে মুগ্ধ নয়ন
দেখ্ ফিরিয়ে ফুলের স্বপন
হাজার ফুলের হাসি হেথায়
আনে খুশীর ধুম ॥

॥ তিন ॥

যতই কাঁদিবে ফিরিবেনা আর
হেলায় হারানো বেলা
ভেঙ্গে যায় যদি একবার কভু
জীবনের মধুমেলা ॥

কাননে ফাগুন আসে বার বার
জীবনের দিন ফিরেনাকো আর
অবেলায় আজি অভিমানী তব
মিছে আঁখি জল ফেলা ॥

ঝরা ফুলগুলি মালার বাঁধনে
যদিও বাঁধিয়া রাখি
তবু সে শুকায় কেঁদে কেঁদে যত
নয়ন সলিলে মাখি ॥

কি হবে কুড়ায়ে সেই ফুল দল
ফুরায়েছে যার সুধা পরিমল
আজ কেন তার এত সমাদর
করেছ যাহারে হেলা ॥

বন্দিনী

শ্যামল চক্রবর্ত্তী

যৌবনের পাপড়ি সবে পাখা মেলতে শুরু করেছে, তপতী সংকল্প করল জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে চারিদিকে মোহিত করে দেবে। শুধু খেয়ে পরে বাঁচার দাবী নিয়ে সহস্র মানুষের সাথে পা ফেলে সংসার মিছিলে যোগ দেবে না। নিজের জীবনে আনবে একটু স্বাতন্ত্র। কালের খাতায় সোনার কলমে না হোক, খাগের কলমে অন্ততঃ একটা আঁচড়ে সে বড় হ'বে।

—দিদিমণি খাবে না ?

অপুকে পাশে শুইয়ে কখন নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। লাবণ্যের ডাকে চোখ মেলে তাকালো তপতী।

—খাবেনা দিদিমনি ? একটা বেজে গেলো যে, কত রাত হলো বলো দেখি ?

—উনি ফিরেছেন ? হাই তুলে উঠে বসল তপতী, দু'হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাংল, ফিরে এসেছেন উনি ?

—না।

—তবে তুই খেয়ে যা আর ভাত এ-ঘরে এনে রেখে দে।

—এ ঘরে এনে রাখা মানেই তো তুমি খাবেনা দিদিমণি।

—খাব। ও ফিরলেই খাব।

—না, বাবু ফিরে এসে খাবেনা, তুমিও না। আর তুমি না খেলে আমরা চাকররাই বা কেমন করে খাই। দিদি —

—দূর হ হতভাগা তর্ক করিস্‌নে, হঠাৎ বাজ পড়ার মতো ফেটে পড়ল তপতী, যা বলছি তাই কর।

ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লাবণ্য। সলজ্জ তপতী পেছন ফিরে তাকাল। আন্দোলিত পরদা কাঁপছে—ওর গলার আওয়াজে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। লজ্জা পেল তপতী। লজ্জা পেল তার এই অনাবশ্যক রূঢ়তায়। কিন্তু মাঝে মাঝে তপতী এমন ভয়ংকর হয়ে উঠে। অন্তরের রুদ্ধ বেদনা একটু ছিদ্র পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে চায়। খামকা চাকরগুলির উপর অগ্নিবান ছুঁড়ে মারে।

তপতী উঠে দাঁড়ালো। অপু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমোক! শান্তিতে থাকুক অপু। ওর উপর যেন কোন ঝড়-ঝাপটা না লাগে। পাখীর মত ডানা মেলে সব কিছু থেকে তাকে বাঁচাবে তপতী। কোন আঘাত লাগতে দেবে না ওর শরীরে।

কর্মক্লান্ত দিন যেন রাত্রির কোলে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল, টুপ-টাপ করে গাছের পাতা থেকে এখনও জল পড়ছে। ঐ শব্দ যেন রাত্রির নীরবতাকে আরো প্রকটিত করে তুলেছে। গাছ-পালা থেকে মানুষ পর্য্যন্ত সব গভীর নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রায় মগ্ন। ক্লান্তি শুধু তপতীর চোখে। শান্তি নেই শুধু তপতীর মনে।

তপতী ড্রেসিং আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে এমন বুড়িয়ে গেছে। নিজেরই অবাক লাগে তপতীর।

—কী সুন্দর ফিগার তোর, আর এমন টানাটানা উদাসীর মতো চোখ। এ কিন্তু ভগবানের অন্যায় তপতী। সব রূপ উজাড় করে তোর গায়ে ঢেলেছেন, আমাদের ভাগে ঘোড়ার ডিম।

কলেজের বান্ধবীদের কথা স্মরণ করে হাসলো তপতী। বান্ধবীরা সোহাগ করে ওকে ডাকত উর্বশী।

—তুই মরলে যমরাজ বিচারে তোকে শাস্তি দেবে না দেখিস্। এরূপ দেখেই ওর চক্ষু চড়ক গাছে উঠবে! তপতী তখন হাসত। নিজের রূপ সম্বন্ধে সেও নেহাৎ অচেতন ছিল না। প্রসাধনের পারিপাট্যে ঐ রূপকে মেজেঘসে আরো চকচকে, আরো লোভনীয় করে তুলত। বক্তৃতায় ওর সুনাম ছিল কলেজ জোড়া। বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে কলেজের সব ছাত্রী আর অধ্যাপিকার সামনে টানা হরিণ চোখকে ভাবের উদ্বেলতায় প্রগাঢ় করে সে যখন সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে জোরালো বক্তৃতায় মেতে উঠত, তখন নিস্তব্ধ হলে ঘনঘন করতালির তুফান উঠত। বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে এলে জাপটে ধরত বান্ধবীরা।

—বাঃ, কী বক্তৃতাটাই দিলি আজ, মাৎ করে দিয়েছিস্।

অমন, যে দেমাকী নমিতা, সে-ও বলতো, তুই বড় হ'লে মন্ত্রী হবি তপতী। খ্যাতনামা সমাজ সেবিকা।

—আর, কানন সহাস্যে যোগ করে দিত, আমাকে রাখবে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

—আর আমরা সবাই বাদ পড়ব নাকি। না, না, সে হ'বে না। সবাইকে চাকরী দিতে হ'বে। দিবি তো তপতী।

আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠত কমল রুম। হাসির হল্লোড়ে সচকিত হয়ে উঠত কার্নিসে বসা পয়রার দল।

মাঝে মাঝে প্রিন্সিপাল নিজে আসতেন।

—থ্যাঙ্ক উ টপটী, থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর গুড্ লেকচার। আজ—ঐ রাত একটার পর—ঐ সকল কথা মনে পড়ছে তপতীর। মনে পড়ছে আর একটা গভীর কান্নার লহর পাঁজর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হায়রে! সেদিনের তপতী যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। একটা বিষাক্ত ভয়াল সাপ যেন পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। ওর বড় হবার স্বপ্ন, ওর বড় হ'বার আকাংখা দুমড়ে যাচ্ছে। উঃ!

তপতী জানালায় এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার কালো রাত্রি। ঐ দূরে ফটকের পাশের ঝাউগাছ দুটো রাত্রির অন্ধকারে সতর্ক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। আকাশের পানে তাকালো তপতী। দু' একটি তারা মিটিমিটি জ্বলছে, মেঘলা আকাশে চাঁদ কোথায় ডুবে গেছে। কোণে ঐ একটি তারা স্থির হয়ে জ্বলছে। মিটিমিটি না, দপদপানি না, ধীর, শান্ত। প্রেমিক চাঁদ নেই, তাই গভীর ব্যথায় যেন মুখভার করে আছে তারা মেয়ে।

: কেঁদোনা তারা, ঐ মেঘ থাকবে না। চাঁদ আবার উঠবে, জ্যোৎস্নার প্লাবনে আবার পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠবে।

চাঁদ উঠবে, দেখা দেবে তপতীর জীবনে? ঐ জীবন তো চায়নি তপতী? মাতাল স্বামীর খেলার পুতুল হয়ে, তার বিকৃত লালসার ইন্ধন জুগিয়ে, ঐ ঘরের সীমাবদ্ধ পরিসরে তার জীবনকে ব্যর্থ করে দেবে? না, দেবে না। তপতী সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মনে মনে কী সংকল্প আঁটল যেনো। মুক্তি পাগল পাখীর পিঞ্জরের কঠিন শৃঙ্খল ভাংগার সংকল্প!

ফিরে দাঁড়ালো তপতী। অপু। গভীর সুখে ঘুমে অচেতন অপু। তপতীর ছেলে। ওর জন্যেই তো শিকল ভাংতে পারছে না তপতী! কী এক মায়াজাল ছড়িয়েছে অপু। ওর সরল মুখের একটি হাসিতে সব সংকল্প কেমন ভেসে যায়! সহস্র অত্যাচার, কঠিন মনোবেদনা বুকে চেপে তপতী এখানে পড়ে থাকে।

পর্দা ঠেলে বারন্দায় এলো তপতী, রান্না ঘরে আলো জ্বলছে। সতর্ক পা ফেলে রান্না ঘরে দাঁড়ালো তপতী। মেঝেয় আসন পেতে লাবণ্য অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মিটসেফের তারের জাল দিয়ে দেখা যায়, সব অমনি পড়ে আছে।

লাবণ্য খায় নি?

—লাবণ্য।

সাড়া নেই।

—লাবণ্য, হাত দিয়ে ওকে ঠেলে দিলো তপতী, হ্যাঁ রে লাবণ্য খাবি না?

ধড়মড় করে উঠে বসলো লাবণ্য।

—অ্যাঁ, দিদিমনি, খাবে এখন?

হাসল তপতী। যার খোঁজ নেওয়ার কথা তার পাত্তা নেই, কোথাকার এক পাচক তার জলন্ত বুকের চিতায় শীতল জল ঢালবার চেষ্টা করছে।

—খাব।

খেতে বসল তপতী।

—আগে রাগ করোনি তো লাবণ্য। খামকা।

—কী যে বলেন দিদিমণি, খুশীতে যেনো ঝলমল করে উঠল লাবণ্য। দিদিমণি তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যেন কৃতার্থ হয়েছে লাবণ্য। খেতে রুচি নেই, তবু জোর করে কয়েক গ্রাস ভাত গিলে ফেলল তপতী।

—এই। এই খেলে দিদিমণি? ঐ খেয়ে মানুষ বাঁচে? না, বাঁচে না। তপতী জানে, বাঁচে না। এবং বাঁচতে সে চায়ও না। কী হ'বে ঐ ঘৃণিত জীবন টেনে। নিজের মনের সংগে, রুচির সংগে নিরন্তর যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার তো কোন অর্থ নেই। হ্যাঁ, বাঁচতে পারে, নিজের মনকে যদি টুটি টিপে মেরে ফেলে তপতী। আপন সত্তাকে যদি বিলীন করে দেয়। কিন্তু সে পারবে না। আর ভাবা নয়! আজ এই রাত্রেই একটা হেস্তনেস্ত করে নেবে সে। প্রবীর ফিরে আসুক। বারান্দা পেরিয়ে সামনের পোর্টিকে ঢুকলো তপতী। ওয়াল ক্লকটা টিকটিক করে মহাকালের বুকে আঁচড় কাটছে। তার ওপরেই একটা গ্রুপ ফটো। তপতী আর প্রবীর। তপতী চেয়ারে বসে, হাতল ধরে দাঁড়িয়ে প্রবীর।

তপতী একটা চেয়ার টেনে বসল। দু'টো। রাত দুটো বেজেছে। জল পড়ার টিপটাপ, দু'একটা নিশাচর পাখীর কর্কশ ডাক, আর আকাশে তারার মিটিমিটি।

সোঁ সোঁ—

গাড়ীর হর্ণ শোনে জানালায় এসে দাঁড়ালো তপতী। না, প্রবীরের গাড়ী নয়। আবার একটা। উঁহু, এটাও নয়। আবার। হ্যাঁ, প্রবীর এসেছে। ফটক দিয়ে গলে গাড়ী গ্যারেজের পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রবীর নামল। কিন্তু বরফের মতো এমন জমে যাচ্ছে কেনো তপতী? গায়ের রক্ত অমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কেন? হেলেদুলে নেশার ঘোরে প্রবীর পোর্টিকে পেরিয়ে যাচ্ছিল।

—শোনো—

তপতীর গলার অস্বাভাবিক বীভৎস আওয়াজে থমকে দাঁড়ালো প্রবীর।

—তুমি, ইয়ে তুমি এখানে? স্যরি, দেখিনি, মাইরি।

তপতী আপনাকে শক্ত করে নিলো।

—শোনো, কাল থেকে ক্লাবে যেতে পারবে না। মদ ও—

—কেনো? প্রবীর চেয়ার টেনে বসলো।

—না, যেতে পারবে না। আমি দেবো না।

হো হো করে হাসির ফোয়ারা ছুটালো প্রবীর। বীভৎস, হিংস্র, ভয়ানক।

—জীবনটা তো স্ফূর্তির জন্য তপতী। হাসো, খেলো, টাকা ওড়াও। একা যদি তোমার খারাপ লাগে, চলো না তুমি ক্লাবে—

চেয়ার ছেড়ে ওঠে তপতীকে জড়িয়ে ধরলো প্রবীর।

—ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে। অসভ্য।

দমকা হাওয়ায় শিরশির করে কচিপাতার কাঁপুনির মতো তপতীর ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠলো।

শরীরের আঘাত, সে যতো কঠিন হোক না কেনো সহ্য হয়। কিন্তু মনের আঘাত? সে বড় ভয়ানক জিনিষ! বাইরে থেকে টের পাবার জো নেই, ভেতরে অব্যক্ত যন্ত্রনা। কেঁচোর মতো মনের শান্তি কুড়ে ডেলা পাকিয়ে তোলে।

না, তপতী এখানে পড়ে থাকবে না। কিসের বন্ধন তার? অপু? কিন্তু অপু তো তার সত্যিকারের ছেলে নয়। নেশাগ্রস্ত প্রবীরের বিকৃত লালসার জমাট বাঁধা রূপ।

—দিদিমণি, বিনয় বাবু এসেছেন।

—বিনয়দা এসেছেন? কই, কোথায়? অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো তপতী, আসতে বলো তাকে।

—না বলতে হ'বে না তপতী। নিজেই এলাম। চকিতে ঘাড় ফিরে তাকালো তপতী। বিনয়দা। ঠিক তেমনি আছেন। মিলের সস্তা দরের কাপড় পরা, চুল ছোটো করে ছাটা। ত্যাগী দেশকর্মী। দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। কলেজে ঐ বিনয় ছিলো তপতীর সেরা প্রিয় ছাত্র। পড়াশোনায় ছিলো খুব ভালো; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর বি, এ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কুমিল্লায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, আর পড়াশোনা ছেড়ে আর্ত্তের ক্রন্দনে সাড়া দিতে ছুটল বিনয়। তপতীও সংগে যেতে চেয়েছিলো।

—না, এখন নয়, বিনয় বলেছিলো, পড়ো। নিজের মনকে আগে সুন্দর, মজবুত করে গড়ে নাও। তারপর কাজ।

—কিন্তু বিনয় দা, তুমি?

—আমি? আমি তো সাধারণ সৈনিক। সেনাপতির আদেশ এসেছে তাই যাচ্ছি।

—আমিও তো সৈনিক বিনয়দা। আবেদনের স্বর ফুটে উঠেছিলো ওর কণ্ঠস্বরে।

—না, তুমি সৈনিক নও তপতী। সেনাপতি হবার শক্তি তোমার আছে। ঘুমন্ত নারী সমাজকে তুমি জাগিয়ে তুলবে।

সেই বিনয়, সেই বিনয়দা! বিনয়দা দেখুক তাঁর স্বপ্ন ভেংগে দিয়ে সে আজ কুণোব্যাঙ সেজেছে। সেনাপতি! বিদ্রুপের একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো তপতীর মুখে।

—কী বিনয়দা, কী দেখছ?

—দেখ্‌ছি? চারদিকে যেনো ভালো করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো বিনয়, না, কিছু না। অতি ধীরে ফেললেও তপতী শুনতে পেলো বিনয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ। কী যেনো হ'য়ে গেলো মুহূর্তে। তপতী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না।

—আমাকে বাঁচাও বিনয়দা। ঐ নাগপাশে পড়ে আমার দম আটকে যাচ্ছে। আমাকে বাইরে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে যাও। তোমার পায়ে পড়ি। বিনয়ের পায়ে উপুড় হ'য়ে পড়লো তপতী। বাধা দিলো না বিনয়, কথা বললো না। নীরব থেকে যেনো তপতীর দুঃখ নিজের বুকে অনুভব করতে চেষ্টা করলো।

—ছিঃ, তপতী উঠো। হাতধরে ওকে উঠালো বিনয়, তোমার সব কথা আমি জেনেছি। এবং এজন্য এসেছি।

—এসেছ? আমাকে নিয়ে যাবে বিনয়দা?

—যাব।

—কোথায়?

—আমাদের কেন্দ্রে—ঢাকায়। সেখান থেকে গ্রামে গ্রামে যাবে। তোমার কাজ নারী শক্তিকে জাগিয়ে তোলা! পারবে? পারবে তপতী?

—পারব বিনয়দা। কিন্তু অপু? আমার ছেলে, ওকে সঙ্গে নিতে পারবো?

—না। সব সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হ'বে। ঘর না ছাড়লে বাইরের উপকার করা যায় না। তুমি দেশকর্মী, তুমি দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত।

—কিন্তু অপু? কান্নাভেজা চোখ দু'টি মেলে ধরল তপতী, অপুকে কার কাছে দিয়ে যাবো। ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যাবো? এর অভিশাপ আমার গায়ে লাগবেনা?

নিষ্পাপ দুধের শিশু, কী অপরাধ করেছে সে? না, না, বিনয়দা, ও আমি পারবো না!

—ভালো করে ভেবে দেখো তপতী, তোমার আদর্শ কী। স্মরণ করো তোমার অন্তর্নিহীত প্রতিভার কথা।

এ-জঘন্য আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার ঐ অতুলনীয় প্রতিভাকে বিনষ্ট করে দেবে? নিজের কাছে যে তুমি অপরাধী হ'বে তপতী!

বিনয় উঠে দাঁড়ালো।

—আজ আমি যাই তপতী। কাল আবার এ-সময় আসব। যদি যাও, তৈরী থেকো।

ধীর পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হলো বিনয়। বিমূঢ়, হতচকিত, বিভ্রান্ত তপতী ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম তার মনে হলো যেনো বিনয় কঠিন আঘাতে তার বুক দুমড়ে দিয়েছে। অব্যক্ত ব্যথার জ্বালায় বলি-দেওয়া পাঁঠার মতো যেনো সে হাত পা ছুঁড়ছে। কিন্তু কেনো? কিসের আকর্ষণে সে এখানে পড়ে থাকতে চায়। বিনয় তো তার বুকে আঘাত করেনি। বরঞ্চ তার এতদিনের কামনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করছে। বিনয় নমস্য। বিনয় ত্যাগী পুরুষ। ওর উপর মিথ্যা রাগ কেনো?

না, তপতী আর এখানে পড়ে থাকবে না। এ-সুযোগ আর আসবে না ওর জীবনে। ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হ'য়ে তার জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে প্রবীর। প্রবীরের কবল থেকে মুক্ত হওয়া চাই। আর অপু! অপুর জন্যও তো আর ভাবনা নেই তার। নেশামত্ত প্রবীরের অভদ্র আলিংগনের ফল তো অপু। অপু তার ছেলে নয়। তপতী স্বীকার করে না।

পরদিন এগারোটা। তপতী খেয়েদেয়ে প্রস্তুত হ'য়ে রইলো। কলেজ জীবনে সস্তাদরের মিলের শাড়ী কিনেছিলো একখানা, ট্রাঙ্ক খুলতে সেটা চোখে পড়লো। তা-ই গায়ে জড়িয়ে নিলো তপতী। অলংকার সব খুলে রাখলো। ড্রেসিং আয়নার সামনে একবার দাঁড়ালো। হ্যাঁ, এই বেশ-ই তপতীর উপযুক্ত। সত্যিকার জনদরদীর!

আয়না থেকে চোখ নিজের অজান্তেই সরে এক জায়গায় এসে নিবদ্ধ হলো। অপুর বিছানা। না, অপু বিছানায় শুয়ে নেই। নিজ হাতে স্নান করিয়ে, খাইয়ে দাসীর হাতে তুলে দিয়েছে তপতী। শেষ সেবা। শেষ দেখাও হয় তো। অপুকে কোলে করে দাসী বেরিয়ে গেছে।

—ওকে তোমার বাড়ীটা দেখিয়ে আনো মোক্ষদা। এর আগে অনেকবার অপুকে নিজের ওখানে নিতে চেয়েছে মোক্ষদা। পারেনি, তপতী ধমকে উঠেছে।

অবিশ্বাসী চোখে তাকালো মোক্ষদা।

—সত্যি?

—হ্যাঁ যাও, গলাটা তেমন যেনো কেঁপে উঠলো তপতীর, দাঁড়াও। চুমোয় চুমোয় ওর গাল ভরে দিলো।

নাঃ, অপুর কথা আর ভাববেনা তপতী। শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। পেছনে কী পড়ে রইলো না রইলো, ভাববে না। এগিয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে সে।

—কী তপতী, প্রস্তুত?

গলায় যেনো পাথর আটকেছে, কথা বেরুচ্ছে না তপতীর। চোখে যেনো ছানি পড়েছে কিছু দেখছে না। আর, মাথাটা যেনো ভোঁ ভোঁ করে পাথার মতো ঘোর পাক খাচ্ছে।

—প্রস্তুত তপতী, যাবে? বিনয় তাড়া দিলো।

—যাব, তপতীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

—তবে চলো। আর সময় নেই।

—সময় নেই? একটু দাঁড়ানো যায় না। এতক্ষণ ধরে গেলো ফিরে আসছে না কেনো মোক্ষদা? অপু কী খুব কাঁদছে? তাকে শান্ত করতে পারছে না মুক্ষদা! আড়চোখে একবার অপুর বিছানার পানে তাকালো তপতী। নরম বিছানা খোলা উন্মুখ হ'য়ে আছে, অপু কখন্ আসে। টিপয়ে অপুর একটা খেলনা। ওটার দিকে চোখ পড়লো তপতীর। প্রাণহীন জড় খেলনা যেনো তাকে ডাকছে।

—চলো তপতী। দেরী করো না। বিনয় আবার তাড়া দিলো। যন্ত্রচালিতের মতো তপতী বাইরে এসে দাঁড়ালো। ঘরের প্রতিটি জিনিষ যেনো তাকে হাত বাড়িয়ে বলছে: না, অপুকে ফেলে যেও না তপতী। অপু তো নির্দোষ।

—বিনয়দা, পাঁচ মিনিট পরে গেলে হয় না!

—না, না, তপতী দেরী নয়! গাড়ি ফেল করবো। সব ব্যবস্থা তবে ফেঁসে যাবে।

তপতীর যেনো প্রাণ নেই। বিনয় যেনো জোরে তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে মোটরের সামনে এসে দাঁড়ালো তপতী।

—দাঁড়িও না, উঠে পড়ো।

—রাখো। তপতী চারিদিকে আচ্ছন্ন দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে আনলো। সে যেনো মেঘলা আকাশের ক্ষীনতম তারা। জ্যোৎস্নার শ্যামলতার আশায় উন্মুখ হ'য়ে আছে। মিটিমিটি চাইছে চারদিকে। আকণ্ঠ আলোর পিপাসায় কাতর, সাহারার বুকে একটু শীতল পানির দারুন প্রতীক্ষা। আপনাকে বিভ্রান্ত, বিস্রস্ত মনে হলো তপতীর। সূর্যের লালাভ রশ্মি বায়ুমণ্ডলের ঘন বিস্তৃতস্তর ভেদ করে তীরের মতো এসে বিঁধছে তপতীর শরীরে। অশরীরী কতগুলো প্রেতাত্মা যেনো কাঁপছে—ভৈরবী নাচ শুরু করেছে তাকে ঘিরে। মোক্ষদা আসছে না কেনো? তপতী আবার শংকিত, ম্লান দৃষ্টি মেলে তাকালো। ঐ তো,

মোক্ষদা আসছে, না? শিকারের পেছনে ধাওয়া ঝানু শিকারের মতো দৌড়ালো তপতী।

—একী, কোথা চল্লে?

বিনয়ের কথা যেনো একটা নির্মম পরিহাসের মতো শোনালো। আর ঐ বিদ্রুপের কশাঘাত সইতে না পেরে যেনো তপতী তার চলার গতি বাড়িয়ে দিলো। মোক্ষদার কোল থেকে অপুকে ছিনিয়ে আনলো তপতী। বুকে চেপে ধরলো। কালো নরম মাড়ি বের করে সরল হাস্যে উথলে উঠলো অপু। ঈষৎ উন্মোচিত, প্রকাশের আবেগে বিহ্বল একটি ফুল। তপতী যেনো অপুকে আপন সত্তায় মিশিয়ে দিতে চাইলো কিংবা আপনাকে ভেংগে টুকরো টুকরো করে অপুতে মিশে যেতে।

রমনা ঃ উত্তর তিরিশে

আতাউর রহমান

খবর জানিনা তার বহু দিন,—এখন সন্ধ্যায়
জানিনা কাহার ঘরে—সে রমণী প্রদীপ জ্বালায়,
সন্তান-সন্ততি নিয়ে রাত্রিদিন বিরক্ত বিব্রত,
সাংসারিক ঝামেলায় মন ক্লান্ত, দেহ অবনত।

খবর জানিনা তার—মনে হয় প্রতিদিন তার
কেটে যায় বহু কাজে, অবকাশ কোথা ভাবনার।
সকালে উঠেই যায় পাক ঘরে, জ্বালায় উনুন
ভেজা কাঠ জ্বলেনাকো, তাই বলে ধোঁয়ায় কাঁদন,
ভেবোনাকো কারো জন্যে, একটু সময় নেই তার
কোন দিকে তাকানোর, বাজে কাজে গল্পে কাটাবার।

স্বামী যান অফিসেতে, ছেলে-মেয়ে কলেজে ইস্কুলে,
সময়ে তাদের খাওয়া দিতে হয়, এতটুকু ভুলে
হতে পারে বহু ক্ষতি, (আহা স্বামী সংসারের সার)
তার ভালোমন্দ দেখা অবশ্যই কর্তব্য তাহার।

পৃথিবীর রঙ লীলা চলে সব আগের মতন—
ফুল ফোটে পাখি গায় ঘন মেঘে মেদুর শ্রাবণ,
এখন হৃদয়ে যদি আসে তার রমনার মাঠ
সে চিন্তা অবৈধ ভেবে, রুদ্ধ করে স্মৃতির কবাট।

পলাশীর পর ও সিপাহী যুদ্ধের আগে

হায়দার আলী

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বাকেরজঙ্গ পরিশিষ্ট

'মুতাখ্খারীন' ইংরাজী তর্জমার দ্বিতীয় খণ্ডে রাজা রামনারায়ণ ও শাহ্ আলমের যুদ্ধ সম্পর্কে ৩৩৪—৩৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে-সব বিস্তারিত কাহিনী আছে তার কতকটা সংক্ষেপে এইরূপে লিখা যায়:

"বিহার সীমান্তে শাহজাদা (বা সম্রাট শাহ্ আলম) আলী গওহর কর্তৃক যে বাংলা সুবা আক্রমণ হয়, তখন মুতাখ্খারীন লেখক গোলাম হুসেন ছিলেন মুর্শিদাবাদী নবাবের পক্ষে আর তাঁর আব্বা সৈয়দ হিদায়েত আলী ছিলেন শাহজাদার পক্ষে।

শাহজাদার পিতা সম্রাট আলমগীর সানী এবং তাঁর বেগম সম্রাজ্ঞী জিনাতমহল যখন প্রকৃত পক্ষে ইমাদুল মুল্কের জীবননাশা শত্রুতার হাত থেকে শাহজাদাকে রক্ষা মানসে সৈয়দ হিদায়েত আলীকে ডেকে শাহজাদাকে তাঁর হাতে সঁপে দেন, সে সময় থেকেই হিদায়েত আলী শাহজাদার শুভাকাঙ্খী। পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লীর মুগল রাজশক্তির সঙ্গে বাংলার যে নামে মাত্র সম্পর্কটি ছিন্ন হয়, হিদায়েত আলী মারফৎ তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোশেশ হয়, আর হিদায়েত আলীই যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে শাহজাদাকে বাদশাহ শাহ আলম সানীরূপে দিল্লীর তখ্তে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁকে যদি তাঁর মত্ মতো কাজ করতে দেওয়া হতো, তাহলে ইংরাজ বাংলা সুবায় এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত কিনা সন্দেহ।

হিদায়েত আলীই শাহজাদাকে পূর্বাঞ্চলে তাঁর ভাগ্যান্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেন ইমাদুল মুল্কের দুশমনী থেকে দূরে। তখন বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা হয়। শাহজাদা পূর্বাঞ্চলে চলে আসেন। হিদায়েত আলীর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন টিকরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিহারের এক জমীদার রাজা সুন্দরসিংহ। ইনি সিরাজুদ্দৌলার অন্যায় হত্যার দাদ নেওয়ার জন্যে মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। কাজেই তিনি শাহ্জাদাকে এ-ব্যাপারে স্বেচ্ছা সমর্থন করে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কাশীর বলবন্ত-সিংহ ও ভোজপুরের রাজা পাহ্লওয়ান সিংহ এঁরাও শাহজাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন আশা করা গেল।'

(The Calcutta Review—June—1942 Essay: Nawwab Sayyid Hidayyit Ali)

সিয়ারুল মুতাখ্খারীন থেকে কয়েকটি সন তারিখ দেখে মনে হয় শাহ্জাদার অভিযান হয় হিজরী ১১৭২ সনের রজব মাসে (১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে)। শাহ-জাদা দুসরা দফা অভিযানে আসেন ঈসায়ী ১৭৬০ সনের ডিসেম্বর মাসে। এবারে সোন নদীর পূর্ব পাড়ের পথে তিনি সম্রাট পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। তখন হিদায়েত আলীকে ডেকে, তাঁর পরামর্শে সম্রাট বলে ঘোষিত হন।

মুতাখ্খারীন লিখেছে, এ-সময় তিনি কর্মনাশা পার হয়েছেন। জায়গার নাম কাটোলি (Catoly)।

উজীর ইমাদুল মুল্কের এক দোস্ত কায়দা করে সম্রাটকে এক দরবেশের কথা শুনায়। সম্রাট দরবেশকে দেখবার জন্যে ফীরুজশাহ্ মাকবরায় যান; সেখানে তাঁর তলোয়ার মেহদী নেছার খাঁর হস্তে দিয়ে পর্দা তুলে দরবেশের ঘরে ঢোকামাত্র মেহদী নেছারের তুরানী আততায়ীরা সম্রাটকে বধ করে এবং দরজা খুলে পা ধরে টেনে নদীর দিকে ফেলে দেয়। সম্রাট আলমগীর সানীর ভাতিজা ও জামাতা মির্জা বাবর এই দৃশ্য দেখে তাঁর তলোয়ার খোলেন এবং সে দলের দু'একজনকে জখম করেন; কিন্তু মেহদী নিছারের লোক তাঁকে অচিরেই পাকড়াও করে ফেলে; তারা তাঁকে পালকীতে সলিমগড় কিল্লায় স্থানান্তরিত করে; এই কিল্লাতেই রাজপরিবারের শাহজাদাদের বন্দী রাখা হত। এখান থেকে অন্য এক শাহজাদাকে বের করে নিয়ে শাহ্জাহান সানী নাম দিয়ে তারা তখ্তে বসিয়ে দেয়। অবশেষে একদল লুচ্চা (Luchcha) শ্রেণীর লোক হুমায়ুনের মকবারায় সম্রাটকে দাফন করে। এ-খবর পেয়ে আলী গওহর মুতাখ্খারীনকারের পিতার উপদেশ ক্রমে সম্রাট হন। কামগার খাঁ এবং দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁ নামক তাঁর দুই ভাই ৬।৭ হাজার সওয়ার ও পাইদল সেনা নিয়ে নয়া সম্রাটের সাহায্যে আসেন।

ইংরাজের তাঁবেদার নায়েব নওয়াব রামনারায়ন এ-সময় দেহবা (দেওডোব) নদী তীরে ছাউনী পেতেছিল। সম্রাটের সঙ্গে এই নদীতীরে লড়াই হতে থাকে তার। অনেক লড়াইএর পর ইংরাজ সৈন্যসহ রাজা রামনারায়ণ পলায়ণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পলায়নকালে কামগার খাঁর বর্শাবিদ্ধ হয়ে রামনারায়ণ মৃত্যুমুখীই হয়েছিল, তবে মীর আবদুল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার পেয়ে হাওদায় পড়ে যায়। মিঃ ওয়াট্স্ মীর আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর রক্ষায়

মুতাখ্খিন করেছিল ; এর ফলে মীর আবদুল্লাহ শোচনীয়-ভাবে মৃত্যু বরণ করে।

যুদ্ধ জয়ের পর নয়া সম্রাট বে-পরোয়া আনন্দ করবার হুকুম দিলেন। যুদ্ধে মৃত সিপাহসালার দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে তুলে নিয়ে ফতুয়াহ ও বৈকণ্ঠপুরের মাঝামাঝি স্থানে সমাধিস্থ করা হয় (Betwsxit Fatuah and Bycantpur)।

ডকটর ফুলারটনের বাংলোয় রামনারায়নের এই পরাজয়ের খবর গেলে কেউ তা বিশ্বাস করছিল না। কিন্তু বারবার একই খবর আসতে থাকে।

নয়া সম্রাট আজীমাবাদে প্রবেশ করলেই আজীমাবাদ তাঁর দখলে আসত কারণ সেখানে তেমন কোনো সিপাইলশকর ছিল না; কিন্তু কামগার খাঁ আশেপাশের দেশগাঁও লুটপাট করেই সন্তুষ্ট রইল।

দুই তিন দিন রামনারায়ণ জখম সারার কৈফিয়ৎ দিয়ে সম্রাটের সামনে আজীমাবাদের বশ্যতাব্যঞ্জক হাজীরা দিল না। এরপরে মুর্শিদাবাদী সৈন্যসহ মীরণ ও কর্ণেল ক্লাইভের আগমন সংবাদ পেয়ে সম্রাট এগিয়ে গেলেন তাদের যুদ্ধ দিতে। খালিকদাদ খাঁর ছেলে কাদিরদাদ খাঁ ও গোলাম শাহ্ লাখ্সুভীকে সিপাহসালার করে কামগার খাঁ বাহিনীর প্রথম কাতার তাদের অধীনে দিলেন। এ যুদ্ধেও মুর্শিদাবাদীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। কিন্তু ইংরাজের সহায়তায় অবশেষে মীরণের জয়ের সূচনা দেখা দিল। সম্রাটের সালারেরা কয়েকজন মারা গেলেন ; কামগার খাঁ সম্রাটকে নিয়ে বিহারে চলে যাওয়া নিরাপদ মনে করলেন। এই বিজয়ে মীরণ আনন্দ করবার হুকুম দিল।

কিন্তু বিহার থেকে দু'তিন দিন পরই কামগার খাঁ সম্রাট-সহ মুর্শিদাবাদ আক্রমণে ছুটলেন। পথে সৎচরিত্র মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ শিউভট ও বাবুজান বিষ্ণুপুরের সঙ্গে একত্র হয়ে সম্রাটের সাহায্যে এলেন। এই সময়ে রংপুরের ফৌজদার মীরকাসিম দামোদরতীরে সম্রাট সৈন্যের মুকাবিলার জন্যে ছাউনী ফেলতে এসে হাজীর হলেন। মীরণও এসে হাজীর হল। বুড়া নওয়াব বিপুল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে কামগার খাঁ ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে যেন আজীমাবাদ আক্রমনে যাচ্ছেন এমনিভাবে যাত্রা করলেন। উল্লসিত মীরজাফর শাহ আবদুল ওয়াহ্হাব কাসু নামক একজন সৎচরিত্র সিপাহসালারকে গুলী করে মারলেন; কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল যে সে মুরশিদাবাদ থেকে সম্রাটকে সব খবর দেয়। সে সিরাজুদ্দৌলারও খুব বিশ্বস্ত ছিল।

সম্রাট মঁসিয়ে লা-কে তাঁর সাহায্যের জন্যে ডেকে পাঠান। মঁসিয়ে লা আজীমাবাদে হাজীর হয়ে দেখেন সম্রাট বর্দ্ধমান অভিযান থেকে আসেন নাই। আজীমা-বাদের লোকেরা এমন অরক্ষিত অবস্থায় ছিল যে মঁসিয়ে লা-র আক্রমণ ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত ছিল। কিন্তু মসিয়ে শহর আক্রমণ না করে বিহারে গিয়ে বারুদ তৈরীতে লেগে পড়েন। কয়েকদিনের মধ্যে কামগার খাঁ সম্রাটসহ বর্দ্ধমান অভিযান থেকে ফিরে আসেন ; এসে কয়টি সুখবর পান। এই সময়েই খাদিম হোসেন খাঁ সংশ্লিষ্ট এবং সম্রাটের সাহায্যে অচিরেই তাঁর লোক-লশ্কর হাজির হবেন। এ-সময়ে ছোট পার্শ্বেলে করে শাহী খাজাঞ্চী-খানার জন্যে সন্ন্যাসী ফকীরদের সূত্রে রাজা দুর্ল'ভরামের কাছ থেকে অনেক টাকা আসে। সন্ন্যাসী ফকীরেরা এমন সব চিঠিও নিয়ে এল যাতে রাজার সম্রাটপদে ভক্তির বিশেষ স্থির নিশ্চয়তা রয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মিরী সওদাগর মীর আফজলের কাছেও এ-জাতীয় নীরব আদান-প্রদান পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল না। এই সওদাগর সম্রাটকে অর্থ ও খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করতেন।''

উক্ত মুতাখ্খারীন ইংরাজী অনুবাদে যে দেওডোবা নদীতীরে ছাউনী পেতেছিল—নদীটি সম্পূর্ণ মজে গেলেও দেওডোবা নামটি এখনও অক্ষত রয়েছে। এই দেওডোবা হ'ল বর্তমান রঙ্গপুর কলেজ রোড থেকে সোজা তিন মাইল পশ্চিমে। এবং দেওডোবা হ'তে ফতুয়া বা ফতেপুরের দূরত্ব হ'ল এক মাইলের কিছু বেশী। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সম্ভবতঃ এই ফতুয়া'র নাম 'ফতেপুর' হয়েছে। দেওডোবা হ'তে বৈকণ্ঠপুর পাঁচ মাইল পশ্চিমে হবে। যে স্থানে ডেপুটী নবাব রামনারায়ণ পরাজয় স্বীকার করে ঐ স্থানটিকে 'রসরাজপুর' বলা হয়। যেস্থানে শাহ আলম স্বয়ং গিয়ে লড়াই করেন, ঐস্থানটিকে এখনও 'শাহ-বাজপুর' বলা হয়। উক্ত স্থান দু'টি বৈকণ্ঠপুর হ'তে ৫,৬ মাইল দূরে। যে স্থানে বাদশাহ শাহ আলম বাংলা ক্রোক দেন—ঐস্থানটিকে এখনও 'কুরশা' বলা হয়। আসলে 'কুরশা' না হয়ে 'কুর্ক্‌শাহ্' হবে। ইহা পারসী ও তুর্কী শব্দ। এই 'কুর্ক' এর অপভ্রংশ হ'য়েছে 'ক্রোক'। ইহার পাশেই একটি গ্রামের নাম এখনও আলমপুর বলা হয়। সম্ভবতঃ উহাও শাহ আলমের নামে 'আলমপুর' হ'য়েছে। পার্বতীপুরের দক্ষিণে ফুলবাড়ী (রেলওয়ে-ষ্টেশন) গড় হ'তে এক মাইল পূর্বদিকে 'মির্জ্জাপুর'। ইহার দু'মাইল দক্ষিণে 'কুরশাখালি'। সম্রাট এস্থানে যুদ্ধে জয়লাভের পর 'ক্রোক' বাতিল করেন। তাই ইহার নাম 'কুরশাখালি' হ'য়েছে। ফুলবাড়ীর পূর্ব-দক্ষিণ ঘেঁসে 'শাহবাজপুর'। ফুলবাড়ী হ'তে ইহার দূরত্ব মাত্র দু'মাইল। এখানেও সম্রাট ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন। যে স্থানে ইংরাজরা ছাউনী ফেলেছিল—ঐ স্থানটিকে আজও 'ভালুকাজয়পুর' বলা হয়। ঐ স্থান থেকে ইংরেজদের

বিতাড়িত করার দরুণই উক্ত নাম করণ করা হয়। তৎকালে স্থানীয় লোকেরা ইংরাজদের ভালুক বা ভল্লুক বলত। উক্ত ভালুকাজয়পুরের পাশে 'জয়পুর' নামে আর একটি গ্রাম র'য়েছে। সেই জয়পুরের অর্দ্ধমাইল দূরে আর একটি শাহবাজপুর র'য়েছে। এখানেও সম্রাট যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন বলে ঐ নামকরণ হয়, তাহা স্থানীয় লোকেরা বলেন। উক্ত ভালকাজয়পুরের ছ'মাইল পূর্বে-দক্ষিণে বিখ্যাত 'বামনগড়'।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ ভবানী পাঠকের গড় বলে খ্যাত! এই দুর্গ হ'তে বেরিয়ে এসে ইংরাজ ভল্লুকদের ভবানী পাঠক ভালুকাজয়পুর হ'তে তাড়িয়ে দেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কুরশাখালির পশ্চিম পার্শ্বে ঘেঁসে অর্দ্ধমাইল দূরে 'ধনতোলা' নামক স্থান র'য়েছে। ইংরাজ ও ইংরাজ—পক্ষীয়দের ধনমাল ঐস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঐ নামকরণ হয়। বামনগড় ও মশহুর মহিমপুরস্থ মুগলীগড়ের সাম্‌নাসাম্‌নি দূরত্ব প্রায় তিন মাইল হবে। মুগলীগড় দুর্গের যে অংশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হ'য়েছে—ঐ স্থানটিকে লোকে আজও 'লৌয়ারগুন্ড' বলে থাকে। বর্ত্তমানে ঐ স্থানটিতে একটি হাট বসেছে। সেটিকে 'ছড়ানের হাট' বলা হয়। দুর্গের গড়খাই বা ছড়ার জন্য ছড়ানের হাট নামকরণ হ'য়েছে। উক্ত ছড়ানের হাটের দু'মাইল উত্তরদিকে কুরশা (কুর্কশাহ্) নামে আর একটি স্থান রয়েছে। উক্ত কুর্‌শা হ'তে এক মাইল দক্ষিণে 'ধনতলা' নামে আর একটি স্থান রয়েছে। সুবাদার নবাব বাকের মোহাম্মদ এর পুত্র কামাল উদ্দিনের কুঠিতে ধনমাল রাখা ও নিয়ে যাওয়া-আসা করার দরুণ ঐ নামকরণ হ'য়েছে বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। বর্ত্তমান মহিমপুরের হাট হ'তে তরফসাদি [তরফ শাহদিগর] এর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল; দক্ষিণে। এস্থানে বাদশাহ পক্ষীয়দের তরফ ছিল। 'তরফ বাহাদি' [তরফ বাহাদিগর] এখানে মীরজাফর পক্ষীয়রা প্রথমে এসে ছাউনী ফেলে। বাদী পক্ষ মানে প্রথম মীরজাফর পক্ষীয়রাই আসে। এখনও উক্ত নামকরণ-গুলি প্রচলিত রয়েছে। মহিমপুরের দু'মাইল উত্তরে অপরূপ সৌন্দর্য্যশালী সরোবরের উপরে 'মোগল কোট' [অস্ত্রাগার]। উহার উক্ত মোগলকোট নাম এখনও রয়েছে। উক্ত কোটের সিকি মাইল উত্তরে রয়েছে 'আন্ধারকোটা' (জেলখানা)। আন্ধারকোটা নাম এখনও অভিহিত হ'য়ে আসছে। আন্ধারকোটার অর্দ্ধ মাইল উত্তরে সুবাদার নবাব বাকেরজঙ্গের অর্দ্ধ সমাপ্ত প্রাসাদ ও মস্‌জিদ প্রভৃতি। উক্ত মূল প্রাসাদের এক মাইল উত্তরে রাজা দয়াশীল (ইংরাজদের দয়াশীল) এর কোট ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। শীলরাজার কোট ও বাড়ী এখনও লোকেরা বলে থাকে। শীলরাজার কোটের দেড় মাইল উত্তরদিকে টাকা-আনী (টাকশাল-বা ধনাগার)।

'আনন্দ মঠ'-এর মধ্যে বংকিম বাবু যে জমিদার মহেন্দ্রসিংহের উল্লেখ ক'রেছেন, উক্ত মহেন্দ্রসিংহ ও তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র সিংহ উক্ত ধনাগারের সম্রাট শাহ-আলম পক্ষীয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধের ভার যে পাটনার নবাবদের উপরে ছিল, তা' নিম্নোক্ত বিষয়টি হ'তে পরিষ্কার হ'য়ে পড়ে। জানকীরাম [রাজা] লিখ্‌তে গিয়ে আশুতোষ দেবের 'সরল বাংলা অভিধানে' এই লিখা আছে—

"বেহার বঙ্গের দ্বার স্বরূপ বলিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের ভার পাটনার শাসনকর্ত্তার উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমান রাজত্ব এতাদৃশ গুরুতর ভারও বাঙ্গালীদিগের উপরে অর্পিত হইত।"

এখন ইহা পরিষ্কার হ'য়ে পড়ে যে পাটনার নায়েব-নবাব রাজা জানকীরামের ন্যায় রামনারায়ণ এর উপরেও বহিঃশত্রু আক্রমণ নিবারণের ভার পড়েছিল। এজন্যই রামনারায়ণ সম্রাট ও সম্রাট পক্ষীয়গণকে আক্রমণ করেন। 'দেওডোবা,' 'বৈকণ্ঠপুর প্রভৃতি স্থান তৎকালে হিন্দু প্রধান ছিল। সুচতুর ইংরাজগণ তাই ঐ হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে নায়েব নবাব রামনারায়ণকে পাঠান। শ্যামপুর, হরিপুর, রামচন্দ্রপুর, মধুপুর, চন্দনপাঠ, নন্দনপুর, শ্রীরামপুর, অযোধ্যাপুর, মাধবপুর, গোপালপুর প্রভৃতি। কিন্তু এ-সবক স্থানের অধিবাসীগণ রামনারায়ণকে সম্পূর্ণ-রূপে নিরাশ করে। ইহারা ইংরাজ ও ইংরাজদের পদ-লেহী নবাব ও ডেপুটি নবাবের চক্রান্তে না পড়ে সম্রাট—পক্ষীয়দের পক্ষে থেকে বিদেশী ও স্বদেশী দুর্বৃত্তদের রঙ্গপুরের পবিত্রভূমি হ'তে তাড়িয়ে দেন।

মজনুশাহ্, ভবানী পাঠক, ও দেবী বা দেবী চৌধুরাণী, জমিদার শিবচন্দ্র রায় ও জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী—ইহারা প্রত্যেকেই একই সময়ে একই মহৎ উদ্দেশ্যে ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কেননা উপরোক্ত তিনজন যে একই সঙ্গে ডাকাতি ক'রেছেন, তা' ইংরাজদের মিথ্যা ইতিকথায় পাওয়া যায়। ইংরাজের বেতনভুক কর্মচারী ডেপুটি বংকিম্ বাবু যে এ-দেশীয় বিপ্লবীদের পরিচয় বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন তা আশুতোষ দেবের সরল বাংলা অভিধানের (পৃঃ ১০৮১) নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু থেকে পরিষ্কার হয়ে পড়ে :—

"পরে দেবী বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলে মহাসমারোহে একটি দরবার করিয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া বৈশাখের

শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে ইংরাজকে ধরা দিবার নিমিত্ত বজরায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন” ইত্যাদি।

বৈকণ্ঠপুরে জংগল কোন সময়ই ছিল না। দেবী চৌধুরাণীকে দস্যু প্রতিপন্ন ক'রতে গিয়ে বংকিমবাবু জলপাইগুড়ি জিলাস্থ বৈকণ্ঠপুর জংগলের দিকেই লোকের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ক'রেছেন। আসলে বৈকণ্ঠপুরে কোন জংগলই ছিলনা। জলপাইগুড়ির বৈকণ্ঠপুরই প্রসিদ্ধ জংগল বলে আজো খ্যাত। বংকিমবাবুর এতাদৃশ কার্য্যের প্রতি যে কোন স্বাদেশিকের মনে ঘৃণারই উদ্রেক করে। জাগগানের রচয়িতা বিখ্যাত লোক কবি রতিরাম দাস তাঁর জাগগানে বলেছেন—

"মন্থনার কর্ত্তী জয়দুর্গা চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি॥
... ...
পীর গাছার কর্ত্তা আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনেতে বৈসে একে একে সবি॥
... ...
জলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই?॥
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ তলোয়ারে॥
করিতে হৈবে'না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু॥"

এই মন্থনার জমিদার হ'লেন, দেবী চৌধুরাণী বা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী। 'পীরগাছা'—মন্থনা ও ইটাকুমারী উভয় এলাকার থানা। জমিদার শিবচন্দ্র রায় এর গ্রাম হ'ল 'ইটাকুমারী'। ইটকুমারী হ'তে মন্থনা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছয় মাইলের মত হবে। মন্থনার জমিদার পূর্ব-হ'তে অর্থাৎ মোগলদের আমল হ'তেই জমিদার ছিলেন। এ-সম্বন্ধে পরের সংখ্যায় আলোচনা করা হবে। মহাজ্ঞানী পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "রঙ্গপুরের জাগের গান" ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৫ সাল, 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় যে আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা পড়লেই বুঝা যায়, দেবী চৌধুরাণী ও জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী একই মহিলা। পণ্ডিতরাজের জন্মভূমি হ'ল ঐ ইটাকুমারী গ্রামে। শিবচন্দ্র রায় ও তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীর দূরত্ব পাঁচ শত গজের বেশী হবেনা। তর্করত্ন মহাশয় 'জাগগানে'র আলোচনা ক'রতে যেয়ে অত্যাচারী দেবী সিং এর কথা উল্লেখ ক'রেছেন। তাতে প্রজারা যে নুরল উদ্দিনকে নবাব পদে বরণ ক'রেছেন, এ কোটেশনটিও সম্ভবতঃ বিশ্বকোষের দেবী সিং হ'তে তিনি নিয়েছেন। যা-ই হোক, শিবচন্দ্র রায় ও দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তর্করত্ন মহাশয় নুরল উদ্দিন সম্পর্কেও আলোচনা ক'রেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত শিবচন্দ্র ও জয়দুর্গা দেবীর সহিত মিলিতভাবে নুরল উদ্দিন সংগ্রাম ক'রেছেন। অবশ্য নুরল উদ্দিন, বাকের মোহাম্মদ মজনুশাহ—এ তিনটি নাম একই ব্যক্তির। সুচতুর ইংরাজদের এ-শিয়ালের কুমীরছানা দেখানোর ন্যায় কৌশল মাত্র। পণ্ডিতরাজ লিখেছেন—নুরল উদ্দিন, বিশ্বকোষে লিখা আছে—নুরল মোহাম্মদ, তবে কোচবিহারের ইতিহাস লিখক আমানতুল্যা চৌধুরী সাহেব যে, 'নুর উদ্দিন' এর কথা উল্লেখ ক'রেছেন তা' সম্পূর্ণ ঠিক না হ'লেও আংশিক ঠিক। প্রজাদের নির্বাচিত নবাব বলে ঘোষিত নবাবের আসল নামটি হবে সুবাদার নবাব বাকের মোহাম্মদ নুর উদ্দিন ফতেহ্ জঙ্গ বাহাদুর।

এই যে নুরল উদ্দিন বা নুরল মোহাম্মদ অথবা নুর উদ্দিন, 'নবাব' এ-কোথাকার নবাব? ইংরাজরা এক-দেড়টা পরগণা জমিদারী দিয়েও 'নবাব' খেতাব অনেককে দিয়েছে—এমন কি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টরকে পর্য্যন্ত নবাব খেতাব দিয়ে বসেছে। যেমন বানরের গলায় শিকল দিয়ে বানরকে নাচায় এবং লাঠির উপর দিয়ে লাফায়ে এপার হ'তে ওপার নিয়ে গিয়ে বলে, 'এই আমার বীর হনুমান, লংকা লাফায়ে গেল' আবার লাঠির এপারে লাফায়ে বলে 'লংকা হ'তে জিতে এল আমার বীর হনুমান' আবার কোমরে ঘুঙুর দিয়ে বলে—'নাচরে বাঁদর নাচ, তালে তালে নাচ, ঘুরে ঘুরে নাচ' ইত্যাদি। এ-তো সে রকম নবাব নয় এবং সে সময় নবাব হতে গেলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার' নবাব হ'তে হয়—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাসে ডেপুটী নবাব বলেও উল্লেখিত নেই; সুতরাং এ-নবাবই যে সম্রাটের প্রতিনিধি হবে—এতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 'নবাব' মানে নায়েব, কার নায়েব? দিল্লী মসনদের মালিক সম্রাট শাহ আলমের, না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর? মীরজাফর, মীরকাশিম হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়েব। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্বের প্রভু ও ঐ সময়কার কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলী গৌহর সম্রাট শাহ আলম এর প্রতিনিধি বাংলা-বিহার উড়িষ্যার কোথায় তখন ছিলেন? 'স্বাধীন নবাব' বলে যে কথাটি প্রচলিত, তা' ঐতিহাসিক সত্য নয়। 'স্বাধীন নবাব' কথাটি নাট্যকারদের লিখা—কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

"শাহ আলম মুর্শিদাবাদ হইতে বিহার প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। শাহ আলম এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার

করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ ডিসেম্বর তিনি দিল্লীর সিংহাসনের অভিষিক্ত হন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩-এ অক্টোবর বকসারের যুদ্ধে শাহ আলমের প্রধান মন্ত্রী সুজাউদ্দৌলা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। শাহ আলম নিরুপায় হইয়া ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট আল্লাহাবাদে আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার প্রদান করিয়া এক সনদ লিখিয়া দেন!

শাহ আলম নামমাত্র সম্রাট ছিলেন। তিনি জেনারেল স্মিথের করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। জেনারেল স্মিথই প্রকৃত পক্ষে শাসনকর্তা ছিলেন।"...ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ)

"২রা আগষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে, মীরকাসিমের বিপুল বাহিনী ইংরাজদলের নয়নপথে পতিত হইল। 'সুতী'র সুরক্ষিত গড়খাতের মধ্যে হইতে অগ্রসর হইয়া গিরিয়ার সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নবাব সৈন্য সমবেত হইয়া ছিল। ইংরাজ সৈন্য বাঁশলুই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিলে, বাঁশলুই ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তীস্থানে বিপক্ষে বিনাশ সাধন নবাব মীরকাসিমের উদ্দেশ্য ছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরাজের জয় হইল।" ('বিশ্বকোষ')

১৭৫৯ এর শেষের দিকে শাহ আলম যুবরাজ ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নবাব থাকাকালিন পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরাজ, রামনারায়ণ ও মীরজাফরের পুত্র মীরণের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। যাহোক, ঐ সময় মীরণ নানা উপঢৌকন দিয়ে আলী গৌহরের মনস্তুষ্টি করবার ইচ্ছা করায় মীরণ তার শিবিরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হত্যা যে ইংরাজেরা করে তা' ইতিহাস পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন। মীরণ কোম্পানীর নায়েবি বা অধীনতা হতে মুক্ত হয়ে দিল্লীর সম্রাটের নায়েবি বা অনুগত হতে চাওয়ায় ইংরাজচক্র তাঁকে হত্যা করেও রটায়ে দেয় যে, সিরাজের আত্মীয়রা মীরণকে অভিসম্পাত দিয়েছিল—'মীরণ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরে'—তাই ঐ ভাবে মীরণের মৃত্যু হয়েছে।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট মীরকাসিম পরাজিত হন। শাহ আলম ঐ সময় দিল্লীর বাদশাহ। অযোধ্যা প্রদেশের সুবাদার নবাব সুজাউদ্দৌলা শাহ আলমের প্রধান মন্ত্রী। সুজার আশ্রয়ে মীরকাসিম আসলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে শাহ আলম মেজর কার্ণাক কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হন; আবার ঐ সালেই মারাঠা-বীর মাধোজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মুক্ত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং ইংরাজদের কর্ত্তৃ হ'তে ঐ সনেই শাহ আলম মুক্ত হন। এখন কথা হ'ল, ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রঙ্গপুরের মসিমপুরে রামনারায়ণ সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে রামনারায়ণ পরাজিত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর দিল্লীতে গিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এই এক মাস চৌদ্দ দিনের মধ্যে আলী গৌহর দিল্লী হ'তে সুদূর বঙ্গের উত্তর প্রান্ত রঙ্গপুরে এসে যুদ্ধ করতে পারলেন, অথচ সম্রাট বাংলার সুবাদার নিযুক্ত ক'রতে পারলেন না? এ ও কি বিশ্বাসযোগ্য? সম্রাটের সুবাদার নিয়োগ করা ও সুবাদার হওয়ার মত আকাঙ্খিত লোক কি একটিও ছিল না!

১৭৬৩ সালের ২রা আগষ্ট মীরকাসিম পরাজিত হ'লেন এবং সুজার আশ্রয় নিলেন। এখন কথা হ'ল, ১৭৫৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর হ'তে ১৭৬৩ সালের ২রা আগষ্ট প্রায় ৩ বৎসর ৭ মাস ৮ দিন—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কি সম্রাট সুবে-বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন নি! এও কি বিশ্বাস করতে হবে? ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে মীরকাসিম, সুজাউদ্দৌলা এবং শাহ আলম যুদ্ধে পরাস্ত হন। ১৭৬৩ এর ২রা আগষ্ট যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে মীরকাসিম আশ্রয় নিলেন সুজার, সম্ভবতঃ ১৭৬৪ এর ২৩শে অক্টোবর পূর্বে কোন এক সময়ে সুজার প্ররোচনা ও চাপে শাহ আলম মীরকাসিমকে সুবে বাংলার নবাবী সনদ দান করেন। ইহা কোন্ সালে ও কত তারিখে দান ক'রেছিলেন, তা' আমরা অবগত নই। যা-ই-হোক, ১৭৬৪ সালের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত সুবে বাংলার কোন সনদী নবাব ছিল না—এটা কি ক'রে বিশ্বাস করা যায়। এ যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অত্যাশ্চর্য্যও বটে। অথচ সম্রাট ও তদীয় পক্ষীয় লোকগণ হাতে চুড়ি দিয়ে, শাড়ী পরে, ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয়দের নাম শুনে ভয়ে ঘরের কোণে 'বউটি' সেজে বসেছিলেন। এতৎসম্পর্কে ইতিহাস এক বারেই নীরব!

অথচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়েব [নবাব] ১৭৫৭র ২৩শে জুন হ'তে মীরজাফর, মীরকাসিম, আবার মীরজাফর, মীরজাফরের অন্যতমা নর্ত্তকী, পত্নী মনি বেগমের দুই পুত্র নজমউদ্দৌলা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৭৬৬ পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় পুত্র সৈফউদ্দৌলা ১৭৬৬ হ'তে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহারা উভয়েই বালক ছিল বলে মণি বেগম অভিভাবিকা-স্বরূপ রাজকার্য্য করতঃ মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক উদ্দৌলা ইংরাজদের খেলার গুটি স্বরূপ নবাব ছিল। অথচ যাঁরা শত শত বৎসর বাদশাহী ও নবাবী ক'রে এসেছেন, সেই দিল্লীর বাদশাহগণ বাংলার জন্য নবাব করলেন না কেন! সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে বেনিয়া ইংরাজ নবাব নির্ব্বাচিত করল একটার

পর একটা সুবে বাংলার জন্য; অথচ অপর পক্ষে, মানে সম্রাট পক্ষ নবাবই নিয়োগ ক'রলেন না! একি করে বিশ্বাস করব?

ইংরাজ পক্ষ মসিমপুরের যুদ্ধের কথা গোপন করে কেন? কেনই বা গোপন ক'রে বাকেরজঙ্গের সুবাদারীর কথা? রঙ্গপুর ও এর চতুষ্পার্শ্বস্থিত—জেলা গুলির বিদ্রোহীদের কথা—কি কারণেই বা গোপন করে? বাকেরজঙ্গের পুত্র-পৌত্র—আত্মীয়দের অহাবী সিপাহী যুদ্ধের নায়কতার কথা গোপন করে কেন? অন্যে যা-ই কিছু মনে করুক, আমি বলব—ইংরাজরা অত্যন্ত ধূর্ত্ত, কৌশলী ও বাস্তববাদী ছিল। তারা জানত, বাকেরজঙ্গ দিল্লীর শেষ নিবু নিবু বাতির উজ্জ্বল আলোক। বাকের-জঙ্গ প্রথম হ'তে হিন্দু-মুসলিম, ফকীর-সন্ন্যাসী, জমিদার-প্রজা—জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে এক ক'রে বিদেশী লুণ্ঠনকারী দস্যু ইংরাজ, বিবেক ও মনুষ্যত্ব বিসর্জনকারী এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের হস্ত ও চক্রান্ত হ'তে এদেশীয়-দেরকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য তিনি তাঁর জীবনপাত পর্য্যন্ত ক'রেছেন। যদিও তিনি দেশকে বিদেশীয়দের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেননি; কিন্তু তাঁর দেশের মুক্তিযোদ্ধা বীরেরা প্রায় পৌণে দুইশত বৎসর পর ইংরাজদের কবল থেকে এদেশকে মুক্ত ক'রেছেন। এ জয় নবাব বাকেরজঙ্গ ও তদীয় সাথী-সঙ্গতিগণেরই জয় বলতে হবে; আমরা আজ তাই তাঁদের সকলকেই শ্রদ্ধাবনতশিরে স্মরণ করছি।

আমাদের ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইংরাজরা এদেশবাসীকে প্রকৃত মানুষ ও এদেশকে সমৃদ্ধি-শালী করতে আসেনি। এসেছিল লুণ্ঠন, দস্যুতা ও মনুষ্যত্ব হরণ করতে। যে কৌশলের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল, সে কৌশলটি হ'ল আমিত্ব বিসর্জনকারী একদল বিবেক-বিবেচনা বর্জিত চাকর, চটকদার, গাল ভরা নাম রাজা, নবাব, মহারাজ, মহারাজধিরাজ, খান, মালিক ইত্যাদি সমর্থকদের, তা ইংরাজরা পেয়েছিল। এসব ইংরাজ সৃষ্ট মনুষ্যরূপী জীব গুলিই এদেশের সর্ববিধ অমংগলের কারণ। এই দেশদ্রোহীরা ইংরাজদেরকে খুশী করতে গিয়ে দেশের যে কি অপরিমেয় ক্ষতি ক'রেছে—তা' কারুর অজানা নেই। ইংরাজরা সব থেকে ভয় করত জাতীয়তাবাদকে। মানে হিন্দু-মুসলিম এক হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা বাকেরজঙ্গ তৎবংশীয় এবং তাঁর বন্ধুদেরকে গোপন ক'রে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইতিহাস চিরদিন সত্যকেই ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছে আর মিথ্যাকে আঁধারে নিক্ষেপ করেছে।

এ-প্রসংগে এও বলতে চাই যে, যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে যা প্রমাণ করা যায়, তা' বিজ্ঞান সম্মত। দস্যু ইংরাজরা আমাদের নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি বলা চলে; তবু আমরা যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি প্রমাণ ক'রছি। পুরানো বই-কেতাব ও ফাইল ঘেটে যা প্রমাণ করা হয় তাকে যা-ই-বলা হোক, গবেষণা (রিসার্চ) বলা চলে না। বিশেষ করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের লিখার উপর প্রত্যয় ক'রে গবেষণা করা হলে তাতে ত্রুটী-বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

প্রায় দু'শত বৎসরের বিজয়ী ও দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ইংরাজরা 'মজনু' শাহর [মজনু অভিধানিক অর্থ পাগল, সুতরাং কোন মুসলমানেরই শুধু মজনু নাম নেই-ই] আসল নামটি পর্য্যন্ত বের করতে পারেনি, এটা কি ক'রে বিশ্বাস করা যায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাট্যকার বন্ধুবর আসকার ইব্‌নে শাইখ নবাব বাকেরজঙ্গ, ভবানী পাঠক প্রমুখের কার্য্যাদি নিয়ে 'অগ্নিগিরি' নাম দিয়ে যে নাটক লিখেছেন—তাঁর নির্বাচিত নামটির মধ্যে বহু কিছু বিষয় ভাববার ও চিন্তা ক'রবার রয়েছে। রঙ্গপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন কারমাইকেল কলেজের অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক-মহোদয় বাকেরজঙ্গ এবং তদ্বংশীয় ও তদ্বন্ধুদের অনেকগুলি কীর্ত্তি-সমন্বিত স্থান পরিদর্শন করেন ও বাকেরজঙ্গ যে সুবাদার ছিলেন, এ-সম্বন্ধে তাঁরা স্থিরনিশ্চিত হন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকই আমার আলোচ্য বিষয়গুলির মতামত মেনে নিয়েছেন।

সৈয়দ আহমদ নামে রঙ্গপুরের বদরগঞ্জ বন্দরে ১১৭ বৎ-সর বয়সের এক পীর সাহেব বাস করেন। উক্ত পীর সাহেবের আদি নিবাস ছিল পেশোয়ারের নিকট 'লালগাঁও'। ইনি ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে ইংরাজদের বিপক্ষে লড়েছেন। ইনি আমাকে বলেন যে, "বাবা, দিল্লীতে যাও, সেখানে ১৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোক অনেক রয়েছে, তারা তোমাকে অনেক খবর দিতে পারবে। তিনি আরও বলেন যে, মোগল রাজবংশীয় অনেকেই গরীব হ'য়ে আছে, তারাও তোমাকে অনেক খবর দিতে পারবে।" মসিমপুর মুগলীগড় নিবাসী মধুসূদন শাহা কবিরাজ (বয়স-১৪৭ বৎসর) ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে দিল্লীতে ছিলেন, ব্রিটিশ-বিরোধীদের অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে। ইনিও বাংলা, বিহার, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছেন। কিন্তু আমার অবস্থা ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্য খোঁজবার অনুকূলে নয়; সুতরাং দেশের অগণিত জ্ঞানী-গুণীগণ যদি এর অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হন তাহলে দেশের সর্বাধিক মংগল হবে বলে মনে করি। আমাদের বর্ণিত ও অন্যান্য স্বদেশ প্রেমিক সর্বস্ব ও আত্ম-বিসর্জন-

কারী বীরগণের প্রতি যত বেশী সম্মান ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দেখাতে পারবো, তত শীঘ্র এদেশীয়-লোভী ফেরেববাজরা দুর্বল হ'ত দুর্বলতর হ'য়ে ধূলায় মিশে যাবে। আর তা' যদি করা না হয় তাহলে আমরা শয়তানের আশ্রয় নরকে চিরদিন বাস করতেই থাকব।

পরিশেষে জহুরউদ্দিন ও তাঁর বোন আছিরনের গানের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ করতেছি।

জহুর উদ্দিনের ভণিতা। (১)

মুইতো জহুর কথায় কহুর মোর নাই গিয়ান,
থাকো মুই বিল কচুয়ার উপর বাড়ী মহিষ বাতান।

আছিরণের ভণিতা।

রাজবাড়ীর কাছে আমার বসতি,
বাপ মোর নাম রাখিছেন আছিরণ সতি ;
মুই বড় ভাগ্য হীনা ভাই জহুরুদ্দি।

ছড়া গান

"বিছমিল্লা বলি নিব নাম আল্লা আর নবী,
মন দিয়ে শুন সবে চৌদ্দ বৎসর আগের কবি।
মুগলীগড়ের কেচ্ছা কিছু বলিতে চাই ভাই,
সেথ্না কেচ্ছা সকলকে আগে বলিয়া শুনাই।
নওয়াব বাকের মির্জ্জা নুরউদ্দিন জঙ্গ বাহাদুর,
সুবাদার হৈয়া আইল বাঙ্গেলা মশহুর।
নওয়াব মুর্শিদাবাদের বড় দুশমন আছিল,
তে কারণ মজনু শা নাম তার রটনা করিল।
মসিমপুর নওয়াব গড় নির্ম্মাইল,
মুগলীগড় নাম তার ঘোষণা করিল।
মুগলীগড়ে রণ দিল রাজা রাম নারায়ণ,
দিন দশ বুঝি দুশমন পালাইল তখন।
নওয়াব মুর্শিদাবাদের আর ইংরাজ নস্কর,
লড়াই (২) হারি পালেয়া গেল কলিকাত্তা শহর।
সে তো শাহাজাদা তাকে রোক্কে (৩) সাধ্য কার,
ইংরাজ পশ্চিমা সেনা মারি করিল একাকার।
সেই শাজাদার পুত্র কামাল উদ্দিন একজন,
তাহার বাড়ী নুট (৪) করিল শুন দিয়া মন।
জমপুর (৫) জেলা মাঝে ফুলচকি গ্রাম,
তথায় বসতি ছিল চদ্রী (৬) কামাল উদ্দিন নাম।
সেই কামাল উদ্দিন জমিদার হাজার কি একজন,
তাহার বাড়ীত ডাকু পাইল শুন বিবরণ।
দিন সন্ধ্যা খাটিয়া গেল রাইতের দুই পহরে,
শোল্লক (৭) কহিয়া ফিরিঙ্গী ডাকু রাজপুরী ঘেরে।
একতালা দুইতালা ভাঙ্গি কল্ল (৮) খান্ খান্,
টাকা কড়ি লইল কত শাল-বানাতের থান।
ঝুটুশিংএ কল্লবা কথা এতেক কাঁহা গোল,
ডাকু বলে চুপ্ রে বেটা কামাল কাঁহা বোল।
এই কথা কহিয়া ইংরাজ ডাকু কতেক পুরীত ঢুকিল,
আর কতেক ডাকু ভুত বাহিরে গেল।
পুরীর ভিতরে যেন ভুঁই কম্প (৯) চলিল,
তনহীন সেরাজ উদ্দিন বক্সী ছিল।
তার ভাই গলায় ছিল জকা (১০) কাশ,
খিড়কী পার হৈতে তার দমের নাই আশ।
জয়ের উদ্দিন রহীমুল্লা বক্সী বলে ভাই কি করি উপায়,
ডাকুদের হাতে বুঝি প্রাণ মারা যায়।
দুই বক্সী বুদ্ধি করি বাঁচি কোন কলে (১১),
আমরা দুইজন যারা নুকাই (১২) তক্তপোষের তলে।
কতেকক্ষণ পরে ডাকু সব বাহিরে বারাইল,
একত্র হইয়া ডাকু শোল্লক কহিল।
শোল্লক কহিয়া ডাকু সব চলি গেল,
যেখানে যে নুকাইয়াছিল সকলে বাহির হৈল।
কি কব সে ডাকাতের কথা কহা নাহি যায়,
যেই শুনে সেই পস্তায় করে হায় হায়।
তারপরে শুনে ভাই বাড়ীর ঘটনা,
একে একে করি আমি তাহার বর্ণনা।
বাড়ীর ভিতর এমন লুটপাট (১৩) করিছিল,
১৮৩ মোহর আঙ্গিনায় পড়েছিল।
রাজপুরির এমন দশা হইল,
তিন বছর ইংরাজ ডাকু ঘিরিয়া রহিল।
পাত্তর দিয়া বান্দা যত কব্বর ছিল,
একে একে সব ভাঙ্গি গুড়া করি দিল।
ছদ্দে মর্মরের যত গাঁথুনী * আর মাজিয়া আছিল,
ছাব্বল মারি ত হা ভাইরে দূরে ফেলি দিল।
ধনমাল নিল ভাইরে সোনা আর চান্দি,
কর্ত্তার বাড়ীত ছিল ১৭ জনা বান্দি।
তারপরে শোন ভাই চাকরদের কথা,
বাড়ীর চৌদিকে ভাই বাসা যথা তথা।
কোন চাকর কোন কাজ করে কে করে শুমার,
পুরির ভিতর যেন সদা গুলজার।

---

(১) কেরাম উদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম : তিলকপাড়া, মিঠাপুকুর জেলা : রঙ্গপুর। ৯।৬।৫৭ তারিখে তাঁর সংগৃহিত গ্রন্থ থেকে নকল করে আমাকে দেন। ১৩১৯ সনের ২৭ হাঃ মণ্ডল সাহেব ছড়া গানগুলি সংগ্রহ করেন।

(২) যুদ্ধ। (৩) বাধা প্রদান করা। (৪) লুট। (৫) জঙ্গপুর। বর্ত্তমান রংপুর কে পূর্বে জঙ্গপুর বলা হত। কারণ এখানে মোগল রাজ বংশীয় কামাল ও তৎবংশীয়দের রঙ্গালয়, কুঠি, শিশ্ মহল প্রভৃতি ছিল। (৬) চৌধুরী। (৭) কমাণ্ড। (৮) করিল। (৯) ভুমিকম্প। (১০) যক্ষা। (১১) কৌশল। (১২) লুকাই। (১৩) লুটতরাজ * ভিতরের দিকে পাঁচ ইট গাঁথুনী ছিল।

তারপরে শুন ভাই খাবার সরঞ্জনা,
বাসন কোসন ছিল সব চান্দির আর সোনা।
চান্দির হুকা চান্দির কল্‌কি চান্দির ঢাকনা চান্দির
ওগোলদানী
সোনার নলে খায় খোশবু তামাক লোকে করে
কানাকানি।
কুরসীতে বসিয়া রাজা যখন খাইত তামাক,
সুগন্ধি শুভিয়া (১) লোকে হইতো অবাক।
সমবারে বেসদবারে কাচারিত বসিয়া বিচার করে
লোকজন নিয়া,
আসামী ফৈরাদীর জবানবন্দী নেয় হাসিয়া হাসিয়া।
সাক্ষী প্রমাণে যদি দোষী সেই হয়,
দরবারের লোক নিয়া তাকে সেই শাস্তি দেয়।
খাট পালং চে'র (২) সোনা কাঠ রূপার কথা কি
বলিব ভাই,
দুই শও আড়াই গ'ড়ী তাতে ঠেকা নাই।
গ্রামের নাম ফুলচৌকি বাড়ী যেন ইন্দ্রপুরী,
রাজরাণী দাসী-বান্দী যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী।
বাড়ীর চৌদিকে ভাই কত দীঘি আছে,
ভরা পূর্ণ সব দীঘি নানা জাতি মাছে।
বড় দীঘির ছিল তিন পাকে ঘাট,
পূর্ব পাকে লাগাইয়াছিল কোকিলা জঙ্গ (৩) হাট।
দুই পাকে চাইয়া দেখ পানির সরোবর,
পাহাড় থাকি কাটি আনছে সেই নহর।
বড় ছোট কত ঝরনা ফোয়ারা কে করে সুমার,
রাজপুরির চৌদিকে যেন ইন্দ্রের বাজার।
কি কব রাজপুরির কথা কহা নাহি যায়,
সাজিয়া আছে ইন্দ্রপুরী যেন বা মনে হয়।
মোগল বাদসার গণাগণ পুরির মধ্যে থাকে,
কুর্নিশ করি যায় আইসে দরবারে সব লোকে।
সুবাদারের বেটাবেটির কথা বলিব এখন,
কুলাভর্ত্তি ধান দিয়া শুন যাও লক্ষ্মীগণ।
কামাল জামাল দুই পুত ছিল,
লালবিবি চান্দবিবি কন্যা আছিল।
আর কেহ লইবে নাম ভাইলাম বেগম ছাহেবার,
তার ভিটায় ঘুঘু চরবে বইলেছে কোম্পানী সরকার।
সেই লালবিবি জননি যে দিল্লীর ঈশ্বরী,
বাদশা আকবর শাহার বিয়াস্তী স্ত্রী।
ইংরাজ হারামজাদা ডাকাইতের সর্দার,
গাঁয়ে ২ ঘুরিয়া কহে নাম কেহ লইওনা মজনু কন্যার।

যাহার জন্য হায় তামান দেশের লোক কান্দেরে,
নিঠুরে শুলি করি মারিল মিরগঞ্জ বন্দরে।
লালবিবি বলে আল্লা মোকে শহিদ কবুল কর,
দোয়া করো দেশের লোক ফিরিঙ্গিকে না ডর।
আরে বাহে জানেন নাকি বাহাদুরশার জননি
লালবিবি মাই,
হামাক নুন মরিচ দিয়া চাইরটা পান্তা ভাত দেন খাই।
এই শুসা কেচ্ছা তোমরা আরো শুনবার চান,
মিয়ার বাড়ীতে যারা শুনি খান গুয়া পান।
আর তাল নারিকেল আম জাম—বাগানে কত গাছ
আছে
গরীব দুখিনীর ছেলেরা ভাই তাই খাইয়া বাঁচে।
দিন গুজারিয়া সন্ধ্যাকাল পরে পুরীর মাঝারে,
সরিষ্যার তেল বাতি জলে ঘরে ঘরে।
সেই কালের কথা কি বলিব হায়,
ত্রিশ সের তেল দিন বাতিত পোড়ায়।
ঘরের ভিতরে আসবাব ছিল থাকে থাকে,
রেশমী পশমী জরি শাল ও বানাত।
তামা কাসার কথা কিছু না বলিব ভাই,
বাড়ীর বাহিরের কথা সকলকে জানাই।
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখ শওটা হাতী বান্দা
আছে,
সেই হাতীর চাকুরী করি মাহুত বাঁচে।
বকর মাউতের ঝাউলি হাতী অলি মাউতের হাতীর
নাম হিরা,
সেই হাতীর নিকটে যাইতে মাহুত কাড়ে
কিরা (৪)।
আর এক হাতী ছিল নাম তার গণেশ,
দোহা নামে মাহুত ছিল হাতী সাদা বেশ।
শও হাতী তিন শওটা মাউত ছিল,
উত্তর দিকের কথা এখন বলিতে হইল।
নীল চিনি রেশম লোহার কারখানার লেকা
জোকা (৫) নাই,
কিষাণ পাইটে কারখানাত খাটে কি বলিব ভাই,
পশ্চিম দিকের কথা এখন কিছু বলিয়া জানাই।
পশ্চিম দিকে রাস্তার ধারে পাকা মজিদ আছে,
দিন রাইতে মৌলভী পাঁচবেলা আজান হাঁকে।
নামাজ পড়ে জামাত করিয়া,
গোঁতি কুটুম্বের বাড়ীত যায় পালকিত চড়িয়া।
প্রজাপাইটে আসে যদি দেখা করিবারে,
মধুমাখা কথা কয় কোকেলির স্বরে।

---

(১) শুকিয়া। (২) চেয়ার। (৩) এই স্থানে বিপুল ধুমধামের সহিত 'বেরা' নাম এক উৎসব হ'ত। এখন হতে মাত্র ১০।১২ বৎসর হয় ঐ উৎসব উঠে গেছে। বাহে (১) বাবাহে অর্থাৎ 'হে বাবা'। (৪) শপথ। (৫) সীমা।

সেত নওয়াবজাদা বড়ই সাদা চন্দ্রলেখা মুখ,
ফকির মিছকিন গরীব দেখ্‌লে দুঃখে ফাটে বুক।
সেত' বুক ফাটে নিজে হাঁটে গরীবের বাড়ীতে যায়,
টাকা পয়সা আধ্‌লী সিকি গরীবকে বিলায়।
শুন দিয়া মন মৃত্যুর কেচ্ছা এখন করহে শ্রবণ;
একদিন নওয়াবজাদা শ্বশুর বাড়ী যায় পাল্‌কিত চড়িয়া,
নকীব সঙ্গে যায় নাম ডাকিয়া ডাকিয়া।
সম্মুখে ডাকিয়া কাগ (১) ডাকে ঘনে ঘন।
কাগের ডাকে রিদয় (২) ফাটে কি বলিব হায়,
বেহারা পাল্‌কিসহ করিল বিদায়।
জমপুর থাকি বেহারা ফিরিয়া আসিল,
তিনদিন পরে তার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।
রাজবাড়ীর ভিতরে যেন কিয়ামত নাজেল হইল।
কে কোথায় কান্দে করে হায়, হয়,
মাটিত পড়িয়া বেগম ধুলাত লুটায়।
এই রকম করি রাজ পুরিত রোল পৈল,
এ বাড়ীর ও বাড়ীর লোক সব জমা হইল।
তারপরে শুনহে সব্বায় শাজাদি গেল পালকিত চড়িয়া,
কেহ গেল ঘোড়া দাবারিয়া অবশিষ্ট লোক গেল পায়ে দৌড়িয়া।"

১৮৫৭'র পরের নূতন জমিদার ধন পৎসিং দুগড় ও ছত্র পৎসিং দুগড় এবং অন্যান্য জমিদাররা প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে শাল গাছের বীজ ছড়ায়ে বিরাট শাল বাগানের সৃষ্টি করে' সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭) অব্যবহিত পর হতে এই নগরস্থ স্থানগুলি কিরূপ ভয়াবহ জঙ্গলাকার হয়ে যায়, তা' নিম্নোক্ত ভাওয়াইয়া গানটি হ'তে আঁচ করতে পারবেন।

ভাওয়াইয়া গান

বাপ ছাড়িলাম মাও ছাড়িলাম
ছাড়্‌লাম সোনার বাড়ী।
বেড়ুয়ার (৩) জঙ্গলে আসি করিলাম ঘর বাড়ী॥
কোকিলাজঙ্গ হাটের সং সুপারী
নেজামুদ্দির বরের পান,
কি দিয়া খিলাইলেন বন্ধু
আউলাইলেন পরাণ।
একেতো ভেলোয়া (৪) নদী তাতে কুমীরের ভয়,
ভোলা যায় গোসল করিতে বন্ধু প্রাণ উড়িয়া যায়।
একেতো বেড়ুয়ার কাটাল তাতে বাঘের ভয়,
বাঘের গর্জ্জনে বন্ধু প্রাণ উড়ি যায়।
বাপ ছাড়িলাম মাও ছাড়িলাম ছাড়িলাম সোনার বাড়ী,
পেটের ক্ষুধাতে বন্ধু থাকিতে না পারি।
ভাঙ্গা দাঁড়ার (৫) রুই মাছ বন্ধু কছিমুদ্দির হাঁড়ির ভাত,
তিন দিনকার উপাসে খাইয়া বন্ধু মাথায় দিলাম হাত।
জাইতো গেলো কুল ও গেলো তাকো নাইরে শুনো,
কোলের ছাওয়াল ছাড়ি বন্ধু থাকতে না পারেঁা।
ভেলোয়া নদীর পাড়ে গোয়ালের বসতি,
দধি দাওয়ার আশা করি বাড়াইলাম পিরীতি।
বড় নদীর পশ্চিম পাড়ে ধনীরও (৬) বসতি,
ইলশা পেটি নথের আশায় বাড়াইলাম পিরীতি!
ভেলোয়া নদীর পাড়ে পাড়ে বিন্না বা থোকা থোকা,
ছাড়িয়া দেরে চেংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্দো খোঁপা।
ভেলোয়া নদীর বাতায় বাতায় নানান বা জাতি ফুল,
ছাড়িয়া দেরে চেংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্দো চুল।
হায়রে বড় নদীর পুব পাড়ে বায়াই পাখির ভাঁসা,
ভাঁসা গেল পাখিও গেল মিছা বন্ধুর আসা।

(১) কাক। (২) হৃদয়। (৩) বড় সরোবরের পশ্চিম প্রান্ত। এখানে বেড়ু বাঁশ পরে হয়।
(৪) বড় সরোবরটি পরে ভেলায় পারা পার হওয়ার জন্য এই নামকরণ হয়। (৫) সরোবরের মুখ পূর্বের তিস্তায় গিয়ে ঠেকেছে।
(৬) ইংরাজ বিরোধি শের্ব ভগবানসিং এবং তৎ বংশীয়দের প্রমাণ।

কওমী সংগীত

মার্চের সুর

পাকিস্তান পাকিস্তান,
ধন্য দেশ পাকিস্তান,
পুণ্য ভূমি পাকিস্তান,
পাকিস্তান পাকিস্তান ॥

ঊর্ধে ধরিয়া তোমারি নিশান,
কণ্ঠে তুলিয়া তব জয়গান,
চিত্তে বরিয়া তোমারি ধেয়ান,
ধন্য মোরা ভাগ্যবান।
শান্তি সুখে দীপ্যমান ॥
পুণ্য ভূমি পাকিস্তান ॥

নিপীড়িতের তুমি আশ্রয়,
মানবতার রূপ অক্ষয়,
দিগ্‌বিদিকে ওঠে তব জয়,
সাম্যমৈত্রী মূর্তিমান।
বিশ্বে তুমি গরিয়ান ॥
পুণ্য ভূমি পাকিস্তান ॥

আসুক ঝঞ্ঝা ঘন-আঁধিয়ার,
ডরিবনা কভু হটিবনা আর,
জীবন দানিয়া রাখিব তোমার—
নাম্ ও নিশান্ পাকিস্তান।
অমর তুমি পাক্ ওয়াতান্ ॥
পুণ্য ভূমি পাকিস্তান ॥

কথা—ফেরদাউস খান ঃ সুর ও স্বরলিপি মফিজুল ইসলাম

II সা মা ধা -া | গা মা পা -া I সা সা ধা -া | পা ধা ণা -া
পা কি স্তা ন   পা কি স্তা ন   ধ ন্য দে শ   পা কি স্তা ন

র্রা র্রা র্সা র্সা | ণা ধা পা -া I র্সা র্সা ণা -া | ধা পা মা -া
পু ণ্য ভূ মি   পা কি স্তা ন   পা কি স্তা ন   পা কি স্তা ন II

মর্সা র্সা র্সা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা ণা -া I মণা ণা ণা ণা | র্সণা র্সণা ধা -া
উ০ র্ধে ধ রি য়া   তোমা রিনি শা ন্   ক০ ঠেতু লি য়া   তব জয় গা ন্
নিপী ড়ি তে র   তু মি আ শ্র য়   মা০ নব০ তা র   রূপ অ০ ক্ষ য়
আসু ক ঝন্ ঝা   ঘ ন আঁধি য়া র   ডরি না ক ভু   হটি বনা আ র

মধা ধা ধা ধা | ণধা ণধা পা -া I সা মা ধা ধা | গা মা পা পা

চি॰ ত্তের দি য়া তব জয় গা ন্ ধ ন্য মো রা ভা গ্য বা ন

দি॰ গবি দি কে ওঠে তব জ য় সা ম্য মৈ ত্রী মু ক্তি মা ন

জীব নদা নি য়া রাখি বতো মা র না মনি শান পা কি স্তা ন

সা সা ধা ধা | পা ধা ণা -া I র্সা র্সা সা র্সা | ণা ধা পা -া

শা ন্তি সু খে দী প্য মা ন পু ণ্য ভূ মি পা কি স্তা ন

বি শ্বে তু মি গ রী য়া ন পু ণ্য ভূ মি পা কি স্তা ন

অ মর তু মি পাক ওয়া তা ন পু ণ্য ভূ মি পা কি স্তা ন

র্সা র্সা ণা ণা | ধা মা পা -া II

পা কি স্তা ন পা কি স্তা ন

পা কি স্তা ন পা কি স্তা ন

পা কি স্তা ন পা কি স্তা ন

ধোঁয়াটে আকাশ

আনোয়ারা বেগম চৌধুরী

"ওমা তুই ?"—বিস্ময়ে সেলিনার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে।

"হ্যাঁ, ভয় পেলি নাকি ?"—রাবেয়া মুচকি হাসে।

"না—না—ভয় পাব কেন, আয় বোস্"—রাবেয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকল সেলিনা।

ছোট্ট এক টুকরো অন্ধকারময় ঘর। চুনবালি খসা ইঁটগুলো লাল দাঁত বার করে যেন হাসছে। উঠোনে বিক্ষিপ্ত নানা আবর্জনা, ঘরের ভিতর বিভিন্ন টুকিটাকি জিনিষে ঠাসা। ঘরের সবটুকু জায়গার অধিকাংশ একখানা খাট আর একটা তক্তপোষে জুড়ে রয়েছে। রাবেয়া তাকিয়ে দেখল। মনে মনে লজ্জা পেল সেলিনা। তক্তপোষের উপর থেকে তুলো বের করা বালিশটা সরিয়ে একখানা চাদর পেতে দিল। "বোস্"—সেলিনা বলল। রাবেয়া বসল।

"তারপর, আমার বাসা চিনলি কি করে ?"

"সালেহার কাছ থেকে শুনলাম। কলেজ বন্ধ। ঢাকায় এসেছি। কিছুদিন ঘুরে বেড়াব এখন। তা তোর এ-অবস্থা কেন ?"—রাবেয়া তাকাল সেলিনার দিকে।

"আর বলিস কেন ভাই, যা কিছু ছিল সব ওঁর মামাত ভাইয়ের সঙ্গে মামলা করতে চলে গেছে—ফলে বুঝতেই পারছিস।"—সেলিনা ক্ষীণ হাসল।

"অ। যাক, তোর ছেলেমেয়ে ক'টি এখন, তারা সব কোথায়, তোর বরটিই বা কই।"

"ইস্ একসঙ্গে এত প্রশ্ন করলে জবাব দিই কেমন করে বল্। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কর্। ছেলেমেয়ে তো বর্তমানে চারটি দেখছি—তিনটে স্কুলে। আর ও গিয়েছে অফিসে।"

"বাঃ বেশ চাকুরী শুরু করেছিস তো দেখছি। ছয় বছরেই চারটি! আরও তো দিন পড়ে আছে। তাই বুঝি দেহের দশা এমন ?"—হাসল রাবেয়া সেলিনার রুগ্ন শরীরের প্রতি তাকিয়ে।

"হ্যাঁ, আমার তো এ দশা। তোর কি হল। এখনও বিয়ের ফুল ফুটেনি নাকি।"

"ফুটল আর কবে। এই ছাব্বিশে তো পড়লাম প্রায়। বুড়ীর দলেই তো চলে গেছি একরকম। এম, এ, পাশ করে মফঃস্বলের কলেজে প্রফেসারী করছি।"

"না করেছিস, বেঁচে গেছিস। বিয়ে করে মানুষে ?" সেলিনা বলল।

"তাই নাকি, এ-অভিজ্ঞতাটা হল কবে, বিয়ের আগে না পরে ?"—রাবেয়া ঠোঁট কামড়ে হাসলো।

"বিয়ের আগে হলে তো বেঁচেই যেতাম। এই দুর্দশায় পড়তে হত না। কিন্তু তা তো হয়নি……যা ; একটু বোস্ তো ভাই, রান্নাঘরে তরকারীটা চড়িয়ে দিয়ে এসেছি। এতক্ষণে ধরে গেল হয় ত, দেখে আসি।"—সেলিনা দ্রুতপদে চলে গেল।

রান্নাঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সেলিনা। রাবেয়ার আকস্মিক আগমনে বেশ অপ্রতিভ হয়েছে সে। আগে খবর পেলে ঘর দোরগুলো অন্ততঃ একটু গুছিয়ে নিত। মুনিম অফিসে। ছেলেমেয়েগুলোও স্কুলে। ভাগ্যিস ঘরে একটু আটা ছিল। সেলিনা চট্ করে বাটিতে একটু আটা নিয়ে মাখাতে বসল। রাবেয়া বসে আছে ঘরে। তা থাক্। এখনি হয়ে যাবে তার। বেশ দেখতে হয়েছে রাবেয়াকে। মুখখানা শান্ত গম্ভীর। বয়সের আধিক্যে কপালে একটু কুঞ্চন। তাতে যেন আরও মানিয়েছে ওকে। বেশ আছে রাবেয়া। কেমন যেন এক ঈর্ষা দানা বাঁধছে সেলিনার বুকের ভিতর। রাবেয়ার উপর ঈর্ষা। ও—'ও ঠিক এতদিন রাবেয়ার মত এম, এ, পাশ করে যেত। কম বড়লোকের মেয়ে ছিল না তো সেলিনা। কিন্তু তখন কি লেখাপড়ার এত মর্য্যাদা জানত ? উচ্ছল উদ্দাম যৌবন চঞ্চল দিনগুলোর মধ্যে লেখাপড়াকে একটা উঁচুদরের বিলাসিতার মতই মনে হত বটে। সেই সময় হল মুনিমের সাথে ওর পরিচয়। মুনিমকে ভালবাসলো। জ্যোৎস্না রাতে খোলা বাতায়নের পাশে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুনিমকে স্বপ্ন দেখল। ওর স্বপ্নময় আঁখি করল মুনিমকে মুগ্ধ। কিন্তু মুনিম গরীবের ছেলে। সেলিনার বড়লোক বাবার কাছে গিয়ে ওকে প্রার্থনা করার মত সাহস তার ছিল না। তাই সেলিনাই নিজে গিয়ে বাপের কাছে মুনিমকে দাবী করল। বাপের চিরকালের আদুরী সে। কোন কথা গোপন করা তার স্বভাব নয়। বাবা বিস্মিত হলেন। চিন্তিতও হলেন। তারপর দিলেন অনর্গল উপদেশ। চালচুলোহীন ছেলের সাথে কোন বাপ মেয়ে দিতে পারেন না, সে কথা সেলিনাও বুঝত। কিন্তু মুনিমের কিছু না থাক্, হৃদয় ছিল। আর সেই হৃদয় জুড়ে ছিল সেলিনা। কিন্তু আজ! আজ আর সে জোর নেই সেলিনার। সে কণ্ঠও নেই। প্রেমের দাবীও শিথিল হয়ে এসেছে তার। কি দিয়েছে মুনিম তাকে ? শুধু দারিদ্র্য আর হতাশা ছাড়া আর কিছুই তো নয়। তার

ভিতর আবার এসেছে চার চারটে নিরপরাধ শিশু। ওদেরকে নিয়ে সেলিনার মুস্কিল হয়েছে বেশী। ওদের মা ডাকই ওকে ভুলিয়ে রেখেছে বস্তির ঘরে। ভুলিয়ে রেখেছে চার পাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। বেশ আছে রাবেয়া। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। কোন ঝামেলা নেই। নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্তে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও। কেমন এক ঈর্ষায় সেলিনার বুকটা জ্বালা করতে লাগল।

"কি রে সেলু, এত দেরী কেন?"—রাবেয়া ঘর থেকে জিজ্ঞাসা করলো।

"আসছি ভাই, একটু অপেক্ষা কর্।"—সেলিনা তরকারীর হাড়িটা নামিয়ে কড়াইতে ঘি দিয়ে লুচি ছাড়লো।

বালিশে হেলান দিয়ে ঘরখানার দিকে দৃষ্টি বুলোল রাবেয়া। খাটের উপর বালিশের পাহাড়। দেয়ালে টাঙান চার পাঁচখানা ফটো। তার মধ্যে একখানা সেলিনার স্বামী মুনিমের। শান্ত সরল চেহারা। দেখলেই মনে হয় বড় ভাবুক। সেই বিয়ের দিনেই দেখেছিল রাবেয়া মুনিমকে। কিন্তু সেলিনার এই অবস্থা যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না। দারিদ্র্যের প্রতি যার ঘৃণা ছিল অপরিসীম, তার ঘরেই দারিদ্র্য এমন জাঁকিয়ে বাসা বেঁধেছে। তবু বেশ আছে সেলিনা। স্বামী, সংসার আর চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ আছে। দারিদ্র্যে ভর্তি হলই বা সংসার, তবু তৃপ্তি আছে এতে। কিন্তু এত লেখাপড়া শিখে আর অর্থ উপার্জন করেও, সুখী হল না রাবেয়া। কি পেল সে জীবনে? কিছুই পায়নি। অতৃপ্তির ছোঁয়ায় বুকখানা তার খচ্‌খচ্ করে। কিন্তু তখন তো বোঝেনি সে। শাহেদ যখন ওর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিলো, "তুমি বিয়েতে এখন মত দাও রুবি, বিয়ের পর আমিই তোমাকে পড়াব।" তখন সে-ই তো দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলো, "লেখাপড়া শেষ না করে, অন্ততঃ এম, এ, পাশ না করে তো আমি বিয়ে করতে পারি না শাহেদ ভাই।" সেই রাবেয়া এম, এ, পাশ করল। জ্ঞানের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত করল। কিন্তু শাহেদ আর অপেক্ষা করতে পারেনি। বাপ মায়ের অনুরোধে তাকে তখনই বিয়ে করতে হয়েছিল অন্য এক মেয়েকে। এখন তিনটী ছেলের জনক সে। বিকেলে ছেলে বউকে নিয়ে মোটরে করে লেকের ধারে হাওয়া খেতে যখন সে বের হয়, তখন রাবেয়ার মনে হয় তার বুকখানা যেন কে দু'হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।......উঃ, বুকের ভিতর কেমন যেন জ্বালা করে রাবেয়ার। সবাই জিতে গেছে কেবল তারই হয়েছে হার।

"উঁ—আ—আ"—একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে দরজার দিকে ফিরে তাকাল রাবেয়া। ছোট্ট একটা ছেলে। ফর্সা, ডিমের মত। সেলিনার ছেলে নিশ্চয়। মুখের ভিতর লাল চুষিকাঠি পুরে অদ্ভুত শব্দ করছে। সারা মুখ লালায় সমাচ্ছন্ন। সবেমাত্র ধুলিশয্যা ছেড়ে যেন এসেছে। ছুটে গিয়ে রাবেয়া ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর ওর নরম তুলতুলে মুখখানা চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। আঃ কি সুন্দর! কি নরম তুলতুলে মুখখানি। ঠিক শাহেদের ছোট ছেলেটির মত। বড় ইচ্ছে করে রাবেয়ার শাহেদের ছোট ছেলেটাকে এমন ভাবে আদর করতে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এমনি করে চুমু দিয়ে মুখ ভরিয়ে দিতে। ইস্ সেলিনারও কি সৌভাগ্য। এই টুকটুকে পুতুলের মত ছেলেটির অধিকারিণী সে।

"কি রে পাগল হলে নাকি?"—রাবেয়ার কাণ্ড দেখে সেলিনা হেসে বলল, "শাড়ীখানার কি দশা হয়েছে দেখ্ তো।"

"কি সুন্দর তোর ছেলেটিরে ভাই"—রাবেয়া খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

"সুন্দর না ছাই, এইসব শত্তুরদের জ্বালায়ই তো আমার এমন দশা। যাক্—এখন এটুকু মুখে দে তো।" সেলিনা ছোট টেবিলটার উপর লুচি আর আলু ভাজা সাজিয়ে দিল।

"ছিঃ এরা নিষ্পাপ। এদের গাল দিস কেন রে"—রাবেয়া ব্যথীত কণ্ঠে বলল।

"না, গাল দেবে না, যদি জানতিস্ এদের নিয়ে কত জ্বালা, তবে ওকথা বলতে পারতি নে।"

"হ্যাঁ জ্বালা আছে, তবে আনন্দও কম নয়,—ইস্ এসব আবার করলি কেন?"—খাবার দেখে রাবেয়া আপত্তি জানাল। তবু একটু ছিঁড়ে মুখে দিতে হল। খাওয়া শেষে বলল, "তোর বরটির সাথে দেখা হল না ভাই, এমন অসময়ে এলাম।"

"দুপুরে থেকে যা'না, দেখে যেতে পারবি।"—সেলিনা খোকাকে কাঁধের উপর শুইয়ে পিঠের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

"থাকি কি করে বল্। মিলির বাসায় কথা দিয়ে এসেছি। ওর ওখানে আজ খেতে হবে।"

রাবেয়ার কথায় বেশী জেদাজেদী করল না সেলিনা। তা ছাড়া আজকে যা রান্না হয়েছে, তা স্বামীর পাতে দেওয়া যায়; কিন্তু বন্ধুর পাতে দেওয়া যায় না।

"তা হলে এখন উঠা যাক্ কি বল্"—রাবেয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুমন্ত খোকার গালে একটা টোকা মেরে ওর বদ্ধ মুঠিখানা খুলে একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল, "খোকাকে পুতুল কিনে দিস্।"

"কিন্তু তুই কি এখনই যাবি ?"—সেলিনা আপত্তি জানাল।

"হুঁ", কতকগুলো বই কিনতে হবে আবার। এরপর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ভারী ঝঞ্ঝাট্। তোরা বেশ সুখে আছিস ভাই।"

ফিরে তাকাল সেলিনা, "বিদ্রূপ করছিস বুঝি ?"

"ছিঃ, বিদ্রূপ করব কেন বল্। যা সত্যি তাই বললাম। স্বামী সংসার ছেলেমেয়ে বেশ লাগে দেখতে।" রাবেয়ার অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরে বিস্মিত সেলিনা অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর এই দারিদ্র্যে ভরা সংসার, শত বন্ধনে আবদ্ধ জীবন কেমন করে এক মুক্ত বিহঙ্গীর আকাঙ্খিত হতে পারে ভেবে পেল না। রিকশা এসে দাঁড়াল। "আসি ভাই"—রাবেয়া রিকশায় উঠল।

"আবার আসিস"—অন্যমনস্ক সেলিনা অস্ফুটে জবাব দিল।

"আসব।"—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রিকশার ভিতর থেকে আকাশের দিকে তাকাল রাবেয়া। আকাশটা ধোঁয়াটে। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে বুঝি।

ট্রাজেডির শেষ অংক

চৌধুরী ওস্‌মান

এখন কেবল তোমার কথাই পড়ছে মনে,
দিবস রাতের কাজ-অকাজে সকল ক্ষণে।
এখন শুভ্র চাঁদের হাসি লাগছে বাসি,
গরল ছড়ায় কানের কাছে মিষ্টি বাঁশী।

যখন তোমায় পেয়েছিলাম নিবিড় করে,
তখন কিন্তু ভুলেও একটি বারের তরে
মনের কোণে এই হারাবার একটু ভয়
দেয়নি হানা। জীবন প্রাতে সূর্য্যোদয়

দেখেই কেবল সব ভুলেছি, রাতের কথা
হয়নি স্মরণ। মনের আবেগ উচ্ছলতা
গানের সুরে হাওয়ার সুরে সব ভুলালো,
মনের গহন অন্ধকারে দীপ জ্বালালো।

তখন মোরা যৌবনেরই দৃপ্ত গানে
লজ্জা ভয়ের দেয়াল ভেঙে সমুখ পানে
এগিয়ে গেছি। হায় ট্রাজেডী, কোন্ সময়
দীপ নিভিলো লুপ্ত হলো সূর্যোদয়।

এখন কেবল লিখন লিখি অশ্রুজলে
কাটছে দিবা-রাত্রি শুধু পলে পলে।

আমাদের লোক সাহিত্যের একদিক

গোলাম কাদির

অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক সংখ্যা আমাদের দেশে কম; আবার যাদের অক্ষরজ্ঞান আছে তারা সকলেই সাহিত্যের পাঠক বা সাহিত্য-রস উপলব্ধির ক্ষমতাপন্ন নয়। অথচ সকল মানুষের মনেই সাহিত্য রসের একটা সাধারণ ক্ষুধা রয়েছে। আদি কাল থেকেই মানুষ তার চলনে বলনে, উত্থানে-পতনে তার মনের বিভিন্ন বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেবার চেষ্টা করে এসেছে এবং একের সেই অভিব্যক্ত-ভাব অন্যের মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই ভাবেই মানুষ প্রাথমিক যুগ থেকে তার সাহিত্য ক্ষুধার নিবৃত্তি করে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আচরণে ভদ্র হয়ে উঠল, তার শিক্ষা, জ্ঞান, তাহজীব তাকে উন্নত রুচির অধিকারী করে তুললো। উন্নত সভ্যতায় জীবনের বিকাশ হয় জটিলতর; এতদিন মানুষের সাহিত্যক্ষুধার যা একক বিষয়বস্তু ছিল জটিলতার যুগে তাই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, নৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ললিত কলার এই সকল বিভিন্ন শাখার চর্চা দ্বারা বিদগ্ধ ও রসগ্রাহী সমাজের ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু বিদগ্ধ সমাজের মত আমাদের সামগ্রিক সমাজের পরিধিটা এত সংকীর্ণ নয়; কাজেই সমাজের বৃহত্তম অংশটাই বিদগ্ধ জনের বাইরে পড়ে রইল। অথচ তাদেরও ক্ষুধা নিবৃত্তির পর মনের ক্ষুধা দেখা দেয়—তারাও মানব মনের বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে পেতে চায়। স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের ভেতর থেকে একদল সংবেদনশীল লোক এই অভিব্যক্তির পথ খুঁজে বের করে। মুখে মুখে তারা ছড়া কাটে, পালা গান সৃষ্টি করে গাঁয়ে-বাজারে, মাঠে প্রান্তরে অন্তরের দরদ মিলিয়ে গেয়ে ফিরে। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এমনি ভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লোক সাহিত্য বা Folk Literature এর সৃষ্টি হয়েছে।

যেহেতু এই সাহিত্য অক্ষরজ্ঞানহীন বা অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষের জন্য তাদেরই শ্রেণীর মানুষেরা সৃষ্টি করেছেন, কাজেই এই সাহিত্যে উন্নত রুচি ও শালীনতার অভাব পরিদৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভাষার দীনতা, প্রকাশ-ভঙ্গীর দুর্বলতা, আঙ্গিকের ত্রুটি এবং অনেক ক্ষেত্রে অমার্জিত রুচিবোধ এই শ্রেণীর সাহিত্যকে তার পরি-মণ্ডলের ভেতরে গতিশীল ও প্রাণবান করে তুলেছে। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত গেঁয়ো কবি-সাহিত্যিকেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং রুচি মাফিক লোক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। বিদগ্ধ জনের বাইরে আমাদের যে বৃহত্তম জন-সমাজ তার সাহিত্য রস-পিপাসা এই সাহিত্যের দ্বারাই পরিতৃপ্ত হয়ে এসেছে। লোক সাহিত্যের উৎপত্তি এবং গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্র নাথ তাঁর "লোক সাহিত্য" গ্রন্থে সরস ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

জটিল জীবনের ছায়াপাত আমাদের লোক সাহিত্যেও হয়েছে। এরই ফলে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া, কবি-গান, সারি গান, বিয়ের গান, আধ্যাত্মিক বা মারফতি গান, পালা বা কাহিনী মূলক গান এবং প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি পেয়েছি। আমাদের লোক সাহিত্যের সংগ্রহ আমরা খুব কমই করতে পেরেছি। এদেশে শিক্ষিত মানুষের চাইতে অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যেমন অবাঞ্ছিত রকমের বেশী, তেমনি আমাদের শালীন সাহিত্যের চেয়ে লোক সাহিত্যের পরিধিও প্রশস্ততর। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা" ও "ময়মনসিংহ গীতিকা" সংগ্রহে এই ব্যাপক সাহিত্যের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। পল্লীকবি জসিমউদ্দিন পাক-বাংলার বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত পালা কাহিনী অনুসরনে স্বীয় প্রতিভাবলে অনবদ্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন তাঁর "হারামণি" গ্রন্থে অনেকগুলো গান সংগ্রহ করে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। আজ-কাল আরো অনেকেই লোক সাহিত্যের সংগ্রহ এবং চর্চায় আত্মনিয়োগ করে দেশের একটা মূল্যবান সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসছেন। এটা নিঃসন্দেহে ভরসার কথা।

ছড়ার ক্ষেত্রে বোধহয় রবীন্দ্রনাথই উল্লেখযোগ্য বিচরণকারী। তাঁর "ছেলে-ভুলানো ছড়া" প্রবন্ধে ছড়ার আলোচনা ও সংগ্রহ দুটোই লক্ষ্যনীয়। ছড়ার জগতটা সত্যই বিচিত্র ও ব্যাপক। আমাদের দেশের আনাচে কানাচে কতো যে বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে তার হিসাব দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। দেখা যাবে এই সমস্ত ছড়ায় সমাজ জীবনের একটা ছাপ কখনো স্পষ্ট আবার কখনো অস্পষ্ট হয়ে লেগে আছে। অশিক্ষিত গেঁয়ো কবিরা এই সকল ছড়া রচনায় বালক সুলভ চপলতার পরিচয় দিয়েছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের রচনা বিদগ্ধ জনমনেও রেখাপাত করার মত শক্তিময়ী হয়ে উঠেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমরা ছড়া সম্বন্ধেই এখানে দু'এক কথা বলব।

শুধু আমাদের দেশে কেন, বোধ করি সর্ব দেশেই এবং সর্বকালেই গৃহস্থ মানুষের নিকট ইঁদুরের উৎপাতটা অসহ্য ছিল এবং এখনো আছে। ইঁদুর ভাঁড়ার কেটে গৃহস্থের সঞ্চিত ধানের অপচয় করে, মূল্যবান কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনাশ সাধনে ইঁদুরের দোসর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ট গেঁয়ো কবি ছড়া রচনা করেছেন :

এই বাড়ীর বুড়ী সেই বাড়ী যায়।
পথে পাইয়া বুড়া ইন্দুর দুই হাতে কিলায়॥
কিলাইতে কিলাইতে বুড়ি মলে দুই কান।
"তুই ইন্দুর খাইছছ আমার নাতিন জামাইর ধান॥"
"খাইছি ধান, খাইছি ধান কি করিতে পার?
ছালা কাট্ইয়া নিয়াম ধান মাথা কুট্ইয়া মর॥
আতা কাটবাম, পাতা কাটবাম, কাটবাম ঘরের কোনা।
একই রাইতে কাটইয়া নিয়াম বউ-এর কানের সোনা॥"
বউ-এর কানের সোনা নিয়া ঝি-এর কানে দিয়া।
অভাগা ইন্দুর কান্দে হাত তালি দিয়া॥

থুড়থুড়ে এক বুড়ী, এ-বাড়ী থেকে ও বাড়ী যাওয়ার পক্ষে তেমনি থুড়থুড়ে এক বুড়ো ইঁদুরের সাথে দেখা। ঘটনাটি উপভোগ্যই বটে। তারপর বুড়ীর নাতিন জামাইর ধান খাওয়ার অভিযোগে ইঁদুরকে কিলাতে কিলাতে তার কান মলা—ছেলে মেয়েদের নিকট সত্যিই এক কৌতুকপ্রদ চিত্রের সৃষ্টি করেছে।

ইঁদুরের মতই আর এক বিরক্তিকর প্রাণী হলো চিকা। তার গতিবিধি বিশেষ করে পাক ঘরকে কেন্দ্র করে; ঘটি বাটি থালা, ভাতের হাঁড়ি, তরকারীর পাতিল প্রভৃতিতে অকারণে মুখ গলিয়ে তার নিজের গায়ের অসহ্য দুর্গন্ধকে সে ছড়িয়ে রেখে যায়। বারবার বাসন পত্রাদি ধুইতে গিয়ে ঘরের গৃহিনীরা অতিষ্ঠ হয়। মারতে গেলেও চিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবেনা, ঘরের কোণে কোণে, বিভিন্ন জিনিষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে তার গতি; কোন কিছু দ্বারা আঘাত করলে চিকা ত মরবেই না, বরং নিজের একটা মূল্যবান জিনিষ ভেঙ্গে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিভিন্ন অন্ধকার কোণ থেকে চিক্ চিক্ শব্দে এরা বেরিয়ে আসে, আর এদের দেখে ছেলে মেয়েদের ছড়া কাটতে শুনা যায় :

চিকা আইল চিকচিকাইয়া।
বাবন আইল দড়ি লইয়া॥
ধর চিকা, মার চিকা।
চিকার হাতে ঘর লিপা॥

গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় মেয়েদের চুল কেটে দেয়া এবং তাদের হাতে জোর করে ঘর লেপানোর অর্থ মেয়েদের প্রতি গভীর অমর্যাদা প্রদর্শন। চিকার ভাগ্যে হয়ত সেই অমর্যাদাকর শাস্তিরই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাঁয়ের কারো বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন এলে নিজের ঘরের বা পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনে মোরগ জবেহ করা হয়। তা না হলে মান থাকেনা। আর এই মোরগ জবেহ ব্যাপারটাও সহজ নয়; একটা মোরগকে কেন্দ্র করে এক পাল ছেলে মেয়ের ভীড় জমে যায়। জবেহ করে সাধারণতঃ ছেলেরা, মেয়েরা ধরতেও পর্যন্ত পারেনা। কোন ছেলে এমনি কোন সময় যদি মোরগ জবেহ করার দোয়া না জানে পালের অন্য কোন ছেলে তৎক্ষণাৎ দোয়া বাতলিয়ে দেবে :

তর তরানি ফর ফরানি,
গাছের তলে পাথ ছড়ানি;
খাও ধান কুড় মাটি,
আন তোমার গলা কাটি;
আল্লাহ্ হো আকবর।

নদীনালা, খালবিল পরিবেষ্টিত পাক বাংলায় বড়শী দিয়ে মাছ ধরা একটা খুব উপভোগ্য ও সাধারণ ব্যাপার। বর্ষার আগমনের সাথে সাথে ছেলে মেয়েরা প্রায়ই দল বেঁধে বড়শীর ছিপ হাতে ঘাটে জড় হয়। বড়শীতে সাধারণতঃ কেঁচো গেঁথে দেয়া হয়। কিন্তু সকলের বড়শীতে সমান ভাবে মাছ ধরা পড়ে না, কেউ বেশী পায়, কেউ কম। যারা কম মাছ পাচ্ছে বা মোটেই পাচ্ছেনা তারা যাদের বড়শীতে বেশী মাছ ধরা পড়ছে তাদের গেঁথে দেয়া কেঁচোকে মাছের নিকট বলতে শিখিয়ে দেয় :

আছলাম পাতালে,
তুলছে ক্ষইকরে;
ছোঁইছ না আমারে,
লইয়া যাইব তরে।

পরিণামে বেশী মাছ প্রাপ্ত ছেলের দল ক্ষেপে গিয়ে যা করে বসে তা না বলাই ভাল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ছড়া গুলো বিভিন্ন পর্যায়ের। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের মধ্যে নানা ধরনের খেলা প্রচলিত আছে। খেলা গুলোও যেন কাব্যের ছন্দে তাল রেখে এগিয়ে চলে। চার পাঁচজন ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়ে এক ধরনের খেলা খেলতে দেখা যায়। তারা গোলাকার হয়ে বসে নিজ নিজ হাতে আপন নাভি-মূল চেপে ধরে থাকে; আর একজন এক হাতে একটি গুটি নিয়ে ছড়া কাটে। ছড়ার প্রতি পর্ব উচ্চারণ করার সাথে সাথে এক এক জনের নাভিমূলে চেপে ধরা হাতে নিজের হাত গুজে গুটিটি সেখানে রেখে দেয়ার ভান করে। যার হাতের কাছে গিয়ে ছড়া ফুরিয়ে যায়, তাকেই বলতে হয় গুটিটি কার নিকট রাখা হয়েছে। কেউ যদি

ঠিক ঠিক বলতে পারে তাহলে যার নিকট গুটি রয়েছে তার একদফা হার হয়, আর বলতে না পারলে তার উল্টো ফল ফলে। এমনি করে তাদের খেলা এগিয়ে চলে। এবার ছড়াটি শুনুন :

উকুনি রে যুকুনি,
ফুল ফুল টুকুনি ;
ফুলের নাম তুলসীপাতা,
সাত বইন মন্দিরা গাঁথা ;
সারে গুড়ি সারে থাক,
কও গুড়ি কার ঠাঁই ?

এই জাতীয় আর একটি খেলার সন্ধান পেয়েছি আমরা। সেখানে ছেলে মেয়েরা গোল হয়ে বসে প্রত্যেকেরই উভয় হাত উপুড় করে মাটিতে চেপে ধরে ; আর একজন ছড়া কেটে কেটে প্রত্যেকের হাতের উপরই ছোট এক একটি কিল বসিয়ে যায়। এই ভাবে যার হাতে গিয়ে ছড়া কাটা শেষ হয় সেই ভাগ্যবান ; কারণ খেলার পরবর্তী পর্যায়ে সে-ই ছড়া কাটার অধিকার পায়। ছড়াটি নিম্নরূপ :

ইচুম বিচুম দরগা লড়ে,
গাবর বেড়ি চাউল কাঁড়ে ;
চাউল কাঁড়ানি খালা গো,
আমার ছাতি ধর গো।
ছাতির উপর ইন্দুরডা,
ফাল দিয়া উডে জুঙ্গুরডা ;
এল ভাত বেল ভাত,
রাজার ঘরে চুরি হাত ;
চুরি হাত বাঁড়ি,
আলউয়ার ডাউল কাঁড়ি ;
আলউয়ার চাউলের মেলা ভাত,
তোল তোল তোমার হাত।

আমাদের দেশে প্রচলিত হাডুডু খেলার কথা কমবেশী সকলেই জানেন। এই খেলার রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদেশী খেলাধূলা আমাদের নিজস্ব এই ক্রীড়া নৈপুন্যকে যেমন ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি এই খেলায় যে সকল ছড়া কাটা হ'ত তাও আমরা হারাতে বসেছি। এখানে কয়েকটি ছড়া উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

॥ ১ ॥

আমি যাই পূবে,
বাঁশ কাটি কুপে ;
বাঁশের নাই আগ,
আমার নাম বাঘ।...

॥ ২ ॥

অইয়া রে অইয়া,
কি কর বইয়া ?
ডাউকা ডাকে টকটকাইয়া ;
ডাউকার মাথায় কুঁড়ার তেল,
সি খেলিতে বারান গেল।...

॥ ৩ ॥

আমি কোন আইরে,
কামার বাড়ী যাইরে ;
কামারে গড়াইছে নাও
বাতা বাইয়া যাইরে ;
বাতায় ঝন্ ঝন্
কুটি কুটি বাঙ্ইয়ন।...

॥ ৪ ॥

গাঙের পারে ভাঙের গাছ
রক্ত পড়ে ধারে,
তেরে বংশের মাথা নাই
ভক্তি দিবে কারে ?...

প্রতিটি ছড়াই দ্রুত উচ্চারণে এক প্রকার অনুরণনের সৃষ্টি করে ; এবং প্রতিটি ছড়ারই শেষ ছত্রটি বার বার আবৃত্তি করে নিজের দমকে দীর্ঘায়িত করা এবং শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

আমাদের এই কৃষিভিত্তিক সমাজে গৃহ পালিত জীব-জন্তুর মধ্যে গরু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গাঁয়ের কিষানেরা অনেক সময় নিজেদের চেয়েও যত্নে গরু পালন করে। কিন্তু ক্ষেতখামারের কাজের ব্যস্ততায় তারা নিজেরা মাঠে মাঠে গরু চড়িয়ে বেড়াতে পারে না—সে কাজের জন্য চাই রাখাল। প্রতি গাঁয়েই রাখালের একটি দল দেখা যায়, প্রতিবেশী অন্যান্য গাঁয়ের রাখালদের সাথেও তাদের ঐক্য ও সখ্য গড়ে উঠে। তারা একে অন্যে ঝড়া করে, আবার তাদের মধ্যে যে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দেখা যায়—রাখাল ছাড়া অন্য কারো সাথে সে বন্ধন গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এদের যেন একটা আলাদা সমাজ, একটা পৃথক জগত। প্রতিদিন সকালে তারা এক সঙ্গে গাঁয়ের সকল গরু নিয়ে মাঠের দিকে যাত্রা করে আর সকলে সমস্বরে ছড়া আওড়ায় :

গরু ডাক দেওরে ভাই ঢাকে বাড়ি দিয়া,
গুরু নাথের ঘরখানি দেখইয়া আইলাম গিয়া ;
গুরু নাথের ঘরখানি দেখিতে সুন্দর,
পিট্ পিট্ মেঘ পড়ে ভাই, জুড়িল কান্দন।
ঘোড়া গেছে ঘাস খাইতে ঘোড়ারে খাইত বাঘে,
সকল ঘোড়া জিতইয়া আইল গুল-বাগিচার আগে,

গুলবাগিচা, গুলবাগিচা, কই যাস্‌রে ভাই?
রাজার হাতের রাম-দা লইয়া বাঘ মারিতে যাই।
এক বাঘ মারিতে গেলাম, গরুর গোপাটে।
আর এক বাঘ মারিতে গেলাম, বাঘে দিল ফাল।

এই পর্যন্ত ছড়াটি সমভাবেই এগিয়ে গেছে; কিন্তু এর পর থেকে রাখালদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করবে আর বাকী সকলে এক সঙ্গে জবাব দিয়ে যাবে:—

সেই বাঘ কি হইল?
জঙ্গলে লুকাইল।
সেই জঙ্গল কি হইল?
রাখালে পুড়িল।
সেই ছাই কি হইল?
ধোপা কাপড় ধুইল।
সেই কাপড় কি হইল?
কালা দামায় খাইল।
সেই দামা কই গেল?
গাঙে সাঁতার দিল।
সেই পানি কি হইল?
শুকাইয়া গেল।
সেই মাছ কি হইল?
জ্যাঠা বকে খাইল।
সেই বক কি হইল?
গাছের ডালে গেল।
সেই ডাল কি হইল?
পাতালে নামিল।

রাখালেরা কখনো বা একসঙ্গে এক পালেই সারা গাঁয়ের গরু চড়িয়ে ফিরে, আবার কোন কোন সময় মাঠে গিয়ে ছোট ছোট পালে বিভক্ত হয়ে যার যার গরু আলাদা ভাবে রাখে; এবং সে-ক্ষেত্রে এক পালের কোন একটি বা একদল গরু অন্য পালে গিয়ে মিশে পড়লে ভারী বিপদ। যার গরু অন্য পালে গিয়ে মিশে গেল তাকে পালের বয়ান করতে হবে, নতুবা অন্য পালের রাখাল গরু ফিরিয়ে দেবে না। অভিজ্ঞ রাখাল তখনই ঝটপট বলে দেবে:

এক গাছি, দু গাছি লাই,
গণতে গণতে পালে যাই;
পালে আছে কবলি গাই,
দুধটুকু খিরাইয়া খাই,
দুধটুকু লড়ে চড়ে,
সাত রাখাল পড়িয়া মরে।
সাত রাখালের সাত লড়ি,
মুই রাখালের এক লড়ি;
আন লড়ি ডাক দিয়া;
ঘাড় ভাঙ্গি পাক দিয়া;
টাটু গুয়ার বাটা খান,
ছাড়িয়া দে আমার পাল খান।

বয়ান যেমন গরুর পালের আছে, তেমনি আছে রাখালেরা যে বাঁশের চিকন শলা কাদ্বারা গরু রাখে তার। এক জনের হাতের শলা যদি হারিয়ে যায় এবং অন্য কোন রাখাল তা পেয়ে থাকে, তবে শলার বয়ান না বলা পর্য্যন্ত মালিককে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এ-বয়ান নিম্নরূপ:

অঘ্রান মাসে লাগাইলাম বাঁশ
কেরুল ধরে বার মাস
সেই কেরুলে বানাইলাম ফলা;
ফলা আমার বড় ভাই
হালে গেলে হাল বাই,
মুইয়ে গেলে মুই বাই,
সাঁতারে পড়লে তাঁ পাই
দরবারে গেলে জিতিয়া আই
ডাইনে বাঁয়ে কিছু দিয়া
ফলা আমার লইয়া আই।

এত গেল তাদের পেশাগত ছড়ার কথা। গাঁয়ের লোকেরা হাটবারে সওদা নিয়ে বাড়ী ফেরে। আর রাখালেরা পথের মাঝে একটা গামছা বিছিয়ে জড় হয়ে বসে তাদের ছোট ছোট লাঠি ফেলে মাটিতে আঘাত করে এবং তালে তালে ছড়া কাটে। হাট-ফেরত কৃষাণেরা রাখালদের কাছে বসে দুএক ছিলিম তামাক খেয়ে একটু জিরিয়ে নেয় আর যাবার বেলায় তাদের কিছু দিয়ে যায়। এবার সে ছড়াটা শুনুন:

হাটওয়ালা, ঘাটওয়ালা
মাঠওয়ালারে ভাই,
আমরা কিছু চাই,
আমরারে না দিলে
গুরুনাথের দোহাই,
পান দিবে সুপারি দিবে
আর দিবে কি?
গুরুনাথের নামে দিবে
সোয়া সের ঘি।...

গুরুনাথ ব্যক্তিটি কে জানিনে; কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় রাখালদের প্রায় ছড়াতেই এই গুরুনাথ শ্রদ্ধার আসনে বসে আছে। হিন্দুদের গো-দেবতার কল্পনায় গরুনাথই এখানে গুরুনাথে পরিণত হয়েছে কিনা কে জানে!

এবার তিনটি ছড়ার কথা উল্লেখ করে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটা শেষ করব। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় হাতে কোন খাবার নিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুড়ে ফিরে খেতে পছন্দ করে। এ-দিকে আবার দুষ্ট কাক-চিল ওৎ পেতে থাকে, একটু সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে তাদের হাতের খাদ্য নিয়ে পালায়। এমনি ধরনের দলকে লক্ষ্য করে তারা গীত গায় :—

পুরল পুরল,
ঝিঙ্গল ঝিঙ্গল,
মামুর বাড়ীর কলাডা
চিলে দিল থাবাডা ;
ও চিল রইয়া যা
বাঘের নাইচ দেখইয়া যা,
বাঘ বইছে ডালে,
হেঁচুয়া বইছে খালে,
দুই বইনে খেইর খেলায়
মেতি গাঙের পারে ;
মেতি গাঙ, মেতি গাঙ
টলমল করে।

মনে হয় ছড়াটির আরো দু'এক পংক্তি বাকী রয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা ভেবে এখন আর ফল নেই।

এ-দেশের মেয়েদের শ্বশুর বাড়ী যাওয়াটা অত্যন্ত পীড়া দায়ক। সেখানকার ভীতিটা বালিকা বয়সেই এসে যায়। কারণ বালিকা বয়সেই এদেশের অধিকাংস মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু শ্বশুর বাড়ী গিয়ে খেলা যায় না, সেখানে বালিকা বয়সেই গৃহিনীপনা করতে হয়। তাই ভাবটুকুর করুণ অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে নীচের ছড়ায় :

কাউয়াডা কল কলায় গাছের আগে বইয়া,
টুপিডা মাথা কুটে চিনা ক্ষেতে বইয়া,
আইজ টুপির লতিপতি কাইল টুপির বিয়া,
টুপিলারে নিতে আইছে ভেরণ তলা দিয়া
ভেরণের ফুল পড়ে চাকা চাকা অইয়া।
আইওরে ছোটতা খেইর খেলিতে যাই,
যেমনি গেলাম খেইর খেলিতে, এমনি অইল বিয়া
আরত খেইর খেলতাম না পরের ঘরে গিয়া,
পরের পুতে লইয়া যাইব ঢোলে বাড়ি দিয়া
ঢোল বাজে ঘামুর ঘুমুর, সানাই বাজে রইয়া।

এখন যে ছড়াটি উদ্ধার করতে যাচ্ছি তার বিষয় বস্তু অনেক পুরোনো এবং সে বিষয়ে আরো বহু ছড়া রয়েছে। তবু যে ছড়াটি আমার হাত এসেছে তার কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে বলেই পুনরায় সেটার উল্লেখ করতে সাহস পাচ্ছি। পরিনত বয়সের অভিভাবকেরা তাদের অশান্ত ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুমের কামনা করে নীচের ছড়াটি আওড়িয়ে থাকে :

নিন্দ্ওয়ালি মাইয়া গো
আমরার বাড়ী যাইও,
আমরার আবু দিলে ভাত
ডালে বইয়া খাইও ;
ডাল-ডুল ভাঙ্গিয়া তেলী বাড়ী যাইও।
তেলী দিবে তেলের ফোটা
মালী দিবে ফুল,
আমরার আবুর বিয়ার দিন
চিকায় বাজাইব ঢোল।

নিজের দেহের চেয়ে শতগুণ বড় একটা ঢোলক নিয়ে আবুর বিয়ের মসলিসে চিকা যখন আনন্দে নাচতে শুরু করে দেবে তখনকার অবস্থা শিশুমনেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উপযোগী।

অত্যন্ত সংক্ষেপে উপরে কয়টি ছড়ার আলোচনা করা হল। আমাদের গ্রামজীবনের উপজীব্য এই মূল্যবান সম্পদ আজ হারাতে বসেছি। এ গুলোর সংগ্রহ আজ এক প্রকার দুরুহ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কারণ গাঁয়ের নবীনদের মনে শহুরে সভ্যতার দৃষ্টি লেগেছে, তারা মনে মনে শহুরে 'ভদ্র' হওয়ার চর্চায় ব্যস্ত। এই সকল ছড়া তাদের কাছে আর তেমন প্রীতিদায়ক নয়। যে কয়জন বুড়ো মেয়েলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারাই আজও এ-গুলোকে প্রাণবান করে রেখেছে। আর একেবারে নিরক্ষর চাষী বা রাখালদের কাছেও ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্পাদকীয়

শিল্পী ও সাহিত্যিক কল্যাণ তহবিল

সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কল্যাণের জন্য একটি বিশেষ তহবিল মঞ্জুর করিয়াছেন। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁদের উল্লেখ-যোগ্য দান আছে, তাঁদের উপকারার্থেই এই তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। যে সমস্ত শিল্পী ও সাহিত্যিক অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন অথবা অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, প্রাথমিক পর্য্যায়ে তাঁদের কল্যাণের জন্যই এই তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইবে। জাতীয় তমদ্দুনের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যিকের দান প্রকৃতই গর্ব্বের বিষয়, তাঁদের স্বার্থের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সদর বলেন, "শিক্ষা ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিকট জাতি চিরকালই ঋণী। শারীরিক অক্ষমতার জন্যই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক; তাঁদের নূতন সৃষ্টির কল্যাণের প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

শিল্প-সাহিত্য ও রাষ্ট্র

পাকিস্তানের সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁর এই নূতন তহবিল গঠনের সংবাদকে সারা দেশবাসী আন্তরিকতার সাথে মোবারকবাদ জানাইবে। এ-কথা বলিতে সত্যই আজ আমাদের দ্বিধা নাই যে, সদর একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রের সাহায্য, সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার সাথে শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক চিরকালের। অনেকের ধারণা "আধুনিক-পূর্ব্ব যুগে" যত বড় বড় শিল্পী ও সাহিত্যিকের জন্ম হইয়াছে, পরবর্তী যুগে তা কখনও হয় নাই। মধ্য যুগ হইল বড় বড় রাজা, বাদশা, সামন্ত, আমীর-ওমরাহের যুগ। মধ্যযুগের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত এই সব রাজা, বাদশা, ওমরাহদের প্রভাব বহু দেশে বিদ্যমান ছিল। তাঁদের মধ্যে কারো কারো বিদ্যোৎ-সাহিতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁরা অকাতরে কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য এনাম, খেলাত, অর্থ, সম্পত্তি দান করিতেন। শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির বড় বড় সৃষ্টি সম্ভব হওয়ার মূলে এ-সব সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা অনেকখানি কাজ করিত, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। শিল্প ও সাহিত্যের জন্য মুছলমান বাদশা, আমীর-ওমরাহদের দান ছিল সর্ব্বজনবিদিত। গজনীর সুলতান মাহমুদ হইতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস এ-জন্য গর্ব্ব বোধ করিতে পারে। বাংলা ভাষা সত্যিকারের বাংলা ভাষাই হইত না--যদি না বাংলার পাঠান নৃপতিদের সাগ্রহ ও সানন্দ স্বীকৃতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য লাভ না করিত। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ ও সাহায্য দান মুছলমান রাষ্ট্রের চিরাচরিত ঐতিহ্য। অন্ততঃ পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এ-ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার এ-ধারা বন্ধ হইয়া গেল। মুছলমানের রাজ্য, সম্পদ যাওয়ার সাথে সাথে তার শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণধারাও শুষ্ক হইয়া গেল।

আজাদ পাকিস্তান ও শিল্প-সাহিত্য

আজাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সকলেই আশা করিয়াছিল যে, শিল্প ও সাহিত্যকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ আগাইয়া আসিবেন। তাঁরা তাঁদের জাতীয় ঐতিহ্যকে পুণর্জাগ্রত করিবেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের কদর করিয়া পাকিস্তানের অবলুপ্ত, ক্ষীণ, উপেক্ষিত সৃষ্টিধর্ম্মী শক্তিতে নব জীবনের প্রাণবন্যা ধ্বনিয়া তুলিবেন। এ-দিক হইতে যে তেমন কিছু এ-পর্য্যন্ত করা হয় নাই, তা দুঃখের সাথে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি এ-উপেক্ষা অকৃতজ্ঞতার শামিল ছিল, প্রসঙ্গত আজ এ-কথা বলিতেও আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই।

পাকিস্তান ও শিল্পী এবং সাহিত্যিক

সকলেই জানেন, পাকিস্তান শুধু রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলন ছিল না, তামদ্দুনিক মুক্তিরও আন্দোলন ছিল। সাহিত্যিক, শিল্পী, চিন্তানায়কদের একটি বড় দলই প্রথম পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, দর্শন দিয়াছিলেন এবং দিয়াছিলেন তার যুক্তি-শাসিত পরিকল্পনা। এক কথায় পাকিস্তান ছিল বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীদের তামদ্দুনিক মুক্তির আন্দোলন। মহাকবি ইকবাল হইতে শুরু করিয়া বহু সুধী, শিল্পী ও সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনাই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিতর দিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজনৈতিকেরা এই আন্দোলনকে লুফিয়া নিয়াছিলেন। তাকে কাজে লাগাইয়া দিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এতদিন পর্য্যন্ত আমরা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রূপই দেখিলাম। তার ভারী শিল্প, ব্যবসায়-বানিজ্যের কথাও কিছু শুনিলাম। পাকিস্তানের তামদ্দুনিক জীবনের পথে এ-পর্য্যন্ত রাজনীতিকেরা দৃষ্টি ফিরান নাই। সরকারের পর সরকার গঠিত হইয়াছে এবং ওজারতের পর ওজারত আসিয়াছে ও গিয়াছে; কিন্তু শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমস্যা ও জীবন-মরণের কথা কেউ গুরুত্ব সহকারে ভাবেন নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয়, নয়া শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁর এই তহবিল গঠন এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয়। আমরা চাই, নয়া শাসন ব্যবস্থার আমলদারীতে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ-দিকে আরো সম্প্রসারিত হইবে। জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি জাতীয় ঋণের স্বীকৃতি দিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। তাঁরই আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের শিল্প ও সাহিত্য এবং তামদ্দুনিক জীবন সংগঠনের নূতন করিয়া আয়োজন হইবে; এবং আমাদের জীবনে শিল্প ও সাহিত্যের নব জাগরণ নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে। কারণ, এর জন্য চাহিদা ও তাগিদ যেমন অনুভূত হইতেছে, তেমনই এক সুবর্ণ সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশেরও আজ সৃষ্টি হইয়াছে।

শিল্প ও সাহিত্যের নব পরিবেশ

দেশে আজ যে শিল্প-সাহিত্য এবং তামদ্দুনিক আন্দোলনের এক নব পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, তা সকলেই স্বীকার করিবে।

ইতিহাসের পাঠকমাত্র অবগত আছেন যে, রাজনীতি জাতীয় মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। রাজনীতি যখন উগ্র ও কঠিন হইয়া উঠে, তখন জাতির মন তার সর্ব্বগ্রাসী আবিলতায় মূহ্যমান হইয়া যায়। এ-যুগের রাজনীতির ব্যাপকতা যে মানুষের শিল্প, সাহিত্য এবং অন্যান্য সুকুমার মনোবৃত্তির সর্ব্বনাশ ক্ষতিকর হইয়াছে, তার প্রমাণ অল্প বিস্তর সকল দেশেই পাওয়া যায়। অতীতে সকল দেশে রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইতেন বাদশা, উজীর, নাজীর ও উপর তলার গুটিকয়েক জন বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। সাধারণ মানুষের প্রকাণ্ড অবসর ব্যাপিয়া থাকিতেন শিল্পী, কবি, গায়ক ও অন্যান্য ছোট বড় সৌন্দর্য্য ও আনন্দ স্রষ্টার দল। তাই দেখা গিয়াছে যে আগের দিনে শিল্পে সাহিত্যে যে সব দিকপালেরা আসিতেন, আজ আর তেমনভাবে তাঁরা আসেন না। এ-জন্য বর্ত্তমান সভ্যতার জটিলতা অনেকখানি দায়ী সত্য এবং তার সাথে দায়ী জনমনের ব্যাপক রাজনৈতিক আচ্ছন্নতা। আবার দেখা গিয়াছে যে, জাতির জীবনে কোনো কোনো যুগে যেমন আসে রাজনীতির প্লাবন, তেমনই কোনো কোনো যুগে আসে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির প্লাবন। এর কারণও পূর্ব্বে ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে জাতির জীবনে সাহিত্য আগে আসে এবং পরে রাজনীতি, সে জাতিই বেশী ভাগ্যবান। আমাদের জীবনে বড় রকমের সাহিত্যিক প্লাবন আসার আগেই রাজনীতি আমাদের বুদ্ধি, মন, চিন্তা ভালবাসাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ফলে উন্নত চিন্তা ও আদর্শের সাহিত্যিক প্রেরণা হইতে আমরা ছিলাম অনেকখানি বঞ্চিত। এক দিক হইতে ইহা অত্যন্ত আশার কথা যে দেশে আজ রাজনীতির ডামাডোল আর নাই। আমাদের রাজনীতি আর দুর্নীতি যে সমার্থক হইয়া পড়িয়াছিল তাও সকলে জানেন। সাহিত্যের জন্য সেই অনাত্মীয় পরিবেশ আজ দূর হইয়াছে। আজিকার নব পরিবেশ শিল্প, সাহিত্য ও তমদ্দুনের জন্য আনিয়াছে এক প্রকাণ্ড সুযোগ। এর সুযোগ আজ সকলে মিলিয়া মিশিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্ম্মকর্ত্তাদের পোষকতা ও শিল্পী, সাহিত্যিকদের তৎপরতা আজ মিলিত হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক মহৎ, সুন্দর ও কল্যাণের আয়োজন হইতে পারে। তাই অপসারিত অসুন্দর ও অকল্যাণের রাজনীতির শূন্য স্থান সুন্দর ও কল্যাণের সাধনায় পূর্ণ করিয়া তোলাও আজ আমাদের এক মহান জাতীয় দায়িত্বরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে রাষ্ট্রের মালিকমোখতারদের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি শিল্পী, গুণী ও সাহিত্য-সাধকদেরও ভূমিকা রহিয়াছে। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য গঠিত সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁর এ-তহবিলকে এই নূতন যাত্রাপথের প্রথম পদক্ষেপ বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে চাই। শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ অর্জনে আজ রাষ্ট্রের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা মুক্ত ও অবাধ হওয়া যেমন দরকার, তেমনই শিল্পী,

সাহিত্যিক ও তমদ্দনসেবীদের নিরলস সাধনা ও তৎপরতার তাগিদও তীব্রভাবে আজ অনুভূত হইতেছে। এরই জন্য সময় ও পরিবেশ আজ অত্যন্ত অনুকূল।

প্যাষ্টারন্যাক

এবারের সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন সোভিয়েট সাহিত্যিক প্যাষ্টারন্যাক। অন্যান্য বিষয়ের মত সাহিত্যের জন্য প্রতি বৎসরই দুনিয়ার একজন সেরা সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই রুশ সাহিত্যিকের সৌভাগ্যে কারো বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। প্যাষ্টারন্যাক আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিভাবান কবি ও ঔপন্যাসিক। সুতরাং গুণীর উপযুক্ত সমাদর করাই হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্যাষ্টারন্যাক সুইডিশ একাডেমী কর্ত্তৃক এই পুরস্কার পাইয়াও তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির প্রথম খবর তাঁকে উৎফুল্ল করিয়াই তুলিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া কোনো রূপে প্রাণে বাঁচিতে হইয়াছে। তবে এখনও তাঁর ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে কিনা, বলার সময় আসে নাই। সুইডিশ একাডেমী প্যাষ্টারন্যাকের বিখ্যাত উপন্যাস 'ডাঃ জিভাগোর' জন্যই তাঁর নাম পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। এই নভেলটি রাশিয়া হইতে তিনি প্রকাশ করেন নাই এবং করিতেও পারেন নাই। রাশিয়ার বাহির হইতে তাঁর এই নভেলটি প্রকাশিত হইয়া যাওয়ার পর তাঁর খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই নভেলের ভিতর ষ্ট্যালিন-শাসিত রাশিয়া সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় সত্য স্থান পাইয়াছে। তাতে তার বিভীষিকা ও নিপীড়ন নীতির যে বাস্তব চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তা বর্ত্তমান সোভিয়েটের মাতব্বর মোড়লেরা নেক-নজরে দেখিতে পারেন নাই। প্যাষ্টারন্যাকের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই রাশিয়া হইতে প্যাষ্টারন্যাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। 'সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘই' এই আক্রমণ ও প্রতিবাদের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। "সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ" সভ্য পদ হইতে প্যাষ্টারন্যাকের নাম খারিজ করিয়া দেওয়া হয় এবং প্যাষ্টারন্যাককে উপদেশ দেওয়া হয় যে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সমাজতন্ত্রবাদ প্রীতি থাকিলে তাঁকে অবিলম্বে এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা উচিত। সকল দিক ভাবিয়া প্যাষ্টারন্যাক নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। প্যাষ্টারন্যাকের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের ব্যাপার লইয়া সারা পৃথিবী জুড়িয়া যে বিতর্ক ও হৈ চৈ শুরু হয়, তার নজীর নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে নাই।

সোভিয়েট ও মানুষের স্বাধীনতা

এই আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যিক বিতর্ক আর একবার নূতন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষের প্রকৃত অবস্থার উপর রূঢ় আলোকপাত করিয়া গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষের মতের স্বাধীনতা নাই, পথের স্বাধীনতা নাই এবং সাহিত্যিক ও শিল্পীর জীবন যে সেখানে পদে পদে বিড়ম্বিত, এ-কথাটা নূতন করিয়া জানাজানি হইল। সেখানে কোনো বেসরকারী ছাপাখানা নাই এবং কেউ পুস্তক লিখিলে প্রথম দফায় সরকার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত এবং অনুমোদিত হওয়া চাই। এই অনুমোদন ও পরীক্ষার পর্ব্ব শেষ হইলে সরকারী ছাপাখানায় তা ছাপা হইয়া থাকে। প্যাষ্টারন্যাকের আলোচ্য উপন্যাসটি বাহিরেই ছাপা হইয়াছিল এবং এরই জন্য তিনি নোবেল প্রাইজের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের রাজনৈতিক মতবাদের খেলাফ বলিয়া তাঁকে এই পুরস্কার কেবল প্রত্যাখ্যান নয়, এর জন্য অনেক বিড়ম্বনাই কুড়াইতে হইল। বস্তুতঃ রাশিয়ার শিল্প ও সাহিত্য রাষ্ট্রের নিগড়ে বাঁধা। সেখানে সরকারী নীতিই হইল যে, সাহিত্য কমিউনিষ্ট দলের একটি অস্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। একটা কথা রটিয়াছিল যে, জনাব ক্রুশ্চেভের আমলে রাশিয়ার অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হইয়াছে; ষ্ট্যালিনযুগের ভয়-বিভীষিকা আর সেখানে নাই। লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাধারণ মানুষের মতামত ও ব্যক্তিগত আজাদির কিছুটা স্বীকৃতি সেখানে দেওয়া হইতেছে; কিন্তু একথা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ সেখানে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতেছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা পাওয়া গেল। প্যাষ্টারন্যাকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বিড়ম্বনা এই একই সত্যের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছে।

ঢাকার নওয়াব

ঢাকার নওয়াব খওয়াজা হবিবুল্লা গত ২০শে নবেম্বর শেষ রাত্রে এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে... রাজেউন)। এন্তেকালের সময় তিনি বিধবা বেগম, পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রাখিয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার মাগ্‌ফেরাত কামনা করিতেছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সান্ত্বনা এবং সমবেদনা জানাইতেছি।

ঢাকার নওয়াবের মৃত্যুতে পাকিস্তানের বিশেষভাবে পূর্ব্বপাকিস্তানের যে ক্ষতি হইল, তা সহজে পূরণ হওয়ার মত নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক বিষয় লইয়া

মতবিরোধ এবং বিতর্কের [illegible] পারে—হয় ত না-ও থাকিতে থাকে [illegible] একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে [illegible] ছিলেন একটি দিকপাল এবং মানুষে [illegible] জীবন ছিল বিচিত্র কর্ম্মচাঞ্চল্যতায় [illegible] মহাযুদ্ধের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন, [illegible] তিনি ছিলেন বরেণ্য নেতা, মোছলেম লীগের সংগঠন ও পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরব-দীপ্ত। ঢাকার আহসান মঞ্জিলের দান আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চিরকাল স্বীকৃত হইবে। এর ঐতিহ্যবাহী ছিলেন নওয়াব হবিবুল্লাহ। তিনি যোগ্য পিতা স্যার সলিমুল্লাহ্‌র যোগ্য সন্তান ছিলেন। তাঁর বহু গুণেরই তিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন। দেশ ও জাতি তাঁর এই যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে যাইয়া তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল এবং দুই দুইবার তিনি অবিভক্ত বাংলার উজীর পদে বরিত হইয়াছিলেন।

তাঁর চরিত্রের দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষ চিরকাল স্মরণ করিবে। জীবনের কর্ম্মপথে যখন তিনি যে মত স্থির করিতেন ও যে পথ বাছিয়া লইতেন, তাকে তিনি নির্ভীক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সাথে অনুসরণ করিয়া যাইতেন। বিপদ আপদের ভ্রূকুটি তাঁকে কখনও বিচলিত করিতে পারিত না। সকল বাদ-প্রতিবাদ, প্রশংসা-নিন্দায় অবিচলিত থাকিয়া তিনি অগ্রসর হইতেন।

ঢাকার নওয়াবের দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। মুক্ত ও দারাজ হস্তে তিনি দান করিয়া যাইতেন। কত জানা ও অজানা লোক তাঁর এই শাহী চিত্তের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জনগণকে তিনি যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, তেমনই জনগণের অসীম ভালবাসাও তিনি পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ একদিন ঢাকায় নাম ও ব্যক্তিত্ব যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিত। আজ তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তা কবে পূরণ হইবে, কে জানে!

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the 'Azad Press'
Ramna, Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী

পৌষ, ১৩৬৫
৩০শ বর্ষ, ঃ ৩য় সংখ্যা

রুমী ও ইকবাল

মূল ঃ মিয়া বশীর আহমদ
অনুবাদ ঃ মফিজুল ইসলাম

রুমীর বাল্যকাল

১২০৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বলখ দেশে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমীর জন্ম হয়। সেখানে তাঁহার পিতা মাওলানা বাহালুদ্দিন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; কিন্তু জনশ্রুতি যে, যখন তিনি তথাকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের ঈর্ষা ও বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়ান, তখন সেখানে বাস করাকে তিনি আত্মসম্মানের পক্ষে আর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না। উপরন্তু সেখানে তখন মোঙ্গল আক্রমনেরও আশংকা ছিল। কাজেই তিনি তাঁহার পরিবার লইয়া বলখ ত্যাগ করেন। তাঁহার বলখ ত্যাগের তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন মতৈক্য নাই। লেখকগণ রুমীকে তখন দুই, পাঁচ অথবা বারো বৎসরের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি তখন বালক বয়সী ছিলেন।

পনেরো ষোল বৎসর যাবৎ এই অভিযাত্রী দল হাজার হাজার মাইল ভ্রমন করেন এবং বলখ হইতে নিশাপুর, বাগদাদ, মক্কা, মালভিয়া, লারিনদা এবং আরো বহুস্থান হইয়া কোনিয়ায় পৌঁছেন। কথিত আছে, নিশাপুরে অবস্থানকালে বিখ্যাত সুফী কবি ফরিদ-আল-দীন আত্তার রুমীকে কোলে লইয়া এই ভবিষ্যদ্বানী করেন যে, কালে রুমী একজন মহাপুরুষ হইবেন।

তৎকালে মুসলমান বিদ্বানগণ তুর্কিস্তান, ইরান, আরব, ইরাক, ভারত প্রভৃতি মুসলিম দেশসমূহকে তাঁহাদের নিজ বাসস্থান বলিয়া মনে করিতেন।

ইকবাল যথার্থই বলিয়াছেন ঃ

"মোমিনের দুনিয়া জানেনাকো
কোন প্রান্তের মানা—
সব প্রাসাদই মোমিনের ঘর।"

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ইহার সভ্যতা মোঙ্গলগণ কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই বিশৃঙ্খল সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম নৃপতিগণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার দিকে মন দেন। মাওলানা বাহালুদ্দীন ও তাঁহার পরিবার সালজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের নিকট হইতে এই ধরণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কোনিয়া তাঁহার রাজধানী ছিল। নিয়তিরই লিখন যে, সালজুক সুলতানগণের গড়া প্রাসাদ ও মাদ্রাসাসমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একজন মহাপুরুষের আদর্শ সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় সাতশত বৎসর যাবৎ তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীরণ করিবে।

তৎকালীন মুসলমান উলামা সম্প্রদায় যে স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। কথিত আছে যে, ১২২১ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার রাজধানী খারিজম ধ্বংস ও ইহার ছয় সহস্র অধিবাসীকে হত্যার পূর্বে চেঙ্গিজ খান বিখ্যাত পণ্ডিত নাজম-আল-দীন কুব্রাকে উক্ত শহর হইতে নিরাপদে বাহির হইয়া আসিবার সুযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পণ্ডিতগণ কেবল পুস্তকের কীট বা স্বার্থপর ছিলেন না,

তাঁহারা ছিলেন আল্লাহের উপাসক। নিজ শ্রেণীর সম্মান রক্ষা করিয়া নাজম-আল-দীন স্বধর্ম্মীয়দের সহিত নগর রক্ষার্থে শহীদ হইয়াছিলেন।

রুমীর চরিত্র ও কার্য্যাবলীর বিবরণ

রুমী ছিলেন একজন বীর সম্মানধর্ম্মী পুরুষ। একজন প্রতিভাবান পথ প্রদর্শক রূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি সহস্র সহস্র মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সংস্কার সাধন করেন। "মৌলবী শ্রেণীর" তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। ইহার অনুগামীগণ প্রেম, প্রীতি ও আত্মনির্য্যাতন দ্বারা আদর্শ জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন।

রুমী ছিলেন সেই সব ভাগ্যবানদের অন্যতম, যাহারা জাগতিক পদমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতিকে অবহেলা করিয়াও রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি "সুফী-শ্রেষ্ঠ" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেও ইসলামী গূঢ়তত্ত্ব কমপক্ষে তিনশত বৎসর যাবৎ প্রসার ও প্রসিদ্ধ লাভ করিয়া দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছায়।

রুমীকে গাজ্জালী ও ইবনে আরাবীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া নিরীক্ষণ করিলে তিনি ইসলামের তিনজন শ্রেষ্ঠ গূঢ়তাত্ত্বিকের অন্যতম বলিয়া প্রতিভাত হন এবং তাঁহাকে সিনাই ও ফরিদ-আল-দীনের পর্য্যায়ে ফেলিলে তিনি তিনজন শ্রেষ্ঠ গূঢ়তাত্ত্বিক কবির অন্যতম রূপে প্রতিভাত হন। রুমী ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ ও কবি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তিদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি এত অধিক যে, আজ এমন কোন মুসলমান দেশ নাই যেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে স্মরণ করা হয় না।

মধ্য এশিয়ার তুর্কীদের মধ্যে যাহারা উজবেক ভাষায় কথা বলে, রুমীর জন্ম তাহাদেরই মধ্যে। তিনি হজরত আবুবকরের জ্ঞাতি। তাঁহার মাতা ছিলেন খারিজমের একজন তুর্কী মহিলা। কিন্তু তিনি ফার্সীতেই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রীক দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আরবীয় শিক্ষার সাথে নিজেকে পরিচিত করেন এবং পবিত্র কোরআনকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেন। অতিবিপরায়ন ও গুণাবধারণক্ষম সালজুক তুর্কীদের মধ্যে তিনি বাস করেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক বানী দান করেন—যদিও ইহাদের উপকারিতা শুধু এই সকল দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আহমদ রুমী নামে তাঁহার একজন অনুগামী ভারতে আসেন এবং এখানে পঞ্চাশ বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

"মসনবী"-র উপর তিনিই প্রথমে সম্ভবতঃ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে সমালোচনা প্রকাশ করেন যাহা "দাকায়িক-আল-হাকায়িক রাকবায়িক আল-তারিক" নামে পরিচিত। ইহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন: "আমার নাম আহমদ এবং রুম আমার দেশ।" ভারতের যে অংশে তিনি অবস্থান করিতেন তাহাকে তিনি "আভাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের অযোধ্যা প্রদেশ হইবে। উপরিউক্ত পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন:

> "আমাদের মাওলানা এমনই বলিতেন
> যিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টিকর্ত্তার
> নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের আবিষ্কর্ত্তা।"

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর উজলুকের মতে "মসনবী" অধ্যয়নের পূর্ব্বে তুর্কীরা উক্ত পদ্যাংশ আবৃত্তি করে।

"মসনবীর" উপর সমালোচনার কৃতিত্ব তাই মুসলিম ভারতেরই প্রাপ্য। পরবর্ত্তীকালে রুমীর গ্রন্থাবলী বহু দেশে ও বহু ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং বহু সমালোচনাও করা হইয়াছিল। ইহা উল্লেখ করিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, মাওলানা রুমীর জীবদ্দশাতেই, আবদুর রহীমের পুত্র সাফি আল-দীন-মুহম্মদ নামে একজন ভারতীয় মুসলমান কোনিয়ার ইপ্ লিকৃচি মাদ্রাসার শিক্ষকরূপে কাজ করিতেন। তিনিও "নিবায়াত আল-ভুসুল ইলা ইলুম আল-ভুসুল" সহ বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দামেস্কে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মসনবী বর্ণিত গল্পগুচ্ছ বোধহয় আজ প্রত্যেক মুসলমান পরিবারের জানা আছে। হয়তো এমন কেহই নাই যিনি "ওমর ও রুমের দূত" এবং "মোজেস ও রাখাল" প্রভৃতি গল্পসমূহ জানেন না। কিন্তু এইগুলি শুধু গল্পই নহে—এ-গুলিতে আছে সর্ব্বোচ্চ নৈতিকতার প্রকাশ।

কিছুদিন আগে আমি অধ্যাপক উজলুকের সঙ্গে রুমী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে কতিপয় পুস্তক আনিয়াছিলাম। এই পুস্তকগুলির মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন যে, ইহাতে রুমীর দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো তথ্য রহিয়াছে। বইখানা হাতে লইয়া আমি বিস্ময় এবং খুশীর সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম—ইহা একটি ইংরাজী পুস্তক, নাম The Meta-Physics of Rumi—লাহোরের আবদুল হাকিম রচিত।

রুমীর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বহু পাশ্চাত্য জাতি তাঁহার রচনা হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যে রুমীকে

কেন্দ্র করিয়া একটি সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ—কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক A. J. Arberry রুমীর উপরে লিখিত অধ্যাপক নিকল্‌সনের লেখার উপর একটি রচনা প্রকাশ করেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই পুস্তকটি "Ethical and spiritual" সিরিজ-এর প্রথম প্রকাশনা। ইহার স্থাপয়িতা অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের কয়েকজন কৃতি ছাত্র। পুস্তকের সাধারণ ভূমিকায় একথা বলা হইয়াছে, দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ অন্যান্য জাতি সম্পর্কে আরো বেশী করিয়া জানিতে চায়। বিশেষ করিয়া তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ হইতে উপকৃত হইতে চায়; কিন্তু মানুষ বা জাতির নৈতিকতার মাপকাঠি কি হইবে? আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে যোগসূত্র কি ভাবে স্থাপিত হইবে?

"Ethical and Spiritual" Series এর এই প্রথম পুস্তকে রুমীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তসহ প্রাণোন্মাদনাকারী রুমীর ৯৯টি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাজেই দেখা যায় যে, সাতশত বৎসর পরও চিন্তাবিদ রুমী আজ অবধি জীবিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মাওলানার পিতা ও তাঁহার পরিবার ১২২৮ খৃষ্টাব্দে (৬২৫ হিজরী) কোনিয়ায় পৌঁছেন। তিন বৎসর পর মাওলানার পিতা পরলোক গমন করেন। রুমী প্রথমে তাঁহার পিতা ও পরে তাঁহার শিষ্য বুরহান আল-দীন মুহাক্কিক (১২৩২-১২৪০ খৃষ্টাব্দ)-এর নিকট হইতে গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। তিনি এলেপ্পো ও দামাস্কাসেও গমন করেন। অন্য কথায়—তিনি ব্যক্তি ও স্থান নির্ব্বিশেষে শিক্ষালাভে ব্রতী ছিলেন এবং কতিপয় বিজ্ঞানেও দক্ষতা অর্জ্জন করেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে মুহাক্কিকের মৃত্যুর পর রুমী 'শেখ' উপাধি গ্রহণ করেন; কিন্তু একজন সত্যিকার সত্যানুসন্ধানীর ন্যায় তিনি জ্ঞান আহরণে ব্যয়িত করেন। রুমীর বন্ধু ও সহচরদের মধ্যে যাহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে সবিশেষ পটু ছিলেন তাহাদের প্রতি রুমীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন তিন জনের নামও করা যাইতে পারে।

রুমীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহচর শামস্‌ তাব্রিজীর প্রতি তাঁহার আধ্যাত্মিক আকর্ষণ এত বেশী ছিল যে, তিনি তাহাকে তাঁহার দিওয়ানির সবটুকুই উৎসর্গ করিয়া দেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের রহস্যময় অন্তর্ধান রুমীর জীবনে যে মানসিক-বিপ্লব সংঘটিত করে, তাহা তাঁহার পুত্র সুলতান ভালাদ কর্ত্তৃক বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল-ফালাকির মতানুসারে শামস তাব্রিজীর স্মৃতিরক্ষার্থে রুমী "মৌলবী শ্রেণীর" প্রবর্ত্তন করেন, যাহা পরবর্ত্তীকালে তাহাদের "শামা"-এর নৃত্য ও আবৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিল। শামস তাব্রিজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর সালাহ্‌-আল-দীন নামক এক স্বর্ণকার রুমীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং ১২৫২—১২৫৯ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত তাঁহার "খলিফা" রূপে কাজ করেন। সম্ভবতঃ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে হুসাম-আল-দীন তাঁহার "খলিফা" নিযুক্ত হন এবং রুমীর মৃত্যু পর্য্যন্ত মসনবীর সম্পাদক ও লেখকরূপে কাজ করেন।

রুমীর শিষ্টাচার, বিশ্বস্ততা, বস্তু পরায়ণতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এত অধিক ছিল যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে তিনি নিজের পথ প্রদর্শক এবং প্রত্যেক সহচরকে তাঁহার উপদেষ্টা ও সহকর্ম্মীরূপে মনে করিতেন। একজন অকপট ও মহাপুরুষের ধর্ম্মই ইহা যে—নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে না করা বরং দীনতম মানুষের মাঝেও নৈতিকতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা। এই সকল গুণই রুমীকে মুসলমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছিল এবং বহু মুসলিম দেশের বিশেষ আগ্রহের বস্তুতে রূপান্তরিত করিয়াছিল। চন্দ্র ও তারকারাজি সমগ্র জগতে আলো বিকীরণ করে। কাজেই আমরা কি রুমীকে জগতের একজন প্রিয় নাগরিকরূপে গণ্য করিতে পারিনা?

রুমীর কার্য্যাবলী

রুমীর সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে দিওয়ান-ই-শামস-ই তাব্রিজী, মসনবী ও রুবায়াত উল্লেখযোগ্য। মসনবীর প্রথম পুস্তক (দফতর) ১২৫৮—১২৬১ খৃষ্টাব্দে; দ্বিতীয় পুস্তক ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে, এবং আরও চারটি ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে শেষ হইয়াছিল।

দিওয়ান-ই-শামস তাব্রিজীতে ২৫০০ গজল ও মসনবীতে ২৫০০০ মিত্রাক্ষরিক শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার রুবায়াতের সংখ্যা প্রায় ১৬০০। পাশ্চাত্যের একজন সমালোচকের মতে দিওয়ানের সাহিত্য ও শিল্প মূল্য মসনবীর চেয়ে বেশী; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহা পাঠকের পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। প্রাচ্যের একজন সমালোচকের মতে মসনবীর লিখন পদ্ধতি খুব জোরালো। তথাপি প্রায় প্রত্যেকেরই মসনবী হইতে কিছু না কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে। ইহা একটি সমুদ্রের ন্যায় একাধারে শান্ত ও বিক্ষুব্ধ। ইহার সমতলে পাখীরা সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় ও ইহার গভীরতা মণিমুক্তা দুষ্প্রাপ্য করিয়া তোলে। দুনিয়াই জোরালো এবং তদ্রূপ মানুষের জীবন ও প্রকৃতি। অতএব, এই সব জীবনালেখ্যের সাধারণ সৌন্দর্য্যও জোরালো না হইয়া পারেনা।

বহু দেশেই রুমীর কার্য্যাবলী প্রকাশলাভ করিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যাপারে মুসলিম-ভারত,

পাকিস্তান, ইরাণ ও তুরস্কের প্রচেষ্টাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উজলুকের ব্যক্তিগত পাঠাগারে আমি বহু দুর্লভ পুস্তক দেখিয়াছি। অন্যান্য দেশে রুমীর যে সকল পুস্তক ও তাহার উপর লিখিত গ্রন্থরাজি—যাহা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তুরস্কের কোন সাধারণ পাঠাগারে সন্নিবেশ করিলে ভাল হয়, বিশেষ করিয়া যখন তুরস্কেই রুমীর জীবন কাটিয়াছে।

আজকাল তুরস্কে রুমীর স্মৃতিকে উজ্জীবিত করিতে বহু চেষ্টা করা হইয়াছে। রুমীর উপর ১৯৪৩ সালে লিখিত "মওলানা" তুরস্কের একখানি প্রকাশনা। ইহাতে বহু তুর্কী লেখকের মতামত দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে রুমীর স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া কয়েকখানি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। একজন শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ছেলেবেলায় তিনি রুমীর কথা শুনিয়াছেন এবং তদবধি তাঁহাকে নিজ জীবনের অংশ বলিয়া মনে করেন। কোণিয়া হইতে তুরস্কের জাতীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যের মতে রুমী ছিলেন একটি স্বাধীন আত্মা এবং ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও অর্থগৃধ্নুতার কবলে পতিত দুনিয়ায় তাঁহার কবিতা ও সঙ্গীতানুরাগ প্রেম ও প্রীতির পথ প্রদর্শক ছিল। তিনি ছিলেন সত্য ও অকপটতার প্রতীক এবং তাহার মতামত প্রত্যেক জাতিরই ভাবধারার প্রকাশ। অন্যান্য লেখকেরা মাওলানার চিন্তাধারা, তুর্কী জাতির সহিত তাহার যোগসূত্র, তুরস্কের সাহিত্য, কবিতা ও সঙ্গীতের উপর তাঁহার বিরাট প্রভাব ও তাহার মননশীলতার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। এই পুস্তকে দিওয়ান ও মসনবী হইতে উদ্ধৃত অংশ সমূহের উপর সমালোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহার কাল্পনিক স্মৃতিসৌধ ও আলেখ্য সমূহের বিবরণীও ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাতে কবিতা এবং রুমীর উপরে আলোকপাত করিয়া দার্শনিক প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হইয়াছে। একজন গুণমুগ্ধের ভাষায় "সৌন্দর্য্যানুভূতি, গুণধর্ম্ম ও সত্যদর্শিতা আমাদের দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম, রুমীর প্রদর্শিত 'আল্লা ভক্তির' পথ নির্দ্দেশক।"

আর একটি প্রবন্ধে ইহা বলা হইয়াছে যে, রুমী ছিলেন একজন সুফী—দার্শনিক নন এবং বর্ত্তমান লেখকগণ যেন প্রত্যেক জিনিষেই দর্শনের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বেড়ান। রুমী কি ইহা বলেন নাই:

"চিন্তা ও ধারণায় দার্শনিক একজন
অজ্ঞেয়তাবাদী—
দেওয়ালে মাথা খুঁড়িয়া তাহাকে মরিতে দাও।"

অন্য একজন লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুমীর গ্রন্থাবলী পড়া ও তাঁহাকে জানাই যথেষ্ট নহে—তাঁহার বানীকে কার্য্যে রূপদান করিলেই তাঁহাকে উপলব্ধি করা হইবে। অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে, বাহিরের কোন সাহায্য ব্যতীতই রুমীকে উপলব্ধি করা সম্ভব। সর্ব্বোপরি "রুমী ছিলেন হজরতের পথের ধূলিকণা বিশেষ," "তিনি ছিলেন পবিত্র কোরআনের দাস," "পবিত্র প্রেমের মদিরায় মত্ত" এবং "স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসী।" রুমী আমাদিগকে "খোদার ও আমাদের উভয়েরই কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতে" বলেন।

আজিকার দুনিয়ার নিকট রুমীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শন অপরিহার্য্য। তিনি ছিলেন প্রগতিতে বিশ্বাসী, স্বাধীন-চিন্তায় শ্রদ্ধাশীল—তিনি নিজ-সত্ত্বা ও ইহার স্বাধীনতাকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বস্তুবাদের দাসেও তিনি পরিণত হন নাই। তিনি ছিলেন সত্য-সন্ধানী। তিনি সর্ব্বশক্তিমানের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে চান নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল নিজ-সত্ত্বার প্রধান উৎসের প্রতি। ইহাই সত্যিকারের মানবীয় অগ্রগতি। ইহা একটি দুর্গম পথ। যুক্তি এখানে একটি বিশেষ সীমার বেশী আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং ইহার যদি সত্যিকারের ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মানব একজন আদর্শ-মানবে পরিণত হইতে পারে।

রুমীর মতে ইহা কিরূপে অর্জ্জিত হইতে পারে? শুধু যুক্তির পিছনে ধাবিত হইওনা; বিশ্বাস অর্জ্জন কর।

"গ্রীক দর্শনতত্ত্ব কতক্ষণ পড়িবে?
বিশ্বাসীর দর্শনতত্ত্বও অধ্যয়ন কর।
আত্মার অস্তিত্ব যুক্তির সীমার বাহিরে;
তুমি সীমার মধ্যে; কিন্তু তোমার সত্ত্বা অসীমের দেশে।
তোমার এখানকার কার্য্য বন্ধ কর—ঐখানে তাহা
সুরু কর।
সময় জানেনা সময়শূন্য তার প্রকৃতি,
কেননা কেবল বিস্ময়ই সেখানে লইয়া যাইতে পারে।
তোমার যাহা কাজে লাগিবে তাহা বিস্ময় ও বিশ্বাস,
যুক্তি নহে:
চিন্তাশীলতাকে বিস্ময়ের সহিত বদল করিয়া লও
চিন্তাশীলতা শয়তানের, প্রেম আদমের।"

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, তিনি কতক পরিমানে যুক্তির সাহায্য লইয়াছেন এবং বিবর্ত্তনবাদকে বুঝিয়াছেন।

"নিরীন্দ্রিয় জগত হইতে আমার মৃত্যুর পরে
আমি বৃক্ষশিশুতে পরিণত হই
অতঃপর বৃক্ষ-জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া
জীবের জীবন লাভ করি।"

কিন্তু তিনি জীব হইতে মানুষের এবং মানুষ হইতে দেব-দূতে রূপান্তরিত হইতে চান:

"অতঃপর আমি আমার ঐশ্বরিক সত্ত্বা বিসর্জন দিয়া যাহা লাভ করিব তাহা অচিন্ত্যনীয়।"

"যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকার" প্রতিও তিনি সজাগ :

"এই পৃথিবীর দিকে যখন তাকাইবে
দেখিবে শুধুই সংগ্রাম,
অনুকণা অনুকণার সহিত সংগ্রাম করিতেছে
ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রামের ন্যায়।"

তিনি চেষ্টাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং স্বাধীন-চিন্তার উপর জোর দিয়াছেন।

"হজরত বলিয়াছেন, যখনই কোন দরজায়
করাঘাত করিবে
কেহ না কেহ বাহির হইয়া আসিবেই।
কূপের জন্য প্রতিদিন ভূমি খুঁড়িলে
একদিন তুমি নির্ম্মল জলের সাক্ষাৎ পাইবেই।
(জীবনের) এই পথে চলার সময় তুমিই তোমার পায়ে
শৃঙ্খল জড়াইয়াছ
কাহার প্রতি তোমার এই উপহাস ?
তুমিই তোমার যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছ।
প্রয়াসের অর্থ প্রকৃতির দানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।
তোমার ব্যর্থতার অর্থ সেই দানের অস্বীকৃতি।"

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণবাদ কি? স্বাধীন ইচ্ছাই বা কি? নিয়ন্ত্রণবাদ প্রকৃতির নিয়ম ; ইহাতে বাধ্য বাধকতার কিছু নাই।

"নিয়ন্ত্রণবাদ আল্লাহ্‌র অনুষঙ্গ এবং
অবশ্য কর্ত্তব্য নহে,
ইহা আকাশের মেঘ নয়, চন্দ্রের প্রভা"

যারা বাস্তবতার কদর জানেন, তারা স্বাধীন-ইচ্ছা অর্জন করেন। ক্ষুদ্র বিন্দুর প্রতি তাকাও, যাহা খোলসের অভ্যন্তরে মণিতে পরিণত হয়।

"তাহাদের স্বাধীন-ইচ্ছা এবং সম্পীড়ন বিভিন্ন।
খোলসের অভ্যন্তরস্থ বিন্দু সকল মণি বিশেষ।"

সত্য কি? নিজের হৃদয়ের প্রতি তাকাও।

"যদি তুমি চাও, নিজের সত্ত্বা হইতে তাহা জান।
ইহাতেই মহৌষধ নিহিত যাহা আমাদের মধ্যে
খুঁজি।"

কিন্তু নিজের মধ্যে ইহার অনুসন্ধান সহজ নয়।

"মানুষ শত আবরণে ঢাকা।
যাও, আপন আনন হইতে মলিনত্ব তুলিয়া ফেল।"

সত্ত্বার ক্ষমতাই সার্ব্বভৌম। সত্ত্বাই সর্ব্বক্ষমতার উৎস। ইহা বাস্তব সাহায্যের প্রতীক্ষা করেনা।

"আমাদের সংস্পর্শে সুরাই মত্ত হইয়া গিয়াছিল,
সুরার সংস্পর্শে আমরা মত্ত হই নাই ;
আমাদের মধ্য দিয়া দেহ আসিয়াছে,
দেহের মধ্য দিয়া আমরা আসি নাই।"

সত্ত্বা সম্পর্কে রুমী

কিন্তু সত্ত্বাকে জানার উপায় কি? অর্থ-গৃধ্নুতা ও কামনা পরিহার কর। উচ্চ লক্ষ্য রাখ। আল্লাহ্‌র সাথে নিজকে সংযুক্ত করিবার প্রয়াস পাও, যিনি সকল উৎকর্ষের উৎস। এই লক্ষ্য, এই সংসর্গই প্রকৃত প্রেম যাহা সকল বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করে।

"হে মানব! সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল,
স্বর্ণ-রৌপ্যের শৃঙ্খলে আর কত শৃঙ্খলিত থাকিবে?
পবিত্র প্রেমের জন্য যে পরিচ্ছদ ছিন্ন করে
সেই সকল কামনা ও পাপ হইতে মুক্তি পায়।
সুখী হও, হে মহানুভব প্রেম,
সকল দুঃখ কষ্টের হে মহামহৌষধ!
প্রেমের গুণে জড়দেহ স্বর্গলোকে আরোহণ করে,
পর্ব্বত রাজি ক্ষিপ্র ও নৃত্যরত।
প্রেমের আগুনে দেহকে প্রজ্জ্বলিত কর।
চিন্তা ও উপাসনা পরিপূর্ণরূপে শেষ করিয়া দাও।
প্রেমের ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম হইতে পৃথক,
প্রেমিকগণ আল্লার সাহচর্য্য ও ধর্ম্মকে লাভ করে।"

সর্ব্বশক্তিমান সম্পর্কে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

"যাহা তোমার ধারণার অধীন, তাহা পার্থিব।
যাহা ধারণাতীত, তাহাই সর্ব্বশক্তিমান।"

আল্লার সাহচর্য্য প্রাপ্তিই মানব জীবনের অস্তিত্বের আদি ও অন্ত। কারণ

"সমষ্টি হইতে খণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিলে
সমষ্টি বিকলাঙ্গ হয় ;
দেহ হতে অঙ্গচ্ছেদন করিলে দেহ কদাকার রূপ
প্রাপ্ত হয়।"

কিন্তু আল্লার সাহচর্য্য প্রাপ্তির অর্থ দেহকে উৎসর্গ করা নহে :

"লৌহ তাহার বর্ণ আগুণের বর্ণতে হারায়,
লৌহ আগুনের বর্ণ প্রাপ্ত হয়
এবং আগুনের মত দেখায়।"

খোদা-প্রেম সম্পর্কে রুমী

এই প্রেম, যাহা আমাদের আদি ও অন্ত এবং যাহা "সকল রোগের মহৌষধ," এক প্রকার বাতিক, "মৌলবী ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" অনুযায়ী যাহার আহরণ ও গ্রহণের অন্যতম উপায় হইল শামাহ্‌। সঙ্গীত যে আনন্দ ও উল্লাসের সৃষ্টি করে, তাহা মানুষকে কিয়ৎ পরিমানে জীবন

ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। রুমীর কয়েকটি গজল কত উল্লাসময়!

"এস হে প্রেমিক! এস হে প্রেমিক!
তোমার যন্ত্রণাভার লাঘব করিবার সুযোগ আমাকে দাও,
তোমার বন্ধু হিসাবে তোমার অবস্থা ভাল করিবার সুযোগ আমাকে দাও।'
এস হে প্রেমিক! এস হে প্রেমিক!
তোমার হৃদয় আমাদের নিকট সমর্পন কর,
যাহাতে প্রেম অর্জ্জন করিবার এবং আমার মত প্রেমাদৃত হইবার শিক্ষা তোমাকে দান করিতে পারি।
এস হে প্রেমিক! এস হে প্রেমিক!
আমার তরে তুমি তোমাকে উৎসর্গ কর,
যাহাতে আমার জীবন দান করিয়া আমি তোমাকে সুখী করিতে পারি।
আমি বহুবার তোমার তরে আসিয়াছি!
প্রেমের বাতিক এমনই হয়।
আমার ঐশ্বরিক জগত নৈসর্গিক জগতে
এবং নৈসর্গিক জগত ঐশ্বরিক জগতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।
আমার পানীয়রূপে দেখা দিল স্বর্গীয় সুরা।
প্রেমের বাতিক এমন হয়।"

আদর্শ মানুষকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো সে বলিবে:

"গতরাত্রে ধ্যানীকে নির্জ্জনে বলিলাম
আমার নিকট হইতে বিশ্বতত্ত্ব গোপন না করিতে।
ধীরে সে আমার কানের কাছে বলিল
চুপ।—ইহা এমন কিছু যাহা জানিবার, বলিবার ন'হে"

এমন অবস্থায় বিপদের কথা না-ভাবিয়াই একজন প্রেমাগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

"সেই প্রেমই ভালো, যা' দুর্য্যোগের সৃষ্টি করে
কারণ, দুর্য্যোগকে যে পরিহার করে, সে খাঁটি প্রেমিক নয়।
পুরুষোচিত সে, প্রেমের সন্ধানে যে জীবন বিসর্জ্জন দেয়
যদি জীবনই সে প্রেমের উৎসর্গ করিবার হয়।"

প্রেমই জীবনের সৃষ্টি করে।

"প্রেম চিরস্থায়ী এবং ইহা চিরকাল থাকিবে।
প্রেমের সন্ধানে যারা ঘুরিবে, তাহাদের সংখ্যা হইবে অগন্য।
আগামীকল্য যদি প্রলয় ঘটে তাহা হইলে যে প্রেমিক নয়,
সে শাস্তি ভোগ করিবে॥"

ইকবাল কর্ত্তৃক রুমীর দর্শনের প্রচার

আধুনিক ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা জালাল-দীন-রুমীর জীবনাদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে, পাকিস্তানের দার্শনিক কবি ইকবাল উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন এবং ইসলামী ও অনৈসলামিক চিন্তাধারার ব্যাপক গবেষণা করিয়া তিনি কোরআনকে জীবনের পথ প্রদর্শক এবং রুমীকে একজন বিজ্ঞ উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি ব্যক্তির সত্তার দর্শনের সুন্দর কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং মুসলমান জাতির সুপ্ত প্রতিভাগুলিকে জাগ্রত করিয়া সত্তার দর্শনকে তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছেন। আজ যাহারা রুমীর কবিতা ও বানী হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ পাইতে চান, তাহাদের উচিৎ প্রথমে রুমী ও পরে ইকবালকে পাঠ করা। বর্ত্তমান পৃথিবীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মনে হয়, জীবনের সমস্যা ও বিপদ-সঙ্কুল পথে আমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে রুমীই যেন ইকবালের মধ্য দিয়া তাহার বানী প্রচার করিতেছেন। অন্য কথায়, সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছায় পাকিস্তান যেন ইকবালকে রুমীর উত্তরাধিকারী হিসাবে পাইয়াছে। ইসলামের নামে ইকবাল তাহার কাব্যের মাধ্যমে বর্ত্তমান দুনিয়াকে ইসলামী গূঢ়তত্ত্ব ও বর্তমান দর্শনের মিশ্রনরূপ এক অগ্নিশিখা দান করিয়াছেন।

ইকবালের-আসরারই-খুদী ও রুমুজ-ই-বেখুদী

ইকবালের জীবন-দর্শন আসরার-ই-খুদীতে প্রকাশলাভ করিয়াছে। ইহা রুমীর মসনবীর ছন্দে লিখা। ইহার ভূমিকায় "আগামী দিনের কবিকে" "নীরবতার রাত্রিতে" নিম্নলিখিত রুমীর প্রশস্তিতে প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

"বাকরুদ্ধ, তুমি আজ বেদনা-কাতর,
পরিতাপ সম নিজেকে কর অগ্নিতে নিক্ষেপ!
ভয়ের আরশ ভেঙ্গে কর চুরমার।
বাজারে বোতল ভাঙ্গ।
আপন সঙ্গীত লাগি কর সৃষ্টি নতুন রেওয়াজ।
তোমার তীক্ষ্ণভেদী গীতে সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত কর।"

ইকবালের অন্য কবিতার নাম রুমুজ-ই-বেখুদী (স্বার্থপরতাহীনতার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ)। ইহা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কে রুমীর নিম্নলিখিত মিত্রাক্ষর যুগ্ম পঙ্ক্তিক ব্যাখ্যা করে:

"চেষ্টা কর এবং নিজের সত্তাকে স্বার্থ-পরতাহীনতায় খুঁজিয়া পাও
যত শীঘ্র ততই মঙ্গল। সর্ব্বশক্তিমানই সত্যকে ভাল জানেন।"

পায়াম-ই-মাশরিক (প্রাচ্যের বাণী) নামক কবিতার নিম্নলিখিত কথাগুলিতে ইকবাল, আবু আলী ইব্‌নে সিনা অপেক্ষা রুমীর দর্শনই গ্রহণযোগ্য মনে করেন :

"উষ্ট্র কর্তৃক উত্থিত ধুলায় আবু আলী হারাইয়া গিয়াছিল,
কিন্তু রুমী সশয্যা শিবির আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।
শেষোক্ত ব্যক্তি গভীরতর প্রদেশে ডুব দিয়া মণি সংগ্রহ করিয়াছিল,
কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি খড়কুটার ন্যায় ঘূর্ণিতলে আটকাইয়া গিয়াছিল।
আবেগ-বর্জ্জিত সত্যই দর্শন ;
আবেগ সহ ইহা কবিতা।"

অতঃপর স্বর্গলোকে রুমী ও গ্যেটের সাক্ষাৎ :

"কহিলেন রুমী : হে প্রিয় কাব্য !
তুমি দেবদূত আর স্রষ্টাকে শিকারের মত কর তাড়া।
সকলেই আর প্রেমের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নহে।
সকলেই আর এই উপাসনালয়ের যোগ্য নহে।
স্রষ্টাই শুধু জানেন কে ভাগ্যবান এবং আত্মবিশ্বাসী।
'প্রতিভা শয়তানের কিন্তু প্রেম আদমের'।"

জঙ্গ-নামা নামক ইকবালের মসনভী, যাহা কাহারও মতে ইকবালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, রুমীর সুরাসারে পরিপূর্ণরূপে ভরপূর। কবি এখানে রুমীর সহিত স্বর্গলোক পরিভ্রমণ করিয়া মৃত (বিদেহী) আত্মাসমূহের সহিত আলোচনা করেন। অন্য কথায় কবি রুমীর সাহায্যে সৃষ্টির রহস্য-সমূহ অবগত হন। দেখুন কিভাবে রুমীর কথায় ইকবাল তাহার নিজের দর্শন প্রকাশ করেন :

"তুমি জীবিত কি মৃত কি মরণোন্মুখ,
তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর।
প্রথম সাক্ষী তোমার আত্মদর্শন
অর্থাৎ নিজের আলোকে নিজকে দেখা।
দ্বিতীয় সাক্ষ্য 'অন্যে'-কে চেনা
অর্থাৎ অন্যের আলোকে নিজকে দেখা।
তৃতীয় সাক্ষ্য সর্বশক্তিমানকে জানা
অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের আলোকে নিজকে দেখা।

যদি স্বর্গীয় আলোতে তিষ্ঠিতে না পার,
তবে জানিবে তুমি জীবিত এবং স্রষ্টার ন্যায় চিরজীবি।"

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের তুলনা প্রসঙ্গে বলেন :

"গর্ভের বিস্ফোরণে শিশু জন্মলাভ করে ;
বিশ্বের বিস্ফোরণে জন্মলাভ করে মানুষ।"

যদিও ইকবালের জাতীয় সংগঠন কোরআনকে ভিত্তি করিয়া, তথাপি তিনি তাহার প্রসিদ্ধ সাতটি ইংরাজী বিবৃতিতে (The Reconstruction of Religious thought in Islam, Oxford, 1933) বুঝাইয়াছেন যে, উচ্চ শ্রেণীর প্রগতিমূলক ব্যাখ্যার সাথে ইসলামী নিয়মতন্ত্রেরও মাঝে মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়।

"ইহাই জাগ্রত জাতিসমূহের নিদর্শন যে
মাঝে মাঝে তাহাদের অদৃষ্টের পরিবর্তন ঘটে
তাহাদের জীবন সু-উচ্চ ন্যায়নিষ্ঠা ও সহনশীলতার প্রতীক
কাজেই প্রকৃতি তাহাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে।"

ইকবাল চান ইসলামের জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যত গড়িয়া তুলি :

অতীত দিনের স্মৃতি আমার ধরণীর নিকট সর্ব্বরোগক্ষয়কারী সুধা ;
আমার অতীতই আমার ভবিষ্যতের সমালোচনা।"

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানগণ যখন অবনতির পথে, ইকবাল তখন নিম্নলিখিত কথাগুলি দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ভবিষ্যত বাণী করিয়াছেন :

"দুর্ব্বল পিপীলিকার এই অভিযাত্রী দল
পুষ্পের পাঁপড়িতে করিবে এক তরণী সৃজন,
সহস্র সহস্র তরঙ্গের সাথে সংগ্রাম করিয়া
সমুদ্র দিবে পাড়ি।"

এবং ইহার অল্প পরেই তিনি মুছলমানদের ঐক্য ও ইসলামের অগ্রগতি সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেন :

"উদীয়মান সূর্য্যের সাথে হইবে রাত্রির অবসান।
এবং স্বর্গীয় ঐক্যের সঙ্গীতে হইবে এই উদ্যান মুখরিত।"

মনোযোগ সহকারে কি আমরা আমাদের জাতীয় এবং আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গের কথা শুনিব না? এবং একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘে কি আমরা ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির ধ্বজা উড্ডীন রাখিব না ?

"তোমার প্রকৃতিই তোমার জীবনের সম্ভাবনা-সমূহের তত্ত্বাবধায়ক।
তুমি যেন জগতের প্রচ্ছন্ন নিষ্কর্ষের পরীক্ষা।"

* Islamic Review হইতে।

ঢাকার রাত্রি

আজিজুর রহমান

ক্ষীণ জ্যোছ্‌নার নিষ্প্রাণ শুভ্রতা
নেপথ্য কোনো অভিনীত নাটকের
বাহিরে সজ্জা অন্তরে রিক্ততা
উপহাস বুদ্ধি নিরুপায় নিশীথের।

স্বল্পায়ু রাত হয়ে যাবে নিঃশেষ
সঙ্কোচহীন দু'টী কম্পিত বাহু
স্বল্পায়তন রিক্‌শার পরিবেশ ঃ
ক্লাবের কোঠরে চলে উদ্যত রাহু।

কাঁকর কীর্ণ পথে পথে প্রতিবাদ
ঢাকাই পা'জামা ঢাকাই শাড়ীর ছায়া
তৈল-তৃষিত চাকার আর্তনাদ
আসা-যাওয়া করে ছড়িয়ে স্বপ্ন-মায়া।

রুজ ঘষা মুখে সহাস্য অনুরোধ
ভেসে ভেসে আসে খণ্ডিত রসালাপ
বেচা ও কেনার চক্‌চকে উপরোধ
ক্রমে মনে মনে জমে উঠে উত্তাপ।

চোখগুলো যেন সুতো কাটা ঘুড়ি প্রায়
সন্ধ্যা এনেছে সান্নিধ্যের হাওয়া
ভাবনার পাখা সহসা হারিয়ে যায়
ট্যাক্‌সীরা করে দুরন্ত বেগে ধাওয়া।

রমনার পথ ডানা করে বিস্তার
দিবা-বিস্মিত ছুটেছে রুদ্ধ আশা
দেহ-বাস হ'তে গন্ধ-সুরভী সার
ঢাকার রাত্রি পেলো যান্ত্রিক ভাষা।

ঝিক্‌মিক্‌ করে নিওনের শ্বেত দ্যুতি
কক্ষে কক্ষে উষ্ণ সে কলাভাব—
শিরায় শিরায় অত্যুগ্র অনুভূতি
উছল হাসির সচটুল উচ্ছ্বাস।

আঁখিতে আঁখিতে উত্তাপ সঞ্চার
তরঙ্গ তোলে ঝিলিক লাগানো হাসি
মনের ময়ুর পাখা করে বিস্তার
মৃদু কথা আর বেড়ে ওঠে চাপা কাশি।

অদূরে গলিতে পথিক হোঁচট খায়
চিৎকার করে পথ সারমেয় দল
ছ্যাঁক্‌ড়া গাড়ীর তীব্র কশার ঘায়
ঢাকার রাত্রি উদ্দাম চঞ্চল।

শ্বেত-প্রলেপের বেমানান চুনকাম
রাতের নখরে আবরণ যায় খসে
শিথিল তনুর ব্যর্থ মনস্কাম
সহসা সাধের সৌধ পড়েছে ধ্বসে।

অভিমানাহতা বুড়ীগঙ্গার ব্যথা
গভীর নিশীথে ক্রমশঃ নিবিড় হয়
বাড়ে রাত পানা পুকুরের স্তব্ধতা
নৈশ-নগরী তন্দ্রায় তন্ময়।

খঞ্জ-প্রহর কেটে যায় অবসাদে
মাঞ্জা ভাঙা প্রেম বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

অন্য গ্রহ

মোহাম্মদ শরীফ রাজা

আছরের আজানের জন্য অপেক্ষা করে জোলেখার বাপ। এরপর বেশী দেরী করতে গেলে প্রদোষের সুযোগ নিয়ে ঠকবাজ ছোঁড়ারা অনেক সময় আনির-ধার-ঘষা জাল সিকি দিয়ে তিন আনা পয়সা নিয়ে যায়। ও-পাশের পানওয়ালাকে দেখিয়ে পরীক্ষা করে নিতে নিতে আঁধারে গা ঢাকা দেয়। তা ছাড়া পশু হাসপাতালের বারান্দায় পৌঁছতে সময়ও লাগে তার। অন্ধকারে কতজন গায়ের উপর পড়ে, কত পথিকের পায়ের উপর ঠুকে দেয় নিজের লাঠিটা। খেঁকিয়ে উঠে ওরা—

—চোখের মাথা খেয়েছিস্, বেটা?

—অন্ধ মানুষ বাপজান, দেখতে পাই না। কাতর মিনতি জানায় জোলেখার বাপ। ওরা বকবক করে চলে যায়।

এত হাঙ্গামের আর দরকারটা কী! আন্দরকিল্লার মোড়ে কোলাহলের মাঝেও জুমা মসজিদের আজানটা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। কোমর আর পা দুখানি ইঙ্গিত দেয়। আছরের সময় ঘনিয়ে আসতে আসতে ওদের ব্যথাটা অসহনীয় হয়ে উঠে—টন টন করে রগগুলি। তখনও জোলেখার বাপের অভ্যস্ত জিহ্বা ছক বাঁধা বুলিটা আওড়ে যায়—

—বাবাজান! অন্ধ মানুষ। দু'খান্ পয়সা খ'রাত দিয়া যাও। আল্লা তোমাদের একে লাখ করবো। হায়াত দারাজ করবো। আমার রসুল হাশরের দিন সুপারিশ করবো। দয়া কর বাবারা!

কান দুটি পড়ে থাকে জুমা মসজিদের দিকে। আজান হলে হাতটা গুটিয়ে নেয়। পিছন ফিরে ঠিক আট কদম এগুলেই পানের দোকানটা। চৌপর দিনের বরাদ্দ বিড়ির পয়সা দুটি চুকিয়ে দিতে গিয়ে বলে—

—চললাম, জেটু। আছর হয়ে গেলো।

পানওয়ালা ছোকরাটা বেশ ভালো। সন্দেহজনক পয়সাটা দেখেশুনে দেয়, বৃষ্টি-বাদলে বারান্দায় আশ্রয় নেবার ঠাঁইটুকুও দেয়। হাতে কাজ না থাকলে দুটি কথাবার্তা বলে—দেশের কথা, নেতাদের কথা, লড়াইর কথা, কাশ্মীরের কথা যায় নিজেদের পারিবারিক কথা। বেশ ছেলেটি। মাঝে মাঝে অনুযোগ করে—

—দেশের থনে একটা ছোট ছেলে নিয়া আসতে পার না, জেটু? শহরের রাস্তায় হাঁটা চলায় কত কষ্ট!

—হাঁ, জেটু, দেখি এবার গেলে সুবিধা মতো একটা যদি পাই।

ছেলে আর পাওয়া হয় না। ভাত-কাপড় আর উপরি দশ টাকা বেতনের কমে কেউ রাজী হয় না। অত রোজগার কোথায়? দিন পড়েছে খারাপ। লোকে একটা ফুটো পয়সা দিতে গিয়ে সাতবার টিপে টিপে দেখে। তবুও যা দু'পয়সা পড়তো তাতেও লেগেছে এক শরীক। কোথেকে যেয়ে একটা জুটেছে ঠিক পাশটিতেই। ভাবে, ইজ্জত আবরু বলতে আর কিছু রইলো না দেশে!

ছেলে-ছোকরাদেরও বিশ্বাস করা যায় না। ফাঁক পেলেই হাত টেনে পয়সাটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে।

পশু হাসপাতালের বারান্দায় থাকে ময়নার বাপ। ছেলে ময়নাও। বয়স নাকি তেরো-চৌদ্দ হবে। সেবার নিয়ে এসেছে বাড়ী থেকে। দিন কয়েক পর রাত্রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ময়নার বাপ—

—ওরে হারামীর পোলা!

সঙ্গে সঙ্গে কিল-চড়ের আওয়াজ। জোলেখার বাপ লাফিয়ে বসে জিজ্ঞাস করলো—

—কি হয়েছে রে ময়নার বাপ, কি?

—আর কইহ কি, ভাই। হালার পুতে খাইয়া নাশ করলো, আবার চুরিও ধরছে! এই দেখোনা দশ-দৌশ্ গা পয়সা বিছরাইয়া পাইলাম ট্যাঁকে। হারামীর পোলা! মশায় খায় বলে বুকে নিতে গিয়া দেখি ট্যাঁকে পয়সা,—হা-রা-মী!

কাঁচা ঘুমে মার খেয়ে ছেলেটি কাঁদছিলো।

পাহারাওয়ালা এসেছিলো এগিয়ে—

—এই, শালালোগ্! কেয়া হল্লা মচা দেয়া, হেঁহ্?

—কুছ নেই বাবুজি! আমার লড়কাকো একটু শাসন করতা।

সিপাই চলে গেলো।

—শুনছো, দাদা—ময়নার বাপ আবার বলতে লাগলো—

শহরে পোলাপানের শাসনও করতে পারবো না। এই নচ্ছারের পুত্! চুপ! এইটা তোর গেরাম দেশ না। ঠুকাই দিমু ঐ লাল পাগড়ীর হাতে! আচ্ছা, ভাই, পেটের পোলা যদি ফাঁকি দিয়া কাম বানায়—

তবে আর অন্যের ছেলেকে কি ভাবে বিশ্বাস করবে জোলেখার বাপ? কিন্তু তবুও। শহরের রাস্তায় অন্ধ মানুষ। একা বড় নিরুপায়। আন্দরকিল্লার মোড় থেকে পশু হাসপাতাল কদম গোনা আছে। কিন্তু যদি জায়গা বদল করতে হয়? হবেও।

সকালে উঠে দুজনে মিলে শরীকদারীতে চা খায়। দু আনা করে খরছ। ময়না বড় টিনটায় চা আনে আর মুড়ি। ছোট টিনে ঢেলে দেয়। ছেলেটা খায় সরকারী থেকে।

গরম টিনে লেগে ঠোঁট পুড়ে যায় জোলেখার বাপের—

—থেৎ শালা, টিন।

ওটা নামিয়ে রেখে ডাকে—

—ময়নার বাপরে!

—উঁ।

—এবার আন্দরকিল্লা ছাড়তে হবে, ভাই।

—কেন? হনুমানের দল জুটছে?

—কোথা থেকে মাইয়া একটা—

—হ' হ'—তার কথা কেড়ে নিয়ে সোৎসাহে বলে উঠে ময়নার বাপ—

সেই কথাই ত কই। কিন্তুক ছাড়িয়া যাইবা কই, দাদা? সারা শহরে যেখানেই যাও হনুমানীরা আছে। এত মাইয়া আসে কোনখান্ দিয়া খোদা-মালুম। ডান চোখে তো একটু আধটু ঠাহর পাই, দাদ', নজর করলে দেখি যোয়ানী উছলাই পড়ে শরীলে। তুমি আর কেমনে ভিখ্ পাবা কও?

—হুঁ বুঝলা, ময়নার বাপ? সেই যে হুজুরেরা কয়ে গেছেন আখেরী জমানায়—

ময়নার বাপ শুনেনি তার কথা। ভেবে চিন্তে সে একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে।

—আমি ঠিক করছি, ভাই—হঠাৎ মনে পড়ে ছেলের কথা—

—ওরে ময়নারে।

—কি-ও।

—ওরে হারামজাদা একটু ওদিক গিয়া বস্‌না।

ময়না উঠে যায়।

—তয় শুনছ, দাদা? আমি ঠিক করছি—ময়নার মা'ত নাই—যোয়ান দেইখা নিকা করি লমু।

নিজের বুদ্ধির গৌরবে হাসে ময়নার বাপ। জোলেখার বাপ কী যেন ভাবছিলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—

—আখেরী জমানা—

উত্তরটা ঠিক ময়নার বাপের ঠোঁটের আগায় তৈরী ছিলো—

—আখেরী জমানা আসলে কি আর তুমি রুখতে পারবা, ভাই? মরণ সবার লাগবো জানি—কিন্তু বাঁচনও তো সবার লাগবো, নাকি?

শুক্রবার। জুম্মা-মসজিদের দ্বারে মৌমাছির মতো গিজ গিজ করছে এক ঝাঁক ভিক্ষুক। এঁদের আর কিছু না থাক, দুটি কি একটি চক্ষু অন্ততঃ আছে। ঝড়ের-মুখে-পড়া বাঁশ ঝাড়ের মতো হুড়োহুড়ি। এক ফোটা করুণা লাভের জন্য রিক্ত মানুষের হাস্যকর রণসজ্জা! জোলেখার বাপের স্থান এখানে নয়। কাল-বসন্ত তার চক্ষু দুটি বিলকুল পচিয়ে ফেলেছে। ময়নার বাপের মতো দুআনি দৃষ্টিও রেখে যায়নি।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। সামনে লাঠিটা ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলো জোলেখার বাপ।

'চক-বাজার, পাঁচলাইশ' বাসের ছোঁকরাটা হেঁকে উঠলো। দু'নম্বরের বাসটা মোড় ছেড়ে গেলো বোধ হয়।

—জেটু আসলা? পানওয়ালার প্রশ্ন।

—হ, জেটু। একফালি হাসি ফুটে বুড়োর বিকৃত মুখে।

রেলগাড়ীর মতো জীবন। একই লাইনে চলা। পশু হাসপাতাল থেকে আন্দরকিল্লার মোড় আবার আন্দর-কিল্লার মোড় থেকে পশু হাসপাতাল। জীবিকান্বেষীদের সংগ্রাম ও বিশ্রামের দুটি ষ্টেশন।

পানের দোকান থেকে উজিয়ে আট কদম। সামনে দাঁড়িয়েছিল কে! গায়ে হাত ঠেকতেই পুরানো কথা-গুলো ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসে—

—বাপজান—অন্ধ মানুষ—

—দূর দূর, মিনসে যেন চোখ হাতে লইছে, দেখ না।

বলতে বলতে ভিখারিণীটা খানিক তফাৎ সরে যায়। হাসাহাসি করে কয়েকজন মিলে। আজকে আরো দু'চারটা জুটেছে বোধহয়।

ভরদুপুরে লোকজন কমে। আজ জুমার দিনেও এতক্ষণ কামাই হলো না কিছু। জোলেখার বাপ বিড় বিড় করে—

—দুনিয়ার মানুষ এতখান্ কিরপিণ হয়ে গেল? স-ব পড়েছে ঐ তালে—লোহার সিন্দুকে ভরো, মাটির তলায় গুঁজাও। আখেরের কথা কোনো বেটার মনে নাই।

আর এই মাইয়াগুলা! ইজ্জতের উপর লাল বাওটা উড়িয়ে পেট চালায়। নেশায় পড়েছে সব। মরবে—মরবে—

পথ থেকে হঠাৎ হেসে উঠলো একটা মেয়েলী কণ্ঠ।

—আমরা মরব কেন্? তুমি বুড়া বাঁদরটা মরতে পারো না?

জোলেখার বাপের মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠে।

—ওরে হাবরে বজ্জাত। কথাটা আমি তোরে কইছি? তুই যে অমন মুখ নাড়লি!

—আমারে কও নাই, বেবাকরে কইছ। তুমি কইবার কে?

গতিক ভাল নয়। হাভাতে মেয়ে। ওদের কি আবরুর ভয় আছে? হয়তো লোকজন হাসছে। পানওয়ালা ডেকে বলে—

—সামাল, সামালকে—

জোলেখার বাপ সমঝোতার চেষ্টা করে অগত্যা।

—তোরাতে তো একলা কইলা, বেটি। মানুষের কথাই কই। সারাদিন রৌদে পুড়ি মরি। ভাতের পয়সাটা না হইলে মেজাজ খারাপ হয় না?

মেয়েটি এবার চুপ মারে। নরম হয়। এক সময়ে কাছে ঘনিয়ে আসে।

—তুমি কোনখানে থাক গো?

—পশু হাসপাতালের বারান্দায়।

—আমারে একটু ঠাঁই দিবা? ইষ্টিশানের কাছে থাকি। কুলি ছোঁড়াগুলার জ্বালায় আর ঘুমাইতে পারি না। দিবা একটু ঠাঁই?

ময়নার বাপের কথা মনে পড়ে বুড়োর। খানিক চিন্তা করে বলে—

—আইস না আইজ; দেখা যাবে।

আছরের আজান ধ্বনিত হয়। মেয়েটি বললো—

—আমি এখন যাব না গো। আর দুইটা গাড়ী দেখি।

পশু হাসপাতালের বারান্দায় পা দিতেই 'বাজান' বলে একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরলো জোলেখার বাপকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে—

—বাজান, বাজান—মা মারা গেছে—আমার মা—

—এ্যাঁ? মেয়ের পিঠের উপর হাতখানা বুড়োর স্তব্ধ হয়ে গেলো। হাতের লাঠিটার মতো নির্বাক-নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো সে।

ময়নার বাপও ফিরে এলো আঁধার পড়তে না পড়তে।

—দাদা আসছ? কণ্ঠে তার উপচে-পড়া খুশীর ছলছলানী।—ঐ যে তোমারে কইছিলাম, একটা ঠিক করে আনলাম আইজ। হেঁ-হেঁ-হেঁ—দেখি না একটু—এই, ময়না, কই রে? যা'ত একটু ঐ দিক।

ময়না এতক্ষণ অবাক তাকিয়েছিলো জোলেখার প্রতি। গ্যাস লাইটের আলোতে সত্যি অপরূপ মনে হচ্ছিলো মেয়েটাকে। বারান্দার কোণায় গিয়ে একটা থামে হেলান দিয়ে বার বার ওর দিকে দেখতে লাগলো সে।

জোলেখার বাপের কথা শুনে আফসোস করলো ময়নার বাপ। কিন্তু যতখানি আশা করছিলো ততখানি নয়। ঠিক মাপা-জোকা কারবার। লৌকিকতার খাতিরে যা দরকার তার একরত্তিও বেশী নয়। বড় অদ্ভুত লোকটি ময়নার বাপ। বলে—

—মরেছে না, দাদা, বেঁচে গেছে কও। ইজ্জত আবরু লইয়া বাঁচন যাইব আর? দেখছ? দিন দিন কী হইছে দেশটার?

এইটুকু বলে থামে—কী চিন্তা করে। হয়তো দেশের কথা। হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করে—

—মাইয়াটা গাঁও থেকে আইলো কেমন করে?

উন্মিলিত অন্ধ চোখ দুটি থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে জোলেখার বাপের। হাতের চেটো দিয়ে মুছে বলে—

—দেশের করম আলী চন্দ্রী কাছারীতে আইসবার কালে লইয়া আসছে।

—ও, আচ্ছা। এখন তুমি চিন্তা করবা এই জিন্দাটার কথা। মরেছে সে'ত বেঁচে গেছে। যারা জিন্দাগুলারে সুখে-শান্তিতে রাখতে পারবে তারাই মরাগুলার কথা ভাবে।

জোলেখার বাপ কোন উত্তর দেয় না। হয়তো খেয়ালও করে না। নীরবে কলের মতো মাথা নাড়ে শুধু। ময়নার বাপ বলে যায়—

—যে কইছিলাম। সুরৎ নাই, দাদা; কিন্তুক গতরখানা কচি ডাবের মতোন।

—ছিঃ ছিঃ বেতরিবৎ কথা কইও না, ময়নার বাপ। শক্ত গোনা।

আন্দরকিল্লার সেই মেয়েটা আসে। বগলে একটা পুটুলী, হাতের টিনে কিছু ভাত-তরকারী। কোন হোটেলের পিছনে আলো-আঁধারীর রহস্যময় স্থানে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে ভিক্ষে করছিলো যোয়ান-মরদ বাবুর্চীর কাছে। এসে খোঁজলে—

—কই গো আমার বুড়া,? ঠাঁই দিবে কইছিল?

জোলেখার বাপ চিনতে পেরে ডাকে—

—এই ত। আও না।

—মাগো সব দেখি মদ্দ-মানুষ! বলতে বলতে সে উঠে গেলো বারান্দায়। বসলো ওদের সামনে। আর সহসা জমিয়েও তুললো।

ময়নার বাপের জুড়ি হয়েছে, ভালো। সে প্রথমেই বলে ফেললো—

—মদ্দ-মানুষ কাল-সাপ হইলেও তোমরা গলার মালা করি রাখতে পার।

মেয়েটা কৃত্রিম আর্তনাদ করে উঠে—

—মাগো সাপের কথা কও কেনে; আমার ভীষম ডর করে গো!

ময়নার বাপ হেঁসে উঠলো। ওপাশে ময়নাও। বাপ ডেকে বলে—

—ময়নারে! চারটা ত খাইছ বাবা। এখন শুইবার জোগাড় কর না দেখি।

ওরা বাপ বেটায় শুয়ে পড়ে এক ধারে।

আন্দরকিল্লার মেয়েটা খুঁজে-পেতে বারান্দার কোণা থেকে বার করে আধভাঙ্গা একটা সানকি। কিছু ভাত তরকারি ওতে ঢেলে এগিয়ে দেয় জোলেখার বাপ আর মেয়ের প্রতি।

—নাও, তোমরা খাও নাই লাগে।

জোলেখা জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলো এতক্ষণ। বিস্মিত দু'নয়ন মেলে দেখছিলো এ মানুষগুলির বিচিত্র ধরণ-ধারণ। বড় অদ্ভুত লাগছিলো তার কাছে। এবার সে একটু নড়ে বসলো—সংকোচে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো—

—তোমার মাইয়া নাকি গো, ? আহা, নতুন আসছ বুঝিন। হইবই। লজ্জা করছে। খাও, খাও। দেখবা আমরার পোড়া অদেষ্ট। তখন আর লজ্জা থাকব না। ঐ ত আমরার সংসার।

সত্যি জোলেখা ধীরে ধীরে নিজকে খাপ খাইয়ে নিলে নতুন পরিবেশের সহিত। আজকাল আর অত সকাল আন্দরকিল্লার মোড় থেকে ফিরেনা জোলেখার বাপ। মগরিবের সময়টাও বাদ করে আসে। ঐ সময়টাতে বেশ দু পয়সা পড়ে টড়ে। টাকা আধুলীর ভাঙতি নিয়েও পয়সা দেয় লোকে। বড় শীতে ;মাছ লাগতে থাকলে যেমন বড়শী-ওয়ালার নেশা চাপে তেমনি জোলেখার বাপেরও।

এদিকে আসবার কালে কোন অসুবিধায়ও পড়তে হয় না। মেয়েটা লাঠি ধরে আগে আগে চলে। লোক বুঝে দাঁড়ায়। দু'চার পয়সা হাতে পড়ে পথেও।

সেদিন ফিরবার পথে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের খানিকটা ওদিকে থাকতেই একটা পাহারাওয়ালা রাস্তার ধারে লিচু তলা থেকে ডাকলো—

—এই। ওরা থামলে বললো, নাও পয়সা। দিতে পারবা সাত আনা ?

আধুলীটা নিয়ে জোলেখা দূরবর্তী লাইটের ক্ষীণ রশ্মিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বাপের হাতে দিলো। বুড়ো বুকের ভিতর কোথা থেকে টিপে টিপে সাতটি আনি বের করে দেয়। চলবার সময় হঠাৎ পাহারাওয়ালা জোলেখার গাল টিপে দিলো।

—যাঃ—সলজ্জ প্রতিবাদ জানায় মেয়েটি। বাপ জিজ্ঞাসা করে—

—কি রে, মাইয়া ?

—কিছু না, বাবা। কুত্তার ছাও একটা পথে খাড়াইয়া রইছে।

আবছা স্বল্পালোকে এগিয়ে আসে কোন ছোঁড়া।

—এই, জেটু। নাও চার আনা পয়সা। এগিয়ে দেয় একখানা দশ টাকার নোট। বুড়ো দু হাতে অনুভব করে। কাতর কণ্ঠে বলে—

—বাবা, অত ভাঙতি কোথায় পাব গো, ? দয়া করলা যদি, একটু সামনের কোন দোকানে চল না, দেখি—

—আরে বাপু একটু ভাল করে দেখ না ঝোলা টোলাতে। তোমাদের রুজী কি আর দোকানীর চাইতে কম ? বরং বেশী।

জোলেখার বাপ মন রাখা হাসি হেসে বলে—

—না বাপজান। অত পাইলে কি আর—

কথার মাঝখানে লাঠিতে টান পড়ে। ওরা এগোয়। ছেলেটার দৃষ্টিতে কুটিল একটা ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছে জোলেখা।

সে বুঝতে পারে ময়নার-মার কথার অর্থ।

হাঁ, আন্দরকিল্লার ভিখারিণী এখন ময়নার মা-ই বটে। ময়নার বাপের নতুন সমাজের রীতিতে গ্রহণ করা বৌ। সেদিন কচি ডাবের মত মেয়েটা এসে কী ভীষণ ঝগড়া বাধিয়ে দিলে তার স্বামী কেড়ে নিয়েছে বলে। শেষে ময়নার বাপ রফা করলে।

—যাও। কইছিলাম সত্য কিন্তুক তুই একদিন সেট্ করলি কেন্ ? হবে না। যা, ভাগ্।

মেয়েটা যাওয়ার আগে ভেঙচি কেটে বলে গেলো—

—যা, ভাগ্। কত আমার মরদ রে! তোমার লাখান কেরায়া-খেগো না হলে আমার চলবো। এই শরীল, এই যোয়ানী থাইকলে কত মরদ মাথা খুড়বো পায়ে।

জোলেখা সেদিন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো; আজ আর হয় না। ময়নার বাপ মা ফিরে কোতোয়ালীর ঘন্টিতে ঠং ঠং করে নয়টা পড়লে কি তারও পরে। ছেলেটা এদিকে হা-পিত্তেস করে। বাপ বলে—

—ডেঙ্গা ত হইছ কম না। নিজের পেটটা চালাইতে পার না ?

ময়নার চোখে মুখে ফুটে উঠে শ্বাপদ-সংকুল-সংসারের পথে নবীন যাত্রীর অসহায়তা।

ও এখন জোলেখার বাপের পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে, গভীর রাতেও মাঝে মাঝে ওর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় জোলেখা। সেদিন নিশুতি রাতে হঠাৎ নিদ্রা টুটে গেলো—বারান্দার অন্ধকার কোণে কে যেন কাঁদছে!

উঠে বসলো জোলেখা। ওদিকে ছেঁড়া কাপড়ের আওতা দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ময়নার বাপ আর বৌ। রাস্তাঘাট নিঝুম। দূরে বিনিদ্র প্রহরীর মতো ঢুলু ঢুলু

চোখে জেগে আছে ল্যাম্প-পোষ্ট দুটি। পশু হাসপাতালের দ্বারেও জলছে একটি ভাল্‌ব্‌। এক ঝাঁক পোকা ফুর ফুর করে উড়ছে চার পাশে। জোলেখা উঠে গিয়ে বসলো ক্রন্দনরত বালকটির পাশে।

ময়না। দুনিয়ার শহুরে জৌলুসের মধ্যে এ-ছেলেটি যেন মূর্ত্তিমান অভিসম্পাত। জোলেখার বাম হাতখানা যন্ত্রের মতো উঠে যায় ওর মাথায়।

—কান্‌ছ কেনে গো ময়না ভাই? গভীর সহানুভূতিতে আর্দ্র কণ্ঠ তার। ময়না এবার সত্যি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বুঝি! জোলেখা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে—

—চুপ চুপ। সবাই উঠে পড়ব। কও না, কাঁদ কেনে।

—পেটের ভিতর জলতাছে, জোলেখা। আইজ কিসুস্থু খাই নাই।

বাপের শিয়রের কাছে একটি পুটুলীতে জড়ানো ছিলো আধখানা রুটি। সন্তর্পণে তা-ই খুলে এনে ওর হাতে তুলে দিলো মেয়েটি।

মানুষকে অনুগ্রহ করতে পারাতে একটা আনন্দ আছে। ময়না আকুল আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। আঁচলের খুট থেকে এক পোটলা মিহিদানা কিংবা চানাচুর বের করে সে-হাতে তুলে দিতে পারলে জোলেখার বুকখানা কেঁপে উঠে অপরিসীম আনন্দে। ময়না খায় আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। অকস্মাৎ জোলেখাও ফিক্ করে হেসে ফেলে। মুখ ঘুরিয়ে পড়ে যায়। বাপ ডেকে বলে—

—মাইয়া রে। তুই এবার বাড়ীতে চলি যা!

আশ্চর্য্য হয়ে যায় জোলেখা।

—কেন্ বাবা?

বুড়ো কোন জবাব দিতে পারে না। কেমন করে সে বলবে—মেয়েকে স-ব কথা ভেঙ্গে-চুরে। তাই আবার শুধু বলে—

—না, মাইয়া, তুই চলি যা—

জোলেখা বুঝবার চেষ্টা করে কিছু। বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠে না। তবে বাড়ীতে যে তার কোন অবলম্বন নেই তাতো জানা আছে। কিসের ভরসায় বাবা তাকে পাঠাবেন জেনে নেওয়া প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করে সে—

—সেখানে আমারে রাখবে কে, খাওয়াবে কে, বাবা?

—তোর খালার কাছে থাকবি।

—হ, খালা খাওয়া'বে না ত কি! কণ্ঠস্বরে জোলেখার স্পষ্ট অভিমান ঝংকৃত হয়ে উঠে।

জোলেখার বাপও যে জানে না কিছু তা নয়। কিন্তু উপায় তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। ময়নার বাপের কথাগুলি যখন মনের দুয়ারে আঘাত করে তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে বুড়ো। সব খাপছাড়া—ছিষ্টিছাড়া কথা। বলে কিনা—আমরা পথের মানুষের একটা আলাদা সমাজ—আলাদা রীতি।

জোলেখার বাপের মনটা কেঁপে কেঁপে উঠে—তার একমাত্র কন্যা জোলেখা। সে বিয়ে করবে পথের ধারে। কোন বারান্দায় পাতবে যাযাবরের সংসার। তার ভবিষ্যৎ বংশধরের থাকবে না কোন সামাজিক পরিচয়—। সে হতে পারে না—হতে পারে না!

তাই মেয়ে যতই এ-জীবনের সহিত আপনাকে জড়িয়ে নিচ্ছে, ততই বেড়ে উঠছে তার দুশ্চিন্তা—উদ্বিগ্নতা। অন্তরের যে-দুটি চক্ষু অবিরাম পড়ে আছে মেয়ের উপর সে দুটি স্পষ্ট দেখে সব। দেখে না শুধু উপায়—একটুখানি পথের দিশা!

জোলেখাকে কাছে টেনে নেয় বুড়ো। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে যেন বুঝাতে চায় কত বড়টি হয়ে উঠলো তার সন্তান—তার মেয়ে। পাঁচ বছর আগে সে দেখতে পেতো মেয়েকে—তখন চোখ তার নষ্ট হয়নি। সবে দুটি দাঁত পড়েছিলো জোলেখার।

ওর মুখের নীচে হাত দিয়ে তৃপ্তিভরা পিতৃত্ব বলে—

—তোরে যে বিয়া দেওন লাগব, মাইয়া।

ক্ষণিকের জন্য হলেও ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সুখ-স্বপ্নে তলিয়ে যায় বুড়ো।

ময়নার বাপ আর বৌ কোথায় চলে গেলো। আজ দু'দিন ফিরে না পশু হাসপাতালে। ময়না কেঁদেছে, খুঁজেছে কিন্তু; পায়নি কোন হদিস।

জোলেখার বাপ মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—

—ঐটা মানুষ না, বাছা। খোদা তোমারে মারবো না। বেটা ছেলে, কিসের চিন্তা তোমার? কাইল থেকে রেলে যাও। ছোট মোট মাল-মাত্তা বও। এক পেটের খোরাক হবেই।

ময়না তা ই করলো।

সারাদিন কাজকর্ম্ম করে কয়েক আনা পয়সা নিয়ে চলে আসে পশু হাসপাতালে। হাতের মুঠিতে দু'পোটলা চানাচুর।

আজ জোলেখাকে চমৎকৃত করে দেবে সে। বহু দিনের ম্রিয়মান পৌরুষ আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে উঠে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ময়না।

সন্ধ্যার বাতি জলে উঠেছে।

ওদিকে একটা কুকুর শুয়ে আছে ফুটপাতের ধারে। কোথা থেকে সঙ্গিনী এসে গা শুঁকতেই উঠে পড়লো

কুকুরটা। তারপর দুটিতে চলে গেলো পাশাপাশি। কোথায় গেলো ?

'নিরালায়' সেকেণ্ড শো ভাঙলো বোধহয়। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ কল কল করে চলেছে রাস্তা দিয়ে।

জোলেখারা ফিরলো আরো অনেক পরে।

বুড়োর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। চক্ষু দুটি জ্যোতিষ্মান হলে আগুন ঠিকরে পড়তো যেন। জোলেখাও অচঞ্চল। নীরবে বসে পড়লে একটি থাম হেলান দিয়ে। এক ফোঁটা কথা ফুটলো না কারো মুখে।

হতভম্বের মতো দুটি মুখে চষে বেড়াতে লাগলো ময়নার অবোধ দৃষ্টি। হাতের তলায় চানাচুরের পুটলী ভিজে উঠতে লাগলো ঘামে। কিছুই বুঝতে পারলো না সে। জানতে পারলো না—

আজকে ফিরবার পথে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের খানিক ওদিকে লিচু তলা থেকে একটা যুবক ডাক দিয়েছিলো—

—এই, জেটু ; পয়সা লও।

—আল্লা—আল্লা তোমার ভালা করবো বাবা—

হাতের তালুতে একটি দু আনি অনুভূত হলো। ওটা পকেটে পুরে বললো—

—চলরে, মাইয়া।

এ-সময়ে নেহাৎ অকস্মাৎ মেয়ের হাত থেকে লাঠির অপর প্রান্ত ঝট করে পড়ে গেলো মাটিতে। অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনতে পেলো বুড়ো—

—না—না—না—বাবা—বাবা—

চীৎকার করতে যাচ্ছিলো বুড়ো—

—কি রে, কি রে মাইয়া—

এমন সময় ঝটকা মেরে নিজকে মুক্ত করে, টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে মেয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো তার কম্পমান দেহ। নিজের শঙ্কাতুর কচি তনুও তার কাঁপছিলো বাঁশ পাতার মতো—থর থর থর।

সামনে থেকে এক জোড়া জুতার আওয়াজ মিশিয়ে গেলো দূরে।

বুড়ো দিব্য আলোয় সব পরিষ্কার দেখতে পেলো।

তারপর ওরা চলে এসেছে।

ময়না জানতে পারলে না কিছু।

আজকে তার পরিশ্রম হয়েছে। নতুন হাবা গোছের ছোকরা কুলি পেয়ে লোকেরা যথেষ্ট ঠকিয়েছে তাকে। বেজায় শ্রান্ত হয়েছে দেহ। ঘুমের নেশায় জড়িয়ে আসতে চাইছে তার চোখের পাতা। নেতিয়ে পড়তে চায় সমস্ত দেহখানি গুলী-খাওয়া জন্তুর মতো। অথচ এরা বাপ মেয়ে দুটি বসে আছে শীলামূর্ত্তির মতো নিস্তব্ধ, নীরব।

হঠাৎ বুড়োর ডাক—নিঝুম রাতে কোতোয়ালীর ঘন্টিতে যেন একটার ঘড়ি—ঠং।

—ময়না।

—কি।

—ময়না রে—বুড়োর গলায় অহেতুক কান্নার ঢেউ,—তুই আমরার সাথে যাবি রে, ময়না ?

—কই, জেটু ?

—যেখানেই যাই। তুই যাবি ?

ময়না কী ভাবলো। একবার তাকালো জোলেখার প্রতি। তারপর বললো—

—যামু।

বুড়ো যেন এই উত্তরটার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিলো। চোখ মুছে বললো—

—তয় চল্ ময়না। এই শহরে আমার দম আটকাইয়া যায়, আমি—।

পরদিন সন্ধ্যা বেলা পশু হাসপাতালের খালি বারান্দা খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কেউ এলো না ফিরে। এক ধারে আধভাঙ্গা সানকি। একটি নেড়ী কুকুর এসে শুঁকলো সানকিখানা। শুঁকে-টুকে বসে পড়লো ; এবং এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়লো।
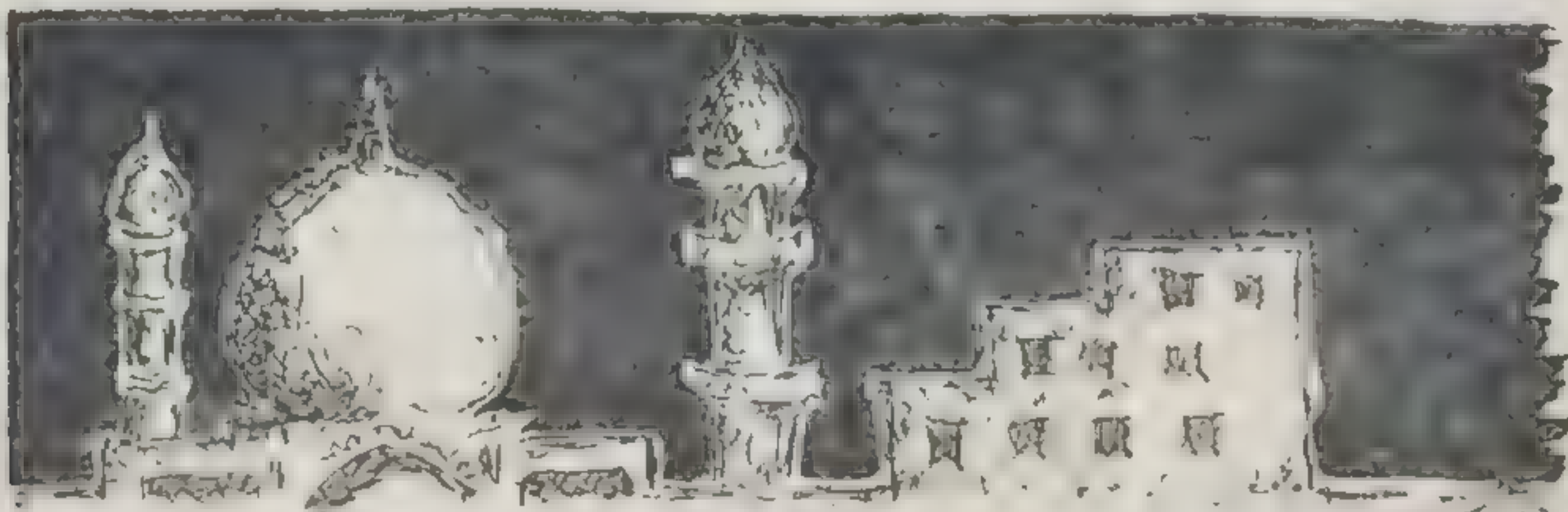
হজরত হুদ আলাই-হেস্ সালাম

মুস্তাফিজুর রহমান

হজরত হুদ আলাইহেসসালাম প্রেরিত হইয়াছিলেন আ-দ জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। আ-দগণ প্রথমে খাস আরবের বাসিন্দা ছিল। পরে তাহারা মিশর, বাবেল প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং তথায় বিরাট রাজত্ব স্থাপন করে। এই উন্নত জাতির প্রভাবে উপরোক্ত এলাকায় এক নতুন সভ্যতা গড়িয়া উঠে। আ-দদের জামানা হজরত নূহ (আঃ) এর পরে আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব দুই হাজার বৎসর ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আরব এবং আফ্রিকার বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া এক সময় এই জাতির যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজমান ছিল। কোরআন মজীদে ইহাদের আদি নিবাস আরদে-আহকাফ—বা আহকাফ ভূমি বলা হইয়াছে। হাজারা মওতের নিকট—আম্মানের পার্শ্বস্ত এই ধ্বংস প্রাপ্ত দেশটিতে বর্ত্তমানে বালির ঢিবি ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়েনা। কয়েক বৎসর পূর্বে হাজারা মওতের উক্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক অনুসন্ধান কাজ চালান হয়। বিস্তৃত এলাকা খনন করার পর তথায় প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তরের আসবাব পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আ-দগণ তাদের পূর্ববর্ত্তী জাতির ন্যায় প্রতিমা পূজক ছিল। তাদের পূর্ববর্ত্তী জাতি—হজরত নূহের দেশ বাসিগণ স্থাপত্যে দক্ষ ছিল। এই শিল্পের যোগ্য-উত্তরাধিকারী আ-দ জাতি পূর্ববর্ত্তীদের ন্যায় উপাসনা করার উদ্দেশ্যে পাষান খোদাই করিয়া কয়েকটি প্রতিমা প্রস্তুত করে। এই সকল প্রতিমার মধ্যে সওয়াগ, ইয়াগুস, ইয়াউক, নসর, সামুদ, হেতার, সদা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

আ-দ জাতি নিজেদের অপরাজেয় শাসন ক্ষমতা, সভ্যতা সংস্কৃতি ও শারীরিক সামর্থে এক আল্লাহকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। তাহারা নিজেদের হাতে গড়া পুতুল পূজা আরম্ভ করিয়া দেয়। কেবল তাহাই নহে, তাহারা ক্রত আল্লার পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার গর্হিত কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ তাহাদের সংশোধনের উদ্দেশ্য তাদের একটা প্রধান শাখা খালুদ বংশে হজরত হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সুদর্শন হজরত হুদ (আঃ) তাঁহার জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হজরত হুদ (আঃ) সাধ্য মত তাঁহার জাতিকে আল্লার একত্ব বাদের দিকে আহ্বান জানাইয়া একমাত্র তাঁহারই এবাদত করিতে বলিলেন। তিনি দুর্বলের প্রতি অত্যাচার-না করিয়া সমাজে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। জাতি তাঁহার কথা মানিল না। তাঁহাকে অবিশ্বাস করিল। তাঁহার সকল প্রকার অনুরোধ উপরোধকে তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল। দম্ভভরে বলিল,—দুনিয়ায় আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে?

হজরত হুদ আঃ দমিলেন না। তিনি বার বার তাঁহার জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদিগকে সতর্ক করিলেন। তাহাদের কার্য কলাপের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেন, তাহারা যদি কেবল অন্যায়ই করিতে থাকে, তা' হইলে তাহাদের প্রতি আল্লার আজাব নাজেল হইবে। প্রসঙ্গতঃ তিনি নূহ (আঃ) এর জাতির পরিণতিও উল্লেখ করিয়াছিলেন :—

"হে আমার! জাতি তোমরা নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শারীরিক সামর্থের দরুন অহঙ্কার করিওনা। তোমাদিগকে আল্লাহ যে নিয়ামত দান করিয়াছেন, তাহার শোকরগুজারী করা উচিত। তিনি কওমে নূহের ধ্বংস প্রাপ্তির পর আমাদিগকে পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব দান করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার মেহেরবানীর কথা ভুলিয়া যাইওনা। প্রতিমা-পূজা ত্যাগ কর। হাতে গড়া পুতুলগুলি কি করিয়া তোমাদের উপাস্য হইতে পারে? এই সহজ কথাটি কি তোমরা উপলব্ধি করিতে পারনা। এই গুলি যেমন তোমাদের কোন উপকার করিতে পারেনা; তেমনি তোমাদের কোন ক্ষতিও করিতে পারেনা। হায়াত, মওত, লাভ-লোকসান সব কিছু একমাত্র আল্লারই হাতে। হে আমার জাতি! যদিও তোমরা দীর্ঘকাল যাবৎ আল্লার নাফরমানি ও হটকারিতা করিয়াছ, তবুও মনে রাখিও, আল্লার রহমত অসীম। তাঁহার করুণা অনন্ত। তওবার দরওয়াজা চির উন্মুক্ত। সুতরাং তোমরা এখনও তাঁহার পথে ফিরিয়া আসিতে পার! অনুতপ্ত হইলে তিনি বান্দার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন। তোমরা তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। পবিত্র জীবন যাপন করিতে থাক। তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন। সম্মান দান করিবেন। ধন-দওলৎ প্রদান করিয়া সরফরাজ করিবেন।"

জাতির বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও হজরত হুদ (আঃ) স্বীয় কর্ত্তব্যে অটল রহিলেন। তিনি একান্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে

তাঁহার জাতিকে সত্যের পানে আহ্বান জানাইয়া চলিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন :—

"হে আমার দেশবাসী ! আমার এই প্রচার কার্য সম্পূর্ণ-রূপে লিল্লাহ্। আমি এই কার্যের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রামিক চাহিনা। আমার পুরস্কার একমাত্র আল্লার নিকট। আল্লার নবী রসুলগণ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ রূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। কোন প্রকার পুরস্কারের আশায় তাঁহারা কখনও সত্য-প্রচারের ব্রতী হন নাই।"

আ-দ জাতির অধিকাংশ লোকই ধীরে ধীরে নানা প্রকার গর্হিত কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিল। হটকারিতা, অহঙ্কার ও বে-তমিজীতে তাহারা একেবারে তুলনাহীন হইয়া বসিল। জাতির মুষ্টিমেয় সৎলোক ইহাদের তুলনায় একেবারে নগণ্য ছিল। তাঁহারা হজরত হুদ (আঃ) এর বিরুদ্ধাচরণের নতুন পথ আবিষ্কার করিল। ইতিপূর্বে তাহারা কেবল তাঁহার কথা অমান্যই করিয়াছিল—তা'ছাড়া তাঁহার সহিত অন্য কোন প্রকার বে-আদবী করিতে হিম্মত করে নাই। এইবার তাহারা তাঁহার সহিত চরম গোস্তাখী আরম্ভ করিয়া দিল। যেখানে সেখানে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাঁহার প্রচারিত প্রত্যেকটি কথা লইয়া তাহারা নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শারীরিক সামর্থে শক্তিমান হজরত হুদের জাতি বলিতে লাগিল—আমাদিগকে সদুপদেশ দান করিবে এমন ব্যক্তি কে আছে ? তাহারা হজরত হুদ (আঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিল :

"হে হুদ ! তুমি আমাদের নিকট একটি প্রমাণও আনিলেনা। আমরা তোমার কথায় আমাদের মাবুদ-গুলিকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। আর আমরা তোমার প্রতি ঈমানও আনিব না।"

হজরত হুদ আঃ যথাসাধ্য তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বার বার বলিলেন :—"আমি নির্বোধ নহি। আল্লাহ কখনও কোন নির্বোধকে নবুওৎ দান করেন না। অযোগ্য লোককে নবী করিয়া পাঠাইলে লাভের পরিবর্ত্তে অধিক লোকসান হওয়ারই সম্ভাবনা। তা'ছাড়া এই প্রকার লোকের প্রভাবে মানুষ অন্যায় এবং অসত্যের পথেই চলিতে থাকিবে। মূলতঃ আল্লাহ এই প্রকার গুরুত্ব পূর্ণ কাজের জন্য নিজের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন লোককেই নির্বাচিত করেন, যিনি সৎ এবং সর্ব গুণে মণ্ডিত। রেসালতের যোগ্য ব্যক্তি কে, তা' আল্লাহ জানেন।"

এত সব যুক্তি সঙ্গত উপদেশ সত্ত্বেও হজরত হুদ (আঃ) এর জাতির বিরুদ্ধাচরণ ও হটকারিতা বাড়িয়াই চলিল। তাহাদের চরম অবিশ্বাসের সম্মুখে তাঁহার সকল প্রকার দলিল প্রমাণ ও আন্তরিকতা নিস্ফল হইয়া গেল। উপদেশ গ্রহণ ত দুরের কথা, তাহারা নানাভাবে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের বে-আদবী চরমে পৌঁছিল। তাহারা হজরত হুদ (আঃ)-কে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমাদের মাবুদগুলির শেকায়েত করায় তাঁহার এই দশা হইয়াছে। এমন কি উহাদের বদ-দোআয় তিনি একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছেন বলিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করিল না।

এই প্রকার বিদ্রূপাত্মক প্রচারণার ফলে হজরত হুদ (আঃ) এর দেশবাসী মনে করিয়াছিল যে, তিনি বিচলিত হইয়া পড়িবেন। তাহাদের উপহাসে দমিয়া গিয়া তিনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন। হজরত হুদ (আঃ) কিন্তু তাহাদিগকে চরমভাবে নিরাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সকল বাক্য বাণ সহাস্যে বরদাশত করিয়া স্বীয় কাজে অবিচল রহিলেন। তিনি তাহার জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :

"আমি খোদাকে এবং তোমাদের সকলকে সাক্ষ্য করিয়া সর্বপ্রথম এই কথা ঘোষণা করিতেছি যে, এই সকল মূর্ত্তি আমার অথবা অপর কাহারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে এই বিশ্বাস আমার নাই। অতঃপর তোমাদিগকে এবং তোমাদের বাতিল মাবুদগণকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, যদি সত্যই এইগুলির ঐ প্রকার কোন ক্ষমতা থাকে তবে যেন সর্ব প্রথম আমার ক্ষতি সাধন করে। আল্লাহ আমাকে বিবেক বুদ্ধি দান করিয়াছেন। আমি তাহারই মেহেরবাণীর উপর নির্ভর করিয়াছি। পৃথিবীর সব কিছু তাহারই অনুগত। তিনি হায়াত-মওতের মালিক। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন।"

সর্বশেষ তিনি আ-দ জাতির ক্রমাগত অবাধ্যতা ও হটকারিতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন যে, যদি তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে, এবং তাহারা যদি আমার উপদেশ না শুনে, তা হইলেও আমি স্বীয় কর্ত্তব্যে অটল থাকিব। কিন্তু তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ অতি সত্বর তাহাদিকে হালাক করিবে এবং অন্য জাতিকে করিবে পৃথিবীর মালিক। তাহারা আল্লার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারিবেনা। সব কিছুর উপর তাহার কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তিনি সব কিছুর রক্ষক। সারা জাহান তাঁহার কুদরতের অধীন।

"হে আমার দেশবাসীগণ ! এখনও সময় আছে; তোমরা বিবেকের পথ অবলম্বন কর। হজরত নূহের জাতির অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লার সিদ্ধান্ত

অতি নিকটবর্ত্তী। 'অতি সত্বর তোমাদের সকল দর্প চূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন তোমাদের অহঙ্কার করার মত কিছুই বাকী থাকিবেনা। সেই চরম সময়ে হাজার আফসোসেও কোন ফায়দা হইবেনা।

''হজরত নূহ (আঃ) তাহার জাতিকে বার বার এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে আমি তোমাদের দোস্ত, দুশমণ নহি। আমি তোমাদের নিকট ধন-দওলৎ, স্বর্ণ-রৌপ্য বা রাজত্বের প্রত্যাশী নহি। আমি তোমাদের উন্নতি ও সঙ্গতির জন্য সচেষ্ট। তোমাদের পরম সুহৃদ। আল্লার পয়গাম সম্পর্কে আমি সমানরূপে নির্ভয়যোগ্য। আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে, আমি তাহাই প্রচার করি। জাতির উন্নতি ও শুভ পরিণতির উদ্দেশেই আমি সব কিছু করিয়া থাকি।

"তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির উপর আল্লার প্রত্যাদেশ নাজেল হওয়ায় আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই; কেননা ইহা আল্লার শাশ্বত বিধান যে তিনি যে কোন জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্য হইতেই একজনকে বাছিয়া লন। তাহাকে তিনি নবুওৎ দান করিয়া স্বীয় আদেশ নিষেধ জানাইয়া দেন। এই ভাবে নবী রসুল মারফৎ আল্লার বিধান সমূহ প্রচারিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ তাহাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তা হইলে ধর্ম প্রচারকে জাতির ভাষা সম্পর্কে ওয়াকেফ হইবেন, তাহাদের চাল-চলন জীবণ ধারণ পদ্ধতি তাহার জানা থাকিবে। এমন লোকই জাতির প্রকৃত দরদী পথ প্রদর্শক হইতে পারে।"

আ-দ জাতি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না কেমন করিয়া তাহারা এক খোদার ইবাদত করিবে। তা' হইলে তাহাদের হাতে গড়া পুতুলগুলির কি হইবে? পুতুল পূজা ত তাহাদের মধ্যে বংশানুক্রম চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে উহা বর্জন করা কেবল কষ্ট সাধ্যই নহে; বরং উহাতে তাহাদের পূর্বপুরুষদের অপমানও বটে! তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পুতুল পূজার ফলে তাহাদের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল ত হইবেই; উপরন্তু উহা আল্লার নিকট তাহাদের উদ্দেশ্যে সুপারিশও করিবে। তাহারা যখন কিছুতেই সত্য পথ অবলম্বন করিল না; তখন হজরত হুদ (আঃ) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"আমি তোমাদিগকে ভয়ঙ্কর দিনের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছি।"

এই প্রকার কঠোর সতর্ক বানী প্রচারের পরও তাহাদের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তাহারা কেবল জেদ-ই করিয়া চলিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা স্পষ্টতর জানাইয়া দিলো, এই প্রকার রোজকার ওয়াজ-নসীহত আমাদের পছন্দ হয় না—আরও বলিল:

"যদি তুমি সত্যবাদীদের একজন হও—তবে যে (আজাবের) ওয়াদা করিতেছ, তাহা লইয়া আস।"

হজরত হুদ (আঃ) বলিলেন: "আমার এই প্রকার স্বার্থহীন নসিহত এবং যুক্তিযুক্ত উপদেশের জবাবে তোমরা যদি আল্লার আজাবই কামনা করিয়া থাক, তবে তাহাও দেখিতে পাইবে। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আজাব এবং গজব নাজেল হওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।"

হজরত হুদ (আঃ) তাঁহার জাতিকে বলিলেন: "তোমরা স্বহস্তে মূর্ত্তি গড়িয়া উহার এক একটি নাম করিয়া থাক। উহাকে মাবুদ মনে করিয়া ইবাদৎ করিয়া থাক। তোমাদের বাপদাদা যাহা করিয়াছে, তোমরাও তাহাই করিতেছ—ইহা ব্যতীত তোমাদের কৃত কার্যের স্বপক্ষে অপর কোন যুক্তি প্রমাণ নাই। আমরা তোমাদিগকে যুক্তি সঙ্গতভাবে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি—তোমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে। তোমরা যদি আজাবের প্রত্যাশা করিয়া থাক, তবে তাহাও আসিবে। তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করিতে থাকিব।"

শেষ পর্য্যন্ত আ-দ জাতির চরম দুর্দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ, বিদ্রূপ ও হট-কারিতার পরিণাম এক অভিনব বেশে তাহাদের নিকট দেখা দিল। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে আকাল পড়িল। শস্য শ্যামল ক্ষেত-খামার বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিল। নদী-নালা, খাল-বিল শুকাইয়া গেল। অর্দ্ধাহারে, অনাহারে মানুষ ও পশু-পক্ষীর সুন্দর চেহারা বিকৃত হইয়া পড়িল। দেশের দিকে দিকে উঠিল হাহাকার। সুন্দর দেশ বিরান হইয়া গেল।

সেই চরম মুহূর্ত্তে হজরত হুদ (আঃ) তাঁহার জাতিকে শেষ বারের মত তওবা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: এখনও সময় আছে। আ-দ জাতি যদি আল্লার এই গজব দেখিয়াছ এখনও সত্য পথ অবলম্বন করে, তবুও আল্লাহ তাহাদিগকে চরম সাজা হইতে অব্যাহতি দিবেন। এখনও তাহারা সত্য পথে ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু চরম হটকারিতা ও অবাধ্যতা যাহাদের আদর্শ, তাহারা দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা তখনও উপলব্ধি করিতে পারিল না যে, তাহাদের চরম দিন অতি নিকট-বর্ত্তী। আ দ জাতি হজরত হুদ (আঃ) এর সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল।

তদানিন্তন দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অতুলনীয় ও শারীরিক শক্তিতে আ-দ জাতির ধ্বংসের দিন অতি নিকট-

বর্ত্তী হইল। সারা দেশ ব্যাপিয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ তাহারা মনে করিল: দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি তাহাদের মর্মর প্রাসাদগুলি কে ধ্বংস করিতে পারে। ক্রমান্বয়ে ঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভীষণ ঝড় ও বানের মুখে তাহাদের বাড়ী ঘর, দালান কোঠা, বাগ-বাগিচা সব কিছু বরবাদ হইতে আরম্ভ করিল। আট দিন সাত রাত্রের তুফানে সারা দেশ ছারখার হইয়া গেল। হজরত হুদ ও তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুগামী ব্যতীত সকল নর নারী মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

ছিন্ন মূল মহীরুহের ন্যায় দীর্ঘকায় আ-দ জাতির লাশে দেশ ভরিয়া গেল।

আরবের অধিবাসীদের মধ্যে হজরত হুদ (আঃ) এর ওফাৎ এবং কবরস্তান সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। হাজারা মওতের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, ধ্বংসলীলার পর তিনি হাজারা মওতে হিজরত করেন এবং তথাকার বরহুত উপত্যকার নিকটবর্ত্তী তরয়ম নগরে এন্তেকাল করেন; তথায়ই তাঁহাকে দাফন করা হয়। তা ছাড়া হাজারা মওতের নিকট একটি লাল টিলার নিকট তাঁহার কবর রহিয়াছে বলিয়াও কোন কোন রেওয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে। ফেলিস্তিনের অধিবাসীগণ দাবী করিয়া থাকে যে, তথায়ই তাঁহার ওফাৎ হইয়াছে। ফেলিস্তিনে একটি কবর রহিয়াছে—তথাকার লোকেরা উহাকে হজরত হুদ (আঃ) এর কবর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সেখানে বাৎসরিক উরুস করিয়া থাকে। ইতিবৃত্তকার মতে পূর্বোক্ত মতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত।

হজরত হুদ (আঃ) এর জীবনী, শিক্ষা ও আদর্শ এবং আ-দ জাতির পরিণতি হইতে শিক্ষনীয় অনেক কিছুই রহিয়াছে। হজরত হুদ (আঃ) সহণশীলতা ও ধৈর্য্য ছিল অতুলনীয়। তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন:

"আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখিতেছি আর মনে করিতেছি মিথ্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন:

"হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নহি। আমি সারা জাহানের প্রতিপালকের রসূল। আমার প্রতিপালকের পয়গামসমূহ তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া থাকি। আমি তোমাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য হিতাকাঙ্খী মাত্র।"

কোরআন মজীদের সূরা আরাফ, হুদ এবং শোয়ারায় হজরত হুদ (আঃ) এর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

শীতের সন্ধ্যা

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

শীতের সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে
কুয়াশায় জাল বোনে।
তোমার স্মৃতির প্রদীপ জ্বলিছে
আমার হৃদয়-কোণে॥

দূর-দিগন্তে শুকতারা হাসে
ছায়া পড়ে তার কচি-দূবঘাসে,
তুমি শুধু নাই মনের আকাশে
এমন গোধূলি ক্ষণে॥

বাতাস পরেছে শীতের-সিফন
মন্থর গতি তাই,
ক্লান্ত-বিহগ ফিরিছে কুলায়
কণ্ঠে যে গান নাই।
প্রকৃতি এখন নীরব-নিথর
কামনা-নিহত প্রদোষ-প্রহর
হৃদয়ে তোমার নামে বয় ঝড়,
শিশির ঝরিছে বনে॥

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বি-এ আর এম-এ পরীক্ষার মাঝখানে

বি-এর ফল বের হল। খবর শুনে পাশের গাঁ ছাব্বিশা হতে রোহিনী চন্দ এসে আমার বড় ভাইকে ডাকলেন। বললেন—'গুরু দশায় বছর; ভাইটিও তো ভাল পাশ করল। এখন ওকে দিয়ে কি করাবে? ডিপটী হবে?' ভাই বললেন, 'না, ও ইংরেজের চাকরী করবে না।' চন্দ মশাই বললেন, 'বেশ—বেশ; ভাল উকীলের কাছে ডিপটী লাগে কোথায়? টাকার ভাবনা করোনা, টাকা আমি বিনা সুদে দিব; যখন পারে, ও শোধ করবে।'

রোহিনী চন্দের সাথে আমাদের ডাকা খোঁজার একটা সম্বন্ধ পুরুষানুক্রমে ছিল। আমরা তাঁকে কাকা করে ডাকতাম। তাঁর সুদের ব্যবসায় ছিল, অথচ সুদ তাঁর মনকে ছোট করতে পারে নাই। বাজারের বড় মাছ প্রায়শঃ তিনিই কিনতেন; অতিথ মুছাফিরকে তিনি কখনো ফেরত দেন নাই; দরিদ্র তাঁর কাছে হাত পেতে ব্যর্থ হয়ে আসে নাই।

এই দিল-দরিয়া রোহিনী কাকার টাকা নিয়ে এম-এ আর ল' পড়তে গেলাম।

একটি মেস

কলকাতায় আবার থাকার সমস্যা দেখা দিল। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের জন্য তখন হার্ডিং হোষ্টেল ছিল; কিন্তু সে কেবল হিন্দু ছেলেদের জন্য। বহু আন্দোলনের পর তখন মুছলমান ছেলেদের জন্য কারমাইকেল হোষ্টেল কেবল বানান শুরু হয়েছে। অগত্যা আমি একটা ছাত্র মেসে গিয়ে উঠলাম। অমন দুরন্ত ঘরে জীবনে কখনো থাকি নাই। নোংরা মহল্লা; ছোট্ট গলি, তারই মধ্যে এক ছোট্ট দোতলা বাড়ী। নীচে ভাঙ্গাচুরার অন্ত নাই; সন্ধ্যার পর হতে বড় বড় ইন্দুরের দাপাদাপি শুরু হয়। তারা মানুষকে বিশেষ পরোয়াই করতে চায়না। আবার মহাশয়দের লেজে পাড়া লাগলে পায়ে ঘ্যাচ করে কামড় বসিয়ে দেন। সে কামড় অনেক সময় নাকি বিষাক্তও হয়ে পড়ে। চোখ মুখ বুঁজে দিন গণতে লাগলাম, কারমাইকেল হোষ্টেল কখন্ শেষ হবে।

গাঁয়ের মেহমান

একদিন আমাদের দেশের (গাঁয়ের নাম করবনা) দুটি মেহমান জুটলেন। এঁদেরে আমার মেসে দিয়ে গেলেন আমার বড় ভাইয়ের সহপাঠী খোন্দকার মাশা উল্লা। খোন্দকার সাহেবের বুদ্ধির তারিফ করি; তিনি ধরতে পেরেছিলেন যে আমার মেসের যে চেহারা তাতে অমন মেহমান না হলে খাপ খায় না। মেহমান দুটির সাথে শত ছিন্ন কাঁথা, সে-কাঁথার ভাঁজে ভাঁজে রেল গাড়ীর ছারপোকারা এসে বাসা নিয়েছে। তাঁদের গাঁয়ের কাপড়ে চোপড়ে জানালার অন্ত নাই; মাথার টুপিতে তেল আর ধূলার বার্নিশ, পায়ে চটি—তার আগা আছে, গোড়া কোথায় খসে পড়ে গেছে। অথচ পরিচয়ে শুনলাম, এঁরা গাঁয়ের তালুকদার, অবস্থাও মোটামুটি ভাল। খাওয়া-দাওয়ার পর নিরালায় জিজ্ঞাস করলাম: 'শহরে আসতে আস্ত কাপড় কাঁথা নিয়ে এলেন না কেন?' বললেন—'তাইতো! বড় শরমে পড়ে গেছি। ভাল কাপড়, লেপ, কাঁথা, জুতা সবই আছে; কিন্তু রওনার আগে কয়েকজনে এসে পরামর্শ দিল—'চিকিৎসার জন্য যাচ্ছ, ছেঁড়া কাপড়-চোপড় না হলে হাসপাতালে জায়গাই পাবেনা; কারণ হাসপাতাল তো আর ধনীর জন্য নয়।' তাই শুনে, গাঁয় থেকে খুঁজে খুঁজে ভাল কাঁথা কাপড় বদল দিয়ে এই সব ছেঁড়া জিনিষ সংগ্রহ করে এনেছি।'

পরদিন এসে খোন্দকার সাহেব আমার মেহ্‌মানদেরে নিয়ে শহরে বেরিয়ে এলেন। রাত্রে বললেন,' এ-মেহ্‌মানদেরে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছি।' বললাম—'নিরীহ ভাল মানুষ, এঁদেরে নিয়ে আবার ফ্যাসাদ কেন?

বল্‌লেন—'এ-ই তো ফ্যাসাদের মূল। এরা, একদম আজব জীব।' বল্‌লাম—'একটু বুঝিয়ে বলবেন? তিনি শুরু করলেন:

এঁদেরে নিয়ে সিরাজগঞ্জ গাড়ীতে উঠেছি। দুই ভাইয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হল।

'ও ভাই, ভাই গো?

'আরে কি অইল? অমন আমলাম নইলি ক্যান?'

'আচ্ছা, গাড়ী যে চীক্কুর শুরু করল, কানের পর্দা ফাইট্টা যাবনা তো?

'আরে চুপ কর—চুপ। গাড়ী এহন দৌড় মারব।'

'তাই তো ভাই; এ-শালার গাড়ী এক্কেবারে ঘিন্নীর নাগাল ছুটল।'

* * *

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে—

'ও ভাই, ভাই গো, এত যে মানুষ জন, আজ কলকাত্তার 'আট' নাকি?

'অবারো পারে। আমি কি সব জাইনা রাখছি নাকি?

'আচ্ছা, ভাই, কলকাতার পাল্কী যে ঘোড়ায় টানে, বেহারারা সবাই বাড়ী গেছে নাকি?

'কথা এখন থো; পথে চল।

'ওরে বাপরে বাপ ইমারত! উপর দিকে চাইলে না মাথার পাগড়ী পড়ে যায়!

'মাথার পাগড়ী পড়ে যাবে না? এসব আমাগরে মহারাণীর বাড়ী না?

'আরে মুশকিল! দালান ইমারত দেখে দেখে যামু, তা পথের মানুষে এমন ধাক্কায় কেন? ব্যাটারা কানা নাকি?

* * *

গড়ের মাঠের ধারে

'আচ্ছা, খোন্দকার সাহেব, অ্যাংরাজের না হুনি এত বুদ্ধি!

'তা বুদ্ধি তো ওদের সত্যিই আছে।

'তা অইলে এ-বোকামিটা করল কেন, হুনি?

'কি বোকামিটা করল, বলুন তো?

'এই যে এত বড় গড়ের মাঠ, গরুর নাদায়, ঘোড়ার নাদায়, ছাগলের নাদায় সারে ভরে আছে। এই মস্ত জায়গাটায় পাটের আবাদ না করে এমনি ফেলে রেখেছে কেন?

* * *

শরবতের দোকান

'খোন্দকার সাহেব, বড় পিয়াস লাগছে যে?

'শরবত খাবেন?

'হ্যাঁ, খুব খাব। দাম কত?

'ঘোলের শরবতের গেলাস দুই আনা।

'হস্তা দামে নাই?

'আছে। ঐ পানি আর বরফের শরবত।

'দাম?

'এক পয়সা গেলাস।

'বেশ, ঐ শরবতের দুই গেলাস আমাগরে দুই ভাইরে দিক। আর আপনি খান এক গেলাস।

'আচ্ছা, ঐ শরবত নেও।

(শরবত মুখে দিয়ে) 'হায় হায়রে টাল্‌কা! দাঁত না আমার নাইগা গেল। ও ভাই, ভাই গো, আর শরবত নিয়োনা; এক গেলাসেই আমাগরে দুই জনের চইলা বেশী অইব।

হেড়ম্ব মৈত্র

এম-এ আর ল পড়তে এসে তিনটি অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পেলাম যাঁদের কথা সহজে ভুলবার নয়।

এঁদের একজন ছিলেন অধ্যক্ষ হেড়ম্ব মৈত্র। ইনি ইউনিভার্সিটীতে ইংরাজী পড়াতেন। এঁর প্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন কারলাইল আর ইমার্সন। আচার্য কেশব সেনের মত লোকের ধর্ম-প্রাণতার সঞ্জীবনী পরশ যাঁদের গায় লেগেছিল, হেড়ম্ব মৈত্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। চিরদিনের আদর্শবাদী, চিরদিনের নীতিবাগীশ, চিরদিনের অধ্যয়ন পরায়ন পণ্ডিত, তাঁর অধ্যাপনার স্তরে স্তরে তাঁর ঐ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। বইয়ের ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁর মন দুলে উঠত, তাঁর কণ্ঠস্বর স্তরে স্তরে উঠত নামত, কখনো ভাবের আতিশয্যে নিজে শিউরে উঠতেন, আমরাও শিউরে উঠতাম। এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাস, এমন প্রাণের আগুন, এমন গভীর দরদ দিয়ে পড়াতে আর কোন অধ্যাপককে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

তারপর পেলাম রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল জানকী-ভট্যাচার্যকে। একান্ত আপন-ভোলা পণ্ডিত মানুষ: অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার মধ্যে হামেশা মশগুল থাকতেন। সেকালে সেকসপিয়র পড়াতে তাঁর মত দক্ষ অধ্যাপক কলকাতাতে আর কেউ ছিলেন না। ইউনিভার্সিটী কমিশন যখন কলেজে কলেজে ঘুরে বেড়ান, তখন আশু-মুখার্জী তাঁদেরে জানকী বাবুর ক্লাসে নিয়ে গিয়েছিলেন। কমিশনের দেশী-বিলাতী প্রত্যেক মেম্বর প্রশংসমান শুদ্ধতার সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। আমি তাঁর কাছে ইংরেজী পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, অবশ্য মাঝে মাঝে সেণ্টপলস্ হতে এসে তাঁর সেকসপীয়র ক্লাসে বসতাম। তবে তাঁর ল-ক্লাসে বরাবরই বসেছি। সমস্ত কলেজের মধ্যে তাঁর ল-বক্তৃতাই সবার চেয়ে ভাল হত।

তাঁর ঘরে স্ত্রী বর্তমান ছিলেন না। বাল বিধবা কন্যা সেই বাপের দেখশুনা করত। মেয়ে অনেক সময় বাপকে পথে থেকে ধরে নিয়ে বলত: 'বাবা, কেবল এক পায় জুতা পরে কি যেতে আছে?' বাবা কুপিত হয়ে বলতেন- 'তা বাপু তোমরা এতখানি বেখেয়াল তা কে জানে? আগে থেকে বলে দিলেই তো আর আমার এত সময় নষ্ট হত না!' ছাত্ররা কেউ কেউ অনেক মাসের বেতন বাকি ফেলে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হত। তিনি প্রথমে ভয়ানক রেগে যেতেন। বলতেন,

'হতভাগারা, দশ মাসের বেতন বাকি পড়তে পারে? ফাঁকি—সব ফাঁকি।

'না, স্যার, ফাঁকি নয়, সত্যি আমরা বড় গরীব।

'দেখ, কথা বলোনা, বলছি। আমি এখন বিস্তু ধরে মার শুরু করে দিব।

'তাহলে স্যার, যাই। পড়া ছেড়েই দিতে হবে।

'আরে হতভাগারা, থাম্—থাম্। সত্যি তোরা গরীব।

'হ্যাঁ, স্যার নেহায়েত গরীব।'

'আচ্ছা, আয়; দরখাস্ত নিয়ে আয়। যাও বাবা সকল, পাঁচ মাসের মায়না দাও গিয়ে, আর পাঁচ মাস মাফ।

সর্বশেষে পেলাম রিপন কলেজের আইন-অধ্যাপক ডাক্তার কাঞ্জীলালকে। তিনি দরদী, অতি বিদ্বান, অতি হাস্যরসিক, অতি দক্ষ অধ্যাপক। একদিন আমাদেরে উপদেশ দেওয়া উপলক্ষে তাঁর নিজের জীবন কাহিনী বল্লেন।

জন্মে ছিলাম নিতান্ত গরীবের ঘরে। বহু কষ্টে এন্ট্রান্স পাশ করে হলাম মফঃস্বল কোর্টের মোখতার। অল্পকাল মধ্যেই নাম পড়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্য করতে লাগলাম, যত ভাল মোখতারই হইনা কেন, উকীলরা আমাদের উপেক্ষার চোখে দেখবেই। ভাবলাম—'নাঃ, আমাকে উকীল হতেই হবে।' অনেক কষ্টে প্রাইভেট পড়ে এফ এ (আই-এর তৎকালীন সংস্করণ) পাশ করলাম; তারপর পাশ করলাম পি-এল পরীক্ষা। তখনকার দিনে বি-এল-এর নীচে এই একটি ল পরীক্ষা ছিল। এইবার উকিল হয়ে কাজ শুরু করলাম। পশার বেশ হল। কিন্তু, ও ভগবান, দেখি কি যে বি-এল উকীলরা পি-এল উকীল দেরে মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় না। ভাবলাম-'বস, আমি, বি-এ, বি-এল দুইটি পাশ করে তবে ছাড়ব।' তাই করলাম—বহু অভাব দুঃখের ভিতর দিয়ে। এইবার গিয়ে বুক ফুলিয়ে বি-এল উকীলদের মধ্যে বসলাম। ওকালতী চল্ল। পশার দিন দিন বেড়ে চল্ল।

এমন সময় একটা জটিল মামলা উপলক্ষে কলকাতা হাইকোর্ট হতে একজন উকীল এলেন—নাম তাঁর মিষ্টার মিত্র। মিষ্টার মিত্রকে দেখবার জন্য আদালত লোকারণ্য হয়ে উঠল। মিষ্টার মিত্রের অপর পক্ষে দাঁড়ালেন আদালতের যিনি সবচেয়ে প্রবীন উকীল তিনি। আমি এই স্থানীয় উকীলের জুনিয়র হয়ে কাজ শুরু করলাম। মামলায় ছওয়াল জওয়াবের সময় মিষ্টার মিত্র ধমকিয়ে ধমকিয়ে আমার সিনিয়রকে অস্থির করে তুল্লেন। 'আমার সিনিয়র এত লোকের সামনে ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে গেলেন।

টিফিনের ছুটি হল। আমি আমার সিনিয়রকে বল্লাম—'যদি অনুমতি করেন, তবে টিফিনের পর আমি দাঁড়াই।' আমার সিনিয়র যেন কুল পেলেন। বল্লেন—'পারবে বাবা, দাঁড়াতে?' আমি বল্লাম, 'আপনি আশীর্বাদ করে দিন, তার পরের টুকু আমি দেখি।' তাই হল। টিফিনের পর আমি দাঁড়ালাম।

পাঁচ মিনিটও যায় নাই, মিষ্টার মিত্র আমাকে কষে খুব এক ধমক দিলেন। সেকালে বাঙ্গালী শিক্ষিত মহলে সদ্ভাব শতকের রাজত্ব ছিল। সে বইয়ের এ-দুটি লাইন সবারই মুখস্থ ছিল:

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

মিষ্টার মিত্রের ধমক শুনে আমার এই কবিতা মনে পড়ল। আমি তৎক্ষণাৎ হাত দুলিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম—

ওহে মিত্র তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

আমার কথা শুনে হাকিম, পেশকার, উকীল, মোখতার, দর্শক সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সে-হাসি আর থামে না। এরপর হাসি যখন থামল, তখন দেখা গেল, মিষ্টার মিত্রের আওয়াজ আর মুখভঙ্গি একদম নরম হয়ে গেছে।

মামলায় আমরা জিতলাম। দেশময় আমার জয় জয়াকার পড়ে গেল।

কিন্তু আমার মনের শান্তি গেল। আবার চঞ্চল মন বলতে লাগল: 'না, হাই কোর্টের উকীল না হলে উকীল জন্মই বৃথা!'

এম-এ পড়া শুরু করে দিলাম। পাশ করলাম। হাইকোর্টে চলে এলাম।

কিন্তু হাই কোর্ট যে এত বড় দরিয়া তা আমার জানা ছিল না।

হাতের টাকা শেষ হয়ে গেল। দিন আর যায় না। একদিন একটা মামলা এল। বুঝলাম, মিথ্যা মামলা! ফিরিয়ে দিলাম। তখন বাসায় এক বেলা করে উপবাস শুরু হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে তাদের

মা অস্থির। তাঁর হাতের বালা, গলার মালা আগেই খতম। অনেকদিন পর আবার একটা মামলা এল। নথি পত্র দেখে বুঝলাম মিথ্যা মামলা। ফেরত দিলাম। কয়েক টাকা ফি দিয়েছিল, তা দিয়ে দিলাম। গিন্নী আড়ালে থেকে সব দেখছিলেন। মক্কেলটা বাইরে গেলে তিনি এসে বল্লেন—'খোকা যে আজ আর বাঁচেনা! কর্জও চাবেনা, মিথ্যা মামলাও নিবেনা, এখন উপায় কি? তিনি হু হু করে কেঁদে ফেল্লেন। আমি মনে মনে বললাম—'ভগবান আমায় শক্তি দাও—আমায় শক্তি দাও।' প্রকাশ্যে বললাম—'খোকা যদি মরে তবে মরবে, তবু সত্যচ্যুত হতে পারবনা। তবে তুমি ইচ্ছা করলে খোকাকে যে কোন পথে বাঁচাতে পার।' গিন্নী চোখ মুছে ভিতরে গেলেন। আমি গালে হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলাম।

সে রাত গেল: কি ব্যথার ভিতর দিয়ে তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

ভোরে একটি মামলা এল: সত্য মামলা। টাকা পেলাম। চাকর বাজারে গেল। সকলে পেট ভরে খেল।

সেই যে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, জীবনে আর কখনো অভাব কষ্ট হয় নাই।

তোমরা জীবনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থেকো। মিথ্যার আশ্রয় না নিলে ওকালতী হয়না, একথা কখনো মনে স্থান দিয়োনা।

হ্যাঁ, আমার জীবনের আরো দুটি কথা বলব। কলকাতা এসে দেখি, কেবল এম-এ, বি-এল এখানে কিছুই নয়। তাই এম-এল পড়তে লেগে গেলাম। পাশও করলাম; কিন্তু ডি-এল না হলে উচ্চতম সম্মান কোথায়? ফের পড়ায় লেগে গেলাম। ডি-এল উপাধিও অর্জন করলাম।

দরিদ্রের এই সংগ্রামময় জীবনের কথা মনে করে তোমরা সাহসে বুক বেঁধো।'

১৯১৭ সালের পয়লা জানুয়ারী আমার বিয়ে হল। শ্বশুর টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বড় বাশালিয়ার নয়া মিঞা সাহেব—গাঁয়ের বড় তালুকদার—বংশ আছে, চেহারা আছে, ইজ্জত আছে, প্রতাপ আছে, এ-সব গুণ আমার বড় ভাইয়ের চিত্তে দোলা দিয়েছিল: তিনিই বিয়ে ঠিক করেন।

এতকাল যে জীবন-বিহঙ্গ অনন্তনীলের অপার বিথারে নির্বিকার বিহার করে বেড়াচ্ছিল, আজ সে নীড়ের মায়ায় আবদ্ধ হল।

কারমাইকেল হোষ্টেল। দুটি কামরা ঠিক হতেই আমি আর মৌলভী আবুল হোসেন সেখানে গিয়ে উঠলাম। কারমাইকেলের আমরা দু'জনই প্রথম বাশিন্দা। আবুল হোসেন সাহিত্য ক্ষেত্রে তখনই নাম করেছেন। স্বাধীন চিন্তার নিষ্ঠাবান সাধক, মৌলিক গবেষণায় ইচ্ছুক ও অভ্যস্ত, অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত দরদী, তাঁর মত সত্যব্রতী সুপণ্ডিত সে আমলে আমাদের মধ্যে কেউ ছিল না। ওয়কফ বিলটি তাঁরই হাতে তৈরী ছিল এবং তাঁরই চেষ্টাতেই তা আইনে পরিণত হয়। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়ে স্যার পি-সি রায় মুগ্ধ হন। ঢাকার 'শিখা' পত্রিকা প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টার ফল ছিল; কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন তাঁর সহযোগী। আবুল হোসেন সাহেব কিছু কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সেই সময় 'শিখাকে' কেন্দ্র করে তাঁরা যে স্বাধীন মতবাদ প্রচার শুরু করেন, তার প্রভাবে ঢাকায় একটি স্বাধীন-চিন্তক-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে! যতদূর মনে হয়, ডাক্তার কাজী মোতাহার হোসেন, কবি আবদুল কাদির—এঁরা তখন এই নতুন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আবুল হোসেনের অকাল মৃত্যু বাংলার মুছলিম সমাজের পক্ষে এক অপূরনীয় ক্ষতি।

কাজী আবদুল ওদুদ

কিছুদিন পর কারমাইকেলে এসে জুটলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তখন তিনি 'মীর পরিবার' লিখে বেশ খানিকটা নাম করে নিয়েছেন। চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারি নাই। তাঁর নিজের সম্বন্ধে তাঁর বরাবরই উচ্চ ধারনা: সে ধারনা অন্যের প্রতি সব সময় সকরুন নয়। তাঁর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্যাঁচ গোচ দিয়ে লেখার ষ্টাইল, তা আমার চিত্তে কখনো সদরদ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। তিনি সত্যি চিন্তা করেন, তার চেয়ে বেশী চিন্তা করেন যে তিনি চিন্তা করেন। রবীন্দ্র প্রতিভা লিখে এবং রাজা রাম মোহন রায়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তিনি হিন্দু শিক্ষিত মহলের বাহবা পেয়েছেন। কাজী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে মনে হয় যেন তাঁর মনে একটুখানি খেদ আছে যে মুছলমান সমাজ তাঁর যথেষ্ট কদরদানি করে নাই। হয় তো তিনি ভুলে যান যে রবিবাবু ও রাম মোহনকে তিনি ভালবেসে তাঁদের নিভাঁজ প্রশংসা করেছেন, আর মুছলমান সমাজকে (হয়তো ভালবেসেই) দেখিয়েছেন প্রধানতঃ তার দোষত্রুটি কাজেই উভয় সমাজ হতে এমতাবস্থায় তাঁর একই রকম সম্বর্দনা পাওয়া তো স্বাভাবিক নয়। তিনি নাকি পনর বছর খেটে গোটে লিখেছেন। পনর বছর খেটে মুছলিম সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে লিখলে তিনি হয় তো আমাদের জন্য একটা স্মরণীয় কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।

অভাব। এম-এ ছেড়ে দিতে হল। ল ঠিক রাখলাম। সেক্রেটারীয়েটে একটা কেরানী-গিরি নিলাম, আর নিলাম আমরাতলী লেইনে এক ছুরতী সদাগরের বাড়ীতে একটি টিউশনী। ছেলেটা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ত। তাকে ইংরেজী আর লজীক পড়ান শুরু করলাম।

ভোরে উঠে ল কলেজে যাই, দুপুরে চাকরী করি, বিকালে ছেলে পড়াই, রাত্রিতে ম্যালেরিয়ায় কাঁপি। এই-ভাবে জীবনের নদী বয়ে চল্ল।

খাজা গোলাম আহমদ আশায়ী

এই সময় কারমাইকেল হোষ্টেলে আমার কামরায় এক কাশ্মিরী অধ্যাপক এসে হাজির হলেন—নাম তাঁর খাজা গোলাম আহমদ আশায়ী, বাড়ী শ্রীনগর—লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফারসীতে এম-এ পড়ানর ব্যবস্থা ছিলনা বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। জ্ঞানার্জনে অতৃপ্ত আকাঙ্খা, সৌজন্য সুন্দর ব্যবহারে অসাধারণ, অফুরন্ত প্রাণ শক্তির উচ্ছ্বাসে ডগমগ—অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব জমে উঠল। কাশ্মীরের নদী, কাশ্মীরের পর্বত, কাশ্মীরের হ্রদ, সে হ্রদের বুকে জোছনা রাতে নৌকা বিহার, কাশ্মীরের ফুল, কাশ্মীরের ফল, কাশ্মীরের শাল, কাশ্মীরের গালিচা, সর্বোপরি কাশ্মীরের মানুষ—তন্ময় হয়ে এ-সবের কাহিনী তাঁর কাছে শুনতাম; তিনিও পরম আনন্দে, পরম গর্বে এসব কাহিনী বলতেন। কলকাতা হতে ফিরে যাওয়ার কিছু কাল পর কাশ্মীরের মহারাজার অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে প্রজাবিদ্রোহ। আশায়ী অধ্যাপনা ছেড়ে সে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর জেল হয়। ইংরেজ সরকারের মধ্যস্থতায় আপোষ হয়। তিনি মুক্তি পেয়ে শিক্ষা বিভাগে এক মস্ত পদলাভ করেন। বহুকাল পর আবার যখন ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হতে থাকে, তখন তার সহানুভূতি আজাদীর মুজাহিদদের দিকে ঢলে পড়ে। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তিনি আবার গেরেফতার হয়ে জেলে আছেন।

সে কালে শামছুল ওলামা মওলানা বেলায়েত হোছেন সাহেব বঙ্গবিখ্যাত আলিম ছিলেন। তাঁর বহু বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে মওলানা আকরম খাঁ সাহেব অন্যতম।

তখন কারমাইকেল হোষ্টেলে আমার বহু সহ-বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন পাবনার জিল্লুর রহমান ও ময়মনসিংহের খোরশেদ আলী তালুকদার। এঁরা উভয়েই পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এঁরা তখন আরবীতে এম-এ পড়তেন। আরবীর একটি পেপার তাঁরা পড়তেন মওলনা বেলায়েত হোছেন সাহেবের কাছে। মওলানা সাহেবের বয়স তখন আশী বছরের উপর; বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ান তাঁর পক্ষে তকলীফ হত; তাই স্যার আশুতোষ মুখার্জী তাঁকে বাড়ীতে বসে পড়াতেই অনুমতি দিয়েছিলেন। ইউনি-ভার্সিটীর টাকা খাবেন, অথচ মজা করে বাড়ীতে বসে পড়াবেন, এ-শ্রেণীর তুচ্ছ আপত্তিকে এ দরাজ-দিল জ্ঞান তপস্বী ব্রাহ্মণ কোন দিন আমল দেন নাই।

মওলানা বেলায়েত হোসেন

আমি মওলানা সাহেবকে দেখবার জন্য তাঁর উপরোক্ত ছাত্রদ্বয়ের সাথে তাঁর বাড়ী গেলাম। এ-বয়সেও লাল টকটকে রং, পাতলা শরীর, মিঠা জবান, অত্যন্ত স্নেহ প্রবন হৃদয়। আমাকে আদরের সঙ্গে কাছে বসালেন। বল্লেন—'আমার চোখের জোর ঠিক আছে, চশমা লাগাইনা, রোজ আট দশ ঘণ্টা পড়াশুনা করি, মাথার মগজেও কমজোরী আসে নাই; লেখা পড়া করে মোটেই হয়রান হই না; কিন্তু শরীরের শক্তি কমে গেছে।'

তিনি অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ ছিলেন; তাঁর ছাত্ররা তাঁকে ওলী মনে করত।

খুব সম্ভব তার পর বৎসর তিনি হজে গেলেন। আরফাতের ময়দানে হাজির হয়ে দুই হাত তুলে দোওয়া বল্লেন—'লাব্বায়েক, আল্লা হোম্মা, লাব্বায়েক,—'হাজির প্রভু, তোমার ডাকে হাজির।' তারপর মাটিতে পড়ে গেলেন। দেখা গেল, তিনি চলে গেছেন।

এম-এ ওয়াহেদ

কুচবিহার হতে একটি ছেলে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে এল। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, বুদ্ধি দীপ্ত চেহারা, পরিচ্ছন্ন পোষাক, চটপটে চলন ফিরন, বই পত্রিকা পড়ার জন্য পাগল; আমি হোষ্টেলের কমন রুমের চার্জ তার উপর দিয়ে দিলাম। কাজ বেশ চল্ল। একদিন হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট কমন রুমের বেয়ারারকে আমার কামরায় নিয়ে এসে বল্লেন—'দেখুন, আপনার ওয়াহেদ মিঞার কাণ্ড, এখন এর যা হয় আপনি করুন।' দেখলাম, ওয়াহেদ মিঞার থাপ্পরে ছোকরার গালের তিনটা ব্রন ভেঙ্গে রক্তাক্ত। ওয়াহেদ মিঞাকে ডাকলাম। শরম পেল। ছোকরাকে আদর করে একটা টাকা দিল; ছোকরা খুশী হয়ে চলে গেল।

ওয়াহেদ মিয়া ধনী ঘরের ছেলে। বড় ভাই আনছার মিঞা কুচবিহারের মন্ত্রী। ভাই, ভাইস্তা ভাইজী সবাই শিক্ষিত। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরই তার বিলাত যাওয়ার কথা ঠিকঠাক। ভবিষ্যত তার উজ্জ্বল। নানা বিভ্রাটে অকালে তার পড়া খতম হয়ে গেল।

কলেজের পড়া খতম হল, কিন্তু অধ্যয়ন তাঁর খতম হলনা। খবরের কাগজ—দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক—

বাংলা ইংরেজী—দেশ বিদেশের—এক ঝাঁক তাঁর নামে আসত। ভাল বইয়ের নাম শুনলেই এক কপি খরিদ করা চাই। দুনিয়ার খবর বার্তা তাঁর নখাগ্রে ছিল।

কিছুদিন ঘুরাফিরা করে তিনি জীবন বীমার এজেন্সী নিলেন। মাসে চার পাঁচ শ টাকা রোজগার হতে লাগল; কিন্তু ঘর তাঁর শূন্যই রয়ে গেল। রোজগারের টাকা তাঁর বই পত্রিকা খরিদ, মেহমানদারী ও আত্মীয় ছেলে-মেয়েদের উপহার—এতেই নিঃশেষ হতে লাগল। কলকাতা গিয়ে আমি বহুবার তাঁর বাসায় সাদর আতিথ্য লাভ করেছি।

আস্তে আস্তে ওয়াহেদ মিঞার দেহের ওজন সোয়া-তিন মণে গিয়ে উঠল। তাঁকে নিয়ে পথে চলতে সুবিধাও ছিল, অসুবিধাও ছিল। সুবিধা ছিল, তাঁকে দেখে অনেকে ভয়ে পথ ছেড়ে দিত। ভীড়ের মধ্যে তাঁকে সামনে রেখে পথ চলায় আরাম ছিল। আবার অসুবিধাও ছিল। তাঁর জন্য রিকশাওয়ালা পাওয়া কঠিন হ'ত। কেউ কাছে এসে দেহের আয়তনের দিকে চেয়ে বলত, 'মাফ্ করবেন, সাব, আমার রিকশার টায়ার টিউব পুরানা।' যে রাজী হত, সেও তাঁকে তুলে নিয়ে বার বার তার রিকশার টায়ার টিউবের দিকে নজর করে দেখত।

ওয়াহেদ মিঞাকে নিয়ে রাধাবাজারে গিয়েছি। উনি বাইরে দাঁড়ানো, আমি একটা দোকানের ভিতরে গিয়ে একটা জিনিষ দেখলাম। দাম চাইল পাঁচ টাকা। ভাবলাম, ওয়াহেদ মিঞা ধুরন্ধর মানুষ, তাঁকে ডাকি। ওয়াহেদ মিঞা ঘরে ঢুকতেই 'আইয়ে শেঠজী, আইয়ে' বলে দোকানদার তাঁকে অভ্যর্থনা করল, আর তাঁর কাছে জিনিষটির দাম চাইল সাত টাকা।

ওয়াহেদ মিয়াকে নিয়ে ময়মনসিংহ হয়ে করটীয়া চলেছি। ময়মনসিংহে বাসের টিকিট কিনে এক ষ্টলে বা-ইতমিনান বসে চা খেলাম। বাসের বাঁশী বাজল। চড়তে এলাম। ড্রাইভিংসিটের টিকিট ছিল; সে সিটের দুয়ার তাঁকে কবুল করল না। তিনি প্রথম শ্রেণীর কাছে গেলেন; সে দুয়ার বল্ল উঁহু, দ্বিতীয় শ্রেণীর দুয়ার বল্ল—'মাফ চাই।' বাসের পেছনে মাল ঢুকানের জন্য একটা মস্ত দুয়ার ছিল; সেই দুয়ার দিয়ে উঠে তৃতীয় শ্রেণীতে বসে রইলেন।

বর্ষাকাল। করটীয়ার খাল কানায় কানায় ভরা। উনি গোছল খানা ছেড়ে সেই খালের পারে বসে গোছল শুরু করলেন। রাখাল ছেলেরা গরু ফেলে এসে তাঁর অনাবৃত দেহ-পর্বতের পানে চেয়ে রইল। এক ছোকরা একটু এগিয়ে এসে বল্ল—

'অ ব্যাটা, তুমি কি খাও গো?

'কেন, ভাত খাই?

'ইস্! আমরা আর ভাত খাইনা? কৈ, আমরা তো অমন হইনা?

'আরে ও জন্য আমি আরো কিছু খাই।

'আর কি খাও?

'ছোট রাখাল পেলে ধরে খাই।

'ইস্! মিছে কথা।

রাখাল ছেলেটির একজন সাথী ডেকে বল্ল—

'আয়রে, সরে আয়; কি জানি কওন যায় না।

ইকবাল

স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই মারফত ইসলাম সম্বন্ধে জানবার আমাদের কোন সুযোগ ছিল না। পুঁথি, মহফিল মজলিসের ওয়াজ নছিহত আর বাইরের বই—এই সবের মারফত আমরা দু চার হরফ শিখতে লাগলাম। ইসলামের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে আমরা শুনতাম, বিশ্বাসও করতাম: ওতে একটা গর্বিত আনন্দ ছিল। তারপর আমাদের তরুন মনের সামনে উপস্থাপিত হল ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা। এবারো গর্ব বোধ করলাম, কিন্তু ভয়ে ভয়ে। এ যেন গরীবের জমিদার আত্মীয়। সম্বন্ধ সত্যই আছে, তা ভেবে আনন্দ হয়, চুপ চাপে মানুষের কাছে বলে গর্ব বোধের তৃপ্তি ঘটে; কিন্তু ঠিক জমিদারের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে সাহসে কুলায়না; কি জানি যদি অস্বীকার করে বসে! আল্লামা সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগাণীর ওজস্বিনী বানীর তরঙ্গ আমাদের মনের তটে এসে আঘাত করল; ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অগ্নিময়ী বক্তৃতার ঝলক আমরা অনুভব করলাম; মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর যুক্তি ও ইতিহাস ধর্মী প্রচার ধীরে বিস্তার লাভ করতে লাগল, সৈয়দ আমীর আলী স্পিরিট অব ইসলাম ইংরেজী শিক্ষিতদের মনে বিপুল বিস্ময়-পুলকের সঞ্চার করল; মওলানা মুহম্মদ আলী আর আবুল কালাম আজাদ যখন ইটালীর ত্রিপলী আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করলেন তখন তুরস্কের সাথে আমাদের ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধটা যেন কার্যতঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

যতদূর মনে পড়ে এরই কাছাকাছি কোন সময় আমাদের কানে এল ইকবালের উদাত্ত বাণী—

'চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তান হামারা,
মুছলিম হ্যায় হাম, ওতন হ্যায় ছারে জাহাঁ হামারা।'

মনের বহুদিনের ভীরু গোপন আশা যেন সবল দৃপ্ত ভাষা পেল। মুসলিম ভারতে তখন যত বড় বড় সভা হত, তার বেশীর ভাগের আসরেই গীত হত ইকবালের এই প্রাণময়ী সঙ্গীত। পরবর্তী কালে আমার লেখা 'আনোয়ার পাশা' নাটকে এই সঙ্গীতেরই অনুসরনে লেখা একটা সঙ্গীত দিয়েছিলাম:

'সিরিয়া আরব ভারত তোমার, ভ্রাতৃসংঘ ধনী ও নিঃস্ব,
মুছলিম তুমি মুক্ত উদার, স্বদেশ তোমার বিপুল বিশ্ব।'

ক্রমে ইকবালের সঙ্গে আত্মিক পরিচয় হতে লাগল। তাঁর শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া আমাদের মনের দুয়ারে দারুন আঘাত হানল। মুহ্যমান মুছলমানের মনের দিগন্তে আশার আলো চিকমিক জ্বলে উঠল। তিনি বলে যেতে লাগলেন—'আছে আমাদের সব আছে। শুধু চাই একজন নেতা।

'জলুয়া এ তুর তো মউজুদ হ্যায়,
মুছা হি নেহি।'

তুরের বুকের নুরের আগুন এখনো জ্বলিছে ভাই,
আজি মুছা নাই! শুধু মুছা নাই!

মুছলমান তবু সাহসে বুক বাঁধেনা; তবু সে তকদীরের ডরে থর থর; ভাবে, ভাগ্যের ভাগে যা পড়েছে, তার বেশ কম হবে কি করে?' ইকবাল বল্লেন—'হতভাগা সাধনার মত সাধনা কর, তোর ভাগ্যের ভাগ তোরই কথা মত আল্লা বিতরণ করতে বাধ্য হবে।'

'খুদী কো কর বুলন্দ্ এতনা
কে হর তকদীর ছে পহলে
খোদা বান্দেছে খোদ পুছে,
বাতা, তেরা রেজা কেয়া হ্যায়?'

'ব্যক্তিত্ব বিকাশ তব কর এই মতো
ভাগ্য বিতরণ আগে যেন তব কাছে
স্বয়ং বিধাতা আসি জিজ্ঞাসে, বল তো,
হে বান্দা তোমার এতে সম্মতি কি আছে?'

এত বড় জোরের কথা এর আগে আর কোথাও পড়েছি বা শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

তাই ইকবাল আমাদের সৌন্দর্যের কবি যত বড়, শক্তির কবি তার চেয়ে অনেক—অনেক বড়। নজরুল ইসলামও শক্তির বাণী প্রচার করেছেন—হয় তো এরো চেয়ে জোরের ভাষায় করেছেন। কিন্তু সে অনেক দিন পর। ইকবালের আগে বা তাঁর সময়ে ভূ-ভারতে হিন্দু মুসলমান কোন কবিই এমন প্রাণময়ী ভাষায় মানুষের সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন করেন নাই।

কেবল কথা বলে বলে ইকবালের মন তৃপ্তি লাভ করল না। তিনি ভারতের মুসলমানের জন্য কার্যতঃ কি করা যায়, ভাবতে লাগলেন। এমন সময় লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠক উপলক্ষে পাঞ্জাবের লণ্ডনে-অধ্যয়ন-রত ছাত্র চৌধুরী রহমতুল্লা পাকিস্তানের প্রস্তাব পেশ করলেন। গোল টেবিল বৈঠকের বিজ্ঞ সভ্যরা মুচকি হেসে চৌধুরী রহমতুল্লাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু বীজ উপ্ত হয়ে গেল। কবি ইকবাল কথাটা ভাবতে লাগলেন। তাঁর ভাল লাগল। তিনি মুসলিম লীগের প্রকাণ্ড সভায় 'পাকিস্তান' দাবী করে বসলেন। তাদের প্রিয় কবি দার্শনিকের কথা ভারতের মুছলমানদেরে ভাবিয়ে তুল্ল।

কবির প্রাণের আগুন কর্মীর প্রাণে গিয়ে লাগল। কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান প্রস্তাবকে তাঁর আজাদী জেহাদের ঝাণ্ডায় বড় বড় হরফে লিখে এগিয়ে চল্লেন।

তাই আজ ইকবাল শুধু শক্তির কবি নন, তিনি স্বপ্নেরো কবি; আবার তিনি শুধু স্বপ্নের কবি নন, সাধনারো কবি।

এ-মহা স্বপ্ন সাধনার বাণী
দিল কোন্ দিক পাল?
দখিনা মলয় মর্মরি কয়—
আল্লামা ইকবাল।'

মুজফফর আহমদ

মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, ঠোঁটে সংকল্পের দৃঢ়তা, কণ্ঠে সদরদ আবেদন, পাতলা দেহ, চঞ্চল গতি—যুবকের নাম মুজফফর আহমদ। আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; আমাদের এ-ঘুমন্ত দেশ ও সমাজের জন্য একটা কিছু করতে হবে, একথাও হয়েছিল। তাঁকে হঠাৎ সেক্রেটারিয়েটে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম:

'কি, ভাই, আপনি যে এখানে?

'পেট-টা বড় পেটুক, ও কিছুতেই কথা মানে না।

'পেট আবার পেটুক হয়, এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা তো কোথাও শুনি নাই রে ভাই?

'তাই। সেই জন্য ওর তরে কিছু রসদ জোটানের মতলবে এখানে একটা ছোট্ট চাকরী নিয়েছি—দিন দশেকের জন্য।

'কিন্তু ভাই, দশ দিন পর যে পেট-মশাই তার মেজাজ বদলাবেন, এমন ভরসা কিছু পেয়েছেন?

'পাই নাই, তাই তো চাকরীটা টেনে টুনে একটু লম্বা করে নেওয়ার চেষ্টায় আছি।

'তার মানে?

'ওরা আমাকে একটা লড়াইর পুস্তিকা ইংরেজী থেকে বাংলা করতে দিয়েছে। অনুবাদের জন্য আর একটা পুস্তিকা না আসা পর্যন্ত এটারই অনুবাদ চালাতে হবে।

'পেনে লোপের জালের মত?

'ঠিক ধরেছেন। ওদের টাকা আছে, আমার পেট আছে, কাজেই এখানে প্রসন্ন গোয়ালিনী আর কমলা কান্তের সম্বন্ধটা পেতে নিতে বাধা কোথায়?

এর পর মুজফফর আহমদের সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে। আলাপের বৈঠকে, বক্তৃতার মজলিসে, খবরের

কাগজের পৃষ্ঠায় তিনি বরাবর ঐ দরিদ্র, ঐ সর্বহারাদের কথাই বলে আসছেন। এই দরিদ্র দরদই তাঁকে প্রথমে বলশেভীক, পরে কমিউনিষ্ট মতবাদে দীক্ষা নিতে উৎসাহিত করে। এই গণসেবার অতন্দ্র আগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি আমাকে রাশিয়ায় পাঠাতে চেষ্টা করেছিলেন। বহু বছর পরের কথা। তিনি নেত্রকোনা কমিউনিষ্ট কানফারেন্স করে কলকাতা ফিরছিলেন। পথে ট্রেনের কামরায় তাঁর সাথে দেখা। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর নামের খ্যাতি ভারতের সীমা পার হয়ে কত দুর দুরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু ভিতরের মুজফফর একটুও বদলায় নাই।

মুজফফর আহমদের সঙ্গে পথের মিল আমার তখনো ছিল না; আজো নাই। কিন্তু মঞ্জিল যে আমাদের উভয়েরই এক, দুঃস্থ মানুষের কল্যান সাধন যে আমাদের উভয়েরই আযৌবন ধ্যান, সে কথা আমরা উভয়ে জানি। তাই আমাদের কর্ম জীবনের স্বপ্নোজ্জ্বল প্রভাতে উভয়ের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে-উঠেছিল, তা কখনো শিথিল হয়েছে বলে মনে হয় না।

ইয়াকুব আলী চৌধুরী

ফরিদপুরের ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল: আমাদের উভয়ের লেখার বাতিক ছিল, সম্ভবতঃ সেই সূত্রে। একদিন কলকাতা মুছলিম ইনষ্টিটিউটের এক সভায় পড়লেন তাঁর প্রবন্ধ—'আজান'। বাংলা গদ্য এত যে সুন্দর করে কেউ পড়তে পারে, তা আমার জানা ছিল না। সমঝদার শ্রোতার মজলিশ, লেখার বিষয় বস্তু কাব্যময়, সমগ্র লেখাটি কোন গদ্য কাব্যের সর্গ বিশেষ, পাঠকের মনে জোশের জোয়ার: সমস্ত শ্রোতা তন্ময় হয়ে আগা হতে গোড়া পর্যন্ত শুনল। এরপর আমরা খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে এক সঙ্গে কাজ করেছি। ষোল আনা মন, ষোল আনা ইমান, ষোল আনা শক্তি নিয়ে তিনি এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। চৌরি চউড়ার দুর্ঘটনার পর গান্ধীজী যখন অসহযোগ বন্ধ করে দিলেন, তখন চৌধুরী সাহেবের কি দুঃখ আর রাগ! তিনি বার বার আমাকে বলেছেন: 'কেন গান্ধীজীর এ-ভীরুতা? কেন তিনি আমাদের মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থায় বাধা দিচ্ছেন? আমরা মরব; কিন্তু আমাদের রক্তের শালু-ঢাকা পথে ডেকে আনব আমাদের আজাদীকে।'

আদর্শের ব্যাপারে ইয়াকুব আলী চৌধুরীর মন কোন অবস্থাতেই অসত্যের সঙ্গে আপোষে প্রস্তুত ছিল না। আষাঢ়ের জোয়ারের আলোড়নে খোয়ার পারের বেত গাছ যেমন কাঁপে আর কাঁপে, ভাবের আতিশয্যে চৌধুরী সাহেবের ক্ষীন দেহ তেমনি থর থর কাঁপত তাঁর "মনের মুকুট" তাকে বাংলা-সাহিত্যে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

শেষ বয়সে ইয়াকুব আলী চৌধুরী অভাবে পড়েছিলেন। তিনি নিজে চির কুমার ছিলেন; কিন্তু দুইটি ভাইয়ের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের দুস্থ পরিবারে গুরুভার তাঁর দুর্বল কাঁধে গিয়ে পড়েছিল। একবার তিনি আমাকে লিখলেন: 'একান্ত মনে দেশের সেবা করব বলে সংকল্প করেছিলাম যে জীবনে কখনো বিয়ে করবনা। কিন্তু সে সকল্প গ্রহণ কালে বিধাতা কি ক্রুর হাসিই না হেসেছিলেন! নইলে আমার এ-বয়সে রোগ দুর্বল দেহের উপর এতগুলি অসহায় অপোগণ্ড শিশুর ভার তিনি চাপিয়ে দিবেন কেন?'

—ক্রমশঃ
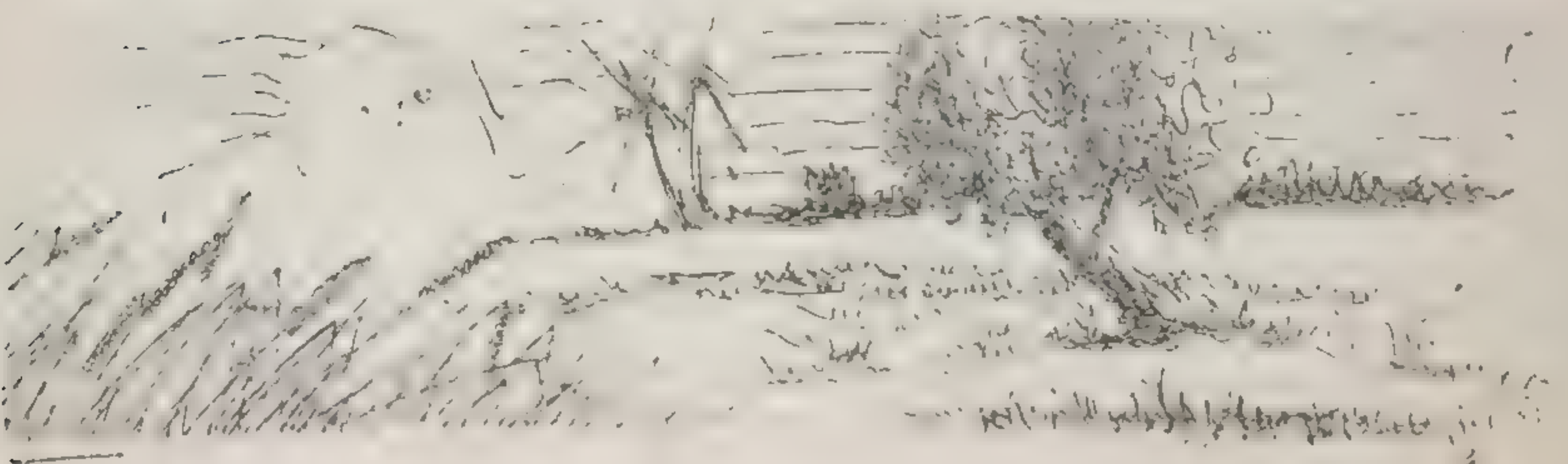
মুজাহিদ অভ্যুত্থানের পশ্চাদ্‌ভূমি

জগ্‌লুল হায়দর আফ্‌রিক

পঞ্চদশ শতকের অমুস্‌লিম রহস্যবাদের মধ্যে গুরু নানক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মুস্‌লিম উলামা ও সুফী-সাধকদের সংস্পর্শে এসে ইস্‌লামী ওহ্‌দানিয়াৎ, আখ্‌লাক ও মাসাওয়াতের প্রভাবে মুগ্ধ হন। কিন্তু তিনি ইস্‌লামী আসলিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকতে সক্ষম হন নি। তিনি সুফীয়ানা সাধনার মাধ্যমে নতুন মত ও পথের সন্ধানে লিপ্ত হন এবং হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী মতবাদের 'জের-জবর' অবলম্বনে 'শিখ মতবাদ' প্রচার করেন।

যতদিন গুরু নানকের 'শিখ মতবাদ' খাঁটি মজ্‌হাবী মতবাদ ছিল ততদিন মুস্‌লিম বাদশাহ্‌রা শিখ গুরুদের যথোপযুক্ত খাতির-তওয়াজ করেছেন; কিন্তু যখন এই মতবাদ রাজনৈতিক রূপ ধারণ কর্‌লো, তখন মুগল্‌ শাহানশাহ্‌দেরও খাতির-তওয়াজের মোড় ঘুরে গেল!

গুরু অর্জুনের সুপারিশক্রমেই সম্রাট আকবর সুবা পাঞ্জাবের এক বৎসরের খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন। সম্রাট আকবরই শিখদেরকে 'গুরুচক' (অমৃতসর) দান করেছিলেন।

পরবর্তীকালে গুরু অর্জুন 'গুরুচক'কে কেন্দ্র করে শিখদের রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন করলেন এবং কাবুল থেকে চাটগাম ও ঢাকা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত যে সকল শিখ বাশিন্দা ছিল, তাদের নিকট থেকে চান্দা ও মাহ্‌সুল আদায় কর্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে ক্রমে শিখেরা দৌলত ও হুকুমতের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলো। গুরুর শিষ্যেরা প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লো যে, দৌলত ও হুকুমত গুরু নানক থেকে বারো ক্রোশ দূরে ছিল; এখন তা গুরু অর্জুনের সান্নিধ্যে এসেছে। শিখ জনসাধারণ দৌলত ও হুকুমতের নেশায় রণদেহি মূর্তি ধারণ কর্‌লো!

শাহজাদা খসরু যখন বিদ্রোহী হলেন, তখন গুরু অর্জুন সম্রাট জাহাঁগিরের পরোয়া না করে বিদ্রোহী শাহ্‌জাদাকে আশ্রয় দিলেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁকে উস্‌কাতে লাগ্‌লেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাদার বিদ্রোহ কার্যকরী হলো না।

সম্রাট গুরু অর্জুনকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। গুরু অর্জুন দরবারে হাজির হলেন। কিন্তু তাঁর অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলেন না। সম্রাট তাঁর জরিমানা কর্‌লেন। গুরু অর্জুন জরিমানা দিতে রাযী হলেন না। সম্রাট তখন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ইহা ছিল নিছক সিয়াসী মুওয়ামিলা। শিখেরা এ-কে মজহাবী রংয়ে রঞ্জিত কর্‌লো। গুরু হর গোবিন্দের সময় থেকে শিখদের সাথে মুগল্‌ বাদশাহ্‌দের প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হলো।

গুরু হর রায় দারা শেকোকে সাহায্য করেছিলেন। এরপর গুরু তেগ বাহাদুর কাশ্মিরী হিন্দুদেরকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর্‌তে লাগ্‌লেন। সম্রাট আওরঙজেব তেগ্‌ বাহাদুরকে বন্দী করে আন্‌লেন এবং হত্যার আদেশ দিলেন। এরপর আস্‌লেন গুরু গোবিন্দ সিং। তখন থেকে শিখদের দুশ্‌মনী মুগল্‌ সম্রাট ও মুসল্‌মান জনসাধারণ সকলের বিরুদ্ধেই প্রযোজিত হতে লাগ্‌লো। গুরু নানকের সময় থেকেই শিখেরা মুস্‌লিম সুফী ও সাধক পুরুষদের মাযার জিয়ারৎ করতো—নিয়াজ-নযর দিতো। গুরু গোবিন্দ সিং আদেশ দিলেন যে, এখন থেকে কোন শিখ আওরত্‌-মরদ মুস্‌লিম সুফী ও ওলীদের মাযারে যেতে পার্‌বে না; তারা কোন মুস্‌লিম সাধক বা পীরের তাজিম করবে না। এ-আদেশ অমান্য করলে ১২৫৲ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

আওরঙজেবের সাথে সংঘর্ষের ফলে শিখদের উল্লেখ-যোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের কেন্দ্র কমজোর হয়ে পড়েছিল। আওরঙজেবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উপযুক্ত বাদশাহ্‌ থাক্‌লে শিখরা জাঠ ও গুজর্‌দের দশা প্রাপ্ত হতো, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুগল্‌ সম্রাটদের দুর্বলতার কারণে শিখশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা মুস্‌লিম জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে।

সর্বপ্রথম বান্দা বৈরাগীর অধিনায়কতায় শিখদের খুন-খারাবী, হত্যা ও গারতগরী শুরু হয়। বান্দা ছিল পুঁছের অধিবাসী। প্রথম দিকে সে বৈরাগীর বেশে ভিক্ষা করে ফির্‌তো। শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের সাথে তার পরিচয় ঘটে। বান্দা শিখ মতবাদ গ্রহণ করে মুস্‌লিম নিধন কার্যে আত্মনিয়োগ করে।

দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম তখন রাজপুতদের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সুযোগে বান্দা একদল শিখ সৈন্য নিয়ে সির্‌হিন্দ আক্রমণ করে বস্‌লো। সির হিন্দের শাসন কর্তাও ময়দানে অবতরণ কর্‌লেন। কিন্তু হঠাৎ একটা তীরের আঘাতে তিনি নিহত হ্‌লেন। তাঁর সৈন্য-দল নিরুৎসাহ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্‌লো। বান্দা বৈরাগী তখন তার শিখ সৈন্যের সহযোগীতায় ব্যাপক মুস্‌লিম হত্যা ও গারতগরী শুরু করে দিলো। শত শত মুসলিম

নরনারী ছদ্মবেশে হিন্দুদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ কর্লো। হাজার হাজার মুসলিম বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী শিখ পশুদের হস্তে শহীদ হলো। শিখদের অত্যাচার শুধু জীবিত ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলনা। তারা সাধক পুরুষ শায়খ্ কামিস কাদিরী (রঃ)-র মাযার তাঁরই উত্তরাধিকারীদের দ্বারা খনন করিয়ে নিয়েছিল। সহারনপুরে ইজ্জত-আবরুর ভয়ে মুসলিম ললনারা কূপ ও বাউলিতে ঝম্প প্রদান করেছিল। শিখ অধ্যুষিত এলাকায় বহু মুস্‌লিম নরনারী আত্মরক্ষার্থে হিন্দুয়ানী নাম রেখে নিয়েছিল।

সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ রঙগিলার যমানায় ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ্ দিল্লী অধিকার করেন। দিল্লীতে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। নাদির শাহ্ বহু ধনরত্ন ও ময়ূর সিংহাসন নিয়ে সরে পড়েন। এর ফলে সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌র শৌকত্, দৌলত ও ইজ্জত খর্ব হয়ে পড়লো। এই ঘটনার পর শিখদের নিকট এলো সুবর্ণ সুযোগ। তারা বেপরোয়াভাবে মুসলিম হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মুসলিম সম্পত্তি ধ্বংস প্রভৃতি অপরাধ মূলক কার্য চালাতে লাগ্‌লো। তাদের যুলুম্ ও সিতমে মুস্‌লিম-যমিন ও আস্‌মান তঙ্ হয়ে উঠ্‌লো। মুসল্‌মান হয়ে বাস করা মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তাদের সামনে দুটি পথ বর্তমান ছিল: শিখ হয়ে যাওয়া কিংবা ডোম-চণ্ডাল, চামার-মেথরের মত জীবন যাপন করা।

সিরহিন্দের পর বান্দা বৈরাগী বাটালা আক্রমণ করে বহু মুসলিম নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করে। পদাঘাত করে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করা হয়; দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে আছড়িয়ে মারা হয়। এরপর সে লাহোর আক্রমণ করে; কিন্তু তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়। নাকাম বৈরাগী 'শালিমার বাগ' পর্যন্ত ধ্বংসলীলা চালিয়ে পলায়ন করে।

সম্রাট ফররুখ সিয়র বান্দা বৈরাগীকে শায়েস্তা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর্‌লেন। তিনি আবদুস্ সামাদ খাঁ দিলির জঙ্‌কে পাঞ্জাবের গভর্ণর নিযুক্ত কর্‌লেন। দিলির জঙ্ ছিলেন তুরানী বাহাদুর ব্যক্তি। তিনি বৈরাগীর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই মহা-পাপী বৈরাগী তার আটশত অনুচরের সাথে বন্দী হলো। বৈরাগীকে প্রথমে লাহোরে আনা হলো। সেখান থেকে পাঠানো হলো রাজধানী দিল্লীতে। সম্রাট বৈরাগীসহ এই দস্যুদলের মৃত্যুদণ্ড বিধান কর্‌লেন।

১৭৬২ সালে আহমদ শাহ দুররানী শিখদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করেন। শিখরা এই ঘটনাকে 'ঘলুঘাড়া'—(অদেখা আপদ) নামে অভিহিত করে। কিন্তু আহ্‌মদ শাহ্‌র প্রত্যাবর্তনের পর শিখরা পুনরায় পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে লুঠতরাজ আরম্ভ করে। কিছুদিন পর শিখদের তিনটি 'মছল্' লাহোর দখল করে বস্‌লো। লাহোর শহর ও উপকণ্ঠ তিনভাগে বিভক্ত হলো: একাংশে সুহা সিং, দ্বিতীয়াংশে গুজর সিং ও তৃতীয়াংশে লহ্‌না সিংহের হুকুমত কায়িম হলো।

আহমদ শাহ্‌র পৌত্র যমান শাহ্ রণজিৎ সিংকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিতে একখানি পরওয়ানা দিয়ে ছিলেন। এই পরওয়ানার বদৌলতে রণজিৎ সিং প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। তিনি ১৭৯৯ সালে নওয়াকোটের চৌধুরী মহকম দীনের সহায়তায় লাহোর অধিকার করেন। ১৮০৯ সালে রণজিৎ সিং ইংরাজদের সাথে সন্ধি করে ফেললেন। তারপর সুবা সরহদ অভিমুখে পেশকদমী কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি একে একে সকলকে হড়প করে চল্‌লেন। কাশমির ও আটক গলাধঃকরণ করে অগ্রসর হলেন। ভীত ইয়ার মুহম্মদ খাঁ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন।

তখন সীমান্তের পাঠানদের অবস্থা ছিল আজীব ও গরীব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে এক একজন আমীর; তাদের মধ্যেও কৌমি ইত্তিহাদ ও ইত্তিফাক ছিলনা। তারা শিখদের আনুগত্য পছন্দ করতো না; পক্ষান্তরে শিখদের বিরুদ্ধে লড়বার মত শক্তিও ছিলনা তাদের। বারিকজই সরদারেরা শিখদের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছিল। যারা শিখদের আনুগত্য কবুল করতো, তারা শিখদের জন্য ঘোড়া ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম যোগাতো। যারা আনুগত্য স্বীকার করতোনা, তারা ডেরা-ডাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যেতো। শিখরা তাদের বস্তীগুলি জ্বালিয়ে দিতো; ক্ষেত-খামার ধ্বংস করতো।

শিখদের অত্যাচারে একদিকে লাহোর ও পেশাওর তাবাহ্ ও বরবাদ হয়ে গিয়েছিল; অন্য দিকে কাশমির কাঙাল হয়ে পড়েছিল। সমগ্র পাঞ্জাব, সীমান্ত ও কাশমিরের মুসলমানরা গোপনে ইস্‌লামী ফারায়েজ পালন করছিল। প্রকাশ্যে দীন ইস্‌লামের নাম উচ্চারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শিখদের সন্ত্রাসবাদ চরম পর্যায়ে উঠেছিল পেশাওর ও হাজারায়। নহর আবাসীন থেকে লুন্দ্‌খোর উপত্যকা পর্যন্ত এমন কোন বস্তী ও জনপদ ছিলনা, যেখানে তাদের লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৮১৩ সালে শাহ্ শুজা লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। রণজিৎ সিং তাঁকে নযরবন্দ্ করে প্রথমতঃ কোহিনুর হীরক হস্তগত করলেন। এরপর শাহ্ শুজা ও তাঁর বেগমের সমস্ত টাকাকড়ি, মণিমুক্তা ও জেওরাত কেড়ে নিয়ে তাঁদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। নিরুপায় শুজা ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয় প্রার্থনা কর্‌লেন।

এমনিভাবে শিখ হুকুমত, শিখ সেনাবাহিনী ও শিখ

জনসাধারণ কর্তৃক মুসলিম নারীর ইজ্জত, মুস্‌লিম নরের জীবন, মুসলিম ধনীর দৌলত এবং মুস্‌লিম সরদারের ইমারত লুণ্ঠিত হতে লাগ্‌লো।

এ-সব যযালিম ও অত্যাচারের কাহিনী আর্শ-মুআল্লা থেকে বরিলী পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফেরিশ্‌তারা অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। বনিনো ইন্‌সান ক্ষোভ ও দুঃখে হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়েছিল। সৈয়দ আহ্‌মদ বরিলবী মৌলানা শাহ্‌ ইস্‌মাইলকে জিহাদ-ইজতিহাদের তব্‌লিগ কার্যে উদ্‌বুদ্ধ কর্‌লেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক মুখ্‌তসর জমায়াত-ই-মুজাহিদীন আল্লাহর পথে দরিন্দহ্‌ স্বভাব, সন্ত্রাসবাদী শিখ হুকুমতের বিরুদ্ধে নারা-ই-তক্‌বির বুলন্দ করলো তার আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে বালাকোট, হাজারা ও সীমান্ত মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো। এই জামায়াতের পুরোভাগে আমরা দেখ্‌তে পাই—সৈয়দ আহমদ বরিলবী, মৌলানা শাহ্‌-ইস্‌মাইল, মৌলানা আবদুল হাই, সৈয়ব মুহম্মদ আলী, মৌলবী খয়রুদ্দিন শেরকুটি, মৌলানা মুহম্মদ ইউসুফ ফুল্‌তি, কাযী মুহম্মদ হইয়্যান, শায়খ্‌ বুলন্দ্‌ বখ্‌ত্‌, মৌলবী যয্‌হর আলী আযীমাবাদী, সৈয়দ মুহম্মদ রামপুরী, আরবাব বহ্‌রম খাঁ, রেসালদার আবদুল হামিদ খাঁ, শায়খ মুহম্মদ ইস্‌হাক গোরখ্‌পুরী, নওয়াব ওজীর-উদ্‌-দৌলা, মিয়াঁ মহীয়ুদ্দিন চিশ্‌তি, পীর মুহম্মদ (কাসিদ-ই-খাস), সৈয়দ কুতবে আলী, সৈয়দ যফর আলী, শায়খ আলী মুহম্মদ, আল্লাহ দাদ খাঁ পন্নী, মৌলবী আবদুল ওহহাব, মৌলবী নূর আহমদনগরী, মুন্‌শী মুহম্মদী আন্‌সারী বাকির আলী আযীমাবাদী, কমরুদ্দিন হুসয়ন, আহমদুল্লাহ নাগপুরী, আবদুল মজিদ খাঁ আফ্‌রিদী, সৈয়দ আনওর-শাহ, মৌলবী ইমামুদ্দিন বাঙালী (ত্রিপুরা), সৈয়দ আওলাদ হুসয়ন প্রভৃতি মুজাহিদ আমীর ও সালারগণকে। এঁদের স্মৃতি জাতির অন্তরে চির জাগরূক থাকবে। এঁদের জিহাদ ইজতিহাদ প্রত্যক্ষভাবে কামিয়াব না হলেও, তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার বদৌলতে শিখ অত্যাচার প্রশমিত হয়েছিল। ইংরাজের রাজ্য বিস্তার অব্যাহত থাক্‌লেও তাকে অনেক ঝড়-তুফানের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সর্বশেষ তুফানে সে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে তার পৈতৃক বাসভূমি শ্বেত জজিরায় !

●

রাত্রি

চৌধুরী জুল্‌ফিকার মতিন

চাঁদ ঝলোমলো শুভ্র আকাশ শুকনো হাওয়ার খেলা,
অনুরনি' তার বাজছে কোথায়—দিগন্তরের
কোন্‌ সে দেশে,
তারার মেলা লাগছে কোথায়—কোন্‌ সে হৃদয়
আস্তে হেসে,
চুপি চুপি নয়ন মেলে দেখছে সেকি তারার মেলা।

কোন্‌ সে হৃদয় জাগছে রাতি কাহার আশায় দিনগুনি,
শুভ্র হৃদয়, অবাক হৃদয়—রাত্রি অবাক,
মনটি অবাক আরো,
গাঁয়ের পথে চাঁদনী রাতে হয়তোবা আজ—
লাগ্‌ছে ছোঁয়া কারো,
কখনো একা হেঁটেছো কি তুমি,
পরশ পেয়েছো শুনি ?

রাত্রি অবাক, চাঁদ ডুবে যায়, চোখেতে নামেনি ঘুম,
গান গেয়ে যায় কোন্‌ সে পথিক সুর ডালে
মিঠে পথে,
মায়াবী রাতে আবছা আঁধারে বুড়ো হিজলের তটে,
দুইটী হৃদয় জাগছে এখনো, লেগেছে মিঠেল চুম !

পৃথিবী অবাক—অবাক হৃদয়, মরা পুকুরের ছায়া,
চাঁদ ডুবে যায় হাওয়ার খেলা দিগন্তরের দেশে,
আবছা আঁধার ঝরছে এখনো ; পড়ছে মিষ্টি হেসে,
গেঁয়ো পথে পথে হিজলের তলে লেগে আছে
কত মায়া ॥

পাণ্ডুর আকাশ

সৈয়দ মাহ্ফুজউল্লাহ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

॥ পাঁচ ॥

একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হয়েছিল রিজিয়ার। যে বয়সে এদেশের মেয়েরা কোল আলো করা সন্তানের জননী হবার গৌরবে গৌরবান্বিতা, রিজিয়া তখন স্বপ্নের ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে। ভোরের বাতাসের মতো হালকা মন নিয়ে ও তখন ঘুরে বেড়ায় বেপরোয়া, হয়তো অবজ্ঞার হাসিতে উড়িয়ে দিতে চায় দুনিয়ার সব সমস্যা।

যে পাখী খাঁচার বাঁধন মানতে চায় না, আকাশের দিকেই তার দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে ধরা দেয় দূরের নীলাভা। রিজিয়াও বাঁধ মানতে চায়নি কোনোদিন, কিন্তু মুক্তি চাইলেই কি আর মুক্তি পাওয়া যায়? যায় না। শেষ পর্যন্ত রিজিয়াও মুক্তি পেল না। তার উদ্দাম ডানা মিইয়ে এলো কঠিন খাঁচার পরিমিত সীমানায়।

শীতের কুয়াশা তখন ছড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যার সীমন্তে। প্রান্তরের সবুজ ঘাসে চকচকে হীরার মতো জ্বলছে শিশিরের স্ফটিক বিন্দু। বিকেলের স্তব্ধতার আড়ালে ক্রমান্বয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে দিনের অবিশ্রান্ত কোলাহল। এমনি সময়ে ঝুকতে ঝুকতে বাসায় ফিরে এলেন ফরিদ সাহেব—তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন উপরের কামরায়। অন্য দিনের তুলনায় আজ একটু বেশী ক্লান্ত মনে হলো তাঁকে, হয়তো এই বুড়ো বয়সে শীতটা তাঁকে কাহিল করেই ফেলছে। আগে থেকেই তাই তার এবিশেষ সতর্কতা। আজকাল সন্ধ্যার পর বাইরে থাকেন না, যথাসম্ভব আগেই ফিরে আসেন, তারপর খেয়েদেয়ে গা ঢাকা দেন। ব্যবসার সবকিছু আজকাল বড় ছেলেই দেখছে, তবু কাজ তদারক করবার জন্যে একবার করে তাকে অফিসে যেতে হয়। বলা তো যায় না, ব্যবসা কখন কোন দিকে মার খায়। শরীরের রক্ত পানি করে যে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন, তার সামান্যতম ক্ষতিও যে অসহ্য! স্ত্রী জরিনা বেগম মাঝে মাঝে বলেন, 'ছেলের সংসার ছেলে দেখবে, এ নিয়ে তুমি এতো ভেবে মরছো কেন?' স্ত্রীর কথায় হাসি পায় ফরিদ সাহেবের। 'তুমি কি বুঝবে ব্যবসার? এ তো আর মেয়েলোকের কাজ নয়।' কথা শেষ করে মনে মনে দুঃখিত হন ফরিদ সাহেব, হয়তো কথাটা একটু রূঢ়ই শোনাবে জরিনার কানে। হাজার হোক, মেয়েমানুষের মন।

সেই শীতের সন্ধ্যায় বেশ একটু ব্যস্ত হয়েই ঘরে ঢুকলেন ফরিদ সাহেব। কামরায় পা দিয়েই মেয়েকে ডাকলেন, 'রিজিয়া! রিজিয়া!' রিজিয়া তখন পাশের কামরায় বই সাজাচ্ছিল। ফরিদ সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই তড়িৎগতিতে চলে এলো এ পাশের কামরায়।

মেয়েকে লক্ষ্য করে ফরিদ সাহেব বললেন, 'শোন মা রিজিয়া, ও ঘর থেকে আমার জাম্পারটা নিয়ে আয়। শীতটা আজ একটু বেশী বলেই মনে হচ্ছে।' একটু থেমে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ মা, তোরাও সব গরম জামা বের করে ফেল। এ সময়ে ঠাণ্ডা লাগলে ঠিক নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। শুরুতেই যা শীত পড়েছে।'—ফরিদ সাহেবের কথা শুনে মনে মনে একটু হাসলো রিজিয়া, হয়তো ভাবলো, 'আব্বার সবটাতেই বাড়াবাড়ি, আজ আর এমন কি শীত?' কিন্তু মুখে বললো, 'আপনি হাত মুখ ধোন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।' বলে কক্ষান্তরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো রিজিয়া।

ফরিদ সাহেব বললেন, 'শোন, তোর মাকে একটু আমার ঘরে পাঠিয়ে দে। জরুরী আলাপ আছে। আমার চা-টাও না হয় এ-ঘরেই নিয়ে আসিস।'

রিজিয়া পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরে জরিনা বেগম আবির্ভূতা হলেন। ফরিদ সাহেব ততক্ষণে গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়েছেন। স্বামীকে লক্ষ্য করে জরিনা বেগম বললেন, 'আমায় ডাকছিলে নাকি?'

: 'হ্যাঁ, ডাকছিলাম বৈকি। রিজিয়া কোথায়? ওকে না জাম্পারটা আনতে বললাম?' একটু থেমে স্ত্রীর দিকে তাকালেন তারপর উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'একি!

তোমরা যে দেখছি সবাই পাতলা কাপড় পরে আছো!'

: 'তুমি কি এই শীতেই কাবু হয়ে গেলে নাকি?' জরিনা বেগমের কণ্ঠ পরিহাস-তরল। 'শীতের তো সবে মাত্র শুরু।'

এরি মধ্যে রিজিয়া ফিরে এলো, বললো—'এই নিন আব্বা, আপনার জাম্পার।'

জরিনা বেগম বললেন, 'সন্ধ্যা না হতেই জাম্পার গায়ে দিচ্ছ কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি?'

ফরিদ সাহেবও একটু ব্যস্ত হলেন, হয়তো স্ত্রীকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলেন, বললেন, 'না, না, ঠিক তা নয়, তবে কিনা আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো।'

রিজিয়া এ-সময়ে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলো, বললো, 'এই নিন আব্বা, আপনার চা।'

চায়ের মিষ্টি গন্ধে একটু উৎফুল্ল হলেন ফরিদ সাহেব, বললেন, 'দে মা, দে। গরম আছে তো?'

রিজিয়ার মন করুণা-ঘন হয়ে এলো। হয়তো বুড়ো বাপের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিও দেখা দিলো। বললো, 'হ্যাঁ আব্বা, খুব গরম। এখনও ধোঁয়া উড়ছে।'

এতটা যেন জরিনা বেগমের ভালো লাগে না; হয়তো বাড়াবাড়িই মনে হয়। একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই বললেন, 'আমায় ডাকছিলে কেন? কোন কথা আছে নাকি?'

ফরিদ সাহেব খানিকটা তৃপ্তির সুর ঢেলে বললেন, 'আগে চা-টা তো খেয়ে নিই।' জরিনা বেগম বললেন, 'কিন্তু ওদিকে যে রান্না চড়িয়ে এসেছি।'

রিজিয়াকে লক্ষ্য করে ফরিদ সাহেব বললেন, 'যা না মা রিজি, রান্নাটা কি হলো একটু দেখগে। তোর মার সঙ্গে একটু আলাপ আছে।' বিনা প্রতিবাদে রিজিয়া রান্না ঘরে যেয়ে ঢুকলো।

রিজিয়া চলে যাওয়ার পর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন ফরিদ সাহেব। গরম চায়ের আমেজ যেন তখন তার সারা শরীর জড়িয়ে এসেছে। জরিনা বেগমকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমায় কেন ডাকলাম তাই বলি। রিজিয়ার বিয়ে-শাদীর কথা ভাবছো কিছু?'

: 'আমি আর কি ভাববো! তোমরা সবাই রয়েছো, ভেবে-চিন্তে একটা কিছু করলেই তো হয়।'—জরিনা বেগম মন্তব্য করলেন।

ফরিদ সাহেব অনুযোগের সুরে বললেন, 'এটা কিন্তু রীতিমতো অন্যায়! মা হয়ে মেয়ের বিয়ের কথা না ভাবলে চলবে কেমন করে?'—একটু থেমে যোগ করলেন, 'তা' ছাড়া আমার কত কাজ! দেখে-শুনে একটা কিছু করবার তেমন ফুরসৎ কোথায়?'

: 'আমিও কি আর অবসর বসে আছি? সংসারের ঝামেলা নিয়ে যে এদিকে হাঁপিয়ে উঠলাম! তা' ছাড়া মেয়ের আমার বয়সই বা আর এমন কি হলো যে এখনই ভাবতে হবে?'—জরিনা বেগমের কণ্ঠ আরো চড়া শোনা গেল।

ফরিদ সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'বলো কি জরিনা! মেয়ের বিয়ের বয়স হয়নি বলে আগে থেকে ভাবতে হবে না, এ-কেমন কথা? আজকাল সমাজের যা অবস্থা তাতে সুপাত্র যোগাড় করা খুবই কঠিন।'

বোঝা গেল, ফরিদ সাহেবও খুব চিন্তিত হয়েছেন। তার কপালে কয়েকটা ভাবনার রেখা পড়লো। একটু থেমে বললেন, 'মেয়ে আমার আইবুড়ো হয়ে থাকবে, অথচ ভালো বর জুটবে না, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনে।'

জরিনা বেগম বললেন, 'বিয়ের বয়স হলে সুপাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া আমিও পছন্দ করি।' কথা শেষ করে কি যেন ভাবলেন জরিনা বেগম, তারপর আবার বললেন, 'বেশ তো, রিজিয়ার একটা পাত্র-টাত্র খুঁজে দেখো না।'

ফরিদ সাহেব যেন এতক্ষণে হালে পানি পেলেন। একটু বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই তো বলতে ডাকলাম জরিনা। তুমি কি ভাবছো আমি চুপ করে বসে আছি?'

: 'কোন ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে নাকি?' জরিনা বেগমের কণ্ঠ থেকে উৎকণ্ঠা ঝড়ে পড়লো।

ফরিদ সাহেব অনুভব করলেন স্ত্রীর ঔৎসুক্যে এতক্ষণে নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কিছু আগেও তার কণ্ঠ ছিল স্তিমিত, স্থিরতায় অনাবিল। মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনিও যে ভাবিত হননি তাও সত্য নয়, তবু হাঁকডাক করে তা ঘোষণা করার প্রবৃত্তি তার প্রকৃতি বিরোধী। মেয়ে যখন জন্মিয়েছে বিয়ে তার একদিন হবেই। এই সহজ দর্শনে তিনি আস্থাবান। স্ত্রীর ঔৎসুক্যের প্রতি ফরিদ সাহেবও শেষ পর্যন্ত আগ্রহ দেখালেন, একটু দ্রুত লয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, এ কথা বলতেই তো তোমাকে ডাকলাম।'

জরিনা বেগম মৃদু গলায় বললেন, 'কোথায়? ছেলে কি করে?'

ফরিদ সাহেব বললেন, 'ছেলে তোমার পছন্দ হবে জরিনা।'—বলে একটা আত্মতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর যোগ করলেন, 'আমারই এক সহপাঠীর ছেলে, কলেজে আমরা একই সঙ্গে পড়তাম। এর বাবা শেষ পর্যন্ত বি-এ'র চৌকাঠ পেরোতে পারেনি, শেষ দরজায় মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। কিন্তু নিজে পাশ করতে না পারলেও ছেলেকে সে মানুষ করে তুলেছে, হয়তো নিজের অপূর্ণ

আকাঙ্খার পরিপূর্ণতা দেখবে বলেই। পড়াশুনার অবশ্য খুবই ভাল ছিল সে, কিন্তু তবু কেন যে পাশ করতে পারেনি, তা আমি আজো ভেবে পাইনে। অনেক পরে শুনেছিলাম সে গ্রামেরই এক স্কুলে মাষ্টারী নিয়েছে, কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে দিন গুজরান করছে। কিন্তু আমি তখন গ্রামের বাঁধন ছেড়ে শহরেই নীড় বেঁধেছি, কাজেই তাঁর স্মৃতিও আমার মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছিল।' —বলে ফরিদ সাহেব থামলেন, তার চোখে যেন অতীতের একটা ছায়া পড়লো, তার মন করুণ হয়ে এলো।

জরিনা বেগম বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ছেলেটী কি করছে, সে খোঁজ নিয়েছ ?'

: 'ছেলেটী এ-বছর বি-এ পাশ করেছে। এম-এ পড়বার ইচ্ছাও তার ছিল, কিন্তু তার বাবার পক্ষে খরচ যোগানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে একটা ক্লারিকেল পোষ্ট—এ-ই সম্প্রতি ঢুকে পড়েছে। তবে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে বলে শুনলাম।'—কথা শেষ করলেন ফরিদ সাহেব, ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটু আশান্বিত হলেন।

এরপর আর বেশী কিছু জানতে চাইলেন না জরিনা বেগম। স্বামীর পছন্দেই তার পছন্দ, তদুপরি মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে তার বাপই সবচেয়ে বেশী চিন্তান্বিত, অতএব এ-বিয়েতে দ্বিমত করবার কোন হেতু খুঁজে পেলেন না জরিনা বেগম। নিজের সঙ্গে যারা সংগ্রামে আহত হতে চান, তিনি সে প্রকৃতির মেয়েই নন।

* * *

দিনক্ষণ দেখে একদিন নির্বিঘ্নে রিজিয়ার বিয়ে হয়ে গেলো মামুনের সঙ্গে। পাত্র দেখে খুশী হয়েছিলেন জরিনা বেগম, খুশী হয়েছিলেন ফরিদ সাহেব। কিন্তু রিজিয়া উৎসবমুখর বাড়ীর আনন্দ কোলাহলের মধ্যেও তার ভবিষ্যত ভেবে বারবার শংকিত হয়ে উঠেছিল। কারণ সে জানতো, কেরাণীর হেঁসেলে যেয়ে একবার যে ঢুকেছে তার আর সহজে নিস্তার নেই।

কিন্তু তবু মুখ খুলে সে প্রতিবাদ করেনি। ফরিদ সাহেবের ব্যক্তিত্বের কাছে তার সব প্রতিবাদই ব্যর্থ হয়ে এতো জানা কথা।

কিন্তু রিজিয়ার এই মৌনতার বাঁধ একদিন বন্যার জলের মতো সবেগে ভেঙ্গে-চুড়ে একাকার হয়ে গেল, কিন্তু জীবনের নদী তখন জটিলতায় বাঁক নিয়েছে।

॥ ছয় ॥

কম্পিটিটিভ পরীক্ষার সেতু শেষ পর্যন্ত পার হতে পারলো না মামুন। তবে দিন-রাত খেটে লোয়ার ডিভিশন থেকে আপার ডিভিশনে প্রমোশন পেল। লোয়ার-আপারের পার্থক্যে মন ভরে না রিজিয়ার, 'কেরাণী' কথাটাই যে তার প্রাণে কাঁটার মতো করুণ হয়ে বাজে।

স্ত্রীর মন ভরে দেবার মতো ঐশ্বর্য্যের অধিকার পায়নি মামুন, এই অতি সত্যি কথাটা সম্প্রতি সে আরো বেশী করে অনুভব করছে। কিন্তু মন যার ভরে না, তার মন কি ভরানো যায় ? নিজের মনেই প্রশ্ন করে মামুন, কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পায় না সে।

কলোনীতে যখন বিকেলের ছায়া নেমে আসে রিজিয়ার মন তখন ব্যাকুল হয়ে উঠে। কবুতরের খোঁপের মতো ছোট ছোট ফ্লাটের বারান্দায় তখন এসে ভিড় জমায় বিচিত্র-ধরণের নর-নারী, কেউ হাসিতে উল্লসিত, কেউ বা ভাবনায় করুণ। কিন্তু তবু তাদের চোখে-মুখে যেন ছড়িয়ে থাকে জীবনের আভা, বিলাসের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। কারো কারো জামা-কাপড়ে বিজ্ঞাপিত ঐশ্বর্য্যের দিকে তাকিয়ে তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আকুল হয়ে উঠে রিজিয়া, তার নামে দেয় চিন্তার কালো ছায়া।

ফ্লাটে ফ্লাটে দাম্পত্য জীবনের বিলাস, বৈচিত্র্যময় গতিধারার কলধ্বনি। একই সমতালে পা ফেলে ওরা এগিয়ে যায় জীবনের অভিষ্টের দিকে, ওদের চলমান গতিতে আসে না ছন্দপতনের গ্লানি। জীবনকে ওরা উপভোগ করছে বিচিত্র উপায়ে, আঙ্গুরের রসের মতো নিংড়ে নিচ্ছে এর প্রতিটি নিটোল মুক্তা বিন্দুকে।

সন্ধ্যায় যখন বাতি জ্বলে ওঠে ফ্লাটের ঘরে ঘরে রিজিয়া তখন এসে দাঁড়ায় খোলা বারান্দায়। আলোকোজ্জ্বল কলোনীর হৃদপিণ্ডের ধ্বনি সে অনুভব করতে চেষ্টা করে। পসারিণী রাত্রি তার বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্য নিয়ে নেমে আসে কলোনীর আকাশে, কখনো অন্ধকারে, কখনো আলোতে।

মামুন স্ত্রীর মনোবেদনা অনুভব করে শংকিত হয়। আজন্ম সুখে পালিতা স্ত্রীর বৈষয়িক প্রয়োজন সে মেটাতে না, এই চরম সত্যটি তার চেয়ে আর কে বেশী করে অনুভব করে ? মাঝে মাঝে এই তীব্র অনুভূতির রেশ তার মনের আকাশে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে, একটা অসহনীয় জ্বালা ধরিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

রিজিয়া স্বামীর মনের অতল রহস্যের খোঁজ পায় না। খুঁজে দেখার প্রবৃত্তিও যে তার নেই। আশার কোন আলোকেই যে সে বিশ্বাস করে না। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছর সে ভবিষ্যতের কল্পনায় উৎফুল্ল হয়েছিল, কিন্তু জীবনের বৈচিত্র্যহীনতায় সে আনন্দ যে আজ মরুভূমির মরীচিকার মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে।

* * *

কলেজে পড়ার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে রিজিয়ার।

কি অফুরন্ত উৎসাহ নিয়েই না তখন সে ভবিষ্যতের কথা ভাবতো—স্বপ্ন দেখতো অনাগত রঙিন ভবিষ্যতের। এ-বয়সে কে না স্বপ্ন দেখে? স্বপ্নের ঘন কাজলের রেখা ফুটে উঠতো তার চোখের কোণায়। লুকাতে গেলেও তা লুকাতে পারতো না রিজিয়া। ধরা পড়ে যেতো সহপাঠিনীদের চোখে। কখনো কখনো ইচ্ছা করেই ধরা দিতে ভালো লাগতো রিজিয়ার। তার সৌভাগ্যে অন্যেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠুক এই আকাঙ্খাও তার মনে অবচেতনায় লুকিয়ে থাকতো।

কলেজে সবচেয়ে মুখরা মেয়ে বলে পরিচিত ছিল ফরিদা। কিন্তু ফরিদাকে খুবই ভালোবাসতো রিজিয়া। কেন ভালোবাসতো সে কথা রিজিয়া কোনদিনই ভেবে দেখেনি, হতে পারে ফরিদার বেপরোয়া চালচলন আর চঞ্চল-প্রকৃতিকেই ভালোবেসেছিল রিজিয়া। অহেতুক লজ্জার আবরণ টেনে নিজেদেরকে যারা লুকিয়ে রাখতে চায় রিজিয়া তাদের দলে নয়।

সেই বেপরোয়া ফরিদাই একদিন পাকড়াও করে বসলো রিজিয়াকে। আগে থেকে বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন এসে রিজিয়াকে টেনে নিয়ে ছুটলো 'রূপালি' সিনেমার দিকে। 'রূপালিতে' তখন 'শেষ গোধূলি'র গৌরবময় পঞ্চম সপ্তাহ চলছে। রিজিয়া প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ফরিদা তাকে কিছুই বলতে দিতে নারাজ। সিনেমা দেখাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে এমন রেখে-ঢেকে কথা বলবার অর্থ কি? ফরিদার ব্যক্তিত্বের কাছে সব সময়েই পরাজয় মেনে এসেছে রিজিয়া। আজ আবার নতুন করে এই অনুভূতিটা টের পেলো রিজিয়া।

অনেক পীড়াপীড়ি করেও কিছু জানতে পারলো না রিজিয়া। অবশেষে বাধ্য হয়ে ফরিদার পিছু পিছু গিয়ে রিকসায় চেপে বসলো রিজিয়া।

অনেক কথার পর জানা গেল 'শেষ গোধূলি'র সিনেমা দেখাই তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। উৎসাহের স্রোতটা তরঙ্গায়িত হয়েছে অন্য এক কারণে। তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যের আকাঙ্খায়। ফরিদার মামাতো ভাই মাহবুবকে জানতো রিজিয়া। ফরিদার মুখে এক সময় তাঁর অনর্গল প্রশংসা শুনে ঈষৎ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল রিজিয়া, হয়তো সেটা ছিল তার মনেরই দুর্বলতা।

মাহবুব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের ছাত্র—বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ যুবক। চেহারায় সৌন্দর্যের অফুরন্ত মাধুরিমা, কথা-বার্তায় সীমিত জ্ঞানের প্রাচুর্য। ফরিদার মুখে আরো শুনেছিল সে, একালের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ গল্প লেখকদের মধ্যে মাহবুবের স্থান অসংশয়িত রূপে উচ্চে। প্রশংসা শুনেই চুপ করে থাকেনি রিজিয়া, নানা মাসিক-পত্র ঘেঁটে মাহবুবের গল্পের রসাস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে প্রতিভার ঝলক দেখে। হয়তো মনে মনে কামনা করেছে এমনি ধরণের এক প্রতিভাদীপ্ত তরুণের জীবন-সঙ্গিনী হতে।

মাহবুবকে প্রথম যেদিন দেখেছিল রিজিয়া সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমন চোখ ঝলসানো রূপৈশ্বর্য যার তাকে কি সহজে পাওয়া যায়? এর পর থেকে কেবলি একটা সন্দেহের কাঁটা যেন তাকে অবিরাম খুঁচিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলছে। তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, তবু রিজিয়ার ভাবনার শেষ ছিলনা তখন।

অসুস্থ ফরিদাকে দেখতে গিয়ে ওদের বাসায়ই আর একদিন মাহবুবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল রিজিয়া। একবার দৃষ্টির পর্দা তুলে দিতেই যেন তা প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। এমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারার দিকে কি বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়। ফরিদা নিজেই এগিয়ে এলো মাঝখানে—দু'জনকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলো ঈষৎ হাস্যরসের চুটকি মিশিয়ে। তার পরের ইতিহাস অনেক দুর গড়িয়ে গেল।

কিছুদিন পরই রিজিয়া টের পেয়েছিল ভাবনাটা শুধু তার একার নয়। তাকে নিয়ে যে অন্য কেউ ভাবতে পারে এটা যেন তার বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু ফরিদার মুখে যা শুনেছে তাতে আর বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি?

ফরিদার মুখেই শুনেছিল রিজিয়া, মাহবুব ইদানীং তার ভাবনা নিয়েই আছে। রিজিয়া ছাড়া অন্য কেউ মাহবুবের জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না এ-কথাই সে জোর করে বলে দিয়েছে। রিজিয়া ভাবতো এসব কথা ঢাহা মিথ্যা নয়তো ফরিদার মনগড়া, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বানানো। কি এমন রূপ-গুণ আছে রিজিয়ার, যার জন্যে মাহবুবের মতো যুবকের মন উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে! মাহবুবের যে প্রতিভাদীপ্ত চেহারা একদিন রিজিয়ার মনে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে গেছে, তার তুলনায় নিজেকে বড়ো হীন মনে হলো রিজিয়ার। হতে পারে, ফরিদা নেপথ্যে একটা নাটকের চাবিকাঠি ঘুরাচ্ছে—হয়তো মাহবুবের কাছে অতিরিক্ত প্রশংসা করেছে রিজিয়ার।

কিন্তু কেন। কেন ফরিদা এমন একটা ছলনায় তাকে জড়িয়ে নিচ্ছে। এমনি ধরণের নানা প্রশ্ন রিজিয়ার মনে কিলবিল করে বেড়াতো। নিজের মনকে সে বিশ্বাস করতে পারতো না তবুও। সত্যিই কি সে নিজেও শেষ পর্যন্ত মাহবুবের রূপ-সুষমায় মুগ্ধ হয়ে যায়নি? কোন

মোহ কি তার মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি!

প্রথম পরিচয়ের সেই লগ্নটি এখনো তার মনে মধুর হয়ে জেগে রয়েছে, কি একটা অনুভূতি যেন সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল তার মনকে ঘিরে। শুধু দু'একটা মামুলি কথার মধ্যে দিয়েই তো পরিচয়ের প্রথম লগ্নটি ডানা মেলেছিল সেদিন! তারপর কত বিকেল আর কত সন্ধ্যে তারাভরা রাত তারা কাটিয়েছে রমনার মাঠে আর পার্কের নির্জনতায়! প্রথম প্রথম ফরিদাকে কেন্দ্র করেই তাদের আনাগোনা চলতো, কিন্তু নিবিড়তা যেদিন অন্তরঙ্গতায় পরিণত হল সেদিন তারা আর ফরিদার মধ্যস্থতার প্রয়োজন অনুভব করেনি। দু'জনেই পরস্পরকে আপন করে নেবার সহজ একটা অনুপ্রেরণা যেন অনুভব করেছিল সেদিন। সে কথা ভাবতে রিজিয়ার নিজের কাছেই আজ কেমন যেন অবাক লাগে। কোন কোন নির্জন মুহূর্তে এসব কথা ভাবতে গিয়ে তার নিজকেই বড় অচেনা মনে হয় রিজিয়ার। আর ফরিদা? ফরিদা কি জানতো যে ঘটনার গতি এমন করেই মোড় নেবে?

সিনেমা দেখতে গিয়ে রিজিয়া যেদিন মাহবুবের সাথে পরিচিত হয়, সেদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাকে নিয়ে একটা মানুষ এমন করে স্বপ্ন রচনা করতে পারে। কিন্তু যেদিন সেই স্বপ্নের সুরভি নিয়ে সত্যিই একটা চিঠি এসে পড়লো রিজিয়ার হাতে সেদিন সে অবাক না হয়ে প'রলো না। 'ফরগেট মি নট' লেখা রঙিণ প্যাডের কাগজে কয়েক ছত্র চিঠি। কিন্তু ভাবতে গেলে মনে হয় এর মধ্যেই যেন মিশে আছে এক রাজ্যের আকুলতা। প্রত্যেকটি শব্দ এমন করে যোজনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তরঙ্গতার স্পর্শ যেন নিবিড় হয়ে আছে।

রিজিয়ার স্পষ্ট মনে আছে, বিকেলের ডাকে চিঠিটা এসে পৌঁছেছিল তার হাতে। আকাশের রঙের সাথে কেমন যেন আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল সেই রঙিণ চিঠিটার। নীল রঙের প্যাডের কয়েকটি কথার বিনুনি। চিঠিটা হাতে পেয়েই রিজিয়া দৌড়ে উঠে গিয়েছিল চিলেকোঠার ছাতে। বুকের ভেতরটা তখন কাঁপছিল ঘন ঘন—ভয়ে নয় আবেগে। ফরিদা তাকে বলেছিল, 'মাহবুব ভাই তোর কাছে চিঠি লিখবে, উত্তর দিতে দেরী করিস নে যেন।' মুখ বেঁকিয়ে রিজিয়া বলেছিল, রোজ রোজ যার সাথে দেখা হয় তার আবার চিঠি লেখার দরকার কি? কিছু বলতে হয় তোর কাছে বললেই তো পারে।' ফরিদা চুপ করে থাকেনি এক মুহূর্তও বরং মুখের উপরই জওয়াব দিয়েছিল, 'প্রাণের কথা তো কারো কাছে মুখ খুলে বলা যায় না ভাই, ওসব লিখতে হয় চিঠিতে। তা ছাড়া, মুখের কথার দামই বা কি, তার তো কেউ সাক্ষী থাকে না, বাতাসেই সব মিলিয়ে যায়। চিঠি লিখলে তা সময় সময় সাক্ষী হয়েও কাজ করে। সে কথার আর কোনো জওয়াব দেয়নি রিজিয়া। কেমন যেন আনমনা হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই এলো সেই রঙিন চিঠি। হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল রিজিয়া। ফরিদার কথা সেদিন বিশ্বাস করেনি সে মোটেই। চিঠিটা হাতে পেয়ে তাই তার অবাক হবার পালা। দু' চোখ মেলে পরম নিবিষ্টতায় সে পড়তে থাকলো সেই রঙিন চিঠি:

প্রিয়তমাসু,

শুরুতেই যে সম্বোধন করছি তার কোন অধিকার তুমি দেবে কিনা, জানি না, তবুও নিজের মনের সাথে অনেক বোঝাপড়া করে শেষ পর্যন্ত এই সম্বোধনে উদ্যোগী হলাম। চাইলেই না কি সব সময় অধিকার পাওয়া যায়? যায় না, তা নাকি আদায় করে নিতে হয়, আর ত'র পেছনে থাকা চাই আকাঙ্খার সহজ স্বাভাবিক শক্তি। এই শক্তিতে বলীয়ান বলেই, এই অনভিপ্রেত আকস্মিক সম্বোধনে সাহসী হলাম। অবজ্ঞা কিংবা অবহেলায় যদি দূরে ঠেলে দিতে চাও তবে তাতেও যে তুমি সফলকাম হবে এমন ভরসা করো না, কেননা, শুধু মাত্র কোন খেয়ালের বশেই এই পত্র মৈত্রী রচনায় অগ্রসর হইনি, যাকে নিয়ে আমার স্বপ্নের পাখী ডানা মেলেছে, তাকে নিজের মনের কথা জানাবার অবলম্বন হিসেবেই এই পত্রধারার সূচনা। এ-ধারার গতি অব্যাহত রাখার দায়িত্ব এখন কেবলি তোমার।

ইতি

প্রেমমুগ্ধ

মাহবুব

চিঠি পড়ে অবাক হয়ে গেলো রিজিয়া। সত্যি সত্যি এমন করে তো সে ভেবে দেখেনি কোনদিন। হয়তো খানিকটা মোহ ছিল তার মনের গোপনতম কোণে; কিন্তু একে সম্বল করে এগিয়ে যাবার কোনো শক্তি তো সে সঞ্চয় করতে পারেনি।

মাহবুবের চিঠি তার চোখের সামনে আর এক নতুন দুনিয়ার দ্বার খুলে দিলো। কোনো তরুণের কাছ থেকে এমন করে চিঠি পাবে, এ-কল্পনা সে করেনি কোনো দিন। নাটক-নভেলে অনেক রোমান্টিক কাহিনীই সে পড়েছিল এতো দিন, আর তাকেই সম্বল করে নিজের মনের চার পাশে গড়ে তুলেছিল একটা স্বপ্নের মোহময় জগৎ। সেই স্বপ্নের কাহিনী তার নিজের জীবনে সত্য হতে যাচ্ছে দেখে রীতিমত ভাবিত হলো

রিজিয়া। তারপর অনেক ভাবনার সিঁড়ি ভেঙ্গে, অনেক মুহূর্তের কল্পনা জড়ো করে সে-চিঠির উত্তর রচনা করলো সে। চিঠির প্রত্যেকটি ছত্রে নিজের অজ্ঞানতেই যেন সে নিজকে সমর্পণ করে বসলো মাহবুবের কাছে। চিঠি লেখার সেই বিরলতম মুহূর্তে হয়তো সে ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি, ভাবেনি কোনো ঘটনার অবিচ্ছিন্নতার কথা। সাময়িক আবেগ আর উত্তেজনাই সেদিন তাকে সবচেয়ে বেশী প্ররোচিত করেছে, তাই মাহবুবের কাছ থেকে পাওয়া প্রত্যেকটি চিঠিকেই সে তার হৃদয়ের সাক্ষী মনে করে এমন ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল তার আকুলতার কাছে।

প্রথম প্রথম মাহবুবের চিঠি সে ফরিদাকে না দেখিয়ে থাকতে পারতো না। ফরিদাও যে তাতে কি অদ্ভুত আনন্দ পেতো সে কথা ভেবে রিজিয়া মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। তার সৌভাগ্যে ফরিদার রীতিমত বিস্মিত হবার কথা; কিন্তু ফরিদার চোখে-মুখে সে কোনোদিনই এমন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেনি। মাহবুবের মতো এমন চমৎকার তরুণ যুবক রিজিয়াকে চিঠি লিখে নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করছে ভেবে সে নিজেই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যায়।

এমনি করে দু'জনার স্বপ্নের দিনগুলো ডানা মেলে চলতে থাকে। মাহবুবকে ছাড়া তখন রিজিয়ার আর অন্য কোন স্বপ্ন নেই। মাহবুবও একমুহূর্ত রিজিয়ার কথা ভুলতে পারে না। তার সমগ্র সত্তা জুড়ে যেন রিজিয়া তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে দিয়েছে। চেষ্টা করেও মাহবুব বেরিয়ে আসতে পারে না সেই সুবিস্তৃত গণ্ডী থেকে।

ফরিদার কাছে আর আগের মতো তেমন করে মুখ খোলে না রিজিয়া। মাহবুবের প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন চেপে যেতে চায় নীরবে। রিজিয়ার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যায় ফরিদা। কোন কোন সময় খোঁচা দিতেও কসুর করে না যেন। মাহবুবের প্রসঙ্গ তুলে নানা ধরণের কথার জাল বুনে যায় ফরিদা; কিন্তু শত চেষ্টা করেও রিজিয়ার মনের আসল তথ্যটি বের করে আনতে পারেনা সে, তল পায়না সেই অতল রহস্যের।

তেমনি সময়ে এক বিকেলে ফরিদা এসে হাজির হলো রিজিয়াদের বাসায়। মাহবুবকে কেন্দ্র করে রিজিয়ার ভালবাসা যখন গভীর হয়ে জমে উঠেছে তখন থেকেই ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেই অকৃত্রিম রূপে যেন ফাটল ধরেছে, ওরা আর আগের মতো তেমন করে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে নেয় না। সেই থেকে ফরিদাও আর রিজিয়াদের বাসায় ঘন ঘন পদার্পন করেনা, রিজিয়াও যেন তাকে এড়িয়েই চলতে চায়। তাই অনেকদিন পর ফরিদা যখন ওদের বাড়ী এলো, রিজিয়া তখন রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলো না; কিন্তু তবুও মুখে হাসির আভা ফুটিয়ে ফরিদাকে এগিয়ে নিয়ে এলো তার নিজের কামরায় ফরিদাও আগের মতোই হেসে হেসে কথা বললো রিজিয়ার সাথে। এমনি করে দু'জনের কথার সুতো বিনিয়ে বিনিয়ে ওরা মালা গাঁথতে লাগলো। এক সময়ে মাহবুবের প্রসঙ্গ তুললো ফরিদা। রিজিয়া কিন্তু এতে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলো না, বরং কায়দা করে কথাটা চেপে যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে সজাগ হয়ে উঠলো। কিন্তু ফরিদা ছাড়বার পাত্রী নয়, খুচিয়ে খুচিয়ে মাহবুবকে কেন্দ্র করেই সে কথার মালা গেঁথে চললো।

ফরিদা বললো "মাহবুব ভাইদের বাড়ী গিয়েছিলাম কাল বিকেলে, তিনি তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।"

রিজিয়া যেন মাহবুবকে ঠিক চিনতেই পারলো না, এমনি ধরনের ভাব করে বললো, "কোন্ মাহবুব ভাই ?"

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল ফরিদা, তবুও অবাক হবার মতো মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তার। শুধু বললো, "কেন, মাহবুব ভাইকে মনে নেই ? সেই যে গল্প লেখক..."

অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়লে মানুষ যেমন প্রসন্ন হয়ে উঠে, মুখে ঠিক তেমনি হাসির রেখা টেনে রিজিয়া বললো, "ও, তোর মামাতো ভাই-য়ের কথা বলছিস। যার গল্প তুই আমাকে পড়তে দিয়েছিলি ?"

ফরিদা এবার জওয়াব না দিয়ে থাকতে পারলো না, একটু ব্যঙ্গ করে বললো, "আমি ঠিক পড়তে দিইনি, তুইই বরং পড়তে চেয়েছিলি।"

রিজিয়া বললো, "কিন্তু আমি তো আর তাকে চিন-তাম না। তুইই তো সিনেমা হলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলি।"

'সে-কথা অবশ্য ঠিক, পরিচয় আমিই করিয়ে দিয়েছি-লাম, আর তাতেই হয়তো আমার ভুল হয়েছিল'—ফরিদা একটু দম নিয়ে আবার বললো, "কিন্তু তাকে চিঠি লেখার পরামর্শটা আমি দিইনি।"

ফরিদার কথা শুনে সন্দেহের একটা কালো ছায়া যেন ভেসে উঠলো রিজিয়ার মনে। ফরিদা এমন সুরে কথা বলতে পারে, রিজিয়া যে কল্পনাও করেনি। সে ভেবেছিল, ফরিদা হয়তো মাহবুবের সাথে তার মিলনের পথ-টাকে নিষ্কণ্টক করে তুলবে; কিন্তু কথা শুনে রিজিয়ার সে ধারণা বদলে গেল এক মুহূর্তে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলো রিজিয়া, "কেন, চিঠি কি আমি লিখেছিলাম ? তোর ভাইকে একবার জিজ্ঞেস করেই দেখ না। পরিচয়

না হয় হয়েই ছিল, তাই বলে গায়ে পড়ে চিঠি লিখতে এলো কেন ?”

ফরিদা বললো, “তোর কথাই মানলাম, স্বীকার করে নিলাম মাহবুব ভাই-ই তোকে প্রথম চিঠি লিখেছিল ; কিন্তু তুই জওয়াব না দিয়ে চেপে গেলেও তো পারতে।”

রিজিয়া অবাক হয়ে বললো, “সেরে ! এক ভদ্রলোক চিঠি লিখতে পারলেন আর আমি তার জওয়াবটাও দিতে পারবো না ? ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে ?”

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে এসে ঢুকলেন রিজিয়ার ভাবী সুফিয়া বেগম। ভাবীকে ঘরে ঢুকতে দেখেই চুপ করে গেলো রিজিয়া। ঘরে ঢুকতেই সুফিয়া বেগমের নজর গেল ফরিদার ওপর। এই অসময়ে তাকে এখানে দেখতে পেয়ে একটু অবাকই হলেন তিনি। বললেন, “আরে ! ফরিদা যে, কখন এলে শুনি ?” একটু থামলেন সুফিয়া বেগম, তারপর আবার বললেন, “রিজিয়ার কাছে প্রায়ই তোমার কথা বলি, আগে তো প্রায়ই আসতে, আজকাল তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না একেবারে, ব্যাপারটা কি বল তো ?”

ফরিদা বললো, “রিজিয়াকেই জিজ্ঞেস করেন না ভাবী, ওর কাছেই সব কথা জানতে পারবেন।” সুফিয়া বেগম বললেন, “তার কাছে জিজ্ঞেস করেও যে তোমার কথা জানা যায়না, ব্যাপার কি বলতো ? তোমরা আবার ঝগড়া-ঝাটি করনি তো ?”

ফরিদা বললো, “না, না, ঝগড়া করতে যাবো কেন, এমনিতেই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসবার সময় করে উঠতে পারিনি।”

সুফিয়া বেগম বললেন, “কিন্তু তাই বলে তোমাদের দু’জনের বন্ধুত্বে চিড় ধরবে, এমন তো কোনো কথা হতে পারেনা, আগে না হয় ঘন ঘন আসতে, কিন্তু এখন যে একেবারে দেখাই পাওয়া যায় না ! আশ্চর্য।”

এমনি করে তাদের কথা এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে পাখা মেলে। রিজিয়া মুখ খোলে সব কথার জওয়াব দিতে চায়না। ফরিদাকে তার কেবলই ভয়, যদি ভাবীর কাছে সব কিছু সে খুলে বলে দেয়, তা হলে ? তা হলে তো সর্বনাশ ! ভাবী তো সব কথা চেপে রাখবেন না, না না প্রসঙ্গের ফোকল বেয়ে তা একদিন না একদিন তা সবার কানে ছড়িয়ে পড়বেই। তখন মুখ দেখবার জায়গা থাকবে না রিজিয়ার। আম্মা জরিনা বেগমকে না হয় নানা কথা বলে বুঝিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু রিজিয়ার আব্বাকে বুঝাবে কে ? তিনি যদি শেষ পর্যন্ত রিজিয়াকে সন্দেহ করে বসেন তা হলে তো তার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

ফরিদার ভাবগতিক দেখে রিজিয়ার আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, আসল কথাটুকু বলার জন্যেই সে এত কথার মালা গেঁথেছে। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সে নানা অজুহাতে এ-কামরা সে-কামরা ঘুরে এলো। এক সময় দূর থেকে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো ফরিদা সুফিয়া বেগমকে কি বলে। একা পেলে সে হয়তো তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারবে, তাতে হয়তো সুফিয়া বেগমের কাছে কথাটা খুব বেশী আশ্চর্য বলে মনে হবেনা, হাজার হোক অল্প বয়েসী মেয়ে মানুষ, তার বয়স রিজিয়ার চেয়ে আর কত বছরই বা বেশী হবে ! বিয়ে হয়ে গেলে এতদিনে তো রিজিয়াও দু’এক সন্তানের মা হতে পারতো। তা ছাড়া ভাবীকে আগে থেকে বুঝিয়ে রাখতে পারলে প্রয়োজনে তার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে অনেক সাহায্যও তো পাওয়া যেতে পারে। সংসারে অসম্ভব বলে তো কোন কথা নেই। মাহবুবের চোখ ঝলসানো রূপ আর চেহারা দেখলে সুফিয়া বেগমও কি পছন্দ না করে পারবেন ?

ভাবনার নানা তরঙ্গে যখন রিজিয়ার মন দুলছে তখনই আবার কথা বললেন সুফিয়া বেগম। তার কথায় রিজিয়া যেন চমকে উঠলো হঠাৎ। সুফিয়া বেগম বললেন, “তোমার কথা ছেড়েই দিলাম ফরিদা, বরং আমাদের রিজিয়াও যে দেখছি দিন দিন ঘরকুনো হয়ে উঠছে। তাকেও তো আর আগের মতো তেমন হাসিখুসী দেখছিনা। এতদিন তো সে বিকেলে বাইরে না বেরিয়ে এক মিনিট ও ঘরে বসে থাকতে পারতো না; কিন্তু ক’দিন থেকে যে তেমন কোন উৎসাহই দেখতে পাইনে। সকাল-সন্ধ্যা ঘরে বসে বসে কি যেন লেখে আর ছেঁড়ে।”

ফরিদা হয়তো এমনি ধরণের একটা কথার অবলম্বনের অপেক্ষায় কান পেতেছিল। সুফিয়া বেগমের কথা শেষ না হতেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললো, “তা হলে ব্যাপারটা আপনিও লক্ষ্য করেছেন ভাবী ! এতক্ষণ শুধু আমি এই-ই ভাবছিলাম যে, ভাবীর চোখ কেমন করে এড়িয়ে চলছে রিজিয়া ! এখন দেখছি আমার ধারণাই ভুল।”

সুফিয়া বেগমের মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। সে রেখাটা তার সুন্দর সুডৌল মুখে আশ্চর্য রকম চিক চিক করে উঠলো। রিজিয়া সহজেই বুঝতে পারলো ভাবী একটা কিছু বলার জন্যেই তার মন ও মুখকে প্রস্তুত করে তুলছেন। মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কের ভাণ করলো রিজিয়া। সুফিয়া বেগম বললেন, “কালের হিসেবে আমরা একটু প্রবীণা; কিন্তু তাই বলে তোমাদের মতো অতি আধুনিকাদের মনোভাবটা ধরবার মতো বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি বলেই ধরে নিতে পারো। তোমা-

দের বয়সে কোন কোন সময় এমন আনমনা তো আমরাও হয়ে যেতাম ভাই, তখন শত চেষ্টা করেও আমাদের ভাবী-দের চোখে আমরা ধুলা দিতে পারিনি। তাই তোমরাও যে পারবে এমন ভরসা আমি অন্ততঃ রাখি না।"

কথা শুনে রিজিয়ার মনে একটা সন্দেহের ছায়া দোলা দিয়ে গেল। 'তা হলে সুফিয়া বেগম কি আসল ব্যাপার টের পেয়ে গেছেন—রিজিয়ার মনে এমনি ধরণের একটা আশঙ্কা জেগে উঠলো। মুখে সে কিছু বলবার মতো খুঁজে পেলোনা।

ফরিদা বললো, "ভাবী সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন কোনো ধারণা নেই। আমি শুধু ভাবছিলাম, রিজিয়া কি শেষ পর্যন্ত ভাবীকেও ফাঁকি দিতে পারলো।"

সুফিয়া বেগম বললেন, "সে চেষ্টা যে রিজিয়া কিছু কম করেছে তাও মনে করো না ভাই। তবে ভাবীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ নয় বলেই, তার সে চেষ্টা সার্থক হয়নি।" সুফিয়া বেগমের কথা শুনে রিজিয়া স্পষ্টতঃই বুঝতে পারলো যে তার গোপন প্রেমের কাহিনী আর ভাবীর কাছে অজানা নেই। তাই সে উঠে যেতে চাইলো আচমকা; কিন্তু ফরিদার মুখভঙ্গী আর চোখের ইশারা তাকে আটকে দিল তখনি।

(ক্রমশঃ)

ইণ্ডিয়ানায় শীত

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

পত্রহীন শুষ্ক উইলো সারির মধ্য দিয়ে
শীতের হাওয়া নেমে এলো এ-দেশের পথে ঘাটে···
বিবাগী নাইটিঙ্গেল কোন্ বনে হ'ল দেশান্তরী।

শীত পবনের রথে চড়ে নেমে আসছে হিমানী কন্যা
সে এখন ঘুরে বেড়াবে উইলো গাছের ছায়ায়
ওক সারির পথে
যদি দেখা মেলে বসন্ত সাথীর....।

চিরন্তনী আবেদনে
ভরে উঠেছে মানবীর মন
এই শীত পবনের শেষে
আবার নামুক বসন্তের গান
ফিরে আসুক নাইটিঙ্গেল।

তুহিন শীতের কান্না থামবে একদিন
গলে যাবে হিম কণা
সূর্য্য উঠবে পূর্বদিগন্ত আলো করে।

জানালায় তাকিয়ে দেখছি
জনশূন্য পথে
বরফ ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলেছে একটি ছোট মেয়ে
নীরব উইলো সারির সাথে তার আলাপ জমেছে
আসবে—আসবে—
বসন্ত আসবে
চেরী ফুল ফুটবে
পালিয়ে যাবে শীত।

তোমাদের দেশেও আসবে বসন্ত....
মানবতার এই বিশ্ব-বসন্ত
গড়বে ইতিহাস॥

* পূর্ব পাকিস্তানের জনৈক তরুণ কবিকে উদ্দেশ করে লেখা।

ইসলাম-দর্শন

অধ্যাপক আলগীর জলীল এম-এ, ডিপ-ইন-এড্

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসের সংযোজন অনস্বীকার্য্য। যে সব ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে বা হচ্ছে তাতে সাময়িক পত্রের স্থান এক প্রকার নেই বল্লেই চলে। প্রধানতঃ উপযুক্ত মাল-মশলার অভাবেই এই ইতিহাস নিতান্ত ত্রুটি-পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। ইদানিং সংবাদ পত্র-মারফত অনেক তথ্যের পরিবেশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের অভিজ্ঞ, যোগ্যতর তরুণ গবেষকদের যতই এদিকে দৃষ্টি পড়বে, ততই আমাদের ভবিষ্যত উজ্জল হবে বলে আমাদের ধারনা।

সম্প্রতি 'ইস্লাম দর্শন' বলে এক সেট ১ম বর্ষের বাঁধান পত্রিকা হস্তগত হওয়ায় এই প্রবন্ধের অবতারনা। এক বছরের পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই আমরা যথাসাধ্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

'ইস্লাম-দর্শন'—জনাব মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবু-বকর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত "আঞ্জমান-ওয়ায়েজীনে-বাঙ্গালা"র মুখপত্র একটি জাতীয় মাসিক। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ (শাবান ১৩৩৮) থেকে ১ম বর্ষ সুরু। সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও নূর আহ্মদ। ম্যানেজার-আবদুল ওদুদ। সাহেবজাদা মহম্মদ সুলতান আলম এটর্নী-য়্যাট-ল কর্তৃক প্রকাশিত। 'আঞ্জমন আফিস'ই যদি পত্রিকা-অফিস বলে অনুমিত হয় তো ঠিকানা—১৩নং চাঁদনীচক ফাষ্ট লেন, কলিকাতা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য: সভ্যগণের জন্য ২৲ ও সাধারণের জন্য—২॥৹; প্রতিসংখ্যা হাতে নিলে।৹, ডাক-যোগে।৵৹ আনা নির্ধারিত ছিল। প্রথম বর্ষে ১২ সংখ্যায় মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৭৬। পত্রিকায় আঞ্জমন সংবাদ, চয়নিকা, শরিয়ত সঙ্কলন, সাময়িক সাহিত্য, মসলাতলব, পুস্তক-পরিচয়, সাহিত্য সন্দেশ—এই কয়টি বিভাগ নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত মাসে মাসে। ২ পৃষ্ঠায় 'অবতরণিকা'য় সম্পাদকদ্বয় পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রায় তিনটি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন।

"..'ইসলাম প্রচারক', 'নবনূর' প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ক জাতীয় মাসিক পত্রিকা গুলির অকাল তিরোধানে বঙ্গীয় মোসলিম সমাজ অবসাদ ও জড়তার যে ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—তাঁহাদের জীবন-বীনার উদ্দীপ্ত সুর যেরূপ চিরনীরবতায় স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, দুঃখের বিষয় এ-পর্য্যন্ত সেই অন্ধকার ও নীরবতা অপসৃত হইয়া সূর্য্যাস্তের পর স্বাভাবিক অরুনোদয়ের মত জীবন-প্রভাতের আর কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং সমাজের সেই তমসা ও অবসাদ ঘুচাইয়া মোসলমানের জাতীয় জীবন ধর্ম্মভাব মণ্ডিত নির্ম্মল সাহিত্য রসে অভিষিক্ত এবং তাঁহাদের অন্তর বাহির জাতীয়তার স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল অরুণালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই আমরা ইস্লাম-দর্শন প্রচারে ব্রতী হইতেছি।....."

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও জাতীয়তার সৎ আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও একদেশ দর্শিতার উর্দ্ধে উদার ও উন্নত বিশ্বধর্ম্ম ইসলামের মুখপত্র রূপেই এই পত্রিকার আবির্ভাব। ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ ইসলামকে জগতের চক্ষে হেয় ও হীন করবার জন্য যে সকল পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশ ও সাময়িক পত্রাদি প্রচার করা অথবা ইসলামের দুর্ণাম ও কলঙ্ক রটনা ক'রে নিজেদেক সর্বেসর্বা ভাবতে চায়, তার প্রতিবাদ ও প্রতিকার নিমিত্তও 'ইস্লাম-দর্শনে'র প্রকাশ অপরিহার্য্য।

"...বিশেষতঃ হিন্দু সাহিত্য সারথিগণ ইস্লামের যে আদর্শ ও মোসলমান জাতির যে চিত্র বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে আঁকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু মোসলমানের মিলন ও প্রকৃত পরিচয়ের পথে সহস্র যোজনের ব্যবধান রচিত হইয়া রহিয়াছে। নিরপেক্ষ ও সুনিপুন আলোচনার দ্বারা উপরোক্ত মহা অনর্থের নিদান নির্ণয় ও মূল উৎপাটন করাও ইস্লাম-দর্শন প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।..."

'সূক্ষ সমলোচনা-সম্মার্জ্জনী প্রহারে সাহিত্যের স্তূপীকৃত আবর্জনা রাশি অপসারন পূর্ব্বক' মোসলমানের বিশুদ্ধ জাতীয় আদর্শদ্যোতক সৎ-সাহিত্য সৃষ্টিও ইস্লাম-দর্শকের অন্যতম ব্রত। পরিশেষে—

"উপরোক্ত মহান উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের জন্য আমরা আবার সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহতালার সাহায্য ও কৃপা প্রার্থনা করিতেছি এবং বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কল্যাণ ও আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। অনন্তর আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা এবং কার্য্যে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য আমরা দেশের আলেম, ফাজেল, সাহিত্যিক ও সহৃদয় দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।"

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্যাত্মক বিষয় বিন্যাস দেখতে পাই সারা বছরের প্রতিটি সংখ্যায়। যেহেতু আঞ্জমনের মুখপত্র—আঞ্জমনের মাসিক সংবাদ পরিবেশন ব্যতীত

'ইসলাম দর্শন' মুসলমানের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবির মত সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। হিন্দু-মুসলিমের সংহতিতে বিশ্বাসপরবশ হয়েও 'ইসলাম দর্শন' মুসলমানের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, শিক্ষা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এবার আমরা পুরো ১৩২৭ বঙ্গাব্দের এক বছরের 'ইসলাম-দর্শনের' বর্ষ সূচী পরীক্ষা করলেই আমাদের উক্তির সত্যতা কতদুর বুঝতে পারব।

বর্ষ সূচী—প্রথম বর্ষ—১৩২৭ সন

(বর্ণানুক্রমিক)

	বিষয়	লেখক	মন্তব্য
১।	অবতরণিকা	মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	সম্পাদকীয়
২।	অন্তিম খেদ (কবিতা)	„ মীর আবদুল গনি ফরিদপুরী	
৩।	অন্বেষণ „	„ শেখ হাবিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন	
৪।	অবসান „	„ জসীম-উদ্দিন-আহমদ, বি, এ	
৫।	অবৈধ অনুকরণ	মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবুবকর	
৬।	অক্ষর ও কাগজ (কবিতা)	এম, ইদ্রিস	
৭।	অমৃতে গরল „	আফতাব আমিরাবাদী	
৮।	অভ্যুদয় „	মোঃ আবদুল হামিদ, কাব্যবিনোদ	
৯।	আবেদন „	শমসের আলি খাঁ	
১০।	আমাদের কথা (চয়ন)	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, বি-এল	আঙ্গুর, বৈশাখ, ১৩২৭
১১।	আদর্শ উপন্যাস (সমালোচনা)	মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহ্মদ	
১২।	আঞ্জমন সংবাদ	আঞ্জমন সেক্রেটারী	৮ সংখ্যায়
১৩।	আরব জাতির জ্ঞানচর্চ্চা	শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম-এ, বিটি	
১৪।	আল হাসান	এ, লোহানী	
১৫।	আল্লাহতালার স্বরূপ	মৌলবী মোহাম্মদ রুহোল আমিন	
১৬।	আজান (কবিতা)	মোহাম্মদ আব্দুস সালাম শাহজাদপুরী	
১৭।	আবির্ভাব „	আবদুল হামিদ, কাব্যবিনোদ	
১৮।	আফগানিস্তানের বিবরণ	মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ	
১৯।	আত্মসমস্যা	মৌলবী মোহাম্মদ রুহোল আমিন	
২০।	ইস্লামের নীতি ও শিল্প	„ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	৩ সংখ্যায়
২১।	ইস্লাম (কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মজুমদার	
২২।	ইস্লামের উত্থান ও পতন	মৌঃ সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী	২ সংখ্যায়
২৩।	ইস্লাম দর্শন (কবিতা)	মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, কাব্যবিনোদ	
২৪।	ইস্লাম ও যীশু	„ মোজাফ্ফার উদ্দিন	
২৫।	ইস্লাম-প্রচার (চয়ন)	গোলাম মোস্তফা বি-এ	'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,' শ্রাবন, ১৩২৭
২৬।	ইস্লামে আল্লাহর স্বরূপ	মৌঃ খোন্দকার আবদুস হালিম	২ সংখ্যায়
২৭।	ইস্লাম-হিন্দু (কবিতা)	শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী	
২৮।	ইস্লাম গ্রহণ	একটি হিন্দু যুবক ও রজনী কাপালী নামক একজন বিধর্ম্মী	
২৯।	ইস্লাম প্রতিভা	মৌঃ আলতাফ হোসেন বি-এ,	
৩০।	ইনসাফ (কবিতা-চয়ন)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৭ সন
৩১।	ঈদ আবাহন	মৌলবী মীর আবদুল গনি ফরিদপুরী	
৩২।	এলমে তাসাউফ	„ মোহাম্মদ রুহোল আমিন	
৩৩।	এমাম-চরিত	„ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	৩ সংখ্যায়

	বিষয়	লেখক	মন্তব্য
১১২।	সুন্নত ও বেদয়াত	মৌঃ আবদুল ওদুদ বি-এ,	
১১৩।	সাময়িক সাহিত্য	মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	৩ সংখ্যায়
১১৪।	সাহিত্য সন্দেশ	সম্পাদক	
১১৫।	সমাজের কথা	মৌলবী হাবিবর রহমান ফরিদপুরী	
১১৬।	সুখের ছলনা	মৌঃ অজিহউদ্দিন আহমদ রংপুরী	
১১৭।	সংসার রহস্য	মৌঃ মীর আবদুল গনি ফরিদপুরী	'রুমী' থেকে অনুবাদ'
১১৮।	সৌন্দর্য্য-প্রসঙ্গ (চয়ন)	'হিন্দুস্থান'	
১১৯।	সন্ধ্যায় (কবিত	এ, লোহানী	
১২০।	সং (কবিতা)	মমিনউদ্দিন আহমদ	
১২১।	হাম্‌দ-নায়াত	মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	
১২২।	হজরত মোজাদ্দাদ আলফ-সানী	মৌঃ মোঃ আবদুর রব	২য় বংখ্যায়
১২৩।	হারাম ও কোফর	মৌলবী আবদুল ওদুদ বি-এ,	
১২৪।	হজরত মোহাম্মদ (কবিতা)	মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, কাব্যবিনোদ	
১২৫।	হজরত এবরাহিম	মমিনউদ্দিন আহমদ	
১২৬।	হিন্দুধর্ম্মে গো হত্যার বিধান, ও গো রক্ষিনী সভা (চয়ন)	পণ্ডিত শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	'বাঙ্গালী,' ৬ই আশ্বিন, ১৩২৭ সন।

'ইসলাম-দর্শন' ১ম বর্ষে নিম্নলিখিত মুসলমানী পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, সাহিত্যের সংবাদ পাওয়া যায়।

'ইসলামিক রিভিউ'—খাজা, কামালুদ্দিন বি-এ, এল-এল-বি সম্পাদিত ইস্‌লাম ধর্মবিষয়ক জগদ্বিখ্যাত মাসিক পত্র। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পর্য্যন্ত সম্পাদকের হস্তগত হয়েছে।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'—"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" হ'তে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র।

'বঙ্গনূর'—সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শেখ হবিবর রহমান। গত ছ'মাস ধরে নিয়মিত বের হচ্ছে।

'নূর'—সিরাজগঞ্জের কবি ইস্‌মাইল হোসেন সম্পাদিত একখানা নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। শরীয়তের প্রতি একটা তীব্র বিদ্রোহের ভাব সম্পাদনার মধ্যে পরিলক্ষিত। তবু মুসলমান জাতির জাতীয় জীবনের একটা জ্বালাময়ী তৃষা, সমাজের দুঃখদৈন্য দূরীভূত করবার একটা অদম্য পিপাসার অনুভূতি পত্রিকাটির স্থানে স্থানে বেশ পরিস্ফুট।

'ভাস্কর'—মফঃস্বল হ'তে প্রকাশিত মাসিকপত্রের ৯ম সংখ্যা। মৌলবী নূরল হোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত।

'আঙুর'—শিশু মাসিক—সচিত্র ও সুশোভন! সম্পাদক, মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, বি-এল সাহেব। মখদুমী লাইব্রেরী হ'তে মোহাম্মদ মোবারক আলী সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার ডবল ফুলস্কেপ ৮ পেজী ৪ ফর্মা। মূল্য—সডাক ২৷০ আনা।

'মোসলেম ভারত'—বৈশাখ সংখ্যা, ১৩২৭ সন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদক—কবিবর মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর)। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু লেখক লেখিকার সংখ্যাই অধিক। হিন্দুগন্ধী!

'সাধনা'—বৈশাখ, ১৩২৭। চট্টগ্রাম—আন্দরকিল্লা হ'তে প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যসাগর ও শ্রীযুক্ত আবদুর রসিদ সিদ্দিকী সাহেবান। ভাষা ও ধরন মন্দ নয়—তবে একটু হিন্দুগন্ধী!

'আহলে-হাদিস'—বৈশাখ, ১৩২৭। মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের ধর্মবিষয়ক মাসিক মুখপত্র।

'শিক্ষক'—শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক খান সাহেব কাজী ইম্‌দাদুল হক্‌ বি-এ, বি-টি সাহেব।

'নবযুগ'—অনারেবল মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক এম-এ, বি-এল পরিচালিত একটি দৈনিক রাজনৈতিক পত্রিকা।

'সাহিত্য সন্দেশে' পাই—

'ইস্‌লাম-দর্শন' সম্পাদক মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব প্রণীত "প্রতিদান" নামক আট আনা সংস্করণের প্রথম উপন্যাস বের হ'ল।

মৌলবী এ, লোহানী প্রণীত "শপথ" নামক উপন্যাস এই সপ্তাহে প্রকাশিত হ'য়েছে।

মৌলবী ফজলুর রহিম চৌধুরী এম-এ প্রণীত "সোহ্‌রাব-রোস্তাম" নামক কাব্যখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব প্রণীত 'পল্লী সংসার' [বৈশাখ সংখ্যা থেকে] 'মিলন ও 'প্রতিদান' নামক

উপন্যাস সমালোচনার জন্য আদর্শ উপন্যাস বলে খ্যাতি পেয়েছে।

'বাঁশরী'—শেখ হবিবর রহমান প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদ মোবারক আলি, মখ্‌দুমী লাইব্রেরী; ৫।এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা। বৃহৎ গীতি কবিতার সংগ্রহ।

'নিয়ামত'—সুকবি শেখ হবিবর রহমান প্রণীত গল্পের পুস্তক। প্রকাশক মখ্‌দুমী লাইব্রেরী; মূল্য ১৲ টাকা। সর্বশুদ্ধ বারটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে এতে।

'সোহরাব-রুস্তম'—খণ্ডকাব্য বের হ'য়েছে। প্রকাশক মখ্‌দুমী লাইব্রেরী; ৫।এ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা—মূল্য বারো আনা।

এংলো এরেবিক ওয়ার্ড বুক—মৌলবী ফজলুর রহমান চৌধুরী এম-এ প্রণীত। প্রকাশক মখ্‌দুমী লাইব্রেরী; মূল্য ॥০ আনা।

বর্ষসূচী দেখে মনে হয় বোধহয় গল্প, উপন্যাস 'ইস্‌লাম-দর্শন' বড় সুনজরে দেখত না। মাত্র ২।১টি গল্প-উপন্যাস বারো সংখ্যা মিলে স্থান পেয়েছে। কবিতা বিশেষতঃ প্রবন্ধই পত্রিকার মূল উপজীব্যস্বরূপ। প্রবন্ধগুলো সুনির্বাচিত এবং সুরচিত। বিষয় বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে 'ইস্‌লাম দর্শন' তার নামমাহাত্ম্য ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে বলা চলে।

'ইস্‌লাম-দর্শন'—মনে হয় আগে একবার প্রকাশিত হ'তে হ'তে হঠাৎ বিলুপ্ত হয়। তারপর নবকলেবরে নব সৌষ্ঠব নিয়ে 'ইস্‌লাম-দর্শন' ইস্‌লামের উদ্গাতারূপে আত্মপ্রকাশ করে বেশ দর্পেরই সঙ্গে!

যেহেতু 'আঞ্জমন-ওয়ায়েজীনে-বাঙ্গালার' মুখপত্র, সে জন্য 'ইস্‌লাম-দর্শন' প্রায় প্রতিটি মাসেই 'আঞ্জমনের সংবাদ' সাহায্যে নিজ কলেবর পরিশোভিত করত। পত্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে 'আঞ্জমনের' অনেক সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া যায়। আঞ্জমনের উদ্দেশ্য, কার্য্য-প্রণালী, গঠন-বৈচিত্র্য, প্রচার, প্রসার, সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রভৃতি বিষয়সমূহের অতি উজ্জ্বল ও কৌতুহলোদ্দীপক খবরাখবর সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ মুসলিম বাঙলার নবাব, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, রাজ-রাজড়াদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা তথা পৃষ্ঠ-পোষকতা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হয়েছে এই আঞ্জমন মারফত...'আঞ্জমন-সংবাদ' থেকে উদ্ধৃতি দ্বারাই আমাদের কথার যথার্থ নির্ণীত হবে আশা করি:

..."আঞ্জমনের নিয়মিত মাসিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ বর্তমান সময়ে প্রায় ৫০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আঞ্জমনের প্রচারকগণ এখন নোয়াখালি, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, যশোহর ও বরিশাল জেলায় প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তবে বর্ষার জন্য স্থানে স্থানে কার্য্য তেমন সুবিধা মত সম্পন্ন হইতেছে না।

...আঞ্জমন লাইব্রেরীতে নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ করা হইতেছে। উপযুক্ত সংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত হইলেই পাঠাগার খোলা হইবে।

আঞ্জমন হইতে সাঁওতাল পরগণা ও আসামে প্রচারক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

এই মাসে আঞ্জমনের প্রচারক ও অনারারী প্রচারকগণ ১৫ জন বিধর্মীকে পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছেন।

[আষাঢ়, ১৩২১]

..."আঞ্জমনের বেতনভুক্ত প্রচারকগণের মধ্যে মৌলবী হবিবর রহমান ফরিদপুরী সাহেব কুমিল্লা হইতে প্রচার কার্য শেষ করিয়া ঢাকা জেলার সদরে উপনীত হইয়াছেন। তিনি কোরবানীর সময়ে সেই স্থানেই অবস্থান করিবেন।

মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব যশোহরে, মৌলবী ফজলর রহমান সাহেব নদীয়ায় এবং মৌলবী অলি আহমদ সাহেব শ্রীহট্টে প্রচার কার্য্যে ব্রতী আছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত মাসে আঞ্জমন কর্তৃক যে ১৫ জন বিধর্মী ইসলামের পুণ্যালোক লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে আঞ্জমনের খ্যাতনামা অনারারী প্রচারক মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব একাই ১১ জন খ্রীষ্টানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

এই মাসে আঞ্জমনের সুপ্রসিদ্ধ অনারারী প্রচারক মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব একটি হিন্দু মহিলাকে এবং মুনশী জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ৩টি খ্রীষ্টান যুবককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আঞ্জমনের চেষ্টায় এ-মাসে মোট ৭ জন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আঞ্জমনের চেষ্টায় জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত পাঁচনূর গ্রামে মৌলবী মোহাম্মদ ফয়জুদ্দীন সাহেব কর্তৃক একটি জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। [শ্রাবণ—১৩২১]

"আঞ্জমনের ১৯১৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসরের মেম্বরগণ বর্তমান বর্ষের ১৲ টাকা চাঁদা এবং ৵০ আনার ডাক টিকেট পাঠাইয়া দিলেই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইবেন। মেম্বরগণের মধ্যে যাঁহারা "ইসলাম দর্শনের" গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা বিনা ডাক মাশুলেই রিপোর্ট পাইবেন।

...আঞ্জমনের প্রচারকগণের মধ্যে মৌলবী ফজলর রহমান সাহেব মুর্শীদাবাদে, মৌলবী হবিবর রহমান ফরিদপুরী সাহেব ঢাকায়, মৌলবী আবদুল হামিদ সাহেব ময়মনসিংহে, মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব যশোহরে এবং মৌলবী আলি আহমদ সাহেব শ্রীহট্টে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।...[ভাদ্র—১৩২১]

বালি ও ফেনা

[খলীল জীবরানের মূল "রুম্মাল্ ওয়া জাবেদ"-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ]

আবদুস্ সাত্তার

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

আমরা সকলেই আমাদের অন্তরের
আকাঙ্খার শিখরে আরোহন করছি।
যদি অন্য যাত্রী তোমার বিষয়-সম্পদ চুরি করে
এবং এই চুরি তার মেদ-বৃদ্ধির কারণ হয়—
তার জন্যে তোমার কৃপা প্রদর্শন করা উচিত।
তার মেদ-বৃদ্ধি আরোহণকে অধিকতর কষ্টকর
এবং চলার পথকে আরও দীর্ঘ করে দেয়।
এখন তোমার কৃশ অবস্থায়
সেই মাংশল ব্যক্তিকে এক পা' চলতে সাহায্য করো।
ইহা তোমাকে চঞ্চল করবে।

তার সম্বন্ধে তোমার যতটুকু জ্ঞান আছে
তার বাইরে তুমি তাকে বিচার করতে পারো না।
এখন ভেবে দ্যাখো তোমার জ্ঞান কত অল্প।

যে শহর তারা জয় করেছে সেই সম্বন্ধে বিজয়ীদের
বক্তৃতা শুনতে আমি পছন্দ করি না।

সেই ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীন
যে দাসত্বের শৃঙ্খল ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে বহন করে।

এক হাজার বৎসর আগে আমার এক প্রতিবেশী
আমাকে বলেছিল: 'আমি জীবনকে বড় ঘৃণা করি।
কেননা এই জীবনে কোন মুখের চিহ্ন নেই।'
গতকল্য আমি একজন রাজ-মিস্ত্রীর পাশ দিয়ে
যেতে দেখলাম জীবন তার কবরের উপর নৃত্য করছে।

প্রকৃতির মাঝে যুদ্ধ
অনিয়মের ভেতর একটা নিয়ম ছাড়া কিছুই নয়।

নির্জনতা একটা নীরব ঝড়;
আমাদের সমস্ত মরা শাখা সেই ঝড়ে ভেঙ্গে যায়।
তথাপি ইহা আমাদের জীবন্ত মূল-শিকরকে
জীবন্ত পৃথিবীর জীবন্ত-অন্তরের গভীরে পৌঁছিয়ে দেয়।

একবার আমি একটা সাগরের কথা
একটা ছোট নদীকে বলেছিলাম।
ছোট নদী আমাকে বাচাল সাব্যস্ত করলো।
আর একবার আমি একটা ছোট নদীর কথা
একটা সাগরকে বলেছিলাম।
সাগর আমাকে অসম্ভব নিন্দুক সাব্যস্ত করলো।

পিঁপড়ের চঞ্চলতা ফড়িঙের গানের চেয়ে কত নিকৃষ্ট।

এখানকার সব চেয়ে মহৎ গুণ
অন্য পৃথিবীর গুণের চেয়ে ছোট।

গভীরতা এবং উচ্চতা
একই পথে ভ্রমণ করে।
কেবল মাত্র আয়তন বৃত্তাকারে ঘোরে।

যদি আমরা আমাদের ওজন এবং পরিমানের ধারনায়
ঠিক না হই,
আমাদেরকে আগুনের অভিশাপের সামনে দাঁড়াতে হবে।
যেমন আমরা সূর্যের সামনে হয়ে থাকি।

চিন্তা-শূন্য বৈজ্ঞানিক যেন একটা কসাই,
আর তার সামনে ভোঁতা ছুরি ও ছেঁড়া দাড়ি-পাল্লা
বর্তমান।

তা'হলে তুমি কী, যখন আমরা সব নিরামিষ ভোজী?

যখন তুমি গান গাও,
ক্ষুধার্ত ব্যাক্ত শূন্য পেটে সেই গান শুনে থাকে।

মৃত্যু নব-জাতকের চেয়ে বৃদ্ধের নিকটবর্তী নয়;
জীবনের ত কথাই নেই।

যখন তুমি সরল হ'তে ইচ্ছে কর,
সুন্দর ভাবে সরল হও,
অথবা নিশ্চুপ থাকো।
আমাদের বাড়ীর পাশে একজন লোক মারা গেছে।

মানব জাতির জানাজা কী ফেরেশতাদের বিবাহ-ভোজ?

ভুলে যাওয়া বাস্তবতার অপমৃত্যু।

আমরা আমাদের কাছেই সব কথা বলি।
কখনও স্বর উঁচু করি যেন অন্যেরাও শুনতে পায়।

ভুল ধরা পড়ে না যে পর্যন্ত না
অন্য কেহ ভালো করে তার ব্যাখ্যা করে।

আমার ভেতর যদি ছায়াপথ না থাকে
তবে আমি তাকে কী করে জানব বা চিনব?

ডাক্তারদের মধ্যে যদি আমি ডাক্তার না হই
তবে তা'রা আমাকে জ্যোতিষী বলে বিশ্বাস করবে না।

সাগরের মুক্তো ঝিনুক ছাড়া কিছু নয় ;

সময়ের হীরক খণ্ড কয়লা ছাড়া কিছু নয়।

যশঃ আলোর সামনে ধৈর্যের ছায়া।

শিকরই ফুল যা যশকে ঘৃণা করে।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সৌন্দর্যের কাছে কিছু নয়।

প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তিকে আমি জানি,
যাদের এই পর্যায়ে পৌঁছোবার পূর্বে উৎকণ্ঠা ছিল ;
এই উৎকণ্ঠা তাকে অকর্মণ্যতা, পাগলামী
এমন কী আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখতো।

সে মহান।
যেহেতু সে কাকেও চালিত করে নি।
বরং সে নিজেই অন্য দ্বারা চালিত হয়েছে।

মানুষ মধ্যবিধ ;
এই ধারনায় আমি অবিশ্বাসী।

তা'র বক্তব্য : শ্রেষ্ঠ কাজ পৃথক।
এই জন্যেই দেখা যায়
তারা অন্যায়কারী ও পয়গম্বরকে হত্যা করে।

সহনশীলতা উদ্ধত্য-রোগের মধ্যে এক প্রেম রোগ।

অস্বীকার দুই মনের মধ্যে একটা ছোট ছেদ।

আমি অগ্নি শিখা ও জ্বালানি কাষ্ঠ।
আমার এক অংশ অন্য অংশকে ভক্ষন করে।

আমরা সবাই পবিত্র পর্বতের চূড়া খুঁজি ;
আমাদের অতীতকে চালক না ধরে যদি নিয়ম ধরি
তবে আমাদের রাস্তা কী ক্ষুদ্র হবে না ?

জ্ঞান তখন জ্ঞান থাকে না,
যখন এই জ্ঞান অতি অহঙ্কারে কাঁদে,
অতি গাম্ভীর্যে ঠাট্টা করে,
অতি স্বার্থ-পরতায়
অন্যকে বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থ দেখে।

তুমি যা' জান সেই সব দিয়ে যদি আমার ভাণ্ড পূর্ণ করি
তা'হলে তুমি যা না জান
সেই সব ধরবার আমার জায়গা কোথায় ?

আমি বাচালের কাছ থেকে নীরবতা,
অধৈর্যবানের কাছ থেকে ধৈর্য,
এবং নির্মম লোকের কাছ থেকে দয়া-শিক্ষা
গ্রহণ করেছি।
অথচ কী আশ্চর্য,
আমি এই সব শিক্ষকদের কাছে ভয়ঙ্কর কৃতঘ্ন।

ধর্ম্মান্ধ-ব্যক্তি পাথর-বধির বক্তা।

ঈর্ষা পরায়নদের নীরবতা আরও গোলমেলে।

তোমার যা' জানা দরকার
তুমি যদি তার শেষ সীমায় পৌঁছে যাও
তোমার যা বুঝা দরকার
তার প্রথম অবস্থায় কেবল পৌঁছুলে !

অতি-রঞ্জন এক প্রকার সত্য ;
ইতিমধ্যে সে তার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে।

তুমি যদি কেবল প্রকাশিত আলো দেখ
এবং কথিত কথা শুন
তা'হলে আসলে তুমি কিছুই দেখ না বা শুন না।

সত্যের কোন কাম-গন্ধ নেই।
একই সময়ে তুমি হাসতে ও নির্দ্দয় হতে পার না।

আমার হৃদয়ের খুব কাছে
রাজ্য শূন্য এক রাজা বাস করেন ;
সেই খানে এক দরিদ্রও বাস করে—
অথচ সে ভিক্ষে করতে জানে না।

ধূর্ত নিষ্ফলতা
অভদ্র সাফল্যের চেয়ে অনেক ভাল।

পৃথিবীর যেখানে খুশী গর্ত খোঁড়ো,
গুপ্ত ধন পেয়ে যাবে ;
তবে সেই কাজে কৃষকের একনিষ্ঠতা থাকা চাই।

বিশজন অশ্বারোহী ও বিশটি কুকুর দ্বারা তাড়িত হয়ে
একটা শিকারী শৃগাল বললো :
"নিশ্চয় তারা আমাকে বধ করবে। কিন্তু তারা কত
হতভাগ্য
এবং কত বোকা ! বিশটি শৃগালের বিশটি গাধায় আরোহন
অবস্থায় বিশটি নেকড়ে দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়ে একজন
মানুষকে হত্যা করা মোটেই শোভনীয় বা উপযুক্ত
হবে না।"

আমাদের মন আমাদের পরিচালিত আইনে
বশ্যতা স্বীকার করে ;
কিন্তু আমাদের আত্মা মনের সাথে একমত নয়।

আমি একজন ভ্রমনকারী ও নাবিক,
প্রতিদিন আমার আত্মার রাজ্যে অভিনব স্থান আবিষ্কার
করি।

একজন রমনী প্রতিবাদ করলো : 'নিশ্চয় এটা ন্যায় যুদ্ধ।
কী করে আমার ছেলে সেখানে মরলো ?'

আমি মহা জীবনকে বললাম : 'আমি মৃত্যুকে কথা বলতে শুনি।'
মাত্রাতিরিক্ত সুর চড়িয়ে জীবন আমাকে বললো :
'এখন তার কথা শুনো।'

জীবন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয় ;
সেই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারলে
জীবনের আ'র এক রহস্য উদ্ঘাটন হয়।
জন্ম ও মৃত্যু সাহসিকতার দু'টো মূর্ত প্রকাশ।

হে আমার বন্ধু,
আমরা দু'জনে জীবনের ঘরে আগন্তুক ;
একজন আর একজনের কাছে
সকলে নিজের কাছে
সেই দিন পর্যন্ত যখন তুমি বলবে আমি শুনবো ;
তোমার কথাকে আমার নিজস্ব কথা মনে করবো,
এবং যখন আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াব
তখন নিজেকে মনে হবে
একটা স্বচ্ছ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

তারা আমাকে বললো :
'তুমি নিজেকে চেনো, তবে সকলকেই চিনবে।'
আমি বললাম :
'যখন আমি সকলকে চিনলাম
তখনই নিজেকে চিনেছি।'

তুমি দুইজন মানুষ।
একজন অন্ধকারে জেগে থাকে
দ্বিতীয় জন আলোকে ঘুমায়।

সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু ;
যেহেতু সে খণ্ড পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেছে
এই জন্যে যে বিনা বাধায় গোটা পৃথিবীকে
উপভোগ করতে পারবে।

বিদ্বান ও কবির মাঝখানে
এক সবুজ মাঠ অবস্থিত।
বিদ্বান ব্যক্তি সেই মাঠ অতিক্রম করলে
জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন ;
কবি সেই মাঠ অতিক্রম করলে
মহামানবে পৌঁছে যান।
গতকল্য সন্ধ্যায় দেখতে পেলাম
একদল দার্শনিক
ঝুড়িতে তা'দের মাথা বোঝাই করে
বাজারের দিকে যাচ্ছেন
আর চীৎকার করছেন, 'বিক্রীর জন্যে জ্ঞান এনেছি, জ্ঞান এনেছি।'
হতভাগ্য দার্শনিক!
তাদের অন্তরের খোরাকের জন্যে
তা'দের মস্তক বিক্রীর প্রয়োজন।

একজন দার্শনিক একজন রাস্তার মেথরকে বললেন :
'তোমার জন্য বড় দুঃখ হয়,
তোমর কাজ বড় কঠিন ও যন্ত্রণাযুক্ত।'
মেথর তাঁকে বললো :
'ধন্যবাদ জনাব, বরং আমাকে বলুন আপনার কাজটা কী ?'
দার্শনিক উত্তর দিলেন :
'আমি মানুষের মন, কাজ ও তা'দের ইচ্ছা-আকাঙ্খা অধ্যয়ন করি।'
মেথর হাসলো ও তার কাজে পুনরায় যোগ দিয়ে
বললো : 'হে হতভাগ্য! হে হতভাগ্য!'

সত্য কথা শুনা
সত্য কথা বলার চেয়ে কোন অংশ কম নয়।

প্রয়োজনীয়তা ও বাবুগিরির মাঝখানে
কেউ আঁক টানতে পারে না।
দেবতারা তা' পারেন
কেননা তাঁরা বুদ্ধিমান ও সতৃষ্ণ।
সম্ভবতঃ দেবতারা এই পৃথিবীতে আমাদের মঙ্গলের ধ্যান।
সেই ব্যক্তি সত্যিকারের রাজা
যিনি তাঁর সিংহাসন খোঁজেন দরবেশের অন্তঃকরণে।

জ্ঞান, তোমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী দিচ্ছে,
অহঙ্কার, তোমার প্রয়োজনের চেয়ে কম গ্রহণ করছে।

সত্যের জন্যে তুমি কারও ধার ধার না।
সবার জন্যে তুমি সবার কাছে ঋণী।

যারা অতীতে ছিল
তারা এখন আমাদের সাথে বাস করে ;
আমাদের কেউই এখন অকৃতজ্ঞ অতিথি-সেবক নয়।

দীর্ঘ আশা দীর্ঘ জীবনের প্রতীক।

তারা আমাকে বললো :
'হাতের একটা পাখী বনের দশটা পাখীর চেয়ে মূল্যবান।'
আমি বললাম : 'বনের একটি পাখী ও তার পালক হাতের দশটি পাখীর চেয়ে মূল্যবান।'
তোমার সেই পালকের অন্বেষণ পাখা-লাগানো পা' যুক্ত
জীবন ; না বরং এইটেই জীবন।

এখানে দুই প্রকারের গুনাবলী বর্তমান।
একটি সৌন্দর্য
আর একটি সত্যতা।
সৌন্দর্য প্রেমিকের অন্তররাজ্যের নায়ক,
সত্যতা ক্ষেত চাষকারীর কঠিন হাতের বাহন।

সৌন্দর্য আমাকে বন্দী করে,
এর চেয়েও যেটা মহত্তর সৌন্দর্য
সেটা আমাকে তা' থেকে মুক্তি দেয়।

যে সৌন্দর্য দেখতে চায় তার চোখের চেয়ে
যে সৌন্দর্যের আকাঙ্খা করে তার হৃদয়ে
ইহা উজ্জ্বলতর হয়ে প্রতিভাত হয়।

আমি তার প্রশংসা করি,
তার সমস্ত ধ্যান আমার কাছে উন্মোচিত করেছে ;

আমি তারও প্রশংসা করি
যে তার স্বপ্ন খুলে বলে।
কিন্তু যে আমার সেবা করে
তার সম্মুখে কী করে লাজুক হবো ?

গুণী-ব্যক্তিরা একদা রাজ-পুত্রদের সেবা করতো,
এতে গৌরবের লিপ্সা বর্তমান ছিল।
এখন তারা নিঃস্বদের সেবার বিনিময়ে
সম্মান দাবী করে।

(ক্রমশঃ)

শীত প্রকৃতির রূপ

সিরাজুল ইস্‌লাম

॥ এক ॥

শিশির সিক্ত পৌষে যে আজ
　　বেদনা মলিন দিন
নিঝুম নীরব প্রকৃতির সব
　　সুরে গানে ভরা বীণ ॥

প্রান্তরে জাগে কুহেলীর ছবি
ঢলে যেন পড়ে দুপুরের রবি
দিগন্তে ঘন সবুজাভ রেখা
　　কুয়াশায় হলো লীন ॥

অবেলায় যেন সন্ধ্যা তিমিরে
　　দিবস বিদায় মাগে
ভুলে যাওয়া ব্যথা মরমের মাঝে
　　হিমেল বাতাসে জাগে ॥

নীলিমা নয়নে শিশিরের ধারা
ম্লান মুখে দূরে জাগে শুকতারা
হিম ছায়া ঘেরা পূর্ণিমা চাঁদ
　　আলো দেয় অতি ক্ষীণ ॥

॥ দুই ॥

হিমেল হাওয়ায় শীত এলো আজ
　　ধরণীর আঙিনায়
ছল ছল আঁখি মুখখানি ঢাকা
　　কুয়াশার ওড়নায় ॥

বনের সবুজে ঘুম ঘুম ছায়া
মিলায় মাঠের অপরূপ মায়া
আকাশের নীল নয়ন ধূসর
　　কি জানি কি বেদনায় ॥

রাতের ব্যথার করুণ কাহিনী
　　তরু-লতা-তৃণ দলে
লিখে যায় সে যে নীরব ধারায়
　　রূপালী শিশির জলে ॥

গানের পাখীরা ভুলে গেছে গান
হিমানী মাখানো দিবালোক ম্লান
পৃথিবী বিভোর যেন কোনো এক
　　নতুনের সাধনায় ॥

অসমাপ্ত চিঠি

মূল : ভালেরি অসিপভ

অনুবাদ : ফখরুজ্জামান চৌধুরী

দু'বছর আগে, শরতের অক্লান্ত বর্ষনের সময়, চারজন ভূতত্ত্ববিদ তেইগার জনশূন্যতায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। অনুসন্ধানকারীরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও তাঁদের কারো খোঁজ পায়নি। বসন্ত কালে বরফ গলতে শুরু করলে ক'জন ইভেন্‌ক হরিণ পালক তাদের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছয়। সেখানে তারা একটি মৃতদেহের সন্ধান পায়। ইনি হলেন দলপতি কষ্টিয়া সাবিনিন।

ইভেন্‌কদের তাঁবু থেকে কিছু দূরে তাঁর মৃতদেহ পড়ে ছিলো। মৃত্যু যখন তাঁকে গ্রাস করে তখনও তিনি হামাগুঁড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে চলছিলেন। সেই গরম-কালে ইভেনক্‌দের সাথে আর কোন ভূতত্ত্ববিদের দেখা হয়নি। ওরা তেইগা অঞ্চলে চলে গিয়েছিলো। তাই কোন অনুসন্ধানকারীরা নৌকো দেখতে পায়নি। মাথার ওপরে উড়োজাহাজ যে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃতদেহটির সন্ধানে, তা-ও তারা দেখতে পায়নি।

হরিণপালকেরা মৃতদেহটির পোষাকের পকেটে একটি মানচিত্র পায়। ভূতাত্ত্বিকদের আবিষ্কৃত হীরের খনির স্থান নির্দেশ এতে ছিলো। আর পায় কতগুলো কাগজ। কাগজগুলোতে লেখা ছিলো স্ত্রীর কাছে লেখা সাবিনিনের দীর্ঘ পত্র।

চিঠিটা প্রাপকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দে'য়া হলো। আর মানচিত্রটি পাঠানো হলো ভূতাত্ত্বিক প্রধান কেন্দ্রে।

সাবিনিনদের আবিস্কৃত হীরের পরিমান বিরাট হওয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেখানে। চিঠিটি সাবিনিনের স্ত্রী পাঠিয়ে দেন ইয়াকুতিয়া-তে কর্তব্যরত ভূতাত্ত্বিকদের কাছে। দল থেকে দলের হাতে ঘুরে চিঠিটি। শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে ওরা চিঠিখানা পড়ে।

কয়েক মাসের ঘটনা এখানে কিস্তিতে কিস্তিতে লেখা হয়। চিঠিটার মূল ঘটনা এক, পূর্বাপর সম্বন্ধ বিশিষ্ট; কিন্তু অসমাপ্ত। এই হলো তার কাহিনী :

"প্রিয় ভেরা! বাড়ীতে এখন সন্ধ্যে কিন্তু এখানে সকাল। বাইরে মোরগ ডাকছে আর তুমি রেডিয়ো শুনছো। আমরা জেগে উঠে বিমান বন্দরে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছি। তুমি যখন ঘুমুবে, আমরা তখন থাকবো শূন্যে। মধুর স্বপ্ন দেখবে তুমি। আমি আর আমার সঙ্গীরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখবো দলে দলে মেঘ ভেসে যাচ্ছে আমাদের উড়োজাহাজের ডানার নীচে দিয়ে। বাতির আলোয় তোমার কামরায় থাকবে উষ্ণতার আমেজ; চোখ মেলে থাকবো আমরা লাল উত্তর মেরু জ্যোতি দেখার আশায়।

"আমরা দু'জন কতো দূরে দূরে! জানি আমার জন্যে তুমি ভাবছো। আমার মতো চঞ্চল জীবন তুমি যাপন করতে পারো না। দু'জনে দু'জনেরে কতো কম দেখি! তোমার মনে স্মৃতি হিসেবে হয়তো জেগে আছে রেল-গাড়ীর কামরার বা উড়োজাহাজের দরোজার আমি।

"দূরে তুমি যখন ঘুমুচ্ছ, তখন আমি আর আমার নীরব সঙ্গীরা ছুটে চলেছি উত্তর দিকে। তোমার জন্যে কিছু করার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসেছে। তোমাকে উপহার দেব এক মধুর স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখলাম আমি দেশের জন্যে মহৎ কোন কাজ করছি। তুমি বললে, চিরদিন আমাদেরকে দূরে দূরে থাকতে হবে। সে কথা শোনার পর অনেকক্ষণ আমরা চুপ করেছিলাম। জানি, এই হলো সত্য। কিন্তু আমাদের বলিষ্ঠ প্রেম তা সইতে পারবে।

"আমার একান্ত ভেরা, যখনই আমরা দূরে দূরে যাই, যাওয়ার সময় পুনর্মিলনের নামে আমরা 'টোষ্ট' পান করি। সে-সব মুহূর্তের গভীর আনন্দ সব বেদনা ম্লান করে দেয়।

"তুমি যখন জাগবে, আমরা তখন তেইগা অঞ্চলের এই নদীর হলুদ-বালিভরা পাড়ের ওপর নামবো। মেরু অঞ্চল তার থেকে বেশী দূরে নয়। তুমি জেগে ওঠে হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়াবে আমরা তখন উড়োজাহাজে চেপে ছুটবো দক্ষিণ দিকে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চলবো উত্তর-মুখে। বরফ কেটে কেটে চলবো আমরা। ধ্রুব তারার নীচে ঘুমুব আমরা। স্বপ্নে দেখব, বাড়ী ফিরেছি।

"অনেক অনেক দিনের ভ্রমন শেষে তেইগা পার হবো আমরা। শ্রান্ত ময়লা দেহ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আমাদের জন্যে এরোপ্লেন অপেক্ষা করবে। খালি হাতে ফিরবো না আমরা। আমাদের অনুসন্ধান ফলবতী হবে। এ-বিষয় আমি স্থিরনিশ্চিত। আমাদের উড়োজাহাজ যখন আকাশে উড়বে, জানালার পাশে বসে আমি তখন তোমার কথা ভাবেবো।

"কিন্তু সে-মুহূর্তের এখনও দেরী আছে। অপেক্ষা করো বুক বেঁধে। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখো...

"প্রিয়া, রাগ করো না। কি, হয়েছে বলছি। বিশ্রী একটা জায়গায় আমাদের প্লেন নামে। বসন্তের পরে

পানি কমেনি। বিমান নামার জায়গাটা অর্ধেক পানির নীচে ছিলো। বিমানটা প্রায় পানি ছুঁয়ে নেমেছিল। আমরা মাল পত্তর নামিয়ে নিজেরা নেমে পড়ি। সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে পাইলটের কাছে চিঠিটা দিতে ভুলে যাই। তাই মাস খানেক ধরে এটা আমার সাথেই আছে। মনে হয়, তুমি ওটা পেয়েই গেছ। সত্যি, বড় দুঃখ হচ্ছে।

"প্রিয়তমা, আবার আমরা আসলাম ; আবার এখানে রাত্রি। ক্যাম্পফায়ার করেছি আমরা। তোমার সাথে কথা বলার সুযোগর অপেক্ষায় আছি। হয়তো আগামী শীতে এ-চিঠি আমি নিজেই তোমার হাতে দিতে পারব। মানে, দেরীতে হলেও তুমি এ-চিঠি পাবেই। বাড়ী ফিরে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নিজে তোমাকে কিছু বলবো না। আমি আসব, তারপর ব্যাগটা রেখে চিঠিগুলো তোমার হাতে তুলে দেব। তুমি যখন চিঠিটা পড়বে, আমি তখন তোমার সামনে বসে দেখবো তোমার মুখ, চুল, হাত। চিঠিটা আমার সম্বন্ধে সব কথা বলবে। আমার সম্বন্ধে তখন আমি কিছুই বলবো না, বলবো শুধু তোমারই কথা।—আমার অবর্তমানে তোমার এবং তোমার কাজের কথা শুনবো।

"তাই আমি কান্না-হাসি-দুঃখ বিজড়িত আমাদের এখানকার প্রতিটি ঘটনা লিখব।

"তুমি তো জানো, এখানে আমরা হীরের সন্ধানে আছি। আমরা কাজের দ্বারা বাঁধা। প্রাথমিক কাজে এতো টাকাপয়সা খরচ হয়েছে যে এখন রিক্ত হাতে ফিরলে চলে না। আমাদেরকে হীরের সন্ধান পেতেই হবে। একবার খোঁজ পেলে হীরের নমুনা নেব, ম্যাপে স্থানটার চিহ্ন আঁকবো। আমাদের পরে আসবে নির্মাতারা। তারা এখানে খনি বানাবে। দক্ষিণ দিকে ভূতাত্ত্বিকদের আরো ক'টি দল এ-কাজে বের হয়েছে। এতে আরো উৎসাহ পাচ্ছি আমরা—প্রথম হতে চাই আমরা।

"আমাদের দল সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে আমি ভুলেই গেছি। আমরা চারজন। সার্জেই, আমাদের ম্যানেজার ; কিন্তু রান্না, পরিশ্রম করা, মালপত্র টানা সবই সে করে। সে আমাদের মধ্যে সবচে বয়স্ক আর তার অভিজ্ঞতাও প্রচুর।

"আর দু'জন সদস্য (আমি ছাড়া) হলো হারম্যান আর টেনিয়া। দু'জনেরই বয়েস কম। হারম্যান দু'বছর আগে টেকনিক্যাল স্কুলের পড়া শেষ করেছে। টেনিয়া তিন বছর আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। প্রতি বছরই সে দূর দক্ষিণে হীরের সন্ধানে যায়। কিন্তু মেরু অঞ্চলের জন্যে সে অভিজ্ঞতা অপ্রতুল। সার্জেই সব সময়ে তাদেরকে চোখে চোখে রাখে, বক্তৃতা দেয়, তাদেরকে শিক্ষা দেয়।

"আজ সকালে একটা স্রোতধারার পাশে আমরা কাজ শুরু করি। স্রোতধারাটি নদীর মতো—সাত গজ চওড়া, বারো ফুট গভীর।

"আজ সার্জেই হারম্যানকে ক্যাম্পফায়ার করা শিখালো। হারম্যান বিরাট আকারের আগুন জ্বালিয়েছিলো। সার্জেই রেগে গেলো।

'মূর্খ কোথাকার !' চিৎকার করে ওঠে সার্জেই, গোটা তেইগা অঞ্চলে আগুন লাগাতে চাও বুঝি ?

"হারম্যান এতে আঘাত পেলো; কিন্তু কিছু না বলে সে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চশমার কাচ মুছতে থাকে। হারম্যানের হৃদয় সোনার। টেনিয়া বলে হারম্যান নাকি ডাক্তার ডুলিটলের মতো। এ-নামে সে তাকে মাঝে মাঝে ডাকে। (মনে হয় টেনিয়ার প্রতি হারম্যানের দুর্বলতা আছে। আর টেনিয়া তা জানে বলে মাঝে মাঝে তার সাথে হাসিঠাট্টা করে।)

"স্রোতধারা আমাদেরকে দূরে আরো দূরে নিয়ে চলেছে। তেইগা অঞ্চল ধীরে ধীরে তুন্দ্রার রূপ নিয়েছে। ঘাস আর লাল শ্যাওড়ায় ঢাকা বিরাট বিশাল গাছহীন অঞ্চল রয়েছে এখানে।

"আমরা স্রোতধারার পাড় বেয়ে চলেছি। টেনিয়া আর হারম্যান একদিকে, আমি অন্যদিকে। সার্জেই আমাদের রবার বোট দু'টাকে একসাথে বেঁধে সামনে দিয়ে দাঁড় বেয়ে চলেছে। ম্যাপে একটা জায়গার চিহ্ন আছে। সেখানে আমরা রাত্রে বিশ্রাম নেব।

"সুসংবাদ ভেরা, গতকাল সার্জেই একখণ্ড হীরে পেয়েছে। স্রোতের দু'পাশের কয়েকটি জায়গায় আমরা খননকার্য চালাচ্ছি ; লেখার সময় নেই ; ঘুমানোর সময় নেই ! রাতে মাত্র তিন ঘণ্টাই ঘুমাবো।

"অনেকদিন লিখিনি। ক্লান্ত আমি। বিশ জায়গায় খননকার্য চালালাম। কিন্তু আর হীরে পেলাম না। দুর্ভাগ্য ! টেনিয়া, হারম্যান হতবুদ্ধি। সার্জেই হিম-শীতল মাটির সাথে লড়াই করছে। একটুও ঘুমায় না সে।

"আবহাওয়া অসহ্য রকম ঠাণ্ডা। এখন সেপ্টেম্বর। কিন্তু আবহাওয়ার কথা ভাবার সময় নেই। সবাই খনন-কার্য চালিয়ে যাচ্ছি। সে এক ভীষণ ব্যাপার। টেনিয়াও আমাদের মতো কাজ করছে। বেচারী !

"হীরে ! আমরা কি কখনো তার খোঁজ পাবো ?

"...হুররা ! গতকাল টেনিয়া আর আমি নতুন এক জায়গা খুঁড়তে শুরু করি। হঠাৎ নীল আবরণ পেলাম আমরা ! এক মিটার গর্ত করার পর ধূসর-নীল কাদা দেখতে পেলাম। তারপর আরো, আরো। দু'মিটার নীচে কাদা পাথরের মতো শক্ত। সার্জেই আর হারম্যান এমনি ভাবে গর্ত করতে লাগলো যে দু'ঘণ্টার মধ্যে আমা

দের সমান কাজ করে ফেললো। হারম্যান একটা ছোট্ট স্ফটিক পেলো। টেনিয়া পেল দু'টা।

"আনন্দে আমরা প্রায় পাগল হয়ে গেলাম। এমন কি সার্জেইও হাসলো। সে মুহূর্তটি আমরা ভোজের মাধ্যমে উদযাপন করলাম। অতি প্রয়োজনের জন্যে রাখা মদের কিছু অংশ পান করলাম।

"মদ পেটে পড়ায় হারম্যান বক্তৃতা জুড়ে দিলো। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সে বলতে শুরু করলো যে সে বৃথা বাঁচেনি। তার জীবনের অর্থ আছে, সে দেশসেবা করেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"টেনিয়া কচি খুকির মতো হাসলো। সার্জেই ভ্রু কুঁচকে শাবল নিয়ে আবার মাটি খুঁড়তে লেগে গেলো। টেনিয়া আর হারম্যানের বয়েস কতো কম। দু'জনের বয়স যোগ করেও পঞ্চাশ হবেনা। ওরা বেশ উৎসাহী।

"হীরের খোঁজ তাহলে পাওয়া গেলো। তিনদিন আগে এরই আশেপাশে আমরা মাটি খুঁড়ছিলাম।

"যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। এ-জিনিষের মূল্য শুধু বিরাট পরিমাণ বলে নয়। তুমি জানো, জীবনে সংগ্রাম করে, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আমি বাঁচতে চাই। আজ এই দূর দক্ষিণে আনন্দিত আমি সে জন্যে।

"তোমার জন্যে আমি সুখী। তোমার স্মৃতি সাগরে, পাহাড়ে, নদীতে, বনে সুখ দেয়। এ-ভাবে সময় কাটাই আমি।

"যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তা বাস্তবায়িত করেছি। যার জন্য যুদ্ধ করেছি তা জয় করেছি। এবার আমরা বাড়ী ফিরতে পারি। সবার মন ভালো। হারম্যান যেন একটু বেশী খুশী। টেনিয়ার কানে কানে কি যেন সে সব সময়েই বলছে। সার্জেই আগের মতোই গম্ভীর। কি হলে যে সে তার অনুভূতি প্রকাশ করবে!

"বাড়ী, বাড়ী, বাড়ী। সহসাই তুমি আর আমি গত শীতে করা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেব। আমি ছুটি নেব। তারপর আমরা চলে যাবো দক্ষিণে। সেখানে দু'জনে সাগরে গোসল করবো, হাঁটবো তোমার প্রিয় গাছের ছায়ায়।

"...প্রিয়তমা, অনেকদিন তোমায় লিখিনি। কারণ বেশ রকমের বিপদে আমরা পড়েছিলাম। এক পা আনন্দের পরই এক পা দুঃখ, কথাটা কি সত্যি!

"ম্যাপে স্থান চিহ্নিত করে কিছু নমুনা তিনটা ব্যাগে ভরে আমরা স্রোতধারা বেয়ে নাবতে শুরু করি। স্রোতধারা যেখানে নদীর সাথে মিশেছে, সেখান থেকে এক মাইল দূরের এক জায়গায় আমরা তাঁবু ফেললাম। নির্ভাবনায় আমরা তাঁবু খাটিয়ে বোটগুলো নদীর পাড়ের ওপর টেনে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন নাই। একইভাবে নদী থেকে কুয়াশা উঠছিলো। কন কনে বাতাস। আমরা খুব ক্লান্ত, তাই নমুনাগুলো তাঁবুতে না এনে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নৌকায় রেখে দিলাম।

"মাঝরাতে শরৎকালীন বৃষ্টি নাবলো, এ-টেরও পাইনি। প্রথমে জাগলো সার্জেই। ভোর তখন ছ'টা। বাইরে গর্জন শুনে বাতাস মনে করে সে পাশ ফিরে শুতে যাবে, এমনি সময় বৃষ্টির কথা টের পেলো। সবাইকে জাগিয়ে দিলো সে। তাঁবুর বাইরে পা রাখা তখন অসম্ভব। বসে বসে সবাই কাঁপতে লাগলাম। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হলো, মেরু অঞ্চলের সব বরফ গলে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে আমাদের ওপর পড়ছে। সার্জেই লাফিয়ে উঠলো।

"'নৌকা!" চিৎকার দিয়ে উঠলো সে।

"তীরের দিকে তাকালাম আমরা। তীর তখন শূন্য। নৌকাগুলো যেখানে রাখা হয়েছিলো, সেখানে পানি দাপাদাপি করছে। ঝড়ে উপড়ানো গাছ নিয়ে ভীষণ বেগে পানির স্রোত চলেছে।

"নিঃশব্দে সবাই দৌড়ে বের হলাম—আধো ঘুমে, অর্ধনগ্ন অবস্থায়। ঝড় বৃষ্টি ঠেলে কোনমতে এগিয়ে চললাম। কাদায় পা একাকার। টেনিয়াকে তাঁবুতে ফিরে যেতে বললাম; কিন্তু সে রাজি হলো না।

"স্রোতের মুখ গাছে বন্ধ হয়ে গেছে।

"'ঐ দেখ একটা নৌকা! আমার কনুই ধরে চিৎকার করে বললো সার্জেই। গাছগাছড়ার ভেতর হলুদ মতো কিছু একটা দেখলাম। আমাদেরই একটা রবার বোট, তাতে আছে আমাদের খাবার আর সংগ্রহের নমুনা। কিন্তু সেখানে যাবো কি করে?

"কিছু বুঝতে পারার আগেই সার্জেই সাবধানে গাছের ওপর দিয়ে নৌকার দিকে যেতে শুরু করলো। হঠাৎ কি হলো! গাছগুলো যেন এতক্ষণ একটা ধাক্কার অপেক্ষায় ছিলো, ছুটে সজোরে স্রোতের বেগে চললো। শেষবারের মতো দেখলাম সার্জেই সজোরে একটা গাছের ডাল ধরে আছে। পর মুহূর্তে অনেকগুলো গাছ এসে ঢেকে ফেললো তাকে।

"অনেকদিন কেটে গেছে, তাই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমায় বলতে পারছি; কিন্তু তখন আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। টেনিয়ার কান্না, হারম্যানের চিৎকার সব যেন আমার ভেতর থেকেই বের হতে লাগলো। হতচকিত আমরা অর্ধনগ্ন অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে লাগলাম।

"পানি আর কাদায় একাকার হয়ে ফিরে চললাম আমরা। বৃষ্টির চোটে তাঁবু প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম।

কোনমতে আমাদের কাপড়, বিছানা, দু'টা রাইফেল কিছু ভিজে কার্তুজ, অল্প ক'টিন খাবার শুকনো জায়গায় রাখলাম। কুঠার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষও আমরা বাঁচাতে পারতাম; কিন্তু সার্জেইর মৃত্যু আমাদেরকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে।

"কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো। এবার বিপদের মাত্রা বুঝতে পারলাম। তেইগার জনহীন প্রান্তরে আমরা অসহায় তিনজন—কুঠার নেই, কম্পাস নেই, নেই কোন ম্যাপ।

"বৃষ্টি পড়তেই লাগলো। তার জোর কিছুটা কমেছে বটে। সারাদিন অপেক্ষা করলাম। তবুও বৃষ্টি থামলো না। ঠিক করলাম বেরিয়ে পড়বো।

"বিমান বন্দরে পায়ে হেঁটে পৌঁছানোর আশা যে নেই, এটা আমরা বুঝতে পারলাম। নদীর দু'পাড় বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত। ঢলের ওপর দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। স্থানে স্থানে পানির বেগ এত বেশী যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে।

"শুকনো জায়গা দিয়ে আমরা অবিশ্যি পায়ে হেঁটে যেতে পারতাম; কিন্তু তা হলে শুধু ঢল এড়ানোই হতো। এতে পথ এতো লম্বা হতো যে ব্যাপারটি বুদ্ধিগ্রাহ্য হলো না।

"শেষে কতগুলো ভিজে ডাল একসাথে বেঁধে তাঁবু ছিঁড়ে তাতে লাগালাম। জিনিষটা বড় একটা ঝুঁড়ির মতো মনে হলো। সেটার ওপর চেপে বসে লাঠির সাহায্যে কোন রকমে বেয়ে চললাম। এ-শুধু নিজেকে কষ্টই দেয়া। এখন আমি আমাদের কষ্টের দশ-ভাগের একভাগও তোমাকে জানাতে পারবো না।

"প্রথম দিনে আমরা বড় নদীতে পৌঁচলাম। নদীর ওপরই রাত কাটালাম। দ্বিতীয়দিনে স্রোত আমাদেরকে টেনে নিয়ে চললো। আমরা লাঠির সাহায্যে নদীর'-ওপরের গাছগুলোর সাথে সংঘর্ষ এড়াতে লাগলাম। গাছের সাথে ধাক্কা লাগলেই আমাদের ভেলা ডুবে যাবে।

"দ্বিতীয় রাত এলো। বৃষ্টি পড়তেই লাগলো। আমাদের কাপড় খুলে যেতে লাগলো। গাছ-গাছড়ার একটা চাপ রাত্রিকালে পার হওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করা। বড় নদী থেকে ফিরে যেতে চেষ্টা করলাম আমরা। এমনি চেষ্টার ফলে আমাদের ভেলা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেলো।

"তীরে কি করে উঠলাম, মনে নেই। ভেবে দেখ, ঠাণ্ডা পানি (এখন সেপ্টেম্বরের মাঝিমাঝি) বুক ডুবিয়ে আছি আমরা। সামনে দু'হাতে দূরের জিনিষও দেখা যায় না। হারম্যান ও টেনিয়া অদ্ভুত তরুণ-তরুণী। একটু অনুযোগও তারা করলো না। শুধু পা অসাড় হয়ে হয়ে যাওয়ায় টেনিয়া চিৎকার করেছিলো।

"একটু একটু করে এগুতে থাকি আমরা। একটু 'শুকনো' জায়গার খোঁজ করতে লাগলাম আমরা। শুকনো শব্দ কোটেশনে রাখলাম এ-জন্যে যে একশ' মাইলের মধ্যে সত্যিকারের শুকনো জায়গা নেই। হঠাৎ টের পেলাম উপরের দিক উঠছি আমরা। বুঝলাম নদীর কিনারে এসেছি আমরা। সামনে দেখলাম, কতগুলো গাছের গুঁড়ি একটা আশ্রয় সৃষ্টি করেছে। বাঁচলাম আমরা।

"আমরা এতো ক্লান্ত আর অবসন্ন যে ব্যথা ছাড়া আর কিছু বোধ করলাম না। ঠাণ্ডা যেন আমাদের হাড়ে লেগেছে। দাঁত কপাটি লেগে গেলো। ঘুমিয়ে সব ভুলে যেতে চাইলাম আমরা; কিন্তু তা অত্যন্ত মারাত্মক হতো। ও'দের দু'জনকে বললাম আগুন জ্বালাতে। বৃষ্টিতে, আর বিশেষ করে সার্জেইর মতো কাঠ সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান না থাকায়, কাজটি খুব সহজ বলা যায় না। শেষ অবধি কোন মতে আগুন জ্বালিয়ে কাপড় শুকাতে লেগে গেলো তারা। দেখা গেলো আমাদের সামান্য খাবারের মধ্যে দু'টিন মদও আছে। কাপড় খুলে একে অন্যের গা ডলে দিয়ে আগুনের পাশে এসে বসলাম। আমাদের তাঁবুটাই কেবলমাত্র শুকনো আছে। হারম্যান হাত উঁচু করে ওটা নিয়ে নদী পার হয়েছিল।

"এবার সবাই সামান্য মদ খেয়ে কার্তুজগুলো শুকাতে লাগলাম। আমাদের ছিলো উনিশটা কার্তুজ, মদের টিন, খাবার, একটা রাইফেল, (অন্যটা ফেলে দিতে হয়েছিলো), তিনটা বিছানা আর একটা তাঁবু।

"মনের দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্যেই আমি এতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখছি। পা'য়ে হেঁটে না ভেলায় করে (ভয় হয় কেউ আর এতে রাজী হবেনা) বিমানবন্দরে যাব, ঠিক করতে পারিনি। শীতকাল এসে গেছে। এ-শীত সাধারণ শীত নয়, রীতিমতো হাকুতিমান শীত! এমনি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে রয়েছে মাত্র উনিশটা কার্তুজ আর সতের টিন খাবার।

"হারম্যান এই মাত্র ঘুরে এলো। বাইরে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। এখান থেকে সোজা বিমানবন্দরে যাওয়া যাবে না, কারণ বহুস্থান পানির নীচে। তাছাড়া ম্যাপ ছাড়া চলাও যাবেনা। এ-অঞ্চলের সব দিকচিহ্ন পানির নীচে। কি করবো আমরা?

"ঠিক করলাম, আগামীকাল সকালে ভেবেচিন্তে সব ঠিক করবো। রাতের ঘুম ভালো হলে সকালে চিন্তাশক্তি বাড়বে। শুভরাত্রি, প্রিয়তমা। তুমি আর আমি যখন এই চিঠিটা একসাথে পড়বো, তখন সব কিছু আমার কাছে

বিস্তৃত মনে হবে; কিন্তু এখানকার অবস্থা স্মরণ রাখার জন্যে আমার কোন চিঠির দরকার নেই।”

“বিশ্রামকালে লিখছি। তেইগা অঞ্চল দিয়ে চলেছি আমরা। গত সকালে সব কিছু ভেবে চিন্তে দেখলাম বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আশা বৃথা। নদী দিয়ে যাওয়ার আশা ত্যাগ করেছি কারণ (১ নদী দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আনাড়ি, (২) নদী এমন ভাবে ঘুরে ঘুরে গেছে যে পথ অনেক লম্বা হবে, আর তা ছাড়া তেইগা অঞ্চলে থাকতে থাকতে নদী জমেও যেতে পারে। আমাদের লোকজন নিশ্চয়ই আমাদেরকে পাবে বলে আশা করছে, সেখান থেকে দূরে যাওয়া যাবে না।

“তাই আমরা হেঁটে চলবো যতোদিন খাবার আর কার্তুজ থাকে। এ-ভাবে আমরা তেইগার বাইরে যেতে পারবো মনে হয়। বসে বসে অপেক্ষা করার মত খারাপ আর কিছু নেই। হয়তো ভুল করছি। কিন্তু ভালো ফলই আশা করছি।

“আমাদের প্ল্যান সোজা। জনপদে পৌঁছানো পর্যন্ত শুধু হাঁটবোই। সত্যিকার শীত নামার আগে আমাদেরকে পৌঁছতে হবেই।

“ওরা দু'জন চমৎকার। ভয় হচ্ছে, নদীতে ভেজার পর থেকে হারম্যানের গায়ে জ্বর। টেনিয়ারও শরীর খারাপ; কিন্তু হেসে, ঠাট্টা করে সে অসুস্থতা গোপন করে যাচ্ছে।

“বিদায়, প্রিয়। সামনের বিশ্রামস্থান পর্যন্ত বিদায়। এখন আর বেশী লিখবো না—কাগজ ফুরিয়ে আসছে।

“অনাবাদী জমির ওপর দিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের আগে আর কেউ বোধহয় এখানে পা রাখেনি। দিনে দিনে শীত বাড়ছে। এখনও বরফ পড়া শুরু হয়নি। রবারের কাপড় খুব উপযোগী মনে হচ্ছে না—খাবার হিসেবে তিনজনে খাই আধ টিন আর যত খুশি গরম পানি। মাঝে মাঝে জাম খাই; কিন্তু জামের স্বাদ ভালো না আর পাড়তেও কষ্ট অনেক।

“ঘুমুই অনেক, কথা বলি কম। ওদের দু'জনকে একটু মনমরা মনে হচ্ছে। তাদেরকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। শুভরাত্রি, প্রিয়তম।

“কাল যা লিখেছি আজ তা পড়ে খুব লজ্জা লাগছে। নিজেদের কথা এতো বলছি কেন! আজ সকালে হ্রদের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় একটা হাঁস ধরেছি। হাঁসটার ডানা ভাঙ্গা। তার সাথী ওকে ফেলে দক্ষিণে চলে গেছে। আমরা হাঁসটার প্রতিটি অংশ খেলাম। হারম্যান ছোট ছোট দু'টা মাছ ধরেছিলো। তা-ও খেলাম। বুঝতে পারছো সামনের ক'দিনের জন্যে বেশ জোর সঞ্চয় করেছি।

“...মনে হচ্ছে, শীত আমাদেরকে এখানেই ধরবে। সকালে পায়ের নীচে বরফের আস্তর কড়মড় শব্দ করে ভাঙ্গে। রাতে থার্মোমিটার হিমাঙ্কের নীচে দশ বারো দাগ নেমে যায়। হারম্যানের জন্যে খুব ভাবনা হচ্ছে। তার খুব জ্বর। তাপ মাপার কোন উপায় নেই। তবুও বেশ বোঝা যাচ্ছে। টেনিয়া তার সেবা করছে।

“আর মাত্র এগারো টিন খাবার আছে। গতকাল একটা ছোট্ট তৈগা পাখী মেরেছিলাম। দু'টা কার্তুজ খরচ হয়ে গেলো। পাখীটির প্রতিটি অংশ এমনকি হাড়গুলো পর্যন্ত গুঁড়ো করে খেয়েছি।

আজ আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটলো: পাথরের ঢাল বেয়ে নামার সময় হারম্যান তার গোড়ালীতে ব্যথা পায়। প্রথমে সে উঠতেই পারেনি। টেনিয়া আর আমার সাহায্যে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে।

“হারম্যানের অসুস্থতার জন্যে নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক আগে আমরা খেয়েছি। তিনগুলী খরচ করে আরেকটা পাখী মারলাম। আর মাত্র তিন টিন খাবার আছে, তাই আর সহজে সেগুলো ধরছিনে। জরুরী দরকারের জন্যে সেগুলো রেখেছি। আহা, যদি একটা হরিণ মারতে পারতাম! তেইগায় সব কিছু মৃত মনে হচ্ছে।

“হারম্যানকে একটা লাঠি বানিয়ে দিয়েছি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাদের সাথে তাল রাখতে চেষ্টা করছে সে। টেনিয়া ওর দিকে তাকাবার সময় সন্তর্পনে চোখের পানি মুছে ফেলে। আশ্চর্য মেয়ে সে!

“গতরাতে হারম্যানের ঠাণ্ডা লেগে দাঁত কপাটি লেগে যায়। আমি আর টেনিয়া এ-জন্যে ঘুমাতে পারিনি। টেনিয়া নিজের বিছানা ছেড়ে ওর বিছানায় গিয়ে তাকে গরম করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁপন থামলে সে ঘুমিয়ে যায়। টেনিয়া জ্বরে পড়তে পারে; কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই।

“...হারম্যান প্রায় নড়তেই পারে না। তার গোড়ালী ফুলে গেছে। তার বোঝা আমি বয়ে চললাম। আজ দুপুরে হারম্যানের জ্বরের জন্যে আবার থেমেছিলাম। ওকে বললাম টিন খুলে কিছু খেতে, সে রাজী হলো না।

“আরেকটা পাখী মারলাম। আর বাকী আছে সাতটা কার্তুজ। আগুনের পাকে বসে আজ প্রথম বরফের সাদা কুঁচি দেখলাম। দেখলাম, টেনিয়ার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। কোন কারণে হারম্যান আমাকে বললো হীরের খনির ম্যাপটা দেখাতে। আমি ম্যাপটা তার হাতে দিলাম। তার কম্পমান হাঁটুর ওপর ম্যাপটা বিছিয়ে অনেকক্ষণ কি যেন দেখলো সে, তারপর আমার হাতে ফিরিয়ে দিলো।

“নির্বানোন্মুখ আগুনের পাশে বসে বিমর্ষ আমরা-

তিনজন। আমি নিজেই এতো মনমরা যে ওদেরকে চাঙ্গা করার কোন চেষ্টা করতে পারছিনে।

"আজ সকালে লাঠির সাহায্যেও হারম্যান এক পা অগ্রসর হতে পারলো না। পা ছড়িয়ে বসে পড়লো সে। আমি ওকে একটা ক্যাচ বানিয়ে দিলাম। বাইরে বরফ পড়ছে।

"ক্যাচের সাহায্যে হারম্যান প্রথম প্রথম বেশ হাঁটছিলো; কিন্তু শিগগীরই সে পিছে পড়ে গেলো। ও অত্যন্ত দুর্বল। বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আবার আমরা আগে আগে থামলাম। হারম্যানকে তাঁবুতে বয়ে নিলাম আমি। অজ্ঞান হয়ে গেলো সে। তার হিক্কা উঠতে শুরু করলো। টেনিয়া কেঁদে ফেললো। এখনও নদীর দেখা নেই।

"ভয় হচ্ছে, আগামী কাল বের হতে পারবো না। আমি প্রস্তাব করলাম টেনিয়া সবগুলো বোঝা (প্রায়-আশি পাউণ্ড) বইবে আর আমি হারম্যানকে কাঁধে করে বইবো। টেনিয়া রাজী হলো; কিন্তু হারম্যানের কোন ভাবান্তরই হলো না।

"টেনিয়া আর আমি বনে গেলাম কাঠ আনতে।

"...যা ঘটে গেলো তা আমি কি করে বর্ণনা করি? এ যে বর্ণনাতীত। অর্থাৎ ভেঙ্গে পড়েছি।

"গতরাতে হারম্যান আমাদেরকে ছেড়ে গেলো।

"টেনিয়া আর আমি বন থেকে ফিরে শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লাম। হারম্যান আমাদের দু'জনের মাঝে বিছানায় শুয়েছিলো। সকালে উঠে দেখি তার বিছানা খালি। তাঁবুর গায়ে পিন দিয়ে এক টুকরো কাগজ আটকানো। তাতে লেখা :

"প্রিয় কনষ্টাণ্টিন পেট্রোভিচ,

আমি যা করছি তা যে কোন লোকই করতো। এ-হলো সোজা অঙ্কের ব্যাপার। তিনজনের চেয়ে একজন মরা ভালো। বিছানার ভেতর আমার টিন রাখা আছে। ভুলো না যেন। আমি চললাম, আমার খোঁজ নিয়ে বৃথা সময় আর শক্তি নষ্ট করো না। বরফ এসে আমার পায়ের দাগ মুছে দেবে।

"পুনঃ হেড কোয়ার্টারে তোমাদেরকে পৌঁছাতেই হবে। সেখানে তারা অপেক্ষা করছে। টেনিয়ার যত্ন নিয়ো।

"সন্ধ্যে পর্যন্ত তার খোঁজ করলাম; কিন্তু সারারাত বরফ পড়ায় পথের কোন চিহ্নই পাওয়া গেলো না। পর দিন দুপুরে তাঁবু গুটিয়ে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

"টেনিয়া শান্ত সমাহিত। কোন কথা বলছে না সে। মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটছে সে। তার জন্যে খুব আঘাত হারম্যানের অন্তর্ধান। কি বিষাদময় ঘটনা!

"আজ প্রায় দশমাইল হাঁটলাম, বুঝতে পারলাম, আমাদের জীবনের চেয়ে ম্যাপটার দাম অনেক। এর জন্যেই সার্জেই আর হারম্যান জীবন দিলো। নিজেদের কথা ভাবার কোন অধিকার নেই আমাদের—যে করেই হোক ম্যাপটা পৌঁছাতে হবে।

"টেনিয়াকেও এ-ব্যাপারে খুব সতর্ক মনে হলো। কাল কমপক্ষে তের মাইল হাঁটার জন্যে আধ টিন মাংস খেলাম আমরা। তাড়াতাড়ি চলতে হবে আমাদেরকে। সহসাই জোর শীত পড়বে।

"...আজ পদক্ষেপ গুণলাম—বত্রিশ হাজার পাঁচ শ। খুব ক্লান্ত লাগছে। আরো আধ টিন খাবার খেলাম। পাখী মারতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। লিখতে পারছি না। এখনও নদীর দেখা নেই।

".. ছত্রিশ হাজার পদক্ষেপ। সকালে যাত্রা শুরু করেছি, থেমেছি রাতে। নদীর দেখা নেই। ভয় হচ্ছে, ভুল পথে চলেছি আমরা। ডানদিকে চললাম।"

"...একটা জিনিষ বুঝলাম। এতো তাড়া করা উচিত নয়। আজ সাত হাজার পা চলার পর টেনিয়া মূর্ছিতা হয়ে পড়ে। খুব শুকিয়ে গেছে সে—হাড় আর মাংস সার। দু'দিন বেচারী আমার সাথে সাথে চলেছে। আজ পারলো না; কিন্তু তার ক্লান্তি বা আস্তে চলার কথা একবারও সে আমায় বলেনি।

"ওকে বয়ে চললাম আমি। ভালো বিশ্রাম স্থান পাওয়া পর্যন্ত ক'মাইল হাঁটলাম। টেনিয়ার ওজন একদম নেই।

"আগুন জালিয়ে পানি গরম করে কিছু খাবার সহ তাকে দিলাম। ও শুয়ে আছে। আমি বসে বসে লিখছি। ভেরা, প্রিয়তমা। শীত আমাদেরকে ধরে ফেলেছে। তার ভয়ে আমরা চলেছিলাম; কিন্তু পারলাম না। মেরু সাগর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। নাক-কান ব্যথা করছে। রবারের জুতোয় পা জমে যাচ্ছে।

"আজ মেঘের আড়ালে আকাশের নীলিমা দেখা গেল। অর্থাৎ শীত আসছে। এবার থার্মোমিটার নীচে নামবে।

"...টেনিয়া আর আমি একটা বিছানায় ঘুমাচ্ছি। অন্যটা ফেলে দিয়েছি। তোমার কথা ওকে বলার জন্যে টেনিয়া আমায় বলছে—তোমার চুল, চোখ, শরীর, তোমার কাপড়---সব কিছুর কথা সে জানতে চায়। সব তাকে বলেছি। শুয়ে শুয়ে শুনেছে সে। চুপিসারে কথা বলছি আমরা।

"...দুপুরের দিকে বাতাস কমলে পর আমরা বেরিয়ে-

পড়লাম। আজ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হাঁটলাম। তাঁবু খাটালাম। আবার বরফ পড়তে শুরু করেছে। তাঁবুর ভেতরে আগুন জ্বালালাম। হাত-পা জমে গেছে। আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। টেনিয়া তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো—আমরা প্রথম কি করে দেখা করি, ভালোবাসার কোন্ কথাটা প্রথম বলি।

"হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো ম্যাপটা আছে কিনা। তাকে ম্যাপটা দিলাম।

"আরো দু'টা কার্তুজ আছে। টেনিয়া ঘুমিয়ে পড়লে একবার বাইরে যাবো। দেখি কোনো শিকার মিলে কিনা।

"ভেরা, ভেরা! কি ভয়ানক বছর এটা। কতো বন্ধু হারালাম আমি। দু'মাসে হারালাম তিনজন মহৎ বন্ধু!

"এখন আর বেশী লিখতে পারছিনা, প্রিয়তমা...

"...কাল বাইরে অনেকক্ষণ ছিলাম। একটা পাখীর পিছে পিছে দু'কিলোমিটার পথ হাঁটলাম। হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করলে পথ প্রায় হারিয়ে ফেললাম। তিন-ঘণ্টা বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে দেখলাম, এক টুকরো কাগজ রেখে টেনিয়া চলে গেছে। কাগজটাতে লেখা আছে:

"'প্রিয় কনস্টান্টিন পেট্রোভিচ,

হারম্যানের কাছে চললাম। আমার সম্বন্ধে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করো না। এ-আমাকে করতেই হতো। অনেক ভেবেছি আমি। এক সাথে চললে দু'জনকেই মরতে হবে। একজনকে বাঁচতেই হবে। ওরা ম্যাপের জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমাকেই ম্যাপ নিয়ে যেতে হবে। তুমি আমার চেয়ে সবল। হারম্যান আর আমি তোমার কাছে বোঝা হয়ে পড়েছিলাম। তা না হলে অনেক আগেই তুমি বিমানবন্দরে পৌঁছতে পারতে। আমাদের জন্যে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছ, এবার তোমার জন্যে আমাদেরকে উৎসর্গ করলাম। হারম্যান অনেক আগেই এটা বুঝেছিল—আমিও বুঝেছিলাম; কিন্তু সাহস পাইনি। আসলে আমি ভীরু। এবার সব ঠিক করেছি। বরফ পড়া শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। হারম্যানের কাছে যেতে বেশীক্ষণ লাগবেনা। আমার খোঁজ করোনা। বরফ আমার পায়ের দাগ মুছে দেবে। এক টিন খাবার বাঁচিয়েছিলাম, বিছানার ভেতর পাবে। আমার জন্যে যা করেছ তার ধন্যবাদ হিসেবে এটা গ্রহণ করো। হেড-কোয়ার্টারে তোমায় পৌঁছতে হবে। বিদায়!

টেনিয়া।

"'পুনঃ স্ত্রীর কাছে তোমায় যেতেই হবে। ওকে এতো ভালোবাসো তুমি। হারম্যান আর আমিও পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি। কেউ কাউকে জানতে দিইনি কাজের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে। সুখ আমাদের কপালে নেই। তুমি সুখী হবে। স্ত্রীর কাছে তুমি পৌঁছবে। একটা অনুরোধ—আমার মা'র কাছে তুমি চিঠি দিয়ো। হেডকোয়ার্টারে তাঁর ঠিকানা পাবে। আর নয়।

ধন্যবাদ,

টেনিয়া।"

"সারাদিন তার খোঁজ করলাম। কিন্তু তুষার ঝড়ে সব ব্যর্থ হলো। ঠিক মুহূর্ত বেছে নে'য়ার শিক্ষা হারম্যান তাকে দিয়েছে।

"এখন আমার জীবন আমার একার নয়। বাঁচতে হবে; কারণ ম্যাপ পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। তাঁবু ছিঁড়ে ক'জোড়া পায়ের কাপড় বানালাম। পা আমার আসল জিনিষ। চারটিন খাবার, একটা বিছানা, বারোটা ম্যাচবাতি আছে। বাঁচতে হবে আমাকে।"

"...আজ পঞ্চাশ হাজার পদক্ষেপ গুনলাম। প্রায় তের মাইল হেঁটেছি। এখন আমি বিরাট একটা লার্চ-ছায়ায় বসে চা বানাচ্ছি। চায়ের পানি ফুটার আগে তোমায় ক'লাইন লিখব। লেখার জন্যে এ-সময়টাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনি ভাবে তোমায় আমি প্রায় লিখেছি। আমার চারপাশে বরফের শাদা স্তূপ। কিন্তু খুব ঠাণ্ডা লাগছে না। প্রকৃতির কি ভীষণ শক্তি!

"...আজ গুনলাম তেপ্পান্ন হাজার পদক্ষেপ। নিশ্চয়ই ভুল পথে চলেছি। মনে হচ্ছে নদীর সমান্তরালে আমরা চলেছি, তাই নদীর দেখা পাচ্ছিনে। গন্তব্যে পৌঁছতে আমি কৃতসিদ্ধান্ত। হারম্যান আর টেনিয়া তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, আমিও আমারটা করবো। বোধ হয় ভূতাত্ত্বিকদের মতো এতো দায়িত্ব আর কারো নাই। দায়িত্ব পালনের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতে হয় তাকে।

"দিনের হিসেব তুলেছি অনেকদিন হলো। কিন্তু মনে হচ্ছে এখন নিশ্চয়ই নভেম্বর মাস। বেশীক্ষণ আগুন থেকে দূরে থাকতে পারিনা জমে যাওয়ার ভয়! ঘুমানোও এক সমস্যা। বিছানার নীচে অনেক ডাল জড় করে রাখতে হয়। কিন্তু সে শক্তি নেই। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

"দু'দিন লিখিনি। ভীষন ঠাণ্ডা। ভয় হচ্ছে, মুখ জমে গেছে। ঠাণ্ডা লাগায় জেগে গেলাম। স্বপ্নে দেখলাম, ম্যাপটা হারিয়ে ফেলেছি। ভীষন ভাবে খোঁজার পর পেলাম।

"হারম্যান আর টেনিয়ার কথা ভাবছি। জানতামনা ওরা প্রণয়াবদ্ধ। আহা, কাজের জন্যে গোপন করে থাকলে কি সুন্দরই না সে প্রেম! কাজের জন্যে জীবনের বড় সম্পদই তারা দিয়েছে!

"ওরা তরুণ। কিন্তু কি আত্মসংযম!

"'...অবশেষে নদী পেলাম। মরা নদী। বরফে ঢাকা। ঠাণ্ডা বাতাস। যেখানে ছিলাম সেখানে থাকলেই বোধ হয় ভালো করতাম। মনে করেছি, ওরা আমাদের খোঁজ নিচ্ছে। নিশ্চয়ই, তারা খোঁজ করেছে। ওরা আমাদেরকে তেইগায় নিশ্চয়ই ফেলে রাখবে না। যা যা হলো, তার জন্যে আমরা দায়ী।

"..সব শেষ বোধ হয় আমার। ডান পা জমে গেছে। আর মাত্র তিন বাক্স ম্যাচ আছে। আমার এখন একমাত্র চিন্তা, ম্যাপটাকে জনপদের কাছে নিয়ে যাওয়া।

"আমার সাথে ম্যাপটা ধ্বংস হয়ে গেলে কাউকে দোষ দেয়া যাবে না। এহলো অনেকগুলো দুর্ঘটনার ফল। কিন্তু সেটা জরুরী ব্যাপার নয়। এবারকার অনুসন্ধানের সময় হীরের মতো মূল্যবান আরেকটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি আমার নিজের জন্যে। টের পেলাম, জীবন সম্বন্ধে আমার ধারনা ভুল। সব সময় ভেবেছি, কেউ যদি সত্যিকারের ভালবাসা পায়, তা হলে তাকে প্রেমিকার কাছে ফিরে যেতেই হবে। ভেরা, ভেবেছিলাম আমাদের প্রেম আদর্শ প্রেম। কিন্তু এখন হারম্যান আর টেনিয়াকে আমি ঈর্ষা করছি। তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়েছে। তাদের জীবন এক হয়ে মিশে গেছে। তাদের ভালোবাসা এতো মহান যে বাহ্যিক প্রকাশের প্রয়োজন নেই। শেষ পর্য্যন্ত তারা ছিলো। ভালোবাসার বলেই তারা কর্তব্য সম্পাদন করে গেছে।

"কিন্তু আমার বেলা তা হয়নি। প্রায় প্রত্যেকদিন তোমাকে আমি লিখেছি, সব সময় তোমার কথা বলেছি। কিন্তু এতো সুখ নয়, সান্ত্বনা মাত্র।

"অনেকবার তোমায় বলেছি উত্তরের এখানে আমার সাথে আসতে, ভেরা। তোমাকে কাছে পেতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি আসোনি। এ-সব এখন ভাবতে আমার কেমন লাগছে। অত্যন্ত নির্মম, খুব বেদনাদায়ক! এ-সব চিন্তা আমার শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে।

"ভেরা প্রিয়তমা! তোমাকে আমি এখানে চাই, অন্য কোথাও নয়। বাস্তবে তোমায় চাই, স্বপ্নে নয়! আহা যদি তুমি আমার পাশে থাকতে! যদি তোমার হাতে ম্যাপটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম!

"ম্যাপটা দেব, এমন কেউ নেই। হারম্যানের কথা ভাবছি। ওকে বড় হিংসে হয়।

"জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি...আর ফিরে পেলাম। লিখছি। আর কিছু করতে পারিনা। হারম্যানকে হিংসে করছি। ওর আর টেনিয়ার প্রশংসা করছি। আমাদের জন্যে সাহসের সাথে ওরা জীবন দিয়েছে। মহৎ প্রেমিক।

"এতো সহজে থামবো না। হামাগুঁড়ি দিয়ে হোক, গড়িয়ে হোক সামনে যাবো আমি...

"এই আমার শেষ চিঠি...

"না এখনো আমি বেঁচে আছি। ম্যাপটা নিয়ে কি করি? তারা এটার জন্যে বসে আছে। কে তাদেরকে দেবে? কে?

"কে তাদেরকে দেবে ম্যাপটা? হয়তো এই আমার শেষ প্রশ্ন...

"...মরিনি। হামাগুঁড়ি দিয়ে সামনের দিকে চলেছি। হয়তো আমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো। পেন্সিলটা ধরে রাখতে পারছি না। লেখার অভ্যেস কমে গেছে। দু'লাইন লিখে আবার হামাগুঁড়ি দিই। খাওয়ার চেয়ে লিখছি বেশী। লেখা কমবে, জীবনের শেষ আসবে...

"তাঁবুর মতো কি দেখছি। আমাকে আর ম্যাপটাকে খুঁজে পাওয়া সহজতর হবে...

"কণ্ঠস্বর শুনলাম। কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। না, কিছু না। তাবুতে ফিরে গেলাম। বেশ গরম। আগুন নিভে আসছে। ম্যাচবাতি নেই। আহা, ভেরা, এখন তোমাকে আমি চাই! স্ত্রী, সাহায্যকারিণী হিসেবে, খেলার জিনিষ হিসেবে নয়। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

"ম্যাপটা অনুভব করলাম। সাথেই আছে।

"ভেরা, টেনিয়ার মা'র খোঁজ নিয়ো...তাঁকে চিঠি দিয়ো...হারম্যানের খোঁজ ও...

"যা ঘটলো তার জন্যে আর কেউ নয়, আমিই দায়ী।"

পূর্ব-পাকিস্তানের সামুদ্রিক সম্পদ

ডাঃ হামিদুর রহমান

সমুদ্র যেমন বিশাল, ইহার মধ্যে লুক্কায়িত ধনসম্পদও সেইরূপ অগাধ। আমাদের উপকূলভাগে এত কাঁচা মাল পড়িয়া আছে, যাহা আহরণ করিতে পারিলে ও কাজে লাগাইতে পারিলে, দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসিবে এবং বহু লোকের খাওয়া পরার সুরাহা হইবে।

কর্ণফুলী নদীর মোহনা হইতে আরম্ভ করিয়া নাফ নদীর মধ্য ভাগ—এই দুই শত মাইল ব্যাপিয়া সমুদ্র উপকূলের মধ্যে জলে-স্থলে বহু মূল্যবান সম্পদ রহিয়াছে। মইশখালী, সোনাদিয়া, কুতুবদিয়া, সাহা পরীর দ্বীপ এবং সেণ্ট মার্টিন্ দ্বীপের আশেপাশের অগভীর পানিতে হাঙ্গর, রূপচান্দা, ভেট্‌কী, কালিকাদা, ছুরী মাছ ইত্যাদি ছাড়াও প্রায় দুইশত রকমের সুন্দর সুন্দর ঝিনুক, শামুক ও কড়ি বিচরণ করে। তা ছাড়া ঐ সব দ্বীপের আশে-পাশে মুক্তাগর্ভ ধারিণী ঝিনুকও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধ ভাবে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব উদ্ধার করিতে পারিলে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তা পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নাফ নদী পূর্ব দিকে পাকিস্তানকে ব্রহ্ম দেশ হইতে আলাদা করিয়াছে। নাফ খুবই পাগলা নদী। ইহাতে এত বড় মাছ আছে যে বলিয়া শেষ করা যায় না। টেক্‌নাফ্ পূর্বদিকে আমাদের সর্বশেষ থানা। এখান হইতে নাফ নদী দক্ষিণ পূর্বে আরও অন্তত: ২৫ মাইল দূরে সাগরে মিলিত হইয়াছে। নদী হইতে মূল ভূমি পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত চর। এই চরে বেশ বড় বড় একপ্রকার ঝিনুক পাওয়া যায়। ঝিনুকগুলি বালির নীচে ডুবিয়া থাকে, এই জাতের ঝিনুক দেখিতে বেশ সুন্দর ও ওজনে ভারী, গভীর খাদবিশিষ্ট। এইগুলি পুড়াইয়া উৎকৃষ্ট চুণ প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ ঝিনুক কাঠের টুকরায় বসাইয়া চমৎকার ছাইদানী তৈয়ার করা যায়।

প্রতি জোয়ারের সময় বিস্তৃত চরে বালির উপর সমুদ্রের ঢেউ যে সব সুন্দর সুন্দর নানা রঙ্গের ঝিনুক, শামুক ও কড়ি ফেলিয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া সহরে, বন্দরে শো কেস্ করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ লাভ হইবে। এই ঝিনুকগুলির রং ও আকৃতি খুবই আকর্ষণীয়, বিশেষ করিয়া শিশুদের জন্য, ক্ষণস্থায়ী প্লাষ্টিকের খেলনার চেয়ে অনেক ভাল। কতকগুলি শামুক বেশ বড়—যাহার মধ্যে বৈদ্যুতিক ভাল্‌ব লাগাইয়া টেবিল বাতি তৈয়ার হইতে পারে। দেশ-বিদেশে ইহার খুব চাহিদা। উপকূল ভাগে ও নদীর মোহনাগুলিতে নানা রঙ্গের ছোট বড় মাছ দেখা যায়। এর মধ্যে তারা মাছ (Star fish), পাতা মাছ (Leaf fish), ঘোটক (Sea Horse) বেশ আকর্ষণীয়। জীবিত অবস্থায় ধরিয়া অন্যান্য দেশের মত 'একরিয়ামে' রক্ষা করিতে পারিলে শিশুদের জন্য শিক্ষনীয় হইতে পারে।

পূর্বপাকিস্তানের সর্ব্বশেষ দক্ষিণ পূর্বের মূল ভূমি হইতে প্রায় ১৪ মাইল সমুদ্রের ভিতর সেণ্ট মার্টিন নামে একটী দ্বীপ আছে। ইহা দৈর্ঘে প্রায় কয়েক মাইল এবং পাশে অর্দ্ধ মাইলের মত। এই দ্বীপের চারি পার্শ্বের চরে ও সমুদ্রে বড় বড় পাথরের ঢেলা দেখা যায়। এই পাথরগুলির প্রায় ৫০ ভাগ চুণা দ্বারা গঠিত। অল্পদিন পূর্বে বিলাতী মাটির বিশেষজ্ঞগণ এই দ্বীপে সিমেণ্ট কারখানা খোলা যায় কিনা, তাহার সম্ভাবনা পরীক্ষা করিতে যান। তাঁহাদের মতে সেণ্ট মার্টিন দ্বীপ একটী বিলাতী মাটির পাহাড়ের উপর স্থাপিত। পাঁচ ছয় ফুট মাটি খুঁড়িলে শীলা পাওয়া যায়। দ্বীপে ২৫।৩০ ঘর নোয়াখালীর বাসিন্দা আছেন। সেণ্ট মার্টিন্ দ্বীপের আশেপাশে প্রবাল কীটের পাহাড় দেখা যায়। কক্স বাজারে কোন কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবালের অংশবিশেষ দেখা যায়। প্রবাল কীটের পাহাড় খুবই মূল্যবান দ্রব্য। ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেণ্ট মার্টিন দ্বীপে নারিকেল, সুপারী, পিয়াজ, রসুন খুব ভাল উৎপন্ন হয়। আকিয়াব ও তাহার পূর্ব দিক হইতে যে সব সওদাগর কক্স বাজার ও চাটগাঁও ব্যবসায় করিতে নৌকায় আসেন, তাঁহারা এই দ্বীপে পানীয় জল সংগ্রহ করেন এবং এক আধ দিন নৌকা লাগাইয়া বিশ্রাম করেন। অনেক সময় অধিক ঢেউ ও ঝড়ের দরুণও এই দ্বীপে নৌকা ভিড়াইতে বাধ্য হন। দ্বীপের আশে পাশে চোরা পাহাড় গাত্রে ধাক্কা খাইয়া নৌকা ডুবিও কম হয় না। দ্বীপবাসীরা ডুবাইয়া মাল ও নৌকা উদ্ধার করেন। এই দ্বীপে ভাল ডুবুরী আছে। সময় সময় বর্ম্মার জলদস্যুরা দ্বীপবাসীদের উপর হামলা করিয়া ধনসম্পদ নিয়া যায়। এই দ্বীপের শাসনকর্তা একজন চৌকিদার মাত্র। টেকনাফ্ থানায় খবর নিয়া দেখা যায় যে স্থানীয় কোন মোকদ্দমার আসামী হিসাবে দ্বীপবাসীরা কখনও থানায় হাজির হয় নাই। এই দ্বীপের লোকের কোন দ্রব্যের অভাব হয় না।

ভূ-তত্ত্ব বিভাগীয় কর্মচারিগণ সেণ্ট মার্টিন দ্বীপ পরিদর্শন করার পর বলেন যে, বিলাতী মাটি প্রস্তুত করার উপযুক্ত যথেষ্ট পাথর এই দ্বীপে বর্তমান। তাঁহারা আরও

বলেন যে, এই দ্বীপে যে পরিমাণ পাথর আছে, তদ্বারা একটী কারখানা অনেক বৎসর চলিতে পারে ও হাজার হাজার টন সিমেন্ট তৈয়ার হইতে পারে।

কর্ণফুলী ও নাফ্ নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ এলাকার উপকূল ভাগের জলে, নদীর মোহনায়, প্রণালী ও খালের মুখগুলিতে কমছে কম শত রকমের মাছ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে হাঙ্গর বিশেষ স্থান দখল করিয়া আছে। হাঙ্গরকে (Shark Fish) সমুদ্রের ব্যাঘ্রও বলা হয়। মানুষ যেদিন হইতে সমুদ্রে ভাসিতে শিখিয়াছে সেইদিন হইতে হাঙ্গর মানুষের মহাশত্রু হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন কাল হইতে মানুষ ও হাঙ্গরের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্র যাত্রা কালে নাবিকগণ হাঙ্গর দেখিলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে ও ইহাকে মারিতে চায়। অনেকে হয় ত দেখিয়া থাকিবেন জাহাজের দুই পাশে দলে দলে হাঙ্গর চলিতেছে। ইহারা জাহাজের সমান গতিতে চলিতে পারে। জাহাজ হইতে কোন দ্রব্য জলে পড়িলে হাঙ্গর তাহা ধরিয়া ফেলে, সে কাঠের টুকরাই হউক আর ছাগলের শুকনা হাড়ই হউক। জীবিত কি মৃত—স্থল ও জলচর প্রাণী মাত্রই হাঙ্গরের ভোজ্য। সুযোগ পাইলে নিজের জাত ভাইকেও ছাড়ে না। সমুদ্রের কোন প্রাণীই ইচ্ছা করিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে আসে না। দলবদ্ধ ভাবে হাঙ্গর তিমি ও জলহস্তিকেও আক্রমণ করিতে কসুর করে না। জীবিত তিমি ও জলহস্তি হইতে কামড় দিয়া মাংসের দলা নিয়া যায়। ইহাদের দাঁত এত ধারাল যে মস্তিকে বেদনার অনুভূতি পৌঁছিবার পূর্বেই শরীর হইতে পা ও মাংসের টুকরা খসিয়া যায়। হাঙ্গর চলাচলের পথে কোন মানুষ পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই। মুহূর্তের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলে।

পৃথিবীর সমুদ্রে প্রায় ৫০০ জাতের হাঙ্গর দেখা যায়। হাঙ্গর কয়েক সের হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক মণ পর্যন্ত ওজন হয়। গড়ে ৪০ফুট লম্বা হয়। বছর দুই পূর্ব মহিশখালী দ্বীপে ষোল মণ ওজনের একটী হাঙ্গর ধরা পড়ে। উহার কলজের ওজন ছিল ৪০ সের, কলজে হইতে ২০ সের তৈল পাওয়া গিয়াছিল। হাঙ্গর অন্যান্য মাছের মত ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয়। মাদী হাঙ্গর একসঙ্গে ৬ হইতে ১৪টী বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চাগুলি জন্ম হইতে সাঁতার কাটিতে পারে। বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ের সাথে বিচরণ করে। পিতা সুযোগ পাইলে ইহাদের খাইয়া ফেলিতে চায়। স্ত্রী হাঙ্গরের গর্ভধারণের সময় হইলে বেশ কয়েকটী পুরুষ হাঙ্গর ইহার পিছনে লাগিয়া যায়। এই সময় স্ত্রী হাঙ্গর আর পুরুষদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে ; যে শক্তিশালী সেই জয়ী হয় ও স্ত্রীকে ভোগ করে। এই যুদ্ধে অনেক সময় দুই একটী পুরুষ হাঙ্গর মারা যায়। মারা গেলে স্ত্রী হাঙ্গরগুলি ইহাদের খাইয়া ফেলে। স্ত্রী হাঙ্গর সাধারণতঃ শক্তিশালী পুরুষ হাঙ্গরের পেছনে ঘুরে।

হাঙ্গর শিকার একটী লাভজনক ব্যবসা। কক্স বাজার এবং আকিয়াব এলাকার মগ জেলেরা অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে মহিশখালী, সোনাদিয়া ইত্যাদি দ্বীপে গিয়া খলা বাঁধে ও জুন মাসের প্রথম দিকে বর্ষা আরম্ভ হইলে বাড়ী ফিরে যায়। ইহারা জাল দিয়া বাহির সমুদ্রে গভীর রাত্রে হাঙ্গর শিকার করে। রাত্রে হাঙ্গর শিকার যেমন দুঃসাহসের কাজ, তেমনি বিপদ-জনক। জালে আটকায়া গেলেও করাত দিয়া হাঙ্গরগুলি জেলেদেরকে আঘাত করিতে চায়। রাতভর জেলেরা হাঙ্গর শিকার করে, প্রাতে নৌকা বোঝাই করিয়া চরে নিয়া আসে। এইগুলিকে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া বাঁশে বা দড়িতে ঝুলাইয়া শুকাইয়া নেয়। মুসলমান জেলেরা সাধারণতঃ বড়শী দিয়া হাঙ্গর ধরে। বড়শীতে মোটা সিল্কের সূতা বাঁধে এবং টোপ দেয় কাদার কুচিয়া। এইগুলি হাঙ্গরের অতি উপাদেয় খাদ্য। বড়শীতে কোন হুইল ব্যবহার করে না। বড়শী দ্বারা হাঙ্গর ধরা অত্যন্ত আমোদজনক। তিনশত বিশ সের ওজনের একটী হাঙ্গর বড়শীতে আটকাইলে যে কি আমোদ, সে শুধু শিকারীরাই জানে! মুসলমানগণ জানা অবস্থায় হাঙ্গরের শুটকী খায় না। এই শুটকী মগদের অতি উপাদেয় খাদ্য। এই শুটকী বর্মা এবং তারও পূর্ব দিকে চালান দেওয়া হয়।

হাঙ্গরের কোন অংশই অন্য দেশে বাদ যায় না। নাড়িভূড়িগুলি পর্য্যন্ত শুকাইয়া রাখা হয়। ইহা ছাড়া নানা উপায়ে দশ বার রকমের শিল্পজাত দ্রব্য হাঙ্গরের চর্ম ও হাড় হইতে প্রস্তুত হয়। কলিজা হইতে যে তৈল পাওয়া যায় (Shark Liver Oil) তাহাতে 'কডলিভার তৈল' হইতে প্রায় ১০ গুণ বেশী ভিটামিন 'ডি' বর্তমান। হাঙ্গরের তৈল টনিক ও সাবান প্রস্তুতের কাজে লাগে। চর্ম হইতে লেদার, সার ও সুন্দর সুন্দর হাত ব্যাগ প্রস্তুত হয়। ইহার চর্ম বাছুরের চর্মের চেয়ে অনেক গুণ বেশী টেকসই হয়। চর্ম দেখিতে খুবই উজ্জল ও চকচকে। ইহার শিরদাঁড়া হইতে সুন্দর লাঠি প্রস্তুত হয়। দাঁত-গুলিকে ঘসাইয়া মেয়েদের অলঙ্কার প্রস্তুত করা যায়।

উপকূল ভাগের দ্বীপগুলির চরে আট দশটী হাঙ্গর ধরার খলা আছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র মহিশখালী খলা হইতে মৎস্য বিভাগ ও অন্য দুই একটী পার্টি সার্ক মাছের তৈল সংগ্রহ করে। অন্য খলাগুলিতে তৈল সংগ্রহ

করার কোন বন্দোবস্ত নাই। তাই সেখানে কলিজাগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। মহিশখালী হইতে কেবল মৎস্য বিভাগই প্রতি মাসে ২৬—৩০ টিন তৈল ৪০৲ টাকা মণ দরে কিনে আনে। এই তৈল শোধন করার পর চার টাকা সের হিসাবে বিক্রয় করা হয়। জেলেরা বলেযে, শতকরা ৭০ ভাগ তৈল ফেলেদেওয়া হয়। থলাগুলি মূল ভূমি হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া দেশী নৌকা দ্বারা যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। যান্ত্রিক নৌকার বন্দোবস্ত হইলে ও নিকটে কোন কারখানা বসাইতে পারিলে, হাঙ্গর হইতে আরও বহু মূল্যবান শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বর্তমানে হাঙ্গরের গোস্ত বাদে আর কোন অংশই আমাদের জেলেরা কাজে লাগাইতে পারে না।

সন্ধ্যামণির গীতি

অমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

সন্ধ্যামণির কপোল তলে
চাঁদের আলো দেয় চুমো।
পাগলা হাওয়া কেঁদে বলে,
সোনার মেয়ে ঘুমো ঘুমো॥
শিউলি ঝরে চিতার ’পরে
জোনাই কাঁদে প্রদীপ ধরে
বন পাপিয়া খুঁজে বেড়ায়—
আয়—আয়—আয়—
জাগো জাগো সন্ধ্যামণি দিন যে বয়ে যায়॥

ঝড় এসেছে, সন্ধ্যামণির
মুকুলগুলো গেছে ঝরে,
প্রদীপ জ্বালার সময় হলো
হাস্‌বে কুসুম কেমন ক’রে?

কান্না-হাসির মায়ার গীতি,
শেষ করেছে ফুলের বীথি
সবার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়
আঁখির জলের ঘায়,
সন্ধ্যামণি কেঁদে বলে, ‘মুখ দেখানো দায়॥’

ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

দার সারা

দিল্লীতে সুলতান মাহমুদের যে প্রাসাদ তা' দার সারা নামে পরিচিত। দার সারার দরওয়াজা ছিল অনেক গুলি। প্রথম দরওয়াজায় থাকত দ্বাররক্ষীর দল, তার একটু দূরে জয়ঢাক ও শানাই বাদকেরা। এদের কাজ হল যখন কোন আমীর ওমরাহ বা বিখ্যাত কোন ব্যক্তি দরবারে আসেন তখন নিজের নিজের বাজনা বাজানো এবং আগন্তুকের নাম ঘোষণা করা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরওয়াজায় ঠিক একই ব্যবস্থা। প্রথম দরওয়াজার বাইরে আছে কয়েকটি বেদী। বেদীর উপরে মোতায়েন থাকে একদল জল্লাদ। তাদের ভিতর নিয়ম হল, বাদশাহ কারও প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে দরবার গৃহের সামনে। সেখানেই তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। প্রাণ-দণ্ডের পরে লাশটি সেখানেই তিনরাত্রি ফেলে রাখা হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরয়াজার মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রকাণ্ড বেদীর উপরে বসে প্রধান নকিব। নকিবের হাতে সোনার রাজদণ্ড। মাথায় স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত পাগড়ী। পাগড়ীর উপরে ময়ূরের পালক। দ্বিতীয় দরওয়াজা দিয়ে এগিয়ে গেলেই সুবিস্তৃত দরবার গৃহ। দর্শকদের বসবার নির্দিষ্ট স্থান।

তৃতীয় দরওয়াজায় যে বেদী আছে তাতে বসে লেখক বা মুন্সীগণ। সুলতানের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ যাতে এ-দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা মুন্সীদের একটি প্রধান কাজ। অনু-মতি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কর্মচারীদের কে কে আসবে তারও নির্দেশ সুলতানই দেন। এই দরওয়াজায় কেউ এলেই মুনশীরা তৎক্ষণাৎ তার পরিচয় এবং আগমনের সময় লিখে রাখে। সাধারণতঃ মাগরেবের নামাজের পরে সুলতান এ-গুলো দেখেন। মুনশীদের আরেকটি কাজ হল, প্রাসাদে যারা অনুপস্থিত থাকে তাদের হিসেব রাখা। সুলতানের অনুমতি নিয়ে অথবা বিনা অনুমতিতে প্রাসাদের কেউ যদি তিন দিন বা তার বেশী অনুপস্থিত থাকে তবে পুনরায় অনুমতি লাভের আগে প্রাসাদে ঢুকতে পায় না। যদি কেউ অসুস্থতা বা অন্য কোন অজুহাত দেখায় তবু নিজের ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসতে হয় সুলতানের জন্য।

হাজার-উসতান

তৃতীয় দরওয়াজা পার হয়েই আরেকটি প্রকাণ্ড দরবার গৃহ। এটির নাম হাজার উস্তান বা হাজার স্তম্ভ। স্তম্ভ গুলির সবই কাঠের তৈরী। স্তম্ভের মাথায় কাঠের কারুকার্য খচিত সুদৃশ্য ছাদ। ছাদের নীচেই বসে সুলতানের আ'ম দরবার।

দরবার

সাধারণ নিয়মানুযায়ী সুলতানের দরবার বসে অপরাহ্নে; কিন্তু অনেক সময় সকালের দিকেও তিনি দরবার ডাকেন। একটি ছোট বেদীর উপরে সাদা কার্পেট বিছানো, তারই উপর সুলতানের মসনদ। পায়ের উপর পা রেখে তিনি বসেন। তাঁর পাশে দু'টি আর পেছনে একটি প্রকাণ্ড তাকিয়া। সুলতান আসন গ্রহণ করলে উজির-দাঁড়ান তাঁর সামনে, তারপরে পদানুসারে অন্যান্য কর্মচারীরা। তখন নকিবরা উচ্চেস্বরে 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করে। প্রায় শতেক শান্ত্রী এসে দাঁড়ায় সুলতানের ডাইনে আর শতেক দাঁড়ায় বামে। তাদের কারো হাতে থাকে ঢাল, তলোয়ার, কারো হাতে তীর-ধনুক। অন্যান্য কর্মীরাও ডাইনে ও বামে সারি বেঁধে দাঁড়ায়। তারপর রাজকীয় সাজে সাজিয়ে সেখানে আনা হয় ষাটটি ঘোড়া। ঘোড়া-গুলির অর্ধেক দাঁড় করানো হয় ডাইনে, অর্ধেক বামে। তারপরে আনা হয় পঞ্চাশটি হাতী। হাতী গুলির পিঠে রেশমী বস্ত্রের আচ্ছাদন। দাঁত মোড়ানো হয়েছে লোহা দিয়ে। হাতীর এই লোহা বাঁধানো দাঁত দিয়ে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের হত্যা করা হয়। প্রতিটি হাতীর উপরে একজন করে মাহুত। মাহুতের হাতে ছোট কুঠার জাতীয় একটি লোহার অস্ত্র। হাতীর পিঠে প্রকাণ্ড সিন্দুকের মত একটি বস্তু। এর ভিতর কমবেশী কুড়িজন যোদ্ধা অনায়াসে থাকতে পারে। এই হাতী গুলিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মাথা নত করে সুলতানকে যথারীতি কুর্নিশ করতে। হাতী গুলি যখন একযোগে সুলতানকে কুর্নিশ করে, নকিব, নায়েব ও দেওয়ান প্রভৃতি কর্মচারীরা তখন পুনরায় উচ্চেস্বরে 'বিসমিল্লাহ্' বলে উঠে। এরপর একে একে লোকজন এসে যখন নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ায় নকিবরা তখনও 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে। আগন্তুকের পদ মর্যাদানুসারে বিস্‌মিল্লা বলার সুরের উচ্চতা বাড়ানো বা কমানো হয়। বিধর্মী কেউ এসে যদি সুলতানকে কুর্ণিশ জানায় তাহলে নকিবেরা বিস্‌মিল্লাহ্‌র পরিবর্তে বলে ওঠে, 'খোদা তোমাকে সুপথে চালিত করুন।'

যদি সুলতানের জন্য কোন উপঢৌকন নিয়ে কেউ দরওয়াজায় এসে হাজির হয়, নকিবরা তখন সুলতানকে গিয়ে সে খবর পৌছায়। সুলতানের কাছে পৌছতে তিন জায়গায় তিনবার তাদের কুর্ণিশ জানাতে হয়। আগন্তককে নিয়ে যাবার হুকুম পেলে প্রথমে একজন পরিচারকের হাতে উপঢৌকনের বস্তু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিচারক সেগুলি নিয়ে সুলতানের কাছে দাঁড়ায়। এরপর সুলতান আগন্তককে কাছে ডাকেন। আগন্তককেও যেতে যেতে তিনবার কুর্ণিশ জানাতে হয়। তাকে সর্বশেষ আরেকবার কুর্ণিশ করতে হয় সুলতানের কাছে পৌছে। সুলতান তখন অত্যন্ত আদর সহকারেই আগন্তককে সম্বোধন করেন ও যথারীতি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। আগন্তুক তেমন উপযুক্ত পাত্র হলে সুলতান তাঁর সঙ্গে মোসাহেফা করে বা আলিঙ্গন দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। পরে উপঢৌকনের জিনিষগুলি হাত দিয়ে নেড়ে দেখে নিজের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেন; এবং উপঢৌকন দাতাকে উৎসাহিত করেন। সুলতান আগন্তুকদের অনেক সময় সম্মানসূচক পোষাক দান করেন এবং সেই সঙ্গে কিছু নগদ অর্থও দিয়ে থাকেন।

নগর প্রত্যাবর্তন

সুলতান যখন কোনো দেশ ভ্রমনের পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর হাতীগুলিকে সাজানো হয় সুন্দর করে। ষোলটি হাতীর উপরে রঙ্গীন রেশমী ষোলটি ছাতা। ছাতা গুলি সোনা ও জহরতের কারুকার্য্যখচিত থাকে। পথের স্থানে স্থানে তৈরী করা হয় কয়েকতলা উচু কাঠের মঞ্চ। মঞ্চ গুলিও মণ্ডিত করা হয় রঙ্গীন রেশমী বস্ত্র দিয়ে। মঞ্চের প্রত্যেক তলায় নৃত্যরত সুসজ্জিত নর্ত্তকীর দল। প্রত্যেকটি মঞ্চের মধ্যস্থানে চামড়ার তৈরী জলাধার। তার ভিতর রাখা আছে সুপেয় সরবৎ। দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সবাইকে সরবৎ পান করতে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিতরণ করা হয় পান সুপারী। দুই সারি মঞ্চের মধ্যবর্তী পথেও কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। সুলতানের অশ্ব তার উপর দিয়েই যায়। পথের দুপাশের বাড়ীর দেয়াল গুলিতেও রঙ্গীন কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নগরের প্রবেশদ্বার থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদ পর্য্যন্ত এভাবে সাজানো হয়। সুলতানের গোলামদের থেকে বাছাই করা একদল পদাতিক মিছিলের সম্মুখভাগে চলতে থাকে। তাদের সংখ্যা হবে কম করেও কয়েক হাজার। মিছিলের পেছনে থাকে জনসাধারণ এবং সৈন্যদল।

একবার সুলতানের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় দেখেছিলাম হাতীর পিঠে রাখা হয়েছে তিন চারটি গুলতি (catapults)। সুলতানের রাজধানীতে পদার্পনের সময় থেকে শুরু করে প্রাসাদে প্রবেশ পর্য্যন্ত সর্বক্ষণ সেই গুলতির সাহায্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নিক্ষেপ করা হচ্ছে দর্শক জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে।

সুলতানের দানশীলতা ও উদারতা

এখন আমি সুলতানের দানশীলতা ও উদারতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

শেহাব উদ্দিন ছিলেন কাজারুণের একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর। সে সময়ে আল-কাজারুণী নামে ভারতেও একজন খ্যাতনামা সওদাগর ছিলেন। দুজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আল কাজারুণীর দাওয়াত পেয়ে একবার শেহাবউদ্দিন এলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সুলতানের জন্য মূল্যবান উপহার সমগ্রী তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। দুইবন্ধু উপহারের জিনিষপত্র নিয়ে সুলতানের কাছে আসবার পথে একদল বিধর্মীর দ্বারা আক্রান্ত হন। বিধর্মীরা আল-কাজারুণীকে পথেই হত্যা করে এবং সমস্ত মালপত্র অপহরণ করে। সওদাগর শেহাবউদ্দিন কোন রকমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। তাই লুণ্ঠন ও নরহত্যার সংবাদ কানে যেতেই সুলতান শেহাবউদ্দিনকে ত্রিশ হাজার দিনার দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দিতে হুকুম করলেন। কিন্তু সওদাগর শেহাবউদ্দিন তাতে রাজী হলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, আমি এজন্য আসিনি। আমি এসেছিলাম মহামান্য সুলতানকে দর্শনের বাসনা নিয়ে। শেহাবউদ্দিনের কথা পুনরায় সুলতানকে লিখে জানানো হলো। সুলতান পরম সন্তুষ্ট হয়ে হুকুম করলেন শেহাবউদ্দিনকে সসম্মানে দিল্লীতে নিয়ে আসতে। শেহাবউদ্দিন দিল্লী পৌছে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি তাঁকে মূল্যবান উপহার দিয়ে সমাদর জানালেন। তারপরে কয়েক দিন শেহাবউদ্দিনকে অনুপস্থিত দেখে সুলতান তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শুনা গেল তিনি অসুস্থ। সুলতান একথা শুনেই তাঁর একজন পারিষদকে হুকুম করলেন খাজাঞ্চীখানা থেকে এক লক্ষ স্বর্ণ টংগা (তঙ্কা)* বের করে শেহাবউদ্দিনকে দিতে। এ টাকা দিয়ে ভারতীয় যে কোন পণ্য কিনে দেশে নিয়ে যাবার স্বাধীনতাও শেহাবউদ্দিনকে দেওয়া হলো। সুলতান হুকুম দিলেন, শেহাবউদ্দিনের সওদা কিনা শেষ হবার আগে সে সওদা আর কেউ যেনো না কিনে। তাছাড়া সম্পূর্ণ লোক লস্কর ও সাজ সরঞ্জাম

* এক টংগা মরক্কোর আড়াই দিনারের সমান

সহ তিনখানা জাহাজও সুলতান মঞ্জুর করলেন শেহাব-উদ্দিনকে পৌছে দিতে। শেহাবউদ্দিন হরমুজ দ্বীপে গিয়ে প্রকাণ্ড একটি গৃহ নির্মান করলেন। আমি পরে এ-গৃহটি দেখেছিলাম এবং শেহাবউদ্দিনকেও দেখেছিলাম সর্বস্বান্ত হয়ে শিরাজের সুলতানের কাছে দান ভিক্ষা করতে। ভারতের ধন দৌলতের রীতিই ছিল এই। কচিৎ এখান থেকে ধন দৌলত নিয়ে কেউ স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। যদি কখনও কেউ ধন দৌলত নিয়ে যায়ও তবে এমন এক বিপদে সে পড়বে যার ফলে অচিরেই তাকে যথাসর্বস্ব খোয়াতে হবে। হরমুজের বাদশাহ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে এক গৃহ বিবাদের ফলে শেহাবউদ্দিন সবকিছু ছেড়ে হরমুজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ডাক্তার শামসউদ্দিন ছিলেন একাধারে দার্শনিক এবং স্বভাব কবি। তিনি একবার সুলতানের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা রচনা করলেন। কবিতাটিতে ছিল সাতাশটি স্তবক। সুলতান প্রতিটি স্তবকের জন্য কবিকে এক হাজার রৌপ্য দিনার পারিতোষিক দিলেন। এর আগে এ-ধরনের কাব্যরচনার জন্য কোন সুলতানই এত বেশী টাকা পারিতোষিক দেন নাই। তাঁরা সাধারণতঃ দিয়েছেন একটি কবিতার জন্যে এক হাজার দেহ্‌রাম অর্থাৎ বর্তমান সুলতানের দানের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ। শিরাজে সাজউদ্দিন নামে একজন কাজী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও ধর্মপ্রাণতার খ্যাতি শুনে সুলতান তাঁকে দশ হাজার রৌপ্য দিনার পাঠিয়ে দেন। এ ছাড়া সমরখন্দের নিকটে সাগার্জ নামক এক জায়গায় বোরহান উদ্দিন নামে একজন ধর্মপ্রচারক ও ইমাম ছিলেন। তিনি অর্থব্যয়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত উদার। অনেক সময় তিনি নিজের যথাসর্বস্ব ব্যয় করে বসে থাকতেন এবং অপরকে কিছু দেবার প্রয়োজন হলে অনায়াসে ঋণ গ্রহণ করতেন। সুলতান ইমাম বোরহান উদ্দিনের কথা শুনে তাঁকে চল্লিশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে দিল্লীতে আগমনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। ইমাম পারিতোষিক গ্রহণ করে নিজের ঋণপরিশোধ করলেন কিন্তু সুলতানের কাছে এসে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। বলে পাঠালেন, "যে সুলতানের সম্মুখে গিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমি সে সুলতানের কাছে যেতে রাজী নই।"

ভারতের একজন আমীর একবার কাজীর দরবারে নালিশ করলেন, সুলতান তাঁর ভাইকে বিনা কারণে হত্যা করেছেন। সুলতান নিরস্ত্র অবস্থায় পদব্রজে গিয়ে কাজীর দরবারে হাজির হলেন এবং যথারীতি কাজীকে অভিবাদন করলেন। সুলতান কাজীকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন দরবারে সুলতানের উপস্থিতিতে দণ্ডায়মান না হতে। কাজেই সুলতান কাজীর সম্মুখে সাধারণ আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কাজী সুলতানের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন না। তাঁকে মামলায় রায় দিতে হলো সুলতানের বিরুদ্ধে। সুলতান সে রায় বিনাদ্বিধায় মেনে নিলেন এবং রায়ের মর্মানুসারে ফরিয়াদীকে সন্তুষ্ট করে বিদায় করলেন। আরেকবার একজন মুসলমান সুলতানের কাছে টাকা পাবে বলে নালিশ করলো। কাজী সুলতানের বিরুদ্ধে ডিগ্রি দিলেন এবং সুলতান ডিগ্রির টাকা পরিশোধ করলেন।

একবার ভারতে ও সিন্ধুতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক মণ গমের দাম হলো ছয় দিনার। সুলতান হুকুম দিলেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বা আমীর-ফকির নির্বিশেষে দিল্লীর প্রতিটি অধিবাসীকে ছয় মাসের আহার্য রাজকীয় শস্য-ভাণ্ডার থেকে খুলে দিতে। রাজকর্মচারীরা দিল্লীর অধিবাসীদের নামের তালিকা করে ফেললো। সবাই দলে দলে এসে ছয় মাসের বরাদ্দ আহার্য নিয়ে যেতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

বিয়ের গীতি

রায়হান উদ্দিন সরকার

প্রাচীন কাল থেকে বাংলার নিভৃত পল্লী অঞ্চলের সরল লোকদের আনন্দ জাগানোর অনুকূলে পল্লীগীতি নামক এক শ্রেণীর গীতির প্রচলন হয়ে আসছে। কোন পর্ব্বাদি এবং বিবাহ ব্যাপারেই এই গীতগুলি বেশীর ভাগে গীত হয়ে হয়ে থাকে।

পল্লীর জানানা মহলে এই গীতগুলি বিশেষ আনন্দ এবং সুন্দর পরিবেশে গীত হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত গীতি কয়েকটি উত্তর বাংলার, বিশেষ করে রংপুরের বিয়ে বাড়ীর গীতি। সাধারণতঃ বয়জ্যেষ্ঠ স্ত্রীলোকেরাই এই গীতিগুলি গেয়ে থাকেন। গ্রামের লোকেরা আবার তাদেরকে 'গীদালী' বলে অভিহিত করে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে এই সব গীতের কতটুকু প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আজ আমাদের বিচার করতে হবে।

॥ এক ॥

চৈতে গাড়নু গুয়া বৈশাখে ধরে
আগা বাধা গুয়া মোর
সরকারে নেখে গো
সরকারে নেখে !
রংপুরের বাজারে কিসের হুড়াহুড়ি
দামানের মাও গো খাইছে গুয়া
নাই দেয় মোক কড়ি গো
নাই দেয় মোক কড়ি।
রিক্সা হতে নামিল দামান
জোড় হাত করি
ছাড়িয়া দেও শাশুড়ী মাওক
আমি দিমো কড়ি।

[দামান—বর। কড়ি—আগে পয়সার পরিবর্তে ব্যবহৃত হত]

[দুই]

পান নাইরে, দামানের মাও
মোক কি কবার নাগে না
ভাটি কাটিনু হয়ঃ আটি বান্ধিনু হয়,
পান ধরিয়া আসিনু হয়।
গুয়া নাইরে দামানের মাও
মোক কি কবার নাগেনা
ইটা কড়ানু হয়ঃ বস্তা ড়ড়ানু হয়
গুয়া ধরিয়া আসিনু হয়।
চুন নাইরে দামানের মাও
মোক কি কবার নাগেনা
বগা ফান্দানু হয়ঃ খেবগে হাগানু হয়
চুন ধরিয়া আসিনু হয়।
চা নাইরে দামানের মাও
মোক কি কবার নাগেনা
শুখাতি ভিজানু হয়ঃ শুরুয়া করিনু হয়
বাটি ভরিয়া দিনু হয়।

[বগ—বক। শুখাতি—পাট পাছের পাতা শুকায়ে]

বর বা কণের বাড়ীতে বর বা কনেকে হলুদ দেয়ার প্রথা আছে। বর বা কণেকে হলুদ দেয়ার আগে নতুন কাপড় পরাণ হয়। তারপর বর বা কণেকে তারা (গ্রাম্য স্ত্রী-লোকেরা) ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। যেখানে হলুদ দেয়া হবে সেখানে একটা তক্তা (কাঠের বসবার) থাকে। ঐ তক্তার উপর বর বা কণেকে বসবার আগে নিম্নরূপ গীত গীদালীরা গেয়ে থাকে—

বিছমিল্লাহ বলিয়া দামান
তক্তে চড়
আল্লাহ নবীর নামে দামান
ছালাম কর
দামান—তক্তে চড়।
পয়গাম্বর পীরের নামে দামান
ছালাম কর
দামান তক্তে চড়।
দাদা দাদীর নামে দামান
ছালাম কর
দামান তক্ত চড়।
বাপ মায়ের নামে হে দামান
ছালাম কর
দামান—তক্ত চড়।

তারপর পানের পাতায় হলুদ মেখে বর বা কণের মুখে প্রথমতঃ পাঁচজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি লাগিয়ে দেয়। তার পর গীদালীরা নিম্নরূপ গীত গেয়ে থাকে—

কালা কালা কচু ঢাবা ঢাবা পাত
আয় সইরষা মায় সইরষা
হামার বাউটা ফুতিয়া খেলায়
এতু চাইটটা ভাত।

ফুতিয়া খেলাইতে না ফেলাও ভাত
আথালি পাথালি ফেলাও পাও,
আয় ক্যান গো দামানের মাও
খা ক্যানে গো মদ
একপিয়ালা খায়া দামানের মাও
ঢুলাঢুলি করে
দুই পিয়ালা খায়া দামানের মাও
ঢেউলিয়া টেউলিয়া পরে।
তিন পিয়ালা খায়া দামানের মাও
চিতর হয়া পরে।

[ঢাবা—চেপ্টা। বাউ—ছেলে। এতু—অল্প। ফুতিয়া—এক রকম খেলা]

তারপর হলুদ দেয়া হলে বরকে বরের ভগ্নিপতি (বোনের স্বামী) গোছল করাবার জন্য কোলে করে নিয়ে যায়। সেখানে গীদালীরা নিম্নরূপ গীত গেয়ে বর বা কণের মাথায় পানি ঢালতে থাকে।

পানির নোটা দামানের মাথায় টলমল করে
মরি হায়রে হায়রে
পানি পরিয়া দামানের ভিজিল পাগড়ী জোড়া
মরি হায়রে হায়
ভিজুক ভিজুক সুতার পাগড়ী
হামরা পেন্দাম বান্দা পাগড়ী
মরি হায়রে হায়।
পানির নোটা দামানের ঘাড়ে টলমল করে
মরি হায় রে হায়।
পানি পড়িয়া দামানের ভিজিল আচকান জোড়া
মরি হায়রে হায়।
ভিজুক ভিজুক সুতার আচকান
হামরা পেন্দাম সিল্কের আচকান
মরি হায় রে হায়।

রোমন্থন

বুলবুল খান মহবুব

যদিও আমার আকাশে এখন চৈতালী চাঁদ নাই,
নিশীগন্ধার মৃদু সৌরভ তবুও এখনো পাই ;
হৃদয়-বীণার তারগুলি আজ তোলেনা তো ঝঙ্কার,
তবুও কিসের সুর শুনে মন মেতে উঠে বার বার।

ফেলে আসা কোন্ স্বপ্নের ছায়া আজিও মনের দ্বারে
এসে হানা দেয়, জন-কোলাহলে মুছে যায়
বারে বারে।

জীবনের সেই দিনগুলি আজ রোমন্থনের পালা,
বুঝাতে পারিনা প্রতিদিন সই এই বুকে
কি যে জ্বালা!

যদিও আমার আকাশে এখন চৈতালী চাঁদ নাই,
তবুও হৃদয়ে থেকে থেকে বুঝি কিসের আভাস পাই॥

০ ২নং গীতিটী রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী হাসিনা বানু কর্তৃক সংগৃহীত।

জীবন-খাতার দুইটি পাতা

হাসিব চৌধুরী

॥ এক ॥

তখন আমাদের ভালবাসার বয়স হয়েছিল। রেহানাকে আমি ভালবাসতাম এবং রেহানাও আমাকে ভালবাসত। রেহানার আম্মা জানতেন; কিন্তু কিছু বলতেন না। রেহানার আব্বা হাসান সাহেব জানতেন না; কিন্তু সন্দেহ করতেন। মাঝে মাঝে রেহানার আম্মাকে তাই সমঝে দিতেন। বলতেন—

: দেখো, রেহানা এখন বয়স্থা হয়ে উঠেছে। এখন কি ওকে যার-তার সাথে মিশ্‌তে দেওয়া উচিত?

রেহানার আম্মা প্রতিবাদ করতেন, বলতেন—

: যার-তার সাথে আর মিশ্‌ছে কই? আর কে-ই বা এমন আস্‌ছে এ-বাড়ীতে?

: কেন, তুমি কি কিছুই চোখে দেখ না?

: হাসুর কথা বলছ?

: হাসুর সাথেই কি মিশ্‌তে দেওয়া উচিত?

: কিন্তু ওর সাথে যে রেহানার এতটুক কাল থেকে পরিচয়। ওরা একসাথে স্কুলে গেছে, খেলেছে, বেড়িয়েছে—

: জানি।

: তা ছাড়া, তখন তুমিও তো কিছু বলনি। বরং—

: তখন ওরা ছোট ছিল।

: এখনই বা এমন কি বয়েস হয়েছে ওদের। ওই তো ওর বয়স মাত্র সাড়ে তের। আর রানু তো সাড়ে বারো-য় পা দিয়েছে। একটু বাড়ন্ত, এই যা—

আসলে রেহানার আম্মা আমাদের বয়স একটু কমিয়েই বলতেন। তাঁর সঙ্গে হাসান সাহেবের আরও কথা হোত। কিন্তু প্রায়ই হাসান সাহেব তর্কে হেরে যেতেন। হেরে যেয়ে তাঁর রাগ হয়ে উঠত দ্বিগুণতর। তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠতেন—

: দেখো, রানুর মা, তুমি যা-ই বলো, এর পরিণাম কিন্তু ভাল হবে না। মীরপুরের সৈয়দদের অবস্থা যা-ই হোক, তাঁরা খান্দানী ঘর। কম-ঘরের মেয়ে আনলেও, কম-ঘরে তাঁরা মেয়ে দিতে পারে না মনে রেখো!

হাসান সাহেব রাগে গর-গর করতে করতে ঘর হতে বেরিয়ে যেতেন। আর রেহানার আম্মা ব্যথা-ভরা চোখ দুটো তুলে শুধু তাকিয়ে থাকতেন।

বস্তুতঃ কথা কয়টির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল। রেহানার আম্মা খান্দানী ঘরের মেয়ে ছিলেন না। এ-কথা তাঁকে এমনি করে প্রায়ই শুনিয়ে দেওয়া হোত।

কিন্তু খান্দানী ঘরের না হলেও রেহানার আম্মা ছিলেন উন্নততর পরিবেশের মেয়ে। তাঁর আব্বা-আম্মা-ভাই-বোনেরা সবাই ছিলেন সুশিক্ষিত। তাঁর কথা সব সময়ই মনে পড়ে আমার। তাঁর ছবি যেনো চোখে ভাসে। কি সুন্দর চেহারা আর লম্বা ছিপ-ছিপে একহারা গড়ন! কাঁচা-হলুদের মত টকটকে গায়ের রং! মুখে যেন হাসিটি লেগেই আছে। তাঁর কথা স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় আমার মাথা আপনিই অবনত হয়ে পড়ে। জীবনে নিজের মাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে মা বলে মনে করে থাকি, তবে তিনি একমাত্র রেহানার আম্মা! ভক্তি-বিনম্র চিত্তে চিরকাল আমি স্মরণ করব তাঁর কথা।

॥ দুই ॥

আমাদের সম্পর্কে হাসান সাহেব এবং রেহানার আম্মার মধ্যে যে কথা হোত, রেহানা তা' নিজ কানে শুনত; আমি আকার-ইঙ্গিতে বুঝতাম। অনেকদিন ভেবেছি আর যাব না ওদের বাড়ী। কিন্তু রেহানা আমাকে রেহাই দেয়নি, আর আমিও ওকে এবং ওর আম্মাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ওদের বাড়ী চলত আমার যাওয়া-আসা।

রেহানার আম্মাকে আমি চাচী আম্মা বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। আদর করে খেতে দিতেন। হাসান সাহেব বাড়ী না থাকলে রেহানাও বসত আমার পাশে। আমরা দু'জনে খেতাম। চাচী আম্মা পরিবেশন করতেন। পরিবেশনের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন আমাদের দু'জনের দিকে। কখনো বা তন্ময় হয়ে পড়তেন। আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যেত। কিন্তু চাচী আম্মার খেয়াল থাকত না কিছুই। রেহানা দুষ্টুমী-ভরা হাসি হেসে আমার দিকে তাকাত। আমি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতাম। তাড়াতাড়ি চাচী আম্মার তন্ময়তা ভঙ্গ করবার জন্য বলে উঠতাম—

: চাচী আম্মা, পানি দিন!

চাচী আম্মা হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেতেন, বলতেন—

: এ্যাঁ! তাইতো, তোমাদের যে পায়েসটা এখনো দেওয়াই হয়নি!

আমি উত্তর করতাম—

: না, চাচী আম্মা, আমার পেট ভরে গেছে। আমি আর কিছু খেতে পারব না।

চাচী আম্মা কিছু বলবার আগেই রেহানা চেঁচিয়ে বলে উঠত—

: না, আম্মা, হাসুর কিছু খাওয়া হয়নি।

আমি প্রতিবাদ করতাম—

: ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, চাচী আম্মা। সত্যি বলছি, আমার পেট ভরে গেছে।

চাচী আম্মা হাসতেন, বলতেন—

: আমি জানি, তোমাদের কারুর-ই খাওয়া হয়নি।

তারপর দু'জনের পাতে বেশ খানিকটা পায়াস ঢেলে দিয়ে বলতেন—

: নাও, দু'জনে শিগ গীর খেয়ে উঠ।

আমরা আর কথা বলতাম না। দু'জনে একসঙ্গে খেয়ে উঠতাম।

বাড়ী ফিরবার সময় চাচী আম্মা অনুরোধ করতেন, বলতেন—

: হাসু, কাল আবার এসো কিন্তু বাবা!

আমি সম্মতি জানাতাম।

রেহানাদের বাড়ীর পূব-কোণের আমবাগানের মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ ছিল। আমি সেই পথ দিয়েই যাওয়া-আসা করতাম। রেহানা আমার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসত। আম-বাগানের শেষ ধারটায় এসে আমি ফিরে দাঁড়াতাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত কোনদিন বলতাম—

: আজ যাই, তা'হলে।

রেহানা হাসত, তাড়াতাড়ি শুধরে দিয়ে বলত—

: যাই না, আসি।

আমিও হেসে উঠতাম, বলতাম—

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে! যাই না আসি! পুনরাবৃত্তি করে বলতাম—

: আচ্ছা! আসি তাহলে।

রেহানা উত্তর করত—

: হ্যাঁ, এসো।

আমি বিদায় হতাম। ও বড় একটা আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখত আমাকে। আমিও ফিরে-ফিরে তাকাতাম। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে পথ যেখানে একটা মোড় নিয়েছে সেখানেও দাঁড়িয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাতাম। দেখতাম, আম গাছের নীচু একটা ডাল ধরে তখনও নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে রেহানা। আমি মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতাম।

কোন সময় দু'দিন না গেলেই চাচী আম্মা আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে যেতেন। অভিযোগ জানাতেন—

: এতদিন আসনি কেন, হাসু?

আমি বলতাম—

: এতদিন আর কই, চাচী আম্মা? মাত্র তো দু'দিন।

চাচী আম্মা অবাক হতেন, বলতেন—

: মাত্র দু'দিন?

রেহানা হঠাৎ কোত্থেকে এসে চেঁচিয়ে বলে উঠত—

: না, আম্মা, হাসু মিথ্যে বল্‌ছে। ও চার-পাঁচদিন আসেনি আমাদের বাড়ীতে।

আমি প্রতিবাদ জানাতাম, বলতাম—

: ইস: আমি পরশুর আগের দিন আসিনি?

ও আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে উঠত—

: না, কিচ্ছুতেই না!

আমি চাচী আম্মার শরণাপন্ন হতাম, বলতাম—

: আপনিই বলুন, চাচী আম্মা!

চাচী আম্মা মনে মনে হিসাব করে নিয়ে বলতেন—

: না রেহানা, হাসু ঠিকই বলেছে।

রেহানা পূর্ববৎ চেঁচিয়েই বলত—

: তুমি ভুল করছ আম্মা। তুমি কিচ্ছু জান না।

চাচী আম্মা হাসতেন, বলতেন—

: আচ্ছা, তোমার কথাই ঠিক।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন—

: তা' এ-দুইদিন আসনি কেন, হাসু?

: পরীক্ষা সামনে। পড়াশোনার বড্ড চাপ পড়েছে, চাচী আম্মা।

রেহানা ফোড়ন কাট্‌ত, বলত—

: পড়াশোনা না কচু। সারাদিন বাড়ী বসে বসে আড্ডা মারা।

চাচী আম্মা বিরক্ত হতেন, ওকে ধমক দিয়ে বলতেন—

: ভারী বকতে পারিস, রেহানা! তোর চেঁচা-মেচিতেই আরো ও আসতে চায় না এ-বাড়ী।

রেহানা লজ্জা পেত। মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াত কিছুক্ষণ। তারপর এক ফাঁকে সরে পড়ত সেখান থেকে।

চাচী আম্মা আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন। এক সাজি মুড়ি এবং এক মুঠো নারকেলের নাড়ু খেতে দিয়ে বলতেন—

: পরশু থেকে রেখে দিয়েছি, তোমার জন্য।

আমি বারান্দায় বসে বসে সেগুলো খেতাম। চাচী আম্মা ঘরে বসতেন সেলাই নিয়ে। কিন্তু রেহানাকে আর কাছে-কিনারে দেখা যেত না কোথাও। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর ওর সন্ধান মিলত। ওদের পুকুর পারের লিচু গাছ তলাটায় ও বসে থাকত। আমি ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে যেতাম। আদর করে ডাকতাম—

: রেহানা !

রেহানা উত্তর দিত না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসত। আমি আস্তে আস্তে ওর এলোচুলে হাত বুলিয়ে দিতাম। সহসা ওর চোখ থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ত অশ্রু। রেহানা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত।

আমি ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যেতাম। কি করব কিছুই ভেবে পেতাম না। ওর কান্না প্রশমিত হলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতাম। রেহানা ধরা গলায় অভিযোগ জানাত : তুমি এ'দুদিন কেন আসনি ?

আমি তাড়াতাড়ি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে উঠতাম—

: কথা দিচ্ছি ! এরপর আর কখনো এমন হবে না।

রেহানার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠত, সামনের গন্ধরাজ গাছটার দিকে তাকিয়ে বলত : দেখেছ, কত ফুল ফুটেছে !

আমি বলতাম—

: হ্যাঁ। আমাকেও দাও না ক'টা তুলে !

রেহানা পাঁচ-সাতটা ফুল তুলে এনে আমার হাতে দিত।

কোত্থেকে হঠাৎ রেহানার ছোট ভাই হাফিজ দৌড়ে এসে বলত—

: আমাকে দাও না, দু'টো ফুল, আপা !

আমি ঠাট্টা করতাম, বলতাম—

: ফুল কেন, হাফিজ ?

হাফিজ উত্তর করত—

: আপনি নিয়েছেন কেন তা'হলে ?

রেহানা বলত—

: গণ্ডগোল করো না। আচ্ছা তোমাকে দিচ্ছি এনে।

হাফিজ তার আগেই আমার হাত থেকে দু'টো ফুল টেনে নিয়ে দৌড় দিত। আমি হাসতাম। বাকিগুলো রেহানার এলোচুলের খোঁপায় গুঁজে গুঁজে দিতাম।...

কোনদিন চাচী আম্মার নাম করে রেহানা নিজেই আমাকে ডেকে পাঠাত। হাফিজ হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে খবর দিয়ে যেত—

: হাসু ভাই, আম্মা আপনাকে এক্খুনি যেতে বলেছেন।

আমি বলতাম—

: সে কি হাফিজ। এই তো সকাল বেলা তোমাদের বাড়ী থেকে এলাম। আবার এক্ষুণি যেতে বলবেন কেন ?

হাফিজ উত্তর করত—

: জানিনে।

এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের অবসর না দিয়েই সে ছুটে পালাত। আমি বুঝতাম, নিশ্চয়ই রেহানা ডেকেছে। তবু প্রথমেই রেহানার সঙ্গে দেখা না করে সোজা চলে যেতাম চাচী আম্মার কাছে। বলতাম—

: চাচী আম্মা, আপনি নাকি আমাকে ডেকেছেন ?

চাচী আম্মা অবাক হতেন, বলতেন—

: আমি ? কে বলেছে, হাফিজ বুঝি ?

আমি 'হ্যাঁ' বলে সায় দিতাম।

চাচী আম্মা হাসতেন, বলতেন—

: দেখো তো, রাসুর বুঝি কিছু দরকার আছে।

তারপর কি একটা কাজে তিনি রান্নাঘরে ঢুকতেন। আমি রেহানাদের দক্ষিণ-ভিটির ঘরটার দিকে এগিয়ে আসতাম। বারান্দার বেড়ার আড়াল থেকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠত রেহানা। বলত—

: সত্যি, কি বোকা তুমি !

: বোকা ! কেন বলো তো !

: বা-রে ! তুমি যে বুঝতেই পারনি, কে তোমাকে ডেকেছে !

: বুঝব কেমন করে, হাফিজ যে বলল চাচী আম্মার কথা।

: হাফিজ তো তা বলবেই।

: তবে আমি ঠিক পাব কেমন করে ?

: সেই জন্য-ই তো তুমি বোকা।

: তা'হলে তো দেখছি সন্ন্যাসীর সঙ্গ নিতে হবে।

: কেন, শিষ্য হবে নাকি ?

: না, তবে গোণা পড়া শিখব।

: গোণা-পড়া ?

: হ্যাঁ !

: কেন ?

: তুমি আবার কখন কার নাম করে ডাকবে, বুঝতে হবে তো ?

রেহানার হাসির মাত্রা বেড়ে যেত, বলত—

: নিজের বুদ্ধি না থাকলে গোণা-পড়ায় কাজ হয় না।

: বেশ কথা !

ও জোর দিয়ে বলে উঠত—

: হ্যাঁ, তাই !

আমি অভিমান করতাম, বলতাম—

: থাক, আমি চালাক হতে চাইনে।

রেহানা নরম হয়ে যেত। কাছে এসে আমার ডান হাতখানা তুলে নিত ওর হাতে। আদর-ভরা কণ্ঠে, বলত—

: আমি কি আর সত্যি-ই বলেছি।

আমি উত্তর দিতাম না। ও আমার হাতখানা আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিত।

আবার বলত: ছিঃ! তুমি কেন বোকা হবে?

আমি চুপ করেই থাকতাম। রেহানা আরও নরম হয়ে যেত, বলত—

: এই প্রতিজ্ঞা করছি। এমন আর কোন দিন বলব না।

আমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠত। সামনের পেয়ারা গাছটার দিকে তাকিয়ে বলতাম—

: দেখেছ রেহানা, পেয়ারা পেকে রয়েছে।

আমার হাতে আস্তে একটু চাপ দিয়ে রেহানা বলত—

: আমাকে পেড়ে দেবে, চল।

আমি বলতাম: চল।

আমরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যেতাম।

আমি গাছে উঠে পেয়ারা পারতাম। রেহানা নিচে থেকে কুড়াতো। হঠাৎ কোত্থেকে হাফিজ দৌড়ে এসে আবদার জানাত: আমাকে কিন্তু বড়টা দিতে হবে, হাসু ভাই!

রেহানা উত্তর দিত—

: ইস: বড়টা! ছোট মানুষ, ছোটটা পাবে।

হাফিজ আমাকে সাক্ষী মানত, বলত—

: ছোট মানুষ বড়টা পায়, তাই না হাসু ভাই।

আমি সায় দিতাম, বলতাম: হ্যাঁ!

হাফিজ রেহানাকে লক্ষ্য করে বলত—

: হাসু ভাই বলেছে, শুনেছ আপা!

রেহানা হাসত, বলত—

: তোমার হাসু ভাই যখন বলেছে, তখন বড়টাই পাবে, যাও!

আমি গাছ থেকে নেমে আসতাম। হাফিজ বড় পেয়ারাটা নিয়ে দৌড় দিত। এক শ' ডাকেও আর তাকে ফিরানো যেত না। আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতাম।

॥ তিন ॥

ছোট বেলা থেকেই চাচী আম্মার অত্যন্ত বই পড়ার সখ ছিল। বিয়ের পর তাঁর আব্বা তাঁকে মাসে মাসে বই কেনবার জন্য টাকা পাঠাতেন। তিনি খান দুই মাসিক পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে হাল আমলের ভাল-বইয়ের লিষ্ট করে তিনি সেগুলো ভি-পি করে আনিয়ে নিতেন। প্রথম প্রথম তাঁর স্বামী, শাশুড়ী বা অন্য কেউ এর জন্য বিশেষ কিছু বলত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নব-বধূর এই বই-পড়া 'হবি' তাদের কাছে ভাল লাগেনি।

কারণ, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে তাঁর শ্বশুর মারা যান। এ-জন্য তাঁকে ভাবা হোত 'অপয়া'। তাছাড়া ছোট-বেলায় তিনি শহরে মানুষ হয়েছিলেন বলে, এবং বিয়ের সময় তাঁর বয়স একটু বেশি হয়েছিল বলেও তাঁর অকাট-মূর্খ গেঁয়ো খান্দানী শাশুড়ী তাঁকে যেন আন্তরিক স্নেহ করতে পারত না। মাঝে মাঝে তাই শোনা যেত তার মুখ ঝামটা।

: ওমা! একি ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড গো! এত বয়স হোল কিন্তু বউ মানুষের এমন কারবার তো দেখি নাই। কাজ-কাম নাই বসে-বসে শুধু বই পড়া।

এ-কথা অবশ্য সত্য নয়। চাচী আম্মা কখনই কাজ-কাম ফেলে বই নিয়ে থাকতেন না। সংসারের এটা-ওটা সেরে অবসর সময়েই তিনি পড়া-শোনা করতেন। কিন্তু তবু কোন প্রতিবাদ শোনা যেত না তাঁর মুখে।

শাশুড়ীর রাগ আরও বেড়ে যেত। দ্বিগুণতর বেগে মুখ-ঝামটা দিয়ে সে বলে উঠত—

: ওসব শহুরের নবাবী এখানে চলবে না বলে দিচ্ছি। ভাগ্যিস! শরীফ ঘরের বেটি নন!

চাচী আম্মার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠত। তিনি জানতেন, তাঁর আব্বা তাঁকে এ-পরিবারে বিয়ে দিতে খুব বেশি রাজী ছিলেন না। তাঁর পরলোকগত শ্বশুর-ই তাঁর আব্বাকে অনেক তোষামোদ করে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু তবু তিনি প্রতিবাদ করতেন না। শুধু অলক্ষ্যে তাঁর গণ্ড বেয়ে টস্‌টস্ করে গড়িয়ে পড়ত বড়-বড় ফোটায় কয়েক বিন্দু অশ্রু।

তাঁর স্বামীর কাছেও এসব বাড়াবাড়ি বলে মনে হোত। টাকা পয়সা দিয়ে বই কেনা, আর সময় নষ্ট করে তা পড়া মেয়ে মানুষের পক্ষে রীতিমত বাজে সখ বলে তিনি মনে করতেন। মাঝে মাঝে তাই শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বলতেন—

: সংসারের একটা ভাল কাজ হয় না। অথচ বাজে সখের জন্য টাকা খরচ। একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে তো চলা দরকার।

চাচী আম্মা বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত তাই করেন। আর তিনি বই কিনতেন না। তাঁর আব্বার কাছ থেকে যে টাকা তিনি পেতেন, তখনই তুলে দিতেন স্বামীর হাতে। এ-ভাবে জীবনের গতিটাই তাঁর গেল বদলে। স্বামী-শাশুড়ীর মন-পাবার জন্য তিনি প্রাণপণে লেগে গেলেন সংসারের কাজে। এতকালের সঞ্চিত তাঁর আদরের বই-পত্তরগুলো কতক এখানে-ওখানে গড়াগড়ি যেতে লাগল, কতক উঁই-ইঁদুরে কেটে নষ্ট করে ফেলল,

কতক তাঁর স্বামী সের দরে দিলেন বিক্রি করে। চাচী আম্মা কোনদিন ফিরেও দেখল না এসব। তিনি স্বামী শাশুড়ীর মন জোগাতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু তবু? না, থাক। চাচী আম্মা জীবনে কি পেয়েছিলেন—না-পেয়েছিলেন সে হিসেব নিকেশ আর করতে চাইনে আমি।

হ্যাঁ, যা' বলছিলাম। এমনি করেই চাচী আম্মার দিনগুলো কেটে যেতে থাকে। সুদীর্ঘ ষোলটি বছর। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। তাঁর শাশুড়ী মারা গেছে। রেহানা জন্মেছে। হাফিজ জন্মেছে। তারা বড় হয়েছে। চাচী আম্মার আরও দু'একজন সন্তান জন্মেছিল, তারা আঁতুর ঘরেই মারা যায়।

যখনকার কথা বলছি, সে সময়ে চাচী আম্মাই সংসারের কর্ত্রী। তাঁর স্বামী হাসান সাহেব তখন মহকুমা-শহরে কি একটা চাকরী করতেন। তিনি সকালের ট্রেণে যেতেন। বিকালে ফিরতেন। কোনদিন সন্ধ্যায়ও ফিরতেন। চাচী আম্মা সংসারের কাজকর্ম সেরে আমাদের নিয়ে বসতেন গল্প করতে। তিনি অনেক গল্প বলতেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তিনি আমাদের নামাজের সুরা শিখাতেন। কখনো বা পীর-পয়গম্বর-আউলিয়া-দরবেশদের অলৌকিক জীবন কাহিনী বর্ণনা করতেন। হজরত মুহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে তিনি প্রায়ই বলতেন—

: আমাদের পয়গম্বর শুধু শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন।

আমরা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। তিনি বলে যেতেন—

: আত্মঘাতী অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব সমাজকে তিনি আলো দান করেছিলেন, একটা মহৎ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

আমরা আরও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতাম। একটু থেমে চাচী আম্মা আবার বলতেন—

: 'মানুষ—তার বড় পরিচয় সে মানুষ! সুতরাং মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। তারা সবাই এক আল্লার সৃষ্টি।' একথা হজরত মুহম্মদ (দঃ) প্রথম দুনিয়াতে প্রচার করেছিলেন।

তাঁর কথার মধ্যে হয় ত রেহানা হঠাৎ বলে উঠত—

: আচ্ছা আম্মা, হেরা পর্বতের গুহায় তপস্যা করেই বুঝি হজরত মুহম্মদ (দঃ) পয়গম্বর হয়েছিলেন।

চাচী আম্মা উত্তর দিতেন—

: হ্যাঁ, তবে শুধু হেরা পর্বতের গুহায়ই নয়! আসলে তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন সাধনা।

আমি প্রশ্ন করতাম—

: সে কি রকম চাচী আম্মা?

তিনি জবাব দিতেন—

: শিশুকাল থেকেই নির্জনে বসে-বসে তিনি গভীর চিন্তা করতেন। মানুষের আত্মিক উন্নতির কথা ভাবতেন। আরববাসীদের হানাহানি দেখে ব্যথিত হতেন। এসবই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম পর্য্যায়ের সাধনা।

আমি অন্য প্রশ্ন করতাম—

: খুব কঠোর সাধনা করলেই কি পয়গম্বর হওয়া যায় চাচী আম্মা।

চাচী আম্মা জবাব দিতেন—

: না, শুধু সাধনা দ্বারাই পয়গম্বর হওয়া যায় না। এটা খোদার দান।

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলতেন—

: তবে মনে রেখো হাসু, জীবনে সত্যিকার মানুষ হতে হলেও চাই কঠোর সাধনা।

এ-ভাবে তিনি আরও অনেক উপদেশ দিতেন। মাঝে-মাঝে গল্প-উপন্যাস নিয়েও আলোচনা করতেন। কখনো বা ভাল ভাল বইয়ের নাম করে বলতেন—

: বড় হলে এ-বইগুলো প'ড় হাসু!

আমার মন 'লোভে কম্পমান' হয়ে উঠত।

চেহারা-চরিত্রে রেহানাও ঠিক ওর আম্মাকেই অনুকরণ করেছিল। গ্রামে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ওকে নিম্ন-প্রাইমারী পাশ করেই পড়া-শোনায় ইস্তাফা দিতে হয়। কিন্তু বাড়ী বসে বসে ও যথেষ্ট পড়া-শোনা করত। ভাঙা আলমারী খুঁজে উঁই-ইঁদুরের কাটা ওর আম্মার বইগুলো বের করে রেহানা পড়ত। আমাকেও পড়তে দিত। সাধারণতঃ ওদের দক্ষিণ-ভিটের ঘরের বাইরের বারান্দার একটা কামরায় আমরা পড়া-শোনা করতাম। গরমের দিনে ওদের আম-বাগানের বড় একটা গাছের ছায়ায় মাদুর বিছিয়ে চলত আমাদের পড়াশোনা। হাফিজ আমাদের কাছে বসে ধারাপাত মুখস্থ করত, আর গুণ-ভাগ কষত। আমরা এক একটা বই পড়ে আলোচনা করতাম। যে বইয়ের প্রথম বা শেষের বা মধ্যের পাতা থাকত না তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতাম। তারপর দু'জনে আন্দাজ করে নিতাম কাহিনীটা সেখানে কি রকম থাকা উচিত ছিল। কখনো দু'জনে দু'রকম অভিমত প্রকাশ করতাম। কিন্তু প্রায়ই রেহানার বুদ্ধি দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে যেতাম।

মাঝে-মাঝে ওদের পুকুরঘাটে বসে আমরা অস্তগামী

সূর্যের শোভা দেখতাম। রেহানা হয়ত হঠাৎ প্রশ্ন করে বলত: বলত হাসু, সূর্যাস্তের সময় আকাশ লাল হয় কেন?

আমি আমার পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে উত্তর দিতাম—

: অস্তগামী সূর্যের রশ্মি মেঘের উপর পড়ে বলে।

রেহানা জবাব দিত—

: বলতে পারলে না।

আমি প্রশ্ন করতাম—

: তবে?

: কারবালার কাহিনী জান?

: শুনেছি।

: হ্যাঁ, হোসেনের বুকে ওই-যে সীমার খঞ্জর বসিয়েছিল, সে সময় তাঁর বুক থেকে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে। সেইজন্য আকাশ এখনো হয়ে উঠে লাল।

এ-কথার ঐতিহাসিকতা নিয়ে তখন মাথা-ঘামানোর বয়স ছিল না আমার। আমি স্বভাবতঃ বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বলে উঠতাম: তাই নাকি!

রেহানা অন্য প্রশ্ন করত—

: কিন্তু এমন হয় কেন জান?

আমি জবাব দিতাম না।

রেহানা একটা বিশেষ ভঙ্গিতে টেনে-টেনে বলে যেত—

: সূর্যাস্ত সময়ে আকাশের ওই রক্তিমাভা যুগ-যুগ ধরে মানুষকে এ-কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যারা মহৎ—যারা আদর্শবান, তারা চিরকাল এমনি করেই অকুণ্ঠ-চিত্তে সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

কথা ক'টি বলতে বলতে রেহানার উজ্জ্বল-মুখখানা আরও চক-চক করে উঠত। আমি অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম—ওর দিকে।

কোন কোন দিন রেহানা আমাকে বলত—

: হাসু বড় হ'লে তুমি সাহিত্যিক হ'য়ো।

: সাহিত্যিক?

: হ্যাঁ, তুমি গল্প লিখবে, কবিতা লিখবে, আর লিখবে উপন্যাস।

আমি ঠাট্টা করতাম, বলতাম—

: কোন্ বিষয় নিয়ে।

রেহানাও ঠাট্টা করত, বলত—

: মনে করো, আমাদের জীবন নিয়েই!

আমি হাসতাম, বলতাম—

: এই কি একটা কথা হোল।

রেহানাও হাসত, বলত—

: আমাদের জীবনটা কি তুমি তুচ্ছ মনে করো?

আমি আমতা-আমতা করতাম—

: না, তবে কিনা—

হঠাৎ রেহানা যেন গম্ভীর হয়ে যেত, বলত: হ্যাঁ, তুমি লিখবে দেশের কথা, সমাজের কথা, জাতির কথা। মানুষকে তুমি জাগাবে,—অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তুমি তুলবে প্রতিবাদের ঝড়।

আমি চুপ করে থাকতাম। একটু থেমে রেহানা আবার বলত—

: লেখা-পড়া শিখতে পারলে অবশ্য এ-সব আমিই করতাম।

আমি আস্তে-আস্তে বলতাম—

: কিন্তু আমার দ্বারা কি—

ও বলত—

: তুমি অনেক লেখা-পড়া শিখবে, বই পড়বে। তোমাকে পারতেই হবে।

আমি হাসতাম, বলতাম—

: তোমাকে সঙ্গে থাকতে হবে, তা'হলে।

রেহানাও হাসত, বলত—

: আচ্ছা।

॥ চার ॥

কালের গতি অব্যাহত বয়ে চলে। আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। কিন্তু পড়া-শোনা বুঝি আর এগোয় না আমার। আমাদের সংসারের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অথচ একদিন আমরাই ছিলাম এ-গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবার। আমাদের জমি-জমা ছিল অনেক। জমিতে যে ফসল ফলত, তাতে সারা বছরের খাওয়া খরচ চলত। উপরন্তু বিক্রী করে নগদ টাকাও আসত ঢের। আমাদের গ্রামের কিছু দূর দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা নদী। আমাদের জমি-জমার অধিকাংশ ছিল এই পদ্মার পার দিয়ে। ভাগ্যের পরিহাস। হঠাৎ পদ্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আর আমাদের সাংসারিক-আয়ের একমাত্র সম্বল জমি-জমাগুলো প্রায়ই গেল পদ্মার অতল গহ্বরে তলিয়ে। এদিকে আব্বাও খুব বেশি দূরদর্শী ছিলেন না। সংসারে যা আয় হয়েছে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে বসেছেন। ভবিষ্যতের ভাবনা একবারও ভাবেননি। কাজেই এখন তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। আমাকে ডেকে বললেন—

: বাবা হাসু, দেখতেই তো পারছ সংসারের অবস্থা। তুমি না হয় এবার পড়াটা বাদ দাও। আগামী বছর তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেবো।

আব্বার কথা শুনে হতাশায় আমার মনটা ভেঙে

পড়বার উপক্রম হোল। এতদিন আশা করে আছি,—ম্যাট্রিক পাশ করব, কলেজে ভর্তি হবো। জেলা-শহরের মস্তবড় কলেজটাও কয়েকবার বেড়িয়ে দেখে এসেছি। আর আজ কিনা সব বিফল! আমি কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম।

আব্বা আমার মনের গোপন ব্যথাটাবুঝলেন; কিন্তু কি করবেন তিনি!

এক সময় ব্যাপারটা নিয়ে চাচী আম্মার সঙ্গে আলাপ হোল। চাচী আম্মা বললেন—

: না, হাসু, তোমাকে এবারই ভর্তি হতে হবে।

আমি বললাম—

: কিন্তু টাকা?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

: 'তোমাদের জমি-জমা যা' এখন আছে তাতে কি সংসার চলবার উপযুক্ত নয়?'

আমি উত্তর দিলাম—

: সংসার কোন রকমে চলতে পারে; কিন্তু বাড়তি খরচ চলাটা বোধহয় কষ্টকর।

তিনি বললেন—

: চিন্তা করো না। হয়ে যাবে এক রকম। হয়তো তোমাকে কিছু কষ্ট করতে হবে। হোষ্টেলের পরিবর্তে থাকতে হবে লজিং-এ। আর তুমি যখন ভালভাবেই পাশ করেছ, সুতরাং হয়ত একটা ষ্টাইপেণ্ডও পাবে কলেজে। তাছাড়া, একটি জিনিস মনে রেখো, জীবনে মানুষ হতে হলে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই মানুষ হতে হয়।

চাচী আম্মার কথা ক'টি শুনে আমি যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আমার মনও বার-বার বলতে লাগল, যদি কোন রকমে ভর্তি হতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই চলে যাবে একরকম। তাছাড়া আমি ছিলাম বাবার আদুরে সন্তান। যেমন করেই হোক তিনিও কিছু কিছু খরচ না দিয়ে পারবেন না। কিন্তু এখন ভর্তি হওয়াটাই যে বড় সমস্যা।

চাচী আম্মা বোধ করি আমার মনের কথাটা আন্দাজ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

: জান, ভর্তি হতে তোমার প্রথম কত টাকা প্রয়োজন?

আমি সংবাদটা নিয়েছিলাম। কলেজ থেকে একটা প্রস্‌পেক্‌টাস্‌ও আনিয়ে রেখেছিলাম। অতএব জবাব দিলাম—

: মোটের উপর ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা।

তিনি বললেন—

: আচ্ছা, তুমি সব গুছিয়ে ঠিক-ঠাক করে নাও। পরশু ভাল দিন আছে; ভর্তি হয়ে এসো।

আমি চিন্তিত মুখে বললাম—

: কিন্তু এত টাকা কোথায় পাব, চাচী আম্মা।

চাচী আম্মা জবাব দিলেন—

: সে দেখা যাবে; পরশু তুমি সকালে একবার এসো।

আমি আর কিছু বললাম না। মনে মনে বললাম—

: দেখাই যাক, কি হয়-না-হয়।

কিছুক্ষণ পর চাচী আম্মা আবার বললেন—

: শহরে আমার এক মামাতো ভাই থাকেন। আমি তাঁর কাছে চিঠি লিখে দেবো। তোমার লজিংএর ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।

সেদিন সকালে চাচী আম্মার সঙ্গে যে আলাপ হোল, রেহানা ছাড়া তা আর কেউ জানত না।

একদিন পর যথাসময়ে আমি রেহানাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। হাসান সাহেব সকালেই তাঁর কর্মস্থলে রওয়ানা হয়ে গে'ছিলেন। সেদিন চাচী আম্মা আমার জন্য অনেক কিছু রান্না করেছিলেন। তিনি আমাকে খেতে দিলেন। সামনে বসে একে-একে সব পরিবেশন করতে লাগলেন। কিন্তু আমার মন ছিল চঞ্চল। আমি প্রায় কিছুই খেতে পারছিলাম না। চাচী আম্মা তবু সাধাসাধি করে আমাকে খাওয়াতে ছাড়লেন না। আমি খেয়ে উঠলাম। তিনি আমাকে বসতে বলে নিজের ঘরে গেলেন।

রেহানাকে আজ একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার মুখে বিশেষ কোন কথা ছিল না। আমার খাওয়ার সময় চাচী আম্মাকে ও এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল। এখন চুপচাপ ঘরের মধ্যে একটা চৌকিতে বসে কি-একটা বইয়ের পাতা এলোমেলো উল্‌টাচ্ছিল। মনের উদ্বেগে আমিও আজ ভাল করে কথা বলতে পারছিলাম না।

চাচী আম্মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কাছে এসে দশ টাকার আট-খানা নোট গুণে আমার হাতে দিলেন। হয়তো এ ছিল তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়। কৃতজ্ঞতায় সারা অন্তর ভরে উঠল আমার। একি আমার চাচী আম্মা! না, ধরার ধূলায় অবতীর্ণা কোন বেহেশ্‌তী…! শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আমি তাঁর কদমবুসী করলাম। চাচী আম্মা আমার মাথায় হাত রেখে দোওয়া করলেন, বললেন—

: মনে রেখো হাসু, তোমাকে মানুষ হতে হবে।

আমি উত্তর করলাম—

: সে আপনার দো'য়া, চাচী আম্মা!

তিনি আমাকে আরও অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর কি একটা কাজের ভাণ করে রান্নাঘরে ঢুকলেন। বলে গেলেন—

: তোমার তো বোধহয় ট্রেনের সময় হয়ে এল। তুমি শিগ্‌গীর রওয়ানা হয়ে পড়।

আমি আর একবার তাঁর কদমবুসী করলাম।

রেহানা তখনও ঘরের মধ্যে বইয়ের পাতা উল্‌টাচ্ছিল। আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম, ডাকলাম—

: রেহানা!

রেহানা উঠে দাঁড়ায়, বলল—

: একটু দাঁড়াও।

তারপর ঘরের কোণের আলনায় ঝোলানো কাপড়ের আড়াল থেকে ওর স্বহস্তে রচিত একটা ফুলের মালা এনে আমার গলায় পরিয়ে দিল। আমি হাসলাম, বললাম—

: আসি তা'হলে।

ও জবাব দিল : চলো।

তারপর ওদের আমবাগানের সেই সরু পথটা দিয়ে রেহানা এগিয়ে এল আমার সাথে। বাগানের শেষ প্রান্তে এসে আমি ফিরে দাঁড়ালাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—

: মনে রেখো!

একটু ম্লান হেসে রেহানা উত্তর করল—

: মেয়েরা ভোলে না!

আমি খুশি হলাম, বললাম—

: সত্যি!

রেহানা আলুতোভাবে মাথাটা একটু হেলালো, বলল—

: হ্যাঁ, সত্যি!

আমি বিদায় হলাম। খানিক দূর এগিয়ে এসে একবার ফিরে তাকালাম। দেখলাম, সেই আম গাছটার নীচু ডাল ধরে উদাস-নয়নে তাকিয়ে রয়েছে রেহানা। মোড়ের কাছে এসে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে আর একবার ফিরে তাকালাম। এবার বুঝি চোখে আঁচল চাপা পড়্‌ল রেহানার।

সুদীর্ঘ ক'টি বছরের আনন্দমুখর দিনগুলো! আজ পেছনে ফেলে চলেছি। ব্যথায় বুকটা টন্‌ টন্‌ করে উঠল আমার!···

সেদিনই কলেজে ভর্তি হলাম। খোঁজ করে চাচী আম্মার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। চিঠি দিলাম। তিনি খুশি হলেন। একে একে রেহানাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দু'দিন তাঁর বাসায় থাকা হল আমার। তিনি অত্যন্ত যত্ন করলেন। তাঁর বাসায় অন্য একজন ছাত্র লজিং থাকত। সুতরাং আমাকে তিনি অন্য একটা লজিং করে দিলেন।

যথারীতি আমি কলেজে যাওয়া-আসা শুরু করলাম। কিন্তু আব্বা আম্মা বুঝি ভেবে-চিন্তে সারা হচ্ছেন বাড়ীতে। তাই দু'দিন পর আব্বাকে চিঠি লিখলাম—

: আমার নিজের কাছে কিছু টাকা ছিল। তাই দিয়ে ভর্তি হয়েছি কলেজে। এখানে একটা লজিং পেয়েছি। প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তিনি একটা ষ্টাইপেণ্ডের আশ্বাস দিয়েছেন। এখন আপনি যদি আমাকে মাসে মাসে অন্ততঃ দশটি করে টাকা পাঠান; তাহলেই আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারব।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ভাল আছি। ইত্যাদি···।

কয়েকদিন পর আব্বার উত্তর পেলাম—

: তুমি ভর্তি হবেই, তা বলে গেলেই পারতে। এদিকে তোমার খোঁজ না পাওয়ায় তোমার আম্মা তো একেবারে কান্নাকাটি করে সারা!

যাহোক, আমি তোমাকে মাসে পনেরটি করে টাকা পাঠাতে পারব। তোমার বইপত্র কেনবার জন্য শিগ্‌গীরই কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। তুমি ভাল ক'রে পড়াশোনা ক'রো।

আমরা ভাল আছি। ইত্যাদি···

আমি সমস্ত জানিয়ে চাচী আম্মাকে চিঠি লিখলাম। চাচী আম্মা দো'য়া জানিয়ে উত্তর পাঠালেন।

কলেজের দিনগুলো একরকম কেটে যেতে লাগল। নতুন পরিবেশে মনটাও হালকা হয়ে উঠ্‌ছিল বেশ। কিন্তু তবু চাচী আম্মা আর রেহানার কথা মনে পড়ে ব্যথায় বুকটা ভরে উঠত আমার।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসে। নিয়মমত আমার কলেজে যাওয়া-আসা চলে। ছুটি পেলে আমি বাড়ী যাই। রেহানা-চাচী আম্মার সঙ্গে দেখা করি। হাসান সাহেব এখন চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়ীতেই থাকেন। নিজস্ব জমি জমার তদারক করেন। এখন একটু সাবধানেই রেহানাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করি। রেহানার সঙ্গে দেখা হয়। গোপনে। প্রায়ই ওদের সেই দক্ষিণ-ভিটির ঘরের বাইরের বারান্দার ছোট্ট কামরাটাতে। রেহানা ওখানে পড়াশোনা করে।

কোন দিন পা টিপে-টিপে গিয়ে দেখি রেহানা নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা লিখছে। আর ওর মাথা-ভরা কালো চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়েছে ওর পিঠের উপর দিয়ে। ওর আব্বা ঘরে থাকলে রেহানা আমাকে সতর্ক করে দেয়। পাতলা ঠোঁট দুটোর উপর ডান হাতের তর্জনী-আঙুলটা আড়াআড়ি রেখে ফিস-ফিস করে বলে—

: চুপ। ঘরে আব্বা ঘুমুচ্ছেন। তারপর বাঁ দিকের চেয়ারটা দেখিয়ে বলে—

: বস।

আমি বসে পড়ি। নিঃশব্দে ওর লেখার বিশেষ ভঙ্গিটি নিরীক্ষণ করি। লেখা শেষ হলে ও আমাকে দেখায়। আস্তে আস্তে বলে—

: কেমন হয়েছে ?

আমি মুচকি হাসি, অনুচ্চস্বরে বলি—

: চমৎকার।

রেহানার আব্বা বাড়ী না থাকলে রসিকতা করি—

: হঠাৎ এ-খেয়াল !

রেহানা লজ্জিত হয়, বলে—

: বা-রে ! তুমি এম-এ. পাশ করবে, আর আমি বুঝি হাতের লেখাটাও ভাল করতে পারব না।

হঠাৎ চাচী আম্মা সেখানে এসে পড়লে ও তাঁকে মধ্যস্থ মানে, বলে—

: শুন্ন আম্মা, বলছে কি ? আমি হাতের লেখা লিখছি, তা নাকি একটা খেয়াল। আচ্ছা আম্মা, ও এম-এ পাশ করবে, তা' কিছু না, আর আমি হাতের লেখা একটু লিখ্ছি, তাই দেখো কেমন ওর হিংসে !

আমি প্রতিবাদ করি—

: না ! না ! তা হবে কেন ?

চাচী আম্মা কথা বলেন না। আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসেন।...

একদিনের কথা। বিকেলে বেড়াতে গেছি রেহানাদের বাড়ী। হঠাৎ রেহানা করে বসে এক অভিনব অনুরোধ, বলে—

: কাল সন্ধ্যায় তোমার দাওয়াৎ ! তোমাকে খেতে হবে। আব্বা বাড়ী থাকবেন না। কোথায় যেন যাবেন। আসবেন পরশু।

আমি হাসি, বলি—

: বেশ তো ! কিন্তু তোমাদের বাড়ী খেতে দাওয়াতের প্রয়োজন তো হয়নি কোন দিন।

শাড়ীর আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে রেহানা জবাব দেয়—

: তা বটে ! কিন্তু আমি তো তোমাকে খাওয়াইনি কখনো !

আমি খুশি হই, বলি—

: তুমি খাওয়াবে নাকি ? বেশ ! কিন্তু রান্নাটা করবে কে ?

রেহানা উত্তর দেয়—

: বা-রে, খাওয়াব আমি। আর রান্না করবে এসে বিলেতের মানুষ ?

আমি আরও খুশি হই, বলি—

: সত্যি, তোমার নিজ হাতের রান্না খাওয়াবে ?

রেহানা ঘুরিয়ে উত্তর দেয়—

: কাল তোমাকে আসতেই হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি।

এমন সময় চাচী আম্মা সেখানে এসে পড়েন। তিনিও বলেন—

: কাল তুমি অবশ্যই এসো কিন্তু হাসু !

নিশ্চয়ই আসব বলে আমি বিদায় হই।

কিন্তু পরদিন কোন একটা কাজে রেহানাদের বাড়ী যেতে একটু দেরি হয়ে যায়। সন্ধ্যার খানিকটা পরে গিয়ে হাজির হই। দেখি, রান্না-বান্না সেরে রেহানা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেদিন যেন ওর নতুন বেশ লক্ষ্য করি। সুন্দর করে চুলগুলো বাঁধা ; পরণে গোলাপী রঙের একখানা শাড়ী ; চোখে কাজল ; কানে দুল। আমি বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে ওর দিকে তাকাই। রেহানা কৃত্রিম শাসানির ভঙ্গিতে বলে উঠে—

: এই বুঝি, তোমার সন্ধ্যা ! কখন্ থেকে তোমার জন্য বসে আসি, আর তুমি কিনা এলে এখন !

আমি তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিই, জবাব দিই—

: নাও, এই একটু দেরী হয়ে গেছে, তা'—

আমার কথা অসমাপ্ত থেকে যায়।

রেহানা বলে উঠে—

: থাক ! থাক ! আর ছাপাই কথার কাজ নাই ! এখন চলো তো দেখি—

ওর কথা বলার ভঙ্গিটিও কেমন নতুন মনে হয় আমার।

ঘরের মেঝেয় রেহানা একটা মাদুর বিছিয়ে দেয়। আমি বসে পড়ি।

আমার খাওয়া শেষ হয়। হাত মুখ ধুয়ে ঘরের মেঝের চৌকিটাতে বসি। রেহানা সুন্দর করে একটা পান সেজে এনে দেয় আমার হাতে। এমন সময় কথা বলতে বলতে চাচী আম্মা ঘরে ঢোকেন—

: রাসুর রান্না ! কেমন হয়েছে কে জানে।

হাসুর বুঝি ভাল করে খাওয়াই হয়নি !

আমি অপ্রতিভ হই, বলি—

: না চাচী আম্মা। খুব ভাল রান্না হয়েছে। আজ বেশি করে খেয়েছি !

চাচী আম্মা সোয়াস্তির হাসি হাসেন—বলেন : তা' বেশ !

তাকিয়ে দেখি কোন্ অলক্ষ্যে রেহানা সেখান থেকে উধাও !

(আগামীবারে সমাপ্য)

আদম খাঁর গীত

চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর, সাহিত্যভূষণ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অলির নিয়ামত বিবি রে
কিনা কাম কৈলা রে—
চিঠি দিলা কেদাই রাজার আগে রে।
বেটা মোর আদম খাঁ বলি
বাপ তার মহলন্দ আলী
আসিতেছে শ্রীপুর ছয়ল্যাবে রে।
স্বপনেতে দেখ্‌ছে বা
উদয়তেরা কন্যা বা
বিয়া কর্‌ছে শ্রীপুর শহরে রে।
বাপের ঘরের বেটা বা
জোরে সোরে হৈছে বা
সংগে আছে গরিধর মাঝি রে।
বুঝে সুজে থাকিও বা
বেআকল পুয়া বা
জলদি করি ফিরাই দিও দেশে রে।
চিঠি পাইয়া কেদাই বা
ভাবৈন মনে মনে বা
জব্দ কেমনে করিতা আদম রে।
গরিধর মাঝি বা
ডিংগায় কাড়ার (১) ধর্‌ছে বা
দাড় মারৈন চব্বিশ হাজার দাড়ি রে।
সুবাতাস পাইয়া বা
শূন্যে উড়া কর্‌ছে বা
ঝলক দিল শ্রীপুরের পানি রে।
শ্রীপুরের ঘাটে বা
গেলা যদি আদম খাঁ
দাড়ি মাঝি ঘাটেতে থৈয়া রে।
ধীর ধীর করিয়া বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
মামুর বাড়ী গেলা যে চলিয়া রে।
মামুর বাড়ী যদি বা
গেলা চলি আদম খাঁ
খুশী তারা হইলা ভাইগনা পাইয়া রে।
কেদাই রাজার বাড়ীত বা
লাগিল ধুমধাম বা
খাশী বক্‌রী অনেক জব হইল রে।

দাড়ি মাঝির লাগি বা
ভালা করি সিধা (২) বা
পাঠাই দিলা ডিংগার মাঝারে রে।
রংমহল ঘরে বা
আদমরে বসাইলা বা
খাইবার দিলা ভালা ভালা চিজ রে।
খারো (৩) বইয়া কেদাই বা
ভাইগনারে খাওয়াইন বা
খাইন ভাইগনা খোশালিত হইয়া রে।
৮০ নাগের বিষ বা
খানার মাঝে আছিল বা
খানা খাইয়া পড়িলা ঢলিয়া রে।
হায় হায় হায় বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
মাটিতে পড়ি লুটপুটি খায় রে।
শুন কেদাই মামু বা
কি খানা খাওয়াইলায় বা
কলিজ্বী (৪) যে যায় রে জ্বলিয়া রে।
কি দোষ করিলাম বা
মায়ের ভাই মামু বা
বুঝাইয়া কহিবায় আমারে রে।
কেদাই বলে ভাইগনা বা
জাত্‌ আমার মারিয়া বা
তোমার মা'রে ধরিয়া নিছিল জোরে রে।
সেই বাপের বেটা বা
ভাইগনা রে আদম খাঁ
আইছো তুমি নিতায় উদয়তেরা রে।
তোমার স্বপ্‌নের কথা বা
যেম্‌নে তেম্‌নে জান্‌ছি বা
কৌশলে তোমারে কৈলাম বন্দ্‌ রে।
এ রে শুনি আদম খাঁ
বলে দয়ার আল্লা বা
নিদান কালে বাঁচাও আমারে রে।
অলির নিয়ামত মাই গো
মরণ কালে তোমায় গো
না দেখিলাম একবার চান্দ মুখ রে।

(১) কাণ্ডার (২) খানার সরঞ্জাম (৩) নিকটে (৪) হৃৎপিণ্ড

বিষ খাওয়াইয়া মামু গো
তোমার পুতে মাইলো গো
আদম খাঁ হৈল বেহুস রে।

বেহুস হৈল আদম খাঁ
দেখি কেদাই রাজা বা
বরকন্‌তাজে করিলা হুকুম রে।

বাঘের বাচ্চা বাঘ বা
কৌশলে বন্দ্‌ করছি বা
হাতে পায়ে বান্দো জিন্‌জির দিয়া রে।

হাতে পায়ে বান্ধিয়া বা
বন্দী থানায় নিয়া বা
বুকুত দিবায় ৮০ মণি পাটা রে।

মরিচের ধূমা বা
ঘরের মাঝে দিয়া বা
বাইরে দিয়া কর্‌বায় তালাবন্দ রে।

এক দিন দুই বা
তিন দিন যায় বা
আদম খাঁ না ফিরিলা ডিংগায় রে।

মনে মনে গরি বা
অনেক কথা ভাবৈন বা
না জানি কোন বিপদ ঘটিছে রে।

এই না কথা ভাবিয়া বা
গরিধর মাঝি বা
কান্ধে লৈয়া হাজার মণি বৈঠারে।

ধীর ধীর করিয়া বা
গরিধর মাঝি বা
কেদাইর বাড়ীত গিয়া ঘনে ডাকেরে।

ডাকে গরিধর বা
কুবাই (৫) বা আদম খাঁ
তিন দিন ধরি খবর কেনে (৬) নাইরে।
এক ডাক দুই বা
তিন ডাক দিতে বা
কেদাইরাজা বাহির হৈয়া কৈনরে।
ভইনর ঘরর ভাইগনা বা
অত দিনে আইছে বা
থাকি যাইব দুই তিন মাস রে।
তুমি কেনে ডাকো বা
আদম আমার ভাইগনা বা
তুমি যাওগি তোমার নাওয়ে চলিয়া রে।

গরিধর মাঝি বা
পাল্টা জুয়াব দিলা বা
আদম থইয়া আমি নাহি যাইমু রে।

একথা শুনিয়া বা
কেদাই ও যে রাজা বা
ডাক দিলা ৮০ জন পয়লয়ানরে।

কেদাইর ডাক শুনিয়া বা
৮০ পয়লয়ান আইয়া বা
বের দিলা (৬) গরিধর ধর মাঝিরে।

বে গতিক দেখিয়া বা
গরিধর মাঝি বা
হাজার মণি বৈঠা যে তুলিয়ারে।

এক বাড়ি (৭) দিলা বা
৩০ পয়লান মৈলা বা
আর এক বাড়ি দিলা যে খেচিয়ারে।

আর ৩০ পয়লান বা
মারিয়া পালাইলা বা
বাকী ২০ জন গেলা যে ভাগিয়ারে

৬০ পয়লান মারিয়া বা
গরিধর মাঝি বা
বিপাক বুঝি ডিংগায় চলি আইলারে।

ডিংগায় আসিয়া বা
দাড়ীদেরে কইলা বা
গায়ের জোরে বৈঠা মারো ভাই রে।

তা' না হইলে মরবায় বা
হাছা কথা কৈলাম বা
দাড়িগণে দাড় লৈলা হাতে রে।

চখুর পলকে বা
শ্রীপুর ছাড়্‌লা বা
চলি গেলা বহুত বহুত দূরে রে।
এক দিন দুই বা
তিন দিন বাদে বা
গাংগের পারে ডিংগা যে লাগাইল রে।
চাইয়া দেখে গরি বা
১৫ দিনের পথ বা
চলিয়া তারা আইছে তিন দিনে রে।
ডিংগা লাগাইয়া বা
গরিধর মাঝি বা
আদম খাঁর তিন ভাইরে দিলা চিঠি রে।

(৫) কোথায় (৬) ঘিরিয়া ফেলিল (৭) আঘাত

শুন দেওয়ান বিরাইম খাঁ
শুন দেওয়ান আবদুল খাঁ
শুন শুন জমসর খাঁ দেওয়ান রে।
তোমরার ছোট ভাই বা
দেওয়ান রে আদম খাঁ
গিয়াছিলা শ্রীপুর ছয়লাবে রে।
নদীর ঘাটে থইয়া বা
মায়ুর বাড়ী গেলা বা
তিন দিনর মাঝে না পাইলাম খবর রে।

তিন দিন বাদে বা
তান খবরে গেছলাম বা
আয়ুর জোরে আসিয়াছি বাঁচিয়া রে।
দানার জোরে আমি বা
বাঁচি কেবল আইছি বা
না জানি কি করিছে আদম খাঁ রে।
টংগির শহরে আমি বা
ডিংগা লৈয়া আছি বা
তোমরা আইবায় তুরিত করিয়া রে।

(ক্রমশঃ)

উত্তরণ

আবদুল মজিদ

দ্বিধার আবর্ত কেটে অবশেষে সেও কাছাকাছি
সশরমে সরে এলো মৃদু হাসি-রঙ্
ঠোঁটে-মুখে মেখে নিয়ে, দৃষ্টির মৌমাছি
উড়িয়ে ফুলের খোঁজে দ্রুততালে, চাতুর্যে এবং
বুকের পাঁজর গেঁথে ; দুঃসহ প্রাণের জ্বালা ঢেকে

যে শুধু হাওয়ার মতো দু'হাত এড়িয়ে
এতদিন ফাঁকি দিয়ে নিরাপদে রেখেছে নিজেকে
পড়েও পড়েনি ধরা, উড়ে গেছে এ-হৃদয় নিয়ে

নির্লজ্জ লোভেই সেও অবিবেকী পতঙ্গের মতো
আঁটামাখা ডালে শেষে দু'পাখা ভিড়ালো
আবেগ কম্পিত দেহে ; শুধু এক অন্তরের ক্ষত
যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে অন্য কোনো যন্ত্রণাকে ছুঁ'ল ॥

হজরত ইদরিস (আঃ) ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

হাকিম মীর ওয়াজেদ আলী জাহাঙ্গীরনগরী

মানব-জাতির আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাবের পর হইতে আরম্ভ হয় প্রস্তর যুগ। ইহাই মানুষের ইতিহাসের প্রথম যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তখন মানুষ পর্ব্বত গুহায় বাস করিত। পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া আগুন বাহির করিত; এবং খাদ্যাদি ঐ আগুনে পোড়াইয়া ভক্ষণ করিত। এই প্রস্তর যুগ কত-কাল ধরিয়া চলিয়াছিল উহা নির্ণয় করা নেহায়েৎ কঠিন। তৎপর ক্রমে ক্রমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা আরব, মেসোপটামিয়া, মিসর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। এই প্রস্তর যুগের আরেক নাম রাখা হইয়াছে বর্ব্বরযুগ।

উত্তর-আফ্রিকার-নীল-নদীর তীরে এই বর্ব্বর যুগীয় মানব কুলে হঠাৎ দেখা দিল আলোক রশ্মি। এক মহা-মানব মর্ত্তে লইয়া আসিলেন সভ্যতার-প্রথম আলো। তাঁর পবিত্র নাম ছিল 'হার্মিস'। আরবী ভাষায় তিনি হজরত ইদ্রিস (আঃ সঃ) নামে সুপরিচিত। সে আজ প্রায় খৃঃ পূঃ দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাঁহার সময় হইতে মিসরে এক নব যুগের সূচনা হয়। তিনি মানুষের মনের ভাবকে ভাষায় ব্যক্তকরণবিদ্যা; লিখন প্রণালী, বস্ত্রবয়ন, কৃষিকার্য্য এবং সমাজবদ্ধ ধর্ম্মীয় জীবন যাপন পদ্ধতির-প্রচলন করেন। এই সময় হইতে নগর-প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক জীবন-যাপন আরম্ভ হয়। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম এই স্থানেই চিত্র-লেখা বা হিরোগ্নাফিক ভাষার প্রচলন হয়। মোট-কথা মিসর দেশেই হয় মানব-সভ্যতার এই প্রথম বিকাশ।

খৃঃ পূঃ ৫৮ সনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'ডায়োডেরাস' মিসর ভ্রমন করিয়া মিসর দেশের প্রাচীন-ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"মানুষের ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে পৃথিবী দেব-দানবের এবং বীরসাধকদের আবাস ভূমি ছিল। তাঁহারা ছিলেন সূর্য্যদেবতা ও চন্দ্র-দেবতা। মিসরী-ভাষায় তাঁহাদের নাম ছিল 'ওশীরী' ও 'ঈশী'। তাঁহারা 'পরমাত্মা'কেই দেবতা ও মানুষের (স্রষ্টা) পিতা বলিয়া বিশ্বাস করিত। 'হার্মিস-থৎ' ছিলেন ওশীরী দেবতার পবিত্র-লেখক ও পরামর্শদাতা। তিনিই ভাষা ও ধর্ম্মের কর্ম্ম-বিধান রচনা করেন। পৃথিবীতে লিখন প্রণালী তিনি সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। দেবতা ও বীর (বা পয়গম্বর) গণের সুবর্ণ রাজত্বের পরে, 'ম্যানে-ভিস্' নামক প্রথম মিসর রাজই সর্ব্ব প্রথম রাজ্য-শাসন আইন লিখিত ভাবে রচনা করেন। রাজা 'ম্যানেভিস্' শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত আইন-কানুন তিনি (রাজর্ষি) 'হার্মিসের' নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ঐ সমস্ত আইন তিনি আপন প্রজাবর্গের উপর কৃতকার্য্যতার সহিত জারী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

'রাওজাতুস্ সাফা' নামক প্রসিদ্ধ ফার্সি ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ইদ্রিস (আঃ সঃ) আরবদের মধ্যে 'হার্মিস'; 'ইদ্রিস'; এবং মাষাল্লাস-বিন্-নে'আমাহ' এই তিন নামে অভিহিত হইতেন। 'হার্মিস'-অর্থ বুধগ্রহ, ইদ্রিস-অর্থ অধিক পাঠকারী, এবং 'মাষাল্লাস-বিন্-নে'আমাহ—অর্থ 'নবুওয়াৎ,' 'হিকমাত' ও 'হুকুমাৎ' এই ত্রি আশির্ব্বাদযুক্ত। কারণ হজরত ইদ্রিস (আঃ সঃ) একাধারে পয়গম্বর, চিকিৎসক এবং বাদশাহ ছিলেন।"

ইউরোপেও হজরত ইদ্রিস (আঃ সঃ) 'হার্মিস-ট্রেস্-ম্যাজিষ্টাস' আখ্যায় প্রসিদ্ধ। জগদ্বিখ্যাত 'ইন্‌সাই-ক্লোপেডিয়া-বৃটানিকা' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, "হার্মিস ট্রেস-ম্যাজিষ্টাস (বা ত্রিগুন শ্রেষ্ঠ হার্মিস) মিসরীয় হার্মিসের একটি সম্মান বাচক আখ্যা, অর্থাৎ 'থৎ' বা জ্ঞান-দেবতা। 'থৎ' ছিলেন দেবতাগণের লেখক এবং স্বর্গীয় বাণীর আধার (পয়গম্বর)। অতি পবিত্র ধর্ম্মীয় গ্রন্থাদি তিনিই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রীক-পণ্ডিতগণ উক্ত লিপিগুলিকে 'হার্মিটিক' (হার্মিসের কীর্ত্তি) বলিয়া অভিহিত করিতেন। উহার সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশ' খানা ছিল। উহাতে বহু বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তি এ-পর্য্যন্ত যাহা প্যাপিরাস ও মন্দির গাত্রে খোদিত পাওয়া গিয়াছে, উহাতে ভূগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র, 'ধর্ম্ম-গাথা' এবং চিকিৎসাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।"

কথিত আছে যে, হজরত ইদ্রিস (আঃ সঃ) মিসর দেশের নীলনদীর উপর নৌকায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ সুঠিত, মুখাবয়ব উজ্জ্বল ও কান্তিময় এবং স্বভাব ধীর ও স্থির ছিল। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং সতত খোদার ধ্যানে রত থাকিতেন। এই নিমিত্তই মিসরীয় প্রাচীন ইতিহাসে পয়গম্বরকে 'বীর সাধক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জগৎ প্রসিদ্ধ আরবী ঐতিহাসিক ইবনে-জাবীর বলেন যে, "আদম-তনয় কাবীলের বংশধর-গণ সেযুগে 'সিরীয়া' এলাকায় বাস করিত। শয়তানের কুমন্ত্রনায় তাহারা অগ্নিপূজা, মদ্যপান, ইত্যাদি নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হয়। হজরত শীশের বংশধরগণও (ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট) কাবিল বংশীয়গণের সংস্রবে আসিয়া ব্যভিচারে মগ্ন হয়। ঠিক এই সময় আদম-সন্তানগণের ত্রান উদ্দেশ্যে

হজরত ইদ্রিস (আঃ সঃ) ঐশী-আদেশে 'পয়গম্বর' (বা-পথ প্রদর্শক) নিযুক্ত হন; তিনি শীশ বংশীয়গণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। আল্লাহতালা ফেরেশতা মারফৎ ত্রিশখানা 'সহিফা' বা ধর্ম্মলিপি তাঁহার উপর নাজিল করেন। তিনি পৃথিবীতে ৩৬৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।"

হিজরী পঞ্চম শতাব্দির প্রসিদ্ধ স্পেনীয় ঐতিহাসিক কাজি সায়েদ-বিন-আহমদ আন্দালুসী (মৃত্যু—৪৬২ হিঃ) তাঁহার 'তাব্‌কাতুল-উমাম' গ্রন্থে মিসরীয় সভ্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "সমস্ত আলেম ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ যে, হজরত নূহ (আঃ সঃ)এর মহা প্রলয়ের পূর্ব্বযুগীয় যাবতীয় বিদ্যার একমাত্র আবিষ্কারক ও প্রবর্ত্তক ছিলেন—'হার্মিস—আউয়াল'। তিনি সাইদে মিসর নামক স্থানে বাস করিতেন। বানি ইস্‌রাইলদের মধ্যে তাঁহার বংশ-তালিকা নিয়রূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যথা—"আখ্‌নুক (ইদ্রিস আঃ সঃ) বিন-ইয়ারু, বিন মাহ্‌লাইল, বিন আনুষ, বিন শীশ, বিন আদম (আঃ সঃ)। 'আখ্‌নুক' বা ইদ্রিস (আঃ সঃ) ই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্ব গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষন এবং উহার হিসাব নির্দ্ধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেন। উপাসনার্থে হায়কল বা উপাসনাগার নির্ম্মান এবং আল্লার মহিমা কীর্ত্তনের প্রথা তিনি সর্ব্ব প্রথম প্রচলন করেন। জগতে সর্ব্ব প্রথম তিনিই চিকিৎসা-বিদ্যা আবিস্কার করেন। ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় হিতজনক দ্রব্যের কবিতা-রচনা করিয়া তিনি স্বদেশবাসীকে উপহার দেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তীযুগে এক ভীষন তুফান ও অগ্নি-বৃষ্টি হইবে। তাঁহার আবিষ্কৃত বিদ্যা যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিরাট 'এহরাম' ও বরাবরী (পিরামিড) নির্ম্মান করেন; এবং উক্ত এহরামের (পিরামিড্‌) প্রস্তর গাত্রে তাঁহার বিজ্ঞান ও হিতোপদেশগুলি খোদিত করেন।

ডাক্তার য়্যাল ডোকোষ্টিলানি এবং ডাক্তার এল্‌বার্ট ক্যাসমার্স প্রণীত—'ম্যানুয়েল্‌-অব-ট্রপিক্যাল-মেডিসিন' নামক গ্রন্থে ডাক্তার দ্বয় মিসরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলেন যে, এবারেস-প্যাপিরাস যে প্রাচীনতম মিসরীয় ঔষধতত্ত্বের বিবরণ, তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। প্যাপিরাস যুগের পূর্ব্বে উহা প্রস্তর স্তম্ভে খোদিত ছিল; এবং উহা 'থতের' কীর্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে মিসরীয় এস্কালিউপিয়াস (চিকিৎসার আদি পিতা) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লেখকদ্বয় আরও বলেন যে, 'এবারেস-প্যাপিরাস' গুলিকে অনেকে হার্মিস-ট্রেস ম্যাজিষ্টাসের কীর্ত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা চল্লিশ খানা ছিল। তম্মধ্যে ছয় খানায় চিকিৎসা বিবরণ, সার্জ্জিকাল যন্ত্রপাতি, দেহতত্ত্ব ও ঔষধ-তত্ত্বের বিবরণ লিখিত রহিয়াছে। হার্ষ্ট প্যাপিরাস গুলোও এবারেস্‌ প্যাপিরাসের অনুরূপ। উহাতে নানাপ্রকার ঔষধের ফরমূলা এবং যোগ সাধনার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বার্লিনের প্রধান প্যাপিরাস গুলিতে ভৌতিকমন্ত্র এবং ঔষধীয় ফরমূলা আছে। বার্লিনের অন্য প্যাপিরাস গুলিতেও কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসা সহ অন্যান্য বহুরোগ বিবরণ, ঔষধীয় ফরমুলা, দেহতত্ত্ব ও দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া বিবরণ লিখিত রহিয়াছে।"

তৎপর লেখকদ্বয় বলেন—"মিসরীয়-চিকিৎসার এই ইতিহাসই ক্রম বিকাশ লাভ করিয়া পরবর্ত্তীযুগে আলেকজান্দ্রিয়, তৎপর আরবী (বা ইস্‌লামি) চিকিৎসা এবং পরিশেষে বর্ত্তমানযুগীয় (এলোপ্যাথি) চিকিৎসায় পরিণত হইয়াছে।"

বিলাতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ইতিহাসের-অধ্যাপক মিষ্টার চার্লস সিঙ্গার সাহেব বলেন, "বাবেল দেশীয় প্রাচীন কীলক-আকার লিপির গবেষকদের মূল চিকিৎসা বিজ্ঞান উৎসের অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এবং মোটামুটি ভাবে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, আধুনিক গবেষকগণ মেসোপটোমিয়ার চেয়ে মিসরকেই পূর্ব্বের ন্যায় চিকিৎসার আদি উৎস বলিয়া অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন। কেননা ইদানিং খৃঃ পূঃ ১৭০০ শতাব্দির লিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক যে প্যাপিরাসের পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে, উহার সহিত হাকিম বোকরাতের কোন কোন গ্রন্থের বিবরণের সহিত অবিকল সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পৃথিবীতে খৃষ্টজন্মের প্রায় আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরদেশেই সর্ব্ব প্রথম চিকিৎসা-বিজ্ঞান হজরত ইদ্রিস নবী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কঠোর সাধনা দ্বারা ইদানিং যে প্রাচীন প্যাপিরাসের পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে, উহা দ্বারা ইহাই প্রণানিত হয় যে, আর্য্যগণের ভারত আগমন ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের জন্ম হওয়ার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মিসরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি পিতা হাকিম ইস্‌কালিবুস (বা এস্কালিউপিয়াস), হজরত ইদ্রিস নবীর শিষ্য ছিলেন। তিনি বহুকাল মিসর দেশে অবস্থান করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানে চরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। হজরত ইদ্রিসের ওফাতের পর হাকিম ইস্‌কালিবুস গ্রীসদেশে আসিয়া মানব সেবায় মনোযোগ দেন। তাঁহার অনন্য সাধারণ ও অলৌকিক রোগহারক শক্তিদর্শনে গ্রীকগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দেশবাসীগণ তাঁহার

মূর্তিনির্ম্মান করিয়া ব্যাধির হাত হইতে ত্রান কর্ত্তা হিসাবে পূজা আরম্ভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মন্দিরগুলিতে কাহেনী বা পুরোহিত চিকিৎসাও আরম্ভ হয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে উক্ত মন্দিরের পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী শয়ন করিতে হইত; এবং রোগ মুক্তি হইলে আপন আপন রোগ বৃত্তান্ত তাম্র রৌপ্য বা স্বর্ণ-পদকে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মন্দিরে ঝুলাইতে হইত। এই কাহেনী-চিকিৎসা গ্রীস দেশে প্রায় হাজার বৎসরের অধিক চলিয়াছিল। তৎপর হাকিম বোকরাতের স্বর্ণযুগ উপস্থিত হয়। হাকিম বোকরাত (Hippocra es) ঐ সমস্ত রোগ বিবরণী ফলকগুলি সংগ্রহ করিয়া ইউনানী চিকিৎসাকে একটি বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিণত করিতে সক্ষম হন। এই নিমিত্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আজ হাকিম বোকরাতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে "দি ফাদার অফ মেডিসিন" (The father of Medicine) আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

হাকিম বোকরাতের পরিবর্ত্তীযুগেও গ্রীস দেশে হাকিম আফলাতুন, হাকিম আরাস্তু, হাকিম দি-মাকরাতিস, হাকিম সাওক্রেস্তাস, হাকিম দিয়াস কুরিদাস প্রভৃতি বহু-দার্শনিক-পণ্ডিত হাকিমগণ দ্বারা ইউনানী শাস্ত্র-পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান সম্মত শাস্ত্ররূপে গঠিত হয় এবং উহার চরম উন্নতি সাধিত হয়।

মধ্যযুগে, ষষ্ঠ শতাব্দির প্রথমভাগে পৃথিবীতে ইস্‌লামের-আবির্ভাব ঘটিলে, মুসলমান বিদ্যোৎসাহী উম্মিয়া ও আব্বাসিয় খলিফাগণ কর্ত্তৃক বহু স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে মূল গ্রীক ভাষা হইতে ইউনানী-চিকিৎসা শাস্ত্র আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ইমাম রাজী, বু-আলী সীনা, জাহরাবী, জাবের-বিন হাইয়ান, জুন্‌জুন্ প্রভৃতি মুসলমান পণ্ডিতগণ ইউনানী-চিকিৎসার উপর কঠোর গবেষণা চালাইয়া উহাকে ইস্‌লামী হাকিমী-চিকিৎসায় পরিণত করিয়াছেন, যাহা আজ হাকিমী বা ইউনানী-চিকিৎসা নামে প্রচলিত।

ঝঁকে ঝঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ আঠারো ॥

হোমায়েরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হোমায়েরা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকার চেষ্টা করিতেছিল। অর্গানের মৃদু টুংটাং শব্দে বাতাস মাতোয়ারা। ঘরের ভিতরে অর্গানের চাবিতে অনভ্যস্ত লঘুহাত চাপ দিয়া চলিয়াছে জুলি। সখ করিয়া হোমায়েরা অর্গানের জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়াছে। তবে কেনার সখ থাকিলেও শিখার ধৈর্য্য তাহার ছিল না। তাছাড়া বসিয়া বসিয়া টুংটাং করিতে তাহার ভালও লাগিত না।

জুলি মেয়েটি খুবই ছটফটে। পারুক আর নাই পারুক সময় পাইলেই বসিয়া বসিয়া অর্গান বাজাইত। হোমায়েরা তাহার আগ্রহ দেখিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, তোকে মাষ্টার রেখে দেব রে। ভাল করে শিখে নিতে পারবি।

আশ্বাস পাইয়া জুলির উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়। কাজ ফেলিয়া অর্গান বাজাইতে গিয়া হোমায়েরার ধমকও খাইয়াছে যে কয়েকবার! জুলেখা হোমায়েরার ঘর সংসার তদারক করে। হোমায়েরার নিজস্ব পরিচারিকার স্থান দখল করিয়াছে জুলি। তবে জুলির সহিত পরিচারিকার মত ব্যবহার করে না। অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে হোমায়েরার সহিত জুলির ব্যবহারও সহজ হইয়া উঠিয়াছে। হোমায়েরা জুলির বিবিসাব ডাকা ছাড়াইয়া আপা ডাকাইতে শুরু করিয়াছে। জুলেখা এক রকম বানে ভাসিয়াই আসিয়াছে। মা-বাবা মরা মেয়েকে তাহার আত্মীয় স্বজন এতিমখানায় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। মেয়েটিকে হোমায়েরার ভাল লাগিয়া যাওয়ায় সে রাখিয়া দিল, এতিমখানায় দিতে দিল না। নয় দশ বছরের সময় হোমায়েরার কাছে যখন আসে তখন পুষ্টির অভাবে পাঁচ ছয় বছরের মনে হইত। হোমায়েরার যত্নে মেয়েটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি ফিরিয়া পাইয়াছে। পনের যোল বছরের স্বাভাবিক জৌলুষ জুলির দেহে উচ্ছলতা লইয়া আসিয়াছে।

হোমায়েরা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ডাকিল, জুলি, ও জুলি!

জুলি অর্গানের চাবি হইতে হাত না তুলিয়াই জওয়াব দিল, জী।

হোমায়েরা ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল, এদিকে এসে শোনই না কি বলি।

জুলি উঠিয়া গিয়া হোমায়েরার সামনে দাঁড়াইল। হোমায়েরা হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, জাফর সাবকে ফোন করার কথা বলেছিলাম, করেছো?

জুলি জওয়াব দিল, করেছি আপা। জাফর সাব বললেন, আজ সন্ধ্যায় জরুরী কাজ পড়ে গেছে। তিনি আসতে পারবেন না। আগামী কাল সন্ধ্যায় অবশ্যই আসবেন।

হোমায়েরার মুখের হাসি নিভিয়া গেল। সে অনেকটা চাপা কণ্ঠে বলিল, আজ জরুরী কাজ পড়ে গেছে, আসতে পারবেন না! কাল আমার জরুরী কাজ আছে, কাল তার সাথে দেখা হবে না, সেটা তুমি বলে দাওনি?

কৈ, কাল আপনার জরুরী কাজ আছে বলে ত আমি জানিনা, আপা।

আছে, আছে। তুমি আর জেরা করোনা। যা বলছি তাই করো। ফোন করে জানিয়ে দাও।

তাই দিচ্ছি, আপা।

জুলি চলিয়া যাইতেছিল। হোমায়েরা তাহাকে ডাকিয়া থামাইল। বলিল, থাক এখনই ডাকাডাকি করতে হবে না। এক সময় জানিয়ে দিলেই হবে।

হোমায়েরা ইজিচেয়ারের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল।

আবার শুইয়া পড়িল। কিছু সময় আগেও সে যে স্বস্তি-বোধ করিতেছিল তাহা দূর হইয়া গেল। সায়েমের সাথে ব্যাপারটি চুকিয়া যাওয়ায় সে মনে করিতেছিল, সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এখন মনে হইতেছে, সায়েমের সাথে এমন ব্যবহার না করিলেও চলিত। সায়েম পথে থাকিলে জাফর তাহাকে এভাবে তুচ্ছ করার সাহস পাইত না। অন্তত আগে ত এমন সাহস হয় নাই।

এই কয়েক বছরে হোমায়েরা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। সে আগের তুলনায় অনেক ভারী হইয়াছে। তবে শরীরে পরিমাণ মোতাবেক মেদ বৃদ্ধির সহিত লাবণ্যও শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। সযত্ন পরিচর্য্যায় তাহার মাঝে উজ্জ্বল কান্তি শ্রী আসিয়া গিয়াছে। তাহার মুখে তারুণ্যের চপলতার জায়গায় শান্ত স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার চোখের দৃষ্টিতে আর তার ঠোঁটের কোণে সেই আগের হোমায়েরা জীবন্ত রহিয়াছে।

সংগ্রামই যদি জীবন হয়, তাহা হইলে সুন্দরভাবেই হোমায়েরা এই কয়েকটি বছর কাটাইয়াছে, ইহাই হোমায়েরার ধারণা। কোন দিকে দৃকপাত করে নাই। ন্যায় অন্যায় শালীনতার ধার ধারে নাই। জাফরের কাছে সে অত্যন্ত ঋণী। জাফরের উৎসাহ না পাইলে, জাফর তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া না আনিলে সে এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এখনও সামনে অনেক পথ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। যাহা সে পাইয়াছে সে ত তুচ্ছ, যাহা সে পায় নাই, তাহার জন্য তাহাকে আরও সংগ্রাম করিতে হইবে। হঠাৎ কি মনে হইতেই হোমায়েরা আবার ডাকিল, জুলি, ও জুলি!

জুলি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, কি, আপা?

ফোন করেছ?

না, আপা।

করে কাজ নাই। কিছু বলতে হবে না।

বলব না, আপা।

হোমায়েরা নিষেধ করিয়া দিল; কিন্তু সে জানিত নিষেধ না করিলেও ক্ষতি ছিল না। জুলির কথা শোনার পরও সে আসিতই। আসিয়া নিজের যতক্ষণ খুশী গল্প করিত, না হয় জোর করিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইত। কোন আপত্তি শুনিত না। জরুরী কাজের কথা উড়াইয়া দিত। জাফর স্বীকার করিত না তাহার সহিত আলাপ করা অপেক্ষা জরুরী কাজ হোমায়েরার আছে। জাফর নিজের দাবীকে এখন অধিকারের পর্য্যায় ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছে।

হোমায়েরা মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিত। কিন্তু হোমায়েরা ক্রমেই এই শিক্ষা পাইয়াছিল, মনের ভাব আর বাহিরের আচরণের মাঝে আসমান জমিন ফারাকই ভব্যতা। তাছাড়া, এক অনাস্বাদিত পূর্ব্ব আনন্দও যে তাহার শিরায় শিরায় রোমাঞ্চিত হইয়া ফিরিত না, তাহা নয়। এই কামনাই যেন সে আজীবন পোষণ করিয়া আসিয়াছে। ঝড়ের মত তাহার জীবনকে তচনচ করিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া তাহার মন যে কাড়িয়া নিবে তাহার উৎপীড়নের বোঝা বহন করার জন্যই সে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই। তাই তাহার দাক্ষিণ্যের দ্বারে হাত পাতিয়া নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। সে দান করিতে পারে না, সে লুণ্ঠিত হইতে চায়।

তাছাড়া নিজের কামনার রঙে যে দুনিয়া তাহার কাছে রঙিন, নিষ্কামতার ভান সেখানে অচল। জাফরকে তাহার প্রয়োজন ছিল, আরও আছে।

যে অপরিচয় লইয়া সে একদিন বাহির হইয়াছিল, সে অপরিচয় এখনও তাহাকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া আছে বলিয়া তাহার মনে হয়।

সত্যি সেদিন সন্ধ্যায় ঝোঁকের মাথায় বাহির হইয়া পড়িয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই-ত কোথায় যাওয়া যায়!

রিকসাওয়ালার প্রশ্নের জওয়াব অল্পক্ষণে সে দিতে পারে নাই। আববার ওখানে? তহমিনা আছে, ফুফু-আম্মা আছেন, আব্বা আছেন। হোমায়েরার অবাধ্যমন শতকণ্ঠে নিষেধ করিয়া উঠিল না, না,।

হোমায়েরা কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া মরিয়া হইয়া যাহা মনস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে তাহা কাজে লাগাইতে হয়ত দ্বিধা করিত না। এমন সময় তাহার মনে হইল, জয়নবের এত দিনের বন্ধুত্ব আমার কি এতটুকু কাজে আসিবে না? সঙ্গে সঙ্গে হোমায়েরা স্থির করিল, এ-ক্ষেত্রে বেশী ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া অর্থহীন।

হোমায়েরাকে এভাবে দেখিয়া জয়নব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। বিস্মিত জয়নবের দিকে চাহিয়া হোমায়েরা বলিল, হা করে দেখছিস কি? আমি তোর এখানে থাকবো বলে এলাম।

জয়নবের মুখ দিয়া কথা সরিতে ছিলনা। হোমায়েরা আবার বলিল, কি রে, জায়গা দিবি না?

জয়নব যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া বলিল, চল্, ভাই, চল, ভিতরে চল। কিন্তু তোর এই কি অবস্থা? এই চেহারা হয়েছে কেন তোর?

হোমায়েরা বলিল, সে অনেক কথা, কিছু পরে শুনবি। কিছু কিছু তোর না শুনলেও চলবে। কিন্তু তুই ত আশ্রয় দিলি, তোর সাব তাড়িয়ে না দিলে হয়।

জয়নব বলিল, কি যে বলিস। তারপর সে স্নিগ্ধ

হাসিয়া বলিল, এত সামান্য ব্যাপার, আমি ভুল করলেও উনি আমায় মাফ করবেন।

কয়েকদিন ভালই কাটিল। জয়নবের যত্ন আর কুদ্দুসের উৎসাহে হোমায়েরাকে কোন রকম অসুবিধা বোধ করিতে হয় নাই। এদের সাথে হোমায়েরার দিনগুলি আনন্দের সাথে মিশিয়া গিয়াছিল। এর মাঝে আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের সূচনা যে হইয়াছে তাহা জয়নব তাহাকে বুঝিতে দিল না। জয়নব অত্যন্ত যত্নের সহিত সংযত হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু হোমায়েরার ক্রমে মনে হইতে লাগিল জয়নব তাহার কাছ হইতে কি যেন লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে।

হোমায়ের মনে মাঝে মাঝে কৌতুক জাগিয়াছে। এমন যে পারস্পরিক বিশ্বাস এটা কি অটুট। দেখা যাক না একটু পরীক্ষা করে। কুদ্দুসের সহিত গল্প করার সুযোগ পাইলে হোমায়েরা হাসিতে বিবসউল্লাস সৃষ্টি করিয়াছে। কুদ্দুস যে ক্রমে তাহার সহিত আলাপ করার বিশেষ আগ্রহ বোধ করিতেছিল, হোমায়েরার তাহাতে সন্দেহ ছিল না। হোমায়েরার সাপুড়ে মনে এক হিংস্র আনন্দ ক্রমে ফণা মেলিয়া দুলিতেছিল। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, হোমায়েরা কঠিন হাতে রাশ টানিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল। সুখের সংসারের দাম তাহার কাছে ছিল না, কিন্তু সংসার পুড়াইবার নিষ্ঠুরতা তাহার এই কৌতুহলের মাঝেও প্রশ্রয় পাইল না।

জয়নবের কোন ভাবান্তর না দেখিয়া হোমায়েরা ভাবিল, মেয়েটি বড়ই সরল। জয়নবের উপর তাহার মায়া হইল। তবে ঘটনা চক্রে একদিন জয়নব ও কুদ্দুসের বাদানুবাদ তাহার কানে আসিল।

জয়নব বলিতেছিল, চল এখান থেকে চলে যাই।

কুদ্দুস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কোথায় ?

জয়নব বলিল, কেন তোমাকে প্রথমে যেখানে দিতে চেয়েছিল সেখানে।

কুদ্দুস বিরক্ত হইয়া বলিল, একি ছেলে খেলা ? এত লোকের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে ওডার বদলালাম। এখন আবার সেখানে যাবার জন্যই দরখাস্ত করবো।

হোমায়েরার কানে চাপা কান্নার শব্দ ভাসিয়া আসিল। জয়নব জড়িত কণ্ঠে বলিল, আমাকে ভাড়িও না। আমি সব বুঝি। এটা আমার সহ্য হবে না। চল এখন থেকে যাই।

কুদ্দুস বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর ? কি আশ্চর্য্য !

জয়নব কি বলিল হোমায়েরা শুনিতে পাইল না। স্বামীস্ত্রীর আলাপ এ ভাবে শুনিয়া নেওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া তাহার মনে হইল। তবে আলোচনার মাঝখানে সে নিজে রহিয়াছে বলিয়া তাহার কৌতুহলও হইতেছিল। তাহার মনে হইল জয়নব ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সম্ভবতঃ কুদ্দুসের বুকে মুখ চাপিয়া কাঁদিতেছে।

হোমায়েরাকে একটা ব্যবস্থা করিয়াই নিতে হইল। দুইদিন পরে হোমায়েরা জয়নবকে বলিল, তা হলে এবার তোদের এখান থেকে যাই।

জয়নব লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবি।

হোমায়েরা বলিল, একখানে কোথাও গিয়ে উঠতে হবে।

জয়নব বলিল, জায়গা ঠিক না হলে যাবি কেমন করে ?

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, তুই আরও থাকতে বলিস ?

জয়নব দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলিল, থাক না।

হোমায়েরা বলিল, দূর পাগলি! জীবনের অনেক জায়গায় শক্ত হতে হয় রে। সেখানে স্নেহের দুর্ব্বলতা বা বন্ধুত্বের আবদারকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

জয়নব হোমায়েরার দৃষ্টির সামনে লজ্জায় মাটির সাথে মিশিয়া যাইতেছিল। হোমায়েরা জয়নবের মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। জয়নব হোমায়েরার গলা জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ স্কুলের দিনগুলি যেন দুই জনের মঝখানে ফিরিয়া আসিল।

হোমায়েরা বলিল, তোর হয়ত মনে পড়ে আমি বলেছিলাম, দেখবো তোর জীবন। তুই-ও আমার জীবন কিছু কিছু দেখেছিস, আমিও দেখলাম। তোদের কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারবো না রে। তবে জয়-পরাজয় এখনও স্থির হয় নাই। সামনে এখনও বহুদিন পড়ে আছে।

কথা শেষ করিয়া হোমায়েরা হাসিয়াছিল। অনাবিল প্রাণখোলা হাসি সে হাসিয়াছিল।

হোমায়েরা চলিয়া আসিয়াছিল। তবে এবার তাহাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিয়া আসিতে হয় নাই। সে একটি স্কুলমাষ্টারী জোগাড় করিয়া লইয়াছিল।

স্কুলমাষ্টারী হইতে স্কুল ইন্সপেক্‌ট্রাস পর্য্যন্ত চড়াই অতিক্রম করিতে তাহাকে যাহা করিতে হইয়াছে, আজ তাহা মনে করিলে, তাহার কাছে তাহা রীতিমত রোমাঞ্চকর বলিয়া মনে হয়। কোন কোন সময় ঘৃণায় তাহার নাসিকাও কুঞ্চিত হইয়া উঠে। তবে নিজের কৃতিত্বের জন্য নিজে সে যথার্থ গর্ব্ববোধ করে। কোন অন্যায়কে সে অন্যায় মনে করে নাই, কোন অশোভনতা তাহার নিকট অশোভন ছিল না। কত রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্ম্মচারীর সংশ্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। বিচিত্র এ দুনিয়া। বিচিত্র মানুষের মনোবৃত্তি। কিন্তু কিছুই তাহাকে দমাইতে পারে নাই। যুগের সাথে তাল রাখিয়া

চলার নামই জীবন, এই বিশ্বাসই সে পোষণ করিয়াছে। আজও এই বিশ্বাস হইতে উৎসাহ আর কর্ম্ম শক্তি সে লাভ করিতেছে। সবাই যে পথের যাত্রী সে পথেই সে চলিতেছে, এতে লজ্জা বা গ্লানির স্থান কোথায়!

হাসান সাহেব বহুবার তাহার খোঁজ করিয়াছেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে ধরা দেয় নাই। জামাল তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ধমক খাইয়া তাহার ফেরাই সার হইয়াছে। হোমায়েরা এদের কথা বুঝিতে পারে না। কাজেই এদের কাছে তাহার শোনার কিছু আছে, তাহা সে মনে করে নাই। যুগের কাছে এরা বাতেল বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছিল।

সে যে জগতের সেখানকার সব কিছুই তাহার কাছে ভাল লাগিত। তবে সায়েমের বাড়াবাড়ি তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে যখন জয়নবের বাসায় সে সময়ই সায়েম রাশেদাকে তালাক দিয়া ছিল। এই ঘটনাটি হোমায়েরাকে অত্যন্ত ধাক্কা দেয়। এ-জন্য সে নিজেও কিছুটা দোষী। ইহা মনে করিয়া সে খুবই কষ্ট পাইতেছিল। সায়েম সম্পর্কে তাহার মন অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু রাশেদাকেও সে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। এ-আবার কেমনতর মেয়ে। তিলকে তাল করিয়া ঝগড়া বাধাইবার জন্যই যেন মুখাইয়া আছে। কেন বাবা! পুরুষ মানুষ কি আঁচলে বাঁধিয়া রাখার বস্তু! রয়ে সয়ে টান দিয়া ঢিলা দিয়া চলিতে না পারিলে এমনি হয়। রাশেদা বরাবরই খিটখিটে মেজাজের। কাজেই ভাগ্যের হাতে এই ফল গ্রহণ করা ছাড়া তাহার উপায়ই বা কি!

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটিই যে কুৎসিৎ, তাহাতে হোমায়েরার কোন সন্দেহ রহিল না। ইহা কঠোর ভাবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া গেল। রাশেদার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে সে জয়নব সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিল।

সায়েমের সহিত বোঝাপড়া করার জন্য হোমায়েরা তৈয়ার হইয়া ছিল। কিন্তু অনেকদিন যাবৎ সায়েমের দেখা সাক্ষাৎ নাই। কি সব কারণে তাহার চাকুরী যাওয়ার মত হয়। সে দিক সামলাইবার জন্য সায়েম ব্যস্ত ছিল। সায়েম পরে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। এর মাঝে মোবারকের সাথে হোমায়েরার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জয়নবদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার পরই হোমায়েরা এই খবর পাইল। খবর শুনিয়া সে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া পড়িল। এটাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

ভালই হইয়াছে, ভালই হইয়াছে, সে মনে মনে বলিতে চাহিল। কিন্তু নিজের ভিতর হইতে তেমন সাড়া পাইল না। সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক মোবারকের সহিত তাহার গড়িয়া উঠিয়াছিল। দুইজনের মাঝখানে কপাট চিরদিনের মত সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল! কিন্তু ইহা ছাড়া পথই বা কি ছিল? হোমায়েরা নিজের হাতেই ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ইহার পর ছেঁড়া সুতার গিরো দেওয়ার আর পথ ছিল না।

হোমায়েরার পড়ার খরচ জোগাইবার জন্য মোবারক উদায়াস্ত খাটিয়াছে। কতদিন হোমায়েরার মনের ফেনায়িত আবেগে ইহার প্রতিদান দেওয়ার প্রতিজ্ঞা জাগিয়াছে। হোমায়েরাও তাহার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তৈয়ার ছিল। সে ত নিজেকে মোবারক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কখনও কল্পনা করে নাই। মোবারকের সহিত জড়িত তাহার ভাগ্যকে সে ত মানিয়াই লইয়াছিল। সে নিজে নিজকে সকল দিক হইতে তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সাধের গড়া কল্পনাটিকে মোবারকই ত ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল।

বেশ হইয়াছে, ভাল হইয়াছে! সে এখন স্বাধীন, সম্পূর্ণ আজাদ। কোন দ্বিধাকেই তাহার আর প্রশ্রয় দিতে হইবে না, কোন সংশয়ই তাহার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। মোবারককে তাহার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

হোমায়েরা অতিরিক্ত মাত্রায় খুশী প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার গলার কাছে একটি কাঁটা বিঁধিয়াই রহিল। কয়েকদিন তাহা সে কিছুতেই নামাইতে পারিল না।

তাহার মনের যখন এই অবস্থা, সায়েম সে সময় তাহার কাছে আনাগোনা বাড়াইয়া তুলিল। হোমায়েরা রাশেদার প্রসঙ্গ তুলিতে পারিল না।

সায়েমের আনাগোনা যে সম্পূর্ণ নিষ্কাম নয়, হোমায়েরা তাহা বুঝিত। বর্ত্তমানে তাহার আকাঙ্খার মাত্রা যে অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সে টের পাইয়াছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার বাসনা যে কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সে খবর সে পায় নাই।

হোমায়েরা কৌতুহলের বশেই সায়েমকে প্রশ্রয় দান করিয়া চলিয়াছিল। একদিন সে বুঝিল, খেলা বন্ধ করার সময় আসিয়াছে। কিন্তু হোমায়েরা ছক গুটাইতে চাহিলেও সায়েম গুটাইতে পারিল না।

সায়েমের চোখে মাতাল দৃষ্টি দেখিয়া হোমায়েরা মনে-

মনে শঙ্কা বোধও করিতেছিল। সে তাহাকে এড়াইয়া চলার চেষ্টা করিতেছিল। হোমায়েরা সেদিন বাহিরে যাওয়ার জন্য তৈয়ারী হইয়া আসিয়া দেখিল সায়েম বসিয়া আছে। হোমায়েরাকে দেখিয়া সায়েম নাটকীয় ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এই যে!

হোমায়েরা বলিল, মাপ করবেন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

সায়েম মিনতির সহিত বলিল, একটু পরে গেলে হয় না?

না জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি।

সায়েম বলিল, এখন দেখছি আমি ছাড়া আর সমস্তই তোমার কাছে জরুরী!

হোমায়েরা কঠিন মুখে বলিল, যদি তাই বুঝেন, তা হলে তাই।

হোমায়েরার কঠিন মুখ দেখিয়া সায়েম ধাক্কা খাইলেও সামলাইয়া লইল। সে বোকাবোকা হাসি হাসিতে লাগিল। হোমায়েরা পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিল। সায়েম দরজা আগলাইয়া বলিল, এ কথা আমি এত সহজে গ্রহণ করবোনা হোমায়েরা।

হোমায়েরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আপনি কি জোর জবরদস্তি করতে চান?

সায়েম বলিল, দরকার হলে করতে হবে বৈ কি। অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য জোর জবরদস্তিতে অগৌরব নাই, হোমায়েরা।

হোমায়েরার আগের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। নাই দিলে বাঁদরও যে মাথায় চড়িয়া বসে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। পাশের একখানা চেয়ারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া হোমায়েরা বলিল, সকল শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে আপনার এই মনোবৃত্তি।

সায়েম হোমায়েরার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সবই ত তুমি বুঝ, হোমায়েরা। হৃদয়বৃত্তির কাছে দুনিয়ার আর সমস্তই তুচ্ছ। চিত্ত সাগরে যখন ঢেউ উঠে, জগৎ-সংসার তখন ফেনার মত তলিয়ে যায়। তোমার উপর জবরদস্তি করার সাধ্য আমার নাই। আমি তোমার কাছে হাত জোড় করছি, মিনতি করছি, তুমি আমার কথাগুলি শুনো হোমায়েরা।

হোমায়েরা চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলিল, বলুন।

হাতলহীন চেয়ার টানিয়া আনিয়া হোমায়েরার সামনে বসিয়া সায়েম বলিল, একখানা স্বপ্ন হাজারো রঙে রঙিন করে আমি বুনে তুলছি, আজ সে স্বপ্নই আমার শ্বাসরোধ করে আনছে। আমার সকল সাধনা নিয়োজিত করে আমি যা চেয়েছি, তা হতে কি চিরদিন আমাকে বঞ্চিত থাকতে হবে?

হোমায়েরা নির্বিকার মুখে বলিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

তোমাকে কি করতে হবে?

সায়েম অধৈর্য্য ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমাকে কি করতে হবে তা বলে দেওয়ার সাধ্য আমার নাই। তুমি নিজের অন্তর খুজে নিজেই এর জওয়াব দাও হোমায়েরা। আমার চিত্তের চূর্ণ কাচ মাড়িয়ে তুমি চলে যাবে, না আমার আশার স্বপ্নকে তুমি আরও সুন্দর করে তুলবে, তোমার বিবেচনার উপরই সব নির্ভর করছে।

হোমায়েরা দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অর্থাৎ আপনি চান, রাশেদা যা সন্দেহ করে আসছিল তাই সত্য বলে আমি প্রমাণ করি?

সায়েম অশান্তভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, না, রাশেদাকে তুমি টানছো কেন? সে স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাছাড়া রাশেদার সাথে আমার ত সকল সম্বন্ধই চুকে-গেছে। তার কথা নিয়ে তুমি আবার ভাবছো কেন?

হোমায়েরা বলিল, আপনাকে শিক্ষক বলেই শ্রদ্ধা করে আসছি।

হোমায়েরার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া সায়েম বলিল, তোমার শ্রদ্ধা ত আমি চাইনি, হোমায়েরা। যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছি, সেদিন হতেই তোমার কাছে একটি জিনিষ পাওয়ার জন্যই আমার মন কাঙ্গাল হয়ে উঠেছে। সেটা কি, আন্দাজ করতে পারো, হোমায়েরা?

সায়েমের হাত ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া হোমায়েরা বলিল, না ত।

পারো। তবু আমি বলছি, তা হলো, ভালবাসা।

হোমায়েরা মৃদু হাসিয়া বলিল, প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম।

সায়েম বলিল, তুমি ঠাট্টা করছো, হোমায়েরা। আশ্চর্য্য! তোমার হৃদয় শক্ত পাথর দিয়ে গড়া।

লোকে তাই বলে। আর তাতে একটা সুবিধাও আছে। আচ্ছা বলুন ত, এই ভালবাসা চাই-চাই-ভাব রাশেদাকে প্রথম দেখেও হয়েছিল কিনা?

তুমি বিশ্বাস করবে, হোমায়েরা?

বলুন।

আমার মনের এমন গভীর অনুভূতি পূর্ব্বে আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

হোমায়েরা বলিল, একথাটা যে রাশেদার কাছেও বলেছিলেন, সে সহজেই আমি বিশ্বাস করতে পারি।

সায়েম ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি নেহায়েৎ আমার প্রতি বিমুখ, তাই বিদ্রূপ মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছো না।

হোমায়েরা বিদ্রূপের কণ্ঠে বলিল, এটা যদি বুঝেই থাকেন তা হলে ফুসলাবার চেষ্টা করছেন কেন?

সায়েম কোনদিকে আশার আলো দেখিতে না পাইয়া মরিয়া হইয়া উঠিল। বলিল, তোমার মত মেয়ে লোকের মুখে এরূপ ঠাট্টা শোভা পায়! তবে তুমি এমন ছিলে না বলেই আমি তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ আশা করছিলেন, যে কোন মেয়েকেই সহজে বোকা বানানো যায়?

সায়েম বলিল, না তা আশা করছিলাম না। তবে জাফরের ঐশ্বর্য্য তোমার চোখ ধাঁধিয়ে না দিলে এটাকে তুমি এভাবে গ্রহণ করতে না।

হোমায়েরা বলিল, কথাটা তুললেন যখন তা হলে বলি, কোনদিনই আপনাদের মত লোককে কিছু আশা করার ফুরসত আমি দেই না।

সায়েম বলিল, তুমি খেলা করতে ভালবাসো। কিন্তু খেলাই তোমাকে একদিন এমন আঘাত দিবে যা তোমার পক্ষে মর্ম্মান্তিকও হতে পারে।

হোমায়েরা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া বলিল, আপনি আমাকে বদদোয়া দিলেন। কিন্তু আমিও আপনার কথাই বলছি নারী-পুরুষের সম্পর্ক খেলারই সম্পর্ক। এটাকে গুরুতর করে দেখার বোকামী যখন আসে তখন আপনারা বদদোয়া না করলেও মর্ম্মান্তিকতার কারণ ঘটেই যায়।

হোমায়েরা আবার হাসিয়া বলিল, আপনার কথা-গুলোই আপনাকে উপহার দিচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না।

সায়েম হতাশভাবে বলিল, পায়ের তলায় পিষে দিয়ে কেহ যদি বলে বলে কিছু মনে করো না, তা হলে সে ক্ষেত্রে আর কিছু বলার থাকে না।

হোমায়েরা সায়েমের কথার জওয়াব দিয়া কথা আর বাড়াইতে চাহিল না। সে শুধু বলিল, আপনার সাথে বাজে কথা বকে বকে আমার কাজ মাটি হলো। বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনাই ভেস্তে গেল। যাক কথা যখন পাড়লেন, এর একটা হেস্তনেস্ত করা আমার দিক হতেও দরকার বলে মনে করছি। সব কিছুরই মাত্রা আছে, কিন্তু আপনি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বলেই দেখতে পাচ্ছি। কাজেই এ-ব্যাপারে এখানেই যবনিকা টানা দরকার বলে আমি মনে করি। আমাকে অন্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন না বলেই আমি আশা করছি।

হতচকিত সায়েম হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিয়া বাক শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। হোমায়েরা নির্ম্মম। কিন্তু সে যে হৃদয়হীন, তাহা আজই প্রথম সায়েম বুঝিতে পারিল।

হোমায়েরা সায়েমের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, আঘাত দিয়ে যাদের আনন্দ, আঘাত পাওয়ার জন্যও তাদের তৈয়ার থাকা উচিত।

হোমায়েরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়া সায়েমের মনে হইল এই দুইটি চোখ তাহার সকল শক্তি যেন নিঃশেষে শুষিয়া নিতেছে।

সায়েম টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। হোমায়েরার মাথা হইতে যেন একটি মস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়
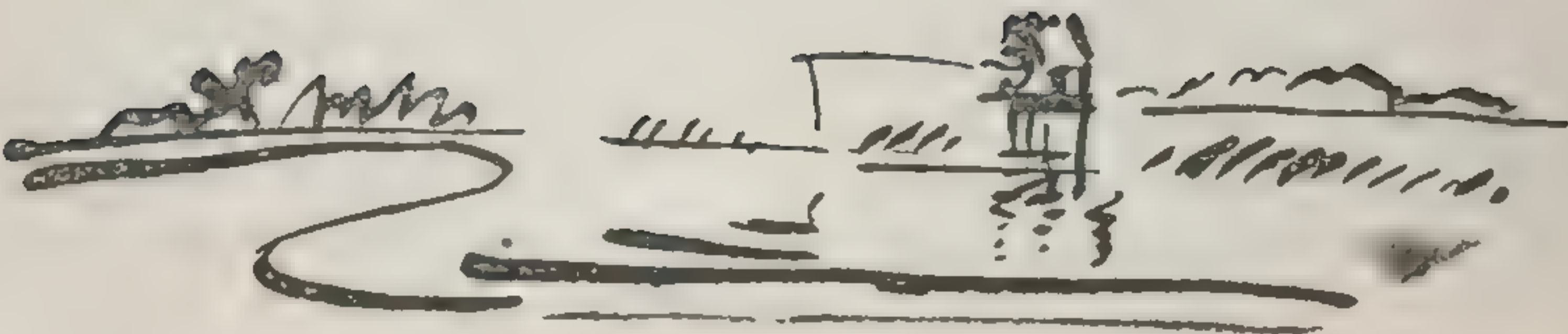
শিক্ষা কমিশন

দেশের শিক্ষাকে পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশনে ১০ জন শিক্ষাবিদ সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কমিশন শিক্ষাকে জাতির চাহিদা অনুসারে ঢালিয়া সাজিবেন। শিক্ষাকে যে নূতন ভাবে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন আছে, সে-সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এগার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এ-পর্যন্ত শিক্ষাকে জাতির চাহিদা পূরণের উপযোগী করা হয় নাই। ব্রিটিশ আমলের দিনে যে শিক্ষা এখানে চালু হইয়াছিল, তাকেই ইতস্ততঃ সংস্কার করিয়া আমরা কাজ চালাইয়া লইতেছি। বর্তমান শিক্ষা ব্যয়সাধ্য এবং জনসাধারণের নিকট দ্বার উন্মুক্তও নয়। শিক্ষাকে যদি সর্ব্বজনের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, তবে তাকে জাতীয় শিক্ষা বলা চলে না। আশা করি, কমিশন জাতির এই চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখিয়া তাঁদের সুপারিশ রচনা করিবেন।

শিক্ষা ও জাতীয় তমদ্দুন

পাকিস্তান যে একটি তামদ্দুনিক বিপ্লব, এ-কথাটার প্রতি গত এগার বৎসর আমরা কোনো গুরুত্ব দান করি নাই। জাতীয় শিক্ষার এই দিকটির প্রতি আমরা দারুণ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। ভারতীয় উপ-মহাদেশের ভিতর সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুছলমানরা নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। কারণ, ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুর সাথে মুছলমানদের তামদ্দুনিক জীবন ছিল আসমান-জমিন ফারাক। ধর্ম্ম, তাহজীব, তমদ্দুন ও শিক্ষাগত সংঘর্ষ সেদিন অখণ্ড ভারতে ছিল একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে সেদিন এই তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্য সব চাইতে বেশী প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এ জন্যই সেদিন মুছলমান বিশেষ-ভাবে তাদের একটি স্বদেশ কামনা করিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা যেন কতকটা ভুলিয়াই যাওয়া হইয়াছিল। আশা করা যায়, এবার এই ভুলের সংশোধন করা হইবে। আমাদের জীবনে জাতীয় তমদ্দুনের ছাপ লাগাইতে হইলে শিক্ষার মাধ্যমেই তা করিতে হইবে। সুতরাং সে সম্বন্ধে পরিস্কারভাবে নীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিতর এ-সব নীতি এবার নির্ভুল এবং পরিস্কারভাবে স্থির করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

বাধ্যতামূলক বিজ্ঞান শিক্ষা

পাকিস্তান বিজ্ঞান সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মানের শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটির প্রতি আমরা পাকিস্তানের সকল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক কল্যাণ সাধন যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রত্যেক মানুষকে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান আহরণ করা দরকার। ব্যক্তি হিসাবে কথাটা যেমন সত্য, জাতি হিসাবে ইহা আরো সত্য। সোজা কথায় বিজ্ঞানের প্রসারের উপরই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জ্ঞান-গরিমায়, মান-মর্য্যাদায়, সম্পদে, শৌর্য্যে যদি জাতিকে বড় হইতে হয়, তবে বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া ভিন্ন আজ আর গত্যন্তর নাই। দেশবাসীর সীমাহীন দারিদ্র্যের প্রতিকার করিতে হইলে দেশের আর্থিক ভিত্তিকে প্রশস্ত করিতে হইবে। এ-জন্য শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার না করিতে পারিলে বড় হওয়ার অন্য কোনো পথ নাই। দেশে দেশে নব নব কল কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। দেশের কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন না বাড়াইতে পারিলে বিদেশ হইতেও অর্থাগম সম্ভবপর হইবে না। দেশে-বিদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িতে হইলে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে হইবে। দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নয়নও দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিজ্ঞানকে দেশবাসীর সাথে সুপরিচিত করিয়া

তোলা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদের আজ পরম ও পবিত্র দায়িত্ব। দেশের নাগরিকদিগকে বিজ্ঞানমুখী করিয়া তোলার প্রধান সুযোগ তাদের শৈশব-তরুণ বয়সেই মিলে। এ-দিক হইতে বিচার করিলে বিজ্ঞান সমিতির সিদ্ধান্ত খুবই সুচিন্তিত হইয়াছে। কারণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যদি শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করা যায়, তবে এ-শিক্ষা যেমন তাদের স্বভাবগত হইয়া উঠে, তেমনই উচ্চ শিক্ষার পথও তাদের এ-দিক হইতে প্রশস্ত হইয়া উঠে। যারা তখন বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করিতে চায়, তারা এ-সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। বিজ্ঞান-সমিতির প্রস্তাব সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিবেন, সে-বিশ্বাস আমাদের আছে।

তোফায়েল ও আজম স্মৃতিস্তম্ভ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি মেজর মোহাম্মদ তোফায়েল ও জমাদার মোহাম্মদ আজমের স্মৃতি রক্ষার্থ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর মেজর জেনারেল ওমরাও খাঁ এই স্মৃতি স্তম্ভের উন্মোচন-অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাতে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীর মনের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। তিনি বলেন, "আক্রমণকে প্রতিহত ও মানবিক অধিকার প্রভৃতি রক্ষার্থ জীবন-দানকে মৃত্যু বলা চলে না। ইহাই প্রকৃত জীবন। এ-জীবন শহীদের জীবন। এছলামের মহান মনীষীরা ইহাই আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। এইরূপ মহৎ আদর্শ লইয়া বাঁচা ও মরার সঙ্কল্প আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

গাজী ও শহীদের ইতিহাস লইয়াই এছলামের ইতিহাস। শহীদের প্রতি মুছলমান যতখানি সম্মান দেখায়, অন্য কোনো জাতি তা করে না। শাহাদতের ঐতিহ্য নূতন দেশ পাকিস্তানে আজ গড়িয়া উঠিতেছে। মেজর তোফায়েল ও জমাদার আজম আজ তারই গোড়া পত্তন করিলেন। জাতির জন্য তাঁরা মৃত্যুহীন উত্তরাধিকার রাখিয়া গেলেন। যুগের মানুষ বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের মানুষ গর্ব্বের সাথে তাঁদের কথা ইয়াদ করিবে এবং নব নব অনুপ্রেরণা লাভ করিবে। সম্পদে নয়, বিপদেই মানুষের পরীক্ষা আসে এবং সেখানেই তার বীরত্বের পরিচয় মেলে। এই বীরত্বের পরিচয় দিয়া গেলেন মেজর তোফায়েল ও জমাদার আজম। তাঁদের উদ্দেশ্যে জাতির সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদিত হইবে।

প্রেস কমিশন

নয়া শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার আগেই পাকিস্তানের সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং সাংবাদিকতার উন্নয়নের জন্য প্রেস-কমিশন একাধিকবার গঠিত হয়। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় চেষ্টা শুরু হওয়ার পরই সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয়, নয়া কর্তৃপক্ষ এই কমিশনের ভিতর নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন এবং কমিশনের কাজ পুরাদমে অগ্রসর হইতেছে।

পাকিস্তানের সংবাদপত্র

পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদপত্রের সমস্যা অন্তহীন। নানা কারণে পাকিস্তানে তার সমস্যা আরো জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ বিভাগের পর বড় বড় শহরগুলি ভারতে পড়িয়া যায়। করাচী, লাহোর ঢাকা প্রভৃতি শহর পাকিস্তানে পড়ে বটে, তবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন-ভাবে চলার ঐতিহ্য তাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। সংবাদপত্রের অবস্থাও তার সাথে একই সূত্রে গ্রথিত। যা' হোক দেশ বিভাগের প্রাথমিক ধাক্কা পাকিস্তানী সংবাদপত্র কাটাইয়া উঠিয়াছে। নূতন ভাবে যন্ত্রপাতি আমদানী, সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি পাকিস্তানী সংবাদপত্রকে করিয়া লইতে হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে অনগ্রসর অঞ্চলগুলি লইয়া পাকিস্তান গঠিত হয়। সুতরাং বেসরকারী পাকিস্তানী বিজ্ঞাপনের অসুবিধাও পাকিস্তানী সংবাদপত্রকে দীর্ঘদিন ভোগ করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। অথচ সকলেই জানেন যে, বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রের অর্থাগমের প্রধান পথ। এই পথে পাকিস্তানী সংবাদপত্রের যে অসুবিধা আছে, তা সকলেরই জানা কথা। ফলে চেষ্টা চরিত্র থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানী সংবাদপত্রের আর্থিক বুনিয়াদ আশানুরূপ সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দারুণ আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকূল পরিবেশের উপর সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তানী সংবাদপত্রসমূহকে বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে।

প্রেস আইন

পরাধীনতার যুগ হইতে আমরা সংবাদপত্রের ভাল মন্দ সব কিছুই উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া আসিয়াছি। মন্দের মধ্যে আমরা ব্রিটিশ আমলের কতকগুলি সংবাদপত্র সম্পর্কিত আইন পাইয়াছি। এ-সব আইনের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার আজ বাঞ্ছনীয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ-দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে যে সুনজরে দেখিতেন না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজাদ পাকিস্তানে আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং আজ আমরা অন্যান্য আজাদ ও গণতান্ত্রিক দেশের সমতুল্য স্বাধীনতাই কামনা

করি। আশা করা যায় যে, কমিশন পাকিস্তানী সংবাদ-পত্রের এই সব দাবী-দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁদের সুপারিশাদি রচনা করিবেন।

আইনগত ব্যাপারে সংবাদপত্র কোনো ধরণের বিশেষ অনুগ্রহও চায় না এবং নিগ্রহও বরণ করিতে চায় না। দেশের আর দশজন নাগরিক প্রচলিত আইনের যে সব সুবিধা-সুযোগ ভোগ করে, সংবাদপত্র শুধু সেই সমতুল্য অধিকারই কামনা করে। কোনো সংবাদপত্র অপরাধ করিলে দেশের সাধারণ আদালতের সাধারণ আইনেরই তারা বিচারাধীন হইতে চায়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানে ঠিক আমরা আজ তাই চাই। সংবাদপত্রের আজাদীর দাবী, দেশের জন-গণেরই দাবী। আশা করি, প্রেস কমিশন এ-সব কথা সব সময়ই ইয়াদ রাখিয়া তাঁদের প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রণয়ন করিবেন।

জনাব বোখারীর এন্তেকাল

অধ্যাপক আহমদ শাহ বোখারী গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে নিউইয়র্কে এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে ...রাজেউন)। অধ্যাপক বোখারী জাতিসঙ্ঘের জন-সংযোগ দফতরের আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। অধ্যাপক আহমদ বোখারী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষের পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনি অবিভক্ত ভারতে "অল-ইণ্ডিয়া রেডিও"-র প্রথমে ডেপুটি কণ্ট্রোলার পরে কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হন। পরে তিনি ইহার প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর জেনারেলের পদেও বরিত হইয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অধ্যাপক বোখারীর খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়ে। সাহিত্যিক, ছোট গল্পের লেখক এবং অনুবাদক হিসাবেও অধ্যাপক বোখারীর কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তানের শুধু ক্ষতি হয় নাই, জাতি-সঙ্ঘেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে যাইয়া জাতিসঙ্ঘের মুখপাত্রেরা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ-কথা নানা ভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, অধ্যাপক বোখারীর ভিতর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তমদ্দুনের এক মধুর মিলন সাধিত হইয়াছিল। আমরা মরহুম বোখারীর আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিতেছি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতি-ষ্ঠান গড়িয়া তোলার ব্যাপারে তৎপর হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করার জন্য শীঘ্রই পাঁচ জন জার্মানী বিশেষজ্ঞ করাচী পৌছিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। অন্য দিকে পাকিস্তানের ক্ষুদ্র শিল্প কর্পো-রেশনকে পুনর্গঠন করা হইতেছে। এই সব ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে তিন শত পর্য্যন্ত শ্রমিক কার্য্য করিবে। পল্লী এলাকায় এবং ছোট ছোট শহরে শ্রমিকদের কর্ম্ম সংস্থান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে।

পাকিস্তানে কিছু কিছু ভারী ও বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-সবের ঝক্কি এবং ঝামেলা অত্যন্ত বেশী। এ-জন্য বড় মূলধন, কারিগরী অভিজ্ঞতা ও সংগঠনী বৃদ্ধির প্রয়োজন খুব বেশী। দরিদ্র দেশে তাই বড় বড় কল কারখানা গড়িয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পক্ষান্তরে এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ যেমন প্রকাণ্ড, চাহিদাও তেমনই প্রচুর। আমরা সরকারের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

মরহুম শওকত হায়াত খাঁ

লেঃ কর্ণেল শওকত হায়াত খাঁ দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ১৪ই ডিসেম্বর এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন (ইন্না-লিল্লাহে রাজেউন) তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র এবং কর্ম্মবহুল। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করিতেছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

মোহাজের পুনর্ব্বাসন

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্বপাকিস্তানের মোহাজের পুনর্বা-সনের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য এ-মাসেই পুনর্বাসন উজীর লেঃ জেঃ আজম খাঁ পূর্ব্বপাকিস্তানে আগমন করিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারের কাজে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এ-কাজের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিলেন। নয়া সরকার মোহাজের পুনর্বাসনকে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে মোহাজের পুনর্বাসনের কাজ খুব জোরেশোরে আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য সেখানে উপশহরও নির্ম্মিত হইতেছে। সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় এই পুনর্বাসনের দায়িত্ব এবং বর্ত্ত-মান সরকারের কর্তব্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতা দেখিয়া মনে হয় যে এবার মোহাজের পুনর্বাসনের কাজ যথাশীঘ্র এবং সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। অতীতে মোহাজেরদের নাম করিয়া অনেক নেতা ও অনেক উজীর অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁদের সময় এই সমস্যা সমাধানের জন্য তেমন কোনো বাস্তব ও আন্তরিক চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যা' হোক, আমরা মোহাজের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চাই। এ-ব্যাপারে আমাদের দীর্ঘকালীন ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-কলঙ্কের যতশীঘ্র অবসান হয়, ততই মঙ্গল। কারণ, মোহাজের সমস্যার সমাধান ভিন্ন সুখী পাকিস্তানের স্বপ্নসাধ বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবে না।

পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি

ঢাকায় সাহিত্যে, শিল্পে এবং অন্যান্য তামদ্দুনিক কাজের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের আদর্শ প্রচার ও পাকিস্তান বিরোধী কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠিত হইয়াছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আমাদের সাহিত্য এখনও তার পরিপূর্ণ জাতীয় রূপ লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য দাবী অনেক কিছু। অতীতের চিন্তার বদভ্যাস ও মোহাচ্ছন্নতাও অনেকে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, পাকিস্তান আমাদের জীবনে এক বিপ্লব আনিয়াছে। এই বিপ্লব আজও আমাদের সাহিত্যে তার বলিষ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং এজন্য পাকিস্তানের সাহিত্যিক গোষ্ঠির সাধারণভাবে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক গোষ্ঠির আজ বিশেষভাবে অবহিত হইয়া পূর্ণোদ্যমে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।

পক্ষান্তরে পাকিস্তান বিরোধী ভাবধারাও আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে আজও ইতস্ততঃ সক্রিয় রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় আদর্শের দুশমনরা সাহিত্যের অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করিয়া নানারূপ অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। ইহাদের প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দেওয়ারও প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং সকল পাকিস্তান পন্থী সাহিত্যিক ও তমদ্দুনসেবীদের একযোগে সচেতনভাবে কাজ করা দরকার। এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। আমরা এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad Press
Ramna Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী
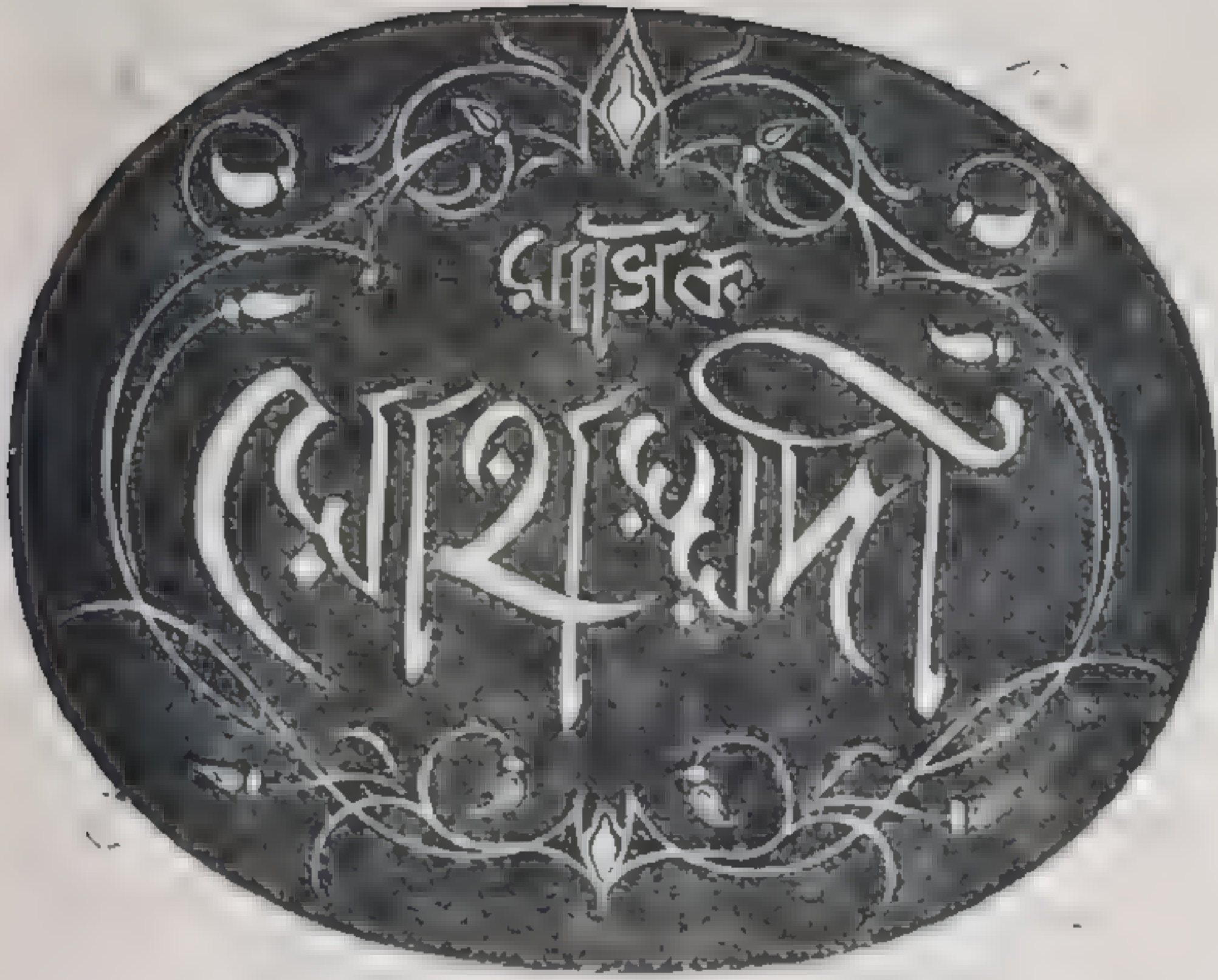
মাঘ, ১৩৬৫
৩০শ বর্ষ, : ৪র্থ সংখ্যা

আনবিক যুগে ইসলামের মূল্যমান

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ

বিজ্ঞানের এ-অগ্রগতির যুগে আনবিক বোমার আবিষ্কার এক অভুতপূর্ব ব্যাপার। এর ফলে দুনিয়ার পূর্বতন চিন্তাধারাতে হয়েছে আলোড়নের সৃষ্টি। আনবিক শক্তির দওলতে একদিকে মানুষ যেমন নানাবিধ ক্ষেত্রে অসম্ভব উন্নতি লাভ করতে পারে—তেমনি তার অপপ্রয়োগের ফলে মানব সভ্যতার ধ্বংস হ'তে পারে। আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা আলবার্ট আইনষ্টাইন তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, যুদ্ধের সময়, আনবিক শক্তি প্রয়োগ না করার জন্য সকল দেশের মানুষের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেছেন এবং মাত্র কিছুদিন আগে অপর কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে একযোগে বার্টাণ্ড রাসেলও দুনিয়ার মানুষের কাছে এ-শক্তির অপপ্রয়োগ যা'তে না হয়—তার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন।

বৈজ্ঞানিক জগতে তাই দেখা দিয়েছে মহা সংকট। বলগা হারা বুদ্ধির দওলতে প্রতিদিনই বিজ্ঞান নানাবিধ শক্তির আবিষ্কার করছে। মানুষ শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'লে তার পক্ষে প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের হিতাহিত বিচার করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। মানুষের সুবিধার জন্য বা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন শক্তিকে মানুষ যথা ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। আবার বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পূর্বেকার আবিষ্কার নিয়েই মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকলে তার পক্ষে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির করা হয় অবমাননা। বিজ্ঞানের শেষ নেই। প্রতিদিনই তাকে এগিয়ে যেতে হ'বে নূতন থেকে নূতনতর পর্য্যায়ে। কোন এক ধাপে এসে থেমে গেলে বিজ্ঞানের হবে অপমৃত্যু।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে তার অবদানের সুপ্রয়োগ নিয়ে তাই চলেছে দ্বন্দ্ব। একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে অভিনবত্ব, অপরদিকে তার ফলিত রূপের সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণের সম্বন্ধ।

কিসে বিজ্ঞানের এ-দু'টো দিকের সমন্বয় হয়, সে প্রসঙ্গে চিন্তার ফলে বার্টাণ্ড রাসেল সিদ্ধান্ত করেছেন—"Science increases our power to do good and harm and therefore enhances the need for retraining destructive impulses." অর্থাৎ "বিজ্ঞান আমাদের ভালমন্দ দুই-ই করবার শক্তি বৃদ্ধি করে, এর জন্যই ধ্বংসকারী প্রবৃত্তির দমন তাতে আরও প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে।"

তারজন্য তিনি নূতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বলেছেন—"A few moral outlook is called for a which submission to the powers of nature is replaced by the respect of what is best in man. It is where this respect is lacking that scientific technique is dangerous. :o long as it is present science having delivered man from bondage to nature, can

proceed to deliver him from bondage to the slavish part of himself. The dangers exit but they are not inseritable, and the hope for the future is atleast as rational as fear."

একটা নূতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। তা'র ফলে প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নতি স্বীকারের পরিবর্তে মানুষ তার মধ্যকার সর্ব্বোত্তম গুণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'বে। যে-সব ক্ষেত্রে এ-শ্রদ্ধার অভাব, সে-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভয়াবহ। যতদিন এ-পর্য্যন্ত এটা বর্তমান থাকে ততদিন বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তার আপনার দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করবে। ভয়ের আশঙ্কা রয়েছে সত্যি, তবে সেগুলো অপরিহার্য্য নয় এবং ভবিষ্যতের জন্ম ভয়ের সঙ্গে আশা পোষণও সমানভাবে যুক্তিপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে মানুষ কিসের প্রেরণায় তার সর্ব্বোত্তম গুনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'বে? সে প্রেরণা তো বিজ্ঞানের কাছে থেকে পাওয়া যায় না। তিনিই তো স্বীকার করেছেন—"The sphere of values lies outside science."

মূল্যমানের ক্ষেত্র বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। আবার তিনিই সাবধান করে বলেছেন—"Science as the pursuit of power must not dotrude upon the sphere of values" শক্তির অন্বেষণ হিসেবে বিজ্ঞানের পক্ষে মূল্যমানের ক্ষেত্রে অযাচিত ভাবে তার মতামত চাপানো উচিৎ হ'বে না।

তা'হলে বৈজ্ঞানিক অবদানের সুষ্ঠুফলিত রূপের জন্ম বিজ্ঞানকে নৈতিক—মূল্যমানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে হ'বে। নৈতিক মূল্যমানের প্রতি শ্রদ্ধার পশ্চাতে রয়েছে মানুষের নীতিবোধ। সে নীতিবোধ স্বয়ং সম্পূর্ণ (Self-Sufficient) না তার পশ্চাতেও রয়েছে আরও কোন শক্তি কার্য্যকরী—সেইটেই আজকের দিনে ভেবে দেখবার বিষয়।

মানুষের নীতিবোধকে ক্যাণ্ট বা তার অনুসারীরা সার্ব্বভৌম বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁদের মতে, কর্তব্যবোধ থেকেই নানাবিধ নৈতিক মূল্যমানের সৃষ্টি হয়। Thou oughtest therefore Thou Caust তোমাকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেই হ'বে, তা'হলেই বুঝ্‌তে হ'বে তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করার সামর্থ্যও রয়েছে। এতেই ইচ্ছার স্বাধীনতারও স্বীকৃতি রয়েছে।

ক্যাণ্টের এ-সব উক্তিতে যে আংশিক সত্য রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিক মূল্যমানের স্বীকৃতি রয়েছে। ভাল-মন্দের বিচার আমরা সর্বদাই করি। তবে বিচারে তারতম্যও রয়েছে। সকল মানুষের বিচার এক পর্য্যায়ের নয় এবং সকলের কর্তব্যবোধও এক নয়। এর মধ্যে এক সার্বজনীন-সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন। ক্যাণ্টের মত মহামানবের পক্ষে যে নীতিবোধ ছিল অতি স্পষ্ট, সর্ব্ব সাধারণ মানুষের কাছে তা' দুর্বোধ্য। তাই আরও গভীর ভাবে এ-নীতিবোধের উৎস খুঁজতে হ'বে।

যদি মনের প্রকৃতিকে প্রমাণ করা যায় সার্বজনীন বলে এবং যদি প্রমাণ করা যায়—মানুষের মধ্যে আপাত বৈষম্য দৃষ্ট হ'লেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক ভিত্তিগত ঐক্য, তাহলে সে-নীতি বোধের উৎস পাওয়া যেতে পারে মানুষের প্রকৃতিতেই।

ইস্‌লাম ক্যাণ্টের অনেক আগে তাই মানুষের মধ্যে সে-ঐক্য আবিষ্কার করে বলেছে :

"মানুষেরা ছিল একই জাতি—পরবর্ত্তীকালে-মানুষেরা তাদের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছে।"

(সুরা ইউনুছ-১০—২—১৯)

কাজেই যে-নীতি বোধকে ক্যাণ্ট ধরে নিয়েছেন সার্বজনীন বলে—এবং যার সার্বজনীনতা বর্তমানে আমাদের অভিজ্ঞতাতে স্পষ্ট নয়—তার প্রমাণ স্বরূপ কোরাণের ভাষায় বলা যায় এটার অভাব দেখা দিয়েছে মানুষের কারসাজিতে। মানুষ তাদের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি করে তার এ-সার্বজনীন নীতিবোধের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি করেছে।

মানুষের মধ্যে গোড়ার দিকে রয়েছে ঐক্য। তাই বর্তমানে নীতির বিচারে তাদের মধ্যে তারতম্য দেখা দিলেও সে-নীতিবোধের সঙ্গে তার রয়েছে জন্মগত যোগ। পারিপার্শ্বিক কারণে তাতে ঐক্যের অভাব দেখা দিলে বুঝ্‌তে হ'বে এটা মানব-জীবনে একটা আপতন (accident) মাত্র। এ-পরিস্থিতি চিরস্থায়ী নয়।

যে নীতি বোধের অভাবের ফলে আজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে মানুষ পড়েছে মহা ফাপরে এবং যার ফলে মানব সভ্যতা এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত—তাকে বর্তমান কালের নানাবিধ সংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্ম চাই উদার মানবিকতার সৃষ্টি। মানুষকে আবার সুস্থ ও সুষ্ঠু করার জন্ম তাকে নিজস্ব প্রকৃতির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে এবং তাকে শিখিয়ে দিতে হ'বে তোমাদের মধ্যে তোমরা যে বিভেদের সৃষ্টি করেছো তা তোমাদের প্রকৃতির অনুকূল নয়। তোমরা গোড়াতে ছিলে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ; তোমরা অশিক্ষা ও কুশিক্ষার মোহে পড়ে পরস্পর থেকে বিভিন্ন হয়ে পড়েছো। কোরাণের ভাষায় বলতে হ'বে—

"প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভ্রাতৃত্ব একই ভ্রাতৃত্ব এবং আমি তোমাদের প্রভু। কাজেই আমাকে ভয় করো। মানুষেরা নিজেই তাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের আইন-কানুন এবং লোকাচরে আনন্দ প্রকাশ করে"—

(আল মু'মেনিন-২৩—৩—৫২—৬৩)

ইস্‌লাম গোড়াতে মানুষের প্রকৃতিগত ঐক্য স্বীকার করে নেওয়ায় এবং মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ থাকার সত্যটী স্বীকার করায় বর্তমানকালের সংকটে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পারে।

এ-সংকট সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। তাতে বাধা দিলে বিজ্ঞানের হয় মৃত্যু। আবার বিজ্ঞানের অবদানের শুভ প্রয়োগ না হ'লে মানব সভ্যতার হয় ধ্বংস। বিজ্ঞান তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবেই, তার জন্যও কোরাণ শরীফে অনুপ্রেরণা রয়েছে—

"প্রভু যাকে তার পছন্দ হয়, 'হিকমত' দান করেন এবং যে হিকমত লাভ করে সে চরমতম সুবিধার অধিকারী হয়—" (সুরাঃ বকর-৩—৩৬—২৬৯)

এ-হিকমতকে বৈজ্ঞানিক বা তত্ত্বজ্ঞান উভয়েই বলা যায়। এরই দওলতে মানুষ বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান লাভ করতে পারে। সে-জ্ঞানের ফলেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় সম্ভবপর। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে তাই ইস্‌লামের পক্ষ থেকে তাগিদ রয়েছে। তবে যাতে সে গবেষণালব্ধ ফল মানুষের অকল্যাণে প্রয়োগ করা না হয় তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে—যারা-সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয় তাদের অপরাধের জন্য রয়েছে ঘোরতর শাস্তি।

ইস্‌লাম তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অনুপ্রেরণা দিয়ে মানুষকে নূতনতর জ্ঞান লাভের জন্য একদিকে উদ্‌বুদ্ধ করে, অপরদিকে যাতে তার গবেষণা লব্ধ ফলের অপ-প্রয়োগ না হয় তার জন্য তার জন্মগত ঐক্যও তার মূল্য বোধের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিজ্ঞানের এ-যুগ সন্ধিক্ষণে তাই বিশ্ব সভ্যতাকে একমাত্র ইস্‌লামই রক্ষা করতে পারি।

শেষ রাতে

মনসুর আহমদ

শেষ রাতে ঘুম ভেংগে গেল।
আশ্চর্য হিমেল হাওয়া, নক্ষত্রের অভ্রধোয়া বাতি,
কালো ভয়েলের মাঝে সবুজাভ গাছের শরীর
নারীর মতন স্নেহে গুটিসুটি কাছে জমে আসে।

অগোছালো বিছানায় বালিশের বুক থেকে
সরে যাওয়া মাথা
অসহায় চোখ রাখা মশারির খোঁয়াটে দেয়ালে,
এমন নিথর রাতে হলুদ চাঁদের মত
মনে হলো আমিও তো একা।

অথচ সবই তো আছে—হাত দিলে চুনের দেয়াল
সদ্য নীল রঙ দেয়া, মাথার অনেক কাছে বুক সেলফ
থাকে থাকে বই—অনেক অনেক কথা অক্ষরের
সমাহিত ভীড়, অথবা ব্রাকেটে ঝোলা
কাপড়ের উষ্ণ অনুভূতি,
তবুও তো মনে হলো সব যেন মিথ্যে অবয়ব—
আমি একা, এ-প্রহরে আমি কত একা!

শেষ রাতে ঘুম ভেংগে গেল।
অল্প ঝড় উঠেছিল মায়াবী হাওয়ায়,
অনেক দূরের ঐ কাঁচের আকাশ থেকে
এতটুকু আলো
নারীর মতন স্নেহে হাত রাখে গাঢ় মমতায়।

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

সেকালে মুছলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন টেইলর সাহেব। তাঁরই নাম অনুসারে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে মুছলমান ছেলেদের জন্য টেইলর হোষ্টেল খোলা হয়। একদিন টেইলর হোষ্টেলে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা কামরায় বেশ ভীড়। অনুসন্ধান করায় একজন বল্ল—একটা লোক মর মর অবস্থায় ওখানে পড়ে আছে। বল্লাম কে? উত্তর হল অতশত তো জানি না; তবে লোকটার নাকি লেখার ব্যারাম আছে। আর এক জনে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বল্ল—আরে কেবল তাই নয়: উনি আবার সংস্কারক হতে চান, আর সে-জন্য সোনাগাছিতে ঘোরাফেরা করেন।

কথাটা আমার মনে লাগল। ভাবলাম লিখতে চাওয়ার অপরাধ অনেকেরই আছে: এ-অপরাধে শাস্তি নাই, প্রশংসা মিলে; অগত্যা সকরুণ সহানুভূতিটুকু আর যায় কোথায়? কিন্তু সংস্কারের জন্য বেশ্যাদের বাড়ী গিয়ে খোঁজ নেওয়া—এতো ছোট মনেরও কথা নয়, সহজ সাহসেরও কথা নয়।

দেখতে গেলাম। রোগা শরীর, দারিদ্রের চিহ্ন দেহের সর্বত্র পরিস্ফুট; অথচ মুখে অসম্ভব রকম ধৈর্যের মহিমা লেগে আছে। শুনলাম নাম ওঁর ডাক্তার লুৎফর রহমান।

আরো শুনলাম দেশে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের সেবা ধর্মে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। আশে-পাশের মুনশী-মৌলভীদের কাছে অনুসন্ধান করেন যে ইছলামে সেবা কাজের তাকিদ আছে কিনা। তাঁরা সন্তোষজনক কোন উত্তর না দিতে পারায় ডাক্তার সাহেব খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে ব্রতী হন। খবর জেনে এক মৌলভী সাহেব তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। এর পর হতে ইনি কলকাতা এসে বেশ্যা পল্লীতে পল্লীতে যাতায়াত শুরু করেন; তাদের করুণ কাহিনী নিজে শোনেন; তাঁর সহানুভূতির পরশে বেশ্যারা কাঁদে; তা দেখে তিনিও কাঁদেন। তিনি সাব্যস্ত করেন, ওদের মধ্যে যারা নিষ্পাপ জীবনে ফিরে আসতে চায়—(এবং এদের সংখ্যাই বেশী) তিনি তাদের আসার পথ সুগম করে দিবেন। এ-কাজ যে কত কঠিন, তা সবাই জানেন। ডাক্তার সাহেব চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সমাজের সদরদ সহযোগিতা না পাওয়ায় বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নাই। তাঁর এই মহান প্রচেষ্টার জন্য বরাবর আমি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি।

তাঁর কথা শুনে আমার একান্ত কৌতুহল হল। কলকাতায় আমার এক দারোগা বন্ধুকে ধরলাম—'ভাই, আমাকে কোন একটা বেশ্যার বাড়ী নিয়ে চল; আমি তার সাথে আলাপ করব, তার সমস্ত কথা শুনতে চেষ্টা করব।' বন্ধুটি আমাকে নিয়ে চল্লেন। অর্ধেক পথ গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন; বল্লেন: 'না, ইব্রাহীম, তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারব না।' আমি বল্লাম, 'কেন? কি দোষ? আমার উদ্দেশ্য তো তুমি জান?' তিনি বল্লেন—'আমি নষ্ট পেয়েছি, তোমাকে যে নিয়ে যাব, যদি হঠাৎ তোমার পা পিছলে যায়, তবে সে দুঃখ রাখবার আমার ঠাঁই থাকবেনা।'

ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেবের খৃষ্টান হতে যাওয়ার কথা শুনেই মওলানা আহ্ছান উল্লা সাহেবের সহযোগে আমি 'ইছলামে সেবা' নামক পুস্তিকা লিখি।

এই নীরব সাধকের মহান চিত্ত ফুটে উঠেছে তাঁর 'উন্নত জীবন' ও 'মহৎ জীবন'-এ।

ছৈয়দ এমদাদ আলী

কি সূত্রে মনে নাই, ছৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবের সঙ্গে এই সময় পরিচয় ঘটে। নব জাগ্রত মুছলিম বঙ্গে যে কয়জন কল্যাণব্রতী সাধনার সংকল্প নিয়ে বাংলা সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হন, ছৈয়দ এমদাদ আলী তাদের অন্যতম। তিনি সে আমলের 'নব নূর' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। পুরাণা এক কপি 'নব নূরে' ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের একটি ছোট্ট কবিতা দেখে-

ছিলাম। আমি স্কুলে থাকতেই এমদাদ আলী সাহেবের 'তাপসী রাবেয়া' পড়েছিলাম।

ছৈয়দ এমদাদ আলী তখন পুলিশে চাকরী করেন। কিন্তু কি সুন্দর তাঁর মেজাজ, কি ভদ্র তাঁর ব্যবহার, কি উদার তাঁর মন, কি মার্জিত তাঁর চাল-চলন! পরম স্নেহে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করে কাছে বসালেন; সাহিত্যের মারফত আমাদের এ-দুর্ভাগা সমাজের কি কি বিষয়ে খেদমত করা সম্ভব ও সঙ্গত, পরম দরদের সঙ্গে তিনি তা আলোচনা করতেন। কিছু নাস্তা পানি না খেয়ে তাঁর ওখান হতে উঠবার উপায় ছিল না।

দীনেশ সেন

এক হিন্দু বন্ধু আমাকে ধরে একদিন দীনেশ সেন মশাইর বাড়ী নিয়ে গেল। স্কুলে পড়তেই তাঁর 'বেহুলা' পড়েছিলাম। পরে তাঁর আরো অনেক বই পড়ি।

তাঁর সঙ্গে কথা বলে বার বার মনে হচ্ছিল, তাঁর লেখা যেমন গভীর মমতা, কখনো বা নিবিড় ভক্তি রসে ডগ মগ, তাঁর মেজাজটিও তেমনি সুন্দর, তেমনি মমতাময়, তেমনি ভক্তি নিষিক্ত। এক ইয়াকুব আলী চৌধুরী ছাড়া তাঁর মত বাংলায় সুন্দর পাঠক আমি আর দেখি নাই। তাঁর চিত্ত ছিল পরম উদার। পরবর্তী কালে আমার 'হীরক হার' বইখানা তিনি ম্যাট্রিকে পাঠ্য করতে বহু চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু অন্য বন্ধুদের সাগ্রহ প্রতিকুলতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। তাঁর 'বৃহত্তর বঙ্গ' লেখার সময় মালদহের নকশী কাঁথা ইত্যাদি দিয়ে তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিত সহযোগিতা করেছিলাম। মুছলমান যুবকদেরে তিনি পরম দরদের সঙ্গে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দিতেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ময়মনসিংহ গীতিকায় তিনি যে মৌলিকতা, দক্ষতা ও দরদের পরিচয় দিয়াছেন, তা অবিস্মরণীয়।

লড়াই-লড়াই

তখনো সুরেন বানার্জী বাংলায় মুকুটহীন রাজা। জার্মান-ইংরেজ লড়াই তুমুল বেগে চলছে। অকস্মাৎ সুরেন বাবু তাঁর দেশের নওযোয়ানদেরে ডেকে বল্লেন—'চল চল যুদ্ধে চল।' ইংরেজকে তার বিপদের দিনে সাহায্য করলে ইংরেজ সে কথা মনে রাখবে, আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া সহজ হবে, এই ছিল তাঁর এবং তাঁর মত আরো অনেকের মুখ্য আশা ও উদ্দেশ্য। একটা দূরের আশাও ছিল—রবি বাবু বড় দুঃখ করে বলেছিলেন:

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি।

বঙ্গ সন্তানেরা এবার সে দুর্ণাম ঘুচাবে। তারা লড়বে এরপর দরকার হলে বৃটিশের হাত হতে তারা স্বাধীনতা আপন বলে কেড়ে আনবে। আমিও ঠিক করলাম, লড়তে যাব;—বিশেষ করে, যখন ফ্রান্সে লড়তে যেতে হবে। তৈয়ার হলাম। কর্ণেল সুরেশ সর্বাধিকারী পরীক্ষা করে 'ফিট' ঘোষণা করলেন। নুরুন্নবী চৌধুরী আমার সমপাঠী ছিলেন; তিনিও যেতে তৈয়ার হলেন। বাড়ীতে পত্র লিখলাম। পাড়ার একজনে আমার বড় ভাইকে এসে বল্ল—'হায়—হায়, এখন উপায় কি?' বড় ভাই বল্লেন—'কুচপরোয়া নেহী। পাঠানের বাচ্চা বলে যখন দাবী করি, তখন দরকার মত একহাত লড়বে বই কি?' স্ত্রীর কাছ থেকে পত্র পেলাম, চোখের পানিতে ভিজা। পড়ে সযত্নে রেখে দিলাম।

রওনার দিন সাতেক আগে খবর পেলাম, বৃটীশ সরকার মত বদলিয়েছে; আমাদের ফ্রান্সে না নিয়ে ইরাকে নিবে—তুর্কদের সঙ্গে লড়তে। ভাবলাম, এক গোলাম দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি, সেই অভিশাপে বাঁচিনা; আর একটা আজাদ দেশকে গোলাম করতে যাব?' বল্লাম—'য়ুরোপের যে কোন দেশে নেও, লড়ব, দরকার হয় জান দিব; এশিয়ার কোন দেশে লড়তে যাবনা।'

আমি গেলাম না। নুরন্নবী চৌধুরী গেলেন। ফিরে এসে তিনি নমিনেশনে আই-সি-এস হলেন।

উত্তরবঙ্গে বন্যা

এই সময় উত্তরবঙ্গে ভয়ানক বন্যা হল। বন্যার পরপরই দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর কলেরার মড়ক। তখন বাংলার হিন্দু যুবকেরা তীর্থস্থানে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে, কংগ্রেস কনফারেন্সে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করে দেশসেবার বাস্তব শিক্ষা লাভ করছে। আমি কারমাইকেল হোষ্টেলে একটি সেবকসঙ্ঘ গঠন করলাম; কয়েক হাজার টাকা চাঁদা তুল্লাম। ইতিমধ্যে নাটোরের তরুণ ব্যারিষ্টার আশরাফ আলী খাঁ বেকার ও ইলিয়ট হোষ্টেলের ছেলেদের নিয়ে একটি সেবকসঙ্ঘ গঠন করলেন। ওদিকে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী আর একটি সঙ্ঘ গঠন করলেন। আমাদের তিন সঙ্ঘ পরস্পর সহযোগিতায় উত্তর বঙ্গে সেবাকাজ চালালাম। জ্ঞানাঞ্জন বাবু পরে বলেছেন, 'আমি অনেক জায়গায় অমন সেবাকাজ করেছি; কিন্তু হিন্দু-মুছলমান মিলেমিশে এমন ভাবে সেবাকাজ এর আগে আর কোথাও হতে দেখি নাই।'

এই সময় সমস্ত ভারতব্যাপী এক ভয়াবহ জর দেখা দিল। কলকাতার বাড়ীতে বাড়ীতে হোষ্টেলে, মেসে কেবল জর আর জর। খবর পেয়ে পেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। সাধ্য পক্ষে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলাম।

তার পর একদিন নিজেই জ্বরে পড়লাম। পাঁচ দিনের দিন জ্বর হতে উঠে দেখি, কলকাতা শূন্য হয়ে গেছে। অত বড় লোকারণ্য শহর, তার রাস্তাঘাট একদম খালি। আমি একদিন রাস্তায় খানিক দূর গিয়ে ভয়ে ফিরে এলাম। আশ্চর্য! গাঁয় এর চেয়ে কত বেশী শূন্য পথে হাঁটতে আমি অভ্যস্ত, অথচ কলকাতায় দিনে-দুপুরে শূন্য রাস্তায় কিছুদূরও হাঁটতে পারলামনা। খাবারের দোকান বন্ধ, পোষ্টাফিস আছে তো তার পিয়ন, রানার নাই; বেশীর ভাগ ঔষধের দোকান বন্ধ; পান-বিড়ির দোকান শূন্য। ভয়ে আমিও কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এলাম। শুনেছিলাম সমস্ত ভারতে যাট লাখ লোক এই জ্বরে মারা গিয়াছিল। সে পাঁচ বৎসর ব্যাপী প্রলয়ঙ্করী বিশ্ব-যুদ্ধেও নাকি এত লোক মারা যায় নাই।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন মনে নাই; তবে আমি কলকাতা যাওয়ার পর হতেই এর সভ্য ছিলাম। এর অফিস ছিল মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে। আমার হাতে খড়ি এ-সমিতির কাগজে না হলেও হাত পাকানি যে এতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। 'খাজা'—এই ছদ্ম নামে আমি লিখতাম। আমার 'লক্ষ্মী ছাড়া' গল্পটি এই সময়ের লেখা এবং বঙ্গীয় মুছলমান সাহিত্য পত্রিকায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি গোলাম মোস্তফা, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাক্তার লুৎফর রহমান, কবি মোজাম্মেল হক, কবি শাহাদাৎ হোসেন, আবুল মুনসুর আহমদ সবাই এ-কাগজে লিখতেন।

তৎকালীন প্রবীণ মুছলিম লেখকেরা এ-কাগজের ধারপাশ দিয়ে বড় ঘেঁসতেন না: তরুণেরা তখনো তাঁদের কাছে অপাংতেয় না হলেও নির্ভরের অযোগ্য ছিল। সমগ্র বাংলা দেশে তখন এই-ই ছিল মুছলমানদের একমাত্র সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান; অথচ এর অভাব অনটন প্রায় লেগেই থাকত। কোন তথাকথিত 'বড় মানুষের' সাহায্য সমিতি কখনো পেয়েছে বলে মনে হয় না। কেবল একটি গাছের ছায়ার তলে গিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়ান যেত;—সে গাছটি হচ্ছেন মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক। একদিনের ঘটনা বলি। ঘটনার বর্ণনাকারী আয়নাওয়ালা আবুল মনসুর সাহেব।

'সমিতির বাড়ীর ভাড়া বাকি পড়েছে; না দিলে বাড়ী ছাড়তে হবে, তার নোটিশ এসেছে। দুইজনে মিলে একদিন সকালে গেলাম ফজলুল হক সাহেবের কাছে। তখন তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ী রোডে থাকেন। বল্লেন—'এখন হাত খালি, বিকালে এস।' বিকালে গেলাম। দেখি, তিনি হাইকোর্ট হতে তখনো আসেন নাই। কিন্তু তাঁর বাড়ীর দুয়ারে বসা দুই কাবলীওয়ালা। ঠেকাপড়ে হক সাহেব কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন, এ কথা অনেকেই জানত। একটু পর হক সাহেব ফিরলেন ও পকেটে হাত দিয়ে পঞ্চাশটি টাকা বের করে আমাদেরে দিলেন। মনে হল এই তাঁর পকেটে ছিল। আমাদের কৌতূহল হল—দেখি, কাবলীওয়ালাদেরে তিনি কি বলেন। দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝলাম, বচসার মত কিছু হচ্ছে। একবার কেবল এক কাবলীওয়ালার উত্তেজিত আওয়াজ কানে এল: 'কম্‌বখ্‌ত, রূপিয়া নাহি দেনে ছেকতা হায়, তব লেতা হায় কাহে?' ভাবলাম—'এই আমাদের ফজলুল হক!'

আধুনিক বাংলার মুছলিম সাহিত্য সাধনায় বঙ্গীয় মুছলমান সাহিত্য সমিতির দান অনস্বীকার্য্য।

আমরা মাঝে মাঝে 'দি মুছলমান' অফিসে যেতাম। এ-কাগজের তখন কাণ্ডারী ছিলেন ব্যারিষ্টার এ, রছুল, আর সম্পাদক ছিলেন মৌলভী মুজিবর রহমান। মুছলিম বাংলার অভাব-অভিযোগ সরকারের গোচর করার জন্য তখন এইটিই প্রধান কাগজ ছিল। মুজিবর রহমান সাহেব ছিলেন মুছলিম সমাজের হেড়ম্ব মৈত্র: অনমনীয় নীতিপরায়ণ। এক ব্যবসায়ী তাঁর কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে অফিসে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করছেন:

'আপনার কাগজের গ্রাহক সংখ্যা ঠিক কত?

'তা তো বলতে পারব না।

'আপনি সম্পাদক, আর গ্রাহক সংখ্যা জানেন না?

'তিন দিন আগে তো ছিল দুই হাজার তিন শ পঁচিশ। আজ কত তা তো ঠিক জানি না।

'ঐ সংখ্যাতেই চলবে, সম্পাদক সাহেব।

'আপনি ঠিক সংখ্যা চেয়েছেন কিনা?

একটুও না বাড়িয়ে কমিয়ে তিনি কথা বলতেন, কাগজে লিখতেন, এতে তাঁর ভাষা সব সময় জোরালো হতনা; কিন্তু তাঁর প্রতি গ্রাহক সমাজের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তার ফলে তাঁর কথায় তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। তিনি চির কুমার ছিলেন। অথচ তাঁর মেজাজ স্নিগ্ধ ছিল; তাঁর মুখে হাসির অভাব দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যে-সব কুমার-কুমারীরা ভাবে বুঝাতে চান যে, তারা বিয়ে না করে সমাজকে অপার অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের দলে ছিলেন না। তাঁর কাগজকে রাজনৈতিক দল-বিশেষের মত সমর্থন করার জন্য কেউ কেউ অনেক টাকা দিতে চেয়েছেন; তিনি তা পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর আদর্শবাদিতা আমরা তরুণদের সামনে একটা অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।

স্কুলে ছাত্র থাকার আমলে আমরা মওলানা মনিরুজ্জামান ইছলামাবাদীর সম্পাদিত 'ছুলতান' পড়তাম।

সুলতান ছিল নির্ভীক, স্বাধীনচেতা, জাতীয়বাদী কাগজ, আর 'মিহির ও সুধাকর' ছিল সরকার ঘেঁসা কাগজ। উভয়ই ছিল সাপ্তাহিক।

তখন হতেই ইছলামাবাদী সাহেবের প্রতি আমাদের একটা বিরাট শ্রদ্ধা ছিল। ল-ক্লাসে পড়ার সময় তাঁর সাথে পরিচয় হল। তখন তিনি 'আল-ইছলাম' নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করেন। পরিচয় হল বটে; কিন্তু কাছে ঘেঁসতে পারলাম না। পাতলা লম্বা শরীর, মোটা হাড্ডি, মস্ত মাথা, অকরুণ তীক্ষ্ণ চোখ, নিজের বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস, খাট্টা মেজাজ, বিদ্রোহ-প্রবণ প্রকৃতি—এই নিয়ে ছিলেন ইছলামাবাদী। লেখায় তাঁর জোশ, যুক্তি ও উষ্মা সবই থাকত।

তাঁর বহু কালের স্বপন ছিল, তিনি একটা আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। তার জন্য তিনি মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক সময় তিনি নিতান্ত অভাবের ভিতর কাটিয়েছেন; কেউ আর্থিক সাহায্য দিলে তা গ্রহণ করতে আপত্তি করেন নাই; কিন্তু সে জন্য কারো কাছে তাঁর মাথা নত হয় নাই। এ-সাহায্য যেন তাঁর ন্যায়তঃ প্রাপ্য ছিল। বাংলার সেকালের মুছলিম যুবকদের মধ্যে তিনি স্বাধীন চিন্তা ও আত্ম-মর্যাদা জাগ্রত করার কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন।

মওলানা সাহেবের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় তার অনেক বছর পরের কথা। তখন ভারতের আকাশ-বাতাস খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গে তোল-পাড়। মওলানা সাহেব করটিয়া এলেন। চাঁদ মিঞা সাহেবের আহ্বানে বিরাট সভার আয়োজন হল। তিনি আগুনের ভাষায় বৃটীশ সরকারের বর্তমান ও অতীত কুকীর্তি বর্ণনা করলেন। বিখণ্ডিত তুর্ক সাম্রাজ্যের ব্যথায় বহু শ্রোতার চোখ ভিজে উঠল। করটিয়া হাই স্কুলের তরুণ শিক্ষক খোন্দকার আজমদ্দীন বসা ছিলেন; তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন—'মওলানা সাহেব, তুরস্কের জন্য জান কোরবান করে দিতে আমি রাজী, আমায় কি করতে হবে বলুন।'

তখন করটিয়ায় পয়েট-লরিয়েট ছিলেন রসিকলাল বসু। ভদ্রলোক ভাল গল্প লিখতেন এবং মেজাজটি তাঁর রাজকবি হওয়ার মতই মিষ্টি ছিল। 'শেরশা' ও 'কালা-পাহাড় নামে' তাঁর দুটি বই ছিল, আমার কাছে তা ভাল লাগত। মওলানা সাহেবের সভার পরদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আচ্ছা, মওলানা সাহেবের বক্তৃতার সব কথাই ত বুঝলাম, কেবল ঐ 'বোতলের মকরধ্বজ' জিনিষটা বুঝলামনা।' আমি ফাঁপরে পড়লাম। অনেক জেরা করে বুঝলাম, মওলানা সাহেবের 'বয়তুল মোকদ্দছ' রসিকবাবুর কাছে এসে বোতলের মকরধ্বজে পরিণত হয়েছে।

মওলানা ইছলামাবাদীর বাড়ী ছিল চাঁট গাঁ। ১৮৭৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। মাদ্রাসার শিক্ষা খতম করেই তিনি বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর দেন। নিছক কাব্যরস উপভোগ তাঁর লক্ষ্য ছিল না; মুহ্যমান মুছলমানদের বুকে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, এই ছিল তাঁর পণ; তিনি সাহিত্যচর্চায় হাত দেন এই জন্যই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুছলমানদের কি অবদান, ইতিহাস ও যুক্তির সাহায্যে তিনি 'ভারতে মুছলমান সভ্যতা' নামক বইয়ে তাই-ই প্রমাণ করেন। 'সুলতান' ও 'আলইছলাম' সম্পাদনা ছাড়া তিনি দৈনিক 'আমীর' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা শুরু করেন। তাঁর লিখিত বই অনেক: (১) তুরস্কের সুলতান (২) ভারতে মুছলমান সভ্যতা (৩) নেজামুদ্দীন আউলিয়া (৪) সমাজ সংস্কার (৫) মুছলমানের অভ্যুত্থান (৬) ভূগোল শাস্ত্রে মুছলমান (৭) ভারতে ইছলাম প্রচার (৮) কনষ্টান্টিনোপোল (৯) কোরাণে স্বাধীনতার বাণী (১০) মোছলেম বীরাঙ্গনা।

সে-কালে আমাদের কল্পনা বিশেষরূপে উদ্দীপ্ত হয়েছিল দুটি মানুষের সাহচর্যে এসে। এঁদের একজন আগা মঈদুল ইছলাম, অন্যজন ডাক্তার আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দী।

আগা মঈদুল ইছলাম

আগা মঈদুল ইছলাম মূলতঃ ছিলেন পারস্যের মানুষ—আল্লামা সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর মন্ত্রশিষ্য। পারস্যে তৎকালীন শাহের অনাচারের বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন করার অপরাধে তিনি দেশ হতে নির্বাসিত হন। কলকাতার চীৎপুরে তিনি একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন ও 'হাবলুল মতীন' নামে পারস্য ভাষায় একটি কাগজ চালাতেন। ক্রমে আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলেন। তখন দুইজনে মিলে কিছুদিন হাবলুল মতীনের উর্দু ও ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। আগা মঈদুল ইছলামকে কেন্দ্র করে চীৎপুরে বেশ একটি প্রগতিবাদী মুছলিম সংঘ গড়ে উঠে। তাঁর ছেলে ছিলনা; মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একান্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। এক মেয়েকে স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। অন্য মেয়ের বিয়ে হয় আই-সি-এস নুরুন্নবী চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর অনেক কাল পর অত্যাচারী শাহের রাজত্ব খতম করে রেজা শাহ্ পাহ্লুবী পারস্যের বাদশা হন এবং বাদশা হয়েই তিনি কলকাতা হতে মঈদুল ইছলামের কফীন তেহরাণে নিয়ে যান।

আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দী

দীর্ঘ পাতলা শরীর, সুন্দর রং, পিয়ারা চেহারা, উন্নত নাক, ভাসা ভাসা চোখ, চিক্কন রেশমী চুলঃ আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দীকে দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হত। সে-আমলে অত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলার মুছলমান সমাজে আর একটিও ছিলনা। তিনি আরবী, ফারছী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। আরব জগতের উল্লেখযোগ্য কেউ এলেই তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করত; তাঁর ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হত। তাঁর দরবারে মাঝে মাঝেই ইরাণী মেহমান দেখতাম। তাঁরাও তাঁর সাথে কথা বলে তৃপ্তি লাভ করত।

অনেকদিন পরের কথা। পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন গভর্ণর ডাক্তার হরেন মুখার্জী তখন কলেজ ইনস্‌পেক্টর। তাঁর সঙ্গে একদিন কথা বলছিলাম। আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দীর কথা উঠল। তিনি বল্লেন—'প্রিন্সিপাল সাহেব, ছোহরাওয়ার্দী যখন ইংরেজী বলেন একদম বার্কের মত ইংরেজী বলেন।' কেবল তাই নয়। অদ্ভুত এ-লোকটার সাহস। ইউনিভার্সিটির একটা কমিটি সভাঃ স্যার আশুতোষ স্বয়ং উপস্থিত। একটি অধ্যাপকের পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে ছোহরাওয়ার্দী আপত্তি করলেন। এক মেম্বর বললেন—'কিন্তু ডিপার্টমেন্টের হেড যে তাঁর সম্বন্ধে ভাল বলেছেন?' ছোহরাওয়ার্দী বল্লেন—'আরে রেখে দাও ডিপার্টমেন্টের হেডের কথা। আমি তো এবার সারা বছরে ক্লাসে পাঁচটা লেকচার দিয়েছি; ডিপার্টমেন্টের হেড তবু তো আমাকে ভালই বলবে।' সকলে অবাক! আশু বাবুর মুখে মৃদু হাসি। সমগ্র ইউনিভার্সিটিটীর মধ্যে এক আবদুল্লা ছাড়া এমন কথা আশু বাবুর সামনে বলবার মত বুকের পাটা আর কারো নাই।'

সর্ব দিকে কাঙাল বাংলার মুছলমান সমাজ,—আমরা তাঁর দিকে চেয়ে বুকে বল পেতাম। ভাবতাম, অন্ততঃ এই একটি লোককে নিয়ে আমরা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের সুধী সমাজের মোকাবেলা করতে পারব।

এত বড় পণ্ডিত মানুষ, অথচ শিশুর মত সরল ছিল তাঁর ব্যবহার। ছাত্র-অছাত্র যুবকেরা তাঁকে অষ্টক্ষণ ত্যক্ত করত। কখনো কখনো তিনি ভয়ানক রেগে উঠতেন; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য; পরমুহূর্তেই তিনি মোমের মত গলে যেতেন। তিনি মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা দোতলা বাড়ীতে থাকতেন। একদিন বাড়ীর পাশের লোকেরা দেখল—আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দী লুঙ্গী পরে একটি চটি পায় আর এক চটি হাতে এক যুবককে তাড়া করে দৌড়াচ্ছেন। জানা গেল, তাঁর এক প্রিয় ছাত্র একান্ত অসময়ে—তাঁর কি একটা লেখার মধ্যে অতর্কিতে গিয়ে কি বলায় তিনি রেগে উঠে এই রকম করছেন। ঐ দিন বিকালে তাকে চাকর পাঠিয়ে ডেকে এনে ভীম নাগের রসগোল্লা খাইয়ে তারপর তার কাছ থেকে মাফ নিয়েছেন।

আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দীর দরবারে গিয়ে আমি কোন দিনই অনাদর পাই নাই। আমার লেখা তিনি পড়িয়ে শুনতেন; উৎসাহ দিতেন, দুনিয়ার বহু বড় বড় লেখকের গল্প করতেন।

আশু মুখার্জী জহরী ছিলেন। তিনি আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দী ও তাঁর মত আরো অনেক প্রতিভাকে তাঁদের বহু আবদার অত্যাচার সহ্য করে নিজ পক্ষ পুট তলে পরম স্নেহে আশ্রয় দিয়ে রাখতেন।

স্যার আশুতোষ মুখার্জী

কারমাইকেল হোষ্টেলে থাকি। সুপারিণ্টেডেণ্ট যিনি ছিলেন তাঁর সাথে কিছুতেই আমাদের পড়েনা। কোন অসুবিধার নালিশ করলে তিনি নীরব ও নির্বিকার। অবশেষে একদিন আমরা জন পঞ্চাশেক ছেলে সোজা স্যার আশুতোষের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। অতগুলো ফেজপরা ছেলে তাঁর বাড়ী বোধ হয় আগে আর কখনো যায় নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর দুই ছেলে রমা প্রসাদ আর শ্যামা প্রসাদকে নীচে পাঠিয়ে দিলেন—আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে যেতে। ছেলে দুটি বোধ হয় পড়ার ঘরে ছিলেন, খালি পায় অমনি নীচে নেমে এলেন। উপরে গেলাম। দেখলাম, আশুবাবু খালি গায়ে বসে আছেন, এক পশ্চিমা চাকর তাঁর সেই বিরাট ভুঁড়ির উপর তৈল মালিশ করছে। পাশে হেলনা বেঞ্চিতে বসা রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপাল রায় কুমুদিনী কান্ত বাহাদুর আর একজন বিলাতী সাহেব। বল্লেন—'তোমরা কে? কি চাও?' আমিই ডেপুটেশনের নেতা ছিলাম। বল্লাম:

'আমরা কারমাইকেল হোষ্টেলের ছেলে।

'বেশ।

'সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব আমাদের কাছ থেকে মাথা পিছু দুই টাকা অনর্থক আদায় করেছেন। সেই টাকাটা আমরা ফেরত চাই।

'বেশ, তা পাবে। সে টাকা কার কাছে আছে?

'বেগতিক দেখে তিনি সে টাকা নাকি ইউনিভার্সিটিতে জমা দিয়ে দিয়েছেন।

'তবেই তো মুস্কিল করলে। এ দরিয়ায় টাকা পয়সা কিছু এক বার এলে আর কি তা কখনো উদ্ধার করা যায়? বেশ আর কি?

'আমাদের সিটিদেণ্ট পাঁচ টাকা আছে; আমরা ওটা চাই চার টাকা করে দিতে।

'তা পরের মাস থেকেই হবে। আর ?

'আমাদের রান্নাঘর নেহায়েত ছোট ; ওতে চলেনা। আপনি নিজে গিয়ে একবার দয়া করে দেখে আসুন।

'কিন্তু আমি যে কুলীন ব্রাহ্মন হে। তোমরা ফাঁকি দিয়ে তোমাদের রান্নাঘরে নিয়ে আমার জাত মারবে নাকি ?

সিটরেণ্ট কমিয়ে দিলেন। সেই দিনই বিকালে এসে আমাদের হোষ্টেলের রান্নাঘর দেখে গেলেন। সপ্তাহ না যেতে পাকের ঘর বাড়ান শুরু হয়ে গেল।

নওয়াব শামছুল হুদা

এর কয়েকদিন পর গেলাম নবাব স্যার শামছুল হুদার কাছে। সার্কুলার রোড়ে বিরাট আঙিণার মধ্যে বাড়ী। দরজায় বন্দুকধারী পাহারা। আঙিনার ভিতর পুকুর। তাঁর খাছ ধোপা ঐখানে তাঁর কাপড় ধোয়। তিনি তখন বাংলা সরকারের এক্সিকিউটীভ মেম্বর। বৈঠক খানায় দামী পুরু গালিচা পাতা ; জুতা নিয়ে যেতে ভয় হয়। স্প্রিংওয়ালা সোফা—দামী, সুন্দর। ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর ডাক পড়ল। আলাপ ভাল ভাবেই করলেন। উর্দু বলতে চেয়েছিলেন ; পরে বাংলাই বল্লেন।

আশুবাবু, শামছুল হুদা উভয়ে মারা গেলে একটা কথা মনে হয়েছিল : শামছুল হুদা সাহেব বেতন পেতেন সোয়া পাঁচ হাজার, আর আশুবাবু পেতেন চার হাজার। শামছুল হুদা ছিলেন নিঃসন্তান ; আশুবাবুর সন্তান চারটি—দুই ছেলে, দুই মেয়ে। আশুবাবু কম টাকা বেতন পেয়ে ছেলে মেয়ে মানুষ করেছেন, বিলাতে পাঠিয়েছেন, বিয়ে থা দিয়েছেন, মেয়ে কমলার নামে ৪০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছেন। আর শামছুল হুদা ? বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক পয়সাও দেন নাই। তাঁর ঋণের দায়ে বাড়ীটা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল।

সে আমলে আমরা তরুণের দল গভীর বেদনার সঙ্গে ভাবতাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে স্যার তারকনাথ পালিত দিলেন ১৫ লাখ টাকা, স্যার পি, সি, রায় দিলেন ১৫ লাখ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ দিলেন ৪০ লাখ, সেখানে কোন একটা মুছলমান জমিদার সদাগর ব্যারিষ্টার যে ১৫ হাজার টাকাও দিল না, এ-লজ্জা রাখার স্থান কোথায় ?

সেকালে অনেক বছর মুছলিম লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক সভা লাগ সময়ে একই শহরে বসত। উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতারা এই উপলক্ষে গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে পরস্পর আলাপ আলোচনা করতেন, এবং একে অন্যের সভায় গিয়ে বক্তৃতা দিতেন। যতদূর মনে হয়, পাটনার ব্যারিষ্টার মজহরুল হক, মুহম্মদ আলী জিন্না ও মওলানা মুহম্মদ আলী—মুছলমান পক্ষে এই তিন জন ও হিন্দু পক্ষে কয়েকজনের চেষ্টায় লীগ ও কংগ্রেস এমনি ভাবে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়।

কলকাতায় কংগ্রেস-লীগ উভয়ের বার্ষিক অধিবেশন হল। লীগের মনোনীত সভাপতি ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ আলী ; কিন্তু তিনি তখন রাজবন্দী। লীগ তাঁর সভাপতির আসন শূন্য রেখেই সভা করে চল্ল। কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মিসেস এনি বেসান্ত। লীগের তরফ হতে ব্যারিষ্টার মজহরুল হক ও মাহ্মুদাবাদের রাজা সাহেব কংগ্রেসের সভায় গেলেন, আর কংগ্রেসের তরফ হতে লীগের সভায় এলেন বেশ কয়েক জন ; তাঁদের মধ্যে বক্তা মিসেস সরোজিনী নাইডু।

সরোজিনী নাইডু

সরোজনী নাইডুর নাম আগে শুনেছিলাম, এবার তাঁকে দেখলাম। চোখে মুখে প্রতিভার ছাপ, দৃপ্ত চলন ভঙ্গী, অঙ্গে লীলায়িত শাড়ী—তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে, বাহু আন্দোলন করে বক্তৃতা শুরু করলেন। ভাবের আবেগে যখন অভিভূত হয়ে ওঠেন, তখন সোজা ঘাড় পেছন দিকে বেঁকে যায়, যেন বিদ্যুতের প্রবাহ বেগে দেহ ঘন ঘন কঁপে, দোলে, হেলে পড়ে। ডান হাত হয় বাতাসে ঘন ঘন আন্দোলিত, বাঁ হাতে মাঝে মাঝে পড়ে যেতে-চাওয়া কাপড় মাথায় তুলে দেন কি সুন্দর তাঁর ইংরেজী ভাষা ! তারো চেয়ে কি সুন্দর তাঁর উর্দু আর ফারসী কোটেশন ! আর সে উর্দু ফারসীর উচ্চারণ ভঙ্গীইবা কি সুন্দর ! ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের অবিচার, মুছলমানের সঙ্গত দাবীর প্রতি ইংরেজের ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা—আগুনের ভাষায় বর্ণনা করে গেলেন ; ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বার বার কেঁপে উঠল।

তখন সমস্ত ভারতে সরোজিনী নাইডুর মত মহিলা বক্তা ও মহিলা কর্মী একজনও ছিলেন না। আমরা অন্য প্রদেশ বাসীদের সাথে আলাপের সময় বলতাম : আরে অমন না হয়ে পারে ? উনি যে আসলে বাংলার মেয়ে—আমাদেরই বিক্রমপুরের অঘোর নাথ চাটার্জী ওর পিতা। ইংরেজীতে কবিতা লিখে 'বুলবুল-এ হিন্দুস্তান' হয়েছেন শুনে অবাক হচ্ছ ? জাননা, বাংলা তরুদত্ত, অরুদত্তের দেশ ?' ওরা বলত, 'আরে সবুর, আমাদের মেয়েরাও এগিয়ে আসছে।' আমরা বলতাম—'আসবেনা ? তোমাদের গোখেলে সাহেবই তো বলে গেছেন—'What Bengal thinks to day, the rest of India thinks to-morrow. ?'

মিসেস বেসান্ত

মিসেস এনি বেসান্তের বক্তৃতা শুনলাম—প্রথম কংগ্রেসের সভায়, পরে কলেজ স্কোয়ারের থিওসফীকাল হলে। অমন স্বচ্ছ সহজ সুন্দর ভাষায় অমন জোরের বক্তৃতা তার আগে আর কোথাও শুনি নাই। পরাধীন দেশের অন্তর্জ্বালার দাহে যে কোন শক্তিমান বক্তার ভাষনে তখন আগুন লেগে যেতে পারত; কিন্তু ধর্মের মত গম্ভীর বিষয় আলোচনা কালে মিসেস বেসান্ত জিনিসটিকে যেমন সুন্দর, সরস, চিত্তাকর্ষক করে তুল্লেন, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া বিরল। তারপর, কি বিরাট ত্যাগ এই মহিয়সী মহিলার! কোথায় তাঁর জন্মভূমি আয়র্ল্যাণ্ড! তাঁর মাতৃভুমির সন্তানেরাও ইংরেজের পরাধীনতার দাহে জ্বলে মরছে; তারাও কৃচ্ছ্র সাধন করছে—তাদের স্বাধীনতা পুনর্লাভের জন্য। কিন্তু ইনি আপন দেশ ছেড়ে ঘর করছেন এই দূর দুঃস্থ ভারতে—ইংরেজ শাসকের রোষ-রক্ত ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ক্লান্তিহীন ভাবে জেহাদ করে যাচ্ছেন এর আজাদীর জন্য!

১৯১৭ সালে ল-প্রিলিমিনারী ও ১৯১৮ সালে ল-ইণ্টার পাশ করেছিলাম। ১৯১৯ সালে এম-এ প্রাইভেট দিলাম। ১৯২০ সালে ল-ফাইনাল দিয়ে সোজা ওকালতী করতে যাব, এই রইল পরিকল্পনা।

ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স

আমার এম-এ পরীক্ষার পর একদিন বরিশালের কবি মোজাম্মেল হক হোষ্টেলে এলেন। বল্লেন—'আমি ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স কোম্পানী করছি: ইছলামী সাহিত্য স্বষ্টি করব, সাহিত্যিক স্বষ্টি করব, বাংলার মুছলিম সমাজে নব জীবনের বন্যা বইয়ে দিব।' আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ইয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী আবদুল অদুদ, ডাক্তার লুৎফর রহমানকে ডাকা হল। আমরা প্রত্যেকে এই কোম্পানীর জন্য বই লিখিব—এই সংকল্প গ্রহণ করলাম। ঠিক হল, আমরা প্রথমে শিশু সাহিত্যের দিকে নজর দিব।

এই পরিকল্পনা মোতাবেক আমি লিখলাম 'তুর্কী উপকথা' আর 'ছেলেদের শাহনামা', ইয়াকুব আলী চৌধুরী লিখলেন, 'নুরনবী।' আর কেউ কিছু লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে না।

কোম্পানীটি পরবর্তী কালে ফেল পড়ে এবং করিম বখ শ ব্রাদার্স উহা নিলামে কিনে নেন।

কারমাইকেল হতে বিদায়

কারমাইকেল হতে আমার বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। তার কিছুদিন আগে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মেম্বর আলীগড়ের বিখ্যাত গণিতবিদ ডাক্তার জিয়াউদ্দীনকে কারমাইকেলে দাওয়াত করল'ম। সঙ্গে দাওয়াত করলাম ডাক্তার আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দ্দী ও তরুণ ব্যারিষ্টার শহীদ ছোহরাওয়ার্দ্দীকে। আমি নিজে ইংরেজীতে একটা নাটিকা লিখেছিলাম—শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে। নাটিকাটি অভিনয়ের পর ডাক্তার আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দ্দী ও ডাক্তার জিয়াউদ্দীন আমাকে ডেকে বল্লেন—'লেখাটি সুন্দর হয়েছে; আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লেগেছে।' কাছে দাঁড়ান ছিলেন টাঙ্গাইলের আয়ুব খাঁ—পরম বন্ধু। তিনি বাইরে এসে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন—'যাচ্ছেন তো কলকাতা ছেড়ে কোন্ পাড়া গাঁয়। কে সেখানে আপনার এ সমঝদারী করবে?' আমি রুমালের কোণে চোখ মুছলাম।

১৯১৯ সালের অক্টোবরে কারমাইকেল হোষ্টেল ছেড়ে বাড়ী চল্লাম।

টাঙ্গাইল হয়ে বাড়ী যাওয়ার পথে ভাবলাম, করটীয়া হাইস্কুলে মালদহের বন্ধুবর আবুল খায়ের চৌধুরী আছেন, তাঁকে একটু দেখে যাই। করটীয়া চল্লাম। এই করটীয়া যাওয়া আমার জীবনের মোড়কে সম্পূর্ণ রকমে ঘুরিয়ে দিল। আকস্মিক ঘটনা মানুষের জীবনে এমন প্রভাবও বিস্তার করে থাকে!

করটীয়ায়: প্রথম পর্যায়

করটীয়া পন্নী পরিবার পুরানা জমিদার ঘর। স্বয়ং বাদশা আকবর নাকি এঁদের পূর্ব পুরুষ ছলিম খান পন্নীকে তাঁর সামরিক সেবার পুরস্কার স্বরূপ একটা পরগানা দান করেন। দানের পরগনা বলে এর নাম হয় আতীয়া (আতা-দান) পরগনা। আটীয়া গ্রাম করটীয়া হতে পাঁচ মাইল দূরে। সেখানে ছলিম খান পন্নীর মছজিদ আজো অটুট অবস্থায় বর্তমান আছে এবং মছজিদের গায় লাগানো শিলা লিপিটিও অক্ষুন্ন আছে। ঐ শিলালিপি ওখান হতে তুলে এনে বর্তমানে করটীয়ার মসজিদের সঙ্গে রাখা হয়েছে হেফাজতের জন্য। পন্নী পরিবার এক সময় সমস্ত আটীয়া পরগনার মালিক তো ছিলেনই, তাছাড়া মোগল বাদশাদের পক্ষ হতে কোন কোন সময় চাটগাঁ পর্যন্তও যে শাসন করেছেন, ইতিহাসে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডুর আকাশ

আহমদ মাহফুজউল্লাহ
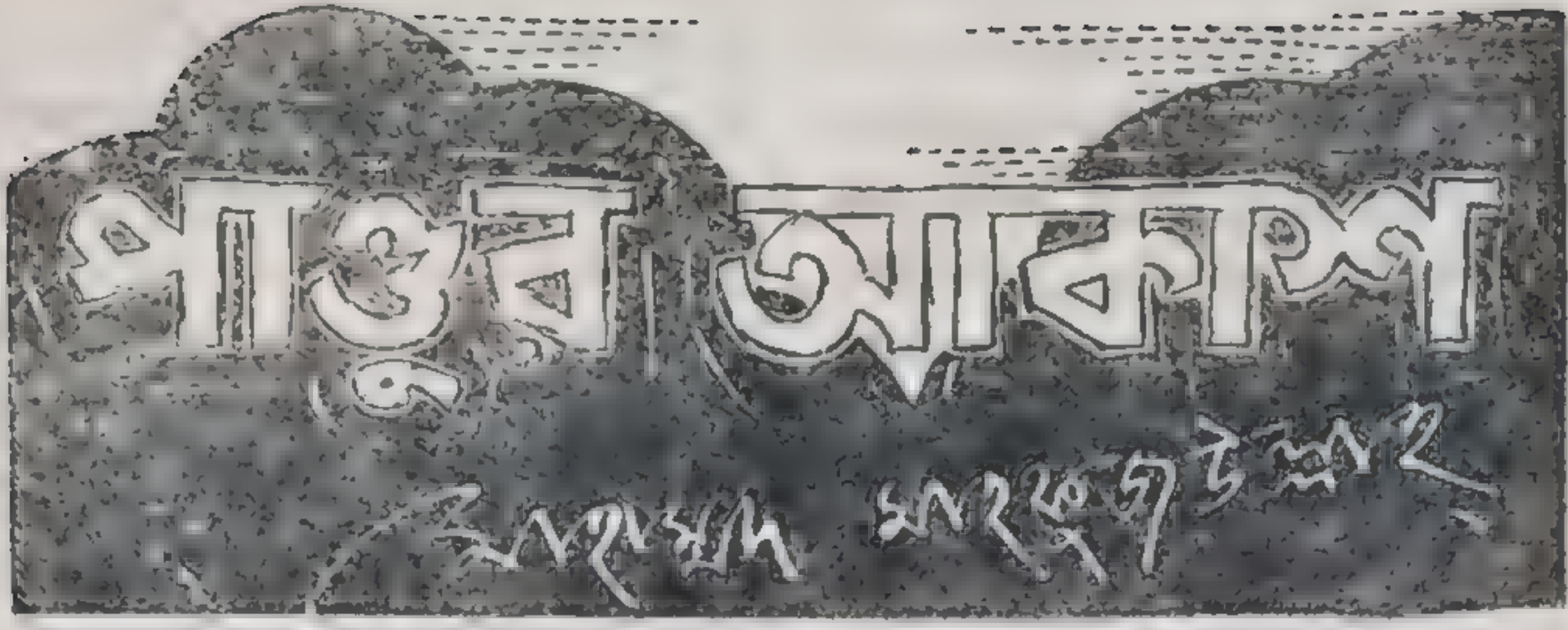
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়লো রিজিয়া। তার মনে তখন নানা আশংকার হাজার হাজার ঢেউ, উঠছে আর পড়ছে। সেই ঢেউয়ের ক্রুদ্ধ হাহাকার সে শুনতে পাচ্ছে তারই হৃৎপিণ্ডের তীরে তীরে।

ফরিদা তখন নিবিষ্ট মনে একে একে সেই ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করেছে সুফিয়া বেগমকে। মাহবুব-রিজিয়ার প্রথম পরিচয়ের সেই লগ্নটি ফরিদার বর্ননাগুণে যেন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে সুফিয়া বেগমের চোখে। সুফিয়া বেগম কান পেতে শুনছেন সেই সব ইতিকাহিনী, মাঝে মাঝে হাসির সোনালি রেখা ফুটে উঠছে তার চোখের কোণে, মুখে ছড়িয়ে পড়ছে প্রসন্নতার অপরূপ আভা।

ফরিদা বলছে, "আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না ভাবী, কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, মাহবুব ভাই রিজিয়াকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকেই জীবন-সঙ্গিনী করতে রাজি নন।" সুফিয়া বেগম বললেন, "প্রথম প্রথম প্রেমে পড়লে এমন কথা অনেকেই বলে থাকে, কিন্তু এর শেষ রক্ষা কয়জন করেছে বলতে পারো? দু'দিনের এই মোহ ভাঙতে কোনো পুরুষেরই তেমন সময় লাগে না। তারা আজ যাকে ভালবাসে কালই আবার তাকে পায়ে ঠেলে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। তখন পরিচয়ের সব কয়টি লগ্নকেই তারা মিথ্যা-স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে এক মুহূর্তও দেরী করে না। পুরাণো খোলসের স্মৃতি কয়জনই বা মনে রাখে?"

ভাবীর কথা শুনে রিজিয়া যেন তার কণ্ঠে তার নিজের জীবনেরই এক বিরল মুহূর্তের ধ্বনি শুনতে পেল। কয় বছরের ব্যবধানেও যেন সুফিয়া বেগম সেই পুরানো দিনের স্মৃতি ভুলতে পারছেন না, তাই এই অতি সত্যি কথাটা এত সহজে বলতে পারলেন। সুফিয়া বেগমের নিজের ইতিহাসও যে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! তাই কি তিনি এমন করে কথা বলছেন, ফরিদাকে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন? সহজ আলাপে আর অন্তরঙ্গতায়ও কি তিনি ভুলতে পারেন নি পিছনের ইতিহাস? রিজিয়ার মতো তিনিও তো একদিন মন-প্রাণ সঁপেছিলেন এক আশ্চর্য সুন্দর যুবককে। তার যেমন ছিল রূপ ঠিক তেমনি ছিল অপরূপ সুরেলা কণ্ঠ। সেই কণ্ঠের সাতরাগিনীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন সুফিয়া বেগম, আর আত্মসমর্পণ করেছিলেন সেই তরুণের বাহু-বন্ধনে। কিন্তু একদিন তাকেও সেই বন্ধনের বাইরে চলে আসতে হলো, তখন তিনি অবহেলিত আর ধিকৃত! চরম অপমানের বোঝা নিয়ে তখন তিনি দিশেহারা। তারপর নিয়তির স্বাভাবিক নিয়মে একদিন তাকে আবার মালা তুলে দিতে হলো এক অপরিচিতের গলায়।

বৌ হয়ে এ-বাড়ীতে আসার পর থেকেই সুফিয়া বেগম কেমন যেন বদলে গেলেন। পুরানো দিনের সেই স্মৃতিকে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে দিলেন। তারপর আশ্চর্য কুশলতার সাথে মিশে গেলেন এই নতুন পরিবেশে। অনেকদিন পর এক দুর্বল মুহূর্তে রিজিয়ার কাছে তিনি খুলে ধরেছিলেন তার অতীত জীবনের রোমান্স-গন্ধী কাহিনীর পাতা। হয়তো সেদিন তার মনে জেগে উঠেছিল স্মৃতির অশেষ তরঙ্গ!

মাহবুবের কাছে এমন করে ধরা দেবার আগে রিজিয়াও বারবার স্মরণ করেছে সুফিয়া বেগমের কাহিনী, কিন্তু কোনো স্মৃতিই সেদিন তার মনের আবেগকে চাপা দিতে পারেনি এক মুহূর্তের জন্যে। কিসের একটা আকর্ষণ যেন তাকে চুম্বকের মতো টেনে বেড়িয়েছে সব সময়।

ফরিদা বললো, "আপনি যাদের কথা বলছেন তারা সংসারের ব্যতিক্রম। সত্যিকার ভালোবাসা বিচ্ছেদ ডেকে আনে না, বরং মিলনকেই ত্বরান্বিত করে দেয়।"

সুফিয়া বেগম বললেন, "সংসারে এটাই তো কাম্য, কিন্তু কার্যতঃ তা হচ্ছে কোথায়? এমন কয়টা উদাহরণ তুমি দিতে পারবে যাতে সত্যিকার প্রেম পরিণয়ে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সব-কাহিনীর ইতিই কিন্তু

এক। পার্থক্য শুধু এই, পুরুষ যেখানে নারীকে চেয়েছে, নারী সেখানে করেছে বিশ্বাসঘাতকতা, আবার নারী যেখানে স'পেছে তার নিজের প্রাণমন সেখানে পুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে চরম অবহেলা। আমাদের সমাজের অধিকাংশ প্রেম-কাহিনীর ইতিহাসই তো এই।" কথা শেষ করে সুফিয়া বেগম চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন রিজিয়ার দিকে। হয় তো রিজিয়ার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন তিনি।

ফরিদা বললো, "সব কিছুকে একই মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে ভুল করবেন ভাবী। আমাদের সমাজে লায়লী-মজনু জন্ম না নিতে পারে, কিন্তু তাই বলে পরস্পরের ভালোবাসার মর্যাদা দেবার মতো মানুষের অভাব এখনও ঘটেনি। যেদিন ঘটবে, সেদিন দুনিয়াটা মরুভূমিতে পরিণত হবে। প্রেম-প্রীতি বলে আর কোনো জিনিষই থাকবে না মানুষের সংসারে।"

সুফিয়া বেগম বললেন, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও তোমার মাহবুব ভাই দেবে সেই প্রেমের মর্যাদা!"

ফরিদা বললো, "অন্ততঃ আমি তো তাই মনে করি।" একটু থেমে সে মুখ ফেরালো রিজিয়ার দিকে, চোখ উলটিয়ে কেমন যেন একটা ইঙ্গিত করলো, তারপর বললো আবার, "অবশ্য সে-কথা আমার চেয়ে রিজিয়াই ভালো বলতে পারবে। আপনি তার কাছ থেকেই জেনে নেবেন ভাবী।"

ইঙ্গিতটা সহজেই বুঝতে পারলো রিজিয়া। একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় যেন তখন তার মন ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তেই একটা সন্দেহ আর অস্থিরতার কালো ছায়া হানা দিচ্ছে তার মনে। ভাবী যখন সব কিছু জেনে ফেলেছেন তখন ব্যাপারটা কি রূপ নেবে, এই ভাবনার দোলায় তার মন কাঁপছে প্রতিনিয়ত। কালকেই হয়তো কথাটা ওঠবে আম্মার কানে, তারপর তা রূপান্তরিত হবে নানা জল্পনা-কল্পনায় এবং একদিন সত্যি সত্যি গিয়ে পৌঁছাবে আব্বার কানে। তখন! তখন কি জবাব দেবে রিজিয়া?

স্থির থাকতে না পেরে এক সময় সে উঠে গেলো বাইরে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। কিন্তু সেখানেও যেন কেমন একটা অস্বস্তির হাওয়া বইছে। তার মনের ঝড় আর বাইরের আবহাওয়া যেন এক হয়ে গেছে।

সেই দিনটির কথা স্মরণ করে আজো কেমন যেন অবাক হয়ে যায় রিজিয়া। ফরিদার সেই কথাগুলো যেন তার কানে স্পষ্ট হয়ে বাজতে থাকে। কিন্তু রিজিয়া কি জানতো, এই ফরিদাই একদিন তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে! তার সব স্বপ্ন-সাধকে তাসের ঘরের মতো উড়িয়ে দেবে! শুধু স্বপ্ন ভেঙে দিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি, সে যে তার জীবনের সব চেয়ে আকাঙ্খিত বস্তুকে হরণ করেছে, তাকে তিলে তিলে পুড়ে মেরেছে বিষাক্ত কুটিল যন্ত্রণায়! মানুষ এমন ছলনাও জানে! সত্যিই নারী ছলনাময়ী।

সুফিয়া বেগমের সাথে যেদিন এত কথা খুলে বললো ফরিদা, সেদিন রিজিয়া ভাবতে পারেনি জীবনের চরম আঘাত সে পাবে তারই কাছ থেকে। কিন্তু একদিন তাও সত্যে পরিণত হলো! কিন্তু রিজিয়া সেদিন নিরুপায়। তার স্বপ্নের প্রাসাদ তখন গুঁড়িয়ে ধুলায় মিশে গেছে। পরম ক্ষতির খেসারত দিয়ে সেদিন সে বুঝতে পারলো মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা বর্তমান, একটির রূপ ধরা পড়লেও অন্যটি থাকে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে। কিন্তু সেটি যেদিন প্রকাশ পায় তখন প্রতিকারের কোনো পথই আর খোলা থাকে না, তখন অনুতাপই হয় জীবনের একমাত্র সম্বল।

ফরিদার দ্বিতীয় সত্তাটি ঠিক এমনি করে একদিন ধরা দিল। খুলে গেলো মাহবুবের মনের মুখোস। সেদিন, সেদিন রিজিয়া স্পষ্টতঃই বুঝতে পারলো জীবনের চরম ভুলটি সে কোথায় করেছে। ফরিদাকে এমন করে বিশ্বাস করেছিল বলেই না তার জীবনে নেমে এলো চরম বিপর্যয়। সে কি জানতো যে ফরিদা এমন করে তার প্রেমাস্পদকে সরিয়ে নিয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে?

কিন্তু জানলো সেদিন, যেদিন সুন্দর সোনালি কার্ডে এলো বিয়ের নিমন্ত্রণ—মাহবুব আর ফরিদার বিয়ের নিমন্ত্রণ। চিঠি হাতে নিয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না রিজিয়া। তার কেবলি মনে হচ্ছিল, সে যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে, দিবাস্বপ্ন। কিন্তু সেই দিবাস্বপ্নই শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো পরম সত্যে। এক মধুর লগ্নে হলো মাহবুব আর ফরিদার মালাবদল।

তারপর এই কয় বছর রিজিয়া শুধু ভেবেছে। ভেবেছে আর অবাক হয়েছে মানব সত্তার দুই রূপ দেখে। কিন্তু আজো সে তার অফুরন্ত ভাবনার কোনো কিনারা খুঁজে পায়নি।

* * *

আবার তাকে একদিন ঠিক তেমনি করে ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু সে ভাবনায় ছিল না কোনো যন্ত্রণার দাহ, কোনো বেদনার অভিব্যক্তি। শুধু একটা ক্ষণিকের ভাবনা তাকে উদ্বেল করে তুলেছিল সেই পরম মুহূর্তে। বিয়ের রাতে এক মুহূর্তের জন্য রিজিয়ার মনে জেগে উঠেছিল সেই পুরাণো দিনের ছবি। কিন্তু প্রাণপণে সে চোখ ফিরিয়ে রেখেছিল। কোনো দুর্বলতাই আর তাকে অভিভূত করতে পারেনি। একটা অনমনীয়-দৃঢ়তায় সে

মনকে শাণিত করে তুলেছিল। তাই মামুনের গলায় সেদিন মালা তুলে দিতে গিয়ে তার হাত কাঁপলেও মন কাঁপেনি এক মুহূর্তের জন্য। এত বড় একটা ইতিহাসকে সেদিন কেমন করে ভুলতে পেরেছিল রিজিয়া, আজও ভেবে অবাক হয় সে।

ছ' বছর আগের কাহিনী আজো তার মনে মাঝে মাঝে ছায়া ফেলে। সেই ছায়ায় সে খুঁজে বেড়ায় নিজেরই আর একটা চেহারা, যা আবছা কুয়াশার মতো ভেসে ওঠে। সব সময় তার নিজেরই যেন চিনতে কেমন ভুল হয়।

বাসর রাতের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো আজো তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

আকাশ সেদিন ছিল তারায় তারায় ছাওয়া। তারও চেয়ে হয়তো বেশী জৌলুস ছিল নবদম্পতির মনের আকাশে। এখনো মাঝে মাঝে তারায় ছাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে রিজিয়া যেন সেই পুরানো দিনের স্মৃতিকে ফিরে পায়। কিন্তু আকাশ আগের মতো তারায় ছেয়ে গেলেও তাদের দু'জনার মনের আকাশে যে আর কোনো আলোর রেখাই ফোটে না।

ফুল ছড়ানো বিছানায় এক রাজ্যের লজ্জা আর কুণ্ঠা নিয়ে বসেছিল রিজিয়া। হয় তো ভীরু কপোতীর মতো কাঁপছিল তখন। তারপর এক সময়ে এলো সেই পরম লগ্নটি যখন মামুন হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিলো। কেমন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ যেন ছড়িয়ে দিয়েছিল তার সারা অঙ্গে। তারপর কয়েক বছর কেটে গেলো তারা স্বামী-স্ত্রীতে ঘর বেঁধেছে; কিন্তু সেদিনকার সেই আন্তরিকতা যেন আর খুঁজে পায় না তেমন করে।

রিজিয়ার স্পষ্টই মনে আছে, মামুনের সেই আন্তরিকতা সেদিন তাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল, শিখিয়েছিল ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে। শিশিরের স্পর্শে যেমন করে ফোটে ওঠে রাতের ফুল, ছড়িয়ে দেয় তার প্রাণের সৌরভ, ঠিক তেমনি করে যেন ফুটে উঠেছিল রিজিয়া। মামুনের আন্তরিকতার স্পর্শে তার মনের পাঁপড়িতে সেদিন ফুটেছিল প্রেমের পরাগ।

গভীর রাতে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল মামুন। প্রশ্ন করেছিল, "সবচেয়ে তুমি কাকে ভালোবাসো রিজিয়া?" অনেকক্ষণ এ কথার কোনো জওয়াব দেয়নি রিজিয়া। তার মনে তখন ভাবনার নানা তরঙ্গ।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মামুন। রিজিয়ার হাত দু'টো আরো নিবিড় করে টেনে নেয় কাছে। বলে, "চুপ করে রইলে কেন রিজিয়া, কথা বলো?"

কিন্তু কি বলবে রিজিয়া? এ প্রশ্নের জওয়াব সে কিই-বা দিতে পারে। স্বামীর বাহুতে আরো নিবিড় হয়ে ধরা দেয় রিজিয়া। তারপর এক সময়ে সমস্ত লজ্জা আর কুণ্ঠার বাঁধ ভেঙ্গে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতেই যেন বেরিয়ে আসে সে প্রশ্নের জওয়াব। স্বামীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে বলে, "তোমাকে।" আবেগে আকুল হয়ে ওঠে মামুন। রিজিয়াকে নিবিড় করে জড়িয়ে নেয় নিজের বুকে।

রাতের তারা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যায় আকাশে, এক সময় হয় তো তাদের চোখেও লাগে ঘুমের ছোঁয়া। কিন্তু এই নবদম্পতির চোখে তখনও ঘুম নেই। তারা তখন নানা রঙিন কথার নক্সা বুনে চলেছে আপন মনে।

এক সময়ে আবার কথা বলতে শুরু করে রিজিয়া, বলে, "তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাসো?" মামুন বলে, "সত্যি তোমাকে ভালোবাসি রিজিয়া, বিশ্বাস না করো ....।" রিজিয়া বলে, "প্রথম প্রথম এমন কথা সবাই বলে, কিন্তু দু'দিন পরেই তা মনে থাকে না।"

মামুন বলে, "সবার কথা আমি জানি না, আমার মনের কথাই আমি বলতে পারি। বিশ্বাস না করো তোমার এই শরীর স্পর্শ করে বলছি।" মনে মনে কৌতুক বোধ করে রিজিয়া, বলে, "আজকের এই মুহূর্তের প্রতিজ্ঞার কোনো মূল্য নেই, এর চেয়ে ঢের বেশী কঠিন প্রতিজ্ঞার কথাও মানুষ মনে রাখে না।"

মামুন বলে, "জীবনে এই প্রথম একজন নারীকে শপথ করে কথা বলছি, আমার এ-শপথ যেদিন মিথ্যা হবে সেদিন আল্লার দুনিয়ায় ভালোবাসা বলে কোনো বস্তুই থাকবে না, তখন মানুষের মন হয়ে উঠবে নিরেট পাথর।"

রিজিয়া তখন চুপ করে থাকে, হয় তো নানা ভাবনার গভীরে ডুব দেয়। মামুনের কাছে নীরবতা যেন অসহ্য। মামুন বলে, "আমার মনের কথা তো খুলে বললাম রিজিয়া, এখন তোমার কথা বলো।" রিজিয়া বলে, "কি বলবো?" মামুন বলে কেন, "তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা।"

রিজিয়া বলে, "ভালোবাসি বলেই তো তোমার গলায় মালা দিতে পারলাম, নইলে..." মামুন বলে, "বিয়ের মালা বদল করেছো বলেই যে আমাকে ভালোবাসো তার কি প্রমাণ আছে? এমনও তো হতে পারে, তোমার মা-বাবার মতের বিরোধিতা করতে পারোনি বলেই ․"

মামুনের মুখের কথা শেষ না হতেই রিজিয়া হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে বলে, "ছি, ছি, তুমি এসব কি বলছো? মা-বাবার বিরোধিতা করতে যাবো কেন?"

রিজিয়ার কথা শুনে মামুন নিজেও যেন কেমন লজ্জা পায়। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকে। এমনি করে দাম্পত্য জীবনের নানা সুখ-সম্ভাবনার স্বপ্নে তারা কাটিয়ে দেয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত। তারপর এক সময় ঢলে পড়ে নিবিড় ঘুমের কোলে।

রাতের তারা গান গেয়ে গেয়ে বিদায় নিয়েছে। নতুন দিনের সূর্য আবার দেখা দিয়েছে প্রভাতের আঙ্গিনায়।

।। সাত ।।

বিয়ের কয়েক দিন পর মামুন বউ নিয়ে রওয়ানা হলো দেশের বাড়ীতে। শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে রিজিয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্বামীর মন খারাপ হবে ভেবে সে আপত্তি জানাতে পারেনি। মামুন তাকে বলেছে, "ভাববার কি আছে রিজিয়া, কয়েকদিনের ব্যাপার, সবার সাথে পরিচিত হতেই দিনগুলো কেটে যাবে। তখন আর তোমার খারাপ লাগবে না। তা' ছাড়া বাড়ীতে গিয়ে একবার সবার সাথে মিশতে পারলে তখন হয় তো তুমি আর ফিরতেই চাইবে না।"

রিজিয়া বলেছে, "তখন না হয় তুমি একাই চলে আসবে!" মামুন বললে, "আমি আসতে চাইলেও তুমি আসতে দেবে কেন?"

এই সময়ে এসে ঘরে ঢুকলেন জরিনা বেগম, মামুনকে উদ্দেশ করে বললেন, "রিজির কথা ছেড়ে দাও বাবা, দেশের বাড়ী যাচ্ছ,. দিন কয়েক না বেড়িয়ে এলে চলবে কেন, সবার সাথে পরিচিত হতেই তো বেশ কয়দিন চলে যাবে। তা' ছাড়া আত্মীয়-স্বজন রয়েছে তাদেরও তো একটা আমোদ-আহ্লাদ আছে।"

মামুন বললে, "আমরা আসতে চাইলেই কি আর এত তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবো? অন্যান্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম, আম্মা নিজেই তো আসতে দেবেন না।"

জরিনা বেগম বললেন, ঠিকই তো, বিয়ের পর এই প্রথম বউ নিয়ে বাড়ী যাচ্ছো। বাড়ীতে একটা কিছু আনন্দ-উল্লাস তো হবেই, তাই..."

রিজিয়া বললে, "তুমি যা-ই বলো না কেন মা, আমি কিন্তু চার দিনের বেশী কিছুতেই থাকতে পারবো না।"

মামুন বললো, "সে সব পরে দেখা যাবে, আগে যাওয়া তো হোক।"

যাবার আগের দিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কথা বললো দু'জনে। রিজিয়াও তন্ন তন্ন করে সবকিছু জেনে নিলো মামুনের কাছ থেকে। নতুন জায়গায় গিয়ে কেমন করে চলতে হবে, কেমন করে কথা বলতে হবে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জওয়াব দিতে দিতে অস্থির হয়ে গেল মামুন। শহুরে মেয়ে রিজিয়ার কেবলই ভয় পাছে সে শ্বশুর বাড়ী যেয়ে কোনো রকম দুর্বলতার পরিচয় দেয়, পাছে তার চলনে-বলনে একটা খুঁত বেরিয়ে যায়। নতুন পরিবেশে নতুন অবস্থায় কেমন করে সে-নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে, এই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠলো। সে ভাবতে লাগলো, সত্যিই কি তাঁরা তাকে আপন করে নেবে? সেই গ্রামীন পরিবেশে সে নিজেকে কি অসহায় মনে করবে না? কি জানি সে যদি সেই সব লোকদের মনের নাগাল না পায়? মামুন বলে, "এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এত ভাববার কি আছে রিজিয়া? গ্রামের লোকেরাও তো রক্তমাংসের মানুষ, তারাও পরস্পরকে ভালো বাসতে জানে, শ্রদ্ধা করে।"

রিজিয়া বলে, "কি জানি বাপু, তোমাদের গ্রামের লোকদের তোমরাই ভালো জানো। আমি কোনো দিন গ্রামে যাইনি, গ্রামের বাড়ীর খবরও জানিনে।"

মামুন বলে, "জান না বলেই যে জানতে হবে না তার কি মানে আছে? যা জান না তাই তো জানতে আনন্দ হওয়ার কথা।"

রিজিয়া বলে, "আনন্দ আমারও কিছু কম হবার কথা নয়; কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছে, সে আনন্দ যদি শেষে কান্নায় পরিণত হয়?"

মামুন বলে, "এ-সব তোমার অলস মনের কল্পনা। এ-দেশের শতকরা আশি জনই গ্রামে জন্মেছে তাই বলে তাদের জীবন মরুভূমি হয়ে যায়নি।"

রিজিয়া বলে, "সবার কথা বলছি না, আমার মতো যারা শহরে জন্মেছে তাদের কথাই বলছি।"

মামুন বললো, "তোমার সব প্রশ্নই এখন আমি জমা করে রাখলাম, দেশের বাড়ী থেকে ফিরে এসে সব কয়টিরই জওয়াব দেবো। তখন কিন্তু তুমি অন্য কথা বলতে পারবে না।"

রিজিয়া বললো, "বেশ তাই হবে' খন।"

* * * * *

সকাল দশটায় ট্রেণ ছাড়লো। জীবনের মতো এই প্রথম রিজিয়া শহরের বুক ছেড়ে চলেছে এক অজানা গ্রামে। হুইসিল দিতে দিতে ট্রেণটা এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে, আর রিজিয়ার মনে হচ্ছে তার পেছনের সব স্মৃতি যেন মিশে যাচ্ছে একে একে। তবুও সে জীবনের কয়েকটি ছেঁড়া পাতার অস্পষ্ট লেখা পড়তে চেষ্টা করলো। স্মৃতির ওপার থেকে ভেসে আসা কয়েকটা ধ্বনি যেন কেবলি হারিয়ে যেতে লাগলো চলন্ত ট্রেণের চাকার তলায়।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বললো না রিজিয়া। আনমনে তাকিয়ে রইলো দূর আকাশের দিকে। ট্রেণের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে চারপাশের গাছপালা গুলো' যেন দৌড়াতে লাগলো প্রাণপনে—অবিশ্রান্ত গতিতে। রিজিয়ার মনে হলো তার মাথার মধ্যেও যেন এমনি ভাবে নানা চিন্তা পাখা মেলে উড়তে শুরু করেছে।

ট্রেণের কামরায় যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। একটি

সম্পূর্ণ বেঞ্চই প্রায় দখল করে বসেছিল ওরা। মামুন বললো, "অবাক হয়ে কি দেখছো রিজিয়া?" রিজিয়া বললো, "দেখছি চারপাশের গাছপালাগুলো কেমন করে দৌড়াচ্ছে। আর ভাবছি, মানুষও কি এমন করে মিথ্যা মোহের পেছনে দৌড়ায়।"

মামুন বললো, "যে গাছগুলোকে দৌড়াতে দেখছো আসলে কিন্তু সেগুলো স্থির হয়েই আছে। ট্রেণটা দৌড়াচ্ছে বলেই আমরা এমন দেখতে পাচ্ছি।"

রিজিয়া বললো, "তা হলে তুমি বলতে চাও যে মানুষ ও ধাঁধাঁয় পড়েই দৌড়ায়?"

মামুন বললো, "অনেকটা তাই ; তবে সে ক্ষেত্রে ধাঁধাঁ না বলে একে বরং মোহ বলাই ভালো।" কথাটা সূক্ষ্ম হলেও রিজিয়ার মনের তন্ত্রীতে গিয়ে বাজলো। মোহঘেরা সেই দিনগুলোর কথা তার মনে পড়লো আবার। সত্যি একে মোহ না বলে কিই বা বলা যায়। মোহে না জড়ালে কিংবা নেশায় বুঁদ না হয়ে পড়লে কেউ কি এমন করে অনিশ্চিতের পেছনে দৌড়াতে পারে! সেই 'ডানা মেলা দিনগুলোর কথা স্মরণ করে রিজিয়া কেমন যেন ভাবাতুর হয়ে যায়। মামুনের দৃষ্টি এড়ায় না রিজিয়ার এই ভাবান্তর, চেহারার ঈষৎ পরিবর্তন। মামুন বলে, "তন্ময় হয়ে কি ভাবছো রিজিয়া? শহর ছেড়ে যাচ্ছো বলে মনে খুব লাগছে, না?" রিজিয়া বলে, "না কিছুই ভাবিনি, দেখছি ট্রেণটা কেমন করে পেছনের সব কিছু পার হয়ে এগিয়ে চলেছে।"

মামুন কথার মোড় ঘোরায়, বলে, "গ্রামে গিয়ে পৌঁছালেই তোমার মনের সব আশংকা দূর হয়ে যাবে। পাড়া-পড়শীদের সাথে একবার মিশতে পারলে গ্রাম ছেড়ে আর আসতেই ইচ্ছা করবে না।"

রিজিয়া বলে. "মিশতে পারবো না বলেই তো আশংকা হচ্ছে। পাছে নিজেকে নিয়ে আবার বিব্রত না হতে হয়।" মামুন বলে, "সামান্য কয়দিনের ব্যাপার, ইচ্ছা করলেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।"

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে দ্রুত-গতিতে। পুরানো যাত্রী নামছে আবার নতুন যাত্রী উঠছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে রিজিয়া। দূর-দূরান্তের নানা যাত্রীর এই ক্ষণিক স্মৃতি তার মনে যেন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দিচ্ছে। ট্রেণে যাতায়াতের স্মৃতি তার খুব বেশী নেই বললেই চলে, শহরে বাইরে এ-জীবনে গিয়েছে তো মাত্র কয়েকবার। সে সব স্মৃতি বালির উপর পদচিহ্নের মতো হারিয়ে গেছে সে কোন কালে। রিজিয়ার মনে পড়ে সেবার দল বেঁধে বাড়ী শুদ্ধ সবাই গিয়েছিল চট্টগ্রাম রাতের মেল ট্রেণে ওরা চেপেছিল ঢাকা থেকে। সারা রাত ট্রেণ চলেছে অশ্রান্ত গতিতে। ঢাকা থেকে সুদূর চট্টগ্রামের পথের কোনো দৃশ্যই ভালো করে দেখতে পাইনি তারা। মাঝে মাঝে ট্রেণে যাত্রীর ওঠানামার ভীড় দেখে বুঝতে পেরেছে ওটা ষ্টেশন। ষ্টেশনের স্বল্পালোকিত পরিবেশে দেখেছে মানুষের মুখ। অবাক উৎসুক হয়ে তারা তাকিয়ে থেকেছে সেই সব মানুষের দিকে। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিল রিজিয়া সেই দিন ভোরে। ভোর হয়েছিল সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে। সারা রাতের অশ্রান্ত ঝিমুনি আর অনিদ্রার শেষে সকাল হতে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল রিজিয়া। তখন তার বয়সই বা ছিল কত। ছেলে-মানুষী স্বভাবের তাড়নায় ট্রেণ থামতেই হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছিল সে। জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই বাইরের বিরাট পাহাড় শ্রেণী দেখে অবাক হয়ে গেল রিজিয়া। পাহাড়টা যেন আকাশের গা ভেদ করে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। গাছপালার সবুজ-শ্যামলিমা ঘেরা পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে লালমাটির রাস্তা এঁকে বেঁকে উঠে গেছে অনেক উচুঁতে। রিজিয়ার মনে হয়েছে কালো কেশের মাঝখান দিয়ে যেন কে সিঁথির চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। ট্রেণ থেকে মনে হয়েছিল পাহাড়টা যেন সামান্য দূরে, ইচ্ছে করলেই সে পাঁচ মিনিটে গিয়ে গা ছুঁয়ে আসতে পারে। কিন্তু তার আব্বাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিল পাহাড়টা অনেক অনেক দূরে। কিন্তু সেদিন সে কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেনি রিজিয়া। সীতাকুণ্ডের সেই পাহাড়ের স্মৃতি আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে রিজিয়ার মনে।

মামুন বললো, "অনেকদিন পরে ট্রেণে যাচ্ছো কিনা তাই এমন অবাক লাগছে। আমরা হর হামেশা ট্রেনে চাপতে চাপতে বিরক্ত হয়ে গেছি। ট্রেণে কোথাও যেতে আর মোটেই ইচ্ছা করেনা।"

খানিকক্ষণ পর ট্রেণ এসে থামলো আরিখোলা ষ্টেশনে। আবার আর এক দফা যাত্রীর ওঠা-নামার ভীড়, হৈ-চৈ হট্টগোল।

মিষ্টিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল ট্রেণের পাশ দিয়ে 'চাই-মিষ্টি! টাটকা খাবার!' মামুন বললো, "মিষ্টি খাবে, ডাকবো?' রিজিয়া চুপ করে রইলো। মামুন সহজেই বুঝতে পারলো মিষ্টি খেতে তার কোন আপত্তি নেই। জানালা দিয়ে গলা বের করে মিষ্টিওয়ালাকে ডাকলো মামুন। মিষ্টিওয়ালা আসতেই টাট্‌কা মিষ্টি চেয়ে নিল ওরা।

রিজিয়া কয়েকটি রসগোল্লা মুখে দিয়েই ঠোঙ্গাটা ঠেলে দিলো মামুনের দিকে। মামুন বললো, 'একি, খাচ্ছো না যে?' রিজিয়া বললো, 'তুমি নাও, আমার আর লাগবে না।'

মামুন প্রায় জোর করে আরও কয়েকটি মিষ্টি তুলে দিলো রিজিয়ার হাতে। রিজিয়া আবার সেগুলো ফিরিয়ে

দিতে চাইলো মামুনকে। কামরার যাত্রীদের প্রায় সবাই একদৃষ্টে ফিরে তাকালো ওদের দিকে। রিজিয়া তো টের পেল, লজ্জায় আরক্ত হয়ে গেল তার মুখ !

রিজিয়ার আজো স্পষ্ট মনে আছে, সেই সময়ে তাদের কামরায় এসে উঠেছিল আরো দু'জন যাত্রী। স্বামী স্ত্রী। আশ্চর্য সুন্দর মানিয়েছিল তাদের দু'জনকে। যেমন গায়ের রং তেমনি সুন্দর সুডৌল চেহারা, আল্লার অপূর্ব সৃষ্টি ! ওদের দু'জনকে উঠতে দেখেই কামরা শুদ্ধ যাত্রীদের চোখ গিয়েছিল ঘুরে, মনে হয়েছিল ওরা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

তারপর যতক্ষণ ওরা কামরায় ছিল রিজিয়াও বার বার তাকিয়ে দেখেছে চুপি চুপি। তার দৃষ্টি পড়েছিল সেই ভদ্রলোকের ওপর। মুখের আদল দেখে পুরানো দিনের আর একটা পরিচিত চেহারা ভেসে উঠেছিল তার চোখে। তারই প্রেমাস্পদ মাহবুবেরর চেহারার সাথে আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল সেই ভদ্রলোকের। রিজিয়া সারাক্ষণ শুধু ভেবেছে এ-কেমন করে সম্ভব হলো ! মানুষের সাথে মানুষের চেহারার এমন অবাক মিল সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি !

বেশ মনে আছে রিজিয়ার, দু' ষ্টেশন পরেই ওরা নেমে গিয়েছিল ট্রেণ থেকে। আর মনে হয়েছিল কামরা শুদ্ধ সবাই যেন উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে ছিল তাদের গমন পথের দিকে। কিন্তু বহুদিন ধরে সেই ভদ্রলোকের চেহারা ভুলতে পারেনি রিজিয়া।

* * * * *

ট্রেণ চললো আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একমনে তাকিয়ে রইলো রিজিয়া। রেল-লাইনের দু'পাশে বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত, সবুজ-শ্যামলিমায় চোখ জুড়িয়ে গেল তার। শহরের একঘেঁয়ে জীবনের বাইরে এসে খাঁচা-ছাড়া পাখীর মতো অবাধ মুক্তির নিঃশ্বাস নিল সে !

তারপর এক সময় ট্রেণ এসে থামলো দৌলতকান্দি ষ্টেশনে। এবার এদের নেমে যাবার পালা। ষ্টেশনে ট্রেণ থামবার আগেই তাড়াহুড়া শুরু করে দিয়েছিল মামুন। সঙ্গে যে-সব মাল-পত্র রয়েছে ত্বরিৎ সেগুলো নামিয়ে ফেলতে হবে, নইলে ট্রেণেই থেকে যাবার সম্ভাবনা। ছোট্ট ষ্টেশন দৌলতকান্দি—ট্রেণ থামে এক মিনিট, এরি মধ্যে সবকিছু নিয়ে নামা রীতিমতো তাড়াহুড়ার ব্যাপার। মামুন বললো, “সবকিছু গুছিয়ে নাও রিজিয়া, ট্রেণ থামতেই ঝটপট করে নেমে পড়তে হবে।”

রিজিয়া বললো, “কেন, বাড়ী থেকে লোকজন আসবে না কেউ ?”

মামুন বললো, “আসবার তো কথাই আছে, তবুও তৈরী থাকা ভালো। ওরা হয় তো আমাদের খুঁজে পেতেই এক মিনিট পার হয়ে যাবে।”

রিজিয়াও জিনিষ-পত্র গুছিয়ে তৈরী হয়ে থাকলো। ট্রেণ থামলো একটু পরেই। মামুন দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো বাড়ী থেকে কেউ ওদের এগিয়ে নিতে এলো কিনা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ওর নজর পড়লো ষ্টেশনের এক পাশে রাখা একটি পাল্কীর ওপর। মামুন সহজেই বুঝতে পারলো এটা রিজিয়ার জন্যেই এসেছে। ও আগেই বাড়ীতে চিঠি লিখে দিয়েছিল যেমন করেই হোক একটি পাল্কীর ব্যবস্থা যেন করা হয়। হাজার হলেও নতুন বউ। ষ্টেশন থেকে হেঁটে বাড়ী পৌঁছালে গ্রামশুদ্ধ ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে।

মামুনের ছোট ভাই রকিব এরি মধ্যে এসে দরজায় দাঁড়ালো। তার পেছনে পেছনে এসে দাঁড়ালো মামুনের আব্বা, পাড়া-পড়শী আরো কয়েকজন। রকিব সবাইকে উদ্দেশ করে জোরে জোরে বলতে লাগলো, “এই যে, ভাইজান এ-কামরায়।” রকিব চট করে উঠে গেলো কামরার ভেতর, বিছানা-পত্রগুলো একে একে ঠেলে ফেলতে লাগলো নীচে।

মামুনের আব্বা তাকে উদ্দেশ করে বললো, “মাল-পত্রগুলো ওরাই নামাবে, তুমি বউকে নিয়ে নেমে পড়ো মামুন। পাল্কী তৈরীই আছে।”

রিজিয়াকে নিয়ে ট্রেণ থেকে নামলো মামুন। রকিব ও অন্যান্যরা মিলে বিছানা-পত্রগুলো রাখলো এক পাশে। ট্রেণ চলে গেলে বাড়ী নেবার ব্যবস্থা করবে ওরা।

ট্রেণ চলে যেতেই ষ্টেশনের হৈ-চৈও কমে এলো। যাত্রী যারা নেমেছিল তারা চললো যার যার গন্তব্যের দিকে। মামুনের আব্বা রিজিয়াকে হাতে ধরে নিয়ে তুললেন পাল্কীতে। মামুনকে বললেন, “তুমি আগে আগে যাও বাবা, আমি পাল্কীর সাথে আসছি।” রিজিয়াকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে বললেন, “শক্ত হয়ে বসে থেকো মা, পথঘাট সুবিধের নয়, ঝাঁকুনি লাগতে পারে।”

পাল্কীতে জড়োসড়ো হয়ে বসলো রিজিয়া। জীবনে এই প্রথম সে পাল্কীতে চড়লো। দুই বেহারার পাল্কী উঠলো কয়েক মিনিট পরে। রিজিয়ার জীবনে এ আর এক নতুন অভিজ্ঞতা।

[ক্রমশঃ]

"নূর-অল-ঈমান সমাজ" ও "দুগ্ধ সরোবর"

অধ্যাপক আলমগীর জলীল এম-এ, ডিপ্ ইন-এড

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে মুসলমানরা দেশ, জাতি ও ধর্মের উন্নতিকল্পে বিভিন্নস্থানে কয়েকটি 'ধর্মসভা' স্থাপন করেছিলেন। মুসলমানের কথা বলা আর মুসলমানের ধর্ম ইস্‌লামের মর্মকথা প্রচার করা ছাড়াও ধর্মজ্ঞান হীনতার জন্য মুসলমান সমাজের যে দুঃখ দুর্দশা, তার প্রতিরোধ করার সাধনায় নিয়োজিত ছিল এই সব ধর্মানুষ্ঠান বা 'জামায়াত'। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করার বন্দোবস্তের ভারও নিয়েছিল এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণ করে আত্মবিস্মৃত মুসলমান জাতির তাহজীব-তমুদ্দন প্রতিফলিত-করণের পরিচয় পাই এমনি কয়েকটি নিম্নের আঞ্জুমনেঃ রাজশাহীর 'আঞ্জমনে মহম্মদীয়া' আটিয়ার 'আঞ্জুমনে মঈনুল ইসলাম,' নাটোরের 'তাইদে ইসলামিয়া,' রংপুরের 'নুরুল ইমান জামায়াত,' নদীয়া শান্তিপুরের 'আঞ্জুমন তাইদে ইস্‌লাম,' বগুড়ার 'সভা,' ত্রিপুরা—গোকর্ণস্থিত 'আঞ্জমন রেয়ায়েতে ইস্‌লাম,' জলপাইগুড়ি—চন্দন বাড়ীর—'তারিক নুর সভা,' জলপাইগুড়ি শহরের, 'আঞ্জমনে ইস্‌লামিয়া,' রাজশাহী—বিয়াঘাটের 'আঞ্জমনে আহম্মদীয়া,' রাজশাহী শহরের 'নূর-অল-ঈমান সমাজ' ইত্যাদি।

সম্প্রতি মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর 'দুগ্ধ সরোবর' (২য় সং) আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং অত্র প্রবন্ধের অবতারনায় এই পুস্তিকখানিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১২৯৮ সালের 'ইসলাম প্রচারক' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 'দুগ্ধ-সরোবর' রাজশাহী 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' ও রঙ্গপুর 'নুরল ইমান জামায়াতে'র যুক্ত সহযোগিতায় প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত 'ইসলাম প্রচারকে'র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় আর একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছেঃ কিমিয়ায়ে সাআ'দাতের বঙ্গানুবাদ—ভূমিকা—"করুণাময় খোদাতাআ'লার করুণার উপর নির্ভর করিয়া ভারত বিখ্যাত ধর্মবীর মৌলবী হাসান আলী সাহেবের উপদেশমতে, ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিতরাজ পরমতত্ত্বদর্শী মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী সাহেবের প্রসিদ্ধ অমূল্য গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সাআ'দাৎ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য "রাজশাহী আঞ্জুমানে মহম্মদীয়া" ও "রঙ্গপুর নুরল ইমান" সমাজদ্বয়ের নির্বাচিত "অনুবাদক ও প্রকাশক কমিটি" নিযুক্ত হইয়াছেন।..."

প্রশ্ন হচ্ছে, রঙ্গপুরের 'নুরল ইমান' সমাজ ও আমাদের আলোচ্য রাজশাহীর 'নূর-অল-ঈমান' সমাজ কি একই প্রতিষ্ঠান? আমাদের অধিকৃত 'দুগ্ধ সরোবরে' লিখিত আছে, 'রাজশাহী নূর-অল-ঈমান' সিরিজের ১নং পুস্তক। তবে একথা স্পষ্ট যে, রাজশাহীর 'আঞ্জমনে মহম্মদীয়া' ও রাজশাহীর 'আঞ্জমানে হেমায়েতে ইস্‌লাম' এক এবং অভিন্ন। আমাদের মনে হয়, রঙ্গপুরের 'নুরল ইমান'ই পরে রাজশাহী শহরের 'নূর-অল-ঈমান সমাজ' নামে অভিহিত হয়। প্রথমটি বাংলা ১২৯৮ সনে এবং দ্বিতীয়টি ১৩০২ সনে স্থাপিত। রঙ্গপুরের 'নুরল ইমান জামায়াতে'র শাখা-উপশাখা স্থাপিত হয় মহীপুর অঞ্চলে এবং জমিদার মৌলবী চৌধুরী আবদুল মজিদ সাহেবকে 'মহীপুর দায়রায় জমাত' প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে পায়। এই প্রতিষ্ঠান যে মাত্র ৪ বছরেই (১২৯৮-১৩০২) ধ্বংস পেয়ে নবীন কলবরে নতুন নামে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়—এটা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ। আমরা প্রসঙ্গের অবতারণা এবং অনুমান সাপেক্ষতার কথাটাই জানিয়ে রাখলুম মাত্র। আশা করি সুধীবৃন্দ এদিকে সঠিক আলোকপাত করে সত্য প্রদর্শনে তৎপর হবেন। এবার 'দুগ্ধ-সরোবর' (২য় সং) অবলম্বনে 'নূর-অল-ঈমান সমাজের বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

'দুগ্ধ-সরোবরে'র কভারিংয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

নূর-অল-ঈমান সমাজ। হেড অফিস, মির্জাবাগ ভিলা, রাজশাহী। সুবিখ্যাত এখওয়ানোস্ সাফা নামক সমাজের অনুকরণে এবং বিদ্যানুরাগী ইংরেজ রাজপুরুষগণের স্থাপিত এসিয়াটিক সোসাইটি সমাজের সাদৃশ্যে ১৩০২ সালে উত্তরবঙ্গে নূর-অল-ঈমান নামক একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা সম্বন্ধীয় বিবিধ কথা নিম্নোক্ত প্রকার বঙ্গীয় মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রচার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। যথাঃ—

(ক) বালক-বালিকাগণের উপযোগী বিবিধ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা।

(খ) বয়স্ক নর-নারীদিগকে জ্ঞান পথ প্রদর্শনার্থ হিতকর গৃহ পাঠ্য ও অবসর পাঠ্য পুস্তক-পত্রিকা প্রচার করা।

(গ) আরবী-পারসী-ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করা।

(ঘ) উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ টাইপ সৃষ্টি করতঃ তদ্দ্বারা কোরআন শরীফ ও আরবী-পারসী গ্রন্থ ছাপা করা।

(ঙ) শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক দেশহিতকর গ্রন্থাদি প্রচার করা।

(চ) গ্রন্থকারদিগকে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করা। (হিতকর গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াও প্রকাশিত না হইলে কোন শর্ত্ত স্থাপন করিয়া সমাজের পক্ষ হইতে সে পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করা যাইবে)

(ছ) প্রচারক প্রেরণ দ্বারা মৌখিক উপদেশ প্রচার শিক্ষিত সর্বসাধারণকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করা।

(জ) চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হেতু সমাজের পক্ষ হইতে একখানি (ম্যাগাজিন) বিশ্ব জ্ঞানাধার পত্রিকা প্রকাশ করা। নানা বিষয়ক পরামর্শ, মতভেদের তর্ক ও মীমাংসা এবং সমাজের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজের মেম্বরগণ ইহাতে আলোচনা করিবেন।

আলেম, ফাজেল ও শিক্ষিত চিন্তাশীল নরনারী লইয়া এ-সমাজ-গঠিত। ধর্ম্ম প্রচারক, মৌলবী, মসজেদের ইমাম, বিবিধ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উকীল, মোখতার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সওদাগর, শিল্পী, কৃষক, জোতদার, জমিদার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জ্ঞানী লোক, নরনারী নির্ব্বিশেষে ইহার মেম্বর হইতে পারিবেন। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে সম্পাদকের নিকট অথবা নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন।

মির্জ্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব। মির্জ্জাবাগ ভিলা
রাজশাহী।

এই পুস্তিকায় আরো দেখি :—

নূর-অল-ঈমান সমাজ।

(১) মৌখিক উপদেশ দান (২) উপদেশ মূলক পুস্তক ও পত্রিকা প্রণয়ন (৩) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও হিতকর গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা মুসলমান সমাজকে সৎপথ ও ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করাই নূর-অল-ঈমান সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। আলেম, ফাজেল ও শিক্ষিত চিন্তাশীল নরনারী লইয়া এ-সমাজ গঠিত। সকল শ্রেণীর জ্ঞানী লোক, নরনারী নির্বিশেষে, ইহার মেম্বর হইতে পারিবেন।

হেড অফিস সম্পাদক
মির্জাবাগ ভিলা নূর-অল-ঈমান সমাজ।
রাজশাহী

'দুগ্ধ সরোবরের' প্রথম মুদ্রাঙ্কনের ভূমিকায় পাই :—

...উত্তরবঙ্গে রাজশাহী হেমায়েতের এসলাম সভা ধর্মের উন্নতি, বিদ্যালোক বিস্তার, গৌরব ও একতা স্থাপন, বাণিজ্য পথ আবিষ্কার ইত্যাদি কার্য্যে 'কমর' বান্ধিয়াছেন। ওদিকে তৎসহযোগী নূর-অল-ঈমান নামক সমাজ, বালক বৃদ্ধ যুবকদিগের নিকট এস্‌লাম ধর্মের মর্ম, কোরআন শরিফের আজ্ঞা এবং তাহার অর্থ, তফসীর, মসজেদে মসজেদে হাটেঘাটে জনাকীর্ণ স্থানে ঘোষণা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন—এতদ্ব্যতীত ধর্মগ্রন্থের 'তরজমা' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিবেন-মুসলমান সমাজের মঙ্গলার্থে গ্রন্থ পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবেন। বিলাতে ইংরাজগণকে এস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে যে সকল "ওয়ায়েজ" বা প্রচারক যাইবেন তাঁহাদিগকেও সাহায্য করিবেন। উত্তরবঙ্গের দুই সমাজই সমস্ত বঙ্গদেশকে এক ভ্রাতৃ প্রেম সূত্রে গ্রথিত করিতে ইচ্ছুক। ইহাদের এই সাধু সঙ্কল্পে মুগ্ধ হইয়া লেখক এই ক্ষুদ্র দুগ্ধ-সরোবরটি বাহির করিলেন। ইহা মন্থনে যে ধন পাওয়া যাইবে তাহা ভাগ সওদাগরীর মূল ধনরূপে সংগৃহীত হইয়া একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের তরজমা পুস্তক, পুস্তিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে। তৎসমস্তই সাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে কৃষি ও বাণিজ্যের অন্যান্য শাখা খোলা যাইবে।

মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এই :—কোন বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাপুরুষ এই সামান্য দুগ্ধ-সরোবর দেখিয়া যদি সহসা বলিয়া উঠেন যে, ইহা 'দুগ্ধের সরোবর' নয় 'জলের সরোবর' আর সেই ধ্বনি শুনিয়া যদি অপর লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে ইহা 'জলের সরোবর' তবে নিরুপায় লেখক বলিবেন 'তাহা হইলে ইহার নির্ম্মল স্বচ্ছ জলে তোমরা আপন আপন মুখের ছবি দেখ।'

১৩০৮ হিজরী রমজান লেখক।
১২৯৮ সাল
বৈশাখ

দ্বিতীয় সংস্করণের মন্তব্য :—

করুণাময় সিদ্ধিদাতার কৃপায় দুগ্ধ সরোবর সাময়িক পরিবর্তন সহকারে পুনরায় মুদ্রিত হইল। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে লইতে হইলে,—(১) কুসংস্কার বর্জিত যুক্তিমূলক উদার ধর্ম্মমত প্রচার; (২) হিতকর শিক্ষাবিস্তার; (৩) মুদ্রাযন্ত্রের সদ্ব্যবহার (৪) সমবেত শক্তি গঠন বিশ্বাস মূলক ভাগ সওদাগরীর প্রসার—এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য, শৃঙ্খলার সহিত সমাজে প্রচলিত করিতে দেশের চিন্তাশীল সমাজপতিগণের নিকট অনুরোধ স্বরূপ দুগ্ধ সরোবর লিখিত হয়। প্রদর্শিত কার্য্যাবলীর দিকে চিন্তাশীল লোকের দৃষ্টি যে না পড়িয়াছে তাহা নহে। বঙ্গ-বন্ধু স্বর্গীয় মুনশী মেহের উল্লা সাহেব ও তাঁহার সহকারীগণের অমূল্য প্রচার চেষ্টা; শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন গঠনার্থ বিখ্যাত 'সোলতান' পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণের আপ্রাণ পরিশ্রম; শিক্ষা সমিতির প্রতি দেশের বড় লোক ও রাজ পুরুষগণের উজ্জ্বল সহানুভূতি; মিশনকার্য্য শৃঙ্খলার সহিত গঠনার্থ পরম ভক্তি-ভাজন 'সুফী, মওলানা আবুবকর, সোলতানের ভূতপূর্ব সম্পাদক

মৌলবী মনিরুজ্জমান, 'মোহাম্মাদী' সম্পাদক মৌলবী আকরম খাঁ, 'মোসলেম হিতৈষী' সম্পাদক শেখ আবদুর রহীম, ইংরেজী 'মুসলমান' পত্রের সম্পাদক মৌলবী মুজীবর রহমান ইত্যাদি মহাপ্রাণ লোকের অতুলনীয় চেষ্টা; চট্টগ্রামে বঙ্গীয় ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী গঠন, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অর্থাৎ বিশ্বাস মূলক ধন-ভাণ্ডার স্থাপনে গবর্ণমেণ্টের আইন পাস; স্থানে স্থানে মুসলমান কর্তৃক ছাপাখানা স্থাপন, চিনি প্রস্তুত ও 'চন্দ্রদা-বগৎ' ইত্যাদি ব্যবসায়ের দিকে লোকের দৃষ্টিপাত এই প্রকার চিহ্ন দৃষ্টে বুঝা যায় সমাজ-পতিগণের মনোযোগ ঐ চতুর্ব্বিধ কার্য্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে। বিশ্বপতির অলক্ষিত হস্ত-সঞ্চালনে এই শুভ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। অভাবের তাড়নায় ও লাঞ্ছনার বেত্রপ্রখরে সমাজদেহে চেতনার সঞ্চার হইতেছে, এই সময়ে সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রকাশ এবং হিতকর সদুপদেশ সর্বদ্বারে প্রচার নিতান্ত আবশ্যক। দুর্ব্বল নুর-অল-ঈমান এই শুভলগ্নে সমাজের কিছু খেদমৎ করিতে ইচ্ছা করে। সাধু সঙ্কল্পে সৎকার্য্যের পুণ্য পাওয়া যাইতে পারে। মহাত্মা এবরাহীম নবীকে যখন উৎপীড়ক। নমরুদ অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপ করে তখন দুর্ব্বল ভেক মুখে জল লইয়া গিয়া সেই অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ভেকের মুখ বিনরছ জলে অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাণ হওয়া অসম্ভব। তথাপি মহাবিচারক ভেকের সাধু সঙ্কল্পে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের অপার দুর্ভাগ্যগ্নি নিবারণকল্পে এই দুর্বল সমাজের চেষ্টা তদ্রূপ বিবেচিত হইবে কিনা জানা যায়না।

১৩৩২ হিজরী, ১০ই জেলহজ।	নুর-অল-ঈমান।

কার্ত্তিক—১৩২১ সাল।

উপরোক্ত ভূমিকা ও মন্তব্য আলোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয় যে, 'দুগ্ধ সরোবর' ১ম সংস্করণ ১২৯৮ সনে দু'টি সমাজের সহযোগিতায়ই খুব সম্ভব রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়; এবং দ্বিতীয় সংস্করণ 'নব প্রতিষ্ঠিত' রাজশাহীর মির্জাবাগভিলার 'নুর অল-ঈমান' সমাজ কর্তৃক ১৩২১ সন বা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। (১২৯৮-থেকে ১৩২১) এই ২৩ বছরের মধ্যে আর কোন সংস্করণ আমরা পাইনা 'দুগ্ধ সরোবর' পুস্তিকটির। ইতোমধ্যেই ১৩০২ খৃষ্টাব্দে 'নুর-অল-ঈমান' সমাজ স্থাপিত হয়। 'নুর-অল-ঈমান সমাজ' কর্তৃক প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর সংবাদ পাওয়া যায়।

"নুর-অল-ঈমান" সিরিজ নং

১। দুগ্ধ সরোবর (২য় সং—মৌলবী মির্জা ইউসুফ আলী প্রণীত)

মুসলমান সমাজ কি কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হইল, সেই দুর্দশা কি উপায়ে দূর করা যেতে পারে, তা' মনোহর গল্পচ্ছলে বর্ণিত। মূল্য ।০

২। সৌভাগ্য-স্পর্শমণি (মৌলবী মির্জা ইউসুফ আলী সম্পাদিত) ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লার জগদ্বিখ্যাত পারস্যগ্রন্থ কিমিয়া সাআদাতের বঙ্গানুবাদ। নিম্নলিখিত সাতখণ্ড মুদ্রিত হয়েছে; অবশিষ্ট একখণ্ড যন্ত্রস্থ (ক) দর্শনপুস্তক—৮০ (খ) এবাদৎ পুস্তক—১।০ (গ) ব্যবহার পুস্তক ১ম ভাগ—১৲ (ঘ) ব্যবহার পুস্তক শেষ ভাগ—১৲ (ঙ) ধ্বংসকর দোষ ১ম ভাগ—১।।০ (চ) ধ্বংসকর দোষ শেষ ভাগ—১।।০ (ছ) পরিত্রাণ পুস্তক ১ম ভাগ—২৲ (জ) পরিত্রাণ পুস্তক—শেষ ভাগ (যন্ত্রস্থ)।

৩। খোশ খবর (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) বঙ্গদেশে ইসলাম মিশনের প্রয়োজনীয়তার প্রমান। মূল্য আল্লার নজর বলে যিনি যা দেন।

৪। ওয়ায়েজুল মোমেনিন (মুনশী ছমির উদ্দিন আহ্‌মদ বিরচিত) রয়াল অষ্টাংশিত। এছলামী পয়ার-ছন্দে দিনদারী ওয়াজ নছিহত এবং উপদেশ পূর্ণ পুঁথি। কেয়ামতের বর্ণনা ইত্যাদি সুন্দর লিখিত হয়েছে। ওয়াজ শুনতে যাঁরা অবসর পাননা তাঁরা ইহা পাঠে সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন। মূল্য—।৶০

৫। পতিভক্তি—চতুর্থ সংস্করণ দেওয়ান বছিরুদ্দীন আহাম্মদ* (সোলতান পত্রের ভূতপূর্ব ম্যানেজার ও সম্পাদক এবং প্রসিদ্ধ বক্তা) স্বামীর প্রতি মোসলেম রমনীর কর্ত্তব্য এতে বিবৃত আছে।—৶০ আনা দাম। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত। 'মেয়েমহলে' 'পতিভক্তি' যাতে পঠিত হয় তার জন্যে পুঁথির ভাষায় লিখিত। রাজশাহী নুর-অল-ঈমান সমাজের পক্ষ হতে শিকারপুর, ডুবলহাটী পোঃ (রাজশাহী) হ'তে শ্রীমতী বিবি আফিরন্নেসা কর্তৃক প্রকাশিত এবং রাজশাহী—মির্জাবাগভিলা, হেমায়েত ইসলাম চারু মুদ্রাণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

"সন্তানের জন্য ইহা শাস্ত্রে লিখিয়াছে।
জেন্নত তাহার হয় মাতৃপদ নীচে॥
এইরূপ লেখা আছে গাজীর ভাগ্যেতে।
জেন্নত তাঁহার হবে কৃপাণ ছায়াতে॥
সেইরূপ রমনীর ভাগ্যেতে এমন।
লেখা আছে এবে তাহা শুন বিবিগণ—

* গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী—উর্দ্দু শিক্ষক, আরবীপড়াশিক্ষা, হাসির তরঙ্গ, সমাজ সংস্কার, পাপের ফল, রমজান শরীফ মাহাত্ম্য, পুষ্পহার, ইসলামী নামকরণ এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও হজরত ইমাম মেহদীর আবির্ভাব।

পতির তুষ্টিতে হবে বেহেশতেতে স্থান।
নতুবা আখেরে তার মহা অকল্যাণ॥"
('পতিভক্তি'—২৫ পৃষ্ঠা)

সবশেষে আমরা 'নূর-অল-ঈমান' সিরিজ নং১—মির্জা সাহেবকৃত 'দুগ্ধ সরোবরে'র কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধের শেষ করব।

'দুগ্ধ সরোবর' রাজশাহী—মির্জাবাগভিলা হ'তে নূর অল-ঈমান কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ ১২৯৮ সাল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২১ সাল, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। 'হেমায়েত ইস্‌লাম চারু মুদ্রনে যন্ত্রে (রাজশাহী)' বি, কে, সরকার দ্বারা মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান-কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে, কোহিনূর পুস্তক বীথি, মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব, মির্জাবাগভিলা, রাজশাহী মূল্য—।০ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮।

ইরাণের সম্রাট ও বিখ্যাত জ্ঞানী মহাত্মা দানেশ মন্দের মধ্যে কথোপকথন ব্যপদেশে মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবনতি এবং তা থেকে পরিত্রানের উপায় নির্দেশ করে রূপক-চ্ছলে কাহিনী মারফত চমৎকার গল্পের অবতারনা। কোরান, আল্লা, রছুল (দঃ), এস্‌লামধর্ম, হাদিস, আলেম, দরবেশ, জাকাৎ, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রীতি, তেজ, রাজা ও রাজ্য, অহঙ্কার, ধন-দৌলত, দান-গ্রহণ, বয়তুল মাল, শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মানসে 'দুগ্ধ সরোবরে'র মাধুর্য্য অর্পন-অভিলাষী 'লেখক' যেমন—

"যতদিন মুসলমানের সংখ্যা জগতে অল্প ছিল, ততদিন তাঁহারা অতি সতর্কতার সহিত আপনাদিগকে প্রকৃত পূর্ণমানুষের গুণগ্রামে বিভূষিত করিবার চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাপ্রভুর চক্ষের উপর তাঁহার আজ্ঞার একবিন্দু ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইতেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা একটি গুরুতর 'দায়িত্বভার' অন্তরে পোষন করিতেন—তাঁহারা ভাবিতেন মানুষকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা নিত্যসুখের পথে চালনা করিতে 'মনুষ্য শিক্ষকে'রই প্রয়োজন ; এবিষয়ে ফেরেশতাগণের কোন উপযোগিতা নাই। ফেরেশ্‌তাগণের মনুষ্যাতীত দৃষ্টান্ত, দুর্ব্বল মানুষের নিকট সাধ্যাতীত বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। এই জন্য পরম 'হেকমত-কুশল' বিশ্বপতি পৃথিবীতে মুসলমানদিগকেই জগতের আদর্শশিক্ষা স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও চরিত্র মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া অপরাপর লোক এসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক নিত্যস্থায়ী সুখের অধিকারী হইবে।

...মুসলমানগণের সামান্য ত্রুটীদর্শনেরূ যদি কোন সম্প্রদায়, এস্‌লামের উপর বিরক্ত হয়, এবং মুসলমান সমাজের গৌরব কিঞ্চিত মাত্রও হ্রাস পায়—এস্‌লাম প্রচারের স্রোত মন্দীভূত হইয়া যায়, তবে অন্য লোকেরা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে বিরত হইবে এবং তাহাতে সে সকল লোক করুণাময়ের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইবে ; এরূপ হইলে আমরাই ঘোর পাপী হইব এবং আমরাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎবাসী নরনারীকে মনুষ্যোবিত মহৎ গুণার্জ্জনে বঞ্চিত করিলাম বলিতে হইবে। এই দায়িত্ব ভয়ে পূর্বকালের মুসলমাগণ অতি সতর্কতার সহিত চলিতেন।..."
('দুগ্ধ সরোবর'—২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

বিচার কার্য্যের অনুপযোগীতা সম্পর্কে লেখক বলছেন—

..."সজীব দেহে, বেদনার সংবাদ যেমন বিনা বাধায় অঙ্গের সাহায্য বিনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তথায় সূক্ষ্ম-সুবিচার অন্তে প্রতিবিধানের জন্য যেমন হস্তপদাদির উপর আদেশ হয়, তদ্রূপ সজীব সমাজে সুবিচার বিনামূল্যে সর্ব্বদ্বারে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আপনার ইরাণ দেশে অভিযোগ আণয়ন করিতে উৎপীড়িত প্রজাকে কত অর্থব্যয় ও বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। প্রথম, মূল্যদানে 'দরবারী কাগজ,' কিনিতে হয়, পরে রাজানুজ্ঞাত আইন ব্যবসায়ীকে উচ্চ পারিশ্রমিক দিয়া সেই অভিযোগ লিখিয়া লইতে হয়। শেষে 'পেশ' করিতে ও 'সওয়াল-জবাব' করিতে উচ্চ বেতনে তদ্রূপ আইন-ব্যবসায়ী নিযুক্ত করিতে হয়। সাক্ষীগণকে উপস্থিত করিতেও বহু অর্থব্যয় করা আবশ্যক। যে দেশে উৎপীড়িত প্রজাকে অর্থ ব্যয়ে বিচার কিনিয়া লইতে হয়, সে রাজ্যে অধিকাংশ স্থলে বিচার বিভ্রাট ও সত্যের অপলাপ হেতু প্রজাগণের দুর্দশার সীমা থাকেনা।..."
(ঐ ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা)

এস্‌লাম-ধর্মপ্রচারক জোনাব মৌলানা হাসান আলী 'দুগ্ধ সরোবর' সম্পর্কে লিখেছেন :

"...It is really a good book. The sentiments in many places are philosophical. The present deplorable condition of the Mussalman has been explained in an interesting manner and the remedy has been pointed out. I like this useful book to be in the hand of every young Bengal Mohammadan..."

কটক কলেজের আরবী ও পারসী ভাষার অধ্যাপক মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব লিখেছেন :

"...বর্ত্তমানকালে মুসলমানগণ কি কারণে উৎকৃষ্ট গুণগ্রাম হারাইয়াছেন, তাহা অতি কৌশলে এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই পতিত মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি হইতে পারে, তাহাও

বেশ পরিষ্কার করিয়া পুস্তকের শেষ ভাগে দেখান হইয়াছে। এস্‌লাম ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহার মধ্যে সহজ যুক্তি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা মুসলমান কওমের ও এস্‌লাম ধর্ম্মের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা এ-পুস্তক ক্রয় করিয়া অন্ততঃ একবার পড়িবেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের উদার ও সহৃদয় মহোদয়গণ যাহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও এই পুস্তকের দিকে দৃষ্টি করবেন।…"

পরিক্রমা

খন্দকার আবদুর রহিম

যন্ত্রণার অরণ্য পার হয়ে
একসারী বলিষ্ঠ চেতনা
তোষার-মগ্ন জীবনেরে পিছে রেখে
উদয় গিরির দ্বারে
প্রদীপ্ত চোখের তৃষ্ণা
যখন ছড়ালো সম্মুখের বিশাল প্রান্তরে—
সে মুহূর্তে আমি মুক্তিকামী বিশ্বের অন্য এক সত্বা,
সে মুহূর্তে আমি প্রেম,
প্রীতির সমুদ্র-ধ্বনি
অনন্ত কালের।
স্বপ্নের নীল পাথরগুলো দিয়ে
ঢাকা ছিল এতকাল
আমার দেহের আর
মনের
আর কামনার
অসংখ্য যুগের সিঁড়ি।
পানি-শেওলার ঘর সেখানে
সংসারাসক্ত চড়ুইও
আসেনি সেখানে ঘুরে ফিরে যেতে।
এক বন্ধ্যা প্রহরের চাপে
কখন পলাশ ফুলের রঙ
ঝরে গেল কুটিল মাটিতে।
এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো পিঁপড়ের রাস্তা
আর ইঁদুর-কাটা কুচি কুচি
খড়গাদা—
সব দিয়ে
এক পোড়ো বাড়ির চেহারা—
এই ছিল আমার
এতদিনের স্মৃতির কাহিনী।
তারপর এসেছিলে তুমি।
রক্ত ঢেলে ঢেলে পিচ্ছিল পথে
তোমার অভিসার চলছিল
কয়েক যুগ ধরে।
সে-পথে তোমার প্রেম এলো,
এলো আকণ্ঠ পানের পিপাসা।
তোমার নিঃশ্বাসেই নড়ে উঠেছিল
আমার বিমুগ্ধ সত্বার ঘুমগুলো।
তুমি অসংখ্য চুম্বনের পরাগ ঢেলে দিলে
আমার লজ্জার শরীরকে আলিঙ্গনে ঘিরে।
সে-উত্তাপে আমি বিহ্বল হয়েছিলাম।
তুমি ডেকেছিলে বুঝি, ওগো ধানকন্যে!

আজো সেই ডাকের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
দিকদিগন্তের অনেক বাধা ডিঙ্গিয়ে এসে
আমাকে আকুল করে,
উদাস করে।

তোমার প্রেমের জন্যে
পাণ্ডুর আকাশের রঙে বার বার
তাই সাজাই আমাকে॥

নীল-তনয়া

আবদুন নূর

সময়ের চত্বরে কাঠঠোকরার কলধ্বনি শিপ্রা চৌধুরীকে বার বার অস্থির চঞ্চল করে তুলছিলো। যৌবনের প্রান্ত-সীমায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। রূপোলী সৌন্দর্যের ভার শংখচূড় দেহের খাঁজে খাঁজে। বিচিত্র বরনা বন্যার মাধুরী আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে অজানিতে। সুগভীর ঘ্রানে মৌমাছি ভীড় করবে, তাতে আশ্চর্য্য কি!

পড়ন্ত প্রহরের ম্লান সোনালী ছটায় শিপ্রা চৌধুরী উদ্ভাসিত, চঞ্চল যৌবনের আবেগে উচ্ছল মুখর! প্রত্যুষের উর্মিমুখর কল্লোলের শেষ কলধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর পরই, যে বিষাদ হতাশা ব্যাপ্তিময় হয়েছিলো শিপ্রার মনের সংগোপনে, লুকিয়ে থাকা ধুক-পুকে পড়ন্ত বিকেলের সুবর্ণ আভায় রক্ত রঞ্জিত হয়ে উঠবে, তাতেই বা বিচিত্র কি!

বিচিত্র ধারা দেখতে অভ্যস্ত নার্স শিপ্রা। রোগীর সম্মিলিত কল্লোলে সমুদ্র গর্জনের বিশালতা হয়তো উপভোগ করতে পারে না শিপ্রা; কিন্তু পারে ক্ষীণতোয়া নদীর আশ্চর্য্য ক্ষীণ জীবনের স্পন্দন। তবু তার মনের অল্প গভীরে ক্ষুদ্র একোরিয়ামে লাল-নীল-হলুদ স্বপ্নালু মাছগুলো তকবক করে ছুটে বেড়ায়।

ওয়ার্ডের মাঝামাঝি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। বিচ্ছিন্ন বিষাদের তিক্তছায়া মনের গভীরতায় অল্পবিস্তর প্রলেপ দিতে নির্বিকার তাকিয়ে ছিলাম জানালার ফাঁকে চিলতে আকাশের ছন্নছাড়া রূপের পানে। জৈবিক জিজ্ঞাসার প্রশ্নে যে বিকার সর্পিল বিকৃতি ব্যাপৃত হয়ে দাঁড়ায়, তারই একটি বীভৎস ব্যাকুল রূপ ফুটে উঠেছিলো আকাশের গায় লেপ্টে থাকা ভোরের মেঘগুলোয়। কিংবা সে আশ্চর্য্য প্রহরে শিপ্রা চৌধুরীর রিক্তা মনের যে আকুল কান্না আমাকে বিচলিত করে তুলেছিলো, তারই কোন উর্ণনাভ প্রচ্ছায়া আমার অবচেতন মনে শংখচূড়ের ন্যায় প্রবেশ করেছে। ছড়িয়ে দিয়েছে হিমশীতল শকুনির কুটিল ছায়া। সে জন্যেই কি শিপ্রা চৌধুরীকে মনে মনে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েও সাধারণ নারী পর্যায়ে স্থান দিতে কেমন যেন বাঁধো বাঁধো ঠেকছিলো। আমি আমার নিজেরই এ-রূপ দেখে নিজেই অবাক হয়েছিলাম।

সিষ্টার, ওপাশের একটি রোগী কঁকিয়ে উঠলো!

শিপ্রা চৌধুরী উঠে দাঁড়ালো।

রোজই সে ওয়ার্ডের মাঝামাঝি চেয়ারে বসে বয়ে যাওয়া জীবনে স্মৃতির তরঙ্গের উজানে ঠেলে যাওয়ার চেষ্টা করে। অতীতে নদীতটের আশেপাশে যে বিচ্ছিন্ন ঢেলা ছড়িয়ে দিয়েছিলো, তা আবার ফিরে কুড়িয়ে নেয়। আর মাঝে মাঝে যে কালো নুড়ি ছড়িয়ে আছে বালুচরে, তা ডিংগিয়ে পার হয়ে যায়!

আমি ওর মুখের পানে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি। ওয়ার্ডের অজস্র রোগীর মাঝে আমি একা নিসঙ্গ নির্লিপ্ত। ডানে বাঁয়ে পাশে আমার মতো আরো অনেক শুয়ে শুয়ে ভাবছে। হয়তো শিপ্রা চৌধুরীরই কথা! কারো পা ভেংগেছে, কেউ আলসারে ভুগছে, কেউ বা অক্সিজেন নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। আর কেউবা কাতরাচ্ছে হয়তো যে প্রিয়া চলে গেলো তারই অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির জন্যে। অসংখ্য এই রোগীর মাঝে লুকিয়ে আছে অসংখ্য প্লট, আমার সারা জীবনের সাধনাকে মণি মুখর করে তোলার প্রয়াসে বুঝিবা! তবুও কি এক আশ্চর্য্য নির্লিপ্ত অনুভূতিতে আমি তাদের প্রতি ফিরে চাইতাম না। কথা বলার প্রবৃত্তি হতো না! এ-জন্যে নিজের মনের কাছে বার বার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়েও আবার দ্বন্দ্বে দাঁড়াতাম। আত্মদ্বন্দ্বে ক্লান্ত হলেই তাকিয়ে থাকতাম শিপ্রার পানে।

ওর চিন্তার তরঙ্গায়িত প্রবাহের সাথে সাথে ওর মুখেও ছায়া পড়তো—মনের প্রতিচ্ছায়া! মনে হতো অতীত রোমন্থনের নায়িকা ভবিষ্যের প্রতিফলিত রূপ চোখে রেখেই বার বার বিচূর্ণ করে ফেলছে তার কলংকের বিষাক্ত কালিমা। মাঝে মাঝে খুশীর উচ্ছলতায় চঞ্চল হয়ে উঠত। আবার ক্ষণে ক্ষণে বিষাদের ক্লান্ত আমেজে ছেয়ে ফেলতো ওকে। কি যেন চিন্তা করতে করতে থেমে যেতো। চঞ্চল চোখ দিয়ে বার বার তাকিয়ে যেতো রোগীদের পানে।

হঠাৎ চমকে উঠতো। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একদলা সাদা রেণুর প্রলেপ দিতো ওর শ্যামলা গালে। ছোট আয়নায় চেহারা এক ঝলক দেখে নিতো। তারপর বাইরে তাকিয়ে একটি বিচিত্র হাসি হাসতো।

আর তখনই হয়তো কঁকিয়ে উঠেছে পাশের ওয়ার্ডের বিস্মৃতা যৌবনা কালী বাগদীর ছোট বউটা। সে নাকি দু'বার পালিয়েছিলো ঘর হতে। পয়লা বার বিয়ের আগের 'নাগরের' পাল্লায় পড়ে। পরের বার রাস্তার দালালের হাতে। বহুরূপীর ছদ্মবেশ নিয়ে বহুরূপিনীর ব্যবসা করা যাদের অভ্যাস, সেখান হতেই সটান এসেছে এখানে মুমূর্ষ অবস্থায়। বিড় বিড় করে অনুরোধ জানিয়েছে কালী বাগদীকে ডাকতে! মরণের সময়ই খেয়াল

হয়েছে বিচিত্র লীলাখেলার কুটিল পরিণাম। এবার স্বামীর পা ছুঁয়ে না গেলে নারীর মোক্ষ লাভ হবে কি করে! কান্না শুনে ঝলক হাসি হাসে শিপ্রা চৌধুরী। ক্ষণে ক্ষণে মিট মিট হাসি। সে যেন উপভোগ করছে দুরাগত ধ্বনির বিষাদিত যন্ত্রনা।

আমি অবাক হলাম। কি এক প্রবৃত্তির বশে প্রশ্ন করলাম।

ঃ হাসছেন কেন সিষ্টার?

ও তাকালো আমার শায়িত দেহের পানে। নির্নিমেষ চোখে আপাদ মস্তক ঘুরিয়ে আনলো। অবশেষে কঠিন গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বল্লো।

ঃ ফর গড্স্ সেক ডোণ্ট ইণ্টেফেয়ার ইন্ মাই পার্সো'নাল এফেয়্র'াস। আর গট্ গট্ করে সম্রাজ্ঞীর ন্যায় বেরিয়ে এলো ওয়ার্ড হতে।

পাশের বিছানায় শুয়ে ছিলেন কোন এক মহল্লার সর্দার। তিনি অবাক হয়ে তার গমন পথে তাকিয়ে রইলেন কিয়ৎক্ষণ। তারপর আমায় লক্ষ্য করেই এক বিচিত্র ভংগীতে চিবিয়ে বল্লেন: হ, মাগীর রকম দেখ না! একবার—

বিশ্রী উক্তি করেই তিনি লুঙ্গির উপরিভাগ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন! কোন এক জৈবিক রোগের কল্যাণে এখানে এসেছেন। নিমিষে শিপ্রা ঘুরে দাঁড়ালো, ওখান হতেই জিজ্ঞেস করলো: স্পিকিং এনিথিং? সর্দারজী শশব্যস্ত হলেন। মুখ কাঁচুমাচু করেই রইলেন। কি উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

সে আবার বল্লো: ডু হ্যাভ রেসপেক্ট ফর ইওর মাদারস্ রেস্।

তিমির তমসার অন্ধকার ঝরে পড়ে। শিশির নামে ধীরে ধীরে। ঘাসের সবুজ কার্পেটে, ফুলের চুমকিতে। একঝাঁক কালো নাগ যেন হাত বাড়ায় ব্যাপ্তিময় মানুষের কল্লোলে—সীমায়িত মনের অলক্ষ্যে। হিমশীতল রাত্রি অমাবস্যার শকুন অন্ধকার নিয়ে বীভৎস নৃশংসতায় দাঁড়ায় জানালার আশেপাশে। চিলতে আকাশের প্রচ্ছন্ন রূপে ঠক্ ঠক্ করে আঙ্গারের মত জলে নক্ষত্রগুলো।

ঃ আর ইউ—।

চমকে চেয়ে দেখি শিপ্রা চৌধুরী। আমার নিমীলিত চোখের পানে ওর মায়া চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টির প্রক্ষেপ নির্নিমেষ হয়ে রয়েছে। তাতে রয়েছে নীল সাগরের অতল গভীরতা।

থার্মোমিটার হাতে নিয়ে আবার বিছানার পাশে এসে বসেছে। রক্ত তাপ নেবে। রাত প্রায় বারটা। কেমন যেন ভয়ের আভাস ছড়িয়ে দেয় অঙ্গে অঙ্গে। এমনি সময় শিপ্রা চৌধুরী আমাকে এ্যাটেণ্ড করা অভাবনীয় বটে। এছাড়া আমি ভালো হয়ে এসেছি। আগামী সকালেই ডিসচার্জ হবো। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছেন। হয়তো রোগীর নিন্দা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই এই অভিনয়ের অবতারণা।

ঃ না, আমি নির্লিপ্ত উত্তর দেই।

ঃ নো ইউ সিলি বয়। টেল মি দা টুথ্। আমার যে অনেক কিছু বলার আছে।

গলায় ওর পুঞ্জীভূত মেঘের আর্দ্রতা। একটু নড়ে আরো ঘন হয়ে এলো। মুখে থার্মোমিটার দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে অনুনয়ের স্বরে বল্লো: প্লিজ, প্লিজ ডোণ্ট ব্লাফ্ মি।

আমাকে বিস্মিত করেছে ওর গলার আশ্চর্য্য বিষাদ, বেদনা। সব রুদ্ধ ঝরনার করুন আকুতি স্তরে স্তরে জমা হয়ে রয়েছে ওর মরাল গ্রীবায়। বল্লাম: ইয়েস সিষ্টার। নিমিষে সে শ্লথ অঙ্গ তড়িৎ শিরার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে এলো। শাণিত তলোয়ারের ফলকের ন্যায় ঝলমলিয়ে উঠলো।

ঃ প্লিজ প্লিজ ডোণ্ট ছে সিষ্টার। ছে শিপ্রা, ছে ডরোথী অর এনিথিং ইউ লাইক, বাট নট্...। উঃ, সিষ্টার সিষ্টার, সিষ্টার। আমায় পাগল করে তুলবে। আমি যেন মানুষ নই, মানবী নই, দেবী নই। আমার যেন কোন পৃথক সত্তা নেই, আত্মা নেই, তফাৎ নেই, পার্থক্য নেই। আমি মা নই, মেয়ে নই, প্রিয়া নই, শুধু সিষ্টার, শুধু সেবিকা!

হঠাৎ ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির দুরন্ত অভিমানের লাভা-স্রোত মনের গভীর হতে ছাড়া পেয়ে ঘরঘরিয়ে বেরিয়ে এলো। আহা, কি এক আকুতি আর্তসুর সে উষ্ণ স্রোতে বার বার ব্যাঞ্জনা দিয়ে উঠছে, মুর্চ্ছনা দিচ্ছে।

নিমিষে ও সামলে নিলো। মাথার এ্যাপ্রন আঁটতে আঁটতে যেন বুকের ব্যথা চাপতে চাপতে বল্লো: মাফ করুন! আবেগ আমার বেশী হয়ে গেছে।

ওর কথার অকস্মাৎ আবর্তিত ধ্বনিতে আশেপাশের অনেক রোগীর আলতো তন্দ্রা ভেংগে গেছে। কেউ কেউ নির্লজ্জ অভিভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার বেডের পানে। কে একজন অলক্ষ্যে বিড় বিড় করে বল্লো: ঘুমের ব্যাঘাত করে কেন এই অভিসারের পালা।

আমি একটু উঠে লোকটিকে ঠাহর করতে চেষ্টা করলাম। পেলাম না।

কেউ পাশ ফিরে শুলো, কেউ ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো। দূরের বৃদ্ধটি আর্তস্বরে ডাকলো, সিষ্টার, পানি।

ঃ একটু দাঁড়ান। আমি ওকে এ্যাটেণ্ড করেই আসছি।

দ্রুত সরে গেলো শিপ্রা চৌধুরী। ওর ক্রেপ্ সেলের চপ্পল সাদা সিমেন্টের বুকে কোন মূর্ছনাই তুল্লো না। শুধু মৃদু শিশির পাতের মতো রস ঘন ধ্বনি বিস্তৃত হলো ওয়ার্ড ঘেরা চার শ্বেত দেওয়ালে।

: সিষ্টার, ক'টা বেজেছে।

: কথা বলবেন না, আপনি ঘুমোন। মাথার তলায় সরে যাওয়া বালিশ গুঁজে দিতে দিতে বল্লো।

: আমার যে ঘুম পাচ্ছে না সিষ্টার। একটু আগে তন্দ্রা এসেছিল, দেখলাম বাবা যেন আমায় ডাকছেন ওপার হতে। আমি কি বাঁচবো?

: অনর্থক চিন্তা করবেন না। এছাড়া ভয়েরইবা কি আছে। আপনি তো ভালো হয়ে গেছেন।

: মাঝে মাঝে বুকের ব্যথা যে চাড়া দিয়ে ওঠে সিষ্টার।

: ওসব কিছু না। মনের ভয় শুধু। এক ডোজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

: আর কতকাল ঘুমের ওষুধ খাওয়াবেন সিষ্টার। সারা জীবনই তা খেয়ে খেয়ে জরাজীর্ণ শরীর টিকে আছে। নয় কবে ধ্বসে পড়ে যেত। বাঁচতে আমি চাইনা আর।

: আপনি বেশ বকছেন। আমি আসছি।

ত্রস্ত পদে সে রেক হতে ওষুধ নিয়ে আসে।

: নিন্, খেয়ে ফেলুন।

ওপাশ হতে আরেকটি রোগীর কাতরোক্তি শোনা গেলো: সিষ্টার, বেদনা যে কমছে না।

এ পাশের বিছানায় বল্লে: সিষ্টার শুনুন।

অদূরের বেডের ছোট ছেলেটি অস্ফুট স্বরে জানালো সিষ্টার শুনুন তো।

বাজারের সমস্ত কলরব যেন ইথারে ইথারে ভেসে এসে এখানে আস্তানা গাড়লো। সমস্ত ওয়ার্ড ব্যাপ্তিময় হয়ে উঠলো চার পাশের চাপা গাঢ় আওয়াজে—সিষ্টার, সিষ্টার, সিষ্টার। সব রোগী যেন একযোগে জোট বেধে চেঁচিয়ে উঠছে। বদ্ধ জমাট আব-হাওয়ায় সে মিশ্রিত কল্লোচ্ছ্বাস গমগমিয়ে উঠলো। নিমিষে আহত যুদ্ধক্ষেত্রের করুণ আর্তনাদের দৃশ্যে পর্যবসিত হলো ওয়ার্ডটা।

শিপ্রা চৌধুরীর ত্রস্ত পদক্ষেপ আরও দ্রুততর হয়ে এলো। সে ক্রমাগতই এদিক-ওদিক ছুটে চল্লো। কিছু পরেই আবার তমসার কালো শীতল নিস্তব্ধতা থাবা বাড়ালো।

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম। সামান্য কিছুক্ষণ আগেও সিষ্টার সম্বোধনে শিপ্রা আহত ফণিনীর ন্যায় ফুলে উঠেছিলো। ওর সর্পিল বলিষ্ঠ দেহের সুষম খাঁজে খাঁজে তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকের উগ্রা বিকশিত হচ্ছিল। আর এখন কি আজব কৌতুকে নির্লিপ্ত নয়নে সে ডাক গ্রহণ করলো আর আর রোগীদের কাছ হতে।

রোজ রাতেই ওকে দেখেছি সম্রাজ্ঞীর মতো, জননীর মতো আশ্চর্য্য কঠিন দৃঢ়তায় সেবিকার মহান ব্রতে ছুটে ছুটে বেরিয়েছে বেডে বেডে রাত্রির এই গাঢ় অন্ধকারে। ক্লান্তি প্রহরে। নির্জীব জীবনের বুকে অনাগত যৌবনের সোনালী প্রচ্ছায়ার রূপ খুঁটে খুঁটে ফুটিয়ে তুলতে এই লীলাময়ী নিপুনা কন্যার কি নিদ্রাহীন ব্যগ্র ব্যাকুলতা। চুন-ধবল ঠোঁটে তাম্বুল রাগ রংয়ের প্রলেপ মাখানোর কি বিচিত্র আগ্রহ! আমার শ্রদ্ধানত দুটি চোখ ক্রমান্বয়ে প্রতি রাত ওকে অনুসরণ করতো।

: ঘুমালেন?

: না।

: অবাক হয়েছেন?

: না।

: মিথ্যে কথা।

: না।

: তবে কথা বলছেন না যে!

ও আমার আরো নিবিড় হয়ে বসলো। সোনালী মাছের ঠোঁটে অবোধ্য গানের ভাষার মতো মৃদু স্বরে বল্লো আপনাকে যে আমার অনেক কিছু বলার আছে।

আঁধারে অনুভব করলাম ওঁর উষ্ণ প্রশ্বাস আমাকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। আমি অভিভূতের মতো চেয়ে রইলাম। ওর নীল চোখের আশ্চর্য গভীরতার পানে।

ওখানে কোন মায়ার ঢেউ বার বার উছলে উঠছে। দেখতে পাচ্ছি সেই ছায়া ছায়া নদী, মেঘ, ফল, ফুল, হরিদ্রাবর্ণ প্রজাপতির ঘর আর জাফরানী রং সন্ধ্যার সমাবেশ। প্লাবিত করে দিচ্ছে মণির উজ্জ্বল শিখাকে, হিরণ্ময় প্রকৃতির উচ্ছ্বাসকে। গভীর ব্যথার আর বেদনার প্রকাশকেও।

: আপনারা আমাদের কি ভাবেন বলতে পারেন? আমরা যেন কেউ না, কিছু না। আমাদের নিজেদের কোন সত্তা নেই, ব্যক্তিত্ব নেই। আমরা হাতের পুতুল। যে ভাবে খেলাবেন সে ভাবেই খেলবো। কিন্তু আমি যে আমিই, শিপ্রা চৌধুরী; ডরোথী। একটি মানবী। আমার হাসি আছে, কান্না আছে। আমার প্রকাশ আছে, বেদনা আছে। আমিও ভালবাসি সুবর্ণ আকাশের স্নিগ্ধ রং, ক্রপদের মৃদুস্বর, ঘ্রানময় সময়, নীল স্বপ্নের শাড়ী, সকাল, বিকাল সন্ধ্যা। আমিও চাই আমার সীমিত উঠোনে আকাশী রংয়ের কারুকার্য্য। আমারও রক্তের জোয়ারে প্রজ্ঞার জাহাজ ওঠানামা করে। তবুও আপনাদের সেই মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি আমার আত্মাকে খুঁজে পায়

না, পায় আমার আত্মাশ্রিত দেহকে। শুনবেন আমার ইতিহাস ?

আমি সম্মোহিতের ন্যায় চকিতে উঠে বসতেই ওর চিবুক কপালে ক্ষুদ্র সংবর্ষ হয়ে গেলো। আমার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু কালো নিকষ তমসার মায়াতেই যেন অভিভূত স্বরে বল্লাম: আমি, আমি আপনাকে স্বর্গাদপি জননীর মতোই শ্রদ্ধা করেছি, দয়া করে···

সে ধমকালো। অবাক দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো। অকস্মাৎ রহস্যময়ী পাগলিনীর ন্যায় সে তিমির তনয়া খিলখিল হাসিতে ভেংগে পড়লো; কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র। আবার সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বিভীষিকা হাঁটু গেড়ে বসলো, মুঠো মুঠো মায়ার রেণু ছড়িয়ে।

ব্যাংগের একটি ফিকে হাসি হেসে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো: অ্যাণ্ড টু ব্রুটাস্।

গলায় গিনতি ঢেলে বল্লাম: আমায় অন্য ভাববেন না শিপ্রা চৌধুরী। সত্যি আমি আপনাকে জননীর মতো দেখেছি। কোন এক বিস্মৃত প্রায় অবসরে মাকে দেখেছি আকুল হয়ে সেবা করতে আমার এই রোগ অধিকৃত দেহকে। আর এই যৌবন প্রান্তে এসে দেখেছি আমার সেবায় আপনাকে। গরীয়সী আপনি আমার শ্রদ্ধান্বিতা

: কিন্তু আমি তো আপনার সেবা করিনি।

: তার মানে ? আমি বিস্মিত হলাম। সে হাসলো

: হ্যাঁ, অবাক হওয়ার কথা বৈকি। আমি সেবা করেছি আপনার বেড্‌টিকে। চার নম্বর বেড্‌। এখানে যদি আপনি না এসে কোন পলিতকেশ বৃদ্ধও আসতেন, তাকেও আমি এমনি মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করতাম। আগামীতে যাঁরা আসবেন তাদেরও করবো। কারণ আমার জীবনের গভীরতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পট-ভূমিকা বেড্‌।

: শিপ্রা চৌধুরী। ডাকলাম কোমল স্বরে। আপনার সে কাহিনী আমায় শোনাবেন ?

শিপ্রা সেই ব্যাংগের হাসি হাসলো। শানিত ফলার ন্যায় তা আমায় বিদ্ধ করলো।

: তাতে যে আপনার অভিজাত শ্রদ্ধা ভেংগে খান খান হয়ে যাবে।

: যে দৃঢ় মাটিতে এ-শ্রদ্ধার ইমারত গঠিত তা ভাংবে না।

: বেশ তো কথা বলতে পারেন আপনি।

: কথা বলা মানুষের স্বভাবগত দোষ। তা একটু গুছিয়ে বলতে পারা গুণ বই কি।

: থাক্ সে-সব কথা। আপনার শরীর অসুস্থ। রাত জাগা ঠিক নয়।

: আগামী কালই ডিস্‌চার্জ হচ্ছি এবার বলুন।

: বেশ শুনুন তবে। এই চার নম্বর বেডের সাথে আমার জীবনের যে করুণ প্রচ্ছায়া লুকিয়ে আছে তাঁরই প্রতিচ্ছবি। ও একটি গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো। শুনতে শুনতে হয়তো করুনায় আপনার হরিদ্রামন দ্রবীভূত হবে। তবে আপনার অভিজাতিক শ্রদ্ধা লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

নার্সিংয়ে পাশ করে যখন এ-হাসপাতালে ঢুকলাম তখন আমার বয়স ষোলো পেরিয়ে সবে সতেরোয় পড়েছে। হাসলে যে ? ও বুঝেছি। মেয়েদের বয়স লুকোনোর কথাটা মনে পড়লো বুঝি। কিন্তু এখানে আমি সত্যি কথাই বলছি। সারভিস্ বুকে হয়তো অনেক রকম দেখবে।

মন তখন সাবান ফেনার বুদ্ বুদ। বাতাসের আলতো ঢেউয়ে যেদিকেই ছড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে পড়বে। যাকেই ভালো লাগবে তাকেই আলিঙ্গন করবো। চাইবে পক্ষী শাবকের ন্যায় তারই পক্ষপুটে আশ্রয় সন্ধান করতে।

মেয়েদের মনের এ-একটি আশ্চর্য্য সময়। পরিপুর্ণ জনতার মাঝেও সে একাকী নিসঙ্গ ব্যাপ্তিময় গভীর অনুভূতি উপভোগ করে। সে দেখে ঘর, বাড়ী, মেঘ, আকাশ, ফুল, লাল-নীল-হলদে-তামসী, সব কিছুর মাঝেই কি যেন নাই নাই ভাব। কি যেন হারানো হারানো প্রতিচ্ছায়া। যা আছে তাকে না ভালো লাগা। যা নেই তারই পক্ষপুটে নিজের আশ্রয় সন্ধান করা। আর রয়েছে সেই পরম পুরুষের কাছে জীবনের অনুজ্জল অর্ঘ্য রচনা করে সঁপে দে'য়ার অপার আগ্রহ। নিজেকে অচেনা আর অন্যকে চেনা করতে, সব মিলে তাকে করে তোলে অদ্ভুত। সে তখন রক্ত-মাংসের মানবী নয়, শ্রদ্ধার অঞ্জলী পাওয়া দেবী নয়, সে-আপনায় আপনি বিকশিত উচ্ছলা নারী।

সে তখন যারই মনে-প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায়, দেখে তাঁরই হৃদয় হতে অনুসরিত সুর আর ওর হৃদয়ের সুর, একই অবোধ্য সিমফনির তালে লয় ব্যক্ত করছে। সে উপলব্ধির সাথে সাথে একে অন্যে লীন হবে, একে অন্যতে বিকশিত হয়ে উঠবে তাতেই বা আশ্চর্য্য কি। প্রকৃতির এই সুন্দর বিকশিত হওয়ার স্থূল কথাটাই হচ্ছে বোধহয় বিয়ে, নয় কি ?

থাকগে অর্থের কথাবার্তা তুলে লাভ কি। নার্স জীবনের—অবলীলা ক্রমে শিপ্রা চৌধুরী উচ্চারণ করলে নার্স; প্রথম পক্ষ আশ্চর্য্য স্নিগ্ধতায় মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় কলকলিয়ে ত্রস্তে সরে গেলো।

সেবা করার এক মহান আনন্দ প্রশান্তিতে আমার মন হয়ে থাকতো ভরপুর। বাইরের জগতের সাথে সব সংশ্রবের সরু তারগুলো ছিন্ন করে ফেললাম। একাগ্র

হয়ে অনুগতা পরিচারিকার ন্যায় পরিচর্যা করতাম সেই অসংখ্য বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবকে। ওদের চোখের গভীর অনুভূতিতে প্রকাশ পেতো জননীর মতো শ্রদ্ধা। ওরা আমায় ভাল-বাসলো। হয়তো কোন দূর শৈশবে দূরাগত বার্তার মৃদুধ্বনির মতো কানে কানে বলে যায় মায়ের সেই নিরাভরণা জাতের বার বার সেবা করার কাহিনী, দৃশ্যপটে ভেসে উঠে তার ছবি। আর আজ আপন না হোক, মায়েরই জাতের কোন এক অজানা নারীর নিবিড় প্রশান্তিতে সেবা করার দৃশ্য। আমার মনের দৃঢ়তম আগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ওই শত শত আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে আমি হবো—নিশ্চয়ই হবো জননীর মতো রাজ-রাজেশ্বরী।

প্রথম যেদিন রোগীটি আবেগ ছল ছল চোখে আমার হাত ধরে বল্লো: আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। মায়ের কাছেও এতটা সেবা আশা করি নি; তখন সাফল্যে আমার বুক স্ফীত হয়ে উঠেছিলো।

এমনি সময় এই বেডে এলো ডেভিড্ দশ দিনের জ্বরে। টাইফয়েড। উজ্জল শ্যামবর্ণ যৌবন উজ্জল ছেলে। স্বাস্থ্যবান চেহারা।

সুন্দরের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। সে প্রবৃত্তি-রাশকে কেউ টেনে রাখতে পারে না বলেই জগতে এত ব্যর্থতার ইতিহাস যুগে যুগে রচিত হয়ে আসছে। আমিও ডেভিডের প্রতি আকর্ষিত হলাম। কিন্তু মায়ের স্নেহে নয়।

শিপ্রা চৌধুরী মৃদু হেসে চুপ করলো। উঠে দাঁড়িয়ে পুরো ওয়ার্ড আরেক বার পায়চারী করে এলো, হয়তো অতীতের স্মৃতি কিছুটা রোমন্থন করে গুছিয়ে আনলো।

: ওর প্রতি আকর্ষণ ক্রমে গভীর হলো। আবেগ প্রধান হলো। কিন্তু ডেভিড্ তো তখনো অজ্ঞান। টাইফয়েডের জ্বরে জীবন মরনের সমস্যা। আমি আমার প্রাণের সমস্ত আকুতি দিয়ে তাকে ভালোর পথে নিয়ে এলাম। যেদিন পূর্ণ জ্ঞান হলো সে দেখলো একটি গাঢ় নীলাঞ্জন ছায়া ওর নীল সমুদ্রের বুকে আশ্রয় খুঁজছে।

অস্ফুট কণ্ঠে ও বল্লে থেমে থেমে: শিপ্রা।

আমার ঠোঁট দুটো বার বার কেঁপে উঠে কি এক অব্যক্ত গানের সুর ব্যক্ত করতে চাইছিলো। আমার ছন্দে তখন বাজছে রক্তের উন্মাদ রিনিঝিনি, চঞ্চল কলরোল। বিচিত্র আভরণের সৌন্দর্য্য, লাবণ্যময় অভিব্যঞ্জনা রোমাঞ্চিত হেমন্তের ধারে আর নবান্নের গানের দ্যোতনা দিচ্ছিল ক্রান্তি প্রহরের প্রথম পুরুষকে।

ওঁর শিশির ঝরা শ্বেত কাশ বনে পান্না ঝরে। হেমন্তের ধানে সুবর্ণ বর্ণে ঝংকার তোলে দূরাগত সেতারের মূর্চ্ছনা। ও অস্ফুট স্বরে বলে—

: কথা বলছো না কেন শিপ্রা।

: মন নীরব থাকতে চাইছে। তাই।

: না, না কথা বলো, কথা বলো। কথার ফুলঝুরিতে আমার রিক্ত মন ভরপুর করে দাও। অতীতের স্থির নিসঙ্গতা আমায় ব্যথিত বিষন্ন করে তুলছে। তুমি তাতে হীরা পান্নার উজ্জল স্নিগ্ধ মধুর প্রলেপ জুড়িয়ে দাও।

ওর আর্তস্বরে উষ্ণ রিক্ততা ফুটে ওঠে। ওকে আমার আরো গভীর করে ভালো লাগে। আরো নিবিড় হয়ে ওর পাশে বসি।

: চলো শিপ্রা, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। দেখো ঝলসানো রুটি চাঁদটা আজ কি এক আশ্চর্য্য মোহময়ী স্নিগ্ধতায় ভরে রয়েছে। আবাহন জানাচ্ছে আমাকে, তোমাকে। আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিওনা। ডেভিডের কণ্ঠে বার বার মূর্চ্ছনা দিচ্ছে আমেজ বিহ্বল-সত্তা।

: আজ কেন এত উত্তেজিত ডেভিড। শান্ত হও।

: না, না, চলো যাই আজ। করুন মিনতিতে আমার হাত ধরে ও। চাঁদটা তো রোজই আমায় ঝলসানো রুটি দেখিয়েছে। আমি কুকুরের ন্যায় তাঁর পিছু পিছু ছুটেছি। আজ তার এই পরিবর্তনে সাড়া দাও।

পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা সবার অলক্ষ্যে বারান্দায় দাঁড়ালাম। ও আমার ঘাড়ে ভর দিয়ে বুভুক্ষের মতো চাঁদের পানে চেয়ে রইলো। ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বল্লো আমার ঘাড়ে মুখ রেখে। আমার গাল আরক্ত হয়ে উঠলো।

অনূঢ়া রাত্রির দীর্ঘ ছায়া বিষন্নতা ধীরে ধীরে নামছে। ডেভিড আমার হাত টেনে নিয়ে বল্লে: আমার নির্জন ঘরে আমি কাউকে ডাকিনি। তোমায় ডাকছি। যাবে?

আমি বল্লাম: আমার ঘরেও কারো পদচিহ্ন নেই। তোমার নীল-পদ্ম এঁকে দাও আমার মনের মেঝেতে। আমি তোমায় সমর্পিত।

শিপ্রা নিশ্চুপ হলো। উঠে সরে বারান্দায় দাঁড়ালো। আর আকাশের কোণে হারিয়ে যাওয়া ক্ষীণ চাঁদের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো।

আমার চোখে তখন গাঢ় নিদ্রার ঢেউ নামছে। বার বার সে অন্তহীন ঢেউয়ে সাঁতরিয়ে কূলে ওঠার চেষ্টা করছি।

ও আবার এসে বসলো টুলটায়। শ্লথ হাতে মুখ হতে থার্মোমিটার তুলে নিলো। পারদের উজ্জল রেখার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বললো: বাট্ হি ইজ ডেড্।

আমি চমকে উঠলাম।

সর্বহারা উদাসিনী একটি ফ্যাকাসে হাসি হাসলে। ঝরে পড়ার পূর্বমুহূর্তে যেমনি করে হাসে শেফালী।

ঃ ইয়েস্ ছ্যাটস্ দা ট্রুথ্। টাইফয়েড রিলেপস্ করলো। এই বেড্ই তাঁর শেষ শয্যা ছিলো

কল্পনা করলাম নিমিলীত চোখে অনন্তের জন্যে শুয়ে রয়েছে উজ্জল যুবক ডেভিড। আর তারই বুকে আছ্ড়ে পড়ে কাঁদছে শিপ্রা চৌধুরী। বলছে কথা কও, কথা কও প্রিয়।

শিপ্রা ম্রিয়মান হাসি হাসলো। বল্লো ঃ আরো শুনতে চান। তিল তিল করে যে বালির প্রাসাদ গড়েছি তা বহুবার হয়েছে ভংগুর।

ঃ আমার শ্রদ্ধা এখনো অটুট রয়েছে। আমি মৃদু হাসি হাসলাম।

ঃ ওটা ভাংবেই।

ঃ দেখা যাক্।

ঃ মা আছেন আপনার?

ঃ নিশ্চয়ই।

ঃ এখানে, মানে ঢাকায়?

ঃ না মফঃস্বলে।

ঃ ওর ছবি আছে আপনার কাছে।

ঃ থাকা স্বাভাবিক।

ঃ রোজ ভোরে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিন?

ঃ লোক দেখানো লৌকিকতায় কি প্রয়োজন। অবশ্য আমার মনের সুচির অর্ঘ আমার জননীর পায়ে রোজ ভোরে শিশির পাতের মতোই অর্পিত হয়। তিনিও ওই সুদূর হতে আমায় সর্বদিনের পাথেয় অর্পণ করেন।

ঃ কিন্তু আমিওতো ডেভিডের ছবি সাজিয়ে দিই ফুল দিয়ে রোজ ভোরে! ওঁর বাবার কাছ হতে চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কই, পাথেয় তো আমি তাঁর কাছ হতে পাই না।

এবারের আর্তনাদ আমার শরীর শির শির্ করে কাঁপিয়ে দিলো। আলোচনা সরিয়ে নেয়ার জন্যেই বল্লাম ঃ বলুন বাকী কাহিনী।

ঃ এবারের কাহিনীতে আপনার শ্রদ্ধার দৃষ্টি ভেংগে যাবে যে। আবার শানিত হাসি হাসলো সে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আমার হাতের ওষুধ তিক্ত হয়ে উঠবে।

ঃ তবে আরো মন দিয়ে শুনবো।

ঃ কি এক অদৃশ্য ইংগীতে বেড্টি যেন আমার জীবন ধ্রুবতারার দিশারী। এখানেই আমি পেয়েছি নীল-জীবনের ফেনায়িত স্বাদ অথবা বিস্মৃত যুবকের লেলিহান দৃষ্টি। আপনার বয়েসী আরেকটি যুবক আশ্রয় নিলো এখানে আল্সারের রোগে ভুগে। হুমায়ুন শেখ্। জাতে পাঠান। বর্তমানে পুরুষানুক্রমে বাংগালী। তিন পুরুষ আগে তারা বাংলা দেশে এসেছিলেন।

প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তিতে আমরা আকর্ষিত হয়েছি পরস্পরের পানে, আশা করি সে-কথা খুলে বলতে হবেনা। ওকে সেবা করার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের নিবিড় অনুরাগের ছায়া পক্ষ বিস্তার করেছিলো, তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। সুচির কুমারীর মনে সে পুরুষের অর্ঘ মহিমান্বিত মণিমুক্তার ন্যায় উজ্জল হয়ে উঠেছিলো। ও যখন হাসপাতাল হতে ডিসচার্জ হলো তখন আমরা এক এবং অনন্য। ওর মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। আমার সব হৃদয়ের আবেগ ওর সত্তায় বিলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা চমকে চমকে ওঠে। যাওয়ার বেলা একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে বল্লে ঃ শিপ্রা, আমায় ভুলোনা! আর হাতে গুঁজে দিলো একটি সবুজ কাগজের টুকরো। তাতে লেখা ঃ আজ সন্ধ্যায় বেবীতে এসো।

হাসপাতাল আর বাসা। বাসা আর হাসপাতাল। এর মাঝে যে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে তাকে যেন এই কয়েকটা বসন্ত চোখ বুজে উপেক্ষা করেই এসেছি। সেদিন বিকেলে বেরিয়ে জগতটাকে নতুন বলে মনে হলো। কেমন যেন অচেনা অচেনা ভাব। এখানে রমনার এই নির্জন রাস্তায়, পার্কের চারপাশে, কার্জন হলের মোড়ে, সব জায়গায় আমি যেন অতিথি। এতে আমায় দৃঢ়ভাবে আকড়ে রাখার কোন খড়কুটো নেই। অনাহুতের মতো এই রূপের হাটে আমি হাঁটু গেড়ে বসেছি।

মনে হলো একদিন এই প্রকৃতিই ছিলো আমার আপন। কোন বিস্মৃতময় সন্ধ্যায়, এই প্রকৃতির মাঝে বসেই আমি কল্পনার সপ্ত রং তুলি দিয়ে আঁকতাম মনের পটে সেই সুবর্ণ রাজপুত্তুরকে। যে আজ বাস্তবের রূপোলী ঘোড়ায় চড়ে হানা দিয়েছে। আজ আমি প্রকৃতির কাছে অপরিচিতা হলেও, তাঁর কাছে নই। সে—দি বোল্ড প্যাসনেট হিরো।

বেবীতে ও অপেক্ষা করছিলো। দুর্নিবার হৃদয়ের আবেগে আসতে হয়তো একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো। চেয়ে দেখি হুমায়ুন শেখ্ অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে গল্প করছে বন্ধুর সাথে। আমায় দেখেও দেখলো না। আমারও অভিমান হলো।

মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে আসবো আসবো করছি। এমনি সময় সে উঠে এলো। ঃ রাগ করোনা শিপ্রা। তোমায় আমি দেখতে পাইনি।

আমায় নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে বন্ধুর সাথে ঃ মনজুর আহ্মেদ। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর ইনি হচ্ছেন—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই চোখের এক ঝলক ইংগীতে

বাকিটা বুঝিয়ে দিলে। সে ভংগীতে আমার গা কেমন যেন রি রি করে উঠলো। মনজুর বল্লে : বসুন।

আইসক্রীম এলো! ওরা খাচ্ছে চামচ দিয়ে কেটে কেটে। আর কথা বলছে। ব্যবসা সংক্রান্ত। আর আমার ছোট বুক ওঠানামা করছে প্রথম অভিসারের ব্যাকুল অভিব্যক্তিতে। কওয়া, না-কওয়া, বলা, না-বলার বিচিত্র কল্লোলে।

ওদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যবসার আলোচনাতেই গভীর মগ্ন। ধীরে ধীরে এক গাঢ় অভিমানের ছায়া আমায় ছেয়ে ফেললো—

: শিপ্রা চৌধুরী থামলে। প্রশ্ন করলে—

: আর বলতে হবে?

: না।

: অভিজাত শ্রদ্ধা ভেংগেছে?

: না।

: ফিরে এলাম পর দিন ভোরে। এসে দেখি অজস্র রোগীর মাঝে লক্ লক্ করছে, চোখে চক্ চক্ করছে একই ক্রুর ইচ্ছা, জৈবিক প্রত্যাশা। একটি রাতের মাঝে যেন তাঁদের দৃষ্টি পরিপূর্ণ বদলে গেছে। আমি যেন মানুষ নই, মানবী নই। আমার মনের দাম নেই। দাম রয়েছে আমার আশ্রিত দেহের। ওই জরাজীর্ণ পলিত কেশ বৃদ্ধ, ওই নবীন বালক, ওই যুবক প্রত্যেকের চোখে একই দৃষ্টি—জৈবিক লালসার। সব রোগীর নয়ন একই ইচ্ছার প্রতিফলিত রূপে উদ্ভাসিত। তারা আমাকে চা'য়না। আমার মন আশ্রিত দেহকে চায়।

জানলাম এতদিন যে দৃষ্টিকে আমি জননীর মত শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি বলে ভেবে এসেছি, তা ভুল। ওতে শ্রদ্ধার কণা মাত্র ভেজাল নেই। সে দৃষ্টি শ্রদ্ধার নয়—কামনার, লালসার। ও থামলে। আমি একদৃষ্টে ওর মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

: আপনার ধারণা বদলেছে কি।

বিজয়ী সম্রাজ্ঞীর ন্যায় শিপ্রা প্রশ্ন করলো।

: মোটেই না। কাঁচা সিমেন্টের ওপর পানি সিক্ত হলে কি হয় জানেন? আরো দৃঢ় হয়।

ওঁ চমকালো। এবার আর হাসলো না। উঠে ত্রস্ত সরে গিয়ে ওঁর চেয়ারে বসলো। টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। অঝোরে কাঁদতে থাকলো। থেকে থেকে সে কান্না নিস্তব্ধ ওয়ার্ডকে প্লাবিত করতে থাকলো।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে আমি শুয়ে শুয়ে শুনলাম সে পাষাণ তনয়ার কান্না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়াল নেই।

রোদ ঝলমল ভোরে হাসপাতালের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ালাম। দীর্ঘ পঁচিশ দিনের বন্দী জীবনের পর আজ আমি মুক্ত। আজ সারাদিন আমি হেসে খেলে পথে ঘাটে, ঘুরে কাটিয়ে দিলেও কেউ বকবে না। কারো নিষেধের বেড়াজাল আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

ঝাউ ছাওয়া পীচের পথে তাকিয়ে অবাক হলাম। সেই সম্রাজ্ঞী ন্যায় বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিতে গঠ্ গঠ্ করে এগিয়ে আসছেন শিপ্রা চৌধুরী। বন্ধু ডাক্তার বল্লেন : ওঁর তো রোজই রাত্রে ডিউটি। সকালে কেন এলো?

আমি স্তিমিত হাসলাম। কি জানি কি প্রয়োজন খেয়ালী শিপ্রা চৌধুরীর।

এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। মুচকি হেসে বল্লে গুড্ মর্ণিং। যাক, ঠিক সময়েই এসেছি। রাতে ভালো ঘুম হয়েছিলো?

: আপনার সাথে কথা আছে।

: বলুন। ও একটু ইতস্ততঃ বোধ করলো।

: এখানে নয় ওখানে।

: বেশ চলুন। ডাক্তারের পানে চেয়ে আমি হাসলাম। সে একটি অর্থবোধক বিশ্রী ইঙ্গিত করলো অলক্ষ্যে। হঠাৎ চেয়ে দেখি শিপ্রা চৌধুরীর চোখ জ্বল্ জ্বল করছে। ইঙ্গিত ও দেখে ফেলেছে।

একটু এসে ও থমকে দাঁড়ালো। পিছে ফিরে আমায় প্রশ্ন করলো : আমার একটি স্মৃতিচিত্র আপনি নেবেন?

: নিশ্চয়ই নেবো, আমি বিস্মিত হলাম ওর প্রশ্নে। ওর তো কোন উপহারই দেবার কথা নয়, বরং আমার। মনে মনে লজ্জিত হলাম। আমার উচিত ছিলো আপনাকে একটি—

: তবে এই নিন।

নিমিষে গাউনের ফাঁক হতে বের করে আনলো মাঝারি সাইজ ছবি—শিপ্রা চৌধুরীর। আয়নার সামনে বসে মুখে মোহময়ী হাসি নিয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত। খুশী হয়ে বল্লাম।

: চমৎকার হয়েছে ছবিটি। অপূর্ব।

মনে মনে ও খুশী হলো। প্রশংসাটি গ্রহণ করতে করতে সলাজ্জ হাসি হেসে বল্লেন : যা বাজে কথা!

: বেশ তাই হলো। আমি হেসে বল্লাম। আচ্ছা যাই তাহলে।

: আচ্ছা আসুন। ভুলবেন না যেন আমাদের। আর কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

: তা' কি হয়। আমি পা বাড়ালাম।

: হ্যাঁ, শুনুন। ও আবার ডাকলো। আমি ফিরে তাকালাম, আমার আরো কাছে ঘেঁসে এলো। গাঢ় নীল অঞ্জনা এক দৃষ্টে চেয়ে বল্লেন :

: একটি অনুরোধ ছিলো।

: বলুন।

ও মুখ নামলো, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল সিমেণ্ট খুড়তে থাকলো। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে খুলি খুলি হয়েও খুলছে না। কি যেন বলবে বলবে ভাবছে। বলছে না। দূরে ঝাউ বনের পানে তাকালো। কিছু পরেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো। তাকালো বা হাতের অনামিকার পানে। নীলাঙ্গুরীর আঙ্গুলের মাঝেই নাড়াচাড়া করলো। হঠাৎ বের করে আনলো। কি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো। আবার ঢোকালো। আস্তে আস্তে ভেজা গলায় বল্লো—

: ছবিটি কোথায় রাখবেন?

আমি চমকালাম। আরো বিব্রত বোধ করলাম। এ-অর্বাচীন প্রশ্নের কি উত্তর দেবো। কোন কথা এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছিনে। বাইরে বিদ্যুতের তারে তারে আহত সকালের আকাশের পানে মিয়মান চোখে চেয়ে রইলাম।

সে শানিত হাসি হাসলো, নিমিষে বর্শাফলকের ন্যায় আমায় তা বিদ্ধ করলো। সব দ্বিধা সব সংকোচ এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে বল্লো:

: দয়া করে ওটা আপনার মায়ের ছবির পাশে সাজিয়ে রাখবেন না।

শিমুল তলায় অন্ধকার

মনজুরে মাওলা

থুরথুরে সেই বৃদ্ধা এক
বসত দাওয়ায়, বলত আর—
"আমারি মতোন বৃদ্ধা চাঁদ
এখনো কি আছে চমৎকার?
শিমুল তলায় দৃষ্টিহীন
অন্ধকার, অন্ধকার!

তার
মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন;
(গোলাপ ফুলের সেই রঙীন
মেয়ের কথাই বলছি ভাই;)
তবুও তো তার গন্ধ পাই
হাসনুহেনার শ্বেত মুখে,
অপরাজিতার নীল বুকে
আসবেই না সে কখনো আর!
আমারি মতোন দৃষ্টিহীন
শিমুল তলার অন্ধকার;
তাহারি মতোন রূপসী চাঁদ
এখনো কি আছে চমৎকার?"

পুরাতন সেই রমনী আরো
ছড়া কেটে যায়, শুনতে পাই;
হাসির মতোন কন্যা এক,
এখনো কি তার তুলনা নাই?

একদিন সেই অনেক চেনা
রূপোলী মেয়ের সন্ধানেই
চলে গেল বুড়ি সকল দেনা
শোধ করে দিয়ে অজান্তেই!

সেই উঠোনেতে বসে না কেউ
বলে না তো আর—এই অপার
পৃথিবীর কোণে এক শিমূল,
তাহার কোণেই বারম্বার
প্রেতের মতোন জমছে দেখি
দৃষ্টিবিহীন অন্ধকার।

বলছে সবাই, শুনতে পাই,
বুড়ি চাঁদটা যে চমৎকার!
চমৎকার!!

নজিবর-সাহিত্যে সমাজ

অধ্যাপক হারুনূর রশীদ

বাংলা সাহিত্যের আদিকাল হইতেই সমাজ চিত্র-অংকিত হইয়াছে। চর্যাপদে আমরা তৎকালীন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ম-পদ্ধতির পরিচয় পাই। যদিও তাহা মূলতঃ ধর্ম্মীয় রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপের জন্য রচিত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের নাথ সাহিত্যে, মঙ্গল কাব্যে, এমনকি বৈষ্ণব কাব্য এবং অনুবাদ সাহিত্যেও সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। একথা সত্য যে সাহিত্যে সমাজ বলিতে যাহা বুঝায় বাংলা সাহিত্যে তাহা রবীন্দ্রিক যুগের পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সমাজ আছে, তাহার নীতি আছে, নিয়ম আছে, ভাল-মন্দ আছে, মহত্ত্ব আছে, নিষ্ঠুরতা আছে, তাহার প্রাচুর্য আছে, অপ্রমেয়তা আছে। সমাজের একটা বিশেষ শক্তি আছে—সে শক্তি জীবনের ভিতরে ও বাহিরে থাকিয়া ব্যক্তিকে সফলতা বা বিফলতার দিকে লইয়া যায়; এ-শক্তি কখনও তাহাকে সুখী সমৃদ্ধ করিয়া তোলে,আবার কখনো তাহাকে ব্যথা জর্জরিত করিয়া সারাটা জীবন দুঃখ-বিষাদে, বিয়োগ-বিচ্ছেদে ভরিয়া দেয়। আধুনিক সাহিত্যে সমাজ কেবল মাত্র গোটা চিত্রের সমষ্টি নয়। এ-সমাজ ব্যক্তি জীবনে, ভিতরে এবং বাহিরে এক বিশেষ রূপে বিরাজ করে। এ-সমাজের চিত্র এবং প্রতিফলন আমরা পাইয়াছি রবীন্দ্রোত্তর যুগে।

উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে যুগ সৃষ্টি করিয়াছেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র সমাজের চিত্র এবং জীবনের বাস্তব দিকটিকেই সাহিত্যে উপস্থিত করিয়াছেন। নজিবর রহমান শরৎচন্দ্রের যুগেরই সাহিত্যিক। শরৎ-চন্দ্র যখন সমাজের বিভিন্ন দিক এবং জীবনের বাস্তব সমস্যা লইয়া সাহিত্য সাধনায় সবে মাত্র প্রবেশ করিতেছেন তখনই নজিবর রহমানও ঐ একই ভাবধারা লইয়া, অধিকতর বাস্তব এবং নিখুঁত সমাজ চিত্র লইয়া সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন। নজিবর রহমানের উপর সামাজিকতা এবং বাস্তবতার দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের প্রভাব পড়ে নাই, উহা ঐ জামানারই প্রভাব। আদর্শের দিক দিয়া এবং কল্পনার দিক দিয়া তাঁহার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। নজিবর রহমান ও শরৎচন্দ্রের যুগই ছিল বাস্তব সচেতনতার যুগ। সে-যুগে বাস্তবের প্রতি উদাসীন থাকিবার মত অবকাশ কাহারো ছিলনা। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত তখন ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলকেই আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। যে আলো-ড়ন আসিয়া মানুষ মাত্রকে সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে ভাবিতে এবং জীবন সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহারই ফলে নজিবর রহমান, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য চিন্তা নায়ক সমাজের প্রতি ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন হিন্দু সমাজ, নজিবর রহমান লইয়াছেন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজ। তবে মুসল-মানদের প্রতি দৃষ্টি অধিক। কিন্তু হিন্দু-লেখকগণ, বিশেষ করিয়া হেম-নবীন-বঙ্কিম প্রভৃতির ন্যায় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সহকারে তিনি কোন সমাজের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনোদ্দেশেই তিনি বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। মুসলমান সমাজের প্রতি দৃষ্টি দানের আরো একটি কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে যেমন তৎপরবর্ত্তী হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রভাবান্বিত হইয়া হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তেমনি ইসমাইল হোসেন শিরাজির প্রভাবে তৎকালীন মুসলীম সাহিত্যিকবৃন্দ মুসলীম সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন। তাছাড়া বাংলার সমাজ বলিতে ইহাদেরই বুঝায়। বাংলা দেশের জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশই ইহারা, বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইহাদের অবদান। অথচ ইংরাজের অনুগ্রহ পুষ্ট সংকীর্ণমনা হিন্দু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বাংলার ইতিহাসের এই চূড়ান্ত এবং জলন্ত সত্যকে অস্বীকার করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজকে কোনরূপ আমল না দিয়াই বাংগালী সমাজের নামে সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজের এবং একটি বিশেষ কৃত্রিম শ্রেণীও তাহাদের সংস্কৃতিকে সাহিত্যে প্রচার করিলেন। নজিবর রহমান বাংলার সমাজ বলিতে যাহাদের বুঝায় সেই মুসলমান সমাজের আশা-আকাংখা, দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপ তাহাদের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে সাহিত্যে রূপদান করিবার ব্রত লইয়াই সাহিত্য-সাধনায় প্রবিষ্ট হন। মুসলীম জীবন লইয়া উপন্যাস সৃষ্টি হয়না, এই ভ্রান্ত ধারনা অপনোদনের জন্য মুসলমান সমাজের কাহিনী ও আদর্শ লইয়া উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

মুসলমান সমাজ দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ। এ-সমাজে জমিদার বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নাই। নজিবর রহমান তাই অখ্যাত দরিদ্র পরিবারের নর-নারীর কাহিনী লইয়া সাহিত্য সাধনায় হাত দিলেন।

এই দরিদ্র পল্লীর মুসলীম যুবক-যুবতী যে রোমান্সের শিহরণে শিহরিত হয়, তাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাহা করে নজিবর রহমান সাহেব তাহারই নিখুঁত চিত্র দিয়াছেন। এই দিক দিয়া নজিবর রহমান সাহেবই প্রথম—যিনি কোনরূপ পলিশ না করিয়া বা কল্পনার রং দিয়া মার্জিত না করিয়া মুসলমান সমাজ তথা বাংলার সমাজকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নজিবর রহমান সাহেবের উপন্যাসের মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, তাহার মধ্যে বাংলার বিশাল জনসংখ্যা কথা কহিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলার মানুষ এমন করিয়া কথা কহিতে পারে নাই। নজিবর রহমানের এক একটি চরিত্রের পিছনে যেন বাংলার সমস্ত মানুষ দাঁড়াইয়াছে, তাহারা যেন ঐ একটি চরিত্রের মধ্যে নিজেদেরকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে তাহাদের আশা-আকাংখা ভাবনা-কল্পনার বানী যেন ঐ একটি নুরুল ইসলাম বা গদা, আনোয়ারা বা গোলাব জান বহিয়া আনিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, হেমচন্দ্র, জগৎসিংহ, ওসমান, মোবারক, আয়শা, জেবউন্নিসা, দলনী, শৈবালিনী প্রভৃতি আমাদের কেহই নহে—বাংলার আপন মানুষের কেহ নহে; কিন্তু আনোয়ারানুরী, হামিদা, মরিয়াম, নূরুল ইসলাম, মতি, আমজাদ, খাদেম, গবা, রতিশ প্রভৃতি আমাদেরই প্রতিনিধি। আমাদের দোষ-গুণের সাথী ইহারা! বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড়, রমাকৈবর্ত্ত, হাসেমশেখ প্রভৃতিকে লইয়া ব্যঙ্গ-কৌতুক করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি বা দরদ প্রকাশ করেন নাই। নজিবর রহমান সাহেব সমাজের সাধারণ মানুষের কথা ভাবিয়াছেন, তাহাদের ভাবনা-কল্পনার রূপ দিয়াছেন, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনার চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংস্কার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি অতি দরদী মন লইয়া এই মূক ম্লান মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সহানুভূতির সহিত তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধরাইতে চাহিয়াছেন।

নজিবর-সাহিত্যের সমাজ ভালমন্দ মিশ্রিত সমাজ। এ-সমাজে যেন ভুঁইয়া সাহেব, রতিশ, খাদেম, দুর্গা, গবা, গোলাপজান প্রভৃতি আছে, তেমনি আছে আমজাদ, হামিদা, তালুকদার সাহেব, ইন্সেপেক্টার সাহেব প্রভৃতি। এ-সমাজে কুটিল স্বার্থসর্বস্ব লম্পট চরিত্রের সহিত আছে মহৎ ও উদার মানুষ। এ-সমাজ স্বার্থের সন্ধান, পরশ্রীকাতরতায় কলুষিত, আবার পরোপকারের মহত্ত্বে অন্তরের উদারতায় মহিমান্বিত।

শরৎচন্দ্র ও নজিবর রহমান উভয়েই সমাজমুখীন সাহিত্যিক। তবে উভয়ের দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য আসিয়াছে দুই সমাজ-আদর্শের পার্থক্যের জন্য। শরৎচন্দ্রের সমাজ হিন্দু আদর্শের সমাজ। এই সমাজের নীতি-নিয়মের মধ্যে তিনি মানবতার অপমৃত্যু দেখিয়া, সমস্যা সংকুল মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান দানে এ-সমাজের অপ্রমেয়তা দেখিয়া তিনি চাহিয়াছেন ঐ সমস্ত নিয়ম ও নীতির মূলনীতির সংস্কার করিতে। নজিবর রহমানের সমাজ মুসলীম আদর্শের সমাজ। এই সমাজ আদর্শের নীতি-নিয়ম বিচ্যুত হওয়ায় মানবতার অধঃপতন দেখিয়া তিনি তাহাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন। এই দিক দিয়া বঙ্কিমের সহিত যেমন স্বাধর্ম আছে, তেমনি ব্যবধানও আছে। বঙ্কিম প্রাচীন আদর্শের প্রতি অন্ধ ভক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার কুসংস্কারের পর্য্যন্ত সুব্যাখ্যা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই; কিন্তু নজিবর রহমান ইসলামিক আদর্শের নামে অন্ধতা বা গোড়ামী, যাহা তৎ-কালে মুসলীম সমাজে প্রচলিত ছিল, সমর্থন করেন নাই।

নজিবর রহমান সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক হইলেও তিনি কেবল সমাজের বহিরংগের চিত্র আঁকিয়াছেন, সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। সমাজ শুধু জীবনকে বাহির হইতেই পরিচালিত করেনা, ইহা তাহার বাহির এবং ভিতরকে পরিচালিত করে। সমাজের দোষ-ত্রুটি অপরাধ অধর্মের প্রবণতা মানুষের কেবল বহির্জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করেনা তাহার অন্তরকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তিনি সমাজের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। নজিবর রহমানের দৃষ্টি সমাজের গভীর স্তরে পৌঁছে নাই; কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল সমাজের নীতি নিয়মের গভীরে—মর্মতলে। শরৎ সাহিত্যে দেখা যায় সমাজ। সমাজের নীতি নিয়ম তাহার সংস্কার ব্যক্তি জীবনে বিশেষ এক মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে ভিতরে এবং বাহিরে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাঁহার সাহিত্যে সমাজের নিষ্ঠুরতা কপটতা অপ্রভুলতা যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজের এই অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয়। বরং সমাজের এই দিকটাই তাঁহার প্রতিভাকে বেশী করিয়া আকৃষ্ট করিয়াছে। নজিবর সাহিত্যে সমাজ শুধু ব্যক্তি জীবনের বাহিরকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সমাজ-নিয়মের অধীন মনের কোন পরিচয় নজিবর সাহিত্যে নাই। সমাজের দুষ্ট বা শিষ্ট শক্তির হাতে ব্যক্তি জীবনের যে ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইয়াছে, সেই ঘাত প্রতিঘাতের ফলে কোন মানসিক আলোড়নের স্পষ্ট প্রকাশ নজিবর সাহিত্যে নাই। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অপকর্ম প্রভৃতি ব্যক্তি জীবনের অন্তরে কোন আলোড়ন বা মানসিক বিপর্যয় বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার কারণও ছিল। মুসলমান সমাজের প্রথম দরদী তুলিকার ছিলেন তিনি। এ-সমাজের বাহিরকে যে

সমস্ত অনাচার, অপকর্মে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত সমাজকে গ্রাস করিতে বসিয়াছিল, তাহাকে উপেক্ষা করিবার মত সময় এবং অবকাশ তাহার ছিলনা। সম্ভবতঃ তাঁহার শিক্ষা এবং প্রতিভাও অত সূক্ষ্ম ছিলনা।

এ-সব সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে তিনি মুসলীম তথা বাংলার মানুষের সমাজের যথার্থ তুলিকার এবং এদিক দিয়া তিনিই প্রথম। হয়ত বা আজো তিনি শ্রেষ্ঠ অকৃত্রিম সমাজ দরদী সাহিত্যিক।

ময়দান

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

এখানে দেখেছি বুভুক্ষু জনতার কঠিন শপথ
শুনেছি বজ্রকণ্ঠের দৃপ্ত আওয়াজ : প্রতিরোধ
চাই অন্যায়ের।
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় কত শিত বালবৃদ্ধ এসেছে দলে দলে
সুদূর শহরতলী—গ্রাম বন্দর বাজার থেকে—
লাখো কণ্ঠের মিলিত আওয়াজ
মুহুর্মুহু করতালি কাঁপায়েছে ধরিত্রীর বুক,
উড়ায়েছে ধূলিজাল—
জন-সমুদ্রের কল্লোল শুনেছে নীলাকাশ
গোধূলির আলো-অন্ধকারে সে প্রতিধ্বনি এসেছে
ফিরে বারংবার।
এখানে দেখেছি মঞ্চে কত মিথ্যার লড়াই ঃ
আর মিথ্যার আশ্বাস
জীর্ণ-শীর্ণ ক্লান্ত দেহে শুনে গেছে
দীর্ঘ দুঃখরাত্রির অবসানের প্রতীক্ষায়—
কণ্ঠ বিদীর্ণ করি তারা দিয়েছে যে হাঁক
পবনে পবনে উঠেছে সে করুণ আর্তনাদ—
তার দীর্ঘশ্বাস
ছুঁয়েছে আকাশ
জনতার অধিকার লিপি নিয়ে
ওরা ভুলে গেছে ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে।

তারপর গেছে দীর্ঘ রাত্রি-দিন—
গেছে কত নিদাঘ প্রাবৃষ, শিশির বসন্ত
প্রান্তরের ধূলি-তৃণ বিশুষ্ক বিগত যৌবনের মত
তা-ও একদিন শ্রাবণ বরিষণে
সঘন পল্লব পুঞ্জে হয়ে ওঠে ঘন শ্যাম—
বঞ্চিতের দুঃখরাত্রির তবু হয়নাকো অবসান—
ইতিহাস লিখে রাখিবে না এ-প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুর কাহিনী
তার সোনার পাতায়—
শুধু শ্যাম তৃণদলের পল্লবের গোপনে
সঞ্চিত সব রক্ত—সব কান্না— সব দীর্ঘশ্বাস
মহাকাশ মনে রাখবে।

বালি ও ফেনা

[খলীল জীবরানের মূল "রুম্মাল্ ওয়া জাবেদ"-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ]

আবদুস্ সাত্তার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফেরেশতারা ভালো করেই জানেন—
অনেক বাস্তব-পন্থী লোক
কল্পনা-বিলাসীর কষ্ট-অর্জিত রুটি ভক্ষণ করে।

বুদ্ধি কখনো কখনো মুখোশ পরে থাকে।
সেই মুখোশ যদি ছিন্ন করতে পার
হয়তো আশ্চর্য উত্তেজনা দেখতে পাবে
অথবা সুচতুর বাজীকর বলে প্রতিপন্ন হবে।

বুদ্ধিমানেরা আমাকে বুদ্ধিমান সাব্যস্ত করে,
স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমাকে মনে করে মূঢ় ;
আমার মতে তা'রা দু'জনেই ঠিক।

সে আমার অন্তরের গুপ্ত রহস্যের অনুমান করতে পারে ;
জানতে পারলাম তার অন্তরে গুপ্ত রহস্য বর্তমান।

নিশ্চয় সেখানে 'নিরফানা'[১] প্রস্তুত আছে।
সে তোমার ভেড়ার পাল চারণ ভূমিতে নিয়ে যাবে,
তোমার সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর জন্য দোলনায় রাখবে
আর তোমার কবিতার শেষ লাইন লিখতে সাহায্য করবে।

অভিজ্ঞতার অনেক আগেই আমরা আমাদের
আনন্দ ও দুঃখকে পছন্দ করে থাকি।

বিষন্নতা দুই বাগানের মাঝখানে একটি প্রাচীর।

আনন্দ অথবা দুঃখ বৃহত্তর হলে
পৃথিবীটা আয়তনে বড় ছোট হয়।

আকাঙ্খা জীবনের অর্ধেক,
উদাসীনতা মৃত্যুর অর্ধেক।

আজকের সবচেয়ে দুঃখপূর্ণ ঘটনা
গতকালের সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতির সমান।

তা'রা আমাকে বললো :
'ইহকালের আনন্দ ও পরকালের শান্তির মধ্যে তোমার বিশ্বাস থাকা উচিত।'
আমি তা'দেরকে বললাম :
'আমি ইহকাল ও পরকাল উভয়ের আনন্দের প্রতি সমান বিশ্বাসী। কারণ আমি জানি আমার হৃদয়ে মহাকবি একটি মাত্র কবিতা লিখেছেন যা পরিমাপে পূর্ণ এবং আশ্চর্য ছন্দময়।

বিশ্বাস অন্তর-মরুভূমিতে মরুদ্যান সদৃশ।
চিন্তার কাফেলা সেখানে পৌঁছতে পারে না।

মনে করো এখন তুমি
উন্নতির সর্ব-উচ্চতায় পৌঁছে গেছো।
এখন কেবল আকাঙ্খার জন্যে আকাঙ্খা
ক্ষুধার জন্যে ক্ষুধা
এবং পিপাসার জন্যে পিপাসা অনুভব করতে পার।

তুমি তোমার গোপনতা হাওয়ার কাছে ফাঁস করে দিয়েছো। তুমি বোকা।
হাওয়া সেই কথা বৃক্ষকে বলে দিয়েছে বলে তুমি হাওয়াকে গাল-মন্দ করতে যাও কেন ?

বসন্তের ফুল শীতের স্বপ্ন,
এবং তা' দেবতাদের প্রাতঃভোজনের নিকটবর্তী।

কচ্ছপ খরগোসের চেয়ে রাস্তার খবর ভাল জানে।

বেশী বাচাল লোক কম বুদ্ধিমান ;
বক্তা এবং নীলাম বিক্রেতার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

বহুত প্রশংসা যেহেতু আমাকে আমার বাবার জীবনের প্রতিষ্ঠায় কিম্বা চাচার অর্থের সাহায্যে বাঁচতে হয়না।
আরও প্রশংসা যেহেতু অন্য কাউকে আমার দয়ায় বাঁচতে হয় না।

বাজীকর যখনই তার বল ধরতে অসমর্থ হয় কেবল তখনই অন্যের অনুগ্রহ ভিক্ষে করে।

ঈর্ষান্বিত লোক কিছু না জেনেই আমার প্রশংসা করে।

বহু দিন পূর্বে
তুমি তোমার মায়ের ঘুমে স্বপ্ন ছিলে ;
তার পর তাঁর জাগরণে তোমার জন্ম।

জাতির বীজ মায়ের আকাঙ্খায় নিহিত।

আমার বাবা ও মা সন্তানের আশা করেছিলেন, অবশেষে আমাকে পেলেন।

আমি একজন পিতা ও একজন মাতার আশা করেছিলাম,
আমি পেলাম রাত্রি ও সাগর।

১। পরোপকারে যারা আত্মোৎসর্গ করে থাকেন।

আমাদের কোন কোন সন্তান পূণ্য-সদৃশ ;
আবার কোন কোন সন্তান পাপের নামান্তর।

এখন রাত্রি,
তুমিও অন্ধকার হয়ে যাও সেই রাত্রির মতন।
অথবা বিছানায় শুয়ে রাত,
অথবা ইচ্ছা-সহ আঁধারে পরিণত হও।
যখন ভোর হয়
তখন তুমি সেই অন্ধকার থেকে দাঁড়িয়ে
দুর্বার আকাঙ্খা নিয়ে বলো ; 'আমি এখন অন্ধকার।'
দিন ও রাত্রির মধ্যে
এমন মহড়া নিছক বোকামী ছাড়া কিছু নয়।
তা'রা উভয়ে তোমাকে ঠাট্টা করবে।

কুয়াশায় আবৃত পর্বতকে ছোট পাহাড়
মনে করতে পার না।
অথবা বৃষ্টিতে ভেজা এক বৃক্ষকে
তার ক্রন্দন বলে মেনে নিতে পার না।

এখানে কূটনীতি বর্তমান ;
তার গভীরতা ও উচ্চতা পরস্পর নিকটবর্তী,
তাই বলে তার মধ্যভাগ কিন্তু তা' নয়।

আমি একটা স্বচ্ছ আয়না ;
তুমি আমার সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াও
তোমার প্রতিমূর্তি দেখতে পাবে।
এখন তুমি বলো : আমি তোমায় ভালবাসি।'
কিন্তু আমি কি বলি শুনবে ?
তুমি আমার মধ্যে কেবল তোমাকেই ভালবাস।

তোমার প্রতিবেশীকে তুমি ভালবাস।
সেই ভালবাসার আনন্দ যেন
একটা মহৎ গুণের পরিণতি।

যে ভালবাসা দিন দিন না বাড়ে
সেটা যেন আস্তে আস্তে মরে যায়।

একই সময়ে যৌবন ও তার উপলব্ধি পেতে পারি না।
যৌবন জানবার জন্যে অতি ব্যস্ত ;
উপলব্ধি বাঁচবার জন্যে অতি ব্যস্ত।

তুমি তোমার জানালায় পথিকদের যাওয়া লক্ষ্য করছো।
দেখলে একজন বেশ্যা তোমার বাম পাশ দিয়ে যাচ্ছে,
আর একজন তাপসী তোমার ডান পাশ দিয়ে যাচ্ছে।
সরল প্রাণে তুমি তা'দেরকে বললে :
একজন কত কু-শ্রী পাপী,
আর একজন কত সুন্দর পবিত্র।'

এখন তুমি চোখ বন্ধ কর
শুনতে পাবে ইথার থেকে একটা শব্দ তোমার কানে আসছে
: 'একজন আমাকে কামের যন্ত্রণায় খোঁজে,
অন্যজন খোঁজে পবিত্রতার প্রার্থনায়।
প্রত্যেকের আত্মায়ই আমাদের আত্মার জন্য
স্ব স্ব নিকুঞ্জ বর্তমান।'

প্রতি এক হাজার বৎসরে একবার করে
নাজারাতের যীশু
খৃষ্টানদের যিশুর সাথে
লেবাননের পার্বত্য-ভূমির এক বাগানে সাক্ষাত করেন।
দীর্ঘ সময় ব্যাপি তাঁরা আলাপ-আলোচনা করেন।
প্রতিবার নাজারাতের যীশু
খৃষ্টানদের যিশুকে এই বলে চলে যান :
'হে বন্ধু, আমার ভয় হচ্ছে
আমরা বোধহয় কোনদিন একমত হতে পারব না।'

আল্লাহ অতি বিত্ত-শালীদেরকে খাদ্য দিন।

মহৎ ব্যক্তিদের দু'টো অন্তঃকরণ।
একটি দয়ায় পূর্ণ
দ্বিতীয়টি সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা।

যখন কোন মানুষ মিথ্যা কথা বলে
এবং সেই মিথ্যা কথা তোমার এবং অন্য কারও
কোন ক্ষতি করে না
তখন তোমার নিশ্চয় তাকে বলা উচিত :
"তোমার সত্যের ঘর কল্পনার পরিসরে বড় ছোট
এবং বৃহত্তের কোন জায়গার জন্য কেন এটা শীগগীর
পরিত্যাগ কর না ?"

প্রত্যেক বন্ধ দরজার পেছনে
সাতটা মোহর অঙ্কিত রহস্য বর্তমান আছে।

প্রতীক্ষা সময়ের খুর।

তোমার ঘরের পূর্ব-দিকে নতুন জানালা।
এতে নাকি তোমার খুব কষ্ট হয়। কষ্টের কারণটা কী ?

যাকে ঠাট্টা করেছো
তাকে তুমি সহজে ভুলে যেতে পার,
কিন্তু যার সাথে একদা কেঁদেছো
তাকে তুমি কখনো ভুলতে পারবে না।

লবনের মধ্যেও আশ্চর্য পবিত্রতা আছে।
তার কিছুটা আমাদের অশ্রুতে,
বাকীটা সাগরের জলে।

আমাদের মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র পিপাসায়
আমাদের সকলকেই পান করবেন :
সামান্য শিশির বিন্দু
এমন কী আমাদের অশ্রু-জল।

তুমি তোমার বিরাট দৈত্যের মত সত্তার কাছে
সামান্য টুকরো মাত্র।
সেই মুখ যা রুটি খায়
আর তার অন্ধ হাত
বিরাট হা' এর তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্যে পিয়ালা ধরে থাকে।

যদি তুমি জাতি, দেশ এবং নিজের চেয়েও
সামান্য উন্নত হও
তবে তুমি ফেরেশ্‌তা-সদৃশ।

আমি যদি তুমি হতাম,
ভাঁটার সময় সমুদ্রকে দোষী সাব্যস্ত করতাম না।
ভালো নৌকা, চালক সিদ্ধ হস্ত
কেবল তোমার যাত্রাপথ এখন কর্দমাক্ত।

যা' আমরা আকাঙ্ক্ষা করি
অথচ অর্জন করতে পারি না,
কিন্তু যা' অর্জন করেছি
তার চেয়ে এটা মহার্ঘ।

যদি তুমি এক-খণ্ড মেঘের উপর বসো
তা'হলে এ-দেশ এবং ও-দেশের সীমারেখা দেখতে পাবে না; অথবা এক কৃষি-ক্ষেত্র থেকে অন্য কৃষিক্ষেত্রের মাঝখানের পাথর-সীমা ঠিক করতে পারবে না।
বড়ই দুঃখের বিষয় যে
তুমি যখন মেঘ-খণ্ডের উপর বসেছিলে
তখন তোমার বসবার আসল জ্ঞান ছিল না।

সাত শতাব্দী আগে সাতটা সাদা পায়রা
একটা গভীর উপত্যকা থেকে বরফ-আবৃত সাদা পর্বত-শৃঙ্গে উড়ে গিয়েছিল।
সাতজন মানুষের মধ্যে একজন যে এই উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক দেখেছিল সে এসে বললো: 'আমি সাতটা সাদা পায়রার পাখায় একটা কালো দাগ দেখেছি।'
আজকে সেই উপত্যকার প্রতিটি মানুষ এক বাক্যে বলে: 'সাতটা কালো পায়রা বরফ-আবৃত পর্বত শিখরে উড়ে গিয়েছিল।'

আমি শরৎ কালে আমার সমস্ত যন্ত্রণা একত্র করি আর সেই সব যন্ত্রণা বাগানে কবরস্থ করি।
এপ্রিল ফিরে এলে,
বসন্ত পৃথিবীকে বিবাহের সাজে সাজায়;
আমার বাগানে এখন কী সুন্দর ফোটা ফোটা ফুল;
সেই সব ফুল অন্যান্য ফুল থেকেও চমৎকার।
আমার প্রতিবেশীরা সেই সব দেখতে আসে
এবং আমাকে বলে: 'যখন বীজ বোনার সময় নিয়ে শরৎ কাল আসে,
আপনি কী এই সব ফুলের বীজ আমাদের বাগানে ফুল পাবার জন্যে দেবেন না?

তখন আমার ভারী খারাপ লাগে
যখন আমি আমার শূন্য-হাত কারুও কাছে বাড়িয়ে
কিছু না পেয়ে ফিরে আসি।
তখনও আমার খারাপ লাগে
যখন আমার পূর্ণ-হাত বাড়িয়ে
কিছু দেবার জন্যে লোক খুঁজে পাই না।

আমি অনন্ত কালের আকাঙ্খায় মত্ত,
কেননা সেখানে আমার অলিখিত কবিতা
এবং অচিত্রিত ছবি বিদ্যমান আছে।

কলা প্রকৃতি থেকে
অসীমের দিকে ক্রমশঃ চলমান পদক্ষেপ।

কলার কাজ যেন কুয়াশার মধ্যে মূর্তির বিকাশ।

যে হাত কাঁটার মুকুট তৈরী করে
নিশ্চল হাতের চেয়ে সে হাত অনেক ভালো।

যে সব মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে গেছেন
তাঁ'রা প্রত্যেকে রাজা ও ক্রীতদাসের বংশধর ছিলেন।

যদি যিশুর প্র-পিতামহ জানতেন তাঁর
ভেতরে কী লুক্কায়িত আছে
তা, হলে কি তিনি নিজের ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন না?

জোদার মায়ের পুত্র-স্নেহ কী মেরীর
পুত্র-স্নেহের চেয়ে কম ছিল?

যিশুর তিনটী অলৌকিক গুণ ছিল—যা কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নি।
প্রথম: তিনি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছিলেন।
দ্বিতীয়: তাঁর রসবোধ ছিল প্রকট।
তৃতীয়: আসল তিনি বিজয়ী যদিও বিজিত হয়ে ছিলেন।

হে ক্রুশ-বিদ্ধ মহামানব!
তুমি যেন আমারই অন্তরে ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছো।
যে শলাকা তোমার হাত বিদ্ধ করেছে
তা আমার অন্তরের প্রাচীর বিদ্ধ করেছে।

আগামী কাল যখন কোন পথিক এই পথ অতিক্রম করবে
সে বুঝতে পারবে না যে এখানে দুই জনের
রক্তপাত হয়েছিল।
সে ইহাকে একই ব্যক্তির রক্ত বলে মনে করবে।

তুমি হয়তো পবিত্র পর্বতের কথা
শুনেছো।
এটাই পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত।
যদি তুমি সেই পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে যাও
তখন তোমার একটি মাত্র অভিপ্রায় থাকবে
সে হলো নীচে নেমে আসা
এবং গভীরতম উপত্যকার অধিবাসিদের সাথে
একত্র বসবাস করা।
এই কারণেই এই পর্বতকে পবিত্র পর্বত বলা হয়।

প্রত্যেক চিন্তাই আমি প্রকাশের মধ্যে
বন্দী করে রেখেছি ;
কাজের মাধ্যমে সেই সব বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

[সমাপ্ত]

সমুদ্র যাত্রীর চিঠি

আ. ফ. ম. সিরাজ-উদ্‌দউলা চৌধুরী

আমার এ-মন আর আকাশ-তারার
পরিচয় পেলাম সে-দিন
সন্ধ্যায় সূর্যের রঙে রঙ্‌ রাঙা 'ব্যালসামে' আর
লাল সাদা ক'টি ফুলে—রঙিন রঙিন।

রঙের বসন্ত নিয়ে আসে নাকি 'ডালিয়া'ও
'ক্রিসেন থিমাম' ;
(জানিনে কখন আসে)। তা'দের কি লেখা আছে নাম
আমার হৃদয় পটে ? (জানিনে তো !) আজ অজানার
তরঙ্গে নির্ভুল আমি আয়োজন করেছি এ'
সমুদ্র-যাত্রার।

সমুদ্র যাত্রার আগে, বহু আগে মায়া ঝরা সকালের শত
স্বপ্নে আমি উদ্বেলিত।..... মহাশূন্যে আকাশ আমার
সহস্র তারার ফুলে এঁকেছিল রঙিন স্বপন।.......

স্বপ্ন দেখেছি লক্ষ তারায়। সত্যের সন্ধান
পাইনি এখনো ! রাত্রি শেষের ঝরে' পড়ে
'ব্যালসাম' ;
তাই সমুদ্র-যাত্রার শুরু—দূরে সী-গলের গান,
কোটি তরঙ্গ। জীবনের গতি এরো বুকে উদ্দাম।

লক্ষ তারার স্বপ্ন এখানে করেনি তো ছায়াপাত,
জীবনের শত স্বাক্ষর আঁকা—স্বপ্ন ও সংঘাত।...
এ-বার তাহলে আসি,
জাহাজ ছুটেছে সময়ের গানে বার বার উল্লাসি'।

জীবন-খাতার দুইটি পাতা

হাসিব চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ ৫ ॥

কালের স্রোতে ঘূর্ণি-পাকের বুদ্বুদ তুলে মিলিয়ে যায় আরও দেড়টা বছর। আমি আই-এ পাশ করে বি এ-তে ভর্তি হই। কয়েক মাস আগে আব্বা মারা যান। পড়া-শোনা চলে অত্যন্ত সংকটের মধ্য দিয়ে। লজিং থাকি। টিউশনি করি। অল্প টাকার একটা ষ্টাইপেণ্ড পাই। এক-এক সময় মনে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে চাচী আম্মার কথা কয়টি: হাসু, তোমাকে মানুষ হতে হবে। আব্বার অন্তিম বাসনা—কষ্টে-সৃষ্টে আমি যেন পড়াটা চালিয়েই যাই। সুতরাং আবার সাহস সঞ্চয় করি। কোন রকমে দিনগুলো গড়িয়ে দিই।

আগে মাঝে মাঝে রেহানার চিঠি পেতাম। এখন আর পাইনে। বস্তুতঃ হাসান সাহেবের চাকরী ছেড়ে দেবার পর থেকেই রেহানার সাথে আমার চিঠি-পত্তর আদানপ্রদান বন্ধ। একবার রেহানার কাছে লেখা আমার একখানা চিঠি হাসান সাহেবের হাতে পড়েছিল। চিঠিতে বিশেষ কিছু লেখা ছিল না। তবু সেই হতে আমাদের সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ বেড়ে গেছিল শতগুণ। তা ছাড়া হঠাৎ দু'একদিন রেহানার সঙ্গে বসে আমাকে গল্প করতেও তিনি দেখেছিলেন। এর জন্যে রেহানাকে যথেষ্ট গালাগালি খেতে হয়েছিল। চাচী আম্মাকেও শুনতে হয়েছিল বকাবকি।

এখন তাই রেহানার সঙ্গে কম দেখা করি। তা'ও অধিকতর সাবধানে। ওদের আমবাগানের পথ দিয়েই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। পুকুর পাড়ের পূব কোণের বড় একটা তেঁতুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকি কিছুক্ষণ। হাসান সাহেব বাড়ী 'আছেন' বুঝলে ফিরে আসি। 'নাই' বুঝলে এগিয়ে যাই। রেহানার সঙ্গে দেখা করি। চাচী আম্মার হাতের রান্না খাই। দুয়েকদিন ভুল হয়ে যায়। 'নাই' বুঝে এগিয়ে গিয়ে হয়ত দেখি হাসান সাহেব বাড়ীতেই আছেন। সেদিন আপাততঃ চাচী আম্মার সঙ্গে আলাপ করি। আড়াল-আবডাল থেকে রেহানার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। হাসান সাহেব কখনো বা দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কখনো বা জিজ্ঞাসা করেন না। আমার জন্য রেহানা কিংবা চাচী আম্মার উপর রাগ করলেও আমাকে তিনি কোন দিন কিছু বলতেন না।

সে সময়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। অল্প কয়েক দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছি। একদিন সন্ধ্যায় রেহানাদের বাড়ীতে যাই। হাসান সাহেব বাড়ী ছিলেন না। আমি আর রেহানা গিয়ে পাশাপাশি বসি ওদের পুকুর-পাড়টায়।

সেদিন বোধ করি ছিল পূর্ণিমা। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠ্ছে। দূরে একটা পাখী একটানা ক্লান্ত সুরে ডেকে যাচ্ছে 'বউ-কথা-কও'। হাস্নু-হেনার গন্ধে ম' ম' করছে পুকুরের পাড়টা।

সেদিন রেহানাকে কেমন যেন বেদনার্ত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ ও আমার আরও একটু কাছে সরে আসে। আমার বাঁ-হাতখানা টেনে নিয়ে ওর কোলের উপর রাখে। আস্তে আস্তে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে। আমি ডাকি—

: রেহানা!

রেহানা সহসা বলে উঠে—

: আচ্ছা হাসু, তোমার সাথে যদি আমার বিয়ে না হয়।

ওর কণ্ঠে কেমন যেন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করি। বলি—

: যাও! যত সব বাজে কথা!

রেহানা ওর কোলের উপর রাখা আমার হাতখানার আঙুলগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতেই উত্তর দেয়—

: না, সত্যি যদি—

আমি বাধা দিই, বলি—

: এমন হতেই পারে না। চাচী আম্মা এ-কিছুতেই হতে দেবেন না। তা ছাড়া তোমার আব্বাও কি তোমার মতটা না নিয়ে কিছু করতে পারবেন?

রেহানা একটু ম্লান হাসে, বলে—

: বিয়ের আগে অবশ্য মেয়েদেরও কিছু একটা মতামত থাকতে পারে এবং তার কিছুটা মূল্য দেওয়াও হয়ত উচিত। কিন্তু মনে হয়, এ-দেশের মেয়ে আর 'বলি'র পশু সমান। বলির সময় পশুর যেমন মতামতের প্রয়োজন হয় না, কোন রকমে ধরে-বেঁধে 'কাৎলায়' চড়িয়ে দেওয়া হয়, বিয়ের ব্যাপারেও এ দেশের অনেক মেয়ের ভাগ্যে ঠিক তেমন দশাই ঘটে।

আমি বলি—

: এমন হোত একদিন। এখন যুগ বদলে গেছে।

একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেহানা উত্তর দেয়—

: যুগ বদলালেও মানুষ সব এখনো বদলে যায়নি, হাসু!

আমি চুপ করে থাকি। পুকুরের পানিতে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর লুকোচুরি খেলা দেখি।

কিছুক্ষণ পর রেহানা হঠাৎ আবার বলে উঠে—

: আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই, তুমি কি আর বিয়ে করবে না, হাসু।

আমার যেন কেমন মনে হয়, বলি—

: আজ এসব কথা তুমি বলছ কেন, রেহানা।

রেহানা আমার মুখের দিকে তাকায়। অনুরোধের ভঙ্গিতে বলে উঠে—

: না, বল, বিয়ে তুমি করবে কিনা?

আমি একটু গম্ভীর হই, বলি—

: না।

পুকুরের অপর পাড়ের বড় একটা করুই গাছের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রেহানা। তারপর সহসা আবেগ-কম্পিত স্বরে বলে উঠে—

: না, না! বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

এসব আলোচনা আর ভাল লাগে না আমার। রেহানার মনটাও একটু হালকা করে দিতে চাই। তাই ঠাট্টা করে বলি—

: আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে; অবশ্য তোমার মত যদি কাউকে পাই।

রেহানা যেন সত্যি একটু হালকা হয়ে উঠে, উত্তর দেয় —

: আমার চেয়েও ভাল পাবে, বলছি।

আমি ঠাট্টার মাত্রা আরও একটু চড়াই, বলি—

: তোমার মত যদি কেউ আমাকে ভালবাসে।

রেহানাকে আরও সহজ মনে হয়, একটুখানি হেসে বলে—

: যে-কেউ আমার চেয়েও বেশি ভালবাসবে তোমাকে।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরি। কিন্তু মনটা হঠাৎ অস্বোয়াস্তিতে ভরে যায়।

রেহানা আজ কেন যে এ-সব কথা বলে তার কারণটা যেন আস্তে আস্তে বুঝতে পারি।

হাসান সাহেব অনেকদিন ধরেই রেহানার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন। কিন্তু খান্দানী ঘরের ভাল ছেলে পেয়ে উঠছেন না। দুয়েকজনের যাও বা সন্ধান পেয়েছিলেন, তারা রেহানাকে পছন্দ করেনি। অবশ্য সে রেহানার নিজের দোষেই। প্রত্যেকবারেই ও চালাকি করেছে। যেমন-তেমন করে চুলগুলো বেঁধেছে। চোখে কাজল নিতে খানিকটা লেপ্টে ফেলেছে। মুখে হয়ত অনেকটা তেল মেখে, তারপর পাউডার দিয়ে চেহারাটা আরও বিশ্রী করে ফেলেছে। কাপড় পরেছে, তাঁর 'কুচি' দিয়েছে হয়ত উল্টো করে। ফলে বরপক্ষীয়েরা রেহানাকে নির্ঘাৎ 'আনাড়ি' মেয়ে ভেবে ফিরে চলে গেছে। হাসান সাহেব এসব কিছুই বুঝতে পারেন নি। মেয়েকে তিনি হতভাগ্য মনে করে নিরাশ হয়েছেন। কখনো বা চাচী আম্মার উপর খামাখা রাগারাগি করেছেন। এখন তিনি একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছেন। যেমন করেই হোক, তিনি শিগ্‌গীর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন।

কয়েকদিন পরের কথা। রেহানাদের আমবাগানের ভিতর দিয়ে পুকুর পারের সেই তেঁতুল গাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ মনে হোল রেহানাদের দক্ষিণ-ভিটির ঘরটায় হাসান সাহেবের সঙ্গে চাচী আম্মার যেন কি কথা হচ্ছে। চাচী আম্মা বলছেন—

: ছোট বেলা থেকেই ওদের দু'জনের পরিচয়। তা' ছাড়া দু'জনের মানাবেও বেশ।

হাসান সাহেব বলছেন—

: আমি আগেই জানতাম রাসুর মা, একদিন তুমি এ-কথা বলবে।

চাচী আম্মার সহজ-কণ্ঠ—

: আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্রে এ-যুগে ওর মত কয়টা ছেলে পাওয়া যায়।

: বলেছি তো, মীরপুরের সৈয়দরা খান্দানী ঘর। তারা যে-সে ঘরে মেয়ে দিতে পারে না।

আমি সন্তর্পণে আরও একটু এগিয়ে যাই। একটা মেহেদী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বারান্দার দিকে তাকাই। দেখি, ওই কোণে একটা চৌকিতে চুপচাপ বসে আছে রেহানা। আমি ভাল করে চাচী আম্মা এবং হাসান সাহেবের কথা-বার্তা শুনবার চেষ্টা করি।

চাচী আম্মা বলেন—

: আজকাল আর অতশত মানে কে? এটা একটা দেশ-চলতি ছাড়া তো কিছু নয়?

হাসান সাহেবের উত্তর শোনা যায়—

: যে শিয়ালের লেজ নেই, অপরের লেজটাকে সে বাড়্‌তি মনে করে।

এ কথার তাৎপর্য কি বুঝতে পারি।

কিন্তু চাচী আম্মা রাগ করেন না। বরং আরও নরম সুরে বলেন—

: ও বি-এ পড়ছে, পাশ করবে। চেষ্টা করলে এম-এ'টাও পাশ করতে পারবে।

হাসান সাহেব সম্ভবতঃ মাথা নাড়েন, বলেন; হুঁ।

চাচী আম্মা বুঝি একটু জোর পান।

তিনি আরও নরম সুরে বলেন—

: তা ছাড়া, ঠিক খান্দানী না হলেও ওরা এমন নীচ-বংশই বা কি? বরং ভালই।

হাসান সাহেব সম্ভবতঃ মনে-মনে হাসেন, বলেন—

বটে :

চাচী আম্মা আরও জোর পান।

একান্ত মিনতি-ভরা কণ্ঠে তিনি বলে উঠেন—

: তোমার কাছে তো জীবনে কোনদিন কোন অনুরোধ করিনি। আজ আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমি হাসুর সঙ্গে রাসুর বিয়ে দেব।

মেহেদী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। বারান্দায় বসে রেহানাও বুঝি অনুভব করে কিছুটা চঞ্চলতা। হঠাৎ হাসান সাহেব রাগে ফেটে পড়েন। কর্কশ-ভরা কণ্ঠে বলে উঠেন—

: এ-সব তুমি কি বলছ, রাসুর মা। এতদিন ধরে গোপনে বুঝি এই ফন্দি পাকিয়েছ। তুমি কি আমার মাথাটা মাটিতে নুইয়ে দিতে চাও?

চাচী আম্মার আর কোন কথা শোনা যায় না। তিনি চুপ করে যান। আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বারান্দার দিকে সোজা এক নজর তাকাই। দেখি, মাথাটা নীচু করে সেখানেই নিশ্চল বসে আছে রেহানা। আমি ধীরে-ধীরে পিছন হাঁটি।

কলেজে ফিরে যাই। কিন্তু পড়া-শোনায় আর মন বসে না মোটে। হাসান সাহেব এবং চাচী আম্মার সেদিনের আলোচনার কথাটা মাঝে মাঝে ভাবি। মনটা কেমন বিষিয়ে উঠে। হাসান সাহেব এত নীচ! এত সংকীর্ণ-মনা। তবে কি তিনি সেই পুরান-কালের ঘটনাটা এখনো মনে করে রেখেছেন। আমার যেন হঠাৎ মনে হয় তাই। কিন্তু তাতে আমার আব্বার দোষ ছিল কি? হাসান সাহেবই তো অন্যায় করেছিলেন।

সে কি আজকের কথা! সাত-আট বছর কি তারও আগের। ঘটনা এই :

হাসান সাহেব লোক দিয়ে কাজ করাতেন। কিন্তু ঠিকমত মজুর দিতেন না কারো? তারা অনেকেই এসে আমার আব্বার কাছে অনুযোগ জানাত। সেদিনও একজন এসে কেঁদে পড়েছিল।

: নয়-দশদিন কাজ করছি, হাসান সাহেব এখন টাকা দেয় না। বলে, তুমি ভাল করে কাজ কর নাই। গরীব মানুষ। আপনারা এটা বিধান না করে দিলি যে মারা যাই।

আব্বা বলেছিলেন : আচ্ছা!

পরদিন ছিল শুক্রবার। হাসান সাহেব তখন গাঁয়ের মসজিদে এমামতি করতেন। সুন্নত নামাজ শেষ করে সেদিন তিনি যে-ই মিম্বারের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, অমনি আব্বা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—

: আপনি নেমে আসুন। আপনার পেছনে নামাজ হয় না।

হাসান সাহেব রেগে উত্তর করেছিলেন—

: আমি সৈয়দ-বংশ। আর আমার পেছনে নামাজ হয় না, কি রকম কথা!

আব্বা বলেছিলেন—

: ইসলামে সৈয়দ অ-সৈয়দে পার্থক্য নাই। বরং ইসলামে নির্দেশ আছে, কাজের পর মজুরের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দিতে হবে। সে নির্দেশ পালন তো দূরের কথা, আপনি আসলে কাজ করিয়ে মজুরিই দেন না। সুতরাং আপনার পেছনে নামাজ-পড়া না-জায়েজ।

হাসান সাহেব জানতে চেয়েছিলেন, কাজ করিয়ে কা'কে তিনি টাকা দেননি?

আগের দিন যে লোকটি আব্বার কাছে এসেছিল, সে-ও সেদিন মসজিদে উপস্থিত ছিল। সবার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রমাণ দিয়েছিল, বলেছিল—

: আমারে দিয়ে আপনি দশ দিন কাজ করাইছেন। কিন্তু এখন টাকা দিতেছেন না।

এতে হাসান সাহেব অপমানের চূড়ান্ত হয়েছিলেন এবং বাধ্য হয়ে সেই লোকের পাওনা চুকিয়ে দিয়েছিলেন।

এ ঘটনা পরে আমি অপরের মুখ থেকে শুনেছিলাম।

কিন্তু এখন তো আব্বা মারা গেছেন। এখনও কি তিনি সেই অপমানের ব্যথাটা ভুলতে পারেন নি? নাঃ, আসলেই হাসান সাহেব অহংকারী, বংশাভিমানী! আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে।...

ছ'মাসের মধ্যে আর বাড়ী আসা হয় না আমার। রেহানা-চাচী আম্মার সংবাদও পাইনে বড় একটা। হঠাৎ সেদিন কলেজে গিয়ে একটা চিঠি পাই। পরিচিত হাতের লেখা। বুকটা কেমন ঢিপ্-ঢিপ্ করতে থাকে। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি চিঠিটা। রেহানা লিখেছে মাত্র কয়টি লাইন।

: অনেক কষ্টে চিঠি পাঠালাম। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। দুয়েকদিনের মধ্যেই। দেরী করলে...। আর লিখতে পারছিনে। ইতি—

তোমারই
রেহানা

চিঠিটা পড়ি। ফিরে ফিরে পড়ি। ব্যাপারটা কি?

কি করা যায়? না আর এক মুহূর্ত ও বিলম্ব নয়। সাড়ে এগারটার ট্রেনের এখনও দেরী আছে। এই ট্রেণেই যেতে হবে।

কলেজ থেকে সোজা ষ্টেশনে চলে আসি। কেবল আপ ট্রেণটা আসল। ডাউন ট্রেণ আরও আধ ঘণ্টা পর। মনটা ভারাক্রান্ত। টিকেট নেওয়ার গেট্‌টার কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের যাওয়া-আসা লক্ষ্য করি। হঠাৎ দেখি, হাসান সাহেব। এই ট্রেণ থেকেই নামলেন বুঝি। একবার ভাবি, সরে পড়ি। কিন্তু একেবারে সামনা-সামনি এসে পড়েছেন যে!

আমি তাঁকে ছালাম জানাই। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকান আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করেন—

: তোমার কলেজ খোলা না, হাসিব?

: জি!

: তা' এখানে?

: বাড়ী যাব!

সহসা তিনি যেন একটু চমকে উঠেন। আর কথা বলেন না সোজা চলে যান। আমি অবাক হই!

বাড়ী এসে এক মুহূর্তও দেরী না করে রেহানার সঙ্গে দেখা করতে যাই। প্রথম চাচী আম্মার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর আজ কথা হয় না তেমন। রেহানাই সব কিছু বলে। ওর আব্বা নাকি কোথায় গোপনে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। চাচী আম্মাও জানেন না! হাসান সাহেবের সঙ্গে তাদের আগের থেকেই জানাশোনা। তারা একদিন বেড়াতে এসে রেহানাকে দেখে গেছে। জেলা-শহরের কাছাকাছি কোথায় নাকি তাদের বাড়ী। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেছে। আর মাত্র আট দিন। কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় আমার লজিং-এর জন্য চাচী আম্মা তাঁর যে মামাতো ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, কয়েক দিন আগে তিনি রেহানাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিই সব বলে গেছেন। রেহানা আর বলতে পারে না। ওর চোখ ফেটে কান্না আসছিল।

সব শুনে ওকে আমি আশ্বাস দিই—

: চিন্তা করো না। এ-বিয়ে আমি ভেঙে দেবই। তারপর যা' হয় হবে। আমি বাড়ী ফিরি। মনটা আজ সত্যিই বিদ্রোহী হয়ে উঠে। না! না! কাপুরুষের মত আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না। রেহানা আমার! আমার রেহানা! তাকে আমি কিছুতেই অপরের হাতে তুলে দিতে দেব না।

রাত্রে শুয়ে অনেক চিন্তা করি। বুদ্ধি পাকাই। কাল এগারটার ট্রেণে চলে যাব। কলেজে আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু রয়েছে। তাদের কাছে ব্যাপারটা বলব। চাচী আম্মার ভাইকেও সব কিছু জানাতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই বরের বাড়ী-বরের ঠিকানা জানেন। তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের খুঁজে বের করব। শেষের কাজগুলো অবশ্য করতে হবে বন্ধু ক'জনকে দিয়েই। বিয়ের এখনো আট দিন বাকি। দু'দিনেই সব করা হয়ে যাবে। ঠিক! এই বুদ্ধিই ঠিক!

পরদিন যথাসময়ে ষ্টেশনে হাজির হই। ট্রেণটার দেরি নেই বেশি। টিকেট কিনে প্লাটফর্মে ঘোরা-ফিরা করছি। একটু দূরে যেন হাফিজের মত মনে হয়। তাই-তো, এ-যে হাফিজই দেখছি! অনেক দিন হোল হাফিজ ওর এক খালুর বাসায় থাকে। সেখানেই পড়াশোনা করে। বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে বুঝি! আমি এগিয়ে যাই। জিজ্ঞাসা করি—

: কবে এলে হাফিজ?

হাফিজ ফিরে তাকায়। বিস্মিত-কণ্ঠে বলে—

: হাসু ভাই! কেমন আছেন আপনি?

: ভাল।

: আমি আজ সকালের ট্রেণে এসেছি।

: বেশ! তা এখন আবার যাচ্ছ নাকি কোথাও।

: না। কাল বড় মামার সংগে আব্বার নাকি কখন কোথায় দেখা হয়েছিল। আজকের এই ট্রেণে নানীজানের আসবার কথা।

: আসবেন, তোমার আপার বিয়েতে বুঝি।

: জি!

হঠাৎ আমার কেমন খটকা লাগে। হাসান সাহেব নাকি গোপনে রেহানার বিয়ের সব ঠিক করেছেন। কিন্তু এ তো দেখ্‌ছি জানাজানি ব্যাপার। কৌতূহলী হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করি—

: বিয়ের তো আর ছয়-সাতদিন বাকি, কেমন?

হাফিজ উত্তর দেয়। কিন্তু গলাটা যেন কেমন কেঁপে উঠে ওর।

: হ্যাঁ, কথা ছিল নাকি তাই! কিন্তু বিয়ে তো... হয়ে গেছে!

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। ওর কথাগুলো কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়, জিজ্ঞাসা করি—

: কি বললে, হাফিজ?

হাফিজ উত্তর করে—

: আব্বা নাকি কাল সকালে কোথায় গে'ছিলেন। রাত দুটোয় বর এবং বরের অভিভাবক ধরণের দু'য়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরেন। রাত্রে তিনি নিজেই বিয়ে পড়িয়ে দেন।

আমার হৃৎপিণ্ডটায় হঠাৎ শক্ত হাতুড়ির ঘা পড়ে।

আমি একেবারে হতবাক হয়ে যাই। মনে হয়, আমার পায়ের নীচ থেকে বুঝি মাটি সরে গেছে। শূন্যে ঘুরছি আমি!

ট্রেণটা ততক্ষণে এসে পড়েছে। হাফিজ তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যায়, ওর নানীজান এসেছে কিনা খুঁজে দেখতে!

আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি। ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা হয়ে গেছে। গার্ড হুইস্‌ল্ দেয়। সবুজ নিশান উড়ে। তবু দাঁড়িয়েই থাকি আমি। ট্রেণ ছাড়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ট্রেণ। হঠাৎ পেছন থেকে কোন ত্রস্ত-যাত্রীর ধাক্কা অনুভব করি। কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পাই। টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে গিয়ে চলমান ট্রেণের একটা কামরার হাণ্ডেল চেপে ধরি!

॥ ৬ ॥

সাত-আট মাসের মধ্যে আর বাড়ী আসি না আমি। আসতেও ইচ্ছে করে না। ফাইন্যাল এসে যাচ্ছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করবার চেষ্টা করি। কিন্তু পড়তে বসলেই মাথা ঘোরে। কানের মধ্যে বোঁ-বোঁ শব্দ করে। কিছুই ভাল লাগে না।

বাড়ীতে আম্মা রয়েছেন। আর ছোট ভাইটি। তাদের জন্য অবশ্য বিশেষ ভাবতে হয় না আমার। জমি-জমায় যে ফসল হয়, তাতেই চলে যায় তাদের। তা ছাড়া গ্রামে আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রয়েছেন। জমি-জমার বিলি-ব্যবস্থা রক্ষণা-বেক্ষণ তিনিই করেন। কিন্তু তবু অনেক দিন দেখি না তাদের। প্রাণটা কেমন আই-ঢাঁই করে উঠে।

অবশেষে আবার একদিন রওয়ানা হই। বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কলেজ খোলা থাকা সত্ত্বেও—কামাই করে।

বাড়ী এসে আপাততঃ নিজেকে একটু হালকা মনে হয়। একটু শান্তি পাই। রেহানা ও চাচী আম্মার কথা ভুলে যেতে চাই। কি হবে আর তাদের কথা মনে রেখে। শুধু শুধু দুঃখ পাওয়া! রেহানা আমাকে অনেক দিয়েছে। চাচী আম্মা অনেক উপকার করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ! চির কৃতজ্ঞ! ব্যস! আর কি!

রেহানা ও চাচী আম্মা সম্পর্কে তাই আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করি না। এমন কি তাদের বাড়ীমুখোও হাঁটি না।

তবু মনের মাঝে রেহানা ও চাচী আম্মার কথাই নাড়া-চাড়া চলে। আবার শান্তিভঙ্গের উপক্রম হয়। মনটা বিষিয়ে উঠে। দূরে ছিলাম, সেই তো ভাল ছিলাম। না! শীগ্‌গীরই আবার বাড়ী ছাড়তে হবে, দেখছি!

দিন দুই পর। হাফিজ এসেই উপস্থিত। ও এখন বাড়ীতেই থাকে। ওর আম্মা পাঠিয়েছেন।

এ ক'দিন সত্যি করেই আমি রেহানা ও চাচী আম্মার সংবাদ নিইনি। হাফিজকে দেখে আজ মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠে। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করি, ওর মুখ থেকে কিছু একটা সংবাদ শুনবার জন্যে। হাফিজ বলে—

ঃ আম্মা আপনাকে যেতে বলেছেন। ও আরও বলে—

ঃ বিয়ের পর রেহানা আপা একবার মাত্র সে-বাড়ী গিয়েছিল। ছিল মোটে সাত দিন। কান্না-কাটি করে দেখে আব্বা নিয়ে এসেছিলেন। এ-পর্যন্ত বাড়ীতেই আছে।

একটু থেমে আবার বলে—

ঃ আপাকে তারা পরশুর পরদিন সকালে নিয়ে যাবে। আপাও আপনাকে যেতে বলেছেন।

হাফিজ আর বিশেষ কিছু বলে না। যাবার আগে আর একবার চাচী আম্মা ও রেহানার অনুরোধটা জানিয়ে যায়।

আমি সমস্যায় পড়ি। কি করা যায়। যাব, কি—যাব না। একবার ভাবি, যাই। দেখা করি। যা' হবার হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের এত দিনের পরিচয়টা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে! আবার মনে চিন্তার উজান স্রোত বয়। না! দেখা করলেই মন খারাপ হয়ে যাবে। রেহানাও হয় ত দুঃখ পাবে বেশি বেশি করে। এ ভাবে কেটে যায় দু'দিন। কাল সকালেই চলে যাবে রেহানা। আর কখনো দেখা হবে কিনা, কে জানে!

আজও সকালে হাফিজ এসেছিল। বলে গেছে, রাত আটটার ট্রেণে তারা আসবে। ভোরেই রওয়ানা হবে। আম্মা আপনাকে যেতে বলেছেন। আর রেহানা আপাও।

আমি হাঁ-না কিছুই বলিনি।

এখন বিকাল। সন্ধ্যাও হয়ে এল বুঝি! দুয়েক পা করে বাড়ী থেকে বের হই। আনমনা হাঁটি। বেশ কিছু দূর। অন্ধকার হয়ে আসছে! দূরে সদর রাস্তা দিয়ে কারা যাচ্ছে যেন! হাফিজ না? হাসান সাহেবও সঙ্গে দেখ্‌ছি! হাফিজের হাতে হারিকেন বুঝি! ওই তো ষ্টেশনের পথ ধরল!

সামনেই রেহানাদের বাড়ী যাওয়ার সেই আমবাগানের পথ। পথ্‌টা এখনো আছে দেখ্‌ছি। আমি ধীরে ধীরে পা চালাই। সেই পরিচিত পথে। তেঁতুল গাছটার কাছে এসে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াই। বাইরের বারান্দায় বসে কে-ও? চাচী আম্মাই তো! আমি এগিয়ে যাই!

চাচী আম্মার কদমবুসী করি। চাচী আম্মা আমাকে দেখে খুশী হন। দোওয়া করেন। সতৃষ্ণ নয়নে তাকান আমার মুখে।

চাচী আম্মাকে আজ যেন কেমন নতুন মনে হয়। শুধু চাচী আম্মাই নন। এই বাড়ী, এই ঘর, এই পরিবেশ সবই যেন আজ আমার কাছে নতুন।

চাচী আম্মা আমার সাথে আলাপ করেন। অত্যন্ত সাধারণ দু'চার কথা। শরীর কেমন আছে? পড়াশোনা কেমন চল্‌ছে? ইত্যাদি! আরও দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করেন তিনি। তারপর আমাকে বসতে বলে, কি-একটা কাজে চলে যান সেখান থেকে।

একা বসে-বসে অস্থিরতায় ছট্-ফট্ করি আমি। বার বার এদিক-ওদিক তাকাই। হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ! রেহানা এগিয়ে আসে! কিন্তু এ কি রেহানা? এ কি পরিবর্তন তার? থর-থর কাঁপছে রেহানা! টলে পড়ে যাবে নাকি! আমি উঠে এগিয়ে যাই। কণ্ঠে যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা এনে জিজ্ঞাসা করি—

: কেমন আছ, রেহানা?

সহসা কান্নায় ফেটে পড়ে রেহানা—

: তুমি এত দিন আসনি কেন? কেন? কেন তুমি আসনি?

উত্তর দিতে গিয়ে আমার চোখেও অশ্রু নামে। কান্না-ভরা কণ্ঠে বলে উঠি—

: আমাকে মাপ করো, রেহানা। রেহানা! তুমি অতীত ভুলে যাও। নতুন করে তোমার জীবন গড়ো! আমি দোওয়া করতে এসেছি রেহানা। তুমি সুখী হও।

রেহানার কান্না আরও বেড়ে যায়। উদ্‌ভ্রান্তের মত জবাব দেয়—

: সুখী? দোওয়া? পারবে? পারবে তুমি? পারবে তোমার অতীতকে ভুলতে?

রেহানা আর বলতে পারে না। শাড়ীর আঁচলে ঘন ঘন চোখ মোছে ও। কান্নার অশ্রুতে আমার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে আসে। রেহানা কাঁদে। আমি কাঁদি। হায়রে নিয়তি! অনেকক্ষণ পর, দুজনের কান্নাই প্রশমিত হয়ে এলে রেহানা বলে—

: কিসে কি হোল তুমি তো সবই জান। আমি আত্মহত্যা করতাম। কিন্তু শুধু তোমাকে দেখব বলেই—

আমি উত্তর করি—

: না, না! আত্মহত্যা নয়! তা'হলে আমিও যে বাঁচব না রেহানা।

রেহানা বলে—

: সাত-আটটি মাস প্রতিক্ষণ আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছি। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমি যখনই বাড়ী আসি, তোমার সাথে যেন আমার দেখা হয়।

আমি প্রতিজ্ঞা করি, বলি—

: নিশ্চয়ই হবে।

একটু থেমে ও আবার বলে—

: ওরা সকালে আমাকে নিয়ে যাবে। আজ সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে আসার কথা। হয়ত এতক্ষণ এলো। আমি আত্মহত্যা করব না। তবে বাঁচব কিনা জানি না। তোমার কাছে আমার আর একটি অনুরোধ, তুমি বিয়ে করো।

আমি আনমনা ভাবে জবাব দিই—

: আচ্ছা, দেখব!

শেষ পর্যন্ত ও আরো একটি অনুরোধ জানায়, বলে—

: কাল সকালে তুমি ষ্টেশনে যেয়ো। যাওয়ার আগে তোমাকে আর একবার আমি দেখে যেতে চাই।

আমি কথা দিই—

: আচ্ছা!

সাড়ে আটটা প্রায় বাজে বাজে। আর দেরী করলে নয়। আমি বিদায় হই। বিদায়ের আগে রেহানা আমার বুকের কাছটিতে দাঁড়িয়ে একান্ত সমর্পনের ভঙ্গিতে বলে—

: মনে রেখো, রেহানা চিরদিন তোমারই।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙে, তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। রেহানার অনুরোধটা মনে পড়ে যায়। ট্রেণের আর দেরিও বেশি নেই। কিন্তু আবার সেই দ্বন্দ্ব! যাব, কি-যাব না। আমাকে দেখে যদি রেহানা ফের কাঁদে। আমি যদি কান্না সংবরণ করতে না পারি। ষ্টেশনে, অত লোকের মাঝে। না, থাক! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্য ভাবনা শুরু হয়। আমি যে রেহানাকে কথা দিয়েছি। হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি। না! যা' হয় হবে। আমি যাব। ষ্টেশনে। এখনই।

তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে' পথে বের হই। হাঁটি। জোরে। খুব জোরে। যত জোর আছে। দৌড়াচ্ছি যেন। ট্রেণের বুঝি শব্দ শোনা যাচ্ছে। সময় বুঝি আর বেশি নেই। সামনে একটা মাঠ। মাঠ পেরিয়েই ষ্টেশন। পথ ঘুরে গেছে। আমি সোজাসুজি নেমে পড়ি। মাঝামাঝি এসে পড়েছি প্রায়। কিন্তু? ওই তো ট্রেণ ছেড়ে দিল। হুস-হুস করে এগিয়ে চলেছে ট্রেণ। রেল-সড়কের পাশের পথ দিয়ে হাফিজ হেঁটে যাচ্ছে, দেখছি। রেহানাকে এগিয়ে দিয়ে এল বুঝি!

একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে পড়ি আমি। অপলক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ট্রেণটার দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ট্রেণ। এগিয়েই চলেছে। এখন জোরে। বেশ জোরে। দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় ট্রেণ। শব্দ মিলিয়ে যায়। ধুঁয়া ফুরিয়ে যায়। তবু সেই মাঠটার মাঝে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকি আমি।...

॥ ৭ ॥

চার বছর পরের কথা। আমি এম-এ পাশ করেছি। বর্তমানে ঢাকার কাছে কোন একটা কলেজে করছি অধ্যাপনা। হোষ্টেলে থাকি। সকালে লেকচার প্রিপেয়ার করি। সন্ধ্যায় ক্লাবে একটু আড্ডা দেই। আর সারাদিন তো কলেজেরই ডিউটি। কিন্তু প্রায়ই মন ভাল থাকে তো শরীর ভাল থাকে না। শরীর ভাল থাকে তো মনটা ভাল থাকতে চায় না। জীবনের এই 'হের-ফের' নিয়ে কোন রকমে দিনগুলো কাটাই।

মাঝে-মাঝে ছুটিতে বাড়ী আসি। দুয়েকদিন থাকি। এখানে-ওখানে বেড়াই। আবার ফিরে যাই।

চাচী আম্মা ও রেহানার সঙ্গে আর দেখা হয় না। বহু দিন হোল হাসান সাহেব আমাদের গ্রাম ছেড়ে সপরিবারে অন্যত্র চলে গেছেন। সেখানে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর এক মৃত আত্মীয়ের অনেক সম্পত্তি পেয়েছেন। তাঁর পুরাতন বাড়ীটা অবশ্য এখনো আছে। দুয়েকজন চাকর-বাকর থাকে। এখানকার জমি-জমা দেখাশোনা করে। হাসান সাহেবও মাঝে-মাঝে আসেন। সবকিছু দেখে-শুনে যান। কিন্তু চাচী আম্মা বোধ করি আসেন না কখনো। রেহানাও বেড়াতে আসলে ওর আম্মার কাছেই আসে। সুতরাং তাদের সাথে আর আমার দেখা হবার সুযোগ কোথায়!

কিছুদিন আগের কথা। পূজার ছুটিতে বাড়ী এসেছি। বিকালের দিকে বেড়াতে-বেড়াতে একটু নদীর ধারে যাই। বর্ষা-শরৎ পার হয়ে হেমন্ত এসে যাচ্ছে। পদ্মার বুকে জেগেছে নতুন চর। এক সময় তার যে উত্তালতা দেখেছি, এখন তা' আর নেই। ঢেউগুলো একের পর এক ক্লান্তিতে আছ্‌ড়ে পড়ছে তীরে এসে। পদ্মাকে দেখে ঠিক আজ আমার মতই মনে হয়। জীবন-যুদ্ধে পর্যুদস্ত যেন!

কাছেই একজন বৃদ্ধ জেলে 'ক্ষেমলা' জাল ফেলে মাছ ধরছে। এক-একবার উঠছে অনেকগুলো করে মাছ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার মাছ-ধরা দেখি। তারপর দুয়েক পায় পদ্মার পার ধরে হাঁটতে থাকি। সামনের ঘাট থেকে কে একজন প্রৌঢ়া-গোছের মেয়েলোক কলসী ভরে পানি নিচ্ছে। কে-ও? চেনা-চেনা মনে হয় যেন! এ্যাঁ! এ যে দেখছি রেহানাদের বাড়ীর সেই চাকরাণী মজির মা!

মজির মা চাকরাণী হলে কি হবে? ওর বেশ বুদ্ধি সুদ্ধি আছে। আর আছে আন্তরিকতাও! হাসান সাহেবের সংসারে ও বহুদিন ধরে কাজ করছে। চাচী আম্মার বিয়ের সময় থেকে! চাচী আম্মাকে মজির মা খুব ভালবাসত। তাঁর অনুগতও ছিল খুব। চাচী আম্মা এবং রেহানা সম্পর্কীয় অনেক সংবাদ এই মজির মার কাছ থেকেই আমি সংগ্রহ করতাম।

মজির মা এগিয়ে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি—

ঃ কি মজির মা, কেমন আছ? কবে এলে?

মজির মা আমার দিকে ভাল করে তাকায়। চিনতে পারে। জবাব দেয়—

ঃ কয়্যাক দিন অ'ল আইছি। আপনি ক্যামুন আছেন।

ঃ ভাল।

কলসীটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মজির মা আবার বলে—

ঃ আম্মাও বেড়াবার আইছেন। রেহানা আপাও! আমি তাগো সাথে আইছি।

এতদিন পর রেহানা ও চাচী আম্মার কথা শুনে বুকটার মধ্যে হঠাৎ ধ্বক করে উঠে। বিস্মিত হয়ে বলি—

ঃ তাই নাকি!

মজির মা মাথা নাড়ে, বলে—

ঃ জ্বি! আবার দু'য়েকদিনের মধ্যেই আমাগো যাওনের কথা। আম্মা আর রেহানা আপা আপনার কথা জিগাইছিল। তা' আপনি তাগো দেখতে যাবেন না?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, বলি—

ঃ যাব বৈকি!

ঃ যাবেন। আমি আম্মারে আপনার কথা জানাই গে।

অতঃপর কলসীটা কাঁখে তুলিয়া মজির মা চলে যায়।

পদ্মার স্রোত একটানা বয়ে চলেছে। সূর্যের আলোয় চক-চক করছে। আমি অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকি। স্মৃতির পাথার উত্তাল হয়ে উঠে। তাকিয়ে থাকি আরও কিছুক্ষণ। তারপর গলি-পথটায় পা বাড়াই। রেহানাদের বাড়ীর দিকে।

বহুদিন পর আজ আবার রেহানাদের বাড়ী যাচ্ছি। আম-বাগানের সেই পথটা বুঝি এখন বন্ধ হয়ে গেছে! সে পথে বুঝি আর চলাচল করে না কেউ! আজ চলেছি ওদের বাড়ী, সামনের পথটা ঘুরে!

প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর একটু এগিয়েই বাঁয়ে মোড়। দু'দিকে সুপারি গাছের সারি। তার মধ্য দিয়ে পথ। মোড় ঘুরব। হঠাৎ দেখি সামনে হাসান সাহেব। কোথাও বেরোচ্ছেন বোধ হয়।

আমাকে দেখে তিনি যেন একেবারে কলরব করে উঠেন—

: আরে হাসিব যে! কেমন আছ, কেমন আছ হাসিব ?

আমি একটু থতমত খাই, বলি—

: জি, ভালই আছি।

: বেশ! বেশ! বেশ! হ্যাঁ, শুনেছি তুমি এম-এ পাশ করেছ। খোদার রহমত! তা' এখন যেন কি করছ ? প্রফেসরি না ? ঢাকার কাছেই বুঝি!

: জি!

: তা বেশ! তা বেশ! গ্রামের মুখ উজ্জ্বল কর বাবা! তুমি হলে গে আমাদের দেশের একটি রত্ন! আর না-ই-বা হবে কেন! তুমি তো আর যে-সে মানুষের ব্যাটা নও! তোমার মরহুম ওয়ালেদ ছিলেন এ-তল্লাটের একজন মাথা। আহা! তাঁর এন্তেকালে এ-অঞ্চলটাই যেন এখন এতিম হয়ে পড়েছে!

হাসান সাহেবের কণ্ঠটা যেন সত্যি একটু বেদনা-করুণ হয়ে উঠে। কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বলেন—

: তা' আর একটু চেষ্টা-টেষ্টা নিচ্ছ না ? কম্পিটিটিভ! ই-পি-সি-এস—সি-এস-পি। এখন আর সেদিন নাই, বুঝলে না ? এ-যুগ হোল, 'ক্যারিয়ার ওপ্‌ন্‌ড্‌ টু টেলেন্‌ট্‌।' বংশ-টংশ সব মিথ্যে! চেষ্টা করো, চেষ্টা করো, একটা চান্স নাও!

আমি কথা বলি না। চুপ করে থাকি।

হাসান সাহেব পকেট ঘড়িটা একবার বের করে দেখেন। তারপর আবার বলেন—

আমার আবার গাড়ীর সময় হয়ে এল। একটু সদরে যাব! তুমি দেখা করগে, যাও! তোমার চাচী আম্মা এসেছেন। রেহানাও এসেছে! রেহানার সাথে তোমার কত আলাপ ছিল। ছোট বেলা তোমরা এক সাথে খেলেছ, বেড়িয়েছ, স্কুলে গেছ। ক'দিনের কথা! আর তোমাদের বয়সই বা কত! রেহানা তোমাকে দেখলে খুশি হবে। প্রায়ই তো ও তোমার কথা বলে। তোমার চাচী আম্মাও খুশি হবেন। যাও! দেখা করগে যাও!

হাসান সাহেব চলে যান। আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি তাঁর গতিপথের দিকে। মনে হয়, তিনি যেন বদলে গেছেন অনেক।

প্রথম চাচী আম্মার সঙ্গেই দেখা হয়। তাঁর কদমবুসী করি। রেহানার সঙ্গেও দেখা হয়। চাচী আম্মা আমাকে দেখে প্রসন্ন হাসি হাসেন। কিন্তু তাঁর হাসিতে আগের সেই উজ্জ্বলতা যেন ফিকে হয়ে গেছে অনেকখানি। তিনি আমার সব সংবাদই জানতেন। রেহানাও বোধ করি জানত। বহুদিন পর আজ আবার চাচী আম্মার হাতের রান্না খাই। তিনি যত্ন করে সামনে বসে খাওয়ান। খাওয়া শেষ হলে এটা, ওটা জিজ্ঞাসা করেন। তারপর সেই আগের নিয়মে কি একটা কাজে চলে যান অন্য ঘরে।

রেহানা আর আমি আজ দু'জনেই বুঝি কিছুটা সহজ হতে পেরেছি। রেহানার একটা ছেলে হয়েছে। কি সুন্দর ফুটফুটে চেহারা! রেহানা ছেলেটা আমার কোলে এনে দেয়। আমি বুকে চেপে ধরি। আদর করি। কচি মুখে চুমু খাই। নরম তুলতুলে হাত দিয়ে ও আমার চুল টানতে থাকে। হঠাৎ একসময় ওর ছোট্ট মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে আমার, 'এ-শিশু আজ আমার না হয়ে অপরের কেন ?' বার বার প্রশ্ন জাগে। আমি কেমন বিমনা হয়ে পড়ি। আর জোরে ওকে চেপে ধরি আমার বুকে। পাশে দাঁড়িয়ে ছল ছল নেত্রে তাকিয়ে দেখে রেহানা। অলক্ষ্যে ওর চোখের কোণ দুটো ভিজে উঠে।

আসবার সময় রেহানা ছেলে-কোলে আমার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে আসে। কিছুদূর এসে হঠাৎ ও বলে—

: হাসু, তুমি কি আমার কথাটা রাখবে না ?

আমি বুঝতে পারিনে, জিজ্ঞাসা করি—

: কি কথা, রেহানা ?

রেহানা জবাব দেয়—

তোমাকে যে বলেছিলাম বিয়ে করতে।

আমি হাসি, উত্তর দিই—

: বলেছি তো তোমার মত যদি —

রেহানা বাধা দেয়, বলে—

: মিথ্যে কথা। আমার চেয়ে ভাল তুমি অনেক পাও!

আমি জবাব দিই না। মনে মনে বলি—

: তোমার মত মেয়ে কোন দিনই ঝাঁকে-ঝাঁকে পালে-পালে পাওয়া যায়না, রেহানা!

রেহানা ওর পূর্ব কথার জের টানে, বলে—

: আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করেই কর না। তা' না হলে এখন তোমার কত মেয়ের সঙ্গে পরিচয়, মিশা-মিশি!

আমি একটু হাসি। জবাব দিই—

: সে কথা ঠিক! জীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছি, মিশ্‌ছিও। কিন্তু তাদের কারো মাঝেই তোমাকে বুঝি খুঁজে পাইনি, পাইও না, রেহানা!

রেহানার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠে। তিবাদ করে বলে—

: যাও! যত সব বাজে কথা! শুধু ফাঁকি দেওয়ার

ফন্দি! না, ওসব চলবে না! তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, তুমি শীগ্‌গীর বিয়ে করবে।

রেহানা ওর ডান হাতখানা এগিয়ে দেয় আমার দিকে। আমি ইতস্ততঃ করি। ও জিদ ধরে—

: না, আমাকে ছুঁয়ে বলতেই হবে।

আমি আর ইতস্ততঃ না করে' ওর হাত স্পর্শ করি। জবাব দিই—

: আচ্ছা, বলছি, করব।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি রেহানার উজ্জ্বল মুখখানা যেন কেমন রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

●

গড় মাঝির দীঘি

রওশন ইজদানী

[মোমেনশাহী, কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত 'ওয়াই' নামক গ্রামে একটি অতি-পুরাতন দীঘি আছে। একে বলা হয় "গড় মাঝির দীঘি"। এর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। এর খননকারীর নাম ছিল সম্ভবতঃ 'গৌড়-মাঝি' অথবা 'গৌর মাঝি'—"গড়মাঝি" তারই বিকৃতরূপ।]

এই যে হেথায় যায় না দেখা একটা ছোট ডোবা ?
নাই কো পানি, এথায়-সেথায় সবুজ ঘাসের থোবা,
বক্‌নাতে কয় খাইছে চরে, মনোলাসে ঘাস
চোত-কাতি নাই এম্‌নি চলে দীরঘ বরষ-মাস,
উত্তরে তার ফের সে বিরাট পারের কাছাকাছ
নলের বনের ধারে ধারে শিল কদমের গাছ—
ডোবা এ-নয়—এ-এক আজব পুকুর পুরাতন
লোকে বলে এর বুকেতে লুকান অনেক ধন।
অনেক গুনে গুণী দীঘি—'গড়মাঝি' এর নাম,
এর গুণেতে হয় সমাধা অনেক কঠিন কাম।
পছিম পাড়ে ঐ যে হোথায় ছোট্ট গরীব বাড়ী,
কল্যাণে এর আজ তাহারা ফকির খেতাব ধারী।

দীঘির বুকে দাম জমেছে হাত চারি-এক পুরু
তাইতে চরে আজকে সেথায় নির্ভাবনায় গোরু।
মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোকে কাট্‌ছে সরু 'ফুক'
তায় দেখা যায় সুরমা-কালা দীঘির গভীর বুক।
বরফ-সমান শীতল পানি গেরাম বাসী খায়
ঢাল্‌লে মাথায় ঘোর-পাগলের পাগ্‌লামী দূর যায়।
পানি তো নয়, ইহার পানি—ঘোর পাগলের দাওয়া,
এই পানিতে ফকির বাড়ীর জুগায় পরা-খাওয়া।
এই পুকুরের দৌলতে আজ তাদের মাথায় 'তাজ'
ভুগ্‌ছে পুরুষানুক্রমে জমিন লা-খেরাজ।

দীঘি এমন গুণের দীঘি, শুন্‌তে লাগে তাক
চতুর্দ্দিকে আজও দীঘির অনেক নাম ও ডাক।
লোকে বলে এই দীঘিতে আছে জিনের মাল—
সিন্ধুক এবং ডেকচি বোঝাই ঘটি-বাটি-থাল।
পয়-পরবে মেজমানীতে চাইলে গিয়া পারে
থাক্‌তো উঠে থালা-ঘটি দীঘির ঘাটের ধারে।
কাজের শেষে পাড়ে আবার ফেরৎ দিলে সব
নাম তো হঠাৎ দীঘির বুকে অমনি ঝপাঝপ।
হইত এসব—হয়না এখন, হইতো অনেক আগে
আজকে তাহা বন্ধ দিছে জিনেই নাকি রাগে।
এনে বাসন একটা কে তার করলে বদল পর
নেয়নি ফেরৎ দীঘিতে আর আগের বরাবর।
ভয় খেয়ে পর আসল বাসন ফেরৎ হলো দেওয়া,
লইলো পুকুর সকল বাসন—হইলও এ-শেষ-নেওয়া

লোকে বলে এ-''গড় মাঝি'' মেঘনা গাঙের সুত,
এই দীঘিতে ভেসেছিল বৈঠা এক অদ্ভুৎ।
মরছিল এক নাও বিপাকে মেঘনা গাঙের বুকে
মালিক তাহার দেশ-বিদেশে ঘুরতো মনের দুখে,
বৈঠাতে তার কৌশলেতে লুকান ছিল ধন
এই কারণে ঘরেতে আর বান্‌তো না তার মন,
ঘুরতে এসে সেই ব্যাপারী ছন্ন-ছাড়ার বেশ
অতিথ হলো 'ফকির-বাড়ী' সে-এক দিনের শেষ।
দেখ্‌লো চেয়ে ঘরের মাঁচায় বৈঠা তাহার সেই—
উঠ্‌লো হৃদয় রঙ্গে নেচে ''বৈঠা তো মোর এই!''
বাড়ীর মালিক শুনেই তাজব ঃ "বলেন কি সব বাত।"
সত্য প্রমাণ হইল শেষে বৈঠা চিরার সাথ।
বৈঠা-মালিক পাইলো তাহার সকল হারান ধন,
আগা-গোড়া সকল খুলে বল্‌লো বিবরণ!
সেদিন থেকে জানলো সবাই জোয়ান-বুড়া-শাদা
মেঘনা গাঙের "সোতার" সাথেই ইহার সোতা বাঁধা।
পরখ করে গেলো পাওয়া অনেক গভীর জল
উত্তর দিকে যায় না কভু মোটেই পাওয়া তল।
নাই বরষা, চত্রি-কাতি—আজও হরেক মাসে
দামের উপর দাঁড়ায় পানি—হঠাৎ জোয়ার আসে।
ভাটার সময় আট্‌কে দামে বিরাট গজার মাছ
খায় না মানুষ,—ভয়েই তাহার মাড়ায় না কেউ কাছ।

কত কালের পুরাণ দীঘি, বয়স তাহার কত
বুড়ার বুড়া টাবগা মুড়াও বল্‌তে নারে তত।
কয় শুধু যে কর্‌লো খনন "গড়মাঝি" তার নাম,
আজও তাহার কাহিনী-কথা বলে নগর-গ্রাম।
অনেক গভীর করেও দীঘির পায়নি পানির চিন্
জানলো মাঝি স্বপ্নে পরে মাঝরাতে একদিন
বল্‌ছে ডেকে কে যেন্ তারে—তার 'অবিয়াইত' মেয়ে
দিলেই পূজা উঠবে পানি দীঘির তলায় যেয়ে।
সুন্দরী সেই কইনা মাঝির ছিল নয়ন-তারা
ছিল না আর ডাকের নিধি কন্যা-সে এই ছাড়া,
মান্‌লো না-সে কাহার মানা রাখ্‌লো না কার মন
দীঘির তলায় কর্‌লো নেমে পূজার সমাপন,
অম্‌নি তাহার সাথে সাথে ফাট্‌লো দীঘির বুক
আচম্বিতে পাতাল ফুঁড়ে উঠ্‌লো বিরাট মুখ।
দেখ্ দেখা দেখ্ হইল দীঘির গলায় গলায় জল,
সুন্দরী সেই কইনা মাঝির হইল ডুবে তল।
কয় লোকেরা আজিও নাকি হইলে গভীর রাতি
শুন্‌তে পাবে সাবধানী জন নীরব শ্রবণ পাতি।
ঘাটে এসে সেই মেয়েটি নিতুই ভরে জল,
হাতে বাজে কাঁকন-চুড়ি, পায়ে ঘুঙুর মল।
এই ভয়ে কেউ যায় না ঘাটে গভীর রাতের বেলা,
লোকে বলে এ-সব শুধু জ্বীন-পরীদের খেলা॥

পলাশীর পর ও সিপাহী যুদ্ধের আগে

· হায়দার আলী

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

আমরা প্রথমতঃ রঙ্গপুরের জাগগানের কবি রতিরাম দাস রচিত, পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত ও সাহিত্য পরিষদ হ'তে প্রকাশিত জাগ-গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি এবং পরে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু তৎপূর্বে রতিরাম দাসের কবিতার কিছু কিছু অংশ নবীন পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কবি রতিরাম দাস রঙ্গপুর জিলার সদর মহকুমার প্রসিদ্ধ 'ইটাকুমারী' গ্রামে রাজবংশী ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁনি বিশেষ কিছুই লেখাপড়া জানতেন না ; তবে এঁর কবিতার কোন কোন পংক্তি হীরার টুকরার মত উজ্জ্বল হয়ে চিরদিন থাকবে—একথা আমরা জোর ক'রে বলতে পারি। পূর্বে যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীরা শরীরচর্চা, ঘোড়ায় চড়া—ইত্যাদি কুস্তি-কসরৎ করে শরীরকে বলশালী ও মজবুত করত ; এমনকি, সাধারণ ঘরের পুরুষেরাও শরীর-চর্চা, লাঠি-খেলা, সড়কী-চালনা,—ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিল। পূর্বের বন্দুক, তলোয়ার, লাঠি উধাও হ'য়ে গিয়ে পুরুষদের হাতে এসেছিল ছড়ি, তা-ও এখন আর নাই। এখন পুরুষদের মেয়েলী স্বভাব, শরীরের মেয়েলী-গঠন, ·গড়ন ; অথচ আমাদের রতিরাম দাস পুরুষের যা' বর্ণনা দিয়েছেন—তা সত্যাই একক, অভিনব—কুলটা রমণীর উপপতির রূপ বর্ণনা।

"মাঠের মতন কেমন ওসার *
পাটার (১) মতন বুক।
সে কঠিন বুক দেখি শত্রু রুর
শুকাইয়া যায় মুখ॥
বুক-রাজ পাটে কে আসি বসিবে
কে হইবে এখানে রাজা।
জোর করি মুক্তি দখল করিমু
মোর বুক বড় তাজা॥
মোটা মোটা তার হাত দুইখানি
নোহা (২) দিয়া যেন গড়া।
ড্যানা (৩) দুইখানি নোহার মতন
হাড়ে মংসে (৪) রগে জড়া॥
সিদা (৫) যদি করে বাইমের (৬) মতন
মাঝোতে মাঝোতে ফুলে।
জোরেতে নগুলে (৭) টিপা যদি যায়
খাল নাহি পড়ে মূলে॥
সে দাপনা (৮) দুটি আপনার করিচোঁ (৯)
কিছুতে নাহি মোর ভয়।
এ ননীর দেহ সখাবে তাহার
সকল দাপট (১০) সয়॥"

[রঙ্গপুরের জাগের গান।
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা,
রঙ্গপুর শাখা; সন ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা
১৮৮ পৃঃ]

মহাপ্রেমিক কবি তাঁর কাল্পনিক বঁধুয়ার যে রূপ-গড়ছেন, তা' সত্যই অপরূপ ; যেমনি তার ভাষা স্বচ্ছ, সহজ, সরল তেমনি তার অনাড়ম্বর বর্ণনা ভঙ্গিমা :—

কুলটা রমণীর উপপতির রূপ বর্ণনা।

"জনম ভরিয়া বঁধুয়ার রূপ
দেখিছোঁ (১) মিটেনা আশ।
দেখিতে দেখিতে তেঁওতো মিটেনা
আরো বাড়ে হাভিলাষ (২)॥
চৌকের (৩) কখন আলিস (৪) হয়না
পড়েনা চৌকের পাতা।
সে রূপের সনে মিছামিছি কেনে
দেখাইমো লতাপাতা॥
বঁধুয়ার রূপ বঁধুয়ার মত
আর নাই সে রূপের মত
কালা মাণিকের রঙ্গও হার মনে
তোমাকে বুঝামো (৫) কত॥"

[১৮৬—১৮৭ পৃঃ]

রাধার শাক তোলা।

"খুঁরিয়া (৬) বতুয়া (৭) শাকে ক্ষেত গেইছে (৮) ভরি।
রাধা যায় শাক, তুলিতে নয়া (৯) ডালি ধরি॥

° • ° ° • ▪

---

* চওড়া। (১) বাটনা বাটা পাথর। (২) লোহা। (৩) বাহু (৪) মাংসে। (৫) সোজা। (৬) বাইন মাছের মত, অর্থাৎ পেশী (muscle) সংযুক্ত। যেমন বাইম মাছের গাত্রে দেখা যায়। (৭) অঙ্গুলিতে। (৮) বাহু। (৯) করেছি। (১০) বেগ

(১) দেখেছি। (২) অভিলাষ। (৩) চোখের। (৪) আলস্য (৫) বোঝাব। (৬) নটেশাক। (৭) বাতুকশাক। (৮) গেছে (৯) নতুন।

নাজ নাই নজ্জা নাই গাবুর (১০) বউরী (১১)।
শাক তুলিতে এমন বউকে দেয় কেমন করি॥
ঐ যে আইসে নন্দের বেটা জুয়ান জাওয়ান কানু।
কেনে আইসে আইলে আইরে বুঝিরে না পানু॥
কেমন করি চৌকে চায় গিলিয়া যেমন খায়।
জুয়ান বউরী দেখি এই ভিতি (১) ধায়॥
চিটুল (২) চাউনি তার মুখে মুচ্‌কি হাসি।
রাস্তায় ঘাটায় (৩) পাইলে আগে আঞ্চল ধরে আসি॥
কোনদিকে যাই এখন এ বড় বালাই।
যেদিকে পালাই এখন সেই দিকে কানাই॥
[৮৬—৮৭ পৃঃ]

কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা।

"ছিপছিপানি (৪) বিষ্টি পড়ে ঘাড়ে নিল ছিপ্ (৫)।
অন্তরে আগুন জলে করিয়া খিপ্ খিপ॥
বাঁও হাতে (৬) বল্লার চাক (৭) ধরাত্ (৮) গুঁজে বাঁশী।
মাছ মারিতে চলে কানাই মুখে মধুর হাসি॥
যেই ঘাটে সিন্নান করে রাধা বিনোদিনী।
সেই ঘাটে বড়শী ফেলায় কানাই গুণমনি॥
জলেতে ভাঁসিয়া পাতা (৮) করে টিপ্ (৯) টিপ্।
দুই হাতে টানিয়া কানাই তুলিয়া ধরে ছিপ্॥
রাধা কয় কি এ মাছ রুই না কাতল।
রুই মাছের মুড়া মিঠা আর মিঠা কোল (১০)॥
কানাই কয় কেন মামী দেন জলের ছিটা।
তোমার কোল হতে কি মামী রুয়ের কোল (১১) মিটা॥"
[১৬৯]

কবি রতিরাম সম্বন্ধে লিখ্‌বার জন্য আমরা সকল কবি-সাহিত্যিক প্রভৃতিকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এবার দেবী চৌধুরাণীর পালা। 'দেবী চৌধুরাণী'—এ-নামটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে অমর ক'রে রেখেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমবাবু লিখেছেন—

"দেবী চৌধুরাণীরও [আনন্দ মঠের ন্যায়] ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার Statistical-Account মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।"

অথচ বঙ্কিম একথা বলতে সাহস পাননি যে, পাঠক-পাঠিকাগণ রংপুরে এসে সরেজমিনে তদন্ত করলে জানতে পারবেন। হাণ্টার প্রমুখ ঐতিহসিকরা ইংরাজ শক্তিকে এদেশে চিরস্থায়ী করবার মানসেই ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করেছে। এ দেশীয় অনেক ঐতিহাসিকই তার প্রমাণ দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। ইংরাজের যারা তল্পীবাহক মানে ভাত-কাপড়, চলা-ফেরা, বাড়ী-গাড়ী, পোষক-পরিচ্ছেদ আরও বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এসেছে; ভারত উপ-মহাদেশের সর্ববিধ স্বার্থকে জলাঞ্জলি-দিয়ে, তারা বলতে পারে ইংরাজরা এদেশে এসে এদেশের প্রভূত কল্যাণ ও উপকার হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ন্যায়ের তুলাদণ্ডে বিচার করেন, স্বদেশ প্রেম বুকে নিয়ে তাঁরাই বলবেন, ইংরাজদের লোমহর্ষক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও গোটা দেশটার অধিকাংশ লোককে লোভী ও চরিত্রহীন করে তুলবার কথা। ডিপুটি বঙ্কিমবাবুও ইংরাজদের একজন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইংরাজ-নফরদের স্বাধীন-মত বলতে কিছুই ছিলনা। তা আমরাও দেশবিভাগের অনেক পূর্ব হ'তে লক্ষ্য ক'রে এসেছি। বঙ্কিমের উপাস্য প্রভু লেপ্টেন্যাণ্ট ব্রেণান যা' বলেছে তার কিছুটা এ-স্থানে উদ্ধৃত করে দে'য়া হ'ল:—

"ভবানী পাঠক নামক এক বিখ্যাত দস্যুর সহিত এই স্ত্রীলোক ডাকাত দেবী চৌধুরাণীর যোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণী নৌকাতেই থাকৃত। তার বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ [সিপাহী] ছিল, এবং এতদঞ্চলে তার প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল খুব বেশী। দেবী চৌধুরাণী নিজে ত ডাকাতি করতই, ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিরও ভাগ পেত। চৌধুরাণী উপাধি থেকে মনে হয়, দেবী চৌধুরাণী হয়ত জমিদার ছিল। তবে তার জমিদারী বৃহৎ ছিলনা, কেননা তাহলে ধরা পড়ার ভয়ে সে নৌকাতে নৌকাতে থাকৃবে কেন?"

'বঙ্কিম স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি'
—অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
২০শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল,
[৬২ পৃঃ]

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁর উক্ত 'বঙ্কিম স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি' প্রবন্ধে বলেন—

"এখানে জিজ্ঞাস্য এই, দেবী চৌধুরাণী যদি সাধারণ ডাকাতই হত, তবে যে অঞ্চলে সে ডাকাতী করছে সেই অঞ্চলে তার এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে কিরূপে এবং থাকা সম্ভবপরই বা হয় কি করে?" [৬২ পৃঃ]

ইংরাজ কর্মচারী ব্রেণান রণরঙ্গিনী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর আসল নাম না দিয়ে শুধু 'দেবী চৌধুরাণী' বলবার হেতু বা কারণটা কি? ব্রেণান না বললেও আমরা জানি, সাম্রাজ্য রক্ষা করবার কু-মৎলবেই জয়দুর্গা

(১০) যুবতী (১১) বউ। (১) দিক। (২) চঞ্চল। (৩) রাস্তায়, পথে। (৪) টিপটিপ বৃষ্টি। (৫) বড়শীর ছিপ। (৬) বামহস্তে। (৭) বোলতার বনচক্র, বোলতার চাক। (৮) বড়শী কোনা, বড়শীর গাড়া। (৯) একবার ডুবে একবার ভাসে। (১০) পেটা। (১১) ক্রোড়।

দেবী চৌধুরাণীর নাম বে-মালুম গোপন করে গেছে। স্থবাদার নবাব বাকের মোহাম্মদ নূর উদ্দিন ও তৎবংশীয়দের নাম এবং মসিমপুরের যুদ্ধ প্রভৃতির বেলায় যদ্রূপ নাম গোপন করা হয়েছে, তদ্রূপই জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নামও গোপন করা হয়েছে ঠিক একই উদ্দেশ্যে—একই কারণে। সাহিত্য পরিষদের করিৎকর্মা কর্মকর্তারা জয়দুর্গার পরিচয় বিশেষরূপেই জানতেন—তা' তাঁদের লেখা মন্তব্য হতে পরিষ্কার বুঝা যায়। তথাপি জয়দুর্গার সম্বন্ধে এসব সাহিত্য পরিষদের করিৎকর্মা মহারথীরা কেন লিখ্‌লেন না—সে কথা আজ আমরা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করি। আসলে এসব ইংরাজের পোষ্য জমিদার ও চাকুরী-জীবির দল। এরা যেমন জয়দুর্গার পরিচয় জানতেন, ভবানী পাঠকের পরিচয়ও তদ্রূপ জানতেন। জানতেন নবাব বাকের মোহাম্মদ নূর উদ্দিন, কামাল-উদ্দিন, সম্রাট-মহিষী বেগম লালবিবি এবং ভারত উপ-মহাদেশের স্বর্গতুল্য—'নগরে'র বৃত্তান্ত। জানতেন সাহিত্য-পরিষদের মহা-গবেষক পণ্ডিতরা রংপুরের মহল্লার নাম 'বাকের কাশানা', 'কামাল কাশানা' ইত্যাদি কেন হল! কাশানা ওয়ালা কামালটাই বা কে, তা-ও কি তাঁরা জানতেন না? হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান—এঁদের কারুরই কাশানা ছিল না, এক মোগলদের ব্যতীত। অথচ সেই কাশানার উপরেই রঙ্গপুর শহরে বাস ক'রেও এসব ইংরাজ পোষ্য দালালরা কাশানা কি, আর কাকেই বা বলে তা' জানলেন না! 'রঙ্গপুর', কার রঙ্গপুর, এখানে কার রংমহল ছিল—তা-ও জানলেন না—এসব বিশ্বাসঘাতক দেশোদ্রোহী বিদেশীর ফেনচাটা কুকুরের দল! এদেরেই বা এদের মত হতভাগাদের দ্বারাই ইংরাজরা তাদের যতকিছু অনাচার, অত্যাচার, লুণ্ঠন, পেষণ, শোষণ চালিয়েছে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কারুরই নিন্দা, গ্লানি করিনে—করতে চাইনে। জাতির খাতিরে পরদেশী ফেনচাটাদের আসল রূপ তুলে ধরাই হ'ল আমাদের উদ্দেশ্য। এরা বা এদের যে কোন গোষ্ঠী বা দল অথবা অন্য যে কোন লোক আমাদার বর্ণিত মূল বিষয়গুলি যদি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে পারে বা পারেন, তবে তাঁদের অভিমতকে আমরা সানন্দে আমাদের মতের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত আছি।

প্রত্যক্ষদর্শী রতিরাম দাস, জাগগানের মধ্যে ইংরাজ কর্মচারী দেবী সিংএর অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে দেবী সিংএর অন্যায়ের প্রতিবাদকারী জমিদার রাজারায়ের পুত্র শিবচন্দ্র রায় জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর বীরত্বগাঁথা সুর দিয়ে হাজার হাজার লোককে কাঁদায়েছেন। কবি রতিরাম দাস যে কবিতা রচনা করেছেন তাতে রয়েছে—

"মন্থনার কর্ত্তী জয়দুর্গা চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি॥
শিবচন্দ্রের কাজকর্ম্ম তার বুদ্ধি নিয়া।
তার বুদ্ধির পত্তিষ্ঠা (১) করে সকল (২) দুনিয়া।"

রঙ্গপুর সহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
সন ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা।
[১৮০ পৃঃ]

"পীরগাছার কর্ত্তী আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনতে (৩) বৈসে একে একে সবি॥"

[১৮১ পৃঃ]

"কারো মুখে নাই কথা হেটমুণ্ডে (৪) রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয়॥
যেমন হারামজাদা রাজপুত ডাকাইত।
খেদাও (৫) সর্ব্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত॥
জলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই?॥
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ্ তলোয়ারে॥
করিতে হৈবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু॥"

[১৮২ পৃঃ]

এখন কথা হ'ল, পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য 'শতদল' নাম দিয়ে মধুসূদন দেব প্রণীত একখানি বাংলা সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পুস্তকে 'রাণী চৌধুরাণী' নামে একটি গল্প রয়েছে। তাতে যা' রয়েছে তার কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"রঙপুর ফতেপুরের জমিদার ছিলেন রাজা রায়। সেই প্রকাণ্ড চাকলার একাই ছিলেন অধিপতি। সে সময়কার মন্থনা বামনডাঙ্গা প্রভৃতি পরগণা তাঁহার জমিদারী। রাজধানীর নাম ইটাকুমারী...

রাজা শিবচন্দ্র ও রাণী জয়দুর্গা চলিলেন প্রজাদের সঙ্গে এই অভিযানে—দেবীসিংহের রঙ্‌পুরের বাড়ী-ঘর লুট করিতে।...

রাণী জয়দুর্গা চলিলেন সকলের আগে। অপূর্ব তাহার রণবেশ! বৃহৎ এক শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়াছেন তিনি...।"

উক্ত গল্পের এক জায়গায় লেখক শিবচন্দ্রের স্ত্রী করেছেন জয়দুর্গাকে। কি করে শিবচন্দ্রের স্ত্রী জয়দুর্গা হ'ল—এটা আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। 'শ্বেত-

(১) প্রতিষ্ঠা। (২) সকল। (৩) নাটমন্দিরেতে। (৪) অধোমুখ (৫) তাড়াও।

'অশ্বপৃষ্ঠে' তিনি জয়দুর্গাকে চড়িয়েছেন—তা তিনি চড়ান;

'জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে'—একথার উপরে জয়দুর্গাকে শিবচন্দ্রের স্ত্রী বলে ধরে নে'য়া যায় না। আমরা যতদূর জানি, কবি রতিরাম দাসের কবিতা ব্যতীত 'শিবচন্দ্র-জয়দুর্গা'র কথা আর কোন পুঁথি-কেতাব বা ছড়াগানে নেই। অথচ লেখক কোথায় পেলেন শিবচন্দ্রের স্ত্রী জয়দুর্গা তা আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট হ'তে জানতে পারলে সুখী হতাম। 'ফতেপুর যেমন একটা জমিদারী এষ্টেট ছিল, মন্থনা'ও ঐরূপ ঐ সময়কারই জমিদারী এষ্টেট। ফতেপুর জমিদারী হিসাবে খুবই বড় ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"বৈদ্যবংশ চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবী সিংহের অত্যাচার আর নাহি সয়॥
রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার।
সবাকে লিখিল পত্র সেঠ্‌টে আসিবার॥"

[১৮০ পৃঃ]

শিবচন্দ্র বৈদ্যবংশসম্ভূত—ইহা কবি রতিরাম দাস যেমন বলেছেন, আমরাও তাই জানি।

"পীরগাছার কর্ত্রী আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনতে বৈসে একে একে সবি॥"

[১৮১ পৃঃ]

'পীরগাছা' অর্থাৎ একটি গ্রামের নাম, আর 'মন্থনা' হ'ল পরগণার নাম। পীরগাছার জমিদাররা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। এই পীরগাছার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর স্ত্রী হলেন প্রথিতযশা স্বদেশ প্রাণা বীরাঙ্গনা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী। শিবচন্দ্র রায় বা তাঁর পিতা রাজারায়ের জমিদারীর কোন কোন গ্রাম হয়ত সে সময় তাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। রতিরাম বাবু সম্ভবতঃ সে সময় ভাবেননি যে কোনো এক সময় তাঁর এই গানগুলি ইতিহাসের অন্তর্গত হবে। তাই তিনি ঐভাবে গান রচনা করেছেন। সে যা-ই হোক নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পর জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর উপরে জমিদারীর কর্তৃত্বভার এসে পড়ে। ঐ সময় ১১৭৬এর মন্বন্তর এবং তার পূর্বে ও পরে ফকীর-সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, অসন্তুষ্ট-সেনা-বিদ্রোহ, প্রজা-বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-লোকদের-বিদ্রোহ ;—প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নাম দিয়ে ঐ সময়কার ব্রিটিশ মীরজাফর প্রভৃতিদের বিরোধী সংগ্রামকে ঐ সব যা-তা নাম দিয়ে চিত্রিত করা হ'য়েছে।

মধুসূদন দেব মহাশয়ের মত আর একজন লিখক 'দেবী চৌধুরাণী'কে বামন ডাঙ্গার জমিদারদের বংশসম্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের নাম হ'ল কেশবলাল বসু। ইনি "দেবী" নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন ও নীচে তারকা চিহ্নিত ক'রে লিখেছেন—

"দেবী চৌধুরাণীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বামনডাঙ্গা দর্শনে লিখিত।"

উক্ত লেখকের কবিতাটির নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দে'য়া হ'ল—

দেবী।

"কেবা কোন্ যুগে "চৌধুরাণী" এ নাম দিল কোনদিন।
জ্ঞানের আঁধার পাঠকের শেষ ভস্ম কোথায় লীন!
কোথায় বিরাট চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া "রাণী"—
সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা তুষিলেন সাধো প্রাণী।
... ...
ঘাটে ঘাটে বাঁধা তরণী হেরিয়া আজি মোর মনে হয়,
দেবীর সৈন্য বহিবার তরে বুঝি ঘাটে বাঁধা রয়।
কোথা রঙ্গরাজ, রসরাজ কোথা, দিবানিশি দুইবোন,
পিপীলিকাসম দেবীর সৈন্য কোথা আজি অগণন।
... ...
রঙ্গবধূর সুখের স্বপন-সফল-পিয়াসী চিত,
প্রফুল্লের পাদস্পর্শে এ ঘাট হয়েছিল আলোকিত।
বুঝাইলা দেবী নিজের জীবনে স্ত্রীলোকের কোথা স্থান,
"দেবীরাণী" তাই প্রফুল্লের মাঝে লভিলা নূতন প্রাণ।"

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
২০ভাগ, ২য় সংখ্যা ১৩৪৩ সাল
[৬৭—৬৮ পৃঃ]

স্বর্গীয় কেশববাবু একেবারে আকাশে লাফি মেরেছেন—বামনডাঙ্গার বংশীয়া করিতে চেয়েছেন দেবী-চৌধুরাণীকে। নিরীহ স্কুল-শিক্ষক কেশববাবু কবিতা লেখা ছেড়ে ইতিহাসে লাফ দিয়ে যাবার কারণ হ'ল—তৎকালীন রঙ্গপুর জেলাবোর্ড ও সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁকে নাকি পাঁচশ' টাকা নগদ দিয়েছিলেন—'দেবী চৌধুরাণী' ইতিহাস লেখার জন্য।

পরে আরও টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা' না দে'য়ায় তিনি লেখা বন্ধ করেন। ঐ সময় জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি। এর পেছনে গভর্ণমেণ্টের কোনো হাত বা উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা' এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নি। ভবানী পাঠকের সহকারী রঙ্গপুরের রাজা কামালউদ্দিনকে 'রঙ্গরাজ' করেন নি তো? শুদ্ধি করবার প্রথা তো তখন হ'তেই ছিল। যা-ই হোক্, কেশবলাল বসু মহাশয় দেবী চৌধুরাণীকে বামনডাঙ্গার বর্তমান জমিদারের পূর্বপুরুষ বলে উল্লেখ করার মধ্যে কিছুটা কারণ ছিল। জাগ-গানের কবি রতিরাম ইংরাজ বিরোধী দেবী বা চৌধুরাণীর নাম বলেছেন—'জয়দুর্গা চৌধুরাণী'। কেশববাবু তাঁর দেবী

চৌধুরাণী বা প্রফুল্লের আসল নাম প্রকাশ করতে সাহস পান নি। হান্টার, যামিনী মোহন ঘোষ, এ, ক্যাসেল্‌স্ প্রভৃতির মত কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করবার মানসে অর্থাৎ 'হয়'কে 'নয়', 'নয়'কে 'হয়' করবার ফন্দীতে ছিলেন। কিন্তু ১৩৪৬ সাল; সুতরাং প্রতিবাদের ঝড়ের ভয়েই হোক অথবা কর্তৃপক্ষীয়দের প্রতিশ্রুতিমত টাকা না দে'য়ার কারণেই হোক, তিনি আর প্রফুল্লকে বামনডাঙ্গায় নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে চাননি। ১১৭৬ এর মন্বন্তরের কয়েক বৎসর পরে বা ঐ সময় তৎকালীন বামনডাঙ্গা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। সেই পরিবারে পবিত্রা দেবী নাম্নী ঐ ব্রাহ্মণের ঘরে এক মেয়ে জন্মেছিল। এই পবিত্রাই কর্ণওয়ালিশ অথবা তাঁর কিছু পূর্বে হেষ্টিংসের সময় বামনডাঙ্গা পরগণার জমিদারী লাভ করেন। এর পূর্বে ঐ পবিত্রার ভাইয়েরা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। বঙ্কিম বাবু যে ব্রাহ্মণীর [নিশি] কথা উল্লেখ করেছেন, প্রফুল্লের অর্থাৎ দেবী চৌধুরাণীর সেবীকারূপে; তাই কেশবলাল বসু প্রফুল্লকে ['দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমের] পবিত্রা নাম করতে সাহস পান নি। বঙ্কিম বাবু তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী'র মধ্যে আর একজন সেবিকার নাম 'দিবা' বলে উল্লেখ করেছেন।

সেই 'দিবা'র নাম হ'ল অলকানন্দা। এ 'কাকিনা'র ১১৭৬এর মন্বন্তরের সময়কার জমিদারের স্ত্রী। এই অলকানন্দা সম্বন্ধে ছড়াগানে এখনও বলা হয়—

"অল্‌কা নটির কপাল ভাল।
হাত্তীত চড়ি' রংপুর গেল॥"

উল্লেখযোগ্য যে, বামনডাঙ্গা গ্রামে ইংরাজ-বিরোধী সন্ন্যাসীদের মঠ ও সৈন্য থাকবার দুর্গ ছিল এবং এখনও তার অনেক কিছুই রয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের মূল আখ্‌ড়া ছিল 'নগরে'র পাশে—'সাহাগঞ্জে' [সাহেব গঞ্জ]। আমরা বামনডাঙ্গা জমিদার পরিবারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। ইতিহাস লেখার খাতিরে এবং সত্য প্রকাশের জন্য বাধ্য হয়ে রংপুরের স্থানীয় সুপ্রাচীন লেখকেরা যা' বলেছেন—তা' এখানে উদ্ধৃত করব। বামনডাঙ্গা সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি সত্য না হলে আমরা সুখী হব। তাঁদের যদি কিছু বলার থাকে, তাও আমরা প্রকাশ করব। কেননা, মিথ্যা-বর্জিত ইতিহাসের আজ যেমন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এমনটি আর কোনো সময়ই হয়নি। তাই শুধু স্বদেশের মঙ্গলার্থে আমরা প্রাচীন লোকদের কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিতে চাই। তাঁরা যা' বলেন তা' সংক্ষেপে এই—

বামনডাঙ্গার জমিদাররা হেষ্টিংসের সময় সাধারণ গরীব গৃহস্থ ছিল। ঐ গরীব গৃহস্থের ঘরে এক সুন্দরী মেয়ে জন্মগ্রহণ করে—তার নাম হ'ল 'পবিত্রা'। এই পবিত্রাকে ইংরাজবিরোধী জমিদার ও মহাজন সন্ন্যাসীরা যে ভাবেই হোক নিয়ে গিয়ে তাদের আশ্রিতা করে রাখে এবং কাকিনার জমিদারের স্ত্রী অলকানন্দাকেও ঐ সন্ন্যাসীরা তাদের আশ্রয়ে আশ্রিতা করে রাখে।

যখন সন্ন্যাসীরা ইংরাজ ও কোচবিহারের রাজার সহিত লড়াই করতে পাটগ্রামে যায়, তখন ইংরাজের গুপ্তচর ও দূত রামকান্ত মুন্‌শী* জমিদারীর ও আরও অনেক কিছুর লোভ দেখিয়ে পবিত্রা ও অলকানন্দার সহিত গোপনে পরামর্শ করে; এবং যখন বাকের মোহাম্মদ নূর উদ্দিন জঙ্গ বাহাদুর 'মুবারকোট' হতে পাটগ্রাম যাবার মানসে কাকিনার দেড় ক্রোশ পূর্বে 'পলাশী' নামক গ্রামে নবাব নির্মিত মস্‌জিদ ও কুঠির সম্মুখীন হন, ঐ সময় নবাবের সহিত মাত্র ১৫।২০ জন দেহরক্ষী ও মন্ত্রী দয়াশীল ছিলেন; উক্ত অলকানন্দা ও পবিত্রা [দিবা ও নিশি] সন্ন্যাসীদের পাঞ্জা দেখিয়ে নবাবকে ভিন্নপথে চালিত করে, কোচবিহারের দিকে ঠেলে দেয়। নবাব ঐ পথে গিয়েই ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সৈন্যচক্রের মধ্যে পড়ে যান এবং স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ হয়; ঐ যুদ্ধে নবাব গুরুতরভাবে আহত ও রাজা দয়াশীল হত হন। পরে কোনোক্রমে নবাবকে 'নগরে' নিয়ে আসা হয় এবং অল্প কয়েকদিন পর নবাব 'নগরে'ই [ফুলচৌকিতে] ইন্তেকাল করেন। যা হোক, ঐ সময়ের পর হতে পবিত্রা জমিদার হন এবং পবিত্রার মৃত্যুর পর তাঁর ভাইয়েরা ঐ জমিদারীর মালিক হয়ে পুরুষানুক্রমে ভোগ করতে থাকেন। এর কোনো ছেলেপেলে ছিল না। অলকানন্দারও কোন ছেলেপেলে ছিল না। অলকানন্দার পোষ্য পরবর্তীকালে কাকিনার জমিদার বলে পরিচিত। 'পবিত্রা' অর্থাৎ 'নিশি' হলেন ব্রাহ্মণী ও 'অলকানন্দা' হলেন বৈদ্য, 'দিবা'। অলকানন্দার স্বামী, শ্বশুর—এরা

---

* রামকান্ত মুন্‌শী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যা-মহার্ণব বলেন, "দেবী সিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গবাসীগণ প্রপীড়িত হওয়ায়, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। ঐ সকল জেলার বন্দোবস্তের জন্য রামকান্ত ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণে অচিরে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। হেষ্টিংস তজ্জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর্তমান নদীয়া জেলাস্থিত পরগণা তালবেড়িয়া ও বলবেড়িয়া নামক দুইখানি তালুক, একটি মুক্তাখচিত সিরপেঁচ এবং রজত নির্মিত হীরকখচিত আধারসহ একখানি সুন্দর তরবারি খেলাৎ প্রদান করেন। ['বাংলা-বিশ্বকোষ']

মুক্তাজড়িত সিরপেচ রজতনির্মিত হীরকখচিত আধার সহ যে তরবারীখানি উক্ত রামকান্ত মুন্সী পায় তা নবাব বাকের জংগের বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। —(লেখক)

পূর্ব হতে জমিদার ছিলেন। বঙ্কিমের প্রফুল্লের নামই জয়দুর্গা দেবী।

বঙ্কিমের 'দেবীচোধুরানী' [মূল গ্রন্থের পুমুর্দ্রণ, ৪৫নং পটুয়াটুলী, ইসলামপুর, ঢাকা; প্রকাশক: শ্রী-সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।] গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ আমরা পাঠকদের কাছে উদ্ধৃত করে দিলাম। উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমবাবু লিখেছেন :—

"প্রফুল্ল স্পন্দনহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল।"

আসলে প্রফুল্লের নামই জয়দুর্গা তা' পূর্বেই উল্লখ করা হয়েছে। জয়দুর্গার আসল নামটি না দিয়ে বঙ্কিম-বাবু গ্রামের নাম দুর্গাপুর দিয়েছেন।

"সুন্দরী [অর্থাৎ নিশি]। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ-মার কাছ ছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।" (৫২ পৃঃ)

এ ছেলেধরা আর কেউ নয়—সন্ন্যাসীরা।

"ও বামুনীর মুখটা বড় কদুয্যি।" (৫২ পৃঃ)

"আমি বামুনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামুনী নই।" (৫২ পৃঃ)

যাঁরা বঙ্কিমের গ্রন্থ কোনদিন পড়েন নি—সেই সুপ্রা-চীন অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বৃদ্ধরা বলেন—পবিত্রার বিবাহ হয়নি। তাঁর ভায়েরাই ইংরাজদত্ত সম্পত্তি পায়।

"নিশি ঠাকুরানী রাজার ঘরে থাকিয়া পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।"

(পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৫৯ পৃঃ)

ভবানী ঠাকুর মানে ভবানী পাঠক—ইঁনিও 'রাজা'ই ছিলেন। 'ফুল খাঁ' চাকলার ইঁনি জমিদার এবং যে সন্ন্যাসীরা নিশিকে চুরি করে নিয়ে যায় তাঁরা জমিদার ছিলেন।

ভবানী পাঠক হয়ত সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না; ইংরাজকে না তাড়ান পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বলে মনেহয়। তাই ইংরাজরা অনেক সন্ন্যাসীকে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে ইতিহাসে উল্লেখ করেছে।

"প্রফুল্ল। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শেখাইবে? নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক-বালিকা ভিন্ন দলে রাখেনা। তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল।" [৬২]

উক্ত স্থানে বঙ্কিমবাবু তারকাচিহ্ন দিয়ে লিখেছেন—"এ কথা Warren Hastings নিজে লিখিয়াছেন।"

সন্ন্যাসীরা বলিষ্ঠ ছেলে নিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে চুরি-ডাকাতি করতেন না এদের দিয়ে ইংরাজদের এদেশ ছাড়া করবার মরণ পণ সংগ্রাম করতেন। ইংরাজ উক্ত বঙ্কিম-বাবু—'রামেরটা শ্যামের, আর শ্যামেরটা রামের' করেছেন। ইংরাজের ইজারাদার দেবী সিং করল জমিদার ও লোকদের উপর অপরিসীম, অমানুষিক অত্যাচার; অথচ ইংরাজ-নফর বঙ্কিমবাবু 'জমিদারেরা সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার করেছে'—একথা কিভাবে বর্ণনা দিয়েছে দেখুন—

"ভবানী ওজস্বী বাক্য পরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্বিবহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারীর কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘর বাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে একগুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে,যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে।

যুবতীকে কাছারীতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রজাতির যে শেষ অপ-মান, চরম বিপদ, সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।"

[৬৬ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

ঠিকানা

গোলাম কাদির

ছোট ষ্টেশন, তার চেয়েও ছোট জনতা। এখানেই রাত কাটাতে হবে; ভোরের এদিকে কোন ট্রেণ নেই। পাশাপাশি দু'টো ওয়েটিং রুম; একটা পুরুষদের, অন্যটা মহিলাদের। ক্রমে প্লাটফরমের ক্ষুদ্র জনতা রাতের আঁধারে মিলিয়ে যেতে লাগলো। আধ ঘণ্টা পরেই জনহীন নীরবতা; ষ্টেশনের সারাটা এলাকা নিঝুম, স্থবির।

হাণ্ড ব্যাগটা নিয়ে ধীরে ধীরে ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাশের রুমটিতে ফিস্ ফিস্ নারী কণ্ঠের আওয়াজ, আমার রুমটা খালি। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। কিন্তু না, রাত জাগার স্বাবলম্বন সিগরেট নেই একটিও। বাইরের অনেক দূরে একটা পানওয়ালাকে ডেকে এক পেকেট সিগরেট কিনে পুনরায় আমার চেয়ারে ফিরে এলাম। ভীষণ ধরণের নীরব, অসহ্য একাকিত্ব।

রাত দশটা পর্যন্ত কাটলো হাতের মাসিকটার প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা হজম করতে। এরপর ভাবছি কি করা যায়। ঠিক এমন সময় পাশের রুমে একটা গোলমাল শুনতে পেলাম। বাদ-প্রতিবাদ হচ্ছে নারী এবং পুরুষ কণ্ঠে। বাইরে এসে দেখি, তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর ভেতর থেকে তিনটি নারী কণ্ঠ কোরাস তুলছে: বার বার বলছি, এটা লেডিস্ ওয়েটিং রুম, তবু আপনারা দরজা ঠেলছেন; কেন, মতলবটা কি আপনাদের?

জাগ্রত কৌতুহল নিয়ে সামনে গেলাম। কিন্তু ভদ্র লোকদের তখন কেটে পড়বার পালা: sorry, আমাদের এক আত্মীয়ার আজ রাতে এখানে আসার কথা ছিল; তাই বিরক্ত করলাম, excuse us.

ক্ষমা তাদের করতে হলো বটে; কিন্তু ভদ্রমহিলা তিনজন আমাকে ক্ষমা করলেন বলে মনে হলো না। কারণ, তিনজনই বিভিন্ন ভাষায় একই ভাব প্রকাশ করলেন: জায়গাটা সত্যি ভালো নয়; আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো please আমাদের রুমে এসে একটু বসুন, গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দেয়া যাবে।

অগত্যা যেতে হলো। তিন বান্ধবী গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকায় আত্মীয় বাড়ী বেড়ানো শেষ করে খুলনা ফিরে যাচ্ছেন, আর আমি ফিরছি মফস্বলের কয়েক জায়গা ঘুরে ঢাকায়। কিন্তু এই আলাপে রাত কাটে না।

একে ত বাইরে অন্ধকার, তার উপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ফোটা ফোটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। ভেতরে আমরা চারটি প্রাণী প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ নিয়ে বসে আছি মুখোমুখি। অনেক কথা আছে হয়ত বলার, আরো বেশী আছে শুনার। কিন্তু সে দীর্ঘ জানাজানির আরম্ভটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, আর দারুণ অস্বস্তিতে তা-ই খুঁজে ফিরছি আমরা।

কিন্তু তাও পেয়ে গেলাম এক সময়।

: কি বই পড়ছেন? আমার সামনের তরুণীর হাতের বইটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম।

: "নতুন কাহিনী"। শায়ের আজাদের লেখা।

এক মিনিট মেয়েটির মুখের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। গোলগাল মুখ, উজ্জ্বল দীপ্ত দুটো চোখের চাহনিতে পরিষ্কার আত্মবিশ্বাসের ছাপ। অদ্ভুত মনে হলো। কারণও আছে। আমার সদ্য প্রকাশিত "নতুন কাহিনী" উপন্যাসটা ইতিমধ্যেই বন্ধুবান্ধবদের প্রশংসা লুটেছে। গুণীজনেরা পাঠিয়েছেন আশ্বাসবাণী। অনেক পাঠক পাঠিকার অভিনন্দনে আমার পকেট ভরেছে। রীতিমতই কৌতুহল জাগলো।

: কেমন লাগলো বইটা?

: কেন আপনি পড়েন নি? এ বইটা পড়া উচিত।

: কেন বলুন তো! শায়ের আজাদের লেখার সাথে আমার যতটুকু পরিচয় তাতে তো মনে হয়না বইটা খুব ভাল হবে।

: আপনি বলেন কি? পাক বাংলার কথাশিল্পীদের মধ্যে শায়ের আজাদের দৃষ্টি সবচাইতে গভীর ও ব্যাপক।

: একমত হতে পারলাম না, দুঃখিত।

: আমিও; তবে এই লেখকের লেখার সাথে আপনার কতটুকু পরিচয় সন্দেহ আছে।

: সন্দেহ ভাঙতে পারি। 'মাটির ফসল', 'সূর্যাস্ত', 'দিনমান' সবগুলো বই আমি পড়েছি।

: তবুও?

: হ্যাঁ, তবু তাঁর লেখাকে আমি খুব ভাল বলতে পারিনে।

: কেন, আপনার কাছে কেমন মনে হয়?

: মনে হয় ভদ্রলোকের গল্প বলার ক্ষমতা আছে, কিন্তু যে দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেন তা না বর্জোয়া, না মার্ক্সীয়, না ফ্রয়েডীয়। মনে হয় ভদ্রলোকের জীবন দৃষ্টির কোন স্থায়ী ভিত্তি নেই।

এতক্ষণ অন্য দুই তরুণী নীরব ছিলেন। এবার একজন সায় দিলেন আমার সাথে: ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। আমারও তাই মনে হয়।

: তুই থাম মিলি; বাধা দিলেন প্রথমা। জানেন, শিল্প সাহিত্যে জীবনকে দেখার যে দৃষ্টি তা শিল্পীর নিজস্ব—মার্ক্সে'রও নয়, ফ্রয়েডেরও নয়।

: কিন্তু যুগ আর কালের প্রভাবটা?

: সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি তো শায়ের আজাদের নেই। এ-যুগের মানুষেরাই তার গল্পের নায়ক-নায়িকা।

: এ-কথা ঠিক বলেছিস লিলি। আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন। তৃতীয়া কথা বল্লেন এবার।

নীরব রইলাম। না স্বীকার, না অস্বীকার। লিলি নামটাও যেন পরিচিত। মনে পড়ছে, আমার প্রতিটি বই প্রকাশের পরই নিজের ঠিকানা গোপন করে আমার প্রকাশকের মারফত আমাকে চিঠি লিখেছে লিলি। ভক্ত পাঠিকার নিঃসঙ্কোচ হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ সে-সব চিঠির ছত্রে ছত্রে। যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি উৎসাহ আবেগময় ভাষায় জানিয়েছে লিলি। অনেকবার ভেবেছি, ভদ্র মহিলাকে একটা জবাব দিই; কিন্তু ঠিকানার অভাবে আর হয়ে ওঠেনি। এই মুহূর্তে লিলি যেন আমার বহুদিনের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে তার মনের প্রতিটি অনুভূতি আমার জানা।

শায়ের আজাদকে আপনার এত ভালো লাগে কেন বলুন তো? জানা কথা, তবু ওর নিজের মুখে একবার শুনতে ইচ্ছে হলো।

: প্রশ্নটা কঠিন। তবে তাঁর গল্প আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁর নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রেম-প্রীতি অল্পই, কিন্তু যা আছে ব্যথা বেদনার আগুনে পুড়ে একেবারে খাঁটি সোনা। জীবনের সহস্র দীনতার ভেতরেও যে একটা অপূর্ব মধুময় ইঙ্গিত শায়ের আজাদের লেখায় আছে তাই বোধহয় আমাকে সবচাইতে বেশী মুগ্ধ করে।

সত্যিই অপূর্ব মনে হচ্ছে। এই কথাগুলো আরো ঐশ্বর্যময় ভাষায় একাধিক পত্রে লিখেছে লিলি। কিন্তু এবার তার মুখে শুনে মনে হচ্ছে যেন অপূর্ব। পৃথিবীতে এমন একটি গুণগ্রাহী পাঠিকাও আমার আছে। আমি ধন্য, অন্ততঃ এই মুহূর্ত তো বটেই।

: শুনেছি লেখকের ব্যক্তি জীবনটা খুব সুখের নয়।

: আমার তা মনে হয় না। প্রতিবাদ করলো লিলি। দুঃখের সংসারে দুঃখটাই তাঁর কাছে বড় নয়। আগুনের মাঝে বসে ফুলের কামনা করেন তিনি।

: জীবনের বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন বলে শুনেছি।

: তা জানিনে; কিন্তু আমি তাঁর অন্তরের খবর রাখি। সেখানে শায়ের আজাদ দেউলিয়া নন। তাঁর মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ক্ষুদ্রও মহত্ত্ব লাভ করে, তুচ্ছ সকলের সমবেদনা কুড়ায়।

অপূর্ব বটে। কই এমন ভাবে আমার নিজেকে তো কোন দিন চিনতে পারিনি। আমি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছি। কিন্তু দেখতে ভুল করছিনা তো?

: কিন্তু শায়ের আজাদের প্রকাশকটা যেন কেমন লোক। তার মারফত অনেকগুলো চিঠি লিখেছি লেখককে। কে জানে সেগুলোর একটাও তিনি পেয়েছেন কিনা।

কেমন করে যে নীরব ছিলাম বলতে পারিনে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বাইরে তখন যাত্রীদের কলরব উঠেছে। সিগন্যাল দেয়া হয়েছে—প্লাটফরমে গাড়ীটা ইন্ করবে। এ-গাড়ী লিলিদের, আমারটা আরো পরে।

: আমাদের গাড়ীটা এসে গেলো। ডলি, তুই চা দে!

লিলি, মিলি, ডলি তিনটা নামই জানা হলো এতক্ষণে। টিনের বিস্কিট, ফ্লাস্কের চা, নাস্তাও হলো পুরোপুরি।

যাত্রীর ভীড় যেমন কম, গাড়ীটাও তেমনি ছোট। ইন্টারে কোন লোক নেই। ততক্ষণে অন্ধকার অনেকটা কমে গেছে। আর গাড়ীর কম্পার্টমেন্ট এবং ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে প্রভেদ অনেক। কাজেই আমি এখানে অহেতুক। কারণ, আমার টিকিট ঢাকার।

ট্রেণটা হুইসিল দিলো। প্রথম বারের মতই শেষ বারেও ত্রিকণ্ঠে কোরাস উঠলো: আসি, আপনাকে কষ্ট দিলাম সারা রাত; মনে কিছু করবেন না।

এবার সত্যি সত্যি ট্রেণটা চলতে শুরু করেছে। কণ্ঠের কাছে এসেও কথাটা শব্দরূপ লাভ করতে পারলো না: আপনার ঠিকানার অভাবে একটা চিঠিরও জবাব দেয়া হয়নি।

ট্রেণটা ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। লিলির হাতের আন্দোলিত রুমালটা আর দেখতে পাচ্ছিনে।

ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুলতানের নিষ্ঠুরতা

দরিদ্রের প্রতি সুলতানের করুণা, সুবিচার, অসাধারণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যেসব সদ্‌গুণের কথা বলেছি, সে সব থাকা সত্ত্বেও তিনি নিষ্ঠুর কম ছিলেন না। এমন কি কথায় কথায় তিনি রক্তপাত করতে কসুর করতেন না। তিনি ছোট বড় সকল রকম অপরাধেরই শাস্তি বিধান করতেন। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি কখনও অপরাধীর পদমর্য্যাদা বা তার বিদ্যাবত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শাস্তির তারতম্য করতেন না। প্রতিদিন শত শত লোককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, পিঠমোড়া বেঁধে সুলতানের দরবারে আনা হ'তো এবং তাদের মধ্যে কাউকে প্রাণদণ্ড, কাউকে প্রহার অথবা অমানুষিক ভাবে শারিরীক জ্বালা যন্ত্রণা দেওয়া হতো। তাঁর রীতি ছিল, একমাত্র শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন প্রত্যেক কয়েদীকে কয়েদখানা থেকে বের করে দরবার গৃহে আনা হবে। শুক্রবার দিনটি কয়েদীদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট। সেদিন তারা কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে এবং কথঞ্চিৎ আরামে থাকতে পারে।

মাসুদ খাঁ

মাসুদ খাঁ নামে সুলতানের একজন বৈপিত্রেয় (Half brother) ভাই ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের কন্যা। মাসুদ খাঁর মতো সুন্দর সুপুরুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। তিনি বিদ্রোহের আয়োজন করছেন বলে সুলতান একবার সন্দেহ করলেন। তাই মাসুদ খাঁকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। মাসুদ সুলতানের ভয়ে বিশেষ করে তাঁর দেওয়া অকথ্য শারিরীক জ্বালা-যন্ত্রণার ভয়ে অপরাধ স্বীকার করলেন। তিনি জানতেন, এ ধরণের অপরাধের জন্য কাউকে সন্দেহ করা হলে স্বীকারোক্তি আদায় না করা পর্য্যন্ত সুলতান যে অসহ্য শারিরীক অত্যাচার করতে হুকুম করেন তা সত্যিই অমানুষিক। সে অত্যাচারের চেয়ে মৃত্যুবরণ করা বরং শ্রেয়। হতভাগ্য মাসুদের স্বীকারোক্তি শুনে সুলতান হুকুম করলেন, বাজারের প্রকাশ্য স্থানে নিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলতে এবং শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর মৃতদেহ যথারীতি তিন দিন সেই প্রকাশ্য স্থানে ফেলে রাখতেও তিনি হুকুম দিলেন।

দিল্লী পরিত্যাগের আদেশ

সুলতানের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয় তার ভিতর সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি হলো প্রজাদের দিল্লী শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করা। এর কারণ হলো, প্রজারা নাকি সুলতানকে কুৎসিৎ গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখ্‌তো। সেই চিঠি খামে ভরে রাত্রির আঁধারে তারা নিক্ষেপ করতো দরবার গৃহে। চিঠির উপরে লিখিত-ভাবে অনুরোধ থাকতো, সুলতান ছাড়া অপর কেউ যেনো সে চিঠি না পড়েন। সুলতান সে সব চিঠি খুলে দেখতেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে গালাগালি বর্ষন ছাড়া আর কিছুই তাতে নেই। এর ফলে সুলতান স্বভাবতঃই নিজকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। অবশেষে ক্রোধান্ধ সুলতান মনস্থ করলেন, দিল্লী শহরকে তিনি শ্মশানে পরিণত করে ছাড়বেন। এ সঙ্কল্পের পরেই তিনি দিল্লীর অধিবাসীদের সমুদয় বিষয় সম্পত্তি কিনে ফেললেন এবং দিল্লী ত্যাগ করে তাদের সবাইকে দৌলতাবাদে* গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করলেন। তারা দিল্লী ছেড়ে যেতে প্রথমে অস্বীকার করলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তিন রাত্রি পার হয়ে যাবার পরে কেউ যেনো দিল্লীতে অবস্থান না করে। অধিকাংশ লোকই দেশত্যাগের এ মর্মান্তিক আদেশ মেনে নিল, কেউ কেউ অবশ্য নিজ নিজ গৃহে লুকিয়ে রইলো। সুলতান সমস্ত গৃহ তল্লাসীর হুকুম দিলেন। সুলতানের অনুচরেরা দিল্লীর রাস্তায় দু'জন লোকের দেখা পেল। তাদের একজন বিকলাঙ্গ ও আতুড়, অপর জন অন্ধ।

সুলতানের সম্মুখে তাদের হাজির করা হলো। সুলতান তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধানের। সুলতানের হুকুম অনুসারে আতুড় লোকটিকে যুদ্ধকালীন পাথর নিক্ষেপের যন্ত্রের সাহায্যে দূরে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। অন্ধ লোকটির প্রতি হুকুম হলো, তার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নেওয়া

---

* দৌলতাবাদ বা দেবগিরি হায়দরাবাদ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করা সুবিধাজনক মনে করে সুলতান মাহমুদ তুঘলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের চেষ্টা করেন এবং দিল্লীর বাসিন্দাদের দৌলতাবাদে অভিযানের আদেশ দেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে তার জীবদ্দশাতেই দেবগিরি বাহ্‌মনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার করতলগত হয়।

হবে দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ চল্লিশ দিনের পথ। হতভাগ্য অন্ধের দেহ পথেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, শুধু পা দু'খানা গিয়ে পৌছলো দৌলতাবাদ। সুলতানের এ কুকীর্ত্তি দেখে সবাই নিজ নিজ আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী ফেলেই দিল্লী পরিত্যাগ করলো। ফলে দিল্লী একটি পরিত্যক্ত শহরে পরিণত হলো। একজন অতি বিশ্বস্ত লোক আমাকে বলেছেন, এ ঘটনার পরে একদিন রাত্রে সুলতান গিয়ে প্রাসাদের ছাদের উপর উঠলেন এবং দিল্লী শহরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোন গৃহে একটি প্রদীপ ও দেখতে পেলেন না, এমন কি কোথাও সামান্য আগুনের চিহ্ন বা ধুম-উঠতেও দেখলেন না। এ দৃশ্য দেখে তিনি বলে উঠলেন, "এতদিনে আমার মনে শান্তি এসেছে, আমার রাগ প্রশমিত হয়েছে।" তারপরে তিনি অন্যান্য শহরের বাসেন্দাদের লিখে পাঠান দিল্লী শহরে এসে বসবাস করতে। তার ফলে এই হলো যে, যারা দিল্লীতে এলো তাদের পরিত্যক্ত শহরগুলো তো ধ্বংস হলোই অধিকন্তু দিল্লীও আর আগের মতো জনবহুল নগরীতে পরিণত হলো না। তার কারণ দিল্লী সারা দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ শহর। ঠিক এই অবস্থায় আমরা এসে দিল্লী পৌছলাম। দিল্লী তখন জনবিরল শূন্য শহর।

এবার আমাদের আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা রাজধানীতে কি করে পৌছলাম এবং সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে কি ভাবে আমার ভাগ্য ফিরে এলো তাই এখন বলছি। আমরা দিল্লী যখন পৌছলাম সুলতান তখন রাজধানীর বাইরে ছিলেন। আমরা প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরওয়াজা অতিক্রম করতেই প্রধান নকীব আমাদের নিয়ে হাজির হলেন প্রশস্ত একটি দরবার গৃহে। এখানে উজির আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। তৃতীয় দরওয়াজার পরবর্ত্তী এই বিশাল কক্ষই 'হাজার উসতান' নামে পরিচিত। সেখানে হাজির হতেই উজির আভূমি নত হয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন; আমরাও প্রায় তেমনি ভাবে তাঁকে প্রত্যাভিবাদন জানালাম। সুলতানের মসনদের উদ্দেশ্যে নত হয়ে আমরা আঙ্গুলীদ্বারা মাটী স্পর্শ করলাম। আমাদের এ অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পরেই নকীব 'বিছমিল্লাহ্' বলে চীৎকার করে উঠলো এবং আমরা সবাই প্রস্থান করলাম।

অতঃপর সুলতানের মাতার প্রাসাদে গিয়ে আমরা তাঁকে কিছু উপঢৌকন দিলাম এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে প্রবেশ করলাম। আমাদের সেই গৃহে আসবাব পত্র, গালিচা, মাদুর, তৈজসপত্র, বিছানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই মোতায়েন দেখতে পেলাম। ভারতে ব্যবহৃত বিছানা খুবই হালকা। একজন লোকেই অনায়াসে তা বহন করতে পারে। সফরে যেতে হলে সবাই তার বিছানা নিয়ে যায় এবং একটি বালক ভৃত্য তা মাথায় বহন করে মনিবের অনুসরণ করে। চারটি কুদানো পায়ার সঙ্গে আড়াআড়ি চার টুকরা কাঠ জুড়ে এবং সেই সঙ্গে রেশমী বা সূতী ফিতা বুনে এ বিছানার সৃষ্টি। এ বিছানায় শুলে নরম অন্য কিছুরই দরকার হয় না। বিছানার সঙ্গে দু'টি তোষকও দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে আছে বালিশ আর বিছানার চাদর। সবই রেশমী। এখানকার রীতি হলো, তোষক ও বালিশের উপরে সূতী বা রেশমী আবরনী ব্যবহার করা। ময়লা হলে আবরনীটি ধুইয়ে ফেললেই মিটে যায়, বিছানা বরাবর পরিস্কারই থেকে যায়।

উজির সমীপে

পরদিন ভোরে আমরা গেলাম উজিরকে ছালাম করতে। তিনি আমাকে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রাসহ দু'টি তোড়া উপহার দিলেন। দিয়ে বললেন, "এ যৎ-সামান্য অর্থ দেওয়া হলো আপনার মাথা ধোওয়ার (সম্মানের) জন্য।" এছাড়া আর দিলেন চিক্কণ ছাগ-লোমে তৈরী-একটি পোষাক। আমার সঙ্গী ভৃত্য ও গোলামদের একটি তালিকা তৈরী করে তাদের চার পর্য্যায়ে ভাগ করা হলো। প্রথম পর্যায়ে যারা তারা প্রত্যেকে পেলো দু'শো দিনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দেড়শো দিনার; তৃতীয় পর্যায়ে একশো এবং সর্বশেষ বা চতুর্থ পর্যায়ে যারা তারা পেলো পয়ষট্টি দিনার। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় চল্লিশ জন। সবাই মিলে তারা মোট পেলো চার হাজার দিনারেরও বেশী। অতঃপর ঠিক হলো সুলতানের অতিথির বরাদ্দ। আমাদের জন্য বরদ্দ হলো হাজার পাউণ্ড ভারতীয় ময়দা, হাজার পাউণ্ড গোশ্‌ত সেই সঙ্গে ঘি, চিনি, সুপারী পান কতটা ঠিক আমার স্মরণ নেই। ভারতীয় প্রতি পাউণ্ডের ওজন হলো মরক্কোর বিশ পাউণ্ড বা মিনারের পচিশ পাউণ্ডের সমান। পরে সুলতান আমার নামে কয়েকটি গ্রাম লিখে দিয়েছিলেন। তার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পাঁচ হাজার দিনার।

সুলতান সমীপে

শাওয়াল মাসের ৪ঠা তারিখে (৪ঠা জুন, ১৩৩৪ খৃঃ) সুলতান ফিরে এলেন রাজধানী থেকে সাত মাইল দূরবর্তী তিলবাত দুর্গে। উজির আমাদের হুকুম করলেন সেখানে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সুলতানকে উপহার দেবার জন্য ঘোড়া, উট, ফলমূল, তরবারী প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে দুর্গের প্রবেশ দ্বারে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একে একে

দর্শনার্থীদের ভিতরে নিয়ে জরির কাজ করা মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার দেওয়া হলো। আমার পালা যখন এল আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম সুলতান একখানা কেদারায় বসে আছেন। প্রথমে আমি তাঁকে একজন ওমরাহ বলে ভুল করেছিলাম। আমি দু'বার তাঁকে কুর্ণিশ করার পরে সুলতানের একজন অন্তরঙ্গ ওমরাহ্ বলে উঠলেন,—"বিছমিল্লাহ্, ইনি মওলানা বদর উদ্দিন।" এখানে সবাই আমাকে বদর উদ্দিন বলে সম্বোধন করতো। 'মওলানা' (আমাদের প্রভু) পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপাধি। আমি সুলতানের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং হাত ধরে রেখেই পার্শ্বে বললেন, "আপনার আগমন শুভ হয়েছে। আপনি নিঃসঙ্কোচে এখানে থাকুন। আপনার প্রতি খাতির যত্ন ও আমার অনুগ্রহের কোন অভাব হবে না। বরং সে সবের কথা আপনার মুখে শুনে আপনার দেশবাসীরা আপনার সঙ্গে এসে যোগদান করবেন।" এর পর তিনি আমার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার যথাযথ উত্তর দিলাম। আমাদের এই আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে যত বারই তিনি কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বললেন ততবারই আমি তাঁর হস্তচুম্বন করলাম। এভাবে সাতবার আমি সুলতানের হস্তচুম্বন করলাম। সমস্ত দর্শনেচ্ছুরা পরে একত্রিত হলে সুলতান এক ভোজের আয়োজন করে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন।

আমার ভাতা ও চাকুরী

অতঃপর সুলতান প্রায়ই তাঁর সামনে বসে আহার করতে আমাদের ডাকতেন। তখন তিনি আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে ভুলতেন না।

তিনি সবাইর জন্য ভাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমার ভাতা বরাদ্দ হলো বছরে বার হাজার দিনার। এছাড়া আগে যে তিনটি গ্রাম লিখে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আরও দু'টি গ্রাম যোগ করে দিলেন।

একদিন উজির এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা এসে আমাদের বললেন, "সুলতান বলেছেন, আপনাদের ভেতর উজির সিপাহ্সালার, হাকিম, শিক্ষক বা শেখ হবার যোগ্যতা যাঁর আছে সুলতান তাঁকে সে পদে নিয়োজিত করবেন।" উপস্থিত সবাই প্রথমে চুপ করে রইলেন। কারণ, তাঁরা এসেছিলেন কিছু ধন দৌলত লাভ করে' দেশে ফিরে যাবেন এই আশায়। তাদের কেউ কেউ নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করার পরে উজীর আমাকে আরবীতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বক্তব্য কি?"

আমি বললাম, "ওজারত বা অন্য কোন পদ আমার কাম্য নয়। কাজীগিরি বা শেখগিরি আমার পেশা। পূর্বপুরুষরাও তাই করতেন।

সুলতান আমার এ জবাবে খুব খুশী হয়েছিলেন। পরে আমাকে প্রাসাদে ডেকে দিল্লীর কাজীর পদে আমাকে বহাল করেন।

(ক্রমশঃ)

কয়েকটি পল্লী-গীতি

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী

অনেক দিন আগের কথা। জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগ; বিকাল বেলা। আকাশ নির্মল। মাঠের বুকে ধান-পাটের কচি শিশুরা ম্লান হাসি হাসিয়া মৃদুমন্দ বাতাসে লুকো-চুরি খেলিতেছে। কৃষকেরা আনন্দে মশ্‌গুল হইয়া ধান-পাট নিড়াইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে অস্থির কৃষাণীর মনের কথা কৃষাণ কর্মীদের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তাহারা সমস্বরে গাহিতেছে—"ইসফের লাগিয়া গো জলেখা উদাসী। উদাসী, উদাসী,—আরে ইসফের লাগিয়া গো জলেখা উদাসী।"

ওদের গানের সুর অজ্ঞাতসারে আসিয়া, "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিয়া আমাকে টানিয়া ওদের কাছে নিয়া গেল। ওরা আমাকে তাহাদের সঙ্গে পাইয়া গৌরবে আটখানা হইয়া বেশ গাইতে লাগিল। "বয়াতি" 'দিশা' গাহিয়া যায় আর অন্যেরা সমস্বরে গাহিয়া উঠে—"ইসফের লাগিয়া গো।" আমিও ওদের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিলাম। ওদের আনন্দ ও কর্মশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। শহরের কর্মক্লান্ত জীবনের ফাঁকে, বিস্তৃত মাঠের বুকে আসিয়া প্রাণ প্রতিম কৃষক ভাইদের সঙ্গে মিশিয়া, গান গাহিয়া যে আনন্দটুকু পাইলাম, তাহার রেশ আজিও আমার প্রাণের তারে ঝংকৃত হইয়া উঠে, আমি আনন্দে বিভোর হইয়া যাই। গানটি এই :—

দিশা :—"ইসফের লাগিয়া গো জলেখা উদাসী। উদাসী, উদাসী'
আরে ইসফের লাগিয়া গো
জলেখা উদাসী।"

বয়াত :"—আনিয়া বেসরের ঝাঁপি খুলিল ঢাকুনী।
দশ নউখে বাছিয়া লইল আবের কাঁকই খানি॥
একে ত আবের কাঁকই চন্দনের কোঁটা।
আঁচড়াইয়া মাথার কেশ করলা গোটা গোটা॥
আঁচড়াইয়া মাথার কেশ বায় বান্ধিল খোঁপা।
খোঁপার উপুর তুল্ল্যা লইল গন্ধরাজ আর চাম্পা॥
পর্‌থমে বান্ধিল খোঁপা, খোঁপার নাম উনি (?)।
খোঁপার মধ্যে ঝল্‌মল করে হাজার হাজার জুনি (১)॥
সেই খোঁপা বান্ধিয়া কন্যা খোঁপার পানে চায়।
দিল-মন না খুশা অইলে আউলাইয়া ফালায়॥
তারপরে বান্ধিল খোঁপা, খোঁপার নাম কেঁও(?)।
খোঁপার মধ্যে লট্‌কিয়া রইছে বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও॥
বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও নারে, বিয়াল্লিশ গণ্ডা মাছি।
তেওত (তবুও) কন্যার কেশ নাইলে (হেলে) এক গাছি॥
সেই খোঁপা বান্ধিয়া কন্যা মনে খুশী অইল।
এক-দুই করিয়া শাড়ি পৈরাইতে (পরিধান করিতে) লাগিল॥
পর্‌থমে পৈরাইল শাড়ি নামে "গঙ্গাজল"।
নউখের উপর তুল্‌লো শাড়ি করে টলমল॥
সেই শাড়ী পরিয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়।
অইল না তার মনের মত দাসীরে পৈরায়॥
তারপরে পৈরাইল শাড়ি নামে "মুক্তামনি।"
সাত রাজার ধন লাগ্‌গ্যাছে শাড়ির গাঁথুনি॥
সেই শাড়ি পৈরাইয়া কন্যা শাড়ির পানে চায়।
দিল-মন না খুশী অইল, খুরাইয়া (খুলিয়া) ফালায়॥
তারপরে পৈরাইল শাড়ি নাম তার "কেঁও" (?)।
শাড়ির মধ্যে আঁক্‌কিয়া থইছে বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও॥
চাটগাঁও, সোনারগাঁও, হরিপুর, মধুপুর লেখ্‌ছে থরে থরে।
কত পক্ষীর নাম লেখথ্যাছে শাড়ির কিনারে॥
দইয়ল (দোয়েল) খঞ্জন লেখ্‌থ্যা থইছে যার বুক কালা।
কুসুম পক্ষী লেখথ্যা থইছে রাও শুনিতে ভালা॥
কুঁড়া পক্ষী লেখ্‌থ্যা থইছে টুল্লুর টুল্লুর করে।
কানিবগা (বক) লেখ্‌থ্যা থইছে গাল ফুলাইয়া মরে॥
শাড়ির মধ্যে লেখ্‌থ্যা থইছে ভালা ভালা গাঁও॥
শাড়ির মধ্যে লেখ্‌থ্যা থইছে সাউধেভরা (সাধু-ব্যবসায়ী) নাও॥
আরেক শাড়ি রাখ্‌থ্যা দিছে "আস্‌মান তারা" নাম।
লতা-পাতা-ফল-ফুল নবিসিন্দা (কারুকার্য) কাম॥
সাজিয়া পরিয়া কন্যা রূপের পানে চায়।
চান-সুরুজ লজ্জা পাইয়া আবের নীচে যায়॥
তারপরে খুলিয়া বাটা মুখে দিল পান।

(১) জুনাকি।

ঘরধনে বাইর অইল পূর্ণিমায়ের চান।।
কন্যার রূপে ঘুন্নিয়াই পশর (আলোকিত)
আন্ধাইর গেল দূরে।
ফুল ফুটটাছে লাখে লাখে—মন ভমরা উড়ে।।"

এই গানটি আমি আমার ফুফাতো ভাই অশীতিপর বৃদ্ধ জনাব ফারুক হুসেন সাহেবের নিকট হইতে সম্পূর্ণ লিখিয়া লইয়াছি। আমাদের অঞ্চলে তিনি নানা জাতীয় গ্রাম্য গানের রাজা। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে বুঝা যায়—একদিন আমাদের গ্রামবাসীরা ছিল গানের আর ধানের রাজা। বর্তমান প্রদাহী সভ্যতার চাপে পড়িয়া গ্রামবাসীর আনন্দের উৎস ধারা বিশুষ্ক, গানের বীনা নীরব আর ধানের গোলা নিঃশেষ। কৃষক-রাজা আজ পথের ভিখারী—শীর্ণ কায় আর জীর্ণ-বসন; আবাস ভূমি গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত।

এই গানটি কেবল শব্দের সমষ্টিই নহে;—ইহাতে আছে তথ্য, সত্য, সৌন্দর্য, সাজগোজের কথা, বস্ত্র শিল্পের কথা, গ্রামের ধনের প্রাচুর্যের কথা আর আছে আমাদের চির অবহেলিত গ্রাম্য লোকের সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির কথা, উন্নত ও পরিমার্জিত রুচির কথা;—চারু ও শিল্পের সমাবেশ।

জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক মানুষ সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময়ের চির অভিসারী। সে সৃষ্টি-সৌন্দর্য অনুধাবন করিয়া এর আড়ালে সত্যকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সত্যকে আবার বাস্তব সৌন্দর্যে রূপায়িত করিয়া কল্যাণ কর্মে আত্ম-নিয়োগ করিতেছে। ইহাই ত জীবনের শিল্প। এই সৌন্দর্যবোধ আর আত্মোপলব্ধিই মানুষকে করিয়াছে অসীমের পথচারী। সীমার মাঝে অসীমের রূপ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে কতবার কত ভাবে সাজিতেছে, "হলনা তার মনের মত"—সাজ খুলিয়া ফেলিতেছে আবার সাজিতেছে,—অনুসন্ধান করিতেছে—"হেথা নয়, হোথা নয়, আর কত দূর।"

নীরেট বাস্তবতার সংস্পর্শে মানব মনের এই যে চির অতৃপ্তি ও অশোয়াস্তি (Divine Discontent and restlessness)—অবিরাম এই যে কাকুতি,—ইহাইত দিয়েছে সামনে চলার শক্তি-সাহস, বুদ্ধি-বৃত্তি আর চির গতিবেগ; নিত্য-নূতনের অনুসন্ধিৎসা এবং আবিষ্কার উদ্ভাবনের কল্পনা শক্তি, পর্যবেক্ষণ-পরিবীক্ষনের শক্তি সামর্থ্য। বিবিধ গ্রাম্য গানেও আমরা এইরূপ বহু দার্শনিক মতবাদ অবগত হইতে পারি।

এই গানটির শব্দ, বিষয়বস্তু এবং বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ইহা ষোড়স কি সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত। অবশ্য সময়ের স্রোতে পড়িয়া কিছু যে পরিবর্তন না ঘটিয়াছে, এমন নয়। মুগল আমলে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা এই গানটির রচনা কাল নির্ণয় করিতে পারি। মানুষ সময় ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারেনা;—মাছের পক্ষে যেমন জল ও জলাশয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব।

গানে উল্লিখিত "হরিপুর-মধুপুর" পূর্ব পাকিস্তানের কোথায় অবস্থিত ছিল বা আছে, তাহা আমি অবগত নহি; তবে সেখানে যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র-শিল্পের কারখানা ছিল এবং উন্নত রুচির তন্তুবায় ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গানটি কে রচনা করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে পারিলাম না; তবে গানের শব্দ ও শব্দ বিন্যাস এবং প্রকাশ ভঙ্গীতে বুঝা যায় উত্তর-পূর্ব ময়মনসিংহের কোথাও রচিত। এখন শব্দ ও ভাষা তত্ত্ববিদেরা আমার কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারেন।

বাস্তব জীবনের আদর্শ অনুসরণে আল্লাহের নৈকট্য লাভের তীব্র অনুভূতি-কাকুতি নীচের গানটিতে পাওয়া যায়। গানটির ঐতিহাসিক চিত্র দর্শন করিলে মর্মন্তুদ বেদনার উদয় হইয়া থাকে। এই গানটির রচক নেত্রকোনা শহরের নিকটবর্তী বাইশ চাপড়া গ্রাম নিবাসী রশীদ উদ্দীন সাহেব। তাঁহার বহু গান লোক মুখেশুনা যায়। গানগুলি উচ্চভাব ও অনুভূতিতে বিমণ্ডিত আর নির্মল প্রেম রসে সিক্ত। বর্তমানে তিনি বাঁচিয়া আছেন।

তালাশ কর্‌ইয়া পাইলাম না গো শহর বন্দরে,
তোম্‌রানি দেখ্‌খ্যাছ আমার বন্ধু নাগরে॥
লক্ষ্ণৌ হইয়া কানপুরেতে, দিল্লীর বাদ্‌শার বাড়ীত রে;
শূন্য তথ্‌ত পড়্‌ইয়া আছে পাইলামনা প্রাণ বন্ধুরে॥
জামে-মস্‌জিদ ঘুরাইয়া মীনাবার উপুরে গিয়ারে;
ধন্ধ হইয়া রইলাম চাইয়া, বন্ধু কি নিদয়া রে॥
বৃন্দাবন আর মথুরাতে পাইল্যামনা মোর প্রাণ
নাথে গো;
শুন্‌নিয়া আইলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ভমরায় গুঞ্জরে রে॥
কোরাণে তার খবর পাইয়া "কুহেতুর" দেখ্‌লাম
গিয়ারে;
পাহাড় জলিয়া গেছে আমার বন্ধুর রূপে রে॥
না পাইয়া মোর বন্ধুর সন্ধান, শেষে গেলাম কারবালার
ময়দান রে;
লহুর নদী বইতে আছে দেখ্‌খ্যা আইলাম নজর
কৈরে॥
মক্কা আর মদীনা গেলাম, বন্ধুর উদ্দিশ নাহি
পাইলাম রে;
মদীনার লোক বল্‌ল্যা দিয়ে আছে বন্ধু প্রেম পুরে॥

১৯৩৪ সনে পূর্ব ময়মনসিংহে দারুন অর্থাভাব এবং ১৯৩৫ সনে ঐ অংশে "বাদিয়ানীর (মহুয়ার) গান"-এর ঝড় দেখিয়া আমাদের সুপরিচিত পল্লীগান রচক ও গায়ক নীচের গান দুইটি রচনা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে লিখিয়া আনিয়াছি। গান দুইটিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গায়ো ভিন্ন অন্য জাতে গো-সাপ মারা বড়ই নিষ্ঠুর ও নীচকর্ম বলিয়া সমাজে নিন্দার্হ।

॥ ক ॥

দেশটার মধ্যে অভাব হইল, পয়সা নাইগ্যা
লোকের হাতে।
গুইল (১) মারা যায় গাঁতে (২) মানুষ গুইল মারা
যায় গাঁতে ॥
দেখ্‌লাম কত পথে পথে, ভিজা শিয়ালের মতে;
তারা সবে দল বাঁধিয়া ঘুরে বাপে পুতে;
মোটা মোটা লাঠি একটা থাকে সবার হাতে;
বাড়ি (৩) দিয়া না মারে গুইল পাক্‌ড়াইয়া ধরে হাতে ॥
আমার দেশের যত মানুষ, পয়সা পাইলেই থাকে
সন্তোষ;
টাকা টাকা গুইলের চামড়া-শুন্‌ছিল দুন্‌ইয়াইতে;
তৈল-সাবান-আয়না-কাঁকই কিনবে ফুর্তির সাথে;
গুইল মার্‌ইয়া চামড়া বেচ্‌চিয়া মিশ্রী লাগায় বৌ-
এর দাঁতে ॥
যদি গুইলা বেড়ে পড়ে, পুতেবলে বাপেরে,—
হঠাৎ যুদি ছুট্‌টিয়া যায় কইলাম আচ্ছা মতে;"
একদিন একটা ওইলা ছুট্‌টিয়া গেল জঙ্গলাতে;
বাপে-পুতে ঝগড়া কর্‌ইয়া বাপেরে গিয়া পুতে জ্যাতে ॥
বুড়া বাড়ীতে গিয়া পরে, বুড়ীর সাথে আলাপ করে;
'আইজ আমারে জ্যাত্‌তিয়া মার্‌ছে এই যে বান্দীর
পুতে;'
বুড়ী বলে—'ক্যারে তুমি গেছলা এইডার সাথে;
হায়রে, বুড়্‌ইয়া যদি মর্‌ইয়া যাইত পিরিত চল্‌ত
কার সাথে॥'

॥ খ ॥

দেশে আইল আই রসের বাগ্যাণীর গান॥
বাগ্যাণীর গান হইল সৃষ্টি, লইয়া দশের সকল গোষ্ঠি;
কথা বলে মিষ্টি মিষ্টি, কাড়্‌ইয়া লেয়গো মন প্রাণ॥
আশি বছরের যত বুড়া, কোমর বান্‌ধিয়া সবেই খাড়া;
পাড়ায় পাড়ায় দিয়া সাড়া, জমাইয়া দেয় আসর খান॥
ভাটি কি উজানে যাই, বাগ্যাণীর গান শুন্‌তে পাই;
ছোট বড় বেশ কম নাই, হিন্দু কি আর মুসলমান॥
স্বয়রাজের গান নাইগো এখন, পদাবলী, চপ-কীর্তন;
ছেলে-মেয়ে সবাই এখন, বাগ্যাণী:তে মারে টান॥
যারা আছে যত ভাই, রাইতে একটাও বাড়ীত নাই;
বুড়ায় বলে 'আমৎত যাই, মাইয়া সকল খুব সাবধান॥'
খালি বাড়ী পাইয়া তারা, খবর দিল পূবের পাড়া;
কোমর বান্‌ধিয়া বাইরে খাড়া বৌ সাজিল নছার চান॥
নতুন বৌ-এ চুলার পারে, গান শুনিতে কান্দা ধরে;
আম্‌রারে দেখাও না ক্যারে, তোম্‌রার যে বুচ্‌কির
খুরান॥
বড় জালে (জা) কয় ছিছি লতাই, উমরা বাগ্যা হয় যে
তর ঝি জামাই;
ছোট্‌টায় কয় গোপনত নাই, তরডাও যে হয়
লবজান॥'
হরিপুরে বাগ্যার বাড়ী, কিনা মড়লের বাবুগিরি;
দিন রাইতে দৌড়াদৌড়ি, পকেট ভর্‌ইয়া লইয়া পান॥
জারিয়ার নাছির বাগ্যা, লব জানিরে দিছে আধ্‌খিয়া;
লব জানরে বা খাওয়াই কিদ্ দিয়া, পাক তুল্‌লিয়া
শীঘ্র আন॥
ভানুমতীর কালা জরে, হাত পাও তার ছট্‌ফট্ করে,
ডাক্তার বাবু শুন্‌নিয়া পরে, কৈরা গেলেন
ইন্‌জেক্‌শান॥
নাইস্‌রা বাগ্যার বৌ-চুরি, নাইয়র আনতে হয়
চাতুরি;
জালালে কয় ছিছি মরি, ভদ্র লোকের গেল মান॥

আমাদের সুধী সাহিত্যে যেমন ইংরেজী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বর্তমানে লোক সাহিত্যেও তদ্রূপ দেখা যায়। এই গানটি ইহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজী প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও ইহাতে দেহ তত্ত্বের ভিতর দিয়া সাধন তত্ত্বের ইংগিত আছে। গানে উক্ত 'প্রেমানন্দ সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না।

গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে, গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে।
গইড়ে পরিপাটি, দিয়ে আগুন-জল-মাটি, বলে
হাওয়ার বলে॥
ইঞ্জিনের কলের ভিতর, মরি কি আজব শহর;
তারেতে দিয়েছে খবর কি আজব লীলা।
ষোল জন দেয় পাহারা, সেই গাড়ীতে মিলে
কুল-কুণ্ডলিনী মহারাণী বিরাজ করে চতুর্দলে॥
মনিপুর ইষ্টিশনে বৈসে খোদ মাহাজনে,
চালায় গাড়ী রাত্র দিনে, যেখানে মন চলে।
আট কটরায় ন-দরজায় সদায় হাওয়া খেলে।

(১) গো-সাপ (২) গর্তে (৩) লাঠির আঘাত

বারাস থানায় জ্বল্‌ছে বাতি আলো করছে রং মহলে ॥
সজ্জনার সঙ্গে জুইটে, ওরুকে ধরগা এঁইটে ;
নিয়ে যাও টিকেট কেইটে, মনরে সকালে সকালে ;
অনুরাগী হইলে পরে, পড়বেনা জঙ্গালে ;
তোমার সাধনার ধন দেখ্‌তে পাইবে গুরু গোসাঁইর কৃপা বলে।
হাওয়ার ঘর বন্ধ হইলে, ইঞ্জিন সব যাবে খুইলে,
পেচেঞ্জার যাবে চৈলে, সাধের গাড়ী ফেইলে ;
তখন কাঠি দিয়া কেউ ছুঁইবেনা, প্রেমানন্দে বলে ;
যাবে ধূলায় পইড়ে গড়াগড়ি শ্মশান ঘাটে দিবে জ্বেইলে ॥

প্রাচীন উন্নত সঙ্গীত (Classical Song) আর লোক-সঙ্গীত মিলিয়া বর্তমানের আধুনিক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে ; গণ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। আধুনিক সঙ্গীতের শ্রোতার মধ্যে দেশের সকল মানুষকে একই আসরে পাওয়া যায়। এই আধুনিক সঙ্গীতের বদৌলৎ আমাদের সাম্য-ভাবের একটা সুষ্ঠু পরিবেশ দেখিয়া মন স্বতঃই আনন্দে মশ্‌গুল। গ্রাম্য গানের আলোচনা যতই বাড়িবে ততই আমরা জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার বুনিয়াদ প্রাপ্ত হইব।

স্বপ্নাতীত

আখ্‌তার-উল-আলম

কবেকার সে কিস্‌সা—সিন্দাবাদ !
কোন্ দূর অসীমের যাত্রাপথে নিরুদ্দেশে হারা,
কোন্ কোকাফের পারে—জিয়ন মরণ ডোরে—
ঘুমায় শাহেরজাদী ;
কোন্ শাহাজাদা সুরাত পাগল তার !
আজকের শাহ জাদা,—হে বনী আদম !
কোন্ দূর গ্রহান্তরে রহস্যের-বেড়া অন্তরালে
কোন্ জীবনের ডাক নিশ্চল নির্বাক !
তবু কী জাননি আজ সুবিশাল কল্পনার তীরে,
স্বপ্নের কিশতে নয় বাস্তবের জাহাজ ভিড়ায় ?

অথবা জাননা আজ, হে সভ্যতা—মরু মায়াপথ :
আদিম মানব শিশু হারাল সে আদিম প্রিয়ায় ,
এই যে এখানে জাগে সেই সরন্দীপ,
আর জাগে মঞ্জিলের দৃষ্টি হারা অসংখ্য নিশান !

মাটির অন্তর্ভেদী
রক্তের স্বর্ণাক্ষরে বাস্তবের বাঁধাই জেলেদে—
অতীতের ইতিবৃত্ত আজ।

স্বপ্নাতীত জিন্দেগীর সুদৃঢ় সে-পদক্ষেপে,
শতাব্দীর এ-সফর—সিন্দবাদ !
লক্ষ্যের মঞ্জিল সেই—প্রশান্তির-প্রদীপ্ত-মোকাম ॥ *

* ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৫৮) নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পঠিত।

ঝাঁকে ঝাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশতের পর)

॥ উনিশ ॥

কামরার এক পাশে মাঝারি রকম একটি টেবিলের উপর রেডিও সেট; তার দুই পাশে দুইটি ফুলদানী। রেডিও সেটের উপর একপ্রস্থ ধূলা জমিয়াছে। ফুলদানির ফুলগুলি বাহার বিহীন। লাল, নীল, গোলাপী নানা রঙের ফুলের উপর একটি ধূসর পাণ্ডুরতা ছাড়া বাকি কিছু নাই।

জুলি ফুলের তোড়া জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। পালকের ঝাড়ন দিয়া রেডিও সেটের উপর হইতে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আপা এটা কিনবেন, ওটা কিনবেন; কিন্তু কিছুতেই মন নাই। কেন যে ওসব কিনেন, তাই বুঝি না।

পাশে তাকাইয়া জুলি বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিল। বলিল, যে দিকে তাকাবে সেদিকে নোঙরা হয়ে আছে ছাড়া আর কিছুই দেখবে না।

কোমরে হাত রাখিয়া সে শেলফের সামনে দাঁড়াইল, তারপর দ্রুত হাত চালাইয়া বই হইতে ধূলা ঝাড়িয়া এক এক করিয়া তাকে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

হোমায়েরা বাথরুমে ছিল। সে বাহির হইয়া আসিয়া কোনদিকে না তাকাইয়া পাশের কামরায় গিয়া ঢুকিল। নিঃসঙ্গ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়া ক্লান্ত রাতগুলি কাটিয়া যায়; ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় অলস-মধুর-নিঃসীম-রাতের কাহিনী প্রতি লোমকূপে জড়াইয়া আছে। গত রাতে বেশী ক্লান্ত বোধ করার কারণও ছিল। মফঃস্বল আর ট্রেণ জার্ণিতে সে এখনও তেমন রপ্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে পানির অতি আশ্চর্য গুণ আছে। পানির সহিত সকল ক্লান্তি গা হইতে যেন ঝরিয়া গিয়াছে।

হোমায়েরা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়াছিল। নিজেকে তাহার বেশ তাজা মনে হইতেছে। গোসল করিয়া যে আটপৌরে শাড়ীখানা সে পরিয়াছিল তাহাই তাহার গা জড়াইয়া আছে। শাড়ীর কালো ডোরাটি বুকের পাশ ঘেসিয়া ঘাড়ের উপর দিয়া সাপের মত লতাইয়া গিয়াছে। ঘনকৃষ্ণ চুল গুচ্ছে গুচ্ছে সারা পিঠ ভরিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শুভ্র কাঁধের উপরে চুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু পানি জমিয়াছিল। হোমায়েরা সাড়ীর আঁচল দিয়া সাবধানে তাহা মুছিতে লাগিল।

হঠাৎ ঠিক বুকের নীচ হইতে যেন গুখরো সাপের ফুসফুস ধ্বনি হোমায়েরার কাণে আসিয়া বাজিল। সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে দুই হাতে ড্রেসিং টেবিল ভর দিয়া সামনের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া দেখিল, আয়নার উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে মুগ্ধ দুইটি চোখ।

হোমায়েরা সম্বিত হারা হইয়া পড়িয়াছিল। নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে তাহার অনেক সময় লাগিল এবং সে লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি আয়নার দিকে পিছন ফিরিয়া সে গায়ের বসনখানা খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। কাপড় পালটানো শেষ হইলে সে চুল তাকে তাকে ভাজিয়া আনিয়া উপরে ক্লিপ দিয়া আটকাইয়া দিল।

হোমায়েরা বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল একখানা বড় ছবির সামনে জুলি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হোমায়েরা পিছন হইতে প্রশ্ন করিল, কি হচ্ছে জুলি?

জুলি ব্যস্ত হইয়া বলিল, কত ধূলা জমেছে দেখ, আপা। সাফ করছি।

হোমায়েরা মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ!

জুলি চেয়ারের উপর উঠিয়া সযত্নে ছবিখানা পরিষ্কার করিতে লাগিল। হোমায়েরাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, একখানা মাত্র ছবিতে ভাল দেখায় না, আপা। ও পাশে এমনি বড় আরেকখানা ছবি হলে ভাল হত।

হোমায়েরা নিজের বৃহৎ ছবিখানার দিকে তাকাইয়া বলিল, ও পাশে কি ছবি দেওয়া যায়।

জুলি কিছু সময় ভাবিয়া বলিল, জাফর সাবের ছবি হলে ভাল হয়।

হোমায়েরা সস্নেহে তিরস্কারের সহিত বলিল, দুষ্টু!

জুলি সরল ভাবেই কথাটা বলিয়াছিল। বলিয়া ফেলিয়া তাহার মনে হইল ইহা ঠিক হয় নাই। সে সংশোধন করার জন্য বলিল, আমি এমনি বললাম, আপা।

হোমায়েরা বলিল, এমনি বলে থাক, আর যেভাবেই বলে থাক, আমি বলছি এখানে এই একটি মাত্র ছবিই থাকবে, আর থাকবে না। এতে সৌন্দর্য্য বাড়ে বাড়ুক, আর কমে কমুক, কিছু আসে যায় না।

জুলি বোকার মত জিজ্ঞাসা করিল, কেন, আপা?

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, এমনি।

জুলি হা করিয়া হোমায়েরার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জোরে জোরে ছবির উপর নেকড়া ঘসিতে লাগিল। হোমায়েরা বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, আমি ওদিককার কামরায় আছি, জাফর সাব এলে বসতে বলো।

হোমায়েরা বাহির হইয়া যাইতেই জুলি চেয়ার হইতে নামিয়া নাচের ভঙ্গীতে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া পাক খাইল।

হোমায়েরা চেয়ার টানিয়া বসিয়া হাতের কাছের ফাইলটি টানিয়া লইল। ফাইলের স্তূপীকৃত কাগজগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। আলগোছে দুই আঙ্গুলে একটি দরখাস্ত চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া ইহার সাথে পিনগাথা ছোট স্লিপটি সে অপর হাতে নাড়িতে লাগিল। তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ নাড়িয়া উঠিল। অনুচ্চ কণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল, মজা টের পাবে!

আয়া আসিয়া খবর দিল, আম্মা একজন ভদ্র মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চান।

হোমায়েরা গলা লম্বা করিয়া বলিল, এখন ভদ্র মহিলা আবার কেন? আচ্ছা যাও, নিয়ে আস।

ভদ্র মহিলা জড়সড় হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। হোমায়েরা নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই আপনার?

ভদ্র মহিলা হোমায়েরার দিকে একখানা চিঠি আগাইয়া দিলেন। হোমায়েরা তাচ্ছিল্যের সাথে চিঠিখানা হাতে লইয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিল। চিঠি লিখিয়াছে আনোয়ারা। হোমায়েরার একসময় কার সহপাঠিনী। হোমায়েরা আনোয়ারার কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। নাম দেখিয়া তাহার স্মরণ হইল। সে এখন স্কুলমাষ্টারী করিতেছে। জায়দার জন্য সে সোপারেশ করিয়াছে। হোমায়েরা হইতে তাহার যাহাতে ক্ষতি না হয় সে জন্য সে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছে। আনোয়ারার নাম দেখিয়াও হোমায়েরার মুখের কঠিন ভাব দূর হইল না। সে চিঠিখানা একপাশে পেপারওয়েট চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। হোমায়েরা এ ফাইল ও-ফাইল নাড়াচাড়া করিয়া বহু সময় পরে চোখ তুলিয়া দেখিল জায়দা যে ভাবে বসিয়াছিল, সে ভাবেই বসিয়া আছে। হোমায়েরা টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া সামনের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া বলিল, আপনাদের নিয়ে হয়েছে মুশকিল। কোথায় কার সাথে কিভাবে কতটুকু পরিচয় আছে, সে খুঁজে সময় নষ্ট না করে একটু যদি কাজ করতেন, তা হলে ত কোন ফ্যাসাদই হতো না। সে জায়গায়, কাজ না করে কাজের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জায়দা এমনি সঙ্কোচিত হইয়া বসিয়াছিল, আরও যেন মাটির সাথে মিশিয়া গেল। বহু কষ্টে আমতা আমতা করিয়া বলিল, অপরাধ আমার নয়।

হোমায়েরা ফাটিয়া পড়িয়া বলিল, তা হলে অপরাধ আমার! আপনার স্কুল আমি যেমন দেখেছি সে ভাবেই লিখে দিয়েছি। এতে আমার কিছু করার নাই। আপনি যেতে পারেন।

জায়দা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাহির হইয়া না গিয়া কি বলার চেষ্টা করিতে লাগিল। হোমায়েরা মাথা নীচু করিয়া কাজ করিয়া যাইতে যাইতে বলিল, আমার কথাও আমি বলেই দিলাম। আর কিছু আমাকে শুনিয়ে কোন ফায়দা আছে?

হোমায়েরা মাথা নত করিয়া থাকিলেও স্পষ্ট বুঝিল, দুই ফোটা পানি জায়দার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। হোমায়েরা নিজে মেয়েলোক হইলেও মেয়েদের সাথে কাজ করিতে গিয়া ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে যে, চোখের পানিতে ভুলিলে কিছুই করার উপায় নাই। সে স্কুলের ছাত্রীই হউক বা ছাত্রীর শিক্ষয়িত্রীই হউক, রেডীমেড চোখের পানির প্লাবন কারণে-অকারণে যে কোন সময় তাহারা বাহাইতে পারে। ঘরেই হউক বা বাইরেই হউক, এটা যে মস্ত হাতিয়ার সে বোধ অনেকেরই আছে।

হোমায়েরার চিন্তায় হঠাৎ ছেদ পড়িল। হাতিয়ার একটি না হউক আরেকটিতে সকলকেই শান দিতে হয়। কারো হয়ত চোখের পানি, আবার কারো বা চোখের চাহনী! যারা কিছুই পারে না তাহারা হারে।

হোমায়েরা নির্ব্বিকার ভাবে আর কাজ করিতে পারিল না। সে উঠিয়া গিয়া আয়াকে বলিল, যে ভদ্র-মহিলা চলে গেলেন তাকে ডেকে নিয়ে আস।

আয়া বলিল, সে ত অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন।

অনেকক্ষণ হয়নি। তুমি একটু এগিয়ে গেলেই তাকে পাবে।

হোমায়েরা নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছু সময় পর জায়দা আসিয়া আবার কামরায় ঢুকিল। হোমায়েরা তাহাকে হাতের ইশারায় বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি আপনি বলতে চেয়েছিলেন, তাই বলুন।

জায়দা বলিল, স্কুল যদি উঠে যায় আমরা মারা পড়বো। পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিয়ে একা আমাকে সংসার চালাতে হয়। হাজার অভাবের মাঝে স্কুল হতে যা পাই সেটাই আমার ভরসা। স্কুলটি উঠিয়ে দেবেন না।

মিনতিতে জায়দার কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হোমায়েরা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, বেওকুফের মত কথা বলেছেন কেন? স্কুল উঠিয়ে দেওয়ার বা রাখার মালিক কি আমি? আর আপনার পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ত স্কুল রাখা না রাখা স্থির হবে না।

জায়দা এরমাঝে কিছুটা আত্ম সম্বরণ করিয়া আনিয়াছিল। বলিল, দেশে শিক্ষার অবস্থা ত জানেনই, আমি আর কি বলবো। সাধারণ লোক ত মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেই চায় না। তবু কাছাকাছি স্কুল থাকলে কিছু মেয়ে পড়া শোনা করার সুবিধা পায়।

হোমায়েরা এবার হাসিয়া ফেলিল, মেয়েরা লেখা পড়ার বেশী সুযোগ পাক, এই সাধারণ নীতিতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। বরঞ্চ আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। আর এ-আগ্রহ অনেকেরই আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কোন স্কুল যদি মাসে ত্রিশদিন বন্ধ থাকে তা হলে সে স্কুলের টিকে থাকার আবশ্যকতা কি?

জায়দা ব্যস্ত ভাবে বলিল, বিশ্বাস করুন আমার স্কুল এভাবে বন্ধ থাকেনা। সে সময় আমার তিনটি মেয়েরই অসুখ ছিল, তাদের দেখার বা ঘরের কাজ করার কোন লোক আমার বাড়ীতে ছিল না। তা না হলে আমার পনের বছরের মাষ্টারী জীবনে এমন গাফলতি আর কখনও হয় নাই।

হোমায়েরা বলিল, আপনার কৈফিয়ৎ ভাল করে গুছিয়ে লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর আমি দেখবো কি করা যায়।

জাফর হাতের বইখানা সশব্দে সামনের টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া ঘরময় পায়চারী করিতে করিতে ডাকিল, জুলি!

জুলি পাশের কামরায় ছিল। দৌড়াইয়া আসিয়া সাড়া দিল, জী।

জাফর থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জুলি, তোমার আপা এতই ব্যস্ত, এখনও কাজ শেষ হলো না। কি করছেন বলতে পারো? না, আমিই তাঁর ওখানে যাবো?

জুলি ব্যস্ত হইয়া বলিল, আমি দেখে এসেছি। আপা একজন ভদ্র মহিলার সাথে আলাপ করছেন।

জাফরের ঠোঁট হাসার মত বিস্তারিত হইল। বলিল, আলাপ করছেন, আর আমার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। যাক, তোমার আপারই শুধু কাজ আছে, আর আমরা একেবারে নিষ্কর্মা।

কথা শেষ করার আগেই জাফর ধপ করিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল। আকস্মিক শব্দে জুলি আঁতকাইয়া উঠে।

জাফর বলিল, তোমাদের এখানে গলাটা যে ভেজাবো তার কোন ব্যবস্থাই নাই।

বলিয়া ফেলিয়াই জাফর সতর্ক হইয়া বলিল, আরে, ভারী পিপাসা ধরেছে। তুমি এক গ্লাস পানি নিয়ে এস, জুলি।

জুলি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া এক গ্লাস শরবত লইয়া আসিল। জাফর এক চুমুকে সবটা পান করিয়া বলিল, বাহ্, বেশ ত!

জুলি গ্লাস তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। জাফর পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, শোন!

গোঁফের উপর আলগোছে হাত বুলাইয়া লইয়া জাফর হাসিতে সারা মুখ ভরিয়া তুলিয়া বলিল, বলতে পারো, জুলি, তোমার আপার মেজাজটা এমন কড়া কেন?

কড়া?

তোমার কি মনে হয় কড়া নয়?

জুলি ক্রমে সহজ হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, আপার মত এমন ভাল আর হয় না।

জাফর হাসিয়া বলিল, সে ত তুমি বলবেই। আম কি বলছি তোমার আপা ভাল লোক নন? তোমার সাথে আমার মতের অমিল কোথায়ও নেই জেনো। তবে কথা হচ্ছে কি সহজেই তোমার আপা রেগে যান, এটা কি ঠিক নয়?

জুলি ভাবিয়া বলিল, তা ঠিক।

জাফর বলিল, তোমার আপা তোমাকে কি অকারণে বকেন না?

জুলি জওয়াব দিল, দোষ করলে বকেন।

জাফর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তোমার আপাকে আড়াল করে রাখবেই দেখছি, কিছুতেই তার দোষ স্বীকার করবে না।

যা সত্য নয় তা কেমন করে বলবো?

জাফর বলিল, না, না, তা বলতে কি কেহ তোমাকে বলছে? তবে সত্যি করে বল ত, আপাকে তুমি এত ভালবাস কেন?

জুলি বলিল, তিনি আমাকে স্নেহ করেন। আমি আজ যা সে আপার জন্য।

জাফর বলিল, ওঃ কৃতজ্ঞতা।

জুলি কি বুঝিল বলা যায় না। সে বলিল, শুধু এ-জন্যই যে আমি তাঁকে ভালবাসি তা নয়। ঠিক ছোট বোনটির মতই তিনি আমাকে দেখেন। দায়ে ঠেকে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি না, মন চায় তাই শ্রদ্ধা করি।

তোমার আপা তোমাকে বকলে বিরক্ত হও না?

জুলি জেরায় পড়িয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; সে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া বলিল, হই। তার পরে তিনি নিজেই এত আদর করেন যে, সেটা আর মনেই আসে না। আপনি জেরা করছেন বলে, তা না হলে এটা বিচার করে দেখার কথাও কোনদিন আমার মনে আসে নাই।

জাফর প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া বলিল, তুমি খুবই বুদ্ধিমতী, জুলি। আমি এত প্রশ্ন করছি বলে তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ?

জুলি জওয়াব দিল, জী না।

জাফর বলিল, আমি তোমার আপার দোষ বের করার জন্য তোমাকে জেরা করছি না। তুমি জান ত, আমিও তোমার আপার গুণমুগ্ধ। কিন্তু কি জান আমার যেন কেমন ভয় করে।

জুলি বিস্মিত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, ভয়?

জাফর বলিল, হ্যাঁ ভয়, সত্যিকারের ভয়। তুমি কখনও সার্কাস দেখেছ, জুলি।

জুলি জওয়াব দিল, জী না।

জাফর বলিল, আফসোস, হাজার আফসোস। রিং মাষ্টার যখন বাঘ নিয়ে খেলা করে তখন আমার মনে হয়, নিছক সম্মোহন ছাড়া এটা আর কিছুই না। বাঘ যখন বুঝতে পারবে, সত্যিকার শক্তি এতে কিছুই নাই, তখন হালুম বলে বাঘ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে মুহূর্তে শেষ করে দেবে।

মেরে ফেলবে? মাগো!

হ্যাঁ, মেরে ফেলবে, কিছু বাকি রাখবে না। আমি ভয়ে ভয়ে রিং মাষ্টারের এই পরিণামের দিকেই চোখ খুলে রাখি।

আপনি চান তাই হউক? কিন্তু—

জাফর নড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি কি বলতে চাও বুঝতে পেরেছি। ছেলে মানুষ হলেও নির্বোধ তুমি নও। তুমি ভাবছো, আমি একটি অসঙ্গত তুলনা করছি। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, কোন কিছুরই তুলনা আমি করছি না। তোমার আপা হয়েছেন এক মুঠি পারা। অথবা তাও নয়। পারাকে হাতের মুঠায় রাখা গেলেও তোমার আপাকে রাখার উপায় নাই।

জুলি এতশত না বুঝিয়া বোকার মত জাফরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জাফর আবার স্বাভাবিক তরল কণ্ঠে বলিল, আমি ভাবছি তোমা হতে না তোমার আপার কোন ক্ষতি হয়ে যায়।

জুলি বিস্ময়ে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, আমা হতে?

জাফর বলিল, কেন নয়? বন্ধু বল, মিত্র বল, আপন-জন বল, একমাত্র তুমিই তোমার আপার আছ। তোমার আপার মত নিঃসঙ্গ অসুখী মেয়ে মানুষ আর না।

অসুখী?

হ্যাঁ, অসুখী। কেন জানো? তোমার আপা সহজ হতে জানেন না। তিনি চান জীবনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে; কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন দুর্ভেদ্য দুর্গের আড়ালে। জীবনে এ-দ্বৈত শাসন শুধু দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে, সহজ আনন্দের উৎস হয় না।

আরাম করিয়া মাথা এলাইয়া দিয়া জাফর আবার বলিল, তুমি বিস্মিত হবে, হওয়া তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আজ পর্য্যন্ত তোমার আপার বিরুদ্ধে সবলে শুধু অভিযোগই করে আসছে। আজ আমিও তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে নূতন করে নালিশ জানাচ্ছি।

জুলি বলিল, দেখুন, আপনার কথাগুলি যে আপার কাছে বলবো সে সাধ্য আমার নাই। কারণ, আদপে এর কিছুই আমি বুঝতে পারিনি।

জাফর হাসিয়া বলিল, তোমার আপার কাছে বলার জন্য বলছি নাকি?

জুলি বলিল, আমার কাছে যে যা বলেন, আপার কাছে বলার জন্যই বলেন, তাছাড়া এর আর কোন কারণ নাই।

জাফর এবার প্রাণখোলা হাসি হাসিল। বলিল, জুলি তোমাকে আমি যা ভাবছিলাম তার চেয়েও চালাক তুমি। তবে তোমার আপাকে তুমি যদি কিছু বলতে চাও তা হলে বলো, জাফর সাব অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। অধৈর্য্য শব্দটি মনে রাখতে পারবে ত?

জুলি গোপন হাসি লুকাইয়া ফেলিল। বলিল, সে আর এমন কঠিন কি! অধৈর্য্য মানে জানা ত? আপা এই এখনই এলেন বলে।

জাফর বলিল, জুলি তুমি শুধু চালাকই নও, বানরও।

জুলি বলিল, যা বলেই গাল দেন, মাথা পেতে নেব। তবে ঐ আগের কথাটি আর কখনও বলবেন না। আমি জান দেব, তবু আমা হতে আপার কোন অমঙ্গল হতে দেব না, জেনে রাখবেন।

জুলির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। জাফর হাসিয়া

বলিল, সে কথাটি তুমি এখনও মনে করে রেখেছ? কি প্রসঙ্গে যেন বলেছিলাম? সে এখন আমার মনেই পড়ছে না, তা যাক। আমি তেমন কিছু ভেবে বলিনি। শুধু এই বলছিলাম, খোদা সবচেয়ে বড় আঘাত প্রিয়জনের হাত দিয়েই পাঠান, তাই দেখে আসছি। তবে এটা একটা কথার কথা মাত্র, মনে রেখ।

জাফর দার্শনিকের মত মুখভাব গম্ভীর করিয়া বলিল, তুমি ছেলে মানুষ, তাই একটি প্রাসঙ্গিক কথায় ভয় পেয়ে গেলে। আসল ব্যাপার কি জান, আঘাত প্রিয়জনের কাছ থেকে বড় হয়ে আসে না, প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে বলেই বড় হয়ে উঠে। তোমাকে একটা কিস্‌সা বলছি।

জাফর আরাম করিয়া হাত পা ছড়াইয়া বলিল, কলেজে পড়াশোনা করলেও, শেখার মাঝে বইকে ফাঁকি দিতে হয় কি ভাবে তাই শিখেছি, এই হল আমার বিদ্যা। কাজেই বুঝতে পারছো একটি শোনা গল্পই তোমাকে শুনাচ্ছি। কে যেন একজন দরবেশ ছিলেন, নামটাও আমার মনে নাই, তিনি কি যেন একটা মতবাদ প্রচার করেন। যাক গে, মতবাদ দিয়ে আমাদের কিছু আসে যায় না। কাজীর বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। তাঁকে শূলে চড়াবার তামাসা দেখবার লোভে ময়দান হাজার হাজার লোকে জমজমাট। সুযোগ পেলে অসহায়ের উপর আঘাত দেওয়া মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। অনেকেই দরবেশের উপর পাথর ছুঁড়ছিল। দরবেশ নির্ব্বিকার মুখে তা সহ্য করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক শুকনা ফুল তাঁর উপর ছুঁড়ে মারলো। দরবেশের মুখ ব্যথায় কালো হয়ে গেল। এক সময় এ লোকটি তাঁর একান্ত বন্ধু বলে জাহির করতো।

জাফর গল্প শেষ করিয়া হাসিল। জুলি গল্প শুনিতেছিল কিনা বুঝা গেল না। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন ঝি আসিয়াছে। কোথায় কি করিয়া বসে তাহার ঠিক কি! জুলি জানে রান্নাবান্নায় একটু এদিক সেদিক হইলে হোমায়রা আপা ভাত মুখেই দিতে পারিবেন না। সে আসছি বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। জাফর পিছন হইতে বলিল, দেরী করো না।

ফিরিয়া আসিতে জুলির দেরী হইল না। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা দেব?

জাফর সোফার হাতলের উপর পা তুলিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, তোমার আপা ত খবরই নিলেন না, তা তুমি যা হোক একটু আধটু দেখা শোনা ত করছো! আন। বসে বসে গলা কাঠ হতে চললো। তা বলতে পারো, তোমার আপা কি ইচ্ছে করে আমাকে বসিয়ে রেখে মজা দেখছেন?

জুলি হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। কোন কথা বলিল না।

জুলি ট্রেতে করিয়া চা ও কিছু নাশতা লইয়া ফিরিয়া আসিলে জাফর পুরাতন প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করিল। জুলি বলিল, জী না। আপার সত্যি অনেক কাজ।

জাফর উঠিয়া ঘরময় পয়চারী করিতে শুরু করিয়াছিল। বলিল, অনেক কাজ যদি, তা হলে আমাকে আসতে মানা করে দিলেই পারতেন। জালে মাছ আটকা পড়লে বুঝি সে সম্পর্কে ভাবনার আর কিছু থাকে না?

জুলি লজ্জিত হইল। কিছু না বুঝিলেও এ-লোকটিকে কেমন যেন তাহার অসহ্য মনে হয়। মুখে কিছু আটকায় না। আগল কোথাও নাই। তবু শুধু আপার জন্য সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

জুলি বলিল, বসুন, চা খান।

হ্যাঁ, খাচ্ছি।

জাফর বসিয়া পড়িয়া এক চুমুকে সবটা চা শেষ করিয়া ফেলিল। সে খালি কাপ নামাইয়া রাখিলে জুলি জিজ্ঞাসা করিল, আরেক কাপ দেব কি?

জাফর বলিল, হ্যাঁ, দিতে পারো।

জুলি কাপ তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিলে জাফর বলিল, থাক, চায়ের দরকার নাই। তোমার সাথে বরঞ্চ গল্পই করা যাক।

কিন্তু জুলি দাঁড়াইল না। বলিল রান্নাঘরে আমার কাজ আছে। কাজটা সেরে আসি।

অনেকক্ষণ পর জুলি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জাফর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জুলিকে দেখিয়া জাফর দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, আমি চললাম।

জুলি কোন কথা বলিল না।

জাফর বলিল, দেখে আসি তোমার আপার এত কি কাজ।

জুলি পথ আগলাইয়া বলিল, না, যাবেন না।

কেন?

আপা কয়েকটি মেয়ের সাথে আলাপ করছেন।

তাতে কি? তোমার আপা কি আমাকে যেতে নিষেধ করেছেন?

না।

তবে? ও তুমি নিজেই নিষেধ করছো। তোমার আপার কোথায় কি কি লজ্জা সেটা কি তুমি আমার চেয়ে বেশী জানো?

জ্বি হ্যাঁ।

জ্বি হ্যাঁ? বেয়াদপ মেয়ে! বলিয়া জাফর হো হো

করিয়া হাসিয়া উঠিল। জুলি তাহার হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

হোমায়েরা লঘু পায়ে কামরায় ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত হাসি কিসের ?

হোমায়েরা আসার পর জুলি বাহির হইয়া গেল। হাসির ধাক্কায় জাফর দুলিতেছিল। স্থির হইয়া বসিয়া সে বলিল, তবু যাক শেষ পর্য্যন্ত তোমার সাথে দেখা হল। আমি ত ভাবছিলাম, আজ জুলির সাথে আলাপ ছাড়া আর কিছুই জুটল না।

জাফরের কথার মাঝে এমন একটা ধাক্কা থাকে, হোমায়েরা বুদ্ধি দিয়া ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও অন্তর দিয়া বুঝে, এটা অরুচিকর। জাফরের চোখের তির্য্যক হাসির সহিত মিশিয়া তাহার কথাগুলি হোমায়েরার কাছে অশুভন হইয়া উঠে। অথচ এতে আপত্তি করারও কিছু থাকে না। তাহার অন্তরের অতন্দ্র দৃষ্টিতে পলক পড়ে না। কিন্তু এর মাদকতাও রোমাঞ্চকর অনুভূতির মত তাহার সারা শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, তাতে বাধা দেওয়ার উপায় তাহার জানা নাই।

হোমায়েরা হাতলহীন চেয়ারখানা একটু দুরে টানিয়া দিয়া সতর্কভাবে বসিয়া পড়িল। সহজভাবে বলিল, তোমাকে অনেক সময় বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু জান ত আমাদের মেয়েদের স্বভাব। এক কথা বলতে এলে একশ কথা না শুনিয়ে ছাড়বে না। কঠিন হয়েও এদের হাত হতে রেহাই পাওয়ার উপায় নাই।

জাফর বলিল, কাজের চেয়ে কথায়ই এদের আনন্দ।

হোমায়েরা বলে, ঠিক তাই। তা ছাড়া সবাই মনে করে নিজের কথাগুলি খুবই মূল্যবান। হাত পা গুটিয়ে বসে অপরের তা শোনা নেহায়েৎই জরুরী। একেক জনের মাথা নয় যেন চলন্ত পরিকল্পনার ফাইল। সুযোগ পেলেই একেকটি করে পরিকল্পনা তা থেকে বেরিয়ে আসে। এটাকে কাজে লাগাতে বলো দেখবে, সব ফাঁক হয়ে গেল। তখন বলবে করে দেন।

জাফর হাসিয়া বলিল, এমনি কারো পাল্লায় পড়েছিলে নাকি ?

হোমায়েরা জওয়াব দিল, তাই ত উঠতেই পারছিলাম না। স্থানীয় গার্ল্‌স্ হাই স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস। ভদ্র মহিলা অনেকদিন কাজ করছেন, অভিজ্ঞতা বেড়েছে; কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান বাড়েনি। কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা যেন বড় ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

জাফর জিজ্ঞাসা করিল, খুব চটেছ মনে হচ্ছে।

হোমায়েরা বলিল, তাকে কিছুতেই বুঝাতে পারলাম না, আমার এখতিয়ার বলে একটা জিনিষ আছে, আর সবকিছু তার ভিতর পড়ে না। যুক্তি হার মানলে প্রবীণতার দাবী পেশ করতে তিনি কসুর করলেন না।

জাফর হাসিয়া বলিল, মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞা[illegible] থাকা উচিত কিনা সেও এক প্রশ্ন।

জাফরের এই হালকা তর্কের দিকে হোমায়ে[illegible]র মন ঝুঁকিল না। হোমায়েরা বলিল, আমি যত দেখছি ততই মানুষ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে উঠছি।

জাফর বলিল, তোমার নিজের চোখ দিয়েই ত দেখছো।

হোমায়েরা এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তবে তোমার চোখ দিয়ে দেখবো, সেটাই কি তুমি আশা করো ?

জাফর এবার একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করিল। বলিল, তা হলে বলি, হোমায়েরা, অনেক সময় হয়। এটা দর্শনের কথা নয়, দার্শনিকতার আমি ধার ধারিনা, কলকারখানা চালাতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি, নিজের চোখে দেখাই সব সময় দেখা নয়। পরের চোখে দেখতেও শিখতে হয়। তা না হলে সময় সময় কল বিকাল হয়ে ওঠে।

হোমায়েরার মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, বাঃ, বেশ কথা ত বলছো।

জাফর বলিল, তোমার সে হেডমিষ্ট্রেসের কথা কিছু বলছি না, তিনি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে থাকুন, আর তার মাথায় কীট আছে কিনা, তা নিয়ে তুমি গবেষণা করতে থাক, তবে স্থান-কাল-পাত্রে রূপান্তরের কথা ভেবে দেখার জন্য তোমাকে একবার বলেছি আরবার বলবো।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, তারপর ?

জাফর বলিল, ঠাট্টার কথা নয়। আমি যখন আমার কলকারখানার শ্রমিকদের দিকে তাকাই তখন আমার মনে হয়, গরু-ছাগলের সাথে এদের প্রভেদটা কোথায় ? কিন্তু...

হোমায়েরা উৎসাহ দিয়া বলিল, বলে যাও।

জাফর বলিল, বলবই ত। কোন দ্বিধা করবো না। তোমার চোখের দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় এ এক নূতন জগৎ। জীবন মরনের সন্ধিসীমা এখানে লয় হয়ে গেছে।

হোমায়েরা হাসিতে গিয়া বিষম খাইল। বলিল, তোমার ভিতরও যে কাব্য আছে, সে ত আমি জানতাম না।

জাফর থামিয়া গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। নিজেকে আবিষ্কার করিয়া সে হো হো করিয়া হাসিল। হোমায়েরা তাহার এই হঠাৎ হাসির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

জাফর বলিল, আমার মাঝে কাব্য ! হাসির কথাই বটে ! তবে তুমি কেন জানতে না, তার কারণ আছে। তুমি ত জানতে চাও না, হোমায়েরা। মানুষকে নিয়ে প্রকৃতি এক মহা ষড়যন্ত্র ফেঁদে রেখেছে। এই ষড়যন্ত্রের চক্করে পড়ে যে যা নয় তাই হয়ে উঠতে পারে। একটি জানার চেষ্টা করোনা বলে তোমার কাছে সবই আকস্মিক মনে হয়।

হোমায়েরা বলিল, এত উচ্চ চিন্তায় কাজ নেই আমার। অহ, তোমাকে বসিয়ে রাখলাম যে জন্যে—

বলিয়া হোমায়েরা থামিল। জাফর ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলিল, তাই বলো।

হোমায়েরা বলিল, বাড়ীর আমার প্ল্যান এপ্রোভ হয়ে এসেছে। কিন্তু ওদিকে কিছুই হচ্ছে না।

জাফর উৎসুক কণ্ঠে বলিল, তাহলে ত কাজ শুরু করে দেওয়া যায়।

হোমায়েরা বলিল, বাড়ী আমার বড় নয়, তবু লোনের টাকা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কাজে হাত দিতে পারছি না। হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে যে দরখাস্ত করেছিলাম, তার যে কি হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে শেষে সব প্ল্যানই ভেস্তে যায় কিনা, কে জানে !

জাফর আগ্রহের সহিত বলিল—কেন, কেন ভেস্তে যাবে ?

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, স্বাভাবিক নিয়মে।

জাফর সোফার উপর গড়াইয়া গিয়া বলিল, এটা হলো তোমার অকারণ ভাবনা।

হোমায়েরা বলিল, তোমার কাছে অকারণ হতে পারে, কিন্তু আমি ত আমার অবস্থা ভাল ভাবে বুঝতে পারছি। এ-সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে দেবে, এ জন্যই তোমাকে বিশেষ দরকার ছিল।

জাফর বলিল, এটা এমন কিছু নয়, আমি কালই পাত্তা লাগাবো। কিন্তু হোমায়েরা, আমি কি তোমার একটুও সাহায্যে আসতে পারি না ?

হোমায়েরা ঝট করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, ও কথা থাক। তুমি জানো তোমার সাহায্য ছাড়া আমি অগ্রসর হতে পারতাম না। আর ভবিষ্যতেও অনেক সাহায্যের আশা রাখি।

জাফর বলিল, তোমার নিশ্চিহ্নে মুছে ফেলার যে কায়দা, তাকে আমি খুবই ভয় করি। আমার কথা তুমি তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলে; কিন্তু যে সাহায্যের কথা তুমি বলছ সেটা ত সাহায্য নয়, হোমায়েরা।

জাফর থামিয়া আবার বলিল, তোমাকে সাহায্য করবো, সে স্পর্ধা আমার নাই। কিন্তু আমার সহযোগিতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাকে এভাবে পর করে রাখার মানেটা কি ?

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, তোমার সহযোগিতাই আমি চাচ্ছি। যা বললাম সে কাজটা করে দিও।

জাফর বলিল, আমি যা বলছি তা তুমি বুঝতে পারছো, তবু এড়িয়ে যেতে চাও।

হোমায়েরা বলিল, ও থাক। এতে বিতর্কের কোন ফাঁক আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ভাবছি মাঝখানে দুটো দিন হাতে কোন কাজ নাই, এ-সময় একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে হয়।

জাফর বলিল, আমিও তোমার কাজের ফাঁকটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। নদীর ওপারে আমার নূতন মিলের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসবো। পরশু তোমাকে যেতে হবে।

যেতেই হবে ?

হ্যাঁ। কেন যাবে না, কাজ নাই ত ঘরে বসে থেকে কি করবে ? আমি বলছি দিনটি তোমার ভাল কাটবে।

তোমার কথার উপর আমাকে নির্ভর করতে হবে ?

কেন নয় ?

প্রশ্ন করিয়া জাফর তাহার সেই আদিম অমার্জ্জিত, অথচ খারাপ লাগিলেও আপত্তি করা যায় না, এমন হাসি হাসিল।

(ক্রমশঃ)

হজরত সালেহ্ আলাইহেস সালাম

মুস্তাফীজুর রহমান

হজরত হুদ (আঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আ-দ-জাতির যে অংশটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বলা হয় আ-দ-ই উলা আর যাহারা তাঁহার উপদেশ পালন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশগধরগণকে বলা হয় আ-দ-ই সামিয়া। এই খান্দানে সা-মূদ-নামক এক ব্যক্তি ছিল। তাহারই বংশে হজরত সালেহ্ (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ তথ্যবিদ তাবেঈ ওহব ইবনে মোনব্বার মতে তাঁহার বংশ নামা এইরূপ: সালেহ্ ইবনে ওবায়দ ইবনে জাবের ইবনে সা-মুদ। (১) হজরত সালেহ্ (আঃ) এর উর্দ্ধতন পুরুষ সামূদের নাম অনুসরণেই তাহার অধঃস্তন খান্দানকে বলা হইত: আ'-লে সামূদ বা সামূদের বংশ। এই সামূদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন হজরত নূহ (আঃ)। তাঁহার বংশ নামা এইরূপ: সামূদ ইবনে আ-দ, ইবনে এওজ, ইবনে এরাম, ইবনে সাম, ইবনে নূহ (আঃ) (২) সামূদ শব্দের অভিধানিক অর্থঃ স্বল্প পানির স্থান অথবা স্থায়ী জাতি।

পশ্চিম-উত্তর আরবে হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যে ওয়াদি-আল্ কোরা নামক যে বিস্তৃত ময়দান রহিয়াছে—তাহাই ছিল সামূদ জাতির বাসস্থান। এই বিরাট অঞ্চলকে বলা হয় ফাজ্জ্ন-না-কাই। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ ছোট ছোট বস্তীতে বাস করিতেন বলিয়া উহাকে বলা হইত ওয়াদি আল্ কোরা। প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ কর্ত্তৃক উক্ত জাতির তৈরী মজবুত ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থাপত্যে তাহারা ছিল বিশেষ দক্ষ। এক এক খণ্ড বিরাট কায় পাষান খুদিয়া তাহারা উহার মধ্যে এক একটি গোটা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া ফেলিত। এই জাতি সম্পর্কে কোরআন মজীদে উল্লেখ রহিয়াছে:

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد -

আর সামূদরা ওয়াদি আল্ কোরা অঞ্চলে পাষান খুদিয়া ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকিত। (ফজর) এই জাতির রাজধানী ছিল হাজর নগরে। উহা মদ-ইয়ানের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত আকাবা উপসাগরের নিকটবর্ত্তী। সিরিয়া-হেজাজ পথের মাঝে এই জাতির গড়া বহু বাড়ী-ঘরের ধ্বংসাবশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে: এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক মাসউদী লিখিয়াছেন:—

ورسومهم باقية وآثارهم بادية فى طريق من
ورد عن الشام جلد ٣ ص ١٤٧ -

হেজাজ-সিরিয়া পথে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও পথিকের নজরে পড়ে। তৃতীয় খণ্ড—১৪৭ পৃঃ।

হজরত হুদ (আঃ) এর জীবন কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে যে তাঁহার জাতি স্থাপত্য শিল্পে সু-নিপুন ছিল, সামূদ জাতি উক্ত আদেরই বংশধর। ইহারাও সুদৃশ্য ও মজবুত ইমারত প্রস্তুতের কাজে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল। এই সম্পর্কে কোরআন মজীদে উল্লেখ রহিয়াছে:—

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم
فى الارض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون
الجبال بيوتاً -

"আর তোমরা সেই সময়ের কথা ইয়াদ কর, যখন আল্লাহ তোমাদিগকে আদের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তিনি তোমাদিগকে জমিনে স্থান দিলেন। তোমরা সমতল ভূমিতে বালাখানা সমূহ প্রস্তুত করিয়া থাক আর পাষান খুদিয়া বসতির ব্যবস্থা কর।"

আলোচ্য জাতির স্থপতির যে সব ধ্বংসবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে এরামী এবং সামূদী ভাষায় শিলা লিপিসমূহ রহিয়াছে, যাহার পাঠোদ্ধার কঠিন।

আ-দ জাতির ন্যায় সামূদও প্রতিমা পূজক ছিল। তাহারা এক আল্লার ইবাদত ভুলিয়া অনেক কিছুকেই তাঁহার সমতুল্য মনে করিয়া বসিল। আল্লাহ এই জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্য হজরত সালেহ্ (আঃ) কে পাঠাইলেন। তিনি মধুর বাক্যে যুক্তি প্রমান দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লার নেয়ামতের কথা ইয়াদ কর। তিনি কত বড় মেহেরমান! কত বড় দয়ালু! তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রভুত্ব দান করিয়াছেন। কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান দিয়া তোমাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। প্রভু প্রতিপালকরূপে তাঁকেই স্বীকার কর। ইবাদতের উদ্দেশ্যে একমাত্র তাঁরই হুজুরে মাথা নত কর! একমাত্র তিনি ব্যতীত দুনিয়ার কিছুই ইবাদতের যোগ্য নহে।

আল্-গরজ হজরত সালেহ্ (আঃ) সাধ্যমত তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন ফায়দা হইল না। তাহারা স্বহস্তে নানা প্রকার নক্ষত্রের মূর্তি

---

(১) তফসীর-ই ইবনে কাসীর সূরা আল আরাফ। (২) তফসীর-ই-রুহুল মায়ানী ১৪২ পৃঃ

প্রস্তুত করিয়া উহার ইবাদত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল: "আমরাই আল্লার প্রিয় বান্দা। তা না হইলে তিনি আমাদিগকে এত ধন-দওলত, সোনা-চান্দি, দালান-কোঠা, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, ফল-পাপড়ী ইত্যাদি দিয়াছেন কেন?"

হজরত সালেহ (আঃ) তাঁহার জাতকে এই সওয়ালের জবাবে বলিয়াছিলেন: "সত্য বটে, এই সব কিছু আল্লাহ তোমাদিগকে দিয়াছেন; কিন্তু তোমরা যদি এই প্রকার হঠকারিতা করিতে থাক এবং সত্য বিমুখ হও তা' হইলে অতি সহজেই তিনি তোমাদিগকে এই সব নেয়ামত হইতে মাহরূম করিতে পারেন। তিনি যেমন অতি সহজ এবং অভাবিতপূর্বরূপে তোমাদিগকে এত সব সাজ-সামান দান করিয়াছেন, তেমনি অতি সহজে দেখিতে না দেখিতে তিনি তাহা ছিনাইয়া লইতে পারেন। তোমাদের এই সাজানো বাগান ছারখার করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ।"

হজরত সালেহ্ (আঃ) এর যুক্তি পূর্ণ কথায় কোন ফায়দা হইল না। মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত সমস্ত জাতি-ই কুফরী ও নাফরমানীতে ডুবিয়া রহিল। পক্ষান্তরে তাহারা হজরত সালেহ্ (আঃ) কে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিয়া বসিল: "আল্লাহ আমাদের মত একজন মানুষকে নবীরূপে পাঠাইলেন, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? তাহারা তাজ্জব হইয়া বলিল:

أ انزل علوه الذكر من بيننا -

'আমাদের মধ্যে হইতে তার উপরই কী আল্লার বানী অবতীর্ণ হইল?'

তাহারা হজরত সালেহ্ (আঃ) এর অনুগামীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল:

اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه -

তোমরা কি মনে কর যে সালেহ্ তার পরওয়ার দেগারের পয়গম্বর? তাহারা বলিল—

انا بما ارسل به مومنون -

'আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার আনীত পয়গামের উপর বিশ্বাসী।' ঈমানদারদের এই জবাব শুনিয়া তাহারা বলিল—

انا بالذی امنتم به کافرون -

"নিশ্চয়ই তোমরা যাহার প্রতি ঈমান আনিয়া থাক, আমরা তাহাকে অস্বীকার করি।"

কোন রকমেই হজরত সালেহ্ (আঃ) এর কওম তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল না। তাহারা কেবল নাফরমানী ও বাড়াবাড়িই করিতে আরম্ভ করিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হজরত সালেহ্ (আঃ) এর নিকট মো'জেজা দাবী করিয়া বসিল। তাহারা বলিল: "আপনি যদি বরহক আল্লার নবী হইয়া থাকেন, তা হইলে আপনার কথার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আলৌকিক কিছু পেশ করুন। সেই সময়ও তিনি তাঁহার কওমকে এই বলিয়া সতর্ক করিলেন যে, না-ফারমানীর পরিণাম অতি ভয়াবহ। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় মোটেই কর্ণপাত করিল না।"

শেষ পর্য্যন্ত সালেহ্ (আঃ) এর দোয়ার ফলে একটা সাদা উটকে আল্লার তরফ হইতে পাঠান হইল মোজেজা-রূপে। হজরত সালেহ্ (আঃ) তাঁহার জাতিকে শেষ বারের মত এই বলিয়া সতর্ক করিলেন যে, "কূপের পানি একদিন উষ্ট্রীর, একদিন তোমাদের। সাবধান, তোমরা যদি ইহাকে কোনরূপ ক্লেশ দিতে যাও, তা' হইলে তোমাদের পরিণাম ভয়াবহ হইবে। তখন খোদার গজব হইতে তোমরা কিছুতেই রেহাই পাইবে না।"

কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হজরত সালেহ্ (আঃ) এর জাতির কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দাবী উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার হুকুমে যদি এই মুহূর্তে পার্শ্বের এই পর্বত হইতে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রি আমাদের সামনে হাজির হয়, তা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ঈমান আনিব। হজরত সালেহ্ (আঃ) তাহাদের দাবী মানিয়া লইলেন বটে, তবে তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তাহারা যদি আল্লার কুদরতের নিদর্শন এই পশুটিকে কষ্ট দেয়, তবে তাহার পরিণাম খুবই দুঃখময় হইবে। সেই সময়কার মত তাহারা তাহার কথায় সায় দিল। আল্লার কুদরতে যথা সময়ে পাষান ভেদ করিয়া একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী জন সম্মুখে উপস্থিত হইল। আল্লার এই অসীম কুদরত দেখিয়া জানদা ইবনে আমর নামক জনৈক ব্যক্তি তৎক্ষনাৎ হজরত সালেহ্ (আঃ) কে সাচ্চা নবী রূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। তা'ছাড়া আরও কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনিতে প্রস্তুত হইলে পর তাহাদের প্রধানগণ তাহাদিগকে এই বলিয়া বিরত রাখিল যে, এত তাড়াহুড়ার আবশ্যক কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করাই উচিৎ।

স্থির হইল: কূপের পানি একদিন উষ্ট্রী পান করিবে অপর দিন দেশবাসীগণ। এই ভাবে কিছু দিন চলিল। নাফরমান কওমের পক্ষে এই ব্যবস্থা বেশী দিন বরদাশ্ত হইল না। তাহারা প্রচার করিতে লাগিল: এই প্রকার বাধ্যবাধকতা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তাহারা ভাবিল: পশুটিই এর মূল কারণ, সুতরাং উহাকে হত্যা করিতে হইবে। গয়রাহ নাম্নী একজন স্ত্রীলোক তাহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা পেশ করিয়া কায়দার নামক জনৈক ধনী ও প্রভাব শালী ব্যক্তিকে উষ্ট্রী হত্যা

করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। লোভে পড়িয়া কায়দার পশুটি আঘাত করিয়া আহত করেন। কোন কোন রেওয়াতে পশুটিকে হত্যা করার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। হজরত সালেহ্ (আঃ) এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া একান্ত বিষন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন: সামুদ জাতির ধ্বংসের দিন অতি নিকটবর্তী। এই প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে কেবল নাকা-তুল্লাহ, আল্লার প্রেরিত উষ্ট্রী। এই কথারই উল্লেখ রহিয়াছে। বাকী কাহিনী বিভিন্ন হাদিস ও ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত। সুতরাং তাহাকে অকাট্য মনে করা জরুরী নহে।

এই ঘটনার পর হজরত সালেহ্ (আঃ) তাঁহার জাতিকে বলিলেন? "তোমরা আল্লার কঠিন আজাব ভোগ করিতে প্রস্তুত হও। গজবের দিন খুবই নিকটবর্তী; মাত্র তিন দিন পরই তোমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।"

আজাবের আলামত স্বরূপ প্রথম দিন তাহাদের চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিন হইল রক্তিম, তৃতীয় দিন ঘোর কাল বর্ণ। এতদসত্বেও হতভাগা সামুদ জাতি সত্যের পথে ফিরিয়া আসিল না। তাহাদের সাজার দিন উপস্থিত হইল। (৩)

তৃতীয় দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর রাতের আঁধারে প্রলয়কাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল। ভীষণ বজ্রাপাতের ও ভূমিকম্পের ফলে সামুদ জাতি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। বাকী রহিলেন—হজরত সালেহ্ (আঃ) এবং তাঁর অনুগামী কতিপয় ঈমানদার বান্দা।

কোরআন মজীদে ভীষণ শব্দ, বজ্র, ভূমিকম্প ইত্যাদি কথার উল্লেখ রহিয়াছে এই প্রলয় কাণ্ড সম্পর্কে। প্রকৃত পক্ষে এই শব্দগুলি মহাতাণ্ডবের মাত্র। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিকে লক্ষ্য করিয়া হজরত সালেহ্ (আঃ) বলিয়া ছিলেন:

يقوم لقد ابلغتكم رسالة ربي و نصحت لكم ولكن
لا تحبون الناصحين ـ

"হে আমার জাতি। আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাইয়াছিলাম। তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা উপদেশদাতাগণকে পছন্দ করিতে না।"

কোরআন মজীদের সূরা-আল আরাফ, হুদ এবং শোয়েরায় হজরত সালেহ্ (আঃ) এর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে:

তবুক যুদ্ধ উপলক্ষে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) যখন তাঁহার সাহাবীগণসহ হাজর নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন মোজাহেদগণ তথায় তাবু খাটাইয়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চুল্লি প্রস্তুত করা হইল। কূপ হইতে পানি তুলিয়া রুটী তৈরির কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হজরত (ছঃ) এর হুকুমে পানি ও আটা ফেলিয়া দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন: এই স্থানের অধিবাসিদের উপর আল্লার গজব নাজেল হইয়াছে, কাজেই এই স্থানে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করা ঠিক নহে। কোন কোন রেওয়াতে ইহাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, হাজর নগরে প্রবেশ করার প্রাক্কালে তিনি মোজাহেদগণকে এই বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আল্লার কাছে পানাহ্ চাহিতে চাহিতে এবং তওবা এস্তেগফার করিতে করিতে এই অভিশাপ্ত দেশ অতিক্রম কর।" (৪)

হজরত সালেহ (আঃ) সম্পর্কে কোরআন মজীদের সূরা-আল্ আরাফে ইরশাদ করা হইয়াছে—"আর এই প্রকার আমরা সামুদ জাতির মধ্যে নবীরূপে প্রেরণ করিলাম, তাদের আপন লোক সালেহ্ কে। সে বলিল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লার বন্দেগী করিতে থাক। আল্লাহ ছাড়া দোসরা কোন মাবুদ নাই। দেখ, তোমাদের পরওয়ার দেগারের পক্ষে একটা সুস্পষ্ট দলিল তোমাদের কাছে আসিয়াছে। আল্লার নামের উষ্ট্রিটি তোমাদের পক্ষে একটা চূড়ান্ত মীমাংসাকারী নিদর্শন। তাহাকে আল্লার জমিনে স্বাধীনভাবে চরিতে দাও। উহাকে কোন ক্লেশ দিওনা। তা হইলে তোমরা যন্ত্রনাদায়ক আজাবে পতিত হইবে। ইয়াদ কর! আল্লাহ তোমাদিগকে আ-দ জাতির পর পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব দান করিয়াছেন। তোমরা পৃথিবীর সমভূমিতে দালান-কোঠা প্রস্তুত করিয়া থাক আর পাষান খুদিয়া স্থাপন কর বসতি। তাঁহার কত এহ্সান। তাঁহার নেয়ামতগুলির কথা ইয়াদ কর। নাফরমানী করিয়া দেশে অশান্তি ছড়াইও না। সে জাতির সরদারদের মনে ছিল ধন-দওলতের অহঙ্কার, তাহারা বিমুখ হইল। এবং তোমাদের মধ্যকার যাহাদিগকে দরিদ্র মনে করা হইত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: তোমরা কি মনে কর যে সালেহ তার পরওয়ার দেগারের প্রেরিত পয়গম্বর? তাহারা উত্তর করিল: তিনি সে সত্য নিয়া আসিয়াছেন—আমরা উহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী। অহঙ্কারীগণ বলিল: তোমরা যাহা বিশ্বাস করিয়া থাক, আমরা তাহা অস্বীকার করি। তাহারা উষ্ট্রিকে আঘাত করিল। এইভাবে তাহারা আল্লার নির্দেশ অমান্য করিয়া বসিল। তাহারা বলিল: হে সালেহ্! যদি তুমি নবীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাক—তাহার ব্যবস্থা কর। প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প তাহাদিগকে পাইয়া বসিল। তাহাদের গৃহ সমূহে তাহা-

(৩) তফসীরে রুহুল মায়ানী ১৪৪—১৪৫ পৃঃ

(৪) তারিখে ইবনে-কসী প্রথম খণ্ড ১৩৮—১৩৯ পৃঃ

দের ভোর হইল—অথচ তাহারা উপুড় মুখী মৃত। সালেহ তাহাদিগকে পরিহাস করিল, বলিল: হে আমার জাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে পৌঁছাইয়াছি আমার প্রতি-পালকের পয়গাম। তোমাদিগকে সদুপদেশ দিয়াছি। কিন্তু তোমরা নসিহতকারীগণকে পছন্দ করিতে না।" আল্-আরাফ।

তিনটি কবিতা

আবদুল মজিদ

মেয়েটার চোখ

যেন এক প্রশ্নপত্র মেয়েটার চোখ
আমার জানালা পাশে ওই ছাতে মেলা ;
দুপুরের রোদ পড়ে বিকেল ছড়ালে
ছায়াময় কিছু শান্তি, সতর্কে একেলা
মুখোমুখী জানালার গাম্ভীর্যে দাঁড়ায় :
অকল্পিত প্রশ্নপত্র নিত্য পরীক্ষায়॥

কালীবাড়ী রোড্

বিশেষণে পরিচিত, বিলাসী প্রদত্ত কোনো নাম
নেই তার ; এ-শহরে লোকমুখে রয়েছে সুনাম।
যেমন রমনা-রাঁচী নামে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন রুচি,
এই নামে সত্তা জুড়ে অরসিক ধর্ম্ম-অভিরুচি।
রাত্রি নামে, অন্ধকারে পায়ে পায়ে সতর্কিত বুট,
গলির কিনারে ভীড়, ব্রীড়াক্রান্ত কালীবাড়ী রোড্॥

আফসের ঘড়ি

ঘড়িটা পরম শত্রু, প্রতিক্ষণ পাহারায় রত,
কখনো টেবিল ছেড়ে ওঠে গেলে গড়ে অভিযোগ—
নির্ভুল মিনিট বিশ দেখা নেই, বাহির—উন্মুখ
আমাকে অফিসে নিয়ে নাকি বড় সবার বিপদ।
দশটায় হাজিরা দে'য়া, হ'তে পারে, ঘটেনা প্রত্যহ
তার জন্যে ছুটি-ছাঁটা কাটা পড়ে যদিও, পড়ুক ;
ঘড়িটার হিংসে তবু, সারাদিন টিকটিক্ বুক—
দশটা-পাঁচটা করে, প্রাত্যাহিকী জীবন দুঃসহ।

আদম খাঁর গীত

চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর, সাহিত্যভূষণ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

তিন চিঠি দিয়া বা
গরিধর মাঝি বা
বসি থাকে টংগির শহরে রে।
বিরাইম খাঁ দেওয়ান বা
গরির চিঠি পাইয়া বা
ফালে উঠে ১০ হাত উপরে রে।
লোক লস্কর সাজো রে
শ্রীপুর যাইতাম রে
কেদাইর পুরী করিতাম উড়াড় রে।
আবদুল খাঁ দেওয়ান বা
গরির চিঠি পাইয়া বা
কান্দেন দেওয়ান মাথায় মারি হাত রে।
লোক লস্কর লৈয়া বা
দেওয়ান বা আবদুল খাঁ
চল্‌লা যাইতা শ্রীপুর শহরে রে।
জমসর খাঁ দেওয়ান বা
গরির চিঠি পাইয়া বা
লোক লস্কর করিলা সাজন রে।
লোক লস্কর লৈয়া বা
দেওয়ান বা জমসর খাঁ
ধাওয়া কৈলা কেদাই মামুর বাড়ী রে।
দেওয়ান বা বিরাইম খাঁ
দেওয়ান বা আবদুল খাঁ
আর আইলা জমসর খাঁ দেওয়ান রে।
তিনজন মিলিয়া বা
টংগির শহর আইয়া বা
মিল দিলা গরিধরের সংগে রে।
এই সব কথা বা
এই খানো থইয়া বা
কি করৈন আদম খাঁ দেওয়ান রে।
কৈয়া কিছু যাই বা
উদয়তেরা কন্যা বা
খবর পাইলা ফুলদাসীর কাছে রে।
কুবাইতো (১) এক বেটা গো
শাদীর পৈগাম লইয়া গো
আসিয়াছিল তোমার বাপের আগে রে।
তোমার ওযে বাপে গো
সেই না বেটারে গো
বান্দিয়া থৈছেন বন্দীখানা ঘরে রে।
তোমার নামে বেটা গো
বন্দখানায় মৈলে (২) গো
পুরুষবধের পাপে তোমায় পাইবে গো।
এই না কথা শুনিয়া রে
উদয়তেরা কন্যা রে
চলি গেলা বন্দীখানা ঘরে রে।
বন্দীখানা ঘরে বা
গিয়া কন্যা দেখে বা
চান্দ এক পাথরের তলে পড়্‌ছে রে।
বন্দীর ছুরত দেখিয়া বা
উদয়তেরা কন্যা বা
আশিক হৈলা বন্দীর উপরে রে।
উষ্টা (৩) যে মারিয়া বা
উদয়তেরা কন্যা বা
৩০ মণি পাথর পালাইলা উড়াইয়া রে।
হাত পাওয়ের বান্দ্‌ বা
ছিঁড়িয়া পালাইলা বা
মরছর ধুমা পালাইলা ছিৎরাইয়া (৪) রে।
তেল পানি আনিয়া বা
বন্দীর মাথাত দিলা বা
দিতে বন্দীর হুশ যে ফিরিল রে।
হুশ হৈতে আদম খাঁ
চউখ মেলি দেখে বা
সপনের কন্যা ছামনে হাজির রে।
কন্যারে দেখিয়া বা
কৈন দেওয়ান আদম খাঁ
কও কন্যা তুমি কোন্‌ জন রে।
উদয়তেরা কৈন বা
তোমার পরিচয় বা
আগে কৈলে (৫) পাছে কৈমু (৬) আমি রে।
এ রে শুনি আদম খাঁ
পরিচয় কয় বা
শুন শুন স্বপনের পরি রে।

(১) কোথা হইতে। (২) মরিলে (৩) পদাঘাত (৪) বিদূরিত করিয়া (৫) কইলে (৬) কহিব

বাপের নাম মছলন্দ আলী
মোর নাম আদম খাঁ বলী
মা' আমার অলির নিয়ামত বিবি রে।
চিন্‌ছি চিন্‌ছি চিন্‌ছি বা
ফুফুর ঘরের ভাই বা
আমার নাম যে উদয়তেরা কন্যা রে।
চিন্‌ছি চিন্‌ছি চিন্‌ছি গো
মামুর ঘরের বইন গো
স্বপ্নে তোমায় করছি আমি বিয়া রে।
বাপে আমার বান্দিয়া বা
বন্দী খানায় থৈছেন বা
ঐ বলেনি (৭) করতায় আইছ বিয়া রে।
তোমার ঐ যে বাপে গো
বিষ যে খাওয়াইয়া গো
কৌশল করি বান্দিয়াছে আমারে রে।
কৌশল না করিলে রে
কোন বান্দীর পুতে রে
বন্দী করতে পারতো আদম খাঁয় রে।
এমন সময় কালে রে
গরিধর ধর মাঝিরে
ফিরিয়া আইলা ছিরিপুরের ঘাটে রে।
লগে আইছেন তিন বা
আদম খাঁর ভাই বা
আর আইছেন বহুত লস্কর রে।
ঘাটে ভিংগা থৈয়া বা
ডনকাত (৮) বাড়ি দিলা বা
হিন্দোল (৯) পড়িল ছিরিপুর শহরে রে।
৬০ হাজার ছিপ্পাই বা
কেদাইরাজার ছিল বা
সাজি আইলা করিতে যে রণ রে।
এক হাজার দুই বা
বাইট হাজার সাজিতে বা
বিরাইম খাঁয় কিনা কাম কৈলা রে।
কৈন বিরাইম আবদুল খাঁ
শুন ভাই জমসর খাঁ
শুন শুন গরিধর মাঝি রে।
দের (১০) নাহি কর বা
পরানে না সয় বা
না জানি কি করিছে আদম রে।

যত বৈল (১১) না দেখছি বা
প্রাণের ভাই আদম খাঁ
অত বৈল (১২) না পরান ঠাণ্ডা হয় রে।
এই না কথা বলিয়া বা
বিরাইম খাঁ দেওয়ান বা
ধাওয়া (১৩) কৈলা (১৪) কেদাই রাজার বাড়ী রে।
এরে দেখি আবদুল খাঁ
সাজি চলৈন জমসর খাঁ
আর চল্‌লা গরিধর মাঝ রে।
শতেক মণি বৈঠা বা
কান্দে তুলি লৈলা বা
রোষে টলেন যেমন তুফান রে।
তিন ভাইর ফৌজ বা
যেমন পিপড়ার পাল (১৫) বা
চল্‌লা তারা পিছে পিছে হৈয়া রে।
কেদাই রাজার ফৌজ বা
মহাযুদ্ধ লাগিল বা
মার মার করি আসিলা ধাইয়া (১৬) রে।
দুই দলের ফৌজ বা
মহাযুদ্ধ লাগিল বা
লউয়ে (১৭) যায় আত্তি (১৮) ঘোড়া বাইয়া রে।
বিরাইম খাঁ দেওয়ান বা
এক এক উয়ারে (১৯) বা
মারৈন ছিপাই বিশ তিশ করিয়া রে।
দেওয়ান বা জমসর খাঁ
এক এক উয়ারে বা
মারৈন ছিপ্পাই ৩০।৪০ করিয়া রে।
গরিধর মাঝি বা
শতেক মণি বৈঠায় বা
এক এক উয়ারে মারেন শতেক করিয়া রে।
গরিধর ধর মাঝি বা
ময়দানের মাঝে বা
ঘুরৈন যেমন কুমারে চাক্ রে।
বাড়ীর ভিতর তনে (২০) বা
দেওয়ানরে আদম খাঁ
গজি উঠ্‌লা যেমন হাড়ি কোনর দেও রে।
লাথ যুড়কর দিয়া বা
দেওয়ান বা আদম খা
দৌড়ে গেলা ময়দান মাঝারে রে।

(৭) এই শক্তিতে কি (৮) রাজঘণ্টা (৯) হুলস্থূল (১০) বিলম্ব (১১) যত সময় (১২) তত সময় (১৩) আক্রমণ (১৪) করিলেন (১৫) দল (১৬) সরোষে (১৭) রক্তে (১৮) হাতী (১৯) আঘাতে (২০) হইতে

চারি ভাই যদি বা
এক খানো অইলা (২১) বা
ডরে ডরাইল ছিরিপুরের ফৌজ রে।

৪ ভাই দেওয়ানরে বা
গরিধর মাঝিরে বা
একথানো (২২) দেখি পরমদ গনিলা রে।

বিপাক গনি মনে বা
যে যেবাই (২৩) পারলা বা
ভাগিয়া গেলা নিজর জান (২৪) লৈয়া রে।

ময়দান খালি হৈল বা
পাঞ্চজনে মিলে বা
সান্ধাইলা কেদাই রাজার বাড়ী রে।

সকলে মিলিয়া বা
তকিত করি চায় বা
কেদাইরে না পায় দেখিতে রে।

বিতি বিতি (২৫) করিয়া বা
আন্ধাইর এক ঘরে বা
গরিধরে পাইলা কেদাইরে রে।

দুনুহাতে ধরিয়া বা
শূন্যে তুলি ঘুরিয়া বা
শূন্যে মাইল (২৫) যেমন ইটার দলা (২৬) রে।

বিরাইম খা দেওয়ান বা
দৌড়দি গিয়া লুভিয়া বা
আরবার দিলা শূন্যেতে উড়াইয়া রে।

পাঁচজনে মিলে বা
লুভালুভি করে বা
কেদাই রাজায় দুহাই ফিরাদ (২৭) করে বা।

ভনির ঘর ভাই গনাইন বা
পরানে না মারো বা
যিতা (২৮) চাইবায় দিমু যে তোমারে রে।

এরে শুনি বিরাইম খাঁ
গরিধর মাঝিরে বা
বাৱন কৈলা আদম ও জমদর রে।

মা'র ভাই মামু বা
পরানে না মারো বা
যদি মামু মানৈন আমরার কথা রে।

ভনির ঘর ভাইগানাইন বা
মানমু (২৯) তোমরার কথা বা
আমারর এক খান কথা তোমরা শুন রে।

কুটুমিতা নয়া বা
আরবার করতাম বা
যদি তোমরা মানো আমার কথা রে।

উদয়তেরা ঝিয়াই বা
আদম ঠাইন (৩০) বিয়া বা
দিতায় আমার বড় মনে হৈছে রে।

বেটা বেটি আর বা
ধর্মে নাহি দিছা বা
বেটি দিয়া বেটা কৈলাম তারে রে।

একথা শুনিয়া বা
হকল (৩১) খুশী হইলা বা
কেদাই রাজায় না মারলা পরানে রে।

অলির নিয়ামত বিবি বা
দিরং (৩২) দেখিয়া বা
চলি আইলা শ্রীপুর ভাইর বাড়ী রে।

সব কথা শুনিয়া বা
আত্তাইয়া পত্তাইয়া বা
সামিল হইলা আদমের বিয়ায় রে।

মহা ধুম ধামে বা
বিয়া হৈয়া গেলা বা
কন্যা লৈয়া গেলা সোনার গাউরে।

দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদে আলী বাংগালী জাতির গৌরব। ইতিহাসে তাঁহার নাম সোনার জলে লিখা। গীতকার বিষয়বস্তু কতখানি ঐতিহাসিক সত্য এখানে তাহার বিচার নয়। তবে কবি কল্পনাও নয়। শিলহট জেলার কমলগঞ্জ থানার "নগর" নামক মৌজায় আদম-খাঁর বাড়ী ছিল।

"আদম খাঁর দিঘী" নামক বিরাট দিঘী ও "আদমপুর" পরগানা আদম খার অক্ষয় স্মৃতি। তাঁহার অধস্তন বংশধর "করিম খাঁ"র নামে "করিমপুর" মৌজার নাম স্মরণ হয়! করিম খাঁর বংশধরগণ এখানে সম্মানের সহিত বসবাস করিতেছেন। আদম খাঁর অন্যতম অধঃস্তন পুরুষ দেওয়ান হারুন খাঁ সিদ্ধেশ্বরপুর মৌজায় বাস করিতে ছিলেন। "হারুন খাঁর দীঘি" নামক বিরাট দীঘি তাহার স্মৃতির দেউলে মিটিমিটি করিয়া জলিতেছে। এই দীঘির ভূপরিমান ১৬ একরের চাইতেও বেশী। হারুন অধঃস্তন বংশধরগণ নিকটস্থ "দরগাহপুর মৌজায়" নিজস্ব খানে বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন। ঐ নিজস্ব বাদশাহী

(২১) আসিলা (২২) একত্রে (২৩) যেদিক (২৪) পরান (২৫) অনুসন্ধান করিয়া। (২৫) মারিল (২৬) মাটির ঢেলা (২৭) চেচামেচি (২৮) যাহা (২৯) মানিব (৩০) নিকটে (৩১) সকল (৩২) দেরী

আমলের। ব্রিটিশ আমলেও "ঐ জমিতে" করধার্য্য হয় নাই।

দেওয়ান ঈশা খাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলে মুসা খাঁ মসনদে আলার বংশধরগণ "হযবত নগর জঙ্গল বাড়ীতে" আছেন। আলীর নিয়মত বিবি (স্বর্ণময়ী)র গর্ভজাত "আবদুল খাঁ" "বিরাইম খাঁ" "জমসর খাঁ" দেওয়ানের বংশধর কোথায় বসবাস করিতেছেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

ছেলের জন্ম ঈশা খাঁর "আল্লার নিকট ফরিয়াদ, ছেলে জন্মিবার সংবাদ পাইয়া "দুই রেকাত নমাজ" আদায় করেন, মালমাত্তা লুটাইয়া দেন, ছেলের জ্ঞানের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে 'মকতবখানা'য় পড়িতে দিয়া 'কোরান কিতাব' পড়ান ইত্যাদি সবই ইসলামিক তমদ্দুনের ধারক। কবি কৌশলে গীতিকার ইমারতের দেওয়ালে ইসলামী তমদ্দুনের যে কারুকার্য করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তারিফের যোগ্য।

এই "গীতিকাটি শিলহট জেলার রাজনগর থানার "তেঘরি" গ্রাম নিবাসী "নৈমউল্লা"র নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। লোকটি নিরক্ষর বটে, তবে তার স্মৃতিশক্তির তারিফ না করিয়া পারা যায় না। সুর সংযোগে বিভিন্ন অংগভংগী সহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাপিয়া গীত গাহিতে কোথাও ভুলত্রুটি হয় না। গ্রাম্য গায়কের শতকরা একশত জনের স্মৃতিই এরূপ। এই গায়কের নিকট হইতে "দুলন্তীর গীত" নামক একটি করুণ কাহিনীর বর্ণনামূলক গীতিকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছি। সময়ে সুযোগে উহা সুধীমণ্ডলীকে উপহার দিবার খাহেশ রহিল।

সম্পাদকীয়

করাচী লেখক সম্মেলন

গত জানুয়ারী মাসের ২৯শে, ৩০শে এবং ৩১শে তারিখে করাচীতে সারা পাকিস্তান লেখক সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাকে অনায়াসে বলা যাইতে পারে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সম্মেলন শুধু সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় নাই, এতে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় "গীল্ড"ও গঠিত হইয়াছে। লেখকদের দ্বারা গঠিত এই গীল্ড লেখকদের স্বার্থ, অধিকার ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিয়া যাইবেন। এই কেন্দ্রীয় গীল্ড গঠনের পর আঞ্চলিক গীল্ড গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আঞ্চলিক গীল্ড গঠনের পর এর সর্ব্বাঙ্গীন চেহারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। গীল্ডের উদ্দেশ্য মহৎ এবং সম্মেলনে গৃহীত সকল প্রস্তাব যদি যথারীতি কার্যকরী হয়, তবে পাকিস্তানের লেখক ও সাহিত্যিক গোষ্ঠি যে উপকৃত হইবেন, তা লইয়া দ্বিমতের অবকাশ নাই। তাই আমরা গীল্ডের কামিয়াবি কামনা করি। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ করাচী লেখক সম্মেলন ও গীল্ড গঠনের ব্যাপারে যে সব প্রাথমিক ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এখানে আজ বলা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি। হয় ত এ সব ত্রুটি নানা কারণে অনিবার্য্য ছিল ; কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ঘটিয়াছে তা অস্বীকার করার উপায় নাই।

প্রাথমিক ত্রুটিবিচ্যুতি

করাচী লেখক সম্মেলনে আমন্ত্রিত পশ্চিম পাকিস্তানী লেখকদের সম্পর্কে আমরা তেমন বেশী কিছু জানি না। তবে পূর্ব্বপাকিস্তানের আমন্ত্রিত লেখকদের তালিকা সুষ্ঠু হয় নাই। এতে অনেক যোগ্য লেখক বাদ পড়িয়াছিলেন এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিও কিছু কিছু স্থান পাইয়াছিলেন। এর জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দায়ী নন, দায়ী তাঁদের পূর্ব্বপাকিস্তানী উপদেষ্টা বা উপদেষ্টারা। ফলে কেন্দ্রীয় গীল্ডে পূর্ব্বপাকিস্তানী প্রতিনিধি-তালিকা সুনির্ব্বাচিত হয় নাই। গোড়াতেই একটা ভুল হইয়া গিয়াছিল। আঞ্চলিক গীল্ড গঠনের পর কেন্দ্রীয় গীল্ড গঠিত হইলে এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটার অবসর অনেকখানি কমিয়া যাইত। কোনো প্রতিষ্ঠানকে নীচের দিক হইতে গড়িয়া উঠিতে দেওয়া ভাল। উপর হইতে চাপাইয়া দিতে গেলে ইহাতে কৃত্রিমতা ও মেকিত্ব থাকিয়া যাইতে বাধ্য।

সম্মেলনে পূর্ব্বপাকিস্তানের পক্ষ হইতে যাঁরা ভাষণ দিয়াছেন বা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, সেগুলিও সন্তোষজনক এবং আশানুরূপ হয় নাই। কবি জসিমুদ্দীনের ভাষণটির গলদ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়া ধরা পড়িয়াছে। তাঁর ভাষা ও চিন্তা এলোমেলো এবং তাঁর মন্তব্য ও গবেষণা অনেক ক্ষেত্রে অভিনব এবং উদ্ভট ঠেকিয়াছে। অন্য দুইটি প্রবন্ধের লেখক ও পাঠক তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতই তাঁদের উক্ত দুইটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এ-কথা এখানে বলিয়া দেওয়া আমরা প্রয়োজন মনে করি। তা না হইলে ভুল বুঝাবুঝির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্মেলনের সাফল্য

এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা জোরের সাথে বলিতে চাই যে করাচী লেখক সম্মেলন ইতিহাসের অন্তর্গত হইবে। সর্ব্বপ্রথম পাকিস্তানে এই ধরনের একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইল এবং সারা পাকিস্তানের ভিত্তিতে একটি গীল্ড গঠন করা হইল। এই গীল্ড লেখকদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য কাজ করিয়া যাইবে। এই মহৎ সিদ্ধান্তের দাম অনেক। ইহার ফল কল্যাণপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী হোক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad Press
Ramna Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী
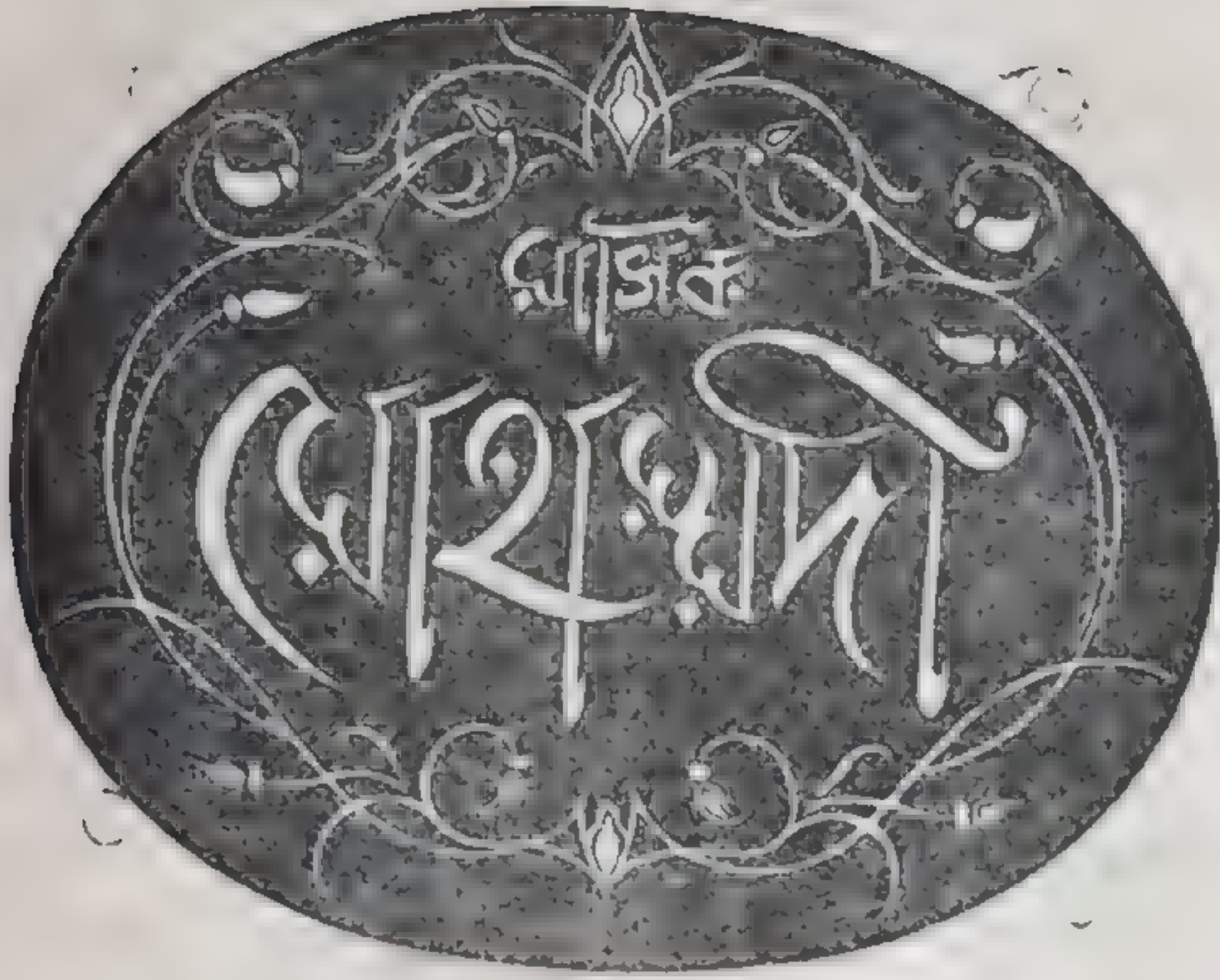
ফাল্গুন, ১৩৬৫
৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা

জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান

এইরূপ একটি উচ্চ শিক্ষিত সুধী সমাবেশে বক্তৃতা দানের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এখানে উপস্থিতির পর হইতে আমার মনে এই ধারণা ছিল যে, আমাকে এখানে বক্তৃতা করিতে হইবে না এবং আমাকে বক্তৃতা দিতে হইবে না বলিয়াও আমাকে জানানো হইয়াছিল। সুতরাং আমি নিশ্চিন্তে বসিয়াছিলাম। আমি আমার আসনে বিশ্রাম করিতেছিলাম বলিয়াই আমার মনে হইতেছিল। কিন্তু আমাকে বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া যখন বলা হয় তাহার পর হইতে আমি সম্মেলনে প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতে আরম্ভ করি। ঐ সব বক্তৃতায় যে আমি খুব অভিভূত হইয়াছি তাহা আপনাদের নিকট আমি স্বীকার না করিয়া পারি না।

একটি বিষয় আপনাদের নিকট বলার সুযোগ পাইয়া আমি খুব আনন্দিত যে, পাকিস্তানে লেখকদের নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উক্ত অসুবিধা যে চিরকাল ধরিয়া অব্যাহত থাকিবে তাহার কোন অর্থ নাই। অতীত ঘটনাবলীর দ্বারাই ঐ সব অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। আসুন, আমরা এখন এই আশা পোষণ করি যে, ভবিষ্যতে এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য মানুষের জন্য যতটা করা সম্ভবপর, তাহা করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

সমস্ত বক্তাদের মধ্যে একটি সংগ্রামী ও সৃজনশীল প্রেরণা লক্ষ্য করিয়া আমি খুব আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহারা এই মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের প্রতি তাঁহাদের একটি বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে এবং পাকিস্তানের সংহতির জন্য তাঁহাদের কিছু করিবার রহিয়াছে।

প্রায় বন্ধুদের মধ্যে অনেকে আমার নিকট আসিয়া আমাকে এমন কিছু দিতে বলেন যাহা দ্বারা জনসাধারণ পাকিস্তানের আদর্শের সন্ধান পাইবে। তাহারা যে জিনিসটি লইয়া কাজ করিবে তাহার রূপ কি হইবে? আমিও এই কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছি; কিন্তু একজন সাধাসিধা সৈনিক হিসাবে কম কথা বলা ও সময় নষ্ট না করায় অভ্যস্ত। সুতরাং আমার দৃষ্টিতে পাকিস্তানের আদর্শও খুব সহজ। উহা হইতেছে পাকিস্তানের ক্রম-বিবর্তনের ধারা; কিন্তু আমরা উহাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। পাকিস্তান হাছেল হওয়ার পর আমাদের পরবর্তী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন ছিল।

উদ্দেশ্য

যে আদর্শের জন্য আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম তাহা হাছেল না করা হইলে শুধু পাকিস্তানের কোন অর্থ হয় না। উক্ত উদ্দেশ্য হইতেছে—পাকিস্তানের জন-সাধারণের জন্য উন্নততর, অধিকতর সুখী ও আনন্দদায়ক এবং পূর্ণতর ও অধিকতর সৃজনশীল ও সুনির্দিষ্ট জীবন অর্জন করা।

উহাই হইতেছে পাকিস্তানের আদর্শ। উহা কিরূপে বাস্তবায়িত হইবে আসুন তৎপ্রতি আমরা অবহিত হই।

কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী, অকৃত্রিম ও কঠোর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কঠিন পরিশ্রমের দ্বারাই আমরা উহাকে বাস্তবায়িত করিতে পারি। উহার বিকল্প আর কোন পন্থা নাই। আপনারা যদি একটি উন্নততর পাকিস্তান কামনা করেন তাহা হইলে আপনারা উহা পাইবেন। আমি আপনাদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, গত ১১ বৎসরের হতাশা সত্ত্বেও জনসাধারণের উদ্দীপনা দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। যে জিনিসটি আমাকে প্রেরণা এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনির্ব্বাণ আশায় সঞ্জীবিত করিয়া থাকে তাহা হইতেছে এই দেশের জনসাধারণ এবং বিভিন্ন সময়ে যে ভাবে তাহারা অবস্থার মোকাবেলা ও প্রেরণাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে তাহা।

এই সমস্ত গুণ অক্ষুন্নই রহিয়াছে এবং উহাকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ ও স্বাভাবিক সৃজনশীল খাতে উহাকে প্রবাহিত হইতে দিতে হইলে যাহা এতদিন ধরিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে সেই সব সুযোগের দ্বার পুনরায় খুলিয়া দিতে হইবে; এবং এইভাবে ২০ অথবা ৩০ বৎসর কাল আমাদের কাজ করিতে হইবে: কঠোরভাবে ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সহিত চিন্তা করুন, বাস্তবের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলুন, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞতার সহিত পরিকল্পনা করুন এবং আরও কঠোর পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ করুন। কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারী এবং কারখানার শ্রমিকরাই যে উক্ত কঠোর পরিশ্রম করিবে তাহা নয়, এমনকি আমাদের প্রত্যেককেই উহা করিতে হইবে—এমনকি কোন স্থানে গৃহ পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত একজন ঝাড়ুদারও পাকিস্তানের জীবনযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাহা হইলে আমি দেখিতে চাই যে, ঝাড়ুদারটি আরও ভালভাবে পরিষ্কার করুক এবং তজ্জন্য গর্ববোধ করুক। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এইভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। আমরা যে সঠিক কাজে রত আছি, এ-বিষয়ে আমাদের সকলকে সুশিক্ষিত হইতে হইবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখকদের বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের যথেষ্ট দিবার রহিয়াছে এবং নিজেদের লেখা ও অবাঞ্ছিত বস্তবাদ হইতে জনসাধারণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া তাঁহারা উহা করিতে পারেন। বর্তমান পৃথিবীতে আপনারা বস্তুবাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না; কিন্তু এছলাম নির্দ্দেশিত পথে উহাকে প্রবাহিত করিয়া আপনারা আরও দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন।

বিরাট চাপ

চতুর্দ্দিক হইতে আমরা প্রতিকূল চাপের মধ্যে পতিত হইয়াছি। সমগ্র মানবজাতিই বিরাট চাপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। অতীতে মানুষ দৈহিক লড়াইতে নিয়োজিত হইত, আর আজ মানুষ ভীষণ মনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

আমাদের মানবিক মন এছলামের অনুসারী। কিন্তু উহাকে বিপথগামী করার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে নানাভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু উহার প্রকৃষ্ট জওয়াব কি হইবে? উহার অর্থ কি এই যে, আমাদের মধ্যযুগীয় ভাবধারায় ফিরিয়া যাইতে হইবে? এখন আপনাদের যাহা করনীয় তাহা হইতেছে আধুনিক মনে ভাষা ও ভাবধারায় এছলামের আদর্শ প্রচার করা। উহাতে কোনরূপ শূন্যতা সৃষ্টি হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। আপনাদের বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও চলতি ঘটনাবলীর ভাষায় কথা বলিতে হইবে। কারণ পৃথিবী ক্রমশঃ অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া আমাদের যোগ্যভূমিকা গ্রহণের উপযোগী হইতে হইবে।

একজন বক্তা একটি ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার যে সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার ফল ক্ষতিকর হইবে। অবশ্য উহা মোটেই আনন্দদায়ক ব্যবস্থা নহে। আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ৮ কোটি লোকের নিরাপত্তার জন্য যে সরকার দায়ী, তাহাকে মর্য্যাদা ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে কি করা উচিত? যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সরকার উহা মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ যদি সেন্সরের আওতায় আসিয়া পড়েন তাহা হইলে আপনারা এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, কেহ পাকিস্তানের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কিছু করিলে আমি অথবা আমার আসনে উপবিষ্ট অন্য যে কেহ সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিবেন।

জনসাধারণের মনের দ্বন্দ্বের জন্য আজকাল নাশকতামূলক কার্য্য খুবই বিপজ্জনক। ব্যক্তিবিশেষ যদি দেশের নিরাপদ আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া বৈদেশিক আদর্শ ও স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিতে থাকে তবে উহা অসহনীয় হইয়া পড়িবে। যতই খারাপ হউক না কেন এইরূপ অবস্থার মোকাবেলা করিতেই হইবে এবং খুব জোরের সহিতই তাহা করা উচিৎ। লোক আমাকে আসিয়া বলিয়া থাকেন যে, অমুক লোকটি অথবা অমুক ব্যক্তি একজন বিরাট লেখক অথবা বিরাট কবি। তাঁহার হয়ত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে বলার ক্ষমতা থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি যদি পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যাহত করেন তাহা হইলে তাঁহাকে যদি স্বীয় কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ত দিবার জন্য

তলব করা না হয় তাহা হইলে আমি আমার কর্তব্য-পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিব। বর্তমান পরিবর্তন সাধনের পর হইতে বরাবর আমি এই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে, জনসাধারণ যেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারে যে, জীবনের কোন ক্ষেত্রে যদি তাহাদের মহৎ কিছু করার থাকে তাহা হইলে উক্ত মহৎ প্রচেষ্টা হইতে কোন কিছুই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেনা। আমরা ইহাই দেখিতে চাই যে, তাহাদের স্বাধীন ও গঠনমূলকভাবে চিন্তা করার এবং দেশ ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কাজ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে। এই সব লোককে উৎসাহিত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি আশা করি যে, এই ভাবধারা জাগ্রত হইবে। যে পদ্ধতিতে এই নয়া ব্যবস্থা করা হইতেছে—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সামরিক আইনের পদ্ধতি। আমি উহাকে যতটা সম্ভব নরম ও সহজভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা উহা পছন্দ না করিতে পারেন, কিন্তু আপনারা যদি উহার উদ্দেশ্যের সহিত একমত হন তাহা হইলে আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এই দেশকে এমন একটি রূপ দিতে সক্ষম হইব যেখানে আপনারা স্বাধীন দেশের যোগ্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নিজেদের বিকাশ করতে সক্ষম হইবেন।

আমি আপনাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়াছি। আপনারা এত লোক এখানে সমবেত হইয়াছেন দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা খুবই চমৎকার কাজ। আপনারা যতই ঘন ঘন একত্র মিলিত হন ততই ভাল। আপনাদের কিছু অর্থনৈতিক অসুবিধা রহিয়াছে এবং আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, কোন জায়গা হইতে দশ হাজার টাকা উঠাইয়া আমি আপনাদের তহবিলে প্রথম চাঁদা দিতে পারি। তবে উহা পাকিস্তানের সেবায় নিয়োজিত হউক, ইহার চাইতে পাল্টা আমার আর কিছু দাবী করার নাই। আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ দিতেছি। আপনাদের এই সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম।*

কুহু কুহু

কে, এম, শম্‌শের আলী

কুজ্ঝটি-ঘোমটা-ঢাকা মুকুলিত আম্র-বীথিকায়
অমর লোকের কোন্ বার্তাবহ কুহু কুহু স্বর
প্রদোষ-উষায় আজি মুহুর্মুহু সুর-মূর্চ্ছনায়
ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে নিদ্রালস দিগন্ত অম্বর !
সুরের পরশ পেয়ে জাগিল কি তামাম জাহান
রঙের ছোঁয়াচ লাগে পলাশ-অশোক-শাল্মলীতে,
আনন্দের প্রস্রবন কুহু স্বরে মাতায় পরাণ ঃ
সুদূর মিনার-চুড়ে শুনি যেন ভোরের আজান !

কেবলি একটি সুর দূরান্তের বৈতালিকী গানে
প্রবল বন্যায় বুঝি ভাসাইল দুঃখ-গ্লানি-শোক,
অমরার দীপ্ত জ্যোতি বিভাসিল আজি মর্ত্য-লোক ঃ
আনন্দ-হিল্লোল-ধারা তরঙ্গিত অন্তরে সবার।
ক্ষণিকের হে অতিথি ! সুধাকণ্ঠ সুললিত তানে
মাতালে ভুবন আজি, ধন্য তব বানী অমরার !

*করাচীতে অনুষ্ঠিত লেখক-সম্মেলনে পাকিস্তানের সদরের প্রদত্ত ভাষণ।

আমাদের সাহিত্যের সমস্যা

জসীমুদ্দীন

এই মহতী লেখক সমাবেশে সভাপতি হইয়া আমি বড়ই সংকোচ বোধ করিতেছি। পাকিস্তানের উভয় অংশে আমার চাইতে অনেক যোগ্য ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ লেখক আছেন। তাঁহারা আজীবন সাহিত্যসাধনা করিয়া জনপদবাসীর জন্য বেহেশত হইতে অমৃতরস আহরণ করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ এই আসন অলঙ্কৃত করিলে আপনাদের কাজ অনেক সুষ্ঠুতর ভাবে সম্পাদিত হইত। পক্ষান্তরে তাঁহাদের সাহিত্য সাধনার সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনারাও অনেকটা গৌরব বোধ করিতে পারিতেন। এইখানে দাঁড়াইয়া আমার অক্ষমতা ভাবিয়া বড়ই ম্রিয়মান হইতেছি। আমার চারদিকে আজ আমি যে সাহিত্যের পুষ্পকানন দেখিতেছি, তাহার সৌরভে ও সৌন্দর্যে দিগন্ত প্লাবিত হইতেছে। আমি এখানে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরী, মধুমতী, কুমার, শীতলক্ষ্যা নদীর মিঠা পানিতে গড়া ভাটিয়ালী সঙ্গীতের সঙ্গে ঝিলাম, বিপাশা, সিন্ধু নদের তীরে তীরে কৃষাণ কুটিরের গানগুলির যেন এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতেছি। গম ভাঙ্গিতে যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে এ-দেশের মেয়েলী কণ্ঠে যে সুরের সরু সুতা বুনিয়া উঠে, সুদূর পূর্ব্বপাকিস্তানের ঢেঁকির গানের সঙ্গে মিশিয়া তাহা এক অপূর্ব্ব জামদানী শাড়ী বুনট করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আমি দেখিতেছি, কত সব ফুল বাগানের দক্ষ মালী ইরানের বুলবুলের সুরের তুলি দিয়া গোলাপের সুকোমল বক্ষ হইতে রঙ আর সুগন্ধ আহরণ করিয়া কত অপূর্ব্ব তসবীর অঙ্কিত করিয়াছেন।

কাশ্মিরী শালের রঙীন নকশার তাম্বুর তলে তরমুজের লাল ফালি রঙের অধরগুলি হইতে গজলের মিঠা বুলি বাহির হইয়া সুদূর পূর্ব্ব পাকিস্তানে ভাসিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের নকশী কাঁথায় করিয়া আমরা বহিয়া আনিয়াছি আমাদের দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেতের সবুজ মায়া। আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতলকরা কৃষাণের পর্ণ কুটিরের সহজ ভালবাসা, আর আনিয়াছি সরষে ক্ষেতের হলুদ শাড়ীতে করিয়া মটরশুটি ফুলের বুনট করা রঙীন কাহিনী। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশের খোরমা, খেজুর, বেদানা, ডালিম গাছের ছায়াতলে বসিয়া আপনারা যে স্বপ্ন দেখেন আমাদের কাহিনীর সঙ্গে তাহার এক নতুন মিতালী গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি এই নতুন সমাবেশের জয়গান গাহিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আজ প্রায় ১২ বৎসর পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহু সমস্যা লইয়া নানাস্থানে নানা পর্য্যায়ে আলোচনা হইয়াছে। দেশের উভয় অংশ হইতে রাজনৈতিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ দল এদেশ-ওদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশের লেখকদের লইয়া কেহই মাথা ঘামান নাই। সমস্ত দেশের লেখকদের একত্র সমাবেশের কথাও কেহ কল্পনা করেন নাই। আজ আপনারা যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ থাকিয়া এই লেখক সমাবেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহারা আমার আন্তরিক মুবারকবাদ গ্রহণ করুন। এই মহতী সভায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ না পড়াইয়া লেখকদের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার যে সুযোগ আপনারা দিয়াছেন, সে জন্যও আমি আপনাদের প্রশংসা করিতেছি।

পাকিস্তান হাছেল হইবার পর দেশে একদল লোক উন্নতির ধাপে ধাপে কেবলই উপরে উঠিতে লাগিলেন—কি চাকরীর ক্ষেত্রে, কি শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কি ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল স্থানেই আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হওয়ার কাহিনী। কিন্তু দেশের একদল লোক কেবলই ধাপে ধাপে নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। ইহারা দেশের জনসাধারণ। আমরা লেখকরাও সেই দলের। কেমন করিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম সেই কাহিনী বলিব। পূর্ব্ব পাকিস্তানের ঘটনাই আপনারা শুনুন।

আমার বিশ্বাস, পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের অবস্থাও অনুরূপ। হয় ত সেখানে সামান্য কিছু তারতম্য থাকিতে পারে।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আমরা কলিকাতায় আমাদের বইগুলি প্রকাশ করিবার আধুনিকতম সকল প্রকার সুযোগই পাইতাম। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় আসিয়া সেই সব সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ছিলেন। ধনী প্রকাশকদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কোন রকমে তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাহাদের প্রকাশিত পুস্তক কচিৎ পাঠ্য হইত; কিন্তু স্বাধীনতার পরে হিন্দুরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়িয়া দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করিলেন। পাঠ্যপুস্তকের একচেটিয়া ব্যবসা হাতে পাইয়া মুসলিম প্রকাশকেরা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের নামে গবর্ণ-

মেণ্টের নিকট হইতে কাগজের permit লইয়া সেই কাগজ চোরাবাজারে বিক্রী করিয়া আর নানা উপায়ে কেহ কেহ বড় লোকও হইলেন। কবিতা, নাটক, নভেল প্রভৃতি পুস্তক যাহা স্কুল পাঠ্য নয়; এগুলি প্রকাশ করিতে তাহারা বিরূপ হইলেন। পানির দামে যাহারা বইএর স্বত্ব বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন তাহাদেরই দু'চারখানা বই তারা মাত্র ছাপাইলেন। কি যেভাবে বই প্রকাশ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ । যায় সেদিকে তাহারা একেবারেই খেয়াল করিলেন না। স্বাধীনতার পরে ঢাকায় আসিয়া আমরা এই সকল প্রকাশকের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হইলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিব।

কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক ব্যবসায়ী আমার এক প্রকাশক ছিলেন। স্বাধীনতার পরে সেখানে আমার বইগুলি রাখা সম্ভবপর হইল না। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া সেখানকার আয়কর বিভাগ আমার উপর শতকরা ৩৩॥ অনুপাতে আয়কর ধরিলেন।

ঢাকায় আসিয়া আমি একজন নামকরা প্রকাশকের দ্বারস্থ হইলাম। আমার 'নকশী কাঁথার মাঠ' পুস্তকখানা প্রকাশের আলোচনা হইল। এই বই ছয় মাসে হাজার সংখ্যা বিক্রি হয়। প্রকাশক ভদ্রলোক নানা টালবাহানা করিয়া আমাকে ছয়মাস ঘুরাইলেন—তারপর বলিলেন, আপনার পুস্তকের স্বত্ব যদি বিক্রী করেন তবে আপনার বই আমরা ছাপাইতে পারি। আমি সালাম করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যেহেতু আমার পিতা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া আমাকে এম, এ পাশ করাইয়াছিলেন এবং আমি গবর্ণমেণ্ট চাকরী করিতাম, তাই আমি এই প্রকাশকের কবল হইতে মুক্তি পাইলাম। কিন্তু আমি যদি পুস্তক রচনাকেই আমার একমাত্র জীবিকার পথ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা হইলে এই প্রকাশকের কাছে পানির দামে আমার পুস্তকের স্বত্ব বিক্রী করিয়া আমার ছেলে মেয়ে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের অভাবের অবলম্বন আমার বইগুলির আয় হইতে বঞ্চিত করিতাম। মোজাম্মেল হক নামে একজন বটতলার লেখক আছেন। তিনি প্রায় একশত বই লিখিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন বইয়ের ৩০টি সংস্করণ ছাপা হইয়াছে; কিন্তু তিনি প্রায় ভিখারীর মতন জীবন যাপন করেন। কারণ তার প্রত্যেকখানা পুস্তকেরই স্বত্ব তিনি সামান্য দামে বিক্রী করিয়াছেন। এরূপ ইতিহাস পূর্ব্ব পাকিস্তানে বহু মিলিবে।

পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক ফজলুল হক সাহেব স্বাধীনতার পরে কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট অফিসের চাকরীটি ছাড়িয়া দিয়া ঢাকায় আসিলেন জীবিকার সন্ধানে। বড় বড় নেতা ও মন্ত্রীদের দুয়ারে দুয়ারে কয়েকদিন ঘুরিলেন। কিন্তু বৃথা। দুইবেলা আহারেরও সংস্থান তিনি করিতে পারিলেন না। অনাহারে, অনিদ্রায় এবং নেতাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একদিন তিনি চলন্ত ট্রেণের সামনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিলেন। এই মূল্যবান জীবনটিকে রাখিতে পারিলে তার দানে আমাদের দেশের গৌরব বাড়িত। তার রচিত কাহিনীর অমৃত পান করিয়া আমাদের পাঠক সমাজ ধন্য হইত। সেই অভিমানী লেখক ফজলুল হকের মৃত আত্মা কি আজো পাকিস্তানের বঞ্চিত লেখক সমাজের ফরিয়াদ হইয়া আকাশে-বাতাসে ক্রন্দন করিয়া ফিরিতেছে না?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লেখক হইতে হইলে দারিদ্র্যত আসিবেই। লেখক যত গরীব হইবেন, তাহার লেখার জোশ ততই বাড়িবে। কিন্তু বর্তমান যুগে এ-কথা খাটে না। বিদেশের যতটা খবর রাখি, বহু দেশেই লেখকরা লিখিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন। বছরে বছরে যে সব সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পাইতেছেন, তাহাদের অনেককেই দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। দারিদ্র্যই যদি লেখকের শক্তি ফুটাইবার একমাত্র পন্থা হইত তবে আমাদের গরীবের দেশে বারনার্ড শ, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, টমাসহার্ডির উদ্ভব হইল না কেন? বুলবুল পাখীর খাঁচার ঢাকনী খুলিয়া দিলে চিরজনমের মত গান বন্ধ করে। দুঃখ দারিদ্র্য এবং অভাবের তাড়নায় কত লেখক পাখী চিরজনমের মত গান বন্ধ করেছেন, কে তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিবে?

আমি আগেই বলিয়াছি, প্রকাশকেরা আমাদের বই ছাপাইতে চাহেন না। আমরা নিজেরাও আমাদের বই ছাপাইতে যাইয়া নানারূপ সমস্যায় পড়িয়াছি।

সাধারণ পাঠকের আকর্ষণীয় করিয়া বই ছাপাইতে হইলে প্রয়োজন নানা রকমের আকর্ষণীয় কাগজ, ভাল ছাপাখানা, ভাল ব্লকের কারখানা আর চিত্রশিল্পীর।

কর্ণফুলী কাগজ যন্ত্রের বদৌলতে আজ যথেষ্ট কাগজ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যে কাগজে বই ছাপাইলে পাঠককে আকর্ষণ করা যায়, সেরূপ কাগজ কর্ণফুলী পেপার মিলে তৈরী হইতেছে না। তা ছাড়া কর্ণফুলীর কাগজের দাম অত্যন্ত বেশী। স্বাধীনতার পরে ঢাকার প্রেসের মালিকেরা ছাপানর দাম অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দিলেন। প্রেসের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং ছাপাইবার কাগজ সীমাহীন। এই কারণে প্রেসের মালিকেরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ছাপানর মান বাড়াইবার কোনই প্রয়োজন মনে করিলেন না। ঢাকায় ব্লকের যে কয়টি কারখানা আছে তাহাদের দাবী অত্যন্ত বেশী এবং সকল রকমের ভাল ব্লকও তারা তৈরী করিতে পারেন না। বন্ধুবর শিল্পী জয়নুল আবেদীনের স্নেহের ছায়াতলে

অধুনা একদল তরুণ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ব্লক তৈরীর কারখানার শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য তাহাদের ছবি অঙ্কণ পদ্ধতিকেও সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

এই অবস্থায় আমাদের বইগুলি ছাপা হইয়া যখন বাহির হয়, তাহারা দেখিতেও যেমন কুৎসিত, দামও পড়ে তেমনি বেশী, সীমান্ত পার হইতে যে সব চকচকে বই আমাদের বাজারে আমদানী হয়, তাহার দাম পড়ে আমাদের দামের অর্দ্ধেক। আমাদের মানস কন্যারা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর চটের বসন পরিধান করিয়া সেই সব রঙিণ শাড়ী আর অলঙ্কারের জৌলুস ভরা সুন্দরীদের পাশে পাঠকের উপহাসের পাত্র হইয়া বিরাজ করে। শো কেস হইতে সেই সব বই কিনিয়া লইতে লইতে পাঠকেরা যখন মত প্রকাশ করেন, পাকিস্তানে কি আর লেখক আছেন? তখন তাহাদের দোষ দিতে পারি না।

সীমান্তপারের বই আসা বন্ধ করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। বই হইল জ্ঞান বিস্তারের পথ। এই পথ বন্ধ হউক, ইহা কেহই চাহে না। বরঞ্চ আমরা সীমান্ত পারের বইগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াই আমাদের পাঠকের অন্তর জয় করিতে চাহি। বিদেশী সাহিত্য যতই বড় হউক, নিজের দেশের সাহিত্যের প্রতি আমাদের আর এক রকমের দরদ আছে। গালীবের অথবা নজরুল ইসলামের কবিতা পড়িয়া আমরা যে রস অনুভব করি, মিলটন, শেলী, কীটস পড়িয়া সেই রস অনুভব করি না। তা যদি হইত, তবে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সি, এস, পি পাশ করা বড় বড় চাকুরেরা রাতের পর রাত কবি সম্মিলনীর রস উপভোগ করিতে পারিত না। মাতৃদুগ্ধের মত দেশী সাহিত্য আমাদের অবচেতন মনে আকর্ষণের মদিরা ঢালিয়া দেয়।

আমরা চাহি, আমাদের বইগুলিকেও সুন্দর করিয়া বাহির করিতে। মানস কন্যাকে যখন বরের দেশে পাঠাইব, তখন তার গায়ে যেন সুন্দর করিয়া জেওর পরাইয়া দিতে পারি। যাহাতে প্রথম দৃষ্টিতে বরের সে মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেই জন্য আমাদের প্রস্তাব :—

১। কর্ণফুলী পেপার মিল হইতে নানা রকমের আকর্ষণীয় কাগজ তৈরী করিতে হইবে। এই কাগজ যাহাতে ঢাকা, করাচী এবং লাহোরে সহজে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাগজের দাম কমাইতে হইবে। কাগজ শিক্ষার বাহন। আমাদের অনুন্নত দেশে শিক্ষাই হইল সব চাইতে বড় সমস্যা। ভুলিলে চলিবে না ও দেশের মানুষ এখন চন্দ্রে অভিমান করিতেছে। কাগজকে সহজপ্রাপ্য করিয়া আজ দেশের শিক্ষাকে বহু বিস্তৃত করিবার কামনা যেন দেশের সকল মানুষের মনে জাগে।

২। প্রেসও লোক শিক্ষার আর একটি বাহন। নতুন প্রেস কিনিবার জন্য প্রেসের মালিকদিগকে উদারভাবে লাইসেন্স প্রদান করিতে হইবে। শুনিয়াছি, গত কয়েক বৎসরের উপার্জ্জনে ফুলিয়া ফাঁপিয়া কোন কোন প্রেসের মালিক ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব ছাপাখানাকে সম্প্রসারণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের দরবারে বহু হাজিরা দিতেছেন। তাহাদিগকে উদার ভাবে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যথেষ্ট সংখ্যক প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রেসের মালিকরা অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ছাপানর মান বাড়াইতে বাধ্য হইবে এবং ছাপানর খরচও আস্তে আস্তে কমিয়া আসিবে।

৩। ব্লকের কারখানাগুলি যাহাতে সহজে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দরকার হইলে ব্লক তৈরীর খরচের হার বাঁধিয়া দিতে হইবে। নতুন মেসিন কিনিবার জন্য যথেষ্ট লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বই ছাপা হইলে তাহার যথেষ্ট প্রচারের প্রয়োজন। ভাল প্রকাশকের সাহায্য না পাইলে এই প্রচারকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয় না। স্কুলপাঠ্য নয় এরূপ পুস্তক ছাপানর জন্য প্রকাশকদিগকে এই সব পুস্তকের উপার্জ্জনের উপর আগামী বৎসরের জন্য আয়কর মাফ দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে আরও অনেক সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়া আউট্ বুক প্রকাশে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে ভাল মাসিকপত্র নাই। যে কয়টি মাসিকপত্র আছে তাহার গ্রাহক সংখ্যা নগণ্য। মাসিকপত্র যেমন নতুন নতুন লেখক তৈরী করে তেমনি তাহার কলেবরে অসংখ্য পুস্তকের বিজ্ঞাপন বহন করিয়া পাঠক সাধারণকে বই কিনিতে উৎসাহিত করে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে সেরূপ মাসিকপত্র না থাকায় প্রকাশকদিগকে দৈনিক কাগজে উচ্চহারে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপন একদিনেই শেষ হইয়া যায়। প্রতিদিন বইএর বিজ্ঞাপন দিতে গেলে অসম্ভব খরচ পড়ে। পুস্তক বিক্রী করিয়া খরচ পোষাইয়া লওয়া যায় না। সেইজন্য মাসিকপত্রগুলির যাহাতে বেশী কাটতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বন্ধুবান্ধবকে আমরা মাসিকপত্রের গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতে পারি। সরকার এইরূপ মাসিকপত্রের বহুসংখ্যা ক্রয় করিয়া স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরীগুলিতে বিতরণ করিতে পারেন। অক্লান্তকর্ম্মী মিঃ এন, এম, খান পূর্ব্ব পাকিস্তানে থাকিতে পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির মারফত এরূপ কাজে হাত দিয়াছিলেন। তাঁর

চেষ্টায় শিশুদের জন্য দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকা দুইটি উঠিয়া যায়। সস্তাদরে কাগজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া ও ডাক মাশুলের হার কমাইয়া আমাদের সরকার মাসিক-পত্রগুলিকে আবার জাগাইয়া তুলিতে পারেন।

সরকার পরিচালিত পত্রপত্রিকায় বইএর বিজ্ঞাপনের হার ১/৪ অংশ, অন্যান্য দৈনিক পত্রিকার প্রচলিত বিজ্ঞাপনের হারের অর্দ্ধেক এবং রেল ষ্টিমার ও ডাকযোগে পুস্তক পাঠাইবার মাশুলের হার অর্দ্ধেক কমাইয়া সরকার পুস্তকের বহুল প্রচারে সাহায্য করিতে পারেন। এই কাজ করিতে সরকারের আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে অধিক খরচ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ডাক রেল ষ্টিমার বিভাগের প্রচলিত যে কর্ম্মচারী রহিয়াছে তাহারাই এ-কাজ সমাধা করিতে পারিবেন।

এখানেই কাজ শেষ হইবে না। সমস্ত দেশে বই পড়ার জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। শহরে মহকুমার এবং গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে পুস্তকের চাহিদা বাড়াইতে হইবে। দেশের দু'চারজন লেখককে পুরস্কার অথবা মাসহারা প্রদান করিলেই লেখকদের সমস্যা মিটিবে না। তাহারা সাহিত্য করিয়া যাহাতে নিজের আয়ের উপরেই দাঁড়াইতে পারেন, জীবিকার জন্য যাহাতে তাহাদের আর কারো মুখাপেক্ষী হইতে না হয় সেরূপ আবহাওয়া দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গত মহাযুদ্ধের সময়ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহার আয়ের এক তৃতীয়াংশ সাহিত্যকলার জন্য ব্যয় করিতেন। সেই দেশে দেখিয়া আসিয়াছি, পত্র-পত্রিকার দোকানগুলিতে বহুদূর বিস্তৃত লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ক্রেতার দল। ফরাসী জাতি যে জগতের সাহিত্যকলায় এত দান করিতে পারিয়াছে তাহার পিছনে রাষ্ট্রেরও অনেকখানি দান রহিয়াছে।

পাকিস্তান হাসেল হইবার পর দেশে বহু সরকার আসিয়াছেন, গিয়াছেন। তাঁহাদের এত যে ভাষণ পত্র পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে তাহার কোথাও লেখকদের কথা নাই, আমাদের বর্তমান জনপ্রিয় সরকার বিভিন্ন সময়ে যেসব বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। কিন্তু সমাজের লোকেরা যদি আমাদের জন্য না ভাবেন তাহা হইলে সরকারের সেই অনুকম্পাও কর্পূরের মত উড়িয়া যাইতে পারে।

আমরা লেখকেরা দেশের অবহেলার পাত্র নই। আমরা দেশের চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ যেখানে শেষ হয়, সেখান হইতেই আমাদের কাজ আরম্ভ হয়। নাটকে, নভেলে, কবিতায় নানা কাহিনীর ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া নানা কথার তাজমহল তৈরী করিয়া আমরা তাহাদিগকে আকর্ষণ করি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ছাত্রেরা যখন জীবন সংগ্রামে নামিয়া আসে তখন আমরা আমাদের পুস্তকের পাতায় রচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সব ছাত্রদের গ্রহণ করিয়া লই। আমরা না থাকিলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পণ্ডিতমূর্খ পরিণত হইত।

ছোট হই, বড় হই আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। আমাদের লেখনীর উপর সোয়ার হইয়াই যুগান্ত-কারী লেখকদের আবির্ভাব ঘটে। হেম, নবীন, মাইকেল, বিহারীলাল যদি আগে আসিয়া দেশের কঠিন মাটি উর্ব্বর না করিতেন তবে বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের আগমন সম্ভব হইত না। খাইবার গিরিপথ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও পূর্ব্বপাকিস্তানের কক্সবাজারের নীলা টেকনাফ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে কত ভাষায়, কত ছন্দে, কত রূপে আমরা আপনাদের জন্য কথামৃত রচনা করিতেছি।

যুগে যুগে আমাদের লেখনীর আঘাতে কত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়াছে—কত রাষ্ট্র গড়িয়াছে। কত আদর্শবাদ প্রচার করিয়া কত আদর্শবাদের সঙ্গে আঘাত রচনা করিয়া মহামানবের যাত্রাপথকে আমরা সামনের দিকে আগাইয়া দিয়াছি। আপনারা যখন ঘুমাইয়া থাকেন আমরা তখন মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া আপনাদের জন্য কথার পাখী রচনা করিয়া তাহাকে জীবন দিতে বিনিদ্র রজনী জাগিয়া থাকি। আমাদের কথার পাখী উড়িয়া যায় দেশ হইতে দেশান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে। আপনাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়।

আমাদিগকে আপনারা অবহেলা করিবেন না। আমাদিগকে ডাকিয়া আদর করিলে দেশের কৃষ্টিকেই সম্মান দেখান হয়। আমরা যাহার গৃহে যাই, আমাদের মানস লোকের আনন্দ সেখানে বিতরণ করিয়া আসি। রাষ্ট্র ধ্বংস হইয়া যায়, বড় বড় রাষ্ট্রনেতার কাহিনী ইতি-হাসের পাতায়ই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু আমরা লেখকেরা যুগে যুগে বাঁচিয়া থাকি। মহাকবি কালীদাসকে উৎসাহ না দিলে আজ রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম কে করিত? মহাকবির সেই অমর শোলোকগুলির মধ্যেই ত' আজ রাজা বিক্রমাদিত্য এবং সেই সঙ্গে তাঁর রূপকথার জৌলুস-ভরা উজ্জয়িনী নগরী 'কালের কপোলতলে সমুজ্জ্বল' হইয়া বিরাজ করিতেছে। হাফেজের কবিতার সঙ্গে যোগ না থাকিলে আজ কে গোলাপ ফুলকে ফুলের রাণী বলিত?

রাজা-বাদশার যুগ চলিয়া গিয়াছে—দেশের জনগণের কাছেই আজ আমরা উৎসাহের বাণী শুনিতে চাই।

অতীতে দু'একজন রাষ্ট্রনেতা সাহিত্যিকের জন্য

যখনই কিছু করিতে গিয়াছেন, সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যিকের স্বনির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি হরণ করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যের পদ্মবনে বক আর হংস প্রবেশ করিয়া গুগলী শামুক লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া আসর কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফুলের সৌরভে মানস-সরোবর হইতে যে সব ভ্রমরের দল আসিয়া সেখানে গুঞ্জরণ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের কোলাহলে সেই গান আর কেহ শুনিতে পাইল না। আজ সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের পদ্মবন হইতে এই সব পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে আলাদা করিয়া লইতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্ধকার গবেষণায় তাহাদের জন্য রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। সাহিত্যিকদের আসরে শুধুমাত্র রসিক ব্যক্তিদের গুঞ্জরণ শুনিতে পাই।

পাকিস্তানের সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় তথা পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের তুলনা করিতে শুনা যায়। তাহাদের সুন্দর পরিপাটি করিয়া সাজান বইগুলি দেখিয়া আমাদের পাঠক সমাজের চোখ ঝলসাইয়া যাইতে চাহে। অধুনা প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের ভালমত বিচার করিলে তাহাদের তুলনায় সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা যে কিছু করি নাই, এমন প্রমাণিত হয় না। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের অথবা ভারতের কোন লেখকই আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

ভারতের বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের বই নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। নুট হামসুন, টমাস হার্ডি অথবা সমারসেট মমের মত তাহাদের কোন পুস্তকই আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন যে রবীন্দ্রনাথ তারও নভেল বা নাটকগুলি দেশের চৌহদ্দীর সীমা অতিক্রম করে নাই। একা রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়াই পীরবাদের মত বংশ পরম্পরায় তার পরিচয়ধারী সকলকেই সেই সম্মান দিব, এমন কোন কথা নাই। আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহারাও যেমন ফেল ছাত্র আমরাও তেমন ফেল ছাত্র। ফেল ছাত্রের মধ্যে কোন তারতম্য করা যায় না। তথাপি কেন ভারতীয় সাহিত্যিকের লেখা বই আমাদের ভাল লাগে? কেন আমাদের পাঠকেরা আমাদের বই না কিনিয়া ভারতীয় বইয়ের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে? এই কেনর উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে কিছুটা অতীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

গত উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়া শিকড় মেলে। রাজ্যহারা, সম্পদহারা মুসলমানদিগকে সেই সভ্যতা হইতে দূরে সরাইয়া রাখার নানা কৌশল জাল বিস্তার করা হয়।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে উন্নতি করিয়া হিন্দু সমাজ কতকটা আত্মসম্মোহিত। অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোধা গমন করায় তাহাদের জীবন ও সাহিত্যকে আমরা রূপকথার ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে করি। এই কারণেই হয়ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ রাজকুমারী রাজকুমারদের রূপকথা শুনিতে ভালবাসে সেইজন্য আমরাও তাহাদের প্রতি সম্মোহিত, আমাদের শ্রদ্ধা পাইয়া তাহারাও অনেকখানি আত্মসম্মোহিত। সেইজন্য আমাদের জীবনকে অথবা সাহিত্যকেও তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পান না। আমরাও সেই সঙ্গে নিজেদিগকে কিছুটা অবহেলা করিতে শিখিয়াছি। এককালে আমাদের কোন কোন লেখক শুধু হিন্দু সাহিত্যিকদেরই অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, নিজেদের লিখিত গল্পে হিন্দু চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সেই Inferiority Complex-এর ইন্দন যোগাইয়াছেন।

বিদেশী সভ্যতা ও সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আমাদের হিন্দু বঙ্গ এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, এককালে What Bengal thinks today, India thinks tomorrow এই বাণী সর্ব্বভারত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পরানুকরণের জৌলুস বেশীদিন টিকাইয়া রাখা যায় না। আজ যে জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে তাহার কারণ হয়ত নিজের কৃষ্টি ও ট্রেডিশনকে বাদ দিয়া বাঙ্গালী বিদেশীর ভাবধারা আনিয়া নিজেকে বড় করিতে চাহিয়াছিল। দেশের সাহিত্যের পূর্ব্ব সুরীদের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঙ্গালী যে সাহিত্য রচনা করিল, তাহাকে বিদেশী ও আন্তর্জ্জাতিক বলিয়া গ্রহণ করিল না দেশের আপামর জনসাধারণ ও তাহাদের নিজস্ব সম্পদ বলিয়া স্বীকার করিল না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম সেকালের ছাপাখানা বর্জ্জিত দেশে যতটা লোক-স্বীকৃতি পাইয়াছিল এ-কালের কয়জন আধুনিক বাঙালী লেখক ততটা লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন?

আজ একথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। গালিব, হাফেজ, জলন্ধরী ও জোমা এদের কবিতা ইংরাজী শিক্ষিত কবি ইকবালের কবিতার চাইতে জনপ্রিয়, নজরুল ইসলামের কবিতা রবীন্দ্রনাথের চাইতে জনপ্রিয়। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের দান হয়ত আশানুরূপ হইতে না পারে; কিন্তু পাকিস্তানী সাহিত্যের দান একেবারে নগণ্য নয়।

পূর্ব্বপাকিস্তানের চাষীর গান ইংরাজী, ফরাসী ও চেক ভাষায় অনূদিত হইয়া আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আমাদের সিন্ধি, পাঞ্জাবী এবং পশ্‌তু ভাষায়

লোকসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া ভাষ্ণুরিত হইলে আমাদের সম্মান আরো বাড়িবে। আমাদের লোকশিল্পও দুনিয়ার বিস্ময়ের ব্যাপার—এগুলি সংগ্রহ করিয়া দুনিয়ার সামনে না ধরিতে পারিলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমরা দেশদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইব। কারণ দেশে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার মান যেমন দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে আর কয়েক বৎসর পরে ঐ লোক-সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি আর পাওয়া যাইবে না। আজ জাপান ও চীন তার লোকসংস্কৃতিকে জগৎসভায় খুলিয়া ধরিয়া ইউরোপের সাহিত্যিক এবং শিল্পীদিগকে সৃষ্টির মান উন্নত করিতে সাহায্য করিতেছে। আধুনিক বহু বিখ্যাত ইউরোপীয় লেখক ও শিল্পী এই দুই দেশের কাছে তাহাদের ঋণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট পুঁথি সাহিত্যের ভাণ্ডার এক মস্ত বড় বিস্ময়। আলেফ-লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া প্রভৃতির বিরাট পুস্তকগুলি কবিতাকারে অনূদিত হইয়া লক্ষ লক্ষ সংখ্যা বিক্রয় হইয়াছে। বটতলার এই সাহিত্য ব্যবসা এখন ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। যে বিশেষ টাইপে এই বইগুলি ছাপা হইত, সে রকমের টাইপ পাকিস্তানে তৈরী হইতেছে না। প্রকাশকেরা সস্তাদামে কাগজও পান না। বটতলার এই সাহিত্য ভাণ্ডারটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে দেশের অসংখ্য জনগণ যাহারা এখান হইতে আনন্দরস পান করিত তাহারা আমাদিগকে অভিসম্পাত দিবে।

আমার চারিদিকে আপনারা অগণ্য লোক বসিয়া আছেন। আপনাদের সকলের মধ্যেই আমি অদম্য সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা কেহ কাহারো চাইতে ছোট নই। জাতির ফুটিয়া ওঠার কাজে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। আমাদের লেখনীর উপর সোয়ার হইয়াই যুগান্তকারী মহালেখকের আবির্ভাব হইবে। হয়ত আমার সম্মুখেই তিনি বসিয়া আছেন। আমি আপনাদের জয় কামনা করি।*

নীল কণ্ঠ

নূরুল ইসলাম (সন্ত)

শূন্যগৃহ স্তব্ধ সন্ধ্যা--মহাকালে হাত রেখে গৌরগ্রামে সোনা মস্‌জিদ
স্তিমনেত্র পক্ককেশ গুণীদের স্থিরতর স্তুম্ভ-গম্ভীর
কালজয়ী স্থাপত্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল—বাতিঘরে ভাস্বর-নীরন।

অনেক বছর আগে এই উপাসনা গৃহে মানুষের অনেক সুহৃদ
প্রার্থনা করেছে রাতে, সকালে, সন্ধ্যায় সব উদাত্ত ধ্রুপদ, রাগিনীর
সামুদ্রিক স্বর মেলে—কিষাণের, তাঁতী আর মজুরের মন!

মিনারে লেগেছে রঙ ফটলের বাদুড়ের কৃষ্ণপক্ষ ফেলে আছে ছায়া
কর্মহীন, প্রাণহীন, অচঞ্চল রৌদ্রজলে, শীতাতপে পৃথিবীর তীরে
যেন ভগ্ন সভাগৃহ, অতীতের কড়ি গুণে হারিয়েছে জীবন-তাগিদ।

সন্ধ্যার শান্তির সাথে মর্মরিত কলগানে আসে যেন জীবনের কান্না,
সচকিত মনবনে উবনরা নেচে যায় জীবনের ইলোরাকে ঘিরে,
ধ্যানমগ্নে জ্যোতির্ময় —বেলালের জন্য জাগে একা রাতে সোনা মসজিদ।

*পাকিস্তান লেখক সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

আমাদের তামদ্দুনিক সংগ্রাম

অধ্যাপক মমতাজ হোসেন

পাকিস্তানী লেখকদের এই সম্মেলন এমন একটি বৎসরে অনুষ্ঠিত হইতেছে, যখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের সাফল্যের এক নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহা অত্যন্ত গর্ব্বের বিষয় যে, মানুষ মহাশূন্যের বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। মহাজগতের যে সকল স্থানে মানুষ একদিন কল্পনার ঘোড়া ছুটাইতেও সক্ষম হয় নাই, আজ তাহা তাহার মহাশূন্য-যানের রাজপথে পরিণত হইয়াছে। মানুষের এই অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার সৃজনক্ষমতা অপরিসীম এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী যুক্তিসঙ্গত। এই কারণেই মীর বলিয়াছেন :—

"পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি খোদার অপরিসীম দান" এবং একবাল এই মহামানবের আবির্ভাবের জয়গান করেছেন :—

"উঠ! আদমের আবির্ভাবের সময় হয়েছে, এক মুঠো মৃত্তিকার প্রতি সেজদার সময় এসেছে। যে রহস্য এতদিন বক্ষে লুকা য়ত ছিল তা আজ চঞ্চল মৃত্তিকার মধ্যে দর্শন ও শ্রবণ করার সময় এসেছে।"

নিজের মহত্ত্বের উপর মানুষের এই আস্থাই তাহার তমদ্দুনের প্রাণকেন্দ্র এবং ইহাই তাহার তামদ্দুনিক প্রচেষ্টাকে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাকৃতিক বাধ্যবাধকতা হইতে মানুষ যখন নিজেকে মুক্ত করিতে শুরু করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার তমদ্দুন শুরু হইয়াছে। এই মুক্তিপ্রচেষ্টায় তাহার সৃজনধর্ম্মী কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে; তাই কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

"তুমি এনেছ রাত্রির অন্ধকার আর আমি এনেছি প্রদীপ, যেমন দারিদ্র্য তোমার দান আর আমি এনেছি প্রাচুর্য।"

এই কার্যক্রমের মারফতই মানুষ তাহার প্রকৃতি গঠন করিয়াছে এবং এই প্রকৃতি কেবলমাত্র কতকগুলি নীতির উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাহার অনুভূতি ও মানসিকতার সমৃদ্ধি সাধনও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু যে আশরাফুল মখলুকাত মানুষ দীর্ঘ দিনের বস্তুগত ও আদর্শগত সৃজনপ্রচেষ্টায় নূতন ভাব, অনুভূতি ও মহৎ চিন্তাধারার সাহায্যে নিজের ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, সে আজ তাহার মানবীয়গুণ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং আত্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আল্লামা একবাল এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন: "যে সূর্যরশ্মিকে আয়ত্তে এনেছে অথচ জীবনের অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি।"

আর দিবা-দ্বিপ্রহরের অন্ধকার সম্পর্কে কবি নিজেই বলিয়াছেন :—

"ধনতন্ত্রের জন্যই মানুষ মানুষকে ধ্বংস করে।"

কিন্তু এই বিপদ হইতে মুক্তির পথ অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়া নয়, কারণ অতীতও মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত নয়। ক্রীতদাস প্রথা ও সমাজতন্ত্র এই শোষণের দুইটি রূপ। আমাদের এমন ভাবেও কাজ করা উচিত নয়, যাহার ফলে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাফল্য বাতেল করিতে হইতে পারে; কারণ বিজ্ঞান জীবনের ভার হ্রাস করিয়াছে, অতীতে যাহা করিতে একশত বৎসর সময় লাগিত, এক্ষণে তাহা মাত্র এক ঘণ্টাতেই সম্পন্ন করা যাইতেছে। এই বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের কলাকৌশলই আমাদিগকে অভাবের দুনিয়া হইতে প্রাচুর্যের দুনিয়ায় প্রবেশ করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার ফলেই অগ্রগতির পথে দীর্ঘ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। অতএব এখান হইতে আর ফিরিয়া যাওয়া যাইতে পারে না। মানুষ যে দীর্ঘবাহু অপরিমেয় শক্তি ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাতেই তাহার অতীতের শোষণের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু শোষণ বর্জ্জনের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। আরও কারণ রহিয়াছে। শোষণই মানুষকে তাহার আত্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, এবং তাহার সৃষ্টিধর্ম্মী প্রেরণা বিনষ্ট করিয়াছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইয়া মানুষ অপরের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে; মানুষ মানুষ না থাকিয়া যন্ত্রের ক্ষুদ্রাংশ ও বাজারের পণ্যে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা দ্বারা আমি ধনতন্ত্রের মৃত্যুযন্ত্রণার বিবরণ দিতে চাহিতেছি না। আমি কেবলমাত্র গুরুত্বসহকারে বলিতে চাহিতেছি যে, তমদ্দুন কতিপয় নীতিবাক্য, কয়েকটি কবিতা, স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিচিহ্ন অথবা কয়েকখানি চিত্র নয় যে, তাহা সংরক্ষণের জন্য মাথা ঘামাইতে হইবে। তমদ্দুন এমন একটি সর্ব্বাত্মক শক্তি যাহা দ্বারা মানুষ নিজেকে গভীর ও সম্প্রসারিত করিতে পারে। বিজ্ঞানকে মানবতাভিত্তিক এবং মানবকে বিজ্ঞানভিত্তিক করাই তমদ্দুনের উদ্দেশ্য। কারণ ভিতর-বাহির উভয় দিক হইতেই মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে। তাহার আজাদী ও তাহার মানবতা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত,

এবং তাহার আজাদী ও মানবতার মাঝখানে যে কালো ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। শোষণ হইতেই এই কালো ছায়ার উৎপত্তি; অতএব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় আমাদের বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট কলাকৌশলের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদিগকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের শোষণ ও অন্যান্য অনিষ্টতা প্রতিরোধ করিতে হইবে।

এক্ষণে তমদ্দুন কি, তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পূর্ব্বে আমি আন্তর্জ্জাতিক দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, যোগাযোগের উপায় উদ্ভাবন ও পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে একটি বিশ্ব-তমদ্দুনও গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে কেবলমাত্র বিজ্ঞান, কারিগরি জ্ঞান ও যান্ত্রিক উৎপাদনই বিশ্বজনীন নয়, বরং জীবনের মৌলিক আদর্শ ও মানবীয় আজাদীর সনদও মোটামুটি একই প্রকৃতির। এই ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য ও একতাবোধের প্রেরণায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরের অন্তঃস্থলে তামদ্দুনিক ভাষার পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক চাহিদা ও চিন্তাধারায় সকল মানুষই এক। এই ঐক্যের দিকে অগ্রগতির জন্যই আমাদের বহু প্রাচীন রাজনীতি বাতেল হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা আর ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারি না অথবা উপপত্নী রাখিতে পারি না; এবং অদূর ভবিষ্যতেই যে আমরা বহুবিবাহ বর্জ্জন করিয়া একটি বিশ্বসনদ স্বাক্ষর করিব না, তাহাই বা কে বলিতে পারে!

এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের তমদ্দুনকে বিশ্ব-তমদ্দুন হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে পারি না; অথবা আমাদের তমদ্দুনের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি না, যাহা বর্ত্তমান যুগের সচেতনতার বিরোধী।

প্রত্যেকটি পুষ্পের পৃথক বর্ণ ও পৃথক গন্ধ রহিয়াছে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অনুরূপভাবে আমাদেরও একটি নিজস্ব জাতীয় ও ব্যক্তিগত ভাবধারা রহিয়াছে; এই ভাবধারা পাকিস্তান কায়েমের সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্য হইতে উড়িয়া আসে নাই; ইতিহাসের মৌলিক শক্তিই ইহার উৎপত্তিস্থল। পাক-ভারত উপমহাদেশের মাটিতেই এই ভাবধারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং গত ছয় অথবা সাতশত বৎসর যাবত ঐতিহাসিক শক্তির দ্বারা ইহা লালিত-পালিত হইয়াছে ও নিজস্ব রূপ লাভ করিয়াছে। এই কারণেই সকলের ধর্ম্ম এছলাম হওয়া সত্ত্বেও ইরাণ, আরব ও তুর্কীস্তান হইতে আমাদের তমদ্দুন ও ভাষা সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ইতিহাসের কোন্ সময়ে কোন্ দেশ হইতে কতজন মুছলমান কি ধরণের তামদ্দুনিক প্রভাব লইয়া ভারতে আসিয়াছিল, তাহা আমাদের জানা উচিত; কারণ তাহাদের প্রভাবই আমাদের তমদ্দুনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ মুছলমানই সুফী আন্দোলনের প্রভাবে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই আন্দোলন এই উপমহাদেশের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছিল।

এই আন্দোলন গোঁড়ামী আমদানী করে নাই, বরং বর্ণ ও সম্প্রদায়ের বাধা অপসারণ ও সকল মানুষই এক, এই আদর্শ প্রচার করিয়া মানুষের মনকে উদারতা দান করিয়াছে। ইহা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে একটি নূতন সম্পর্ক "সৃষ্টির ঐক্য" ও "প্রেমের ঐক্যের" ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সুফীগণ যে মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দান করিয়াছিল, তাহা হইতেছে মানুষের বেহেশতি ব্যক্তিত্ব ও তাহার মর্য্যাদা।

এই সুফী আন্দোলনের ছায়াতলেই আমরা এছলাম সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলাম, এবং ঈমান ও বিবেকের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন লা-ইকরাফিদ্দীন অর্থাৎ 'ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই' এর সমর্থক।

খসরু হইতে বাহাদুর শাহ জাফর পর্য্যন্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্য—উর্দ্দু, বাংলা, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পশতু যে কোনো ভাষাতেই হউক না কেন—মৌলিকতা ও গুণাবলী এবং মানুষ ও প্রেমের ঐক্যের মূল্যবোধে উজ্জ্বল।

এই আন্দোলন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংবরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করার জন্য আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে নাই; ফলে পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লব এবং যন্ত্র, অভিযাত্রী ও বনিকদের কাফেলা যখন দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তখন আমরা অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছি মাত্র। আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা প্রাচীন বলিয়া এবং আমরা মুমূর্ষ সামন্তবাদী ব্যবস্থায় আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া এই সংগ্রামে আমরা সকলের পিছনে রহিয়াছি।

কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর যখন আমরা এই পরাজয় উপলব্ধি করি, তখনই আমরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করি। স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই নূতন মন ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক ছিলেন। তিনিই আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, প্রকৃতি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়মাধীন এবং এখানে কোনো প্রকার যাদুবিদ্যার স্থান নাই। তিনিই আমাদিগকে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেন। ইহার ফলেই আমাদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয় এবং আমির আলী ও শিবলির ন্যায় আমাদের ঐতিহাসিকগণ এই নবচেতনারই সৃষ্টি। এই চেতনার প্রভাবেই হালী প্রকৃতিবাদের প্রতি আহ্বান জানান এবং ফলে আমাদের

সাহিত্য হইতে জেন-পন্থী অনুহিত হয়। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের এই মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদের আন্দোলন বাস্তবতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে ভাবপ্রবণ বাস্তবতার স্থান ছিল না, ফলে ইহা তাহার নিজস্ব ভাবপ্রবণ বিপ্লব আনয়ন করে; এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন আমাদের রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পর্য্যায়ে প্রবেশ করে, তখনই ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে।

এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব হইতে সৃষ্টি হইলেও আমরা ইহাকে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শাসন হইতে মুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি নাই, আমরা মানুষকে সকল প্রকার বাধা-বন্ধন হইতে মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াছি। এই সময়ে আমরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছি, এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই; তবে আল্লামা একবালের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ তিনিই আমাদিগকে পাকিস্তানের পরিকল্পনা দিয়াছিলেন।

কবিতা প্রকৃতিগতভাবে প্রতীকধর্ম্মী; ফলে কবির যে ব্যক্তিত্ব, স্থান ও কাল কাব্যপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার না করা পর্য্যন্ত কবিতার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায় না।

আল্লামা একবালের সমগ্র সংগ্রামই ধনতন্ত্র ও তাহা হইতে উদ্ভূত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে। তিনি ইহার বিরোধিতা করিতেন, কারণ ইহা কেবলমাত্র তাহার দেশকেই দাসে পরিণত করে নাই, বরং ইহা মানবতাবিরোধী এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব বিনষ্টকারী। ইহা ব্যতীত তিনি তাহার নিজের অতীতের ব্যাপারেও একটি গ্রহণ ও বর্জ্জনের বিরোধে জড়িত ছিলেন। এই বিরোধে তিনি এমন ভিত্তির উপর নির্ভর করিতেন, যাহা তাহার যুগের ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রেরণা সৃষ্টির উপযুক্ত। এছলামের ধর্ম্মীয় মূল্যবোধ অবহেলা না করিয়া তিনি যে ইহাকে একটি গতি ও বিবর্ত্তনশীল ভাবধারা হিসাবে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার মূল কারণ; এবং এইজন্যই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছেন :—

"ধনতন্ত্রই এ-যুগের সাম্রাজ্যবাদ"

এবং তিনি ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের উভয়ের বিরুদ্ধেই বিপ্লব সৃষ্টির জন্য তাহার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন :—

"শ্রমিকের বুকের রক্তেই প্রভুর সম্পদ লাভ হয়, যেমন ভূম্যাধিকারীর অত্যাচারে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস হয়—তাই বিপ্লব চাই, বিপ্লব... শুধু বিপ্লব—"

তাঁহার ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমরা যে ভাবধারার সন্ধান পাই, তাহাও এই একই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি—

"কোরান? সে ত ধনিকের মৃত্যুর পয়গাম এবং দরিদ্রের পরম আশ্রয়।"

কে তাঁহার এই বাণী উপেক্ষা করিতে পারে? প্রাচ্যের বহু দেশে তাঁহার এই বাণীই আজাদীর আলো আনিয়াছে। এই বাণী মহাকালের বাণী।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যে সকল কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকের সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টি আমাদের প্রেরণাকে আলোক ও রূপদান করিয়া থাকে, এই তামদ্দুনিক সংগ্রামে তাহাদের ভূমিকা কি, এবং তাহাদের শিল্পকলা, মানবতা, জাতি, দেশ ও দেশবাসীর প্রতিই বা তাহাদের দায়িত্ব কি।

মানব জীবনের এত অধিক রূপ অথবা দিক রহিয়াছে যে, তাহার কোনোটিকেই সমগ্র জীবনের সহিত একত্রিত করিয়া ভাবা যায় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা যাইতে পারে। সাহিত্য এত ব্যাপক ও বিভিন্ন রূপসম্পন্ন যে, ইহার কোনো একটি দিককে তুলিয়া ধরিয়া বলা যায় না যে, ইহা সাহিত্য। জীবনের মৌলিক মূল্যবোধে মানবতা, সুন্দরই হউক অথবা কুৎসিতই হউক ইহা ব্যতীত জীবন অভিশাপস্বরূপ; অনুরূপভাবে সাহিত্যের মৌলিক মূল্যও মানবতা; কারণ যে সৌন্দর্য্য শিল্পীদের এত প্রিয়, তাহার মৌলিকতা ও উৎকর্ষতা মানবতা হইতেই আসিয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে :—

"সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর।"

আমাদের কবি মীরও মানবতাকে প্রধান বিষয় হিসাবে উল্লেখ করিয়া শিল্পীদের ভূমিকার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন: "মূর্ত্তি নির্মাতা আজর খোদার মূর্ত্তি তৈরী করেছিল; আর আমি নিজেকে মানুষ তো তৈরী করি!"

সাহিত্য সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই আমরা সর্বদা বলিয়া আসিয়াছি যে, মানুষের জন্যই শিল্প, শিল্পের জন্য শিল্প নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই আমাদের সাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এবং পশুবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদ ও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে তমদ্দুনকে রক্ষা করিয়াছে। যে কোনো স্থানে এবং যখনই তমদ্দুন ও বর্ব্বরতার মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, তখনই এই মতবাদ অনুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে কোন স্থানের শান্তিকামী মোজাহেদদের প্রতি আমরা খোশ আমদেদ প্রেরণ করিয়াছি; আজাদী ও তমদ্দুনের পক্ষে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা আলজিরীয় জনসাধারণের আজাদী সংগ্রাম উদযাপন

করিয়াছি। ইহাই আমাদের সাহিত্যের কাহিনী ; মানবতার মুক্তি ও মানবজাতির আজাদীর জন্য আগ্রহ ও আবেগে পরিপূর্ণ এই কাহিনী আমরা বুকের রক্ত দিয়া লিখিতে কখনই দ্বিধাবোধ করি নাই।

দুই সুর

আ. ক. ম. সিরাজ-উদ্‌দউলা চৌধুরী

॥ এক ॥

বসন্তের এক রাত।…
ঘরের মাঝে ভাব্‌ছি বসে একা,
জান্‌লা পথে আকাশ আমায় হঠাৎ দিলো দেখা।
হৃদয় ভরা আবেগ দিয়ে দূর সে-নীলিমায়—
গেঁথেছি আজ তারার বনে অনেক দিনের গান,
এখন তোমার মনের লতা ফাগুন রাতের ছায়
দুল্‌ছে নাকো ?
একই সুরে তোমার আমার প্রাণ—
গাইছে নাকো একলা ঘরে মিলন রাতের গান!

বসন্তের এ-রাতের হাওয়ায় কান্না ঝরে কা'র।
দূরের বনে গুলমোহরের মেয়েরা ঘুম যায়,
দিগন্তরের যাত্রা পথের যাত্রী বলাকার—
ফিরলো বুঝি আবছা সুদূর দিগন্ত রেখায়।

হয়তো তাঁদের গান,
সকাল বেলার কুসুম হয়ে ঝরছে অফুরাণ।
শুন্‌ছি তবু কান্না ঝরা সুর,
কারণ তুমি আমি এখন অনেক যোজন দূর ॥

॥ দুই ॥

নীল্‌ পাখীরা ডানা মেলে
চলছে দিগন্তরে,—
কখন্‌ দেবো গানের আকাশ
সুরের তারায় ভরে।
রোদের হাসি ঝলো মলো,
বনের পাতা ছলো ছলো—
শিশির ঝরা কান্না এখন
তাই তো থেমে যায়,
গানের আকাশ ভরে দেবো
সুরের তারকায়।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
বনান্তরের ছায়—
নীল্‌ পাখীরা নীল-সায়রে
সাঁতার কেটে যায়।
শান্ত চপল হাওয়ার সাথে
মন যেন কার মালা গাঁথে,
ফেলে আসা দিনের স্মৃতি
আজ হৃদয়ে ঝরে,
নীল্‌ পাখীরা হারিয়ে গেল
নীলের দিগন্তরে।

* করাচীতে অনুষ্ঠিত লেখক-সম্মেলনে পঠিত।

লেখকদের জাতীয়তা ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতা

ডাঃ জাবিদ একবাল (বার-এট-ল)

পৃথিবীতে ধর্ম্মীয় ভাবধারার ব্যাখ্যার জন্য এছলাম সর্ব্বদাই তাহার সামাজিক শৃঙ্খলা কার্য্যকরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এছলামী সমাজবিধান প্রবর্ত্তনের জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন হওয়ায় পাকিস্তান কায়েম হইয়াছিল; প্রথমে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে এবং পরে উহাকে এছলামী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলে ভুল করা হইবে।

১৯৪০ সালে পাকিস্তান কায়েমের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই সংগ্রামে বুদ্ধিজীবিগণ কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ১৯৪০ সালের পরই বা তাহারা কি করিয়াছেন এবং এখনই বা তাহারা কি করিতেছেন? যে কোনো সমাজে বুদ্ধিজীবিদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইতেছে জনসাধারণের সমস্যাবলী সমাধানে সততার সহিত সাহায্যের চেষ্টা করিয়া সমাজের সেবা করা এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সামগ্রিক উন্নয়নে শক্তি সঞ্চার ও পথনির্দ্দেশের জন্য নূতন ও বাস্তব চিন্তাধারা দান করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বুদ্ধিজীবিগণ এ-পর্য্যন্ত সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াছেন এবং ফলে পাকিস্তানে নূতন চিন্তাধারার অভাব ঘটিয়াছে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আকস্মিকতা অথবা দুর্ঘটনায় দেশ ধ্বংস হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই দুর্ঘটনার সহিত রাজনীতিবিদদের নাম জড়িত রহিয়াছে। গত দশ বৎসর যাবত "রাজনীতি" বলিতে ক্ষমতা লাভের তিক্ত ও নির্ম্মম সংগ্রাম এবং প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবনতি ও দুর্নীতি বুঝা যাইত। এই সকল অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তিদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো যে কোনো উপায়ে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করা। রাজনীতিবিদদের কেহই জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে মাথা ঘামায় নাই, ফলে জনসাধারণ আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে এবং নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তান সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসন্তোষ ও অশান্তির একটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান বিপ্লব আমাদিগকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। ১৯৪৯ সালে আমরা যে স্তরে ছিলাম, এখন আমরা পুনরায় সেই স্তরে রহিয়াছি। এক্ষণে জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষা ও লেখা প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব উপলব্ধির সময় আসিয়াছে। আমরা আত্মমগ্ন থাকায় ও নৈরাশ্যবাদী হওয়ার দোষে দোষী হইয়াছি এবং আমরা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। পাকিস্তান যাহাতে আস্থা ও আশার সহিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারে, তজ্জন্য বুদ্ধিজীবি হিসাবে আমাদের ভূমিকার প্রতি আমাদের মনোভাবের বিপ্লবের প্রয়োজন রহিয়াছে।

এছলামে সমাজের তাৎপর্য্য কি? হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার সহচরগণ যখন মক্কা হইতে মদিনা পৌঁছিয়া একটি স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপন করেন, তখন হইতে এছলামী যুগ আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ এছলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য এছলাম যখন একটি রাষ্ট্র আয়ত্ত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন হইতেই এছলামী যুগ অথবা এছলামী ইতিহাস শুরু হইয়াছে। এছলামী বর্ষ গণণা খৃষ্টান বর্ষ গণণার ন্যায় পয়গম্বরের জন্মতারিখ হইতে শুরু হয় নাই; পয়গম্বরের এন্তেকালের তারিখ অথবা কোরআন নাজেলের তারিখ হইতেও শুরু হয় নাই।

এই ঐতিহাসিক সত্যে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম এছলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি এবং প্রত্যেকটি মুছলমান এছলামী সমাজ হইতেই তাহার নিজস্ব পরিচয় লাভ করে। এই কারণে কোনো কবি, লেখক অথবা শিল্পী যদি সমাজের অন্যান্য মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল মাত্র নিজের জন্যই শিল্প সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহা সমাজ হইতে কোনো সাড়া পাইবে না, এবং তাহা স্থায়ীও হইবে না। অন্যান্য তামদ্দুনিক ভাব-ধারা হইতে শিল্প ও বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া তাহাকে নূতন জীবন দান এবং তাহাকে এছলামী আদর্শে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা এছলামী সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এছলামী সাহিত্য, এছলামী চিত্রকলা, এছলামী ইতিহাস, এছলামী দর্শন, এছলামী ধর্ম্মতত্ত্ব, মোটকথা মোছলেম জাহানে যে সকল শিল্প ও বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এছলাম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

যে সকল কবি ও লেখক সমাজ হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, এছলামে তাহাদের স্থান নাই। কোরআনে আল্লাহ এই সকল কবি ও লেখকদের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্যদের সম্পর্কে আল্লাহ বলিয়াছেন:—

"যাহারা ভালো কাজে বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, এবং সর্ব্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে, ও অত্যাচারিত

হওয়ার পর ক্ষমা করে, তাহাদের রক্ষা কর।" (২৬শ ছুরাহ, ২২৭ আয়াত)।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জীবিতাবস্থায় সাহিত্য সমালোচনার জন্য একটি মান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; এবং যে সকল কবি ও লেখক সমাজের সেবায় তাঁহাদের মেধা প্রয়োগ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার অনুমোদন লাভ করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার জন্য পাশ্চাত্য ঔপনবেশিক শক্তিবর্গ এছলাম জাহানের বহু স্থান দখল করিয়া ফেলে এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব মোছলেম জাহানে বহু নূতন ভাবধারা আমদানী করে। এই সকল ভাবধারার সর্ব্বাধিক শক্তিশালীদের মধ্যে দুইটি—জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতাবাদ অন্যতম। এছলাম অবচেতন নয় বলিয়া ইহাকে নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহণ করে নাই; প্রাণবন্ত ও গতিশীল শক্তি হিসাবে এছলাম ইহার যতোটুকু হজম করিতে ও কাজে লাগাইতে পারিয়াছে, মাত্র ততোটুকুই গ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মোছলেম ভারতের কবি ও লেখকগণ এই সকল ভাবধারাকে এছলামী রূপ দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতীয় এছলামের ইতিহাসে সাহিত্যিকগণ ইহাই সর্ব্বপ্রথম সমাজের খেদমতে তাহাদের মেধা প্রয়োগ করেন। এ বিষয়ে কবি হালির নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ সমাজের খেদমতে সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, তিনি তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। বিংশ শতাব্দীতে একবালের কাব্য-সাহিত্যে ইহা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর মুছলমান এছলামের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া ও কাটিয়া-ছাঁটিয়া বিদেশী ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাবধারার সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করা যায় না। অতএব, আধুনিক মুছলমান সচেতন ও অচেতন ভাবে এছলামেরই সৃষ্টি, এবং সমসাময়িক জীবনব্যবস্থার নূতন ও জটিল চাহিদার মোকাবিলায়ও তাহার এছলামের প্রয়োজন।

প্রথমতঃ আধুনিক মুছলমান ধর্ম্মনিরপেক্ষতা- গ্রহণ করে নাই। ঠিক ভাবেই হউক অথবা বেঠিক ভাবেই হউক, মুছলমানগণ সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিয়াছে যে, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা খৃষ্টান ধর্ম্মের আদর্শ ও বস্তুর মৌলিক দ্বৈতবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং এই নীতির ফলেই পাশ্চাত্য জনসাধারণের সামগ্রিক জীবন হইতে ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ইহার ফলেই ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে ধর্ম্মকে ইছলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতর হইতে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা শাসন বিভাগীয় সুবিধা মাত্র; আধুনিক মুছলমানের নিকট ইহা নূতন নয়, কারণ এছলামের ইতিহাসে ইহার বহু নজীর রহিয়াছে। আধুনিক মুছলমান এমন কোনো নীতি গ্রহণের কথা চিন্তাও করিতে পারে না, যাহা সমাজের সামগ্রিক জীবন হইতে এছলামকে পৃথক করিয়া রাখার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয়তঃ জাতীয়বাদীকেও আধুনিক মুছলমান পাশ্চাত্য আকারে গ্রহণ করে নাই; কারণ যে নীতি অনুসারে জনসাধারণের ঐক্য সম্পূর্ণতঃ বর্ণ ভাষা অথবা এলাকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এছলাম তাহা সমর্থন করে না। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের দাবীও এছলামবিরোধী। তবে দেশপ্রেম, অর্থাৎ নিজের দেশ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও তমদ্দুনের স্বার্থ-রক্ষায় প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা আধুনিক মুছল-মানের ঈমানের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আধুনিক এছলামী দেশসমূহে ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের পরিবর্ত্তে মোছলেম জাতীয়তাবাদই জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। "মোছ-লেম জাতীয়তাবাদের" অর্থ হইতেছে এই যে, মুছলমান অধ্যুষিত প্রত্যেকটি দেশে ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি এছলামপন্থী নাগরিকের জন্য বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত থাকিবে, এবং মুছলমানদের ধর্ম্মীয়, রাজনীতি ও তামদ্দুনিক সামঞ্জস্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও মোছলেম সংহতির সাধারণ নীতির সহিত এই মুক্তি সামঞ্জস্যবিহীন হইবে না। উদাহরণস্বরূপ ইরাণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইরানী জাতীয়তাবাদ মূলতঃ শিয়া মোছলেম জাতীয়তাবাদ। আরববাদ ও এছলামের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির অসুবিধা আরব জাতীয়তাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। ইন্দোনেশীয় জাতীয়তার মর্য্যাদা কেবল মাত্র মুছলমানদেরই প্রাপ্য। তুরস্কেও কেবলমাত্র মুছল-মানগণকেই পূর্ণাঙ্গ তুর্কী নাগরিকের মর্য্যাদা দেওয়া হয়; এহুদী ও খৃষ্টানগণ সেখানে অনুরূপ মর্য্যাদা লাভ করে না। ১৯৫৫ সালের ইস্তাম্বুলের দাঙ্গায় ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, তুর্কী মুছলমানগণ তুর্কী জাতীয়তাবাদের সীমারেখার মধ্যে অমুছলমান তুর্কীগণকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নয়।

বর্ত্তমান যুগে একদিকে আমরা যেমন দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষ মহাশূন্যের পথে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছিবার উপক্রম করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষ এমন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা দ্বারা সমগ্র মানবতার পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস সাধন করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই নূতন সম্ভাবনা ও বিপদের সম্মুখে পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাহাদের জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতাবাদের আদর্শকে তাহাদের প্রয়োজনের মোকাবিলায় সক্ষম বলিয়া দেখিতে পাইতেছে কিনা। যে ইউরোপ গত দুইশত বৎসরে এশিয়ায় এই সকল আদর্শ

ছড়াইয়াছে, সেই ইউরোপই এখন জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা হইতে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপদের জন্য অনিশ্চিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহ অবশেষে উপলব্ধি করিয়াছে যে, বর্ণ, ভাষা ও এলাকার ভিত্তিতে মানবতাকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা ধ্বংসাত্মক, এবং এই কারণেই তাহারা এখন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতেছে। পাশ্চাত্য জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্মের পুনরাবির্ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের বুদ্ধিজীবিগণ যদি পরিমার্জ্জন ও সংশোধন না করিয়া জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যে উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা কাজ করিয়াছে, তাহারা তাহাতে শরীক হইবেন না। অতএব, তাহারা দেশের কল্যাণে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না।

মোছলেম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পাকিস্তান কায়েম হইয়াছিল। এই নীতির ব্যাখ্যা হিসাবেই "দ্বিজাতি তত্ত্ব" তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। কোনো কোনো পাকিস্তান বিরোধী সমালোচক বলিতে চেষ্টা করেন যে, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং এছলামে ইহার কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কিন্তু সত্য পরিস্থিতি হইতেছে এই যে, মোহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে মুছলমানগণ যখন বিজয়ী হিসাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরই এই দ্বিজাতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য আল-বেরুনীর বিখ্যাত পুস্তক "কিতাব-উল-হিন্দ" হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে; নবম শতাব্দীতে সোলতান মাহমুদের সহিত ভারত সফরকালে তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। হিন্দু ও মুছলমানদের সামাজিক আচার-আচরণে তিনি যে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :—

"অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাহারা (হিন্দুগণ) ইচ্ছাকৃতভাবেই তাহাদের রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কারণ আমাদের রীতিনীতির সহিত তাহাদের রীতিনীতির সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু তাহারা প্রকৃতিগতভাবে ইহার বিরোধী; এবং কখনও যদি তাহাদের কোনো আচরণ আমাদের কোনো আচরণের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত তাৎপর্য্য রহিয়াছে।"

হিন্দু সমাজ হইতে মোছলেম সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত কারণ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"হিন্দুদের সমস্ত গোঁড়ামী যাহারা তাহাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে তাহাদের, সমস্ত বিদেশীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত। তাহারা তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং তাহাদের সহিত বিবাহ, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি যে কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করিতে নিষেধ করে; কারণ তাহারা মনে করে যে, ইহার ফলে তাহারা অপবিত্র হইয়া যাইবে। যে সকল বস্তু বিদেশীর আগুন ও পানি স্পর্শ করে, তাহাকে তাহারা অপবিত্র বলিয়া মনে করে, এবং কোনো গৃহস্থালীই এই দুইটি বস্তু ছাড়া চলিতে পারে না। অন্য কোনো সমাজের লোক ইচ্ছা করিলেও অথবা তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহশীল হইলেও তাহারা তাহাকে গ্রহণ করার অনুমতি পায় না। ইহার ফলেই তাহাদের সহিত কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব এবং ইহাই আমাদের ও তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।"

এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই দুইটি সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য বারবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর এই দুইটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে এছলাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হইতে পারেন নাই। অতঃপর সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট আওরঙ্গজেব বিকল্প পন্থা অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সংখ্যালঘু শাসক মুছলমানদের আইন সংখ্যাগুরু অনিচ্ছুক হিন্দুদের উপর কঠোরভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, কারণ সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রজাগণ ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত যখন বৃটিশের হাতে চলিয়া যায়, তখন সৈয়দ আহমদ খান এই সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মওলানা মোহাম্মদ আলীও বলেন যে, ভারতে দুইটি জাতি রহিয়াছে।

একবাল বিশ্বাস করিতেন যে, অতীতে নিজস্ব রূপ প্রকাশের জন্য এছলাম সর্ব্বদাই তাহার সমাজব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে; এবং এই কারণেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মুছলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। আকবর ও আওরঙ্গজেবের ন্যায় শক্তিশালী সম্রাটদের নিকট যে সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া দেখা দিয়াছিল, অবশেষে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাহার সমাধান করেন। কায়েদে আজম বলিয়াছেন :—

"হিন্দু ও মুছলমানগণ দুইটি পৃথক ধর্ম্ম, দর্শন, সামাজিক আচরণ ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা

পরস্পরের সহিত বিবাহ করিতে পারে না; অথবা আহার্য গ্রহণ করিতে পারে না, এবং প্রকৃতপক্ষে তাহারা এমন দুইটি পৃথক সভ্যতার যাহা ধারক পরস্পরবিরোধী ধারনা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ধর্ম্ম ও দর্শন অনুসারে মুছলমানগণ সমাজবহির্ভূত ও ম্লেচ্ছ এবং সামাজিক, ধর্ম্মীয় তামদ্দুনিক অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাদের সহিত হিন্দুদের কিছু করনীয় নাই। অতএব মুছলমান ধর্ম্মীয় সামাজিক ও তামদ্দুনিক ভাবে একটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এক হাজার বৎসরেরও অধিক-কাল হইতে অধিকাংশ মুছলমান একটি পৃথক জগত, পৃথক সমাজ, পৃথক দর্শন ও পৃথক বিশ্বাসের মধ্যে বসবাস করিয়া আসিয়াছে।"

আল-বেরুনী ও কায়েদে আজমের এই উক্তিদ্বয়ের মধ্যে হাজার বৎসরের ইতিহাস রহিয়াছে। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এক হাজার বৎসরকাল একত্রে বসবাস করিয়াও হিন্দু ও মুছলমানগণ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। অতএব কোনোক্রমেই বলা যাইতে পারে না যে, কায়েদে আজম দ্বিজাতি তত্ত্ব ও সমস্যা উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন।

আমাদের মোছলেম-জাতীয়তাবাদের নীতি সর্ব্বদা সুস্পষ্টরূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কারণ ইহাতে পাকিস্তানের মৌলিক ভিত্তি এবং পাকিস্তান কায়েমের মূল কারণ নিহিত। আমরা যদি এই নীতি বর্জ্জন করিয়া অপর কোনো আদর্শ গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা এমন সামাজিক স্বার্থের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিব, যাহার জন্য আমাদের সমাজ ইতিমধ্যেই বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে এছলাম তাহার নিজস্ব সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই পাকিস্তান কায়েম হইয়াছিল। এই কারণেই ১৯৪৯ সালের আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং এই একই কারণে এই প্রস্তাব সমগ্র মোছলেম সমাজের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। এবং যেহেতু ১৯৪৯ সালে আমরা যে স্তরে ছিলাম, এখন পুনরায় আমাদের সেই আদর্শ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা প্রয়োজন; কারণ এই সমর্থনের মারফতই আমরা পাকিস্তানী জনসাধারণের উন্নততর জীবন যাত্রার পূর্ণাঙ্গ রূপায়নের জন্য আশার সহিত ভবিষ্যতের দিকে চাহিতে পারি।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই যে, আমাদের সমস্যাবলীর ন্যায় আমাদের আশঙ্কাও নূতন। আমাদের আশা নূতন এবং আমাদের স্বপ্নও নূতন। বুদ্ধিজীবি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা ও ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরতা অর্জ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; আমাদের দেশের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া, এবং সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন ও শিল্পকলা প্রয়োগের জন্য আগ্রহান্বিত থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষরূপে প্রয়োজন।

আমরা যখন লিখিতে বসিব, তখন আমাদের এমন বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করা উচিত, যাহা পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে ভালোবাসা, ঐক্য ও সমঝোতা বৃদ্ধি করিবে এবং আমাদের মধ্য হইতে সকল প্রকার শ্রেণীবাদ, প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমরা আমাদের দেশবাসীকে বিপদের মোকাবিলায় অপূর্ব সাহস ও শক্তির পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আমাদের এই সকল বাস্তব নজীর গ্রহণ করা উচিত; কারণ তাহা হইলে আমরা বিভিন্ন সমস্যাবলীর মোকাবিলায় জনসাধারণকে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করিতে পারিব। আমাদের এমন বিষয়বস্তু বাছিয়া লওয়া উচিত, যাহা জনসাধারণকে মধ্যযুগীয় আচরণ ও সংকীর্ণ মনোভাব বর্জ্জনে সাহায্য করিবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে উৎসাহদান করিবে। জনসাধারণের প্রকৃত চাহিদা ও সমস্যাবলী সরকারের নিকট তুলিয়া ধরাও আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের যথাযথ ও উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করা উচিত। শেষতঃ পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

ইহা ব্যতীত, যেহেতু আমাদের একটি পৃথক নিজস্ব তমদ্দুন রহিয়াছে, সেহেতু বর্তমান জটিল বিশ্বের দৈনন্দিন প্রয়োজনের মোকাবিলায় আমাদের তামদ্দুনিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে যথাযথরূপে প্রয়োগের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবিগণের অগ্রণী হওয়া উচিত। দেশ ও জাতির খেদমতের নিমিত্ত লেখকগণের জন্য যেমন উপযুক্ত বিষয়বস্তু রহিয়াছে, গায়ক, ভাস্কর, স্থপতি, চিত্রকর প্রভৃতির জন্যও তেমনি অসংখ্য বিষয়বস্তু রহিয়াছে; এই সকল বিষয়বস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

আমরা মুছলমান বলিয়াই পাকিস্তান লাভ করিয়াছিলাম, অতএব আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র গঠনমূলক হইলেই চলিবে না, তাহাকে এছলামীও হইতে হইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বুদ্ধিজীবিদের দায়িত্ব হইবে নূতন ও বাস্তব ভাবধারা সরবরাহ করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের সমস্যাবলীর সমাধান ও অগ্রগতিতে সাহায্য করা। আমাদের বুদ্ধিজীবিগণ যখন সম্যকরূপে তাহাদের দায়িত্ব ও কার্য্যক্রম উপলব্ধি করিতে

পারিবেন, তখন পাকিস্তানে আর নূতন চিন্তা ও ভাব-ধারার অভাব থাকিবে না এবং আমরা সহসা শিল্প ও ললিতকলার উৎসাহব্যঞ্জক প্রবাহ দেখিতে পাইব।

এই পৃথিবী ঃ এই দেশ

আতাউর রহমান

সকাল

পৃথিবী আপন কক্ষে বারংবার আবর্তিত হয়,
সূর্য-শশী-গ্রহ-তারা সাথী তার বহু বছরের।
পথে ঘাটে পৃথিবীর বহুরূপী অভিনয় দেখি
শিশির-কুয়াশা-শীত সব কিছু অবহেলা করে
শস্যের জনক চাষী হাল ঠেলে তিল ভাঙ্গে মাঠে,
মাঘের দানব-শীতে হি-হি কাঁপে জেলের শরীর,
তবু সে পুকুরে-বিলে-নদীতে শিকার করে মাছ।
বন্ধুর জটিল পথে দুঃসাহসী মাঝিমাল্লা-দল
গুণ টানে হাল ঠেলে অবিরাম নদী দরিয়ায়—
আশ্চর্য সুন্দর মাঠ সবুজ-কলাই-গম ভরা—
শীতের কুসুম রোদে হাসে তার সৌন্দর্য অটুট
ক্লান্তি-মৃত্যু জড়তার অনিবার্য ব্যূহ ভেদ ক'রে
শিল্পী-চাষী কারিগর গড়ে তোলে সভ্যতা-প্রাসাদ।

বিকাল

কী অদ্ভুত! ভালো লাগে এ-দেশের শীতের বিকাল,
মসৃন কোমল রোদ শুয়ে মাঠে শান্ত বিড়ালের
গরু ঘোড়া ঘাস খায় অনাহত স্রোতের মতন—
দুরন্ত অবুঝ ছেলে হানা দেয় ইঁদুরের সঞ্চিত ভাণ্ডারে,
ধান কাটে আঁটি বাঁধে—কৃষক মজুর বয় ভার,
কোনও দর্শন জানি মনে তার
আসেনাকো এমন বিকালে
শুধু মনে আসে তার দৈনিক বাৎসরিক
খাদ্যের হিসাব,—
বাজেট-বিবৃতি-প্ল্যান সে কখন শোনেনা তেমন।
অনেক দূরের বাদ্য তাকে আর দেয় না কো নাড়া,—
সে জানে আকাশ আর মৃত্তিকার সহজ স্বভাব—
জানে সে যে দরদাম ধান-গম হালের গরুর।
সভ্যতাকে দেখেছে সে প্রবঞ্চক দালালের
ধূর্ত ভূমিকায়।

রাত্রি

অন্ধকার রাত্রি নামে, পথ-মাঠ হয়ে আসে বিজন বিরল
শীতের শরীর উনুনের কাছে চেয়ে নেয় উত্তাপ আশ্লেষ,
কুকুরের ঘেউ ঘেউ, নিশাচর পাখির ডাক,
একটানা ঝিঁঝিঁ রব।
মাঝে মাঝে গরুর গাড়ির চাকার শব্দ দূরগামী সড়কে
আর শীতার্ত গাড়োয়ানের ভাটিয়ালী গানের সুর—
অদূরে-সুদূরে খোল করতাল কীর্তনের ঐকতান
অন্ধকার আকাশ-সমুদ্রে তোলে ধ্বনির
কম্পন-কল্লোল।
সপ্তমীর চাঁদ সিফন শাড়ির মত তরল মেঘে ঢাকা—
চর-মাঠ-বন শুকনো নদী সবকিছু একাকার চোখে।
পথের ধারে আধখোলা ময়না মুদীর দোকান
সেখানে লণ্ঠন জ্বলে অনেক রাত ধরে—
পথিকেরা কেনে পান-বিড়ি চিড়া-মুড়ি তেল-নুন।
দু'একজন যুবক অহেতুক ঘুরে বেড়ায়
গুন গুন গান গেয়ে,
অন্ধকারে স্তম্ভিত নারিকেল সুপারি
গাছের সারিগুলি—
পরিত্যক্ত রাজবাড়ী জীর্ণকুটো—সময়ের
নিষ্ঠুর প্রহারে—
নহুষের প্রেতাত্মার মত অতৃপ্তির হাহাকারে কাঁদে!!

* করাচীতে অনুষ্ঠিত লেখক-সম্মেলনে পঠিত।

আজাদাউত্তর পূর্বপাকিস্তানের সৃজনধর্মী রচনা

আবু রুশদ্

এই প্রবন্ধের শুরুতেই আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, আজাদী লাভের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সৃজনধর্মী রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

আজাদীর অব্যবহিত পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসর আমাদের লেখকদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও উচ্চ আদর্শবোধ বিরাজিত ছিল, তা রূপায়িত হয়েছিল 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সওগাত' ও 'বুলবুল'—সে সময়ের এই তিনটি সাহিত্য পত্রিকার লেখাগুলির মধ্য দিয়ে। কিন্তু আজাদী লাভের পরবর্ত্তী প্রথম কয়েক বৎসর সম্ভবতঃ অনিশ্চিত অবস্থার জন্য সে ধারা কিছুটা মন্দীভূত হয়ে আসে। রাজনীতির উপর অতি নির্ভরশীলতা ও জাতীয় জীবনে অধিক মাত্রায় উহার অনুপ্রবেশের ফলে পূর্ব্বপাকিস্তানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা প্রতিকূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সরকারী চাকুরী, বিভিন্ন বৃত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আকস্মিক জোয়ার দেখা দিয়েছিল এবং তারই দরুণ যে সমস্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য্য এসেছিল তাঁরাই ছিলেন আমাদের পাঠক সমাজের একটা বড় অংশ। এই প্রাচুর্য্যই আবার তাঁদের সকলের মনকে সাধারণ পাওয়ার দিকে খুব বেশী করেই টেনেছিল। জ্ঞানের সূক্ষ্ম অনুভূতি—দীর্ঘ তামদ্দুনিক কর্ম্মধারার মধ্যে যার স্বাভাবিক উৎস—বস্তু-জগতের কুটীল গতিপথে তা হারিয়েই গিয়েছিল।

সাহিত্যের প্রতি যে আগ্রহ তা পুনরায় জেগে উঠার প্রথম লক্ষণ আমরা দেখতে পাই সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'মাহে-নও' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এর বর্তমান ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাক না কেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের তমদ্দুন ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার অপরিহার্য্যতার দিকে পূর্ব্বপাকিস্তানের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টিকে প্রতি-ফলিত করার ব্যাপারে বাংলা 'মাহে নও' পত্রিকার অবদান সবচেয়ে বেশী। আমাদের লেখকদের বিভিন্নরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও তারপর থেকে আমাদের সাহিত্যের সৃষ্টি কমবেশী গতিশীল রয়েছে। কবি জসিমুদ্দীন ও ডাঃ সাজ্জাদ হোসেনের প্রবন্ধে এই সমস্ত অসুবিধার বিষয় চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আজাদীর পরবর্ত্তী যুগে আমাদের সৃজনধর্ম্মী রচনা-গুলিকে মোটামুটীভাবে তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর রচয়িতাদের সকলের মধ্যে যে একটী বিশেষত্ব আমাদের চোখে পড়ে তা হলো তাঁদের লেখার এছলামী বিষয়বস্তু। এছলামী বিষয়বস্তু এই কথাটীর সংজ্ঞা দেওয়া অবশ্য সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এখানে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে, প্রধানতঃ এছ-লামের ঘটনাবলী থেকে নেয়া রোমান্টিক ভাব প্রবণতা-মিশ্রিত এই সমস্ত বিষয়বস্তুর স্বকীয়তা সহজেই ধরা পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নজরুল ইসলামের "কামাল পাশা" ও "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে" এইরূপ কবিতা ও গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছলামী বিষয়বস্তুকে চমৎকার কাব্যে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে এগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। গোলাম মোস্তফা ও ফররুখ আহমদ পরে তাঁদের কবিতায় এই ধারা গড়ে তুলেছেন আর তাঁদের অনুসারী হলেন আলী আহসান, তালিম হোসেন ও মুফাখখারুল ইসলাম। এছলামী বিষয়বস্তু অর্থে আমি যা বলতে চেয়েছি গোলাম মোস্তফার কতকগুলি দেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে আর তাঁর এই সমস্ত কবিতা বেশ জন-প্রিয়তাও অর্জন করেছে।

এই প্রসঙ্গে তাঁর "তারাণা" কবিতাগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আরব্যোপন্যাসের কাহিনী ও ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই ফররুখ আহমদের রচনা সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আলী অহসানের এছলামী কবিতা বিশেষভাবে তাঁর 'কায়েদে-আজম' কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর ধর্ম্মীয় চেতনা ও প্রজ্ঞার এক আনন্দময় সংমিশ্রণ। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, এই সমস্ত ধারা প্রধানতঃ কাব্যেই রূপায়িত হয়েছে। এর কারণ বোধহয় ইহাই যে, চিন্তা ও মনের ভাব প্রকাশের জন্য কবিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লেখকগণ তাঁদের সমাজচেতনার জন্য গর্ব্ব অনুভব করে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজেদের বিশেষ মতবাদের আওতায় না পড়লে অন্যের রচনাকে নিরর্থক বলে বাতেল করে দেন। অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ সচেতনতার সহিত শিল্পসুলভ অনুভূতি বা মনোস্তাত্বিক উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে এমন গল্প লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, যার মধ্যে থাকবে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে গোর্কির "ফর্টি মেন এণ্ড এ গার্ল"এর (Forty men and a girl) কথা ধরা যেতে পারে। তবে উপরের দুটী গুণ বাদ দিয়ে শুধু সমাজের

মন্দটার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কোন লেখকেরই কর্তব্য বলে গণ্য হতে পারে না।

এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কিছু কিছু চমৎকার শিল্পরসসমৃদ্ধ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই দিক থেকে শওকত ওসমান ও আলাউদ্দীন আল-আজাদের ছোট গল্প এবং আহসান হাবীব ও আবুল হুসেনের কবিতা উল্লেখযোগ্য। শওকত ওসমানের "ইলেম" এবং আলাউদ্দীন আল আজাদের "বৃষ্টি হলো শুরুতে" সামাজিক সমস্যার যে রূপ তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্যে তা স্থান পাবে। আহসান হাবীবের "হে ধাণরী অসি হও" ও আবুল হোসেনের "নায়ক" কবিতা এবং মুনীর চৌধুরীর কয়েকটী ছোট-গল্পের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

তৃতীয় পর্য্যায়ে লেখকরাই হলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট। নির্দ্দিষ্ট কোন গণ্ডী বা মতবাদ নিয়ে এঁরা চলেন না। চোখের দেখা ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাধ্যানুযায়ী রূপ-রসে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তাঁরা সার্থকতা খুঁজে পান। এই লেখকরা আপন অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের ন্যায় শিল্পরসহীন বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে প্রস্তুত নন।

এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে খ্যাতি-মান হলেন জসিমুদ্দীন এবং আমার ধারণায় উদীয়মানদের মধ্যে সেরা হলেন শামসুর রহমান। আপন পল্লীর বন-ভূমির মরমরধ্বনি না হলেও জসিমুদ্দীনের সঙ্গীত নীরব হয় নি। শামসুর রহমান তাঁর তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে এর মধ্যেই বেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আর একজন উদীয়মান তরুণ কবি। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক নীরবতা বেশ কিছুটা বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছে। সানাউল হক ও সৈয়দ নূরুদ্দীনের কোন কোন কবিতায় পল্লীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটা প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে। তবে তাঁদের রচনা যথাস্তরে উন্নীত বা সজীব হয়ে উঠতে পারেনি। আলী আশরাফ এবং আশরাফ সিদ্দিকীর কয়েকটি কবিতাও বেশ ভাল হয়েছে। আমাদের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছেন সেই সুফিয়া কামাল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁর লেখায় এমন একটা কমনীয় ভাব রয়েছে—নির্দ্দিষ্ট মতবাদহীন লেখার মধ্যে যা প্রায়ই দেখা যায় না।

আমাদের সৃজনধর্মী সাহিত্যে সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে তৃতীয় পর্য্যায়ের ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখকগণও রয়েছেন। মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শাহেদ আলী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক এঁদের সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে আমাদের সৃজনধর্মী সাহিত্যে। সমগ্রভাবে এইসব লেখকদের রচনায় বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের বেশ একটা পূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে। মাহবুবুল আলম ও আবুল মনসুর আহমদ ব্যঙ্গকৌতুক চরিত্র অঙ্কনে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। শাহেদ আলী ও শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে রোমান্টিক মনের কল্পনার রূপ। আবু রুশদ ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লার লেখার মধ্যে রয়েছে কম-নীয়তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আবু ইসহাকের "সূর্য্য-দীঘল বাড়ী" উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই পল্লী-জীবনের ঘটনাবলীর সাথে তাঁর নিবিড় সংযোগ। মতিন উদ্দীন আহমদের লেখা কয়েকটী ছোটগল্পে তাঁর কৌতুকবোধ ও সূক্ষ্ম নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকের ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টির গুণাগুণ অনেকখানি অনিশ্চিত। নূরুল মোমেন অবশ্য কথোপকথনে কিছুটা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং রচনানৈপুণ্যও অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু নাটকের মধ্যে কাব্যের স্থান তেমন হয়নি। সুতরাং যেরূপ পরিবেশ তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন তা সবসময় শক্তিশালী নাটকীয় ভাব আনতে পারে নি। শওকত ওসমানের নাটকগুলি অতিরিক্ত নীতিকথার দরুণ পাংশে। তরুণ নাট্যকার আসকার এবনে শাইখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত একটি নাটকে মুনীর চৌধুরী উৎকণ্ঠার ভাব সৃষ্টির কার্য্যে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি যেভাবে লেখকদের এই তিনশ্রেণীতে ভাগ করেছি তার মধ্যে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। তিন শ্রেণীর লেখকদের সকলের মধ্যে যেমন শিল্পী-সুলভ নিষ্ঠা রয়েছে তেমনি তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যেও যে সমাজ-সচেতনতার অভাব নেই, এই সত্যটি আমি এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে যাইনি।

আমাদের লেখকদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব সাহিত্যের গুরুত্বকে কম করে দেখার একটা ঝোঁক আছে এবং সেটাই হলো সবচেয়ে নৈরাশ্যের বিষয়। এর ফলে সাধারণ পাঠকের মনেও একটা অতিরিক্ত সন্দেহের ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত আমি বলছি এই জন্য যে, সাধারণের মনে আগে থেকেই একটা ধারণা রয়ে গেছে যে, মানের দিক থেকে আমাদের সাহিত্য এরূপ নিম্নস্তরের যে তার জন্য উৎসাহ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। পূর্ণ মানের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের সাহিত্যকে নিশ্চয়ই মধ্যমশ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। তবে বিশ্বের প্রাচীন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যের সাথে নিজেদের সাহিত্যিকে—কয়েক বছরের শিশুমাত্র—তুলনা করতে যাওয়া আমাদের উচিৎ হবে না।

নিজেদের সাহিত্যের উন্নতি যদি সত্যই আমাদের কাম্য হয় তাহলে একে সযত্নে লালন পালনও করতে

হবে। বিভিন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা যেটুকু অর্জ্জন করেছি সেই দিক থেকে বিচার করেই আমাদের যোগ্যতার মান নিরূপিত হবে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা ব্যর্থ হয়েছি তার ব্যাপারে আমাদের সহনশীল হতেই হবে। সাময়িক ত্রুটিবিচ্যুতি, স্বীকৃতিলাভের জন্য পীড়াদায়ক দাবী এবং এলোমেলো চিন্তাধারার জন্য ধৈর্য্য হারালে আমাদের চলবে না। অপরদিকে রচনার সার্থক দিকটা খুঁজে বার করে সৃজনশীলতার দিক থেকে লেখককে স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদিগকে তৎপর হতে হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করা অসম্ভব নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত "সমকাল" নামক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা এবং পূর্ব্বপাকিস্তানের সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগ কর্ত্তৃক আয়োজিত সেমিনারগুলিতে এদিক থেকে উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে।

লেখক ও পাঠকবর্গ যদি সমবেতভাবে এই ডাকে সাড়া দিয়ে যেতে পারেন তাহলে আমাদের সাহিত্যের বিপুল উপকার সাধিত হবে।

বসন্ত

শামসুদ্দীন

মানুষের মন
চেয়েছিল বুঝি এক অনন্য স্বপন
আরো এক পৃথিবীর কাছে।
যেখানে শুকায় নাক' ফুল, ফল ঝরে নাক'
হাওয়ার দোলায়।
তাই
এখানকার শাখে শাখে
এক দিন যেই পাখী গেয়েছিল গান,
পত্র মঞ্জরীর সাথে চেয়েছিল আকাশ প্রমাণ
আকাংখার উচ্চ-চূড়া মন,
সমস্ত ঐশ্বর্য ভরা আলোকিত আরো এক
রোমাঞ্চ স্বপন ;
সেই পাখী গেল উড়ে
দূর বনান্তরে।

গাছগুলি তৃণগুলি আকাশে নক্ষত্রেরা আরো
হ'ল থরো থরো।
পৃথিবীর পূর্ণরস মৃত্তিকার কণা
হ'ল আনমনা।
অলক্ষ্য অলংঘ্য আর দুর্গম পথের
সমস্ত গহনে।

রুক্ষ দম্ভ-হতাশায় মরুভূ প্রান্তরে,
স্থির হলো নিরুদ্ধ পবনে।
গহন পর্বত আর দুস্তর দিগন্ত পার
শুষ্ক ধূলিপথ
হল অন্ধকার।
শত শত যৌবনের শব
কুণ্ঠিত ধূলার তলে করে আর্তরব
দুঃসহ ব্যথায়।

দীর্ঘ পরিক্রমা করি শেষ দিক চক্রবালে
আরো দূর দূর দূর পারে
খুঁজে কা সে পেল কারে
জানি না তা'।
একদিন সেই পাখী এল ফিরে,
রিক্তম্লান হিমসিক্ত ঋতুর দোলায়
চলিষ্ণু পাখার ভরে
ঝরা পাতা গানে।
কঠিন সংগ্রাম শেষে
দেখা দিল হেসে
সেই পুরাতন নব নব কিশলয় পত্র মঞ্জরীর
নব নব আশা পৃথিবীর।

* করাচীতে অনুষ্ঠিত লেখক-সম্মেলনে পঠিত।

লেখকের দায়িত্ব ও সংগঠন

ডাঃ আবদুল হক

এই প্রতিনিধি সম্মেলনে সারা পাকিস্তান হইতে এত অধিক সংখ্যক লেখক সমবেত হইয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দ প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিনা। এই জন্য যে সমস্ত সাহসী ব্যক্তি এই শুভ সম্মেলনকে সংগঠিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, প্রথমেই আমি তাঁহাদিগকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

এই বিরাট সম্মেলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমি দেখিতে পাই যে, এই সম্মেলনে এমন অনেক প্রসিদ্ধ লেখক উপস্থিত আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান সাহিত্য, তার বিষয় সমূহের সূক্ষ্ম ভাবধারা এবং লেখক সমাজের অধিকার এবং সুযোগ প্রভৃতির প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লেখকগণ অধিকতর কর্মঠ এবং অধিকতর জ্ঞাত এবং আমার মনে হয় যে, আমি এই প্রতিযোগীতায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি যে, আজিকার এই সম্মেলনে আমাকে এইরূপ সম্মানজনক পদ প্রদান করা খুব সংগত হয় নাই। সম্ভবতঃ, তাঁহারা আজিকার এই সম্মেলনে আমাকে সভাপতি হিসাবে কেন মনোনীত করিয়াছেন, তাহার কারণ প্রদর্শন সম্পর্কে কেবলমাত্র বলা যায় যে, আমাদের সমাজে বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান এবং ভক্তি প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত আছে এবং সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে পুরাতন ভাবধারা সম্পন্ন কয়েক জন রক্ষনশীল লোক সেই নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, খুব খারাপ অবস্থার মধ্য হইতেও লোকে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে। এমন কি কোনও মন্দ ঘটনা হইতেও মানুষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। যে বয়সকে আমি বাস্তবিক পক্ষেই অভিসম্পাত বলিয়া মনে করি, এবং যাহা অস্তিত্ব সম্বন্ধে হতাশাগ্রস্ত করিয়া তোলে তাহাই আজ আমাকে এই বিরাট সম্মান দান করিয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহা আমাকে আমার কিছু কিছু পুরানো লেখক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে এবং ইহার মধ্য হইতে আমি নুতন অনেক কিছু শিখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই সমস্ত কারণে আমার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই ধন্যবাদ প্রদান আনুষ্ঠানিক মাত্র নহে—বরং আমি অকপটভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে চাহি।

বর্ত্তমানে যখন আমরা সকলে একত্রে মিলিত হইতে পারিয়াছি, তখন এই সময়ে আমাদের চতুর্দ্দিকে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে হিসাব গ্রহণ করা অর্থাৎ বর্ত্তমানে আমাদিগকে ঘিরিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার পর্য্যালোচনা করার একমাত্র উপযুক্ত সময়। আমি এই দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে বেদনা বোধ করি যে, আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির কাজ কেবলমাত্র ছন্দ ও কবিতার সৃষ্টি, গল্প লেখক, মোশায়েরা এবং অন্য ভাষার সাধারণ স্তরের পুস্তকগুলির অনুবাদ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন একটি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারি নাই, যাহা আমাদের অতীতের অবদান সমূহের সহিত যুক্ত হইতে পারে এবং সারা পৃথিবীর নিকট না হইলেও অন্ততঃ পাকিস্তানবাসীর নিকট উহা একটি সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, অন্যান্য ভাষায় লিখিত শিল্প এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ বিষয়সমূহ আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুক্ত করিয়া আমরা খুবই উন্নত ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে শুরু না করিলে, আমাদের সাহিত্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করার আমাদের কোনও অধিকারই থাকে না। যে সমস্ত সাহিত্য এবম্বিধ নিপুণ সাহিত্য-প্রতিভা বিবর্জ্জিত, তাহাদিগকে কোনও সুসভ্য এবং প্রগতিশীল সমাজে সম্মানের অধিকারী বলা যায় না। অনেক শূন্য স্থান পূরণের জন্য আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে এবং বহুবিধ ত্রুটিকে সংশোধন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদিগকে বিস্তারিত এবং আস্থার যোগ্য অভিধান, এনসাইক্লোপিডিয়া ও রেফারেন্সের বই সৃষ্টি করিতে হইবে এবং দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর পুস্তক প্রণয়ণ করিতে হইবে। অন্যান্য ভাষার সেরা পুস্তকগুলিকে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ যুগসৃষ্টিকারী বিপ্লবাত্মক কর্মধারা আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হইবে এবং আপনাদিগকে পথের সন্ধান দিতে পারিবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দ্দু প্রকাশনার নিমিত্ত এইরূপ একটি প্রোগ্রামের অনুসরণ করিতেছিলেন

এবং আমি বলিতে পারি যে আঞ্জুমান ইহাতে প্রচুর সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক—পাকিস্তান হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত ইহার ক্রিয়াকলাপ চলিতে পারে নাই। বিশেষ আনন্দের সহিত আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, ইদানীং সৈয়দ মোহাম্মদ তকী কতকগুলি উচ্চ পর্য্যায়ের গ্রন্থের অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিতেছেন তাহা অতিশয় নিগূঢ় এবং জটিল।

এই কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং আমরা যদি আমাদের সাহিত্যকে অধিকতর মর্য্যাদাসম্পন্ন করিতে চাই, তাহা হইলে এইরূপ কঠিন কাজেই আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, যে সমস্ত প্রফেসর এবং পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে কর্মরত আছেন, তাঁহাদিগকে এই সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করা উচিত ছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এই সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সমস্ত বিষয়ের জন্য তাঁহাদিগকে তত দোষারোপ করা যায় না, কারণ যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তাঁহারা গড়িয়া উঠিয়াছেন, সেই শিক্ষা তাঁহাদিগকে এরূপ ব্রতে হস্তক্ষেপ করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। মূল বিষয় এই যে, আমাদের প্রফেসর এবং শিক্ষকগণ যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন তাহা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারাও ছাত্র এবং শিক্ষার্থীগণকে যাহা দান করিয়া থাকেন, তাহাও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই। ফলতঃ শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই তাঁহাদের নিজেদের দেশবাসীকে দিবার মত যথেষ্ট উপাদানের অভাব থাকে; কারণ তাঁহারা বৈদেশিক ভাষার মাধ্যমেই তাঁহাদের ভাবধারা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং যেরূপ বিদ্যাই তাঁহারা লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাহা কেবলমাত্র তাঁহাদের মধ্যেই থাকে, অপর ব্যক্তির কোনও কাজে আসে না। আমরা যদি এখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন না করি তাহা হইলে এইরূপ অবস্থা যে চলিতেই থাকিবে—তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমরা যদি এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে ইংরাজী ভাষার গোলামী করিয়াই চলিতে হইবে এবং প্রকৃত স্থায়ী জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা সম্ভবপর হইবে না।

আজিকার দিন দ্রুত পরিবর্তনের দিন। যে ভ্রমণ সমাপ্ত করিতে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ এক যুগের প্রয়োজন হইত, আজ তাহা সামান্য কয়েক মাস এমন কি কয়েক দিনেই সম্পন্ন করা যায়। আমি কি প্রশ্ন করিতে পারি যে, যে সরকারী ব্যবস্থাপনা ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, সেই ব্যবস্থাপনা কি আমাদের ভাষা-সমূহকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিতে পারে না। আমি মনে করি যে ইংরাজী ভাষাকে পাণ্ডিত্যের ভাষা হিসাবে টিকিয়া থাকা উচিত, কিন্তু ইহা সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই। তথাপি ইহা সত্ত্বেও, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে ইহাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে টিকিয়া থাকিতে দেওয়া যায় না। এই অবস্থাকে অবিলম্বেই, এমন কি আজিকার দিবাবসানের পূর্ব্বেই পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। যদি ইহা সম্পন্ন করা কোনওরূপ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভূমি সংস্কার সাধন ইহা অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য ছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেও এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করাও কল্পনার বাহিরে ছিল। আমাদের পূর্ব্বতন রাজনীতিবিদগণ এবং তথাকথিত সমাজ সংস্কারকগণ এ-সম্বন্ধে ধারণাকেও সংগোপনে পরিহার করিয়া চলিতেন। কিন্তু প্রায় নিমিষের মধ্যেই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, কোনও বিষয়ে যতক্ষণ অগ্রগতি সাধিত হইতেছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি, সত্যিকার অগ্রগতি শুধু ততক্ষণই সাধিত হয়। অন্তঃকরণ যখন সংকল্পবদ্ধ, বিজয়ের পথে কোনও বাধাই তখন বড় হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

আমাদের সাহিত্যের বর্তমান স্থবিরতা সম্পর্কে প্রচুর চিন্তার প্রয়োজন আছে। এই স্থবিরতার মূলে কি আছে, আসুন তাহা আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি। বস্তুতঃ, এই সম্পর্কে আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, তথাপি বর্তমান অবস্থার কারণসমূহের মধ্যে আমাদিগকে আরও গভীর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। নগণ্য ধরণের রাজনৈতিক চিন্তাসমূহ যখন কোনও রাষ্ট্রের অথবা কোনও জাতির মন এবং আকাঙ্খার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন এইরূপ চিন্তাসমূহ যে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিকারীদের মধ্যে ছোট ছোট দল এবং উপদলের সৃষ্টি করিয়া থাকে—দুনিয়ার ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করিয়া আছে। আবার, এইরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তিসমূহ স্থবির ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। অন্যদিকে, এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে ক্ষমতার লিপ্সাও সমস্ত সীমা অতিক্রম করিয়া যায় এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেদের ব্যক্তিগত এবং আত্মীয়স্বজন ও ভাড়াটিয়াদের স্বার্থের দিকে বেশী মনোযোগ দিতে থাকেন। এইরূপভাবে জীবনধারনের এবং সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিটি রাস্তাই ঐ সমস্ত রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার সহিত জড়িত হইয়া পড়ে এবং জাতীয় প্রশ্নসমূহ

মৃত রাজনৈতিক আপোষের স্থান গ্রহণ করে। এইভাবে, ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকগণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতার এবং আকাঙ্খার কামনার গোলামে পরিণত করিয়া ফেলেন এবং এই কামনার সহায়তা এবং প্রেরণাতেই চক্রান্ত এবং ধ্বংসমূলক ক্রিয়াকলাপের উৎপত্তি। এই ভাবে সততার অভাব, প্রতারণা, জুয়াচুরি, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি এবং নীতিহীনতা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি দৈনন্দিন জীবনের অংশ হইয়া পড়ে। বিগত কয়েক বৎসর যাবত আমাদের সরকার এবং রাজনীতিবিদগণ এই পথই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং ইহাতে কোন ই সন্দেহ নাই যে, এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ চলিতে থাকিলে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রই টুকরা টুকরা হইয়া পড়িত। ইহার জন্য, কয়েক মাস পূর্ব্বে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, উহা অপরিহার্য্য ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অপেক্ষা বিপ্লবের উপযুক্ত সময় আর ছিল না। অবশ্য আমাদের সৌভাগ্য যে, বিপ্লব সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতেই সংঘটিত হয় এবং এক বিন্দু রক্তও পাত করা হয় নাই।

এখন সহজেই অনুভব করা যায় যে, রাজনৈতিক কূটকৌশল বর্তমানে সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়াছে। এবং উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যে আবহাওয়া আমাদের অস্তিত্বের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় স্থবিরতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমি বলিব যে, আপনাদের নিজদিগকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তেই গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ কেবলমাত্র সংগঠিত উপায়েই আপনারা কোনও কিছু লাভ করিতে পারেন ; কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অপেক্ষা সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই অধিকতর সাফল্য বহন করিয়া আনে। প্রকৃতপক্ষে, সম্মিলিত প্রচেষ্টা একটি বিরাট শক্তি এবং এই শক্তির সহায়তায় আপনি ভালো ভাবেই আপনার উদ্দেশ্য পুরণ করিতে অথবা পূরণের আশা করিতে পারেন।

আমি মনে করি যে, আমাদের দেশের বর্তমান আবহাওয়াকে আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। যে স্থবিরতা আমাদের সাহিত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে মলিন করিয়া দিতেছে, তাহাকে দূরীভূত করার জন্য এখন আমরা অভিযান শুরু করিতে পারি। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এনসাইক্লোপিডিয়ার জন্য আন্দোলনের নিমিত্ত যে সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল, বর্তমানে আমাদিগকে সেই একই সমস্যার সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আপনারা সকলেই জানেন যে, মুষ্টিমেয় সাহসী, দৃঢ়সঙ্কল্প বুদ্ধিজীবি এক মহান আন্দোলন পরিচালন করিয়া শিক্ষার আলোকে প্রজ্জলিত করেন এবং সমাজকে পশ্চাদপদ অবস্থার অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। এই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিগণ বিজ্ঞান এবং দর্শন হইতে লব্ধ জ্ঞানরাজি তাঁহাদের সহযাত্রী ভ্রাতাগণের মধ্যে পরিবেশনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহস করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত বিশ্ব, মানুষ ও রাষ্ট্র ; এবং সমাজ, ধর্ম্ম ও নৈতিকতা সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা ও প্রথাসমূহের নূতন বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বুদ্ধিজীবিদের এই দল এইরূপে নিজেদের প্রচেষ্টা দ্বারা সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের জন্য এক নূতন পাদপীঠ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে এনসাইক্লোপিডিয়া তাঁহারা সৃষ্টি করেন, তাহা বুদ্ধিজীবি জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে এবং তাঁহারা যে দেশের অধিবাসী, সেই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করে। যাহা হউক, তাঁহাদের সমাজের প্রধান শক্তি সরকার এবং ধর্ম্ম তাঁহাদের প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার ফলে তাঁহাদিগকে ভীষন দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হইতে হয়। এমন কি তখনকার সরকার তাঁহাদের এনসাইক্লোপিডিয়াকে বেআইনী ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই পুস্তক প্রকাশনার সময় তাহাতে লিপিবদ্ধ মূল বিষয়গুলিকে জোরপূর্বক পরিবর্তিত করিয়া সমস্ত বিষয়টিকে অর্থহীন করিয়া ফেলেন। এই সমস্ত পরীক্ষা এবং কষ্ট দুঃখ সত্ত্বেও তরুণ বুদ্ধিজীবিগণ তাঁহাদের প্রচেষ্টায় লাগিয়াই থাকেন। যদিও শেষের দিকে এই আন্দোলনের কোনও কোনও সহচর পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষের চাপে এই পথ পরিহার করেন, তথাপি এই মহান বুদ্ধিজীবি আন্দোলনের অগ্রগামী বাহিনী তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূরণের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বুদ্ধিজীবিদের এই দলটি তাঁহাদের আদর্শকে পূরণ করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। তাঁহারা গোপনে রাত্রিতে কাজ করিতেন এবং তাঁহাদের কার্যের প্রুফগুলি অন্ধকারে দেখিয়া লইতেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি শক্তির দুর্ব্বলতা ছিল, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ইহা খুবই সম্ভব যে, আজিকার দিনে কোনও রেফারেন্স লাইব্রেরীতেই এই মহান এনসাইক্লোপিডিয়ার একটি মাত্র কপিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না এবং সম্ভবতঃ সাহিত্যের এই মহান অবদানের একটি শব্দও পড়ার সুযোগ এখন কেহ পাইবে না। তথাপি, ইহা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নহে যে, এই তরুণ বুদ্ধিজীবিদের বৈপ্লবিক মনোভাবই মহান ফরাসী বিপ্লবের অগ্রপথিক এবং এই ফরাসী বিপ্লবই সমসাময়িক ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেরও ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়াছিল ও ইহার ফল সুদূর প্রসারী ছিল, এবং ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য সমাজেও আন্দোলনের

সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা জানি যে, এই অদ্বিতীয় বিপ্লব সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত বহু পুস্তকই লেখা হইয়াছে এবং প্রত্যেক উৎসুক ব্যক্তিই এই মহান আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত বিস্তারিত ঘটনাবলীর সহিত গভীরভাবে পরিচিত হইতে চাহেন।

আমাদের সন্নিকটে, আমাদের নিজেদের সমাজেই ফ্রান্সের অনুরূপ বিপ্লব এক সময় সংঘটিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বের কথা স্যার সৈয়দ আহমদ খান তাঁহার সততাপূর্ণ আগ্রহ এবং সরলতাপূর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করেন। মনুষ্য সমাজের সেই মহান নেতা ও সমাজ সংস্কারককে এক সময় খুব নিকট হইতে পাওয়ার ও তাঁহার জীবনের আদর্শ পূরণের জন্য তাঁহার পাশাপাশি কার্য্য করিবার সুযোগলাভ করায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। স্যার সৈয়দের আগ্রহ সমাজকে এক নূতন জীবন দান করে। তাঁহার প্রচেষ্টাসমূহ পশ্চাদপদ অবস্থা এবং অশিক্ষা দূর করিতে সাহায্য করে; যে স্থবিরতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি তাহা বিদূরিত করেন এবং সমাজকে পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার এবং ভিত্তিহীন ভীতি হইতে মুক্ত করেন; যুক্তিবাদ এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উর্দ্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা কোনও ক্রমেই সহজসাধ্য ছিল না এবং ইহা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান হেয় নয়। যে সমস্ত অসুবিধা এবং ভীতির মধ্য দিয়া স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা ধারনা করা বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব নহে। যখন স্যার সৈয়দ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যাত্রা সুরু করেন, তখন তাঁহার যাত্রাপথে বহু বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং তিনি বিরাট বিরোধীতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং এমনকি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। তথাপি তিনি নীরবেই সমস্ত কষ্ট-দুঃখ ভোগ করেন এবং স্বীয় সঙ্কল্পে অটুট থাকেন। অবশেষে অবশ্য তিনিই কৃতকার্য্য হন। জাতি তাঁহার মধ্যে একজন মহান নেতাকে দেখিতে পায় এবং তাহার অস্তিত্বের একটি নূতন পাতা উন্মোচিত হয়।

ফরাসী দেশে ফরাসী এনসাইক্লোপিডিয়া আন্দোলন এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া দুইটি অসাধারণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ইতিহাসে কেমন করিয়া দুই দুইবার বুদ্ধিজীবিগণ সাহিত্যের স্থবিরতা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনারা দেখিয়াছেন যে, কেমন ভাবে এই সমস্ত নির্ভীক আদর্শবাদিগণ তাঁহাদের পরীক্ষা এবং দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইয়াও নিজেদের লক্ষ্যে অটল ছিলেন। মানবতার ইতিহাসে অগ্রগামী হিসাবেই তাঁহারা চিরকাল থাকিবেন—তাঁহারা অমর। তাঁহারা মানবতার জন্য এক চিরস্থায়ী মঙ্গল বহিয়া আনিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিজয়লাভ হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। আমি আমার সমবেত বন্ধুমণ্ডলীকে বলিতে পারি যে, একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, প্রস্তাব পাশ করা অথবা সরকারের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা কোনও ক্রমেই যথেষ্ট নহে। আপনাদিগকে কঠোর অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। আমি যখন আপনাদিগকে কার্য্য করিতে বলি, তখন অফিসে গমনকারীরা যেমন সকাল ৯টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ কার্য্য করিতে বলি না। আমরা যে কার্য্যের সম্মুখীন হইয়াছি, পূর্ণ সঙ্কল্প এবং ধৈর্য্য লইয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। দিবারাত্রই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। আমাদিগকে নিজেদের কার্য্যের জন্য নিজদিগকে উৎসর্গ করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যাইতে হইবে।

ইহাই হইবে আমাদের সান্ত্বনা যে, যাঁহারা জীবনে কোনও বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে বাস্তবিকই উৎসাহ এবং ঐকান্তিকতার সহিত কার্য্য করিয়া যাইতে হয় এবং যাঁহারা এইভাবে জীবন যাপন করেন তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা অবিনশ্বর। যাঁহারা দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করিতে চাহেন না, সত্বরই তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হন।

আমরা জানি যে, বিরাট রাষ্ট্রসমূহ ধ্বসিয়া পড়ে এবং এবং পরাক্রান্ত জাতিসমূহ অতীতের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু তাহাদের চিন্তাশীল এবং দার্শনিকদের সম্পাদিত কার্য্যসমূহ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীস ইরাণের হস্তে তাহার নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু গ্রীসের চিন্তাশীল এবং দার্শনিকেরা অদ্যাবধি মানবজাতির স্মৃতিপথে বাঁচিয়া আছেন। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহা ঐকান্তিক আগ্রহ, সম্মান এবং ভীতিমিশ্রিত ভক্তির সহিত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, মানুষের বুদ্ধি এবং জীবনীশক্তির ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবদানসমূহ আজও বাঁচিয়া আছে। আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান অথবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনও আবিষ্কারের মূল সূত্র প্রাচীন গ্রীসের কোনও মহান চিন্তার মধ্যে অন্বেষণ করা হয়। মহান গ্রীক দার্শনিক, লেখক এবং শিল্পীগণের নাম আমাদের আজিকার সমাজেও সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। আমাদের পশ্চাদপদ নারী সমাজও সক্রেটিস ও অন্যান্য দার্শনিকদের বিষয় এমনভাবে,

আলোচনা করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের জীবনের অংশ বিশেষ।

লেখকেরাই জাতির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষা করা সমস্ত জাতিরই দায়িত্ব। সন্দেহ নাই যে, আমাদের লেখকেরা খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছেন। তাঁহারা যাহা কিছু করেন, অধিকাংশ সময়েই তাহার অপচয় হয় এবং প্রতিদানে তাঁহারা কিছুই লাভ করেন না। যে সম্মান তাঁহাদের পাওয়া উচিত, তাঁহারা তাহা পান না। অনেক তরুণ সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ হইতেই বঞ্চিত। আপনারা জানেন যে, একজন লেখককে দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত বাতি জ্বালাইয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যমকে নিয়োজিত করিতে হয় এবং ইহার পর তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা মূল্যহীন হইয়া পড়িতে দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার পর যদি তিনি দেখিতে পান যে তাঁহার সমস্ত পুস্তকের লেখাই চুরি হইতেছে অথবা প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকেই ছাপা হইতেছে, তখন আদালতের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত ঐ অবস্থা হইতে উদ্ধারের তাহার আর কোনও আশা থাকেনা। আবার, আইনের রাস্তা তাঁহার নিকট খুবই ব্যয় বহুল, দীর্ঘ সূত্রীয় এবং ইহা তাঁহাকে বিজড়িত করিয়া রাখে ও কোনও কোনও সময় একটি মামলার নিষ্পত্তি হইতে মাসের পর মাস, অথবা বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়। ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক জটিল হওয়ায় এই অবস্থা আরও অপকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, ভারতীয় প্রকাশকদের পক্ষে কোনও পাকিস্তানী লেখকের লেখা চুরি করিয়া ছাপানো একটি সাধারণ ব্যাপার। ইহার বিপরিতও ঠিকই। এরূপক্ষেত্রে আইন আদালতের আশ্রয় লওয়া নিরর্থক। এইরূপ ঘটনা লেখকদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থাকে আরও দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে এবং এইরূপ অসদাচরণ আপনাদের সংগঠনের ন্যায় লেখকদের সংগঠনের দ্বারাই দূর করা যাইতে পারে।

আপনারা যে সংগঠনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বহুবিধ উপায়েই সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্য করিতে পারে। আপনারা লেখক-প্রকাশকের সম্পর্ক অথবা কপিরাইটের ধারা প্রভৃতি সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন এবং আপনাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য কোনও রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। বস্তুতঃ আমি মনে করি যে, লেখকদের নিজেদের এবং তাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টির কার্য্যের প্রায় সমস্ত সমস্যাই এইরূপ একটি সংগঠনের দ্বারা সুষ্ঠু সমাধান করা যাইতে পারে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সাহিত্য-সৃষ্টি একটি সম্মানজনক ব্যবসায়। ইহার সম্মান এবং মর্য্যাদা রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব। সদাচার এবং অকপটতাই আপনাদের সকলের পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত। সাহিত্যের মাধ্যমে পশ্চাদপদ অবস্থা এবং মুক্তির অভাবকে দূর করার আশা করা যায় এবং চরিত্রসৃষ্টি ও নিজেদের ভ্রাতৃবৃন্দের নীতিবোধ এবং চরিত্র-সৃষ্টির কাজে সাহায্য করা যায়। আপনাদের প্রতি আমার উপদেশ—ভবিষ্যতের জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান রাখিয়া যান যে, যাহা চিরকালের জন্য মানবসমাজের স্মৃতিপটে বাঁচিয়া থাকে।

পরিশেষে আমি এইটুকু বলিব যে, আপনারা সম্মিলিত একটি দল হিসাবে কার্য্য করিয়া যাইবেন। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনাদের সংগঠন কৃতকার্য্য হউক এবং লেখক-সমাজ ও জাতির কার্য্যে উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হউক।*

* করাচী লেখক সম্মেলনে পঠিত ভাষণ।

লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা

কুদরতুল্লাহ শেহাব

লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কে কিছু বলার পূর্ব্বে লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। উক্ত দায়িত্বগুলি হইতেছেঃ

(১) লেখক কোনক্রমেই আইনের উর্দ্ধে নহে;

(২) তিনি এক দেশে বাস করিয়া অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারেন না;

(৩) তিনি একরূপ আদর্শ প্রচার করিয়া ভিন্নরূপ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের কাবি্যক সম্পদ গ্রহণ করিতে পারেন না।

উক্ত সীমাবদ্ধতা সকল সৎ নাগরিকের পক্ষেই প্রযোজ্য; কিন্তু লেখকদের বেলায় উহা আরও গভীরভাবে প্রযোজ্য এই জন্য যে, লেখকের কার্যকলাপ সর্ব্বদা জনসাধারণের বিচারের অধীন। তিনি যাহা লিখিবেন তাহা যে সব সময় অতীতের বিষয়বস্তু হইবে—তাহার কোনই অর্থ নাই।

আসল বিপদ এই যে, লেখকের মত একজন অসাধারণ ব্যক্তির কার্য্যকলাপ একটি অতি সাধারণ মাপকাঠির দ্বারা বিচার করা হইয়া থাকে। উহাতে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায় তবে তাহা সংশ্লিষ্ট লেখকের অথবা যে মাপকাঠির দ্বারা তাঁহার বিচার করা হইয়া থাকে তাহার দোষে নাও হইতে পারে। উহা আপনার নিজের উদ্দেশ্য এবং ঘটনাবলী সঠিকভাবে যাচাই করার দক্ষতার অভাবের জন্যও হইতে পারে। লেখক আপনার নিকট হইতে যাহা চাহেন তাহা সহনশীলতা নহে,—বোধগম্যতা। উহা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ ইন্সপেক্টরের বোধগম্যতা নহে—উহা উৎসুক পাঠক, উন্নততর মূল্যবোধ ও সত্যসেবীর বোধগম্যতা। একজন চোরের অনুসন্ধানের জন্য অপর একজন চোরকে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। কিন্তু একজন লেখকের বিচারের জন্য শুধু পাঠককেই নিয়োজিত করা চলে। লেখকের অধিকার নির্দ্ধারণের জন্য বিচারকার্যে নিযুক্ত আমলাতন্ত্রীরা যদি মূল পুস্তকটী পাঠ না করিয়া কেবল ফাইলের নোট পড়েন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বদাই লেখকের ভুল বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিবেন। অনুরূপ আমলাতন্ত্র কখনই ইহা বুঝিতে পারিবেন না যে, দৈহিক শাস্তির দ্বারা আদর্শের শাস্তি বুঝায় না। তিনি কখনই উহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন না যে, আদর্শের মৃত্যু নাই এবং পৃথিবীর সমস্ত ফৌজদারী আইন, শতাব্দীব্যাপী সমস্ত রকমের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতি জ্ঞানও সত্যের আত্মাকে শৃঙ্খলিত করার মত বন্ধনী আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই।

লেখকের আজাদীর আর একটি বিপদ এই যে, তিনি স্বাভাবিক সময় অপেক্ষাও অধিক দিন ধরিয়া জনচিত্তে জীবিত থাকেন। লেখক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভাবিতপূর্ব্ব পরিবেশের মধ্যে নিজেকে রাখিয়া যান এবং তাঁহার আগামীকালের স্বপ্ন বর্তমানের উপযোগিতার দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়। সাধারণের চাইতে তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা দীর্ঘতর ও ভাবপ্রবণতা দৃঢ়তর বলিয়া তিনি উন্মাদ অথবা দেশদ্রোহী নহেন। আপনার নিজস্ব স্বল্পতার চিন্তাধারাকে লেখকের শক্তি ও উদ্দেশ্যের সহিত সমাজবিধানের চেষ্টা করুন। অন্যথায় আপনি কখনই লেখকের সম্পর্কে ন্যায়বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

শোষক

লেখকের স্বাধীনতার পক্ষে তৃতীয় বিপদ হইতেছে তাঁহার আর্থিক অসুবিধা। আমাদের দেশে দাম বেশী হওয়ার দরুণ বই পুস্তক বিক্রী হয় না। যাহাদের ক্রয় করার ক্ষমতা আছে তাহারা পড়েন না। আর যাহাদের পড়ার আগ্রহ আছে তাহাদের কিনিবার সামর্থ নাই। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে যাহারা লাভবান হন তাহারা হইতেছেন প্রকাশক। প্রকাশকরা লেখকদের জীবনের সমুদয় রক্ত শোষণ করিয়াও উহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেননা বলিয়া আফশোস করিবেন। প্রকাশক নিজের প্রকাশনী ব্যবসায়ের উন্নতির মাপকাঠিতে লেখককে শোষণ করিবেন।

লেখকের বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ বিকাশ সাধনের পথে আর একটী বাধা রহিয়াছে। উহা হইতেছে বাইরের বিপদ।

আমাদের দেশ ছোট। আমরা দরিদ্র। আমাদের বিষয়াদিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হইতেছে। ফলে পৃথিবীতে আমরা অনেক সাহায্যদানকারী বন্ধু, অনেক বিদ্রূপকারী বন্ধু এবং অনেক শত্রুতাচরণকারী বন্ধু লাভ করিতেছি। কিন্তু ইহাপেক্ষাও বিপদের বিষয় হইতেছে এই যে, আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাপক ধ্বংসের মধ্যে জাতি হিসাবে আমরা আমাদের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। আমরা নিজেরাই যখন আমাদের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিলাম তখন শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। তখন হইতে পৃথিবীর নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোকেরা

সকল প্রকারের বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া উক্ত শূন্যতা পূরণ করার উদ্যমে লাগিয়া গেল।

আমাদের চিন্তাধারাকে মক্কা হইতে মস্কো, ওয়াশিংটন কলিকাতায় নিবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। মস্কো ও কলিকাতা আমাদের চিন্তাধারাকে বিপথগামী করিতে চাহে; ওয়াশিংটন উহাকে অন্যপথে চালাইতে চাহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎসস্থল পাকিস্তান, পৃথিবীর অন্য কোথাও নহে। পাকিস্তানের লেখকগণকে বিশ্বরাজনীতির পরীক্ষাগারে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না। আমরা দরিদ্র ও সংগ্রামী। কিন্তু আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও তামদ্দুনিক ক্ষেত্র রহিয়াছে।

এই আন্তর্জাতিক দাবা খেলার একটি ফল হইতেছে এই যে, সৃজনশীল কার্যকলাপের ফোয়ারা কয়েক বৎসর যাবৎ ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও বিভ্রান্তগামী হইতেছে। পয়সার লোভনীয় ফাঁদ পাতিয়া বৈদেশিক ভাষায় অজস্র সস্তা পুস্তক অনুবাদ করার জন্য আমাদের লেখকদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের কোন একজন শ্রেষ্ঠ লেখক যদি তাঁহার উৎকৃষ্ট লেখনী দ্বারা একটী পাতা লিখেন তাহার বিনিময়ে তিনি দশ আনা পয়সাও পাইবেন না। কিন্তু তিনি যদি কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈদেশিক লেখকের একটী তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকের এক পৃষ্ঠা অনুবাদ করেন তাহা হইলে তিনি দশ টাকা পাইবেন।

প্রকৃত স্বাধীনতা

উপসংহারে আমি সরকার ও লেখকের স্বাধীনতার মধ্যস্থিত সম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলিব। প্রায় তিন মাস পূর্ব পর্য্যন্ত রাজনীতিকরা সকল রকমের স্বাধীনতা ভোগ করা শুরু করেন,—তাঁহারা লুঠপাট ও বিদ্রূপ পরিহাসকে চারু শিল্পের মধ্যে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, অনুরূপ অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেও আমি এইরূপ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে সাহস করিতাম না। কিন্তু বর্তমানে সামরিক আইনের ৬৯টী ধারার মধ্যে অবস্থান করিয়া এবং প্রধান সামরিক শাসনকর্তার সম্মুখে থাকিয়া আমি এই বক্তৃতা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি। ইহাপেক্ষা অধিক আর কিছু আমরা চাই বলিয়া আমি মনে করি না।*

ফাগুন

আখ্‌তার-উল্‌-আলম

আস্‌লো ফাগুন লাগলো আগুন মনে;
জাগলো শিহর কোকিল ডাকায় বনে।
শীতের দারুণ টুট্‌লো পাষাণভার,
ফুট্‌লো কুসুম মৌমাছি গুঞ্জনে॥

ঘুপ্‌সী গেরাম রূপসী নদীর তীর;
ক্লান্ত ছায়ায় শ্রান্ত চাষীর ভিড়।
চকের পাথার দিক্ সীমানায় হারা
সন্ধ্যা ঘনায় ছন্দে ধরিত্রীর॥

বন্ধু হাওয়া লাগ্‌লো পালের গায়;
নৌকা তোমা'র কোথায় যেতে চায়।
ভাটীর খেওয়া বইছো অনেক দিন,—
দাওনা পাড়ি এবার উজান বায়॥

* করাচীতে অনুষ্ঠিত লেখক-সম্মেলনের পঠিত।

করাচী লেখক সম্মেলন

মোহাম্মদ নাসির আলী

জানুয়ারীর শেষার্দ্ধ তখন শুরু হয়েছে। বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে আমন্ত্রণ-লিপি পেয়ে জানলাম, করাচীতে পাকিস্তান লেখক সম্মেলন হচ্ছে। জানুয়ারীর ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে—তিনদিনব্যাপী অধিবেশন। পূর্ব পাকিস্তানের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের যাতায়াত খরচ এবং খাওয়া-থাকার খরচ বহনের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের তরফ থেকেই করা হবে।

এর বেশী কিছুই তখন জানি না। আমন্ত্রিত আর আর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে জানলাম, পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মোট আড়াই শ' লেখক নিয়ে হচ্ছে এই ঐতিহাসিক সম্মেলন। পূর্বপাকিস্তান থেকে আমন্ত্রিত হয়েছেন পঞ্চাশ জন—মোটের উপর এক-পঞ্চমাংশ। রাহা খরচের অপ্রতুলতার জন্যেই নাকি এ-অসম ব্যবস্থা।

দু'একদিন পরেই একটা মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উঠলো লেখকদের ভেতর। অনেকেই বলতে লাগলেন, পূর্বপাকিস্তানের আমন্ত্রণ-তালিকা তৈরী করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা ঠিক সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেননি। অনেক অনভিপ্রেত লেখককে তাঁরা আমন্ত্রণ করেছেন যোগ্যতর লেখকদের বাদ দিয়ে।

এই তালিকাটি তৈরীর ব্যাপারে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে শুনা গেলো, তাঁরা শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব অস্বীকার করলেন। বললেন, এ-তালিকা তৈরী হয়েছে পাকিস্তানের রাজধানী খাস করাচী বন্দরে। অথচ পরে সঠিকভাবেই জানা গেলো, তালিকা করাচীতে তৈরী হলেও 'কাঁচা মাল' সরবরাহ হয়েছে ঢাকা থেকেই।

স্বভাবতঃই নীতিগত কারণে কেউ কেউ এ-সম্মেলনে যোগদানে অসম্মতি জানালেন, কেউ কেউ অবশ্য অসম্মত হলেন ব্যক্তিগত কারণে। যাঁরা অসম্মত হলেন তাঁদের জায়গায় দ্বিতীয় দফায় কয়েকজনকে আমন্ত্রণ করা হলো। ফলে, পূর্ব-পাকিস্তানের পঞ্চাশ জনের 'কোটা' ঠিকই রইলো।

করাচী যাত্রার আগের দিন। লেখকদের বহুজনের সমাবেশ হয়েছে বাংলা একাডেমীতে। বিমান ভ্রমনের টিকিট ও অপরাপর জ্ঞাতব্য সবকিছু পাওয়া ও জানা যাবে সেখানেই। একাডেমীর পরিচালক ডাঃ এনামুল হককে জিজ্ঞেস করলেন প্রবীণ সাহিত্যিক মুহম্মদ বরকতুল্লাহ সাহেব: কাল ভোরের প্লেনে আমাদের সঙ্গে আর কে কে যাচ্ছেন ?

-প্রশ্নের জওয়াবে ডক্টর সাহেব বললেন: কালকের ভোরের যাত্রীদের মধ্যে আপনি একদল তরুণ সাহিত্যিক যেমন পাবেন, তেমনি পাবেন আমার মতো পক্ক কেশ একদল বৃদ্ধ সাহিত্যিক। সুতরাং যাঁর যে দলে খুশী ভিড়ে যেতে পারবেন।

পরের দিন ভোরে তেজগাঁ বিমান বন্দরে গিয়ে দেখলাম, কথাটা সত্যিই। শুভ্র-শ্মশ্রু খান বাহাদুর আবদুর রহমান, ডকটর কাজী মোতাহার হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনুল মোমেন, কবি মঈনুদ্দীন, জনাব মতিন উদ্দিন আহমদ, কবি আবদুল কাদির, কবি বেনজির আহমদ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মুতী প্রভৃতি সবাই আছেন। চাটগাঁ থেকে এসেছেন জনাব মাহবুব-উল-আলম, অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক শওকত ওসমান আর কবি মতিউল ইসলাম। রংপুর থেকে কবি মোফাখখারুল ইসলাম আর দিনাজপুর থেকে কবি কাদের নওয়াজ।

ভোরে যাত্রার সময়ে আকাশের অবস্থা ভালই ছিল। দুপুরের দিকে আকাশে জায়গায় জায়গায় মেঘের ভেলা ভাসতে দেখা গেলো। পরে খবরের কাগজে দেখেছিলাম, লাহোরে তখন ঝড় আর শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। বন্ধুবর শামসুদ্দীন আবুল কালাম খবর নিয়ে এসে বললেন, ঝড় এড়ানোর জন্যে প্লেন অনেকটা বাঁয়ে সরে এসেছে তার নিত্যকার নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে। তা' না হলে এতক্ষণে আমরা নীচে যোধপুর শহর দেখতে পেতাম।

নীচে চেয়ে দেখলাম, প্লেন তখন সত্যিই রাজপুতনার মরুভূমির উপর দিয়ে চলেছে। গাছপালা নদীনালার চিহ্ন কোথাও নেই। চোখে পড়ে যোজনের পর যোজন-ব্যাপী শুষ্ক বন্ধ্যা মাটী, জায়গায় জায়গায় বালির উঁচু ঢিঁবি। ইতিহাসে পড়া পদ্মিনী আর মানসিংহের এই সেই রাজপুতনা। একদা শাহী আমলে এরা যেমন যুদ্ধ করেছিলো মুসলমানদের সঙ্গে তেমনি সখ্যতাও করেছিলো বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে।

সহসা প্লেনের উঠা-নামা (Bumpirg) শুরু হতেই চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। পর পর কয়েক বার দ্রুত উঠা এবং নামা। স্বর্গারোহনে নতুনব্রতী কোনো কোনো বন্ধুর চোখে-মুখে তখন ফুটে উঠেছে আতঙ্কের চিহ্ন। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। বুদ্ধিমান কেউ কম নন। গল্পে মশগুল সহযাত্রী অপরাপর বন্ধুদের ভাবলেশহীন

মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কিত বন্ধুরা সহজেই আশ্বস্ত হলেন।

গল্পে-গুজবে আর হৈ-হুল্লোড়ে দীর্ঘ পথ যেন নিমেষে শেষ হলো। ঢাকাই ঘড়িতে বোধহয় তখন বিকেল চারিটার বেশী বাকি নেই। সহসা পাইলটের ঘোষণা শোনা গেলো: আমরা করাচী পৌঁছে গেছি। অনুরোধ এলো: কোমরে বেল্ট বেঁধে নিন্।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা নিরাপদে অবতরণ করলাম করাচীর ড্রিগ্ রোড বিমান ঘাঁটীতে।

পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের সাদর সম্ভাষণ জানাতে স্নিগ্ধ-হাস্যে এগিয়ে এলেন মেজর ইবনুল হাসান আর তাঁর সঙ্গে করাচী কালচার সেণ্টার এর বৃত্তাকার ব্যাজ পরিহিত যুবক কর্মীবন্ধুরা। কর্মীদের সাথে ইংরেজীতে প্রাথমিক আলাপ সারতে গিয়ে যেনো হোঁচট খেতে হলো, জওয়াব এলো পরিষ্কার বাংলায়। মন আমাদের স্বভাবতঃই খুশীতে ভরে উঠলো। বারো শ' মাইলের দীর্ঘ ব্যবধান মুহূর্তে ঘুচে গেলো।

কনভেন্শান কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত বাসে আমরা এসে পৌঁছলাম কাচারী রোডের তাজ হোটেলে। রিসেপ-শন রুমে নামধাম লিখাতে গিয়ে জানলাম, এক কামরায় জোড়ায় জোড়ায় থাকবার ব্যবস্থা। সহবাসী বন্ধু বেছে নেবার পালা শুরু হলো। দেখলাম, অ-কবিরা কবিদের সঙ্গে জোড়া বাঁধছেন। প্রথমেই জনাব বরকতুল্লাহ বেছে নিলেন কবি মঈনুদ্দীনকে। তারপর জনাব মতিনউদ্দিন আহ্মদ নিলেন কবি আজহারুল ইসলামকে। আমার অবস্থা তখন বাঁশবনে ডোম কানার শামিল। সবাই তো বন্ধু—কাকে ছেড়ে কাকে নির্বাচন করি? কবিবন্ধু বেনজীর আহমদের মনের অবস্থাও তাই। অতএব আমাদের মতের মিল হলো। পদ্মের সঙ্গে মূর্তিমান গন্ধ আমি উঠে এলাম তিন তলার এক কামরায়। কয়েক জোড়া গেলেন চারতলায়। কবি বেগম সুফিয়া কামাল, খান বাহাদুর আবদুর রহমান, জনাব মাহবুব উল আলম প্রভৃতি গেলেন পাশের বাড়ীতে হোটেল্স ডি-লুক্সে। শুধু বেগম শামসুন্নাহার হলেন দলছাড়া। তিনি মেহমান হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিঃ এ-কে খানের বাড়ীতে। আমরা রাস্তার এ-পারে, তিনি রাস্তার ও-পারে। প্রোগ্রাম মাফিক সম্মেলনে যাতায়াত একই বাসে।

সন্ধ্যার পর ডিনারের টেবিলে বেশ মজা হলো। হোটেলের বয় এসে একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করে গেলো, কার জন্যে কি ডিস্ চাই—পাকিস্তানী, না ইংলিশ?

দেখলাম, অধিকাংশই পাকিস্তানী ডিসের ভক্ত। শুধু কবি বেনজীর আহমদ হুকুম করলেন ইংলিশ ডিস্। পাশ ফিরে আমাকে বললেন—বাড়ীতে তো তিন বেলাই পাকিস্তানী চালাই। এখানে এসে ইংলিশ ডিসের সুযোগ ছাড়ি কেনো?

গাল-গল্পের সহযোগে ভোজনপর্ব এগিয়ে চলেছে শম্বুক গতিতে। সহসা হোটেলের ম্যানেজার এসে হাঁকলেন—হু ইজ মিঃ ক-উ-ই মঈনুদ্দীন প্লিজ? এ ট্রাঙ্ক কল্ ফ্রোম ঢাকা।

রইলো পড়ে অর্ধ সমাপ্ত পাকিস্তানী ডিস্। কবি হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন টেলিফোন রুমের উদ্দেশ্যে। বিমান-যাত্রার প্রাক্কালে একবার টেলিফোন করা হয়েছে তেজগাঁ থেকে। হোটেলে এসে "নিরাপদে পৌঁছেছি" সংবাদবাহী পত্রও ডাকে ছাড়া হয়েছে। এর কিছুই সহযাত্রী বন্ধুদের সকৌতুক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এখন চলেছে তৃতীয় প্রস্থ। বিস্ময়ের কথাই বটে। একজন কে যেনো বলে উঠলো—এতো দিনে তো বেশ পুরানো হবার কথা! তবে আবার এতো টান ক্যানো হে?

সবারই সামনে সুপ ডিস ভরতি ভাত। বোধহয় সে জন্যেই টেবিলের ও-পাশ থেকে জবাব এলো—'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।'

পরিহাস রসিক মতিন উদ্দিন সাহেব ছিলেন সুদীর্ঘ টেবিলের দক্ষিণ সীমান্তে। তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ কণ্ঠে বলে উঠলেন—'শুনুন আপনারা, যাঁর কথা বলছেন তিনি পুরানো হতে পারেন কিন্তু টেলিফোনটি নতুন।'

হাসির রোল উঠলো চারদিকে। মিনিট দশেক পরে কবি ফিরে এলেন। জের তবু যেনো মিট্ছে না। বন্ধুবর সৈয়দ আবদুস মান্নান তাঁর অকৃত্রিম বরিশালী কণ্ঠে হাঁকলেন—'বলি কাজ তো সাইরা আসলেন, লাগলো কেমন তাই কন।'

কবি পরিহাসকে পরিহাস বলে গ্রহণ করতে জানেন। তিনি বললেন—'লাগ্লো কেমন তা আর বলতে? হাজার মাইল দূরে এসেছি তা মনেই রইলো না। মনে হলো যেনো বাংলাবাজার থেকে গেণ্ডারিয়া গেছি।'

রাত বারোটায় ঘুমানো চিরকালের অভ্যাস। অবসর অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিলো। প্রবাসের প্রত্যেকটি মিনিট কাজে লাগানো চাই। বন্ধুবর শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাছে প্রস্তাব করলাম, হোটেল এক্সেল্সিওরে কনভেনশনের অফিসে গিয়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে এলে বেশ হতো।

এ-কাজে শামসুদ্দীন সাহেব এভার রেডী। করাচীর প্রায় সবাই তাঁর পরিচিত, সবাই অন্তরঙ্গ বন্ধু। তৎক্ষণাৎ তিনি টেলিফোন ধরলেন। ওপাশ থেকে জওয়াব এলো—ভেরী গুড্। এক্ষুণি গাড়ী যাচ্ছে। চলে আসুন।

এ-ক'দিন ধরে যাঁদের নাম শুনছিলাম তাঁদের প্রায় সবাইকে দেখলাম। মিঃ কুদরতুল্লাহ শেহাব, কবি হাফেজ

জগন্ধরী, মিঃ শহীদ আহ্‌মদ দেহলভী, মিঃ জামিল উদ্দিন আলী, মিঃ ইবনুল হাসান, বেগম হাজেরা মাসরুর, মিস্ কোরাতুল আয়েন হায়দার প্রমুখ সবাই সেখানে হাজির। সবাই কর্মব্যস্ত। তবু আমাদের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা-পূর্ণ ব্যবহার ও অকৃত্রিম আদর-আপ্যায়ণে আমরা মুগ্ধ হলাম। এ-ঐতিহাসিক সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এঁরা দিনের পর দিন প্রাণপণ পরিশ্রম করে চলেছেন। এতো বড়ো বিরাট ব্যাপার ঘাড়ে চাপলে আমরা কি করতাম, মনে মনে তাই ভাবছিলাম।

পরের দিন সাড়ে দশটায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। তার আগে কায়েদে আজমের মাজার জেয়ারত। প্রাতে নাশ্‌তা সেরে হোটেলের গেটে দেখলাম অপেক্ষমান প্রায় অর্ধ ডজন ট্যাক্সী। আমাদের শুধু একত্র হতে বাকি।

আধঘণ্টার ভেতর আমরা গিয়ে হাজির হলাম বিখ্যাত সেই মাজারের শান্ত পরিবেশের ভেতর। যথারীতি দোয়া-দরুদ সমাপনের পর প্রথমে কায়েদে আজমের মাজারে এবং পরে কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী ও আবদুর রব নিশতারের মাজারে পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের পক্ষ হতে পুষ্পমাল্য প্রদান করলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। দুনিয়ার কতো খ্যাতিমান নারী ও পুরুষ এই সমাধিস্থলে এসে অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। তাঁদেরই অনুসারী আমরা নিজেদের ধন্য মনে করলাম।

এরপর করাচী গোয়ান এসোসিয়েশন হলে সম্মেলনের অধিবেশন। প্রারম্ভে কোরান পাঠ করলেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান। করাচীর অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ সায়ীদ উদ্বোধনী ভাষণ দান করলেন। কনভেনশনের কার্যকরী সংসদের সভাপতি শহীদ আহ্‌মদ দেহ্‌লভী পাঠ করলেন তাঁর রিপোর্ট। এ-রিপোর্ট থেকেই সম্মেলনের সূত্রপাত কি করে হয়েছিলো জানা গেলো। প্রথমে করাচীর আটজন লেখকের এক সমাবেশে স্থির হয় পাকিস্তানের সর্বভাষার লেখকদের এমনি একটি সম্মেলন আহ্বান করা। ডিসেম্বরের ৪ঠা তারিখে তাঁরা মিলিত-ভাবে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তারই ফল আজকের এ লেখক সম্মেলন। এ-সম্মেলনকে সফল করে তুলতে তাঁরা বহু জনের সমর্থন যেমন পেয়েছেন তেমনি শুনেছেন বিরূপ সমালোচনা। সম্মেলনের ব্যয় বাবদ বাংলা একা-ডেমী, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিটী ফাণ্ড এবং করাচী ও লাহোরের কতিপয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা।

রিপোর্টের শেষে বাংলায় সভাপতির ভাষণ দান করেন কবি জসিমউদ্দীন। তুমুল হর্ষধ্বনির ভেতর তাঁর ভাষণ শেষ হবার পর সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশনগুলির কার্যসূচী প্রকাশ করেন জনাব জামিলউদ্দিন আলী।

সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো পাকিস্তানী লেখকদের একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করা। সে-কাজ যাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে পারে সে-জন্যে কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। প্রস্তাব প্রভৃতির খসড়া তৈরী করে সাব কমিটির কাজও অনেক দূর এগিয়ে রাখা হয়েছিলো। এ-সব সাব-কমিটির প্রস্তাবই পরে পাশ করিয়ে নেওয়া হয় মূল সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বাবায়ে উর্দু মৌঃ আবদুল হক। তার আগের অধিকাংশ অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন বাঙালী মেয়ে মিসেস মোহাম্মদ হোসেন। সভার কার্য্য পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব সবাইকে মুগ্ধ করে।

সমাপ্তি অধিবেশনে লেখকদের এ-সম্মেলন স্থায়ীভাবে পাকিস্তান লেখক সমিতিতে (Pakistan Writer's Guild) পরিণত হয়। ভাষার ভিত্তিতে মোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হলো কেন্দ্রীয় কমিটি। তাঁদের ভেতর বাংলা লেখক ১১ জন, উর্দু ১১ জন এবং পশতু, সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ১ জন করে—৩ জন গেলেন। সর্বসম্মতিক্রমে গিল্ডের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হলেন জনাব কুদরতুল্লাহ শেহাব। এ-সম্মেলনে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের যে-সব লেখক যোগদান করেছেন তাঁরা সবাই হলেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য (Founder Member).

কেন্দ্রীয় সমিতি ছাড়াও করাচী, লাহোর ও ঢাকায় গঠিত হবে তিনটি আঞ্চলিক সমিতি। পাকিস্তানের যে কোনো লেখককে আঞ্চলিক সমিতি গিল্ডের সদস্যভুক্ত করে নিতে পারবেন। আঞ্চলিক সমিতিগুলিতে সেক্রে-টারী ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া সদস্য থাকবেন ১১ জন করে।

শেষদিনের অধিবেশনে যোগদান করে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান সমবেত লেখক ও উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন এবং সমিতেতে দশ হাজার টাকা দান করেন।

এ-অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটি রচনা পাঠ করেন জনাব কুদরতুল্লাহ শেহাব, অধ্যাপক জাবিদ একবাল, ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক আবু রুশদ ও অধ্যাপক মমতাজ হোসেন।

করাচীতে সম্মিলিত আড়াই শ' পাকিস্তানী লেখককে সম্বর্দ্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে দু'টি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যথাক্রমে ইষ্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশন ও করাচী কালচার সেণ্টার। প্রথমোক্ত সমিতির পরিচয়

তার নামেই রয়েছে, দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টিতেও বাঙালী প্রাধান্য বেশী। করাচীতে ছোট বড় আরও যে সব সমিতি রয়েছে তাদের কেউ এ-ধরণের কোনো সম্বর্দ্ধনা সভার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এখানে একজন ভদ্রমহিলার নাম উল্লেখ প্রয়োজন। ইনি হলেন বেগম এম, ই, খান। ঢাকার বিক্রমপুরে তাঁর বাড়ী। স্বামী অবাঙালী, করাচীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। বাঙলা ভাষার আওতার বাইরে—সেই সুদূর করাচী হতে নিয়মিতভাবে 'দিগন্ত' নামে একখানা বাংলা সাময়িকী প্রকাশ করে ইনি পাক-বাংলা ভাষার প্রতি যে দরদ দেখাচ্ছেন, তা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি অবশ্য চেয়েছিলেন পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্যিকদের তাঁর বাসায় দাওয়াত করতে; এবং তাঁর এ-ঐকান্তিক বাসনা আমাদের জনৈক প্রবীন সাহিত্যিককে জানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠেনি। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি, কবি বেনজীর আহমদ ও কবি আবদুল কাদির তাঁর বাসায় গিয়েছি, তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি।

সম্মেলনের শেষে লেখকদের বেশীর ভাগ ঢাকায় ফিরে এলেন ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে।

ফাগুন-পরশ

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

মোর দেহে হায় আসে না ফাগুন,
আসে শুধু ফুলবনে,
প্রাচীন শিমূল হয়েছে তরুণ
যৌবন জাগরণে।

কিশলয় জাগে নব চেতনায়—
দন্ত ওঠে না কেন পুনরায়!
শাখায় শাখায় ফোটে রাঙা ফুল—
কাঁচা নাহি হয় হায় পাকা চুল!

জর্জ্জর দেহ হয়না নিটোল
মলয়-সঞ্চরণে!
মোর দেহে হায় আসেনা ফাগুন
আসে শুধু ফুলবনে॥

প্রতি বৎসর নদী-গিরি-বন,
ফাল্গুন বায়ে লভে যৌবন;
একবার শুধু আগমন করি'
যৌবন কোথা, হায়, গেল সরি?

ফিরে না আসিল আর একবার,
কোকিল ভ্রমর সনে!
মোর দেহে হায় আসেনা ফাগুন
আসে শুধু ফুলবনে॥

কবিতার ফুল তবু কেন ফোটে?
ছন্দ ও মিল কেন এসে জোটে?
তবে কি গো আমি হয়েছি তরুণ?
ফিরে পেনু কেশ দন্ত নতুন?

অজ্ঞাতসারে বদ্‌লে কি গেছি
ফাগুনের পরশনে?
তোমরা না হয় বলত সত্য—
হেরিছ তো জনে জনে॥

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

পন্নী পরিবার

বর্তমানে পন্নী পরিবার আটীয়ার অংশবিশেষের মালিক মাত্র এবং কয়েক শরীকে মিলে এঁদের জমিদারীর বার্ষিক আয় লাখ পাঁচেক টাকা। কিন্তু এঁদের বংশের ইজ্জত আজো প্রচুর ; এঁদের নজর আজো বড়। পাশের জমিদার সন্তোষের রায় চৌধুরীদের ২৮ শতাংশে পাখী ; আর এঁদের এলাকায় ৫৬ হতে ৭৬ শতাংশে পাখী ; তারো আবার সিকি পরিমাণের খাজনা দিতে হয় না। খাজনার হারও এঁদের খুব কম। খাজনার জন্য প্রজার উপর জুলুম—এ-অপবাদ এঁদের সম্বন্ধে কথনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

চাঁদ মিঞা সাহেব

করটীয়ার জমিদারদের মধ্যে দশ আনীর মালিক তখন ছিলেন মৌলভী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চাঁদ মিঞা সাহেব। সেই চাঁদ মিঞা সাহেবের সঙ্গে পরদিন সকালে দেখা করতে গেলাম। বয়সে প্রৌঢ়, পেটাও শরীর, মোটা হাড্ডি, ছফেদ রং, বড় বড় চোখ, অত্যন্ত সৌজন্যময় ব্যবহার, তাঁর সঙ্গে দুই চারটি কথা বলেই মনে হল—হ্যাঁ, বহুদিন পর একটি সত্যিকার অভিজাত সন্তানের সঙ্গ লাভ করেছি। অল্প পরিচয়েই তাঁর উপর আমার হল ভক্তি, আমার উপরেও বোধ হয় তাঁর হল স্নেহ। বল্লেন—

'ল-পাশ করে ওকালতী করতে যাবেন, সে তো বুঝলাম ; কিন্তু তার আগের এ-সময়টায় কি করবেন ?'

'চাটগাঁর ফটিকচরী হাই স্কুলে ওঁরা ডেকেছেন—হেড্ মাষ্টারী করার জন্য।'

'চাটগাঁও তো অনেক দূর ; কাছে আসুন না কেন ? আমার এখানে তো হেড্ মাষ্টারের পদ খালি আছে ?'

'তা হলে একটু ভাবতে হয়।'

'কিন্তু কি আর বেশী ভাববেন ? আমি আপনার পড়শী ; আপনার উপর তো আমার পড়শীর হক আছে। সে হক আপনি অস্বীকার করবেন কি করে ?

'তা অস্বীকার করা তো কঠিনই বটে।

'বাস ; তা হলে পূজার ছুটির পর এখানে এসে পড়ুন।

মাত্র কয়েক মাস কাজ করব, এই শর্তে ১৯২৯ সালের ২৮শে নভেম্বর করটীয়া হাই স্কুলের কাজে যোগ দিলাম। এই কয়েক মাসকে বিধাতা আমার কর্মজীবনের সিকি শতাব্দীর সঙ্গে যে অলক্ষ্যে জুড়ে দিচ্ছিল, তা তখন কে জান ত ?

শিক্ষকতা আমার জীবনের প্রিয়তম কাজ। কাজেই করটীয়ার কর্মজীবন আমার ভাল লাগল। স্কুলের ছেলেগুলি অত্যন্ত ভদ্র, বাসিন্দাদের ব্যবহার সৌজন্যময়, কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিশীল।

বন্ধু এখানে যাঁদের পেলাম, তাঁদের কথা কোন দিনই ভুলবার নয়। আমার অতীতের আকাশে তাঁরা সুদূরের তারার মত জেগে আছেন ; যখনই ফিরে চাই, তখনই তাঁদের অনির্বান আলো স্মৃতির চোখে জ্বলে ওঠে।

স্কুলে পেলাম তিনজনকে :

আবুল খায়ের চৌধুরী—বাড়ী মালদহের অন্তর্গত বাজিতপুর গাঁয়, গণিতের শিক্ষক। অমন শান্ত, সংযত, স্নিগ্ধ মেজাজ, অমন দিলদার বন্ধু বৎসল সদানন্দ মানুষ জীবনে আর কাউকে পেয়েছি বলে মনে পড়েনা। আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'শরীফ সাহেব'। রোজ সকালে ফজরের নামাজের পরই লাঠিখানি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, কিছুক্ষণ বেড়ানের পর এসে জুটতাম তাঁর কামরায়। দেখতাম, নাস্তা আর চা নিয়ে তিনি বসে আছেন। এক সঙ্গে বসে খেতাম, হাসতাম, সকুলের কথা ভাবতাম, গল্প করতাম। আবার বিকালের চা নাস্তা এ-একই সঙ্গে হত। মেস ছেড়ে বাসায় গেলাম। বাসা হতে এলেও রোজ তাঁর ওখানে হাজির হতাম।

তিনি ছিলেন আমার চায়ের ওস্তাদ। করটীয়া আসার আগেও চা খেতাম; কিন্তু সে ছিল সখের খাওয়া।

চৌধুরী সাহেবের ছোহবতে চা খাওয়া অভ্যাসের শামিল হয়ে গেল।

আগেকার দিকে যারা তামাক খেতেন, তাঁরা তামাককে জায়েজ করার জন্ম ফতোয়া সৃষ্টি করে নিতেন। চা খাওয়ার বিরুদ্ধে কেউ কখনো ফতোয়া দেন নাই (স্যার পি-সি রায় ছাড়া); তবু চায়ের মহিমা কীর্তনে কেউ কেউ কবিতা লিখতেন। যেমন :

যব দুনিয়া মে চায়ে না থী
তো হালে জাহা কুছ আওর থা
তনমে জান থী
জানমে দিল না থা
বালি হ্যায় চায়ে
উছকি রং হ্যায় পিলে,
মায় তো পি লিয়া
পিয়ালে তু পি লে।

জীবনের বিশ বছর কাল এমনি ভাবে চৌধুরী সাহেবের ছোহবতে কেটে গেছে। আজ তিনি বহু দূরে আছেন। আজো চায়ের সময় তাঁর কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তিনিও কি তার সুদূরের আবাস হতে তারার দুরবীন ধরে আমাদের সে মজলিসের পানে কখনো করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করে থাকেন?

জমিদার বাড়ীর বাংলায় আমরা কিছু দিন ছিলাম। বাংলোর সামনের নীম গাছ তলে সন্ধ্যার পর বসতাম। কত হাসি, কত গল্প, চায়ের পেয়ালায় কত জলতরঙ্গ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উকি দিত, তারারা তা নিমিখ চেয়ে থাকত। সে বাংলো, সে গাছ, সে চাঁদ, সে তারা সবই আছে, শুধু আমরা আজ সেখানে নাই।

আহছান উল্লা

মৌলভী আহ ছানউল্লা—স্কুলের দ্বিতীয় মৌলভী—বাড়ী নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। ধীর, জ্ঞান-পিপাসু, ধর্মভীরু, নীরবকর্মী। বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ইছলাম সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা করেছি—তর্ক, গোশ্বা, ঝগড়া, সব হয়েছে; আবার আমরা শান্ত মনে আলোচনায় বসেছি। 'হীরকহার' বইখানির উপকরণ খুঁজে বের করলেন তিনি, তাতে ভাষা দিলাম আমি। বইখানির স্বত্ব স্বামীত্ব তাঁকেই দিয়েছিলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর ধরে মেহনত করে লিখলাম 'ইছলাম সোপান'—আমাদের প্রকাশকগণকে ধন্যবাদ, তাঁরা অনেকে তার প্রকাশভার নিয়ে পরে সরে পড়েছেন : কারণ ওতে পয়সা কামাইর সম্ভাবনা কম। তাঁর রচিত গান—'তোমহারা ছুরুজ ডুব ডুবু হ্যায়, তভী তোমহারা খবর নাহি হ্যায়'—খিলাফত আন্দোলনকালে বহু সভায় গীত হয়েছে।

আহছান উল্লা সাহেব বাজার করতে জানতেন, বাবুর্চী খাটাতে পারতেন, দরকার মত নিজে চুলার পারে বসে যেতেন। তিনি অনেক বছর আমাদের সঙ্গে এক মেসে খেতেন। আমি খাওয়ার জিনিষ যোগাড় সম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন, অথচ ভাল খাবার সামনে এসে পড়লে তখন আমার উৎসাহের অভাব সম্বন্ধে আমার শত্রুরাও কখনো নিন্দা করে না। আমার স্ত্রী বাসায় আসার আগে চৌধুরী সাহেব ও মৌলভী সাহেব আমার স্বাস্থ্য ও খাওয়ার যে যত্ন নিয়েছেন, তাতে মনে হয়, তাঁরা আমার কাছে না থাকলে আমি নির্ঘাত মরে যেতাম। মৌলভী সাহেব করটীয়া হতে অবসর নিয়ে এখন বাড়ী আছেন।

সতীশ কাব্যতীর্থ

স্কুলের তৃতীয় বন্ধু ছিলেন পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র কাব্য তীর্থ—বাড়ী খুলনা জিলার শ্রীফলতলী গ্রামে। মার্জিত রুচি, উদার মন, ধর্মে নিষ্ঠাবান, কাব্যরসিক, বন্ধুবৎসল—তিনি হাসতে জানতেন, অন্যকে হাসাতে জানতেন। সমস্ত করটীয়ায় তখন ঐ এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে নিয়ে বসে আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা চলত। তিনি সওগাত, নওরোজ ইত্যাদি কাগজ সানন্দে পড়তেন। একদিন সকালে বাসায় বসে আছি, হঠাৎ পণ্ডিত মশাই একখানা মাসিকপত্র হাতে নিয়ে এসে হাজির। উল্লাসে ডগমগ তাঁর চেহারা। বল্লেন—

'দেখুন, স্যার, দেখুন, একটা অদ্ভুত সুন্দর কবিতা বের হয়েছে—'শাতিল আরব'। আচ্ছা, ধুমকেতুর মত উদিত হল এ-লেখকটি কে?

কবিতাটি পড়লাম। আমারো মন উল্লাসে নেচে উঠল; পরম ব্যাথার সঙ্গে শেষ লাইন কানে বার বার বাজতে লাগল—

শহীদের দেশ! বিদায়—বিদায়!......

মন আরো খুশী হল পণ্ডিত মশাইর আনন্দ দেখে। ভাবলাম, আমাদের দ্বন্দপরায়ণ দুই সমাজের মনের মিলন শেষ পর্যন্ত হয় তো আমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হবে।

আরো একদিন তিনি অমনি উল্লাস-আবেগে এসে হাজির। বল্লেন—'আচ্ছা, খেয়া-পারের তরণী' পড়েছেন কি?' বল্লাম—'পড়েছি'। উনি বল্লেন—

'কাণ্ডারী এ-তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা;
দাড়ী মুখে সারি গান 'লা-শরীক আল্লা।'

ওহ! মুছলমানী শব্দ দিয়ে যে এত সুন্দর কবিতা হতে পারে, তা এতদিন আমাদেরে শুনান নাই কেন?

দেখলাম, যে দুটি লাইন আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লেগেছে, তাঁর কাছেও তাই সব চেয়ে ভাল লেগেছে।

করটীয়ায় অনেক দিন চাকরী করে তিনি গাঁয়ের হাই স্কুলে পণ্ডিতি করতে গেলেন—চোখের জলে বিদায়পথ সিক্ত করে। অনেক বছর পর আমি যখন ঢাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, তখন তাঁকে বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত করলাম। তিনি কাগজ নিতে ঢাকায় এসেছিলেন। এসেই পড়েন কলেরায় এবং সেই দিনই মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁর ছেলে আমাকে পত্র লিখে জানাল—'বাবা পরম আগ্রহ নিয়ে ঢাকা গিয়েছিলেন—কাগজ আনবার জন্য তত নয়, যত আপনার সঙ্গে দেখা করবার। তাঁর আকস্মিক বিয়োগে আমরা অধীর, আপনার সঙ্গে যে শেষ দেখাটুকু হয় নাই, সে জন্য আমরা মর্মান্তিক ব্যথিত।'

ছেলেকে উত্তরে লিখলাম—

'এই বিশ্বে সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে গভীর ক্রন্দন—

'যেতে নাহি দিব—যেতে নাহি দিব।
হায় তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

কৈলাস পণ্ডিত

স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন কৈলাস চন্দ্র দে সরকার—বাড়ী টাঙ্গাইলের পশ্চিমে চাড়াবাড়ী—সে কালের ছাত্রবৃত্তি ও নর্মাল পাশ—বয়স পঞ্চাশের উপর—সাদাসিধা দিল খোলাসা মানুষ। টিফিনের সময় মাষ্টারদের মন একটু হালকা করার দরকার হলে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কৈলাস পণ্ডিতকে ঘিরে বসতেন। 'সদ্ভাব শতক' আর 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' অনেকখানি তাঁর মুখস্থ ছিল। এদুটির চেয়ে ভাল বই যে বাংলা ভাষায় হতে পারে এটা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। মাষ্টারদের মধ্যে একজন ছিলেন মদন বাবু, অন্য জন কেষ্ট বাবু—দুজনই দুষ্টু বুদ্ধিতে পাকা; সতীশ পণ্ডিত ছিলেন এ-বিদ্যায় সবার ওস্তাদ। তাঁরা এই ধরনের আলাপ শুরু করতেন।

মদন বাবু—'আচ্ছা, কেষ্ট বাবু, রবি ঠাকুর নাকি 'গীতাঞ্জলী' নামে ভারী সুন্দর একটা বই লিখে ফেলেছেন?

কেষ্ট বাবু—'নিশ্চয়। অমন বই বাংলা ভাষায় আর কখনো হয় নাই।

সতীশ পণ্ডিত—সদ্ভাব শতক, মেঘনাদ বধ কাব্য নাকি সে বইয়ের কাছে কিছুই নয়?

কৈলাস পণ্ডিত—'দেখুন মশাইয়ের দল, অনধিকার চর্চা করবেন না, বলে রাখছি। কথায় বলে—

মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফারসী পড়ে তাঁতী।

বলি কেউ ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছেন? না কেউ ত্রৈবার্ষিক নর্মাল পাশ করেছেন যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অত বড় বড় কথা বলছেন?

মদন বাবু—কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের এমন কি বাহাদুরী, শুনি?

কৈলাস পণ্ডিত—শুনুন তবে মেঘনাদ বধের একটা লাইন—

গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,

এখন বলুন, গীতাঞ্জলীর কোথাও অমন একটা লাইন আছে?

কেষ্ট বাবু—রাম—রাম—রাম, অবশেষে কাব্যে কাদম্বিনীর নাদার আমদানী হল? গরুর নাদা যথেষ্ট হল না?

কৈলাস পণ্ডিত—(সগর্বে) যেমন মুখ্য, তেমন কথা। বলি, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিতে গেলে এই রকমই হয়। শুনুন তবে ও লাইনের ব্যাখ্যা……।

পণ্ডিত মশাইর সুন্দর লম্বা দাড়ি ছিল। একবার ইন্সপেক্টর এলেন। পরিদর্শনের দিন দেখি, ও আল্লাহ! পণ্ডিত মশাইর দাড়ি গোঁফ একদম ছাফফ'ন ছাফফা। পরে কারণ শুনলাম। আগের দিন সতীশ পণ্ডিত গিয়ে কানে কানে পরামর্শ দিয়েছেন—'এতগুলি পাকা দাড়ি নিয়ে স্কুলে গেলে বুড়ো বলে ইন্সপেক্টর মাষ্টারী থেকে নাম কেটে দিবেন। তার চেয়ে বরং ওদিন অনুপস্থিত থাকুন। মদন বাবু গিয়ে বলেছেন—'ওঁ হোঁ, সতীশ পণ্ডিতের মত আপনার শত্রু কেউ আছে? তাঁর পরামর্শ শুনলে মরবেন। গরহাজির মাষ্টারকে এ-ইন্সপেক্টর দুই চক্ষে দেখতে পারেন না। স্কুলে যেতেই হবে—তবে দাড়িতে খেজাব দিয়ে যান।' কেষ্ট বাবু গিয়ে বলেছেন—এত তাড়াতাড়ি খেজাব আর কোথায় পাবেন? তার বদলে দাড়ি গোঁফে আলকাতরা মেখে নিন।' সতীশ পণ্ডিত গিয়ে বলেছেন—'হায় হায় করেছেন কি? সকালে দাড়ি গোঁফ চেঁছে ফেলুন, নইলে ইন্সপেক্টর সাহেব টের পেলে পাগল ঠাওরাবেন।'

এমন চক্রে পড়লে স্বয়ং ভগবানও ভূত হয়ে যান, বেচারা পণ্ডিত মশাইর দোষ কি?

আর একদিনের কথা। হিন্দু হোষ্টেল। রাত এগারটা, বাইরে আমাবস্যার অন্ধকার। সবাই শোয়ার জোগার করছেন। হঠাৎ সতীশ পণ্ডিতের মাথায় কীড়া মোচড় দিয়ে উঠল। বল্লেন—

'আচ্ছা, কৈলাস বাবু, বাংলা দেশের কায়স্থরা তো বুঝি সবাই শূদ্র?'

'কখখনো না—কখখনো না—কখখনো না…

'তবে বৈশ্য ?'

তাও নয়, তারা ক্ষত্রিয়, ঠাকুর, তারা ক্ষত্রিয়—সেকালে বামুনেরা যাদের বাড়ীর চাল-কলা খেয়ে বাঁচত।

'কিন্তু কৈ, আমাদের এ নকল ক্ষত্রিয়দের সাহস বলের কোন পরিচয় তো পাইনা ?'

'আসুন না, এখনই পাছাড় ধরি—ক্ষত্রিয়ের শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'রাম-রাম-রাম, অবশেষে চাল-কলা খাওয়া বামুনের সাথে ক্ষত্রিয়ের শক্তি পরীক্ষা ? তার চেয়ে সাহস যদি থাকে তবে এখনি গিয়ে ম্যানেজার সাহেবের বাদাম গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে আসুন, কাল সমস্ত স্কুলে একটা নাম পড়ে যাবে।

'বেশ, তাই হবে, এই চল্লাম।'

সেই অন্ধকারের মধ্যে পণ্ডিত মশাই হন হন করে চল্লেন। মস্ত বড় বাদাম গাছ ; তার নীচে নাগালের মধ্যে ডাল পালা কিছুই নাই ; উপরে বাদাম নিয়ে বাদুড়েরা দাপাদাপি করছে। তারই মধ্যে পণ্ডিত মশাই গাছে উঠে ডাল একটা ভেঙ্গে নিয়ে হোষ্টেলে হাজির।'

'এই দেখুন মশাই, ক্ষত্রিয়ের সাহস আছে কিনা।'

'কিন্তু একি কৈলাশ বাবু ? বাদামের ডাল না এনে জামের ডাল এনেছেন কেন ?'

'এইবার কিন্তু চোখে একটা খোঁচা দিব।'

'আচ্ছা, মতি বাবুকে সাক্ষী মানি। মতি বাবু—ও মতি বাবু আসুন তো দেখি—বলুন তো এ কিসের ডাল ?

'বাঃরে ! এটাতো পরিষ্কার জামের ডাল।'

'পণ্ডিত মশাই রেগে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন : বিড় বিড় করে বল্লেন—'সব শিয়ালের এক রা—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।'

পরদিন ভোরে উঠে সতীশ পণ্ডিত এদিক ওদিক ঘুরা ফিরা করে এলেন। ফলে একে একে দর্শক আসতে শুরু করল। যে আসে সেই দরজায় পা দিয়েই বলে—একি পণ্ডিত মশাই, বিছানার পাশে জামের ডাল কেন ? পণ্ডিত মশাই রাগে কটমটিয়ে চান ; দাঁত কিড়মিড় করে কি যেন বলেন—তার একটা শব্দের কিছু শোনা যায়—শা…

পণ্ডিত মশাইর বাড়ীর কাছে সন্তোষ জমিদারবাড়ী ; মহারাজা মন্মথ নাথ রায় চৌধুরীর জন্ম স্থান। জমিদার বাড়ীর বালিকা স্কুলে পণ্ডিতের পদ খালি হল। কৈলাস বাবু সেইখানে চলে গেলেন।

বছর তিনেক পর হঠাৎ পণ্ডিত মশাই আমার কাছে এসে হাজির।

বল্লেন—

'স্যার আমাকে আবার করটীয়া স্কুলে নিয়ে নিন।'

'বাড়ীর কাছে স্কুল, এই বয়সে ছেড়ে আসতে চান ?

'একান্ত মনে চাই, স্যার।

'মায়না পাওয়ায় গোলমাল আছে ?

'কিছু না। ঠিক নিয়ম মত মায়না পাই।

'গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন ?

'না, স্যার। আসলে ওখানে অনেক অসুবিধা আছে।

'দুই একটা বলুনা, শুনি।

'মেয়েদের স্কুলে আর পড়াতে চাই না।

'কেন, পণ্ডিত মশাই ? মেয়েরা তো নিতান্ত শান্ত শিষ্ট জীব ?

'মেয়েদের শান্ত শিষ্ট জীব বলছেন, স্যার ? ওদের মত বেহদ্দ দুষ্টু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই। মুনি ঋষিরা পর্য্যন্ত ওদের উপর রুষ্ট, নইলে বাগান নষ্ট করার জন্য ঋষি প্রবর ওদেরে বেঁধে রাখবেন কেন ? আর ওদের উপকার করতে গিয়ে মহারাজা হরিশ্চন্দ্রই বা এত বিপদে পড়বেন কেন ?

'তা কড়া শাসন করবেন। আপনার ডরে তো এখানকার ছেলেরা কাঁপত !

'শাসন করতে পারলে তো হতই, স্যার। কিন্তু তার উপায় নাই।

'কেন বলুন তো ?

'চড় থাপড় দিতে পারবনা। কানের কাছে হাতটা পর্য্যন্ত নিতে পারবনা। দূর হতে একটা বেত মারতে পারবনা ; এমন কি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাতে পারবনা। এবম্বিধ প্রতিবন্ধক থাকলে ছেলেমেয়ের সুশিক্ষা হয় ?

'সে তো হওয়া কঠিনই দেখছি।'

'সেদিন একটা মেয়েকে দুই ধমক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। মায়ের আদরে মেয়ে। তিনি কেঁদে কাপড় ভাসিয়ে বাড়ী গেলেন। একটু পরেই দেখি—ও মা ! মেয়ের মা কোমরে আঁচল বেঁধে এসে হাজির।

'হাতে খোচানী ছিল তো ?

'না, স্যার। হাত খালি ; কিন্তু যেন ঘটোৎকচের আপন মায়ের পেটের বোন !

'আপনি বুঝি তখন নির্ভয়ে সরে পড়লেন ?

'তা সরে পড়ব কেন স্যার ? আমি ক্ষত্রিয় সুত নই ? কিন্তু তাই বলে স্যার…

'তাই বলে কি, পণ্ডিত মশাই ?

'তাই বলে, এই ধরুন, নিজের গিন্নীকে বাড়ীতে বসে যেমন ভাবে উপযুক্ত শাসন করি, পরের ঘরের বৌকে, স্যার এই ধরুন তেমন শাসন করা তো আর চলেনা।

'তাই তো চলেই না।

তাই অগত্যা নরম হয়ে তাঁকে অনেক বলে কয়ে মাফ

চেয়ে মুক্তি নিয়ে নিলাম। কিন্তু তখনি মনে মনে পণ করলাম—'আর মেয়েদের স্কুলে কাজ করবনা।'

মীর সাহেব ও খোন্দকার সাহেব

করটিয়ার পাশের গাঁ করাতী পাড়া। করাতী পাড়ায় করাতী নাই, আছেন মীর সাহেবেরা। এঁরা সুপরিচিত ভদ্র লোক। এঁদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পীর ছিলেন; তখনো কেউ কেউ মুরীদ বাড়ী যেতেন। তবে আয়েসের গর্দিশে ও ব্যবসাটা বে-ওফা হয়ে পড়ায় মীর সাহেবদের অনেকেই তখন অন্য পেশা গ্রহণ করে ছিলেন। এই বংশের মীর মোতাহার হোসেন ওরফে মানিক মিঞা সাহেব জমিদার বাড়ীতে মোখতারী করতেন। বাড়ী ফিরার পথে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে বিকালে চায়ের শরীক হতেন। ভদ্রলোক দুরন্ত গইপ্পা ছিলেন। অমন কোন একটা কিছু অস্বাভাবিক গুণযুক্ত মানুষকে আমার বরাবরই ভাল লাগে। লম্বা চওড়া জোয়ান বুলন্দ আওয়াজ, কথার শক্ত গাঁথুনি—হাত তুলিয়ে যখন তিনি কিছু রেওয়ায়েত শুরু করতেন, তখন পাশ দিয়ে যেতে কেউ না দাঁড়িয়ে পারতোনা। তাঁর জঙ্গলে শিয়াল বান্দর, খরগোস ছিল না, ছিল কেবল বাঘ সিংহ, ভল্লুক, গণ্ডার। তাঁর সমাজে ধোপা, নাপিত, কৃষক শ্রমিক ছিলনা, ছিল কেবল লাঠিয়াল, জমিদার, চর দখল, হাই কোর্ট পর্যন্ত মামলা।

এই সময় আমাদের সঙ্গে এক মেসে খেতেন ডাক্তার ছাদত আলী। বাড়ী বগুড়া, আমাদের প্রায় সমবয়সী; স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। হাস্যরসিক, সাহিত্যদরদী, দরাজ দিল, সদালাপী—বংশে খোন্দকার। মীর আর খোন্দকার মাঝে মাঝে কাঠে কুড়ালে লেগে যেত: দুই জনই পীর খান্দানের মানুষ, এই-ই ছিল প্রধান কারণ।

একদিন খোন্দকার সাহেব রেগে মীর সাহেবকে বল্লেন: 'আরে ভাই আগে কি ছিলেন তা তো জানে আলিমুল গায়েব, তার পর হলেন পীর, কিছু দিন পর হলেন মীর, এখন হতে চলেছেন ছৈয়দ। এত যে র‍্যাপিড প্রমোশন, গুনটা কি আছে শুনি? আমরা একটুখানি প্রমাদ গণলাম: আজ বা এঁদের দুজনে সত্যি মনান্তর ঘটে। এতদিন দুজনে মাঝে মাঝে তর্ক শুরু হলেও তা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নাই; কারণ মীর সাহেবের বুলন্দ আওয়াজ, বিরাট দেহ আর বিপুল হস্তের সবল আন্দোলনের আড়ালে খোন্দকার সাহেবের ছোট্ট শরীর আর মিহি সুর যে কোথায় হারিয়ে যেত তা আর পরে টের পাওয়া যেতনা। আজ কিন্তু খোন্দকার সাহেব নাছোড় বান্দা হয়ে উঠেছেন।

মীর সাহেব রাগত স্বরে জবাব দিলেন:

'গুণের কথা শুনতে চান না দেখতে চান, খোন্দকার সাহেব?

'একটু দেখতে পেলে তো ধন্যি হয়ে যাই।

'তা হলে একটা গাছে গিয়ে উঠে বসুন; আমি মাত্র একটি ডাক দিব, সেই এক ডাকেই আপনাকে নেমে আসতে হবে।

'বেশ, চড়ব আমি গাছে। নামান দেখি আমাকে এক ডাকে। আজ খোন্দকার আর মীরের শক্তির একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক।

খোন্দকার সাহেব উঠলেন। তখন রাত আটটা। বাইরে বিষম অন্ধকার। আমরা লণ্ঠন নিয়ে চল্লাম। খোন্দকার সাহেব কি দোওয়া পড়তে পড়তে একটা কাঁঠাল গাছে উঠলেন এবং দুইটি মোটা ডালের ফাঁকে মজবুত হয়ে বসে দুই হাতে একটি ডাল জোরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, যাতে মীর সাহেবের দোওয়ার জোরে তিনি কাবু না হন। মীর সাহেব তখন স্বরে অপরিসীম গাম্ভীর্য আমদানী করে বল্লেন:

'খোন্দকার সাহেব, নেমে আসুন।'

খোন্দকার সাহেব আরো জোরে ডাল চেপে ধরে বসে রইলেন। মিনিট দুই আমরা চুপচাপ; কিন্তু কৈ, খোন্দকার সাহেব নেমে আসার মত লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। আমি বল্লাম কৈ, মীর সাব, এক ডাকের তো কোন বরকত দেখিনা?

'দেখবেন, একটু সবুর করুন। ততক্ষণ বরং চলুন, আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

'উনি যে গাছে রইলেন?

'তা উনি কি আর চিরদিন গাছে থাকতে পারবেন? একবার ওঁকে নামতেই হবে: তা ওঁর সুবিধা মত সময়ে উনি নেমে আসবেন। তবে আমি আর ওঁকে দ্বিতীয়বার ডাকবনা, সে ঠিক।

আমরা হেসে উঠলাম। খোন্দকার সাহেব দাঁত কিড়মিড় করে বল্লেন: 'শয়তান, এই দোওয়ার বরকত নিয়ে মুরীদ চরিয়ে খাও'।

আমরা চল্লাম। খোন্দকার সাহেব চীৎকার করে বল্লেন—'আরে ধীরে, এই আমি নেমে আসছি'।

স্কুলের বাইরে আরো অনেকটি বন্ধু পেলাম। এঁরা জমিদার বাড়ীর সঙ্গে নানা কাজে জড়িত ছিলেন।

পাদ্রী সাব

পাদ্রী সাবের কথা ভুলবার নয়: স্বল্পভাষী, দৃঢ় সংকল্প উন্নতমনা, বন্ধু বৎসল, ইনি বহু বিপরীত গুণের একটা অপূর্ব সংমিশ্রন ছিলেন। কোন কোন নদীর মধ্য পথে

আর একটা নদী এসে যোগ দেয়। তখন দুই নদীর তরঙ্গ যেখানে এসে মুখোমুখি হয়, সেখানে একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয়: দুই ধারার ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে নতুন ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ে। সে ঢেউ এ-পাশের ঢেউয়ের চেয়ে বড়, দেখতেও ভাল—মাথার উপরে তার ফেনার মুকুট; কিন্তু সে ঢেউয়ের গতি নাই। পাদ্রী সাবকে দেখে এই ঢেউয়ের কথা মনে পড়ত। স্পষ্টই বোঝা যেত যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে তাঁর প্রথম যৌবনকালে এদেশে যে তীব্র সংঘাত বর্তমান ছিল, তিনি সেই সংঘাতের ফল। তাঁর মধ্যে উভয় সংস্কৃতির প্রভাবই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এ দুইয়ের সংহতি অথবা এ-দুইয়ের কোন একটি সংস্কৃতিই তাঁর চরিত্রে আদর্শবাদীতার জোশ বা জোর সৃষ্টি করতে পারে নাই। অথচ তাঁর মধ্যে আকর্ষণের বস্তু ছিল প্রচুর। তিনি পাদ্রী সাহেব; অথচ তিনি পাদ্রী ছিলেন না, সাহেবও ছিলেন না; ছিলেন তিনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাইপার গাঁয়ের আবদুর রশীদ চৌধুরী। তাঁর প্রথম যৌবনে মফস্বল টাউনে এল হ্যাট কোট। মৌলভী মুন্শী সাবরা তখন মুছলমানের গায় কোট প্যান্ট দেখলে আগুন।

যুবক আবদুর রশীদ সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কোট, প্যান্ট, হ্যাট ব্যবহার শুরু করে দিলেন; নাম হল তাঁর পাদ্রী সাব। তিনি ছিলেন চাঁদ মিঞা সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী, অথচ দুই জনে আলাপ-প্রলাপ, তর্ক ও বিতর্ক উভয়ই চলত সমানে সমানে। লোকে বলত: চাঁদ মিঞা সাহেব বোধহয় তাঁর জীবনে এই একটি লোককেই খাতির করে চল্লেন। পাদ্রী সাব ইংরেজী লেখাপড়া অত্যন্ত পছন্দ করতেন; কিন্তু কার্যকালে ইংরেজী শিক্ষিতদের চেয়ে আলেমের ইজ্জত বেশী করতেন। তাঁর চাকরদের মধ্যে কারো পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিলনা; ত্রুটি পেলে এমনি বেতের শাপাং-শাপ। কিন্তু তাঁর সামনে অন্য কোন মনিব তার চাকর বা প্রজার উপর জুলুম করবে, এর উপায় ছিল না। সমান পদের মানুষ না হলে তিনি তাদের সাথে কথা কওয়াই পছন্দ করতেন না; অথচ বিচারের সময় তিনি বরাবরই দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করতেন। জমিদারদের তরফ হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যাতে কোন রকমেই অন্যায় হস্তক্ষেপ না হয় সে-দিকে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত ছিল।

পাদ্রী সাব বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। বনশী শিকার, বন্দুক শিকার, কুকুর পালন, মুরগীর চাষ, বাগান তৈরী, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার যে কেউ আসুক, তার জন্য ফরাসী নিয়মে নির্ভুল খানার মেনু তৈয়ার ও আদব-কায়দা রক্ষা করা—এসব বিষয়ে সমস্ত মহকুমায় তাঁর জুড়ী কেউ ছিলনা।

একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা

একটা তহশীলদারের বিরুদ্ধে নালিশ ছিল; চাঁদ মিঞা সাহেব তারই বিচার করে দিলেন। তিনি যতক্ষণ তর্জন-গর্জন করলেন, ততক্ষণ পাদ্রী সাহেব অন্যদিকে চেয়ে রইলেন,—এমনভাবে চেয়ে থাকা ছিল তাঁর রাগের লক্ষণ। বিচার অন্তে তহশীলদার চলে গেল। পাদ্রী সাহেব ফিরে বসলেন। বল্লেন:

'এই লোকটার উপর এত তর্জন-গর্জন কেন করলেন, শুনি?

'শুনলেন না নায়েবের নালিশ?

'লোকটা বদমায়েশ; তহবীল ভেঙ্গে খেয়েছে।

'খায় নাই; ছেলের চিকিৎসা করেছে।

'কিন্তু আমার টাকা ভেঙ্গে চিকিৎসা কেন?

'চাকরী করে আপনার, টাকা ভাঙ্গতে যাবে কার?

'টাকা ভাঙ্গবে কেন?

'ভাঙ্গবে না তো টাকা ঘরে রেখে অচিকিৎসায় ছেলে মারবে?

'অতসব তর্ক বুঝিনা। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

'তহশীলদারের মোকাবিলা আমাকে বেয়াদবী করতে বলছিলেন, না কি?

'ও আহমদ মিঞা, ও ব্যাটারে পরামিশ দাও গিয়ে, কাল সকালে এসে আমার কাছে থেকে জরিমানাটা যেন মাফ নিয়ে নেয়।... এখন মনটা খুশী হল তো?

'আপনার প্রজার ভাঙ্গামন জোড়া দিয়ে আপনি ছওয়াব হাছেল করছেন, তাতে আমার খুশী হওয়ার কি আছে?

'আপনিও একটু ভাগ যেন নিন।...ও শমসের আরে জলদী নিয়ে আয় আমের মোরব্বা ডজন খানেক; পাদ্রী সাবের গলা শুকিয়ে গেছে।

'আমার জন্য আনলে কিছু আমলকীর মোরব্বা না হয় সঙ্গে আসুক।

মৌলভী আবদুল খালেক

মৌলভী আবদুল খালেক, বাড়ী বর্ধমান, শরীফ ঘরের সন্তান, শরীয়তের অত্যন্ত পা-বন্দ, লেবাছ হামেশাই মুছলমানী, লম্বা জোয়ান, লম্বা ঘন দাড়ি, হারাম-হালাল সম্বন্ধে অত্যন্ত হুশিয়ার, আগে ময়মনসিংহ ওকালতী করতেন, পরে করটীয়া বড় তরফের ম্যানেজার হয়ে আসেন। বাসার লাগ বাজার, অথচ তিনি কোন দিন বাজারে যেতেন না, কি জানি মাঝি যদি তাঁকে দেখে খাতির করে মাছের দাম কম নেয়। মেজাজ কখনো গরম কখনো নরম। কোন দিন রাগের মুহূর্তে কোন পিয়াদা বরকন্দাজকে হয়তো থাপ্পড় দিয়ে বসতেন। কিন্তু

তারপর আর সুস্থির মনে কাজ করতে পারতেন না; বাসায় চলে আসতেন, যে পিয়াদা বরকন্দাজকে ডাকিয়ে এনে তার কাছ থেকে মাফ নিতেন, তাকে দুই এক টাকা বখশীশ দিয়ে বিদায় করতেন, তারপর তাঁর নিজের গোছল খাওয়ার কথা আসত। তিনি আমার প্রায় পিতার বয়সী ছিলেন; অথচ কি অন্তরঙ্গ ভাবেই না মিশতেন। তাঁর সম্পর্কিত অনেক ছোট ছোট ঘটনা আজো মনে পড়ে।

করটীয়ায় বার্ষিক পুণ্যাহ—মহা ধুমধাম। ম্যানেজার সাহেব কাছারী হতে বাসায় ফিরছেন, আমি হঠাৎ তাঁর সাথ নিয়েছি। বাজার গরম। তারই মাঝখান দিয়ে পথ। একটা ছেঁড়া কাপড় পরা লোক এসে সেলাম দিয়ে বল্ল—

'দোহাই আল্লার, হুজুর বিচারের মালিক, আমার মুরগীর দাম না দিয়ে আজ যেতে পারবেন না?

'কে কবে তোর কাছ থেকে মুরগী নিয়েছে রে?

'হুজুর নিয়েছেন: এক বছর তিন মাস দশ দিন আগে, বাকী, একদম বাকী।

'বলিস কি রে? আমি তো কখনো হাট-বাজারে যাই না তুই ভুল করেছিস, বাবা। এখন পথ ছাড়, যেতে দে।

'হুজুর ভুলে গেছেন। আমার আণ্ডা পাড়া মুরগী ছিল; অমন মুরগী খেয়ে মানুষ সব ভুলেই যায়।

'ব্যাটা, বলে কিরে? বরকন্দাজ?

'হুজুর আমি বহুরূপী: এখন একটা বখশীশ চাই।

'(হেসে) ব্যাটা তা আগে বলতে হয়। আয়, বাবা, সাথে বাসায় আয়।

রাত দশটা। এতক্ষণ পড়াশুনা করে শোব শোব করছি; এমন সময় ম্যানেজার সাহেব এসে হাজির, বল্লেন—

'চলুন হেডমাষ্টার সাহেব, একটু যাত্রাগান শুনে আসি।

'মাফ চাই; আমার যাওয়ার ইচ্ছা নাই।

'গুনা হবে এই জন্য তো?

'ঠিক তা নয়। রাত জাগলে আমার কষ্ট হয়, এই জন্য।

'আচ্ছা চলুন আমরা একঘণ্টার মধ্যেই চলে আসব। আমারো যাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না; স্বয়ং চাঁদ মিঞা সাহেব বাসায় গিয়ে বল্লেন কিনা, তাই। একটু কথা রক্ষা।

চল্লাম। গান শুরু হল। এক ঘণ্টা যায়। ম্যানেজার সাহেব তন্ময়। হাঁটুতে চিমটি কাটি। টের পান; কিন্তু মুখের দিকে তাকান না। আরো এক ঘণ্টা যায়; তবু উঠবার নাম নাই। কানের কাছে গিয়ে বল্লাম—এবার চলুন।

তিনি বল্লেন—'আরে ভাই, সকালে তো তওবা করতেই হবে, তা আর এত অল্প শুনে কেন? চল পালাটা খতম করেই বাসায় ফিরি।

আরো এক দিনের ব্যাপার

ম্যানেজার সাহেব ও আমি কলকাতা চলেছি। পোড়াবাড়ী ষ্টিমার ষ্টেশন। ফ্ল্যাট হতে সারেং আমাদের দুজনের জন্য দুটি চেয়ার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই পেতে নদীর পারে বসে আছি। ম্যানেজার সাহেব বিলাতী সাহেব দেখতে পারতেন না। তাই সিগারেট না খেয়ে বিড়ি খেতেন। তিনি একটা বিড়ি খেয়ে ফেলে দিলেন। বাকী অংশটা একটা ছোকরা এসে তুলে নিল। টেনে টুনে দেখল আগুন নিভে গেছে। ম্যানেজার সাহেব দেখলেন: কয়লার মত কালো, গায় কাদা মাখা, সম্পূর্ণ ন্যাংটা কোথাকার এক ছোকরা চোখে মিনতি নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানো। তিনি আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন—

'আগুন নিভে গেছে রে?

'হ। নিভেই তো গেছে; আগুন থাকতে কি তোমরা বিড়ি ছাড়?

'আগুন ধরিয়ে দিব?

'দেওনা কেন্?

'আচ্ছা এগিয়ে আয়।

আটীয়া পরগণার সুবা চাঁদ মিঞা সাহেবের প্রতাপান্বিত ম্যানেজার মাথায় সুন্দর রুমী টুপী, গায় অত্যন্ত দামী পোষাক, পাল্কী ছাড়া দশ কদম চলেনা—সেই ব্যক্তি অতি যত্নে দুই হাতের তালুতে ছাপিয়ে রেখে দিয়াশলাইর কাঠি দিয়ে সেই পোড়া বিড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। জাহাজের সারেং, খালাসী, পাড়ের দোকানদার, ঘাটে বসা যাত্রীদল সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ছোকরা বিড়ি টানতে টানতে মন্তব্য করলেন 'বুইড়া মানুষ অইলি কি অব? বিড়িতে আগুন দেওন হিখে নাই। আমার মুখটা পুইড়া দিয়ন নইছিল আর কি!'

ছৈয়দ সাহেব

নাম ছিল তাঁর ছৈয়দ বদরদ্দোজা ওরফে মাখ্‌থন মিঞা; সবাই জানত তাকে ছৈয়দ সাহেব বলে। বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফারছী, উর্দু সবই জানতেন কিছু কিছু। কিন্তু কি অতৃপ্ত ছিল তাঁর জ্ঞানের পিপাসা, শিক্ষিতের উপর কি বিপুল ছিল তাঁর শ্রদ্ধা আর শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি আকুল ছিল তাঁর আগ্রহ! হাই স্কুল,

হাই মাদ্রাসা, কলেজ—এ সবের স্থাপন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাঁর কাছে থেকে যে সদরদ সহযোগিতা, যে আপ্রাণ সাহায্য পেয়েছি, এক চাঁদ মিঞা সাহেব ছাড়া আর কারো একার কাছে থেকে তার অধিক পাই নাই। কত রাত স্কুলের ধারে পুকুর পারে বসেছি; স্কুল, মাদ্রাছা, কলেজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছি; আমাদের আলাপ শুনেছে তখন বনের ঝিল্লী আর আকাশের তারারা; নবমীর চাঁদ নীল সাগর নীরবে পাড়ি দিয়ে চলেছে আর চলেছে; একটা উল্কা হয় তো হঠাৎ আকাশের বুক চিরে তীরের মত ছুটেছে; ছৈয়দ সাহেবের বাড়ীর চাকর লাঠী আর বাতি হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; পাশের গাঁয়ের কুকুরটা চীৎকার করে করে এখন থেমে গেছে; ঘুম বার বার আমাদের চোখের পানে তাকিয়ে দুর হতেই নিরাশ হৃদয়ে উধাও হয়েছে; আমাদের সে স্বপনের কাহিনী তবু শেষ হয় নাই। তারপর অনেক দিন সকাল বেলায় দুইজনে মিলে কাজ শুরু করেছি। দুইজনে একখানে দাঁড়িয়ে বোর্ডিং ঘরের খাম গাড়িয়েছি, দুই জনে এক নৌকায় চড়ে গাঁয় গাঁয় ঘুরে ছেলেদের জন্য জায়গীর করেছি; দুই জন এক সঙ্গে চাঁদ মিঞা সাহেবের দরবারে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছি, নতুন নতুন স্বপনের মাথায় তাঁর মনকে উতলা করে তুলেছি। অমন সুন্দর চেহারা, রহম দিল, অমন নরম মেজাজ, অমন মোলায়েম ব্যবহার সমস্ত করটীয়া ও তার আশেপাশে আর একজনেরও ছিলনা।

বাসায় একদিন আমার একটি শিশু ছেলে মারা গেল। খবর শুনা মাত্র ছৈয়দ সাহেবের মামু মামু মিঞা সাহেব এসে বল্লেন: ছেলেটিকে আমরা চাই। মাখ্‌খন মিঞা তার পারিবারিক গোরস্থানে নিজ ছেলের পাশে ওকে শুইয়ে রাখবে। একটু পরই ছৈয়দ সাহেবের বিবি এক পাল্কীতে চড়ে এসে হাজির। আমার স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে কাঁদলেন তারপর চোখের পানি মুছে কোমরে আঁচল বেঁধে শিশুটির ধোয়ানের কাজে লেগে গেলেন। আর একটু পরই ছৈয়দ সাহেব নিজে এসে হাজির। তাঁর হাতে নতুন কাপড়, সাথে লাশ নেওয়ার মানুষ। কাফন দিয়ে লাশ নিয়ে চল্লেন। গোরস্থানে গিয়ে দেখি, ছৈয়দ সাহেবের কামলারা কবর কেটে, বাঁশের চাউট হাতে তৈয়ার। কামলার দাম, বাঁশের দাম, কাপড়ের দাম দেওয়ার কথা মুখে আনবার সাহসই পেলাম না।

[ক্রমশঃ]

দুইটি কবিতা

এস, মোফাজ্জল হোসেন

গাছ

মেঘের বিজুলী কণা নীচে নেমে এসে
ডাক দিল—'আয়'
ধরণী শুধায়,
আমার শোণিত কণা কে যাবিরে নিয়ে
কে বাঁচাবি নিরুপায় নিরীহ জীবেরে
নিজ প্রাণ দিয়ে?
বিপুল বিটপী এক আছিল দাঁড়ায়ে
ধরা পানে দুই হাত দিল সে বাড়ায়ে।
মুঠি ভরি রক্তকণা ঊর্দ্ধে ছুঁড়ে দিলো
মেঘের জ্বলন্ত বজ্র মাথা পেতে নিলো।

ভিতর ও বাহির

বহির্জগত হাতছানি দে' ডাকে বারে বারে
পিছন পানে কুটির ডাকে রাখ্‌তে ঢেকে তারে।
জগৎ জোড়া রূপের রাশি অহর্নিশি ডাকে
ঘরের কোণে প্রিয়া টানে, ছাড়তে নারি তাকে।
বাহির আমায় নিতুই ডাকে লোভ-লালসার পানে
ভিতর আমার সুপ্ত রাখে ঊর্দ্ধ লোকের গানে॥

শোককাব্য 'ভাঙ্গাপ্রাণ' ও দাদ আলী

অধ্যাপক আলমগীর জলীল এম, এ, ডিপ-ইন্-এড

সম্প্রতি আমাদের অজ্ঞাতনামা, বিস্মৃত প্রায় বা অপরিচিত কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক সাহিত্যিকই তবু আজো অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত। এই অর্ধপরিচিত কবিদেরই অন্যতম মুন্শী মোহাম্মদ দাদ আলী। দাদ আলী ও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'আশেকে রাসুল' সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হলেও কবির প্রথম কাব্য 'ভাঙ্গাপ্রাণ' সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

স্ত্রীবিয়োগ অবলম্বনে রচিত কবির প্রথম কাব্য সৃষ্টি 'ভাঙ্গাপ্রাণ।' খুব সম্ভব ইহাই বাংলা সাহিত্যে মুসলিম রচিত সর্ব প্রথম স্ত্রীবিয়োগজনিত কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস। মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিবি কুলসুম' (উপন্যাস) কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' (গীতিকাব্য), শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলীর 'আমার প্রিয়া' (শোক-গাথা) ও কবি নজরুলের 'বুলবুল' কতকটা এই জাতীয় রচনা হলেও দাদ আলীর 'ভাঙ্গাপ্রাণ' একেবারেই অভিনব ও অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যে দেদীপ্যমান। 'ভাঙ্গাপ্রাণ' দু'খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আমাদের একমাত্র অবলম্বন—যা' এই প্রবন্ধ লিখতে সাহায্য করেছে ২য় সংস্করণের একখানা ১ম খণ্ড 'ভাঙ্গাপ্রাণ।'

কাব্যটির প্রকাশক মোহাম্মদ ইউসফ আলী সম্ভবতঃ কবির পুত্র। কারণ কবির এবং প্রকাশকের নামসাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঠিকানাও একেবারে হুবহু অভিন্ন বা এক: পোঃ পোড়াদহ, ভিলেজ আটীগ্রাম, জেলা নদীয়া। কলিকাতা, ১১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেনস্থ 'কালিকা যন্ত্রে' শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১৲ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮/০+২৫০। গ্রন্থমধ্যে স্বত্বসংরক্ষণে পাই: এই পুস্তক যথানিয়মে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। যিনি গ্রন্থকর্ত্তার অজ্ঞাতে বা বিনানুমতিতে এই গ্রন্থের কোনস্থান উদ্ধৃত, মুদ্রিত, ভাষান্তরিত বা বিকৃত করিবেন, তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।—প্রকাশক।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি বলেছেন: গ্রন্থকার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য এই 'ভাঙ্গাপ্রাণে'র অবতারণা করে নাই। গ্রন্থকারের হৃদয়ক্ষেত্রে ভালবাসার যে বীজটি বহুদিন হইতে নিহিত ছিল; গুনজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উৎসাহবারি সেচনে সেইটী অঙ্কুরিত ও লতিকাকায় ধারণ করতঃ কবিতারূপ প্রসূনগুলি প্রসব করিল। গ্রন্থকার কালের পরিবর্ত্তনশীল গতিতে বর্ত্তমানে নিঃস্ব। অনেক সহৃদয় বন্ধু বান্ধব ও পরোপকারব্রতী উন্নতচেতা মহাত্মাগণের নিঃস্বার্থ সাহায্যে এই ১ম খণ্ড 'ভাঙ্গাপ্রাণ' পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইল।

লেখকের পরম বন্ধু পাবনা রেজউয়াননগর নিবাসী সাহিত্যানুরাগী মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব ভ্রম ও প্রুফ সংশোধন সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড 'ভাঙ্গাপ্রাণ' সাধারণের স্নেহচক্ষে পড়িলেই দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইবে। যদিও লেখক বয়সে প্রাচীন কিন্তু লেখক শ্রেণীতে নূতন বলিয়া পরিচিত। খুঁজিলে পুস্তকে শতশত দোষ দৃষ্ট হইবে, যাহার চক্ষে যে দোষটী লক্ষিত হইবে, সেইগুলি গ্রন্থকারের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন:

সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে প্রথম সংস্করণের এক সহস্র পুস্তক ষন্মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। লেখক প্রায় দুই বৎসর কাল নানাবিধ কঠিন রোগে পীড়িত থাকায় দ্বিতীয় সংস্করণ বহির্গত করিতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। জগদীশ্বর কৃপায় সেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বহির্গত করিতে সক্ষম হইল।

এই সংস্করণে দুরূহ শব্দগুলির অঙ্কনির্দেশে নিম্নে টীকা ও স্থানে স্থানে নূতন ভাবগুলির ব্যাখ্যা লিখিত হইল। আশা করি ইহাতে পাঠকবর্গের শব্দার্থ ও ভাবার্থ বোধ জন্য কিছুনা কিছু সুবিধা হইবে।

মোহাম্মদ দাদ আলী

পোঃ পোড়াদহ, আটীগ্রাম (নদীয়া)।

দ্বিতীয় সংস্করণের এই কাব্য মধ্যে কোথাও 'ভাঙ্গাপ্রাণে'র প্রথম রচনার তারিখতো পাওয়া যায়ই না, তদুপরি দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রকাশকালও সম্পূর্ণ আঁধারে বিলীয়মান। গ্রন্থের সন্নিবেশিত বিজ্ঞমণ্ডলীর অভিমতগুলো দৃষ্টে মনে হয় কবি এই কাব্যটি ১৯০৫ (বাং ১২৯৮) খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচনা করেন। কবির জীবনকাল (১৮৫৬—১৯২৭)। তাহলে তিনি ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর এই কাব্যখানা প্রকাশ করেন বলে আমরা মনে করতে পারি। ভূমিকায় কবি নিজেও তাঁর প্রবীণ বয়সের কথা জানিয়ে বিনয় প্রকাশ করেছেন। প্রথম খণ্ডের প্রকাশনার সময়েই দ্বিতীয় খণ্ড 'ভাঙ্গাপ্রাণে'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল। মনে করতে পারি একই সময়ে রচিত হয়েও অর্থাভাবে বিভিন্ন

সময়ে প্রকাশ করেন দ্বিতীয় খণ্ডখানা। আকারে ২য় খণ্ড মনে হয় ১ম খণ্ডের অর্দ্ধ পরিমাণ। কারণ ১মখণ্ডের মূল্যমান যখন ১৲ ২য় খণ্ডের তখন ৷৹ আনা মাত্র। কবির দ্বিতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'আশেকে রাসুলে'র প্রকাশ-কাল জানা যায় ১৯০৭ (বঙ্গাব্দ ১৩১৪) খৃষ্টাব্দে। ১৯০৫ হ'তে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবি দাদ আলী ১৬ খানা কাব্য-গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

১। ভাঙ্গাপ্রাণ ১ম খণ্ড ১৲ ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৷৹ ৩। আশেকে রাসুল ১ম খণ্ড ১৲ ৪। ঐ ২য় খণ্ড ৷৶৹ ৫। দেওয়ানে দাদ ১৲ ৬। শান্তিকুঞ্জ ৷৹ ৭। সমাজ শিক্ষা ।৶৹ ৮। ফরায়েজ ।৶৹ ৯। সংগীত প্রসূন ৷৹ ১০। উপদেশ মালা ।৹ ১১। এলোপ্যাথি জ্বর চিকিৎসা ৷৹ ১২। আয়ুর্ব্বেদ রত্ন (১৯০৮ খৃঃ র পূর্বে রচিত) ৷৹ ১৩। আখের মউত ✓৹ ১৪। মশলা শিক্ষা ৷৹ ১৫। জাতি শত্রু বড় শত্রু ✓৹ ১৬। কানা চোখের অঞ্জন (১১ শ সংখ্যা, ২৫ বর্ষ, মাসিক মোহাম্মদী দ্রঃ)

পুস্তকের তালিকা দৃষ্টে এবং বিশেষ করে 'ভাঙ্গা-প্রাণে'র ১ম খণ্ড পাঠ সমাধা করে আমাদের এই ধারনা হয় যে, কবিরাজী শাস্ত্র সম্বন্ধে কবি দাদ আলীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। মনে হয় কবি নিজেও একজন চিকিৎসক ছিলেন। কবির শিক্ষার অল্পতা এবং প্রথম কাব্য প্রচেষ্টা হলেও 'ভাঙ্গাপ্রাণে'র ছত্রে ছত্রে স্বতোৎ-সারিত কবিত্ব দুর্লভ নয়। 'ভাঙ্গাপ্রাণ' কবির প্রেমিক হৃদয়ের শোকাচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। স্ত্রীবিরহী কবি তাঁর শোক সন্তপ্ত হৃদয় ও পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার মানসে এই কাব্য রচনা করেন। একদিকে বাঙলা সাহিত্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' যে স্থান, অপর দিকে মোহাম্মদ দাদ আলীর 'ভাঙ্গাপ্রাণে'রও সেই স্থান। একটি গদ্য কাব্য—অপরটি ছন্দোবদ্ধ গাথাকাব্য। কবির পত্নী বিয়োগের শোক মূর্চ্ছনা অনুরণিত হয়েছে 'ভাঙ্গা-প্রাণে'র প্রতিটি কবিতায়। পার্থিব-দৈহিক প্রেম ধীরে ধীরে উন্নীত হয়েছে আধ্যাত্মিক লোকের পরকীয় শাশ্বত প্রেমে। খোদার ইশ্‌ক অনুপ্রাণীত হয়ে রসুলের সান্নিধ্যে ছুটে যাবার ব্যাকুলতা স্ফূর্ত্তিলাভ করেছে তাই প্রতিটি কবিতার উপসংহারে। মক্কা-মদিনা গিয়ে 'মহা-পুরুষের' প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে ভাঙ্গাপ্রাণে কথঞ্চিৎ অনাবিল শান্তি বারি সিঞ্চণের প্রয়াস দেখি কবির মূল প্রেরণা। স্ত্রীবিয়োগ সন্তপ্ত কবি হজ ব্রত পালন অভিলাষে মক্কা গিয়ে রোগাতুর নিমিত্ত মদিনা বিমুখ হয়ে এসে লিখেন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'আশেকে রাসুল'। তাই কবি দাদ আলী মূলতঃ সাধক ও সুফী ভাবাপন্ন। ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে অতীন্দ্রিয় জগতে, রূপকে অতিক্রম করে ভাবের দিকে তাঁর যাত্রা। 'ভাঙ্গাপ্রাণে'র উৎসর্গ পত্রে কবি অশেষমাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেব হজরত শাহ আবেদুল হাক্ মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলে নিবেদন করছেন…

যাঁর প্রেম শিখাইলে, যাঁর প্রেম বিলাইলে
এ হৃদয় ব্যগ্রতার 'রউজা' দরশে
সে প্রেমে মরম রুগ্ন, মানে নাক বাধাবিঘ্ন
সিন্ধু পারে যাই, দাও বিদায় হরষে।

গ্রন্থের সূচীপত্রে এক নজরেই কবির খোদা ও রাসুল প্রেমের নিদর্শন চোখে পড়ে। 'হামদ ও নায়াত' যেন কবির কাব্য সাধনার চাবি কাঠি। প্রথম কাব্য গ্রন্থেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সূচীপত্রে মোট ১৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। যথা—

ঈশ্বরস্তোত্র, মোহাম্মদ (সাং) নায়াত, মৃত্যুকালীন বিলাপ, একশূন্যে সব শূন্য, কি যেন আমার নাই, আর কি দেখিব, রেখ অভাগারে মনে, নিসর্গ তস্কর, মৌনবতী, বিহাহ সজ্জা, রাখ মোর প্রাণ, আমিই কাঁদিব, হাহাকার সার, দুঃখই সুখের মূল, কেন আজি পোহাল, অপ্রেমিক, মদন।

কাব্যের 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শীর্ষক কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি না দিয়ে পারলাম না। এই কবিতাটির কাব্যিক উৎকর্ষ ছাড়'ও আর একটি নতুন জিনিষ লক্ষ্যনীয়। প্রতি পঙক্তির আদ্যক্ষর সহযোগে সুন্দর আর দু'টি চরন সম্পৃক্ত একটি কবিতা পাওয়া যায়। কবিতাটি নিম্নরূপ—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বরদাচরণ মিত্র সোসনজজ মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

দাও মোরে কৃপা বারি, গুণের বর্ণনা করি
হেন শক্তি নাহিক আমার
দরশিতে ও বদন, শুনিতে ও সম্ভাষণ
হৃদয়ে বাসনা অনিবার।
আদরিলে তুমি দীনে, তাতেই গুনজ্ঞজনে
আদর করিল অভাগায়
লিখিতে সে-সব কথা, শক্তি মোর আছে কোথা
সেগুণ কীর্ত্তন করা দায়।
তব উৎসাহের বার, (১) মম প্রতি বার বার
আশাতীত হইল সেচন
বলিব কি সেই রসে, শুষ্কহৃদি পুনঃ রসে
ভাঙ্গাপ্রাণে কলিকা সৃজন।

১। বার, জল

দরশি উল্লাস ভরে, তুলিয়া কমল করে
সযতনে দিলে গুণধাম
রচিতে বলিলে হার, ওই কথা ভাবি সার
'ভাঙ্গাপ্রাণ' মালা গাঁথিলাম।
শত স্থানে আছে দোষ, জ্ঞানিগণ পরিতোষ
হবে যাতে কোথা পান তাহা,
নেতা নহি কবিকুলে, মোর কাব্যে কেবা ভুলে
সার মাত্র হায়, উহু, আহা!
রভস (২) উপজে মনে, যবে দেখি এ নয়নে
মধুমাখা লিপিকা (৩) তোমার
ভিদুর (৪) সদৃশ স্বনে (৫) বিঘোষিল সর্বস্থানে
বাড়াইল উদ্যম আমার।
খাপগা (৬) পবিত্র নীর, তব কৃপাবারি, ধীর।
তাই মম সহায় সম্পদ
ব্রীড়া (৭) নহি কোন স্থানে, সাদর ও সম্ভাষণে
উৎসাহিত দূরিত বিপদ।
করিয়াছ উৎসাহিত, সর্বস্থানে সমাদৃত
কারো কাছে হইনি ঘৃণিত
রত মোর মঙ্গলার্থে, কেহ বা তোষেণ অর্থে
কেহ করে অশুদ্ধ শোধিত।
নাহি কারো মনে হিংসা, মোর প্রতি ভালবাসা
যথা যাই তথায় আদর
নিজ উদারতা গুণে, বন্ধু ও বান্ধব জনে
'ভাঙ্গাপ্রাণ' পাঠ নিরন্তর।
রাখিবে কণ্ঠে এ হার, মিছে আশা দুরাশার
স্বপনেও কভু ভাবি নাই
শত শত নমস্কার— কণ্ঠে হার ব্যবহার
করিছেন, তাঁদেরে জানাই।
তাই বলি গুণনিধি, তোমার হৃদয়ে যদি
দয়াবারি না হত সঞ্চিত
রেকা (৮) কি আছয়ে ইথে, এ দীনে উৎসাহ দিতে
কেহ অগ্রসর না হইত।
সে কথা হইলে স্মৃতি, উদ্দেশে তোমায় নতি
করি, সদা চাহি সুমঙ্গল
জগতে তুলনা তব, খুঁজিলে আর না পাব
তোমা লাগি হৃদয় বিকল।
নমস্কার নমস্কার, লও এই উপহার
তব অনুমোদিত এ হার
তোমার করেতে দিয়া শীতলি এ-দগ্ধ হিয়া
যাহা ইচ্ছা কর গুনাধার।

মাহাত্ম্য তোমার বই, হেন শক্তি মোর কই?
ক্ষোভ রইল, দেখ আদ্যাক্ষর
রিক্ত আমি কিবা দিবে, চিরদিন বাখানিব
লও কৃতজ্ঞতা, গুনধর।

আদ্যাক্ষর যোগে আমরা তাহলে পেলাম—
দাদ আলী তব দরশনের ভিখারী।
কর না নিরাশ তারে সেজন তোমারি॥

কাব্যারম্ভে কবির 'ঈশ্বর স্তোত্রে' আমরা শুনি—
কালচক্রে পোষিত এ হৃদয় সরসী আজি
বৃন্তচ্যুতি তাপদগ্ধ বিহীন কেশর রাজি
যদিও নীরসময়
তব নামে রসময়
হইবে সরস যথা সুরসাল ফল
রূপের ছটায় করে মানবে বিহ্বল।

তাতেও যদি কবি ব্যর্থকাম হন? তবে সান্ত্বনা—
দর্দুর কুরব সম দীনের কুরব শুনি
শ্রবন বিকল হবে মনে হেন অনুমানি
যদি কেহ নাহি শুনে
শুক পদ্ম সুধা জেনে
গান যদি নাহি করে ক্ষতি না গণিব
ভক্ষিব নিজেই, গেয়ে নিজেই শুনিব।

কবি স্ত্রীর "মৃত্যুকালীন বিলাপ" করছেন। তাতে কবির শোক সন্তপ্ত পুত্র কন্যাদের পরিচয় পাওয়া যায়।
কখনো করিতে মান, দেখিনি তোমায় প্রাণ,
এখন এ গুরুতর মান
কোথায় শিখিলে ধনি! বল বল চন্দ্রাননি!
এ মানের নাহি পরিমান।
তোমার নয়নতারা, ইদ্রি, মন্ন ও চেহরা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হল সারা
ইউসফ, এহসান, এরা দুটি জ্ঞানবান,
মেহেরুণ জ্যেষ্ঠাটি জোহরা (১)

'মৃত্যুকালীন বিলাপে' আরো পাই—
শুন আত্ম বন্ধু সব, আমার প্রিয়ার শব,
কেহ যেন দিও না সমাধি
ওই শব লয়ে মাথে, বেড়াইব ঘাটে পথে,
যোগী ঋষি খুঁজি নিরবধি।
দুর্গম অটবি মাঝে, দুরারোহ গিরিরাজে,
অথবা কন্দরে কি প্রান্তরে
সরিৎ সাগর কূলে, নৈয়গ্রোধ তরুমূলে,
অম্বুধির সলিল ভিতরে।

২। আনন্দ ৩। সার্টিফিকেট ৪। বজ্র ৫। শব্দে ৬। গঙ্গা ৭। হেয়, তুচ্ছ ৮। সন্দেহ।
(১) ইদ্রিস, মনসুর, গোলচেহরা, ইউসফ, এহসান, মেহেরুন্নেসা, জোহরা, এই সাতটি পুত্রকন্যা।

সব শেষে কবির আকুল যাচ্ঞা:—

দীননাথ এ দীনের, ঘুঁচাও মনের ফের,
লও প্রভো! প্রেয়সীর কাছে
দাও ত্রিপিষ্টপে স্থান, সে আমার সুকল্যাণ,
করপুটে এই দীন যাচে।

স্বপ্নভঙ্গে কবির সখেদ উক্তি—

হিংসুক পরের সুখ দেখিতে পারেনা হায়।
চৈতন্য, শত্রুতা করি হারিল সে সুনিদ্রায়
জাগ্রত হইয়া দেখি
কোথাবা সে শশিমুখী
কোথা আমি?—সেই ভগ্ন খট্টায় শয়ন
দশ দিশি অন্ধকার করি দরশন।
(একশূন্যে সবশূন্য)

কবির হাহাকার বাস্তবতার স্তর ভেদ করে ঊর্দ্ধলোকে উড্ডীয়মান:

শূন্য করি গৃহদ্বার, শূন্য করি মম হৃদি
শূন্য করি দশ দিশি অটবি অচলাম্বুধি
গেলে প্রিয়। শূন্য দেখি
যেদিকে ফিরাই আঁখি
এক শূন্যে (১) শত শূন্য, শূন্য বই নয়
বামে যার এক নাই, শূন্যই নিশ্চয়।

শূন্যতা পূরণের নিমিত্ত কবি মদিনায় গিয়ে আরাধনা করবার প্রাক্কালে লিখ্‌ছেন—

মানব কুলের যিনি কলুষ হরন তরে
কোরেশ বংশেতে জন্ম মক্কানামা সুনগরে
তাঁহার সমাধি যথা
মনানন্দে যেয়ে সেথা
সমাধিতে বসিয়া সে সমাধির ধারে
প্রিয়ার মঙ্গল হেতু আরাধিব তাঁরে।

সে সময় জন্মভূমির প্রতি কবি বল্‌ছেন—

জননী কোমল হৃদি না হয় কঠিন কভু
করুনা পিযুষে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে বিভু
নির্গুন সন্তান হলে
তারি তরে হৃদি গলে
যদি কৃপা করি মাতঃ! মনে রাখ তুমি
পাইব প্রসাদ তব সিন্ধু পারে আমি।

কত সুন্দর রূপে মৃতা পত্নীকে কবি সাজান। প্রিয়া-হীন হয়ে বিশ্বপ্রিয়ার সন্ধানে কবি ঘরছাড়া দিক হারা—

স্মৃতিরূপ হারে তার সাজাই হৃদয় রে
হস্তেতে পরাই তার নম্রতা বলয় রে
স্নেহ কর্ণফুল কানে
পরাই রে সযতনে
প্রীতিরূপ মল তার চরণে পরাই রে
কি যেন আমার নাই খুঁজি আমি তাই রে।

* *

বহিনু ভূতের বোঝা জীবন ভরিয়া রে
বাঁধাছিনু অধীনতা শৃঙ্খল পরিয়া রে
এখন স্বাধীন হয়ে
বেড়াই নেচে ও গেয়ে
তোমার প্রেমিক নাম জগতে রটাই রে
কি যেন আমার নাই খুঁজি আমি তাই রে।
(কি যেন আমার নাই)

বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে কবি প্রিয়া। প্রকৃতির নানা বেশভূষায় কবি অবলোকন করছেন তাঁর মানসপ্রিয়াকে। জড় প্রকৃতির বাসকসজ্জায় কবি সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যের মধ্যে স্বীয় অনুভূতির প্রত্যক্ষ রূপ পর্য্যবেক্ষণ করছো আর বল্‌ছেন অতি সুন্দর শব্দ সুষমা সম্ভারে—

লতায় লতায় যবে
পক্ক বিম্বগুলি শোভে
পবনহিল্লোলে মৃদু কম্পমান হয়
মম সহ আলাপিতে
প্রেয়সী হরিষ চিতে
যেন আধ সম্ভাষিছে ওষ্ঠাধর হেলাইয়ে।
দাড়িম্ব ওরঙ্গ রূপে
বীজগুলি মুখকূপে
দন্তবলি নয়নের ভ্রম জন্মাইছে।
ইন্দ্র ধনু বিহায় সে
ভ্রূযুগ অতীব রোষে
সৌদামিনী-ইষু যেন সুকটাক্ষ সন্ধা নিয়ে।

* * *

খঞ্জনে চলিতে দেখি
অঞ্জন মিলিত আঁখি,
মনে হয় আরো যেন ইন্দিবর দুটি
দুটি ভ্রমরের সনে
খেলিতেছে হর্ষ মনে
স্বভাব দেখায় সদা তব রূপ প্রকাশিয়ে।
(রেখ অভাগারে মনে)

কবি প্রিয়া আর সাড়া না দিয়ে পারেন না। কবির এত কাতরোক্তি এত অনুনয় এত আর্তি মিথ্যে নয়। স্বপনে দেখা দেন কবির মানসলক্ষ্মী "আত্মার সহিত বিজড়িত রূপ" নিয়ে মায়ার কায়া নিয়ে "ঈশ-স্বরূপ অপরূপ" হয়ে দেখা দেয়—

এ রূপ দেখায়ে অন্যে বিমোহন
করিতে আসিনি মরত ভবন

(১) বামের 'এক' অভাবে শত শত শূন্যেরও মূল্য নাই।

কেবল এসেছি তোমারি কারণ
তোমারে দেখায়ে ভুলাব তোমা
রূপের সমুদ্র সমুখে আসিলে
সে রূপ চরণে ঠেলিব রে ফেলে
এ নয়ন কভু যাবেনাক ভুলে
কেহই ভুলাতে নারিবে আমা। (বিবাহ সজ্জা)

কবির হাহাকার শূন্যময় দেখে এ পৃথিবী—

যে দিকে তাকাই দেখি সকলি আঁধার
শূন্য ভিন্ন চ'খে কিছু পড়ে না আমার
গৃহশূন্য হৃদিশূন্য শূন্য দশ দিশি
শূন্যময় দিবানিশি শূন্য রবিশশী
শূন্যই হয়েছে সার শূন্য হৃদয়ের
শূন্যেতেই দরশন যেন নয়নের
শূন্যই হয়েছে তব মনোরম্য স্থান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।
(রাখ মোর প্রাণ)

কবির অদ্ভুত উপমা দক্ষতা। কথায় কথায় উপমা রূপক, উৎপেক্ষাদি অলঙ্কারের সুষ্ঠুপ্রয়োগ সাহায্যে শোকের বর্ণনা একেবারে খাঁটী প্রিয়জনোচিত ও প্রাণবন্ত করেছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই—

যে যাহারে ভালবাসে সেত দূর নয়
বিজ্ঞ হ'তে মূঢ়লোক জানেন নিশ্চয়
বিবস্বান্ বিমান প্রদেশে দেখা দিলে
অম্ভোজ ত্যাজিয়া লাজ দু'নয়ন খু'লে
সম্বারিতে নারে ভাব পড়ে বাহিরিয়া
শম্বরে এলিয়া পড়ে হাসিয়া হাসিয়া
তুমি তো কখনো দেখালেনা ও বয়ান
দেখা দিয়ে প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ!

কবির জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। আকুতি প্রশ্নবান দ্বারা পাঠকের চিত্তে কারুণ্যের অভিসিঞ্চন অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হয়েছে—

এ সংসারে কারইত কিছু করি নাই
কারো বাড়া ভাতে কভু দেইনিক ছাই
কারো ভরা ঘরে কভু দেইনি আগুন
কারো পত্নী পুত্রে কভু করি নাই খুন
কারো নিদ্রাকালে কভু ছি'ড়িনি বিতান
কারো গলে দেইনিক ক্ষুর খরশান
বিনা দোষে মোর গলে কে দিল কৃপাণ
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

অশান্তির পৃথিবীতে সুখক্রীড়ারত খঞ্জনখঞ্জনী, দয়েল-দয়েলা, কপোতদম্পতি, ডাহুক-ডাহুকী, হংস-হংসী, বলাক-বলাকা, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর রতিবিহার সন্দর্শনে কবির "হাহাকার সার"—

অশান্তি সংসারে শান্তিময় দুইজন
সুখের তুলনে হারে মানবজীবন
দেখি সদা সমুখে বিরহ পারাবার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার।

ভুক্তভোগী ব্যতীত প্রেমের বিচ্ছেদব্যথা কেহ উপলব্ধি করতে পারে না। কবির যাতনা—"আকাশ-কুসুমের" মত অসম্ভব বস্তু আর সবার কাছে:

রোগীর যাতনা রোগী
বুঝিবে যে ভুক্তভোগী
পিপাসার যে যাতনা তৃষ্ণাতুর বিনা
তটিনীর নীর নিবাসিনী বুঝিবে না।
(দুঃখই সুখের মূল)

আরো পড়ুন—

মলয়জ কি ছলে উরজ তটে যেয়ে লো!
পূরাইবে তার মনোআশ
কোনই কৌশল তার খু'জিয়া না পেয়ে লো!
হইল হতাশ
দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন
এই তার শেষ পণ
প্রস্তরে ঘর্ষিত হায় দেহ প্রাণ নাশ
ঘৃষ্ট রূপে উরে উরি পুরাইল আশ।

অন্বেষণে বিফল মনোরথহয়ে সমস্ত নারীজাতীকে ধিকৃত করছেন জ্ঞানীগণের মতের পোষাকরূপে অবিশ্বাসী ললনাকুলকে ছলনাময়ী কুটিলস্বভাব বলেও যাতে প্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে পারেন তারই জন্যে লিখ্ছেন—

হৃদয়ে গরল পোরা মুখে ভরা অমৃত
ক্ষণমাত্র আলোকিয়া আঁধারেতে আবৃত
ক্ষণসুখে হাসাইতে
চির তরে কাঁদাইতে
এমন মোহিনী মন্ত্র কার কাছে শিখিল
ধন্য সেই গুরু! হেন গুরু গিরি করিল।
(কেন আজি পোহাল)

প্রতিদানে কবির স্বপ্নপ্রিয়া ওষ্ঠাধর হেলিয়ে মৃদু হেসে কবির "হৃদয়ের তমোরাশি নাশিল"—

ভালবাস কিনা বাস, সে তোমার বাসনা
আমার এ ভালবাসা আর কেহ পাবেনা
তোমায় বেসেছি ভাল
প্রতিদান কর ভাল
না কর, তাতেও দাসী ক্ষতি নাহি গাণল
মুছিবে না, হৃদে;—তব যেই ছবি উঠিল।
(কেন আজি পোহাল)

'মদন' নামক শেষ কবিতায় কবির হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অসম্ভ প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগীকে ভোগী

নীরোগকে রোগী করলেও 'ভাঙ্গাপ্রাণে'র কবি কামদেবকে ভয় করেন না। শিবলী, রাবেয়া, জীবন্নেসা, মনসুর হাল্লাজ, খানজাই, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহৎ চেতাদের স্মরণ করে নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন—

কোমল হৃদয় হয় যার ফুলবান ব্রহ্মঅস্ত্র তার
এ হৃদি কোমল নয়, কেবলি পাষানময়
তব শর ব্যর্থ হবে মোর।

* * *

এ দুরাশা কখনো করনা করিলেও সুফল হবেনা
প্রেয়সীর প্রেমবর্ম্মে, এ দেহ এ অস্থিচর্মে
আবরি রেখেছি, কি ভাবনা ?

এতদ্ব্যতীত কবি নামের গুনে ভবনদী পার হ'তে চান—সেই নামে যুগে যুগে সাধক, দরবেশ, মহাপুরুষেরা পার হয়েছেন। সব শেষে কবির 'পথ যেন বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি': 'মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে তাই কবি জেনেছেন, কিছু নাহি ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছো, আমি আছি—'

সে নামে, হে মকর কেতন। করিয়াছি কেতন রচন
এ ভব পারাবারে-এ দেহ তরনী পরে
তুলিয়াছি শাশ্বত কেতন।
সেই ধ্বজা দেখিলে অদূরে পাপাবর্ত উর্ম্মি যায় দূরে
ক্রোধ মদ অহঙ্কার,— কুম্ভীরাদি শিশুমার
আসে না সে তরনির ধারে।
যে আরোহি সেই তরনীর তার হৃদি সদা রহে স্থির
কামরূপ কু বায়ুতে, পারেনা বিপথে নিতে
মহাম্মদ মাঝি যে তরির।

দাদ আলীর সম্পূর্ণ সাহিত্য কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়ে নতুন করে সম্পাদনা করার সময় এসেছে। যেমন জানছি সুধাকর দলকে, যেমন জানছি মীর মোশাররফ-মোজাম্মেল সিরাজীকে, তেমনি করে সন্ধানীর দৃষ্টি মেলে দাদ আলীকে দেখব আমরা। কবির স্বগ্রামের কোন লোক বিশেষ করে কবির পুত্র-পৌত্রদের নিকট নিকট থেকেও আমরা যথেষ্ট উপকরণ প্রত্যাশা করি। তবে এদিকে বাঙলা এ্যাকাডেমী বা বিশ্ববিদ্যালয় সাগ্রহে অগ্রনী হলেই সুফল ফলবে শীঘ্রই। বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির 'আশেকে রাসুল' পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত। *

ফাল্‌গুনী

আজহারুল ইস্‌লাম

তোমার আয়ত আঁখি কী যে ভাষা বয়ে নিয়ে যায়।
ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ?
আগুন ভরেছে কত ঝরে পড়া সজ্‌নের ফুলে,
উদাসী ভ্রমর-মন মেতে ওঠে আমের মুকুলে,
একটি কোকিল ডেকে ঢেলে দেয় তার ভালবাসা,
কেউ কি বুঝেছে তব ও আঁখির ভাষা ?

কী ইশারা জেগে ওঠে আজ তব আঁখির পাতায় ?
পলাশ-শিমুল বন রাঙা হয় ফাগুন বিভায়,
মটর-কলাই ক্ষেতে ফড়িংয়েরা অতি চুপিসারে
নরম পেলব পাখা নাড়ে,

দখিনা হাওয়ার রাতে উড়ে যায় মালতীর
বুকের বসন,
কাজলের কালো কি গো আঁখি হতে করেছ মোচন ?
মাঠের দিগন্ত হতে শোনা যায়
সকরুণ বুক ভাঙা পাখীদের গান,
প্রাণে ফাটে বিরহ বিমান,
অশোক ফুটেছে কত তোমার বেণীর পাশে আজ,
তন্দ্রার সংগীত গেয়ে বেতস পেতেছে বড় লাজ,
সুন্দর বেণীর বুক সোনা রোদে উঠেছে কাঁপিয়া,
তোমার কাজল আঁখি মুদে যাক ঘোর তন্দ্রা দিয়া

* প্রবন্ধ রচনায় যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজের আমার ক'জন ছাত্র সাহায্য করেছেন।

টি হোসেন

সৈয়দ আবদুস্ সুলতান

টি হোসেনের সাথে প্রথম পরিচয় কিছুতেই ভোলা যায় না। সকাল বেলা আলিফের মতই সোজা শরীরের এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন বৈঠকখানায়। মাথার চুল ঘন এবং কোকড়ান। কিন্তু একটিও কালো নেই। মুখ দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশের ওপারে নয় কিছুতেই। যদিও পঁয়তাল্লিশের ওপারে গেছে অবশ্যই। লুংগি পরণে—সিঙ্গাপুরী। পাঞ্জাবী গায়ে—আদ্দির। চুড়িদার হাতা।

পরিচয়ের পয়লা' পর্বটা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পুরাদস্তুর অফিশিয়াল মেযাযটা ফিরে এল আমার। বললাম, আপনিই টি হোসেন? পেয়েছিলেন আমার নোটিশ?

পঁয়তাল্লিশ বছরের ঝন্ঝা-বাত্যা সত্ত্বেও তার মাথার একটি কেশও যেমন স্থানচ্যুত হয়নি, ঠিক তেমনি অনড় হয়ে বসে রইলেন ভদ্রলোক। পেপারস্টোন্টা হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে রেখে বললেন, আপনার কাছে আসা ত সে-জন্যই।

রকম সকমটা ভাল ঠেকলনা মোটেই। বললাম, দেখুন, অত আস্তে ধীরে কথা বলার সময় নেই আমার। আপনি কি করবেন আপনার অই অজগর সাপের মত পড়ে থাকা দেনাটার?

ভদ্রলোক হাসলেন।—ঠিকই বলেছেন আপনি। অজগর সাপের মতই। ওটা নড়েনা চড়েনা বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে কবে যে গ্রাস করবে তারও ঠিক নেই। কিন্তু করি কি? তাও আপনাকেই বাতলিয়ে দিতে হবে। বলছি সব কথা।

মনে করেছিলাম এতটুকু খাতির করবোনা ভদ্রলোককে। কিন্তু অল্পক্ষণেই আমাকে ফিরে আসতে হল আমার স্বাভাবিক আমিতে। অবলীলাক্রমে কখন পিছনে চলে গেল আমাদের অফিশিয়ালের সম্পর্ক। গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপে মেতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিলাম দু'জনে।

যাওয়ার সময় টি হোসেন দাওয়াত করলেন। তার ওখানে রাতে খেতে হবে। এড়ান গেলনা কিছুতেই।

কাজ সেরে যেতে সামান্য দেরী হল আমার। গিয়ে দেখি টি হোসেন খেতে শুরু করেছেন। মোরগের রানের হাড্ডিটার উপর দাঁতের শক্তি পরীক্ষা শুরু করতে করতে বললেন, আসুন, স্যার, আসুন। কেবলই বসেছি!

টি হোসেন বিয়ে করেন নি। গুছিয়ে উঠতে পারেন নি আজো তাই। কেন গুছিয়ে উঠতে পারেন নি পরে বলছি। একটি ছোকরা পাক করেছে। সেই খাওয়াচ্ছে। বসে গেলাম। টি হোসেন বললেন, খাবেন কি? অযথাই তকলিফ দিলাম আপনাকে।

তা কেন? অনেক ত রয়েছে দেখছি বাটিতে। এতে আমার রুচি হবেনা এমন ভাবছেন কেন?

কি করে রুচি হবে, বলুন? এটা কি গোশ্‌ত পাকিয়েছে হারামযাদা। আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকলনা। ঝালে টি হোসেনের সারা মুখমণ্ডল বেয়ে ঘাম ঝরছিল।

বললাম, ঝাল হয়নি, তবে আপনি অত ঘেমে অস্থির কেন?

—তাতে কি? একি ঝাল? ঝাল একে বলে?

তারপর বাবুর্চি ছোকরার দিকে চেয়ে বললেন, কি রে শয়তান, পাক কর তো ঝাল ছাওনা, এ-কোন্ দেশী পাক কইতে পার?

বাবুর্চি চুপ করে রইল। মনে হল এ-অভিযোগ তার বিরুদ্ধে একান্ত নিত্যকার ব্যাপার।

গোশ্‌ত মুখে দিয়ে দেখি সত্যি জলন্ত আগুন। দুটি জিনিসই আশ্চর্যজনক। একটি হচ্ছে তরকারীতে এত ঝাল, আর একটি এত ঝালের পরও অভিযোগ যে ঝাল হয়নি।

ঝালের ঝালেই সারা চোখে মুখে পানি ঝরছে। তথাপি ঝালের ঝাল মেটেনা।

টি হোসেন অল্ পাকিস্তান হাবলি অয়েল সোসাইটি লিমিটেড্-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর। চারদিকের সাজান আলমারীতে রং বেরংয়ের লেবেল লাগান বিচিত্র রকমের শিশিবোতলের সমাবেশ। মাঝখানে একটি টেবিল সামনে করে টি হোসেন বসে থাকেন। টেবিলের উপর একটি হুক্কা।

টি হোসেন আরামে হুক্কা টানেন আর বাইরের পথের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। চার রাস্তার মোড়ের উপর তার ঘর। শহরে কে আছে, কে নেই, কে বেরিয়ে গেছে, কে এখনো ফেরে নি তার একটা মোটামুটি খতিয়ান যে কোন সময় টি হোসেন দিয়ে দিতে পারেন। এই দিক দিয়ে টি হোসেন শহরের গেজেটিয়ার।

টি হোসেন বললেন, আমি একজন সাধারণ মানুষ। যাকে বলে আদ্‌না লোক। আমার মত লোক কি করে একটা অল পাকিস্তান কন্‌সার্ন দাঁড় করাতে পারে?

কিন্তু করব কি? কেউ যখন এদিকে নযর দেয়না তখন নিজেই হাত দিয়ে বসেছি। কিন্তু হাত দিয়ে এমন উভয়-সংকটে পড়েছি যে আর বেরুবার পথ পাচ্ছি না। বলতে পারেন বটে—আর শুধু আপনি কেন অনেকেই বলে থাকেন যে এটা আমার একটা রোগ—ম্যানিয়া, দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে বিভিন্ন রকমের তেল তৈরী করা। কিন্তু রোগ হলেও এ-রোগ আমাকে পেয়ে বসেছে ভাল করে। এ-জন্য জীবনে অনেক কিছুই হয়নি। আর আশাও নেই। কিন্তু এটাকে ত ছাড়তে পারলামনা। অবশ্য করতেও পারলাম না কিছু। কারণ, একটা অল্ পাকিস্তান কন্‌সার্ন দাঁড় করানো মুখের কথা নয়।

টি হোসেন কথা বলেন আমার দিকে চেয়ে নয়, বাইরে চেয়ে। হঠাৎ কথা বন্ধ করে ফরসী হুক্কার নল মুখে তোলেন। বাইরে থেকে নযর ফিরিয়ে এনে এবার দেয়ালের দিকে চেয়ে আমার উদ্দেশ্যে বলেন, পান মর্যায করুন। আপনি তো নন্-স্মোকার।

টি হোসেন আবার বলেন। এবার নল হাতে। কাজেই আপনাদের সকলের সহানুভুতি আমার পাওয়া দরকার। দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, আমার জন্য নয়। আমার আর কি, আমার তো সবি গেছে। জোত গেছে, তালুক গেছে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়েছে, বিয়েও করা হয়নি জীবনে। কিন্তু তবুও আফসোস নেই যে প্রতিষ্ঠানের জন্য সব কিছু আমাকে ছাড়তে হ'ল তার যদি কিছু করতে পারতাম তা'হলে কোনই দুঃখ থাকতনা আমার জীবনে। করতে পারলে সোজা জিনিস হতনা। আফটার অল একটি অল্ পাকিস্তান কন্‌সার্ন। আর দিয়েছি তো আমি গোড়া ঠিক করে। এখন আপনারা এর গায়ে চাকা লাগিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

বললাম, আচ্ছা এই যে এতসব তেল দেখছি এসব কি আপনার নিজের আবিষ্কার?

বলছি কি তবে আপনাকে? সব কয়টিই। বললাম ত এরই পিছনে আমার জীবন শেষ করেছি। কোথায় আমার মত একটি নগণ্য মানুষ, আর কোথায় একটা অল্ পাকিস্তান কন্‌সার্ন।

টি হোসেন উঠে দাঁড়ালেন। টক্ টক্ করে দু'তিনটি আলমারীর দরযা খুলে আমার সামনে আট দশটি ছোট বড় বাহারি তেলের শিশি রেখে বললেন, সব কয়টিই আমার অরিজিনাল ফরমুলা। আর অরিজিনাল বলতে অরিজিনাল? যাকে বলে আদি, আসল ও মৌলিক।

কিন্তু আপনি এতসব জানলেন কি করে?

না জানলে চলবে কেন? এটুকু বিশেষত্ব না থাকলে একটা অল পাকিস্তান কনসার্নে হাত দিলাম কি কোন্ সাহসে? অইটাই তো আমার সম্বল—ফরমুলা, ফরমুলা নিয়েই যত মারামারি, ঘ টাঘাটি আর গাত্রদাহ। বলব সবি একে একে আপনাকে।

চলে আসার আগখানে বলেই ফেললাম, যদি কিছু মনে না করেন। আপনি পাচ্ছেন কত এই প্রতিষ্ঠান থেকে?

আমার আর পাওয়া না পাওয়া কি? সবি আমার, কিছুই আমার নয়। তবে হ্যাঁ বেঁচে থাকতে হবে ত? কাজেই কিছু একটা নিতে হয় বৈকি।

এই সব জানতে চাচ্ছি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না। অল্প পরিচয়েই আপনার এ ছন্নছাড়া জীবনের প্রতি বড় মমতা হয়ে গেছে আমার। তাই বড় কৌতুহলী হয়ে পড়েছি আপনার সব কিছু জানতে।

—ও আবার জেনে কি হবে, প্রতিষ্ঠানটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আমার জীবনের ব্রত। সেই দিকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। কম খেলাম; না বেশী খেলাম, সেটা মোটেই প্রশ্ন নয়। দোয়া করুন, যেন আমি এটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

তারপর আপনারা একে চালিয়ে নেবেন। আফটার অল, একটা অল্ পাকিস্তান কনসার্ন এবং দি ওনলি ওয়ান্ অফ ইট্‌স্ কাইন্ড্।

আর ঘাটাতে সাহস করলাম না। বাধলো। বললাম, আজকের মত তা হলে—

—একি, এসব নিয়ে যান। এগুলি দেওয়া হয়েছে আপনাকে। ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের প্রচারের জন্য একটা অংশ ব্যয় করার।

আমতা আমতা করেও শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলাম সব কয় শিশি তেল—বকুল তেল, চাম্পা কুসুম হেয়ার অয়েল, দি তাজমহল অয়েল, দি নিউ কোহিনূর, পাকিস্তান হেয়ার অয়েল, আমলা তৈল, দি ক্রিসেন্ট হেয়ার টনিক এবং আরও কি-কি।

টি হোসেনের তেলের দোকানের হিসাব অডিট্ হচ্ছিল। অডিটার এসে রিপোর্ট দিলেন, একটা অ্যাবসার্ড ব্যাপার। এ-অডিট কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি ভাউচারও চেক করবার যো নেই।

—কেন?

—কি করে হবে? তেল তৈরী করার জন্য কখন কি জিনিস তিনি কিনেছেন তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। ক্যাশ মেমো রয়েছে; কিন্তু যে জিনিসটি কেনা হয়েছে তার নাম ব্লেড দিয়ে নিপুণ হাতে কেটে তুলে ফেলা হয়েছে। ক্যাশ মেমোতে আছে পঁচিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা কিন্তু কিসের মূল্য বাবদ সেটি পাবার কোনই উপায় নেই।

টি হোসেনের কাছে গেলাম। টি হোসেন আমাকেই

বোকা বানিয়ে দিলেন। অডিটর হিসাব পরীক্ষা করবেন, সে জন্য তিনি টাকা পয়সার অংক দেখবেন, জিনিষের নাম দিয়ে তার দরকার কি?

জিনিসের নাম না পেলে অডিটার কি করে বুঝবেন আপনি কোন্ জিনিস কত টাকা দিয়ে কিনলেন?

বাহ, বাহ্! আপনিও দেখছি আর দশজনের মতই বলছেন। জিনিসের নাম ওদের জানতে দিলে ওরা তো আমার ফরমুলাই জেনে ফেলুস। আমার আর বিশেষত্ব থাকল কোথায়?

তা হলে ওরা কি করে জানবে যে টাকা আপনি খরচা দেখাচ্ছেন সে টাকা সত্যিই খরচ হয়েছে কিনা?

আশ্চর্য করলেন স্যার আপনি। সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আমি একটা অল্ পাকিস্তান কন্‌সার্ণ দাঁড় করাবার চেষ্টায় আছি। আর আমি মিথ্যা হিসাব তৈরী করেছি? একটি অল্ পাকিস্তান কনসার্ণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার কোনই মূল্য নেই?

এই প্রসংগে টি হোসেনের কাছে আমাকে হার মানতে হল। অডিটার তার রিপোর্ট দাখিল করলেন। টি হোসেন টি হোসেনই রয়ে গেলেন। তার একটি ফরমুলাও আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি।

রাস্তায় একদিন টি হোসেনের সাথে দেখা। রিকশাতে চলেছেন। বললেন, কোথায় যাবেন।

—যেখানে যাব সেখানটা ঠিক পাচ্ছিনে।

—তা ত চোখমুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে। উঠুন রিকশাতে।

—উঠে কি হবে? আপনি যাবেন একখানে আর আমি যাব আর একখানে।

—সে যাওয়া যাবে 'খন। আপনি উঠুন ত আগে।

—উঠলাম। টি হোসেন রিকশা পুলারকে বললেন, যাও।

—ডান দিকে, হুযুর?

—আরে, না।

—বাঁয়ে?

—কোন্ দুঃখে তুমি ডাইনে বাঁয়ে চালাবে? জীবনে একদিনও আমি ডাইনে বাঁয়ে গিয়েছি? আমার চলার পথ সিধা। সিধা সামনে চালাও।

টি হোসেনের কথা সত্যি ভাল লাগল। নিতান্ত প্রয়োজনে আমি নরেন ভট্‌চাযের বাড়ীর পথ খুঁজছিলাম। তাকে আমায় পেতেই হবে। কিন্তু পথ জানি না। টি হোসেন শুধু আমাকে দেরী করালেন।

পুলার বলল, হুযুর সামনে গিয়ে আর লাভ কি? একটা ভাঙা আছে। ও পারে রিকশা চলবে না।

টি হোসেন দ্বিধা সংশয়হীন গলায় বললেন, আরে যাও বাপু, এগিয়ে যাও। ভাঙাতে আমাদের কি করবে?

হুযুর, রিকশা নেওয়া চলবে না ওদিকটায়। শহরের এ-অঞ্চলটার নামই হচ্ছে ভাটিপাড়া।

—আরে এক পথ অইবেই। পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আল্‌পস্ পর্বত থাকবে না, কি বলেন? দেয়ার শ্যাল্ বি নো আল্‌পস্।

—অবশ্যই। কিন্তু আল্‌পস্ না হয় চলেই গেল। তাতে কি নরেন ভটচাযের বাড়ী পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আল্‌পস্ চলে গেলে তার আড়াল থেকে কিছু বেরিয়ে আসবে। দাঁড়াও ভাই, এক মিনিট। তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না এ-কাজ। এবার বল, নরেন ভটচাযের বাড়ী কোন্ পথে?

একদমে কথা বললেন টি হোসেন। মকিম উদ্দীন ততক্ষণ সাইকেল থেকে নেমে পড়েছেন। বললেন, আরে, সেই একসাইয্ ভেনডার ত? নৌকাডুবি হয়েও যে মরল না?

—অত শত জানি না, ভাই। আপাততঃ নরেন ভট্‌চায্য হলেই বোধ হয় আমাদের চলে।

বললাম, হ্যাঁ, নৌকাডুবির কথা জানি নে। তবে একসাইযের সাথে কি একটা সম্পর্ক তার আছে শুনেছি। আর তিনি ওঝার কাজও করেন।

—হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার পেছনে আসুন।

মকিম উদ্দীন আমাদের পথ দেখালেন নরেন ভট্‌চাযকে পাওয়া গেল না। কোথায় কবিরাজী করতে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু ক্ষতি নেই। বাড়ী চেনা গেল। আমার প্রয়োজন তার সাথে সর্প চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করা, বিষ ঝাড়ান নয়।

টি হোসেন বললেন, চলুন আপনাকে দিয়ে আসি।

—কোথায়?

—কেন বাড়ী ফিরবেন না? বারোটার উপরে বাজে।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এখন আপনি আবার এক মাইল উল্টা দিকে চলবেন? কোন্ প্রয়োজনে?

—এক মাইলে আমার কি করবে? এখনো অনেক কাজ সেরে তবে ফিরতে হবে আমাকে। চালাও, রিকশাওয়ালা।

—তাহলে বরং চলুন আমার কাজটা যেমন সারলেন আপনার কাজও তেমনি দুজনে গিয়ে সেরে নেই। কি কাজ আপনার বলুন।

—আরে সে অইবে। আপনে বাসায় যান দেহি। খাস ভাষায় বললেন টি হোসেন।

—আচ্ছা নাইবা গেলাম আপনার সাথে। শুনতে

পারি অন্ততঃ কোথায় কি কাজে বেরিয়েছেন ? আর কখন ফিরবেন ?

আরে সে অনেক কথা। হে দিয়া আপনে করবেন কি। রিকশাওয়ালা আমার পাশেই থাকে। সকাল বেলা বসে থাকে ঘরের সামনে। দরকার হলেই চড়ি। কাজ যখন শেষ হয় ফিরি। এর আবার কোন কিছু নির্দিষ্ট আছে নাকি ?

আমার বাসা এসে গেছে। নেমে গেলাম। রিকশাতে বেশী জায়গা পেয়ে টি হোসেন পায়ের উপর পা রেখে আমিরী কায়দায় বসলেন। আবার একটি চুরুট ধরালেন।

টি হোসেনের জীবনের পথ। যেখানে মনের দিগন্ত, সেখানে পথের দিগন্ত। রিকশা তাই চলতেই থাকে। পথে ভাঙা আছে, খাল আছে, পথ আগলিয়ে পাথর আছে, পথের ওপার এপার ঢেকে গাছ পড়ে আছে। কিন্তু আলপ্‌স্‌ থাকেনা। চলে যায়। অনেক দুর চলে গেছে টি হোসেনের রিকশা।

সবুজ মাঠ। তার মাঝখানে দিয়ে চলে গেছে সর্পিল যেরুয়া কাপড় পরা পথ।

খান বাহাদুর সাহেবের স্ত্রী মারা গেলেন। পাড়ার ছেলেদের ডেকে তিনি বললেন, তোমাদের তিনি ভাল বাসতেন তার স্মৃতি রক্ষার একটা ব্যবস্থা কর। ছেলেদের বহুদিনের আকাংখা মিটার একটা সুযোগ হল। ঠিক হল তারা একটা পাঠাগার খুলবে—তাহ্‌মিনা পাঠাগার। আলোচনা সভাতে আমারও ডাক পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখি টি হোসেন। ছেলেরা তাকে বলছে ক্যাশিয়ার হতে হবে। তিনি বলছেন, আমার কাজ খান বাহাদুর সাহেবের হুকুম তামিল করা আর আপনাদের খেদমত করা। ক্যাশিয়ারও বুঝিনা, কেরানীও বুঝিনা। যে-ভাবে আপনারা আমাকে চান সে-ভাবেই খেদমতে হাযির আছি।

টি হোসেন ক্যাশিয়ার নির্বাচিত হলেন। নগদ এক হাযার টাকা দিয়ে তাকে পাঠান হল ঢাকায়। পাঠাগারের পয়লা কিস্তির বই কেনার জন্য।

টি হোসেন আর ফিরেন না। পাঠাগারের তরফ থেকে চিঠির পর চিঠি গেল। লোক মুখেও তাগিদ গেল। আপনি না এলে পাঠাগারের উদ্বোধন হয় না যে। খালি আলমারি দিয়ে পাঠাগারের উদ্বোধন কি করে হবে ?

টি হোসেন জানালেন বই পেতে দেরী হচ্ছে। তারপর জানালেন, বই কেনা প্রায় শেষ কিন্তু আমি অসুস্থ। শেষে জানালেন খান বাহাদুর সাব ঢাকাতে আসার কথা আছে। তিনি এলে এক সাথেই আসছি।

খান বাহাদুর সাব ঢাকা গেলেন। তিনি ফেরার আগেই টি হোসেন ফিরে এলেন। ছেলেরা বলল, আপনি যখন এসে গেছেন খান বাহাদুর সাবকে ছাড়াই আমরা পাঠাগারের উদ্বোধন সেরে ফেলব। টি হোসেন বলতে চেয়েছিলেন, খান বাহাদুর সাবকে ছাড়া চলে কি করে ? কিন্তু ছেলেদের প্রস্তুতির বেগ দেখে ভয়ে আর কিছু বললেন না।

আগের দিন সন্ধ্যায় একজিকিউটিভের সভা। টি হোসেন সেখানে বই বুঝিয়ে দিবেন। টি হোসেন বললেন, আংশিক বই কেনা হলে খান বাহাদুর সাবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যখন জানতে পারলাম তিনি যাচ্ছেন ঢাকাতে তখন তাকে নিয়েই বাকী বই কেনা ঠিক করলাম। কারণ তিনি হলেন তোমাদের এবং আমারও মুরুব্বি। কিন্তু তিনি ত যেতে যেতে দেরী করলেন। শেষ পর্যন্ত আমি চলে এলাম। এখানে এসে আবার দেখি তিনি চলে গেছেন। কাজেই সামান্য যে কয়খানা বই কেনা হয়েছে তাই শুধু নিয়ে এসেছি। প্রকাণ্ড বড় ট্রাংকের তলদেশ থেকে টি হোসেন খান বিশেক বই বের করলেন। ট্রাংক দেখে সবাই ভেবেছিল ওটা ভাত বই।

ছেলেদের মুখ কালো হয়ে গেল। কেউ বলল, দরকার নেই উদ্বোধনের। কেউ বলল, যদি আগে জানতাম তা হলে কিছুতেই এ-কাজে আসতাম না। বড়দের কেউ কেউ টি হোসেনের কৈফিয়ত শুনে মুচকি হাসলেন।

টি হোসেন এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এবার কথা বললেন। কী হয়েছে কি ? উদ্বোধন হওয়াতে অসুবিধাটা কি ? কত বই লাগবে ?

—যত টাকা বই আনতে দেওয়া হয়েছে আপনাকে তত টাকার বইই লাগবে।

—তা কেন লাগবে ? যদি দু হাযার কি পাঁচ হাযার টাকার বই দিয়ে আমরা উদ্বোধন করি বাধা আছে ?

সবাই নীরব।

—বোধহয় নেই। যদি পাঁচ শো টাকার বই দিয়ে শুরু করি তাতেও নিশ্চয়ই নেই।

—কম বেশীর কথা হচ্ছেনা। যত টাকা বই কেনার জন্য দেওয়া হয়েছিল তত টাকার বই কেন আসবেনা ?

—আসবেনা কে বলছে ? এখন আসে নি। কেনার অসুবিধে ছিল তাই আসেনি।

—কিন্তু কিছু টাকার বই যখন কেনা হয়েছে তখন বাকী টাকার বই কেনার ব্যাপারে কী অসুবিধে ছিল তা আমরা বুঝতে পারছি না।

—কিছু টাকার বই কেনা হয়েছে সে অই এক হাযার টাকার মাঝখান থেকে নয়। এখানে এক শো টাকার

বই এসেছে। এটা আমার নিজের টাকায় কেনা। তাহমিনা পাঠাগারের জন্য এটা আমার ক্ষুদ্র দান। খান বাহাদুর সাবের বিবির স্মৃতিরক্ষাতে শরীক হওয়াকে আমি আমার পবিত্র কর্তব্য মনে করি।

সবাই নীরব। কেউ কেউ ভাবেন তাহলে এক শো টাকা ব্যয় করে কি এক হাযার টাকা গায়েব করা?

টি হোসেন আবার কথা বলেন।—আর আপনাদের যে এক হাজার টাকা তা এই নিন্।

এক হাযার টাকার নোটখানা সেক্রেটারীর সামনে ধরে দিলেন টি হোসেন। টাকা রাখুন। টাকা থাকলে বই আসবে।

সবাই চুপ্। আমি বললাম্ এতদিন থাকলেনই, টাকাও দেখা যায় সাথেই ছিল। তবু বই নিয়ে এলেন না কেন?

টি হোসেন আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, দেখুন স্যার ভুলে যাবেন না। আমি একলা মানুষ। একটি অল পাকিস্তান কন্সার্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সময় কোথায়? আসতে সময় এক দোকান থেকে এক শো টাকার বই নিয়ে এলাম। উদ্বোধনটা সারতে হবে ত। অল পাকিস্তান কন্সার্ন চালিয়ে তারপর সময় পাচ্ছি কোথায়? এটা থেকে আমাকে মুক্তি দিন, আমি আপনাদের পেছনে আছি।

টি হোসেনের আর সময় হয় নি।

হঠাৎ খান বাহাদুর সাব কেন্দ্রের উযির হয়ে গেলেন। তারো চেয়ে হঠাৎ সংগে সংগে টি হোসেন উধাও হলেন। অল পাকিস্তান হাবলি অয়েল সোসাইটি লিমিটেডের দরজায় তালাচাবি লাগল।

দিনের পর দিন যায়। হপ্তার পর হপ্তাহ। শেষে মাসের পর মাস। ডাক দিলে পেছনের পাকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাবুরচি ছোক্‌রা। বলে, সায়েব ত চিঠিও দেন না, কিছুই না। খরচও ফুরিয়ে এসেছে।

একদিন সেও চলে যায়। একা দাঁড়িয়ে থাকে টি হোসেনের একক জীবনের মতই অল্ পাকিস্তান কনসার্ন।

অনেকদিন পর আবার করাচী গেলাম। আশা ছিল সাত দিনে কাজ শেষ হবে। একমাস চলে গেল। যেখানটায় থাকবার জায়গায় হয়েছিল সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়া প্রয়োজন। কথায় কথায় জানতে পারলাম একটি নতুন পূর্বপাকিস্তানী হোটেল হয়েছে সম্প্রতি। পূর্ব পাকিস্তানী খানা খাওয়ার খুব ভাল এনতেযাম। টি হোসেন নামে এক ভদ্রলোক তার ম্যানেজার।

টি হোসেন? আমাদের টি হোসেন তা হলে? কৌতুহল হল।

গিয়ে দেখি সত্যি টি হোসেন। দু'জনে বহুদিন পর দেখা। আলাপ হল অনেকক্ষণ। বললেন, বিছানাপত্র নিয়ে আসুন সোজা এখানে। আর অন্যত্র কেন?

বললাম, এখানে এসে যে ম্যানেজার হয়েছেন আপনার প্রতিষ্ঠানের কি হবে?

ম্যানেজার? কে বলল আপনাকে? খান বাহাদুর সাব দিয়েছেন হোটেলটা। ছোট করে বললেন, অবশ্য কনফিডেনশিয়াল, শুধু আপনি বলে। বললেন, হোটেলটা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাও। তাই আছি। দাঁড় করিয়ে দিয়েই চলে যাব।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে ফেলে রেখে অতদিন থাকা। টাকা পয়সার দিক থেকে পোষাবে ত?

টাকা পয়সার কোন প্রশ্নই নেই। টাকা পয়সা দিয়ে আমি কি করব? আমি যা নিয়ে আছি তা হচ্ছে একটা অল পাকিস্তান কনসার্ন। টাকা পয়সার দিকে চেয়ে বসে থাকলে চলবে আমার?

তা হলে পাচ্ছেন টাকা পয়সা। কত পাচ্ছেন?

বললাম ত টাকা পয়সার প্রশ্ন নেই। খান বাহাদুর সাব মুরুব্বী মানুষ। বললেন, খাড়া করে দাও হোটেলটা। তাই চেষ্টা করছি। দেখা যাক্।

কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানটি যে শেষ হবার যোগাড়।

কি শেষ হবে? মুখের কথা বললেই হল?

অনেক নাকি পাওনাদার রয়েছে? তারা খুব ঘুরাঘুরি করছে দেখে এলাম। যদি নীলাম টিলাম হয়ে যায়।

ও, নো, নো, নো। আফটার অল এ্যান অল পাকিস্তান কনসার্ন। দেনা কার না আছে? পঞ্চম জর্জ, আই মিন, জর্জ দি সিক্সথ্, আই মিন, রাণী এলিজাবেথের নেই? পরে ছোট করে বললেন, একটা কথা বলব? অফকোর্স কনফিডেনশিয়াল—আপনি বলেই বলছি। বলবেন না! অবশ্য দুদিন পরে সবাই জানবে। তথাপি আগেই ঢাক না পিটানই ভাল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছি। খান বাহাদুর সাব ব্যাক করছেন। সরকার পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া স্থির করেছে। হয়ে যাবে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। য়্যাণ্ড দেন, ইউ উইল সি। পাওনাদারস, আই শ্যাল স্যাটিস্ফাই এভ্রি ওয়ান অফ দেম। য়্যাণ্ড টু দি লাষ্ট ফারদিং।

করাচী থেকে ফিরে এলাম। আরো তিন মাস গেল। শকুনের মত পাওনাদারেরা টি হোসেনের ঘরটার চার পাশে ঘুরাফেরা করে। আমি কথা দিয়ে দিয়ে রাখি। টি

হোসেনকে চিঠি দেই। তিনি লেখেন, আপনাকে যে বলেছিলাম, সেটা হয়ে এসেছে। ফাইনান্সে আটকা পড়েছিল। তাই দেরী হয়েছে। এবার চট করে চলে আসছি।

আরো তিন মাস গেল। তারপর একদিন অল পাকিস্তান হার্বাল অয়েল সোসাইটির সরখানি নীলাম হয়ে গেল। পাওনাদারেরা চেয়ার, টেবিল, আলমারি, টিন, কাঠ ভাগ করে নিল। সে দৃশ্য নীরবেই আমাকে দেখতে হল। তবু টি হোসেন এলেন না।

তারপর একদিন খানবাহাদুর সাহেবের ওয়ারেন্ট চলে গেল। তিনি হোটেল বন্ধ করে দিলেন।

টি হোসেন আর ফিরলেন না। খান বাহাদুর সাবকে জিগ্‌গেস করলে বললেন, কেন, সে আসেনি? সে ত আমার আগেই চলে এসেছে?

টি হোসেন রহস্যের মতই হারিয়ে গেলেন।

এ-কাহিনীর এখানেই ইতি হওয়া ভাল ছিল। কিন্তু আরও খানিকটা না বললে চলে না।

ঠিক দশ বছর পর সেই টি হোসেনের সাথে সেদিন দেখা। ঢাকার একটা ময়লা দেশী রেস্তোরাঁতে। আমাকে ডেকে নিলেন নওয়াবপুর রোডের উপর থেকে। চেনা যায় না। লম্বা দাড়ি, মাথায় ময়লা গোল কাপড়ের টুপি। দাঁত পড়েছে। হাতে একটি ছাল্লার তালি দেওয়া বাজারের ব্যাগ। কাগজ দিয়ে ভর্তি।

টি হোসেনের সেই আলিফের মত সোজা দেহটি নেই। ধনুর মত বেঁকে গেছে। শুধু গলার আওয়াজটা ঠিক আছে।

প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর বললেন, তুমি নাকি বড় উকিল হয়েছ, ভাই? আমার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমাটা করে দেবে? ডামেইজ সুট? মানি য়্যাণ্ড ড্যামেইজ? দেওয়ানী কর ত? না শুধু ক্রিমিনাল?

সবই করি। কিন্তু কিসের ডামেজ সুট?

কেন সেই যে পঁচিশ হাজার টাকা? আমার অল পাকিস্তান কনসার্নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মনযুর করল? খান বাহাদুর সাবের হোটেলের বেগার খেটে দিলাম যার মূল্য বাবদ?

তাজ্জব হয়ে জিগ্‌গেস করলাম, সে টাকা আপনি পেয়েছিলেন? তা হলে আপনার প্রতিষ্ঠান গেল কেন?

পেলাম না? পেলাম ত পঁচিশ হাযার টাকা। টাকা নিল খান বাহাদুর। সেই শয়তান। তারপর তার একটি পয়সাও ত আমার হাতে দিল না। সব টাকা মেরে দিল।

কিন্তু তিনি নিলেন কেন আপনার টাকা?

আহা, তোমাকে বুঝি বলিনি? তিনি উযির হওয়ার পর তাঁকেই যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান করেছিলাম। চেয়ারম্যান হিসাবে তিনিই টাকাটা রিসিভ করেছিলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

টি হোসেন বললেন, কথা বলছ না যে ভাই। পারবে আমার মোকদ্দমা করে দিতে? সব শয়তানদের একবার আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। চোর খান বাহাদুরকে আর অই সব তস্করদের যারা আমার অবর্তমানে আমার দোকান ভেঙে আমার সব ফর্মুলা চুরি করেছে পাওনা আদায় করার নামে।

ফর্মুলার কথা বলতেই টি হোসেনের গলা ভেঙে গেল। তার দুটি ক্লান্ত চোখ বেয়ে আঁসুর ধারা এসে টস্ টস্ করে পড়ল তার ময়লা দাড়ির উপর।

টি হোসেন শান্ত হওয়ার পর তাকে বুঝিয়ে বললাম এ নিয়ে মোকদ্দমা করার উপায় নেই। কে মোকদ্দমা করবে? টাকার মালিক দি অল পাকিস্তান হার্বাল অয়েল সোসাইটি লিমিটেড। সে প্রতিষ্ঠানের ত আজ আর অস্তিত্ব নেই।

টি হোসেন বললেন, তা হলে তুমিও অই একই কথা বলছ? তুমিও আর সবার মত হলে? একটা অল পাকিস্তান কনসার্ন সেটা এমনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? আমার সারাটা জীবন দেওয়া তা হলে বৃথাই হল?

আমি তাঁর এ-প্রশ্নের কোন জওয়াবই দিতে পারলাম না। শুধু তার অশ্রুসজল চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। এক সময় আমারও দু'চোখ জ্বালা করে উঠলো।

হজরত ইবরাহীম আলাইহেস সালাম

মুস্তাফীজুর রহমান

নাম ও খান্দান

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ইবনে আযর ইবনে নাহুর, ইবনে সরুজ ইবনে রুউ ইবনে ফালেহ ইবনে আমের ইবনে সালেহ ইবনে আরফাকশাজ ইবনে সাম ইবনে নূহ আলাইহেস সালাম। (১) অবশ্য তওরাতে হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর পিতার নাম তারেখ উল্লেখ রহিয়াছে। আযরের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিদ্‌দের মধ্যে কিছুটা মতভেদ থাকিলেও তাহাদের উল্লেখিত সব তাৎপর্যের মধ্যেই একটি সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রাচীন মিসরের প্রধানতম প্রতিমার নাম আযর, অথবা শ্রেষ্ঠ পুজারী আযর, অথবা শ্রেষ্ঠ মূর্তি প্রস্তুত কারীকে আযর—যে অর্থই লওয়া হয়না কেন, হজরতে ইবরাহীমের পিতার আসল নাম তারেখ হওয়া সত্বেও তাহার আযর নামে পরিচিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নহে।

কোরআন মজীদে বাকারা, আল্‌-এমরান, নেসা, আল্‌-আনআম, তওবা, হুদ, ইবরাহীম, নহল, আম্বিয়া, শোয়ারা, আহ্‌যাব, সা-দ, জোখরোফ, নজম, মোম্‌তাহেনা, ইউসুফ, হাজ্জর, মরইয়ম, হজ্জ, আনকবুত, সাফ্‌ফাত, শোরা, জারিয়াত, হাদীদ, আল্‌-আলা প্রভৃতি সূরায় হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

তওরাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইবরাহীম ইরাকের আওর কসবার কাল্দান বংশের লোক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ মূর্তি পূজক ছিল, ইনজীলে বলা হইয়াছে যে তাঁহার পিতা কাবির মূর্তি প্রস্তুত করিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া থাকিত।

অতি অল্প বয়সেই হজরত ইবরাহীম দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতা মূর্তি পূজক ও প্রস্তুত কারক। মূর্তির তেজারতই তাহার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। জীবন প্রভাতে এই পরিবেশ তাঁহার ভাল লাগল না। সেই কচি বয়সেই বিবেক তাঁহাকে আঘাত করিল: এ, কী? এই মূর্তিগুলি ত কোন কিছু শুনিতে এবং দেখিতে পার না। ইহারা কাহারও ফরিয়াদের জবাব দিতে পারে না; ইহারা কাহারও কোন প্রকার লাভ-লোকসান করিতে পারে না। তিনি সব সময় দেখিয়া থাকিতেন যে তাঁহার পিতা নিজ হাতে ঐগুলি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পছন্দ মত সে উহার চোখ, নাক, কান, হাত ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি জুড়িয়া দিয়া থাকেন। যথাযথ রূপগুলি প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া আসেন। খরিদ্দারগণ এবং তিনি আবার এই গুলির পূজাও করিয়া থাকেন। তিনি ভাবিতেন: এই হাতে গড়া প্রতিমাগুলি কী করিয়া মানুষের মাবুদ হইতে পারে?

নবুওৎ লাভ

যথা সময়ে আল্লাহ হজরত ইবরাহীমকে নবুওৎ দান করিয়া সরফরাজ করিলেন। নবুওৎ প্রাপ্তির পূর্বে তিনি যে ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন নবী হওয়ার পরও তিনি সেই মতেই তাহার জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به
عالمين - اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل
التى انتم لها عاكفون - قالوا وجدنا اباءنا لها
عابدين - قال لقد كنتم انتم و اباؤكم فى ضلال
مبين - قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللعبين -
قال بل ربكم رب السموت والارض وانا على ذلكم
من الشاهدين - (الانبياء)

"আর আমরা পূর্বেই ইবরাহীমকে সত্যের সন্ধান দিয়াছি। আমরা তাহার ব্যাপার অবগত ছিলাম; যখন সে তাহার পিতা এবং জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল যে মূর্তিগুলি সম্মুখে রাখিয়া তোমরা বসিয়া থাক, ইহা কী? তাহারা বলিল: আমরা আমাদের বাপ-দাদাগণকে উহার পূজা করিতে দেখিয়াছি। সে বলিল নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদাগণ সাফ গোমরাহীতে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা বলিল: তুমি আমাদের জন্য কোন প্রকার সত্যের সন্ধান লইয়া আসিয়াছ, না আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছ? সে বলিল: এই প্রতিমাগুলি তোমাদের প্রতিপালক হইতে পারে না। বরং উর্দ্ধ জগৎ এবং এই পৃথিবীর স্রষ্টাই তোমাদের প্রভু প্রতিপালক। আমিও ইহা স্বীকার করিয়া থাকি।"

বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর বিশ্বাসও দৃঢ় হইতে লাগিল। মূর্তি ও তারকা পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার মনে বিদ্রোহ দেখা দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহার জাতি নির্বোধ! তাহারা নিজ হাতে পছন্দমত পুতুল তৈয়ার করিয়া তাহার এবাদত করিয়া

(১) ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড ৬৭ পৃঃ

থাকে। আকাশের জল্‌জল্‌ তারকাকে তাহারা মনে করিয়া থাকে মহান—অসীম! এইগুলির তাহারা এবাদত করে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাহাদের অন্তর হইতে এক মহান আল্লার ধ্যান-ধারণা পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। জাতির এই প্রকার মানসিক অধঃপতন ও চিন্তা-বিপর্য্যয় তাঁহাকে ব্যথিত করিল। তিনি একমাত্র সহজ স্বাভাবিক ধর্ম প্রচারের সংকল্প করিলেন। জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—

"হে আমার জাতি! তোমরা ইহা কি করিতেছ। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তোমরা নিজ হাতে কাঠ কাটিয়া তদ্বারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া থাক। একটা মূর্ত্তি তোমাদের পছন্দমত তৈয়ার না হইলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আর একটা প্রস্তুত করিতেছ। তোমরা দিব্য চক্ষে দেখিয়া থাক যে এইগুলোর কোন ক্ষমতাই নাই। তবু কেন তোমরা উহার ইবাদৎ কর? তোমরা কী করিয়া বিশ্বাস কর যে, এই অসাড় প্রতিমাগুলিরও শক্তি আছে? ইহারা মানুষের লাভ-লোকসান করিতে পারে? তোমরা এই সব বাজে কাজ হইতে বিরত থাক। এক আল্লার নিকট মাথা নত কর। তিনি তোমাদের এবং বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা ও পালক।"

হজরত ইবরাহীমের এই আকুল আবেদনে কোন ফল হইল না; বরং সত্য ও একত্ববাদ গ্রহণের পরিবর্তে তাহারা হজরত ইবরাহীমকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল।

পিতাকে সত্যের আহ্বান

জাতির বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও হজরত ইবরাহীমের সত্য প্রচারের আগ্রহ হ্রাস পাইল না। তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে অটল থাকিয়া প্রচার কার্য্য চালাইয়া গেলেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁহার পিতাকে পুতুল পূজার অসারতা বুঝাইবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "এই যে পথ আপনারা অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা সত্য পথ নহে। আমি আপনাদিগকে তাওহিদের যে পথের দিকে ডাকিতেছি, তাহাই প্রকৃত মুক্তির পথ। আপনি গোমরাহীর রাস্তা ত্যাগ করিয়া নাজাত ও মর্য্যাদার পথ গ্রহণ করুন।"

হজরত ইবরাহীম (আঃ) একান্ত বিনয়ের সাথে ও যুক্তিসঙ্গত কথায় তাঁহার পিতাকে সত্যের পানে আহ্বান জানাইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফায়দা হইল না। তাঁহার ওয়ালেদ স্বীয় খান্দানী পথ ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। বরং তাঁহার কথায় আযরের মনে গোস্সা হইল। তিনি তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন: "দেখ, তুমি যদি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য করিতে থাক, তা' হইলে তোমার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। তোমাকে এই অপরাধের দরুণ পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে।"

ব্যাপার যখন এতদূর গড়াইল, তখন হজরত ইবরাহীম বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। একদিকে পিতার বাড়াবাড়ি, অপরদিকে সত্য প্রচারের তাগিদ—নবুওতের মহান কর্তব্য। এই দুইয়ের মধ্যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই নবুওয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি আল্লার নবী রসূলদের চিরাচরিত রাহা অবলম্বন করিলেন। দুঃখ-বরণ, ত্যাগ ও তাওক্কালের পথে চলাই স্বীয় কর্তব্য মনে করিলেন। পিতার সাথে কোন প্রকার বে-আদবী না করিয়া একান্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন: "আব্বা, এই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তা' হইলে আমি আমার এরাদাও আপনাকে জানাইয়া দিতেছি। প্রতিমা পূজা করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। প্রতিমা পূজার অসারতা বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং সালাম জানাইয়া আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমাদের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক এইখানেই শেষ। আমি আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি; বটে তবে আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিব না। বরং গায়েবানা আপনার জন্য আল্লার দরগাহে মুনাজাত করিতে থাকিব—তিনি যেন আপনাকে সত্য ও হেদায়েতের সন্ধান দেন।"

"হে নবী, আপনি আল কেতাবে ইবরাহীমকে স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যাদর্শী নবী। যখন সে তাহার অ আব্বাকে বলিয়াছিল: পিতঃ! আপনি কেন এমন বস্তুর পূজা করেন যাহার না কোন কিছু শুনিবার ক্ষমতা আছে, না কোন কিছু দেখিবার। যাহা মানুষের কোন উপকার করিতে পারে না। পিতঃ! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি যে, আমি এমন একটি জ্ঞানের আলোক লাভ করিয়াছি; যাহার সন্ধান আপনি পান নাই। আপনি আমাকে অনুকরণ করুন। আমি আপনাকে সত্যের পথে পরিচালিত করিব। আব্বা! আপনি শয়তানের পয়রবী করিবেন না। সে আল্লার নাফরমান হইয়াছে আব্বা! আমি ভয় করিতেছি—আল্লার কাছ হইতে কোন আযাব যেন আপনাকে পাইয়া না বসে। আপনি যেন শয়তানের সাথী না হইয়া যান।"

এই সকল কথা শুনিয়া আযর বলিল: "ইবরাহীম! তুমি আমার মাবুদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছ কি? স্মরণ রাখিও, যদি তুমি এসব কথা হইতে বিরত না হও; তা' হইলে আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিব। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে স্বীয় জান সালাম লইয়া

আমার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাও।" ইবরাহীম বলিল: "আমার সালাম কবুল করুন। আমি চলিয়া যাইতেছি। অবশ্য এখন হইতে দূরে থাকিয়া আপনার মাগফেরাৎ কামনা করিতে থাকিব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড় মেহেরবান। আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম। আপনারা আল্লাহ ছাড়া যে মা'বুদের ইবাদৎ করিয়া থাকেন, আমি তাহা ত্যাগ করিলাম। আমি আমার পরওয়ারদেগারকে ডাকিতেছি। আমার বিশ্বাস—তিনি আমাকে মহরূম করিবেন না।" (মরইয়ম)

জাতিকে ইসলামের পথে আহ্বান

হজরত ইবরাহীম (আঃ) যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার প্রচারকার্য্য আরও ব্যাপক ভাবে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার ওয়ালেদকে সত্যের পথে ডাকিয়াছিলেন, এখন তিনি তাঁহার জাতিকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ কোন ফায়দা হইলনা। তাঁহার জাতি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলনা। তাহারা যেন দেখিয়াও দেখিল না। শুনিয়াও শুনিল না। তাহারা যে প্রতিমাগুলির পূজা করিত; সেইগুলি যেমন শ্রবণ ও দর্শনশক্তি হইতে ছিল বঞ্চিত, তদ্রূপ তারাও যেন শ্রবন ও দর্শনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল।

হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর জাতি যখন কিছুতেই তাহাদের বাপদাদার মযহাব ছাড়িতে রাজী হইল না; তখন হজরত ইবরাহীম (আঃ) তাহাদিগকে প্রশ্ন করিল, "দেখ, এই যে প্রতিমাগুলির তোমরা পূজা করিতেছ, ইহাদের কী ক্ষমতা আছে? ইহারা তোমাদের কী লাভ লোকসান করিতে পারে?" জবাবে তাহারা বলিল: "অতসব ফ্যাসাদের দরকার কি? আমরা এত সওয়াল জবাব দিতে রাজী নহি। আমাদের বাপ-দাদাগণ যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহাই করিতেছি। বাস্, এতটুকু মাত্র বলিতে পারি। এর বেশী কিছু নহে।"

এইবার তিনি তাঁহার বক্তব্যের ধারা বদলাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ মূর্তিগুলোকে আমি আমার দুষমন মনে করি। আমি ঐগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। আমি দেখিতে চাই, ঐ অসাড় মূর্তিগুলি আমার কি ক্ষতি করিতে পারে?

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস; সারা জাহানের মালিক আল্লাহ-ই আমার প্রভু। তিনি আমাকে পয়দা করিয়াছেন। সত্য পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিয়া থাকেন। অসুস্থ হইলে তিনি-ই আমাকে আরোগ্য করেন। তিনি আমার হায়াত-মওতের মালিক। তাঁর দরবারে আমার মুনাজাত তিনি যেন দয়া করিয়া আমার গুণাহ্ সমূহ মাফ করিয়া দেন।

"পরওয়ার দেগার! তুমি আমাকে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তওফীক দান কর। নেক লোকদের ফিরিস্তিতে আমার নাম শামিল কর। আমাকে সত্য-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে জান্নাতের নেয়ামত দান কর।"

এই সম্পর্কে কোরআন মজীদে ইরশাদ করা হইয়াছে; "আপনি আপনার জাতিকে ইবরাহীমের কথা বলুন। যখন সে তাহার পিতা এবং তাহার জাতিকে সওয়াল করিল;—তোমরা কিসের ইবাদৎ করিয়া থাক। তাহারা বলিল: আমরা প্রতিমা পূজা করি: আমরা সদাসর্ব্বদা উহার নিকট বসিয়া থাকি। সে বলিল; তোমরা যখন ঐগুলোকে ডাক, তখন তাহারা তাহা শুনিতে পায় কি? তাহারা তোমাদের কোন প্রকার লাভ-লোকসান করিতে পারে কি? তাহারা বলিল: (আমরা এত কথার জবাব দিতে পারিনা) আমরা আমাদের বাপ-দাদাগণকে যাহা করিতে দেখিয়াছি—আমরাও তাহা করিতেছি। সে বলিল: বেশ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাহার ইবাদৎ করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমার দুষমণ। তবে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আমার প্রভু। যিনি আমাকে পয়দা করিয়াছেন, তিনি আমাকে সত্যের সন্ধান দিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পানাহার করিতে দিয়া থাকেন। যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি তখন তিনি আমাকে শাফা দিয়া থাকেন। তিনি আমাকে হায়াত মওত দিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস, রোজ কিয়ামতে আমার গুনাসমূহ মাফ করিয়া দিবেন। প্রভু আমাকে হুকুম দাও। আমাকে সৎ লোকদের দলভুক্ত কর। পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার সত্য স্মৃতি বজায় রাখ। আমাকে নেয়ামতের কুঞ্জ-কাননের অধিকারী কর। আমার বাপকে মাফ কর। নিশ্চয়ই সে বিপথ-গামীদের দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রোজ হাশরে আমাকে শরমেন্দা করিও না। সেই দিন মাল ও আওলাদ কোন কাজে আসিবেনা; তবে যে আল্লার হুজুরে আসিয়া থাকিবে সুস্থ অন্তঃকরণ লইয়া সেই মুক্তিলাভ করিবে।"

(শোয়ারা)

এই প্রকার যুক্তিসঙ্গত ও আবেদন-নিবেদনেও কোন লাভ হইলনা। আযর এবং তার সাথীগণ সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হইলনা। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত ইবরাহীমের সমাজে নক্ষত্র-পূজারও প্রচলন ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের হায়াত, মওত, রিজিক লাভ-লোকসান, ফসল উৎপাদন, আকাল, জয়-পরাজয়, ইত্যাদি তারকারাজির ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ইহারা যাদের প্রতি খুশী থাকিবে তাহাদের জীবন সুখের হয়, আর ইহারা যাদের প্রতি থাকে নারাজ তাদের দিন হয় দুঃখের। সুতরাং তারকারাজিকে খুশী রাখার চেষ্টা করা দরকার। এই জন্য তাহারা নক্ষত্রের পূজা করিয়া থাকিত।

হজরত ইবরাহীম (আঃ) মনে করিলেন—পুতুল, প্রতিমা পূজার অসারতা যেমন বর্ণনা করা দরকার, তেমনি সেতারা পূজার অযৌক্তিকতাও বর্ণনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন,—কী করিয়া ইহা সহজ ও ফলপ্রসূ হইতে পারে? কেননা যে সমাজ হাতে গড়া অসাড় মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে কোন প্রকার মন্তব্য শুনিতে রাজী নহে, তাহারা মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে অবাঞ্ছিত কোন কথাই শুনিতে প্রস্তুত হইবে না। সরাসরি এই প্রকার মন্তব্যে হিতে-বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাও রহিয়াছে। সুতরাং তিনি এই ব্যাপারে একটা নেহায়েৎ যুক্তিসঙ্গত দার্শনিক পন্থ অবলম্বন করিলেন।

আসমানে অগণিত তারকা। হজরত ইবরাহীম আঃ দেখিলেন—একটি তারকা বড় উজ্জ্বল। তিনি বলিলেন: এই আমার প্রভু প্রতিপালক। কিন্তু যথা সময়ে যখন উহা অস্ত গেল, তখন তিনি বলিলেন: অস্তগামী তারকা কখনও মাবুদ হইতে পারে না। পরের ইঙ্গিতে যাহার উদয়-অস্ত, সে কী করিয়া মানুষের পূজনীয় হইতে পারে? তিনি আবার আকাশের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন: দূর আসমানে উজ্জ্বল চাঁদ হাসিতেছে, উহা আরও বড়, আরও রওশন—নক্ষত্রই যদি পরওয়ারদেগার হইতে পারে, তবে এটাই ত শ্রেষ্ঠ, সবার সেরা, তিনি বলিলেন, এই আমার প্রভু প্রতিপালক। রাত শেষ হইয়া আসিল, দূরদিগন্তে দেখা দিল সুবেহ্-সাদেকের সূর্য নূর। তিনি বলিলেন: ইহাও আমার মাবুদ হইতে পারে না। এইবার তিনি তার সমাজের সম্মুখে তাঁর প্রকৃত মালিক সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন বটে, তবে তা' একান্ত দক্ষতার সাথে—যাতে তাদের তাঁর প্রতি হঠাৎ বিরূপ হওয়ার কোন কারণ ঘটিল না। তিনি বলিলেন—আমার প্রভু যদি আমাকে সত্য পথের সন্ধান না দিত, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই বিপথগামীদের দলভুক্ত হইয়া পড়িতাম।

তারকা অস্ত গেল। চাঁদ আড়ালে মুখ ঢাকিল। পূব আকাশে দেখা দিল অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য। দিনের নূরে সারা জাহান হইল নূরানী। হজরত ইবরাহীম বলিলেন: "সূর্য্য ত তারা ও চাঁদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইহাই আমার প্রভু। যথা সময়ে দিনান্তে রাতের আঁধারে দুনিয়া আচ্ছন্ন হইল। সূর্য্য মুখ ঢাকিল ইরাকের পশ্চিম প্রান্তে। এইবার তিনি তাঁর জাতির সামনে ঘোষণা করিলেন: এর একটাও মানুষের মাবুদ হইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ে উদয়-অস্ত যাদের ধর্ম, তারা ত বাঁধা নিয়মেরই অধীন। এরা কী করিয়া মানুষের মাবুদ হইতে পারে? তিনি এলান করিলেন: হে আমার জাতি! তোমাদের এই প্রকার অযৌক্তিক ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। যিনি আসমান-যমীন পয়দা করিয়াছেন, আমি সর্ব্বোতভাবে একমাত্র তাঁরই দিকে মুখ করিয়াছি। তাকেই প্রভুরূপে স্বীকার করিতেছি। আমি মোশরেক-দের দলভুক্ত নাই।"

হজরত ইব্রাহীম (আঃ)এর অকাট্য দলীল প্রমাণের মোকাবেলায় তাঁর সমাজের কোন বক্তব্যই রহিল না। এইবার তারা একেবারে লা-জওয়াব হইয়া পড়িল। যুক্তির পরিবর্তে যুক্তি দেখাইতে যখন তাহারা অপারগ হইল, তখন তাহারা প্রতিশোধ ও অভিশাপের পথ গ্রহণ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল: "দেখ ইবরাহীম! তুমি যে আমাদের মাবুদগুলোর বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতেছ, এর পরিণাম তোমার পক্ষে খুবই দুঃখজনক হইবে। তুমি নিশ্চয়ই অভিশাপে পতিত হইবে।"

হজরত ইবরাহীম আঃ তাঁহার সমাজের উপরোক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা আমাকে যে ভয় দেখাইতেছ, তাহাতে আমি কখনও ভীত নহি। তোমাদের ঐ বাতিল মাবুদগুলির কোন ক্ষমতাই নাই। উহারা মানুষের কোন লাভ-লোকসান করিতে পারে না। এই বিশ্বাস আমার আছে। আমার প্রকৃত মাবুদ মালিক সে সম্পর্কও আমাকে যথেষ্ট জ্ঞান ও দলিল প্রমাণ দান করিয়াছেন; সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চিত যে আমার পথ সত্য ও হেদায়েতের পথ। তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, উহা অসত্য এবং গোমরাহীর পথ।"

"আর ইবরাহীমের সাথে কথা কাটাকাটি করিল তার জাতি। সে বলিল—তোমরা কি আমার সাথে আমার প্রভু সম্পর্কে হুজ্জত করিতেছ—তিনি ত আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়াছেন। তোমরা আল্লার সাথে যাহা-দিগকে শরীক করিয়া থাক; আমি উহাকে ভয় করি না। হ্যাঁ! তবে আমার প্রভু যাহা চা'য়, তাহাই ঘটিয়া থাকে। আমার প্রভুর এলম সর্ববাপী। তোমরা কেন সদুপদেশ গ্রহণ কর না? তোমরা আল্লার সাথে যাহা-দিগকে শরীক করিয়া থাক, উহাকে কেন ভয় করিব? অথচ তোমরা আল্লার সাথে দলীল প্রমাণ ব্যতীত অপরকে শরীক করিয়া থাক—ইহাতে তোমরা মোটেই ভীত নও। এখন বল ত দুই দলের মধ্যে শান্তির উপযোগী কারা? যদি তোমরা বিবেকবান হও, যাঁহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাঁহাদের ঈমানকে শির্কের দ্বারা কলুষিত করে নাই, তাঁহারাই নিরাপদ এবং সত্য পথ প্রাপ্ত। এমনি প্রমাণপুঞ্জিসমূহ আমরা ইবরাহীমকে

দিয়াছি—তাঁহার কওমের বিরুদ্ধে। আমরা যাঁকে ইচ্ছা করি উচ্চ মর্য্যাদা দিয়া থাকি। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মহাজ্ঞানী সুনিপুণ।” (আনআম)

এই সম্পর্কে কোরআন মজিদে আরও ইরশাদ করা হইয়াছে: “যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলিল—আপনি মূর্ত্তিগুলিকে মাবুদ মনে করিতেছেন? নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এবং আপনার কওমকে স্পষ্ট বিপথগামী দেখিতেছি। এমনি আমরা ইবরাহীমকে আসমান এবং যমীনের বাদশাহাতের প্রত্যক্ষদর্শী করি, যেন সে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হয়।” (আনআম)

মূর্ত্তি পূজকদের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ মূর্ত্তিগুলির অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা মানুষের যেমন উপকার করিতে পারে, তেমনি ক্ষতিও করিতে পারে। সুতরাং ঐগুলির তাজীম করা উচিৎ। হজরত ইবরাহীম (আঃ) সাধ্যমত তাঁহার কওমকে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ঐগুলির কোন শক্তিই থাকিতে পারে না। ঐগুলি ত মানুষের হাতে গড়া প্রতিমা। ঐগুলি অন্ধ, মূক ও বধির। অসাড় অনড় বস্তু মানুষের লাভ-লোকসান করিতে পারে কি করিয়া? তিনি তাঁহার জাতিকে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন বটে, তবে তাহাতে কোন ফায়দাই হইল না। তিনি যখন যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তাহাদিগকে মূর্ত্তি পূজার অসারতা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার কওমের ধর্মযাজকগণ বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিল: দেশবাসীগণ তাহার কথায় মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। এই ভয়ে তাহারা মূর্ত্তিগুলির অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলো। তাহারা বিশেষ জোরের সাথে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, যদি কেহ হজরত ইবরাহীমের কথায় ঐগুলির সঙ্গে কোন প্রকার বেআদবী করিবে, তা হইলে তাহার মুসিবতের অন্ত থাকিবে না। তাহাদের এই প্রকার প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে মূর্ত্তি পূজার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল।

হজরত ইবরাহীম (আঃ) মনে করিলেন: যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার দেশবাসীগণকে বুঝাইতে হইবে যে মূর্ত্তিগুলির কোন ক্ষমতাই নাই। এই বিশ্বাস তাহাদের মনে জন্মাইতে না পারিলে হাজার প্রচার কার্য্যেও কোন ফল হইবে না। এবং তিনি যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ হইবে না। এই বিষয়ে মনস্থির করিয়া তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। দেশবাসীকে বলিলেন:

تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين

“তোমাদের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মূর্ত্তিগুলির সাথে একটা চাল চালিব।”

সেই সময় তাঁহার দেশবাসীগণ একটা মেলা উপলক্ষে অন্যত্র যাইতেছিল। তাহারা হজরত ইবরাহীম (আঃ)-কেও তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলিল। তিনি আকাশের তারকাগুলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন: “আমি অসুস্থ।”

فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم - فتولوا عنه مدبرين -

“সে নক্ষত্ররাজির দিকে একবার তাকাইয়া বলিল: আমি (মানসিক) অসুস্থ। (ইহা শুনিয়া) তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।” (সা—ফ্—ফা—ত)

দেশের ছোট বড় সকলেই মেলার আনন্দে মত্ত রহিল। এই সুযোগ নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এইবার প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিতে হইবে যে প্রকৃত পক্ষে মূর্ত্তিগুলির কোন ক্ষমতাই নাই। তিনি মূর্ত্তিগুলির নিকট চলিয়া গেলেন। দেখিলেন: উহার সামনে রকম রকমের ফল-পাকড়া খানা-পিনা মওজুদ রহিয়াছে। তিনি উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: কেন, তোমাদের কী হইয়াছে। এত সব খাদ্য-দ্রব্য ফল-মূল পড়িয়া রহিয়াছে—অথচ তোমরা তাহা গ্রহণ করিতেছ না। ইহার কারণ কি?

فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون مالكم لا تنطقون
فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا الا كبيرا
لهم لعلهم اليه يرجعون -

“অতঃপর সে নীরবে ঢুকিয়া পড়িল, তাহাদের মাবুদগুলির নিকটে। বলিল—“তোমরা (এই সব খাদ্যদ্রব্য) গ্রহণ করিতেছ না কেন? তোমাদের কী হইয়াছে? তোমরা কথা বলিতেছ না কেন? শেষে সে স্বীয় ডান হাতের সাহায্যে ঐগুলিকে আঘাত করিয়া প্রধানটি ব্যতীত বাকীগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; যেন তাহারা এই সম্পর্কে (প্রধানটির) শরণাপন্ন হয়।” (আম্বিয়া)

হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর দেশবাসীগণ যথাসময়ে মেলা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিল কে বা কাহারা তাহাদের মূর্ত্তিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল: এ কাণ্ড কে করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা বুঝিতে তাহাদের বেশী বেগ পাইতে হইল না।

قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين -

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم -

“তাহারা বলিল: আমাদের মাবুদগুলির সাথে যে

এই কাণ্ড করিয়াছে ; নিশ্চই সে চরম বাড়াবাড়িকারীদের অন্যতম। কেহ কেহ বলিল : আমরা ইবরাহীম নামক একজন যুবককে ঐগুলি সম্পর্কে সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি। (সুতরাং তারই কাণ্ড)।" (আম্বিয়া)

স্বভাবতঃ এই ব্যাপারে ধর্মীয় প্রধানদের ভূমিকাই ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। গোস্বায় তাহারা লাল হইয়া গেল। বলিল : লোকটিকে জন সম্মুখে লইয়া আসা হউক। তা' হইলে সকলেই দেখিতে পাইবে অপরাধী কে। যথা সময়ে তাঁহাকে জন সম্মুখে লইয়া আসা হইল :

قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون -
قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم -

"তাহারা বলিল : তাকে (ইবরাহীমকে) জন সম্মুখে লইয়া আস। যেন তাহারা দেখিতে পারে, যথা সময়ে তাঁহাকে লইয়া আসা হইল। তাহারা সওয়াল করিল : ইবরাহীম, আমাদের মাবুদগুলির সাথে এই কাণ্ড কে করিয়াছে?

হজরত ইবরাহীম (আঃ) এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। জন সম্মুখে মূর্তি পূজার অসারতা বর্ণনা করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাহার দেশবাসীদের পূজনীয় মূর্তিগুলির যে কোন ক্ষমতা-ই নাই, বাস্তব পক্ষে তাহা প্রমাণিত করাই ছিল তাঁহার মতলব। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী-ই তিনি কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। শেষ পর্যান্ত দেশবাসীর সামনে তাহা প্রকাশ করার মওকা লাভ করিয়া তিনি আনন্দিত-ই হইলেন।

بل فعله كبيرهم هذا - فاسئلوهم ان كانوا ينطقون -

"সে বলিল : বরং এই প্রধান মূর্তিটিই তাহা করিয়াছে। তারা যদি বলিতে পারে, তবে তাহাদিগকে-ই জিজ্ঞাসা কর।" (আম্বিয়া)

এই অকাট্য প্রমাণের পর হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর দেশবাসীর কোন জবাব রহিল না। তাহারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে—তাহারা-ই ভ্রান্ত। ইবরাহীম নহে। বরং সে সত্য পথের পথিক।

"তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল : ইবরাহীম বাড়াবাড়িকারী নহে ; বরং তাহারাই। অতঃপর নিজেদের মাথা নত করিয়া বলিল : ইবরাহীম, তুমি বেশ জান যে, এইগুলি কথা বলিতে পারে না।"

সাময়িকভাবে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার যুক্তিতে নীরব হইল। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :

"তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যাহাদের ইবাদৎ করিতেছ, তাহারা তোমাদের কোন প্রকার লাভ-লোকসান করিতে পারে না। আক্ষেপ তোমাদের প্রতি—তোমাদের কি মোটেই কাণ্ডজ্ঞান নাই।" (আম্বিয়া)

এইসব যুক্তি ও দলিল প্রমাণের ফলে হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর দেশবাসীগণ তখনকার মত দমিয়া গেল বটে, তবে তাহাদের অন্তরের কলুষ দূরিত হইল না। তাহারা সম্মিলিতভাবে ভবিষ্যতের কার্য ক্রম স্থির করিল। তাহাদের মধ্যকার প্রধানগণ বলিল : আমাদের মা'বুদগণকে খুশী করিতে হইলে ইবরাহীমকে দমন করিতে হইবে। যখন কোন প্রকারেই তাহাকে শায়েস্তা করা গেল না ; তখন তাহাকে একেবারে হত্যা করাই ভাল। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে পারিলেই এই ফ্যাসাদের সমাপ্তি ঘটিবে।

বাদশার প্রতি ইসলামের পয়গাম

তখনকার দিনে ইরাকের বাদশার খেতাব ছিল নমরূদ (৩)। দেশবাসীর মতে সে কেবল বাদশাই ছিল না ; বরং তাহাদের মাবুদও ছিল। এই বিশ্বাস মতে দেশবাসীগণ তাহারও ইবাদৎ করিয়া থাকিত। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অন্তরে নমরূদের মর্য্যাদা মূর্তিগুলি অপেক্ষা অধিক ছিল। কেননা সেইগুলি ছিল মুর্দা দেবতা, আর নমরূদ ছিল জিন্দা দেবতা।

হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রচারের কথা যথা সময়ে নমরূদের কানে পৌঁছিল। সে মহা ফাপরে পড়িয়া গেল। কেননা সে ভাবিল : যদি লোকেরা ইবরাহীমের ধর্ম মত গ্রহণ করিয়া বসে, তা' হইলে কিছুতেই তাহার প্রভুত্ব বজায় থাকিতে পারে না। এই সব বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল : ইবরাহীমকে কতল ব্যতীত এই মুসিবৎ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই দেখা যাইতেছে না।

শাহী দরবার বসিল। যথা সময়ে হজরত ইবরাহীম (আঃ) কে তথায় ডাকা হইল। নমরূদ জিজ্ঞাসা করিল : "ইবরাহীম! তুমি পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিতেছ কেন? আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিতে তোমার আপত্তি কী? তিনি বলিলেন : তুমি কী করিয়া মানুষের খোদা হইতে পার? সারা জগতকে যিনি পয়দা করিয়াছেন, তিনিই মানুষের খোদা। তুমি অন্যান্য দশজনের মত একজন মানুষ মাত্র। অন্যান্য মানুষ যেমন আল্লার সৃষ্ট জীব, তুমিও তেমনি। তুমি বা মানুষের তৈয়ারী মূক, বধির, অন্ধ প্রতিমাগুলি কেমন করিয়া মানুষের মাবুদ হইতে পারে ; এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

(৩) কেসাসুল কুরআন ১৬৮ পৃঃ।

স্বার্থপর মানুষের নিজেদের সুবিধার জন্যই এইসব পথ আবিষ্কার করিয়াছে। এই সব ভুল পথ ত্যাগ করিতে হইবে। আমার পথই সত্য পথ। এই পথেই মানুষের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।”

নমরুদ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল: “ইবরাহীম, তুমি তোমার প্রভুর পরিচয় দাও। তিনি বলিলেন: যার হাতে হায়াত মওত—তিনিই আমার মওলা। সে বলিল: আমার হাতেই ত মানুষের হায়াত-মওত। এই বলিয়া সে একটি বেকসুর লোক হত্যা করিতে এবং অপর একজন অপরাধীকে মুক্তি দিতে আদেশ করিল। যথা সময়ে তাহার আদেশ পালিত হইল। সে বলিল: আমার হাতেই ত মানুষের হায়াত-মওত। অথচ সে বুঝিতে পারিল না যে উহাকে প্রকৃত হায়াত-মওত বলা হয় না। তবে এই ক্ষেত্রে হায়াত-মওতের সূক্ষ্ম দার্শনিক তাৎপর্য বর্ণনা করা সমীচীন হইবে কিনা তিনি তাহাই চিন্তা করিলেন। অবিলম্বে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, এই সূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্কের ফলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে তিনি আলোচনার গতি বদলাইয়া বলিলেন, “আমার প্রভু পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে সূর্যকে পরিচালিত করিয়া থাকে। তুমি উহাকে পশ্চিম হইতে পূর্ব করিয়া আইস ত।” (বকরা) এই স্থূল সওয়ালের জবাব সে দিতে পারিল না। সে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল।

অগ্নি পরীক্ষা

এই সব কিছু ঘটিল সত্য; কিন্তু হজরত ইবরাহীমের সমাজ সত্য পথ গ্রহণে রাজী হইল না। বরং এই সব তর্ক-বিতর্কের পর তাহাদের দেলে হজরত ইবরাহীমের বিরুদ্ধে দুশ্‌মনী আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহারা সমবেত ভাবে সিদ্ধান্ত করিল: ইবরাহীমকে এত সব বে-আদবীর জন্য সাজা দিতে হইবে। তাহারা স্থির করিল: জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করাই তাহার একমাত্র যোগ্য সাজা।

قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين -

“তাহারা বলিল: তাহাকে জ্বালাইয়া ফেল। আর নিজেদের মাবুদগুলির সাহায্য কর। যদি তোমাদের কিছু করিবার ইচ্ছা থাকে।” (সা—ফ—ফা—ত)

হজরত ইবরাহীম (আঃ) মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। তর্ক-বিতর্কের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরম দিন অতি নিকটবর্তী। পিতা আযর তাঁর বিরোধী। দেশবাসীগণ তাঁহার উপর চরম অসন্তুষ্ট। বাদশাহ নমরূদ তাঁহার জানের দুশ্‌মন। তাঁহাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার চোখের সামনে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। দিনের পর দিন শত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সে হুতাশন ভয়ঙ্করী আকার ধারণ করিয়াছে। এমতাবস্থায় হজরত ইবরাহীম (আঃ) নিজেকে একাকী মনে করিতে পারিল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ত আছেন। তিনি বরহক। তাঁহার কুদরতের সীমা নাই। নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। দুশ্‌মনদের নিকট তিনি শরমেন্দা হইবেন না—এই একীন তাঁহার ছিল। মুসিবৎ ও এমতেহানের দিন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাহার ঈমানের জোর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যথা সময়ে ঢোল-শোহরৎ করিয়া তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। সারা জাহানের মায় অগ্নিকুণ্ডের স্রষ্টা হুকুম করিলেন:

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم -

“আমরা আদেশ দিলাম: আগুন! ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও শান্তিপ্রদ হও” (সা—ফ—ফাত)

আল্লার হুকুমে জলন্ত অগ্নিকুণ্ড হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর পক্ষে গুল-বাগিচায় পরিণত হইল। যথা সময়ে নিরাপদে তিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহিরে আসিলেন। আল্লার নবী মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহা একটা মোযেজা। মোযেজা সব সময় সংঘটিত হয় না। নবীদের জীবনে কদাচিৎ উহা ঘটিয়া থাকে। আগুনকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, দাহ্য গুণও দিয়াছেন তিনি। আগুনকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—তার দহন ক্ষমতাও দিয়াছেন তিনি। সুতরাং তাঁর পক্ষে সাময়িকভাবে উহার দহন শক্তি রোধ করা অসম্ভব নহে।

অবশ্য এই সব ব্যাপার একমাত্র নবী রসূলদের পক্ষেই শোভনীয়। যাহারা কেবল জড় জীবনেই বিশ্বাসী, তাহাদের মনে এই সম্পর্কে কোন সংশয় থাকিলে, তাহা সহজেই দূরীভূত হইতে পারে। কেননা নবী ত দূরের কথা, সাধারণ মানুষের জীবনেও দেখা যায় যে, সাধনা সাপেক্ষে তাহারাও “ফায়ারপ্রুফ” হইয়া পড়ে। সুতরাং নবীদের পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

হিজরতের এরাদা

আল্লার অসীম কুদরতে হজরত ইবরাহিম (আঃ) সহি সালামতে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আল্লাহ তাঁহার ইজ্জৎ রক্ষা করিল। দুশ্‌মন হইল লা-জবাব। কিন্তু তাতেও কোন ফল হইল না। তাঁহার জাতি শির্ক ও কুফরীর রাস্তা পরিত্যাগ করিতে রাজী হইল না। এত দীর্ঘ জমানায় এত যত্ন ও সাধনার পর মাত্র তাঁর স্ত্রী বিবি সারা এবং ভাতিজা হজরত লুত (আঃ)ই

তাঁর উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। এই অকৃতকার্য্যের ফলে তিনি বড় দুঃখীত হইলেন। দেশে তাঁহার মন টিকিল না। তিনি দেশ ত্যাগ করার এরাদা করিলেন। স্থির করিলেন—যে দেশের লোকেরা তাঁহার কথা শুনিবে, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সে দেশে চলিয়া যাইবেন।

قال انى ذاهب الى ربى سيهدين -

সে বলিল: "আমি আমার প্রভুর দিকে যাইব। তিনি আমাকে অতি সত্বর পথ দেখাইবেন।"

উর্‌কাল্‌দানীনের পথে

স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী হজরত ইবরাহীম (আঃ) জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ফুরাতের পশ্চিম উপকূল বাহিয়া চলিলেন। এই পথে বেশ কয়েকদিন চলার পর তিনি উরকালদানীন নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই সফরে তাঁহার সাথী ছিলেন—হজরত সারা এবং হজরত লুত (আঃ)। উক্ত অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি তথা হইতে হারান নামক জায়গায় চলিয়া যান। তথায় কিছুকাল তবলীগ ও এশায়াতের কাজ করিতে থাকেন। হজরত ইবরাহীম (আঃ) বড় দয়ালু ছিলেন। এত সব দুশমনী করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার দেশবাসীগণকে বিশেষতঃ তাঁহার পিতাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন, আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন আপনার জন্য মাগফেরাতের দো'আ করিতে থাকিব। তিনি সেই ওয়াদার খেলাফ করিতে পারিলেন না। তিনি অহরহ তাহার হেদায়েতের জন্য মুনাজাত করিতেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যখন তাঁহাকে ওহী মারফৎ অবগত করান হইল যে, তাঁহার পিতা কখনও ঈমান আনিবেন না, তখন তিনি তাহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন।

ফেলিস্তিন ও মিসর সফর

এইভাবে কিছুদিন পর তিনি হারান হইতে ফেলিস্তিন এবং তথা হইতে শি—কেম হইয়া মিসর উপনীত হইলেন। কোন কোন রেওয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মিসরের বাদশাহ তাঁহাকে দেখিয়া যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। নানাপ্রকার মূল্যবান উপহার হাদিয়া তোহফা দান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তখনকার দিনের রেওয়াজ মত বড় বিবি সারার খেদমতের জন্য বাদশাহজাদী হাজেরাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিলেন। এইভাবে কিছুকাল মিসরে অবস্থান করার পর তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গেলেন। হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর পুত্রদ্বয়—হজরত ইসমাইল ও হজরত ইসহাক (আঃ) সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করার বাসনা রহিল।

বাঁকে বাঁকে বয়ে যায়
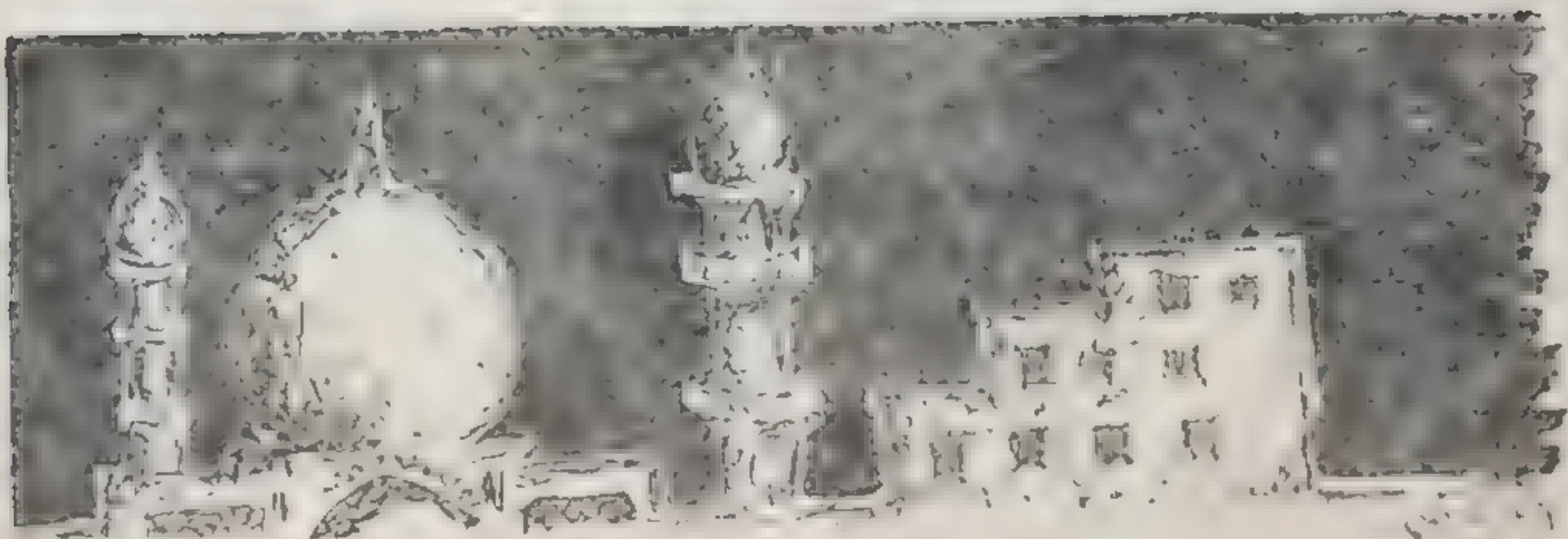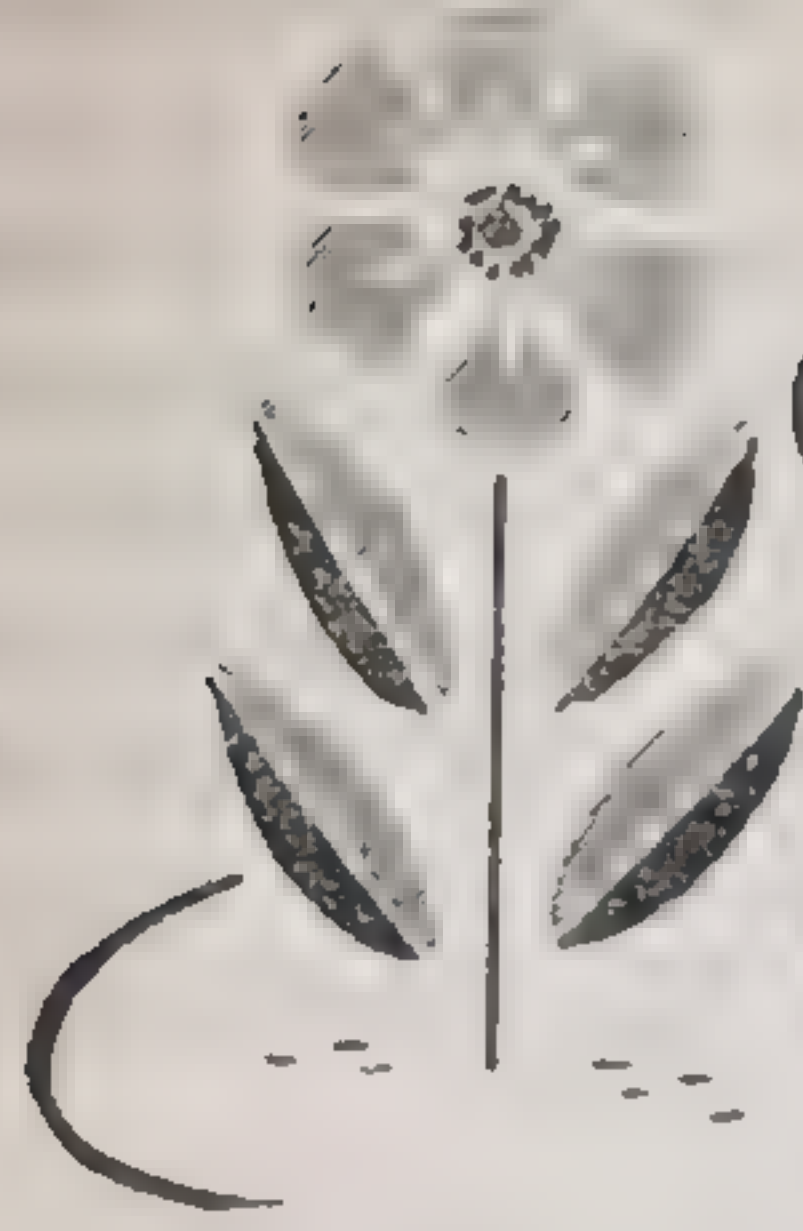
সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশতের পর)

॥ বিশ ॥

গ্রীনবোট তৈয়ার ছিল। কিন্তু উঠিয়াই হোমায়েরার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। সারা গ্রীনবোট বোঝাই হইয়া আছে নানা শ্রেণীর লোক। এদের অধিকাংশেরই যে গান আর বাজনাই পেশা তাহা আন্দাজ করিয়া নিতে হোমায়েরার দেরী হইল না। বোটের পিছনের দিকে বহু লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হোমায়েরা বুঝিল, জাফর আয়োজনটা বিরাট রকমেরই কিছু করিয়াছে। জাফরের নূতন মিল প্রতিষ্ঠার কাজ এখনও চলিতেছে, সেখানে তৈয়ারী এন্তেজাম কিছুই নাই। বয়, বাবুর্চি লইয়া খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু বাহুল্যটা হোমায়েরার কিছুতেই ভাল লাগিল না। এদিকে ভীড়ের মাঝখানে স্বাচ্ছন্দ্যও বাষ্প হইয়া উধাও হইয়া ছিল।

হোমায়েরা হাসিমুখে সকলের সাথে আদাব বিনিময় করিল। মাঝিরা জিনিষপত্র তখনও তুলিতেছে। গ্রীনবোট ছাড়িতে কিছু দেরী হইবে। হোমায়েরা জাফরকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, আমার মনে হচ্ছে, আমার না যাওয়াই উচিত।

জাফর যেন আসমান হইতে পড়িল। বলিল, কেন, কেন?

হোমায়েরা বলিল, তুমি যে এমন হুলস্থূল কাণ্ড বাধাবে, আমার জানা ছিল না। আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। হয় আমাকে নেমে যেতে হবে, না হয় ওদের নেমে যেতে হবে।

জাফর বিপন্ন কণ্ঠে বলিল, কি যে বল!

হোমায়েরা স্থিরধীরভাবে বলিল, আমি যা মনে করি তাই বলি। এমন একটা তামাসা যদি সৃষ্টি করবে তা হলে আমাকে ডাকলে কেন?

জাফর বিনীত ভাবে বলিল, এ যে তোমারই জন্য, হোমায়েরা!

হোমায়েরা ঠোঁটে কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। একটু হাসির আভাস ফুটাইয়া তুলিল, এ সব বাঁদরামি আমি পছন্দ করিনা।

হোমায়রা কি বলিতেছে, সে দিকে জাফর কান দিল না। তাহার ঠোঁটের কোণায় হাসির আভাসটিকে সে আশ্বাসের মত অবলম্বন করিল। বলিল, আজকের মত সহ্য করে যাও, হোমায়েরা। এদেরে নামতে ত আর বলা যায় না। আরেকটা বোটের ব্যবস্থা আমি করতে পারি। কিন্তু আমি ত আর এদেরে অপমান করতে পারি না। জাফর আশ্বাসের সুরে আরও বলিল, ভাবনা কি! ওপারে ভিড়ালেই বাবুর্চিরা নেমে যাবে। ভীড় অনেকটা হালকা হয়ে উঠবে।

হোমায়েরা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরে সমস্ত ব্যাপারটি ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ভাঙ্গনের মহাগর্জ্জন ধ্বনির সামনে সে যেন তাহার সমস্ত কিছু লইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথায়, সে ত সমস্ত কিছু তুচ্ছ করিয়া জোর করিয়া নামিয়া যাইতে পারিল না। ব্যাপারটি সামান্য। কিন্তু কিছুতেই ইহার রেশ তাঁহার মনের উপর হইতে নামিতে চাহিল না।

ঠিক হইয়া ছিল, দিনের আধাআধি ভাগ নদীর উপর গ্রীনবোটে কাটিবে। তারপর ডাঙ্গায় উঠিয়া মিল এলাকায় আহার ও বিশ্রাম। অবশেষে অন্য কাজ।

সূর্য্য উঠার আগেই গ্রীনবোট ছাড়ার কথা ছিল, তবে দেরী হওয়ার স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। বোট ছাড়া হইল যখন সূর্য্য উঠি উঠি করিতেছে। বড় কামরার পাশে ছোট কামরাটিতে একখানা মাঝারী রকম

টেবিলের পাশে দুইখানা চেয়ার রাখা ছিল। হোমায়েরা তাহার একখানা দখল করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন মনে হইল জুলিকে আনাই ভাল ছিল।

জাফর জুলিকে দাওয়াত করিয়াছিল। কিন্তু উল্লাসিত জুলির নিভিয়া যাইতে দেরী হইল না। সে হাসি মুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হোমায়েরার দিকে চাহিয়াছিল। হোমায়েরা কিছু বলে নাই। তবে জুলি ছেলে মানুষ হইলেও হোমায়েরার মুখ দেখিয়া মনের ভাব আঁচ করিয়া নেওয়ার সূক্ষ্মদৃষ্টি সে আয়ত্ত করিয়া নিয়াছে। জুলি নিজেই প্রবল ভাবে আপত্তি জানাইল। ঘরের কাজের নানা অজুহাত তুলিয়া সে জাফরের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

দিনের রঙ ফেরা মুহূর্তে মায়ামাধুর্য্য কোনদিন হোমায়েরার দৃষ্টিতে মুগ্ধ হওয়ার আমন্ত্রন আনিয়া দিতে পারে নাই। এদিকটাতে তাহার মনের কপাট চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া আছে। সে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে ছিল, চোখের সামনে রূপালী নদীর বরফের মত সফেদ ধারাটি নিরুদ্দেশের পথে হারাইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের তরুণ আলোর সাথে লোকোচুরি খেলিতেছে ছোট ছোট ঢেউ। কানাকানি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, আর আঘাত খাইয়া সফেদ ফেনার ঝুরঝুরি তুলিয়া সূর্য্যের আলোকে মুক্তাধারার মত আবার নদীর বুকে লয় হইতেছে।

সূর্য্যের আলোকে উচ্ছল হইয়া নদীর তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে সেতারের করুণ সুর। এতক্ষণ কিছুই কাণে আসে নাই। কণ্ঠসঙ্গীতের মহড়ায় হট্টগোলের ভাগই বেশী বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু কোন্ সময় যে হঠাৎ একটি করুণ রাগিণী দিগদিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে হোমায়েরার সে খেয়াল ছিল না। যখন বুঝিতে পারিল তখন সে বিস্মিত হইল। তাহার মনও সুরে সুরে নাচিতে পারে, অনেক অজানা বস্তুর মত তাহার ইহা এক নূতন আবিষ্কার।

হট্টগোলের মাঝে সুর থামিয়া গেল। হোমায়েরার কপাল কুঞ্চিত হইল। চোখ ফিরাইয়া সে দেখিল নাশ্‌তা দেওয়া হইতেছে। নিজের সৃষ্টির সহিত মানুষের নিজের কত ফারাক। হোমায়েরার টেবিলেও নাশ্‌তার রেকাবী আসিয়া পড়িল।

জাফর এতক্ষণ ওপাশে ছিল। সে আসিয়া খালি চেয়ারখানা টানিয়া বসিতে বসিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগছে?

অদ্ভুত!

হোমায়েরার সংক্ষিপ্ত জওয়াব। জাফর বলিল, যাক। এখানে শ্রোতা মাত্র আমি একজন। কাজেই তোমার জওয়াবের তফসির নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

হোমায়েরাও হাসিয়া বলিল, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কাজটা যত কম হয়, ততই আমি স্বস্তিবোধ করি।

জাফর তেমনি ভাবে বলিল, তোমাকে নিয়ে নয়, তোমার উক্তি নিয়ে। কথাকে মোচড় দেওয়ার অভ্যাস যতই রপ্ত করো না কেন, সব সময় এতে কাজ হয় না। তা ছাড়া, মনেরও দিন সব সময় সমান যায় না। আজ যা গর্ব মনে করছো কাল তাই গ্লানি হয়ে ফিরে আসতে পারে।

হোমায়েরা ঠোঁটের বাঁকা হাসিটি সংযত করিয়া বলিল, নূতন কথা সব শুনছি।

জাফর হাসিয়া বলিল, এটা পারো, তুমি সব তুচ্ছ করে দিতে পারো। জুলি আমাকে কি বলছিল জানো? বলছিল, আপার কাছে কি বলবো সেটা ত বুঝতে পারছি না। এখন যদি আপাও না বুঝতে পারেন, তাহলে বলবো, এজন্য জমানাই দায়ী।

হোমায়েরা সন্দেশ ভাঙ্গিয় মুখে দিয়া চিবাইতেছিল। জাফর ছুরি দিয়া আপেলের খোসা ছড়াইতে ছড়াইতে গল্প করিতেছিল।

বয় আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া জানিতে চাহিল, কি দিবে।

হোমায়েরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। জাফর বুঝাইয়া দিল চা ও কফি দুয়েরই ব্যবস্থা আছে। কি চাই, তাহাই জানিতে চাহিতেছে।

বয়ের দিকে চাহিয়া হোমায়েরা বলিল, বাছাই করার ভারটাও তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম। যাও, যা তুমি ভাল মনে কর তাই নিয়ে এসো।

জাফর বলিল, মানে?

সব কিছুরই যে মানে থাকতে হবে, তেমন ত কথা নাই।

জাফর নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলিল, এ যাত্রাটাই কি এ-ভাবে যাবে?

হোমায়েরা কোন জওয়াব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। জাফর আপেল কাটিয়া হোমায়েরার দিকে বাড়াইয়া দিল।

ও পাশ হইতে যন্ত্রের টুং টাং ভাসিয়া আসিতে লাগিল। জাফর বলিল, তুমি ওদের দিকে এ-ভাবে বিমুখ হয়েই থাকবে?

হোমায়েরা জিজ্ঞেস করে, কি করতে হবে আমাকে?

জাফর বলিল, দেখ, এরা হেলাফেলা করার লোক নন। কারো কণ্ঠ তুমি বেতারে শুনতে পাবে, আর কারো কণ্ঠ রেকর্ডের প্যাঁচে প্যাঁচে এঁটে আছে। এরা সবই মাননীয় শিল্পী।

আমিও এতে মোটেই সন্দেহ করছি না।

এরা তোমার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন।

হোমায়েরা বলিল, আমি ত এদের জন্য ব্যস্ত নই।

জাফর বলিল, তুমি এ-ভাবে সরে থাকলে ওঁরা সত্যি অপমানিত বোধ করবেন। ওঁরা ভাবছিল, তুমিই এখানকার মেজবান।

কি?

হোমায়েরার ঝঙ্কৃত কণ্ঠে জাফর প্রথমে চমকাইয়া উঠিল। অতঃপর সামলাইয়া নিয়া হাসিয়া বলিল, আমার উপর রাগ করলে কি করবো, বলো। আমার কোন অপরাধ নাই। কে কি ভাবলো, আমি তাতে বাধা দেবো কি ভাবে?

হোমায়েরা বিরক্তভাবে বলিল, আর সে কথা আমাকে শোনাবার উৎসাহই বা দমন করবে কি করে! আমি ওদের মত মেহমান, এ-কথাটা এদের বুঝবার যোগ্যতা যদি না থাকে, তা হলে এরা যা খুশী মনে করতে পারেন।

জাফর হোমায়েরার অনুকূলে হাসিয়া বলিল, ও কথা ছেড়ে দাও। তবে গান—

হোমায়েরা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, ও সব আমার ভাল লাগে না।

জাফর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমি বড় মজার কথা বলতে পারো। সুর, সে হলো সংসারের উপর এক যাদুমন্ত্র। কারো এটা ভাল লাগেনা, এটা হতে পারে?

জাফর আবার হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। হোমায়েরা বিরক্ত হইয়া ভাবিল, লোকটার মনের সীমানা কত পরিমিত!

জাফর বলিল, শোন এই মাত্র ওদের কাছে গল্প শুনছিলাম, সুরের যে কি মাহাত্ম্য!

সে থামিয়া তুরস্কের সোলতান চতুর্থ মুরাদের কাহিনী বলিতে লাগিল। চতুর্থ মুরাদ বাগদাদ জয় করিয়াছেন। রক্তোন্মাদ সোলতান হুকুমজারী করিয়াছেন বাগদাদের নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি লোককে কোতল কর। শাহ কুলি সুরবীনের সেরা শিল্পী। সোলতানের দরবারে তাঁহার ডাক পড়িল। শিল্পীর সামনে আজ মহা পরীক্ষা। যন্ত্রের মৃদু ঝঙ্কার এসে হাজারো কলিতে পেখম মেলিয়া সুর বাহারে মূর্চ্ছিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। হৃদয়হীন সোলতান কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন।

শিল্পীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনাম তুমি চাও, ভাই।

হাফেজ পরের গোয়ালে গরু দান করিয়াছিলেন। প্রিয়ার গালের তিলের বদলে সমরখন্দ ও বোখারা বিলাইয়া দিয়াছিলেন। মুরাদের জিজ্ঞাসার আন্তরিকতার মানে হইল, সুরের বদলে সারা সাম্রাজ্য তিনি বিলাইয়া দিতে পারেন।

বাগদাদের নরনারীর ভয়ার্ত্ত আর্তনাদ শিল্পীর কানে বাজিতেছে। শাহ কুলি বলিলেন, জাঁহাপনা, বাগদাদের পৌনে দু'লাখ লোকের প্রাণ ভিক্ষা চাই।

সোলতান তখনই তাঁহার পূর্ব্বের আদেশ বাতেল করিয়া নয়া হুকুম জারি করিলেন।

জাফর কাহিনী শেষ করিয়া বলিল, সুর-শক্তি কি সোজা কথা!

হোমায়েরা শুধু বলিল, মন্দ গল্প নয়।

জাফর বলিল, সবকিছু তুমি অবিশ্বাস করতে চাও হোমায়েরা।

হোমায়েরা বলিল, মোটেই না। তবে কি না টলষ্টয়ের উপন্যাসও উপন্যাস, আবার ছলিমুদ্দির উপন্যাসও উপন্যাস।

জাফর বলিল, ত ঠিক। তবে একবার পরীক্ষা করে দেখই না, এরাও ভাল গান গান।

হোমায়েরা বলিল, যা শোনার তাত শুনতেই আছি। ওদের মাঝে গিয়ে আর নূতন কি শুনবো।

জাফর বলিল, থাক গে। তুমি কথা শুধু ঘুরিয়েই দিচ্ছ। দেখছি এদের প্রসন্ন করার সাধ্য আমার নাই।

জাফর মুখের উপর নৈরাশ্যের ভাবকে এমনভাবে ফুটাইয়া তুলিল, হোমায়েরা তাহা দেখিয়া না হাসিয়া পারিল না।

জাফর উঠিয়া গেলে হোমায়েরার অর্দ্ধচেতন অর্দ্ধ অচেতন মনের উপর হিসাবনিকাশের মহড়া চলিতে লাগিল। বহু বছর আগে, বেনার ছাব লইয়া আলাপ করিতে করিতে জামালকে হোমায়েরা যে সব-কথা বলিয়াছিল, বিস্মৃতির অতল হইতে তাহাই ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া হোমায়েরা সচেতন হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল বোট তীরে ভিড়িয়াছে। একে একে সকলে পারে উঠিয়া যাইতেছে। জাফর আসিয়া হোমায়েরাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি উঠবে নাকি? যে চমৎকার জায়গা দেখা যাচ্ছে, সেখানে ওঁরা আসর জমাবেন।

হোমায়েরা বলিল, না। এখানেই ভাল আছি। তা তোমার মিলে গিয়েই ত এ-কাণ্ডটা ওরা করতে পারতেন। ফিরে যেতে ত সময় লাগবে।

জাফর বলিল, তা পারতেন। তবে খাবার তৈরীর জন্য বাবুর্চিদের সময় দেওয়া দরকার। যা ক্ষিধা পেয়েছে, সেখানে চলে গেলে আর সহ্য হবে না।

জাফর ইতস্ততঃ পায়চারী করিয়া বলিল, তোমাকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে হয় না, আর ওদের সাথে না গেলেও ভাল দেখায় না। সবাইর মাঝে থেকেও একা থাকার অভ্যাসটা তুমি আর বদলালে না।

হোমায়েরা কোন জবাব দিল না।

একা বসিয়া থাকিতে হোমায়েরার নেহায়েৎ মন্দ লাগিতেছিল না। সে কল্পনা করিতে পারে, মাঠের মাঝখানে গাছের সারিতে অন্ধকার হইয়া আছে যে জায়গাটি সেখানে আসর জমিয়াছে। দুপুরের ঝিকিমিকি রোদে সুরের রেশ ঝলকে ঝলকে দিকদিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তবে শিল্প নিয়া যাহাদের কারবার, কাণ্ডজ্ঞান যে তাহাদের কিছু কম, সে-সম্পর্কে হোমায়েরার কোন সন্দেহ ছিল না। কতক্ষণ যে এভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে তাহা ভাবিয়া সে বিরক্ত হইতেছিল। তবে ভরসার কথা, জাফর ওদের সাথে আছে।

জাফর ফিরিয়া আসিয়া হোমায়েরার কাছে ক্ষমা চাহিল। সে বলিল, তোমাকে একা ফেলে রেখে এভাবে সেখানে এতক্ষণ আড্ডা জমানো সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে।

হোমায়েরা বলিল, বিরক্তিজনকভাবে দিন কাটাবার জন্য তৈয়ার হয়েই আমাকে বেড়াতে হয়েছে। কিছু ভেবো না।

তবু হোমায়েরার মুখে হাসি দেখিয়া জাফর নিশ্চিন্ত হইল।

মিলে পৌঁছিয়া জাফর হোমায়েরাকে বলিল, আমার সাথে এসো।

একখানা বাংলো; কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলা যায়; কাঁচা চুনের গন্ধে কেমন যেন এক উৎকট পরিবেশ; সেখানে পৌঁছিয়া হোমায়েরা দেখিল হল ঘরের মত কামরায় টেবিল পাতা হইয়াছে। পুরো টেবিলক্লথের নীচে চাপা পড়িয়া গেলেও বুঝা যায়, এখানকার কোনও জায়গা হইতে ইহা কুড়াইয়া নেওয়া হইয়াছে। দুয়েকখানা চেয়ার যা পাতা হইয়াছে, তাহা ঘসিয়া মাঝিয়া সাফ করা হইলেও চুনসুরকির দাগ সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই। গ্রীনবোটে যে চেয়ার ছিল, হোমায়েরা দেখিল তাহাও আনা হইয়াছে।

জাফর হাসিয়া বলিল, এই আমাদের আয়োজন। একটু অসুবিধা হলেও এটা তেমন খারাপ মনে হবেনা।

হোমায়েরা জাফরের দিকে চাহিয়া হাসিল। বলিল, পিকনিক করতে এসে এটাই ত বেশী মনে হচ্ছে।

কিন্তু জাফরের দিকে চাহিয়া বুঝিল, সে তাহার কথা সহজভাবে গ্রহণ করে নাই। হোমায়েরা বলিল, সত্যি বলছি, আমার খুবই ভাল লাগছে।

জাফর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবেই ভাল। বাস্তবিক এটা আমাদের বদ-অভ্যাস যে, তোমার কথা ঝট করে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

এটা তোমাদের খুবই অন্যায়।

জাফর বলিল, যাক। কথায় সময় নষ্ট না করে রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি। কাউকে দেখছি না কেন! নিশ্চয় তোমার খুবই ক্ষুধা পেয়েছে।

এটা তোমার নিজের কথা।

ও একই কথা হলো। কেহ নিজেকে আর পেটুক বলতে চায়!

ও পাশে রান্নার জন্য যে ঘরখানা ঠিক হইয়াছিল সেদিকে যাইতে যাইতে জাফর বলিল, তুমি একটু বিশ্রাম নাও।

কিছু সময়ের মাঝেই খানা হাজির হল। হোমায়েরা দেখিল তাহাদের দুইজনের মত খানা দেওয়া হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, শিল্পীরা কোথায়?

জাফর রেকাবী টানিয়া বসিতে বসিতে বলিল, এদের জন্য কোন ভাবনা নেই, সুরেই এদের পেট ভরে, স্থূল খাবারটা ওদের জন্য বাহুল্য। এ-বাহুল্য কাজটা এক সময় সারলেই চলবে।

হোমায়েরা বলিল, সে কেমন?

জাফর বলিল, কোন ভাবনা নাই। ওরা গোসল করতে গেছেন। নদীর চমৎকার শানবাঁধানো ঘাট তাদের শিল্প চেতনা জাগিয়ে তুলেছে।

কিন্তু জাফর যে কথা বলিতে চাহে না, হোমায়েরার তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহার বিরক্তি বাঁচাইয়া চলার জন্য জাফর একটা আলাদা ব্যবস্থা করিয়াছে। এটা অসঙ্গত মনে হইলেও হোমায়েরা আর কথা না বাড়াইয়া চুপ করিয়া গেল।

আয়োজন মন্দ হয় নাই। জাফর হোমায়েরাকে এটা নাও, ওটা নাও, এটি আরেকটু দেখ বলিয়া অবিরাম তাড়া দিতে লাগিল। হোমায়েরা কখনও মৃদু আপত্তি করিয়া, কখনও প্রবলভাবে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

জাফর মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, তোমার ত কিছুই খাওয়া হইল না।

হোমায়েরা হাসিল, কোন কথা বলিল না। একটু দূরে সরিয়া বসিয়া সে জাফরের খাওয়া দেখিতে রহল। তাহার মনে হইল, একসময় জোবায়েরকে সামনে বসিয়া নিজে বাড়িয়া দিয়া খাওয়াইতে তাহার ভাল লাগিত। তাহাতে একটা আনন্দ ছিল। কিন্তু সেদিকটি আজ সম্পূর্ণ মরিয়া গিয়াছে। হয় ত এটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ অনাহূত ভাবে অকারণে একটি কবিতার দুইটি লাইন তাহার মনের তলে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল:

গোঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে
স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল
সন্ধ্যা দীপখানি।

খাওয়া-দাওয়া করিতে করিতে বেলা গড়াইয়া গেল। গাছের পাতায় পাতায় সূর্য্যের আলো তখন চিকচিক করিতেছে। ইতিমধ্যে জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এরিখ হোহেনবুর্গ প্রবীণ, তবে তাঁহার কর্ম্মঠ শরীরে কাঠিন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রখর। হোহেনবুর্গ হোমায়েরার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহার ইংরেজী তেমন চোস্ত না হইলে সেজন্য তিনি মোটে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। হোমায়েরা এক সময় জাফরকে বলিল, কোথায় কি আছে দেখাও।

জাফর বলিল, আমিই জানি কোথায় আছে! ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলো।

হোহেনবুর্গ আন্দাজে বুঝিয়া নিতে চেষ্টা করিলেন কি আলাপ হইতেছে। পরে জাফর তাহাকে হোমায়েরার ইচ্ছা জানাইল। হোহেনবুর্গ খুশী হইয়া উঠিয়া বলিলেন, চলুন, সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

যন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কে শিল্পীদের কোন আগ্রহ নাই। তাঁহারা এক জায়গায় জটলা পাকাইতে লাগিলেন। হোমায়েরা হোহেনবুর্গের পাশে পাশে চলিল, জাফর তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল।

যন্ত্রপাতি সব আসিয়া পৌঁছে নাই। আর যাহা আসিয়াছে, তাহাও বসাইবার কাজ চলিতেছে মাত্র। হোহেনবুর্গ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ইহাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নয়, এ-সব যন্ত্র কোথায় তৈয়ারী হইয়াছে এবং সেখানে কি ভাবে কাজ হয় তাহারও বর্ণনা দিতে লাগিলেন। দুনিয়ায় কোথায় কোথায় এ সব যন্ত্র পাওয়া যায়, এবং কোথ[illegible]ার যন্ত্রের গুণাগুণ কি, তাহার বর্ণনাও দিতে [illegible]াগিলেন। হোমায়েরার মনে হইল, এ-ব্যাপারে উৎসাহের সহিত হোহেনবুর্গ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছেন

দেখানো শেষ হইলে হোহেনবুর্গ বারবার মাফ চাহিয়া বিদায় নিলেন। হোমায়েরা জাফরকে বলিল, অদ্ভুত লোক।

জাফর বলিল, অদ্ভুত মানে অদ্ভুত। আজকে ছুটির দিন। কাজের সময় যদি দেখতে তা হলে বুঝতে। গায়ের রঙ তোমার একটু খটকা লাগতো বটে; তা না হলে তুমি বুঝতেই না, কে ইঞ্জিনিয়ার আর কে শ্রমিক। নিজেই ঘাড়ে করে বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, দরকার হলে মাটিতে গড়া গড়ি করে মেসিনের সাথে লড়াই করছে। আমাদের ঠিক উল্টো।

হোমায়েরা বলিল, সত্যি এ-জন্য এদের জাতি এত বড় হয়।

জাফর বলিল, বড়! কল্পনাই করা যায় না কত বড়। যুদ্ধ জার্ম্মানীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের অভিশাপ জার্ম্মানীকে এখনও নানাদিক হতে আচ্ছন্ন করে আছে। কিন্তু উদ্যমের কাছে সকল বাধাই যে তুচ্ছ, তার প্রমাণ দিচ্ছে জার্ম্মানী। পশ্চিম জার্ম্মানীতে উৎপাদনের হার, ফ্রান্স ত ফ্রান্স, শ্রেষ্ঠ বৃটেনকেও ছাড়িয়ে গেছে। ওরা কাজ করে ভাগ্য গড়ে তোলে, আমরা কর্ম্মবিমুখ বলে শুধু পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়াই।

হোমায়েরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে জাফরের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি অন্ততঃ একটি সম্মানিত ব্যতিক্রম।

হোমায়েরার দৃষ্টি বা কণ্ঠস্বরে সংশয়ের কোন ফাঁক ছিল না। এমন স্পষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টি হোমায়েরার চক্ষে জাফর আর কখনও দেখে নাই। তবু সে নিজের ঝোঁকেই থামিয়া যাইতে লাগিল, কিছুই না। আমিও ওদেরই একজন। তেমনি গড্ডালিকা স্রোতের অন্যতম যাত্রী।

জাফরকে হোমায়েরা আজ নূতন ভাবে দেখিয়াছে। তাই সে মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, নদীর পারে নির্জ্জন প্রান্তরে এই যে নূতন শহর মাথা তুলতে চলেছে, এত তোমারই কল্পনা ও কামনার রূপান্তর। দেশের রূপান্তরে তোমার দান ত কম নয়।

এত বড় সার্টিফিকেট হোমায়েরার কাছ হইতে আসিবে সেটা জাফরের ছিল স্বপ্নেরও অতীত। সে যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি হোমায়েরার মনের দুর্ব্বলতার জায়গাটি তাহার চোখের সামনে দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া উঠিল। এটার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করা যে বিপজ্জনক, হোমায়েরাকে এতদিন দেখিয়া সে সম্পর্কেও তাহার সন্দেহ ছিল না। জাফর নৌকাকে বিপরীত দিকে বাহিয়া নেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিল।

জাফর বলিল, নিজের চেষ্টায় যে কিছু করবো সে সাধ্য আমার নাই। এ ব্যাপারে আমি দশজনেরই একজন। পৈত্রিক ওয়ারিশানসূত্রে পেয়েছি ব্যবসায়ী ঐতিহ্য আর কার্য্যকরী মূলধন। তাই নিয়তির উপর গা ভাসিয়ে দিয়েও একরকম ফেঁপেফুলে উঠছি। সুযোগ যাদের আছে, তারাই কিছু করে নিচ্ছে। সুযোগ সৃষ্টি করছে না।

হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আর এই মিল? এটা ত করে দিচ্ছে হোহেনবুর্গ। আমি হোহেনবুর্গকে বের করিনি, সেই আমাকে আবিষ্কার করেছে। ভাগ্যের হাতে এ ত এক রকম দাবা খেলা। কোথায় খবর পেয়েছিল, আমার কাছে টাকা আছে, তা কাজে লাগলেও লাগতে পারে। আমাকে এসে ধরলো। একদিন নয়, অনেকদিন আমাকে বুঝিয়ে পাড়িয়ে রাজি করালো। কাজ কর্ম্ম যা হচ্ছে তা সেই করছে, আমি কি কোন খবর রাখি।

হোমায়েরা বলিল, তবু ত বুঝতে পেরেছেন তোমার দ্বারা কাজ হবে।

তাহার পক্ষ নিয়ে হোমায়েরা তর্ক করিতেছে, ইহা তাহার কাছে রোমাঞ্চকর ব্যাপার। তর্কে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। জাফর বলিল, তা বলতে পারো। ভাগ্যের সাথে আমার নূতন যোগাযোগ হয়ে গেল। কেহ মাথা কুটে পায় না, কারো হাতে আপনা থেকে এসে উপস্থিত হয়। আমি ভাগ্যবান।

একটু থামিয়া সে আবার বলিতে শুরু করিল, এ ব্যবস্থাটাও হোহেনবুর্গের। জার্মান কোম্পানীতে আমার সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট দিয়ে বিলম্বিত দায় শোধের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি আনাবার ব্যবস্থা করেছে। আমার কাছ থেকে সে পাবে মাইনে আর কোম্পানী থেকে পাবে ভাতা, আর এর বদলে সে আমার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে দিয়েছে।

হোমায়েরা জাফরের কথা শুনিতেছিল, আর তাহার চোখ হইতে প্রশংসা ঝরিয়া পড়িতেছিল। জাফরের আত্ম অস্বীকৃতিতে তাহার ভাবান্তর হইল না। জাফরকে শ্রদ্ধার আসনে নূতন করিয়া অভিষিক্ত করার জন্য মন তাহার তৈয়ার হইয়া উঠিল।

দুনিয়ার চেহারা যারা বদলাইয়া দিতেছে, নিজের অজ্ঞাতে তাহাদের জন্যই যেন হোমায়েরা আপন মনকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। নির্মীয়মান মিলে এই দিনটিতে সে যেন তাহারই সাক্ষাৎ লাভ করিল।

আলাপ করিতে করিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, সে দিকে হোমায়েরার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চকিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, এ-কোথায় এলাম?

জাফর হাসিয়া বলিল, এমন কোন জায়গায় আসো নাই, যেখানে বাঘ বা ভল্লুক আছে। ভয়ের কিছুই নাই।

হোমায়েরা বলিল, তা ত বুঝলাম। কিন্তু সন্ধ্যা যে মাথার উপর ঝুলছে।

জাফর বলিল, সামনে সুচির শর্বরী, পিছনে দীর্ঘপথ, ক্লান্ত যাত্রায় কোথায় থামবে, হে অনন্ত যাত্রি!

হোমায়েরা বলিল, কাব্য রাখ, চল ফেরা যাক।

জাফর বলিল, একটু বসলে হয় না, হোমায়েরা?

পায়ে চলা পথ সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া সামনে হারাইয়া গিয়াছে। পাশে বেতসকুঞ্জ; কাঁটার করাত দুলাইতেছে। একটু দূরেই হিজল বন। জাফর আগাইয়া গিয়া পরিষ্কার জায়গা দেখিয়া বসিয়া পড়িল। ডাকিল, এসো, হোমায়েরা।

হিজল বনকে পিছনে রাখিয়া তাহারা বসিয়াছিল। হোমায়েরা দেখিল মাঠের পর মাঠ ঢেউ তুলিয়া দূর হইতে দূরে বিস্তারিত হইয়া গিয়াছে। দূরে বহু দূরে দিগন্তের কোলে অন্ধকার রেখার মত গ্রামগুলি মিলাইয়া আছে। সূর্য্যের লাল আভা তখনও দূর আকাশের ভাসমান মেঘের বুকে মিশিয়া রহিয়াছে।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে বসে কি হবে?

জাফর জওয়াব দিল, কিছু না। তবে এই অনন্ত শূন্যতার মাঝখানে শুধু তুমি আর আমি, জগৎ সংসার হারিয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি আছি তুমি আর আমি, অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও এটা কল্পনা করার মাঝে একটা রোমাঞ্চ আছে।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, মাঝে মাঝে তুমিও যে কেমন করে তোমাহারা হয়ে যাও, সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর হয়ে উঠে।

জাফর বলিল, আমার মন নিয়ে তুমি বিচার করলে বিস্মিত হতে না।

হোমায়েরা বলিল, এ-তর্কের ত মীমাংসা এক সময় হয়ে গেছে।

জাফর বলিল, মীমাংসা হয় নাই, হোমায়েরা। কিছুই হয় নাই।

হোমায়েরা বলিল, তা হলে বল, তোমার কথাই বল। বেচারা জগৎসংসারকে যখন তখন লুপ্ত করে দিয়ে ফায়দা কি।

জাফর বলিল, আমার নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে আমার কোন লজ্জা নাই, হোমায়েরা। তবে আমার মনে হয়, তোমাকে আত্মহারা করে দেওয়ার মত পুরুষ হয়ত জন্মেনি। আমার মত আত্মহারা হওয়ার সাধ্য তোমার থাকলে তুমি দেখতে সংসারে একটি মাত্র সত্য আছে, আর সবই মিথ্যা। দেখতে, আসমানের ছায়াপথ চূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আছে শুধু একটি তারা।

হোমায়েরার হাসি জাফর শুনিতে পাইল। সে তাহার মুখের দিকে চাহিল। হোমায়েরা বলিল, পরিবেশটি সত্যি অত্যন্ত চমৎকার। এ-জায়গায় আমারও একটু কবিত্ব করার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কি নিয়ে যে কবিত্ব করবো, তাই বুঝতে পারছি না।

জাফর তাহার দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল। জাফরের অভিজ্ঞতা হোমায়েরার কাছে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেও সে বুঝে, বরফ ভাঙ্গিতে শুরু করিলে তাহার ঝঙ্কার কেমন হয়।

সে বলিল, এ ব্যাপারে তুমি বড়ই দরিদ্র, হোমায়েরা; সে তুমি স্বীকার করো আর নাই করো, আমাকে বলতেই হবে।

হোমায়েরা বলিল, নিজের দারিদ্র্য লুকিয়ে ঐশ্বর্য্যের বড়াই করে বেড়াবো, সে কি আর হয়?

জাফর বলিল, কথা এটা নয়। অনেকে দারিদ্র্যকেই

ঐশ্বর্য্য মনে করে। তুমি কি স্বীকার করো, হোমায়েরা, তোমার দারিদ্র্যকে তুমি যদি বড় করে, মহান করে সামনে নিয়ে গর্ব্বের সাথে না চলতে, তা হলে তুমি সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যেতে।

হোমায়েরা বলিল, আমি যেমন আছি, সেটা যে আমার কাছে কাম্য নয়, তা ত আমি জানি না।

জাফর বলিল, তুমি দুনিয়ার প্রতি অবিচার করো না, হোমায়েরা। দুনিয়ার সামনে সকল দ্বার বন্ধ করে দিয়ে তুমি ত শুধু তোমার কথাই ভাবছো। অপরের কথাও তোমাকে ভাবতে হবে।

তা হলে অপরে আমার কথা ভাববে, সেটাও ত সঙ্গত।

অন্যে তোমার কথা যত ভাবে, তার অর্দ্ধেকও তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাবলে, সে আলাদা ব্যাপার হত।

হোমায়েরা বলিল, কিন্তু ভাবনার সাথে ভাবনার মিল না হলে সে দোষটা কি আমার?

জাফর বলিল, দোষাদোষির কথা হচ্ছে না। চিন্তাধারা যাতে একই খাতে বয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থাও ত করা সম্ভব। তুমি নিজে যে সম্পূর্ণরূপে অনির্দিষ্টের উপর নির্ভর করে থাকো না, সেও ত আমার জানা আছে।

হিজল বনে সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে দুয়েকটি তারা ফুটিয়া উঠিতেছে। বনের পিছন হইতে শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। হোমায়েরা আঁতকে কাঁপিয়া উঠে। জাফর তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলে, ও কিছুনা শেয়াল।

হোমায়েরা বলিল, চল, উঠি।

জাফর বলিল, আরেকটু বসি, হোমায়েরা। এ-সন্ধ্যা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা।

হোমায়েরা বলিল, এমন সন্ধ্যা বহু এসেছে, আরও আসবে।

জাফর বলিল, সন্ধ্যা এসেছে, এবং আরও আসবে, কিন্তু এ সন্ধ্যাটি সম্পূর্ণরূপে একক। আমার জীবনের চিরদিনের স্মৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎস হয়েই এ-সন্ধ্যা বেঁচে থাকবে।

হোমায়েরা বলিল, আনন্দের অবিনশ্বরতায় তা হলে তুমি বিশ্বাস করো?

জাফর বলিল, করি। অন্ততঃ আজকের দিনের আনন্দ সম্পর্কে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, আজকে আজকের কথাই বলো। জগৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, এ-পরিবর্তনের মুখে তুমি আজকে যা আছে, কাল তা থাকবে না, কাজেই এত নিশ্চিন্ত হওয়া ভাল নয়।

জাফর বলিল, তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছো না। কিন্তু তোমার সাথে আমার পরিচয় ত দুদিনের নয়, হোমায়েরা। পিছনে ফেলে আসা অনেক-গুলি বছরের দিকে তাকিয়ে তুমি আমার সম্পর্কে রায় দাও। তুমি যে রায় দেবে, সে রায় আমি মাথা পেতে মেনে নেব। কিন্তু তোমার আদালতে বারবার মুলতুবির হুকুম আমাকে পাগল করে দেবে, হোমায়েরা।

হোমায়েরা বলিল, তোমার আজ কি হয়েছে বলতে পারি না, যা বলছো, সবই বাড়িয়ে বলছো। মানুষের দেখাটা বিচিত্র, ভাবটা আরও বিচিত্র। কাজেই অতীতের কথা তুলে আমার উপর জবরদস্তি করলে, আমি একেবারেই নাচার।

জাফর বলিল, অতীতের কথা আমি ভুলবো না, হোমায়েরা, আমি বর্তমানকেই দেখতে চাই, বর্তমানেই আমি বাঁচতে চাই। তুমি মনে কোন সংশয় পুষে রেখো না হোমায়েরা।

হোমায়েরা বলিল, এ-ব্যাপারে তোমার সাথে আমার মোটেই মতভেদ নাই, আর এ-জন্যই তোমাকে আমি পছন্দ করি।

জাফর গভীর কণ্ঠে ডাকিল, হোমায়েরা!

হোমায়েরা বলিল, এটা কোন নূতন কথা আমি বলিনি। এটা তুমি জানো। তবু তোমার ধারণা আমি তোমাকে পাশ কাটিয়ে যাই। এটা তোমার ভুল।

জাফর বলিল, তা হলে বলো, জীবনের স্রোতধারা কোথায় বন্দী হয়ে আছে।

হোমায়েরা বলিল, না, তোমার সাথে আজ আর পারবো না। মনে হচ্ছে যেন, মুখস্ত করে করে কথাগুলো শিখে তবে আজকের এই মুহূর্তে এখানে তুমি আমাকে পথ ভুলে টেনে এনেছ।

জাফর বলিল, তোমার কথা সব সত্য নয়, তবে কিছুটা সত্য এতে আছে। পথ ভুলাবার বহু চেষ্টাই করেছি, কিন্তু আমার জীবনে এসে তোমার কোন পথই কখনও শেষ হলো না। তবু প্রতীক্ষা করে আছি। দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখ, সেখানে কত গাঢ় অন্ধকার জমছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রতীক্ষারও শেষে আছে শুধু এমনি অন্ধকার।

হোমায়েরা বলিল, যাকে তুমি অন্ধকার দেখছো, সে তোমার চোখের জন্য। আসলে, এ-গুলো গ্রামশ্রেণী, হাসিকান্নার বাসর সাজানো মানুষের সংসার সেখানে আছে।

জাফর বলিল, বল, হোমায়েরা, এই প্রতীক্ষার শেষে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছার আশা আছে।

আকাশ-তারার আলোতে জাফর সুস্পষ্টভাবে হোমা-

য়েরার স্নিগ্ধ হাসিটি দেখিতে পাইল। হোমায়েরা মধুর স্বরে বলিল, এর জওয়াব আমি বহু আগেই দিয়েছি।

হোমায়েরা আর অপেক্ষা করিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, বনের ছায়ার কোল ঘেসিয়া পায়ে চলা পথে একাই চলিতে শুরু করিয়া দিল।

জাফর যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। হোমায়েরা একা চলিয়া যাইতেছে, তবু জাফর উঠিতে পারিল না। সে যখন উঠিল, তখন হোমায়েরা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া হোমায়েরা কোথায় বুঝিতে না পারিয়া জাফর চিৎকার করিয়া ডাকিল, হোমায়েরা।

জাফরের স্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া মাঠের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

মৃদু কণ্ঠে জওয়াব আসিল, এই যে।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া জাফর দৌড়াইতে লাগিল। হোমায়েরার পাশে গিয়া সে তাহার হাত ধরিল।

(ক্রমশঃ)

এ যুগের য়ূসফ

কাদের নওয়াজ

(একটি উর্দ্দু কবিতার ভাবানুসরণে)

বনে কান্তারে ঘুরি' য়ুসফ্ খুঁজিছে আজি
সুন্দরী জুলেখারে তার,
রভসে গোঁয়ায় রাতি, চাঁদ জাগে শিয়রেতে
ফোটে ফুল হাস্নেহেনার।
অনুরোধ এই শুধু, গহীন নিশীথে সবে
চরাচর সুপ্ত নিঝুম,
শুয়ে বিছানায় তুমি, আলু-থালু বেশে যবে
ঘোমটা উতারি যাবে ঘুম—
তখন আকাশ থেকে, মুক্ত জানালা দিয়ে
করুণ চাহনী তার হানি,
একটি উজল তারা, ছল্-ছল্ চোখে যদি
চেয়ে থাকে হে জুলেখা রাণি!
হঠাৎ নিশীথে তব, ঘুম ভাঙে যদি সেই
তারকার জ্যোতি চোখে লেগে,
ভাবিও তাহারি সম, তোমা তরে নিশি-দিন
য়ুসফের আঁখি আছে জেগে।

যামিনীর শেষে যবে, ঢলে' পড়ে রাঙা-শশী
হাসি-রাশি মিলায় গগনে,
তখন জাগিয়া তুমি, দেখ যদি সেই চাঁদ
সেই শেষ বিদায়ের ক্ষণে—
তাহার সজল আঁখি, কাতর করুণ দিঠি
দেখিয়া ভাবিয়ো তুমি নারি!
এম্নি সজল-চোখে, য়ুসফ প্রবাসে বসি'
প্রণয় মাগিছে জুলেখারি।
ফারহাদ শিঁরী আর, কায়েস্-লায়লি সম
য়ুসফ্-জুলেখা দোঁহে হায়!
আশেক, মাশুক হ'য়ে কাঁপিছে বিরহে নিশি
মিলন হবে না দুনিয়ায়।
শুকতারা যেথা ডোবে, সেথা হ'তে দূরে
বেহেস্তের অমর কাননে,
পরিণয় হবে তব হে য়ুসফ! জানি জানি
বিরহিণী জুলেখার সনে।

পলাশীর পর ও সিপাহী যুদ্ধের আগে

হায়দার আলী

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন, দেবী সিং, হররাম ও দেবীসিংএর প্রভু হেষ্টিংস প্রমুখেরা এই লোমহর্ষক অত্যাচার রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে চালিয়েছে যদ্দরুণ হেষ্টিংস ও দেবী সিংহকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। কোম্পানীর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে হেষ্টিংস এই লোমহর্ষক অত্যাচার করে,—এই কৈফিয়তেই হেষ্টিংস বেঁচে যায়। ধূর্ত্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ দেবী-সিং এর বিরুদ্ধে এমন প্রবল আকারে প্রপাগণ্ডা চালালেন যে, হেষ্টিংস চাপা পড়ে গিয়ে দেবী সিং ও হররাম প্রধান অত্যাচারী বলে প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে স্বদেশীয়রা যে ঐ সময়টিতে যুদ্ধ বিগ্রহ চালালো—তা-ও প্রপাগাণ্ডার ধূম্রজালে একরূপ অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ বঙ্কিমবাবু বলছে যে,—জমিদাররা উক্ত অত্যাচার করেছে। কি রকম ইংরাজ প্রীতি! বঙ্কিম! তুমি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল—সন্দেহ নেই; কিন্তু বিদেশী ইংরাজ দস্যুদের কাছে সর্বসাকুল্যে সম্ভবতঃ মাত্র এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তুমি তোমার বিবেক ও প্রতিভাকে বিক্রী করে দিয়েছ বৈ ত নয়? ইংরাজের তক্মায় ভুলে বিদেশী দস্যুর গোলাম হয়ে সারা দেশটাকে তুমি জাহান্নামে দিয়ে গিয়েছ? তোমার 'আনন্দ-মঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে তুমি সুবাদার বাকের মোহাম্মদ নূর উদ্দিনের নাম দাওনি—দাওনি তৎ-পুত্র কামাল উদ্দিনের নাম, মুসা শাহ প্রভৃতির নাম। হিন্দু হ'লেও 'শীল' নীচ সম্প্রদায়; সেই জন্য রাজা দয়াশীলের নামটি পর্য্যন্ত দাওনি। হিন্দু-মোসলমানকে এক করে, এক জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে, তুমি তোমার প্রতিভাকে কাজে লাগালে পরাধীনতার জালায়-কাতর-ভারতে স্বর্গীয়-সুষমা-মণ্ডিত এক বীর্যবান মহাজাতীয়তা গড়ে উঠ্‌ত নাকি? হায়রে, পয়সা ও চাকুরী, আর তোমার মত কালা বোবা ও লেজনাড়া ডিগ্রীধারী—এ তিনই দেশটাকে জাহান্নামে দেয়ার মূলে। বঙ্কিম, তোমার যারা প্রশংসা করে, তারা তোমার মতই বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী। বঙ্কিমকে যারা 'ঋষি'—পথ প্রদর্শক বলে, তারাও বঙ্কিমের মত বিদেশী অত্যাচারী দস্যুদের তক্মায় নিজের ও পরিবার-পরিজনদের মেদ ও বংশবৃদ্ধি করেছে; বঙ্কিমের মত তা'দিগকেও স্বদেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলা যায়। আমাদের আলোচ্য বিপ্লবীগণ জাতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপরে যে অতুলনীয় ত্যাগ, দুঃখবরণ ও জীবন পাত করেছেন—সেই 'জাতীয়' দৃষ্টিকে সাম্‌নে রেখে আমরা আমাদের কথাগুলো বলছি।

"ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মারকুইস অব হেষ্টিংসকে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্ব্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই।"

[১০৬ পৃঃ]

এ-উত্তরবাংলায় হেষ্টিংস প্রভৃতিরা যে দীর্ঘ বৎসর বাধার সম্মুখীন হয়, অত বড় ও দীর্ঘস্থায়ী বাধা ইংরাজেরা আর কোথাও পায়নি—তা' ইংরাজদের ও তাদের দালালদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই প্রমাণিত হয়।

"সোমবারে প্রাতঃ-সূর্য্য—প্রভাসিত, নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবীরাণীর "দরবার" বা "এজলাস"। সে এজলাসে কোন মামলা মোকদ্দমা হইত না। রাজ-কার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল; কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে—কিন্তু বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদোয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালার। তাহার ভিতর চন্দন কাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট-রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মস্‌নদ পাতা, তাহাতেও মুক্তার ঝালর......।" ইত্যাদি।

[১১১—১১২ পৃঃ]

জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর জমিদারী খুব বেশী ছিল না—তা আমরা ইংরাজ লেপ্টেন্যাণ্ট ব্রেণান এর লিখা হতে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম—

"দেবী চৌধুরাণীর হয়ত জমিদার ছিল। তবে তাঁর জমিদারী বৃহৎ ছিলনা।"

দেবী চৌধুরাণী বংশের লোকদের নিকট হতে জানা যায় যে, দেবী চৌধুরাণী ও তাঁর স্বামী নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর জমিদারীর আয় এক লাখ টাকার অধিক ছিল। প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী ঐরূপ শান-শওকতের

মধ্যে বিচার করেননি; যিনি ঐভাবে বিচার করেছেন তাঁর নাম বঙ্কিম না দিলেও আমরা দিচ্ছি।

সেই বিচারপতির দরবারে ছিলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক প্রভৃতি। যাঁর এজলাসে বসে বিচার করার কথা বঙ্কিম বলেছে—তাঁর নাম হল কামাল উদ্দিন। বঙ্কিম যেমন সোমবারে বিচার করার কথা বলেছে, তদ্রূপ জহুরুদ্দীন ফকীরও কামালের সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে বিচার করার কথা তাঁর ছড়াগানে উল্লেখ করেছেন—

"সমবারে বেসদবারে কাছারিত বসিয়া বিচার করে
লোকজন নিয়া।
আসামী ফৈরাদীর জবানবন্দী নেয় হাসিয়া হাসিয়া॥
সাক্ষিপ্রমাণে যদি দোষী সেই হয়।
দরবারের লোক নিয়া তাকে সেই শাস্তি দেয়॥"

ধনকুবের কামাল উদ্দিন ভ্রাম্যমান অবস্থায়ও বিচার করতেন। তার প্রমাণও আমরা এখানে দিচ্ছি। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সেক্রেটারী জমিদার সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ ও এঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রাজ বাহাদুরের নিজ গ্রাম 'সপ্ত পুষ্করিণী'। উক্ত সুরেন বাবু জমিদারের তহশীলদার রমজান আলী মিঞা সুরেন বাবুর গ্রামেরই লোক। রমজান আলী মিঞা যা আমাকে বলেছেন, তা' হল এই:—

"আমার বয়স যখন নয় বৎসর, ঐ সময় আমার কালা জ্বর হয়। গো-গাড়ীতে করে আমি সপ্ত-পুষ্করিণী চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্সারীতে যাই। ডিস্‌পেন্সারীর অনতিদূরে একটি উঁচা জায়গা পাকা অবস্থায় বাঁধান রয়েছে। ওর পাশ দিয়ে পাকা অবস্থায় দু'খানা হেলায় দে'য়া বেঞ্চও রয়েছে। আমি আমার শরীরের ক্লান্তিবশতঃ উক্ত শান্ বাঁধা পাকা জায়গাটির এককোণে বসামাত্র আমার অভিভাবক বৃদ্ধ আমারে ধমকায়ে ঐ স্থান থেকে উঠায়ে দেন; এবং ফুলচৌকির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বলেন—'এখানে নবাব বসে বিচার করতেন—ও জায়গায় কেউ বসতে পারে না—আর বসা যায়ও না।' আমাদের বাবুরাও* ঐ গোলাকার জায়গাটিতে কখনও বসেন না—ঐ জায়গাটিকে পবিত্র মনে করেন।"

ফুলচৌকিতে বিচার ও সরকার হওয়া সম্বন্ধে পায়রাবন্দের জমিদার টাটি চৌধুরীর পৌত্র, আবু আলী চৌধুরীর পুত্র মোহাম্মদ মছিহুজ্জমান আবুল ওছামা ছাবের চৌধুরী তাঁর জবানবন্দীর একস্থানে বলেন—

"বাবাজানের ও লোকের মুখে শুনিয়াছি, ফুলচৌকিতে পূর্ব্বে সরকার ছিল। জমিদার বরদাসুন্দরী ও প্রজা সানজুয়া প্রামাণিকএর সহিত কাঁঠাল গাছ উঠান লইয়া মামলা হয় ফুলচৌকিতে। ঐ মামলায় সানজুয়া প্রামাণিক কাঁঠাল গাছ পায় এবং সানজুয়া প্রামাণিক ঐ কাঁঠাল গাছের তক্তায় মাহিপোষ তৈয়ার করে। সেই মাহিপোষটি আমার শ্যালক আবদুল ওয়াহেদএর নিকট এখনও আছে। আমার বাড়ীর নিকটে আবদুল ওয়াহেদ মিঞার বাড়ী।" ৮।১১।৫৮

কামাল উদ্দিন খুবই জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। হয়ত বঙ্কিমবাবু সুরেনবাবুদের পিতৃপুরুষ ও অন্যান্য লোকদের নিকট ঐ রকম আড়ম্বরপূর্ণ দরবারের কথা শুনে তাঁর উপন্যাসে ঐরূপ লিখে থাকবেন। কেননা সুরেনবাবুরা পুরুষানুক্রমে ইংরাজভক্ত ছিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী, সুরেন চৌধুরীর বাড়ীর মাত্র ছ'মাইল দূরে ফুলচৌকির মূল প্রাসাদ অবস্থিত ছিল।

"বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতির দল জমায়েতবদ্ধ হইয়াছে—" [১১৩ পৃঃ]

এই 'বৈকুণ্ঠপুর' বঙ্কিম কোথায় বলতে চেয়েছে!

একি রঙ্গপুর শহরের আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর?—না, জলপাইগুড়ির নিবিড় অরণ্য বৈকুণ্ঠপুর? বিখ্যাত রায়কত পরিবারের বাড়ীর কাছে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের নিবিড় জঙ্গল মেরে এখন চা-বাগান করা হয়েছে। যখন জঙ্গল মধ্যে বলা হয়েছে, তখন জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরই হবে। নায়েব নবাব রামনারায়ণ যে বৈকুণ্ঠপুর, দেওডোবা প্রভৃতি স্থান থেকে সম্রাট শাহ আলম ও তাঁর নিযুক্ত সুবাদার নবাব বাকের মোহাম্মদ নূর উদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে,—সে বৈকুণ্ঠপুরে কিন্তু জঙ্গল নেই,—এখন লোকালয় হয়েছে। ইংরাজরা বাকেরজঙ্গ, ভবানী পাঠক, জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির সমস্ত কাজ-কারবার গোপন ও বিকৃত করবার ভার ইংরাজ কর্মচারী বঙ্কিমের উপর দেয়—বঙ্কিম তা' নিপুণ হস্তে সমাধা করেছে এবং পুরস্কারস্বরূপ রায়বাহাদুর ও সি-আই-ই খিতাব পেয়েছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'আনন্দমঠে'র ১ম সংস্করণে বিদ্রোহীদের স্থান বঙ্কিম 'নগর' বলেছে; কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে আর তা' বলেনি। বঙ্কিমের প্রভু ও পথপ্রদর্শক হাণ্টার ফুলচৌকিরাজ কামালের 'নগর'কে যেমন সুকৌশলে এমনভাবে চিত্রিত করেছে—যা সাধারণ পাঠক 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থ পড়লে মনে করবে—এ 'নগর' বীরভূমের 'নগর'। বঙ্কিমও তদ্রূপ ১১৭৬এর পূর্ব-মধ্য ও পরবর্তী ঘটনাগুলিকে ১ম

* সুরেন বাবু, মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও তাঁদের পূর্বপুরুষরা।

সংস্করণে বীরভূমে ঘটাতে চেয়েছে; কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে উত্তরবঙ্গে নির্দেশ করেছে—এর মধ্যেও হয়ত তার প্রভুদের ইঙ্গিত ছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য, বঙ্কিম এ-সব বিদ্রোহী অঞ্চলে এসেছিল কিনা। বঙ্কিমের চাকুরীর খতিয়ান দেখলে মনে হয়—আসেনি। কিন্তু অনেক প্রাচীন লোক বলেন ও আগেও বলেছেন—বঙ্কিম রঙ্গপুরে এসেছিল। আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, ঐ সময় আমার বড় মামুজী রহিম উল্লাহ্ আহ্মদ ও মেজ মামুজী ডাক্তার শহর উল্লাহ্ আহ্মদ এবং আমার খালু আবদুস্ সামাদ চৌধুরী আমাদের বাড়ীতে বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে ডাক্তার মামা যা বলেছেন তা' নিম্নরূপ :—

"বঙ্কিমবাবু ও তাঁর স্ত্রী কলিকাতা হতে রঙ্গপুর ট্রেনে আসা পথে 'বদরগঞ্জ' ষ্টেশনে বঙ্কিমবাবু যে কামরায় ছিল, ঐ কামরায় এক যুবক উঠে। ঐ কামরায় আমার ডাক্তার-মামা-ও উঠেন। কামরায় চঞ্চলমতি যুবকটি বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কেমন বে-য়াড়া ভাবভঙ্গী করতে থাকে। সুচতুর বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি কিন্তু যুবকটির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী তার পানবাটার বাক্স হতে একটি পান বঙ্কিমবাবুকে দেয়—আর একটি পান নিজে খাবার জন্য প্রস্তুত করে, ঐ সময় বঙ্কিমবাবু বলে, 'ওকেও [যুবকটিকে] একটি পান দাও।' বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী যুবককে পান দিলে যুবকটি ইতস্ততঃ করে গ্রহণ করে। বঙ্কিমবাবু তখন যুবককে বলে—'দেখ হে, আমি সারা-জীবন ধরে এর পদসেবা করেও মন পাইনি—আর তুমি এত সহজে এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও ?' উক্ত কথা বলামাত্র কামরাস্থিত সমস্ত যাত্রী হেসে ফেটে পড়ে। বদরগঞ্জের পারে শ্যামপুর ষ্টেশনে লজ্জা পেয়ে যুবকটি নেমে পড়ে।"

উপরোক্ত ঘটনাটি সাহেবগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মহন্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মহন্ত; আমার ডাক্তার মামুজীর নিকট শুনেছেন বলে, আমার কাছে প্রকাশ করেন।

এ-সব ঘটনা হতে বুঝা যায়, বঙ্কিম চাকুরী করতে রঙ্গপুরে না আসলেও উপন্যাস লিখার খাতিরে এখানে এসেছিল।

"বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম। সেইখানে প্রফুল্ল-মুখীর শ্বশুরালয়।"

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪র্থ পৃঃ]

রঙ্গপুর জিলাস্থ তিস্তা জংশনটিই 'ভূতনাথ' গ্রাম। এখানে বঙ্কিমের প্রফুল্লমুখী বা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর শ্বশুরালয় ছিল না; ইহা কাল্পনিক মাত্র। 'পীরগাছা' গ্রামে দেবীর শ্বশুরালয়।

"প্রথমে জর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে বামুনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না।"

['দেবী চৌধুরাণী'। ৭ম পরিচ্ছেদ, ২৬ পৃঃ]

প্রফুল্লমুখী ও তাঁর শ্বশুর—ইঁহারা ব্রাহ্মণ, আর বামন-ডাঙ্গা গ্রামের বর্তমান জমিদার বংশও ব্রাহ্মণ এই মনে করেই যদি কেশব লাল বসু মহাশয় দেবী চৌধুরাণী [জয়দুর্গা মাই] কে বামনডাঙ্গার ঘরের মনে করে থাকেন, তাহলে ভুল করেছেন। কেননা বামনডাঙ্গা গ্রামের জমিদার যেমন ব্রাহ্মণ, মন্থনা পরগণার পীরগাছা গ্রামের জমিদারেরাও তদ্রূপ ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। বামনডাঙ্গা জমিদারদের উপাধি যেমন 'রায়,' মন্থনা [পীরগাছা] ও ইটাকুমারী জমিদারদ্বয়েরও উপাধি হল 'রায়'; তবে ইটাকুমারীর জমিদার রাজারায়, শিবচন্দ্ররায়—ইঁহারা বৈদ্যবংশ সম্ভূত।

২০শ ভাগ, ২য় সংখ্যায়, ১৩৪৬ সাল 'দেবী' নাম দিয়ে 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় কেশবলাল বাবু যে কবিতা লিখেছেন—তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি।

সাদুল্লাপুর থানাধীন দুর্গাপুর; এই গ্রামে শতাধিক পুষ্করিণী আছে। নবাবের আদেশে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নামানুসারে এই জনপদের নামকরণ হয়। সুবাদার বাকেরজঙ্গ এই পুষ্করিণী খনন করিয়ে দেন। উক্ত দুর্গাপুরের পার্শ্বে 'ভগবানপুর'। এই জনপদের নাম বাকেরজঙ্গের টাকশালের কোষাধ্যক্ষ (ব্যাংকার) ভগবানসিংএর নামানুযায়ী উক্ত গ্রামের নামকরণ হয়। 'কুটিরপাড়'—ত্রিমোহনী নদীর পাড়ে অবস্থিত।

রঙ্গপুর রেলষ্টেশন হতে পশ্চিমে 'মুন্সীপাড়া,' 'ধাপ' [রংমহলে উঠ্বার সিঁড়ি], উত্তরে 'চিকলী' [নবাব-বাকের ও কামালের কৃত্রিম হ্রদ], ও দক্ষিণে 'লালবাগ'-এর শেষ প্রান্ত—এই ভূ-ভাগের নাম ছিল 'রাধাবল্লভ'। মন্থনার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর মন্থনা পরগণাধীন এই 'রাধাবল্লভ' প্রান্তরটি ছিল। উক্ত স্থানের 'শাহী মসজিদে'র পুরানো কাগজপত্রে দেখা যায়—এর নাম 'রাধাবল্লভ'। পরে নবাব ও নবাব পুত্র কামাল এখানে কাশানা, কুঠি, রংমহল প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এ-স্থানটিকে রঙ্গপুর, দিনাজপুরের হাজার হাজার প্রাচীন লোকেরা 'জংপুর' ও অশিক্ষিত লোকেরা 'জমপুর' বলত। ইংরাজরা একে 'জংপুর' না ব'লে 'রংপুর' বলবার সুযোগ নিয়েছে এঁদের নাম-নিশানা সবকিছু মুছিয়ে ফেলবার বাদ্-মতলবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ ও দেশবাসীদের নিকট অনুরোধ, তাঁরা সর্বস্বত্যাগী নবাব ও নবাব পুত্রদের 'জংপুর'কে জংপুর নামকরণ যাতে পুনরায় করা হয়—

সেদিকে চেষ্টা করবেন। ফুলচৌকি বা নগরে যেস্থানে বীরাঙ্গণা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী স্বয়ং-ডিপুটী নবাব রামনারায়ণ ও ইংরাজ পক্ষের বিরুদ্ধে, সম্রাট শাহ আলম ও বাকেরজঙ্গের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছেন, ঐ স্থানটিকে এখনও বলা হয় 'দুর্গাপুর'। ঐ স্থানে সৈন্যদের পানি পান ও গোসল করবার জন্য একটি দীঘি খনন করা হয়। এখনও সে দীঘি বর্তমান। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী মীরকাসিমের বিপক্ষে উক্ত 'দুর্গাপুরে' লড়াই করেন। যে স্থানে মীরকাসিম সৈন্য সমাবেশ করেছিল—সেখানে একটি সুবৃহৎ দীঘি এখনও বিদ্যমান। দীঘিটাকে এখন লোকে 'বেল পুকুর' বলে। উক্ত 'দুর্গাপুর' ও 'কাসিমপুর' গ্রাম মুখোমুখি অবস্থায় অবস্থিত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৬০ সালে মীর কাসিম কোম্পানীর নায়েব বা নবাব পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু তা' ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর পর। সম্ভবতঃ উক্ত ৯ই ফেব্রুয়ারীর 'মসিদপুর' যুদ্ধে ইংরাজ ও তাদের তাবেদার নবাব মীরজাফর পক্ষ হেরে যাওয়ায় ইংরাজরা চিন্তিত হয়ে পড়ে; পরে তারা মীর কাসিমকে কোম্পানীর তাবেদার নায়েব নবাব করে।

'নগরে'র মূল প্রাসাদের দেড় মাইল দক্ষিণে 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থে হাণ্টার বর্ণিত নগরের সরোবরের যে স্থলে দ্বীপের কথা রয়েছে, সেই দ্বীপের পাঁচ শ' গজ পূর্ব-উত্তর পার্শ্বের পূর্ব পাড়ে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর গ্রীষ্মাবাস ছিল; উহার সম্মুখস্থ 'দহ'টিকে এখনও 'জয়দুর্গারদহ' বলা হয়। মূল প্রাসাদের [বাকেরজঙ্গ ও তৎবংশীয়দের] এক মাইল পশ্চিম দিয়ে সরোবরটি আরও মাইল দু'য়েক উত্তরদিকে গিয়েছে এবং ওরই এক অংশ দক্ষিণদিকে এক মাইল গিয়ে 'কাটগড়ী' [নবাবের কাটা খাল] নাম্নী নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। উক্ত সরোবরটিকে এখন লোকে 'শাপ গড়ীর বিল' বলে এবং উক্ত সরোবরের অন্য একটি শাখাকে 'আইনশা'রবিল' বলে। মূল প্রাসাদের এক মাইল দক্ষিণ দিক দিয়ে একটি সরোবর প্রবাহিত হয়ে পূর্বের তিস্তায় গিয়ে ঠেকেছে। মূল প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে মাইলের পর মাইল স্থান জুড়ে অসংখ্য ঝর্ণা-ফোয়ারার পানি আছাড় খেয়ে খেয়ে দালানের সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে ঘাটগুলি বেয়ে নিম্নাভিমুখী হয়ে সরোবরগুলির মুখে গিয়ে ঠেকেছে এবং দক্ষিণাভিমুখী সে জলধারা তিস্তা [বর্তমান যমুনেশ্বরী] নদীতে গিয়ে পড়েছে। এক একটা ঝর্ণা ও ফোয়ারার মুখ অর্দ্ধহস্ত হতে পঞ্চাশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। এ রকম লক্ষ লক্ষ ঝর্ণা ও ফোয়ারা ছিল—এখনও কোথাও কিছু কিছু রয়েছে। ফোয়ারা ও ঝর্ণার পানি গ্রীষ্মের সময়গুলিতে ঝরানো হ'ত। কলের মুখে খুলে দিলে ঐসব ফোয়ারা ও ঝর্ণার পানি গড়ায়ে চতুর্দ্দিকে সাগরের মত হত এবং ঠাণ্ডা পানির সুশীতল হাওয়া ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরতো মূল প্রাসাদ ও প্রতি গ্রীষ্মাবাস গুলিতে। শীতের দিনে ঝর্ণা-ফোয়ারার পানি প্রয়োজন ব্যতীত ঝরানো হত না। দার্জিলিং এর ঝর্ণার পানির মত এস্থানের ঝর্ণার পানিও স্বচ্ছ, শীতল এবং সুপেয়।

"রাজপুরীর দুইদিকে পানির সরোবর।
পাহাড় থাকি কাটি আনছে সেই নহর॥
কত ঝর্ণা-ফোয়ারা আছে কে করে শুমার।
রাজপুরীর চৌদিকে যেন ইন্দ্রের বাজার॥
কি কব রাজপুরীর কথা কহা নাহি যায়।
সাজিয়া আছে ইন্দ্রপুরী যেন বা মনে হয়॥
মোগল বাদশার গণাগণ পুরীর মধ্যে থাকে।
কুর্ণিশ করি যায় আইসে দরবারে সব লোকে॥"
[জহুর ফকির]

এখন হতে প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্বে আমি ছোট বেলায় দেখেছি এবং আরও অনেকে দেখেছে, 'শিকুরপাড়া' গ্রামের শরীতুল্লাহ্ ফকির বা শরী ফকির নামীয় ১২০।১২৫ বৎসর বয়সের এক সুপ্রাচীন বৃদ্ধ ভিক্ষুক মূল প্রাসাদের পার্শ্বের রাস্তা দিয়ে যখন যাওয়া-আসা করতেন, তখন যাওয়ার পথে—কুর্ণিশ আরম্ভ করতেন। বর্তমান ছফির উদ্দিন আকন্দ সাহেবের বাড়ীর রাস্তার উত্তরপার্শ্বে—বড় আম্রগাছের তলা হতে, সে গাছটি এখনও রয়েছে এবং ভিক্ষা করে ফিরে আসার পথে আদিল আকন্দের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তার তে-মাথায় এসে যখন উত্তরদিকে রাস্তায় হাঁটা পথে চলতেন ঐস্থান থেকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ও মস্তক উঠানামা করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতেন; এমতাবস্থায় ইঁনি সর্বদা মুখ প্রাসাদের দিকে করতেন এবং কখনও নিতম্ব প্রাসাদের দিকে ফেরাতেন না এবং উক্ত ছফির আকন্দের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের বড় আম্রগাছের নীচে গিয়ে কুর্ণিশ করা বন্ধ করতেন। আমরা অর্থাৎ ছেলেরা ফকিরের ঐরূপ করা [কুর্ণিশ করা] দেখে হাসতাম ও বলতাম—'ফকির পাগল হয়েছে রে, ফকির পাগল হয়েছে।' পরে বুঝতে পারলাম এ পাগলামী নয়, এ-হল কুর্ণিশ করা।

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডুর আকাশ
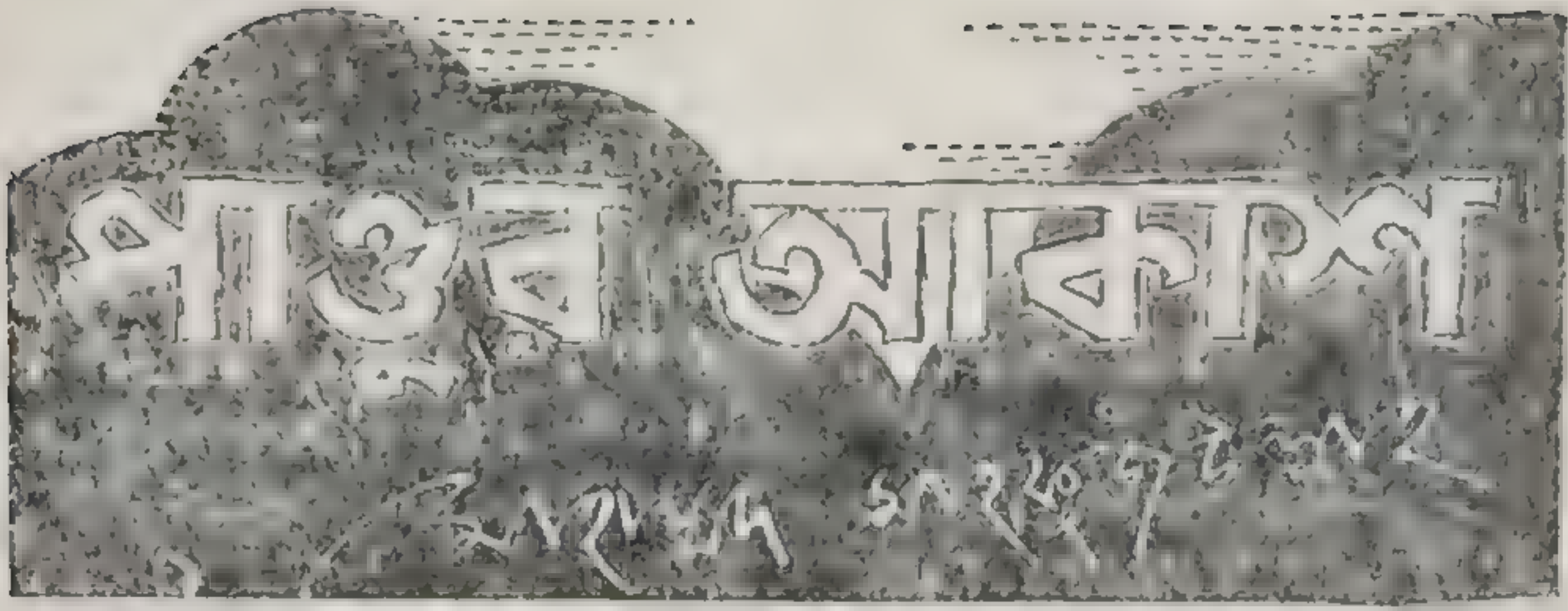
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ষ্টেশন থেকে পলাশপুর দু'মাইলের বেশী দূর নয়। হেলে-দুলে পাল্কী চলেছে পলাশপুরের দিকে। পাল্কীর দোলানির সাথে তাল রাখতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে প্রায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রিজিয়া। এই এক অস্বস্তিকর অবস্থা তার। একে নতুন বউয়ের লজ্জা তার ওপর আবার পাল্কীর দোলানি! মুখ খোলে কিছু বলাও শোভা পায় না তার, পাছে আবার গুরুজনেরা কিছু মনে করে বসে। পাল্কীর সাথে সাথে হেঁটে চলেছেন মামুনের আব্বা—লতিফ সাহেব। রিজিয়া পাল্কীর দরজা ফাঁক করে একবার দেখে নিল তার শ্বশুরকে। লতিফ সাহেব বার বার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন রিজিয়াকে। বলছেন, "সাবধানে শক্ত হয়ে বসে থেকো বৌমা, সামনেই একটা খাল পেরোতে হবে। পানি নেই খালে, শুকিয়ে তামা হয়ে আছে; তবু উঁচুনীচু পার হতে ঝাঁকি লাগতে পারে।"

শ্বশুরের কথা শুনে আরো আঁট সাঁট হয়ে বসে রিজিয়া। বেহারাকে সতর্ক করে দিয়ে লতিফ সাহেব বলেন, "তোমরা খুব আস্তে আস্তে খাল পেরোবে কিন্তু। বৌমা আমার শহরের মেয়ে, জীবনে পাল্কী চড়েছে কিনা কে জানে।"

এই অস্বস্তির মধ্যেও শ্বশুরের কথা শুনে হাসি পায় রিজিয়ার। মনে মনে সে বেশ কিছুটা কৌতুকও বোধ করে।

খালের কাছে এসে পৌছাতেই লতিফ সাহেব ডাকেন রকিবকে। রকিব পাল্কীর পেছনে পেছনেই আসছিল। বাপের ডাক শুনে আরো কাছে এসে পৌছাল। লতিফ সাহেব বললেন, "পাল্কীর এক পাশে তুই থাকবি রকিব, দেখিস বৌমার যেন কোনো কষ্ট না হয়।"

রকিব বললো, "আমি ডান ধারে আছি, ভাবীর কোনো অসুবিধা হবে না।"

অবশেষে পাল্কী এসে পৌঁছালো লতিফ সাহেবের আঙ্গিণায়। চার পাশে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়ালো ভীড় করে। মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের মতো সবার কথা এক সাথে জটলা পাকিয়ে উঠলো। ভীড় দেখে লতিফ সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সে মুহূর্তে তিনি ভাবতেও পারলেন না যে তাঁর বাড়ীতে নতুন বৌয়ের আগমনের জন্যেই পাড়াপড়শীর এই জটলা। সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর মনে শুধু শহুরে বউয়ের অসুবিধার কথাটাই বড় হয়ে দেখা দিল, তিনি দু'হাতে জটলা সরাতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে এসে পাল্কী পাল্লা সরাতে শুরু করে দিয়েছে। এক ফাঁকে রিজিয়াও দেখলো নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে ভীড় জমিয়েছে পাল্কীর চার পাশ ঘিরে। ঘামে ভিজে একাকার হয়ে গেছে রিজিয়া, পাল্কীর গুমোট পরিবেশ অসহ্য মনে হচ্ছে তার।

লতিফ সাহেব প্রায় তেড়ে এসে ছেলেমেয়েদের দু'হাতে ঠেলে সরাতে লাগলেন। দৃশ্যটা মামুনের চোখে একটু বিসদৃশ মনে হলো। তবুও বুড়ো বাপ মনে আঘাত পাবে ভেবে সে শুধু বললো, "থাক না আব্বা, ওদের সরিয়ে কি হবে, ছেলেমেয়েদের আনন্দই তো সবচেয়ে বেশী।"

লতিফ সাহেব বললেন, "দেখবার তো ঢের সময় রয়েছে বাবা, বৌমার যে এদিকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে গরমে।" কথা শেষ করে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন লতিফ সাহেব। মামুনের আম্মাকে ডাকতে লাগলেন তিনি। বললেন, "কি মামুনের মা, তোমরা কি বউ ঘরে তুলবে, না গরমে পুড়িয়ে মারবে?" রাবেয়া বেগম আরো কয়েকজন বয়সী মেয়ে নিয়ে এগিয়ে এলেন পাল্কীর কাছে। দরজা খুলে দিয়ে বউমাকে বেরিয়ে আসতে বললেন তিনি। রিজিয়া প্রথমটা চুপ করে রইলো। রাবেয়া বেগম নিজ হাতেই অবশেষে তাকে পাল্কী থেকে বের করে

আনলেন। তারপর ধান-দূর্বা দিয়ে ছেলে আর ছেলে-বউকে ঘরে তুলে নিলেন।

রিজিয়ার আজো মনে পড়ে, যে কয়দিন সে পলাশপুরে ছিল তার মনটা শান্তি পায়নি এক মুহূর্তের জন্যেও। শ্বশুর-খাশুড়ী আদর-আপ্যায়নের ক্রটী করেনি কিছুই, কিন্তু তবুও কি কারণে যেন সে পলাশপুরের সাথে তার মনকে খাপ-খাওয়াতে পারেনি এতটুকু। লোকজনের আদর-আপ্যায়ন আর স্নেহ-মমতা বড় কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে তার। পলাশপুরের স্ত্রী-পুরুষের অনেকেই তাকে দেখতে এসেছে প্রতিদিন, এদের সবার মাঝে রিজিয়া দেখেছে দারিদ্র্যের করাল ছায়া আর অশিক্ষার ভয়ঙ্কর রূপ। কথাবার্তা আর চাল-চলনের গ্রাম্যতা লক্ষ্য করে নিজের অদৃষ্টের কথাই ভেবেছে রিজিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মাঝখানেও সে নিজেকে অনুভব করেছে একাকী আর নিঃসঙ্গ।

রিজিয়ার শহুরে চালচলন নিয়ে রসিকতা করেছে দেবর আর ননদেরা। বুড়োদের মধ্যেও যে কানাঘুষা হয়নি এমন নয়। রিজিয়া স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে এনে লতিফ সাহেব খুশী হননি মোটেই। প্রথম দিন কথাবার্তায় তিনি যে স্নেহ-মমতার ঝর্ণা ঝরিয়ে দিয়েছিলেন তা রিজিয়ার মনকেও ভিজিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু দু'দিন পরেই অনুভব করতে পেরেছিল এ বাড়ীতে সে সম্পূর্ণ বেমানান। ননদেরা ঠাট্টা-মস্করা করে অনেক কথাই বলেছে, রিজিয়া বুঝতে পেরেছে তার মধ্যেই রয়েছে নানা প্রচ্ছন্ন ইংগিত।

বাড়ীর চেহারা দেখেই রিজিয়া বুঝতে পেরেছে দারিদ্র্যের কষাঘাত এর প্রতি অঙ্গে ছড়ানো। মিথ্যা কৃত্রিমতার আবরণে তা ঢেকে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। এক অসতর্ক মুহূর্তে তার ছোট ননদ জোহরা মুখ কালো করে বলেছিল, "জানেন ভাবী, আব্বা ভাইজানকে কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মহাজনের কাছ থেকে ঋণ এনে ভাইজানের পড়ার খরচ চালিয়েছেন, তাই না ভাইজান শহুরে গিয়ে এখন টাকা রোজগার করছেন।" রিজিয়া বলেছিল, "তাই নাকি, তোমার ভাইজান তোমাদের খুব টাকা পাঠায়, না?" জোহরার মুখ থেকে তখন খইয়ের মতো কথা ফুটছে। জোহরা বললো, "বারে! ভাইজান টাকা না পাঠালে আমরা খাবো কি? মাসে মাসে ভাইজান যে টাকা পাঠান তাই দিয়েই তো আমাদের সংসার চলে।"

রিজিয়া বুঝতে পেরেছিল এর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে বাড়ীর আসল খবর। তাই জোহরাকে আরো কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সে বলেছিল, "আচ্ছা জোহরা, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, না?"

ভাবীর কথা শুনে লজ্জা পেয়েছিল জোহরা। মাথা নীচু করে বসে ছিল সে আপন মনে। রিজিয়া বলেছিল, "ভাবীর কাছে লজ্জা কি জোহরা, বলো, তোমার ভাইজান তোমাদের জন্যে আর কি কি পাঠায়।" জোহরা বলেছিল, "টাকা পাঠান, কাপড় জামা পাঠান, আরো কত কিছু পাঠান।"

রিজিয়া বলেছিল, "তোমার ভাইজান তোমাকে কাপড় দেয় না?" জোহরা বলেছিল, "হ্যাঁ, মাসে মাসে তো দেয়।" রিজিয়া বলেছিল, "কেন তুমি তো তোমার আব্বার কাছ থেকেই চেয়ে নিতে পার।" জোহরা বলেছিল, "বারে! আব্বা দেবেন কোত্থেকে? আব্বার কি বেশী টাকা আছে। সব টাকা যে মহাজন নিয়ে গেছে।" রিজিয়া বলেছিল, "তাই নাকি? খুব খারাপ কথা তো! দাঁড়াও, তোমার ভাইজানকে বলবো মহাজনের কাছ থেকে যেন সব টাকা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।" রিজিয়ার কথা শুনে মুচকি হেসে উঠে চলে গিয়েছিল জোহরা।

সে রাতেই অনেক পীড়াপীড়ি করে মামুনের কাছ থেকে সব কথা জানতে পেয়েছিল রিজিয়া। দেনার দায়ে তাদের অনেক সম্পত্তি নীলাম হয়ে গেছে সে-কথা জানতেও বাকী রাখেনি সে। আদ্যোপান্ত শুনে এক মুহূর্তে বিষিয়ে গিয়েছিল রিজিয়ার মন। সে-রাতে অনেকক্ষণ মুখ ভার করে আকাশ-পাতাল ভেবেছিল রিজিয়া। নিজের অতীত স্বপ্ন-সাধের সাথে ভাগ্যের এই গরমিল লক্ষ্য করে, মনে মনে পাগল হয়ে উঠেছিল সে। অনেক রাত পর্যন্ত একা জেগে থেকে ভাবনার অতল সমুদ্র মন্থন করেও এর কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায়নি রিজিয়া। শুধু মনের অতলে কেমন একটা বিষের জটলা যেন পাকিয়ে পাকিয়ে তাকে অস্থির করে তুলেছিল। তার কেবলই মনে হয়েছিল এই অস্বস্তিকর জীবনের বোঝা থেকে সে মুক্তি পাবে কেমন করে!

॥ আট ॥

পলাশপুর ছেড়ে যেদিন ঢাকায় এসে পৌঁছেছিল সেদিন ভরে খানিকটা মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন সে প্রাণ পরই আবার তাকে এক রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে ফিরে যেতে হল। এবার পলাশপুর নয়, তবে তার চাইতেও আরও বেশী সংকীর্ণ জায়গায়। ঢাকারই এক ঘিঞ্জি গলিতে বাসা নিয়েছিল মামুন। অন্ধকার সরু গলিতে ছোট্ট একটা টিনের ঘর। চারধারে বাঁশের বেড়া। টিনের ছাউনি যখন রোদে আগুনের মতো গরম হয়ে উঠতো তখন জবাই

করা মুরগীর মতো ছটফট করতো রিজিয়া। নীলাম্বর সাহা রোড থেকে ডান দিকে ঘুরেই সেই সরু ঘিঞ্জি গলি। এ-গলিতে বাতাস ঢুকেনি কতকাল কে জানে। দুপুরে একটু আলোর মুচকি হাসি ঝরে পড়তো সারা বাড়ীতে, তারপর চারটে না বাজতেই সূর্য যে কোথায় ডুব মারতো কে জানে! প্রথম যেদিন গিয়ে উঠেছিল সেই গলিতে তখন রিজিয়ার মনে হয়েছিল এক মুহূর্তও সে বাঁচতে পারবে না সেই পরিবেশে। কুয়োতলায় মেয়ে-পুরুষের ভীড় দেখে থমকে গিয়েছিল রিজিয়া। একটি কুয়ো থেকে চারপারে লোকজন পানি উঠিয়ে নেয়, হাত-মুখ ধোয়! এ এক এলাহী কাণ্ড। সকাল থেকে এসে লাইন লাগায় মেয়ে ছেলেরা। জয়েণ্ট কুয়োতে কার অধিকার আগে কে জানে। রাস্তার পাশে কল থেকে পানি পড়ে বটে, কিন্তু তার চারধারে সারা এলাকার লোকের ভীড়, সেখান থেকে পানি আনে কার সাধ্য!

বাসা দেখে মনমরা হয়ে গেল রিজিয়া। মামুন বললো, "দু'দিন থেকে দেখ রিজিয়া, এখন যতটা খারাপ লাগছে ততটা হয়তো লাগবে না শেষ পর্যন্ত। এর চেয়ে কত নোংরা পরিবেশে মানুষ বাস করছে আজকাল। ঢাকায় বাসা পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! কত খুঁজে খুঁজে তবে-না এটা জোগাড় করতে পারলাম।"

হঠাৎ ফেটে পড়লো রিজিয়া। "এর চেয়ে তুমি আমাকে দোজখে নিয়ে যাও, সেখানেও বরং আরামে থাকতে পারবো। এমন পরিবেশেও মানুষ বাস করে! যেমন তুমি, তেমনি তোমার বাসা। না বাপু, আমি এক-দিনও এখানে থাকতে পারবো না।"

মামুন বললো, "পারবো না বললে তো চলবে না রিজিয়া। নিজের ক্ষমতার বাইরে যাবার কোন শক্তিই আমার নেই। আমার মতো চাকুরেরা এর চেয়ে ভাল বাসার কথা চিন্তাও করতে পারে না। শুধু বাসা নিয়ে থাকলেই তো চলবে না, খাওয়া-পরার দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া বাড়ীর প্রতিও তো আমার একটা কর্তব্য আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন?"

রিজিয়া বললো, "ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। এর চেয়ে ভালো বাড়ী পাও তো দেখ, নইলে বরং বাসা না করাই ঢের ভালো।"

মামুন বললো, "সে-চেষ্টা পরে করা যাবে। এ বাড়ীতে তো আর আমরা চিরদিনের জন্যে উঠছি না, যখন সুবিধে মতো বাড়ী পাওয়া যাবে তখন উঠে গেলেই হবে। এর জন্যে এত ভাবনা-চিন্তার কি আছে?"

রিজিয়া বললো, "তুমি যেমন লোক, একবার এসে গেলে যে সহজে নড়তে চাইবে তেমন তো মনে হয় না। নইলে এ কয়দিনে এর চাইতে ভাল বাসা নিশ্চয় জোগাড় করতে পারতে। ঢাকা শহরে তো আর বাড়ীর অভাব নেই।"

মামুন বললো, "বাড়ীর অভাব নেই সে কথা সত্যি, কিন্তু অভাবটা শুধু টাকার। টাকা থাকলে এই ঘিঞ্জি-গলির বাসা আমি কিছুতেই নিতাম না।"

রিজিয়া সহসা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো, "কেন, এ বাসা পঞ্চাশ টাকায় না নিয়ে ষাট-সত্তর টাকায় একটা বড় বাসা নিলেই হয়। কয় টাকাই বা আর বেশী লাগবে?"

মামুন এবার না হেসে পারলো না, বললো, "সত্যি তুমি হাসালে রিজিয়া। পঞ্চাশ আর সত্তরের মধ্যে অঙ্কের যে তফাৎ সেটা তোমার কাছে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আকাশ-পাতাল। পঞ্চাশের ওপর ভাড়া দেবার সাধ্যি নেই বলেই শেষ পর্যন্ত এই ঘিঞ্জি-গলিতে আসতে হলো। যাক্, ওসব নিয়ে ভেবে-চিন্তে লাভ নেই, আগে এসে উঠি, পরে যা হয় একটা কিছু করা যাবে। এ গলিতে যে সারাজীবন থাকবো না অন্ততঃ সেটুকু ভরসা রাখতে পারো।"

বাড়ী দেখে ফিরে আসতেই রিজিয়ার মা জরিনা বেগম বললেন, "কি বাবা মামুন, বাসা পছন্দ হলো?" মামুন বললো, "আমার তো বলতে গেলে এক রকম পছন্দই হয়েছে। ভাবছি কালকেই নতুন বাসায় চলে যাবো। কারণ এর চেয়ে ভাল বাসা পাবো বলে আপাততঃ ভরসা পাচ্ছি না।"

জরিনা বেগম বললেন, "সে তো খুবই সত্যি কথা বাবা। ভাল বাসা খুঁজে পাওয়া যে কি ঝামেলা সে কি আর বলতে হয়! নিজেরা কষ্টে-সৃষ্টে একটা বাড়ী করেছিলাম বলেই না একটু আরামে আছি। তা বাবা আস্তে আস্তে খুঁজে দেখলে তোমরাও একটা ভাল বাসা হয়তো পেয়ে যেতে পার।"

"আমিও তাই ভাবছি আম্মা, এবার যেয়ে উঠলে পরে ভালো দেখে একটা বাসা অবশ্যিই খুঁজে নেওয়া যাবে। আপনি রিজিয়াকে বরং একটু বুঝিয়ে বলবেন। ও কিছু-তেই যেতে রাজি হচ্ছে না।" কথা শেষ করে মামুন জরিনা বেগমের দিকে তাকালো।

জরিনা বেগম বুঝতে পারলেন মামুনের চোখে কেমন একটা অসহায়তার ছায়া যেন ভাসছে। জরিনা বেগমের চোখ তা এড়াতে পারলো না। কণ্ঠে কিছুটা সান্ত্বনার সুর এনে জরিনা বেগম বললেন, "তা একটা অবশ্যই খুঁজে নিতে পারবে বাবা। খোঁজ-খবর না করলে কি সুবিধেমত বাসা পাওয়া যায়! আমরা যখন প্রথম শহরে এসেছিলাম তখন তো তোমার মত অবস্থাই ছিল। খোদা করলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কয়দিন লাগে।"

মামুন বললো, "রিজিয়াকে আপনি একটু বুঝাবেন আম্মা! ওকে কিছুতেই এসব কথা বুঝাতে পারছিনা, ও একেবারে শুনতেই চায় না যে।"

জরিনা বেগম রিজিয়াকে ডাকলেন। মায়ের ডাক শুনে উদ্দেশ্যটা বুঝতে বাকী থাকলো না রিজিয়ার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সে। জরিনা বেগম বললেন, "বাসা তো পছন্দ হয়েছে রিজিয়া?" রিজিয়া বললো, "তোমার জামাইকে জিজ্ঞেস কর না কেন? তার কাছেই সব শুনতে পাবে।"

জরিনা বেগম বললেন, "জামাইর কাছে তো সব কিছুই শুনলাম, এখন তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই তো যাওয়া-না-যাওয়া নির্ভর করছে।"

সে-কথার কোনো জওয়াব দিলনা রিজিয়া।

॥ নয় ॥

তারপর সত্যি সত্যিই একদিন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই বস্তিগলিতেই গিয়ে উঠতে হল রিজিয়াকে। আসবাব-পত্র বলতে তেমন কিছুই ছিলনা রিজিয়ার। বিয়ের আগের এ কয় বছর তো মামুন মেসে মেসেই কাটিয়েছে। পড়া শেষ করে হোষ্টেল ছেড়ে সরাসরি এক মেসেই গিয়ে উঠেছিল মামুন। হোষ্টেলে থাকতে কষ্ট-স্বষ্টে মাসে মাসে ছেলেকে টাকা পাঠাতেন লতিফ সাহেব। কিন্তু অবস্থা যখন পড়ে এলো, টাকার অংকও কমতে লাগলো ধীরে ধীরে। লতিফ সাহেবের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা অজানা ছিল না মামুনের, বাপের অক্ষমতা বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় তার। যে মাসে টাকা আসতে প্রায় দশদিন দেরী হয়ে গেল, তখনই সে বুঝতে পারলো, লতিফ সাহেব তাঁর আর্থিক ক্ষমতার শেষ সীমান্তে পৌঁছে গেছেন। নিজের কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েও সেদিন মামুন তার আব্বাকে জানিয়েছিল, এর পর থেকে তাকে আর টাকা পাঠাতে হবে না। মিছে-মিছিই সেদিন সে চিঠি লিখেছিল তার আব্বাকে। মিথ্যা কথা লিখতে গিয়ে মন তার সায় দেয়নি মোটেই কিন্তু তবুও লতিফ সাহেবের মাথার বোঝা হাল্কা করার জন্যেই সেদিন তাকে মিথ্যা চিঠি লিখতে হয়েছিল। মামুন জানতো, এর পর থেকে তাকে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হবে। নিষেধ না করলেও নিজে থেকেই হয়তো লতিফ সাহেব আর টাকা পাঠাতে পারবেন না। কোত্থেকে পাঠাবেন তিনি, জমি-জায়গা যা ছিল ঋণের দায়ে ইতিমধ্যেই তো তা মহাজনের কুক্ষিগত হয়ে গেছে। তবুও লতিফ সাহেব স্বপ্ন দেখছেন তার ছেলে মানুষ হবে, আর একদিন কুড়িয়ে আনবে তার সব হারানো সম্পদ। এই আশা নিয়েই তো তিনি বেঁচে আছেন দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে। মামুন মাঝে মাঝে ভেবে অস্থির হয়ে যায়, বাপের স্বপ্ন-সাধ কি সে পূরণ করতে পারবে? পারবে কী ছোট ভাই রকিবকে মানুষ করে তুলতে? রকিব যদি লেখাপড়া না শিখতে পারে তবে তার বাপ তো কিছুতেই মনে শান্তি পাবেন না। দুই ছেলের আশা নিয়েই যে তিনি বেঁচে আছেন এই পৃথিবীতে।

মামুন তার বাপকে টাকা পাঠাতে নিষেধ করে লিখেছিল। "আব্বাজান, এখন থেকে আমাকে আর টাকা পাঠাবেন না। আমি একটা মোটা টাকার টিউশনি পেয়েছি, ওতেই হোষ্টেলের খরচ চালিয়ে নিতে পারবো। আমার জন্যে আপনাদের কোন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। টাকার দরকার হলে আমিই লিখে জানাবো।"

জবাবে লতিফ সাহেব লিখে জানিয়েছিলেন, "এবার তোমার পরীক্ষার বছর বাবা, টাকা-পয়সার চিন্তা করে পড়ার ক্ষতি করো না যেন। টিউশনি করলে নির্ঘাত তোমার পড়া-শোনার ক্ষতি হবে। এসবের এখন কোন দরকার নেই। যেমন করে পারি আর কয়টা দিন আমিই চালিয়ে নেব। খোদা চাহেত তোমরা যদি মানুষ হতে পার তবে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না বাবা। যা-ই করো না কেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে করবে। বাড়ী-ঘরের জন্যে তোমার কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই। কি স্থির করেছ চিঠি লিখে জানাবে।"

মামুন তার আব্বাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, পড়ার কোন ক্ষতি সে করবে না। টিউশনি চালিয়েও পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারবে। মোরব্বীদের দোয়ার বরকতে কোনো অসুবিধেই তার হবে না।

বৌ নিয়ে বাড়ী গিয়ে সেই সব হারানো দিনগুলোর কথাই আবার মনে পড়েছিল মামুনের। বুড়ো বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কেবলই মনে হয়েছে, তাঁর স্বপ্ন-সাধ সে পূরণ করতে পারেনি। তবুও লতিফ সাহেব আশায় আশায় বেঁচে আছেন। হয়তো একদিন সুদিনের মুখ দেখবেন সেই ভরসায়।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

কাজী নেওয়াজ খোদা

কাজী নেওয়াজ খোদা এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে···রাজেউন)। কাজী নেওয়াজ খোদা বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোটের এক শরীফ পরিবারের সন্তান। দেশ বিভাগের পর তাঁদের পরিবার পূর্ব্বপাকিস্তানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই পরিবারে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। কাজী নেওয়াজ খোদার পরলোক গমনে আমরা বিশেষভাবে শোক ও বেদনা অনুভব করিতেছি। এই মাসিক মোহাম্মদীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং সুদীর্ঘ কালের। এক সময় এর সম্পাদকীয় বিভাগের সাথে কাজী নেওয়াজ খোদা ছিলেন যুক্ত। জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সহযোগী হিসাবে তিনি বহু দিন কাজও করিয়াছিলেন। এছলামী সাহিত্য ও তমদ্দুনের সাথে কাজী নেওয়াজ খোদার নিবিড় পরিচয় ছিল। ফরাসী ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজী নেওয়াজ খোদার মৃত্যু পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পূর্ব্বপাকিস্তানী সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তা সহজে পূরণ হইবে না। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানাইতেছি; এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

পাকিস্তানের ক্রিকেট বিজয়

পাকিস্তানে সফররত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টীমের সাথে এ-পর্য্যন্ত পাকিস্তানের দুইটি টেষ্ট খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুইটি খেলাতেই পাকিস্তান জয়লাভ করিয়াছিল। পাকিস্তান রাবার লাভ করে। গতবার পাকিস্তান ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর করে। এই সফরে পাকিস্তান বেশী সুবিধা করিতে পারে নাই। তখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়াছিল। এবার এই দুইটি খেলায় জয়লাভ করায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, ভাল টীমের সাথে ভাল খেলিয়াই পাকিস্তান ক্রিকেটের এই জয়-গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। এর ফলে পাকিস্তানী টিম যে আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা অর্জ্জন করিল তার জন্য প্রত্যেক পাকিস্তানীই গর্ব্ব বোধ না করিয়া পারে না। আমরা এ জন্য পাকিস্তানী ক্রিকেট টীমকে সানন্দ মোবারকবাদ জানাইতেছি! আশা করি, ভবিষ্যতেও এই টীম তার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া খেলা করিয়া যাইবে।

লেখক গীল্ড

পাকিস্তান লেখক গীল্ডের পূর্ব্বপাকিস্তানী শাখা গঠিত হইয়াছে। যেসব পূর্ব্বপাকিস্তানী লেখক করাচী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁদিগকে লইয়াই এই গীল্ড গঠিত হইয়াছে। জনাব মতিনউদ্দীন আহমদ এই আঞ্চলিক গীল্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পাকিস্তানের লেখক গোষ্ঠিকে একত্র করিয়া একটি গীল্ড প্রতিষ্ঠা একটি নূতন প্রচেষ্টা। লেখক ও সাহিত্যিকদের কল্যাণমূলক কাজেই এই গীল্ড তার চেষ্টাকে নিয়োজিত করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কথায় বলে, "গাছের পরিচয় ফলে।" গীল্ডের গঠন ও প্রাথমিক ত্রুটিবিচ্যুতি লইয়া আমরা আমাদের বক্তব্য গতবার বলিয়াছি। সে সব বড় কথা নয়। গীল্ডের ভবিষ্যত কার্য্যকলাপের দ্বারাই এর বিচার হইবে এবং এর কার্য্যকারিতার সত্যিকারের পরিচয় মিলিবে। পাকিস্তানের লেখক ও সাহিত্যিকেরা সাধারণভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ও উপেক্ষিত। তাঁদের ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের পথে সত্যই এ-দেশে অনেক কিছু করবার আছে। সুতরাং গীল্ডের কার্য্যক্ষেত্র উদার ও প্রশস্ত। সঠিকভাবে অগ্রসর হইলে গীল্ডের দ্বারা সাহিত্যিক ও সাহিত্যের আরও উপকার হইতে পারে। দেশবাসী সাগ্রহেই গীল্ডের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়া যাইবে।

শিক্ষার মাধ্যম

দেশে আজকাল শিক্ষার মাধ্যম লইয়া যেখানে-সেখানে আলোচনা চলিতেছে। কিছুদিন ধরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে

উর্দ্দুকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার দাবী অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সেখানে একদল লোক উর্দ্দুকে শিক্ষার সকল মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্য দাবী করিতেছেন। এ জন্য তাঁরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইবেন, সে জন্যও প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও অন্যান্য শব্দের পরিভাষা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত কমিটি গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন।

পূর্ব্বপাকিস্তান ও বাংলা

পূর্ব্বপাকিস্তানেও বাংলাকে অনুরূপভাবে শিক্ষার সর্ব্বস্তরে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার দাবী বহু দিন ধরিয়াই রহিয়াছে। পূর্ব্বপাকিস্তানের লোকও বাংলাকে যথাসত্বর শিক্ষার মাধ্যমরূপে সর্ব্বত্র দেখিতে চায়। এখানেও পরিভাষার সমস্যা আছে এবং পরিভাষা সৃষ্টির কিছু কিছু চেষ্টাও এখানে কেউ কেউ করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়োজন

বৈজ্ঞানিক কারিগরী ও অন্যান্য পরিভাষা সৃষ্টির সময় পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের লোকের বিশেষ করিয়া শিক্ষার্থীদের জানাজানির সুবিধা বিবেচনা করিয়া কাজ করাই উচিত। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য যে কোনো ভাষা হইতে পরিভাষা আমরা গ্রহণ করি না কেন, এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটাও স্মরণ রাখিতে হইবে। আরবী-ফারসী প্রভৃতি তামদ্দুনিক ভাষার সাথে অল্পবিস্তর পরিচয় দুই অঞ্চলের বাসিন্দাদেরই আছে। সুতরাং পরিভাষা রচনার সময় যথাসাধ্য আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার সহজসভ্যতার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সুতরাং পাকিস্তানের পরিভাষা রচনার কাজ একটি কমিটির হাতে থাকাই উচিত এবং এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলের একযোগে কাজ করা উচিত।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the Azad Press
Ramna Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী
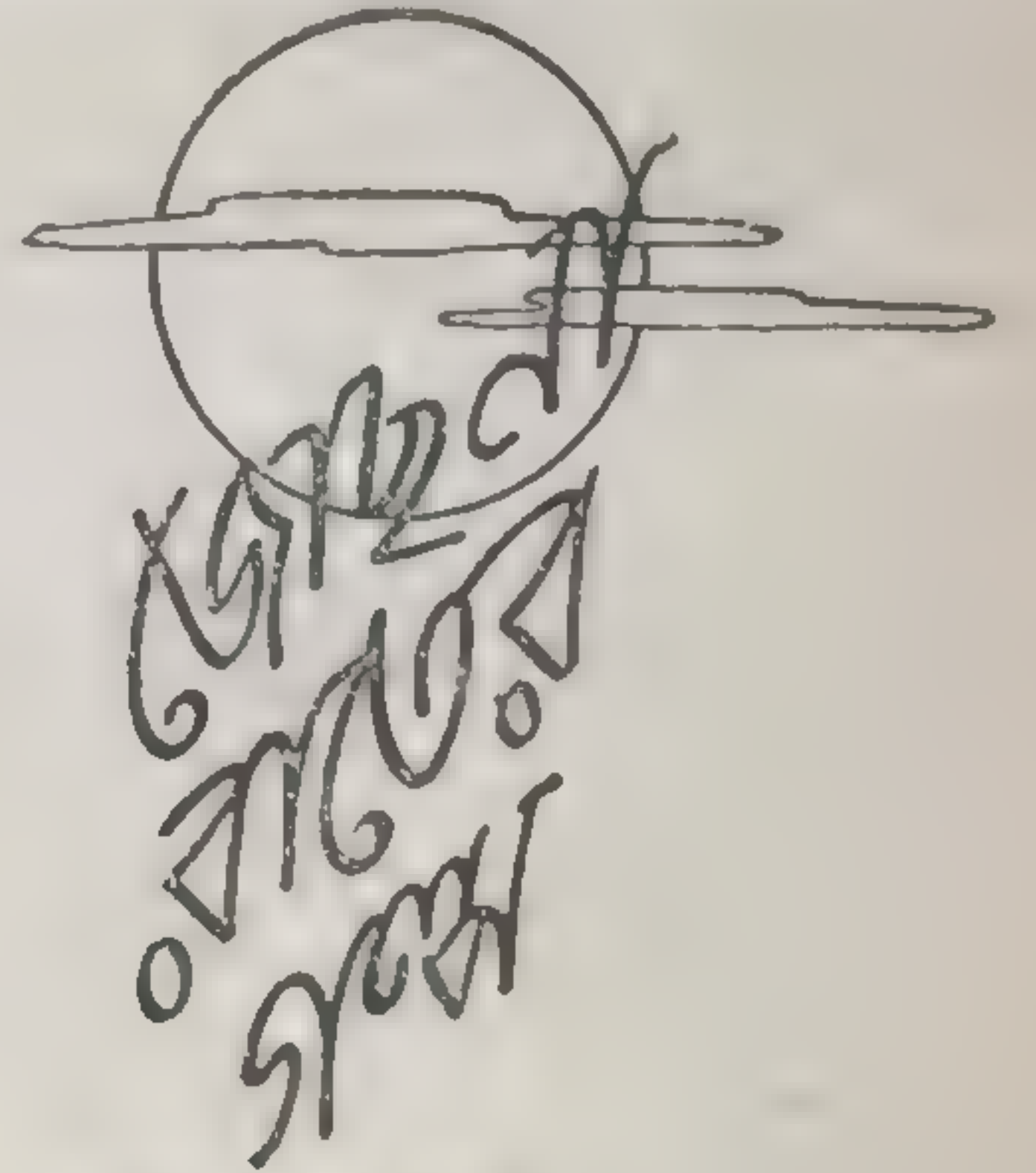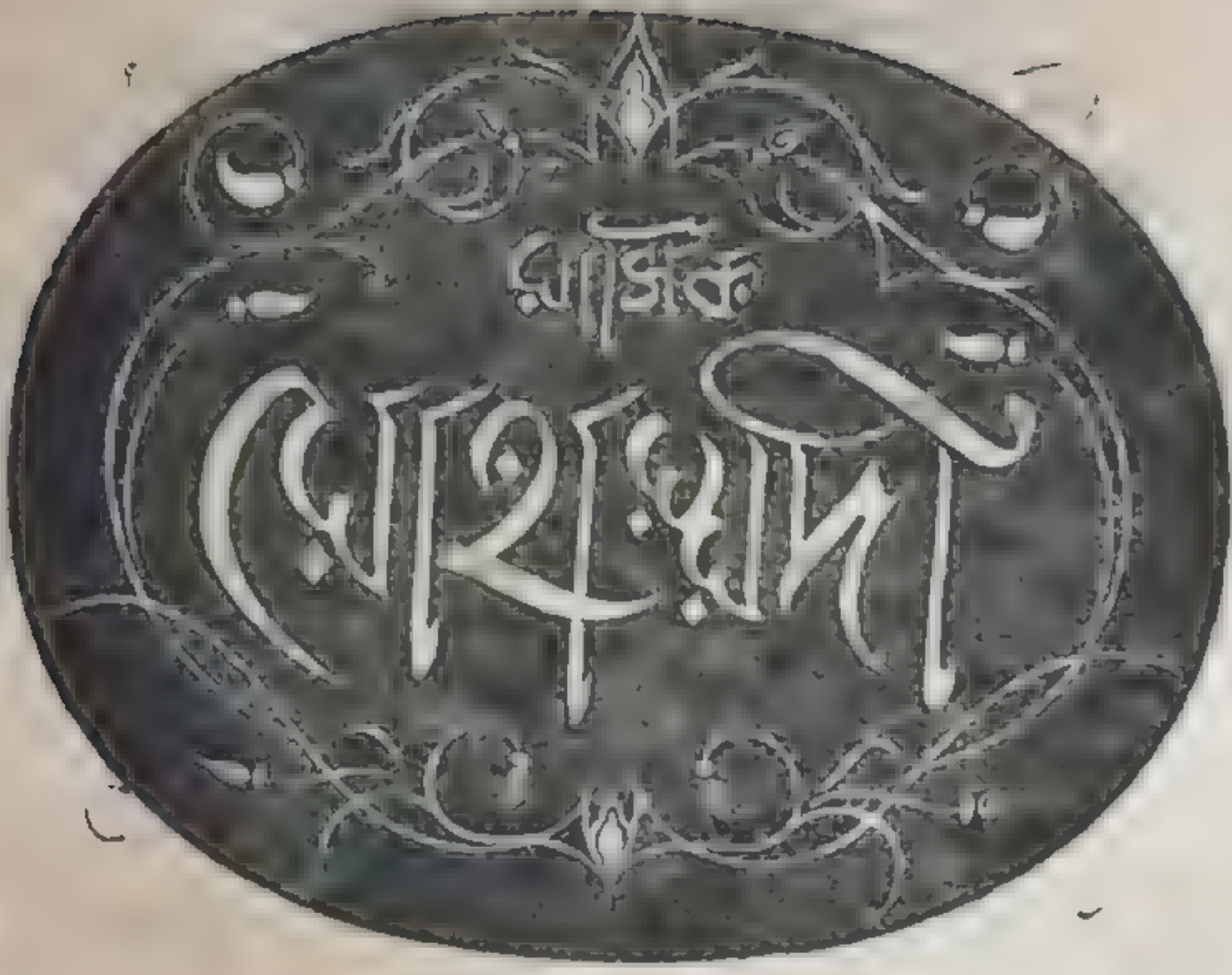
চৈত্র ১৩৬৫
৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হাদীছ সংরক্ষন ও সংকলন

নূর মোহাম্মদ আ'জমী

[লেখক তাঁর মেশ্‌কাত শরীফের তরজমা ও ব্যাখ্যার প্রথম দিকে এক বিরাট ভূমিকা লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহারই অংশ বিশেষ।—সম্পাদক]

প্রথম যুগ

প্রথম যুগ বলিতে আমি এখানে রাছুলুল্লাহ (ছঃ)-এর নবুওতের প্রথম হইতে হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজের খেলাফত লাভ (৯৯ হিঃ ৭২২ ইং) পর্যন্ত মোট ১১৩ বৎসর সময়কেই বুঝাইতেছি।

এ-যুগে হাদীছের হেফাজত দুই উপায়ে করা হয়: হেফ্‌জ (মুখস্থ করা) ও লিখন। ছাহাহাবীগণের মধ্যে যাঁহারা নিজেদের হাফেজাহ্‌ বা স্মৃতির উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন—আর এরূপ ছাহাহাবীর সংখ্যাই ছিল অধিক—তাঁহারা হাদীছ মুখেমুখেই হেফ্‌জ করিয়া লইয়াছিলেন এবং রাছুলুল্লাহ্‌ (ছঃ) ও ইহারই প্রতি অধিক জোর দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যাহারা নিজেদের স্মৃতি উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন না তাঁহারা হেফ্‌জ করার উদ্দেশ্যে হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। উভয়রূপে হেফ্‌জ করার পর কেহ উহা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেকে শেষ পর্যন্ত উহা রক্ষাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ দুই উপায়ের মধ্যে (হেফজ ও লিখন) প্রথম উপায়ই ছিল প্রধান। এ-কারণে এযুগকে হেফ্‌জের যুগ বলা যাইতে পারে। এছাড়া এযুগের শেষ পর্যন্ত ছাহাবীদের অনেকেই মৌজুদ ছিলেন বলিয়া ইহার অপর নাম ছাহাবীগণের যুগও দেওয়া চলে।

ছাহাবীগণ কর্তৃক হাদীছ হেফ্‌জের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে তাঁহাদের পক্ষে—রাছুলুল্লাহর সমস্ত হাদীছ তথা তাঁর জীবনের সমস্ত ব্যাপারকে হেফ্‌জ করিয়া রাখা সম্ভাব্য ব্যাপার ছিল কিনা তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলে ভালো হয় বলিয়া মনে করি। ছাহাবীদের যুগে এলম বলিতে কি ছিল, সে যুগের লোকদের স্মৃতি শক্তি কেমন ছিল, হাদীছের মোট সংখ্যা কত, পীর ছাহাবীদের সংখ্যা কত এবং রাছুলুল্লাহ (ছঃ)-এর প্রতি ছাহাবীগণের ভক্তি শ্রদ্ধা কেমন ছিল, এ-কয়টি বিষয় জানা গেলেই সে বিচার সহজ হইবে। অতএব, নীচে এ-সকল বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে :—

ছাহাবীদের যুগে এলম

শে'র ও খোত্‌বাহ্‌ (কবিতা ও বক্তৃতা) এবং এল্‌মুল আন্‌ছাব বা কুলপঞ্জীই ছিল জাহেলিয়ত যুগের এল্‌মী সম্পদ। শে'র ও খোত্‌বাহর বিষয়বস্তু ছিল সাধারণতঃ যৌন প্রবনতার প্রকাশ, যুদ্ধজয়ের গর্ব, প্রতিশোধের আহ্বান এবং কুলগৌরব। কোরআন ইহার প্রত্যেকটাকেই অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং নানা নষ্টের মূল বলিয়া ঘোষণা করে এবং মোছলমানদের ইহা হইতে বারণ করে ;

ফলে জাহেলিয়ত যুগের এল্‌মী সম্পদ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া পড়েন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এল্‌ম বলিতে ছাহাবীদের হাতে যাহা ছিল কোরআন তাহাদের হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লয়; অপরদিকে এলম শিক্ষা করার জন্য তাহাদের তাকীদের পর তাকীদ করিতে থাকে। ফলে তাঁহারা এলমের জন্য মাত্‌ওয়ালা হইয়া পড়েন; এ-সময় এলম বলিয়া তাঁহাদের নিকট যাহা পেশ করা হইল তাহা হইল এই কোরআন ও হাদীছের এলম। সুতরাং এসময় তাঁহারা ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কোনো ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নহে।

ছাহাবীদের সংখ্যা

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন, রছুলুল্লাহর এন্তেকালের সময় মোছলমানদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার: মদীনায় ৩০ হাজার ও মক্কায় ৩০ হাজার। কিন্তু হাফেজ আবু জোর্‌আ-রাজী বলেন: রছুলুল্লাহ (ছঃ কে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সরাসরি ভাবে অথবা অন্য ছাহাবীর মার্ফত হাদীছ রাওয়ায়েত করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের সংখ্যাই এক লক্ষের উপর ছিল—(তাজরীদু আছ্‌মাইছ্‌-ছাহাবাহ্‌ ৩ পৃঃ)। আমার মতে এ-উভয় কথার মধ্যে কোনো রকমের অসামঞ্জস্য নাই। কারণ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মক্কা ও মদীনার মোছলমানদের কথাই বলিয়াছেন, অথচ রাছুলুল্লাহর সময় ইয়ামন, বাহ্‌রাইন ও সমগ্র আরব বস্তির লোকেরাই ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হাফেজ ইব্‌নো হাজর বলেন: বোখারী ও মোছলেম তবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে ছাহাবী কা'ব বিন মালেকের যে বর্ণনাটি রহিয়াছে তাহাতে আবু জোর্‌আ রাজীর কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। হজরত কা'ব বলেন: তবুকে এত লোকের (ছাহাবীর) সমাবেশ হইয়াছিল—যাঁহাদের হিসাব করা কঠিন ছিল। অতঃপর ইবনো হাজর বলেন: প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম ছুফ্‌ইয়ান ছাওরীর কথায় ও ইহার তায়ীদ হইয়া থাকে। ইমাম ছাওরী বলেন: "যে ব্যক্তি হজরত আলীকে হজরত ওছমানের উপর মর্যাদা দেয় সে ব্যক্তি রাছুলুল্লাহর ১২ (বার) হাজার ছাহাবীর প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করে।" ইবনো হাজর বলেন: ইমাম ছাওরী (রাঃ) এ-কথাটি হুজুরের ওফাতের বার বৎসর পর (অর্থাৎ হজরত ওমরের শাহাদতের পর যখন হজরত ওছমান ও হজরত আলীর মধ্যে কে খলিফা হইবেন এ-সইয়া বিতর্ক চলে তখনই) বলিয়াছিলেন, অথচ ইহার পূর্বেই হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের খেলাফত কালে বিদ্দার যুদ্ধ ও অ দ্‌ওয়াছ প্রভৃতির মহামারি এবং বিভিন্ন জেহাদে বহু সংখ্যক ছাহাবী দুন্‌য়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই নানা গোত্রের বেদুইন ছিলেন বলিয়া সকলের নাম জানা যায় নাই অথচ ইঁহারা সকলেই বিদায় হজ্জে রাছুলুল্লাহর সহিত শরীক হইয়াছিলেন।—(এছাবাহ্‌ ১ম খঃ ৪র্থ পৃঃ)

সম্ভবতঃ এ-কারণেই (নাম না জানা যাওয়ার কারণ) আমাদের আছমাউর্‌ রেজালের কিতাবে যাঁহাদের নাম রহিয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা ৮ হাজারের অধিক হইবেনা। ইব্‌নো আবদুল বারের "ইস্তিয়াব, কিতাবে (পরিশিষ্ট সহ) সাত হাজারের এবং ইব্‌নোল আছীর জজরীর "উছদুল-গাবাহ্‌ কিতাবে ৭৫৫৪ জনের জীবনী রহিয়াছে। শামছুদ্দীন জাহ্‌বী তাঁর তাজ্‌রীদে ৮ আট হাজারের নাম রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করেন এবং বলেন যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অপরিচিত। হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে যাঁহারা সরাসরি রাছুলুল্লাহর নিকট হইতে হাদীছ রাওয়ায়েত করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা চারি হাজারের অধিক নহে। কিন্তু হাফেজ জাহ্‌বীর মতে এরূপ ছাহাবীর সংখ্যা দুই হাজারের বেশী নহে। —(ইছাবাহ্‌ ১ম খঃ ৪পৃঃ) ইহাঁদের মধ্যে ছেহার কিতাবে ৮৩ জনের নাম রহিয়াছে।

হুজুরের এন্তেকালের পর ছাহাবীদের সকলই যে মদীনায় অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা নহে বরং ইহাদের অনেকেই কোরআন-হাদীছের এলমকে সঙ্গে লইয়া মদীনার বাহিরেই বসবাস এখ্‌তিয়ার করিয়াছিলেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ তাঁহাদের এরূপ হিসাব দিয়াছেন: মক্কায়—২৬, কুফায়—৫১, বছরায়—৩৫, শামে—৩৪, মিছরে—১৬, খোরাছানে—৬, এবং জজীরায়—৩ জন। হজরত আলী, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ, হজরত আবু মুছা আশ্‌রাফী, হজরত ছা'দ বিন আবি ওকাছ ও হজরত ছলমানে কারছী (রাঃ) কুফায়ই বসবাস করিয়াছিলেন।—(ওলুমুল হাদীছ)

হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাব সমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের "মোছনাদ"ই সর্ব বৃহৎ কিতাব; ইহাতে ৭ শত ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত মোট ৩০ হাজার হাদীছ রহিয়াছে। (একরার ছাড়া) শেখ আলী মোত্তাকী জৌনপুরীর "মোন্তাখাবে কাঞ্জোল ওমমালে"ও এ-পরিমাণ হাদীছই একত্র করা হইয়াছে। ছোলাইমান ইব্রোল ফারছীর "জামউল ফাওয়ায়েদ" হালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১৪টি মূল কিতাবের হাদীছ একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাতে আরো কিছু অধিক হাদীছ রহিয়াছে। হাকেম আবু আবদুল্লাহ মনে করেন যে, প্রথম শ্রেণীর ছহী হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম

হইবে। বোখারী শরীফে ২৬০২, মুছলিম শরীফে ৪০০০, এবং "মোয়াত্তা" ইমাম মালেকে মাত্র ৬৯৭ টি মারফুর রহিয়াছে। মোটকথা সকল কিতাবের ছহীহ, গয়র ছহীহ এবং রাছুলুল্লার (ছঃ) দ্বারা ও তায়েবীনদের সমস্ত হাদীছকে একত্র করা গেলেও হাদীছের সংখ্যা এক লাখের কম হইবে না। (ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাবী ছাহাবীর সংখ্যা দুই হাজার ধরা গেলেও জন প্রতি ২৫টি করিয়া হাদীছ পড়ে নাই।)

তবে যে, বলা হইয়া থাকে হাদীছের বড় বড় ইমাম গণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল যথা ইমাম আহমদ বিন হাম্বেলের ৭॥ লক্ষ, ইমাম বোখারীর ৬ লক্ষ, ইমাম মুছলিমের ৩ লক্ষ আর ইমাম আবু জোরআ রাজীর ৬ লক্ষ ছহীহ হাদীছ জানা ছিল। ইহার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছেরই বিভিন্ন ছনদ বা সূত্র রহিয়াছে এমন কি নিয়ত সম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ হাদীছটির ৭ শতের মত ছনদ রহিয়াছে তাহাকে ততটি হাদীছ বলিয়াই গণ্য করেন।—(তদ্‌বীন—৬২)

আরবদের স্মৃতি শক্তি

সে যুগের আরবদের স্মৃতি-শক্তি বা হাফেজাহ্ কিরূপ প্রখর ছিল তাহা আমাদের এ-যুগের লোকের পক্ষে ধারণা করাও কঠিন। সে যুগের এক এক জন সাধারণ বেদুইন পর্যন্ত শত শত দীর্ঘ কবিতা ও বক্তৃতা এবং বিরাট বিরাট নছব নামা মুখস্থ করিয়া রাখিত। জাহেলিয়ত যুগের কবিদের কবিতা, বাগ্মীদের বক্তৃতা এবং সমস্ত আরব গোত্রের নছব নামা আমরা এ সূত্রেই লাভ করিয়াছি। ইবনো আবদুল বা'র বলেন: হেফ্‌জ আরবদের একটা স্বভাবগত জিনিষ। ইহা তাহাদের বৈশিষ্ট্যও বটে। (মোখ্‌-তাছারুল জামেয় ৩৫) এ-কারণেই আরবের লোকেরা লেখা বা কিতাবের নামে বিদ্রূপ করিত। এক আরব বেদুইন বলে: "তোমার অন্তরে রক্ষিত একটি কথা কিতাবে রক্ষিত দশ কথা হইতে উত্তম" (ঐ ৩৫)। আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ ইমাম খলীল নহবী বলেন: "কাগজ যাহা রক্ষা করিয়াছে তাহা এলম নহে, অন্তর যাহা রক্ষা করিয়াছে তাহাই এলম।"—(ঐ ৩৪) "অপর এক-জন আরব কবি বলেন: "যে ব্যক্তি কাগজে এলমকে রক্ষা করিয়াছে সে উহাকে নষ্ট করিয়াছে, সত্যই কাগজ এলমের জন্য একটা অপপাত্র—(ঐ ৩৫)।" এক কথায় আরবের ঘোড়া ও আরবের মেহমানদারীর ন্যায় আরবদের স্মৃতি শক্তিও একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে রীতিমত লেখার চর্চা আরম্ভ হওয়ায় এবং উহার উপর নির্ভর করার ফলেই তাহাদের এ-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

রাছুলুল্লাহর প্রতি ছাহাবীগণের ভক্তিশ্রদ্ধা

রাছুলুল্লাহর প্রতি তাঁর ছাহাবীগণের যে ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, তার নজীর মানব ইতিহাসে তালাস করা বৃথা। ছাহাবীগণ তাঁহাদের প্রিয় রাছুলের সামান্য ইশারাই তাঁহা-দের জান, মাল, প্রিয়জন এক কথায় যথাসর্বস্ব কোরবান করিতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিলেন এবং এ রূপ করিয়াও দেখা-ইয়াছেন। ওহোদের যুদ্ধে যখন রাছুলুল্লাহর প্রতি শত্রুদের তীর চারিদিক হইতে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতেছিল, তখন ছাহাবীগণ তাঁহাদের প্রিয় রাছুলকে রক্ষা করার জন্য দুর্গের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার ফলে শত্রুর তীরে কোন কোন ছাহাবীর শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। হিজরতের সময় ছুর গুহায় প্রিয় রাছুলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হজরত আবুবকর (রাঃ) সাপের গুহা স্বীয় আঙ্গুলী দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সাপের দংশনে আবু বকর কাতর হইয়া গেলেন তথাপি নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে প্রিয় রাছুলের শির আপন ক্রোড় হইতে সরাইলেন না। যে রাত্রি রাছুলুল্লাহ (ছঃ) কে কতল করার জন্য কোরাইশগণ স্থির করিয়াছিল সে রাত্রে হজরত আলী (রাঃ) রাছুলুল্লার বিছানায় শুইয়া প্রিয় রাছুলকে হিজরতের সুযোগ দিয়াছিলেন। ওরওয়াহ বিন মাছউদ ছকফী (রাঃ) তাঁর ইছলাম গ্রহণের পূর্বে—হোদাইবিয়ার সন্ধিকালে কোরাইশদের নিকট যাইয়া রাছুলুল্লাহর প্রতি ছাহাবীগণের ভক্তি-শ্রদ্ধার যে ছবি আঁকিয়া ছিলেন তাহা এখানে তাঁহারই ভাষায় পেশ করা যাইতেছে, অথচ তিনি তখন কোরাইশদের প্রতিনিধি হিসাবেই মোছলমানদের শিবিরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "কোরাইশগণ, খোদার কছম—আমি তোমাদের প্রতিনিধি হিসাবে রোমের সম্রাট, ইরানের শাহেন্‌শাহ ও আবিসিনিয়ার বাদশার দরবারে গিয়াছি; কিন্তু খোদার কছম—আমি কোনো রাজা বাদশাহের প্রতি তাঁর প্রজা বা দরবারীগণকে এ রূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই, যেরূপ মোহাম্মদের ছাহাবীগণ মোহাম্মদের প্রতি করিয়া থাকে। খোদার কছম—মোহাম্মদের থুথুকে পর্যন্ত তার ছাহাবীগণ মাটিতে পড়িতে দেয় না, তাহারা উহা হাতে হাতে লইয়া তাহাদের মুখ মণ্ডল ও শরীরে মাখিয়া দেয়, যখন সে কোনো কাজের জন্য আদেশ করে তখন তাহারা কার আগে কে করিবে, তাহা লইয়া হুড়াহুড়ি করিতে থাকে। যখন সে ওজু করে তখন তাঁহারা তার সে ওজু করা পানি লইয়া কাড়াকাড়ি-মারামারি আরম্ভ করে। আর যখন সে কথা বলে তাহারা নিঃশব্দে চুপ করিয়া থাকে এবং তার সম্ভ্রমে তাহারা তার প্রতি দৃষ্টি করিতে সাহস করে না।—(বোখারী শরীফ)" এখানে বোধ হয় একজন পাশ্চাত্য লেখকের (মিঃ গডফ্রে হেগেন-

সের) একটি কথা উল্লেখ করা অন্যায় হইবে না। তিনি বলেন : মোহাম্মদের পয়গাম তাঁর অনুচরদের মধ্যে যে আত্মোৎসর্গের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল, তার নজীর যিশু-খৃষ্টের প্রাথমিক অনুচরদের মধ্যে তালাস করা বৃথা।—" (তদবীনে হাদীছ—২১)

হাদীছের হেফাজতে ছাহাবীগণের তৎপরতা

এমতাবস্থায় ছাহাবীগণ যখন আল্লাহ ও তাঁহাদের প্রিয় রাছুলের পক্ষ হইতে হাদীছের হেফাজত ও উহার প্রচারের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কোনো কোনো ছাহাবী তো এজন্য নিজের জীবনকেই ওকৃফ করিয়া দিয়াছিলেন, যথা হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) আর যাঁহারা কাজের ব্যস্ততার দরুণ সর্বক্ষণ হুজুরের খেদমতে হাজির থাকিতে পারিতেন না তাঁহারা অন্যের মারফত তাহা জানিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেন ; এমন কি কেহ কেহ ইহার জন্য অন্য ছাহাবীর সহিত পালা ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন : "আমি ও আমার এক আন্ছারী প্রতিবেশী—আতবান বিন মালেক—আওয়ালীতে বাস করিতাম (যাহা মছজিদে নববী হইতে কিছু দূরে ছিল)। অতএব আমরা হুজুরের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য পালা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম : তিনি একদিন হুজুরের খেদমতে হাজির হইতেন আর আমি এক দিন। যে-দিন আমি হাজির হইতাম সে-দিনের ওহী এবং অন্যান্য খবর আমি তাঁহাকে দিতাম এবং যে-দিন তিনি হাজির হইতেন সে-দিন তিনি এরূপ করিতেন।" (বোখারী)

ছাহাবীগণ যে শুধু হুজুরের জীবনকালেই হুজুরের হাদীছ সংগ্রহ ও উহার প্রচারে তৎপর হইয়াছিলেন তাহা নহে বরং তাঁহার ওফাতের পর তাঁহাদের এ-তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হুজুরের ওফাতের পর কোনো কোনো ছাহাবী অপর ছাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য শত শত মাইল সফরের কষ্ট স্বীকার করেন, অথচ তৎকালের সফর আজকালের ন্যায় সহজ ব্যাপার ছিলনা। হজরত আবু আইউব আন্ছারীর ন্যায় প্রবীণ ও মর্য্যাদাবান ছাহাবী একটি মাত্র হাদিছ লাভের জন্য মদীনা হইতে মিছর সফর করেন এবং আক্‌বাহ বিন আমরের নিকট উহা দরযাপ্ত করেন।—(তারীখুল হাদীছ ১৩) হজরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) হজরত আবদুল্লাহ বিন উনাইছের নিকট হইতে একটি হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। (সম্ভবতঃ শামের, কেননা আবদুল্লাহ বিন উনাইছ (রাঃ) তখন শামে অবস্থান করিতেন)—(তারিখুল হাদীছ ১৩) অপর একজন ছাহাবী, হজরত ফোজালাহ বিন ওবাইদ ছাহাবীর নিকট হাদীছ জিজ্ঞাসা করার জন্য মিছর গমন করিয়াছিলেন। —(দারেমী-১। ১২৭) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হজরত আবদুল্লাহ বিন উনাইছের নিকট হাদীছ জিজ্ঞাসা করার জন্য শাম গমন করিয়াছিলেন।—(বোখারী-কিতাবুল এল্‌ম) এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) তো হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য প্রবীণ ছাহাবীদের দ্বারে দ্বারে পড়িয়া থাকিতেন।—(দারেমী ১।১২৬)

হাদীছ হেফ্‌জ

ছাহাবীগণ আল্লাহর কিতাবের যেরূপ হেফ্‌জ ও আলোচনা করিতেন সেরূপ রাছুলের ছুন্নাহ্‌ বা হাদীছের হেফজ ও আলোচনা করিতেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) বলেন : "আমরা (হুজুরের সময়) হাদীছ হেফ্‌জ করিতাম।" (মুছলিম শরীফ)। হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন : "আমরা হুজুরের নিকট বসিতাম, তিনি আমাদের হাদীছ বর্ণনা করিতেন, অতঃপর তিনি তাঁর কাজে চলিয়া যাইতেন যখন আমরা বসিয়া পরস্পরে উহার একটার পর একটা আলোচনা করিতাম, অতঃপর আমরা যখন মজলিস ত্যাগ করিতাম হাদীছ আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাইত যেন উহা তথায় রোপন করা হইয়াছে।"—(জামউল্ দাওয়ায়েদ্ – ১।১৬১) হজরত মাআবিয়া (রাঃ) বলেন : "এক দিন আমরা নবী করীমের সঙ্গে ছিলাম, এ-সময় তিনি (আমাদের সহ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন : তথায় কতক লোক বসিয়া আছে, হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কেন বসিয়া আছ? তাঁহারা উত্তর করিলেন : আমরা ফরজ নামাজ পড়িয়াছি, অতঃপর এখানে বসিয়া আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর ছুন্নাহ্‌ আলোচনা করিতেছি।" (মুস্তাদরেক)। এক কথায় রাছুলুল্লাহর ছাহাবীগণ রাছুলুল্লাহর সমস্ত হাদীছ তথা তাঁহার জীবনের সমস্ত কথা ও কার্যকেই সযত্নে ইয়াদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা, তাঁহাদের স্মৃতি, তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ও তাঁহাদের আগ্রহের অনুপাতে ইহা কিছুই ছিলনা। তবে তাঁহাদের সকলেরই রাছুলুল্লাহর নিকট হইতে সরাসরিভাবে অথবা অন্যের মারফতে হাদীছ সংগ্রহের সমান সুযোগ ছিলনা বিধায় সকলেই সমান সংখ্যক হাদীছ রক্ষা করিতে পারেন নাই, কেহ কম রক্ষা করিয়াছেন আর কেহ বেশী। যাঁহারা হাজারের অধিক হাদীছ রক্ষা করিয়াছেন বা রাওয়ায়েত করিয়াছেন আমাদের আলেমগণ তাঁহাদের বলেন "মোক্‌ছেরীণ।" যাঁহারা হাজারের কম অথচ পাঁচ শতের অধিক হাদীছ রাওয়ায়েত করিয়াছেন

তাঁহাদের বলেন "মোতাওচ্ছেতীন"। আর যাঁহারা পাঁচ শতের কম অথচ ৪০ চল্লিশের অধিক হাদীছ রাওয়ায়েত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম দিয়াছেন "মোকেল্লীন" এবং ইহার কম যাঁহারা রাওয়ায়েত করিয়াছেন তাঁহাদের বলেন "আকল্লীন"। নীচে আমরা প্রথম তিন শ্রেণীর ছাহাবীর নাম এবং তাঁহাদের কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দিতে চেষ্টা করিলাম।—

মোক্‌ছেরীন ছাহাবী

১। হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ)—৫৩৬৪টি হাদিছ
২। হজরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ)—২২৩৬টি
৩। হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ)—১৬৬০টি
৪। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)—১৬৩০টি
৫। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)—১৫৪০টি
৬। হজরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ (রাঃ)—১২১০টি
৭। হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ)—১১৭০ টি

(শরহে বোখারী কির্‌মানী হইতে)

মোতাওচ্ছেতীন

১। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ)—৮৪৮টি
২। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর আছী (রাঃ)—৭০০টি
৩। হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ)—৫৮৬টি
৪। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)—৫৩৯টি

(কির্‌মানী)

মোকেল্লীন

১। হজরত উম্মে ছালেমাহ্ (রাঃ)—৩৭৮টি
২। হজরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ)—৩৬০টি
৩। হজরত বার্‌রা বিন আজের (রাঃ)—৩০৫টি
৪। হজরত আবুজর গফফারী (রাঃ)—২৮১টি
৫। হজরত ছাদ বিন আবি ওককাছ (রাঃ)—২১৫টি
৬। হজরত ছাহল আনছারী (রাঃ)—১৮৮টি
৭। হজরত ওবাদাহ্ বিন ছাবেত (রাঃ)—১৮১টি
৮। হজরত আবু দরদা (রাঃ)—১৭৯টি
৯। হজরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)—১৭০টি
১০। হজরত ওবাই বিন কা'ব (রাঃ)—১৬৪টি
১১। হজরত ইয়াজীদ বিন খাছীব (রাঃ)—১৬৪টি
১২। হজরত মাআজ বিন জাবাল (রাঃ)—১৭৫টি
১৩। হজরত আবু আইউব আন্‌ছারী (রাঃ)—১৫০টি
১৪। হজরত ওছমান গণী (রাঃ)—১৪৬টি
১৫। হজরত জাবের বিন ছামোরাহ্ (রাঃ)—১৪২টি
১৬। হজরত আবুবকরর ছিদ্দীক (রাঃ)—১৪ টি
১৭। হজরত মোগীরাহ্ বিন শোআবাহ্ (রাঃ)—১৩৬টি
১৮। হজরত আবু বক্‌রাহ্ (রাঃ)—১৩০টি
১৯। হজরত এমরান বিন হে'ছাইন (রাঃ)—১৩০টি
২০। হজরত মাআবিয়া (রাঃ)—১৩০টি
২১। হজরত ওছামাহ্ বিন জ'য়েদ (রাঃ)—১২৮টি
২২। হজরত ছাওবান (রাঃ)—১২৭টি
২৩। হজরত নো'মান বিন বশীর (রাঃ)—১২৪টি
২৪। হজরত ছামোরাহ্ বিন জোন্দাব (রাঃ—১২৩টি
২৫। হজরত আবু মাছউদ আন্‌ছারী (রাঃ)—১০২টি
২৬। হজরত জরীর বিন আবদুল্ল'হ বাজালী—১০০টি
২৭। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা—৯৫টি
২৮। হজরত জায়েদ বিন ছা'বেত আন্‌ছারী —৯২টি
২৯। হজরত আবু তালহা আনছারী —৯০টি
৩০। হজরত জায়েদ বিন আকরম (রাঃ)—৯০
৩১। হজরত জায়েদ বিন খালেদ (রাঃ)—৮১টি
৩২। হজরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ)—৮০টি
৩৩। হজরত রাকেব বিন খাদীজ (রাঃ)—৭৮টি
৩৪। হজরত ছলমাহ বিন আক্‌ওয়া—৭৭টি
৩৫। হজরত আবু রাফের (রাঃ)—৬৮টি
৩৬। হজরত আওফ বিন মালেক (রাঃ)—৬৭টি
৩৭। হজরত আদী বিন হাতেমতায়ী—৬৬টি
৩৮। হজরত আবদুর রহমান বিন আবি আওফা—৬৫টি
৩৯। হজরত উম্মে হাবীবাহ (উম্মুল মোমেনীন)—৬৫টি
৪০। হজরত ছলমান ফারছী (রাঃ) –৬৪টি
৪১। হজরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাঃ)—৬২টি
৪২। হজরত হাফছাহ (উম্মুল মোমেনীন)—৬০টি
৪৩। হজরত জোবাইর বিদ মোতইম (রাঃ)—৬০টি
৪৪। হজরত শাদ্দাদ বিন আওছ (রাঃ)—৬০টি
৪৫। হজরত অছমা বিন্তে আবি বকর (রাঃ)—৫৬টি
(ইনি হজরত আয়েশা ছিদ্দীকার ভগ্নী ছিলেন)
৪৬। হজরত ওছিলাহ বিন আছকাত (রাঃ)—৫৬টি
৪৭। হজরত আকাবাহ বিন আমর (রাঃ)—৫৫টি
৪৮। হজরত ফোজালাহ বিন ওবাইদ (রাঃ)—৫০টি
৪৯। হজরত ওমার বিন আতবাহ (রাঃ)—৪৮টি
৫০। হজরত কা'ব বিন ওমার (রাঃ)—৪৭টি
৫১। হজরত ফোজালাহ বিন ওবাইদ আছলমী—৪৬
৫২। উম্মুল মোমেনীন হজরত মাইমুনাহ (রাঃ)—৪৬
৫৩। হজরত উমেম হানী বিন্তে আবিতালেব—৪৬টি
(হজরত আলীর ভগ্নী)
৫৪। হজরত আবু জোহাইফা (রাঃ)—৪৫টি
৫৫। হজরত বিলাল মোয়াজ্জিন (রাঃ)—৪৪টি
৫৬। হজরত আবদুল্ল'হ বিন মোগাফফাল—৪৩টি
৫৭। হজরত মেকদাদ বিন আছওয়াদ (রাঃ)—৪৩টি
৫৮। হজরত উম্মে আতীয়াহ (রাঃ) –৪১টি

৫৯। হজরত হাকীম ইবো হেজাম (রাঃ)—৪০টি
৬০। হজরত ছালেমাহ বিন আছীফ (রাঃ)—৪০টি
(তারীখুল হাদীছ ১৮)

প্রথম শতাব্দী

প্রথম শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক ব্যাপকভাবে হাদীছ সংগ্রহের নির্দেশ জারী করা পর্যন্তই স্বয়ং রাছুলুল্লাহ ছঃ)কে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হাদীছ যে সম্পূর্ণরূপে মাহ্‌ফুজ ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকিতেছেনা। নীচে এরূপ কতিপয় দীর্ঘজীবী ছাহাবীর নাম দেওয়া গেল :—

অবস্থান
মদীনা শরীফ

১। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আন্‌ছারী (রাঃ)—মৃত্যু ৭৮হিঃ ”
২। হজরত বার্‌রা বিন আজেব (রাঃ) ৭২হিঃ ”
৩। হজরত আওফ বিন মালেক (রাঃ)৭৩ ” ”
৪। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)৭৩ ” ”
৫। হজরত আছমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ)৭৩ ”
৬। হজরত ছায়ীদ বিন খালেদ (রাঃ)৭৩ ” ”
৭। হজরত আবু জোহাইফা (রাঃ)—৭৪ ” ”
৮। হজরত মোহাম্মদ বিন হাতেব (রাঃ,৭৪ ” ”
৯। হজরত রাফে্ন বিন খাদীজ (রাঃ)৭৪ ” ”
১০। হজরত ছলমাহ বিন আকওয়া (রাঃ)৭৪” ”
১১। হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) ৭৪ ” ”
১২। হজরত আবু ছা'লাবাহ্ খোশানী (রাঃ)৭৫” ”
১৩। হজরত এরবাজ বিন ছা'রীয়াহ (রাঃ) ৭৫ ” শাম
১৪। হজরত জায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) ৭৮” হিমছ
১৫। হজরত আতবাহ্ বিন নজর (রাঃ) ৮৪” বছরাহ্
১৬। হজরত ওয়াছেলা বিন আছকা (রাঃ) ৮৫” মিছর
১৭। হজরত আমর বিন ছালেমাহ্ (রাঃ) ৮৫ ” শাম
১৮। হজরত আবু ওয়াকেদ্ লায়ছী (রাঃ) ৮৫” কুফা
১৯। হজরত আমর বিন হোরাইছ (রাঃ) ৮৫ ” ”
২০। হজরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) ৯০ ” মদীনা
২১। হজরত আবু ওমামাহ্ বাহেলী (রাঃ) ৮৬ ” হিম্‌ছ
২২। হজরত আবদুল্লাহ বিন হারেছ বিণ জাজা ৮৭ ” মিছর
২৩। হজরত মেক্‌দাদ বিন মা'দীকারাব্ (রাঃ) ৮৭ ” শাম
২৪। হজরত আতবাহ বিন আবদুল্লা ছোলামমী (রাঃ) ৮৭” কুফা
২৫। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাঃ) ৮৭ ” ”
২৬। হজরত ছাহল বিন ছা'দ ছায়েদী (রাঃ) ৯১ ” মদীনা
২৭। হজরত আবদুল্লাহ বিন বোছর মোজণী (রাঃ) ৯৬ ” শাম
২৮। হজরত মোর্‌ছাদ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) ৮৯ ” মদিনা
২৯। হজরত ছায়ীদ বিন ইয়াজীদ (রাঃ) ৯৪ ” ”
৩০। হজরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) ৯৩ ”
৩১। হজরত মাহমুদ বিন বারী (রাঃ) ৯৯ ”

ছাহাবীগণের তাবেয়ীন্দের প্রতি নির্দেশ :—

ছাহাবীগণ শুধু নিজেরাই যে হাদীছের হেফ্‌জ ও হেফাজতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তাহা নহে বরং তাঁহাদের শাগরিদ তাবেয়ীনদের প্রতিও ইহার নির্দেশ দিয়াছিলেন। হজরত আলী মোরতজা তাঁর শাগরিদদের বলেন : “তোমরা পরস্পরে মিলিত হইবে এবং বেশী করিয়া হাদীছ আলোচনা করিবে, অন্যথা হাদীছ তোমাদের অন্তর হইতে মুছিয়া যাইবে।—(দারেমী ১।১৫০) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) তাঁর শাগরিদদের বলিতেন : পরস্পর হাদীছ আলোচনা করিতে থাকিবে, আলোচনাতেই হাদীছের জীবন।—(দারেমী ১।১৫০) হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) তাঁর শাগ্‌রিদদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন : “পরস্পরে হাদীছ আলোচনা করিবে, আলোচনাই হাদীছকে স্মরণ করাইয়া দেয়। (১।১৪৬) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) তাঁর শাগরিদদের বলিতেন : আমাদের নিকট হইতে যখন কোনো হাদীছ শুনিবে পরস্পরে উহা আলোচনা করিবে।—(দারেমী ১।১৪৮) তিনি ইহাও বলিতেন যে, “তোমরা পরস্পরে হাদীছ আলোচনা করিবে যাতে উহা তোমাদের অন্তর হইতে পালাইয়া যাইতে না পারে। কেননা উহা কোরআনের ন্যায় এক জায়গায় সুরক্ষিত নহে, সুতরাং তোমরা যদি উহার আলোচনায় মনোনিবেশ না কর উহা পালাইয়া যাইবে। সাবধান, তোমাদের কেহ একথা যেন না বলে যে, কাল আলোচনা করিয়াছি আজ আর আলোচনা করিব না বরং কাল করিয়াছ, আজও কর এবং আগামীকালও করিবে।—(দারেমী ১।১৪৭)

তাবেয়ীনদের হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ :—

ছাহাবীগণের এরূপ উৎসাহ দানের ফলে তাবেয়ীনদের মধ্যে এ-ব্যাপারে এত অধিক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়

যে, তাঁহাদের এক এক ব্যক্তি এক একটি হাদিছের জন্য তৎকালের সমস্ত হাদীছের কেন্দ্র মদীনা, মক্কা, কুফা, বছরা, শাম ও মিছর প্রভৃতি ঘুড়িয়া বেড়ান। তাবেয়ী বোছর বিন ওবাইদুল্লাহ বলেন: "আমি একটি মাত্র হাদীছের জন্য এ সকল শহরের অনেকটিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। (দারেমী ১।১২৬) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবুল আলীয়াহ্ রিয়াহী (রাঃ) বলেন: "আমি বছরায় (তাবেয়ীনদের নিকট—) ছাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না—যে পর্যন্ত না উহা মদীনায় যাইয়া স্বয়ং ছাহাবীগণের মুখেতে শুনিতাম। (দারেমী ১।১২৬) তাবেয়ী আবু কোলবাহ্ (রাঃ) বলেন "মদীনা সফরান্তে আমি প্রত্যাবর্তনের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়াও কেবল মাত্র হাদীছ শোনার জন্য তিন (মাস) পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম এবং হাদীছটি শুনিয়াই আসিয়াছিলাম।—(দারেমী ১।১২৫)। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম জোহ্রী হাদিছ শোনার জন্য (প্রবীন তাবেয়ী) ওরওয়াহ্ বিন জোবাইরের দরজায় পড়িয়া থাকিতেন।—(দারেমী ১।১২৬)

তাবেয়ীগণ ছাহাবীগণের নির্দেশ অনুসারে হাদীছকে মুখস্থ রাখার জন্য উহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেন। তাবেয়ী আতা বিন আবিরাবাহ (রাঃ) বলেন: "আমরা ছাহাবী হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহর নিকট হাদীছ শুনিতাম এবং তাহার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন পর আমরা পরস্পরে উহা আলোচনা করিতাম। (তাদবী ৯০)। এক দিন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) তাঁর শাগরিদদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "হাদীছ আলোচনার জন্য তোমরা পরস্পরে মিলিত হও কি না?" উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলন: "কোন দিন যদি আমাদের কোনো সঙ্গী আলোচনায় যোগদান না করেন আমরা যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হই এবং উহা আলোচনা করি—যদিও তাঁহার বাসস্থান কুফার শেষ প্রান্তেও হয়। ইহা শুনিয়া হজরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন: "যে পর্যন্ত তোমরা এরূপ করিতে থাকিবে কল্যাণের সহিত থাকিবে। (দারেমী ৭৯)

এক কথায় ছাহাবাহ ও প্রবীণ তাবেয়ীগণের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম যুগে হাদীছ সম্পূর্ণরূপে মাহ্ফুজ ছিল। তাঁহারা ইহা মুখে মুখে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রবীণ তায়েবীনগর

প্রথম শতাব্দীতে "তাবাকায়ে উলা" (প্রবীণ তায়েবী নগর) যাঁহারা ছাহাবীগণের সহিত হাদীছের হেফাজতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা অনেক। নীচে ইহাদের কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের নাম দেওয়া গেল—

১। হজরত আল্কামা বিন কায়ছ (রাঃ) মৃত—৬২ হিঃ
২। হজরত আবু মুছলিম খাওলানী (রাঃ)—৬২ „
৩। হজরত রবী বিন খায়ছম (রাঃ)— „
৪। হজরত আমর বিন শোরহাবীল (রাঃ)—৬৩ „
৫। হজরত মাহরুফ বিন আজদার (রাঃ)—৬৩ „
৬। হজরত আবু আবদুর রহমান ছোলামনী (রাঃ)৭৩,,
৭। হজরত আবু বোরাদাহ আমের বিন আবিমুছা—৭৪
৮। হজরত আছওয়াদ বিন ইয়াজীদ নাখায়ী (রাঃ) ৭৫
৯। হজরত আবদুর রহমান বিন গানাম (রাঃ)—৭৮ „
১০। হজরত কাজী শোরাইহ্ (রাঃ)— ৭৯ „

হজরত আলীর ইহুদীর সহিত জামাসম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ বিচারের ঘটনাটি ইহার নিকটই উপস্থিত করা হইয়াছিল।

১১। হজরত ছোলাইমান বিন কায়ছ (রাঃ)—৮০ „
১২। হজরত আবু ইদ্রিছ খাওলানী (রাঃ)—৮০ „
১৩। হজরত মোহাম্মদ বিন হানাফীয়াহ (রাঃ)—৮১ „

হজরত আলীর অ-ফাহতেমীয় পুত্র। ইনিই সাধারণের নিকট মোহাম্মদ হানিফা নামে প্রসিদ্ধ।

১৪। হজরত আবু ওয়াইল বিন ছালেমাহ (রাঃ)—৮২ „
১৫। হজরত জোর বিন হোবাইশ (রাঃ)—৮৩ „
১৬। হজরত আবদুর রহমান বিন আবিলায়লা (রাঃ) ৮৩
১৭। হজরত কাবীছাহ বিন জোয়ার (রাঃ)—৮৬ „
১৮। হজরত ইব্রাহীম বিন ইয়াজীদ তামিমী (রাঃ)—৯২
১৯। হজরত আবুল আলীয়াহ রেয়াহী (রাঃ)—৯৩ „
২০। হজরত ইমাম জায়নুল আবেদীন (আলি বিন হোছাইন) —৯৪ „
২১। হজরত আবুবকর বিন আবদুর রহমান মাখজুমী ৯৪
২২। হজরত আবু ছলেমাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ—৯৪ „
২৩। হজরত ছায়ীদ বিন জোবাইর (রাঃ)—৯৪ „
২৪। হজরত ছায়ীদ বিন মোছাইয়াব (রাঃ)—৯৪ „
২৫। হজরত ইব্রাহীম বিন ইয়াজীদ নাখায়ী (রাঃ) ৯৫ „
২৬। হজরত ইব্রাহীম বিন ইয়াজীদ তাইমী (রাঃ) ৯৫ „
২৭। হজরত ওরওয়াহ বিন জোবাইর (রাঃ)—৯৪ „

হজরত আয়েশা ছিদ্দীকার ভগ্নী হজরত আছমার পুত্র

২৮। হজরত হাছান মোছান্না বিন হাছান বিন আলী (রাঃ)—৯৮ „
২৯। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আতবাহ ৯৯
৩০। হজরত হাছান বিন মোহাম্মদ বিন হানাফীয়হ ৯৯ „
৩১। হজরত আবদুর রহমান বিন আছওয়াদ নাখায়ী ৯৯
৩২। হজরত খারেজাহ বিন জায়েদ (রাঃ)—১০০ „
৩৩। হজরত ছোলাইমান বিন ইয়াছার (রাঃ)—১০০ „
৩৪। হজরত আবু ওছমান নাহদী (রাঃ)—১০০ „

(তারীখুল হাদীছ ২০)

পঙ্কিল

চৌধুরী আব্বাস উদ্-দীন

বেশ সুখেই ছিলো ওরা। হাবিব আর রাবিয়া। দুটি মানুষের হাতে গড়া সুখের সংসার। বিয়ের বছর-খানেক পর দুটি মানুষের সংসারে অতিথি এলো একজন। তিনজনের সুখ আর শান্তিতে কেটে যাচ্ছিলো দিনগুলো। আর্টস পাশ করা গ্রাজুয়েট বিভায় মাসে দেড় শ' খানেক টাকা আয় হতো হাবিবের। তা' দিয়ে কত সুন্দর ভাবেই না চালিয়ে নিতো রাবিয়া! সপ্তাহে সপ্তাহে ভালো ছবি-টবিতেও যাওয়া হতো দু'জনের। পাড়া-পড়শীদের নিমন্ত্রণ করেও খাওয়াতো রাবিয়া,—মাঝে মাঝে।

ঠিক যেমনটি চেয়েছিলো হাবিব। ছোট্ট একটা নীড়ে স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে বসবাস করা। জীবন সম্বন্ধে স্বপ্নের দৌড়টা ওর আর বেশী দূর এগুতে পারে নি। দরিদ্র সন্তানের এর চেয়ে আর অধিক কামনা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবতো সে। তাই হাবিব যা পেয়েছিলো, তাই নিয়ে সুখী হয়েছিলো—সুখী হতে পেরেছিলো জীবনে।

রাবিয়া কি আরও বেশী চেয়েছিলো? সামান্য কেরাণী পিতার কন্যা হয়ে আর অধিক কি চাইবে ও। যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছিলো, যে পরিবেশের সাথে ওর আনাগোনা ছিলো, নিজের জীবন নিয়ে তো সে পরিবেশ ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারেনি। তাই তো হাবিবের ছোট্ট সংসারটিকে স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিলো রাবিয়া। নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলো। স্বামীর ভালোবাসা আর সন্তানের স্নেহের কাছে ওর সমস্ত সুখ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো।

হাবিব কতবার অনুযোগ করেছে, একটা ঝি রাখো রুবি। দেখছো না তোমার শরীর দিন দিন কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাবিয়া মৃদুভাবে হেসে উত্তর দেয়, ও কিছু নয়। দুটি মানুষের সংসারে এমনই বা কি কাজ?

: তোমার কষ্ট সে তো আমার সহ্য হয় না—হাবিবের কণ্ঠ অভিমানে ভরে আসে।

: কিইবা কষ্ট। তুমি কিচ্ছু ভেবো না—রাবিয়ার স্বর গদ্‌গদ্ হয়ে উঠে, সংসারে এইটুকু কাজ না করতে পেলে আমি মরে যাবো।

হাবিব আর কোন কথা বলে না। স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়ে চুপ মেরে যায়।

রাবিয়া বলে, ছেলেকে আমাদের উকিল করবো।

বাধা দিয়ে হাবিব নাক সিটকে বলে, ওকালতি সে বড় বিশ্রী। তার চেয়ে ওকে ডাক্তারী পড়াবো। ছেলে আমাদের নামকরা ডাক্তার হবে। আমাদের মতো যারা গরীব, বিনা পয়সায় তাদের চিকিৎসা করবে।

খুশীতে ডগমগ হয়ে হাততালি দিয়ে উঠে রাবিয়া, সেই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মুখখানা পাংশু হয়ে যায়।

হাবিব ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করে মৃদু হাসে। আদর কণ্ঠে স্ত্রীকে শুধায়, কি হলো রুবি? মুখখানাকে হাঁড়ি বানিয়েছো কেন?

: ডাক্তারী পড়াতে তো অনেক টাকার দরকার—রাবিয়া নিরাশ কণ্ঠে বলে, অতো টাকা কই আমাদের?

স্ত্রীর আশঙ্কায় প্রবলভাবে হেসে উঠে হাবিব, তুমি কি ভাবো চিরদিন আমি দেড় শ' টাকা মাইনায় চাকরী করবো? না গো না। চাকরীতে আমার উন্নতি হবেই। আর যদি না হয় অন্য একটা সুবিধা মতো চাকরী পেলেই এটা ছেড়ে দেবো।

রাবিয়ার মুখ থেকে আষাঢ়ের মেঘ ধীরে ধীরে অপসৃত হয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, খোদা তাই করুন।

আনন্দের পাখনায় ভর করে ওদের সুখের দিনগুলো কেটে যেতে লাগলো। মিন্টু এখন বেশ বড় হয়েছে। দু'বছরে পড়লো এবার। ছোট্ট শিশুটাকে দেখে বড় মায়া লাগে। সবাই ওকে আদর করে। মিন্টু মনমতো সমঝদার একজন সঙ্গী পেলে তার সাথে সাত রাজ্যের গল্প জুড়ে দেয়।

হাবিব ওকে কোলে নিয়ে শুধায়, মিন্টু বাবু, কে ভালো? আমি, না তোমার মা?

অবুঝ শিশু অতশত বোঝে না। সে আধো আধো করে বলে—টুমি।

এক ঝটকায় ওর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় রাবিয়া। মিন্টু ব্যথা পেয়ে হয় তো কেঁদে ফেলে। ওকে শান্ত করে রাবিয়া শুধায় এবার, কে বেশী ভালো বলো তো বাবু, তোমার বাবা, না আমি?

মিন্টু হাসি মুখে বলে, টুমি।

ছেলের উত্তর পেয়ে রুখে দাঁড়ায় রাবিয়া, শুনলে তো?

হাবিব হেসে ফেলে। বলে, ও তো ছোট্ট। যার কাছে যাবে, তাকেই ওর ভালো লাগবে।

: তাই বলো—রাবিয়াও হাসে।

আরো বেশ ক'টা দিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে গেলো।

মাস-পয়সা। বেতনটা হাতে পৌঁছুতেই হাবিব ছোট খাটো একটা দোকান কিনে আনলো যেন। রাবিয়ার জন্য শাড়ী, পাউডার, মাথার ক্লিপ, এমন কি নতুন বেরুনো এক জোড়া সেণ্ডেল পর্য্যন্ত। মিন্টুর জন্য হরেক রকমের খেলনা। চাবি টিপলে কথা কয়, কোন্‌টা দৌড়ে যেতে চায়। কোনটা হাত তুলে সালাম জানায়।

রাবিয়া অনুযোগ তুলে, এত কিছু আনতে গেলে কেন, তুমি ?

: মিন্টু বাবা খেলা করবে ; তাই তো।

: ওগুলো তো একটু আঘাত পেলেই ভেঙ্গে যাবে। ছেলেদের হাতে কি ওগুলো দিতে আছে ?

: তুমিও তো বেশ—হাবিব হাসে, বলি ছেলেদের জন্য না হলে কি ওগুলো বুড়োদের জন্য ?

: আমাদের মতো গরীবদের ছেলের জন্য নয়। রাবিয়া ম্লান ভাবে হাসে, যাদের নষ্ট করবার মতো টাকা আছে অনেক, তাদের ছেলেদের জন্য।

: গরীবের ছেলে বলে ওর সখ নেই ?—হাবিব প্রতিবাদ জানায়।

: তা' নয় হলো—রাবিয়া মানলো, কিন্তু ওগুলো—বলে সে নিজের জন্য আনা শাড়ী জুতোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, ওগুলো দিয়ে বুঝি আমি খেলবো ?

উত্তর দিতে গিয়ে হাবিবের চোখ দু'টো সজল হয়ে এলো সহসা। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তোমার কোন সখটাই তো পূরণ করতে পারলাম না রুবি। আমার যে কত বড় সৌভাগ্য তোমাকে পেয়ে, এ-কি করে বোঝাই ?

: ব্যস্ ব্যস্—রাবিয়া বিরক্ত মুখে বাধা দেয় ওকে। একটু নীরব থেকে বলে ও, জানি না সৌভাগ্যটা কার বেশী। তোমাকে পেয়ে আমার, না আমাকে পেয়ে তোমার। তবে একথাটা মনে রেখো, তোমাকে পেয়ে আমি যে কত সুখী তা' কিছুতেই তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তুমিই আমার সব। যে ক'টা দিন বেঁচে থাকি, তোমার সেবা করে যেতে পারলে আমি আর কিছু চাই না।

: তবে—হাবিব প্রশ্ন করে, তুমি খুশী মনে এগুলো নিতে পারছো না কেন ?

: বলছিলাম কি—রাবিয়া একটু মৌন থেকে বলে, ছেলেটা এখন বড় হচ্ছে। দিন দিন খরচটাও বাড়বে ওর জন্য। অথচ তোমার বেতন বাড়ছে না মোটেই। তাই এত বেশী খরচ না করে কিছু কিছু জমালে ভালো হয় না ?

: সে জন্য তোমার ভাবনা কেন—হাবিব ওর কথাটায় মোটেই আমল না দিয়ে বলে, এই মাত্র ক'টা টাকা। এর থেকে আবার বাঁচাবো কি ? একটু চুপ থেকে সান্ত্বনা কণ্ঠে বলে সে, ওর জন্য তুমি এত ভাবো কেন ? মিন্টু বড় হোক। ওকে মানুষ করবার দায়িত্বটা আমারই।

তারপর একদিন।

সেদিন আকাশটা ঘন মেঘে আচ্ছন্ন ছিলো কিনা, হাবিবের সঠিক মনে পড়ে না। তবে গরমটা যে খুব পড়েছিলো, তা' ওর ঠিক ঠিকই মনে আছে।

অসময়ে অফিস থেকে ফিরে আসতে দেখে রাবিয়া বিস্মিত হয়েছিলো। কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে শুধায়, ফিরে এলে যে ? শরীরটা কি ভালো নেই ?

হাবিব এসে ধপ্ করে চৌকিটায় বসে পড়ে। ম্লান কণ্ঠে বলে, আজ থেকে আমরা ধর্মঘট করেছি। কোম্পানী আমাদের দাবী পূরণ করে দিতে বাধ্য। তুমি দেখো রুবি, তখন আমার মতো গরীবেরা বাঁচবার একটা পথ পাবে।

: কত দিন চলবে তোমাদের এই ধর্মঘট—শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রাবিয়া।

: তার কোন নিশ্চয়তা নেই রাবিয়া। যতদিন কোম্পানী আমাদের দাবী মেনে না নেয়, ততদিনই আমরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবো।

: না, না এ করোনা তুমি—রাবিয়া চঞ্চল হয়ে উঠে, আমাদের আর দরকার কি টাকার ? যা' পাচ্ছো, তা' দিয়েই চলে যাবে কোন মতে।

: তোমার আমার মতো সবাই নয়—হাবিব উত্তেজিত হয়ে উঠে, একপাল ছেলেপুলে নিয়ে দেড়শ' টাকায় তুমি কি ভাবে চালাবে ? দিন দিন মানুষের সংসারে লোক বাড়ছে, অথচ কোম্পানী বেতন বাড়াবে না, এত বড় অবিচার আর সহ্য করবো না। শোষণের দিনের খতম চাই আমরা।

ওদের আলোচনায় ঘুমন্ত ছেলেটা কেঁদে উঠলো। রাবিয়া উঠে দাঁড়ায়। বাক-যুদ্ধ শুরু হয়।

কিন্তু, হাবিবেরা যা' চেয়েছিলো, তা কি হলো শেষ পর্য্যন্ত ?

হলোনা। হাবিব চাকরী হারালো।

চললো অভিশপ্ত বেকার জীবন। হন্যের মতো ঘুরে ঘুরে বাটার পনের টাকা পনের আনার জুতোটার গাড়ালী ক্ষয় করে ফেললো হাবিব। তবু চাকরী পেলো না সে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে অবসন্ন দেহ নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে সে। রাবিয়া আগের মত সমাদর করে না ওকে। শুয়ে থাকলে শোয়া থেকে উঠেও না। শুয়ে শুয়েই জিগ্‌গেস করে, 'হলো কিছু ?'

: না—ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় হাবিব।

: এদিকে চাল ডাল সব ফুরিয়ে গেলো। বড় জোর দু' তিন দিন চালাতে পারবো, তারপর ?

: জানি না—

: জানো না বললে হবে কেন ?

: চেষ্টার ত্রুটি তো করছি না।

চুপ করে থাকে রাবিয়া। শয্যা থেকে নেমে এসে নীরবে ভাত বেড়ে দেয়। সারাদিন ছুটাছুটির দরুণ অসম্ভব ক্ষিধে পেয়েছিলো হাবিবের। গোগ্রাসের সে গিলতে থাকে ভাত।

আরো দিন যায়। চাকরী মিলে না হাবিবের।

একে একে শেষ হলো রাবিয়ার যে ক'টা অলঙ্কার ছিলো সেগুলো। হাবিবের পরিচিত যে ক'জন বন্ধু ছিলো, সবার কাছ হতে টাকা ধার করলো সে। বাটার চার টাকা বারো আনার ক্যানভাসের জুতোটার তলি রাজপথের সাথে মিশে গেলো, তবুও চাকুরী পেলো না হাবিব।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে তিক্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরলো হাবিব।

রাবিয়া আগুণ হয়ে ছুটে যায় ওর দিকে। ক্রুদ্ধ মুখে শুধায়, ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবে তুমি? তারপরেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সে, আমরা না হয় বুঝি। গাছের পাতা শাক সজী কিছু খেয়ে কোনমতে বাঁচলাম। কিন্তু ও যে একেবারে দুধের ছেলে। ওর কি এত কষ্ট সহ্য হয় ?

উদাস ভাবে তাকায় হাবিব। করুণ স্বরে প্রত্যুত্তর দেয়, আমি কি করতে পারি ?

বি, এ, পাশ করেছ, পুরুষ মানুষ তুমি। রাবিয়া ফুঁসে উঠে, ইচ্ছা করলে তুমি একটা উপায় করতে পারবেই।

হাবিবও ভাবলো ক'দিন। ইচ্ছা করলে দুটি মানুষকে সে অনায়াসেই চালিয়ে নিতে পারবে। তবে কি করবে সে? রিক্সা চালাবে ? তাতেও টাকা লাগবে। লাইসেন্স করতে হবে। কাগজ বেচবে—পত্রিকা ? তাতেও যে ছোটখাটো একটা 'ক্যাপিটাল' চাই। অথচ এক বেলা ভাতের চালের পয়সা নেই হাবিবের। তবে কি করবে হাবিব ? এমন একটা কিছু তাকে করতে হবে, যাতে ষোল আনাই লাভ। কিন্তু এমন কি ব্যবসা ?

ছেলেটা ক্ষুধায় চেঁচিয়ে উঠে। রাবিয়া পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়। এ বাড়ী, ও বাড়ী হতে ছেলের জন্য কিছু চেয়ে নেয়। পাড়া-পড়শীদের দয়া-মায়া আছে। ছেলেদের এঁটো দ্রব্যগুলো তুলে দেয় রাবিয়ার হাতে। রাবিয়া কোনমতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। পাগলের মতো বলে যায়, আমাদের না মেরে তুমি কি আর শান্ত হতে পারবে না ? উঃ—আমার অদৃষ্টে এতো ছিলো। রাবেয়া ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ রোদনের পর রাবিয়া বলতে থাকে, শীতের একটা কাপড় নেই ছেলেটার। আমার পরণে যেটা, ওটা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করা মুস্কিল। এমনি ভাবে আর কতদিন চালাবে তুমি ?

হাবিব গুম হয়ে রইলো।

জবাব না পেয়ে রাবিয়া আরো রেগে উঠলো। রাগ মুখেই বলে চললো সে, স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ-পোষণ করতে না পারলে বিয়ে করেছো কেন ? উঃ—কত বড় ভুলই না করেছি আমি, তোমায় ভালোবেসে ?

: তোমার যা' ইচ্ছা তাই বলো রাবেয়া। হাবিব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

: নয়তো তোমাকে "পূজা" করবো নাকি বসে বসে। লজ্জা করে না তোমার, স্ত্রী আর পুত্রের মুখে দু'মুঠো ভাত দিতে পারো না। ধিক তোমার জীবনে।

সারারাত আর কথা হলো না কারো। দু'জনেই এপাশ ওপাশ করলো। কারো চোখেই ঘুম এলো না, কেউই ঘুমোতে পারলো না। উভয়ে উভয়ের যন্ত্রণা বুঝলো। কিন্তু কাউকে কেউ সান্ত্বনা দিলো না। ছেলেটা দু'চারবার ক্ষুধায় কেঁদে উঠলো। রাবিয়া মারলো খুব ওকে। হতভাগা ছেলে কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমোলে অবশেষে।

পরদিন সকালেই বেরিয়ে গেলো হাবিব। কোথায় বা যাবে। রাস্তায় ভয়ে ভয়ে সাবধানে পথ চলতে হয় হাবিবের। বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা হলেই পাওনা দাবী করে বসে ওরা। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে পথ চলে সে। ক্ষুধায় পেটের নাড়িভুড়ি জ্বলছে। রাস্তার কল থেকে পেট পুরে পানি খেল দু'তিন বার হাবিব। কিন্তু ক্ষুধা মরলো কৈ ? পানি ভর্ত্তি পেট নিয়ে চলতে কষ্ট হয় ওর। তবু চলতে হয়।

হাবিব ভাবে, এই কি সেই রাবেয়া ? যে ওকে একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো। যার মুখে সে বহুবার শুনেছে, তোমার কাছে কোনরকম একটা আশ্রয় পেলেই আমার চলে যাবে। আশ্চর্য, অর্থ মানুষকে কত ছোটই না করতে পারে। আজ হাবিবের এই দুর্দিনে কোথায় সে একটু সান্ত্বনা যোগাবে ? না, হাবিবের জ্বালাটাকে বা দিয়ে আরো বেশী আঘাত করছে সে। হাবিব ভাবলো, টাকা না থাকলে পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। না স্ত্রী, না পুত্র। সবাই স্বার্থপর। হাবিব কি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেছে ? ঘরের মধ্যে থেকে রাবেয়া তার কি জানে ? সারাদিন কেমন পাগলের মতো-ইনা ছুটে বেড়ায় হাবিব।

হাবিব ছুটছে। আজ তাকে যেভাবেই হোক, টাকা যোগাতে হবেই। রাবেয়ার মুখে ছুড়ে দিতে হবে টাকা! দেখা যাক্, তখন কি বলে? রাবেয়ার মুখে কি হাসি ফুটে উঠবে না?

রাত হয়ে এলো। তবু কি টাকা যোগাতে পারলো হাবিব? কোন উপায়ই তো মাথায় এলো না। রাবেয়া তো বলেছে, পুরুষ মানুষ তুমি। ইচ্ছা করলেই টাকা যোগাতে পারো। ইচ্ছা কি করেনা নাকি হাবিব? কিন্তু টাকা তো যোগাড় হয় না।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো হাবিব। হঠাৎ দেখল, একটি লোক কাছের দোকান থেকে ফল মূল কিনছে। লোকটার মানি ব্যাগটা টাকায় উঁচু হয়ে আছে। মনে মনে হিসাব করে দেখলো হাবিব, মাস পয়লা এখন। ভদ্রলোক বোধ হয় বেতন পেয়েছে।

একটু পরেই বাস এসে পড়লো। হুড়মুড় করে অগনতি লোক উঠে গেলো বাসে। ভদ্রলোকটি ছুটে এসে উঠলো। হাবিবও উঠলো। হাবিবের মনে এক চিন্তা, টাকা চাই। যে উপায়েই হোক, টাকা ওর চাই-ই।

বাসে সবাই বাদুর ঝোলা ঝুলছে। তিল ধারণের জায়গা নেই। তবু টাসছে কনট্রাক্টর। বাস ছুটেছে। কনট্রাক্টর হাঁকছে, রথখোলা। পয়সা হাতে নিয়ে নিয়ে নামুন।

হাবিব বুঝতেই পারলো না, ওর হাতটা কোন অবসরে ভদ্রলোকের পকেটে চলে গিয়েছে। বাসের ভীড়ে একের গায়ে আর একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কার খেয়াল কে রাখে! মানি ব্যাগ হাতে আসতেই হাবিব নেমে পড়লো। বাসের ভাড়াটাও দিলো না সে। কণ্ট্রাক্টর যখন অন্যদিকে ব্যস্ত—ও তখন সরে পড়লো এক ফাঁকে।

মানি ব্যাগ পেয়ে হাবিব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাসটা ওর চোখের অন্তরাল হয়ে গেছে। উঃ—এ কি করলো হাবিব! খোদা আমি একি করলাম? পকেট মারলাম! পকেট!

হাঁ পকেট মেরেছে হাবিব। রাবিয়া তো বলেছে, পুরুষ মানুষ, ইচ্ছা করলেই টাকা যোগাতে পারো। তাই তো টাকা যোগিয়েছে হাবিব। অনেক অনেক টাকা।

হাবিব বাজারে ছুটে গেলো। পেট ভরে প্রথমে কিছু খেয়ে নিলো। তারপর চাল কিনলো, ডাল কিনলো।

আবার কি মনে হতেই থমকে দাঁড়ালো সে। মনে মনে ভাবলো সে না থাক, আজ আর রান্না করে দরকার নেই। রাবিয়া হয়তো রাঁধতেই পারবে না ক্ষুধায়। তারচেয়ে কিছু পাউরুটি কিনে নি। কাছের 'মতি ভাই রেষ্টুরেণ্ট' থেকে কিছু গোশত কিনেই রাতটা চালিয়ে দেবো।

পাউরুটি আর চালের ব্যাগ নিয়ে একটা রিক্সা করলো হাবিব। পথ যেন আজ ফুরোতে চায় না। রিক্সাওয়ালাকে বার বার তাগিদ দিলো সে, জোরসে চালাও।

রিক্সা এসে থামলো দোর গোড়ায়। ভাড়াটা মিটিয়ে দরজা ধরে নাড়া দিলো হাবিব। দরজা খুলছে না রাবিয়া। রাত এমন কি বেশী হয়েছে। মাত্র দশটা। এই সময় তো রাবেয়া প্রায় জেগে থাকে। রাবিয়া কি রাগ করেছে? অভিমান করেছে ওর সাথে।

হাবিব স্নেহকণ্ঠে ডাকলো, দরজা খুলে দাও, রাবেয়া। আমি যে টাকা নিয়ে এসেছি।

কোন উত্তর পাওয়া গেলো না।

হাবিব আরো জোরে ডাকে, দরজা খুলো রাবেয়া। এই দেখো আমি কত কিছু নিয়ে এসেছি।

রাবিয়া কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হাবিব প্রবলভাবে আঘাত করতে থাকে দরজায়। ছেলেটার ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু রাবেয়ার কি হলো? ওর ঘুম কি এতই গভীর?

হাবিব মরিয়া হয়ে উঠলো। বিপুল শক্তিতে দরজার 'পরে ধাক্কাতে থাকে ও। অনেকক্ষণ পর দরজার ছিটকিনীটা ভেঙ্গে পড়লো। হাবিব ছিটকে পড়লো ঘরে। হাত থেকে ব্যাগটা খসে পড়লো মেঝেতে। ডাল আর চালে মিশে একাকার হয়ে গেলো ঘরের মেঝেটা।

ঘরে ঢুকে হাবিব অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, রাবিয়া!

রাবিয়ার দেহটা ঝুলছে। রাবিয়া গলায় শাড়ী জড়িয়ে ছাদের রেলিঙের সাথে ঝুলে আছে। কেরোসিনের অস্পষ্ট আলোতে ওকে কেমন যেন বীভৎস দেখাচ্ছে! হাবিব কি ভয় পেলো নাকি?

হাবিব আকুল স্বরে কেঁদে উঠলো, রাবিয়া আমি তো চাকুরী পেয়েছি। এই দেখো কত টাকা এনেছি। তুমি কি চেয়ে দেখবে না একবার! হাবিব পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে ছুঁড়ে মারলো রাবিয়ার দিকে। রাবিয়ার চোখ দুটো এত বড় বড় কেন? ও কি সবই দেখছে নাকি!

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

জোহরা

ছৈয়দ সাহেবের বাড়ী গিয়ে আর এক মায়ার ফাঁদে পা দিলাম। তাঁর ছোট্ট মেয়ে—পরীর বাচ্চার মত সুন্দর—পরীর বাচ্চার মতই কখনো প্রজাপতির পেছনে, কখনো হাওয়ায় ওড়া পাতার পেছনে, কখনো ব ভেড়া বকরীর বাচ্চার পেছনে বাড়ীময় দৌড়ে বেড়ায়।

একদিন জোহরাকে কাছে ডাকলাম, সোহাগ করলাম। সেই একদিনের আদরে জোহরা আমার চিরদিনের মা হয়ে রইল।

এর পর যখনই ছৈয়দ বাড়ী গেছি, তখনই দূর হতে দেখেই জোহরা ছুটেছে অন্দরে, তার মাকে পাকড়াও করে আদায় করেছে মোরব্বা, রুটি-বিস্কুট, আণ্ডা ভাজা; চাকরাণীর হাতে দিয়ে সগর্বে আমার কাছে করেছে হাজির। আমি তাকে কাছে ডেকেছি; কোলের কাছে দাঁড়িয়েছে, আমি খেয়েছি, সে খেয়েছে।

দিন চলেছে। জোহরার বয়স বাড়ছে। পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়: জোহরা লক্ষ্য করে নাই, আমিও লক্ষ্য করি নাই। তখনো গেলে সে আগের মতই নাস্তা নিয়ে আসে, কোল ঘেঁসে দাঁড়ায়, আমাকে খাওয়ায়, নিজে খায়। জোহরা নানীর বাড়ী যায়। সেখানে থাকে, পড়াশুনা করে, নামাজ রোজা, মছলা মাছায়েল শিখে।

বছর পাঁচেক পর এক দিন সৈয়দ সাহেব বল্লেন—'জোহরা এসেছে। চলুন, ছালাম নিয়ে দোওয়া করবেন।,

গেলাম।

বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম, জোহরা দৌড়ে এলনা, ডাক পড়ল—'অন্দরে আসুন'। ছৈয়দ সাহেবের শোবার ঘরে গিয়ে বসলাম; তাও জোহরার সাড়া পাওয়া গেলনা। মনে হল—দীর্ঘ পাঁচ বছরের কথা। বাচ্চা মেয়ে নিশ্চয় ভুলে গেছে। এমন সময় ছৈয়দ সাহেবের ডাকে জোহরা এল। কিন্তু একি! এ তো সে-জোহরা নয়! এ-যে সাড়ী, ব্লাউজ, ওড়না পরা পরিপূর্ণ নারী—যেন বধূ হয়ে হয়ে কারো ঘরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে। সামনে বসে আমার কদমবুছি করল, মাথায় হাত দিয়ে দোওয়া করতে হাত উঠল না। সে ছালাম করে কিছুক্ষণ চুপ দাঁড়িয়ে রইল, তার বাপ চুপ বসে রইলেন, আমিও নিশ্চুপ। তারপর আস্তে সে সরে গেল।

হায়! কাবলীওয়ালা, এ-দুনিয়ায় তুমিও নিঃসঙ্গ নও।

এরপর মা জোহরার সঙ্গে দেখা হয়েছে; সে সন্তান গরীয়সী জননী। বাচ্চা কোলে দিয়ে সে অকুণ্ঠভাবে কথা বলেছে, আমিও অকুণ্ঠভাবে কথা বলেছি। তার কয়েক বছর পর আবার তার সঙ্গে দেখা। এবার হায়! সে বিধবা!! তবু তার সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ের কল-কোলাহল তাকে আনন্দের জোছনায় ঘিরে রেখেছে, বিষাদের আঁধার কাছে ঘেসতে দেয় নাই। বাচ্চাদের ডেকেছি। তাদের মায়ের মত তারাও আমার কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে আমার কানের সাথে তাদের মাথা ঘসেছে; অবাক হয়ে হয়তো ভেবেছে, তাদের মা যে স্নেহের মায়ায় তাদেরে অহরহ ঢেকে রাখেন আজ অকাতরে সেই স্নেহ দিচ্ছেন এক অজানা বুড়োকে! লোকটা কে?

মা ভাগ্য

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি: গণকঠাকুর আমার হাত দেখে খণা খণা ডাক ভেঙ্গে আমার ভবিষ্যতের সুনিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে এ-যাবত যত মিছা কথা বলেছেন তার কোনটিই এত বড় মিছা ছিল না যে আমার মায়ের ঘরে শূন্য। এরপর মা আমি জীবনে অনেক পেয়েছি; হারিয়েছিও অনেক। এক হিসাবে ভালই হয়েছে; নইলে এত মা একত্র থাকলে হয় তো কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেত।

'সওগাত' সম্পাদক নাসির উদ্দীন সাহেবের বাড়ী গিয়ে পেলাম মা নুরুকে। আট বছরের মেয়ে—অত্যন্ত সুশ্রী, অত্যন্ত চঞ্চল, অত্যন্ত আদর-কাতর। দুদিনের স্নেহে আপন হয়ে গেল। কিন্তু দিন তো বসে থাকে না; সে চলে আর চলে। মানুষের দিনও চল্ল। হঠাৎ একদিন

শুনি, নুরু 'বেগমের' সম্পাদিকা হয়ে বসেছে। ভাবলাম, বাপরে! নুরু বিবি তবে এখন মহিলা! সভায় বসা অবস্থায় হঠাৎ 'বেগম' সম্পাদিকা এসে হাজির হলে আর দশজনের সাথে তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই হবে। একদিন ভয়ে ভয়ে গেলাম। নুরু এল। দেখলাম, নুরুর ভিতরের আমার সে মা বেঁচে আছে, মরে নাই।

ঢাকা জিলার বালিয়াগ্রাম। সেই গ্রামের ভাই লাল মিঞা সাহেবের মেয়ে নুরু মা হয়ে বুকে আসন জুড়ে বসল। মা হারা মেয়ে, একটুখানি স্নেহের পরশে মোমের মত গলে যায়, মায়ের মত মায়ার ডোরে বেঁধে রাখতে চায়। অনাথা মেয়েটার মনের জোর, যুক্তির জোর, ভাষার জোর দেখে অবাক হতে হয়। তার বাপকে দেখে সব লোকে ডরায়, বাপ এই ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে ডরায়। ইদানীং মাতাজীর আঙ্গিনায়ই নবাগতরা এসে ভীড় জমিয়েছে, আমি সরে এসেছি। নইলে ভাই সাহেবেরা লাঠি হাতে তাড়া করে আসতো। বলতো, "তা হলে' আমাদের ঘাড়ে করে বেড়াও"। এ ঘাড়ে করে বেড়ানোর জন্য কিন্তু পয়সা কড়ির বরাদ্দ নাই! পাল্কীওয়ালাকে পয়সা দিবে, রিকশাওয়ালাকে পয়সা দিবে, শুধু আমার দাম তাদের কাছে এত কম যে আমি তাদের ছোহবত হাছিল করে ধন্য হলাম বলে কিছু নজরানা দিয়ে এলে যেন তারা খুশী হয়। আত্মীয়া কন্যা—ইনিও নুরু ওরফে নুরুন্নাহার: কলকাতা কলেজে পড়তে চলেছেন—একজন বয়স্ক বাচ্চা না হলে চলে না; অতএব একটা মাতৃত্বের ফাঁস গলায় দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। একবার ভাবলাম—একটা দিন পেটে ধরলেন না, পেশাব পায়খানা সাফ করা দূর থাক, তার গন্ধটা পর্যন্ত নাকে এল না, আবদার উপদ্রব কিছুই সইলেন না—অথচ মা হয়ে বসলেন। ভারি তো মজা। আবার ভাবলাম, 'যাক তবু তো মা বলে ডাকা চলবে'! একদিন শুনলাম—চাটগাঁয় মাতাজীর নাম পড়ে গেছে: প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবি উঠেছে, কাগজে তাঁর লেখা কবিতা ছাপা হয়েছে, সমঝদার মহলে তাঁর ছোট গল্প প্রশংসা পেয়েছে। এরই মধ্যে বেরিয়ে গেল তাঁর 'অগ্নিকমল'।

কোল অধিকার করে বসেছে 'জঙ্গী' সিপাই, আঙিনায় জমে উঠেছে—অগ্নিফসল: ভাবলাম, একটু সরে থাকাই ভাল।

ইস্তাম্বুলের খলিফা আবদুল হামিদের প্রাসাদে আন্ত-পার্লামেন্টের সভা। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সবাই মিলে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের সুবিধা দেখতে লেগে আছেন। পরিচয় হল এঁদেরই একটি মেয়ের সাথে: এখনো তরুণী, অথচ ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা: পড়ান ল্যাটীন আর স্পেনীয় ভাষা—নাম ডাক্তার নিস্তেরিন দিরবানা—স্বামী সাইপ্রাস দ্বীপে কাজ করেন—আগে এঁদের বাড়ী সেখানেই ছিল। সুন্দরী, অমায়িকা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দরাজ দিল: দুই দিনের আলাপে মা হয়ে গেলেন। মাতাজী চিঠিপত্রে জানান আমাকে ছালাম, আর ডাকবার সময় সোজা জিজ্ঞাসা করে বসেন—'ইব্রাহীম কেমন আছ'? বাপ বিলাতে ডিপ্লোমেট ছিলেন, অবসর নিয়ে বাড়ী এসেছিলেন। মারা গেলেন। যেন আমি তার কত কালের আপন, এমনি ভাবে কেঁদে কেঁদে লিখেছে: "আমার চোখের পানি কিছুতেই শুকাতে পারছি না; বাবা নাই, এ-কথা মনকে কিছুতেই বুঝাতে পারছি না; পড়ব বলে বই খুলে নিয়ে জানালার ধারে বসি: খোলা বই খোলাই পড়ে থাকে, চোখের দৃষ্টি জানালার ফাঁক দিয়ে গিয়ে আকাশের অসীমে হারিয়ে যায়। চোখে ঘুম নাই; চিত্তে আরাম নাই, দেহে শক্তি নাই। কেবল—কেবল আমাদের রছুলুল্লা'র মত মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে মনে একটু শান্তি পাই।"

সৎমা

অবশেষে ঘরে এলাম একটি মা। তবে সৎমা, নাম খালেদা, সৎমায়ের সমস্ত উপদ্রবই তাঁর আছে। কেবলই গোস্বা, কেবলই সন্দেহ, বুঝি বা আমি তাকে আপন মায়ের মত ষোল আনা বিশ্বাস করিনা; বুঝি বা আগের মত দেউড়ীতে পা দিয়েই তাকে আর ডাকিনা; বুঝি বা খেতে বসে চীতলের পেটীটা তার বাসনে তুলে দিতে তেমন আর জেদ করি না ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভেবে ছিলাম এত কাছে পাওয়া মা, এটি অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবে; কিন্তু না! এখানেও ভাগী এসে জুটেছে; পাকে প্রকারে আমাকে বুঝাতে একটুও বাকী রাখে নাই যে ও মাতা সম্পত্তির দিকে আমার নজর আর না থাকাই ভাল।

বিনা খেসারতে আমাদের কোন কোন রাজনৈতিক দল জমিদারী, তালুকদারী বাজেয়াফ্‌ত করবে বলে শুধু একটু হুমকী দেয়, আর তাই নিয়ে দেশময় কত সভা, কত শালিস; কিন্তু আমার সম্পত্তি যে একের পর এক এমন ভাবে বিনা খেসারতে, বিনা নোটীশে বাজেয়াফত হয়ে চলেছে, এর জন্য দেশের কোথাও আন্দোলনের ক্ষীণ-তরঙ্গ পর্যন্ত উঠতে দেখলাম না। কারো কাছে নালিশ করতে গেলে সে চোখের কোণে হাসে; রবি বাবুর কবিতা শুনলাম:

> ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ-তরী,
> আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি!'

ঈশানে বিষাণ

মনের পরিপূর্ণ আনন্দে স্কুলে মাষ্টারী করে চল্লাম, আর গুনতে লাগলাম কবে না ফাইনাল দিয়ে আদালতে গিয়ে হাজির হব। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ ঈশানে বিষান বেজে উঠল। গত কয়েক শ' বছর থেকে ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিগুলি নানা ছলে মুছলিম রাজ্যগুলি একে একে গ্রাস করে ফেলছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মুছলমানদের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হল। তারা ভাবলো, এই যুদ্ধের অজুহাতে তুর্ক সাম্রাজ্যকে আবার ঘায়েল করা হবে। টের পেয়ে ইংরেজদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন—'এ-যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক; তুর্ক সাম্রাজ্যের গায় আঁচড় টুকুও কাটা হবে না। মুছলমানেরা এ আশ্বাসে বিশ্বাস করে জান-মাল দিয়ে ইংরেজের যুদ্ধে সাহায্য করতে লাগল। এদিকে ইংরেজ হিন্দু আন্দোলনকারীদেরে বল্ল—যুদ্ধের পর ভারতের শাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হবে। মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ আজাদীর আশায় হিন্দু-মুছলমান সকলেই যুদ্ধ কাজে আপ্রাণ সহযোগিতা করতে শুরু করল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ইংরেজরা জয়লাভ করল। তখন দেখা গেল ইংরেজের আর এক মূর্ত্তি।

খিলাফত অসহযোগ

বোঝা গেল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোন মতলবই ইংরেজের নাই ও সংস্কারের নামে ফাঁকি ফুঁকি দিয়েই সে ভারতবাসীকে বিদায় করতে চায়। এ দিকে দেখা গেল লড়াই খতম হওয়ার আগেই তুর্কসাম্রাজ্য ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী ভাগাভাগি করে নিয়েছে; মক্ক'-মদীনা সহ জজীরাতুল আরব তুর্কের হাত হতে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হিন্দু-মুছলমান সকলে মিলে ঘোষণা করল, আমরা ইংরেজের এ-বেইমানী বরদাশত্ করব না। মওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ভারতের মুছলমানেরা খিলাফত আন্দোলন শুরু করে দিল। তারা বল্ল—তুর্ক সুলতানকে খলিফা রাখতেই হবে; খলিফা রাখতে হলে তাঁর হাতে চাই মক্কা-মদীনার হেফাজত; অতএব, জজীরাতুল আরবকে শরীফ হোছেনের নামে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়া চলবেনা—চলবেনা। এ দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুছলমান উভয়ে মিলে আজাদী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ল। ইংরেজ এ আন্দোলন দমনের জন্য জারী করল রাউলেট আইন। রাউলেট আইনের বিরুদ্ধে দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীব্র অসন্তোষ ঢেউ খেলে চল্ল। পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালিওয়ানওয়ালা বাগে হিন্দু-মুছলমান, শিখ মিলে প্রতিবাদ সভা করছিল। সেনাপতি ডায়ার তার সৈন্য দিয়ে সেই নিরস্ত্র জনগণের উপর অজস্র গুলী বর্ষণ করল, মৃত্যুমুখী মুছলমান হিন্দুর বুকে ঢলে পড়লো; হিন্দু শিখের বুকে ঢলে পড়ল; শিখ মুছলমানের বুকে ঢলে পড়ল। হৃদয়ের সদ্য নিঃসৃত রক্তের অক্ষরে সেদিন হিন্দু মুছলমান শিখের ঐক্যের চুক্তিনামা লিখিত হল। মহাত্মা গান্ধী আর মওলানা আবুল কালাম আজাদ পরামর্শ করে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করলেন। স্কুল-কলেজের ছেলেদের ডেকে বলা হল: ইংরেজের ও গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে আজাদীর জেহাদে ঝাপিয়ে পড়। স্কুল উজাড় করে, কলেজ উজাড় করে, বিশ্ববিদ্যালয় উজাড় করে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। রবি বাবু এই নৃশংস জুলুমের প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। যে জলন্ত ভাষায় পত্র লিখে কবি তাঁর উপাধি ত্যাগ করেছিলেন, অমন সুন্দর, অমন অগ্নিগর্ভ ইংরেজী আর একটি মাত্র পত্রে পড়েছিলাম—সে মওলানা মুহম্মদ আলীর সম্পাদিত কমরেডে প্রকাশিত তাঁর লেখা The Choice of the Turks. রবি বাবু উপাধি ত্যাগ করলেন বটে; কিন্তু তিনি ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন। গান্ধীজী নিজে শান্তি নিকেতনে গিয়ে রবি বাবুকে তাঁর মতে নিতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু রবি বাবু অটল রইলেন। কবির সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের তীব্র প্রতিবাদ করলেন আরো কয়েকজন দেশ বরেণ্য ব্যক্তি—অবসর প্রাপ্ত হাই কোর্টের জজ মিষ্টার হাছান ইমাম, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, মৌলভী এ কে ফজলুল হক। কিন্তু গঙ্গার উত্তুঙ্গ তরঙ্গের সম্মুখে যেমন মত্ত মাতঙ্গ ভেসে গিয়েছিল, এঁদের প্রতিবাদও তেমনি দেশের জনগণের মতবাদের সম্মুখে অনায়াসে ভেসে গেল।

করটীয়া জাতীয় স্কুল

দেশে শীগগিরই রব উঠল গোলামী শিক্ষা আমরা চাইনা বটে, কিন্তু দেশী শিক্ষা—আসল নিজস্ব শিক্ষা চাই। এই চাহিদা মিটানোর জন্য কলকাতায় স্থাপিত হল হল জাতীয় স্কুল। আমরা লিখে করটীয় হাই স্কুলের মনজুরী কেটে নিয়ে স্কুলটিকে জাতীয় স্কুলে পরিবর্তন করে নিলাম। সমস্ত ময়মনসিংহ জিলায় করটীয়া হয়ে উঠল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তম কেন্দ্র। আমাদের জাতীয় স্কুলগুলির প্রতিনিধিদের মাঝে মাঝে কলকাতায় পরামর্শ সভা হত—কখনো সি, আর, দাশের বাড়ীতে, কখনো বা তেওড়ার জমিদার কিরণ শঙ্কর রায়ের বাড়ীতে। একদিনের কথা সহজে ভুলবার নয়।

কিরণ শঙ্কর রায়ের বাড়ী সভা। ফটকে গিয়ে দেখি আর আর দিন বন্দুকধারী পাহারা থাকে। আজ তারা কেউ নাই; আছে বাড়ীর ছেলে পেলে—ওরাই স্বদেশী

স্কুলের শিক্ষকদের অভ্যর্থনা করছে। চির অবজ্ঞাত বাংলার মাষ্টার—তাদের জন্য এই সৌজন্যময় ব্যবস্থা দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। ভিতরে গেলাম। ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে কিরণ শঙ্কর বাবু নিজে অভ্যর্থনা করলেন। সভা বসল, আলোচনা চল্ল। কিরণ শঙ্কর বাবু নিজে আমাদের সঙ্গে মাদুরে বসে আলোচনায় যোগ দিলেন। তখন সম্ভবতঃ ভাদ্দর মাস। দুপুরটায় বেশ গরম পড়ল। শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে জল চেয়ে খেলেন—এ জল এনে দিল বাড়ীর চাকরেরা নয়, বাড়ীর ছেলেরা। সন্ধ্যা লাগে লাগে সময় আমি পানি চাইলাম। কিরণ বাবু আমার কাছে মুখ বাড়িয়ে বল্লেন: আচ্ছা সারা দুপুর এই গরম গেল। তখন আপনি জল চাইলেন না; এখন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে এখন জল চাচ্ছেন যে? আমি বল্লাম এটা "রমজানের মাস তো, আমি রোজা রেখেছি"। কিরণবাবু তড়াক করে উঠে গেলেন, মিনিট পাঁচেক পর নিজে এসে আমাকে ডেকে নিলেন, পাশের এক কামরায় আমাকে বসিয়ে বল্লেন—'একটু মুখে দিন'। দেখি, টেবিল ভরা চার পাঁচ রকমের মিষ্টি, পাঁচ ছয় রকমের ফল, এর উপর লুচি আর ক্ষীর। আমি খেতে বসলাম, তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেক বলে কয়ে তাঁকে সভায় যেতে রাজী করলাম। তখন তিনি বাড়ীর একটি ছেলেকে আমার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে তবে গেলেন।

সে দিনের সভায় দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ অনেক গুরু গম্ভীর বিষয় নিশ্চয় আলোচিত হয়েছিল। আজ তার সব ভুলে গেছি, মনে পড়ছে শুধু সুদুর্লভ সৌজন্যের সেই সুন্দর স্নিগ্ধ চিত্রটি।

তুলার আগমন

এই সময় আমার বড় ছেলে তুলার জন্ম হল। খবর শুনে করটীয়া হতে দেখতে গেলাম—বড়বাশালীয়ায় সকাল বেলা। ছেলে দেখার জন্য অন্দরে ডাক পড়ল, গেলাম। বড় ঘরের মেঝে, তারই এক পাশে বিছানা। বিছানার নিচে তোষক নয়, খড়। এক পাশে আগুনের কুণ্ড। তার এদিকে আধা পোড়া লাকড়ী। সেই বিছানার মাঝখানে বসে তুলার মা; কোলে তাঁর ছেলে। ক্রমাগত পনর দিন জ্বর আর পেটের অসুখের পর ছেলে হয়েছে, তাও আবার সাড়ে আট মাসে। কাজেই ছেলের গায় চামড়া ঢাকা কয়েকটি হাড় ছাড়া আর কিছুই নাই। ছেলের মায়ের শরীরের অবস্থাও ঠিক তাই-ই। হঠাৎ মনে হল যেন শ্মশানের বুকে আসন করে বসে কোন সন্ন্যাসিনী কারো মত সন্তান কোলে নিয়ে তার প্রাণ সঞ্চারের জন্য নীরবে তপস্যা করছেন। চেয়ে দেখি তুলার মায়ের ঠোঁটে মৃদু হাসি, তাঁর সমস্ত বদন মণ্ডলের উপর ফুটে আছে এক গভীর তৃপ্তির মৌন শান্ত মহিমা। যেন তার সমস্ত নিবেদিত সত্তার মৌন ভাষায় আমাকে বলছেন, 'এই নেও, তোমারই জন্য এনেছি।' এর পর কত দেশ-বিদেশে গিয়েছি; কত জাতির কত প্রখ্যাতনামা সুন্দরী সামনে পড়েছে, কিন্তু ও হাসির তুলনা ও মহিমার দীপ্তি দুনিয়ার কোন খানেই আর দেখি নাই। আমি অলক্ষ্যে মস্তক নত করে মহিমময়ী জননীকে তাঁর নবীন জীবনে নীরবে অভিনন্দন জানালাম।

এর কয়েক মাস পরের কথা। বড়বাশালিয়া গিয়েছি। তুলার মা বল্লেন—'তুলার পেটের অসুখ, এই জারের দিন; প্রায় সারা রাতই জাগতে হয়।' আমি পরম গর্ব ও তৃপ্তির সঙ্গে বল্লাম: আমি যে কয়দিন আছি এ-কয়টা দিন ওর ভার আমার উপর দিয়ে তুমি রাতে ঘুমাও'! রাতে কয়বার উঠলাম মনে নাই: হয়তো আট দশ বার। প্রত্যেক বারই তেল কাপড় ছাপ করতে হয়, ষ্টোভ ধরিয়ে দুধ গরম করতে হয়। তারপর দুধ খাওয়ান হয়ে গেলে ব্রাস আর গরম পানি দিয়ে চুশনী ছাফ করতে হয়। নইলে ভিতরে দুধ জমে যায়। ভোরে বোধ হল যেন শরীরটা পচে গেছে। ঘুমের অভাবে চোখ জলছে আর জলছে। হঠাৎ মনে হল—'আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন তবে ভোরে উঠে প্রথমই যেতাম তাঁরই ঘরে; তারপর তাঁর সামনে বসে কদম বুচি করে বলতাম: 'মা, আজ তোমাকে চিনলাম'।

চাঁদ মিঞা

জনাব চাঁদ মিঞা সাহেব যখন হাওয়া পরিবর্তনের জন্য তাঁর রাঁচীর বাড়ীতে সেই সময় আমরা করটীয়া হাই স্কুল ন্যাশন্যাল করলাম। তিনি ফিরে এসে খিলাফত আর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন। নিজের বিপুল জমিদারীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বে পরোয়া হয়ে সমস্ত বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম অকুতোভয়ে এগিয়ে এলেন। দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

আন্দোলনের বেগ ক্রমে বেড়ে চল্ল। সমস্ত ভারতে কত লোক যে এ অভিযানে শরীক হলেন, তার লেখা জোখা নাই। তাঁদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটেছিল, তাঁদেরই কয়েক জনের কথা এখানে বলব।

সি-আর দাশ

সেকালে সি-আর দাশের মত মস্ত বাবু অকাতর দাতা ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যারিষ্টার সমস্ত বাংলা দেশে আর একটিও ছিলনা, সমস্ত ভারতে খুঁজে পাওয়াও কঠিন

ছিল। তিনি বারীন ঘোষের বোমার মামলায় আগেই বিরাট নাম করেছিলেন—কেবল ব্যারিষ্টার হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও, তাঁর গাড়ী ঘোড়া বিক্রি করে নিজের খরচ চালিয়ে ছিলেন। তবু মামলা পরিচালন ছাড়েন নাই। মামলায় বারীন ঘোষকে তিনি খালাস করতে পারেন নাই; কিন্তু কলকাতা হাই কোর্টে তিনি আপীল পরিচালন করতে গিয়ে আইনের যেসব তর্ক তুলেছিলেন, তাতে জজেরা হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত কবিতার বই 'সাগর-সঙ্গীত' যখন বের হল তখন বাংলা সাহিত্যের মজলিশে একটা বিপুল বিস্ময়ের হাওয়া বয়ে গেল। তাঁরা ভাবলেন—তাইতো! দিনরাত আইনের শুষ্ক তর্কে যাঁকে মেতে থাকতে হয় ঐ অবুঝ সাগরের কি জানি কি ক্রন্দন তাঁরো চিত্তের রসে সঞ্জীবিত হয়ে ছন্দে রূপলাভ করেছে। আর অমন সুন্দর ছাপা, অমন সুন্দর বাঁধাই, অমন সুন্দর কাগজ—পাতায় পাতায় সমুদ্রের বিচিত্র চিত্র—অমন এর আগে আমি কখনো দেখি নাই। এরপর যখন তিনি মাসিকপত্র 'নারায়ণ' সম্পাদন শুরু করলেন তখন সবাই বুঝল লোকটা না খেয়ে না দেয়ে বোমার মামলার আসামীর সমর্থন করলেও তাঁর প্রাণের আসল সুর মহেশ্বরের প্রলয়ঙ্করী সুর নয়, সে গৌরাঙ্গের প্রেমের সুর। দেশের লক্ষীছাড়া দলের যত লক্ষী বস্ত ছেলে—যারা একদিন দেশ সেবার মহান ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে পিতার পক্ষ পুটের আশ্রয়কে উপেক্ষা করে দুনিয়ার দরাজ পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তারপর যাদের অনাবৃত মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে কত ঝড়, কত বৃষ্টি, কত শিলাপাত, তারা কলকাতা গিয়ে যে লোকটির কাছে সবার আগে সদরদ আশ্রয় পেয়েছে, তিনি ছিলেন এই মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পিতা কি ভবিষ্যৎ জানতেন, তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ-শিশু বড় হয়ে তার দেশের আর্ত আহত, দুস্থজনের চিত্ত-রঞ্জন করবে, তার চিত্তরঞ্জন নামই সত্যি মানায়?

সি-আর দাশ যেদিন ব্যারিষ্টারী ছেড়ে অসহযোগে আন্দোলনে নেমে এলেন সেদিন বাংলা দেশে তুমুল আবেগের তুফান বয়ে গেল। লোকে শুনল প্যারিসে ছাড়া যাঁর কাপড় ধোওয়া হতনা, বছরে ছয় সাত লক্ষ টাকা যাঁর রোজগার, সেই চিত্তরঞ্জন মোটর গাড়ী ফেলে, হ্যাট কোট ছেড়ে ধুতি চাদর পরে পায়ে হেঁটে অসহযোগের নিশান হাতে পথে চলেছেন। লোকে পাগল হয়ে তাঁর পেছনে ছুটল।

আমরা করটীয়ায় সি-আর দাশকে দাওয়াত করলাম। তিনি এলেন। ময়মনসিংহ হয়ে আসতে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ভগান তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারী করে দিল। এখন উপায়? করটীয়ার খেলার মাঠে কমসেকম ৬০ হাজার লোক এসে জমা হল—সি আর দাশকে দেখতে, তাঁকে নিয়ে সভা করতে। দাশ বল্লেন আমি এ লোকদের ফেরত দিতে পারবনা; আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভায় যাব'। চাঁদমিঞা সাহেব বল্লেন—'না, তা হয়না; আমার মহান অতিথিকে আমি নিজ হাতে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারবনা। একদিন তো যেতেই হবে এদের অতিথি-শালায়, চলুন, সেদিন এক সঙ্গেই দুজন যাব।'

সভা হল। সভানেত্রী হলেন দাশের সহধর্মিনী। দাশের সঙ্গে ময়মনসিংহের বিখ্যাত গায়ক হরেন ঘোষ এসে-ছিলেন। তিনি গাইলেন—

স্বদেশ, স্বদেশ করিস কারে?
এ-দেশ তোদের নয়!

পূর্ণিমার আকাশের ডাকে যেমন সাগর বুক বিপুল কলরোলে উতলা হয়ে উঠে, সে দিনের সে জন সমুদ্রের দৃশ্যে হরেন বাবুর বিরাট বক্ষ বুঝি তেমনি উতলা হয়ে উঠেছিল। দেহের সমস্ত শক্তি, হৃদয়ের সমস্ত দরদ নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গেয়ে চল্লেন। সভার প্রত্যেকটি লোক উৎকর্ণ হয়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনল। আমাদের স্কুলের আরবী শিক্ষক মৌলভী আহছান উল্লা একটি গান রচনা করেছিলেন—খিলাফতের সভা উপলক্ষে। ফারসীর মৌলভী ছৈয়দ আমজাদ আলী তাঁর সে অনুপম কণ্ঠে পাগল হয়ে গাইলেন—

তোমহারা ছুরুজ ডুবু ডুবু হায়
তভী তোমহারী খবর নাহি হায়;
তখত্ তোমহার উলট রহী হায়,
তভী তোমহারী খবর নাহি হায়;

শ্রোতারা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাইতো। আমাদের সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আমাদের সিংহাসন উল্টে যাচ্ছে আর আমরা এখনো বেখবর? উপায়? এখন উপায় কি? কে আমাদের নিয়ে চলবে মুক্তির পথে?

তখন হরেনবাবু আবার গাইলেন:

একলা চল, একলা চল,
একলা চলরে...

নৌকা ডুবা মানুষ যেন ধরবার একটা কিছু পেল। শ্রোতারা আপন মনে বলতে লাগল: তাই একলাই চলতে হবে।

এরপর অনেকবার দেশবন্ধু দাশের সভায় গিয়েছি; অনেকবার তাঁর কাছে বসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে একটা পরম হৃদয়বান মানুষের সান্নিধ্যলাভ করেছি। তিনি যখন যে কাজে যেতেন, নিজকে ষোল আনা উজাড় করে তার মধ্যে ঢেলে দিতেন। যখন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে পথে দাঁড়ালেন, তখন তিনি সত্যিই পথে দাঁড়ালেন। তাঁর একজন ভক্ত একদিন

কলকাতা মোটরে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলেন, দাশ এক রাস্তার মোড়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গাড়ী থামিয়ে কাছে গেলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন দাশ বাড়ী যাবেন; কিন্তু তাঁর কাছে পয়সা নাই; একটা ঘোড়ার গাড়ীও ভাড়া করতে পারেন না। রিকশায় উঠতে জানেন না; ট্রামে উঠতে চান; কিন্তু কোন্ ট্রামে উঠতে হবে তা জানেন না। কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারেন না যদি কেউ চিনে ফেলে, দয়া করতে আসে!

অসহযোগের আগের কথা। কন্যাদায় গ্রস্থ ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ীতে হাজির। কিছু চাই। তিনি বলেছেন—'আচ্ছা, একটু দেরী করুন। এক-দুই-তিন সাত দিন যায়। ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; গিয়ে দাশ সাহেবকে বল্লেন। তিনি বল্লেন—'আচ্ছা, আজ যা পাই, আপনাকেই দেবো। ব্রাহ্মন বিশেষ ভরসা পেলেন না; গুম হয়ে সারা দিন বসে রইলেন। বিকালে তিনি ফিরে এসে ব্রাহ্মণকে বল্লেম—

'এই নিন।'

'অ্যাঁ, বাইশ শ' টাকা!

'হ্যাঁ, এই আজ পেয়েছি।'

'কিন্তু এত টাকা কেন?'

'আজ যা পাব সবই আপনাকে দিব বলেছি তো?'

'এর অর্ধেক টাকা হলেই যে আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে।'

'বেশ, বাকী অর্ধেক টাকা দিয়ে কিছু জমিজমা রেখে দিবেন। জামাই এলে খাওয়াতে হবে তো?'

সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। গেলাম। মনে হল, দেশবন্ধু ভয়ানক ক্লান্ত। আরো মনে হল, উল্কা যেমন নিজের আগুনে নিজে জলে যায়, দেশবন্ধুর তাই হচ্ছে। দেহ তার প্রাণের আগুন সামলাতে পাচ্ছেনা; অলক্ষ্যে পুড়ে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে কথাই তিনি সভায় বলছিলেন, তাঁর সমস্ত প্রাণ, সমস্ত দরদ দিয়ে বলছিলেন। "Servant" পত্রিকার সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁকে একটা প্রস্তাব উপলক্ষে আক্রমন করলেন। বল্লেন—'চিত্তরঞ্জনের কথার ওকালতী প্যাঁচ এখানে খাটবেনা।' ওকালতী প্যাঁচের কথায় তিনি অত্যন্ত আহত হলেন। বল্লেন—"ঐ তো আমার কপাল! আমি যখন ওকালতী করতাম তখন বন্ধুরা বলত, তোমার ওকালতী প্যাঁচ নাই। এখন ওকালতী ছেড়ে দিয়েছি, আর এতদিনে নাকি আমি ওকালতী প্যাঁচ দিতে শিখেছি!'

* * *

কলেজের ছাত্র। পত্র লিখেছে, 'স্যার, পাঁচটা টাকা হলে আমি একটা বই কিনতে পারি।' দাশ সাহেব মহরীকে বল্লেন—'দশটি টাকা পাঠিয়ে দাও।' মহরী পত্র দেখিয়ে বল্ল—'চেয়েছে কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকা।' তিনি বল্লেন—'আহা! পাঁচ টাকা চেয়েছে বলেই পাঁচ টাকা দেওয়া যায়? তোমরা লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছ না কি?'

দাশের অসুখ। তখন তিনি স্বরাজ দলের অধিনায়ক। বাংলার মন্ত্রীসভাকে ভাঙ্গতে হবে। ভাঙ্গতেই হবে। তিনি ভরা রিভলভার নিয়ে বিছানায় বসে আছেন। কর্মীদের বলছেন, কালের সভায় হয় মন্ত্রীদল যাবে, না হয় আমি যাব। আমাকে যদি রাখতে চাও, তবে সেই ভাবে কাজ কর। একজন বল্ল—'স্যার, ফজলুল হক সাহেবকে দলে আনতে পারলেই হয়ে যায়। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিনা। তিনি বল্লেন—চল, আমি যাব, রাত বারটা? কুছপরোয়া নাই। এই-ই ভাল সময়।' অতিকষ্টে গাড়ীতে উঠে ফজলুল হক সাহেবের বাড়ীর ফটকে গিয়ে খবর দিলেন। শোনা মাত্র ফজলুল হক সাহেব নেমে এলেন। দাশ বল্লেন—

'ফজলু, আমি তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইতে এসেছি।'

'আহা! তা কি যে বলেন আপনি!'

'আমি সত্যি বলছি, ফজলু। আগামী কাল এ মন্ত্রীসভা না ভাঙ্গলে আমি মরব। দেখছনা, ভরা রিভলভার বুকের কাছে রেখে দিয়েছি?'

'কিন্তু কি করতে হবে আমাকে তাই বলুন।'

'তুমি আমার সাথে এস, কালের দিনটা আমি বাঁচি।'

'বেশ, আমি আসছি।'

'আর শোন। আমি বেশী দিন নাই। যখন যাই, আমাকে বিজয় নিয়ে যেতে দিয়ো, পরাজয়ের কালিমা আমার ললাটে মেখে তোমরা আমায় বিদায় করোনা।'

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুছলমানদের সঙ্গত দাবী পুরনের জন্য তিনি যে মহান চেষ্টা করেছিলেন; আধুনিক হিন্দু ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নাই। দেশবন্ধু দাশের মৃত্যু সংবাদবাহী কাগজ সামনে নিয়ে বসে যে কান্না কেঁদেছিলাম, আর কারো জন্য ততখানি কেঁদেছি বলে মনে পড়েনা।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে কাজী নজরুল ইসলাম কেঁদে আকুল হলেন। তাঁর স্মরণে তিনি লিখলেন 'চিত্ত নামা।' আর কোন মানুষের জন্য বিদ্রোহী কবি এমন ভাষায় লিখেছেন বলে দেখি নাই। রবি বাবু খবর পেয়ে লিখলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

মৌলানা মুহম্মদ আলী

খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অনেক বছর আগের কথা। বিলাত থেকে ফিরে কিছুদিন মিঃ মহম্মদ আলী গাইকোয়াড়ের ওখানে কাজ করেছিলেন। তার পর কলকাতা এসে 'কমরেড' নামে এক ইংরেজী সাপ্তাহিক বের করেন। তখন তাঁর যে চেহারা দেখেছিলাম, তা আজো মনে পড়ে। রামপুরের রোহীলা পাঠান, অকস্ফোর্ডের অনার্স গ্যাজুয়েট, সঙ্গীন মার্কা যুদ্ধংদেহী গোঁফ, রক্তলাল রুমীটুপী, নিটোল স্বাস্থ্য, যৌবন দীপ্ত মুখচ্ছবি, নবতুর্কদের তরুন সেনাপতি আনোয়ার বে, শুকরী বে, শওকাত বে, এঁদের সঙ্গে বসিয়ে দিলে সম্পুর্ণ মানিয়ে যেতে পারত।

কালে সমস্ত ভারতে 'কমরেডের' মত উঁচু দরের ইংরেজীওয়ালা কাগজ আর নাকি একটিও ছিল না। অতি অল্পকাল মধ্যে কমরেড অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে। ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লী সরে যাওয়ার সঙ্গে কমরেডও দিল্লী চলে যায়।

আলীগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার কাজে মুহম্মদ আলীর দান অপরিমেয়। ভারতময় ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুল্লেন; কিন্তু টাকা যখন তোলা হয়ে গেল, তখন গবর্ণমেণ্ট এমন কতকগুলি শর্ত দিয়ে বসল যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার উপর গবর্ণমেণ্টের অন্যায় হস্তক্ষেপের দুয়ার অবারিত থাকে। মুহম্মদ আলী এ শর্ত গ্রহণে রাজী হলেন না। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, তা হলে এ চাঁদার টাকা কি হবে? মুহম্মদ আলী বল্লেন, আলীগড় কলেজের প্রাঙ্গনে একটা কবর কাট, তারই মধ্যে চাঁদার টাকা রেখে কবর বেঁধে দাও, তারপর কবরের গায় লিখে রাখ :—

'Here lith an ideal done to death.' (একটি আদর্শকে খুন করে এখানে কবর দিয়ে রাখা হয়েছে।) যে সব শর্তকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা অপমানজনক মনে করে প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই সব শর্তে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য অবলীলাক্রমে রাজী হয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে ফেল্লেন, অবশেষে অনেক কথা কাটাকাটির পর আলীগড়ের উদ্যোক্তারাও সরকারের শর্ত স্বীকার করে নিল।

খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর তাঁর ও তাঁর ভাই মওলানা শওকত আলীর অনেকবার জেল হয়। জেল হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেকবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কোন বারই আলী ভাইয়েরা কোন অপমানজনক শর্তে রাজী হয়ে মুক্তি খরিদ করেন নাই। বহু বৎসর পর্যন্ত এঁরা দুই ভাই গান্ধীজীর ডান হাত বাঁ হাত ছিলেন। কংগ্রেসী হিন্দুদের কারো কারো ব্যবহারে অবশেষে উভয়েরই মন সন্দেহে দুলে ওঠে; উভয়েই পরে লীগের দিকে ঝুকে পড়েন। খিলাফত আন্দোলনকালে তাঁর এত বড় প্রিয় যে বিশ্ববিদ্যালয়, তাও তিনি ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেন ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দিল্লীর জামীয়া মিল্লিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডাক্তার জাকের হোসেন বহু বৎসর পর্যন্ত জামীয়া মিল্লীয়ার কর্ণধার ছিলেন।

মওলানা মুহম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় দিল্লীতে—১৯২৭ সালে। তিনি তখন কুচায়ে বিলান থাকতেন। 'মুছলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবের একখানা পত্র ছিল। দিলাম। পড়ে বল্লেন—'উনি মুছলমানের ঈদ সংখ্যার জন্য লেখা চেয়েছেন। কিন্তু হায়। একই ঘরে বাস করে গত পঁচিশ দিনের মধ্যে আমার বিবির সাথে আমার দেখা হয়ে ওঠে নাই'। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে চাইলাম। তিনি বল্লেন, 'ভাইয়া, তবে শোন। বিবি ঘুমে থাকতেই রাত ৪টায় উঠে আমি নীচে আসি। রাত ১২টা পর্যন্ত এখানে বসে কাজ করি, গোছল করি, এখানেই খাই। বারটার পর উপরে গিয়ে দেখি, বিবি ঘুমিয়ে পড়েছেন।' তাঁর ঘরে কাজের যে আয়োজন আর মানুষের যে ভীড় দেখলাম তাতে মনে হল, তিনি একটুও অতিরঞ্জন করেন নাই। তখন তিনি 'হামদর্দ' নামক উর্দু দৈনিকের সম্পাদক। সম্পাদনার কাজ তাঁকে প্রায় একাই করিতে হতো। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একবার পত্র লিখলেন—"কেউ কেউ বলে, তোমার লেখা বড় দীর্ঘ হয়।" তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন, "তাঁদেরে বলো, আমার ছোট লেখা লেখার সময় নাই।" উর্দু সাহিত্যে মওলানা মুহম্মদ আলীর দান অবিস্মরণীয়। তিনি 'জওহর' নামে যে সব মূল্যবান কবিতা লিখেছেন, তা উক্ত সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে।

দেশ ধর্মের নামে হাজার হাজার লোক যখন কারা বরণ করেছে তখন তিনি কবিতার পর কবিতা লিখে তাদের অনুগামীদের চিত্তে প্রেরণা জুগিয়েছেন। আজো মনে আছে তাঁর—

"কোমর বান্দে হুয়ে চলনে কো ইয়েঁ ছবইয়ার বয়ঠেঁ হ্যায়॥
বহুত আগে চলে, বাকী যো হ্যায় তৈয়ার বয়ঠেঁ হ্যায়॥"

মুছলিম জগতের আকাশে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। জজিরাতুল আরব ইংরেজের কবলে, তুর্কের শক্তি-সূর্য ডুবুডুবু, পারস্য নিয়ে ইংরেজ রাশিয়ার মধ্যে কাড়াকাড়ি? রীকে আবদুল করিম পরাজয়ের মুখে, ইছলামের পুনর্জাগরণের যারা স্বাপ্নিক, তারা মুষড়ে পড়েছে। 'জওহর' তাদের উদাস প্রাণে নব প্রেরণা সঞ্চার করে বলেছেন—

'কতলে হোছায়েন আছল মে তো মরুগে ইয়াজীদ হ্যায়।
ইছলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বা'দ।'

শেষবারের মত তিনি বিলাতে চলেছেন—গোল টেবিল বৈঠকে। একরকম ধরাধরি করে তাঁকে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। বিদায় কালে এক বন্ধু চোখে পানি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই যদি তোমার মহাযাত্রা হয়, তবে—" তিনি উত্তরে বল্লেন, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা জিন্নার পতাকা তলে সমবেত হয়ো; সে তোমাদের পথ দেখিয়ে চালাতে পারবে।"

গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বক্তৃতা দিলেন। বল্লেন—"আমি স্বাধীনতা নিয়ে দেশে ফিরতে চাই; পরাধীন দেশে আর ফিরবনা"। আ-যৌবন স্বাধীনতার নির্ভীক সৈনিক: খোদাতায়ালার দরবারে তাঁর শেষ প্রার্থনা পৌঁছেছিল। তিনি স্বাধীন দেশ বিলাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর লাশ বয়তুল মকাদ্দেছের মসজিদে আকছার সংলগ্ন আঙ্গিনা নিয়ে কবর দেওয়া হল। সেই খানে তিনি ইছলামের বহু কৃতী সন্তানের সঙ্গে পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছেন।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর কথা ভাবতেই মনে পড়ে তাঁর মহিমাময়ী জননী বি-আম্মার কথা। দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি বিধবা হন; দুটিকেই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন। যে আমলে বেশীর ভাগ মুনশী মৌলভীরা ইংরাজী শিক্ষাকে দোজখে যাওয়ার রাজপথ মনে করতেন, সেই যুগে একটি মুছলিম নারীর পক্ষে ছেলেদের পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া কত বড় দুঃসাহসের কাজ ছিল আজ তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু বি-আম্মা যে বড় ছিলেন, এ ছিল তাঁর মধ্যে এক ছোট্ট প্রমাণ। তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি ছেলেদের কেবল শিক্ষিত করে তুষ্ট থাকেন নাই, তিনি তাদেরে মানুষ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের মহিমা শিখা যাতে অনুদিন অনির্বান জলতে থাকে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

একবার চান্দওয়ারায় মওলানা মুহম্মদ আলী, শওকত আলী উভয়েই বন্দী। তিনি সংবাদ পেলেন; সরকারী লোক তাঁদের কাছে মুক্তির প্রলোভন নিয়ে যাবে—যদি কোন চুক্তি পত্রে দস্তখত করে তাঁরা বেরিয়ে আসতে চান। বি-আম্মা তৎক্ষণাৎ চান্দওয়ারায় ছেলেদের কাছে চলে গেলেন আর জেল কর্তৃপক্ষের মোকাবিলা তাদেরে বল্লেন—"কিজন্য এসেছি বাছারা, জান? যদি দেশ বা ধর্ম্মের অপমানজনক কোন শর্তে দস্তখত করে বেরিয়ে যেতে চাও তবে তার আগে তোমাদের দুজনকে গলা টিপে মেরে তবে আমি বাড়ী ফিরব; কা-পুরুষ সন্তানের মা হয়ে আমি দুনিয়ায় মুখ দেখাতে পারবনা"। নীরবে মায়ের পায়ের ধূলা নিয়ে তাঁরা বলেছিলেন, "মা দোওয়া কর, তোমার সন্তানেরা তোমার উদরের অপমান কিছুতেই করবেনা।"

কলকাতা মুছলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন। সভাপতি মওলানা মুহম্মদ আলী। কিন্তু তিনি বন্দী। অন্ততঃ এই সভার জন্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক, নেতারা সরকারের কাছে আবেদন করলেন। সরকার উদ্ধত কণ্ঠে কেবল বল্ল-'না'। সভাপতির চেয়ার শূন্য রেখে লীগের সভা হল। বি-আম্মা সভায় এলেন; শূন্য চেয়ারের পাশে বসলেন; শ্রোতাদের অনেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু বি-আম্মার চোখে পানি এলনা। মস্ত বড় লম্বা দেহ, বিরাট মুখমণ্ডল, দেহের সর্বত্র বয়স তার গভীর রেখা টেনে গেছে: বি-আম্মা খোলা মুখে নির্বিকার বসে রইলেন। মনে হল, তাঁর জীবনের সমস্ত কান্নাকে তিনি তাঁরই পায় সঁপে দিয়ে এই অনুপম সংযম আয়ত্ত করেছেন। সভার সমস্ত শ্রোতা যেন অলক্ষ্যে অস্ফুটে বলে উঠল—আম্মা!

—ক্রমশঃ

খাজে দেওয়ানের গলি

আজিজুর রহমান

দুপুরের খর রোদে,
শুষ্ক দিবস হাঁকিয়ে উঠেছে
ক্লান্তির নিঃশ্বাসে।
অগ্নি ছড়ানো মধ্য দিনের হাওয়ায়
তপ্ত কটাহ তাপ ছড়িয়েছে
দিক-দিগন্ত জুড়ে,
বহ্নির শিখা বাতাসের সাথে আসে
তাম্রদগ্ধ মাটির রুদ্ধ শ্বাসে
তীব্র-ক্ষুব্ধ উষ্ণ সে উত্তাপ
জমে ওঠে চারিপাশে।

ঢাকার বকেয়া বহুৎ পুরানা দিনের—
কাঁকর-কীর্ণ পথ
বিবরের মত ছোট ছোট ঘিঁজি গলি
যেখানে সেখানে আবর্জ্জনার স্তূপ
কাঠের রেলিং-এ ঝুলছে মাধবীলতা
ভাঙা টবে টবে বিশুষ্ক বেল ফুল।
মনে হয় যেন এই পরিবেশে
রূঢ় এক বিদ্রূপ।

ঝঞ্ঝা ধূলির ক্ষণ আবর্ত্তে
ঘূর্ণীর তমসায়
ত্রস্ত পথিক দ্বিগুণ ব্যস্ত হয় ;
ক্ষুদ্রায়তন সেকেলে শহরে
প্রতি পদে সংশয়—
অতীত উদ্ধৃতি খুঁড়িয়ে চলেছে দিন ;
কাঁটা বেঁধা পায়ে দুঃসহ ক্ষত নিয়ে
সময়ের পিছু অতি মন্থর গতি।

দূরে দূরে ওই বোগেন ভিলিয়া
ফুলের গাছের শাখায়
লাল ফুল গুলি সহসা মনকে রাঙায়—
শির্ শির্ করে বিলিতি পামের পাতা
মনে মনে ব্যথা জাগায়।

ধূলি-ধূসরিত গলির সড়কে
তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে,
চলে ঘড় ঘড় ছক্কড় গাড়ী
তন্দ্রা ভাঙিয়া যায় ;
রিক্‌শার ঠুনঠুন
বাজে যেন কোনো শিশুর খেলনা
দ্রুত তালে রুনঝুন।
গলির জীর্ণ জানালার ঝিলিমিলি
সহসা জীবন পায় ;
কাজ্‌লা দীঘির শান্ত নিবিড় ছায়ায়—
কাজল নয়ন আসে চকিতের মায়ায়
ক্ষণিকের তরে ভীরু পাখী যেন
দেখা দিয়ে সরে যায়,
ক্ষণিক তরে—টুক্‌রো কবিতা
স্বপ্ন সে নিরিবিলি।
মনের অতলে তরঙ্গ তুলে' তুলে'
দিবা-মরীচিকা আবার হারিয়ে যায়।

খোয়া ওঠা পথ ভাঙা নদী ঘিরে
ব্যস্ত বায়স কুকুরের চিৎকার
মাঝে মাঝে পথে সমারোহ বেড়ে ওঠে।
বালতী, মগের, পিতলের কলসের
মিছিল চলেছে চলমান জীবনের ;
"পানিয়া ভরণে"—কলতলা পানে ছোটে
গলির বাতাসে বিষন্ন উচ্ছ্বাস ;
দম্‌কা বাতাস অল্প আবেগে ছোটে।

বিড়ির দোকানে
ক্লান্তি নামিয়া আসে
ক্লান্ত মনের অলস বেলায়—
শ্রান্ত স্বপন ঝিমায়।
গ্রীষ্ম দিনের লৌহ-গলানো রোদ ;
জলন্ত ক্রোধ সৌধ শিখরে ছড়ায়।

পাক-বাঙলা সাহিত্যে উপমা

মঈনুদ্দীন

বিরাট বাঙলা সাহিত্যে উপমা যেমন একদিনে তৈরী হয়নি তেমনি এর প্রসারক্ষেত্রও একজনের দ্বারা প্রস্তুত হয়নি, এতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দানই রয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপমা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে—বাঙলা দেশে আলা-উদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) সুলতানাতের সময় পরাগল খাঁ ছিলেন তাঁর সেনাপতি। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারতের' অনুবাদ করেন। তাতে তিনি সুলতানকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে উপমিত করেছেন এই ভাবে :

নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্র-শাস্ত্র সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে দৌলত কাজী, আলাওল ও মোহাম্মদ হায়াতের নাম শ্রেষ্ঠ বলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা ঘোষণা করেছেন। দৌলত কাজী "লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না" কাব্যে স্বামী পরিত্যক্তা ময়নাবতীর রূপ-বর্ণনা প্রসংগে যে সকল উপমা ব্যবহার করেছেন, তা এই :

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ ॥
কাঞ্চন-কমল-মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে ॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঙ্ক শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে ॥
মদন মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি গেল পুষ্প ধেনু লজ্জার কারণ ॥

আর আলাওল রূপ বর্ণনা প্রসংগে যে উপমা ব্যবহার করেছেন, তার নমুনা :

সুন্দর কামিনী কাম বিমোহে,
খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে ॥
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত বান তরঙ্গে ॥
নাসা খগপতি নহে সমতুল।
সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল ॥
দশন মুকুতা বিজলী হাসি।
অমিয় বরিষে আঁধার নাশি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র রায় গুনাকরের লেখা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য হিসাবে রসোত্তীর্ণ। এতে তিনি এমন উপমাসমূহ ব্যবহার করেছেন, যা পহেলা রিপু উত্তেজনা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। অবশ্য তাঁর পূর্ব্ববর্তী আলাওল বা অন্য কবি, পদাবলী রচয়িতা এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী রচয়িতারাও এ-দোষ থেকে মুক্ত নন। এমন কি লক্ষণ সেনের আমলে বাঙালী কবি জয়দেব সংস্কৃতে যে "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন, তাতেও রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর উপমার অভাব নেই।

যে বিরাট পুঁথি সাহিত্য মুসলিম ঐতিহ্য বহন করেছে, তাতেও উপমার ছড়াছড়ির অন্ত নেই। 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' (আবদুর রহিম কৃত) থেকে একটি মাত্র উপমা বহুল পংক্তি উদ্ধৃত করছি। গাজী ও কালু চম্পাবতীর খোঁজে এসে নদীর ওপারে কদম্ব বৃক্ষের তলায় উপবেশন করেছেন। আর চম্পা রাত্রে ফিরিশ্তার দ্বারা স্বপ্নে জানতে পেরে এপারে এসে সখীগণ সহ নদীতে গোসল করতে নেমেছেন। গোসল হচ্ছে গৌণ। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ। এই অবস্থার বর্ণনা শুনুন :—

স্নান করিবার জলে নামিল আসিয়া।
জলে নামি গাজি দিকে চাহিয়া ২ ॥
হাত মাজে, পদ মাজে, মাজে আর মুখ।
গাজিকে দেখায়ে মাজে কুচ আর বুক ॥
কবরী খুলিয়া কেশ দিল আউলাইয়া।
কাল মেঘে চন্দ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া ॥
কালি হতে কাল কেশ উড়ায় বাতাসে।
গাজির দিকে চায় বালা হাত দিয়া কেশে ॥
লোটন বান্ধিতে কেশ যখন ঝাড়িল।
শিলা বৃষ্টি গগনেতে যেমন গর্জ্জিল ॥
পরে সতী চম্পাবতী নামে কণ্ঠ জলে।
কোটি রবি জিনি অঙ্গ জল মধ্যে জ্বলে ॥
উপরেতে মুখখান শোভিত এমনি।
যেমন শরৎ শশী লক্ষ কোটি জিনি ॥"

ইংরাজ আমলে বাঙলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্য পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহায়তায় পুঁথি সাহিত্য কোণ্ ঠাসা হয়ে বটতলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আর সেখানে প্রবর্তিত হয় সংস্কৃত শব্দ কণ্টকে কণ্টকিত নতুন ভাষা ও সাহিত্য। এর কিছুকাল পরে ঈসাই ধর্মে নব দীক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুন যুগের স্রষ্টারূপে

লেখনী পরিচালনা করেন। ঈসাই ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি মাতৃপিতৃ ঐতিহ্য গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাই তাঁর রচনা হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করেই রূপলাভ করেছে। এই পৌরাণিক কাহিনী থেকে উপমা সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রাবন দূত মুখে পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাগে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর প্রাসাদ শিখরে উঠে যুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দর্শন করলেন :

হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে যমদণ্ডাঘাতে
পড়িয়াছে ধ্বজবহ ; হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় ক্ষত কৃষিদল বলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস নিকর।
রবিকুল রবি শূর রাঘবের শূরে !
পড়িয়াছে বীর বাহু বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহ নীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কাল পৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাগ্নি বান রক্ষিতে কৌরবে।"

মহাকবি কায়কোবাদ মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচনা করেন। কাব্যের নায়িকা জোহরা বলছেন :

"এ-হৃদি-মন্দিরে
পতি মোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা
নিশি দিন।"

শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন 'কোহিনূর কাব্য' রচনা করেন। তাঁর উপমা :

"নীরবিলা বিশ্বেশ্বর। নরাদি আদম
হইলা আশ্বস্ত কিছু বিভীষিকা ছায়া
তবুও রহিল তাঁর হৃদয়-মন্দিরে।"

বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ইসমাইল হোসেন শিরাজী তাঁর 'মহা শিক্ষা' কাব্যে যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা এই :—

হায় ! আজি সে আসনে পাপাত্মা-এজিদ
উপবেশি ঘটাইল ঘোর সর্বনাশ !
সিংহের আসনে আজি বসিল শৃগাল !
গরুড়ের নীড়ে হায় বসিল বায়স।"

এই সময়ের অধিকাংশ লেখকই ছিলেন মাইকেল অনুসারী। তাই দেখা যায় মুসলিম ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও উপমার বেলায় এঁরা হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রমুখ কাব্যকার এবং গদ্য লেখক ভূদেব-বঙ্কিম-রঙ্গলাল থেকে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভংগিতে উপমা ব্যবহার করেছেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লেখেন স্ত্রী বিয়োগের পর। উহা একটি গদ্য-কাব্য। এঁর উপমা ব্যবহারের নমুনা :

"সেই মুখখানি ! কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি ! অপ্সরাকণ্ঠ গীতিবৎ, দুরাগত বীণার শব্দবৎ, নদী হৃদয়ে অস্ফুট চন্দ্রালোকে বিরহ সঙ্গীতবৎ, ভাষায় তেমন কথা নেই, মানুষের তেমন কল্পনাশক্তি নেই, আমার লেখনীতে সে কবিত্ব নেই, কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি।"

পল্লী-সাহিত্যে যে-সকল উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, মার্জিত রুচিসম্মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তাতে তাক লেগে গেছে। ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় পল্লীগীত সংগ্রহ করে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "ময়মনসিংহ গীতিকা" নামে এক সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এই সংগ্রহ-পুস্তকে তিনি হাতসাফাই করে কিছু পরিবর্তন করেছেন। এ-কথা জানা যায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তি থেকে। তিনি ময়মনসিংহ জেলার হয়বত নগর, জংগল বাড়ীর অদূরে অবস্থিত মশোয়া গ্রামের অধিবাসী। তাঁর উক্তি থেকে জানা যায় : জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সোবহান দাদ খান সাহেবের নেতৃত্বে "বাত্যানীর গান বা নদ্যাঠাকুর ও বাত্যা ছেঁড়ি মেওয়া সুন্দরী" প্রথম গীত হয় ১২৬৫-৭৫ সালে ; এবং তা নানা স্থানে শেখ কাঙ্গালী চৌকিদার কর্তৃক প্রচারিত হয়। যা হোক এই মেওয়া সুন্দরী (মহুয়া নহে) নদ্যাঠাকুরের প্রেমে পড়ে। আর নদ্যাঠাকুরও। উভয়ে উভয়ের প্রেমে তখন যাই যাই অবস্থা। একদিন জ্যোৎস্নাবিধৌত সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে উভয়ের সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণকুমার নদ্যাঠাকুর বাত্যাকন্যা মেওয়া সুন্দরীকে বলছেন :

"কৈ শুন সুন্দরী কন্যা তিন সত্যি করি।
তোমারে পাইলে আমি বিয়া কর্ত্তাম পারি॥
তোমার রূপেরে দেখ্‌লাম দুই নয়ান ভরিয়া।
গুণের পূজা করবাম কন্যা মন-প্রাণ দিয়া॥
কও কও সুন্দরী কন্যা সরল তোমার প্রাণ।
তোমারে নি দিতাম পারতাম আমার পরাণ॥

লাজে না নোয়াইয়া মাথা মুচ্‌কী হাস্যা কয়।
তোমার সাথে বাত্যা ছেঁড়ির (হায় রে) কেমনে
বিয়া হয়॥
লাজ ধর্ম্ম সকল ছাড়ছ, ছাড়ছ দেশের ডর।
গলায় কলসী বান্ধ্যা—জলে ডুব্যা মর॥
কই পাইতাম কলসী রে কন্যা—কৈবা পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ, আমি ডুব্যা মরি॥"

প্রিয়তমাকে গহীন গাঙের সাথে উপমিত করে তাতে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার যে সুন্দর কল্পনা—এ-কল্পনা গ্রাম্য নিরক্ষর কবির একান্ত নিজস্ব, একান্ত মৌলিক। মার্জিত রুচিসম্পন্ন শিক্ষার গর্বে গরীয়ান অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও এ-কল্পনায় বিস্ময় জাগে।

আধুনিক রবীন্দ্র-সাহিত্যে উপমার অভাব নেই।

সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে
বিচিত্র রেখায় আলিম্পন।
('সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত'—রবীন্দ্রনাথ)

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্রশঙ্খ বাজে,
মোর চিত্ত মাঝে।
('পঁচিশে বৈশাখ'—রবীন্দ্রনাথ)

সীমন্তে গোধূলী লগ্নে দিয়ো এঁকে
সন্ধ্যার সিন্দুর।
('সাবিত্রী'—রবীন্দ্রনাথ)

এ-কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর শা'জাহান
('শা জাহান'—রবীন্দ্রনাথ)

এবং সত্যেন দত্তের—

"সোহাগী! তোর দেহের মাটি
স্বামী সোহাগ সিঁদূর গো"
('কবর-ই নুরজাহান'—সত্যেন দত্ত)

আর শাহাদাৎ হোসেনের সমুদ্রের রূপ বর্ণনায়—

"জানে নাই—শুনে নাই—বুঝে নাই কেহ
ধ্বংসের প্রতীক সিন্ধু—এরি সে পাতাল-গেহ
ব্রহ্মাণ্ডের মণি-কোষাগার
এ যে সিন্ধু অযত্নের রত্ন-মালাকার।
মহারোল জাগিল মন্থনে—সৃষ্টি উত্তরোল
বিষাক্ত ফেনায় সিন্ধু গর্জ্জমান—উদ্ভট উল্লোল।
সৃষ্টি যায় রসাতলে কম্পমান ভিত্তি ধরণীর
দেব নাগ নর কাঁপে—সৃষ্টি নহে স্থির।
অকস্মাৎ অম্বুধির ভেদি অধস্তল
আলোড়িয়া নিথর নিতল
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত দৃষ্টির সীমায়
জেগে ওঠে নারায়ণী, জাগে দীপ্ত রূপ মহিমায়।
('বাহিরে দেখিছ যারে'—শাহাদাৎ হোসেন)

কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব তাঁর "পরাণ কাঁদে সেই নিরাশায় গভীর বেদনায়" শীর্ষক কবিতায় প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

"মাটির গড়া জীবন্ত ওই স্বর্ণ প্রতিমায়
কোথায় পাব মরণ পারের সেই সে অলকায়?"

কবি সুফিয়া কামালের "অনন্ত পিপাসা" কবিতায় :

"অন্তর-মন্দিরে তার হ'ল যত পূজা আয়োজন,
চিত্ত-তীর পরাজিত সিন্ধুজলে জাগিল প্লাবন।
অবশেষে এল লগ্ন! জীবনের পূর্ণিমার রাতে,
একটি নিশীথ শুধু। কাটাল সে পূর্ণচন্দ্র সাথে।"

কবি নজরুল ইস্‌লাম আমাদের জাতীয় জাগরণের কবি বলে স্বীকৃত। তিনি তাঁর সাহিত্যে যে ইস্‌লামী রূপ দিয়েছেন, তা' পাকিস্তানী-সাহিত্য গড়ে তুলতে খুবই সাহায্য করবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেও হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনী থেকে উপমা সংগ্রহ তিনি করেছেন। যেমন :

আজ জল্লাদ নয় প্রহলাদ সম মোল্লা খুন-বদন!
('কোরবানী'—নজরুল ইসলাম)

অথবা :—

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
(কামালপাশা"—নজরুল ইস্‌লাম)

ওপরে আমরা যে-সকল কবির লেখা উদ্ধৃত করেছি, তাতে দেখা যাবে, এই সকল উপমায় হিন্দু-সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; দেশ-কাল-পাত্র এবং সময়ের অবস্থা বিবেচনা করে এই সকল উপমা প্রয়োগ করতে লেখকেরা যেমন দ্বিধা করেননি, সে-যুগের মানুষের মনেও এজন্য সংকোচ ছিলনা। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতঃই আমাদের দেশে একটা নতুন সাহিত্য গড়ে তোলার চেষ্টা চল্‌ছে। অতএব, মিলিত বংগে যা চল্‌তো এখন আর তা চল্‌বে না, চল্‌তে দেওয়া উচিত নয়।

আমরা নতুন সাহিত্য গড়ে তুল্‌বো। আর তা' গড়ে উঠ্‌বে পুরাতনের ভিত্তির ওপরেই নতুনের রূপ নিয়ে। শুধু তার দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তন হবে।

প্রিয়ার মুখকে কবিরা চাঁদের সাথে, ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। 'উপমা কালিদাসস্য' বলে বহু কীর্তিত মহা কবি কালিদাস অন্ধকারকে 'সূচীভেদ্য অন্ধকারে' বলেছেন, ইংরাজী সাহিত্যে নিঃশব্দতাকে 'pindrop silent' বলা হয়েছে। এ-ধরনের উপমায় আমাদের আপত্তি নেই। আরও আপত্তি নেই পারিপার্শ্বিকতার সংগে খাপ খাওয়া-বার জন্য যদি ঘটনার উপযোগী কোনো উপমা প্রয়োগ করা হয় তাতে।

আমরা আপত্তি করবো যখন এজিদের সিংহাসন আরোহনকে নিন্দা করে বলা হয় :

"সিংহের আসনে আজি বসিল শৃগাল
গরুড়ের নীড়ে হায় বসিল বায়স।"

অথবা খুন-বদন মোল্লাকে ত্যাগী প্রমাণ করার জন্য তাঁকে প্রহলাদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে বলা হয় :

"আজ জল্লাদ নয় প্রহলাদ সম মোল্লা খুন বদন।"

বাংলা-সাহিত্য-চর্চ্চায় সাধারণতঃ হিন্দুরা অগ্রণী ছিলেন বলে অনেক হিন্দু ভাবাপন্ন উপমা সূচক-

শব্দ এবং প্রবাদ বাক্য এতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবেশ লাভ করেছে। মুসলিম-সাহিত্য সুধীরা একান্ত অজ্ঞাতসারে তা ব্যবহার করে এসেছেন। যথা: দৈববল, গোবর গণেশ, দশাচক্রে ভগবান ভূত, নানা মুনির নানা মত, দয়ার অবতার, ধৈর্য্যের অবতার, সমাধি-মন্দির, মান-মন্দির, কাবা-মন্দির, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সিন্দুরিয়া মেঘ, কৃষ্ণচূড়া গাছ ইত্যাদি।

পাক-বাঙলা সাহিত্যে এই ধরণের উপমা-প্রয়োগ রীতির পরিবর্তন করতে হবে। এ হবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তন ছাড়া আমাদের উপায় নেই। কারণ এর অনেকগুলি পাকিস্তান আদর্শের বিরোধী, অনেকগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করে।

এর রূপ কিভাবে পরিবর্তিত হবে, তা নির্ণয় করা এক জনের কর্ম নয়, আর তা এক দিনেও হবে না।

প্রচলিত উপমা ও প্রবাদ বাক্য প্রভৃতি নমুনাস্বরূপ কিছু আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

যেরূপ আছে	যেরূপ হওয়া উচিত
দিল্লীশ্বর	দিল্লীর শাহ্ বা সম্রাট
ধর্মযাজক	ধর্ম প্রচারক
যীশুখৃষ্ট	হযরত ঈসা
খৃষ্টাব্দ	ঈসাই সাল
মুস্লিম শাস্ত্রকারেরা	মুসলিম ধর্ম্মীয় আইন প্রণেতারা
দৈববল	গায়েবী কুয়ত
কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।	কোথাকার পানি কোথায় দাঁড়ায়।
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।	গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা।
ঘর পোড়া গরু সিন্দুরিয়া মেঘ দেখে ভয় পায়	চুন খেয়ে মুখ পুড়েছে দই দেখ্লে ভয় হয়।
জলে বাস করে কুমীরের সাথে বাদ।	পানিতে বাস করে কুমীরের সাথে বাদ।
দশাচক্রে ভগবান ভূত	দশজনার হাতে পড়ে একেবারে নাজেহাল।
নানা মুনির নানা মত	নানা জনের নানা মত।
দাতা কর্ণ	দাতা হাতেম।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।	তাজুর বোঝা নিজুর ঘাড়ে।
পাঠান কুল তিলক	পাঠান গৌরব মণি।
বিদ্যা দিগ্গজ	এলেমের জাহাজ
জীবন প্রদীপ	জীবনের আলো
সেবার মহান ব্রত	খিদমতের মহান সাধনা
মহিমা কীর্ত্তন	মহিমা ঘোষণা
কোরআন অবতীর্ণ	কোরআন নাযিল
তপস্যা	ইবাদত
শিষ্য মণ্ডলী	শাগরিদগণ
সমাধি মন্দির	কবরগাহ্
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড	সারা দুন্য়া
জ্যোতির্বিদ্যা	ইল্মে নজ্মী
পরমাত্মার	আল্লার
হাদীস শাস্ত্র	হাদীস সমূহ, হাদিসের কেতাব
অগস্ত্যাযাত্রা	চির বিদায়, আলবিদা
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অনেক পীরে মোজেজা নষ্ট, বেশী মানুষে কাজের নষ্ট।
অনেক জলের মাছ	গভীর পানির মাছ।
অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে	বেহুদা খরচে বরকত ওঠে।
আদুরে গোপাল	আদুরে মানিক বা দুলাল
আপনি ঠাকুর ভাত পায় না শঙ্করাকে ডাকে।	নিজে মিঞা খেতে পায় না পড়শীকে ডাকে।
আসেন লক্ষ্মী যায় বালাই।	আসে রহম যায় বালাই
ইস্তক জুতা সেলাই নাকাদ চণ্ডীপাঠ	জুতা সেলাই থেকে টুপি সেলাই তক
ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য	খোদা যা করেন ভালর জন্য।
উল্টো বুঝলি রাম	উল্টো বুঝ্লে মিঞা
যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবন	যে যায় কুফায় সে হয় আবদুল্লা জেয়াদ।
রাখে কেষ্ট মারে কে?	রাখে আল্লা মারে কে?
কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।	কষ্ট বিনা কাজ হয় না।
বাঘের মাসী	বাঘের খালা।
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী	তেজারতে বুলন্দ নসীব
বিপত্তে মধুসূদন	আল্লা অগতির গতি।
বিসমোল্লায় গলদ	বিসমিল্লায় গলদ।
যক্ষের ধন	কারুণের মাল।
শনির দৃষ্টি	শয়তানের দৃষ্টি
সতী সাবিত্রী	সতী রহিমা
গৌরীসেনের টাকা	খানজাহাঁ খাঁর টাকা
কলির ভীম	এ-যুগের রুস্তম।

এরূপ অনৈসলামিক অসংখ্য উপমা, প্রবাদ বাক্য এবং শব্দ বাঙলা সাহিত্যের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে আছে। নমুনা স্বরূপ আমরা অল্প কয়েকটি মাত্র এখানে সংগ্রহ করে দিলাম; এবং সহজ ও আয়াস সাধ্য পরিবর্তনও করা গেল। লক্ষ্যযোগ্য যে আমরা মূল রীতি প্রায়ই রেখে সামান্য কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। প্রথমতঃ মূলরীতির সাথে

সাধারণের পরিচয় থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যে-উদ্দেশ্যে পরিবর্তন অপরিহার্য, সে উদ্দেশ্যও সফল হবে। তবে কোনো কোনোটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। এ-না করে উপায় ছিল না।

আমরা সুধীজনের সম্মুখে একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা পেশ করলাম মাত্র। এর চেয়ে উন্নত সমাধান কেউ করে দিলে সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা নেই। বাঙলা একাডেমীর মাধ্যমে যে পাক-বাঙলা অভিধান-প্রস্তুতির চেষ্টা চলছে, তাঁর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এ-দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করছি।

গ্রামের মাটি ঃ দূর থেকে

আতাউর রহমান

সময়ের বন্ধুর দূরত্ব অতিক্রম ক'রে আবার ফাল্গুন এল,
যাযাবর জীবনের ভাঙ্গা জানালায় এক মুঠো রোদের উল্লাস,—
রজনীর কালো নদী পার হয়ে বকের ঝাঁকের মত ভোর আসে
মিহি শীত আর চিকণ কুয়াশায় ভরা মাঠ-বন-দিগন্ত।
হঠাৎ ছাড়া-পাওয়া স্রোতের উল্লাস এ-দেশের প্রান্তরে কাননে
আমের রূঢ় ম্লান ডাঁটা মুকুলের গন্ধে মৌন হয়েছে যেন,
বাতাবি লেবুর গাছের তলায় মৌমাছিরা জমিয়েছে ভিড়।—
টিয়া-ঘুঘু গাছের পাতার আড়ালে সাথার গলা জড়িয়ে আবেশ মুগ্ধ।

এখানকার বসন্তের গাঢ় আয়োজন দেখে মনে আসে—
বাঁশের ঝাড়ের ধারের একটি বাড়ি— পানা—পুকুর
কুল গাছ তলায় কিশোর-কিশোরীর সারা দিন ভর হৈ হল্লা,
বাড়িটার গা ঘেঁসে গাঁদা-রঙ্ সড়ক চলে গেছে অনেক দূরে,
তার আঙ্গিনায় এসে ঠেকেছে মাঠের দীর্ঘ ললাট।
এখন ফাল্গুন মাস—শস্যরিক্ত ফাটল ধরা মাঠ জুড়ে
গরু-মোষ-ছাগল ঘুরে ঘুরে ঘাস আর শুকনো নাড়া খায়,
খাল বিলের বুক ছিন্নভিন্ন ক'রে ধীবর-চাষিরা মাছ ধরে, শালুক তোলে,
বট পাকুড়ের গাছের তলায় ছেলেরা দল বেঁধে খেলা করে।
ধূলি ম্লান ঘূর্ণিবায়ু উন্মাদিনী নারীর মতন নেচে নেচে
শুকনো মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মিশে যায়।

বিকেলের প্রৌঢ়-সূর্য্যের আলো ধারহীন কৃপণের মত।…
তারপর সন্ধ্যা আসে— সূর্যদগ্ধ পৃথিবীতে প্রলেপের মায়া।
সারাদিনের পর ক্লান্তগরু গোয়ালে পায় বিশ্রাম-খড়-পানি।
ঘরে ঘরে জ্বলে দীপ-আকাশে জমে তারার হাট…
বহু মাঠ-বন নদীর-দুরন্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে
রিক্ততার তৃষ্ণাদীর্ণ বুকে—গ্রামের মাটির ছোঁয়া পাই স্বপ্নে।

• ১৬ই আগষ্ট—১৯৫৮ "রওনক"—এর সভায় পঠিত ও আলোচিত।

বাঁকে বাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ একুশ ॥
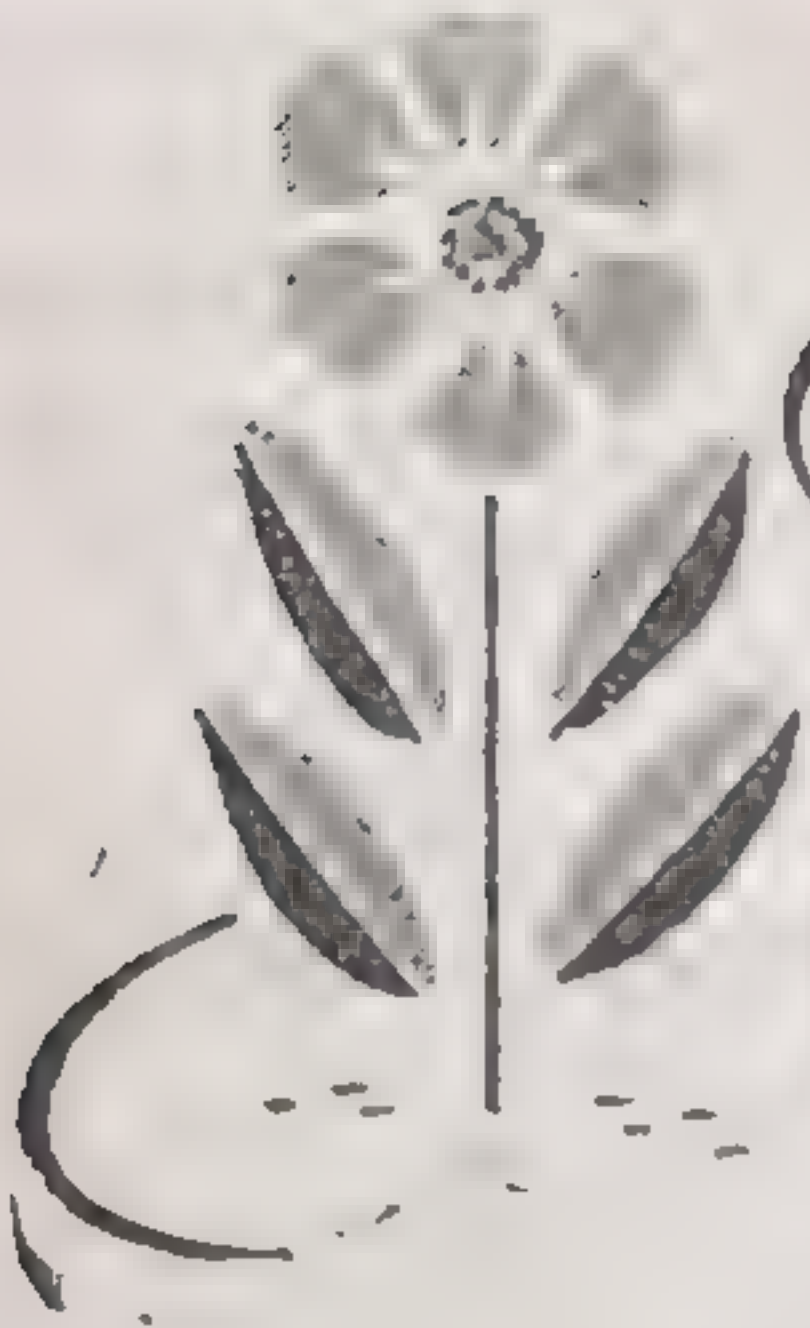
হোমায়েরা মফঃস্বল ছিল। আসিয়া শুনিল দুইজন লোক আসিয়াছিল। ইহার বেশী খবর জুলি দিতে পারিল না। ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করার যে কিছু আছে, হোমায়েরারও তাহা মনে হইল না।

খাওয়া দাওয়ার পর হোমায়েরা বিশ্রাম করিতেছিল। জুলি আসিয়া বলিল, ওরা থাকতে চেয়েছিলেন।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, কারা?

জুলি বলিল, ঐ দু'জন লোক যাদের কথা বলেছিলাম।

হোমায়েরা তাড়া দিয়া বলিল, একটি কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে কি তুমি শিখবে না কখনও। অর্দ্ধেকটা সকালে, অর্দ্ধেকটা বিকালে বলবে।

জুলি বিব্রতভাবে বলিল, মনে ছিল না, আপা।

হোমায়েরা বলিল, তোমার ত কিছুই মনে থাকে না! তা দু'জন কি মেয়েলোক ছিলেন?

না, আপা।

তবে কি পুরুষ?

না, আপা।

হোমায়েরা বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া বলিল, শুধু না আপা না আপা করছো, হ্যাঁ আপা, কোন্‌টি তাই বল না শুনি।

জুলি বলিল, হ্যাঁ, আপা, একজন মেয়েলোক আর একজন পুরুষ।

হোমায়েরা বিস্মিত হইল, এমন এক জোড়া মেয়ে পুরুষ কাহারা হইতে পারে? তাহার বাড়ীতে থাকিতে চাহিবে এরূপ এক জোড়া মেয়ে-পুরুষের কথা সে কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না। তাহার কৌতুহল বাড়িয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা কি বললেন?

বললেন, এখানে থাকতে মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু আপনি বাড়ী নাই, কাজেই থাকা হলো না।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা কে?

জুলি জওয়াব দিল, তা-ও তাঁরা বলেন নাই।

কোথা থেকে এসেছিলেন?

তা-ও বলেন নাই।

হোমায়েরা বিরক্ত হইয়া বলিল, তুমি একটু এগিয়ে জেনে রাখতে পারলে না। দিন দিন তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়ছে, না, লোপ পাচ্ছে!

জুলি আমতা আমতা করিয়া বলিল, অপরিচিত লোকের সাথে বেশী কথা বলতে মানা করেছেন, আপা।

মানা করেছি, বেশ করেছি। এখন যাও আমার চোখের সামন থেকে।

জুলি অপরাধীর মত বাহির হইয়া গেল। হোমায়েরা কিছু সময় ভাবিয়া, ইহাকে পণ্ডশ্রম ধরিয়া নিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেদিনই হোমায়েরা জামালের একখানা চিঠি পাইল। চিঠি খোলার আগে সে কয়েকবার ইহা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। জামাল মাঝেমধ্যে চিঠি লিখে, হোমায়েরা জওয়াব দেয় আরও কম। ফলে যোগসূত্র ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিয়াছে। নিজে লিখিতে পারে না বলিয়া তাহার মনে যে একটা প্রতীক্ষা জাগিয়া না থাকে তাহা ত নয়। জামাল হয় ইহা বিশ্বাস করে না, না হয় গ্রাহ্য করে না। হোমায়েরা ভাবে, জামালটা আগের মত ছেলেমানুষই রয়ে গেল!

চিঠি পড়িয়া হোমায়েরা খুশী হইল। জামাল আসিতেছে লিখিয়াছে। বহুদিন হইল, জামাল এদিকে

আসে নাই। না আসার কারণটা যে হোমায়েরা বুঝে না, তাহা নয়।

এ-কথা মনে করিয়া হোমায়েরা নিজে নিজে হাসিয়াছে। গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি! ডাক্তারের পরিবারের সহিত নিজের সুখদুঃখকে কেমন করিয়া জামাল এ-ভাবে এক করিয়া ভাবিতে শুরু করিয়া দিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া হোমায়েরা বিস্মিত হয়। জামালের জন্য তাহার অনুকম্পা হয়, আবার তাহার মন বিরক্তও হইয়া উঠে।

ডাক্তারের পারিবারিক সুখ-দুঃখের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস যখন আঘাত সাঘাতে আলোড়িত, সে সময় জামাল একবার আসিয়াছিল। জামালের সে সময়কার চেহারা মনে পড়িলে এখনও হোমায়েরার হাসি পায়। যত লজ্জা-গ্লানি শঙ্কা-ভাবনা সমস্তই যেন জামালের। জামালের নির্ব্বাক মুখের রেখায় রেখায় তারই ছায়া জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল।

জামালের নিজের করার কিছুই ছিল না। সে শুধু আশঙ্কার বোঝা বহন করিয়া নীরব দর্শকের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। ঝড়ের শেষে শান্তি ফিরিয়া আসার শুভ সমাপ্তি সে দেখিয়া যায় নাই। সে চলিয়া যাওয়ার পর সমস্যার সুরাহা হইয়াছিল। তবে তারপরও পানি অনেক গড়াইয়াছে।

হোমায়েরা নিজে অবশ্য ব্যাপারটিকে ভাল বা মন্দ কোন একভাবে নিশ্চিত মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কাহিনীটি প্রথমদিকে তাহার নিকট অজ্ঞাতও ছিল। পুরাতন পরিবেশের সহিত নিজের সম্পর্ককে সে এক রকম সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তবে ডাক্তার পরিবারের সহিত তাহার যোগাযোগ একদম বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। আগের পরিচিত লোকদের মাঝে এই ব্যক্তিই তাহার কোন সমালোচনা করেন নাই। ডাঃ বশীর আহমদ হোমায়েরাকে আগের মতই দেখিয়াছেন। হোমায়েরার কাজ লইয়া কোন তর্কের অবকাশ যে তাঁহার মনে আছে, তাহার কোন আভাস হোমায়েরা কখনও পায় নাই। এই পরিবারের সহিত তাই ক্ষীণ যোগসূত্র সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

হোমায়েরা আতিয়া বেগমকে দেখিতে গিয়া যখন ঘটনাটি প্রথম শুনিল, সে সময় স্রোত অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কাহারও কোন অনুরোধ, যুক্তিতর্ক, মিনতিতে ডাঃ বশীর আহমদ কান দেন নাই। পরিবার বিরান হইয়া যাইবে, এই যুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রফেসার হাসানের সহিত তাঁহার ঝগড়াও হইয়া গিয়াছে। এক অমানুষিক শক্তি বশীরকে সমস্ত বিরোধিতার বিরুদ্ধে শক্ত করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। তিনি নার্স ডলি আহসানকে বিবাহ করিবেনই। বিবাহের দিনও এক রকম স্থির হইয়া আছে।

আতিয়া কোনদিকে কূল দেখিতে না পাইয়া শয্যা-নিয়াছেন। হোমায়েরা তাহার কাছেই সমস্ত শুনিল। ঘটনাটি বিচার করার মত ধৈর্য্য বা মানসিকতা হোমায়েরার ছিল না। তবে আতিয়ার অবস্থা তাহাকে নাড়া দিয়া গেল। কিন্তু কি করা যাইতে পারে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। চিন্তিত মন লইয়া সে আতিয়ার কাছ হইতে বিদায় লইল।

পরের দিন আবার সে আতিয়ার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিল, চাচি-আম্মা।

আতিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিলেন, ডাক শুনিয়া ফিরিয়া চাইয়া বলিলেন, বস, মা।

হোমায়েরা বসিতে বসিতে বলিল, এক কাজ করলে হয় না, চাচি-আম্মা?

আতিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিলেন। হোমায়েরা আতিয়ার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কতকগুলি কথা বলিল। আতিয়া চমকাইয়া উঠিলেন।

হোমায়েরা প্রশ্ন করিল, কি বলেন, চাচি-আম্মা?

আতিয়া বলিলেন, তুমি কিনে নিতে বলছো?

হোমায়েরা বলিল, চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি?

আতিয়া বলিলেন, কিন্তু এ যে অতি জঘন্য কাজ।

হোমায়েরা বলিল, কি যে বলেন চাচিআম্মা! ও কাজটিও ত এমন কিছু ভাল হতে যাচ্ছে না। দশ জনের সুখের জন্য একটু আধটু নীচে নামতে হলে তাতে অন্যায়ই বা কি!

আতিয়া বলিলেন, ডলি মেয়েটি কেমন তা আমরা কেহ জানিনা। আমি আমার মেয়ের যথাসর্ব্বস্ব খোয়াতে রাজি আছি। কিন্তু পরিণাম কি হবে, মা?

এত ভাবলে কি কিছু হয়, চাচিআম্মা। সফল হল ত ভালই, আর না হল, তা হলে ত এখনকার অবস্থার চেয়ে খারাপ হওয়ার কিছু নাই।

আমি ভেবে দেখি মা। তোমাদের দশজনের দরদ ও সহানুভূতি আমার দুঃখের মাঝেও মস্ত সান্ত্বনা। কিন্তু কি করবো, মা, আমার নসীবে এই ছিল। বুড়ো বয়সে আমাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

আতিয়া অনেক ভাবিলেন, অনেক কাঁদিলেন। কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন খড়কুটা আঁকড়াইয়া ধরে, হোমায়েরার পরামর্শও তেমনিভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিতে লইল। নিজের চিত্তের হাহাকারের ভিতর দিয়া অন্ধের মত অন্ধকারে তিনি পা বাড়াইতে লাগিলেন।

মাঝখানের ইতিহাস কেহ জানে না। আতিয়া মনে

করেন, এটা তাঁহার পক্ষে এমনই লজ্জার যে, কোনদিন কাহাকেও জানান যাইবে না। শুধু হোমায়েরা জানে আতিয়া নিজে ডলির কাছে গিয়াছিলেন। আতিয়ার কাছে প্রশ্ন করিয়া কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। তবে এইটুকু সে বুঝিয়াছে, আতিয়ার মিনতিতে কোন কাজ হয় নাই।

লোকে শুধু এইটুকুই জানিল, বিবাহের একদিন আগে ডলি শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সারা শহরে কোথাও তাহাকে পাওয়া যায় নাই।

ডাক্তার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নিজেই ডলির খোঁজ নিতে তাহার বাসায় গিয়াছিলেন। সেখানে খবর লইয়া তিনি জানিলেন, রাতের ট্রেনে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, তাহা বলিয়া যায় নাই। আর ফিরিবে কি না তাহাও বলে নাই। তাহার নিজের বলিতে যাহা ছিল, তা সবই সে লইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার গুম হইয়া রহিলেন। আতিয়া নিজের গোপন অপরাধে মর্ম্মে মরিয়া রহিলেন। সারা বাড়ীর উপর শোকের ছায়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল।

কিছুদিন পর ডাক্তার বশীর আহমদ কাজে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, ভিতর হইতে তিনি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছেন। মনের তল হইতে তাহার ভিত্তিটি যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নিজের ভার আর সহ্য হইল না। ডাঃ বশীর আহমদ অসুখে পড়িলেন। আতিয়া দিনরাত তাঁহার খেদমত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতে যেন কিছু হইতে চায় না। বশীরের রাগ ক্রমে বাড়িয়াই চলিল।

আতিয়া বিশ্রামহীনভাবে স্বামীর সেবা করেন, আর গোপনে চোখের পানি মুছেন। নিজের মন হইতে কিছুতেই তিনি অপরাধের উৎকণ্ঠা দূর করিতে পারেন না। তাঁহার শুধুই মনে বাজিতে থাকে, ইহা তাঁহারই গোনার ফল। আল্লাহ তাঁহাকে সাজা দিতেছেন। তাঁহার মনের কাণায় কাণায় অনুশোচনা ভরিয়া উঠে।

হাসান আসেন। বশীরের মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া যেন ধ্যানস্তিমিত হইয়া উঠেন। মাঝে মাঝে আতিয়াকে বলেন, খোদার দুনিয়া বড় বিচিত্র জায়গা, কিছুতেই ঘাবড়াতে নাই, বোন।

আতিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বলেন, এমন কেন হল, ভাইজান?

হাসান আতিয়ার মাথায় হাত রাখিয়া সান্ত্বনা দিতে থাকেন। তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন, ভয়ের কিছু নাই বোন, ও সেরে যাবে।

কিন্তু হাসান নিজের মনেই ইহাতে জোর পান না। আতিয়া আবার জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু এটা কেন হল, ভাইজান?

হাসান বলিলেন, রোগ-শোক সকলেরই হয়ে থাকে। এতে কারো হাত নাই, বোন।

হাসানের এই কথাগুলিকেই মস্ত সান্ত্বনা বলিয়া আতিয়া গ্রহণ করিতে চাহিলেন। শুধু রোগ-শোকের বিষয় হইলে, দুঃখ-বেদনা তাহাতে আছে, কিন্তু জ্বালা থাকে না। আতিয়ার ভিতর যে জ্বলিতেছে।

হাসানের কথায় আতিয়া আশ্বাস খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু হাসান আতিয়ার মনের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি আবার বলিলেন, বোন সবকিছুর জন্যই একটা মানানসই বয়স আছে। অকালে বান ডাকলে, আসতে যেমন ক্ষতি করে, যাওয়ার সময় তেমনি অশেষ ক্ষতি রেখে যায়। বশীরের পক্ষে এ বয়সে এতটা মানসিক উত্তেজনা কিছুতেই কল্যাণকর ছিল না। তারপর তার এরূপ পরিণতি তার পক্ষে সহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়েটা এমন্ দাগা দেবে সেটা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়!

আতিয়ার মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হো হো করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হাসান বলিলেন, কি আর করবে, বোন, এতে আমাদের ত আর হাত ছিল না।

আতিয়া আরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনের জ্বালা কেহ জানে না, কেহ ইহা বুঝিবে না। কাহারও কাছে কিছু বলারও যে তাঁহার উপায় নাই। তাঁহার মনই তাঁহার জন্য দিনরাতের দুঃস্বপ্নের ভিতর বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

হোমায়েরার কাছে যাওয়া তিনি স্থির করিলেন, এবং একদিন তাহাই করিয়া বসিলেন। হোমায়েরা কয়েকদিন আগে বশীরকে দেখিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ আতিয়াকে তাহার বাসায় আসিতে দেখিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, চাচি-আম্মা, ডাক্তার চাচা কেমন আছেন?

আতিয়া জওয়াব দিলেন, আগের মতই।

হোমায়েরা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, যাক্, ভাল। হঠাৎ যে আমাকে মনে পড়লো, চাচি-আম্মা, আমার এত সৌভাগ্য!

আতিয়া কোন রকম ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, হোমায়েরা, তোমার চাচার ব্যারামের জন্য আমিই দায়ী, মা।

হোমায়েরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, তা হবেন কেম?

আতিয়া বলিলেন, প্রথম হতেই নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছিল, কিছুতেই মন হতে তা দূর করতে

পারছিলাম না। এখন এ-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, আমারই গোনার ফলে তোমার চাচা শয্যাগত।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি করে নিঃসন্দেহ হলেন, চাচি-আম্মা? কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি নিজেকে কি জন্যে অপরাধী ভাবছেন।

আতিয়া বলিলেন, এখন ডলি মেয়েটাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে, মা।

হোমায়েরা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, আপনার মনে দ্বন্দ্ব কোথায় এতক্ষনে বুঝতে পারলাম। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ রূপে আপনার মনের দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিন। মন সবল করুন। চাচা ভাল হয়ে উঠবেনই।

আতিয়া বলিলেন, আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না, মা। কেহ কিছু জানুক আর নাই জানুক, সারা দুনিয়ার কাছে আমি অপরাধী হয়ে থাকবো। আমার ছেলে মেয়ের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।

হোমায়েরা বলিল, কেন খামখা নিজের মনে কষ্ট সৃষ্টি করছেন, চাচি-আমা। দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন বলেই ত অন্যায় বেড়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

আতিয়া বলিলেন, তুমি বুঝতে পারছো না, মা। আমার স্বামী অসুস্থ, এটার চেয়ে বড় বিপদ আমার কিছুই হতে পারে না। ন্যায়-অন্যায়ের তর্ক ও এখানে আসে না।

হোমায়েরা মনে মনে বিরক্ত হইল। বলিল, এটা আমি বুঝতেও চাই না। কিন্তু আমি কি করতে পারি।

আতিয়া বলিলেন, তোমার সাহায্য আমার বড় প্রয়োজন। তুমিই সব জানো, আর কারো কাছে কিছু বলার সাহস আমার নাই। এ-জন্যই তোমাকে মিনতি করছি, মা।

হোমায়েরা আতিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এ-ভাবে বলবেন না, চাচি-আম্মা। মিনতি কেন, হুকুম করুন। কিন্তু আপনি যে মানসিক চিকিৎসার কথা ভাবছেন, এটা আগের কালে নাটক নভেলেই চলত। বাস্তব জীবনে এটা চলে না চাচি-আম্মা। তাছাড়া, চাচা ত আর ছেলে মানুষ নন।

আতিয়া বলিলেন, মনের ছেলে মানুষীর কাছে বয়সের কোন মাপ চলে না, মা।

হোমায়েরা বলিল, আপনি যদি হুকুম করেন, তা হলে আমি ডলির খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। খোঁজ পাওয়া গেলে জোড়া তালি দেওয়ার একটা ব্যবস্থাও করতে পারবো। তবে মন শান্ত করে এটা আরও ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, চাচি আম্মা। এটা যে মানসিক দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু না সে সম্পর্কে আমার মোটেই সন্দেহ নাই। আরও ভেবে আমাকে হুকুম করবেন, চাচি-আম্মা।

নূতন দ্বিধাদ্বন্দ্ব লইয়া আতিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে পরে তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই। বশীর ভাল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ভাল হইয়াই বশীর নূতন উদ্যমে ব্যবসায় শুরু করিলেন। আতিয়া কাকুতি মিনতি করিলেন, হোমায়েরা নিষেধ করিল, তাঁহার আর পরিশ্রম করিতে যাওয়া উচিত নয়, এখন বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

বশীর যেন প্রতিশোধের ইচ্ছা লইয়াই কাজের মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিলেন। ব্যবসায় বুদ্ধির মাঝেও যে মানবীয় মমত্ববোধটুকু নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহার চিকিৎসক জীবনের সেই নিঃশেষিত প্রায় অবশেষ-টুকু হাওয়া হইয়া মিলাইয়া গেল। মানবজাতি সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ তাঁহার মনকে আগাগোড়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। চিকিৎসক হিসাবে তিনি এখন নির্ম্মম।

ফল ইহার ভালই হইল। মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্নে আগে যে দ্বিধা আসিত এখন আর তাহা নাই। কাজেই তাঁহার প্রেসক্রিপসনের ফল তাড়াতাড়ি হইতে লাগিল। রোগী মরিতে হইলে তাড়াতাড়ি মরিত, আর ভাল হইতে হইলে তাড়াতাড়ি ভাল হইত। তাঁহার নূতন নাম-ডাক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

* * *

ঘটনাটি হোমায়েরার কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। শঙ্কা আর লজ্জা লইয়া জামালের আত্মগোপন করিয়া বেড়াইবার চেষ্টাই হোমায়েরাকে একটু নাড়া দিয়া গিয়াছে। জামালের মন তাহার বয়সের সহিত ভাল রাখিয়া কি বাড়িয়া উঠিবে না, এমনি এক জিজ্ঞাসা যেন হোমায়েরাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। জামাল আসিতেছে, হোমায়েরা ইহাতেই প্রসন্ন। সত্যি, অনেক দিন হইল জামালের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই।

হোমায়েরা যখন জামালের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সময় কলকণ্ঠে সারা বাড়ী মুখরিত করিয়া যাহারা আসিল হোমায়েরা তাহাদের আসার সম্ভাবনার কথা একটিবারও ভাবে নাই। জুলি একজোড়া নরনারীর কথা জানাইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কথা একবারও তাহার মনে উঁকি দেয় নাই।

আব্বাস আসিয়াই হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিল। সে বলিল, আপা, খুব বেঁচে গেছেন। নিয়ত করে এসেছিলাম আপনার এখানেই আস্তানা গাড়বো। বাড়ী ছিলেন না বলে বেঁচে গেলেন।

হোমায়েরা. সেলিনাকে টানিয়া আনিয়া বসাইল। আব্বাস বলিল, ওর কথা বলবেন না। ও যদি কিন্তু

নিয়েই আছে। আপার এখানে উঠবে, তাতে কিন্তুটা আসে কোথা থেকে। আপনি ছিলেন না, তাই আপনিও বাঁচলেন, আর ও আমাকে টেনে নিয়ে ওর মামার বাসায় উঠতে পারলো। দু'দিকেই সুরাহা হয়ে গেল।

কথা শেষ করিয়া আব্বাস হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। কয়েক বছরে আব্বাসের চেহারা কিছু কিছু বদলাইয়াছে, তবে হোমায়েরা লক্ষ্য করিল তাহার হাসিটি তেমনি আছে।

হোমায়েরা বলিল, আমি না হয় নাই ছিলাম, কিন্তু আমার বাড়ী ত আমার সাথে মফঃস্বল যায় নাই। অধিকার খাটিয়ে দেখতেন, তখন না হয় বুঝতাম, কিন্তু কথা ত কত জনেই বলে।

আব্বাস বলিল, দোহাই আপা, আপনি আমাকে দায়ী করবেন না। ও জোর না করলে আমি কি করতাম, সেটা সেলিনাকেই জিজ্ঞেস করুন।

সেলিনা বলিল, না, আপা, আমি জোর করতে যাবো কেন। সুবিধা হলে আপনার বাড়ীতে থাকবো বলে আমিও ওকে বলেছিলাম।

আব্বাস মহাব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়া বলিল, এই এখন আরেক কথা বলছো কেন? তোমাদের মেয়েদের—

হোমায়েরার দিকে চাহিয়া হাসিয়া আব্বাস বলিল, না, আপা, আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমি ওদের কথা বলছি। সামনে এক কথা আর পেছনে এক কথা বলার স্বভাব মরলেও যাবে না দেখছি।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, বলতে চান, সব মেয়ের সম্পর্কেই বলুন আমার তাতে আপত্তি কিছু নাই।

সেলিনার হাত নাড়িতে নাড়িতে হোমায়েরা বলিল, ওর কথায় কান দিওনা।

সেলিনা বলিল, না, আপা, ওটা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কি কুক্ষণে যে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল!

আব্বাস তাড়া দিয়া বলিল, এই, এক শ বার এ-কথা বলো না। দেখা হয়েছিল তোমার সৌভাগ্য। কিন্তু গাঁটছাড়া বাঁধতে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, চাঁদ?

সেলিনা হোমায়েরার নিকট নালিশ জানাইয়া বলিল, দেখেন ত আপা, ও যদি এক শ বার আমাকে এই খোঁটা দেয় এতে ভাল হবে না বলছি।

হোমায়েরা মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছিল। সে বলিল, মোটেই উচিত নয়, মোটেই উচিত নয়। তা তোমরা বস ভাই আমি এখখনই আসছি।

আব্বাস বলিল, শুনুন, আপা যাবেন না। আপনি না জেনেই ওর পক্ষ নিচ্ছেন। তা হলে কিন্তু আপনার সাথেও ঝগড়া হয়ে যাবে।

হোমায়েরা যাইতে যাইতে বলিল, এখখনই আসছি। পরে যা হয় হবে।

জুলিকে ডাকিয়া হোমায়েরা কানে কানে কি বলিয়া দিল। জুলি দৌড়াইয়া বাবুর্চিখানায় গেল।

সেদিন ওরা বেশী সময় বসে নাই। পরে আরেকদিন আসার জন্য হোমায়েরা তাহাদিগকে দাওয়াত করিল। বলিয়া দিল, যদি তাহারা তাহার এখানে উঠিয়া আসে তাহা হইলে সে আরও বেশী খুশী হইবে।

আব্বাস বলিয়া গেল, আমি ত এটাই চাই, আপা।

আব্বাস আর সেলিনার যে বিবাহ হইয়াছে হোমায়েরা তাহা জানিত না। সে আন্দাজে ইহা ধরিয়া লইয়াছিল। কলেজ জীবনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার হাসি আসিল! সঙ্গী আর সঙ্গিনী সন্ধানই কি সকল উদ্দীপনার উৎস!

যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণই তাহাদের দুইটিতে ঝগড়া করিয়াছে। সেলিনা কোন কথা বলিলেই আব্বাস তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে, আর আব্বাস কোন কথা বলিলেই সেলিনা তাহার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়াছে। প্রথম প্রথম হোমায়েরার কেমন যেন অসঙ্গত আর বাড়াবাড়ি মনে হইয়াছে। তবে কয়েকদিনে আরও বেশী করিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আরও ভাল করিয়া বুঝার সুযোগ তাহার হইয়াছে। সে ইহা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে, জীবন যাপনের একটি নিজস্ব বিশেষ টেকনিক হিসাবে ইহাকে তাহারা গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে।

হোমায়েরার বাড়ীতে খাওয়ার দাওয়াত ছিল। বসিয়া গল্প করিতে করিতে আব্বাস বলিল, মুখে যাই বলুক, সেলিনা কিছুতেই মামার বাড়ী ছাড়বে না।

সেলিনা প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল, আমি মামা-মামীকে বলে দিয়েছি, আমাদের আটকে রাখার জন্য।

আব্বাস বলিল, এই একই কথা হলো।

সেলিনা হোমায়েরাকে মাঝখানে রাখিয়া বলিল, বলুত ত, আপা, মামা-মামী যদি বাধা দেন ত আমি কি করতে পারি। তাদের জওয়াব ত উনি দিতে পারেন।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, ঝগড়া না করে একমুহূর্তও কি তোমরা টিকতে পারো না?

আব্বাস বলিল, ঠিক ধরেছেন আপা, ও যে কি ঝগড়াটে তা কাউকে বলে বুঝাবার নয়।

সেলিনা ক্ষুণ্ন করিয়া বলিল, আমি ঝগড়াটে?

আব্বাস বলিল, না, সে ও পাড়ার লোক। আমার নেতৃত্ব ফলাবার চেষ্টার এই পরিণাম দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে আপনি হাসছেন, আপা। কিন্তু সে দোষও ওর।

সেলিনা বলিল, আমি কিছুই জানি না।

আব্বাস বলিল, জানবে কেন? কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে সকলেই বোকা সাজে। বুঝলেন, আপা, আমাকে গেলার জন্য ও আগাগোড়াই চেষ্টা করছিল। আমি অত-শত বুঝতে পারিনি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না গিলে ছাড়েনি। কিন্তু হজম করতে পারছে না।

তোমাকে হজম করে আমার কাজও নেই।

হোমায়েরা তাহাদের মাঝখানে বসিয়া হাসিতেছিল। আব্বাস বলিল, আপনি হাসছেন, আপা। কিন্তু ওর কাণ্ড যদি শুনতেন, আপনি চেষ্টা করেও হাসতে পারতেন না।

আব্বাস নির্ব্বিকার ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, বিয়েতে ওর মা-বাবা কারো মত ছিল না।

সেলিনা লজ্জিতভাবে বলিল, যাঃ! যা তা কেন বলছো।

আব্বাস বলিল, বারে! সত্যি কথা লুকাবার কি আছে? আমি যে একটা ছাই চাপা আগুন সেটা সেলিনা বুঝলেও তার মা-বাবার বুঝার ত কথা নয়, কি বলেন আপা? বাইরে যা করেছি তাতে তারা ধরে নিয়েছিলেন, আমি একটা অকালকুষ্মাণ্ড। বছরে বছরে পরীক্ষা দিয়ে পাশ না করতে পারাটা যে একটা কৃতিত্ব তা কিছুতেই তাদেরে বুঝানো গেলো না। বাতেল দুনিয়ার একেবারেই দৃষ্টিশক্তিহীন লোক ওরা কিনা।

সেলিনা বলিল, যাঃ।

আব্বাস বলিল, বারবার বাধা দিও না, সাবধান করে দিচ্ছি, তা হলে কথা হারিয়ে যাবে। তা, আপা, এরা আমার ভিতরের প্রতিভা দেখতে পারেন না, বাহিরটাই দেখবেন স্বাভাবিক। কিন্তু সেলিনা নাছোড় বান্দা, সে তাঁদের দৃষ্টি খুলে দেবেই। সে—

সেলিনা বাধা দিল, যা তা বলতে পারবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি।

আব্বাস বলিল, সত্যি কথাই বলছি। সেলিনা আত্মহত্যা করলো।

আব্বাস এমনভাবে বলিল, হোমায়েরা হাসিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

সেলিনার দৃষ্টিতে মিনতি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও দৃকপাত না করিয়া আব্বাস বলিতে লাগিল, মডার্ণ আত্মহত্যা, আপা, মডার্ণ আত্মহত্যা। এতে ঘাবড়াবার কিছু নাই। এমন আত্মহত্যা হরহামেশাই চলছে। শিশির অত্যন্ত পরিষ্কার, যাতে পড়তে সামান্য মাত্র বিলম্ব না হয় সে ভাবে ঝকঝকে হরফে পটাশিয়াম সাইনাইড লেখা থাকলেও আসলে ওতে সম্পূর্ণ নিরীহ আর নির্দ্দোষ সুগার অব মিল্ক ছিল। তবে কাজ উদ্ধারের জন্য এই লেবেলটি আর সেলিনার হাত পা ছোঁড়াই যথেষ্ট হলো।

সেলিনা আবার বলিল, যাঃ।

হোমায়েরা এবার অবাধে হাসিয়া বলিল, প্ল্যানটি ত মন্দ ঠাওরাওনি তোমরা।

সেলিনা বলিল, সব প্ল্যানই ওর, আপা।

আব্বাস বলিল, এই আবার, আবার।

তারপর থামিয়া বলিল, আপনি মেয়েলোক হয়ে বিপদে ফেলেছেন, আপা। ঠিক ঝোঁকের সময় সব কথা বলতে পারি না। না হলে, বলতাম মেয়েদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। দেখুন না, আবার সেলিনা মিথ্যে কথা বলছে।

সেলিনা রাগিয়া বলিল, আমি মিথ্যেবাদী, আমি আমি হেন-তেন, শুধু তাই যদি তুমি বলতে থাকো তা হলে তুমিই থাকো, আমি চললাম।

হোমায়েরা তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, তুমি ত ওর ডাকে আসনি আমার দাওয়াতে এসেছো। বসো।

আব্বাস মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে বলিল, এমন রাগ আমরাও করতে জানি, আপা।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, না, কারো রাগ করে দরকার নাই।

আব্বাস বলিল, কি বলেন, আপা, ও কি আমার কম সর্ব্বনাশ করেছে। লোকে আগে আমার প্রতিভা দেখতে পেত না, সেটা আমি পরোয়া করতাম না। কিন্তু এখন দুঃখের কথা কি বলবো, আপা, লোকে আমার প্রতিভা কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছে। যাঁরা আমার সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা আমাকে প্রেমময় স্বামী আর দায়িত্বশীল সংসারী দেখে হালে পানি পেয়েছিল।

সেলিনা ফোড়ন কাটিল—ইস্!

থাম।

তাহাকে ধমক দিয়া আব্বাস বলিতে লাগিল, কিন্তু বলবো কি আপা, আমি নিজে আমার প্রতিভার আর সাক্ষাৎ পাচ্ছি না।

আব্বাস যখন কথা বলিতে শুরু করে তখন দুনিয়ার কোন কিছু আর ইহাতে বাধ পড়ার জো থাকেনা। এক কথার সহিত অন্য কথার যে সঙ্গতি থাকিতে হইবে, ইহারও কোন মানে নাই।

ছেলে মেয়ের কথা উঠিতেই বলিল, বেশ ভাল আছি, আপা, খুব ভাল আছি।

সেলিনার সলজ্জ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু জ্বালা কি আর কম, আপা!

সেলিনা তর্জ্জনি হেলাইয়া বলিল, এই!

আব্বাস ইহাকে আমল না দিয়া বলিল, এক ধাতের মেয়েছেলে আছে, ওরা চিরকালই মেয়েছেলে থাকবে, কিছুতেই আর বদলাবে না।

হোমায়েরা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর এক জাতের মেয়েছেলে আছে, যারা আর মেয়েছেলে থাকে না, তাই নাকি?

আব্বাস আপত্তি জানাইয়া বলিল, এটা আমি বলছি না, আপা। আমি মেজাজের কথা বলছি। যতই এদেরে বাইরে টানুন, ঘরের কোণ ওদেরে আচ্ছন্ন করে রাখবেই।

সেলিনা বলিল, কেন বাজে বকছো?

আব্বাস আরেকটু উৎসাহের সহিত বলিল, এই সেলিনার কথাই ধরুন না কেন! তাকে দিয়ে কত হাও-বিল বিলি করিয়েছি, কিন্তু মেজাজ কিছুতেই বদলাল না। কি বলে জানেন আপা?

সেলিনা বাধা দেয়, যাঃ!

আব্বাস বলে, ছোট ছেলের ধাপাধাপি না থাকলে না কি ঘরের খুবিই হয় না। আমাকে তাড়া দিয়ে শেষ করে দিল।

সেলিনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার যা খুশি বল, আমি চললাম।

আব্বাস তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিল, যাবে কোথায়, আমি কি মিথ্যে বলছি? ও আর কি বলে জানেন, আপা?

হোমায়েরা বিব্রতবোধ করিতেছিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আব্বাস বলিতেই লাগিল, জাল ফেলেছে, আপা, চারদিক হতে জাল ফেলেছে। বলে, লোকে কি বলে। আরে লোকে কি বললো তাতে আমাদের বয়ে গেল। বেশ আছি, লোকের এটা সহ্য হয়না বলেই ত বলে। আমার মদদ করতে কি লোক আসবে!

এখানে আসিয়া আব্বাস সেলিনার দিকে ভেংচি কাটিল। কিন্তু কথা তাহার কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। সে বলিয়া চলে, যারা চিরকালই মেয়ে থাকবে তাদেরে কিছুতেই দেশ জাতি সমাজ পরিবারের সমস্যা বুঝাতে পারবেন না। এমন নির্ব্বোধ নিয়ে আমার যে হয়েছে কি ঝকমারি সে আর বলবো কি, আপা!

দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়া হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, বক্তৃতা ত অনেক শুনলাম, এখন চলুন দেখি ওদিকে, খাওয়ার কাজটা সেরে আরও ঝগড়া শুনবো।

আব্বাস বিনীতভাবে বলিল, বক্তৃতা করার বদ-অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারলাম না আপা। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নেই। পর্দার আড়ালে বক্তৃতা করি, কিন্তু সেলিনা কিছুতেই বুঝতে চায় না। ওকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দেন না, আপা।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ঝগড়া আপনার ভাল লাগে?

হোমায়েরা বলিল, ভাল লাগে কিনা বলতে পারি না। তবে এবার ভাল লাগলো।

আব্বাস উল্লসিত হইয়া বলিল, আপনি সত্যি সমঝদার, আপা, এ-জন্যই আপনাকে ভালবাসি।

সেলিনা বিরক্তি বোধ করিতেছিল। হোমায়েরা চোখ টিপিয়া হাসিল। আব্বাস বলিল, ঝগড়া হলো দাম্পত্য জীবনের চাটনী।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, তাই বুঝি আহার্য্য বাদ দিয়ে চাটনী দিয়েই সারা সংসার ভরে তুলেছেন?

যে কয়েক দিন ওরা ছিল, প্রত্যহই হোমায়েরার সাথে দেখা করিতে আসিয়াছে। হোমায়েরার কেন যেন বড় ভাল লাগিতেছিল। হালকা, উড়াইয়া দেওয়া জীবনে ভাব কোথাও জমিতেছে না, সংসারের উপর দিয়া সচ্ছন্দে ভাসিয়া ইহারা চলিয়াছে। হঠাৎ হোমায়েরার মনে হইল, লঘু হাস্যে তারল্য ছড়াইয়া যাওয়ার আড়ালে আব্বাসের সচেতন মনই হয় ত কাজ করিতেছে, হয় ত বা জীবনে আগ্রহের নয়া দিক খুলিয়া দেওয়ার জন্য আর্ট হিসাবেই সে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

যাওয়ার সময় সেলিনা বলিয়াছিল, বড় ভাল আছেন, আপা, কোন উপদ্রব সহ্য করতে হয় না।

আব্বাস হোমায়েরাকে আড়ালে পাইয়া বলিয়াছিল, কোন উপদ্রব সহ্য করতে হয় না আপনাকে, এটা বড় দুর্ভাগ্যের আপা! আপনাকে বলতে সাহস হয় না, আর বললে বেয়াদবী হবে, না হলে বলতাম, স্বাভাবিক জীবনে যত দুঃখই থাকনা কেন, এ দুঃখের মাঝেই আছে বাঁচার আনন্দ। আপনার সাথে তর্ক করে পারবো না, আপা, তবে আমি এটাই দেখছি, এ-আপনার স্বাভাবিক জীবন নয়।

নিজের সম্পর্কে কাহারও সমালোচনা শুনিতে হোমায়েরা অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আব্বাসের ব্যাপারটাই স্বতন্ত্র। তাহার কথা বলার এক বিশেষ কায়দা আছে। ভারী কথাটাকেও সে হালকা করিয়া তোলে। অবশ্য যে কথা বলিলে রাগ হইত, আব্বাসের মুখে সে কথা শুনিয়াই হাসিতে হয়। মনের নির্ভেজাল সারল্য ইহার অন্যতম কারণ কিনা, হোমায়েরা তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আব্বাসের সমালোচনা শুনিয়া সেও হাসিয়াছে। কিন্তু কথাটা যে হাসির নয়, হোমায়েরা তখনও বুঝিয়াছিল, এখনও বুঝিতেছে। সেলিনা সরল মন লইয়া বাহিরটাই

দেখিয়াছে, ছেলেমানুষের আলগা মন্তব্য ছাড়া সে আর কি-ই-বা করিতে পারে! আব্বাস হালকা উচ্ছ্বাসে মুহূর্তগুলিকে ভাসাইয়া রাখিলে ও চারপাশের পরিবেশকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। এই সহজ আব্বাসের মাঝেও যে একটি সত্যিকার সমালোচক আছে, সে ত হোমায়েরা বহু আগে হতেই জানে।

কিন্তু হোমায়েরার রাগ হইতে লাগিল, তাহার সম্বন্ধে কেহ কিছু কেন ভাবিতে যাইবে। সে যেই হউক, হোমায়েরা ইহা সহ্য করিবে কেন। তবে দূরাগত সুরের মত তাহার মনে পড়িয়া রহিল একটি কল্পনা। আব্বাস দেখিবে, সবকিছুরই পরিণাম আছে, স্বাভাবিকতার পথ ধরিয়াই সেই পরিণাম হোমায়েরা জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতির মত যে সুখ তাহার মনে মৌচাক রচনা করিতেছে, তাহা তাহাকে প্রসন্ন করিয়া তুলিল।

(ক্রমশঃ)

শহর থেকে দূরে

আলমগীর জলীল

শহর থেকে অনেক দূরে আজ
বিলাসব্যসন যেথায় কভু হায়
ফেল্‌ছে নিশাস্ সুদূর থেকে বাজ
নবীন তোমার মুখের পানে চায়

সেই না পথে গোলায় ভরা গাঁও
সেই না পথে গলায় ভরা গান
বিষের নিশাস মধ্যদিনের তাও
শুকিয়ে ফেলে থামলো নূপুর তান

সোনার মেয়ে জল্‌কে চলে কোন্
তালপুকুরে রাখাল বাঁশী মূক
বাঁশ বনেতে চাঁদবুড়ি এখন
রোগ-শোকেতে ধুঁকছে মরে সুখ

শ্যামল মাঠে কনক ধানের মউ
দুখের সুধা কে করেছে দূর
কলস কাঁখে সরল গাঁয়ের বউ
থমকে গেছে হঠাৎ নামে সুর।

দৃপ্ত-চেতন সুপ্তকারার সাঁঝ
করবে তুমি বাধার গিরি চুর
শুষ্ক বিতান হাস্‌বে ফুলের মাঝ
নবীন তোমার পথ যে অনেক দূর।

মরহুম কাজী নওয়াজ খোদা

অধ্যাপক মাহ্‌মুদ মোকার্‌রম হোসেন

মুসলিম বাংলার নবজাগরণের দিনে যাঁরা সমাজকে এগিয়ে চলার গান শুনিয়ে আত্মসচেতন করে তুলেছিলেন মওলভী কাজী নওয়াজ খোদা তাঁদের অন্যতম। জ্ঞান-বিমুখ, কর্মবিমুখ এমন কি জীবনবিমুখ বাঙ্গালী মুসলমানরা যখন নিঃসহায় এতিমের মত দিশাহারা, তখন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সংগে বাঙ্গালী মুসলিমের জাতীয় জীবনের প্রেরণায় আলোক বিচ্ছুরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন জ্ঞানসাধক নওয়াজ খোদা। তাঁর দায়িত্ব তিনি যথাসাধ্য সম্পন্ন করেছিলেন বলে আমরা তাঁকে বহুদিন স্মরণ করব।

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নামক গ্রামে ১৮৮০ সালে এক বিখ্যাত পরিবারে নওয়াজ খোদা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসংবাদ সমগ্র পরিবারে আনন্দহিল্লোল বহন করে নিয়ে আসে। তাহের শেখ নামক এক ব্যক্তি তাঁর নানা মওলভী জহুরুল হক সাহেবের নিকট এই সংবাদ দান করলে, তিনি এত তুষ্ট হন যে, সংবাদদাতাকে নিজের পরণের এবং গৃহের সমস্ত কিছু দান করে ফেলেন। মওলভী জহুরুল হক সাহেব নিজে বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং আরবী ও ফার্সিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মওলানা শামসুল ওলামা লুৎফর রহমান সাহেব তাঁরই শিষ্য ছিলেন।

কাজী নওয়াজ খোদা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তার আদি পুরুষ সম্ভবতঃ ইরাণ থেকে এ-দেশে আগমন করেন। এই মঙ্গলকোটে অবস্থানের সময় তাঁর পূর্বপুরুষের নিকট যুবরাজ খুর্‌রম একবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পলাতক খুর্‌রম দিল্লীর বাদশা হবার পরও এই আশ্রয়দানের কথা ভুলে যাননি। কৃতজ্ঞতার স্মৃতিস্বরূপ মঙ্গলকোটে তিনি একটি সুদৃশ্য মসৃজিদ নির্মাণ করেন। 'শাহজাহানী মসজিদ' নামে খ্যাত সেই মসৃজিদটি এখনো নওয়াজ খোদার পূর্বপুরুষের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

মরহুম নওয়াজ খোদার বাণীপাঠ শুরু হয় স্থানীয় খ্যাতনামা বিশিষ্ট আলেম মওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটির নিকট। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য এই যে, মওলানা মোহাম্মদ এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের পিতা উভয়েই দিল্লীতে 'মিয়া সাহেব' নামে খ্যাত মওলানা নাজির হোসেন সাহেবের নিকট-সহপাঠি ছিলেন। নওয়াজ খোদা আরবী-ফার্সিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান পিপাসা এতো প্রবল ছিল যে, তিনি নিজেই বাংলা এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন শুরু করেন এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জ্ঞান আহরণে মশগুল ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন অমায়িক তেমনি নির্ভীক ছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে নিষ্ঠাবান উদার হৃদয় নওয়াজ খোদার ব্যবহারগুণে হিন্দু মুসলিম সকলের নিকট তিনি সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। প্রায় দু বৎসর পূর্বে তিনি মঙ্গলকোট থেকে পূর্বপাকিস্তানের যশোর জেলার অন্তর্গত কুমারখালি নদীর ধারে সারেঙ্গদিয়া গ্রামে এসে বসবাস করছিলেন। চলতি ইংরেজী সনের জানুয়ারী মাসে ৭৯ বৎসর বয়সে এই জ্ঞানসাধক মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর অনুজ মওলভী কাজী আল্লা নওয়াজকে ডেকে বলেন,—'ভাই, এবার আমার বিদায়। একটি আশা শুধু। যদি মওলানা আকরম খাঁ সাহেব আমার জানাজার ইমামতি করতেন, তা হলে আমার আত্মা তৃপ্ত হত।'

নওয়াজ খোদা সমগ্র বাংলা দেশে সুপরিচিত ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে। তিনি অকৃত্রিম সাহিত্য সাধক ছিলেন। জাতিকে সুসংগঠিত করতে হলে সাহিত্যের প্রয়োজন এবং সে-সাহিত্য এমন হবে যার মাধ্যমে জাতি তার অতীত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং পেতে পারে ভবিষ্যতের পথের সন্ধান। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি আজীবন লেখনী চালনা করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি যে যুগে এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বাঙ্গালী মুসলমানের তখন অত্যন্ত দুর্দিন। সাহিত্যে বিলাসিতা করা তখন শোভা পেত না। নওয়াজ খোদা বলতেন—"ইমারত তৈরীর পূর্বে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজন। আমরা ভিত্তি স্থাপন করে চলেছি। সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণের ভার ভাবীকালের সাহিত্যস্রষ্টাদের।"

তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় পণ্ডিত রেয়াজুদ্দিন সম্পাদিত 'ইস্‌লাম প্রচারক' পত্রিকার মাধ্যমে। প্রথমতঃ নওয়াজ খোদা ইস্‌লাম প্রচারকে প্রকাশের জন্য একটি কবিতা প্রেরণ করেন; কিন্তু গুণী সম্পাদক তাঁকে সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনার জন্য উৎসাহিত করলে তিনি ইমাম গাজ্জালী রচিত 'এহিয়া আল উলুম'এর প্রাঞ্জল অনুবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁর লেখনীর শক্তিমত্তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং প্রচারক, নবপ্রতিভা, নবনূর, কোহিনুর প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ হতে থাকে। মওলানা মোহাম্মদ

আকরম খাঁ সম্পাদিত "আল ইস্‌লাম" পত্রিকায় তাঁর লিখিত সাদী, খৈয়াম, নেজামী, জামী, হাফেজ, খসরু প্রভৃতি কবি সাধকদের জীবনী ও কাব্যালোচনা বাংলার মুসলমানদের মানসলোকে নবপ্রেরণার দিগন্ত খুলে দেয়। 'মহাকবি সাদী' গ্রন্থাকারে মোহাম্মদী অফিস কর্তৃক প্রকাশিত হলে বাংলার সুধী মহলে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। এই সময় খ্যাতনামা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং পরিচিতি প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কুমুদ রঞ্জনের বিবাহে নওয়াজ খোদা একটি সুন্দর কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁরই অনুরোধে নওয়াজ খোদা 'প্রদীপ,' 'নবপ্রতিভা' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। নবপ্রতিভায় তাঁর বিশিষ্ট রচনা ফার্সি সাহিত্যের প্রথম অবস্থা, রুদেকীর জীবনী ও সাহিত্য ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "উপাসনা" পত্রিকায় তাঁর লিখিত প্রবন্ধ "হাফিজের গজল" এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় "ওমর খৈয়ামের জীবনা" ও "নেজামীর জীবনী" প্রভৃতি রচনা তাঁর সাহিত্য কীর্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাসিক মোহাম্মদী আত্মপ্রকাশ করলে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁকে সহ-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন এবং দুই বৎসর কাল তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এই পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। এই সময় প্রায় প্রতি সংখ্যায় তাঁর কোন না কোন বিষয়ের রচনা মোহাম্মদীতে স্থান পেত। তন্মধ্যে "ইমাম বোখারী" ও "আলফিন্দীর জীবনী" প্রভৃতি রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের উৎসাহে প্রকাশিত 'বারোয়ারী' উপন্যাসের তিনিও অন্যতম লেখক। তাঁর লিখিত অংশের সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। তা ছাড়া, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, আল মুস্‌লিম, দৈনিক আজাদ প্রভৃতি পত্রিকায়ও তাঁর যথেষ্ট রচনা স্থান পেয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাত কবি কাদের নওয়াজের নিকট ভক্তিভরে বলেছেন,—"মওলানা সাহেব অসাধারণ পণ্ডিত। আমার বহু লেখা তিনি সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। তাতে আমার রচনাসমূহ অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি।"

আজ পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃষ্ট ইতিহাস রচনার আমরা উদ্যোগ করছি। বাংলার মুসলিম আন্দোলনের গঠনযুগের জননায়কদের স্মরণ করবার দিন এসেছে। এই সুযোগে বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাদের কাছে একটি আবেদন পেশ করতে চাই। কাজী নওয়াজ খোদার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মূল্যবান রচনাসমূহ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার কলেবর থেকে সংগৃহীত করে একটি সংকলন প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী উদ্যোগী হলে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন হত। এতদ্‌সংযোগে উল্লেখ করা যায় যে, মওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটি লিখিত 'আশায়ে মুসা' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি যাহা এক্ষণে কলিকাতা মাদ্রাসায় রক্ষিত আছে তাহা কাজী নওয়াজ খোদার হস্তাক্ষরে লিখিত। এই পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতা মাদ্রাসা হ'তে আনয়ন করতঃ একাডেমী মিউজিয়ামে রাখবার ব্যবস্থা করলেও একটি বড় কাজ করা হত বলে আমরা মনে করি।
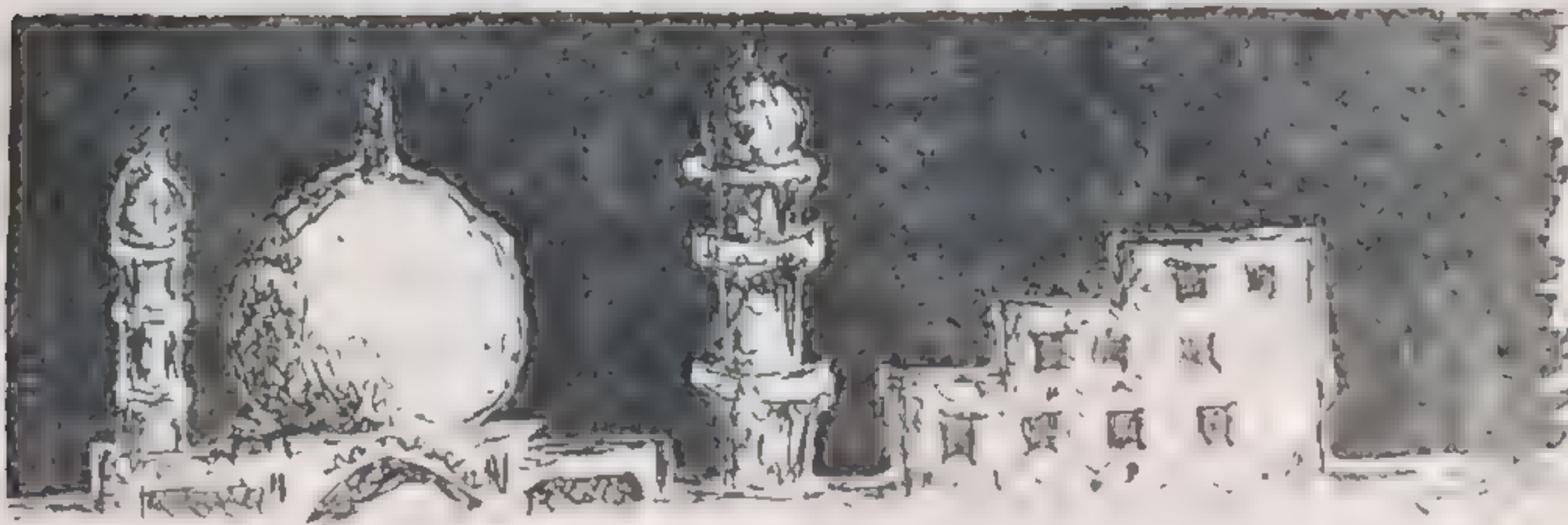
রূপ-রঙ

শহীদ আখন্দ

আম্মা গো, জয়তুন রে—

বিকৃত কণ্ঠের বৃদ্ধ-শিশুর অসহায় কাতর ডাক এবং তার গরগরে রেশ পথচারীকে মুহূর্তেকের জন্য বিমনা করে দেয়। আম্মা এবং জয়তুনের অমনোযোগিতার জন্য রাগ হয় কারো কারো। কিন্তু ওইটুকুই। পল্লীটা একি অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর—তদুপরি এ-পথে যাদের যাতায়াত তাদের কারোরই মানসিকতা এতো দারাজ ও প্রসন্ন থাকে না যাতে করে কয়েকটা মিনিট খয়রাত করে উঁকি দিয়ে সত্যি চেহারাটা দেখে নেয়। যেখানে এই আর্ত কাতরোক্তি ওঠেছে তার থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে ডানহাতের দিকে গোরস্তান, সেখানে সখ করে কেউ যায় না। মৃতদের জন্য পৃথিবীর জীবিতরা অন্তিম কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে আসে মাত্র। প্রিয়জনেরা ফেলে অশ্রু, অন্যান্য দারুন-সঙ্গীরা করে প্রার্থনা। সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস-জাতীয় গাছ দুপাশে, মাঝে-সাঝে নিম। তার নীচে রকমারি ভিখারিরা বহুতর কণ্ঠে সৎকারীদের কাছে করছে দুটো পয়সার জন্য কাতর আবেদন।

কোন কোন গাছের নীচে মাচাঙ তৈরী করে কালো বোরখাবৃতা মোক্ষ ও অর্থকামী ললনারা খোলা কোরান-শরীফ সামনে রেখে অনুচ্চকণ্ঠে পাঠ করে। কোন দল নিকটবর্তী হলে কণ্ঠ হয় অপেক্ষাকৃত উচ্চ আর ঘনঘন দৃষ্টি পড়ে কোরান শরীফের ডানপাশে বিছানো সাদা কাপড়টার ওপরে। আনি-দুয়ানি সিকি-আধুলি এমন কি টাকাও আছে তাতে।

তার পাশে কল। এখন পানি নেই, তাই কলসীও নেই। সন্ধ্যার আগে আগে পানিওয়ালিদের দৈহিক আর কাস্তিক বীরত্বের, মৃত্যুর আর জীবনের, অর্থের আর মোক্ষের, প্রয়োজনের আর পরিণতির অদ্ভুত অভূতপূর্ব অপার্থিব সমন্বয়ও নাই।

এখন কোরান শরীফ নিয়ে চলে গেছে ললনারা, খালি মাচাঙ। আলো জলছে ন্যাংটা পীরের লাল সালু-ঢাকা দরগায় আর চা-খানায়। আলো জলছে ফটকের ডানপাশে অফিসঘরে—মুানিসিপ্যালিটির মৃত্যুর হিসাব রক্ষক সারা দিনের জমা খরচ মিলোচ্ছে।

গোরস্থান নীরব, নির্জন। গন্ধরাজ আর হাস্নাহেনার গাছগুলো বাতাস করছে, মৃত্যুহিম কবরে আর অন্যান্য ঝোপেরা নীরবে প্রহর জাগে।

সমস্ত কিছু বিদীর্ণ করে থেকে থেকে সেই বৃদ্ধের আর্ত কণ্ঠে, 'জয়তুনরে, আম্মারে'—কাঁপিয়ে তুলছে নিরঙ্ক ইথারের স্রোত।

জয়তুনি, কই গেলিরে—

নসুমিয়ার চা-খানায় আড্ডা জমে।

একজন বলে, শালা বুড়ো পাগল অইয়া যাইব এলায়। জয়তুনি মরছে যে বিস্ওয়াস করে না। কইতে গেলে মারতে আহে।

আর একজন দরদ জানায়, আহা বুড়াটার দেখবার কেউ নাই। একটা শাদী করাইয়া দিলে কেমুন অয় এলায়। মনসুরির মারে কইয়া দেখুম নাকি?

আলাপের ধারা এগিয়ে চলে। কখন্ সেই আর্ত কাতরানি বন্ধ হয়ে যায় টের পায় না কেউ। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে বুড়ো, নয়ত ভাবছে, নয়ত বিকৃতমস্তিষ্কে তন্দ্রা এসেছে স্পষ্ট সে দেখছে জয়তুন তার মুখের কাছে এগিয়ে ধরেছে গরম দুধের বাটি।

গরম দুধের বাটি এগিয়ে ধরেনি কেউ। হঠাৎ বৃদ্ধ চোখ বুঁজে যন্ত্রের মতো কাতরাতে কাতরাতে অনুভব করে শিয়রে এসে বসেছে যেন কে!

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কে ও গা?

আমি জয়তুন, আব্বা।

জয়তুনের বাপ কাঁপতে থাকে। কত রকমের সংস্কার ধীরে ধীরে দানা বেঁধে পাথরের মতো স্তূপীকৃত হয়ে সেঁটে আছে মনে। সঙ্গে সঙ্গে বয়স-জাত স্থৈর্যের বিশ্বাসও আছে। এতক্ষণ যে জয়তুন আর আম্মার নাম ধরে আর্ত্ত-ডাকে প্রহর কাঁপাচ্ছিল, সে তো তার নিরবলম্ব অসহায় মনকে সান্ত্বনায় বাঁধতে, উদ্যত নৈরাশ্যকে ভয় দেখাচ্ছিল আত্মগত ক্রন্দনে।

জয়তুন ত মইরা গেছে, তুমি আর কেউ। কেডা তুমি?

আমি তোমার আর এক মেয়ে আব্বা, বড়ো দুঃখা মানুষ। জয়তুনকে কেন ডাকছিলে বলো, আমি করে দেব।

বৃদ্ধের সন্দেহ ঘোচে না। ভদ্রলোকের মেয়ে, যোয়ান বয়স, দেখতে ছবির মতন সুন্দর। ঠকাতে এসেছে সখ করে নাকি? বাবু লোকদের কত খেয়ালই যে হয়—গরীবের দুঃখ নিয়ে তাদের বিলাস—নতুন কথা তো নয়।

কি, কথা বলছো না কেন?

তুমি ভালা মানুষের মেয়ে যে।

ভালা মানুষের মেয়ে দুঃখী হয় না বুঝি। মাথায় হাত

বুলিয়ে মেয়েটি বলে, তোমারও জয়তুন নেই, আমারও আব্বা নেই, খোদাই জুটিয়ে দিলেন, তাই না।

জয়তুনের বাপের চোখে পানি আসে। সে কি মৃত কন্যার স্মৃতিতে না কি দুঃখীর দুঃখ বুঝেছে এমন একজন সহদুঃখী তিনরাত্রি আর্তকান্নার পর আজকে এসে বুক দিয়েছে বলে ?

জয়তুনের বাপ বলে, কিন্তুক পাড়াটা ভালা না যে। বদ্‌মানুষে ভর্‌তি। তোমার বয়স খারাপ, কোন শালা নজর দিলে, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি রে মা।

একটু থেমে, তার চাইতে তুমি যাও গিয়া। অই-ই ভালা নাই নাই-ই।

মেয়েটি বলে, আমার যে যাবার আর ঠাঁই নেই আব্বা; বিশ্বাস কর সত্যিই বড় অসহায় আমি !

জয়তুনের বাপের ত্রিসংসারে কেউ ছিলনা একমাত্র জয়তুন ছাড়া। যদিও জয়তুন মরে গেছে তথাপি তার মৃত্যু এই নিঃসঙ্গ বুড়োর জীবন থেকে তাকে নিঃশেষে মুছে দেয়নি, ঘরের তৈজসপত্রে, ছেঁড়া কাঁথার খাপছাড়া রকমের মোটামোটা সেলাইয়ে, এককোণে সযত্নে রক্ষিত দীর্ণ পাদুকায়, কাঠের বাক্সের ওপরে জিলের ফাঁকে কালো কাপড়ের আচ্ছাদনে জয়তুনের কোরান শরীফে, দুধের বাটিতে এখনো বেঁচে আছে সে। কোন জরিষ্ণু রাতের ঝিম-ধরা মুহূর্তে ওর তন্দ্রাচ্যুত কানে যায় জয়তুনের পদধ্বনির কোমল আওয়াজ। ত্রিসংসারে ওর কেউ নেই, আছে তবু জয়তুন।

বুড়ো বলে, কিন্তুক আমার রোজগার যে কইমা গেছে অখনে। বসাইয়া বসাইরা তোমারে খাওয়ানোর সাধ্য আমার ত নাই। জয়তুন ত আমার মেলা রোজগার কইরা আমারে খাওয়াইত।

কি করতো জয়তুন, আমিও তাই করতে পারব।

পারবানা তুমি। অইটা তোমার কাম নয়। অই যে কোরান শরীফ, অইখান লইয়া রাস্তার পাশে মাচাঙে বসে মিঠে আওয়াজে পড়তো আস্তে আস্তে। তাতেই দিনে যা আসত মে-বেটায় তাই আছিল ঢের—ঢের।

সাহানার মুখ দপ করে নিভে যায়। সে তো আরবী পড়তে জানে না। কোরান শরীফ পড়ে রোজগার তার দ্বারা কি করে হবে। ও বলে তা।

বুড়ো বলে, আরে পড়তে কি জানতে হয় ! অমনি সামনে খুইলা রাইখ্যা বইসা থাকলে আর—একটা সুরাও জান না ? ব্যস, একটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সুর কইরা শুনবার পারে অথচ বুঝবার না পারে কেউ তেমন কইরা পড়লেই হল। জয়তুনও ত হাফেজ আছিল না।

সাহানা শিউরে ওঠে, সে কি, খোদার কিতাব নিয়েও ভণ্ডামি !

বুড়ো হাসে, হু-হু, কইলাম কি তবে। ও কাম তোমার নয়, জয়তুনের। ভণ্ডামি কোন্ শালা না করে, এমুন দরবেশ আইজের দুইনায় কয়জন আছে, কও তুমি ?

সাহানা ভাবে, সত্যিই তো। বর্তমান বিশ্বের সভ্যতা-জর্জর রঙ্গমঞ্চে, সমাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্র অবধি নিরঙ্কুশ সত্য কোনো স্তরে বিদ্যমান আছে কি ? ইচ্ছে করেও কয়জন ভালমানুষ আপনার ভালমানুষিক সঙ্কল্পে অটুট থাকতে পেরেছে ? সাহানার নিজের জীবন ব্যর্থ কেন ? ভণ্ডামি সবাই করছে, কেউ বাইরের সঙ্গে কেউ ভেতরের সঙ্গে, যারা বিশ্বের সঙ্গে করে না তারা নিজের সঙ্গে করে। সাহানার প্রত্যক্ষ জীবন তার প্রমাণ ! বলে, পারব বাবা, খুব পারব। তুমি দাও নামিয়ে কোরান শরীফ।

জয়তুনের বাপ অবাক হয় না। ওঠে গিয়ে কুলুঙ্গির ওপর থেকে একটা কালোমত পোটলা নামিয়ে সাহানার হাতে তুলে দেয়, তাহলে এইটা আগে পরন লাগবো।

একটা ময়লা বোরখা কিন্তু তালিমারা নয়।

কী আশ্চর্য, সাহানার ভাল লাগছে। মন থেকে বেশ স্বচ্ছন্দ সম্মতি মিলছে। যে জীবনকে পেছনে ফেলে এল, যার কোন স্মৃতিই বয়ে আনে নি সঙ্গে করে, তা থেকে এ যেন অনেক অনেক ভাল। বোরখাটা ভালই তো। রঙটা একটু খাবলা খাবলা ওঠে গিয়ে মাঝে মাঝে ধূসর ধূসর হয়ে গেছে। তা হোক, তার নিজের জীবনের ওপরও তো এমনি ধারা বহু দাগ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। পরে নেয় বোরখাটা।

বুড়ো এগিয়ে দেয় কোরান শরীফ, আড়ষ্ট হাতে তা ধরে। কেমন একটু ভয় ভয় লাগছে—মনে হচ্ছে এই বস্তুবস্তুটির এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যা একলহমার গর্ভে অসম্ভব রকম ম্যাজিক খেলা দেখাতে পারে। হাতের সঙ্গে বুকটাও একবার কেঁপে ওঠে।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য।

বুড়ো বলে, যাও আম্মা। তোমারে আমার জয়তুনের মতো লাগতেছে। ওই নিমগাছ, তার নীচে জয়তুনের মাচাঙ, দুদিন ধরে অন্য একটা মায়ালোক বহে, আমার কতা কইও, উইঠা যাইবো।

জীবনে অদ্ভুত এক আস্বাদন। বোরখাটার জন্যই তার দিকে ভুলেও কেউ তাকাচ্ছেনা। পথচারী অনেক ভদ্রলোক, আশফাকের মতো, ম্যানেজারের মতো, খালেকের মত অনেক। কিন্তু সে যেন অবলীলাক্রমে পৃথিবীর সমস্ত সিষ্ট কিম্বা উদগ্র কৌতুহল জয় করে এই জনস্রোতের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র এক অতি মানবিক রূপে স্বতঃ বিহার করছে।

একটা ছোকরা সিগ্রেট টানতে টানতে যাচ্ছিল, হঠাৎ

পকেটে হাত দিয়ে একটা আধ-আনি ছুঁড়ে দেয় কোরআন শরীফের ডান পাশের কাপড়টার ওপর। ওমা, এটি আশফাকের ভাই না ? তাই তো, এরি মধ্যে সিগ্রেট ফুকছে ! এক্ষুনি যদি এই অসমঞ্জস পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সাহানা, হাতের সিগ্রেটটা কোথায় যে নিক্ষেপ করবে ভেবে পাবে না এই ছোকরা। ভয়ে তটস্থ হয়ে বলবে, সাহানাপা ! সিগ্রেট আমি খাইনে ত, কই, হ্যাঁ ওটা এমনি সখ করে কিনেছিলাম, কেমন লাগে দেখতে। কেন যে টানে মানুষে—যাই মুখটা ধুয়ে আসি গে।

সাহানা হাসতো হয়ত।

যেমন করে হেসেছিল আশফাক তার প্রাইভেট টিউটর হয়ে আসার পরে প্রথম দিনটিতে, মাষ্টার সাব কিন্তু ভারি অন্যায় ডাক ! আমার মুখ দিয়ে তো বেরোবে না।

কিন্তু নাম ধরে ডাকা তো খুব অন্যায় নয়।

ওর শেষে ভাই যোগ করলে দুরস্ত হয়ে যায়, আশফাক ভাই।

অথচ কেন কি করে আশফাক ভাই আবার কাটচাট হয়ে শুধু আশফাক হয়ে গিয়েছিল তা দু'জনের কেউ টের পায় নি। টের পেয়েছিল সেদিন—

ইতিমধ্যে অনেক পয়সা জড় হয়ে গেছে কাপড়টায়। মৌলিক প্রার্থনার সুরে আবেদন রত ফকিররা আড়চোখে দখে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠছিল। অন্যান্য পাঠিকারা কিন্তু তা করতে পারে না, কেননা তাহলে বোরখা এবং কোরান শরীফের সঙ্গে বেখাপ্পা হয়ে পথিকের দৃষ্টিতে কটু হবে সে আচরণ। পাশেও তো একটা মেয়ে পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নিম্নকণ্ঠে কে যেন বলে ওঠে, বিড়ি আছে ত ?

পাশের পাঠিকা। জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করেনা সাহানা।

ভারী তো দেমাক, কতা কওনা ক্যান্ ?

বিড়ি নেই।

নেই ! আবার কলকেতাই জবাব ক্যান্ বাপু; পড়ছো তো কোরান শরীফ !

দুত্তোর মারি তোর রোজগার আর জয়তুনের নিকুচি করেছে, ভাবে সাহানা। পারে তো এই মুহূর্তে উঠে যায়। কিন্তু ভালও তো লাগছে ওর।

এমনি ভাল লেগেছিল আশফাকের সাহচর্য। যদিও ইচ্ছে হতো, এই গুরুমশাইগিরির মুখোশটা খুলে দিয়ে ওকে বাধ্য করে নৈত্যিক পড়াশুনার বেনামীতে প্রাণান্ত-করী পণ্ডশ্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করতে, তবু ভালই লাগতো। সে কেমন ভাল লাগা তা টের পেয়েছিল তার বিদায় গ্রহণের দিন।

যাই সানু।

এসো। কিন্তু তুমিই তো আমায় কচ-দেবযানির কাহিনী শুনিয়েছিলে ?

হ্যাঁ, কিন্তু অনেক কাজ যে আমার।

ওষ্ঠাগত অভিমান কঠিন অহমিকার রোষে চাপা দিয়ে সাহানা বলেছিল, কাজ তো সবারই আছে, বলতে না এলেই ভাল করতে।

আরো কি কি যেন বলেছিল। কিন্তু আশফাক জীবনে প্রতিষ্ঠা চায়—প্রেম পথ রোধ করে দাঁড়ালে সে প্রেম বর্জনীয়—বিষবৎ। প্রেম ? টাকায় প্রেম কিনে—আশফাক তা ই চায়।

না, আমার মরনই ভালা। ভিক্ষা দিতে চায়ই না কোন হালায়—তা দিবেই আর কয়জনকে, সব হালারা ভিক্ষা করতে বাইর অয়। ভিক্ষা নিয়াও মারামারি ! তোমার কত অইছে জয়তুন ?

জয়তুনই ডাকে বুড়ো, সাহানা আসেনা তার মুখ দিয়ে ভিক্ষুকের মুখ তো, !

সাহানা কাপড়ের পোটলাটা বাড়িয়ে দেয়।

হাতে নিয়ে বুড়ো উল্লসিত হয়ে ওঠে, বেশ ভারী লাগতেছে ! বা-রে বেটি বাঃ।

আমি আর যাবনা কাল থেকে। তুমি ঠিকই বলেছ আব্বা ও কাজ জয়তুনের, আমার নয়।

বৃদ্ধের উল্লাস বিমূঢ়ের মতো শুদ্ধ হয়ে যায়। বলে কি মেয়েটা, এত রোজগার ! কি জানি, ভালমানুষের মেয়ে, অভ্যেস নেই।

কোন শালায় কইছে নাকি কিছু ?

না।

তবে ?

অন্য কিছু করব। তুমি ভেবো না, দেখো ঠিক চালিয়ে নেবো আমি।

কিন্তু পরদিনও যায়।

এই নোংরা বোরখাটা কি যেন মায়া বিস্তার করে। একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ পরিচিতের কাছে অপরিচিত হয়ে থাকার একটা সুতীব্র কৌতূহল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও জীবনকে দেখবার নির্লিপ্ততার সরলতার প্রতি ছেলেমানুষী দুষ্টুমি—এই বোরখা নইলে কিছুই যে চরিতার্থ হয় না এগুলোর।

পরদিনও যায় তাই।

বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বহু সভ্যভব্য অভিজাতের শোভাযাত্রা যাচ্ছে একটা ফুলমাল্য বিভূষিত সৌখীন খাটিয়া। মৃত্যুতেও কতো বিলাস ! কিন্তু লোকগুলো সবই তো চেনা-চেনা ঠেকছে। সেই মরিয়ান কোম্পানীর অফিসের লোকজন সব। সাহানার কেমন সন্দেহ হয়।

উঠে যায় জয়তুনের বাপ যেখানে বসে ভিক্ষে করে সেখানে। কি বলে ফিসফিস করে, তারপর ফিরে আসে স্বস্থানে। জয়তুনের বাপ উঠে যায় এবং কিছুক্ষণ পর পাঠরতা সাহানার কাছে এসে বলে নিম্নকণ্ঠে, কয় বহুৎ বড়া সাহেব, ইন্‌সান-জি নাকি নাম। জয়তুনের বাপ জানিয়েই চলে যায়।

ইনসান-জি সাহেব। মরিয়ান কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার ও ম্যানেজার। মরে গেছে। কি হয়েছিল?

সাহানা সেলসম্যান হয়ে চাকরী নিয়েছিল মরিয়ান কোম্পানীতে। সোনা মিয়া এসে বলেছিল, দেখবেন আপা, ম্যানেজারকে বিশেষ পাত্তা দেবেন না। লোকটা সুবিধের নয়।

সোনা মিয়া অন্যতম পুরুষ-বিক্রেতা।

কেন, কেন?

বলে রাখলাম এই আর কি। নতুন এসেছেন, আস্তে আস্তে সব বুঝবেন। কিন্তু বোঝার আগে তো জানতে হয়, তাই জানিয়ে দিলাম। লোকটা তেমন সুবিধের নয়। কি জানেন? আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে আপনার মতো মেয়ের জায়গা এটি নয়। বুঝতে পারছি, নিরুপায় না হলে কেউ আসে না। তবে একটু সতর্ক থাকবেন।

সোনা মিয়া প্রাচীন কর্মচারী, বয়স হয়েছে। জ্ঞান দিয়ে যায় সাহানাকে, এখন বুঝবার দায়িত্ব তার।

সাহানা চমকে ওঠে বলেছিল, কিন্তু খালেদা? ওর যে নেই?

আরে ওর কথা ছেড়ে দেন, ওর কি আর ভবিষ্যৎ আছে? নষ্ট মেয়ে! ওই তো হয়েছে জ্বালা—কি বলব, চাকরী করি, নইলে—

সোনা মিয়া কথা শেষ করেনি। সাহানার এক বিজাতীয় ঘৃণা খালেদাকে বিষদৃষ্টিতে দেখার জন্য প্ররোচিত করে তাকে।

সোনা মিয়া ফিরে আসে, বলে, ভালবাসার কথা বলবে, ঘরে দাওয়াত করবে, আপনার মনে হবে আপনি বই আর কিছু জানেনা লোকটা। ভাববেন, লোকটার টাকা আছে, কিন্তু সুখ নেই। ব্যস, এর ওদিকে গেছেন তো মরেছেন, ভারী ধুরন্ধর, চুল পাকিয়েছে ওই করেই।

কিন্তু খালেদার জন্য দুঃখ হয় ওর।

বলে, কিন্তু আপনি এতো কথা জানেন কি করে?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল লোকটা, জানি কি করে? আমায় জিজ্ঞেস করবেন না, অই খালেদাকে জিজ্ঞেস করুন, জিজ্ঞেস করুন সোনা মিয়া তোমার জন্য কবে থেকে বুকের রক্ত পানি করছে, কতদিন হয়েছে।

অশ্রু যেন হাসির চেয়ে ছোঁয়াচে তবে হাসির মতো এতো বেখেয়ালি কিম্বা বেহিসেবিও নয়, দ্রুতও নয়, প্রাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাতে আঘাতে ঢেউ ওঠে ফেনার, অনুভূতি সংক্রমিত হয়ে চোখ বেয়ে ঝরে।

সেই মরিয়ান কোম্পানীর চাকরী করতে পারে নি সাহানা।

সেই মরিয়ান কোম্পানীর দুষ্টগ্রহটিও মরেছে তা'-হলে? এবং এতো শীঘ্র!

সাহানা অবাক হয়। কেন, মৃত্যুতে অবাক হবার কিছু তো নেই। হামেশাই মরছে মানুষ, এখানে থেকে মনে হয় মানুষ যেন খালি মরছেই, মৃত্যুর ওপর দিয়েই পাথিক শোভাযাত্রা—যার নাম জীবন। যা নাকি সীমা দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত। একমুঠো টাকা দিয়ে কয়দিন আর চলে হাওয়াই বাজির খেলা। হুঁ।

কোরান শরীফ গুটিয়ে সাহানা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, সমস্ত শরীরের রক্তস্রোতে হঠাৎ কি একটা আড়ষ্টতা তার মনকে করছে বিহ্বল, ব্যথাতুর।

খালেক না দাঁড়িয়ে? কি করছে ওখানে?

না, গান শুনছে রেডিয়োর। এই মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা-স্থলে রেডিয়োর গান হয়—খবরের কাগজের ফেরীওয়ালাও আসতে কামাই দেয় না।

হতভাগ্য বেচারী খালেক!

একটা কাগজ কিনে নেয় সাহানারা।

অন্তর ভরা ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিল ওর দ্বারে প্রার্থী হয়ে।

বলেছিল, তোমার বাবা তো নেই, তোমার চলবে কি করে?

চলে যাবে এক রকম আর কি?

কিছু যদি মনে না করো—

খালেক নিবেদনে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। খুব বড়ো চাকরী করে না, তবু যা পায় দুজনের সংসারে জন্য যথেষ্ট। মানুষ অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু মনের মানুষ মিলে খুব কম। সাহানাকে ওর ভাল লেগেছে।

কিন্তু সাহানা, তার একরাশ রূপ, পরবর্তী কালে যার সঙ্গে ছবির তুলনা দিয়েছে জয়তুনের বাপের মতো অশিক্ষিত অক্ষমবাক বৃদ্ধ, নিয়ে বিপর্যস্ত হয়, তবু সায় পায় না মনের। এ মন যে অন্য নিবেদিত। আশফাক সৎপথে থেকে উপার্জন করবে, অনেক টাকা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ জন্য সাহানার প্রতি তার একটু একটু আকর্ষনকে মূল্য দেয় না, তার কাছে প্রেম ভালবাসা সিজনমার, অর্থহীন, অসঙ্গত অতি মূল্যবান শুধু। যে কোন ভদ্রঘরের মেয়ে নিয়ে সে ঘর করতে পারবে, বিশেষের প্রতি তার মোহ নেই, নেই-ই তো!

তবু খালেক ফিরে গিয়েছিল।

তবুও আসতো সাহানার গান শুনতে। সঙ্গীতানুরক্ত অক্ষম জীব, আহা! জীবনের স্পর্শাতীত সৌন্দর্যের সঙ্গীতে বিমুগ্ধ।

মরিয়ান কোম্পানীর ইনসান-জির নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে পালাতে হয়েছিল। অনেক দুর··· স্কুল মাষ্টারনীর সম্মান-শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে হয়তো পারতো। কিন্তু এই রূপকে নিয়ে সে করবে কি? ওর ইচ্ছে হতো সুন্দর সে-স্রষ্টা এ-সৌন্দর্য ধ্যানের অলক্ষিতে অমূর্ত বাসনার রঙে গরল ছিটিয়ে দিয়েছে সর্বাঙ্গে; তাকে জিজ্ঞেস করে, দুইয়ের মধ্যে সত্যি জিনিষ কোন্‌টা। তাই অনেকদিন পরে এখানে ফিরে এসে যেন বিস্মৃতপ্রায় অতীতের এক একটি ঘটনা এক একটি অনুচ্ছেদের মতো পুরানো পুঁথির ভেতর থেকে বর্তমান পাঠকের সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। ওর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে একটু অংশ ছিঁড়ে রাখে।

নামহীন এক ঠিকানা, অভিজাত ঘরে শিক্ষিতা মেয়ে চায়। শ্রমসঙ্গত পারিশ্রমিক দেবে।

কত দেবে? এখানে একদিনে শুধু বসে থেকে দশ টাকা রোজগার করেছে—তা হলে?

বোরখাটা পরেই যায়।

ডেইজির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এসে অনুনয় করেছিল, মেধাবী মেয়ে, বছর বছর ফার্ষ্ট হয়, এক ধাক্কায় ম্যাট্রিক পাশ করবে, ওর পড়াটা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হচ্ছেনা ইত্যাদি।

জবাবে ডেইজির আব্বা বলেছিল, একজন প্রাইভেট টিউটর দেন—ভাল সদ্বংশের ইত্যাদি। যিনি এসেছিলেন তাকে ডেইজি আপা ডাকতো, তারপর কি হয়ে গেল—অবশ্য ডেইজির আম্মা বেঁচে আছে; কিন্তু আব্বার স্ত্রী হয়ে নয়। সে অন্য কথা। ডেইজির আব্বা প্রতিষ্ঠিত জীবনে যা চেয়েছিলেন তার অনেক বেশী পেয়েছেন—পারিবারিক গোলযোগ? তা অল্পবিস্তর থাকেই।

কি চাই?

একটা মিসকিন-রূপী বোরখা; নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখতে পান তিনি, জিজ্ঞেস করেন, কি চাই?

সাহানার চোখে পলক পড়ছিল না, ভদ্রলোক একটু জোরেসোরে বলে, কি চাই বলতে হবে তো!

সাহানার কণ্ঠ কেঁপে ওঠে, আপনাদের টিচার চাই একজন? ঠিকানাওয়ালা কাগজটা দেখায় বোরখার হাতে।

ও খোদা! তিনি যে ভিখারী মনে করে বসেছিলেন! বসুন। ডেইজি, ডেইজি—

যাই আব্বা।

তোর মাকেও নিয়ে আয়।

ডেইজি আর তার মা এসে ঢুকে।

সাহানা দ্বিতীয় বারের জন্য চমকে ওঠে।

ডেইজির আব্বা বলেন, এঁকে আপা বলে ডাকবি, তোর নতুন টিচার।

ডেইজির নতুন-মা চমকে ওঠে। এই কথাটিই ঠিক তাকেও বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন আর আপা ডাক কি চলে? তবু মাঝে মাঝে ডেইজির ভুল হয়ে যায়, নতুন-মা ধমক দেয়, এটুকু মনে থাকেনা, পড়বে কি করে মেয়ে?

ভেতরের ঘরে টেনে নিয়ে যায় ডেইজির নতুন মা।

সাহানা বলে, তুমি ডেইজি, না?

আপনি কি করে জানলেন?

আমি জানি, আচ্ছা, একটা খাতা নিয়ে এসো ত' তোমার? দেখি কি পড়াশুনা হচ্ছে।

ডেইজি বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

বোরখাটা ভারী বিচ্ছিরি, না খালেদা? টান মেরে খুলে ফেলে দেয় বোরখাটা।

ডেইজির নতুন মা চমকে ওঠে দ্বিতীয় বার।

আপনি!

ডেইজির আব্বা এসে ঢুকেন, থতমত খেয়ে যান প্রথমটা, তারপর নিবিষ্টমনে সাহানাকে দেখে, আপনি, তুমি—মানে সানু না তুমি?

যাক্, চিনতে পেরেছ, তবু ভাল। খবর জানো খালেদা, ইনসান-জি মরে গেছে।

ইনসান-জি!

ইনসান-জি!

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কোরাসে বলে ওঠে।

এই ত আজকেই। এখন তা'হলে উঠি, কেমন?

উঠবে, এক্ষুণি?

আশফাকের কণ্ঠে কাতর আর্তনাদ। 'জরতুনরে, আম্মাকে'—ডাকের একটা হতাশা-বিষাদ সচকিত সভ্য সংস্করণ যেন।

উঠবেই তো, বসে যাও আর একটু। ইন্‌সানজি মরিয়ান কোম্পানীর ম্যানেজার নয়?

তুমি তাকে চেনো?

নিরুত্তর। কেননা আশফাকের পারিবারিক গোলযোগের সঙ্গে ওই বর্বরটাও জড়িত ছিলো।

সোনা মিয়াকে মনে পড়ে খালেদা?

সোনা মিয়া!

বাঃ, এরি মধ্যে ভুলে গেলে। ইনসানজিই বড়ো হলো, সোনা মিয়া কিছুই নয়!

অথচ এমন হওয়া উচিত ছিলোনা।

শেষ কথাটা সাহানার স্বগতোক্তি।

আশফাক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জিজ্ঞেস করে তুমি খালেদাকে চেনো কি করে? সোনা মিয়া কে?

সে খালেদাকেই জিজ্ঞেস করো অন্য সময়, এখন আমি যাই।

এক রকম ছুটে বেরিয়ে আসে সাহানা—সারাটা পথের দুই পাশে কারা যেন লুকিয়ে থেকে তার গতিবিধির ওপর বক্রচক্ষুর শানিত দৃষ্টি রেখে আড়ে আড়ে হাসছে—যেন যাদের পেছনে ফেলেছে তারাই হো হো করে হেসে উঠছে। আর একটা নেপথ্য ক্রন্দন হাহাকার করে বাসা বাঁধতে চাচ্ছে সাহানার বুকে, যতই তাকে আমল দিতে চায়না, ওটা যেন ততই চেপে ধরছে ওকে।

একটা বউ-কথা-কও পাখী হঠাৎ কোথায় ডেকে ওঠে, 'বউ কথা কও!'

কথা কে কইবে!

সামান্য একটা ককেটের হাতে মার খেয়ে গেল এত বড়ো একটা আদর্শ—ঝান্তব ক্ষুধার কাছে আদর্শিক প্রেম হার মেনে নিল! এই দুঃখ রাখবার ঠাঁই কোথায়! কিন্তু দুঃখ কেন, কুশলী রূপজীবি তো সে নয়!

জয়তুনের বাপ অবাক হয় না—বলে কি রে বেটি, মুখটা শুকনো শুকনো? কি কইল ওরা! চাকরী অইছে না?

সাহানা কিছু বলতে পারে না—যে কান্নাটা এতক্ষণ চেতনার সমস্ত স্তরে ভীষণ তোলপাড় করছিল, সামান্য একটু ফাঁক দেখে বুঝি বের হয়ে যায়। কিন্তু শক্ত হয় সাহানা।

ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। কেন সে গেল খামাখা একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে। সোনা মিয়া আর ইনসান জির প্রসঙ্গ তোলায় আশফাকের মনে প্রতিক্রিয়া কি খুব কম হয়েছে! এর জন্য সেই লাঞ্ছিতা মেয়েটার সুদিনের স্বপ্নটা কি ভেঙে যেতে পারে না! থাক্ গে, কি হবে এসব ভেবে।

কি করবি রে বেটি?

চমকে ওঠে সাহানা, এঁ্যা!

কিতাব নিয়া বসবি না গিয়া?

হ্যাঁ, যাব। ওরা আবার কালকে যেতে বলেছে।

তাহ'লে থাক আজ, না কি কও?

আশফাকের বাড়ীর দোরে এসে বিস্মিত হয় সাহানা। কয়েকবার কড়া নেড়েও কোন সাড়া পেলো না। আরো জোরে কড়া নাড়ে।

দরজা খুলে দেয় ডেইজি, আপনি এসেছেন আপা!

তোমার বাবা-মা নেই বাসায়?

ডেইজির মুখটা সাহানাকে দেখে প্রসন্ন হয়ে ওঠেছিল, হঠাৎ নিভে গেল আবার।

মা তো নেই আমার আপা।

ওই যে ইনসানজি—এর জন্য আব্বার কতো কষ্ট।

এতটুকু মেয়ে নিজের কথাটা ভাবছে না তবু। সাহানা আধো আধো কথাও বুঝে নেয়, তোমার কষ্ট হয় না?

আমার! জানেন আপা, আমার নতুন মা চলে গেছে, আর আসবে না। আব্বাও চলে গেছে, বলে গেছে, আপনি যদি আসেন তাহ'লে যেন অপেক্ষা করেন।

জয়তুনের বাবার জ্বর। ডাক্তার দেখানো উচিত। এই জন্যই বেরিয়েছিল ও। পথে হঠাৎ কি মনে করে এ দিকে এল। অপেক্ষা করবে, না ডাক্তার নিয়ে জয়তুনের দুঃখী বাপের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করবে? আশফাক একদিন মনকে চোখ ঠেরেছে কাম্য ধন পেয়েও মনে হয়েছে কি যেন পাওয়া হয়নি। সুখী হবার ভান করেছে। সাহানা যেন বুঝতে পারে। আরো বুঝতে পারে সে দুঃখী নয় এখন। কিন্তু...

এখন সন্ধ্যা, ও হয়ত এখন সেই নিজস্ব কণ্ঠে জ্বরের ঘোরে প্রাণপণে ডেকে চলেছে, আম্মারে, জয়তুন রে—।

হয়ত তার কাতরোক্তিতে বিমনা হয়ে পথচারী সামান্য একটু বিব্রত হচ্ছে। নসু মিয়ার চা খানায় হয়ত আড্ডা কমেছে।

একজন বলছে, বুড়া শালার আবার বেরাম অইছে এলায়।

একটা মাইয়া জুটাইছিল কোথন, গেল গা না কি?

যাইব না তো কি থাকবার জন্য আইছিল—বড়-লোকের মাইয়ার সখ চাপছিল আর কি!

মাইয়াডা কিন্তুক—

চোখ টিপে ইঙ্গিতে বাকীটা শেষ করে হয়ত।

কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর কান্না গোরস্তান আর ইউক্যা-লিপ্টাস সারি, আর সমস্ত মৃতাত্মাদের কোলাহল সচকিত করে দিচ্ছে—আম্মারে, জয়তুন গো। সাহানা ভাবে সেই যেন জয়তুন, একটা জীবিকা-অন্বেষণ ক্লিষ্ট নারী, অসহায় পিতার পরিচর্যার জন্য যে নারী বিসর্জন দিয়েছিল তার সমস্ত সাধ আহ্লাদ! সেও তো প্রেম।

সাহানা ওঠে, বলে, 'বোধহয় দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু আসছি, তুমি বসো ডেইজি।'

কখন ডেইজি ওর অত্যন্ত কাছে সরে এসেছিল এবার একেবারে ওর গা ঘেঁসে বসে, আমার যে ভয় করছে আপা। আব্বা এলে তুমি যেয়ো। আব্বা হঠাৎ কেমন,

হয়ে যায়—আমাকে মারতে আসে। আজকেও যদি হয় ?

ওদিকে কার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় বৃদ্ধ জয়তুনের বাপ এক একবার চীৎকার করে ওঠেছে আর দরজার দিকে সতৃষ্ণ উদগ্রীবতায় চেয়ে দেখছে। পরক্ষণে আবার চীৎকার করে ওঠছে, জয়তুনি রে…।

সাহানা ডেইজিকে সান্ত্বনা দেয়, বলে, আমার ঠিকানাটা রেখে গেলাম। তোমার আব্বা এলে দিয়ো। কিচ্ছু ভয় নেই, তোমাকে কিচ্ছু করবে না।

ডেইজি ফুঁপিয়ে ওঠে।

ওদিকে যে চীৎকার করে কাঁদছে আমার বাবা—মরে যাবে আমি না গেলে। বুঝো না কেন! তোমার ভয় নেই আমি তো ফিরে আসছি, আসতেই হচ্ছে আমাকে।

সাহানা সন্ধ্যাস্তীর্ণ অন্ধকারে পা বাড়ায়।…

এলো বাহার

সিরাজুল ইস্‌লাম

॥ এক ॥

পাতা ঝরার ঝুমুর তালে
দখিন হাওয়ার দোলায় ছলে
বাহার এলো ধূসর ধরায়
রঙ্‌মহলার দুয়ার খুলে ॥
তারি সবুজ সমারোহে
পাগল করা রূপের মোহে
আকুল সুরে গায় কোয়েলা
বনের বুকে কাঁপন তুলে ॥
স্বপ্ন সুনীল নয়ন যে তার
মনে যে তার অসীম আশা,
কণ্ঠে যে তার গান সুমধুর
প্রাণে গভীর ভালোবাসা ॥
রাতের লাখো তারায় তারায়
পথ চেয়ে কার নিমেষ হারায়,
উছলে পড়ে হাসি যে তার
কৃষ্ণচূড়ায় পলাশ ফুলে ॥

॥ দুই ॥

পাখীর গানে আজ ধরনীর
মুখর বনতল,
এলো তুহিন শীতের শেষে
বসন্ত চঞ্চল ॥
তরু লতায় কচি পাতার
এলো যে তাই নতুন বাহার
হাসিন আলোর ধারায় সুনীল
আকাশ ঝলোমল ॥
ফুলের বনে মৌমাছিদের
মধুর আলাপন
কোকিল জাগায় শিরিন সুরে
গানের শিহরণ ॥
কোন্ সে নিপুণ শিল্পী আবার
বিচিত্র সব রঙ্ ঢেলে তার
আন্‌লো রূপে রঙে অতুল
এ-দিন সুনির্মল ॥

খিলাফতে রাশেদা

মোহাম্মদ আবদুর রহীম

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (ছঃ) এন্তেকালের পর যে চার প্রধান ছাহাবী ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহাদিগকেই 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁহাদের পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'। 'খোলাফায়ে রাশেদীনে'র শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী না থাকিলেও বিশ্বের ইতিহাসে তাহা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকই নহে, অমুসলিম—এমন কি মুসলিম-দুশমন ঐতিহাসিকগণও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলকে মানব-ইতিহাসের 'স্বর্ণ-যুগ' বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা "খিলাফতে রাশেদার" বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

খিলাফত

"খিলাফত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে প্রতিনিধিত্ব, অন্য কাহারো স্থলাভিষিক্ত হওয়া, কাহারো অপসৃত হওয়ার পর তাহার স্থানে উপবেশন করা। এই শব্দটি স্বতঃই এই কথা প্রমাণ করে যে, উহা আসল নয়, আসলের প্রতীক মাত্র, কায়া নয় ছায়া, দর্পণের প্রতিবিম্ব; মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই নাম খিলাফত। 'ইমাম' শব্দও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং 'খলীফা' ও 'ইমাম' এই শব্দদ্বয় একই ব্যক্তির দুইটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। পূর্ববর্তীর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়া সে খলীফা এবং সমসাময়িক যুগের অনুসরণীয় ও সর্বাধিক 'গণ্যমান্য' হওয়ার কারণে সে 'ইমাম' ও 'নেতা'। বস্তুতঃ পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পর গোটা উম্মতের নেতৃত্ব করাকেই বলা হয় 'খিলাফত' ও 'ইমামত্'। নবী করীম (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন: "তোমাদের পূর্বে বনী ইস্রাইল গোত্রে নবী ও পয়গম্বরগণই নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন; এক পয়গম্বরের অন্তর্ধানের পর আর এক পয়গম্বর আসিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু এখন (আমার পর) নবুয়তীর ক্রমিকধারা সম্পূর্ণ হইয়াছে (এখন আর কেহ নবী বা রসূল হইবেন না)। অতঃপর তোমাদের মধ্য হইতে খলীফাগণই অগ্রগামী হইবে।"

এই হাদীস হইতে এ-কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, পয়গম্বরীর প্রতিনিধিত্ব করাকেই খিলাফত বলা হয় এবং ইসলামে নবুয়তের পর ইহাই হইতেছে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ। এই জন্য ইসলামের "খলীফা"গণ কোরআন ও সুন্নতের মূলকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব-সমস্যার সমাধানের জন্য যেসব বিধান ও নির্দেশ দান করেন, তাহা অবশ্যই সর্বজনমান্য হইবে। রসূলে করীম পূর্বাহ্নেই একথা ঘোষণা করিয়াছেন: "আমার পর আমার 'হেদায়েত-প্রাপ্ত' খলিফাগণকে মানিয়া চলিবে। এই কারণেই খলিফা নির্বাচন করার সময় তাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা-দক্ষতার দিকে যত-না দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ, তদপেক্ষা অধিক লক্ষ্য আরোপ করিতে হইবে নবীর সংস্পর্শে তিনি নিজকে কতখানি পরিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক, জ্ঞান-বিদ্যা ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কতটুকু আছে সেই দিকে। হজরত আবুবকর ছিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান গণী ও হযরত আলী—এই চার জনকে পর্যায়ক্রমে খলীফার পদে নির্বাচন করায় উপরোক্ত নীতির নিগূঢ় তাৎপর্য ও যথার্থতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ ইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তামদ্দুনিক উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধান উহারই ভিত্তিতে হইয়া থাকে। পয়গম্বরের আরব্ধ কার্যাবলীকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ হইতে উহার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন—এই সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারাই খিলাফতের দায়িত্বের মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আর একটি মাত্র যুক্ত শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইলে বলা যায়—'একামতে দ্বীন'। এই শব্দটিও এতই ব্যাপক যে, দ্বীনী ও দুনিয়ারী সব রকমের কাজই উহার মধ্যে শামিল হইয়া যায়। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, আইন ও শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন, বিচারব্যবস্থা কায়েম করা, শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা—এক কথায় সমস্ত তামদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক কাজ সম্পন্ন করাই খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীমের পবিত্র জীবন এই সব মহান দায়িত্ব সম্পাদনেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পর যাঁহারাই তাঁহার প্রতিনিধিত্ব ও স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজদের সমগ্র জীবন এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন। নবী-করীমের জীবনকাল হইতেই এইসব কাজে বিভিন্ন লোক জিম্মাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিল। নামাজের ইমামতি

করার জন্য, ছাদ্‌কা ও জাকাত আদায় করার জন্য আলাদাভাবে লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। অন্যায় কাজের প্রতিরোধ ও ন্যায় কাজের প্রচার এবং জনগণের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের নিরপেক্ষ বিচার ও ফয়সালার কাজ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক দ্বারা সমাধা করা হইত। শত্রুর সহিত মোকাবিলা ও সৈন্য পরিচালনা এবং কোরআন শরীফ শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বতন্ত্র লোকের উপর অর্পিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত কাজই খিলাফতের মূল দায়িত্বের মধ্যে শামিল, সেই জন্য স্বতন্ত্র ভাবেই এই সব দায়িত্ব পালনের জন্য যে যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য ছিল, তাহা সবই এককভাবে এক খলীফার মধ্যে বর্ত্তমান থাকা একান্তই আবশ্যকীয় ছিল। শুধু তাহাই নয়, আধ্যাত্মিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া খলীফার মধ্যে নবীসুলভ শিক্ষা ও মনোভাব বলিষ্ঠভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং নবী যাহাদের মধ্যে এই ধরণের আধ্যাত্মিক দক্ষতা দেখিতে পান, তাহাদিগকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা জীবিতাবস্থায়ই ইশারা-ইংগীতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যুগ-বিপ্লব ও অবস্থার আবর্ত্তন খিলাফতের মূল লক্ষ্যকে চল্লিশ বৎসর পরই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এবং উহার কর্তৃত্ব ভার এমন সব লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, যাহারা কোন দিক দিয়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিল না। বিশ্ব-নবীর হেদায়েত অনুযায়ী পরবর্তী খলীফা ও শাসকদের নির্বাচন করা হইলে, মানব সমাজের রূপ সর্বতোভাবে ভিন্নরকমের হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোরআন ও হাদীস হইতে খলীফার যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার দৃষ্টিতে যাচাই করিলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার সর্বাধিক উপযোগী। কোরআন-হাদীসে বর্ণিত গুণ-বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় মওজুদ ছিল এবং সেই কারণে তাঁহারা খিলাফতকে সুষ্ঠু নীতিতে পরিচালিত করিতে পারিবেন বলিয়া জনমনে পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান ছিল। খিলাফতে রাশেদার দায়িত্ব পালনের জন্য কোরআনের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য মনে করা হইয়াছে। কেননা নবী করীমের পরে যাহাদের মধ্যেই এই গুণাবলী পরিস্ফুট হইবে, তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) খলীফাকে প্রথম পর্যায়ে 'মুহাজির' হইতে হইবে; এবং হোদাইবিয়ার সন্ধি, বদর ও তবুক যুদ্ধে শরীক ও সূরায়ে নূর অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত রহিয়াছেন—এমন হইতে হইবে;

(২) বেহেশ্‌ত বাসী হইবার সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হইতে হইবে;

(৩) ছিদ্দীক, শহীদ প্রভৃতি ইসলামী সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে গণ্য হইতে হইবে।

(৪) 'নবী করীমে'র কোন ব্যবহার, কাজ বা কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতে হইবে যে, তিনি নিজে কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত করিলে তাহাকেই নিযুক্ত করিতেন,

(৫) আল্লাহ রসূলের নিকট যেসব ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সত্ত্বা দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হইতে হইবে;

(৬) তাহার কথা ইসলামী শরীয়তে প্রামাণিক হইতে হইবে।

এই গুণাবলী বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য ছাহাবীদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু উহার পূর্ণ সমন্বয় হইয়াছিল মাত্র চারজন ছাহাবীর মধ্যে। ইঁহারা প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন, হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার সময় ইঁহারা উপস্থিত ছিলেন; বদর, ওহোদ, তবুক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ-সংগ্রামে ইঁহারা ছিলেন অগ্রবর্তী। এইভাবে খিলাফতের যোগ্যতার জন্য অপরিহার্য গুণাবলীর মধ্যে কোন একটি হইতেও ইহারা বঞ্চিত ছিলেন না। উপরন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই হযরতের সুস্পষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎবানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। 'হাওযে-কাওসারে' তুমিই হইবে আমার সংগী, কেননা পর্বত-গহ্বরে তুমিই আমার সাথী ছিলে।" হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীমের এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছে: "উমরের কামনায়ই অসংখ্য আয়াত নাজিল হইয়াছে।" হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে রসুল বলিয়াছেন: "ফিরেশ্‌তাও যাহাকে সম্মান করে—শ্রদ্ধা জানায়, আমি কি তাহাকে সম্মান না জানাইয়া পারি?" এবং বলিয়াছেন: "প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, বেহেশ্‌তে উসমান হইবে আমার বন্ধু" হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম এরশাদ করিয়াছেন: "তোমার সংগে আমার হারুণ ও মূসার ন্যায় সম্পর্ক স্থাপিত হউক, ইহা কি তুমি চাও না? আল্লাহ ও রসুল যাহার প্রিয়পাত্র, আমি আগামী কাল তাহার হস্তেই ঝাণ্ডা তুলিয়া দিব।" এতদ্ব্যতীত নবী করীম (ছঃ) ইঁহাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো এত অধিক কথা বলিয়াছেন, যাহার দ্বারা একথা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় যে, হযরতের দৃষ্টিতে ইঁহারাই ছিলেন খিলাফতের সর্বাধিক উপযুক্ত অধিকারী।

খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ

'খিলাফত' সম্পর্কিত আলোচনাকে গভীর ও ব্যাপক ভাবে অনুধাবন করার জন্য উহার রাষ্ট্র-রূপকে যাচাই করা অত্যন্ত জরুরী। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হইতেছে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে। একথা কাহারো অবিদিত নয় যে, ইস্লামে সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক হইতেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা ; এবং আইন রচনা করা ও নির্দেশ দানের মৌলিক অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো নাই। অতএব, ইস্লামী খিলাফতের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যও নিম্নরূপ হইবে :

(ক) কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, পরিবার, শ্রেণী, দল কিংবা গোটা রাজ্যের সমগ্র অধিবাসীও বিচ্ছিন্ন বা সম্মিলিতভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইতে পারে না ; ইহা একান্তভাবে আল্লাহতায়ালারই জন্য নির্দিষ্ট ;

(খ) মূলগত ভাবে আইন রচনার যাবতীয় অধিকার একমাত্র আল্লাহতায়ালার। সমগ্র মুসলমান মিলিত হইয়া নিজেদের জন্যও আইন রচনা করিতে পারে না, খোদার প্রদত্ত আইনেও কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংশোধন শামিল করিতে পারে না।

(গ) ইস্লামী রাষ্ট্র কায়েম হইবে নবীর উপস্থাপিত খোদায়ী আইনের উপর। এই রাষ্ট্রের পরিচালক সরকার খোদায়ী আইনের অনুসারী ও উহার বাস্তবায়নকারী হইলেই ইস্লামী জনতার নিকট আনুগত্য পাইবার অধিকারী হইবে।

কোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ-তায়ালা এই খিলাফতের কথাই বলিয়াছেন সুস্পষ্ট ভাষায় :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم -

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে জমিনের বুকে খলীফা বানাইবেন, যেমন করিয়া তাহাদের পূর্ববর্তী (এই ধরণের) লোকদিগকে তিনি খলীফা বানাইয়াছিলেন।"

এই আয়াত হইতে প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র দর্শনে মানুষের জন্য সর্বভৌমত্ব (Supreme power) মূলতঃই স্বীকৃত নয় ; বরং মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে খিলাফত— খোদার প্রতিনিধিত্ব। বস্তুতঃ ইস্লামী আইন ও বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তি সমাজ শাসনের দায়িত্ব পালন করিবে সে 'প্রভু' নয়— খোদার খলীফা হইয়াই কাজ করিবে।

দ্বিতীয়তঃ আয়াতে খলীফা বানাইবার ওয়াদা বিশেষ কোন ব্যক্তি, বংশ, গোত্র, শ্রেণী, জাতি কিংবা জনসমষ্টির প্রতি নহে, সাধারণ ভাবে সমস্ত ঈমানদার ও নেক-চরিত্র বিশিষ্ট লোকদের প্রতিই এই ওয়াদা উক্ত হইয়াছে। তাই রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি (মুসলিম) নাগরিকই খলীফা মর্যাদা সম্পন্ন এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সমান সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চরিত্র মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও তাকওয়া-পরহেজগারীর পার্থক্যের ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যাইবে।

তৃতীয়তঃ মানবতার ইতিহাসে যখনি খোদার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে কোন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই সমাজের মধ্য হইতে কেবল মাত্র সর্বাধিক নেক ও পরহেজগার এবং উন্নত আদর্শ চরিত্রবান লোকেরাই খলীফা হওয়ার—রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। আর সাধারণ জনতা খোদার দেওয়া মৌলিক অধিকার পূর্ণ ইনছাফও নিরপেক্ষভাবে ভোগ করিতে পারিয়াছে। সেই অধিকারের এক বিন্দু হরণ করা কিংবা সংকোচিত করা হয় নাই। কাহারো স্বাভাবিক কর্মপথে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় নাই। বরং প্রত্যেকের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিভাকে খোদার আইন সম্মত পন্থায় উৎকর্ষ ও ক্রম-বিকাশ লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই খোদার নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য, এই ব্যাপারে খোদার সহিত কাহাকেও শরীক করা যাইতে পারেনা। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা বা 'আমীরুল মু'মেনীন' নির্বাচনে যোগদান করার প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। পদপ্রার্থী হওয়ার কিংবা পদলাভের জন্য চেষ্টা করার অধিকার যেমন কাহারো নাই, নাগরিকদের অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত হইলে দায়িত্ব পালনের জন্য তেমনি সকলেই বাধ্য। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাহার মর্যাদায় শুধু এতটুকু পার্থক্য ঘটে যে, জনগণ নিজ নিজ খিলাফতের মর্যাদা ও অধিকার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে মাত্র ; কেবল সে-ই খলীফা, অন্য কেহ খলীফা নয়। ইসলামী আদর্শবাদের দৃষ্টিতে এ-কথা কিছু মাত্র সত্য নয়। খিলাফতের শক্তি নাগরিকদের সামাজিক ও সামগ্রিক নিয়ম শৃংখলা সংরক্ষণ ও অপরিহার্য আইন-কানুন জারীকরণের দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বতোভাবে নিয়োজিত থাকে। এই শক্তির সংহতি বিধান ও সংযম সাধনের জন্য ইহা সাধারণের নির্বাচিত ও সর্বাধিকযোগ্যতম ব্যক্তির সত্তায় কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক।

খলীফা নির্বাচনের সময় ব্যক্তির জ্ঞান, শিক্ষা, মনন, বিচক্ষণতা ও সংগঠন-যোগ্যতাই শুধু দেখিলে চলিবেন ।

তাহার চরিত্র কত পবিত্র, নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন, বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা খলিফাকে 'মা'ছুম' (নিষ্পাপ) ঘোষণা করে নাই। প্রত্যেক মুসলিমই তাহার কেবল সরকারী দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কেই নহে ; তাহার পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত জীবন ধারারও সমালোচনা করিতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদাও হইবে সাধারণ নাগরিকেরই সমান, আদালতে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে, এবং সে সাধারণ নাগরিকের মতই বিচারকের সম্মুখে হাযের হইতে বাধ্য এবং উপরন্ত তাহাকে তথায় কোন প্রকার বিশিষ্টতা দান করা হইবেনা।

খলীফার প্রতি খোদার কোন অহী নাজিল হয় না ; কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সে কোন বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার দাবী করিতে পারে না।

খলীফা কেবল নিজস্ব মত অনুসারেই কার্য সম্পাদন করিতে পারে না, জনসমর্থিত ও যোগ্য-সুদক্ষ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই তাহাকে যাবতীয় কাজ করিতে হইবে। মজলিসে শুরার সংখ্যাগুরুর মত অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় একথা ঠিক; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্য খিলাফতী শাসন-ব্যবস্থায় ভাল-মন্দ, করনীয় বর্জনীয় নির্ধারণের কোন স্থায়ী মানদণ্ড নহে। তাই খলীফা কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সংখ্যাগুরুর ফয়ছালার সহিতও দ্বিমত হইতে পারে এবং খলীফা কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিবে, তদনুযায়ী কাজও করিতে পারে। অবশ্য এই সমগ্র ক্ষেত্রেই মুস্‌লিম জনতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে : খলীফা সমগ্রিক ভাবে কোরআন ও সুন্নাহ অনুসারে কাজ করে, না, নিজস্ব খেয়াল খুশী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে! দ্বিতীয় অবস্থায় এই খলীফা ইসলামী জনতার নিকট এক বিন্দু আনুগত্য পাইবার অধিকারী হইতে পারে না বরং তাহাকে পদচ্যুতির ব্যবস্থা করাই তাহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। এইদিক দিয়াও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন ও শাসনতন্ত্রের সহিত ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন ও খিলাফতী গণ-অধিকারবাদের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য সুস্পষ্ট !

খোলাফায়ে রাশেদীন

ইতিহাসের যে অধ্যায় হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রাঃ) খিলাফত হইতে শুরু করিয়া হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত সমাপ্ত হয়, ইতিহাসে তাহাই হইতেছে 'খিলাফতে রাশেদা'র যুগ। এবং ৬৩২ ঈসায়ী (১১ হিজরী) হইতে ৬৬১ ঈসায়ী (৪০ হিজরী) পর্যন্ত মুসলিম জাহানের যাহারা রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, তাহাদিগকেই 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের মোট সংখ্যা হইতেছে চার এবং ইঁহাদের খিলাফত্‌ কালের মোট মুদ্দৎ হইতেছে ত্রিশ বৎসর মাত্র।

নবী করীম (ছঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত নবুয়ত, আইন-প্রণয়ণ, সমগ্র ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে নেতৃত্ব দান, বিচার বিভাগ ও সৈন্য বাহিনী পরিচালনা এবং দেওয়ানী সরকারের যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণপদ হযরতের একক ব্যক্তিসত্তায় কেন্দ্রীভূত ছিল,—তিনি একাই এই সমস্ত কাজেরই কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করিতেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কে হইবে, এই প্রশ্ন ইস্‌লামী জনতার সম্মুখে তীব্র ও প্রকট হইয়া দেখা দেয়। যেহেতু নবুয়তের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে,—অতঃপর কেহই নবী হইবেন না ; কিন্তু রসুলের স্থলাভিষিক্ত যে হইবে তাহাকে এই নবুয়ত ছাড়া ও নবুয়ত ব্যতীত আর সমস্ত দায়িত্বই পূর্বানুরূপ আঞ্জাম দিতে হইবে—এই কারণেও প্রশ্নটি অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব সহকারে নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে ভাবিত ও বিব্রত করিয়া তোলে। নবী করীমের নবুয়ত ও স্বভাব-নেতৃপদের উত্তরাধিকারী কেহই হইতে পারেনা। তাঁহার পুত্র-সন্তান কেহই ছিলনা। থাকিলেও তাহাতে খলীফা নির্বাচন সমস্যার কোনো সমাধানই হইতে পারিত না। কাজেই এই দুইটি প্রশ্ন জটিল ভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল :

১—খলীফা কোন্ পরিবার বা গোত্র হইতে হইবে ?

২—খলীফা নিয়োগের পন্থা কি হইবে ?

কোরআন মজীদের কোথাও খিলাফতকে কোন বংশে বা গোত্রের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। হাদীসে যেখানে الائمة من قريش—"নেতা বা খলীফা কোরাইশদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে" পাওয়া যায়, সেখানে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ রহিয়াছে :

"তোমাদের উপর কোন হাব্‌শী গোলামও শাসক হইলে তোমরা তাহার অবশ্যই আনুগত্য করিবে।" কাজেই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। একটু গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মূলতঃ এই দুইটি হাদীসই সত্য ও বাস্তব-তত্ত্ব ভিত্তির ঘোষণা। ইস্‌লামে খিলাফতকে কোন বংশ গোত্র-পরিবার, কিংবা কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই, এ-কথা চিরন্তন সত্য, ইস্‌লামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল সময় ও অবস্থাতেই এই মূলনীতি অনুযায়ী কাজ হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু নবী করীম (ছঃ) যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারই অব্যবহিত পরে উহার

দায়িত্ব ভার পালনের জন্য কোরাইশ বংশের লোক অপেক্ষা অপর কোন বংশের লোক যে কিছুমাত্র যোগ্য বা দক্ষতা-সম্পন্ন ছিল না, তাহাও এক অনস্বীকার্য সত্য। খিলাফতে রাশেদার ও ইহার পরবর্তীকালের ইতিহাসই এই কথার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। কাজেই খিলাফতে রাশেদার চারজন খলীফাই কোরাইশ বংশের লোকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কেননা তাহা না হইলে তদানীন্তন আরব-সমাজের উপর বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা অপর কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইত না। কিন্তু ইহা কোন চিরন্তন ও শাশ্বত নিয়ম নহে, 'খিলাফতে রাশেদা'র পর খলীফার কোরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার কোন শর্তই ইস্‌লামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়।

খলীফা নির্বাচনের বাস্তব কোন পদ্ধতি কোরআন হাদীসে উল্লেখিত হয় নাই। মনে হয়, সেজন্য কোন বিশেষ পন্থাকে স্থায়ীভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া ও যুগ-কাল-স্থান-সমাজ-নির্বিশেষে সর্বত্র উহার অনুসরণকেই গোটা উম্মতের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপাইয়া দেওয়া ইস্‌লামের শাশ্বত বিধানের লক্ষ্য নয়। সেই জন্য নির্বাচনের কোন বিশেষ পদ্ধতির (Form or Proces) পরিবর্তে একটি শাশ্বত মূলনীতি পেশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে : وامرهم شورى بينهم—ইস্‌লামী আদর্শ-বাদীগণ নিজদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আর রাষ্ট্র প্রধান বা খলীফা নির্বাচনই যে মুসলিম সমাজের সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ জাতীয় ও সামগ্রিক ব্যাপার এবং মুসলিম জনতার অবাধ রায় ও পরামর্শ দানের ভিত্তিতেই যে ইহা সুসম্পন্ন হওয়া উচিৎ, তাহাতে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। অতএব, জনমতের ভিত্তিতেই খলীফা নির্বাচন করিতে হইবে—ইহাই হইল ইস্‌লামী নির্বাচনের একমাত্র মূল-নীতি। এই নীতিকে মুস্‌লিম উম্মৎ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে প্রয়োগ করিয়াছে ও নির্বাচন-সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছে এখন তাহাই আমাদের বিচার্য !

খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন

খলীফা-নির্বাচনের উপরোল্লেখিত মূলনীতিকে খোলা-ফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনের ব্যাপারে নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে :

(১) নবীকরীমের ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মতের দায়িত্বশীল নাগরিকগণ 'সকীফায়ে বনী সায়েদা' নামক (টাউন হল কিংবা পরিষদ ভবনের সমমর্যাদাসম্পন্ন) স্থানে মিলিত হয় এবং প্রকাশ্যভাবে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে খলীফা নির্বাচিত করে। উপস্থিত জনতা তখন-তখনি অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার আনুগত্যের শপথ (বয়াত) গ্রহণ করে ; এবং খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব কর্তব্য ও নীতিনির্ধারক মূলনীতি-সমন্বিত ভাষণ দান করেন।

(২) হজরত উমর ফারুকের নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁহার গোটা ইস্‌লামী জিন্দেগী ও খলীফা জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে হযরত উমর অপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্তমান নাই। তাঁহার খিলাফত কালীন যাবতীয় ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী কাজের মধ্যেই হযরত উমর নিবিড়ভাবে শরীক ছিলেন, কোরআন মজীদ প্রণয়ন (রচনা নহে) কেবল মাত্র তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ, চেষ্টা ও পরামর্শে সম্পন্ন হইয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রধান ছাহাবাদের সহিত পরামর্শ ক্রমে হযরত উমর ফারুককেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মুসলিম জনতার নিকট সুপারিশ করিয়া গেলেন। মুসলিম জনসাধারণ প্রথম খলীফার সুপারিশ ও নিজেদের নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে হযরত উমর (রাঃ) কেই খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করিল ও তাঁহার হস্তে বয়াত গ্রহণ করিল। উমর খলীফা নির্বাচিত হইয়া মুসলিম জনতাকে সম্বোধন করিয়া নীতি নির্ধারক ভাষণ দান করেন।

(৩) দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবন-পাত্র সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, তিনি আর বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। সেজন্য তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় ছাহাবীর সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী বোর্ড নিযুক্ত করিলেন। অন্যান্যদের ছাড়াও হযরত উসমান ও হযরত আলী (রাঃ) ও এই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এই ছয় জনই খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে, তাঁহার অন্তর্ধানের পর তিন দিনের মধ্যেই যেন এই বোর্ড নিজেদের মধ্য হইতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করে। বোর্ড সুষ্ঠুরূপে তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করে এবং এই ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিম নাগরিক-দের রায় সংগ্রহ করে। মদীনার প্রত্যেক ঘরে ঘরে

উপস্থিত হইয়া পুরুষদের সংগে সংগে স্ত্রী লোকদেরও রায় জিজ্ঞাসা করা হয়। দুরাগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিকটও রায় জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হয়না। এইভাবে ইস্‌লামী নাগরিকদের সর্বাধিক রায় ও আলোচনা-বিতর্কের পর হযরত উসমান (রাঃ) কেই তৃতীয় খলীফা পদে নির্বাচিত করা হয়।

(৪) তৃতীয় খলিফা হযরত উস্‌মানের (রাঃ) শাহাদতের পর মদীনার পরিবেশ ফেত্‌না-ফাসাদের ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মিশর, কুফা ও বছরার বিদ্রোহীগণ মদীনায় প্রবল তাণ্ডবের সৃষ্টি করে। প্রধান ছাহাবীদের অধিকাংশই সামরিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্য রাজধানীর বাহিরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। হযরত উস্‌মানের শাহাদতের পর ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত খলীফার পদ শূন্য থাকে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হযরত আলী (রাঃ)কেই খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

এই বিশ্লেষণ হইতে এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপারে একই ধরণের বাহ্যিক পদ্ধতি (Form of Election) অনুসৃত না হইলেও প্রত্যেকটি পদ্ধতিতেই জনমতকে নির্বাচনের ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং কোন ক্ষেত্রেই জনমতকে উপেক্ষা করা হয় নাই। বস্তুতঃ প্রকৃত গণতন্ত্রের ইহাই হইতেছে মৌলিক ভাবধারা, যাহা জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা স্থাপনের জন্য প্রত্যেক যুগে ও অবস্থায়ই একান্ত অপরিহার্য। উপরন্তু মৌলিক ভাবধারাকে যথোপযুক্ত মর্য্যাদা ও দাবী সহকারে রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে কোন বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা ইস্‌লামে বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির বিশেষ গুরুত্ব নাই; বরং জাতীয় ও তামদ্দুনিক ব্যাপারে উহার মৌলিক ভাবধারাই হইতেছে একমাত্র লক্ষ্য রাখার বস্তু।

খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য

ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিতে খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বৎসরকালীন শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ গোটা মানব জাতিকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ বিমোহিত করে।

(১) খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিশ্ব নবীর পবিত্র জীবনের চির উজ্জ্বল প্রদীপ অনির্বান হইয়াছিল ও সমগ্র পরিমণ্ডলকে নির্মল আলোকছটায় উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। খলীফাদের প্রত্যেকটি কাজ ও চিন্তায় উহার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চারিজন খলীফাই বিশ্ব-নবীর প্রিয়পাত্র বন্ধু ও বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। অপরাপর ছাহাবীদের তুলনায় রসূলের সাহচর্য ইঁহারাই সর্বাধিক লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন হযরতের পরীক্ষিত, তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ কৃত প্রাণ! একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত আর তিনজন খলীফাই নবীকরীমের দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদীনায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন।

(২) খিলাফতে রাশেদার বংশ-গোত্র-পরিবার ভিত্তিক অধিকার, উত্তরাধিকার বা প্রাধান্যের কোনই অবকাশ ছিলনা। চারজন খলীফা তিনটি স্বতন্ত্র পরিবার হইতে উদ্ভূত ছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারাই ছিলেন গোটা ইসলামী জনতার সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন। ক্রমিক পর্যায়ে ইঁহাদের নির্বাচনে প্রকৃত গণতন্ত্রের মৌলিক ভাবধারা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই বরং উহাই রক্ষিত হইয়াছে সর্বতোভাবে। আধুনিক কালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলেও কেবল মাত্র তাঁহারাই যে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হইতেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারেনা।

(৩) খিলাফতে রাশেদায় আইন-রচনার ভিত্তি ছিল কোরআন ও সুন্নাহ্‌। যে বিষয়ে তাহাতে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতনা, বাস্তব দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার সমাধান বাহির করা হইত এবং এই ব্যাপারে কোরআন হাদীস পারদর্শী প্রত্যেক নাগরিকেরই রায় প্রকাশের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। যে বিষয়ে সকলেরই মতৈক্যের সৃষ্টি হইত, তাহাতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত। ফিকাহ-শাস্ত্রের পরিভাষায় তাহাকে বলা হয় ইজ্‌মা'। ইহা সর্বজনমান্য মূলনীতি বিশেষ। আর কোন বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইলে খলীফা কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নিজস্ব রায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতেন ও তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতেন।

(৪) খোলাফায়ে রাশেদীন অধিকাংশ ব্যাপারেই দায়িত্বশীল ছাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিতেন। সাধারণ ব্যাপারে মজলিশে শুরার সদস্য—তাহারাই মনোনয়ন অনুযায়ী নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু রায়দানের অধিকার কেবলমাত্র নিযুক্ত সদস্যদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলনা।

(৫) খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাজকীয় জাঁক-জমকের ও শান-শওকাতের কোন স্থান ছিলনা। সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারণ ছিল তাঁহাদের জীবন-যাত্রা। তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করিতেন, কোন দেহ রক্ষী তো দূরের কথা, নামে মাত্র পাহারাদারও কেহ ছিলনা। প্রত্যেকটি মানুষই অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত। তাঁহাদের ঘর-বাড়ী ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল সাধারণ পর্যায়ের।

(৬) খোলাফায়ে রাশেদীন বায়তুলমালকে জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করিতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মজুরী ব্যতীত নিজের জন্য এক পাই-ক্রান্তি পর্যন্তও কেহ খরচ করিতেন না। এতদ্ব্যতীত নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা ও পদাধিকার বলে বায়তুল মাল হইতে কিছুই ব্যয় করিতেন না।

(৭) তাঁহারা নিজদিগকে জনগণের খাদেম মনে করিতেন। কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা নিজদিগকে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা-শ্রেষ্ঠ ধারণা করিতেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জন-নেতা ছিলেন না, নামাজ ও হজ্জ প্রভৃতি নিছক ধর্মীয় ব্যাপারেও কেবলমাত্র তাঁহাদেরই নেতৃত্ব কার্যকরী হইত।

খিলাফতে রাশেদায় ধর্মীয় কাজের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কাজের কর্তৃত্ব বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ছিল না; বরং এই উভয় প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই একজন খলীফার ব্যক্তি সত্তায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং ধর্মীয় কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজের দ্বৈতবাদ যেমন আধুনিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অনুরূপ ভাবে এতদুভয়ের একত্রীকরণ ও সর্বতোভাবে এককেন্দ্রীভূতকরণই ছিল খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য।

কার নাম

শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল

ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে ফিরে যায়
আর ত পারিনা সহিতে,
দুইটি নয়নে অশ্রু লহরি,
বুক ফেটে যায় কহিতে।
এই বরিষায় তুমি নাই কাছে,
পিয়াসী হৃদয় কেমনে যে আছে
ভাবিতেছি তাই বসিয়া,
শূন্য হৃদয় ব্যাকুল-আকাশ
নীল অঞ্জন মাখিয়া।
দেখিতে মধুর কেন গো নিঠুর ?
হৃদয় তোমার করেনা বিধুর
আমার কথাটি ভাবিয়া ?

সঙ্কোচ কেন তোমারে ঘিরিয়া
শরম সলিলে নাহিয়া ?
চারিদিকে মোর সুন্দরে ঘেরা,
কল্প মূরতি করে চলাফেরা,
তবু, মরেছি তোমারে ভাবিয়া।
কাছেতে ডাকিলে দূরে সরে যাও
বিভেদ বসন টানিয়া।
বাহিরেতে দেখ মেঘ গর্জ্জন,
আকাশ-বাতাস করে মন্থন্,
বৃক্ষ শিখরে বিজলি চমকি
কার নাম যায় আঁকিয়া ?
বরিষার ধারা তীর বেগে ধায়
চারি ভিতে আজি মাতিয়া।

ঢাকার পথে যোধপুর

মোহাম্মদ নাসির আলী

৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত দু'টা। পাকিস্তান রাইটার্স কনভেনশন সমাপ্তির পরে করাচী থেকে ঢাকায় ফিরছি। কনভেনশন শেষ হয়েছে ৩১শে জানুয়ারী। ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারীর প্লেনে সঙ্গী বন্ধুদের অধিকাংশই ঢাকায় ফিরে এসেছেন। আমরা ৫।৭ জন তখনও ইচ্ছে করেই রয়ে গেছি একটু আরাম-আয়েশ করে ঘুরে ফিরে দেখবো বলে। মুশকিল হয়েছে নিজের ইচ্ছে মত যেদিন খুশী ফিরবার উপায় নেই বলে। খবর নিয়ে জানলাম, ১লা ও ২রা তারিখই নির্দ্দিষ্ট ছিল পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ডেলিগেটদের ফিরবার জন্যে। পরবর্ত্তী বেশ কয়েকদিনের টিকিট অগ্রিম বিক্রি হয়ে গেছে অপরাপর যাত্রীদের কাছে। ৯ই ফেব্রুয়ারীর আগে আর টিকিট নেই। তবু ১লা তারিখ ভোরে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ার ওয়েজের অফিসে গিয়ে ৪ঠা তারিখের একটা চান্স বুকিং (Chance Booking) করিয়ে রেখে এলাম। পরের দিন হোটেল থেকে ফোন করে জানতে পারলাম, হাঁ, একটা সিট পাওয়া যেতে পারে ৪ঠা তারিখের রাত দু'টার ফ্লাইটে। এক-বাক্যে রাজী হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম আরও দু'টি দিন তাহলে রাজধানীতে কাটানো যাবে কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, আমার এ-ধারণা ভুল। ৪ঠা রাত দু'টার অর্থ যে ৩রা তারিখ দিবাগত রাত দু'টা তা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

আমার মত শেষ রাত্রির যাত্রীদের পি, আই-এর সিটি অফিসে রিপোর্ট করার সময় ছিল রাত সোয়া বারটা। সে সময় কোন রকম বাহনই সহজলভ্য নয়। বন্ধুবর সৈয়দ আবদুল মান্নান ঢাকায় রওয়ানা হলেন রাত সাড়ে দশটার প্লেনে। কবি তালিম হোসেন সাহেবও হোটেল ছেড়ে যাচ্ছেন এক বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করতে। আর দু'একজন যাঁরা ছিলেন, তারাও কে কোথায় সরে পড়েছেন। এরপর এত বড় তাজ হোটেল আমাদের জন্যে নিতান্তই ভাঙ্গাহাট। সেখানে আর একটি ঘণ্টাও কাটাতে মন চাইছিলনা। তিন বন্ধু মিলে প্রায় সারাটা দিন কাটিয়েছি কেয়ামারী ডক, ম্যানোরা দ্বীপ আর ক্লিফটন বিচ দেখে। তারপর নৈশ ভোজের পর্ব্ব সেরে হোটেল ছেড়ে রওয়ানাও করলাম এক সঙ্গে। তিন জনই এসে উঠলাম পি, আই, এর সিটি বুকিং অফিসে। একটু পরেই সৈয়দ আবদুল মান্নান বাসে গিয়ে উঠলেন ঢাকাগামী অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে। আমার অনুরোধে কবিবন্ধু তালিম হোসেন অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেলেন গল্পগুজব করে। রাত তখন দশটা ছাড়িয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশী রাত হলে অতি বড় অতিথিবৎসল বন্ধুর বাড়ী গিয়ে উঠতেও সংকোচ বোধ হয়। কেননা, সেক্ষেত্রে 'দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথি' জানতে পেয়েও বন্ধু বা তৎপত্নী যদি আদৌ সাড়া না দেন, তবে তেমন দোষের কিছু নয়।

তিনি চলে যাবার পরে কথাবার্ত্তা বলবার আর কেউ রইল না। কাছেই বসেছিল দুজন কাবুলী। ঝড়ের মুখে যে কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে দেবার নীতি অনুসরণ করলাম। কাবুলী পেলাম কাবুলীই সই। 'কথাবার্তা' না হলেও দু'চারটে 'বাতচিৎ' তো চলবে। তারাও ঢাকাযাত্রী। ষ্টেশনের কাছে সিদ্দিক বাজারে তাদের বাসা। সঙ্গে লটবহর কিছুই নেই। বুঝলাম, আফগান ইউনির্ভাসেল ব্যাঙ্কিং বিজনেস-এর প্রসার কল্পেই তারা বাংলা মুলুকে যাচ্ছে এবং সঙ্গে লটবহর না থাকলেও ঢোলা কোর্তার কোনো গোপন পকেটে ব্যাংকের একটি ছোটখাট ট্রেজারী ঠিকই আছে।

শুধু বাতচিৎ করেই রাত কাটাতে হবে, না কথাবার্ত্তা বলবার লোকও দু'একজন পাওয়া যাবে, তাই দেখবার জন্যে উঠে গেলাম বুকিং কাউণ্টারের কাছে প্যাসেঞ্জারের তালিকাটি দেখতে। তালিকায় একটি অতি পরিচিত নাম দেখে খুশী হলাম। তিনি রাইটার্স কনভেনশনের অন্যতম ডেলিগেট অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ান সাহেব। তাঁর মত একজন সদালাপি বন্ধুজনকে পথের-সাথী হিসাবে পাওয়া যাবে ভেবে স্বভাবতই আশ্বস্ত বোধ করলাম। বিদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকেই অন্তত মনের সুখে কথা তো বলা যাবে।

অধ্যাপক সুফিয়ান সাহেব আসবার আগেই আবির্ভূত হলেন আগাগোড়া আরবী পোষাকে মণ্ডিত এক যুবক। সঙ্গে দু'জন বাঙ্গালী যুবক। তাদের একজন মিঃ আবদুল আলিম ভারতীয় একটি ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখায় চাকুরী করতেন। এখন আছেন সেই ব্যাঙ্কেরই করাচী শাখায়। তিনি আমাকে চিনতেন। মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এসে তিনি আরবী পোষাক পরিহিত যুবককে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি বাড়ী যাচ্ছেন আজকের প্লেনে। এলেন মদিনা শরীফ থেকে। বছর পাঁচেক যাবত সেখানেই থেকে পড়াশুনা করেন। বাড়ী খুলনা। বাড়ী যাবার পথে করাচীতে আমাদের বাসায় উঠেছিলেন। আমরা এসেছি এগিয়ে দিতে।'

একটু পরে আবার বললেন, 'না এলেও চলতো।

আসতে হলো হাফেজ সাহেবের সঙ্গে মালপত্র যা আছে, তার ওজন দশ বারো পাউণ্ড বেশী হবে বলে।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি নিরুপায়। মালের নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ ঠিক রাখতে গিয়ে স্যুটকেস খুলে আমার ক্যামেরাটি কাঁধে ঝুলাতে হয়েছে এবং বিপুলায়তন অপ্রয়োজনীয় ওভার-কোটটিও উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদে গায়ে চাপাতে হয়েছে। তবু মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে যুবক দু'জনকে অভয় দিয়ে বিদায় দিলাম।

সম্ভবতঃ বুঝতে পারছেন, হাফেজ আরবী ভাইয়ার মুশকিল আসান করতে গিয়ে আমাকে কাবুলী ভাইয়াদের শরণাপন্ন হতে হলো। মুসলমানদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই দু'ভাই বীরদর্পে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করল আরবের মাল কাবুলের বলে চালাতে।

মালপত্র ওজন করতে গিয়ে কিন্তু দেখা গেলো, অতি-রিক্ত মালের ওজন হবে দশ পাউণ্ডের পাঁচ গুণেরও বেশী। এমনকি পোর্টেবল লুজ বেডিং নামে নিতান্ত স্বল্পকায় যে বোচকাটি তার সঙ্গে আছে, তারও ওজন প্রায় আধ মণ। অগত্যা তেভাগা পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় রইল না। তার পরেও কম্বল নামক যে বস্তুটি তিনি হাতে রাখবার অনুমতি পেলেন, তা একখানা লেপের সমান। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া ব্যাপারটা রফা হলো পি, আই, এর কর্ম্মচারীদের জ্ঞাতসারেই।

ইত্যবসরে অধ্যাপক সুফিয়ান এসে হাজির হলেন। দেখেই বললাম, তবু ভ্যাগ্যিস্ আপনাকে সঙ্গী পেলাম। পরে তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম, নিতান্ত ভাগ্য গুণে (তাঁর নয় আমার) ছিটকে এসে তিনি আমার সঙ্গী হয়েছেন। এর আগে একদিন যথাসময়ে এসে প্লেন ধরতে পারেননি বলে তিনি আজকের এই প্লেনে ঢাকা যাচ্ছেন এবং এজন্যে বিমান কোম্পানীর তহবিলে বেশ কিছু কাফ্ফারা তাঁকে দিতে হয়েছে।

ড্রিগ রোড দিয়ে বিমান ঘাটির দিকে যেতে যেতে আরবী পোষক পরিহিত যুবক চুপি চুপি বললেন, তাঁর মালের ভাড়া বাবদ তিনি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে তৈরী হয়েই এসেছিলেন। বুঝলাম, তিনি পাকা পোক্ত আছেন। বৃথাই আরবী-কাবুলী মিতালী পাতিয়ে বিমান কোম্পানীকে ঠকানো হলো। এর চেয়ে বরং ভাল ছিল এক বাঙালী মহিলাকে কাবুলীদের দ্বারা উপকৃত করানো। তাতে অন্ততঃ কিছুটা সিভালরি দেখানো হতো। মালের জন্যে ছত্রিশ টাকা ভাড়া গুণে দিয়েও তাঁকে নিজের হোল্ড অলটি আত্মীয়ের জিম্মায় রেখে আসতে হলো বলে এ-মহিলাটী সত্যিই বড় আফসোস করছিলেন।

বিমান ঘাটিতে পৌঁছে শুল্ক বিভাগীয় কায়দা-কানুন শেষ হবার পরেও হাতে সময় রইলো প্রায় এক ঘণ্টা। শীতের রাত। কাঁচের দরজা জানালা আঁটা ঘরে বসেও বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। আমাদের এক সহযাত্রী তো এক কাপ চায়ের জন্যে রীতিমত পেরেশান হয়ে উঠলেন। অবশ্যি শীতের সেই মাঝরাতে ছিটেফোটা পেলে আমরাও যে প্রাণ ভরে শোকর গুজারি করতাম, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চা সেখানে পাওয়া গেল না। সুসজ্জিত একটি 'বার' সেখানে আছে। অরেঞ্জ ও লিমন কোয়াশ জাতীয় শীতল পানীয়ও বোধ হয় দেখলাম। আরযা দেখলাম, তা হল হরেক রকমের লেবেল আঁটা নিষিদ্ধ পানীয়। সাদা উর্দিপরা বেয়ারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বুক পকেটের উপরে রক্তাক্ষরে লেখা সেই নিষিদ্ধ বস্তুটির নাম। বিদেশী প্যাসেঞ্জারদের কাছেই অবশ্যি তার আনাগোনা বেশী। পাকিস্তানী কুটীর শিল্পের একটি সুদৃশ্য ষ্টল ও এখানে রয়েছে। ষ্টার্লিং ডলার প্রভৃতি সব রকম বৈদেশিক মুদ্রাই এ-আন্তর্জ্জাতিক বিমান-বন্দরে সচল।

দুটা বাজবার পনর মিনিট বাকী থাকতে প্লেনে গিয়ে বসবার অনুরোধ এলো। সঙ্গে সঙ্গে যেনো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হলো আগে গিয়ে পছন্দসই আসনটি দখল করবার জন্যে। ঠিক দু'টায় প্লেন যাত্রা করলো।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট সহযাত্রী বেশ একটু উসখুস করছে আর ঘন ঘন পেছন দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে একবার তার দিকে তাকাতেই সে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাস করলো, 'চা উ কুছ' মিলবে কিনা। দু'শো রুপিয়া কেড়ায়া দিয়া।

তার প্রশ্নের জবাবটা তখন মনে মনে হয়তো সবাই খুঁজছিলো। কিন্তু চা আর এলো না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে লক্ষ্য করলাম, কি একটা ব্যাপার নিয়ে ক্রুরা বেশ একটু যেনো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারও কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হলো, প্লেনের মেশিনে সামান্য গোলযোগ দেখা যাচ্ছে বলে আমরা পুনরায় করাচী ফিরে যাচ্ছি।

কথাটা শুনে যাত্রীদের মধ্যে স্বভাবতই একটা মৃদু গুঞ্জরণ উঠল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় ঢাকার মাটিতে গিয়ে পা ফেলব তার পরিবর্ত্তে কিনা ফিরে চললাম করাচী—তাও আবার যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে বলে। ঐ যান্ত্রিক গোলযোগ কথাটাই যেনো যাত্রীদের মনে যত গোলযোগ বাধিয়ে তুলল। প্রায় সবারই মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরেই পাইলট আবার ঘোষণা করলেন, আমরা বেতারে মেসেজ পাঠিয়েছি ভারত সরকারের অনুমতি চেয়ে। অনুমতি পেলেই সুবিধামত নিকটতম কোনো ভারতীয় বিমান ঘাটিতে নেমে পড়বো।

ইত্যবসরে সামনের ডান দিকের ৫।৭টি আসন খালি করে প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে বসানো হলো পিছন দিকে। ব্যাপার দেখে শুনে মনে হলো নিশ্চয়ই অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে।

সেদিনের যাত্রীদের ভেতর প্রায় অর্দ্ধেক ছিল—যাদের বলা যায় বিলাত ফেরৎ। সিলেটে তাদের বাড়ী। বিলাতে বিভিন্ন কারখানায় চাকুরী করে ৩.৪ বছর পরে বাড়ী ফিরছে। পিছনের সিটে যেতে যেতে তাদেরই একজন অপরকে নিজেদের ভাষায় বলছিল, আজকে যাত্রাই ভাল হয়নি।

কুযাত্রায় সুযাত্রায় আমার তেমন বিশ্বাস নেই। তবু তার কথাটা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়লো। করাচী যাবার দিন এক বন্ধু আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন এক ডজন কলা, তাঁর মেয়ে জামাইয়ের জন্যে সওগাত। মুন্সীগঞ্জের কলা হাওয়াই জাহাজে চড়ে পাকিস্তানের রাজধানী করাচী চলছে। তাদের কৌলিন্য, বিশেষ করে তাদের গাত্রবর্ণ বজায় রেখে অক্ষত দেহে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ। কাজেই সারাটা পথ তাদের নিজের হেফাজতেই রাখতে হয়েছে। ফলে দু' একটি সহযাত্রী বন্ধুর সুদৃষ্টি পড়েছিল কদলীর উপর। তারা আমাকে বুঝাতে চাইছিলেন, কলা নিয়ে যাত্রা করা ভয়ানক কুলক্ষণে ব্যাপার। তবে কিনা, কলা খেলে কুলক্ষণ কেটে গিয়ে সুলক্ষণ দেখা দেয়। সুতরাং—

কলা যে পথে খাবার জন্যে আনিনি, সে কথা সবিনয়ে নিবেদন করলাম। একজন প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে বলে উঠলেন,—কলা খাবার নয়, তবে এনেছেন কেনো? কলা নিশ্চয়ই খাবার বস্তু।

অগত্যা আমি বললাম, ধরে নিন প্রদর্শনের জন্যই এনেছি।

কদলী প্রদর্শনের কথায় কেউ খুশী হয় না কিন্তু বন্ধুরা কেউ না-খোশ হলেন না, বরং খুশীই হয়েছিলেন। এখন এই বিমান বিভ্রাটে পড়ে সে কথাটাই মনে হচ্ছিল। কে জানে, সেদিনের সেই কুলক্ষণ-সুলক্ষণের জের এখনও চলছে কিনা।

এমন সময় শোনা গেল, ভারত সরকার দয়া করে অবতরণের অনুমতি দিয়েছেন। খুব কাছেই আছে যোধপুরের সামরিক বিমান ঘাঁটি। সেখানেই নামবার চেষ্টা করা হবে।

বুঝতেই পারছেন, সে সময় আমরা রাজপুতনার মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। যাবার দিন দেখেছি রাজপুতনার মরুভূমির রিক্ততার অপরূপ ছবি। তখন ছিল দুপুর বেলা। আজ শেষ রাত্রে চেয়ে দেখলাম নীচে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়না। চার দিকেই অন্ধকার। দূরে অতি দূরে দু' একটি তারা।

কিছুক্ষণ পরে নজরে পড়ল, নীচে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সাজানো দীপের মালা। আকাশের অসংখ্য তারা যেন কেউ কুড়িয়ে এনে রেখেছে। অনুমান করলাম, এই তা' হলে যোধপুর শহর।

একদিকে মনে আনন্দ, যোধপুর দেখবার সুযোগ পাব, পাসপোর্ট ভিসার বালাই নেই। কোথায় ঢাকা শহর আর কোথায় রাজপুতনার যোধপুর রাজ্য। কিন্তু অপর দিকে—বুঝতেই তো পারছেন তখনও আমাদের অবতরণ বাকি! কাঁঠাল তখনও ঝুলছে গাছে।

আমাদের সুপার কনষ্টেলেশন বিমান বার বার শহরের উপর চক্কর দিতে লাগল। একবার শহরের দীপমালা চোখে পড়ে, আবার কোথায় উধাও হয়ে যায়। এমনি করেই কিছুক্ষণ চললো। মনে হচ্ছিল রাজপুত বীরেরা যেনো আমাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করছেন।

একাধারে মনের অসীম উদ্বেগ ও কৌতুহল নিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে আছি নীচের দিকে। আরও কিছুক্ষণ এমনি করে কাটানোর পর হঠাৎ দেখা গেলো, শহর থেকে কিছুটা দূরে এক জায়গায় যেনো একটি লাল রংয়ের হাউই বাজী জ্বলে উঠল। অনুমান করলাম, এটিই বিমান ঘাটি হবে। এর পরেও দু'তিনবার চক্কর দেওয়া হলো। তারপর আবার সেই হাউই বাজী। অগ্নিস্রাবী পিস্তলের সংকেত।

এরপর এলো কোমরে বেল্ট বেঁধে তৈরী হবার নির্দেশ। বুঝলাম, এবার তা'হলে সত্যি সত্যি আমরা রাজপুতনার মাটিতে অবতরণ করব।

অবশেষে আমরা নির্বিঘ্নে ধরায় অবতরণ করলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো এ যাত্রা রক্ষা পেলাম বলে। রানওয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ট্যাক্সিইং করার পরে সিগন্যাল অনুসারে কন্ট্রোল রুমের অদূরে এসে আমাদের বিমান থামলো।

তখনও রীতিমত অন্ধকার রয়েছে, যদিও ভোর হতে আর বেশী বাকী নাই। বিমানের ইমারজেন্সী ল্যাডারটি খুলে পাইলট তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন ক্রুদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর অনুসরণ করলেন। হাতে লণ্ঠন ও টর্চ নিয়ে স্থানীয় কাষ্টমস্ সামরিক ও পুলিশ কর্ম্মচারীরা এগিয়ে এসেছিলেন। বিমানের পাশেই দাঁড়িয়ে দুই দলে কথাবার্তা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না কিছুই।

দেখতে দেখতে ভোরের আলো এসে পড়লো বিমান ঘাঁটীর উপর। একদিকে ঘর বাড়ী, অফিস, অপর দিকে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। ঘাস ছাড়া অন্য কোন ফসল তখন চোখে পড়লো না। অদূরে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে যোধপুর শহর এবং পর পর কয়েকটি প্রাসাদ।

আমরা মাটীতে নামবার জন্য উসখুস করছি। করাচী বা ঢাকা থেকে রিলিফ বিমান না আসা পর্য্যন্ত অথবা এটি মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত এভাবেই বন্দী থাকতে হবে কিনা, কে জানে?

আমাদের তখনকার মনের অবস্থা অতিথিবৎসল রাজপুত বীরেরা সহজেই বুঝতে পারলেন। তাঁরা আমাদের সবাইকে ধরার ধূলায় অবতরণের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা তৈরী হয়েই ছিলাম। কিন্তু তৈরী থেকেও কোন লাভ হলো না। মুশকিল বাঁধলো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে। কম করেও দশ মিনিট কোশেশ করে করে এক এক জন নামতে লাগলো। সেখানে যে কাঠের সিঁড়িটি দেখলাম প্রকাণ্ড বিমানের দরজা অবধি তার মাথা কোনক্রমেই পৌছায় না। অবশেষে এলো ফায়ার ব্রিগেডের একটি সিঁড়ি। কিন্তু তাও এতো হালকা এবং নড়বড়ে যে, নীচে থেকে দু'তিন জনে ধরে না রাখলে তার কাঁপুনী থামে না। এয়ার হোসটেস্ মিস রাশিদাকে নিয়ে বিমানে ছিলেন মোট চারজন মহিলা। নামতে গিয়ে তাঁদের অসুবিধাটা স্বভাবতঃই একটু বেশী হলো।

মহিলাদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী। তার কাঁধে ঝুলানো একটি ক্যামেরা। দেখলাম, তা নিয়েই সে নামছে। ক্যামেরাটি তার বড্ড প্রিয়। সারারাত সেটা তার কণ্ঠলগ্ন দেখেছি। বিদেশ বিভূঁইয়ে বিশেষ করে বিমান ঘাটীতে ক্যামেরা খুলতে দেবে না, জানতাম। তাই আমার ক্যামেরাটি ব্যাগে বন্ধ করে খালি হাতে নামছিলাম। কিন্তু এই মহিলাকে ক্যামেরা নিয়ে নামতে দেখে আমারও একবার ইচ্ছে হলো নিজের ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে নামতে। কিন্তু তা' আর হলো না। শ্বেতাঙ্গিনীর এক পা মাটিতে ঠেকাবার আগেই আপত্তি উঠল। অগত্যা সে তার ক্যামেরাটি রেখে দেবার জন্যে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিল।

একে একে আমাদের দলের সবাই যখন নীচে নামলেন তখন রোদ উঠেছে। তবু খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে বেশ শীত লাগছিল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই জটলা করছিলেন। কেউ কেউ পায়চারী করতে করতে একটি মাঠের দিকে পা বাড়াতেই একজন সিপাই এসে বলল, এধার ওধার মাৎ যাইয়েগা। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া বিদেশে এসে এধার-ওধারে যাওয়া যে নিষেধ, আমরা সবাই তা' জানতাম। কাজেই এ-কড়াকড়ি তখন অনাবশ্যক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, স্বয়ং রাজার চেয়ে তাঁর পারিষদের দাপট যেমন একটু বেশী থাকে, এ-যেনো ঠিক তাই। বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী সেখানে যে কয়জন ছিলেন তাঁহারা আমাদের বিপন্ন অতিথি হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষ অবধি অতিথিজনোচিত সৌজন্য দেখিয়েছিলেন।

সেখানকার শুল্ক বিভাগের একজন ইন্সপেক্টার সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি বয়সে যুবক কিন্তু জাতে গোড়া ব্রাহ্মণ। বাড়ীর বাইরে একমাত্র পানি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। লাহোর ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েট। বাড়ীও তাঁর লাহোরের গ্রামাঞ্চলে। অত্যন্ত সদালাপী ভদ্রলোক। তিনি বললেন, আপনাদের সবাইকে 'উমিদ ভবনে' যেতে হবে। শুনে মনে মনে ভাবলাম, 'উমিদ ভবনটা আবার কি? রাজপুতদের ভাষায় কারাভবন নয় তো? অথবা অতিথিশালা?

প্রকাশ্যে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের 'উমিদ-ভবনটা' কোথায়? ভদ্রলোক উত্তর দিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ যে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে। মহারাজ উমিদ সিংহের প্রাসাদ। আপনারা আমাদের অতিথি। ওখানে বিশ্রাম করবেন, তা'ছাড়া একটু জলযোগেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা যেনো হাতে আসমান পেলাম। বিশ্রামও জলযোগ দুটারই তখন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা হলেও ইতিহাস প্রসিদ্ধ যোধপুরের মহারাজার প্রাসাদে যাচ্ছি, সে আনন্দেই আমাদের মন ভরপুর।

একটী মিলিটারী ট্রাকে বেঞ্চ পেতে দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলো। অনেকে ইচ্ছে করে দাঁড়িয়েই রইলেন চার দিকের শোভা ভাল করে দেখার জন্য। সমতল পথে কিছুদূর চলে গাড়ী ক্রমশ: উপরের দিকে উঠিতে লাগলো। পাহাড়ের গা ঘেষে মোটর চলার মসৃণ রাস্তা। রাস্তাটি প্রাসাদের প্রায় দক্ষিণ সীমানা ঘেষে গেছে।

আমাদের গাড়ী প্রাসাদের সিংহ দরজা ছাড়িয়ে পিছন দিকের অপর একটি দরজায় গিয়ে হাজির হলো। শুনলাম, সিং দরজাটি কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া খোলা হয় না।

প্রাসাদের প্রথম প্রবেশদ্বারে দ্বাররক্ষীর ইঙ্গিতে আমাদের গাড়ী থামাতে হলো। পরে ভেতর থেকে নির্দেশ আসায় দারোয়ান গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ীটি তখন প্রাসাদে ঢুকবার সর্ব্বশেষ দরজায় এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে প্রশস্ত একটি উঠান পার হয়েই উপরে উঠবার সিঁড়ি।

উমিদ-ভবন নামক এই প্রাসাদে ঢুকে সর্ব্বপ্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আঁকর্ষণ করে এর আধুনিক সাজসজ্জা।

চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃতি আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সবকিছুতেই আধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ। পরে শুনলাম, উমিদ ভবন তৈরী হওয়ার পরে মোটে এক পুরুষ গত হয়ে দ্বিতীয় পুরুষে পড়েছে। যোধপুরের মহারাজাদের তৈরী এটিই সর্বশেষ প্রাসাদ।

বর্তমান মহারাজা গজধর সিংহের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। তিনি লণ্ডনে পড়াশুনা করছেন। রাজমাতা আছেন পূনায়। বর্ত্তমান নাবালক মহারাজের পিতামহ ছিলেন মহারাজা উমিদ সিং। উমিদ ভবন তিনিই নির্ম্মাণ করেন। তাঁর আগের মহারাজাদের মধ্যেও কেউ কেউ নিজের ইচ্ছে মত এক একটি প্রাসাদ তৈরী করে গেছেন। উমিদ ভবন ছাড়াও যোধপুরে আরও যে সব ভবন বা প্রাসাদ আছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। বর্ত্তমান মহারাজের পিতা অর্থাৎ মহারাজ উমিদ সিংহের পুত্র কয়েক বৎসর আগে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই একটা হল কামরার পার্শ্বে অপর একটি প্রশস্ত কামরায় দেখলাম টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। বুঝলাম, এ-আয়োজন আমাদের জন্যই। বোধহয় বিমানঘাটী থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করেই এ-ব্যবস্থা হয়েছে। কেউ কেউ চা বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেলেন। আমি, অধ্যাপক সুফিয়ান সাহেব এবং আরও দু'চারজন সহযাত্রী হাতমুখ ধোবার প্রয়োজন বোধ করলাম। একজন বেয়ারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো বাথরুমে। সেখানেও আধুনিকতার কোন অভাব নেই।

বেয়ারা চাকরদের কর্তা একজন জমাদার। চা নাশতার পরে সে আমাদের কয়েকজনকে প্রাসাদের বিভিন্ন কামরায় নিয়ে দর্শনীয় সব কিছু দেখাতে লাগলো।

মধ্যের একটি বৃত্তাকার হল কামরায় যোধপুর কেল্লা ও শহরের একটি রৌপ্য নির্ম্মিত মডেল দেখতে পেলাম। প্রাসাদের পশ্চিম বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে যোধপুরের সুন্দর শহর ও কেল্লাটি দেখা যায়। একটি যাদু ঘরও নাকি ওখানে আছে। অধ্যাপক সুফিয়ান বলছিলেন, মোগল আমলের কিছু দলিল-দস্তাবেজ নাকি এখনও যোধপুর যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

দরবার কক্ষটি দেখবার জন্য আগ্রহ ছিল। জমাদার আমাদের সেখানে নিয়ে গেলো। এক পাশে ক্ষুদ্র একটি মার্ব্বেল নির্ম্মিত বেদীর উপর সোনালী রংয়ের সিংহাসন। তার দু'পাশে বিশেষ ধরণের কয়েকটি আসন। সেগুলি পরিষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দরবার কক্ষের মধ্যস্থলে রয়েছে ক্ষুদ্র একটি কৃত্রিম ফোয়ারা। দেয়ালে বিদেশী শিল্পীর অঙ্কিত রামলীলার কয়েকটি ছবি।

একটি কামরায় দেখলাম, তিনটি Staffed চিতাবাঘ। বড় বড় গাছের গুড়ি এনে বাঘগুলোকে তার ওপরে চড়িয়ে রাখা হয়েছে। একটু দূর থেকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে সত্যিকার চিতাবাঘই যেনো গাছে চড়ে আছে। শুল্ক বিভাগের সেই ইন্সপেক্টরটি বলছিলেন, উমিদ ভবন যেখানে নির্ম্মিত হয়েছে এককালে সেখানে চিতাবাঘের খুবই উৎপাত ছিল। তাই আজও 'উমিদ-ভবন' স্থানীও বহুলোকের কাছে 'চিতা ভবন' নামে পরিচিত।

ঘুরতে ঘুরতে জমাদার স্বল্পায়তন একটি সিনেমা হলে নিয়ে আমাদের হাজির করলো। রাজ পরিবারের বা রাজানুগৃহীত স্বল্প সংখ্যক দর্শকের জন্য সিনেমার আয়োজনা শুনলাম, নাটকাভিনয়ও সেখানে হয়।

নিম্নতলে দেখলাম একটি স্নানাগার। প্রাসাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্য অবগাহনের সুব্যবস্থা। আগাগোড়া মোসের্লিনের টালিতে মোড়া হাত তিন চার গভীর ছোট্ট একটি সরোবর। প্রয়োজন মত পানি সরিয়ে ফেলা বা বাহির থেকে পানি আনার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। স্নানাগারের সঙ্গেই পর পর কয়েকটি আধুনিক ধরণের ড্রেসিংরুম।

সেখান থেকে আবার উঠে এলাম উপরের হল কামরায়। তার পাশেই একটি কামরায় কাচের দরজার ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম আলমারীতে অনেক বই সাজানো রয়েছে। একদিকে একটি ভদ্রলোক অখণ্ড মনোযোগ সহকারে কি যেনো লিখছেন। আমরা একদল পাকিস্তানী আগন্তুক যে সহসা এসে মহারাজার প্রাসাদের উপর হামলা করেছি সেদিকে তাঁর একটুও খেয়াল নেই। রাজা-মহারাজার পাঠাগারে সাধারণতঃ কি কি পুথি-পুস্তক থাকে দেখতে খুবই লোভ হচ্ছিল। অধ্যাপক সুফিয়ান পণ্ডিত মানুষ। তাঁরও দৃষ্টি অবশ্য সেদিকেই ছিল। পরে আমরা দু'জনে দরজা ঠেলে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা প্রথমে আমাদের পরিচয় এবং তথায় গমনের হেতু সংক্ষেপে বিবৃত করলাম স্বভাবতই মনে করেছিলাম, আমাদের এই বিমান বিভ্রাট সম্বন্ধে ভদ্রলোক অবশ্যই কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠবেন; কিন্তু তিনি তার ধার দিয়েও গেলেন না। সে সব কথায় তার কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি স্মিতহাস্যে প্রথমেই জিজ্ঞাস করলেন, Well, are you willing to hear some thing about a language, the larguage encented by me?

এরকম একটি অভূতপূর্ব্ব বিষয়ে দু'চার কথা শুনবার সুযোগ কে হারায়? আমরা উভয়ে বিশেষ করে সুফিয়ান সাহেব খুব আগ্রহ দেখালেন তাঁর আন্তর্জাতিক ভাষা

সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে। কিন্তু ভদ্রলোকের এই ভূমিকা হীন প্রশ্নের ধরণ দেখে আমার তাতে কেমন যেনো লাগছিল। মনে পড়ছিল, এক বন্ধুর কাছে শুনা পাগলা গারদের একটি গল্প। নানা রকম পাগল সেখানে থাকে। এক পাগল সুন্দর কাউকে দেখলেই ডেকে জিজ্ঞেস করে, ও মশাই, লাল যদি টুকটুকে হয়, আর কালো যদি হয় কুচকুচে, তবে হলদে হবে কি ? হলদে কি হবে; সেই নিয়েই সারা জীবন মাথা ঘামিয়ে লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

এই গল্পের সঙ্গে বর্তমান ঘটনার সামঞ্জস্য কতটা আছে তা আমি তখন ভেবে দেখিনি। ভদ্রলোক তার উদ্ভাবিত ভাষা সম্বন্ধে যা কিছু বললেন তার সবটা আমার বোধগম্য হয়নি সম্ভবতঃ অধ্যাপক সুফিয়ান তার বক্তব্য পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। আমরা প্রশ্ন করে জানলাম, ভদ্রলোক তার এই ভাব সম্বন্ধে ইউ-এন-ওর সঙ্গেও লেখালেখি করেছেন। সুফিয়ান সাহেব তাঁর নাম-ঠিকানা চাইলেন। ভদ্রলোক নাম লিখলেন মতিলাল গুরু।

মহারাজের পাঠাগারে ইংরেজী ছাড়া অপর কোন ভাষার বই দেখলাম না। বিষয়ানুসারে সমস্ত বই বিভিন্ন আলমারীতে নিপুন ভাবে সাজানো রয়েছে।

এমনি করে প্রাসাদের ভেতরে ঘুরে ফিরে দেখতেই বেলা প্রায় বারটা বেজে গেল। আমাদের খুব ইচ্ছে হয়েছিল, যোধপুর শহর, বিশেষ করে কেল্লা ও যাদুঘর দেখতে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনুমতি ব্যতীত তা' সম্ভব নয়। লাইব্রেরী থেকে ফিরে আমরা এসে বড় হল কামরাটায় বসেছি, এমন সময় অতি উৎসাহী আমাদের এক সহযাত্রী চুপি চুপি বলল—শুনে এলাম আমাদের 'লাঞ্চের' ব্যবস্থা নাকি এখানেই হচ্ছে।

হয়তো ব্যবস্থা সত্যিই হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে বসে লাঞ্চ খাওয়া আর হলো না। একটু পরেই খবর এলো করাচী থেকে একখুনি প্লেন এসে পড়বে, কাজেই বিমানঘাটিতে ফিরে যাওয়া দরকার। খাওয়া-দাওয়া সেখানেই হবে।

অগত্যা সবাইকে গিয়ে উঠতে হলো আবার সেই বেঞ্চ পাতা ট্রাকে। ট্রাকে উঠে দেখা গেলো, সংখ্যায় আমাদের লোক একজন কম হচ্ছে। চিতাবাঘের উপদ্রব এক সময়ে ছিল কিন্তু এখন তো নেই, চিতাবাঘ যে কয়টি দেখে এলাম সবই মৃত। তা হলে লোকটির হলো কি ? অচেনা আর অর্দ্ধ চেনা লোকের ক্ষুদ্র সমষ্টি কে যে হারালো তাও সহসা বুঝবার উপায় নেই। সবাই নিজ নিজ বুকে হাত রেখে মনে মনে বলতে লাগলো আমি তো ঠিকই আছি তবে হারালো কে ?

হারালো কে অবশেষে অনেক গোণাগুণতির পর তা বুঝা গেল। যোধপুরে এসে অবধি এক যুবক শহরে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এক কালে সে নাকি যোধপুরেরই অধিবাসী ছিল। তার হাল সাকিন ঢাকার তেজগাঁতে। পেশা তার তেজারতি। যোধপুরের পথঘাট তার নখাগ্রে। উমিদ ভবনে পৌঁছেই সে সকলের অলক্ষ্যে শহরে গেছে ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে মোলাকাত করতে। বুদ্ধিমান ছেলে বলতেই হবে তাকে। পাসপোর্ট আর 'বি' ভিসার বালাই এড়িয়ে হাজার মাইল দূরে ভাই-বেরাদরের সঙ্গে মোলাকাতের এ-শুভ সুযোগ কার জীবনে ক'বার আসে ?

বুঝা গেল, চিতাবাঘের পেটে হজম হবার পাত্র এ ব্যক্তিটি নয়। যথাস্থানে সে অনায়াসে হাজির হতে পারবে। কাজেই আমরা ফিরে এলাম বিমানঘাটিতে।

ফিরে এসে কেউ কেউ প্লেনে উঠে দেখে এলো নিজ নিজ তল্পিতল্পা সব ঠিক আছে কিনা। বাকি সবাই মাঠে পায়চারী করতে লাগলো। এমন সময় মিলিটারী মেস থেকে এল প্রচুর পাউরুটি, জেলী, মাখন আর চা। চায়ের পান পাত্র হিসাবে এল কাগজের তৈরী কাপ।

আমরা যখন সানন্দে ভোজ্য বস্তুগুলোর সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত তখন হাসতে হাসতে ফিরে এল সেই হারিয়ে যাওয়া যোধপুরী যুবক। তার দুহাতে বোঝাই খাবারের বড়ো বড়ো ঠোঙ্গা : মিষ্টি ও ঝাল উভয় রকম খাবার। সেই সঙ্গে একটা মাটীর পাত্রে যোধপুরের দধিবড়া। যুবকের আগ্রহাতিশয্যে সবাইকে সে খাবারের শরিক হতে হলো।

আমাদের আহ্বানে শ্বেতাঙ্গিনী যুবতীও যোগদান করলেন আমাদের সঙ্গে। প্রয়োজনের তাগিদে শাদা কালার ব্যবধান ঘুচে গেলো। বিপদে আপদে সত্যিই মানুষের ব্যবধান ঘুচে যায়। বহু বছর আগে মাইজদি ট্রেন দুর্ঘটনার একটা ছোট ঘটনা মনে পড়লো। ট্রেন ছাড়বার একটু আগে দু'জন যাত্রীকে দেখেছিলাম বসবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে। বিনা যুদ্ধে সূচ্যাগ্র ভূমি কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না এমনি ভাব। কিন্তু দুর্ঘটনার পরে তাদেরই দেখলাম, একে অপরের গলা ধরে কাঁদছে। ব্যবধান তখন ঘুচে গেছে।

উমিদ ভবন থেকে ফিরেই অনেকে সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে গিয়ে উঠেছিলো তা আগেই বলেছি। যারা উঠেছিলো তাদের প্রায় সবাই নেমে এসেছিলো কিন্তু খেতে খেতে দেখলাম, সেই আরবী পোষাক পরিহিত যুবক এসে দাঁড়িয়েছেন প্ল্যানের দরজায়। তিনি নামতে চাইছেন। কিন্তু একটু আগেই কে যেন সিঁড়িটি সরিয়ে নিয়ে গেছেন। নীচে ভোজনের বিপুল আয়োজন আর উপরে নিরুপায় দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধার্ত একজন সঙ্গী। এ-দৃশ্য সত্যি বড়ো করুণ। কিন্তু কোন বেরসিকজন যে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে

নেবার মতো হাস্যকরুণ এ-দৃশ্যের অবতারণা করলেন না বুঝা গেলো না। অবশেষে মই যখন ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এলো তখন খাওয়ার এই দ্বিতীয় প্রস্থ শেষ হয়ে গেছে।

তৃতীয় প্রস্থে এলো আমাদের লাঞ্চ। ট্রাক ভর্ত্তি হয়ে এলো ডেকচি থালা বাসন গ্লাস ইত্যাদি। আমরা ভেবে রেখেছিলাম, রুটির সঙ্গে নিরামিষ তরকারী ছাড়া কি আর খাওয়াবে। কিন্তু খেতে বসে দেখা গেলো ভাত ও রুটি দুয়েরই ব্যবস্থা আছে—যার যা খুশী। সেই সঙ্গে গোশও আছে প্রচুর। আরও যা ছিলো তার ফিরিস্তি দিয়ে সেদিনের সেই বিমান বিভ্রাটে অনুপস্থিত বন্ধুদের মনোকষ্টের কারণ ঘটাতে চাইনে।

খাওয়ায় ব্যস্ত থাকলেও আমাদের মন ছিলো করাচী থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্যে নতুন প্লেন কখন্ আসবে সেই দিকে। ওখানকার অফিসাররাও কনট্রোল রুমে দৌড়ে গিয়ে করাচীর প্লেন রওয়ানা হলো কিনা খবর নিচ্ছিলেন। বেলা দু'টা থেকে চারটা পর্য্যন্ত চললো অধীর প্রতীক্ষা।

চারটা বাজার কিছু আগে শুল্ক বিভাগের সেই ইন্সপেক্টার কনট্রোল রুম থেকে দৌড়ে এসে আমাদের সুখবর শুনালেন, দশ মিনিটের ভেতর করাচীর 'ভাইকাউন্ট' বিমান এসে যোধপুরের বিমানঘাটীতে অবতরণ করবে। আমরা আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম, কান পেতে রইলাম দূরাগত বিমানের আওয়াজ শুনবার জন্যে।

মিনেট দশেক পরে সত্যি সত্যিই বিমান এলো। নতুন বিমান 'ভাইকাউন্ট'। কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান এরই নামকরণ করেছেন 'সিটি অব করাচী।'

ভাইকাউন্ট চারটার সময়ে এসে পৌছলেও সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা যাত্রা সম্ভব হলো না। সেদিনই ভারতীয় একজন উপমন্ত্রী গিয়েছিলেন যোধপুর পরিদর্শনের জন্যে। স্থানীয় অফিসাররা বিকালের দিকে সবাই পুরোপুরি তাকে নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। এ-কারণে আমাদের যাত্রা বিলম্ব হতে লাগলো।

বিমান ঘাটীর এক পাশে কর্ম্মচারীদের কয়েকটা একতালা বাড়ী। বিকালে আমরা যখন পায়চারী করছিলাম তখন কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে জুটলো সেখানে খেলা করতে। তাদের ভিতর ছ'সাত বছরের একটি ছেলে প্লেনের গায়ে বাংলায় লেখা 'পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ' কথা কয়টি বানান করে করে পড়ছিল। দেখে আমার ইচ্ছে হলো ওদের সঙ্গে আলাপ করতে—এখানকার ছেলে বাংলা শিখলো কি করে?

আলাপ করে জানলাম, তারা বাঙ্গালী। আরও অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সেখানে আছে। এক কালে তাদের বাড়ী পাকিস্তানেই ছিল। আমরা পাকিস্তানের বাশিন্দা বুঝতে পেরে প্রথমেই সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, পাকিস্তানে তাদের বাড়ী আমি চিনি কিনা।

তাদের বাড়ী ছিল নোয়াখালী জেলায়। তার জন্মের আগেই বাপ-মা ভারতে চলে এসেছে। ছেলেটী তাদেরই মুখে শুনেছে যে, তাদের বাড়ী পাকিস্তানে নোয়াখালী জেলায়। তাকে স্বীকার করতেই হলো যেহেতু আমরা পাকিস্তান থেকে গেছি, সেই হেতু তাদের বাড়ীটি আমার অচেনা নয়।

সন্ধ্যার দিকে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো। নতুন বিমানে তখনো আলো জ্বালা হয়নি। আমরা টর্চের সাহায্যে বিমানে উঠে বসলাম। তারপর কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনেই নেই। অবশেষে ঘুম ভাঙলো বিমান ষ্টার্ট দেবার শব্দ শুনে। আমার ঢাকাই ঘড়িতে তখন রাত ন'টা। পাইলট বললেন অনুমান তিন ঘণ্টায় আমরা ঢাকা গিয়ে পৌঁছতে পারবো।

একটু পরেই চাটগাঁ যাত্রী একজন অবাঙ্গালী খাবারের জন্যে বেশ একটু শোরগোল শুরু করলো। তার বক্তব্য হলো, দুশো পাঁচ টাকা ভাড়া নেওয়া সত্ত্বেও একরাত একদিন পরেও বিমান থেকে কোনো খাবার দেওয়া হলো না? তাহলে বিমানে যাত্রীদের জন্যে খাবার কেন আনা হয়? কর্ম্মচারীদের এ-ত্রুটী সে মাফ করবে না—কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করবে।

তার ক্রোধের এ-বহিঃপ্রকাশ ফলপ্রসূ হলো। একটু পরেই হোসটেস ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এলো এবং সবার আগে খবোব তাকেই পরিবেশন করলো।

খাওয়ার পরে এলো সিগারেট। বিমান যাত্রীদের জন্যে টিনের সুদৃশ্য কৌটায় স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট সিগারেট। দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সাধারণতঃ এক প্যাকেটের বেশী কেউ কিনে না। আমার পাশেই বসেছিলেন সেই আরব থেকে আগত যুবক। তিনি ধুমপান করেন না। তাকে বললাম, আমি নিজে এক প্যাকেট সিগারেট কিনছি—আপনার নাম করে আরেক প্যাকেট আমাকে কিনে দিন। এই নিন টাকা।

তার জবাব শুনে আমাকে অবাক হতে হলো। তিনি বললেন, তিনি নিজে ধুমপান করেন না বলে এ-কাজে আমাকে সাহায্য করতে তাঁর নীতিতে বাধে।

অগত্যা আমি দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে নিলাম।

পরে অবশ্য সেই নীতিবাগিশ যুবকের কাছে স্বীকার করলাম, গত রাত্রি আমি একটা ভয়ানক দুর্নীতির কাজ করে ফেলেছি, সে জন্যে অন্ততঃ একটিবার 'তওবা' করা উচিত!

যুবক কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি দুর্নীতি কাজ আমি করেছি?

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, আপনার মালের ভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কাল রাত্রে পি-আই-এ কোম্পানীকে অনেকগুলো টাকা ঠকিয়েছে।

যুবকটি একেবারে নিশ্চুপ।

সত্যি সত্যিই আমরা তিন ঘন্টা পরে ঠিক বারোটায় তেজগাঁ এসে নামলাম। নেমেই দেখলাম ডিউকের-'কমেট' বিমানখানা সেখানে আছে।

যুবক বন্ধু তার মালপত্র নিয়ে একটি রিকসায় গিয়ে উঠলো। সবার আগে প্রায় সবাইকে সালাম আলাইকুম জানিয়ে গেলো; কিন্তু আমি মুখপোড়ার দিকে ফিরেও চাইলো না।

অগত্যা আমি তাকে ডেকে সালাম আলায়কুম করলাম; কিন্তু চলন্ত রিকসা থেকে তিনি জবাব দিলেন কিনা, বুঝতে পারলাম না!

দুইটি আধুনিক আরবী কবিতা

মিখাল তার-আদ (লেবানন)

আঙুল

মেয়েটার নীলাভ দু'চোখে
প্রতিজ্ঞার স্বীকারোক্তি জ্বালে ;
বসন্ত বাগান জুড়ে বহু বিচরণ
অবশেষে একাকিনী মন
মুখর উন্মুখে
হঠাৎ কুড়াতে গিয়ে ফুটন্ত গোলাব
দশটি আঙুল তার হারালো নিজেই
গোলাবের পাতার আড়ালে॥

তাকে তুমি বলো

ও বাড়ীর মেয়েটা কেবল
আমাকে পাবার জন্যে প্রার্থনার জল
দুইচোখে আনে।
তাকে তুমি বলো,
'কী যে এক মোহময় টানে
সে তোমার স্বর্গ বিকিয়েছে
সামান্য লাভের প্রত্যাশায় ;
এখানে দুয়ারে শুধু শোকাচ্ছন্ন গান মুরছায়।
সব তার গেছে
অযথা চোখের ছলোছলো॥'

মূল আরবী থেকে অনুবাদ ঃ
আবদুস সাত্তার

পলাশীর পর ও সিপাহী যুদ্ধের আগে

হায়দার আলী

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নগরের মূল প্রাসাদটি ও বাগ-বাগিচা, সরোবর প্রভৃতি নিয়ে স্থানটি অন্ততঃ বিশ লক্ষ বিঘা জমিরও উপরে অবস্থিত ছিল। ধনকুবের রাজা কামালের এই 'নগর'টি মূল প্রাসাদসহ সাতটি সশস্ত্র সৈন্য চক্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল। মোস্‌লিম-হিন্দু ধর্মের যেরূপ বেহেশত্‌ বা স্বর্গের বর্ণনা দে'য়া হয়েছে—এখানেও তদ্রূপ কবি কল্পনার সাহার্য্যে মৃত্তিকার উপরে বাস্তবেই বেহেশ্‌ত্‌ বা স্বর্গ-নির্মিত হয়েছিল। সরোবরগুলির পাশ দিয়ে স্বুরদের অর্থাৎ কামালের পার্শ্বচরদের পুরী বা গ্রীষ্মাবাস নির্মিত হয়েছিল। পরীস্তানের গল্পের মত ফল ফুলের বিরাট কানন; আবার বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে ছোট-বড় নানারকম দীঘি—তাতে নানারকম—নানাজাতের ও রংএর মাছ, তার মাঝে পরীরা দীঘিতে গোছল করেন। আবার মাঠ—আবার বাগান ফল ফুলের,—সুন্দর সুন্দর হর্ম্যরাজি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ঐরূপ পরীকাহিনী বা স্বর্গের কাল্পনিক তুলিকায় শিল্পীর আঁকা এই স্বর্গপুরী একদিন বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ সেখানে স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৮৫৭ সালের পাক-ভারত আলোড়নকারী স্বদেশীয় বিপ্লবী-বীরগণ আমাদের আলোচ্য 'নগর'কেই দিল্লীর পরিবর্তে ভারতের রাজধানী করবার সঙ্কল্প নিয়েছিল। এসব কথা আমরা সিপাহী যুদ্ধের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এখনকার ইঞ্জিনিয়ারদের এইসব স্থান পরিদর্শন করার জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে। কেননা এর মধ্যে অনেক কিছু জানবার ও শিখবার রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই সরোবর প্রভৃতির মালিক বাকেরজঙ্গ, নবাবজাদা কামাল এর এক-একটা কুঠির চতুষ্পার্শ্বে বিরাট পরিখা এবং পরিখার মধ্যস্থিত স্থানটির অন্ততঃ আড়াই হাজার হতে ত্রিশ হাজার বিঘা জমির উপরে কুঠি অবস্থিত ছিল। ইহাদের এ-রূপ প্রায় শতখানিক কুঠি বিভিন্ন জায়গায় লোকে দেখায়ে দেয়। যা-ই হোক, অর্থনীতিবিদদেরও এ সব স্থান পরিদর্শন করা দরকার বলে মনে করি। শুধু ভারত যে সময় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিল এবং সত্য সত্যই ভারত যে ঐ সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনৈশ্বর্য্যশালী দেশ ছিল, এ স্থানগুলির কুঠি ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করলে তা' উপলব্ধি করতে পারা যায়। বাকের, কামাল, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির এই 'নগর' পরিদর্শন করার জন্য আমরা দেশপ্রেমিক নর-নারীদেরকে পুনরায় সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। কবি ও সাহিত্যিক পাবেন তাঁদের কাব্য ও সাহিত্যের অফুরন্ত উপাদান; নাট্যকার দিতে পারবেন দেশকে নূতন ও গৌরবোজ্জ্বল পথের সন্ধান এবং অর্থনীতিবিদ দেখাতে পারবেন এখন হতে মাত্র দুইশত বৎসরে কি করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনৈশ্বর্য্য-শালী ভারত-উপমহাদেশ পৃথিবীর সব চেয়ে গরীব দেশে পরিণত হল! দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এক কথায় দেশ-হিতৈষী বিভিন্ন চিন্তাবিদদিগকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কর্তৃক 'গুম' করে রাখা এ 'নগরে' পদার্পণ করার জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে।

"সেই ত্রিস্রোতের উপরে কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরাখানি নানাবর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মূর্ত্তি আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল-দাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিল্‌টি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ; সেটাও গিল্‌টি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল আবার নিস্তব্ধ। ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত।"

['দেবী চৌধুরাণী,' ৭৪ পৃঃ]

ঋষি—পথপ্রদর্শক বঙ্কিমের এ 'বজরা' কাল্পনিক নয়; দেবী চৌধুরাণীর প্রকৃত পক্ষে এ 'বজরা' ছিল না; তিস্তা নদীতেও এ বজরা ভাসমান অবস্থায় থাকত না বটে, তবে যে সরোবরটির পাশে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর 'বালাখানা' (গ্রীষ্মাবাস) ছিল, ঐ সরোবর থেকে ওয়ালীদাদ এবং শিবচন্দ্ররায়ের 'বালাখানা'র পার্শ্বস্থিত সরোবরটিতে পৌঁছিতে তিস্তা নদী হয়ে প্রায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করতে হত।

হান্টার 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্‌' গ্রন্থের ১৪৭-১৪৯ পৃঃ নগরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে লিখিত রয়েছে :—

"জরীন একটি বজরা বিশেষ গর্বভরে পানি কেটে খিড়কির ঘাট থেকে বাগান-শোভিত সরোবর মধ্যস্থ একটি দ্বীপে যাতায়াত করত।"

উক্ত দ্বীপের কাছেই ছিল জয়দুর্গা দেবী-চৌধুরাণীর গ্রীষ্মাবাস; বজরাটি হ'ল নবাবপুত্র কামালের—বেগমেরা ঐ বজরায় হাওয়া খেয়ে বেড়াতেন। ইহা সত্য যে, কামালউদ্দিন মোহাম্মদের এই 'নগর' নির্ম্মানের কৌশল ও রুচি সম্পূর্ণ অভিনব। গোটা ভারত উপমহাদেশে এইরূপ নগর নির্ম্মানের কায়দা ও রুচিবোধ আমাদের

জানা মতো ইহাই প্রথম ও ইহাই শেষ। কামালের এই 'নগর' ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে অন্ততঃ কদিন এখানে থেকে ঘোরাফেরা করা দরকার। নইলে দুনিয়ার সর্বনিম্ন গরীব দেশের লোক আমরা ধরতেই পারবনা নগর নির্মাণের কলাকৌশল। কারণ যে সময় এই স্বর্গীয় রাজপুরী নির্মিত হয়েছিল ঐ সময় ভারত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী দেশ এবং ভারতের মধ্যে কামাল ঐ সময় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী ধনী সৌখিন মানুষ।

"এবং প্রত্যেক জিলাতেই কোন না কোন শাহী খান্দানের বংশধর বিষন্নভাবে কোন ছাদের ইমারতে আর খাগড়া-বোজা দীঘির ধারে তার আত্মনাশ করে যাচ্ছে।" [দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্ ১৪৭-৪৯ পৃঃ]

প্রত্যেক জিলাতেই বাদশাহী বংশধর ছিল না, ইহা হাণ্টার অমূলকভাবে বলেছেন লোকদেক বাদশাহী খান্দানদের গুরুত্ব হানি করবার কুমতলব নিয়ে। হাণ্টার যেমন নগরের সরোবরের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সেখানে একসময় তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত ছিল না; পরে খাগড়া-বোঁজা ও কোন কোন স্থান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়—আমাদের এ-দিককার স্থানীয় লোক-কবিদের গানেও তার আভাস পাওয়া যায়।

"ভালোয়া নদীর ধারে ধারে নানান বা জাতি ফুল।
ছাড়িয়া দে রে চেংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্ধ" চুল॥"

পরে যখন সরোবরে নলখাগড়া বা বিন্না গাছ থোকায় থোকায় হয়, তখন আবার কবি গাহিলেন—

"ভালোয়া নদীর বাতায় বাতায় (পাড়ে পাড়ে)
বিন্না বা থোকা থোকা।
ছাড়িয়া দে রে চেংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্ধ" খোঁপা॥"

নগরের স্বর্গ সদৃশ স্থানগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পরদেশলুণ্ঠনকারী দস্যু ইংরেজরা সিপাহী যুদ্ধের পরে বিদেশীদের দ্বারা নিযুক্ত নূতন জমিদার ছত্রপৎ সিং দুগড় ও ধনপৎ সিং দুগড় দ্বারা ঐ সব এলাকাকে দুর্গম জঙ্গল করবার মানসে শাল গাছের বীজ ও চারা রোপন করে ঐ সব স্থানগুলিকে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত করে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সর্বপ্রধান সরোবরটিকে স্থানীয় লোকেরা ভালোয়া নদী বলে। কারণ ভেলায় চড়ে এপার ওপার হয়। তাই স্থানীয় লোকগীতিকারগণ গান রচনা করেছেন, তার ক'লাইন এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"যারে কালা! কালা তোর পিরীতির গাছতলায়
যারে কালা
ভালোয়া নদীর বাতায় বাতায়, ভাসিয়ে যায় রে
শালপাতা।
হায় রে ভাসিয়া যায় রে শালপাতা
কালা তোর পিরীতির গাছতলায় যা রে কালা।
সেই না পাতায় দেখা যাও রে আমার প্রাণের বন্ধুর
নাম লেখা।
যা রে কালা॥"

এই বিস্তৃত রাজপুরীর মধ্যে মাত্র একটি সাজান বন্দর ছিল; বন্দরটির নাম "কোকিলা জং"। উক্ত কোকিলা বন্দরটিকে নিয়ে একটি সুন্দর গীত এতদঞ্চলে আজোও মেয়েদের মধ্যে গাওয়া হয়ে থাকে, গীত হল এই—"ওরে বুড়ী কোনা গেল তাঁতিয়ার বাড়ী; তাঁতিয়ার আসছে জরো রে। কেমন করিয়া বানাবো শাড়ী বুড়ী, বড় বৌউক পাঠায়ে দে। বড় বৌউ গেল তাঁতিয়ার বাড়ী, তাঁতিয়া হাসে মনে মনো রে, কও তো সুন্দরী কোন্ বা রংগে বানাবো শাড়ী তাকবা বলিয়া দে। দশো দিকে দশো ডোরা শকুন্নামতি অঞ্চলো—তাহারে মধ্যে নারায়ণী কমোলা হরিচরণ ছকিয়া দে। সেই শাড়ী পরিয়া গেল বৌউ "কোকিলা জংগিয়ার বন্দরে"। কোকিলা জংগিয়ার রসিকো সদাগর অঞ্চল ধরিয়া টানে, শশুরো হইল মোর গাঁয়েরও পঞ্চায়ইত, ভাসুরো চৌকিদারও রে। তাহারও হুকুমে বানাইচো শাড়ী, সদাগর অঞ্চল ছাড়িয়া দেও রে।"

(সংগৃহীত—লেখক)

'চৌধুরাণী' রেল ষ্টেশনের জায়গাটি জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর নামানুসারে হয়। পীরগাছা থানার সে স্থানে 'মংলা কুঠি' (মোগল কুঠি) অদ্যাবধিও বলা হয়, উহা নবাব বাকের জঙ্গ ও তৎপুত্র কামাল উদ্দিনের কুঠি ছিল। উহার অনতিদূরে জয়দুর্গা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি দীঘি খনন করিয়ে জয়দুর্গার নামানুসারে উহার নামকরণ হয়।

পরিশেষে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী যে পীরগাছার ভূম্যধিকারিণী তা' 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র নিম্নোক্ত উক্তি হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

"ঐতিহাসিক হিসাবেও [রতিরাম দাসএর] এং কবিতাগুলি সামান্য নহে। এই কবিতা প্রকাশ করিতেছে যে, রঙ্গপুরে এককালে একটি বিরাট পণ্ডিতসমাজ বিদ্যমান থাকিয়া সমগ্র বাঙ্গলার গৌরবস্থানীয় হইয়াছিল। রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহ, দেবীসিংহের অত্যাচার শ্রবণে পীরগাছার প্রাতঃস্মরণীয়া ভূম্যধিকারিণী জয়দুর্গা চৌধুরাণীর উক্তি নবীনচন্দ্রের লিখিত পলাশীর যুদ্ধে রাণী ভবানীর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি উক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রতিরাম বহুপূর্ব্বে যাহা গ্রাম্য ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন নবীন কবি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়া আজ বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের এই গ্রাম্য কবির স্থান এখন কোথায় দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ নির্ণয় করুন। হায়!

আমাদের অনুসন্ধিৎসার অভাবে এরূপ বহু রত্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।”

[১১ই ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট (১৯০৮)
চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় অধিবেশন
স্থান রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী গৃহ
সভাপতি—আশুতোষ লাহিড়ী
জাগগানের সংগ্রাহক
পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়]

স্বর্গীয় কেশবলাল বসু ও মধুসূদন দেব মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা। কেননা ১৯০৮ সালের সাহিত্য পরিষদের সুপ্রাচীন কর্মকর্তারাও বলেছেন জয়দুর্গা পীরগাছার ভূম্যধিকারিণী। উপরন্তু শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিজ ও পৈত্রিক গ্রাম হল জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের গ্রাম ইটাকুমারীতে। উক্ত ইটাকুমারী হতে পীরগাছার দূরত্ব মাত্র ছ'মাইল। পীরগাছা ও ইটাকুমারীর সকল জমিদারদের খবর বৃদ্ধ তর্করত্ন মহাশয় ভালভাবেই রাখতেন। সুতরাং সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তা ও যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মতের সহিত আমরা একমত যে, পীরগাছার জমিদার বাটীর কর্ত্রী হলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী।

মন্থনা পরগণার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর পীরগাছা সদর কাছারীর দলীল হতে নিম্নোক্ত বিষয়টি দে'য়া গেল। প্রয়োজন হলে আরও অনেক দলিল ও কাগজপত্র আমরা পেশ করতে প্রস্তুত রয়েছি।

“পেট ভাতার দলীল ৭ পাতা হইতে দেবত্তোর উপঞ্চকী মহাল হারের স্থিত বহি হইতে সদর তোক মহালের মৌজা অনন্তরাম—বাং ১১৯৮ সালের শ্রী জয়দুর্গা দেব্যার নামীয় জমিদারের তালুদ মিন্সানী কাগজ মতে ঐ সময়ের ৪৩৶৩ পাই সিক্কাটাকা।”

এ দলীল খানায় যে সন দেওয়া হয়েছে তাহা বাংলা ১১৯৮ সন। ইংরাজী ১৭৯১ সনের দিকে এ-দলীল রচিত হয়েছে। তখন বাকেরজঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র কামাল উদ্দীন লর্ড কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে মিত্রতা সূচক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে শান্তি-মত নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তারে মন দিয়েছেন এবং নগর নির্মাণ সম্পূর্ণ করবার পথে গিয়েছেন। তাঁর নগরের পরিকল্পনার ভিতরে ইংরাজ বিরোধী জমিদার কর্তাকর্ত্রীর গ্রীষ্মাবাসগুলিও ছিল, যেমন মুর্শিদাবাদে ছিল রাণী ভবানী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদির আবাস স্থল। সেই পরিকল্পনা মুতাবেক নগরের যে স্থানে যাঁর বালাখানা নির্মিত হয়েছিল, সেই সব স্থান আজো সেই সেই কর্তাকর্ত্রীর পরিচয় লোকের মুখে মুখে বহন করেছে।

আমরা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর স্বামীর বংশতালিকা নিম্নে দিলাম।

স্বামী

(১) নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
(২) রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
(৩) হরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
(৪) মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
(৫) জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
(৬) ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী (বর্তমান)

স্ত্রী

(১) জয়দুর্গা দেব্যা চৌধুরাণী
(২) সর্বমঙ্গলা দেব্যা চৌধুরাণী
(৩) মহামায়া দেব্যা চৌধুরাণী
(৪) রাধাপ্যারী দেব্যা চৌধুরাণী
(৫) ভবসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী

এই সঙ্গে আমরা সুবাদার নবাব বাকের মোহাম্মদ নূরউদ্দিন এর বংশ তালিকা ও ইঁহার দেওয়ান রাজা দয়া (দয়াল) চন্দ্রশীল এর বংশ তালিকা এবং বাকের জং এর প্রধান সেনাপতি ও সহকারী মিঞা কাদের উল্যা ওরফে মুছা শাহ'র বংশ তালিকাও দিলাম:

স্বামী	স্ত্রী
১। বাকের মোহাম্মদ নুরউদ্দিন	১। কিসমত বানু
২। কামাল উদ্দিন মোহাম্মদ ও জামাল উদ্দিন মোহাম্মদ	২। জতন বিবি —অজ্ঞাত
৩। নছির উদ্দিন মোহাম্মদ ও গৌস্ উদ্দিন মোহাম্মদ এবং জামাল উদ্দিনের পুত্র খিজর উদ্দিন মোহাম্মাদ।	৩। আমিরন নেসা ৩। খয়রতন নেসা ও করিমন নেসা নাদের বানু (গৌস্ এর এক মাত্র মেয়ে) ৩। খিজর উদ্দিনের স্ত্রী নাম এখনও জানা যায় নাই।
৪। নেহাল উদ্দিন মোহাম্মদ, নিজাম উদ্দিন মোহাম্মদ ও ৩ ভাই লতিফ উদ্দিন মোহাম্মদ, লতিফ উদ্দিনের অপ্রাপ্ত বয়সে অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু।	
৫। নজিম উদ্দিন মোহাম্মদ (নেহালের এক পুত্র)। আবদুর রহিম মোহাম্মদ, মসিহ্ উদ্দিন মোহাম্মদ ও আবদুল লতিফ উদ্দিন মোহাম্মদ (নিজাম উদ্দিনের পুত্র)	শাহ্ বানু। স্বর্ণমাই বিবি, মাইজান বিবি আবদুল লতিফ উদ্দিন বিবাহের পূর্বে এন্তেকাল করেন।

৬। নঈম উদ্দিনের—২ পুত্র নজির হোসেন ইত্যাদি।
আবদুর রহিমের—১ পুত্র মোজাফফর হোসেন তায়েরাফুন
(ইনি ইন্তেকাল করেছেন ক'টি পুত্র ও কন্যা বর্ত্তমান)
মসিহ্ উদ্দিনের—৫ পুত্র আবদুল মজিদ নুরন্ নাহার
ইত্যাদি।
আবদুল লতিফ বিবাহ করার পূর্ব্বেই ইন্তেকাল করেছেন।

॥ ১ ॥	॥ ১ ॥
১। দয়াল চন্দ্র শীল।	১। মিঞা কাদের উল্যা (মুছাশাহ)
২। জয়দেব চন্দ্র শীল।	২। মিঞা কসিম উদ্দিন শাহ।
৩। নবীন চন্দ্র শীল।	৩। নইম উদ্দিন শাহ।
৪। বানেশ্বর চন্দ্র শীল ও রাজ মোহন চন্দ্র শীল।	৪। আইন উদ্দিন শাহ।
৫। হরিমোহন শীল, ভাগন্ত।	৫। মফেজ উদ্দিন শাহ। ইত্যাদি
৬। নগেন্দ্র চন্দ্র শীল।	
শীতিশ চন্দ্র শীল। ইঁহারা বর্ত্তমান।	ইঁহারা বর্ত্তমান।

স্মৃতির মুহূর্ত জাগে

আবদুল মান্নান হাওলাদার

আমার অন্তরে কাঁপা, স্বপ্নভরা আশার ছোঁয়ায়
স্মৃতির মুহূর্ত্ত জাগে। মধু-রাত, বিশখালী জল
আমাকে আনন্দ দিয়ে একদিন করেছে চঞ্চল,
করেছে সুরের সৃষ্টি বোবা-মূক রাতের ভাষায়।
বিশখালী-কালোজল ঃ সেদিনের সেই মধু-রাত ঃ
দুইজন পাশাপাশি, দু'জনার বসা অতি কাছে,
কোমল দেহের সেই উষ্ণতাপে চঞ্চল প্রভাত
হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা—সেই স্মৃতি আজো বেঁচে
আছে।

এখানে চাষীর ঘরে পৌষ মাসে নবান্নের ঘ্রাণ
যেমনি চঞ্চল করে অগণিত কিষানের মন,
আনন্দের মধু-গন্ধে জেগে ওঠে মায়ের ভুবন ;
কিষান বধুর ঠোঁটে হাসি ফোটে—হাসে তার প্রাণ
তেমনি একটি রাত মনে পড়ে ডেকের চেয়ারে
তুমি, আমি পাশাপাশি। আজ তুমি স্মৃতির ওপারে।

জীবন

শামসুদ্দীন

ঘর পাশে কুসুমের বন
সারারাত আনন্দ মগন
বিলাইল সুরভি রতন।
মধুপ লুটিল মধু আর
ভেঙে দিল স্বপ্ন সুষমার।
রবি করে হ'ল সব ভুল
মন আর করিল বেভুল।
অলস মন্থর পদে
বাহিরিয়া আসি
ভুলিলাম রজনীর
যত গান, হাসি।
এতক্ষণে ভুলেছিনু
মন,
—এখন সহজ
এ-জীবন।

* ইতিপূর্ব্বে উপরিলিখিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহান নেতৃত্রয়ের সম্বন্ধে মাসিক "মোহাম্মদী"তে কিছুটা আলোচিত হ'য়েছে। লেখক।

পাণ্ডুর আকাশ
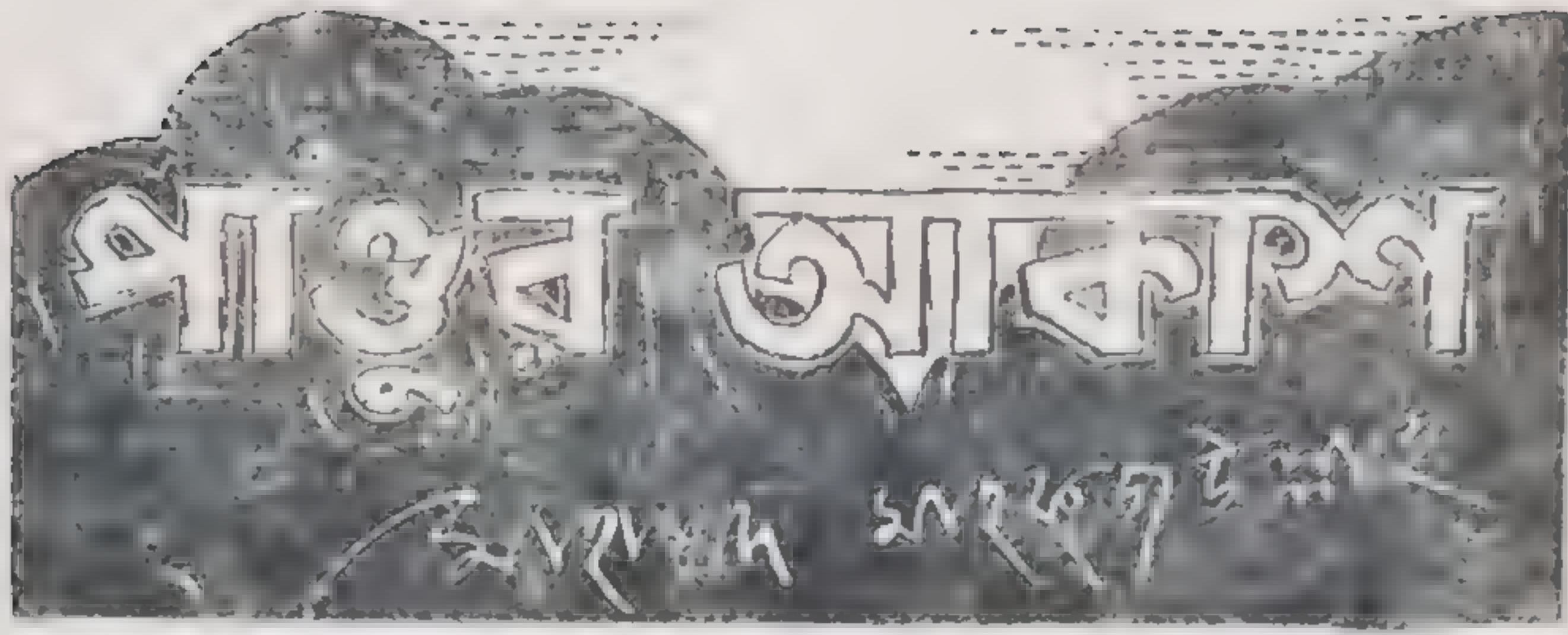
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নতুন বাসায় পা দিয়ে মামুনের মনে একটা চিন্তার রেখাই বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল। রিজিয়া যদি দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠে তা হলে তার যন্ত্রণার অন্ত থাকবে না। এর চেয়ে ভাল বাসা খুঁজে পাওয়ার কথা দূরে থাক পঞ্চাশ টাকায় যে সে ঢাকায় শেষ পর্যন্ত একটা বাসা জোগাড় করতে পেরেছে সেটাই তো পরম ভাগ্যের কথা। সারা শহর ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছে তবুও একটা পছন্দসই বাসা সে খুঁজে পায়নি। শ' আড়াই টাকায় ভাড়া নিতে পারলে তবে যদি মন ওঠে। কিন্তু সে-কল্পনা তার কাছে আকাশ-কুসুমের মতোই মনে হয়। রিজিয়া হয়তো তেমন কিছুই একটা ভাবছে, কিন্তু মামুনের জন্যে তা কল্পনাতীত। একটা বড় বাসা যদি ভাড়া নিতে পারতো তবে বুড়ো বাপকেও এনে রাখতে পারতো নিজের কাছে। সারা-জীবন তো তিনি ছেলেদের জন্যেই ভেবে মরলেন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

ঘর-দোর গুছাতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। রিজিয়া সেই যে কালো মুখে ঘরে ঢুকেছে আজো তাতে হাসির রেখা ফুটেনি। মামুনকে একলাই প্রায় সব কিছু গুছাতে হলো। চাকরটা এসে মাঝে মাঝে হাত মিলিয়েছে তার সাথে। মামুন বলেছে, "যা না নইম, বিবি সাহেবা কিছু দরকার আছে কিনা দেখ না। আমার কাজ আমি একলাই করতে পারবো।" মামুনের কথা শুনে নইম ছুটে গিয়েছে রিজিয়ার কাছে, বলেছে, "সায়েব বললেন, তিনি একলাই সব কিছু গুছাতে পারবেন। আমার নাকি কোন দরকার পড়বে না।"

রিজিয়া বলেছে, "বেশ তো, দরকার না থাকে তোর সায়েবকে বলে চলে গেলেই পারিস। আমাকে বলতে এলি কেন?"

কথা শুনে বোকা বনে যায় নইম। এ যাবত সে অনেক বাসায়ই চাকর খেটেছে, কিন্তু কোথাও তো এমন সুরে কথা বলতে শুনেনি কাউকে।

দিনরাত খেটে মামুন ঘরটাকে ঝকঝকে তকতকে করে তুললো। অফিস থেকে ফিরে এসে সে আজকাল ঘর সাজাতেই ব্যস্ত থাকে। বাইরের ক্ষুদ্র আঙিনায় ইতিমধ্যেই কয়েকটি ফুলের চারা এনে লাগিয়েছে, সকাল বিকাল তাতেই পানি ঢালে মামুন। রিজিয়া বলে, "এই খাটালের গলিতে ফুল ফুটিয়ে কি লাভ হবে তোমার? কে আসবে তোমার ফুলের বাগান দেখতে?"

মামুন বললে, "ফুলের বাগান তো কারো দেখার জন্যে গড়ে তুলছি না, নিজেরা ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবো, এটাই বা কম আনন্দের কথা কি?"

রিজিয়া বললো, "রেখে দাও তোমার ফুলের বাগান। পারো তো একটা ভাল বাসা খুঁজে দেখ, না হয় আমি আবার শান্তিনগরেই ফিরে যাবো।"

শান্তিনগরে রিজিয়ার আব্বার বাসা। মামুন বললে, "না হয় কিছুদিন সেখানে গিয়েই থাকলে, কিন্তু তাতে লাভ হবে কি? আবার তো এখানেই ফিরে আসতে হবে। ভালো বাসা যে কবে পাবো তার কি কোনো ঠিক আছে?"

রিজিয়া বলিল, "কেন কত লোক তো সরকারী বাড়ী পাচ্ছে আযিমপুরায়, তুমি একটা দরখাস্ত করতে পারো না?"

মামুনের হাসি পেল কথা শুনে। বললে, "তা কি আর না করেছি, কিন্তু দরখাস্ত করলেই তো আর বাড়ী পাওয়া যায় না, তার জন্যে অনেক চেষ্টা তদবীর চাই। সে পথ তো আমার তেমন খোলা নেই।"

রিজিয়া বললো, "বেশ তো চেষ্টা তদবীর দেখলেই পারো। আমাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে একটা তাগাদা দাওনা কেন!"

"তাগাদা দিলেই সরকারী বাড়ী পাওয়া যায় না রিজিয়া। কথাটা তুমি যত সহজে বললে, বাড়ী পাওয়াটা যদি আসলে এত সহজ হতো তা হলে তো কোন ভাব-নারই কারণ ছিল না।" একটু ব্যঙ্গের সুরেই কথাটা

বললো মামুন। এ সুর রিজিয়ার কানেও বাজলো। রিজিয়া বললো, "দুনিয়া শুদ্ধ লোক তো এমন করেই সরকারী বাড়ী পাচ্ছে, তোমার মতো তারা হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। ভালো চাও তো একটা ব্যবস্থা করো। এই নোংরা বাড়ীতে আমি আর কিছুতেই টিকতে পারছি না। তিলে তিলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

বেশী কথা না বাড়িয়ে মামুন একটা কাজের উপলক্ষ করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। রিজিয়া বুঝতে পারলো তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই মামুন এ-পথ অবলম্বন করেছে।

সেদিন বিকেলেই মেয়েকে দেখতে এলেন ফরিদ সাহেব। ভদ্রলোক দিনরাত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মেয়েকে যে একবার এসে দেখে যাবেন সে অবসরও তাঁর নেই। ফরিদ সাহেবের গলা শুনতে পেয়েই ঘর থেকে আঙ্গিনায় বেরিয়ে এলো রিজিয়া। নিজের বাপের সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় সে মনে মনে এতটুকু হয়ে গেল। কি ভাববেন ফরিদ সাহেব মেয়েকে এই নোংরা পরিবেশের জীর্ণ ঘরে দেখে। বড় আশায় তিনি রিজিয়াকে তুলে দিয়েছিলেন মামুনের হাতে। কিন্তু তিনি তো জানতেন না মামুনের সংসারে দারিদ্র্য এমন করে এসে বাসা বেঁধে বসেছে। ছেলে-বেলার বন্ধু লতিফ সাহেবের ছেলের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দিতে গিয়ে তিনি অতীতের কথাই ভেবেছিলেন, বর্তমানের খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাইনা আজ রিজিয়াকে এমন করে জলে পুড়ে মরতে হচ্ছে ক্রমাগত।

ফরিদ সাহেব এসে আঙ্গিণায় দাঁড়ালেন। রিজিয়া বাপের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, "এই যে আব্বা, আপনি কখন এলেন? মেয়েকে বুঝি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এমন করেই ভুলে যেতে হয়! কতদিন হলো এ বাড়ীতে এলাম, অথচ আপনি একদিনও এলেন না।"

ফরিদ সাহেব প্রায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "সে কথা বলে আর লজ্জা দিস না মা। এই বুড়ো বাপকে তো তুই জানিস। সংসারের কত বোঝা এখনো তাকে টেনে বেড়াতে হচ্ছে। ব্যবসা না দেখলে যে মা সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে একদিনে। তোর মাকে তো প্রায়ই আসতে বলি। আসে কিনা খবরটা যে নেবো তারও অবসর নেই।"

রিজিয়া বললো, "আম্মা তো মাঝে মাঝে আসেন, কিন্তু আপনি যে মেয়েকে একেবারে ভুলেই গেলেন।"

রিজিয়া জানে, তার আব্বা টাকা-পয়সা আর ধন দৌলতকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভেবেছেন। সারা জীবন ধরে ব্যবসার পেছনে লেগে থেকে দুনিয়ার আর সবকিছুকেই প্রায় ভুলতে শিখেছেন তিনি। ছেলেমেয়ে আর পরিবার-পরিজন ঘেরা সংসারে তিনি শান্তি পান না, অর্থের মোহ তাঁকে সব সময়েই তাড়া করে ফেরে। এ নিয়ে জরিনা বেগমও কথা তুলেছেন কতবার। রিজিয়া আড়াল থেকে চুপ মেরে কান পেতে শুনেছে সবকিছু। বাপের স্নেহ রিজিয়াও পুরোপুরি পায়নি কোনদিন। ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলবার সময় তিনি পাবেন কোথায়! বুড়ো বয়সেও ছেলের হাতে ব্যবসার ভার তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, কে জানে কোন ফাঁকে সর্বনাশ ঢুকে পড়ে তার সাজানো সংসারে। তাই এই বয়সেও ব্যবসা নিয়েই মেতে থাকেন ফরিদ সাহেব।

এমন যে বাপ তাঁকে হঠাৎ মেয়ের খোঁজ নিতে ছুটে আসতে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যায় রিজিয়া। বলে, "মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে খুব তো নিশ্চিন্ত আছেন আব্বা। একবারটিও এ পথ মাড়ালেন না।"

ফরিদ সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "অভিযোগ তোর মিথ্যে নয় মা। মেয়েদের বিয়ে দিলে ওরা বাপকে এমন কথাই বলে। কিন্তু আমি জানি মা, তোকে মামুনের হাতে তুলে দিয়ে সেদিন কি যন্ত্রণাই না আমি পেয়েছিলাম। যেদিন মা হবে, সেদিন বুঝতে পারবে পরের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দিতে বাপ-মায়ের প্রাণে কি যন্ত্রণাই না অনুভূত হয়। কিন্তু সংসারের নিয়মই যে এই। একদিন সব মেয়েকেই তো বাপের সংসার ছেড়ে আর এক সংসার গড়ে তুলবার দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। এর জন্যে দুঃখ করে তো কোন লাভ নেই মা। দু'দিন পরই দেখবে স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ী যেতে তো'র নিজেরই মন চাইবে না।

ফরিদ সাহেবের মুখের কথা টেনে এনে রিজিয়া বলে, "মন যাতে না চায় সে ব্যবস্থাই তো করছেন আব্বা। নইলে এমন একটা নোংরা বাসায় কি কেউ নিজের মেয়েকে ঠেলে দেয়?"

কথাটা ফরিদ সাহেবের মনে করুণ হয়ে বাজলো। রিজিয়ার কান্না-পাওয়া সুর তিনি শুনতে পেলেন এতক্ষণে। আশৈশব আদরে পালিতা কন্যাকে তিনি ভুল করেই তুলে দিয়েছেন একজন সামান্য চাকুরের হাতে। কিন্তু তিনি কি জানতেন যে তাঁর বন্ধু লতিফ সাহেবের সাংসারিক অবস্থা আজ এমন অস্বচ্ছল হয়ে গেছে যে, ছেলের সামান্য চাকুরীর ওপরই এর ভরা-ডুবি নির্ভর করে আছে? এমন জানলে তিনি কখনো এ ভুল করতেন না। তিনি তো স্বপ্ন দেখছিলেন অনেক রঙ্গিন দিনের, কিন্তু সেগুলো যে ফানুসের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে তা কি তিনি ভেবেছিলেন কোন দিন?

কথায় কথায় একদিন মামুনই বলেছিল, "সংসারের সবকিছু তো আমার উপরই নির্ভর করে আছে। আব্বার যে ভূসম্পত্তির কথা আপনি জানতেন তা ঋণের দায়ে মহাজনের হাতেই উঠে গেছে। আমার চাকুরীই এখন সংসারের একমাত্র ভরসা।"

কথা শুনে চমকে উঠলেন ফরিদ সাহেব। সোফা থেকে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসেছিলেন তিনি, বলেছিলেন, "তাই নাকি? তোমার আব্বার অবস্থা এমন কাহিল হয়ে পড়েছে এরি মধ্যে? কিন্তু আমি তো জানতাম, তোমার দাদা প্রচুর বিষয়-সম্পত্তিই রেখে গিয়েছিলেন।"

মামুন প্রায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার গলার সুরে ধরা দিল পরাজয়ের গ্লানি, তবুও মাথা নীচু করেই বলেছিল মামুন, "আপনি ঠিকই জানতেন আব্বা। দাদাজান প্রচুর সম্পত্তিই রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু আব্বার হাতে পড়ে সব কিছুই প্রায় ফতুর হয়ে গেছে। এখন শুধু বেঁচে আছে বংশের খানিকটা সুনাম। তাও কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবো জানিনা।"

ফরিদ সাহেব আর বিশেষ কিছু জানতে চাননি সেদিন। এ-টুকুতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মেয়েকে তিনি গরীবের ঘরেই তুলে দিয়েছেন। তবুও ভরসা ছিল মামুন হয়তো একদিন সেই হারানো সম্পদকে কুড়িয়ে আনবে, বাপ-দাদার সুনামকে বাড়িয়ে তুলবে নতুন করে; কিন্তু ইদানীং তিনি সে বিশ্বাসও হারাতে বসেছেন।

মেয়ের বাসায় পা দিয়ে তাঁর সেই ভাবনাটাই আবার নতুন করে চাড়া দিয়ে উঠেছে। মুখে তিনি রিজিয়াকে অনেক খুশীর কথাই বললেন; কিন্তু অন্তরে অন্তরে একটা অনুভূতিই তাঁকে কাঁটার মতো যন্ত্রণা দিতে লাগলো। অতীতের সমস্ত বিশ্বাস আর ভরসা যেন তার মনে তাসের প্রসাদের মতো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

রিজিয়া বললো, "আসুন আব্বা, ঘরে এসে বসুন।" বারান্দা ছেড়ে ফরিদ সাহেব ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বারান্দায় খানিকটা হাওয়া দিচ্ছিল এতক্ষণ, প্রাঙ্গনের বাগান থেকে কিছুটা ফুলের সুবাসও মিশেছিল তাতে; কিন্তু ঘরে ঢুকে দম বন্ধ হয়ে এলো ফরিদ সাহেবের। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো-বাতাস আসে সারা ঘরে তা' টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায়। আরো অন্ধকার ছিল ঘরটা। মামুন নিজের হাতে জানালা কেটে আলো-হাওয়ার পথ করে দিয়েছে। প্রাঙ্গনে ঘরে তুলেছে সাজানো বাগান। তবুও প্রয়োজনের তুলনায় তা এতই সামান্য যে এর অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না।

ফরিদ সাহেব বললেন, "সত্যিই রিজিয়া, বাসাটা তোদের খুবই অসুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে। মামুন একটা ভাল বাসার চেষ্টা করলেই পারে।"

রিজিয়া বললো, "চেষ্টা কি আর তিনি কম করছেন আব্বা। কিন্তু পাচ্ছেন কোথায়? পেলেও যে বেশী ভাড়ায় নিতে পারবেন তেমন সামর্থ্য তো নেই।"

ফরিদ সাহেব বললেন, "সরকারী বাড়ীর চেষ্টা করলেও তো পারে। ওতে নাকি ভাড়াও কম পড়ে, অথচ বেশ আরামেই থাকা যায়।"

এই সময়েই প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে এসে ঢুকলো মামুন। ফরিদ সাহেব মুখের কথা শেষ না করেই তার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, "এই যে বাবা মামুন, এতক্ষণ তোমার অপেক্ষাই করছিলাম।"

মামুন বললো, "কখন এলেন আব্বা! আপনি আসেন না বলে রিজিয়া তো রীতিমত রাগ করেই আছে।"

ফরিদ সাহেব বললেন, "তা বাবা বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি করবো বলো, সংসারে জড়িয়ে পড়লে ছেলে-মেয়ের কথাও মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়। আমার অবস্থাও হয়েছে তাই।"

মামুন বললো "কিন্তু এ বয়সে আর আপনার এত পরিশ্রম করা উচিত নয় আব্বা। ভাইজান রয়েছেন, ব্যবসার দায়িত্বটা তাঁর কাঁধেই তুলে দিলে পারেন।"

কথা শুনে হেসে উঠলেন ফরিদ সাহেব, বললেন, "ঠিকই বলেছ বাবা, ব্যবসার দায়িত্বটা মুজীবের হাতে তুলে দিলে আমার সব দায়িত্বই প্রায় ঘুচে যায়। তোমার ভাইজানটি যা করিতকর্মা তাতে সংসার লাটে উঠতে খুব কিছু সময় লাগার কথা নয়।

ফরিদ সাহেবের কথা বুঝে নিতে মামুনের কোনই কষ্ট হলো না। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো তার শ্বশুর কবরের মুখে পা দেবেন, তবুও সংসারের মায়া ত্যাগ করবেন না। ব্যবসা নিয়ে যারা মেতে থাকেন, মামুন ভালো করেই জানে, তাদের মনোভাব এমনই হয়ে থাকে। মিছামিছি কথা বাড়িয়ে কোনো ফায়দারই সম্ভাবনা নেই।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন ফরিদ সাহেব। মামুন কোন কথার জওয়াব দিল, আবার কোনটা কায়দা করে এড়িয়েও গেল। ঘর-সংসারের কথা থেকে শুরু করে অনেক কথাই জানতে চাইলেন ফরিদ সাহেব। মামুনের মনে হলো তার শ্বশুর যেন তাকে নতুন করে যাচাই করে নিচ্ছেন—খুলতে চাইছেন এক অজ্ঞাত রহস্যের দুয়ার। কিন্তু ফরিদ সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝতে কোনই কষ্ট হলো না মামুনের। কি তিনি জানতে চান! অজানা সমুদ্রের অতল থেকে কি তিনি তুলে

আনবেন, কোন নতুন কথার মুক্তা! হয়তো তিনি সে চেষ্টাই করেছেন।

সংসারের অনেক কথাই হলো তিনজনে মিলে। ফরিদ সাহেব জোর দিয়ে এটুকুই বলতে চাইলেন যে, রিজিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া মামুনের পরম কর্তব্য। এ ব্যাপারে অবহেলা শুধু অনভিপ্রেত নয়, অনুচিতও। ঘর-সংসারের সাদা-মাটা চেহারা দেখে ফরিদ সাহেব বললেন, "বাবা মামুন, একটা কথা না বলে পারছিনা, তা তুমি যা' কিছু মনে কর না কেন। ঘর-সংসার সাজিয়ে তুলতে হলে আসবাব-পত্র চাই বৈ কি। কিন্তু তোমার ঘর দেখে মনে হচ্ছে এদিকে তোমার মোটেই নজর নেই। যা-ই বলনা কেন, এটা কিন্তু ভালো নয় বাবা। বাসা যেমনই হোক না কেন, সাজিয়ে গুছিয়ে তাকেই সুন্দর করে তোলা যায়, কারণ এর সাথে রুচির প্রশ্নটাই জড়িত।"

মামুন ভাবে, ফরিদ সাহেব রুচিটাই দেখলেন, সামর্থ্যের কথাটা তলিয়ে দেখলেন না। তবুও সে বললো, "আসবাব-পত্রের দরকার বৈ-কি; কিন্তু তা গড়ে তুলতে সময়েরও প্রয়োজন।"

রিজিয়া বললো, "ওসব কথা বলে কোন লাভ নেই আব্বা। জিনিস-পত্র আমি চাইনা। শুধু দম ফেলে বাঁচবার মতো একটা বাসা খুঁজে পেলেই বর্তে যাই। আসবাব পত্রের সখ আমার অনেক আগেই মিটে গেছে।"

রিজিয়ার গলার স্বরে হতাশার রেশ বেজে উঠে। মামুন বুঝতে পারে কথাগুলো স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

এমনি ধরণের নানা কথা-বার্তায় অনেক সময় উতরে গেলো। চা-নাস্তা শেষ করে ফরিদ সাহেব উঠে পড়লেন। রিজিয়া এসে করুণ চোখে তাকালো বাপের মুখের দিকে। সে-দৃষ্টিতে অনেক কিছুর ছায়া দেখতে পেলেন ফরিদ সাহেব। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে ফরিদ সাহেব বললেন, "আমি মা রিজিয়া, যখন যা দরকার হয় এ বুড়ো বাপকে জানাতে ভুলবে না। নিজে না আসতে পারলেও সব ব্যবস্থাই আমি করবো।"

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো রিজিয়া। মুখে কোন কথাই বললো না সে। ফরিদ সাহেব ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, মামুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে গেলেন রাস্তায়। একটা রিকসা ডেকে উঠে পড়লেন তিনি।

—ক্রমশঃ

গান

হেমায়েত হোসেন

অনেক গানের ছলে প্রাণের অনেক কথা বলবে
ভেবেছি অনেকদিন, হয়ত আমার পথে চলবে।
আমার মনের মাঝে
অনেক আঁধার সাঁঝে
অনেক প্রদীপ হয়ে জ্বলবে॥
ভেবেছি তোমায় ঘিরে
আমার প্রাণের তীরে
অনেক আশার ফল ফলবে॥

অথচ মোহের ঘোরে
ভাবিনি কখনো মোরে
অনেক কথায় শুধু ছলবে॥
বুঝিনি আমার মালা
এমনি করেই বালা,
অনেক পায়ের তলে দলবে॥

শিশু-শিক্ষা

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শিক্ষায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু-শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে শিশুর অন্তরে ভবিষ্যতের মহা-মানব সুপ্ত রয়েছে, তার শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না হ'লে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই বালুর উপর সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণের সমতুল্য হবে। দুঃখের বিষয় যে, জলাশয়ের গভীরতা কমে যাওয়ায় যেমন তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায় তেমনি বর্ত্তমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার লাভ হ'লেও সেটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে উঠছে।

তার প্রধান কারণ এই যে, তথাকথিত আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার আদর্শ কি হবে এবং কেমন করে সে শিক্ষাদান সম্ভব হবে তা বর্তমান শিক্ষাবিদরা অনেক ক্ষেত্রে স্থির করে উঠতে পারছেন না। তবে এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, শৈশবেই শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ শরীরতত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর জীবনে সময়ের মূল্য যত বেশী, জীবনের আর কোন স্তরেই ততটা নয়। তার তিন হ'তে সাত বছরের সময়টা পূর্ণ বয়স্কের পনর-কুড়ি বছরের সমান। সুতরাং এই সময়ের সদ্ব্যবহার না হ'লে শিশু সারা জীবন শিশুই থেকে যায়।

শিশু শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা। এই পর্য্যায়ে শিক্ষা বলতে নীতিশিক্ষাই বুঝায়। অবশ্য বর্তমান জগতে নৈতিকতার প্রশ্নে সকলেই বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকেন। কিন্তু বহু গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে নীতি-বর্জ্জিত শিক্ষাই বর্তমান পৃথিবীর অশান্তির মূল কারণ। গোড়া থেকেই শিশুকে, সার্ব্বজনীনতা, ন্যায়-নীতি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং পারতপক্ষে তাতে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের অসংখ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার ধীরে ধীরে তার সামনে উদ্ঘাটিত করে তুলতে হবে।

নীতি-জ্ঞান ও নীতি-শিক্ষা শিশুর এবং বয়স্কের সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদিও শিশুর নীতির প্রতি উপেক্ষার ফলাফল খুব মারাত্মক নয় তবুও চরিত্রসৃষ্টির জন্য শৈশবাবস্থাই একমাত্র সময়।

শিশু-শয্যাই শিশুর উপযুক্ত শিক্ষায়তন। এ-কথা অনেক মা-বাবার, বিশেষ করে মা'র মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া করে। কারণ যে সময় শিশুর খেলা, শিশুর হাসি, শিশুর আনন্দ তাদের চিত্তকে উৎফুল্ল করে তখন শিশুর উপর কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা আরোপ করার কথা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না। অথচ এই অবহেলার ফলেই পরবর্ত্তী জীবনে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োগের ফল অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়। শিশু চীৎকার করে কেঁদে উঠলে তাকে কোলে তোলা বা মুখে দুধের শিশি তুলে ধরা যত সহজ, তাকে কাঁদতে দেওয়া তত সহজ নয়। এ-কথার অর্থ, শিশুর বায়না কঠোরতার সাথে রোধ করা দরকার, তাতে শিশু যত চীৎকারই করুক না কেন। মা যদি একবার দুর্ব্বলতা দেখায় শিশু তা কখনও ভুলে না এবং ক্রমান্বয়ে তার বায়না অসহনীয় হয়ে উঠে।

এরূপ কঠোরতার প্রস্তাবে মা-বাবা প্রতিবাদ করে বলবেন: 'শিশুর সঙ্গে কঠোর হওয়া নিষ্ঠুরতার সমান এবং সেটা অসম্ভব। অত ছোট সময় শিখবার বয়স নয়। কারণ তখন তার বুঝবার ক্ষমতাই জন্মে না।'

এটাই একটা মস্ত বড় ভুল। তিন মাস বয়সেই শিশুর জ্ঞান জন্মে। কঠোরতা বলতে নিষ্ঠুরতা মনে করা ঠিক নয়। কারণ তখন মারধোর করা দরকার হয় না; একটু ধৈর্য্য সহকারে শিশুর আব্দারে নতি স্বীকারের মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। তা ছাড়া বোধজ্ঞান না হলেও কিছু যায় আসে না। কারণ শিশুর নিজস্ব জগত সম্পর্কে ধারণা স্বতঃস্ফূর্ত, অনেকটা পশুর মত। এ-সময় ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে শিশুকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

কোন শিশুই গা' ধোওয়া পছন্দ করে না। তবুও মা শিশুকে স্নান করায় এবং পরিচ্ছন্ন থাকায় অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করে। শিশু যাতে তার নিজের অঙ্গুলি না চুষে সেদিকেও বহু মা'র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। এগুলি দরকারী এবং যাঁরা তা মেনে চলেন তাঁরা স্বাস্থ্য রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিকই করেন। কিন্তু নৈতিক দিকটায় প্রায় সকলেই বেখেয়াল থাকেন।

সুতরাং প্রাইমারী শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে শিশুর চরিত্র সৃষ্টি। এ-সময় শিশুর মনে অন্য কোনরূপ অভ্যাসের ছাপ থাকে না। ফলে তখন যা-ই শিখান যায় তা তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মা-বাবা এবং শিক্ষকের তখন কর্তব্য হচ্ছে, মানবতার অতীব প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষাগুলি শিশুর মনের উপর চাপিয়ে দেওয়া। এই শিক্ষাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘষে মেজে সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়ে মানব-কল্যাণকর হবে। দ্বিতীয়তঃ শিশুকে অনুগত করে তুলতে হবে। তার মা-বাবা বা শিক্ষকের অবাধ্য হবার সম্ভাবনা দূর করতে হবে। একবার যদি সে অবাধ্য হয় তবে তাকে কিছুতেই বাধ্য করা যাবে না। তৃতীয়তঃ শিশু যাতে নিজেকে বশ করতে

পারে তার চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ লক্ষ রাখতে হবে সে যেন অধৈর্য্য, বদ্ মেজাজী এবং খিটখিটে না হয়। এ-শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং মনোযোগের প্রয়োজন হয়—। এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক ডাঃ হেলেন কেলারের নাম অনেকেই শুনেছেন। তিনি আশৈশব অন্ধ, বোবা ও কালা ছিলেন। ফলে তারজন্য মা-বাবার স্নেহ ছিল অগাধ। শৈশবে হেলেনকে শিক্ষা দেওয়ার কি বিরাট সমস্যা ছিল। কারণ, অন্ধ বা বোবার শিক্ষা-পদ্ধতি বিদ্যমান থাকলেও একই ব্যক্তি অন্ধ, বোবা ও কালা তার শিক্ষার কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখনও আবিষ্কার হয় নাই। যাহোক মিস অ্যানি সুলিভ্যান হেলেনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তখন হেলেনের বয়স সাত বছর। মিস সুলিভ্যান দেখলেন যে অত্যধিক স্নেহে হেলেন একটা একগুঁয়ে প্রকৃতির মেয়ে হয়েছে। কোন কিছু তার পছন্দ বা মনমত না হলে রাগে ফেটে পড়ে। কাছে যাকে পাবে মেরে একাকার করে তুলবে। মিস সুলিভ্যানের প্রথম কাজ হলো তার চরিত্রশুধি করা। কারণ তাছাড়া তার শিক্ষা অসম্ভব।

মিস সুলিভ্যানের উপস্থিতির দ্বিতীয় দিনেই শুরু হলো বিপদ। খাবার টেবিলে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী এক সঙ্গে বসলেন। কিন্তু হেলেন হাত দিয়েই খেতে শুরু করে দিল। মিস সুলিভ্যান তার হাতে চামচ তুলে দিলেন। হেলেন চামচ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হেলেনের খাবারের প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাগে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। তার চীৎকার শুনে তার বাবা ছুটে এলেন এবং মিস সুলিভ্যানের কাছে সব শুনলেন। তখন তিনি বললেন: "আমার মেয়েকে খাবার থেকে বঞ্চিত করে কোন শিক্ষা দেওয়া হোক আমি সেটা পছন্দ করি না।" মিস সুলিভ্যান বুঝলেন যে এই স্নেহের নীড়ে হেলেনের শিক্ষা অসম্ভব। তখন তিনি প্রস্তাব করলেন যে, তার ছাত্রীকে নিয়ে তিনি আলাদা বাড়ীতে থাকতে চান। বহু যুক্তিতর্কের পর হেলেনের মা-বাবা তাতে রাজী হলেন। আলাদা বাড়ীতে তাঁরা থাকলেন এক সপ্তাহ। তার প্রথম রাত্রিই ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিছানায় গিয়ে হেলেন যখন বুঝতে পারল যে তার মা কাছে নেই তখনই সে চীৎকার শুরু করল। কিছুতেই সে সুলিভ্যানের সঙ্গে এক বিছানায় শোবে না। মিস সুলিভ্যানও নাছোড়বান্দা। প্রায় সারারাত্রি চলল তাদের ধস্তাধস্তি। রাতের শেষে ক্লান্তিতে হেলেন নতি স্বীকার করল। এবং বিছানার এক ধারে শুয়ে রাত কাটাল। এমনি করে ধীরে ধীরে সে মিস সুলিভ্যানের স্নেহ ও শাসনের বশীভূত হল।

এরপর আর কোন দিন হেলেন অবাধ্য হয় নি। একদিন হঠাৎ সে তার পুরানো মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে ভীষণ চীৎকার শুরু করল এবং তাদের চাকরানী ভাই-নিকে ভীষণ প্রহার করতে শুরু করল। চীৎকার শুনে মিস সুলিভ্যান নীচে গেলেন। তিনি হেলেনের পুরানো মূর্ত্তি দেখে শঙ্কিত হলেন। তখন তিনি হেলেনের তালুতে লিখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি?" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে হেলেনের সঙ্গে কথাবার্তা ও লেখা-পড়া সব কিছুই হাতের তালুতে লেখার মাধ্যমে চলত। হেলেন মিস সুলিভ্যানের তালুতে লিখে জানাল, "ভাইনি দুষ্টু।" মিস সুলিভ্যান বুঝলেন যে ভাইনি এমন কিছু করেছে যারজন্য হেলেন ভীষণ রেগেছে। তিনি হেলেনকে নিয়ে উপরে গেলেন। প্রায় ঘু'ঘন্টা পরে হেলেন মিস সুলিভ্যানের কোলের কাছে গিয়ে তাকে চুমো খেতে বলল। কিন্তু তিনি হেলেনকে লিখে জানালেন, "হেলেন দুষ্টু। তাকে আদর করব না।" তখন হেলেন লিখল, "ভাইনি আমাকে মেরেছে।" কিন্তু তাতেও শিক্ষক রাজী হলেন না। তিনি লিখলেন, "তুমি কেন তাকে মারলে? যদি তুমি তার কাছে মাফ চাইতে পার তবে তোমাকে আদর করব।" তখন সে মাফ চাইতে রাজী হ'ল এবং মিস সুলিভ্যান তার হয়ে ভাইনির কাছে মাফ চাইলেন। ভাইনি এগিয়ে এসে হেলেনকে চুমো খেল। হেলেন শিক্ষয়িত্রীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ভাইনিকে বাধা দিল না। ইতিপূর্ব্বে সে মা-বাবা ও মিস সুলিভ্যানকে ছাড়া অন্য কাউকে তার মুখে চুমো খেতে দিত না।

এরূপ শিক্ষার ফলেই ডাঃ হেলেন কেলার আজ বিশ্বের বিস্ময় এবং চিরস্মরণীয়।

কোনো হরিণীর জন্যে

মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম

হরিণী, তোমার হামেশা আনত শির,
তারি তল থেকে তুলি' জোড় চাহনির
নীরব পলক—অপলকে তুমি চেয়েছ আকুল চাওয়া;
সে সজল চাওয়া জিন্দিগানীর মোর যত দাবী-দাওয়া
উলটি পালটি দিয়েছে, করেছে এক দম গড়্‌বড়্‌,
দিলের দরিয়া দামাল তুফানে বে-চইন বে-সবর!

কোন্ বিষ-শর আমূল বিঁধ্‌ল তোমার বক্ষে,
কোন্ সঙ্গ্ দিল হানল সে তীর তোমায় লক্ষ্যে!
তুমি যে নবীনা পান্থচারিণী
এমন বে-দিল কোন্ হতভাগা
অজানার এই বেদনার ভার
কে চাপিয়ে দিল এ-বিষম দাগা!

পানির চশ্‌মা চক্‌চ্‌ক ক'রে উছ্‌লে পড়ে
পাথর ডিঙায়ে পাথর 'পরে,
পাহাড়ের 'পরে সাপ খেলায়,
ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে খেলে ছল্‌ছল্
এক টিলা থেকে আর টিলায়;
মহাবারিধির নীর সুগভীর
বেদনা-নিবিড়,
তার ব্যথাধার নাহি পায় পার
সুদূর পাথার,
সে মহাসাগর
তোমার আঁখির তলে হিয়া-ভর
ভিড়েছে কি এসে?
তাই কি নিথর চাহনি-সাগর
অশেষ কথায় খামুশ অতল নিশ্চুপ শেষে?

হায় গো হরিণী, কার কাছে করি
সোয়াল সে-কথা?—ঝোলা-কাঁধে শেষে
কোন্ রাহা ধ'রে বেরোই পথে?
সে ব্যথার ভার!—হদীস তাহার
সন্ধানে কার কদমে যাই-বা খাদিম হ'তে?
কর ইরশাদে সাজ্জাদা মোর
সাজাই শরাবে বে-হুরমতে!

'কহো কহো' করি' বুলবুল সারাদিন
আরজ করছে বে-আরাম বে-চইন;
মাটীর মরম সাগর-বিথারে
শুধু গুলাবের চাহনি-কিনারে
অনেক ব্যথার কোশেশে জিগর-নির্ঘাস শব্‌নাম
এক ফোটা দেখলাম।
নীরব—নীরব হতবাক গুলফাম॥
কথা নাই, শুধু চাহনি নিমেষ-হীন!
চেয়ে থাকে তার বুলবুল পানে নিরুপায় গমগীন।

হায়রে বেদনা, নীরব বেদনা!
তুই কেন ওই গুলাব-হিয়ায় দিলি ব্যথা-পারাবার,
তার চোখে সেই ব্যথার আভাস
দুঃসহ বড় দুঃসহ হায়—দুঃসহ বিধাতার!

হে বেদনা, তুই আস্‌বি-ই যদি
তার বুক থেকে মোর বুকে আয়,
মোর হরিণীর হিয়া থেকে আয়,
আমার হিয়ায়
হরিণীরে মোর ছেড়ে চলে আয়!

যে বুকে কখনো ব্যথার আবাস রচেনি জহর বিষ
সেখানে এমন বেদনার ঢেউ নাহি—ওরে নাহি দিস!
আমার হিয়ায় বেদনা তুফান করি জোর মন্থন
জহরে-কহরে করেছে সতত সহিষ্ণু এই মন,
এইখানে আয়—এইখানে রচি ঘর,
তবু হরিণীর ফুল-বুকে তুই করিস না কভু ভর।

তুর্ক-জর্মন মিশন ও উপজাতীয় এলাকা

জগ্‌লুল হায়দর আফ্‌রিক

ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটানোই ছিল জর্মনদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, এই উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ কর্‌লে, সমগ্র বিশ্বে জর্মনদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের পথে কোনরূপ বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হতোনা। ব্রিটিশশক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল পাক-ভারত উপমহাদেশ। সুতরাং এ-দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে জর্মনদের ঔৎসুক্য ছিল প্রবল।

'বঙ্গভঙ্গ'-কে উপলক্ষ্য করে জর্মন গ্রন্থকার ফন বার্ণহার্ডি লিখেছিলেন: বাঙালী হিন্দু—যাদের রাজনৈতিক তৎপরতা বিশ্ববিখ্যাত, তারা যদি প্রতিবেশী মুস্‌লিমদের সাথে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, তবে তারা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করতে সক্ষম হবে, যার মুকাবিলায় বৃটিশ সরকারের রক্ষাব্যবস্থা অচল হয়ে পড়্‌বে।

আমরা যে-সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন স্বল্প সংখ্যক পাক-ভারতী সন্তান বিদেশ-বিভূঁইয়ে আস্তানা গেড়ে জন্মভূমির আযাদীর জন্য বিভিন্ন রকম কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'-একটি রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চম্পা করমন পিল্লাই প্রতিষ্ঠিত বার্লিনের 'ইন্‌ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টি' ছিল তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্থা। মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ ভূপালী, লালা হরদয়াল, তারক নাথ দাস, হিরম্বলাল গুপ্ত ও চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী এই পার্টির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এই রাজনৈতিক দলটি জর্মন সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চল্‌তেন।

প্রথম বিশ্বসংগ্রামের প্রারম্ভিক কালে জর্মন সরকার পাক-ভারত অভ্যন্তরে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। কারণ, পাক-ভারতে ইপ্সিত হাঙ্গামার সৃষ্টি হলে, ভারতীয় বাহিনীগুলি আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকৃতো, তখন তাদেরকে বাইরের রণাঙ্গনে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌তোনা; এ-টাই ছিল জর্মন সরকারের পক্ষে বড় রকমের লাভের কথা।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁরা তিনটি পরিকল্পনা কার্যকরী কর্‌তে অগ্রসর হলেন। প্রথম পরিকল্পনা: সন্ত্রাসবাদী বাঙালী যুবকদের নিকট অধিক সংখ্যায় বন্দুক, রিভল্‌ভার ও পিস্তল এবং অধিক পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা: যে কোন উপায়ে আফ্‌গানিস্তানের আমীর হবিবুল্লাহ্‌ খাঁকে পাক-ভারত উপমহাদেশ আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করা।

তৃতীয় পরিকল্পনা: উপজাতীয় এলাকায় ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ও ফৌজি তৎপরতা সৃষ্টি এবং উপজাতীয় 'খেল' সমূহকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে বাধ্য করা।

বাঙলার সন্ত্রাসবাদীদের নিকট সরাসরি ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরণ করা সহজসাধ্য ছিলনা। তাই জর্মন কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাটাভিয়া ও ব্যাঙ্কক দূতাবাসের মারফত বাঙলায় অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের মৎলব কর্‌লেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দূতাবাস দু'টি সতর্কতার সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে কোন জর্মন জাহাজ 'বঙ্গোপসাগর' অতিক্রম ক'রে বাঙলার তটরেখায় পৌঁছ্‌তে পার্‌লোনা। অবশেষে 'বর্‌তানবী বহ্‌রী বেড়া' জর্মনদের একখানি চেষ্টারত জাহাজকে পাকড়াও ক'রে ফেল্‌লো। এর ফলে জর্মনদের প্রথম পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল।

এ-ক্ষেত্রে জর্মনদের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না। তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল যে, ব্রিটিশ সিংহ নিদ্রিত নেই। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে তার সতর্ক প্রহরা নিযুক্ত আছে। ভাগ্য আশাতিরিক্ত সুপ্রসন্ন থাকৃলে, দু'-একটি জাহাজ বাঙলার তটভূমিতে পৌঁছ্‌তে পারে। কিন্তু দু'-এক জাহাজ বন্দুক, পিস্তল আর বিস্ফোরক দ্রব্যাদির অপব্যবহার দ্বারা মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদী যুবকেরা বাঙলায় জর্মন প্রতিপত্তি কায়িম কর্‌তে সক্ষম হবেনা। জর্মনরা এই 'কুশিশ-ই-নাতামামে'র ফেরে পড়ে অনেক অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জর্মন সরকার ফন হেন্‌টিগের অধিনায়কতায় 'জর্মন মিশন' গঠন কর্‌লেন। ফন হেন্‌টিগ (ইনি দূতাবাসের সেক্রেটারী পর্যায়ের অফিসার ছিলেন) কাইসর-ই-জর্মনের খাস প্রতিনিধি ও মিশনের সর্বময় কর্তার পদ মর্যাদা লাভ কর্‌লেন। এই মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন মৌলানা বর্‌কতুল্লাহ্‌ ভূপালী ও রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ। জর্মন মিশন যথাসময়ে ইস্তাম্বুল পৌঁছলো।

তুর্ক মিশন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। কাযিম বে ছিলেন এই মিশনের প্রধান। তিনি তুর্কি সুল্‌তান—খলিফাতুল্‌ মুস্‌লিমীনের প্রতিনিধি ও শায়খুল্‌ ইস্‌লাম

হুকুমত্-ই-তুর্কিয়ার কাযিম মুকাম পদমর্যাদা লাভ করেন। মিশন দু'-টিতে বেসামরিক সদস্য ব্যতীত কতিপয় সামরিক সদস্যও ছিলেন। ইস্তাম্বুল থেকে রওয়ানা হয়ে মিশন দু'-টি এশিয়া মাইনর অতিক্রম ক'রে ইরাকে প্রবেশ কর্‌লো।

ইরাকের পথঘাট নিরাপদ ছিল না। স্থানে স্থানে ব্রিটিশ প্রহরা নিযুক্ত ছিল। তাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করতে হলে, পথঘাট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। মিশনের সকলেই ছিলেন ইরাকের পথঘাট সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। পক্ষান্তরে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পথপ্রদর্শক গ্রহণ করাও সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। প্রতিমুহূর্তেই গেরেফ্‌তার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগ্‌লো।

অবশেষে ফন হেন্‌টিগ মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ ভূপালীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মৌলানার জন্মভূমি ফতেহ্‌পুর। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল ভূপালে, এ-জন্যই তিনি 'ভূপালী' নামে অভিহিত হয়েছেন। তিনি অতুলনীয় স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। অতুলনীয় বলছি এই জন্য যে, এ-দেশের তদানীন্তন তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কুর্‌আন শরীফ ও 'সিহাহ্‌ সিত্তা' (বুখারী, মুস্‌লিম, আবু দাউদ, ইব্‌নে মাজা, নিসায়ী ও মিশ্‌কাত এই ছয়টি হাদিস গ্রন্থ)-এর হাফিয ছিলেন। ইংরাজীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল উল্লেখযোগ্য। আরবী, ফারসী ও উরদু ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি ইস্‌লাম প্রচারের উদ্দেশ্যে লণ্ডন গমন করেছিলেন; সেখান থেকে আমেরিকা যান। আমেরিকা থেকে জাপান গিয়ে টোকিও ইউনিভার্সিটীতে উরদু ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বৃত হয়েছিলেন।

ফন হেন্‌টিগের অনুরোধক্রমে মৌলানা ভূপালী মিশন দু'টির পথ প্রদর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি দিবাভাগে পথচলা স্থগিত করে দিলেন। রাত্রিকালে নীলাকাশের তারকারাজির গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পর নানারূপ বাধা বিঘ্ন পশ্চাতে ফেলে তাঁরা ইরান ভূভাগে প্রবেশ করলেন। ইরানের দীর্ঘপথে মিশন দু'টি কোনরূপ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়নি। দীর্ঘ তিন মাস পর মিশন দু'টি কাবুল পৌঁছ্‌লো। আফগান সরকার অতিথিদের সাদর-সম্ভাষণ জানালেন।

ফন হেন্‌টিগ এবং কাযিম বে মৌলানা ভূপালী ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সমভিব্যাহারে আমীর হবিবুল্লার সঙ্গে মুলাকাত করলেন।

ফন হেন্‌টিগ কাইসর-ই-জর্মনের প্রতিনিধিরূপে আমীরকে আশ্বাস প্রদান করে বল্‌লেন, "...শুধু তুর্ক্-জর্মনের জন্য নয়;—মুস্‌লিম-জগত, আফগানিস্তান এবং হিন্দুস্তানের স্বার্থ ও পরমার্থের খাতিরেই ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ করা উচিত। মহামান্য কাইসর বিশ্বাস করেন যে, এ-বিষয়ে আপনার দ্বিমত হবে না। অবশ্যই এ-কার্যের জন্য অর্থ, অস্ত্র ও সৈন্যবলের প্রয়োজন। কাইসর-ই-জর্মন আপনাকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান কর্‌বেন। আমরা অবিলম্বে সীমান্ত উপজাতীয় এলাকায় সৈন্য সংগ্রহ ও সামরিক তা'লিম-তর্‌বাইৎ কার্য আরম্ভ করবো। সুতরাং যুদ্ধ ঘোষণা করতে কোনরূপ বাধা নেই।..."

খলিফাতুল মুস্‌লিমীন ও শায়খুল ইস্‌লাম হুকুমত্-ই-তুর্কিয়ার প্রতিনিধি কাযিম বে আমীর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লেন, "ইহা শুধু রাজনৈতিক প্রশ্নই নয়; এর অন্তরালে আছে মজ্‌হাবী তাকিদ।—যালিম ইংরাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আযাদ আফগানিস্তানের পক্ষে ওয়াজিব। তুর্কির সুল্‌তান আপনার পশ্চাতে দণ্ডায়মান; তাঁর সকল প্রকার ইম্‌দাদ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে; আমরা আপনার হুকুমের ইন্‌তেযার কর্‌ছি!"

মৌলানা ভূপালী ও রাজা মহেন্দ্রও আমীরকে অনুরূপ আশ্বাস প্রদান করে যুদ্ধ ঘোষণার তাগিদ দিলেন।

আমীরের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা সর্দার নস্‌রুল্লাহ্‌ খাঁও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উভয়েই মিশনের বক্তব্য শ্রবণ কর্‌লেন। কিন্তু কারো মধ্যেই তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। আমীর মিশনের বক্তব্যের উত্তরে বল্‌লেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে!"

'আচ্ছা, দেখা যাবে' কর্‌তে কর্‌তে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মিশন আফগানিস্তানে অবস্থিত কতিপয় ভারতীয় মুজাহিদ মুসলমানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেল্‌লো। আফগানিস্তানে ভারতীয় মুহাজিরদের মধ্যে মৌলানা মুহম্মদ বশির ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ইনি সৈয়দ আহ্‌মদ বেরিলবীর পদাঙ্কসরণকারী মুজাহিদ-দলের প্রতিনিধিস্বরূপ কাবুলে অবস্থান করছিলেন। এরপর আস্‌লেন মৌলানা মুহম্মদ আলী কাসুরী। ইনি ভারতে মুস্‌লিম হুকুমত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অকৃতকার্য হয়ে কাবুল সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ ক'রেছিলেন।

কাবুলে অবস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে মৌলানা আবদুল্লাহ্‌ সিন্ধী একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইনি ছিলেন শায়খুল হিন্দ্‌ মাহমুদুল হাসানের অনুগামী ব্যক্তি।

মৌলানা মুহাম্মদ বশির ও মৌলানা মুহাম্মদ আলী কাসুরীর পরামর্শে মিশন কতিপয় ব্যক্তিকে উপজাতীয় এলাকায় প্রেরণ কর্‌লেন: তাঁদের প্রচার ও প্রপাগাণ্ডার

ফলে অল্পদিনের মধ্যেই উপজাতীয় এলাকায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। এরপর কিছু অস্ত্রশস্ত্র সহ আরো দু'টি প্রচারক দল পাঠান হলো খাইবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—তোরখাম পরপারে আফ্‌গান এলাকায় সৈন্য সংগ্রহের একটা ঘাটিও তৈরী করা হয়েছিল।

এবার মৌলানা বশির ও মৌলানা কাসুরী মিশনের পক্ষ থেকে আমীরকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাঁদের অনুরোধে আমীর একরূপ রাযি হলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ ঘোষণার জন্য শর্ত আরোপ কর্‌তে ছাড়্‌লেন না।

তিনি মন্তব্য কর্‌লেন, "যুদ্ধ ঘোষণার জন্য 'ইন্‌ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে'র সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে গেলে মৌলানা মুহম্মদ আলী, হাকিম আজমল খাঁ কিংবা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। নিয়ে আসুন, তাঁদের একজনকে।" যে আফ্‌গান জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত, সভ্য জগতে যারা অর্দ্ধ সভ্য মানুষ হিসেবে পরিচিত, সেই আফগান জাতির আমীরের উল্লিখিত ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তখন কাবুল থেকে ভারতে আগমন করা কিংবা ভারত থেকে কোন কংগ্রেসী নেতাকে কাবুল নিয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। তাই অনেক জল্পনা-কল্পনার পর কাবুলে একটি 'আরিযী আযাদ হিন্দুস্তান সরকার' গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো :

সদর্-ই-হুকুমত : রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ।
ওযীর্-ই-আযম : মৌলানা বর্‌কতুল্লাহ্ ভূপালী।
পররাষ্ট্র সচিব : মৌলানা মুহম্মদ আলী কাসুরী।
দেশরক্ষা ও সৈন্য সংগ্রাহক মন্ত্রী : মৌলানা মুহম্মদ বশির।
মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা : মৌলানা আবদুল্লাহ্ সিন্ধী।
মৌলানা মনসুর আনসারী ও মৌলানা সয়ফুর রহ্‌মানকে মন্ত্রীসভার ডেপুটির পদ প্রদান করা হয়েছিল।

মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ আমীর হবিবুল্লাহ্‌র সাথে দেখা ক'রে যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ জানালেন। আমীর এবার বেশ খানিকটা উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন; হয়ত তিনি যুদ্ধ ঘোষণাও কর্‌তেন, কিন্তু মিশন ও তথাকথিত সরকারের ভুলে সব কিছুই পণ্ড হয়ে গেল।

তুর্ক-জর্মন মিশন ও 'আরিযী আযাদ হিন্দুস্তান সরকার' যখন আমীরকে যুদ্ধ-মন্ত্রে দীক্ষিত করতে ব্যস্ত ছিলেন, ইংরাজ তখন বস্তা বস্তা রজত মুদ্রা পাঠাচ্ছিলেন আফগানিস্তানে। টাকার জোরে ইংরাজ চারবাগের পীর-দস্তগীরকে বশীভূত করে রেখে ছিলেন।

আফগান রাজা-প্রজা সকলেই পীরের ভক্ত। খাৎনা-আকিকা, বিবাহ-তালাক, বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সকল ক্ষেত্রেই পীরের হুকুম-আহ্‌কাম অপরিহার্য।

রীত্যানুসারে আমীর বাহাদুর যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে চারবাগের পীর-দস্তগীরের অভিমত তলব কর্‌লেন। পীর সাহেব মুদিত নয়নে বল্‌লেন, ঠায়রো বাচ্চা, 'ইস্‌তি-খারা' ক'রে পরে জানাবো।

'ইস্‌তিখারা' সমাপন করতেই তিনদিন অতিবাহিত হলো। চতুর্থ দিবসে পীর সাহেব 'ইস্‌তিখারা'র তা'বির প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন, "মনহুস, বিল্‌কুল মনহুস! ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ করার অর্থ—আফগানিস্তানের সর্বনাশ ডেকে আনা; তাবাহি ও বরবাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা! সব্ লাল হো জায়েগা বাচ্চা,—খুদা তুমকো সহি-সালামতে রাখ্‌খে, আমীন!" যুদ্ধ ঘোষণার সকল সম্ভাবনা এখানেই নিঃশেষ হয়ে গেল।

মিশনের অকৃতকার্যতার মূলে আরো অনেক কারণ ছিল। মৌলানা আবদুল্লাহ্ সিন্ধী বলেন :

"হেন্‌টিগ সুবিধাজনক লোক ছিলেন না। তাঁর নানা বিরূপ মন্তব্যের কারণে জর্মন ও ভারতীয়দের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

মিশনের বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ অর্দ্ধ-কংগ্রেসী ও অর্দ্ধ-মহাসভায়ী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। তিনি প্রায়ই ভূমিহীন ভূপ বনে যেতেন। তাঁর কোন দোষ ত্রুটির কথা উল্লেখ কর্‌লে, তিনি বিরক্তির সুরে বল্‌তেন, আমি তোমাদের এ-সব মন্তব্য শুন্‌তে অভ্যস্ত নই।

এক বৎসর পর ফন হেন্‌টিগ তাঁর জর্মন সহকর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হলেন।

তুর্কি প্রতিনিধি কাযিম বে কিন্তু দেশে ফিরে গেলেন না। তিনি মৌলানা বর্‌কতুল্লাহ ভূপালী, মৌলানা মুহম্মদ আলী কাসুরী, মৌলনা মুহম্মদ বশির ও মৌলানা আবদুল্লাহ সিন্ধীর সাথে পরামর্শ ক'রে এক সুদীর্ঘ 'জিহাদ-ফত্‌ওয়া' প্রণয়ন করলেন। এই 'জিহাদ-ফত্‌ওয়া' খানির পাঁচ হাজার কপি সমগ্র উপজাতীয় 'খেল' এলাকায় বিতরণ করা হয়েছিল।

'চমর্‌কুন্‌ড—জালালাবাদের উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে হিন্দুকুশ পর্বতের বিভিন্ন শাখা ছড়িয়ে পড়েছে। 'কণ্টর' নদী-তীরবর্তী শাখা থেকে 'আস্‌মার' সীমান্তে আর একটি উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে। এই উপশাখার আশে পাশে উপজাতীয় 'পশত্', 'চোগ্‌তাসরাই,' 'কনৃবর' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ অবস্থিত। পশত্ থেকে প্রায় পাঁচ-মাইল দূরে যে নামহীন ক্ষুদ্র গিরিপথ রাক্ষসের মত মুখ

ব্যাদান করে আছে, তারি 'বালায়ী' (উচ্চ) এলাকায় চমর্কুন্ড অবস্থিত। এখান থেকে তিন ফার্লং দূরে হিড্ডার মুল্লা সাহিব নির্মিত মসজিদ 'সাহিব-ই-মুবারক' বিরাজিত। এই মসজিদ সন্নিহিত বস্তীটি 'চমরকুনড্ বস্তী' নামে অভিহিত।

মৌলানা মুহম্মদ বশির কাবুল থেকে জালালাবাদের পথে চমরকুন্ড এসে পৌঁছলেন এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবিক কার্যের পরিকল্পনা প্রণয়নে লিপ্ত হলেন। তাঁর সহকর্মীরা প্রায় সমগ্র উপজাতীয় এলাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য পরিচালনা করতে লাগ্লেন।

মৌলানা মুহম্মদ আলী কাসুরী তখনও কাবুলে অবস্থান কর্ছিলেন। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদের সম্মুখীন হলেন। চারবাগের পীর সাহেব নাকি আমীরের কানে কানে এ-কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, মৌলানা মুহম্মদ আলী কাসুরী শুধু ইংরেজের নয়, আফ্গানিস্তানেরও অন্যতম প্রধান দুশমন। সুতরাং আমীর হবিবুল্লাহ তাঁকে গেরেফ্তার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সর্দার নসরুল্লাহ্ খাঁ ও সিপাহ্সালার নাদির শাহ্-এর প্রতিবন্ধকতার দরুন তিনি প্রকাশ্যে কোন কার্যক্রম অবলম্বন কর্তে পার্লেন না।

একদিন গভীর রাত্রে একদল ডাকাত মৌলানার আবাস গৃহ ঘেরাও করে ফেললো (অনেকের ধারণা, মৌলানার হত্যার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আমীর সেই দস্যুদল প্রেরণ করেছিলেন)। খুদা মদদ্গার; মৌলানা কৌশলে পালিয়ে গেলেন এবং নাদির শাহ্-এর গোপন সাহায্য গ্রহণ ক'রে নিরাপদে জালালাবাদ পৌঁছ্লেন। তারপর তিনি পদব্রজে দুর্গম গিরি-এলাকা অতিক্রম ক'রে চমরকুন্ড এসে মৌলানা মুহম্মদ বশিরের সাহায্য লাভ কর্লেন।

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে মৌলানা মুহম্মদ আলী কাসুরী চমরকুন্ড পৌঁছেছিলেন। তাঁর আগমনে জিহাদ-ইজ্তিহাদের কার্য পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো। তিনি কাবায়িলী লোকদের মধ্যে জিহাদ-ইজতিহাদের অনুপ্রেরণা জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে হাজী সাহিব তরঙ্জই ও মুল্লা সাহিব বাব্ড়ার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। এরপর তিনি সওয়াত, আম্ব, চিত্রল প্রভৃতি রিয়াসতের প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কর্লেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে কাবায়িলী সমাবেশে তেজোদীপ্ত ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগ্লেন। তাঁর এই বক্তৃতার আকর্ষণে কাবায়িলী পাঠানরা 'রণদেহি' মূর্তি ধারণ কর্লো।

প্রথমতঃ রয্মক, পারাচুনার, কোহাটদ্বর্হ্ ও থল অভিমুখে আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। মুল্লা সাহিব বাব্ড়ার সহযোগিতায় প্রথম আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় গন্দাব ও মচ্সিতে। স্বয়ং হাজী সাহিব তরঙ্জই জিহাদ-ময়দানে অবতরণ করেছিলেন। চল্লিশ হাজার মুজাহিদীন ইংরাজ মুর্চাগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইংরাজদের গোরা, গুর্খা ও শিখ সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্তে বাধ্য হয়। ইংরাজ সেনাবাহিনীর সহায়তা কর্ছিল তাদের সুসজ্জিত তোপখানা ও এগারটি হাওয়াই জাহাজ; তৎসত্ত্বেও তিনদিন যুদ্ধের পর ইংরাজ সৈন্য মুর্চা পরিত্যাগ করে চলে গেল। মুজাহিদীন ইংরাজ সৈন্যের পরিত্যক্ত বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত কর্লেন। *

এমনি আরো কতিপয় সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব সংঘর্ষে ইংরাজদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল সত্য, পক্ষান্তরে এরূপ সংঘর্ষকে ব্রিটিশ-ভারতের বিরুদ্ধে 'মুনাজ্জম' সংগ্রাম বলা চলেনা। সুতরাং পুনরায় কতিপয় প্রভাবশালী খানকে কাসিদ নিযুক্ত করে আমীর হবিবুল্লাহ্র নিকট পাঠান হলো। তিনি চারদিক থেকে চাপে পড়ে যুদ্ধ ঘোষণা কর্লেন না বটে; কিন্তু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি; ওয়াদাহ্ মুতাবিক অর্থ সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। সর্দার নসরুল্লাহ্ খাঁ ও সেনাপতি নাদির শাহ্ও গোপনে মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য কর্তেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজরা তাঁর এই রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেল্লো। তাঁরা তখন মুল্লা-মৌলবী ভাড়া ক'রে কাবায়িলীদের মধ্যে প্রপাগণ্ডা চালাতে লাগ্লো যে, কাবায়িলী এলাকা আইনতঃ আফ্গানিস্তানের আমীরের 'ইমারত' এবং আমীর মৌসুফ্ই কাবায়িলীদের ইমাম; অতএব আমীর মৌসুফের জিহাদ ঘোষণা ব্যতীত যুদ্ধ পরিচালনা শরিয়তের পরিপন্থী। এইরূপ প্রপাগণ্ডার ফলে কাবায়িলীদের উৎসাহ অনেকখানি কমে গেল। এমনি সমস্যাপূর্ণ মুহূর্তে সংবাদ আস্লো—তুর্ক-জর্মন পরাজিত হয়েছে; খলিফা ও খিলাফত অনিশ্চয়তার মধ্যে অবস্থান কর্ছে।

এই সংবাদে সকলের অলক্ষ্যে সীমান্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাগুলির উপর দিয়ে প্রবল তুষার-প্রবাহ বয়ে গেল। অগ্নি নির্বাপিত হয়েছিল সত্য; কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে সৃষ্ট উত্তাপ বর্তমান ছিল পাক-ভারত স্বাধীনতার পূর্বদিন পর্যন্ত!

* মুজাহিদাত-ই-কাবুল ও ইয়াগিস্তান।

সম্পাদকীয়

আবদুল গফুর জালালী

সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবদুল গফুর জালালী এনতেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে……রাজেউন)। যে জামানায় অবিভক্ত বাংলায় সাহিত্য ও সাংবাদিকতা আমাদের সমাজে পুরাপুরি শিল্প ও ব্যবসায় হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই, আবদুল গফুর জালালী ছিলেন সে জামানারই ঐতিহ্যবাহী। তখন সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বড় কথা ছিল দেশ সেবা, জাতি সেবা ও ধর্মীয় উন্নয়ন। অনন্ত আদর্শ লইয়া তখন একদল মানুষ আমাদের সমাজে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে মওলানা ইছমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আরও কয়েকজন। তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। আবদুল গফুর জালালীর ব্যক্তিত্ব হয়ত তাঁদের অনেকের মত বড় ছিল না কিন্তু তাঁদের আদর্শ ও পন্থাকে তিনি সারা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আদর্শ লইয়াই সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মোহাম্মদীর সাথেও বহু দিন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরলোকগমনে আজ জাতির যে ক্ষতি হইল, তার পূরণ হইতে বহু দিন লাগিবে। আমরা মরহুমের শোক-বিধুর পরিবার-পরিজনকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি এবং তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করিতেছি।

মঈনুদ্দীন চৌধুরী

সিলেটের অক্লান্তকর্মী রাজনীতিক মঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুরী এনতেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে……… রাজেউন)। জনাব চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরিয়া অধুনা-লুপ্ত মোছলেম লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং নেতা ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় লীগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সকল কাজই তিনি যোগ্যতা, কৃতিত্ব এবং তৎপরতার সাথে সম্পন্ন করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। এ-ছাড়া তাঁর অন্যান্য চারিত্রিক গুণও তাঁকে সকলেরই নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি অমায়িক, সদালাপী ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন নেতা ও কর্মী হারাইল। আমরা মরহুমের আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিতেছি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতের দাঙ্গা

ভারতের কয়েক জায়গায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাতে পাকিস্তানে উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। কারণ; এই সব দাঙ্গার ফলে মুছলমানগণই নির্য্যাতিত হইয়াছে। ভারতের মুছলমানদের প্রতি পাকিস্তানের জনসাধারণের যে স্বাভাবিক সহানুভূতি রহিয়াছে, তা সকলেরই জানা কথা। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। দাঙ্গা দমনের জন্য ভারত সরকার কি স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তা পাকিস্তান সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়া যাইবে।

দাঙ্গার ব্যাপক বিস্তৃতি

গত হোলীর সময় ভূপালে দাঙ্গা হয়। তারপর এই দাঙ্গা আস্তে আস্তে বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। মুবারকপুর, সীতামারী, আখড়া, দত্তনগর প্রভৃতি বহু স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের অনেক স্থানে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব দাঙ্গা দমনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করিয়া ভারতের কংগ্রেস সরকার এই দাঙ্গার ব্যাপারে গোড়া হইতে ঔদাসিন্য এবং নির্লিপ্ত-তার নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। একটির পর একটি স্থানে দাঙ্গা হইতে লাগিল, ভারতের কংগ্রেসী নেতারা চুপ করিয়া রহিলেন।

সীতামারীতে মুছলমান মরিতে লাগিল, গ্রামের পর গ্রাম জ্বলিতে লাগিল এবং অসহায় মানুষ আশ্রয়ের জন্য দূরবর্তী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিতে লাগিল ; তখন ভারতীয় উজীরে আজম জনাব নেহরু দালাই লামা ও তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থীদিগের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত। এমন কি এই দাঙ্গার নিন্দা করিয়া তিনি একটি বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। দাঙ্গা-উপদ্রুত স্থানগুলির পরিদর্শন করার দায়িত্বও অনুভব করেন নাই। শুধু জনাব নেহরু নন, অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারাও তখন বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের তরফ হইতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলিতে কোনো প্রতিনিধিদলও প্রেরিত হয় নাই। এ-অভিযোগ কেবল আমরা করিতেছি না, শিখ নেতা মাষ্টার তারা সিংহ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের এই ঔদাসিন্যের সমালোচনা না করিয়া পারেন নাই। পরে অবশ্য "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি"র মত করিয়া ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দাঙ্গার নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সবের মধ্যে কোথাও আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল না। একটি দেশের ক্ষমতাসীন দলের মনোভাব যদি একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ হয়, তার নিন্দার ভাষা আমাদের নাই।

পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীর পক্ষপাতিত্ব

ভারতের এই সব সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে জিনিসটা সব চাইতে বড় ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, তা হইল দাঙ্গার সময় পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের লজ্জাজনক পক্ষপাতমূলক আচরণ। দাঙ্গার সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই আচরণ সম্পর্কে গোড়াতেই জমিয়তুল ওলামায়ে হিন্দ অভিযোগ করিয়াছিলেন। জমিয়ত বলিয়াছিলেন যে, দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘু মুছলমানেরা পুলিশ ও বেসরকারী কর্মচারীদের সাহায্য লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দাঙ্গাকারীরা সাহায্য লাভ করিয়াছে। জমিয়ত ওলামায়ে হিন্দ ছাড়া অন্যান্য অমুছলমান প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও এই অভিযোগ সমর্থন করিয়াছে। আকালী দল ও কমিউনিষ্ট দল সোজাসুজি পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতমূলক আচরণের সমালোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবেও পরোক্ষভাবে এ-কথার স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। কমিউনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটি শুধু পুলিশ ও বেসরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতমূলক আচরণের নিন্দা করেন নাই, কমিটির অভিযোগ আরো গুরুতর। কমিটি অভিযোগ করিয়াছেন যে, পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীরাও দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

কংগ্রেসী সরকারের দায়িত্ব

সুতরাং দাঙ্গার ব্যাপারে ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠিয়াছে, সেগুলি মারাত্মক। এর প্রতিকার একমাত্র ভারতীয় কংগ্রেস সরকারের নীতি পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ গলদ হইল যে ভারতের কংগ্রেসী সরকারের শাসনযন্ত্র নিরপেক্ষতার সহজাত দৃষ্টি হারাইয়াছে। পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মচারীরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, শান্তি রক্ষা করিবে ও দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দান করিবে—ইহা সকলেই সকল সভ্য সরকারের নিকট আশা করে। শাসনতন্ত্রের ও শাসনযন্ত্রের এই মৌলিক নীতি আজ ভারতে পদদলিত হইতেছে। শুধু তাই নয়, পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মচারীর মুছলমান-বিরোধী দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করার খবর প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত সরকার যদি কঠিন হস্তে এই সব অনাচারের প্রতিকার না করেন, তবে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতির কোনো কিছুই আশা করা যায় না। সুতরাং পক্ষপাতী ও দাঙ্গায় জড়িত পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বপ্রথম শাস্তিবিধান করিতে হইবে। তারপর দাঙ্গাকারীদিগকে উপযুক্ত সাজা দিতে হইবে। তাই উপরতলার কংগ্রেসী নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ভারত হইতে দাঙ্গা উচ্ছেদের একটি ব্যাপক ও সার্ব্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এ-কথার অর্থ হইল যে কংগ্রেস সরকারের মূল নীতির পরিবর্ত্তন চাই। তাঁরা যদি এ-ব্যাপারে তাঁদের ঔদাসিন্য ও দায়িত্বহীনতার নীতি ত্যাগ না করিতে পারেন, তা হইলে পরিস্থিতির উন্নতির কোনো আশা নাই। আশা করি, পাকিস্তান সরকারের নোটে ভারতীয় কংগ্রেস সরকারের এ-সব দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করিতে চাই যে, এর শুভ প্রতিক্রিয়া হইবে এবং শুভবুদ্ধির জয় হইবে।

ক্যানবেরা দুর্ঘটনা

পশ্চিম পাকিস্তানে অনধিকার-প্রবেশকারী ক্যানবেরা বিমান পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক গুলীবিদ্ধ হওয়ায় ভারতের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। এ-সম্বন্ধে চড়া গলায় ভারতীয় দেশরক্ষা উজীর জনাব কৃষ্ণ মেনন এবং ভারতীয় উজীরে আজম জনাব নেহরু অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁরা ধরিয়া লইয়াছেন যে প্রচারের জোরে তাঁরা আসল সত্য চাপা দিতে পারিবেন এবং দুনিয়ার লোককে বোকা বুঝাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁরা হাজার চেষ্টা করিলেও আসল সত্যটি চাপা পড়িবে না। ভারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত এই ক্যানবেরা বিমান সকল আন্তর্জ্জাতিক আইন-কানুন

অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছিল। পাকিস্তানে প্রবেশ করার পর ইহা একটি মারাত্মক অপরাধের কার্য্য করিতেছিল। ভারতীয় ক্যানবেরাটি পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির ফটো গ্রহণ করিতেছিল। তাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইলেও তা অবতরণ করিতে চাহে নাই বা আত্মসমর্পণের কোনো সংকেত করে নাই। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে বাধ্য হইয়া তাকে গুলীবিদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান তার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারই এ-ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছে। শুধু এই বিমানটি নয়, আরো বহু বার ভারতীয় বিমানের বিরুদ্ধে এ-ধরণের কার্য্য করার অভিযোগ করা হইয়াছে এবং ভারতের নিকট এ-সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনও করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের মুখপাত্র এ সব তথ্যের দিকে যাইতেছেন না। তাঁরা শুধু তর্জ্জন গর্জ্জনের সাথে পাকিস্তানের নিন্দা করিয়া যাইতেছেন। তাঁরা ধরিয়া লইয়াছেন যে, প্রচারের ঝড় তুলিয়াই তাঁরা আসল সত্য হইতে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে চালিত করিতে পারিবেন। কিন্তু মিথ্যার বেসাতি যে পরিণামে ব্যর্থ হয়, তা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রচারের আরো পরিণতি প্রমাণ করিয়াছে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি হইবে মাত্র।

রোমান হরফ

পাকিস্তানের কেউ কেউ বাংলা ও উর্দ্দুকে রোমান হরফে লেখার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব দেশের বর্ত্তমান পশ্চাতভূমিতে নূতন হইলেও আসলে প্রস্তাবটি নূতন নয়। অবিভক্ত ভারতেও এরূপ প্রস্তাব অনেকে উত্থাপন করিয়াছিলেন। কারো কারো এরূপ অভিমত ছিল যে যেহেতু ভারতের অধিকাংশ ভাষী আর্য্য-গোষ্ঠির ভাষার অন্তর্গত, সেই হেতু সব ভাষাকে রোমান হরফে লিখিলে লাভ হইবে। এর ফলে ভারতের সামস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

হিন্দী ও বাংলার ব্যবধান প্রধানত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে মাত্র—এ কথার উপর জোর দিয়া বলা হইত যে রোমান হরফে লিখিলে বাঙ্গালীর হিন্দী বুঝা এবং হিন্দী ভাষীর বাংলা বুঝা সহজতর হইবে। এ-কথা অল্প বিস্তর অন্যান্য আর্য্য-গোষ্ঠির ভাষার বেলায়ও খাটে। সুবিখ্যাত ভাষা-তত্ত্ববিদ ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছিল এই মত। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব যে গৃহীত হয় নাই, তা সকলেরই জানা কথা। পাকিস্তানে আজ আবার উর্দ্দু ও বাংলাকে রোমান হরফে লেখার কথা চিন্তা করিতেছেন। তাঁদের পক্ষে যে বলিবার কিছু নাই, এ কথা আমরা বলিতে চাই না। রোমান হরফের ব্যবহারিক সুবিধা ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলির হাতে পড়িয়া অনেক বাড়িয়াছে। রোমান অক্ষরগুলিকে ব্যবহারিক কাজে বৈজ্ঞানিক ভাবে আজ যতখানি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, অন্য হরফের দ্বারা তা আজও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাছাড়া রোমান হরফ গ্রহণ করিলে পাকিস্তানীদের মধ্যে উভয় অংশের ভাষা জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার যে বহুগুণ সুযোগ বাড়িবে, তাও একটি বড় কথা। পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য ও জানাজানির পথ সত্যই অধিকতর প্রশস্ত হইবে।

রোমান হরফের অসুবিধা

তবে রোমান হরফের ব্যবহার আর এদিক হইতে একান্ত অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। বাংলা ও উর্দ্দুর অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটি দুরতিক্রম্য ছেদ ও বাধার পর্দ্দা টানিয়া দিবে। রোমান হরফ গ্রহণ করিলে নূতন বই ও বড়জোর চলতি বই গুলি নূতন ভাবে পুনর্লিখিত হইবে। অন্যান্য বইগুলি সাধারণ পাঠকদের জ্ঞাত ও পরিচিত রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইবে। উর্দ্দু ও বাংলার সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধিশালী বিরাট ও বিচিত্র অতীত রহিয়া গিয়াছে। অতীতের সব বই রোমান হরফে লেখার সম্ভাবনা কম এবং অত্যন্ত ব্যয়-বহুল। সে সবের অনেক-গুলির জন্য রোমান হরফে পুনর্লিখনের সাক্ষাত তাগিদ অনুভূত না হওয়ায় সেগুলির চিরবিলুপ্তির আশঙ্কাও উড়াইয়া দেওয়ার মত নয়। সুতরাং হরফ পরিবর্ত্তনের কথা বিবেচনা করার সময় অত্যন্ত ধীরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই উচিত। এক্ষেত্রে আমাদিগকে তুলনামূলক ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কোন্‌টাতে আমাদের লাভ বেশী। তাছাড়া ভাষার হরফ পরিবর্ত্তনের অনেক সময় তার নাড়ী ও ঐতিহ্যের যোগ ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় থাকে। রোমান হরফ গ্রহণ করিলে যদি ক্ষতি বেশী হয় ও ঐতিহ্যগত অনিষ্টের ঝুঁকি থাকে, তবে তা গ্রহণ না করাই উচিত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার এরূপ গুরুত্ব বিষয়ে বিতর্ক বর্জ্জিত হওয়া আমরা উচিত মনে করি। এর চাইতে আরো অনেক প্রশ্নের মীমাংসা আজ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে সে-সবের প্রতি আশু মনোযোগ দেওয়াই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এখন কর্ত্তব্য।

"ফুলমনি ও করুণা"

সকলের ধারনা ছিল যে, প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক। তাঁর "আলালের ঘরের

দুলাল”ই বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের মর্য্যাদা পাওয়ার অধিকারী। “আলালের ঘরের দুলাল” ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু নূতন আবিষ্কারে “আলালের ঘরের দুলালের” এই গৌরব ম্লান হইয়া গেল।

কলিকাতা “ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে” গবেষনার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস ক্যাথারিন মুলিনস নামক জনৈক ব্রিটিশ মহিলা কর্ত্তৃক ১৮৫২ সনে লিখিত হইয়াছিল। উপন্যাসটি ছিল “ফুলমনি ও করুণার” কাহিনী। ইহা “ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাষ্ট এবং বুক সোসাইটি” কর্ত্তৃক একই বৎসরই প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির ভূমিকায় মিসেস মুলিনস লিখিয়াছেন যে পুস্তকটি বিশেষ করিয়া দেশীয় খৃষ্টান মহিলাদের জন্য লিখিত। ইহাতে আমি পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্ম্মের বাস্তব প্রভাব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস মুলিনসের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিয়া “ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া” পত্রে বলা হয়, তাঁর রচিত “ফুলমনি ও করুণা” উৎকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লিখিত এবং ইহা ভারতের প্রত্যেকটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের নিকট বানিয়ানের “পিলগ্রীম প্রগ্রেসের” যে মর্যাদাবান আসন রহিয়াছে, এই পুস্তকখানিও দেশী খৃষ্টানদের নিকট ঠিক সেই মর্য্যাদাবান আসন লাভ করিয়াছে।

উনিশ শতকের বাংলা ভাষার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আরো অধিক গবেষণা হওয়া উচিত। এদিক হইতে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীকে তৎপর হইতে দেখিলে আমরা খুশী হইব। উনিশ শতকের মধ্যভাগ বাংলা ভাষার ভাঙ্গাগড়ার যুগ। এ-সময় বাংলা ভাষার রূপ-পরিবর্ত্তনের একটা সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলে। এ-ব্যাপারে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদেরও হাত ছিল। আরবী-ফারসী বাংলা বর্জ্জনের তখন একটা জঙ্গী মনোভাব নব-শিক্ষিত হিন্দু ও মিশনারীদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। তারই পরিণতি হইল সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা ভাষা। প্যারী চাঁদের “আলালের ঘরের দুলাল” তার সম্মানজনক ব্যতিক্রম। “আলালের ঘরের দুলাল” বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের মর্য্যাদা না পাইলেও আরবী-ফারসী যুক্ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী পুস্তক হিসাবে চিরকাল কীর্ত্তিত হইবে। “ফুলমনি ও করুণা”-র সাথে আমরা পরিচিত নই। “ফুলমনি ও করুণা” “আলালের ঘরের দুলাল” এবং তাদের সম সাময়িক সাহিত্য লইয়া এখানে উপযুক্ত ব্যক্তিরা গবেষণা করিয়া আলোকপাত করিলে আমরা খুশী হইব।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad Press

মাসিক মোহাম্মদী

বৈশাখ, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

দেখে এলাম করাচী

মঈনুদ্দীন

অন্ধের হাতি দেখার কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। আমার করাচী দেখার কাহিনীও প্রায় সেইরূপ। বিরাট শহর করাচী। দু'চার দিন তো নয়-ই, দু'চার বছরেও করাচী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ। আমি এক নজরে করাচীকে যা' দেখেছি, তা-ই লিখ্ছি।

গত ১৬ই জানুয়ারী (১৯৫৯) হঠাৎ এক খানা চিঠি পেলাম। ঢাকার বাঙলা একাডেমীর ডিরেকটর ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের স্বাক্ষরিত চিঠি। করাচী শহরে 'পাকিস্তান লেখক সম্মেলন' (Pakistan Writers' convention) হবে ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫৯) তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ। জনাব শহীদ আহ্মদ দেহ্লভী এর কার্যনির্বাহক কমিটীর সভাপতি। তাঁর পক্ষ থেকে ডাঃ এনামুল হক সাহেব চিঠিখানা পাঠিয়েছেন। যাতায়াত ও করাচী থাকার ব্যয়ভার উদ্যোক্তারা বহন করবেন। অতএব...।

দেশে সামরিক শাসনের বদৌলতে সব কাজই দ্রুত সমাধান করতে হবে—এই-ই কানুন। পত্রে নির্দেশ আছে, ২০শে তারিখের মধ্যে সম্মতিসূচক পত্র পাঠাতে হবে। অতএব, সিদ্ধান্তও দ্রুত করতে হবে। চারদিন মাত্র সময়। এর ভেতর কতো ঝামেলা শেষ করতে হবে। তারপর প্রস্তুত হতে হবে করাচী যাওয়ার জন্য। এতো শীঘ্র প্রস্তুত হওয়া সম্ভব কি না, তা ছাড়া ক্রনিক বাত আর অম্লরোগের রোগী আমি, আমার পক্ষে চৌদ্দ শ' মাইল দূরে আকাশ পথে ভেসে যাওয়া চল্বে কিনা, এ-ও এক সমস্যা। ওখানে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আড়াই শ' বুদ্ধিজীবি এসে সমবেত হবেন, শুধু স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁদের দর্শনলাভ থেকে আমি থাকবো বঞ্চিত, এটা কোনো কাজের কথা নয়। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী সবাই একসুরে বলে উঠ্লো: চিরদিন সাহিত্যসেবা করে এ-সুযোগ হারানো অন্যায় হবে। ছোট ছেলে শাহাবুদ্দীন গড়াগড়ি দিয়ে কান্না জুড়ে দিলো। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। অতিকষ্টে তাকে সান্ত্বনা দিলাম। বল্লাম: "ওখানে গিয়েই তোমাকে ফোন্ করবো।"

নিমন্ত্রিতের তালিকা দেখে চক্ষুস্থির! বহু খ্যাতনামা আজীবন সাহিত্যসেবী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। আবার যাঁরা সবেমাত্র হাত পাকাচ্ছেন, তাঁদেরও অনেকে এতে স্থান পেয়েছেন। পাকিস্তানের আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাসী নন,—এখনো যাঁরা পশ্চিম বঙ্গের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন, এই তালিকায় এমনও কয়েকজনের নাম আছে। ভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের লোকদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে করাচী যাওয়া চলে কিনা, এ-এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

পাকিস্তান হাসিলের আগে থেকেই যাঁরা বাঙলা-সাহিত্যে ইস্লামীরূপ ফিরিয়ে আনার জন্য কুশিশ করছেন, পাকিস্তান হাসিলের পর করছেন প্রাণপণ চেষ্টা, নবরূপায়নে করেছেন আত্মনিয়োগ—তাঁদের কয়েকজনের সাথে দেখা করলাম। তাঁরাও এই সমস্যার কথাই ভাবছেন। অনেক গুফ্ত্গু, অনেক বাতচিৎ—অনেক

আলাপ-আলোচনার পর স্থির হলো কনভেনশনে আমাদের যাওয়াই উচিত। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের দাওয়াতের ব্যাপারে এর উদ্যোক্তাদের দোষ দে'য়া চলে না। তাঁরা এখানকার লেখকদের মতিগতি সম্বন্ধে সম্ভবতঃ ওয়াকিফহাল নন। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে ভিন্ন মতের লোকেরা হাজির হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মত বলে তাঁদের কাছে যা' পেশ করবেন, তা' মোটেই পূর্ব পাকিস্তানের মত নয়। অতএব সেখানে আমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। এ-মত আমরা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত কয়েকজন মেনে নিলেন না। এদের না যাওয়ার হয়তো অন্য কারণও থাকতে পারে।

যাত্রার আয়োজন চল্‌লো। ডাঃ এনামুল হক সাহেব তাঁর লোক দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করে দিলেন ২৬শে তারিখে। সংগে দিলেন ডেলিগেট কার্ড, প্রোগ্রাম আর ওখানে গিয়ে কোন্ হোটেলে কি ভাবে উঠ্‌তে হবে, তার নির্দেশ। তাঁর দায়িত্ব শেষ। এখন স্বাধীনভাবে বিমান ঘাটিতে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

করাচী আমার কাছে নূতন। আর বিমানও। এর মধ্যে বন্ধুদের আর কারো সাথেই যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হলো না। একখানা ট্যাক্‌সী নিয়ে ২৮শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায় গিয়ে তেজগাঁ পৌঁছলাম। ছোট ছেলে, বাড়ীর আরও চারজন সংগে গেলেন। চমৎকার! চমৎকার!! সেখানে গিয়ে দেখি আত্মার আত্মীয় বন্ধুদের অনেকেই উপস্থিত। পরে আরো কয়েকজন এসে পৌঁছ্‌লেন।

একজন প্রশ্ন করলেনঃ মুখ শুক্‌নো দেখাচ্ছে ব্যাপার কি?

বল্লামঃ বিমানে এই প্রথম উঠ্‌তে যাচ্ছি কি না, তাই একটু অস্বস্তি বোধ করছি।

হেসে বন্ধু বল্লেনঃ আরে তাই নাকি! বিংশ-শতাব্দীতে বাস করে বিমানে উঠ্‌তে ভয়? এখন স্পুটনিকের যুগ চল্‌ছে—বিমান তো তার কাছে গরুর গাড়ী! উঠ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে, কী আরাম!

টিকিট আর কাষ্টমচেকিং সেরে শুধু পানের বাটা আর এটাচী ব্যাগটি হাতে নিয়ে বিমানে গিয়ে উঠে পড়লাম। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। ছোট ছেলে শাহাবুদ্দীন আর অন্যান্য সবাই খুশীমনে হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছে। আর বড় ভাই মৌলবী গোলাম রাজ্জাক খানের চোখে অশ্রু টল্‌মল্ করছে।

পাশাপাশি সীটে বস্‌লেন—কবি মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম আর সৈয়দ আবদুল মান্নান। ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে বিমান আকাশ পথে উড়্‌লো। ঘোষণা করা হলোঃ সতেরো হাজার পাঁচশ' ফিট ওপর দিয়ে বিমান উড়ে যাবে। বাপ্‌স্! এতো উঁচু দিয়ে?

মাটির মানুষ আমরা। সর্বংসহা মাটির সাথে আমাদের নিবিড় পরিচয়। মাটির গন্ধ আমাদের কাছে ভারী মিষ্টি। তাই মাটিকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু এই মাটির মানুষই করেছে শূন্যকে জয়। মানুষের ভয়ে মহাশূন্যের অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত। আমরা কি কম? মাটির মায়া ক্ষণিকের জন্য মন থেকে দূরে সরে গেলো। মহাশূন্যই এখন আমাদের একান্ত আশ্রয়। স্থির হয়ে বসে রইলাম দাঁতে দাঁত চেপে। ঘোষণা করা হলোঃ "সীটে বেল্ট আছে, তা কোমরে বেঁধে নিন।"

ফুঃ বেল্ট বাঁধ্‌তে হবে? কেন, কি প্রয়োজন? তবু নতুন মানুষ আমি। বিমান-ভ্রমণের জানিনা তো কিছু। বেল্ট কোম'রের কাছে গুছিয়ে রেখে দিলাম এমন ভাবে, যেন এক মিনিটে বেঁধে ফেলা যায়। বাঁধলাম না। কিন্তু সারা পথে ওটা আর আমার প্রয়োজন লাগেনি।

শোঁ শোঁ করে বিমান উড়ে চলেছে পাকিস্তান ইণ্টার ন্যাশন্যাল এয়ার লাইন্‌স্-এর বিমান। ব্যাঘ্রের মতো সাহসী আর ক্ষিপ্রগতি। ভারী ভালো লাগ্‌ছে। না হেল্‌ছে না দুল্‌ছে। নৌকায় যেতেও তো কতো দুলুনী খেতে হয়। এতে তা-ও নেই!

মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লামকে বল্লামঃ নানা, বিমান কি থেমে আছে, চল্‌ছে না যে মোটেই!

হেসে মুফাখ্‌খার বল্লেনঃ চল্‌ছে না মানে? ওঃ আপনি মাঝখানে বসেছেন তাই টের পাচ্ছেন না। ঐ জান্‌লা দিয়ে দেখুন।

জানালার পথে তাকালাম। সে এক মহাশূন্য। সেই সীমাহীন শূন্যের ওপর দিয়ে পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা খণ্ড মেঘ মনের খুশীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটু দূরের এক সীটে বসেছিলেন আবদুল্লাহ্ আল্‌মুতী। আল্‌মুতী তরুণ অধ্যাপক। বিজ্ঞানের ছাত্র। ডাক্‌লেনঃ কবি সাহেব এদিকে আসুন, একটা মজার জিনিষ দেখাচ্ছি। আপনার দেখা উচিত।

মজার জিনিস ই বটে! জান্‌লার পথে উঁকি মারলাম। অপূর্ব! অপূর্ব!! বিমানের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে পাখা রয়েছে, তাকে ঘিরে চলেছে এক অপূর্ব খেলা। মেঘ শিশুরা তাকে ঘিরে এক আশ্চর্য খেলা জুড়ে দিয়েছে। বিমান তাদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সামনের দিকে পা বাড়াতেই যেন খল্‌খল্ করে হেসে উঠ্‌ছে শিশুর দল। কেউ ডানা ধরে ঝুল্‌ছে, কেউ একটু দূরে সরে যাচ্ছে, কেউ আবার ছুটে এসে জড়িয়ে ধরছে। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে, উপরে, নীচে,

নেচে ফিরছে শিশু মেঘ। কতোদিনের কতো নিবিড় পরিচয়, কতো আত্মীয়তা যেন আমাদের বিমানের সাথে।

আরে, চমৎকার—চমৎকার! যুবতী-মেঘও এসে জুটেছে তাদের সাথে। যৌবন ভরা ঢল ঢল দেহের অপূর্ব ভংগিমায় এরা যুবক-বিমানের আশে পাশে ঘুর্ ঘুর্ করছে। নব বধূর স্মিত হাসি যেন তাদের মুখে। স্বর্যের ক্ষীণ আলোয় তাদের শাড়ীর স্খলিত অঞ্চল করছে ঝিক্ মিক্ চিক্ চিক্। টানা ভূরু কুঞ্চিত করে ওরা এগিয়ে আস্‌ছে বীর-বিমানের দিকে। কিন্তু বীরের সেদিকে কোনো লক্ষ্যই নেই। যুবতীর অক্ষি কটাক্ষে ভুলবার পাত্র সে নয়। আপন কর্তব্য কর্মে ভারী সজাগ। এগিয়ে চলেছে সে আপন গাম্ভীর্য বজায় রেখে।

এক সময় দুটি যুবতী-মেঘ তাদের স্বর্ণাঞ্চল দিয়ে ঢেকে দিলো বিমানের ডানা। বিরহিনী বালিকা বধূর মতো জড়িয়ে ধরলো যেন—আলিংগন দিলো যেন দয়িতকে। হঠাৎ বাম্পিং করে বিমান কয়েক হাজার ফিট নিচে নেমে গেলো। চালকের চালনা-কৌশলে মেঘের স্তর থেকে দূরে সরে আস্‌তে হলো। আর মেঘ-যুবতীরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো—ছড়িয়ে পড়লো সারা আকাশে। তাদের মুখে চোখে অসীম বেদনা। আশাহত কাতর চাউনি। একান্ত উদাস।

বিমান-চালক তাঁর অজ্ঞাতসারেই যে ওদের মনে ব্যথা দিয়েছে, এ-কথা আমার মনে হলো। চোখ ওদিক থেকে ফিরিয়ে নিলাম। তাকালাম নিচের দিকে। কিছুই দেখা যায় না। খা খা করছে বিরাট শূন্যতা। মাঝে মাঝে ধূমায়িত মেঘ ভেসে চলেছে নিচু দিয়েও। তার ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো নয়নে পড়ে নদী, মাঠ, বাড়ী-ঘর। ধোঁয়ার মতো ঝাপ্‌সা। নদীকে নদী বলে চেনাই যায় না। মনে হয় এক খেই মোটা রূপালী সুতো যেন আকাবাঁকা হয়ে লতিয়ে পড়ে আছে। বড় বড় দালান-কোঠাগুলো যেন ছোট ছোট খেলাঘর।

বারোটায় এয়ার ষ্টুয়ার্ড টিফিন নিয়ে হাজীর। এদের দলে ছিলেন: জনাব আনোয়ার, আজীজ, আদীল আর একটি তরুণী। নাম: আর্জুমান্দ্। এরা সকলেই ভারী মিষ্টি, আদব-কায়দা দুরস্ত। বোধহয় এজন্য তাঁদের বিশেষ ট্রেনিং দে'য়া হয়।

এই সময় আবার বাম্পিং অর্থাৎ গাঢ় মেঘখণ্ডকে এড়িয়ে বিমানের ওঠা-নামা শুরু হলো। মিনিট পাঁচ-সাত পরেই আবার তার গতি স্থির।

খাওয়া শেষ করে পানের বাটা খুলে বস্‌তেই চারদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলো: মঈনু ভাই, আমাকে একটা—কবি ভাই, আমাকে একটা। হাসি মুখে বন্ধুদের চাহিদা মেটালাম। এরাই অনেকে তেজগাঁ বিমান-ঘাটিতে আমার হাতে পানের বাটা দেখে ঠাট্টা করেছিলেন। এখন দেখ্‌ছি, পানের চাহিদা আমার চেয়ে এঁদের কম নয়।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম চট্‌পটে, উৎসাহী, কর্মঠ আর আবেগ প্রবল। মহা আনন্দে তিনি এর-ওর সাথে সারা বিমান ঘুরে আলাপ করে বেড়াচ্ছেন। বল্লেন: সামনের দিকে যাবেন, ইঞ্জিনরূমে? প্রধান-চালকের অনুমতি নিয়েছি, গেলে ওদিকটা দেখে আস্‌তে পারেন।

বল্লাম: মন্দ কি? একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

প্রথম বিমান আরোহণের অস্বস্তিভাব কেটে গিয়েছিল। স্বচ্ছন্দ মনে এগিয়ে গেলাম। সংগে মুফাখ্‌খার ও সৈয়দ মান্নানও গেলেন। এমন সুযোগ কি আর ছাড়তে আছে? ডাইনে মালখানা আর বাঁয়ে বাথরুম পেরিয়ে বিমান-যাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় দরওয়াযার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইঞ্জিনরুমের ভেতরে তিনজন অফিসার। একজন একেবারে সামনে বসেছিলেন। আর দুজন তাঁর একটু পেছনে—ডাইনে বাঁয়ে। তাঁরা পর্যবেক্ষণ (Observation) যন্ত্রের দিকে একান্ত নিবিষ্ট-চিত্তে তাকিয়ে আছেন। কোনোদিকে তাকাবার তাঁদের অবসর নেই।

সামনে বসেছিলেন প্রধান চালক ক্যাপটেন কুরাইশী। দু'জনের একজন হচ্ছেন কো-পাইলট জনাব ইয়াকুব অপরজন রেডিও অফিসার জনাব রশীদ। আর একজন নেভিগেশন অফিসার জনাব আদমও ছিলেন। ক্যাপটেন কুরাইশীর স্বাস্থ্য সুন্দর, গম্ভীর চেহারা। মুখে চোখে বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে বাড়ী।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। ফিরে তাকালেন শুধু ক্যাপটেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে। শামসুদ্দীন আমাদের সবার সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরস্পর হাত মুসাহেফা হলো। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় শামসুদ্দীন তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। ভারী লজ্জা করতে লাগ্‌লো। কথায় কথায় ক্যাপটেন জান্‌তে পারলেন, আমি অনেক-গুলি বইয়ের লেখক আর একজন নজরুল সাথী। তাঁর মুখ আনন্দে ভরে গেলো। বল্লেন: নজরুলের কবিতা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি—নাম শুনেছি। আমি ইকবালের একজন ভক্ত পাঠক। এ-কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লেন তিনি।

"আচ্ছা ভাইয়া আস্‌সালামু আলায়কুম—আব্ রুখ্‌সাত।" বলে ইঞ্জিনরুমের বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। ভাব্‌লাম: আমাদের মতো ক্যাপটেনের মাথায়ও দেখ্‌ছি কবিতার পোকা আছে। যে ভাবে

কাব্যালোচনার সূত্রপাত হচ্ছে, এ আর বেশীদূর এগুতে দেয়া উচিত নয়। এই বিমানে পূর্ব পাকিস্তানের অনেকগুলি প্রতিভা রয়েছেন। হঠাৎ ক্যাপটেনের অন্যমনস্কতার সুযোগে ইঞ্জিনের কোনো অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তা' হলে আমরাই হবো এতোগুলি লোকের বিপদের কারণ।

পরে জেনেছিলাম, আমার এ-ধারণা ছিল ভুল। কারণ ক্যাপটেনকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই দায়িত্ব দে'য়া হয়। চারি ইঞ্জিনযুক্ত বিমান পরিচালনার জন্য এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত যাঁদের পাঠানো হয়, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য খরচ হয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এঁরা দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনিংগ্রহণ করেন। ট্রেনিংগ্রহণের মেয়াদ আড়াই বৎসর। এই সময় এঁরা "বিশ্বের সকল জায়গায় পাইলটদের জন্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান-পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। তাঁদের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার মান অনুযায়ী এ, এল, টি, পি, লাইসেন্স অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষানবীশরূপে কিছুদিন কাজ করেন। এই লাইসেন্স পাওয়ার উপযোগী ট্রেনিং-এর সময় এঁরা বিমান-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই ট্রেনিং গ্রহণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লাইসেন্স পাওয়ার পর কিছুদিন ক্যাডেট হিসাবে, পরে কো-পাইলট হিসাবে কাজ করেন। তারপর কমপক্ষে পাঁচ হাজার ঘণ্টা শিক্ষামূলক উড্ডয়ন এবং আরও কয়েক রকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্যাপটেনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

ক্যাপটেন কুরাইশী নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ছিলেন সজ্ঞান। অতএব আমার অহেতুক ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। যাহোক আমরা তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন রুমের বাইরে চলে এলাম। পেছন থেকে ক্যাপটেন বল্লেন: "আপ্ জাগাহ্ পার্ আরামসে হায় না?"

বল্লাম: "জী হাঁ,—বহুৎ বহুৎ শুকরিয়া।"

খানিক পর নিজের সীট ছেড়ে একা আবার বাথরুমের দিকে রওয়ানা হলাম। সামনের সীট গুলোতে বসেছিলেন, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম শামসুন্নাহার মাহ্মুদ এবং অন্য একটি ভিন্ দেশীয় মহিলা। ইনি আমাদের কাফেলার সংগী নন। এঁদের পেরিয়ে বাথরুমে যেতে হয়। দেখ্লাম: খাতা খুলে সুফিয়া আরামে বসে কবিতা লিখ্ছেন। সুফিয়া আমার বোন—আপন বোনের চেয়ে বেশী। কিছুদিন থেকে ওঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছেনা। নির্দিষ্ট কোনো অভিভাবক ছাড়াই বিমানে আরোহণ করেছেন। আমরা সবাই ওঁর ভাই, সবাই ওঁর আপনজন। সকলেরই সজাগ দৃষ্টি আছে ওঁর ওপরে। ওঁকে নিবিষ্টচিত্তে কবিতা লিখ্তে দেখে ভারী ভালো লাগ্লো। তা'হলে বিমান যাত্রা সুফিয়ার আরামপ্রদ হয়েছে? ওঁর ধ্যান না ভাংগিয়ে ফিরে এসে মুফাখ্খারকে বল্লাম: "নানা, সুফিয়া কবিতা লিখ্ছেন।"

মুফাখ্খার বল্লেন: "আরে, তাই নাকি! বিমানে বসে কবিতা লেখা—এতো এক স্মরণীয় ঘটনা। আমাকেও তো একটা লিখ্তে হয়। কিন্তু কাগজ কোথায় পাই?"

এটাচী ব্যাগ খুলে কাগজ দিলাম। সৃষ্টি হলো মুফাখ্খারের বিমানের ওপরে বসে লেখা নতুন কবিতা।

পরে হয়তো এঁরা কোথাও ছাপ্বেন কবিতা দু'টো।

এক সময় শামসুদ্দীন এসে বল্লেন: রাজপুতানার মরু মাঠের ওপরে ঝড়ের আয়োজন হয়েছে। ক্যাপটেন কুরাইশী তা' এড়িয়ে অনেক দক্ষিণ দিয়ে বিমান নিয়ে যাচ্ছেন। অতএব করাচী পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক দেরী হবে। কি করা চুপ্ করে বসে রইলাম।

ভাবলাম: করাচী পৌঁছে তো আর সময় পাওয়া যাবে না। যতটুকু এলাম, তার ক্ষুদ্র বর্ণনা দিয়ে বাড়ীতে একখানা চিঠি লেখা যাক্। বেশীদূর এগুনো গেলো না। ঘোষণা হলো: "দূরে ঐ করাচী শহর দেখা যাচ্ছে। ইন্শা আল্লাহ্, আমরা করাচী পৌঁছে গেছি।"

তারপর ঠিক চারটেয় বিমান করাচীর মাটি স্পর্শ করলো। মাটির মানুষ আমরা—মাটির স্পর্শ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। এরপর ধীরে ধীরে সবলে বিমান-অফিসে গিয়ে বস্লাম। যাঁরা এগিয়ে নিতে এসেছিলেন কনভেনশনের উদ্যোক্তাবন্ধুদের তরফ থেকে তাঁরা এঁর-ওঁর পরিচয় নিতে লাগ্লেন ঔৎসুক্য বশতঃ।

একপাশে একটি সোফায় চুপ্চাপ বসেছিলাম। বেশ ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। পাশেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির উর্দু-বিভাগের প্রধান ডক্টর সাদানী বসেছিলেন। বিমান থেকে নেমেই তাঁর সাথে আমার প্রথম আলাপ। মৃদুস্বরে কথা বল্ছিলাম আমরা। একটি উচ্চ আওয়াজ কানে যেতেই ফিরে তাকালাম। সম্ভবতঃ চেহারার বৈশিষ্ট্য দেখে 'করাচী কাল্চার সেন্টারে'র কোনো ভলান্টিয়ার জনাব শওকত ওস্মানকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে থাক্বেন। শওকত ওস্মান মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করে তাঁকে বল্ছেন: "দেখ্তেই পাচ্ছেন, ব্যাগের ওপর নাম লেখাই আছে।"

বলার ভংগিটি ছিল খুবই আপত্তিকর। কিন্তু আমি হো হো করে হেসে বিষয়টিকে হাল্কা করে দিলাম। আমারই এটাচী ব্যাগে নাম লেখা ছিল। তার দিকে অংগুলী নির্দেশ করছিলেন, জনাব শওকত ওস্মান।

প্রশ্নকারী ভদ্রলোক থ' মেরে গেলেন তাঁর বলার ঢং দেখে। ডাঃ সাদানী বল্লেন: ইন্কা নাম মঈনুদ্দীন হায়। বাঙলাকে মশ্হুর শায়ের।"

ব্যাগে নাম লেখার জন্য শওকত ওসমান ঠাট্টা করলেন। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা একটু পরেই দেখা গেলো। সংগের জিনিষ ছাড়া আর যে স্যুটকেইস্ ইত্যাদি আনা হয়েছিল বিমানের কর্মচারীরা তা' পাশের ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলেন। যাঁর যাঁর স্যুটকেইস তাঁকে তাঁরটি বেছে নিতে বলা হলো। সুফিয়া মুশকিলে পড়ে গেলেন। ওঁর স্যুটকেইসের মতো আরও চার-পাঁচটি স্যুটকেইস পরপর সাজানো। কোন্‌টা নিজের বলে তুল্‌বেন? সংগের ল্যাগেজ টিকিটে বিশেষ কোনো চিহ্ন ছিলনা বা তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া গেলোনা। বল্লাম: যে স্যুটকেস্‌টি তোমার বলে মনে হয়, তোমার কাছে তো চাবি আছে, লাগিয়ে দেখ ওটা খোলে কি না বা তোমার জিনিষ ওতে আছে কি না।

দু'একটিতে চেষ্টা করতেই একটা খুলে গেলো। বল্লেন: "হ্যাঁ, এটাই আমার।"

হৃষ্টচিত্তে সবাই এয়ারপোর্টের বাসে উঠে পড়লাম। 'করাচী কালচার সেণ্টারে'র স্বেচ্ছাসেবকরা এ-ব্যাপারে বেশ সাহায্য করলেন। বাস চলতে শুরু করলে এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বল্লেন: "ম্যায় হুঁ ইব্‌নুল্ হাসান। জনাব আপকি তা'রীফ?"

নাম বল্লাম। দু'এক কথায় আলাপ সেরে তিনি একে একে সবার সাথেই পরিচিত হলেন। ভদ্রলোককে দেখে প্রথমেই আমার ভারী ভালো লাগ্‌লো। দীর্ঘ একহারা চেহারা। চোখে যৌবনোজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি। কাজকর্মে খুব চট্‌পটে মনে হলো।

করাচীর কাচারী রোড একটি অভিজাত পাড়া বলে পরিচিত। সেখানে তাজ হোটেল আর হোটেল ডি-ল্যুক্স। হোটেল দুটো পাশাপাশি। বহু রাস্তা ঘুরে ফিরে বাস এসে তাজ হোটেলের সামনে দাঁড়ালো। উদ্যোক্তাদের ইন্তেজাম ছিল ভারী সুন্দর। কাউকে কিছু বলতে হলো না। অফিসে নাম লেখা হয়ে গেলে যাঁর যাঁর রুমে মাল পৌঁছে গেলো।

ঢাকা থেকে এই বিমানে এসেছি আমরা সাইত্রিশ জন। বেগম শামসুন্নাহার বর্তমান মন্ত্রী জনাব এ, কে, খানের বাড়ী চলে গেলেন। খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন, জনাব মাহবুব-উল আলম ও কবি সুফিয়া কামাল গেলেন পাশের হোটেল, হোটেল ডি-ল্যুক্সে। বাদবাকী সবাই আমরা তাজ হোটেলে রয়ে গেলাম। এতে প্রতিটি কামরায় দুটো করে সীট। যাঁর যাঁর পছন্দ মাফিক সাথী বেছে নিলেন প্রত্যেকে। জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সাহেব আমাকে তাঁর সাথী হতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সাথে বন্ধুত্ব নিবিড় অনেক দিন থেকে। মত আর পথও এক। স্বভাব গম্ভীর ভদ্রলোক। তাঁর সাথী হওয়ায় ভালোই হলো আমার। বেশ আনন্দিত মনে কাটানো যাবে কয়েক দিন। চাবি নিয়ে তেতলায় ৬৯নং কামরার দরওয়াযা গিয়ে খুললাম। পশ্চিম-দক্ষিণে খোলা। বেশ ভালোই লাগ্‌লো।

অন্তরংগ বন্ধুদের অনেকেই করাচী আছেন। কিন্তু কারো ঠিকানা জানি না। মোহাম্মদ হজরত আলী শিকদার অবিবাহিত যুবক। ভারী কাজের লোক। টাংগাইলে বাড়ী। জীবনে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের পর নিজের চেষ্টায় করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এম-এ; এল-এল-বি, ডিগ্রী নিয়েছেন বিদেশ থেকে। ওখানে হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। আমার অত্যন্ত অন্তরংগ বন্ধু। থাকেন নজরুল একাডেমীতে। তাঁর সাথে দেখা হওয়া প্রথমেই বাঞ্ছনীয় মনে হলো। চেম্বারে ফোন করে তাঁকে পাওয়া গেলো না। একজন স্বেচ্ছাসেবককে সংগে নিয়ে নজরুল একাডেমীর খোঁজে বের হলাম।

জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহেব খোঁজ করছিলেন, 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' প্রভৃতি বইয়ের লেখক জনাব আকবর আলী এম-এস-সি সাহেবকে। তিনি ওখানে উঁচুদরের সরকারী চাকুরী করেন। বরকতুল্লাহ সাহেবের তিনি ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় এবং আমারও বহু দিনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। বরকতুল্লাহ্ সাহেব তাঁর খোঁজে বের হলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবান যাচ্ছেন কনভেনশন কমিটির অফিসে। কে কে এসেছেন ঢাকা থেকে তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে হবে সেখানে। এ-দায়িত্ব ডাঃ হকের ওপরেই ছিল।

হযরত আলী সাহেব সহ সাড়ে আটটায় হোটেলে ফিরে এলাম। ডাইনিং হল গুলেগুলজার। সবাই খানার টেবিলে বসে পড়েছেন। মুখ হাত ধুয়ে তাঁদের সাথে প্লেট আগ্‌লে বস্‌লাম। ভাবলাম: লাইন পেতে সম্ভবতঃ দেরী হবে, অতএব এখনি ঢাকার Trunk Call Book করে এলে ভালো হয়। হয় তো খাওয়া শেষ হতে হতে লাইন পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু এতো দেরী হলো না। সবে মাত্র মুখে গ্রাস তুলে দিয়েছি অমনি অফিস থেকে ডাক এলো: লাইন পাওয়া গেছে। শীগ্‌গীর আসুন।

Trunk call এর খবর শুনে বাড়ীর সবাই বোধ হয় ওখানে হাযীর ছিল। সবার সাথেই এক সেকেণ্ড দু' সেকেণ্ড করে আলাপ করলাম। শাহাবুদ্দীনকে বল্লাম: "কেমন তোমাকে ঠিক বলে আসিনি, করাচী থেকে ফোন করবো! ও ভারী খুশী হয়েছে বোঝা গেলো। বল্লাম: তোমাদের ছেড়ে ১৪০০ মাইল দূরে এসেছি, কিন্তু ফোনে

কথা বলার ফলে বাঙলা বাজার থেকে যেন গেণ্ডারিয়া গেছি, এতো কাছে মনে হচ্ছে।" সবশুদ্ধ ছ' মিনিট কথা বলে একটা তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে খাবার টেবিলে ফিরে এলাম।

বন্ধুদের প্রায় সবাই রসিকতা শুরু করলেন। একজন বল্লেন: এখন তো পুরোনো হয়ে গেছে, তবু এই কয়েক ঘণ্টার বিরহ সহ্য করতে পারলেনা? মতীনউদ্দীন আহমদ সাহেব রসিক মানুষ। মন্তব্য করলেন: "আরে গৃহিনী পুরানো হলে হবে কি? টেলিফোনটি তো নতুন।" হো হো করে হেসে উঠ্লেন সবাই। হাস্য পরিহাস আনন্দ-কোলাহলের ভেতর দিয়ে আহার পর্ব শেষ হলো।

জানিয়ে দেয়া হলো: কাল ভোরে সকাল সকাল তৈরী হয়ে নিতে হবে। কারণ প্রথমে সকলকে জাতির পিতা কায়েদে আযমের মাযার যিয়ারত করতে যেতে হবে। তারপর ওখান থেকেই গোয়ানিজ এসোসিয়েশন হলে যেতে হবে। সেখানেই হবে সম্মেলনের অধিবেশন।

উদ্যোক্তাদের কর্মকুশলতায় ক্রমেই মুগ্ধ হচ্ছি। কোনো ত্রুটিই যেন এঁরা রাখ্তে জানেন না। আজ ২৯শে জানুয়ারী সকাল ঠিক ন'টা। অনেকগুলি গাড়ী হোটেলের দরওয়াযায় এসে হাযীর। কায়েদে আযমের মাযার এখান থেকে অনেক দূরের পথ। রাজধানীর উপযোগী অনেকগুলো প্রশস্ত রাস্তা ডালপালা মেলে ছড়িয়ে আছে করাচীর বুকে। তার ধারে ধারে বিরাট দালানের সারি। ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ শহর করাচী। নেই সেখানে বাঙলা দেশের কোমল সজীবতা। স্বভাব-সুন্দর সবুজের সমারোহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কৃত্রিম উপায়ে আধুনিক কালে গাছ উৎপাদনের চেষ্টা চল্ছে। কিন্তু প্রকৃতির অবহেলায় তার ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয়না।

পাকিস্তান হাসিলের পর রাজনৈতিক নেতাদের বদৌলতে বারবার শাসন-চক্র পরিবর্তন হয়েছে। তবু করাচী চারদিকে উড়িয়ে চলেছে নবরূপায়নে তার জয় পতাকা। এখানকার মানুষ গুলোর দৃঢ় বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা, চেহারায় নিজেকে বড় করার কাঠিন্য, অপূর্ব কর্মস্পৃহা আর প্রাণচাঞ্চল্য যে-কোনো বিদেশীকে মুগ্ধ করতে সক্ষম। রাস্তাগুলো যেন তারই প্রতীক।

একটা শৃংখলাবদ্ধ জীবন যেন সকলের। পথ চল্তে গিয়ে হঠাৎ গাড়ীচাপা পড়ার সম্ভাবনা কম। ছোট বড় সবাই এ-শৃংখলা মেনে নিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। গাড়ী যখন চলবে, তখন সারি সারি গাড়ী-ই চল্বে। পায়ে চলা পথিক তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার। পুলিসের ইংগিত পেয়ে গাড়ী গেলো থেমে। তখন পথিক পার হয়ে এলো নির্বিঘ্নে বড় রাস্তা। ধরলো ফুটপাথ ধরে চলা।

আমাদের গাড়ীও এক সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো একটা মোড়ের মাথায় এসে। পথিকের দল পার হয়ে যাওয়ার পর আবার গাড়ীর গতি সচল হয়ে উঠ্লো। মুগ্ধ হয়ে গেলাম করাচী পুলিসের কর্মদক্ষতা আর জন-সাধারণের সহযোগিতা দেখে। এমনি না হলে কি আর আযাদ দেশ! একটা বিরাট চত্বরের ওপর কায়েদে আযমের মাযার। তার একটু পূবেই কায়েদে মিল্লাত মরহুম লিয়াকৎ আলী খান ও মরহুম জনাব আবদুর রব নিশ্তারের মাযার। মাযারের ওপর ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। চারদিকেই খোলা। ঝড়-ঝাপ্টা ধূলোবালি প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নেই। সাম্নে কয়েকজন খাদেম বসে আছেন। 'সাহেব লোগ' জুতো খুল্তে পারবেন না,—খুল্তে কষ্ট হবে, অতএব জুতোর ওপর তাঁরা সাদা কাপড়ের থলিয়া পরিয়ে দেবেন। এই ব্যবস্থা আমাদের মনঃপূত হলো না। তাই আমরা সবাই যাঁর যাঁর জুতো খুলে দিয়ে মহান নেতা কায়েদে আযমের মাযার শরীফকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

মাযারে দেবার জন্য কে মোটা একছড়া মালা এনেছিল, জানি না। আমাদের ভেতরে তখন একমাত্র মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামালের হাতে সে-মালা দে'য়া হলো। তিনি একান্ত ভক্তিবিনম্রচিত্তে মালাটি মাযারের ওপর দিয়ে সালাম করলেন। আমরা সবাই একে একে মাযার সালাম করে চুপ করে দাঁড়ালাম। কয়েক মিনিট ধরে দরুদ ও কালাম পড়া হলো। বয়োবৃদ্ধ এবং মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফের বাঙলা অনুবাদক খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান সাহেব মুনাজাতের জন্য হাত ওঠালেন। সবাই তাঁর অনুসরণ করলাম। এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় খান সাহেব মুনাজাত করলেন যে, সকলের চক্ষু সজল হয়ে উঠ্লো।

আহা! এই আমাদের জাতির পিতা কায়েদে আযম! এখানে ঘুমিয়ে আছেন একান্ত অসহায়। কঠোর পরিশ্রমে তিনি দেশের আযাদী এনেছেন। বলেছেন: "আমার কর্তব্য আমি করেছি, এখন তা' গড়ে তোলার ও রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের।"—আযাদী পরবর্তী বারো বৎসরের দেশের ইতিহাসের পাতাগুলি চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠ্লো। এ জন্যই কি কায়েদ আযম আযাদী এনেছিলেন? দেশের অভ্যন্তরে লোভ, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থলোলুপতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকোলাহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কাকে মেরে কে একদিনেই বড়লোক হয়ে যাবেন, তারই প্রতিযোগিতা চলছে রাত্রিদিন। এর আভাস পেয়েই কি কায়েদে আযম অভিমানে নিজেকে

দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন? এতিম করে দিয়ে গেছেন সকলকে?

মুনাজাত খতম করে চোখ মেলে তাকালাম। মাযার চত্বরের দূরে পূব দিকে সারি সারি অনেকগুলো ঘর। সামনে ছেঁড়া চটের পর্দা ঝুলছে। উলংগ শিশুর দল বাইরে খেলা করছে। জীর্ণ মলিন বেশ কতকগুলি মানুষ ঘরগুলোর এদিকে-ওদিকে ঘোরাফেরা করছে। একটি বর্ষীয়সী মহিলা ময়লা ছিটের চুড়ীদার পায়জমা পরিধানে। গায়ে তাঁর পিরহান আর ছেঁড়া ওড়না। চটের পর্দা সরিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। আর ওঁদের সাথে কি আলাপ করতে লাগলেন। বল্লাম: ওঁরা কারা?

পেছন থেকে একজন বল্লেন: "ওটা মুহাফীর বস্তী—ওঁরা মুহাফীর।"

আহা! এঁরাই মুহাফীর! মনে হলো: মহান নেতা কায়েদে আযম এঁদের বুকে করেই এখানে শুয়ে আছেন। কাঁদছেন যেন এঁদের অসহনীয় দুঃখে। সে কান্না শুনতে পেলাম আমি। এ-কান্না শুনেছেন আরো অনেকে। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে কায়েদে আযমের এ-অশ্রু মুছাবার চেষ্টা হয়েছে। লাখ, লাখ, কোটি, কোটি টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে দেশবাসীকে। কিন্তু তা' নিয়েও চলেছে কতো রাজনৈতিক ছিনিমিনি খেলা! বিবৃতিতে বিবৃতিতে ভরে গেছে খবরের কাগজের পাতা। প্রতিকার হয়নি।

না, আশা আছে। জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান—পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রাধিনায়ক এ-সমস্যার সমাধান ভার হাতে তুলে নিয়েছেন। কায়েদে আযমের কান্না থামাতে পারবেন তিনি। এই কয় মাসের শাসন-কর্তৃত্বে তিনি জনসাধারণকে বুঝাতে পেরেছেন, তাঁর কথা ও কাজে অমিল নেই।

কায়েদে মিল্লাত ও জনাব নিশতারের মাযারও যিয়ারত করলাম আমরা। দোওয়া-মাগফেরাৎ চাইলাম। তারপর একে একে মোটরে চেপে বসলাম। এখন যেতে হবে গোয়ানিজ এসোসিয়েশন হলে। লেখক-সম্মেলনের সভামণ্ডপে।

মাযার চত্বরে প্রবেশ মুখেই লম্বা ছিপ্‌ছিপে কাঁচাপাকা চুল এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছিল। বলেছিলেন: "ম্যাঁয় হুঁ দীল্—আনওয়ার শব্‌নম্ দীল। মণ্টোগামারী গবর্ণমেণ্ট কলেজ কি ইংলিশ প্রফেসর, জনাব আপকি তা'রীফ?"

প্রথম দেখেই ভদ্রলোককে ভারী ভালো লেগেছিল। কোনো জওয়াব না দিয়ে বুকে চেপে ধরেছিলাম। তারপর মাযার যিয়ারতের ব্যস্ততায় তাঁর সাথে আর আলাপ করার সুযোগ হয়নি। এক্ষণে তিনি আমাদের মোটরেই জায়গা করে নিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ডেলিগেট তিনি। একই পথের যাত্রী। সারাপথ আলাপ-আলোচনা হাস্যপরিহাসের ভেতর দিয়ে কাটলো।...হলে প্রবেশ করে আরো অনেকের সাথে আলাপ হলো। উর্দু গল্প-লেখক, কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক অনেকেই ছিলেন। কবি হাফিজ জলন্ধরী আমার সম্প্রতি প্রকাশিত শিশুরই 'বাবা আদম' হাত থেকে টেনে নিলেন। বল্লেন: "চমৎকার! এটা আমার কাছে থাক, আমার পাক সরজমীন' পত্রিকার কাজে লাগবে।"

বল্লাম: "জনাব, আপনি কি বাঙলা জানেন? আলী আহমদ সাহেব আছেন ওখানে?"

বল্লেন: "না, তবে হয়ে যাবে। আলী আহমদ সাহেবকে শীগ্‌গীর আনা হবে।"

একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন উর্দু গল্প লেখিকা কুর্‌রাতুল্ আইন হায়দর। তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভগ্নি বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। নাহার আরো একজনার সাথে পরিচয় করালেন। ইনি মিসেস রোজী মোহাম্মদ হোসেন। এঁর আসল নাম যুসুফ জামাল বেগম। ঠিকানা দিলেন আমার পকেট ডায়রীতে লিখে। মিসেস হুসাইন বাঙলা দেশের মেয়ে। মরহুমা মিসেস এম, রহমান সাহেবার নাৎনী। এক সময় মিসেস এম, রহমানের স্নেহ সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম আমি ও কাজী নজরুল ইস্‌লাম। উভয়েই 'মা ডাকতাম তাঁকে। তাঁরই নাৎনী রোজী হুসাইন। বাঙলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তিনি। নাম দিয়েছেন: "Poems From East Bengal." একান্ত আপনার মনে হলো তাঁকে। একান্ত স্নেহের পাত্রী। তারপর আরো কতো জনার সাথে আলাপ হলো। এই আলাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বলে এঁদের কারো কথা আর মনে নেই।

মনে না থাকার আরো একটি কারণ: পাকিস্তানের এতোগুলি লেখকের যেখানে একত্র সমাবেশ, (একটা ঐতিহাসিক সমাবেশই ঘটিয়েছেন কনভেনশনের উদ্যোক্তা বন্ধুরা) দু'একজন ছাড়া কেউ কাউকে জানেন না। কারণ কেউ কারো লেখা পড়েননি।

পাকিস্তানের দু'টি ভাষা প্রধান। বাঙলা আর উর্দু। এ দুটো ভাষাই নিজেদের যোগ্যতায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এক ভাষায় দখল থাকলে, আরেকটি ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন নয়। অতএব উভয় ভাষাভাষী পরস্পরের ভাষা আয়ত্ত করে নিলে পরস্পরকে জানবার এবং বুঝবার পক্ষে আর কোনো বাধা থাকে না। অপরিচয়ের আবরণ ছিন্ন করা সহজ হয়।

ব্যাজ বিতরণ শুরু হলো। পিকক ব্লু-প্রিণ্টের ওপর ময়ূরের সাদা পালকের কলম অংকিত সুন্দর ব্যাজ। এ-ব্যাজ ডেলিগেটদের প্রতীক চিহ্ন। কার্ড দেখে যথাযথ লোকের হাতেই ব্যাজ দেওয়ার নিয়ম। কার্ড দেখিয়ে ব্যাজ গ্রহণ করলাম। আমাদের প্রায় সবাই কার্ড দেখালেন। কিন্তু দু'একজনের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা গেলো। তাঁরা বল্লেন: "ভুলে কার্ড ফেলে এসেছি।" এ-কেমন ধারা ভুল? ভারী লজ্জা করতে লাগ্লো এঁদের এই ভুলের জন্য। কারণ ভলান্টিয়াররা তাঁদের ব্যাজ দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগ্লেন। শেষে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের পরিচয় দিয়ে ব্যাজ সংগ্রহ করে দে'য়া গেলো।

উদ্বোধনী সভার এই অধিবেশনে সভাপতির আসনে বস্লেন: আমাদের সকলের অকৃত্রিম বন্ধু কবি জসীম উদ্দীন। তাঁর লেখার কিছু কিছু ইংরাজী অনুবাদ হওয়ায় দেখা গেল ওখানকার অনেকেই তাঁকে জানেন।

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াত পাঠের পর সভার কাজ শুরু হলো। উদ্বোধন করলেন: প্রফেসর মির্জা মোহাম্মদ সায়ীদ। তারপর অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব শহীদ আহমদ দেহ্লভী এক অভিভাষণে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। এরপর কবি জসীম উদ্দীনকে তাঁর সভাপতির ভাষণ দিতে আহ্বান জানালেন জনাব জামীল উদ্দীন আলী। জনাব আলী উর্দু সাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক। প্রত্যুৎপন্নমতি, হাস্যরসিক আর চমৎকার বক্তা। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সভাপরিচালনা করলেন আগাগোড়া।

জসীম উদ্দীনের ভাষণের সারাংশ উর্দু ও ইংরাজীতে ছেপে বার করা হয়েছিল। কিন্তু মূল বাঙলা কপিটি কনভেনশন-কমিটির কাছে পাঠাননি, এজন্য তা' ছাপিয়ে বার করা সম্ভব হয়নি। যাহোক অসংখ্য করতালির ভেতর দিয়ে জসীমউদ্দীন তাঁর হাতের লেখা বাঙলা ভাষণ পড়ে শেষ করলেন। অভিভাষণটি ছিল বেশ বড়। সবাই ধৈর্য সহকারে শুনলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগ্লেন: ঢাকায় সকলকে ডেকে লেখাটা আগে শোনালে, অভিভাষণটি আরও নিখুঁত হতে পারতো।

প্রথম অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে জানিয়ে দে'য়া হলো: সাবজেক্ট কমিটির গঠনে যাতে কোনো গোলযোগের বা অযথা জটিলতার সৃষ্টি না হয়, এজন্য বিকালে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি থাকবেন মাত্র ১১ জন।

হোটেলে ফিরে আহারান্তে একটু বিশ্রামের আয়োজন করছি আমি আর বরকতুল্লাহ্ সাহেব, এমন সময় নির্বিবাদী বন্ধু মোহাম্মদ নাসির আলী সাহেব এসে খবর দিলেন: বিশ্রাম করা চলবেনা। ওপরে চলুন, গোলাম মোস্তফা সাহেবের কামরায় হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। মেজর ইবনুল হাসান সাহেব এসেছেন, আমাদের এগারো জন ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যের নাম নিতে। শেষে কি হল—এগিয়ে হট্টগোল করবেন?

তাই নাকি! ওপরে গেলাম। বরকতুল্লাহ সাহেবকে বল্লাম: "আপনিও আসুন।" ওপরে গিয়ে দেখি গুলেগুলজার। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই উপস্থিত। পাশের হোটেল থেকেও ওঁরা সবাই এসেছেন। কবি বেনজীর আহমদ, কবি তালিম হোসেন, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, কবি আবদুর রশীদ খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ সাহিত্যিকদের ঘিরে এক বিরাট হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে। যে এগারো জনের নাম দিয়ে এঁরা লিষ্ট তৈরী করেছিলেন, তা উঠ্তি লোকদের কয়েকজনের মনঃপূত হয়নি। তাই তাঁরা ঐ লিষ্ট বাতিলের জন্য খুব জেদাজেদী শুরু করেছেন। অনেক বাদানুবাদের পর একটা লিষ্ট নিয়ে জনাব ইবনুল হাসান চলে গেলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
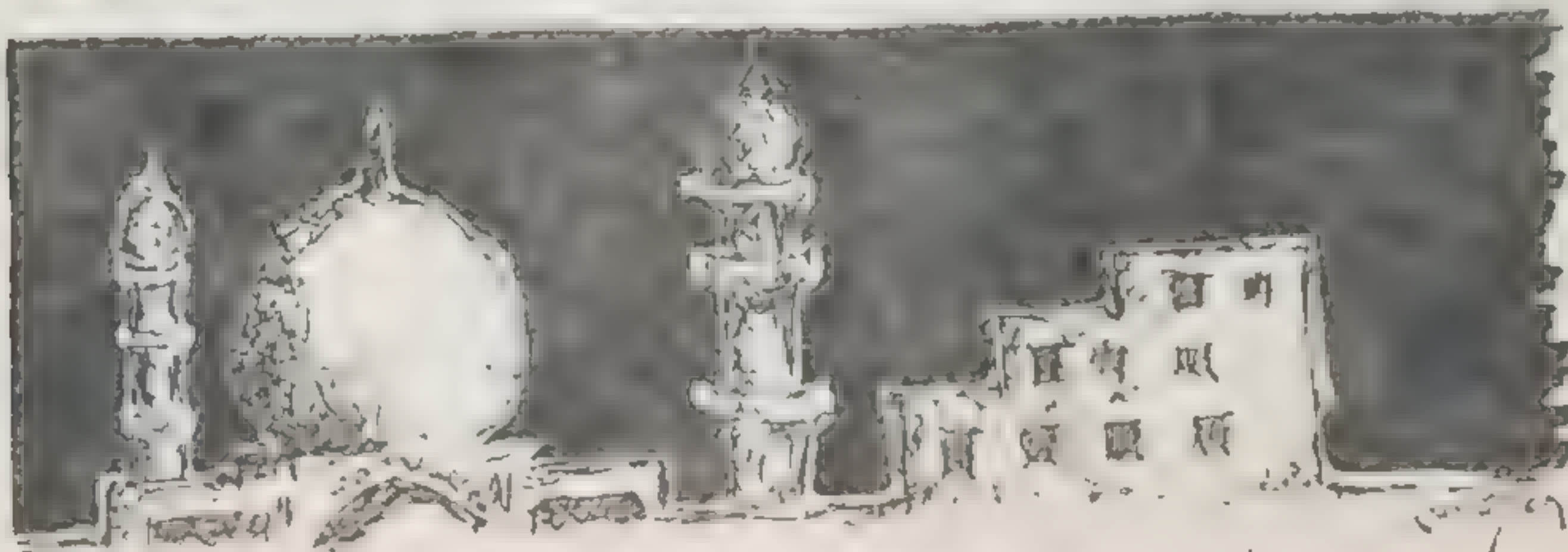
বিদ্যুৎ চমকায়

বেনজীর আহমদ

বিদ্যুৎ চমকায়
প্রতীচীর প্রত্যন্ত সীমায়।
খনে খনে গরজিছে বাজ—
গুড়্ গুড়্ গভীর আওয়াজ,
পৃথ্বি ওঠে কাঁপি।
দেখি শুধু সর্ব নভ ব্যাপি
স্তরে-স্তরে কৃষ্ণ-কালো মেঘ
সঞ্চারিছে ঝড়ের আবেগ
দূর বায়ু কোণে।
প্রলয়-দূতেরা বুঝি গোণে
তারি উগ্র মুহূর্ত যাত্রার,
প্রমত্ত তাণ্ডব নাচে দুরন্ত দুর্বার
পথে-পথে চূর্ণ-চুরমার
কখন করিবে সে যে সৃষ্টি বিধাতার
চলার আবেগে—
তারি আশে রয় তারা জেগে।

* * *

তাহারি ইঙ্গিত হেরি রক্ত মেঘে-মেঘে
করিতেছে খেলা।
ওরে মন, তুই এই বেলা
বুঝে দেখ্ হবি তুই সাথী তার কিনা,
হাতে তোর প্রলয়ের বীণা—
রক্ত-আঁখি-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য সীমানা
পায়ে তোর লঙ্ঘনের ডাক ;
ঘূর্ণি-ঘন প্রভঞ্জন রহিবে অবাক
হেরি তোর শক্তি বারম্বার—
বক্ষে তোর নৃত্য-বেগ উদ্দাম ঝঙ্কার,
অক্ষি-পথে ঠিকরিছে ক্রুদ্ধ জ্বালা বহ্নিমান
আগ্নেয়-গিরির—
বক্ষ ভেদি উঠিয়াছে গর্বোদ্ধত তোর উচ্চ
সুদর্পিত শির
দৃপ্ত ভঙ্গিময়,—
পৃথ্বি-সারা পড়ে তোরি ত্রাস-ভয়ে কাঁপি-কাঁপি
বিলুণ্ঠিয়া পায়,
শুধু কণা কৃপার আশায়
তীক্ষ্ণ তোর কৃপাণের ছায়।
চেঙ্গিজের, হালাকুর, তৈমুরের বাহু
আজ হোক রাহু
ফের্ বিশ্বময় !

আজ তুই আন্ ডাকি নূহের প্রলয়
রক্তের প্লাবনে ঃ
যেথায় প্রবল আজ প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে
কাড়িতেছে দুর্বলের গ্রাস,
যেথায় বিজ্ঞেরা আর বিজ্ঞানীরা মিলি,
সদম্ভ-সদর্পে কোথা—কোথা নিরিবিলি,
বিজয়িনী বিজ্ঞানের কুহকিনী বলে
কানুনে-কৌশলে
ছড়াইছে দিনে-দিনে বিনাশ-বিলয় গর্ভ
বিভ্রান্তির ত্রাস,—
যেথায় শান্তির নামে ভ্রান্তি-বাহী দুর্বলেরা
মেষ সম খায় শুধু ঘাস
আর ব্যাঘ্র সবলেরা সুযোগ সন্ধান মতো
মহানন্দে মাতি
সেই সব অতি-বুদ্ধি তাজা তাজা ভেড়া
ধরে ধরে খায় সুখে ধরণীর সর্বদিক
খুঁজি পাতি পাতি
পিটাইয়া খনে-খনে "ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি"
ঢেঁড়া
মাথা করি নেড়া,
অথবা বাড়ায়ে চুপে টিকি-দাড়ি দেড়া
পীর, গুরু, ঋষি কিম্বা তাবারিশ সেরা
ব'নে যায় চাহিদা মাফিক
যেথা ঠিক্ ঠিক্ ;—
যেথায় ঠগীরা সদা দুর্বলের খুনে ছোপা
সহিংস লেবাস
সাবধানে ঢাকি ঢাকি আ-গোড়ালি প্রলম্বিত
পরে পীত কিম্বা শ্বেত শুভ্র বহির্বাস,
মুখে জপে অহিংসার ভাষ
সবারে শুনায়ে
তিলক প্রলেপ আঁকি সারা অঙ্গ-গায়ে
ধরে শান্তি ধ্বজাধারী মহাত্মার বেশ
আর বোনে পথে-পথে মুনাফা মওকা বুঝি,
চাহে যাহা যেথা যেই দেশ
মুক্তি, মোক্ষ, ধর্ম কিম্বা সাম্যের আবেশ
ভ্রমি দিগ্দেশ ;—
আহা যেনো পরহিতে সদা দীল-খোলা
বাবা সে ভোম্বলা !

অথচ গোপনে
লোলুপ নজর খুলি শুধু দিন গণে
কোন ছুতা-ছলে
কখন সুবিধা মতো গোলামী-শিকলে
বাঁধিবে দুর্বলে।

*   *   *

শ্বেত, পীত, লাল যতো জুলুম-বাদীরা
দীর্ণ করি অসংশয়ে রক্ত-বাহী শিরা
অক্ষম জাতির,
অথবা নির্ভয়ে তার ছিন্ন করি শির
লক্ষ-মুখে সেই রক্ত পিয়া নিরন্তর
নির্বিকারে রচে হেন দৃশ্য ভয়ঙ্কর
যেথা বিশ্ব-ভর—
আর হেন সর্বনাশা হিংস্র জুলুমের
নাহি পূর্ণ প্রতিকার যেথায় বিশ্বের
নাহি সত্য অধিকার যেথায় নিঃস্বের
চলে শুধু নিত্যনব অন্তহীন জের
অত্যাচারের,—
যেথা সর্ব দেশ
নির্বিবাদে মেনে চলে হেন হীন পাশবিক
নীতির নির্দেশ,—
পূরবে পশ্চিমে কোথা আজো কেহ পাবেনাকে
যে-ব্যাপারে মূল গত পার্থক্যের লেশ—
ওরে মন তবে সেথা
আর কেনো লজ্জাহীন ছলনার ক্লেশ
সহিতেছ বৃথা—
করো পাঠ—করো পাঠ সত্যের সংহিতা
নির্বেদ নির্মম—
রেখোনা রেখোনা আর মিথ্যাময়ী করুণার
কণা ক্ষুদ্রতম
নারী সম অন্তরে লুকায়ে,
কঠোর বাস্তব পথে অগ্রগামী হও তুমি
রক্ত-আঁকা শক্তি-দৃঢ় পায়ে।
মনে রেখো নিত্য-নিরন্তর ঃ
অশ্রু-জলে নাহি গলে শক্তিমান দানবের
পাষাণ অন্তর ;—
শক্তিরে রুখিতে চাহি শক্তি দৃঢ়তর
বজ্রাগ্নি-প্রখর।
ওরে মন ভুলোনা কখনো—
ফাল্গুনী বসন্তে তুমি যত স্বপ্ন বোনো—
আষাঢ়ের বজ্র নয় মিছে,
বর্ষে-বর্ষে বর্ষা-জাগা প্লাবনে আনিছে
শ্যাম শস্য সম্পদ-সম্ভার ;
ধ্বংসের হাপরে হেরো সৃষ্টি নব জাগিতেছে
নিত্য বারম্বার।
বন্যা নাই—ফসল ফলাও,
ধ্বংস নাই—নব সৃষ্টি চাও,
জরা মৃত্যু নাহি কোথা—তবু আশা চিত্তে তব
নব জাতকের—
ওরে মূর্খ এই তোর অদৃষ্টের ফের্ ?

*   *   *

জীর্ণ ধরা, জীর্ণ জাতি, বিজীর্ণ সভ্যতা
রচে শুধু বার্ধক্যের ক্লান্তি-আবিলতা।
যুগ-যুগ-পুঞ্জীভূত জীর্ণতার ভিতে
কেহ কভু পারেনা রচিতে
নভ-চুম্বী গৌরবের প্রবুদ্ধ প্রাসাদ।
নব সৃষ্টি তরে যদি থাকে কভু সাধ
হতে হবে সত্য-অভিসারী—
নির্মম পাষাণ পথে বাস্তব দিশারী,
অকম্পিত বজ্র-দৃঢ়-পদ।
তারি লাগি রাজ্য-পাট বিশ্বের সম্পদ
চেয়ে আছে পথ।

...

ধ্বংস-স্তূপ ছায়ে
স্তূপীকৃত আবর্জনা নিঃশেষে সরায়ে
চিরন্তনী শিল্পী সেথা তুলিছে গড়ায়ে
নব সৌধমালা—
অবসাদ-ক্লেদ-মুক্ত আশায় উজালা
নব ভিত্তি' পর—
সমুন্নত লৌহ-দৃঢ়তর।
মিথ্যার আলেয়া হতে প্রলয়ের আলো
লক্ষ গুণে ভালো—
সেথা মেলে সত্যের সন্ধান ;
সেথা নাহি ছলনার ছদ্ম অবদান
মুখে হাসি—বিষ-কুম্ভ প্রাণ।
ওরে মন হও সত্যচারী—
হোক পথে সূচী-তীক্ষ্ণ কণ্টক-বিসারী
কঠিন কঠোর—
দূর হোক্ তবু আজ মিথ্যা মায়া-ঘোর।

...

বজ্র গাহে আগমনী নূতন বৃষ্টির,
প্রলয় সংকেত বহে নূতন সৃষ্টির।

প্রমোচন

আনিসুল ইসলাম

জানালার শিক গলিয়ে দুরে দৃষ্টি ছড়িয়ে বসেছিল সালেহা। দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের মাতাল হাওয়া একটানা বয়ে আসছে। উত্তাল উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে সামনের নদী। ঢেউয়ের পর ঢেউ ফুলে উঠে আছড়ে পড়ছে। ছিটকে উঠছে জলকণা। তার উপর কড়ারোদ পড়ে কুচি কুচি রঙধনু রং ঝরে পড়ে। অদ্ভুত সুন্দর। কিসের চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ছে নদী। ভীষণ শব্দ উঠছে নদীর অতল বুক চিরে। সর্বনাশা ভয়ঙ্করী চেহারা ওর। একখানা নৌকোও কোথাও নেই। ছোট খালের মুখে, ভিতরে সার বেঁধে নোঙ্গর করে আছে মধুভাঙ্গা নৌকো, কাঠুরে নৌকো, গোলপাতার নৌকো আর জেলে নৌকো। কারো সাহস নেই নদীর ঐ বিস্রস্ত মাতাল বুকে নৌকো ভাসাতে। ঢেউয়ের মাথায় তুলে আছড়ে খান খান করে ভেঙ্গে ফেলবে।

ঝাপটে এসে পড়ছে বাতাস ফরেষ্ট-আপিসের গায়ে। বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে শীষ দিয়ে সালেহার দু'কানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। কানের পর্দায় আঘাত করছে একটানা বাতাসের উন্মত্ত সুর। নাকে আসছে লোনা-পানির গন্ধ, বাতাসেও লোনা স্বাদ। গালে, কপালে, চোখের পাপড়িতে সূক্ষ্ম—অতি সুক্ষ্ম শীতের রাতের শিশিরের মত ভেজা নুন জমে যায়। ঠোঁট চাটলে উৎকট নোনাটায় মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে।

নদীর ওপারে ধুসর সবুজ বিশাল সুন্দরবন। বনরাজির অপ্রতিহত গতি যেন হঠাৎ ওখানটায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এক মাইল প্রশস্ত নদী ওর গতি ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু গ্রাস করবার অত্যুগ্র কামনা ওর মুহু-র্মুহু প্রকাশ পাচ্ছে। দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তাল হাওয়ায় সারা দেহ দুলিয়ে পাতায় পাতায় বাতাসকে গলিয়ে অদ্ভুত শব্দের তরঙ্গ তুলে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর বুকে। নদীও আক্রোশে ফুসে উঠছে।

উজানে, কিছু দূরে অনেকখানি চরা পড়েছে। প্রথম যখন সালেহা এখানে আসে তখন সবে জাগতে শুরু করেছিল। দু'বছরে অনেকখানি জেগেছে। কিশোর বনরাজি মাথা তুলছে। পুষ্ট হয়ে বেড়ে চলেছে পলির স্বাদে। নদীকে গ্রাস করছে বনানী।

আবার ভাটিতে এক পাক দিয়ে নদী গিয়ে আছড়ে পড়ছে প্রবল গতিতে বনানীর গায়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ অনবরত আঘাত হেনে চলেছে। ভেঙ্গে পড়ছে পাড়। সেই সাথে টুকরো টুকরো হয়ে বনানীর অঙ্গ আর্তনাদ করে অসহায় ভাবে লুটিয়ে পড়ছে নদীর বুকে

দীর্ঘদিন ধরে সালেহা দেখছে বনানী আর নদীর আক্রোশ আর লড়াই—একে অপরকে গ্রাস করা। তা—কতদিন হবে? মনের গভীরে প্রশ্ন ওঠে। আনমনা হয়ে পড়ে ও। মনে মনে হিসাব কষে—দু'বছর চারমাস ক'দিন হয়েছে। দীর্ঘদিন বই কি! মানুষ আর ক'বছর বাঁচে? অজান্তে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

চারপাশের পরিবেশটা চমকে কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ে। বন-আপিসে অনেকগুলো লোকের উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ আসে। সকলের গলা ছাপিয়ে শোনা যায় আর একটি মোটা রুক্ষস্বর। ওর স্বামীর গলা। তম্বী করছে যারা লাইসেন্স করতে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে তাদের উপর। টুকরো টুকরো কথা ওর কানে আসে।

'এখন আর না—বিকেলে। ব্যাটারা লাইসেন্স কাটার সময় ত খুব কথা। কমিশন দেবার বেলায় কথা বেরোয় না।'

বাদার মৌসুম শুরু হয়েছে। মধুভাঙ্গার দল, গোল-পাতা কাটার দল, কাঠুরের দল দিনভর আসছে নৌকো বেয়ে। ওপাশের খালটা নৌকোয় ঠাসা। দু'মাস কি তিন মাসের মাত্র মৌসুম। যে দল যত আগে বাদায় নামতে পারে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত এ সময়ে তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। সারা বছরের রোজগার এই ক'মাসে হবে। মৌসুমে কমিশনের হারও চড়া। আপত্তি জানায় না কেউ। জানিয়েও উপায় নেই। তারা কমিশন ট্যাঁকে করে নিয়েই আসে। মৌসুমে এই আপিস থেকেই পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা আমদানী হয় সরকারের। আলতাফ বলে—'সরকারের এত আয় করিয়ে দিচ্ছি একদম বিনা খরচায়। অথচ সরকার যা দেয় তাতে খাটুনী পোষায় না। তবে পুষিয়ে নেবোনা কেন?'

অদ্ভুত এই সুন্দরবন। গরীবের ঘরের অযত্ন অব-হেলিত কাদামাটি মাখা সবল পুষ্ট শিশুর মত। কোনই যত্ন নিতে হয় না। গাছ লাগাতে হয় না—তদারক করতে হয়না। আপনাআপনি জন্মে অসংখ্য গাছপালা। অথচ কি সুন্দর নিয়মতান্ত্রিক স্বাতন্ত্রভাবে। যেখানে সুন্দরীকাঠ, সেখানে আর কোন কাঠ নেই। গোলবনে আর কোন গাছ নেই। প্রত্যেকটি জাত আপন আপন স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নিজ পরিবেশ গড়ে তোলে একটা সীমার মধ্যে।

আবার আলতাফের ধমকানি কানে আসে—'বিরক্ত করিস নে? ও বেলায় কাটব!' অনেকগুলো কাকুতি-ভরা স্বর শোনা যায় অস্পষ্ট।

শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সালেহা। প্রথম প্রথম বড্ড খারাপ লাগত ওর। ওরাও ত মানুষ! ওদের সাথে এমনি ব্যবহার কেন? মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্র পরিবেশে কেটেছে ওর বাল্য-কৈশোর। তার রুচিতে বাধত। মনে ব্যথা পেত। একদিন আলতাফকে বলেওছিল—

: ওদের সাথে অমনি ব্যবহার নাই বা করলে?

: তুমি বুঝবে কি? ব্যাটারা জংলী। ওদের সাথে অমনি ব্যবহার না করলে মা-ই পেয়ে যাবে। কমিশনের বেলায় কথাকথি করবে।

: কমিশন নাই বা নিলে? নেওয়া কি ভাল?

: জঙ্গলে আসাই ত টাকার জন্য। নইলে কোন্ শা—

আর কথা বলতে রুচি হয়নি সালেহার। শুধু ওর ব্যথাতুর আত্মা কেঁদে উঠেছিল।

ওপারের ধূসর বনানী দৃষ্টির সামনে কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। কাপড়ের প্রান্তে দু'চোখ মুছে নেয়। নদীর ক্রুদ্ধ গর্জন কানের তীরে আছড়ে পড়ে। নাকে লাগে নোনা গন্ধ। চোখেমুখে লাগে বাতাসের ঝাপটা। ওপারে নদীর তীরে গোটাকয়েক অস্পষ্ট দেহ হেঁটে বেড়াচ্ছে। হরিণ নেমেছে তীরে ছোট ছোট চারা গাছের পাতা খেতে। হয়ত বা ওখানটায় কেওড়া গাছের সারি আছে। বাতাসে কেওড়া ফুল ঝরে নীচে ছড়িয়ে আছে। ওরা হেঁটে হেঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে।

এখনি আলতাফ এসে পড়বে। মনে পড়তেই সালেহা উঠে আসে জানালার পাশ থেকে।

বিকেলে আলতাফ আবার আপিসে গিয়ে বসতে আপিস সরগরম হয়ে উঠে। সালেহাও আবার জানালার পাশে গিয়ে বসে।

বাতাসের বেগ অনেকটা কমে এসেছে। দক্ষিণে সমুদ্র বুঝিবা শান্ত হয়ে আসে এ-সময়ে। নদীর আক্রোশ আর তেমন নেই। সারাদিনের আলোড়নে বুঝিবা ক্লান্তি নেমে আসছে ওর দেহে। ক্রমে ঘন বনানীর উপর দিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসবে। তারপর গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে ওপারের সুন্দরবন, সামনের নদী। নদী ততক্ষণে শান্তিতে ঝিমিয়ে পড়বে। ওর বুকে শুধু স্রোতের চাপা শান্ত শব্দ শোনা যাবে।

সালেহার সারা দেহও ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসতে চায়। কেমন নির্জীব! ঝিমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে রাতের ঐ বনানী আর ক্লান্ত নদীর মত। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে মন চায় ওপারের বিশাল সুন্দরবনের নির্জন প্রান্তে, সমাহিত হতে ইচ্ছে হয় সামনের অতল নদীর বুকে। আপনা আপনি বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

একখানা দু'খানা করে নৌকো খাল থেকে নোঙ্গর তুলে নদীর পাড় ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণে। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। মাত্র ক'দিনের মরশুম। এক-মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চায়না ওরা। হাজার মণি কাঠুরে নৌকো চলেছে দক্ষিণে বাতাস ঠেলে। পার দিয়ে গুণ টেনে চলেছে চারজনে। তার পেছনে মধুভাঙ্গা দেড় চৈয়ালা নৌকো। ওরা সব এসেছে দূর দূরান্তর গ্রাম থেকে, রোজগারের ধান্দায় চলেছে। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু আর বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে ওরা। কে জানে ওদের মধ্যে সকলেই ফিরতে পারবে না? প্রত্যেক বছরই মানুষ খেকোর কবলে, কুমীরের পেটে, হাঙ্গরের কামড়ে নয়ত বিষাক্ত সাপের ছোবলে কিছু লোক মরবেই। জেনে-শুনেই এই ঝুঁকি নিয়ে ওরা যায় ভয়াবহ সুন্দরবনের গভীরে। ওদের পরিবার পরিজনও জানে তারা হয়ত নাও ফিরতে পারে। তবুও তারা আসে। প্রিয়জন তাদের বিদায় দেয়।

আলতাফকেও যেতে হয় মাঝে মাঝে। মানুষ খেকোর মানুষ নিলে লাশ উদ্ধারে যেতে হয়। বাঘকে গুলী করে মারতে পারলে পাঁচ শ' টাকা বরাদ্দ পুরস্কার সরকার থেকে দেওয়া হয়। আবার না মারতে পারলে লোকে জঙ্গলে নামতে ভয় পাবে। সরকারের আয় কম হবে। ফরেষ্টা-রের উপর উপরওয়ালার চাপ আসে। কোন সময় বন-ভদারকে যেতে হয়! গাছে নম্বর লাগিয়ে আসতে হয়। কাঠুরেরা শুধু মাত্র ঐ নম্বর মারা গাছগুলিই কাটতে পারে। কিন্তু কমিশন ঠিকমত দিলে সেখানে শিথিলতা আছে।

প্রথম প্রথম সালেহা আলতাফকে জঙ্গলে যেতে বাধা দিত। এমনকি ভয়ে কেঁদেও দিয়েছে। ওর কথায় কোনদিন কান দেয়নি আলতাফ। দু'জন গার্ড সাথে নিয়ে নৌকো ভাসাত কোন বাঘে ধরা মানুষের লাশ খুঁজতে নয়ত গাছে নম্বর লাগাতে। সালেহার প্রতিটি মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় কেটেছে। দূরে নদীর সমান্তরালে দৃষ্টি ফেলে বসে রয়েছে জানালার পাশে। উদ্বিগ্নতার অসহ্য পীড়নে জানালার শিকে মাথা রেখে কেঁদেছে। দুরু দুরু বুকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দূরে আলতাফের ডিঙ্গি ফিরতে দেখে আনন্দে আবার দু'চোখে পানি জমেছে। আলতাফ ঘরে ঢুকতেই ছুটে গিয়ে ওর বুকে মাথা রেখে কেঁদেই ফেলছে। এ-আতিশয্য ভাল না লাগলেও প্রথম প্রথম আলতাফ ওকে একটুখানি আদর করেছে। কিছুদিন পর ওকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়েছে। সরিয়ে দেবার সময়

আলতাফের হাতের পেশীর স্পন্দন দেখে সালেহা বুঝতে পারত সে এমন আতিশয্য পছন্দ করেনা। অতি কঠিন আঘাতে ওর বিদেহী আত্মা কেঁদে উঠত। ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করতে পেরেছে।

বাইরে ওর দু'চোখে' সামনে অন্ধকার নেমে আসে। ওপারে বন আর দেখা যায় না। নদীর বুকে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ থিতিয়ে শান্ত হয়ে এসেছে। থেকে থেকে মৃদু বাতাসের ঝাপ্‌টা জানালা গলিয়ে ওর চোখে মুখে লাগছিল। ক্রমেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। এক সময়ে জানালার পাশে এসে যেন দাঁড়ায়। নিজেকে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করে এই অন্ধকারে।

বিয়ের পর আলতাফের মুখে শুনেছিল সুন্দরবনের প্রান্তে তার চাকুরী স্থানের বর্ণনা। আলতাফ গল্প করেছিল গভীর অরণ্যের কথা। বাঘ, হরিণ, কুমীর, সাপ ও হাঙ্গরের কথা। শান্ত-নির্জন বনানীর দৃশ্যের কথা।

সেখানে আপিস সংলগ্ন বাসা। চারপাশ নির্জন। মানুষের বসতি কম। ভয় পায়নি সে মোটেই। বরং তার মনে রোমাঞ্চের ঢেউ জেগেছে। ছোট্ট একটি সংসার। দু'টী প্রাণী। নির্জন বনপ্রান্তে বাসা। ভাবতে ভালই লেগেছে।

আশা-আনন্দ-ব্যাকুলতা নিয়ে একদিন সে আলতাফের সাথে তার বাসায় রওনা হয়েছিল। খুলনা থেকে বন বিভাগের ডাকবাহী লঞ্চে আসতে সুন্দরবনের অদ্ভুত আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। নদীর দু'পারে হরিণের পাল, নাম না জানা সব সুন্দর সুন্দর পাখীর কাকলি শুনে ওর মন চাইছিল ঐ গভীর বনানীর প্রান্তে বনকন্যার মত খেলে বেড়ায়। তৃপ্তির আতিশয্যে তার মনে হয়েছিল তার এতদিনের রঙীন স্বপ্নগুলো বুঝিবা বাস্তব হয়ে উঠল।

ছোট্ট বাংলো প্যাটার্নের কাঠের মাচানওয়ালা নির্জন বাসা তার খুবই ভাল লেগেছিল। সংসারে শুধু দু'টী প্রাণী। আলতাফ আর সে। সামনেই চওড়া নদী। ওপারে ধূসর বনানী। সংসারটাকে মনে হয়েছিল পাখীর নীড়।

তারপর দিন গড়িয়ে চলল। দিনের পর মাস পেরিয়ে দীর্ঘ দু'টী বছর চলে গেল। কিন্তু রংগীন স্বপ্নগুলো ত বাস্তব হয়ে উঠল না। অতৃপ্তির পীড়নে আজ তার জীবন হয়ে উঠছে অতিষ্ঠ অসহনীয়। তার বিদেহী-আত্মা অলক্ষ্যে গুমরে কেঁদে ফিরছে।

প্রথম প্রথম আলতাফকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে সে। মুহূর্তগুলো কেমন করে কেটে গেছে বুঝতেও পারেনি। আলতাফের বিকৃত বন্য রূপ মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠলেও মনে রাখতে চেষ্টা করেনি। ধীরে ধীরে আলতাফের উদ্দাম উন্মত্ততায় ভাটা পড়তে আপন সত্ত্বা আর অনুভূতিগুলো সে যেন ফিরে গেল। ওষুধের ক্রিয়ার মত মনের উপর ছায়া পড়তে শুরু করল। পারিপার্শিক সম্বন্ধে মন সজাগ হয়ে উঠল। অবসর মুহূর্তে বিচার করতে বসে গেছে। ভেবেছে তার জীবনের সার্থকতার কথা।

বনের আবহাওয়ায় আলতাফের মাঝে কেমন যেন একটা আদিম বুনো মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। দিনে দিনে কেমন রুক্ষ হিংস্র আর স্বার্থপর হয়ে পড়েছে নিজের অজ্ঞাতসারে! কেমন নিষ্ঠুর আর নির্মম হয়ে উঠেছে তার স্বভাব!

যে সংসারকে সালেহার মনে হয়েছিল ছোট্ট পাখীর নীড়ের মত—আজ তার পরিবেশ তার কাছে দুর্বিসহ লাগে। স্বার্থপর আলতাফ তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোর কথা মোটেই চিন্তা করে না। নিরবচ্ছিন্ন একা একা মুহূর্ত কাটে তার। নীরস বৈচিত্র্যহীন। আর অসংখ্য চিন্তায় পঙ্কিল।

দৈনিক যাদের সাথে আলতাফের কারবার তাদের প্রতি কি জঘন্য ব্যবহার! কমিশনের টাকার জন্য ধমকানী—গালাগালি। অথচ বেচারাদের কথা মনে হলেই ওর মায়া হয়।

ওর মনে পড়ে বিয়ের আগে সকলের মুখে চাপা আলোচনা—ছেলের ভাল চাকুরী। 'উপরি' বেশী। 'উপরি'টাকে সে তখন বুঝতে পারেনি। ভেবেছে বেতনেরই অঙ্গ। কিন্তু আজ আলতাফের উপরি রোজগারই তাকে অত্যন্ত মনোকষ্ট দেয়।

জানালার বাইরে অন্ধকার জমাট বেঁধে গেছে। চার পাশে নিবিড় কঠিন নিস্তব্ধতা। দু'চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় অন্ধকারের মাঝে। বাতাসের ঝাপটা আর নেই। সমুদ্র এখন শান্ত। ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস চোখে মুখে লাগে। বুক ঠেলে কেমন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ চমকে ওঠে ও। মনটা সচেতন হয়ে পড়ে। আলতাফ কাকে যেন ধমকাচ্ছে—'ব্যাটা, কমিশনের টাকা না নিয়ে লাইসেন্স করাতে এসেছিস্! বসে থাক্। বাদায় নামতে হবে না আর।'

কার যেন অস্পষ্ট মিনতিভরা করুণ স্বর কানে আসে।

খেউ-খেউ-খেউ। ওপারে বনের মধ্যে হরিণ ডাকছে! দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে সালেহা তাকায়—জানালার বাইরে অন্ধকারের মাঝে। হরিণী ডাকছে। এখন ওদের জীবনের সুখময় সময়। ভরা বর্ষায় পূর্ণিমা রাতে এমনি উদাত্ত স্বরে ডাকবে বাঘিনী। সারা বনপ্রান্তর কাঁপিয়ে

ওঁ-ম, ওঁ-ম করে। দূর থেকে বাঘ এগিয়ে আসবে তার সঙ্গিনীর ডাকের উত্তরে অমনি ডাকতে ডাকতে—।

একটু পরে আলতাফও আপিসের কাজ শেষ করে ফিরবে। কিন্তু বসন্তের পেলব হাওয়ায় আর বর্ষার পূর্ণিমা রাতের মাতাল করা চাঁদের রূপ—হরিণী আর বাঘিনীর মনে যে তীব্র কামনা, আবেদন ও পুলক জাগিয়ে তোলে, তেমন কি তার অন্তরে তোলেনা?

* * * * *

দুপুরে খেয়েদেয়ে আলতাফ রোজকার মত নির্লিপ্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেলা পড়ে এসেছে। সেই দুপুর থেকে জানালার পাশে বসে আছে সালেহা নদীর উত্তাল বুকে দৃষ্টি ছড়িয়ে। বাতাসের বেগ ক্রমে ক্লান্ত হয়ে এসেছে। নদীর গর্জন থিতিয়ে এসেছে। হঠাৎ ওর কানে আসে দূর থেকে গুড় গুড় শব্দ। কান পেতে শোনে। লঞ্চ আসছে। আজকে ত ডাকলঞ্চ আসবার সময় নয়—সাথে সাথে মনে পড়ে। রেঞ্জার আসছে বোধ হয়। আলতাফকে ডেকে দিতে হয়। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকায়। কেমন নির্লিপ্তে ঘুমুচ্ছে। সারা মুখখানা, শান্ত কোমল। কিন্তু জেগে উঠলেই ঐ মুখের ভাব সম্পূর্ণ পালটে যাবে।

বাইরে হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত গার্ডের গলা শোনা যায়—সাহেব, সাহেব।

মৃদু ঠেলা দেয় সালেহা আলতাফের গায়ে। ঘুম থেকে ডাকলে ও বড় বিরক্ত হয়। দু'চারবার ঠেলা দিতে বিরক্তিসূচক শব্দ করে ও উঠে বসে, জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ও তাকায়। ততক্ষণে গার্ডের গলা ও শুনতে পেয়েছে—

: কি রে, চ্যাঁচাস কেন ব্যাটা?' খেঁকিয়ে ওঠে আলতাফ।

: স্যার, হেড আপিসের লঞ্চ আসছে। শীগগির আসুন।

একটু উত্তেজিত স্বরে বলে গার্ড।

থমকে কান পেতে শোনে আলতাফ। লঞ্চের গুড় গুড় শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। চকিতে তড়াক করে উঠে পড়ে আলতাফ। সারা মুখে ত্রস্ততা। তাড়াতাড়ি য়ুনিফর্মটা গায়ে চড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। ওর চলার শব্দে সারা কাঠের ঘরখানা কেঁপে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর সালেহা রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওর ব্যস্ততার মাঝেই উপলব্ধি করতে পারে সারা বন-আপিস কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত। মাঝে মাঝে একটা অপরিচিত চড়া গলায় ধমকানী শুনতে পায়। সেই সাথে আলতাফের বিনিয়ে বিনিয়ে অস্পষ্ট কথাও কানে আসে। অজান্তেই ওর কেমন হাসি পায়। আলতাফের কর্কশ উঁচু গলা শুনতেই ও অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ এই ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক লাগে!

সন্ধ্যার একটু পরেই আবার লঞ্চের শব্দ হয়। ক্রমে গুড় গুড় শব্দ ক্ষীণ হয়ে দূরে মিলিয়ে যায়। সন্ধ্যার থমথমে পরিবেশের সাথে যেন আজকে বন আপিসও থমথমে। আলতাফের আসতেও বেশ দেরী হয়। কাজ করছে বলেও মনে হয় না। সারা আপিসটা চুপচাপ। কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় সালেহার।

জানালার পাশে গিয়ে বসে সালেহা। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। নদীতে বোধহয় জোয়ার আসছে। নদীর বুকে জলের কেমন চাপা সুর।

অন্য দিনের চাইতে অনেক দেরীতে ফেরে আলতাফ। দু'চোখে ঘুমের মিষ্টি আমেজ নেমে এসেছে তখন সালেহার। কিন্তু আলতাফের মুখের দিকে তাকিয়ে ও চমকে ওঠে। বাতির আলোয় কেমন রহস্যময় মর্মান্তিক দেখায় ওর মুখখানা। কিছু বলে না আলতাফ। বিছানার এক পাশে চুপচাপ এসে বসে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকে সালেহা। অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় ওর বুকের মাঝে দুরু দুরু করতে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না ওর।

: 'কি হয়েছে?' অনেকক্ষণ পরে উদ্বিগ্নতা চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে সালেহা।

প্রথমটায় জবাব দেয় না আলতাফ। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে টেনে টেনে জড়ান স্বরে বলে—'চাকরীটা গেল।'

দারুণভাবে চমকে ওঠে সালেহা। আপনা আপনি বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে—'সে কি!'

রাতে আর কারো খাওয়া হয় না। সারা রাত কারো চোখে ঘুমও আসে না। আলতাফ আফসোস করছিল। অনুতাপও করছিল। খাপছাড়া ছেলে মানুষের মত কান্নার আতিশয্যে ওর স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল কথা বলতে।

নতুন ডিভিশনাল কনজ়ারভেটর এসেছিল। ভয়ানক কড়া অফিসার। এমন অতর্কিতে যে আপিস দেখতে আসবে, কে ভেবেছিল? ক'দিনের হিসাব সে ফেলে রেখেছিল। তাতেই সাহেব চটে যায়। তারপর হঠাৎ আশেপাশে অপেক্ষমান কাঠুরে ও মধুভাঙ্গার দলকে জিজ্ঞেস করে বসে সে কমিশন নেয় কিনা? ব্যাটা নিমকহারামের দল নাকি ধমকের চোটে ভয়ে সব বলে দেয়। সাহেব ওদের সকলের কাছ থেকে একে একে লিখিয়ে নিয়ে আলতাফের সাসপেণ্ড অর্ডার দিয়ে চলে গেছে। আগামীকাল রেঞ্জার-আপিস থেকে লোক এসে চার্জ বুঝিয়ে নেবে।

তিনদিন পর।

সমস্ত সংসার নৌকোয় চাপিয়ে ওরা চলেছে। জোয়ারের টানে নৌকো চলেছে। আলতাফ কাৎ হয়ে শুয়ে আছে উপরে ছইয়ের দিকে তাকিয়ে। উদাস দৃষ্টি! ক'দিনে চেহারা যেন চুপসে গেছে।

একপাশে সালেহা বসে আছে ছইয়ের ফাঁকে নদীর বুকে দৃষ্টি ছড়িয়ে। দক্ষিণে সমুদ্রে বাতাস উঠেছে। পেছনে সুন্দরবনের বিশাল বনানী ডিঙ্গিয়ে সে বাতাস নৌকার ছইয়ে এসে আছড়ে পড়ছে। জোয়ারের টানে বাতাস লেগে উদ্দাম হয়ে উঠেছে নদীর বুক। গলুইয়ের দু'পাশে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে। ছিটকে উঠছে লোনা পানি। কুচি এসে থেকে থেকে গায়ে পড়ছে।

গত তিনদিন ধরে আলতাফকে সে সান্ত্বনা দিয়েছে। আলতাফ থেকে থেকে হিংস্র সুন্দরবনের কোন জন্তুর মত মরিয়া হয়ে বলেছে—'মামলা করব, হাইকোর্ট করব।'

একটু অবাক লাগে ভেবে সালেহার। কই, আলতাফের চাকুরীর গোলযোগে সে ত মোটেই দুঃখিত হয়নি। বরং—হ্যাঁ, তার যেন মনে হয় সুখীই হয়েছে সে। এই বনের পরিবেশ থেকে নিজে—আলতাফ দূরে যাচ্ছে বলে সে যেন সুখী। কেমন যেন মুক্তির স্বাদ তার অন্তরে।

গত তিনদিন আলতাফকে সে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত, অবসন্ন জন্তুর মত। তাকে সান্ত্বনার বানী শুনিয়েছে। আশার প্রেরণা দিয়েছে। আদর করেছে। সব ভুলিয়ে দেবার তীব্র কামনা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে ওর দেহ-মনে।

বহুদিন পর আলতাফকে ভাল লাগছে তার। অসহায় ভারাক্রান্ত ছোট্ট ছেলের মতই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অন্তরের চাপা পড়া স্নেহ-মায়া-মমতা বরফগলা জলের মত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে যেন। দু'হাতে বুকের মাঝে ওর মুখখানা টেনে নিয়ে সালেহা তাকে শুনিয়েছে নতুন জীবনের আশা-আকাংখার কথা—ভরসার কথা। নতুনভাবে ঘর সংসার পাতবার কথা—।

উদ্দাম ঢেউয়ে ভরা নদীর বুকে সালেহা আঁকতে চেষ্টা করে নতুন জীবনের আশা-আকাংখার ছবি!

তোমাকে

মুহম্মদ খুরশেদুল ইস্‌লাম

তুমি তো জানো না জীবনে আমার বেদনা অন্তহীন
আঘাতে আঘাতে সুরহারা আর স্তব্ধ মনের বীণ,
'লু' হাওয়ার শাপে টুটেছে স্বপ্ন সোনালী জিন্দেগীর
নতুন আশায় সাহারা-গোবিতে তবুতো বেঁধেছি নীড়।
নীড় বেঁধে যাই; ঝড় নেমে আসে: রিক্ততা জেগে রয়
স্মৃতির শ্মশানে রাতদিন শুধু হু-হু করে হাওয়া বয়:
মনের তিমিরে তবু যে আবার সূর্যের গান শুনি
জীবন বীণার তারে তারে বাজে সৃষ্টির ফাল্গুনী।

সৃষ্টি নেশায় উন্মন মন: শুনেছি দূরের ডাক:
আশার ঈগল ঝড়ো রাত্রিতে মেলেছে আতসী পাখ,
শপথ নিয়েছি নব জগতের আমি এক সন্ধানী:
শত নির্বাক জীবনের বুকে জাগাবো জাগার বানী।
তুমি কি পারবে সেই শপথের গাহিতে সূর্য-গান
পারবে সহিতে সাহারার জ্বালা—বেদনা বহ্নিমান?

আমাদের লোক-সাহিত্যের একদিক

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ

আমাদের লোক-সাহিত্য যুগ যুগ ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগের সংঘাতে এই সাহিত্যের আবশ্যকতাও মানুষ ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ-কথা আমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, গোটা জাতির এক বিরাট ইতিহাস এই লোকসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তাই আমাদের লোক-সাহিত্য উদ্ধারের জন্য আর মুহূর্ত্তমাত্র কালক্ষেপ সঙ্গত নহে।

আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যে লোক-সাহিত্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে পাকবাংলায় বিশেষ কয়েকটি জিলার ঐতিহ্য, তমদ্দুন ও কৃষ্টিই পরিলক্ষিত হয়। উত্তর বঙ্গ—প্রাচীন পৌন্ড্রবর্দ্ধনপুরীর বিশেষ কোন স্পর্শ এই সাহিত্যে নাই বলিলেই চলে। অথচ প্রাচীন কাল হইতে পূর্ব্ব-অঞ্চলের ভাষা, আদর্শ, এমন কি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী প্রভৃতি বিচার করিলে, উত্তরবঙ্গের সহিত একটি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ পর্য্যালোচনা করিলেও এ-কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ হইবে।

উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রস্থল প্রাচীন পৌন্ড্রবর্দ্ধনপুরী (বর্ত্তমান মহাস্থানগড়) প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা এমন কি ধর্ম্মীয় ব্যাপারেও ইহা সমস্ত বাংলা দেশের পীঠস্থান ছিল। তাই এই পৌন্ড্রবর্দ্ধনপুরীকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন কাল হইতে বাংলা দেশে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব আজিও উত্তর বাংলার ভাষা, কৃষ্টি ও লোকগীতির উপর পরিদৃষ্ট হয়। তাই এ-কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, উত্তর বাংলার লোক-সাহিত্য সংগৃহীত হইলে বাংলা-সাহিত্য ইতিহাসের এক বিরাট দিক উদ্‌ঘাটিত হইবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমি বগুড়া জিলার কয়েকটি 'সোহেলী সংগীত' আলোচনা করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। এই সব সংগীত সাধারণতঃ বিবাহ, উপনয়ন, খৎনা প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রাম্য মহিলারা সমবেত হইয়া গাহিয়া থাকেন। এই সব গীতিকা আলোচনা করিলে আমাদের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী, দাম্পত্য-প্রণয় প্রভৃতির একটি স্পষ্ট ছাপ আমাদের চোখে ভাসিয়া উঠে।

গ্রামে সাধারণতঃ বাল্যবিবাহ হইয়া থাকে। এই সব বিবাহের পরিণতি কি, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। বিবাহরূপী একটি বিচ্ছেদ-রেখা কি ভাবে কন্যা হইতে পিতা-মাতাকে পৃথক করে এবং আজন্ম স্নেহে পালিত সেই কন্যা কি ভাবে পিতা মাতার কোল ছাড়িয়া যাইতে ব্যথা অনুভব করে তাহারই একটি করুণ চিত্র :—

নদীর কুলে সানাই বাজে,
অকিলা কান্দোচে।
কুটি (১) গেল অকিলার বাপ,
অকিলা বিদায় মাগোচে।
কি ব্যান (২) দিমু অকিলায়
বিদায় দিতে কলেজা জর জর
করোচে।

অকিলা নাম্নী এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে। বর-যাত্রীরা কন্যাসহ বিদায় হইবে। নদীর ধারে সানাই বাজিয়া বিদায়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া অকিলা পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। সমাগত মহিলারা অকিলার পিতার খোঁজ করিতেছে। আজন্ম স্নেহে পালিত কন্যার এই বিচ্ছেদ বেদনা পিতাও সহ্য করিতে পারিতেছে না। আর কি দিয়াই তিনি কন্যাকে বিদায় দিবেন তাহা ভাবিয়া তাহার কলিজা জর জর হইতেছে :

অনুরূপ আর একটি গীত :—

চতুরা মুড়া (৩) ব্যাতের রে আড়া (৪)
মদ্দে আয়মন খ্যালে।
আয়মন যাবি শ্বশুরের স্থানে
কে ব্যান যাবি তার সাতে।
ভাইএর আগে জোড় যোরে কান্দে
ভাবিক লিবে তার সাতে
বাপের আগে জোড় মোরে কান্দে
মায়েক লিবে তার সাতে।

চতুর্দ্দিকে বেতস বনে-ঘেরা আয়মনদের বাড়ী। সেই বেতস বনে বসিয়া নব-বিবাহিতা আয়মন কাঁদিতেছে। আজ তাহাকে শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে। অদেখা শ্বশুর বাড়ীর অজানা আশংকায় সে ভীত হইয়াছে তাই একাকী যাইতে অনিচ্ছুক। বাপ এবং ভাইয়ের নিকট কান্নাকাটি করিতেছে মা কিম্বা ভাবীকে সাথে লইবার জন্য।

(১) কুটী—কোথায়। (২) ব্যান—যে, বা ইত্যাদি। (৩) মুড়া—দিকে, ধার ইত্যাদি। (৪) আড়া—জঙ্গল, বন।

আর একটি বর বিবাহ করিতে যাইয়া কি করিয়া দৈবাৎ জলে ডুবিয়া মরিল—সেই করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত :—

গোছা পানিত নাম্যা সাদু
গোছা শুদ্দ করে, ঐ না নদীর জলে
হাঁটু পানিত নাম্যা সাদু
হাঁটু শুদ্দ করে, ঐ না নদীর জলে।

নৌকায় করিয়া বর বিবাহে চলিয়াছে। কনের বাড়ীর ঘাটে নামিয়া বর হাত মুখ ধোবার জন্যে জলে নামিয়াছে। অতঃপর :—

নৌকা ভরা বৈরাত থাকিল
সাদু পড়িল দয়ে।

বরযাত্রীরা সবাই নৌকায় থাকিল ; কিন্তু বর দহে অর্থাৎ গভীর জলে পড়িল। এইবার তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে :—

খবর দেও রে খবিরা (৫) ভাই
মাঝি ভাইয়ের আগে
ঐ না নদীর জলে।

বরযাত্রীরা সবাই সন্ত্রস্ত হইল। মাঝিকে খবর দিবার জন্য লোক পাঠান হইল। মাঝি আসিয়া জলে নামিয়া বরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল :—

এক ছাঁকা দেয় মাঝি ভাই
টুপি উঠ্যা আসে
আর ছাঁকা দেয় মাঝি ভাই
জুতা উঠ্যা আসে
ঐ না নদীর কূলে।

প্রথম বারে টুপি এবং দ্বিতীয় বারে বরের জুতা পাওয়া গেল ; কিন্তু সাধু অর্থাৎ বরকে পাওয়া গেল না :

নৌকা ভরা বৈরাত থাকিল
সাদু পড়িল দয়ে
তক্তের বিবি তক্তে রহিল
সাদু পড়িল দয়ে।

পুনরায় গীত হইতেছে, নৌকা ভরা সব বরযাত্রীই রহিল শুধু বরই জলে ডুবিয়া মরিল। আর বরের গলায় মাল্য প্রদানের জন্য ক'নে তক্তে বসিয়াই রহিল। ইহা কতই না করুণ!

পাড়া গাঁয়ে অশিক্ষিত দম্পতির মধ্যে মাঝে মাঝে সংসারের খুঁটিনাটি ত্রুটি বিচ্যুতি লইয়া ঝগড়া ঝাটির সৃষ্টি হয়, তাহা পরিণামে কিরূপ ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরিশেষে কিরূপে নিষ্পত্তি হয়, তাহার একটি আলেখ্য নিম্নের গীতিকায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

নদীর কূলে বাবা, হেনচার খোপা,
ঘাটের কূলে বাবা কলুম ঝোপা
সাদু আছে ভাত ভাত বইলা
ভাত দিতে হল দোপর বেলা
তারি থাক্যা মাল্ল জোড়া জোড়া বাঁতের বারি, (৬)
এক বারি মারে মাংশ খস্যা পড়ে
আরও বার মারে অক্ত (৭) বার হ'য়া পড়ে।
কালি ফজরে বাপেক খবর দিমু।

মাঠের কাজ কর্ম সারিয়া স্বামী ভাত খাইতে আসিয়াছে। স্ত্রী নদীর ঘাটে হেনচা ও কলুমের শাক তুলিতে গিয়াছে। তাই ভাত দিতে কিছু দেরী হইয়াছে। সেই জন্য স্বামী ভীষণ রাগিয়া স্ত্রীকে খুব মারধোর করিয়াছে। স্ত্রীও রাগের মাথায় ইহার প্রতিকারের জন্য বাপ-ভাইকে খবর দিয়াছে। বাপ-ভাইরা বড়লোক। তাহারা খবর পাইয়া লোকলস্কর লইয়া আসিতেছে।

ভাইধন আচ্চে লোক লস্কর লিয়া
বাপধন আচ্চে হাতী ঘোড়া লিয়া—

অতঃপর বাপ-ভাই আসিয়া যাহাতে অপমানিত কিম্বা অপদমানিত না হয় তজ্জন্য নিজের সমস্ত অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীই স্বামীকে সাবধান করিয়া দিতেছে।

বাঁচন যদি চাস্ সাদু খাসী মাইরা থো
বাঁচন যদি চাস্ সাদু পোলা পাক্যা থো।
ঘাটাত (৮) আসতে সাদু, সালামালকি দিয়ো
আগ্‌নায় আস্‌তে সাদু, ওজুর পানি দিয়ো
সবই কতা সাধু মাপ হ'য়া যাইবে।

স্বামী যেন তাহার বাপ-ভাইয়ের নিমিত্ত খাসী মারিয়া পোলাউ করিয়া রাখে এবং তাহাদের পৌঁছামাত্র যেন সালাম ও ওজুর পানি দেয়। পরিশেষে স্ত্রী ইঙ্গিতে এ আভাসও দিতেছে যে, তাহার (স্বামীর) সব অপরাধ মাপ হইয়া যাইবে। ইহা তাহাদের দাম্পত্য-প্রণয়ের গভীরতাই বুঝাইতেছে। ইহার পর বাপ আসিয়া বিচারে বসিয়াছেন :—

কহ কহ বেটি, কি দোষে তোমায় মারিলা ?

কন্যা উত্তর দিতেছে :—

ভাত দিতে বাবা হল দোপর বেলা
পানি দিতে বাবা হল দোপর বেলা
তারি থেক্যা মাল্ল, জোড়া ২ ব্যাতের বারি

নিজের দোষ স্বীকার করিয়া কন্যা জানাইতেছে, ভাত পানি দিতে দেরী হওয়ায় স্বামী তাহাকে প্রহার করিয়াছে। পিতা সমস্ত শুনিয়া বিজ্ঞের ন্যায় রায় দিলেন :—

(৫) খবিরা—সংবাদ-দাতা। (৬) বারি—আঘাত। (৭) অক্ত—রক্ত। (৮) ঘাটাত—পথে বা রাস্তায়।

সন্ধ্যা লাগলে বেটি, সন্ধ্যা বাতি দিয়ো,
সন্ধ্যা লাগলে বেটি, ওজুর পানি দিয়ো
তবে হবে বেটি পরার বেটার দয়া।

পাড়া গেঁয়ে বধুরা কি ভাবে স্বামীর সহিত ঠাট্টা মশকরা করে এবং বিলাস-ব্যসনের জন্য স্বামীর নিকট কি ভাবে আব্দার করিয়া থাকে, তাঁহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে নিচের গীতিকায়।

সেন্দুর কিনে দেও বিয়্যাবাড়ী যাই,
কালা অসিগা (৯) রে,
যুদুল সেন্দুর না কিনা দেও
বানিয়ার (১০) সাথে যাইবার মন
কালা অসিগা রে
হাস্তিরা পস্তিয়া মরিবি রে তুই
কালা অসিগা রে।

স্ত্রী বিয়ে বাড়ী যাইবার জন্য স্বামীর নিকট বায়না ধরিয়াছে এবং সেই জন্য তাহাকে সিন্দুর কিনিয়া দিতে হইবে। অতঃপর মশকরা করিয়া বলিতেছে যে, যদি স্বামী তাহাকে সিন্দুর কিনিয়া না দেয়, তবে সে সিন্দুর-ওয়ালার সাথে চলিয়া যাইবে। তখন স্বামীকে হা-হুতাশ করিয়া মরিতে হইবে।

আর একটি দুঃস্থ পরিবারে কি করিয়া স্বামী ও শাশুড়ী মিলিয়া বধুকে নির্য্যাতন করিয়া থাকে তাহারই একটি করুণ কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নের গীতিকায়।

মায়ে ব্যাটা যুক্তি কর্য়া
খুঁটিত কর্য়া আন্দে
ও কি ভাইধন রে
সেই না ভাত দেখ্যা ভাইধন
জলা উঠে আগুন রে
ও কি ভাইধন রে।

শাশুড়ী এবং স্বামীতে যুক্তি করিয়া ছোট হাঁড়িতে রান্না ক'রে এবং বধুকে পেট পুরিয়া খাইতে দেয় না। তাহাই ইনাইয়া বিনাইয়া ভাইয়ের নিকট বধু ফরিয়াদ করিতেছে :—

এই না কথা বাপে যেন শুনে না
মায়ে যেন শুনে না, ভাইধন রে।
বাপে যদি শোনে তবে ব্যবস্থা করিবি
মায়ে যদি শোনে তবে গলায় দড়ি দিবি।

কিন্তু বধু ভাইকে এ-কথাও অনুরোধ করিয়া জানাইতেছে যে, এই সব কথা যেন তাহার বাপ-মায়ে না শোনে। বাপ শুনিলে হয় তো এই লইয়া স্বামীর উপর বিচার ব্যবস্থা করিতে পারেন। আর মায়ে শুনিলে হয় তো শোকে দুঃখে আত্মহত্যা করিতে পারেন। স্বামীর ঘরে শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও যে তাহারা স্বামীর ঘরসংসার করিতে অনিচ্ছুক নয়- ইহা তাহারই জলন্ত প্রমাণ।

গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ অন্তঃস্বত্ত্বা বধুকেও সংসারের যাবতীয় কাজকাম হইতে রেহাই দেওয়া হয় না, এবং সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য শ্বশুর-শাশুড়ীর অকথ্য গালিগালাজ সহ্য করিতে হয়, তাহারই একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে নীচের গীতিকায়—

ছালুন আন্দিতে ভাঙ্গিল কুমারের পাতিল,
গালি দিল আয়েলার শ্বশুর।
আর গালাই না, ও হামার বাপজান,
হামার চাচারা কুমার গাঁয়ের পাইকার
কালি ফজরে পাতিল গড়িয়া দিবে।

তরকারী রান্ধিতে হঠাৎ বধু পাতিল ভাঙ্গিয়াছে। কৃপণ শ্বশুর তজ্জন্য (আয়েলা নাম্নী) বধুকে গালি দিয়াছে। বধু তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া শীঘ্রই ইহার ক্ষতিপূরণ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছে। তাহার চাচারা কুম্ভকারের পাইকার, কাজেই তাহাদিগকে খবর দিয়া আগামীকল্যই বধু শ্বশুরের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবে।

আর একটি বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে। কোনদিন সংসারের কাজকর্ম্ম করে নাই। বাপমায়ে দুধে-ভাতে মানুষ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারও বিবাহ হইয়াছে। স্বামী আসিয়াছে লইতে। স্বামী বধুকে বলিতেছে :—

সিন্দুর এনাছি আঁচলে বান্দিয়া
সোনার ঝুমুরু (১১) ও
উঠ ঝুমুরু হামার মনও দাও।

স্বামী নববধুর জন্য সিন্দুর আনিয়াছে। এখন বধুর তাহার সহিত যাওয়া উচিত এবং সংসারে মন দেওয়া উচিত। বধুও উত্তর দিতেছে :—

তোমার হামার গেলে বাবা হামার কান্দে,
সোনার সাদু ও
তোমার মা হয়তো গোয়াল বাড়্যা নিবে,
তোমার বাবা হয়তো হুকা শুলফা চাবে।
হামার বাবা হলে, কোলে তুল্যা নিবে,
হামার মা হলে দুধ খাবার কবি।
সোনার সাদু ও

বধু জানাইতেছে যে, তাহার বিচ্ছেদ বেদনা তাহার বাপ-মায়ে সহ্য করতে পারে না। তাহার বাপ-মা তাহাকে কোলেপিঠে করিয়া দুধে-ভাতে মানুষ করিয়াছে। এখন স্বামীর সংসারে গেলে হয় তো শ্বশুর-শাশুড়ীর আদেশ-

(৯) অসিগা—রসিক নাগর ইত্যাদি (১০) বাণিয়ার—ব্যবসায়ীর বা সওদাগরের। (১১) ঝুমুরু—স্ত্রী, কন্যা।

মত সংসারের যাবতীয় কাজ করিতে হইবে। আদরের দুলালের সে ব্যথা তাহারা কি করিয়া সহ্য করিবে?

আর একজন কৃষকের স্ত্রী স্বামীর-বিরহে কিরূপ বিলাপ করিতেছে :—

ওরে কালো মশ্যাল,
　　কে তোরে বান্দিল রে,
ওরে কালো মশ্যাল।
জমা দিতে গ্যাল মশ্যাল,
　　ফেরত নাহি আলো রে,
ওরে.........।
হামার মশ্যালের চোখে আছে
　　সদাগরের সুরমা রে।
ওরে.........।
হামার মশ্যালের পরণে আছে
　　চিকণ পাড়্যা ধুতি রে।
ওরে.........।
হামার মশ্যালের কান্দে আছে
　　জামদানীর চাদ্দর রে।
ওরে.........
হামার মশ্যালের যাতে আছে
　　ঢাকা নগরের ছাতি রে।
ওরে.........
হামার মশ্যালের পায়ে আছে
　　কাবুল দেশের জুতা রে।
ওরে কালো.........।

জনৈক কৃষকের মহিষের হাল আছে। চাষ-বাসের অবসরে সে-নিজেই মহিষকে চারণ ক'রে। তাই স্ত্রী তাহাকে ঠাট্টা করিয়া মশ্যাল অর্থাৎ মহিষওয়ালা বলিয়া ডাকে। এই মহিষওয়ালা স্বামী আজ ঘরে নাই। জমিদারের খাজনা দিতে গিয়া কোন বিপাকে পড়িয়া ঘরে ফিরিতে পারিতেছে না। বিরহিনী স্ত্রী স্বামীর কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতেছে। স্বামীর যাত্রাকালীন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার স্বামী যাত্রাকালে সওদাগরের সুরমা চোখে দিয়াছিল। চিকন ধুতি পরিয়া, জামদানী চাদর কাঁধে বিছাইয়া ছিল। তাহার পায়ে কাবুল দেশের তৈরী জুতা আর মাথায় ঢাকার তৈরী ছাতি ছিল। স্বামীর সেই মোহিনী মূর্ত্তি কল্পনায় স্ত্রী বিভোর হইয়া গিয়াছে।

এই সব 'সোহেলী সংগীত' আলোচনা করিলে উত্তর বঙ্গের সামনে তদানিন্তন সমাজের একটা নিখুঁত ছবি যে আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, সে কথা বলাই বাহুল্য। অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী, তাহাদের দাম্পত্য-প্রণয়, সমাজের আচার, ব্যবহার, লৌকিকতা প্রভৃতির একটা স্পষ্ট ছাপ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এই সব পল্লী-ললনার গীতিকায়।

এই সব গীতিকা কে বা কাহারা কখন্ রচনা করিয়াছেন, তাহার হদিস্ পাওয়া হয়তো বর্ত্তমানে খুবই শক্ত, তবে ইহার রচনা পদ্ধতি, ছন্দ-বিন্যাস ও ভাষায় বিকৃত রূপই—একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে এগুলি কোন উচ্চ শিক্ষিত লেখক বা লেখিকার রচনা নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, ভাষার পারিপাট্য বা ছন্দোবিন্যাস যাহাই হউক, এগুলিও আমাদের লোক-সাহিত্যের যে অঙ্গ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তর বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে আজিও পাকবাংলার প্রভাব-মুক্ত বহু ছড়া, গান, কবিতা, গীতি লোকে মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে। এই গুলি যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়া আমাদের লোক-সাহিত্যের সাথে সংযোজন করিয়া উহার পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমাদের নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর গুরু-দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। তাছাড়াও রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এ-বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়াও আমরা মনে করি।

জীবনের পাড়ি

দিলওয়ার

"The Poetry of earth is never dead."
—J. Keats.

॥ এক ॥

ঝঞ্ঝাহত হে জীবন, আর কতোকাল
নিয়ে ক্ষুদ্র জীর্ণ তরী : শতছিন্ন পাল,
আশাতে বোঝাই করি' যাবে তুমি ভেসে
যন্ত্রণার সিন্ধুজলে, হাঙ্গরের দেশে ?
একি ব্যর্থ দুরাশার আত্মঘাতী আশা ?
বেদনার্ত মনে জাগে শাণিত জিজ্ঞাসা।

আর কতোকাল
সিংহের রাত্রির নখে হবে নাজেহাল
পাখীর সকাল ?

সবিতার সোনামাখা সকালের পাখী,
মর্ত্যের বনানী হতে উঠো কারে ডাকি
ঝাড়া দিয়ে ডানা ?
পেয়েছো কি দুর্ভাগার সমুদ্র-ঠিকানা ?
কতো কাছে তুমি আছো! তবু কতো দূর!

নিঃশ্বাসের বাষ্পে ঘামে মায়ার মুকুর,
লবনাক্ত অশ্রু এসে ভরে তোলে চোখ,
হাংগরের দাঁতে আজ আমার ভুলোক।

ক্ষমাহীন নির্জনতা তীক্ষ্ণ নখে তার
করে তুলে রুধিরাক্ত হৃদয় আমার।
যে-হৃদয় একদিন শস্য-গন্ধ মাখি'
উঠেছিলো ধরণীরে প্রিয় নামে ডাকি।
পুঞ্জিভূত অন্ধকারে এই সে-হৃদয়
খুঁজেছিলো অনির্বাণ সূর্যের নিলয়।
সত্তাকে প্লাবিত করি' তার সেই প্রেমে
বহুবার যায়নি সে মৃত্যু গর্ভে নেমে ?
বলেনি সে বারবার রাজসিক সুরে :
জগতের সব ভালো মন্দের অংকুরে ;
মন্দকে যে নিতে পারে প্রিয়তর করি'
তাহারি একান্ত প্রাপ্য বসুধা সুন্দরী ?
দুর্গমের পথে পথে শ্বেত-দীপ জ্বেলে
গিয়েছে সে ছুটে তাই বাহু দু'টি মেলে।

তবু কেনো বিপর্যস্ত উদ্দীপনা তার
ন্যস্ত করি' যন্ত্রনায় ফুল্ল তনুভার ?
সামুদ্রিক শংকানীল বলো হে জীবন
কারা কাটে দারুচিনি এলাচের বন
বেহুলার প্রেমঘাতী বিষে ভরি দাঁত ?
ভাঙ্গে কারা বন্দরের বান্ধবীর হাত ?
আনন্দ-মুখর তার অঙ্গে বুঝি তাই
ধর্ষকের নারকীয় পূতি গন্ধ পাই!
ধারালো নখরাখাতে পীন-পয়োধর
স্বর্গের শুচিতা খোঁজে মর্ত্যের ভিতর।

হে জীবন বলো তুমি, বলো দেখি তবে
কাদের চক্রান্তে আজ বিঘ্নিত নীরবে
চারুবালা কেঁদে চলে শনিগ্রহ পানে
প্রেতায়িত আশংকার ভয়ংকর গানে ?

॥ দুই ॥

অতঃপর জীবনের কণ্ঠে জাগে ভাষা
শান্ত করি' সমুদ্রের দুর্জ্জেয় পিপাসা :
দৃপ্ত হও, দীপ্ত হও ওগো তিক্ত মন,
বন্ধ করো অনাসক্ত অশ্রুর প্লাবন।
মেরুদণ্ড শক্ত করি' বলো তারপরে
পৃথিবীর সুখ-শান্তি আছে বক্ষে ধরে
চিদানন্দ বিধাতার দুঃখ আর ব্যাধি,
সকলেরি অন্তে আছে সকলের আদি।
দুর্বিসহ যন্ত্রনার মরু বক্ষে জানি
লুপ্ত হয়ে জেগে আছে বারিধির পানি।
সিন্ধু-গর্ভে কথা কয় বিস্তৃত প্রান্তর
শষ্পময় চিত্তে তুলি' খুশীর লহর।

সূর্য যদি পেতে চাও—অন্ধকারে ডুবে
যাত্রা করো নিশিহন্তা পূর্বাশার পূবে।

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

মওলানা আজাদ

বাংলার মুছলিম সমাজে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সেকালে একটা বিপুল বিস্ময় ছিলেন। দীর্ঘ দেহ, কমনীয় চেহারা, স্বপ্নালু চোখ—যে তার কাছে যেত সেই ফিরে এসে বলত, 'লোকটা অদ্ভুত'। বালীগঞ্জ পার্কের কাছে একটা বিরাট বাড়ীতে থাকতেন; জমিদারী নাই, সদাগরী নাই অথচ খরচেরও অন্ত নাই! কোথা থেকে এত টাকা আসে? জীন-পরীরা টাকা এনে দেয়? স্বদেশী ডাকাত পোষেন? রাশিয়া গোপনে টাকা পাঠায়? এমন কিছু একটা আবিষ্কারের জন্য পুলিশ তাঁর পিছে লেগেই থাকত। পুলিশ তাঁর পাছে লেগে থাকার আরো কারণ ছিল। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু আর মওলানা আজাদ মিলে যে বিদেশ থেকে এদেশে গোপনে অস্ত্র আমদানীর কাজে লিপ্ত ছিলেন, তা সরকার জানত। একবার মওলানা আজাদের পাঠানো লোক আফগান সীমান্তে অস্ত্রসহ হাতে নাতে ধরাই পড়ে গেল। মওলানা সাহেবের আধ্যাত্মিক শক্তির খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে তাঁর ভক্তদেরে আমি শ্বাস আধা বন্ধ করে ফিস ফাস করতে শুনেছি। চেষ্টা করলে তিনি মুছলিম জগতের আগা খাঁ বা শেখ সনৌছি হতে পারতেন। তাঁর বিদ্যা যে কত তা কেউ ঠাহর করতে পারতনা। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব নিতান্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বল্লেন—'ইছলামের দর্শন, অর্থ বিজ্ঞান ও কোরানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যা মনে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল; কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলামনা। ভাবলাম, মওলানা আজাদের কাছে একটু গিয়ে দেখি'। গেলাম। উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সমস্যার যুক্তি ও প্রমান মূলক এমন সহজ ও সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি করে দিলেন যে মনে হল যেন একমাস আগে থেকে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেটে আমার জন্য তৈয়ার হয়ে বসে ছিলেন।

জওহীর লাল নিজে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তি। এই পরম পণ্ডিত যে হিন্দু ভারতে মওলানা আজাদকে শিক্ষা মন্ত্রী করেছেন তাতে মনে আর সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে লোকটির বিদ্যা সত্যই অগাধ। তাঁর বাগ্মীতা ছিল অনন্য সাধারণ। ফজলুল হক সেলবর্ষী অনেকদিন মওলানা আজাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেছেন—'গেলাম আফগান সীমান্তে লুকিয়ে। আজাদ সাহেব পাঠানদের সভায় ফারছীতে বক্তৃতা শুরু করলেন: মুছলমানের পবিত্র স্থান মক্কা, মদিনা কিভাবে ইংরেজ কেড়ে নিচ্ছে তারই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। কিছুক্ষণ পর পাঠানেরা গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল। চীৎকার করে বলে উঠল—'মওলানা, থাম—থাম আমাদের কতল করোনা—আমাদের কতল করোনা।' তাঁর সম্পাদিত 'আলহেলাল' ছিল সে আমলের শ্রেষ্ঠতম উর্দু কাগজ। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে আলহেলালের অবদান অমূল্য। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁর জেল হল। জেলে তিনি কোরান শরীফের তাফছীর লেখা শুরু করেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মুজিবর রহমান, আকরম খাঁ, জে, এল বানার্জী, পীর বাদশা মিঞা এঁরা জেলে তাঁর কাছে কোরান ও হাদীছের ব্যাখ্যা শুনতেন। খিলাফত আন্দোলন কালে তাঁর সংগঠনী প্রতিভা দেখে সি-আর দাশ মুক্ত কণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করেন। আজকের ভারতে মুছলমান কোন বিপদে পড়লে সবার আগে তাঁরই পানে চায়।

সুভাষ বসু

সুভাষ বসু আই-সি-এস পাশ করে দেশে ফিরেছেন। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, পরে বিভাগের কমিশনার, না হয় জিলা জজ, সর্ব শেষে হাই কোর্টের জজ হবেন, এ তো নির্ঘাত। আর সেকালে বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে এর চেয়ে বড় লোভনীয় পদ আর কিই বা ছিল? কিন্তু সুভাষ বসুর এর কিছুই হওয়া হল না। সি-আর দাশ তাঁকে ডাকলেন; সে ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি মনে-প্রাণে

অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সি-আর দাশ কলকাতা করপোরেশনের মেয়র হয়ে সুভাষ বসুকে করে দিলেন চীফ একসিকিউটীভ অফিসার। তাঁর এ-পদে যাওয়ার কয়েক দিন পরের কথা। করপোরেশনের এক বুড়ো হিন্দু কর্মচারী আলাপ করছেন: 'না হে, না, ছোকরা সহজ পাত্র নয়। গিয়েছিলাম একটা জটিল ফাইল নিয়ে, ফাঁকী দিয়ে পাড়ি দিয়ে আসব এই ছিল ষোল আনা ভরসা। ও বাবা! দেখি কি, ছোকরা টপ করে সব ধরে ফেল্ল; আমাকে দিল শক্ত বকুনী। এখন সমস্ত করপোরেশনময় একটা সাড়া পড়ে গেছে; সবাই বলাবলি করছে,—'এখন কাজ করতে হবে হে, কাজ করতে হবে।' মনে হয় সুভাষ বসু ছিলেন জন্মবিদ্রোহী। স্কুলে শিক্ষকদের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন আমরা জানি না, তবে প্রেসিডেন্সী কলেজের সিঁড়ির উপর ধরে অধ্যাপক ওটেনকে যে তিনি মারধর করলেন সে তো আকস্মিক অভ্যাসের ফল বলে মনে হয় না। ওটেনকে মারার ফল আমাদের ছাত্র সমাজে ভাল হয় নাই; অমন ঘটনার প্রভাবে অলক্ষ্যে গুরু-শিষ্যের পবিত্র বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু দেশ এজন্য সুভাষ বাবুর নিন্দা করে নাই; বরং তাঁকে বাহবা দিয়েছে। বন্যা বিধ্বস্ত উত্তর বাংলায় সুভাষ বাবু রিলিফ কাজ করতে গেলেন—স্যার পি-সি রায়ের নেতৃত্বে। কিছুকাল মধ্যেই স্যার পি-সি রায়ের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বেধে উঠল। অবশেষে পি-সি রায় সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান করে তাঁকে পত্র লিখে বলে পাঠালেন—

'You are young and God is merciful' *

এ-সব কলহে দোষটা কেবল সুভাষ বাবুর, একথা কিন্তু আমার বক্তব্য নয়। বরং আমার মনে হয়, তাঁর তরুণ বয়সের প্রতিষ্ঠা সকলের কাছে ভাল লাগে নাই। তাঁর কংগ্রেস সংক্রান্ত বিরোধ হতে আমার অন্ততঃ তাইই মনে হয়েছে। গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষ বাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে বসলেন, মনে হয়, স্বয়ং গান্ধীজীও তাঁর নিজের এ-পরাজয়কে সহজে হজম করতে পারলেন না। তাই কলকাতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে সেই কথা উঠল। সেই সভায় নিজ চোখে দেখলাম, কি করে গান্ধীজী ও জওহর লাল নেহরু মিলে সুভাষ বসুকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। বিদ্রোহী সুভাষ গিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে বসলেন।

সুভাষ বসু নিজ কর্মবহুল জীবনে তাঁর মূল ব্রতকে কোন দিনই ভুলেন নাই। তিনি কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হলেন। তৈরী করে ফেল্লেন—সেনাপতির অর্থাৎ জি-ও-সির (জেনারেল অফিসার কম্যানডিং) পোষাক। নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাট্টা করে সুভাষ বাবুর উপাধি দিলেন, 'আমাদের গরু'। সুভাষ বাবু পরোয়া করলেন না। মোটর গাড়ীতে সেই মিলিটারী পোষাকে বিজয়দম্ভ সেনাপতির মত সুভাষ বসু দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালন করছেন—সে দৃশ্য আজো মনের চোখে ভেসে উঠে। সেনাপতি বলে সেদিন যাঁরা তাঁকে ঠাট্টা করেছিলেন, তাঁরা পরবর্ত্তী জীবনে দেখলেন, অন্ততঃ শুনলেন যে নেতাজী সুভাষ বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি হয়ে ভারত আক্রমণ করছেন।

সুভাষ বাবুর ভারত আক্রমণ সফল হয় নাই—কেউ কেউ এই কথা বলে থাকেন। আমি তা বলি না। তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে গেছে—তিনি পরপারে চলে গেছেন, সবই সত্যি। কিন্তু ইংরেজ যে এত শীগগিরই ভারত ছেড়ে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের সে মহান অভিযান কি তার অন্যতম কারণ নয়? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষ বাবুর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আজমল খাঁ

হেকিম আজমল খাঁ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় সমস্ত দিল্লী এ-অভিযানের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কারণ সমস্ত দিল্লীতে তখন হেকিম আজমল খাঁর মত বড় রইছ আর একজনও ছিলেন না। আর কি অটল শ্রদ্ধাই না ছিল তাঁর উপর মানুষের। তখন তো পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, ভুলা ভাই দেশাই, মওলানা মুহম্মদ আলী, ডাক্তার আনছারী প্রমুখ মহারথীরা সবাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, অথচ তাঁদের সবাইকে বাদ দিয়ে মহাত্মা গান্ধী একাধিকবার হেকিম আজমল খাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে আন্দোলন চালিয়েছেন।

শরীফানা, চেহারা, মুছলমানী লেবাছ, স্নিগ্ধ মেজাজ, শান্ত সংযত জবান, অসামান্য চরিত্রবল—এই ছিলেন হেকিম আজমল খাঁ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে এরা বাদশাহী হেকিম ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর হায়দরাবাদ, ভুপাল, রামপুর, বরোদা প্রভৃতি বড় বড় সামন্ত রাজারা ছিলেন এঁদের রোগী। এঁদের বাড়ী গেলে এঁরা কোন দিনই কোন রোগীর কাছ থেকে ভিজিট নিতেন না।

হেকিম আজমল খাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা তাঁর দিল্লীর বাড়ীতে। আমার একটি ভাইকে তাঁর কাছে

* তুমি তরুণ আর বিধাতা দয়াময়।

চিকিৎার জন্য নিয়েছিলাম। রোগী দেখার যে ব্যবস্থা দেখলাম তাতে মনে হল সেই আফলাতুন আরাস্ত র আমানার কথা। শোনা যায়, একদা একজন গিয়ে আফলাতুনকে বল্ল—'হুজুর, আরাস্ত চিকিৎসা-শাস্ত্র এই অল্প স্বল্প পড়েই যে রোগী দেখা শুরু করেছেন, রোগী মারবেন না তো?' আফলাতুন বল্লেন—'বেশ, আমি নিজে গিয়ে পরখ করব'। আফলাতুন ছদ্মবেশে গিয়ে দেখলেন, কাতারবন্দী হয়ে রোগীরা বসে আছে, আরাস্ত হেঁটে হেঁটে প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়ে রোগীর নাড়ী দেখছেন আর ঔষধের নোছখা দিচ্ছেন। আফলাতুন গিয়ে সেই কাতারে বসে পড়লেন ও আরাস্ত কাছে গেলে মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আরাস্ত হাত দেখেই যেন চমকে উঠলেন; তারপর ওস্তাদকে ছালাম করে বল্লেন—'হুজুর এখানে কেন'? আফলাতুন বল্লেন—'কিন্তু আগে বল, কি করে টের পেলে যে এ-হাত আমার'? শাগরিদ উত্তর দিলেন—'নাড়ী ধরে দেখলাম, মানুষের শরীরের উপাদান যে আব-আতশ-খাক-বাদ এ দেহে তার অপূর্ব সুন্দর আনুপাতিক সমাবেশ। ভাবলাম, আমার ওস্তাদ ছাড়া এ-সমাবেশ এমন ভাবে রক্ষা করতে পারবেন, এ-দুনিয়ায় তেমন আর কে আছে?' ওস্তাদ মাথায় হাত দিয়ে শাগরিদকে আশীর্বাদ করে বল্লেন—'জীতে রহো'। আজমল খাঁর বাড়ী দেখলাম সেই ব্যবস্থা। দীর্ঘ বারান্দা—বারান্দার একদিক হতে অন্যদিক পর্যন্ত মোড়া বসান আছে। রোগীরা এসে একে একে সেই মোড়ায় বসে যান। এখানে ধনী গরীবের কোনও তফাৎ নাই। যিনি আগে আসবেন তিনি আগে বসবেন এবং রোগী দেখা কালে হেকিম একদিক থেকে দেখে যাবেন; ধনীর খাতিরে গরীবকে বাদ দিয়ে তাঁকে আগে দেখবেন না। হেকিম আজমল খাঁ নিজে এই নিয়মে রোগী দেখতেন।

হেকিম আজমল খাঁর নাড়ী দেখার অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে নাটোরের জমিদার মরহুম রওশন আলী খাঁ একদিন বলছিলেন: 'নওয়াব ছলীমুল্লার চিঠি নিয়ে হেকিম আজমল খাঁর কাছে গেলাম। তবু তাঁর দেখা পেতে লাগল দশ দিন। তিনি হাত দেখলেন—বড় জোর দুই মিনিট; তারপর নোছখা দিয়ে চল্লেন। আমি সামনে গিয়ে জোড় হাত করে বল্লাম—'হুজুর আমি হাজার মাইল দূর থেকে এসেছি, আমাকে একটু ভাল করে দেখবেন'। তিনি একটু হাসলেন। বল্লেন—'বেশ চল, বসি। আমি তোমার নাড়ীতে যা পেয়েছি তা বলি; তারপর তোমার যা বলবার থাকে বল, আমি শুনব'। উভয়ে বসলাম। তিনি বলে যেতে লাগলেন। আমি জমিদারের জওয়ান ছেলে। এমন ছেলের যত রকম দোষ থাকতে পারে, সবই আমার ছিল। তিনি একে একে তাই বলে যেতে লাগলেন। মনে হল যেন গত দশ বৎসর যাবত এই লোকটি সুস্থানে কুস্থানে সর্বত্র আমার সাথে আছেন। বলা শেষ করে বল্লেন—'আচ্ছা, এখন বল, তোমার আর কি বলবার আছে'। আমি দাঁড়িয়ে ছালাম করে বল্লাম—'হুজুর, গোস্তাখী হয়েছে, আমার আর কিছু বলবার নাই'।

হেকিমী চিকিৎসার উন্নতির জন্য হেকিম আজমল খাঁর যত্নের অন্ত ছিল না। একবার তিনি দুইজন ভাল এলোপ্যাথী ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে য়ুরোপে যান; লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা প্রভৃতি ডাক্তারী কলেজ দেখেন; তারপর দেশে ফিরে তিনি দিল্লীর তিব্বীয়া কলেজ স্থাপন করেন। আমাদের দেশী গাছগাছড়ার রাসায়নিক গুণের পরীক্ষা; ভাল এলোপ্যাথী ডাক্তার দিয়ে মরা কেটে হাতে কলমে শরীর বিদ্যা শিখান, আধুনিক রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা শিখান——এ-সবের সুব্যবস্থা তিনি তাঁর কলেজে করেন। আধুনিক জগতের আর কোথাও শিক্ষার এমন ব্যবস্থা আছে বলে শুনি নাই।

মওলানা আকরম খাঁ

মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' মারফত। আমরা আগে মুছলমানের সম্পাদিত কাগজের মধ্যে দেখতাম 'মিহির-সুধাকর' আর 'সুলতান।' তারপর এল এই মোহাম্মদী। শুনলাম, এক লা-মোজহাবী মৌলভী এই কাগজ বের করেছেন। ভয়ে সহজে মওলানা সাহেবের কাছে গেলাম না। তখনকার দিনে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে লা-মোজহাবী মৌলভীরা ধর্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, কিন্তু মেজাজে নিতান্ত কড়া; মওলানা সাহেবের জামাই মৌলভী আবদুর রাজ্জাক খাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার এ-ভুল ভাঙল। দেখলাম, মাদ্রাসা পাশ কাট্টা লা-মোজহাবী মৌলভী, অথচ কি সুন্দর তাঁর মেজাজ, কি রস-পিপাসু তাঁর দিল, কি হাস্য-মুখর তাঁর কথাবার্তা! তিনি বল্লেন, 'আমার শ্বশুর আরো খোশ-আলাপী'। আস্তে আস্তে মওলানা সাহেবের কাছে গেলাম, তাঁর স্নেহ-আশীর্বাদ পেলাম, অনেক কথা তাঁর কাছে শিখলাম।

মওলানা আকরম খাঁ যখন খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়লেন, তখন আমাদের এদেশীয় আলেম সমাজে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হল। তাঁরা শক্তিমান বাংলার খেলাফত আন্দোলনের অনেক খানি প্রেরণা জুগিয়েছিল।

মওলানা আকরম খাঁ সাহেব বহু বিষয়ে আমাদের বাঙ্গালী মুছলিম সমাজের অগ্র-পথিক। পত্রিকা পরিচালন ব্যাপারে তিনিই প্রথম হিন্দু সমাজের সঙ্গে পাল্লা করে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদীর মত আর কোন কাগজই এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমন নিয়মিতভাবে কোন মুছলমানের পরিচালনায় চলে নাই। বাঙ্গালী মুছলমানদের মধ্যে দৈনিক কাগজ প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক তিনিই। এঁদের মধ্যে তিনিই প্রথম দৈনিক জামানা (উর্দু) ও পরে 'আজাদ' প্রকাশ করেন। কাগজে ছবি ছাপান জায়েজ কি না-জায়েজ, এ নিয়ে যখন আমাদের আলেম সমাজে তুমুল তর্ক চলছিল, তখন তিনি 'সমস্যা ও সমাধান' লিখে এ-তর্কের সমাধান করেন। তাঁর 'মোস্তফা চরিত' ও 'কোরানের তফছির' বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। মোজেজার ধমক দিয়ে নয়, কেরামতের ভেল্কী দিয়ে নয়, ইছরাঈলিয়াতের কেচ্ছা কাহিনী দিয়ে নয়, জঈফ মউজু হাদিসের জৌলস দিয়ে নয়, কোরআনের শাশ্বত বাণী, ছহি হাদিছের অনাবিল মর্মকথা, ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য, যুক্তির অমোঘ আবেদন—এই সবের সাহায্যে ইছলামকে বুঝবার ও বুঝাবার যে চেষ্টা মওলানা আকরম খাঁ করেছেন, বাংলার আর কোনও আলেম ততখানি করেছেন বলে আমার জানা নাই।

মুছলিম ভারতের ইতিহাসে মওলানা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত "মোহাম্মদী" ও "আজাদে"র সেবা স্মরণীয়। মুছলিম জাহানের যখন যেখানে বিধর্মীরা জুলুম করেছে, তখনই "আজাদ" ও "মোহাম্মদী" উভয়েই তার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে। রীফের আবদুল করিম, ইরানের রেজা শা, মিশরের জগলুল পাশা, তুরস্কের মুস্তফা কামাল, আরবের ইবনে ছউদ—এদের অতন্দ্র আজাদী সংগ্রামের কাহিনী এ-উভয় কাগজ যে দরদময় ভাষায় প্রচার করেছে, তাতে বাংলার ম্রিয়মান মুছলমানদের বুকে জেগেছে হিম্মত, অন্তরে জেগেছে স্বপন, চোখে জেগেছে আশার ঝিকিমিকি। মুছলমানকে এ-দুনিয়ায় মুছলমান রূপে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতিগত স্বকীয়তার প্রাণশক্তি বলে বেঁচে থাকতে হবে, এ-কথা এ-দুইটি কাগজ যত জোরে এবং যত দীর্ঘকাল বলেছে বাংলা দেশে এমন আর কোন কাগজে বলে নাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-সংস্কৃতির লালন, বিকাশ ও বিস্তারের জন্য যে ব্যাপক আয়োজন চলছিল, তার পাশে বাংলার মুছলমানের সংস্কৃতিকেও স্থান দিতে হবে, এ-আন্দোলন মওলানা সাহেবই শুরু করেন বলে মনে পড়ে। বাংলার মুছললমানেরা আরবী ও ফারছী ভাষার যে সব শব্দ তাদের কথায় হামেশা ব্যবহার করে থাকেন, সেই সব শব্দকে বাংলার সাহিত্যে স্থান দেওয়ার জন্য মওলানা সাহেব যে প্রচার করেন, তা নিষ্ফল হয় নাই।

মওলানা আকরম খাঁকে আজো মাঝে মাঝে তাঁর নিজস্ব পরিবেশে দেখি। চারদিকে আলমারীতে, র‍্যাকে, টেবিলে থরে থরে বই সাজানো: আরবী, ফারছী, উর্দু বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত—হরেক রকমের বই। সেই গ্রন্থ-ঘরের মাঝখানে টেবিল সামনে নিয়ে কুরছীতে বসা এক নীরব জ্ঞানতপস্বী—বিরাশী বছরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বহির্জগতের কথা আপাততঃ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ক্রমাগত লিখছেন আর পড়ছেন, পড়ছেন আর লিখছেন। কোরআন শরীফের বাংলা তরজমা? হাঁ, তাই। এ-বয়সেও রোজ বারো হতে ষোল ঘণ্টা এর পেছনে খাটছেন।

এ দেশে বহু বিষয়ে মওলানা আকরম খাঁ একক।

বাকী ও কাফী

মওলানা আবদুল্লা-হেল-বাকী ও মওলানা আবদুল্লা-হেল-কাফী উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ আলেম—দুই সহোদর। উভয়েই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মওলানা কাফী সাহেবের সঙ্গেই আমার প্রথম পরিচয় হয়। ভাষার উপর অসাধারণ দখল, যুক্তি শাস্ত্রের ব্যবহারে অসাধারণ পটুতা, বক্তৃতায় অসাধারণ শক্তি, মনের অসাধারণ জোর, নিজের সম্বন্ধে অসাধারণ বিশ্বাস—এই নিয়ে মওলানা কাফী। তিনি তখন সত্যাগ্রহী নামক একটি সাপ্তাহিক সম্পাদন করতেন। 'সত্যাগ্রহী' আমি যতবার হাতে নিয়েছি, ততবারই মনে হয়েছে, এই কাগজটি সম্পাদকের সত্যিকার প্রতীক। বিজ্ঞাপনহীন অনাড়ম্বর কাগজ, কাগজের কঠিন বানান, কঠিন উচ্চারণ, কঠিন উচ্চ বিষয়, কঠিন ভাষা—সবই ঐ চিরকুমার, সংযম কঠোর, হাস্যবিরল উচ্চ-চিন্তামগ্ন মওলানা সাহেবের মত। তিনি ইদানীং একটি হাদীছ সংক্রান্ত মাসিকের সম্পাদন করছেন। অকাল স্বাস্থ্যভঙ্গে ইনি পঙ্গু হয়ে না পড়লে সমাজ এঁর কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারত। মওলানা বাকী সাহেবও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ষোল আনা বিশ্বাস নিয়েই তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই যে তিনি খদ্দরের কাপড় পরা শুরু করেছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সে ব্রত ঠিক রেখেছিলেন। তাঁর সেই সাদা ধবধবে অনাড়ম্বর পোষাক, হাস্য-উজ্জল পিয়ারা মুখছবি, পাণ্ডিত্যমণ্ডিত আলাপ-আলোচনা, মেজাজের নিবিড় মাধুর্য, চরিত্রের অনাবিল লাবণ্য: মানুষ প্রীতি-ভক্তিতে স্বভাবতঃই তার দিকে ঝুকে পড়ত। আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় ময়দানে: আমার 'খলিফার খোশরোজ'

নামক একটি লেখার চার সপ্তাহ ধরে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে। আমিও তার জবাব দেই। তার অনেক বছর পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আমাকে এমনভাবে গভীর হৃদ্যতার সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেন আমরা কতকালের হারানো বন্ধু ফের একত্র হয়েছি।

কিচলু

ডাক্তার ছয়েফুদ্দীন কিচলু পাঞ্জাবের সুপরিচিত তরুণ ব্যারিষ্টার। জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তের দৃশ্য তিনি সইতে পারলেন না; ব্যারিষ্টারী ছেড়ে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনেক দিন জেল খেটে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতায় অবশেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে 'তানজিম' আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তানজিম মানে সংগঠন। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, মুছলমানেরা আত্মকলহ ভুলে যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, যদি সংগঠন মারফত তারা আত্মোন্নতি না করে, তবে ভারতে মুছলমানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বহু বৎসর পর্যন্ত তিনি তানজিম আন্দোলনে অহোরাত্র খেটেছিলেন। তিনি করটিয়া এসে প্রায় সপ্তাহকাল থাকেন ও তানজিমের বার্তা প্রচার করেন। এ-বিষয়ে তিনি মুহম্মদ আলী জিন্নার অগ্রগামী।

পীর বাদশা মিঞা

বাদশা মিঞা ফরিদপুরের অন্তর্গত বাহাদুরপুরের খান্দানী পীর বংশের সন্তান। বাংলা দেশে তাঁদের শিষ্য সেবকের সংখ্যা নগণ্য নয়। বাদশা মিঞার পূর্বপুরুষেরা শক্তিমান আলেম ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন বিখ্যাত হাজী শরীয়তুল্লা। হাজী শরীয়তুল্লা একসময় বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। শরীয়তুল্লার সেই অগ্নিময় রক্ত বৃটিশের জুলুমে আবার বাদশা মিঞার ধমনীতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বাদশা মিঞা মনেপ্রাণে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁর লক্ষাধিক মুরীদ হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বৃটিশের মেহমানদারী হতে তিনিও মহরুম হলেন না; অনেকদিন জেল খেটে বের হয়ে এলেন।

পীর বাদশা মিঞার শুভ্র, সুন্দর, নূরানী চেহারা জেলের শিকের পেছনে যে দেখত সে-ই বলে উঠত হায়রে হায়!

আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী

কুমিল্লার আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী বাংলায় সুপরিচিত ব্যক্তি। কারমাইকেল হোষ্টেলে থেকে যখন ল' পড়ি সেই সময় ইনিও কারমাইকেলে গিয়ে জুটলেন। ইনি ল' পাশ করেছিলেন কিনা মনে নাই; তবে ও দিকে যে ওঁর মনের ঝোঁক ছিল না তা তখনই বুঝা গিয়েছিল। ইনি কারমাইকেলে থেকে ছাত্র অবস্থাতেই কলেজ স্কোয়ারে মুছলিম পাবলিসিং হাউস স্থাপন করেন। আমরা এ-দোকানে ঘন ঘন যেতাম—আমাদের পরিচিত কলকাতার সমস্ত মুছলমান বইয়ের দোকানের মধ্যে ঐখানে গিয়ে বেশী ভদ্রতা ও হৃদ্যতা পাওয়া যেত।

সুন্দর চেহারা, ততোধিক সুন্দর মেজাজ, দরাজ দিল, উচ্ছ্বাসময় চিত্ত, স্বচ্ছ সততা—আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলে কেউ তাকে ভাল না বেসে পারত না।

অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রকমে বিলিয়ে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যের মহনীয়তা, তাঁর চরিত্রের নির্মলতা, তাঁর চিত্তের উদারতা দেখে দেশবন্ধু দাশ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যতদূর মনে হয় মুছলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী হন। তিনি দশ বৎসর জেলে কাটিয়েছেন। সেই যে আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী খদ্দর ধরেছিলেন, আজো তাঁর গায় সেই খদ্দরের শুভ্র পোষাক শোভা পায়।

জে, এম, সেনগুপ্ত

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের বিখ্যাত জনহিতৈষী নেতা যাত্রামোহন সেনগুপ্তের পুত্র—তরুণ ব্যারিষ্টার—রিপণ কলেজে আমাদের ল' পড়াতেন। নিতান্ত খোশ মেজাজ, সৌজন্যভরা ব্যবহার, ঘরে বিলাতী মেম: ইনি যে কখনও দেশের জন্য দুঃখব্রত গ্রহণ করবেন, এ তখন কল্পনা করি নাই। কিন্তু ডাক যখন এল, তখন তিনি ঘরে থাকতে পারলেন না; ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান, তবু সে অভিযানের সাফল্যের জন্য সেনগুপ্তের সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তা দিনরাত অক্লান্ত ভাবে খাটতে লাগলেন। আসামের চা বাগানের হাজার হাজার কুলী বিলাতী মালিকের কাজ ছেড়ে দেশে চল্ল। চাঁদপুর এসে তারা কয়েক হাজার আটক পড়ে গেল। জাহাজ তাদেরে নিয়ে কুলাতে পারছিল না। এদের সবার জন্য সেনগুপ্ত লক্ষাধিক টাকা নিজ হতে খরচ করে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর উপাধি দিল—'দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত'। নির্মল চরিত্র, অনমনীয় নীতি, অকুণ্ঠ ত্যাগ, অনাবিল আদর্শবাদিতা—এ সবের

জন্য দেশপ্রিয় সেন তাঁর দেশবাসীর মনে বিপুল শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন।

অমর ঘোষ

অমর ঘোষের বাড়ী ছিল টাঙ্গাইল মহকুমায়। টাঙ্গাইল শহরেই তিনি মোখতারী করতেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। কোন পথে অর্ধেক পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ান অমর ঘোষের ধাতে ছিল না; তিনি যাত্রা করলে পথের শেষে গিয়ে তবে থামতেন। অসহযোগ আন্দোলনেও তাই করলেন। মোখতারী ছাড়লেন, মদ ছাড়লেন, মাংস ছাড়লেন, দামী পোষাক ছাড়লেন, সর্ব প্রকার বিলাস বর্জন করে সস্ত্রীক এসে পথে দাঁড়ালেন।

সমস্ত বাংলা দেশ খুঁজলে অমর ঘোষের মত চৌকোশ লোক সংখ্যায় বেশী পাওয়া সম্ভব ছিল না। টাঙ্গাইল শহরে মোখতার হিসাবে তিনি ছিলেন সবার উপরে। সমস্ত টাঙ্গাইল মহকুমায় তাঁর মত সুবক্তা আর একজনও ছিলেন না। তিনি মদ খেতেন এবং এ-বিদ্যায় তিনি শহরে সবার উপরে ছিলেন। যৌবনে তাঁর আরো দোষ ছিল এবং তাতেও কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে নাই। আবার টাঙ্গাইল কালিবাড়ীর কর্তা বরাবর তিনিই চেষ্টা চরিত করে তাকে পাকা করেন। অমর ঘোষ যেখানে বসতেন, সেখানেই মজলিস জমে উঠত। কথায় কথায় এত রসের পরিবেশন—একটা পরম উপভোগ্য বস্তু ছিল। অমর ঘোষকে বাদ দিয়ে টাঙ্গাইল টাউনের হিন্দু সমাজে কোন আনন্দ উৎসবের কথা কল্পনার অতীত ছিল। টাঙ্গাইলের কোন মহোৎসবই অমর ঘোষকে ছাড়া সম্পন্ন হত না। একদিনের ঘটনা বলি। টাঙ্গাইল কালিবাড়ীতে পূজা। সেই উপলক্ষে মহোৎসব। যুবক ভলান্টিয়ারেরা নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সবাইকে খাওয়াচ্ছে। এদিকে কালিবাড়ীর আঙ্গিনায় চলছে সংকীর্তন। অমর ঘোষ সেখানে বসা। তিনিও সবার সাথে মাথা দুলিয়ে বার বার বলছেন—

আর হবে না মানব জীবন
ভাঙলে মাথা পাষাণে।

এমন সময় ভলান্টিয়ার একজন এসে অমর ঘোষের কানে কানে বল্ল—'সর্ব্বনাশ' সমস্ত চাল ফুরিয়ে গেছে; অথচ চার পাঁচশ লোক এখনো খাওয়ার বাকী। পাঁচ মণ চাল না হলে আর জাত বাঁচেনা। তিনি বল্লেন, 'বেশ, চাল কিনে নাও।' ভলান্টিয়ার বল্ল—'হাতে একটি পয়সা নাই; কোন দোকানদার চাল বাকী দেয়না।' অমর ঘোষ বল্লেন—'তাই তো! আচ্ছা, দাঁড়াও বাইরে, ভেবে দেখি।' সংকীর্তনের সভায় ছিলেন সাহা, অত্যন্ত ধনী, অত্যন্ত কৃপণ। তখন সাহা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার সাথে কীর্ত্তন শুরু করলেন। একটু পরেই তিনি সাহার গলা ধরে আসরে পড়ে গেলেন।

এমন দুটি ব্যক্তি ভক্তিভরে দশা ধরেছেন দেখে খোল, ঢোল করতাল মহা উল্লাসে বেজে উঠল। ঘোষ সাহাকে নীচে ফেলে তাঁর গলা চেপে ধরলেন। সাহা বল্লেন, 'আরে মরলাম—মরলাম, ছেড়ে দাও'। ঘোষ বল্লেন—'মহোৎসবের ভাত ফুরিয়ে গেছে, বল চাল দিবে কয় মণ ?', সাহা বল্লেন—'আরে ছাড়—ছাড়—চাল যা চাও তাই দিব'। 'তবে স্বীকার কর চাল দিবে দশ মণ'। 'আচ্ছা দিব'। ঘোষ সাহার গলা ছেড়ে দিলেন। দুই জনই ঘামে ভিজে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের ভক্তি ভাবের প্রাবল্য দেখে আবার ঢোলকেরতাল সঘন বেজে উঠল। সাহা দোকানে দশ মণ চালের চিঠি লিখে দিলেন।

আরো অনেকে

এঁদের ছাড়া আমার পরিচিতদের মধ্যে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন আরো অনেকে—যেমন মওলানা মনিরুজ্জামান ইছলামাবাদী, মৌলভী মুজিবর রহমান, মৌলভী ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মৌলভী ফজলুল হক সেলবরষী, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, অধ্যাপক জে, এল, বানার্জী, জ্ঞানরঞ্জন নিয়োগী ইত্যাদি, ইত্যাদি। এঁদের সবার উদ্দেশে আজ আমার সশ্রদ্ধ ছালাম।

নজরুল ইসলামের আবির্ভাব

এই সময় ধুমকেতুর সমস্ত জ্বালা, সমস্ত প্রদীপ্তি, সমস্ত বিস্ময় নিয়ে বাংলার সাহিত্য আকাশে অকস্মাৎ উদিত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর 'শাতিল আরব' পড়ে বাংলার সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন প্রত্যেক মুছলমান উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল; যেন তাদের কণ্ঠ হতে অলক্ষ্যে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল:

'এসেছে রে এসেছে!'

কে এসেছে ? যার প্রতীক্ষায় তারা এতদিন ছিল, সেই এসেছে। বহু বহু কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে যে মুছলমান লেখকই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চেয়েছেন তিনিই সংস্কৃত ঘেষা বাংলা লিখেছেন। সে ভাষা পড়ে হিন্দু সমজদারেরা বলেছেন—'বাঃ, মুছলমানেও তবে বাংলা লিখতে পারে'।

আমরা ছোট বেলায় কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুকরণ করেছি তা নয়। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক ও ইছমাইল হোছেন শিরাজী সাহেবের গদ্যেরও অনুসরণ করেছি। তারপর শুরু হল প্রতিক্রিয়া। ইছলাম গণতান্ত্রিক ধর্ম। মুছলমান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে

লালিত। তারা অল্পকাল মধ্যেই অনুভব করল, যে ভাষা বারো আনা মানুষে বুঝে না; সে ভাষায় লেখা বই সেই অনুপাতেই ব্যর্থ। কেবল তাই নয়, যে ভাষায় ঈশ্বরের বেশে ছাড়া স্বয়ং আল্লার প্রবেশ নিষিদ্ধ, প্রেরিত পুরুষের পরিচয় ছাড়া যে ভাষায় রছুলুল্লার স্থান নাই, সে ভাষা মুছলমানের ভাষা কি করে হতে পারে? অতএব মুছলমানের জন্য ভাষার স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী চাই। সেই নতুন ভাষার অভাব সকল শিক্ষিত মুছলমানই অনুভব করছিলেন; কিন্তু কেউ আবিষ্কার করতে পারছিলেন না। ইছলামীয়া কলেজের অধ্যাপক আবদুল মজিদ সাহেব নতুন বাংলা ষ্টাইল চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু দেখা গেল, তা অজানা আরবী-ফারছী শব্দে এমন কণ্টকিত যে তা পড়া যায়, বোঝা যায় না। এমন সময় এলেন নজরুল ইসলাম তাঁর 'শাতীল আরব' নিয়ে। সবাই পড়ে বল্ল—'তাই তো রে, এত নতুন শব্দ অথচ এত সুন্দর! হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম: তবে সিপাই তার রাইফেল ছেড়ে কলম ধরেছে? 'নজরুল ইসলাম' এ নামটাও তো সহজপ্রাপ্য নয়। তারপর কবিতার প্রথম দুই লাইন:

শাতিল আরব। শাতিল আরব!
পুত যুগে যুগে তোমার তীর;
শহীদের লহু, দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর!

কই? শাতিল আরব, শহীদ, লহু, দিলীর, খুন এতগুলি 'মুছলমানি' শব্দের এমন সুন্দর প্রয়োগ আর তো কেউ কখনো করতে পারে নাই।

বাঃ।

আবার—

'সমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি হেরেছি
বীর নারীর'।

মুছলমানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার অতীত দিনের গৌরবের ছবি যেদিন বীরাঙ্গনা আরব নারীর আক্রমণে বিভ্রান্ত রোমক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েছে স্ত্রীয়াকের তীরে!

ঢাকার নওয়াব বাড়ীর একটি মহিলার আঁকা ছবি কাগজে উঠল। মামুলী ছবি: 'নদী—নদীর বুকে একটি পাল তোলা নৌকা—ঝড়ে নৌকা বুঝি যায়!' কিন্তু তবু তো মুছলমান মহিলার হাতের ছবি! নজরুল ইসলামের চোখে সে ছবি পড়ল। তিনি তাঁরই উপর কবিতা লিখলেন—

'খেয়া পারের তরণী'।

সে ছবির কথা কেউ জানে, কেউ জানে না; কিন্তু সকলেই জানে সে কবিতার সেই অনুপম দুটি লাইন—

কাণ্ডারী এ-তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি মুখে সারি গান লা-শরীক আল্লা।

'মুছলমানী' শব্দের এমন মনোজ্ঞ ব্যবহার হতে পারে, এ যেন আগে কেউ কল্পনাই করতে পারে নাই।

মৌলভী তরিকুল আলম ভাল বিদ্বান—সুন্দর চেহারা—সাহিত্যিক রুচী-সম্পন্ন পরম ভদ্রজন। তিনি কাগজে এক প্রবন্ধ লিখে যা বল্লেন তার মর্ম এই যে, কোরবাণীতে অকারণে পশু হত্যা করা হয়; এমন ভয়াবহ রক্তপাতের কোন মানে নাই। নজরুল ইসলাম অমনি তার জওয়াবে লিখলেন 'কোরবাণী' কবিতা।

তাতে বল্লেন তিনি—

'ওরে, হত্যা নয় এ-সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন,
দুর্বল ভীরু চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন।

• • •

এই দিনই মীনা ময়দানে পুত্র স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম সে আপনার রুদ্র পণ,
ছি, ছি, কেঁপনা ক্ষুদ্র মন।'

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কলকাতা থেকে যে আসে তাকেই জিজ্ঞাসা করি নজরুল ইসলামের কথা; সাহিত্যিক বন্ধুদেরে পত্র লিখে বার বার ত্যক্ত করি তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করে।

তখন নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যা যা কানে এল তার মর্ম এই: মা নাই, বাপ নাই, দুনিয়াতে কেউ নাই; একান্ত সৃষ্টিছাড়া জীব; অথচ সমস্ত সৃষ্টি যেন আজ তার দুর্দান্ত স্বাস্থ্য, পেশীপুষ্ট সবল শরীর। হাসে, গান গায়, গল্প করে, তার হাসির ধমকে বাতাস কাঁপে, ঘরের ছাদ দুলে উঠে। তার গান কেবল তার কণ্ঠে নয়, তার চোখে, তার ললাটে, তার চুলের দোলায়, তার লীলায়িত আঙ্গুলের আগায়, তার উচ্ছ্বসিত দেহের কানায় কানায়। তার গল্পে মজলিস স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে; খাওয়া, নাওয়া, ঘুম সমস্ত বন্ধ করে আরো—আরো শুনতে চায়।

আরো শুনলাম: নজরুল ইসলামের পেছনে দিন রাত ঝাঁক লেগে আছে। সবাই তাকে চায়, হয়তো জোর করে ধরে নিয়ে যায়: গান শুনার জন্য, গল্প করার জন্য, হাসবার আর হাসাবার জন্য। কিন্তু কেউই ডেকে বলে না, 'কবি, এইখানে দু'দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বস, কিছু লেখ'। কবি যা লেখেন, সে তাঁর এই অনবসর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেখে শুনে বলতে বাধ্য হয়েছেন—'কবি, এ-কি করছ তুমি? তলোয়ার দিয়ে গোঁফ চাচছ'?

আমি ভাবলাম, এত বড় একটা প্রতিভা যদি শুধু

তরল আনন্দবিলাসীদের ক্ষণিক ক্ষুধা মিটাতে ক্ষয় হয়ে যায়, তবে সে হবে জাতির এক চরম ক্ষতি। আমি চাঁদ মিঞা সাহেবের কাছে গেলাম। সমস্ত অবস্থা জানিয়ে বল্লাম, 'যদি অনুমতি দেন, তবে আমি কবিকে করটীয়া নিয়ে আসি। এইখানে নিরালায় বসে তিনি লিখবেন। ফেরদৌসীকে দরবারে স্থান দিয়ে সুলতান মাহমুদের গজনী যেমন অমর হয়েছে, কাজীকে এখানে রেখে করটীয়াও তেমনি অমর হবে'।

চাঁদ মিঞা সাহেব সমজদার ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সানন্দে রাজী হলেন। আমি তখনই 'সওগাত' সম্পাদক নাসির উদ্দিন সাহেবকে পত্র লিখে দিলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন, 'বেশ, এসে নিয়ে যান'।

কবিকে আনতে কলকাতা গেলাম। গিয়ে শুনি, তিনি কুমিল্লা কান্দিরপাড় আছেন। তিন চার দিন অপেক্ষা করলাম; কিন্তু তাঁর ফিরবার কোন লক্ষণ বোঝা গেল না। নাসির উদ্দীন সাহেবকে বল্লাম—'আমি যাই; কবি এলে আমাকে খবর দেবেন।'

কিছুদিন পর নাসিরুদ্দীনের পত্র পেলাম; 'কাজীর সাথে এক হিন্দু মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে: কাজী আপাততঃ সেই স্বপনে বিভোর। তা ছাড়া এই উপলক্ষে তাঁর যে সব হিতৈষী জুটেছেন, তাতে কাজী এখন নাগালের বার। তাকে করটীয়া ধরে রাখতে পারবেন না।'

অবস্থা গতিকে আমারও তাই মনে হল। কাজেই কাজীকে করটীয়া আনার আকাঙ্খা ব্যথিত চিত্তে ছেড়ে দিলাম। আজ কবির গুণগ্রাহীরা তাঁকে য়ুরোপ ঘুরিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন; কোন চিকিৎসাতেই তাঁর ফায়দা হল না। মনে হয়, তাঁর চিকিৎসার জন্য টাকা তুলতে যত মানুষকে খোশামুদী করলাম, তার অর্ধেক মানুষকে খোশামুদী করে তাদের মারফত যদি তাঁকে ধরে করটীয়া এনে রাখতে পারতাম, তবে তাঁর পরবর্তী জীবনের ইতিহাস, হয়তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বুঝি আজ অন্য রকম হত।

আহা!

তুমি হও

নূর মোহাম্মদ

এবার আসবে দিন ঘুমশেষে নির্বাক শ্রান্তির।
তোমাকে দেখেছি নিত্য তৃণশ্যাম ভূমিরূপে
একাকার গম্ভীরার গানে আর ভাটিয়ালী সুরে
ভরে গেছে তব বুক। সাধের স্বপন নিয়ে প্রাণে
তিমিরের তীর-ছোঁয়া কাঞ্চন-নদীর কূলে কূলে।

অপগত রজনীর ইতিহাস জানিতে চাহিনি।
তোমার চোখের তারা, তারা নয়, যেন সে আকাশ
বেদনা লভিলে অশ্রু মুছে যায়—
'ভালোবাসি' বলে...

বিরহিনী শঙ্খচিল, আকাশের ঘননীল,
সাক্ষী আজ সশরীরে বিপদ এড়িয়ে।

এখনো কি হয় নি সময়?
নির্বাক শ্রান্তির দিন, জীবনের অনুস্বপ্ন মাঝে
খুঁজে পাক আকাঙ্খার বীজ
তুমি হও আবর্তিত কুসুমের মাস
আমি হই শীতে-ভেজা সবুজাভ ঘাস।

মানুষের জন্ম

গোলাম কাদির

গোয়ালে গোয়ালে ধেঁায়া দিয়েছে কিষাণেরা। সন্ধ্যার আবছা আঁধার সে ধেঁায়ার আচ্ছন্নতায় ঘনায়মান।

গরু নিয়ে মাঠে নামে তায়েব। রীতিটা উল্টো হলেও প্রয়োজনটা ব্যবহারিক। ক্ষেতে খামারের কাজ চলেছে পুরো দমে। হালের গরুগুলো দিন-দুপুরে কাঁধের জোয়াল ছাড়ে। তারপর পালে এসে কয় কামড় ঘাস খেতে না খেতেই সন্ধ্যা। তাও যদি গোচার থাকত রীতিমতো। যা দিন-কাল, পতিত জমি আবাদ হচ্ছে হুড় মুড় করে। ঘাস নয়—মাটি কামড়ায় গরু গুলো। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ খাইয়ে নিলে তবু ওদের পেটের আগুনটা একটু কমে। রাতে ঘুমোয় ভাল। সকালে চাঙ্গা হয়ে উঠে জোয়াল কাঁধে নেয়। আর রাতের ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণ চরে না বেড়ালে পরদিন গাই-এর নীচে দুনা নিয়ে বসলে শুমশুম্ শব্দ উঠে না। কামলাদের পা'তে দুধ পড়েনা।

তাও কি আর সহজে হওয়ার জো আছে। ছেলেরা আপত্তি করে। বলে, মুরুব্বী মানুষ এ-সবে আসবে কেন। আরে মুরুব্বা তো মুরুব্বী, স্বয়ং আল্লার ফেরেস্তারাও নিজ নিজ কাজ করে সময় মত। ক্ষেত খামারের কাছে গিয়ে কামলাদের একটু আধটু সাহায্য, গরু বাছুরটা সময় মত দেখা শুনা এগুলোও না করে হাত পা বেঁধে বসে থাকবে মানুষ। যত সব বাপ জ্যাঠামি। গাঁয়ের মানুষেরাও তাই। বলবে এসব ছেড়ে দিয়ে একবার পশ্চিম থেকে ঘুরে আস তায়েব মিয়া। দুনিয়ার পথ ছেড়ে আখেরাতের পথ দেখ। হুম—আখেরাতের পথ! আখেরাতের পথ দেখাবে পোঁচন মোড়ল, সোনা উল্লা মুন্সী আর রহমত মাতব্বর। বাপরে বাপ, পেটে পেটে যত খিচুড়ী এই পেঁচনের। সেই ত সারা গাঁয়ে তিন তিনটা দল করে রেখেছে। সাথে সাথে শরীক থাকছে রহমত। আর সোনা উল্লা। নিজে মুন্সী গিরি করে রাত বিরাতে পরের দুয়ার ঘুচিয়ে বেড়ায়। জুম্মার নামাজে গিয়ে বলবে, যারা কোরাণ শরীফ পড়া জানেনা তারা পেছনে থাক।

এখানে গাঁয়ের পালান শেষ। তারপর রাস্তাটা ডান পাশে এগিয়ে গেছে নিতাই দাশের ডোবা পর্যন্ত। এরপর দুই পাশের জালা ক্ষেত পেরিয়ে সামনে কান্দা। পূব পশ্চিমে দীঘল কান্দা। মাঝ খানটা উঁচু, দুই পাশের ঢালু জায়গা ক্রমবর্দ্ধমান। উঁচু জায়গায় বনতুলসী গজায়, বিন্না গজায়। এক বছর পর পর গাঁয়ের মানুষ এখানে খড়ি কাটে, ঘর-ছানির বিন্না যোগাড় করে। পাশের ঢালু জায়গাটুকুতে দূর্বা ঘাস—তরতাজা সবুজ দূর্বা। উঁচু কান্দার দু'একটা ডেরে দুধ ঢেলে ঘাসও গজিয়ে উঠে মাঝে মধ্যে। এখানকার দূর্বার রসে সতেজ হয়ে উঠে হালের বলদগুলো। দুধ ঢেলে গাইয়ের দুধ বাড়ায়। গরু জ'তের মাথা নেই। থাকত গোয়ালে বাঁধা পেটের জ্বালায় ছটফট্ করত সারা রাত। কোথায় তাড়াতাড়ি কয়েক কামড় ঘাস খেয়ে পেট ভরবে, না লোভ যত অই জ'লা ধানের ওপর। বলদ গুলো তবু কান্দার ওপরেই শুয়ে আছে, কিন্তু গাই-গরুর মুখ নামছে না। সামনের জা'লা ধানে নেমে যেতে চাইছে বারবার। না, একটা ডেরে নিয়ে না গেলে ধানের লোভ ছাড়বে না পশুগুলো।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মরা চাঁদ শেষ রাতের আগে ওঠবেনা আসমানে। তার আগে শুধু ক্রমবর্দ্ধিত ঘনায়মান অন্ধকার। এদিকটাতে মানুষ নেই। ডান পাশে নলডুবির হাওরে এখনও অনেক পানি। মাস পনের দিন পর ছাড়া টানের ক্ষেতেও হাল দেবার জো নেই। বাঁ-দিকের জলভরণ কিত্তায় হাল লেগেছে। সেও টান টিকরের জমিতে। সকালের দিকে যা মানুষ থাকে, বিকালে এদিকটা একেবারেই নীরব। হাটবারে শুধু কান্দার পাশ দিয়ে মানুষ গঞ্জে যায়। আবার সওদা করে ফিরে আসে সন্ধ্যার আগে আগে। তারপর আবার নীরব। কানে তালা লাগে। ডেরের তরতাজা ঘাস ছেড়ে আর একটা গরুও মাথা তুলছেনা। আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। লাঠিটা পাশে রেখে নরম তেল তেল দূর্বার উপর বসে পড়ে তায়েব মিয়া। ঠেঙ্গিয়ে না তুললে আর একটা গরুও ডেরের বাইরে যাবেনা।

আসমানে তারা উঠেছে। অগণিত অসংখ্য তারা। কোনটা মিট্‌মিট্ করে, এই জলে, এই নেভে। কোনটা উজ্জ্বল। পূবের আকাশে নীলাভ জোহরা। তার আরো উপরে আদম সুরত। উত্তর-দক্ষিণে আসমানটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মাঝখানে নূহের জাহাজের ধেঁায়ার আচ্ছন্নতা। কি আশ্চর্য, কবে, সেই কোন্ কালে নুহ আলাইহেস সালাম তার জাহাজ ভাসিয়েছিলেন দুনিয়া জোড়া বন্যার দিনে; আর আজও সে জাহাজের ধেঁায়া জমাট বেঁধে আছে আসমানে। তায়েব মিয়ার ভাবনার অন্ত নেই।

অবাক কাণ্ড। চমকে উঠে তায়েব মিয়া। চমকাবারই কথা। রাত খুব বেশী হয়নি। গাঁয়ের ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে এখনো। ছোট কাল থেকে শুনছে, জল ভরণের

দরগাতলাটা ভাল নয়। দেওদানবের আছর আছে গাছটার ওপর। কিন্তু জীবনের ষাটটা বছরের একদিনও কোন কিছুর সামনে পড়েনি। ভয়ও পায়নি। তবু না, নিজের কানে ভুল শুনছে না তায়েব মিয়া। ঐ তো পেছন দিক থেকেই শব্দটা আসছে। চাপা কান্নার শব্দ। কাঁচা শিশুর কান্নার সময় মুখ চেপে ধরলে যে রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ উঠে ঠিক তেমনি শব্দ। আর বসে থাকা যায় না। পেছনের দিকে দু এক পা এগিয়ে যায় তায়েব মিয়া।

—কেউ মানুষ আছনি এই খানে?

সাথে সাথে শব্দটা বন্ধ। একটু পরেই আবার কান্না। আরো তীব্র, আরো করুণ। তারপর আবার চাপা। আবার কান্না। ধীরে ধীরে শব্দটা সরছে। কান্দা ছেড়ে জলডুবির পারের দিকে এগোচ্ছে কান্না। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে তায়েব মিয়া। তারপর লাঠিটা শক্ত করে ধরে পা চালায় সামনের শব্দটা লক্ষ্য করে। জলডুবির দিকে। আশ্চর্য একটা মানুষের ছায়া দ্রুত এগিয়ে চলছে সামনে।

—এই, কোন মানুষ যাওনি তুমি?

নীরবে এগিয়ে চলে ছায়াটা। মাঝে মাঝে কান্নার শব্দটা আসে তীব্রতর, মাঝে মাঝে চাপা। এবার পাল্লা দিয়ে পা চালায় তায়েব মিয়া। আর একটু, তারপর দেওদানবের মাথা না ভেঙ্গে ছাড়াছাড়ি নেই।

—যেই হও রা কর। নইলে এই দিলাম লাঠির বাড়ি।—হুঙ্কারের মত শোনায় তায়েব মিয়ার গলার আওয়াজটা। ধপাস্। চলতে চলতে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে সামনের ছায়াটা। সাথে সাথে কান্না। এবার এক নয়, দুই কণ্ঠের কান্না এক সাথে। শিশু কণ্ঠের কান্নার শব্দটা চাপা পড়ে বয়সী কণ্ঠের কান্নার আড়ালে। লাঠি উঁচিয়ে ধরে সামনে দাঁড়ায় তায়েব মিয়া।

—কথা না কইলে এক বাড়ীতে গুঁড়া, কইলাম।

—আমি চাচা মিয়া, আমি খেদি।

হাউ মাউ করে দুই পায়ে ঝাপ্‌টে পড়ে ছায়ামূর্তিটা।

—খেদি! তুই খেদি?

বিহ্বল বিস্ময়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে তায়েব মিয়া। তিন বছর না হলেও আড়াই বছরের কম ত নয়ই। আজ আর ঠিক মনে পড়ে না। গাঁয়ে কলেরা এলো আজরাইলের রূপ ধরে। এক বার বিছানায় কেউ পড়ল ত আর রক্ষা নেই, জীবনের কারবার ফতে। সেও আর দু'চার জন নয়। সারা গাঁয়ে আশিটা লোক মরল ছেলে বুড়া জোয়ানে। হায়রে আল্লাহ, কি যে গজব! মরা মানুষের লাশগুলোকে মাটির নীচে পুতে দেওয়ার লোক নেই। দু'তিন দিনের বাসি মরা নিয়েও রাত জেগেছে কেউ কেউ। সেই বছরই চল্লিশ বছরের জোয়ান মর্দ মনিরউদ্দিন তার বাড়ীতে কামলা খাটে। এত বড় জোয়ানটা দুপুরে খেতের কাজে গিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী এসে বার কয়েক দাস্ত আর বমি করেই চির দিনের জন্যে নীরব হয়ে যায়। বিপদের সীমা নেই। রাতের বেলা কাউকে ডাকতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার পরেই দুয়ারে দুয়ারে হুড়কা লাগায় ভয়ার্ত মানুষেরা। কিন্তু এদিকে মনিরের বউ-বাচ্চা আছে, খবরটা না দিলেই নয়। অগত্যা একটা হারিকেন হাতে নিয়ে, সেই রাতেই তিন মাইল পথ একা একা হেঁটে গিয়েছে তায়েব মিয়া। খবর শুনেই চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল খেদি। যাদের বাড়ীতে থাকত, তারাই বুঝিয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা। খেদির নিজের বাপ-ভাই বলতে কেউ বেঁচে ত নেই-ই, মনিরও সেই পৃথিবীতে এক মুঠো মাটি রেখে যায়নি যে তার উপর পা ফেলতে পারবে খেদি। তারপর বছর দিনের একটা বাচ্চা।

আল্লাহ নাকি হক বিচারের মালিক। কেন, তার নিজের তিন তিনটা ছেলের মধ্যে একটা কলেরা হলে পারতো না? দুর্বলের উপর সবলের লাঠি সব জায়গায়। কি করবে তায়েব মিয়া।

—তার বিচার নাইরে খেদি, তার বিচার নাই। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে তায়েব মিয়া। দেখিসনা যার ঘরে ভাত নাই তার খেতে ধান অয়না। আর বছর বছর আমার ভাঁড়ারে ধান ধরে না। নতুন করইয়া ভাড়ার বান্ধি। এইতো তার বিচার।

—আমার কি উপায় রইল, চাচা মিয়া। আমার নবীর? কান্না ভাঙ্গা কণ্ঠ খেদির।

—আমি যতদিন আছি চিন্তা নাই। থাকবার অসুবিধা অইলে আমার বাড়ীর দুয়ার তোর লাগি খোলা রইল।

সেদিন খেদিকে স্বেচ্ছায় সে অধিকার দিয়েছে তায়েব মিয়া। আর এ-অধিকার দে'য়া মানেইত খেদির বোঝা নিজের ঘাড়ে টেনে নে'য়া। সত্যি, মরার চল্লিশটা দিন যেতে না যেতেই চলে এসেছিল খেদি। এসেছিল বাধ্য হয়ে; নিরুপায় হয়ে।

তারপর মাস তিনেক সময় লেগেছে মরা মানুষটাকে ভুলতে। দুনিয়াটাকে ভাল ভাবেই জানে তায়েব মিয়া। এমন ঘটনাও মানুষের জীবনে ঘটে যার ফলে মানুষ মনে করে উঁচু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে পা দুটো এক দম ভেঙ্গে গেছে, এগিয়ে চলার পথ এইখানেই শেষ। অথবা হঠাৎ ভূমিকম্প এসে তার ওপর একটা বড় গাছ বা ঘরের টিন চাপা দিয়ে মাথার খুলিটাই উড়িয়ে নিয়েছে, সে আর বেঁচে নেই। অথচ সময়ের গতিতে সবই সয়ে যায়। সবই ভুলে যায় মানুষ। আবার সে পুরোণ জগতে ফিরে

আসে, দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে। তা নয়ত কি! তিন মাস পরেই খেদির ছেলেটা মরল, কি-যে কান্না কেঁদেছিল খেদি! চারটা দিন-রাত কবরের পাশেই কাটিয়ে দিয়েছে। সন্তানের মায়ায় পাগলী মা। কাছে গিয়ে দুই কথা বুঝ দিতে গেলেই দুই পায়ে জড়িয়ে ধরে বলত, আমার কলজার একটা টুকুরা ছিঁড়ি গেছে চাচা মিয়া, সেখানে থাকি লহু পড়ছে গো—তাজা লহু।

কিন্তু এ-লহু কয়দিন পড়ল খেদির কলজে থেকে? খেদির বছর দিনের ছেলে নবী মরে গেছে; কিন্তু বহু দিনের পুরনো ছেলে পৃথিবীটা মরেনা। সে বেঁচে আছে সেই কোন্ অনাদিকাল থেকে। সব মায়ের মুখে তার সমান স্নেহের আর্তি, সব বাপের মুখে ভালবাসার সমান দাবী। এই দুনিয়ার মুখ চেয়েই মানুষ সব কিছু ভুলে, সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে। খেদিও ভুলেছে। একদিন মনিরকে ভুলেছে, তারপর একদিন নবীকে। সহজ স্বাভাবিকতায় এ-বাড়ীরই একজন হয়ে উঠেছে সে। সকালে তায়েব মিয়ার অজুর পানি এনে দেয় খেদি, দুপুরে গোয়ালের গোবর সাফ করে আর বিকালে রান্না ঘরের কাজ। নিতান্তই এ-বাড়ীর মেয়ে। কোন দিন ঢেঁকিতে বারা দেয়, ঘর-দুয়ার লেপা মুছাত আছেই। বাড়ীর এক পাল হাঁস-মোরগ খেদির পেছনে ঘুরে ফিরে। ওদের খুঁদ কুড়া তার নিজের হাতে দে'য়া চাই। আজ কাল অনেক কাজ খেদির। এত বড় সংসারের কোথায় এক কোণে পড়ে থাকে; কিন্তু গৃহস্থ ঘরের কাম জানে খেদি। এটা যেন তায়েব মিয়ার বাড়ী নয়—তার নিজের বাপের বাড়ী।

বছর দেড়েক কাটল নির্বিবাদে। বড় মেয়ে আয়শার বিয়ে হয়েছে আগেই। কিন্তু ছোট মেয়ে তুতীর বিয়ের পর যে জায়গাটা খালি পড়েছিল খেদি এসে সেটাকে ভরাট করেছে। শুধু ভরাট নয় উপরিও দিয়েছে অনেক। তুতী সংসারের কাজ তেমন করতে পারত না। কিন্তু দুই দুইটা মেয়ের কাজ করে খেদি। আর তুতীর স্থানটা ভরে দিয়েছে সে সেবায়, যত্নে, আদরে, সোহাগে। তায়েব মিয়াকে নিজের হাতে তামাক ভরতে হয়না। অজু গোছলের পানি, আলাদা চারটে ভাত-চালুন ফুটিয়ে দেওয়া, কাপড়-চোপড় গুলো ধুয়া-পাখালা করা সব খেদির ওপর। এক তুতীকে বিয়ে দিয়ে আর এক তুতীকে ফিরে পেয়েছে তায়েব মিয়া।

কিন্তু মানুষের ঘরের চালেও সাপ থাকে, আর দুর্বাবনেও বাঘ লুকায়। একদিন সোনা উল্লাহ মুন্সীই বাড়ীর সামনে ডেকে নিয়ে কথাটা বলল। বলল আকারে ইঙ্গিতে, মুখের ভাষায় আর দেহের ভঙ্গিতে। বজ্জাতি শুধু মনে নয়, হাড়ে হাড়ে মিশে আছে সোনা মুন্সীর। গাঁয়ের কোন্ মানুষটার মনে কি, সব তার মুখে মুখে। তুমি যদি চল গাছে গাছে, সে চলে পাতায় পাতায়।

ঘরে এসেই তুতীর মাকে নীরবে ডেকে জিজ্ঞেস করে তায়েব মিয়া। মেয়েরা মেয়ের খবর জানে। কিন্তু তুতীর মাও বুঝতে পারেনা কিছু অথচ সোনা মুন্সী বুঝে। সে নাকি নায়েবে রসুল, মানুষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়াই তার কাজ। কি যে ধান্দাবাজীর জায়গা এই দুনিয়াটা। তবু ভালো, এতদিনে মনে পড়েছে কথাটা। সোমথ মেয়ে মানুষ ঘরে, মান-ইজ্জত সকলেরই আছে। আজ থেকে হুঁশিয়ার হওয়াই ভাল।

কিন্তু অবাক। সোনাউল্লা কি নজুম, না পীর। তিন মাস যেতে না যেতেই তার কথাটা যেন ধানের ভেতর থেকে আস্ত চাল বেরিয়ে আসার মত সত্য হয়ে দেখা দিল। খেদি আর তেমন ভাবে সামনে আসেনা। আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে। সময় পেলেই বিছানায় পড়ে ঘুমায় বা শুধু শুধু শুয়ে থাকে। এবার আর তুতীর মা'র সন্দেহ নেই। সে যেন ছোবল মারবে তায়েব মিয়াকে—অত বড় সংসারে আর মানুষ পাইলানা; এক ছিনাল হারামজাদীরে বাড়ীতে আনছ। অখন সামলাও ঠেলা।

না, এ-ঠেলা তায়েব মিয়াও সামলায়নি। যখন তখনই খেদিকে ডেকে এনে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছিল বাড়ী থেকে। এই মুহূর্তে খেদি যেন মানুষ নয়, একটা আগুনের বুন্দা তার সামনে। যাক মরুকগে যেখানে খুশী, পরের মেয়েকে মায়া করার এই পরিণতি। যাওয়ার সময় আবার দুই পা জড়িয়ে ধরেছিল খেদি।

—যা যা, জাহান্নামে যা হারামজাদী, জাহান্নামে যা। আমার বাড়ী থাকি বাইরহ কমবকৃত্!

ঠিক যে ভাবে খালি হাতে একদিন এ-বাড়ীতে এসে উঠেছিল খেদি, তেমনি খালি হাতে একদিন এ-বাড়ী ছেড়ে চলেও গিয়েছিল সে। আসার দিনে নিঃসহায় ছেলেটা ছিল তার কোলে আর যাওয়ার দিনে তেমনি নিরপরাধ সন্তানটা তার পেটে।

কয়েক দিন পরে মনটা কেমন কেমন করেছে। একটা মানুষ দেড়টা দুইটা বছর তাকে ছ'য়ার মত ঘিরে রেখেছে চারিদিকে থেকে; হঠাৎ নিঃসহায় হয়ে কোথায় গিয়ে উঠেছে, কি করেছে জানতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছে তায়েব মিয়া। তুতীর মাকে ডেকে জানতে চাইছে যাওয়ার সময় খেদি কিছু বলে গেছে কি না। এ-বিষয়ে তুতীর মা'র মনটা মোটেই নরম নয়।

—তোমার যা কথা, এই সব কথা কেউ কইয়া যায়?

—কেউর নাম করে নাই?

—কইছে সুনা মুন্সির কথা। কথা একটা কইলেই খালি বিশ্বাস করে মানুষে ?

মানুষ বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু তায়েব মিয়া বিশ্বাস করে। কেউ না জানবার আগে সোনামুন্সীই-ত এ-ইঙ্গিত দিয়েছিল তাকে। জঙ্গলেই বাঘ থাকে, আর মানুষের মনেই পাপ থাকে।

তারপর বনগাঁর কয়টা ফকির বেটিই একদিন খেদির খবর দিয়েছিল তায়েব মিয়াকে। একটা ফকিরের আড্ডায় গিয়ে উঠেছে, গতর খাটিয়ে কাজ করে গৃহস্থ বাড়ীতে। কাজ না পেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ মাগে। কিন্তু সে তো মাস ছ'য়েক আগের কথা। তারপর আর কোন খবর নেই। সেই খেদি আজ তার সামনে, দুই পা ধরে কাঁদছে।

—খেদি! তুই খেদি? কিছুতেই যেন আর বিশ্বাস হতে চায়না তায়েব মিয়ার।

—হ, চাচা মিয়া আমি খেদি।

—কাঁচা মানুষ লইয়া এই খানে কি রে?

—এর লাগিই এই খানে আইছি চাচা মিয়া, এই এর লাগি।

বুকের কাছে চেপে ধরা নবজাত শিশুটিকে এবার সামনে তুলে ধরে খেদি। অন্ধকারে কিছুই দেখার উপায় নেই, শুধু একটা কাপড়ের পুটলার মত পড়ে আছে খেদির হাতে। কাঁদছে ভাঙ্গা গলায়। কখনো স্পষ্ট, কখনো চাপা কান্না।

—এই জারের বাতাসে মারবে বাচ্চাটা!

—সংসারে তো এর ঠাঁই নাই চাচা মিয়া। এ-বেঁচি থাকলে আমারও ঠাঁই নাই।

—তার লাগি একটা মানুষ খুন করবে হারামজাদী?

—আমি কি করি কন? আমার নবীর ঠাঁই আছিল সংসারে, নবী বাঁচলনা। এর ঠাঁই নাই, তবু এ মরে না! কি করি কন?

খেদিকে কি করতে বলবে তায়েব মিয়া? তার কোলের বাচ্চাটা একটানা কেঁদে চলছে। এক মুহূর্ত্ত সে দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল তায়েব মিয়া। চারদিকে যেন এই ভাঙ্গা গলার কান্নার প্রতিধ্বনি। কান্দায় কান্দায় ঝিঁ ঝিঁ পোকারা কাঁদছে, আসমানের আদম সুরত কাঁদছে, জোহরা কাঁদছে। সামনে কাঁদছে মা, কাঁদছে সন্তান। তায়েব মিয়া কি করতে পারে।

—দিস্, ওরে আমার কাছে দিস্ খেদি। সংসারে ঠাঁই না থাকলেও আমার বাড়ীতে আছে, আয়। আমি কেউর ধার ধারি না, ডরাই না কোন বেটারে। আয় আমার বাড়ীতেই তোরা মা বেটা থাকবে আয়।

সত্যি খেদির কোল থেকে সেই জীবন্ত পুটলাটা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় সে। জীবনে এই প্রথম বারের মত ভুল। পাশের গরুগুলোর কথা একেবারেই ভুলে গেছে তায়েব মিয়া।

প্রতিভাস

শামসুদ্দীন

একদা সান্ত্বনা ছিল ফের তুমি আসিবে হেথায়
কনক-চাঁপার গন্ধে ভরে দিবে অংগন আমার
পাখিরা পালক খুলি হর্ষ ভরে নাচিবে আবার
ফুল হবে বালুকণা, গন্ধ দিবে পথের ধূলায়।
ঘর-দোর উঠিবে আবার জাগি করি ঝলমল
কর্মের প্রেরণা দিবে রাতদিন, হইবে মুখর
নিস্তব্ধ প্রাণের তন্ত্রী, শব্দে সুরে সুহাস সুন্দর
ঝংকৃত হইবে পুনঃ মর্মবীণা—ছিল যা বিকল।

সহসা নয়ন তুলি দেখিলাম অনাগত দিন
হাসিতেছে, মরাডালে ফুটিছে কুসুম শাদা, লাল
কতনা অজানা পাখি-দল আসে আর গায় গান
ভোমরা পাখায় তার তোলে সুর আনন্দ অম্লান
দৃষ্টিবান করে আঁখি,
শাদা-কালো মেঘে তুলি পাল;
তুমি কি আসিছ প্রিয় স্মরণীয় স্বপন রঙিন!

আধুনিক উর্দু সাহিত্যে মুস্‌লিম মহিলা

মাওলা বখ্‌শ

চলতি যুগের উর্দু-সাহিত্যে পাক-ভারতীয় মুস্‌লিম-মহিলাদের অবদান পরিমিত ও আশাপ্রদ হলেও সাহিত্যের-আসরে এদের আগমন খুব বেশী দিনের কথা নয়—অনুমিত বিশ শতকের গোড়াতেই। যুদ্ধোত্তর-যুগ থেকেই এদের রচনাবলী ব্যাপক আকারে প্রকাশ লাভ করতে থাকে। তাই এদের সাহিত্যিক-পরিচিতি ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিকট-অতীতেই। এদের পরিমিত-অনবদ্য সৃষ্টিসমূহ সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে সব বিষয়ে। প্রবহমান উর্দু-সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় এইসব মহিলাদের বিভিন্ন-মুখী মৌলিক-অবদান উজ্জ্বল-স্বাক্ষর বহন করে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁরা আমাদের দেশের পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে পশ্চাদপদ তো নয়ই—বরঞ্চ প্রতিযোগিতায় কোন কোন বিষয়ে পুরুষদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। যে-সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন সাহিত্য-কর্ম স্থায়ী ও অমর আসন দাবী করতে পারে এদের রচনার প্রায় সর্বত্রই তা' উপস্থিত।

আলোচ্য-প্রবন্ধে এই-সব মহিলা-সাহিত্যিকদের মৌলিক-সৃষ্টির সবিস্তার আলোচনা না করে এঁদের রচনা-কর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকার, আয়তন ও বিষয়-বস্তর দিক দিয়ে যে আমূল-বিবর্তন এনে দিয়েছে তৎপ্রতি আলোক সম্পাতই মূল উদ্দেশ্য। এদের প্রত্যেকটি রচনাকর্ম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। সুবিশাল প্রকৃতি-ভাণ্ডার-সঞ্চিত সচেতন-অনুভূতিবোধ, সুক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণশক্তি ও পরিমিত রুচিজ্ঞান সাহায্যে সৌন্দর্যের উত্তুঙ্গ-শিখরে ও মানুষের মনের-গভীরে সার্থক-ভাবে ডুব দিয়েছেন এঁরা। মহিলা ব্যতীত পুরুষ সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য ও অনুভূতিবোধ প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। সুস্পষ্ট মৌলিকতা, সরল প্রকাশভংগী ও সুষ্ঠু-গোছালো মননশীলতা এদের রচনা-ধারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ-প্রতিভা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন বিষয়-বস্তর ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনীতি, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান, নাটক-নভেল, ছোট-গল্প, কবিতা ও সমালোচনা সকল-ক্ষেত্রেই সম-পরিমাণে পরিস্ফুট। এঁদের সৃজনশীল-প্রতিভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ-সকল শাখা-প্রশাখায় নতুন ব্যাখ্যা ও রূপ দিয়ে অভিনব আশা-আকাঙ্খার সঞ্চার করেছে মানুষের মনে। কিন্তু উপন্যাস ও ছোট-গল্প রচনায় এঁদের অবদান সমধিক উল্লেখযোগ্য।

ছোট-গল্প রচনা প্রচেষ্টা—ইহার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নয়ন-ইতিহাস সম্পর্কে সবিস্তার পর্যালোচনা এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব না হওয়ায় আমরা এই বিভাগে পাক-ভারতীয় মুস্‌লিম মহিলাদের বিভিন্নমুখী অবদানের একটা ধারা-বাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। মহিলাদের সাহিত্য-আসরে আগমন ও অবদানের ইতিবৃত্ত গবেষণা করে দেখা যায়, গোড়ার দিকে মূলতঃ এঁরা বড়-গল্প রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এদের ভেতর বিহারের খাদিজাল কোবরা, পাঞ্জাবের মোহাম্মদী বেগম, মাদ্রাজের আব্বাসী বেগম, তৈয়েবা বেগম ও হায়দরাবাদের সোগরা হুমায়ুন মির্জা সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা মূলতঃ নাট্যকার। চলতি যুগে অনেক প্রখ্যাতা মহিলা সাহিত্যিক ছোট-গল্প রচনার দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছেন। অবশ্য গল্প ও নাটকের আসর তুলনা-মূলকভাবে নিঃসন্দেহে সুবিস্তৃত—ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, বিদ্রূপাত্মক, সামাজিক, সংস্কারমূলক ও উপদেশাত্মক নানাশ্রেণীর।

আগেকার দিনের গল্পগুলো কিছু পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতি পূর্ণ ছিল। এগুলো 'দস্তান' নামে পরিচিত ছিল। কাল্পনিক-কাহিনী, অবাস্তব-ঘটনা যা' মানব-জীবনের গতিধারা, কর্ম-পদ্ধতি ও জীবন-জিজ্ঞাসার কোন সমাধান জোগায়না, তখনকার দিনে গল্পের বিষয়বস্তু ছিল—মানব-মানবীর স্থলে পাপিষ্ঠ-শয়তান, ভূত-প্রেত, জিন, দৈত্য, পরী ইত্যাদি অশরীরি জীব। সুতরাং বাস্তব-জীবন, সমাজ-জীবন ও সমাজ-সম্পর্কহীন গাঁজাখুরে কল্পনাবহুল গল্পই সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে সাংস্কৃতিক আসরে চালিয়ে দেওয়া হত। দস্তানগুলো মূলতঃ সামন্তিক বা আয়মা-যুগের সৃষ্ট গল্প। এই যুগে জনসাধারণের অধি-কাংশই ছিল জায়গীরদার বা ভূ-স্বামীদের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান বলি। কুসংস্কার ও মূর্খতা সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়ে বসেছিল। শিক্ষাহীন অগণিত জনগণের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে কোনপ্রকার সম্পর্ক না থাকায় সংগতি-সম্পন্ন সমাজের উপরতলার ব্যক্তিরা এইসব অলীক কাহিনীগুলি সাধারণতঃ উপভোগ করতেন। সে-যুগে কলাশিল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামন্তিক জমিদারগণের বীর্যপূর্ণ ক্রিয়া-কর্মাদি সম্পর্কে প্রশংসামূলক গীত-রচনা মাধ্যমে তাদের পরিতোষ-বিধান। সাম্প্রতিক যুগে এই দৃষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। অতীত জায়গীর প্রথা উত্তরকালে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়। আজ ধনতন্ত্রই এই অভীষ্ট সাধনে সবল কর্মভূমিকা

গ্রহণ করেছে। প্রগতিশীল এবং আধুনিক ফ্যাশানের সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শিল্পীরা আজ অগণিত মজদুর-সাধারণের পর্যায়ভুক্ত। আজকের দিনে সমাজের সাধারণ মানুষই সাহিত্য-কলার বিষয়বস্তু। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ছোটগল্প সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দস্তান-যুগের অবাস্তব ও কাল্পনিক কাহিনীগুলোকে অচল করে দিয়ে নিজস্ব যুগ সৃষ্টি করে নিতে সক্ষম হয়েছে। উপদেশাত্মক—গল্পগুলো অংশতঃ অসম্ভব ও কল্পনা-প্রধান ঘটনা সৃষ্টি করলেও সাম্প্রতিক যুগের সাহিত্যিকদের রচনায় এদের সংযত ও সুষ্ঠু সুন্দর রূপায়ন ঘটেছে। অবশ্য এই গল্পগুলো আজকের যুগে অনেকাংশেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

আকার, আয়তন ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ছোটগল্পের আসরে অনেক বিবর্তন সাধিত হয়েছে। আগের দিনের কাহিনী আর চলতি যুগের ছোটগল্পে প্রায় কোন বিষয়েই আর সদৃশ্য নেই। চলতি ছোটগল্পে প্রাত্যহিক জীবনের কর্মপদ্ধতি, গতিধারা ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। আঙ্গিক ও চরিত্র অংকনই ছিল অতীতে ছোটগল্প বিচারের মানদণ্ড। কিন্তু আজকের যুগে চলমান জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা, নৈসর্গিক বিপর্যয়, ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতারও বাস্তব রূপায়ন ঘটেছে ছোট-গল্পে। অনেক কাহিনীতে আখ্যানভাগ ও চরিত্র-সৃষ্টি সার্থকভাবে অংকিত না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীর গল্পের ভেতর আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

উর্দু সাহিত্যের ছোটগল্প লেখক গোষ্ঠী প্রথমদিকে ইংরেজী ও ফ্রান্স সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক্ষণে, এদের রচনায় রাশিয়া ও মার্কিন প্রভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে টলষ্টয়, শেখভ, শোলোখভ এবং ও'হেনরীর প্রভাব এদের রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আমেরিকা কিংবা অন্যান্য দেশের দার্শনিকদের প্রভাব ছাড়া মার্কস ও ফ্রয়েডের মতবাদেও এদের রচনাধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অন্যান্য প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও শেখভের মনস্তাত্ত্বিক আবেদন ও একেশ্বরবাদী-দৃষ্টিভংগী, গোর্খীর বাস্তবতাবোধ ও চরিত্র অংকন এবং লরেন্সের যৌন-সমস্যার স্পষ্ট ছাপ সমধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উর্দু সাহিত্যে এমনও অনেক ছোটগল্প লেখক আছেন যাঁরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ষ্টাইল ও প্রকাশ ভংগীর দিক দিয়ে এঁরা নিজস্ব আসন সৃষ্টি করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের ভেতর কৃষ্ণচন্দ্র, খাজা আহমদ আব্বাস, সা'দত হাসান মিণ্টো, এম, আসলাম, মজনুন গোরখপুরী, জলীল কিদওয়াই, ফজলী হক কোরেশী, আহমদ নাদিম কাশিমী, ইব্রাহিম জলীস এবং বাইদী সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা সাধারণ পাঠক মহলে সবিশেষ পরিচিত ও খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের দেশে মহিলা ঔপন্যাসিকের চেয়ে মহিলা ছোট-গল্প রচয়িতার সংখ্যা অনেক বেশী। এরা পাক-ভারতের বিভিন্ন নগর ও মফস্বল এলেকার বাসিন্দা। এদের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সাময়িক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখনী পরিচালনা করে থাকেন। ইহার ভেতর উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়শ্রেণীর রচনাকর্ম পরিদৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে উচ্চ-প্রতিভার পরিচায়ক মৌলিক সৃষ্টিগুলোর বিচার করা সমালোচকের কর্তব্য।

এই সব মহিলা লেখিকাদের ছোটগল্পগুলো ব্যাপক ও সুক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে স্বতঃই পরিলক্ষিত হয় যে, শ্রেণীগত দিক দিয়ে এগুলো এক শ্রেণীভুক্ত নয়। মননশীলতায় এরা ইউরোপ, আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রখ্যাত পুরুষ চিন্তাবিদ্‌দের অনুসারী। অবশ্য এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা চিন্তাধারা ও ষ্টাইলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিকতার দাবী করতে পারেন। কলা-কৌশল ও আখ্যান-আংশিকের দিক দিয়ে বিচার করলেও এদের পাণ্ডিত্য অক্ষুন্ন থাকে সর্বত্র। পরিশীলিত ভাষা, সুমার্জিত কল্পনা, সুষ্ঠু চিন্তাধারা, বাস্তবতাবোধ, অভিনব ষ্টাইল, স্পষ্ট বাচনভংগী, সংস্কার-মুক্ত সুস্থ মানসিকতা ও মৌলিক ভাবধারা এদের সৃষ্টি-কর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। উর্দু-সাহিত্যের মহিলা লেখি-কাদের আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। এদের ভেতর প্রথম-দল তুলনামূলকভাবে বহুদিন যাবত সাহিত্য-সাধনায় নিরত। দ্বিতীয় দল চিন্তাধারার দিক দিয়ে কিছুটা রক্ষনশীল হলেও এদের রচনায় প্রগতিশীল-ভাবধারা আয়ত্ত-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আর শেষ-দলের সাহিত্য-আসরে আগমন সাম্প্রতিক কালেই। আমরা এখানে প্রথম দু'-গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করব। নাজার সাজ্জাদ হাইদার, জমিলা বেগম এবং তাদের সমসাময়িকরা প্রখ্যাতি-অর্জন করলেও এঁরা প্রগতিশীল গোষ্ঠীভুক্ত নহেন।

সাম্প্রতিক যুগের উর্দু-সাহিত্যে ইসমাত চুগতাই সমধিক জনপ্রিয় প্রখ্যাতা ছোট-গল্প লেখিকা। প্রগতিশীল সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর ভেতর প্রথম কাতারেই তাঁর স্থান। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা নিয়ে লিখে থাকেন তিনি। সমাজ দেহে অনুপ্রবিষ্ট যৌন-বিশৃংখলার বলিষ্ঠ ও সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক তিনি। এদিক দিয়ে চলতি যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় উন্মার্গ-গামী ছোট-গল্পকার মাণ্টোর অনুসারী তিনি। কিন্তু মাণ্টোর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও জনপ্রিয়তায় কোন অংশে তিনি হীন নহেন। তিনি সাংস্কৃতিক বিধ্বংস ও সমাজে প্রবহমান উচ্ছৃংখলতার

বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। তিনি সমাজদেহে পুঞ্জীভূত সকল-প্রকার কুসংস্কার, মূর্খতা, জড়তা, দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। অথচ ইনি অতিমাত্রায় সবলতা প্রকাশ করে থাকেন। যৌন-সমস্যা ও সমাজ চিত্রায়নে অনন্য সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেও সংস্কারক হিসাবে ইনি পূর্ণ কৃতিত্ব ও প্রশংসার দাবী করতে পারেননি। সম্ভবতঃ তিনি অন্য কোন পন্থা খুঁজে পাননি। কিছুসংখ্যক সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর কাহিনী যৌন-ক্ষুধা ও অশ্লীলতা-দুষ্ট। কিন্তু তাঁর অংকিত চরিত্রগুলো যৌণতা-দুষ্ট হলেও নিছক্ ভুয়ো নহে। এঁর গল্পে সুপ্রকাশিত সমুজ্জ্বল-সত্য ও ঘটনা-বিবর্তনকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। তার কাহিনীগুলো সমাজ জীবনের বাস্তব-প্রতিচ্ছবি। এর রচনা অসহণীয় হলে আমাদের সমাজ-জীবনের উচ্ছৃংখলা নিঃসন্দেহে অসহনীয় প্রমাণিত হবে। তাকে সমালোচনা করতে গিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে আমরা নিজেদের সমাজ, ব্যক্তিক-জীবন, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতিরই সমালোচনা করে থাকি। নিজেদের অবয়বের প্রতি দৃষ্টি লাভের জন্য আমাদের হাতে স্বচ্ছ-দর্পণ তুলে দিয়েছেন তিনি। এদিক দিয়ে তিনি মাত্র সপ্রশংস কৃতিত্বের দাবী-দার নহেন—অনন্যও।

মুসলিম-সমাজ-জীবন রূপায়ণই তাঁর রচনার মূল-উৎস। পূর্ণ-ইসলামী-ভাবধারা-সম্বলিত নিষ্ঠাবান মুসলিম-পরিবারে মানুষ হওয়ায় এদের জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত ঘটনাই তাঁর নখ-দর্পণে। এদের জীবনের সুখ-দুঃখ সাফল্য-ব্যর্থতা, উত্থান-পতন ও মতদ্বৈধতার সুষ্টু চিত্রকর তিনি। প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব-চিত্র ইহার কাহিনীগুলিতে রূপায়িত হওয়ায় পাঠক সর্বক্ষণ এদের সাথে আপন-সত্ত্বার সাদৃশ্য খুঁজে পান। 'তিল' 'লিহাফ' ও 'পেশা' তার সমধিক আদর্শ স্থানীয় কাহিনী। 'দোজখী' তার উৎকৃষ্ট মৌলিক-রচনার উজ্জ্বল-স্বাক্ষর। সমগ্র উর্দু-সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি খুব কমই আছে।

কেবলমাত্র যৌন-সংক্রান্ত আলোচনার ভেতর তার শিল্প প্রতিভা সীমিত নয়—বিবর্তিত-যুগধারার পরি-প্রেক্ষিতেও তিনি প্রভূত-প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ধানী বানকিয়ান' ও অন্যান্য কাহিনী তার বিবর্তন-প্রদীপ্ত সুস্থ সবল মানসিকতার সুক্ষ্ম বিচারক্ষম বৈদগ্ধের প্রামাণিক স্বাক্ষর। যৌন-সমস্যা বাদ দিয়ে জীবন দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সুক্ষ্মসমস্যাগুলোর দিকে ইনি এখন লেখনি সঞ্চালন করেছেন। তাঁর অতিমাত্রায় লজ্জাশীলতার প্রকাশকে অনেকে নিছক ভূয়া লজ্জাশীলতা বলে মনে করে থাকেন। ইনি 'তেহরী-লাকীর' ও 'জিদ্দী' নামক দু'খানা বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেছেন। অগণিত জনগণের জাগৃতি মানসে ইনি সাহিত্য-সাধনায় রত।

তাসনীম সলিম চাট্টারী অল্পকালের ভেতর সাধারণ পাঠক-মহলে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আয়মা-ঐতিহ্য ও বুর্জোয়া-মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও তিনি সামন্তিক স্ত্রীজাতির দাম্ভিকতা হীন-প্রভ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এ-গতি-প্রবণতা অদ্ভুত হলেও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কোন কোন সমালোচকের মতে তাঁর কাহিনীগুলি রোমান্স-অনুভূতি চিত্ত-সংক্ষোভ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রেম ও ভাব-প্রবণতার ঝর্ণা থেকে উৎসারিত হয়েছে। অবশ্য প্রেম-আনন্দ ও সুখ-অনুভূতির কাহিনী তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু বিয়োগান্ত কাহিনী যেমন আবশ্যিকরূপে জীবনের মাশুল আদায় করে, ঠিক তেমনি তার কাহিনীতে ভাব-উদ্দীপনা, করুণ-রস, হীন-প্রবৃত্তি ও ক্ষুধা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য জীবনের বিয়োগ-বেদনা—হতাশা, অবিচার, ভাগ্যের নির্মম-পরিহাস ইত্যাদির কথা থাকলেও তিনি তাঁর কাহিনীতে কোন দিন তা প্রচারের প্রচেষ্টা করেন নি। অনেকের মতে তার কাহিনাতে শারদ-কালীন আরণ্যক নিঃসঙ্গতা অনুভূত হয়। গ্রীষ্মের সতেজ জীবন চাঞ্চল্য অনুপস্থিত। তাঁর কাহিনীতে মাঝে মাঝে নৈরাশ্য-বাদের ছাপ পরিদৃষ্ট হয়। বাংলার দুর্ভিক্ষের কাহিনীকে কেন্দ্র করে তাসনীম কয়েকটি চিত্তাকর্ষক—গল্প রচনা করেছেন। তাঁর সুখ-পাঠ্য গল্প-পুস্তকগুলি হচ্ছেঃ 'টুট্ গিয়া এক-তারা' (একটি ছোট গল্প) ও "ভুখা হায় বেংগল"।

হিজাব ইমতিয়াজ আলী দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে জন্মগ্রহণ করলেও মাদ্রাজে যৌবন অতিবাহিত করে পরবর্তীকালে ইনি পাঞ্জাবে বসতি-স্থাপন করেন। কল্পনার দিক দিয়ে ইনি নিজস্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এই কল্পনা জগতের বাসিন্দারা মানবরূপী হলেও কোন কোন দিক দিয়ে এরা যেন রক্ত-মাংসের জগতের মানুষ নয়। এঁর গল্পে সৃষ্ট স্থায়ী চরিত্রগুলো—প্রৌঢ় মাতামহ, জোবায়দা, ডাঃ ঘর্, স্যার হার্লি, প্রোহি ও নিগ্রো-মহিলা জোনস যেন একই পরিবার ভুক্ত। তাঁর গল্পগুলো প্রেম ও রোমান্সকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, বিস্তার-লাভ করে এবং বিকশিত হয়। কিন্তু পাশব প্রবৃত্তি বা অশ্লীলতার-ছাপ পরিদৃষ্ট হয়না কোথাও। তাঁর সৃষ্ট-নায়ক-নায়িকারা প্রগতিশীল-ভাবধারা-প্রদীপ্ত। এঁরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভালবাসার স্বপ্নময়-জগতে বাস করে; এবং প্রেমিকের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার উর্ধে-অবস্থিত। তাঁর বচন-ভংগী গতিশীল ও কবিত্বময়। ভাষা এত ব্যঞ্জনা-বহুল, মধুর ও ছন্দোময় যে কবিতা বলে ভ্রম-সংশয় উপস্থিত হয়। এঁর কাহিনী ঐন্দ্রজালিক,

রমনীয় ও মনোমুগ্ধকর হলেও আবেগ-প্রবণতা, চিত্ত-বিপ্লব, ইন্দ্রিয়ানুরাগ আতিশয্য অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর রোমান্টিক-গল্প-রচনা লঘু-গতি ও অগভীর মননশীল হওয়ায় এদের স্থায়ী-মূল্য নেই। সকল প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য-মহলে এঁর খ্যাতি আজ লুপ্ত-প্রায় এবং তাঁর গল্পের যুগও অতীত হয়ে গেছে। চলমান-সমাজ ও জীবন দর্শনের সাথে তাঁর সৃষ্টি আজ সম্পূর্ণ-সংগতি-বিহীন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলোর ভেতর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে—'আন্ধেরা খোয়াব।' এটি উর্দু-সাহিত্যের স্বল্প-সংখ্যক রচনার ভেতর অন্যতম।

বিশেষ আবদুল কাদির বিশেষ সমঝদার ও অভিজ্ঞ লেখিকা। মানসিক জীবনে তাঁকে অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এঁর অভিনব বলিষ্ঠ ও সৃজনশীল প্রতিভা অক্ষুন্ন রয়ে গেছে শেষ-অবধি। অতি-বাস্তব উপদেশাত্মক কাহিনীর দিকে এর প্রবণতা বেশী। উর্দু-সাহিত্যে তিনিই একমাত্র লেখিকা যিনি তাঁর গল্পে রহস্য ও অতিপ্রাকৃততায় ভত্তি করে অগ্রসর হন। তার "রবাবত" গ্রন্থটি পাঠককে শিহরিত করে তোলে। এঁর "লাশন কা শহর," 'রাহিবা,' 'ওয়াদি-ই-খাক,' গল্প-সংগ্রহগুলি বেশ সুখ-পাঠ্য। প্রয়োগ-কৌশলের দিক দিয়ে এ-গুলি নিঃসন্দেহে সার্থক ও সুন্দর সৃষ্টি। সুনির্দিষ্ট আদর্শ-প্রচার-প্রচেষ্টা অনুপস্থিত হওয়ায় সময় ও শক্তির অপচয় ঘটেছে অনেকাংশে। কলা সৌন্দর্যের পর্যাপ্ত ছাপ না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন পাঠক মহলে তাঁর সৃষ্টিসমূহ জনপ্রিয় অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের সমালোচকের দৃষ্টিতে তার অধিকাংশ রচনাকর্মই জীবন-দর্শন ও কলা-সম্পর্ক-হীন।

ডাঃ রশীদ জাহান উর্দু-সাহিত্যের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পূর্ব দলভুক্ত। তিনি প্রসিদ্ধ "আংগারা" গ্রন্থের অন্যতম প্রখ্যাত লেখিকা। এই গ্রন্থখানা উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমূল বিবর্তন ও বিপ্লব সংঘটিত করেছে। মৌলিক চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারিনী ডাঃ রশীদ জাহান উর্দু-সাহিত্যের একজন উগ্র-আধুনিকপন্থী লেখিকা। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিয়াশীল বকের বিরুদ্ধে নব-বিধান ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে এককালে যে-সব মহিলা সাহিত্যিক অসম সাহসিকতার সাথে বিপ্লব ঘোষণা করে চিন্তার লড়াই চালিয়েছিলেন, ডাঃ রশীদ জাহান তাঁদের পুরোধা। নব-বিধান ও প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সংগ্রাম চালিয়েছেন তিনি আমরণ। সমাজের তথাকথিত নির্যাতীত জনগণের জন্য তাঁর বেদনা-বোধ অপরিসীম। এদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহন করেছেন। ব্যক্তি ও গণস্বাধীনতায় তাঁর এ-ভূমিকা সরকারকে পর্যন্ত সন্ত্রাসিত করে তোলে। এজন্য তাকে আদালতের কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়েছে।

বাংলার শায়েস্তা আখতার সোহরাওয়ারদী জন্ম সাহিত্যিক নহেন। সমপ্রতি তিনি করাচীতে বসতি স্থাপন করেছেন। ইনি স্বভাবতঃ রাজনীতি, মহিলা সাংস্কৃতিক ও সংস্কারমূলক সংস্থার সাথে জড়িত আছেন। ইনি অভিজাত বংশীয়া। সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ভাবধারা সম্বলিত পরিবারে লালিত হওয়ায় সাহিত্য-চর্চা ও জ্ঞানা-নুশীলনের প্রতি ইহার অদম্য স্পৃহা প্রকাশ পায়। ইসলাম সংগঠন-কেন্দ্রিক কতকগুলো কাহিনী লিখেছেন ইনি। সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। সরল বাচন-ভংগী ও মার্জিত রুচিজ্ঞানের জন্য ইহার কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। রচনায় বিশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না।

হাজিরা মাশরুর ও খাদিজা মশরুর দু'বোনকে একই দলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এঁরা হচ্ছেন প্রগতিশীল গোষ্ঠীভুক্ত মার্ক্সের অনুসারী। খাদিজার গল্প-সংকলন "ভূচর' এবং হাজিরার "চরখা" ও "হায়-আল্লাহ" অনেক-আগেই সাধারণ পাঠক-মহলে সমাদৃত হয়েছে। এদের সামপ্রতিক কালের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর ভেতর 'আন্ধেরে উজালে' ও 'চান্দ রোজ' সমধিক বিখ্যাতি অর্জন করেছে। সুক্ষ্ম-বৈজ্ঞানিক-চিন্তাধারা, সুন্দর-সাবলীল প্রকাশভংগী এদের কাহিনীর বৈশিষ্ট্য। এরা উভয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক, যৌন ও অর্থনৈতিক দিক নিয়ে লিখে থাকেন। নুতন-সমাজ-ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান গড়ে তোলাই এদের কাহিনীর মুখ্য বিষয়-বস্তু। অতীত-আচার-ব্যবহার ও ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন এঁরা উভয়েই। এঁদের কলা-কৌশল সম্পূর্ণ শিল্পীক ও বাস্তবধর্মী। সেজন্যে কোন পাঠকই এদের রচনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না। কেননা চিন্তার-গভীরতা, মৌলিকতা, সারল্য, স্পষ্টবাদীতা ও রচনা-সৌন্দর্যই পাঠকের মনকে অজ্ঞাতসারেই জয় করে নেয়। এরা এদের সুক্ষ্ম-বর্ণনায় বিশেষ সাহস ও সারল্যের পরিচয় দিলেও অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকদের মতো—উন্মার্গগামী নহেন। জীবনের সমস্যাকে এঁরা যেমন ভাবে দেখেন ঠিক তেমন ভাবেই প্রকাশ করে থাকেন এবং এদের রচনার বিষয়-বস্তুও নেওয়া হয়েছে আজাদী লাভ ও তাঁর অনুবর্তী-ঘটনাগুলো থেকে। আমাদের সমাজ-দেহে নিহিত ভয়াবহ বিশৃংখলা, অনভিপ্রেত কাণ্ডকারখানা, দুর্বলতা তথা বিরাট দোষ-ত্রুটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে দিয়ে এঁরা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট কল্যাণ-সাধন করছেন। এদের দু'বোনের রচনাকর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা

করে দেখা যায়, সম্পূর্ণতা ও চিন্তাধারায় খাদিজা এবং বহুদর্শি-কলা-জ্ঞান ও সরল-সাবলীল বচন-ভংগীতে হাজিরা স্বতন্ত্র-আসন সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

শাকিলা আখতার বিহারের বাসিন্দা। তাঁর গল্পগুলি কলাজ্ঞানের দিক দিয়ে উঁচুমান দাবী করতে পারে। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভূতি-প্রবণ জীবনের বাস্তব চিত্রাংকনে তিনি সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। সরল সুন্দর চলতি ভাষায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্রাংকনেও তিনি বিশেষ সিদ্ধ-হস্ত। তাঁর কাহিনীতে মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

মহিলা ঔপন্যাসিকদের ভেতর নাজার সাজ্জাদ হাইদার, কুর্‌রাতুল-আইন হাইদার, এ, আর, খাতুন ও ইসমাত চুঘতাই সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত লেখিকার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। নাজার সাজ্জাদ হাইদার দিল্লী ও লখ্‌নৌর গতায়ু এবং গোঁড়া সভ্যতার জীবন্ত-চিত্র অংকন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী যাতে সুখ-পাঠ্য মনে হয়, সেজন্য সবিশেষ নিপুণতার সাথে সমাজের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক গতি-ধারার সমন্বয়-সাধন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা প্রেমঘটিত ব্যাপারে অসম সাহসিকতার পরিচয় দেয়; কিন্তু তাতে প্রচলিত ধ্যান-ধারনা ও নিজস্ব প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না, যদিও কয়েকটি চরিত্র পরিণামে সাহসের সাথে এ-সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে: 'নাজমা' ও 'আখতার-উন্‌-নিসা।'

কুর্‌রাতুল-আইন হাইদার—নাজার সাজ্জাদ হাইদারের কন্যা। পিতা সাজ্জাদ হাইদার ইয়াল্‌দারামের প্রতিভার উত্তর-অধিকারিণী তিনি। তাঁর সাথে হিজাব ইমতিয়াজ আলীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তাঁর কাহিনী বুর্জোয়া সম্প্রদায়ে জীবন-ধারার রোমান্টিক দিকে আলোক সম্পাত করেছে। ইহাতে সত্য ও বাস্তবতা—পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ-গুলো সামন্তিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যুগধারার বিবর্তনে জায়গীরদার-জমিদার গোষ্ঠির অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত প্রায়। কুর্‌রাতুল-আইন হাইদার সম-সাময়ীক লেখিকাদের ভেতর চিহ্নিত আসনের অধিকারিণী। তিনি নিজেই তাঁর আদর্শ। তার শিল্প-বোধ, প্রয়োগ কৌশল, চরিত্র সৃষ্টি ও বিষয়বস্তু সকলই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। কতিপয় সমালোচকের মতে তাঁর ষ্টাইল কৃত্রিমতা দুষ্ট। চরিত্রগুলো স্ব-সমাজের দুর্বল, বিকৃত, অধঃপতিত ও পথ-ভ্রষ্ট মানুষেরই জলন্ত-প্রতিচ্ছবি। অন্তঃসার-শূন্য সমাজের ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনা ও শঠতা তার তার কাহিনীর আখ্যান-বস্তু। অতি-আধুনিকা বুর্জোয়া যুবতীর জীবন্ত-চিত্র এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকৃত-দিকটাই তিনি আমাদের দৃষ্টি-পটে তুলে ধরেছেন। তার কাহিনীর নায়িকা চরিত্রগুলোর চলন্‌-বলনে একটা ভুয়ো-রোমান্টি হাব-ভাব ফুটে উঠেছে। এরা যেন ষ্টুড্‌বেকারের অভিনব সংস্করণ ছুৎমার্গ-সম্পন্না ভর-যৌবনা যুবতী। আধুনিক-ফ্যাসানের চোখ্‌-ঝল্‌সানো ড্রইং-রুম ও ক্লাব-প্রবণ হলেও এরা নির্ঝঞ্ঝাট-সুখশান্তি ও আরাম-আয়াস প্রিয়। পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। বিরুদ্ধমুখী বিপ্রলাপ ও নেতিবাচকতার জন্য চিন্তাধারা জটিল, দুর্বোধ্য ও অবিজ্ঞান-সুলভ হতে বাধ্য হয়েছে। কারো কারো মতে তার কাহিনীতে বাস্তব জীবনের ছাপ না থাকায় সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে না। যাহোক, তাঁর সৃষ্টি-সম্পর্কে এ-কথা সাহস করে বলা যায় যে, ভাব-প্রবণতা ও কৃত্রিমতার পিছনে বাস্তব-জীবনের ছাপ পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়। তাঁর 'সিতারোঁ সে আগে' উপন্যাসখানায় এ-কথার হুবহু প্রমাণ মেলে। কুররাতুল-আইন-হাইদার পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সবিশেষ প্রভাবান্বিত। তাঁর চরিত্রগুলো ইহার সুস্পষ্ট রূপায়ণ। কেননা তাঁরা প্রাচ্য-দেশীয় হলেও পুরোপুরি পাশ্চাত্য দৃষ্টি-কৃষ্টি ভাবাপন্ন। চরিত্রগুলোর চাল-চলন গতিবিধি, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী, কথাবার্তা প্রায় পুরোপুরি পাশ্চাত্যধর্মী। এ-ধরণের চরিত্র-চিত্রন মারফত কুররাতুল-আইন-হাইদার বার্নিশ করা পাশ্চাত্য সভ্যতার জরাজীর্ণ মুখোশধারী আমাদের আধুনিক যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি পরোক্ষ-ইংগিত করেছেন। তিনি আমাদের প্রাচ্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতার উন্নত ও মূল্যবান দিকটা নির্দেশিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলো আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন সমাজের গতিধারার মূল্যবান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষন। 'মেরে ভি শানামখানে' শীর্ষক উপন্যাসের জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এটি এমন একটি লোভনীয় উপন্যাস যা' গোড়া থেকেই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে তোলে। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে নিছক একটি রোমান্টিক পরিবেশে – ধীরে ধীরে প্রেমের যাদুকরী ছোঁয়া রহস্যজাল বিস্তার করে হালকা-চরিত্রগুলোকে সমুজ্জল করে তুলেছে এবং পরিণামে বাস্তবতা-মণ্ডিত বিভ্রান্তিকর ঘটনাবলীর দ্বারা প্রেম-সম্পন্ন ও পরিকল্পনা পূর্ণতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সিদ্দুর মাহমুদা রাজভিয়ার গল্প সাধারণ ইতিহাসিক ও রোমান্টিক-ঘটনা-কেন্দ্রিক। এ-পর্য্যন্ত তাঁর অনেকগুলি গল্প-সকলন প্রকাশ লাভ করেছে। সরল-সুন্দর-বাচন-ভংগী ও চমকপ্রদ কাহিনীর জন্য ইনি পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

দিল্লীর সালিহা আবিদ হোসেন এক সংস্কৃতিভাবাপন্ন উচ্চবংশজাত। তাঁর কাহিনীতে নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার-

প্রচেষ্টা উপস্থিত। এর কাহিনীতে জীবনের বাস্তব-ঘটনা কল্প-সৌষ্ঠবে সুষমা-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সিদ্দিকা বেগম সেওহারভি কম্যুনিষ্ট মতবাদপন্থী। তাঁর চরিত্রগুলি সমাজের নিম্ন-তলার সংগ্রামশীল মানুষের প্রতীক। কৃষাণ-মজদুর প্রভৃতি শোষিত জনগণের জীবন-সংগ্রাম তাঁর কাহিনীর মূল উৎস। তাঁর কাহিনীতে বাস্তব-ধর্মী ও শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভংগীতে গণ-আন্দোলন রূপায়ণ-প্রচেষ্টা সুপ্রকাশ। পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। বর্ণনা-ভংগী সরল ও চলতি হলেও সাহিত্য-সৌন্দর্য কোন অংশে ব্যাহত হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরস্পর-বিরোধী চিন্তা ও ভাবধারাকে সাহসিকতার সাথে প্রকাশ করে দিয়ে তাদিগকে সংগ্রামরত গণশক্তিতে যোগদানের ইংগিত করেছেন তিনি। তাঁর মতে এটিই হচ্ছে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রতিশ্রুতিশীল রঙীন ভবিষ্যতের পথ।

হামিদা সুলতানার গল্পগুলো শুধুমাত্র কল্পনা রসে আপ্লুত নয়। বাস্তব ঘটনা ও সত্যকে কাহিনীতে রূপান্তরিত করায় এগুলো কল্পনা প্রধান উপন্যাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শনের প্রতি অনুরক্ত নন। তাঁর বহু-প্রসারিত দৃষ্টি-দর্শনে সকল শ্রেণী ও সমাজের বাস্তব ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন শ্রেণীর ভেতর তিনি ভেদ-প্রাকার সৃষ্টি করেন নি। চমকপ্রদ কাহিনী, বাক্-পটুতা ও সাবলীল প্রকাশ-ভংগী ইহার বৈশিষ্ট।

রাহাত আরা বেগমের জন্মস্থান বাংলা। তাঁর প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ 'বাঁশরী কী আওয়াজ', 'ঘুনাছা-ই-আফছানা' এবং 'শাহ কী পুকার' উঁচুস্তরের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সংস্কারমূলক সাহিত্যিক বিশ্লেষণ। সামাজিক উন্নয়ন সাধনই তাঁর কাহিনীর সারবস্তু। কিন্তু সাহিত্যরসের সংমিশ্রনে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালোরে বাসিন্দা মমতাজ শিরীন দেশবিভাগের পর করাচীতে বসতি স্থাপন করেছেন। এর কাহিনীগুলো প্রাত্যাহিক জীবনের মনস্তাত্বিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। কাহিনীগুলো প্রধানতঃ বর্ণনামূলক। ইনি কৌমার্যের প্রতি কিছুটা অনুরক্ত। তাঁর বাচনভংগী সরল হলেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য প্রদীপ্ত। ইনি অপেক্ষাকৃত কম মৌলিকত্বের অধিকারিণী এবং অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য-ভাবাপন্না। তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত। তাঁর চিন্তাধারাও অস্পষ্ট। তাঁর এই প্রচ্ছন্ন অবচেতনতা অতি সংবৃত্তির ফল, না এর পিছনে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা' বিশ্লেষন করে দেখা আধুনিক সমালোচকের কর্তব্য। প্রগতি কিংবা রক্ষণশীল কোন্ গোষ্ঠিতে যোগ দেওয়া উচিত, বোধ হয় এখনো পর্যন্ত তিনি তা' স্থির করতে পারেন নি। আজো পর্যন্ত তিনি মতদ্বৈধতার দোলায় দুলছেন। তাঁর কাহিনী পাঠে স্পষ্ট দিবালোকের মতো এ-সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। কিছুসংখ্যক সমালোচক এ-সম্পর্কে কতকগুলো মন্তব্য করেছেন কিন্তু ইনি তা' স্বীকার করে নিতে রাজী নন। যাহোক, সাহসের সাথে কোন এক দলে তার যোগদান করা উচিত। এ-ভাবে আর বেশী দিন তিনি দু'গোষ্ঠীর মনস্তুষ্টি করে চলতে সক্ষম হবেন না। প্রগতি-শীল গোষ্ঠী তাঁকে নিজেদের দলীয় বলে ঘোষণা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অথচ অন্য দলে যোগ দিতে তিনি রাজী নহেন। প্রত্যেকটি জ্ঞান-জীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো তিনি মনস্তাত্বিক দ্বিধা সংশয়ের দোলায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। এঁরা পরস্পর-বিরোধী দু'গোষ্ঠীর যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে চান—একদলে প্রকাশ্যে অপরটিতে প্রচ্ছন্নভাবে। 'আপনা নাগরিয়া' শীর্ষক গল্প-সংকলনের জন্য তিনি বিশেষ প্রখ্যাতি অর্জন করেছেন। এর গল্পগুলি প্রেম-রোমান্স, কর্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কখনো কখনো তার নায়ক-নায়িকারা আত্ম-ত্যাগী, অনমনীয়তায় দীপ্ত স্ত্রী-পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়। লেখিকার বর্ণনায় ও চিত্রাঙ্কনে নিঃসন্দেহে আরো বেশী সমালোচকসূচক ও বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়া প্রয়োজন। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বাঙ্গালোরের মমতাজ শিরীণ আর আজ করাচীর মমতাজ শিরীনে ঢের পার্থক্য বিদ্যমান।

শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ অপর একজন জনপ্রিয় লেখিকা। ইনি বিভিন্ন উর্দু-সাময়িকীতে মাঝে মাঝে মহিলাদের জন্য লিখে থাকেন। বিদেশ ভ্রমন ও মনস্তাত্বিক বিষয়েও তিনি কিছু কিছু লিখেছেন এবং ভবিষ্যতে লেখার আশা পোষণ করেন। তার 'কুসিস-ই-নাতামাম' যথার্থ সাফল্যের নিদর্শন।

আমিনা নাজলী ব্যঙ্গ ও রসরচনাতে সিদ্ধহস্তা। ধর্মীয় গোড়ামি, সংস্কার, রীতিনীতি, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দুর্গতি ইত্যাদিই তাঁর প্রকাশভংগী সহজ-সুন্দর এবং তাতে একটা পরিচিত পরিবেশের ছোঁয়া পাওয়া যায়। তার 'দোঁশালা' ও 'হা অতর তুম' বড় চমৎকার সৃষ্টি।

এ. আর. খাতুনের উপন্যাস কাহিনী বহুল। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অদৃষ্ট-পূর্বঘটনা, আত্ম-ত্যাগ ও ভণ্ড-বদমায়েশদের বিরুদ্ধে মহৎ চরিত্রের সংগ্রামশীলতায় পরিপূর্ণ। তাঁর

সৃষ্টনায়ক-নায়িকারা প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উন্নত-চিন্তা, অনমনায় কর্তব্য পরায়নতা, সচেতন দায়িত্ব-বোধ, প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও শৌর্যবীর্যবোধ থেকেই কর্মক্ষম কুলীনের সৃষ্টি করেছেন। বেশীর ভাগই কল্পনা সৃষ্ট হলেও তাঁর উপন্যাসগুলো শেষ পর্যন্ত বেশ উপভোগ্য ও আকর্ষনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'তস্‌বীর' ও 'শাম আফ-ছান' তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প লেখিকা হচ্ছেন ফাতেমা বেগম, লাইলা বেগম, লাখ্‌নৌর শিরীন মুহম্মদ হুসেন, শালিকা বানু, সানজিদা আশরাফ, সৈয়েদা আশরাফ ও আখতার মাহমুদ। স্থান অভাবে তাদের কথা পৃথকভাবে আলোচনা করা সম্ভব হোল না। এক্ষণে, হায়দারাবাদ ও দাক্ষিনাত্যের মহিলা সাহিত্যিকদের কথা আলোচনা করা যাক। এদের ভেতর অনেকেই উর্দু সাহিত্যে প্রথম শ্রেণী পাওয়ার যোগ্য।

জাহান বানু উইমেনস্‌ কলেজের উর্দু বিভাগের রীডার। মূল্যবান ও চমকপ্রদ প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। উচ্চ শিক্ষিত ও সাহিত্যিক ভাবধারা সম্বলিত পরিবারে তিনি মানুষ। মিরজা নাসিরুল্লাহ খাঁন দওলাত ইয়ার জংগ তাঁর মাতামহ দিক দিয়ে। ইরানের প্রভাবশালী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ভেতর তিনি অন্যতম। সুক্ষ বুদ্ধি, বহুশিতা ও বিদ্যাবত্তার জন্য হায়দরাদেও তিনি বহু প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'দাসতানই তার্ক তাজানই হিন্দ' পণ্ডিত মণ্ডলীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাহান বানু যে-সময় সাহিত্য সাধনা শুরু করেন তখন একমাত্র সোগরা হুমায়ুন মিরজা ছাড়া আর কেহ হায়দরাবাদে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেননি। তাঁর সুখপাঠ্য গল্পগ্রন্থ 'রাফ্‌তারই খেয়াল' কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর গল্পগুলি দু'শ্রেণীভুক্ত—মৌলিক ও অনুবাদ। কিন্তু তার অনুবাদ এত স্বচ্ছ ও সাবলীল যে মৌলিক সৃষ্টির চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। এগুলি বিদেশী বলে আদৌ মনে হয়না। বিষয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য করে নিজ রীতি ও গতিধারা অনুযায়ী এগুলো বেশ চমক-পদ ও চিত্তাকর্ষক। তিনি সাধারণতঃ দুর্বল দিকটা সরল বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁর ব্যঙ্গোক্তি বেশ সুখদ, কার্যক্ষম ও ফলপ্রদ। সমাজ দেহের বিকৃত ও কৃত্রিম দিকটার মুখ উন্মোচন করেছেন তিনি। সরল চলতি ভাষা ব্যবহার ও চরিত্রাংকনে তিনি শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি ছোট গল্প না লিখে ইনি সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ লিখছেন। সম্ভবতঃ তিনি ছোট গল্পের আসর থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

জিনাত সাজিদা—হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সসম্মানে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন—পরে কৃতিত্বের সাথে সাহিত্যে এম, এ, ডিগ্রি লাভ করেন। এক্ষণে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের উর্দু শিক্ষা-দানের জন্য অধ্যাপিকা নিযুক্তা আছেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নত হায়দরাবাদের এক প্রসিদ্ধ মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ লাভ করে। তাঁর 'জল-তরংগ' সুধী ও সাধারণ পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। হায়দরাবাদের ভেতর তিনিই সর্বাধিক জনপ্রিয় ছোটগল্প লেখিকা।

তাঁর কাহিনী তথাকথিত প্রগতিশীল গোষ্ঠীর অন্যান্য উন্মার্গগামী সাহিত্যিকদের মতো সমস্যাবহুল নয়। কল্যাণকর, পরিমার্জিত ও উন্নত-রুচিসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর মূল লক্ষ্য। বাস্তব জীবনের সত্য ঘটনাকে তিনি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও চমকপ্রদভাবে রূপ দিয়েছেন। আখ্যান-ভাগ ও চরিত্র সৃষ্টির সাথে সর্বত্র সুসংবদ্ধ সংহতি বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো যেন এক একটা জীবন্ত মানুষ। হায়দরাবাদের প্রাত্যহিক জীবনের উন্নত ও বিকৃত দু'টো দিকই তিনি বিচিত্র করে থাকেন। তিনি অনেকগুলো ব্যাঙ্গাত্মককাহিনীও লিখেছেন। ইহাতে উচুস্তরের সাহিত্য-প্রতিভা ও সুমার্জিত কলাজ্ঞানের ছাপ সুস্পষ্ট। এদিক দিয়ে বিচার করলে মৌলিকতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যঙ্গ-কাহিনীগুলির ভেতর 'আগার মাই মরদ হোতি' এবং 'আল্লাহ মিয়া আওরত হোতি'—সবোৎকৃষ্ট সার্থক সৃষ্টি।

সাইদা মজাহার হায়দারাবাদের জেনানা কলেজের লেকচারার ছিলেন। অতঃপর শিক্ষা বিভাগে প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেছেন। ইনি প্রধাণতঃ ছোট-গল্প রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইনি "বেগম" শীর্ষক পার্ল এস, বাকের একটি নাটিকা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদকর্মে মৌলিক-সৌন্দর্য ও ভাবধারা কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। আখ্যান-ভাগ ও চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে তাঁর গল্পগুলো মৌলিকতা-সম্পন্ন উচ্চ প্রতিভার স্বাক্ষর নিঃসন্দেহে বহন করে।

সুলতানা আজিজ এম, এ, হায়দারবাদস্থ ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা। ইনি দিল্লীর বিখ্যাত শামসুল্‌ উলামা মওলানা সৈয়েদ শাহ নাজার হাসানের পৌত্রী। ইনি

প্রধানতঃ ছোট গল্প ও কবিতা লিখে থাকেন। বলিষ্ঠ-সরল প্রকাশ-ভংগী এঁর বৈশিষ্ট্য। এর সৃষ্ট চরিত্রে বাস্তব জীবনের ছাপ অনুপস্থিত নহে। মাঝে মাঝে সঙ্গীব-ভাবধারা ও সোৎপ্রাস পরিলক্ষিত হয়। এঁর দৃষ্টি-ভংগী সুস্থ ও উন্নত।

রফিয়া সুলতানা উপরোক্ত কলেজের অধ্যাপিকা। এঁর জন্ম-স্থান আওরংগাবাদ। ছোট-গল্প রচনায় ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর সুখপাঠ্য প্রথম গল্প-সংগ্রহের নাম হচ্ছে: 'কাচকা দাগা।' ইনি বিশেষ নৈপুন্যের সাথে মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলোয় আলোক-সম্পাত করে থাকেন। তিনি চলতি-যুগের শক্তি-লিপ্সু ও শান্তিকামী মানুষের সর্বাঙ্গীন সুন্দর চিত্রাংকনে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরে নাম করতে হয় আজিজুন্নেছা হাবিবী বি, এস্-সি'র। ইনি বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিতা হলেও গোড়া থেকে সাহিত্যের প্রতি অনুরক্তা। তাঁর "তাম বাদী সাং দিল হোয়া" শীর্ষক প্রথম গল্প-গুচ্ছ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ইনি এমন এক সংগতি-সম্পন্ন ধনী পরিবারে জন্ম-লাভ করেন যাঁরা সাহিত্য-চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি পুরোপুরি উদাসীন। এ-জন্যে সাহিত্যিক-মহলে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সংগ্রাম ও বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর আলেখ্যগুলি মূলতঃ রোমান্টিক আধুনিকা যুবতী মেয়ের রোমান্টিক জীবনের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে দিয়ে তাঁর জীবন নাটিকার শেষ-অংকে প্রতীক্ষিত মৃত্যু-যবনিকার আভাষ দিয়েছেন। তাঁর কাহিনীতে স্ত্রী-পুরুষ তরুণ মনের পারস্পরিক মিলন-প্রকৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। এরূপ প্রচেষ্টা অবশ্য সংস্কার মূলক। ইহাতে অতীত-ঐতিহ্য পরিহার-প্রচেষ্টা ও এ-যুগের ভাবপ্রবণতার জীবন্ত চিত্র অংকিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কবিতা, সাহিত্য-সমালোচনা ও বিবিধ-রচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক মহিলা সাহিত্যিক লেখনি পরিচালনা করছেন। কোয়ালসমী, জোহরা বেগম প্রমুখ মহিলারা কবিতা ও গজল রচনায় সাফল্য লাভ করছেন। অন্যান্যরা সনেট রচনার চেষ্টা করছেন ও প্রতি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন: উর্দু-সাহিত্যে অংশতঃ অমর কবি আখতার শিরীনই খুব সম্ভবতঃ প্রথম সনেটের প্রচলন করেন। সমালোচনা ও অনুবাদ সাহিত্য মমতাজ শিরীন ও সাম্প্রতিক কালের কিছুসংখ্যক মহিলা লেখিকা— মনোনিবেশ করছেন।

জীবনের প্রতি

এস, এম, এ, রাজ্জাক

কে তুমি জানি না আমি, হে জীবন! হে অপরিচিতা!
শুধু জানি আমাদেরে পরস্পর ছেড়ে যেতে হবে
একদিন, কোনো কথা উচ্চারণ না করে নীরবে ;
আজো তবু রয়ে গেলে সেই তুমি রহস্য-গুণ্ঠিতা।

জানি না কোথায় কবে এবং কিরূপে কোন্‌খানে
আমাদের পরিচয়—প্রথম সাক্ষাৎ। হে জীবন!
যদি এতদিন ধরে ঘনতর বন্ধুর মতন
সুখে-দুঃখে, হাসি ও কান্নায়—এই পৃথিবীর গানে

এক সাথে গান গেয়ে এ-পৃথিবী করেছি মুখর,—
শেষ লগনের সেই দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল তবে
হাসি-মুখে হেলা করা, জানি জানি খুব শক্ত হবে।
তাই তুমি পূর্বাহ্নেই দিও মোরে শেষের খবর

চুপ করে। বলো না অমন করে, বিদায়—বিদায় ;
স্বাগতম জানিও আমারে অন্য আলোর মায়ায়।

বাঁকে বাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব প্রকাশতের পর)

॥ বাইশ ॥

জামাল আসিবে হোমায়েরা তাহাই জানিত; কিন্তু সবদিকে আঁটঘাট বাঁধিয়া সে আসিতেছে, তাহা হোমায়েরার জানা ছিল না। বাসা জোগাড় করা খুবই কঠিন কাজ। তবুও এরমাঝে জামালের বাসাও একটা ঠিক হইয়া গিয়াছে। জামালের উঠিবার মত জায়গার অভাব নাই। অন্যান্যবার আসিলে হাসান সাহেবের ওখানে উঠে। হোমায়েরার বাসায় উঠে না বলিয়াও হোমায়েরা তাহাকে কম বিদ্রূপ করে নাই। কাজেই একটু কৌতূহল হয় বৈ কি!

তাহার বদলী হইয়া আসাটাও যে চেষ্টার ফল, তাহাও হোমায়েরার অজানা রহিল না। হোমায়েরার কৌতূহল তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিল। সবাইর ধারণা, হোমায়েরা মনে করে বিশ্ব তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিবে, আর সে শুধু ধ্রুবতারার মত মিটিমিটি জ্বলিতে থাকিবে। হোমায়েরা নিজে হইতে সাধারণতঃ কোথাও যায় না। কিন্তু এবার জামালের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে নিজেই জামালের বাসা খোঁজ করিয়া গিয়া উঠিল। জামাল বাসায় ছিল না। হোমায়েরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, সারা বাসাই যেন আস্তাবল হইয়া আছে।

একটি লোক কাজ করিতেছিল। সম্ভবতঃ রান্নাবাড়ার জন্য তাহাকে রাখা হইয়াছে। এ-লোকটিই হোমায়েরাকে দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব সাফ করে রাখতে পারো না?

লোকটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিল কোন জওয়াব দিল না। হোমায়েরা বুঝিল, তাহাকে এ-সব করিতে বলা হয় না, তাই সে করে না। হোমায়েরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, যেমন সাব, তেমন মেট জুটেছে।

হোমায়েরাকে বেশী সময় অপেক্ষা করিতে হইল না। জামাল আসিল। কিন্তু জামাল একা নয়, তাহার সঙ্গে আসিয়াছে মেরী।

হোমায়েরার ভিতরটা কঠিন হইয়া উঠিল। জামাল তাহার ওখানে খাওয়ার সময়ই করিয়া উঠিতে পারিল না, অথচ মেরীকে ডাকিতে যাইতে তাহার সময়ের অভাব হয় না।

আগেরদিন হইলে হোমায়েরা ফাটিয়া পড়িত। কিন্তু এখন মনের ভাব চাপিয়া গিয়া সে হাসি মুখে বলিল, এই যে জামাল! কেমন আছো?

হোমায়েরাকে দেখিয়া জামালের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। না ডাকিতে হোমায়েরা এ-ভাবে আসিবে, সেটা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। সে ভিতরে ভিতরে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে মুখে তাহার কথা সরিতেছিল না।

হোমায়েরা ইহাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিল। তাহার ঠোঁটের কোণে চাপ পড়িয়া পেশীগুলি শক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে হোমায়েরা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কি, কথা বলছো না কেন? নিজের অবস্থা নিজেই জানো না, না?

জামাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, আপা। ভাল আছি। তুমি কেমন আছো?

হোমায়েরা বলিল, তবু ভাল। আমি কেমন আছি সে কথাটা তোমার মনে পড়লো।

হোমায়েরা জামালের সহিত কথা বলিয়া যাইতেছিল। মেরী আগাইয়া আসিয়া বলিল, আপা, আমাকে কি দেখতেই পাননি।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, দেখতে পাবো না কেন, তোমাকেই সবচেয়ে বেশী দেখছি।

মেরীর কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইল। সে বলিল, তা হলে একটি কথাও বলেন নি কেন?

হোমায়েরা বলিল, দিন ত তোমারই। কথা বলার সময়ের অভাব হবে বলেই তেমন তাড়াবোধ করছি না।

জামাল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মেরী সহজভাবেই বলিতে লাগিল, আপনি অনেকদিন আমাদের ওখানে যাননি আপা, সে জন্য আম্মা কত দুঃখ করছিলেন।

হোমায়েরা বলিল, দুঃখ করার কিছু নাই, বোন। যখনই দরকার হবে যাবো।

অদরকারে কি যেতে নাই, আপা?

হোমায়েরা এবার হাসিয়া ফেলিল। মেরী সত্যই তাহাকে লজ্জা দিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞানের অভাবটা অনেক ক্ষেত্রেই অমার্জ্জনীয়।

হোমায়েরা বলিল, তুমি সুখী হবে, মেরী।

মেরী ঘরের চারপাশে তাকাইতেছিল। সে বলিল, দেখছেন, জামাল ভাই আর কিছুতেই বদলাবেন না। চারপাশে কেমন নোংরা করে রেখেছেন!

জামাল বলিল, কি করবো বলো? আমি একা মানুষ। রান্নাবাড়া হতে ঘর-ঝাঁট দেওয়া তক সব করতে পারি না।

মেরী বলিল, কি যে বলেন! রান্নাবাড়া করতে হয়েছে নাকি? আর ঐ লোকটি আছে কেন? ঝাঁট দিতে পারে না?

মেরী লোকটিকে ডাকিয়া আনিল। সে বলিল, তরকারী চুলায়, সেটা পুড়িয়া নষ্ট হইবে।

মেরী বলিল, নষ্ট হয় হোকগে। তোমার সাবের একবেলা না খেলেও চলবে। তুমি ঝাড়ু নিয়ে আস।

লোকটি ঝাঁট দিয়া ঘর-দোর পরিষ্কার করিয়া তুলিল। মেরী তাহাকে সঙ্গে লইয়া জিনিষপত্র টানিয়া গুছাইয়া তুলিতে লাগিল।

হোমায়েরার দিকে চাহিয়া বলিল, এখন একটু বসার মত জায়গা হলো, তাই না, আপা? বাপরে বাপ, কি যে অবস্থা করে রেখেছিলেন জামাল ভাই।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, জামাল ভাই যদি বুঝতে পারেন তার কাজটা অন্যে করে দেবে, তা হলে চিরকালই এমনটি থাকবে না।

মেরী বলিল, তবু আমাকে কি আনতে চান! আমি এক রকম জোর করে তাঁর সাথে চলে এসেছি। সংসারের এই ছবি দেখাতে বুঝি শরম করছিল, জামাল ভাই?

জামাল একটা জওয়াব দিত। মেরীর কথার জওয়াব দিতে শব্দের অভাব তাহার হয় না। কিন্তু হোমায়েরা যেন তাহার সকল শব্দ কাড়িয়া নিয়া বসিয়া আছে। একজন তাহাকে করে মুখর, আরেকজন করে মূক।

হোমায়েরাই জওয়াব দিল। বলিল, এ-শরমটুকু জামাল ভাইর থাকা উচিত নয়।

মেরী বলিল, জামাল ভাই আগের মতই লাজুক রয়ে গেছেন, আপা। আম্মা বলেন, এজন্যই জামাল ভাইকে তাঁর খুব ভাল লাগে।

হোমায়েরা জামালের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, দুনিয়ায় একশ্রেণীর অকেজো লোক আছে, যাদেরে অকারণেই অনেকের ভাল লাগে। আর একশ্রেণীর লোক আছে, নিজের কথাটি বলার সাহস নাই বলে অপরের বরাত দিয়ে বলে।

জামাল বিস্মিত হইল। হোমায়েরা আপা যেন আজ আর হোমায়েরা আপা নয়। হোমায়েরা আপার শ্রেণী-ভেদটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। হোমায়েরা আপা যাহাদিগকে সমকক্ষ মনে করেন, তাঁহার বিদ্রূপ শুধু তাহাদের বিরুদ্ধেই শানিত হয়ে উঠে। সে জানিত মেরী তাঁহার অনুকম্পার শ্রেণীতে পড়ে।

জামাল চুপ করিয়া থাকিলেও হোমায়েরাকে এই ভাবে পাইয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। বাহির হইতে খাবার আনাইয়াছিল। কিন্তু হোমায়েরা কিছুই মুখে দিল না। জামাল লক্ষ্য করিল, হোমায়েরা চলিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে যাইতে একবারও বলিল না।

হোমায়েরা রাগ করে, ধমক দেয়, বিদ্রূপ করে তাহাতে জামালের কিছুই আসে যায় না। সেটাই স্বাভাবিক বলিয়া সে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার ব্যতিক্রম জামালকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল। হোমায়েরা আপা একটিবারের জন্যও তাহাকে ধমকালেন না, এটা যে বড়ই অস্বাভাবিক।

জামাল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। মেরী ডাকিল, জামাল ভাই!

জামাল মেরীর মুখের দিকে চাহিল। মেরী বলিল, জামাল ভাই আমি সব বুঝি। হোমায়েরা আপা আমাকে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হোমায়েরা আপা কেন আমার প্রতি প্রসন্ন নন, জামাল ভাই?

জামাল বলিল, তোমার কি মনে হয় আমি জানি?

মেরী বলিল, তুমি আমাকে বোকা ঠাওরিয়েছ তাই না, জামাল ভাই? কিন্তু বুঝেও আমি জওয়াব দিতে পারিনি। আমি যে হোমায়েরা আপাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি, জামাল ভাই।

এই একটি জায়গায় এক হইয়া যাওয়ার বড় জামালের কাছে আর কিছু নাই। সে মেরীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, তোমাকে বোকা ভাবার মত বোকা বলে কি আমাকে মনে হয়?

হোমায়েরার কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে বেশীদিন দেরী হইল না। সে নিজের আত্মীয় স্বজনের সমাজ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, তাহা না হইলে অনেক আগেই সে ইহা শুনিতে পাইত। কথাটি এমন অভাবিত-পূর্ব্ব নয় যে, ইহাতে বিস্ময়ে আকাশ হইতে পড়িতে হইবে। বরঞ্চ সকলের মনে এই রকম একটি সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বে হইতে গাঁথিয়া থাকাই বেশী করিয়া স্বাভাবিক। আকস্মিক ভাবে ইহা ঘটিতে চলিলে, মনে ধাক্কা লাগার সুযোগ আসিত; কিন্তু যাহা সবচেয়ে স্বাভাবিক সে জন্য মনের শুব্ধ হইয়া উঠার কোন কারণ থাকিতে পারে না। হোমায়েরা কথাটা শুনিয়া কিছু সময় ভাবিল, তারপর সে নিজেই একদিন ডাক্তারের বাড়ীতে গেল।

আতিয়াকে হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, মেরীর বিয়ে নাকি ঠিক করে ফেলেছেন, চাচিআম্মা?

আতিয়া বলিলেন, এখনও পাকা কথা হয়নি, মা। আলাপ চলছে। কিন্তু তুমি কি জাননা?

হোমায়েরা বলিল, আমি কিছুই জানিনা, চাচিআম্মা। আর জানেন ত, আমার জানার সুযোগও কম।

আতিয়া হাসিয়া বলিলেন, জামাল যা মুখচোরা সে যে নিজে থেকে কিছু বলবে না, তা জানি। আর ওদের সাথে ত তুমি তালুকই রাখতে চাওনা।

হোমায়েরা বলিল, সে কথা থাক্, চাচিআম্মা। কিন্তু কি হচ্ছে, তাই বলুন শুনি।

আতিয়া বলিলেন, এমন আর কি মা, একদিন ভাই-জান নিজে আর রহিমা বোন এসেছিলেন, দুটিতে ছোট বেলা হতেই ভাব। আর জামালকে এতটুকু হতে আমরা দেখে আসছি। এমন নেক আখলাক ছেলে কমই হয়। তবু বিয়েশাদীর ব্যাপার, লাখ কথা না হলে নাকি কিছুই হয় না। তা না হলে পাকা কথা না হয়ে যাওয়ার কোন আপত্তি আমি দেখিনা।

হোমায়েরা গম্ভীর হইয়া গেল। কিন্তু আতিয়ার চোখে সন্দেহ-দৃষ্টি আর মুখে নিশ্চয়তার হাসি দেখিয়া সে বেশী কিছু বলিল না। শুধু বলিল, ঠিক চাচিআম্মা, এ-সব ব্যাপারে সবকিছু ভেবে দেখা দরকার। সোজা কথা ত নয়! একটি মেয়ের জীবনের প্রশ্ন এতে জড়িয়ে আছে।

আতিয়া বলিলেন, তা ঠিক, মা। মেয়ে জন্ম দিলে যে কি হয়, তা এক মা-বাপই বুঝতে পারে। মা-বাপের মনের উৎকণ্ঠা কি আর কিছুতেই দূর হতে চায়। দেখ ত জামালের মত পরিচিত ছেলে, তবু কি আর ভাবনার শেষ আছে! তবে মেয়ের সুখদুঃখ সবই খোদার হাতে।

হোমায়েরা তীর্যক দৃষ্টিতে স্নেহবিগলিত আতিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাল করে ভাবাই উচিত, চাচিআম্মা।

আতিয়া প্রথমে কিছু মনে করেন নাই। পরে খট করিয়া কথাটা মনে বাজিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন মা এ-কথা বলছো। জামাল সম্পর্কে তোমার কিছু বলার আছে?

না চাচিআম্মা। জামাল খুবই ভাল ছেলে।

আতিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন, আমিও ত তাই বলি। জামালের এমন কিই বা আমাদের অজানা আছে।

আমি মেরীর কথা ভাবছি।

ভাববেই ত মা। জামাল তোমার আপনজন হলেও মেরীও ত পর নয়।

হোমায়েরা বলিল, এমন কথা উঠতেই পারে না। তাই ত আমিও খুব ভাবছি, চাচিআম্মা।

হোমায়েরা সোজা বশীরের দফতরে গিয়া উপস্থিত হইল। বশীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হোমায়েরাকে দেখিয়া বলিলেন, এস, মা, এস।

হোমায়েরা বলিল, এখন ব্যস্ত থাকলে পরে আসি, ডাক্তার চাচা।

বশীর বলিলেন, না, মা। কাজ ত সব সময়ই আছে। তুমি ত আর সব সময় আসনা। কোন অসুবিধা হবেনা, তুমি বস।

হোমায়েরা সামনে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, ডাক্তার চাচা, জামালের সাথে মেরীর যে সম্বন্ধ করছেন সেটা কি ঠিক হচ্ছে?

বশীর সাগ্রহে বলিলেন, বল, মা, তোমার মত বল। আমরা এখনও ভাবছি।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এ-সম্পর্কে কিছুই কি ঠিক করেন নি?

বশীর বলিলেন, হাসান আমার বন্ধু, তাঁর কথা ঠেলা কঠিন। তা ছাড়া, জামাল ছেলেটিও বড় ভাল। এ-ব্যাপারে যে সত্যি অমত করার কিছু আছে মনে হয় না। আমরা সাফ কিছু না বললেও তোমার আব্বা আর ফুফু আম্মা ধরে নিয়েছেন, এতে অন্যথা হবে না।

হোমায়েরা বলিল, এটা মেরীর ভবিষ্যতের প্রশ্ন। এতে শুধু একটি দিক নয়, সব দিক দেখা দরকার।

বশীর বলিলেন, তা ত ঠিক, মা।

হোমায়েরা বলিল, মেরীর জীবন একভাবে গড়ে উঠেছে। কোথায় কিভাবে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে সেটা দেখা ত আপনাদেরই কাজ।

বশীর বলিলেন, তুমি ঠিকই ধরেছ। এ-কথাটি যে একেবারে ভাবিনি তা নয়। আর এ-ব্যাপারে একবার

ভুল হলে যে আর সংশোধন করা যায় না, সে কথাটি এখনই বিশেষ করে মনে পড়ছে, মা।

কথা শেষ করিয়া বশীর হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টির সামনে হোমায়েরা কিছুটা সংকোচ বোধ করিল। হোমায়েরা বলিল, ভেবেই কাজ করা ভাল।

তাই ত, মা, তাইত। লাফ দেওয়ার আগে সামনটা দেখ ভাল করে।

হোমায়েরা ভাবিল, প্রথমেই ইঁহাদের সহিত আর বেশী কথা বলা উচিত নয়। ওঁরা ভাবিতেছেন, আপাততঃ ভাবিতেই থাকুন।

কিন্তু হোমায়েরা চুপ করিয়া রহিল না। সে বাড়ী ফিরিয়াই জাফর কামালকে তলব করিল। সে ফাওয়ান যেন তাহার সহিত দেখা করে।

জাফর আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, এ যে একেবারে খাড়া হুকুম! এ-অধম কি খেদমত করতে পারে?

হোমায়েরা জাফরের এই কৌতুকে কান দিল না। সে বলিল, বস।

জাফর বসিয়া হোমায়েরার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হোমায়েরা বলিল, কাজ না থাকলে কি তোমাকে ডাকতে নাই? হঠাৎ ইচ্ছা হলো। বসো চাটা খাও। না বাইরে তাড়া আছে?

জাফর বলিল, তাড়া থাকলেও যে তোমার সামনে বসে থাকাকেই বড় কাজ মনে করবো সে ত জানা কথা। যতক্ষণ খুশী বসে থাকতে পারি।

হোমায়েরার হঠাৎ ইচ্ছা হওয়াকে জাফর সৌভাগ্য মনে করে। কিন্তু এই হঠাৎ ইচ্ছা যে অকারণে হইয়াছে, জাফর ঝট করিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

গল্পগুজব করার পর জাফর যখন উঠি উঠি করিতেছে, সে সময় হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ভাগনীর নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?

জাফর জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ভাগনীর?

হোমায়েরা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিল, তোমার একটি বোনকেই আমি জানি, আর শুধু তাঁর ছেলে-মেয়েরাই আমার নিকট পরিচিত।

জাফর হা হা করিয়া উঠিয়া বলিল, বুঝেছি। তুমি মেরীর কথা জিজ্ঞেস করছো? তা এ-ঘটনাটি আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানার কথা।

হোমায়েরা বলিল, আমি তোমার কাছে সোজা জওয়াব চাচ্ছি।

জাফর বলিল, তুমি সোজা জওয়াব যখন চাও, অতি সামান্য ব্যাপারেই চাও। আমি সোজা জওয়াবই দিচ্ছি। হ্যাঁ, শুনেছি জামালের সাথে মেরীর বিয়ের আলাপ চলছে। এটা ত খুবই ভাল কথা, অত্যন্ত ভাল কথা।

হোমায়েরা গম্ভীর হইয়া উঠিল। জাফর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, সে যে জন্য এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল, তাহা বৃথা গিয়াছে। ঝট করিয়া উচ্ছ্বাস দমন করিয়া সে বলিল, এটা কেমন মনে হচ্ছে তোমার কাছে?

হোমায়েরা উদাসীনভাবে বলিল, সেটা তোমরাই বুঝবে।

আমরা বুঝবো?

হ্যাঁ, মেয়ে তোমাদের।

জাফর উৎসাহের সহিত বলিল, বলই না কথা কি।

হোমায়েরা বলিল, আমার আর এতে বক্তব্য কি থাকবে। তবে আমি ভাবছি, জামাল মেরীকে শামলাতে পারবে কি! জামাল কলেজের লেকচারার। কার না হলে মেরী চলতে পারে না। কারের স্বপ্ন দেখা ত দূরের কথা সংসারের অভাব-অনটন দূর করাই তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মেরীকে নিয়ে সে চলবে কি করে? জামালের কথাই আমি ভাবছি।

জাফর হাঁটুর উপর থাবা মারিয়া বলিল, ঠিক কথা বলেছ। দুলাভাই আর আপা এ-কথাটা ভাবছেন না, কি আশ্চর্য্য! মেরীর দিক থেকে এ-কথাটি বেশী করে ভাবা দরকার।

হোমায়েরা বলিল, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আজকাল মেয়ে পার করা সোজা কথা নয়। হাতের কাছে মওজুদ পেলে ছাড়বেন কেন?

জাফর তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, কি যে বলো। তোমরা মাঝখানে আছো। তা ছাড়া, ছেলে বেলা হতে এরা দুজনে দুজনকে ভালবেসে আসছে। এ সব ভেবেই না আমি কিছু বলিনা। তা না হলে মেরীর মত চৌকশ মেয়ের নাকি আবার দুলার অভাব! আমার হাতে একজন আছে। ভাল লেখা-পড়া শিখেছে। বাপেরও অগাধ টাকা। তার গ্যারেজে চারখানা গাড়ী সব সময় মওজুদ থাকে। যখন খুশী তাকে এনে হাজির করতে পারি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া গর্ব্বিত দৃষ্টিতে জাফর হোমায়েরার দিকে চাহিল। হোমায়েরা তেমনি নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, এ-তোমাদের ব্যাপার, তোমরা ভাল বুঝবে। তবে কথায় বড়াই অনেকেই করতে পারবে।

জাফর বলিল, বড়াই নয়, বড়াই নয়। রোশো দেখবে। আমি আজই আপা আর দুলাভাইকে বলবো। কথাটা পেড়ে দেখি, তারপর যা হবার হবে।

হোমায়েরা বলিল, আজ না। তুমিও ভাল করে

বুঝে দেখ। আর যার কথা বলছো তাকেও আঁচ করে দেখো।

জাফর বলিল, সে তুমি ঠিকই বলেছ।

হোমায়েরা কয়েকদিন চুপ করিয়া রহিল। জাফরের নিকট সে সংবাদ পাইতেছিল। জাফরের উৎসাহ হোমায়েরাকে প্রথমদিকে বিস্মিত করিয়াছিল। পরে সে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। নিশ্চিন্তও হইল। অবশ্য অবচেতন মন যে কি ভাবে কাজ করিতেছে তাহা ব্যাখ্যা করার উৎসাহ হোমায়েরার ছিল না।

বশীর ও আতিয়ার কাছে জাফর কথা পাড়িয়াছিল। সে বলিয়াছিল, সেলিম আমার খুবই পরিচিত। ছেলে হিসাবে তার সম্পর্কে আপত্তি করার কিছু নাই। তাছাড়া তার যা আছে, অনেকের কাছেই সেটা দুর্লভ, শুধু তাই নয় কল্পনার অতীত বলা চলে।

বশীর ইহা শুনিয়া কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। আতিয়া বলিলেন, এটা কেমন করে হয়? আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। এরপর আর পিছুব কি করে?

আতিয়ার মনে ভয়ানক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। জামালকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। সে স্নেহ সহজে কাটিবার নয়। অপরদিকে মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সে দুর্ভাবনাও আতিয়া মন হইতে কিছুতেই তাড়াইতে পারিলেন না। তাই জোর দিয়া কিছু বলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না।

বশীর বলিলেন, এত একটি প্রস্তাব। ভেবেচিন্তে দেখা যাক। এখনই এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে?

জাফর বলিল, আমার ভাল মনে হল, তাই একটি প্রস্তাব করলাম, এখন তোমরা ভেবে দেখ।

জাফর আর কথা বাড়াইল না বটে, তবে বশীর ও আতিয়া দুইজনেই বুঝিলেন, জাফর যখন উদ্যোগী হইয়াছে তখন এখানেই থামবে না।

পরে জাফর যখন পুনরায় কথাটি তুলিল, তখন বুঝা গেল সে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই কথা তুলিয়াছে। আতিয়া অনেক ভাবিয়াছেন। কিন্তু কূল কিনারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মানসিক দ্বন্দ্বে মাথার রগ টনটন করিয়াছে, কিন্তু সুরাহা কিছু নাই।

তবে জাফর যখন অত্যন্ত জোর দিয়া কথা বলিতেছিল, আতিয়া তখন ঝোঁকের উপর বলিতে লাগিলেন, না এটা হয় না।

জাফর জিজ্ঞাসা করিল, কেন হয় না?

আতিয়া বলিলেন, শুধু মুখে বলিলেই পাকা কথা হয় না। এটা যে পাকাপাকি সেটা আমরা এতদিন তাঁদের ভাবতে দিয়েছি, এরপর সরে দাঁড়ানো বেমক্কুয়ত হবে।

বশীর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমরা ইচ্ছা করে তাঁদের কিছু ভাবতে দিয়েছি বলে মনে হয় না।

জাফর বলিল, তাঁরা সাধ করে কিছু ভেবে থাকলে সে দায় তাদের। আমাদের নয়।

আতিয়া বলিলেন, না, বাপু, আমি তা মনে করিনা। এখন অন্যথা করতে গেলে কাহাকেও মুখ দেখাতে পারবো না।

জাফর বলিল, এ-ভয় তুমি অযথাই করছো, আপা।

আতিয়া বলিলেন, ও সব কথা বাদ দাও। খোদা যা করে হবে। আল্লা যদি জামালের সাথে মেরীর জোড় বেঁধে থাকে, তা হলে তাই হবে।

জাফর রাগিয়া বলিল, আমার তাহলে কোন কথা বলাই ঘটিবে না, আপা? আমি ওদের আশ্বাসই দিয়ে এসেছি বলা চলে। ওরা হেলাফেলা করার লোক নন। আমার মান-মর্য্যাদা কি কিছুই নাই? তোমাদের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলার আছে কি না বল দেখি।

আতিয়াও দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, কে তোমাকে ওদেরে আশ্বাস দিতে বলেছে?

জাফর বলিল, আমি তোমাদের কেউ নই তা হলে, আপা? এই বলছি, আমি আর তোমাদের কোন কথায়ই আসবো না।

বশীর তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আহা এ-সব কথা কেন তোমরা তুলছো। দিন ত আর বয়ে যাচ্ছে না। সময় আছে। সবদিক ত ভেবে দেখতেই হবে, দরকার হলে আরও ভেবে দেখতে হবে।

সেদিনের মত কথাটা সেখানেই চাপা পড়িল। জাফর অনেকটা নিরাশ ভাবে হোমায়েরার কাছে গিয়া বলিল, বোধ হয় তোমারই জিত হলো। আপা যে জিদ ধরেছেন, তাতে তাঁকে সোজা করা যাবে বলে ভরসা হচ্ছে না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না দুলাভাই ত জোর করে কিছু বলছেন না।

হোমায়েরা কিছু বলিল না। শুধু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল।

ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া হোমায়েরা দেখিল আতিয়া একা বসিয়া আছেন, বশীর বাড়ী নাই। হোমায়েরাকে দেখিয়া আতিয়া খুশী হইয়া উঠিলেন। হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার চাচা কোথায়, চাচিআম্মা?

বলতে পারিনা, মা। কোথাও কলে গেছেন হয়ত। কোন কাজ আছে নাকি তাঁর কাছে?

না, চাচিআম্মা। অনেকদিন আপনাদের দেখিনি তাই এলাম।

আতিয়ার সমালোচনা-প্রবণ মন হইলে হোমায়েরার এ-কথা সহজে বিশ্বাস করিতেন না। দেখা না হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হওয়ার পরিচয় হোমায়েরা আগে কখনও দিয়াছে, চেষ্টা করিলে আতিয়া তাহা স্মরণ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

তিনি বলিলেন, বেশ, মা, বেশ।

এ-কথা সে-কথার পর হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, মেরীকে যে দেখছিনা, চাচিআম্মা?

আতিয়া বলিলেন, তার কে এক বান্ধবী এসেছিল তার সাথে বেরিয়ে গেছে। বড় মেয়ে তাকে যাওয়ার জন্য লিখেছিল, কিন্তু যেতে পারছে না। তার বিয়ে নিয়ে যে বড় দুর্ভাবনায় পড়লাম, মা।

হোমায়েরা কণ্ঠে বিস্ময় ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, কেন, চাচিআম্মা?

আতিয়া বলিলেন, আর বলো না মা, এদিকে জাফর এক পয়গাম নিয়ে এসেছে। সব যেন গুলিয়ে দিচ্ছে। তা না হলে ত আমরা স্থিরই করে ফেলেছিলাম। জামাল ছেলেটার কথা মনে হলে মনটা মোচড় দিয়ে উঠে।

জাফরের চাপ, সেলিমের পরিচয় সমস্ত আতিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিলেন। হোমায়েরা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাঁহার কথা শুনিল। তারপর বলিল, তাইত!

ঐশ্বর্য্য দেখে আর সমস্ত কি ভুলে যাওয়া উচিত, তুমিই বলত মা?

হোমায়েরা বলিল, সেও ত কথা।

আতিয়া বলিলেন, কিন্তু কি পোড়া বিপদ হয়েছে, কিছুতেই মন আর স্থির হয়ে উঠছে না। তোমার চাচা ত শুধু বলছেন, দেখো।

হোমায়েরা বলিল, তাও ত ঠিক, চাচিআম্মা। মনের আবেগ ত আছেই। তবে ভাল করে বিচার করে সব ঠিক করাই ভাল। আপনারা যা হোক একটা ঠিক করে দিতে পারেন; কিন্তু মেরীকে সারাজীবন তাই বহন করতে হবে। মেরীর জীবন কি ভাবে গড়ে উঠেছে সেটাও ভাবা দরকার।

আতিয়া বলিলেন, তোমার মত কি, মা।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, আমার মত বলা কি ঠিক হবে, চাচিআম্মা? মেরী আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এটা আমাদের ত খুশীর কথা। তবে মেরী আর্থিক অনটন কি তা কখনও জানতে পারে নাই। সীমিত আয়ের সংসারে ঢুকে সে খাপ খাওয়াতে পারবে কিনা তাও বিচার করতে হবে।

বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে, মা।

হোমায়েরা বলিল, এটা বেশী করে ভাববারই ত কথা।

আতিয়া বলিলেন, কিন্তু ছেলেবেলা হতে দু'টি ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে, এখন আমরা অন্য রকম ঠিক করলে ফল কি দাঁড়াবে।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, চাচিআম্মা, ছোটবেলা দুনিয়া চোখের সামনে এক রকম থাকে, বড় হলে অন্য রকম হয়। এটা ধর্ত্তব্যের মাঝেই নয়।

আতিয়া আশ্বাস খুঁজিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বল এটা কিছু না।

হোমায়েরা বলিল, সকলের জীবনেই ছোট বেলার ইতিহাস একটা থাকে; কিন্তু তা মুছে যেতে বড় বেশী সময় লাগে না। মেরীর এখনকার মন নিয়ে তাকে তার সমস্ত বিচার করতে দিন। তাকে সব কয়টি দিক দেখিয়ে দিয়ে তাকে ঠিক করতে দিন। মন ঠিক করতে তাকে সময় দিন।

আতিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিকই বলেছ, মা। মেরী বড় হয়েছে, ভালমন্দ তাকেই বুঝে নিতে দেওয়া ভাল।

হোমায়েরা বিদায় নেওয়ার আগেই বশীর ফিরিয়াছিলেন। তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গিয়া হোমায়েরা বলিল, খামখা এত সমস্যা বাড়াচ্ছেন কেন ডাক্তার চাচা। সংসারের হিসাবে যা ভাল তাই শেষ পর্য্যন্ত টিকবে।

বশীর বলিলেন, স্বাভাবিক পথে ঘটনাকে গড়ে উঠতে দিচ্ছি মা। ক্রমে সবই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। প্রাথমিক দ্বিধা ও সঙ্কোচ সকলের মনেই থাকে মা।

হোমায়েরা মাঝে মাঝে খবর নিয়া জানিয়াছে, মন ঠিক করিতে মেরীর দেরী হইতেছে। আতিয়া যখন বিচারের ভার মেরীর উপর ছাড়িয়া দেওয়ার কথা তুলিলেন, তখন বশীর বলিলেন, পাকা বুদ্ধি হার মেনে গেল, এখন ভালমন্দের সব দায় কচি মেয়েটার উপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছ, তাই দাও।

বিতর্কের আভাস মেরীর কাছেও পৌঁছিয়াছিল। সে আগে হইতেই কান খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। সবিস্তারে সমস্ত দিক বর্ণনা করিয়া যখন তাহাকে মন স্থির করিতে বলা হইল তখন সে যেন অকূলে কূল হারাইল।

প্রথম কয়েকদিন মেরী খুব কাঁদিল। আতিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, এ-আমার সহ্য হয় না।

বশীর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কাঁদতে দাও। চোখের পানির সাথে মনের বোঝা হালকা হয়ে যাবে। তখন সে তার নিজের মনকে ভাল ভাবে বুঝতে পারবে।

টাকা পয়সার অভাব হইলে সংসার কেমন নিরুরুণ হইয়া উঠে, সে গল্প মেরীর কাছে বলা জাফরের নিত্য-

দিনের কাজ হইয়া উঠিল। একদিকে বাড়ী-গাড়ী ও শাড়ীর জৌলুস, আর অন্যদিকে আধপেটার নিরানন্দময় শুষ্কতা, তাহার চিত্রকে মেরীর সামনে জীবন্ত করিয়া তুলিতে জাফরের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। তবে জাফরের এত পণ্ডশ্রম হয়ত না করিলেও চলিত।

জাফর একদিন আসিয়া হা হা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। হোমায়েরা তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, কথা কি তাই বল দেখি!

জাফর হাসিমুখে বলিল, আমারই জিত! আরে, দুনিয়াকে কি আমি দেখি নাই, না জানিনা! খুব জানি।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, কি হল তাই শুনি।

জাফর বলিল, মেরী এই সোজা কথাটা যদি নাই বুঝবে, তা হলে ত সে মেয়েই নয়! দায়িত্ব যতদিন নাই ততদিন যত খুশি প্রেম করো; কিন্তু দায়িত্ব নিতে যখন যাবে তখন ঝানু ব্যবসায়ী হতে হয়।

হোমায়েরা তীর্য্যক দৃষ্টিতে জাফরের দিকে তাকাইল। জাফর নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, সব ক্ষেত্রে এক কথা খাটে না। তবে সংসারের পথে যারা নূতন তাদের ব্যাপারে এটা খুবই খাঁটি।

জাফরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করার জন্য হোমায়েরা বলিল, কোথায় ব্যবসাদারী আর কোথায় পেশাদারী তা আর ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। আন্দাজে আমি কিছু কিছু বুঝতে পারছি, তবু তুমি সাফ করে বলত আসল ব্যাপার খানা কি?

জাফর বলিল, ব্যাপার খানা সোজা, অতি সোজা। অতঃপর মেরী সেলিমের হবে, এতে আর অন্যথা হওয়ার জো নাই।

হোমায়েরা শুধু বলিল, হুঁ।

জাফর বলিল, প্রেম হল নদীর ধারার মত, যে দিকে সুযোগ পাবে সেদিকেই বয়ে যাবে। খামখা এটাকে এত বড় করে দেখা এক রোগ বিশেষ। সেলিমের গাড়ীতে মেরীকে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দেওয়ার পর আর কিচ্ছুটি ভাবতে হয় নি।

হোমায়েরা বলিল, এইঅল্প সময়েই মন বদলে মেরী সেলিমের পিছু নিয়াছে?

জাফর বলিল, আহ! তুমি এ-ভাবে ব্যাপারটা দেখছো কেন?

রহিমা প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, নিশ্চই কোথাও ভুল হচ্ছে, ভাইজান। তা না হলে ওরা এ-ভাবে লিখতে যাবেন কেন?

হাসান গম্ভীর মুখে জওয়াব দিলেন, ভুল কোথাও নেই, বোন, সবই ঠিক আছে। বেঠিক হয়েছে শুধু ওদের মতটা। সামনা সামনি বলতে বোধহয় চক্ষু লজ্জায় বাধা দিচ্ছিল, তাই লিখে পাঠিয়েছে।

কিন্তু কেন?

সেটা আমিও ত ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। হয়ত এর চেয়ে ভাল পাত্র পেয়েছে।

রহিমা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ভাল পাত্র?

হাসান ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভালর কোন মানদণ্ড নাই বোন। তুমি যা ভাল মনে করো অন্যে তা মনে নাও করতে পারে। ভাল মানে ধনবান পাত্রের কথা বলছি।

রহিমা বলিলেন, ধনের বিনিময়ে ওরা নিজেদের বিকিয়ে দেবে? মেরী জামালের এতদিনের—

রহিমা আর বলিতে পারিলেন না। হাসান বলিলেন, কিছু না, বোন, কিছু না। দওলতের জৌলুস বড় সাংঘাতিক, লোকে নিজের আত্মাকে এ-জন্য বিক্রয় করতে পারে। তবে সব না জেনে কিছু বলা ওদের প্রতি অন্যায় হবে। দুয়েক দিনেই সব জানা যাবে।

রহিমা বলিলেন, আমি একবার ওদের ওখানে যাবো।

হাসান বলিলেন, যেও। কিন্তু কোন লাভ হবে না, বোন। তোমার মনে পড়ে ওরাও একবার এভাবে এসেছিল, কিন্তু কোন ফায়দা হয় নাই। আমাদের মুদ্রায়ই ওরা আমাদের ঋণ শোধ করলো।

কোন কিছুই চাপা থাকেনা। রহিমা সমস্তই শুনিলেন। ডাক্তারের ওখানে যাওয়া যে অর্থহীন তাহাও বুঝিলেন। তবু বুঝাপড়া করা দরকার বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

হাসানকে লইয়া রহিমা ডাক্তারের বাড়ী গেলেন। হাসান যাওয়ার আগে বলিয়া গেলেন, এতে আমার কিছু বলার নাই। আমরা ভাল মনে করেছিলাম, জামালের সাথে মেরীর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা ভাল বুঝেছে, এটা প্রত্যাখ্যান করেছে।

রহিমাকে দেখিয়াই আতিয়া কোন ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, তোমাদের দেখাবার মত মুখ আমরা রাখি নাই।

রহিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কেন করলে, বোন?

আতিয়া বলিলেন, তকদীর খণ্ডন করা যায় না, বোন। মানুষ ভাবে এক খোদা করেন আর।

রহিমা বলিলেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে ত রায় দেওয়ার ভার তোমাদের হাতে ছিল।

আতিয়া ইহার কোন জওয়াব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কি করবো বোন, জানত বিয়ে-শাদীর ব্যাপার কতদিক থেকে কত রকম কি হয়ে যায়!

রহিমা বলিলেন, তোমরা আমাদের উপর প্রতিশোধ নিলে।

আতিয়া বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম?

রহিমা বলিলেন, হোমায়েরার ব্যাপারে তোমাদের কথা রাখিনি, জামালের বেলা তারই শোধ তোমরা তুললে।

আতিয়া শতকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন, না, না, বোন, এটা মোটেই নয়। সে কথা আমাদের মনেই ছিল না।

রহিমা বলিলেন, ধনের লোভে তোমরা এ-ভাবে ভেসে যাবে তা আমি কখনও ভাবতে পারিনি।

আতিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের কাছে বড়ই শরমিন্দা বোন, এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। জামালকে আমি কখনও পর ভাবিনি, কিন্তু মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সকল মা-বাপেরই সবচেয়ে দুর্ভাবনার কারণ। আমি মিনতি করছি বোন, এটাকে অন্য ভাবে নিও না।

রহিমা চুপ করিয়া রহিলেন। আতিয়া আবার বলিলেন, লজ্জা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না, তা না হলে আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে যেতাম।

রহিমা বলিলেন, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাচ্ছি না, বোন। জামাল আমাদের স্নেহের পাত্র। আর খোদাই জানেন কেন মেরীকেও তিনি আমাদের কাছে এনে দিলেন। দুদিক থেকে স্নেহবন্ধনে আমরা জড়িয়ে গেলাম। আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছা আজ নিষ্ফল হতে দেখে বড়ই দুঃখ হচ্ছে।

আতিয়া বলিলেন, আমাকে ভুল বুঝোনা, বোন। আমিও মনে শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু—

রহিমা বলিলেন, তোমরা মেরীর বিলাসী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই দেখল। কিন্তু তার নিজের মন দেখলে না।

আতিয়া বলিলেন, সে ফয়সালা সে নিজেই করেছে।

রহিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এত দিনের ইতিহাস সে মুছে ফেলতে পারলো?

আতিয়া বলিলেন, ভাই-বোনের স্নেহকে মুছে দেওয়ার কথা কেন বলছো বোন?

রহিমা বলিলেন, মেরী ছেলে মানুষ। ঐশ্বর্য্যের ইন্দ্রজাল দিয়ে তোমরা তাকে ভুলিয়েছ। কিন্তু তুমি কেমন করে ভুললে বোন। তুমি ত জানো মেয়েলোকের মন ঐশ্বর্য্যে সব সময় ভরে না। তোমার জীবনের অশ্রু-জলের ইতিহাস স্মরণ করে দেখ। মেরীর জীবনেও ঐশ্বর্য্যের ছদ্মবেশে তাকে আরও মর্ম্মান্তিক হয়ে আসতে দিও না।

আতিয়া রহিমাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, তুমি আমার মেয়েকে বদদোয়া দিও না বোন। আমাদের আর পিছুবার উপায় নাই। যত বদদোয়া আমাকে দাও। আমার মেয়ের জন্য দোয়া করো বোন।

রহিমাও দুই হাত দিয়া আতিয়াকে গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ছিঃ ছিঃ, আমি কি মেরীকে বদদোয়া দিতে পারি? মেরী চিরদিনই আমাদের থাকবে। সে যেখানে থাকুক, যেভাবে থাকুক, খোদা যেন তার মঙ্গল করেন।

আতিয়া বলিলেন, বিয়েতে তোমাদের আসতেই হবে, বোন। ভাইজান ও তুমি যদি না আস তা হলে আমার মেয়ের অকল্যাণ হবে।

রহিমা বলিলেন, তোমাকে অনেক কড়া কথা বললাম। আমার মনের দুঃখে এটা আমিই বলেছি। ভাইজানের কাছে চল, দেখবে এ-সম্পর্কে কোন কথাই তিনি বলবেন না। তিনি আগেই ছবর করে বসে আছেন।

আতিয়ার চোখে পানি আসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ভাইজানের এই নীরব ব্যথাকেই যে আমি বরাবর সবচেয়ে বেশী ভয় করে এসেছি।

মেরী জামালের প্রতি অবিচার করে নাই। সে তাহাকে দেখা করার জন্য চিঠি লিখিয়াছিল। তাহার বলার অনেক কথা আছে। সাক্ষাতে সমস্ত সে খুলিয়া বলিবে। মেরীর বলার বহু কিছু থাকিলেও জামালের শোনার আগ্রহ মোটেই ছিল না। সে চিঠির কোন জওয়াব দিল না। মেরী কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া সংকোচ কাটাইয়া নিজেই দেখা করিবে ঠিক করিল। জামাল যে ইচ্ছা করিয়া তাহার সহিত দেখা করিতেছে না, তাহা তাহার মনে হইল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে বাড়ীতে থাকার অনুরোধ জানাইয়া সে আবার চিঠি লিখিল। জামাল প্রথম ভাবিল, আসে আসুক কিছু বলার থাকে বলুক। পরে ভাবিল, দরকার কি। জীবন নাট্যের অন্ধকার দিকে মশাল জ্বালার অযথা চেষ্টা করে ফায়দা কিছু নাই।

সেদিন সারা বেলা সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কাটাইল। রাগ, দুঃখ বা ঘৃণা লইয়া সে মেরীর কাছ হইতে সরিয়া রহিল না, যে সুর শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার রেশ টানায় ক্লান্তি তাহার সহ্য হইবে না বলিয়াই মেরীর সহিত আসিতে সে বিরত রহিল। অনেক রাতে ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল মেরী আসিয়াছিল। অনেকগুলি বই টেবিলে স্তূপ হইয়া পড়িয়াছিল। সেগুলি স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। ময়লা কাপড়-গুলি, ময়লা বিছানার চাদর অপসারিত হইয়াছে।

ধোপদুরস্ত চাদরে বিছানা ঢাকা রহিয়াছে। আলনায় কাপড়-জামা সাজানো আছে।

জামালের মনের ভিতর জ্বালা করিয়া উঠিল। মেরীর আশা কি এখনও মিটে নাই? সে কি আরও প্রতিশোধ নিতে চায়?

মেরীর বিয়ের চিঠি জামালও পাইয়াছে। হোমায়েরা বিয়েতে যায় নাই। নানা অজুহাত দেখাইয়া না যাওয়ার জন্য সে ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আত্তিয়া ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গাড়ী দিয়া জাফরকে পাঠাইয়াছিলেন।

জাফর তাহাকে খুবই তাড়া দিতে লাগিল। বলিল, তোমার অজুহাত যে সব কাজে সে আমি বুঝি।

হোমায়েরা বলিল, বুঝ যদি তা হলে আর তাড়া দিও না। চাচিআম্মাকে যা হয় একটা বলে সন্তুষ্ট রেখো।

জাফর বলিল, তা আমি পারবো। কিন্তু কিসে যে তুমি সন্তুষ্ট তাই বুঝতে পারলাম না আজো।

হোমায়েরার কৌতুহল হইতেছিল। তাছাড়া সে ভাবিতেছিল, ইহা লইয়া জামালের সহিত একটু মশকরা করা যাইবে। সন্ধ্যা হয় হয় সময় সে জামালের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

ধোঁয়ার মত আঁধার ঘরে ছড়াইয়া আছে। জানালার ভিতর দিয়া বাড়ীঘর গাছপালার উপরের আকাশটিকে বদ্ধ খাঁচার মত মনে হইতেছে। হোমায়েরা দেখিল, জানালার পাশে টেবিলে দুই হাতে মাথা রাখিয়া জামাল অন্ধকারে বসিয়া আছে।

হোমায়েরা হালকা মন লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত পরিবেশ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, নিজেকে সে এমন অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে, যে অবস্থার মোকাবেলা তাহাকে জীবনেও করিতে হয় নাই।

হোমায়েরা জামালের মাথায় হাত রাখিল। জামাল চমকাইয়া ফিরিয়া তাকাইল। তারপর আবার সে টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল।

হোমায়েরা কিছু সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া জানালার হালকা অন্ধকারটুকু দেখিয়া লইল। সে ডান হাতে জামালের গলা বেষ্টন করিয়া তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া ডাকিল, জামাল!

জামাল কোন জওয়াব দিল না। হোমায়েরা বলিল, তুমি আমার উপর রাগ করেছ জামাল।

জামাল উঠিয়া হোমায়েরার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কাজের কোন সমালোচনা জীবনে কখনও আমি করিনি আপা, ভবিষ্যতেও করবো না।

হোমায়েরা বলিল, এত অভিমানের কথা হলো, জামাল?

জামাল বলিল, কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারি না, আর আমার কাছে কিছু শুনতেও তুমি চাওনি, আপা। কিন্তু দুঃখ যে, আজ যখন শুনতে চাচ্ছো তখনও আমি গুছিয়ে বলতে পারবো না। সত্যি যদি অভিমান করতে পারতাম, আপা, তা হলেও হয়ত বাঁচোয়া ছিল।

হোমায়েরা বলিল, তুমি আমায় অপরাধী ভাবছো?

বিবর্ণ হাসি জামালের ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া গেল। জামাল বলিল, অপরাধী? না আপা।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি জানতে? সবই।

সবই?

জামাল বলিল, বলা আমার পক্ষে কঠিন। মন অনেক সময় মানুষকে সতর্ক করে রাখে। সমুদ্রের নীচে যত গভীরে ডুবুরী নামে ততই নাকি অধিকমাত্রায় হুঁশিয়ার হয়। যাক, অবস্থা ঘুরছে দেখে বড় দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু—

কিন্তু কি?

সেলিমের সাথে উল্লসিত মেরীকে যেদিন দেখলাম, সেদিন আমার মন আর্তনাদ করে বলে উঠলো, ঠিক হয়েছে, ভাল হয়েছে।

জামাল বসিয়া পড়িতে পড়িতে বলিল, লোক চিনতে বছরের পর বছর চলে যায়, আবার একটি মুহূর্তেই হয়ত সব চেনা হয়ে যায়।

জামাল মুখ ঘুরাইয়া বলিল, হয়ত বা মেরীর প্রতি আমি অবিচার করেছি। তবু, আমি বেঁচে গেছি, আপা, বড় বেঁচে গেছি।

জামাল টেবিলের উপর মাথা রাখিল। হোমায়েরা আজ যেন নিজেরই সারা জীবনের সহিত বুঝাপড়া করিতে লাগিল। অন্ধকারে দুইটি মূর্ত্তি যেন ভূতের মত বিভীষিকা জাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। জামাল টেবিলের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে, হোমায়েরা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হোমায়েরা হাত বাড়াইয়া জামালের চোখের কোণে আঙ্গুল দিয়া দেখিল, সেখানে পানি জমিয়া আছে। জামাল কাঁদিতেছে। হোমায়েরা আঁচল দিয়া জামালের চোখ মুছাইয়া দিল। জামালের কাঁধের উপর ভর দিয়া হোমায়েরা বলিল, আমাকে মাফ করো, জামাল।

জামাল যেন আঘাত খাইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, আপা!

হোমায়েরা বলিল, আমি ঠাট্টা করছি না, জামাল। তোমার অনেকদিনের সাথী হিসাবেই তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি। মাফ করতে পারবে না, জামাল?

হোমায়েরার প্রশ্নের সামনে হতভম্ব জামাল স্তব্ধ হইয়া

রহিল। পরে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মাফ! মাফের যে কোন কথাই আসে না। আমি যথার্থই বলেছি, তোমার কাজের বিচার করার সাধ্য আমার নাই। যদি থাকত—

জামাল যেন কিছুতেই কথা শেষ করিতে পারিতেছিল না। সে আসিয়া আবার বলিতে শুরু করিল, তোমার কাজ বিচার করার সাধ্য থাকলে বহু আগেই তা করতাম। তোমার প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নাই।

সরল, স্বচ্ছ, আন্তরিকতায় ভরা দুইটি চোখের দিকে চাহিয়া হোমায়েরা আর কথা বাড়াইল না। কিন্তু তাহার যেন সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। পিছনে ফিরিয়া দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাসের পাতাকে বারবার উল্টাবার সাধ তাহার হইতে লাগিল। কিন্তু হোমায়েরা জানে একবার মনে অনুশোচনা শুরু হইলে তাহার অভিশাপ এড়ানো সম্ভব হয় না। ইহা কিসের শুরু? ইহা কিসের সমাপ্তি?

অন্ধকারে হোমায়েরা ও জামাল মুখামুখী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। ডাক্তারের বাড়ী কাছে হইলে ব্যাঙের শব্দ এই নীরবতা ভাঙ্গিতে পারিত।

(ক্রমশঃ)

দোসর নেই

আবদুস্ সাত্তার

তখন সান্নিধ্যে এসে গেছি,
আকাশ সমুদ্র যেন পরস্পর একের ভিতরে।

জলের আঙুল উঠে নামে
হাওয়ার সেতারে বার বার
বিচিত্র সুরের সেই আশ্চর্য ধ্বনির।
এখানের নিস্তব্ধ প্রহরে
অবাধ প্রবেশ অধিকার।

বাইরে পাহাড়ী ঝোঁপে এক জোড়া ময়ূর-ময়ূরী
দু'ঠোঁটে দু'ঠোঁট রেখে প্রেমের বৈকুণ্ঠে উপনীত
খুশীতে ঝাউয়ের শাখা বাতাসের কোলে এলায়িত,—
বাহুর উৎকীর্ণে যেনো নরম বঁধুর
উল্লসিত আত্ম-সমর্পণ।

সার্কিট হাউস জুড়ে নিস্তব্ধ বিকেল।
এমন কী সামান্য পিনের ছোট্ট টুংটাং সুর
কার্পেট ছড়ানো এই মেজের নির্জনে
তোলে না ঝংকার কোনো।

অথচ এখানে আমি আজ
জল-জমা নিস্তব্ধ পুকুরে তার সে প্রেমের ঢেউ চাই।

চাপরাশী কাছে নেই। খানসামা চলে গেছে তার
বিকেলের ছুটি-ঘরে। নিঃসঙ্গ এখানে আমি একা
বাইরে তাকিয়ে আছি সমুদ্রের ডগঝম্ফ শুনে।

দমকা বাতাস এসে জানলার রঙিন পর্দাটা
সশব্দে সরিয়ে দিলো। চেয়ে দেখি একটি চড়ুই
ড্রেসিং টেবিলে বসে বারবার নিজেরই সে ছবি
দেখে, আর ক্রমশঃ এগিয়ে যায় আয়নার কাছে।

এখন বুঝেছি আমি হয়তো দোসর নেই তার।

আত্মা ও মনের স্বরূপ

মোহাম্মদ মোশতাক ডিপ-ইন্-এড

'আত্মা' (soul) কি, 'মন' (miud) কি, আমাদের মধ্যে ওগুলোর অস্তিত্ব কোথায়—যুগ যুগ ধরে প্রখ্যাত মনীষীরা যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসতে প্রয়াস পেয়েছেন তাতে আজো কোন বিজ্ঞমন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। কারণ বর্তমান মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন চিন্তানায়কদের চিন্তাধারাগুলো আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও মন কি, ওদের মধ্যে কি সম্বন্ধ রয়েছে, দেহে তাদের অস্তিত্ব কি এবং কোথায়, ওগুলো আমাদের কি কি ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করছে—কেন এবং কি ভাবে করছে—ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন সুস্পষ্ট সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আজো তাঁরা দিতে সক্ষম হননি। ফলে মনোবিজ্ঞানের এ-আদি সমস্যাগুলো এখনো অস্পষ্ট, অমীমাংসিত ও অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

আমি আজ এখানে মানব মনের এ-আদি জিজ্ঞাসা—মন ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচলিত চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে এক নূতন ও মৌলিক ব্যাখ্যার সূচনা করতে চাচ্ছি। এতে এ-বাস্তবতার যুগেপ্রকৃতির রাজ্যে—বিশেষ করে 'আত্মা' ও 'মন'এর বেলায় প্রকৃত রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার মতে 'আত্মা' ও 'মন' এক জিনিস নয়। ওগুলোর অস্তিত্বও আমাদের মানস জগতে 'কল্পচিন্তা'র মধ্যে নয়। বরং ওগুলো আমাদের দেহের বাস্তব ক্ষেত্রে বাস্তব অনুভূতির ভিতর স্ব স্ব ক্ষমতা ও অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। আমরা এদ্দিন ওগুলোকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখিনি বলেই অবাস্তব কল্পবস্তু ঠেকেছে।

এখন প্রকৃতপক্ষে 'আত্মা' ও 'মন' কি তাই বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাক।

আত্মা বা soul হচ্ছে একটি 'বৃহৎ শক্তি'। শিল্পীরা যেমন বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট যন্ত্র তৈরী করে ওটার কার্য্যকারিতাকে চালু করবার জন্যে বিদ্যুৎএর সাহায্যে শক্তি বা গতির সঞ্চার করে থাকেন—তেমনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ বা সেই অনন্ত কারণিক প্রকৃতির রাজ্যকে সৃষ্টি করে কিছু সংখ্যক দেহে সমস্ত ব্যবস্থাপনটিকে কার্য্যকারিতায় চালু করবার মানসে একপ্রকার বিশেষ শক্তি, গতি বা জীবনীর সঞ্চার করেছেন। এটাই হচ্ছে জীবন বা আত্মা । এর প্রধান ধর্ম হচ্ছে দেহকে সজীব, সতেজ বা সক্রিয় রাখা।

এই শক্তি বা আত্মা স্রষ্টা বা অনন্তকারণিকের প্রকৃতি রাজ্যে একটি আদি সৃষ্টি বা নির্দেশ। সূর্য্য আছে বলেই যেমন আমাদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও আলো পাওয়া সম্ভব হচ্ছে—প্রকৃতির রাজ্যে আত্মার ব্যাপারে তেমনি স্রষ্টার নির্দেশ রয়েছে বলেই সব জাগ্রত দেহে জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব, এটা মৌলিক, অনন্ত ও অবিনশ্বর। যতদিন পর্য্যন্ত এটা কোন শারীরিক পরিসরে সক্রিয় থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই ওটা ঐ পরিসরটিকে কর্মক্ষম ও পরিবর্দ্ধনশীল—এক কথায় জীবন্ত রাখে। আর যখন সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি হেতু অথবা কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আত্মা উক্ত শারীরিক ক্ষেত্রটিকে ছেড়ে তার আদি রূপ অনন্তে মিলিয়ে যায়—তখন আমাদের নিকট ওটা মৃত মনে হয়।

তবে জীবনী বা প্রাণের প্রধান লক্ষণ দেহের কার্য্যকারিতা ও পরিবর্দ্ধন ক্ষমতা এ-জগতে যে-সব সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মানবগোষ্ঠি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ মানব-দেহের মধ্যে অন্যান্য জাগ্রতদেহীদের ন্যায় জীবনীশক্তি তো রয়েছেই, তদুপরি শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হেতু এতে আত্মার আর একটি 'বিশেষ গুণ' প্রকাশ পেয়েছে—তা হলো 'মন'। এটা মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জাগ্রত সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়নি—আর পেলেও তা এত সামান্য যে অনণভূত, কারণ ওদের দেহগঠন উক্ত অনুরূপ গুণটির প্রকাশনার অনুকূল নয়—তাই।

এখন মন কি দেহে ওটার সত্যিকারের অস্তিত্ব কোথায় ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের ধারাবাহিক চিন্তাধারাকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে মনোবিদ্‌রা গবেষণা ক্ষেত্রে ক্রমে মন পদার্থের স্বরূপ ও অস্তিত্ব নিরূপণ ছেড়ে দিয়ে মানব দেহে ওটার প্রকাশমান প্রতিক্রিয়াসমূহের প্রকৃতি, সম্বন্ধ ও পরিণতি প্রভৃতি নির্ণয় ও তাদের সংজ্ঞা দান কাজে এসে পড়েছেন। ফলে 'মন' সম্বন্ধে সেই আদি ধারণা—এটা জ্ঞানসীমার বাইরে একটি অজ্ঞাত গুণই রয়ে গেল—আসল ব্যাপারটির মীমাংসা হলো না আজো।

কিন্তু আমাদের মতে,—'মন' জ্ঞান সীমার বাইরে—একটি 'অজ্ঞাত বস্তু' নয়। 'মন' সম্পূর্ণ ভাবে জ্ঞানাধীন এবং আমাদের অনুভূতির মধ্যে ওটার অস্তিত্ব রয়েছে। এখন মনের শারীরিক অস্তিত্বকে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের দেহযন্ত্রকে—বিশেষ করে এর স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্যকারিতাকে ভাল করে জানতে হবে।

প্রকৃতি অনুসারে বিচার করলে আমাদের সমস্ত দেহযন্ত্রকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করতে পারি। (ক)

জ্ঞানেন্দ্রিয়, (খ) দেহের পেশী ও গ্রন্থি এবং (গ) মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল। এখন একটি একটি করে এগুলোর মোটামুটি কার্য্যকারিতাকে আলোচনা করা যাক।

(ক) জ্ঞানেন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকই হচ্ছে প্রধান। এগুলো বাহ্য জগতের সংবাদ সংগ্রহ করে। তাই এদেরকে বলা হয় সংগ্রাহক। এই ইন্দ্রিয়গুলো বহিরিন্দ্রিয়—এদের প্রত্যেকটিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যবাহক স্নায়ুসূত্র দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সহিত যুক্ত। এখন এ-ইন্দ্রিয়গুলোর বহির্ভাগের কোষসমূহ বাইরের কোন উত্তেজক দ্বারা উত্তেজিত হলে তা' অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়ে সর্বশেষ জ্ঞানদায়ী স্নায়ুকেন্দ্রে এসে আড়োলনের সৃষ্টি করে এবং ফলে আমাদের মধ্যে 'বোধ'এর সৃষ্টি হয়। এমনিতর আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো সর্বদাই নিজ নিজ উত্তেজক দ্বারা উত্তেজিত হচ্ছে এবং ওগুলো জ্ঞানদায়ী স্নায়ুকেন্দ্রে এসে আমাদের মধ্যে বোধ জাগাচ্ছে।

(খ) দেহের পেশী ও গ্রন্থি—আমাদের দেহের সমস্ত ক্রিয়া ও গতি সম্পন্ন হচ্ছে দেহের পেশী ও গ্রন্থিগুলোর মধ্য দিয়ে। এগুলো কর্মেন্দ্রিয়—তাই এগুলোর ইংরেজী নাম effectors। পেশী দিয়ে আমরা নড়িচড়ি—কাজ করি। গ্রন্থিগুলোর মধ্য দিয়ে দেহের নানারূপ ক্ষরণ ও স্ফুরণের কাজ সম্পন্ন হয়।

(গ) স্নায়ুমণ্ডল—দেহের সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার সংযোগ ও সমন্বয়সাধন করছে স্নায়ুমণ্ডল। এ-গুলোকে তাই সংযোজক বলে।

সমস্ত দেহের শাসন ও পরিচালনার ভার বা দায়িত্ব এ-স্নায়ুমণ্ডলের উপর। এগুলোকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল এবং (খ) উপান্ত স্নায়ুমণ্ডল। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের দায়িত্বই অধিক। এই স্নায়ুমণ্ডলের উভয় অংশই দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম স্নায়ুসূত্র দিয়ে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত।

কেন্দ্রীয় ও উপান্ত স্নায়ুমণ্ডল—উভয়টির আবার দুটো করে অংশ রয়েছে। (ক) মস্তিষ্ক ও (খ) মেরুদণ্ড হচ্ছে কেন্দ্রীয় মণ্ডলের; আর (ক) মস্তিষ্ক ও সুষুম্না (Cerebro-spinal nerves.) নির্গত স্নায়ু এবং (খ) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু হচ্ছে উপান্ত স্নায়ুমণ্ডলের দুটো অংশ। মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নির্গত স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে প্রসারিত অসংখ্য স্নায়ুসূত্র। এগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সাথে দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশীগুলোর সংযোগসাধন করছে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাথে কোন যোগাযোগ রক্ষা করছে না, তবে ওগুলো দেহাভ্যন্তরে হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি কতগুলো বিশেষ যন্ত্র ও গ্রন্থির প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ অংশ মস্তিষ্ক আবার তিনটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান অংশে বিভক্ত। প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে—(ক) বৃহৎ মস্তিষ্ক, (খ) মধ্য মস্তিষ্ক ও (গ) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। অপ্রধান দুটো অংশ হচ্ছে—'থালামাস' (Thalemus) ও সুষুম্না যোজক। মানবদেহের মধ্যে স্নায়ুর যত রকমের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলছে—এ সবগুলোরই ব্যবস্থাপন কেন্দ্র হচ্ছে এই মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কের বৃহৎ (Cerebraum) অংশটি বড় দুটি ভাগে বিভক্ত। উভয় ভাগের উপরই শ্বেতবর্ণের একটি ভারী পর্দা আছে। এটাকে বলা হয় বৃহৎ মস্তিষ্কের 'কায়াবরক'। কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ কেন্দ্রগুলো এই ভারী পরদাটির মধ্যেই অবস্থিত। মানুষের সব রকম ভাব, চিন্তা এবং কর্ম এখানেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এটা মানুষের 'মনন-ধর্ম' এর প্রধান আশ্রয়স্থল।

তা ছাড়া, মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলো নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সরাসরি ভাবে মানব দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর—যেমন cerebraumএর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আমাদের বিভিন্ন চিন্তা ও কাজের আধারভূমি। Basal ganglia বা mid brain আমাদের চলনশক্তির নিয়ন্ত্রক, cerebethum আমাদের দেহের ঋজুতা ও ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্র প্রভৃতি—প্রধান কেন্দ্রস্থল হলেও সমস্ত কেন্দ্রগুলোর উপর 'মনন-ক্রিয়া'র ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বৃহৎ মস্তিষ্কের 'কায়াবরক'এর স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর দ্বারা। এখানে কোন অংশে কোন বিকৃতি ঘটলে তার ফল সমগ্র মস্তিষ্কে তথা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীতে দেখা দেয়। বৃহৎ মস্তিষ্কের এই আবরক আধারটিই মনের উঁচু দরের শক্তিগুলোর একমাত্র ক্ষেত্র।

এতদ্ব্যতীত কোন জটিল শাসন ব্যবস্থাকে চালাতে গেলে মূল কেন্দ্রের সহিত অধস্তন কেন্দ্রের ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে—তাদের সঙ্গে মূল কেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষা যেমন অত্যাবশ্যক হয়—তেমনি আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ু কেন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক জগতে তার শাসন ব্যাপারে সুব্যবস্থার জন্য তার সহিত বহু স্নায়ু শিরা-উপশিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সুষ্ঠু যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্র, অধস্তন স্নায়ুকেন্দ্র, মেরুদণ্ড ও তাদের থেকে যে সব শিরা-উপশিরা বেরিয়ে দেহের শেষ বহির্বিন্দু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, ওগুলোই হচ্ছে এই যোগাযোগ স্থাপন ও সংরক্ষণকারী স্নায়ুসূত্রসমূহ। এগুলোর মাধ্যমে দেহের প্রতিটি অংশ থেকে সংবাদ গিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছে।

আবার এগুলোর মাধ্যমেই তথা হতে প্রতিটি কর্মবিভাগে করণীয় আদেশ বাহিত হচ্ছে। অতএব, প্রকৃতি অনুসারে বিচার করলে এ-জাতীয় স্নায়ুশিরাসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— ক) জ্ঞানদা, (খ) কর্মদা ও (গ) সংযোগী।

(ক) জ্ঞানদা শিরা—এ স্নায়ুশিরাগুলোর কাজ হচ্ছে বহিরিন্দ্রিগুলো থেকে উর্ধতন ও মধ্যবর্তী স্নায়ুকেন্দ্রে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। এরা অন্তর্মুখী শিরা। তা ছাড়া, এগুলো বোধ জাগাচ্ছে, তাই এগুলোকে 'জ্ঞানদা' শিরা বলে।

(খ) কর্মদা শিরা—এ-স্নায়ু শিরাগুলোর কাজ হচ্ছে মূল কর্মকেন্দ্র হতে পেশী বা গ্রন্থিতে শক্তি বা আবেগ সঞ্চারিত করে দেওয়া। এরা বহির্মুখী শিরা। তবে এরা কাজ করে বলে এদেরকে 'কর্মদা' শিরা বলে।

(গ) সংযোগী শিরা—এরা মূল বোধকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র, এর মধ্যে সংযোগ সাধন করছে বলে এদেরকে 'সংযোগী' শিরা বলে।

এতক্ষণ আলোচনার পর এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেহের সমুদয় ব্যবহার বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার বৃহৎ মস্তিষ্কের কায়াবরকস্থ মূল স্নায়ু কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এটা এক দিকে যেমন শারীরিক বিভিন্ন অন্তর্বর্তী কার্য্যকারিতাকে সঠিক ভাবে চালাচ্ছে, তেমনি আমাদের মননধর্মের মূল মানসিক ক্রিয়াগুলোর ব্যবস্থাপনাও হচ্ছে এই মূল স্নায়ুকেন্দ্রে। এটা আমাদের শারীরিক ও মানসিক সমুদয় ব্যবহারের মূল আধার ভূমি।

অতএব, মানব মনের অস্তিত্ব নিয়ে যে আদি জিজ্ঞাসা আজো চলে আসছে তার সুষ্ঠু মীমাংসা এখানেই। মস্তিষ্কের কায়াবরকে অবস্থিত 'মূল স্নায়ুকেন্দ্র'ই হচ্ছে 'মন'; আর সমগ্র শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলী হচ্ছে তার 'বাহন'।

এখন 'মন' আমাদের ব্যবহারগুলোকে কি ভাবে, কেন নিয়ন্ত্রণ করছে—তাই আলোচনা করা যাক।

উনবিংশ শতাব্দির প্রখ্যাত দার্শনিক কান্ট সাহেব আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে সঠিকভাবেই তিনটি বিশেষ শ্রেণী—'জ্ঞান', 'অনুভূতি' ও 'ইচ্ছা'-তে ভাগ করেছেন। এগুলো আমাদের মনের মূল স্বরূপ—মনের সব প্রতিক্রিয়াগুলোই—যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নিয়তই প্রকাশ পাচ্ছে, এই তিনটি বিশেষ বিভাগের অন্তর্গত। (ক) ইন্দ্রিয়বোধ, উপলব্ধি, স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা ও বিচার প্রভৃতি হচ্ছে 'জ্ঞান'এর অন্তর্ভুক্ত। (খ) ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আবেগ হচ্ছে 'অনুভূতি'এর পর্য্যায় ভুক্ত; এবং (গ) মনোযোগ, সহজাতক্রিয়া, প্রত্যাবর্তক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, অভ্যাস প্রভৃতি সমুদয় শারীরিক ও মানসিক স্বেচ্ছাকৃত কাজগুলো হচ্ছে 'ইচ্ছা'এর অন্তর্ভুক্ত।

মনের এই সকল বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে মূল শক্তি এর 'চেতন প্রকৃতি'। বাইরের বস্তু জগতে বিদ্যুৎ শক্তি রয়েছে বলেই যেমন পদার্থের 'গতি' সম্ভব হচ্ছে—তেমনি আত্মার প্রভাবে আমাদের মধ্যেও—বিশেষ করে স্নায়ুমণ্ডলে অহরহ এমনি বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে বলে মন সর্বদাই 'চেতন' থাকছে। মনের এই চেতনা বা স্নায়ুমণ্ডলের এই তড়িৎ ব্যবস্থার ফলেই আমাদের মধ্যে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমুদয় শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াগুলোর সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে।

তাছাড়া কোন জিনিসে সঞ্চারিত গতির বিভিন্ন অবস্থা যেমন ওতে নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ শক্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে, তেমনি মনন ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্য্যায়গুলোও মূল স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবাহিত বিদ্যুৎশক্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করছে। এখানে আমাদের মূল স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবাহিত বিদ্যুৎ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শক্তি অনুযায়ী স্পন্দন জাগায় এবং তাতে আমাদের মনে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা জন্মে। অতএব, মনের মূল স্বরূপ জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা মন বা স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবাহিত বিদ্যুৎশক্তির বিভিন্ন গুণ-এর ফল। জ্ঞানের জন্যে যে পরিমাণ শক্তির—মানে যেরূপ স্পন্দনের প্রয়োজন, তা যদি অনুভূতি জাগরূক বিদ্যুৎশক্তি বা স্পন্দনের অনুরূপ হয় তবে মনের অবস্থা তখন আর 'জ্ঞান' পর্য্যায়ের থাকবে না—'অনুভূতি' পর্য্যায়ে এসে পৌঁছবে। মনের ইচ্ছা পর্য্যায়ও এমনি মূল স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবাহিত বিদ্যুৎশক্তিও তার স্পন্দনের উপর নির্ভর করছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে মন বা মূল স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবাহিত বিদ্যুৎশক্তি ও স্পন্দন উক্তানুরূপ অবস্থা বিশেষে পরিবর্তিত হচ্ছে কেন—কোন্ শক্তির বলে? এর পেছনে মনের কি কোন আলাদা সত্ত্বা রয়েছে যা এ-পরিবর্তনটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে?

মন বা মূল স্নায়ুকেন্দ্রে এ-বিশেষ বিষয়গুলোর রূপায়নে বা বিদ্যুৎশক্তি ও তার স্পন্দন ক্রিয়ার পরিবর্তনের পেছনে এমন কোন নিয়ন্ত্রক নেই। এখানে মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ঘটনার স্বাভাবিক উত্তেজনার ফলেই মনে এই পরিবর্তনগুলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটছে।

তবে মনের এই স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন ও ওগুলোতে তার সক্রিয় ভূমিকা শুধুশুধি হচ্ছে না। আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হবার পরমুহূর্ত থেকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা অহরহ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে নানারূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। এতে আমাদের জন্মকালীন নিষ্ক্রিয় মনে যে শুধু উত্তেজকগুলোর অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হচ্ছে

তা নয় সঙ্গে সঙ্গে ঐ উত্তেজনা ও তার প্রতিক্রিয়াগুলো মনের বিদ্যুৎপ্রবাহে 'অভ্যস্ত' (Conditioned) ও হয়ে যাচ্ছে। ফলে তৎপরবর্তী সময়ে যখনই আমাদের স্নায়ুমণ্ডল উক্তানুরূপ কোন অবস্থা বা উত্তেজকের সংস্পর্শে আসছে তখনই মনের স্নায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎপ্রবাহে 'অভ্যস্ত' ঐ প্রতিক্রিয়াটি আত্মপ্রকাশ করছে এবং এতে আমাদের মধ্যে অবস্থা বিশেষে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা জন্মাচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন নির্দিষ্ট স্বাদ বোধ—যা একবার আমাদের স্বাদেন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল, যেমন ধরুন জলপাইয়ের টক বোধ—তার নাম শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন মানসিক সক্রিয় ভূমিকার পূর্বেই উক্ত গুণটি নির্দিষ্ট সংগ্রাহক স্নায়ুতে 'অভ্যস্ত' থাকার ফলে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে—তেমনি আমাদের জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার বেলায়ও অনুরূপ কোন প্রতিক্রিয়া জাগরূক অবস্থা আমাদের মনের বাহন 'জ্ঞানদা' ও 'কর্মদা' স্নায়ুতে 'অভ্যস্ত' থাকছে বলে প্রয়োজন মুহূর্তে আমাদের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলোর প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে।

তবে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার পেছনে আমরা মনের যে সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাই, তা হচ্ছে নেহায়েত ঘটনা ও উত্তেজনার জটিলতার ফলে। মূল স্নায়ুকেন্দ্রের বা মনের বিদ্যুৎপ্রবাহে কোন প্রক্রিয়া 'অভ্যস্ত' থাকার পর ঘটনাক্ষেত্রে যদি অনুরূপ অথচ অধিকতর জটিলতর কোন পরিস্থিতি উক্ত স্নায়ুমণ্ডলকে উত্তেজিত করে—মন বা মূল স্নায়ুকেন্দ্রে তখন অধিকতর উচ্চ পর্য্যায়ের জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার ব্যবস্থাপনা চলতে থাকে। এটাই হচ্ছে সমস্যাটির উপর মনের সক্রিয় ভূমিকা।

অতএব, আমাদের মধ্যে কোন শিশুকে যদি জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই এমন পরিবেশে রাখা যেতো সেখানে তার স্নায়ুমণ্ডল কোনক্রমেই মনের স্বরূপ জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার সংস্পর্শে আসছে না, তা হলে দেখা যেতো যে পরিণত বয়সেও তার মধ্যে সক্রিয় মনন ধর্মের তেমন কোন বিকাশ ঘটেনি। এ-জন্যেই আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে যারাই জীবনে মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে অনুকূল সমস্যা বা ঘটনার সংস্পর্শে যত কম আসছে—তাদের মধ্যে মনন প্রকৃতিগুলোর 'অভ্যস্ততা'ও তত কম হওয়ার ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানসিক দিক দিয়ে তারা অনুরূপ কাঁচা থেকে যাচ্ছে—অর্থাৎ উত্তেজক থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার ব্যবস্থাপনা তাদের মধ্যে তেমন জাগছে না।

এখন কেউ কেউ হয় তো প্রশ্ন করবেন যে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো যদি ওর বিদ্যুৎতরঙ্গে উত্তেজক-গুলোর 'অভ্যস্ততা' এর ফলেই হয়, তবে সদ্যজাত শিশুর আচরণগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি করে? এখানে শিশুর মিষ্টি বা আরামের প্রতি 'হাঁ' সূচক এবং তিক্ত ও দুঃখের প্রতি 'না' সূচক অনুভূতি ধর্মী প্রতিক্রিয়াগুলোর পেছনে তো কোন উত্তেজক ইতিপূর্বে তার মধ্যে অভ্যস্ত ছিল না? অথবা আমাদের মধ্যে এখনো অভ্যস্ত হয়নি এমনি কোন প্রথম ও নূতন উত্তেজকের প্রত্যুত্তরই বা আমাদের মন দিচ্ছে কি করে?

আমি পূর্বেই বলেছি এবং আলোচনা করেছি যে মন হচ্ছে একটি দৈহিক জিনিষ; এবং জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা হচ্ছে এর মধ্যে আত্মার প্রভাব চেতনার ফল। এখন মনের চেতনা হচ্ছে দেহের চেতনা—কেননা আমরা দেখেছি যে মন এবং দেহ কার্য্যকারিতায় উভয়ই উভয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। 'মন' যেমন দেহের বিভিন্ন কার্য্যকারিতার নিয়ন্ত্রক, তেমনি আবার দেহ ও স্নায়ুমণ্ডলীও মনের কার্য্যকারিতায় একমাত্র সহায়ক। সদ্যজাত শিশুর বেলায় অথবা প্রথম ও নূতন কোন উদ্দীপকের বেলায় আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে—তার কারণ হলো আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে ও তার কেন্দ্রে বা মনে উদ্দীপকটির নিজস্ব স্বভাব-ধর্মের পরিণতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের মধ্যে প্রথম ও নূতন কোন ব্যবহারই শুধু উদ্দীপকগুলোর স্বভাবানুরূপ প্রতিক্রিয়ার ফল হচ্ছে; বরং আমাদের সমুদয় ব্যবহার-গুলোই মূলতঃ পরিণতিতে উদ্দীপকগুলোর স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়ার ফল। অভিজ্ঞতা ও অনভ্যস্ততা এর বিশেষ মূল্য এখানেই যে এটা আমাদের মধ্যে মনের স্বাভাবিক সক্রিয় ভূমিকা ও অধিকতর উন্নত প্রতিক্রিয়াকে জাগাচ্ছে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা অভ্যস্ততাসমূহ যদি আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে ও মনে রক্ষিত না থাকতো, তবে আমাদের মন অনুরূপ ক্ষেত্রে এমনি উন্নততর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির গুণ লাভ করতো না।

তবে মনের মধ্যে কোন অভিজ্ঞতা বা অভ্যস্ত বিষয়ের কার্যক্ষম অবস্থার সংরক্ষণ ব্যাপারে একটি নিয়ম রয়েছে। সব পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অভ্যস্ততা আমাদের মনে সব সময় একই রূপ প্রকৃতি ও শক্তি নিয়ে বর্তমান থাকছে না। আমি পূর্বেই বলেছি যে, উদ্দীপনগুলো আমাদের স্নায়ুমণ্ডল ও তার কেন্দ্রে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহে নিজ নিজ প্রকৃতি ও ক্ষমতানুযায়ী স্পন্দন জাগাচ্ছে এবং ফলে উক্ত স্পন্দনের গুণানুসারে বা ওটার 'অবিরতি' বা (Frequeney) এর শক্তি হেতু আমাদের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মানসিক প্রক্রিয়াগুলো দেখা দিচ্ছে। এখন যে কোন উদ্দীপনের উদ্দীপনা

ঘটনা ক্ষেত্রে মনের বিদ্যুৎপ্রবাহে স্পন্দন জাগিয়ে স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়াটি সম্পাদিত হবার পরই যে পুনরায় মিলিয়ে যাচ্ছে—তা নয়। প্রকৃতির রাজ্যে 'ইথার' প্রবাহে যেমন সব শব্দই—শ্রাব্যাধীন হোক বা না হোক—ভাসমান থেকে যাচ্ছে, আমাদের স্নায়ুমণ্ডল ও তার কেন্দ্রের বা মনের বিদ্যুৎপ্রবাহেও তেমনি উদ্দীপন ও প্রতিক্রিয়াগুলো অভ্যস্ত থেকে যাচ্ছে—একেবারে মুছে যাচ্ছে না। তবে হাঁ, এখানে ঠিক ইথারের শব্দতরঙ্গেরই ন্যায় উদ্দীপন ও তার প্রতিক্রিয়াজাত স্পন্দনের 'অবিরতি' কালক্রমে উদ্দীপনের বৈচিত্র হেতু ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে এবং ফলে ওগুলো আমাদের মধ্যে ঠিক পূর্ব প্রকৃতি ও গুণ নিয়ে বর্তমান থাকতে পারছে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন নির্দিষ্ট মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগরুক স্পন্দন তার পূর্ণ 'অবিরতি' শক্তি নিয়ে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে আলোড়িত করছে—ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের মধ্যে ঐ মানসিক প্রতিক্রিয়াটির সক্রিয় ভূমিকা চলতে থাকে। তারপর কালক্রমে ঘটনার বৈচিত্র্যহেতু অথবা আমাদের মন প্রতিনিয়তই নূতন নূতন উদ্দীপন দ্বারা আড়োলিত হচ্ছে বলে ঐ স্পন্দন ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে থাকে এবং ফলে উক্ত প্রতিক্রিয়াটি আর মনের সক্রিয় ভূমিকায় টিকে থাকতে পারছে না।

তবে আমাদের মধ্যে ক্রমে ক্ষীণমান স্পন্দনের আবার এমন একটি সীমা রয়েছে যে তখনো অনুরূপ কোন ঘটনা বা উদ্দীপনা তার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে—অর্থাৎ অনুরূপ উদ্দীপনার ফলে উক্ত ক্ষীণমান স্পন্দনটি আবার তার হৃত শক্তি ফিরে পেয়ে মনে সক্রিয় ভূমিকা লাভ করতে পারছে। কিন্তু ঘটনা পরিস্থিতির চাপে কালক্রমে মনের মধ্যে স্পন্দনটির পুনরোদ্ধারাধীন অবস্থাটিও যখন পার হয়ে যায়—অর্থাৎ স্পন্দনটি পুনরোদ্ধারাধীন স্পন্দন থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে, তখন অনুরূপ কোন উদ্দীপনা আর সহজে ওটার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে না। একেই আমরা সাধারণ কথায় 'ভুলে যাওয়া' বলে থাকি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান জগতের বিখ্যাত চিন্তানায়ক ডাঃ ফ্রয়েড মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনের যে 'চেতন', 'অর্দ্ধ চেতন' ও 'অবচেতন'—তিনটি অবস্থার সন্ধান পেয়েছিলেন তা হচ্ছে মনে বিদ্যুৎপ্রবাহে উদ্দীপন ও তার প্রতিক্রিয়াজাত স্পন্দনটির এই বিভিন্ন রূপ অবস্থা। প্রতিক্রিয়া যখন মনের মধ্যে সক্রিয় ভূমিকায় থাকছে তখন হচ্ছে মনের 'চেতন' অবস্থা। যখন ওটা স্পন্দনের ক্ষীণতার ফলে সক্রিয় ভূমিকার আড়ালে পুনরোদ্ধারাধীন সীমায় থাকছে তখন হচ্ছে মনের 'অর্দ্ধচেতন' অবস্থা, আর যখন স্পন্দনটি আরো ক্ষীণতম হবার ফলে পুনরোদ্ধারাধীন সীমা পেরিয়ে দুরতিগম্য সীমায় এসে যাচ্ছে তখন হচ্ছে মনের 'অবচেতন' অবস্থা।

যা হোক, এখন 'আত্মা' ও 'মন' সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারাকে সংক্ষিপ্ত করলে এই দাঁড়াচ্ছে যে—

(ক) 'আত্মা' একটি 'বৃহৎ শক্তি'। এটা আমাদের মধ্যে স্রষ্টা বা অনন্ত কারণিকের একটি নির্দেশ। এটা আমাদের দেহকে সজীব, সতেজ ও সক্রিয় রাখছে। এটা মৌলিক, অনন্ত ও অবিনশ্বর।

(খ) 'মন' আমাদের মধ্যে শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হেতু একটি বিশেষ গুণ। আমাদের মধ্যে এর শারীরিক অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের বৃহৎ মস্তিষ্কের কায়াবরকস্থ মূল স্নায়ুকেন্দ্রই হচ্ছে 'মন'—আর সমগ্র দেহ ও তার স্নায়ুমণ্ডলী হচ্ছে তার 'বাহন'।

(গ) মনের মূল স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা। এগুলো ঘটনার উদ্দীপনা হেতু আমাদের মনের বিদ্যুৎ প্রবাহে স্পন্দন ক্রিয়ার মারফত স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে মন সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই-ই। তবে মূলতঃ জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মনে এগুলোর পরিণতি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দীপনগুলোর স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়ারই ফল।

(ঘ) আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা ও তার প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পাদিত হবার পরই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এগুলো আমাদের স্নায়ুমণ্ডল ও তার কেন্দ্র বা মনে প্রবাহিত বিদ্যুৎতরঙ্গে 'অভ্যস্ত' থেকে যাচ্ছে।

(ঙ) মনের মধ্যে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কোন অভ্যস্ত বিষয়ের সংরক্ষণ ও তার কার্য্যক্ষমতা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎপ্রবাহে কৃত স্পন্দনের 'অবিরতি'র উপর নির্ভর করছে। কোন উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া হেতু পূর্ণ 'অবিরতি' সম্পন্ন মুহূর্তটি হচ্ছে মনের 'চেতন' অবস্থা, স্পন্দনের ক্রম ক্ষীণমান গতির ফলে মনের সক্রিয় ভূমিকার আড়ালে পুনরোদ্ধারাধীন সীমা পর্য্যন্ত হচ্ছে মনের 'অর্দ্ধ চেতন' অবস্থা, আর স্পন্দনটির অধিকতর ক্ষণতম কাল যখন থেকে এর পুনরোদ্ধার কৃচ্ছ্রসাধ্য ও আকস্মিক—তা হচ্ছে মনের 'অবচেতন' অবস্থা।

মা

নিরাপদ্ খাঁ

নঈম প্রবল জ্বরে বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। মা হালিমা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। এক অজানা আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিতে থাকে। সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ছেলের বিশীর্ণ শুষ্ক মুখের দিকে।

হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া হালিমা ইন্দ্র কবিরাজকে ডাকিয়া আনিয়াছে। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ বলে: "সন্নিপাত। সাংঘাতিক জ্বর, যে জ্বর অইলে বাঁইচবার আশা থাহে না। পোলার অবস্থা ভাল লাইগছে না। টাহা-পইসা আছে ত? অষুধ দিলে ভগবানের কৃপায় ভাল অইব।"

"সন্নিপাত!" একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়া আসে হালিমার মুখ হইতে। বজ্রাহতের মতো সে বসিয়া পড়ে। একটা অব্যক্ত বেদনার দীর্ঘশ্বাস হালিমার বুক চিরিয়া বাহির হয়। তাহার চেহারায় গভীর বিষাদের কালিমা জমিয়া উঠে। বুক ফাটিয়া কান্না আসে। একটি পয়সাও যে হাতে নাই! নঈমের পাওনা মাহিনার পাঁচটি টাকা যদি পায় তবে সে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

দর্শনীর টাকার জন্য ইন্দ্র কবিরাজ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল ঘরের দাওয়ায়। শেষ পর্য্যন্ত যখন দেখিল 'দর্শনী' পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া দুই-একটা কড়া মন্তব্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

হালিমার একমাত্র ছেলে নঈম। বার তের বছর বয়স। বাপ মারা গেছে অনেক দিন। দুনিয়াতে এক মা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই। হালিমা পরের বাড়ী ধান ভানিয়া কাজকর্ম করিয়া যাহা পায় তাহাতে কোন দিন খাইয়া কোন দিন না খাইয়া দিন কাটায়। নঈমকে দিয়াছে রাখালের কাজে। মাসে পাঁচ টাকা মাইনা। সেইদিন মাঠে গরু চরাইতে গিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া সামান্য জ্বর লইয়া সে বাড়ীতে ফিরে। স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের কোণে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে নঈম।

করিম সর্দার ঘরের সামনে আসিয়া হাঁকে: "কই রে বেটা নঈম! আইজ দুইদিন আইয়হ্‌ছ না ক্যান্? গরু খাওন না পাই যে শুকাই মরবার লাইগ্‌ছে।"

"পোলার যে জ্বর,"—হালিমা ভিতর হইতে অস্পষ্ট কণ্ঠে আপত্তির সুরে উত্তর দেয়।

"হালা, হারামজাদা, জ্বরের ভান কইরয়্যা ঘরে হুইয়া আছ!" গলার স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া বলে করিম সর্দার। "সব বুইঝি, ফাঁকি দেওনের আর সময় পাওনি না। হালা, আইজ কাজে না আইলে গেল মাসের মাইনা-টাইনা দিমুনা বইলৃছি।"

করিম সর্দারের কথা শুনিয়া দুঃখে-ক্ষোভে হালিমার বুক বিদীর্ণ হয়। তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া দুই ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

রাত্রিতে নঈমের জ্বর বাড়ে। তাহার গায়ে হাত দিয়া হালিমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কি ভীষণ উত্তাপ! শরীর হইতে যেন আগুনের ঝলক বাহির হইতেছে। নঈমের চোখ দুইটি টক্‌টকে লাল। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ। মাঝে মাঝে দুই-একটি ভুল কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

এই অবস্থায় কি করিবে হালিমা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মনে এলোমেলো চিন্তা আসে। ছেলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সে দিশাহারা হইয়া যায়।

গ্রামের এক প্রান্তে পরের ছাড়া বাড়ীতে ঘর বাঁধিয়া বাস করে তাহারা। একান্ত একা, আশেপাশে লোকজন নাই। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে চারি দিক সমাচ্ছন্ন। কেমন একটা থম থম ভাব বাইরে। ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ বহুদিনের ছাড়া বাড়ীতে যেন দৈত্যদানব ভুত-পেত্নীরা আসিয়া আসর জমাইয়াছে। ঝোপের মধ্যে পাখীর সামান্য ডাক, পাতা নড়ার সামান্য শব্দ, তার মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝাঁজালো চীৎকার ধ্বনি হালিমাকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে।

নঈম কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসে বিছানায়। ঘরের কোণের দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলে: "ঐ সাপ, কালাসাপ! ঐ দেখ, আইয়ে, কামড়াইতে আইয়ে। বাপরে বাপ, কি জোরে দৌড়াই আইয়ে। মোরে খাওনের লাইগ্যা আইতেছে।" ভয়ে কুঁকড়াইয়া যায় নঈম। হালিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মা তাহাকে শোয়াইয়া দেয়।

অল্প কতক্ষণ পরেই নঈম উঠিয়া দাঁড়ায়। হালিমা বাধা দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লয়। ভীষণ বিক্রমে তাহাকে ঠেলিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করে। হাসিতে হাসিতে বলে: "কি সুন্দর তোঁয়ার সোনালী ডানা দুইডা।" তারপর হাতছানি দিয়া ডাকে: "ওগো পরী, মোরে লইয়া চল পরীর দেশে। তোঁয়ার ডানায় কইর‍্যা উড়ইয়্যা যামু।"

হালিমা নঈমকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া দেয়। মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালে, পাখার বাতাস দেয়। আস্তে আস্তে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

ঘরের মাঝখানে একটা কেরোসিনের বাতি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। একটু বাতাস লাগিলেই বুঝি নিভিয়া যায়। অস্পষ্ট আধো আলোতে নঈমের বিশীর্ণ মুখখানি যেন ঠিক মরার মুখের মতো। হালিমা তাকাইতে পারে না সেই দিকে। অজানা আশঙ্কায় এবং তীব্র বেদনার অনুভূতিতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহার অন্তরে। সমস্ত শরীর হিম হইয়া আসে। রক্তের প্রবাহ যেন বন্ধ হইয়া যায়। চারিদিকে পরিব্যাপ্ত গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন মৃত্যু হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে তাহার নঈমকে। ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেন আজরাইল ও তাহার অনুচরেরা উঁকি মারিয়া দেখিতেছে আর তাহার প্রাণ-সমতুল্য নঈমের জান লইয়া প্রস্থানের সুযোগের অপেক্ষায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

স্নেহময়ী মায়ের প্রাণ হইতে ক্রন্দনের রোল ও হাহাকার উত্থিত হয় খোদার আরশের দিকে। জোড় হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া হালিমা জানায় হৃদয়ের কাতর আবেদন, নঈমের জীবন রক্ষার প্রার্থনা, "হে খোদা! কত সাধনা করছি, কত মানত করেছি, কত পীর-দরবেশের দোয়া লইছি, কত মসজিদে ও দরগায় শিন্নি দিছি। তারপর খোদা, তুমি দিছ মোর প্রাণের মানিককে। পাওনের আশা শেষ অই গেছিল যহন, তহন মোর বন্ধ্যাত্ব দূর কইরছ। মোর জীবনে ফুটাইছ এই ফুল। হে খোদা, তোঁয়ার দেওয়া হেই ফুল অহন কাইড়্যা লইবা। মায়ের বুক শূন্য কইর‍্যা কাইড়্যা লইবা, খোদা!" চোখের পানিতে হালিমার বুক ভাসিয়া যায়। কাঁদিতে কাঁদিতে সে নঈমকে বুকে জড়াইয়া কখন্‌ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা টের পায় নাই।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই হালিমা দেখিল, নঈম অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। গায়ে হাত দিয়া সে চমকিয়া উঠে। কি ভয়ঙ্কর জ্বর! জ্বরের তাপে সমস্ত শরীর পুড়িয়া যেন ছাই হইয়া যাইতেছে।

হালিমা আর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারে না। যে কোন রকমে হউক ইন্দ্র কবিরাজকে ডাকিয়া আনিবে। করিম সর্দারের নিকট নঈমের পাওনা বেতন পাঁচ টাকা পাইলে আপাততঃ কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধ খরচ চলিবে।

পাশের বাড়ীর পাগলা বউকে ডাকিয়া নঈমের পাশে বসাইয়া দিয়া হালিমা বলিল, "মা, এহানে তুঁই বইয়া থাহ। মোর যাদুর দিকে খেয়াল রাইখ্‌খো। বাইর-টাইর অইয়া না যায়। আঁই একটু ঘুইর‍্যা আহি।"

হালিমা বড় আশা করিয়া মনে মনে খোদা রসুলের নাম জপিতে জপিতে করিম সর্দারের বাড়ীর পথে চলিল। ইত্যবসরে করিম আসিয়া হাজির। ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকে: "নঈম, ও নঈম, হারামজাদা, আইজও আইলি না। হালা পলাইছ বুঝি। গরু যে মইর‍্যা যায়। ঐ রহম কইরলে টাহা-পইসা দিমু না। ঘরের দরজা বন্ধ কইর‍্যা হুইয়া আছ, হালা।"

ঘরের দরজায় দুই তিনটা ধাক্কা দিয়া নঈম ও তাহার মাকে গালাগালি করিতে করিতে করিম সর্দার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হালিমাকে দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠে। ক্রুদ্ধস্বরে বলিল: "এহানে আইয়্যা বইয়া রইছ। তোঁয়ার পোলা যে আইজও আইল না।"

"পোলা যে জ্বরে মইর‍্যা যাওন লাইগছে। আইব কি কইর‍্যা? পোলার বেতনের টাহাডা দিবেন, বাবা।"

"অহন পোলার টাহার জন্য আইছ। জ্বরের কথা কইয়া ফাঁকি দিয়া টাহা নেওয়ার লাইগ্যা। হালারে আইতে কইও। ন অইলে টাহা পয়সা দিমুনা, বলছি। মোগো গরু মইর‍্যা যাওন লাইগছে।"

অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াও হালিমা টাকা পাইল না। বরং গালাগালি শুনিয়া, অপমানিতা হইয়া, দুঃখের বোঝায় হৃদয় আরও ভারাক্রান্ত করিয়া ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার পথে ইন্দ্র কবিরাজের বাড়ী গেল। তাহাকে কাতর নিবেদন জানাইল আর একবার আসিয়া তাহার প্রাণ এতিম নঈমকে দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবার জন্য। কবিরাজ মুখ বাঁকাইয়া বলিল: "যাইয়া দেইখলে কি অইব। অষুধের দাম-টাম দিতে পাইরবানা। হুদাহুদি যাইয়্যা কি করুম। আমার এহন রোগী দেহার লাইগ্যা বাইরা যাওন লাইগবো।"

ইন্দ্র কবিরাজের কথা শুনিয়া হালিমার ভয়ানক রাগ ও দুঃখ হয়। দুই বছর পূর্বেও এই ইন্দ্র কুমার ছিল নাপিত। অন্য স্থানে হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাসা বাঁধিয়াছে। নঈমের মাথার চুল ফেলিয়াছে। চার পয়সার ক্ষৌরি করিবার জন্য তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে একবার দুইবার নয় বহুবার। এখন সে গ্রামের কবিরাজ।

চারিদিক হইতে নৈরাশ্যের অন্ধকার আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। একান্ত নিরুপায় হইয়া, সকল আশা-ভরসা হইতে বঞ্চিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল হালিমা। তাহার হৃৎপিণ্ড ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। না জানি ইতিমধ্যে নঈমের কি অবস্থা হইয়াছে। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া সে থ খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নঈম আবার প্রলাপ বকিতেছে। পাগলা বউ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

অমাবস্যার রাত্রির গভীর অন্ধকারে প্রকাণ্ড ছাড়া

বাড়াটা কেমন ছম ছম করিতেছিল। এই রাত্রিকেই হালিমা সব চাইতে বেশী ভয় করে। অমাবস্যার রাত্রি। নঈমের অবস্থা খুবই খারাপ। ঠিক নিশীথ রাত্রে ঘরের চালের উপর বসিয়া একটা দাঁড় কাক কা কা করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়। ঘরের কোণের দিকের তেঁতুল গাছ হইতে প্যাঁচা-পেঁচী মরিয়া হইয়া চ্যাচামিচি করিতেছে। এক সঙ্গে এতগুলি কুলক্ষণ, হালিমাকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তোলে। পুত্রের জীবনের আশা সে এক প্রকার ছাড়িয়াই দিল। অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল নঈমের মুখের পানে। ইহাই যেন শেষ দেখা। তাই প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লয়।

যা'হোক, নঈম আস্তে আস্তে ভাল হইয়া উঠিল।

আবার অন্যের বাড়ী কাজে লাগে নঈম। মাঠে মাঠে গরু চরায়। মনের আনন্দে গান গায়। বাঁশী বাজায়। কত সাধনার ধন এই ছেলে। তাহাকে এক মুহূর্ত দেখিতে না পাইলে হালিমা পাগলের মতো হইয়া যায়। তাই সকাল বিকাল দুইবার নঈমের মুনিবের বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকে তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে বাড়ীতে না পাইলে মাঠে যাইয়া দেখিয়া আসে। রাত্রিতে নঈম মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শোয়। তাহার কোমল স্নেহের স্পর্শে কত আরাম অনুভব করে; সকল দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্যের কষাঘাত, মুনিবের গালাগালি আর তাহার নিকট হইতে পাওয়া সমস্ত লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া যায়। সেই স্নেহ-মধুর স্পর্শে জীর্ণ পর্ণ কুটিরকেও মনে হয় রাজার প্রাসাদ। এমনিভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল সাত আটটি বছর।

হালিমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জীবনের শেষ প্রান্তে। তাহার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাহার মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। সারা জীবনের গড়া তাহার স্বপ্নসৌধ শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

নঈমকে বিবাহ দিবার জন্য হালিমা অধীর হইয়া উঠিল। অনেক দিন ইচ্ছা প্রবল ভাবে চাপিয়া রাখিয়াছে। কেন যে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহার কারণ সে নিজেই খুঁজিয়া পায় না। এখন ছেলের বউ দেখিবার জন্য সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কত রঙীন স্বপ্ন দেখে। বউ আসিয়া বাড়ীটাকে সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিবে। তাহার নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন আনন্দের কলতানে হইয়া উঠিবে মুখর। নাতি-নাতিনীকে কোলে কাঁখে করিয়া শেষ দিন কয়টি কাটাইতে চায়। ইহাতেই তাহার আকাঙ্খার চরম পরিসমাপ্তি এবং সুখের পূর্ণ পরিণতি।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক সুন্দরী তরুণীকে হালিমা তুলিয়া আনিল পুত্র বধূরূপে। দেখিতে গরীবের মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। হালিমার ভারি পছন্দ হইয়াছে মেয়েটিকে। অষ্টপ্রহর ছেলের বউকে জড়াইয়া সে তাহার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করিয়া দিল। পুলকের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ঝড় বহিয়া গেল তাহার বুকের ভিতর।

এক মাস দুই মাস করিয়া কয়েক মাস কাটিয়া গেল। কোন্‌টা কি ভাবে করিতে হইবে হালিমা সে সম্বন্ধে বউকে উপদেশ দেয়। রান্না-বাড়ার রীতিনীতি শিখায়। পদে পদে বাধা. প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ আর উপদেশ বউয়ের ভাল লাগে না। সে রাগ হয়, গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকে। হালিমা মিষ্টি কথা বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করে।

একদিন রাত্রে গোসা করিয়া বসিল বউ। নঈম অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাত খাওয়াইতে পারিল না। সেই রাত্রে কাহারও খাওয়া হইল না।

বউ-শাশুড়ী সম্বন্ধ ক্রমশঃ তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ যেন সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল হালিমার মাথায়। তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। এ কি হইল, কেন হইল বুঝিতে পারেনা হালিমা। মনে হইল সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যেন তাহার চোখের সামনে ওলট পালট খাইয়া ঘুরিতেছে।

"মা তোঁয়ার লগে আর থাকন যাইব না," কঠোর কর্কশ স্বরে বলিয়া ফেলে নঈম। "তোঁয়ার শহিদ্যে একটু দয়ামায়া নাই। হারাদিন বউ খাটে গাধার মতন। আর তুঁই তার লগে কর খেচ্‌মেচ্‌? তার মা-বাপকে গালা-গালি কইর‍্যা কথা কও।"

আশ্চর্য্য হইয়া শুনে নঈমের কথা। প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না হালিমা। শুধু দুইটি কথা বলিল: "কই, কহন কি বইল্লাম।" হালিমার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া গেল।

"মা, তোঁয়ার সব মিচা কথা"—নঈম রাগিয়া বলে। "এমন ভালা বউ কোনহানে দেইখ্‌ছ? তুঁই ভালা ব্যবহার কইরতে পাইরলা না তার লগে, এদ্দিন বইয়্যা বইয়্যা মোর রোজী রোজগার খাইছ। কাইল থাইক্যা দেহা যাইব খাওন আইয়ে কই থেইকা?"

হালিমার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

পরদিন স্ত্রীকে লইয়া নঈম শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

আজ কয়েকদিন হইল নঈমের প্রবল জ্বর হইয়াছে। পথ্যাপথ্য নাই। সেবা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নাই।

বউ আসিয়া একটু উঁকি মারিয়া চলিয়া যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী ত দেখিতেই আসে না। একটা আপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া কথায় কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে। বউকে দেখিয়া তাহার মাথায় রক্ত উঠে। পিঁড়ি ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। 'মা' 'মা,' বলিয়া কাতর আর্তনাদে গলা ফাটাইতে থাকে।

মায়ের স্নেহ-কোমল কোলে নঈম ফিরিয়া যাইতে চায়। সে কাতর কাকুতি জানায় তাহার মাকে আনিয়া দিতে। মায়ের হস্ত স্পর্শেই সে আবার সারিয়া উঠিবে। "মা, মা" বলিয়া সে কখন হাসে, কখন কাঁদে এবং কখন আবোল-তাবোল বকিতে থাকে। তাহার চোখের সম্মুখে মরুভূমির বিশাল শূন্যতা, হিম-শীতল মৃত্যুর বিভীষিকা!

নঈমের মা'র কোন সন্ধান মিলিল না। সেই নির্জন ছাড়া বাড়ীর ছোট্ট কুঁড়েঘরখানি শূন্য পড়িয়া আছে। বউ লইয়া নঈমের প্রস্থানের পর হালিমাকে আর কেহ দেখে নাই।

এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়া নঈম আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

রাংগা-মাটিতে সন্ধ্যা

আখ্‌তার-উল্‌-আলম

আরক্ত মাগ্রিব— ডুবে যায় আলোকের বিরাট ভুবন।
গোধূলির ধূলি-পথে ছায়াচ্ছন্ন নামে ক্রমে আবছা আঁধার ;
তারকার ম্লান আঁখি ঃ তন্দ্রাভারে এ-মাটীর সোনালী স্বপন।
পাখীরা নীড়ের স্বপ্নে।
দিগন্তের সুদূরিকা সবুজ বিথার
ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।
ভাঙ্গা মেঘে আকাশের রাঙ্গা রূপভার,
বাসরে কী সুসজ্জিত—এই সাজে মেহেদীর রক্তিম বরণ ?

শহুরে পল্লীর এই
আধো আধো ছোঁয়া নিয়ে আশ্চর্য অবাক,
নির্বাসিত এ-জীবন।
কোথাকার উঁচু চূড়া— যায় দেখা যায় !
চকিতে 'বাসে'-র শব্দ দিয়ে যায় শহরের ডাক ;
ছায়াচ্ছন্ন দূর গ্রাম আধো আলো আধো ছায়ে নীরবে ঝিমায়।

সজীব পাখীর কণ্ঠ ডুবায় নির্জীব-যন্ত্র-পাখা আর্তনাদ ;
মজুরেরা বাড়ী-ফেরে ঃ শ্রান্ত পথ ক্লান্ত পেরেশান।
সীমিত সন্ধ্যার মত ফুরে যায় আকাশের-দিবসের সাধ ;
ইথারের পথে পথে ডাক দিয়ে ফেরে শুধু—
বেলালের নতুন আজান ॥

ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি পালন

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি, সুলতান আর্থিক যে সব দান খয়রাতের প্রতিশ্রুতি দিতেন খাজাঞ্চিখানা থেকে তা দিতে বিলম্ব করা হতো—যদিও শেষ পর্যন্ত অর্থ সত্যিই দেওয়া হতো। সুলতান আমাকে যে বার হাজার দিনার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আদায় করতে আমাকে ছ'মাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। তা' ছাড়া সুলতানের দানের এক দশমাংশ কেটে রাখবার রীতিও এখানে প্রচলিত আছে। আগেই বলেছি, আমার সফরের খরচের জন্যে, সুলতানের উপঢৌকন বাবদ এবং দিল্লীর বাসস্থানের খরচ বাবদ অনেক টাকা আমাকে ঋণ করতে হয়েছিল বিদেশী সওদাগরদের কাছ থেকে। সওদাগরদের দেশে ফিরে যাবার সময় হলে স্বভাবতই তারা আমাকে ঋণ পরিশোধের জন্যে তাগিদ দিতে লাগল। আমি অগত্যা সুলতানের প্রশংসা সূচক লম্বা একটি কবিতা রচনা করে তাঁর দরবারে পেশ করলাম। তিনি সানন্দে সেটি গ্রহণ করলেন এবং সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাল। অতঃপর আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে আমি সুলতানের কাছে এক দরখাস্ত পাঠালাম। তার ফলে, সুলতান তাঁর উজিরকে হুকুম করলেন টাকাটা দিয়ে দিতে। উজির সুলতানের হুকুম তামিল করতে বিলম্ব করতে লাগলেন এবং ইত্যবসরে তাঁর দৌলতাবাদে যাবার হুকুম এসে গেল। এদিকে সুলতানও বাইরে চলে গেলেন শিকার করতে। কয়েক দিনের মধ্যে উজিরও দৌলতাবাদ যাত্রা করলেন। সুতরাং আরও কিছুদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হল।

আমার পাওনাদাররা যখন সত্যি সত্যিই স্বদেশে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হল তখন তাদের ডেকে একদিন বললাম, "আমি যখন সুলতানের প্রাসাদে হাজির হব ঠিক তখন এদেশের রেওয়াজ অনুসারে তোমরা গিয়ে আমার কাছে টাকার তাগাদা করবে।" কারণ, আমি জানতাম, সুলতান আমার ঋণের কথা জানতে পারলেই তা পরিশোধ করে দেবেন।

রেওয়াজ ছিল, পাওনাদার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে দরবার কক্ষের দরজায়। দেনাদার যখন ঢুকতে যাবে দরবারে,—ঠিক তখন পাওনাদার সুলতানের দোহাই দিয়ে পাওনা টাকা দাবী করবে। পাওনা পরিশোধ করা বা একটা কিছু রফা না করা পর্যন্ত কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না।

পাওনাদারের দল আমার পরামর্শ মতো একদিন সত্যিই তাই করলো। খবর পেয়ে সুলতান তাঁর একজন সভাসদকে পাঠালেন সওদাগরদের কাছ থেকে আমার দেনার পরিমাণটা জেনে নিতে। তারা বলে পাঠালো, দেনার পরিমাণ পঞ্চান্ন হাজার দিনার। সুলতান পুনরায় সেই সভাসদকে পাঠালেন সওদাগরদের কাছে। তাদের কাছে এসে তিনি বললেন, মহামান্য সুলতান তোমাদের জানাতে বলেছেন, পাওনা টাকা তিনিই দেবেন, কারও ওপর অবিচার হবে না। তোমরা পাওনার জন্যে তাঁকে (ইবনে বতুতাকে) আর তাগাদা করো না।

এরপর সুলতান দু'জন কর্মচারীকে হুকুম করলেন সওদাগরদের হিসাব পরীক্ষা করে দেখতে। হিসাব ও দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল সব ঠিকই রয়েছে। সুলতান এ-সংবাদ পেয়ে হেসে বললেন, আমি জানি উনি একজন কাজী, কাজেই তাঁকে পাওনাদাররা ঠকাতে পারবে না। তিনি খাজাঞ্চীকে হুকুম দিলেন টাকাগুলো শীগ্‌গীর দিয়ে দিতে। কিন্তু অর্থলোভী খাজাঞ্চী ঘুষ চেয়ে বসল। ঘুষ না পেলে সে টাকা দেবে না। আমি অগত্যা দু'শ টাঙা ঘুষ বাবদ দিলাম। সে তা গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠাল এবং নিজের একজন ভৃত্যকে দিয়ে বলে পাঠাল, পাঁচ শো ঠাঙার কমে কাজ হবে না। আমি তা' দিতে অস্বীকার করলাম। কথাটা সুলতানের কানে উঠতে দেরী হল না। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে টাকাটা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং ইত্যবসরে খাজাঞ্চীর কাজের যথাযথ তদন্ত চালাতে হুকুম করলেন।

এর কিছুদিন পরে সুলতান রাজধানী ত্যাগ করলেন শিকারে যাবার উদ্দেশ্যে। আমিও অবিলম্বে তাঁর সঙ্গ নিলাম। লোক-লস্কর যোগাড় করে আমি এ-জন্য তৈরীই ছিলাম।

একদিন সুলতান তাঁর তাঁবুর ভেতর বসেছিলেন। আমি তখন তাঁবুর বাইরে ছিলাম। বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে তা' সুলতান জানতে চাইলে নাসিরউদ্দিন নামক একজন সভাসদ আমার কথা জানালেন। বললেন, লোকটি বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।

সুলতান স্বভাবতই আমার বিমর্ষ হবার কারণ জানতে

চাইলেন। নাসিরউদ্দিন বললেন, তাঁর দেনার ভাবনায় তিনি অস্থির। পাওনাদাররা দেনাশোধের জন্যে ভয়ানক পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছে হুজুর। খাজাঞ্চীখানা থেকে টাকাটা শোধ করে দিতে হুজুর একবার উজিরকে হুকুম করেছিলেন; কিন্তু টাকা না দিয়েই উজির চলে গেলেন। উজির ফিরে না আসা অবধি পাওনাদারদের অপেক্ষা করতে হুকুম করেন তো খুব ভাল হয়। নবাব দৌলৎ শাহ সেখানে হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, শাহানশাহ, এ-লোকটি প্রতিদিন আরবী ভাষায় আমাদের কি যে বলেন তার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝতে পারি না। নাসির উদ্দিন কিছু বুঝতে পার ?

নাসির উদ্দিন বললেন, তিনি তাঁর ঋণের কথাই বলেন।

সুলতান তখন নাসির উদ্দিনকে বললেন, আমরা রাজধানীতে ফিরে গেলে তুমি নিজে গিয়ে খাজাঞ্চীখানা থেকে টাকাটা এনে পাওনাদারদের দিও।

সে সময়ে খাজাঞ্চীও সেখানেই হাজির ছিল। খাজাঞ্চী বলল, শাহানশাহ্, এ-লোকটি ভয়ানক অপব্যয়ী। তাঁকে আমি সুলতান তারমাশিরিণের দরবারে দেখেছি।

তাঁবুর ভেতরে যেসব কথাবার্তা হল তার কিছুই তখন আমি জানতে পারিনি। একটু পরে সুলতান আমাকে খাবার দাওয়াত করলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই নাসির উদ্দিন বললেন, নবাব দৌলত শাহ্‌কে আপনার উচিৎ ধন্যবাদ দেওয়া।

দৌলত শাহ বললেন, আমাকে নয়, খাজাঞ্চীকে ধন্যবাদ দেবেন।

ফিরে আসার পরের দিনই আমি প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে সুলতানকে দু'টি মূল্যবান উট এবং এগার থালা মিষ্টি উপহার দিলাম। সুলতান মিষ্টির পাত্রগুলো তাঁর খাশ্‌মহলে নিয়ে রাখতে হুকুম করলেন এবং নিজে সেখানে ফেরবার পরে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমরা দু'জনে একত্র বসে মিষ্টি খেলাম। কয়েকটী মিষ্টি সুলতানের খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি আমার কাছ থেকে সেগুলোর নাম জেনে নিলেন। তারপর পান খেয়ে আমি চলে এলাম।

এর কিছুক্ষণ পরেই খাজাঞ্চী আমার কাছে গিয়ে হাজির। সে বলল, টাকা নেবার জন্য আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

আমি যথারীতি লোক পাঠিয়ে দিলাম। পরে মগরেবের নামাজ পড়ে বাড়ী ফিরে দেখলাম, তিনটি বস্তা বোঝাই টাকা এনে রাখা হয়েছে। এর ভেতর ঋণের পঞ্চান্ন হাজার দিনার ছাড়া সুলতানের পূর্বপ্রতিশ্রুত বার হাজার দিনারও রয়েছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মোট টাকার এক দশমাংশ কেটে রাখা হয়েছে।

বিদ্রোহ দমন

জমাদিয়াল আউয়াল মাসের নয় তারিখে (মোতাবেক ২১শে অক্টোবর, ১৩৪১) সুলতান দিল্লী ত্যাগ করে মাবারে (করমণ্ডল) রওয়ানা হয়ে গেলেন সে জেলার একজন বিদ্রোহীকে দমন করতে। আমি সুলতানের সঙ্গে যেতে তৈরী ছিলাম কিন্তু সুলতান আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমাকে দিল্লীতেই থাকতে আদেশ দিয়ে গেলেন। এ লিখিত আদেশ যে আমাদের হস্তগত হয়েছে তা স্বীকার করে রসিদ দিতে হল। এ-ছাড়াও সুলতান আমাকে কুতুবউদ্দিনের মাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গেলেন।

বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে আবার আমাদের ডাক পড়ল। আমার কোন অনুরোধ আছে কিনা সুলতান তা জানতে চাইলেন। আমি ছয়টি আবেদনসহ একখানা কাগজ বের করলাম। কিন্তু সুলতান বললেন, আপনার বক্তব্য মুখে বলুন।

আমি তখন অপরাপর কথাপ্রসঙ্গে বললাম, সুলতান কুতুবউদ্দিনের মাজার সম্বন্ধে আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি ? এ কাজের জন্য আমি চার শ' ষাট জন লোক বহাল করেছি। কিন্তু এ-মাজারের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ আছে তাতে এদের বেতন ও আহারের খরচ চলে না।

তিনি উজিরকে বললেন, পঞ্চাশ হাজার। সে সঙ্গে আরও বললেন, বরাদ্দ ফসলের কিছু অগ্রিমও নিশ্চয় আপনি পাবেন। এর ফলে আমাকে এক লক্ষ মণ গম ও চাউল দেওয়া হল চলতি বছরের জন্যে বরাদ্দ ফসল না-পাওয়া পর্যন্ত কাজ চালাতে।

আমার বাসস্থান মেরামত করা দরকার, সে কথাও সুলতানকে জানালাম। আমার সে প্রার্থনাও মঞ্জুর করে সুলতান বললেন, আপনাকে বলবার একটি কথা আমারও আছে। আর কখনও ঋণ করে বিপদ ডেকে আনবেন না। কারণ আপনাদের বিপদের সময় আমাকে খবর দেবে এমন কাউকে আপনি খুঁজে পাবেন না। আমি যা-কিছু আপনাকে দিয়েছি তারই উপর নির্ভর করে চলতে থাকুন। এই বলে মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে কোরাণের একটি নির্দেশ তিনি আমাকে আবৃত্তি করে শুনালেন। আমি তাঁর কদমবুছি করতে উদ্যত হতেই তিনি আমাকে হাত দিয়ে থামালেন। অবশেষে আমি তাঁর হস্তচুম্বন করে চলে এলাম।

রাজধানীতে ফিরেই আমি আমার বাসস্থান মেরামতের কাজে লেগে গেলাম। এ-কাজে ব্যয় হল মোট চার

হাজার দিনার। তার ভেতর ছয় শ' দিনার মাত্র খাজাঞ্চীখানা থেকে পেলাম, বাকি সব আমাকে দিতে হল। আমার বাসস্থানের অপর দিকে একটি মসজিদও আমি তৈরী করালাম এবং সুলতান কুতুব উদ্দিনের মাজারেরও তদারক করতে লাগলাম।

মাজারের জন্যে সুলতানের বরাদ্দ ছিল বার মণ ময়দা এবং বার মণ গোশ্‌ত। আমি দেখলাম এখানকার প্রয়োজনানুসারে খাদ্যের এ-বরাদ্দ অকিঞ্চিৎকর। অথচ সুলতান সম্প্রতি যা দিয়ে গেছেন তা যথেষ্ট। কাজেই আমি খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে করলাম পঁয়ত্রিশ মণ ময়দা আর পঁয়ত্রিশ মণ গোশ্‌ত, সেই সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ চিনি, মিশ্রী, ঘি ও পান-সুপারী। শুধু কর্মচারীরাই যে তা খেত তা নয় বরং এরপর পথিক ও মুসাফিররাও খেতে লাগল। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। সুতরাং এ-খাদ্য অনেকেরই কষ্ট লাঘব করেছিল এবং দেশে-বিদেশে এ-কথা রাষ্ট্র হয়েছিল। নবাব সাবিহ্‌ তখন দৌলতাবাদে গিয়েছিলেন সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে। সুলতান তাঁর কাছে দিল্লীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, অমুক লোকের মত যদি আর একজন লোক দিল্লীতে থাকতেন তবে দুর্ভিক্ষের নালিশ আর শুনতে হত না।

সুলতান এ-কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজের একটি পোষাক উপহার পাঠিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন।

মাবারে রওয়ানা হয়ে যাবার পর সুলতানের সৈন্যদলে মড়ক দেখা দেয়। অগত্যা তিনি ফিরে এসে গঙ্গানদীর তীরে তাঁবু ফেলেন। আমি দিল্লী ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলাম এবং অযোধ্যার শাসনকর্তার বিদ্রোহ দমন না করা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই রইলাম। এই সময়ে তিনি তাঁর সভাসদদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন। ঘোড়া আমিও পেয়েছিলাম এবং আমাদের সভাসদদের দলভুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধের সময় এবং বিদ্রোহীদের বন্দী করার সময় আমি সুলতানের সঙ্গেই ছিলাম। তারপর তাঁর সঙ্গেই দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করি।

শেখ শিহাব উদ্দিন

এর কিছুকাল পরে আমি সুলতানের বিরাগভাজন হয়ে পড়ি, কারণ আমি শেখ শিহাব উদ্দিনের * সঙ্গে দেখা করতে দিল্লীর বাইরে তাঁর আস্তানায় গিয়েছিলাম। তিনি এজন্যে আমাকে শাস্তি দিতেও চেয়েছিলেন এবং দরবার কক্ষে সর্বক্ষণের জন্যে আমার পাশে চারজন ক্রীতদাসকে পাহারায় থাকতে হুকুম করেছিলেন। কারও জন্যে এরকম ব্যবস্থা হলে শাস্তির হাত থেকে কদাচিৎ সে রেহাই পেত।

আমি ক্রমাগত পাঁচদিন রোজা পালন করলাম এবং প্রতিদিন কোরানের শুরু থেকে শেষ অবধি তেলাওত করতে লাগলাম। পানি ছাড়া আর কিছুই আমি এ-সময়ে গ্রহণ করিনি। পাঁচদিন পরে আমি রোজা ভেঙ্গে আবার চারদিন রোজা রাখতে মনস্থ করলাম এবং এ-সময়েই শেখের এন্তেকালের পরে মুক্তি পেলাম।

কিছুকাল পরে সুলতানের চাকুরী ত্যাগ করে আমি সবিশেষ জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণ ইমাম কামাল উদ্দিনের সাহচর্যে চলে গেলাম। তাঁর বিষয় আগেই আমি বলেছি। সে সময়ে সুলতান সিন্ধুতে ছিলেন। তিনি আমার পদত্যাগের কথা শুনে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সংসার-ত্যাগী দরবেশের পোষাক পরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বিশেষ সহৃদয়তার সহিত আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং আমাকে পুনরায় চাকুরীতে বহাল করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী না হয়ে মক্কা যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি সম্মতি দিলেন। তখন হিজরীর জমাদিয়সসানি মোতাবেক ১৩৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস চলছিল।

চল্লিশ দিন পর সুলতান আমাকে জিনআঁটা কয়েকটি ঘোড়া, কয়েকজন ক্রীতদাস-দাসী, কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ ও অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেই পোষাক পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার নীল রঙের একটি আল-খেল্লা ছিল। সেইটি খুলে রেখে সুলতানের দেওয়া পোষাক পরে নিজকে আমি ধিক্কার দিলাম। এরপরে যখনই আমি এই নীল আলখেল্লাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি তখনই অন্তরে যেনো কেমন এক আলোর সন্ধান পেয়েছি। সমুদ্রের মধ্যে বিধর্মীদের কবলে পড়ে এই আল-খেল্লাটি না-হারানো পর্যন্ত বরাবর আমার হেফাজতেই ছিল।

সুলতানের সঙ্গে দেখা করলে তিনি এবার আমার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সদয় ব্যবহার করলেন এবং বললেন, রাষ্ট্রদূত হিসাবে চীনের বাদশার কাছে পাঠাবার ইচ্ছা করে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি জানি আপনি দেশ-বিদেশ সফর করে বেড়াতে ভালবাসেন। তারপর প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থাই আমাকে করে দিলেন এবং আমার সঙ্গে যাবার জন্যে কিছু সংখ্যক লোকও নিয়োগ করলেন। সে বিবরণীই আমি এখন পেশ করব। (ক্রমশঃ)

* শেখ শিহাব উদ্দিন একদা সুলতানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তাঁর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তিনি দিল্লীর সন্নিকটে এক জায়গায় মাটীর নীচে বাসস্থান তৈরী করে কয়েক বছর বাস করেছিলেন। সেখানে কয়েকটি বাসোপযোগী কামরা ছাড়াও ভাণ্ডার ঘর, ও গোসলখানা প্রভৃতি ছিল। পুনরায় দরবারে আহূত হলে তিনি প্রকাশ্যে সুলতানকে বিশ্বাসঘাতক বলে দোষারোপ করেন। পরে এই দোষারোপ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করায় তাঁর প্রাণদণ্ড হয় বলে কথিত আছে।

পাণ্ডুর আকাশ

আহমদ মাহফুজউল্লাহ
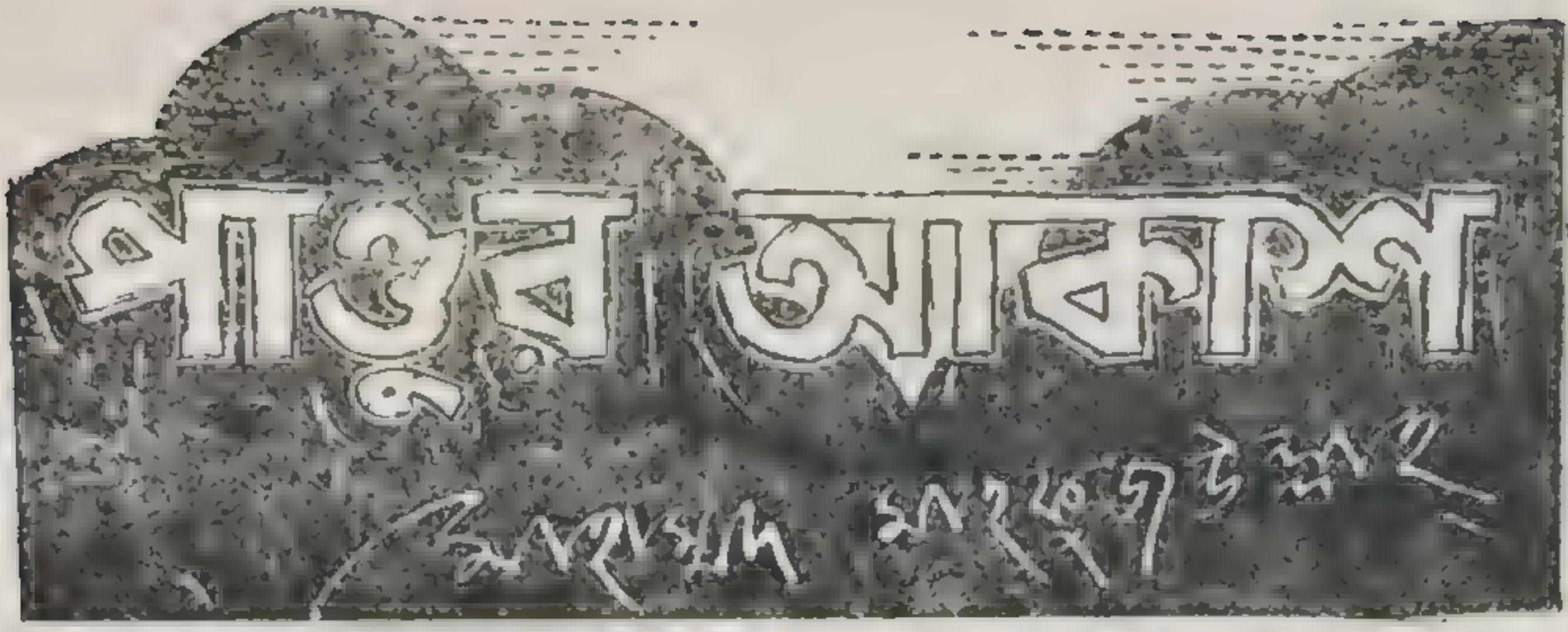
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দশ ॥

ফরিদ সাহেব চলে যাবার পর থমথমে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো রিজিয়া। মামুনও এগিয়ে এসে মুখ খুলে কোন কথা বললো না নিজে থেকে। শ্বশুরের প্রসঙ্গ তুলে রিজিয়ার বাঁকা নানা কথা শুনতে তার নিজেরও মন চায় না। এতক্ষণ বাপ আর মেয়েতে যেসব কথা হলো তার একটাও মামুনের সহনীয় বলে মনে হলো না। কথায় অনেক কথা বাড়বে, তখন রিজিয়াও আর চুপ করে থাকবে না। বাপের সামনেই মুখ ঝামটা দিয়ে মামুনকে নানা কথা শুনিয়ে দেবে। বিয়ের পর থেকেই তো মামুন এই একই ব্যাপার দেখে আসছে। তাই ফরিদ সাহেব যতক্ষণ কথা বলছিলেন, তার প্রায় সবটুকু সময়ই মামুন চুপ করে থেকেছে, মাঝেসাঝে দুই-একটা জওয়াব দিয়েছে মাত্র, নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রায় কিছুই বলেনি।

সেই যে ফরিদ সাহেব বিদায় হলেন তারপর বহুদিন এ-পথে আর তিনি পা বাড়ালেন না। রিজিয়া নিজে যেয়ে শান্তিনগরে কত অনুযোগ জানিয়ে এসেছে, তবুও ফরিদ সাহেব ব্যবসার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে একবারের জন্যও আর মেয়েকে দেখতে গেলেন না। হয় তো ব্যবসার কারণ ছাড়াও এমন একটা কিছু তাঁর মনে ছিল যার জন্য তিনি সব সময়েই মেয়ে আর মেয়ে জামাইকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন। রিজিয়া প্রায়ই শান্তিনগরের বাসায় গিয়ে জরিণা বেগমের কাছে কেঁদেকেটে পড়তো, কিন্তু জরিণা বেগমের মন তাতে গলে গেলেও ফরিদ সাহেব মেয়ের আবদারকে খুব বেশী আমল দিতেন না; বলতেন, "হ্যাঁ মা, যাবো যাবো করে অনেকদিন তোদের ওখানে আর যাওয়াই হল না, জানিস তো মা, সব সময়েই এই বুড়ো বাপকে সংসারের ঝামেলায় কেমন আটকে থাকতে হয়, একটু যে নড়েচড়ে আত্মীয়স্বজনের খোঁজ-খবর নেব তেমন সময় কোথায়?"

রিজিয়া কিন্তু ফরিদ সাহেবের কথায় খুব বেশী আশ্বস্ত হতে পারলো না। এমন অজুহাত তো তিনি হরহামেশাই দিয়ে থাকেন। একই শহরের দুই এলাকায় দু'টি বাসা, ইচ্ছা থাকলে সময় করে বেড়াতে যেতে আর কতক্ষণ! কিন্তু তবু কি কারণে তিনি তাঁর মেয়েকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন তা রিজিয়ার বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। বাপকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। বিয়ে দেবার আগে কত সোহাগ-আদরের কথাই না তিনি বলতেন; কিন্তু মেয়েকে পার করে দিয়ে এখন যেন লোকটা একেবারে আমূল বদলে গেছে। বুড়ো বাপের এই দুই কালের চেহারা ভাবতে গিয়ে রিজিয়া নিজেও কম অবাক হয় না।

ঠিক একই কথা চিন্তা করে মামুনও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। শ্বশুরের এই আশ্চর্য চরিত্র লক্ষ্য করে মানুষের মনোবৃত্তি সম্পর্কেই তার কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

জরিণা বেগম মেয়ের কাছে স্বামীর হয়ে কথা বলতে এগিয়ে আসেন, তার বুড়ো বাপের পক্ষ থেকে নানা কৈফিয়ৎ জড়ো করে এনে দাঁড় করান। জরিণা বেগম বলেন, "জানিস রিজিয়া, তোর আব্বা প্রায়ই বলেন, মেয়েটাকে যে যেয়ে দেখাশোনা করবো তেমন ফুরসৎও আমার নেই। কিন্তু কি আর করি বলো, এত বড় একটা ব্যবসা চালানো কি আর চাট্টিখানি কথা যে সব দিক বজায় রেখে চলবো! কত মানুষের ছেলে-পুলেই তো সংসার দেখা শোনা করে বুড়ো বাপকে শান্তি দেয়; কিন্তু আমার কপালে তাতেও যে ছাই।"

রিজিয়া বলে, "কেন, মুজীব ভাই কি আজকাল সংসার দেখা শোনা করেন না নাকি?"

জরিণা বেগম অবাক হয়ে বলেন, "আমায় অবাক করলি রিজিয়া, তোর ভাইধনটিকে দেখছি এখনো তুই চিনতেই পারলি না। মুজীব যদি সংসার দেখবে তো রাস্তায় টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াবে কে?"

রিজিয়া বললো, "ভাইজানও তো ইচ্ছা করলে মাঝে মাঝে আমার খোঁজখবরটা রাখতে পারেন। কিন্তু না,

তোমরা দেখছি সবাই আমাকে বিদায় করে দিয়ে যেন প্রাণে বেঁচে গেছো।”

জরিণা বেগম মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলতে আছে রিজিয়া। মা-বাপ কি কোন দিন মেয়েকে পরের ঘরে ঠেলে দিয়ে শান্তি পেতে পারে? না, এটা কেউ চায়?”

মা-মেয়েতে এমনি ধরণের কথা-বার্তা দেখা হলেই হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে পরস্পরের মধ্যে একটা এড়িয়ে যাবার ভাবই প্রকাশ পায়, প্রাণের ছোঁয়া যেন লাগে না। এ-নিয়ে মামুন আর রিজিয়ার মধ্যেও প্রায়ই কথা উঠে, মাঝে মাঝে তা সাধারণ কথার সীমানা পেরিয়ে কলহের পর্যায়েও উঠে যায়। রিজিয়া প্রাণপণ মা-বাপের পক্ষ অবলম্বন করে, কিন্তু মামুনের তীক্ষ্ণ কথার আঘাত সহ্য করতে না পেরে আগুনের মতো জ্বলে ওঠে, আর তখনই বিরোধের ফাটলটি আরো বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

এমনি করে দিনের পর মাস, আর মাসের পর বছর গড়িয়ে চলে।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন বিনা বাতাসেই ঝড় উঠলো, ঝড় উঠে তোলপাড় করে দিলো দু'জনের মনের আকাশ। ঝড়ের বেগটা কমে আসতেই মামুন আর রিজিয়া বুঝতে পারলো, ঝড়টা যেন একটু বেশীই বয়ে গেলো, হয় তো এতটা তোলপাড়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। সামান্য একটা কথা থেকেই রিজিয়া এমন করে জ্বলে উঠেছিল যে মামুনের আর চুপ করে থাকা কিছুতেই সম্ভব হল না। অন্য সময় হলে মামুন হয় তো কথাটা হজম করেই নিতো কিন্তু সেদিন সে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারেনি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখবার কোন অবকাশও তার ছিল না। তাই এক মুহূর্তেই এত বড় একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটে যেতে পারলো। এখনও মাঝে মাঝে ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় রিজিয়া। সেদিনের সেই স্মৃতিটা মামুনকেও কম অবাক করে না।

দেশের বাড়ী থেকে লতীফ সাহেব এসেছিলেন বেড়াতে। বুড়ো বয়সে ছেলের বাসায় আরাম আয়েশে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবেন এটাই বা মন্দ কি! সারা জীবন তো তিনি সংসারের ঘানি টেনেই মরলেন, দু'দণ্ড বিশ্রাম নেবারও অবকাশ পেলেন না।

মামুনই চিঠি লিখেছিল লতীফ সায়েবকে। লিখেছিল, “আব্বা, বহুদিন থেকে আপনি বেড়াতে আসবেন বলে লিখছেন, কিন্তু প্রায় এক বছর হতে চললো, একবারও বেড়াতে এলেন না। বুড়ো বয়সে একবার সংসারের মায়া ত্যাগ করে বাইরেই এসে দেখুন না। আমার বাসায় জায়গা খুবই কম, কিন্তু তবু আপনার কোনই অসুবিধা হবে না। আশা করি, আমার চিঠি পেয়েই একবার এসে বেরিয়ে যাবেন।”

লতিফ সাহেব চিঠি পেয়ে খুবই খুশী হলেন। লিখলেন: “বাবা মামুন, তোমার অভিযোগ অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তুমি তো জানো বাবা, সংসারে আমি কি ভাবে জড়িয়ে পড়েছি। অভাব-অনটনের মধ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংসার চলছে, কাজেই বাইরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসবার অবকাশ কোথায়? কিন্তু যেমন করেই হোক এবার তোমার অনুরোধ রক্ষা করবোই। সামনেই ধান কাটার মৌসুম, অতএব এ-সময়ে বাড়ীর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কয়টা দিন সবুর করো, ফসলটা ঘরে এলেই একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াতে বেরুতে পারবো। নইলে দূরে গিয়েও মনটা সব সময়েই ঘরে পড়ে থাকবে।”

তারপর ধান কাটার শেষে সত্যি সত্যিই একদিন লতীফ সাহেব এলেন বেড়াতে। মামুন বাসায় ছিল না সে-সময়ে। দুপুরে ট্রেণ থেকে নেমে হেঁটেই গিয়েছিলেন লতীফ সাহেব। এর আগে আর কোনো দিন তিনি ছেলের বাসায় আসেননি, তাই প্রথমটা বাসা খুঁজে বের করতে তাঁকে বেশ কিছুটা হয়রাণীই পোহাতে হলো।

কার্তিকের কড়া রোদ যেন তখন ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। ঝাঁ ঝাঁ উত্তাপ না থাকলেও দুপুরের কড়া রোদে পথ হাঁটতে লতীফ সাহেবের বেশ কষ্টই হচ্ছিল তখন। নিজে বাসা চেনেন না, তাই পথ চলতে চলতে আর লোক-জনকে রাস্তার হদিস জিজ্ঞেস করতে করতে তিনি প্রায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

অবশেষে লতীফ সাহেব এসে পৌঁছালেন নীলাম্বর সাহা রোডের সেই বিশ্রি গলিতে। রিজিয়া তখন দুয়ারে বসে একটা পুরানো মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলো। বিয়ের পর সেই একবারই পলাশপুরে গিয়েছিল রিজিয়া। লতীফ সাহেবও এর আগে আর কোনো দিন ছেলের বাসায় আসেননি। অতএব উভয়ের মধ্যে ক্ষণিকের পরিচয়ের আবছা ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রিজিয়া জানতো, মামুন প্রায়ই তার বাপকে আসতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে লতীফ সাহেব এসে পড়বেন, এটা ঠিক রিজিয়া কল্পনা করতে পারেনি। তাই লতীফ সাহেবকে বাসায় ঢুকতে দেখে রিজিয়া কেমন যেন একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা তো সে শ্বশুরকে চিনতেই পারেনি। স্মৃতির ঝুলি হাতড়িয়ে যখন সে সামান্য পরিচিত একটা মুখ আবিষ্কার করতে পারলো, লতীফ সাহেব তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। অল্প দামের সাদা কাপড়ের পাঞ্জাবী গায়ে,

আধময়লা পায়জামা পরণে, মাথায় ফুলতোলা একটা কিস্তি টুপি—এমনি ধরণের একজনকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখলে রিজিয়ার মতো মেয়ের অবাক হবারই পালা। শুধু অবাকই বা কেন, খানিকটা বিরক্তি অনুভব করতেই বা আপত্তি কি।

রিজিয়া তার শ্বশুরকে শেষ পর্যন্ত চিনে উঠতে পারলেও; মুখে তেমন কোনো পরিচয়ের প্রসন্নতার হাসিই ফুটলো না। মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে মুখ তুলে সে লতীফ সাহেবের দিকে তাকালো। রিজিয়া অপরিচয়ের ভাণ করলেও লতীফ সাহেব কিন্তু চিনতে ভুল করলেন না মোটেই। পঞ্চাশের ওপর এসেও স্মৃতিশক্তি তার তেমনই আশ্চর্য ধারালো হয়ে আছে। সেই প্রখরতার আলো ফেলেই লতীফ সাহেব বুঝতে পারলেন, এ-তারই পুত্রবধূ।

পলাশপুরে দেখা হয়েছিল সেই এক বছর আগে। রিজিয়া তখন ছিল নবপরিণীতা বধূ, লজ্জার আবরণে ঢাকা একগুচ্ছ ফুলের মতো কোমলতায় উজ্জ্বল। কিন্তু এখন তার চেহারায় ফুটেছে কাঠিন্যের আভাষ, রুক্ষতার ছাপ, কিন্তু তবু লতীফ সাহেবের চিনতে ভুল হয়নি। লতীফ সাহেবই এগিয়ে এলেন রিজিয়ার কাছে। গলায় স্নেহের আমেজ মেখে বললেন, "কেমন আছো মা ?"

লতীফ সাহেবের কণ্ঠ শুনে একটু যেন বিব্রত হলো রিজিয়া। পঞ্চাশ বছরের এক বৃদ্ধের এই সম্বোধন সে কিছুতেই অবহেলা করতে পারলো না। একটু আগেই তার মন ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠেছিল, সে বুঝতে পেরেছিল, তার মনের কোণে সেই পরিচিত অনুভূতিটাই আবার জট পাকিয়ে উঠছে। রিজিয়া মাঝে মাঝে তার নিজেকেই সব চেয়ে আপন করে চেনে, তখন তার নিজের চরিত্রের প্রতিই তার অপরিসীম ঘৃণা জন্মে যায়। কিন্তু কোন অসতর্ক মুহূর্তে, সে নিজেই ভেবে পায় না, কে যেন এসে তার কানের কাছে এমন মন্ত্র দিয়ে যায় যা তাকে আমূল বদলে দেয়। ছোটবেলা থেকেই সে নিজের চরিত্রের এই দ্বৈত রূপটি নিয়ে ভাবিত হয়ে আছে।

লতীফ সাহেবের কথা শুনে রিজিয়ার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। মাথার কাপড়টা আরেকটু টেনে দিয়ে সে ঢিপ করে শ্বশুরকে সালাম করে বসলো, মুখে বললো, "কি আশ্চর্য। আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি আব্বা—আচ্ছা বলুন তো, আসা-যাওয়া না থাকলে কি কেউ কাউকে সহজে চিনতে পারে ? সেই কবে পলাশপুরে গিয়েছিলাম, তাও মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তারপর তো একটি বছর কেটে গেল, কিন্তু কই আপনি তো এর মধ্যে একবারও এলেন না। তা আর আসবেনই বা কেন, ছেলের বৌ তো আর নিজের মেয়ে নয় যে তার কথা মনে থাকবে!"

রিজিয়ার কথায় লতীফ সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকলেন। এই অনুযোগের জওয়াব কিইবা তিনি দেবেন। সেই মামুলি কথাগুলোই তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হবে। এতে কি রিজিয়ার মন ভরবে! তবুও একটা কিছু বলতে হয় ভেবে লতীফ সাহেব বললেন, "তোমার অনুযোগ মিথ্যা নয় মা। কিন্তু তুমি হয় তো জানো না সংসারে কত ঝামেলায় এই বুড়ো বাপকে কত ব্যস্ত থাকতে হয়।"

রিজিয়া বললো, "আমার আব্বাও ঠিক একই কথা বলেন। এখন দেখছি মেয়েদের তাড়িয়ে দিয়ে সব বুড়ো বাপই একই কথা বলে থাকেন।"

লতীফ সাহেব বললেন, "তোমার আব্বার কথা আলাদা মা। বড় লোক মানুষ, সংসারের এত ঝামেলা পোহাতে যাবেন কেন ? তা' ছাড়া তোমার ভাইজান তো শুনছি সংসারের সবকিছুই দেখতে পারেন।"

রিজিয়া বললো, "ভাইজানের কথা আর বলবেন না। তিনি যদি ব্যবসা দেখতেন তা হলে কি বুড়ো বয়সে আর আব্বাকে এমন করে খাটতে হতো ?" একটু থামলো রিজিয়া, তারপরই আবার বললো, "ওসব কথা পরে হবে আব্বা, এখন আপনি এই চেয়ারটায়ই একটু বিশ্রাম নিন, আমি হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করছি।"

লতীফ সাহেব বললেন, "মামুন কি এখনো অফিস থেকে ফেরেনি ?"

রিজিয়া বললো, "কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ফিরবে। আজ একটু সকাল সকাল ফেরবার কথা আছে।"

লতীফ সাহেব একটা গাঁটরীতে করে কিছু চিড়া, কলা ইত্যাদি নানা খাবার জিনিস নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই একটা লুঙ্গিতে বাঁধা ছিল জিনিষগুলো।

লতীফ সাহেব রিজিয়াকে ডেকে বললেন, "এই যে বৌমা, গাঁটরীটাতে কতকগুলো খাবার জিনিস আছে। খুলে ভালো করে গুছিয়ে রাখো।"

রিজিয়া আগেই গাঁটরীটা দেখেছিল, কিন্তু নিজে উৎসাহিত হয়ে এ-সম্পর্কে কোন কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। সে ভালো করেই জানে এই লুঙ্গির গাঁটরীতে কি থাকতে পারে। তবুও বললো—"এ সব আবার আনতে গেলেন কেন ? শহরে তো আর খাবার জিনিসের অভাব নেই। খামাখাই এ-সব আনলেন, সবগুলো তো নষ্টই হয়ে যাবে।"

লতীফ সাহেব বললেন, "তাড়াতাড়ি করে চলে এলাম মা, তোমাদের জন্য কিছুই আনতে পারলাম না। তোমার

শাশুড়ী বলেছিল, আরো কয়েকটা দিন পরে যান, বউমার জন্য কিছু ভালো পিঠা তৈরী করে দেব।"

রিজিয়া বললো, "না এনে ভালো করেছেন, ওগুলোও খামাখাই নষ্ট হতো। চালের পিঠা আমাদের তেমন ভালো লাগেনা।"

লতীফ সাহেব বললেন, "তোমরা মা শহুরে মানুষ, তোমাদের ভালো না লাগারই কথা, তবে মামুন হয়তো খেতে পছন্দ করবে।"

রিজিয়া চাকরটাকে ডেকে গাঁটরীটা ঘরে নিয়ে যেতে বললো, একবার খুলেও দেখলো না এতে কি রয়েছে।

লতীফ সাহেব বুঝতে পারলেন বড়লোকের শহুরে মেয়ের মন ভরাবার মতো কোন সম্পদই তার নেই। হাতে তৈরী করা চিড়া-পিঠাতে মামুনের মায়ের স্নেহের স্পর্শ যতই লেগে থাকুক না কেন, শহুরে বৌয়ের মন তা কিছুতেই ছুঁয়ে যেতে পারবে না। তাই জিনিষগুলো দেবার সময় লতীফ সাহেব এ-কথাটা মামুনের মা-কে বার-বারই বুঝিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "ওসব বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়ে কোনই লাভ হবে না, তোমার বউ তা ছুঁয়ে দেখবে না।" কিন্তু হাজার হলেও মেয়েলোকের মন, কিছুতেই তিনি লতীফ সাহেবের কথা মানতে চাইলেন না, শেষ পর্যন্ত গাঁটরীটা জোর করেই প্রায় হাতে দিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর হাত-মুখ ধোয়ার পানি এসে গেল। লতীফ সাহেব পায়জামা ছেড়ে লুঙ্গি পরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বসলেন। রিজিয়া চাকরকে দিয়ে চা-নাস্তা পাঠিয়ে দিল।

লতীফ সাহেব খানিকটা অবাকই হলেন, তিনি আশা করেছিলেন, অন্তত: খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা বৌমা নিজের হাতেই করবেন। শ্বশুরকেও যে চাকরের হাতেই চা-নাস্তা পাঠিয়ে দেবে এতটা তিনি আশা করতে পারেন নি। আবার ভাবলেন, হয়তো এটা শহুরে রেওয়াজই হয়ে থাকবে। গ্রাম্য বউয়ের মতো এতটা আন্তরিকতা খোঁজা হয়তো তার ভুলই হয়ে থাকবে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে লতীফ সাহেব চায়ের পেয়ালা টেনে নিলেন। তশ্‌তরীতে কয়েকটা নাবিস্কোর বিস্কুট সাজানো। লতীফ সাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ইতি-মধ্যেই, খানিকটা ক্ষিধাও তার পেয়েছিল বৈকি। কিন্তু এই সামান্য কয়টি নাবিস্কোর বিস্কুটে তাঁর ক্ষুধা দূর হবে কি? তবুও তিনি দু'একটা বিস্কুট হাতে তুলে নিলেন। একবার ভাবলেন, তাঁর নিজের আনা চিড়া-পিঠা দিলেও হয়তো এর চেয়ে ঢের ভালো হতো; কিন্তু তবু তিনি মুখ খুলে তা চাইতে পারলেন না। হাজার হোক, ছেলের বাসায় তিনি এই প্রথম এসেছেন। নিজে চেয়ে কোন কিছু নিতে গেলে শহুরে বৌটিই বা কি মনে করবে।

চা শেষ করে পেয়ালাটা রেখে দিলেন লতীফ সাহেব। চাকর এসে তা ভেতরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর রিজিয়া এসে দাঁড়ালো তার শ্বশুরের সামনে। বললো, "আপনি একটু বিশ্রাম করুন আব্বা। আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসি। তারা এ-বেলায় আমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছিল, না গেলে খুবই রাগ করবে। তা'ছাড়া আপনার ছেলে তো এই কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

রিজিয়ার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন লতীফ সাহেব! আশ্চর্য! শ্বশুরকে ঘরে রেখে বৌমা কিনা বেড়াতে যাবে তার বান্ধবীর বাড়ীতে!

মনে মনে অবাক হলেও লতীফ সাহেব চেহারায় তেমন কোন ভাবই প্রকাশ করলেন না। বললেন, "বেশ তো, যাওনা মা, এতে আর এমন কি! তুমি না গেলে ওরা যদি রাগই করে তবে তোমার যেতে আপত্তি কেন! আমার কোন অসুবিধাই হবে না, চাকরটা তো রইলোই, কোন কিছু দরকার পড়লে তার কাছ থেকেই চেয়ে নেবো।"

[ক্রমশঃ]

আল্লামা ইকবাল

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

পাকিস্তানের স্বাপ্নিক মহাকবি ইকবাল একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, বক্তা ও সমাজ বিজ্ঞানবিদ ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি জ্ঞানের বিস্তৃত রাজ্য পরিভ্রমন করেছেন—যা অনেক কবির ভাগ্যেই ঘটে না। ইংল্যাণ্ড এবং জার্ম্মেনীতে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র ছিল তাঁর নখদর্পণে। ইকবালের কাব্যালোচনা করতে গিয়ে আরেক মহা কবির কথা আমাদের স্মৃতি পটে উদিত হয়—তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ইকবাল এবং রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ রয়ে গেছে। রবীন্দ্র-কাব্যে দর্শন আছে; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কবি। আর ইকবাল কবি হলেও দর্শনটাই তাঁর কাব্যে প্রধান। সুতরাং তাঁকে দার্শনিক কবি বলা হয়। ইকবাল কাব্যের ভিতর দিয়ে দর্শনের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন, ধর্ম্ম ও আদর্শের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাই মনে হয় তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য যত না ছিল কাব্যের সৃষ্টি তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল দর্শনের আদর্শের সৃষ্টি; এবং এটিই ইকবালের বৈশিষ্ট্য।

ইকবালের দার্শনিক কাব্য 'আসরারে খুদী' জগত বিখ্যাত। এই অমূল্য গ্রন্থ মূলতঃ ফার্সীতে লেখা। পরবর্ত্তীকালে তা ডক্টর নিকলসন কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়। অধুনা বাংলাতেও তার অনুবাদ বেরিয়েছে। মাতৃভাষা উর্দ্দুতে না লিখে তাঁর বিশিষ্ট বইগুলি ফার্সীতে লেখার কারণ সম্বন্ধে ইকবাল একটি সুন্দর কবিতায় লিখেছেন—

> "গরচে হিন্দী দর উজুবৎ শকর আস্ত
> তরজে গুফ্‌তারে দরী শিরিতর আস্ত
> ফারসী আজরফ অস্তে আন্‌দেশা আম
> দর খোরদ বা ফিত্‌রতে আনদেশ আম"

অর্থাৎ—"হিন্দের ভাষা চিনির মত মিষ্টি যদিও, ফারসী ভাষার ভঙ্গী মধুরতর। এ-ভাষার সৌন্দর্য্যে মন আমার মুগ্ধ, ভাব আমার অতি উচ্চ, ফারসীই এই ভাবের যোগ্যতম বাহন। রসের বিচারই করো শুধু। পাত্রের সঙ্গে করোনা বিবাদ।" আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কবি ইকবাল ভাষাকে বিচার করেছেন রসের তুলাদণ্ড দিয়ে। সুতরাং যে ভাষা রসসম্ভারে যতবেশী সমৃদ্ধ, গুণীর কাছে তার কদর ততই বেশী।

'আসরারে খুদীতে' ইকবালের জীবনদর্শনের মূল কথা হল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের শক্তি থেকেই বিশ্বের জীবন। আর এই শক্তির অভাবেই হল মৃত্যু। এবিষয়ে তাঁর চিন্তা ভারতীয় দর্শনের বিরোধী ছিল। ভারতীয় দর্শনের মতে ব্যক্তি মায়া—ব্রহ্মের নির্গুণ সত্তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অবকাশ নেই। ব্যক্তির জীবনের আদর্শ সেখানে ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে আত্মবিলোপ। এ-মনোভাবের ফলে নৈরাশ্যবাদ অনিবার্য্য। ব্যক্তির কর্ম্মপ্রেরণার বিনাশ তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ইকবালের দর্শন এই মায়াবাদের প্রতিদ্বন্দী একটা স্বচ্ছ এবং বলিষ্ঠ মতবাদ। এই শক্তিবাদ বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের আলোচনা করতে গিয়ে মনে পড়ে যায় জার্ম্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক নীট্‌শের 'সুপারম্যান' থিওরির কথা; কিন্তু ইকবালের খুদীর সঙ্গে নীট্‌শের 'সুপার ম্যানের' প্রভেদটাও সুস্পষ্ট। নীটশের থিওরিতে সাধারণ মানুষ কিছু না। তার কাজ হচ্ছে অতি মানবের দাসত্ব এবং সেবা করা। অতি মানব শুধুমাত্র আত্ম প্রতিষ্ঠার ধর্ম্ম মেনে চলবে, আর কোন ধর্ম্ম মানবে না। সাধারণ মানুষের জীবননীতি তার কাছে মূল্যহীন। নীটশের মতবাদ জার্মানীতে এবং সমগ্র ইউরোপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিটলারিজম এবং ফ্যাসিজম সেই মতবাদ থেকেই সঞ্জীবিত হয়েছিল। নীটশের চরম লক্ষ্য ছিল—The will of power কিন্তু সেই ক্ষমতা কিসের জন্য—তিনি তার উত্তর দেন নি। ইকবাল 'রমুজে-বেখুদীতে' সে উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে ক্ষমতা প্রয়োগ হবে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, ইসলামের গৌরবের জন্য। ইকবালের শক্তিবাদের সঙ্গে সমাজ জীবনের সংঘাত নেই। তিনি বলেছেন—

> "ব্যক্তির প্রাণ সমাজ সঙ্গ আর কিছুতেই নয়
> সিন্ধু বক্ষে বাঁচে তরঙ্গ, আর কিছুতেই নয়।"

ইকবালের মতে ব্যক্তিরই চারিদিকে সমাজ গড়ে উঠে। ব্যক্তিই সৃষ্টির কেন্দ্র। আধুনিক জগতে এ-কথার আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বর্ত্তমান দুনিয়ায় রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে অনেক সময়ই ব্যক্তি আড়ালে পড়ে যায়। ডিক্টেটরীর আমলে সমষ্টির চাপে ব্যক্তিকে পঙ্গু করা হয়। এমন কি গণতন্ত্রের চোখেও ব্যক্তি নগন্য, তুচ্ছ। বিপুল জগতের বৈচিত্রের মধ্যে ব্যক্তির আজ এই যে অনাদর, তারই বিরুদ্ধে ছিল ইকবালের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। ইকবালের নির্দ্দেশিত পথে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে শক্তি সাধনা মানুষকে

আত্মন্তরিতায় নিয়ে যেতে পারে না। এই শক্তি সাধনার পেছনে থাকবে একটা মহৎ উদ্দেশ্য। এই শক্তি সাধক ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে হবেন অতি ভদ্র, বিনীত ও নিষ্কাম। ইকবালের লেখা তৎপুত্রের প্রতি একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

"আমিরী আমার নয়, ফকীরের তরীক আমার
যে দরবেশ দুনিয়ার পরোয়া করেনা, কিম্বা নাম
করেনা জাহির, চাও, পাও তুমি সে খোশ্ নসিব।"

আসরারে খুদীতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের তিনটি স্তর দেখা যায় – যার শেষ স্তর হল Vice regency of God অর্থাৎ খোদার খেলাফত প্রাপ্তি। পবিত্র কোরানেও আল্লাহ্‌তালা মানুষকে খোদার প্রতিনিধি বলেছেন। সেই স্তরে পৌঁছাতে হলে প্রথম প্রয়োজন আনুগত্যের এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মসংযমের। খোদার দেওয়া বিধি-বিধান রয়েছে, তার প্রতি আমাদিকেগকে অনুগত হতে হবে। ইকবাল বলেছেন—

"ওগো মুসলিম, ওগো বেখেয়াল, নিয়মের কাছে মাথা নত কর, স্বাধীনতা সে-নিয়মেরই সন্তান, নিয়মের মুঠায় বন্দী চন্দ্র-সূর্য্য। গোলাপের খুশবুতে বন্দী বাতাস, কস্তুরী সে-ত বন্দী মৃগনাভীর কারাগারে। রক্তের যাতায়াত শিরার বন্দীশালায়, মিলনের নিয়মে বিন্দু থেকে সমুদ্রের সৃষ্টি—কণা থেমে জন্ম সাহারার।"

দ্বিতীয় স্তরে আত্মসংযমের অন্তরায় অনেক। দুনিয়ার ভয়, জীবনের ভয়, দুঃখ-দৈন্যের ভয়, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্খা, স্ত্রীপুত্র-পরিজনের ভালবাসা—এবম্প্রকার অনেক কিছুই। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একমাত্র আল্লায় আত্ম সমর্পণ করলে দ্বিতীয় স্তরের সাধন পথের বাধা বিদূরিত হয়ে যায়। 'লাইলাহা ইল্লাল্লার' মূলগত অর্থ—দুনিয়ার কোন কিছুরই নিকট মাথা নত না করা—একমাত্র আল্লার শাশ্বত বিধান ছাড়া।

একবালের কাব্যে পাওয়া যায় মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর প্রতি তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা। তাতেই মনে হয় রুমীকে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। ইকবাল লিখেছেন—

"রুমীর প্রতিভা মোরে করেছে লালন
তাঁহার ইঙ্গিতে আমি বহু সুগোপন তথ্য করিব জ্ঞাপন।
অগ্নির লেলিহ শিখা অন্তর তাঁহার
সে অগ্নিকণা হতে গড়া হল প্রতিভা আমার।
রুমীর ইঙ্গিতে মোর মনটি হল সোনার সমান
এক বিন্দু ভস্ম পেল লেলিহান শিখার সম্মান।"

স্বপ্নে রুমীই তাঁকে বলছেন—

"কারভাঁ যাত্রীর তুমি প্রাণদ ইঙ্গিত
নতুন উল্লাস ভরে জাগ্রত করিয়া দিক তোমার সঙ্গীত।"

ইকবাল যে দর্শন প্রচার করে গিয়েছেন মূলতঃ তা কোরানেরই দর্শন, ইসলামেরই দর্শন—ইসলামের বানী সমগ্র দুনিয়ার জন্যই উদ্দেশিত। কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ইহার লক্ষ্য নহে। সুতরাং ইসলাম তথা ইকবালের দর্শনকে বিশ্বমানবের কল্যাণের ভিত্তিতেই আলোচনা করতে হবে। ইকবাল বিশ্বমানবের জন্য বহু চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাঁর কবিতায় আছে—

"ধরার মানুষ লাগি অনেক নিশীথে আমি করেছি ক্রন্দন
কামনা শুধুই ছিল ধরনীর তথ্য যেন নবরূপে হয় উদ্ঘাটন"

আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে, আমাদের চিন্তাভাবনায় এবং আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাবহীনতা দৃষ্টে ইসলামের প্রতি অনেকে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন না, এমন কি নৈতিক চরিত্র গঠনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করতে চান না। ইকবাল বলেছেন—

"ধর্ম্ম কি জান ? মৃত্তিকা থেকে উত্থান
যেন এ-আত্মা খুঁজে পায় তার সন্ধান"

অদৃষ্ট মানুষের আজ্ঞাবহ। তাই ইকবাল বলেছেন—

"করো উন্নত সত্ত্বা এমন
যেন তকদির লেখার আগে—
শুধান আল্লা বান্দাকে :
বল কী বাসনা তব হৃদয়ে জাগে ?"

এই আত্মবিকশিত সত্ত্বা যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তখন স্রষ্টাই সৃষ্টিকে আলিঙ্গনের জন্য তাঁর নিকট নেমে আসেন। ইকবাল বলেন—

"আকাশ আনত হয়ে বরিবে পৃথ্বিরে"

পুরাতন জরাজীর্ণ পৃথিবীকে ভেঙ্গে নব সৃষ্টির প্রেরণা আমরা ইকবাল-কাব্যে পাই। স্থবিরতা নয়, গতিকেই তিনি জীবনের লক্ষ্য ঠাওরিয়েছেন। তিনি বলছেন—

"A wild wave rolled fast and said
I am if I move ; If I don't I am not."

* * *

"These stars are old and the sky is worn-out
I want a world, which is just newly sprung."

ইকবালের চিন্তাধারা সব সময়ই সুস্পষ্ট। কিন্তু তবুও তিনি মুক্ত বিচার বুদ্ধির পক্ষপাতী। এক জায়গায় নিজের চিন্তাধারা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"There is no such thing as finality in philosophical thinking. As knowledge advancs and fresh avenus of thought are opened, other views and probably sounder views are possible. Our duty is carefully to watch the progress of human thought and to maintain an independent critical ottitude towards it.

ইকবালের কবিতার প্রথমযুগে আমরা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করি। সে যুগেই তিনি লিখেছিলেন "নয়া শিবালা," "তারানা-ই-হিন্দ", ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইউরোপে থাকাকালীন জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা লক্ষ্য করে তাঁর চিন্তার মোড় অন্য দিকে ফিরে। এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে জাতীয়তাবাদ আজও বিশ্বমানবকে শান্তি-কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও পাই—

"জাতি-প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়"

ইউরোপ হতে ফেরার পর ইকবাল "শেকোয়া"ও "জওয়াবে শেকোয়া" "তারানা-ই-মিল্লি" ইত্যাদি কবিতা লেখেন। শেষ জীবনের অনেক কবিতায় তিনি সর্ব্বহারাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং জনগণের রাজ অর্থাৎ "মুলূকে জমহুর" প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লামা ইকবাল যখন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে নতুন আদর্শবাদ প্রচার করছিলেন তখনকার পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীদের তাঁর বাণীর নিগূঢ় অর্থ গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিলো না। তাই ইকবাল লিখেছিলেন—

"আসরে মন দানেন্দায়ে আসরার নীস্ত
য়ুসুফে মন বহরে ঈ বাজার নীস্ত
না উমীদস্তম জেয়ারায়ে কদীম
তুরে মন সুজদ কে মী আয়দ কলীম"

অর্থাৎ—

"আমার বাণীর গূঢ় রহস্য বোঝেনা এই যুগ ;
মোর ইউসুফ নয় পণ্য এই মূক বিপনীর
প্রাচীন সঙ্গীর প্রজ্ঞা হতাশাস করেছে আমারে
আমার সিনাই জ্বলে অনাগত মুসার আশায়"

সুখের বিষয়, অধুনা ইকবালের কাব্য ও ভাব ধারার প্রতি সুধীজনের মনোযোগ ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছে : এবং তাঁর বাণীর মর্ম্ম অনুধাবন করার চেষ্টাও চলছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দোষ-দুর্ব্বলতার কোনটাই ইকবালের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। ইউরোপের অন্ধ-অনুসরণকে ইকবাল শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। কামাল পাশার সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"তুর্করা আহ্‌ঙেন ও দর চুঙণীস্ত
তাজা আশ জুক্ কুহ্‌নায়ে আফরঙনীস্ত"

"তুর্কীদের বাঁশরীতে নূতন সুর নাই। তাঁদের কাছে আজ যা নূতন, তা ইউরোপেরই পুরাতন জিনিষ।"

আল্লাহ্ এবং মানুষের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী গোঁড়া মোল্লা এবং পীরদের স্বরূপও তিনি উদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন। পীরদিগকে তিনি সুদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এবং সমাজে তাদের অবস্থানকে বাজপক্ষীর বাসায় পাঁতি-কাকের অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরিতাপের বিষয়, মুসলমান সমাজে এমন দৃষ্টান্তের অভাব আজও নেই যেখানে পীরকে খোদার আসনে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় জীবনে সাফল্যের উপায় নির্দ্দেশ করে ইকবাল বলেছেন—

"সবক ফির পড় আদালত কা শুজাআত কা, সদাকত কা
লিয়া যায়েগা তুমছে কাম দুনিয়াকি ইমামত কা"

অর্থাৎ

"সত্য-ন্যায়ের সবক নে ফের, নে সবক তুই বীরত্বের,
তোরে দিয়ে কাজ হবেরে আবার সারা দুনিয়ার ইমামতের।"

শিল্প-বিজ্ঞান, কাব্য-কলা সম্পর্কে ইকবাল বলেন—"শিল্প আর বিজ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়ে আমি জীবনের পদধ্বনি শুনি।"

*　　*　　*

"হারায় গরিমা সম্মান জাত আকাশ-বিমান তলায়
হারায় যখন সে আত্মজ্ঞান ধর্ম্মে, কাব্য-কলায়"

কবি আমির খসরু কাব্য সুষমা দ্বারা কি করে একটি বাদশাহীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা ইকবালের "বু'আলী কলন্দর" কবিতায় পাওয়া যায়। শুধু বেঁচে থাকাটাই জীবন নয়; এবং সত্যের জন্য জীবন দান করাকে মৃত্যু বলা ভুল। কোরান পাকেও এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট বানী রয়েছে। ইকবাল বলেছেন—

"লাভ লোকসান হিসাব ছাড়ায়ে বেঁচে থাকা জানি সেই
তো জীবন
কভু রাখা প্রাণ, কভু দে'য়া প্রাণ, জানি জানি আমি এই
তো জীবন।"

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ইকবাল বলেছিলেন—"আমি মুসলিম, মৃত্যুকে আমার ভয় নাই।"

আল্লার প্রতি কত গভীর নির্ভরশীলতা এবং নিজের প্রতি কত সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে মৃত্যুর সময় এমন বানী উচ্চারিত হতে পারে ত চিন্তনীয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইকবালের রচিত শেষ কবিতার উল্লেখ করে এ-ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যবনিকা টানছি।

"মর্দে মুমিন ইমানদারের নিশানি জানাই শোনো
মরণ লগ্নে হাসি ছাড়া মুখে চিহ্ন জাগেনা কোনো।"

*　　*　　*

"অতীতের সুর আবার বাজিবে, হয়ত বাজিবে নাকো
হেজাজের বা'য়ু তুলিবে শিহর, হয় ত তুলিবে নাকো
এই যে ফকীর দূর দরবেশ, তাহার জীবন দিন
আজিকে তাহার চির অবসান হলো,
তারপরে এই জীবন-ধ্যানী, রহস্যজ্ঞানী জন
হয়ত আসিবে এই ধরনীর ঘরে
কে জানে কখন্ সে কথা বলো ?
চলে যাওয়া জন হয়ত আসিবে নাকো।"

নজরুল-গীতি

(খেয়াল) হিন্দোল—ত্রিতাল

কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্ব্বনাশী॥
বন ঢেলে ছায়, উজাড় করে
ফুলের ডালা চরণ' পরে
নীল গগনে ছুটে আসে মেঘের রাশি॥

বিপুল ঢেউয়ের নাগর-দোলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণা নদীর কূলে কূলে।
তোমার প্রলয়-মহোৎসবে
বন্ধু ওগো, ডাকবে কবে?
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন কাঁদন-হাসি॥

কথা—কাজী নজরুল ইসলাম। স্বর ও স্বরলিপি—মফিজুল ইসলাম।

০ ১ + ৩
(ন্‌া -া ধ্‌া -া)
II II না ধা না ক্ষা | গা ক্ষা গা সা | সা -া -া -া | সা -া -া -া
কে • • দু | র ন্‌ ত বা | জা • • • | • ও • •

০ ১ + ৩
ধ্‌া ন্‌া সা গা | -া ধা ক্ষা ধা | না ধা না -া | মা ধা র্সা -া
ঝ ড়ে র • | • ব্যা কু ল | বাঁ • • • | শী • • • II . I

+ ৩ ০ ১
ক্ষা গা মাগা সা | সা -া -া -া | ন্‌া ধ্‌া ক্ষ্‌া ধ্‌া | সা -া -া -া
আ কা •শ কাঁ | পে • • • | সে সু র্‌ শু | নে • • •

+ ৩
না ধা না ক্ষা | -া ধা র্সা -া II II
স • র্‌ ব | • না শী •

০ ১ + ০
। গা গা গা | ক্ষা -া গক্ষা ধনা | র্সা -া -া র্সা | -া র্সা র্সা -া
• ব ন্‌ ঢে | লে • ছে• •• | য়্‌ উ জা ড়্‌ | ক • রে •

০ ১ + ৩
-া গা গা ক্ষা | গা -া র্সা -া | -া না ধা না | ক্ষা ধা র্স -া
• ফু লে র | ডা • লা • | • চ র ণ | প • রে •

০ ১ + ৩
-া র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা -া | -া না না র্রা | নর্রা নধা ক্ষা গা
• নী ল্‌ গ | গ • নে • | • আ সে • | ছু• •• টে •

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　হ্মা　গা　সা　সা　মাগা　ধা　হ্মা　না　ধা　র্সা　-া　না　ধা　হ্মা　গা II II
•　মে　•　ঘে　র　••　রা　•　শি　•　•　•　•　•　•　•

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　গা　গা　হ্মা　গা　-া　সা　-া　-া　ন্‌া　ধ্‌া　ন্‌া　হ্মা্‌　ধ্‌া　সা　-া
•　বি　পু　ল　ঢে　উ　এ　র্‌　•　সা　গ　র　দো　•　লা　র্‌

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　গা　গা　হ্মা　গা　-া　সা　সা　-া　গা　গা　গা　হ্মা　-া　গহ্মা　ধনা
•　সা　গ　র　হৃ　•　দে　•　•　বা　ন্‌　ডে　কে　•　যা৹　••

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
র্সা　মা　ধা　মা　হ্মা　-া　গা　-া　-া　গা　গা　হ্মা　গা　-া　সা　-া
য়্‌　শী　র্‌　না　ন　•　দী　র্‌　•　কূ　লে　•　কূ　•　লে　•

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　গা　গা　গা　হ্মা　-া　গহ্মা　ধনা　র্সা　-া　-া　র্সা　-া　র্সা　র্সা　-া
•　তো　মা　র　প্র　•　ল৹　••　য়্‌　ম　হো　ৎ　স　•　বে　•

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　র্গা　র্গা　র্হ্মা　র্গা　-া　র্সা　-া　-া　না　ধা　না　হ্মা　ধা　র্সা　-া
•　ব　ন্‌　ধু　ও　•　গো　•　•　ডা　ক　বে　ক　•　বে　•

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　র্সা　-া　র্সা　র্সা　-া　র্সা　-া　-া　না　না　র্ঋা　নর্ঋা　মধা　হ্মা　গা
•　ভা　ঙ　বে　আ　•　মা　র্‌　•　খ　রে　র　বাঁ৹　••　ধ　ন্‌

•　　　　　　　　১　　　　　　　　+　　　　　　　　৩
-া　হ্মা　গা　সা　সা　মাগা　ধা　হ্মা　না　ধা　র্সা　-া　না　ধা　হ্মা　গা II II
•　কাঁ　•　দ　ন　••　হা　•　সি　•　•　•　•　•　•　•

প্রাচীন মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী। হিণ্ডোল বা হিন্দোল ছয় রাগের অন্যতম রাগ। ভায়রো, হিণ্ডোল, মালকোষ, শ্রীরাগ, মেঘ ও দীপক। হিণ্ডোল রাগে কড়ি মধ্যম ব্যবহার্য্য। ঔরব-ঔরব জাতীয় রাগ। আরোহণে সা গা হ্মা ধা (না) র্সা। আরোহণে র্সা না ধা হ্মা গা সা। অধিকাংশ গুণী আরোহণে নিখাদকে বর্জ্জ্য স্বর রূপে গণ্য করেন। এই রাগ রুদ্র রসের প্রতীক। গান্ধার, মধ্যম, ধৈবৎ ও নিখাদ-প্রায় প্রত্যেকটি স্বরই মীড়যুক্ত। এই রাগের পকড় হচ্ছে সা ন্‌া ধ্‌া হ্মা ধ্‌া সা অথবা সা গা হ্মা গা সা।

স্বরলিপিকার কর্তৃক গানটি ঢাকা বেতারের ষ্টুডিও রেকর্ডে গীত হয়েছে।

সম্পাদকীয়
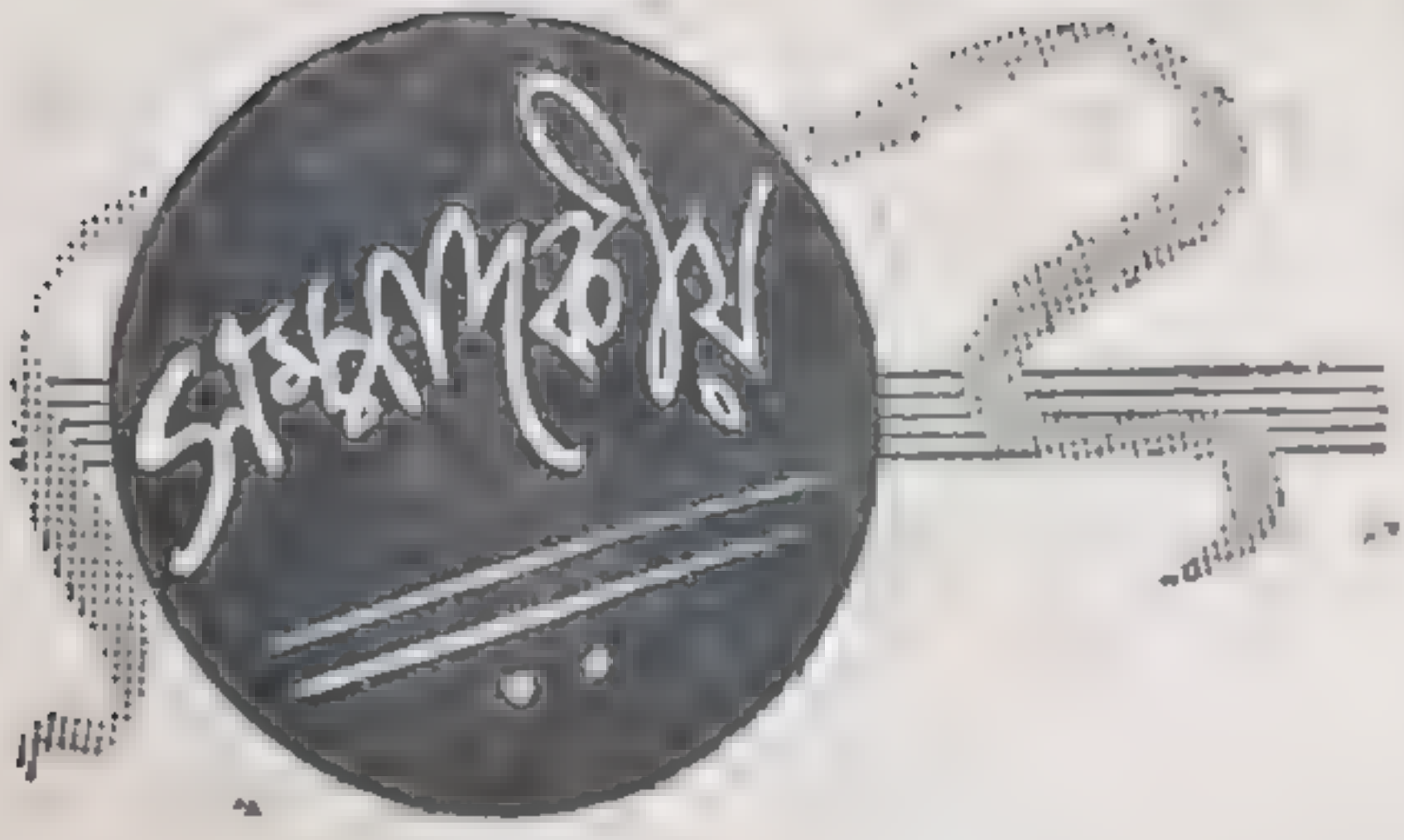
শহীদুদ্দীন মোহাম্মদ

জনাব শহীদুদ্দীন মোহাম্মদ এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে……রাজেউন)। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"A good man is a great man" অর্থাৎ ভাল মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ। মরহুম শহীদুদ্দীন মোহাম্মদের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া এই কথাটি আজ বার বার মনে পড়িতেছে। কারণ কথাটি তাঁর সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। শহীদুদ্দীন সাহেব সরকারী চাকুরী করিতেন এবং চাকুরীজীবী হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁর কর্ম্মতৎপরতা তাঁর এই সরকারী কাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু দিক হইতে সমাজ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতাতেই তাঁর কর্ম্ম-তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার ও তামদ্দুনিক আয়োজনে সব সময়েই তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। এ-সব জনহিতকর, কল্যাণমূলক ও জাতিগঠনমূলক কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তাঁর শক্তি ও প্রাণ-প্রাচুর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করিত। এরূপ নিরলস ও নিবেদিত-প্রাণ সমাজসেবী তখন খুবই কম দেখা যাইত। ফলাফল, সমালোচনা ও বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি জলন্ত আদর্শের তাগিদে যে কাজটি বাছিয়া লইতেন, তাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। বহু শিক্ষা-সম্পর্কিত ও তামদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান তাঁর সেবায় ও সাহায্যে বহু স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল ও প্রাণ পাইয়াছিল। জনাব শহীদুদ্দীন মোহাম্মদের এন্তেকালে আজ জাতির যে ক্ষতি হইল, তার সহজে পূরণ হইবে না। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাইতেছি; এবং তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করিতেছি।

মওলানা আবদুল আজিজ

বিখ্যাত রাজনীতিক, সমাজকর্ম্মী ও শিক্ষাব্রতী মওলানা আবদুল আজিজ পরলোকগমন করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে……রাজেউন) তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার অধিবাসী। দেশ, জাতি ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি আজীবন ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর স্বগ্রামে তিনি "দারুল উলুম মাদ্রাসা" ও "দারুল এতিমখানার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁর এন্তেকালে জাতি সত্যই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিতেছি ও শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সান্ত্বনা এবং সমবেদনা জানাইতেছি।

ইকবাল দিবস

পাকিস্তানের সর্ব্বত্র সাড়ম্বরে মহাকবি ইকবালের স্মৃতি দিবস পালিত হইয়া গেল। এ-উপলক্ষে অনেক সভারও অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে এবং বেতারেও অনেকে মূল্যবান বক্তৃতা করিয়াছেন। এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং "আসরারে খুদী"-র কবির স্মরণে এ-দেশের লোক সভা ও আলোচনার আয়োজন করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইকবাল জাতিকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তার জন্য কৃতজ্ঞ জাতির অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে।

ইকবাল ও পূর্ব্ব-পাকিস্তান

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে মহাকবি ইকবালের ভক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তির অভাব নাই। বাংলা জবানে এখানে ইকবালের কাব্যের তর্জ্জমা করিয়া কয়েকজন নাম কিনিয়াছেন। কারো কারো রচনা খুবই সুন্দর হইয়াছে। তবু আমরা বলিব যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইকবালের পয়গাম, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি প্রচারের প্রকাণ্ড অবসর রহিয়াছে। তাঁর কথা এখানে প্রচারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ-দিকে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টা মিলিত হইলে আরো সুখের হয়। আমরা আমাদের এই প্রস্তাবের প্রতি সকলের বিশেষ করিয়া মহাকবির ভক্ত, অনুরক্ত ও সমঝদার পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ প্রস্তাব আগেও করা হইয়াছে; কিন্তু কোনো কাজ

হয় নাই। এবার হইতে এ-উদ্দেশ্যে বাস্তব কাজ হইবে আশায় আমরা প্রস্তাবটির পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

সাহিত্যিক ও সরকারী সাহায্য

সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ গত ১১ই মে তারিখে লেখক ও শিল্পীদের কল্যাণের নিমিত্ত আটটি সাহায্য মনজুর করিয়াছেন। এই সমস্ত সাহায্যের মধ্যে ছয়টি অসুস্থ ও বৃদ্ধ লেখকদের জন্য মনজুর করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন বর্ত্তমানে যক্ষা রোগে ভুগিতেছেন এবং সরকার যক্ষা হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবেন। পরলোকগত দুইজন লেখকের পরিবারবর্গের নিমিত্ত মাসিক ভাতা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় সকল সাহায্যই এক বৎসরের জন্য মনজুর করা হইয়াছে। এক বৎসর গত হইলে পুনরায় পরিস্থিতি বিবেচনা করা হইবে।

সাহায্যগুলি এইরূপ করা হইয়াছে: লাহোরের মওলানা আবদুল মজিদ সালেক, মাসিক ৫০০৲; পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রওশন ইজদানী, মাসিক ১৫০৲; শক্কুরের রহিমদাদ খান, মাসিক ১০০৲; জেকোবাবাদের আবদুল করিম গাজী, মাসিক ১০০৲; করাচীর মওলানা সিদ্দীক হাসান, মাসিক ১০০৲; হায়দরাবাদের একবাল আজমীরী নগদ ৫০০৲ এবং যক্ষা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয়; লায়ালপুরের মরহুম আহমদ রিয়াজের পরিবারবর্গের জন্য মাসিক ১৫০৲ ও লায়ালপুরের মরহুম আলা উদ্দীন হায়দারের পরিবারবর্গের জন্য মাসিক ২০০৲।

আমরা সদরের এই সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদরের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি। অতীতে বহু সাহিত্যিক দুস্থ ও দুর্গত হাল-হকিকতে থাকিয়া বিদায় লইয়াছেন, তাঁদের প্রতি সরকারের তেমন প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ে নাই। অত্যন্ত খুশীর বিষয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সরকারী ঔদাসিন্য ও জড়ত্বের অবসানের সূচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান সরকারকে এজন্য আমরা শোকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। এখানে উল্লেখিত আটজন সাহিত্যিকের মধ্যে অনেকেই আমাদের নিকট পরিচিত নন। তবে আমরা স্থির-নিশ্চিত যে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করিয়াই এ-সব সাহিত্যিকের নামের তালিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এঁদের মধ্যে পূর্ব্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যিক হইতেছেন জনাব রওশন ইজদানী। এ-নামটি সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। তবে পূর্ব্ব পাকিস্তানে আরো দুস্থ ও এ-ধরনের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিক রহিয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানেও এরূপ সরকারী সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত আরো আছেন। আশা করি, তাঁদের কথাও যথাসম্ভব কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আঞ্চলিক বাংলার লুগাত

আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত শব্দ লইয়া একখানি ষ্ট্যাণ্ডার্ড পূর্ব্ব পাকিস্তানী বাংলা লুগাত সংকলনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশ, বাংলা একাডেমীর সঙ্কলন বিভাগ ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে আনুমানিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই লুগাত সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ-পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানের সকল অংশ হইতে ৯০ হাজার আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। লুগাত সংকলনের কাজ চূড়ান্তভাবে আরম্ভ করার পূর্ব্বে এই শব্দগুলি ভালভাবে ব'ছাই করা হইবে। সংগৃহীত শব্দগুলি বর্তমানে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজান হইতেছে। শব্দ সংগ্রহের জন্য এ-পর্য্যন্ত মোট ১০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত সচিত্র বাংলা লুগাতখানি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রত্যেকটি খণ্ডে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠা থাকিবে। শেষ খণ্ডে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী থাকিবে।

বাংলা একাডেমী একটি কাজের মত কাজে হাত দিয়াছেন। আমরা তাঁদের এই প্রচেষ্টার সর্ব্বাঙ্গীন কামিয়াবি করি। বাংলা শব্দের উপযুক্ত লুগাত বেশী নাই বলিলেও চলে। বাংলা জবানের যে সমস্ত লুগাত এ-পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে, সেগুলিও আবার সম্পূর্ণ নয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক জীবনের শব্দ সে-সব লুগাতে বহু ক্ষেত্রে বর্জন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই উপেক্ষার প্রতিকার অত্যন্ত ফরজ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক বুনিয়াদ তার আঞ্চলিক সম্পর্কের সাথে যুক্ত ও পরিচিত না হইলে কখনও সুষ্ঠু হইবে না। সুতরাং একাডেমীর এই লুগাত রচিত হইলে একটি প্রকাণ্ড অভাব দূর হইবে। আশা করি, এই লুগাতটি সকল দিক হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক শব্দের সংগ্রহ ও সঙ্কলন হিসাবে সন্তোষজনক হইবে।

আরবী-ফারসী-বাংলার লুগাত

আলোচ্য লুগাতটিতে আরবী-ফারসী-বাংলা শব্দ সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তা আমাদের জানা নাই। পূর্ব্বপাকিস্তানের সাহিত্যে ও জবানে আরবী, ফারসী, উর্দ্দু ও তুর্কী শব্দের প্রচুর ব্যবহার রহিয়াছে। আজ জাতীয় ঐতিহ্য, তাহজীব-তমদ্দুন এবং পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডত্বের তাগিদে এ-সব শব্দের নব জানাজানি ও

পরিচয় অত্যন্ত দরকার। এ-সম্বন্ধে অতীতে বহু আলাপ-আলোচনা এবং জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। বাংলা একাডেমীকে এ-সব শব্দের জন্য বিশেষভাবে আর একটি লুগাত রচনায় মনোযোগী হইতে দেখিলে আমরা খুশী হইব।

দ্বিতীয় পাক সঙ্গীত সম্মেলন

গত ১লা, ২রা এবং ৩রা মে তারিখে পাক ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট হলে সারা পাক সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম নিখিল পাক সম্মেলনের অধিবেশনও ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সঙ্গীত সম্মেলনে পাকিস্তানের বাইরের শিল্পীরাও যোগদান করিয়াছিলেন এবং তা কতকটা আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের রূপ ধারন করিয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে লোক সমাগমও বেশী হইয়াছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবারকার সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য সম্পর্কে নানা দিক হইতে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের অনেক নাম করা গায়ক ও শিল্পী যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ আমাদ আলী খাঁ, সালামত, নাজাকাত, আলী খাঁ, কবির খাঁ, লায়লা আর্জ্জুমন্দ বানু, সুরাইয়া মুলতানী কর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সঙ্গীত ও শিল্প-নৈপুণ্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এবারকার বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় সম্মেলনের বড় কথা হইল যে, ইহা একমাত্র পাকিস্তানী আর্টিষ্টদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। এবং পাকিস্তানী শিল্পীরাই এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পাক সঙ্গীত সম্মেলন একটা কথা চূড়ান্তভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ওস্তাদী সঙ্গীতের সত্যিকারের কদরদান শ্রোতার প্রাচুর্য্য আছে এবং এখানে ওস্তাদী সঙ্গীতের ভবিষ্যত আছে। পয়লা সারা পাক সঙ্গীত সম্মেলনই এ সত্যটিকে স্পষ্ট করিয়া তোলে এবং এবারকারের সঙ্গীত সম্মেলন এই সত্যটিকে সন্দেহাতীত করিয়াছিল। ইহা হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও কদরদান ব্যক্তিদিগকে কর্ত্তব্য-সচেতন হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

ওস্তাদীগানের কেন্দ্র

পূর্ব্ব পাকিস্তানে ওস্তাদী সঙ্গীতের একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়িয়া তোলার দিকেই আমরা ইঙ্গিত করিতেছি। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখানে হালকা গানের দাম পড়িয়া গিয়াছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দাম চড়িতেছে। একেই স্থায়ী করার প্রয়োজন একটি জাতীয় প্রয়োজন। সুতরাং ঢাকায় একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলেজ বা একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আজ তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। আজ সময় অত্যন্ত অনুকূল। এই অনুকূল হাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিলে এখানকার সঙ্গীতামোদীগণ সত্য সত্যই উপকৃত হইবেন।

আমির রিপোর্ট

গত সেপ্টেম্বর মাসে অধুনালুপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সব ঘটনা ঘটে, সে-সব ব্যাপার তদন্ত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের বিচার-পতি জনাব আমিরকে লইয়া একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্টে যে-সব কথা বলা হইয়াছে তা অত্যন্ত কঠোর হইলেও সত্য। সে সময় গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সরকারী শাসনযন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হইয়াছিল পুরাপুরি। দলীয় স্বার্থের খাতিরে তৎকালীন উজীরে আলার ভূমিকা যে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথাও রিপোর্টে আছে। এই রিপোর্টটি আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার একটি দলিল হইয়া রহিল। এতে দেশবাসীর জন্য চিন্তার খোরাক আছে। আমাদের গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে যদি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে এই রিপোর্টের প্রকৃত শিক্ষা দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তারই আলোতে আমাদের গণতান্ত্রিক জীবন হইতে ত্রুটি ও বিচ্যুতির অবসান ঘটাইতে হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানান্তর

শিক্ষা উজীর জনাব হাবিবুর রহমানের এক বিবৃতিতে জানা গেল যে ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্ত্তমান স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। প্রকাশ, ইহাকে টঙ্গীর কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করা হইবে। বর্ত্তমান স্থান হইতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়কে অপসারিত করার প্রস্তাব আগেও হইয়াছিল। পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রথম যখন ৯৩ ধারার শাসন চালু হইয়াছিল তখনও এরূপ একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে সরকারী তৎপরতাও কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল। এজন্য একজন কার্য্য নির্ব্বাহক অফিসারও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি জোরের সাথে কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ওজারতের শাসনের সময় ইহা পরিত্যক্ত হয়। আমরা গোড়া হইতেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলাম এবং এখনও করি।

স্থানান্তরের সুবিধা ও অসুবিধা

এ-কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এখান হইতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়কে অন্যত্র লইয়া যাইতে গেলে একটা নূতন বিপুল খরচের সম্মুখীন হইতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র-ছাত্রী নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করে তারা এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাক্ষাত সুযোগ হইতে হয়ত কিছুটা বঞ্চিত হইবে। এসব হইল নূতন প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অসুবিধার দিক।

তবে সুবিধার দিকও বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের মতে এ-ব্যাপারে সুবিধার পাল্লাই ভারী হইবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাই শান্তিপূর্ণ এবং আদর্শ পরিবেশ। একদিন যখন ঢাকা শহর ছোট ছিল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার পর ঢাকার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যাইতে বসিয়াছে। এখানে জনসমাগম বাড়িতেছে। ঢাকার সর্ব্বত্র নূতন ঘরবাড়ী ও অফিস আদালত স্থাপিত হইতেছে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিককার স্থান অত্যন্ত জনাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে স্থানে তার সম্প্রসারণ মোটেই সম্ভবপর হইতেছে না। শহরের হট্টগোল বিশ্ব বিদ্যালয় এলাকার পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্বি-বদ্যালয়কে বর্ত্তমান স্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়াই উচিত।

কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রীর এতে অসুবিধা হইতে পারে। কারণ তাঁরা এখন যেমন বাহির হইতে আসিয়া এখানে পড়াশুনা করেন, তখন তা পারিবেন না। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় না থাকিলেও এখানে উপযুক্ত কলেজ ও প্রতিষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা সব সময়ই থাকিবে। সুতরাং তাঁদের তেমন কোনো অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা এতে নাই।

রাজনীতি ও ছাত্র-ছাত্রী

জনাকীর্ণ স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলে রাজনীতির প্রভাব যে সেখানে অত্যন্ত কার্য্যকরী হয়, তা অতীতে দেখা গিয়াছে। এদেশের রাজনৈতিক নেতারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে তাঁদের সুবিধার জন্য স্ব স্ব দলে টানিতেন এবং তাঁদিগকে তাদের দলীয় প্রচারের জন্য ব্যবহার করিতেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক কোন্দলের আখড়া হইয়া পড়িয়াছিল। যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হয়, তবে রাজনীতির প্রভাব হইতে তাবা মুক্ত থাকিতে পারিবে।

রক্ষা-ব্যবস্থা ও পাক-ভারত

রাওলপিণ্ডিতে একটি বিবৃতি প্রদান করিতে যাইয়া পাকিস্তানের সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে পাক-ভারতের সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এরূপ কোনো পরিস্থিতিতে উভয় দেশকে তিনি একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বিবৃতি প্রদানের সময় তিনি তিব্বতের ঘটনাবলী সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন।

তিব্বতের পরিস্থিতি

তিব্বতের পরিস্থিতিতে যে পাক-ভারতের চিন্তার কারণ আছে, তা বেশী ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। কমিউনিজম সারা দুনিয়ার উপর আজ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চায়। তিব্বত নীতিগতভাবে আগেই কমিউনিষ্ট চীনের প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছিল। তা সত্ত্বেও ঘরোয়া ব্যাপারে তার স্বাতন্ত্র্য এবং সার্ব্বভৌমত্ব ছিল। এই সার্ব্বভৌমত্ব এবং স্বায়ত্তশাসন আহরণের আকাঙ্খায়ই তিব্বতীরা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তিব্বতের প্রধান দালাই লামা তিব্বতীদের এই জাতীয় মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। ইহাকেই কমিউনিষ্ট চীন "বিদ্রোহ" বলিয়া আখ্যা দেয় এবং নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালাইয়া বহু তিব্বতীকে হত্যা ও বন্দী করে। দালাই লামাকে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তিব্বতে চীনাদের এই অভিযানই আজ পাক-ভারতের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ চীনের লাল ফৌজ পাকিস্তান ও ভারতের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। সুতরাং পাকিস্তান ও ভারতের যুক্ত রক্ষা প্রচেষ্টার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

তিব্বত ও ভারত

তিব্বত সম্পর্কে ভারতের মনোভাব অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। প্রথমদিকে তিব্বতী স্বায়ত্ত শাসনের উপর চীনের আঘাত জনাব নেহরু সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। চীনের পক্ষ হইতে এ-ব্যাপার লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে তুমুল হৈ চৈ চলিতেছে। পণ্ডিত নেহরু এর পর সুর ঘুরাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি এখন চীন ও ভারতের বন্ধুত্বের উপর অত্যন্ত জোর দিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যতদূর দেখা যাইতেছে, তাতে মনে হয় যে জনাব নেহরু আজ চীনের বন্ধুত্বই চান এবং তিব্বত লইয়া তাঁর মাথা-ব্যথা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। এ-অবস্থায় পাক-ভারতের যুক্ত রক্ষা

প্রচেষ্টার আবেদন কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তা বলা শক্ত।

কাশ্মীর ও খাল-পানি

তা ছাড়া পাক-ভারতের যুক্ত রক্ষাপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে পরিণত করার আগে পাকিস্তান ও ভারতের বড় বড় বিরোধগুলি মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। পাক-ভারতের বিরোধগুলির মধ্যে কাশ্মীর ও খালের পানির বিরোধই সব চাইতে বড়। খালের পানির বিরোধ মিটাইতে যাইয়া বিশ্বব্যাঙ্ক হিমশিম খাইতেছেন এবং মিটমাটের জন্য প্রস্তাবের পর প্রস্তাব করিতেছেন; কিন্তু কোনটিই এ-পর্য্যন্ত ভারতের মনোপূত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যা' হোক খাল-পানি সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে এখনও চূড়ান্তভাবে নিরাশ হওয়ার সময় আসে নাই।

তবে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব এবং অনমনীয় জেদের খবর কারো অজানা নাই। জাতিসঙ্ঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সকলের সাথে ভারতও একদিন উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু তারপর ভারত আস্তে আস্তে তার সুর ঘুরাইয়া ফেলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সে আর গণভোট গ্রহণের প্রস্তাবের ধার দিয়াও যাইতেছে না। জাতিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবে ভারতের সহযোগিতা লাভ করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু একটার পর একটা প্রস্তাব ভারত বাতিল করিয়া দিয়াছে এবং ছলে-বলে ও কৌশলে সে কাশ্মীরকে তার পদানত রাখার কোশেশ করিতেছে। সুতরাং ভারতের পক্ষ হইতে পাক-ভারতের সম্পর্কের উন্নতির জন্য কোনো সাড়াই পাওয়া যাইতেছে না।

সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁর প্রস্তাব শুভ বুদ্ধির পথেই আবেদন। পাক-ভারতের যুক্ত রক্ষা-প্রচেষ্টার ভিত্তিই হইবে এই শুভবুদ্ধি। কারণ শুভবুদ্ধির উন্মেষ হইলেই দুই দেশের সম্প্রীতি বাড়িবে এবং বাহিরের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্ত রক্ষাপ্রচেষ্টার প্রস্তাব একমাত্র তখনই কার্য্যকরী হইবে; কিন্তু ভারতের হাবভাব দেখিয়া এ-ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করার তেমন কিছুই পাওয়া যাইতেছে না।

মৌলিক গণতন্ত্র

পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছেন। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মতই সেখানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা চালু হইবে। পাকিস্তানের সর্ব্বত্র ইউনিয়ন বোর্ডগুলির হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড যে সব ক্ষমতা ভোগ করিতেছে, তার চাইতে তারা পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় অধিকতর ক্ষমতা পাইবে। আরো একটি বিবৃতি হইতে পরে জানা গেল যে, বর্ত্তমান জেলাবোর্ডগুলির অবস্থাও বদলাইবে। তাদের নূতন নাম হইবে—'জেলা কাউন্সিল।' তাদের হাতেও অনেক নূতন ক্ষমতা আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাদের হাতে অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করারও ক্ষমতা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

গণতন্ত্রের ভিত্তি

উপরতলার নেতা, প্রতিনিধি বা মুখপাত্রেরা দেশের আইন ও ব্যবস্থাপক সভার শোভা বর্দ্ধনই বেশী করেন, আসলে গণতন্ত্র থাকে নীচের তলার জনগণের মধ্যে নিহিত ও বদ্ধমূল। এখানেই আমরা ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সাক্ষাৎ পাই। এই সব ইউনিয়ন বোর্ড ১৯২১ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মের ফলে স্থাপিত হইলে তাদের ক্ষমতার গণ্ডী ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই গণ্ডীকে আজ সম্প্রসারিত করিয়া তাদের হাতে নিজেদের কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি সত্যিকারের কার্য্যকরী ক্ষমতার অধিকার লাভ করিয়া যদি সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তবেই এ-দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি হইবে প্রশস্ত ও মজবুত। এই উদ্দেশ্যেই এই সব মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আজ সুদৃঢ় ও সবল করার প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে। এর সাথে জেলা কাউন্সিল গঠন করিয়া তাদের হাতেও অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। জেলা কাউন্সিলগুলি প্রদেশের কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই স্বাধীনভাবে অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিতে পারিবে। এতে উপর তলার কাজের চাপ যেমন কমিয়া যাইবে, তেমনই দ্রুত গতিতে কাজ করা সহজ হইবে। এর ফলে আরো একটা বড় লাভ হইবে। প্রদেশের কেন্দ্রে আসিয়া নেতা ও প্রতিনিধিরা ক্ষমতার লোভে যে-দৃশ্যের অবতারণা করেন, সে-দৃশ্য পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থাতে ততখানি দৃষ্ট হইবে না। এ-সব কথা বিবেচনা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ নূতনভাবে জেলা কাউন্সিল গঠন ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে শক্তিশালী

করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রচেষ্টারই সাফল্য কামনা করি ও ইহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। এই প্রচেষ্টার ফলাফল আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়া যাইব।

জাতীয় ঐক্য ও বৈসাদৃশ্যের অবসান

এই পরিকল্পনায় যে জিনিসটা সব চাইতে আমাদের ভাল লাগিয়াছে, তা হইল পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক বৈসাদৃশ্যের অবসান। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে এতদিন ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় গোঁজামিলের যে কিছুটা অবকাশ ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি ঘটিলেও পশ্চিম পাকিস্তানে ইহা আরো জাঁকাল-ভাবে টিকিয়া ছিল। সেখানে ছিল জায়গীরদারী প্রথা ও সামন্ততন্ত্র। এর কুফল অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অনৈক্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। নয়া শাসন-কর্তৃপক্ষ এই জায়গীরদারী প্রথার অবসান ঘটাইয়াছেন। এর পর তাঁরা সেখানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের বৈসাদৃশ্য দূর করার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায়ই প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের ভিত গড়িয়া উঠিবে, তা বলাই বাহুল্য। অবস্থা ও ব্যবস্থার ঐক্য যদি পরিপূর্ণ হয়, তবে জাতীয় ঐক্যও সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক রূপ পাইবে। সুতরাং এ-পরিকল্পনাকে আমাদের বিপ্লবাত্মক বলিতে দ্বিধা নাই। এর সাথে সারা দেশের জনগণের যে সমর্থন আছে, তা ব্যাখ্যা করিয়া বলারও প্রয়োজন করে না।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the 'Azad Press
Ramna Dacca (E Pakistan)

আপনার টাকার জন্য

আরও বেশী

স্থদ

এখন দেওয়া হচ্ছে ৬%

সেভিংস সার্টিফিকেটে

এই বর্দ্ধিত হার ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল
তারিখ থেকে কার্য্যকরী
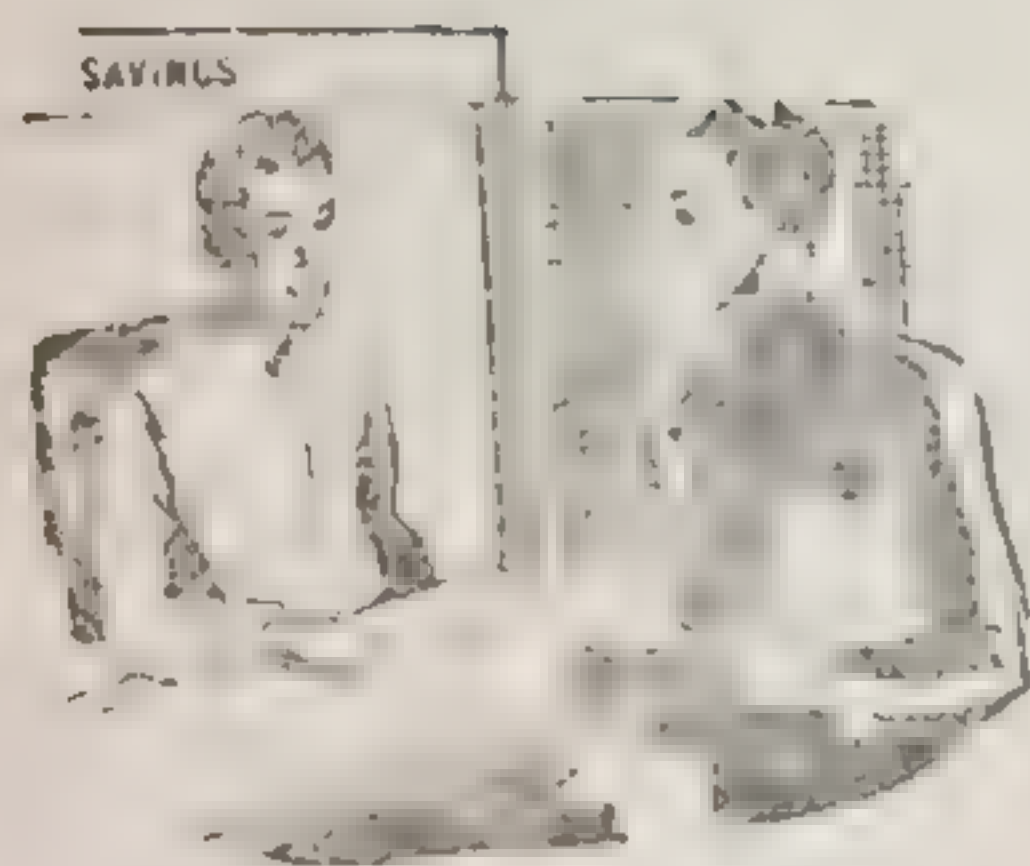
ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট সেভিংস সার্টিফিকেটের উপর স্থদের হার—৫% হতে ৬%—বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় প্রচেষ্টায় এক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্ব্বে বিশেষ-করে স্বল্প নিয়োগকারীদের জন্য সঞ্চয় কখনই এত লাভজনক ছিল না। আপনারা সকলেই এই যুগান্তকারী স্থযোগের সদ্ব্যবহার করুন।

যে কোন পোষ্ট অফিস
থেকে কিনুন।

স্বল্প নিয়োগকারীদের জন্য এ একটা অপূর্ব্ব স্থযোগ।

মাসিক মোহাম্মদী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

"তাফছীরুল কোরআন"

মুজীবুর রহমান খাঁ

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর "তাফছীরুল কোরআন" বা কোরআনের তফসীরের দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমরা একে সারা বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য খবর এবং এ-বছরের পাক-বাংলা সাহিত্যের সেরা ও অদ্বিতীয় খবর বলে অভিনন্দিত করতে চাই। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের বড় বড় ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের তর্জমা হয়েছে অনেক এবং পাক-বাংলা সাহিত্যের ভূমিকাও এদিক দিয়ে কম গৌরব-দীপ্ত নয়; কিন্তু মওলানা সাহেবের এই "তাফছীরুল কোরআনের" নিকট আর সব ম্লান ও স্তিমিত হয়ে পড়বে, এ-কথা বলতে আমাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই।

তাফছীরুল কোরআনকে কেন আমরা এই সম্মানিত আসন দিচ্ছি—তার কথা এখানে একটু খোলাসা করে বলতে চাই। সাহিত্য যাঁদের নিকট সাধনা—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সে-দলেরই একজন সাহিত্যিক। এ-কথা তাঁর পূর্ববর্তী বহু রচনায় একাধিকবার নির্ভুল-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে রচনায়ই হাত দিয়েছেন, তাতে তিনি অন্তর-মনের সকল বুদ্ধি, যুক্তি ও পাণ্ডিত্য মিলিতভাবে নিবেদিত করে তাকে সার্থক এবং সম্পূর্ণ করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এর পরিচয় তাঁর "মোস্তফা চরিত" "সমস্যা ও সমাধান" প্রভৃতি পুস্তকের পাঠকগণ অতীতে ঘনিষ্টভাবে পেয়েছেন। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সকল রচনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান ও মধ্যমণি রূপে বিবেচিত হবে তাঁর এই "তাফছীরুল কোরআন।"

পাক-বাংলা সাহিত্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-ই যে এ-কাজের জন্ম সবার চাইতে যোগ্যতম ব্যক্তি, তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। কারণ, কোরআন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নিকট একটি কিতাব বা নীতি বাক্যের সংগ্রহ মাত্র নয়, কোরআন তাঁর জীবন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ অতীতে একদিন ধর্ম প্রচার করেছেন, সমাজ সেবা করেছেন, পুস্তক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সম্পাদনা করেছেন। আবার রাজনৈতিক নেতারূপে দেশ ও জাতিকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। কিন্তু সব কিছুতেই তিনি কোরআনকে সর্বক্ষণ তাঁর অতন্দ্র মনের নিকট জীবন্ত রেখে কাজ করেছেন। তাঁর ইস্‌লাম প্রচার, সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য সাধনা, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি এই কোরআনের আদর্শেরই প্রতিধ্বনি। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর দারুল-ইসলামী ভাবধারার প্রতি আনুগত্যের কথা সার্বজনবিদিত। তাঁর আহলে হাদিস, খিলাফত ও মুসলীম লীগ আন্দোলনের ভূমিকা এবং "ইসলামী শাসনতন্ত্রে মূলনীতি" সম্পর্কিত রচনা, তাঁর "মোস্তফা রচিত" এবং "সমস্যা ও সমাধানে"র প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে এই একটি কথাই বার বার মর্মরিত হয়ে উঠেছে যে, কোরানের আদর্শকেই জীবন ও কাজের সর্বত্র

রূপায়িত করে তুলতে হবে। সুতরাং কোরআনের তর্জমা ও তফসীর রচনার যোগ্যতা ও অধিকার এদিক হতে যে তাঁর সবার চাইতে বেশী এ-কথা মেনে না নিয়ে উপায় নাই।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় যাঁরা মনোযোগের সাথে আগাগোড়া লক্ষ্য করে এসেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা আড়ালে থেকে দিনের পর দিন ধরে তাঁকে যেন এ-কাজের জন্যই গড়ে তুলেছেন। এক একটি মানুষ এক একটি মহৎ কাজ বা মহৎ সৃষ্টির জন্য এমনি এক অদৃশ্য হাতের খেলায় যে গড়ে উঠেন, তার প্রমাণের অভাব ইতিহাসে নাই। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "জীবন দেবতা" ও ইংরেজী সাহিত্যে বলা হয় Guardian Angel. মহাত্মা গান্ধী অনেক কাজ করেছেন, চরকা কেটেছেন, হরিজন উদ্ধার করেছেন, সমাজ সংস্কার করেছেন এবং আরও অনেক কিছু করেছেন ; কিন্তু তাঁর সব চাইতে বড় কাজটি ছিল ভারতের আজাদী অর্জন। অনেকে হয় তো জানেন না কায়েদে আজম জিন্নাহ্ চমৎকার নাট্যাভিনেতা ছিলেন। আইনজীবি হিসাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দী ছিল বিরল। পার্লামেণ্টারী নেতা হিসাবে তাঁর যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তাঁর সব চাইতে সেরা কাজটি হইল পাকিস্তানের বাস্তব রূপায়ন। এরই জন্য যেন তাঁরা আজীবন কোন এক রহস্যময় গোপন হস্তের ইঙ্গিতে জীবনের বিচিত্রধারায় এবং ঘাত-প্রতিঘাতে দিনের পর দিন তৈরী হয়ে উঠেছিলেন! শক্তিধর ও ঐতিহাসিক মানুষের বিশিষ্ট ভূমিকায় সর্বত্রই আমরা এমনিতরো প্রতিভার সাথে পরিচিত হয়ে থাকি। সাহিত্যে যারা বড় বড় স্রষ্টা, দিক্‌পাল, তাদের বেলায়ও এর সত্যতা সুন্দরভাবে লক্ষ্য করা যায়। মিলটন অনেক বই লিখেছেন ; কিন্তু মনে হয় তাঁর আগমন বিশেষভাবে Paradise Lost-এর জন্যই নির্দ্ধারিত হয়েছিল। এ-কথা সেক্সপিয়ারের "হ্যামলেট," ভিক্টর হিউগোর "লা মিজারেবল," টলষ্টয়ের "ওয়ার এণ্ড পিস" রবীন্দ্রনাথের "বলাকা," মাইকেলের "মেঘনাথ বধ কাব্য" এবং নজরুল ইস্‌লামের "অগ্নিবীণার" বেলায়ও অল্প বিস্তর ঘটে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আরবী জবানের একজন মস্তবড় পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পাক-বাংলার আলেম সমাজে তাঁর স্থান সকলের পুরোভাগে। তাঁর সাধনার ও প্রতিভার চরম এবং পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি এই তাফছীরুল কোরআনের মধ্যে ধরা পড়েছে।

বিভিন্ন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে আমরা একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করতে পারি—তা হলো পরিণত যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় মেলে কাব্য সৃষ্টিতে আর পরিণত প্রবীণত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দান মিলে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ গদ্য রচনায়। কোরআনের তর্জমা ও তফসীরের কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং আয়াসসাধ্য। মূল ভাষা এবং অনুবাদের ভাষায় অনুবাদকের চাই অসাধারণ দখল। মূল ভাষার প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের ধাতুগত এবং ব্যবহারিক অর্থের যেমন তাৎপর্য্য জানা চাই—তেমনি অনুবাদের ভাষা, লীলাধর্ম ও রীতিধারার সাথে অনুবাদকের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। সোজা কথায় অনুবাদের ভাষা নিয়ে যাদুকরের মত খেলা করার মুন্সীয়ানা যে সাহিত্যিকের জানা নাই, তাঁর দ্বারা কোন ক্লাসিক্যাল (Classical) গ্রন্থের অনুবাদ করা সম্ভব নয়। সকলেই জানেন এ-দিক দিয়ে মওলানা সাহেবের সাহিত্যিক যোগ্যতা তর্কাতীত। কোরআনের মত গ্রন্থের তাফছীর করতে হলে দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক এবং বিচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের খবরাখবর সম্বন্ধেও মোটামুটি ওয়াকেফহাল হতে হয়। সুখের কথা, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এ-সব জ্ঞানের অভাব নাই। ফলে, তাঁর তাফছীরুল কোরআন বাংলা সাহিত্যের একটি মহৎ অবদান হিসাবেই আমরা পেয়েছি। আরও বলা যেতে পারে, তফছীরুল কোরআন পাক-বাংলা সাহিত্যের নব সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির স্বাক্ষর বয়েই এসেছে।

প্রচলিত সাহিত্যিক অনুবাদের মোটামুটি তিনটি রীতি আছে। এই তিনটি রীতি হলো বিশ্বস্ত অনুবাদ, স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও সৃষ্টিধর্মী অনুবাদ। তবে কোন একটা মহৎগ্রন্থ বা সাহিত্য সৃষ্টির অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদের এই তিনটি রীতির কোন একটিকে একমাত্র বাঁধা-ধরা রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে অনুবাদ সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। এই ছককাটা তর্জমা রীতির কোন একটিকে তাফছীরুল কোরআনের অনুবাদের ভিতর মওলানা সাহেবও গ্রহণ করেন নাই। তিনি যথাসাধ্য বিশ্বস্ততার সাথে মূলের অর্থকে যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার সাহিত্যরীতির সাথেও সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে তাঁর অনুবাদে সহজ সরলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর এই তর্জমা ও তাফছীরের ভিতর দুইটি বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কোরআনে উল্লিখিত রসূল ও নবীদের সম্পর্কে পরবর্ত্তীকালে অনেক অবৈজ্ঞানিক ও অর্থহীন কেচ্ছাকাহিনী রচিত ও প্রচলিত হয়েছে। হযরত আদম, হযরত মুসা, হযরত ঈসা প্রভৃতি পয়গম্বরদের সম্পর্কে নানারূপ আজগুবী ও বিস্ময়কর ঘটনা তাফসীরকারদের অজ্ঞতার দরুণ পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে। মওলানা সাহেব এই অযৌক্তিক উপকথা, আখ্যান প্রভৃতির অসত্যতা নানা যুক্তি, তর্ক এবং বিশ্বস্ত দলিল-দস্তাবিজের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তাফছীরুল কোরআন পাঠের সাথে সাথে পাঠকগণ এদিক থেকে অনেক নূতন কথা

ও তথ্য জানতে পেরে লাভবান হবেন। কোরআনের সুরাগুলির এ-সব বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা তাফছীরুল কোরআনকে নিঃসন্দেহ সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে। বহু কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ক্ষতিকর ভ্রান্তধারণার মূলোৎপাটন করেছেন মওলানা সাহেব। তাঁর রচিত "মোস্তফা চরিতের" পাঠকগণ মওলানা সাহেবের এ-ধরণের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং আলোচনার সাথে আগে থেকেই সুপরিচিত। তাফছীরুল কোরআনে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য কোথাও ম্লান হয় নি।

মওলানা সাহেব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্যযুক্ত বহু কোরআনিক শব্দের সুন্দর টীকা রচনা করেছেন। টীকা রচনার সময় এ-সব শব্দের অর্থ ভাষাতাত্ত্বিকের বিশ্বস্ত পন্থায় উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তিনি একটি শব্দের সঠিক অর্থ বের করার জন্য কোরআনের ভিতরই তার অন্যত্র ব্যবহারের তাৎপর্য গ্রহণের জন্য সন্ধান করেছেন। যেখানে তার সুযোগ পাওয়া যায়নি, সেখানে সে-সব শব্দের অর্থ বের করবার জন্য ছহি হাদিসের আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর তিনি সমসাময়িক আরবী সাহিত্যের ভিতর সে-সব শব্দের অর্থের প্রয়োগ বিধিও লক্ষ্য করেছেন। এখানেই তিনি অনুসন্ধিৎসু বিচারধর্মী এবং যুক্তিবাদী মনের নিবিড় পরিচয় দিচ্ছেন। এক কথায় কোরআনের তর্জমা, তার গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল শব্দের টীকা, তফসীর রচনায় মওলানা সাহেবের পদ্ধতি হয়েছে অত্যন্ত বিচারধর্মী ও সত্যাভিসারী।

কোরআনের বাংলা তর্জমা আরও কয়েকটি হয়েছে। সে-সব তর্জমা অত্যন্ত সহজ ও অনায়াসলব্ধ পন্থায় শেষ করার লোভ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিকট পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। মওলানা সাহেব এই সহজ ও অনায়াসের পথ না বেছে নিয়ে কঠিন পথেই অগ্রসর হয়েছেন। অন্যান্য অনুবাদকদের অনেকেই তাদের তফসীর ও ব্যাখ্যায় প্রচলিত কুসংস্কার এবং বিভ্রান্তিককর গল্পের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে যাননি। কেউ কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ-গুলিকে সমর্থন করেছেন বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আপোষহীন যুক্তি ও অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে তার টীকা ও ব্যাখ্যাকে সব ক্ষেত্রেই নির্ভুল করে তুলেছেন। এখানে তাঁর সাহসিকতার ও সত্যভাষণের নির্ভীকতা বিশেষভাবে উল্লেখ না করে পারা যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর অনুবাদে কোন বাঁধা-ধরা নীতির অনুসরণ না করে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে তর্জমার কাজ করেছেন। আরবী মূলের অর্থ তিনি যেমন অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন, তেমনি তাঁর তর্জমায় কোরআনের মূল ঝঙ্কার ও প্রকাশ-শৈলীকেও বাংলা ভাষায় আনয়নের জন্য যথাসাধ্য দৃষ্টি দিয়েছেন।

অনুবাদ সাহিত্যের সব সময়ই একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা রয়েছে। কারণ, যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়, সে ভাষার রীতিনীতি ও লীলা চাতুর্যের সাথে অন্য কোন ভাষার স্বভাবতই মিল থাকে না। এই গরমিলকে লক্ষ্য করে একটা প্রবচন গড়ে উঠেছে যে, কোন বড় গ্রন্থকেই ভাষান্তরিত করা যায় না। অনুবাদকের যদি তার মাতৃভাষায় অসাধারণ দখল থাকে—তবে তাঁর রচনা-চাতুর্য্যের দ্বারা এই অসুবিধাকে অনেকখানি অতিক্রম করে যেতে পারেন। এ-ব্যাপারে বাংলা ভাষার সাধারণ দৈন্যের কথাও মনে রাখা দরকার। যা হোক, বাংলা ভাষায় অসাধারণ দখল থাকার দরুণ মওলানা সাহেব অনুবাদের এই বাধা ও অসুবিধাকে অনেকখানি জয় করতে পেরেছেন।

মওলানা সাহেবের তর্জমা ও তফসীরের আর একটি বিশেষ দিক হলো তাঁর রচনার সরলতা ও সাবলীলতা। তাঁর পূর্ববর্তী রচনায় এক সময়ে আমরা এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলাম। আমাদের একদল নেতৃস্থানীয় লেখক ও লেখিকা কঠিন অপরিচিত গুরুগম্ভীর আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের আগ্রহ দেখাতেন। এই সংস্কৃতাভিসারী বাংলা ভাষাকে মুসলমান সাহিত্যিকরাও একদিন আপন বলে ঐতিহাসিক কারণে গ্রহণও করেছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁও ছিলেন তাদেরই একজন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, তাফছীরুল কোরআন পুরাপুরি না হলেও মোটামুটি এ-ধরণের সংস্কৃতের প্রভাব হতে মুক্ত। এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাফছীরুল কোরআনেও দু'চারটি কঠিন ও আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, তবে এ-গুলি ব্যতিক্রম মাত্র। তাফছীরুল কোরআনের ভাষা সহজ, অকৃত্রিম এবং বেগমান। এর কোথাও আড়ষ্টতা নাই। আমরা নিম্নে তার কিছু কিছু উদাহরণ দিলাম :—

"যাবতীয় কৃতজ্ঞতা আল্লারই প্রাপ্য যিনি সকল জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার, যিনি করুণাময় কৃপানিধান, যিনি বিচার দিবসের মালেক ;

(হে আমাদের পরওয়ারদেগার!) আমরা এবাদত করি একমাত্র তোমারই—আর সাহায্য প্রার্থনা করি একমাত্র তোমারই নিকটে, আমাদিগকে পরিচালিত করিও সরল সুপ্রতিষ্ঠিত পথে—য'হাদের উপর কৃপা করিয়াছ তাহাদের (অবলম্বিত) পথে, কিন্তু দণ্ডভাজন করা হইয়াছে

যাহাদিগকে এবং সুপথ-হারা হইয়াছে যাহারা তাদের পথে নহে।"—(সুরা ফাতেহা, ১ম খণ্ড)

"নিজেদের মাল দওলৎ আল্লার রাহে খরচ করে যে সব লোক, তাহাদের (দানের) মেছাল হইতেছে :—যেমন একটী শস্যবীজ, যাহা হইতে উৎপন্ন হইল সাতটা শীষ, তাহার প্রত্যেক শীষে আছে একশত দানা ; এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা (এই পুণ্যফল) বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন দানে বিপুল, জ্ঞানে ব্যাপক।—সেই সমস্ত (দাতা) যাহারা আল্লার রাহে নিজেদের মাল-দওলত ব্যয় করে, অথচ ব্যয়ের সঙ্গে (কাহারও প্রতি) অনুগ্রহ প্রকাশও করে না এবং (কাহাকে) কষ্ট প্রদানও করে না—তাহাদের জন্য পুণ্য-ফল অবধারিত আছে—তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে, কোনও ভয় নাই তাহাদের এবং দুঃখিতও হইবে না তাহারা।

"যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশদায়ক কিছু, সদালাপ, ও ক্ষমা তাহা অপেক্ষা উত্তম ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন বেনায়াজ, মহা ধৈর্য্যশীল।

"হে মোমেনগণ ! এহছান জিতাইয়া অথবা ক্লেশ দিয়া নিজেদের দানগুলিকে পণ্ড করিয়া ফেলিও না—সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের অর্থ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লার প্রতি ও আখেরী দিনের প্রতি তাহার ঈমান নাই ; সে-মতে তাহার মেছাল হইতেছে, যেমন একখানা পাথর (আর) তাহার উপরে আছে কিছু মাটি—তাহার উপরে হইল প্রবল বৃষ্টিপাত, ফলে তাহাকে (ধুইয়া) ছাফ করিয়া ছাড়িল, নিজেদের শ্রমের সামান্য ফলও তাহারা লাভ করিতে পারিল না ; বস্তুতঃ অবিশ্বাসী সমাজকে আল্লাহ্ সুপথে পরিচালিত করেন না।

"পক্ষান্তরে, যে সমস্ত লোক নিজেদের অর্থ ব্যয় করে আল্লার রেজামন্দী হাছেল করার আশায় ও আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে, তাহাদের উদাহরণ, যেমন উর্ব্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি ফলের বাগান—তাহাতে নামিল প্রবল বৃষ্টিধারা, সেমতে তাহাতে উৎপন্ন হইল দ্বিগুণ খাদ্য সামগ্রী, আর প্রবল বৃষ্টির পরিবর্তে যদি অল্প বৃষ্টিও নামে (তাহাতেও সুফল হয়), বস্তুতঃ তোমাদের কৃতকার্য্যগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন সম্যক দ্রষ্টা। আচ্ছা, তোমাদের কাহারও যদি খেজুর ও আঙ্গুর ফলের এমন একটা বাগান থাকে—যাহার নিম্ন দেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদ-নদীনালা, সকল প্রকার মেওয়াজাতের সংস্থান তাহাতে আছে, আর সে উপনীত হইয়া গিয়াছে বার্দ্ধক্যে, এবং তাহার আছে কতকগুলি অক্ষম সন্তান সন্ততি—এমনই অবস্থায় একটা অগ্নিবৎ 'লুহ' সেই বাগানকে আক্রমণ করিয়া পুড়াইয়া ফেলিল—কানন স্বামী কি ইহা পছন্দ করিবে? এইরূপে আল্লা'হ্ তোমাদের মঙ্গলের জন্য আয়াতগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন, যেহেতু তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিবে।"—(সুরা বাকারা, ১ম খণ্ড)।

"বল : আমরা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কোনো বস্তুর অর্চনা করিব—যাহা আমাদের কোনও উপকার করিতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করিতে পারে না, অধিকন্তু আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়েত করার পর, আবার কি আমাদিগকে ফিরিয়া চলিতে হইবে পশ্চাতের পানে? সেই ব্যক্তির ন্যায়, শয়তানরা যাহাকে উর্দ্ধ-দেশ হইতে পৃথিবীর নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে—দিশাহারা অবস্থায়, অথচ তাহার স্বজনগণ তাহাকে সৎপথের পানে আহ্বান করিয়া বলিতেছে—আমাদের সঙ্গে আস! বল : আল্লার প্রদর্শিত যে পথ—তাহাই হইতেছে সত্য পথ ; আর আমরা আদিষ্ট হইয়াছি সকল জগতের প্রতিপালক প্রভু আল্লার হুজুরে আত্মসমর্পন করিতে।

(আমাদিগকে আরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে) ;—"তোমরা নামাজকে যথাযথভাবে কায়েম রাখিবে, আর তাঁহার সম্বন্ধে সমীহ করিয়া চলিবে ; সেই (প্রভু) তিনি, যাঁহার পানে সমবেত করা হইবে তোমাদের সকলকে।

"এবং তিনিই সেই (প্রভু), যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন সুসঙ্গতভাবে ; যখন বলেন—হউক, অমনি হইয়া যায় ; পরম সত্য তাঁহার বাণী ; সুরে ফুৎকার করা হইবে যেদিন, সেদিনকার বাদশাহাৎ হইবে একমাত্র তাঁহারই ; (মানুষের) সব দৃষ্ট ও অদৃষ্টের পরিজ্ঞাতা তিনি এবং তিনি হইতেছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

"আরও (স্মরণ কর) সেই সময়ের কথা, ইবরাহীম যখন তাহার পিতা আজরকে বলিয়াছিল—তুমি কি কতকগুলি মূর্তিকে খোদা বানাইয়া লইতেছ? আমি তো দেখিতেছি, তুমি ও তোমার স্বজাতীয়রা নিশ্চয় একটা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে (পড়িয়া) রহিয়াছে।

"এবং এইরূপে আমরা ইবরাহীমকে প্রদর্শন করি আসমান ও জমীনের সার্বভৌম আধিপত্যের (নিদর্শন-গুলিকে) যেমতে সে প্রত্যয়শীলদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

"অতঃপর রজনীর অন্ধকার যখন আচ্ছন্ন করিল তাহাকে, তখন সে একটী নক্ষত্রকে দেখিয়া বলিল—এই কি আমার ঈশ্বর? কিন্তু (নক্ষত্রটী) অস্তমিত হইয়া গেল যখন, সে তখন বলিল—নিশ্চয় অস্তগামীদিগকে আমি ভালবাসি না।

"তাহার পর যখন চন্দ্রকে দেখিল সমুজ্জলরূপে, সে বলিল—এই কি আমার ঈশ্বর? কিন্তু (চন্দ্র) অস্তমিত হইয়া গেল যখন, তখন সে বলিল:—আমার প্রভু যদি স্বয়ং আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তো আমি বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

"অতঃপর সূর্যকে যখন দেখিল জাজ্জল্যমানরূপে, সে বলিয়া উঠিল—ইহাই কি আমার ঈশ্বর? ইহা বৃহত্তম। কিন্তু এই সূর্য্যও যখন অস্তমিত হইয়া গেল, তখন ইবরাহীম বলিল, হে আমার স্বজাতি! তোমাদের এই সব মোশ-রেকী ভাবধারার সহিত আমার বিন্দুমাত্রও সংশ্রব নাই।

—"আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিলাম কৈবল্য সহকারে তাঁহার হুজুরে—সমগ্র গগনমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছেন যিনি, এবং আমি মোশরেকদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।

"আর, তাহার স্বজাতীরা (ইহা লইয়া) ইবরাহীমের সঙ্গে বিসম্বাদ আরম্ভ করিয়া দিল এবং তাহাতে ইবরাহীম বলিল—তোমরা আমার সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়াছ—আল্লাহ সম্বন্ধে? অথচ আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন সেই আল্লা-ই; আর (সকলে শ্রবণ কর!) যে সকল পুতুল প্রতিমার পূজা তোমরা করিয়া থাক,—সেগুলিকে আমি কিছুমাত্রও ভয় করি না, আমার প্রভুর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। আমার প্রভুর জ্ঞান প্রত্যেক বিষয়কে জ্ঞাপন করিয়া আছে; তবুও কি তোমরা বিচার করিয়া দেখিবে না?

"আর তোমাদের পূজ্য (পদার্থ) গুলিকে আমি ভয় করিতে যাইব কোন্ যুক্তি অনুসারে? অথচ তোমরাই অন্যকে আল্লার শরীক ঠাওরাইতেছ—ইহার জন্য আল্লাহ্ কোনো অধিকারই তোমাদিগকে প্রদান করেন নাই, অথচ একটুও ভয় করিতেছ না তোমরা! অতএব তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও, তাহা হইলে বিচার করিয়া বল—দুই দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিকারী হইবে কাহারা? যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে কোনো মহাপাতকের দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তার অধিকারী তাহারাই এবং তাহারাই হইতেছে সত্য পথের অভিযাত্রী।"—(সুরা আন্আম—২য় খণ্ড)

আমি এখানে মাত্র কয়েকটি সুরার কিছুটা অনুবাদ উদ্ধৃত করলাম। এতে পাঠকগণ আরও লক্ষ্য করতে পারবেন যে, মওলানা সাহেব সততার সাথে যেমন অনুবাদ করেছেন, তেমনি তার অনুবাদের বাংলায় মূলের ভাবগাম্ভীর্য্য ও রচনা ঝঙ্কারকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি মূলের বিশ্বস্ততা এবং তর্জমার ভাষার স্বাভাবিক লীলা-ধর্মকে কোথাও নষ্ট হতে দেন নি। তাঁর তফসীর এবং টীকার ভাষাও অনবদ্য এবং সুন্দর হয়েছে। সর্বত্রই তিনি যুক্তিশাসিত, সহজ ও সরল ভাষায় টীকা ও তফসীর রচনা করেছেন। বস্তুতঃ টীকা ও তফসীর রচনায় তিনি যে পন্থা গ্রহণ করেছেন, তা' বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট সমাদৃত না হয়ে পারবে না।

এ-পর্যন্ত তাফছীরুল কোরআনের দুই খণ্ড ছাপা হয়েছে। প্রথম খণ্ড সাত শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ড আট শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতেহা, সুরা বাকারা, সুরা আল্ এমরান, সুরা নেসার কতকাংশ রয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সুরা নেসার অবশিষ্ট অংশ, সুরা মায়েদা, সুরা আন্আম, সুরা আরাফ, সুরা আন্ফাল ও সুরা তাওবা।

প্রত্যেকটি সুরার মূল আরবীসহ তাদের বাংলা তর্জমা, কঠিন কঠিন শব্দের টীকা-টিপ্পনী এবং সাধারণভাবে তাদের তফসীর দেওয়া হয়েছে। তফসীরের ভিতর আধুনিক বহু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেও বহু কথার মনোজ্ঞ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তাফছীরুল কোরআনের দুটি খণ্ড বাংলা সাহিত্যের যে তুলনাহীন সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে, তা স্বীকার করতেই হবে। এক কথায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর স্বকীয়ত্ব এবং সাহিত্য সাধনার অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করবে তাফছীরুল কোরআনের এই প্রথম দুটি খণ্ড। জানা যায়, মওলানা সাহেবের তাফছীরুল কোরআন পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আমরা অতি আগ্রহের সহিত তাঁর অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ উপযুক্ত সময়েই কোরানের তর্জমা ও তফসীর রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁর পরিণত প্রবীণত্বের সুযোগের কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া কাজের বিচিত্র ধারার সর্বতোমুখী টানে ছিন্নভিন্ন হওয়ার অবসরও আজ দেশে কম। রাজনীতির কল-কোলাহলের পথ বহু আগেই তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। আজ রাজনীতি দেশ থেকে বিদায় নেওয়ায় তার নেপথ্য আক্রমণের উৎপাতও তাঁর সাধনার পথ হতে অন্তর্হিত হয়েছে। সুতরাং কোরানের তর্জমা ও তফসীর রচনার কাজের উপযুক্ত বয়স ও সুযোগ তিনি পরিপূর্ণভাবেই আজ লাভ করেছেন। আমরা যতদূর জানি, নিজের প্রতিভাকে খণ্ড খণ্ড করে অপচয় করার ক্ষতিকর সর্বপ্রকার পথ তিনি এখন বর্জন করে চলার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ। পাক-বাংলার সাহিত্যের স্বার্থেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে আমরা আমাদের সাহিত্যের একটা দুর্ভাগ্যের কথা একটু উল্লেখ

করতে চাই। আমাদের দেশের বহু প্রতিভার দুর্গতি ও অপমৃত্যু দেখে আমরা পীড়িত হয়েছি। তাঁরা নিজেদের ভূমিকা নির্বাচনে ভুল করেই দেশ ও জাতির পরোক্ষভাবে বিপুল ক্ষতি করেছেন। যিনি যে কাজের কাজী নন, তিনি সে কাজ করতে গিয়েই এই অনর্থ ঘটিয়েছেন। রাজনীতি যাঁর পেশা, তিনি কবিতা লেখার জন্য কলম ধরেছেন এবং কবি হওয়াই যাঁর কাজ তিনি হতে চাচ্ছেন রাজনীতিক। কেউ অসিকে করেছেন মসি এবং কেউ বাঁশীকে করেছেন বাঁশ। আরো সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি, ভাষাতাত্ত্বিক কবিতা লিখছেন এবং কবি পদার্থ বিজ্ঞানের দার্শনিক দিক নিয়ে প্রবন্ধ ফেঁদে বসেছেন। সর্বতোমুখী প্রতিভার হাতে অল্প-বিস্তর হয়ত সব কিছুই সম্ভব। কিন্তু এ-ধরণের সর্বতোমুখী প্রতিভা সারা দুনিয়াতেও খুব বেশী আসেন নি। সুতরাং রচনার সঠিক বিষয় ও ভূমিকা নির্দ্ধারণের উপর সাহিত্যিক সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। এখানে ভুল করলে ক্ষয়-ক্ষতির মাশুল দিতে হয় অনেক। তাই কোরানের তর্জমা ও তফসীর রচনায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মধ্যে আজ যে অখণ্ড মনোযোগ ও তন্ময়তা দেখছি, তার নিরাপদ অগ্রগতি ও সম্পূর্ণ কামিয়াবি কামনা করি।

সোনার হরিণ

বন্দে আলী মিয়া

বনের হরিণ পথ ভুলে কি
এলে আমার আঙ্গিনায়!
নীল চোখে তার শ্যামল স্বপন
ক্ষণে ক্ষণে মন ভুলায়।
ফুলের দেশের ঝরণা ধারা
কণ্ঠে তাহার জাগায় সুর
তার পরশে ধন্য জীবন
গৃহ আমার স্বর্গ পুর।
দিগন্তরের কাজল মায়া
মোর ভুবনে ফেল্‌লো ছায়া
সেই ছায়াতে জাগ্‌লো কাঁপন
পুলক জড়া পুবান বায়!!

দূরে বিদেশের সোনার হরিণ
ছিলো সে মোর স্বপন সাধ
ছিলো আমার গহণ সুখে
নৃত্য-পাগল দিবস-রাত
ক্ষণিক দিনের সঙ্গী সে মোর
হারিয়ে গেল হঠাৎ হায়

তার লেগে আজ বাদল আকাশ
ভেঙে পড়ে সুর ধারায়।
দীপ নিবেছে গৃহে আমার
খুঁজে তারে পাইনাকো আর
পথ রুখিতে পার্‌লো না তার
আমার মনের প্রীতির বাঁধ॥

জান্‌তে কিগো তোমার তরে
ছিলো মোর কি আয়োজন!
তুমি ছিলে মোর ভুবনে
নিশীথিনীর সুখ স্বপন।
হে পাষাণী, ছিলে তুমি
আমার ভালোবাসায় হায়
ছিলে তুমি রূপ ধরে মোর
কান্নহাসির এই খেলায়।
চলে-ই যদি যাবে তবে
আস্‌লে কেন আমার ভবে!
তোমার চলায় জড়িয়ে গেছে
মোর জীবনের মধুর ক্ষণ।

রাজপুত্র আর রাজকন্যার কাহিনী

নীলু দাস

সাহারার উত্তপ্ত বুকে রক্তরঙের ঝড় তুলে শেষ বেলার লাল সূর্যটা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্ত রেখার মাঝে ডুবে যাচ্ছে। মধ্যদিনের প্রখর রৌদ্রতাপে সাহারার বালুকণায় আগুণ জ্বলে উঠে। একদিকে আগুন, অপর দিকে ঝড়। সারাটা দিন সে অগ্নি-ঝড়ের তাপে জ্বলে-পুড়ে সাদা পাংশু হয়ে উঠে শৃঙ্খলিত মানুষের দেশ আলজেরিয়া। তারপর নেমে আসে সন্ধ্যা। সাহারা আর গোবীর বালুস্রোতে তখন বয়ে যায় হিমেল বাতাসের দাপাদাপি। আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া আর মরক্কোর পাশ ঘেসা গাঁয়ে তখন নেমে আসে শীত আর কুয়াসার ক্ষীণ আভরণ। দিনের তীব্র দাহনের পর এ-দেশের প্রতিটি মানুষ রাতের অন্ধকারে কঠিন শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।

পথ চলতে চলতে স্বপ্ন দেখে সুলেন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পীড়ন ভেঙ্গে দিতে পারেনি এ-দেশের বলিষ্ঠ মানুষের শক্ত মেরুদণ্ড। শিরদাঁড়া সোজা করে শাবল আর গাইতি দিয়ে নির্ম্মমভাবে আঘাত করে এ-দেশের মানুষ সাহারা আর গোবী মরুভূমির কিনার ঘেসা বন্ধ্যা মাটির বুকে। শক্তিবান স্পর্দ্ধিত পুরুষের বর্ব্বর যৌবনের ছোঁয়ায় বন্ধ্যা মাটির গর্ভে দেখা দেয় ফসলের স্বপ্ন। সবুজ রঙে ভরে উঠে কৃষকের ক্ষেত-খামার। হাসির বান ডাকে কুমারী মেয়েদের মুখে আর নিষ্প্রাণ মরু প্রান্তরের বাঁকে বাঁকে।

বাঁক ঘুরতে ঘুরতে সুলেনের চোখমুখ উজ্জ্বল আভায় চক্ চক্ করে উঠে। না না না। এ দেশের মানুষ কোন-মতেই অন্ধকারের বুকে বিসর্জ্জনকে মেনে নিতে পারে না। মনে মনে হেসে উঠে সুলেন। আলজেরিয়ার মানুষ শ্মশানের মাঝে জীবনের স্বপ্ন দেখে। এদের ক্ষয় নেই। অক্ষয় আর নিষ্কলঙ্ক এঁদের জীবন। ফরাসীর সাদা হাতের এঁকে দেওয়া কলঙ্ক-তিলক এদেশের মানুষের কপালে আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবেনা। না না না, কিছুতেই পারবেনা। চীৎকার করতে ইচ্ছা করে সুলেনের। উত্তপ্ত বালুকণার মধ্য থেকে জেগে উঠছে সংগ্রামী মানুষ। জীবনের বিনিময়ে আনবে জীবন সূর্যকে। এদের সাধনা ব্যর্থ হবার নয়।

চিংসীর সব চেয়ে বড় রাস্তাটায় পড়া মাত্রই সুলেনের চোখের দৃষ্টিটা আরো প্রখর এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। যুবতী নারীর দেহের মত চিংসীর দোকান রেস্তোরাঁয় আর পথের মোড়ে মোড়ে ঝরে পড়ছে বিলোল হাসির ঢল। আলোয় আলোয় স্বপ্নপুরীর মত হয়ে উঠছে রাতের শহরটা।

মাথার টুপিটায় আরো একটু চাপ দিয়ে ওভার-কোটের বড় কলারটা উঁচিয়ে দিয়ে সুলেন ফিরে চায় রাস্তার উপর চলমান মানুষের উপর। মানুষের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা চামড়ার ফরাসী পুলিশ। তারা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা পুলিশ সুলেনের দিকে এগিয়ে আসে। মুহূর্তে নিজেকে তৈরী করে নেয় সুলেন। এগিয়ে আসা একটি মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে টানাটানা সুরে সুলেন বলে উঠে, 'এই যে মিস্...' দৃপ্ত ভঙ্গীতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে। সুলেনের দিকে ভালো করে এক নজর চেয়েই শামীম বলে উঠে, 'সুলেন!'

চোখের চাউনিতে ধমক দিয়ে উঠে সুলেন। চাপা কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'পুলিশ আসছে, খুব সাবধান।'

কালো কোর্ট গায়ে ফরাসী পুলিশটা ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে সুলেন শামীমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠে, 'আহা, রাগ করছেন কেন, একটু বলে দিন না এলনোরের ঘরটা কোন্ দিকে। এলনোর আমাকে খুব ভালোবাসে, আজকে রাতে না গেলে ভয়ানক রাগ করবে।'

গর্জ্জন করে উঠে শামীম—'মরতে পারনা অপদার্থ কোথাকার। লজ্জা করেনা মদ খেয়ে মেয়েদের সাথে কথা বলতে?'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে শামীম পুলিশের দিকে চেয়ে বলে উঠে, 'একে একটু জাহান্নামটা দেখিয়ে দিন ত।'

অগ্নি-দৃষ্টিতে সুলেনের দিকে চেয়ে ঝড়ের বেগে শামীম বড় রাস্তায় মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায়।

পুলিশের কাছে এ-ধরনের কেস্ নতুন নয়। রূপার চাকৃতি দিয়ে যারা নারীর যৌবনকে কিনে নিয়ে দু'হাতে ছিনিমিনি খেলে তারা ঠিক এমনি ভাবেই সেন্ট্ আর মদের মহাসাগরে ডুব দিয়ে রঙচঙে পোষাক পরে টলতে টলতে অভিসারের পথে পা বাড়ায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আজকাল অধিক সংখ্যক পুলিশ সতর্ক পাহারা দেয়। কিন্তু ওরা চোর বদমায়েশ খুঁজে বেড়ায় না, ওরা খুঁজে ফেরে সাধারণ চেহারার অসাধারণ মানুষকে। যারা চোখের পলকে বড় বড় রাস্তা পার হয়ে যায়, যেখানে সেখানে আগুন লাগায়। এমন কি সহজ প্রয়োজনে যারা নির্ব্বিকার মুখে বেয়নেটের তলায় নিজেদের কোমল বুক বিছিয়ে দেয়।

সুলেনের কাছে গিয়ে পুলিশটা ধমক দিয়ে উঠে—

'এই কোথায় যাবে ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের সাথে কথা বলো কেন ?'

স্থলেন বলে, 'এলনোরের ঘরটা কোথায় একটু বলে দিন না।'

ইতিমধ্যে আরো একজন পুলিশ সেখানে এসে দাঁড়ায়। স্থলেনের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে বলে উঠে, 'এই তোমার টুপিটা নামাওত।'

স্থলেন মাথায় হাত দিতে যায়, কিন্তু তার আগেই প্রথম পুলিশটা বাধা দিয়ে বলে উঠে, 'আরে ধ্যেৎ তোর টুপী, ছেড়ে দে এসব হতভাগাকে। টুপী খুল্লেও এর মাথায় দাগ পাওয়া যাবেনা।—স্থলেন, হাফিজ, শামীম এরা আর যাই হোক, মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়ী যায় না। চল নিজের কাজে যাই।'

একজন পুলিশ আর একজনকে টেনে নিয়ে বড় রাস্তার উপর চলে যায়।

মনে মনে একটু হেসে স্থলেন এগিয়ে যায়। শামীমের অতি বাস্তব অভিনয় আর নিজের ভাগ্যের জোরে আজ বেঁচে গেলো সে।

চলতে চলতে মদের দোকানটার সামনে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায় স্থলেন। তারপর ঢুকে পড়ে অন্ধকার পল্লীটার ভেতর।

এখানে এলে পয়সার বদলে পুরুষ হাতের মুঠোয় ফিরে পায় নারীর নগ্ন অঙ্গ। সুরা-তরঙ্গ আর নারী-দেহের খাঁজের মোহিনী নেশায় পুরুষ ফিরে যায় আদিম যুগের পর্বতগুহায়। নিষ্ঠুরতম সে বর্বরতায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠে এ-জগতের মেয়েরা। আশ্চর্য ! তবুও এদের মৃত্যু-মোহনায় ঝাঁপ দিতে বিন্দুমাত্র অরুচি নেই।

পা টিপে টিপে স্থলেন অন্ধকারে ভরা একটি ঘরের সামনে গিয়ে ডাক দেয়, রুহী, রুহী।

ধীরে ধীরে দোরটা খুলে যায়। ঘরের ভেতর গিয়ে স্থলেন প্রশ্ন করে, নতুন কোন খবর পেলে ?

খবর আছে কিন্তু বলবো না।

রুহী, এসব কি বলছো ?

ঠিকই বলছি, খবরটা দেওয়া মাত্রই তুমি চলে যাবে, কিন্তু কেন বলত ? আমি বেশ্যা, তাই বুঝি ঘৃণা করো ?

ছিঃ রুহী, এসব বলতে নেই। বেশ্যা হলেও তুমি আমাদের কাছে ছোট নও। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে চাই আমরা, এর জন্যে আমরা অনেকেই অনেক কিছু করছি, কিন্তু তুমি যা করছো তার সত্যি দাম নেই। ঠিক সময়ে নির্ভুল সংবাদ পাওয়ার দাম যে কত বেশী, তা সবাই বুঝতে পারে না। আমাকে তুমি ভুল বুঝ না, জান ত আমাদের কত কাজ !

একটুক্ষণ নীরব থেকে রুহী বলে চলে, কাল রাতে বড় একজন অফিসার এসেছিলো, তার কাছ থেকে জেনেছি, দু'একদিনের ভেতরেই গাঁয়ে গাঁয়ে তল্লাসী চলবে। তোমাদের আড্ডা আবিষ্কারের জন্যে ফরাসী সরকার পাগল হয়ে উঠেছে। অন্য খবর এখনও পাইনি, আগামীকাল পুলিশ অফিসার আসবে, হয়ত নতুন কিছু জানতে পারবো।

হঠাৎ কাঁচের জানাটায় টং করে একটা শব্দ হয়।

স্থলেন জানালাটার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, কে যেন ঢিল দিলো।

দোরটা খুলে দিয়ে রুহী বলে উঠে, পুলিশ আসছে, তুমি এক্ষুণি যাও।

পুলিশ আসছে !

হাঁ, যে কোন সময় আজকাল ওরা এসে হামলা বাধায়। প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজে দেখে তোমাদের মত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। মদের দোকানের ছেলেটি ঢিল দিয়ে আগে থেকেই আমাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু আর কথা নয়, এবার যাও, নইলে ধরা পড়বে।

কালো ছায়ার মত নিঃশব্দ রাতের অন্ধকারে স্থলেন নিজেকে মিশিয়ে দেয়। বালুর পাহাড়ের পাশ দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে আপন মনে সে এগিয়ে চলে। রাতের গভীরে ফিরে আসে নিজেদের গোপন আস্তানায়।

ছোট্ট ঘরটিতে তখন আট দশজন যুবক আর যুবতী। সবার মাঝখানে হাফিজ। আলজেরিয়া, মরক্কো আর তিউনিসিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান সেনানী। বলিষ্ঠ যোয়ান পুরুষ। বড় বড় চোখে ভবিষ্যত সম্ভাবনার উজ্জ্বল দ্যুতি। এক নজর মানুষটির দিকে চাইলেই মাথা নত হয়ে আসে। ফরাসী সরকার এর মাথার দাম কয়েক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে।

চোখের ইঙ্গিতে স্থলেনকে কাছে ডেকে হাফিজ জিজ্ঞেস করে, কাজ করে এসেছো ?

ভাঙ্গা একটা চেয়ারে বসে স্থলেন ধীরভাবে জবাব দেয়, সব কিছু রেডি। রাব্বি আর সুঁস্যুতে দীনা এবং মোহাম্মদের কাছে ষ্টেন্ গান, দূর পাল্লার রাইফেল্ হেণ্ডবোম দিয়ে এসেছি।

তোমার ইচ্ছামত দীনা এবং মোহাম্মদ তাদের পার্টি নিয়ে কাজ করবে, এ-আদেশ তুমি পেয়েছো ?

পেয়েছি, যাবার বেলায় শামীম আমাকে বলে দিয়েছিলো।

হুঁ। ওদেরকে অস্ত্র দিয়ে কি আদেশ দিয়ে এসেছো ?

কালকে ওরা ফরাসীদের লাল কেল্লা আক্রমণ করবে, ওখানেই ফরাসীদের অস্ত্র আর রসদ মজুদ আছে।

হাসি মুখে হাফিজ বলে উঠে, আমি জানতুম সব দিক

দিয়ে তৈরী না হয়ে তুমি কোন কাজ করবে না। ঠিক আছে, তুমি আর শামীম আজকে এ-ঘরেই থাকবে।

কিন্তু তোমরা কোথায় চল্লে ?

প্রতিশোধ নিতে।

আশ্চর্য্য হয়ে যায় সুলেন, প্রতিশোধ।

চাপা কণ্ঠে হাফিজ বলে উঠে, হে, প্রতিশোধ! শাহীনের মৃত আত্মার প্রতিশোধ। আমার আদেশেই শাহীন চাটাল-দুর্গ আক্রমণ করেছিলো। বীরের মত সে প্রাণ দিয়েছে।

শাহীন। কলেজের নামকরা ছেলে, লাখপতি রুস্তমের একমাত্র আদরের ছেলে!

নিজের দল নিয়ে হাফিজ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। অল্পক্ষণের জন্য নিঝুম নীরবতা নেমে আসে ছোট্ট ঘাটির মাঝে। সুলেনের চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠে, শাহীন, গিয়াস, সাসেন, রুবাই, জামাল আর তিংসীর উজ্জ্বল মুখের প্রতিচ্ছবি। দেশকে স্বাধীন করবার শপথ নিয়ে এ'রা এসেছিলো হাফিজের কাছে। স্কুল আর কলেজের ছাত্রছাত্রী। ননীর মত কোমল চেহারা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি দুর্জয় শক্তি! অকাতরে ওরা বুকের রক্ত ঢেলে দিলো থাইসি নদীর জলস্রোতে আর পাদপবিহীন সাহারার উত্তপ্ত বালুকণায়; কিন্তু বিন্দুমাত্র ম্লান হতে দেয়নি নিজেদের পৌরুষকে।

হঠাৎ শামীমের দিকে চেয়ে সুলেন বলে উঠে, কিন্তু তুমি এখানে কেন এলে ?

মাথা নত করে শামীম জবাব দেয়, থাকতে পারিনি তাই।

নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারলে না, চলে এলে মৃত্যুঝড়ের মাঝে!

মৃত্যু দিয়ে তুমি আমাকে ভয় দেখাও ?

চঞ্চল হয়ে উঠে সুলেন। হঠাৎ শামীমের কাছে গিয়ে অবাক ভাবে স্থির হয়ে যায় সে। কোমল কণ্ঠে শামীমের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠে, তুমি ভুল করছো শামীম।

তা হলে তুমিও ভুল করেছো।

শামীম! অসহায়ের মত শামীমের রাঙা দুটি হাত ধরে সুলেন বলে, এখানে যারা আসে তারা মরতে ভয় পায় না, আমি জানি অনেকের মত তুমিও একদিন মরবে।

এতে দুঃখ কি, দেশের জন্যে মরতে পারা এ যে সৌভাগ্য!

কিন্তু আমি চাই তুমি বেঁচে থাক। হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল ভাবে সুলেন কম্পিত কণ্ঠে বলে, থাইসির পাড়ে খোলা সবুজ মাঠের মাঝে সব চেয়ে উঁচু বেণ্ট গাছটার নীচে সুন্দরী একটি মেয়ে প্রতিদিন অপেক্ষা করত সুন্দর একটি ছেলের জন্য। এক সময় কলেজ পালিয়ে ছেলেটি আসত, দু'জনের মুখে ফুটে উঠত সুন্দর হাসি। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার জাল ফেলে যেত থাইসির কালো জল আর পিঙ্গল ঘাসের উপর। কিন্তু তবুও ওরা উঠতে পারত না। সুন্দরী মেয়েটা পরম নির্ভরতায় এলিয়ে পড়ত প্রথম বয়সের সেই ছেলেটির বুকের উপর, তারপর স্বপ্নের মত কোমল কণ্ঠে বলে যেত দুনিয়ায় যত পরিবর্ত্তনই হোক না কেন, আমার ভালবাসার কোন পরিবর্ত্তন হবে না—চিরদিন আমি তোমারি থাকবো।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তুমিই আগে ভেঙ্গেছো। অভিমান ঝরে পড়ে শামীমের কণ্ঠ থেকে। ছল ছল করে উঠে ওর দুটি বড় বড় চোখ।

পরাধীন দেশের হীন মানুষ আমরা, জন্ম থেকেই বুকের ভেতর জমা হয়েছিলো ক্ষোভ, সুযোগ পেয়ে সে জেগে উঠেছে, তাকে থামানোর শক্তি আমার নেই শামীম। আমি জানি তোমাদের রক্ত দরকার আছে, সব চেয়ে বড় কথা জন্মভূমি শুধু পুরুষের নয়, মেয়েদেরও। কিন্তু একটি কথা কি জানো, ভালবাসা বড় লোভী, নিষ্ঠুরতা থাকা সত্ত্বেও সে প্রতীক্ষাকে মধুর মনে করে।

স্মিত হাসি মুখে শামীম এগিয়ে আসে সুলেনের কাছে। সুলেনের দৃষ্টি তখন চলে গেছে বালুর সমুদ্রের উপর, যেখানে গলিত চাঁদের আলো সূক্ষ্ম বালুর উপর প্রতি মুহূর্তে মুক্তোর মত হেসে উঠছে।

শামীমের উষ্ণ নিঃশ্বাস লেগে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় সুলেনের। আবেগ ভরে শামীমের কোমল দেহটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে, শামু!

ছিঃ, তুমি এত দুর্ব্বল! ফরাসী সৈন্যরা যার নাম শুনলে আঁতকে উঠে, সেই সুলেন একটা মেয়ের প্রেমকে এতখানি ভয় করে!

ভয় নেই শামু, সে অন্য কিছু, আমি জানি তুমি তা কোনদিন বুঝতে চাইবেনা।

সুলেনের একটা হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে শামীম বলে, আমি সব বুঝি, তুমি ভয় পেওনা লক্ষ্মী। আমি চিরদিন তোমারই থাকবো। যদি মরি তা'হলে তোমারি আদর্শ রক্ষার জন্যে মরবো!

নিঃশব্দে সুলেন নিজের আলিঙ্গনকে ঘন করে নেয়। বোবা হয়ে যায় ওরা দু'জন। নিঃশব্দ রাতের প্রহরের মত নিঝুম মেরে যায় ওদের দেহ, শুধু জেগে থাকে দুটি হৃদয়ের দীর্ঘ অগ্নিনিশ্বাস।

হঠাৎ স্তব্ধ রাতের বুক চিরে পর পর জেগে উঠে কয়েকটি আকাশ ফাটা আওয়াজ। হেণ্ডবোম আর ষ্টেন গানের বিকট শব্দ। মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠে শামীম, হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়, তবে কি—

অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসে প্রখর হয়ে উঠে সুলেনের কণ্ঠ, ভয় নেই শামীম, হাফিজ কোনদিন ভুল করেনা। রূপার মত চক্ চক্ করছে দিগন্ত প্রসারী বালুর সমুদ্র।

হয়ত তাই, হাফিজ হয়ত সত্যি ভুল করেনা। এতদিন সে তর্ক করেছে হাফিজের সাথে, বলেছে এতবড় ফরাসী-শক্তির বিরুদ্ধে ভাঙ্গা চুরা অস্ত্র আর মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে তুমি কি জয়ী হতে পারবে?

অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠত হাফিজ, বলত, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম বর্ব্বর এই ফরাসী সরকার, ভিক্ষে চেয়ে ওদের কাছ থেকে কিছু আনতে পারবেনা। নিজের জিনিস অধিকারের জোরে ছিনিয়ে আনতে হবে। অস্ত্রের বদলে রয়েছে আমাদের বিশ্বাস আর কিছু না পারি মরতে ত পারবো। কাপুরুষের মত হেয় হয়ে বাঁচার চেয়ে বীরের মত মরা অনেক গুণে শ্রেয়।

শামীম বলত, শুধু মরলেই কি স্বাধীনতা আসবে?

হ্যাঁ, আসবে, আমি মরলে আমার রক্ত থেকে জন্ম নেবে আরও দশজন, যারা আমার আর তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। গুলী করতে করতেই ওদের বন্দুক একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে। তোমরা রক্ত দাও, দেখবে, রক্তের পথ বেয়েই একদিন নেমে আসবে আমাদের স্বাধীনতা।

হাফিজের চিড়খাওয়া কণ্ঠের আওয়াজে বিকল হয়ে যেত শামীমের সর্ব্বসত্ত্বা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য এই হাফিজ, মৃত্যুকে সে যেন হাতের মুঠোর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সুলেন বলে ওঠে, রাত বেশী নেই শামু, একটু ঘুমিয়ে নাও, কাল অনেক কাজ।

বিনা প্রতিবাদে টেবিলটার উপর নিজেকে এলিয়ে দেয় শামীম। এ-ভাঙ্গা টেবিল আর চারটা হাতল বিহীন চেয়ার ছাড়া অন্য কিছুই ঘরে নেই।

নিজের এক হাতের উপর মাথাটা কাৎ করে দিয়ে শামীম বলে, তুমিও এসো, আর ত কিছু নেই, আপাততঃ আমার সাথেই একটু ঘুমোও।

কোন কথা না বলে সুলেন শামীমের পাশে শুয়ে পড়ে। পরিশ্রান্ত সুলেনের দেহ, কিন্তু তবুও তার চোখে নেমে আসেনা গাঢ় ঘুমের ঢল। নির্ভয়ে শামীম ঘুমিয়ে পড়েছে। এক ফালি চাঁদের আলো এসে চুপি চুপি ওর রাঙা মুখে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। চমৎকার সুন্দর দেখায় ঘুমন্ত শামীমকে কিন্তু এ-সৌন্দর্য্য একদিন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে মৃত্যুর অগ্নিস্পর্শে। নিষ্ঠুর এই হাফিজ। শামীমের লাবণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে ওর মন বিন্দুমাত্র টলবে না। হঠাৎ একটা নির্ম্মম ছবি সুলেনের চোখের সামনে ভেসে উঠে।

আজ থেকে চার বছর আগে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চিংগী থেকে হাফিজ নিজের গাঁ চারসাতে গিয়ে পৌঁছে। সন্ধ্যা তখন মিলিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে হাসিমুখে হাফিজ বলেছিলো, ফিরে সুলেন, খুব কষ্ট হলো, না?

গম্ভীর মুখেই সুলেন বলেছিলো, তিরিশ মাইল রাস্তা হেঁটে এলুম, এর পরও কি কষ্ট হবে না?

হাসি মুখেই হাফিজ জবাব দিয়েছিলো, না, এর পরেও কষ্ট হবেনা, কারণ আজ রাতেই আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে।

নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলো সুলেন। মরুভূমির তপ্ত বালুর ছোঁয়ায় তার পা তখন বিক্ষত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক প্রহর রাতে সে দেখেছিলো চরম নিষ্ঠুরতা।

হাফিজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হাসিনা। চাঁদের আলোঝরা নিঝুম রাত। ছোট্ট একটি ঘরে স্বামী আর স্ত্রী। পদ্মফুলের মত স্নিগ্ধ শ্রী উছলে পড়ছে হাসিনার সর্ব্ব দেহ থেকে।

মেয়ে মানুষ যে এত সুন্দরী হতে পারে, সুলেন এটা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

হাসিনার সেই অতল কালো চোখ থেকে তখন ঝরে পড়েছিলো ব্যথার শ্বেত অশ্রু। কান্নাঝরা কণ্ঠে হাসিনা বলেছিলো, আজকের রাতটুকু তুমি থেকে যাও। আবার কবে আসবে কে জানে! বিয়ের পর কি একদিনও নিজের স্ত্রীকে কিছু দিতে নেই?

সহজ কণ্ঠে হাফিজ বলেছিলো, আমার সব কিছু অন্য জায়গায় দেওয়া হয়ে গেছে আর কিছুই বাকী নেই, তোমাকে কি দেবো বল?

হাসিনা বলেছিলো, আমি কি নিয়ে থাকবো তা-হলে?

আলজেরিয়া, মরক্কো আর তিউনেসিয়ার সমস্ত মানুষ ব্যথা আর বেদনা নিয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে, তুমিও—

বাধা দিয়ে হাসিনা বলেছিলো, কিন্তু তাদের স্বামী আছে, স্বামীর ভালবাসা আছে, সন্তান আছে। আমার কি আছে? সন্তান থেকে আমাকে কোন্ অধিকারে তুমি বঞ্চিত করেছো?

যে দেশের সন্তান জন্মের পরই ক্ষুব্ধ পরাধীন মাটি স্পর্শ করবে, সে দেশে সন্তানের জন্ম দেওয়া মস্ত বড় পাপ হাসিনা।

চোখে জল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ হাসিনার কণ্ঠটা কঠিন হয়ে উঠেছিলো, বলেছিলো, স্ত্রীকে ক্ষুধিত রেখে, তিল তিল করে কষ্ট দেওয়া, মায়ের বুক থেকে সন্তানের স্বপ্নকে মুছে দেওয়া, এই সবই তোমার কাছে মহৎ পুণ্যের কাজ, তাই না? তুমি নিষ্ঠুর!

হঠাৎ আবার শান্ত হয়ে এসেছিলো হাসিনার কণ্ঠস্বর।

পদ্ম ফুলের পাপ্ড়ীতে পাপড়ীতে জমে উঠেছিলো স্নিগ্ধ শিশির বিন্দু। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হাফিজের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে হাসিনা বলেছিলো, ওগো, আজকের রাতটুকু তুমি আমার কাছে থাকো, অন্ততঃ একটা রাতের স্মৃতি নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও।

নির্মম নিষ্ঠুরতায় হাফিজ বলেছিলো, না, রাতের শয্যায় ঘুমুবার সময় আমার নেই।

তারপরই ঘর থেকে চলে এসেছিলো হাফিজ।

সেই কাল রাত্রির পর থেকে তিলে তিলে পলে পলে একে একে গড়িয়ে গেছে সুদীর্ঘ চারটি বছর। হাসিনা-ভাবী আজও বন্ধ্যা। আজও ওর পদ্মপলাশ লোচন থেকে ঝরে পড়ছে ঠিক তেমনি শিশির অশ্রু। যেমনটি সুলেন দেখেছিলো চার বছর আগে গভীর কালো রাত্রে।

পাশ ফিরে সুলেন শামীমের সুন্দর মুখের দিকে চায়। আশ্চর্য্য মমতায় নুয়ে পড়ে সুলেনের মন। সত্যি, শত চেষ্টা করলেও সে হাফিজ হতে পারবেনা।

পরম নির্ভাবনায় শামীমের দেহকে বেষ্টন করে সুলেন এক সময় চোখ বুঁজে।

সূর্য ওঠার সাথে সাথেই সুলেনের ঘুম ভেঙ্গে যায় শামীমের ডাকাডাকিতে।

চোখ খুলতেই শামীম বলে উঠে, ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর মত যে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছ, ওদিকে কি হচ্ছে খেয়াল আছে কিছু?

একটু হেসে রসিকতা করে সুলেন বলে উঠে, স্বামী ঘুমিয়েছে, এখন ত সব কিছু সামলাবার পালা গিন্নীর।

কৌতুক নেচে উঠে শামীমের চোখে, বটে। বিয়ে না করেই স্বামী সাজবার লোভ!

কি যেন একটা জবাব দিতে চেয়েছিলা সুলেন; কিন্তু তার আগেই হাফিজ এসে ঘরে প্রবেশ করে।

গত রাত্রে যুদ্ধের কোন চিহ্ন নেই তার দেহে বা মনে। একেবারে সহজ, সরল মানুষ।

উভয়ের দিকে চেয়েই হাফিজ আদেশ দিলো, দশ মিনিটের ভেতর তোমরা দু'জন চাটাল চলে যাও। চাটাল গাঁয়ে ফরাসী সৈন্যরা কৃষকদের উপর হয়ত অত্যাচার করবে।

আর কোন কথা না বলেই হাফিজ ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

মুখটা কোনরকমে ধুয়েই সুলেন শার্টটা গায়ে দিয়ে শামীমের সাথে বের হয়ে যায়।

সরাসরি খেজুর গাছ আর মরুদ্যানের পাশে পাশে সবুজ লের ক্ষেত, এই নিয়ে চাটাল গাঁ।

আয়তনে ছোট কিন্তু লোক সংখ্যা বেশী। বাড়ীতে বাড়ীতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ষ্টেন গান, রাইফেল, হাণ্ড-বোম, না হয় গুলী কিংবা বারুদ।

ফরাসী সরকারের টনক নড়ে গেছে। চাটাল দুর্গ দখল করে মুক্তি সেনারা সমস্ত অস্ত্র লুটে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা নতুন অভিযান করতে পারে। সেই জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য ফরাসী সরকার নতুন অস্ত্রসহ আরো বেশী সৈন্য পাঠিয়েছে চাটাল গাঁয়।

ফরাসী সৈন্যের দখলেই গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। বর্ব্বর এ-সৈন্যদের অত্যাচার সহ করবার শক্তি উপবাস ক্লিষ্ট ভীরু গ্রামবাসীদের নেই। তাই ওরা সেপাই দেখলেই পালায়। বাড়ী ঘর ছেড়ে, ছেলেমেয়ে সহ ওরা পালাতে চায়।

সামনের একটা বাড়ীতে গিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় সুলেন আর শামীম। সারা বাড়ীতে একটিও লোক নেই, অথচ বীর পুরুষ সেপাইরা খালি ঘর থেকে চাষীর জমানো ফসল কাপড়-চোপড় সব কিছুকে বাইরে এনে দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।

একটা সৈন্যের দিকে চেয়ে সুলেন বলল, এদের কাপড়-চোপড় আর ফসলের মাঝে আগুন লাগাচ্ছ কেন?

আমাদের ইচ্ছে, কিন্তু তুমি কে?

সুলেন বলল, আমি কলেজের ছাত্র।

হঠাৎ একটা সৈন্য ঘর থেকে চীৎকার করে উঠে, পেয়েছি পেয়েছি।

সুলেন এবং শামীম উভয়েই পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আশ্চর্য্য সাফল্য বলতে হবে।

দশ মাসের পোয়াতী একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে না পেরে দোরের আড়ালে পালিয়েছিলো।

গোলা-বারুদ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সৈন্যটি মেয়েটিকে দেখতে পায়।

গলা ছেড়ে মেয়েটা চীৎকার করছে, দোহাই বাবা, আমাকে মেরোনা, তোমাদের পায়ে পড়ি।

চুল ধরে টানতে টানতে মেয়েটাকে উঠোনের মাঝে এনে সৈন্যটা ধমক দিয়ে উঠে, বল, বাড়ীর লোকেরা কোথায় লুকিয়েছে?

জানিনা বাবা, আমি কিছু জানিনা। আমাকে—

এই চুপ, হারামজাদী। বল, কোন্ জায়গায় গোলা-বারুদ লুকিয়ে রেখেছে?

আগের মতই কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি জবাব দেয়, দেখিনি হুজুর। আমার অসুখ, সারাদিন আমি বিছানায় পড়ে থাকি।

বটে, সোজা কথায় ঘি উঠবেনা দেখছি। পশুর মত ধমক দিয়ে উঠে, এই বলবিনে, কোথায় বারুদ আর বন্দুক রেখেছে?

আমি জানিনে হুজুর।

জানিসনে, না? এখনো বল।

হুজুর—

বীর দর্পে এগিয়ে যেতে চায় সৈন্যটি, কিন্তু চিরদিনের জন্য তার চলার বেগকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য হঠাৎ গর্জ্জন করে উঠে শামীমের হাতের রিভলবার। বুক ফাটা একটা চীৎকার করে মুখ থুবড়ে শক্ত মাটির উপর পড়ে যায় ফরাসীর একটা পালিত কুকুর।

চোখের পলকে অন্য-তিনটি সৈন্য বন্দুক ধরে ট্রেগার টিপতে যায়; কিন্তু তার আগেই সেপাই তিনটির পেছন থেকে ভেসে আসে সুলেনের কণ্ঠস্বর, বন্ধুগণ আর একটু নড়েছো কি মরেছো।

সুলেনের দুহাতে পিস্তল। প্রত্যেকটিতে বারটি করে গুলি ভরা।

মুহূর্ত্তের জন্য থেমে পড়ে ফরাসী সরকারের পদলেহী বীরপুঙ্গব তিনটি সেপাই।

গর্জ্জন করে উঠে সুলেন, হাত থেকে বন্দুক ফেলে দাও তারপর সোজা গ্রাম ছেড়ে চলে যাও।

চীৎকার করে উঠে শামীম, ওদেরকে গুলি কর সুলেন, এরা পশু।

হেসে উঠে সুলেন, না শামীম, মশা মেরে পৌরুষত্বকে ক্ষুণ্ণ করবো না, এদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো।

কলের পুতুলের মত সেপাই তিনটি নিজেদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে পেছন দিকে চলতে থাকে।

শামীম অনেকক্ষণ পর ভূলুণ্ঠিত মেয়েটির কাছ থেকে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ সুলেনের দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে শামীম।

সান্ত্বনা দিয়ে সুলেন বলে, কাঁদতে নেই শামীম। প্রতিজ্ঞা করো যারা আমাদের মায়ের উপর, বোনের উপর জঘন্য অত্যাচার করেছে, আমাদের কাছ থেকে ওরা যেন কোনদিন ক্ষমা না পায়।

নির্ব্বাক, একেবারে পাথর হয়ে শামীম ফিরে আসে। আজ অত্যন্ত রূঢ় ভাবে তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কিসের নেশায়—কোন্ দুঃখে সুলেন তার প্রেমকে দূরে সরিয়ে রেখে নেমে এসেছে মৃত্যুর মোহনায়।

ক্ষুব্ধ মনে ঘরে ঢুকে হঠাৎ হাফিজের গর্জ্জনে চমকে উঠে সুলেন আর শামীম।

হাফিজ চীৎকার করে বলে উঠলো, শামীম একদিন আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, দরকার পড়লে যে কোন মুহূর্তে তুমি জীবন দিতে পারবে, মনে আছে?

একটা হাসির ঝিলিক খেলে যায় শামীমের পাতলা ঠোঁটে। সুলেন দেখতে পায় বিদ্যুৎ। শামীমের মুখে এটা হাসি নয়, এ-ঠিক অন্ধকার আকাশের বুকে মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ রেখা।

হাফিজ আবার চীৎকার করে উঠে, সুলেন!

বুক উঁচিয়ে সুলেন হাফিজের কাছে এগিয়ে যায়। শক্ত হাতে হাফিজের একটা হাত ধরে বলে উঠে, প্রতিজ্ঞার কথা আমার মনে আছে, কিন্তু আমি মরতে চাইনে, মারতে চাই।

গর্জ্জে উঠে হাফিজ, আমিও তাই চাই। জান ওরা কত বড় জঘন্য পশু? রাত্রিতে আজ সকাল থেকে ওরা বিনা অন্যায়ে গাঁয়ের উপর বোমা ফেলেছে। একবার দুবার নয় ক্রমান্বয়ে সারাটা দিন গাঁয়ের উপর বোমা ফেলে বাস্তির ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়েছে, বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী পুরুষ সবাইকে কুকুরের মত খুন করেছে। আমি এর প্রতিকার চাই। আজকে রাতের মাঝে ফরাসীদের সব চেয়ে বড় দুর্গ—ষ্টর্মকে ধ্বংস করতে হবে। শামীম, গভীর রাত্রে পালিয়ে পালিয়ে তোমাকে যেতে হবে ষ্টর্মের ভেতর। ষ্টর্ম-দুর্গের ডান দিকে খাল কাটা আছে, ওখানে আমাদের লোক দড়ি ঝুলিয়ে রাখবে। দড়ি বেয়ে উপরে উঠে দু'তলায় তিন নম্বর ঘরে গিয়ে দোরের উপর সাদা চক দিয়ে একটি ক্রস চিহ্ন এঁকে সোজা চলে আসবে এখানে। মনে রেখো ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য্য।

সুলেনের দিকে চেয়ে হাফিজ আবার বলে, দু'তলার তিন নম্বর ঘরে যে সেপাই আছে সে আমাদেরকে সাহায্য করবে। ফরাসী হয়েও সে আমাদের ব্যথা বুঝতে পেরেছে। শামীম চলে আসার পরই তুমি তোমার লোক নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবে, ভেতর-থেকে বারুদ-ঘরে আগুন লাগাবে আমাদের ফরাসী বন্ধু।

শামীম বলল, যদি ধরা পড়ি তা হলে কি করে খবর দেবো?

খবর দিতে হবে না। রাত্র চারটা পর্য্যন্ত সুলেন অপেক্ষা করবে, তারপরও যদি তুমি না আস তা হলে বুঝতে হবে তুমি ধরা পড়েছো। তুমি ধরা পড়লে আজ আর দুর্গ আক্রমণ করা যাবে না, করলে, অনেক ক্ষতি হবে।

একটুক্ষণ নীরব থেকে হাফিজ আবার বলল, সন্ধ্যার পর শামীম চলে যাবে ষ্টর্মের দিকে, আর তুমি রাত্র বারটার পর থেকে ষ্টর্মের কাছে যে বালুর পাহাড় আছে তার পেছনে লুকিয়ে থাকবে।

আদেশ দিয়েই হাফিজ ঘর ছেড়ে চলে যায়।

শামীম আর সুলেনের মাঝখানে নেমে আসে নিঝুম নীরবতা। অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রাখে শামীম। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় বুঝিবা হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে

উঠে থাইসি নদীর নীল জল, আর নদীপারের বিস্তৃত জমির সবুজ মায়া আর ফসলের স্বপ্ন।

নীরবতা ভঙ্গ করে সুলেনই প্রথম কথা বলে, আমি এখনি বার হয়ে যাবো শামীম। চিংসীতে গিয়ে কুহীর সাথে দেখা করতে হবে। ষ্টর্মের মাঝে "ষ্টর্ম" তোলবার জন্য আমি ষ্টর্মের কাছেই লুকিয়ে থাকবো। যাবার আগে তোমার সফলতা কামনা করে গেলুম।

একটি কথাও না বলে নিশ্চুপ হয়ে থাকে শামীম। পরীক্ষার আগেই নিজেকে তৈরী করে নেয় সে। আত্ম-ভোলা দৃষ্টি দিয়ে শামীম চেয়ে থাকে মরুভূমির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সুলেনের দীর্ঘ দেহের দিকে। ক্রমে ক্রমে দূর দিগন্ত রেখার কাছে গিয়ে বালির পাহাড়ের নীচে ডুবে যায় সুলেন। কিন্তু শামীমের দৃষ্টি সে দিক থেকে ফিরে আসে না। দুপুর গড়িয়ে নেমে আসে সন্ধ্যা, তারপর রাত। মরুভূমির কনকনে শীতের মাঝে এক সময় নেমে পড়ে শামীম।

ষ্টর্মের কাছে গিয়েই শামীম দেখতে পায় চওড়া খালটিকে। খালের দু'পাশে শক্ত তারের বেড়া। নিঃশব্দে জলের মাঝে ডুব দেয় শামীম। খালের পাশ ঘেসেই দুর্গের চার দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ফরাসী সৈন্য।

খালটা পার হয়ে শুয়ে শুয়ে শামীম তারের বেড়াটার ওপাশে যায়। পেছন ফিরে ফরাসী প্রহরী সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া মাত্রই শামীম চোখের পলকে খেজুর গাছটার নীচে গিয়ে আত্মগোপন করে দাঁড়ায়। ক্ষীণ অন্ধকারের মাঝে শামীম দেখতে পায় ঝুলান দড়িটা। চোখের পলকে দড়িতে হাত দিয়ে একটা ঝুকি দিয়ে শামীম তরতর করে উপরে উঠে যায়। তিনতলার কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শামীম একবার চারদিকে দেখে নেয়। দড়িটা ছেড়ে দিয়ে কঠিন সিমেন্টের উপর শুয়ে পড়ে শামীম। উঠে দাঁড়ালেই প্রহরীদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুয়ে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে সে।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাসির রোল ভেসে উঠে। চমকে উঠে পেছন ফেরে চেয়েই শামীম স্থানুর মত নির্জীব হয়ে যায়। উদ্যত পিস্তল হাতে একজন ফরাসী মেজর তার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। শামীম নিজের হাতটা নাড়তে চায় কিন্তু বাধা দেয় ফরাসী মেজর। টেনে টেনে সে বলে উঠে, ওটি করো না সুন্দরী, তোমরা ধরা পড়লে যে মরে এবং মেরে বাঁচতে চাও তা আমার জানা আছে, ওসব চেষ্টা করো না। দাও, লক্ষ্মী মেয়ের মত এবার হাতের পিস্তলটি ফেলে দাও ত।

পিস্তল ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে সরে দাঁড়ায় শামীম।

নতুন আদেশ আসে, যাও আমার আগে আগে এগিয়ে যাও। হ্যাঁ, এই রুমটিতে ঢুকো। ঘরের ভিতর গিয়ে দোর বন্ধ করে দেয় ফরাসী মেজর। অদ্ভুত ভাবে খানিক্ষণ শামীমের দিকে চেয়ে থেকে অফিসারটি বলে উঠে, মৃত্যুর ভয় দেখালেও তুমি কোন গোপন কথা বলবে না তা আমি জানি। তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

রসালো দৃষ্টি দিয়ে শামীমের দিকে চেয়ে টেনে টেনে হেসে উঠে অফিসারটি।

হঠাৎ কঠিন দু'বাহু দিয়ে শক্তিবান অফিসারটি শামীমকে জড়িয়ে ধরে, তোমাকে শাস্তি দেবো না—প্রেম আর ভালোবাসা দেবো।

নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে বিকল হয়ে উঠে শামীমের সর্ব্বশরীর। অসুরের বল নিয়ে জেগে উঠে আদিম মানুষ। উজ্জ্বল আলোকের মাঝে বিবস্ত্র হয়ে উঠে বিশ্বের লজ্জানম্র নারী। উৎকণ্ঠায় চীৎকার করে উঠে শামীম।

বনমানুষের মত উৎকট হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে ফরাসী মেজর। পাথরের মত কঠিন চাপে বিবশ হয়ে উঠে শামীমের দেহ।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়ায় অফিসারটি, বিবস্ত্র শামীমের দিকে চেয়ে কুটিল চোখে হেসে উঠে সে। দেওয়ালের গায়ে একটি বোতাম টিপে দেওয়ার সাথে সাথে চার পাঁচজন সৈন্য এসে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়।

মেজর বলে, আজ খুব শীত পড়েছে, না?

প্রশ্নের ধরণ বুঝতে না পেরে সবাই তটস্থ হয়ে চুপ মেরে যায়।

ধমক দিয়ে উঠে মেজর, শুয়র কা বাচ্চা, কথা বলিস না কেন?

ভয়ে ভয়ে সৈন্যরা জবাব দেয়, ইয়েস্ স্যার, খুব শীত পড়েছে।

হঠাৎ শামীমকে দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠে মেজর, তোদের শীতের ওষুধ। নিয়ে যা ওকে, সারা রাত আজ ওকে প্রতি ঘরে ঘরে চালান করবি। শুধু যেন না মরে সে দিকে লক্ষ্য রাখবি।

মুহূর্তে চার পাঁচজন বিবস্ত্র শামীমকে ধরে নিয়ে যায়। এই পৈশাচিক শাস্তির বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠে শামীম। মেজর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

একে একে গড়িয়ে চলে রাতের প্রহর।

রাত প্রভাত হওয়ার আগেই এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে শামীম। জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথেই শামীম দেখতে পায়, সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গায় সে বন্দিনী। দুর্ব্বল হাতে চক্‌চকে লৌহ-বলয়।

দুপুর বেলায় একজন ফরাসী পুলিস কিছু খাবার নিয়ে এসে শামীমের দিকে ফিরে চায়। জঘন্য অত্যাচারের প্রতি আঁচড় এত স্পষ্টভাবে শামীমের দেহে প্রতিফলিত হয়েছিলো যে কোন অন্ধের চোখেও তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না।

লজ্জায় নত হয়ে শামীম নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

একটু কাছে এসে বৃদ্ধ পুলিশ অনুরোধ করে, কিছু না খেলে এদের অত্যাচার সইতে পারবে না মা।

আশ্চর্য্য! বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যায় শামীম। ফরাসী পুলিশ অথচ এতখানি সরল আর স্নিগ্ধ! শামীমের মনে হয় এও এদের ছলনা। যে জাত মায়ের সন্মান রাখতে জানে না, সে জাতকে বিশ্বাস নেই।

একটু কঠিন কণ্ঠেই শামীম জবাব দেয়, ফরাসী পশুদের চরম অত্যাচার সইতে পেরেছি, নতুন কিছুর জন্য এখন আর ভাবতে হবে না।

একটু কাছে এসে বৃদ্ধটি বলে, ভুল বুঝ না শামীম। ফরাসী মাত্রেই তোমাদেরকে অশ্রদ্ধা করে না। আমার মত এমন অনেক আছে, যারা তোমাদের সংগ্রামকে সমর্থন করে। ফরাসী জনসাধারণ আর ফরাসী সরকার এ-দু'য়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। তোমাদেরকে অত্যাচার করেও ফরাসী সরকার শান্তি পাচ্ছে না। দিন দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছে, সাথে সাথে তোমরাও তত নির্ভীক হচ্ছো। আসলে ফরাসী সরকার ভয় পেয়ে গেছে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পুলিশটির দিকে চেয়ে থেকে শামীম নীরবে প্রশ্ন করে।

পুলিশটি বলে যায়, আরো একজন ভাল কর্ম্মী ধরা পড়েছে। সুলেনের নাম জানো?

চমকে উঠে শামীম। সব কিছু ভুলে শামীম প্রশ্ন করে বসে, সুলেন ধরা পড়েছে?

হাঁ মা, এসব বলবার জন্যই আমি ইচ্ছে করে তোমার রুমে ডিউটি নিয়েছি। তোমাদের রুমে কেউ ডিউটি নিতে চায় না, কি জানি কোন সময় তোমরা পালিয়ে যাও। সে ভয় আমার নেই। তুমি যেদিন ধরা পড়ে যাও সেদিনই ভোর ভোর সময় সুলেন দুর্গ আক্রমণ করে। অমিতবিক্রমে সুলেন দুর্গ আক্রমণ করছিলো; কিন্তু আগের ব্যবস্থা মত ভেতর থেকে সাহায্য না পাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সুলেন পরাজয় বরণ করে। কিন্তু দুর্গ ধ্বংস হয় সেদিনই। সুলেন ধরা পড়ার সাথে সাথেই বিরাট শক্তি নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করছিলো হাফিজ। হাফিজের বিক্রমের কাছে ফরাসী-শিক্ষা আর রণকৌশল জলের মত ভেসে যায়। শেষ পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকজন সৈন্য আর দু'জন মেজর পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। হাফিজ অগ্নি-পুরুষ, ওঁকে পরাজিত করবার মত শক্তি ফরাসী সরকারের নেই।

নির্ম্মল হাসিতে ভরে উঠে শামীমের পাণ্ডুর মুখ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ পুলিশ আবার বলে চলে, তোমার আর সুলেনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। একমাস পর তোমাদের ফাঁসি হবে।

কিন্তু আচম্বিতে একদিন ফরাসী সরকারের টনক নড়ে উঠলো। পাকিস্তান, ভারত, সিংহল, মালয়, চীন, বর্ম্মা, মিশর, তুর্কী—এক কথায় সমস্ত প্রাচ্য জগত প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো এই নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। পশুর মনেও ফিরে আসে বোধ। তকমা আঁটা ফরাসী কর্ত্তারা বুঝতে পারে প্রাচ্যকে অবহেলা করলে তাদের পতন ঘটবে দ্রুতগতিতে।

মৃত চাঁদের আলোয় হেসে উঠে সমস্ত পৃথিবী। সুখবর বৈ কি! শামীম শুনতে পায়, তার মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হয়েছে, কিন্তু সুলেনের ফাঁসি হবে।

বৃদ্ধ পুলিশ শামীমের কাছে এসে চাপা কণ্ঠে বলে: শামীম, ওরা ভয় পেয়েছে। তোমাদের দেশের মুক্তির দিন এগিয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে শামীম প্রশ্ন করে, সুলেনের কবে ফাঁসি হবে?

কাল ভোরে। আজকেই তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে সুলেনের কাছে, মৃত্যুর আগে সুলেন তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

পাষাণের বুক বেয়ে নেমে আসে স্বচ্ছ ফটিক জলের ধারা। কান্নার আবেগে বোবা হয়ে যায় শামীমের কণ্ঠ।

নিজের দুঃখিনী মেয়ের মত শামীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ পুলিশ বলে ওঠে, দুঃখ করিসনে মা। আমার নিজের একটি মেয়ে আছে ঠিক তোর মত চাপা, দুঃখ পেলেই ওর বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করে উঠে। মেয়েরা বাপের সামনে কাঁদবে, এ আমি সইতে পারিনে মা।

স্নেহের ছোঁয়ায় শামীম সব কিছু ভুলে যায়। মনের দুরন্ত আবেগে হঠাৎ বৃদ্ধের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে শামীম।

সান্ত্বনার ছলে ধরা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বৃদ্ধ বলে, আমি সব বুঝি মা, তবুও এর প্রয়োজন ছিলো মা। সুলেনের মৃত্যু তোমার দেশের মানুষকে অনেক খানি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

একটু পরেই দু'জন সৈন্য শামীমকে গার্ড দিয়ে সুলেনের কাছে নিয়ে যায়।

হঠাৎ দু'হাত দিয়ে শামীম নিজের মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠে। টল-টলে দু'ফোটা অশ্রু সুলেনের চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়।

লৌহকপাটের আড়ালে সুলেন। হঠাৎ নিজের বক্ষ প্রসারিত করে দু'হাত বাড়িয়ে শামীম এগিয়ে যায় সুলেনের দিকে। কিন্তু বাধা দেয় মাঝখানের লোহার দেওয়াল।

চীৎকার করে উঠে শামীম, আমি বাঁচতে চাইনে সুলেন, তোমাকে ছাড়া সত্যি আমি বাঁচতে চাইনে।

চোখের জলে হেসে উঠে সুলেন, ছিঃ, এভাবে কাঁদতে নেই।

শামীম পাগলের মত বলে উঠে, মৃত্যুর আগে আমাকে কেন ডাকলে? কি বলতে চাও, ওগো তুমি বলো।

বিচিত্র হাসি মুখে সুলেন জবাব দেয়, মৃত্যুকে আমি ভয় করিনে শামীম।

তবে তোমার চোখে জল কেন?

হাসি মুখে সুলেন বলে, এ-আনন্দের অশ্রু। চির-বিদায়ের আগে তোমাকে দেখতে পেলাম, ফরাসী সরকারের কাছে এ-জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শামীমের দেহ। কি যেন বলতে চায় ও মুখ তুলে, কিন্তু তার আগেই সৈনিকের আদেশে ঘুরে দাঁড়াতে হয় শামীমকে। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার তাকে ফিরতে হবে।

পলকহীন চোখে সুলেন চেয়ে থাকে সৈনিকের পেছনে পেছনে এগিয়ে যাওয়া শামীমের দিকে।

নজরুল স্মরণে

হাসান আবদুল গোফরান

দীর্ণ করে অভিশপ্ত রাত্রির তিমির
আলো আর অন্ধকারে বাঁধি অগ্নিসেতু
হাতে 'অগ্নিবীনা' আর 'বিদ্রোহীর' 'বিষের বাঁশরী'
কণ্ঠেতে কোরাস গান
সুরে সুরে সমুদ্র তুফান ঃ
হিমাদ্রির মত চির সে উন্নত শির
(যে নিজেই আপনাতে আপনি প্রকাশে)
সে এলো সে এলো এই দুর্যোগ আকাশে
'মহাকাল ধূমকেতু'।

আমরা সেদিন কারার আড়ালে অবচেতন
ধূলালুণ্ঠিত প্রিয় আজাদীর জয়কেতন
চলছি সেদিন লক্ষ্য বিহীন গড্ডালিকা
ঝঞ্ঝা-হাওয়ায় নিবু নিবু প্রায় জীবন শিখা
সত্বাশূন্য বন্দী আত্মা গুমরে মরি
মানেনা চক্ষু আজ সে ব্যথার কাহিনী স্মরি
'ভাঙ্গার গানে' কে দিল সাহস শিকল ভাঙার ?
কে-দিল শক্তি বক্ষে-বাহুতে—নতুন জোয়ার ?
রাতের মিনারে হাঁকলো সে কোন্ নয়া আজান
জাগলো জীবন কোটি কোটি প্রাণ নও-জোয়ান।
ভাঙ্‌লো কারার 'লৌহকবাট'—দস্যুরাজ
ছাড়লো এদেশ তাইতো আমরা আজাদ আজ।

মুক্তি পিপাসু বীর,
তুমিই বুঝেছ মুক্তির তরে পরাধীন পিঞ্জরে,
আমাদের মাঝে তুমি আছো আজো—
অথচ আলোর ভোরে

গানের আসরে গাওনাতো গান আনন্দ জলসায়,
সুরহারা পাখী—তাই ম্লান সব দারুণ শোকের ছায়।
গানের পাখী গো যে গান গাহিলে হৃদয় মুগ্ধ তানে,
সেই মুর্চ্ছনায় আজো ফুল ফোটে শুষ্ক গুলিস্তানে।
হে বীনা বাদক,
পরাধীন দেশে তুমি ছিলে এক যুগ স্রষ্টা—যুগের নায়ক
ঝঙ্কারে ভেঙ্গেছ দুই শতাব্দীর অন্ধমূঢ় ঘুম,
পরালে জাতির ভাগ্যে আলোর কুঙ্কুম।
হে বিদ্রোহী,
চলিত নিয়ম প্রথা ভঙ্গ করে ভাঙ্গনের তীর—
ছুঁড়েছ—গেয়েছ গান অগ্নিমন্ত্রে জীবনের জয়
তুমিই ভাঙ্গালে বীর বজ্রগানে জড়তা জাতির
ধ্বংসের মাঝারে সৃষ্টি তুমি তার নব পরিচয়
তোমার বাঞ্ছিত দিন এলো তবু পুরাতন রীতি ঃ
শ্মশান প্রেতের ছায়া, মেঘ বুকে চাঁদ কেঁদে খুন,
অশান্ত দিনের চিতা দাউ দাউ—রাত্রি ও আগুন
জীবন আজিও দগ্ধ—মূল্যহীন পেলোনা স্বীকৃতি !
বেদনার কবি
কণ্ঠে রেখে 'অগ্নিবীণা' বক্ষে চেপে বিদ্রোহের ঝড়,
নির্বাক তোমার পৃথ্বি আর কভু হবেনা মুখর ?

ঝাঁকে ঝাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন
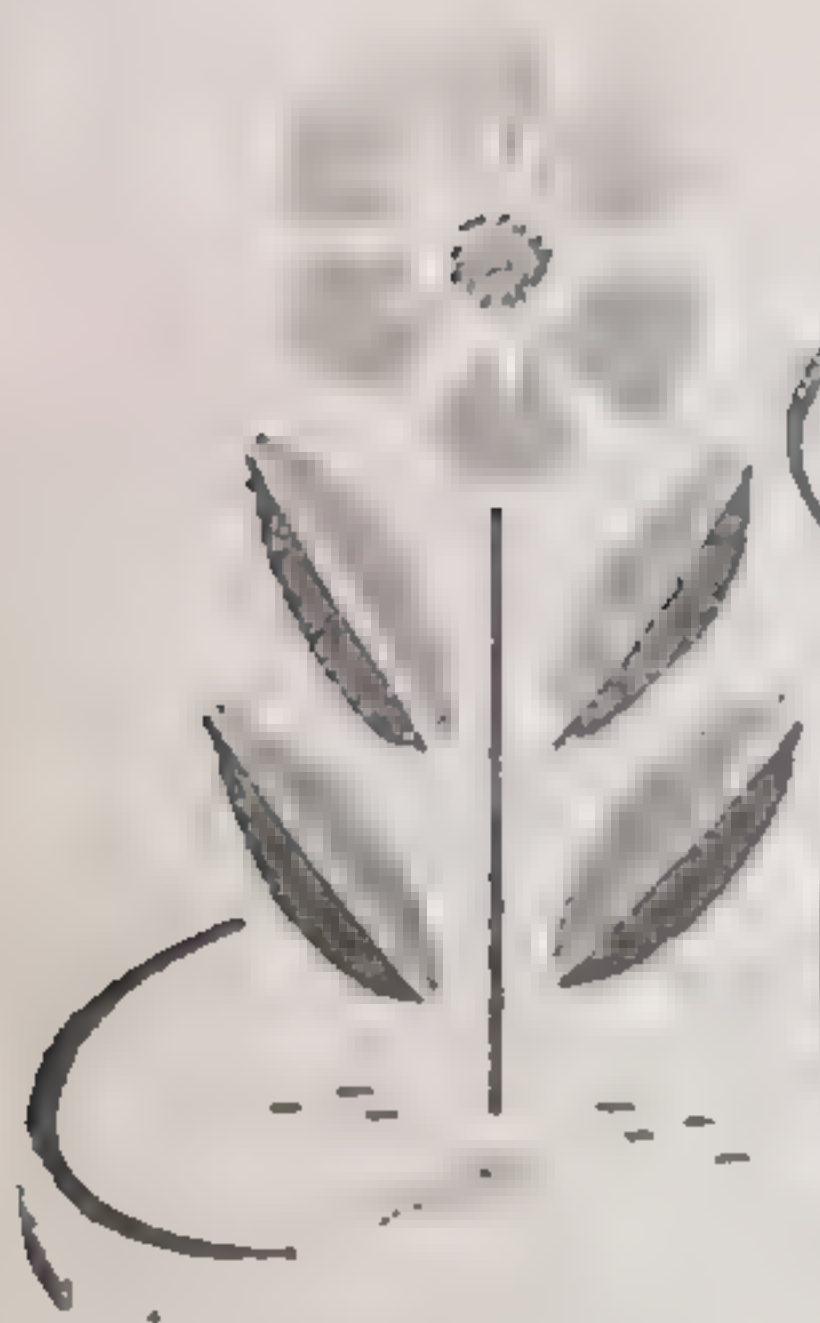
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ তেইশ ॥

মোবারক একা একা ফিরিতেছিল। কয়েকদিন হইতে বালুরগাঁও তাহাকে প্রায়ই যাইতে হয়। মোহাম্মদপুরের পশ্চিমে নয়া বিলে মাছ ধরা লইয়া মোহাম্মদপুরের সহিত বালুরগাঁয়ের কাইজা হয়। বালুরগাঁয়ের মাতব্বররা ঠিক করিয়াছেন, ছেলেদের লেখাপড়া হয় হোক, না হয় না-ই হোক কোন পরোয়া নাই, মোহাম্মদপুর হাই স্কুলে তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে না। দেখা যাক, মোহাম্মদপুরের স্কুল চলে কি ভাবে! বালুরগাঁয়ের মাতব্বররা আশেপাশে অন্যান্য গাঁয়েও মোহাম্মদপুর স্কুলে ছেলে না পাঠাবার জন্য দল পাকাইতেছেন।

ব্যাপারটি মিটমাট করাই মোবারকের উদ্দেশ্য। এ-সব বিষয়ে সে সাধারণতঃ আশরাফকে সঙ্গে নেয় না। আশরাফের কাটা কাটা কথা কোন পক্ষেরই মনঃপূত হয় না, এবং ইহাতে আওলা সুতায় আরও গিরো লাগে।

আজ অবশ্য আশরাফ অন্য কারণে বাহির হইতে পারে নাই। সঙ্গে যাহারা ছিল, পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়াছে। মোবারক সুতারার পার ধরিয়া একা একা হাঁটিতেছিল। মনটা তাহার ভারী হইয়া আছে। গ্রাম্য কোন্দলে সে নিজেকে যত জড়াইতেছে ততই তাহার মনে হইতেছে সে যেন তলাইয়া যাইতেছে। গ্রাম সম্পর্কে রোমাঞ্চকর ধারণা তাহার কোন কালেই ছিল না। কিন্তু আজ মনে হয় সমস্ত অবস্থাটাই শ্বাসরোধকর।

ভুল বুঝার জন্য সকলেই যেন তৈয়ার হইয়া আছে। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে এত বড় করিয়া তোলা হয় যে, তাহার আড়াল হইতে আসল বিষয়টিকে আর দেখাই যায় না। প্রত্যেক গ্রামে কত যে দল তাহার ইয়ত্তা নাই। সহজ-সরল পথে কোন কাজ করা প্রায় অসম্ভব। দলাদলিটা বড় হইয়া উঠিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিতে অগ্রসর হয়। এর ভিতর কাজ করা অসম্ভব, মাঝে মাঝে মোবারকের তাহাই মনে হয়। মন তাহার নিরাশ হইয়া উঠে।

আশরাফ ঝগড়া করে, লোকের সাথে পাল্লা দিয়া কলা বাড়াইয়া কুতর্ক করে; কিন্তু মনে তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। মোবারককে বিমর্ষ দেখিলে, তাহার পিঠ চাপড়াইয়া উর্দ্দু বলিতে শুরু করিয়া দেয়, গব্‌রাও মৎ, সব ঠিক হো যায় গা।

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছুটা বাকি। সামনেই মোহাম্মদপুর। সুতারার পারেই মোহাম্মদপুরের স্কুল ঘরটি রহিয়াছে। বাড়ী ফিরার তেমন তাড়া ছিল না। মোবারক নদীর পারে পায়চারি করিতে লাগিল।

কাল হোমায়েরা আসিবে। কাজে-কর্ম্মে হোমায়েরার সহিত তাহার দেখা হইবেই। লুকাইয়া থাকার উপায় নাই। আর কেনই বা সে লুকাইয়া থাকিবে। কত কাল, আজ কতকাল হোমায়েরার সাথে দেখা নাই!

মোবারকের চোখ দিগন্ত ঘুরিয়া সুতারার বুকে আসিয়া স্থির হইল। পানির ছোট-ছোট ঢেউ পড়ন্ত রোদে ঝিলমিল করিতেছে।

মাঠের পর মাঠ, তারপরে দিগন্তের কোল ঘেষিয়া রেখায়িত ঘন মেঘমালার মত বিস্তারিত হইয়া আছে গ্রাম-শ্রেণী। তারই উপর সায়াহ্নের আরক্তিম সূর্য্য ঝুলিয়া আছে। এখনই গ্রামের আড়ালে ডুব মারিবে। সারা পশ্চিম আকাশটাতে ফাগের ঝিলিমিলি তুলিয়া বিদায় নেওয়ার জন্য তৈয়ার হইয়া আছে সূর্য্য। পায়ের কাছে সাপের মত শিথিল দেহ সুতারা, দৃষ্টিসীমা প্রান্তে বিদায়ী সূর্য্য, বাতাসে ঘরে ফেরা পাখীর পাখা ঝাপটানির শব্দ, আর কোথাও কিছু নাই, এরই মাঝখানে এক অভিভূত অনুভূতি মোবারকের পা হইতে শিরশির করিয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িল।

মোবারক মুগ্ধ দৃষ্টিতে সারা প্রকৃতিকে পান করার চেষ্টা করিতেছিল। ব্যথার মত আনন্দের সুর তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া অনুরণিত হইতে লাগিল। দিগন্তের বিমুগ্ধ সন্ধিতে প্রকৃতির অকুণ্ঠ আহ্বানের মাঝে নিজেকে হারাইয়া আত্মহারা হইয়া যাওয়ার উপায় নাই, আবার নিজের মাঝে নিজেকে ধরিয়া রাখিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকার উপায় নাই।

ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির বর্ণ বদলাইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন রূপ লইয়া মোবারককে আত্মভোলা করিয়া তোলার জন্য ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছে। উন্মাদ করা আহ্বান ধ্বনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া ফিরিতেছে। নিজেকে শূন্য করিয়া, নিঃশেষ করিয়া এই আহ্বানে একাত্ম হইয়া যাওয়ার শক্তি যদি মোবারকের থাকিত, হয়ত অনেক বোঝার দুর্বিসহ ভার তাহার কাঁধ হইতে নামিয়া যাইত!

মোবারকের মনের সকল অনুভূতি শুব্ধ হইয়া আসিল। বেঁচে থাকা সার্থক, কি অর্থহীন, এই প্রশ্নের জওয়াব চাওয়াও যেন তাহার কাছে অবান্তর হইয়া উঠিল। সে আছে, এই তাহার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। ধোঁয়ার মত আঁধারের নীচে তাহার জীবনের স্রোত অজানা হইতে অচেনায় বাহির হইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া যাওয়ার সাধ্য তাহার নাই। কোন কালে তাহার ছিল কিনা তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিলে আজ তাহা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার ও প্রকৃতির মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। তবু আজ সন্ধ্যায় তাহার মর্ম্মের মাঝখানে এই যে আহ্বান ধ্বনিত হইল, ইহার দামও ত কম নয়। সে নিশ্চয়ই দুর্ভাগা নয়। এই আহ্বানটুকুও যার চিত্তে বাজিয়া উঠে না, দুনিয়ায় সেই আসল হতভাগা।

নিজের মন হইতে একটি শক্তি উৎসারিত হইয়া মোবারককে সতেজ করিয়া তুলিল। সে তীর ছাড়িয়া নদীর দিকে নামিতে শুরু করিল।

নদীর ঢালু পারটি লম্বা ঘাসে ভরিয়া আছে। এদিক হইতে ওদিকে সারা পারটিই যেন মসৃণ কার্পেটে মুড়িয়া রাখা হইয়াছে। কিছু দূরে ছোট ছোট হলদে ফুলে সমস্ত এলাকা ফুলময়। কেহ যত্ন করিয়া কেয়ারী করিয়া এই ফুল করে নাই। কিন্তু প্রকৃতি নিজেই বড় আর্টিষ্ট। এখানে ওখানে অযত্নে বাগান সাজাইয়া তুলিতে বড়ই যত্নবান। তাহার তুলির আঁচড়ের বিরাম নাই। ছোট ছোট ফুলের অতি ছোট পাপড়িতে রঙের কি যাদু সৃষ্টি করা যায়, সে জানে একমাত্র প্রকৃতি। প্রকৃতির নিকট হতে চুরি করে এ-শিল্পকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেও মানুষ প্রকৃতির মত এমন সুক্ষ্মতা আর অভাবনীয় কায়দা রপ্ত করিতে পারিল না। মোবারক এক পা এক পা করিয়া আগাইতেছিল আর ভাবিতেছিল, যেখানে সেখানে বৈচিত্র্যকে অজস্রভাবে তুলিয়া ধরিতে প্রকৃতির কি সামান্যমাত্র ক্লান্তি নাই!

মোবারকের পা নরম মাটিতে আসিয়া ঠেকিল। নদীর পারের সাথে নদীর পানির সূক্ষ্ম বিভাজক রেখায় নরম মাটি সতর্কতার সাইনবোর্ড হইয়া আছে। মোবারক দুই পা উপরে উঠিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কুয়াশার মত আঁধার তখনও সন্ধ্যার বাণী বহন করিয়া ফিরিতেছে। গ্রামে গ্রামে তখন পাখীর বাসায় শুব্ধতা নামিয়াছে, কাকলি থামিয়া গিয়াছে। শব্দময়ী প্রকৃতি নিঃশব্দ নিঝুম রাতের প্রতীক্ষায় আনমনা।

শব্দহীন অন্ধকারে সুতারার স্রোতরেখা রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। সুতারার স্রোতে গতি আছে কিন্তু শব্দ নাই। মোবারক নিজের মনকে স্রোতার স্রোতে মিশাইয়া দিল।

তাহাদের গ্রামের পাশ দিয়া বহিয়া চলা এই নিরীহ ছোট নদীটি সম্পর্কে অনেক কল্পকাহিনী মোবারক শুনিয়াছে। তখন তাহা সে বিশ্বাস করিয়াছে। সে বড় হইয়াছে, লেখা পড়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীটি তেমনি আছে, তেমনি আষাঢ়ের বানে ভাসিয়া যায়, আর চৈত্রের অগ্নিক্ষরা দিনে পায়ের তলায় মরিয়া থাকে, তেমনি তাহার পারে পারে গল্পের আসরে বহু পুরুষের কথিত কাহিনীর মালা রচিত হয়। মোবারক হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছে, গাঁজাখুরী গল্প।

আজ এই রহস্যের হাতছানির মাঝখানে সম্ভব অসম্ভব সমস্তই তাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, জীবনটার পিছনে সবই যদি সম্ভবের ক্রিয়া হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবন আসারই ত উপায় ছিল না। সাধারণ লোক সহজভাবে এই কথাটিই হয়ত বুঝিতে পারিয়াছে, তাই সম্ভব অসম্ভব লইয়া তাহারা তেমন মাথা ঘামায় না। কোন অলি আল্লা অজুর পানির জন্য আশা জমিনে ঠুকিয়া স্রোতস্বিনী বহাইয়া ছিলেন, সুতারার জন্মের এই কাহিনীর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য লইয়া গ্রামবাসীর কোন মাথা-ব্যথা নাই, ইহা বিশ্বাস করিয়াই খালাস। সহজ ভাবে তাহারা বুঝিয়াছে মানুষ আশরাফুল মখলুকাত, মানুষের প্রয়োজনের বাহিরে কিছু হওয়ার উপায় নাই।

মোবারক বসিয়া বসিয়া সমস্ত কিছুর সহিত জড়াইয়া সুতারার রহস্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। সুতারা বাঁক হইতে বাঁক ঘুরিয়া চলিয়াছে। পথে পথে জোগাইতেছে খাওয়ার পানি, আর শস্য ক্ষেতে সবুজের সমারোহের মাঝে নিজেকে সঞ্চারিত করিয়া একান্ত আপন

হইয়া মানুষের কাছে আসিতেছে। মানুষের সহিতই সম রেখায় সে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

তাহার পারে পারে আছে কত গ্রাম, মানুষের বসতি। হাসিকান্নায় ভরা উপনিবেশ মানুষ রচনা করিতেছে, একদিন সমস্ত ছাড়িয়া কোথায়, কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করিতেছে। পিছন হইতে আরেকটি তরঙ্গ আসিয়া শূন্যস্থান ভরিয়া দিতেছে। মনে হইতেছে এ-গতির আর শেষ নাই। সুতারা তাহার নীরব সাথী। মোবারকের আশ্চর্য্য মনে হয় তাহার মনের গতিটি। কেন যে আজ তাহার মনে হইতেছে সুতারা যদি মুখ খুলিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক কালের অকথিত কাহিনী স্লেটের উপর সাদা লিখার মত পরিষ্কার হইয়া উঠিত।

কিন্তু সুতারা কি নিজের প্রশ্নের জওয়াব নিজেই পাইয়াছে?

মোবারক বুঝিতে পারে না আজ তাহার কি হইয়াছে। তাহার অন্তরের হাজার সুরের মূর্চ্ছনা এই আকাশ, এই মাঠ, এই সন্ধ্যায় বিস্তারিত হইয়া গিয়াছে। সে হাত বাড়াইয়া নদী হইতে এক আজলা পানি তুলিয়া চোখে মুখে দিল। কিন্তু তাহাতেও সে স্বস্থ হইতে পারিল না। তাহার মন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীর ঢেউয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিল। বারবার দেখা এই নদী তাহাকে আর কখনও এ-ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে পারে নাই। নদীর নিঃশব্দ চলার গতিতে তাহার সকল প্রশ্ন মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। সময় ও স্রোত কাহারও জন্য বসিয়া থাকেনা। মোবারক নিজেই কি আর বসিয়া আছে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও ত নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। পাহাড় পর্ব্বত জনপদ মাঠ প্রান্তরের মাঝখান দিয়া নদীর অবিরাম ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বাঁক হইতে বাঁকে কত যোগাযোগ আর জানাজানির কাহিনী, হাসিকান্নার দোলায় দোলায়িত ঢেউয়ের স্তরে স্তরে কত রহস্যের আনাগোনা! তাহার বাঁকে বাঁকে জাগিয়া উঠিতেছে কত জিজ্ঞাসা। সমস্ত জিজ্ঞাসার জওয়াব কি সুতারা পাইয়াছে? পায় নাই। তাই ত সন্ধ্যার অন্ধকারের তলে এত রহস্যের মাঝেও দীর্ঘ অশ্রু রেখার মতই সুতারাকে মোবারকের মনে হইতেছে। কিন্তু এটাই কি সত্য? পরক্ষণেই মোবারকের মন না না করিয়া উঠে। কিছুক্ষণ আগেও ত মোবারক ইহার ছোট ছোট ঢেউকে পড়ন্ত রোদে ঝলমল করিয়া নাচিতে দেখিয়াছে।

এ-বাঁক হইতে ও-বাঁকে ছুটিয়া চলার শেষ নাই। বাঁকের শেষে নূতন বাঁকের ইশারা সুতারাকে টানিয়া নিতেছে। এ চলায় হয়ত আনন্দ আছে। কিন্তু যেখানে পিছান সবই নৈরাশ্যময় আর সামনে সবই অন্ধকার সেখানে বাঁক ঘুরিয়া অন্ধ আবর্ত্তে ছুটিয়া মরার আনন্দ কোথায়? নদী জানেনা কোথায় তার শুরু, কোথায় তার শেষ, আর অজানার মাঝেই তার আনন্দ। ছুটিয়া চলার আনন্দেই বাঁকে বাঁকে তীরের শাসন মানিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

সেই তীরের শাসনই যে মন মানিতে চায় না মোবারক ত জানে এই শাসন না মানা মনের আঘাতেই প্রতিঘাতের বাঁক তৈয়ার হইয়া উঠিতেছে। না, মোবারক কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। জীবনটা নদীর ধারা নয়। কোথায় এর শুরু, আর কোথায় এর শেষ কিছুই জানা নাই। কেন যে এত সংঘাত, এত দ্বন্দ্ব, তাহারই বা অর্থ কে বলিয়া দিবে?

মোবারক চুপ করিয়া সুতারার স্রোতের দিকে চাহিয়া থাকে। অন্ধকার ক্রমে জমাট বাঁধিতে থাকায় নদীর ধারাটিকে তাহার কাছে অস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। তবু মোবারক স্পষ্টই দেখতে পায়, সুতারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ঐখানে বাঁক নিয়া মোড় ঘুরিয়া গেল। আবার নূতন বাঁকে নূতন মোড় নিবে, সে কল্পনার চোখে তাহা দেখিতে পায়। সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুধু নদীর ধারাটি তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে আড়াল করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলা নদীটি শোভা পাইতে থাকে। মুহূর্ত্তের জন্য মোবারকের কাছে এই আঁকিয়া বাঁকিয়া চলাটাই একমাত্র সত্য হইয়া উঠে, এবং আর সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। সমস্ত অর্থহীনতার পটভূমিকায় এইটুকু অর্থই তাহার মনে আসে।

মোবারক উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে থাকে। অন্ধকারে আর কিছুই চোখে পড়ে না, সে চোখের সামনে শুধু নদীর অস্পষ্ট ধারাটিই দেখিতে পায়। মোবারক আবার বসিয়া পড়িয়া নদীর ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া নেয়।

সুতারার সাথে আজকের এই নূতন পরিচয়কে সে কিভাবে মনে বহন করিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সে গ্রামের পথ ধরে। কান্নার মত একটি অনুভূতি তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া ফিরিতে থাকে। অর্থহীনতাই যদি জীবনের একমাত্র অর্থ হয়, তাহা হইলে কিসের তাড়নায় জীবনের সোজা ধারাকে বাঁকা চোরা করিয়া কোন্দলের পর কোন্দল সৃষ্টি করিয়া চলা হইতেছে?

ঘরে ফিরিয়া মোবারক দেখিল সখিনা উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার জন্য বসিয়া আছে।

সখিনা কণ্ঠস্বরে রাজ্যের উৎকণ্ঠা মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ এত দেরী হলো কেন?

মোবারক মৃদু হাসিয়া বলিল, ভূতে পেয়েছিল।

ভূতে লোককে পথ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া হয়রান করে তাহার অসংখ্য কাহিনী সখিনা শুনিয়াছে। সে মোবারকের কাছে ঘনিষ্ঠ হইয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, দিনে দিনে ফিরে আসবেন। আর কখনও বাইরে রাত করবেন না।

সখিনার সরল মুখের দিকে চাহিয়া মোবারক বলিল, দিনে দিনেই ফিরছিলাম। আশরাফ এসেছিল কি?

সখিনা জওয়াব দিল, কয়েকবারই এসে আপনার খোঁজ করে গেছেন। খুবই ব্যস্ত তাঁরা।

হবারই কথা।

সখিনা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কি কিছু করতে হবে না?

মোবারক বলিল, আমরা আবার কি করবো?

সখিনা বলিল, হোমায়েরা আপা কাল আসবেন, হয়ত আবার কালই চলে যাবেন। হাজার হলেও আমাদের ত কিছু করতে হবে।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মোবারক বলিল, তুমি বড় গেঁয়ো।

নদীর ঘাটে আশরাফ ছাত্রছাত্রী লইয়া তৈয়ার ছিল। দূর হইতে নৌকা আসিতে দেখা গেলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ঐ আসিতেছে, ঐ আসিতেছে বলিয়া শোরগোল করিতেছিল। নৌকা ঘাটে না ভিড়িয়া দাঁড়ের টানে সোজা অগ্রসর হইয়া গেলে, এ ওকে বলিতে থাকে, তোমার কথা ঠিক হলো না। আবার আরেকজন জওয়াব দেয়, আমি কিন্তু বলি নি।

আশরাফ মাঝে মাঝে তাহাদিগকে ধমকাইতেছিল। হোমায়েরাকে এদিকে আসিতে রাজি করাইবার জন্য অনেক কাঠখড় তাহাকে পুড়াইতে হইয়াছে। আশরাফের ভয় হইতেছিল, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ভাবে তাহাকে টানিয়া আনা হইতেছে, তাহাতে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত হিতে বিপরীত হইয়া বসিবে। সকলদিক সামলাইবার জন্য নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে বলিয়াই আশরাফ বেশী করিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিল।

বহু চেষ্টায় ছেলেদের স্কুলের পাশাপাশি একটি মেয়ে স্কুল তাহারা দাঁড় করাইয়াছে। ছেলেদের স্কুল একরকম চলিতেছে, কিন্তু মেয়েদের স্কুল খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়াও যেন আর চলিতে চাহেনা। অনেক লেখালেখি করিয়াও মেয়ে স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। হোমায়েরার রিপোর্টের উপর স্কুলের হয়ত বুনিয়াদ মজবুত হইয়া উঠিতে পারে, এই আশা লইয়াই আজ পাড়াগাঁয় তাহাকে টানিবার জন্য আশরাফ ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু কাজে হাত দিয়া আশরাফ দেখিল, এ-বড় কঠিন ঠাঁই। হোমায়েরা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া আছে। মোহাম্মদপুরে আসার কোন যৌক্তিকতাই সে স্বীকার করে না; এবং এ-ভাবে উপরেও সে লেখালেখি করিয়া না আসার সিদ্ধান্তকে পাকা করিয়া তুলিয়াছে। হাকিম নড়ে হুকুম নড়ে না, এ-ক্ষেত্রে হাকিম ও হুকুম দুই-ই নড়াইবার দায় আশরাফের উপর পড়িল। হোমায়েরার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না; কিন্তু কোন বাধাই আশরাফ গ্রাহ্য করিল না। হোমায়েরার বাড়ীতে ধর্না দিতে শুরু করিয়া একদিন সে পাথর গলাইতে সক্ষম হইল।

কিন্তু আশঙ্কা কিছুতেই আশরাফের মন হইতে নামিতেছে না। হোমায়েরা আসিতে রাজি হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার সম্পর্কে এত দিন সে যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে ভরসা করার কিছু পাইতেছে না। হোমায়েরার বিরক্তি হয়ত অন্যভাবে প্রকাশ পাইবে।

ক্রমেই বেলা বাড়িতেছে, অথচ তখনও হোমায়েরার দেখা নাই, তাহাতে আশরাফের আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল। এদিকে তাহাকে এস্তেকবাল জানাইবার সকল আয়োজনও ভেস্তে যাইতে বসিয়াছে দেখিয়া সে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। বেলা হইয়া গিয়াছে, ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে আর আটকান যাইবে না। আশরাফ ছেলেমেয়েদিগকে অধিকমাত্রায় ধমকাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

হোমায়েরা যখন আসিয়া পৌঁছিল, রোদ তখন গাছের আগায়। নদীর পার জনবিরল। একটি লোককেও নদীর ধারে দেখিতে না পাইয়া সে বিরক্ত হইল। তবে ইহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গের লোকজনকে স্কুল খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়া সে তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

আশরাফের কানে খবর পৌঁছিতেই সে হন্তদন্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিল। বলিল, আমাদেরে অপরাধী করবেন, এই আপনার মর্জ্জি ভাবী! সারাদিন নদীর পারে বসে বসে যেই বাড়ী গেছি অমনি এসে পৌঁছলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সারাটা দিন আপনার জন্য বসেছিল।

হোমায়েরা এই আত্মীয়তাকে আমল দিল না। আশরাফের গায়ে পড়াভাব বরঞ্চ তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে বলিল, স্কুল কোথায়? সেটা দেখার কাজ আমাকে শেষ করতে হবে।

আশরাফ বলিল, আসুন, ভাবী। সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু এটা স্কুল ছুটি হওয়ার সময়, এ-সময় দেখা কি ঠিক দেখা হবে?

হোমায়েরা জওয়াব দেওয়া বাহুল্য মনে করিল।

আশরাফ আবার আমতা আমতা করিয়া বলিল, সারাদিন রাস্তায় গেল। একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর—

বিরক্তির সহিত হোমায়েরা বলিল, আমার কাজ আমি জানি। খামখা উদ্বেগ প্রকাশ করার কোন কারণ নাই।

আশরাফ বলিল, একেবারে পর করে রাখতে চান, তাই সামান্য আবদারও কানে তুলবেন না। কিন্তু, ভাবী, পর করে রাখতে চাইলেই কি রাখা যায়? খোদারই কি মর্জ্জি দেখুন ত? আমাদের কাজটা এসে পড়লো ঠিক আপনারই উপর, আর আপনিও ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের গ্রামে আসলেন। আত্মীয়তা দিয়ে যা পাইনি, কর্ত্তব্যের মাঝ দিয়ে তাই আদায় করে নিচ্ছি।

হোমায়েরা বলিল, এই সুযোগে কাজ হাসেল করে নেওয়ার মতলব বুঝি করেছেন?

আশরাফ বলিল, দোহাই ভাবী, অপরাধ নেবেন না। কাজ যেভাবেই হোক হাসেল হলে আমাদের আপত্তি নাই। দশজনের হয়ে আমি তাতে আনন্দই প্রকাশ করবো। তবে আমার আর্জি হলো, আমাদের মনকে আপনি ভুল বুঝবেন না। কাজ হাসেলের আনন্দের চেয়েও বেশী আনন্দ আমাদের হচ্ছে।

হোমায়েরা বলিল, কাজটা এখনও হাসেল হয় নি।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বালিকা স্কুলে আসিয়া পড়িল। গ্রামের ভিতরে স্কুলের সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ীতেই স্কুল বসে। স্কুলঘরটি হোমায়েরার আগমন উপলক্ষে সাজানো হইয়াছে। তবে একটি স্বাভাবিক পরিপাঠ্যও হোমায়েরার দৃষ্টি এড়াইল না। স্কুলঘরে ঢুকার পথে দুই পাশে বাঁশের বেড়া দিয়া দুইটি ছোট বাগান করা হইয়াছে। সময়টা ফুলের মওসুম নয়। তবে গ্রামে এমন পরিস্কার ও পরিপাঠ্য কম দেখা যায় বলিয়া হোমায়েরাকে স্বীকার করিতেই হইল। স্কুল তাহাকে হামেশাই দেখিতে হয়, তবে বাহিক দৃষ্টি এমনটি সে কমই দেখিয়াছে।

স্কুল এলাকাটি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। গ্রামের পথে ইহা একটি বিশেষ ঘটনা। এমনটি সকল গ্রামেই দেখা যায়। তবে এখানে হয়ত অন্য কারণও ছিল। স্কুল ঘর ছাড়াইয়া একসারি ঘর। সেই ঘরগুলিকে গ্রামের মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে হোমায়েরা তাহা বুঝিতে পারিল। দরজার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টি যে তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে তাহা অনুভব করিতে হোমায়েরার দেরী হইল না। মোবারকের শহুরে স্ত্রীকে দেখার জন্য গ্রামের লোকদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কিন্তু সে কৌতূহল নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নাই। তারপর আরও রহস্যে ইহা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। আজ কল্পলোকের সেই মেয়ে জাঁদরেল মেম সাহেব রূপে গ্রামে আসিয়াছে। ইহাতে কৌতূহল হাজার গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

আশরাফ কৌতূহলী লোকদিগকে নিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। সে তাহাদিগকে গালমন্দ করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু লোকের ভীড় বাড়িয়াই উঠিতেছিল।

হোমায়েরা কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল। কলিমুদ্দিন আর তাঁহার স্ত্রী আরিফা দুইজনেই স্কুলে মাষ্টারী করেন। আরিফা একদিকে জড়সড় হইয়া ছাত্রীদের সহিত মিশিয়া বসিয়াছিলেন। ছাত্রীদের মাঝ হইতে তাঁহাকে আলাদা করার উপায় ছিল না। কলিমুদ্দিন হোমায়েরার সামনে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলেন এবং হোমায়েরা কথা বলার আগেই অযথা ব্যস্ত হইয়া এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতেছিলেন।

সেক্রেটারী মসিহুদ্দিনও আসিয়াছিলেন। দরকার অনুসারে হোমায়েরার সহিত দুয়েক কথা বলিতেছিলেন। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সামান্য আলাপেই হোমায়েরা বুঝিল, তাঁহার লেখাপড়া জানা নাই। তবে মন তাঁহার অসংস্কৃত নহে। গ্রামের মাতব্বর ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। তবে আলাপ হইতে বুঝা যায় মনে সংস্কৃতির ছাপ আছে।

ছাত্রীদের এটা ওটা জিজ্ঞাসা করিয়া হোমায়েরা কাজ শেষ করিল। সে আশরাফের জন্য এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। কলিমুদ্দিন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, আশরাফ সাব কোথায়? আমি এখন উঠবো। প্রদর্শনী বই আমার নৌকায় পাঠিয়ে দেবেন।

আশরাফের অফুরন্ত উৎসাহ হোমায়েরাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাহার উপর প্রথমদিকে যে বিরক্তি ছিল, সেটা কাটিয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া অন্য কারণে হোমায়েরার মন হালকা হইয়া উঠে। ভীড়ের মাঝে মোবারকের সহিত চোখাচোখি হইয়া যাওয়ার দুশ্চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা না হওয়ায় সে স্বস্তি বোধ করিতে থাকে।

হোমায়েরা উঠিয়া পড়িবে, এমন সময় দেখিল আশরাফ দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। সারাক্ষণই আশরাফ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে। এখন যে ভাবে সে ভীড় ঠেলিতেছে তাহা দেখিয়া হোমায়েরার হাসি পাইল।

এত ব্যস্ত হইয়া আশরাফের ভীড় ঠেলার কারণ পরক্ষণেই হোমায়েরা বুঝিতে পারিল। স্কুল ঘরের দরজা হইতে পুরুষের ভীড় সাফ হইলে, পিছনের দরজাটি খুলিয়া গেল। একজন প্রবীণা মহিলা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সোজা হোমায়েরার কাছে আসিয়া

বলিলেন, চল, মা, ভিতরে চল। অতি সামান্য চা নাস্তার ব্যবস্থা করেছি। তোমাকে ডাকতে এসাম। তুমি যা হও তা হও, কিন্তু সেই মেয়েলোকই ত তুমি। দোষ দিতে হলে আমাকেই দিও, মা, কিন্তু ভিতরে চল।

হোমায়েরাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়া, তাহার হাতে ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

ভিতর বাড়ীতে গিয়া হোমায়েরা দেখিল, একটি ঘরে ফরাশ পাতা হইয়াছে। গ্রামের অনেক মহিলা সেখানে আছেন। আনোয়ারার মা তাহাকে লইয়া গিয়া সেখানে বসাইলেন। সে বসিলে দস্তর খানা দেওয়া হইল।

আনোয়ারার মা একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, ও উকিলের মা, সিতারার মাকে আসবার জন্য বার বার করে বলে দিলাম, কিন্তু তাঁকে দেখছি না কেন।

উকিলের মা জওয়াব দিলেন, তিনি আসার জন্য তৈয়ার হয়েছিলেন বোন; কিন্তু হঠাৎ সিতারার অসুখ করে ফেলায় আসতে পারেন নাই।

উকিলের মা যে সত্য কথাই বলিয়াছেন, অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা পরস্পরে চাওয়াচাওয়ি করিলেন। হোমায়েরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। মোবারকের স্ত্রী সখিনা যে কেন আসিল না, তাহার কারণ অন্যত্র রহিয়াছে বলিয়া ইহারা আন্দাজ করিতে লাগিলেন।

ঘরে তৈরী নানা জাতের পিঠা দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হোমায়েরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। পিঠা যে এত জাতের হইতে পারে সে ধারণাই তাহার ছিল না। সব কয়টি হইতেই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া সে মুখে দিতেছিল। এইগুলির স্বাদের সহিত পরিচিত না থাকিলেও তাহার কাছে মন্দ লাগিতেছিল না।

আনোয়ারার মা বলিলেন, বড় সাধ ছিল মা, দুটো শাক ভাত খাওয়াবো; কিন্তু এ অবেলায় আর দিতে সাহস হলো না। তাই এ সামান্য জিনিষ দিয়ে মুখ নষ্ট করালাম।

অনভ্যস্ত অন্তরঙ্গতায় হোমায়েরা যে অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, ইহাদের সরল ব্যবহার তাহা স্থায়ী হইতে দিল না। হোমায়েরাও সহজ হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় এই প্রথম সে মনকে বড় হালকা বোধ করিল। হোমায়েরা বলিল, সামান্য কোথায় খালাআম্মা, এ যে রাজকীয় আয়োজন করেছেন! সত্যি বলছি আপনাদের এখানে না এলে চালের আটা দিয়ে যে খাবারের এত বিচিত্র আর্ট করা যায় তা জানতেই পারতাম না। আমরা এ দেশের মানুষ হলেও কোথায় যে আমাদের কি আছে সে খবরও আমরা রাখিনা।

আনোয়ারার মা বলিলেন, এ ভাবে বলে আমাদের লজ্জা দিও না, মা। কিছুই করতে পারলাম না বলে মনে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না।

নাস্তা খাওয়ার শেষ চা পরিবেশন করা হইলে হোমায়েরা বলিল, খালাআম্মা, শহর হতে এত দূরে এসেও চা উৎপাত শুরু করেছে?

আনোয়ারার মা হাসিয়া বলিলেন, আর বলো না, মা। আমার আনোয়ারার বিয়ে শহরে দিয়েছি। আনোয়ারাকে নাইওর আনলেই চায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। চা তার চাই। আর সে কি একবার দু'বার। আগে চা কখনও খাইনি। কিন্তু এখন যেন কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। চা না হলে চলে না। আনোয়ারার অভ্যাস আমাকেও পেয়ে বসেছে।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, অভ্যাসের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে, অগ্রপশ্চাত বলে কিছু নাই।

আনোয়ারার মা তাঁহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, কয়েকদিন আগেও আনোয়ারা এসেছিল।

পাশের মেয়েটিকে আনোয়ারার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সোলতানের মা কবে না এসেছিল?

পাশের মেয়েটি জওয়াব দিল, এই ত গত মাসের আগের মাসে।

আনোয়ারার মা বলিলেন, ঠিক। আমার আনোয়ারা এখন ছয়টি সন্তানের মা। তুমি আমার আনোয়ারার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এ-কথা মনে করেই ও, মা, বলা নাই কওয়া নাই, তোমাকে তুমি বলতে শুরু করে দিলাম, রাগ করো আর যাই করো।

হোমায়েরা বলিল, সে ত ভালই করেছিলেন। তাই ত একজন খালাআম্মা পেয়ে গেলাম।

আনোয়ারার মা বলিলেন, তুমি আমার একটি অত্যাচার সহ্য করেছ। আরও অত্যাচার করবো আপত্তি করতে পারবে না মা।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, হুকুম করুন। আনোয়ারার মা বলিলেন, তোমাকে আজ রাত আমাদের এখানে কাটিয়ে যেতে হবে।

সে হয় না, খালাআম্মা।

আনোয়ারার মা বলিলেন, কেন হবে না, মা? বেলা গড়িয়ে গেছে। এখন তুমি রওয়ানা হলে অর্ধেক রাত নৌকায় কাটবে। সে আমি হতে দিতে পারবো না।

হোমায়েরা বলিল, এ হোল আমার কাজ। অন্যখানে ত আর বাধা দিতে পারবেন না, খালাআম্মা। কাজেই আর একদিনের জন্য আটকে কি করবেন?

আনোয়ারার মা ততোধিক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,

সে অন্যখানে যা হয় হবে। আমার এখান থেকে তোমাকে রাতের বেলা রওয়ানা হতে দেব না। একবার যখন খালাআম্মা ডেকেই ফেলেছ মা, তখন আর খালাআম্মার এই অনুরোধে আপত্তি করো না।

রাত ত হয়নি।

কিন্তু হোমায়েরার কোন আপত্তিই টিকিল না। তাহাকে রাত কাটাতে রাজি হইতেই হইল। তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিয়া আনোয়ারার মা কাজকর্ম্ম তদারক করিতে গেলেন। আশরাফ শুনিয়া বলিল, বাব্বা, কম-কাজও করেননি, চাচি! আমার ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। যে মেয়ে বাপের কথা মানেনা, ফুফুকে এড়িয়ে চলে, তাকে আপনি কথায় মানিয়ে নিলেন!

বাহিরে হৈ হল্লা হইতেছিল। আশরাফ গলা চড়াইয়া সকলকে ধমকাইতে লাগিল, এই অসভ্যরা, তোরা কি কিছুই বুঝবি না। মুর্খ বর্ব্বরের দল, বাড়ীতে একজন শিক্ষিত মহিলা আছেন, একটু স্মরণ রাখিস। তোদেরে দেখলেও গা ঘিন ঘিন করে।

হোমায়েরা আশরাফকে ডাকিয়া পাঠাইলে সে তাহার ঘরে গেল। হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে সার্কাসের বাঘ না বানিয়ে ছাড়বেন না।

আশরাফ মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, কি যে বলেন, ভাবী!

হোমায়েরা বলিল, তা না হলে চিৎকার করে মেয়েদের কাছে এসব কি বক্তৃতা করছিলেন?

আশরাফ বলিল, বলেন ত নাকে লম্বা করে খত দিতে পারি। আমার ঘাট হয়েছে, ভাবী।

হোমায়েরা বলিল, থাক! নাকে আর খত দিয়ে দরকার নাই। অপরাধ আপনার বুদ্ধির, নাকের নয়। এর চেয়ে এককাজ করতে পারেন। আজকে যখন আর যাওয়াই হলো না, তখন নদীর পারটি ঘুরে আসবো। সার্কাস দেখার ভীড় যাতে না জমে যায় সে ব্যবস্থা করুন।

আশরাফ বলিল, ভাবনা নাই, ভাবী, এটা অতি সহজ কাজ। আমার ভলান্টিয়ার বাহিনীকে জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করে দিচ্ছি। শান্তি ভঙ্গ হওয়ার সামান্য মাত্র সম্ভাবনা দেখলেই লাঠিচার্জ্জ করার কড়া হুকুম থাকবে।

আশরাফ চলিয়া গেলে হোমায়েরা ভাবিতেছিল গ্রামে যে এমন মেয়েলোক আছে সেটা তাহার কল্পনারও বাহিরে ছিল। আনোয়ারার মাকে দেখিয়া তাহার মস্ত ভুল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি একদিকে যেমন সহজ সরল, অন্যদিকে তেমনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। কর্তৃত্ব করার একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহার রহিয়াছে। জোর করিয়া তাঁহাকে কর্তৃত্ব চলাইতে হয় না। তাই হোমায়েরাও তাঁহার সামনে বেশী প্রতিবাদ করিতে পারিলনা। তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিস্ময় কর। হোমায়েরা লক্ষ্য করিয়াছে, কোন কোন মেয়ে আলাপের মাঝে মোবারকের প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু মুহূর্ত্তে আনোয়ারার মার চোখের সামনে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি কম আশ্চর্যের নয়।

হোমায়েরা সঙ্গের মেয়েটিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখিল, কিছু দূরে আশরাফ দাঁড়াইয়া আছে। হোমায়েরাকে আসিতে দেখিয়া সে উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, আসুন, ভাবী।

হোমায়েরা নিঃশব্দে নদীর পার ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। আঁধার তেমন জমাট বাধে নাই। হোমায়েরা দিগন্তের দিকে চাহিয়া আর্ত্তনাদের সুরে বলিয়া উঠিল, ইস্!

দিগন্তে আগুন জ্বলিয়াছে। রাত্রিবেলায় সারামাঠ বেষ্টিত হইয়া আছে। ওপারের গ্রাম শ্রেণী ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে! হোমায়েরার ভয়ার্ত্তকণ্ঠ আশরাফকে সচকিত করিয়া তুলিল। সে হাসিয়া বলিল, কিছু না, ভাবী, কিছু না?

আশরাফের হাসি হোমায়েরাকে লজ্জিত করিয়া তুলিলেও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। উচ্চারণ করিল, কিছু না?

আশরাফ বলিল, একদম কিছু না। আপনারা এ-দেশের নাগরিক, কিন্তু এ-দেশ সম্পর্কে কোনই খবর রাখেন না। আপনার দোষ দেই না, ভাবী, এ-আমাদের গোটা সমাজেরই দোষ।

হোমায়েরা বুঝিল আশরাফ যখন সুযোগ পাইয়াছে তখন অনেক কথাই তাহাকে শুনাইবে। কিন্তু তাহার কৌতুহল নিবৃত্ত হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, কিছু না হলেও একটা কিছু ত বটে। কি তাই বলুন দেখি।

আশরাফ বলিল, ভুত, সেরেফ ভুত। গ্রামে ভুতের আড্ডা জানেন ত ভাবী? সুযোগ পেলেই ওরা মানুষকে ভয় দেখাতে আসে। এদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নাই।

হোমায়েরার গা কাটা দিয়া উঠিল। ভুত-প্রেত সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিশ্বাস না করা এক কথা, আর অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সাহসকে সহজভাবে অবলম্বন করিয়া থাকা অন্য কথা। হোমায়েরা শুধু বলিল, যান, আমাকে কি ছেলে মানুষ পেলেন যে ভুতের ভয় দেখাচ্ছেন?

আশরাফ বলিল, আপনি শহুরে মানুষ, আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন; কিন্তু আমরা গ্রামের ছেলে, আমরা বিশ্বাস না করে পারি না। তবে আপনার কোন ভয় নাই, ভাবী। শুনেই যারা বিশ্বাস করে না, ভুত তাদের কিছু করতে পারে না।

হোমায়েরা বলিল, রহস্য রাখুন।

আশরাফ বলিল, রহস্য নয়, ভাবী। এখন দেখছেন, দিগন্ত পুড়ে যাচ্ছে। রাত গাঢ় হলে দেখবেন, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আপনার সামনে আগুন জলে উঠেছে। তারপর আবার সব অন্ধকার। আবার দেখবেন, পিছনে আগুন জলে উঠেছে। রাতে যারা চলাফেরা করে তাদেরে জিজ্ঞেস করুন, তাদের সবাই বলবে ভুতের পাল্লায় পড়ে কোন না কোন দিন মাঠে পথ হারিয়েছে। মাঠের মাঝখানে এই ঝাকড়া মাথা গাবগাছটার নীচে অনেককে মরে থাকতে দেখা গেছে বলেও বহু কাহিনী শুনবেন।

হোমায়েরার বিশ্বাসও হইতেছিল না, ভালও লাগিতেছিল না; কিন্তু ফিরিয়া যাওয়ার কথা উচ্চারণ করিতেও তাহার লজ্জা হইতেছিল।

আশরাফ বলিল, গ্রাম মাত্রই ভুতুড়ে এলাকা। তাই ত সবাই পালাই পালাই করছে। আপনারা যারা ভাগ্যচক্রে আপনা থেকেই নির্ব্বাসিত, তারা বড় বেঁচে গেছেন।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, সহজ করে কোন কথাই বলবেন না দেখছি।

আশরাফ বলিল, সহজ কথার কদর নাই বলেই জানি। সময়টা মাঘের পয়লা। ধান কেটে নেওয়ার পর খড় পড়েছিল। সব শুকিয়ে ঝুনো হয়ে আছে। আগুন জালিয়ে দিয়ে লোকেরা জমি সাফ করছে।

হোমায়েরা বলিল, আর এ-নিয়ে আমাকে এতক্ষণ বোকা বানাচ্ছিলেন।

আশরাফ বলিল, মোটেই না, ভাবী। আমি একটি কথাও বাড়িয়ে বলি নি।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, পুড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষতি কিছু হয় না।

আশরাফ বলিল, অভয় দেন ত ব্যাপারটা বক্তৃতা দিয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দিই। খড়ের গুণ বহুবিধ। ঐ দেখছেন, আহা, অন্ধকার হওয়ায় দেখতে পাচ্ছেন না গরীবের ঘরের অবস্থা। বর্ষায় ঘরে আর বাইরে কোন তফাৎ থাকে না। ছন কিনে চালে দেওয়ারও সঙ্গতি এদের নাই। বৃষ্টির পানি ঠেকাবার জন্য অনেকে খড় কেটে চালে তোলে। ধানের সাথে যা কেটে তোলা হয় তা গরুতে খায়। আর কিছু খড় তুলে জালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পুড়িয়ে দিলেও ক্ষতি নাই, ছাই হয়ে জমির সার বৃদ্ধি করে।

আশরাফ হাসিয়া বলিল, ধান আপনাদের, আর খড় টুকুই আমাদের।

হোমায়েরা হালকা ভাবে বলিল, তার মানে?

আশরাফ বলিল, তার মানে বুঝতে পারলে অনেক কিছুই আপনারা বুঝতে পারতেন। তবে একদিন ঠিকই বুঝবেন। টাকার থলির মুখ উপোড় করে ধরলেও টেবিলের উপরে প্লেট সফেদ ভাতে যখন ভরে উঠবে না তখন বুঝবেন মণিমুক্তা জহরতের সত্যিই কোন দাম নাই।

হোমায়েরা বলিল, আশরাফ সাব, মনে হচ্ছে আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুনিয়ার যত অভিযোগ আমারই বিরুদ্ধে আনছেন।

আশরাফ বলিল মাফ করবেন, ভাবী, অভিযোগ যারা আনতে চায় আমি তাদের দলে নই। নালিশ আমার কাহারও বিরুদ্ধে নাই। তবে সকলের বিরুদ্ধে আমার বলার আছে।

আশরাফ থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, আমি গেঁয়ো লোক ভাবী, আর এ-জন্যই গ্রাম সম্পর্কে ভাবার বদঅভ্যাসটা আমাকে পেয়ে বসেছে। ফলে পাত্রাপাত্র স্থানকাল জ্ঞান আমার থাকে না। বেআদবী করে বসলে, ভাবী, নিজগুণে মাফ করে যাবেন।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, মাফ পাওয়া মনে হচ্ছে আপনার অধিকারেরই অংশ।

আশরাফ বলিল, অনেকের নিকট তাই বটে।

হোমায়েরা বলিল, ভাবুকের বদঅভ্যাস থাকলেই কি লাভ হবে?

আশরাফ বলিল, কিছু না, কিছু না। তবে আমি ভাবছি, এই ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পাই।

হোমায়েরা বলিল, কাজও যে করছেন, দেখতে পেলাম।

আশরাফ বলিল, এ-আপনার স্নেহ, ভাবী। প্রয়োজন এত বেশী যে, এ ভাবে সামান্য কাজ করে কি হবে, সে জন্য অনেক সময় মনটা ভেঙ্গে পড়তে চায়। তবে মহাজন কাজ অনেক সময় মনে সাহস জোগায়। বিন্দু বিন্দু মিলে সিন্ধু।

হোমায়েরা বলিল, আপনার মত উৎসাহী সবাই হলে অবস্থা পালটে যেত।

আশরাফ বলিল, আমার কথা ছেড়ে দিন, ভাবী। তবে, হ্যাঁ, আমরাও ভাবছি আবেদন-নিবেদন করে আসল কোন কাজ হয় না। সাধারণের মনোবল ভেঙ্গে দিলেও অকাজ আর দুষ্কার্য্যের সুযোগ আসে মাত্র। লোকের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করাই আসল কাজ।

হোমায়েরা বলিল, নূতন কথা শুনছি মনে হচ্ছে।

হোমায়েরা ব্যঙ্গ করিল, কি তারিফ করিল তাহার বিচার করিতে আশরাফ অগ্রসর হইল না। সে বলিয়া যাইতে লাগিল, গ্রামের লোকেরও প্রাণ আছে, সে ত আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মোবারকের উৎসাহকে

দাঁড় করিয়ে রাখাই আমার পক্ষে কঠিন কাজ হয়ে উঠছে।

মোবারকের নাম উঠায় হোমায়েরা সতর্ক হইয়া উঠিল। তবে অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিল, আগপিছ কিছু না ভাবিয়া আশরাফ নিজের কথার ঝোঁকেই কথা বলিয়া যাইতেছে।

আশরাফ বলিয়া যাইতে লাগিল, গ্রামে পরিসর সঙ্কীর্ণ, তাই কুৎসিত দিকটি সহজেই চোখে পড়ে। তাছাড়া কাজের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ না হওয়ায় গ্রামের লোকের মনটাও ছোট হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বাহ্যিক দিকটিকে বড় করে দেখতে গিয়ে তার সমস্ত মহত্বকে অস্বীকার করাটাকে কিছুতেই আমি যথার্থ দেখা মনে করতে পারি না। যারা শুধু এই কুৎসিত দিকটিকেই তুলে ধরতে চান, তাদেরে আমি গ্রাম্য সমাজের দুশমন বলেই মনে করি। আমি যে দেখেছি, অতিথির ক্ষুধা মিটাবার জন্য মুখের গ্রাস এই গ্রামের লোকই তুলে দিচ্ছে। তার মনের এই উদার দিকটাকে মহৎ কাজে লাগানো যাবে না, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

হোমায়েরা দেখিল আশরাফকে বক্তৃতার ঝোঁক চাপিয়া বসিয়াছে। কিন্তু এ দিকে রাতও বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া সে উদ্বিগ্ন বোধ করিতে লাগিল।

আশরাফ জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি আপনাকে বিরক্ত কর্ছি, ভাবী?

হোমায়েরা জওয়াব দিল, কিছু মাত্র না।

আশরাফ বলিতে লাগিল, গ্রামে খারাপ লোক আছে, সে আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি দেখছি ভাললোকের সংখ্যাই বেশী। তবে ভাললোকেরা বড় নিশ্চেষ্ট। তাই খারাপ লোকের এত দাপট। ভাল লোককে সক্রিয় করে কাজ করে যেতে হবে। এতে নিশ্চয়ই আমাদের ধৈর্য্যের দরকার।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, আমি ত আর তর্ক তুলছি না।

আশরাফ হাসিয়া লজ্জিতভাবে বলিল, তর্ক করার রোগ আমার আছে। তবে এটা হয়ত আমি বলতে পারি, এর অনেক কিছুই আপনি জানেন না।

আশরাফ এমন সহজভাবে কথা বলিল যে, হোমায়েরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, সত্যি অনেক কিছুই জানিনা। আর এ-দিকটা ভেবে দেখারও ফুরসত হয় নাই।

আশরাফ বলিল, তবেই বুঝুন, হয়ত হঠাৎ একটা ধারণা করে বসতেন, গ্রামের লোকেরা বড় সরল। আবার কোন দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়লে হয়ত মনে করে রাখতেন, গ্রামের লোকের মত এমন পাজি আর হয় না। দেখুন, আমি বলছি, দু'টিই সত্য আবার কোনটাই সত্য নয়। শহরের নূতন পরিবেশে গ্রামের লোক এদিক ওদিক চনমন করে তাকায় বলে গ্রামের লোককে বোকা ঠাওরাবেন না। তফাৎ যদি কিছু থাকে তা হলে সেটা শুধু মাত্র পরিবেশের।

হোমায়েরা তাহার কথা শুনিতেছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গভীর দৃষ্টিতে হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিয়া আশরাফ আবার বলিল, দেখুন, আমি পাড়া গাঁয়ের মুর্খ লোক, আপনাদের সামনে বড় বড় কথা বলতে আমার লজ্জা হয়, তবে নানা লোকের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি, মানুষকে ছোট করে দেখার উপায় নাই। সকল মানুষের মনেই খোদার আসন পাতা রয়েছে। যাকে পাপী, সমাজের দুষ্টক্ষত বলে ঘৃণা করে এড়িয়ে চলেন, তার সাথেও মিশে দেখুন, তার মনেও এমন মহত্ত লুকিয়ে আছে, সুযোগ দিলে যা তার অন্ধকার জীবনকেও দীপ্ত করে তুলতে পারে। দোষগুণ নিয়েই মানুষ, এ-কথাটা ভুলে গেলেই গোল বাধে, আর গোল বাধায় মনের অতিরিক্ত স্পর্শ কাতরতা। আমার যেমন ধৈর্য্য নেই, মোবারক তেমনি স্পর্শকাতরতা মুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এই খানেই হয়েছে আমাদের বড় অসুবিধা।

হোমায়েরা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে সামনে চাহিয়া সুতারার স্রোত ধারা দেখিতেছিল। বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া সুতারার এই হারাইয়া যাওয়ার ধারাটির কোন অর্থই তাহার কাছে ছিল না। বাহুল্য জিজ্ঞাসা হইতে চিরদিনই সে নিজের মনকে মুক্ত রাখিয়াছে। আশরাফের এই বক্তৃতা যে তাহার মনে দাগ কাটিতেছিল, তাহা নয়। সে বলিল, এখন বোধহয় ফেরা দরকার।

আশরাফ ব্যস্ত হইয়া বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

কিন্তু কথা তাহার বন্ধ হইল না। সে বলিতে লাগিল, নীর ফেলে ক্ষীর যদি আলাদা করে নিতে পারেন ভাল, কিন্তু না পারলে আফসোসের কিছু নাই। এই যে আমাদের সেক্রেটারী মসিহুদ্দিন সাব, তার মত বৈষয়িক লোক আর হয় না। তাঁর স্বার্থপরতা এক সময় আমার মনকে অত্যন্ত বিরূপ করে দিয়েছিল। তাঁকে আমার ঘৃণা হত। কিন্তু তার সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, এটাই সব নয়। একটি বিচিত্র সমন্বয় যদি তার জীবনে না থাকতো তা হলে এমন অকুণ্ঠভাবে তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারতেন না। পারতেন কি, আপনিই বলুন?

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, আপনার কোন কথাই ত আমি অস্বীকার করছি না।

আশরাফ বলিল, অস্বীকার করছেন না ঠিক, তবে

স্বীকারও যে করছেন না সেও আমি বুঝতে পারছি। পাগলের প্রলাপ মনে করে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছেন।

হোমায়েরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, আমি হাসছি না।

আশরাফ বলিল, আপনারা শহরের লোকেরা আমাদের চিরদিন উপেক্ষা করে আসছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি এটা কি ভাল হচ্ছে।

হোমায়েরা বলিল, এ-তর্ক আমি ঠিক বুঝি না। গ্রামের লোকেই শহরে যাচ্ছে, নূতন শহর গড়ছে। কাজেই তফাৎ কোথায়?

আশরাফ বলিল, গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গীও বিসর্জ্জন দিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের দিকে আর ফিরে তাকাতে চায় না। ফলে ক্রমেই দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। এর উপর সেতু রচনা যে দরকার সেদিকে কারো নজর পড়ছে না।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, দুনিয়ার ভাবনা দেখছি আপনার মাথায় জড় হয়ে আছে।

আশরাফ বলিল, হাসির কথা নয়, ভাবী, বড়ই দুর্ভাবনার কথা। আমাদের ক্ষুদ্রতা, মহানুভবতা, দুর্ব্বলতা শক্তি, সংঘাত-দ্বন্দ নিয়ে আমরা একদিকে পড়ে আছি, শহরের কথা আপনিই জানেন ভাল করে। এই দুয়ের যোগসূত্র না থাকায় সারা সমাজই যে বন্ধ্যা হয়ে পড়লো, ভাবী, এ-কথাটি কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন।

হোমায়েরা বলিল, আমি কিছুই ভেবে দেখিনি।

আশরাফ বলিল, এ-হলো আপনাদের অহঙ্কারের কথা। আপনারা ভবেন, আমাদের দেওয়ার কিছুই নাই। কৃষি নিয়ে যদি আমরা না থাকি, আপনারা কোথায় থাকবেন ভাবুন আর কৃষ্টিতে আমাদের দান করার একেবারেই যে কিছু নাই তা ভাববেন না। বরঞ্চ গ্রামে গৃহস্থ আর মসজিদের ইমাম সাবের ঘরেই কৃষ্টি কিছুটা আছে। কারণে অকারণে কোরানের আয়াত আর ফারসী বয়ত তাদের মুখে গণগণ করে উঠে। আপনাদের জীবনে কি আছে? ইংরেজী শিখা আপনাদের জীবনে হয়েছে ব্যর্থ আর আমাদের জীবনে আরবী-ফারসী শিখা অত্যন্ত সংকীর্ণ খাদে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, তাই ত আমাদের সমাজজীবন মুঞ্জরিত হলো না। সমাজের দুই অংশ দুই-দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর বিরোধিতার মাঝে নিঃশেষিত হয়ে গেল। সমন্বয়ের মাঝে জীবনের শিখা ও সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারলো না। তাই ত আমরা এত অসুন্দর, ঠিক বলিনি কি, ভাবী!

হোমায়েরা বলিল, আপনার বক্তৃতা আমার বেশ ভালই লেগেছে।

আশরাফ বলিল, ব্যঙ্গ করুন আর যাই করুন, আমার কথাগুলো আপনাকে শুনাবোই। এখানকার শ্রোতারা এটা বুঝবে না, আর যারা চেষ্টা করলে বুঝতে পারেন তারা শুনবেন না। কাজেই সুযোগ যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, আরও বক্তব্য আছে নাকি?

আশরাফ বলিল, আছে না কি মানে? বলে এ-দুঃখ শেষ হবার নয়। এ-যে কি জ্বালা আপনাকে বুঝাবো কি করে, ভাবি! সবাই গ্রামমুখী হয়ে থাক, সেটা আমি চাই না। সমাজ ভাঙ্গছে, ভেঙ্গে নূতন শৃঙ্খলা গড়ে উঠছে। গ্রামকে আরও গ্রাম্য করে তোলাই ত আমাদের লক্ষ্য নয়। গ্রামের লোককে পরিবর্ত্তিত করতে হবে। শিক্ষা বিস্তারিত হবে, লোক স্বাস্থ্যবান হবে, আগামীকাল গড়ে তোলবে। আপনাদের সমস্যাই আগামীকালের সমস্যা। গ্রামকে আগামীকালের দিকে এগিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

হোমায়েরা বলিল, আপনি এত কথা বলছেন যে আমার পক্ষেই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।

আশরাফ বলিল, বুঝতে না চাইলেই অসুবিধা হয়। আপনারা দয়া করে গ্রামের লোক সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলবেন, তাদেরে চিত্রিত করবেন, তাতেই মহাকাজ হয়ে গেল মনে করে নিজেরাই নিজেদের বাহবা দেবেন, তাতে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের হাসিই আসে। সমাজ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনাদের মত নূতন লোক তাদের সমস্যা নিয়ে বেশী সংখ্যায় আসবে। তাদের কথাই সবাইকে শুনতে হবে। গত যুগ নিয়ে টানাটানি করে লাভ নাই। নূতন লোক নিয়ে আমার পথ আপনারা গ্রামকে দেখান, পরিবর্ত্তন সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তুলুন, তার মনের সাথে আপনার মনের সমন্বয় সাধন করে সমাজকে সুন্দর ফলপ্রসূ করে তুলুন, গ্রামের দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবেন না, এই আমার অনুরোধ।

হোমায়েরা বলিল, আশরাফ সাব, আপনি বলেছিলেন গ্রামে লোককে ভূতে পায়, কথাটা কি সত্যি?

আশরাফ বলিল, এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

হোমায়েরা বলিল, বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি। আপনার বক্তৃতা পরে শুনার ইচ্ছা থাকলো।

আশরাফ বলিল, সুযোগ পেলে যে তা আমি হাতছাড়া করবো সেটা কিছুতেই ভাববেন না।

মাথার কাছে জানালাটি খোলা ছিল। বিড়াল আসিয়া লাফাইয়া বিছানায় পড়ায় সখিনার কাঁচাঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সিতারা, সাবের, মাজেদা একপাশে ঘুমাইতেছে।

মোবারকের জায়গা খালি। মোবারক তাহার সঙ্গেই শুইয়াছিল। সখিনা ছেলে মেয়েদের মাথার বালিশ ঠিক করিয়া দিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও মোবারককে ফিরিতে না দেখিয়া ধীরে ধীরে বিছানা হইতে নামিল। সখিনা দেখিল দুয়ার ভেজানো রহিয়াছে। সখিনা নিঃশব্দে বারান্দায় আসিল।

বারান্দার কোণায় হাসনাহেনার গাছ। তাহার পাশে থামে হেলান দিয়া মোবারক আসমানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসমানে হালকা খণ্ড খণ্ড মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে।

সখিনা যে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মোবারক তাহা টের পায় নাই। আজ সারাদিন মোবারক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে সখিনা তাহা জানে না, মোবারক নিজেও হয়ত তাহা জানিত না। সন্ধ্যাবেলা সে বাহির হয় নাই। সিতারা, সাবের আর মাজেদাকে সে পড়া বলিয়া দিয়াছে। তাহাদের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইয়াছে। খাওয়া দাওয়ার পরই সে শুইয়া পড়িয়াছিল।

সখিনা কিছু সময় তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিল। মোবারক চমকাইয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইল। সখিনাকে দেখিয়া সে কোন কথা বলিল না, আবার সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল। সখিনা কিছু সময় পর বলিল, বাহিরে বড় ঠাণ্ডা, চলেন ভিতরে যাই।

মোবারক বলিল, হ্যাঁ চল।

কিন্তু মোবারক নড়িল না। সখিনা বলিল, বাইরে আরও দাঁড়াতে যদি চান তা হলে আলোয়ানখানা এনে দেই।

মোবারকের কোন জওয়াব না পাইয়া সখিনা ঘরে গেল। ছেলেমেয়েদের গায়ে লেপ ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া আলোয়ান হাতে সে বাহিরে আসিল।

মোবারকের গায়ে আলোয়ান জড়াইতে জড়াইতে বলিল, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে ডেকে আনলেন না কেন?

মোবারক বলিল, আমার ঘুম না হলে তোমারও ঘুমাবার দরকার নাই, না?

সখিনা জওয়াব দিল, একরাতে না ঘুমালে কি হয়।

মোবারক এ-ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত বলা যায় না। হঠাৎ সে অনুভব করিল, সখিনা শীতে কাঁপিতেছে। সে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, চল, ভিতরে চল।

সখিনা বলিল, চলুন।

ভিতরে আসিয়া মোবারক বিছানার পাশে বসিয়া পড়িল। সখিনা পাশে বসিয়া স্বামীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি একটি কথা করবো, রাগ করবেন না?

হারিকেনের ক্লান্ত আলো সখিনার মুখের উপর পড়িয়াছে। মোবারক তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি কি তোমার কথা শুনে রাগ করি?

না।

জওয়াব দিয়া সখিনা মৌন হইয়া রহিল। মোবারক আবার আনমনা হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সখিনা জিজ্ঞাসা করিল, আজ আপনি এত ভাবছেন কি?

মোবারক চকিত হইয়া বলিল, শুধু আজই কি ভাবছি। তেমন কিছুই ত ভাবছি না।

সখিনা বলিল, আমি মুর্খ মেয়ে মানুষ, যা বলবেন তাই বিশ্বাস করবো। আপনার মনের অংশ নেওয়ার সাধ্য আমার নাই, কি করবো, এ-দুঃখ আমর যাবার নয়।

গভীর দৃষ্টিতে সখিনার মুখের দিকে চাহিয়া মোবারক বলিল, আমার কোন কথাই তো তোমার অজানা নাই।

সখিনা মোবারকের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, আমি যদি আপনার উপযুক্ত হতাম তা হলে আপনার মনের অনেক ভারই হালকা করে দিতে পারতাম। আপনার মনের দুঃখ আমার সহ্য হয় না।

মোবারক স্ত্রীর মুখ খানা তুলিয়া ধরিয়া চাহিয়া রহিল। সরল গ্রাম্য বালিকা, মোবারক একে একে রকম উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে। তাহার কাছে সখিনার একান্ত আত্মসমর্পণকে সে কৃতজ্ঞতা বলিয়া মনে করিয়াছে। আজ অনেক বছর হইয়া গেল সখিনা কখনও তাহার কথার উপর কথা বলে নাই, তাহার ইচ্ছার উপর ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই, ইহাকে মোবারক গ্রাম্য বালিকার স্বাভাবিক বিনয় বলিয়া মনে করিয়াছে; কিন্তু ইহাতে যে কতখানি সমঝোতা, দরদ আর সহৃদয়তা রহিয়াছে আজই প্রথম মোবারক তাহার পরিচয় পাইল।

মোবারক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করো?

সখিনা জওয়াব দিল, না।

মোবারক বলিল, তবে তোমার মনে এটা এলো কেন, আমি তোমাকে নিয়ে সুখী নই!

সখিনা অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার মনের বোঝা বহন করবো, কিন্তু সেটা পারছি না, সে কথাই আমি বললাম।

মোবারক বলিল, আমার মনে এমন কোন ভার নাই, যা তুমি আমি দুজনে মিলে বহন না করতে পারি। তোমাকে আমি মন হতে দূরে সরিয়ে রাখিনা, তবে বাহুল্য মনে করে হয়ত অনেক কথাই বলা হয়ে উঠে না।

সখিনা অনেক দ্বিধা করে শেষে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি তাঁকে এখনও ভালবাসেন না ?

মোবারক মনে মনে চমকিয়া উঠিল। সখিনার চোখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য সে পাঠ করার চেষ্টা করিল। সেখানে সে সরলতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। এই মেয়েটিকে ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা মোবারকের কোন দিন ছিল না, তাহাছাড়া প্রশ্নটি সরল মনে করা হইলেও কথার প্যাঁচে এড়াইয়া যাওয়ার উপায় নাই, মোবারক তাহা বুঝিল। আজই প্রথম মোবারক বুঝিতে পারিয়াছে যে মেয়েটিকে সে সাদাসিদা বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে তাহার চোখে কিছুই এড়ায় না। একান্ত সন্তর্পনে নিজের এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সে আড়াল করিয়া চলিয়াছে, মোবারককে সুখী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কোন প্রশ্ন আগে কখনও করে নাই।

মোবারক বলিল, সোজাসুজি তোমার প্রশ্নের জওয়াব দিলে তুমি কি ভাবে গ্রহণ করবে ?

উত্তরটা মনে মনে ভাবিয়া নিয়া সখিনা বলিল, আমি আপনার উপযুক্ত স্ত্রী, আপনার সকল কথাই আমি বহন করতে পারি, এটা জানতে পারার মত সুখের আর কিছুই আমার কাছে হবে না।

মোবারকের কাছে হীনতাই যে সখিনার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছে, মোবারক তাহা বুঝিল। ইহার কোন কারণ আছে কি না, সে জানে না। সম্ভবতঃ তাহার ধারনা হইয়াছে, মোবারক তাহাকে উপযুক্ত স্ত্রী মনে করে না বলিয়া মনের সকল কথা খুলিয়া বলে না।

মোবারককেই চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সখিনা আবার বলিল, আপনার কষ্ট হলে জওয়াব দিয়ে কাজ নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মোবারক বলিল, কিন্তু তুমি যে সহ্য করতে পারবে না।

সখিনা দৃঢ়তার সহিত বলিল, আমাকে এত নীচ আর স্বার্থপর ভাববেন না। এতেই আমার দুঃখ।

কিন্তু মোবারক তবু ইতস্তত করিতে লাগিল। মিথ্যা বলিয়া সখিনার কৌতুহলের ইতি করার সম্ভাবনা থাকিলে সে হয়ত তাহাই করিয়া বসিত, কিন্তু ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি হইবে বেশী, সে তাহা বুঝে।

সখিনা আবার জিজ্ঞাসা করিল, হোমায়েরা আপাকে আপনি এখনও ভালবাসেন ?

মোবারক জওয়াব দিল, হ্যাঁ, সত্যি এখনও ভালবাসি।

সখিনার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া মুখে রক্ত ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, তা হলে ?

মোবারক বলিল, তা হলে বলে এতে আর কিছু নাই। তোমাকে পেয়ে আমি যে কি সুখী হয়েছি সে বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস করো না।

সখিনা বলিল, এ-ভাবে বলে আমাকে অপরাধী করবেন না; কিন্তু আপনার দুঃখও যে আমি সহ্য করতে পারি না

মোবারক বলিল, এতে তুমি ব্যস্ত হয়োনা বা আমাকে ভুল বুঝো না। যে দুঃখের কথা তুমি বারবার বলছ, সে দুঃখের কিছুটা যদি থেকেও থাকে তা হলে তা দুঃখবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাত হয়েছে, আর নয়, চল শুয়ে পড়ি।

সখিনা বলিল, আসুন।

মোবারক বলিল, তবে তার আগে তুমি বল তুমি আমাকে সামান্যমাত্রও ভুল বুঝো নাই।

সখিনা স্বামীর দিকে চাহিয়া মধুর ভাবে হাসিল। মোবারক দুই বাহুর দৃঢ় আলিঙ্গনে তাহাকে বুকে টানিয়া নেয়। অতি পরিচিত এই স্ত্রীর সহিত আজ সে নুতন পরিচয়ের উল্লাস বোধ করিতেছিল।

মোবারকের ঘুম আসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ কদের শব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল, প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পরে তাহার খেয়াল হইল, সখিনা তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। মোবারক চুপ করিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, কান্নার বেগ দমন করার জন্য সখিনা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না।

মোবারক দৃঢ় হাতে সখিনাকে তাহার দিকে ফিরাইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদছো ?

সখিনা কান্নার মাঝেও হাসি টানিয়া আনার চেষ্টা করিয়া বলিল, কৈ, না ত।

মোবারক তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, ছিঃ! এই না তুমি বলেছিলে, তুমি আমাকে ভুল বুঝনি!

সখিনা বলিল, আপনিও আমাকে ভুল বুঝবেন না। একটি বনের পশু পুষলেও মানুষের প্রাণ তার জন্য কাঁদে। আর এ ত মানুষ। তাঁর জন্য আপনার স্নেহ থাকবে না, আপনাকে এত অমানুষ করে তুলতে চাওয়ার মত অমানুষ আমি হবো ভাববেন না। এতে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরার মত ক্ষুদ্রতা আমার মনে যেন কখনও না আসে।

মোবারক তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া বলিল, তা হলে কাঁদছো যে ?

সখিনা মৃদু ভাবে হাসিয়া বলিল, এ অবুঝ কান্নার কোন অর্থ নাই।

সকাল সকাল ঘুম হইতে উঠার অভ্যাস হোমায়েরার

নাই। তবে নুতন জায়গার জন্যই সম্ভবতঃ খুব ভোরে হোমায়েরার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার আর নাই। তবে সূর্য্য তখনও উঠে নাই।

বাড়ীতে কাজের ব্যস্ততা যে ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে সে তাহা টের পাইতেছিল, তবে তাহার উঠিয়া পড়ার কোন তাগিদ ছিল না।

হোমায়েরা চুপ করিয়া শুইয়া রহিয়াছিল। বাড়ীর বাহিরেই মসজিদ। ফজরের নামাজ আদায় করিয়া মসিহুদ্দিন অন্দরে আসিতেছিলেন। তিনি সুর করিয়া করিয়া 'বেবখশায়ে বরহালে মা' প্রভৃতি বয়াত অনুচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া মুহূর্তে, সকালের অনেকটা নীরব পরিবেশে ইহা হোমায়েরার কাছে ভাল লাগিল। সে আশ্চর্য্য না হইয়াও পারিল না। মসিহুদ্দিন বুদ্ধিমান হইলেও অশিক্ষিত, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই অশিক্ষিত লোকের মুখে ফারসী বয়াত!

সে যাহাই হউক, হোমায়েরা শুইয়া শুইয়া অনুভব করিতেছিল, একটি দুর্লভ নির্ম্মলতায় সে বাড়ীর সে সময়কার আলোবাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিবেশ মনকে আনবিল আনন্দে ভরিয়া দিতে পারে।

হোমায়েরা দেখিল মসিহুদ্দিনের ছোট মেয়ে জানালা দিয়া উঁকি মারিতেছে। সে তাহাকে হাতের ইশারায় ডাকিল।

কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি?

রেজিয়া।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পাড়াশোনা করো না।

করি। কাল স্কুলে আপনি যে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, তার জওয়াব আমি ঠিক ঠিক দিয়েছিলেম না?

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, ও মনে পড়েছে। কাল তোমাকে স্কুলেও দেখেছি। হ্যাঁ ঠিক, ঠিক জওয়াব দিয়েছিলে।

রেজিয়া বলিল, আচ্ছা বলুন ত আমি ভাল, না আপা ভাল?

কোথায় তোমার আপা?

ডেকে নিয়ে আসছি।

রেজিয়া ছুটিতে উদ্যোগ করিলে হোমায়েরা বাধা দিয়া বলিল, এখন থাক। পরে পরীক্ষা করে দেখবো তুমি ভাল, না তোমার আপা ভাল।

রেজিয়া বলিল, কেন কাল ত দেখলেন। আপনি যা জিজ্ঞেস করলেন, তার একটিও জওয়াব দিতে পারলো না।

হোমায়েরা বলিল, তা হলে ত বলতে হয় তুমিই ভাল।

রেজিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিল, আমার বড় আপা বলেছেন, আমাকে শহরে নিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে আমি পড়বো।

বেশ ত! খুবই ভাল কথা। তারপর কি করবে?

রেজিয়া সহজভাবে বলিল, আপনার মত হবো।

হোমায়েরা হাসিয়া বলিল, শহরে কখনও গিয়েছ? শহর তোমার কেমন লাগে?

রেজিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, শহরে আবার যাইনি! কতবার গিয়েছি বড় আপার সাথে। শহরে গেলে গ্রামে আর আসতেই ইচ্ছে হয় না।

তারপর রেজিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, ইস্ রে! আপনার পানি দেওয়ার জন্য আম্মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন। যাই, তা না হলে আম্মা এখনই বলবেন, কোন কাজের মেয়ে নয় রেজিয়া।

রেজিয়া আর দাঁড়াইল না। বেলা একটু গড়াইতেই আশরাফ আসিল। আশরাফ কতকগুলি কথা বলিতে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। হোমায়েরা তাহাকে আমতা আমতা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার বক্তৃতা শুরু করবেন নাকি?

আশরাফ বলিল, বক্তৃতা করতে হলে ত ভাবনা ছিল না। সূত্র একবার ধরতে পারলেই হল। তারপর আশে পাশে না তাকিয়ে বলে যেতে পারি। কিন্তু গম্ভীরভাবে দুয়েকটি কথা বলতে গেলেই মুশকিল হয়, তখন ভাবনায় পড়ি।

নির্ভয়ে বলুন।

আশরাফ বলিল, চলুন না, গ্রামের এদিক সেদিক দেখে আসবেন।

হোমায়েরা বলিল, যা দেখবার ত দেখলামই। আর কি দেখবো। কোথাও পশু বিদ্যালয় করেছেন নাকি?

আশরাফ হাসিয়া বলিল, এতদূর এখনও অগ্রসর হতে পারিনি। তবে যা অবস্থা করে তুলছেন, সবগুলিই হয়ে যাবে। আমি বলছিলাম, জোবায়েরের বাড়ী আমাদের গ্রাম থেকে দূরে নয়, আর তার মা আপনাকে দেখতে চান।

হোমায়েরা বলিল, বেশ ত, তাকে নিয়ে আসুন গে।

আশরাফ বলিল, তিনি আসতেন। কিন্তু অসুস্থ বলে আসতে পারছেন না। তাছাড়া জোবায়েরকেও দেখে আসতেন। সে দমে দমে আপনার নামই বলে থাকে।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, জোবায়ের সাব এখন কেমন আছেন?

আশরাফ বলিল, মন্দের ভাল। এখন আগের মত মারমুখো পাগলামী নাই। প্রায়ই চুপ করে থাকে।

কখনও বা কেঁদে উঠে। আবার সময় সময় ইংরেজী বাংলা কবিতা আওড়াতে থাকে।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, উনি কি বাইরে বের হন।

আশরাফ বলিল, না। আগেও জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা ছিল। এখন আর জিঞ্জিরে বাঁধা নেই। তবে একবার ছাড়া পেয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল, অনেক খোঁজাখুজি করে আনা হয়। সে জন্য ঘরে তালাবদ্ধ থাকে।

হোমায়েরার মুখ সমবেদনায় করুণ হইয়া উঠিল। আশরাফ বলিল, আমরা একসাথে ছিলাম। জোবায়ের বরাবরই ভাবুক প্রকৃতির ছিল। স্কুল হতেই আমরা কত আশা করেছি, সে বড় কবি হবে। কিন্তু এমন কেন হলো।

হোমায়েরা নিজের অজান্তেই বলিয়া উঠিল, আমাকে এ-সব শুনাচ্ছেন কেন?

আশরাফ লজ্জিত হইয়া বলিল, আপনাকে শুনাচ্ছি না। তবে আপনি যদি একবার তাকে দেখতে যান, তাই বলছিলুম।

হোমায়েরা বলিল, না, না, বলুন। উনি ভাল হবেন বলে কি আশা করা যায়?

আশরাফ বলিল, সে কিছুই বলা যায় না। সবই আল্লার হাতে। তবে সবাই ওর ভাল হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওর মা! একটি মাত্র ছেলে তাঁর। তাঁর দুঃখ যদি দেখতেন। যাবেন কি, ভাবী, একবার?

হোমায়েরা করুণ স্বরে বলিল, আমাকে এ-অনুরোধ আর করবেন না আশরাফ সাব। আমার সংস্পর্শে যারা এসেছে, তাদের সবাই জ্বলছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার জীবনে অভিশাপ আছে। দুনিয়াকে জ্বালাবার জন্যই আমার জন্ম। অনুশোচনার আগুন আমার জন্যও জমা হয়ে আছে মনে হয়।

হোমায়েরার কণ্ঠস্বরে এমন এক কাতরতা ছিল, যা আশরাফের মন স্পর্শ করিল। সে ব্যগ্রভাবে বলিল, আপনি খামখা নিজেকে অপরাধী করছেন, ভাবী। এ-সব ব্যাপারে আপনার ত করার কিছুই ছিল না। তাছাড় আমরাও ত দেখছি, সবাই মিলে আপনার প্রতি ত কম অবিচার করে নাই।

হোমায়েরা মৌন হইয়া রহিল, এ-দিকের লোকে আপনাকে না চিনলেও আপনি তাদের অজানা নন। এই যে আমার চাচি, মসিহুদ্দিন চাচার স্ত্রী, তিনি আপনাকে দেখার পর কি বলছেন জানেন? তিনি বলছেন, আহা, না জেনে কত অন্যায় কথাই না এর সম্বন্ধে আমরা ভেবেছি, খোদা যেন এ-জন্য আমাদের মাফ করেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই কোথাও মস্ত গলদ রয়ে গেছে, সেটা কেউ খোঁজ করে দেখলো না।

হোমায়েরা ম্লান হাসিয়া বলিল, থাক ওসব। গোয়েন্দা লাগিয়ে এ-সব খোঁজ করে বেড়াবার দরকার নাই। আমি যা আছি, সেই ভাল আছি।

আশরাফ বলিল, সবই কিছু কিছু বুঝি, ভাবী। যাক্, আমি আর ওখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে বলবোনা; কিন্তু কথা তুলে আপনাকে যে আঘাত দিলাম সে জন্য আমার ক্ষোভ থাকবে।

হোমায়েরার রওয়ানা হওয়ার জন্য তোড়জোড় চলিতেছিল। ঘাটে আসিয়া দেখা গেল, মাঝিদের একজন খাইতে গিয়া তখনও ফিরে নাই। হয়ত কোথাও তামাকের আড্ডায় মশগুল হইয়া আছে। তাহাকে খোঁজার জন্য আরেকজন মাঝিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মোবারককে একটি বারের জন্যও এদিকে দেখা যায় নাই। ইহাতে আশরাফ অসন্তুষ্ট ছিল না; কিন্তু মনে তাহার উদ্বেগ লাগিয়াই রহিল। তাহাছাড়া আরও কতকগুলি কারণে সে শান্তি পাইতেছিল না।

হোমায়েরা গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মসিহুদ্দিনের সহিত আলাপ করিতেছিল। গ্রামের মেয়েরা সাধারণতঃ দিনের বেলা নদীর পারে আসেন না। কিন্তু হোমায়েরাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য তাহাদের কেহ কেহ নদীর পার পর্য্যন্ত না আসিয়া পারেন নাই। তাহারা ছাতি দিয়া আড়াল রচনা করিয়া এক জায়গায় জড় হইয়াছিলেন। রেজিয়া বাপের পাশে দাঁড়াইয়া হ করিয়া হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

আশরাফ তাহাদের অনুমতি লইয়া গ্রামের দিকে ছুটিয়া গেল। বলিয়া গেল, এই আমি যাচ্ছি আর আসছি!

আশরাফ যখন ফিরিয়া আসিল তখন হোমায়েরা নৌকায় উঠিয়া গিয়াছে। মাঝিদের সকলে ফিরিয়াছে। রওয়ানা হইতে দেরী করিয়া দেওয়ার জন্য একজন মাঝিকে বকিতে বকিতে আরেকজন মাঝি বাঁধন খুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়ার তোড়জোড় করিয়াছিল।

নদীর পার হইতে আশরাফ ডাকিল, ভাবী, ভাবী, মোবারকের ছেলেমেয়েরা আপনাকে দেখতে এসেছে।

যে মাঝিটি নৌকা ভাসিয়া দিতেছিল, তাহাকে বাধা-দিয়া আশরাফ আবার ডাকিল, ভাবী, ভাবী, মোবারকের ছেলেমেয়েরা আপনাকে একবার দেখতে চায়।

নৌকার ভিতর হইতে হোমায়েরা নৌকা ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য হুকুম করিল। নদীর পারে আশরাফের হাত ধরিয়া সিতারা, সাবের ও মাজেদা দাঁড়াইয়া রহিল। আশরাফের মুখে কথা সরিল না। তাহাদের চোখের সামনে নৌকা শুতারার বাঁক ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শূন্য দুপুর

চৌধুরী লুৎফর রহমান

ইজিচেয়ারের হাতলে পা ছড়িয়ে
অলস আঙুলের ফাঁকে অবলীলা ক্রমে সিগারেটটা রেখে
কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার সংখ্যাহীন রিং ছড়িয়ে চলি,—শুধুই ছড়িয়ে চলি।

আজ রোববারের ক্যালেণ্ডারটা
হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।
যেমন করে তাকায় বাইরের লনে বাদামী রোদের মুঠো মুঠো প্রসন্নতা।
ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলগুলো অনেক ফুটফুটে
পাম গাছটারও গা বেয়ে নামে অন্তরঙ্গতা
আর ইঁটের খোয়াভাঙা লাল-নীল ফুলগুলোতে
ফোটা ফোটা স্বপ্নের অপরিমেয় বিস্ময়।

সারাটা দুপুর ঘাসের শিরিষে
হলুদে উজ্জ্বল রোদ শুধু লুটোপুটি খেয়ে চলে।
আর পিচঢালা পথের দু'পাশে ঝাউয়ের হাওয়ায়
সুরের এস্রাজ বাজিয়ে চলে।
তবুও বাইরে তাকিয়ে থাকি
তেমনি অলস, তেমনি উদাস, তেমনি ভাবনার সহজ খেয়ালে।

জীবনের কোথাও খেয়াল নেই,
জীবনের কোথাও বিশ্রামের অঢেল অবসর নেই
জীবনের কোথাও স্বপ্নের একক দীপ্তি নেই
জীবনের কোথাও শান্তির একনিষ্ঠ তন্ময়তা নেই।
তবুও মাঝে মাঝে এমনি একটি রবিবারকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি
এমনি একটু অবসরে বারান্দার এম্‌নি আয়েসে
নিজেরি মনে তাকিয়ে খুঁজে পাই,
বহু শীত-গ্রীষ্ম আর বসন্তের আব-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা
আমার নিভৃত এক সত্বাকে।

যদিও জীবন অহরহ অপমৃত্যুর সঙ্গীন উচিয়ে
সত্বার সূর্য্যের আলো কেড়ে নেয়
যদিও জীবন সহজ সরল রেখায় পথ কেটে
জীবনের শেষ মাইলষ্টোনকে চিহ্নিত করে না
যদিও জীবন বহু উপত্যকা-অধিত্যকা
চড়াই উৎরায়ের বন্ধুর যাত্রায়

বার বার উপল আর কাঁকরের পথে
ফণিমনসায় ক্ষতবিক্ষত রক্তিম করে তোলে দুই পা।
তখন সামনের দিকে তাকিয়ে জাগে হতাশার মেঘ
আর বুকের অতলে গর্জ্জন করে এক বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের গান
আর সূর্য্যমুখীর মতোন হৃদয়ে তবুও আশা জেগে থাকে এতটুকু হলুদ
রঙিন সোনালী রোদ্দুরের আশা।

সেদিন সেই ভেঙে পড়া দুর্ব্বল মুহূর্তকে স্মরণ করে
সেই পেছনে হারিয়ে যাওয়া বহুতর সন্দেহ
অপমৃত্যু, অপচয় ও গ্লানির মুহূর্তকে স্মরণ করে
আজো এই রোববারে ছুটির অবসরটুকুর সব মাধুর্য্য নিঃশেষে উবে যায়
আর দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠে সোনালী শূন্য দুপুর
ধূসর উদাস চোখ হারিয়ে যায় নির্লিপ্ত
নিস্পৃহ নিরাসক্ত বেদনার ক্লান্তিতে
আকাশের ধূ ধূ তেপান্তরে।
ভাবনার এই অলস অবসরে
যদি দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে ওঠে
তা'হলে এটুকু প্রতিজ্ঞা লিখে নেবো মনে
জীবনটিকে এমনি বঞ্চনা করার বেদনায়
কোনদিন যেনো মনে আর ব্যর্থতার
শূন্য দুপুর না নিয়ে আসে
না নিয়ে আসে।

নজরুলের হাসি

শ্রী জয়গোবিন্দ ভৌমিক

নজরুলের হাসির কথা শুনে সবাই হয়ত হাসবেন—সে কি নজরুল আবার হাসতে জানে নাকি? যার জীবন দুঃখ দিয়ে গড়া, যার সমগ্র জীবনবেদ অশ্রু স্বাক্ষর দিয়ে লেখা, তার আবার হাসি। বৈশাখের খর উত্তাপে যেমন নদী নালা, মাটির রস যায় শুকিয়ে, তেমনি নিদারুন দুঃখ-দারিদ্র্য ও ব্যথা-বেদনায় নজরুলের জীবনের সরস মধুময় দিক যে শুকিয়ে যাবারই কথা। তবু মনে হয়, সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ দৈন্যের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নজরুলের কালজয়ী হাসি।

'অসম্ভব সম্ভাবনার যুগে' নজরুলের জন্ম। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, অবিচার, দেশবাসীকে নাগপাশে আবদ্ধ করেছিল। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে আলোড়নের প্লাবন এসেছিল নজরুল ইসলাম সেই দুর্বার তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরাধীনতার গ্লানিতে সমগ্র দেশ যখন ঝিমিয়ে পড়েছিল—তখন হঠাৎ বাংলার নিভৃত কোণ থেকে শোনা গেল এক অপরিচিত কণ্ঠের অট্টহাসি। বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে সুপ্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন দেশকে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন—শোনালেন এক মৃতসঞ্জীবনী বানী। 'অগ্নিবীণা'র ঝঙ্কারে 'বিষের বাঁশীর' উদাত্ত আহ্বানে 'সিন্ধু-হিন্দোলে'র দোলায় প্রাণ সঞ্চার করলেন নিদ্রিত দেশের শিরায় শিরায়।

নজরুল হেসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই হাসির উৎস ব্যক্তিগত সুখ বা প্রাচুর্য থেকে আসেনি—জীবনের প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি কাটিয়ে গেছেন অপরিসীম দারিদ্র্য-নিপীড়নের মধ্যে। তাই পরিজনেরা তাঁকে ডেকেছিল 'দুখু মিঞা' বলে।

সুখের হাসি হাসবার সুযোগ তাঁর জীবনে মেলেনি। তিনি হেসেছিলেন দুঃখের হাসি—উপেক্ষার হাসি। দারিদ্র্যের কঠোর আঘাতে, দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় বাস্তবতার ভারে তিনি অবনত হননি। কোন কিছুর ভয়েই তিনি নিজের সত্যকে, আপন ব্যক্তিত্বকে খাটো করেন নি। তাই দারিদ্রের প্রতি উপেক্ষার হাসি হেসে বুক ফুলিয়ে দুনিয়ার সামনে বলতে পেরেছিলেন—

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা—"

নজরুল ব্যক্তি-জীবনের উপেক্ষার হাসি সংক্রমিত করে দিতে চাইলেন পঙ্গু জাতির অন্তরে অন্তরে। 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবারে'র রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি বইয়ে দিলেন বিদ্রোহাত্মক হাসির এক তুফান। অনড় অচল জাতিকে প্রাণ-স্পন্দনে চকিত করে তুলতে, সমাজ-ব্যবস্থার অচলায়তন ভাঙতে তিনি তাঁর 'অগ্নিবীণা'য় বাজালেন বিদ্রোহের ছায়ানট—

"বল বীর
চির উন্নত মম শির
শির নেহারি' আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।"

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পঙ্কিল-পরতে তিনি বইয়ে দিলেন নূতন ভাবের বন্যা। পরাধীন দেশের যুগ যুগ পুঞ্জিভূত বেদনার জঞ্জালে তিনি জ্বালিয়ে দিলেন বিদ্রোহের বহ্নিশিখা। তিনি তুর্জ নিনাদে ঘোষণা করলেন—

"আমি প্রাণ খোলা হাসি উল্লাস—
আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা প্রলয়ের
দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।"

রুদ্রমূর্ত্তিতে বজ্রকণ্ঠে আবার নিনাদিত হল—

"আমি ছিন্ন মস্তা চণ্ডী, আমি
রণদা সর্ব্বনাশী
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া
হাসি পুষ্পের হাসি।"

তাঁর বিদ্রোহের উৎসমূল খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে দুইটী ধারার মিলনে তার উৎপত্তি—দুঃখ নিপীড়িত জনগণের প্রতি উচ্ছ্বাসময় দরদ, আর দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি তীব্র আবেগ বা প্রেম। তিনি ছিলেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ-মানবতার কবি। লাঞ্ছিত যারা, বঞ্চিত যারা, নিপীড়িত যারা তাদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম অনুরাগ। নিশ্চিন্তে বেদনাকে তিনি সহ্য করেননি। অপমান, অত্যাচারকে তিনি কখনো মাথা পেতে স্বীকার করেননি। সমস্ত কিছুর উপর আপনার আত্মার বিজয়কেতন উড্ডীন করেছেন—

"মোরা ভাই বাউল চারণ
মানি না শাসন, বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,

মরা-প্রাণ উটকে দেখাই
ছাই চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।"
(—যুগান্তরের গান : 'বিষের বাঁশী')

নজরুল অসংখ্য কবিতা ও গানে যৌবনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—

"যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব :
"ইন্না—রাজেউন।"

লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠীর দুঃখ-বেদনার কাহিনী—নজরুলের হাতে চিত্রিত হয়ে অগ্নিবর্ষণ করেছে। বায়রণ ও ওয়াল্ট হুইটম্যানের মধ্যেও এই ক্ষাত্র তেজ ছিল পুরোমাত্রায়। তাই নজরুল হুইটম্যান ও বায়রণের মতো যেখানে যা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে 'ভেঙেচুরে' দিগ্বিদিকে প্রলয় জাগিয়ে 'ঝড়ের মত শান্তি' খুঁজেছেন। কিন্তু নজরুলের শান্তি নিষ্ক্রিয় শান্তি নয়—এই শান্তির মধ্যেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যঙ্গের ফুলঝুরি।

হিন্দু-মুসলমানের কৃত্রিম মিলনকে বিদ্রূপ করে তিনি গেয়েছেন—

"বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল
উঠিল 'হা হন্ত।'
ঊর্দ্ধে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত!
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা—করুণ চন্দ্রবিন্দু।"

তখনকার দিনে সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণে আমাদের দেশের লোকেরা মেতে উঠেছিল। বদ্‌না গাড়ুতে ঠোকাঠুকি লাগলেও সাহেব সাজবার অভিনব চেষ্টায় আমাদের একতা ছিল অভূতপূর্ব। তাই তিনি সাহেবদের 'শ্রীচরণ ভরসা' করে দেশবাসীকে উপহাসের কটাক্ষ বাণ হানলেন—

"বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং
প্রয়োজন মত বাড়ে গো,
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে
পগারে পুকুর-পাড়ে গো।
লখিতে, চকিতে লজ্জিয়া যায় গিরি দরি-বন সিন্ধু,
এই এক পথে মিলিয়াছি মোরা সব মুসলিম-হিন্দু।"

নজরুলকে দেখেছি আর এক নূতন ভঙ্গীতে হাসতে। হাসির আগুন দিয়ে সমস্ত জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। সেই ভস্মস্তূপ থেকে তিনি এক নূতন সৃষ্টিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন—নূতন ভঙ্গীতে, নূতন উন্মাদনায় মৃতকল্পে প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছেন—আজীবন "তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের" জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন—এক নূতন সৃজনী-প্রেরণা। ধমনীর প্রতি রক্তবিন্দু যেন নৃত্য করে উঠেছে নূতন সৃষ্টির অনুরণনে—

"আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে
মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টির সুখের উল্লাসে।"

'টগবগিয়ে খুন'-এর হাসি নজরুলের মতো আর কোন কবিই হাসতে পারেননি।

বৃষ্টিমুখর

আবদুস্ সাত্তার

আবার কখন সেই বৃষ্টির মুহূর্ত ফিরে এসে
সহজে মিটিয়ে দেবে শুকনো মাটির পিপাসাকে।
সে দিন আকাশে ছিল নগ্ন মেঘ, আপন সত্তাকে
নির্বিঘ্নে নিঃশেষ করে ঢেলেছে পৃথিবী ভালোবেসে।

তখন একাকী বসে কুটিরের নিঃসঙ্গ নিভৃতে
দেখেছি শুকনো মাটি, ধূলো, বালি তৃপ্তির ইচ্ছায়
নিয়েছে মেঘের দান নিরিবিলি। প্রেম-অভিপ্সায়
কী আনন্দ সুপ্ত ছিল পৃথিবীকে ভালোবাসা দিতে।

যে-মাটি বিশুষ্ক. যার প্রতি স্তরে তৃষ্ণা শুধু জ্বলে,—
এবং মরুর মতো বুকে নিয়ে বালির জঞ্জাল
সূর্যের আগুনে পোড়ে; সেই শূন্য বিস্তীর্ণ চাতাল
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় কাঁপে বৃষ্টির ছোঁয়াচ পাবে বলে।

যে-মাটি বিশুষ্ক; যার বুকে জ্বালা মরু-সাহারার,—
সে-বৃষ্টি মুখর দিন সেই খানে নামুক আবার।

দেখে এলাম করাচী

মঈনুদ্দীন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বিকেলের অধিবেশনে যথারীতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ডেলিগেটসদের নিয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হলো। কমিটি থেকে আমরা বাদ পড়ে গেলাম। অতএব হাতে আপাততঃ আর কোনো কাজ রইলো না। সকাল সকাল হোটেলে ফিরতেই আকবর আলী এম, এস-সি, সাহেব বল্লেন: "সংগে গাড়ী আছে, কোথাও যেতে চাইলে চলুন বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বরকতুল্লাহ্ সাহেব বল্লেন: "ক্লিফটনে গেলে বেশ হয়।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। পিচঢালা রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চল্লো শহর ছেড়ে দক্ষিণ দিকে। দু'ধারে সারি সারি বাতি। রাতের করাচী একটা স্বপ্নময় রূপমাধুর্যে ঝলমল্ করছে।

ক্লিফটনে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। বাতির আলো, আঁধারের তীব্রতার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। এ-জন্য ক্লিফটন আমাদের কাছে ধোঁয়াটে রহস্যই রয়ে গেলো। গাড়ী ছেড়ে বালির ওপর দিয়ে অনেক দূর দক্ষিণে এগিয়ে গেলাম। সমুদ্রকে প্রতিরোধ করবার জন্য একটা বিরাট বাঁধ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্রের সীমা নির্দেশ করে দে'য়া হয়েছে এই বাঁধ দিয়ে। মানুষের শক্তি যেন জানিয়ে দে'য়া হয়েছে প্রকৃতিকে। বলা হয়েছে: বন্ধু! এই পর্যন্ত এসে তোমার গতি থামাতে হবে। আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অসুবিধা ঘটিয়ে তার সীমার মধ্যে তোমার আর এগিয়ে আসা চলবে না।

এ-দিক ও-দিক সামুদ্রিক ঝিনুক, শংখ আর করাত মাছের দাঁতের দোকান সাজিয়ে বসে আছে একদল স্থানীয় লোক। ঢাকায় সমুদ্রের কিছু চিহ্ন নিয়ে আসা প্রয়োজন। টাকা দশকের নিলাম। ওতে খুব বড় একটা শংখও ছিল।

পরদিন সকালে (৩০-১-৫৯ শুক্রবার) একটু ধীরে সুস্থে তৈরী হয়ে নিলাম। ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যেরা বিষয়-নির্বাচনী সভায় চলে গেছেন। অতএব, এ-বেলাও আমাদের অবসর। বিকেলে ইষ্ট বেঙ্গল এসোসিয়েশনের আয়োজিত ডেলিগেটসদের রিসেপ্‌শন্ সভায় যোগ দিতে হবে। তারপর সন্ধ্যা সাতটায় কনভেনশনের সাধারণ সভায় যেতে হবে।

জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহেব বল্লেন: "চলুন, এ-বেলা মার্কেট থেকে ঘুরে আসি। এই সংগে শহরও একটু দেখা হবে।" আজহারুল ইস্‌লাম বল্লেন: "আমিও যাব।" কিন্তু কোথায় মার্কেট? পথে তো বেরিয়ে পড়ি, তারপর পথ আমাদের ডেকে নিয়ে যাবে। বন্দর রোড, জাহাংগীর রোড, ভিক্টোরিয়া রোড প্রভৃতির নাম শোনা ছিল আগে থেকেই। এর যে-কোনো একটায় নেমে পড়বো। তারপর মার্কেট একটা পাওয়া যাবেই।

আকবর আলী সাহেব তাঁর গাড়ী নিয়ে এ-বেলা আর আস্‌তে পারেননি। এখানকার রিক্সাগুলো হতাশাব্যঞ্জক। ওপোরে হুড নেই। রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচার উপায় নেই। চাপাচাপি করে দু'জন বসা যায় কিন্তু বসে থাকা এক আযাব। পা গুটিয়ে সে এক আজিব কায়দায় বস্‌তে হয়। এ-আমাদের বাঙালী রীতি ও রুচির বাইরে।

একটা ভিক্টোরিয়া টম্ টম্ এগিয়ে চলেছে। খালি। তাতে তিনজন উঠে বসলাম। চালক জিজ্ঞাসা করলে: "কি ধার যাইয়েগা সাব?"

তাই তো! কোথায় যাব, তা তো জানিনা। বল্লাম: "বাজার চলো।" উত্তর হলো—"কৌন বাজার?"

বল্লাম: "কোই বাজার নেহি। বারাহ্ আনা মে জিৎনা দূর যা সাকো—চলো।"

অনেক রাস্তা ঘুরে ফিরে টম্‌টম্ এক জায়গায় এসে থেমে গেলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখি: আমাদের কেনার মতো একটা দোকানও নেই। একটু হাঁটছি, একটু থামছি। একজন গাইড পেলে ভালো হতো।

একটি প্রায় বৃদ্ধ লোক হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে। বল্লাম: "শুনুন সাহেব। খুচরো জিনিসপত্র কেনার দোকান কোথায়?"

লোকটি হেসে বল্লে: "আপনারা বুঝি করাচীতে নতুন? একটু ডানদিকে গিয়ে বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে গেলেই বড়ি বাজার পাবেন। সেখানে দেখ্‌তে পাবেন।"

লোকটির সাথে কয়েকটি কথা বলেই বুঝতে পারলাম: লোকটি সরল। সে-ও এখানে মুহাযীর হয়ে এসেছে। বল্লাম: "আপনার কি কোনো কাজ আছে? আমাদের সঙ্গে মেহেরবানী করে যেতে পারেন?"

লোকটি বল্লে: "একজনার সাথে দেখা করতে চলেছি। তা' পরে গেলেও হবে। আসুন আমার সাথে।"

লোকটিকে পেয়ে ভালোই হলো। ওর নাম সোলেমান। ছেলে পৃথকান্ন। নিজে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরীর সন্ধানে। ওঁর সাথে আমরা এগিয়ে চল্লাম। কয়েকটি খুচ্‌রো জিনিস কিনলাম তিন জনেই। যার যা প্রয়োজন।

বল্লাম: "এখানে বইয়ের দোকান কোথায়?"

লোকটি খানিক এগিয়ে সমারসেট ষ্ট্রীটে একটি দোকানে নিয়ে গেলো। পরিচয় পেয়েই 'ইকবাল কিতাব ঘরে'র মালিক এগিয়ে এলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর ওখান থেকে '১৮৫৭' নামে একখানা বই কিনলাম। মোহাম্মদ শফীর লেখা উর্দ্দু বই। আযাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা একটি প্রামাণ্য বই বলে মনে হলো। এখানে আলাপ হলো জনাব জাফর ওমর জুবায়রী সাহেবের সাথে। ইনি ডাঃ জুবায়রীর ছোট ভাই। করাচীর ন্যাশন্যাল কলেজের লেকচারার। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। ইতিহাসের একখানা নতুন বই প্রকাশ করেছেন তিনি। Mayer's-এর Ancient History of the World-এর সংক্ষিপ্ত উর্দ্দু সংস্করণ। অনেকক্ষণ ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হলো। তিনি কলেজের পক্ষ থেকে দাওয়াত দিতে চাইলেন। সময়ের সংকীর্ণতা জানিয়ে মাফ চেয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

ভিক্টোরিয়া রোডে ঢাকা বুক ষ্টল। একমাত্র বাঙলা বইয়ের দোকান। এর মালিক হাযী আবদুল গনী সাহেব ঢাকার লোক। খুবই হৃদ্যতার সাথে গ্রহণ করলেন। বেশ বেলা হয়েছে তখন। এগারোটা। হোটেলে ফিরছি। আমাদের গাইড সোলেমান বল্লে: "একটি গাড়ী নিয়ে এখন আপনারা যেতে পারবেন—এবার আমি যাই।" সে সালাম করে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

বরকতুল্লাহ সাহেব বল্লেন: "ওকে কিছু দিলে হতো।"

অনেক দূর চলে গিয়েছিল সোলেমান। ডেকে ফেরালাম। বল্লাম: "ভাই, তুমি কোথায় থাক, আমরা কোথায় থাকি, কেউ কাউকে জানিনা। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না। তোমার আজকের এই উপকারটুকু স্মরণীয় হয়ে রইলো।" বরকতুল্লাহ সাহেব একটি টাকা ওর দিকে এগিয়ে ধরলেন। বল্লেন: "এটা নাও।"

সোলেমান বিস্ময়ে চোখ কপালে তুল্লে। বল্লে: "আপনাদের অসুবিধে হচ্ছিল, তাই সংগে একটু ঘুরেছি। এ-জন্য দাম নিতে পারব না।"

বুঝলাম: আত্মাভিমানে ঘা লেগেছে তার। বল্লাম: "ভাই, তার দাম দিচ্ছিনে। তোমার ছেলেমেয়েদের কিছু কিনে দিয়ো।"

ঝর্‌ঝর্ করে লোকটি কেঁদে ফেল্লে। বল্লে: "সাহেব, আমি খুবই গরীব, অসুবিধায় আছি। দিন চল্‌ছেনা আমার। কিন্তু এজন্য কিছুতেই আমি টাকা নিতে পারবো না।" সে অনেক দূর এগিয়ে গেলো। আশ্চর্য! আজকের যামানায় এমন নির্লোভ মানুষও আছে? মনটা ভারী খারাব হয়ে গেলো ওর বিরাট অভাবেও কিছু সাহায্য করতে পারলাম না বলে।

আবার তাকে ডেকে ফেরালাম। ঠিকানা দিলাম তাজ হোটেলের। বল্লাম: অসুবিধা না হলে দেখা করো। কথা আছে। ওয়াদা করে সোলেমান বিদায় নিলো।

আজহারুল ইস্‌লাম বল্লেন: "আবার ঠিকানা দিলেন? যামানা খারাব। শহরে কতো রকমের লোক থাকে। কোন্ মুশকীলে ফেলে, কে জানে?"

বল্লাম: "যমানা খারাব হলেও মানুষের ওপোর থেকে আমি বিশ্বাস হারাই নি। এখনো সৎ লোকের অভাব নেই। একে কিছু গছাতে না পারলে মনে শান্তি পাবো না।"

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভাবছি: জুম্মার নামাযে যাওয়ার সময় আছে কিনা। এমন সময় হোটেলের বয় সোলেমানকে নিয়ে এসে হাযীর। বল্লে: "হুযুর, এ আপনাকে খুঁজ্‌ছে।"

ভারী খুশী হলাম সোলেমানকে দেখে। বল্লাম: "কি খবর ভাই?"

বল্লে: "বাসায় ফিরেই জান্‌তে পারলাম, আমার এক বন্ধু হায়দরাবাদ (সিন্ধু) যেতে খবর পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি আমার জন্য একটি চাকরী ঠিক করে রেখেছেন। আজই যেতে হবে। আপনার সাথে তো আর দেখা হবে না। ওয়াদা করেছিলাম, তাই বিদায় নিতে এলাম।"

বল্লাম: "যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই তো? এই রাস্তা খরচ ইত্যাদি আর কি!"

বল্লে: "অসুবিধা হবে বৈ কি। বহুদিন বেকার—টাকা পয়সা তো আর নেই।"

পাঁচটি টাকা ওর হাতে দিলাম। বল্লাম: "ভাই, এই সামান্য টাকা দিলাম, যদি তোমার কাজে লাগে। চাকরী হলে তো তোমার অসুবিধা কিছু দূর হবে।"

সালাম করে ও টাকা হাতে নিলো। মন খুশী হয়ে উঠ্‌লো আমার।

বরকতুল্লাহ্ সাহেব বল্লেন: "আপনি একা আর এই নেক কাজের সবটুকু অংশ ভোগ করবেন কেন? আমাকে কিছু অংশ দিন।" তিনি এর অর্দ্ধাংশ আমাকে দিয়ে দিলেন।

একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মুহাযীরকে সামান্য কিছু সাহায্য করতে পেরে ভারী তৃপ্তি পেলাম। বন্ধুরা পরে

জান্‌তে পেরে মন্তব্য করলেন : "লোকটি আমাদের সরলতার সুযোগে পাঁচটি টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেছে"

যদি ঠকেও থাকি—এ-ঠকা আমাদের জীবনে একটা আনন্দময় রূপ নিয়ে বেঁচে থাকবে।

বিকাল চারটেয় এসে হাযীর হলেন আকবর আলী সাহেব। ইষ্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশনের সভায় যেতে হবে। তিনি তার ভাইস্ প্রেসিডেন্ট এবার। জাহাংগীর রোড (ইষ্ট) এঁদের অফিস। হোটেল থেকে অনেকটা দূর। বিরাট প্যাণ্ডাল তৈরী করা হয়েছে। তা ভরে গেছে লোকে। সাম্‌নে নির্দিষ্ট কতকগুলো আসন খালি আমাদের জন্য।

এটা সম্পূর্ণ বাঙালী প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এঁরা যে যে কাজ করেছেন, তার ধারাবাহিক বিবরণী ছাপা হয়েছে। করাচীতে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এঁদের দান অনস্বীকার্য। এঁরা বাঙলার অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিত্র, চারুকলা, ও কারুকলা সব দিকেই নযর দিয়েছেন। সদিচ্ছা নিয়ে কাজে নেমে পড়লে যে কাজ কিছু করা যায়, তা' এঁদের প্রচেষ্টা দেখে প্রতীতী জন্মালো। করাচীতে এ-গুলো ছাড়া আরো অনেকগুলি বাঙলা প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন : নজরুল একাডেমী, ইষ্ট পাকিস্তান লেডিজ এসোসিয়েশন, বেংগলী মজলিস, করাচী কালচার সেণ্টার, ইষ্ট বেংগল কালচারেল সোসাইটি, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল, পরিচয় মজলিস, ইষ্ট পাকিস্তান লাইব্রেরী, পুরবী মহফিল, পূর্ব পাকিস্তান নাট্য সংঘ, সংস্কৃতি সংসদ, শিল্পী সংঘ, ইষ্ট পাকিস্তান মহফিল, ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব, পাকিস্তান ষ্টুডেণ্ট্‌স্ এসোসিয়েশন, প্রবাসী পাঠচক্র, সার্বজনীন পাঠাগার, মহিলা মজলিস প্রভৃতি।

দীর্ঘ কার্যসূচী শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে গেলো। প্রায় সাতটা বাজে। ডেলিগেটস্‌রা সবাই চলে গেলেন। কনভেনশনের সভায় যোগ দিতে হবে সাতটায়। আমাকে এবং গোলাম মোস্তফা সাহেবকে ধরে রাখলেন এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ। বল্লেন : সবাই গেলে কেমন করে হবে? শেষ না করে আপনারা যেতে পারবেন না। সভাপতি বর্তমান আইন সচিব জাষ্টিস মোহাম্মদ ইবরাহীম। তিনিও এ-কথার প্রতিধ্বনি করলেন। অগত্যা বস্‌তেই হলো। আবৃত্তি করতে হলো : আমার সম্প্রতি প্রকাশিত "হে মানুষ" বই থেকে "শোনহ মানুষ শোন" কবিতা। গোলাম মোস্তফা সাহেব তাঁর গান দিয়ে সবাইকে আনন্দিত করলেন।

আনন্দ-কোলাহলের ভেতর দিয়ে সভার কাজ শেষ হলো। আইন-সচিব বল্লেন : "আমার গাড়ীতে আপনারা দু'জন উঠে পড়ুন, গোয়ানীজ হলে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে যাব।"

বেশ ভালোই হলো আমাদের জন্য। অচেনা জায়গা—অচেনা গাড়ী নিয়ে একটা অস্বস্তির ভেতরে পড়তে হতো।

সভা শুরু হতে তখনো কিছু বিলম্ব ছিল। আমরা নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসার পরই সভার কাজ আরম্ভ হলো। এ-সভায় সভানেত্রীত্ব করলেন : মিসেস রোজী হুসাইন। সভার কার্য পরিচালনা দেখে ভারী ভালো লাগ্‌লো। এতোগুলো বুদ্ধিজীবির সভাকে শৃংখলার সাথে চালিয়ে নেওয়াকে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে মনে হলো। আর কৃতিত্ব দেখালেন জনাব জামীলউদ্দীন আলী। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি মাইকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় ঘোষণাগুলি করলেন, রেজুলিউশনগুলি পড়লেন, বাদ-প্রতিবাদের সহজ মীমাংসায় সাহায্য করলেন। গঠনতন্ত্র ছিল পাকা হাতের রচনা। তার ওপোর সাবজেক্‌ট কমিটির অনুমোদনের ছাপ নিয়ে এসেছে। অতএব কথা বেশী খরচ করার দরকার হলোনা কারো। যথারীতি সব অনুমোদিত হয়ে গেলো।

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কামরায় প্রবেশ করতেই আনোয়ার শব্‌নম দীল্ এসে ঢুকলেন। বাঙালীর সাথে মিশ্‌বার অদম্য কৌতুহল তাঁর। তিনি প্রতি কামরায় ঘুরে ঘুরে প্রায় সবার সাথেই আলাপ করেছেন। অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে আমাদের আলাপ চল্‌লো আধ ঘন্টারও বেশী। ভদ্রলোকের সহজ সরল ব্যবহার; মনের গভীরে একটা ছাপ পড়ে গেছে।

পরদিন। ৩১শে জানুয়ারী। আজ আমাদের অনেক কাজ। পাকিস্তান লেখক সংঘ (Pakistan writers' guild) গঠিত হবে সকালের সভায়। বিকালে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। এই সভায় আসবেন সম্মানিত অতিথিরা। পাকিস্তানের বর্তমান জনপ্রিয় প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানও আস্‌বেন। তাই সবার মনে সকাল থেকেই উৎসাহের চাঞ্চল্য।

আমাদের তৈরী হতে সাড়ে আটটা বেজে গেলো। সভামণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার গাড়ীগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। পাশের হোটেল ডি' ল্যুক্সে যাঁরা আছেন, তাঁদের খোঁজ নে'য়া দরকার। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। ডাঃ এনামুল হক ও ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ওপোর থেকে নেমে এসে হোটেলের অফিস কামরায় দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন ওঁদের আরো যাঁরা ওপোরে আ তাঁদের জন্য। শুধু দাঁড়িয়ে আছেন, তাই নয় আলাপ করছেন এঁরা এক অশীতিপর

মহিলা আর পক্ককেশ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার আলাপ দেখে মনে হলো: এঁরা যেন কিছুটা অসাধারণ। এঁদের কথাবার্তা ভাব-ভংগি যেন পৃথক। ইংগিতে জিজ্ঞাসা করলাম ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকে—"এঁরা কাঁরা?"

কাজী সাহেব বল্লেন: "ইনি হচ্ছেন আতিয়া বেগম আর ইনি ফায়জী রাহামীন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী এঁরা। ফায়জী রাহামীনের নাম শুনেছি আগেই। এবার চোখে দেখার সুযোগ হলো। ভারী আনন্দ হলো মনে। কিন্তু আলাপের বেশী সুযোগ হল না। সভাগৃহে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য মন ছিল তখন চঞ্চল। অবশ্য এই দুই চিত্রশিল্পীর সাথে পরে আলাপ হয়েছে। সহজ, সরল, অসাধারণ প্রতিভাশালী বলে মনে হয়েছে এঁদের।

গঠনতন্ত্রের ধারায় ছিল: Pakistan writers' guild যে গঠিত হবে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের এগারো জন, করাচী, পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে এগারো জন, এর পর সিন্ধু একজন, পাঞ্জাব একজন, আর পশ্‌তু একজন—এই পঁচিশ জন নিয়ে হবে সেনট্রাল কমিটি। সেনট্রাল কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হলেন—জনাব ইবরাহিম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার, আবুল হোসেন, ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আশ্‌কার ইব্‌নে শাইখ ও মোহাম্মদ আবদুল হাই।

এরপর অনেকগুলি প্রস্তাব পাস হলো। আমার একটি প্রস্তাব ছিল: "দু'কোটি টাকা প্রাথমিক খরচের এষ্টিমেট ধরে, পাকিস্তানের দু'ডানায় দু'টি শিশু-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হোক। তাতে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে শিশু পাঠোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হোক। পাকিস্তানের দু'ডানার দুই শাসক-প্রধানের পরামর্শ নিয়ে এর কার্যকরী রূপ ও অর্থ ব্যয় করা হবে।" কিন্তু এ-প্রস্তাব পেশের সুযোগ দে'য়া হয়নি।

বিকেলের সভায় গিয়ে হাযীর হলেম। যাঁর যাঁর সীটে তিনি চুপ্‌চাপ বসে আছেন। নিমন্ত্রিত ডেলিগেট এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সবাই বেশ শৃংখলাবদ্ধ। একটি ব্যাপার বেশ দৃষ্টিকটু লাগলো। আমাদের মধ্যে বয়স্ক যাঁরা, যেমন ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ডাঃ এনামুল হক, মাহবুব উল আলম এঁরাও আসন পেয়েছেন অনেক পেছনে। এই ব্যবস্থা অনেকের কাছেই ভালো লাগলো না।

যা হোক। এই সভায় আমাদের মহাসম্মানীয় জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান আসছেন। জেনারেল আইয়ুব শুধু আমাদের সম্মানিত অতিথি নন—তিনি সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান। এই অল্প কয়েক মাসের শাসন ব্যবস্থায় তিনি যে বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছেন, করেছেন হতাশাক্ষুব্ধ পাকিস্তানীদের মনে আশার সঞ্চার, এ-জন্য তাঁর প্রতি সকলেই শ্রদ্ধান্বিত। তিনি আসছেন রাইটার্স-গীল্ডের অতিথি হয়ে। প্রেরণা জাগছে সকলেরই মনে। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকের রাষ্ট্রানুগ্রহ সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে সকল যুগেই দেখা গেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা আর শাহানশাহ্ আকবরের নওরতন-সভা ইতিহাসের শামিল হয়ে আছে। জেনারেল আইয়ুব উচ্চ শিক্ষিত, সাহিত্যেকদের দরদী বন্ধু—তাঁর এই শুভাগমনের দ্বারা তিনি পাকিস্তানী লেখকদের বুকের কাছে টেনে নিলেন।

ঠিক চারটেয় জেনারেল আইয়ুব সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। ধীর, শান্ত মুখশ্রী। আড়ম্বর নেই। সাধারণ নাগরিক বেশে তিনি প্রবেশ করলেন আর জনসাধারণের মধ্যে বসে পড়লেন।

সভার কাজ শুরু হলো। বাবায়ে উরদু ডাঃ আবদুল হক সাহেব সভাপতির আসনে বসলেন আর খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান কুরআন শরীফ তেলাওয়াৎ করলেন। কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া হলো। পড়লেন: জনাব কুদরতুল্লাহ্ শাহাব, জনাব প্রোফেসার মোমতাজ হুসাইন, জনাব ডাঃ জাবিদ ইকবাল, ডাঃ সাজ্জাদ হুসাইন, জনাব আবু রুশ্‌দ।

আবু রুশ্‌দ সাহেবের প্রবন্ধ শুনে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যিকদের মনে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হলো। কারো ধারণাই ছিল না, এমন একটি প্রবন্ধ বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ করে রাষ্ট্রাধিনায়কের সামনে পড়ার অনুমতি দে'য়া যেতে পারে। এটা কি করে সম্ভব হলো? প্রবন্ধটি ইংরাজীতে ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে। এতে পরিচয় দে'য়া হয়েছে পাকিস্তানোত্তর কালের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের। ইনি প্রবন্ধোক্ত সাহিত্যিকদের প্রগতিবাদী বলে অভিহিত করেছেন। অথচ তাঁদের অনেকেই প্রগতির আওতায় পড়েননা।

পাকিস্তান হাসিলের পর একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যের রূপ পাল্টে যাচ্ছে। আর তা' পাল্টে যাচ্ছে যুগ প্রবর্তক কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে, পূর্ব পাকিস্তানী আবহাওয়ায়। এতে থাকছে আরবী-ফার্সী শব্দ সম্ভার আর ইসলামী দৃষ্টি ভংগি। এ-জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, এই আদর্শের বইও তাঁদের কম বের হয়নি। প্রগতিবাদী বলতে হলে এঁদেরই প্রগতিবাদী বলতে হয়। কিন্তু আবু

রুশদ সাহেব এঁদের নাম বেমালুম চাপা দিয়ে এমন কতকগুলি উঠ্‌তি লেখকের নাম করেছেন, যাঁদের অনেকেরই দু'একটি কবিতা মাত্র মাসিক বা দৈনিকের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। তা-ও অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিম বংগের অক্ষম অনুকরণ মাত্র।

কেউ কেউ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেলেন। কনভেনশনের সবগুলি সভা-ই অত্যন্ত শৃংখলার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। উপরন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে প্রতিবাদ উত্থাপন হয়তো অশোভন হবে। পরে কিন্তু পৃথকভাবে এই ভুল তথ্যের প্রতিবাদ করার প্রশ্নও আর তোলা সম্ভব হয়নি।

আর সবার প্রবন্ধই বেশ বাহাবা পেলো। জনাব কুদরত উল্লাহ্ শাহাব-এর প্রবন্ধ সবার কাছেই উচ্চ প্রশংসা পেলো। তাঁর প্রত্যেকটি মতের সাথে আমাদের মতের মিল হলো। মনে হলো আমাদের মতেরই যেন প্রতিধ্বনি করেছেন তিনি। আমাদের সাহেত্যে বিদেশী প্রভাব-প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রকে রূপায়িত করলেন তিনি এই ভাবে:—

"We have been converted into an arena of strange strifes and confusion. Efforts are being made to locate our intellectual Mecca in Moscow, Washington or Calcutta. The motives are different in each case. Moscow and Calcutta wants to subvert our thought. Washington wants to divert it. But remember that our intellectual foundation is nowhere except in Pakistan itself. The writers of Pakistan do not want to be treated as experimental guinea-pigs in the labarotary of world palitics. We are poor and strugling, but we have our own intellectual and cultural horizon. Let us walk in our garden-path far a while.

"আমাদেরকে এক বিদেশীয় দ্বন্দ্ব ও হতবুদ্ধিতার রংগ ভুমির সম্মুখীন করা হয়েছে। আমাদের চিন্তাধারাকে মক্কা থেকে মস্কো, ওয়াশিংটন অথবা কোলকাতার দিকে ফেরাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এদের মতলব পৃথক। মস্কো আর কোলকাতা চায় আমাদের চিন্তাধারাকে ধ্বংস করতে আর ওয়াশিংটন চায় তা বিপথগামী করতে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের চিন্তাধারার কেন্দ্র-স্থল পাকিস্তান, অন্য কোথাও নয়। পাকিস্তানী লেখকেরা বিশ্বরাজনৈতিক পরীক্ষাগারের গিনি-পিগ হতে পারে না। আমরা দরিদ্র, তাই আজীবন সংগ্রামশীল জীবনযাপন করছি। কিন্তু আমাদের নিজস্ব উদ্যান পথ ধরেই আমাদের চলতে হবে।"

মনে হলো: হ্যাঁ, উপযুক্ত লোকের হাতেই রাইটার্স গীল্ডের সেক্রেটারী-জেনারেলের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। একথা বলতে কুণ্ঠা নেই যে, উর্দু সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ বলে, লেখক হিসাবে তাঁকে আমরা মোটেই জানতাম না। কিন্তু এই প্রবন্ধের পর তাঁর সাহিত্যিক মূল্যমান আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেলো। অনেক চিন্তার খোরাক দিলেন তিনি প্রবন্ধে।

অনুরোধ করা হলো জেনারেল আয়ুবকে কিছু বলার জন্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে সাহিত্যিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বল্লেন। রাইটার্স গীল্ডের প্রাথমিক খরচ বাবত দশহাজার টাকা দে'য়া হবে বলে ঘোষণা করলেন। রাইটার্স গীল্ড—পাকিস্তানী লেখকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং তা গঠিত হয়েছে আজই। একে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাহায্য দেওয়ায় সকল সাহিত্যসেবীর মনেই এক অভুতপূর্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার হলো। আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন সকলে। বাবায়ে উর্দু তাঁর সারগর্ভ ভাষণ দেওয়ার পর আনন্দ-কোলাহলের ভেতর দিয়ে কনভেনশন শেষ হলো। করাচীর কাজও আমাদের শেষ।

ঢাকায় অনেক কাজ ফেলে গেছি, আজ প্লেনে সীট নেই অতএব কালই আমাকে ফিরে যেতে হবে। অনেকের অনুরোধ: দু'একদিন থেকে করাচী-শহর ভালো করে দেখে যাবার। কিন্তু দরিদ্রের সংসার আমার। ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না। এ-অবস্থায় সখের খাতিরে দু'একদিন বেশী থেকে গেলে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বরকতুল্লাহ্ সাহেবও কালই যেতে চান। আরও কয়েকজন যাবেন। কিন্তু কাল রাত্রি দশটার আগে কোনো প্লেন নেই। অতএব, কালকের এই একটি দিন—একটি দিন পূরা নয়, অর্ধেক বেলা যতটুকু পারা যায় দেখা যাবে। বিকেলে আবার 'করাচী কালচার সেন্টারে'র কর্মকর্তারা সমস্ত ডেলিগেটসদের ডেকেছেন। আনন্দ-অভিবাদন জানাবেন তাঁরা। তাতে যোগ দিতে হবে বিকেলে।

হোটেলে ফিরতেই দেখলাম, 'নজরুল একাডেমী'র মেম্বার-ইন-চার্জ জনাব হজরত আলী সাহেব বসে আছেন। তিনি দাওয়াৎ করতে এসেছেন, কাল 'নজরুল একাডেমী'তে সকলকে একবার চা খাওয়ার জন্য। কখন সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে, তা-ই জান্‌তে তিনি অনেকক্ষণ ধরে বসে প্রতীক্ষা করছেন। তাঁকে সংগে নিয়ে জসীম উদ্‌দীন, মনসুর উদ্দীন প্রমুখ অনেকের

কাছেই গেলাম। কিন্তু কারো-ই কাল সময় হবে না বলে তাঁরা জানালেন। অগত্যা বিফল হয়ে হজরত আলী সাহেব বিদায় নিলেন। তখন রাত সাড়ে এগারোটা। মনে খুব দুঃখ হলো। নজরুল একাডেমী করাচীতে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। এতে না যাওয়াটা সকলেরই ভুল হলো। আমি ওঁকে বলে দিলাম: কেউ না যাক্, কাল যে-কোনো সময় আমি একবার নিশ্চয়ই যাব একাডেমীর কার্যকলাপ দেখ্‌তে।

পহেলা ফেব্রুয়ারী। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরী হতেই ন'টা বেজে গেল। জনাব আকবর আলী সাহেব গাড়ী নিয়ে এসে হাযীর। ক'দিন থেকেই বরকতুল্লাহ্ সাহেব এবং আমাকে নিয়ে যেতে আছেন। তাঁর সময়ের ওপোর কতো অত্যাচার যে করছি আমরা!

কামরা থেকে বেরিয়েই লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়ালাম। অটোমেটিক লিফ্‌ট। কোনো লোক লাগে না এটা চালাতে। নিচে থাক বা ওপরে থাক, নাম্বার ধরে বোতাম টিপলেই একান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে। ভেতরে ঢুকে দরওয়াযা বন্ধ করে বোতাম টিপুন, নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থেমে যাবে। দরওয়াযা খোলা রেখে বা ভালো করে বন্ধ না করে বোতাম টিপুন, এক ইঞ্চিও ওকে নাড়াতে পারবেন না। নিজের জায়গায় সেই যে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, মনে হবে কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে দিয়ে এই কাজগুলো করাচ্ছে।

ভেতরে ঢুকে দরওয়াযা বন্ধ করে বোতাম টিপ্‌লাম। ধীরে ধীরে লিফ্‌ট ওপোরের চার তলায় উঠে গেলো। এ-কয়দিন থেকেই টিপ্‌ছি, এমন তো কোনো সময় হয়নি! বল্লাম: "এ কি হলো, আমরা যে নিচে যাব।"

হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন আকবর আলী সাহেব। বল্লেন: ভুল করে হয়তো চার তলার বোতাম টিপে দিয়েছেন।

বল্লাম: তাই নাকি! এ তো বড় ভুল করলাম?

তিনি বল্লেন চমৎকার একটা কথা।—"নিশ্চয়ই বোতাম টিপ্‌তে ভুল হয়েছে। নইলে এটা কিছুতেই চার তলায় আস্‌তে পারে না। এটা ঠিক যে, মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু মেশিন কখনো ভুল করে না।

বিজ্ঞানের ছাত্র তিনি। বিজ্ঞানের সুন্দর একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দিলেন। ভারী ভালো লাগ্‌লো কথাটি।

নিচে নেমে ঠিক করা হলো: হক্‌স্ বে (Howks Bay) দেখ্‌তে যাওয়া হবে। করাচী শহর থেকে মাইল চৌদ্দ দূরে।

অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা পার হয়ে শহরের পশ্চিম দিকে শহরতলীতে পড়লাম। ঢালা সুন্দর কালো মসৃণ রাস্তা। দু'ধারে বিরাট খট্‌খটে মাঠ। সবুজের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে দু'চারটি খেজুর গাছ। শুষ্ক—নির্জীব। বাঙলা দেশের খেজুর গাছগুলির সজীবতা নেই তাতে। লাগাম ধরে উট নিয়ে চলেছে তার চালক। আরবের মরুদৃশ্য কি এমন?

সংগে চলেছে আকবর আলী সাহেবের ছোট ছেলে খোকন। ভালো নাম: সেলিম। ভারী চালাক, সপ্রতিভ ছেলে। বয়স বছর পাঁচেক। সে আমাদের গাইডের কাজ করছে। এটা কি, ওটা কি প্রায়ই ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছে। সাম্‌নে একটু ঢালু জায়গা। অনুল্লেখযোগ্য একটি খালের মতো। সমুদ্র থেকে পানি এসে তির্ তির্ করে বয়ে যাচ্ছে। বল্লাম: এখানে নাম্‌তে হবে নাকি? গাড়ী পার হতে পারবে?

আকবর আলী সাহেব বল্লেন: "কোনো অসুবিধা হবে না।" বল্‌তে বল্‌তে গাড়ী পার হয়ে এলো। দূরে ধূসর বালির পাহাড়। মনে হচ্ছে কাছে—কিন্তু অনেক দূর।

হক্‌স্ বে' এসে পৌছিছি। গাড়ী থেমে গেলো। এখানে একটা হোটেল আছে। পরিচ্ছন্ন হোটেল। মুসাফিরের তৃষ্ণা দূর করার জন্য শুধু চা নয়, শরবৎ, সোডা ইত্যাদির ভালো বন্দোবস্ত আছে। নাম: হোটেল স্‌প্লেন্‌ডিড। (Hotel Splendide.) ইংরেজী বানানটি লক্ষ্যণীয়। সম্ভবতঃ সকলের মনে রাখার জন্য অথবা নামটি বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অদ্ভুত বানানটি করা হয়েছে।

সম্মুখে বিশাল সমুদ্র। কাজল-কালো পানি। কে বলে সমুদ্র অশান্ত, সমুদ্র ভয়ংকর—মানুষের ঐশ্বর্য দিয়ে নিজের গহ্বর পরিপূর্ণ করতে উত্তাল তরংগের সৃষ্টি হয় এখানে। আমরা দেখ্‌ছি, একখানা বিশাল কালো গালিচা ছড়িয়ে পড়ে আছে চুপ্‌চাপ্। তার কোনো গতি নেই, কোনো চাঞ্চল্য নেই, নেই মানুষকে ভয় দেখাবার কোনো হীন আকাংখা। সমুদ্রের এই শান্তরূপ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জোয়ারের সময় অথবা বাতাসের সংস্পর্শে এসে ক্ষেপে যায় সমুদ্র। তরংগ-বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন তার গর্জনে, তার উচ্ছলতায় ভীষণ দানবের শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে।

ক্লীফট্‌নে দেখেছি, এখানেও দেখ্‌লাম: মানুষ বাঁধ বেঁধে সমুদ্রের সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে। এই বাঁধের এদিকে আর সমুদ্রের আসা চলে না। এর পায়ের কাছে আছ্‌ড়ে পড়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে থাকে নিষ্ফল আক্রোশে। সংগে নিয়ে আসে, শামুক, গুগ্‌লী, রং-বেরং-এর ঝিনুক-স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ঝল্‌মল্।

আমরা যখন বাঁধের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, সমুদ্র তখন অনেক দূরে সরে গেছে। বাঁধ ডিঙিয়ে আমরা ওধারে গিয়ে পড়লাম। পায়ের নিচে চিক্‌চিক করছে বালি। মৃদু বাতাস এসে গায়ে লাগছে। ভারী আরাম।

একটি উট চালক উট নিয়ে এসে হাযীর। পিঠে হাওদা বাঁধা বেশ সাজানো উট। কিন্তু তার লম্বা গলা, দীর্ঘ পা আর সারা অংগে রুচিহীন কদর্যতা। তা হলেও এর বিশেষ গুণ: কষ্টসহিষ্ণু, প্রভুভক্ত আর অল্পাহারে তুষ্ট।

করাচী শহরের বুকে উটের গাড়ী চলে। মাল বোঝাই গাড়ী। লম্বা গলায়, মুখে, রজ্জুর ফাঁস পরে, দুলকীতালে চলে। কর্মঠ, শক্তিমান চালককে প্রায় কিছুই করতে হয় না। চুপ্ করে বসে থাকে সে মালের ওপোর। আর উট চলে পশম-ঝরা বাদামী দেহ দুলিয়ে মন্থর গতিতে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার দৌড়ায় কখনো। এর চেয়ে ছোট ছোট গাধার গাড়ীগুলো অপেক্ষাকৃত সুন্দর। গাধা-গুলোর শরীরও বেশ তেল চক্‌চকে। ছোট বাচ্চা ঘোড়ার মতো।

চালক সালাম করে বল্লে: "উটে চড়বেন হুযুর?"

তাকালাম আকবর আলী সাহেবের দিকে। তিনি বল্লেন: "চড়তে পারেন, খানিক ঘুরিয়ে আন্‌বে চারআনা নেবে।"

চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো, মক্কা-মদীনার কাল্পনিক দৃশ্য। উটে চড়ে সেখানকার কষ্টসহিষ্ণু মানুষগুলি এ-দিক ও-দিক যায়। এই উটে চড়েই খলিফা ওমর যেরুযালেম দখল নিতে গিয়েছিলেন। সংগে ছিল গোলাম। খানিক নিজে উটের ওপোরে উঠে চলেছিলেন, খানিক গোলাম। খলিফাকে উটের দড়ী ধরে আস্‌তে দেখে যেরুযালেমের খৃষ্টান অধিবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিনা যুদ্ধে জয় করেছিলেন বিধর্মীদের অন্তর। সেই উট সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা নতুন অনুভূতি, একটা নতুন রোমাঞ্চ। জীবনের একটা প্রথম অভিজ্ঞতা!

হাঁটু ভেংগে অদ্ভুত কায়দায় উট বালির ওপরে বসে পড়লো। বেশ কসরৎ করে উঠে পেছনের সীটে বসে পড়লাম। সাম্‌নে আর একটি সীট। বরকতুল্লাহ্ সাহেবকে বল্লাম: "আসুন।" তিনি এলেন না, খোকনকে তুলে নিলাম সাম্‌নে। বরকতুল্লাহ্ সাহেব বস্‌লেও কোনো অসুবিধে হতোনা। খোকনকে কোলে বসিয়ে নেয়া চল্‌তো।

উঠে দাঁড়ালো উট। দড়ী ধরে টেনে নিয়ে চল্লো তার চালক। বাপ্‌রে বাপ্. দুলুনী। মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে গেলাম! সাধারণভাবে চলায়ই এর যা গতি—দৌড়ালে না জানি কি ব্যাপার হবে। খুব শক্তিশালী লোক না হলে, এর সাথে তাল রেখে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমার মতো দুর্বল লোকের তো কোনো কথাই নেই। সাম্‌নে বসে অবুঝ খোকন কিন্তু ভারী খুশী। সে তখন হাততালি দিয়ে হাস্‌ছে!!

হাত চল্লিশেক বোধহয় গিয়েছিলাম। বল্লাম: "থামো হে, থাম। আমি আর বস্‌তে পারছি না।"

উট চালক বিস্মিত চোখে তাকালো। সে দড়ী ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ধমক দিয়ে বল্লাম: "থামো না হে, আমি নাব্‌বো।"

হেসে উট চালক বল্লে: "ভয় পাবেন না সাহেব, শক্ত হয়ে বসে থাকুন, পড়বেন না আপনি।"

বল্লাম: "তুমি থামাও তো দেখি। আর তোমার চালাতে হবেনা। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আজ আমাদের অনেক কাজ।"

বরকতুল্লাহ্ সাহেব ও আকবর আলী সাহেবকে অনেক দূরে পেছনে ফেলে এসেছি। উট ঘুরে এসে ওঁদের কাছে থম্‌কে দাঁড়ালো।

নেমে বল্লাম: বাব্বাহ্। উটে চড়া!! ঝাঁকানীতে কোমর ব্যথা হয়ে গেছে।—'সাহেব লোক' দেখে সম্ভবতঃ চালক এক টাকা আদায় করলো।

হোটেল থেকে শুরু করে অনেক দূর পর্যন্ত বাংলো ধরণের অনেকগুলো বাড়ী। সবগুলো বাড়ীর মুখ সমুদ্রের দিকে। সার বেঁধে সব দাঁড়িয়ে আছে। সে এক দৃশ্য। এই বাড়ীগুলোর মালিক বিলাসী অর্থশালী লোকেরা। শহরের কর্মব্যস্ত দিনের শেষে মন যখন অবসর খুঁজে বেড়ায় তখন সপ্তাহান্তে একবার অথবা ছুটি-ছাটার দিনে এখানে আসেন। একদিন দু'দিন নিরলস আনন্দময় জীবন কাটিয়ে আবার শহরে ফিরে যান! সমুদ্রের শান্ত হাওয়ায় তাঁরা শান্তি খুঁজে পান অথবা লোভী সমুদ্রের অশান্ত গর্জন বুকে নিয়ে তাঁরা শহরে ফিরে যান, কে জানে?

হোটেলে ফিরে আহারান্তে একটু বিশ্রাম নিতেই চারটে বেজে গেলো। আকবর আলী সাহেব গাড়ী নিয়ে এলেন ঠিক পাঁচটায়। আজ রাতে চলে যেতে হবে ঢাকায়। তাই জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে গেলাম হোটেলে। পি, আই, এ, অফিসে গিয়ে সকালেই সীট বুক করে রাখা হয়েছিল।

'করাচী কালচার সেণ্টার' রিসেপ্‌শন দিচ্ছে ডেলিগেটস্‌দের। ওয়াই এম, সি, এ, হলে এঁরা এর আয়োজন করছেন। মন্ত্রী সাহেবানদেরও অনেকে এসেছেন। কবিতা, গান, নাচ। ত্রুটি নেই কিছুর।

বেশ জমে উঠেছে। মাগরিবের নামাযের বিরতি এলো। উঠে দাঁড়ালাম। কবি সুফিয়া কামালকে বল্লাম: তুমিও তো আজই যাচ্ছ। অতএব আর বসা চলে না। সাড়ে আটটায় পি, আই, এ, অফিসে যেতে হবে। দশটায় প্লেন। উঠে এলেন সুফিয়া সংগে সংগে। বরকতুল্লাহ্ সাহেব বল্লেন: "আমি একটু আকবর আলী সাহেবদের বাসা হয়ে আসি।"

বল্লাম: বেশ তো।

সুফিয়াকে অন্য গাড়ীতে হোটেলে পাঠিয়ে দিয়ে আমি গেলাম 'নজরুল একাডেমী'তে। ওদের কথা দিয়েছিলাম।

নজরুল একাডেমীর মেম্বার ইন্‌চার্জ হজরত আলী সাহেব আর সেক্রেটারী জনাব এম, এ, জলীল সাহেব অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। ওঁরা একখানা খাতা বের করে দিলেন। কিছু মন্তব্য লিখে দিতে হবে।

ঘুরেফিরে দেখ্‌লাম নজরুল একাডেমী। প্রায় পাঁচ ছ' হাযার বাঙলা বই আছে এখানে। প্রায় সবই কোলকাতার। বল্লাম: পাকিস্তানী বই-এর দিকে জোর দিন। রবীন্দ্র-শরৎ প্রমুখ Standard লেখকদের বই ছাড়া অন্য বই না রাখাই ভালো। পাকিস্তানোত্তর যুগে যে-সকল বই বেরিয়েছে কোলকাতা থেকে তার অনেকগুলিতে এমন সব কথা আছে, যা' আমাদের সরলচিত্ত পাঠকের সাম্‌নে দেওয়া শুধু অপরাধই নয়—পাপও।

'নজরুল একাডেমী' বেশ কাজ করে যাচ্ছে এখানে। পাশের ঘরে হারমোনিয়মের শব্দশুনে এগিয়ে গেলাম। একটি তরুণী উঠে দাঁড়ালেন। সম্ভবত বিহার প্রদেশে বাড়ী। স্থানীয় উর্দু কলেজের প্রফেসর। বাঙলা গান শিখ্‌ছেন তিনি। অনেকগুলো চেয়ার সারি সারি। এখানে বাংলা ক্লাশও হয়। উর্দুভাষী ভাই-বোনদের জন্য এখানে বাঙলা শেখার ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত কাজেই হাত দিয়েছে 'নজরুল একাডেমী।'

বাঙলাদেশে উর্দু ভাষার চর্চা চল্‌ছে বহুদিন থেকে। ধর্মীয় কারণে সকলকে আরবী ভাষায় কুরআন শরীফ পড়তে হয়। ঐ সংগে আরবী হরফে লেখা উর্দু ভাষার সাহায্যে মস্‌লা-মাসায়েলের দু' একখানা কিতাব পড়ে ফেলতে হয়, বাঙালী ছেলেকে। উর্দুভাষী ছেলেরা যদি এক আধটুকু বাঙলা শিখে ফেল্‌তে পারে, তা হলে আর উভয় পাকিস্তানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাক্‌বে না। 'নজরুল একাডেমী' এ-কাজে হাত দিয়েছেন দেখে ভারী আনন্দ হলো। পাকিস্তানের বুনিয়াদ মজবুত করছেন এঁরা।

বরকতুল্লাহ সাহেব গাড়ী নিয়ে এসেছেন। হোটেলে ফিরে ঐ গাড়ীতেই আবার পি, আই, এ, অফিসে হাযীর হলাম। তখন ঠিক সাড়ে আটটা। আজ এই প্লেনে যাচ্ছেন ডাঃ মোহাম্মদ এনামুল হক, ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন, প্রিন্সিপ্যাল মোহাম্মদ আজরফ, আজহারুল ইস্‌লাম, কবি সুফিয়া কামাল। ওঁরাও একে একে এসে পড়লেন। আকবর আলী সাহেব তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে এবং হজরত আলী ও জনাব এম, এ, জলীল আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের বিদায় দেবার জন্য। এঁদের সাহচর্য এ-কয়দিন এক মধুর আনন্দে ডুবিয়ে রেখেছিল। কর্মব্যস্ত জনাব কুদরতুল্লাহ্ শাহাব, জামিল উদ্দীন আলী আর মেজর ইবনুল হাসান—এঁদের সাথে আমার সময় দেখা হলো না। অন্ধের হাতি দেখার মতো প্রিয় পাকিস্তানের রাজধানী করাচীকে এক নযর মাত্র দেখে এলাম। এই বেদনাটুকু সম্বল করে পি, আই, এ অফিস থেকে সাত মাইল দূরে করাচী বিমান বন্দরে এসে প্লেনে চেপে বস্‌লাম। রাতের অন্ধকারে কিছু দেখা গেলো না। শুধু বোঝা গেলো বিমানের গতি।

ঘুম থেকে জেগে শুন্‌তে পেলাম: বিমান ঢাকার মাটি স্পর্শ করেছে। আমার সোনার বাঙলার সোনার মাটি। তখন রাত তিনটে। পি, আই, এর-বাসে ওঁদের মতিঝিল অফিসে এসে ফোন করলাম বাড়ীতে। তখন ছ'টা বেজে গেছে। মেজকন্যা বেবী ফোন ধরে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো: "ওরে, বাবা এসেছেন, বাবা এসেছেন।"

হেসে সুফিয়া বল্লেন: "আবার ফোন্?"

বল্লাম: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি করি। ওদের সাথে আমার এই রকমই কথা ছিল।"

নজরুলের বিদ্রোহবাদ

অধ্যাপক আনসার আলী এম, এ,

"মম এক-হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণ তূর্য্য —"

সমগ্র নজরুল সাহিত্যের স্বরূপ এ-লাইনটিতে যেমন ভাবে ধরা পড়েছে এমন আর কোথাও নয়। তাঁর এক হাতের বীণার প্রাণ মাতানো সুর আকুল করেছে রস-পিয়াসী রসিক জনকে, অপর দিকে অন্যায়-অত্যাচার-জর্জ্জরিত সমাজ ব্যবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন 'রণতূর্য্য' নিয়ে। এ-দু'য়ের অতি অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে নজরুল সাহিত্যে। তাঁর এক হাতের বাঁশরী বাংলার চিরন্তনী নীতিধারাতে আবেশ সঞ্চার করে চলেছে—অপর হাতের 'রণতূর্য্য' দোলা দিয়েছে ধমনীর চঞ্চল রক্তে। এ-দোলার দুরন্ত আবেগ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে, যে চলার সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনিই ধসে পড়ে পারিপার্শ্বিকের বাঁধন। এই যে বাঁধন ছেঁড়া বিদ্রোহের ধারা, যা নজরুল সাহিত্যের বৈশিষ্ট, তাকে করেছে সমগ্র দেশের চরণ কবি, আর বিপ্লবীরা তাকে বরণ করেছে নিজেদের অগ্রপথিক রূপে। এ-প্রবন্ধে তার কাব্য ধারার এই দিকটিই আজ আলোচনা করব।

সমাজের আভিজাত্যের, রাজনীতির ও ধর্মীয় ভণ্ডামীর পেষণ, যার চাপে দীন-দরিদ্র, চাষী-মজুর, মধ্যবিত্ত মানুষ হয়েছে মৃত্যু পথ-যাত্রী—যাদের জন্য নেই কোন সান্ত্বনার বাণী, কোন অধিকারের জোর, কোন আশার আলো, যারা আসে আর যায়, সমাজ যাদের চলার গণ্ডী দেয় নির্দ্দিষ্ট করে, তাদের এই প্রচণ্ড চিরন্তনী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা, মাথা উঁচু করাই কল্পনাতীত। এই দুর্জ্জেয় দুর্গের গোড়ায় আঘাত হানতে যে দুর্বার শক্তির প্রয়োজন তা নজরুলের লেখায় কেমন করে সম্ভব হোল? নিজে এ-শ্রেণীভুক্ত হয়েও নজরুল এ-শক্তি পেলেন কোথা থেকে?

সত্যিই যদি আমরা এর কারণ খুঁজতে যাই তবে আমাদের প্রথমে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানের ঘরে নজরুলের জন্ম। মুসলমানের জীবনাদর্শ কোমলে কোমল, কিন্তু ভীষণতায় ভয়ঙ্কর। তাছাড়া নীতির সৌন্দর্য্য এবং ব্যবহারিক জীবনের সহজ স্বাভাবিকত্বই সম্ভব করে তুলেছিল এক কালে বিদ্যুত-গতিতে পৃথিবীময় ইসলামের জয়যাত্রা। কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম স্পৃহা। মুসলমানের জীবনের এই শিক্ষা ও সৈনিকের আদর্শ মনোবৃত্তি, ভাব প্লাবিত ভারতভূমিতে পড়ে কিছু কালের মধ্যেই ভাবালুতায় ভরে উঠে। এই ভাবালুতার প্রভাবে মাইকেল বীররস গাইবার তোড়জোড় করলেও আর-হাওয়ার গোলে পড়ে করুণ গীতি রসেরই অনুবর্তী হলেন। অনুকারী হেম-নবীন, কায়কোবাদ হলেন নেস্তনাবাদ, আর অতি চতুর রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ধাত বুঝেই ও রাস্তায় পা-ই বাড়ালেন না। কিন্তু নজরুলের মধ্যে এই আবেশ আসলেও তার জাতীয় জীবনাদর্শ এবং প্রকৃত সৈনিকের শিক্ষা তাকে দিয়েছিল অদ্ভুত বৈশিষ্ট, যার ফলে একমাত্র তিনিই সফলতা লাভ করেছেন এ-ধারায়। তাছাড়া তার আবির্ভাব কালটাও ছিল একটা যুগসন্ধিক্ষণ। তখন সমগ্র বাংলা তথা ভারতে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে ভারতীয় মানসের অস্বীকৃতি, মানসাদর্শকে দমনের প্রচেষ্টায় বর্বর নিষ্ঠুরতার প্রকাশ—জালিয়ান ওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিতে ধূমায়িত বহ্নি জমে উঠছিল ভারতীয় সমাজ মানসে। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত সমাজ ধ্বংসের মুখে। তাই সঙ্কটাপন্ন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদ পথ খুঁজছে নূতন দিকে—নূতন বাস্তব অবস্থাকে আত্মসাৎ করবার জন্য। বাস্তব সমুক্ষিত এই সব সমস্যার সার্থক কাব্য রূপায়নের ক্ষমতা সে সময়কার কবি সত্যেনদত্তের ছিল না—বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরও নয়, কারণ তিনি ছিলেন অতিরিক্ত রকমের ভাব ও ভক্তিবাদী। আর নজরুল ছিলেন সেই যুগের একমাত্র প্রধান ও ব্যতিক্রম কবি-কর্ম্মী। তাই নজরুলের রচনায় সে-কালের যুগবাণী ধ্বনিত হয়েছে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে অমিত তেজ, উদ্দাম, স্বতঃস্ফূর্ত্ততা ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র—যার ওজস্বিতা তাকে দুর্বার করে তোলে। এজন্যই তার সাহিত্যে একটা পৌরুষের পরশ পাই, বাংলা সাহিত্যে নজরুল পুরুষ প্রাণের দৃষ্টান্ত। মুসলমানী ঐতিহ্য এবং ভাবাদর্শে নজরুল কাব্য প্রেরণায় তেজস্বিতা লাভ করলেও সেটা শুধু মুসলমানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকেনি। তার সাহিত্যে ধর্মীয় গোড়ামীর কোন স্থান নেই, সেখানে রাম রহিমের সমান দর। তাই, "হিন্দু না ওরা মুসলিম" জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলতে পেরেছেন—"সন্তান মোর মা'র।"

কবি গুরু গ্যেটে বলতেন: "প্রতিভার কাছে আমার

প্রথম ও শেষ দাবী হচ্ছে সত্য প্রীতি।" নজরুলের সাহিত্য সম্বন্ধেও এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নজরুল যখন তার সত্যসন্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন মানুষের দিকে, তখন দেখেছেন মানুষের যুক্তিহীন, বিচারহীন ধর্মান্ধতা, বলদৃপ্তের আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধা, ক্ষমতাবান জাতির দুর্বার সাম্রাজ্য লিপসা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা। মানবতার অপমান, মুখোশধারী ভদ্রবেশীর বর্বরতা। মানুষের দ্বারা মানুষের যে স্বেচ্ছাকৃত অপমান, স্বার্থবাদী শোষকের দৃষ্টির সামনে সত্যের যে নির্মম লাঞ্ছনা, সমাজের ও ধর্মের মাঝে মানুষের নির্লজ্জ হঠকারিতা যা বিশ্বের বুকে সৃষ্টি করেছে বিভীষিকা, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এ-জন্যই তাঁর কাব্যের মূল সুর অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যবাদীর বিদ্রোহ, স্বার্থপর ধনী সমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের বিদ্রোহ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ, ভণ্ড সমাজ পতির বিরুদ্ধে মানবতার বিদ্রোহ। লাঞ্ছিত মানবের পক্ষ নিয়ে নেমে এসেছেন কবি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শোষণে যাদের নাভিশ্বাস উঠেছে তিনি তাদেরই প্রতিনিধি, তাদেরই গান তিনি গেয়েছেন; কারণ তারাই, "এ-ধরণীর হাতে এনে দিল ফসলের ফরমান।"

নজরুল কাব্যে মানবের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা, অভাব অনটনের সুরই পেয়েছে সর্বপ্রধান স্থান; এখানে আমরা সাধারণ মানুষের পরিপূর্ণ পরিচয় পাই। কবি গুরু যে "কবির বাণী লাগি কান পেতে" ছিলেন, সে যেন নজরুলই। কবি গুরুর বাণী "গেলেও বিচিত্র পথে হয়নি সে সর্বত্রগামী।" আর অপর দিকে নজরুল "কথায় ও কর্মে" সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন। আর তার পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য আছে আদর্শবাদী মানবের ছাপ; কিন্তু নেই দীন-দরিদ্র, কুলি মজুর, চাষীর জীবনের প্রকাশ। আর নজরুলের কাব্যে বাস্তবের কঠোর আঘাতে ও চক্রান্ত-কারীর চক্রান্তে অসহায় মানুষের যে অবস্থা—তাই ফুটে উঠেছে সুষ্ঠুভাবে। তার বাণী সমস্ত নিপীড়িত জন-সাধারণেরই বাণী। তিনি তাদের ডেকে বলেছেন,—

"জাগো জন শক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরামের স্কন্ধে হালের মত ক্ষিপ্রতেজে গগনের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারের বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উল্টে দিক। আনো তোমার হাতুড়ী, ভাঙ্গো ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধূলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড় হাতুড়ী, চালাও লাঙল, উর্দ্ধে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে—লাল ঝাণ্ডা।"

পুঁজিবাদী শোষকের বিরুদ্ধে এর আগে এত বড় রণহুঙ্কার শোনে নেই কোন ভারতবাসী। মেহনতী জনতার ন্যায্য অধিকারে যারা বঞ্চিত করেছে তার বিরুদ্ধে তার লেখনী সংগ্রাম করেছে অবিরাম। যারা হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পরেও পায়না ন্যায্য মজুরী তাদের কণ্ঠেই কবির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠে—

"যে বাড়ীতে থাক তার প্রতি ইঁটে রক্ত মাখানো কার?
হৃদয় থাকিলে, দেখে বেদনায় কাঁপিয়া উঠিত হাড়।
মজুর তোমার মজুরী করিয়া নজরানা কত পায়?
চক্ষে তোমার লজ্জা থাকিলে মরে যেতে লজ্জায়।

* * * *

* * * *

রাজ মিস্ত্রীরা রাজবাড়ী গড়ে তোমরা সেথানে রাজা
আমাদের চালে খড় নাই, একি পারিশ্রমিক সাজা?"

চক্রীর চক্রান্তে চাষী সমাজ নিস্পেষিত, জন্মের দিন থেকেই যে জমির সঙ্গে তার অদৃষ্ট অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা সে জমির মালিক কিন্তু তারা নয়, মালিক তারাই— "মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ।" আর—"বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন ভুঁড়ি; নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে গাড়ী।" অভিজাত ধনতান্ত্রিকদের কারসাজিতে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন। আমরা আজো দেখি—

"(আজ) চারিদিক হতে ধনিক-বনিক শোষণকারীর জাত
(ও ভাই) জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
(মার) বুকের কাছে মরছে খোকা নাইক আমার হাত।"

তাই এই স্বার্থবাদী ধনতান্ত্রিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে তার চরম বাণী গর্জে উঠে,—

"আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্ব্বনাশের: এরে ভাঙিব এবার।
ভেদি দৈত্য কারা
আয় সর্ব্বহারা
কেহ রহিবেনা আর পর-পদ-আনত।

* * * *

শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী
ছিনু সর্ব্বহারা, হবো সর্ব্ব-জয়ী।"

নজরুল দেখেছেন মানুষের কল্যাণে সৃষ্ট ধর্মের আইন-কানুন মোল্লা-পুরুতের কারসাজিতে হয়ে পড়েছে মানুষের ফাঁসীর রজ্জু। ভণ্ড, অজ্ঞ শাস্ত্রবাদীদের কাছে মানুষের চেয়েও বড় হয়েছে ধর্মের বেড়াজাল। দেশব্যাপী পোষাকী ধর্মের হানাহানিতে মোল্লা-পুরুত জুগিয়েছে ইন্ধন; আর সমাজকে নিয়ে চলেছে মধ্যযুগের গোঁড়ামীতে। এই অন্যায় ভণ্ডামী ধূলিস্মাৎ করবার জন্য আহ্বান করেছেন গজনী মাহমুদ ও চেঙ্গীসকে—

"কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙ্গে ফেলো ঐ-ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।

"খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা,
সব দ্বার এর খোলা রবে চালা—হাতুড়ি শাবল চালা।
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।"

যেখানেই মানুষ মনুষ্যত্বকে অবহেলা করে দেবতা ও ধর্মকে বড় করে দেখেছে সেখানেই কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।"

* * *

"এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।"

বিদ্রোহী কবি নজরুলের রাজনৈতিক মতবাদ ছিল বিপ্লবাত্মক। বিদেশীয় শাসন ও শোষণ, অমানুষিক অত্যাচার, কঠোর দমননীতি, অন্যায়ের যোগ্য প্রত্যুত্তর একমাত্র বিপ্লবের পথেই দেওয়া সম্ভব বলে স্বাধীনতার বীর সৈনিক মনে করতেন। কারণ অত্যাচারই তাদের লক্ষ্য—

"লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত
জেনেছে সত্য হত্যাসার।
অত্যাচার! অত্যাচার॥"

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'অগ্রপথিক' বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছেন—

"নাগিনী-দর্শনা রণ রঙ্গিণী শাস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারই পতাকা তুলিয়া ধর।
নির্মম-ব্রত রে সেনাদল!
জোর্ কদম্ চল্‌রে চল্॥"

ইতিহাসের কালচক্র টান দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ভিত ধরে। আজ সাম্রাজ্যবাদের আসন টলটলায়মান। তাদেরও দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে, তাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে বের হবে নতুন সমাজ ও মানুষ। কবির স্বপ্ন সেই নতুন সৃষ্টিতে নিবদ্ধ—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন বেদন
আস্‌ছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশেবেশে
প্রলয় চেয়েও আসছে হেসে-মধুর হেসে
ভেংগে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর

* * * *

এবার মহা নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর
আলো তার ভরবে এবার ঘর।"

তাই নজরুল শুধু ধ্বংসই চাননি, তিনি ধ্বংস চেয়েছেন যুগের অনুপযোগী পুরাতনের, অন্যায় অত্যাচারের। আর তার মধ্যে থেকে চেয়েছেন নূতন আশার আলো।

সাম্প্রতিক উপভোগ্যতার পালা সুদূর ভবিষ্যতে যদি শেষ হয় তাহলেও তার সাহিত্যের দর ও কদর থাকবে বিংশ-শতাব্দীর বাংলা দেশের—তথা ভারতের একখানি নগ্নসত্যের ইতিবৃত্ত হিসাবে, যার মধ্যে আমাদের মত মানুষ, সাধারণ মানুষ নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। নজরুল সাহিত্যকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা সমাজ জীবনের ইতিহাসের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান থেকে যাবে। তাই তার সাহিত্য সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও মহৎ সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য।

তাঁর কাছ থেকে আমাদের সাহিত্য, আমাদের সমাজ অনেক কিছু আশা করেছিল। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে আজ তাঁর পরিণতি অতি করুণ। কালের বিচারে তিনি হয়েছেন জয়ী। তাঁর কাব্যের পাতা উল্টালে দেখা যাবে আপনার বৈশিষ্ট্যে ও দীপ্ততেজ অদ্ভুত মহিমান্বিত তার মূর্তি নব-জীবন ও যৌবনের প্রতীক। বিদ্রোহী নজরুল বাংলা সাহিত্যে অমর।

পাণ্ডুর আকাশ

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ
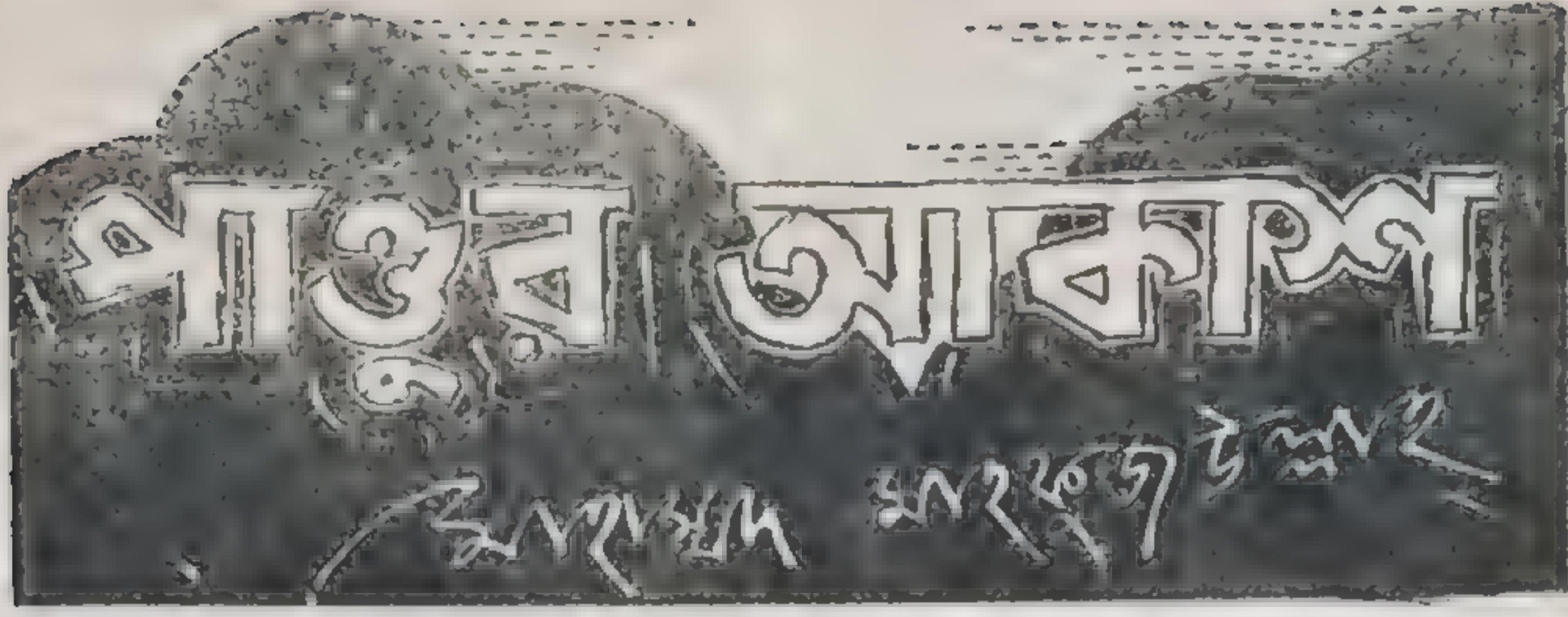
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

লতীফ সাহেবের সম্মতি পেয়ে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না রিজিয়া। একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ল তাতে। কোনো বান্ধবীর বাসায়ই সে যাবে না, আসলে শ্বশুরকে ফাঁকি দেবার জন্যেই কথাটা বলেছিল সে। লতীফ সাহেব আসার পর থেকেই রিজিয়া মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে মিথ্যা কথা বলেই রেহাই পেতে হল।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে রিজিয়া রিকসাওয়ালাকে শান্তিনগরে যেতে বললো। মামুন অফিস থেকে ফিরে এসে তাঁর বাপের সাথে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা যত খুশী বলুক, রিজিয়া এর কোন কিছুই শুনতে চায়না। রাত্রিদিন আর কাহাতক এত কথা সহ্য করা যায়। চিঠি-পত্রে সংসারের সুখ-দুঃখের যত ফিরিস্তি সে এতকাল শুনে এসেছে তাতেই তার মন জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন বুড়ো শ্বশুরের সামনে দাঁড়িয়ে আর নাইবা শুনলো সে-সব পুরানো কাহিনী। একবার এসে যখন বাসায় উঠেছেন তখন যে আর সহজে নড়বার নামটিও করবেন না সে তো অতি জানা কথা। তা ছাড়া টাকা-পয়সার একটা বিহিত ব্যবস্থা করে তবে তো যাবেন তিনি! অসহ্য! একেবারে অসহ্য! রিজিয়া ভেবে পায় না কেমন করে এই রাক্ষুসে পরিবারের হাত থেকে সে মুক্তি পাবে।

শান্তিনগরে গিয়েও কি আর শান্তি আছে! সে-সংসারটাও যে একটা হরিঘোষের গোয়াল! অষ্টপ্রহর টাকা টাকা করে তার বুড়ো বাপও যে সংসারটাকে একেবারে হাহাকারে ভরে তুলেছে! রিজিয়া ভেবে পায় না, মানুষ এমন অতৃপ্ত কেমন করে হয়! ধন-সম্পদ খোদা দু' হাতে ঢেলে দিয়েছেন ফরিদ সাহেবকে, কিন্তু তবুও তাঁর মনে লালসার শিখাটা কেমন যেন দাউ দাউ করে জ্বলে! সামান্য ব্যবসায়ী থেকে বড় লোক হয়ে উঠেছেন ফরিদ সাহেব। রিজিয়ার চোখের ওপরেই ত ঘটেছে এর অনেক তবুও কোন দিন সে তার বুড়ো বাপকে দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে দেখেনি! কিন্তু কেন, কি প্রয়োজন তাঁর এত ধন-সম্পদের আকাংখা নিয়ে বেঁচে থাকবার!

রিক্সাটা ততক্ষণে হাইকোর্টের মোড় পেরিয়ে শান্তিনগরের পথ ধরেছে। রিজিয়ার মনের ভাবনাটাও আর একবার মোড় নিল। এতক্ষণ প্রায় অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল রিজিয়া, হঠাৎ যেন সে তার আত্মচেতনা ফিরে পেল।

রিজিয়া বাসা থেকে বেরিয়ে আসার আধ ঘণ্টা পরেই মামুন গিয়ে ঢুকলো। লতীফ সাহেব তখন সামনের প্রাঙ্গণে একটা চেয়ার পেতে বসেছিলেন। মামুনকে ঢুকতে দেখেই তিনি চেয়ারটাতে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মামুন ঠিক এ সময়ে তার বাপকে এখানে দেখবে বলে আশা করেনি। আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে কিছু দিন আগে মামুন নিজেই চিঠি লিখেছিল, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তিনি এসে পড়বেন এতটা সে আশা করেনি।

মামুন লতীফ সাহেবকে কদমবুছি করে বললো, "কখন এলেন আব্বা?"

লতীফ সাহেব ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এই ঘণ্টাখানেক আগে। তুমি কেমন আছ বাবা?"

মামুন ছোট খাটো দুই একটা কথা বলে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। রিজিয়াকে ডাকতেই চাকর এসে বললো, "বিবি সাহেবা বাইরে বেরিয়ে গেছেন উনার এক বান্ধবীর বাসায়।"

মামুন বললো, "আব্বার সাথে বিবি সাহেবার দেখা হয়েছে?"

চাকর বললো, "হ্যাঁ, ওনার কাছে বলেই তো তিনি বাইরে গেলেন।"

মামুন জিজ্ঞাসা করলো, "আব্বা কি তাকে যেতে বলেছেন?"

মামুনের গলার স্বর লতীফ সাহেবও শুনতে পেলেন। বলার ভঙ্গীটা একটু কর্কশই শোনালো। লতীফ সাহেব চেয়ার ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, "হ্যাঁ বাবা,

বৌমা আমার কাছে বলেই বাইরে গিয়েছে। তার কোন্ এক বান্ধবীর বাড়ীতে নাকি আগে থেকেই চায়ের দাওয়াত ছিল। তাই আমার কাছে বলেই গিয়েছে।”

মামুন তখন ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। রিজিয়াকে সে ভালো করেই চেনে। লতীফ সাহেবকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই যে সে এই নতুন চাল চেলেছে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এই কয়দিন আগেই তো সে মামুনকে বলেছিল, “আব্বাকে নাকি আসতে বলেছ?”

মামুন বলেছে, “বলেছিই তো, তাতে হয়েছে কি?” রিজিয়া কতক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, “আমি বলেছিলাম কি, এখানে না এলেই তো ভালো হয়। একে তো বাসাটা ভয়ানক ছোট, তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ারও নানা অসুবিধা। এমতাবস্থায় এখানে এলে আব্বার তো কষ্ট হবারই কথা। বরং বড় একটা বাসা পেলে তখন না হয় এসে কিছুদিন থেকে যাবেন।”

মামুন বললো, “সে সব সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আসতে লিখেছি বলেই তো আর তিনি চলে আসবেন না। আর যদি আসেনই বা তাতে তোমার ভাববার কি আছে? আমাদের যেমন করে চলছে তাঁরও ঠিক তেমনি করে চলবে। তিনি তো আর মেহমান নন যে আদর-যত্নের জন্য এত মাথা ঘামিয়ে মরতে হবে!”

মামুনের প্রত্যেকটি কথা বড় অসহ্য মনে হয়েছে রিজিয়ার। তবুও সে গলা চড়িয়ে বললো, “তোমার কাছে এজন্যেই কিছু বলতে চাইনা। ভালোর জন্যে বলতে এলাম, আর তুমি কিনা এত কথা শুনিয়ে দিলে। বেশ, আমার কি, বুড়ো মানুষ এসে যদি কষ্ট পান তখন দেখা যাবে।”

মামুন বললো, “থাক থাক, এত হিতোপদেশ দিতে হবে না। আসলে তোমার মনোভাব যে কি, তা আমি ভালো করেই জানি।”

সুতরাং মামুন এখন সহজেই বুঝতে পারলো, লতীফ সাহেবকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই রিজিয়া এই নতুন চাল চেলেছে। কিন্তু তবু মামুন চুপ করে থাকলো, অন্য দিনের মতো হৈ চৈ করে বাড়ী মাথায় তুললো না। চাকরটাকে ডেকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিল কিছু মাছ-গোশ্‌ত আনবার জন্যে। রিজিয়া কখন্ ফিরবে কে জানে! এমনও তো হতে পারে যে সে আজ হয়তো আর আদপেই ফিরবে না। শান্তিনগরে যখন গিয়েছে তখন আর আজ না ফিরে আসারই কথা। মাঝে মাঝে রিজিয়া বান্ধবীর বাড়ীর কথা বলে সোজা শান্তিনগরে চলে যায়, তিন-চার দিন পর আবার আপনিতেই ফিরে আসে।

জরিণা বেগম জিজ্ঞেস করেন—“কি রে রিজিয়া, এই অবেলায় যে তুই চলে এলি? জামাই কি বাসায় ফিরেছেন?”

রিজিয়া বলে, “একলা একলা বাসায় ভালো লাগছিলো না তাই চলে এলাম মা। তাছাড়া অনেক দিন তো আসিনা, ভাবলাম একবার ওদের খবরটাই নেওয়া যাক। তোমরা তো আর আমার খোঁজ-খবর নেও না।”

জরিনা বেগম বলেন, “আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে মা। জামাইর সাথে তুই নিশ্চয় ঝগড়া করে এসেছিস, নইলে এমন করে আসার পাত্রী তুই নস।”

রিজিয়া তার মাকে নানা কথার নক্সা এঁকে ভুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু জরিণা বেগম মেয়েকে সবচেয়ে আপন করে জানেন, বলেন, “এতে আর এমন কি হয়েছে মা, সংসারে চলতে ফিরতে গেলে একটু আধটু মন কষা-কষি তো হবেই। তাতে রাগ করে থাকলে তো চলবে না।”

রিজিয়া অনুযোগের সুরে বলে, “ছিঃ ছিঃ তোমরা কি মা! এলাম একটু দেখাশোনা করতে, তাই কিনা এত কথা বকে চলেছ! আচ্ছা বেশ, তোমরা যদি আমার আসাটা পছন্দ না-ই কর তবে না হয় আর আসবো না।”

জরিনা বেগম মেয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, “পাগল হলি মা! তোর ভালোর জন্যেই তো কথাটা বললাম! আমাকে তুই খামাখা ভুল বুঝিসনে। তোর মুখ দেখেই টের পেয়েছি, মামুনের সাথে আজ তোর নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে।” জরিনা বেগম মেয়েকে আরো কাছে টেনে নেন। বার-বার মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। রিজিয়া চুপ করে থেকে মায়ের সব কথার নীরব প্রতিবাদ জানায়। তারপর এক সময়ে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার নিজের বাসায় ফিরে আসে রিজিয়া।

বিয়ের পর থেকে এমন ঘটনা মামুন-রিজিয়ার জীবনে প্রায় অহরহ ঘটছে। প্রথম প্রথম বড় বেশী খারাপ লাগতো মামুনের। মেয়ে-মানুষের এমন জিদ সত্যি সত্যিই অসহ্য! একটি পুরুষের অনুগ্রহের ওপর যার জীবনের সুখ-দুঃখ সর্বতোভাবে নির্ভরশীল তার কি এমন হলে চলে না—এমন দু'টি মন নিয়ে সুখের নীড় বাঁধা যায়! মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠে মামুন, কি করতে পারে সে এই দুর্ভাগ্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য? নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কোনও সান্ত্বনাই খুঁজে পায়না মামুন। তার কেবলি মনে হয়, সংসারটা একটা

বিশাল মরুভূমির মতো খা খা করছে, চারিদিকে ছুটাছুটি করেও একবিন্দু পানির সন্ধান সে পাচ্ছে না!

রিজিয়া ভাবে. জীবনটা কি তার এমন করেই কেটে যাবে? পশুর চেয়ে তাদের জীবনের মাহাত্ম্য আর এমন কিই-বা বেশী! সন্দেহ, দ্বন্দ্ব আর অবিশ্বাস যেখানে পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে আছে সেখানে জীবনের ফুল ফুটাবার সাধনা কি হাস্যকর নয়? বিয়ের পর দুটি বছর কেটে গেল, রিজিয়ার মনে হল এ-দু'টি বছর যেন সে আগুণের হল্কার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে এসেছে! কেমন করে যে তারা এতদূর এগিয়ে আসতে পারলো এটা ভাবতেও যে আজ তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে!

শান্তিনগরে গিয়ে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো আজকেও। প্রথমটা জরিনা বেগম ভেবেছিলেন মেয়ে তার বেড়াতেই এসেছে। অনেকদিন তিনি নিজেও যেয়ে রিজিয়াকে দেখে আসতে পারেন নি, তাই রিজিয়া যখন আপনি থেকেই এল তখন তিনি খুবই খুশী হলেন, অন্ততঃ মুখে সেই খুশীর ঝলকটুকু বেশ স্পষ্টই ফুটে উঠল। জরিনা বেগম দরজায় এগিয়ে গিয়ে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানায় এনে বসালেন। তারপর সুখ-দুঃখের নানা কথা বলতে শুরু করলেন দু'জনে। একই কথার পুনরাবৃত্তি হলো কতোবার, তবুও রিজিয়ার মনে হলো জরিনা বেগম আজ কেন জানি তাকে ঠিক আগেকার মতোই আপন করে নিয়েছেন। গত দু' বছরে বাপ মায়ের সাথে রিজিয়ার স্নেহের সম্পর্ক বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছিল। এঁদের ব্যবহার রিজিয়ার কাছে বড় মেকী বলে মনে হতো।

মায়ে-মেয়েতে সংসারের নানা কথাই উঠলো। জরিনা বেগম এটাই বলতে চাইলেন যে মামুনের হাতে রিজিয়াকে তুলে দিয়ে তাঁরাও মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। একটা অনুতাপ আর বেদনার কাঁটা সব সময়ই তাঁদেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। কিন্তু ভাগ্যের উপর হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারেন তাঁরা।

নানা কথার ফাঁকে রিজিয়া এক সময়ে তার শ্বশুরের কথা তুললো, বললো, "জানো মা, আজ আমার শ্বশুর সাহেব এসেছেন বেড়াতে।"

জরিনা বেগম প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, বললেন, "কার কথা বললি?"

রিজিয়া বললো "আমার শ্বশুর, অর্থাৎ তোমার বেয়াই এসেছেন বেড়াতে।"

জরিনা বেগম বললেন, "ও, তাই বল, সে তো খুবই খুশীর কথা। আমাদের এখানেই নিয়ে এলি না কেন? তোদের সেই ছোট্ট বাসায় মেহমানের জায়গা কোথায়?"

রিজিয়া যেন হালে পানি পেল, বললো, "আমিই তো তাই বলি মা, এতোটুকুন বাসা, তাতে আবার মেহমান, যত সব!" কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো রিজিয়া। তার মুখমণ্ডলে ভীষণ বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো। আবার বললো "তোমার সোহাগে জামাইটি যে কি মা, বাসায় জায়গা নেই, তবুও চিঠি লিখে বাপকে আনাই চায়! কিন্তু কেন, কিছুদিন পরে এলে কি এমন অসুবিধাটা হতো? আমি হাজার বার বললাম, বড় দেখে একটা বাসা করো, তারপর না হয় আব্বাকে আসবার জন্যে বলা যাবে। না, তিনি সে-সব কথা শুনবেন না, বরং পাল্টা আরো বলবেন, হয়েছে কি? আমরা যেমন করে থাকি মেহমান এসেও তেমন করেই থাকবে।" রিজিয়া মামুনের কথার ভঙ্গী অবিকল নকল করে বললো। তারপর আবার নিজেই মন্তব্য করলো, "যতসব ছোট লোকের কারবার।"

জরিনা বেগমের কানে কথাটা ভালো শুনালো না। হাজার হলেও তিনি বুড়ো বয়সের কোঠায় পা দিয়েছেন, যৌবনের দাম্ভিকতা এখন তার মনে আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই, দুনিয়াদারীর ফাঁকে ফাঁকে সব কিছু ঝরে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। জরিনা বেগম বললেন, "একি বলছিস রিজিয়া! বুড়ো মানুষ ছেলের বাসায় আসবে নাতো কার বাসায় আসবে? পরপারের ডাক কখন্ আসে কে বলতে পারে, যাবার আগে একটু সুখের মুখ দেখে যাবেন না?"

রিজিয়া বললো, "তুমি আমার শ্বশুরকে দেখনি, তাই এত কথা বলছো। বয়স হলেও পরপারে যাবার সময় তাঁর এখনো আসেনি। তা' ছাড়া ডাক যদি এসেই পড়ে তা' হলে তুমি আমি এর কি করতে পারি?"

জরিনা বেগম বেশ কিছুটা বিরক্ত হলেন, বললেন, "ছিঃ ছিঃ মা রিজিয়া, তুই এ-সব কি বলছিস, তোর কি মাথা খারাপ হল?"

রিজিয়া বললো, "এখনও হয়নি, তবে হবার পথে।" কথা শেষ করে একটু গম্ভীর হয়ে গেল রিজিয়া। জরিনা বেগম বললেন, "কি হয়েছে মা, একটু খুলেই বল না, মামুনের সাথে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

রিজিয়া জরিনা বেগমের কথার কোন উত্তর দিল না, আপন মনেই সে বলতে লাগলো, "বড় দুঃখে এ সব কথা বলছি মা, তোমরা হয় তো এর একবিন্দুও বিশ্বাস করবে না; কিন্তু শুধু আমিই জানি কি বেদনা নিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হচ্ছে।"

জরিনা বেগম মেয়ের দুঃখে বিগলিত হলেন না বটে,

কিন্তু তবুও তিনি বললেন, "এ-দুঃখের কাহিনী আর নতুন করে কি শুনাবি মা। যেদিন তোকে মামুনের হাতে তুলে দিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলাম সেদিন থেকেই তো এ-কাহিনীর শুরু। অদৃষ্টের বাইরে কোনো ছারা নাই মা। নিজের জীবনের অতীত-সুখের দিনগুলো যদি ভুলতে পারিস তবেই তুই শান্তি পাবি।" কথা শেষ করলেন জরিনা বেগম, তারপর কি যেন ভেবে আবার বললেন, "জানি মা, অতীতকে ভোলা খুব সহজ নয়; কিন্তু তবুও চেষ্টা তো করতে হবে। মনে কর মা, তোর জীবনের সেই সুখের অধ্যায়টা যেন ছেঁড়া-পাতার মতো কোথায় হারিয়ে গেছে। অতীতকে যতই স্মরণ করতে যাবি, দুঃখের দহন ছাড়া আর কিছুই পাবি না মা।"—জরিনা বেগম থামলেন।

রিজিয়া মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো। তার মনের বিশাল আকাশে তখন কালবৈশাখীর ঝড় হু হু করে বয়ে যাচ্ছে।

মা-মেয়েতে অনেক কথা হলো সে-রাতে, জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কাহিনী।

তারপর যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে রিজিয়া আবার তার নিজের বাসার দিকে পা পাড়ালো। দু'তলার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে জরিনা বেগম বল্লেন, "মা রিজিয়া, তোর শ্বশুরকে কাল সকালেই আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিস। বুড়ো মানুষ, ওখানে হয় তো শুধু শুধু কষ্টই পাবেন।"

জরিনা বেগমের কথার কোন জওয়াব দিল না রিজিয়া। আস্তে আস্তে সে রাস্তায় এসে নামলো, তারপর একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়লো তাতে। রিক্সাটা রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই জরিনা বেগম আবার সিঁড়ি বেয়ে দু'তলায় উঠে গেলেন।

॥ এগার ॥

বিকেলে বেরিয়ে গিয়েছিল রিজিয়া। বিকেল কেটে গিয়ে যখন সন্ধ্যার গা ছোঁয় ছোঁয় করছে, তখনও ফিরছে না দেখে মামুনের বুঝতে বাকী রইলো না বান্ধবীর বাড়ীর নাম করে রিজিয়া কোথায় চলে গিয়েছে। লতীফ সাহেব বুড়ো মানুষ, তদুপরি শহুরে পুত্রবধূর প্রতি তাঁর রয়েছে অপরিসীম স্নেহ। শুধু স্নেহই বা কেন, তার সাথে যে মিশে আছে একটা সমীহের ভাবও। তাই রিজিয়া যখন বললো, "আপনি একটু বিশ্রাম নিন আব্বা, আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।" তখন তিনি ভেবেছিলেন এতে আর এমন কি মনে করার আছে! তাই মামুন বাসায় ফিরে এসে যখন রিজিয়ার খবরদারী করতে শুরু করেছিল তখন তিনি তাতে খানিকটা বাড়াবাড়িই লক্ষ্য করেছিলেন; বলেছিলেন "বৌমা তো আমার কাছে বলেই বাইরে গেছে, হয়তো কতক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

কিন্তু মামুন এতেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। চাকরের কাছে তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে: রিজিয়া কখন বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল ইত্যাদি।

খেয়ে-দেয়ে বাইরের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে বসে আলাপ করছিলেন লতীফ সাহেব। মামুন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছিল সংসারের নানা খবর। চাকরটা এরি মধ্যে এসে বার দুই পান বানিয়ে দিয়ে গেছে। লতীফ সাহেব পান খান খুব বেশী, ভাত না খেয়েও হয় তো তিনি দু'তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারেন অনায়াসে; কিন্তু পান না খেয়ে একদণ্ডও না!

এমনি সময়ে রাস্তার কাছে রিক্সার ঘন্টির শব্দ শোনা গেল। মামুন বুঝতে পারলো সম্ভবতঃ রিজিয়াই ফিরে এলো। একটু পরেই দেখা গেল রিক্সা থেকে নেমে হন হন করে ঘরে গিয়ে ঢুকলো রিজিয়া। মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন লতীফ সাহেব—তাকিয়েছিল মামুন। মামুনের দু' চোখ থেকে তখন রাগ আর ঘৃণার আগুন ঝরে পড়ছিল অবিরাম। রিজিয়া কোন দিনই এই অগ্নিবৃষ্টির দিকে তাকায় না, বাইরে থেকে ফিরে এসে সে প্রায়ই ঘণ্টাখানেকের মতো চুপ মেরে থাকে। এ-সময়ে মামুন যত রাগ আর বাগ বিস্তারই করুক না কেন, রিজিয়া তার কোন জওয়াবই দেয় না। কিন্তু মামুনের রাগ যখন থিতিয়ে আসে তখনই মুখ খোলে রিজিয়া। আর সেই মুখ থেকে বিষের হল্কা বেরিয়ে আসে।

লতীফ সাহেবের সামনে মামুন একটা কাণ্ড বাধাতে চাইলো না, কারণ সে ভালো করেই জানে, সে-কাণ্ড হয়তো কারবালা কাণ্ডকেও ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু মনে মনে রাগ আর বিতৃষ্ণা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছিল।

তারপর একসময়ে ওরা সবাই ঘুমাতে গেল। মামুন বিছানায় যেয়ে দেখল একপাশে মরার মতো পড়ে রয়েছে রিজিয়া। তাকে ঠেলে জাগানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো না মামুনের। নিজে থেকে যদি জাগে তো জাগুক—নিজে সে আজ কিছুতেই জাগাবে না তাকে।

এক সময়ে মামুনের চোখেও ঘুম নেমে এলো। মরার মতো বিছানার একপাশে পড়ে থাকলেও রিজিয়ার চোখে তখন ঘুম নেই। একটা অস্বস্তিকর দমকা হাওয়া যেন তার সারা মন তোলপাড় করে তুলছে। বিকেলের

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে নিজেই বেশ অবাক হয়ে গেল রিজিয়া। খেয়ালের বশে এত বড় একটা কাণ্ড তার কিছুতেই করা উচিত হয়নি। শ্বশুরকে বাসায় একলা ফেলে রেখে বেরিয়ে যাওয়াটা সত্যিই বড় অন্যায় হয়েছে তার। কে জানে, মামুন তার বাপের কাছে রিজিয়ার বিরুদ্ধে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথাই না বলেছে! ছিঃ ছিঃ কি ভাববেন সেই বুড়ো মানুষটা! তার কি দোষ? খামাখা তার মনে কষ্ট দেওয়া তো উচিত হয়নি রিজিয়ার। ছেলের বাসায় বেড়াতে এসেছেন, দু'দিন পরেই হয় তো আবার ফিরে যাবেন সেই গ্রামের বাড়ীতে। মাঝখান থেকে রিজিয়া সম্পর্কে কি একটা খারাপ ধারনাই না নিয়ে যাবেন তিনি! নাহ্, এতটা করা কিছুতেই উচিত হয়নি রিজিয়ার। কিন্তু কিই বা সে করতে পারে? লতীফ সাহেব যখন এলেন তখন থেকেই তো কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে। শান্তিনগরে পালিয়ে না গেলে তখনকার মতো অস্বস্তিটা হয় তো আরো বেড়েই যেতো, আর তাতে করে লতীফ সাহেবের চোখে বড় বেশী করে ধরা পড়তো রিজিয়া! যাক, ভালোই হয়েছে। লতীফ সাহেব যা-ই মনে করুন না কেন, রিজিয়া অন্ততঃ পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে।

এমনি ভাবে ভাবনার নানা তরঙ্গ বেয়ে চললো রিজিয়ার সারা মন জুড়ে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটি বার বারই বড় বেশী তোলপাড় করতে লাগলো। মাঝে মাঝে এমনই হয়ে থাকে রিজিয়ার। ঝোঁকের মাথায় এমন কিছু একটা কাণ্ড করে বসে, যার অনুতাপে তার সারা মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। রিজিয়া স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করে এ-কারণেই সে তার মায়ের স্নেহ আর পিতার আদর থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর স্বামী—স্বামীর প্রেম-ভালোবাসার কথা মনে পড়তেই তার সারা শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে যায়!

মায়ের স্নেহ, পিতার স্নেহ আর স্বামীর ভালোবাসা বড় মেকী বলে মনে হয় তার কাছে। নিজেকে সে মাঝে মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কার করে ফেলে, তখন নিজের সবকিছু খামখেয়ালীর জন্য তার বড় বেশী অনুতাপ হয়; কিন্তু তার পরক্ষণেই কিসের প্রভাবে সে তা জানে না, নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে রিজিয়া।

শেষ রাতের দিকে একটু হাওয়া দিয়েছিল চারদিকে। নীলাম্বর সাহা রোডের সেই ঘিঞ্জি গলিতেও তখন হাওয়ার অভিসার শুরু হয়েছে।

একটি কামরাতেই পার্টিশান করে দু'ভাগ করা হয়েছে। পার্টিশনের ওপাশেই ঘুমুচ্ছেন লতীফ সাহেব। শেষ রাতের হাওয়ায় তার নাক-ডাকার শব্দ ভেসে আসছে এ-পাশের কামরায়। সেই শব্দ শুনে শুনে রিজিয়া মনে মনে একটা মুখ কল্পনা করে নেয়—সে মুখটি লতীফ সাহেবের। বিকেলের দিকে একবারই মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে সেই মুখটি দেখতে পেয়েছিল রিজিয়া, তার আগে একবার দেখেছিল সেই পলাশপুরের গাঁয়ে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো রিজিয়া, এমন অন্যায় আর সে করবে না। সেই বুড়ো লোকটির কিই-বা দোষ, শুধু শুধু তার সাথে দুর্ব্যবহার করে তো লাভ নেই। আজকে বিকেলেই একটা মস্ত বড় অন্যায় করে ফেলেছে রিজিয়া। না, আর নয়।

সারা রাত ঘুম হয়নি রিজিয়ার, তাই শেষ রাতের দিকে চোখগুলো তার আননিতেই বুজে এলো।

ঘুম ভাঙতেই সে দেখলো চারিদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে, মামুনও বিছানায় নেই। অন্যদিন বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠে মামুন, ঘুম ভেঙে গেলেও অনেকক্ষণ সে গড়াগড়ি দেয় বিছানায়।

বাইরে লতীফ সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। কুলকুজা করে তিনি গলা পরিষ্কার করছিলেন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বললেই তো চা দিতে হবে। চাকরটা এসে দাঁড়ালো এক পাশে, বললো, "এখন কি নাস্তা হবে আম্মা?"

অন্য সময় হলে রিজিয়া হয় তো বলতো, "আমি জানিনে, তোর সায়েবকে যেয়ে জিজ্ঞেস কর্।"

কিন্তু এ-মুহূর্তে তেমন কিছুই বললো না রিজিয়া। খানিকক্ষণ সে চুপ করে থাকলো, হয় তো নিজের মনের সাথেই একবার শেষ বোঝাপড়া করতে চাইলো, তারপর বেশ ধীরে ধীরেই বললো, "সেদিন তো রেশন থেকে সেমাই আর আটা এনেছিলে, সেগুলো কি সবই শেষ হয়ে গেছে?"

চাকরটা বললো, "না আম্মা, সায়েব রাগ করছিলেন বলে সেদিন তো কিছুই রান্না হয়নি, সবই তো রয়েছে।"

হঠাৎ রিজিয়া যেন কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়লো, চাকরটিকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "থাম থাম, তোর এত কথা বলতে হবে না। সেমাই আর আটাগুলো নিয়ে পাক-ঘরে যা, আমি আসছি।"

চাকরটি আর একমুহূর্তও দাঁড়ালো না, হন হন করে পাক-ঘরের দিকে চলে গেল। রিজিয়ার মর্জিমেজাজ তার নখদর্পণে। রিজিয়ার মেজাজ বুঝতে কোন সময়েই ভুল হয় না, তাই সে বিনা দ্বিধায় হন হন করে কেটে পড়লো।

হাত-মুখ ধুয়ে রিজিয়া গিয়ে দাঁড়ালো লতীফ সাহেবের সামনে। মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললো, "কাল রাতে ফিরতে একটু দেরীই হয়ে গেল আব্বা, আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো?"

কথা শুনে প্রথমটা একটু অবাকই হয়ে গেলেন লতীফ সাহেব। গত বিকেলে তিনি তার পুত্রবধূর যে রূপ দেখেছেন, তার সাথে এ-রূপের মিল কোথায়? লতীফ সাহেব ভেবে অবাক হন, এ-মানুষ দু'টি কি এক?

রাত্রে যখন রিজিয়া ফিরে এসেছিল তখনই ইচ্ছা করলে লতীফ সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারতো, "আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো আব্বা?"

কিন্তু কই, তখন তো সে হন হন করে গিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, বাইরে বসে থাকা মামুন আর লতীফ সাহেবের দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। আশ্চর্য!

রিজিয়া বললো, "আমি নাশ্‌তা তৈরী করতে যাচ্ছি আব্বা, দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।"

লতীফ সাহেব বললেন, "ঠিক আছে মা, কিছু দরকার হলে আমি নিজেই চেয়ে নেব।"

রিজিয়া চলে গেল পাক-ঘরে। অনেক বেলা হয়ে গেল, অথচ নশ্‌তা তৈরীর এখনো কিছুই হলো না।

ঘুম থেকে উঠেই মামুন চাকরটাকে ডেকে নাশ্‌তা তৈরীর কথা বলে সোজা চলে গেছে বাজারে।

আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বাজার করে ফিরে আসতে হবে, নইলে অফিসে লেট হবার সম্ভাবনা। প্রায়ই সে অফিসে যেতে লেট করে, এবার বড় সাহেব বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং যেমন করেই হোক দশটার আগে তাকে অফিসে যেয়ে পৌঁছতেই হবে।

[ক্রমশঃ]

আমার জন্মদিনে

খন্দকার আবদুর রহিম

ছাব্বিশ বছর আগে রোদ-ছোঁয়া একখানি কুটির-ছায়ায়
বিস্মিত দু'চোখ মেলে প্রথম চেয়েছি আমি আলোর মায়ায়।
ঘণ্টা ও দিনের যোগে ধীরে ধীরে শেষ হলো মাস,
আমার জীবনে জাগে ক্রমাগত সূর্যের বিকাশ।
আম-জাম বাঁশঝাড় কদলীর পাশে
হরিণ-চাঞ্চল্য নিয়ে দিকে দিকে ছুটে বেড়িয়েছি;
কৃষাণ-ছেলের দলে মিশে থেকে অনেক দিবস
পথে-ঘাটে খোলা মাঠে অনেক খেলেছি।
তখন হিজল ফুল চোখেমুখে মেখে দিতো স্নেহরসে মোড়ানো আবীর,
বকুলের ডালে বসে গাঁথিয়াছি মালা, সে কাহিনী অনেক গভীর।
হৃদয়ের তারে তারে হয়ত বা বেজে ওঠে, আজ তার নেই বেশী চিন্।
সেই বেতসের বন, সেই বট-তালগাছ, কৈশোরের দিন—
কালস্রোতে ভেসে গেছে বহু দূর শান্তনীড় অতীত-সাগরে।
কতো জনপদ হেঁটে আমি আজ শহরের কাঁকরে-প্রস্তরে
ভেংগে যাই পদক্ষেপে একে একে রূঢ়তম দিবসের বেড়া
ভবিষ্যের মাঠ পানে,—যেখানে সংঘাত আর সংগ্রামের ঘেরা।
পিছনের দিনগুলো মহাসাগরের বুকে ক্ষীয়মান হয়ে মুছে যায়;
আমার দু'চোখে তবু আশার সোনালী রঙ—পথচলা রসদ জোগায়॥

ছাব্বিশ বছর ধরে পায়ে দলে চলে আসি আমি বহু দিবসের বুক।
কতো ব্যথা হতাশার দুর্ভর বোঝার স্তুপ কতোবার শ্রমক্লান্ত মুখ
পিছনের ইতিহাসে এঁকে গেছে বালুতটে নিরিখ যেমন
সমুখেতে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছি আমি ছুটে চলা ট্রেনের মতন।
বহু দুরাচ্চল পথে উচ্চাবচ সংকট মাড়িয়ে এলাম।
তিক্ততার তীর লেগে ছিঁড়েছে অনেকবার এই বুক
এই মন। অনেক পেলাম
ভিখারীর মতো তৃষা রাজপথে আরো ভাঙা বস্তির কিনারে,
পচা লেন, সেঁদা গলি, নর্দমার ধারে।
হেঁটে যাই উদাসীন। পকেটের শূন্যোমাঠে নেই কাণা পাই ;
আমারি মতন কতো অভাবী মিছিল যায় পথে-ঘাটে যেদিকে তাকাই।
জীবনের ছক্ দিয়ে মিলিয়ে দেখেছি বহু অনাথ ও এতিমের মুখ,
দেখেছি গরীব চাষী। মুটে ও মজুরদেরে ষ্টেশনে ষ্টেশনে,
রিক্সা চালকের মুখ মিলিয়ে দেখেছি,
বিড়ী-মজুরের মুখ মিলিয়ে দেখেছি,
মিলকল শ্রমিকের আরো চার কোটি বাঙালীর মন,
আমার মনের সাথে এক হয়ে মিশে যায় কি আশ্চর্য ছবির মতন॥

শুধু তাই নয়—
রূপোলী প্রাসাদে থেকে আমিও ফেলেছি আঁখি মাটির সীমায়।
প্রাণের সমুদ্র হ'তে জেগে ওঠে রোমান্টিক মন,
এই জমিনের বুক; এই জমিনের লতা শ্যামায়িত গাছপালা
সকলি কেমন অবাক—অবাক লাগে। সকলি দেখেছি ;
মাটির প্রচ্ছদ হ'তে অসংখ্য কাহিনী এনে হৃদয়ে এঁকেছি॥

আমার কামনা তাই দিনে দিনে স্ফুটমান ফুলের মতন,
আকাশের সূর্য এসে দিয়ে যায় বুকে তার সৃষ্টির স্বপন।
ভালবাসি পৃথিবীরে, ভালবাসি মাটি আর মানুষের মুখ,
নীল হয়ে যায় তাই কামনার বিষ লেগে জীবনের অনাবাদী সুখ।
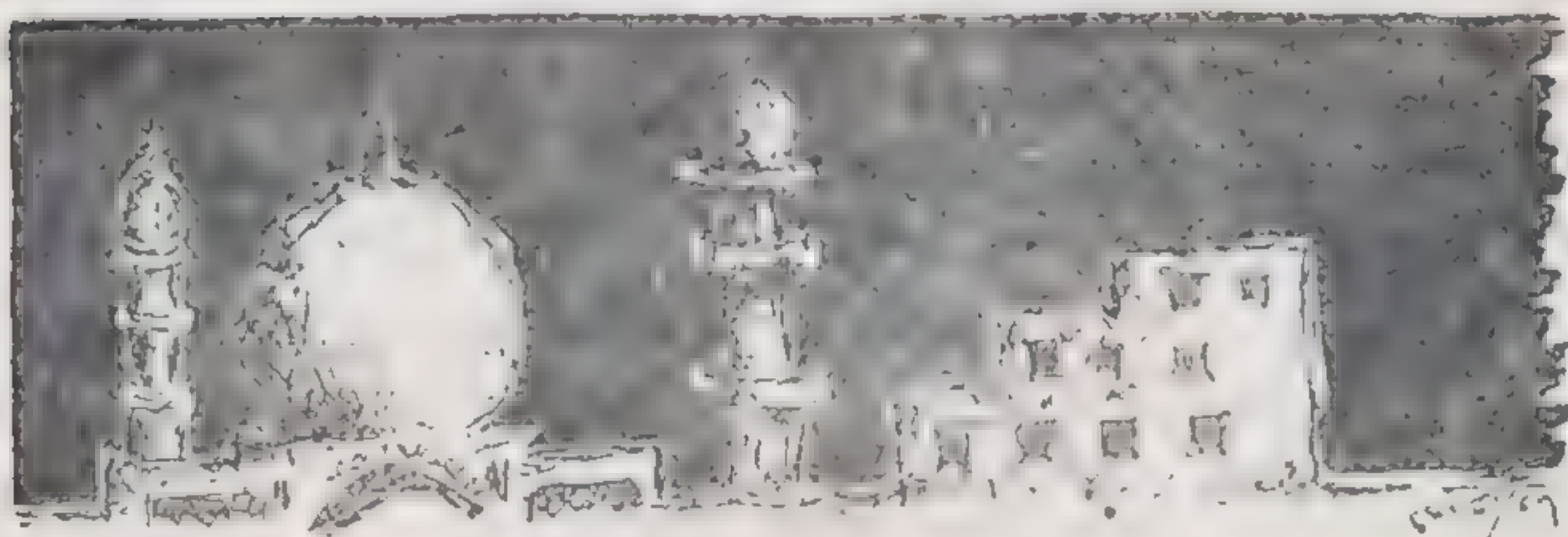
ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চীনযাত্রা

চীন দেশের বাদশাহ সুলতানকে মূল্যবান কতকগুলো উপহার পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে এক শ ক্রীতদাস ও দাসী, পাঁচ শ মখ্‌মল ও রেশমি-কাপড়ের টুক্‌রা, জরির পোষাক এবং অস্ত্রশস্ত্র। এসব পাঠিয়ে কারাজিল (হিমালয়) পাহাড়ের নিকটস্থ একটি মন্দির পুনর্নির্মানের অনুমতি চেয়েছেন তিনি সুলতানের কাছে। চীন দেশীয় তীর্থ-যাত্রীদের এ-মন্দিরটি সম্‌হল নামক স্থানে অবস্থিত। ভারতের মুসলমান সৈন্যরা এক সময়ে এ-মন্দিরটি আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে ফেলে।* চীন সম্রাটের উপহার গ্রহণ করে সুলতান তাঁকে লিখে পাঠালেন, ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে মন্দির নির্মাণের অনুমতি-দেওয়া সম্ভব নয়। যারা মন্দির নির্মাণের জন্যে বিশেষ ধরনের কর দেয় মুসলিম সাম্রাজ্যে শুধু-তাদেরই মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপরে লিখলেন,—"আপনিও যদি 'জিজিয়া' কর দিতে সম্মত থাকেন তবে আপনাকে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে। যারা সত্য পথ অনুসরণ করে তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" পত্রের সঙ্গে তিনি পাল্টা উপহারও পাঠালেন। সে উপহার সম্ভার চীন থেকে প্রাপ্ত উপহারের চেয়ে অনেক বেশী। তার ভেতরে প্রধান ছিল এক শ ভাল জাতের ঘোড়া, এক শ শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, এক শ হিন্দু নর্তকী ও গায়িকা। বারনা বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রখণ্ড, সোনারূপার তৈজস পত্র, সোনালী কাজকরা পোষাক পরিচ্ছদ, তরবারী, মুক্তার কাজ করা দস্তানা, এবং পনের জন খোজা ভৃত্য।

সুলতান আমার সহগামী-দূত হিসাবে নিযুক্ত করলেন জান্‌জানের খ্যাতনামা বিদ্বান আমীর জহিরউদ্দিনকে। উপহার দ্রব্যের হেফাজতের ভার দিলেন কাফুর নামক একজন খোজার উপর। আমাদের জাহাজে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য এক হাজার সৈন্যসহ পাঠালেন আমীর মোহাম্মদকে।

আমাদের সঙ্গে ফিরে চললেন চীনের পনের জন দূত এবং তাদের ভৃত্যগণ, সব মিলে প্রায় শতেক লোক।

সুলতান আদেশ দিলেন, আমরা তাঁর রাজ্যের বাইরে গিয়ে-না-পৌঁছা অবধি—সরকার থেকেই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করা হবে। হিজরী ৭৪৩ সনের ১৭ সফর মোতাবেক ১৩৪২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই আমাদের যাত্রা শুরু হল। যাত্রার জন্যে বিশেষ করে এ-দিনটি নির্দিষ্ট করার একটি কারণ ছিল। এখানকার লোকেরা প্রতিমাসের ২রা, ৭ই, ১২ই, ১৭ই, ২২শে এবং ২৭শে তারিখকে বিদেশ-যাত্রার জন্যে শুভদিন মনে করে।

প্রথম দিন যাত্রা করে আমরা দিল্লীর সাত মাইল দূরে তিলবাতে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বায়না শহরে কুল-এ (আলিগড়) পৌঁছে একটি মাঠের উপর তাঁবু ফেললাম।

হিন্দু-বিদ্রোহ দমন

কুলে পৌঁছে শুনতে পেলাম কতিপয় অবিশ্বাসী হিন্দু-আল-জালালি শহরটি আক্রমণ করে ঘেরাও করে রেখেছে। এ শহরটি কুল থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। অগত্যা আমরা সে দিকেই রওয়ানা হলাম। ইত্যবসরে হিন্দু বিদ্রোহীরা শহরের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং তাদের প্রায় ধ্বংস করে এনেছে। আমরা সেখানে পৌঁছে তাদের পাল্টা আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা আমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল এক হাজার, পদাতিক তিন হাজার। কিন্তু তাহলেও দলের শেষ লোকটি অবধি আমাদের হাতে প্রাণহারায় এবং তাদের বহু ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। অবশ্য-আমাদের দলেরও কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল তেইশ জন অশ্বারোহী, পঞ্চান্ন জন পদাতিক, সেই সঙ্গে উপহার দ্রব্যের হেফাজতকারী কাফুর।

আমরা পত্রযোগে সুলতানকে কাফুরের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে সুলতানের জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম। এ সময়ে আল-জালালীর নিকটবর্তী দুরধিগম্য-এক পাহাড় থেকে দলে দলে হিন্দুরা এসে শহরের আশেপাশে আক্রমণ চালাত। আমাদের দলের লোকেরা প্রায় প্রতিদিন তাদের প্রতিরোধ করতে বেরিয়ে যেত।

বিদ্রোহীদের কবলে

এ-উপলক্ষে একবার আমি কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে অশ্বোরোহণ করে একবার বেরিয়ে এক বাগানে বসে

* কারও কারও মতে সম্‌হল বা সম্বল দিল্লী থেকে আশি মাইল পূর্বদিকে রোহিলাখণ্ডে অবস্থিত।

বিশ্রাম করছিলাম, কারণ এখন গ্রীষ্ম কাল। এমন সময় অদূরে বহু লোক-জনের চীৎকার শুনতে পেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম বিদ্রোহী হিন্দুরা একটি গ্রাম আক্রমণ করেছে। আমরা তাদের পালটা আক্রমণ করতেই তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেল। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তাদের পিছু নিলাম।

এভাবে পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে একবার পাঁচ জন সঙ্গীসহ আমি দল থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়লাম। এ সময়ে এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এক দল অশ্বারোহী ও পদাতিক সহসা আমাদের আক্রমণ করল। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমরা পালাতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে তাদের দশজন আমার পিছু ধাওয়া করেছিল, শেষ অবধি তিন জন আমার পিছনে লেগেই রইল। আমার সামনে তখন আর পালাবার পথ নেই। সেখানকার জমিও প্রস্তর ময়। একবার আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'খানা পাথরের ফাঁকে পড়ে আটকা পড়ে গেল। অগত্যা আমি নেমে ঘোড়ার পা মুক্ত করতে বাধ্য হলাম। ভারতের রীতি-অনুযায়ী একজন লোক দু'খানা করে তরবারী সঙ্গে রাখে। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা আমার একখানা তরবারী মাটিতে পড়ে গেল। তরবারীখানা ছিল সোনার কারুকার্য্য খচিত। কাজেই আবার ঘোড়ার থেকে নেমে আমাকে তরবারীখানা কুড়িয়ে নিতে হল। তখনও শত্রুপক্ষের তিনজন লোক আমার পশ্চাদ্ধাবন করছে। অবশেষে সামনেই গভীর একটি নালা দেখতে পেয়ে আমি নীচের দিকে নেমে গেলাম। তারপরে আর পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সাক্ষাৎ পাইনি।

অতঃপর আমি বনের পাশে একটি উপত্যকায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি রাস্তা পেয়ে আমি অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে লাগলাম। সে রাস্তা কোথায় গিয়ে পৌঁছে, তাও আমার জানা নেই। এমন সময় প্রায় চল্লিশ জন বিধর্মী তীর ধনুক নিয়ে আমাকে ঘেরাও করে ফেলল। আমার ভয় হল যে, পালাবার চেষ্টা করলেই তারা এক সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করবে। এদিকে আমি এখন একেবারে নিরস্ত্র বললেই চলে। কাজেই আমি নিরুপায় হয়ে মাটীতে শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পন করলাম, কারণ আত্মসমর্পনকারী শত্রুকে তারা হত্যা করে না।

তারা আমাকে ধরে পরিধানের বস্ত্র ছাড়া আর সব কিছুই খুলে নিয়ে গেল। তারপরে আমাকে নিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর তাদের আস্তানায়। বৃক্ষাবৃত একটি পুকুরের কাছে তাদের আস্তানা। তাদের দেওয়া মটর-শুঁটির তৈরী এক রকম রুটী খেয়ে পানি খেলাম। এদের দলে দেখলাম দু'জন মুসলমান রয়েছে। তারা ফার্সী ভাষায় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইল। আমি যে সুলতানের নিকট থেকেই এসেছি, একটু গোপন করে আংশিকভাবে তাদের কাছে নিজের কথা বললাম। তারপর তারা বলল, "এদের হাতে অথবা অন্য লোকদের হাতে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাণ দিতে হবে। ইনি এদের সরদার।" এই বলে তাদের মধ্যে একজন লোককে দেখিয়ে দিল। কাজেই আমি তার সঙ্গে কথা বললাম। মুসলমান দু'জন দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

অতঃপর সরদার আমাকে তিনজন লোকের জিম্মা করে দিল। তাদের একজন ছিল বৃদ্ধ, দ্বিতীয় জন তার ছেলে। তৃতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণকায় একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ তিনজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলাম, আমাকে হত্যা করার ভার পড়েছে এদের উপর।

সেই দিনই বিকেল বেলা তারা আমাকে হাযির করল একটি গুহার কাছে। সেখানে কৃষ্ণকায় লোকটি আমার গায়ের উপর তার পা দিয়ে রাখল এবং বৃদ্ধ ও তার ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে উঠে তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল এবং আমাকে পুকুরে যেতে ইশারা করল। আমার তখন আশঙ্কা হল, এবার আমাকে হত্যা করা হবে। কাজেই আমি বৃদ্ধলোকটির সঙ্গে কথা বলে তার দয়া ভিক্ষা করতে লাগলাম। আমার উপর তার কিছুটা দয়া হল।

দুপুর বেলা পুকুরের কাছে কিছু লোকজনের সোরগোল শুনা গেল। তারা মনে করল, তাদেরই দলের লোক। কাজেই তারা আমাকেও সেখানে যেতে বলল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল এ-দলের লোক তারা নয়। নতুন দলটি আমার প্রহরীদের পরামর্শ দিল তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু এরা তাতে রাজী না হয়ে বরং আমাকে তাদের সামনে রেখে বসে রইল। তাদের সামনে একগাছি শনের দড়ি। আমার মনে হল, আমাকে হত্যা করার সময় হয়তো এই দড়ি দিয়েই বাঁধবে আমাকে।

মুক্তি

অনেকক্ষণ পরে শেষোক্ত দলের তিনজন লোক আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে সুদর্শন এক যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে আমি মুক্তি দিলে খুশী হবে?

আমি সম্মতি জানাতেই সে বলল, বেশ যাও।

বলতেই আমি আমার গায়ের জামাটি খুলে তাকে দিলাম। বিনিময়ে সেও তার গায়ের একটি জামা আমাকে

দিল। অতঃপর আমি চলে এলাম কিন্তু সারাক্ষণ ভয় হতে লাগল, হয়ত তাদের মনের অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন হলে আবার আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। তাই আমি তাড়াতাড়ি একটা নল খাগড়ার বনে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই কাটালাম।

যুবক আমাকে যে রাস্তাটী দেখিয়ে দিয়েছিল, সূর্যাস্তের পরে সেই রাস্তা ধরেই চলতে লাগলাম। রাস্তাটী একটি ছোট খালে গিয়ে পড়েছে। সেখানে গিয়ে আমি তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। প্রায় দুপুর রাত অবধি চলবার পর আমি একটা পাহাড়ের নিকট এসে সেখানেই রাত কাটালাম। ভোরে উঠে আবার আমার যাত্রা শুরু হল এবং দুপুর বেলা একটা উচ্চ পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌছলাম। এখানে কুলজাতীয় এক প্রকার ফল পেড়ে খেতে গিয়ে কাঁটার আঁচড় লেগেছিল আমার বাহুতে। বাহুর সে দাগ আজও মিলায়নি।

সপ্তম দিনে বিধর্মীদের এক গ্রামে গিয়ে পৌছলাম আমি। গ্রামে এ'টি কূপ আছে, শাক-সব্জীর ক্ষেতও আছে। আমি কিছু আহার্য চাইলাম কিন্তু গ্রামের লোকেরা আমাকে কিছুই খেতে দিতে রাজী হল না। একটি কূপের কাছে কিছু মূলো-শাক দেখতে পেয়ে অগত্যা আমি তাই আমি খেলাম।

অষ্টম দিনে পিপাসায় আমি মৃত্যুপ্রায় হয়ে গেলাম। একটি গ্রামে গেলাম; কিন্তু সেখানেও পানি পেলাম না।

তৃষ্ণা নিবারণ

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে আমি একটি খোলা কূপের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কূপের কাছে একটি দড়ি আছে কিন্তু পানি তুলবার কোন পাত্র সেখানে দেখতে পেলাম না। আমার মাথায় এক টুকরো কাপড় ছিল। দড়ির মাথায় কাপড়ের টুকরোটি বেঁধে তাই ভিজিয়ে পানি তুলে মুখে দিলাম। কিন্তু তাতে তৃষ্ণা নিবারণ হল না। অবশেষে আমি আমার এক পাটী জুতো দড়িতে বেঁধে তারই সাহায্যে পানি তুলে পান করলাম। কিন্তু তাতে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারলাম না। কাজেই দড়ি বাঁধা জুতোখানা দ্বিতীয়বার কূপে ফেললাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এবার দড়ি ছিঁড়ে জুতোখানা কূপের তলায় পড়ে গেল। অগত্যা দ্বিতীয় পাটী জুতোর সাহায্যে একই উপায়ে পানি তুলে আমাকে পান করতে হল।

তারপর সেই জুতাখানা কেটে তার উপরের অংশ আমার দুপায়ে বাঁধলাম দড়ি এবং ছেঁড়া কাপড়ের সাহায্যে।

সঙ্গীলাভ

আমি যখন পায়ে জুতোর চামড়া বাঁধছিলাম এবং এরপর কি করা যাবে তাই ভাবছিলাম তখন একটি লোক এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি তার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম, লোকটি কৃষ্ণবর্ণ। তার হাতে একটি জগ্ ও একখানা লাঠী, কাঁধে একটি ঝোলা। সে মুসলমানী কায়দায় আমাকে অভিবাদন জানাল, 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলে। আমি অনুরূপভাবে তাকে প্রত্যাভিবাদন জানালাম। তখন লোকটি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম, আমি একজন পথহারা ব্যক্তি। সে বলল, আমিও তাই।

তার সঙ্গে দড়ি ছিল। তার জগ ও দড়ির সাহায্যে পানি তুলে পান করতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় সে বলে উঠল, সবুর কর। এই বলে সে তার ঝোলার ভেতর থেকে এক মুঠো কাল মটর ও চাউল ভাজা বের করে আমাকে খেতে দিল।

খাওয়ার পরে ওজু করে সে দু'রাকাত নামাজ পড়ল। আমিও তাই করলাম। অতঃপর সে আমার নাম জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, আমার নাম মোহাম্মদ। সে তার নিজের নাম বলল, 'আনন্দিত-আত্মা'। তার নামটা একটা ভাল লক্ষণ বলে মনে হল এবং আমার মনে স্বস্তি ফিরে এল।

সে একটু পরে বলল, আল্লার ওয়াস্তে তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি রাজী হলাম; কিন্তু এত দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম যে বেশীক্ষণ তার সঙ্গে চলতে পারলাম না। এক জায়গায় গিয়ে আমি বসে পড়লাম। তাকে বললাম যতদিন তোমার দেখা পাইনি ততদিন বেশ চলেছি কিন্তু তোমাকে পেয়ে যেনো আর চলতে পারছি না।

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থ বসন্ত

শ্রীসুখময় রায় বি, এ

আম্রকলির সাথে নবপল্লবের সুষমায় এমনি করে বসন্ত আরো এসেছিল, আজও এসেছে। ঝরা পাতার পতনের মধ্যে বিবাগী বৃক্ষের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের অন্তরালে পরিপূর্ণ শোভনের যে সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং তা একদিন মৃতকল্প বৃক্ষের ডালে ডালে কচি কিশলয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবেই—এ-খবর বৃক্ষের জানা আছে। তবু ক্ষণিকের বিচ্ছেদের যে অপরিসীম বেদনা তার দ্বারা আলোড়িত হওয়া বৃক্ষ কেন, মানুষেরও তো কম নয়। বসন্তের অপরাহ্ন বেলায় জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দিগন্তের বিলীয়মান বৃক্ষসারির উপর লক্ষ্য করে সাহিত্যিক সমরেশ বাবু ভেবে চলেছেন মানব জীবনের কত কথা।

গত কয়দিন ধরে সমাপ্তপ্রায় উপন্যাসের নায়কের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রভাবের বিষয় ভাবতে ভাবতে সমরেশ বাবু বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। সমাজ স্বীকার করে বা তার আঁটসাট করে বাঁধা নিয়ম-কানুনের সীমায় নায়ককে আবদ্ধ করে রোমান্টিক উপন্যাস লেখা চলে না, এ-কথাটাই সমরেশ বাবুকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। অথচ তাঁর 'আকাশ পথের' নায়ক পরেশ চাইছে সমাজের সকল রাঙা চক্ষুকে তাচ্ছিল্য করে চলে যাবে প্রিয়াকে নিয়ে কোন নাম না জানা দেশে, যেখানে পরিপূর্ণ বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে শুধু সে আর তার প্রণয়ী মিলে নূতন করে গড়ে তুলবে পৃথিবী। সাগর-তীরে তারা দুজনে বালুচরের উপর গড়ে তুলবে ছোট্ট একটি কুটীর, দক্ষিণের হিমেল হাওয়ার আমেজে ভরপুর করে দিয়ে যাবে তাদের হৃদয়ের দু'কুল। আর সেখান থেকে তারা কল্পনার মেঘরথে উঠে হেলেদুলে চলতে থাকবে কোন্ সে দূরের পানে—হয়ত তারাও তা' জানেনা। নায়িকা মাধবী পরেশের হাত ধরে হয়ত বলবে পৃথিবীর ধূলিমলিন মৃত্তিকার উপর প্রেমের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দাও। শুধু তারাই বেঁচে থাকুক এ-পৃথিবীকে যারা ভালবাসতে শিখেছে, হৃদয়ের দুকূলে প্লাবন এনে অসুন্দরের চিহ্নটুকুও ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে ফেলতে যারা পারে পবিত্র প্রেমের অমৃতময় পরশে। কিন্তু তা হলেও দুজনের এ মিলনের পরিণাম কি? পরেশ ও মাধবী দুই ভিন্ন ঘরের পুরুষ ও রমণী। আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা ও সমাজের সকল বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করে তারা ঘর থেকে বের হয়েছে। কিন্তু কেন? উপন্যাসের গতিধারায় তার হয়ত উত্তর মিলবে—প্রেম। কিন্তু সমাজে এ-অবৈধ আচরণের জন্য তাদের স্থান কোথায়?

সমরেশ বাবু স্থির করতে পারেন না পরেশ ও মাধবীকে নিয়ে কোথা গিয়ে দাঁড়াবেন। অথচ সমাজের বিধি নিষেধের উপর বীতশ্রদ্ধ মাধবী ও পরেশ চলেছে সাগর-বেলার অরণ্যের গহ্বরে যেখানে তারা দু'জনে মিলে সমাজ চক্ষুর বাইরে পবিত্র প্রেমের স্মৃতি দিয়ে আপনাদের অস্তিত্বকে লুকিয়ে রাখবে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সে-কথা বেশীদিন আগের নয়। শহরের কলেজে পড়া যুবক পরেশ যখন গ্রামে ফিরে এসেছে পৈতৃক আলয়ে। গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ঘরের তনয়া—মাধবী এতদিন অপেক্ষা করেছে পরেশের জন্য। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম উজাড় করে দিয়ে দুজনে এবার ঘর বাঁধবে। পড়াশুনার দিক থেকে প্রচুর ব্যবধান থাকলেও মাধবী গর্ব্ব করতে পারে যে একদিন সে-ই নিজের পুঁটলী থেকে পরেশের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিস্ দিয়েছিল। বাল্যপ্রেমের সেই অনুরাগ গোপনে পরস্পরকে অত্যন্ত নিকটতম করে তুলেছিল। তাই শহুরে বাবুর বেশে পরেশ যেদিন মুখে সিগারেটের ধোঁয়া উদ্গীরণ করে মাধবীতলার কুঞ্জে এসে দাঁড়াল, সেদিনও মাধবী ভুল করল না যে তার পরেশ দা ই ফিরে এসেছে। কত কথা, কত উচ্ছ্বাস, কত আকুলতা ও উৎকণ্ঠা। দ্রুত গল্পের পরিণতি অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে প্রণয় থেকে চরমতম পরিণতির দিকে। শেষে একদিন পরেশ হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাসকে প্লাবিত করে দিয়ে দূর দেশে চলে যাবার প্রস্তাব করে বসল মাধবীর কাছে। মাধবীর পায়ের তলা থেকে যেন মাটী সরে গেল। আকাশ থেকে বজ্রকণা স্ফুরিত হতে লাগল উল্কাবেগে। শেষে পরেশ বুঝতে পারলো দেহমনের মধ্যে বিরাট ফাঁক রয়েছে, যে ফাঁকটা অনায়াসে পূরণ করা যায়না। মন যত সহজে বাঁধন ভেঙ্গে ছুটে চলতে পারে, দেহ তা পারে না। পরেশ দুই চক্ষু হস্তদ্বারা আবদ্ধ করে মাধবীর নিকট হীন প্রস্তাবের জন্য ক্ষমা চেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আর বোধহয় এ-জীবনে দেখা হবে না—এমনও ইঙ্গিত করে গেল। মাধবী এতক্ষণ যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ছিল। তন্দ্রা ভাঙ্গতেই দেখে সম্মুখে পরেশ দা নেই। উন্মত্তের মত ছুটে চলল ঘরের দিকে মাধবী। পথের দু'পাশে বৃক্ষলতাকে আপনার মনের অজ্ঞাতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো তারা কেউ পরেশকে দেখেছে কিনা? কিন্তু সবই বৃথা। এতক্ষণে হয়ত পরেশ গ্রামের সীমানা পার

হয়ে চলে গেছে নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশানে যেখান থেকে সে সোজা চলে যাবে কলকাতার দিকে।

মাধবী এতদিন ভেবেছিল পরেশ দাকে যখন ইচ্ছা অতি আপনার করে নেওয়া তার সহজ হবে। কিন্তু সে কোনদিনও ভাবেনি যে তারা সমাজের দুই প্রত্যন্ত ভাগ থেকে এসেছে এবং সেটাই তাদের মিলনের প্রধান অন্তরায় হবে। মাধবীর পিতা সম্ভ্রান্ত দত্ত কুলোদ্ভব হরিনাথ বাবু ক'বছর হল ডেপুটীগিরির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশের বাড়ীতে ফিরে এসেছেন জীবনের বাকী কয়টা দিন পল্লীর নিরালায় কাটাবেন বলে। কিন্তু হরিনাথ বাবুদের সঙ্গে পর্য্যায়ের সঙ্গতি রেখে চলার কোন ক্ষমতাই নেই পরেশদের। দরিদ্র হলেও পরেশ মেধাবী, আর কুলেশীলে নীচ হলেও মনের দিক থেকে ছোট বলে পরিচয় আজও মাধবী তার নিকট পায়নি। বিগত কোন এক ফাল্গুনের অপরাহ্নে নদীর তীরে বড়শী নিয়ে ঘুরছিল স্কুলে পড়া ছেলে পরেশ। হঠাৎ কি কারণে চম্পা ফুলের কাননে প্রবেশ করে মধু লোভী ভ্রমরের মত। সম্মুখে হঠাৎ যাকে সে দেখে ফেলেছিল নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে তাকেই মনের মণি-কোঠায় গেঁথে রাখল বহুমূল্য স্মৃতির পশরা দিয়ে। কারণে-অকারণে দেখা হয় দুজনে যেখানে-সেখানে। ফুলের বনের ভ্রমরের পিছনে দুরন্ত ছুটোছুটি থেকে নদীর ধারে অপরাহ্ন বেলায় একে অপরের সাথী হয়ে মাছ ধরতে যায়। নৌকার যাত্রীদেরকে ইশারায় যেন তারা বলে একদিন তারাও যাবে নৌকা দিয়ে প্রেমসমুদ্রের ওপারে কি আছে দেখতে। সেই থেকে হৃদয়ের গভীরতম ভালবাসা ক্রমেই গতিধারার সরল পথে নিজেদের একান্তে আপনার মধুরতম অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সেদিন কুঞ্জবনের আড়ালে যখন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পরেশ বুঝতে পারলো যে মানুষের হৃদয়ের সত্যিকারের রূপ দেহমনের অতীতে কোন নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের অপর প্রান্তে ধূ ধূ করা বালিয়াড়ীর তীরে, তখন আর সে নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না। সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে চলে যাবে এমন স্থানে যেখানে বসন্তের অলিকুল ফুলের উপর গুঞ্জরণ তুলে শুধু বলে যাবে, চির বিরহের কথা, যে বিরহে মিলন নেই।

কিন্তু নিয়তির বিধান ছিল অন্যরূপ। কলেজের হোষ্টেলে বসে একদিন আনমনে পরেশ কি ভাবছিল। এমন সময় পত্রবাহক দরজায় এসে ধাক্কা দিল। লেফাফা থেকে দীর্ঘ পত্র বার করে এক নিঃশ্বাসে পড়ে নেয় পরেশ। স্মৃতির রোমন্থন আজ আবার জেগে ওঠেছে হৃদয়ের দুকুল ছাপিয়ে। বাত্যাহত লতিকার ন্যায় ভেঙ্গে পড়েছে মাধবী দয়িতের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে। শিমুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অসহ্য দাহন চারিপাশের বনানীর মধ্যে। সকাল বিকাল তুলসী মণ্ডপের নীচে দাঁড়িয়ে প্রাণেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানায় স্বকৃত সহস্র সহস্র অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা চেয়ে। আর এদিকে পরেশেরও হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। নিজেকে মাধবীর নিকট শত অপরাধে অপরাধী মনে করে তার সঙ্গে দেখা করবে বলে মনে মনে ঠিক করে নেয়। মনের অসংযত ভাবাবেগে আজ তার হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠেছে। বিকালের দিকে বাক্স পেঁটারা বেঁধে নেয় শক্ত করে, আজই সে যাত্রা করবে মাধবীর সঙ্গে দেখা করবে বলে। সন্ধ্যার ট্রেনে উঠে পরদিন প্রাতে জাহাজ ঘাটে এসে পৌঁছল। জাহাজে উঠে চারিদিকের তরুশ্রেণীর মধ্যে যেন সে কোন গোপন কথার ভাষা খুঁজে পায়। দূর তীরে কৃষকেরা হল কর্ষণ করছে, আর জেলেরা ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরে চলেছে। নদী-স্রোতের উপর তরঙ্গ ভঙ্গে সূর্য্যের সোনালী কিরণ পড়ে পরেশের মনকে যেন অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনে ভরপুর করে তোলে। মাঝে মাঝে কোথাও বা দু'একটা বৃহদাকার মাছ পিঠ ভাসিয়ে দিয়ে আবার অল্পক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত চিত্রপটের মত ছবিগুলো একের পর এক অল্পক্ষণের জন্য চিত্তের দুয়ারে সমস্ত সৌন্দর্য্য উজাড় করে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরেশের মনে কিন্তু শান্তি নেই। আজ তার হৃদয় উদ্বেলিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে মাধবীর নিকট গিয়ে ক্ষমা চেয়ে না নেবে ততক্ষণ চলতে থাকবে তার মনের রাজ্যে ঝড়ের তাণ্ডব। দু'টী গাংচিল যেন ঝগড়া করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবার তারা দুটী একত্রে মিলেছে পরেশের ক্যাবিনের উপর এসে। পরেশের কাছে আজ এ-ঘটনা সামান্য নয়। যেন সে তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে বাহ্য পরিবেশের গোপন অন্তরালে। বলাকার পক্ষ-সদৃশ জলভার হীন শুভ্র মেঘগুলোও ভেসে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে কোন অজানার পানে। তারাও আজ পরেশের কাছে হীন নয়। হঠাৎ জাহাজের নীচের তলায় একটা শোরগোল শুনে পরেশ চমকে উঠে। বহু লোক জড় হয়েছে ঘটনা দেখার জন্যে। পরেশ উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে দেখে একটী মহিলার ক্ষুধাক্রান্ত অল্পবয়েসের শিশু রুটীর দোকানে অনধিকার প্রবেশ করে কয়েকখণ্ড রুটি ছিনিয়ে নিয়েছে বলে মালিক তাকে বেদম প্রহার করে চলেছে। অনাহারক্লিষ্ট মহিলার শিশুপুত্র ক্ষুধা ও বেত্রাঘাতের অসহ্য যাতনায় চীৎকার দিয়ে সারা জাহাজখানাকে প্রকম্পিত করে তুলেছে। শিশুমাতা কাঁদাকাটি করে পুত্রের অপরাধের জন্য দোকানওয়ালার কাছে বিনীত ভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছে। পরেশ অতর্কিতে এসে

শিশুকে ছিনিয়ে নেয় মালিকের কাছ থেকে। বলে উঠে, ছিঃ ছিঃ শিশুর গায়ে হাত দিতে লজ্জা হয় না? ছোট্ট ছেলে কয়দিন খেতে পায় নি। তাই বলে দু'খানা রুটীর জন্য অত মারধোর করতে তোমার লজ্জা হয়নি? কথা কয়টি বলে পরেশ বুক পকেটে হাত দেয় এবং এক টাকার একখানা নোট তুলে ছুঁড়ে দেয় মালিকের গায়ের দিকে। বলে, নিয়ে যাও তোমার কত পাওনা। ভদ্রমহিলা স্তম্ভিতের মত চেয়ে থাকে পরেশের দিকে। আজ দু'দিন তাঁরও উদরে দানাপানি পড়ে নি। চলেছেন স্বামীর কাছে চট্টগ্রামে। গতদিন টেলিগ্রাম পেয়েছেন স্বামী ভয়ানক পীড়িত। স্বামী কাজ করে কোন সওদাগরী আপিসে কেরাণী হয়ে। দুঃখের জ্বালায় একদিকে যেমন তিনি বিক্ষুব্ধ, তার উপর শিশুপুত্রের এ-অসহনীয় আচরণে তিনি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। হঠাৎ কোন্ এ-যুবক সাক্ষাৎ দেবতা-সদৃশ এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল এবং তাঁর দুঃখমোচনে যত্নবান হল? মহিলা যেন নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। পরেশের কাছে কৃতজ্ঞতায় তাঁর দু'হাত যুক্ত হয়। জাহাজও ইতিমধ্যে ঘাটে এসে পৌঁছেছে। কুলীর মাথায় বাক্স পেটারা দিয়ে পরেশ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে এবং জাহাজ থেকে ঘাটে ওঠে। হঠাৎ পরেশ দা বলে একটী চীৎকারে তার শান্ত অবস্থার অবসান হল। উৎকণ্ঠার সাথে চারিদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে পরেশ কুলীকে ঠেলে সামনে চলার ইঙ্গিত দেয়। এমন সময় মাধবী এসে পরেশের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে এবং সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে। পরেশ যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। সমস্ত ব্যাপারটা যেন কুহেলিকার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার নিকট। একটা খালি জায়গায় মাধবীকে হাত ধরে নেয়ে যায় পরেশ। মাধবী কলকাতা যাবে বলে বাড়ী থেকে চাকর হীরুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। পরেশের কাছে গিয়ে সে সহস্র অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিবে এবং আর যেন জীবনে কেউ কাউকে না ভুলে তার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবে। পরেশ তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে মাধবীকে ঘর থেকে এভাবে বের হয়ে আসার জন্য ধিক্কার দেয় এবং আবার গৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু মাধবী শোকাশ্রু দু'হাতের তলে গোপন করে বেদনার সুরে জানিয়ে দেয়—গৃহে তার ফিরে যাবার উপায় আর নেই। যাকে পাওয়ার জন্য তার এই উম্মত্ততা তাকে যখন সামনেই পেয়েছে তখন এ-জীবনে গৃহে ফিরে গিয়ে সামাজিক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছা তার নেই। তারা চলে যাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে কোথাও কোন অজ্ঞাত দেশে যেখানে কেউ তাদের এই আচরণের জন্য ধিক্কার দেবেনা। কোন মানুষের দ্বারা যেন তারা গঞ্জনা না পায়।

কিন্তু পরেশ কি করবে ভেবে পায়না। অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলে উঠে, বেশ তবে চল। এদিকে একটা জাহাজ তখন ঘাট থেকে ছাড়বে বলে বাঁশি বাজিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে এ-জাহাজ আন্দামান পার হয়ে চলে যাবে আফ্রিকার উপকূল দিয়ে ইংলণ্ডের দিকে। পরেশ তাড়াতাড়ি কলম্বোর দু'খানা টিকেট কিনে নেয় এবং কতকটা আনমনেই যেন মাধবীকে নিয়ে উঠে পড়ে। কোথা যাবে তারা, কেউ তা' জানে না। হীরুর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলে দেয় পরেশ সে যেন আর দেশে ফিরে না যায়। এখানেই কোথাও যেন একটা চাকুরী খোঁজ করে নেয়। শেষ বারের মত বাঁশি বাজিয়ে অকূল সাগরের উপর নোঙ্গর তুলে হেলেদুলে চলতে আরম্ভ করে। চারিদিকে যাত্রীরা আনন্দ কোলাহলে নেচে ওঠে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দাপাদাপি আজ পরেশের নিকট অসহ্য হয়ে ওঠে। মাধবী কোন কথা বলেনা। যেন সমস্ত আশা-আকাঙ্খার আজ তার নিবৃত্তি হয়েছে, নদী এসে সাগরে যেন মিশেছে

বন্দরের ঘাট থেকে জাহাজ অনেক দূর চলে এসেছে। এবার জাহাজ সোজা চলেছে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে কলম্বোর পথে, সেখান থেকে চলে যাবে আফ্রিকার উপকূল পার হয়ে সাতসমুদ্র আর তের নদীর পারের দেশে। সাগরের উর্ম্মিমালার মধ্যে পরেশ নিজের বিক্ষুব্ধ অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। কিন্তু কেন এমন হল—তারপরে কি হবে, পরেশ কিছু ভেবে পায় না। একটা অনিশ্চিত আশ-ঙ্কায় পরেশের অন্তর কেঁপে উঠে। মাধবী এতক্ষণে দৈহিক ক্লান্তি অপনোদন করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পরেশ উঠে পায়চারি করতে থাকে। হোটেল থেকে থালা বয়ে পরেশ মাধবীর জন্য খাবার নিয়ে আসে, নিজেও খায়। কিন্তু হৃদয়ের কোন কথা মাধবীকে জানতে দেয়না। যে জীবনের সমস্ত ভার পরম নির্ভয়তার সাথে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আছে, তাকে কোমল পুষ্পের আঘাতেও সে ব্যথিত করবে না। ঘটনার এ-স্রোত যেন পূর্ব্ব থেকেই তার জ্ঞাত ছিল আর এটা যেন তার স্বাভাবিক পরিণতি। মাঝে কলম্বোতে দু'দিন অপেক্ষা করে জাহাজ আবার চলেছে ভারত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে।

ফাল্গুন রজনীর মধ্যভাগ। জ্যোৎস্নার আলো দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করে জলরাশির উপর দিয়ে রৌপ্য ধারার মত ঝিকমিক করছে। যাত্রীদের অনেকে দীর্ঘ-যাত্রার শ্রান্তিতে ক্লান্ত ও অবসন্ন; এবং রাত্রির এই মধ্যভাগে নিদ্রামগ্ন। দূর আকাশের কোণে একখণ্ড কালো মেঘ যেন ধীরে ধীরে

সাজ নিচ্ছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জাহাজের সর্ব্বত্র আলোড়ন অনুভূত হল। দেখতে দেখতে কালো মেঘ আরো প্রসারিত হয়ে গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কাল বৈশাখীর অকাল সূচনা। জ্যোৎস্নার আলো কালো মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিল। জাহাজ ইতিমধ্যে আফ্রিকার উপকূলের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এবার জাহাজ কোন গহন অরণ্য অঞ্চলের পাশ দিয়ে চলেছে। সাগরে বাত্যাবিক্ষুব্ধ উর্ম্মিরাশির প্রলয়ঙ্করী চাঞ্চল্য দেখে ধীরে ধীরে জাহাজকে তীরের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হল। বাহ্য প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরেশের অন্তরেও চলেছিল তুমুল বিক্ষোভ। সে জানে না সে চলেছে কোথায়, কোন্ অচিন দেশের পানে। ঝড় যখন শেষ হয়ে এল তখন রাত্রির শেষভাগ। পরেশ ভাবতে লাগল তাদের এখানে কোথাও নেমে যাওয়াই তো ভাল। গহন অরণ্যের মধ্যে অরণ্যচারীদের সঙ্গে তারা থাকবে মিতালী করে। মনুষ্য সমাজের কঠোর নিয়ম তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। তারা ফিরে যাবেনা সেই সব মানুষের দেশে যেখানে তাদের প্রেমের উপর রয়েছে সমাজের রাঙা চক্ষুর অভিশাপ। তা' ছাড়া আফ্রিকার এ-অঞ্চলের আজকাল লোকেরাও তো শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। পরেশ তো কলেজের পড়া ছেলে। তার জানা আছে আফ্রিকার নরখাদকেরা আজকাল আর অন্ততঃ মানুষ খায়না। আর বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে তো সুসভ্য মিশর দেশের লোকেরা বাস করে। মনের ভিতরে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার যে প্রবল ইচ্ছা তাহাই বাইরে সমর্থন খুঁজে হয়রান হচ্ছিল। ভোরের আকাশ তখনও আলোয় ভরে উঠেনি। পরেশ মাধবীকে জাগায় ঘুম থেকে উঠার জন্য। সে কম্পিত ওষ্ঠাধরে ধীরে ধীরে বলে উঠে জাহাজ তাদের গন্তব্য স্থানের ঘাটে এসে ভিড়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ দুটিকে একটু পরিষ্কার করে মাধবী জিজ্ঞাসা করে জাহাজ কোথায় এসেছে? উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন তখন পরেশের ছিল না। মাধবীকে এক প্রকার টেনে নিয়েই পরেশ জাহাজের কিনারা দিয়ে ছোটে, শেষে দ্রুতপদে তীরে গিয়ে উঠল। কিন্তু তীরে লোকজনের আনাগোনা না দেখে মাধবী প্রমাদ গণল। পরেশ তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে এ-চিন্তা ক্ষণিকের জন্য তার অন্তরকে সংশয়ে দোলায়িত করে তুলল। যন্ত্রচালিতের মত পরেশ হেঁটে চলেছে, মাধবীকে নিয়ে। এদিকে রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পরেশ একটি বৃক্ষতলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু করে। অরণ্যের বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে পরেশ মাধবীকে নিয়ে চলেছে। চারিদিকে বৃক্ষরাজির পত্রের বাতাসে দোলা লেগে মর্ম্মর ধ্বনি বেজে উঠছে। দুই একটা শ্বাপদ জন্তু বিরাটকায় দেহ নিয়ে শিকারের আশায় পথচেয়ে বসে আসে। দূরে দূরে মৃগশিশুদের চাঞ্চল্য দেখা যায়। আর দূরে অরণ্যের গভীরতায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর গর্জ্জন শোনা যায়। যেন অরণ্যে আজ সাড়া পড়ে গেছে অপরিচিত আগন্তুকের আগমনে। পরেশ চলেছে নিশ্চিত মহাকালের মুখ-গহ্বরের দিকে। কাহিনীর জটিলতা বেড়ে চলেছে।

বাংলার সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে মাধবী পরপুরুষে হস্ত ধরে আফ্রিকার জঙ্গলে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃত্যুর সন্ধানে। এমন সময় দূরে কা'দের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথাবার্ত্তা শুনে পরেশের বুকে প্রাণ এল। সে মাধবীকে বলে উঠল আর ভয় নেই, মানুষের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, আশ্রয় মিলবে। পরেশ দেখতে পেল কতগুলি অর্দ্ধনগ্ন লোক একটি আগুনের শিখাকে কেন্দ্র করে আনন্দ নর্ত্তন করে চলেছে। আগুনের মধ্যে একটী হরিণ জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে—তাকে সজোরে চারদিক থেকে আগুনের উপর ধরে রাখা হয়েছে। সেই অসভ্যদের অর্দ্ধ উচ্চরিত গানের সুরে আর বাদ্যের তালে বন প্রকৃতিতে মরণোৎসবের বাজনা বেজে উঠেছে। পরেশের দিকে তাদের চোখ পড়তেই বাজনা গেল থেমে। অসভ্যরা কিচির মিচির শব্দ করে পরেশের দিকে ছুটে এল। মাধবী ভয়ে অজ্ঞান প্রায়। পরেশ হাত যুক্ত করে তাদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করল। পরেশের এই ঢং দেখে তা'দের খুন আরো গেল চড়ে। হাতে তাদের লাঠি-সোটা, বল্লম আর ত্রিশূল। পরেশ ছুটে পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু যাবে কোথায়? অরণ্যচারীদের দেশে আজ সে বন্দী। এখানে কেউ তার কথা বুঝবেনা। অগত্যা পরশের মাথায় বুদ্ধি এল। সে পাশের জঙ্গল থেকে একটি লাঠি সংগ্রহ করে তীব্র বেগে সেটাকে ঘোরাতে শুরু করল। অসভ্যরা ইতিমধ্যে তার একেবারে নিকটে এসে গিয়েছে। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কয়েকটা অসভ্য লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী হলো। কিন্তু যুদ্ধ তার নিশ্চিত পরিণতিতে পৌঁছতে বেশীক্ষণ দেরী করলনা। কতগুলি অসভ্য মাধবীকে লক্ষ্য করে তেড়ে আসতে লাগল। মুখে তাদের প্রেতের হাসি, হাতে যমের ত্রিশূল। পরেশ লাঠি দিয়ে কয়েকটাকে সায়েস্তা করল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর পরেশেরও ক্লান্তি এসেছে। সে সভ্য-জগতের অধিবাসী; কিন্তু অসভ্য জগতের অধিবাসীদের সঙ্গে নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধে তার মস্তিষ্কের সকল বুদ্ধি ও চালনা ব্যর্থ হল। হঠাৎ একটা ত্রিশূল উল্কাবেগে এসে পরেশের বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেলল। পরেশ কাৎ হয়ে মৃত্তিকার উপর পড়ে গেল। রক্তের স্ফুলিঙ্গে তার প্রেমের অনির্ব্বান দীপশিখা আফ্রিকার গহন-অরণ্যে চিরকালের জন্য প্রজ্জলিত হয়ে রইল। কিন্তু মাধবী কোথায়?

এতক্ষণে তা'হলে কি অসভ্যরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে? অন্তর্বেদনায় উত্তেজিত হয়ে সমরেশ বাবু লেখা বন্ধ করে 'মাধবী' বলে চীৎকার করে উঠ্লেন। অন্তঃপুর থেকে সে চীৎকার শুনে অমঙ্গল আশঙ্কায় লেখক-পত্নী ছুটে এলেন। সাহিত্যের রোমান্টিক রাজ্যের কল্পনার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে সমরেশ বাবু সম্মুখে কল্পনারূপী মাধবীকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে উঠ্লেন,—'ফিরে এলে মাধবী, কোন বিঘ্ন হয়নি তো?'

দেওয়াল ঘড়ি তখন রাত্রি বারোটার ধ্বনি জ্ঞাপন করে ঢংঢং করে বেজে চলেছে।

ভালোবেসে

বঙ্কিম মাহাত

ভালোবেসে চোখে জল। যন্ত্রণায় চোখ দু'টো তার
গভীর নিতল কালো সরোবর; নরম রোদ্দুর
সেখানো ছড়ালো আলো: দরদী বন্ধুর অনুভূতি।
হৃদয়ে বিষণ্ণ কান্না,—স্মৃতির উতল অভিসার
পুরনো ক্ষতের মতো ব্যথা দেয়, কী করুণ সুর
তাকে গড়ে তোলে এক বজ্রাহত নির্জন আহুতি।

ভালোবাসা দুঃখময়। ভালোবেসে কেউ কোনদিন
পায়নি চরম তৃপ্তি; বে-আক্কেল কল্পনারা মিলে
চির দিন গড়ে গেছে হংস বলাকার মতো কতো
ঝাঁক-ঝাঁক শান্তনীড়, কতোদিন সালোক মসৃণ
স্বপ্নেরা করেছে ভীড়; তবু সব আকাশের নীলে
ভাসন্ত মেঘের মতো ভেসে গেছে কবে ইতস্তত!

ভালোবেসে চোখে জল। এমন নতুন কিছু নয়
পুরনো স্বপ্নের মতো এর মূল্যায়ণ বড়ো কম;
নির্জন নদীর মতো তার দেহ যন্ত্রণায় চুপ,
হতাশ চিলের মতো শূন্যবুকে অনন্ত সংশয়,
ব্যথাক্লান্ত চোখ দু'টো সরোবর,—বড়ো বেশরম
অহরহ ঝরো-ঝরো তবু ভালোবাসাতে উন্মুখ॥

উজ্জ্বল অতীত আর তুমি

দিলওয়ার

শ্রমিক-প্রাণের ওমে আমি যে চেয়েছি বারবার
গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে মরণের হাসির তুষার
জীবনের অনুর্বর শুষ্ক মাঠে মাঠে। গেলো দিন,
মনে হয় আজ আমি রিক্ত কোনো আকাঙ্খার ঋণ।

হয়তো তোমার কাছে আজ সেটা অলীক কাহিনী:
বীর্যবন্ত সে-যুবক আর তার স্বপ্নের বাহিনী
আগ্নেয় শপথে আহা, একদিন অন্ধকারে যারা
মৃত্যুর করোটি ভেঙ্গে পূর্বাশায় হয়েছিলো হারা।

সে আজ দূরের তারা নীড়াশ্রয়ী তোমার মনের,
নিঝুম নিশীথে শোনো—কান্না তার দিগন্তে মিলায়।
সে আজ ফ্যাকাশে স্মৃতি প্রতারিত কোনো যৌবনের,
প্রাণের রানার তার ছায়াপথে কারে পেতে চায়?

তবু সে নক্ষত্র হয়ে মর্ত্য-পানে দীপ্ত দৃষ্টি রেখে
উজ্জ্বল অতীত থেকে যায় সেই প্রিয় নাম ডেকে॥

নজরুল প্রসংগ

অধ্যাপক বদরুদ্দীন আহমদ

কবি নজরুল যুগস্রষ্টা। বাঙালা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনেতিহাসে যুগান্তরের প্রতীক তিনি। রবীন্দ্র প্রতিভার সর্ব-ব্যাপী ঘূর্ণিপাকে সেদিনের সাহিত্যবিদ ও কবিগণ ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। রবিরশ্মির দ্বিপ্রাহরিক খরদাহে তাই সবাইর প্রতিভার দীপ্তি শুধু ছিল দিয়াশলাইয়ের ম্লান ভাতি। নজরুল প্রতিভার জ্যোতি এল নতুন রশ্মির তীব্র বিকীরণ নিয়ে। রঞ্জন রশ্মির মতো। তাই নজরুলের আর্বিভাবে রবীন্দ্র যুগের অবসান হল। এল নতুন যুগ—যাকে প্রচলিত কথায় যুদ্ধোত্তর যুগ বলা হয়। তা'ছাড়া জাতীয় ইতিহাসে সহস্র উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও কবিগুরু যা দিতে পারেননি অথচ চেষ্টা করেছিলেন—তা' সহজ সরল ও প্রত্যক্ষভাবে এল বিদ্রোহী কবির তরফ থেকে।

কবিগুরুর অবদান তাই এসেছিল দক্ষিণা হাওয়ার মতো। প্রাণ তাতে ভরপুর হয়, ব্যাকুল হয়। কিন্তু নজরুলের কাব্য এল সেখানে কালবৈশাখীর রূপ নিয়ে—ধ্বংস ও সৃষ্টির নতুন বানী নিয়ে। যে প্রেরণা এসেছিল কবিগুরুর স্বভাবজ ও দুরুহ দর্শনের মধ্যে দিয়ে, তাই পূর্ণ বিকাশ হল বিদ্রোহী কবির বীণার ঝংকারে। সুপ্ত প্রাণ সঞ্জীবিত হয়েছিল কবিগুরুর বানীর সুরে। নজরুলের বীনার ঝংকার তাতে এনে দিল মনপ্রাণের বহিঃস্ফুরণ। কবিগুরু নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "আমরা যেখানে এসে শেষ করেছি, নজরুল সুরু করেছে সেখান থেকে।" তা' ছাড়া রবীন্দ্র-কাব্যের উপলব্ধি ছিল সাধারণ মানুষের বাইরে; বিচিত্র পথে গেলেও তা সব-পথগামী হয়নি। পক্ষান্তরে নজরুল ইসলাম সাধারণের কবি।

প্রেম, ভগবান, নারী ও দুরুহ দর্শন ইত্যাদি কবিগুরুর কাব্যক্ষেত্র। তার জীবন-দেবতা ও তার সত্ত্বা রবীন্দ্র-কাব্যের কেন্দ্রবস্তু। নজরুলের কাব্যে সাধারণ আবেদন। কিন্তু তাই বলে তার ব্যঞ্জনা সাধারণ ছিল না। ছিল অসাধারণ আর এই অসাধারণ ব্যঞ্জনার মারফতেই কবি তার লেখনীর বিষয়বস্তুর সাধারণত্বের ভিতর দিয়েও প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন তার স্বকীয় আসন। জন-দরদী কবির লেখায় তাই মানবত্ব ফুটে উঠেছে। মুচি-মেথর-বারাঙ্গনা—যারা সমাজের তথাকথিত নীচুস্তরে, কবির কাব্যে তারা পেয়েছে উচ্চাসন। অধ্যাত্মাবাদের গোলকধাঁধাঁয় তাই কবির মানবতা ও মমত্ব-বোধ অসীমত্বে বিলীন হয় নি, জাগতিক সসীমত্বে তা' অনবদ্য হয়ে রয়েছে। নজরুল কাব্যের বৈশিষ্ট্য সেইখানে।

নজরুল পূর্ব যুগে বাঙালা সাহিত্যের সুর ছিল নিছক কাব্যিক—কল্পনা ও প্রেম-বিরহের লীলাক্ষেত্র থেকে উৎসৃত বাঁশরীর সুর। নজরুল এনে দিলেন তাতে বীণার ঝংকার—তাও অগ্নি-বীণার। 'দহন বনের গহনচারী, নিঙড়ে আগুণ আনলো বারি, অগ্নিমরুর মাঝে।' সাহিত্য-কলা সাহিত্যামোদের খাতিরে—এ-সত্য সেদিন হল বিপর্য্যস্ত। সাহিত্য যদি মানব-মনে ও সামাজিক জীবনে গঠনমূলক অভিঘাত না দিতে পারে, মনের খোরাক জোটালেও সত্যিকারের সাহিত্যিক মর্য্যাদা থেকে তা' বঞ্চিত থাকে। এ সত্য নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন। সেদিনের জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, তার আশু প্রয়োজনীয়তা, সবাই উপলব্ধি করেছিলেন : পরোক্ষভাবে তার প্রকাশ অনেকের কাব্যে ও রচনায়। কিন্তু গলদ সত্যিকারের কোথায় ছিল ও তা' দুরীকরণের বৈপ্লবিক উপায় বয়ান করতে কেউ সাহসী হন নি। পরাধীন জাতির ব্যথা-বেদনা গুমরিয়ে গুমরিয়ে কেঁদে মরছিল ; সে উপলব্ধি এসেছিল নজরুল পূর্ব সাহিত্যে। বিশেষ করে রবীন্দ্র-কাব্যে। কিন্তু তার মূর্ত্ত প্রকাশ তখনো সম্ভব হয়নি। নজরুল সেই ব্যথা-বারিধি মন্থন করে অমৃতের সন্ধান দিলেন। তাই বিদ্রোহী কবি আজ দরদী কবি—তাই তার লেখনীর অভিঘাত আজ এত উজ্জ্বল।

স্বাভাবিক অবস্থায় মানব-মনের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো সুপ্ত থাকে। বাইরের আবহাওয়ার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় তার চেতনার উদ্ভব হয়, সন্দেহ নেই ; কিন্তু তার বহিঃস্ফুরণ হয় না। তাই সেখানে আসে শুধু স্বাভাবিক-উপলব্ধি। কিন্তু মনের অর্গল খুলে তার প্রতিক্রিয়ার বহ্নি বেরিয়ে আসে না। সুপ্ত চেতনার নিছক উন্মেষ তাই কার্য্যকরী ক্ষেত্রে কোন অভিঘাতের সৃষ্টি করতে পারে না। এই সত্য নজরুল পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনার ঘুম ভেঙ্গেছিল নজরুল-পূর্ব সাহিত্যের আহ্বানে। কিন্তু ঘুম-ভাংগা মানুষ ঘরের বাইরে আসার মতো আহ্বান তখনো পায়নি। জড় জাতীয় জীবনের নৈতিক শিথিলতার গভীরত্ব স্বীকার করে নজরুল সাহিত্যের সুর বদলিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রচণ্ড আঘাত না দিয়ে সেখানে শোধরাবার কোন পথ ছিল না। তাই, বেদন-বেহাগ, ভৈরবী সুরে অগ্নি-বর্ষী বানী বেরিয়ে আসে কবির লেখনী থেকে। সুপ্ত জাতির তন্দ্রা আগেই ভেঙ্গেছিল। কিন্তু জাগ্রত মনের অলসতা দূর করে কর্ম্মের প্রেরণা এল

নজরুলের আহ্বানে। বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে এ-সত্য হয়ে রইল চির-প্রতিষ্ঠিত।

সু-সাহিত্যিক জনাব মুজীবর রহমান খাঁ বলেন: "বাঙলার প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নজরুলের কাব্যিক সুরের প্রচণ্ডতার রয়েছে মিতালী। এ-দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাল-বৈশাখীর প্রলয়ংকরী ভয়াবহতা এবং ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণী বজ্রপাতে যে ভৈরবী, নজরুল কাব্যেও তাই।" আপাতঃ-দৃষ্টিতে এ-সম্পর্ককে অস্বীকার করা চলে না। তবুও এখানে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকা ভাল। প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিঘাত মানব-মনে সুস্পষ্ট; তাকে এড়িয়ে যাওয়া সাধারণত্বের বাইরে। তবুও প্রাকৃতিক আব হাওয়াই সব কথা নয়; এ-দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক আবহাওয়ার অভিঘাতই সেখানে প্রবলতর। দেশ অর্থ তার মাটী নয়। তার মানুষের মানসিক গঠন ও প্রতিফলন। তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, তার রাজনৈতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক এবং কৃষ্টিগত ভাবধারা—সব একত্র মিশ্রিত হয়ে যা, ঠিক তাই। তা' ছাড়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি নজরুলের বিদ্রোহী কাব্যের জন্মদাতা, সেখানে নজরুল একক কেন? কেন একই অভিঘাত বাঙলার প্রত্যেক কবি-সাহিত্যিকদের এক একটি নজরুল করে গড়ে তোলে নি? তাই এ-বিষয়ে একমত হওয়া যায় না। আর যদি তা হয়।, নজরুলের স্বকীয় বৈশিষ্টকে অস্বীকার করা হয়। তাকে যোগ্য দৃষ্টিভংগীতে দেখা হয় না।

এখানে এ-কথা স্বীকার্য্য যে নজরুল কাব্যে দেশের এই পরিবেশের ছাপ যথেষ্ট। তার কবিতায় ঘুর্ণি-ঝড়-ঝঞ্ঝার উপমা ও রূপক অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এ-সমস্তই ভাবের বাহন, মর্মকথা নয়। পরিবেশের ছাপ শুধু বাহনে, তার আঙ্গিকে, অন্তরে নয়। তদুপরি অন্তরের আহ্বানকে জোরদার করার জন্য ভাবের বাহনের এই বাহ্যিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। নজরুল কাব্যে তাই ঝড় ঘুর্ণির কালবৈশাখীর ব্যঞ্জনা বাইরের কথা। আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন নয়। তার গূঢ় কারণ অন্যখানে, যা' আগেই বলা হয়েছে।

নজরুল বিদ্রোহী কবি, সৈনিক কবি। রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানি, গতানুগতিক চিন্তাধারা, হিংসা-দ্বেষ ও নানা সংস্কার থেকে পরাধীন দেশের মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন মুক্ত—স্বাধীন। বাঁধনহারা জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ তিনি ভেতরে-বাইরে আহরণ করেছিলেন। মুক্ত ও যতিহীন জীবনের গতিতে তার যাত্রাপথ ভরপুর ছিল। তাই তার কাব্যে ও রচনায় নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান। বিশেষ করে মানুষের রচিত স্বার্থান্বেষী আইনের বেড়া জালে মানবাত্মার তিলে তিলে অপচয়ের তিনি ছিলেন পরিপন্থী। তার রাজবন্দীর জবানবন্দীতে এ-কথা সুস্পষ্ট; তাই তা বাঙলা সাহিত্যের উজ্জল রত্ন। এতদ্ব্যতীত ব্যবহারিক জীবনেও তার বাঁধন-হারা মানুষের পরিচয় পাই। কবিগুরুর পাষান বিধাতা চারিদিকে যে বাঁধনের সৃষ্টি করেছিলেন, নজরুলের বিধাতা তা' ভেঙ্গে দিয়েছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবার প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন থেকে সুরু করে তার সমাজের পরিধি বিশ্ব-জোড়া। মানুষকে তাই নিজের অধিকারের সাথে অপরের অধিকারকেও স্বীকার করে নিতে হয়। তার আত্মচেতনা যতখানি প্রবল, ততখানি হওয়া উচিত তার সমাজ চেতনার। একের যা' লাভ, অপরের তা বঞ্চনা। একের যত ভোগ, অপরের তত ত্যাগ। তা' ছাড়া, খাম-খেয়ালীর প্রাবল্য যেখানে, সামাজিকতা সেখানে পঙ্গু। তাই দেশে আইন ও শৃংখলার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনেও নিয়মের বাঁধন থাকা বাঞ্ছনীয়। নইলে গতিপথ ব্যাহত হয়। বাঁধনহারা জীবনের অর্থ এ-সত্যকে অস্বীকার করা হয়। স্বাধীনতাপূর্ব যুগে এ-দেশের আইন কানুন যা' ছিল, তার একটা বিশিষ্ট দিক ছিল: স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে খর্ব করা। একের উপর অপরের, বিশেষ করে শাসিতের উপর শাসকের ছিল পাশবিক জোর-জবরদস্তি। নজরুলের বিদ্রোহী মন তাই মরিয়া হয়ে উঠেছিল: তাই তিনি বলেছেন: "আমি মানিনাকো কোন আইন।" রণচণ্ডী তার মন ছিল অশান্ত: অত্যাচারের খড়গ কৃপাণের হুহুংকার যেদিন থেমে যাবে সে দিনই তিনি শান্ত হতে চেয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বল্‌গাহারা হওয়ায় আনন্দ আছে। আছে তৃপ্তি। নজরুল তা' কাণায় কাণায় পান করেছিলেন। অবশ্য তার সাধারণ পঙ্গুতা ও চলৎশক্তিহীনতার জন্য তার এই খামখেয়ালীকে দায়ী করা হয়। দৈহিক অভিঘাতকে আমি অস্বীকার করি নে; কিন্তু বাঁধন-হারা জীবনের মাধুর্য্যকেও স্বীকার না করে পারিনে। স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় ক্ষণকালের ছন্দ পেয়েছিল; উড়ে গিয়ে সে ফুরিয়ে গেছে—সেই তো আনন্দ। তার পূর্বাপরের জীবন জড় জীবনের শামিল। জীবনের পূর্ণতা কর্মময় জীবনে। ক্ষণিকের এই দুনিয়ার মুসাফিরিতে যদি বৈচিত্রের স্বাদ না থাকে, তা হলে কী তার সার্থকতা!

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদানের আরেকটা দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। নজরুলের স্বদেশ প্রীতি যেমন প্রিয় ও সর্বাগ্র ছিল, ঠিক তেমনি ছিল তার জাতীয় স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য। বাঙালী হয়ে তিনি জাতীয়তার গানই গেয়ে গেছেন। সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ তার কাব্যে, ব্যবহারে ও কর্মে—কোন ক্ষেত্রেই

জীবনের সত্যকে কলুষিত করে নি। তার জনপ্রিয়তার মূল এখানেও। তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্র কাব্যে ভাবধারার দিক দিয়ে পারশ্য সাহিত্যের যেমনি প্রভাব, নজরুল কাব্যে ঠিক তেমনি ইসলামী শব্দ-নিচয়ের অপূর্ব সমাহার। বাংলা সাহিত্যে নতুন শব্দ আমদানী করে তিনি তরু শব্দ-ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। কবি-গুরু যা' নিঙড়ে শুধু রসটুকুই নিজস্ব রঙে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন; নজরুল সেই আসল বস্তুটিকেই জুড়ে দিয়েছেন। কবি গুরুর স্বকীয়তা ওখানে যেমনি পুরোপুরি বিদ্যমান, নজরুলের বৈশিষ্টও তেমনি ভাবে এখানে উজ্জ্বল। তিনি মুসলমান; তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি কোনদিন।

আরেকটা দিক হল ছন্দের বলিষ্ঠতা। রবীন্দ্র কাব্যে মুক্ত-ছন্দের যে গতি, তা' ঝরণাধারার মতোই অবাধে ছুটে চলে। শিলায় শিলায় ঘাত-প্রতিঘাত তত ফুটে উঠে না; নতুন ঝংকারও তাতে জাগে না। কিন্তু নজরুল কাব্যে ঝরনা ধারা শিলা-খণ্ডের উপর প্রতিহত হয়ে আরও সবেগে নতুন ঝংকার দিয়ে ছুটে চলে। কবি গুরুর ছন্দের যেন ভেসে যাওয়া গতি। নজরুলের ছন্দে পাই চলার গতি। তাই এখানেও নজরুলের বৈশিষ্ট ধরা পড়ে।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত মনের যে ভাব, ভাষার শৃঙ্খলে তাকে আবদ্ধ করে তোলার নামই সাহিত্য। মানুষের মনের আবেগ-উল্লাস, ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা, অনুভূতি-ধারনা সব-কিছু সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটে উঠে। সাহিত্য শুধু-আত্ম-ব্যঞ্জনা নয়। বহির্ব্যঞ্জনাও বটে। তা'ছাড়া, কল্পিত সাহিত্য বা Fiction যাকে Literature of power বলা হয়। কবির কাব্যে, ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে ও গল্পে তার প্রকাশ। আর যাকে Literature of knowledge বলা হয়—তার প্রকাশ বাস্তব জগতের খুটীনাটি নিয়ে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাহিত্য যে কত ব্যাপক, তা' সহজেই ধরা পড়ে।

কাজী নজরুল ইস্লামের সাহিত্যপ্রতিভা তত ব্যাপক নয়—তা' শুধু Literature of power-কে কেন্দ্র করে। তবুও সাহিত্য প্রতিভার যাচাই শুধু তার ব্যাপকতা নিয়ে নয়। সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে তার অভিঘাত নিয়ে। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের জড়তা, তার বহুবিধ সমস্যা ও তা' দূরী-করণের প্রচেষ্টা—এসব দিক দিয়ে সাহিত্যিক কতখানি সচেতন ও সক্রিয়, তা' দেখার প্রয়োজন আছে। আজ নজরুল ইসলাম জীবিত হয়েও মৃত; তিনি মরে হবেন অমর। ইতিহাসে তার মর্য্যাদা চির অনস্বীকার্য্য হয়ে রইবে।

ঝরা পাতা

কে, এম, শমশের আলী

আমার জীবন বিটপী হইতে
ঝরে গেল যেই দিন,
ছিল সে আশার সুষমায় ঘেরা
কল্পনা রঙীন।
ছিল শাখে তার প্রসূন সুরভি
সোনার কিরণ দিত হেম রবি:
কোয়েলা কুহরি'
সারা দিন ভরি
বাজাতো সোহাগ-বীন্॥

আল্পনা আঁকা সে ঝরা পাতার
স্মৃতির সুরভি জাগায় বাহার:
তাই অবেলায়
গান শুনি হায়
ব্যথা মর্ম্মর ক্ষীণ॥

ঢাকা নগরীর ইতিবৃত্ত

শ্রী শিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ

'বেঙ্গল' নামের উৎপত্তি

মুসলমান যুগের পূর্ব্বে এ-স্থানের নাম সম্ভবতঃ Bengal বলিয়া পরিচিত ছিল না। 'Bengal' কথাটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ কথাটা হইতে, বঙ্গ কথাটা আবার অঙ্গ বা পূর্ব্ব শব্দ হইতে আসিয়াছে। তের-শতাব্দীর শেষ দিক দিয়া এই নামটা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। Marco polo নামে একজন ইউরোপীয়ান ভ্রমণকারী সর্ব্বপ্রথম 'Bengal' শব্দটিকে 'বাঙ্গালা' বলিয়া ব্যবহার করেন এবং বঙ্গোপসাগরের উপরিস্থিত স্থানকে তিনি এই নামে অভিহিত করেন।

বৃহত্তর ঢাকা

বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুদ্রিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের লিখিত ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৭৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে ঢাকা পঞ্চম বিভাগ নামে অভিহিত হইত। সে সময়ে বারওয়েল, পালিং, থ্যাকারে, সেক্সপীয়ার এবং হল্যাণ্ড প্রমুখ ব্যক্তিগণ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বারওয়েল উহার সভাপতি ও প্রধান সদস্য ছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩,০০০ টাকা। তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। অন্যান্য সদস্যগণের ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল এবং তাঁহারা তাহা করিতেনও। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে (বাংলা সন ১১৭৯) বাঙ্গলার গবর্ণর হইয়া আসেন।

ঢাকা জালালপুর ও ঢাকা সদর এই দুইভাগে ছিল ঢাকা জেলা বিভক্ত। জালালপুর ঢাকা ফরিদপুরের অন্তর্গত একটি বৃহৎ পরগণার নাম। ফরিদপুর তখন ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত ছিল। ঢাকা ও জালালপুর পরে একাঙ্গীভূত হয়। সে সময় ঢাকাতে দুইটি দেওয়ানী আদালত ছিল। একটিতে ঢাকা জালালপুর সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের বিচার চলিত, অপরটি ছিল শুধু ঢাকা সদরের জন্য। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জালালপুরের দেওয়ানী আদালতটি ফরিদপুর শহরে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, এক সময়ে ঢাকা বিভাগ ঢাকা জেলা, শ্রীহট্ট, আটিয়া, কাসমারী, বরবাজু, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ সহ এক বৃহত্তর ভূভাগ লইয়া গঠিত ছিল। যেমন বৃহত্তর বঙ্গ তেমনি ঢাকা জেলাও বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভূত থাকিয়া এক বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ ছিল।

জরিপি বন্দোবস্ত

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের প্রামাণিক জরিপি বন্দোবস্ত করেন রাজা টোডর মল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার জরিপি বন্দোবস্ত করেন শাহজাহানের এক পুত্র সুলতান সুজা। তৃতীয় জরিপি বন্দোবস্ত হইয়াছিল ১৭২২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহের শাসনকালে নবাব জাফর খাঁয়ের তত্ত্বাবধানে। এই জরিপে পুরানো সংকারগুলি চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সরকার চাক্‌লা এবং সরকার ফতাবাদের এবং বাজুহা চাক্‌লা জাহাঙ্গীর নগর অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে সুবে বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

জাফর খাঁর পরে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে আর একবার জরিপ হয়। ঐ সময় বাঙ্গালার সুবা বা 'ইহতিমাম' বা জমিদারীতে বিভক্ত হয়। এইরূপ বিভাগে ঢাকার অধিকাংশ, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জালালপুর ইহতিমামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম চতুর্থবার বাঙ্গলার জরিপি করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। সে সময়ে ঢাকা জালালপুরের কালেক্টার ছিলেন মিঃ উইলিয়ম ডগলাস্। তৎকালে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী বলিয়া কোন জিলাই ছিলনা। এ-সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে—

"Bakarganj was made a Zila or District for magisterial purposes in 1797 by Regulation 7 of that year but it did not become a collectorate till 1817."

এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় এই জন্য যে, তৎকালে জমিদারের বিলি বন্দোবস্ত, রাজস্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত সমুদয়ই ঢাকার রেভিনিউ আদালতে হইত।

জমিদারী শাসন

মিঃ ডগলাস তৎকালীন জমিদারদের শাসন-সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ্চ তারিখে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রসঙ্গক্রমে তিনি জমিদারদের বিচার ইত্যাদি সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"The Zaminders also had the privilage of administering justice in their respective jurisdictions,.acting something like justices

of the peace in our country, settling trifling disputes, and rendering easy and speedy redress to the injured p rty, which would have been rendered very difficult indeed if a poor man had to travel to the Hajoor and prefer his complaint t rough a regiment of currupt matsadles (clerks) every one of whom must have been briped before he could have granted him on the spot in a day's attendance."

অর্থাৎ সে সময়কার জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকার প্রজাদের ছোটখাট বিবাদ ও কলহের সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। উভয় পক্ষই তাতে সন্তুষ্ট হইত। নতুবা গরীব বেচারীদের জিলায় হুজুরদের নিকট বিচার প্রার্থী হইলে প্রথমতঃ সদরে যাওয়ার অসুবিধা, তারপর মুৎসুদ্দি বা কেরানীদের ঘুষ দিয়া হুজুরের নিকট হইতে সুবিচার পাইতে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইত, তাহা না বলিলেও চলে—কিন্তু জমিদারী কাচারীতে এইসব বিচার মীমাংসা হইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইত না।

শায়েস্তা খাঁর আমল

শায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। এই শহরে তখন টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত। শায়েস্তা খাঁ মসজিদ ও অন্যান্য ইমারৎ প্রস্তুতের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাই তাঁহার নামানুসারে ঢাকায় এক স্থপতি শিল্পের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহা 'শায়েস্তা খানি' নামে সুপরিচিত।

তাঁহার রাজত্ব কালেই ইংরাজেরা প্রথমে ঢাকায় উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন তাহারা এদেশে আসে তখন তাহারা সামান্য বণিক মাত্র ছিল। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম বালেশ্বর ও হুগলীতে তাহাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। দিল্লী সম্রাট শাজাহানের আমলে সুরাটের কুঠীর ইংরাজ ডাক্তার বাউটন মোগল অন্তঃপুরের রাজকন্যাদের সুচিৎকিসায় আরোগ্য করিয়া বিনা শুল্কে বাঙ্গলা দেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার অর্জ্জন করেন। পরে বাঙ্গলার সুবেদার শাহ শুজার নিকট হইতে পুনরায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তবু তাহাদের বাণিজ্য নিরাপদ ছিল না। শায়েস্তা খাঁর আমলে তাহাদের বাষিক তিন হাজার টাকা খাজনা দিতে হইত। ইংরেজেরা এই শুল্কের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য ঢাকায় প্রথমে কুঠী স্থাপন করে। তখন বাঙ্গালা দেশে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন জব চার্ণক্। ঢাকায় সর্ব্ব প্রথম ইংরেজ ছিলেন জেমস হার্ট নামক এক ব্যক্তি। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া জানা যায় না, স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যই তাঁহার পেশা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভেনিস দেশীয় পর্য্যটক মানুৎি তাঁহার ঢাকা ভ্রমন কাহিনীতে প্র্যাট নামক এক ইংরেজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রাট ছিলেন মোগল অধিনায়ক মীরজুমলার সৈন্যদলের মধ্যে একজন গোলন্দাজ এবং মোগল সরকার হইতে পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেন। কিছুকাল পরে এই প্র্যাট মীরজুমলার দরবার হইতে পদত্যাগ করিয়া আরাকানের দিকে পলাইয়া যায় এবং দুইটি মোগল রণতরী আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে। ইহাতে মোগল সুবাদার ক্ষুন্ন হইলে ইংরাজরা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ ও স্মিথ নামক দুইজন ইংরাজকে মোগল দরবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে ঢাকায় পাঠায়।

ঢাকায় ইংরেজদের প্রথম কুঠী ছিল—মণিপুর যেখানে পরে সরকারী কৃষি বিভাগের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। উহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে কিছুই নাই। কুঠী নির্ম্মাণের জন্য জেমস হার্ট তাহাদের ভূখণ্ড দান করেন। এই ভূখণ্ড এক মুসলমান ফকির পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া লিখিত দলিল দেখাইয়া দাবী করিয়া বসে। ইংরেজরা নগর কোতয়ালকে হাত করে এবং পরে কোতয়াল এই ফকিরকে তাড়াইয়া দেয়।

১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাথু ভিন্সেণ্ট নামক ইংরাজের হুগলীর অধ্যক্ষ বিনা শুল্কে ঢাকায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি লইবার জন্য ঢাকায় আসেন। তিনি অনেক চেষ্টার পর সোনার মোহর নজর দিয়া নবাবের নিকট হইতে সেরূপ অনুমতি পাইলেন। কিন্তু তবুও সর্ব্বদাই ইংরেজদের নবাবের অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া থাকিতে হইত। অনুগ্রহের বিনিময়ে তাহাদের নানা উৎকোচ ও মদ ইত্যাদি উপঢৌকন দিতে হইত।

ইংরেজরা বস্ত্র এবং তুলার ব্যবসায়েই অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিখ্যাত মসলিনের জন্মস্থান; এবং আজও আধুনিক জেলখানার উত্তর দিকে তাঁতখানা রোড নামে একটি স্থান বিদ্যমান আছে, সেখানে মোগল দরবারের মসলিন সরবরাহের জন্য একদল তন্তুবায়ের উপনিবেশ ছিল। উহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য মোগল সরকারে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তাঁহার পদবী ছিল তাঁতখানার দারোগা। তন্তুবায়গণ যাহাতে অন্যের নিকট মসলিন বিক্রয় করিতে না পারে তাহার তত্ত্বাবধান করিবার কাজই ছিল তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, কিন্তু কখনও কখনও ইংরেজ বণিকগণ

এই তন্তুবায়দিগকে ভুলাইয়া গোপনে মসলিন সংগ্রহ করিত। কিন্তু ধরা পড়িলে তাহাদের অর্থদণ্ড হইত। ইহা ছাড়া ইংরেজ বণিকগণ নানাবিধ সামগ্রী দেশীয় লোকদের নিকট বিক্রয় করিত। তাহারা কখনো কখনো মূলধনের অভাব বোধ করিত। আধুনিক ব্যাঙ্কের ন্যায় তখন কোন প্রতিষ্ঠান ঢাকা কিংবা বঙ্গদেশে ছিলনা। তাই তাহারা দেশীয় মহাজনদের নিকট হইতে বেশী সুদ দিয়া টাকা ধার করিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস আরও জানা যায় যে, শায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরেজ বণিকদের বাঙ্গলা দেশে অবস্থান কঠিন হইয়া পড়ে। এমন এক সময় হইয়াছিল যে যখন ইংরাজদের প্রধান অধ্যক্ষ বাঙ্গলা দেশে বাণিজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া সুদূর মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন চার্লস আয়ার এবং রোজার ব্র্যাডিল নামক দুইজন ইংরেজ ঢাকায় ইংরেজদের পক্ষে দরবার করিতে আসেন। কিন্তু এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরাস ক্যাপটেন হিট নামক জনৈক ইংরেজ নৌ সেনাপতিকে একটি রণতরী বহর লইয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে সমস্ত ইংরেজদিগকে উঠাইয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই নৌ সেনাপতি প্রথমে হুগলীতে এবং পরে চট্টগ্রামের উপকূলে উপস্থিত হন। ইংরাজরা নাকি চট্টগ্রামে দুই একবার গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। ইহাতে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া ঢাকায় ইংরেজদিগকে নজরবন্দী রাখেন। পরে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের আপোষ হইয়াছিল।

ঢাকার মলমল্ ও মসলিন

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা নগরের মলমল্ বহু সমাদরে ইউরোপ খণ্ডে বিক্রয় হইত। তখন এখানকার হিন্দু তন্তুবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই মলমলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সূক্ষ্মতায়, বয়ন পারিপাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিলনা। ঢাকার কার্পাস তৎকালে সূক্ষ্মসূত্রে উৎপাদনে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ঢাকার মসলিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তুবায়দের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মসলিনের কাটতি কমিতে লাগিল, অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির অন্যতম কারণ।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প এক সময় জগদ্বিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইউরোপের সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত। ভ্রমণকারী ট্রাভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—পারস্যের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমন কালে পারস্যের শাহকে উপহার দিবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন একটি ক্ষুদ্র নারিকেলের খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মসলিন জড়াইয়া একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র দ্বারা এদিকে ওদিকে নেওয়া যাইত। এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড মসলিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত। এবং তাহা ৪০০্।৫০০্ শত টাকা বিক্রয় হইত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহান বেগম ঢাকার মসলিন প্রভৃত আদর করিতেন। সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন দিল্লীর অন্তঃপুরে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে মসলিন ভারতবর্ষ হইতে বাইরে যাইতে না পারে, সেজন্য রাজকীয় আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। গল্প আছে যে, একবার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরীক্ষা করিবার জন্য একখানা বস্ত্র ধুইয়া ঘাসের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, একটা গরু ঘাস খাইতে খাইতে ভ্রমে সেই মূল্যবান বস্ত্রখানাও খাইয়া ফেলিয়াছিল।

বিলাতী মালের প্রতিযোগিতার দরুণ ঢাকার বয়ন শিল্প ও মসলিন শিল্পের পতন হয়। পূর্ব্বে এই জিলায় ৪০ প্রকারের বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। বিলাতী সূতার সংমিশ্রণে উহা বহু কালবধি প্রস্তুত হইত; কিন্তু দেশী সূতা দ্বারা সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত হইত। এইরূপ কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সময় ১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট প্রস্থের এক টুকরা মসলিন যাহার মোট ওজন ৯০০ গ্রেণ উহার মূল্য ছিল ৪০ পাউণ্ড। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট প্রস্থের উৎকৃষ্ট একখানি বস্ত্র যাহা প্রায় ১৬০০ গ্রেণ ওজন হইবে উহার মূল্য ১০ পাউণ্ড ছিল। তখন হইতে উক্ত শিল্পের পতন হইতে লাগিল এবং বিশেষ ফরমাস ছাড়া আর পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট ধরণের বস্ত্র প্রস্তুত হইত না।

স্যার হেনরী জন, এস, কটন ঢাকার বিষয়ে উল্লেখ করিতে যাইয়া এরূপ বলিয়াছেন যে, মোগল শাসনের আমলেই এই শহর সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। বৃটিশ শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব্বে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২ লক্ষ। ১৭৮৭ সালে ৩,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ঢাকার মসলিন ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮১৭ সালে এই রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও লোক সংখ্যা

ঢাকা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদের রাজধানী থাকায়

অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা ৫৯ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। ইহার মধ্যে মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত শেখ সম্প্রদায়ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল, ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায়, বাড়ুই, অর্থাৎ সূত্রধর, বারুই, বেণিয়া, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, জেলে, কৈবর্ত, যুগী, চাষা, শুঁড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল ও কোচ জাতিও হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার অধিবাসী সংখ্যা ২ লক্ষের অন্যূন বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরের জন সংখ্যা ১,৩৮,৫১৮। অতঃপর বাণিজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন উহার লোক সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

হুসেনী দালান

ঢাকা শহরের মধ্যে 'হুসেনী দালান' নামক শিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম বাড়া ঢাকার প্রসিদ্ধ ইমারৎগুলির মধ্যে অন্যতম। মোগল নৌ বিভাগের দারোগা মীর মোরাদ কর্ত্তৃক ইহা ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে মহরমের সময় মহা সমারোহ হয় এবং তাহার জন্য নবাবী আমলে অনেক টাকা খরচ হইত বলিয়া ইংরেজ সরকারও কিছু অর্থ দিতেন। মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য মোগল বাদশাহদিগের যে নৌ বহর রাখিতে হইত তাহার পার্শী নাম 'নাওয়ারা'। ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত ঢাকা এই নৌ-বহরের কেন্দ্র ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ভাল ভাল মহল নাওয়ারার খরচের জন্য খাস্ রাখা হইত। 'হুসেনীদালানের' নির্ম্মাতা মীর মোরাদ এই নাওয়ারার দারোগা বা কর্তা ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে 'হুসেনীদালান' ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার নবাব পরলোকগত স্যার আহসানুল্লা বাহাদুর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া ইহার সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

কওমী সঙ্গীত

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
　　　　শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জমানার
　　　　ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান॥

মুখেতে কলমা হাতে তলোয়ার বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার।
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্ আল্লার আগে চল আগে বাজে বিষাণ।
ওরে—ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ বাঁধা যেরে তোর পাক কোরান॥

ঘুমাইয়া কা'জা করেছি ফজর তখন জাগিনি যখন জোহর্।
হেলা ও খেলায় কেটেছে আছর মাগ্‌রিবের আজ শুনি আজান।
জামাত শামিল হওরে এশাতে এখনো জামাতে আছে স্থান॥

নাহি মোরা জীব ভোগবিলাসের, শাহাদাৎ ছিল কাম্য মোদের।
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের, শাসন করিল আধা জাহান।
তারা আজ পড়ে ঘুমায় বেহুঁশ বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান॥

শুক্‌নো রুটিরে সম্বল করে, যে ঈমান আর যে ত্যাগের বলে
ফিরেছি জগত মন্থন করে সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন্।
আল্লাহো আকবর রবে পুনঃ কাঁপুক বিশ্ব দূর-বিমান॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম।　　　　স্বরলিপি—মফিজুল ইসলাম।

II II	বা	জি	ছে	দা	মা	মা	বাঁ	ধ	রে	আ	মা	মা	
	পা	পা	পা	গা	গা	গা	রা	রা	রা	সা	সা	সা	
	শি	র্	উঁ	চু	ক	রি	মু	স	ল	মা	०	ন্	
	না	-া	না	না	না	না	না	র্সা	না	সা	-া	-া	
	দা	ওয়া	ৎ	এ	সে	ছে	ন	য়া	জ	মা	না	র	
	পা	মা	না	ধা	ধা	ধা	পা	-া	পা	জ্ঞা	গা	জ্ঞা	
	ভা	ঙা	কে	ল্	লা	য়্	ও	ড়ে	নি	শা	०	ন্	
	পা	না	না	ধা	ধা	-া	গা	পা	পা	পা	-া	-া	II II
	মু	খে	তে	ক	ল্	মা	হা	তে	ত	লো	য়া	র	
	ঘু	মা	ই	য়া	কা	জা	ক	রে	ছি	ফ	জ	র	
	ন	হি	মো	রা	জী	ব	ভো	গ্	বি	লা	সে	র্	
	শু	ক	নো	রু	টি	রে	স	ম্	ব	ল্	ক	রে	
	সা	সা	সা	মা	-া	-া	মা	-া·	-া	মা	-া	-া	

বু কে ই | স্ লা মী | জো শ্ দু | র্ বা র্
ত খ ন | জা গি নি | য খ ন | জো হ র্
শা হা দা | ৎ ছি ল | কা ০ ম্য | মো দে র্
যে ঈ মা | ন্ আ র | যে ত্যা গে | র্ ব লে
রা পা পা | -া পা -া | পা -া পা | পা পা -া

হৃ দ য়ে | ল ই য়া | এ শ্ ক্ আ | ল্ লা র
হে লা ও | খে লা য় | কে টে ছে | আ ছ র
ভি খা রী | র্ সা জে | খ লি ফা | যা দে র
ফি রে ছি | জ গ ৎ | ম নু থ | ন্ ক রে
মা ধা ধা | -া ধা -া | ধা -া ধা | ধা ধা -া

আ গে চ | ল্ আ গে | বা জে বি | ষা ০ ন্
মা গ রি | বের্ আ জ্ | শু নি আ | জা ০ ন্
শা স ন | ক রি ল | আ ধা জা | হা ০ ন্
সে শ ক্ | তি আ জ | ফি রি য়ে | আ ০ ন্
পা না -া | না নর্সা নর্সা | ধা না র্রা | র্সা -া -া

ভ য়্ না | ই তো র্ | গ লা য় | তা বি জ
জা মা ত | শা মি ল্ | হ ও রে | এ শা তে
তা রা আ | জ্ প ড়ে | ঘু মা য় | বে হুঁ শ
আ লু লা | হো আ ক্ | ব র্ র | বে পু নঃ
র্সা র্গা র্গা | -া র্রা র্রা | র্সা -া র্সা | না ধা না

বাঁ ধা যে | রে তো র্ | পা ক্ কো | রা ০ ন্
এ খ নো | জা মা তে | আ ছে ০ | স্থা ০ ন্
বা হি রে | ব হি ছে | ঝ ড়্ তু | ফা ০ ন্
কাঁ পু ক | বি ০ শ্ব | দু র্ বি | মা ০ ন্
র্সা র্গা র্গা | র্গা র্রা র্রা | ধা র্সা র্সা | র্সা -া -া

পুস্তক-পরিচয়

শায়ের নামা—সু-সাহিত্যিক জনাব আশরাফ উজ্জামান লিখিত 'শায়ের নামা' পড়লাম।

গ্রন্থকার আমাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, ছোট্ট বই, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারবেন। আমি তা পারি নাই, এক নিঃশ্বাসে নয়, দুই নিশ্বাসে নয়, দশ নিঃশ্বাসেও নয়, পড়ার মাঝে মাঝেই বাঁধা পেয়েছি, স্মৃতির প্রবল বহ্নি।

বইখানি এক পুঁথিয়াল পরিবারের অন্তর লোকের কাহিনী। এতে লোমহর্ষন ঘটনা নাই, রোমাঞ্চকর কাহিনী নাই, সফেদ দেও, আজদাহার বর্ণনা নাই, কামান বন্দুক, আনবিক বোমার কথা নাই, আছে একটা কবি গোষ্ঠীর চিত্তে প্রতিফলিত অনাবিল ভাবের কাব্যিক আনাগোনা।

এ-আনাগোনা আমার চিত্তকে মাঝে মাঝে উদাস করে তুলেছে, পড়তে পড়তে বই বন্ধ করে অতীতের কথা ভেবেছি। আমার শৈশব কালে আমাদের বাড়ীতেও পুঁথি পড়া হত। আমাদের বাড়ীর চারদিকে পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল পুঁথি যে তিন জনে পড়তেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বড় ভাই, মুহররমের সময় তিনি শহীদে কারবালা পড়তেন, আমি কিছুক্ষণ পরেই মজলিস ছেড়ে বেরিয়ে আসতাম। অতো মানুষের মধ্যে কি করে বার বার চোখ মুছি?

শায়ের নামার নায়ক মইজউদ্দীন পুঁথিয়াল ঘরের ছেলে। তার দাদার ভাই গওহর দাদা ছিলেন নামজাদা পুঁথিয়াল। তিনি নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তবু তিনি মুখে মুখে যে পুঁথি রচনা করতেন, তা নিয়ে এখানে ওখানে সেখানে মজলিস জমে উঠতো। মইজের বাপও ছিলেন পুঁথির রচয়িতা। সেই পুঁথিয়াল পরিবারের মইজ, তারো ধমনীতে প্রবাহিত ছিল কবিত্বমাখা রক্তের ধারা। তাই ম্যাট্রিকের টেষ্ট পরীক্ষার আগে আগে সে ইংরেজী আর অঙ্কের বই কয়খানি কাছের নদী গর্ভে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হল। আমি কাছে থাকলে বলতাম, সুবোধ বাবাজীবন, তোমার ঐ কৃৎতদ্ধিতয়ালা ব্যাকরণের বই আর আরবী হরফের বাংলা অনুলিখনের বই—ও দুটি চীজও দরিয়ার বুকে সঁপে দাও।

এরপর মইজের পুঁথিয়াল জীবনের সাধনা শুরু হয়ে গেল। মিল করে কথা বলার নেশা তাকে পেয়ে বসলো। মইজ ঠিক করল, তাকে তার বাপ-দাদার নাম জিইয়ে রাখতে হবে, কেবল তাই নয় তার সাধনার ভিতর দিয়ে তার বাপ-দাদা অমর হয়ে থাকবেন। গহরের আমলে তাদের বাড়ীতে আনন্দের মেলা বার মাস বসেই থাকত, এখন সে মেলা নাই, মইজ সেই মেলা ফিরিয়ে আনবে।

ইতিমধ্যে কিছু পুঁথি নিয়ে সে ঢাকায় গিয়ে প্রকাশক বশারত মিয়াকে দিয়ে কিছু টাকা পেল। টাকা পেয়ে তার বাবা, তার চিররুগ্না মা উভয়েই খুশী হলেন।

মইজের দিন কবিত্বের আমেজময় ধারায় সুখেই এগিয়ে চলছিল। অকস্মাৎ তার জীবন-নন্দন নব হাওয়ায় প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠল। সুন্দরী তরুনী সালমা তার জীবনসঙ্গিনী হয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। এ-নতুন আনন্দের পরশে মইজের ভিতরের ঘুমন্ত কবি মোচড় দিয়ে উঠে বসল।

মাঝখানে মইজ পাটের কারবারে যায়। কিছু লাভও করে সে কারবারে। কিন্তু সেখানে তার মন বসেনা। সে হাটে পাট কিনে, হাটেই সে পাট বিক্রি করতে হবে। হঠাৎ তার কানে আসে পুঁথি পড়ার সুর। পাটের মত পাট পড়ে থাকে, সে পুঁথি পাঠকের কাছে গিয়ে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে, দিন কাবার হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে দেশে আসে বন্যা, বন্যা ডেকে আনে অকাল। দেশ হাহাকারে ভরে ওঠে। এত অভাব-অনটনের মধ্যেও সে সংকল্প করে, আখেরে সে পুঁথিয়ালের জীবনই যাপন করবে।

কিন্তু প্রকাশক বশারত মিয়া মইজকে বলেন: গদ্যে কাহিনী লেখ, কবিতার দিন চলে গেছে। আর লেখ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী। গাঁয়ের মানুষের জীবন কাহিনী লিখতে মইজের লোভ হয়, কিন্তু ভাষা? দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব মিলের কথা ভালবাসে, মনে রাখে। ছন্দহীন লেখা তাদের মনে দাগ কাটবে কেন? সে যখন গাঁয়ের জন্য গাঁয়ের মানুষের কথা লিখবে, তখন সে ছন্দের ভাষাতেই লিখবে। শহরের শিক্ষিতেরা নাক সিটকাক, তবু তার লেখার শুরুতে সে লিখবে—

আল্লা আল্লা কর ভাই, নবী কর সার
নবীর কলেমা পড়ে হয়ে যাবে পার।

গওহর দাদা লেখকের এক সার্থক সৃষ্টি। গওহর দাদার পক্ষে আমাদের সামনে আসার অবকাশ কমই হয়েছে, তবু লেখকের রচনা চাতুর্যের ফলে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর একটি দরদময় কবিত্বের মাধুর্যমাখা

মনোরম ছবি। পাড়াগাঁয়ের বাশিন্দা, অথচ তিনি পরম উদারতার সঙ্গে ভাতিজা দিলদার মিয়ার বিয়ের ঘটকালী করেন- সেই মেয়ের সঙ্গে যাঁর চোখের তীরে ভাতিজা অকস্মাৎ ঘায়েল হয়ে পড়েছেন। তাঁর মহাযাত্রার চিত্রটি অবিস্মরণীয়।

গওহর দাদার তখন খাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। বল্লেন, ফরজন্দ ভাই, সেই গজলটা শোনাও—প্রেমিক যেখানে খোদার ইশকে দুনিয়ার সমস্ত বালা-মুছিবত ভুলে গেছে। ফরজন্দ দাদা গজলে সুর দিলেন। তাঁর দুই চোখে পানি, কণ্ঠে সুর। সমস্ত ঘরময় কারো চোখ সেদিন শুষ্ক ছিল না। সেই গজল শুনতে শুনতেই গওহর দাদা শেষ নিশ্বাস ফেল্লেন। ৪৬ পৃঃ

ফরজন্দ শা ওরফে ফরজন্দ দাদা লেখকের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। অমন অনেক মানুষের কথা শুনেছি, চোখে দেখি নাই, গ্রন্থকারের লেখায় দেখলাম।

অনেক বছর পর হঠাৎ একদা রাত্রিতে মইজের কানে এল—

ইয়া ইলাহী, ইয়া পরওয়ারদিগার
লে চলো মুঝে সিধা রাহ দিখা কার

ফরজন্দ দাদা এসেছেন। তাঁর বাকী পরিচয় লেখকের কথায় বলি। মইজের বাপ দিলদার মিয়া বল্লেন :

—ফরজন্দ চাচা, কোথায় ছিলেন এতদিন ?

—আলহামদুলিল্লাহ, বেঁচে আছ তুমি? এস, এস বুকে এস। দেশে ফিরে এসে যেখানে, যেখানে গিয়েছি, ভয়ে ভয়ে গিয়েছি, কে আছে, কে নেই। কলজা খোশ হল তোমারে দেখে।

—কিন্তু কোথা থেকে এলেন চাচা?

—হালে আজমীর থেকে। মগরেবী দেশে ছিলাম অনেক দিন। মিসর, আরব দেশ।

মইজের স্পষ্ট মনে আছে, ফরজন্দ দাদার কথা। বছরে এক আধবার আসতেন তিনি তাদের বাড়ীতে। কি ধুমই না পড়ে যেত তখন সমস্ত বাড়ী জুড়ে। কথায়, গানে, গল্পে সমস্ত বাড়ী মুখর হয়ে থাকত। কণ্ঠে ফারসী বয়েতের কি অদ্ভুত ঝংকার। মিসরী এলাহানে কোরআন পড়তেন তিনি। সমস্ত বাড়ী গুম গুম করে উঠত অপূর্ব সুর ঝংকারে আর ভাবের মাধুর্যে। সন্ধ্যায় বসে বসে পড়তেন পুঁথি। সেও এক অপূর্ব সুর আর কাহিনীর জগৎ। আরবী, ফারসী, বাংলা তিন ভাষাই সমান খেলে যেতো তাঁর কণ্ঠে। দাদা হবীবুল্লা তাঁকে প্রথম ধরে আনেন কলকাতা থেকে। তারপর তাঁর বন্ধুত্ব বেশী করে জমে ওঠে গওহর দাদার সঙ্গে। ঘরবাড়ীর কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন : সমস্ত দুনিয়া আমার ঘর। ৪৩—৪৪

ফরজন্দ শা কোনখানেই বেশী দিন টিকে থাকেন নাই। অকস্মাৎ চলে যেতেন। কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, পথ যেদিকে টেনে নিয়ে যায়—৫০ পৃঃ। লোকে তাকে ফকীর দরবেশ বল্লে তিনি তার ঘোর প্রতিবাদ করে বলতেন—আমি বুজুর্গ কিংবা আউলীয়া নই, আমি শায়ের।। ৫১ পৃঃ।। অথচ দরকারের মুহূর্তে হঠাৎ তিনি এসে উপস্থিত হতেন। মইজের স্ত্রীর প্রসব বেদনায় মর মর অবস্থা, এমন সময় ফরজন্দ শা এসে হাজির, পানি ফুঁক দিয়ে দিলেন, মুশকিল আছান হল। আবার গওহর দাদার মৃত্যুর আগেও তিনি এসে হাজির। তাঁরই কণ্ঠের গজল শুনে শুনে গওহর দাদা চলে গেলেন। বন্ধু গওহরের লাশ সামনে রেখে তিনি খুলে বসেছিলেন কোরআন। গম্ভীর আর অদ্ভুত সুরে বাঁধা কেরাআত ধ্বনি। সুর উচ্চ থেকে উচ্চতর উঠে খোদার আরশ কুরশী পর্যন্ত সেদিন যেন স্পর্শ করেছিল। বাড়ীতে সে রাতে কেউ ঘুমাতে পারেন নি। তেমন কোরআন তেলাওত যেন জীবনে কেউ শোনেনি। স্তব্ধ, ঘুমহারা রাতের বুকে সে যেন পৃথিবীর ক্ষুব্ধ মানবত্মার বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। ৪৬ পৃঃ।

এমনি সুন্দর ছবিতে বইখানা আগাগোড়া ভর্তি। স্বচ্ছ, সুন্দর ভাষা ঝর্ণাধারার মত চটুল গতিতে এগিয়ে চলেছে। পথের উপল খণ্ডে বাধা পেয়ে ঝর্ণা ধারা যেমন কলকল ছলছল শব্দে নেচে ওঠে, লেখকের ভাষাও তেমনি মাঝে মাঝে ভাবের সংঘাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের সমাজের মানস গঠনের পুঁথি সাহিত্যের অতীত অবদান, পুঁথিয়ালদের দীর্ঘকাল ব্যাপী নিস্বার্থ নীরব সাধনা, পুঁথি সাহিত্যের অবহেলিত পৃষ্ঠা হতে আজো কি কি রত্ন উদ্ধার করে আমরা আধুনিক সাহিত্যের কাজে লাগাতে পারি, লেখক পরম দরদের সঙ্গে তার পরিচয় দিয়েছেন।

বইখানি আমাদের সত্যি ভাল লেগেছে। বইয়ের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভালো। ১৮৭ পৃষ্ঠা, দাম আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা—১।

: ইব্রাহিম খাঁ

বান—(সামাজিক উপন্যাস) লিখেছেন : আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী ; প্রকাশ করেছেন : সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ; ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স; ৪৫, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। মূল্য : তিন টাকা।

পূর্ব পাকিস্তানের যে কয়জন তরুণ সাহিত্যসেবী সম্ভাবনাময় জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যের আসরে, কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনার সহিত যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা অবশ্যই জানেন, এই বিপ্লবধর্মী কবি-সাহিত্যিক

নপীড়িত মানুষের অন্তহীন ব্যথা-বেদনাকেই বানীময় করে তুলেছেন তাঁর সৃষ্টিতে। কবি ওয়াসেকপুরী প্রকৃত গণ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। এই শাশ্বত সত্যের সাক্ষর বহন করেই আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর অধুনা রচিত সামাজিক উপন্যাস 'বান'।

পাক-বাংলার গ্রাম্য জীবনের বাস্তব চিত্র অপূর্ব শিল্প-চাতুর্য্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে এই 'বানে'। করিম মোল্লা, সলিম মৃধা আর নাবালক মিঞার মতো স্বার্থগৃধ্নু শয়তানদের প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে শকুনের মতো ভীড় জমিয়ে আছে ওরা। কুটিলতা আর হীনতার বিষবাষ্পে পলে পলে ওরা বিষাক্ত করে তুলেছে আমাদের সামাজিক আবহাওয়া, ওদের শোষণের মারণাস্ত্রে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় মানুষের সোনালী জিন্দেগীর আশা-আকাঙ্খা। জীবন যেখানে স্বপ্নভরা ক্ষেতের মতোন, সেখানেই ওরা হানা দেয় সংখ্যাহীন পঙ্গপালের মতো। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর সুযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ওদের লালসার লোলজিহ্বা অগ্নিশিখা; আর তাতে আত্মাহুতি দিয়ে মরতে হয় রমজান আলী, জরিনার বাপের মতো শত শত নিরীহ ব্যক্তিদের। 'বান' উপন্যাসখানিতে ওয়াসেকপুরী ভদ্রতার মুখোশধারী সমাজের হর্তাকর্তা সেই শয়তানদের স্বরূপটি এঁকে দিয়েছেন সুন্দরভাবে।

অপর দিকে 'বানে' দেখতে পাই, সেই স্বার্থবাদী সামাজিক অপদেবতাদের জঘন্যতম মনোবৃত্তি দিয়ে গড়া যে সমাজব্যবস্থা তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জালাল মাষ্টার আর ওয়াজেদ মজনুদের মতো নৌজোয়ানদের। দিকে দিকে বান ডেকে যায় নব জাগরণের। প্রতিষ্ঠিত হয় সভাসমিতি। চলে নিঃস্বার্থ জনসেবা। কারাগারের নিষ্পেষণ সহ্য করেও শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত করে তোলে তাদের নতুন অভিযান। আঘাত তাদের বুকে আসে অজস্র; কিন্তু বিনিময়ে সেই মুক্তিসেনারাও হানে প্রত্যাঘাত। ফলতঃ ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে আসে করিম মোল্লার মতো হীনমন্যদের। লেখক আশাবাদী। শোষণহীন এক সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন। 'বান' তাঁর সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন পথে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

লেখকের রচনা-রীতি সরল। ভাষা সহজ ও অনাড়ম্বর; কিন্তু জোরালো। অনেক আরবী-ফারসী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু সেগুলি আমাদের একান্ত পরিচিত বলে বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। বর্ণনার বেলায় তিনি ব্যবহার করেছেন চলতি ভাষা আর সংলাপের বাহনরূপে নিয়েছেন নোয়াখালী অঞ্চলের কথ্যভাষা। কিন্তু একটি রীতিমিশ্রণ দোষের পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলাম বইটিতে। উপন্যাসটিতে মাঝে মাঝে ঘটনাপ্রবাহের দ্রুততাও পরিলক্ষিত হয়, তবু লেখক অনাবশ্যক ঘটনার সন্নিবেশে তার স্বাভাবিক গতিধারাকে ভারাক্রান্ত করেননি। ছাপা ঝকঝকে। মনোটাইপে ছাপার জন্যই হয়তো বা মাঝে মাঝে দু'একটা অক্ষর ভাঙ্গার দরুণ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রচ্ছদপট মনোরম। বাঁধাই সুন্দর। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ঃ খুরশেদুল ইসলাম বি-এ

খেলাধূলা

॥ খেলোয়াড় ॥

ইগলেটস ক্রিকেট টীম—অন্যান্য বছরের মত এবারও পাকিস্তান ইগলেটস ক্রিকেট টীম তিন মাসের ট্রেনিং সফরে ইংল্যাণ্ড গেছে। তারা প্রথমে আলফ গোভারের স্কুলে এবং পরে বিভিন্ন কাউন্টি টীমের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। পাকিস্তানী টেষ্ট ব্যাটসম্যান সাঈদ আহমদ এই দলের ক্যাপ্টেন এবং মেজর জাহেদ সাঈদ লোদী ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন। ইগলেটস দলের সঙ্গে এই সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুজন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ড গেছেন। তারা হচ্ছেন ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের পেস বোলার খওয়াজা আমীরুল্লা এবং রেঞ্জার্স ক্লাবের সোহরাব খান। পূর্ব পাকিস্তানের এই দুই উদীয়মান খেলোয়াড় যদি ইংল্যাণ্ড হইতে অভিজ্ঞতা ও উন্নত শ্রেণীর খেলা শিখে আসতে পারেন, তাহলে এখানে ক্রিকেট খেলার মানেরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

ফুটবল কোচিং কেন্দ্র—পাকিস্তান স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের উদ্যোগে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঢাকায় সারা পাকিস্তানের তরুণ ও উদীয়মান ছাত্র ফুটবল খেলোয়াড়দের দুই মাস কাল ট্রেনিং শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলের বাছাই করা প্রায় ৮০ জন খেলোয়াড় এখন নিয়মিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ট্রেনিং গ্রহণ করছে। পাকিস্তানের ফুটবল খেলার মান উন্নয়নের জন্য এই তরুণ ছাত্র খেলোয়াড়দের ট্রেনিং দেওয়ার ভার অর্পণ করা হয়েছে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্বর্ণ যুগের এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেন্টার ফরোয়ার্ড হাফেজ রশীদের উপর। বিভাগপূর্বকালে হাফেজ রশীদ পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীর নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তার টেকনিক, ট্যাকটিস এবং সর্বোপরি তীব্র শুটিংই হাফেজ রশীদের খেলার বৈশিষ্ট্য ছিল। হাফেজ রশীদকে জাতীয় ফুটবল কোচ নিযুক্ত করায় এখন তার যোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তানের তরুণ ছাত্র খেলোয়াড়গণ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-কৌশল শিখে দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নয়নে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি। হাফেজ রশীদ এখন প্রত্যহ ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে এই সকল ছাত্র খেলোয়াড়দের নিখুঁত বল কন্ট্রোল, রিসিভিং, পাসিং, দুই পায়ে সমান শুটিং প্রভৃতি বিষয় ট্রেনিং দিচ্ছেন। তার এই প্রচেষ্টায় নিশ্চিত সুফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ঢাকায় ট্রেনিং শেষ হলে পর তিনি বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানও সফর করবেন। ঢাকার প্রাচীন খেলোয়াড় জনাব আক্তার, জনাব ইয়াসিন, জনাব নূর হোসেন, মিঃ ক্ষিতিশ রায় ও জনাব সাহেব আলী সহকারী কোচ হিসেবে হাফেজ রশীদকে ট্রেনিং

দেওয়ার কাজে সাহায্য করছেন। পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ড ঢাকায় ফুটবল কোচিং কেন্দ্র খোলার সঙ্গে সঙ্গে করাচীতে ক্রিকেট, লাহোরে হকি এবং এবোটাবাদে এ্যাথলেটিক সম্পর্কেও ট্রেনিং দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক স্কুল এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ও উদীয়মান ছাত্র খেলোয়াড়গণও এই সকল কোচিং কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান সম্প্রতি এবোটাবাদে এ্যাথলেটিকস ক্যাম্প পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দান করেছেন। পাকিস্তানের শিক্ষা, বেতার ও প্রচার দফতরের মন্ত্রী এবং পাকিস্তান স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট জনাব হাবিবুর রহমান ঢাকায় ফুটবল এবং করাচীতে ক্রিকেট কোচিং সেণ্টারের উদ্বোধন করেন।

চ্যানেল সুইমিং—পাকিস্তানের বীর সাঁতারু মিঃ ব্রজেন দাস এ বছরও ইংলিশ-চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য গত সোমবার বিমানযোগে ঢাকা থেকে লণ্ডন গেছেন। তিনি এর মধ্যে লণ্ডনের অদূরে ডোভারে সমুদ্রের নিকটে ঠাণ্ডা পানিতে অনুশীলন শুরু করেছেন। মিঃ ব্রজেন গত বৎসর সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে পুরুষদের মধ্যে প্রথম এশীয়বাসী হিসাবে প্রথম স্থান লাভ করে ক্রীড়া জগতে দেশের মুখোজ্জল করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ইতালীতে ক্যাপ্রি হইতে নেপলস পর্য্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অপেশাদার বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। গতবার জনাব এস, এ, মোহসিন ম্যানেজার এবং প্রদেশের সাঁতার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কাজী মোহাম্মদ আলী কোচ হিসাবে তার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড গেছিলেন, এবার ব্যারিষ্টার কাজী আবদুর রকীব ব্রজেন দাসের ম্যানেজার হিসাবে ইংল্যাণ্ড গেছেন। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এবার তার সঙ্গে কোন কোচ পাঠানো হয়নি। পাকিস্তান সরকার ব্রজেন দাস ও তাঁর ম্যানেজারের যাবতীয় খরচের জন্য বিশ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য দিয়েছেন। তাছাড়া বিমানের ভাড়া]
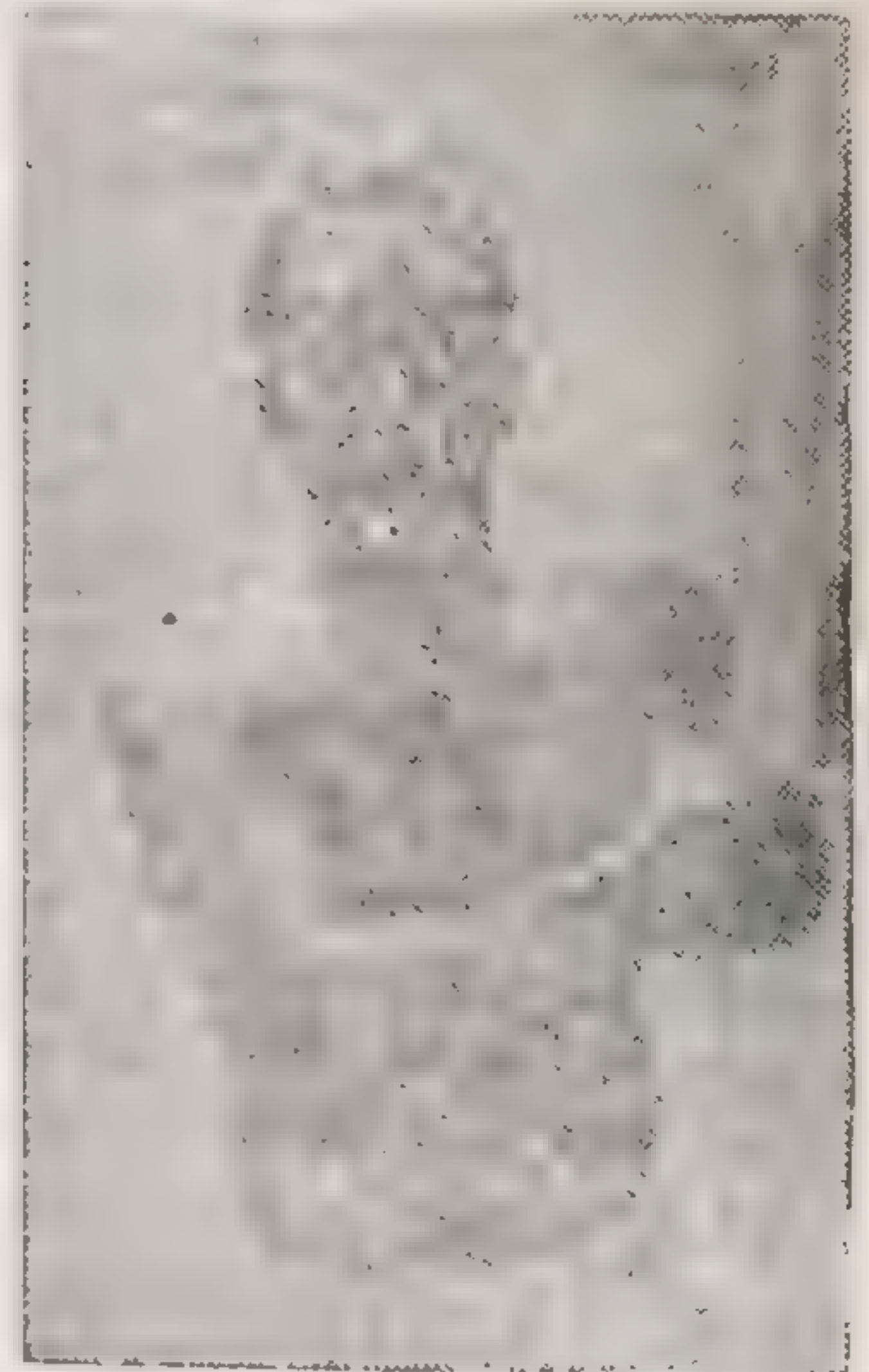
ও অন্যান্য স্থানীয় খরচের জন্য ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন তাদের আট হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছেন। ব্রজেন দাস দেশবাসীর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে ইংলিশ চ্যানালে সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেছেন। তিনি ২৬শে জুলাই ইতালীর ক্যাপ্রি-নেপলস এবং আগষ্টের শেষে ইংলিশ চ্যানেলে ফ্রান্স হতে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সাঁতার দিবেন। তারপর তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত চ্যানেল অতিক্রম করার চেষ্টা করবেন। মিঃ ব্রজেন দাস যদি সৌভাগ্যক্রমে তিনটি প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেন, তা হলে তিনি কেবল প্রথম এশীয় হিসাবেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সাঁতারুদের মধ্যে প্রথম এক অভূতপূর্ব রেকর্ড স্থাপন করবেন। এ-বছর মিঃ ব্রজেন দাস ছাড়াও পাকিস্তান হতে লাহোরের যুবক সাঁতারু শওকাতুল ইসলামও ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন। শওকাতুল ইসলাম বর্তমানে প্রত্যহ ইরাবতী নদীতে একটানা আট ঘণ্টা করে সাঁতার অনুশীলন করছেন। আগামী মাসের প্রথম দিকে বিমানযোগে তাঁকে লণ্ডন প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জনসাধারণের নিকট হতে চাঁদা সংগ্রহ করে তাঁকে লণ্ডন প্রেরণ করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শওকাতুল ইসলাম প্রথম সাঁতারু হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

ঢাকা ফুটবল লীগ—পূর্বপাকিস্তানের জনপ্রিয় ঢাকা ফুটবল লীগের খেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। এবছর প্রথম বিভাগে পনেরটি দল—আজাদ স্পোর্টিং, সেণ্ট্রাল প্রিণ্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী, মোহামেডান স্পোর্টিং, ঢাকেশ্বরী মিল, ওয়াণ্ডার্স, ই, পি, আর, পুলিশ, ওয়ারী, ইস্পাহানী, ভিক্টোরিয়া, ইষ্ট এণ্ড, ফায়ার সার্ভিস, ইষ্ট পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পি, ডব্লিউ, ডি এবং তেজগাঁও দল প্রতিযোগিতা করছে। তন্মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোহামেডান স্পোর্টিং, ঢাকেশ্বরী মিল ও আজাদ স্পোর্টিং দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ঢাকায় মাঠের অভাবে এ-বছর লীগের ফিরতি খেলার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। যা হোক এ-বছর লীগ খেলা বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং দর্শকবৃন্দ খেলাগুলো উপভোগ করছে। জনপ্রিয় মোহামেডান স্পোর্টিং দলেরই লীগ বিজয়ের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর ঢাকেশ্বরী মিল ও গত বছরের লীগ-চ্যাম্পিয়ান আজাদ স্পোর্টিং দলও এখন পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যাচ্ছে। তবে কোন কিছু অপ্রত্যাশিত ফলাফল না হলে মোহামেডান দলকে লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের জয়মাল্য হতে বঞ্চিত করা কারো পক্ষে সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। গত বছরের তুলনায় এ-বছর খেলার মান খুব উন্নত ধরনের না হওয়ায় প্রায় লীগে অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখা গেছে। মোহামেডান স্পোর্টিং তাদের মওশুমের উদ্বোধনী খেলায় পুলিশের নিকট পরাজয় বরণ এবং পরে ইস্পাহানীর সঙ্গে খেলা ড্র করে তিনটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে। অপর দিকে ঢাকেশ্বরী মিল দলও পুলিশ ও ইষ্ট এণ্ড ক্লাবের নিকট অপ্রত্যাশিত ভাবে পরাজয় বরণ করে লীগ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছুটা পেছনে সরে গেছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন আজাদ স্পোর্টিং এ-পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচটি পয়েন্ট নষ্ট করলেও তাদের খেলায় পূর্বের সেই উন্নত ধরনের ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঢাকার একদা শক্তিশালী ওয়াণ্ডারার্স দল এ-বছর তাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। করাচী হতে চারজন খেলোয়াড় আমদানী এবং স্থানীয় গোলরক্ষক মিন্টু, দেবীনাশ, মারী, হাবিব প্রমুখ নামজাদা খেলোয়াড়দের দলভুক্ত সত্ত্বেও তারা আশানুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে নাই। ওয়াণ্ডারার্স দল এ-পর্য্যন্ত মোট ছয় পয়েন্ট নষ্ট করে লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে একপ্রকার সরে দাঁড়িয়েছে বলা চলে।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবেরই এখন ১৯৫৯ সনের সিনিয়র ডিভিশনে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। তারা অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে ঢাকেশ্বরী মিল এবং আজাদ স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করতে পারলেই জয়মাল্য তাদের গলায় অর্পিত হবে।

আগামী ১০ই জুলাই ঢাকা লীগের খেলা শেষ হবে। তারপর রোনাল্ডসে শীল্ড, আজাদী দিবস শীল্ড এবং সর্কোপরি বিখ্যাত আগা খান গোল্ড কাপের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মুন্না

বাটু

কামরু

সামাদ

গজনবী

সম্পাদকীয়
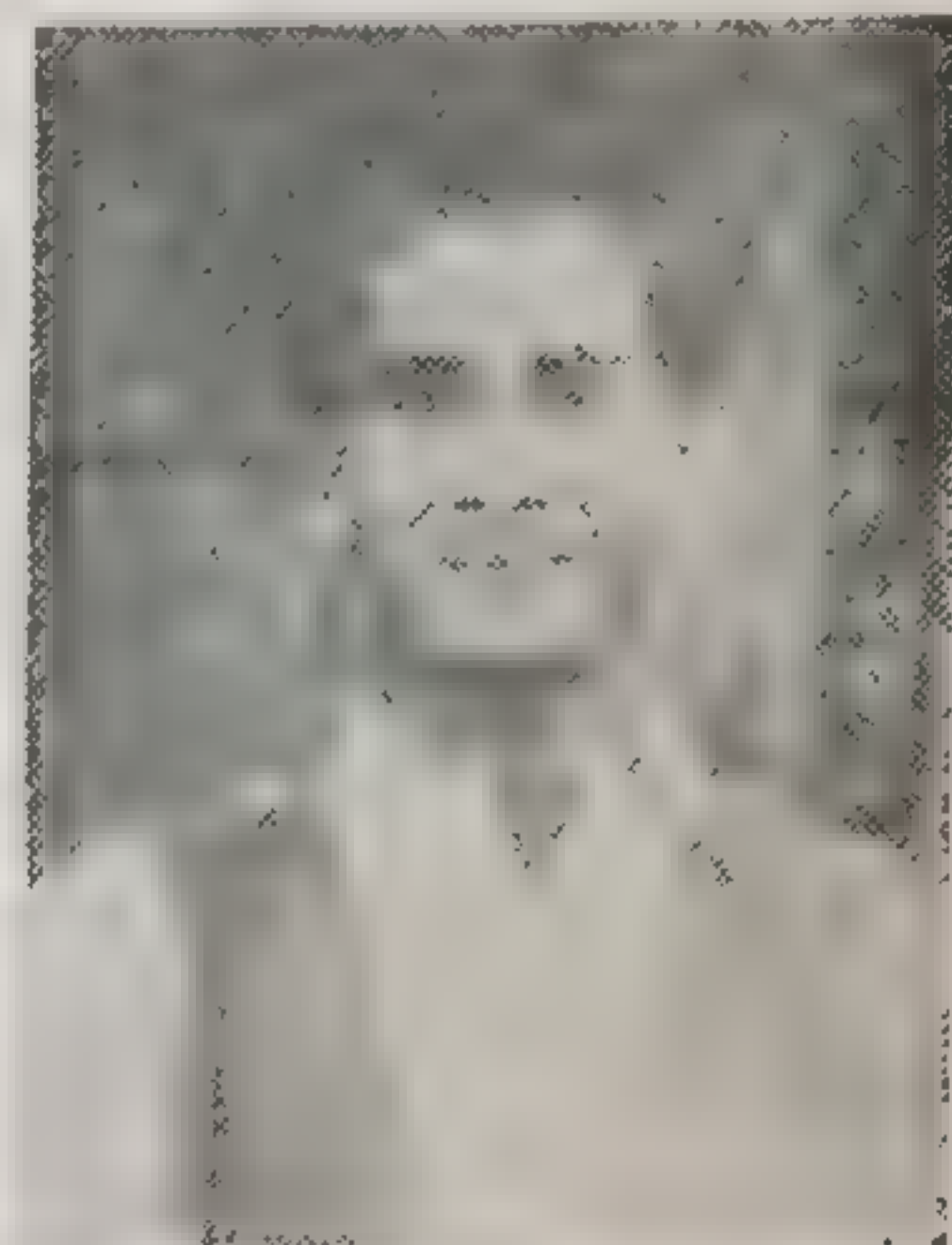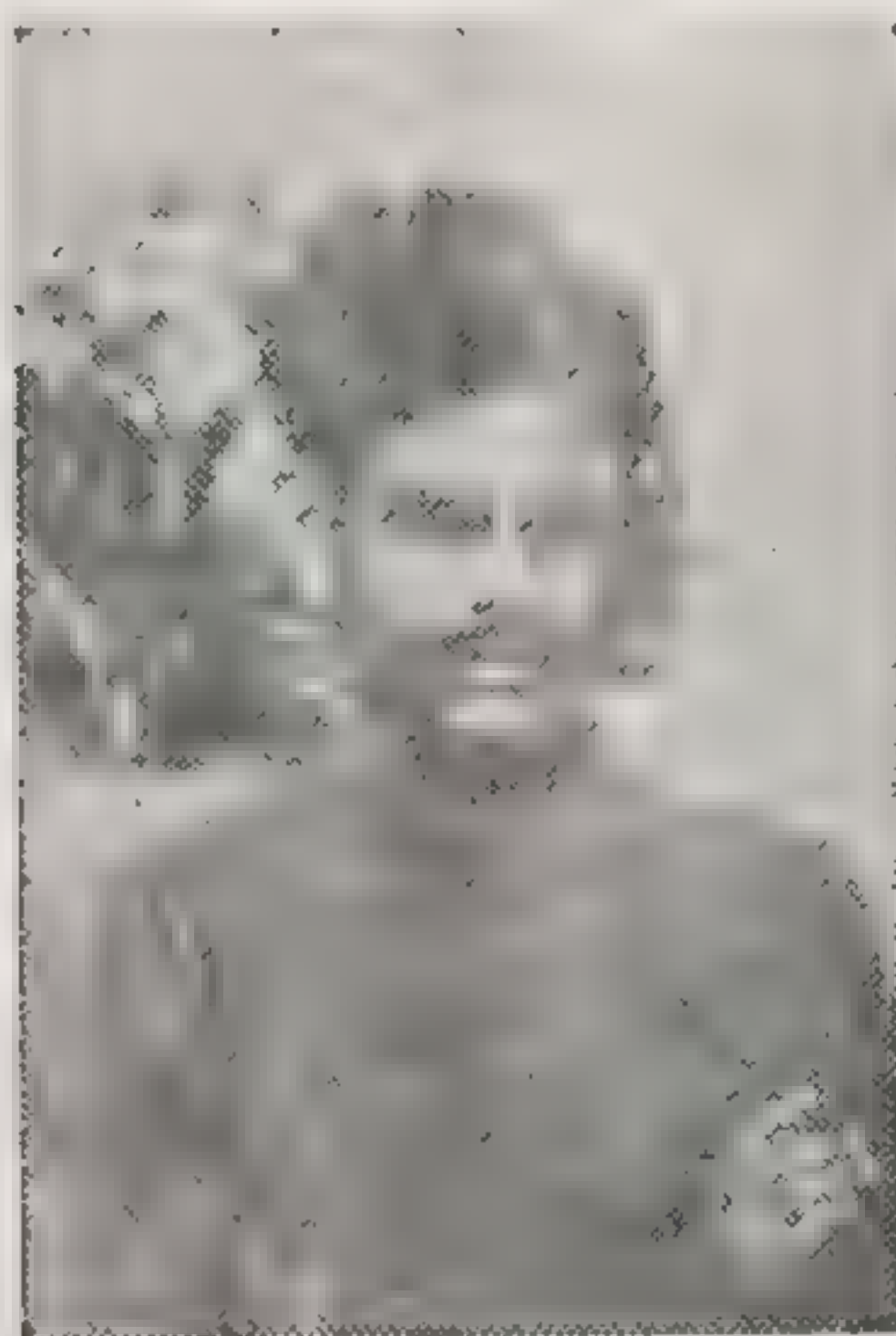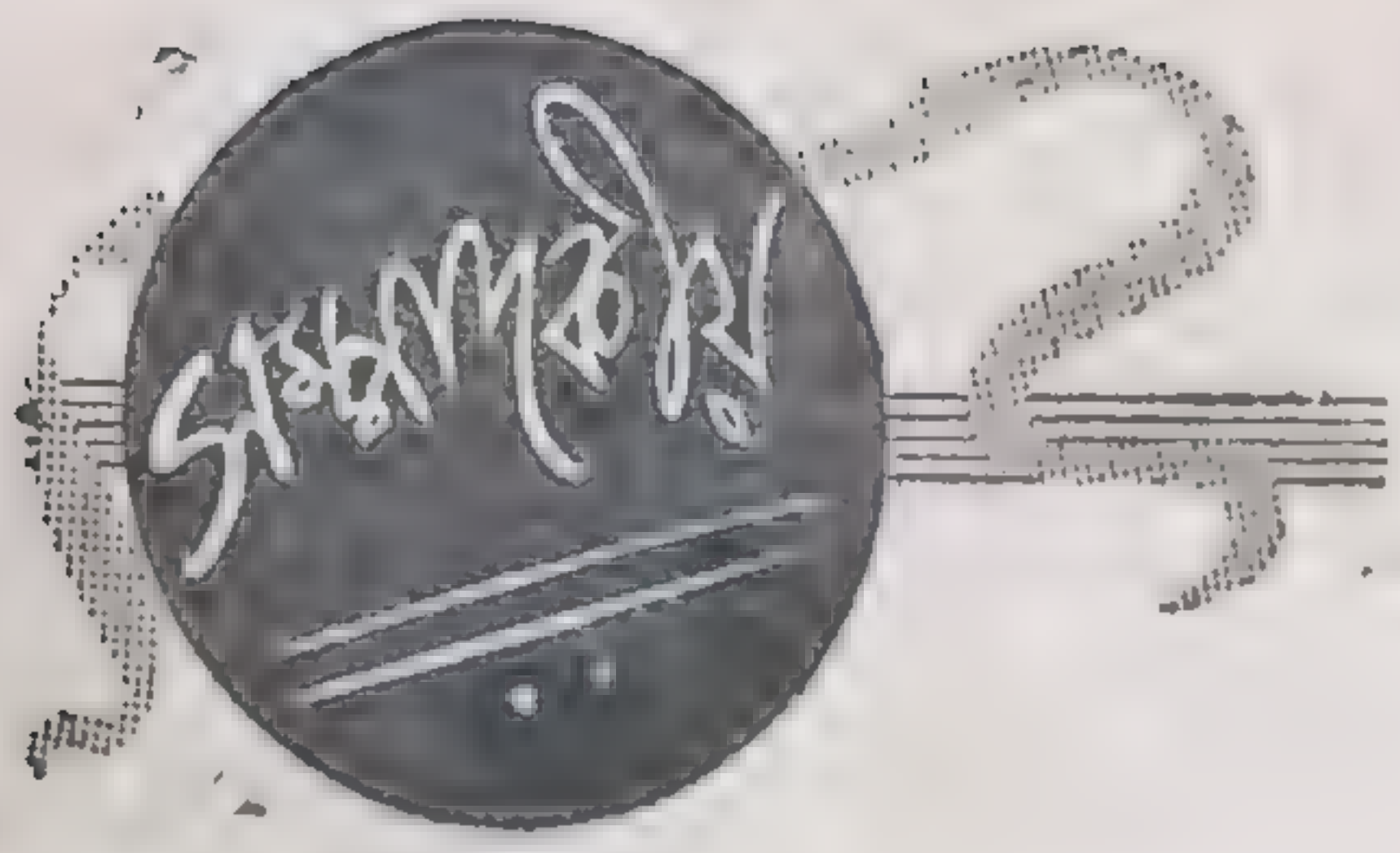
পরলোকে মিঃ ডালেস

মিঃ জন ফষ্টার ডালেস পরলোকগমন করিয়াছেন। মিঃ ডালেসের পরলোকগমনে সাধারণভাবে বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনীতির এবং বিশেষভাবে মার্কিন রাজনীতির যে বিপুল ক্ষতি হইল, তা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধি, প্রতিভা এবং বিপুল দূরদর্শীতার অধিকারী ছিলেন মিঃ ডালেস। শুধু রাজনীতিক হিসাবে নয়, একটি ব্যক্তিত্বশালী এবং মহান মানুষ হিসাবেও তিনি তাঁর দেশবাসীর এবং বহু বিদেশীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাশ হইতে একটি দিকপালের পতন হইল।

মোখতারী প্রথা

মোখতারী প্রথা বিলুপ্ত করার কথা আজ কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এ-দেশের আইন ব্যবসায়ে মোখতারী প্রথার একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রহিয়াছে। এই ব্যবসায়ে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও দেশবাসীর জানা আছে। তাই এই ব্যবসায়ের বিলুপ্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আমরা কর্তৃপক্ষকে এই ব্যবসায়ের সকল দিক বিবেচনা করার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। মোখতারদের তরফ হইতে এ-ব্যাপারে যত কথা বলা হইতেছে, সে-সব কথাও গুরুত্বসহকারে ভাবিয়া দেখার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।

নজরুল জন্মদিবস

পূর্ব্বপাকিস্তানের সর্বত্র এবারও যথারীতি নজরুলের ৬১তম জন্মদিবস পালিত হইয়াছে। এই দিবসে তাঁর কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভা লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। নজরুল-সঙ্গীতও এ-সব অনুষ্ঠানে ব্যাপক ভাবে গীত হইয়াছে। নজরুল দিবস পালনে পূর্ব-পাকিস্তানীদের যে আগ্রহ আছে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ পাক-বাংলা সাহিত্যের এছলামী ভাব ও ভঙ্গীর এক বলিষ্ঠ ধারার উদ্গাতা হইতেছেন নজরুল এছলাম। সুতরাং পাক-বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর মর্য্যাদাবান আসন লইয়া বিতর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

তবে দুঃখের বিষয় বৎসরে একবার জন্মদিবস পালন করিয়াই শুধু কবির প্রতি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন সম্পূর্ণ হইল বলিয়া যেন ধরিয়া লইয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই আমরা চাই না। আমরা নজরুল সাহিত্যের বিশদ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রচারই কামনা করি। এজন্য নিয়মিতভাবে নজরুল প্রতিভার আলোচনার একটি স্থায়ী আয়োজন হওয়া দরকার। এখানে নজরুল একাডেমী বা এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রস্তাব অতীতে অনেকবার হইয়াছে। তবে এ-পর্য্যন্ত কেউ বাস্তব পরিকল্পনা লইয়া কাজে নামেন নাই। এ-জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা আমরা পূর্ব্বপাকিস্তানের সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ সমাজকে ভাবিয়া দেখার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

ডাঃ সায়েফুদ্দীনের মিশন

ভারতের প্রবীণ মুছলমান নেতা ডাঃ সায়েফুদ্দীন কিচলু কয়েকবার শেখ আবদুল্লার সাথে সাক্ষাত করিয়াছেন। তিনি কার তরফ হইতে এবং কি ধরনের প্রস্তাব লইয়া শেখ আবদুল্লার সাথে জেলে যাইয়া দেখা করিতেছেন, তা জানা যায় নাই। কেউ কেউ অনুমান করিতেছেন, যে তিনি ভারতের কংগ্রেসী উজীরে আজম জনাব নেহরুর পক্ষ হইতে আপোষের প্রস্তাব লইয়া গিয়াছিলেন। যদি তা সত্য হয়, তবে আমরা ডাঃ কিচলুর মিশন সম্পর্কে বেশী উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না। কারণ, জনাব নেহরু এবং শেখ আবদুল্লার মধ্যে যে মতানৈক্য রহিয়াছে, তা অত্যন্ত প্রকাণ্ড। একে বলা যাইতে পারে—আসমান-জমিনের ব্যবধান। তা ছাড়া ডাঃ কিচলু হয় ত শেখ আবদুল্লার মত বদলাইবারই উপদেশ দিতেছেন। এর সোজা অর্থ তিনি শেখ আবদুল্লার নতি স্বীকারের প্রস্তাবই আদায় করার জন্য আজ সচেষ্ট। কিন্তু এ-চেষ্টা কি সফল হইবে। যতদূর মনে হয়, শেরে কাশ্মীরকে সহজে ডাঃ কিচলু টলাইতে পারিবেন না। দমন ও প্রলোভন দেখাইয়া যে শেখ আবদুল্লার মত স্বাধীনচেতা মানুষকে জয় করা যায় না, অতীতে তার বহুবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এবারও তার পুনরাবৃত্তি হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad ' re-s
Ramna Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী
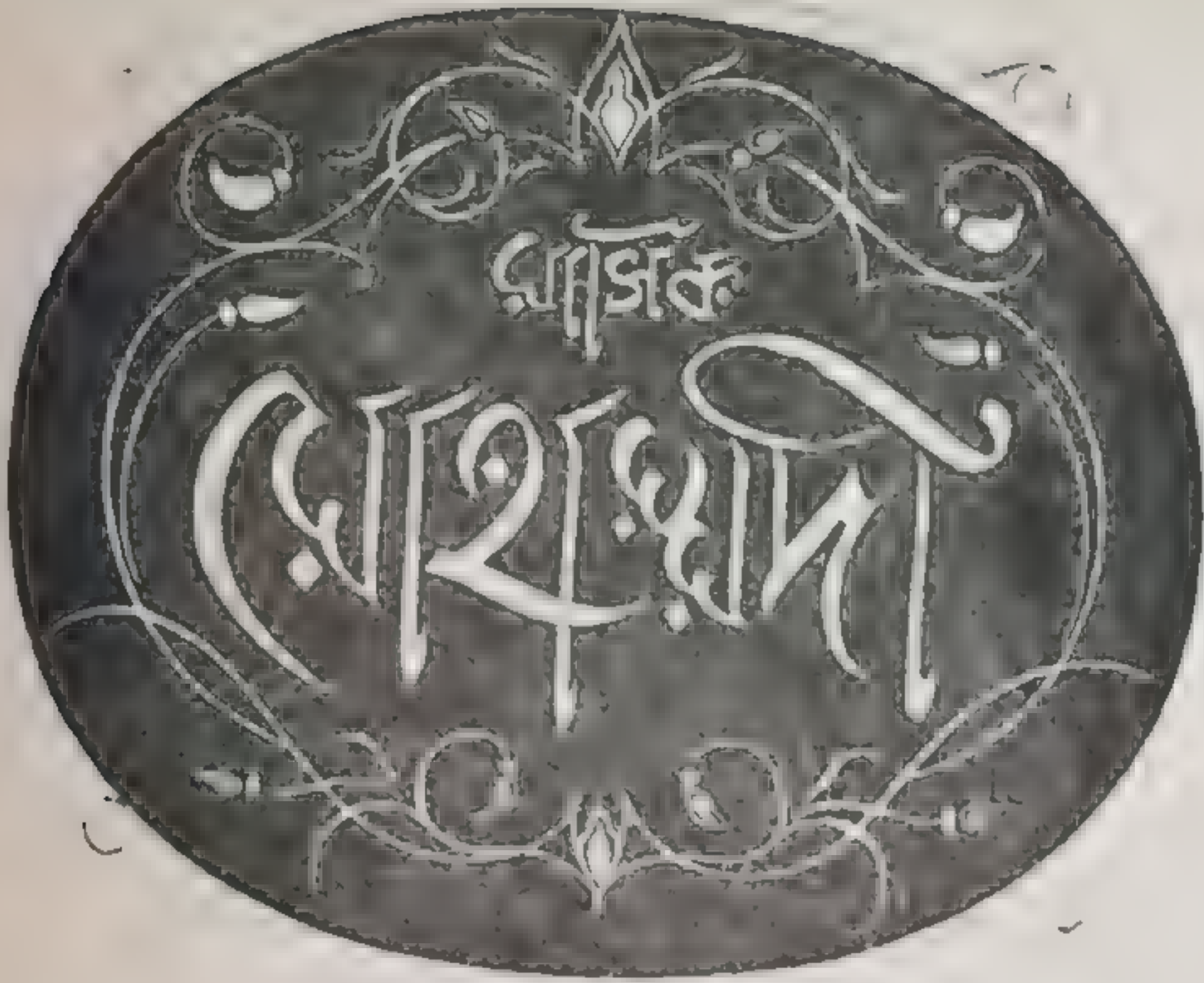
আষাঢ়, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

পুঁথি সাহিত্যের ত্রিধারা

অধ্যাপক আলী আহ্‌মদ এম. এ; বি-টি

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় যে, পুঁথি সাহিত্য বাঙ্গালী মুসলমানদের কৃষ্টি তমদ্দুন ও জাতীয়-জীবন গঠনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। পুঁথি সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমানগণ তাহাদের পৌরানিক কাহিনী, ইতিহাস, ফেকাহ্ ও আকায়েদ শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতঃ মুসলমান হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার প্রেরণা পাইত। প্রাচীন কলমী পুঁথি যতই ক্রমশঃ উদ্ধার ও সংগ্রহ হইতেছে, ততই আমাদের এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল রূপে পাই পরাগল-পুর তথা চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজদরবারকে। কবি সৈয়দ সুলতান, আলাওল, মোহাম্মদ খান, শাহ মুহম্মদ সগীর, শের বাজ ও শেখ চান্দ, আবদুল হাকিম প্রমুখ প্রখ্যাত নামা পূর্ববঙ্গীয় কবিগণ সাহিত্যের সর্ব শাখায় দান রাখিয়া অমর ও চির স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাংলার মুসলমান দিগের জন্য স্বীয় মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিবার প্রেরণা এই পূর্ব বঙ্গীয় কবিগণই প্রথম প্রদর্শন করেন।

রচনা শৈলীর দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই কবিগণ মোটামুটি ভাবে একই রচনা শৈলী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে সংস্কৃত, তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ এই যুগের লেখকদের লেখায় বিশেষ স্থান পায় নাই। তবে এই জাতীয় শব্দ যে তাঁহারা একেবারেই ব্যবহার করেন নাই, তাহাও বলা সমীচীন হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য যে, তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। রচনা শৈলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই কবিদের কাব্য কৃতিকে পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ধারায় আখ্যায়িত করিব।

দ্বিতীয় ধারার উদ্ভব হয় পশ্চিম বঙ্গে। শাহ্ গরি-বুল্লাহ্, সৈয়দ হামজা ও আজিজুর রহমান প্রমুখ কবিগণ এই ধারার অন্যতম লেখক। এই কবিগণ আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা উর্দু ক্রিয়াপদও বাংলায় চালাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহাদের এই সাহসিকতার জন্যই এই জাতীয় পুঁথি সাহিত্যকে বোধহয় 'দোভাষী পুঁথি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই আরবী, ফারসী ও উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ করায় তাঁহারা আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করিতে সহজেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। এই সাহিত্য আবার কলিকাতার ছাপাখানাগুলির সহজ নৈকট্য লাভে সমর্থ হওয়ায় বাংলার মুসলমান সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম ধারায় ছিল সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয় ধারায় প্রাধান্য ছিল আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের; পরবর্তী যুগে এক শ্রেণীর কবি তাঁহাদের কাব্যে সংস্কৃত ঘেঁষা কিংবা আরবী, উর্দু ঘেঁষা বাংলা ব্যবহার না করিয়া সহজবোধ্য বাংলা লিখিবার প্রয়াস

পাইয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে যে সংস্কৃত বা আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু শব্দ পাওয়া যায় না তাহা নহে—তাঁহারা সংস্কৃত, আরবী ও উর্দ্দু শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন; তবে কোনটারই অতিরিক্ত ছড়াছড়ি তাঁহাদের লেখায় দেখা যায় না। এই শ্রেণীর লেখকদিগকে আমরা তৃতীয় ধারার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিব। নোয়াখালীর কবি কমরুদ্দিনের 'শাহে এমরান চন্দ্রবান,' ময়মনসিংহের কবি আবদুর রহিমের 'গাজিকালু ও চাম্পাবতী' ও কবি জবেদ আলীর 'মদন কুমার ও রাজকন্যা মধুমালার' পুঁথিকে আমরা তৃতীয় ধারার কাব্য হিসাবে উপস্থিত করিতে পারি। তবে ইহাও বলা উচিত যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার কবিগণ সাহিত্যিক প্রতিভায় যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তৃতীয় ধারার কবিগণ সেই উচ্চাঙ্গের প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন না। তবে তাহা রচনা শৈলীর দোষ কবি নহে। প্রতিভা থাকিলে যে কোন রচনা শৈলী অবলম্বনে তাঁহার কবি স্ফূর্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্যিক কীর্তির জন্য মাইকেলী দুর্বোধ্য ভাষার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তৃতীয় ধারার কবিগণ বাংলার বিভিন্ন জিলায় থাকিয়া তাঁহাদের কাব্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন। পুঁথি সাহিত্যের বাজারে যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও সমাদরে কাটতি হইতেছে তাহার অধিকাংশই তৃতীয় ধারার কাব্য। নিম্নে আমরা প্রত্যেক ধারার কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃতি উপস্থিত করিতেছি।

প্রথম ধারা

(ক) সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'ওফাত রছুল' হইতে—

তবে ফাতেমাএ জাই কহিল বাপের ঠাই
আরব আসিছে একজন।
আজ্ঞা মাগে আসিবারে তোমা দেখা করিবারে
কহিতে জে তোমাতে বচন॥
সুনি দুহিতার বানি নিজ মনে অনুমানি
রছুল কহিল ফাতেমারে।
সদাএ তোমার প্রতি মোহর গৌরব অতি
তোমার জে গৌরব মহরে॥
মহর যে প্রাণের প্রাণ তুমি বিনে নাহি আন
তুমি মোর আক্ষির পুতুলি।
মোর চিত্ত-বৃক্ষ-ফল তুমি গন্ধ সুশীতল
হৃদয় লতার তুমি কলি॥
যে জন আসিছে দ্বারে আরব না বোল তারে
এহি জন মৃত্যু অধিপতি।
বাপ রাখি পুত্র নিব বাপেরে সন্তাপ দিব
পুত্র থুইয়া বাপ নিব হরি॥

পৃঃ—৬৪ ওফাতে রছুল; আমার সম্পাদিত সংস্করণ

(খ) কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' হইতে—

এতেক শোনিয়া শুকে বলে সবিনয়।
সিংহল ত্রিদ্বীপ তুল্য শোন মহাশয়॥
স্বরূপ সৌষ্ঠব সুখ বিশেষ দেখিয়া।
সেই দ্বীপে গেলে কেহ না আসে ফিরিয়া॥
ছত্রিশ বরণ ঘরে ঘর পদ্মমাণ।
সদত বসন্ত সদা দিবস রজনী॥
নানা বর্ণ উদ্যান পূর্ণিত ফলফুল।
কুরূপ দুর্গন্ধ তথা স্বপ্ন সমতুল॥
নৃপতি গন্ধর্ব্ব সেন তথা রাজ্যেশ্বর।
অপ্সরা বেষ্টিত যে হেন পুরান্দর॥
সুকুমারী পদ্মাবতী সেই রাজসুতা।
জিনিয়া সকল দীপ সর্ব্ব গুণে যুতা॥
পদ্মাবতী সাক্ষাতে রমনীকুল শোভা।
মিহির প্রভাবে যেন হীন চন্দ্রপ্রভা॥

পৃঃ ৪১—৪২, হাবিবী প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণ।

দ্বিতীয় ধারা

(ক) হুগলি জিলার বালিয়া নিবাসী কবি আজিজর রহমান বিরচিত 'কাছাছল আম্বিয়া' হইতে—

এখানে মৌকুফ কিম্বা ইউছফের হাল।
বয়ান করিয়া কহি জেলেখার হাল॥
পশ্চিম দেশেতে বাদশা নামেতে তৈমুছ।
নির্ভয় আছিল দেশে না ছিল জাছুছ॥
হাতি ঘোড়া উট গাদা নাহিক সোমার।
মাল মাত্তা ধোন কড়ি বিস্তর তাহার॥
আদল এনছাফ তার কি কবো জোবানে।
জোলম বেদাত নাই ছিলো কোনখানে॥
বকরি বাঘের গায় ঠেস দিয়া সোএ।
কোনমতে নাই ছিলো জোলমের বোএ॥
বাদসাই রোওাব তার জাহান ভিতরে।
যেমন সুর্জ্জের রব আগাস উপরে॥
এতেক হেয়বতে তার আছিল বাদসাই।
বেটি এক ঘরে তার আফতাব জেয়চাই॥
বেটা পুত্র নাই ছিলো বাদসার ঘরে।
কেবল এক বেটি ছিলো দুনিয়া ভিতরে॥
জেলেখা তাহার নাম প্রকাশ দুনিয়ায়।
কি কবো রূপের কথা কওা নাই জায়॥

পৃঃ ১২৮

(খ) শাহ্ গরিবুল্লার 'আমির হামজা' হইতে—

আরম্ভে আমির রহে খোসাল খাতির।
মির ওমরা ভাই লোক হামেসা হাযির॥

যেখানে আমির যায় সেইখানে ফতে।
আসে পাসে খবর হইল বাদশাহাতে॥
করোব সহরে ঘর উম্মর মাদির।
চওাল্লিস ভাই তারা বড়া কুস্তিগির॥
অর্দ্ধেক আরব ছিল বাদশাই তাহার।
লোকমুখে শুনিল হামজার সমাচার॥
উজির নাজির সাতে মছলত করিল।
ভালত নেড়িয়া পয়দা আরব্বেতে হইল॥
যেথা সেথা ফতে করে বান্দিয়া কোমর।
লিতে পারে আমার মুলুক বরাবর॥
আমি যদি নাহি মারি নেড়িয়া তুরুক।
দিনে দিনে বাড়িবেক বহুত তুজুক॥
উম্মর মাদির বাত শুনে তাকে বলে।
সাহার মছলত খুব যে কিছু কহিলে॥
পহেলা হামজার আগে ভেজ কেতাবত।
ডর লেখে ভেজ তারে শুনহ মছলত॥
কেতাবত পড়ে যদি না মানে তোমায়।
লস্কর সমেত গিয়া মারিব হামজায়॥

পৃঃ ১৭, মনিরউদ্দিন আহমদ এণ্ড সন্সের সংস্করণ

তৃতীয় ধারা

(ক) নোয়াখালী নিবাসী মুনশী কমরুদ্দিনের 'সাহে এমরান ও চন্দ্রবান' নামক পুঁথি হইতে

কোমারের মাতা কহে শুন পরওার।
শুপিনু দুর্ল্লভ পুত্র চরণে তোমার॥
বদনে খুমার রহে পাগল লক্ষণ।
কৈগেল ২ বুলি করয় রোদন॥
এইরূপে পঞ্চদশ দিন গুজরিল।
পূর্ব্ব হতে কিছুমাত্র সুস্ত না হইল॥
উজির কহে বাক্য নৃপতির স্থান।
মোর এক বাক্য নাথ করো অবধান॥
বন্দন মোচন করিয়া কতো রাখিবা কুমার।
অন্নজল বিনে পুত্র মরিব তোমার॥
বন্দন মোচন করি দেহ তার তরে।
নছিবে জে আছে তাহা হইবে আখেরে॥
নৃপতি বলিল জদি বন্দ মুক্ত হয়।
তাহাতে সঙ্কট অতি মনে লাগে ভয়॥

পৃঃ ১৭, কলিকাতা মুনশী বাজার আমির হোসেনি প্রেসে ১২৯৭ সালে ছাপা সংস্করণ

(খ) ময়মনসিংহ নিবাসী কবি আবদুর রহিমের 'গাজিকালু ও চাম্পাবতী নামক পুথি হইতে—

সুন্দর বনেতে গাজি রহে হরষিতে।
একদিন কালু সাহা লাগিল কহিতে॥
হইল বছর সাত সুন্দরের বনে।
কাটাবে সমস্ত কাল বুঝি এই খানে॥
ফকিরের বিধি নহে থাকা এক ঠাই।
এ-দেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই॥
গাজি বলে কালু ভাই কৈলা সত্য কথা।
এই বেলা চল আর না রহিব হেথা॥
এ বলিয়া সাহা গাজি তখনি উঠিল।
কালুকে লইয়া সাথে পথে মেলা দিল॥
নানা দেশ নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।
খোদার সংসার দেখে ভরিয়া নয়ন॥
ভ্রমিয়া অনেক দিন দেশ দেশান্তরে।
সমুখে সাগর এক পায় দেখিবারে॥
আসাতে করিয়া ভর পার হৈয়া গেল।
পার হৈয়া লোক কাছে জিজ্ঞাসা করিল॥
কি নাম এ-দেশের বল রাজা কেবা হয়।
শুনিয়া তাহারা সবে গাজির আগে কয়॥
ছাগাই নগর এই শুন সমাচার।
শ্রীরাম নামেতে রাজা তার অধিকার॥

পৃঃ ১১, ঢাকা, হামিদিয়া প্রেস সংস্করণ

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা পুথি-সাহিত্যের শব্দ সম্পদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা সমীচীন মনে করি এবং এখানে প্রত্যেক ধারার মোটামুটি পার্থক্যও লক্ষ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রত্যেক ধারাই আমাদের গৌরবের সম্পদ। মোটকথা যুগে যুগে সাহিত্যের ধারা বদলায়। সাহিত্য একটা যুগ-মানসেরই বিকাশ। আমরা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কালে সেই যুগেরই নিখুঁত ছবি আঁকিতে চেষ্টা করা উচিত। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধার করার কাজে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা পুঁথি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ইতি কর্তব্য কি, তাহা একটু আলোচনা করিব। আমাদের পূর্ব সুরী শ্রদ্ধেয় মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব কলমী পুথি উদ্ধারের যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সে কার্য কি এখনও চলিতেছে? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জিলা হইতে এখনও প্রাচীন কলমী পুথি সংগৃহীত হয় নাই। যত দিন পর্যন্ত কলমী পুথির উদ্ধার কার্য সম্পূর্ণ হইবে না, তত দিন পর্যন্ত মুসলিম বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা আমরা আকাশ কুসুম বলিয়াই মনে করি।

পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান কবিদের কলমী পুঁথি উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে বর্তমানে একরূপ অসম্ভব কার্য্যই

মনে হইতেছে। তবে সে সমস্ত পুঁথি কলিকাতা হইতে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহের কার্যে অতি শীঘ্র অগ্রসর হওয়া উচিত। কলিকাতায় অনেকগুলি পুঁথি ছাপিবার ছাপাখানা ছিল। বর্তমানে সেগুলির কি অবস্থা তাহা আমরা জানিনা। ঢাকায়ও পুঁথি ছাপিবার প্রেস রহিয়াছে; সেগুলি আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট নহে। পূর্বে বহু সংখ্যক পুঁথি ছাপা হইয়াছিল, বর্তমানে সেগুলির আর কোন সংস্করণ হইতেছে না। ক্রমেই এই পুঁথিগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। আর আজ পর্যন্ত ছাপা পুঁথির কোন বিবরণও প্রকাশিত হয় নাই। জনাব ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা পুঁথির উপর কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ছাপা পুঁথির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আমরা আশু প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সিলেটে বাংলা ভাষাকে সহজ লিপিতে লেখার যে প্রচেষ্টা হয়, তাহা ভাষা ও বাংলা লিপির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বাংলা লিপিকে সহজ করিবার প্রথম চেষ্টাকে আমরা কোন সময়ই ভুলিতে পারিব না। সিলেটে নাগরী পুঁথিও বাংলা মুসলমানী পুঁথি সাহিত্যের একাংশ। সিলেটের সাহিত্যিকদের নিকট সিলেটি নাগরী কলমী পুঁথিগুলি উদ্ধার করার কাজে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। সিলেটি নাগরী বাংলা সাহিত্যের বাস্তবিকই একটি অমূল্য সম্পদ।

দৌলতপুরে রাত্রি

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

নিশীথের ঘুম ভাঙে ভৈরব নদীর কল্লোলে
দুপারে ঢেউ এর মাতামাতি
আমাকে আনে যে টেনে তার ভাঙ্গা তীরে।
ওপারে নারিকেল বন ছায়া কুলে কুলে চলে গেছে
এঁকে বেঁকে বহুদূরে
সে ছায়ার সাথে সাথে চেতনার শাবক ডানা
মেলে ওড়ে
গুলে বকাওলীর দেশে
নীল পরী লাল পরী যেথা যৌবন তরঙ্গে আগুন জ্বালে
আকাশের তারায় তারায় তার শিখা জাগে।

সফেন সমুদ্রের উর্মিমালায় বহু তীর যায় ডুবে
কবে অগ্নিগিরির লাভায় উদ্যান নগরী হল শ্মশান
মহেঞ্জোদারোর বিস্মৃতির অতলান্ত সেই গভীরে
তারে খোঁজে মন। হাজার বছর আগে।
গৌতম বৌদ্ধের বোধিদ্রুমের মূলে
অথবা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মুখের নির্বিকার প্রশান্তিতে।
নিঃসীম নীলে হারিয়ে যাওয়া পাখীর ডানায় ডানায়
খুঁজিলাম যুগে যুগে।
জানিনা কোন মোনালিসার আঁখির তারায় তারায়।
দেখা দাও, আবার হারাও।

অন্তহীন গ্রহের মেলায়
নক্ষত্রের আলো দেখি
শত-শতাব্দী হলো যে তারাটি মরে গেছে তার।

'আবেদা'

[একাঙ্কিকা]

আহমদ পারেছ উদ্দীন

স্থান পারশ্যের একটি সহর।

কাল—মধ্যযুগ।

দৃশ্য—রূপসী শ্রেষ্ঠা রূপোপজীবি আবেদার গৃহের একটি কক্ষ।

প্রধান রাজপথের উপরেই কক্ষটি। রাত এক প্রহর উৎরে গেলেও নীচে রাস্তার ভীড় কমে নাই। বিভিন্ন শব্দের বিচিত্র কোলাহলের গুঞ্জন খোলা বড় জানালা পথে ভেসে আসছে। জানালার ধার ঘেঁসে বড় মাটির আধারে একটি চারা গাছ যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে।

রাস্তার ওধারে টিলার উপর ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে এবং সে চাঁদ প্রতিফলিত হয়েছে ঘরের দেওয়ালে, কেননা বড় বড় মুকুর সেখানে গাথা।

মেঝেতে গালিচা বিছানো। একদিকে বসবার ব্যবস্থা আছে আর একদিকে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র সাজানো রয়েছে। আবেদার দাসী শামা একটা সেতার হাতে টুং টাং শব্দ করছে; এবং দাসী 'গুল' ঘরের আসবাবপত্র ঝেড়ে মুছে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখছে।

একটা অস্পষ্ট সঙ্গীতের শব্দ কানে আসছে। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে যেন।

শামা—(সেতারে টুং টাং শব্দ করতে করতে) হল তোর সব গোছানো গুল।

গুল—হয়ে গেছে, আর একটুখানি।

শামা—তাড়াতাড়ি কর। বিবি বলছেন লোক এখনি এসে পড়বে।

গুল—কে আসবে আজ?

শামা—কেমন করে বলব কে আসবে? যে একশত আশরফি দক্ষিণা দিতে পারবে হয়ত সে-ই আসবে।

গুল—এক রাতে একটা মেয়ের পিছনে একশত আশরফি খরচ করতে পারে এতবড় বড়লোক কয়টা আছে দেশে?

শামা—তা ত জানি না, তবে প্রতি রাত্রেই ত দেখি লোক আসে এবং তারা একশত আশরফি করে দিয়েও থাকে।

গুল—দেয় ঠিকই; কিন্তু কি করে দেয় জান বহিন? জমি বেচে, ঘরবাড়ী বন্ধক রেখে এমন কি নিজের স্ত্রীর গয়না ছিনিয়ে নিয়েও অনেকে এ-টাকা জোগাড় করেছে। কত ঘর যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

শামা—কিছু আসে যায় না। তাদের আসতে বলে কে? প্রদীপ যখন জ্বলতে থাকে তখন বহু পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরে। বাধা দিলেও মানে না। আগুনে পুড়ে মরাই ওদের ধর্ম। তাই বলে প্রদীপ তার জ্বলা বন্ধ রাখতে পারে না। ওরা কারা গায় রে?

(দূরের অস্পষ্ট সঙ্গীত অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে অতি কাছে।)

গুল—(জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে) এরা ফকিরের দল, কাওয়ালি গাচ্ছে। শহরের ওধারে এক ফকির আস্তানা গেড়েছেন—এরা সেখানে থাকে।

শামা—বেশ ভাল গায় ত! (কাওয়ালের দল আবেদার ঘরের ঠিক নীচে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এখন কানে আসছে শুধু বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত। হঠাৎ বাইরে ঝম ঝম শব্দ।)

(নুপুর পায়ে ঝম ঝম শব্দ তুলে আবেদা ছুটে ঘরে ঢুকল।)

আবেদা—কে গায় রে? কোথায়?

গুল—নীচে বিবি, ঐ রাস্তায়।

(আবেদা জানালার পাশে এসে গলা বের করে নীচের দিকে তাকিয়ে গান শুনতে লাগল। কাওয়ালের দল যেন আবেদাকে দেখবার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। কেননা আবেদাকে দেখতে পাওয়ার পরই তারা আবার চলতে লাগল; এবং সঙ্গীতের শব্দ মৃদু হতে হতে একটু পরে মিলিয়ে গেল।)

আবেদা—এ-ত নূতন ধরনের গান। আগে ত এরূপ কোনও দিন শুনি নাই।

গুল—এ-সব গান ফকিরেরা গায়। নাম নাকি কাওয়ালি।

আবেদা—কাওয়ালি? অদ্ভুত নাম, কিন্তু কি সুন্দর। কেমন করে গায় ওরা।

(তন্মত ভাবে উপরের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করে গানের প্রথম কলি দুইটি সুর দিয়ে গেয়ে উঠল। সহসা গান বন্ধ করে নুপুর বাঁধানো ডান পা দিয়ে মেজেতে সজোরে আঘাত করল এবং চোখে মুখে তন্ময় ভাব এনে নৃত্য করতে লাগল।

সোফার কাছে এসে হঠাৎ বসে পড়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।)

শামা—(সে এতক্ষণ নৃত্যের তালে সুর দিয়ে সেতার বাজাচ্ছিল।) থামলে কেন বিবি? এত সুন্দর গান ছিল। মনে কি হচ্ছিল জান? সঙ্গীত ও ভক্তি যেন রূপ নিয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে।

গুল—বিবি যদি দুনিয়াদার না হয়ে দরবেশ হতেন, লক্ষ লক্ষ লোককে মুরিদ বানাতে পারতেন।

আবেদা—আমার উপরের খোলস এটা। যখন যে কাজে নিজকে নিয়োগ করি, সেটা যতটুকু সময়ের জন্যই হোক—মনপ্রাণ দিয়ে করি। সে-টুকু সময়ের জন্য নিজেকে ভুলে যাই। এক রাতের অতিথি আমার ঘরে এসে আমার এই গুণের জন্যই বিভ্রমে পড়ে। ভাবে, আমি তার প্রেমে মুগ্ধা। তার বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়েও আপনার জন। এতদিন যেন তারই প্রতীক্ষায় বসে রয়েছি বুক ভরা উজাড় করা ভালবাসা নিয়ে (হাস্য)।

শামা—কিন্তু বিবি তোমার খোলসটা যদি কোনও দিন আসল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়?

আবেদা—(গম্ভীর হয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করে) কি জানি বলতে পারি না। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস, আমি যেন নিজকে এখনও খুঁজে পাই নাই। আমার বর্ত্তমান 'আমি'টা একটা খোলস, আমার আসল 'আমি' কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে মাথা তুলে জেগে ওঠে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম তার এখনও শেষ হয় নাই!

(নীচে উচ্চস্বরে)—দে দো খোদাকে বান্দা, একটা পয়সা দে দো

আবেদা—সেই খোঁড়া ফকিরটা বোধ হয়, দে একটা টাকা ফেলে দে।

গুল—কেন বিবি একটা টাকা দাও। ঐ লোভেই ত ও প্রত্যেক দিন এখানে আসে।

আবেদা—আসুক না। আমার কি কম আছে কিছু?

গুল—(জানালার ধারে এসে ফকিরকে উদ্দেশ করে) এই যে—(টাকা নীচে ফেলে দিল। ফকির—টাকা কুড়িয়ে নিয়ে) জিতা রাহো মায়ি—খোদা তুমকো হাজারো রূপেয়া দেগা, লাখো রূপেয়া দেগা।

আবেদা—এককালে এমন ছিল ফকির দেখলেই আমি ছুটে পালাতুম।

গুল—কেন বিবি?

আবেদা—বলছি শোন। তখন আমি সবে পাহাড় থেকে এসে শহরে বাসা বেঁধেছি। একদিন সন্ধ্যার সময় জানালার পাশে সেজে গুজে বসে আছি, এমন সময় রাস্তা থেকে কে ডেকে উঠল, 'মা?' 'কে?' চেয়ে দেখি একটা ফকির। বল্ল, 'একটা পয়সা দাও মা,'—'পয়সা ত আমার কাছে নেই।' 'তবে একটা গয়না দাও মা, তোমার গা ভরা গয়না!' 'এ গয়না ত আমার নয়।' 'তবে একটা কাপড়ই দাও, তোমার বাক্স ভরা কাপড়!' 'কাপড়ও ত আমার নাই।' কিন্তু আমার কাপড়, গয়না-পয়সা সবই ছিল। ফকির আমার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে বল্ল, 'এমন একদিন হবে যেদিন তোমার হাতে একটা পয়সাও থাকবে না।' আমি বলে উঠলুম—'ইস!' ফকির বল্লে, 'তোমার গয়না, কাপড় সব কিছু অপরের ঘরে উঠবে।' আমি বল্লুম, 'বল্লেই হল!' ফকির বল্লে, 'তোমার বাড়ীও অপরে দখল করবে।' আমি বল্লুম, 'অসম্ভব!' 'দুনিয়াতে অসম্ভব কিছুই নয়। সবই সম্ভব।' ফকির চলে যাচ্ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলুম,—'ফকির ফকির, শোন!' ফকির ফিরে দাঁড়াল। 'কবে হবে আমার এই দশা; কবে হবে?' জানালার ধারে মাটির পাত্রে রাখা একটি চারা গাছ ছিল। সেইটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ফকির বল্ল 'যেদিন ঐ গাছটি মরে যাবে।' 'কবে মরবে এই গাছ?' যেদিন ঐ গাছে ফুল ফুটবে।' 'ফুল?—হো হো হো—ফুল ত এ-গাছে ফোটে না ফকির!' 'ফোটে, ফোটে সময় হলেই ফোটে!' ফকির ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তার কথাগুলি আমার মনে দাগ কেটে দিল। নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না। কোনও ফকিরকে দেখলেই ঐ অভিসম্পাতের কথা মনে পড়ত, কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই।

উভয়ে—কেন নাই বিবি?

আবেদা—কেন থাকবে? চোখের সামনে গাছটিকে সযত্নে রেখেছি—যেন কোন দিন না মরে। জানালার ধারে—ঐ যে সেই গাছ।) (জানালার ধারে মাটির আধারে রাখা গাছটিকে দেখিয়ে দিল। এ গাছে ফুল কোনদিন ফোটে না। আর ফুল যদিও বা ফোটে, গাছও যদি শুকিয়ে যায় তাইতেই বা আমার কি ভয়? লাখে লাখে আমার টাকা, বাক্স ভরা হীরা জহরৎ; রাজার ভাণ্ডার শূন্য হলেও আমার ভাণ্ডার শূন্য হবে না। ফকিরের অভিশাপকে আমার কি ভয়? ফুটুক না ফুল। যাক না শুকিয়ে গাছ!

শামা—(জানালার কাছে এসে গাছটিকে পরখ করে দেখতে দেখতে) এতদিন তাইত বুঝতে পারি নাই আপনি কেন এই গাছটির এত যত্ন করতেন। এর মধ্যে এত আছে তা কে জানত? সত্যই বিবি,

এ-গাছে ত ফুল ফোটে না। এ কি? একটা কুড়ির মত দেখছি না? হ্যাঁ, কুড়িই ত। দেখুন, দেখুন।

আবেদা—কুঁড়ি? কই? (সাগ্রহে গাছটির কাছে এসে পরখ করে দেখে) সত্যই ত! এ ত কুঁড়িই। তোমরা কোনদিন এ-গাছে কুঁড়ি ধরতে দেখেছ?

উভয়ে—না।

আবেদা—আশ্চর্য্য! কুঁড়ি যখন ধরেছে, ফুলও ফুটবে। (চিন্তিত ভাবে) সময় কি হয়ে এল? (সহসা উচ্চস্বরে) ফুটুক না ফুল। যাক না শুকিয়ে গাছ। কি ভয় আমার? আমি কাউকেও ভয় করি না, কাউকে না।—কই? এখনও ত তারা কেউ এল না!

গুল—কারা আসবে বিবি?

আবেদা—মীরণ শাহ—এ-মুলুকের সবচাইতে বড় যোদ্ধা ও আমীর। আজ সঙ্গীদের নিয়ে তাঁর আসার কথা আছে। (নীচে রাস্তায় সঙ্গীত ও নৃত্যের শব্দ) ও কারা গায় রে?

গুল—(নীচে গলা বাড়িয়ে দেখে) এক বুড়ো জিপসি ও একটা মেয়ে।

আবেদা—জিপসি! দেখি, দেখি। (আগ্রহের সঙ্গে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। নীচে একটি জিপসি তার যন্ত্র বাজিয়ে গান গাচ্ছে ও একটি মেয়ে নাচছে। কিছুক্ষণ গান শোনার পর—)

আবেদা—(উচ্চস্বরে) জীলু!!

(জিপসি গান বন্ধ করে উপরের দিকে তাকাল। আবেদাকে চিনতে পেরে ডেকে উঠল—'আবেদা!!'

আবেদা—এতদিন পরেও ঐ গানই গাচ্ছ?

জিপসি—তাইতেই ত চিনতে পারলে!

আবেদা—কেমন আছ তুমি?

জিপসি—ভাল। তুমি?

আবেদা—ভাল, আসবে এখানে?

জিপসি—না, তুমি আসবে আমার সঙ্গে?

আবেদা—না, না।

জিপসি—তবে আমি যাই।

আবেদা—যাও।

(জিপসি বীণা বাজাতে বাজাতে তার সঙ্গিনীকে নিয়ে চলে গেল। আবেদা জানালার কাছ থেকে সরে ঘরের মধ্যে আসল।)

গুল—জিপসিটা কে বিবি?

আবেদা—ও জিলু। প্রথম যৌবনে ওরই সাথে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কতদিন যে ওর পিছু পিছু ঐ মেয়েটার মত আমিও নেচে নেচে ফিরেছি!

গুল—কি! ঐ কদাকার বুড়োটার পিছনে!

আবেদা—এখন বুড়ো হয়েছে; কিন্তু তখন ত ছিল না। আর চেহারাও অন্যরূপ ছিল। মানুষ কেমন ভাবে বদলায়, দেখ! কে বিশ্বাস করবে যে ঐ লোকটার একদিন পাগল করা চেহারা ছিল!

শামা—কিন্তু বিবি, তোমার চেহারা ত বদলাল না!

গুল—বিবি আমাদের ভোরের তারার মত কোটি মানুষের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে।

শামা—দশ বছর আগে যেমন চেহারা ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে, বরং আরও সুন্দর ও পূর্ণ হয়েছে।

আবেদা—(খুশী হয়ে) তোরা সত্যি বলছিস?

শামা—তবে কি মিথ্যা? (আবেদার কাছে এসে মুকুরে তার প্রতিবিম্ব দেখিয়ে) দেখ কেমন টানা টানা চোখ, বাঁকা ভুরু, মুক্তার মত দাঁত, আপেলের মত গাল, আর এই কালো মেঘের মত (চুল হাতে করে তুলতে গিয়েই থমকে গেল)—ইয়া আল্লাহ্, একটা চুল পেকেছে যে তোমার!

আবেদা—(চমকে উঠে) কি বল্লি?

শামা—হ্যাঁ—একটা পাকা চুল—এই যে। (পাকা চুলটি তুলে আবেদার হাতে দিল।)

আবেদা—(নিরীক্ষণ করে) তাইত! (স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ রইল) আর পাকা চুল আছে নাকি দেখ ত?'

শামা—না, আর নাই।—না না—এই যে আর একটি।

(আর একটি পাকা চুল তুলে আবেদার হাতে দিল।)

আবেদা—যা, তোরা চলে যা!

(দাসীরা চলে গেল। আবেদা মুকুরের কাছে এসে নিজের প্রতিবিম্ব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।)

শরীরে পরিবর্ত্তন নেমেছে। এতদিন ভাল করে দেখি নাই নিজকে, আজ দেখতে পাচ্ছি। ভোমরার মত কালো চুলে রুক্ষতার ছাপ লেগেছে। আজ দুটো পেকেছে, কিছুদিন পরে সব চুলই একসঙ্গে সাদা হয়ে উঠবে। কপালে রেখা দিয়েছে। চিবুকের নীচের চামড়া ঈষৎ শ্লথ হয়ে এসেছে। সুগোল সুডোল বাহুর পেশীগুলি শিথিল হয়েছে যেন। চোখে পড়ে কি পড়ে না,—সমস্ত দেহে পরিবর্ত্তনের একটা জোয়ার নেমেছে। ফুলের পাপড়ির মত, গাছের চিকণ সবুজ পাতার মত যৌবন ঝরে পড়ছে। সুন্দরী যুবতী আবেদার পিছন হতে কুৎসিৎ প্রৌঢ়া আবেদা মাথা তুলে উঁকি মারছে।

(কিছুক্ষণ চুপ করে রইল)

কিন্তু আমি যে ভাবতেও পারি না আমারও একদিন

বার্দ্ধক্য আসবে। মাথার সব চুল সাদা হয়ে উঠবে, দাঁত পড়ে যাবে, মুখ কদাকার হবে, দেহ নুইয়ে পড়বে—সুন্দরী আবেদা কুৎসিৎ বৃদ্ধা আবেদায় পরিণত হবে। আমার যৌবন হাত থেকে পিছলিয়ে চলে যাচ্ছে—কেমন করে বেঁধে রাখব? কে বলতে পারে, কে বলতে পারে?

(নেপথ্যে) আবেদা? আবেদা?

আবেদা—(চমকে উঠে) কে?

(নেপথ্যে)—মীরণ শাহ এসেছেন।

আবেদা—(দুয়ারের কাছে এগিয়ে এসে) আসুন, আসুন। আমিও আপনাদেরই প্রতীক্ষায় আছি—এত দেরী হল যে! ওরে গুল, ওরে শামা—অতিথিদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কর।

(মীরণ শাহ, ফয়েজ ও হাতেম প্রবেশ করল।)

ফয়েজ—এই যে হুজুর, ইনিই হচ্ছেন আবেদা। আপনাকে যা বলেছিলাম, তা সত্য কিনা দেখুন!

আবেদা—তসলিম হজরৎ। তশরিফ রাখুন। আপনি যে এই বাঁদীর ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন—এ-আমার পরম সৌভাগ্য।

মীরণ শাহ—(উপবেশন করে, আবেদার দিকে চেয়ে) না হে ফয়েজ, তুমি পুরা সত্য কথা বল নাই। আবেদা শুধু সুন্দরী নয়, অপূর্ব সুন্দরী। ইরানের বাগানে গোলাপের অভাব নাই; কিন্তু এত সুন্দর গোলাপ আগে চোখে পড়ে নাই।

আবেদা—জাহাঁপনাকে চোখে দেখবার বহুদিনের সাধ। আজ আমি ধন্য যে আপনি দয়া করে নিজে এসে সে সাধ আমার পূর্ণ করেছেন।

মীরণ—(সাগ্রহে) তুমি কি আমাকে জান্‌তে—জান্‌তে?

আবেদা—দিগ্বিজয়ী বীর মীরণ শাহের নাম কে না জানে?

মীরণ—হা হা হা হা হা—শুনলে হে তোমরা শুনলে? আমার দিগ্বিজয়ের কথা আবেদাও শুনেছে।

হাতেম—আবেদা কেন হুজুর? সে-ত মানুষ! বনের পরিন্দাও আপনার বীরত্বের কথা আলোচনা করে।

মীরণ—হা হা হা হা হা (আত্মতুষ্টির প্রবল হাসি।)

(শামা ও গুল রেকাবি শুদ্ধ শরবতের গ্লাস রেখে চলে গেল।

আবেদা—(শরবতের গ্লাস মীরণের সামনে তুলে ধরে।) জাহাঁপানা, একটু শরবত পান করুন।

মীরণ—শুধু পানেই চলবে না। সঙ্গীত, গান; নৃত্যও চাই। কি বল হে হাতেম?

হাতেম—নিশ্চয়। কই আবেদা, তোমার সঙ্গীতকারদের ডাক। নৃত্য-গান সুরু হোক।

মীরণ—ওহে ফয়েজ, ভেবেছিলাম এখানে এক রাতই কাটাব, এখন ভাবছি, এক সপ্তাহ কাটাব। যুদ্ধ করে করে ক্লান্তি এসে গেছে!

ফয়েজ—এক সপ্তাহ কেন হুজুর, এক মাস, এক বছর থাকুন—কি বল আবেদা?

আবেদা—আমার পরম সৌভাগ্য।

ফয়েজ—(আবেদার কানে কানে) মীরণ শাহের লাখে লাখে টাকা, বকসিস দিতে ভুলো না কিন্তু। (উচ্চস্বরে) কই আবেদা, সঙ্গীত যে এখনও সুরু হল না।

আবেদা—(উচ্চস্বরে) শামা, শামা।

(শামা প্রবেশ করল)

শামা—বিবি, একজন ভিখিরী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আবেদা—ভিখিরী? টাকা দিয়ে বিদায় করে দে!

শামা—দিতে চেয়েছি ত! নিতে চায় না। বলে তোমার এখানে আসবে।

আবেদা—আমার এখানে ত ভিখিরী আসতে পারে না।

(দরজার নীচে সিঁড়ি হতে ভিখিরীর কণ্ঠ—'কেন পারবে না আবেদা—যে টাকা দেবে তোমার কাছে সেই আসবে—সে ভিখিরীই হোক কিংবা বাদশাই হোক।)

মীরণ—হা হা হা হা—এত আজব ভিখিরী! ডাক ডাক মজা দেখা যাক।

আবেদা—ডাক তবে শামা (শামা চলে গেল।)

ফয়েজ—(দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে)—হাতেম দেখ, দেখ—এ শাহ সাহেব না?

হাতেম—(ভীত স্বরে) তাই ত! এ যে বায়েজিদ সাহেব—কি হবে?

(উভয়ে মীরণ শাহের পাশে এসে একে অপরের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল।)

মীরণ শাহ—(বিস্ময়ের সহিত) ও কি! তোমরা এ-ভাবে লুকোবার চেষ্টা করছ কেন?

ফয়েজ—হুজুর! উনি যেন আমাদের চিনতে না পারেন!

মীরণ—চিনলেই বা ক্ষতি কি? সব জেনে শুনে উনি যখন এখানে আসছেন তখন ত সব একই পথের পথিক—হা হা হা হা (উচ্চহাস্য)

(শাহ বায়েজিদ ঘরে প্রবেশ করলেন।)

মীরণ—এই যে ফকির সাহেব আসুন—আসুন,—এখানে কি মনে করে?

বায়েজিদ—সকলে যা মনে করে আসে!

মীরণ—সকলে ত এখানে ফুর্ত্তি করতে আসে।

বায়েজিদ—আমিও তাই করব। এবাদৎ করতে করতে মনটা বিগড়ে গিয়েছে। একটু আমোদ করে মনটাকে চাঙ্গা করতে আসলুম।

মীরণ—হা হা হা হা (উচ্চহাস্য)।

ফয়েজ ও হাতেম—(ঘাড় বের করে) হিঃ!

বায়েজিদ—(আবেদার দিকে চেয়ে) তোমারি নাম কি আবেদা ?

আবেদা—জি, এই বাঁদীই আবেদা।

বায়েজিদ—(জহুরীর জওহরৎ দেখার মত আবেদাকে পরখ করে দেখতে দেখতে)—সত্যিই, তোমার রূপ অতুলনীয়। রূপস্রষ্টা খোদাতালার তুমি এক অপূর্ব সৃষ্টি। মানুষ তোমার কাছে যে ছুটে আসে, আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কারণ চুম্বক যেমন করে লোহাকে টানে, সৌন্দর্য্যও তেমনি ভাবে মানুষকে টানে।

মীরণ শাহ—ফকির সাহেব, আবেদাকে আপনার পছন্দ হল ?

বায়েজিদ—অত্যন্ত, অত্যন্ত।

মীরণ—হা হা হা—কিন্তু আবেদার ঘরে থাকতে হলে যে টাকার দরকার।

বায়েজিদ—কত টাকা ?

মীরণ—বলে দাও আবেদা, কত টাকা ?

আবেদা—একশত আশরফি।

বায়েজিদ—একশত আশরফি ?

আবেদা—জি, হাঁ!

বায়েজিদ—আমি ফকির মানুষ! আমার বেলায়ও কি একশত আশরফি প্রয়োজন ?

আবেদা—ফকির, আমীর—সকলেরই কাছে আমার এক দাবী—একশত আশরফি!

মীরণ—শুনলেন ত ফকির সাহেব—এখন চলে যান। মুরীদদের কাছ থেকে একশত আশরফি জোগাড় করুন—তারপর আসুন।

বায়েজিদ—আজ রাতের জন্য যদি তোমাকে পেতে চাই তবে আমাকে একশত আশরফি দিতেই হবে ?

আবেদা—(মীরণের সম্মতি চেয়ে)—জাঁহাপানা!

মীরণ—হ্যাঁ, ফকির সাহেব, তাই দিতে হবে।

বায়েজিদ—আবেদা, আমি প্রশ্ন তোমাকে করেছি!

আবেদা—হ্যাঁ, ফকির সাহেব আজ রাতের জন্য পেতে হলে আমাকে একশত আশরফি দিতেই হবে।

ফকির—বেশ। (নিজের লম্বা আলখেল্লার মধ্য থেকে একটী থলিয়া বের করে)—এই লও একশত আশরফি! (সকলে মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে হতবাক)

মীরণ—দেখি, আবেদা, দেখি! (লাফিয়ে উঠে আবেদার হাত থেকে থলিয়াটি কেড়ে নিয়ে ভিতরে পরখ করে দেখে) তাই ত! এ যে আশ্‌রফিই দেখছি—একশত হবে বলেই মনে হচ্ছে। (হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠল) হা হা হা হা—ফকির সাহেব পাকা লোক। পথ-ঘাট বেঁধে এসেছেন। কিন্তু আবেদা তুমি ত আজ এঁকে রাখতে পার না!

আবেদা—জাঁহাপানা, আমি আপনার সম্মতি নিয়েই কথা দিয়েছি। আবেদার যত দোষ থাক সে কথার খেলাপ কোনও দিন করে নাই। আপনাকে আজকের জন্য আমাকে ক্ষমা করতেই হবে।

মীরণ—কি বল হে তোমরা—(সঙ্গীদের চোখের ইঙ্গিৎ বুঝে)—বেশ বেশ, আমরা আজকের মত যাই—আমার সঙ্গীদেরও আপত্তি নাই!

আবেদা—আসুন ফকির সাহেব, বসুন এখানে (চীৎকার করে) কই গুল, ফকির সাহেবের পা ধোওয়ার পানি নিয়ে আয়। (শামা ও গুল একটি বড় গামলা ও রূপার বর্তনে পানি নিয়ে এল।) এই যে এই গামলায় পা রাখুন, আমি ধুয়ে দিই। (ফকির পা বাড়িয়ে দিলেন, আবেদা ধুয়ে দিতে লাগল।)

বায়েজিদ—আঃ! কি আরাম! বহু বছর পরে এক পরমা সুন্দরী নারী নিজের হাতে আমার পা দুটি ধুয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে যেন!

মীরণ—হা হা হা হা হা

ফয়েজ ও হাতেম—অর্দ্ধেক দেহ বের করে) হিঃ!

আবেদা—গুল! পা ধোয়ার সরঞ্জাম নিয়ে যা এখ থেকে। শামা, কই শরবৎ এনেচিস—দে আমাকে ফকির সাহেব, একটু সরবৎ পান করুন।

বায়েজিদ—শরবৎ ? তা দাও, শরবৎ পান করতে আমি বড় ভালবাসি। (পান করুন) ওকি! আমার গায়ে আতর মেখে দিলে ? বেশ, বেশ! আরও ভাল করে দাও। সুন্দরী রমণীর হাতে মাখানো আতর কে না চায় ?

মীরণ—আমরা তবে আজকের মত বিদায় লই আবেদা ?

আবেদা—গোস্তাকি মাফ করুন জাঁহাপনা। কাল আমি আপনার প্রতীক্ষায় রইব।

(মীরণ শাহ তাঁর সঙ্গীদের সহ উঠে দাঁড়ালেন)

বায়েজিদ—ওকি! তোমরা উঠলে যে ? দু' চারজন সঙ্গী না হলে আমোদ জমে ওঠে না। বস তোমরা।

মীরণ—কিন্তু আপনার অসুবিধা হতে পারে ত ?

বায়েজিদ—অসুবিধা বোধ করলে আমি তোমাদের যেতে বলব। নিজের অসুবিধা করে আমি কোন কাজ করি না।

মীরণ—হা হা হা হা—তবে বস হে।

ফয়েজ ও হাতেম—(দেহের সম্পূর্ণ বের করে এগিয়ে এসে)—হিঃ হিঃ! (সকলে বসে পড়ল।)

আবেদা—প্রভু, এখন বাঁদীকে আদেশ করুন কি করতে হবে?

বায়েজিদ—করছি, করছি—ব্যস্ত হও না। কি বল্লে—আমি যে আদেশ করব তুমি তাই পালন করবে শুধু আজকের রাতের জন্য—এই না?

আবেদা—হ্যাঁ প্রভু, আজকের রাতের জন্য আমি আপনার দাসী।

বায়েজিদ—বেশ, বেশ। একটি রাত বড় দীর্ঘ সময়। কত কিছু হয়ে যেতে পারে একটি রাতে! কিন্তু তাই বলে একটি মুহূর্তও বৃথায় যেতে দিও না। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ কর। কেননা যে সময়টা চলে গেল সেটা আর কোনও দিন ফিরে আসবে না!

মীরণ—ঠিক বলেছেন ফকির সাহেব। আপনার সঙ্গে আমি একমত।

বায়েজিদ—আবেদা, তুমি যেমন সুন্দরী; তোমার ঘরটীও তেমনি সুন্দর করে সাজায়ে রেখেছ। কেমন সুন্দর গালিচা, আসবাবপত্র—দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি। ওটি কার ছবি? তোমারি মত হাস্যলাস্যময়ী তরুণী—এ কি এমনি একটি ছবি, না কারও প্রতিকৃতি?

আবেদা—মুস্তারী বিবির নাম শুনে থাকবেন—এ তারই প্রতিকৃতি।

বায়েজিদ—যে মুস্তারী বিবির নাম একদিন লোকের মুখে মুখে ফিরত, বড় বড় আমীর-ওমরাহ যার কৃপা লাভের জন্য দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকত, এ-তারই প্রতিকৃতি। মীরণ, তুমি এঁকে কোনও দিন দেখেছ?

মীরণ—(একটু গর্বের সহিত) আমি এককালে মুস্তারী বিবির কৃপার পাত্রই ছিলাম।

বায়েজিদ—তাই নাকি! তবে ত ভাল করেই চেন। (পকেট থেকে একটি পাতার মোড়ক বের করে আবেদার হাতে দিয়ে) আবেদা, বল ত এ-কি?

আবেদা—(ভাল করে দেখে) এ-ত পাতায় মোড়া এক মুঠো মাটি!

বায়েজিদ—মাটি না আর কিছু?

আবেদা—মাটি বলেই ত মনে হয়।

বায়েজিদ—মীরণ তুমি বল।

মীরণ—(আবেদার হাত থেকে মোড়কটি নিয়ে দেখে) এ-ত মাটি।

বায়েজিদ—তোমরা ঠিকই বলেছ—এ-মাটি। আজ বিকালে শহরের প্রান্তে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা গাছের নীচে এক জায়গায় মাটি বসে গিয়েছে বলে মনে হল। পরখ করে দেখলুম, একটা কবর। এই মুস্তারী বিবিকে দশ বছর আগে গোর দেওয়া হয়েছিল—ওটা তারই কবর। আর ঐ মাটিটুকু—গোরের ভিতর থেকে তুলে এনেছি,—মুস্তারী বিবির দেহের অংশ!

মীরণ শাহ—(চমকে উঠে) বলেন কি?

(তার হাত থেকে পাতাশুদ্ধ মাটিটুকু নীচে পড়ে গেল।)

বায়েজিদ—ওকি ফেলে দিলে?

মীরণ—ফেলে দেব না? কি সর্বনাশ!

বায়েজিদ—হা হা হা, ভয় পেয়ে গেলে? মীরণ, তুমি না বীরপুরুষ, বহু যুদ্ধ জয় করেছ,—আর আজ এক মুঠো মাটি, যে মাটি দশ বছর আগে এই আবেদারই মত সুন্দরী তরুণী রূপে দুনিয়ার বুকে হেঁটে বেড়াত—সেই মাটিটুকু ধরে রাখতে পারলে না?

মীরণ—(দ্বিধার সহিত) আপনি কি তামাসা করছেন?

বায়েজিদ—মোটেই না। দাঁড়াও, মাটিটুকু কুড়িয়ে নেই। যেখান হতে এনেছি কাল সেখানে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। (আসন হতে উঠে গিয়ে পাতাশুদ্ধ মাটিটুকু যত্নের সহিত হাতে তুলে এনে আসনে এসে বসলেন।)

দেখ আবেদা, চিনতে পার? দেওয়ালে টাঙ্গানো ঐ সুন্দরীর প্রতিকৃতি, আর আমার হাতের মুঠোতে এই মাটি,—কোনও মিল দেখতে পাও কি? পাও না। আমি কিন্তু পাই। দেওয়ালে টাঙ্গানো ঐ ছবির সঙ্গে শুধু নয়, তোমার সঙ্গেও। তুমিও মুস্তারী বিবির মতই সুন্দরী, হাস্যময়ী, লাস্যময়ী—কয়েক বছর পরে তুমিও এই এক মুঠো মাটিতে পরিণত হবে।

আবেদা—ফকির সাহেব!

বায়েজিদ—তোমার ঘন কালো চুল সাদা হয়ে উঠবে, মসৃণ চামড়া লোল হবে, দাঁত পড়ে যাবে, সুন্দর চেহারা কদাকার হবে, আর এই অপরূপ নয়নাভিরাম দেহ ধূলিসাৎ হয়ে মাটির সঙ্গে—

আবেদা—(দুই হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢেকে তীব্র চীৎকার করে) থামুন, থামুন! (চোখ হতে হাত মুক্ত করে) আপনি কেন আমাকে এ-সব বলছেন? আমাকে ভয় দেখাতেই কি আপনি এসেছেন?

বায়েজিদ—(কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবেদার দিকে চেয়ে) আমি দুঃখিত আবেদা, তুমি প্রাণে যে এতটা আঘাত পাবে আমি ভাবতে পারি নাই।

আবেদা—(লজ্জিত হয়ে) ক্ষমা করুন প্রভু, আপনাকে বাধা দেওয়ার অধিকার আমার নাই। আপনি যা বলতে চান, বলুন।

বায়েজিদ—না আবেদা, আর কিছু বলব না।

আবেদা—আমার মাথার দিব্যি আপনি বলুন।

বায়েজিদ—তবে বল, কোন্ কথা বলব? তুমি যা শুনতে চাইবে তাই বলব।

আবেদা—আমি যা শুনতে চাইব?—তবে—তবে—বলুন ত প্রভু কালকে হার মানান যায় কি না?

বায়েজিদ—কালকে হার মানান যায় কিনা?

আবেদা—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমার রূপ যশ গৌরব সময় যেন কেড়ে নিতে না পারে। অনন্ত কাল ধরে আমার সান্নিধ্য মানুষ যেন কামনা করে। সময়ের আঘাত সয়ে আমি যেন চিরদিন অক্ষত হয়ে বেঁচে থাকি। বলুন, এ কি সম্ভব?

বায়েজিদ—সম্ভব বই কি।

আবেদা—সম্ভব! বলেন কি? কেমন করে—কেমন করে?

বায়েজিদ—তুমি দেখতে চাও?

আবেদা—(অতি আগ্রহের সহিত) হ্যাঁ।

বায়েজিদ—তবে ঘরের আলো সব নিভিয়ে দাও।

(আবেদা ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিল।)

বায়েজিদ—ঘর স্নিগ্ধ জোছনায় ভরে উঠেছে। এ-জোছনা এল কোত্থেকে বলতে পার?

আবেদা—আকাশে চাঁদ উঠেছে যে!

বায়েজিদ—চাঁদ শুধু তোমার ঘরকেই নিজের সুষমা দিয়ে ভরে তোলে নাই, জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ বহু দূরে পাহাড়ের চূড়া—যার উপর বরফ জমে আছে—ঝলমল করছে; কেননা চাঁদের কিরণ পড়েছে সেখানে! নীচে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া নদীর বুকে ঢেউগুলি এর ওর ঘাড়ে প'ড়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, আর উপরে আকাশের দিকে চূর্ণ জল কণা ছুঁড়ে মারছে—কেননা চাঁদকে তারা দেখতে পেয়েছে যে! ঘন পাতার আড়ালে গাছের ডালে বসে শাবকগুলিসহ পাখী গলা উপরের দিকে বাড়িয়ে ক্রমাগত শিশ দিচ্ছে—কেননা চাঁদ উঠেছে যে মাথার উপর! চাঁদ তোমার ঘরকেই শুধু সুন্দর করে নাই, সমস্ত পৃথিবী জোছনা দিয়ে ভরে তুলেছে। কিন্তু এই সুষমা চাঁদকে কে দিয়েছে বলতে পার?

আবেদা—কে দিয়েছে?

বায়েজিদ—কাছে এস।

(আবেদা ফকিরের কাছে এগিয়ে এল।)

বায়েজিদ—(ডান হাতে আবেদার চিবুক তুলে ধরে) কি সুন্দর মুখ, কেমন পটল চেরা চোখ, টানা টানা ভুরু, মেঘের মত কালো কেশ—বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। চাঁদের সুষমা তিনিই দিয়েছেন যিনি এই অদ্ভুৎ রূপরাশি দিয়ে তোমাকে ধন্য করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁর দয়া হলে তোমার রূপ, যশ, গৌরব চিরদিন অম্লান থাকবে। তোমার সঙ্গ চিরকাল ধরে লোকে কামনা করবে—কাল তোমার কাছে হার মেনে যাবে।

আবেদা—প্রভু, আমি যে পাপিনী, অত্যন্ত পাপিনী।

বায়েজিদ—কে পাপী নয়? আমি কি পাপী নই? (মীরণ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখায়ে) এরা কি পাপী নয়? পৃথিবীতে কে পাপী নয়? তাই বলে আল্লার করুণা থেকে কেহ বঞ্চিত হয় না। চাঁদের আলোর মত তাঁর দয়া চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—আমরা দেখতে পাইনা, চোখের সামনে প্রদীপ জেলে রেখেছি বলে। আবেদা, তুমি তাঁর দয়া চাও?

আবেদা—চাই, প্রভু চাই।

বায়েজিদ—রাত বেশি হয় নাই—কিন্তু সময় হয়ে এল। আবেদা, আমি যা আদেশ করব তুমি তাই পালন করবে—একটী রাতের জন্য।

আবেদা—হ্যাঁ, প্রভু।

বায়েজিদ—যাও, পায়ের ঘুঙুর খুলে ফেল, গা হতে গয়নাগুলি খুলে রাখ এবং ঐ দামী রঙিন পোষাকের বদলে একটি সাধারণ সাদা কাপড় পরে এস।

আবেদা—যো হুকুম প্রভু! (আবেদা চলে গেল।)

ফয়েজ—(মীরণ শাহের কানে কানে) কি করতে চান ফকির সাহেব।

মীরণ—চুপ! দেখ দেখ—ফকির সাহেব জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চাঁদের কিরণ মুখে ও চোখে এসে পড়েছে।

বায়েজিদ—(আকাশের দিকে চোখ তুলে সুললিত স্বরে) *"আর রহমান। আল্লামাল কোরান। খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান। আশসামছো ওয়াল কামারো বেহুসবানেও ওয়ান নাজমো ওয়াস সাজারো ইয়াসদান। ওয়াস সামায়া রাফায়াহা ওয়া ওয়া দায়াল মিজান। আল্লা তাদ গাও ফিল মিজান। ওয়া-আকেমুল ওয়াযনা বেল কেসতে ওয়ালা তুখ সেরুল মিজান।"

হাতেম—(ফয়েজ চুপে চুপে) দেখ, দেখ! একটা মেঘ নীচে নেমে আসছে।

ফয়েজ—সত্যই ত! ঠিক ওই আসছে যেন!

মীরণ—চুপ কর!

বায়েজিদ—"ওয়াল আরদা ওয়া দায়া হাল এনাম। ফিহা

---

*সূরায়ে রহমান। মানুষের প্রতি আল্লার কি কি দয়া প্রদর্শিত হয়েছে তাহারি কিছুটা এই সূরায় উল্লেখ রয়েছে। এই সূরা আবৃত্তি হওয়ার সময় অগণিত ঢেউ সমুদ্রে ছলাৎছল শব্দ করছে—এমনি শব্দ মাধুর্য্য দিয়ে আবহ সঙ্গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফাকে হাতু ওয়াল নাখলো যাতুল আকমাম। ওয়াল হাব্বু যুল আসফে ওয়ার রাইহান। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান।”

(বৃষ্টি পড়ার শব্দ)

হাতেম—(বিস্মিত হয়ে) বৃষ্টি সুরু হয়েছে।

ফয়েজ—শুধু ঐ জানালার উপর।

মীরণ—(বাধা দিয়ে) শুনতে দাও।

বায়েজিদ—“খালাকাল এনসানা মিন ছাল ছালেন কাল ফাককার। ও'য়া খালাকাল যান্না মিম মারেযেম মিন্নার। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান।

আবেদা—(দুয়ারের কাছে এসে) প্রভু! (থমকে দাঁড়াল।)

বায়েজিদ—মা! (ফিরে দাঁড়ালেন। আবেদার দিকে চেয়ে) কেমন সুন্দর লাগছে তোমাকে। যাও মা—ওজু করে এস।

আবেদা—বাবা!

বায়েজিদ—দেরী করনা মা—সময় হয়ে এল। (আবেদা চলে গেল ওজু করতে)

বায়েজিদ—(আবেদার গমন পথের দিকে চেয়ে) “রাব্বুল মাশরে কাইনে ওয়া রাব্বুল মাগরেবাইন। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান।”

(বাড়ীর দাসদাসী সকলে এক কোণে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। জানালাতে বৃষ্টির পটাপট করে সশব্দে পড়ছে। গুড় গুড় করে উপরে মেঘ ডাকছে।)

বায়েজিদ—মারাযাল বাহরাইনে ইয়াল তাকিয়ান। বাইন'-হুমা বারযাখুল্লা ইয়াব গিয়ান। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান।* ইয়াখ রুজু মিন হুমা লুলু ওয়াল মারজান। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান।

শামা—গুল—দেখ দেখ, কুঁড়িটা ফুটে উঠছে।

গুল—(সভয়ে) তাইত! এক একটা বৃষ্টির ফোটা পড়েছে আর এক একটা পাপড়ি ফুটেছে।

বায়েজিদ—ওয়া লাহুল যাওয়া রেল মুন শাআতো ফিল বাহরে কাল আলাম। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান। কুল্লু মান আলাইহা ফানেও ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বেকা জুল জালালে ওয়াল একরাম। ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বে কুমা তুকাজ্জেবান।

আবেদা—(প্রবেশ করে) বাবা! আমি ওজু করেছি।

বায়েজিদ—এস মা আমার পাশে এসে দাঁড়াও।

(আবেদা পাশে এসে দাঁড়াল)

শামা—ফুলটা সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে!

বায়েজিদ—বল মা, উপরের দিকে হাত তুলে বল, “হে আল্লাহ আমি এতদিন বিপথে ঘুরেছি। আজ তোমার কাছে এসে দাঁড়ায়েছি। তুমি আমাকে পথ দেখাও, আশ্রয় দাও—আমাকে তোমার কাছে টেনে লও, বল মা, বল।

আবেদা—(উপর দিকে দুই হাত তুলে) হে আল্লাহ, আমাকে আশ্রয় দাও, পথ দেখাও, আমাকে তোমার কাছে টেনে লও।

বায়েজিদ—(উর্দ্ধ দিকে চেয়ে উচ্চস্বরে)—আল্লাহ, আবেদাকে আমি তোমার রাস্তায় দাঁড় করায়েছি। সে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছে। আমার করণীয় যতটুকু ছিল আমি করেছি—এখন তোমার দায়িত্ব তুমি পালন কর। (আবেদাকে লক্ষ্য করে) আবেদা চাও তাঁর কাছে আশ্রয়। তিনি নিশ্চয় তোমাকে কাছে টেনে নেবেন।

(বায়েজিদ প্রস্থান করলেন।)

আবেদা—হে আল্লাহ, আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে আলো দেখাও, আমাকে তোমার কাছে টেনে লও।

(আকাশ চিকমিক করে উঠল।)

সকলে—(সভয়ে) সাবধান, সাবধান! (ভয়ে সকলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। প্রবল শব্দে গর্জ্জন করে বজ্রপাত হল।)

ফয়েজ—আলহামদো লিল্লাহ। কিছু হয় নাই। কিছু হয় নাই। কাউকেও লাগে নাই!

শামা—শুধু, জানালার পাশে চারা গাছটা পুড়ে গেছে।

গুল—কিন্তু ফুলের পাপড়িগুলি বিবির সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

আবেদা—(উচ্চস্বরে) বাবা! বাবা!—আপনি কোথায়?

বায়েজিদ—(নেপথ্যে) এই যে মা আমি, নীচে, সিঁড়ির উপর। আমি চল্লুম।

(কাওয়ালের দল ফিরে আসছে। তাদের সঙ্গীত দুরাগত সমুদ্র কল্লোলের মত শোনা যাচ্ছে।)

আবেদা—(উচ্চস্বরে) আমাকেও সঙ্গে নিন। আমিও আপনার সঙ্গে যাব!

বায়েজিদ—(নীচ থেকে) তোমার সমস্ত টাকা বিলিয়ে দিতে হবে যে!

আবেদা—আমি দেব বিলিয়ে সব টাকা। (উচ্চস্বরে) ওগো কে নেবে আমার সব টাকা, কে নেবে?

*তোমার প্রভুর দয়াগুলির মধ্যে সেটি কোন্‌টি—যেটি তুমি অস্বীকার করিতে চাও?

মীরণ—আমি নেব আবেদা। তোমার সমস্ত টাকা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেব।

আবেদা—তবে দিলুম তোমাকে সব টাকা। বাবা, আমি বিলিয়ে দিয়েছি সব টাকা।

(কাওয়ালের দল এগিয়ে আসছে ক্রমে।)

বায়েজিদ—মা, তোমার কাপড়, হীরা, মুক্তা, গয়না—সে সবও যে বিলিয়ে দিতে হবে!

আবেদা—ওগো, কে নেবে আমার সমস্ত কাপড়, হীরা, মুক্তা, গয়না—কে নেবে?

মীরণ—আমি নেব আবেদা। বস্ত্র ও অর্থহীনদের মধ্যে তোমার সমস্ত কাপড় ও হীরা, মুক্তা, গয়না বিলিয়ে দেব।

আবেদা—বাবা, আমি সব বিলিয়ে দিয়েছি।

(কাওয়ালের দল কাছে এসেছে।)

বায়েজিদ—মা, তোমার এখনও বাড়ীটি রয়েছে। এটাও যে দিয়ে দিতে হবে!

আবেদা—কে নেবে আমার বাড়ী? কে নেবে?

মীরণ—আমি নেব আবেদা। সর্ব্বসাধারণের জন্য এটা মোসাফিরখানায় পরিণত হবে।

আবেদা—বাবা আমি দিয়ে দিয়েছি বাড়ী।

বায়েজিদ—তবে এস মা—আমার সঙ্গে এস। আল্লাহ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন!

(আবেদা প্রস্থান করল।)

শামা ও গুল—(এক সঙ্গে চীৎকার করে) বিবি! বিবি! যেও না! যেও না!

মীরণ—(বাধা দিয়ে) ডেকোনা ওকে। ও তোমাদের ডাক শুনবে না। আবেদাকে খোদা টেনে কাছে নিয়েছেন। আমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে গিয়েছে ও। আমরাও ধন্য যে আল্লার এই মহিমা চোখে দেখলুম। আল্লার আশীর্ব্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক! (কাওয়ালের দল নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সঙ্গীতের প্লাবনে সবকিছু ডুবে গেছে। ফকির ও আবেদাকে কেন্দ্র করে সাগরের উর্ম্মিমালার মত সেই সঙ্গীত উচ্ছ্বাস এগিয়ে যেতে লাগল।)

আষাঢ়ের একটি কবিতা

আ, ফ, ম, সিরাজ-উদ-দউলা চৌধুরী

বল কোন্ শিল্পী এসে বাদলের শিঞ্জিনী ঝংকার
তুলেছে আপন মনে পল্লবে পল্লবে—সারা বনে
অশান্ত আবেগ ভরা কত সুর, কতো বেদনার
অব্যক্ত ক্রন্দন শুনি ঝর্‌ঝর্ একা বাতায়নে।

কালো ঘনো অন্ধকারে আকাশের আবক্ষ বিস্তার,
এখন মেঘের সাথে হৃদয়কে ভাসিয়ে পেলাম
অজান্তে দেহের তটে সে কি জ্বালা, যৌবন সঞ্চার
পেলাম স্মরণে ফিরে কোনো এক কুমারীর নাম।

বিচিত্র কল্পনা তাই। শাল, তাল···আমড়া বনের
পত্রে পত্রে জল ঝরা কতো গান অনন্ত প্রীতির,
ব্যথা ও আনন্দ ভরা অনুভূতি একলা মনের
বাদল ধারার মতো জেগে ওঠে চপল-অধীর।

হাওয়ায় হাওয়ায় জাগে হৃদয়ের অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস
কা'কে যে কল্পনা করে,—নিদ্রাহীন বিলম্বিত রাত
আষাঢ়ে সু-সিক্ত তবু স্বপ্নময় ঘুমের আভাস
পাইনে এখনো কেন; সে-কথা কি বলবে প্রভাত?

বাংলা সাহিত্যে নজরুল

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

নজরুল সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই তদানীন্তন সময়ের দেশের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং সাহিত্যের গতিধারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার।

পলাশীর আম্রকাননে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গোলক ধাঁধার ভেতর দিয়ে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত হলো বটে; কিন্তু ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারে মরে যায় নাই তাদের অন্তর হতে। পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা চালালো আন্দোলনের পর আন্দোলন। ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ইংরেজকে। এর ফলে উত্যক্তের কাছ হতে এলো নানা নির্য্যাতন; এবং এ-সব নির্য্যাতন মুসলমানদেরই উপর চললো বেপরোয়া ভাবে।

ইংরেজ এ-দেশে তার কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথাগুলোকে হাত করে নিলো। অনুগৃহীতদের মাঝে নতুন ভাবে বণ্টন করা হলো জায়গীরদারী ও জমিদারী। শিল্প-বাণিজ্য—সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার লাভ করলো এ-দেশীয় বশংবদ একটি শ্রেণী। ফলে দেশের সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত হলো ঐ মুষ্টিমেয়দের। ভেঙ্গে পড়লো অর্থনৈতিক কাঠামো। রাতারাতি সমাজের ক্ষুদ্র একটি স্তর উঠলো ফেঁপে এবং বৃহৎ স্তরে ধরলো বিরাট ফাটল। অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-শোক হলো এদের নিত্য-নৈমিত্তিক অবাঞ্ছিত দোসর। জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত এই বৃহৎ সমাজ হয়ে পড়লো রাজনৈতিক চেতনাশূন্য; জীবনধারণের সমস্যা দেখা দিলো প্রকাণ্ড রূপে। চললো উমেদারী।

বাংলা সাহিত্যও চললো এই উমেদারীর পথ বেয়ে। আবির্ভাব হলো উইলিয়ম কেরী, বিদ্যাসাগরপ্রমুখ পণ্ডিত-ম্মন্য ব্যক্তির। চলতি ভাষার চলা পথে পড়লো বিরাট আগল; জন্ম নিলো সংস্কৃত ঘেঁষা এক কৃত্রিম ভাষা। এই ভাষাতেই শুরু হলো সাহিত্য সৃষ্টির। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। এই সীমিত ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল প্রতিভার। বাংলার উর্বর মাটিতে প্রতিভারও অভাব ঘটলো না। ইংরেজ-অনুগৃহীত ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র সে-অভাব পূরণ করলেন। ঐতিহাসিক সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে ইংরেজের মনোমত লিখে চললেন গল্প-উপন্যাস।

পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিমের পথে পা বাড়ালেন আরো বহু হিন্দু-সাহিত্যিক। কিন্তু আশ্চর্য, পাশাপাশি বাস করেও কারুর কলমে চিত্রিত হলো না মুসলমান ও তাদের আশা-আকাংখার কথা। বঙ্কিম সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা-ভাষার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছেন ঠিকই; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্গীরণ করেছেন বিদ্বেষ বিষ। সেদিন আপন হাতে তিনি যে "বিষ বৃক্ষ" রোপন করলেন, সে বৃক্ষের ফল আত্মপ্রকাশ করলো সাম্প্রদায়িকতা রূপে। এরই সুফল ফলতে দেরী হলো না। হিন্দু লেখকদের তুলিতে মুসলমানরা যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়ে চিত্রিত হতে লাগলো। এবার কিন্তু একই ভাগ্য সূত্রে বাঁধা পরাধীনদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হলো। প্রাথমিক অবস্থায় বঙ্কিম-মাইকেলের রচনায় যে দুর্বোধ্যতা ও সংস্কৃতের বেড়াজাল ছিল, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে সে ভাষা আরও সহজ ও সাবলীল হলো বটে; কিন্তু সংস্কৃতাশ্রয়ী হয়েই রয়ে গেলো। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সে-ভাষাকে এমন এক স্তরে এনে ফেললেন, যার ফলে সংখ্যা গুরু মুসলমানের ভাষার আধুনিক সাহিত্যে প্রবেশের যে ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ছিল—তাও লোপ পেলো। রবীন্দ্রের হাতে পড়ে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হলেও চিন্তাধারা তাঁর বেদ ও উপনিষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। তাঁর কলমের আঁচড়ে মারাঠা দস্যু শিবাজী ভারতের মুক্তিদাতা 'মহারাজ' রূপে চিত্রিত হলো, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, তিতুমীর, মজনু শাহ্, শমশের গাজী, জান মুহম্মদ, তোরাব আলী এঁরা চিত্রিত হলেন না। এমন কি, পাঠান সেনাপতি কেশর খাঁকে রাজপুতানীদের দ্বারা জুতা পেটা করে তিনি যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বকবির বিশ্বউজ্জল আলোও তাতে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে বই কি! বঙ্কিম হতে রবীন্দ্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে হিন্দু-সাহিত্যিকরাই ত উদ্দেশ্যের চাপে ছাড়া মুসলমানদের কোন চিত্র তাঁদের লেখায় তুলে ধরেন-ই নাই, এমন কি কোন মুসলমান সাহিত্যিকও তাঁর স্বসম্প্রদায়ের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে পারেন নাই। তবে চেষ্টা যে কেউ করেন নাই, তেমন কথা আমরা বলছি না; কিন্তু তার মধ্যে অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণই ছিল বেশী। ক্ষমতার অবক্ষয় ছাড়া সৃষ্টি হিসেবে এ-কে চালিয়ে দিতে আমাদের বাধে।

যা হোক, হিন্দু-মানসিকতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি; শরৎচন্দ্র দেশবরেণ্য কথাশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা-কুসুম দিয়ে দেবতার জন্য নৈবেদ্য সাজাতে লাগলেন

আর শরৎচন্দ্র দোষক্রটীপূর্ণ প্রতিটি নর-নারীকে দেব-দেবীর পর্য্যায়ে নিয়ে চললেন। সাধারণ মানুষের সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেও তাদের সাধারণভাবে চিত্রিত করতে পারলেন না শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের আসন ছিল আরো উঁচুতে। তিনি সে-ই আসন হতে নামতে পারলেন না; উঁচু হতেই তিনি নীচু জগতের মানুষের কথা শুনেছেন, তাদের ডাক দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তাই তিনি 'অস্তাচলের পারে এসে পূর্বাচলের পানে' তাকিয়ে বলেছেন—

"কৃষকের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

সেই অনাগত কবির বাণী শুনবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হয়ে রইলেন আর জীবন দেবতার পায়ে নিজের 'শির নত করে' মুক্তির পথ খুঁজলেন। নতশির রবীন্দ্রনাথের অবস্থা যখন এই—সেই সময়ই শির উঁচিয়ে ঝড়ের মতো আবির্ভাব হলো নজরুলের। নির্যাতীত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মধ্য হতে তাদেরই অকৃত্রিম দোসর হয়ে তিনি সদর্পে ঘোষণা করলেন—

"বল বীর চির উন্নত মম শির।"

দেশের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়লো—আত্ম-সজাগ এই বলিষ্ঠ ঘোষণা। পরাধীনতার যাঁতাকলে পিষ্ট শিড়দাঁড়া ভাঙ্গা অবনত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বিদ্রোহী কণ্ঠে ঘোষিত হলো—

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য।"

অপূর্ব! ধ্বংসের প্রতীক 'রণতূর্যের' পাশে সুন্দর সৃষ্টির প্রতীক 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী'—হতাশা-ক্লিষ্ট মানুষের মনে বিপুল আশার সঞ্চার করলো।

ভক্তি ও ভাববাদী বাংলার কোমল মাটিতে 'বিদ্রোহী' যে আলোড়নের ঢেউ তুললো, মানুষকে আত্ম-সচেতনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করলো, নজরুলের পূর্বে কোন কবি তা পারেন নাই। ইস্পাত-কঠিন 'বিদ্রোহী'র মধ্যে শুধু আগুনই ছিল না, কোমলতাও ছিল প্রচুর—

"আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ-হিয়ার কাতরতা
ব্যথা সুনিবিড়
চিত-চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর থর থর
প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল্ করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা,
তা'র কাঁকন চুঁড়ির কন্‌কন্।"

'বিদ্রোহী'র মধ্যে এই যে নতুনত্ব, এই নতুনত্বই নজরুলকে দান করেছে অমরত্ব। নজরুল কাব্যের মূল সুর বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে পুরোপুরি ভাবে নিহিত রয়েছে। নিছক ভাঙ্গার জন্যই যে তিনি 'ভাঙ্গার গান' গান নাই, তা তাঁর "সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" কবিতা পড়ে বুঝতে কষ্ট হয় না।

এই "সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" তাঁর কণ্ঠ হয়েছে বেশামাল। তাই মনের ভাব কোথাও প্রকাশ পেয়েছে সুন্দর ও সংযত রূপে, কোথাও বা অসংযত রূপে। কেননা জীবনের চলা পথে তিনি দেখেছেন—

"ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে।"

জরা-মরার মাঝেও সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচাবার মানবিক প্রেরণায় তিনি হয়ে উঠেছেন 'উন্মাদ'। জরা-ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর পথ চিরতরে বন্ধ করে, অন্যায়-অবিচার দূর করে এ-পৃথিবীকে সুন্দর করে সৃষ্টির তাগিদে মন হয়েছে তাঁর—"বলগা হারা অশ্ব"। সুতরাং তাঁর পদক্ষেপ যে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হবে, এ-তো স্বাভাবিক। বস্তুতঃ গভীর বেদনা হতেই জন্ম নিয়েছে তাঁর 'বিদ্রোহী।' সুতরাং তাঁকে 'বিদ্রোহী-কবি' না বলে 'বেদনার কবি' বলাই সঙ্গত।

এ-গেলো নজরুলের ধ্বংসের এবং সৃষ্টির গোড়ার কথা। গোটা বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহীর এই ভাব, ভাষা ও বলশালিতা কোথাও দৃষ্ট হবে না, এমন কি, প্রচলিত বাঁধা-ধরা নিয়মের দাস হয়ে তিনি কবিতা লেখেন নাই।

ভাবের ক্ষেত্রেই শুধু নয়—ছন্দ ও ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি এঁকে দিয়েছেন বৈপ্লবিক স্বাক্ষর। বাংলার সংখ্যা-গুরু মুসলমানের মুখের ভাষা এতদিন যা ছিল বাংলা সাহিত্যে অস্পর্শ, যার প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ, নজরুল তাকে করলেন শুচিসুন্দর, তার প্রবেশ পথের নিষেধের আগল দিলেন তুলে। তিনি লিখলেন—

"শাতিল আরব শাতিল আরব
পূত যুগে যুগে তোমারে তীর,
শহীদের লোহু দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।"

আরবী-ফার্শী শব্দের এমন সুন্দর ও সাবলীল ব্যবহার দেখে কাব্যরস পিপাসুরা বিস্মিত হলেন। যে-সব হিন্দু-সাহিত্যিকরা—বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্শী শব্দের আমদানীকে উৎপাত বলে মনে করে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন, তাদের কানেও তা মধুর হয়ে বাজলো।

নজরুলের "শাতিল আরব" কবিতাটি সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন: "ঐ এক কবিতাতেই বুঝলাম—কাজীর কবি-প্রতিভা অনন্য সাধারণ। বাংলার কাব্য-কুঞ্জে সেদিন আমি নতুন সুর শুনলাম। ঐ কবিতায়

আমি পেলাম—নতুন ছন্দ, নতুন ভাষা, নতুন ভঙ্গী। ফোরাত ও দজলা যেমন মিলিত হয়ে হয়েছে শাতিল আরব—অন্তরঙ্গের সঙ্গীত ও বহিরঙ্গের সঙ্গীত, বাংলা ভাষার ধারা ও পার্শী ভাষার ধারা, বাংলার সংস্কৃতি ও ইরাণের স্মৃতি তেমন মিলছে ঐ নামের কবিতাটিতে।… যে সকল পার্শী শব্দকে পূর্বে কেউ কাব্যের মধ্যে স্থান দিতে সাহস করেনি, কাজী সে-সকল শব্দ দিয়ে কাব্যের অঙ্গশ্রী বর্দ্ধন করেছে।"

"শ.তিল আরব" এর মতো এমন আরো বহু কবিতায় গজলে যেমন 'ফাতেহা দোয়াজ দাহম,' 'ফাতেহা ইয়াজ দাহম,' 'কামাল পাশা,' 'আনোয়ার পাশা,' 'চিরঞ্জীব জগলুল' 'ওমর ফারুক' 'কোরবাণী,' মোহররম,' 'ঈদ,' 'খালেদ,' 'খেয়াপারের তরণী' ইত্যাদি আরবী-পার্শী শব্দবহুল কবিতা বাংলার কাব্য সম্পদ বাড়িয়েছে শতগুণে; পথহারা বাংলার মুসলমানকে দিয়েছে পথের সন্ধান, পুনর্জাগরণের মন্ত্র। কাব্যসুন্দরীকে করেছে নতুন ভূষণে মণ্ডিতা।

এ-কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, আজকের এই যে পাকিস্তান, এই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলেও নজরুলের পরোক্ষ দান ছিল যথেষ্ট।

প্রচলিত ধ্যান-ধারনার ও চিন্তা ভাবনার পথে নজরুল বিচরণ করেন নাই। নিজের ক্ষমতা বলে তিনি নিজস্ব এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্ত্তী কালে—তাঁর সৃষ্ট পরিমণ্ডলে জুটেছেন অনেক অনুসারী। নজরুলের এই যে নিজস্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টির ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই নজরুলকে দিয়েছে যুগ স্রষ্টার মর্য্যাদা। তাঁর এই পরিমণ্ডল শুধু কাব্য নিয়েই নয়—বাংলার এক ঘেঁয়েমি সঙ্গীতেও তিনি এনেছেন বৈচিত্র্য। ইরাণের বুলবুল আর বাংলার কোকিল এক হয়ে সুর ঢেলেছে তাঁর সঙ্গীতে।

তাঁর 'বিষের বাঁশীর' বিষ জ্বালায় ও 'অগ্নিবীণা'র দাহিকায় অসহ্য হয়ে যেমন ইংরেজকে এ-দেশ হতে তাড়াতাড়ি গুটাতে হয়েছে তার সাম্রাজ্য, তেমনি তাঁর 'নতুন চাঁদের' চিরন্তন বিমল সুধা-পান করে বাঁধনমুক্ত দেশবাসী হয়েছে মুগ্ধ। যুগ-প্রতিভা না হলে এমনটি সম্ভব হতো না। তাই মনে হয়, নজরুল নিজেই একটা যুগ, নিজেই একটা ইতিহাস।

সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা তাঁর প্রেম-সুন্দর মনকে স্পর্শ করতে পারে নাই। নির্য্যাতীত হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁর কাব্যে সমান স্থান পেয়েছে। উভয়ের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আশা-আকাঙ্খার কথা তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি হিন্দুর "কালো মেয়ের (কালীর) পায়ের তলে" যেমন "আলোর নাচন" দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন, তেমনি মুসলমানের "আমিনা মায়ের কোলে মধু পূর্ণিমার চাঁদের দোলা" দেখেও খুশীতে দিওয়ানা হয়েছেন। কেউ অশ্রদ্ধা পান নাই।

নজরুল চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য, অন্য কোন কবির মধ্যে তা দেখাই যায় না। সে-জন্য নজরুল হিন্দু-মুসলমানের এত প্রিয়। তাঁকে নিয়ে এত কাড়াকাড়ি! এ-হেন নজরুলের প্রতি আমাদের একশ্রেণীর তথাকথিত কবি-সাহিত্যিকের অকারণ কটাক্ষপাত, দুষ্টতা ও অসুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় ছাড়া এই আর কিছুই নয়। *

* ৭ই জুন ১৯৫৯, "রওনক"-এর সাহিত্য সভায় পঠিত।

ঝঁকে ঝঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশতের পর)

॥ চব্বিশ ॥

মোহাম্মদ পুর হইতে ফিরিয়া আসার পর হোমায়েরা কোন কাজেই মন বসাইতে পারিতেছিল না। তাহার সকল উৎসাহ যেন কর্পূরের মত হাওয়ায় উবিয়া গিয়াছে। কয়েকটা দিন এ-ভাবেই কাটিল। কিন্তু ক্রমে হোমায়েরা নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কঠিন পাথরের দুর্লংঘ্য পাহাড় ডিঙ্গাইতে গিয়া তাহার ক্লান্ত মন যেন ঝিমাইয়া উঠিয়াছে। মনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগে অলক্ষ্যে এক অপরাধ সচেতনতা তাহার চিত্তকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। হোমায়েরা ইহাতে ভীতও হইল। দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সময়ের মাথায় পা রাখিয়া সে চরিয়া বেড়াইতে পারে; কিন্তু মন যদি নিজের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা করিতে থাকে তখন ত আর দাঁড়াইবার জায়গা থাকিবে না। হোমায়েরা ভাবিতে লাগিল, ইহাকেই সম্ভবতঃ অনুশোচনার মর্ম্মদাহ আর প্রকৃতির প্রতিশোধ বলা হইয়া থাকে।

হোমায়েরা বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত একদিন জামালের খোঁজ করিতে বাহির হইল। জামালের কথা অনেকবারই তাহার মনে হইয়াছে। আশাও করিয়াছে, হয়ত জামাল তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে। তবে এই প্রথম হোমায়েরা কিছুতেই জামালের উপর রাগ করিতে পারিল না। কেন জামাল তাহার খোঁজ করিবে? হোমায়েরার মনে হইতে লাগিল, সে ছাড়া দুনিয়ার যেখানে যে যা করিতেছে, ঠিকই করিতেছে।

জামাল সম্পর্কে হোমায়েরাকে কেহ কোন খবর দেয় নাই, সেও এ-সম্পর্কে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। সে সোজা জামালের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে বিস্মিত হইল। জামালের দরজায় তালা ঝুলিতেছে। পাশেই হিজিবিজি হরফে 'টু-লেট' লেখা রহিয়াছে।

জামাল কি বাসা বদলাইয়াছে? কাহার কাছে খোঁজ নেওয়া যায় প্রথমে হোমায়েরা বুঝতে পারিল না।

পরে হোমায়েরা এ-সম্পর্কে অনেক খবর সংগ্রহ করিল। জামাল বাড়ী বদল করে নাই, সে শহর ছাড়িয়া দিয়াছে। আপাততঃ সে ছুটি লইয়া গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছে। বদলী হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছে। হোমায়েরা শুনিল, যতদিন বদলী হইতে না পারিয়াছে, ততদিন সে ছুটি নিয়াই কাটাইবে।

আগে হইলে হোমায়েরা বিদ্রূপের হাসি হাসিত। জামালের এই চিত্ত দুর্ব্বলতাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে মনে ব্যঙ্গ করিত। কিন্তু আজ কিছুতেই হোমায়েরা নিজের মনকে সহজ করিয়া তুলিতে পারিল না। হাসা ত দূরের কথা! তাহার সারা চিত্ত ঘিরিয়া কেমন যেন এক অস্বস্তির মত অনুভূতি পাক খাইয়া খাইয়া তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল।

জামাল হোমায়েরার উপর রাগ করে নাই। সে মুখে যাহা বলিয়াছে, তাহাই যে তাহার মনের কথা, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় হোমায়েরার ছিল না। সংশয় প্রকাশের কারণ সে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু! হোমায়েরা নিজের মন হইতে এই কিন্তুকে ত কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না।

হোমায়েরা পিছন ফিরিয়া তাকায় নাই, সামনেই আগাইয়া গিয়াছে। মন তাহার দ্বিধামুক্ত ছিল। আজ বারবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মন তাহার নিজেকেই বিচার করিতে চাহিতেছে। পদে পদে প্রশ্ন জাগিতেছে, তবে কি হোমায়েরা আগের মনের জোর হারাইতে বসিয়াছে?

হ্যাঁ, জামাল তাহাকে অপরাধী করে নাই। হোমায়েরার খেলাকে সে আগের মতই নির্ব্বিকার মনে বিনাপ্রশ্নে উপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু জামাল যে ভাবেই ইহাকে বিচার করুক না কেন, তাহার দুঃখের মাঝখানটিতে সে যে হোমায়েরাকেই দেখিতে পাইবে, এ-কথা হোমায়েরা আজ অস্বীকার করে কি করিয়া? নিজের কাছে নিজের অপরাধ ত আর গোপন নাই। নিজের সম্পর্কে এত কঠিন প্রশ্নের মোকাবেলা করিতে হয় নাই বলিয়া হোমায়েরা ছিল একান্ত ভারমুক্ত। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, সে যেন অতলে তলাইয়া যাইতেছে।

মোবারকের কথা সে ভাবে না। মোবারক সুখে আছে। দিকভ্রান্ত জাহাজ বন্দরের ঠিকানা খুঁজিয়া পাইয়াছে। মোবারকের জন্য এটাই সম্ভবত দরকার ছিল। মোবারক হয়ত আজ তাহাকে মুক্তির আনন্দে আশীর্ব্বাদই করিতেছে।

কিন্তু বেচারা জোবায়ের! জোবায়ের অন্ধ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিল, আজ ঘুর্ণাবর্ত্তের আকর্ষণে তলাইয়া গিয়াছে। এ-জন্যও কি হোমায়েরা দায়ী! সে যদি একেবারে তলাইয়া যাইত তাহা হইলেও হয়ত ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। কিন্তু জোবায়ের প্রতিদিনের অস্তিত্বের দুঃখের কাহিনীকে স্মৃতির জালে জড়াইয়া তুলিতেছে। হাজার লোকের অভিযোগের মুখে কৈফিয়ৎ দেওয়ার অনেক কিছুই হোমায়েরার আছে, আজও হয়ত সে তাহা তুচ্ছ করিতে পারে। কিন্তু নিজের মনে অভিযোগ উঠিলে তাহার যে কোন কৈফিয়ৎ নাই, সে কথা বলিয়া হোমায়েরা আজ কাহার কাছে সান্ত্বনা পাইবে?

মৃত অতীতের প্রেতাত্মা যেন দাঁত বাহির করিয়া বীভৎস হাসি হাসিতেছে। অন্যায় কি এক সায়েমেরই ছিল? কিন্তু হোমায়েরা আর ভাবিতে পারে না।

জাফর বাহিরে গিয়াছিল। সে জন্য হোমায়েরা আরও বেশী একা একা বোধ করিতেছিল। একাকিত্ব লইয়া দুর্ভাবনা তাহার তেমন ছিল না। কিন্তু এবারকার একাকিত্বের রূপ যেন আলাদা। সে ইহাকে হজম করিতে পারিতেছিল না, বর্জ্জন করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না। দিনগুলি যেন পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে। ইহা তাহার নিজেকেই নিজের কাছে অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সেদিন মার্কেটিং করিয়া ফিরিয়া আসিয়া হোমায়েরা জুলির কাছে যখন শুনিল জাফর সাহেব ফোন করেছিলেন, তখন তাহার যে আনন্দ হইল, তাহার মনে হয়, এমন আনন্দ যুগ যুগ হইতে আর কখনও অনুভব করে নাই।

হোমায়েরা জিজ্ঞেসা করিল, জাফর সাব তা হলে এসেছেন?

জুলি বলিল, ফোন করেছিলেন, আপা।

হোমায়েরা বলিল, ফোন করেছিলেন, ফোন করেছিলেন, তা ত একশ' বার তোমার কাছে শুনেছি। ফিরে না এসে কি ফোন করতে পারেন না, তাই আমি জিজ্ঞেস করছি।

জুলি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, তাই ত আমি বলছি, আপা।

জুলির মুখের দিকে চাহিয়া হোমায়েরা হাসিয়া ফেলিল। তাহাকে আদর করিয়া বলিল, আচ্ছা যাও।

ফোন তুলিয়া হোমায়েরা কিছু সময় ভাবিল, তারপর আবার রাখিয়া দিল। জাফর ফিরিয়া আসিয়াছে, এই খবরটিই তাহাকে সজীব করিয়া তুলিল। তাহার নিজের মাঝে একটি কিশোরী মন জাগিয়া উঠিয়াছে। বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলিয়া দুনিয়ার রহস্যে সে মুগ্ধ হইতে চায়। আনন্দের আহ্বানে গোপন কিশলয়টি জাগিয়া উঠিয়াছে। হোমায়েরা লঘুপদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল।

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল অনেকদিন ভাল করিয়া চুল বাঁধা হয় নাই। নিজের পরনের শাড়ীখানা অত্যন্ত ময়লা মনে হইতে লাগিল।

হোমায়েরা চুলবাঁধিয়া কাপড় পাল্টাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। জাফর যখন ফিরিয়াছে তখন নিশ্চয়ই আসিবে। হোমায়েরার চঞ্চলতা জুলির নজর এড়ায় নাই। সে কয়েকবার বিস্মিত ভাবে হোমায়েরার দিকে চাহিয়া গিয়াছে।

হোমায়েরা তাহাকে একবার ধমকও দিয়াছিল, কি এমন হা করে দেখছিস?

জুলি আসল কথা গোপন করিয়া বলিয়াছিল, আপনাকে নয়, আপা।

হোমায়েরা বলিয়াছিল, যা, এমন বোকার মত হা করে থাকতে নাই।

একটু বেলা করিয়াই জাফর আসিল। তাহাকে দেখিয়া হোমায়েরা কোন কথা বলিল না।

জাফর তাহার কাছে গিয়া হাসিয়া বলিল, চুপ করেই থাকবে?

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, কি বলব?

জাফর বলিল, কোন কথাই কি বলার নাই? কোথায় ছিলাম, কবে এলাম কিছুই কি জিজ্ঞেস করার নাই।

হোমায়েরা বলিল, ফোনেই যখন এ-সব করা যায় তা হলে এখন আর বলে কি হবে?

জাফর হোমায়েরার চোখের দিকে চাহিল। হোমায়েরার এই কণ্ঠস্বর তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। হোমায়েরার

কণ্ঠে যে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতে পারে তাহা তাহার বিশ্বাসই হইতে চাহিল না। তাহার হৃদয় তোলপাড় করিয়া উঠিল। জাফর তাহার দিকে আরও গভীর ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

অভিমান হয়েছে ?

দূর্, অভিমান হবে কেন ?

জাফর বলিল, অস্বীকার করো না, হোমায়েরা, তোমার মন যা চাচ্ছে তাই বলো। বলো, আমি তোমার কাছে ছুটে না এসে ফোন করায় তুমি আমার উপর রাগ করেছো। আমি তোমার অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য চেষ্টা করি। নারী পুরুষের সম্পর্কের মাঝখানে মান অভিমান না থাকলে তা স্বাভাবিক হতে পারে না। তুমি এটাকে জোর করে কৃত্রিম করে রেখো না হোমায়েরা।

জাফরের মুঠিতে হোমায়েরার হাত কাঁপিয়া উঠিল। হোমায়েরা ধীরে ধীরে হাত মুক্ত করিয়া নিয়া বলিল, বসো। মাঝে মাঝে তুমি এত ভাব-প্রবণতা দেখাও যে সেটাকে দস্তুর মত নাটকীয় মনে হয়।

জাফর বলিল, জীবনে নাটকই যদি না-ই থাকলো তা হলে থাকলো কি! তুমি এ-ব্যাপারটা বুঝতে চাওনা বলেই ত নাটক যখন জমে উঠতে চায়, তখনই তুমি তাতে বাদ সেধে বসো।

জাফর বসিয়া পড়িয়া বলিল, হঠাৎ মনে বড় আশা জন্মে গিয়েছিল, তোমার অভিমান ভাঙ্গাবার সুযোগ বোধ হয় আমার এলো। কিন্তু তোমার মন চাইলেও তুমি সে সুযোগ দিতে রাজি নও।

হোমায়েরা বলিল, কি যে বলছ তা তুমি নিজেও হয়ত জানো না।

জাফর বলিল, বোধ হয় না।

তারপর জাফর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, এসে যা শুনলাম, সেটা রীতিমত নাটক। জামাল নাকি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে, সত্য নাকি ?

হতে পারে।

কেন তুমি কি কিছুই জানো না ?

হোমায়েরা বলিল, কিছু কিছু আমি শুনেছি, তবে তা অন্যরকম। এতে নাটক কোথায় ?

জাফর বলিল, এটা নাটক না ? বিয়ে হলো না, তাই মনের দুঃখে বনবাস ! এ-সব দুর্ব্বল চিত্ত লোকেরা দুনিয়ার ক্ষতিকর।

হোমায়েরা কিছু সময় মৌন থাকিয়া বলিল, তুমি যা খুশি তাই ভাবতে পারো। কিন্তু আমি ভাবছি, তোমরা সবাই মিলে তার যে ক্ষতি করলে সেটা না আমাদের পক্ষে অপূরণীয় হয়ে উঠে।

জাফর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কি যে বলো ! এ-জন্য কিছুই তোমাদের ভাবতে হবে না। স্রোতের গতি একটু ঘুরিয়ে দাও, দেখবে কোথায় ভেসে গেছে। এ-সব ছেলে ভেসে যেতেই ভালবাসে। নিজেরা যে কিছু জোগাড় করে নেবে সে ক্ষমতা এদের নাই, এটুকুই যা অসুবিধা।

হোমায়েরা বলিল, তুমি কি বলতে চাও একটু খোলাসা করে বলো।

জাফর বলিল, খোলাসা করেই আমি বলেছি। আরেকটি মেয়ে জুটিয়ে দাও, দেখবে, জামাল ত জামাল, এমন হাজার জামাল ঠিক হয়ে গেছে।

হোমায়েরা বলিল, এটা কি তুমি বিশ্বাস করো ?

জাফর জওয়াব দিল, আমি বাস্তববাদী।

জাফরের জওয়াব শুনিয়া হোমায়েরা কোন কথা বলিতে পারিল না। কিছু সময় পর সে উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। জাফর খুঁটিয়া খুঁটিয়া হোমায়েরার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিতেছিল, আর তাহার আশ্চর্য্য হওয়ার মাত্রাটা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। হোমায়েরাকে সে সম্পূর্ণরূপে নূতনভাবে দেখিতেছে। আজ প্রথম হইতেই জাফর লক্ষ্য করিতেছে, তাহার মুখের কাঠিন্যকে ছাপাইয়া একটি নরম অভিব্যক্তি বারবার ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। হোমায়েরা জোর করিয়া কঠিন হওয়ার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব তাহাকে জয়ী না করিয়া শুধু ক্লান্ত করিয়াই তুলিতেছে।

হোমায়েরার মুখের উপরের এই মধুর ক্লান্তি জাফরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। জাফর ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কিন্তু মন দিয়া অনুভব করিতেছিল, নিজের রচা ব্যূহ হইতে বাহির হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ লুটাইয়া দেওয়ার জন্য হোমায়েরা ভিতরে ভিতরে তৈয়ার হইয়া উঠিয়াছে।

জাফর উঠিয়া গিয়া হোমায়েরার পিছনে দাঁড়াইল। বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রাখিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে জাফর হোমায়েরার ঘাড়ের দিকে চাহিয়াছিল। কিছুক্ষণ এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জাফর জিজ্ঞাসা করিল,

তুমি আমার উপর রাগ করেছ, হোমায়েরা ?

না ত।

জাফর বলিল, আমার বুঝা উচিত ছিল, হাজার হলেও জামাল তোমার আত্মীয়। কিন্তু সত্যি বলছি হোমায়েরা আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি মুখ খুলে না বললেও, মেরী-জামালের বিয়ে যেন না হয়, সেটাই ছিল তোমার একান্ত ইচ্ছা। তুমি সন্তুষ্ট হবে মনে করেই এদের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে আমি এত আগ্রহ দেখিয়েছি।

হোমায়েরা বলিল, দোষ আমারই !

জাফর বলিল, দোষের কথা নয়, হোমায়েরা। জীবনে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, যা হবার হয়েছে, এ-নিয়ে মন খারাপ করে লাভ কি ?

হোমায়েরা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এ-কথা তোমার কাছে বারবার শুনছি। তাই আমারও ইচ্ছে হচ্ছে তোমার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলি, আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না।

এতক্ষণে জাফর বুঝিতে পারিল কোথায় তাহার ভুল হইয়াছে। নিজের বোকামীর জন্য তাহার অনুশোচনা হইতে লাগিল। জাফর বলিল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, হোমায়েরা।

হোমায়েরা বলিল, কোন্‌টা যে ভুল, আর কোন্‌টা যে ঠিক, তাই আমার ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

জাফর বলিল, তোমার সাথে আমার পরিচয় অল্প-দিনের নয়। আরও কি তোমার পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে ? এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বুঝতে পেরেছ।

কিছুই না।

জাফর বলিল, মানুষের বুঝার শেষ নাই, হোমায়েরা। যত দেখবে, ততই আরো বুঝার ইচ্ছে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত্তে প্রতিটি শব্দ যাচাই করে কোথাও কুল খুঁজে পাবে না। কিছুটা না বুঝাকে মেনে নিয়েই মনস্থির করা দরকার।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বলো।

জাফর বলিল, আমি বলি—

হোমায়েরার দুই বাহু শক্ত মুঠিতে ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া জাফর বলিল, আমি বলি—

তাহাকে বাধা দিয়া হোমায়েরা বলিয়া উঠিল, ইস্‌, লাগে।

জাফর লজ্জিত-ভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, আমি বলি—

হোমায়েরা মধুর-ভাবে হাসিয়া বলিল, চল, ওদিকে গিয়ে আমরা বসি।

জাফর বলিল, হ্যাঁ, চল বসি গিয়ে।

জাফর বসিলে হোমায়েরা তাহার পাশে বসিল। কি-ভাবে যে কথা শুরু করা যায় জাফর তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। হোমায়েরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

এক মিনিট বসো, আমি আসছি—বলিয়া হোমায়েরা দ্রুত পায় বাহির হইয়া গেল। জাফরের মনে হইল, হোমায়েরা তাহাকে ভাবিবার সময় দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কি ভাবিবে, কেনই বা এত ভাবিবে ? ভাবার কি আছে ইহাতে ?

জাফর উঠিয়া কামরার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া আবার বসিল। নিজের দিকে চাহিয়া তাহার হাসি পাইল। অনভিজ্ঞ তরুণ যুবকের মতই স ব্যবহার করিতেছে। কি আশ্চর্য্য ! কেন তাহার এ-অবস্থা হইয়াছে ? সে ত আর কচি খোকাটি নয় !

পায়ের উপর পা তুলিয়া জাফর শক্ত হইয়া বসিল। বাটারফ্লাই গোফ-জোড়াকে সে একবার নাচাইয়া লইল। অনুচ্চ-কণ্ঠে বলিল, যত সব !

হোমায়েরা আবার যখন কামরায় আসিয়া ঢুকিল, জাফর সে সময় আরেকটু আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হোমায়েরা ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আবেশ সারা কামরায় ছড়াইয়া পড়িল যে, জাফরের মনে হইল তাহার সকল সঙ্কল্পই ভাসিয়া যাইতেছে।

হোমায়েরা জাফরের পাশে বসিয়া আবার অত্যন্ত মধুর হাসি হাসিল। জাফরের মনে হইল বলে, হোমায়েরা, তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছো।

কিন্তু জাফরের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। হোমায়েরার চোখে যে সম্মোহন শক্তি আছে, আজই জাফর সেটা ভয়ানক-ভাবে উপলব্ধি করিল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হোমায়েরার সামনে এদিক ওদিক পায়চারী করিল। সে স্পষ্ট বুঝিল হোমায়েরার দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। এক সময় হোমায়েরার সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল।

হোমায়েরার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি তোমাকে বিয়ে করবো, হোমায়েরা।

হোমায়েরা আহত হইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কি ?

জাফরের নিকট হইতে এমনি একটি প্রস্তাবে হোমায়েরার সারা সত্তা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের বুকে যে মাধুর্য্য ফেনাইয়া উঠিতেছে তাহাই বারবার হোমায়েরাকে নরম করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু জাফর কথাটি স্থূলভাবে বলায় সে ভয়ানক ধাক্কা খাইল। তাহার মনে হইল লোকটি অসভ্য বর্ব্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। সে স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

হোমায়েরার পাশে বসিয়া জাফর দুইহাত দিয়া তাহার বাঁ হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমি তোমায় বিয়ে করবো, তুমি অমত করো না, হোমায়েরা।

ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া নিয়া হোমায়েরা দূরে সরিয়া গিয়া কঠিন স্বরে বলিল, না।

না ?

জাফর নড়িতে চড়িতে পারিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, না, এই তোমার শেষ কথা হোমায়েরা ?

হোমায়েরা তেমনি ভাবে বলিল, হ্যাঁ।

জাফর কিছু সময় বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর পা টানিয়া টানিয়া সে চলিতে লাগিল।

সে দরজার বাহিরে গেলে হোমায়েরা ডাকিল, শোন।

জাফর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ?

হোমায়েরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে জাফরকে বলিল, বস।

জাফর কোন প্রশ্ন না করিয়া বসিয়া পড়িল। হোমায়েরা চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে জাফর সেদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, বল।

হোমায়েরার মুখে আবার সেই হাসি ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে তাহার হাতের আঙ্গুল জাফরের চুলের ভিতর-গিয়া খেলা করিতে লাগিল। জাফর হা করিয়া হোমায়েরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হোমায়েরা বলিল, ওসব কথা আজ থাক। তোমার মন আজ ভাল নেই। আরেকদিন বরঞ্চ বলো।

জাফর জিজ্ঞাসা করিল, আরেকদিন বলবো ?

হোমায়েরা বলিল, ইচ্ছে না হলে বলো না।

জাফর গভীর স্বরে ডাকিল, হোমায়েরা।

হোমায়েরার একখানা হাত কাঁধের উপর দিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া জাফর নারবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হোমায়েরা সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এত কি দেখছো ?

জাফর জওয়াব দিল, তোমাকে।

হোমায়েরা রাগের ভান করিয়া বলিল, আজেবাজে কথা বললে কিন্তু আমি চলে যাবো।

জাফর ধীরে ধীরে বলিল, না, না, আজেবাজে ত দূরের কথা, ভাল কথাও আর বলবো না। তোমার জন্য সবই ছাড়তে পারি হোমায়েরা।

হোমায়েরা শাসনের সুরে বলিল, ফের।

জুলি বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আর অস্বচ্ছ স্বরে বলিতেছিল, কি মজা। কি মজা।

ঘর হইতে হোমায়েরা তাহাকে ডাকিল। তাহাকে কাছে টানিয়া হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্ছে ?

কিছুই না, আপা।

এদিকে এসো।

হোমায়েরা তাহাকে অন্য কামরায় লইয়া গেল। সুটকেস হইতে সকল কাপড় টানিয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিল। তারপর একখানা একখানা করিয়া জুলির গায়ের উপর রাখিয়া পছন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই তাহার পছন্দ হইতেছিল না।

হোমায়েরা সবগুলি একপাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া অপর সুটকেস হইতে নূতন বানারশীখানা তুলিয়া লইল। সে জুলিকে বলিল, আয়, এটা পর।

জুলি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, আমি পরবো ?

হোমায়েরা বলিল, হ্যাঁ, তুমি পারবে।

জুলি বলিল, না, না, আমি পারবো না।

হোমায়েরা তাহাকে টানিয়া আনিয়া বলিল, নে, যা বলছি তাই কর। বেজায় বকিসনে।

হোমায়েরা যেন ছেলে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সে অতি উৎসাহে জুলিকে নূতন শাড়ী পরাইতে লাগিল।

জুলি বিব্রতভাবে বলিল, বিয়ে ত আপনার আপা।

হোমায়েরা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, থাম্ দেখি ! তোর কি বিয়ে হতে নেই ?

জুলি লজ্জিত-ভাবে মুখ নত করিল। হোমায়েরা তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তোরও বিয়ে হবে রে, তোরও বিয়ে হবে।

জুলি লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। হোমায়েরা ডাকিল, জুলি।

জুলি মুখ না তুলিয়াই জওয়াব দিল, জি।

হোমায়েরা বলিল, তুই ঘন ঘন রহমানের ঘরে যাস্ কেন ?

জুলি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। সে বিস্মিত ভাবে হোমায়েরার দিকে চাহিয়া বলিল, কে বললো, আপা ?

হোমায়েরা গম্ভীর ভাবে বলিল, বলবে আর কে, আমি কিছুই টের পাই না মনে করো।

জুলি বলিল, আমি যাই না, আপা।

হোমায়েরা ধমকের সুরে বলিল, ফের মিথ্যে বলা হচ্ছে !

জুলি কাঁপিতেছিল। বলিল, বিশ্বাস করুন, আপা, আমি মিথ্যে কথা বলছি না।

হোমায়েরা বলিল, না, তুমি যা বলছো, সবই সত্য বলছো! বড় সত্য বাদী হয়েছ। ভাল ছেলে, তাকে আমি রেখেছি, লেখাপড়া করে কাজের লোক হবে। তা না—

জুলি জড়িত কণ্ঠে বলিল, সত্যি, আপা, উনি না ডাকলে আমি যাই না। তাঁর ভাত-নাশ্‌তা—

হোমায়েরা বলিল, ফের তর্ক করছিস ? উনি না ডাকলে যাইনা। কেন যাবি ? নাশ্‌তা ভাত নিয়ে দেওয়ার লোক কি আর নাই ? আর সবাই কি মরেছে ? ওকেও তাড়াবো, তোকেও আমি তাড়াবো।

জুলি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার কোন দোষ নাই আপা।

হোমায়েরা জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি রহমানের দোষ ?

জুলি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, না, আপা।

তবে কি আমার দোষ ?

হোমায়েরার প্রশ্নে জুলি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না।

তাহার দিকে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া হোমায়েরা তাহাকে কাছে টানিয়া নিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল, কি আর এমন বললাম বল, কেঁদে যে ভাসিয়ে দিচ্ছিস ?

জুলি মাথা নত করিয়া রহিল। হোমায়েরা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ রে সত্যি করে বল দেখি, রহমানকে তোর কেমন লাগে ?

জওয়াব দিতেছে না দেখিয়া হোমায়েরা আবার জিজ্ঞাসা করিল, বল না রে !

জুলি জড়িত কণ্ঠে বলিল, আমি, আমি, আমি—

হোমায়েরা তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, হাঁ, হাঁ, বল !

জুলি আবার বলিল, আমি, আমি, আমি—

হোমায়েরা বলিল, তুমি কি ?

জুলি বলিল, জানি না, আপা।

হোমায়েরা বলিল, আমি জানি। রহমানকে কি আর আমি এমনি রেখেছি রে। পুরুষদের কাছে কিছুতেই নিজেকে হাল্‌কা হতে দিতে নেই, আমার এ-কথা মনে রাখিস। যতদিন নাগালের বাইরে, ততদিন ওরা আশমানের তারা গুণবে, আর হা হুতাশ করবে। কিন্তু হাতের কাছে পেলে ছুঁড়ে ফেলতে এদিক ওদিক ওরা তাকায় না।

জুলিকে নিজের অলঙ্কার পরাইয়া হোমায়েরা সাজাইতে লাগিল। বলিল, সব সময় সেজে গুজে ফিট ফাট হয়ে থাকবি কেহ যেন তোকে উপেক্ষা করতে না পারে।

শাসনের সুরে হোমায়েরা বলিল, কিন্তু খবরদার রহমানের কাছে যাবি না। দূরে দূরে থাকবি।

আয়নার কাছে জুলিকে টানিয়া নিয়া গিয়া হোমায়েরা বলিল, দেখতো এখন তোকে চিনা যায় কিনা ?

সস্নেহ দৃষ্টিতে জুলির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, রহমান তোকে কিছুতেই তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। কিন্তু এখন সাবধান।

মধুর হাসিয়া হোমায়েরা বলিল, তারপর একদিন—। বুঝলি ত ?

জুলি সলজ্জ দৃষ্টিতে চকিতে হোমায়েরার দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল।

(ক্রমশঃ)

সায়াহ্নে

আজিজুর রহমান

নীড়ে ফেরা পাখীর পাখায়
চিহ্ন এঁকে রেখায়,
ক্লান্ত ধূসর সন্ধ্যা নামে
দিগ্বলয়ের সীমায়।

স্তব্ধ মাঠে বিষাদ জাগে
ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা লাগে
ম্লান গোধূলির অস্ত লেখায়—
বিদায় আলোর ব্যথায়।

সন্ধ্যামণির তিমির আঁচল
জড়িয়ে মুখের পাশে,—
রাতের চোখে নীরব মায়ায়
তন্দ্রা নেমে আসে।

ছলোছলো ছায়া উদাস
শীর্ণা নদীর জলের আভাস
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি জাগায়
আঁখির পাতায় পাতায়॥

উপন্যাস সাহিত্যের দশ বছর

আশরাফ উজ জামান

সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের আলেখ্যকেই বলা যেতে পারে উপন্যাস। কালক্রমে এই উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায় জাতির সামাজিক জীবনের ইতিহাস। ইংলণ্ডের ১৯ শতকের সামাজিক জীবনের ছবি তখনকার লেখিকা জেন অষ্টিনের চাইতে আর ভাল কে লিখেছেন? কোন সমালোচক বলেছেন: To study her books is to know what went on in English parsonage, village, town and country house at the begining of the 19th century.

আমাদের দেশের দশ বছরের উপন্যাস সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে জেন অষ্টিন সম্বন্ধে সেই উক্তিটাই মনে পড়ছে সবচাইতে আগে। আমাদের উপন্যাসে, আমাদের জাতীয় এবং সামাজিক জীবন কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে? গত দশ বছরে আমাদের জাতীয় এবং সামাজিক জীবনে ঘটনা ঘটেছে নেহাৎ কম নয়। কিন্তু আমাদের উপন্যাসের পাতায় আমাদের এই দশ বছরের জীবন রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

কথা উঠতে পারে আর্ট বা সাহিত্য সব সময়েই সমাজের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে ওঠে না। পিকাসো যে ছবি এঁকেছিলেন তাতে জীবনতত্ত্বের চাইতে মানুষের কল্পনা-রূপই কি বেশী ফুটে ওঠেনি?

কিন্তু ঠিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ-নজীর কতটা টেকসই হবে, বলা শক্ত। মানুষের সাধারণ জীবনকে নিয়ে লেখকের যেখানে কারসাজি করতে হবে সেখানে নানা রকম ইজমের চাপে পড়ে মানুষের অবস্থা যে ঠিক মানুষ থাকবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

উপন্যাসের আরো কয়েকটি দিক রয়েছে, বিস্মৃত ইতিহাস কিংবা ঘটনাকে গল্পের মাধ্যমে টেনে তোলা কিংবা দেশের ঐতিহ্যকে লোকের চোখের সামনে বড় করে প্রচার করা। আমাদের উপন্যাসে সমাজের সে দিকটাও প্রকটিত হয়েছে কিনা তাও বিচার করে দেখতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতার পর আমাদের সমাজ জীবনে ও ভাবধারায় বিপ্লব ঘটেছে অনেকখানি। যে বিপ্লবের বন্যা ধারায় ভেসে যেয়ে আমাদের মনের আবেগকে প্রশমিত করতে আকুল হয়ে হাত বাড়িয়েছি আমাদের দেশের সীমাকে লংঘন করে বাইরের জগতে। রাশি রাশি বিদেশী বাংলা ও ইংরেজী উপন্যাস এ ক'বছর আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে এবং বিদগ্ধ মনের খোরাক জুটিয়েছে।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্য জগত সমাজ ও রাজনীতি গণ্ডী ধারার বাইরে। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের দেশের সাহিত্যও যদি গড়ে না উঠে তাহলে সে দেশের দৈন্যতাই প্রকাশ পাবে।

আমাদের লেখকদের মধ্যে স্বাধীনতার আগেও যারা পরিচিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আবুল ফজল, মাহবুব আ'লম, শওকত ওসমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, মবিন উদ্দীন আহমদ, আবু রুশদ এবং শামসুদ্দিন আবুল কালাম। এই দীর্ঘ দশ বছরে আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে এঁদের অবদান হচ্ছে:

আবুল ফজলের—'রাঙ্গা প্রভাত,' মাহবুব আলমের—'গ্রামের মায়া', 'নবান্ন', আবুল মনসুর আহমদের—'জীবন ক্ষুধা', মবিন উদ্দীন আহমদের—'সুখচর', আবু রুশদের—'সামনে নতুন দিন।' শওকত ওসমান এবং আবু জাফর শামসুদ্দিন এই সময়ে কোন উপন্যাস রচনা করেন নি।

দেখা যাচ্ছে প্রবীণ লেখকদের দান আমাদের উপন্যাস ক্ষেত্রে খুব সামান্যই। জাতি গঠনের সময়ে যেখানে এঁদের দান অসামান্য হয়ে থাকা উচিত ছিল, সেখানে কেন সকলে সামান্য হয়ে গেলেন বলা শক্ত।

একটি কথা শোনা যায় যে মুসলমান সমাজে মেয়ে পুরুষের অবান্তর মেলামেশায় বাধা-নিষেধ থাকাতে আমাদের উপন্যাসের প্লট দানা বাঁধতে পারেনা।

নর ও নারীর অবাধ মেলামেশায় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সত্য; কিন্তু সেই সমস্যা সব সময়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তু নাও হতে পারে। হৃদয়াবেগ যেখানে রয়েছে প্রেম আর ভালবাসার সন্ধান সেখানে পাওয়া যাবেনা, সে কথাও মেনে নেওয়া শক্ত। তাছাড়া বিবাহ, তালাক, বহু বিবাহ এ-সব সমস্যা তো আমাদের সমাজের রয়েছেই।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় দীনতা মনে হয় আমাদের সমাজ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। আমাদের গল্প-উপন্যাস সাহিত্য অপরিপুষ্ট থাকাতে নিজের সমাজকে আমরা চিনতে পারিনি। সমাজ জীবন সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু শিক্ষা হয়েছে তা আমাদের নিজের সমাজের শিক্ষা ছিল না। শক্তিশালী লেখকদের মতবাদে ভেসে গিয়ে একদিন আমরা অন্য সমাজের সামাজিক বিধানকেই প্রায় নিজেদের বিধান বলে মেনে নিয়েছিলাম এবং সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান সাহিত্য। কাজেই প্রভাবমুক্ত সাহিত্য যতদিন তৈরী না হবে, আমাদের সাহিত্যের রূপও আপন করে ধরা পড়বে

না। আমাদের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে মুক্ত হতে হবে স্বাধীন হতে হবে বৈদেশিক অনুপ্রেরণা ছাড়িয়ে, তবেই না তারা আমাদের আপন জন হয়ে উঠতে পারবে।

সাহিত্যের যারা নব বাহক তারাও প্রভাব মুক্ত হয়ে উপন্যাস কেন স্বরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি সেটাও ভাববার বিষয়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, 'জিনিয়াসের' আবির্ভাব না হলে সাহিত্যের রূপ বদলায় না, আর জিনিয়াস কাল আর যুগে এক আধ বারই দেখা দেন; কিন্তু সেই জিনিয়াসের আবির্ভাবের ক্ষেত্র তৈরী করতে ত হবে এ-কালের লেখকদেরই। যদি পথ তৈরী না থাকে তবে জিনিয়াসও আসবেন না। কাজেই কোন লেখকের দানই সমাজ বা জাতির কাছে কম মূল্যবান নয়। 'জিনিয়াস' হয়তো পথের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন—কিন্তু পথকে চালু রাখতে হয় কম 'জিনিয়াস' লেখকদেরই। কাজেই তাদের দানেই সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বেশী।

এখন দেখা যাক, এই সমৃদ্ধির পথে আমাদের উপন্যাস সাহিত্য কতটা এগিয়ে এসেছে। প্রবীণ লেখকদের বাদ দিয়ে এ-যুগে যারা আমাদের উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হচ্ছেন—কাজী আফসারউদ্দিন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কাজী আবুল হোসেন, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, আকবর হোসেন, আবু ইসহাক, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান, নুরুল আলম, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, সরদার জয়েনউদ্দীন ও সৈয়দ শামসুল হক।

প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বর্তমানে যাঁরা উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এঁর লেখা উপন্যাস 'খরতরঙ্গ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

মেয়ে লেখিকাদের মধ্যে দৌলতুন্নেছা সম্প্রতি 'পথের পরশ' নামে একটি বিরাট উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসটির স্থান, কাল ও বিষয়বস্তু সময়োপযোগী হয়েছে কিনা, তা বিচার সাপেক্ষ।

কিন্তু উপন্যাসের বিচার শুধু বিষয়বস্তু কিংবা সমস্যা নিয়েই সব সময়ে করা যায় না, লেখকের শিল্পী কুশলতার ছাপও উপন্যাসের পাতায় পাতায় মেলে ধরা চাই, যাতে পাঠকের মন বিক্ষিপ্ত না হয়ে ওঠে বই পড়তে পড়তে।

ঔপন্যাসিকদের মনস্তত্ত্ববাদী ত হতে হবেই। নায়ক নায়িকার মন তার যে ভাবে জানতে হবে পড়ুয়ার মনকেও জানতে হবে তার ততখানি করে। সুখের বিষয় আমাদের নতুন লেখকরা এ-বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক কিংবা ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের সকল লেখকেরাই যেন এক রকম নির্বিকার রয়ে গেছেন। কারণ সন্ধান করলে মনে হয় আমাদের ঐতিহ্য এবং বর্তমান জীবন সমস্যা নিয়ে আমরা অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। খুঁজলে আমাদের ঐতিহ্য গৌরবময় ছিল না, এ-কথা বলা চলে না। আমাদের পুঁথি সাহিত্যে, গ্রাম্য গাঁথায়, সামাজিক বিধিলিপিতে খুঁজলে হয়তো অনেক উপাদানই পাওয়া যাবে। উপন্যাসে শুধু সমাজের নিকৃষ্ট দিকটা টেনে আনাই বড় কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে লেখককে পথের সন্ধানও দিতে হবে। আকবর হোসেন, বেদুঈন সমশের তাঁদের উপন্যাসে সমাজের দোষনীয় চিত্রগুলিই শুধু এঁকেছেন; কিন্তু পথের সন্ধান কোথাও তাঁরা বাতলে দেননি। উপন্যাসকারের যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বাক-সংযমের প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় এঁদের মধ্যে তার যেন একান্তই অভাব।

এই দশ বছরে যে দুটি উপন্যাস আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছুমাত্র চমক দিতে পেরেছে, তা'হলো সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর—'লাল সালু' ও আবু ইসহাকের—'সূর্য্য দীঘল বাড়ী।' লাল সালুতে ঢাকা কবরের নীচেকার এক রহস্যময় কাহিনীকে উদ্ভাসিত করা হয়েছে 'লাল সালুতে'।

মানুষ সব চাইতে বেশী ভয় করে মৃত্যুকে। কবরের মাটি সেই মৃত্যুরই সাক্ষী। যে মৃত, জীবন্ত মানুষের চাইতে সে খোদার আরো সান্নিধ্যে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মৃত পীর ফকিরের দরগায় আমরা মানত করি, শিন্নী দেই, দোয়া ভিক্ষা করি। লাল সালু সৃষ্টি হয়েছে মানুষের অন্তরের সেই দুর্বলতাকে সহায় করে। পীরের দরগায় কেউ যদি অভিভাবক হয়ে উঠেন, তিনিও প্রায় পীরের সমপর্যায়ে পৌঁছে যান এবং পীরের দোহাই দিয়ে সমাজে তার প্রতাপ হয় অসীম। সমাজের বিধি নিষেধের ব্যবস্থা তখন তিনি করেন নিজের কার্য সিদ্ধির জন্য, এবং মানুষও সহজে তার সেই কথা মেনে নেয়।

লাল সালুর আড়ালে ঢাকা এক নতুন গল্পের সন্ধান দিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্। এ-উপন্যাসের ভাবধারা, ভাষা পরিস্থিতি সবই আমাদের নিজস্ব।

আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ীর' নায়ক-নায়িকাকেও সহজেই মেনে নেওয়া যায় আমাদেরই সমাজের মানুষ বলে। গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় আমাদের চাষী জীবনে যে ভাঙ্গন ধরলো সেই জীবন ধারাকেই টেনে এনে রচনা করা হয়েছে 'সূর্য দীঘল বাড়ীর' কাহিনী। কাহিনীতে নতুনত্ব না থাকলেও 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র যে ছবি আঁকা হয়েছে—তা সুন্দর এবং যে সকল নরনারী এই উপন্যাসের পটভূমিকায় বিচরণ করেছেন তারা সবাই আমাদের পরিচিত।

আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' বিরাট উপ

ন্যাস। কিন্তু 'আয়নাতে বিভিন্ন চরিত্রের যে জীবন রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল জীবন ক্ষুধার আয়নাতে সে রূপ যেন ফুটে ওঠেনি। হাস্য রসে আবুল মনসুরের হাত যতটা খুলেছিল করুণ রসে যেন ততটা খোলেনি। তবুও বইটির বিরাট পটভূমিকার নানা চরিত্রের আনাগোনা মাঝে মাঝে পাঠককে চমকও দিয়ে যায়।

আরো যে কয়টি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তা হচ্ছে কাজী আফসার উদ্দিনের 'চর ভাঙ্গার চর' আকবর হোসেনের 'কি পাইনি,' কাজী আবুল হোসেনের 'বন-জ্যোৎস্না', শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাশ বনের কন্যা'; আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীর 'বান' এবং সর্দার জয়েনউদ্দীনের 'আদিগন্ত'।

কিন্তু বিগত যুগের লিখিত 'আনোয়ারার' বিক্রির সংখ্যা সমষ্টিগত ভাবে আমাদের সব কটি উপন্যাসের মিলিত সংখ্যার চাইতেও বোধহয় কম নয়। এর কারণ মনে হয়, সমাজের বাস্তব রূপ আমাদের আধুনিক লিখিত উপন্যাসগুলির চাইতে 'আনোয়ারা'য় বেশী করে ফুটে উঠেছিল। পড়ুয়া নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে যে বইতে সহজে বুঝে উঠকে পারবে, সে বইয়েরই সমাদর হবে সাধারণের কাছে সব চাইতে বেশী।

সব বই মিলিয়ে দেখলে আমার মনে হয় ৫০টির বেশী উপন্যাস এই দশ বছরে আমাদের দেশে রচিত হয়নি। এই সময়ের মধ্যে আমাদের উর্দু সাহিত্যের উপন্যাসের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে প্রায় ৩০০। আমাদের সাহিত্য-সেবীদের পক্ষে এটা খুব গৌরবের কথা নয়।

কিন্তু এই কথা বলে শুধু সাহিত্যিকদের অপবাদ দেওয়া চলে না। প্রকাশকদের সহযোগিতা না থাকতে লেখকরা কোনদিনই একা বড় হয়ে উঠতে পারেন না। স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশে আমাদের প্রকাশকরা যতখানি আগ্রহ দেখিয়েছেন, এর এক দশমাংশ আগ্রহ দেখালেও আমাদের উপন্যাসের ক্ষেত্র আরো কিছু প্রসারিত হতো নিশ্চয়ই। উপন্যাসের বিষয়বস্তু দিয়ে পাঠকের মনকে বশ করবার আগে তার রূপ সজ্জাতেও পাঠকের মনকে প্রলুব্ধ করতে হবে। ভাল কাগজ, ভাল ছাপা ও ভাল বহিরাবরন বইকে পাঠকের কাছে প্রলুব্ধ করে তোলে নিশ্চয়ই।

ইদানীং প্রকাশিত কয়েকটি বই অঙ্গসজ্জার দিক থেকে পাঠকের কাছে উতরে গেছে। আমাদের প্রকাশকরা এদিকে যে কিছুটা নজর দিয়েছেন তা সুখের বিষয়।

এবার যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো তা অপ্রিয় হলেও সত্যি। যে দেশাত্মবোধ নিয়ে আমরা আলাদা রাষ্ট্র নিয়ে বিভিন্ন হয়ে এসেছিলাম, আমাদের সাহিত্য সেই প্রভাবে যেন মোটেই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। যারা এই দেশাত্ববোধ নিয়ে সাহিত্যের পথে কিছুটা এগিয়ে এসেছিলেন, এক শ্রেণীর সমালোচক তাদের প্রাচীনপন্থী এবং প্রগতিবাদী নয় বলে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের চোখে পড়া উচিত ছিল দেশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে যে সব বাংলা বই আমাদের দেশে আসে তাতে সেই দেশাত্ববোধ কতটা রয়েছে এবং সর্বপ্রকার বৈদেশিক ভাবধারা থেকে তাদের সাহিত্যকে মুক্ত করবার জন্য তাঁরা কতটা সচেষ্ট হয়েছেন।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা দরকার যে আমাদের লেখকরা উপন্যাসের চাইতে ছোট গল্প ভাল লিখেছেন এবং কয়েকজন নাম করা ছোট গল্প লেখক রয়েছেন যারা উপন্যাসের ক্ষেত্রে হাতই দেননি। দিলে বোধহয় ফল ভালই হ'তো।

তবুও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের লেখকদের যা দান, তাকে অসামান্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের নতুন লেখক যাঁরা আসবেন তাদের পথতো তৈরী করতে হবে প্রবীণ লেখকদেরই। কাজেই গত দশ বছরের উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যিকদের যে অবদান, তার সঠিক বিচার হবে আগামীকালেই।

নীড়ের স্বপ্ন

শ্রীবামা ঠাকুর

দেশে দেশে ঘোরা যাদের নেশা তাদের দলে আমি নই। তবু মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হই একঘেয়েমি কর্ম্মক্লান্ত মনটাকে মুক্তির আলোয় স্নান করাতে। ঘুরে আসি দু'পাঁচ দশদিন নতুন দেশ থেকে। তারপর আবার প্রবেশ করি আগের জীবনে। সেখান থেকে দিন গুণি। স্বপ্ন দেখি নতুন নতুন দেশের।

হেমন্তের এক রৌদ্রোজ্জল সকালে যখন মেলগাড়ীখানা এলাহাবাদ প্লাটফর্মে এসে ইন্ করল তখন একটা কুলির জন্যে প্লাট্‌ফর্মে নেবে তাকাতে লাগলাম এধার ওধার। আমার গন্তব্যস্থল এলাহাবাদ পৌঁছে গেছি। এবার কোন একটা মাঝারী হোটেলে ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করব।

তীর্থ দর্শনে আসিনি। এসেছি বেড়াতে। শহর দেখব, ঘুরব, ফিরব। তারপর একদিন দেশের ডাকে চেপে বসব গাড়ীতে।

—সাব কুলি।

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলুম আমার বোঝা।

কুলিটা মাল তোলবার জন্যে নিচু হতেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই।

—কিষণ লাল।

—বাবুজী। কিষাণ লালও চিনতে পারে আমাকে।

—তুমি এখানে?

—বাংলা মুলুক আউর আচ্ছা লাগল না বাবুজী, তাই চলে এসেছি। একটু হেসে বোঝা তোলে।

এক সময় বলি—বেহালাটা আছে তো।

—না বাবুজী, বাংলার জিনিষ বাংলায় রেখে এসেছি।

টাঙ্গায় উঠে ওর হাতে একটা টাকা দিই। নেয় ও। টাঙ্গা চলতে আরম্ভ করে।

বলে—নমস্তে বাবুজী।

কিষণ লালের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বছর দুই আগের এক মায়াময় সন্ধ্যাকে। আদিসপ্ত গ্রাম ষ্টেশন প্লাটফর্মে সেদিন বিকাল থেকে ট্রেনের আশায় বসে। ষ্টেশন থেকে জানিয়ে দিয়েছে আজ ট্রেনের দেরী হবে। কারণ আগে কোথায় লাইনে গণ্ডগোল হয়েছে।

আকাশে প্রথম বর্ষার ঝর ঝর ধারা। দুরন্ত বাতাসে জলের কণা উড়িয়ে কানে কানে বলে যাচ্ছে গোপন কথা।

—বাবুজী সেলাই হ্যায়?

মনটা হঠাৎ খিঁচড়ে যায়। বিরক্ত ভাবে লোকটার দিকে তাকাই।

একমাথা রুক্ষ চুলের জটা মাথায়, মুখ ভর্ত্তি দাড়ি, পরণে ছিন্ন মলিন কাপড়, কঙ্কাল সার চেহারা। আচ্ছা লোকই সেলাই চেয়েছে বটে।

—সেলাই হ্যায় বাবুজী? আবার প্রশ্ন করে লোকটা।

কোন কথা না বলে দেশলাইটা পকেট থেকে বার করে দিই। বিড়ি ধরিয়ে একটু দূরে বসে টানে লোকটা।

এক সময়ে বলি—তুমহারা নাম কিয়া?

—কিষণ লাল।

চোখ পড়ে লোকটার পাশে রাখা বেহালাটার দিকে। বলি—বেহালা তুমি বাজাও?

—জরুর। আপ শুনিয়ে গা?

কিষণ লাল বেহালাটা কাঁধে ফেলে আস্তে আস্তে ছড় টানে। বেহালার তারে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে করুন সুরের মুর্চ্ছনা।

আকাশে প্রথম বর্ষার ঝর ঝর ধারা। বাতাসের স্নিগ্ধ পরশে ঘুমের আমেজ মাখান আর কিষণ লালের বেহালায় করুন ব্যথার রাগিণী।

এক সময় বেহালা থামে।

বলি—এত ভাল বাজাও তুমি কিষণ লাল, এত সুন্দর তোমার হাত?

কিষণ লাল হাসে। বলে—হাঁ বাবুজী। লেকিন লছমি যখন ছিল এর ছে বহুত আচ্ছা বাজাতুম বাবুজী।

—লছমি কে কিষণ লাল?

—হামার জোরু।

—কি হয়েছিল তার?

—কুছ হয়নি বাবুজী। উঃ হামার সাথ একরোজ পিতাজী-মাতাজী ভাই-বহিন ছোড়কে এসেছিল। লেকিন বাবুজী হামার সে উঃ একরোজ ভেগে গেল। উঃ হামাকে বহুত পেয়ার করত বাবুজী।

হ্যাঁ সেদিন আদিসপ্ত গ্রামে ষ্টেশন প্লেটফর্মে বসে সেদিনের সেই বাদল ঝরা সন্ধ্যায় কিষণ লালের জীবনের গল্প শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল কিষণ লাল সার্থক। তার শিল্পী জীবন সার্থক হয়েছে। লছমি তাকে ছেড়ে চলে গেছে সত্যি কথা; কিন্তু শিল্পী কিষণ লাল পেয়েছে সার্থকতা।

হ্যাঁ, কিষণ লাল তার জীবনের কথা বলেছিল সেদিন।

বিহারের এক গ্রামে তার জন্ম। অল্প বয়সে মা মারা যাবার পর বাপের কাছে চলে আসে বাংলায়। বাপ শিউ কিষণ রেল ষ্টেশনে কুলির কাজ করত।

বাপের কাছে থেকে বড় হয়ে উঠছিল কিষণ লাল। ছেলেকে খুব ভালবাসত শিউ কিষণ।

ছেলে বড় হলে তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়া কিষণ লালের ভাল লাগেনি বেশীদিন। ইতিমধ্যে সে একজন ভিখারীর কাছে বেহালা শেখে।

ছেলের বুদ্ধি দেখে রাগ করে শিউ কিষণ। বলে—লেখা পড়া শেখ্, তা না হলে কি করবি।

কিন্তু কিষণ লাল তা বোঝেনা।

তারপর একদিন শিউ কিষণ বিদায় নিলে। কিষণ লাল তখন মল্লিকপুর ষ্টেশনের চৌকিদার। রাত্রি বেলা ষ্টেশনে ডিউটি পড়ে তার।

রাত্রি বেলা ষ্টেশনে বসে বসে বেহালা বাজায় কিষণ লাল।

লছমি আসে। খুশিতে জলে ওঠে কিষণ লালের চোখ।

লছমি এক সময় বলে—পিতাজীকে বলে হামাদের শাদীর ঠিক কর।

মাথা নাড়ে কিষণ লাল। বলে—যাব, লেকিন।...

—কি ?

—তোর পিতাজী আচ্ছা লোক নেহি।

—ওই বাত তো হামি বলি।

—আচ্ছা যাবে।

হ্যাঁ, কিষণ লাল লছমির বাবার কাছে গেলে। সব শুনে লাফিয়ে উঠেছিল ছট্টি লাল। বলেছিল—তুমহারা সাথ হাম লেড়কিকে শাদী নেহি দেগা।

চলে এসেছিল কিষণ লাল।

তারপর ষ্টেশন মাষ্টার বাবুকে ধরে অন্য ষ্টেশনে বদলীর সব ব্যবস্থা ঠিক করে একদিন লছমিকে নিয়ে পালিয়ে গেলো কিষণ লাল।

সেখানে বেশ সুখেই ছিল তারা। লছমি নিজের মনের মতো করে সংসার পেতেছিল। দিনগুলো কাটছিল বেশ। কিন্তু অত সুখ কিষণ লালের সইবে কেন।

দুষ্ট রাহুর মতো একদিন নতুন ষ্টেশনে কুলির কাজ নিয়ে এল মতি লাল। একই দেশের ছেলে। দোস্ত হ'ল কিষণ লালের।

ভগবান কিষণ লালকে প্রতিভা দিয়েছিলেন; কিন্তু সুন্দর চেহারা দেননি। মতিলাল ছিল সুন্দর। লছমির মন মজে গেল তার রূপে। তাই একদিন কিষণ লালের ঘর ভেঙ্গে নতুন ঘর বাঁধবার জন্য মতিলালের সঙ্গে চলে গেল লছমি।

আর কিষণ লাল সেদিন বেহালাটাকে পথের সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছিল অনিশ্চিতের পথে। দুদিনের খেলাঘর তার ভেঙ্গে গেছে। ফুরিয়ে গেছে দুদিনের স্বপ্ন। ফুরিয়ে গেছে তার সব প্রয়োজন। লছমি তাকে প্রতারণা করেনি। তাকে সত্যিই ভালবাসত। তাই তাকে পেয়ে যত আনন্দ পেয়েছিল, হারিয়ে তত ব্যথা পায়নি সে।

একটু চুপ করল কিষণ লাল। বললে—বাবুজী কসুর করোনা, কসুর হামার নসীবের।

চুপ করে বসে রইলুম। কি বলে যে সান্ত্বনা দেব ভেবে পেলুম না।

দূর থেকে গাড়ীর শব্দ ভেসে এল। প্লাটফর্মে জেগে উঠল প্রাণের চঞ্চলতা। শ্রাবনের ধারা তেমনি ঝরছে।

গাড়ী এসে থামল প্লাটফর্মে।

একটা চার আনি কিষণ লালের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসলুম।

গাড়ী ছেড়ে দিল। ষ্টেশনের অনুজ্জ্বল আলোয় তাকিয়ে দেখলুম, কিষণ লাল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। চোখে জল।

সেবার এলাহাবাদে দিন বারো ছিলুম। ফিরে আসবার সময় খোঁজ করেছিলুম কিষণ লালের, কিন্তু পাইনি।

গাড়ী একসময় ছেড়ে দিয়েছিল। কামরায় বসে কিষণ লালের একটা কথা বার বার মনে পড়েছিল। কিষণ লাল হেসে বলেছিল—বাবুজী, আপনি যে কিষণলালকে দেখেছিলেন, সে হামী না। বেহালার সাথ সাথ সে ভি বাংলায় আছে।

মনে হয়েছিল, সত্যি কি তাই ?

আমার দেখা শিল্পী কিষণ লাল কি নীড়ের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দিতে আজ এলাহাবাদ ষ্টেশন প্লাটফর্মের কুলি ?

কম্যুনিজম বনাম ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ

গণতন্ত্র বলে আজকাল যা' পরিচিত তাকে সঠিক-ভাবে বলতে গেলে প্রতীচ্যের গণতন্ত্রই বলতে হবে। কারণ গণতন্ত্র ইসলামের মধ্যে রয়েছে এবং সে-গণতন্ত্রের রূপ প্রতীচ্যের গণতন্ত্র থেকে বিভিন্ন। তবে প্রত্যেকটী রাজনৈতিক মতবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারার পটভূমিতে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ রয়েছে এবং প্রত্যেকটির পশ্চাতে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। আজকের দিনে গণতন্ত্র বলতে যাকে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি সেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রও একদিনে গড়ে উঠেনি। তাই তাকে বুঝতে হলে তার পটভূমিও যেমন বুঝতে হয় তেমনি তার দার্শনিক ভিত্তিও বুঝবার প্রয়োজন রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। পরে তার দার্শনিক ভিত্তিরও আলোচনা করা প্রয়োজন হবে। তা' হলেই যেমন গণতন্ত্রকে ভাল করে বুঝবার পক্ষে আমাদের সুবিধা হবে, তেমনি ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকে তার সঙ্গে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ও তার অর্থনৈতিক সমাধানের তুলনামূলক আলোচনা করলে উভয়ের গুণাগুণ বিচার করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। বলা বাহুল্য, কম্যুনিজমের উৎপত্তি ও দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধেও তেমনি আমাদের আলোচনা করতে হবে। প্রাচীনকালে গ্রীকদের মধ্যে গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তবে সেগুলো আকারে ছিল খুব ছোট। আধুনিক জগতের মত এত বিরাট রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। কাজেই সে-গুলোর উৎপত্তির ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে বর্তমান কালের গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্রগুলোর উৎপত্তির ইতিহাসেরই আলোচনা করা যাক।

আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগে পোপের শাসনে সমস্ত ইউরোপ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ওরা সমস্ত ইউরোপে তাদের অধীনে বিরাট জমিদারী গড়ে তোলেন। সে-সব জমিদারীর মালিক সামন্ত সর্দারেরা মানুষকে করতো অকথ্য নির্য্যাতন। কাঠুরে রূপে অথবা জল সরবরাহকারীরূপে বা তাদের হাতের পুতুলরূপে সর্বসাধারণকে বেঁচে থাকতে হত। এ-সব সামন্ত সর্দারেরা দেশের উৎপাদন শক্তিকে তাদের হাতের মুঠোয় রেখে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী যথেচ্ছা ভোগ দখল করতেন। উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্যের উপর সামন্ত সরদারদের মালিকানা স্বীকৃত থাকায় তারা তাদের ইচ্ছামত প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য অন্যদেশে চালান দিয়ে বিত্তর উপার্জন করতো। সেই উদ্‌বৃত্ত অন্য দেশে চালান দেওয়ার জন্য অপর একদল লোককে তারা নিযুক্ত করতো। এরাই কালে বণিকশ্রেণী গণ্য হয়। ক্রমে এই বণিকশ্রেণী দেখতে পায় দেশের সমস্ত চাহিদার পূরণের জন্য উৎপাদন করে ভূমিদাসেরা অথচ সামন্ত সর্দারেরা বসে বসে ভোগ করে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের উপর তাদেরই মালিকানা স্বীকৃত হন। সে মালিকানা থাকার জন্য তারা এ-বণিক শ্রেণীকে কোন দেশের উদ্‌বৃত্ত যথেচ্ছা চালান দেওয়ার সুবিধা দেয় না। কাজেই এতে একদিকে যেমন ভূমিদাসদের অসুবিধা হচ্ছে অপর দিকে তাতে মধ্যবর্ত্তী বণিকশ্রেণীরও অসুবিধা হচ্ছে। তার পরিবর্ত্তে সরাসরি উৎপাদিত দ্রব্যে ভূমিদাসদের অধিকার স্বীকৃত হলে তারা যেমন উৎপন্ন দ্রব্য বণিকদের হাতেই তুলে দিতে পারে, তেমনি বণিকেরাও সামন্ত প্রভুদের কাছে ধর্ণা না দিয়ে এবং তাদের মোটা অংক পরিশোধ না করেও উদ্‌বৃত্ত উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দেশে চালান দিতে পারে। বণিকদের এ-চেতনার ফলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি হয়; তাকে বলা হয় উদারনৈতিক মতবাদ বা লিবারেলিজম।

এ-মতবাদের সূচনা হয় ইতালীর রিনেসাঁয়। যদিও রিনেসাঁ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিন্তাজগতে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মের কবল থেকে মুক্ত করে মানব-মনকে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিণত করা—তবু রিনেসাঁর চিন্তাধারার ফলেই এ-উদারনৈতিক মতবাদ বিশেষভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ইতালীর রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) সর্বপ্রথম দেশের শাসন ব্যবস্থায় রাজকীয় প্রধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। পোপের আধিপত্য বিনাশের জন্য তার সূচনা হলেও পরবর্তীকালে ধর্মের রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার প্রবর্ত্তিত প্রটেস্‌টানট ধর্মে খোদা ও মানুষের অন্তবর্ত্তী কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর আধিপত্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতাও প্রাধান্য লাভ করে এবং ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণের জন্যই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা শ্লোগান হয়ে পড়ে।

উদারনৈতিক মতবাদের নেতিবাচক দিকের বিচার করলে একে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ পোপের আধিপত্য বিনাশ

করা তার লক্ষ্য হলেও পরবর্তীকালে রাজকীয় শাসন ও তার উত্তরাধিকারকে সীমাবদ্ধ করার দিকে উদারনৈতিক মতবাদের ঝোঁক ছিল। তার ইতিবাচক দিকের আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় মানুষের অবাধ স্বাধীনতার স্বপ্নই ছিল উদারনৈতিক মতবাদের সর্বপ্রধান কাম্য। ব্যবসায় বাণিজ্যে রাজার বা শাসকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এ-মতবাদ বরদাশ্‌ত করেনি। এর বক্তব্য হ'ল মানুষকে স্বাধীনতা দিতে হ'বে। স্বাধীনতা পেলেই যে যেমন উৎপাদন করতে পারবে—তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যেরও বিলি ব্যবস্থা করতে পারবে। মানুষের মাঝে কোন বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্য স্বীকার করে নিলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ-উদারনৈতিক মতবাদই কালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে (Individualism) বা আধুনিক গণতন্ত্রবাদে পরিণত হয়। এখন তার দার্শনিক ভিত্তির আলোচনা করা যাক।

আধুনিক গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি স্বরূপ কয়েকটি মতবাদই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা দু'টো মতবাদের আলোচনা করছি। একটির জনক ইংরেজ দার্শনিক লক (Locke) অপরটীর প্রবর্তন করেছেন ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau)। লকের চিন্তাধারাকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা যায়—'মানুষের চিন্তারাজ্যে চলছে অণু'র মেলা। বিভিন্ন সংবেদনের (Sensation) সমবায়েই গড়ে উঠে আমাদের জ্ঞান। রাষ্ট্রীয় জীবনেও চলেছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। মানুষ একক হয়েই জন্মগ্রহণ করে, সেই একক মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শ থেকে গড়ে উঠে মানুষের সমাজ, তার জাতি বা তার রাষ্ট্র। মানুষের আদি সত্তায় রয়েছে তার অহং বোধ (Egomism) ও স্বার্থপরতা (Selfishness)। সেই আদি-মানবের চলাফেরায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হ'বে। তার কাজকর্মে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়—তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হ'বে। এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠেঃ যদি মানুষকে এভাবে স্বাধীনতা দেওয়া হয়—তা হ'লে প্রত্যেকের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য মানুষের মধ্যে সব সময়ই মারামারি হানাহানি লেগেই থাকবে। প্রত্যেকে যদি তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে তাহ'লে তো একের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘাতের ফলে সব সময়েই মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'বে। মানুষ শান্তিতে দু'দিনও থাকতে পারবে না। তার উত্তরে লক্‌ ভেবে নিয়েছেন মানুষ বুদ্ধি-প্রধান জীব। প্রকৃতির বুকে বুদ্ধির দওলতেই মানুষ তার অধিকার বজায় রাখে। অন্যের সঙ্গে বিরোধ না করেও সে চলতে পারে। তবে এতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলে মানুষ তার অধিকার, তার মঙ্গলের জন্যই সংকোচিত করে সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়। তাঁর ধারণা ছিল প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ পশুর মত পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত থাকতে বাধ্য নয়। সেখানেও মানুষ বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে শান্তিতে বাস করতে পেরেছে। প্রকৃতির বুকে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির রাজ্যে আইনকে ব্যাখ্যা করার জন্য বা তার প্রয়োগের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই। যদিও সেই আইন-কানুন সকল মানুষের মনেই কার্যকরী, তবুও বিচার বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাতের দরুণ তাতে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। এজন্যই প্রকৃতির বুকেও মানুষ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য অপরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তারই পরিণতিতে সম্প্রদায় গড়ে উঠে। এ-চুক্তির মর্মমতে ব্যষ্টিকে প্রকৃতির আইন কার্য্যে পরিণত করার অধিকার ত্যাগ করতে হয় এবং অপরাধের শাস্তিদান করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। ব্যষ্টিকে অবশ্য তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করতে হয় না। কতকগুলো অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করতে হয়। এতে সম্প্রদায়, ব্যষ্টি জীবনের নিরাপত্তা যেমন রক্ষা করতে পারে—তেমনি তার অধিকারের অপব্যবহার হ'তেও দেয়না। রুশো অন্য এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বড় আক্ষেপ করেই বলেছেন—মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সর্বদাই সে শিকলাবদ্ধ থাকে (Man is born free but everywhere he is in chains)। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে মানুষের কোন বন্ধন নেই; বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নানা নীতি, নানা আইন-কানুন তার উপর চাপানো হয়। তাই রুশো মানুষকে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন Back to Nature. প্রকৃতির বুকে আবার ফিরে যাও। তাঁর ধারণা ছিল, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষের emotion বা প্রক্ষোভ পূর্ণবিকাশ লাভ করে। মানব সৃষ্ট পরিবেশে তা হতে পারেনা। প্রকৃতিতে পশু পাখী কারো কোন দুঃখ দৈন্য নেই। তারা অবাধে বিহার করে। অভাবের উৎপত্তি হ'লেই তার নিবৃত্তির উপায় তার পক্ষে সহজে লাভ করার পদ্ধতিও সে সহজেই পেতে পারে। মানুষ তার বুদ্ধির প্যাঁচে গড়ে তুলেছে তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান। এতে মানব জীবনের পরিপূর্ণ স্ফূর্তিলাভ হয়না বলেই জীবনে যতো দুঃখের হয় উৎপত্তি। তাঁর ধারনা ছিল, প্রকৃতি থেকে বিকাশের ধারায় কোন এককালে মানুষকে তার

জন্মগত স্বাধীনতা বিদান দিতে হয়। তার আত্মরক্ষার জন্য, অন্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সে গড়ে তোলে তার গোত্র, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র।

তাই আমরা দেখতে পাই ব্যষ্টি সম্বন্ধে ধারনায় লক ও রুশোর মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই ব্যষ্টিকে কল্পনা করেছেন একক ও সম্বন্ধহীন। এ-দর্শনই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এ্যাডাম স্মিথের হাতে। তাঁর মতে মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। তার উৎপাদনের প্রাথমিক কারণ অভাবের নিরসন হলেও উদ্বৃত্ত থেকে সে স্বভাবতই মুনাফা করতে চায়। সে সুযোগে বাধা উপস্থিত হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য্য। সে সংঘর্ষকে এড়াতে হলে মানুষের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা টেনে দেওয়া সঙ্গত নয়—তাকে দিতে হবে তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার। তা' পেলেই সে তার অভাবের নিরসনের জন্য যেমন করবে পর্য্যাপ্ত উৎপাদন তেমনি সে উদ্বৃত্তকেও সে তার নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করবে। মানুষ সম্বন্ধে এবংবিধ ধারণার ফলেই এ-জগতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। কারণ মানুষেরা স্বভাবতই একক ও স্বাধীন প্রবৃত্তির হলে তাদের মধ্যে কারো উপর কারো প্রাধান্য বা প্রতিপত্তি থাকবার কথা নয়। তাই সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি মতে গড়ে তুলতে হয় রাষ্ট্র এবং ব্যষ্টিকে; উৎপাদন ও বণ্টনের বেলা দিতে হয় অবাধ স্বাধীনতা। গণতন্ত্র তাই স্বাভাবিকভাবেই ধনতন্ত্রে পরিণত হয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তি বিশেষ তার বুদ্ধির কৌশলে মূলধন (Capital) যেমন সংগ্রহ করতে পারে—তেমনি সে পুঁজি খাটিয়ে তা থেকে সীমাহীন লাভও করতে পারে। তাতে গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি মেনে নিলে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে না।

কম্যুনিজমের উৎপত্তি কার্লমার্কস থেকে নয়। কার্ল মার্কসের বহু আগেও ইহুদি ধর্মের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনি মহাপ্রাণ প্লেটোও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে, ইরানেও মাজ্‌দাক্ যৌন জীবনে কমুনিজমের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

মার্কস প্রচারিত কম্যুনিজমের বৈশিষ্ট্য হল এই—এতে কমুনিজমকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। মার্কসকৃত কম্যুনিজমের দার্শনিক ভিত্তি জড়বাদ। তার প্রধান উপজীব্য জড়বস্তুর সূত্র অবলম্বন করে সব কিছুর ব্যাখ্যা করা। মার্কস প্রমাণ করতে চেয়েছেন আদিতে জড় পদার্থই একমাত্র সত্ত্বা। জড়-পদার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের দরুণ হয় জীবনের উৎপত্তি। সে জীবনেরই এক শাখা মানব জীবন। মানবজীবনের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ উৎপাদন করে। উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে তার সমাজ গঠিত হয়। সেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের রূপ পরিবর্তিত হয়—মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতিরও হয় বিরাট পরিবর্তন। গুহামানব এ-ভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে পশুচারীতে হয়েছে পরিণত। এমনি পশুচারী হয়েছে কৃষিজীবিতে পরিণত। কৃষিজীবির পর্য্যায় থেকে মানব সমাজ এগিয়ে যায় সামন্ততন্ত্রে এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সে গিয়ে পৌঁছায় পুঁজিবাদে। পুঁজিবাদের শেষ পরিণতি সমাজতন্ত্রবাদ। উদাহরণস্বরূপ মার্কস প্রমাণ করতে চেয়েছেন সামন্ততন্ত্রের শেষে যখন পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয়—তখন মানুষ পূর্ব্বের দাসপ্রথা থেকে মুক্তি পেলেও পুঁজিপতির প্রতিষ্ঠিত কলকারখানায় খাটতে বাধ্য হয়। তার ফলে পুঁজিপতির পুঁজিই বাড়ে, তার ভাগ্যের কোন উন্নতি হয় না। শেষে উৎপাদন ব্যবস্থা এমন পর্য্যায় এসে পৌঁছে যে উৎপাদন হয় মজুরদের সংঘবদ্ধ পরিশ্রমের ফলে; কিন্তু তার বণ্টনের ব্যবস্থা থাকে পুঁজি-পতির হাতে। নির্বিত্ত মানুষের চোখ খুললে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে পুঁজিপতির শিল্পাগার তথা সমস্ত বিত্ত থেকে তাকে বঞ্চিত করে সমাজতন্ত্রের করে প্রতিষ্ঠা। পরিবর্তনের সময় (Transition period) নির্বিত্তের নেতৃত্ব (Dictatorship of the proletariat) ছেড়ে দিতে হয় এক জনের হাতে। রাষ্ট্রকে করে নিতে হয় সর্বে-সর্বা। তার পরে মানুষের মনে পরার্থপরতার বা সংঘ-চেতনার পূর্ণ বিকাশ হলে এ-পুলিশী রাষ্ট্র আপনাআপনি বিলিয়ে যায়। তাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গোড়ার কথা মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের ধারণাগুলো পৌঁছিয়ে দিয়ে তাকে পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংহত করে বিপ্লবের সৃষ্টি করা।

মার্কস গোড়াতেই মানব জীবনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখেছেন। তার কাছে মূল সংখ্যা ব্যক্তি নয়—শ্রেণী। এই শ্রেণীর আলোকে তিনি মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে চেয়েছেন। আবার শ্রেণী গুলোকে তিনি দেখেছেন নিছক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার আলোকে। উৎপাদন ও বণ্টনের শক্তি ব্যতীতও যে মানুষের বিভিন্ন গুণ থাকতে পারে এবং সে সব গুণাবলী তাকে কাজে অনুপ্রেরণা দিতে পারে—সেদিক দিয়ে তিনি ফিরেও তাকাননি। মানব জীবনের সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আলোকে তার সমাজ বা রাষ্ট্র জীবনের বিবর্তনের ধারা যদি তিনি পাঠ করতেন তাহলে তাকে বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হ'ত—কেবল উৎপাদন নয় নানাবিধ কার্য্যকারণের ফলেই সমাজের বিবর্তন সম্ভব হয়।

নানাবিধ ভাবের আদর্শ বা নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ নানাবিধ সৃষ্টি করে। সে সৃষ্টির ফলে তার উৎপাদন ব্যবস্থাও হয় পরিবর্তিত। সেই আদর্শের আলোকে মানুষের পাপ-পুণ্য ভালমন্দের বিচার ও মূল্যবোধ হয় সম্ভব। কেবল উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ শ্রেণী সংগ্রাম বা তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া কলাপের দ্বারা মানুষের জীবন ধারার ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্বয়, ব্যত্যয় ও সমন্বয় বা দ্বন্দ্বের দ্বারা মানব-সভ্যতার বিকাশের ধারার ব্যাখ্যা করতে চাইলে তাতে অনেকগুলো সত্যের (fact) ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।* তার ছকের মধ্যে পুরে তিনি জীবন ধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা' নিতান্ত একদেশদর্শী ও অমূলক।

মার্কস নিজেকে নাস্তিক বলেই প্রচার করতেন; কিন্তু জড় পদার্থের উপর তার বিশ্বাস ছিল আস্তিকের চেয়েও বেশী। যদি তর্ক স্থলে ধরে নে'য়া হয় যে ইতিহাসের ধারায় এ-যাবৎ যা' ঘটেছে তা তার প্রদর্শিত ধারায়ই ঘটেছে, তবুও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা জোর করে বলা যায়না যে ভবিষ্যতে জগৎ সভ্যতা এ-ধারায়ই চলবে। তাঁর এ-জাগতিক ধর্ম বিশ্বাস ও তদ্‌জাত প্রক্ষোভ (Cosmic emotion) গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীকেও হার মানিয়েছে।*

শ্রেণীকে গোড়ার সংখ্যা বা (unit) হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি মানব জীবনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে করেছেন অস্বীকার। তার অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের (Economic Determinism) মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। একটা অন্ধ নিয়তির চাকার তলায় সব গেছে নিপিষ্ট হয়ে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধেও তার মনে একটা দ্বৈতভাব ক্রিয়া করছে। পরিবর্তনকালে (Transition period) রাষ্ট্র হয়ে উঠে সর্বেসর্বা। আবার তার কাজ শেষ হলেই সে আপনাআপনি বিলিয়ে যায়। সোজা কথায় নির্বিত্ত মানুষের জন্য অতি মাত্রায় দরদের ফলে তিনি নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে মানব জীবনকে অধ্যয়ন করেন নি। অর্থনীতির আংশিক সূত্রের মাধ্যমে তিনি তার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। তার সমস্ত দর্শনের মূলে রয়েছে নির্বিত্ত মানুষের প্রতি তাঁর দরদ। তবে সে দরদজাত দর্শন যে নিতান্ত একদেশদর্শী, এ-কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরব দেশীয় সমাজ ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। আবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ বা ছিল পশুচারিক পর্য্যায়ের আর কেউ কেউ ছিল বণিক শ্রেণীর লোক। গোটা আরব জাতিকে কোন এক বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা যেতো না।

ইসলামের আবির্ভাবে আরব দেশের সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাতে অর্থনৈতিক জীবনেও সম্পূর্ণ অভিনব সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণের জন্য ইসলামের আবির্ভাব হওয়ায় কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর প্রাধান্যের জন্য বা কোন শ্রেণীর বিনাশের মূখ্যমন্ত্র নিয়েই ইসলাম আবির্ভূত হয়নি। ইসলাম আল্লার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ায় কাবার তৎকালীন পুরোহিতদের আধিপত্য সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়। সার্বভৌমত্ব আল্লার হাতে অর্পণ করার ফলে শ্রেণীগুলোরও ক্ষয় হয়। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নির্বিত্ত মানুষের কল্যাণের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তবে এটি ইসলামের একটি দিক মাত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-দওলতই জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। ধন-দওলত মহৎ জীবন-যাপনের উপায় বা মাধ্যম মাত্র। ইসলাম জীবনকে দেখেছে তার সর্বাঙ্গীনরূপে। ইসলাম জীবন-যাত্রার প্রাথমিক চাহিদার পূরণকে অস্বীকার করেনি। যেমনি তার জীবনের অন্যান্য নানাবিধ দাবীকে অস্বীকার করেনি। গোটা মানব জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য স্বতঃসিদ্ধ রূপে ইসলাম আল্লার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার ফলে মানব জীবনের নৈতিকমানগুলো (Moral Values) সংরক্ষণের পক্ষে তার হয়েছে সুবিধা। আল্লার অস্তিত্ব স্বীকারের অর্থ জীবনে তাঁর গুণাবলী বিকশিত করে তোলা। তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকারের অর্থ ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের চির অবসান। সমস্ত অধিকার আল্লার বলে স্বীকার করে নিলে মানুষের পক্ষে কর্তব্য হ'য়ে পড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আদর্শ সংস্থা হিসেবে গঠন করা। মানুষের পক্ষে তখন আল্লার প্রতিনিধিত্ব করাই হয়ে পড়ে চরম লক্ষ্য। ইসলামে রাষ্ট্রকে মনে করা হয় আল্লার শাসন কায়েম করার জন্য মঙ্গলময় এক প্রতিষ্ঠান রূপে।

আল্লার একত্ব ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে মানুষের অধিকারের সমন্বয় করতে গিয়ে কোরাণ শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে—'হু আল্ লাজি খালা কাল্ লাকুম মা ফিল আর্‌দে জামিয়া'—আল্লাহ দুনিয়ার সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ-আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ আলিম মওলানা মাহমুদুল হাসান বলেন—'সব জিনিষই মানুষের সম্পত্তি বিশেষ অর্থাৎ আল্লাহ সকল

* অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ—ইতিহাসের ধারা

* Bertrand Russell—History of Western Philosophy

জিনিষই মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোন জিনিষই সৃষ্টির দিক থেকে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়, পক্ষান্তরে আবার সকলেরই সম্পত্তি বটে। যেহেতু সব জিনিষই মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে—এ কারণে সকল জিনিষেই মানুষের দখল ভোগের অধিকার আছে। যখন কোন জিনিষ কারো ভোগ দখলে থাকবে তখন তাকেই কেবল এ-জিনিসের একমাত্র মালিক বলে গন্য করা হবে। অন্য কেউ তার উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না। হ্যাঁ, কোন জিনিসের দখলকারীকে এও অবশ্য জেনে রাখা উচিৎ যে, সে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু অনর্থক নিজ কবলে না রেখে অন্যকে অবাধে ভোগদখল করতে দেবে। কেননা মানুষ হিসেবে সৃষ্টির ভোগ প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য।

এ-কারণেই রীতিমত জাকাত আদায় করা সত্ত্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় করা ভাল নয়। নবীগণ ও ধর্ম ভীরু লোকগণ এ-কারণেই ধন সঞ্চয়ে বিরত হয়েছেন। এমনকি, হাদিস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে ছাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু সঞ্চয় বা ব্যবহার অনুচিত বা অসঙ্গত মনে করতেন। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুতে কোন আবশ্যকতা নেই। 'সব সৃষ্টই মানুষের জন্য' নীতিতে (সব কিছুতেই) সকলের দাবী রয়েছে বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু ভোগ দখলকারী (তার নিজের প্রয়োজনের অংশের অতিরিক্ত ভোগ করার দরুন) অন্যায় দখলকারীরূপে মালিক বটে।*

ইসলামের মৌলিক নীতি আল্লার সার্বভৌমত্ব, মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু আল্লার রাহে মানুষের কল্যাণের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার নীতির আলোকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে কোন ভেদ রেখা টেনে দেওয়া হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে দৈনিক পাঁচবার সালাতের মধ্যে এ-জগতে একমাত্র আল্লাহ্ তায়লার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়। বছরে একবার সিয়াম পালন করে ভোগ বিলাস থেকে বিরত থাকার এবং সংঘবদ্ধভাবে সংযত জীবন যাপন করার ও জীবনের চরমতম যাতনা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার শিক্ষা পাওয়া যায়। হজ্জের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব বোধের সৃষ্টি। জাকাতের উদ্দেশ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ অপরের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য মানব সাধারণকে প্রেরণা দান। কোরবানীর আসল অর্থ ত্যাগ। যে ঐতিহ্য থেকে কোরবানী প্রথার সৃষ্টি—তার আসল অর্থ মানব সাধারণকে আল্লাহর রাহে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত করা। জিহাদের আসল অর্থ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধ।

মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সমতার সৃষ্টির জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ খাওয়া হারাম। ভোগ দখলকারীরূপে যাতে আল্লার নিয়ামত সকলেই সমান ভাবে ভোগ করতে পারে এ-জন্য সাম্যবাদ মূলক দায়ভাগ প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। এ-জন্য পুঁজি সৃষ্টির বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স জারী করার ক্ষমতাও আমির বা সুলতানদের দেওয়া হয়েছে।*

ব্যক্তিগত ও সমাজিক জীবনে এ-সব নীতি রূপায়নের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সে-রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতির উপর। মদীনার সনদের সারমর্ম, প্রত্যেক ব্যক্তি (সে ইহুদী হউক বা পৌত্তলিক হউক বা মুসলমান হউক) তার নিজস্ব ধর্ম পালন করার অধিকার ও সুযোগ পাবে। তাই রাষ্ট্রের মূল কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক। তবে খলিফা বা অন্য কোন রাষ্ট্রনায়কের নিয়োগের বেলা কতকগুলো মূল্যমান আলোকে তার গুণাগুণ নির্ধারিত হবে। কেবল জনপ্রিয়তাই নিয়োগের মাপকাঠি হতে পারে না। তার মধ্যে কতকগুলো গুণ থাকতেই হবে। আল্লার রাষ্ট্রকে তার মনজিলে-মকসুদে পৌঁছে দেবার মত খলিফার কতকগুলো গুণ চাই। সে রাষ্ট্রনায়ক বা খলিফার দায়িত্ব সর্বাধিক এবং তার চরিত্র সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে। তিনি ইসলামের মূল-নীতি অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রকে সব সময়েই পরিচালিত করেন। তবে আধুনিক কালের ডিক্টেটর্দের মত তাঁকে অতিমানব বলে ধারণা করতে পারেন না। সে-রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুকে দেওয়া হয় সংখ্যাগুরুর মত সমস্ত অধিকার।

এ-রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিচালিত হয় সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। আল্ গণীমাত (যুদ্ধ লব্ধ বিত্ত) জাকাত, সাদকাহ, জিজিয়া, খেরাজ, আল্কায়, আলউশর প্রভৃতি বিভিন্ন করধার্য্য করে এ-রাষ্ট্রের আর্থিক সৌধ গড়ে উঠে। আবার পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সে-গুলোর পরিবর্ত্তনও স্বীকার করা হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এ-জীবন সংস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু ভোগ দখলে রাখবার সুযোগ দেওয়া হয়না। এমনকি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি যাতে জোতদারের হাতেও না থাকে, তার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। কাজেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে যাতে সর্বাবস্থায় সমান ভাবে দুনিয়ার সম্পদ মানুষেরা ভোগ

* ইজাহল আদিল্লা—পৃঃ ২৬৮

* মহল্লী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৩ মসলা পৃঃ ১২৫

করতে পারে—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মানব সমাজকে সংঘচেতনার পথে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ-জন্যই উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যষ্টি অথবা সমষ্টির আধিপত্য স্বীকার করতে এ-জীবন-দর্শনে কোন বাধা নেই। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন করতে পারে—তবে বণ্টনের ব্যাপারে কেউ তার ইচ্ছামত নীতি প্রয়োগ করতে পারেনা। ব্যষ্টিই উৎপাদন করুক বা সমষ্টিই উৎপাদন করুক—সমাজের কল্যাণের জন্য তার বা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছুই আল্লার রাহে ব্যয় করতে উৎপাদনকারী মাত্রেই বাধ্য।

এতে ব্যষ্টির যেমন স্বাধীনতা থাকে—তেমনি সমষ্টির নিকট তার এক বিরাট দায়িত্বের সৃষ্টি হয়। মানুষ উৎপাদন করবে তার নিজের প্রয়োজনে; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই তার প্রতিবেশী বা আল্লার অন্যান্য বান্দাদের মঙ্গলের জন্য আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে।

এতে স্বাধীনতার প্রচুর সুযোগ থাকলেও শোষণের অবকাশ থাকেনা। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হয় সম্ভবপর।

এখন পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও কম্যুনিজমের সঙ্গে ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যাক্।

গণতন্ত্রবাদীরা যেরূপ মনে করেন সর্বসাধারণের সম্মতির উপরই সমাজ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—ইস্লামপন্থীরাও তাই মেনে নেয়। তবে ওরা মনে করেন সর্বাবস্থায় ভাল মানুষের হাতেই সর্বসাধারণ তুলে দেবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। ইসলামপন্থীরা তাতে বিশ্বাস করেনা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেতৃত্বের জন্য চাই কতকগুলো সাধারণ গুণ। সে-গুলোর মাপকাঠিতেই হবে নেতার বিচার। মাতাল, লম্পট, ভাওতাবাজ যতই জনপ্রিয় হোক্ না কেন, তাকে নেতার পদে বরণ করা যায় না। মোটকথা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা লাভ করলেই ভাল হতে পারেনা। জনপ্রিয়তাই নেতৃত্বের একমাত্র মাপকাঠি নয়। তার অন্যান্য গুণও থাকা উচিত। ইস্লাম পন্থীরা মানুষকে দেবতা বলেও কল্পনা করেনা—পশুর অধম বলে পায়েও ঠেলেনা। পাপ-পুণ্যময় মানুষকে সুপথে পরিচালনা করার জন্য যারা মনেপ্রাণে আকাঙ্খা পোষণ করেন, তাদের চারিত্রিক গৌরবের সার্টিফিকেট ইস্লাম পবিত্র আল-কোরানের আলোকে যাচাই করে দেখে। যারা কথার ফানুস সৃষ্টি করে মোহনীয় আকর্ষণে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে চায়—ইস্লামপন্থী তাদের মোটেই বিশ্বাস করেনা।

তেমনি গণতন্ত্রের নীতি স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে যথেচ্ছা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সুযোগ দিলে এ-দুনিয়ায় যে ভয়াবহ শ্রেণী সংগ্রামের উৎপত্তি হয় তার প্রতি নজর রেখে ইসলাম ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করে নিয়েও এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যষ্টির বা সমষ্টির অধিকার স্বীকার করে নিয়েও বণ্টনের বেলা কতকগুলো শর্ত আরোপ করে পুঁজি সৃষ্টির বিরুদ্ধে বা শোষণের বিরুদ্ধে কতকগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এতে সমাজ জীবনে সংগ্রামের যাতে কোন সুযোগ না হয় এবং মানুষেরা আল্লার প্রতিনিধি হিসাবে এ-দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করতে পারে তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তেমনি কম্যুনিজমের সঙ্গেও রয়েছে ইস্লামের বিস্তর প্রভেদ। কম্যুনিজমের নিকট জড় পদার্থই জগতের আদি কারণ। চেতনা একটা উপঘটনা মাত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লার ভাব (Idea) ও তাঁর ইচ্ছা (Will) জগতের আদি কারণ। এ-জন্যই কম্যুনিষ্টের নিকট জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যই মানবজীবনের একমাত্র কামনার বস্তু। ইস্লামের দৃষ্টিতে সুখস্বাচ্ছন্দ্য মহৎ জীবন যাপনের উপায় (means) মাত্র। কম্যুনিজমের নিকট পরলোকে বিশ্বাস একটা কুসংস্কার। ইসলামের দৃষ্টিতে পরলোক এ-জীবনেরই পূর্ণ পরিণতির স্থল। কম্যুনিজমের দৃষ্টিতে পরলোক বলে কোন কিছু নেই। এটা মানব মনের অন্ধ বিশ্বাস। ইসলামের নিকট পরলোক—ইহলোকেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই ইহলোকের আদর্শের সঙ্গে পরলোকের আদর্শের কোন দ্বন্দ্ব নেই। যা' ইহলোকে মঙ্গলজনক তা' পরলোকেও মঙ্গলজনক। কম্যুনিজমের কাছে পরিবর্তনকালীন সময়ে (During transition period) রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা। ইসলামের কাছে কোন অবস্থায়ই রাষ্ট্র সর্বেসর্বা হ'তে পারে না। রাষ্ট্র স্বয়ম্ভু নয়—মাধ্যম মাত্র। কম্যুনিজমের ধারণা মতে পূর্ণ কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হ'লে রাষ্ট্র আপনা আপনি বিলীন হ'য়ে যাবে—তার আর কোন কাজ থাকবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বিকাশের সকল পর্য্যায়েই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা থাকবে। কম্যুনিজমের ধারণা মতে উৎপাদন ও বণ্টন সব সময়ই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'বে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত উৎপাদনেরও মূল্য রয়েছে—এতে ব্যষ্টি তার বুদ্ধির প্রয়োগ করে প্রচুর উৎপাদন করতে পারে। ব্যষ্টিকে উৎপাদনের সুযোগ দিলে—তাতে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় বলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য দিন দিন বেড়েই চলে। তবে যাতে এ-উৎপাদন সর্বাবস্থায় শোষণের কোন হাতিয়ার হয়ে না দাঁড়ায় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হ'বে।

মোটামুটি ব্যষ্টি সম্বন্ধে গণতন্ত্র ও কম্যুনিজমের রয়েছে কতকগুলো ধারণা এবং সে ধারণারই আলোকে

তারা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছে। গণতন্ত্রের ধারণা মতে মানুষ একক হয়েই জন্মায়। তার নিজস্ব স্বার্থ তার একমাত্র কাম্য। কাজেই যাতে ব্যষ্টির জীবনে তার প্রকৃতির অনুকূলে এ-সব প্রবৃত্তির পরিতোষ সাধন হয় তার ব্যবস্থা করতে হ'বে। তাকে দিতে হ'বে তার নিজস্ব চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা এবং উৎপাদন ও বণ্টনের বেলাও তাকে দিতে হ'বে প্রচুরতম সুযোগ ও সুবিধা।

মার্কসীয় কম্যুনিজমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধরে নেওয়া হয়েছে স্বার্থপরতা হিসেবে। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কামনা কিন্তু স্বার্থপরতা নয়। বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয় না। এ-দুনিয়ায় যারা মণীষী বা মননধর্মী—যাদের গবেষণার ফলে এ দুনিয়ার প্রগতি হয়েছে সম্ভবপর—তারা কেউই স্বার্থপর বা শোষক ছিলেন না। তারা ছিলেন self assertive বা আত্ম প্রচারবাদী, কিন্তু selfish বা স্বার্থপর ছিলেন না। কাজেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্বীকৃতি ও মানুষের স্বার্থ-পরতার স্বীকৃতি একার্থবাচক নয়। গণতন্ত্র বা কম্যুনিজমে মানুষের পরার্থপরতার দিকটার প্রতি মোটেই লক্ষ্য করা হয়নি। মানুষের জীবনে অহংবোধের সঙ্গে পরার্থপরতা বা Altruism রয়েছে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কোন কালেই মানুষ একক জীবন যাপন করেনি বা কেবল তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই চিন্তা করেনি।* অতি আদিম কালেও তার সন্তানের, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মানুষের কথাও সে ভেবেছে। কোন কালেই সে একা কোন কিছুই করতে সমর্থ হয়নি বলে—দলের, গোত্রের বা সমাজের সহায়তায়ই সে নানা কাজে অগ্রসর হয়েছে। সে জন্যই তাকে কেবল স্বার্থপররূপে ভাবা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এজন্য মার্কসীয় মতবাদে এক ভীষণ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। মানুষ যদি স্বভাবতই স্বার্থপর হয়—তা' হলে সে যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন—তার স্বভাব সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাথা তুলে দাঁড়াবে। কাজেই মানব চরিত্রের আলোকে রাষ্ট্র গঠন না করে যদি জোরজবরদস্তি করে কোন রাষ্ট্র বা সংস্থা তার ঘাড়ে চাপানো যায়—তা' হ'লে সে রাষ্ট্র বা সংস্থা দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে না।

তার উত্তরে কম্যুনিষ্টরা অবশ্য বলে থাকেন, মানব জীবনে যে সব মূল্যমানের (values) সৃষ্টি হচ্ছে তারই আলোকে মানুষ তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করবেই করবে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা কোন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের (self determination) অধিকার বর্ত্তমান জগৎ স্বীকার করে নিয়েছে। তাই এ-গুলোর আলোকেই অনাগত বিশ্বসংস্থা যখন গড়ে উঠ্‌বে, তেমনি—"To each according to his capacity and to each according to his need"—'প্রত্যেকে তার সাধ্যমত খাটবে এবং তার প্রয়োজন মত খেতে পরতে পারবে'—নীতি কেন মানব জীবনে গৃহীত হবেনা? এক্ষেত্রে ভেবে দেখবার বিষয় মূল্যমানের প্রতি শ্রদ্ধাও মানুষের যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা মূল্যমান হিসেবে গৃহীত হলেও সাম্য বা মৈত্রীর প্রতি মানুষের তত শ্রদ্ধা দেখা যায়নি। বরং তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা দেখা দিয়েছিল স্বাধীনতার প্রতি। কম্যুনিজমের প্রচারণার ফলে এখন সাম্যের প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। স্বাধীনতার প্রতি মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। কাজেই প্রত্যেককেই তার সাধ্যানুসারে খাটবার ও ভোগ করবার অধিকার আজ যেভাবে স্বীকৃত হচ্ছে কাল তা' নাও হতে পারে। এ-জন্যেই এদের দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপ এমন কোন ধারণাকে গ্রহণ করতে হয় যাতে সর্বাবস্থায় সকল মানবীয় মূল্যমানগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে এবং যাতে তাদের কার্য্যকারিতা ও উপকারিতার মূল্য থাকবে চিরকাল। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বা কম্যুনিজমে মানবীয় মূল্যমানের এরূপ কোন দার্শনিক ভিত্তি স্বীকার করা হয়নি। ইস্‌লাম এ-জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের আদি কারণ স্বরূপ আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে বলে ইসলামী সমাজে এ-সব মূল্যমানের কোন আশঙ্কা নেই।

তাই এসব দেখেশুনে মনে হয় গণতন্ত্রে মানব জীবনের একদিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কম্যুনিজম অপর একদিকের উপর জোর দিয়েছে—ইস্‌লাম মানব-জীবনের সকল দিকের প্রতি সুবিচার করার জন্য এ-জগতের মূলাধাররূপে আল্লাকে স্বীকার করে নিয়ে একদিকে যেমন মানবিক মূল্যমানগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেও যাতে শোষণের কোন অবকাশ না থাকে তার জন্য শোষণহীন সমাজ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

●

* Primiture Communism বা আদি সাম্যবাদ

যে কথা বলতে নেই

গোলাম কাদির

অন্যান্য দিনের মত আজও বড় রাস্তার পাশে এসে থেমে গেলো গাড়ীটা। বাসায় যাওয়া আর হলো না, গলিটার মুখে ঢুকে বইখাতা হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে নীরু। জায়গাটা একটু আড়ালে, সহজে কেউ দেখতে পায়না। পাশেই কলতলার ভীড় পথচারী মানুষের দৃষ্টিকে নেয় টেনে। গাড়ী থেকে নেমে জুতোর মৃদু শব্দ তুলে যে লোকটা এক্ষুনি বেরিয়ে গেলো, দু'মিনিটের মধ্যেই সে গিয়ে পৌঁছুবে বাসায়। আপাটাও হয়তো অপেক্ষা করেই আছে। দরজার পাশটিতে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসবে আর সে হাসিতে মৃদু আন্দোলন জাগবে তার সারা দেহে। চপল খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেতরে ঢুকবে লোকটা। তারপর কতক্ষণ ধরে যে ওদের টুন্‌টান্‌ আলাপ চলবে তার ঠিক নেই; পাশের রুম থেকে হয়তো কেঁদে ওঠবে বাচ্চুটা, বিরক্তি প্রকাশ করবে মীনা। সেদিকে কোন খেয়ালই থাকবে না আপার। তারপর এক সময় ওরা দু'জনেই বেরিয়ে আসবে গলিটার এই মুখে। গাড়ীর দরজা খুলে দেবে লোকটা, ভেতরে ঢুকবে আপা। তারপরের খবর কিছুই জানেনা নীরু। আর এরই মধ্যে যদি আম্মা স্কুল থেকে এসে পড়ে থাকেন, তাহলে বিনয়ে গলে যাবে লোকটা। আম্মার কাছে গিয়ে বলবে: সন্ধ্যার আগেই নীলুকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। বাসায় বসে আক্কি অপেক্ষা করছে কি না তাই। কিন্তু এরপরের ঘটনা তেমনি অজানা রহস্যে আবৃত, তেমনি কৌতুকপ্রদ।

সারাদিন স্কুলের ক্লাশ করে পেটের ভেতরটা ক্ষুধায় জ্বলছে তার। সেই কোন সকালে চারটে খেয়ে গেছে স্কুলে, আর ছুটির পর নবাবপুর থেকে হাই কোর্টের সামনে দিয়ে রমনার মাঠ পার হয়ে এই আজিমপুর বস্তির পথ। সে কি একটু খানি পথ! এ-পথ আম্মাই দেখিয়ে দিয়েছেন তাকে। এ-পথে গাড়ী-ঘোড়ার আনাগোনা কম—ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষে চলাফেরায় নিরাপদ। তাই আম্মার ধারনা। নীরুর সহপাঠীরা কেউ আসে রিক্সায়, কেউ গাড়ীতে। আবার কেউ বা তাদের আব্বার অফিসের পথে স্কুলের গেটে নামে। কিন্তু নীরুরতো সে ভরসা নেই। পায়ে হেঁটেই তাকে স্কুলে যেতে হয়। পায়ে হেঁটেই ফিরতে হয় বাসায়। টিফিনের ছুটিতে ওরা সবাই দল বেঁধে ভীড় জমায় ফেরিওয়ালার চারদিকে—কেউ বাদাম কেনে, কেউ ছোলা, কেউ মিষ্টি খায়, কেউ সন্দেশ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই তাকিয়ে দেখে নীরু। কোন দিন বা টিফিনের ছুটিতে বেরই হয় না সে ক্লাশ-রুম ছেড়ে।

কিন্তু এ-লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারেনা নীরু। ও-দের বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কিছুতেই সে বাসায় ঢুকবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠছে নীরু। তার শরীরের মাঝখানটা যেন নেতিয়ে আসছে, ভেঙ্গে পড়তে চাইছে।

পাশের কলতলায় একটা গোলমাল বেঁধেছে। বস্তির মুচি বাড়ীর নয়া বউটা এসেছে কলসী নিয়ে; কলতলার পাশে ভীড় জমানো আর পাঁচটা মেয়েকে এক রকম জোর করে ঠেলে দিয়ে তার নিজের কলসীটা কলের নীচে বসিয়ে দিয়েছে সকলের আগে। সাহস করে আর কেউ সেটা সরিয়েও দিতে পারছে না—মনে মনে জ্বলছে শুধু। এমন সময় কোত্থেকে একটা বুড়ো ফকির এসে কলসীটা সরিয়ে দিয়ে আঁজলা ভরে পানি খেতে শুরু করে দিলে। রাগে ফুলে গেলো নয়া বউটা। এক ধাক্কায় উপুড় করে ফেলে দিলে বুড়োটাকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার ঘন কাজলমাখা চোখ দুটো স্থির, নিষ্পন্দ হয়ে গেলো। ধাক্কা খেয়ে তার নিজের কলসীটার ওপরই পড়েছে বুড়ো, আর বুড়োর গায়ের ধাক্কায় মাটির কলসীটা দু'ফাঁক হয়ে গিয়ে নয়া বউয়ের এত কষ্টে সঞ্চিত পানিটুকু অকৃপণ ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে মেটে পথে। স্তম্ভিত মৌনতাকে ভেঙ্গে দিয়ে মুচী বাড়ীর বউটা থম থম শব্দে পা চালাচ্ছে নিজের ঘরের দিকে;—পায়ের পাতার কাছে তার শাড়ীর মোটা লাল ডোরাটা তুমুল আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠছে বার বার।

: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি রে নীরু? আম্মা ফেরেননি, বাসায় যা। মীনা-বাচ্চুকে দেখিস্, বুঝলি?

পেছনে তাকিয়ে আর আপাকে দেখতে পেলে না নীরু। বড় রাস্তার পাশে তখন সেই লোকটা গাড়ীর দরজা বন্ধ করছে। আপা ভেতরে। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো গাড়ীটা।

মীনা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, সাথে সাথে গলা ছাড়ছে বাচ্চু। আপার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলো মীনা। এই আজিমপুর বস্তির আশপাশ ছাড়া কোন দিনই বা আর বাইরে গেছে সে! অথচ বাইরের বড় পৃথিবীটার আবহাওয়া প্রতিদিনই এসে গায়ে লাগে আর মীনার কিশোরী মনটা ছটফট্ করতে থাকে বস্তির এই বদ্ধ

জীবনে। কিন্তু বললেই হলো আর কি! আপা তাকে সঙ্গে নেবে কেমন করে? আপা নিজেই যে যাচ্ছে আর একজনের সঙ্গে!

আম্মা যখন এলেন তখন ওদের কান্না থেমেছে। বিক্ষুব্ধ মনের হতাশা এমনিতে স্তিমিত হয়ে এসেছে মীনার, সাথে সাথে একটা নতুন খেলায় মেতেছে বাচ্চু। দরজার নড়বড়ে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে নীরু। চিরদিনের মত শান্ত নিরুদ্বেগ মনে ভেতরে ঢুকলেন আম্মা। তিরিশের কোঠা পার হয়েছে জরিনা বেগমের কয়েক বছর আগেই; কিন্তু চেহারায় নেমেছে উত্তর চল্লিশের পরিণতি। তার এককালের সুন্দর চোখ দুটো বসে না গেলেও দৃষ্টির সে ঔজ্জ্বল্য আর নেই। চুলে পাক ধরেনি যদিও তবু সেগুলোর ভাঁজে ভাঁজে বাসা বেঁধেছে রুক্ষ মলিনতা। তার উজ্জল হলদে চেহারায় কেমন যেন পাণ্ডুর আস্তর পড়েছে একটা। রক্তহীন পাংশুটে হয়ে এসেছে সারাটা মুখ। কিন্তু এই মুখটাই নীরুর কাছে কত আপন, কত না প্রিয়! জরিনা বেগমের চুপসে যাওয়া বুকটাতে নীরুর আশ্রয়টা কত না নিরাপদ! সারাটা ঢাকা শহরে এই বুকের মত একটা নিরাপদ আশ্রয়, এই মুখের মত একখানা মমতা মাখানো মুখ খুঁজে পায় না নীরু।

: আম্মা গো। এক অপূর্ব আবেগে আম্মার কোমরটাকে দু'বাহুর বাঁধনে আবদ্ধ করে ফেলে নীরু।

: কি রে বাবা, ইস্কুল থেকে এসে খাসনি কিছু? ঝুয়ে পড়ে দুহাতে নীরুর মুখটাকে নিজের মুখের কাছে আনতে চেষ্টা করেন জরিনা বেগম। কিন্তু সারাটা মুখই যে ভিজে গেছে নীরুর! নীরবে তার কপালে চুমো খান আম্মা, ধীরে ধীরে নিজের আঁচলে মুছতে থাকেন নীরুর মুখটা।

: কি বোকা ছেলে, এমনি করে কাঁদতে আছে নাকি!

ঠিকই বলেছেন আম্মা। কান্নাটা বোকামী। ইস্কুলেও সবাই বলে এ-কথা। কিন্তু নীরুর মনে কি দুঃখ নেই মোটেই। স্কুলের সব ছেলেরা মাসে মাসে তাদের আব্বার কাছ থেকে নতুন নতুন জুতো পায়, জামা পায়; কত রঙ বেরঙের বই কেনে দেয় ওদের আম্মারা। নীরুর তো এ-সব কিছুই নেই। তার সহপাঠীরা কত জায়গায় দল বেঁধে বেড়াতে যায়। সেবার পিকনিকে যাওয়ার কি ইচ্ছেটাই না ছিলো নীরুর! কিন্তু গোটা একটা টাকা চাঁদা সে দেবে কোত্থেকে? ওরা যখন দু'দুটো গাড়ী বোঝাই করে স্কুলের গেইট পার হয়ে যাচ্ছিলো তখন একরকম চোখ বন্ধ করেই হাই কোর্টের সামনের পথটা অতিক্রম করেছে নীরু। তারপর রমনার মাঠের মাঝ-খানটায় বসে অনেকক্ষণ একাকী কেঁদেছে সে। এই উন্মুক্ত মাঠটা কান্নার জন্যে প্রশস্ত জায়গা—কেউ দেখতেও পায় না অথচ মনের সাধ মিটিয়ে চোখের পানি ফেলতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু বাইরে থাকলে যে সব দুঃখ মনটাকে চেপে ধরে, আম্মার কাছে এলে সে সব কিছুই মনে থাকে না নীরুর। বোধ হয় আম্মার প্রশান্ত মুখের ছায়ায় এসে সেই সব কঠোর বেদনাগুলো গলে পানি হয়ে বেরিয়ে আসে নীরুর চোখ দুটো দিয়ে। তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে না করলেও কান্না আসে তার। আর এ-কান্নাকে সে তার আয়ত্তে আনতে পারে না কোন দিনই। তাই পাখীর বাচ্চা যেমন করে তার নিজের দেহটাকে মায়ের পালকের ভেতর গুঁজে দেয়, ঠিক তেমনি ভাবে নিজের মুখটাকে আরো নিবিড় করে আম্মার বুকে জড়িয়ে মিশিয়ে দেয় নীরু।

: যা তো মীনা, এক দৌড়ে মুড়ি নিয়ে আয় এক আনার! নিজের গাঁট থেকে একটা আনি বের করেন আম্মা।

মুড়ি চিবোতে চিবোতেই হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায় নীরুর। আর ঠিক তেমনি হঠাৎ একবার সে প্রশ্ন করে বসে: এই ভদ্রলোকের সাথে আপা কোথায় যায় আম্মা? কোন জবাব না দিয়ে বাচ্চুকে কোলে টেনে নেন আম্মা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীরুর মুড়ি খাওয়া দেখছিলো মীনা; এবার এগিয়ে আসে সেও। আম্মার একটা হাতের দুটো আঙুল দু'হাতের মুঠোয় পুরে অভিযোগ জানায় মীনা: আপা আমাকে একদিনও সাথে নেয় না। আজ তাকে বকে দিও আম্মা, কেমন?

: কই যায় ওরা আম্মা? দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করে নীরু।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে নীরুর দিকে তাকিয়ে এবার মৃদু হাসেন আম্মা। কিন্তু এ-হাসিটা যেন আম্মার মুখের হাসি নয়—আর কারো মুখ থেকে এসে আম্মার মুখটাকে বিকৃত করে দিয়েছে; কিছুমাত্র উজ্জল করেনি তাকে।

: আশরাফদের বাসায় বেড়াতে যায় আর কি রে নীরু!

: ওদের বাসা কোথায়?

: সে তো ভুলে গেছি বা, এই শান্তিনগর না পুরানা পল্টন কি একটা যেন বলেছিলো আশরাফ।

: ওরা বুঝি আমাদের দেশের মানুষ?

: না, না, ওদের বাড়ী তো কুষ্টিয়ার দিকে কোথায়!

: তা হলে ওরা আমাদের কি হয় আম্মা?

এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না জরিনা বেগম। চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত করে আরো গভীর ভাবে

তাকালেন নীরুর দিকে। এমন ভাবে খুঁটে খুঁটে কোন দিনই প্রশ্ন করেনি নীরু। কিন্তু এ-দৃষ্টিটাও যেন আত্মার চোখের দৃষ্টি নয়—কেমন বিহ্বল অথচ তীব্র, গভীর অথচ উদাস।

এ-প্রশ্নের কি জবাব দিবেন জরিনা বেগম? শুধু নীরুর নয়, তাঁর নিজের মনেও যে প্রশ্নটা বাসা বেঁধেছে আজ অনেকদিন। আশরাফের সঙ্গে নীলার কেমন করে পরিচয় ঘটলো সেটা তাঁর জানার কথা নয়। কিন্তু এই যে মেশামেশি চলছে দু'জনের মাঝে তার পরিণতির কথা চিন্তা করে তো তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। ওদের বাপ মরে গিয়ে জরিনা বেগমের ওপরেই বাপ-মা উভয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। ওদের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ সব কিছুই দেখতে হবে তাঁকে। কিন্তু সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারেন জরিনা বেগম! সবেতো একটা প্রাইমারী স্কুলের চাকরী; মাত্র কুড়িটা টাকা মাইনে। আর বাড়ী বাড়ী ছাত্রী পড়িয়ে গোটা তিরিশেক টাকা। এই পঞ্চাশ টাকায় পাঁচ পাঁচটা প্রাণীর একটা মিলিত সংসার। নিজের কথা ভাবেন না জরিনা বেগম। কিন্তু নীলা এখন বড় হয়েছে। তার প্রয়োজন অনেক। তবু বছরে দুটো শাড়ী ছাড়াতো কিছুই দে'য়া সম্ভব নয় তাকে। এ-বয়সে ছেলেমেয়েদের চোখে রঙ ধরে আর সে-রঙে রাঙিয়ে দিতে চায় তারা পৃথিবীকে। এ-কথা জরিনা বেগম তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারেন। নীলার সুঠাম দেহে তার চঞ্চল প্রাণের উচ্ছল গতিবেগের দিকে চেয়ে শুধু নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জরিনা বেগম। নীলা নাকি আশরাফের বোনের সাথে সই পেতেছে। তার রঙীন শাড়ীটা, একজোড়া ব্লাউজ, আর পায়ের শাদা সেণ্ডেল গুলোও নাকি সেখান থেকেই উপহার পেয়েছে সে। কিন্তু ব্যাপারটা কি শুধু এই? মায়ের প্রাণ নিঃসন্দেহ হতে পারে কই! আশরাফের সাথে যেতে দু'একবার নীলাকে বারণ করেছিলেন জরিনা বেগম। কিন্তু মেয়েটাও যেন কি; মুখে মুখে এতগুলো কথা বলে দিতে পারে সে। যাদের পেটে ভাত নেই, এই সব ন্যাকামী সাজেনা তাদের। যারা ওই বড় বড় দালানে থাকে, হাজার পাঁচ শ' টাকা যাদের মাসে আয়, তাদের জন্যেই এসব বড় বড় কথা। খুঁজে দেখো, এ-বস্তির কেউ মানতে যায় না এসব। কথা গুলো মনে মনে আবৃত্তি করেন জরিনা বেগম।

স্বামীর মৃত্যুর পরেই এই বস্তীজীবনের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি; এ-বস্তির আনাচে কানাচে কি-সব কাণ্ড-কারখানা, সব তাঁর জানা। ওবাড়ীর হালিমাটার বয়েস হয়েছে ছাব্বিশ বছর, তবু বিয়ে হয়নি। বুড়ী মা আর তিন তিনটে ছোট ভাই-বোনের খরচ সে একাই যোগাচ্ছে। আর মরিয়ম, আমেনা, সুফিয়া এদের কারো খবরই তাঁর অজানা নয়। সেবার সুফিয়াদের বাড়ীতে কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেলো! হাসপাতালে যাওয়ার পথেই হয়তো মরে গেছে লোকটা। ওঃ! এই সব মেয়েদের সাথে তার নিজের জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলতে পারলো নীলা? আজরাইলও কি আজকাল বস্তির পথ ভুলে গেছে?

নীরুর কচি মনের ওপরেও কি বস্তির এই পঙ্কিল জীবনের কোন ছায়া রেখাপাত করেছে? সেতো আর কোন দিনই অনুসন্ধিৎসা দেখায়নি এ-সব ব্যাপারে!

কিন্তু জরিনা বেগমতো তা চাননি। নিজেই ইচ্ছে করে তাকে নবাবপুর সরকারী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন। আর পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবে সে। নিজের দুঃখবেদনার কথা যতদূর পারেন জানতে দেন না নীরুকে। এই কষ্টের মাঝেও নীরুর এক জোড়া ভালো জুতো, দুটো সার্ট আর দুটো পেন্ট করে দিয়েছেন জরিনা বেগম। মৃত স্বামীর অন্তিম কামনাকে নীরুর মাঝে রূপায়িত করে তুলতে চান তিনি। লেখাপড়ায়ও খ্যাতি আছে নীরুর; এতগুলো ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে গেলবার সে সপ্তম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। ওর কচি মুখের দিকে চেয়ে সব কিছু ভুলে যান জরিনা বেগম—অতীতের ঐশ্বর্যময় জীবনস্মৃতির বেদনা আর বর্তমান পঙ্গু জীবনের দীনতা সব কিছুই ভুলে যেতে চান তিনি। নীরু, নীরু কোথায়? এখনই তাকে ডেকে বারণ করে দেবেন ওদের সাথে মিশতে। কিন্তু না, নীরু আর এখানে নেই।

সেই কলতলাটাতে আবার ভীড় জমেছে। মুচী বাড়ীর বউটি আসেনি, কিন্তু তার ভাঙ্গা কলসীর টুকরো-গুলো কলতলার পাশে ছড়িয়ে আছে এখনো। মীরা, সুফিয়া, তারা বানু এরা সবাই এসেছে কলসী নিয়ে। বস্তির আরো কয়েকটি ছেলেমেয়ে চার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে আসে নীরু। এরা আরো গরীব। পানি ওয়ালাকে পয়সা দিয়ে পানি নিতে পারেনা এরা। নিজেরাই কলসী নিয়ে কলতলায় ভীড় জমায়। হৈ চৈ করে পানি নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মারা মারিও করে। দেখতে ভারী মজা লাগে নীরুর। যারা মার খায় তাদের জন্যে দুঃখও হয় তার।

: কি গো ভদ্দর লোকের পো, চাইয়া চাইয়া তামসা দেখবার লাগছো নাকি? নিজের ভরা কলসীটা কাঁখে তুলে নিতে নিতে নীরুকে ইঙ্গিত করে তারা বানু।

: নিজের হাতে এক কলস পানি নিমু তাইতে মোদের ইজ্জত যায় না। মন্তব্যটা মীরার।

সুফিয়া তার কলসীটাকে বসিয়ে দিচ্ছিলো কলের নীচে। ফিরে এসে বিরক্তিতে শরীরটা একবার আন্দো-

লিত করলো : আহারে ইজ্জত! দেখছি কেমুন ভদ্দর লোক। ভদ্দর লোক অইব তয় হের বইনে পরের সাথে গাড়ী দৌড়ায় কেন্?

এবার ছোট কয়টা ছেলেমেয়ে ছাড়া সবাই হেসে ওঠে এক সাথে। মন্থর কলতলাটা চকিতে সজাগ হয়ে ওঠে; বিজন বনের নীরবতা ভেঙ্গে কয়েকটা বাঘিনী যেন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে শিকারের আশায়। ওরা পেয়েছে কি নীরুকে! ওদের হাসির শব্দটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ভয়ানক গরম করে দিয়েছে তাকে। অসহ্য। আর চাইতে পারছে না নীরু। কান দুটোও ভারী হয়ে এসেছে তার। কিছুই শুনতে পাচ্ছেনা নীরু।

: তুই কি আজ বাসায় যাবিনে নীরু? প্রশ্নের সাথে সাথে নীরুর কাঁধে সহানুভূতির পরশ লাগালো কার এক-খানা হাত। পেছনে ফিরতেই আপার হাসিমাখা মুখটা চোখে পড়লো নীরুর। কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ আপাকে। সবকিছু ভুলে নীলার সাথে বাসার দিকে পা বাড়ায় নীরু। আপা শুনতে পেয়েছে কি না কে জানে। কিন্তু পেছনে পড়া কলতলা থেকে আসা মন্তব্যটা স্পষ্টই কানে বাজছে নীরুর—

: এই গো ভদ্দর লোকের মাইয়া হাওয়া খাইয়া ফিরবার লাগছে। সাথে সাথে সেই বিদ্রুপের হাসিতে আর একবার সতেজ হয়ে ওঠে কলতলাটা।

আম্মা বেরিয়ে গেছেন ছাত্রী পড়াতে। মেঝেয় বই নিয়ে পড়তে বসেছে মীনা, পাশে বাচ্চু। ঘরে ঢুকেই বাচ্চুকে কোলে তুলে নিলে আপা! অপরিমিত সোহাগের অসংখ্য চুম্বনে ভরে দিলে তার ছোট্ট মুখটা। খুশীতে আজ একেবারেই ভরে ওঠেছে নীলা আর তাই যেন সে ছড়িয়ে দিতে চাইছে এই অবোধ শিশুটার দেহে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে আর তার নিজের মনের প্রশ্নটা দানা বাঁধছে নীরুর। অবশেষে একবার মুখ ফুটে বলেই ফেলে সে।

: ওই ভদ্র লোকের সাথে তুমি কেন যাও আপা?

নীলার আনন্দ-মাখা সুন্দর মুখটা চকিতে লাল হয়ে ওঠে।

: কেন, তাতে তোর কি হয়েছে?

: ওরা আমাদের কেউ নয়। পরের সাথে মানুষ যায় নাকি?

: কে বললে ওরা আমাদের কেউ নয়? আফি আমার সই, তার ভাই তো আমাদেরও ভাই।

: ইস্ বললেই হলো আর কি! তোমার সইতো কোন দিন আসেনা এখানে!

প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে গিয়ে এবার উত্তেজনা এসেছে নীলার কণ্ঠে।

: তোদের এই ভাঙ্গা ঘরে তাকে বসতে দিবি কোথায়? ওরা বড় লোক।

: কিন্তু তার ভাইতো প্রায় রোজই আসেন এই ভাঙ্গা ঘরে!

এবার আর ঠিক থাকতে পারে না, উত্তেজনায় ফেটে পড়ে নীলা।

: মুখে মুখে খুব তো তর্ক করতে শিখেছিস নীরু! দুই-বেলাইতো বসে বসে খাস আর মাসে মাসে ইস্কুলের মাইনে গুনিস। টাকা গুলো কোথেকে আসে তার খবর রাখিস? আম্মার গায়ে একটা ব্লাউজ নেই, তাঁর সেণ্ডেলগুলোতে তালি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। আর তুইতো রাত দিন বাবু সেজে বেড়াচ্ছিস! তর্ক করতে লজ্জা করেনা? বাঁদর কোথাকার।

না, আজ আর ঘুম আসবে না নীরুর চোখে। আপার বকুনিটা মর্মে মর্মে বিঁধছে তাকে। তারা যে গরীব মানুষ এ-কথা অজানা নয় নীরুর। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আপার সেই ঝাঁঝালো কথা গুলো যেন তাদের পারিবারিক পরিবেশ আর অবস্থা সম্পর্কে নতুন ভাবে সজাগ করে দিয়েছে তাকে। ঠিকই তো। আম্মার একটা মাত্র ব্লাউজের দুটো হাতা ছাড়া ছেঁড়তে বাকী নেই কোথাও। একটা শাড়ী বার বার শেলাই করে বাড়ীতে পরেন আম্মা, আর ভালো শাড়ীটা নিয়ে কেবল বাইরে যান। মীনারও একটা ছাড়া ফ্রক নেই। বাচ্চুর না হয় একটা পেন্টেই চলে যায়। কিন্তু এর আগে তো এগুলো তার চোখে পড়েনি। স্কুলের সহপাঠী ছেলেদের কাপড় চোপড়ের প্রাচুর্য আর নিজের দীনতার মাঝখানে যেটুকু পার্থক্য সেটুকু দিয়েই এতকাল সে নিজেদের দারিদ্রের কথা বুঝে এসেছে। কিন্তু নিজের ঘরের মাঝখানটিতে যে এমন ভাবে স্থায়ী হয়ে শিকড় গেড়ে বসে আছে অভাব, এতদিন তো সে কথা ভাবেনি নীরু! আপার কথাগুলো যেন দু'চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবকিছু দেখিয়ে দিয়েছে আজ।

আপা বকেছে ভালই করেছে। তা না হলে এমন ভাবে নিজেদের কথা ভাবতে পারতো না নীরু। এই সব বড় লোকেরা তাদের যে করুণার চোখে দেখে, সে কথাটাও যেন আজ নতুন ভাবে টের পেয়েছে নীরু। কিন্তু আপাটা কেন যায় ওই লোকটার সাথে? টাকার কথা বলেছে আপা। তবে কি আপাকে টাকা দেয় ওরা? কিন্তু নিজের কর্তব্যটা যে কি, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না নীরু। অথচ বোবা কান্নার মত একটা ব্যথা যেন তার সারাটা বুকে চেপে বসেছে—যন্ত্রনায় ছটফট করে গড়াগড়ি দিচ্ছে সে।

হিসাবে ভুল করেননি জরিনা বেগম। তিন মাস পরেই বিছানায় আশ্রয় নিলে নীলা। ডাক্তার ডাকবেন

সে ভরসা নেই; পাড়ার কবিরাজকেই ডেকে নিয়ে এলেন। কবিরাজ নাড়ী টিপে গোটা কয়েক বড়ি দিলে। বললে, তেমন কিছু নয়, তবে মারাত্মক কোন রোগ লক্ষণের জন্যেও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। ভেতরে ভেতরে দমে গেলেন জরিনা বেগম। আচরণে আরো গম্ভীরতা প্রকাশ পেলো। নীরু, মীনা, বাচ্চু এদেরকে নিষেধ করলেন নীলার কাছে যেতে। নিজেই তিনি নীলার দেখাশুনা করে চললেন।

নীরুর স্কুল ছুটি আজ। কিন্তু আম্মার কাজে কামাই নেই—সকালে নাশ্তা করেই কলোনীর মেয়ে পড়াতে চলে গেছেন। কিছুদিন থেকেই আপার সাহচর্যের জন্যে চটফট করছে নীরুর মনটা। কিন্তু জরিনা বেগমের সতর্ক প্রহরায় অসুস্থ নীলার বিছানার কাছও ঘেঁসতে পারে না সে। আজ এই অবসরে আপার কাছটিতে গিয়ে বসে নীরু। পাতলা কাঁথাটাতে মাথা মুড়ে পড়ে আছে নীলা। শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকের কাছটা শুধু আন্দোলিত হচ্ছে, বাকী শরীরটা সহজ অনড় হয়ে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে নীলার মুখ থেকে কাঁথাটা সরিয়ে দেয় নীরু।

: আপা, আপা গো।

অশান্ত তন্দ্রার বাঁধ ভেঙ্গে চোখ মেলে নীলা। কী অবিচল আর শান্ত চোখ দুটো আপার।

: নীরু, তুই আমার এত কাছে এসেছিস ভাই?

: তোমার কি হয়েছে আপা?

নীলার মুখের কাছটিতে নিজের মুখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসে নীরু। কিন্তু আপা তার মুখটাকে সরিয়ে নিচ্ছে কেন?

: না, না, আমার এত কাছে আসিস না নীরু, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, এত কাছে আসিস নে।

অব্যক্ত বেদনা আর অভিমানে সারাটা মন পুঞ্জিভূত হয়ে আসে নীরুর। সে কি ভালোবাসেনা আপাকে?

: কাছে আসতে বারণ করছো কেন আপা? কত দিন তোমার কাছে আসিনি। আমার মনটা যে কেমন করছে। এবার চোখ দুটোও ছল ছল করে ওঠে নীরুর।

: বারন করছিনে রে পাগল, বারন করছিনে। গভীর মমতায় নীরুর একটা হাত টেনে এনে তাতে চুমো খায় আপা। তোর ভালোর জন্যেই বলছি। আমার যে অসুখ করেছে ভাই, কাছে এলে তোর কি হয় কে জানে!

: না, আমি তা মানবো না। এবার সত্যি আপার বুকের কাছটিতে ঝাপিয়ে পড়ে নীরু।

সাথে সাথে বালিশে হেলান দিয়ে ওঠে বসে নীলা। নিজের কোলের ওপর রাখা নীরুর মাথাটাতে হাত বুলোতে থাকে ধীরে ধীরে।

: তোর তো এখন বয়স হয়েছে রে নীরু। তবু কেন বুঝিসনে ভাই বল তো?

: তুমি ভালো হবে কখন আপা?

: সে কি আর বলা যায় রে! ভালো নাও তো হতে পারি।

: যাও, তুমি ঠাট্টা করছো আপা!

: ঠাট্টা না রে, ঠিকই বলছি। যা শক্ত অসুখ করেছে আমার! দেখিসনে আম্মা তোকে আমার কাছে আসতে দেন না।

ঠিকই তো। আম্মা বেরিয়ে না গেলে আজো সে আপার কাছে আসতে পারতো না। কিন্তু আপাকে তো তেমন অসুস্থ বলে মনে হয় না। বেশ তো ওঠতে বসতে পারে। তবু যে সকলেই এত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছে কেন, বুঝতে পারে না নীরু।

: তোমার অসুখ কেন হলো আপা? ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে নীরু।

এবার কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকে নীলা। প্রশ্নটা তার নিজের মনেও দু'চার বার এসেছে। ইতিমধ্যে উত্তরটাও যে তার হাতের কাছে তৈরী না আছে তাও নয়। কিন্তু মুখে বললে: কি জানি, কেমন করে বলবো! তবে তোকে একটা কথা বলি নীরু। আপার কথাটা রাখবি তো ভাই?

: কি কথা বলো না আপা!

: ওই সব লোকদের সাথে মিশিসনে ভাই! ওরা আমাদের ছোট বলে ঘৃণা করে। মুখে ওদের মধু কিন্তু অন্তরটা বিষে ভরা। কেউটে সাপের মতো সুযোগ পেলেই ওরা ছোবল মারে।

বোধ হয় কথাটা স্পষ্ট হয়নি নীরুর কাছে। সাথে সাথে সে প্রশ্ন করে—

: ওই যে-ভদ্রলোক, আর তো আসে না আপা?

: হাঁ, এইসব লোকদের কথাই বলছি ভাই। ওদের সাথে মিশিসনে।

গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে বসে নীরু। এবার বুঝেছে সে। কাছে পেলে সে-লোকটাকে এখনি দু'চার ঘা বসিয়ে দিতো নীরু। লোকটাকে আগ থেকেই দেখতে পারতো না সে; এবার আপার ভুলটা ভেঙ্গেছে দেখে খুবই খুশী হয়েছে নীরু।

: আরো একটা কথা শোন্ নীরু। তুই আম্মাকে দেখিস। আমাদের জন্যে খাটতে খাটতে আম্মার শরীর আর মন দুটোই ভেঙ্গে গেছে। আম্মা যে কত দুঃখ নীরবে সয়েছেন, সে কথা তুই বুঝবি না রে নীরু! কিন্তু ভাই, এ-ভাবে থাকলে তো চলবে না। এ-দুনিয়ায় আর কেউই নেই আমাদের। তোকে সব কিছু বুঝতেই হবে—

করতেও হবে সবকিছু। বুঝলি নীরু লক্ষী ভাইটি আমার! এবার আবেগে উত্তেজনায় নীরুর কপালে চুমো খায় আপা। কিন্তু স্থির নিরাবেগ মনে বসে আছে নীরু। যেন সবকিছু বুঝেছে সে, যেন তার নিজের জীবনের বিরাট দায়িত্বের ভারটা বুঝে নিচ্ছে আপার কাছ থেকে।

আজকাল আর বেশী বাইরে যেতে চান না জরিনা বেগম। আর অপ্রয়োজনে কবেই বা বাইরে গেছেন তিনি। তবু বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছাত্রী পড়ানো এতদিন তার পেশা তো ছিলোই, নেশাও ছিলো। কিন্তু আজকাল সুযোগ পেলেই ওদের বাড়ী থেকে পালিয়ে বাঁচেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই নিম্ন প্রবেশিকার বিদ্যে নিয়ে আস্ত একটা পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—কঠোর সংগ্রাম করে এসেছেন জরিনা বেগম। কিন্তু তাঁর সে মনোবল আর নেই। শীতের মরা গাঙের মতো যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, মিইয়ে এসেছে তাঁর জীবন ধারা। যে জীবনের জন্যে এতকাল সংগ্রাম করেছেন, সে জীবনের কতটুকু নাগাল পেলেন জরিনা বেগম? নীলার ঘটনাটাই সব চাইতে বেশী বেজেছে তাঁকে—শেষ পর্যন্ত বস্তির আর পাঁচটা মেয়ের মতোই ব্যর্থ হতে চলছে নীলার জীবনটাও। এতদিন ধরে জীবনমৃত হয়ে বেঁচে থাকার সাধ ছিল না তাঁর—নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই বাঁচতে হয়েছে তাঁকে। ছেলে-মেয়েদের কচি মুখগুলোর দিকে তাকিয়েই বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছেন জরিনা বেগম। আর আজ? সে-প্রেরণা আজ তাঁকে উজ্জীবিত করতে পারছে কই! তবু ভরসা, নীরু আছে। সে বড় হবে, মানুষ হবে—তার দিকে চেয়েই জীবনের ক্ষীণতম আশাটুকুও জেগে আছে জরিনা বেগমের। আজ আর কিছুতেই বাইরে যাবেনা আম্মা। নীরুর পরীক্ষার ফল বেরুবে আজ। হয়তো এখনই বাসায় ফেরবে সে। স্থির আচরণের অন্তরালে অস্থির উদ্বিগ্ন মনে প্রতীক্ষা করেন আম্মা।

পড়ন্ত রোদের এক ফালি তির্যক আলো এসে পড়ছে সামনের ঘরের মেটে দেওয়ালটাতে। বিবর্ণ দেওয়ালটা কেমন ঝক্‌ঝক্ করছে। বস্তির মেয়েরা কলসী হাতে চলছে কলতলায়। এই অবেলায়ও একটা লোক মুড়ি বেচতে এসেছে। দু'আনার মুড়ি কিনে নিজের হাতে তাতে পিঁয়াজ কুঁচি মেশাতে থাকেন জরিনা বেগম। নীরু ফিরবে।

অবশেষে সত্যি নীরু এলো। তার রুক্ষ-মলিন চেহারাটাতে ক্লান্তির ছায়া। ডাগর চোখের অব্যক্ত ভাবটা দুর্বোধ্য। এমন কি আম্মার কাছেও।

: তোর পরীক্ষার খবর কিরে বাবা। অপরিসীম আগ্রহ আম্মার কণ্ঠস্বরে।

: আমি স্কুলে যাইনি আম্মা। শুনলাম, পাশ নাকি করেছি।

: বলিস কি, স্কুলে যাসনি কেন? আম্মা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

: আর যাবো না স্কুলে।

: কেনরে, এমন কথাতো তুই আর কোন দিন বলিস্‌নি নীরু!

: স্কুলে গিয়ে আর হবে কি আম্মা? বলে তেমনি সহজ ভাবে আম্মার হাতের থালা থেকে এক মুঠো মুড়ি পুরে দেয় গালে। যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু নীরুর ব্যবহারটাও যেন আজ আম্মার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। সত্যি কি বলছে ছেলেটা।

পরপর কয়েক মুঠো মুড়ি খেয়ে এক গ্লাস পানি খায় নীরু। তারপর বলে: আমার বালিশটা আর পাতলা কাঁথাটা দাও আম্মা। এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে।

: এসব কি বলছিস্ পাগলের মতো? কোথায় যাবি তুই?

: আমি একটা চাকরি পেয়েছি আম্মা। এখন পনেরো টাকা মাইনে পাবো। কয়েক দিন পরে বাড়িয়ে কুড়ি টাকা করে দেবে বলেছে।

কিছুই যেন বুঝতে পারছে না আম্মা। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নীরুর মুখের দিকে।

: দাও আম্মা, বালিশটা দাও।

: কোথায়, কি চাকরী পেয়েছিস নীরু?

: চকবাজারে, একটা হোটেলে।

: হোটেলে? শব্দটা যেন চিৎকার দে'য়ার মত শুনালো আম্মার কণ্ঠে। পড়াশুনা ছেড়ে হোটেলে চাকরী করতে যাবি তুই নীরু?

: আমি বুঝেছি আম্মা। এ-সব আমাদের সাজে না। যার, মায়ের পরণে একটা ভালো কাপড় নেই, যার বোন দু'টো টাকার জন্যে মান ইজ্জত হারিয়ে ঘরে বসে, যার ছোট ভাইটা দু'পয়সার একটা খেলনার জন্যে অন্যের মার খেয়ে কেঁদে ফিরে, তার জন্যে লেখাপড়া নয়। আমার জন্যে তুমি দুঃখ করো না আম্মা। আমার মত আরো অনেক ছেলে সেখানে চাকরী করে। দোয়া করো, আমাদের দিন ফিরে এলে, বাচ্চুকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবো।

জরিনা বেগমের কি নিঃশ্বাস পড়াটাও বন্ধ হয়ে গেছে? ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে ওঠে এসেছে নীলা। মীনা আর বাচ্চুও নীরু ভাইয়ার কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর একটি কথাও বললেন না জরিনা বেগম। গলির মুখে সেই কলতলাটায় আবার ভীড় জমেছে। সামনের পথটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিছুই আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারটা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশেও। গোরস্থানের পাশে বড় বড় গাছগুলোর ওপর দিয়ে আদিগন্ত আকাশটা ঝাপসা হয়ে এসেছে।

মোহররম

আশরাফ উদ্দিন আহমদ

এল ফিরে মহরম
মোমেনের দিলে জালেম এজিদ হানে তেগ বেরহম।
পলে পলে কত পার হয়ে গেল সময়ের পারাবার
কারবালা শোক হয়নি তো মূক মাতমের হাহাকার।
যোজন যোজন দূর হতে আজো পশিছে শ্রবণে আসি
শুষ্ক কণ্ঠে করুণ মাতম—পিশাচের ক্রূর হাসি।
মেহদী মিলেনি বিবাহ বাসরে সাজাইতে বর-কণে
তাই তো কাসেম রাঙাল বসন আপন কলজা খুনে।
সদ্য বিধবা সকিনার ওই বুক ফাটা ক্রন্দন
সাহারা মরুর শুষ্ক বুকেও জাগায়েছে স্পন্দন।
খিমায় খিমায় 'পানি পানি' বলে বাচ্চারা তড়পায়
পানি সে তো ছার! আঁসু পরিমল ঝরাতে
পারেনি মায়।
পিপাসা কাতর আলী আকবর পিতার রসনা চুমি
কোরবান হ'তে জঙ্গে আজদীর গেল পুনঃ রণ ভূমি।
মাসুম সে আসগর
পানির বদলে বুকে নিয়ে গেল জালেমের খরশর।
এত শোকে-দুখে এত যাতনায় দমেনি হোসেন বীর,
ন্যায়-নীতি আর সত্যের তরে চির উন্নত শির।
উদ্ধার করি ফোরাতের পানি হোসেন এমামে দ্বীন,
পান করিল না হল রাহাগীর—শহীদানে তাবেঈন।
সীমারের খঞ্জর—
রাঙ্গায়ে দিল হোসেনের খুনে কারবালা প্রান্তর।

* * *

বরষে বরষে আসে মহরম লয়ে এই ত্যাগ-বাণী
ইসলাম, গণতন্ত্রের লাগি জান দিতে কোরবাণী।
সত্য ন্যায়ের রক্ষিতে মান ডাকে দূরে ওই শোন
এস এস বীর মোছ আঁখি-নীর দিলীর ঢালো গো খুন।
মর্সিয়া আর ক্রন্দনে আজ নাহি কোন প্রয়োজন
মজবুত হাতে জালেমের টুঁটী টিপে ধর অনুখন।
জেহাদী লেবাস পরে নাও আজ রাখো মনে উম্মিদ
হয় হবো গাজী জালেমেরে নাশি নয়তো হবো শহীদ।
চলো জোয়োয়ার আজ জেহাদী কাফেলা তৌহীদী
ফরমান
আজকের এই নকল তাজিয়া ভেঙ্গে কর খান্‌খান্‌।
মহরম তসলিম—
তোমার পরশে যুগে যুগে জাগে ইসলাম-মুসলিম।

বিশ্ব-সংস্কারে বিশ্বনবী

এ, টি, এম, নূরুল্লাহ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী আরবের আঁধার যুগ। শুধু আরব কেন, বিশ্বের প্রতি কেন্দ্রে শিথিল মানবতার আকুল হাহাকার তখন কেঁদে ফিরছিল। তখন মানব সমাজে নীতি-ধর্ম্ম, আইন-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। "জোর যার মুলুক তার" ছিল সে সময়ের প্রধান মন্ত্র। একজন অপর জনকে ভ্রুকুটি দেখালে তার তলোয়ার কিছুতেই তাকে ক্ষমা করত না। আরও মজার কথা—কোন শক্তিশালী ব্যক্তি ডজন খানিক মানুষ খুন করলেও মানব সমাজ এর জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হত না। আবার হয়ত সামান্য কলহে রক্তের ঢেউ খেলে যেত। পুত্র পিতাকে সম্মান করত না। স্ত্রী স্বামীকে আমল দিত না। অবাধ যৌন-ধর্ম্ম তখন পশুত্বের সীমাকেও অতিক্রম করছিল। চুরি, ডাকাতি, পরস্ব অপহরণ, পর স্ত্রীর সর্বনাশ যে যত বেশী করতে পারত, সমাজে তারই ছিল তত উচ্চাসন, সে ই পেত সমাজের সর্বত্র সমাদর, সম্মান।

এ-সময়ে একমাত্র রোমে আইনের অনুশীলন দেখা যেত বটে; কিন্তু তা বিশেষ কার্য্যকরী ছিল না। ধনিক সম্প্রদায়ই ছিল প্রকৃত পক্ষে আইনের মালিক, তাদের দ্বারেই লক্ষ লক্ষ দুর্বল প্রাণ আত্মদান করে কৃতার্থ হত। বিচারালয় ছিল তখন বড়দের তলোয়ারের নিম্নে। নারী জাতিও ছিল তখন বেহায়ামীর চরম সীমায়। স্বামীর বর্ত্তমানেও অনেক রমণী যৌন ক্ষুধা নিয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াত। রূপের বাজার খুলে তারা যে কোন পুরুষকে পরিতৃপ্ত করত।

তখন দু'টী বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম-বিধান প্রচলিত ছিল, একটি এহুদী ধর্ম্ম—অপরটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। এহুদী ধর্ম্মের বিধান ছিল—চোখের পরিবর্তে চোখ, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ। প্রতিশোধ গ্রহণের এ-চরম নীতিই সে সময় অবাধে পালিত হত। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঘোষণা করল, "এক গালে চপেটাঘাত খেলে অপর গাল বাড়িয়ে দাও।"

মানব সমাজের এ-যুগ সন্ধিক্ষণে জগতের কল্যাণ নিয়ে ইসলাম বেহেশতের গুল বাগিচা হতে মর্ত্য-মানবের দ্বারে নেমে এল। বিশ্বনবী ঘোষণা করলেন: "যতদূর অত্যাচারিত হয়েছ, ঠিক ততদূরই প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কিন্তু ক্ষমা আল্লার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মনোনীত।"

নীতি ধর্ম হারা হয়ে যে মানুষ পশুত্বের আস্তাবলে স্থান নিয়েছিল, ইস্‌লাম তাদেরে বাইরে টেনে আন্‌ল। বিশ্বনবী তখন মানব সমাজকে দুটী মৌলিক ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিলেন—একটি 'হক্কুল্লাহ' বা খোদার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য—দ্বিতীয় 'হক্কুল এবাদ' বা মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায় ধর্ম্ম। প্রথম ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিলেন—কি প্রকারে 'হক্কুল্লাহ' প্রতিপালন করতে হয়। তিনি এ-ও বললেন: খোদার প্রতি কর্তব্য পালনে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে ক্ষমাশীল খোদার নিকট তার মার্জ্জনা আশা করা যায়; কিন্তু 'হক্কুল এবাদ' খোদা ক্ষমা করবেন না।

উচ্ছৃঙ্খল আইনের গতি রোধ করে বিশ্বনবী মানব সমাজকে আরও শিক্ষা দিলেন—পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নি, প্রতিবেশী, শত্রু-মিত্র, রায়ত-জমিদার, ভৃত্য-প্রভু, স্ত্রী-পুরুষ এমন কি প্রাণী জগতের প্রতিও মানবের সাধারণ কর্তব্য রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম এরূপ ব্যাপকভাবে মানুষকে শালীনতা বা নীতি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে আলোকের পথে, সত্যের পতাকাতলে আনতে সমর্থ হয়নি।

এক্ষণে আমরা আরবের সেই বর্ব্বর-যুগের 'উম্মি নবী' প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি এবং আইন কানুনের সঙ্গে বর্ত্তমান চরম সভ্যতার আলোকময় দেশ সমূহের ঐ সমস্ত নীতিবাদের কিছু তুলনা করব। এর দ্বারা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, একজন নিরক্ষর মরু-বালক কি ভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারকরূপে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর এ-আলোকময় যুগেও পৃথিবীর সর্ব্ব রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে আইনের তারতম্য বিরল নহে। একজন শ্বেতাঙ্গ হত্যার জন্য শত শত কাফ্রীর প্রাণ কি ভাবে গুলীর মুখে উড়ে যায়, সংবাদপত্রে আমরা তা জানতে পারি। অথচ এর বিপরীত অবস্থায় আইনের বজ্র কিছুতেই আমলে আসে না। বর্তমান পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য জাতিদের আইনের কেতাবেও 'ধলা-কালা'র তারতম্য বিধিবদ্ধ রয়েছে। আরবের বর্ব্বর যুগে ত কোন প্রকার সুবিচারের বালা-ই ছিল না। তখন দুর্ব্বল দরিদ্রগণ শক্তিশালীদের রথচক্রে লাখে লাখে হালাক হলেও শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেদিকে পড়বার অবসর পেত না। সামান্য মূল্যে দাসদাসী কিনে প্রভুরা তাদের জীবন-মরণের মালিক সাজত।

বিশ্বনবী আইনের তারতম্য এবং অত্যাচার অবিচারের পাহাড় সাম্যের অস্ত্রে ধূলিসাৎ করে সেখানে উদার বিশ্ব-জনীন ভাবধারার বীজ বপন করলেন। তিনি জগদ্বাসীকে

শিখালেন—"এক মানব অন্য মানবের ভ্রাতা! সুতরাং ভ্রাতৃত্বের হক সম্বন্ধে সকলেই সমান ভাবে অংশীদার।" মানব সমাজের সাধারণ নীতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যে কেউ অন্যায় কার্য্য করবে, তাকেই শাস্তির খাড়া মাথা পেতে নিতে হবে। ব্যক্তিবিশেষে অপরাধীর দণ্ডের তারতম্য হতে পারে না। বিশ্বনবী বরাবরই বলতেন—"আমার ফাতেমা যদি চুরির অপরাধে অভিযুক্তা হয়, খোদার কসম, তার হাত কেটে দিতে আমি কুণ্ঠিত হব না।" আমীরুল মোমেনীন খলিফা ওমরের পুত্র আবু শামা সুরা পানের অপরাধে অভিযুক্ত হলে ঘাতকের দুর্বার শাস্তি ভোগ করতে হয়, তা সকলেই জানেন। খলিফার পুত্র বলে আইনের কঠোরতা তাকে একটুও ক্ষমা করেনি।

বিশ্বজগতেও এতবড় সুমহান মানব রসুলুল্লাহ (দ:) স্বয়ং আদর্শ সেজে মানবমণ্ডলীকে কর্তব্যবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। নির্ম্মম গোলামী প্রথাকে তুলে দিয়ে তিনি কি ভাবে সকল মানবকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করেন, তা ভাবলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। "কাফ্রী গোলাম" বেলাল তাঁর দরবারে উচ্চাসন পেয়েছিলেন। ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে ইসলামের খলিফা—নিজে তার লাগাম ধরে পদব্রজে গমন করেছিলেন। এ ভাবে ভৃত্য প্রভু এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি প্রকাশের সুযোগ দেননি।

ইসলাম-আগমনের পূর্ব্বে নারী জাতিকে লোকে শুধু কামনার ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করত। মানব সমাজে এ-মাতৃজাতির কোন স্থান ছিল না। বাইবেলের ভাষায় নারী "শয়তানের ইন্দ্রিয়" বলে অভিহিত হত। তখনকার বর্ব্বর পুরুষ সমাজের নির্ম্মম হস্ত হতে নারীদিগকে উদ্ধার করে বিশ্বনবী কোরানের ভাষায় ঘোষণা করলেন—"তোমরা (পুরুষ) তাদের (স্ত্রী) পরিচ্ছদ এবং তারাও তোমাদের পরিচ্ছদ।" শুধু তাই নহে, কতিপয় অসহায় বিগত যৌবনা নারীকে স্বয়ং বিবাহ করে তিনি নারীত্বের গৌরব দেখালেন।

আজ গণতন্ত্রের শাসন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবর্তিত হচ্ছে। স্বৈর-শাসন বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্র হতে ধীরে ধীরে অপসৃত প্রায়। পৌণে চৌদ্দশত বছর পূর্ব্বে আরবের উম্মী নবী এ-গণতন্ত্র শাসনের বুনিয়াদ খাড়া করেন। "তোমরা পরস্পর যুক্তি পরামর্শের দ্বারা কার্য্য সম্পাদন কর।" এ-নীতি বাক্য নিজের কর্মময় জীবনেও তিনি অনুসরণ করে গিয়েছেন।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মে উপাসনার ক্ষেত্রে ভেদনীতি বিদ্যমান। খৃষ্টানদের গীর্জ্জায়ও আসনের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। কিন্তু ইসলাম সমতার 'জুলফিকার' দিয়ে উঁচু নীচু সমস্ত ভেদনীতির বন-জঙ্গল সাফ করে প্রত্যেক মুসলমানকে একই আল্লার উপাসনায় একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড় করেছে। সেখানে আমীর-গরীবের পার্থক্য নেই—পৌরহিত্যের দৌরাত্ম্য নেই।

বস্তুতঃ জগতের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ভাবে কাল কাটাতে পারে, বিশ্বনবী সেভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মাটির মানুষের পক্ষে যতখানি সাফল্যের উচ্চতায় আরোহণ করা সম্ভব, বিশ্বনবীর স্থান তার চেয়েও বহু উর্দ্ধে। আজ দুনিয়ার কোন মানুষ সে সীমারেখায় পৌছতে সক্ষম হয়নি। বিশ্বনবীর গুণরাজি বর্ণনার অতীত। আমরা তাঁর গৌরবময় জীবনের ইতিহাস কল্পনায় আনতে পারি না। এ-ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার আলোচনা করতে যাওয়া দর্পণের আকাশ ন্যায়। তাই আজ আমরা অমর কবি সা'দীর কথায় শেষ করছি—

"বালাগাল উলা বে-কামালিহী
কাশাফাদ্দোজা বে-জামালিহী
হাসানাত জামেউ খেসালিহী
সাল্লু আলায়হে ওয়ালেহী॥"

ত্রিবর্গ

শহীদ আখন্দ

তিনু শেখের দিন বড় মন্দা। প্রত্যেকটা পরিকল্পনা ভেস্তে যায় রসদের অভাবে। মাঝে মাঝে এখন তার মনে হয় দিন যখন তার ছিল হাত-টান হয়ে চললে এখন আর তেমন দুরবস্থায় পড়তে হতো না। এখন তো হাতই খুঁজে পায় না, তো টানবে কি। তাই বলে বাইরের জৌলুস দিয়ে বিচার করলে তিনু শেখ এখনো এ-অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয়। ঘরদোরের অযত্নজনিত অপরিচ্ছন্নতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে শালকাঠের চৌকাঠ অথবা ঘোমটা-দেওয়া দেউড়ির ওধারে বেনারসীর আঁচল।

ছেলেবেলায় তিনু শেখ যাত্রা দলের রাণী ছিল, যৌবনে রাজা আর এই প্রৌঢ়ত্বে এসে রাজা-রাণী, উজির-নাজির সব তার হাতের মুঠোয়। সেই খেয়াল-খুশির উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলোতে সমবয়সীরা আক্ষেপ করতো—তর যা চেহারা, তর রাজা হওয়াই উচিত আছিল রে। গানের রাজা নয়, আসল রাজা। ইংলণ্ডের রাজার ছবি ত দেখি, কিন্তুক কিছুই লাগে না তর কাছে।

তিনু শেখও গরদের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রাজকীয় কায়দায় বের করতো সিগারেট।

সিগারেট অবশ্য এখনো চলে; কিন্তু সে বিশেষ অবস্থায়। কোন ভদ্র দশজনের মহফিলে গেলে সে সিগারেটই নিয়ে যায় পকেটে করে। বিড়ির নীচে তাই বলে নামেনি এখনো। সুরুজকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁটে আর একটা গুঁজে দেয়—নে, বিড়ি খা।

বিড়িতে টান দিয়ে সুরুজ বলে,—তা হ'লে তুমি কি কও তিনু চাচা। তুমি থাকতে এই অপমানডা সইয়া যায়?

সুরুজ জোয়ান। কথা বলার সময় চোয়ালের পেশী থেকে শুরু করে প্রশস্ত বুকের প্রতিটি ধমনী চিড়চিড় করে। জোরহাটি গ্রামে যাত্রার দল এনেছিল, তাই দেখতে গিয়েছিল এ-গাঁয়ের অনেকেই। দুষ্ট জাতীয় কয়েকটা ছেলে গানের জম-জমাট অবস্থার সময় হঠাৎ পাম্প লাইটটা নিভে যাওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। হঠাৎ রসহানির চোট সামলাতে না পেরে ঢিল ছুঁড়েছিল আসরের মধ্যিখানে। পালায় দাসী সাজে যে ছেলেটি, ওর মাথায় একটা ঢিল পড়ে এবং খুবই আঘাত পায়। তারপর সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। হৈ-চৈ, ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, কিলাকিলি এবং অন্ধকারে যুদ্ধের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিপর্যয়। সে বিপর্যয় আরো ভয়াবহ হয়েছিল এইজন্য যে, যে ছেলেটি ওই কুকাণ্ডটি করেছিল, ওকে নাকি হাতে-নাতে ওই গাঁয়েরই একজন ধরে ফেলে। বেগতিক দেখে যা কোনদিন কর্তব্য নয় এ-গাঁয়ের ছেলেরা তা-ই করল। মাঠ বরাবর ভোঁ-দৌড়ে বাড়ী ফিরেছে। জান নিয়ে তবু ফেরৎ এসেছে।

সুরুজও দলে ছিল এবং তার পিঠেও পড়েছিল যৎ-সামান্য। আক্রোশটা কিন্তু এখনই ওরই বেশি দেখা যাচ্ছে। বলে—আম্মো গলা ফাটাইয়া কইয়া আইছি, দেইখ্যা লইয়ো বেটারা, শোধ নিব ইয়ের, তিনু শেখ অক্ষণো মরে নাই।

তিনু শেখের ভেতরে ভেতরে আহ্লাদ গুস্ গুস্ করে। স্মিত হাসিতে বলে,—তুই এট্টু ব', আমি অন্দর তনে আহি।

সুরুজ পুনশ্চ জানিয়ে দেয়,—দল অখনো যায় নাই, গোটা বিশেকে বায়নার কামটা সারন যাইবো।

দাস্তু'নি বিবি গোসল সেরে বালতির মধ্যে শাড়িতে সাবান মাখছে। স্বামীর এই ধীরপদে কাছে এসে দাঁড়ানোটা দেখেও দেখল না। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা দেখেই আঁচ করে নিয়েছে, বিষয়টা কি।

তিনু শেখ কণ্ঠে অদ্ভুত দরদ ঢেলে বলে,—পিন্দনের কাপড়টাও খুব ময়লা দেখি। কইলেই ত ধোয়ায় দিয়া আনতে পারতাম।

দাস্তু'নি বিবি বুকের কাপড়টা একটু টেনে নেয় শুধু। তেমনি সাবান লাগিয়েই চলে। স্বামীর কথার পাল্টায় কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না। তিনু শেখ আবার বলে,—তুমি খামখা কষ্ট করতাছ ক্যান্। সুরতিরে কইলেই পারতা।

সুরতি ওদের মেয়ে। এ-ছাড়া আরো আধা ডজন আছে সুরতির ভাইবোন। দাস্তু'নি বিবি স্বামীর মোলায়েম আদরের কথাগুলোকে গ্রাহ্যই করল না, ভাঙা সানকির মত খ্যান্ খ্যান্ করে উঠল,—অতো ঢঙের কথা হুনবার আমার সময় নাই। ট্যাকা দেওন যাইব না।

তিনু শেখ হঠাৎ-ই ধাক্কাটা খায়, হঠাৎ-ই সামলিয়ে নেয়, সহজ কণ্ঠে বলে,—বেশি ত না, এই বিশটা মাত্তর দ্যাও।

—বি-ঈ-শ! আমি যদি একটা পয়সা দেই ত আমি মানুষের বাচ্চা না। অইলো?

তিনু মরিয়া হয়ে বলে,—পাড়ার ছাওয়ালরা যাইব

কই, আমি আছি বইলাই না আছে আমার কাছে। খাও, সুর্যাটা বইসা আছে।

—ট্যাহা নাই। খেত-জমি হক্কল আছে বন্ধকি, এই বেলা চলে ত' ওই বেলা মাগ্‌তে হয়, পোলাপানের পিন্ধনের কাপড় নাই, আর হেই বাপের এই কাম! কথায় কয় না, লোটার তলা নাই, সখের সারিন্দায় তেল দেয়।

কথাগুলো নিরেট সত্য! বন্ধকী ক্ষেত অন্তত দুই-একটা না ছুটালেই নয়। বাদু-সুদখোরের পেটে যাবে তা না করলে। বিশটা টাকার দাম তাই বিশ টাকারও অনেক বেশি। দাম্‌'নি বিবি হিসেব করে না চললে চামচিকের পা দেখতে হতো কিছুদিনের মধ্যেই। এইজন্য দাম'নি বিবি নিজের চেহারাটাকে পরিবারের আর দশ জনের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় না—জোর করে তাতে একটা রুক্ষ কাঠিন্য আরোপ করে। কিন্তু স্বামীর চোখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে ওর নিরীহ ভালমানুষী চেহারা দেখে হেসে ফেলে।

আর এই ভাল মানুষটাই ওদের সব্বাইকে ডুবাচ্ছে। জমিজমা প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে। বাকী আছে ভিটে-বাড়ীটা। তা-ও বুঝি আর রাখা যায় না!

জৌলুশের দিক দিয়ে না হোক চিত্তের দিক দিয়ে সেরা এ-গাঁয়ের মুন্সি বাড়ীর মকিম মুন্সী। ঘরদোর আর চালচলনে ঐশ্চর্য ঘোষণা করে না; কিন্তু গাঁয়ের লোক জানে—এক কথায় হাজার টাকা বের করে দেওয়ার মতো দৌলত একটা মানুষেরই আছে—সে মকিম মুন্সি। উৎসব-পুণ্য দিনে অনেক গরীব-মিস্‌কিন সারি সারি সান্‌কির সামনে বসে ভরপেট খেয়ে মুন্সি সাহেবের হায়াত-দৌলতের আরো পরিবৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে করতে পার হয়; এবং এ-সবের কথা উঠলেই মুন্সির প্রশংসায় সবাই দিকবিদিক জ্ঞান হারাতেই বাকী রাখে। বলে, লোকটার ইহকাল পরকাল দুটোই স্বচ্ছ।

সেই মকিম মুন্সির বাড়ী থেকে গোটা দশেক বাড়ী পরে বাদু সুদখোরের বাড়ী। মুন্সি সাবের কোন দুঃখ থাকতো না যদি তিনু শেখ আর বাদু সুদ্‌খোর তাকে একটু সমীহ করে চলতো; শ্রদ্ধা করতো।

মুন্সি-বাড়ী সব সময়ই তকতকে, ধোয়ামোছা—ঠিক মালিকের স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহারের নিটোলতার মতোই। কিন্তু গোনাহ্‌গারের প্রতি কোন সমবেদনা নেই মুন্সি মকিমের, বে-নামাজির জন্য নেই করুণা, বেঈমানের জন্য নেই এতটুকু বেদনা। তিনু শেখ তার বহিরাঙ্গন দিয়ে ভারী পায়ে দুপদুপ করে চলে যায় উঠানের মাটি কাঁপিয়ে।

দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মুন্সিজি ভাবেন, বেশি দেরি নেই আর, খোদার কু-পয়দা কয়দিন আর দেখাতে পারবে কেরামতি!

সিগারেট টানতে টানতে তিনু শেখের এক ছেলে মস্তাজ আসছিল বিপরীত দিক থেকে। বাপকে দেখে সিগারেট-শুদ্ধ হাতটা পেছনে নেয়।

তিনু শেখ হাসে একটু। ভাবটা—দিন তারও ছিল।

মুন্সি সাবের দৃষ্টি এড়ায় না। তিনিও হাসেন।

সিগারেট টানতে টানতে মস্তাজ মুন্সি সাহেবের সম্মুখ দিয়েই চলে যাচ্ছিল। মুন্সি ডাক দেন,—কি মিয়া মস্তাজ, তোমার বাপে বাদুর বাড়ীর দিকে গেল মনে অইল।

মস্তাজ জবাব দেয়,—হ।

—সব ত অই বেটা সুদখোরের পেটেই দিতাছে তোমার বাপ, তোমাদের উপায় হইব কি? না করবার পার না?

—উপায় ত তিনিই করবেন, আমি কে?

তিনু শেখের বখাটে ছেলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেসে হেসে জবাব দেয়।

বাদু শেখের পর্ণকুটিরে আর যা-ই থাক জৌলুস নেই। শনের ছাউনি। বর্ষায় বৃষ্টি পড়ে, গ্রীষ্মে বেশ হাওয়া। দরদীরা বলে, বাদু-চাচা, ঘরটা ঠিক করেন ইবার।

বাদুর জবাব,—আর কি অইবো ঠিক কইরা। কয়-দিনই বা আর আছি। একরকম কইরা দিন কাটলেই অয়।

তা সত্যি, সাতজন্মে কেউ নেই বাদুর। আছে টাকা। সে-টাকা সুদে খাটিয়ে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলে। নোটের আশ্চর্য স্পর্শে তার স্নেহ-মমতা প্রেম উথলে ওঠে। সেই নোটেরই আশ্চর্যতর মমতায় মাথা নত করে বাদুর পৌরুষ-জ্ঞান-ভক্তি। টাকার নাম দুনিয়া। অথচ যে অর্থে টাকার টাকাত্ব তা মেনে নিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয় সুদখোর কৃপণের মন। জীর্ণ কুটিরে টাকা রাখে না, রাখে ব্যাঙ্কে।

কোন অপরিণামদর্শী খাতক যদি জিজ্ঞেস করে ফেলে,—এত টাকা যে জমাইতেছেন তা কার জন্য চাচা?

চরস-গাঁজা-খোরের মতো চোখ বাড়িয়ে বাদু তেড়ে আসবে না, কঠিন-কণ্ঠে বলবে,—তোর বাপের জন্য।

—না, না, তা কইতেছি না। কইতে চাইছিলাম, আপনের ত কেউ নাই, একটা শাদি কইরা ফালান না।

বাদু শেখ এবার প্রশ্নকারীর মাতার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানোর জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বেকুব খাতক বেগতিক দেখে চুপ করে যায়। নিজের ভুল সে বুঝতে পারে। দেনা-ভয় বড়ো ভয়।

বাদু শেখের শুধু এই পেশাই নয়। সে জমি কিনে,

বন্ধক রাখে, জমি আদি-বর্গা দিয়ে নিজের প্রাপ্য-অংশের ফসলও সুদে খাটায়।

শেষোক্ত পেশার মারপ্যাঁচে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে চলেছে তিনু শেখ।

—কি শেখ সাব, খবর কেমুন?—বাদু অভ্যর্থনা করে তিনু শেখকে।

—আপনের খবর ভাল?

—আর ভাল। খুদায় রাখছে বলেই আছি।

দু'চারটে সংসারী কথাবার্তা হয়। পাটের দর নেই, ধানের বাজার আগুন। ফসলের লক্ষণ খুব সুবিধের নয়। দিনটা ঘুরঘুর করছে, নামলে ভাল হয়। ক্ষেতের আল নিয়ে কিছুদিন আগে একটা মারামারি হয়েছে—বিষয়টা জটিল হয়ে গেছে। দু'পক্ষেরই ক্ষতি, সামান্য একটা আলের মূল্য যত, তার দুনো-তিনো বের হয়ে যাবে প্রত্যেক পক্ষের পকেট থেকে।

বাদু বলে,—এমুন কইরাই খতম হইতাছে জাতটা। ট্যাকা চিনল না।

তিনু শেখ বলে,—কিছু ট্যাকা যে দিতে অয় আরো। বাদুর মুখে দ্রুত পরিবর্তন আসে। চিন্তিত, বিস্মিত ও বিব্রত।

—ক্যান, অই ট্যাকা শেষ!

—শেষই ত অইল। ট্যাকা ত হাতের ময়লা, যে কয়দিন আছে, স্বাস্থ্য খারাপ, গেলেই খালাস। আর দুইনার সকল মানুষে ট্যাকা ট্যাকা করলে কেমুন এক রকম অইয়া যায় না!

—কিন্তু তোমার জমি-জমা ত সব শেষ।

তিনু নিরুত্তর। নিঃশব্দ দুইজনই। তিনু শেখের চোখে প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা ছায়া ফেলে।

বাদু বলে—তোমায় ত আমি ট্যাকা দিতে পারি না। সুদ দেওয়ার সামর্থ নাই তোমার, তুমি সর্ব্বোসান্ত।

অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়ে তিনু শেখ, পারে তো মাথা কুটে মরে এই জঘন্য সুদখোরটার পায়ের নীচে। বলে—এতকাল সুদ দিলাম, আমার খেতিজমি সকল দিলাম, আমার সর্ব্বস্ব আপনেই নিলেন, এখন আমারে ডুবাইবেন না।

মাথা নাড়ে বাদু সুদখোর কঠিন প্রতিজ্ঞায়—অইবো না তিনু।

—রক্ষে করেন বাদু মিয়া। আমার ইজ্জত যায়, না অয় একটু দান-খয়রাতই করলেন।

বাদু শেষ কথা জানিয়ে দেয়—তা হয় না তিনু শেখ। তোমার বউয়ের গয়না-পত্তরও সব দিয়া দিছ। অখন বাকী আছে তোমার ভিটা-বাড়ী। আমার নিয়ম আমি ভাঙি না। পারবা ভিটা-বাড়ী বন্ধক রাখতে?

আর্তনাদ করে ওঠে তিনু শেখ। সে আর্তনাদে সুদখোরের পাষাণ কঠিন মন টলে না একরত্তিও।

ভিটে এবং বাড়ী, তিনু শেখের মাথা গোঁজার শেষ ঠাঁইর ওপর দাগ পড়ল দৈনন্দিন খাঁই মিটানোর এক জঘন্য জন্তুর লোভী থাবার। একমুঠো টাকা বাদুর কাছে কিছুই নয়—ইচ্ছে করলেই দান করতে পারত। একমুঠো টাকা ওর কাছে এক মুঠো ধূলোরও সমান নয়। কিন্তু তা তো হয় না, খয়রাতি করা তার কোষ্ঠিতে নেই। দান? সে তো মহৎ ব্যক্তিদের সুমহৎ কর্ম—সুদখোর আবার দান করে কি করবে!

সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দিন এসে গেল প্রায়। তিনু শেখ বারে বারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে। অনুশোচনায় দিনরাত সে দগ্ধ হচ্ছে—প্রার্থনা করবে, শবেবরাতের পুণ্যরাতে সে প্রার্থনা করবে, যেন কিছুই সে ফিরে না পায়, যেন তার সর্বস্বের বিনিময়ে আত্মার শান্তি পায়।

এসে গেল শবে-বরাত।

কিন্তু প্রার্থনা কি করবে? কোন্ ভাষায়। নিজের দোষে নিজের ঘরে চা'ল নেই আজ। সে কি চাইবে এক-মুঠো চা'ল অথবা অদৃষ্ট এবং আত্মার শান্তি? একমুঠো চা'ল চাইবে, না, সংসার-কামনা-বিরহিত বিশুদ্ধ অন্তরে প্রাণের মুক্তি চাইবে। দেহ, না প্রাণ?

তিনু শেখ ও-সব বুঝে না। প্রত্যক্ষ করছে, এক-মুঠো চা'লের জন্য, এক বেলার আহারের জন্য আজকেই হাত পাততে হচ্ছে তাকে। ছেলেগুলো চলে গেছে বাইরে, ইয়ার-দোস্তদের বাড়ীতে সান্‌কি পাতবে। দামুনি বিবি আর সুরতি দাঁড়িয়ে।

দামুনি বিবি বলে,—যাও না একবার অর কাছেই। আর কেউ ত দিব না, বাদু মিয়ার কাছেই যাও।

—বাদু খয়রাত দেয় না।

—আহা, শবেরাইতে কি কেউ কাউকে ফিরিয়ে দ্যায়? যার কাছে চাইবা হে-ই দিব।

হায়রে বাদু শেখ।

কৈশোরে যে রাণী ছিল, যৌবনে রাজা, প্রৌঢ়ত্বে রাজা-রাণীর মালিক, বার্দ্ধক্যে পৌঁছে আজ ভিখারীর সাজে জমবে কি? জমুক বা না জমুক, যে মানুষটাকে আজকেই প্রথম সে ঘৃণা করেছে, যার জন্য আজকেই সে হৃদয়ে এক গভীর মমতা বোধ করেছে, যে লোলুপ ধনী ভিখারীর জন্য আত্মবোধ সদ্য-উদ্বুদ্ধ তিনু শেখ একবার করুণা ছিটিয়ে দিয়েছে মনে মনে, তারই কাছে ভিক্ষুকের হাত পাততে হবে। শবেবরাতের নিয়তি তাকে বাধ্য করছে যেতে। হয়তো বা ৫-ই বছরের জন্য এই-ই ছিল তার অদৃষ্টের ওপর গত শবেবরাতের শেষ নির্দেশ।

বাদু সুদখোর গম্ভীর হয়ে ওঠে,—কিন্তু আমি তো দান করি না। করতে পারি না। খয়রাত করা আমার ধর্ম্ম না।

তিমু শেখ বলে,—কিন্তু আজ শবেরাইত ঘরে ঘরে পিঠা-পোলাও, আমরা উপাস করব ?

—আমার কাছে হেই কথা কইয়া লাভ নাই।

—বেশী ত না, এক সের চাউল মাত্তর।

—একটি কণাও না। বাদুর কঠিন জবাব।

—দয়া করেন।

—দয়া ?

কি একটা ভীষণ কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে বাদু থেমে গেল। সংযমের কাঠিন্যে চাপা পড়ে রোষ। তারপর ধীর-শান্ত কণ্ঠে বলে, এমন স্পষ্ট শান্ত কণ্ঠে বাদুকে কথা বলতে তিমু শেখই সর্বপ্রথম শুনল,—আমি দয়া করবার যুগ্যি না। চিরটা কাল আমি সুদখোর হইয়া চইলা আসছি। আইজও আমি তাই। তুমিই কও কি করবার পারি তোমার জন্য।

তিমু স্তম্ভিত। কিছুই নয় লোকটার কথায় এমন স্নিগ্ধ প্রশান্তির সঙ্গে গম্ভীর ভাব-স্থৈর্য্য এর আগে কোন-দিনই আসে নি। এই প্রথম এল বলে বিস্মিত হলেই পারত, কিন্তু বিস্মিত নয়, স্তম্ভিতই হয়েছিল তিমু শেখ।

আবার বলে বাদু,—কও, কি করবার পারি।

এমনি পরিবেশে তিমুর বলা উচিত ছিল, কিছুই আর চায় না সে, কিন্তু দাখুনি বিবি দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে তার মেয়ে সুরতি। বলে,—কইলাম ত।

—না। চাউল তুমি মকিম মুন্সির তন নিবার পার। খয়রাত করার হক্ আছে তার।

তিমু শেখ বলে,—কিন্তু আমি ত তনের তন গ্রহণ করবার যুগ্যি না। তানি অপাত্রে খয়রাত করেন না। আমি নমাজ-রোজা করি না।

—তুমি যাও, যদি না দেয় ত আমিই দিব, কইলাম। যাও।

কিছুক্ষণ পর রিক্ত হাতে ফিরে এল তিমু শেখ।

বাদু জীবনে এই প্রথম শর্তহীন দানে ভরে দিল এক অন্নহীন মানুষের ঝুলি।

তিমু শেখের চোখে পানি এসেছিল।

বাদু মিয়ার আঙিনায় যখন সুবেসাদেক উত্তীর্ণ হতে আরো ঘণ্টাখানেক দেরী, যখন মানুষের আনাগোনা শুরু হয়নি মাঠে-ঘাটে-বাটে, তখনই এসে দাঁড়ায় মকিম মুন্সি। ইব্লিসটা বোধ হয় এখনো ঘুমাচ্ছে। জলজ্যান্ত ইবলিস! অথচ এরই কাছে আজকে আসতে হলো তার।

ধীরে ধীরে ডাকে,—বাদু মিয়া।

জায়নামাজে তসবি-হাতে বাদু চমকে ওঠে। হাতের তসবি পড়ে যায় উরুর ওপর। মনের ভুল!

মকিম মুন্সী ভাবেন, লোকটা আচ্ছা গোমরাহ্ তো! এখনো ঘুমুচ্ছে। গোরে যাবার ওকৃত্ হয়ে এল তবু কমতি নেই ঘুমের, খোয়াবের। মনের রোষ চেপে রেখে অসম্ভব রকম শান্ত কণ্ঠে ডাকে আবার,—বাদু মিয়া।

—কে!

দরজা খুলে বাদু; তাড়াতাড়ি টুপীটা নামিয়ে নেয়, যেন তার এই বেশটা, যা এই গাঁয়ের কেউ দেখেনি কোন দিন, কল্পনায়ও আনতে পারে না—সেই বেশটা মকিম মুন্সির দৃষ্টি থেকে সযত্নে সরিয়ে নিতে চাচ্ছে।

—এ কি, আপনে!

ভণিতা না করে মকিম বলেন,—এই পাঁচ সের চাউল, কাইল্কা তিমু শেখেরে আপনে দিছিলেন, ফিরত দিতেছি আমি।

বাদু চমকিত হয়,—কিন্তু ওটা ত ওরে আমি দান কইরা দিছিলাম। দানের জিনিস কি ফিরত নেওন যায় ?

—আপনেরে যদি আমি দশ সের চাউল দেই ?

—একশ' মণ দিলেও অইব না। ওইটা দানের জিনিস।

বাদু মিয়া বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি। কেনই বা মকিম কালকে তিমুকে ফিরিয়ে দিয়ে আজকে এসেছেন বদলা দিতে, কেনই বা চিরশত্রু একটা সুদখোরের সঙ্গে এমন আদব-কায়দা।

—একশ' মণই দিব বাদু মিয়া!

মুন্সি সাবের গলাটা কেমন গভীর হতাশার কান্নায় জড়িত।

একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আসল ব্যাপারটা কি? কিন্তু দানের জিনিস সে ফেরৎ নেবে কি বলে। যে জিনিস সে নিঃস্বার্থ ভাবে খয়রাত করে দিয়েছে তার বদলা ধর্মপ্রাণ এই ব্যক্তিটি কেন দিতে চায়!

বাদু বলে,—হাজার মণেও হবে না মুন্সি সাব।

—কিন্তু এই চাউল তিমু শেখকে আমারই তো দিবার কথা আছিল। তিমু শেখ আমার কাছে কাল হাত পাত্‌ছিল।

—দেন নাই ক্যান্ ? এখন কি করবার চান ?

—শবেবরাইতে ফেরত দিছি, ভাইবা দেখলাম অন্যায় করছি, অন্যায়ের শোধবোধ করবার চাই।

কয়েক মুহূর্ত ভাবে বাদু মিয়া। ব্যাপার যা-ই হোক একটা শর্তে এ-চাউল সে নিতে পারে—নেবেও। বলে,—একটা শর্তে এই চাউল রাখবার পারি। কইব ?

—কন।

—তিনু শেখের সব বন্ধকী জমি আমার তন কিইনা নিয়া তারে আপনে দিবেন। রাজী?

মকিম মুন্সি চমকে ওঠেন ভয়ানক ভাবে। বলেন,—তাতে আপনের লাভ?

—পারেন আপনি?

—কিন্তু সে যে অনেক, অনেক টাকা—। এত টাকা—

বাদু বাধা দিয়ে বলে,—আমার কথা শুনুন, তিনু বেটা বেদীন মানুষ, ওর এমনেও শেষ, তেমনেও শেষ। দিলে-থুইলেও আর রাখবার সে পারবো না। আপনের কি গরজটা? নিজের দিন নিজে দেইখা আসছেন, অখনো তা-ই করেন। কি কাজ হাড়াম কইরা!

মুন্সি সাবের ইচ্ছা হয়—না থাক—আপাতত সব ইচ্ছা দমিয়ে রেখে বলেন,—আমি যা কইলাম তা অয় কি না কন।

—উঁহু, তা অয় না। আমি যা কইলাম তা করলে অয়।

—কি? মকিম মুন্সির প্রশ্ন।

—তিনু শেখের জমি আমার কাছ তন কিইনা লইয়া তারে দিবেন।

মকিম মুন্সি ভাবেন। সূর্য উঠছে। লাল দিগন্ত। সেদিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পর কি ভেবে হেসে ফেলেন,—তাই হবে বাদু মিয়া।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। শবেবরাতের রাতে মকিম মুন্সি খোয়াব দেখেছেন পাঁচ সের চাউল তিনু শেখকে দিয়ে ওর বেহেশতের টিকিটটা নিয়ে যাচ্ছে বেটা বাদু সুদখোর। কে যেন তাকে আদেশ করছে ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে, এখনো সময় আছে।

অবশ্য আদেশটা ঠিক স্বপ্নেই শুনেছেন কিনা, খেয়াল করতে পারছেন না।...

আনিসা তোমার মন

দিলওয়ার

দুস্তর সমুদ্র আর দুর্বিনীত পর্বতের চূড়া
দূরন্ত ডানার ছন্দে যে-পাখীরা পার হয়ে যায়;
আনিসা, তোমার মন গতিবন্ত তাদেরি যাত্রায়,

তোমার স্মরণে তাই মৃত চাঁদ হীরকের গুঁড়া!

আকাশের ফুল-ফুল তারকার পুঞ্জে
মৌমাছি-স্বপ্নেরা আজ শুনি গুঞ্জে!
ওই তো ছায়াপথ
কে টানে মায়া-রথ?
জাগে ডাক পৃথিবীর এই মধু-কুঞ্জে।

তুমি যে মাটির মেয়ে, নবান্নের প্রতুল পুলক,
তুমি যে মাঠের মেয়ে,
সুসবুজ ঘাসের চেতনা

আনিসা, জীবনাবর্তে তুমি সেই সত্যকে
কখনো, ভুলো না।
অগাধ অসীম তাই ভ্রাম্যমান তোমার ভূলোক।
নক্ষত্রের প্রেম নিয়ে বেদনার্ত বুকের গভীরে
ধুঁকে মরে যারা
গজ মূর্খ তারা,
তাদের ভুবনে শুধু ঝুটা যতো গজমোতি হার
ছুড়ে অহর্নিশ
আত্মঘাতী বিষ।
আনিসা, জেনেছি আমি সেই পশু-জীবনের তরে
তোমার আশ্চর্য প্রাণ সবিতার দীপ্তি হয়ে ঝরে॥

ঢাকা নগরীর ইতিবৃত্ত

শ্রী শিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৃদ্ধগঙ্গা

পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকা প্রদেশকে অনেকেই, গঙ্গাহীন তীর্থশূন্য বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ ধারণা ভুল বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ এই দেশকে তীর্থরাজ আমোঘানন্দন ব্রহ্মপুত্রনদ পবিত্র করিয়াছেন, যে তীর্থস্নানে ক্ষত্রকুলান্তকভৃগু নন্দন পরশুরামের মাতৃহত্যাজনিত দুষিত কুঠার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই তীর্থরাজ শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি শ্রীবলদেবচন্দ্র নিজ প্রধান আয়ুধ লাঙ্গলসহ অবগাহন করিয়া পুরাণ-বক্তা শ্রীসূত গোস্বামীর বধজণিত দোষ হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সেই লৌহিত তীরবর্ত্তী স্থানকে নিজ আয়ুধ শ্রেষ্ঠাভিধানে 'লাঙ্গলবন্ধ' নামে বিখ্যাত করেন। তৃতীয়তঃ কপট অক্ষপ্রতারিত সাম্রাজ্যচ্যুত পঞ্চপাণ্ডব এই পশুরামখাতে তীর্থাবগাহন করতঃ সেই স্থানকে 'পঞ্চমীঘাট' নাম নামাকরণ করিয়াছেন। কোনকালে শ্রীমান-মহাদেব ভাঙ্গের ঘাট নামক স্থানে স্নান করিয়া ব্রহ্মবীর্য্যোৎপন্ন অন্ধক অসুর বধজনিত কলঙ্ক হইতে বিমোচিত হন। অধিকন্তু সুরধুনীর পশ্চিম ভাগে যেরূপ যমুনা সদা প্রবাহিত, সেইরূপ শান্তনুকুলনন্দন ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম ভাগে সর্ব্বদা সুর তরঙ্গিনী গঙ্গা প্রবাহিতা রহিয়াছেন। প্রমাণ যথাঃ "লৌহিত পশ্চিমে ভাগে সদাবহতা জাহ্নবী।" অশোকাষ্টমী মহাপর্ব্বে জামদ দগ্ন্য রাঘবরেলৌহিত নদেশ্বর তীর্থরাজ পদাভিষিক্ত হন, বিশেষতঃ বসন্ত সমাগমে বুধাষ্টমী পুনর্ব্বসু নক্ষত্র বৃষলগ্নাদি যোগে ত্রিলোকস্থ সর্ব্বতীর্থ মৌলিমুকুটোপরিস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার বিস্তারিত প্রমাণ কালিকা পুরাণে রহিয়াছে।

উহাতে বিবৃত আছে যে, বৃদ্ধগঙ্গা নাম্নী স্রোতস্বিনী দ্বারিকা হইতে বহির্গতা হইয়া ভারতস্থ পূর্ব্ববঙ্গ পবিত্র করেন এবং ফলে গঙ্গা সদৃশী মতান্তরে সুরনদীর ষোড়শ কলার এক কলারূপে বৃদ্ধগঙ্গা বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

"মধ্য ভাগাৎস্বতাযাতু শঙ্করেসাবতারিতা।
বৃদ্ধগঙ্গা স্বয়া সাতু গঙ্গের ফলদায়িনী ॥"

এই বৃদ্ধগঙ্গাই 'বুড়ীগঙ্গা' নামে ঢাকা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। যাহা সাধারণ ভাষায় 'বুড়ীগঙ্গা' নামে বিখ্যাত হইয়া উর্ম্মিমালা বিস্তার পূর্ব্বক কল্ কল্ ধ্বনিতে প্রবাহিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা গঙ্গাতুল্য অন্যতম তীর্থ। বৃদ্ধগঙ্গা সলিলে অবগাহন করিলে গঙ্গাস্নান জন্য ফল লাভ হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে এই তরঙ্গিনী স্বল্প তোয়া হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বকালে ইহার দুইটি ধারা বা প্রবাহ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে একটি লুপ্ত প্রায় ও অপরটি সতেজ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। লুপ্তটি ক্রমশঃ পূর্ব্বকাভিমুখে গমন করিয়া সুবৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া লক্ষ্যা নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অপর প্রবল ধারাটি বেগবতী হইয়া দক্ষিণাভিমুখে 'ধরলেশ্বরী' বা 'ধলেশ্বরী' নামক প্রবল নদীতে মিলিত হইয়াছে, এই শাখা দ্বারাই বাণিজ্য প্রধান ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন বহু বাষ্পীয় পোতাদি গমনাগমন করিয়া থাকে।

পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে যে, ভগবতীর একান্ন পীঠ ব্যতীত ঢাকা নগরীতে দেবীর একটি উপপীঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে সতীদেবীর মস্তক ভূষণ ঢাক নামক রত্নবিশেষ পতিত হয়, তন্নিবন্ধন এই মহানগরীর নাম 'ঢাকা' নামে সুবিখ্যাত হইয়াছে ও পীঠস্থ দেবী সর্ব্বত্র 'ঢাকেশ্বরী' নামে সুপ্রসিদ্ধ ও মহামান্যা।

এই পূর্ব্ববঙ্গের উত্তর প্রদেশে ঢাকা নগরীর উত্তর পশ্চিমে 'করতোয়া' নাম্নী একটি প্রসিদ্ধ তীর্থনদী রহিয়াছে। সাধারণে যাহাকে 'করতোয়া গঙ্গা' বা করতা গঙ্গা' বলিয়া থাকে। এই পবিত্র প্রবাহিনী 'কতরা নামক জনপদের নিম্নভাগে প্রবাহিত। এই পবিত্র নদীটি কিছু কাল যাবৎ স্বল্পতোয়া হইয়াছে। ভগবান শঙ্কর যৎকালীন মেনকা গর্ভসম্ভূতা উমা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই উদ্বাহ পর্ব্বে গৌরীদান সময়ে শঙ্কর করগলিত সম্প্রদান তোয়াই 'করতোয়া' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই করতোয়া অম্বুবাহিনীর বিবরণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। এই পবিত্র করতোয়ার প্রভাব অদ্ভুত। ইহার অপর নাম 'সদানীরা'। সদানীরা এই নামটিও তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। জাহ্নবী প্রভৃতি যাবতীয় সরিৎবরাই সময়েতে রজঃস্বলা হইয়া থাকে; কিন্তু এই পবিত্র নদী রজস্বলা হয় না, সর্ব্বদাই ইহার বারি পবিত্র থাকে, এইজন্যই ইহার নাম 'সদানীরা'।

নবাবপুরের প্রাচীন মন্দির

ঢাকা নগরীর অতি প্রাচীন বিগ্রহ সর্ব্ব প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির বিদ্যমান। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র (শালগ্রাম শিলা) পুরাকালে বিক্রমপুরস্থ কেদারবাটী

ও পোড়াগাছা নাম্নী গ্রামে বার ভূঞার অন্যতম প্রসিদ্ধ চাঁদরায়-কেদার রায়ের বাটীতে তৎপূর্ব্ব পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুরুষানুক্রমে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, কালপ্রভাবে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ লোপ হইলে ঐ দেবতার আদেশে তদীয় পূজককে এই ঢাকা মহানগরীতে আনয়নপূর্ব্বক বঙ্গাব্দ ৯৮২ সালে অশোকাষ্টমীর সময় নবাব ইসলাম খাঁ বাহাদুরের দেওয়ান প্রভুর কৃপাপাত্র মহাপুণ্যবান কৃষ্ণদাস (বসাক) মুচ্ছদ্দিকে প্রদান করেন। তদবধি উক্ত চক্র তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। তৎপর দারুময় শ্রীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীবলরাম চন্দ্র ৯৯৮ সালে, শ্রীশ্রীমদন মোহন ও শ্রীশ্রীকিশোরী ঠাকুরানী যুগল মূর্ত্তি ১৩২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হন। ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ চারিশত বৎসরের জন্মাষ্টমী মিছিল শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুরের প্রীত্যর্থে প্রতি বৎসর বাহির হয় এবং উক্ত ঠাকুরের বিরাট রথের মেলা হইতেই নবাবপুরের কতকাংশ রথখোলা নামে সুপরিচিত।

উক্তর নবাবপুরে বর্ত্তমান মদন পাল লেনস্থিত মহাপ্রভুর আখড়ায় শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি বিগ্রহ অমরাপুরান্তর্গত বাড়ী ভিতর নামক স্থানের স্বনামখ্যাত 'ঢাকার মসলিন ব্যবসায়ী' পুণ্যবান শ্রী৺প্রেমভূঞা শ্রীজগমোহন ভূঞা পূর্ব্ব পুরুষগণের স্থাপিত। মধ্যভাগে উক্ত বিগ্রহ কিছুকাল আনন্দী নামক গ্রামে ছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ ভূঞা (বসাক) বংশের এই মহাপ্রভু ঠাকুর পারিবারিক বিগ্রহ।

জলপ্লাবন বা বন্যা

বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বেও অনেকবার সাময়িক জলপ্লাবনে এই পূর্ব্ববঙ্গের তথাকথিত ঢাকা জেলার ভীষণ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যাস্রোত এই এই জেলার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মেঘনাদের মোহনার সন্নিধানবশতঃ জলপ্লাবনে এই জেলার বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বর্ষার প্রথমদিকেই মেঘনাদের উচ্ছসিত জলরাশি সারা দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। ফলে বহু লোকের ঘরবাড়ি ও শস্যাদি নষ্ট প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্লাবনের ফলে ১২০ খানা পরগণা ও তালুক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই প্লাবন ও উহার অনুচর দুর্ভিক্ষের বিবরণী লিখিতে গিয়ে বলিয়াছেন,—"এই জলপ্লাবনে শুধু শস্যাদির অনিষ্ট ঘটিলে তাহার ক্ষতিপূরণ অনতিবিলম্বে সাধ্যায়ত্ত ছিল; কিন্তু জনসাধারণের যাবতীয় দ্রব্যাদি ও পশ্বাদি ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে সমগ্র দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িল, ভূমিকর্ষণ করিবার লোকের অভাবে প্রায় সমুদয় জমিই পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল।"

১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দের বন্যার স্রোত ভয়ানকরূপে দেখা দিয়াছিল। ডাক্তার টেলর সাহেব লিখিয়াছেন,—"মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভেই বারিপতন আরম্ভ হয় এবং জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বরুনদেব মুষলধারে বর্ষণ কার্য্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন। ফলে নদীজল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উচ্ছ্বসিত প্রবাহে তটভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। এইরূপ ভীষণ বন্যা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে কখনো দেখেন নাই। এই বন্যাস্রোত ঢাকা শহরের বক্ষোদেশের উপর দিয়া চলিয়াছিল। ফলে শহরের রাস্তার উপর দিয়াই নৌকা চলাচল করিতে থাকে। অধিবাসিগণ বাড়ীঘর ছাড়িয়া বাঁশের মঞ্চ তৈরী করিয়া বাস করিয়াছিল।

এই বন্যায় দক্ষিণ ঢাকাস্থিত গ্রামসমূহেরই ক্ষতি অধিক হইয়াছিল। রাজনগর, কার্ত্তিকপুর, রসুলপুর, এই তিনটি পরগণাতেই ক্ষতির পরিমাণ অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছিল। উহার ফলে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। প্রায় ষাট হাজার নরনারী এই প্রবল বন্যায় এবং দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৭৬৯-৭০, ১৭৮৪, ১৮৩৩-৩৪, ১৮৭০ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যার স্রোতে এই অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। ১৮৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে প্লাবনের ফলে শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ১২৮৩ সনের ১৬ই কার্ত্তিক যে জলপ্লাবন সংঘটিত হয় উহা 'তিরাশী সনের বন্যা' নামে সাধারণের কাছে পরিচিত।

নদীবহুল প্রদেশে জলপ্লাবন অবশ্যম্ভাবী। এই জেলার তিনদিক তিনটি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুইটি অনল্প-পরিসর স্রোতস্বতী এবং আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী এই জেলার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়ায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভূভাগের ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। জেলার নিম্নভাগ প্রতি বৎসর বর্ষার প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া যায়, ফলে পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া ঐ সকল স্থান ক্রমশঃ উচ্চতা লাভ করিতেছে।

সাত গুম্বুজ মসজিদ

ঢাকা সদর ঘাট হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার বাঁশবাড়ী নামক স্থানে নবাব সায়েস্তা খাঁর নির্ম্মিত সাতটি

গুম্বুজ পরিশোভিত নয়ন মুগ্ধকর একটি মসজিদ বিদ্যমান আছে। সৌন্দর্য্যে লালবাগের পরিবিবির সমাধির পরই এই মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে বুড়িগঙ্গা নদী এই মসজিদের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত; বর্তমানে নদী প্রবাহ প্রায় মাইল খানি দক্ষিণ দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যই বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিদায়ক। নিকটেই দুইটি প্রাচীন দরগা আছে। উহা সায়েস্তা খাঁর কন্যা বেগমবিবি ও গুলজার বিবির সমাধি বলিয়া জানা যায়।

এই মসজিদটির অভ্যন্তরে চারিটি অষ্ট কোণ সমন্বিত দ্বিতল প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান আছে। উহার শীর্ষদেশে চারিটি গুম্বুজ শোভিত। মধ্যভাগে বৃহৎ প্রকোষ্ঠটির শীর্ষদেশে তিনটি সুবৃহৎ গুম্বুজ আছে।

স্বনামধন্য নবাব স্যার আবদুল গনি উক্ত মসজিদটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি একজন মোল্লার মাসহারাও দিতেন।

বহির্বাণিজ্যে স্বর্ণ-সূত্র পাট

গঙ্গাবাড়ী এবং শ্রীপুর ঢাকা বিক্রমপুরের প্রাচীন বন্দর। উক্ত দুইটি বন্দরেই সমুদ্রগামী জাহাজ সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। শ্রীপুরে একটি প্রকাণ্ড পোতাশ্রয় ছিল। শ্রীপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বে খড়িসারের উত্তরে হাজিঘাটা নামে একটি স্থান আছে। সম্ভবতঃ হজযাত্রীগণ ঐ স্থান হইতে উঠিতেন। ঢাকার বস্ত্র শিল্পের উন্নতির যুগেই এই অঞ্চলে বহির্বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। তখন বিক্রমপুরের সহিত চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য, ইতালী, স্পেন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। আরমানী, মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি বহু বিদেশীয়গণ এখানে আগমন করতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করিত। বস্ত্রশিল্পের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত বহির্বাণিজ্য লোপ পাইতে থাকে। নীল ও কুসুম ফুলের চাষ যতদিন এদেশে ছিল ততদিন এই দুইটি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত।

যে কোনো খেলায়

আবদুল মজিদ

সে বালসুলভ সুখী। কি যে এক অবুঝ কল্লোলে
শোনো বা না শোনো তুমি অকপট মুখ তার খোলা;
উলংগ নাচবে হেসে, অভিমানে কান্নায় দু'কূলে
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অশ্রু ভিজাবে সে তপ্ত বালুবেলা।

শ্রাবনী যৌবনে তাকে থইথই দিশেহারা মন
তীর ভেঙে নিয়ে গেছে, কি উদ্দেশ্যে, জানেনা নিজেই
গভীরে অতৃপ্তি তার, কেন তা'তে ডাকিনী স্বপন
অপরূপ স্পর্শ দিয়ে সরে গেল, আর কাছে নেই!

নিতান্তই শিশু-স্বার্থে অবিবেকী মন তার ঘেরা
আঘাতে ফিরিয়ে দেয় দানপ্রার্থী শিকড়ের হাত,
তৃষ্ণার আকণ্ঠ দাহ বুকে করে পুড়ছে যে চড়া
উর্দ্ধমুখ প্রার্থনায়, তারো প্রতি নেই দৃষ্টিপাত।

সে লিপ্ত সহজ কিংবা মারাত্মক যে কোনো খেলায়
সুখীও, শ্রাবনে যদি প্রতি বর্ষে উদ্দামতা পায়।

অন্ধকার গলি

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসেম

এতক্ষণ ধরে যে কি ভাবছিলো সে কথা স্মরণ নেই তার। হঠাৎ রিক্সা থেমে যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো : এ কোন্ দোজখে নিয়ে এলি রাশেদ ?

: দূর, দোজখ কেনো? সুপারীর জং ধরা মুখের দুপাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে রাশেদ— এদিকে আলো নেই কি-না, তাই একটু অন্ধকার।

: অন্ধকার!

সম্মুখের গলির দিকে দৃষ্টি ফেলে অবাক হয়ে উঠে হামিদা। শহরে এতো দেদার আলো থাকতে এ-গলিগুলি অন্ধকার। এখানে মানুষও থাকে আবার তারা বড় মানুষও বটে! ভাবতেও কেমন গা'টা আচমকা শিউরে উঠে। এই অন্ধকার গলি ধরে তবু হাঁটতে হয় হামিদাকে। একটু আগেই বৃষ্টি হয়েছিলো। পানিগুলি এখনো জমে আছে। জমানো পানিতে পা পড়ে চপ্ চপ্ করে উঠে। পঁচা আবর্জনা থেকে একটা ভোট্‌কা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। এই কর্দমাক্ত গলিতে চলতে গিয়ে চড় চড় করে পা পিছলিয়ে যায়। দেহ স্থির রাখতে পারে না হামিদা। পরণে তার সাদা ধবধবে শাড়ী। দেশী মিলের শাড়ী। রাশেদ চলতে চলতে হেসে উঠে আপন মনে। আচ্ছা, যদি পা পিছলিয়ে মাটীতে পড়ে কাদা-মাটীতে ডুবে উঠে হামিদা তা হলে অবস্থা'টা কি রকম দাঁড়াবে? না-না, পড়তে দেবেনা রাশেদ। তাই শক্ত করে হামিদার বাহুতে এক হাতে ধরে। তার জ্বলন্ত বিড়ির ধূয়োগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে এ-অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। মিট্‌মিট করে শুধু মাঝে মাঝে আগুন দেখা যায়। যেনো কোনো যাদুকর মুখ দিয়ে আগুন বের করে দেখাচ্ছে।

: আর কতো দূর?—চল্‌তে চল্‌তে হাঁফিয়ে উঠে হামিদা।

: না, আর বেশী দূর নয়—অন্ধকারে ইঙ্গিত করে দেখায় রাশেদ—ওই সম্মুখের ঘরটা।

অন্ধকারে ঠিক ঘরটা দেখা যায় না। আবছায়া মনে হয়। তবু বুঝে নেয় হামিদা। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। ঘরের কোনো আলোকচ্ছটা দেখা যায় কি-না। কিন্তু না। এই গলির মতোই ঘরটাও অন্ধকার। এই ঘরে সাহেব থাকেন ?

হামিদার সে প্রশ্নের জবাব পেতে বেশীক্ষণ বিলম্ব হতে হলো না। টক্‌টক্ করে সিঁড়ি বেয়ে রাশেদ ঢুকে গেলো ঘরে। বাহিরের বেঞ্চিতে বসিয়ে গেলো হামিদাকে। হঠাৎ ভেতর থেকে একটা অট্টহাসি ভেসে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোর ক্ষীণচ্ছটা জানালার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে পড়লো বাইরে। হামিদার বুঝতে বিলম্ব হলো না যে— এই হাসিই সাহেবের। গলিয়ে পড়া আলোকচ্ছটায় হামিদা চতুর্দিকে একবার চেয়ে নিলো।

রাশেদ ঢুকে সাহেবের সঙ্গে কি কথা বলছে সে দিকে তার খেয়াল ছিলো না। সে শুধু ভাবছিলো আগামীর কথা। রাশেদকে চাকুরী দেবেন সাহেব। সে সঙ্গে হামিদাকেও। মন্দ কি, ভাই-বোন দুজনায়ই চাকুরী করবে। দুহাত ভরে টাকা আসবে তাদের। টাকায় টাকায় যখন দুজনে ভারী হয়ে উঠবে তখন রাশেদের জন্য আনতে হবে এতোটুকু একটা বউ। হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠলো হামিদা। তার যেনো ভাবনার অন্ত নেই, কল্পনার শেষ নেই।

এমনি সময়ে তার কানে এলো টানা টানা একটা কথা, ওহ্, লজ্জা কিসের, নিয়ে এসো তাকে।

হঠাৎ যেনো হামিদার বুকটা দুরু দুরু শুরু করলো। তা'হলে এবার তাকে যেতেই হবে সাহেবের সম্মুখে। লজ্জায় ঘেমে উঠতে লাগলো হামিদা। সে যাবে কেমন করে? কথাও বা বলবে কোন্ কায়দায়? প্রশ্নগুলি ভীড় করে উঠলো।

ততক্ষণে রাশেদ বেরিয়ে এলো। এসেই হামিদাকে বললো : যা-না সাহেবের সঙ্গে একটু পরিচয় করে আয়, সাহেব বড় ভালোলোক।

লজ্জা-শরমে মরিয়াই হামিদাকে অগত্যা যেতো হলো সাহেবের সম্মুখে। দুখানা চেয়ার মুখোমুখি। মাঝখানে একখানা টেবিল। টেবিলে বিদেশী মার্বেল-পাতা। ঘরের চতুর্দিকের দেওয়ালে নানা রঙের ছবি। ঘরখানা দেখতে মন্দ নয়। তবে বাইরের মতো এখানেও কিসের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ক্ষীণ বাতাসের সঙ্গে। হামিদা ঢুকেই এ-সব লক্ষ্য করে। বসবে কি-না, মনে মনে ভাবেও।

সাহেব যেনো কি ভাবছিলো। হামিদার দিকে হঠাৎ যেনো নজর পড়ে বলে উঠ্‌লো, আহা দাঁড়িয়ে কেনো বসুন, বসুন।

মুখোমুখি বসতে গিয়ে হামিদার সংকোচ মনে হলো। চেয়ারখানা টেনে একটু ঘুরে বস্‌লো হামিদা। তার অন্তরে যেনো সাগরের উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের কলনাদ।

রাশেদ বসে বসে স্বপ্ন দেখে। আগামী দিনের স্বপ্ন। সাহেবটা নেহায়াত ভালো লোক। তাই গায়ে পড়েই

তাকে ডেকে এনেছে চাকুরী দেবার জন্য। একখানা চাকুরীর জন্য কতো না জায়গায় তাকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। কতো জনের কাছে কাকুতি মিনতি করেছে। কই, কেউ তো দরদ দিয়ে কথা বলেনি। বরং আরো বলেছে—আরে অমন অভাবের দিনে চাকুরী কোথায়?

অথচ এমনি দিনেই এই সাহেবটির কি অপরিসীম দয়া! সেদিন অফিসের দুয়ারে সাহেব নিজেই তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে এবং বলেছে চাকুরী দেবে বলে। এই ভরসায় আজ হামিদাকে নিয়ে সে এসেছে। এখন সাহেব যদি মেহেরবানী করে একটু চাকুরীটা দিয়ে দেয়।

মনে মনে গুনগুনিয়ে উঠে রাশেদ। আমার 'স্বপ্নে দেখা রাজকুমারী থাকে—হঠাৎ এমনি সময়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়ে হামিদা। সিঁড়ি বেয়ে যেতে যেতে ধপাস করে পড়ে যায় সে। পিছনে বাতি নিয়ে এগিয়ে আসে সাহেব, বলতে থাকে, আহা তোমার হলো কি?

হামিদা সে কথার জবাব দিতে পারেনি। তার কপাল কেটে রক্ত বেরিয়েছে। রাশেদ হতবাক। তবু দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বোনকে। হামিদা রাশেদের হাত ধরে টানতে টানতে বলে, চলো রাশেদ, এ-অন্ধকার হতে মুক্তি পাই।

ভাই বোন দুজনে এগিয়ে যায় সম্মুখের দিকে। সম্মুখে দেদার আলো, পেছনে অন্ধকার, দোজখ।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করে রাশেদ: ও রকম করলি কেনো হামিদা?

: করবো না?—কর্কশ স্বরে বলে হামিদা—তোর সাহেব যে টাকা দিতে চায়।

: টাকা! -হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে রাশেদ। আফসোস করে বলে—নিলি না কেনো?

: নিইনি কেনো?—জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বলে উঠে হামিদা—রাগে চট করে রাশেদের গালে এক চড় বসিয়ে দেয়—টাকা নিয়ে নারীত্ব বিক্রি করে না মেয়েরা, পশু কোথাকার।

গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রাশেদ, স্বপ্ন দেখে সত্তর টাকার একখানা চাকুরী, হামিদা আর সে! ভাই-বোন।

হামিদার চোখের ছায়ানটে ভেসে উঠে, অন্ধকার গলি, সাহেব, দশ টাকার একতারা নোট!

সাহেব তখনো বাতি উঁচিয়ে অবাক বিস্ময়ে রয়েছে। সদ্য ফোটা একটা রক্ত গোলাপ দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেলো এ-গলি থেকে।
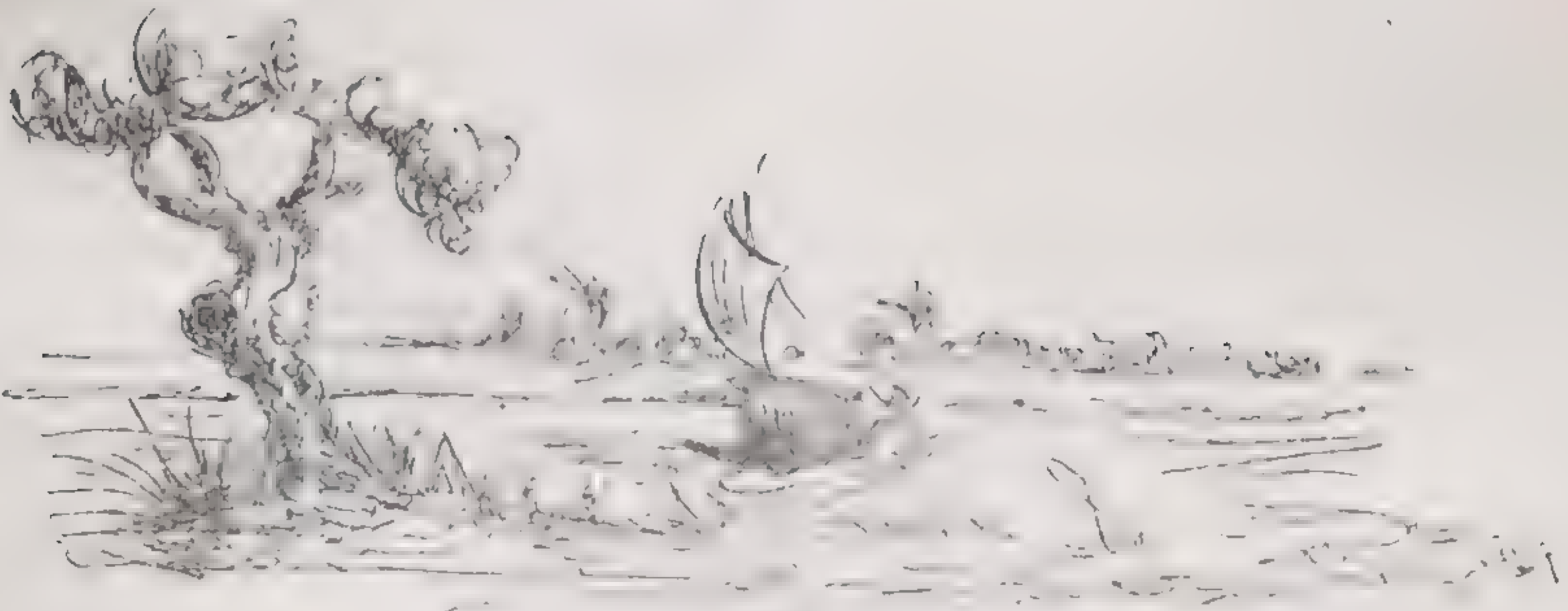
দ্বীপান্তরের চিঠি

(কোন তরুণ বন্ধুকে)

আতাউর রহমান

বন্ধু, কি করে আশার আগুনে জ্বলি ?
জীর্ণ পাতারা মিতালি পাতায় আমার দিনের সাথে,
রৌদ্র দগ্ধ-ছায়া হীন দিন ঝড়-বৃষ্টির রাত
আমার জীবনে হানা দিয়ে ফেরে পাওনাদারের মত।

এই হৃদয়ের অনেক খবর জানো—
ইতিহাস এর অনাবৃত আছে অনেক কবিতা গানে
পথের মানুষ কি করে বুঝবে আমার কাজের মানে ?

সুখনীড় ছিল প্রেম-আশীষের উপহারে উজ্জ্বল,
গোধূলির নদী গান এনেছিল উর্বর এই মনে,
শরাবের মত সাথী ছিল পাশে, তুমিও তো বহু দিন
আমার অনেক জবা মুহূর্ত ছুঁয়ে ছিলে কাছে থেকে
জানি তুমি আজ আমার আকাশে দেখবে কাকের ছায়া
দেখবে কেবল গৃহটি আমার মাকড়সা জালে ভরা ;

সুখের রাজ্য লুটপাট করে শান্তির ঝুঁটি ছিঁড়ে,
জীবন আমার অট্টহাস্য—চৈত্রের পোড়া মাঠ !

সকাল সন্ধ্যা এখনো তেমনি আসে
চায়ের আসরে তুফান আজিও উঠবে অনেক জানি,
আমি আজ শুধু পথহারা এক মরু বেদুইন শিশু
আমিই কেবল নিঃসঙ্গ এক তারকার মত জ্বলি

মনে হয় আমি প্রথম যাত্রী তুষার মেরুর দেশে
খবর তো রাখো বহু—
দেশ-বিদেশের গগনে হৃদয় মেঘের মতন ফেরে
মনকে তোমার পাঠাও আজকে মনে যদি পড়ে,
কেউ

ছায়ার মতন একদা তোমার পৃথিবীতে এসেছিল
জীবনে যাহার দেখেছিলে তুমি কচি শস্যের হাসি—
সেই জীবনের উদ্দাম ধারা মরুপথে দিশাহারা
হৃদয় তাহারা চিবায় আজকে দুঃখ-সরীসৃপ।

জানি আমি আজ ভদ্র-মানস-লোকে
কুলমানহীন উল্কার মত বিদ্রূপ প্রাণে বাজে—
তারা দেখে শুধু চাঁদ-তারা ঘেরা নীল-নীল মহাকাল
ফণি-মনসার মরু প্রান্তর ওদের অজানা আজো।

বহু পথ হাঁটা হলো—
জানা-অজানার বহু অভিযান লিখে গেল ইতিহাস
হৃদয়-স্তম্ভে বহু দূরে আজো ঈপ্সিত সরোবর।

তরুণ দ্বীপের সবুজ হাসিকে পারবোনা ছুঁতে আর ;
কাল বয়ে যায় আপন খেয়ালে, প্রেমের তীক্ষ্ণ ধারে
দিনে দিনে জমে ময়লা-মরিচা (মানুষী স্বভাব এই)
হৃদয়ের কথা জানালাম শুধু বাইরের কোন কিছু
জানতে চেয়োনা সে-সব কেবল শ্মশান অস্থি আজ !

"বঙ্গনূর"

অধ্যাপক আলমগীর জলীল এম, এ, ডিপ্ ইন-এড্

আমাদের সাময়িক-সাহিত্য-পত্রের ইতিহাস রচনা করার সময় এসেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ-সম্পর্কে তালিকা এবং আলোচনা কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যের এই শাখায় মিহির, মোহাম্মদী, হাফেজ, মোসলেম প্রতিভা প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বের হ'তে থাকে। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আখিজন্নাহার, সোলতান, সুধাকর, মিহির ও সুধাকর, এসলাম প্রচারক, প্রচারক হানিফী, নবনূর, কোহিনূর, প্রভাকর, বাসনা, লহরী প্রভৃতির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। আরো কিছু নবজীবনের সাড়ার ইন্ধনস্বরূপ মুস্‌লিম সম্পাদিত মোহাম্মদী, মোসলেম হিতৈষী, রায়ত, আল্-এস্‌লাম, এস্‌লাম-দর্শন, আহলে হাদিস, বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য পত্রিকা, সওগাত, সাধনা, আল্‌হক, বঙ্গনূর, মধুমিঞা প্রভৃতি ত্রৈমাসিক, দ্বিমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাবে ধীরে ধীরে কেটে যায় সমাজের তিমিরাবরণ। আর বর্ত্তমান যুগে তো আমাদের সংবাদ সাহিত্য আরো পুষ্ট—যদিও একেবারে সম্পূর্ণ নয়। যাক আজ আমরা আমাদের সে যুগেরই একটি পত্রিকার কথা প্রসঙ্গে সে কালের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি দিক সম্পর্কে মুসলমান জাতিকে জানবার সুযোগ পাবে হয়ত কিছুটা।

'বঙ্গনূর'—সচিত্র মাসিক পত্র। সম্পাদক শেখ হবিবর রহমান। ম্যানেজার এম, এ, হামিদ ৫ কলিন লেন, কলকাতা। রেজিষ্টার্ড নং সি ৯৬৩। প্রথম প্রকাশ ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ন। ৫, কলিন লেনস্থ (কলকাতা), 'বঙ্গনূর প্রেসে' এই পত্রিকাখানা শেখ হবিবর রহমান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত বলে জানা যায়। অগ্রহায়ণ থেকে কার্ত্তিক পর্যন্ত বর্ষ গননা করা হত। 'বঙ্গনূর' প্রকাশের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সম্পাদক ১ম বর্ষ; ১৩২৬, অগ্রহায়ণ ১ম সংখ্যার "অবতরণিকা"য় জানাচ্ছেন :

বর্ত্তমান সময়ে উন্নতিশাল বাঙ্গালা ভাষায় মোসলমানদিগের কয়েকখানি মাসিক ও সাময়িক সাহিত্য বিষয়ক পত্র পরিচালিত হইতেছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা কেন 'বঙ্গনূর' প্রকাশে ব্রতী হইতেছি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

আমাদের বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ হইতে 'নবনূরের' বিশ্বোজ্জ্বল দীপ্তি এবং 'কোহিনূরে'র কমনীয় কান্তি বিলীন ও বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মোসলেম সাহিত্যকগণ যে ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, পুণ্যদীপ্ত 'ইসলাম-দর্শনের' অকাল তিরোধানে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের জীবন বীণার জাতীয় সুর যেরূপ ভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই অন্ধকার ও নীরবতা যে কারণেই হউক, এখন পর্য্যন্ত অপসৃত হইবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; সুতরাং বাঙ্গালী মোস্‌লেম সমাজের অবসাদ ও জড়তা দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের জাতীয় জীবন সাহিত্য-রসে অভিষিক্ত এবং দেহমন জাতীয়তার নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্যই "বঙ্গনূর" আপনার অকিঞ্চিৎকর শক্তি ও ক্ষীণদীপ্তি লইয়া সাহিত্য-সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

বিশেষতঃ বর্তমান যুগ—মিলন ও সমবায়ের যুগ। এ-যুগে ধর্ম্মই হউক, সমাজই হউক আর সাহিত্যই হউক, কোন বিষয়েই সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশদর্শীতার বজ্র-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিলে চলিবেনা; ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তাই 'বঙ্গনূর' ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য—প্রত্যেক বিষয়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নূতন-পুরাতন, স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের উপরেই আপনার ক্ষীণ-প্রভা প্রতিফলিত করিবার ব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।

উন্নতিশীল বাংলা ভাষা ধর্ম্মগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে জর্জ্জরিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে ভাষা ও সাহিত্য যেমন উচ্চ ভাব ও উচ্চ আদর্শে ভূষিত হইতে পারিতেছে না, উক্ত ভাষা-ভাষী ও সাহিত্যসেবী—বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানও সেইরূপ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে পারিতেছে না। সুতরাং নিরপেক্ষ ও সুনিপুণ আলোচনার দ্বারা উক্ত মহা-অনর্থের নিদান নির্ণয় ও মূল উৎপাটন করাই "বঙ্গনূরের" অন্যতম ব্রত।

অধুনা সাহিত্যক্ষেত্রে রাশি রাশি অপদার্থ ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া জাতীয় সাহিত্যকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে; এবং তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্য ক্রমান্বয়ে সুধী-সজ্জনগণের অপাঠ্য ও অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। সূক্ষ্ম সমালোচনা-সম্মার্জ্জনী প্রহারে সেই অপদার্থ ও আবর্জ্জনা-রাশি অপসারিত করিয়া সাহিত্য-কানন নির্ম্মল ও সুশোভন করাও 'বঙ্গনূরে'র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ সাধনকল্পে আমরা নবীন ও প্রবীণ সুধী সাহিত্যিকবৃন্দ ও সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য ও

সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে এবং বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াচ্ছালামের কল্যাণে আমাদের কামনা পূর্ণ হউক, ইহাই প্রার্থনা।"

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ আমরা জানতে পারি যে, বিশিষ্ট কতিপয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই 'নবনূরে'র স্থলাভিষিক্ত বলে 'বঙ্গনূরে'র আবির্ভাব। প্রসঙ্গতঃ কার্ত্তিক, ১৩২৭ অর্থাৎ ১ম বর্ষ শেষ সংখ্যায় সম্পাদকের "বিদায় সম্ভাষণ" পরীক্ষা করে দেখা যাক :

"পরম করুণাময় আল্লাহ্'র ফজলে বঙ্গনূরের ১ম বর্ষ শেষ হইল। যে সকল সহৃদয় গ্রাহক ও লেখক অনুগ্রহ পূর্বক বঙ্গনূরের গ্রাহক হইয়া ও প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। নানা অনিবার্য্য কারণে বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গনূর প্রকাশে আশারূপ বিশৃঙ্খলার কারণ প্রেসকর্ম্মচারীগণের ধর্ম্মঘট, কাগজ বিভ্রাট ও আকস্মিক বিপদপাত বিষয়ে যথাসময়ে আমরা গ্রাহকগণকে জানাইয়াছি। এবং এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা পাঠকগণের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অনেকে মনে করিতে পারেন বুঝি বঙ্গনূরও অন্তর্দ্ধান করে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্'র উপর বিশ্বাস রাখিয়া মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি—ঐরূপ কুঅভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গনূরে প্রকাশ এবং বঙ্গনূর প্রেস স্থাপন করি নাই। আল্লাহ্'র অনুগ্রহ থাকিলে নববর্ষ হইতে বঙ্গনূর নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

কাগজের আকার ডবল ফুলিস্কেপ করিয়া আমরা প্রথমেই ভুল করিয়াছিলাম; কারণ ঐ সাইজের কাগজ সব সময়ে বাজারে পাওয়া যাইত না। কাজেই নববর্ষে বঙ্গনূর রয়েল আকারে বাহির হইবে এবং কাগজের দুর্মুল্যতার দরুণ বার্ষিক মুল্য সডাক ২।৵০ আনা করা হইবে। আশা করি, গ্রাহকগণ নববর্ষের কাগজ পাইয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মুল্য মণিঅর্ডার করিয়া গ্রাহক হইবেন তাঁহাদের ভিঃ পিঃ খরচ ৵০ কম লাগিবে।

এ 'সম্ভাষণ' থেকে বার্ষিক চাঁদার হার ও পত্রিকার আকার প্রকার সম্পর্কে কিছু প্রতীতী জন্মে। মনে হয় প্রথম বর্ষে বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ছিল ২৲ থেকে ২।০ পর্যন্ত। প্রতি সংখ্যা ৵১০ পয়সা থেকে ৵০ আনা।

এবার পুরো এক বছরের (১ম বর্ষ ১৩২৬-২৭) লেখা ও লেখকের নাম সূচী থেকে বিষয়বস্তু ও রসসৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হবে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬।

বর্ণমালা অনুসারে বিষয় সূচী

	বিষয়	লেখকগণের নাম	মন্তব্য
১।	অবতরণিকা	সম্পাদক	উদ্দেশ্যব্যাখ্যা
২।	অচিন বন্ধু (কবিতা)	এম, হাতেম আহমদ	
৩।	অন্তিমে "	মুন্‌শী শেখ মোঃ ইদরিস আলী	
৪।	অনুবীক্ষণ (সমালোচনা)	সম্পাদক	৯টি সংখ্যায়
৫।	অনুতাপ (কবিতা)	শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন	
৬।	আমাদের কথা	সম্পাদক	১ সংখ্যায়
৭।	আমার কাশ্মীর ভ্রমণ	মৌঃ মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ	
৮।	আঞ্জমান ওয়ায়েজীনে হানিফিয়া	সম্পাদক	বিবিধ প্রসঙ্গ
৯।	আলোক (কবিতা)	মৌঃ এ, লোহানী	
১০।	আল্লার রসুল "	মুন্‌শী দবিরুদ্দিন	
১১।	আফ্রিকায় বাঙ্গালী মোসলেম কীর্ত্তি	সম্পাদক	
১২।	ইসলাম (কবিতা)	শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী	
১৩।	ইউরোপে সত্যযুগের অবতারনা (চয়ন)	'উপাসনা'	শ্রাবণ, ১৩২৭
১৪।	ঈদ আবাহন (কবিতা)	মৌলভী, এ, লোহনী	
১৫।	ঈদল আজহা	সম্পাদক	
১৬।	উপলব্ধি (কবিতা)	মৌ, এ, লোহনী	
১৭।	এস্‌লাম ও প্রতীচী	"	
১৮।	এসলাম বিজ্ঞান	দেওয়ান শামস্ উদ্দিন আহমদ নীতপুরী	২টি সংখ্যায়
১৯।	এসলামে একতা	ফজলুল করিম খান	

	বিষয়	লেখকের নাম	মন্তব্য
৯৬।	সিয়ার-উল মোতাখ্খেরীনের বঙ্গানুবাদ (ইতিহাস)	মৌঃ এ, ও, মোঃ আবদুর রহমান	২টি সংখ্যায়
৯৭।	সুন্দর (কবিতা)	শেখ আবদুল গফুর জালালী	
৯৮।	সুন্দরী (কবিতা)	কাজী নজরুল ইসলাম	
৯৯।	সুরাজ না কুরাজ	শেখ আবদুল গফুর জালালী	
১০০।	সুয়েজ খাল (ইতিহাস)	মৌঃ এ, লোহানী	২টি সংখ্যায়
১০১।	সৈনিক (গল্প)	এম, নূরুল হোদা	
১০২।	সৈয়দ হামজা (কবিতা)	শেখ মোঃ ইদরিস আলি	
১০৩।	স্পর্শমণি (কবিতা)	মিসেস ফাতেমা লোহানী	
১০৪।	স্বর্গের প্রদীপ „	মৌঃ আবদুল হাকিম	
১০৫।	স্মরণে „	এ, লোহানী	
১০৬।	হজরত বড়পীরের (কবিতা)	মৌঃ মোঃ শহিদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল	
১০৭।	হজরত মোহাম্মদের শেষ জীবনী	ঐ	

লেখকদের মধ্যে কয়েকজন এখনও বেঁচে আছেন। কেহ বা খদ্যোতের মত হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি দিয়ে নিভে গেছেন সাহিত্যাকাশ থেকে। আবার কারও বা অকাল মৃত্যুতে বাঙলার মুসলমান সাহিত্য জগত ঘনঘোর মেঘের আড়ালে বিমর্ষ চিত্ত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক অপরিচিত লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেদের—আমাদের চোখের আড়ালে। বনফুলের মত বনে নির্জনে ফুটে নিঃসঙ্গতার ভেতরই ঝরে পড়েছেন চিরদিনের তরে। আমরা এখন থেকে যদি খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করি তা'হলে এঁদের অনেক বিস্মৃত বা অদৃষ্টপূর্ব সাহিত্য-মানসের সঙ্গে পরিচয়ের নিরিখে নিজেদের চিন্‌তে পারব বিষয় নির্বাচন লক্ষ্য করলে স্পষ্টতঃই বুঝতে পারি প্রবন্ধ ও কবিতার সংখ্যানুপাতে গল্প কম। সবের একই লক্ষ্য—মুসলমানের সম্বন্ধে ভাবা এবং কথা বলা।...

সে-যুগের কতিপয় বিশিষ্ট গ্রন্থ ও পত্রিকা সন্দেশ পাই আমরা এই সূচীপত্র থেকেই।

১। মধুমিঞা (মাসিক পত্রিকা)—১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৬ সম্পাদক—সুফী মফেজ উদ্দিন আহমদ ওরফে মধুমিয়া।

২। নূর (মাসিক পত্রিকা)—১ম সংখ্যা, সম্পাদক—ইসমাইল হোসেন শিরাজী।

৩। হাতেম তাই—১ম খণ্ড, মুন্‌শী মোজাম্মেল হক প্রণীত। মোসলেম পাবলিশিং হাউস হ'তে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

৪। শিশুবোধ বর্ণশিক্ষা ও শিশুবোধ বাল্যশিক্ষা—মৌঃ মোঃ মোহসেন ইমাম, বি-এ, প্রণীত। সুলতান লাইব্রেরী। মূল্য যথাক্রমে /৫ ও /১০ পয়সা।

৫। আঙ্গুর (সচিত্র শিশু মাসিক) মৌঃ মোহাঃ শহিদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল সম্পাদিত। মখদুমী লাইব্রেরী। বৈশাখ সংখ্যা।

ভাস্কর (মাসিক পত্র)—বৈশাখ সংখ্যা, মোমেনশাহীর নিভৃত পল্লীপ্রান্তে মৌলভী নুরুল হোসেন কাশেমপুরী সম্পাদিত।

ইস্‌লাম দর্শন—১ম সংখ্যা আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালার মাসিক মুখপত্র। আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ড ফর্মা। মূল্য সাধারণের জন্য ২৷৹, আঞ্জমনের সভ্য, স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র ও মহিলাদের জন্যে ২৲ টাকা মাত্র। সম্পাদক—মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মৌলভী নূর আহ্‌মদ সাহেবান।

পর্দা (কবিতা পুস্তক)—কাজিম উদ্দিন আহমদ প্রণীত ও মুন্‌শী ইস্তক আলি আহ্‌মদ সাহেব কর্তৃক বাইমাইল পোঃ বায়রা, ঢাকা হ'তে প্রকাশিত। মূল্য।৹ আনা।

সোহরাব রুস্তম (গাথাকাব্য)—মৌলবী ফজলুর রহমান চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, প্রণীত ও মখদুমী লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মুন্‌শী মোঃ মোবারক আলী কর্তৃক ৫।এ কলেজ স্কয়ার হ'তে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

দেব-কাহিনী (তিন ভাগে বিভক্ত আখ্যায়িকা)—সফিউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব প্রণীত, ২৯নং আপার সারকুলার রোড্ মোহাম্মদী বুক এজেন্সী থেকে প্রকাশিত। মূল্য ।৶৹ আনা।

শপথ (উপন্যাস)—প্রণেতা 'বঙ্গীয় মোসলমান-সাহিত্য সমিতির' সহকারী সম্পাদক কবিবর মৌঃ এ, লোহানী সাহেব, প্রকাশক, কোহিনূর লাইব্রেরী ৫৩।১

ইলিয়ট রোড্, কলিকাতা মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। বাঁধাই-ও ছাপা সুন্দর।

পল্লীবানী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রাবণ, ১৩২৭।

লায়লী (উপন্যাস)—মৌলভী কলিম উদ্দিন আহমদ বি-এ প্রণীত ও মোহাম্মদ হাবিবর রহমান কর্ত্তৃক প্রকাশিত; সুন্দর ছাপা, পরিপাটি বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

প্রচারক (মাসিক পত্র)—১ম প্রকাশ ১৩০৭ সাল। বেলেঘাটা থেকে। সম্পাদক ইসলাম প্রচারক মেয়েজ উদ্দিন আহ্মদ ওরফে মধুমিয়া।

'সাহিত্য-সংবাদ' পাঠে আমরা সে যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টার অনেক অপরিচিত কথা সম্পর্কে অবগত হই—যাকে নিয়ে আজকের যুগে গবেষণার সবিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এখানে দেখি :

প্রবীণ সাহিত্যিক মোস্লেম হিতৈষীর সম্পাদক মুন্শি শেখ আবদুর রহিম সাহেবের "নামাজ শিক্ষা"র সপ্তম সংস্করণ। মূল্য ।/০ আনা।

সুলেখক ও সুকবি মোস্লেম হিতৈষীর সহ সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেবের "মিলন"—প্রকাশক, ইস্লামিয়া পাবলিসিং হাউস। মূল্য—১৲

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহেব কৃত আলমগীর বের হয়েছে; মূল্য—১৷৹

সুলেখক মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব প্রণীত "প্রতিদান" নামক উপন্যাস বের হ'ল। তাঁর 'প্রতিশোধ' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'জাতীয় লহরী' নামক কবিতা মালা যন্ত্রস্থ।

সুলেখক মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী সাহেবের 'নূতন বৌ' ও 'বঙ্কিমদুহিতা' সম্পাদকের হস্তগত হয়েছে।

'লোহানী' সাহেবের শিশুরঞ্জন সিরিজের ১ম পুস্তক "বালক বীর" (দ্বাদশ বর্ষীয় বালক হোসেন নূরীর অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী) জ্যৈষ্ঠ্য মাসে বের হচ্ছে।

'হিন্দু নারী'—খোসবাগ সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস বের হয়েছে। প্রকাশক কোহিনুর লাইব্রেরী, মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। কলেবর হিসাবে মূল্য অতি সুলভ। গ্রন্থকার গ্রন্থে নাম প্রকাশ করেন নাই।

'হিরণ রেখা'—মৌলভী শাহাদাত হোসেন প্রণীত, শীঘ্রই বের হচ্ছে।

'শেখ পরিবার'—শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস্ আলি প্রণীত, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

শোক সংবাদ—'রাজশাহী শিক্ষা সমিতির' ও নূরল ইমান সমিতির' সুযোগ্য সম্পাদক মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী সাহেব গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ন ৩টা ১৫ মিনিটের সময় অনন্তধামে প্রস্থান করেছেন। তাঁর শেষ কীর্ত্তি, "শিক্ষা সমাচার" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সিরাজগঞ্জী সাহেব আর ইহজগতে নেই। গত ৯ই আগষ্ট সোমবার দিবাগত রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় দুরন্ত নিউমোনীয়া রোগে এন্তেকাল করেছেন। জনাব মুনশী সাহেব মরহুম মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (যশোর) সাহেবের এন্তেকালের পর বিশেষ বাগ্মী বলে বিখ্যাত হ'য়েছিলেন। তাঁর 'বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল', সমাজ চিত্র', 'শ্লোকমালা', প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রাখবে।

বঙ্গনূরের পুরস্কার ঘোষণা—

(ক) ১ম পুরস্কার, সুবর্ণ পদক—'আওরঙ্গজেবের শাসননীতি'।

(খ) দ্বিতীয় পুরস্কার, রৌপ্যপদক—'বঙ্গ সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন মরহুমের দান ও তাঁহার প্রভাব।'

(গ) তৃতীয় পুরস্কার, রৌপ্য পদক—'হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় ও তন্নিবারণের উপায়'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। প্রথম বিষয়টী মোসলমান সাহিত্যিকগণের জন্য ও দ্বিতীয়টি মোসলমান ছাত্রগণের জন্য নির্দিষ্ট। তৃতীয় বিষয়ে হিন্দু মোসলমান সর্ব্বসাধারণ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন।...পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে প্রবন্ধগুলি বঙ্গনূরে প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধের আকার অন্ততঃপক্ষে বঙ্গনূরের এক ফর্ম্মা বা আট পৃষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।...

সুফি মধু মিঞা

বাঙ্গালার মোসলেম সমাজের নীরব কর্ম্মী ও ইস্লাম প্রচারক সুফি মেয়েজ উদ্দিন আহমদ ওরফে মধু মিঞা আর এ-নশ্বর জগতে নাই। গত ১৩ই আশ্বিন তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন (ইন্নলিল্লাহে ও ইন্না এলায়হে রাজেউন) মৃত্যুকালে অনুমান তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। জনাব সুফি সাহেব ইস্লাম প্রচারক ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষার সেবা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভও করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শান্তিকর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)' নামক হজরতের প্রকাণ্ড জীবনী, 'ত্রিত্বনাশক', 'বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ)', 'তুরস্কের ইতিহাস', 'মধু সঙ্গীত' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি সন ১৩০৭ সালে বেলেঘাটা হইতে "প্রচারক" নামক একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন। পরে কয়েক বৎসর চলার পর কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। সুফি সাহেবের শেষ কীর্ত্তি "মধু মিঞা" নামক মাসিক পত্রিকা। তাহা গত সন ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রথমে প্রচারিত হয়; তিনি মাত্র ৮ সংখ্যা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি অনেক মোসলমান যুবককে উৎসাহ দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে বর্তমানে অনেকেই খ্যাতনামা লেখকগণের মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন। কাকিনা রংপুরের বহু গ্রন্থ প্রণেতা মৌলভী শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ ও 'বঙ্কিম দুহিতা', 'নূতন বৌ', 'পীযুষ প্লাবিনী', 'আরবে অমিয়া', প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা মুন্শী শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী সাহেব অন্যতম। তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরাও "বঙ্গনূর" প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলাম।

আক্ষেপের বিষয়, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। যদি কেহ সুফি সাহেবের জীবনী জানেন লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ ধন্যবাদের সহিত পত্রস্থ করিব। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। কেবল জিন্নু মিঞা নামক এক ভ্রাতা ও স্ত্রী বর্তমান। আমরা তাঁহাদের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ সুফি সাহেবের পরলোকগত আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

'বঙ্গনূর' ক'বছর ধরে চলেছিল তার সংবাদ আমরা জানি না। ১ম বর্ষের ১ সেট বাঁধানো 'বঙ্গনূর' অবলম্বনে অত্র প্রবন্ধ লিখিত হল।

তাজ ও মমতাজ

জগ্‌লুল হায়দর আফ্‌রিক

তাজমহল দেখতে যাচ্ছিলাম। শীতের রাত্রি। গাড়ি অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলছিল। সর্বশরীর কম্বলে আবৃত করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিদ্রাদেবীর অন্দর মহলে পৌঁছবার পূর্বেই তন্দ্রা-তরুণীর মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়লাম এবং গড়াগড়ি করতে করতে একেবারে গিয়ে পৌঁছলাম সেই মুগল-যুগের প্রারম্ভে। মাত্র দু'শ লাঠিয়াল নিয়ে যে বাবুর কাবুল অধিকার করেছিলেন, তিনি চৌদ্দ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাণিপথ রণাঙ্গনে ইব্রাহিম খাঁ লোদীকে পরাস্ত করলেন। লোদী রাজপরিবারে ক্রন্দনের রোল উঠলো। বাবুর গতায়ু হলেন; হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন। কিন্তু অধিকদিন ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন থাকলো না। শেরশাহ সুরীর তুফানে হুমায়ুন উড়ে গেলেন ইরানে। দীর্ঘদিন পর তিনি শাহ খসরুর সাহায্যে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন। তারপর অবসর বিনোদন ও সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। একদিন তিনি কুতুবখানার সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন এবং আহত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করলেন। 'খানবাবা' ছিলেন তাঁর অভিভাবক ও হিতাকাঙ্খী। ইনি বৈরাম খাঁ নামে অভিহিত। শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বৈরাম খাঁ শেষ পর্যন্ত নিপীড়িত ও নাজেহাল হয়েছিলেন। আকবরের পরলোক গমনের পর জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হলেন। রাজমহলে প্রেম-মহব্বতের রংমহল সৃষ্টি হলো। আনার কলির ব্যর্থ প্রেমিক জাহাঙ্গীর শেষ পর্যন্ত মেহেরুন্নেছার সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হলেন। মেহেরুন্নেছা 'নূরজাহান' উপাধি লাভ করলেন। রূপ, গুণ ও রাজনৈতিক প্রতিভায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করলেন। নূরজাহানেরই পরামর্শক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদ আলফ্-ই সানীকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে আটক রেখেছিলেন; কিন্তু জনমতের চাপে পড়ে আলফ্-ই-সানীকে মুক্তি দিতে হলো। জাহাঙ্গীর রাজপরিবারে নূরজাহানের জয়জয়কার। পিতা ও ভ্রাতা এখন সাধারণ মানুষ নন; আমীর উমরাহ্!

শাহাজাদা খুররম জাহাঙ্গীরের তৃতীয় সন্তান। মহাধুমধামে তাঁর বিবাহ হল কান্দাহারী বেগমের সাথে! স্বামী-স্ত্রী আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দিনগুজরান করছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন রূপগুণে অনন্যা আর এক তরুণী। ইনি নূরজাহানের সহোদর ভ্রাতা আবুল হাসান আসফ্‌জাহ্-র পরমা সুন্দরী কন্যা আর্জুমন্দ বানু বেগম। নূরজাহানের প্রয়াসে খুররম-আর্জুমন্দ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলেন। একে অপরকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। এমন সে-বন্ধন, যাকে পার্থিব কোন শক্তিই শিথিল করতে পারেনা।

জাহাঙ্গীর মদ্যপান করতেন—অতি উপাদেয় আঙুরী শরাব। এটা ছিল তাঁর বদ্‌অভ্যাস। রূপ-মোহ থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। পক্ষান্তরে অনেকগুলি সদগুণের অধিকারীও ছিলেন তিনি। তাঁর বিদ্যাবত্তা, বীরত্ব-বিক্রম ও বিচার-বুদ্ধি সকল মহলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। নূরজাহানের স্বপ্ন সফল হতে চলেছিল। খুররম-আর্জুমন্দ বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হলেন। যেরূপেই হোক জাহাঙ্গীরের পর খুররম হবেন দিল্লীর বাদশাহ! আর আর্জুমন্দ? তিনি হবেন ফুফুর মতই প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালিনী মহিষী। আনন্দে উল্লসিতা নূরজাহান, মনে হয়, অনেকদিন পর তিনি যেন এইমাত্র ঈদের চাঁদ দেখলেন। মহিষীর এই আনন্দ-উল্লাসে সম্রাট আন্তরিকতা দেখাতে পারলেন না। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করে বসলেন, 'তাহলে কান্দাহারী বেগমের কি হবে?' সম্রাটের এ-প্রশ্ন নূরজাহানের বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির অতলে তলিয়ে গেল। 'কেন, আলিজাহ্; এতে নতুনত্ব দেখা দিলো কোথায়! আমাদের শরিয়ত বিধানই একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। আর হারেমে একাধিক বেগম গ্রহণ মুগল শাহানশাহি খান্দানের প্রচলিত রীতি। আকবর আযম কি সেই রীতির পয়রবী করেননি! স্বয়ং 'যাবদৌলা' (সম্রাট জাহাঙ্গীর) কি আনারকলির প্রেমাসক্ত ছিলেন না?' বাদশাহ্ শেষ পর্যন্ত এ-বিবাহ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। মহাধুমধামে খুররম আর্জুমন্দ বানু বেগমকে 'মমতাজমহল' খিতাব দিলেন।

জাহাঙ্গীর মৃত্যুর পর উল্লেখযোগ্য তদবিরে খুররম তাঁর সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিহত করে ১৬২৬ সালে তখত্ ও তাজ হস্তগত করলেন। খুররম এবার সম্রাট শাহ্ জাহান। ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রথমতঃ তিনি আগরাতেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পর নানারূপ অসুবিধার কারণে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

শাহ্‌জাহান পুণ্যবান ও প্রেমিক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল অতি মধুর। জীবনে মাত্র একবার

অর্থাৎ সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠুরতার কার্য করেছিলেন। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীরাই নিহত ও নিগৃহীত হয়েছিল। তখনকার দিনে রাজশক্তির উত্থান-পতন কালে এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক বা অশোভন ছিল না। শাহ্‌জাহান বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন। বীর সিপাহীরূপে তিনি অন্যতম ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। প্রজাবৎসল বাদশাহরূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সন্তান ও পরিজনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা ছিল। কিন্তু এখানেই তাঁর গুণাবলীর কাহিনী শেষ হয়ে যায় নি। তিনি স্থাপত্য-শিল্প পরিকল্পনায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তি। শাহ্‌জাহান জন্মগ্রহণ না করলে 'তাজমহল' (আগরা), জামে মসজিদ (দিল্লী), প্রভৃতি অপূর্ব স্থাপত্য-শিল্প-নৈপুণ্য নিদর্শন থেকে মস্‌লিম-জগত বঞ্চিত হতো। আমরাও এ-বিষয়ে গর্ব করতে পারতাম না।

রূপ-গুণে মমতাজমহল নূরজাহানের চাইতে কোন অংশেই কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন আদর্শ মুস্‌লিম মহিলা। জ্ঞানানুশীলন, ইবাদত-বন্দেগী, স্বামী-সেবা, সন্তান-তত্ত্বাবধান এবং পরোপকারেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। কিন্তু এই অনন্যা মহিলা দীর্ঘজীবি হতে পারেন নি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুই শাহ্‌জাহানের অন্তরে তাজের স্বর্গীয় স্বপ্ন জাগ্রত করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে তখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সেই সুযোগে পাঠান সর্দার খান জাহান লোদী বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করলেন। স্থানীয় মুগল বাহিনী খান জাহানের নিকট পরাজিত হলো। সম্রাট খানজাহানকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে 'হারাওল বাহিনী' (অগ্রবর্তী-সৈন্যদল) রওনা করে দিলেন এবং নিজে 'মুহাফিয-বাহিনী' (দেহরক্ষী সৈন্যদল) সমভিব্যাহারে বুর্‌হানপুর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এ-অভিযানে গর্ভবতী মমতাজ মহল বাদশাহ্‌র সঙ্গ ছাড়তে স্বীকৃত হলেন না। নিরুপায় বাদশাহ্‌ বেগম ও হারেম সঙ্গে রাখ্‌লেন।

বুর্‌হানপুর তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত। সেখানে শাহি ছাউনি স্থাপিত হলো। ক্ষুদ্র শহর মুগল সেনা-বাহিনীর চাপে টলমল করতে লাগ্‌লো। শাহজাহান ভেবেছিলেন, অনায়াসেই খান জাহানকে দমন করে রাজধানীতে ফিরে যাবেন। কার্যতঃ তা হয়ে উঠ্‌লোনা। খানজাহান সহজে দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চালাতে লাগ্‌লেন। তাপ্তি তীরে হারেম সহ মমতাজ মহল অনেক দিবস-যামিনী অতিবাহিত কর্‌লেন; তবু যুদ্ধ শেষ হলোনা। খান জাহান মচ্‌কিতে লাগ্‌লেন বার বার; কিন্তু ভাঙলেন না একবারও। এমনি অবস্থার মধ্যে একদিন মমতাজ মহল ভীষণ প্রসব বেদনায় মূর্ছিতা হয়ে পড়্‌লেন। বিদেশ-বিভূঁই, অনুন্নত স্থান। সেখানে না আছে নামজাদা তবিব, না আছে কোন হাকিম। দিল্লী থেকে ঘোড়ার পিঠে তবিব দৌড়ান সম্ভবপর নয়। ওঝা-হাতুড়ের অভাব ছিলনা; বেদ-বৈদ্যও আস্‌লো অনেক। সাধু-সন্ন্যাসীরাও তাপ্তি-তীরে মুক্তি-তর্পন আরম্ভ কর্‌লো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা। মমতাজ মহলের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগ্‌লো। উভয় সঙ্কটের মধ্যেও সম্রাট ধৈর্যচ্যুত হলেন না। তিনি দক্ষতার সাথে উভয়দিক রক্ষা করে চল্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে বহু সাধ্য-সাধনার পর এক কন্যা সন্তান (গওহর-আরা) ভুমিষ্ট হলো। প্রসূতির কিন্তু জীবন-প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। পার্শ্বে উপবিষ্ট শাহজাহান রোদন কর্‌তে লাগ্‌লেন। মমতাজ মহল অতি কষ্টে এগিয়ে এসে সম্রাটের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "শোক-দুঃখে লাভ কি প্রিয়তম! সকলকেই একদিন এ-পৃথিবী ছাড়তে হবে। আমার আর অধিক সময় নেই জাহাঁপনাহ্‌, শুনুন; মৃত্যু পথযাত্রীর দু'টি ওসিয়ৎ আছে: 'আমার মৃত্যুর পর আপনি আর বিবাহ কর্‌বেন না। কারণ সদ্য প্রসূতা কন্যাসহ আপনি চৌদ্দটি সন্তানের পিতা। বংশ রক্ষার জন্য এ-সব সন্তানই যথেষ্ট। যদি পুনরায় বিবাহ করেন, তবে সৎমাতার সাহচর্যে আমার সন্তান-সন্ততি সুখী হতে কিংবা নিরাপদে থাকতে পার্‌বেনা। আমার দ্বিতীয় ওসিয়ৎ এই যে, মৃত্যুর পর আমার কবরগাহর ওপর ভালবাসার এমন নিদর্শন তৈরী কর্‌বেন, যা হবে চির অতুলনীয়।" শাহজাহান নির্বিকার চিত্তে ওসিয়ৎ রক্ষার ওয়াদা কর্‌লেন। মমতাজ মহলের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিরনিদ্রায় ঢলিয়ে পড়লেন।

মমতাজ মহলের লাশ অস্থায়ীভাবে 'বাগ-ই-জয়ন-আবাদ' (বুরহানপুর)-এ দাফন করা হয়েছিল। ছ'মাস পর লাশ সেখান থেকে আগরায় স্থানান্তরিত করা হয়।

দ্বিতীয় ওসিয়তের কাজ অর্থাৎ তাজমহল নির্মাণ শুরু হয়ে গেল। চীন, তাতার, তুর্কিস্থান, এসিয়া-মাইনর, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থান থেকে কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ার আসতে লাগ্‌লেন। গরুর গাড়িতে করে শত-শত মাইল দুর থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মর্মর ও লোহিত প্রস্তর আস্‌তে লাগ্‌লো। বিভিন্ন দেশ থেকে পান্না, নীলকান্ত, ফিরোজা, আকীক, মুংগা, নীলম, সঙ-ই-সুলায়মান, সঙ-ই-আজুবা, সঙ-ই-নখুদ, সঙ-ই-তসুসিয়া প্রভৃতি বহুমুল্য প্রস্তরাদি সংগৃহীত হতে লাগ্‌লো। বিশ সহস্রাধিক রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত হলো তাজ-নির্মাণ কার্যে।

নক্‌শা তখনো প্রস্তুত হয়নি। নক্‌শার পরিকল্পনা নিয়ে সকলের মাথাই ভারী হয়ে ওঠেছিল। শাহ্‌জাহানও ভাব্‌ছিলেন। ভাবতে ভাবতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে তিনি দেখ্‌তে পেলেন এক স্বর্গীয় মহাপুরুষ। হাতে তাঁর ক্ষুদ্র এক ইমারত। এই কি আমার তাজ, এই কি আমার তাজ, বল্‌তে বল্‌তে শাহ্‌জাহান জেগে উঠ্‌লেন। বিশ সহস্রাধিক লোকের বিশ বছরের আন্তরিকতা, প্রেম-প্রীতি, একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায় ও কঠিন শ্রমের বদৌলতে তাজমহল গড়ে উঠ্‌লো। 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' সকলেই উল্লসিত হলেন।—একটা ভীষণ হৈ-চৈ-এ তন্দ্রা টুটে গেল। চোখ কচ্‌লাতে লাগ্‌লাম! সঙ্গের তরুণীটি বল্লেন, আগরায় এসে গেছেন; নাম্‌তে হয় তো নেমে পড়ুন! আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো মেয়েটি সম্বন্ধে। মনের ভাব গোপন রেখে মুখে বল্‌লাম, হ্যাঁ নাম্‌তে তো হবেই! নাম্‌লাম এক সঙ্গেই। নেমে দেখ্‌লাম আমার সঙ্গের তরুণীকে অভ্যর্থনা কর্‌তে এসেছে একজন তরুণ ও একজন তরুণী। আমি হাত তুলে 'খুদা হাফিয' বল্‌তে যাচ্ছি এমন সময় আমার সহযাত্রী মেয়েটি মুচ্‌কি হেসে বল্‌লেন, 'চলুন না আমাদের সঙ্গে;—একা একা কোথায় ঘুরে বেড়াবেন; হ্যাঁ, হারিয়ে যাওয়াও কিন্তু অসম্ভব নয়!' তাঁর কথা শুনে ও আমার চেহারা দেখে আগন্তুক তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। 'শুকৃরিয়া, আদাব আরয্‌'—বলে আমি পথে পা বাড়ালাম! পশ্চাৎ দিক থেকে তরুণীর মিহীণ আহ্বান ভেসে এলো: আক্‌রিক ভাইয়া!—! চম্‌কে উঠে ফিরে দাঁড়ালাম! তরুণীর চোখে-মুখে অপরূপ হাসি ও ভ্রুকুটির রেখা। প্রশ্ন কর্‌লেন, 'আভিতক্‌ নেহি পহচানা!' ...আমি নীরব; কিছুতেই মেয়েটির পরিচয় সন্ধান করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না! অবশেষে তরুণী বল্‌লেন, 'এত সত্বরই জাবিদ ওসমানকে ভুলে গেলেন! আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, না, না জাবিদ ওস্‌মানকে ভুল্‌বো কেন! তরুণী বল্লেন, 'হুঁহ্‌!' আমি থতমত খেয়ে খিতাতে লাগ্‌লাম—তবে তুমি—আপনি মানে তুমি জাবিদের—! বাধা দিয়ে তরুণী বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর 'নানী আম্মা'!' আমি সশব্দে হেসে উঠে বল্‌লাম, না, না মনে পড়েছে; তুমি তার মামাতো ভগ্নী—তায্‌কিয়া। এক বছর পূর্বে এক রাত্রে ক্ষণিকের দেখা! জাবিদ রোগশয্যায়; আমি তার পাশে বসে; তুমি ছিলে রকমারী কাজে ব্যস্ত! তোমাকে দেখেছিলাম ভালভাবেই; কিন্তু তোমার চেহারাখানা...যাক্‌ চিন্‌তে না পারলেও অপরাধ করিনি।

বাস্তব তাজের সম্মুখীন হয়েছি আমরা! তাজমহলের প্রবেশ-পথ লোহিত প্রস্তরে নির্মিত। ইহা যমুনা-তল থেকে একশ ফিট উচ্চ। এখান থেকে শুরু করে রওযা পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক 'তাজ বাগ' অবস্থিত। এই বাগের মধ্যস্থলে ও আশেপাশে মনোরম 'হাওয' আছে। হাওযে নানা ধরনের রঙীন মৎস্য খেলা করে ফিরছে। তাজ বাগের মধ্য দিয়ে দুটি 'নহর' রওযা পর্যন্ত চলে গেছে। বাগ ও নহরের পরিবেশে এ-অংশ স্বর্গীয় আবহাওয়ার অধিকারী হয়ে আছে। কত মনোলোভা এর দৃশ্য-বৈচিত্র্য! প্রবেশ পথ থেকে রওযার দূরত্ব ৪১১ ফিট।

হাওযের উভয় পার্শ্বে প্রাচীর সংলগ্নস্থানে একটি করে লোহিত প্রস্তরে নির্মিত ত্রিতল অট্টালিকা আছে। প্রত্যেক অট্টালিকার শীর্ষে 'বুর্জ্‌' আছে। বুর্জের অগ্রভাগ মর্মর প্রস্তরে নির্মিত। বাগ ও হাওয অতিক্রম কর্‌লে আসে সুবৃহৎ তাজ-চত্বর। এ-চত্বরও লোহিত প্রস্তরে নির্মিত এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-চত্বরের দৈর্ঘ্য ৯৭০ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৬৪ ফিট ১০ ইঞ্চি। তাজ-বাগ-তল থেকে চত্বরের উচ্চতা ৪ ফিট ও যমুনা-তল থেকে এর উচ্চতা ৮৩ ফিট। এই চত্বরের মধ্যস্থলে মর্মর প্রস্তরে নির্মিত আর একটি চত্বর। এই মর্মর চত্বরের ওপরই আসল রওযা অবস্থিত। মর্মর চার কোণে চারটি মিনার আছে। মিনার চারটিও স্বচ্ছ মর্মরে নির্মিত। মিনার-গুলিতে প্রশংসনীয় নির্মাণ-শৈলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। চারটি মিনারের যে কোনটিতে উঠে দেখ্‌লে মাত্র দুটি মিনার দৃষ্টি গোচর হয়। তৃতীয় মিনারটি রওযার প্রধান গম্বুজের অন্তরালে আত্ম-গোপন করে। মিনার গুলি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে এক বা একাধিক মিনার পড়ে গেলে, রওযার ওপর পড়্‌বেনা। পড়বে বাইরের দিকে। প্রত্যেক মিনারের বেড় ৬৪ ফিট। উচ্চতা ১৩৭ ফিট। মিনারে ওঠা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। মতানৈক্য ঝগড়ার রূপ ধারণ কর্‌লো। শফ্‌কত (তাযকিয়ার-খালাতো ভাই) চাচ্ছিল আমি ও নাইয়্যার (শফ্‌কতের বোন) এক মিনারে উঠি; সে তাযকিয়াকে নিয়ে আর এক মিনারে উঠ্‌বে! তাযকিয়া শফ্‌কতের সাথে মিনারে উঠ্‌তে সম্মত ছিল না। নাইয়্যার বান্ধুর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আপোষ-রফা হলো। শফকত-নাইয়্যার এক মিনারে উঠ্‌তে গেল; আমি ও তাযকিয়া অপর এক মিনারে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। মিনারে উঠ্‌তে উঠতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, শফ্‌কতের সাথে মিনারে উঠায় তোমার এত আপত্তি ছিল কিসের জন্য? তাযকিয়া বল্‌লো, 'সে অনেক কথা; শফ্‌কত ভাই এ-যুগের 'কানাইয়্যা'! একা পেলেই তাঁর মোহন মুরলী বাজতে এবং নাচ্‌তে থাকে':

মিনারের ওপর পর্যন্ত পৌঁছতে তিনটি মনজিল ও ১৪৭টি ধাপ অতিক্রম কর্‌তে হয়। মিনারের উপর থেকে

রওযা ও তাজের অপরাপর দৃশ্যাবলী অধিকতর সুন্দর দেখায়। আমরা মিনার থেকে নেমে রওযার দিকে অগ্রসর হলাম।

রওযা-ইমারত অষ্টকোণ বিশিষ্ট। এই ইমারতের উপর একটি সুবৃহৎ গম্বুদ আছে। বৃহৎ গম্বুদের দু-পাশে দুটি ক্ষুদ্র গম্বুজ অবস্থিত। বৃহৎ গম্বুজটির নিম্নে রওযাভ্যন্তরে মমতাজ মহল ও শাহ্ জাহানের মক্বিরাহ-প্রতীক পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে। উভয় প্রতীকের মধ্যে মাত্র ৯ ইঞ্চি ব্যবধান। এই প্রতীকের চতুষ্পার্শ্বে মর্মরজালির মনোরম অষ্টকোণ হুজরা। মাযারের উপর সঙ-ই-মুসা (মুসাপ্রস্তর)-এ খোদিত আল্লাহ্‌র নিরানব্বুই নাম। বাম পার্শ্বের মক্বিরায় প্রতীকের উপর ফারসীতে লেখা আছে :

مرقد منور ارجمند بانو بیگم مخاطب به ممتاز
محل توفیت فی ۱۰۴۰ ھ

এর পাশেই শাহজাহানের মক্বিরাহ প্রতীক। এ-প্রতীকের উপরও ফারসীতে লেখা রয়েছে :

مرقد اطہر اعلی حضرت فردوس آشیانی صاحب
قران ثانی شاہ جہان بادشاہ اب ثراہ فی ۱۰۷۶ ھ

এই হুজরার নিম্নে তাহ্ খানা সদৃশ একটি কামরা আছে। এই কামরার মধ্যেই মমতাজ মহল ও শাহজাহানের আসল কবর বিদ্যমান। শাহজাহানের আসল কবরে কিন্তু ভিন্ন 'ইবারত' খোদিত আছে।

মাযারের ছাদের উপর যে আলীশান গম্বুজ আছে, তার বেড় বা ঘের ২৭৪ ফিট ৬ ইঞ্চি। গম্বুজ কলসে যে চাঁদ আছে, তাতে কলেমা তৈয়্যেবা খোদিত করা হয়েছে। রওযার ছাদে উঠবার দুটি সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক সিঁড়িতে ৪৬ ধাপ। রওযার স্থানে স্থানে আরবী তোগ্‌রা ও নসখ অক্ষরে কুরআনে আয়েত খোদিত করা হয়েছে। তাজমহলের পশ্চিমে কোণে এক আযীমুশ্‌শান মসজিদ আছে। মসজিদ চত্বরটি লোহিত প্রস্তরে নির্মিত। মসজিদের তিনটি মেহ্‌রাব আছে। মধ্যস্থলের মেহ্‌রাবে একটি আয়না লাগানো আছে। এ-আয়নায় রওযার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তাজ-সৌন্দর্যের হানি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পূর্ব কোণেও অনুরূপ ইমারত নির্মিত হয়েছে। মসজিদ-প্রতীক হলেও এ-ইমারত 'তস্‌বিহ-খানা' নামে অভিহিত।

তাজমহল দেখা দু-একদিনে শেষ হয় না। এক সপ্তাহ ধরে সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর তাজ দেখেছি ; আজ আমাদের শেষ দেখা। আজিকার এ-চাঁদনি রাতের দশটা অবধি আমরা তাজের স্বর্গীয় শোভা উপভোগ করবো। আমরাই শুধু চারজন নই, আরো অনেক সৌন্দর্য-বিলাসী এসে জুটেছে। দু'জন তরুণীসহ একজন ইউরোপিয়ান যুবাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখানে। তাজের দৃশ্য এক এক সময় এক এক রকম। প্রভাত-সূর্য-কিরণে তাজ অরুণাভরূপ ধারণ করে ; দ্বিপ্রহরে হয় রক্ত-রাগ-রঞ্জিত ; গোধুলি লগ্নে লাভ করে গোলাবী রূপ ; আর চাঁদনি রাতে ? প্রেমিক শাহান্‌শাহর একবিন্দু শুভ্র সমুজ্জ্বল নয়ন-বারি !

ইবনে বতুতার সফর নামা

মোহাম্মদ নাসির আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটি অলৌকিক ঘটনা

আমি হাঁটতে অক্ষম বলাতে আগন্তুক আমাকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং স্মরণ করতে বললেন, "খোদা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা।" আমি বার বার এ-কথা স্মরণ করতে লাগলাম। কিন্তু আমার চোখ যেন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর হঠাৎ যেন মাটীতে পড়ে যাচ্ছি মনে হওয়ায় আমার জ্ঞান ফিরে এল, আমি চোখ মেলে চাইলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে লোকটিকে ধারে কাছে আর কোথাও দেখতে পেলাম না। তা'ছাড়া আমি তখন একটি লোকালয়ে অবস্থান করছি।

গ্রামের ভেতর প্রবেশ করে দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দা হিন্দু কিন্তু তাদের শাসনকর্তা একজন মুসলমান। প্রজাদের কাছে খবর পেয়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে সেই গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, গ্রামটির নাম 'তাজবুরা'। আমার দলের লোকেরা যেখানে আছে সেই কোয়েল এখান থেকে খুব দূরে নয়। গ্রামের শাসনকর্তা আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে একটি ঘোড়া আনালেন। বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে গোসল করালেন এবং গরম খাদ্য খেতে দিলেন। আমার আহারের পরে বললেন, আমার কাছে একটি জামা ও পাগড়ী আছে। একজন মিসরবাসী আরবের লোক এগুলো আমার জিম্মায় রেখে গেছে। কোয়েলে যে সেনাদল আছে, সে তারই একজন সৈনিক। আমি তখন সেগুলো আমাকে দিতে অনুরোধ জানালাম। সেগুলো আমার কাছে হাজির করা হলে দেখলাম, এগুলো আমার নিজেরই সম্পত্তি এবং আমিই কোয়েলে থাকাকালে সেই আরবী লোকটিকে এগুলো দিয়েছিলাম। এ-ব্যাপারে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। যে লোকটি আমাকে কাঁধে তুলে এখানে এনেছিলেন তখন তাঁর কথাই আমি ভাবতে লাগলাম।

আবু আবদুল্লাহ্ আল্-মুর্শিদী

ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ল, আবু আবদুল্লাহ্ আল্-মুর্শিদী নামক একজন দরবেশের কথা। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি হিন্দুস্তানে পৌছে আমার ভাই দিলশাদের দেখা পাবে। তুমি সেখানে একটি বিপদে পড়বে এবং আমার ভাই তোমাকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

আমি এখন বুঝতে পারলাম, ইনিই দরবেশ আবু আবদুল্লাহ আল-মুর্শিদীর ভাই। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ঘটনার সময় ছাড়া আর কখনও এ-লোকটির সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

কোয়েলে প্রত্যাবর্তন

সে রাত্রেই কোয়েলায় পত্র লিখে আমার নিরাপত্তার কথা বন্ধুদের জানালাম। খবর পেয়ে তাঁরা আমার জন্যে ঘোড়া ও পোষাক নিয়ে হাজির হলেন এবং আমাকে ফিরে পেয়ে বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম, কাফুরের মৃত্যুর পরে আমরা সুলতানকে যে চিঠি লিখেছিলাম তার জবাব এসে পৌচেছে। তিনি সম্বুল নামক একজন খোজাকে কাফুরের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন এবং পুনরায় আমাদের যাত্রা শুরু করতে বলেছেন।

আমার বিপন্ন অবস্থার কথা লিখে সঙ্গীরা সুলতানকে আরও একখানা চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিতে তারা এ যাত্রাকে অশুভ যাত্রা মনে করে আর অধিক অগ্রসর হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সুলতানের মনোভাব জানতে পেরে আমি তাদের মতে মত দিতে পারিনি। তারা তখন বলল, যাত্রার শুরুতেই কি রকম বিপদ-আপদ শুরু হয়েছে আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না। আপনার অনুরোধ অবশ্যই সুলতান রক্ষা করবেন। সুলতানের জবাবের জন্যে আমাদের এখানেই অপেক্ষা করা উচিত অথবা সুলতানের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।

আমি তাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে বললাম, আমরা এখানে অপেক্ষা করতে পারি না। যেখানেই আমরা যাই না কেন, সুলতানের জবাব সেখানেই পাব।

পুনরায় যাত্রা শুরু

তারপর আমরা পুনরায় যাত্রা করে তাঁবু ফেললাম বার্জবুরা বা বার্জপুর নামক স্থানে গিয়ে। এখানে একজন শেখের একটি দরগাহ্ আছে। সুশ্রী ও ধর্মপ্রাণ এই শেখ নাভি থেকে পা অবধি শুধু একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করেন। এ জন্য সবাই তাঁকে নাঙ্গা মোহাম্মদ বলে থাকে। বার্জপুর থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা প্রথমে পৌছলাম আব-ই-সিয়া (কালিন্দী) নদী অবধি এবং সেখান থেকে কনৌজ। কনৌজ একটি সুগঠিত ও সুরক্ষিত বড় শহর। শহরটি

প্রকাণ্ড একটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এ শহরে জিনিষ-পত্রের দাম বেশ সস্তা। আমরা এখানে তিনদিন কাটালাম। আমার সম্বন্ধে সুলতানকে যে পত্র দেওয়া হয়েছিল তার জবাব এখানে থাকতেই পেলাম। তিনি লিখেছেন, যদি ইবনে বতুতার কোন খোঁজই না পাওয়া যায়, তবে তাঁর জায়গায় তোমরা দৌলতাবাদের কাজী ওয়াজি-উল-মুলুককে নিয়ে যাত্রা শুরু করবে।

কনৌজ থেকে আমরা মাওরী নামক ছোট একটি শহর ছাড়িয়ে বড় শহর মার-এ গিয়ে পৌছলাম। এ শহরের অধিকাংশ অধিবাসী বিধর্মী; কিন্তু শাসনকর্তা একজন মুসলমান। মালয়া নামক একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম থেকে এ-শহরটির নামকরণ হয়েছে। এরা সুশ্রী ও শক্তিশালী এবং মহিলারা খুবই সুন্দরী। মার ছাড়িয়ে আমরা গেলাম আলাবার বা আলাপুর। এ-ছোট শহরটির অধিবাসীরাও অধিকাংশ হিন্দু এবং শাসনকর্তা আবিসিনিয়ার একজন মুসলমান। এক সময়ে ইনি সুলতানের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। অসীম সাহসিকতার জন্য ইনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। বিধর্মীরা বরাবর একে ভয় করে চলত। কারণ ইনি অনবরত তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে এবং তাদের বন্দী বা হত্যা করে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। ইনি যেমন শক্তিশালী তেমনি দীর্ঘকায় ছিলেন। শুনেছি একবার আহার করতে বসে ইনি একটি ভেড়ার গোশ্‌ত একাই খেয়ে ফেলতেন এবং খাওয়ার পরে প্রায় দেড় পাউণ্ড ঘি খেতেন। তাঁদের নিজের দেশের নিয়মও ছিল তাই। এই শাসন-কর্তার একটি পুত্রও ঠিক তাঁরই মত সাহসী ছিল। অবশেষে একটি গ্রাম আক্রমণ করতে গিয়ে ইনি হিন্দুদের হাতে নিহত হন।

গোয়ালিয়র

অতঃপর আমরা গোয়ালিয়রে এসে হাজির হলাম। এখানে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গের প্রবেশদ্বারে মাহুতসহ পাথরে খোদাই একটি হাতী দেখলাম। এখানকার শাসনকর্তা একজন ধার্মিক ও সৎব্যক্তি। ইনি পূর্বে একবার আমাকে বিশেষ সম্মান করেছিলেন। একদিন আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি একজন বিধর্মীকে তার কোন অপরাধের জন্য দু'টুকরা করে কাটতে উদ্যত হয়েছেন। দেখেই আমি তাঁকে বললাম, আল্লার নামে আমি অনুরোধ করছি, এ-কাজটি করবেন না। কারণ, আমি জীবনে কখনো চোখের সামনে নরহত্যা দেখিনি। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করে লোকটিকে কারাগারে রাখবার হুকুম করলেন। কাজেই আমার হস্তক্ষেপে একটি লোকের জীবন রক্ষা হল।

গোয়ালিয়র থেকে আমরা গেলাম পারওয়ান। পার-ওয়ান মুসলমানদের শহর কিন্তু এ-শহরের অবস্থান বিধর্মীদের অধিকৃত জায়গায়। এ-জায়গাটির আশে পাশে অনেক ব্যাঘ্রের বাস। স্থানীয় একজন লোকের মুখে শুনলাম, শহরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রাত্রে একটি বাঘ প্রায়ই শহরে প্রবেশ করে এবং মানুষ ধরে নিয়ে যায়। এ-ভাবে এ-বাঘটি শহরের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেছে বলে শোনা যায়। অথচ বাঘটা কি ভাবে যে শহরে প্রবেশ করে তা কেউ বলতে পারে না।

অবশেষে একটা আশ্চর্য্যজনক গল্প শুনলাম। একজন লোক আমার কাছে গল্প করল, এ-বাঘটা আসলে একটি মানুষ। যাদুর বলে এ-বাঘের আকৃতি ধারণ করতে পারে। এসব যাদুকরেরা যোগী নামে নামে পরিচিত। আমি এ-গল্প বিশ্বাস করতে রাজী হলাম না; কিন্তু একাধিক লোকের কাছে এ-বিষয়ে আমি একই গল্প শুনেছি।

যাদুগীরের ক্রিয়াকলাপ

এই শ্রেণীর যোগী বা যাদুগীররা অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারে। তাদের কেউ কেউ মাসের পর মাস কাটাতে পারে পানাহার না-করে। কেউ কেউ মাটীর নীচে গর্ত করে তাতেই বাস করে। এ রকম একটি লোকের কথা শুনেছি, সে নাকি এক বছর ছিল এমনি একটি গর্তে। এখানকার লোকেরা বলে, যোগীরা এমন পিল তৈরী করতে পারে—যার একটি খেয়ে কয়েক দিন বা মাস কাটিয়ে দেওয়া যায়। এ-সময়ের মধ্যে তাদের কোন রকম ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। এছাড়া বহুদূরে কি ঘটছে তাও তারা অনায়াসে বলে দিতে পারে। সুলতান যোগীদের সম্মান করেন এবং তাদের সঙ্গ দান করে থাকেন। শুন-লাম, যোগীদের মধ্যে অনেকে আছে শুধু শাক সব্জী খেয়ে জীবনধারণ করে এবং বেশীর ভাগ যোগীরাই মাছ মাংস স্পর্শ করে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে নিজেদের তারা এ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে যে বাহ্যিক প্রয়োজন তাদের অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

যোগীদের মধ্যে এমনও কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা একটি লোকের দিকে চোখ তুলে চাইলেই সেই লোকটি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণ লোকেরা বলে, এভাবে মৃত্যু ঘটেছে এমন কোন লোকের বক্ষ বিদারণ করে দেখা গেছে তার হৃদপিণ্ড নেই। অর্থাৎ হৃদপিণ্ড খেয়ে ফেলা হয়েছে। এ-ধরণের যাদুগীর বা যোগীদের মধ্যে নারীই বেশী। সে সব নারী যাদুগীর মানুষের হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করে তাদের বলা হয় কাফ্‌তার। দিল্লীতে যখন দুর্ভিক্ষ চলছে তখন এমনি একজন স্ত্রী-

লোককে আমার নিকট এনে বলা হয়েছিল, সে নাকি একটি শিশুর হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করেছে। আমি তাকে সুলতানের লেফ্‌টেন্যান্টের কাছে পাঠাতে বললাম। লেফটেনান্ট বললেন স্ত্রীলোকটি সত্যই কাফ্‌তার কি না তিনি তা পরীক্ষা করে দেখবে।

এই বলে হাতে পায়ে চারটি পানিভর্তি কলসী বেঁধে স্ত্রীলোকটিকে যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করা হল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু ডুবে না-গিয়ে পানির উপর ভেসে রইল। এর ফলে তাকে কাফ্‌তার বলে গণ্য করা হল। বলা বাহুল্য-যথারীতি স্ত্রীলোকটি ডুবে গেলে তাকে কাফতার বলে ধরা হত না। পরে হুকুম হল তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে। স্ত্রীলোকটির ভস্মাবশেষ শহরের নারীপুরুষ সবাই মিলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদের ধারনা এ-ভস্ম গায়ে মাখলে এ-বছরের জন্যে অপর কোন কাফতার তাদের কোন রকম অনিষ্ট করতে পারবে না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

আমি যখন দিল্লীতে তখন একদিন সুলতান আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে একটি গোপন কক্ষে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দু'জন যোগীর সঙ্গে দেখতে পেলাম। দু'জন যোগীর একজন বসা অবস্থায় শূন্যে আমাদের মাথার উপরে উঠে গেল। তখনও সে সেখানে শূন্যের উপর বসে আসে। এ-অদ্ভুত দৃশ্য আমাকে এতটা ভীত ও বিস্মিত করেছিল যে, আমি তৎক্ষনাৎ জ্ঞান হারালাম। পরে ঔষধ খাওয়ানোর ফলে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসলাম। তখনও পর্যন্ত যোগী শূন্যেই বসে আছে। অবশেষে তার সঙ্গী যোগী ঝোলার ভেতর থেকে একখানা খড়ম বের করে মাটীতে ছুঁড়ে মারল। খড়ম খানা শূন্যে অবস্থিত যোগীর ঘাড়ে বারবার আঘাত করতে লাগল এবং যোগী ধীরে ধীরে মাটীতে নেমে এসে আমাদের পাশে পূর্ববৎ বসে পড়ল। তখন সুলতান আমাকে বললেন, তুমি ভয় পাবে আমি জানতাম। তা না হলে আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার তোমাকে দেখাতে পারতাম। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম; কিন্তু আমার হৃদকম্প তখনও রয়েই গেল এবং আমি অসুখে পড়লাম। পরে ঔষধ-খেয়ে আমাকে সুস্থ হতে হয়েছে।
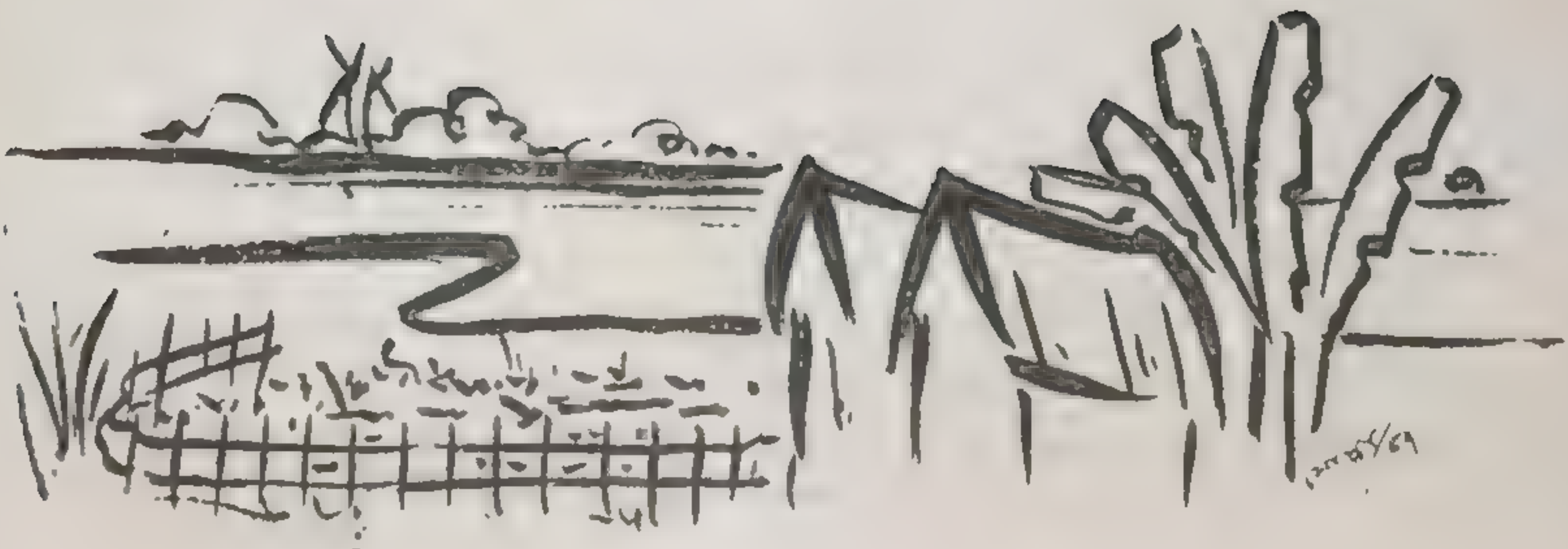
আমাদের সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ

মুজীবুর রহমান খাঁ

মানুষ সত্য মিলে ও গরমিলে, সমত্বে ও স্বকীয়ত্বে, একাকারিত্বে ও বৈচিত্র্যে এবং ঐক্যে ও অনৈক্যে। এ-সত্য ধরা পড়ে মানুষের সমাজ জীবনে, রাজনীতিতে—বিশেষ করে তার তাহজীব-তমদ্দুন এবং শিল্প ও সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক কথায় এই মিল আর গরমিলেরই ইতিহাস। পাক-বাংলা সাহিত্যের পশ্চাত-ভূমিও সঠিকভাবে এখানেই আবিষ্কৃত হতে পারে। মানুষ সর্বত্র এক—তার অন্তরে এবং অনুভূতিতে। মানুষের মন দেশ-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করে যায়। সাহিত্যের এই উদার রাজ্যে সকল দেশ ও জাতির মানুষ আনন্দে সুধাপান করতে পারে। এ-কথা মেনে নিলেও সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গীতে দেশ-কাল-পাত্রের ছাপ পড়ে। মুসলমান তার ধর্মীয় ও তামদ্দুনিক স্বকীয়ত্ব বজায় রেখে একদিন মিলিত বাংলা সাহিত্যে তার সহজ ও স্বাভাবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিল; কিন্তু হিন্দু সাহিত্যিকেরা চিরন্তনের দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা একে চিরন্তনের পরিপন্থী বলে ফতোয়াও দিয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যের রূপসজ্জাতেও মুসলমানের ছাপকে বর্জ্জনীয় বলে মনে করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম পৃথক। হিন্দু আদর্শবাদী, মুসলমান বাস্তববাদী। অহিংসা হিন্দুর একটি বড় আদর্শ; কিন্তু মুসলমানের তা নয়। মুসলমান রুদ্রেরও সাধক। সুতরাং তার সাহিত্যে শক্তিবাদ ও বলশালিতার বৈশিষ্ট্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। মুসলমানের লেখায় আরবী, ফারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি শব্দ বেশী থাকলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। ইসলামের গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী সার্ব্বজনীন মানুষেরই বাণী। সাহিত্যে তার স্থান আছে। তবে নিছক "ইসলামী সাহিত্য" সৃষ্টির চেষ্টা অর্থহীন। একে অতীতমুখী চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। মৃত অতীত-প্রীতি অবাঞ্ছিত। সাহিত্যের অঙ্গনে এই সাম্প্রদায়িকতা কাম্য নয়। সুখের বিষয়, মুসলমান সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার স্পর্শ লেগেছে। তবে এ-কথাও ঠিক ইসলাম থেকে মাল-মসলা গ্রহণের সুযোগ আছে; কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

এ-সব কথা একদিন যুক্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সাহিত্য সাধনায় খুবই সত্য ছিল। আজিকার পাকিস্তানী পশ্চাতভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতেও এ-সব কথার মর্ম্মবাণীকে নবোৎসাহে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এ-সব কথার কাজ আজো ফুরায় নি। এখানেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের নব যাত্রাপথের শুরু নির্দ্ধারিত হতে পারে। কারণ, আমাদের সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারার ইহাই প্রধান ইশারা। ইহাই আমাদের সাহিত্যের দার্শনিক পশ্চাতভূমি। তাই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের "দৃষ্টিকোণের" দর্শন, আমাদের পাকিস্তানী সাহিত্যেরই দর্শন। এ-কারণেই "দৃষ্টিকোণে" ইকবাল ও নজরুল ইসলামের সাহিত্যের উপর মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পুথিসাহিত্যের নব মূল্যায়নের প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পাক-বাংলার লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের নূতন করে মূল্যমান নির্দ্ধারণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

"দৃষ্টিকোণে"র ভিতর মোট চৌদ্দটি রচনা স্থান পেয়েছে। এ-সব প্রবন্ধের বেশীর ভাগের ভিতর পাক-বাংলা সাহিত্যের জাতীয় দৃষ্টিকোণ নির্দ্ধারিত করার চেষ্টা রয়েছে। 'দৃষ্টিকোণে' সংক্ষেপে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কথা দাঁড়াল, অন্তর ও অনুভূতির ক্ষেত্রে সাহিত্য বিশ্বজনীন কিন্তু তার বহিরঙ্গে দেশ-কাল-পাত্রের ছাপ থাকবেই। এই বিচারে পাক-বাংলার সাহিত্য সার্ব্বজনীন সাহিত্য কিন্তু তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। সাহিত্যের এই সাধারণ ভূমিকা নির্দ্দেশ করে "দৃষ্টিকোণে" আবুল কালাম শামসুদ্দীন পাক-বাংলা সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর "দৃষ্টিকোণ" আমাদের সাহিত্য, সাহিত্য-আন্দোলন ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মূল্যায়ণের সাথে সাথে তার দর্শনকেও সকলের কাছে তুলে ধরেছে।

'দৃষ্টিকোণে'র "সাহিত্য ও মানবিবত্তা" নামক প্রবন্ধের গোড়াতেই আছে: "সাহিত্য চিরন্তনের মিলন-ক্ষেত্র বিশ্ব মানবের সার্ব্বভৌম মনোভাব, অনুভূতি ও জীবন-প্রবাহের বিকাশ ক্ষেত্র সাহিত্য। এতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই।" তারপর আছে: "কিন্তু সাহিত্যের অন্তর ভাগ চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র হলেও তার বহির্ভাগ দেশ-কাল-পাত্রেরই লীলাভূমি। কারণ মানব-মনের চিরন্তন মনোভাবগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পাত্রে ঠিক একভাবে প্রকাশ পায় না। সুতরাং সাহিত্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গী দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এমন কি, এই প্রকাশভঙ্গী দেশ-কাল-পাত্রানুসারী করতে না পারলে সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থক হয় না, সুন্দর হয় না, অস্বাভাবিক হয়ে উঠে।" হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ব্যবধানের উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে:

"এই পরিস্থিতিতে মুসলমান স্বষ্ট সাহিত্যে মুসলমানী প্রকাশভঙ্গী দেখে হিন্দুদের আতঙ্কিত হওয়ার কি আছে, বুঝি না।" অন্যত্র আছে: "কিন্তু ইসলাম আদর্শ ও বাস্তবের সামঞ্জস্য সাধন করেছে।......হিন্দু সাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবের বাহুল্য ঘটেছে, এর রূপে মেয়েলী কোমলতাই বেশী ফুটেছে। কিন্তু মুসলমান স্বষ্ট সাহিত্যে এর হুবহু অনুকরণ আশা করা যায় না। কারণ, মুসলমান বাস্তব ও রুদ্রের সাধক বটে। তার স্বষ্ট সাহিত্যে মেয়েলী কোমলতাই থাকবেনা, পুরুষালী বলশালিতাও থাকবে বৈ কি!" আর এক স্থানে আছে: "অনেক সংস্কৃত শব্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়েছে, যা মুসলমানের কাছে গ্রীক। এই দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের প্রচলনে যদি আপত্তি না উঠে, তবে মুসলমানী Tradition, allusion ইত্যাদি প্রকাশের জন্য অত্যাবশ্যক আরবী-ফারসী শব্দ প্রচলনে হিন্দু সাহিত্যিকদের আপত্তির কারণ কি?" সাহিত্যে ইসলামী রূপের প্রয়োজন স্বীকার্য্য ও যুক্তিসহ।

কিন্তু ইসলামী রূপায়ণের এ-সত্য স্বীকার করে নিলেও সাহিত্যের মূল ও সার্ব্বজনীন আদর্শ ত্যাগ করা চলবে না। এক দল মুসলমান সাহিত্যিক এ-সত্য ভুলে যাচ্ছেন, তাঁদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে: "কিন্তু সাহিত্যের এই সার্বভৌম আদর্শকে উপেক্ষা করে বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলমান সাহিত্যিক বাঙলা সাহিত্যকে নিছক 'ইসলামী সাহিত্য' করে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বাঙালী মুসলমান জাতিকে অতীত মুসলমানী গৌরবের যুগে ফিরে যাবার প্ররোচনা দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে মৃত অতীত কোথাও ফিরে আসে না।" 'দৃষ্টিকোণে'র "সাহিত্যের নব-রূপায়ন" অংশের এক জায়গায় আছে: "সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরের বিদেশী পরাধীনতা এদেশবাসীর দেহ-মনে যে সর্বাঙ্গীন বিপর্যয় এনে দিয়েছিল, তার ফলে তাদের শিল্প ও সাহিত্য-স্বষ্টিতে স্বস্থতা ছিল না—তা একেবারে অনুকরণ-অনুসরণের দাস হয়ে পড়েছিল।" উক্ত প্রবন্ধে আবার আছে: "অবশ্য সমগ্র পাকিস্তানে যে কোথায়ও এর ব্যতিক্রম নাই, এ-কথা বলা চলে না, মহাকবি ইক্‌বালকে এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম বলেই আমাদের মনে হয়। ইক্‌বালের প্রথম জীবনের রচনায় অবশ্যি সে ব্যতিক্রমের পরিচয় তেমন নাই; তবে তার শেষ দিকের রচনা স্বকীয়ত্বে উজ্জ্বল এবং বিদেশী ভাবধারা মুক্ত, এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে।" আর এক জায়গায় আছে: "আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ এ-কথা ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন যে, গত-যুগের ব্যর্থ সাহিত্য-ধারার জের টেনে চলা চলবে না। বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার সাহিত্য পাকিস্তানে অচল। এদেশের মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। এ-দেশের মানুষের সত্যিকার জীবনধারা, তাদের অনুভূতি, তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী, আচার-বিচার, কথাবার্তা, তাদের জীবন-সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটি-নাটি সাহিত্য স্বষ্টিতে রূপায়িত করে তুলতে হবে।" 'নজরুল প্রতিভা' নামক প্রবন্ধে আছে: "রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ মেয়েলী কোমলভাবের কবি, মাইকেলে গম্ভীর-ডম্বরু-নাদ শোনা যায়। কিন্তু রুদ্ররসের অগ্নি-উদ্দীপনা নজরুল ইসলামের কাব্যে আমরা প্রথম দেখতে পাই।" আবার আছে: "ইসলামী প্রকৃতিতে শক্তি একটা বড় ব্যাপার—বৈষ্ণবীয়ানার স্থান সেখানে বিশেষ কিছু নাই। আজ যেহেতু ইস্‌লাম বাংলায় প্রবল হয়েই আছে, তাই শক্তিবাদ এখানে অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে, তা একেবারে অসম্ভব। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য—বিশেষ করে, পুঁথি সাহিত্যের সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন, মুসলমান রচিত পুঁথি-কাব্যে শক্তি মন্ত্রই প্রচারিত হয়েছে।" দৃষ্টিকোণের "বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস" নামক রচনাটিতে এক জায়গায় বলা হয়েছে: "আগেকার ইতিহাসগুলিতে পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, সাহিত্যিকদের জন্ম, মৃত্যু ও তাদের রচিত পুস্তকের ইতিবৃত্ত দিলেই সাহিত্যের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে না। এ-গুলি ইতিহাসের একটা বড় কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ব্যতিরেকে সাহিত্যের মূল্যমান নির্দ্ধারিত হতে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্যমান, উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস না থাকলে তা সত্যিকার ইতিহাস পদবাচ্য হ'তে পারে বলে মনে হয় না। আগেকার সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ এ-সম্পর্কে বড় ভাবনা-চিন্তা করেন নাই। তাঁরা সাহিত্যিকের জন্ম, তারিখ নিয়েই বেশী ঘাঁটাঘাটি করেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে দেখলে আগেকার ইতিহাসগুলিকে সত্যিকার ইতিহাস বলে অভিহিত করতে সত্যই মনে দ্বিধা জন্মে।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের "দৃষ্টিকোণে"র সঠিক পরিচয় একদিক থেকে এই কয়টি কথার ভিতরই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তিনি আমাদের সাহিত্যিক ধারা বিচার করতে যেয়ে পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। এই পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতকেই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে আমাদের জাতীয় দৃষ্টিকোণ। আমার মনে হয় "দৃষ্টিকোণে"র দার্শনিক পরিচয় আমার উদ্ধৃতিগুলির মধ্য দিয়ে যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এ-জন্য এখানে আর বেশী উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

যদিও এ-সব উদ্ধৃতির ভিতর 'দৃষ্টিকোণের' আসল পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তবু ইহাই তাঁর দৃষ্টিকোণের এক-মাত্র কথা নয়। সাহিত্য বিচারের সার্বজনীন ও সাধারণ দৃষ্টিকোণকে প্রধান বিষয়বস্তু করে রচিত অনেক মূল্যবান কথা এবং সুন্দর প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। আবার সাহিত্য বিচারের এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী অল্প-বিস্তর ও ইতস্ততঃ 'দৃষ্টিকোণের' সকল প্রবন্ধেই পাওয়া যায়। তবে এ-প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে "আমাদের কথা-সাহিত্য", "একরামুদ্দিনের সাহিত্য প্রতিভা", "রম্য রচনা," "পাক-বাংলার শিশু সাহিত্য", "পরিচয় স্মৃতি"র কথা উল্লেখ করতে পারি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন যে সাহিত্যের রসজ্ঞ, নিপুণ এবং উঁচুদরের সমালোচক, এর পরিচয় তাঁর দৃষ্টিকোণের ভিতর কোথাও ম্লান হয়নি। তিনি যেমন আমাদের জাতীয় দর্শনের আপোষহীন অনুসারী, তেমনি তিনি সুন্দরের অতন্দ্র খাদেম। এ-জন্য আমাদের সাহিত্যের বহু প্রচলিত ধারণার ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে তার সমালোচনা অতীতে যেমন কাজ করেছে, বর্তমানেও তেমনি তা কাজ করে যাবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ এবং সাহিত্যের সাধারণ মূল্যমান সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। আমাদের সাহিত্যের জাতীয় ও সাধারণ দর্শনকে অত্যন্ত মমতা ও শ্রদ্ধার সাথে তিনি গ্রহণ করেছেন। ফলে, তাঁর ধ্যান-ধারণায় যুক্তির সাথে আন্তরিকতার নিবিড় মিলন ঘটেছে এবং জন্ম নিয়েছে অসন্ত বিশ্বাস। এ-জন্য তাঁর ভাষায় সর্বত্র যেমন বিপুল প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি তাতে মিশেছে অনিবার্য আবেগ। এরই জন্য তাঁর কথায় ও চিন্তায় কোথায়ও কুয়াশাও নাই, আড়ষ্টতাও নাই। এক কথায় 'দৃষ্টিকোণের' ভাষা সর্বত্রই বলিষ্ঠ, বেগবান এবং অনিবার্য। তাঁর রচনা-শৈলীর সৌন্দর্য সর্বত্রই পাঠকগণকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে রাখে।

অসন্ত বিশ্বাস থেকে যিনি কথা বলেন, তিনি সব সময়ই নির্ভীক। প্রয়োজনমত অপ্রিয় সত্য ও কঠোর ভাষণেও তাঁর যে দ্বিধা নাই, এ-কথার প্রমাণ 'দৃষ্টি-কোণে'র ভিতর পাওয়া যায়।

তবে তাঁর 'দৃষ্টিকোণের' ভাষা ও কথা অনেক ক্ষেত্রেই বক্তব্য এবং মন্তব্য প্রধান। তিনি তাঁর কথার ব্যাখ্যা ও তার পশ্চাৎভূমি উদ্ঘাটনের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন নাই। ফলে, তাঁর রচনাগুলির সংক্ষিপ্ততা কোন কোন জায়গায় ক্ষতিকর হয়েছে। কারণ তাঁর সব কথার ব্যাখ্যা না থাকার দরুণ, তাঁর ভাষা তীক্ষ্ণ এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাতে তাঁর বক্তব্য সকল দিক থেকে পাঠকগণের নিকট হয় তো সব সময়ই বোধগম্য নয়। "দৃষ্টিকোণে"র এটাকে যদি কেউ দুর্বলতা বলেন, তবে আমি তাঁর সাথে এক মত। তাঁর রচনাগুলি আরও দীর্ঘ ও বিস্তারিত হলেই ভাল হত।

দৃষ্টিকোণের রচনায় ব্যস্ত-সমস্ততার ছাপও আছে; দুই এক জায়গায় ভাষায় সাহিত্যিক সৌন্দর্য একটু আধটু আহত হয়েছে বলে আমি মনে করি। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: "সাহিত্য ও মানবিকতা" নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে: "এ-কারণে মানব মনের বিকাশস্থল সাহিত্যে দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণ ঝড়-ঝঞ্ঝা-কোলাহলের পারিপার্শ্বিকতা তার প্রকাশভঙ্গিতে বাইরের রূপ হিসাবে স্থান পেলেও, তা তার অন্তরের বাণী হতে পারে না।" এখানে "সঙ্কীর্ণ" কথাটা "ঝড়-ঝঞ্ঝা"র বিশেষণ হিসাবে না দিলেই ঠিক হত। দৃষ্টিকোণের দুই এক জায়গায় সুন্দর ও আভিজাত্যপূর্ণ ভাষার সাথেই মাঝে মাঝে হালকা শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে যেমন: "কিন্তু কেবল দানের অতীত-মোহে দাতা সেজে গ্যাট হয়ে বসে 'হায় আফসোস' করতে থাকলেই আমাদের কিছু গৌরব বাড়বে না।" এখানে এই "গ্যাট" কথাটি আমার ভাল লাগেনি।

নজরুল ইসলামের উপর মতামত প্রকাশের সময় "দৃষ্টিকোণে"র এক জায়গায় কি কারণে জানি না লেখক কিছুটা নিজের প্রতিই যেন অবিচার করেছেন এবং তাঁর কথার পূর্বাপর সঙ্গতিও রাখতে পারেন নি। সকলেই জানেন, নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সব সময়ই উচ্ছ্বসিত ও আবেগমুখর। কিন্তু "পাকিস্তান ও বাংলা সাহিত্য" নামক রচনায় এক জায়গায় নজরুল সম্পর্কে আছে: "প্রতিভার ছাপ তাঁর রচনায় খুবই প্রখর। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতার চাইতে তাতে আবেগ ও উত্তেজনারই যেনো বাহুল্য; ফলে স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে তার টিকে থাকা শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে বই কি? "নজরুলের ভাণ্ডার গানের শিল্পরূপ সত্যি অনবদ্য। বাঙলা সাহিত্যে এদিক দিয়ে তাঁর জোড়া নাই। কিন্তু স্রষ্টা সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্থান খুব উঁচুতে, এ-কথা সম্ভবতঃ বলা যায় না।" নজরুল প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের অতীত ও বর্তমানের বহু কথা এবং উক্তির ভিতর, এমন কি, আলোচ্য এই 'দৃষ্টিকোণের' ভিতর এই মন্তব্যটি আমার মনে হয় একটি ছন্দ পতন। এ-সব সামান্য দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিকোণকে আমাদের পূর্বপাকিস্তানে রচিত মনন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিনন্দন জানাতে আমার একটুও দ্বিধা নাই। চিন্তার উচ্চতা ও ভাষার আভিজাত্যের জন্য মোটামুটিভাবে

এ-ধরণের একটি পুস্তক নিয়ে যে কোন সাহিত্য গর্ববোধ করতে পারে।

আবুল কালাম্ শামসুদ্দীনের "দৃষ্টিকোণ" সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে আর একটি কথা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এখানে এসে পড়ে, তা' হল বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মুসলমানী সাহিত্যের ধারায় সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা। এখানে আমি টি, এস, ইলিয়টের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ম্যাথিউ আর্নল্ড সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে টি, এস, ইলিয়ট বলেছেন: "From Time to, every hundred years or so, it is desirable that some critic shall appear to review the past of our literature, and set the poets and the poems in a new order. This task is not one of revolution but of readjustment. What we observe is partly the same scene, but in a different and more distant perspective; there are new and strange objects in the foreground, to be drawn accurately inproportion to the more familiar ones which now approach the horizon. Where all but the most eminent become invisible to the naked eye. The exhaustive critic, armed with a powerful glass, will be able to sweep the distance and gain an acquaintance with minute objects in the landscape with which to compare minute objects close at hand; he will be able to gauge nicely the position and proportion of the objects surrounding us, in the whole of the vast panorama."

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য সাধনার সামগ্রিক ইতিহাস যিনি জানেন তিনি স্বীকার করবেন যে, তিনি আমাদের অনেক সাহিত্যিক কুসংস্কার, অজ্ঞতা, এবং গোঁড়ামীর ধারনাকে আঘাত করেছেন এবং জাতিকে আঘাতের পর আঘাত করে তাকে সত্যিকার সাহিত্যাভিসারী ও রসসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। কবি কায়কোবাদ ও নজরুল ইস্লামের সাহিত্যকে গ্রহণ করবার মত মনের জমি সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর লেখার দান অপরিসীম। প্রবল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তিনি সকলকে সাহিত্যের উদার ও সার্বজনীন ক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন। তাঁর আঘাতে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের কৃত্রিম মর্যাদার মুখোস যেমন খসে পড়েছে, তেমনি তাদের অনেকের মর্যাদার মান উন্নীতও হয়েছে। একদল হিন্দু সাহিত্যিকের সাম্প্রদায়িকতার তিনি যেমন ক্ষমাহীন সমালোচক, তেমনি তিনি একদল মুসলমান সাহিত্যিকের পরানুকরণপ্রিয়তার কঠোর সমালোচক। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বহু প্রবন্ধ আমাদের সাহিত্যে বিচারবোধ এবং মূল্যমান সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পরিবর্তিত করেছে এবং তার ফলে আমাদের সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণা ভারসাম্য ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। সমালোচকের এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি তাঁর "দৃষ্টিকোণে"ও যথাযথ পালন করেছেন। তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য আমাদের মধ্যে নব জানাজানি ও নব বিচার বিশ্লেষণের পথ পরিষ্কার করেছে। "দৃষ্টিকোণে"র লেখক তাই আমাদের অভিনন্দনের যোগ্য।

খেলাধূলা

—খেলোয়াড়

১৯৫৯ সনের ঢাকা লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

মোহামেডান স্পোর্টিং দল লীগ চাম্পিয়ান— পূর্ব্বপাকিস্তানের জনপ্রিয় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৫৯ সনের ঢাকা ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। পাকিস্তানী ইন্টারন্যাশনাল সেণ্টার ফরোয়ার্ড আশরাফের যোগ্য নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং দল এ-বৎসর লীগ খেলায় খুব ভাল রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। তাহারা লীগের মোট ১৪টি খেলার মধ্যে মাত্র একটিতে পুলিশের নিকট পরাজয় এবং ইস্পাহানী ও ঢাকা ওয়াণ্ডারার্সের সঙ্গে ড্র করিয়া মাত্র চারটি পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছে। মোহামেডান স্পোর্টিং দল ১৪টি খেলায় মোট ২৪ পয়েণ্ট লাভ করিয়া লীগ বিজয়ী হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এ-বৎসর ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ও ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স দলের সঙ্গে আসল শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং ফলাফল তাহাদের অনুকূল হওয়ায় লীগ-বিজয় সহজ হইয়াছে। এ-বৎসর ঢাকা লীগে চ্যাম্পিয়ান দলের স্কীপার সেণ্টার ফরোয়ার্ড আশরাফ ১৬টি গোল করিয়া ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক গোল করার এবং সেই সঙ্গে তিনটি হ্যাটট্রিক করারও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আশরাফ গত বৎসর টোকিওতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশীয়ান গেমসে পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল টীমে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে খেলিয়াও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৫৭ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশীপে আশরাফই পূর্ব্বপাকিস্তানী খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গত বৎসর ঢাকা

মোহামেডান ক্লাবের হইয়া কলিকাতায় আই, এফ, এ, শীল্ডে খেলিয়াও আশরাফ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ বৎসর মোহামেডান স্পোর্টিং দলের গোলরক্ষক রণজিৎ ঢাকা লীগে সর্বনিম্ন মাত্র ১১টি গোল খাইয়াছেন। মোহামেডান দলের খেলোয়াড়দের জয়লাভের দৃঢ় মনোবল ও টীম স্পিরিটই তাহাদের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। লীগ খেলায় মোহামেডান দলের পক্ষে নিম্নোক্ত খেলোয়াড়গণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে—

রণজিত, দুলু আফেন্দি, কামরুজ্জামান, গজনবী, সাত্তার, আলতাফ, নজরুল, আবিদ, সামাদ, সঈদ, আমান, কবীর, আশরাফ, খয়ের, শাহ আলম, কাসেম ও করীম।

প্রথম বিভাগ লীগের শেষ অবস্থা

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহামেডান	১৪	১১	২	১	৪২	১১	২৪
ওয়াণ্ডারার্স	১৪	৯	৩	২	৩১	১৪	২১
ষ্টেশনারী	১৪	৯	১	৪	৩৪	১৮	১৯
ই, পি, আর	১৪	৮	৩	৩	৩০	২১	১৯
আজাদ	১৪	৮	৩	৩	২৮	১৫	১৯
পুলিশ	১৪	৬	২	৬	২৩	২২	১৪
ওয়ারী	১৪	৫	৩	৬	১৫	২২	১৩
পি, ডব্লিউ, ডি	১৪	৬	১	৭	১৯	৩৩	১৩
ইস্পাহানী	১৪	৫	২	৭	২৬	২৩	১২
ভিক্টোরিয়া	১৪	৬	০	৮	১৬	৩০	১২
প্রেস	১৪	৫	১	৮	১৫	৩১	১১
ইষ্ট এণ্ড	১৪	৪	৩	৭	১৫	২৯	১১
ফায়ার সার্ভিস	১৪	২	৩	৯	১০	২৭	৭
তেজগাঁও	১৪	১	১	১২	৭	৩৯	৩

ত্রিপুরা জেলার নুরুল আমীন কাপ বিজয়—১৯৫৯ সনের পূর্বপাকিস্তান আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা জেলা বিজয়ী হইয়া নুরুল আমীন কাপ লাভ করিয়াছে। এ বৎসর প্রদেশের চারিটি জোনে চট্টগ্রাম, বরিশাল, বগুড়া ও কুষ্টিয়ায় প্রথমে আঞ্চলিক নক-আউট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র মোমেনশাহী জেলা ছাড়া আর সকল জেলাই অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম জোনে ত্রিপুরা, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরা এই জোনে চ্যাম্পিয়ান হয়।

১৯৫৯ সনের আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী ত্রিপুরা একাদশ।

বরিশালে ঢাকা জোনের খেলায় ফরিদপুর, ঢাকা, মোমেনশাহী ও বরিশাল জেলা দল প্রতিযোগিতা করে এবং বরিশাল চ্যাম্পিয়ান হয়।

ত্রিপুরা দলের ক্যাপ্টেন আশরাফকে
কাপ লইতে দেখা যাইতেছে।

বগুড়ায় রাজশাহী জোনের খেলায় রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা অংশগ্রহণ করে এবং বগুড়া চ্যাম্পিয়ান হয়।

কুষ্টিয়া জোনে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে কুষ্টিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়। অতঃপর ঢাকা ষ্টেডিয়ামে সম্প্রতি মূল প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে একদিকে ত্রিপুরা জেলা কুষ্টিয়া জেলাকে এবং অপরদিকে বরিশাল জেলা বগুড়া জেলাকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে উন্নীত হয়।

ফাইনাল খেলায় ত্রিপুরা জেলা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেষ সময় আশরাফের এক দর্শনীয় গোলে বরিশাল জেলাকে পরাজিত করিয়া আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। খেলার শেষে ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট ব্রিগেডিয়ার সাহেবদাদ খান বিজয়ী দলকে নুরুল আমীন কাপ উপহার দেন। পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট জনাব আতাউর রহমান খান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এইদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

উভয় দল নিম্নরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল :

ত্রিপুরা জেলা—তপন ; জহীর ও মন্টু ; কাসেম, ধন্নু ও বাচ্চু, আমান, গদাধর, আশরাফ (ক্যাপ্টেন), মদন ও শাহ আলম।

বরিশাল জেলা—প্রফুল্ল ঘোষ ; হাবিব ও গজনবী ; আমু, খালেক ও আলতাফ ; সানাউল্লা কবীর (ক্যাপ্টেন), প্যাট্রিক ও পল্টু।

রেফারী—মাসুদুর রহমান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বরিশাল ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ মারীকে তাহাদের পক্ষে খেলিতে অনুমতি না দেওয়ায় তাহারা সারাক্ষণ দশজনে খেলে।

পাক ক্রিকেট টীমের ভারত সফর—পাকিস্তান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের একজিকিউটিভ কমিটি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, পাকিস্তান ১৯৬০-৬১ সালে একটি প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট টীম সরকারীভাবে ভারত সফরে প্রেরণ করিবে। জনাব এন, এম, খান কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড গত মার্চ্চ মাসে যে আমন্ত্রণ জানায়, তাহার জওয়াবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কমিটী চলতি বছরের শেষ দিকে অষ্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্তান সফরকালীন চারিটি ম্যাচ খেলারও অনুমোদন করে।

টেষ্ট ম্যাচের সংখ্যা উহার স্থায়িত্ব ও স্থান সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের বোর্ডদ্বয়ের মধ্যে আরও আলোচনা চলিতেছে। অষ্ট্রেলীয় দল আগামী নবেম্বর মাসে পাকিস্তান সফরে করিবে। তাহারা ঢাকা, লাহোর ও করাচীতে পাঁচদিন ব্যাপী ৩টী টেষ্ট ম্যাচ ও রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেণ্ট একাদশের বিরুদ্ধে ৩ দিবসব্যাপী একটী ম্যাচ খেলিবে। ১৩ই নবেম্বর ঢাকায় তাহাদের প্রথম টেষ্ট শুরু হইবে। ২০শে নবেম্বর লাহোরে দ্বিতীয় টেষ্ট ও ৪ঠা ডিসেম্বর করাচীতে তৃতীয় টেষ্ট শুরু হইবে।

অষ্ট্রেলীয় দলের সফর সূচী নিম্নরূপ হইবে :—

ঢাকায় প্রথম টেষ্ট—১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই নবেম্বর। ১৬ই নবেম্বর বিশ্রাম।

লাহোরে দ্বিতীয় টেষ্ট—২০শে, ২১শে, ২২শে, ২৪শে ও ২৫শে নবেম্বর। ২৩শে নবেম্বর বিশ্রাম।

রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেণ্ট একাদশের সহিত ম্যাচ—২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে নবেম্বর।

করাচীতে তৃতীয় টেষ্ট—৪ঠা, ৫ই, ৬ই, ৮ই, ও ৯ই ডিসেম্বর। ৭ই ডিসেম্বর বিশ্রাম দিবস।

ওয়াকেফহাল মহল এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, ঢাকা ও করাচীতে টার্ফ উইকেটে খেলার সম্ভাবনা আছে।

স্পোর্টস ফেডারেশনের ১ লক্ষ টাকা সাহায্য লাভ—পাকিস্তানে খেলাধূলার সম্প্রসারণ ও উহার উন্নতির জন্য পাকিস্তান স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ চার লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মনজুর করিয়াছেন। এই সভায় কেন্দ্রীয় প্রচার ও বেতার সচিব জনাব হাবিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। পাকিস্তান অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সঙ্গে অনুমোদিত সকল ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানের কোচিং পরিকল্পনার জন্য ১ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাছাড়া খাওয়া ও থাকার জন্য আরও ৫ হাজার টাকা মনজুর করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থের মধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে ৫০ হাজার, পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনকে ৩০ হাজার টাকা, পাকিস্তান হকি এসোসিয়েশনকে ৫০ হাজার টাকা, পাকিস্তান টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনকে ১ হাজার টাকা, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডকে ২৫ হাজার টাকা, ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনকে ১ লক্ষ টাকা এবং পাকিস্তান ফিজিক্যাল, কালচার এণ্ড রেষ্টলিং এসোসিয়েশনকে ১০ হাজার টাকা মনজুর করা হইয়াছে।

ক্যাপ্রি-নেপলস্ সাঁতারে ব্রজেন দাসের ১৬তম স্থান লাভ—গত ২৬শে জুলাই ইতালীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক ক্যাপ্রি-নেপলস্ সাঁতার প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর লাসলো কোভাক বিজয়ী হয়। পাকিস্তান সহ ১৩টী দেশ হইতে ২৫ জন সাঁতারু ১৮ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ৩৮ বৎসর বয়স্ক হাঙ্গেরীয় সাঁতারু কোভাক তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রে ১০ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করেন। পাকিস্তানী সাঁতারু ব্রজেন দাস ১৬তম স্থান লাভ করেন। তিনি হাঙ্গেরীয় সাঁতারু কোভাকের ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড পরে তীরে উঠেন। কয়েকজন প্রতিযোগী সাঁতার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়েন।

সম্পাদকীয়

পাক বাংলার পরিভাষা

পাক-বাংলার পরিভাষা যে নূতনভাবে নির্দ্ধারিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, তা লইয়া দ্বিমতের অবকাশ নাই। আমরা এ-কাজে এখন পর্যন্ত যে সুষ্ঠু ভাবে মনোযোগ দিই নাই এবং দিতে পারি নাই, তাও সকলের জানা কথা। সুতরাং এ-ব্যাপারে আমাদিগকে সকল ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে হইবে। "বাংলা একাডেমী" এ-বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং একটি পুস্তিকাও প্রচার করিয়াছেন। আমরা এ-কাজের প্রতি সুধী সাহিত্যিক ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁরা তৎপর হইলেই এ-কাজটি সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

নীতি নির্দ্ধারণ

পাক-বাংলা ভাষার পরিভাষা নির্দ্ধারণের জন্য সর্ব্বাগ্রে কয়েকটি নীতি স্থির করিয়া লইতে হইবে। বাংলা ভাষা পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম বঙ্গে চালু রহিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার সাথে আমাদের জবানের সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে এখানে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং পাকিস্তানের ভাষা হিসাবেই তার সর্ব্বপ্রকার উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ভাষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত রাখার কথাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। পরিভাষা হিসাবে আমরা যখন নূতন শব্দের সন্ধান করিব, তখন এই কথাটি আমাদের বিশেষ ভাবে ইয়াদ রাখিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। ইংরাজী Chief Minister-এর বাংলা করা হয়, "উজীরে আলা", "প্রধান উজীর", "মুখ্য মন্ত্রী" প্রভৃতি। "মুখ্যমন্ত্রী" কথাটা পশ্চিম বাংলায় হালে ব্যবহার করা হইতেছে। তার ঢেউ এখানে আসিয়া লাগিয়াছে। তাই এখানে কেউ কেউ Chief Minister-এর বাংলা করিয়াছেন "মুখ্যমন্ত্রী"; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কথাটি দুর্ব্বোধ্য। মুখ্য কথার অর্থ জনসাধারণ জানে না। তারা "মুখ্য"কে 'মূর্খ' অর্থে গ্রহণ করিয়া অনেক সময় হাস্যাস্পদভাবে ভুল করিয়া থাকে। তারপর "মন্ত্রী" কথাটার অর্থ যিনি "মন্ত্রণা" দেন। কিন্তু "উজীর" কেবল মন্ত্রণা দেন না, তাঁর ভূমিকা আরো বড় এবং ব্যাপক। সুতরাং "মুখ্য", "মন্ত্রী" বা "মুখ্যমন্ত্রী" প্রভৃতি কোনটা ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা "উজীর" ও "উজীরে আলা" কথাটা ব্যবহার করি, তবে লাভ অনেক। প্রথমত "উজীর" ও "উজীরে আলা" কথাটা পাকিস্তানের সকলে যেমন বুঝে, তেমনই ইহা "Minister" ও "Chief Minister" কথাটার এরা সমার্থক। কিন্তু এখানে আরো একটা বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের দুই অংশের লোক এ-সবের অর্থ সমান ভাবে জানে বলিয়া এখানেও একটি ঐক্যের সূত্রবন্ধন রচিত হইতে পারে। এ-ধরণের যত বেশী শব্দ আমরা আমাদের পরিভাষায় গ্রহণ করিব, ততই মঙ্গল। এর শিক্ষাগত সুবিধার কথাও এখানে চিন্তা করার দরকার আছে।

শিক্ষাগত সুবিধা

লিখিত না হোক, অন্ততঃ কথ্য বাংলা ও উর্দ্দুর ভিতর একপ্রকার শব্দ যত বেশী থাকিবে ততই পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জানাজানি এবং ভাব বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হইবে। অনেক শিক্ষার্থী পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে যান এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে আসেন। তাঁদের শিক্ষার বিষয়-বস্তুতে উভয় অঞ্চলের জানা শব্দ বেশী থাকিলে সবলেরই সুবিধা। এ-কথা পাকিস্তানের ভ্রাম্যমান সরকারী কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলের জন্যই সত্য।

দুর্বোধ্য শব্দ ও আরবী-ফারসী

পরিভাষার জন্য যদি বাধ্য হইয়া দুর্বোধ্য শব্দ গ্রহণ

করতে হয়, তবে আমরা প্রথমে আরবী, ফারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি হইতে তা খুঁজিব। দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সেখানে বর্জন করার কারণ সুস্পষ্ট। কারণ, সংস্কৃত আমাদের ধর্ম্মের, ঐতিহ্যের বা তাহজীব-তমদ্দুনের জবান নয়। এর মাঝে অনেক সময় আমাদের ঐতিহ্যগত বিরোধ দেখা দেয়। সুতরাং পরিভাষার ভিতর জাতীয় ঐতিহ্য ও তাহজীব-তমদ্দুনকে যথাসাধ্য গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টাও আমাদের থাকা উচিত।

প্রচলিত শব্দের ব্যবহার

যে-সব শব্দ আজ সন্দেহাতীত ও সহজভাবে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে কায়েম হইয়া গিয়াছে, সে সব পরিভাষা হইতে বর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে। সে-সব শব্দ সংস্কৃত, হিন্দী, পালী, ইংরাজী বা যে কোনো ভাষার শব্দ হোক না কেন, সেগুলি বর্জন করার বুদ্ধি অশুভ বুদ্ধি।

অশুভ বুদ্ধি

দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে অশুভ বুদ্ধির খেলা নানা ভাবে বহুবার প্রকটিত হইতে দেখা গিয়াছে। একদল বিজাতীয় মোহ, বাহিরের প্রভাব এবং পরানুকরণের বদভ্যাস এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতীত গোলামীর দিনে অশুভ বুদ্ধি কোনো মহলে আমরা বার বার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখিয়াছি। জাতীয় ও আজাদীর দিনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিভাষা রচনার কাজটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জাতীয় জাগ্রত মানুষ যে এ-ব্যাপারে আজ ভুল করিবে না, সে-বিশ্বাস আমাদের আজ পুরাপুরিই আছে।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the 'Azad Press
Ramna, Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী

শ্রাবণ, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

ইসলামে জীবন ও মূল্যবোধ

ইব্রাহীম খাঁ

জীবন কি, এ-প্রশ্ন মানব সৃষ্টির আদিম প্রভাত হতেই তার মনের দুয়ারে আকুল আঘাত হেনে এসেছে। কত ওলী-দরবেশ, কত-ঋষি-দার্শনিক এ-প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় তলিয়ে গেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউই এ-যাবত এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের সন্ধান দিতে পারেন নাই। ওমর খাইয়ামের সেই যে অন্তর্ভেদী জিজ্ঞাসা:—

"কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝ?
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে, হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
যাত্রা পুনঃ কোন্ জগতে?"

এ-তাঁর একেলার কথা নয়। নির্জন মুহূর্তে নিজের পানে চেয়ে বিশ্ব মানবের আত্মার এ-অনিরুদ্ধ ক্রন্দন।

অজানাকে জানার আকাঙ্খা মানুষের অন্তর্প্রকৃতির চিরন্তন আকুতি। কাজেই জীবন জিজ্ঞাসায় বার বার ব্যর্থ হয়েও মানুষের মন পরাজয় মানে নাই, অনুসন্ধান হতে নিবৃত্ত হয় নাই। আর আসলে নিবৃত্ত হওয়ার উপায়ও তার নাই।

জীবন আমাদেরে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, এর দুঃখ-বেদনায় আমরা এমন গভীর ভাবে অধীর, এর আশা-আনন্দে আমরা এমন অনিবার্যরূপে মুগ্ধ যে, একে কোন রকমেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অন্য কথায়, জীবনকে আমরা ষোল আনা চিনি না, কখনো নিশ্চিত রূপে চিনতে পারব কিনা জানি না। তথাপি জীবনকে আমরা ছাড়তে পারি না। জীবনকে আমরা চাই, আকুল আগ্রহে কামনা করি।

তত্ত্বদর্শীর সুদূর প্রসারী দৃষ্টির দাবী না করে জীবন সম্বন্ধে সাধারণভাবে হয় তো বলা চলে: আনন্দ-উল্লাস আর দুঃখ-বেদনার মধুভরা ইহকালের এই যে অস্তিত্ব, এই-ই জীবন। জীবন জীবনের চেয়ে বেশী নয়, জীবনের কমও নয়। বড় করতে গিয়ে জীবনকে জনগণ হতে ছিন্ন করে নিয়ে গুহা-গীর্জা-মঠ-বাসী করার প্রয়োজন নাই; আবার 'আখের ফানা', 'আখের ফানা' বলে জীবনকে হেয় করে তোলারও দরকার নাই।

কিন্তু জীবনের এ-সহজ বর্ণনায় মানুষের চিত্ত তৃপ্তিলাভ করতে পারে নাই। একটা সুষ্ঠু সমাধানের আশায় সে গিয়েছে ধর্মবিদদের দরবারে।

ধর্ম-ব্যাখ্যাতাদের কেউ তাকে বলেছেন: 'জীবন পাপ—মহা পাপ, বার বার জন্ম নিয়ে এ-পাপ ক্ষয় করতে পারলে তবে জীবনের হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে। কবি হেমচন্দ্র জীবন-কারায় ব্যথিত হয়ে দুঃখ করে গেছেন।

আগে যদি জানিতাম
পৃথিবী এমন ধাম

তবে কি রে আসিতাম
এ আনায় মাঝারে ?

অন্য ধর্ম বেত্তাদের কেউ আবার বলেছেন : বাসনাই সমস্ত দুঃখের কারণ ; জীবন সেই বাসনার কারায় বন্দী। বার বার জন্ম নিয়ে এ-বাসনাকে ধ্বংস করতে পারলে তবে জীবনের হাত হতে রেহাই।'

জীবন সম্বন্ধে ইছলাম বলেছে আলাদা কথা। ইছলামের আল্লা মানুষের সৃষ্টি কালেই তার ভিতরে নিজ অন্তঃপ্রকৃতি অনুপ্রবেশ করে দিয়েছেন।

কাজেই মানুষ পাপের সন্তান নয়। সে কোন খোদায়ী অভিশাপের কলঙ্ক তিলক ললাটে নিয়ে এ-ধরায় আসেনা। তার অন্তঃপ্রকৃতি বাসনার কালিমায় অনুলিপ্ত নয়। তার মধ্যে নিহিত আছে স্বয়ং আল্লার বিশিষ্ট গুণ। অতএব, ইছলামে মানুষ সৃষ্টির শুরুতেই পেয়েছে এক বিপুল মর্যাদা।

কিন্তু ইছলামে জীবনের এই-ই শ্রেষ্ঠতম গৌরব নয়। তার জীবন অতঃপর এরও চেয়ে মহত্তর মহিমালোকে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আল্লা এ-জগতে তাকে নিজ খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছেন।

মানুষ পয়দার বহু কোটি বছরেরও আগে পয়দা হয় এ-জগত। নয়া জগত ধীরে ধীরে পুরানো হতে থাকে। অগণ্য প্রকার জীবন তার বুকে অঙ্কুরিত হয়ে বিকাশ লাভ শুরু করে। মানুষ সৃষ্টির অব্যবহিত আগে সে জীবদের মধ্যে আমরা যাদের বিশেষ পরিচয় পাই তারা হচ্ছে ফেরেস্তাদল। এরা আল্লার বিশ্বস্ত হুকুম বরদার ; তাঁর ইবাদত আর আদেশ পালন ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নাই। তাদের নিজেদের কোন স্বতন্ত্র আকাঙ্খাও নাই।

জীবনের ক্রম বিকাশের এই পর্যায়ে ব্যক্তিত্বহীন হুকুম বরদারদের পুরোভাগে রাখার ফলে বিবর্তন ধারার অগ্রগতি ক্রমে রুদ্ধ হয়ে এল। সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ল বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবের যাতে তারা নিজ প্রজ্ঞা বলে ইনিশিয়েটীভ নিয়ে জীবন পথে এগিয়ে যেতে পারে। সেই প্রয়োজনের তাকিদে আল্লা পয়দা করলেন মানুষ। ফেরেস্তারা আল্লার দরবারে সবিনয়ে নিবেদন করল : মাবুদ, তোমার ইবাদত আর হুকুম বরদারীর জন্য আমরাই তো আছি ; তবে আর এ ফেতনাবাজ নতুন জীবের পয়দা কেন ?'

আল্লা বল্লেন : 'আমি দুনিয়ায় আমার একজন খলীফা পয়দা করব।' অর্থাৎ বিবর্তনের উপস্থিত এ-স্তরে এমন একটি নতুন জীব সৃষ্টি করা হবে যে জীব কেবল উপরের আদেশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার নিজ জ্ঞান বুদ্ধির জোরে দুনিয়ায় উপযুক্ত রূপে আল্লার প্রতিনিধির কাজ করতে পারবে।

অন্য কথায় এ-বিশ্বে মানুষ জন্মঅপরাধী নয়, সে আল্লার মহিমান্বিত সহায়ক। সৃষ্টির বিকাশ বিধানে মানুষের এই সহযোগিতার গুরুত্ব বিষয়ে ভাবতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল সাফল্য-উল্লসিত মানুষকে দিয়ে আল্লার দরবারে বলিয়েছেন :

তব সৃষ্টির আঁধারের বুকে
দিয়েছি চেরাগ আনি,
তব সৃষ্টির কাদা হতে আমি
সৃজিয়াছি ফুলদানী।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিকদের অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টি স্রষ্টার লীলার বিলাস নয়, সৃষ্টি গভীর উদ্দেশ্যমূলক। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির ভিতরে জড়জীবের উভয় জগতে অহরহ পরীক্ষানিরীক্ষা চলে আসছে ; সেই এক্সপেরিমেন্ট সমূহের মাধ্যমে সৃষ্টি বিবর্তন পথে এগিয়ে চলেছে। সৃষ্টির এই অন্তহীন বিকাশধারাকে অব্যাহত রাখাই বিধাতার গূঢ় উদ্দেশ্য। এই বিকাশমান সৃষ্টির মারফত স্রষ্টা স্বয়ং আত্মোপলব্ধি করছেন।

স্রষ্টার এই পরম উদ্দেশ্যকে যদি আমরা স্বীকার করে নেই, তবে সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয় যে, এ-দুনিয়ায় স্রষ্টার খলীফা হিসাবে এই বিবর্তন ধারার দ্রুততর গতি অর্জনে একপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করাই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় কর্তব্য।

এই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে মানুষকে জীবনের বিভিন্ন মঞ্চে কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয় ; কিন্তু সেজন্য তার ভয়-ডরের কোন হেতু নাই, আল্লা সংগ্রামের মধ্যেই মানুষকে পয়দা করেছেন। ব্যথার সিন্ধু মন্থনেই ওঠে অমৃত। নিরবচ্ছিন্ন সুখের বেহেস্তে বাস করে আমাদের আদি পিতা কেবল আরামই করেছেন, সৃষ্টিমূলক কিছুতে হাত দেন নাই। সে আনন্দ-নিকেতন হতে বেরিয়ে এসে যখন তিনি ধরার ধূলায় নেমে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হলেন, তখনই শুরু হল তাঁর সৃষ্টি। সে দিন তাঁর ললাট নিঃসৃত স্বেদ সিঞ্চনে উষর ধরণী হয়ে উঠল পুষ্পিত, তার গাছে গাছে ঝঙ্কার তুল্ল কলকণ্ঠ বিহগ-বিহগী, আর তার ভরা মাঠে মৃদুল হাওয়ায় দোল খেতে লাগল সোনার শস্য।

এমনিভাবে এ-দুনিয়ায় আল্লার খলীফার কাজ শুরু হয়ে গেল।

এ-জগত হলো মানুষের কর্তব্য সাধনের এক বিপুল ক্ষেত্র। আর এখানেই তার জীবনের শেষ নয়। তার আসল জীবন কবরের সীমা পার হয়ে ওপার পর্যন্ত

বিস্তৃত। ইহজগতের এ-জীবন তার সমগ্র জীবনের একাংশ মাত্র।

এপারের কর্তব্য যথাসম্ভব সমাধা করে একদা তাকে মউতের দুয়ার দিয়ে সেই পরম জনের পানে মহাযাত্রা করতে হবে। সেখানে হবে তার নব জন্ম;—কি আকৃতিতে তা আমরা জানিনা, তবে নিশ্চয় কোন নতুন আকৃতিতে।

পরলোকেও আত্মার অগ্রগমন থাকবে অনিরুদ্ধ এবং স্তর হতে স্তরান্তরে আত্মা পরিভ্রমণ করবে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ইহকালে মানুষের কর্তব্য ও মৃত্যুর পর তার বাকী জীবনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোরাণের যা নির্দেশ, উপরোক্ত আলোচনায় তার আভাস দেওয়া হয়েছে।

ইহজীবনের কর্তব্য পালনের জন্য মানুষের উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মুছলমানকে দুনিয়ার বহু পুরাণ জিনিষের মূল্য নতুন করে নির্ধারণ করতে হয়েছে।

মৌলিক ও অত্যাজ্য প্রাথমিক অধিকার হিসাবে মুছলমানের জন্য চাই তার আজাদী—দেহের আজাদী, মনের আজাদী, আত্মার আজাদী।

ইছলামে প্রত্যেক মানুষ দেহের আজাদী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে জন্ম-গোলাম নয়, জন্ম-অপরাধী নয়। সমাজের তথাকথিত উচ্চ বর্ণ বিশেষের পদসেবা দ্বারা তাকে মুক্তি ভিক্ষা করতে হয় না। মানুষে মানুষে কোন অধিকারগত ভেদ নাই। শাদা-কালো, ধনী-গরীব, লম্বা খাটো—সকল দেশের সকল মানুষের মানুষের-মত বেঁচে থাকার সুযোগের অধিকার সমান। মূলতঃ বিশ্ব-মানব একই জাতির অন্তর্গত হিসাবে সৃষ্ট হয়েছিল।

আজিকার জাতিসংঘ মানবীয় অধিকারের যে মহান ঘোষণা করেছেন, ইছলাম প্রায় চৌদ্দ শ বছর আগে মানুষের আজাদী ও অধিকার সম্বন্ধে মূলতঃ সেই ঘোষণাই করেছে। মহা নবী (দঃ) বলেছেন: সকল মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদম মাটি দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ আদম সন্তানের বংশগত অহঙ্কারের কোন সঙ্গত অধিকার নাই। ইছলামের চোখে জাতিভেদ, ধর্ম ভেদের কোন দাম তো নাই-ই, উপরন্তু ওসব ভেদের দেওয়াল মনুষ্যত্বের বিকাশে মারাত্মক প্রতিবন্ধক।

সভ্যতা গর্বিত পাশ্চাত্যের কোন কোন স্থানে আজিও কালা-ধলার জীবনে তো এক পথে চলতেই পারে না, মরণেও তারা এক গোরস্তানে শু'তে পারে না। অধঃপতনের গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েও কোন মুছলমান জাতি তার দেশে মনুষ্যত্বের অমন অবমাননজনক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই।

অন্যান্য স্বাধীনতার মত রাষ্ট্রীক স্বাধীনতাও মানুষের জীবনের বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এ-জন্য ইছলামে রাষ্ট্রীক আজাদীর মূল্য অপরিসীম। অধীন দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাত-কাপড়, মান-ইজ্জত পাওয়া সম্ভব হলেও সে দেশ মুছলমানের কাম্য নয়। তার জীবনাদর্শের অবাধ অনুশীলন ও সম্যক বিকাশ সাধনের জন্য চাই মুক্ত স্বাধীনতার পরিবেশ; দেহের চাহিদা পূরণের চেয়ে আদর্শের চাহিদা পূরণের দাম বেশী। কাজেই যে দেশে নিজ ধর্ম ও কৃষ্টির আদর্শ মোতাবেক জীবন নিয়ন্ত্রণে মুছলমানের অবাধ অধিকারের অভাব, সে দেশ তার কাম্য নয়। ইছলামের পরিভাষায় এমন দেশকে বলা হয় দারুল হরব—সংগ্রামের দেশ। আর যে দেশে অমন অবাধ সুযোগ আছে তাকে বলা হয় দারুস ইছলাম। দারুল হরবে মুছলমানের সামনে দুটি কর্তব্য এসে দাঁড়ায়: জিহাদ ও হিজরত। অর্থাৎ হয় সে জিহাদ করে দারুল হরবকে দারুস ইছলামে পরিণত করবে, না হয় সে হিজরত করে কোন দারুল ইছলামে চলে যাবে।

ইছলামের আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ একটি মধ্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন: যে দেশ অমুছলমানের অধীন, অথচ যেখানে মুছলমানের জীবনাদর্শ অনুসরণের মোটামুটি সুযোগ আছে, সে দেশকে দারুল আমান—অর্থাৎ নিরাপদ দেশ বলা যেতে পারে। অসামর্থ স্থলে মন্দের ভাল হিসাবে মুছলমান দারুল আমানে বাস করতে পারে।

ইছলামে মনের আজাদী অপরিহার্য রকমে কাম্য। প্রকৃত পক্ষে ইছলামের আল্লা মনের আজাদী দিয়েই মানুষ পয়দা করেছেন। ফেরেস্তারা আল্লার হুকুম ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। মানুষ আল্লার হুকুম ছাড়াও কাজ করতে পারবে, এই জন্যই তো তাকে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা দিয়ে পয়দা করা হল।

মানুষ সাহসের সঙ্গে সে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করতে পারে কিনা, মনে হয় তারই পরীক্ষার জন্য আল্লা আদি মানুষকে একটা গাছের কাছে যেতে নিষেধ করলেন। তিনি নিষেধ করলেন বটে; কিন্তু নিষেধের কোন কারণ উল্লেখ করলেন না।

সে-গাছের ফল খেতে মানুষের আকাঙ্খা হল। মানুষ আল্লার নিষেধের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াই সাব্যস্ত করল।

আল্লা যে দুনিয়ায় আদমকে নিজ খলীফা নিযুক্ত করবেন, সে তো তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন। এতদিন সে নিযুক্তি মুলতবী ছিল। মনে হয় স্বাধীন যুক্তি মোতাবেক কাজ করে আল্লার পরীক্ষায় মানুষ উত্তীর্ণ হল। নিষেধ আসলে পরীক্ষামূলক হলেও তা অমান্য করায়, আল্লা প্রথমে আদমের উপর বিরক্তি প্রকাশ

করলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুশী হলে আদমকে উপদেশ দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

এই যে অমান্য করার সাহস, সামর্থ ও অধিকার, সৃষ্টির সমস্ত ইতিহাস বিবর্তনের এ-এক গুরুত্বপূর্ণ নব পর্যায় এবং মানুষের পক্ষে এ-এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

এ-অবাধ্যতায় যদি পাপ হয়, তবে মানুষের পক্ষে এ-পাপ না করে উপায় ছিল না।

বাংলার সুফী সাধক শা মাহমুদ ইব্রাহীম তাঁর 'দর মযহে মা'ছিয়াত' নামক গজলে এই কথাই বলেছেন:

পাপহীনতার রোগে
জর্জরিত আদম উদাসী
আখেরে লভিল মুক্তি
পাপের আরোগ্য-শালে আসি।

মানুষের এই পাপ-প্রবণতাকে রছুলুল্লা পরম ক্ষমাময় দরদের চোখে দেখেছেন। একদা এক আরব এসে তাঁকে বল্ল: ইয়া রছুলুল্লা, আমার উপায় কি? আমি যে কোন রকমেই পাপের পথ এড়িয়ে চলতে পারি না? দুঃখে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়।'

উত্তরে মহানবী স্নেহ-নম্র কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন: 'এ-জন্য আল্লার রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। আল্লা বরং এতেই খুশী যে বান্দা পাপ করবে আর সে-পাপের জন্য শরমেন্দা হয়ে তাঁর কাছে মাফ চাবে।'

ইছলামে ভয় হতে মনের আজাদী চাই। আল্লাহু আকবর—আল্লা সকলের চেয়ে বড়। অমন বড় থাকতে ছোটদের কাছে আনুগত্য কেন?

উছিকি গজবছে ডরো
গার ডরো তোম
উছি কে তলব মে মরো
যব মরো তোম।

আবার এত বড় যে আল্লা—মহান সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান—তাঁর কথা ভেবে মানুষের মন বা মুষড়ে পড়ে। তাই হাজারো বার তিনি ঘোষণা করেছেন—তিনি দয়াময়—তিনি রহমান—তিনি রহীম। সর্ব কাজের শুরুতে আমাদের যে আল্লার নাম নেওয়ার কথা, সে আল্লা ভয়ের আল্লা নয়, রহমতের আল্লা: বিছমিল্লা হির রহমানির-রহীম। আল্লা প্রলয়ের মালিক, আল্লা মহা শাস্তি দেওয়ার অধিকারী; কিন্তু এ-তাঁর সাময়িক রূপ, আসল রূপ নয়। আসলে তিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, দয়াময়।

তাই কোরানের যে-ছুরা আমরা সকলের আগে এবং রোজ সবচেয়ে বেশীবার পড়ি, তার আরম্ভে পাই: আলহামদু লিল্লাহি রাব্‌বিল আলামীন—আর-রহমান—আর-রহীম: আমরা সেই আল্লার মহিমা কীর্তন করি যিনি বিশ্বের পালনকর্তা—করুণার অপারসিন্ধু।

আগের জমানায় প্রকৃতিতে বিরাট, মহান বা প্রচণ্ড কিছু দেখলেই বহু মানুষ তাকে প্রভু গণ্যে পূজা করেছে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে ইছলামের মূল্য বোধ সম্পূর্ণ আলাদা-রকম। ইছলামের চোখে এরা কেউ পূজা পাওয়ার অধিকারী তো নয়ই, বরং এদেরে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের অধীন করে। মুছলমান নিজের মঙ্গলের জন্য এদেরে খাটিয়ে নেবে।

তাই ইকবাল তাঁর স্বধর্মীদেরে ডেকে বলেছেন:

চন্দ্র সূর্য তারকা
যা আছে নভে
তোমারই সেবায়
মোতায়েন কর সবে।

ধর্মসাধনের পথ সম্বন্ধে ইছলামের মূল্যবোধ তৎকালীন জগতে একান্ত অভিনব ছিল। কোন কোন ধর্ম সমাজের মুক্তি সন্ধানীরা অনশনে, অর্ধ-অনশনে তপস্যা করে করে নির্জন গুহার অন্ধকারে দেহত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ বরফ-ঢাকা পর্বতের নিদারুণ শীতের মধ্যে অনাবৃত দেহে দিন কাটিয়েছেন। কেউ কেউ আমরণ কুমার জীবন যাপন করে মোক্ষ পথের সন্ধান করেছেন।

অমন আত্ম পীড়নকে ইছলাম ধর্ম-সাধনের পথ বলে মনে করে না। ইছলামের বিধান: প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই ধর্ম: ইছলামের ফিতরতের দ্বীন। সুস্থদেহে থাকা, পেট ভরে খাওয়া, দাম্পত্য ধর্ম পালন—এ-সব প্রকৃতির সুসঙ্গত দাবী। ইছলাম এ-দাবীকে স্বীকার করে নিয়েছে। ইছলাম বলে: খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করোনা। ইছলাম আরো এগিয়ে গিয়েছে। কারণ মানুষ পেট ভরে খেয়ে যে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ইছলামের মতে সে নিশ্চয় তার ইবাদতের শামিল।

ইছলাম প্রাচীন কালের আভিজাত্য বোধকে অকল্যাণকর ঘোষণা করে নতুন আভিজাত্যের পত্তন করেছে। আজকের প্রগতিপন্থীদের অনেকে বলেন—বংশের আভিজাত্য, ঐশ্বর্যের আভিজাত্য—এ-সব বরদাশত করা চলে না; দুনিয়ায় স্থাপিত হওয়া দরকার বুদ্ধির আভিজাত্য। বংশ ও ঐশ্বর্যের আভিজাত্যকে যুক্তিতে অপাঙক্তেয় করে তাঁরা ভাল করেছেন। ইছলামও তাই করেছেন। বুদ্ধির আভিজাত্য এ-দুইয়ের চেয়ে ভাল।

কিন্তু যখন আমরা চোখের সামনে দেখি, দলে দলে বুদ্ধির দিকপাল লক্ষ কোটি নিঃস্বের স্বার্থকে অসংকোচে পদদলিত করে নিজ স্বার্থ সাধন করছেন, তখন কি মনে হয় না যে আখেরে বুদ্ধির আভিজাত্যও ফেল মেরে গেল?

বুদ্ধি নিঃসন্দেহে মহৎ সম্পদ; কিন্তু বিনা শর্তে নয়। ইছলাম বুদ্ধির আভিজাত্যকে গুরুত্ব দেয় নাই; বলেছে:

সেই মানুষ ইজ্জত সম্ভ্রমে বড়, যে-সৎকাজে বড়। এমনি ভাবে ইছলাম সৎকাজের আভিজাত্যের বুনিয়াদ পত্তন করেছে।

প্রত্যেক ধর্মেই আচার অনুষ্ঠান আছে। কোন কোন ধর্মের অনুসারীরা কালক্রমে ধর্মের তত্ত্বকথা ভুলে গিয়ে আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মশগুল হয়ে পড়ে। ফলে তাঁদের ধর্ম হয়ে পড়ে প্রাণহীন।

এমন ধর্মব্যবস্থাকে বড় মানুষের গোরস্তানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি কবর গাঁথনিতে পাকা, ভাস্কর্যে চমৎকার, চুণকামে নিখুঁত, গাত্রসংলগ্ন মার্বেল খণ্ডের উপর উৎকীর্ণ নানা কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনা। শুধু একটুখানি অভাব—ভিতরের দেহে প্রাণী নাই।

ইছলাম যাতে অমন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্য বসিত না হয়, সে জন্য প্রথমেই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। ধর্মের মর্মের উপর হামেশা নজর রাখার তাকিদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নামাজ ও কোরবানী সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

'কেবল মাথা পূব বা পশ্চিম পানে ফিরানের মধ্যে কোন ছওয়াব নাই' এবং 'আল্লার কাছে কোরবানীর রক্ত মাংস কিছুই পৌঁছেনা; তাঁর কাছে পৌঁছে কেবল তোমাদের পরহেজগারী।'

ইছলামে জীবনাদর্শ ও মূল্য-বাধ সম্বন্ধে উপরে যা বলা হয়েছে, তা ছাড়া নিঃসন্দেহ রকমে আরো অনেক কথা বলা যেতে পারে; কিন্তু সে চেষ্টা করতে আপাততঃ আর প্রবৃত্তি হয় না। এ-পর্যন্ত কেবলি বলে এলাম যে ইছলামের সবই ভাল, সবই আদর্শ; মানুষের জীবনের বিকাশ ও সুখ-শান্তি, সম্পদ বিধান ব্যাপারে ইছলাম বিধাতার আশীর্বাদ। সত্যই বলেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে একটা নিদারুণ প্রশ্ন উত্তরের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে? কোন ওজুহাতেই যে আর সে প্রশ্নের মুখ ধরে রাখা চলেনা?

নিদারুণ প্রশ্ন

ইছলাম যদি মানুষের পক্ষে এতই কল্যাণকর ধর্ম হয় বর্তমান জগতের মুছলিম শাসিত দেশগুলি সর্ব বিষয়ে এত পেছনে পড়ে কেন? ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালনে তো মুছলমানরা জগতের আর কোনো ধর্ম অনুসারীর পেছনে নয়? আমাদের মসজিদের সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে? জুম্মার নামাজের জন্য রাজপথ বন্ধ করে দাঁড়ানো তো বেড়েই চলেছে? মক্কায় হজযাত্রীর সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে? চাষ-আবাদ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে গরু কোরবানী তো বেড়েই চলেছে? মুহররমের মিছিল ও মাতম তো বেড়েই চলেছে? তথাপি মুছলমান এগিয়ে যেতে পাচ্ছে না কেন?

মহানবী বলেছেন: ইজতিহাদ কর—ইজতিহাদ কর। সে গবেষণায় সাফল্য লাভ করলে দুই ছওয়াব, সাফল্য লাভ না করলেও এক ছওয়াব। আমাদের মতে এ-গবেষণা কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়, অন্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এখন জিজ্ঞাস্য: ধর্মে এত উৎসাহের বাণী থাকতেও বিগত এক শ বছরের মধ্যে সমগ্র মুছলিম জগতে একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই কেন? উত্তর-দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে পাশ্চাত্যের এত দেশ হতে এত অভিযাত্রী দল হাওয়াই জাহাজ, পানির জাহাজ ভরে অভিযান করল, নতুন নতুন আবিষ্কারে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলল, কত উচ্চাকাঙ্খী যুবক কত সোনার স্বপন বুকে নিয়ে নিষ্করুণ বরফের চাদরতলে ঘুমিয়ে পড়ল, সে-সব অভিযাত্রীদলে একটি মুছলমানকেও দেখা যায় নাই কেন?

রছুলুল্লাহ্ বলেছেন—অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাই-ই জিহাদ-এ-আকবর। সে মহাপুরুষের স্মরণে আমরা এত মিলাদ মহ্ফিল করি, তাঁর তাওল্লাদ বর্ণনার সময় কেউ উঠে না দাঁড়ালে তার মাথা ভাঙতে চাই। তথাপি মুছলিম শাসিত দেশগুলিতে নিরক্ষরতা এত ভয়াবহরূপে বিরাজমান কেন?

কোরান বলে—চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রকে আল্লা মানুষের কল্যাণের জন্য তার অধীন করে দিয়েছেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, তাদেরে খাটিয়ে নেওয়ার জন্য রাশিয়া আর আমেরিকা মেতে উঠেছে, মুসলিম শাসিত কোন দেশ হতে একটা টুনী পক্ষীকেও মহাশূন্যের পথে এ-যাবত পাঠান হল না কেন?

মুছলিম শাসিত দেশগুলির এ-অধঃপতনের কারণ কি? কোন কোন অমুছলমান পণ্ডিত বলেন যে, ইছলামই এ অধঃপতনের কারণ। শুনে আমরা চটে লাল হই; কাছে পেলে মারতে চাই। অগত্যা সরোষে ঘোষণা করি, 'ওরা ইছলামের দুশমন, তাই অমন কথা বলে।' তারপর ধর্মের জোশে চিত্ত উদ্বেলিত করে বলি: 'আমরা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত কায়েম করলেই আমাদের প্রাথমিক যুগের সোনার দিন ফিরে আসবে।' কিন্তু এ-কথা কি ঠিক?

হ্যাঁ, কোন কোন জোশিদা-দিল মুছলমান খালেছ নিয়তেই বিশ্বাস করেন যে, আমরা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত কায়েম করলেই আমাদের সোনার দিন ফিরে আসবে। কিন্তু এ-কথা কি ঠিক? দেশের মুসল্লির সংখ্যা যদি বিশ গুণ বেড়ে যায়, রমজান মাসে হুজুরদের বাবুর্চীখানার দুয়ার যদি দিনে বন্ধ থাকে, বিনা ভাড়ায় সরকারী জাহাজ ছেড়ে দিয়ে হজ-যাত্রীর সংখ্যা যদি দশ গুণ

বাড়ানো চলে, জাকাত যাদের পক্ষে শরীয়তান দেয়, তাদের ছাড়া বাকীদের কাছ থেকেও যদি চৌকিদারী ট্যাক্সের মত জাকাত বাধ্যকরী দেয়রূপে সরকারী পর্যায়ে আদায় হয়, ঘর-বাড়ী বন্ধক রেখে যদি লোকে ঘরে ঘরে কোরবানী শুরু করে দেয়, তবেই কি মুছলিম দেশগুলিতে অগোণে সোনার দিন ফিরে আসবে?

না—না—না, যুক্তিতে তা কয় না, অভিজ্ঞতা তা সমর্থন করে না, ইতিহাস সে রায় দেয় না। আমরা কিছু কাল যাবত বরং দেখে আসছি, এ-দেশের যে অঞ্চলে নামাজ-রোজার প্রাবল্য, দারিদ্র্য সেখানেই বেশী এবং দারিদ্র্যের অন্যতম পরিণতি যে নৈতিক স্খলন, তাও সেখানে বেশী।

আর নামাজ-রোজার নামে আত্মপ্রবঞ্চনা নয়; এখন সাহস করে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দুশমনেরা বলেন, ইছলামই আমাদের অবনতির একমাত্র কারণ। তাঁরা নিঃসন্দেহ রকমে ভুল বলেন। তবে তাঁরা বলতে পারতেন যে, বর্তমানে আসল ইছলামের যে বিকৃত সংস্করণ মুছলমান সমাজে জারী আছে সেই ইছলাম মুছলমানের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

উপরে বলেছি, আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে অবুঝ নামাজ-রোজার সঙ্গে দারিদ্র্যজড়িত দেখা যায়। কথাটা খোলাসা করা দরকার।

দেশের শতকরা ৮৫ জন মানুষ নিরক্ষর। নামাজী বেনামাজীদের মধ্যেও নিরক্ষরদের অনুপাত মোটামুটি ঐ ই। নামাজীদের মধ্যে যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের অনেকে নামাজ-রোজাকেই মুছলিম জীবনের চরম, পরম ও একমাত্র কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন। খালেছ নিয়তেই বিশ্বাস করেন। নামাজ-রোজায় যাঁরা কম অভ্যস্ত তাঁরা মনে করেন: 'আমরা গুনাগার মানুষ, আল্লার রহমত মদদের উপর আমাদের তেমন দাবী নাই; কাজেই রুজী রোজগারের জন্য আমাদেরে প্রধানতঃ নিজ পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে। নিরক্ষর নামাজীদের অনেকে ভাবেন, খালেছ দিলেই ভাবেন যে এত ইবাদত বন্দেগীর বদলায় আল্লা কি তাঁদের পানে না চেয়ে পারবেন? অলক্ষ্যে তাঁদের চরিত্রে আত্মনির্ভরশীলতা শিথিল হয়ে আসে। এদিকে ইবাদত-বন্দেগীর সঙ্গে কর্মশক্তি যুক্ত না হওয়ায় তাঁরা ফাঁকিতে পড়ে যান। তখন তাঁরা নির্বিকার চিত্তে ছবর ইখতিয়ার করেন। ভাবেন, তাঁদের ঈমানে নিশ্চয় কোথাও খলল আছে, সেই খলল দুরস্ত করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে পান্তা-কর্করা খেয়ে কোন রকমে দিনপাত করা যাক। কোন দরদী তাঁদেরে জানিয়ে দেয় না যে, যাঁদেরে আল্লা ডেকে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদেরই কল্যাণের জন্য আসমান-জমিনের সমস্ত বস্তুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। আধপেটা পান্তা কর্করা খেয়ে ছবর ইখতিয়ার তাঁদের জন্য নয়।

আগের জমানার কোন কোন ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীরা দেহকে খাওয়ায় কষ্ট দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতেন। অমন ভাবে দেহের পীড়নকে ইছলাম অনুমোদন করে নাই; উল্টা ঘোষণা করেছে ইছলামে বৈরাগ্য নাই। কথাটাকে জোর দেওয়ার জন্য ফের আদেশের সুরে বলা হয়েছে: 'খাও, পান কর, অপচয় করো না।'

এতসব তাকিদ সত্ত্বেও সংসারে থেকেই না খেয়ে না খেয়ে যাঁরা সন্ন্যাসের ছবক এস্তেমাল করেন, তাঁরা আর যাই হোক, আদর্শ মুছলমান নন। পথে-ঘাটে কখনো কখনো দুই চারটি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মিলে। তাঁদের পানে চেয়ে মনে হয়, সংসারী সন্ন্যাসীদের চেয়ে এ-সংসারত্যাগীরা ভালই দুটো খেতে পায়।

এদেশে অবশ্য আধপেট খেয়ে থাকা বা দুই এক বেলা কিছুই না খেয়ে থাকা মুছল্লী মুত্তাকীদের একচেটিয়া অধিকার নয়। ইদানীং দেশের বেশীর ভাগ লোকই কোন কোন সময় অমন উপাস-কাপাস করে থাকে। কিন্তু মুছল্লী মুত্তাকীদেরে দেখে এরা ছবর ইখতিয়ারের যে ছবক পেয়েছে, তার ফলে এদের অনেকের বুকের তলে মহান অসন্তোষের পবিত্র আগুন মরে গেছে।

যদি আমাদের মুছল্লী-মুত্তাকী আলিম-ফাজিলরা যথাযোগ্য রোজগার করে নিজেরা ফারাগতী হালে চলতেন আর জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন যে, অন্যান্য কারণে তো বটেই, সুষ্ঠু ইছলামী জীবন-যাপনের জন্যও তোমাদেরে পেট ভরে খেতে হবে আর সেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য তোমাদেরে নতুন নতুন পথে অসুরের মত খাটতে হবে—তবে বর্তমানের এ-কঙ্কাল সংখ্যা অনেকটা কমে যেত।

যে কথা আলিম-উলামার বক্তব্য ছিল, সেই কথা এখন কমিউনিষ্টরা দরদের সঙ্গে ভুখা জনগণের কানে কানে কয়ে তাদের চিত্ত জয় করে নিচ্ছে।

আসল প্রসঙ্গের বাইরে গিয়েও একটা কথা এখানে স্পষ্ট বলে রাখা দরকার। কেউ মনে না করেন যে দেশের জনগণকে সুস্থ জীবন-যাপনের কথা বলার দায়িত্ব কেবল মুছল্লী-মুত্তাকী ও আলিম-ফাজিলদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদেরে আমি রেহাই দিচ্ছি।

তা নয়।

বাস্তবিক বর্তমানে সে দায়িত্ব প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষিতদেরই; কারণ ক্ষমতার পরিচালক মূলতঃ তাঁরাই। কিন্তু যেহেতু আমাদের এ-আলোচনা ইছলাম কেন্দ্রিক,

তাই ইছলামের অনুশীলনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, প্রধানতঃ তাদেরই কথা এখানে বলা হচ্ছে।

ইছলামে পুরোহিত প্রথা নাই। এখানে প্রত্যেক বুঝমান মুছলমানই মুবাল্লিগ। আশেপাশের লোকের মধ্যে ইছলাম কিভাবে চলছে সে-খবর নেওয়া নিঃসন্দেহ রকমে তার কর্তব্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা—

নায়েব-এ-নবী

তাঁদের পক্ষে রছুলুল্লার জীবনাদর্শের কথা বলতে গিয়ে কেবল তাঁর হেরা গুহার ধ্যান, মে'রাজ মোবারকের ভ্রমণ আর মছজিদ-এ-নবীর নামাজের বর্ণনা করলে চলবেনা, তাঁর সুমহান ও সুকঠোর কর্মজীবনের কথাও বলতে হবে। জঙ্গে-ওহোদে যখন কোরাইশ দুশমনরা মহানবীকে তাঁর ছাহাবীদের সহ দুনিয়ার পিঠ হতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন মহানবী নিঃসন্দেহ রকমে আল্লার মদদ চেয়েছেন—নিতান্ত আকুল কণ্ঠেই চেয়েছেন, কিন্তু তছবী হাতে মছল্লার উপর বসে নয়, তলোয়ার হাতে মুক্ত সমরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে।

আবার আমাদের বর্তমানকালের সেই মুছল্লী-স্বভাবীদের কথায় আসি।

এই ধর্মপ্রাণ সরল বিশ্বাসী মুছল্লী মুত্তাকারা দিনে-রাতে বহুবার উচ্চারণ করেন: 'সমস্ত প্রশংসা আল্লার, তিনি বিশ্বের পালনকর্তা, দয়াময়, কৃপাসিন্ধু।' এঁরা দিনে রাতে বহুবার মোনাজাত করেন। সে মোনাজাতে আল্লার কাছে কত রহমত, কত নিয়ামতই না চান; মোনাজাতে হাত উঠান তো আর নামাতে জানেন না। অথচ এত যারা বলেন, এত চীজ যারা চান, তাঁদের বেশীর ভাগে ঐখানেই থেমে যান, তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধনায় ব্রতী হন না। নামাজের মছল্লাই তাঁদের জীবন সংগ্রামের অঙ্গন থেকে যায়। এ'দের পানে চেয়ে

একটি ছাত্রের কথা

মনে পড়ে। সে ছিল নেহায়েত বা-আদব—ওস্তাদের খেদমতের জন্য হামেশা উন্মুখ। তার মুকাবিলায় আর কারো সাধ্য ছিল না ওস্তাদের ওজুর পানি এগিয়ে দেয়—ওস্তাদের উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রশংসা কীর্তনে সে ছিল মুখর। কেবল তার সামান্য একটু ত্রুটি ছিল—নিজ পড়ার বইয়ের কাছে ঘেঁসতনা। ভাবত, ওস্তাদের এত খেদমত আর খোশনাম করার পর তিনি প্রমোশন না দিয়ে পারেন? যখন দেখত যে তার প্রমোশন হল না, তখন সে ভাবত, নিশ্চয় ওস্তাদের প্রশংসা কীর্তনে তার কোন ত্রুটি হয়ে গেছে। সে নতুন উৎসাহের সঙ্গে ওস্তাদের প্রশংসা কীর্তনে লেগে যেত।

শুধু পূর্ব বা পশ্চিম পানে মুখ ফিরানের মধ্যে যে ফায়দা নাই, নামাজ-রোজার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে যে জীবনের অসাধ্য সাধনে ব্রতী হতে হয়, এ-কথা এঁদের বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে। কেবল নামাজে দাঁড়িয়ে 'ইহ্‌দিনাছ ছিরাতাল মুস্তাকিম' বলে বার বার আল্লার কাছে সিধা পথ দেখানের প্রার্থনা জানালে চলবে না, সিধা পথে কষ্ট করে নিজেদেরে হাঁটতে হবে।

এঁদের অনেকে ভুলে গেছেন যে, কোরবানীর রক্ত মাংস আল্লার কাছে পৌঁছায় না, তাঁর কাছে পৌঁছায় বান্দার পরহেজগারী—ধর্মপ্রাণতা। ভুলে গেছেন বলেই রাজধানীর ঢাকার বুকেও দেখা যায় প্রদর্শন বিলাসীরা হাজার, দেড় হাজার টাকায় এক একটা গাই কিনে, তার শিঙে তেল মাখে, তার গায়ে রং দেয়; তারপর সেই গাই নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সগর্বে মিছিল করে বেড়ায়, ভাবে, তাদের মত পাককা মুছলমান কে?

মুছলিম জাহানের এই যে শোচনীয় পতন, এর সব চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সে জাহানে মুক্ত বিচার বুদ্ধি নিয়ে জ্ঞান অনুশীলনের নিদারুণ দৈন্য। অথচ ইছলামের মুক্ত জ্ঞান বুদ্ধি দিবেন বলেই মানুষ পয়দা করেছিলেন; এই জ্ঞানের সামনেই ফেরেশতারা মাথা নত করেছিল এবং মানুষকে এই বিচার বুদ্ধি দেওয়ার পর তবে তাকে আল্লা এ-দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন।

ইছলামের অভ্যুদয়ের অল্পকাল পরই দেখতে পাই, সংস্কার বিবর্জিত মনে মুছলিম জ্ঞানান্বেষীরা নব নব তত্ত্ব সংগ্রহ ও গবেষণায় মেতে উঠেছেন। সে কালের সভ্যতার ইতিহাসে ইছলামের যে গৌরবময় স্থান, তা প্রধানতঃ এঁদেরই জন্য নয়। দেশ জয় চেঙ্গীজ খাঁও করেছিলেন।

তারপর ধর্মের ছদ্মবেশে নানা কুসংস্কার এসে ইছলামকে ঘিরে ধরল; লোক চক্ষে ইছলাম তার সত্য রূপ হারিয়ে ফেলল, তার প্রাণদায়িনী শক্তির উৎস ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠল।

ইরান, মিসর, তুরস্ক, ভারত—এ আমলে সর্বত্রই দেখতে পাই সংস্কার আড়ষ্ট পঙ্গুমনের নিস্ফল অভিনয়। যে তুরস্কের একটি হুঙ্কারে একদা সমগ্র য়ুরোপের হৃদয় দুরু দুরু কেঁপে উঠত, জ্ঞান চর্চার অভাবে কাল ক্রমে তার হাত হতে বিজয়ী তলোয়ার খসে পড়ল; আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে মাতোয়ারা নব য়ুরোপ অভিনব অস্ত্র ও যুদ্ধ কৌশল বলে অজেয় হয়ে উঠল। একটা ছোট্ট ঘটনা: তখন খৃষ্টান য়ুরোপ জ্ঞান সাধনার নব নব পন্থা অনুসরণে উন্মত্ত, নব নব সাহিত্য-দর্শনের গ্রন্থে তার কুতুবখানা ভর্তি, সেই সময় ইস্তাম্বুলে প্রথম ছাপাখানা আমদানী করলেন তৎকালীন স্বয়ং খলীফার দামাদ।

ফতোয়া জারী হল, সনাতন কলমী লেখাকে উৎখাত করার এ-এক শয়তানী ষড়যন্ত্র—এ বিলকুল বিদাত। সে ফতোয়া শুনে একদল জান-নিছারী সৈন্য খলীফার মঞ্জিলের অঙ্গনে প্রকাশ্য দিবালোকে সে দামাদকে হত্যা করল।

ভারতের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। ইউরোপ যখন নবীন জ্ঞানের নবীন শক্তিতে দুর্জয় হয়ে উঠেছে, তখন এখানকার বিলাসী বাদশারা জগজয়ী, জগৎপতি প্রভৃতি দম্ভপূর্ণ অসার উপাধি নিজেরাই নিজেদের উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্তে বোকার বেহেশ্‌তে বাস করেছেন। মোগল পাঠান আমলের দালান-ইমারতের যা কিছু এখনো কায়েম আছে, তার মধ্যে দেখতে পাই মসজিদ, কেল্লা, শাহী মনজিল, সমাধিসৌধ, কোথাও একটা অমন উল্লেখ-যোগ্য মাদ্রাসা, কুতুবখানা বা গবেষণাগারের দালান চোখে পড়ে না।

এই সেদিনও ভারতের মুসলমানেরা ফতোয়ার কবলে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার নিয়ামত হতে কয়েক যুগ পিছিয়ে গেল।

যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানানুশীলনের দুয়ার অবারিত খুলে দিতে হবে। মানুষের প্রতি আল্লার এ-শ্রেষ্ঠ দান। কোন অজুহাতেই মানুষকে এ-নিয়ামত হতে বঞ্চিত করা চলবে না।

পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম তরুণেরা ইছলাম থেকে ক্রমে দূরে—আরো দূরে সরে পড়ছে। যতই অপ্রিয় হোক, সমাজ, সরকার ও আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষে এ-সত্যকে অসংকোচে স্বীকার করতে হবে। খোঁজ করতে হবে, কেন এরা পড়েছে ?

আমি যতটুকু জানি

বলি। তরুণেরা ইছলাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আসলে এ-কথা সত্যি নয় ; আমরাই তরুণদেরে ইছলামের গণ্ডী থেকে ঠেলে বের করে দিচ্ছি।

ইতিহাস কয়—ইরান, সিরিয়া, মিসর, স্পেন—যেখানেই সেকালে মুছলিম বাহিনী গিয়ে হাজির হয়েছে, সেখানেই নিঃস্ব জনগণ মুছলিম বাহিনীকে কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো বা প্রত্যক্ষ ভাবে অভ্যর্থনা করেছে ও দলে দলে দ্বীন ইছলামে দাখিল হয়েছে ; কিন্তু কেন ? বিজেতারা খুব নামাজ পড়ে, সেই জন্য ? না। মুছলমানদের চেয়ে অনেক বেশী সময় ইবাদতে ব্যয় করে এমন জাতি তখন ছিল। তাদের চেয়ে অনেক কম সময় ইবাদতে ব্যয় করে, এমন জাতিও বিদ্যমান ছিল। বিজেতারা বড় বড় উট দুম্বা কোরবানী করে, সেই জন্য ? না। বিজেতারা মুয়াহিদ সেই জন্য ? তাও নয়। ইহুদীরা মুয়াহিদ ছিল।

তবে ?

বিজিতদের চিত্তে বিজেতাদের নামাজ রোজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ছায়াপাত নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু তারা বিজেতাদেরে অভ্যর্থনা করেছে ও তাদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে প্রধানতঃ এই জন্য যে, বিজেতারা হক বিচারী ও সাম্যবাদী, তারা এত কালের সাম্রাজ্যের রথের তলে নিষ্পেষিত জনগণকে সে পীড়ন থেকে আজাদী দিচ্ছে, তাদেরে ভাই বলে সম্বোধন করছে ; তাদের দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি ও আর্থিক মুক্তির ব্যবস্থা করছে।

বাস্তবিক তৎকালীন জগতে শোষক সম্প্রদায়গুলি ছাড়া মানব সমাজের বাকী অংশের যারাই ইছলামের সংস্পর্শে এসেছে, তারাই উপলব্ধি করেছে যে, তাদের জীবন সমস্যার সমাধানে ইছলাম বিধাতার আশীর্বাদ-স্বরূপ। কাজেই তারা নিজ জীবনের উৎকর্ষের অনিবার্য প্রয়োজনে সাগ্রহে ইছলাম গ্রহণ করেছে।

এ-জামানাতেও মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে মানব-সমাজের চোখে ইছলাম ততদিনই সত্যিকার শ্রদ্ধার বস্তু থাকবে যতদিন সে ধর্ম আমাদের বর্তমান জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাতে পারবে।

এই দিক দিয়ে আমাদের বিচার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, আমাদের নিজেদের বর্তমান জীবন-সমস্যা সমাধানে ইছলাম কতখানি কার্যকরী প্রমাণিত হচ্ছে।

আমাদের কয়েকটি সমস্যার কথা :

এদেশে আগে ইংরেজ শাসক ছিল, বুঝলাম, তারা খারাপ লোক ছিল। তাদের আওতায় থেকে দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালন করত হিন্দুরা। ধরে নেওয়া যাক, তারাও ভাল মানুষ ছিলনা। কিন্তু এই বিগত ১১ বছর যাবৎ পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা তো খাঁটি মুছলমানের হাতেই আছে ? তবে এ-শাসন কালের মধ্যে দেশের ধন দৌলত বাশিন্দাদের কতিপয়ের হাতে গিয়ে ভীড় করল কেন ? আর কেনই বা দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ দিনের পর দিন নিঃস্ব হতে নিঃস্বতর হয়ে পড়ছে ? শাসন ব্যাপারে এই-ই যদি ইছলামের বাস্তব রূপ হয়, তবে

গাহি সাম্যের গান

শুনে যাদের অন্তর দুর্নিবার প্রেরণায় নেচে ওঠে, এ হেন ইছলামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা অটল থাকবে কেন ?

শাসন ব্যবস্থায় ইছলামের এই বিকৃত রূপ দেখে ঘাবড়িয়ে গিয়ে তরুণেরা আশান্বিত চোখে চায় তাদের শ্রদ্ধেয় নেতাদের পানে—অন্ততঃ তাদের জীবনে ইছলাম রূপায়িত হয়েছে, এই আশায়। খোঁজ নিয়ে দেখে, নেতাদের মধ্যে যাঁরা প্রকাশ্যে ইছলামের নামে ঘন ঘন হাঁক ছাড়েন, তাঁদের বেশীর ভাগেই পর্দার আড়ালে গিয়ে

যা করেন, তা অকহনীয়। এর পর এঁদের ইছলামী জিকীরের উপর তরুণদের আর ভক্তি থাকেন'।

তরুণদের অন্ততঃ একটা মোটা অংশ ইছলামী জীবন যাপন করতে উৎসুক। তারা সে জন্য ইছলামকে জানতে চায়। যায় তারা মিলাদ মহফিলে। মিলাদ পড়া হয় আরবী-উর্দুতে, তারা কিছু বোঝেনা। মিলাদ খান যদি মেহেরবানী করে বাংলায় কিছু বলতে মুখ খোলেন তবে রুছুলুল্লার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে এক নম্বর দলীল হিসাবে বয়ান করেন যে মহানবীর মা হওয়ার সুযোগ না পেয়ে মক্কার তের শ আওরত মনের দুঃখে মরে গেল, আর দুই নম্বর দলীল হিসাবে বয়ান করেন যে বাল্যকালে আঁ হজরত যখন রোদের সময় পথে বের হতেন তখন মেঘেরা তাঁর উপর ছায়া করে সাথে সাথে চলত। তরুণেরা শুনতে যায় কোরান হাদীছের বাণী, মহাপুরুষের জীবন কথা, শোনে তারা বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কিচ্ছা। তারা ব্যর্থ মনে ফিরে আসে।

জুমার নামাজ পড়তে যায় তারা মছজিদে। আরবীতে খোতবা শোনে। কিছু বোঝেনা। জোর করে ভক্তি ধরে রেখে বসে থাকে। সে দিন যায়। দ্বিতীয় শুক্কুর বারে ফের মছজিদে চলে। এদিনও ঐ অবোধ্য আরবী খোতবা। এদিনও অনেক কষ্টে তারা ভক্তিকে ঠিক রাখে। তার পরের শুক্কুর বার ভক্তিকে আর তারা বেঁধে রাখতে পারে না। চোখে নেমে আসে ঝিমানী। ঝিমানী-ওয়ালা হয় তো হঠাৎ চমকে ওঠে, এদিক ওদিক চায়; দেখে বাকী মুছল্লীদেরো বেশীর ভাগই ঝিমাচ্ছে। তখন সে বড় জামাতের শরীক হিসাবে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমায় আর চমকে ওঠে, চমকে ওঠে আর ঝিমায়। এর পরের শুক্কুর বার দেখা যায়, তরুণদের অনেকেই আর মছজিদে ফিরে নাই। এটা

স্বাভাবিক।

শোনা যায় মদ-নিষেধক ওহী নাজিল হওয়ার আগে কেউ কেউ মদের আংশিক নেশা নিয়ে, কেউ বা ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে জামাতে নামাজ পড়তে আসত। তাদের সম্বন্ধে অতঃপর ওহী এল :

'হে মুমিনগণ, তোমরা (নামাজে) যা কিছু বল তা যে পর্যন্ত না বুঝতে পার সে পর্যন্ত কুয়াসাচ্ছন্ন মন নিয়ে নামাজে এসো না।'

ঘুম বা নেশার আবেশেও মন যখন কুয়াসাচ্ছন্ন, অর্থাৎ আংশিক অন্ধকারময় থাকে, তখন নামাজে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ নামাজে তারা নিজেরা যা বলবে, বা অন্যের বলা যা শুনবে, তার মানে তারা পষ্ট বুঝতে পারবে না। আমাদের মুছল্লীদের বেশীর ভাগের মন আরবী ভাষা বোঝন ব্যাপারে কেবল কুয়াসাচ্ছন্ন নয়, অমাবস্যার অন্ধকারে রীতিমত আচ্ছন্ন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে এ-খোতবা শুনে ফায়দা কি?

আরবী মহাগ্রন্থ কোরানের ভাষা, বিরাট একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন; এ-জন্য আরবী ভাষা আমাদের চিত্তের অঙ্গনে এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে বসে আছে। কিন্তু সে শ্রদ্ধারও একটা সঙ্গত সীমা থাকা আবশ্যক। যেখানে আরবীর সঙ্গে আরো তিনটি ভাষা সমান বুঝি ও বলতে পারি, সেখানে ইচ্ছা করলে আরবীকে প্রথম প্রায়োরিটী দেওয়া চলে; কিন্তু যেখানে আরবী কিছুই বুঝি না, সেখানেও সর্বক্ষেত্রে চুপ মেরে আরবী শুনতেই হবে, এর পক্ষে কোন যুক্তি আছে?

আমরা যতদূর জানি, কোরান নাজিল হওয়ার আগে আরবী ভাষায় কোন আছমানী কেতাব নাজিল হয় নাই। ইঞ্জিল নাজিল হয়েছিল হিব্রু ভাষায়। তৎকালে হিব্রুই আরব-ফিলিস্তীনে ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা বলে গণ্য ছিল। সেই অবস্থায় কোরান পাক আরবী ভাষায় কেন নাজিল হল, সে সম্বন্ধে কোরানের বানী :

'ইন্না আনজাল নাহু কোরআনান আরাবীয়াল লা আল্লা কুম তা' কিলুন' অর্থাৎ আমরা আরবী ভাষায় কোরান নাজিল করেছি এই জন্য যাতে তোমরা বুঝে জ্ঞান লাভ করতে পার।'

ভাষা বুঝে জ্ঞান লাভের জন্য কি তাগিদই না দেওয়া হয়েছে! অথচ...।

আমাদের মধ্যে আরবী ভাষা জানা লোকের সংখ্যা এত অল্প যে সংখ্যার দিক দিয়ে তাদের নগণ্য বলা চলে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে মোক্তাদীরা মছজিদে গিয়ে ইমামের মুখের ছুরা, খোতবা কিছুই বোঝে না। বোঝে না বলে ওর প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধাও বোধ করে না। তথাপি তারা ভাণ করে যে সব কথা তারা ভক্তির সঙ্গে শুনল। মোনাজাতের ভাষা তারা বোঝে না। কাজেই ইমাম বড় করে মোনাজাত উচ্চারণ করলেও তাদের লাভ নাই, মনে মনে বল্লেও কোন লাভ নাই। গরমের মৌছুমে মছজিদে ঠাসাঠাসি বসে মোক্তাদীরা যখন ইমামের সঙ্গে মোনাজাতে হাত তোলে, আর ইমাম তাঁর কেরামত বাড়ানের জন্য মোনাজাত দীর্ঘায়িত করে চলেন, তখন তারা মনের ধৈর্য হারায়, ইমামের বিচার বুদ্ধির নিন্দা করে; অবশেষে মোনাজাত শেষ হলে অপ্রসন্ন মনে চলে আসে; অথচ ভাণ করে—অজ্ঞাতসারেই ভাণ করে যে—অনেক ছওয়াব কামাই করে এল!

এমনি ভাবে অজ্ঞাতসারে হলেও কপটতা এসে অনেক মুছল্লীর চরিত্রে সংক্রমিত হয়। ফলে দৃঢ়চরিত্র লোকের সংখ্যা কমে যায়, দুর্বল-চরিত্র লোকের সংখ্যা বেড়ে চলে।

মনে হয় রছুলুল্লা (দঃ)'র পক্ষে যদি আজ এক মরতবা পূর্বপাকিস্তানে আসা সম্ভব হত, তা হলে নিশ্চয় তিনি আমাদের বলতেন: কোরআন-হাদীছ, ফিকা-ওছুল আর তোমাদের খোতবা মাতৃভাষায় তরজমা করে নাও—যাতে তা তোমরা বুঝে জ্ঞান লাভ করতে পার।'

উর্দু ভাষীরা অনেক কাল আগে থেকে তাঁদের মাতৃভাষায় ইছলাম সংক্রান্ত আলোচনা করে আসছেন। আর সেইজন্যই তাঁদের মধ্যে বহু প্রখ্যাতনামা আলিমের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। বাংলা দেশে যারা মাদ্রাসায় পড়েন, তাঁদের বেশীর ভাগেই আরবী ভাষায় কঠিন আবরণ ভেদ করে পঠনীয় বিষয়বস্তুর মর্মাংশে ঠিক মত গিয়ে পৌঁছতে পারেন না। যাঁরা অসুবিধার মধ্যেও কিছু শিখেন, তাঁদের বেশীর ভাগেই আবার মাতৃভাষায় অধিকারের দৈন্যের জন্য তা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে বলতে পারেন না।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস বাংলা দেশে বাংলা ভাষা মারফত ইছলামী শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে এ-দেশে ইছলামকে কায়েম রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না।

প্রতিকারের একটা পথ আমাদের মনে আসে। দেশের সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে আগাগোড়া শিক্ষাদান ব্যবস্থা করুন। অথবা সমস্ত মাদ্রাছা ও ইস্কুলকে ঢেলে এক পর্যায়ে আনুন ও সে-সব পর্যায়ের বিদ্যালয় ও কলেজের সর্বত্র বাংলার মারফত ইছলামী শিক্ষার একটি কোর্স রাখুন। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের একটি মাদ্রাসা রাখুন। সে মাদ্রাছায় শিক্ষাদানের মাধ্যম করুন বাংলা ও আরবী। হাইকোর্ট, জিলা কোর্টের জজদের মতো অতি উঁচু বেতনে শায়খুল হিন্দ, মওলানা মাহমুদুল হোছেন, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাক্তার মুহম্মদ ইকবালের মত মানুষকে সেখানে শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজে নিয়োগ করা হবে। তাঁরা নিজেরা গবেষণা করবেন, ছাত্রদের দিয়ে গবেষণা করাবেন এবং বহির্জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মসম্পর্কে যত ভাল বই প্রকাশিত হচ্ছে, যথাসম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করবেন। তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হবে, বাংলা ভাষায় কোরান হাদীছ, কিংবা ওছুল সম্বন্ধে যত মৌলিক ও তরজমা বই লিখিত হবে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখবেন যে ওসব ঠিক মত লিখিত হয়েছে কিনা।

শেষ কথা

জগতের সামনে ইছলামকে তার সত্য সনাতনরূপে তুলে ধরতে চাইলে কেবল মুখে ইছলামের প্রশংসা করলে চলবেনা; তার অতীতের ইতিহাস হতে কেবল তার গৌরবের কাহিনী উপস্থাপিত করলেও যথেষ্ট হবে না। ইছলাম যে আজো মহা মানবের জীবন সমস্যা সমাধান ব্যাপারে নিয়ামত, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সে ধর্মের বাস্তব রূপায়ন দ্বারা তা সপ্রমাণ করতে হবে।
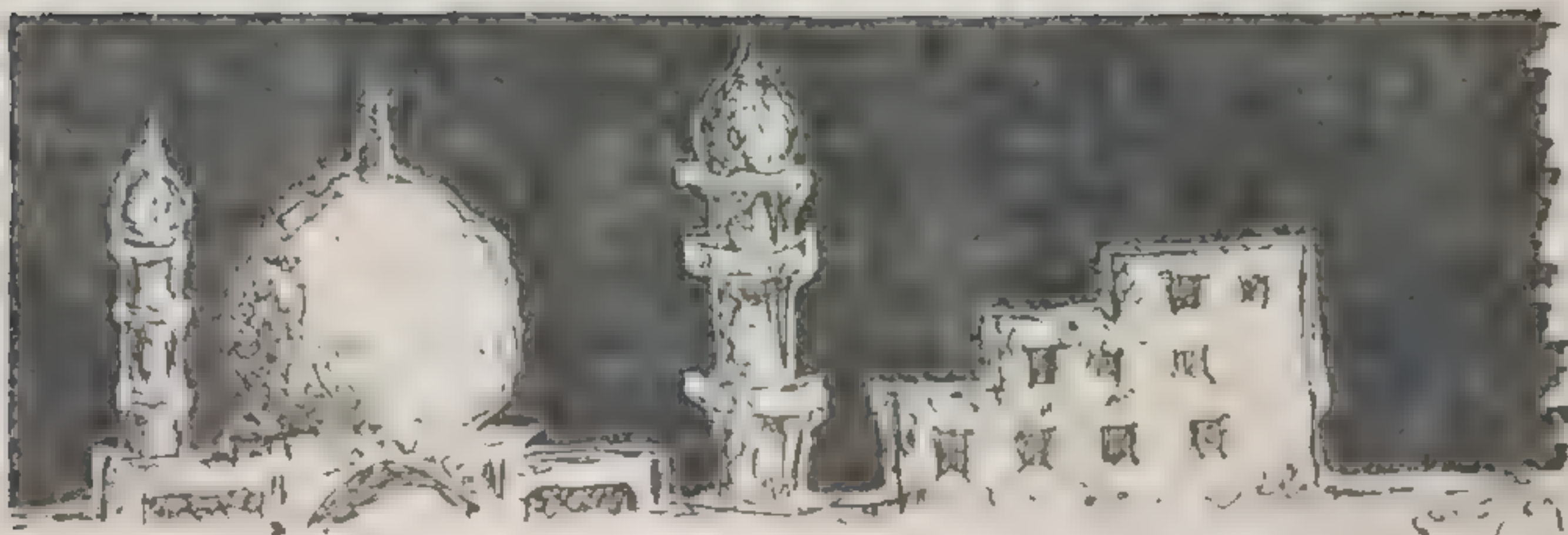
মেজ-কুরসী

মফিজ উদ্দিন আহ্‌মদ

আধ-ঘাটায় সাইকেল বাষ্ট আর নতুন উকিলের মামলায় হার, দু'য়ের অর্থ একই। তখন সাইকেলটি যেমন আর বাহন থাকে না, উকালতি পেশাটিও তেমন থাকে না অবলম্বন। দুটিই হয় বোঝা।

তসর আলি উকিল পেপার-বোঝা বয়ে চলেছেন গত পাঁচ বছর ধরে। নামকরা একটা মামলাতেও জিততে পারেন নাই তিনি। ফলে শ্বশুরের টাকায় ভাড়া করা বাড়ীর বৈঠকখানাটি শুরুতে যেমন বিরাণ ছিল, এখনও তেমনি আছে। মামলাবাজ মক্কেলরা তাকে দেখেই দূরে সরে যায়—যেন ভূত দেখেছে। ফলে অর্থাভাবের চাপ ও বিবির মুখখিস্তি সবই তাকে হজম করতে হয় নীরবে।

তবুও হাল ছাড়েন নাই তিনি। খশুর নাম ভরসা করে রোজ সকাল সকাল কাপড় জামা পরেন, উকালতী গাউন চড়ান; দু'চারখানা নথিপত্র নিজেই হাতে তুলে নেন এবং যথাবিধি পায়ে হেঁটে আদালতে হাজির হন।

তাঁর হাতে নথিপত্র দেখে কেউ যদি ভদ্রতার খাতিরেও জিজ্ঞেস করেন, 'উকিল সায়েবের মহুরী কোথায়—নিজের হাতেই নথিপত্র যে!'

তার জবাবে তিনি মহুরী না থাকার সত্যতা স্বীকার করেন না—মিথ্যা করে বলেন, 'বেচারার স্ত্রীর বড্ড অসুখ, ছুটি নিয়েছে।'

কিন্তু বিকাল বেলা বাড়ী ফিরে এলে বিবি আর ছাড়েন না। বলেন, 'এমনধারা উকিল হয়ে তোমার লাভ কি শুনি? তার চেয়ে কারো মহুরী হলেও তো দু'দশ টাকা পেতে প্রতিদিন?'

তা শুনে মনে মনে রেগে যান তসর আলি উকিল, বলেন, 'উকিলদের পয়লা জীবন অমনিই হয়। তারপর যখন একবার কপাল খোলে তখন রাতারাতি লালে লাল। কতদিনই তো বললাম কথাটা অথচ···না, তোমার এ-সব কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না,' মুখে বললেও তা' সয়ে এসেছেন গত পাঁচ বছর ধরে। প্রতি বারই আশ্বাস দিয়েছেন, 'খুলবে, একবার কপাল খুলবে।'

বিবি জানেন, ও আশ্বাস আশ্বাসই—কাজ হতে দেখা যায় নাই কোনদিন। তাই তিনি সে কথায় কান না দিয়েই চলে গেলেন। তা লক্ষ্য করে উকিল সায়েবের উষ্মা যেন ফেনিয়ে উঠলো। আপন মনেই গালাগাল শুরু করলেন দেশের মানুষদের উদ্দেশ্যে, 'এই সেদিন পর্যন্ত দেখলাম—কালো বাজারী, চোরা কারবারী, চুরি, ডাকাতী, নারীহরণ, ধর্ষণ আর খুনখারাবীতে সারা দেশ গুলজার। আজ সব বেটাই যেন রাতারাতি তওবা করে দরবেশ বনেছে।'

আপন মনে বকতে বকতে ভুলেই যান যে, গত পাঁচ বছরে যতগুলি মামলায় উকালতী করেছেন তার সব-গুলিতেই হেরে গেছেন তিনি।

বৈঠকখানার সামনের দুই দেয়ালের গা ঘেসে রাখা দু'টি বেঞ্চি। আগত মক্কেলরা বসবে তাতে—এই আশায় রাখা হয়েছিলো পাঁচ বছর আগে। এখন তাতে ছাগল, বিড়াল ঘুমায়। মাঝখানে ছোট্ট টেবিল, একটি চেয়ার। পাশে একটি অমসৃণ আলমিরা; তাতে দু'চারখানা আইনের বই। পুরানো ডায়েরী। ব্যবহার কম বলে তার উপর ধূলোর আস্তর স্পষ্টই নজরে পড়ে। রোজ সকাল বেলা উকিল সায়েব টেবিলটি সামনে করে, পুরনো ময়লাযুক্ত চেয়ারটি ঝাড়পোছ করে বসেন এবং চলতি ডায়েরীটি অনাহুতভাবে নাড়াচাড়া করে ব্যস্ততার অভিনয় করেন। মাঝে মাঝে সামনের ইঁটখসা রাস্তার দিকে চেয়ে দেখেন, কেউ দিক পরিবর্তন করে এদিকে আসছে কিনা। এই তার প্রাত্যহিক প্রতীক্ষা। কারো চাঁদমুখ দেখা যায় না সচরাচর। বিরক্তিতে তার মন ভরে ওঠে।

সেদিন তিনি তেমনি প্রতীক্ষারত। দূর থেকে আওয়াজ এলো—'মেজ-কুরসী, খরিদ, বিক্রি, ভাড়া, বদল। মেজ কুরসী,...

এ-হাঁক প্রায়ই শুনেন তিনি। তবুও বিচিত্র লাগে তার। আবার কান পাতেন। হৃৎকম্প কম্পিত বিচিত্রতর আওয়াজে পুনরুক্ত হতে থাকে একই কথা, 'মেজ-কুরসী—

অমন হাঁক দেওয়া মানুষের কাছ থেকে তিনি প্রায়ই দুধ, ডিম, মাছ, তরিতরকারী কেনেন। কিন্তু মেজ-কুরসী কেনেন নাই কোন দিন। লোকটি গাড়ী ঠেলে বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই উকিল সায়েব বারান্দায় এসে ডাক দিলেন—'এই মিঞা শোনো?'

চেয়ার, টেবিল, টিপয়, মিটসেফ বোঝাই ঠেলাগাড়ীটা খটর খটর করতে করতে বারান্দার সামনে এসে থেমে গেলো।

উকিল সায়েব এগিয়ে গেলেন। তার ইশারার সাথে সাথে ঠেলাওয়ালা তাকে দেখাতে লাগলো কখনো মিটসেফ কখনো বা কুরসী।

উকিল বিবি অন্দরবাসিনী হলেও ব্যাপারটি তার চোখ এড়ালো না। তিনি জানালার পেছনে দাঁড়িয়ে

বল্‌লেন—'উকিল সায়েব টাকার গরম বুঝি সামলাতে পারছেন না ?'

কথাটি কানে যেতেই উকিল সায়েব যেন তার পিঠে ঝাঁটার বাড়ির ব্যথাবোধ করলেন। পীর-দরবেশের দোয়া-তাবিজ থেকে আরম্ভ করে কত রকম চেষ্টাই তো তিনি করলেন অথচ পেশাটা জমলো না। পসার হলো না, এলো না দু'দশটা টাকা হাতে। তাই স্ত্রীর মুখ চেয়ে থাকতে হয় তার। বিবির কথার কোন উত্তর না দিয়ে তিনি ঠেলাওয়ালাকে বল্‌লেন—'আজকের মত থাক্ হে। তুমি না হয় আর একদিন এসো।'

'টাকার গরম' কথাটা শুনেছিলো ঠেলাওয়ালা। সে উৎসাহিত হয়ে বল্‌লো, যা পছন্দ হয় নামিয়ে রাখেন স্যার। দরভাও, লেনদেন না হয় দু'দিন পরেই হবে। আমি তো শুধু কেনা বেচা করি না—ভাড়াও দেই, বদলও করি। না হয় কিছু ভাঙ্গাটুটাই দেবেন।

পুরানো নড়বড়ে টেবিল চেয়ারে বসতে আর মন সর-ছিলো না তার। তাই চেয়েছিলেন যদি হেরফের কিছু করা যায়। কিন্তু জানালার ফাঁকে বিবির দুই জ্বলন্ত চোখের উপর দৃষ্টি পড়ায় দ্বিতীয়বার আর বাক্য উচ্চারণে সাহস হলো না। তিনি ফিরে এসে সেই পুরানো চেয়ারেই বসলেন। ওদিকে ঠেলাওয়ালা বার দুয়েক ফিরে চেয়ে গাড়ী ঠেলে নিয়ে রাস্তায় উঠে গেলো। আবার তার হাঁক শুনা গেলো—'মেজ-কুরসী।'

পরদিন সকাল বেলা বৈঠকখানায় বসে নিজের অকৃত-কার্যতার কথাই ভাবছিলেন উকিল সায়েব। দেশে কত কিছুর পরিবর্তন হলো,—কত অপুচ্ছি জিনিসের কদর হলো আগুন বরাবর অথচ তার উকালতীর পসার হলো না! এমন সময় কে একজন ঘরে ঢুকে সালাম জানালো তাকে। তার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেলো। মুখ তুলে চাইলেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, কালকের সে ঠেলাওয়ালা নয় তো ? জিনিসপত্র দেখ্‌তে গিয়ে ভাল করে তার মুখটাও দেখা হয় নাই কাল। সালামের উত্তর দিয়ে বল্‌লেন—'কি চাই ?'

—'আমার একটা মামলা আছে উকিল সায়েব।' লোকটি জবাব দিলো।

শুকনো বুকে পানি এলো উকিল সায়েবের। হেসে বল্‌লেন—'আচ্ছা, বস ঐ বেঞ্চিটাতে। আমার আবার বড্ড ব্যস্ততা।'

লোকটি বসলো। উকিল সায়েব অনাহুত ডায়েরীটা নাড়াচাড়া করে কয়েক মুহূর্ত কাটালেন। তারপর বন্ধ করে রেখে বল্‌লেন—'বেশ, এবার বলো শুনি তোমার ব্যাপারটা কি ?'

মক্কেলটি গলা বাড়ালো। বল্‌লো—'আমি ব্যবসায়ী মানুষ। ঢাকা-কলকাতা কারবার করি। তাতে অবশ্য একটু-আধটু এদিক ওদিক করতেই হয়। কিন্তু তার জন্য কৃপণতা করি নাই কোনদিনই। একদিন একটু লেন-দেনের উনিশ-বিশ হওয়ায় সিভিল সাপ্লাই-সায়েব আমার উপর বেলেক মার্কেটের মামলা করলেন। বরাবর তাকে পকেট ভরে টাকা দিয়ে এসেছি—আর একটা দিন একটু পানেচুন হতেই সায়েব একটা নম্বর চাপালেন আমার ঘাড়ে। মামলাটা আপোষ করার চেষ্টা করছিলেন হায়দার উকিল কিন্তু সায়েব নারাজ। একটা কেস না দেখালে নাকি সায়েবের প্রমোশন আটকে যায়। তাহলে আমিই বা ছাড়ব কেনো ? এতদিন আমার টাকা খেয়ে আমারই ঘাড়ে পা দিয়ে সায়েব নেবেন প্রমোশন ? আমি তা হতে দেব না। রেশওয়াতের মামলা করব তার উপর। অবশ্য সায়েব ভয় পেয়ে যদি মামলাটা আপোষ করে তাহলে আমার আপত্তি নাই।

—ঠিক বলেছ, তুমিই বা ছাড়বে কেন ? এক নম্বর দেখিয়ে দাও। উকিল সায়েব উৎসাহ দেন মক্কেলকে। ভয় তো সে পাবেই। চাই কি—যদি তিনটে পাকা-সাক্ষী দিতে পার তাহলে সে হেরেও যাবে। মনে মনে বলেন—যা' হোক তবুও বেটা মান রেখেছে।'

—তা তো সত্যি। কিন্তু আসল কথা হলো—'হার জিত আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে—সায়েবকে ভয় দেখিয়ে ঐ মামলাটা আপোষ করা। কাজেই একটা কথা আপনাকে আগেই বলে রাখ্‌তে চাই।' মক্কেল শর্ত আরোপ করে।

—'বলো।' মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন উকিল সায়েব।

—টাকা-পয়সা বেশী দিতে পারবো না। আরজীর টাকা ছাড়া ফি তারিখে পাঁচ টাকা করে পাবেন। দেখেন যদি পারেন। তবে সায়েবকে আমি ছাড়বো না।' মক্কেল বজ্র আঁটুনী দিয়ে ফস্‌কে যেতে চায়।

—'সেকি আর একটা কথার মতো কথা হলো ? পাঁচ টাকা কি কখনো উকিলের ফি হয় ? দশ জনে যা দেয় তুমি মোটের উপর তা থেকে কম দিও। তা ছাড়া মামলায় জিতে গেলে উকিলদের তো একটা বিরাট প'শুনা দাঁড়ায়। ভয় করলে চল্‌বে কেন ? সায়েবকে শিক্ষা দিতে হলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

মক্কেলটিও ঝানু ব্যবসায়ী। সে বলে, 'না সায়েব, হাত আড়াল দিয়ে কানকথা নয়। মামলা চলা কালে ঐ পাবেন। তবে জিতলে একটা ভাল জিনিস আপনাকে দেব ; আপনি যা চান!

উকিল সায়েবের মুখে চট করে কোন কথা সরে না। মনে মনে ভাবেন, 'এমনিতেই মক্কেলরা তাকে দেখে

না ভূত দেখে। তবুও যখন হায়দার উকিলের মক্কেল আমার কাছে এসেছে—তখন তাকে ছাড়া যায় কি করে?' মক্কেলের কথা না শুনার ভান করে তিনি নীরবে কাগজ কলম নাড়তে থাকেন।

তার নীরবতার সুযোগটা ব্যবহার করে মক্কেলটি। বলে, 'আপনি যা চান তাই পাবেন। দেখছেন তো চোখের উপরেই—হায়দার উকিল আজকাল কত বড় ডাকসাইটে হয়ে উঠেছে! সে আমার এক উপহারেরই ফল; তার চার পাশে এখন মক্কেলের হাট।'

—কোন্ মামলাটার কথা বলছ?' উকিল সায়েব কৌতুহলী হয়ে উঠেন।

—আপনি জানেন না বুঝি?' মক্কেলটি প্রশ্ন করে। 'সরকারী গুদামে ছিল কয়েক হাজার মণ চাউল। দেশে দুর্ভিক্ষ। গুদামবাবুর সাথে যুক্তি করে আমরা তা বিক্রি করে দিলাম বেলেকে। গুদাম খালি দেখে সরকার গুদামবাবুর খেলাফে করলো মামলা। আমার পক্ষের উকিল ছিল হায়দর সাহেব। আমাদের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে যারা টাকার হিস্যা কম পেয়েছিলো তারা হলো সরকারী সাক্ষী। বেঁচে আসার কোন উপায়ই ছিলো না। অনেক ভেবেচিন্তে হায়দার উকিল জিজ্ঞেস করলেন, 'গুদামটা কি পাকা?'

বললাম, 'পাকা।'

—দরজা বন্ধ করলে ঘরে যাবার আর কোন পথ থাকে?

—না।

—কোন ছিদ্র-ছাদ্রা? এই ধরো পোকা, মাকড়, ইঁদুর ঢোকার মত?

—বোধহয় তাও নাই।

—খুঁজে দেখ, একটা ইঁদুর ঢোকার মত ছিদ্রও বার করতে পার কিনা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেলো। পানি বার করে দেওয়ার মত সামান্য একটি ছিদ্রপথ—দেয়ালের তল দিয়ে বাইরে চলে এসেছে। একটা ইঁদুর তা দিয়ে সহজেই ভেতরে ঢুকতে পারে।

হায়দার উকিল আদালতে যুক্তি পেশ করলেন, যেখান দিয়ে একটা ইঁদুর ঢুকতে পারে সেখান দিয়ে হাজারটা ঢুকতে বাধা কি? দেশে যখন দুর্ভিক্ষ - তখন অন্যত্র খেতে না পেয়ে সেখানে যে লাখ লাখ ইঁদুর উদর-স্ফূর্তির উৎসবে যোগদান করে নাই—তার গ্যারাণ্টি কি?' অবশেষে আদালত রায় দিলেন, 'সব চাউল ইঁদুরে খেয়েছে।'

উকিল সায়েব মুখ তুলে চাইলেন মক্কেলটির দিকে। তা দেখে মক্কেলটি বললো, 'আমিও তাকে একটা সরেস উপহার দিয়েছিলাম। সেই গুণেই তো আজ তার এত নাম-ডাক।

উকিল সায়েব তার ফি'র কথা ভুলে গেলেন। বললেন, 'কি উপহার দিয়েছিলে তাকে?'

—'সে আর বলবেন না।' ব্যবসায়ী চাল দেয় মক্কেলটি। 'সে অনেক সাধ্য-সাধনার ব্যাপার।'

—আহা, তবু বলোই না শুনি?' উকিল সায়েবের কৌতুহল বাড়তেই থাকে।

—মধুপুর গড়ের কালি-মন্দিরে ছিল এক সন্ন্যাসী। উকিল, ব্যারিষ্টারদের যাতে পেশার পসার হয় সেজন্য সে শনি-মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত ব্রাহ্মণ কুমারীর মাথার খুলির মধ্যে ভরে দিত মন্তর তন্তর। তা উকিলের বৈঠকখানায় পুতে রাখ্‌লে পসার আর ঠেকায় কে?'

উকিল সায়েব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'তা হলে তার একটা আমাকেও এনে দিও!'

—কিন্তু সে সন্ন্যাসী তো এখন এ-দেশে নাই উকিল সায়েব। পাকিস্তান কায়েম হতেই তারা সব গড় ছেড়ে সরে পড়েছে বানারসের উদ্দেশ্যে।

মক্কেলের কথা শুনে হতাশার ছায়া ঘনায় উকিল সায়েবের চোখে-মুখে। মরিয়া হয়ে বলেন, 'তেমন লোক কি আর কেউ নাই এ-দেশে?'

আজকাল তেমন লোক পাওয়া ভার। তবে আপনি যদি মামলায় জিততে পারেন—তাহলে অমনি একটা জিনিস দেবই আপনাকে। মক্কেল আশ্বাস দেয়।

উৎসাহিত হয়ে উঠেন উকিল সায়েব। বলেন, সে আবার পীর-ফকিরের তাবিজ-কবজ নয় তো? তাহলে আমি নেব না। ও-সব ধারণ করে দেখেছি—একটা কাণামাছিও আমার কাছে আসে না।

—না, না, তাবিজ-কবজ নয়। মক্কেলটি অভয় দান করে। সে হলো খাঁটি সাধনা সিদ্ধ চেয়ার টেবিল। আগে তো তার খোঁজ-খবরই জানতো না কেউ। জানাজানি হলো এই বছর দশেক আগে; তা' নিয়ে টানাটানিও শুরু হয়েছে এখন থেকেই। গুণাগুণে উকিল ব্যারিষ্টারদের জন্য ধন্বন্তরী। কিন্তু তা' খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

আনন্দে ফেটে পড়েন উকিল সায়েব। টেবিলে থাপ্পড় মেরে বলেন তাই সই! আমাকে ঐ টেবিল চেয়ারই দিও। টাকা-পয়সা চাই না। যেখানে থাক তুমি তা' খুঁজে বার কর।'

আনন্দের তাল সামলাতে না পেরে কথাটা বললেন বটে; কিন্তু অন্দর মহলের দিকে ফিরে চেয়ে তার বুক শুকিয়ে উঠলো। বিবি যদি শুনে থাকেন কথাগুলি, তাহলে এক নম্বর মামলা শুরু হবে ঘরেই।

পরদিনই আরজী পেশ করলেন উকিল সায়েব। সিভিল সাপ্লাই সায়েবের উপর রেশওয়াতের মামলা হয়েছে শুনে ছুটে এলো আর আর ব্যবসায়ীরা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঝেড়ে সাক্ষ্য দিলো—সায়েব বড় বেলেল্লাহ্। হিসাবে একটু উনিশ-বিশ হলেই তেড়ে আসেন। উঃ এমন ঘুষেল আর দু'জন নাই।

অবশেষে সি্ঁকা ছিড়লো বিড়ালের কপালে; পাঁচ বছরের রেকর্ড ভাঙ্লো। মামলায় জীত হলো তসর আলি উকিলের।

মক্কেল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো।

ঠেলাওয়ালা গাড়ী ঠেলে এনে দাঁড়ালো বারান্দার সামনে। উকিল সায়েব গাড়ীর দিকে নজর দিয়েই চিনে ফেললেন উপহারের চেয়ার, টেবিল। খুশীতে হেসে উঠলেন তিনি। বার বার পেছন ফিরে চাইলেন—কান পেতে থাকলেন বিবি কিছু বল্‌ছেন কিনা। অবশেষে ঘরের পুরানো টেবিল চেয়ার দুটি বার করে দেওয়া হলো।

নবাগত চেয়ারের জৌলুসে ঘরখানা ভরে ওঠলো। আনন্দে উকিল সায়েবের চোখমুখ উজ্জল। মনে মনে বললেন, এমন না হলে কি পসার হয়? এবার আর ঠেকায় কে?

চেয়ারটায় বসে একবার পরখ করে দেখার ইচ্ছায় মন তার উস্‌খুস করে। তিনি টেবিলের পাশে এগিয়ে যেতেই ডাক শুনা যায় ঠেলাওয়ালার, একটা কথা আছে স্যার?

বারান্দায় এসে দাঁড়ান উকিল সায়েব। গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে ঠেলাওয়ালা বলে, 'আপনাকে যে মেজ-কুরসীটা দিলাম সেটা কিন্তু বিক্রী নয়, ভাড়া। টাকা দিয়েছেন আপনার মক্কেল। আপনি ব্যবহার করুন। কাজ হাসিল হলে খবর দেবেন, এসে নিয়ে যাব।

—সেকি, ওতো আমার পাওনা উপহার। ফিরে দেবার কোন প্রশ্নই উঠেনা। উকিল সায়েব বিস্মিত হন।

—অ, তাহলে আপনি এ মেজ-কুরসীর কথাই শুনেন নাই স্যার! সমঝদারের মত কথা বলে ঠেলাওয়ালা। এর আর এক নাম হলো বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছা পূর্ণ হলেই এর প্রয়োজন শেষ। তখন আর কেউ এ-মেজ-কুরসী রাখতে চায় না। ছ'মাস ন'মাস গেলে সবাই নিজে এসে ফিরে দিয়ে যায়। কিন্তু আপনাকে তো আর ফিরে দিয়ে আসতে বলতে পারি না? ঠেলাওয়ালা সম্মান জানায়।

—কি বল্‌ছো? প্রশ্ন করেন উকিল সায়েব। মনে মনে বলেন, 'লোকটা পাগল-টাগল নাকি?'

—কেন আপনার মক্কেল কি এ-বিষয়ে কিছুই বলে নাই? পাল্টা প্রশ্ন করে ঠেলাওয়ালা। জবাবের প্রতীক্ষা না করেই আবার বলে, আহা, বেচারা আনন্দের টাল সামলাতে না-পেরে শুধু দিয়েই গেছে অথচ কি দিয়ে গেছে তা বলে যায় নাই। এ না বলে যাওয়ার মানেই হলো আপনাকে রীতিমতো ঠকিয়ে যাওয়া।

—অঁা? আঁৎকে ওঠেন উকিল সায়েব, 'বল কি, সে আমাকে ঠকিয়ে গেছে?'

—যেমন উকিল তেমনি তার সেলামী। জানালার পেছন থেকে নারী কণ্ঠ শুনা যায়।

চুন দেওয়া জেঁাকের মত জড়সড় হয়ে যান উকিল সায়েব। মনে মনে বলেন, 'এই সেরেছে রে!'

ঠেলাওয়ালা ঘাড় ফিরে চাইল সেদিকে। নিমেষে পর্দার পেছন থেকে একখানা সুন্দর মুখ সরে গেলো। সে বল্‌লো, 'এই চেয়ার টেবিলের গুণে শহরের কত উকিল-ব্যারিষ্টার-কপাল ফিরে পেয়েছে। কিন্তু কেউ ছ'মাসের বেশী রাখ্‌তে পারে নাই।'

—কেন কি ব্যাপার? এত ভাল জিনিস তারা রাখ্‌তে পারেন না কেন?' আবার শুনা যায়-অস্ফুট নারী কণ্ঠ।

—তাই-যদি জানতাম বেগম সাহেবা তাহলে কি আর মেজ কুরসীর ফেরি করি? ওতে বসেই কপাল ফিরিয়ে নিতাম।' ঠেলাওয়ালার কণ্ঠে আফসোস। 'বল্‌তে চাই কি—কুরসীতে বসে-মেজে হাত রেখে যা' চাবেন তাই পাবেন, কিন্তু একবার যা' চাবেন শতবার চেয়েও তা' ফেরাতে পারবেন না।'

রাত। চেয়ার টেবিলের-ধার দিয়ে বারবার ঘুরাফেরা করছেন উকিল সায়েব। কি চাইবেন আনন্দের ধাক্কায় তা ঠিক করতে পারছেন না। বিবি বললেন, যেমন উকিল তেমনি পড়েছ সব ধড়িবাজদের পাল্লায়। এ কি আর সেই জমানা নাকি যে, চেয়ারে বসে চাইলেই পাওয়া যাবে? যত সব ঠগের কারবার!'

উকিল সায়েব সে কথা আমলেই আনলেন না। কপালের দোষে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক অপমান সইতে হয়েছে; আর নয়। বললেন, 'নাইবা-হলো সে জমানা, চেয়ে দেখ্‌তে দোষ কি? বল, কি চাইব? এন্তার টাকা, মামলা-মোকদ্দমায় সকল কেস-অথবা মানুষের নৈতিক অধপতন?' একটু থেমে আবার বল্‌লেন, হঁ্যা, শেষের কথাটাই হলো সব চেয়ে বড়। উকিল-ব্যারিষ্টারী পেশার এটিই হলো ফাণ্ডামেণ্টাল।

বিবি বুঝলেন উকিল সায়েব নাছোড়। বললেন, এতই যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে আজ একটা চেয়ে

পরখ কর,—ফল পেলে পরে আরো চেয়ো। তার কণ্ঠে উপহাস।

উকিল সায়েব লাফ দিয়ে বস্লেন চেয়ারে। দুই হাত টেবিলে রেখে ঝড়ের বেগে আবৃত্তি করলেন, 'আমার এন্তার টাকা হোক, আদালতের মামলা-মোকদ্দমার সকল কেস আমার কাছে আসুক আর মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটুক।'

পরদিন সকাল বেলা বৈঠকখানায় ঢুকেই উল্লসিত হয়ে উঠেন উকিল সায়েব। ঘরভরা মক্কেল। চেয়ারে বস্তেই অগ্রিম বায়নার টাকা এগিয়ে ধরলো তারা। বল্লো, আমার মামলাটা, এই বায়নার টাকা। এই টাকাটা নিন। আরো পাবেন, আরো, যত চান। রেশওয়াতের মামলায় আপনার মত উকিল দু'জন নাই।

উকিল সায়েব আনন্দে আটখানা। মনে মনে বললেন, 'লেগেছে, ঠিক লেগেছে। যা চেয়েছি—হুবহু তাই।' তিনি হাসিতে, উল্লাসে সরগরম করে তুললেন বৈঠকখানা।

সেদিন তিনি রিক্সা করে গেলেন আদালতে। সারা আদালতের উকিল-ব্যারিষ্টারগণ তার অবিরল হাসি-উল্লাস লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন।

আদালত থেকে ফেরার পথে তিনি বিবিকে বলবেন বলে মনে মনে অনেক কথাই গুছিয়ে রাখলেন। যা হবার তা সব জামানাতেই হয়। কথাটা বুঝিয়ে বলার জন্য কতকগুলি যুক্তিও দাঁড় করালেন। তারপর ঠিক করে রাখ্লেন, আজ আবার চেয়ারে বসে কি চাইবেন।

বাড়ীর বারান্দায় পা দিয়েই হাঁক দিলেন উকিল সায়েব, 'ওগো শুনছো?' ওপক্ষ থেকে কোন সাড়া এলো না; আগেও আসতো না। কিন্তু আজ তার একটা সাড়া পাওয়া দরকার। তাই তিনি আবার ডাকলেন, 'কই গো —কোথায় গেলে, শুনছো নাকি?'

এবার অন্দরের বারান্দার সামনে বাঁধা বাচ্চাওয়ালী ছাগলটা ভারি গলায় সাড়া দিয়ে ওঠলো।

অনেকদিন পর তার কপাল খুলেছে; মনে লেগেছে রঙ। এবার বিবিকে তারই সোহাগ করার পালা। নথিপত্র বগলে করেই এ-ঘর ও-ঘর করলেন—কিন্তু কই কোথায় বিবি? আশেপাশের দশ বাড়ীতে খবরাখবর করা হলো; জবাব এলো, কোন বাড়ীতেই নাই। কেউ দেখেও নাই তাকে মুহূর্তে বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত হলো উকিল সায়েবের বুকের তলে, 'তবে?'

থানার দিকে ছুটতে ছুটতে একবার তার মেজ-কুরসীর কথা মনে হলো—মনে হলো তার প্রার্থনার শেষ কথাগুলি। ভয়ে আশঙ্কায় তার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো।*

* করাচীস্থ-প্রবাসী পাঠচক্রের সাহিত্য সভায় পঠিত।

বিজ্ঞানে মুস্‌লিম অবদান

মুহম্মদ আবদুর রহীম

"যাহা বাঁচিয়া থাকার যোগ্য তাহাই চিরঞ্জীব"—যোগ্যতমের উর্দ্ধতন সম্পর্কিত এই মূলনীতিটি কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই সত্য নয়, বিজ্ঞানও ইহার সত্যতা ও নির্ভুলতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছে। গ্রীকগণ যখন জাতি হিসাবে ধ্বংস হইয়া গেল, তখন রোমকদের অভ্যুদয় ঘটে, এবং গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে ইউরোপে এক অভিনব সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করে। এই সংস্কৃতিই বাইজান্টাইন কিংবা রোমান সভ্যতা নামে প্রখ্যাত। রোম ছিল এই সংস্কৃতির পাদপীঠ এবং রোমকগণ ক্রুশ ধারকরূপে সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করার প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

রোমকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সম্রাট ও বীর্যবান দিগ্বিজয়ীর জন্ম হইয়াছে, তাহাদের সভ্যতাও ছিল গ্রীকদের মতই বস্তুবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ ছিল উহার হাড় ও মজ্জার সহিত মিশ্রিত। পক্ষান্তরে রোমকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুববেশী অগ্রগতি লাভ করিতে পারে নাই। বরং সত্য কথা এই যে, যখনি তাহারা ত্রিত্ববাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক তখনি তাহারা নির্লজ্জভাবে পশ্চাদপদ হইয়া পড়িল।

ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ত্রিত্ববাদী রাওমাতুল-কুব্‌রা উন্নতির চরমশিখরে উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনটি সাংঘর্ষিক ও প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ধর্মীয় আধিপত্য রোমের নিকটই থাকিয়া যায়, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য পুনর্বার প্রাচ্যের দিকে আবর্তিত হইতে দেখা যায়। গ্রীকগণ যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, প্রাচ্যই ছিল তাহার কেন্দ্র স্থল। অন্য কথায় জ্ঞানের এই আলোক বর্তিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে ক্ষণিকের জন্য রশ্মি-বিকীরণের পরেই আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। রাওমাতুল কুব্‌রার পতনের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়া একবার নূতন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব ও দাপট লাভ করে।

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার

কিন্তু পতনোন্মুখ রোমকগণ এই জ্ঞান-প্রদীপকে নির্ব্বাপিত করার জন্য চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে নাই। বস্তুতঃ ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসই এমন এক জটিল ও দুর্বহ ব্যাপার ছিল যে, মানুষ তাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ফলে অনতিবিলম্বে খৃষ্টান আকীদা-বিশ্বাস বুদ্ধি ও যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই ও পরীক্ষা করা যাইতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্মমতে প্রাণবন্ত বলিতে এমন কিছুই ছিলনা, যাহার দৌলতে ইহা পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড হইতে খাঁটী স্বর্ণ হইয়া নির্গত হইতে পারিত, এই জন্য গীর্জার কর্তৃপক্ষ উহার প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে শুরু করিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, খগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, যুক্তি বিজ্ঞান, দর্শন, অংক শাস্ত্র এবং মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর দিকের কয়েকজন দিকপাল বর্তমান ছিলেন। খৃষ্টবাদে ধর্ম হিসাবে মানবীয় জটিল সমস্যা সমূহের সুষ্ঠু সমাধান লাভ করার কোনই ইংগীত ছিলনা। আস্‌মানী কিতাব হিসাবে ইঞ্জীল বর্তমান ছিল বটে; কিন্তু তাহাতে হযরত ঈসার রোজনামচা ব্যতীত আর কিছুই বর্তমান ছিল না। পক্ষান্তরে খৃষ্টান ধর্মের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অজ্ঞাত কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতে ও তাহা বরদাশ্‌ত করিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তাহাদের দরবার হইতে উল্লেখিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল। দর্শন ও খগোল শাস্ত্রের পারদর্শীগণকে ধর্মত্যাগীদের ন্যায় প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করা হইতে লাগিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট পাঠাগার ধ্বংস করার ব্যাপারে খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ মুসলমানদের উপর আজ পর্যন্ত যে দোষারোপ করিয়া আসিতেছেন, বিংশ শতকের গৌরব স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ (Sir James Jeans) ইহাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। এই ইংরেজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তাঁহার প্রখ্যাত The groth of Phisical Seience গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রোমান ঐতিহাসিকদের সূত্রে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার এই গ্রন্থাগার ৩৯০ খৃষ্টাব্দে থিওফিলাস-এর নির্দেশে স্বয়ং রোমানরাই ভস্ম করিয়াছিল।

মুসলমানগণ ৬৪২ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করেন এবং প্রাচ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের অধিকার ভুক্ত হয়। সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী সময় হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত পূর্ণ সাত শত বৎসরের দীর্ঘকালকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ "অন্ধকার যুগ" (Dark age) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা যখন সপ্তম শতকে রাওমাতুল কুব্‌রার ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর—সরাসরি চতুর্দশ শতকে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক উজ্জীবনের আলোকোজ্জ্বল ক্ষেত্রে লম্ফদান করেন, তখন মাঝখানের

এই আট শত বৎসর পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল, সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানের প্রত্যেক সচেতন ছাত্রের মনেই এক প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক ভাবেই মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

ইস্লাম যে ভূখণ্ডে চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছে, তাহা কেবল মানবতারই প্রাথমিক "দোলনা" নহে, মানবীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও ভূপৃষ্ঠে প্রথমবার এই অঞ্চলেই জন্মলাভ করে। মিছর, ব্যবিলন, নিনাওয়া ও পারস্য শত-সহস্র শতাব্দী কাল যে পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল, মুসলমানগণ তওহীদের পতাকা উড্ডীন করার সংগে সংগে বিস্ময়কর দ্রুততা সহকারে সেই সমস্ত জ্ঞান সমুদ্রকে মন্থন করিয়া উহার নিগূঢ় তত্ত্বকে উন্মোচিত করেন এবং নিমেষমাত্রের মধ্যে বিশ্বের সামরিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে এমন মর্যাদা লাভ করেন, যাহা তখন পর্যন্ত দুনিয়ার অপর কোন জাতির ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। অতঃপর বাগদাদ ও কর্ডোভা যে অতুলনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক উজ্জীবন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ইস্লাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে যে অপূর্ব মর্যাদা দান করিয়াছে, স্পেনের শিক্ষালয় ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আজিও তাহার সাক্ষ্য দেয়। বস্তুতঃ জ্ঞান-ও বিজ্ঞান ইস্লামের উত্তরাধিকার এবং মুসলিমগণ নিজদিগকে উহার যোগ্য ও সংগত উত্তরাধিকারীরূপে প্রমাণ করিতে নিঃসন্দেহে সক্ষম হইয়াছে।

বাগদাদের বায়তুল হিকমাত

নবী করীমের (দঃ) নির্দেশ—"জ্ঞান অর্জন কর, সেজন্য সুদূর চীন পর্যন্ত যাইতে হইলেও কুণ্ঠিত হইওনা"—মুসলিমদের দ্বারা সার্থকভাবে কার্যকরী হইয়াছে। বাগদাদের আব্বাসী দরবার ভারত ও কনষ্টান্টিনোপল পর্যন্ত রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিল। কোথাও কোন বৈজ্ঞানিক মূল্যসম্পন্ন গ্রন্থ প্রাপ্তব্য হইলে যে কোন মূল্যে তাহা খরীদ করা রাষ্ট্রদূতদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। বাগদাদে "বায়তুল হিক্মাত" নামে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান এরিষ্টটল, বত্লীমুস্, আর্কিমিডিস ইউক্লিড্স ও জালীনুসের সকল গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। এক একখানি গ্রন্থের অনুবাদ কার্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ কয়েক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করা হইত। মরুবাসী জনগণ জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে যে বিদ্যোৎসাহের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বাগদাদ হইতে কর্ডোভা পর্যন্ত প্রতি ঘরে গ্রন্থালয় ও গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছিল। দিবারাত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান আলোচনার বৈঠক বসিত। বহু মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বোঝাই উষ্ট্রের কারাভাঁ বোখারা, ভারতবর্ষ ও পারস্য হইতে বাগদাদের দিকে প্রতিনিয়ত চলিতে থাকিত। সামুদ্রিক বাণিজ্যপোত মিশর হইতে জিব্রালটার পর্যন্ত দিনরাত পাড়ি জমাইত। দুনিয়ার দূরতম কেন্দ্র হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের পারদর্শী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আহ্বান করিয়া আনা হইত এবং গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভাবনী কার্যে নিযুক্ত করা হইত। প্রত্যেক মসজিদের সংলগ্ন একটি করিয়া মাদ্রাসা ও প্রত্যেকটি মাদ্রাসাতেই একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইত। তাহাতে চিকিৎসাবিজ্ঞান, ঔষধ প্রস্তুতকরণ, অস্ত্রোপচার, অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিজ্ঞান, ভূগোল শাস্ত্র, ইতিহাস, খগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে অতি মূল্যবান ও অভিনব গ্রন্থসমূহ অনায়াসেই পাওয়া যাইত।

দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, ক্রয়বিক্রয়, নূতন গবেষণালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন করার জন্য রাজা-বাদশাহ, শাহ্জাদা-শাহ্জাদী, মন্ত্রী, শাসনকর্তা ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। শিক্ষালয়ের পরিচালনা ও সাহায্য পৃষ্ঠপোষকতার কাজে ইহারা সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করিত। গরীব ছাত্রদের সাহায্যার্থে ইহারা ছিল মুক্ত হস্ত। জাতি ও বংশের পার্থক্য ব্যতীতই পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করা হইত। তাহাদের কার্য্যাবলী ও অবদান সমূহের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইত এবং তাহাদিগকে সময়-অসময়ে দান-উপঢৌকনে অভিষিক্ত করা হইত। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা উদ্ভাবনী কার্য্যে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করা হইত। আব্বাসী খলীফা ও শাহ্জাদাগণ প্রমোদ ভ্রমণ ও মৃগয়ায় গমন করিলেও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এবং মূল্যবান গ্রন্থ বোঝাই উষ্ট্রের কাফেলা তাহাদের সংগী হইত। স্বদেশে-বিদেশে, আনন্দে ও দুঃখে সকল অবস্থায়ই অধ্যয়ন ও জ্ঞান-আলোচনার জন্য কিছু না কিছু সময় অতিবাহিত করা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। ইহা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, গ্রন্থসংগ্রহ ও জ্ঞান চর্চার মজলিস আহ্বান ও কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিতর্ক-অনুষ্ঠানে তদানীন্তন মহিলাগণও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকদের অপ-প্রচার

কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য ম্লান করার

জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রোমকগণ যে গ্রীক-ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপ-শিখাকে রাওমাতুল কুব্রার ধ্বংস-স্তূপের তলদেশে চিরদিনের তরে নিজেদের হস্তে প্রোথিত করিয়াছিল, সেই ধ্বংসস্তূপের উপরই বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা পুনর্বার স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দশ শতকের পর ইউরোপের বৈজ্ঞানিক রেনেসাঁয় ইস্লামী সভ্যতার ও আন্দালুসিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করিবার জন্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিগণ বৈজ্ঞানিক উজ্জীবনের ব্যাপারে আন্দালুসিয়ার পরিবর্তে ইটালীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুতঃ ইউরোপীয় রেনেসাঁর লীলাকেন্দ্র ইটালী নয়, আন্দালুসিয়াই হইতেছে উহার প্রাণপীঠ। রাওমাতুল কুব্রার পতনের পর ইউরোপ ধীরে ধীরে অজ্ঞতা-মূর্খতা ও অখ্যাতির গভীর অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল; এবং বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা ও তলিতোলা ইস্লামী দুনিয়ার অতিশয় সভ্যতামণ্ডিত ও সংস্কৃতিবান নগর এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবতর কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই কেন্দ্র সমূহেই তদানীন্তন মানব সমাজ মানবীয় ক্রমবিকাশের উন্নতস্তরের এক নবতর জীবন যাপনের স্বাদগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর কালে ইস্লামী সংস্কৃতি যখন দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে "যৌবনজলতরংগ" সৃষ্টি করিল এবং দুনিয়ার জাতিসমূহ তাহাতে বিশেষ তেজবীর্য লক্ষ্য করিতে লাগিল, তখন ইউরোপে জীবনযাপন ও জীবিত থাকার অভিনব প্রেরণা উন্মেষিত হইল।

এই ব্যাপারটি বারবার উন্মোচিত হইতে থাকিলেও ইউরোপের হিংসুক ঐতিহাসিকগণ সচেতন ও ইচ্ছামূলক ভাবেই এই সত্য অস্বীকার করার বারবার স্পর্ধা দেখাইয়াছেন। ইউরোপের নবজীবন লাভের পর যে সব নূতন ইতিহাস বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান-দিগকে অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। খৃষ্টান জগত মুস্লিম সমাজকে "কাফের" আখ্যাদান করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? রবার্ট ব্রিফাল্ট (Robert Briffault) এর প্রখ্যাত The Making of Humanity গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় ইহার বাস্তব প্রমাণ দেখা যাইতে পারে। খৃষ্টান ইতিহাসের ষড়যন্ত্রজালে এই কথা অধিক কাল পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারেনা এবং দুনিয়ার নূতন ও আধুনিক ইতিহাস ইহার স্বীকৃতি দিতে একটুও প্রস্তুত নয়। আজিকার বিজ্ঞানের ছাত্রকে এই ধরনের গালাগাল দ্বারা প্রতারিত করা সম্ভব নয়। এমন কি পাশ্চাত্য দুনিয়ার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গীবনও নিজকে হিংসুক ও বিদ্বেষদুষ্ট ঐতিহাসিক দলের নাম-তালিকার শীর্ষ-স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। "রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও পরিসমাপ্তি" তাঁহার প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত বলিয়া কথিত একখানি ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহার প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীনচিত্তে বিষোদগীরণ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় মণীষীগণ সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে একবিন্দু সত্যের অস্তিত্ব নাই। অধ্যাপক বিভান (Bevan) "মধ্যযুগের ইতিহাস" (কেম্ব্রিজ) গ্রন্থে কি সুন্দরভাবেই-না লিখিয়াছেন: "ইউরোপে উনবিংশ শতকের সূচনার পূর্ব ইসলাম ও ইস্লামের পয়গম্বর (দঃ) সম্পর্কে ইতিহাস নামে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, উহাকে নিছক 'সাহিত্যিক নির্বুদ্ধিতা'ই বলা যাইতে পারে।" বর্তমান সময়েও— প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিবেশ যখন অতিশয় প্রশস্ত হইয়াছে—মধ্যযুগের অবস্থার বিশ্লেষণ সমন্বিত কোন ইউরোপীয় ইতিহাসে ইস্লামের প্রতি কিছু মাত্র ইনছাফ করা হয় না। অজ্ঞতা-মূর্খতা, বর্বরতা, পাশবিকতা ও জন্তুর জীবন হইতে বৈজ্ঞানিক উজ্জীবন লাভ পর্যন্ত ইউরোপীয় রেনেসাঁ সম্পর্কে যে-সব গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোথায়ও মুসলমানদের নাম উল্লেখ করা হইলে "লাল শূলির আশ্রয়ে" কিংবা ইউরোপের প্রতি মুসলমানদের অনুগ্রহকে "বারবারদের গোলামী হইতে স্পেনের মুক্তিলাভ" ইত্যাদি বাক্যাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে। অন্য কথায় ক্রুসেডের যুদ্ধের ইহা এমন এক ইতিহাস, যাহাতে রিচার্ডের নাম তো বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও আদেল-এর নাম ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হইয়াছে। অপরের কথা আর কি বলিব, ডাঃ অস্বর্ণ টেইলর (Dr, Osborntaylor)-এর মতো লোকেরাও "মধ্যযুগীয় চেতনা" (The Mediaval Mind) শীর্ষক বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া মধ্য প্রাচ্যকে জয় করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সারাটি গ্রন্থের কুত্রাপি ইস্লামী সংস্কৃতির নাম পর্যন্ত উল্লেখ দেখা যায় না।

সৃষ্টিধর্মী শক্তিসমন্বিত আলোকোজ্জ্বল, জীবন্ত ও বীর্যবান সভ্যতা আন্দালুসিয়ার কায়া আমূলভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল; এবং ইউরোপের সভ্যতা বিবর্জিত অধিবাসী স্থায়ীভাবে সেই আলোক স্তম্ভের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছিল। মুসলিমগণ খৃষ্টানদিগকে প্রভাবিত করে নাই, কিংবা স্বয়ং ইউরোপ তাহাদের প্রভাব স্বীকার করিবার চেষ্টা করে নাই, এ-কথার ধারনা মাত্র করা সম্ভব নয়। কেননা তাহাতে প্রকৃতির আইন ও স্বভাবের অনিবার্যতাবীর ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। অন্ধ সূর্যের অস্তিত্ব যতই অস্বীকার করুক না কেন, উহার

জীবনদায়িনী কিরণবন্যা স্বতঃই তাহার স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রতিভাসমূহের ক্রম বিকাশ দানে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিবেই, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। আন্দালুসিয়ার ইস্লামী সংস্কৃতি সভ্যতা বঞ্চিত ইউরোপের সহিত অনুরূপ ব্যবহারই করিয়াছে। ইস্লাম ও ইউরোপের সম্পর্ক-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আইন নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মনিরত রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞান-ইতিহাসের রচয়িতাগণ যদিও এই সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন, বিকৃত ও ছিন্ন করার জন্য অত্যন্ত হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছে; কিন্তু তবুও এই বাস্তব সত্য নিজ স্থানেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য এই সম্পর্কের বিশালতা, পরিধি ও গুরুত্বের বিস্তারিতরূপ অনুধাবন করা বড় কঠিন ব্যাপার, অনুরূপ ভাবে পাশ্চাত্য-জগতের উপর মুসলমানদের দান যে কতখানি, তাহার অনুমান করাও সহজসাধ্য নয়। প্রাচীন দুনিয়ার বিশেষ জীব ও বিভিন্ন জাতির সন্ধান লাভের জন্য যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খোদাই কার্য সম্পন্ন করা হয়, উন্নত ইস্লামী সংস্কৃতি ও বর্বর ইউরোপের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত ছবি আন্দালুসিয়া হইতে ফ্রান্স্, ইটালী, বুলগেরিয়া, হাংগেরী, পোল্যণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড, বেলগ্রেড ও ভিয়েনা পর্যন্ত ইউরোপের প্রতিটি কোণে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সুখের বিষয়, যে-সব বিরোধী শক্তিই উহা সর্বাত্মকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, যাহাদের দ্বারাই তাহা সুরক্ষিত রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক উজ্জীবন লাভের পর ইউরোপ ইস্লামী সভ্যতার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নাম-নিশানা পর্যন্ত নির্মূল করা, বিকৃত করা ও নিজেদের চিরন্তন হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ উহাকে ভ্রান্ত রূপদান করার সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব লইয়া কোন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ কিংবা ঐতিহাসিক "ইউরোপের প্রতি মুসলিম অবদান" সম্পর্কে যখনি কিছু লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনি তাহাতে মুসলমানদের বিরাট ভূমিকা অত্যন্ত খাটো করার চেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছেন। আজ এ-কথা অনস্বীকার্য সত্যে পরিণত হইয়াছে যে, মধ্য যুগে ইউরোপ যাহাকে "অন্ধকার যুগ" বলিয়া থাকে—যদি আরব কিংবা ইস্লামী সংস্কৃতির অভ্যুদয় না ঘটিত তাহা হইলে বর্তমানে বার্লিন, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, মস্কো ও প্যারিসের অবস্থা ভিন্ন রূপ হইত। সমগ্র ইউরোপ এখন পর্যন্ত হয় ত তীর-ধনুক ও অশ্বযান ব্যতীত আর কোন কিছু সম্পর্কে বিন্দু-মাত্র অবহিত হইতে পারিত না। ইউরোপের এই উত্থান ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ার পশ্চাতে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ অবদান নিহিত রহিয়াছে। ইউরোপের ক্রমোন্নতি লাভের ব্যাপারে এমন কোন ক্ষেত্রই পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে ইস্লামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান নাই। কিন্তু বিশেষভাবে যে সৃষ্টিধর্মী-শক্তি আধুনিক যুগের শক্তি ও বিশিষ্ট বীর্যবত্তাকে উৎকর্ষদান করিয়াছে,—যাহা বিশ্বের বুকে ইউরোপীয় সাফল্য ও সার্থকতা লাভের উৎসমূল, যাহাকে বলা হয় বিজ্ঞান—তাহাতে ইস্লামী সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গেলিলিও, কুপার-নিকাস্, কেপ্লার, নিউটন ও আইষ্টাইনের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও উহার মূল সূত্র আজিও তাহাই স্বীকৃত রহিয়াছে—যাহা আজ হইতে পূর্ণ আটশত বৎসর পূর্বে বাগদাদ ও আন্দালুসিয়ার মুসলিম বিজ্ঞানী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

কোন কোন ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিশেষতঃ রসায়ন, ঔষধ প্রস্তুতকরণ, চিকিৎসবিজ্ঞান ও খগোল শাস্ত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতে গিয়া নিজ-দিগকে নিছক ধোঁকা দেওয়ার জন্যই ইস্লামী অবদানের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এমন আভাস প্রদান করা হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়ঃ আরবগণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেন কোন সার্থক ব্যক্তিরই সৃষ্টি করে নাই এবং উল্লেখযোগ্য কোন আবিষ্কার উদ্ভাবনীর কাজও তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। এই সব ইতিহাস লেখক লিখিয়া থাকেন যে, আরবগণ সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান গ্রীক-দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহারা বিরাট কীর্তি করিয়া থাকিলেও তাহা শুধু এতটুকুই যে এইসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া কালের সর্বধ্বংসী হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বস্তুতঃ এইসব কথার সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু যে ভাবে তাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কথাগুলি নিতান্ত নির্জীব; প্রাণশূন্য ও অপ্রাসংগিক হইয়া পড়িয়াছে। একথা সত্য যে, কোন আরব বিজ্ঞানী কোপারনিকাস কিংবা নিউটনের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাহাদের পক্ষে আর করারই বা কি ছিল! তাহাদের পূর্ববর্তী গ্রীকগণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন সব গল্প-কিংবদন্তীর জঞ্জাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, যে উহার সত্যতা যাঁচাই করিবেন, কি উহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখের দিকে কোন শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, মুসলিম বিজ্ঞানীদের সম্মুখে তাহাই ছিল এক জটিল প্রশ্ন। কিন্তু এইসব জটিলতা ও অসুবিধা সত্ত্বেও মুসলিম খগোলবিজ্ঞানীগণ এক বত্লীমুসী জ্যোতিবশাস্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি, উহার চিত্র, পঞ্জিক ও অংকিত ছবিসমূহের সমালোচনা করিতে থাকেন। আন্দালুসিয়ার বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল্-জাকারিয়া দাবী করিয়াছেন যে, গ্রহসমূহের পরিবেষ্টনী

সম্পূর্ণ গোলাকার নহে বরং তাহা ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট। আল্-ফরগানী তাঁহার চিত্রে মংগলগ্রহের পরিবেষ্টনী গোল দেখান নাই, দেখাইয়াছেন ডিম্বের ন্যায়। মুহাম্মদ বিন্ মূসা তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন স্থানে গ্রহসমূহের আবর্তন ও "মাধ্যাকর্ষণ" এর উল্লেখ করিয়াছেন উপরন্তু কেবল মাধ্যাকর্ষণ নহে, এই সর্বাত্মক শক্তির কোন কোন নিয়ম-নীতিরও রচনা করিয়াছে। আল-বত্তানী দুনিয়ায় সর্বপ্রথম সূর্যের নিজস্ব আবর্তন ও গতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং আবুল ওফা চন্দ্রের কক্ষ পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্যলাভ করেন। ইব্‌নে সীনা এমন এক তাপ পরিমাপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে বাষ্পের মাত্রা বায়ুর চাপ দ্বারা প্রকাশ করা যইত। এইরূপে ইব্‌নে ইউনুস সময় জানিবার জন্য পেণ্ডুলাম বিশিষ্ট ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানে আরবীয় অবদানের মূলকথা

যাহাই হউক, আরবগণ যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন অতীব বিস্ময়কর ও বিপ্লবীধরণের নিয়ম-নীতি রচনা করিয়া ইউরোপের প্রতি বিশেষ কিছু অনুগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবুও আধুনিক বিজ্ঞান অন্যান্য কয়েকটি দিক দিয়াই মুসলমানদের অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ। কাজেই বিজ্ঞানের মূল সত্তায় এই আরবগণই প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, এ-কথা বলিলে বিন্দু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন পৃথিবী বিজ্ঞানের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত ছিল না, তাহা সর্বজন বিদিত। গ্রীকগণ অংক ও খগোল বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞান ও তথ্য মিছর ও ব্যাবিলন বাসীদের নিকট হইতে লাভ করে। কিন্তু এই দুইটি জিনিষই যেহেতু ছিল বহিরাগত, সেই কারণে ইহা গ্রীক সংস্কৃতির রক্তমাংসের সহিত একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় গ্রীকগণ যথেষ্ট শৃংখলা ও সজীবতা আনয়ন করিয়াছে, উহাকে উৎকর্ষ দান করিয়াছে, উহার জন্য সুস্পষ্ট সহজ ও সাধারণ বোধ্য নিয়ম-নীতি রচনার চেষ্টায় কিছু মাত্র ত্রুটী করে নাই, এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু গবেষণার ধৈর্য সাপেক্ষ পর্যায়, খাঁটি জ্ঞান-তথ্য সংগ্রহ এবং উহার সংরক্ষণের কঠিনতম কাজ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল নিয়মাবলী, অণু পরমাণুতে পরিণত হওয়ার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান কার্য—ইহা এমন সব শুষ্ক ব্যাপার ছিল, যাহার সহিত গ্রীকদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত ছিল। কিন্তু কোরআনের বিপ্লবী শিক্ষা ও ভাবধারা এই বিষয়গুলিকে মুসলমানদের প্রকৃতিতে মিলাইয়া-মিশাইয়া দিয়াছিল। কোরআন মজীদ মুসলিমগণ নিত্য ও সকাল-সন্ধ্যা অধ্যয়ন করিতেন। গভীর অনুধাবন, গবেষণা, ভক্তি ও সম্মান সহকারেই পড়িতেন এবং তাহাতে তাঁহারা জায়গায় জায়গায় "খোদার চিরন্তন আইন" সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির জন্য সুসংবাদ ও নিদর্শন সমূহ চিন্তা-গবেষণা করার সুস্পষ্ট তাকীদী নির্দেশের সম্মুখীন হইতেন।

আজ যাহা বিজ্ঞান নামে অভিহিত, ইউরোপে তাহা এইজন্য প্রচার ও বিকাশ লাভ করিয়াছে যে, আন্দালুসিয়ায় ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখ্ ঝলসানো দীপ্তি, উন্নত সভ্যতা, অতুলনীয় সংস্কৃতি ও অক্ষয় ইস্‌লামী ভাবধারা হইতে প্রভাবিত হইয়া বর্বর ইউরোপ জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের জন্য ঠিক ততখানি পাগল পারা হইয়া উঠিয়াছিল, যতখানি ইতিপূর্বে নব অভ্যুত্থিত মুসলিম জাতির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে আগ্রহ উদ্যম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ডের ছাত্রগণ কর্ডোভায় আগমন করিত, শিক্ষালাভ করিত, বিভিন্ন মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিত এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজদের দেশে প্রত্যাবর্তন করিত। নিজের দেশে আসিয়া তাহারা দেশবাসীকে নবতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাইয়া সর্বপ্রথম তাহাদের ধর্মীয় মানসিকতা উত্তেজিত করিয়া তুলিত। শেষ পর্যন্ত এইজাতি যখন হীনমন্যতার তীব্র অনুভূতিতে ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিত ও আরব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মুখে নতি স্বীকার করিত, তখন তাহা পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত না করিয়া কিছুমাত্র ক্ষান্ত হইত না। এথেন্স, স্পার্টা, ট্রয়, মাকদুনিয়া, রোম ও কনষ্টান্টিনোপলের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর প্রথমবার ইউরোপ সেই সব নিয়ম-পন্থা আয়ত্তাধীন করিয়া লয়, যাহার অধীন মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক আইনের যাচাই-পরীক্ষা করিতেছিলেন। গবেষণা অনুসন্ধিৎসায় এইসব নবতর ও উন্নত নিয়ম-প্রণালী ও পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন ও যাচাই করার পর ইউরোপে বৈজ্ঞানিক উজ্জীবন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। গ্রীকগণ যেসব নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল, ইউরোপ শেষ পর্যন্ত তাহারই অনুসারী হইয়া গেল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের এইসব সোনালী নীতিসমূহের সহিত আরব ও ইস্‌লামী সংস্কৃতিই ইউরোপকে পরিচিত করিয়াছিল।

আব্বাসী খিলাফতের যুগে দুনিয়ার সুদূরতম কোণ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি বাগদাদ নগরে আনীত হয় এবং 'বায়তুল হিকমতে' রাত্রিদিন উহার তরজমা হইতে থাকে। এই সব গ্রন্থের অধিকাংশই ছিল গ্রীক, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আরবদের যে আগ্রহ-উৎসাহ এবং রুচি উহার সংগ্রহকার্য জোরদার করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা

গ্রীকদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ছিল। আরবগণ গ্রীক কবি, ঐতিহাসিক ও নাট্যকারদের সৃষ্টি সমূহ প্রথমবার দেখিয়াই দূরে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এ সবের খুব বেশী কিছু মূল্য ছিলনা। তাঁহাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল একমাত্র তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল গ্রন্থাবলীর দিকে। এইজন্য তাহারা 'সালীস' হইতে য়্যাপোলোনিয়াস পর্যন্ত সমস্ত দার্শনিকের গ্রন্থাবলী ও চিন্তাধারা ছাড়াও প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে যত গ্রন্থই পাওয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক একাডেমী খগোল, জ্যোতিষ, বতলীমুসী ভূগোল ও ইউক্লিডাস (Euclidas) আর্কিমিডিস ও থীওন প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যাহা কিছু কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, আরবগণ তাহার সমস্তেরই কেবল আরবী তরজমা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ কার্যে নিজেদের পূর্ণ লক্ষ্য ও তিতিক্ষা নিয়োজিত করেন। ইউরোপের বিশপ যখন গীর্জাসমূহের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে প্রাচীরের সহিত মাথা কুটিতেছিলেন, বাগদাদ ও কর্ডোভার মুস্‌লিম দার্শনিকগণ তখন নিয়োজিত ছিলেন বুক্‌রাত, সাক্‌রাত্, আফলাতুন ও আরাস্তুর চিন্তাধারা পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই কার্যে। গ্রীকদের নিছক কল্পনা ও অমূলক চিন্তাধারার দিকে তাঁহারা বিন্দুমাত্র লক্ষ্য আরোপ করেন নাই। বস্তু জ্ঞান সম্পর্কে গ্রীকদের ভ্রান্ত কল্পনা ও আন্দাজ অনুমান মূলক কথাবার্তার অন্তঃসারশূন্যতা তাহাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। তাঁহারা গ্রীক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত, সংখ্যা ও গণনা ইত্যাদি শুধু এই জন্য গ্রহণ করিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কোন প্রাথমিক ও মৌলিক উপপাদ্য মানিয়া লওয়া একান্তই অপরিহার্য ছিল। উত্তরকালে এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের যতই অগ্রগতি হইয়াছে, সংগে সংগে নিজেদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে গ্রীক উপপাদ্য, মত ও মূল-নীতি সূত্র সমূহের সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন। গ্রীকগণ সর্বদা মূলনীতি এবং উহার সাধারণ প্রয়োগের উপর অধিক জোর দিয়াছে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে তাহাদের বিশেষ কোন কৌতুহল ছিল না। পক্ষান্তরে আরবগণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা নিয়মের কোন পরোয়া করেন নাই। তাঁহারা বাস্তবভাবেই বস্তুর অন্তর্নিহিত মূল ভাবধারায় ডুবিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণেই মুসলমানগণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর যে মহামূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রীকদের ন্যায় নিছক অনুমানমূলক মত ও আন্দাজ করিয়া লওয়া মূল সূত্র সমূহের সমষ্টি নয়, বরং তাহা হইতেছে এমন বাস্তব ঘটনাবলীর বিরাট সম্পদ যাহার সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা আজ পর্যন্ত কাহারো পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আরবগণ প্রত্যেকটি জিনিষের পরিমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান-তথ্যের ভাণ্ডার সঠিক পরিমাণে ভরপুর। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, যে জিনিস গ্রীকদের "বৈজ্ঞানিক নির্বুদ্ধিতা"কে কল্যাণকর নির্ভর-যোগ্য ও খাঁটি বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়াছে, তাহা বস্তুর মূল-সত্তা সংক্রান্ত বিবরণে নহে, বরং প্রকৃত পক্ষে বস্তুর পরি-মাণ সম্পর্কিত বিবরণ দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও উৎসাহ এবং ইহার উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনায় আরবগণ পরিমাপ ও ওজন করার ব্যাপারে অপূর্ব নির্ভুলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই কারণে প্যারিস ও লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্র, খগোল বিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্ক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে আজ জাকারিয়া, আল খাওয়ারিজ মী, আলমাকদামী, আর-রাজী ও ইবনে সীনার গ্রন্থাবলী হইতে বিশেষ ফায়দা গ্রহণ করা হয়; এবং আজও প্যারিসের চিকিৎসা-বিজ্ঞান কলেজে বু-আলী সীনার প্রতিকৃতি সর্বোন্নত স্থানে স্থাপিত রহিয়াছে।

আরবদের যাবতীয় বিজ্ঞানচর্চা ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ উক্তরূপ বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা দ্বারাই সম্পন্ন করা হইয়াছে। বিশ্ব-ভূমণ্ডল সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে তাঁহারা বত্‌লীমুসের উপস্থাপিত তথ্যকে কবুল করিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি নক্ষত্র ও গ্রহ সমূহের যতগুলি ছবি ও চিত্র এবং তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিম্বা গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী দূরত্বের যতদূর জরিপ করিয়াছেন, আরবগণ তাহার কিছুই করেন নাই। কেননা তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিলনা। তাঁহারা নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ নূতন চিত্র ও ছবি অংকন করিয়াছেন এবং তাহা বতলীমুসের তৈরী চিত্র, তালিকা ও ছবি অপেক্ষা নিঃ-সন্দেহে উত্তম। গ্রহ সমূহের ঘূর্ণন, ঘূর্ণনের ক্ষেত্র ও পরিধি, গ্রহের গতিবিধি, মাত্রা এবং উহাদের মধ্যস্থ দূরত্ব নির্দেশিত সম্পূর্ণ নূতন চিত্রই তাহারা রচনা করেছেন। ভূমির ব্যাস জানিবার জন্য তাহারা দুই-দুইবার স্বতন্ত্রভাবে আন্দাজ করিয়াছেন। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার জন্য তাঁহারা এমন সব যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়াছেন, যাহা কেবল গ্রীকদের অপেক্ষাই উন্নত নহে, পঞ্চদশ শতকে জার্মানীর নুরেম্বার্গস্থ বিখ্যাত কারখানায় প্রস্তুত যন্ত্রপাতি অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর ছিল। প্রত্যেক নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষক ব্যক্তিগত নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণকেই প্রাধান্য

দিয়াছেন। এই সকল-পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ অতীব সুস্পষ্ট সংগঠন, শৃংখলা ও ক্রমিক পর্যায় সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পর্যবেক্ষণ বাগদাদ, দেমাশক্ ও কায়রোর গবেষণাগারসমূহে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত কার্যকরী রহিয়াছে। আরব বৈজ্ঞানিক ও শাসকগণ এইসব পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ ও যাচাই-বাচাইর বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়াছেন যে, কোন গবেষণাকারী কিংবা কোন লেখক এইসব তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান সরকারী পর্যায়ে লিপিবদ্ধ ও প্রচার করিতে চাহিলে তাহার পরিবেশিত তথ্যাদির নির্ভুলতা সম্পর্কে তাহার দ্বারা রীতিমত প্রতিজ্ঞা করানো হইত।

তথ্য, সংখ্যা ও গণনা এবং পরিমাপের এই নির্ভুলতা কেবলমাত্র খগোল, রসায়ন ও ঔষধ প্রস্তুতকরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই এই ভাবধারা বিশেষ ভাবে কার্যকরী ছিল। আল-মামুন ইরাণী পোষ্টমাষ্টারকে ইস্লামী রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাংগ মানচিত্র (Map) তৈয়ার করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে স্থল ও জল ভাগের ব্যবহৃত সমস্ত রাজপথ চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। আরবদের এই বিরাট ভৌগোলিক কীর্তি কেবল সমগ্র দুনিয়াকেই এক নবতর পথ প্রদর্শিত করে নাই, ইহার দ্বারা ভূগোল বিজ্ঞানের এক সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। আব্বাসী খিলাফত প্রধান আল-মামুন উল্লেখিত মানচিত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বড় বড় শহর ও উল্লেখযোগ্য উপশহর ও গ্রাম সমূহেরও বিস্তারিত বিবরণ দানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-সংগ্রহ করায় বিন্দুমাত্র অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

আল-বেরুনীর সাধনা

খনিজ পদার্থ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন ও সে-সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্য আলবেরুনী পূর্ণ চল্লিশটি বৎসর পর্যন্ত তদানীন্তন জ্ঞাত-দুনিয়া পর্যটন করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যে সব জিনিসের ওজন ও পরিমাপের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন সন্দেহ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ইব্‌নেবতুতার সমগ্র ইস্লামী দুনিয়ার পরিভ্রমণ করার পর উদ্ভিদ-জীবনের বিভিন্ন মূল্যবান নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন ও স্বীয় গ্রন্থে প্রায় চৌদ্দশত বৃক্ষ, চারাগাছ, লতা-পাতা সম্পর্কে এতদূর বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি উল্লেখ সহ আলোকপাত করিয়াছেন যে, আজ পর্যন্ত তাহা বিশেষজ্ঞদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। আরাস্তুর মতাদর্শ পূর্ণ দুই সহস্র বৎসর পর্যন্ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশে উজ্জল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি বহু গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন; কিন্তু নিজের কোন একটি মতাদর্শকেই বাস্তব পরীক্ষার কষ্টি পাথরে যাচাই করার জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। এই গ্রীক দার্শনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান ছাড়া আরো অসংখ্য বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থাবলীতে এতদূর বলিয়াছেন যে, "পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের দাঁতের সংখ্যা কম।" কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি কখনো নিজের কিংবা তাঁহার স্ত্রীর দাঁতগুলি গণিয়া ইহার সত্যাসত্য যাচাই করার ঝামেলা পোহাইতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত হন নাই।

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ জোর গলায় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, আরবদের চিকিৎসা বিজ্ঞান জালীনুস পরিবেশিত জ্ঞান ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জালীনুসের বৈজ্ঞানিক-মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করিলেই এই কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে। এই বৈজ্ঞানিক প্রাচীন দেহ-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। অথচ তিনি লিখিয়াছেন : নিম্ন মাড়িতে দুইটি অস্থি রহিয়াছে। উপরন্তু তাহার এই অতুলনীয় মত আবদুল্লতীফ নামক জনৈক মুসলিম বৈজ্ঞানিক কর্তৃক মানব-মস্তকের বাস্তব পর্যবেক্ষণ মারফত ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞান-জগতে সত্য ভিত্তিক বলিয়া মনে করা হইত।

এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গ্রীকগণ যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যাবিলন, মিশর ও কিস্‌য়ান অধিবাসীদের নিকট হইতেই হাছেল করিয়াছে। আর ইহারা প্রকৃত পক্ষে আরব দেশ হইতে হিজরত করিয়া ব্যবিলন, নিনাওয়া, মিশর ও কার্থেজে বসবাস শুরু করিয়াছিল। গ্রীকগণ যেরূপ খগোল বিজ্ঞানের অন্তস্থল পর্যন্ত পৌছিতে ব্যর্থ হইয়াছিল, অনুরূপ ভাবে তাহারা প্রাচ্যের অংকশাস্ত্র হইতেও বিশেষ উপকৃত হইতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে অংক শাস্ত্রকে বুনিয়াদের মর্যাদা গ্রহণ করিতে হইয়াছে,—আরবগণ উহার কেবল উৎকর্ষ সাধনই করেন নাই বরং তাঁহারা নিজেদের হস্তেই বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার এমন কতগুলি নিয়ম-নীতি রচনা করিয়াছেন। যাহা অংক শাস্ত্র ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতি বিধান করিয়াছে।

অংক ও খগোল শাস্ত্রের ন্যায় রসায়নের স্থাপয়িতাও

ব্যবিলন ও মিছরের পূজামন্দিরের ভার প্রাপ্ত ছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহা ছিল এক প্রচ্ছন্ন বিদ্যা। ইহার দৃষ্টিতে প্রাচীন কালের "নীম-হাকীম" ও জ্যোতিষী সাধারণ ভাবে বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখিতেছিল। উত্তর কালে এই বিদ্যা যখন আরবদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহারা লালসা চরিতার্থ করার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে বাহির হইয়া গবেষণা আবিষ্কারের এক অভিনব উদ্যম সহকারে কাজ শুরু করে। ইহা এমন এক সুসংবাদ ও সুসংগঠিত রূপধারণ করে—যাহার পথ-নির্দেশে আরবগণ বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আল্‌কোহল্ ও গন্ধকের তেজাব ইত্যাদি খালেছ ভাবে আরবদের আবিষ্কার। আল-কালী (Alkalis), পারার নয়। আল-কোহল ও বিসমুথ (Bismuth) ইত্যাদি ধরনের সমস্ত জিনিষ আরবরাই তৈয়ার করিয়াছেন। ইহার ফলে রসায়ন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ পথ উন্মুক্ত ও সুপ্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আফলাতুন ও আরাস্তুর ন্যায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত সৃষ্টিলোককে পানি, বায়ু, মাটী ও আগুন এই চারিটি মৌলিক উপাদান হইতে সৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের পরবর্তীকালের গ্রীক পণ্ডিতগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তামা প্রভৃতি সাতটি ধাতু—নিকষ ধাতুকে সাতটি প্রসিদ্ধ গ্রহের সহিত যুক্ত করিয়া এইগুলিকে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। একদিকে আরাস্তু ও আফলাতুনের ন্যায় নির্ভর যোগ্য বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের সুচিন্তিত মত, আর অপর দিকে তাঁহাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্যাবলী একদিকে তাঁহাদের সম্মুখে পানি, বায়ু, মাটী ও আগুন হইতে সৃষ্ট ভূমণ্ডল আর অপর দিকে রহিয়াছে ডিমো-ক্রোটিসের আণবিক মতাদর্শ—তাহাও আবার অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায়। আরবগণ আরস্তু ও আফ্‌লাতুনের চার-উপাদান বিশিষ্ট সৃষ্টিলোক হইতে মুখ ফিরাইয়া আণবিক মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং উহাকে এতদূর উন্নতি লাভ করেন যে, বস্তুর মৌলিক সত্যতা স্থান ও কাল সম্পর্কে তাহাদের মতাদর্শ সর্বতোভাবে ম্যাক্‌স্ প্ল্যাংক-এর পরিমাণ সম্পর্কীয় মতাদর্শের সমপর্যায়ের মনে হইতে থাকে। গ্রীক ও মিছরের পূজা-মন্দির সমূহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ রসায়নকে এতদূর রহস্যপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, উহাকে বিজ্ঞানের পরিবর্তে যাদুমন্ত্র মনে করিয়া ভুল করার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। মুসলিম রাসায়নিকগণ সমগ্র জীবন ভরিয়া খালেছ বিজ্ঞানকে উহার গোপন গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতেই ব্যস্ত থাকেন। "রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থের ইংরেজ গ্রন্থকার স্যার এড্‌ওয়ার্ড থার্প ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, রসায়ন শাস্ত্রে "খাত্তহফী" মতাদর্শ ও তাছাউফকে আরবগণ নহে—খৃষ্টান পণ্ডিতগণই পরিচিত করিয়াছিলেন।

ইউরোপে মুসলিম প্রভাব

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস নির্ধারণে অকারণ আতিশয্য দেখাইয়া থাকেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, ল্যাটিন গীর্জা কর্তৃপক্ষ দশম শতকেই ইস্‌লামী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে শুরু করিয়া দিল। ইউরোপ যদি অজ্ঞতা, বর্বরতা, পাশবিকতা ও হিংস্রতার গভীর পংকে নিমজ্জিত হইয়া না থাকিত, দশম শতকে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের অবস্থা যদি বর্তমান কালের আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিক পশ্চাদপদ জাতিসমূহের ন্যায় হইত, তাহা হইলে আরবগণ ইউরোপে (আন্দালুসিয়ায়) বসিয়া যতখানি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ইউরোপ তাহা আজ হইতে কয়েক শতাব্দী পূর্বেই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিত। আন্দালুসিয়ার মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত উদার উন্মুক্তমনা। তাঁহাদের শাসন আমলে খৃষ্টান সংখ্যালঘুগণ ইসলামী সাম্য ও ইনসাফের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। মুসলিম আন্দালুসিয়ার খৃষ্টানদের নিজেদের নির্বাচিত পাদ্রীগণ গীর্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করিত। কর্ডোভার মফস্বল এলাকায় শত শত খানকাহ্ বিরাজমান ছিল, দূর দেশের পথিক-পর্যটকগণ উহাতে অবস্থান করিতে পারিত। কর্ডোভার হাটে-বাজারে পুরুষ ও স্ত্রী-পাদ্রীগণ প্রকাশ্য ও স্বাধীন ভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিত। ফ্রান্স হইতে নরওয়ে পর্যন্ত ইউরোপীয় যে কোন শাহাজাদা বা শাহাজাদী চিকিৎসক, চিত্রকর, শিল্পী, দর্জী, রাজ-মিস্ত্রী ও গায়ক—যাহারই প্রয়োজন বোধ করিত, কর্ডোভার দরবারে আবেদন পেশ করিলেই অতীব উদারতা সহকারে তাহাদের জন্য তাহা হইত। ইউরোপের এই এস্‌লামী নগরীর খ্যাতি জার্মানীর মত দূরবর্তী দেশসমূহ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। জনৈক সেক্‌সানীয় পাদ্রী কর্ডোভাকে সর্বোত্তম নগর রূপেই কেবল নয়, "দুনিয়ার অধিক চাক্‌-চিক্যপূর্ণ মুক্তা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ওলন্দাজ পণ্ডিত ও পর্যটক ডুজী উত্তেজিত হইয়া এতদূর বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "আন্দালুসীয় মুসলমান যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই লেখা পড়া জানেন।"

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় এতদূর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল যে, ইউরোপের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে জ্ঞান-পিপাসু ইউরোপীয় শাহ্‌জাদা, বিশপ ও পাদ্রী দলে দলে চলিয়া আসিত এবং জ্ঞান আলোকের সন্ধানে আরব মনীষীদের সম্মুখে ছাত্রহিসাবে হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন করিত। কেননা এই জ্ঞান-আলো সমগ্র

দুনিয়ায় বাগদাদ ও কর্ডোভা ব্যতীত কুত্র পি পরিদৃষ্ট হইতনা। কর্ডোভার প্রখ্যাত বিশপ আল্‌-ভারো (Alvaro) নবম শতকে লিখিয়াছিলেন : যে-সব খৃষ্টান যুবক নিজস্ব বিশিষ্ট যোগ্যতা-প্রতিভার কারণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষভাবে দক্ষতা লাভ করিয়াছে। ইহারা এক আশ্চর্য ধরণের কৌতুহল ও উৎসাহ সহকারে আরবী গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে। এই সব গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বড় বড় গ্রন্থাগার রচনা করিত এবং সর্বত্র বিশেষ গৌরব সহকারে বলিয়া থাকিত যে, "এই ভাষা ও উহার সাহিত্য কতই-না সুন্দর। ইহা মনের গভীর গহনে কি নিবিড়ভাবেইনা নাড়া দেয়।" আরীলাসের বিশিষ্ট খৃষ্টান মনীষী জারবার্ট আন্দালুসিয়া হইতে খগোল ও অংক শাস্ত্র সম্পর্কে কয়েকখানি পুরাতন ও অসম্পূর্ণ পুস্তিকা হাছেল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গীর্জার অভ্যন্তরে যখন সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করিতে শুরু করিলেন তখন যুবক ও বৃদ্ধ খৃষ্টানগণই নহে স্বয়ং গীর্জার পর্যবেক্ষক ও পরিচালকও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। আন্দালুসিয়ায় সে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই, তবুও মালমেসবারীর উইলিয়াম এর কথা অনুযায়ী "আরবদের নিকট হইতে অপহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সে যতখানি উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহাকে দ্বিতীয় পোপ সালভেষ্টার (Pope Sulvester) উপাধি দান করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকেই বিশ্ববিখ্যাত ও মধ্যযুগের অতুলনীয় নাটক ফাউষ্ট (Faust)-এর 'হীরো' বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আরবী জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আফ্রিকান পাদ্রী ও রবার্ট গীসকার্ড-এর সহকারী কন্সনতীস এই সব আরবী গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অনুদিত গ্রন্থাদী ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি "মোণ্ট কাসীনো" (Monte Cassino)-তে "আরবদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান" সম্পর্কে অধ্যাপনা শুরু করেন। ইহা খৃষ্টান আধ্যাত্মিকতার প্রখ্যাত "বেনেডিক্‌টিনস (Benedictines) শাখার কেন্দ্রস্থল। এখান হইতেই খৃষ্টান অধ্যাত্মবাদের অপরাপর শাখা-প্রশাখায় আরব জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। "বেনেডিকটিন্‌স্‌" শাখার অপর এক ব্যক্তি— আডেলার্ড বাথ (Adelardoe Bath)-ও কর্ডোভা হইতে বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ ও ইস্‌লামী চিন্তাধারা-মতাদর্শ নিজের সংগে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহযোগিতায় বিশেষ দ্রুততাসহকারে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে তাহার প্রচার করেন। তিনি ইউক্লীডাস এর যে আরবী তরজমা সংগে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে তাহাই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহা দেখিতে পাইয়া ডানিয়েল ডি মরলে (Deaniel De Morlay) অংক শাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের জন্য কর্ডোভা উপস্থিত হন ও শিক্ষার্জন সমাপ্ত করিয়া নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নিজের অর্জিত জ্ঞান-দ্বারা সমগ্র ইউরোপকে প্লাবিত করার পর তিনি অক্সফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। টিভলীর প্লেটো (Plato of Tivoli) আল্‌বেতানীর খগোল ও অংক শাস্ত্র সম্পর্কীয় যাবতীয় কিতাবের অনুবাদ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পীসার (Pisa) ব্যবসায়ী লিওনার্ডো ফিবোনাস্সী (Leonardo Fibonacci) আল্‌জিরিয়া ও আন্দালুসিয়া ভ্রমনকালে আরবদের অংক শাস্ত্র সম্পর্কীয় "আধুনিক বিপ্লবাত্মক জ্ঞান" প্রত্যক্ষ করিয়া যারপর নাই মুগ্ধ হন। তিনি একবার পর্যটন সমাপ্ত করিয়া পুনর্বার আগমন করেন। আরবী ভাষা অংক শাস্ত্রে রীতিমত পড়াশুনা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং আল-খাওয়ারিজেমের বিশ্ব-বিশ্রুত "আল্‌জাব্‌রো অল-মুকাবিলা" হাছিল করিয়া নিজের দেশ প্রত্যাবর্তন করেন। নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি উহাকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। বস্তুতঃ আরবীয় আলজাবরা ও দশমিক বিদ্যা সর্ব প্রথম তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই ল্যাটিন দুনিয়ায় জনপ্রিয় হইয়া উঠে। আল-খাওয়ারিজমের নাম অনুযায়ী এই বিদ্যা Algo Rism নামে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের প্রাথমিক ও সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান করা হইতেছে। ইউরোপে আরবদের 'আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে' জনপ্রিয় করিয়া তোলার ব্যাপারে যাহাদের বিশেষ দান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্রিমোনার জরার্ড্‌ (Gerard of Crimona)-এর নাম চিরদিন শীর্ষস্থানে বিরাজ করিবে।

তিনি কর্ডোভায় জীবনের পঞ্চাশটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় যাটখানি গ্রন্থের আরবী অনুবাদ সংগে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। বতলীমুসের বিখ্যাত গ্রন্থ Almagest ও আল্‌-হায়সাম-এর খগোল সম্পর্কীয় গ্রন্থখানি উহাদের মধ্যে শামিল ছিল। বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ মিকাইল স্কট (Michael Scot) নিজ জীবনে বহু সংখ্যকবার কর্ডোভার পর্যটন করিয়াছেন। প্রত্যেকবারই সমসাময়িক

আরবের উন্নত গ্রন্থাবলী সংগে লইয়া আসিয়াছেন এবং তাহা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। স্পেনে ইউরোপীয় ছাত্রদের অনুপ্রবেশ ও আরবী গ্রন্থাদীর অনুবাদকরণ আন্দালুসিয়ায় মুসলিম শাসন আমলে প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। রোজার বেকনের (Roger Bacon) আন্তরিক বন্ধু রায়মণ্ড লুলী (Raymond Lully) এবং ভীলেনীভ-এর আরনল্ড (Arnold of villeneuve) আন্দালুসিয়াতেই মুসলমানদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও মোণ্ট পীলিয়ার (Mont Pellier)-এ আজীবন শিক্ষাদানের কাজ করেন। নভারা'র কম্পানোস্ (Companus of Novara) কর্ডোভাতেই অংক শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং ভিয়েনায় উহারই শিক্ষাদান করিতে থাকেন। আন্দালুসিয়ায় মুসলিম শাসন সমাপ্ত হইলে আলফান্সো তলিতলায় যথারীতি বিদ্যালয় কায়েম করিয়া আরবী কিতাবসমূহের অনুবাদ করার কাজ ব্যাপক ভাবে শুরু করাইয়া দেন।

খৃষ্টানদের অপেক্ষা ইহুদীজাতি ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে সর্বাধিক উপকৃত হইয়াছে। সারা-দুনিয়ার ইহুদী শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, চিকিৎসক, ভূগোল রচয়িতা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ব্যক্তিগণ কর্ডোভা ও বাগদাদে সমবেত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ফিরাউনীর গোলামীর অক্টোপাশ হইতে মুক্তি লাভের পর ইহুদী জাতি দুনিয়ার কোন অংশে কিছুমাত্র আশ্রয় লাভ করিয়া থাকিলে তবে তাহা এইসব স্থানেই সম্ভব হইয়াছে। যালে তাহারা কেবল খৃষ্টানদের জুলুম-নিষ্পেষণ ও নির্যাতন শোষণ হইতেই সুরক্ষিত থাকে নাই, জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের মহান মানবীয় সাম্য ও রাজনৈতিক ইনছাফ তাহাদিগকে নিরাপদ আশ্রয় দান করিয়াছে। আন্দালুসিয়া পুনর্বার যখন বিদ্বেষী খৃষ্টানদের কবলিত হইয়া পড়ে, তখন যে-সব ইয়াহুদী মনীষী কর্ডোভা, তলিতোলা, আশবিলীয়া ও গ্রানাডায় শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, তাহারই নিরাপত্তার সন্ধানে দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর ইহারা যেখানেই উপনীত হইয়াছে, সেই খানেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্মল আলোক রশ্মি সংগে করিয়া লইয়া গিয়াছে। এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের প্রতিটি কোণায় আধুনিক "জ্ঞান-বিজ্ঞান" ও উন্নত ইসলামী সংস্কৃতির অবিনশ্বর স্বাক্ষর সংস্থাপন করিয়াছে। ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় ধর্মই এই ধরণের "অত্যাধুনিকতা বিরোধী বটে; কিন্তু ইতিহাস আমাদের সম্মুখে মধ্য যুগের এক উজ্জল চিত্র উপস্থাপিত করে। আমরা দেখিতে পাই, ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ ইউরোপের বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে নীরবনিস্তব্ধ ও জনশূন্য খানকাহ্ সমূহে চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, ভূগোল, ধর্ম ও তর্কশাস্ত্রের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ সম্পর্কে চিন্তার আদান-প্রদান করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। ফরাসী ও জার্মান পাদ্রীগণ এই সব "যাযাবরদের" নিকট হইতেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এমন কি, হিলৃডিগার্ড ও রোস-উইথার ন্যায় বিখ্যাত ও সুপরিচিত খৃরিজীয়ান খৃষ্টান খান্কা সমূহেরও আত্মগোপনকারী পাদ্রী সিষ্টাররা চুরি করিয়া এইসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমিয় ফল্গুধারা আকণ্ঠ পান করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে, ইহুদীগণ জার্মানীর নারবুনে কিমহিস ও বৈন-আজরা নামে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছিল। এইসব বিদ্যালয়ে কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত কেবল আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে-কেই সাধারণভাবে জনপ্রিয় করিয়া তোলার কাজ সম্পন্ন হয় নাই, তাহারা নিজদের সংগে যত সংখ্যক আরবী গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে খৃষ্টান ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজও করিতে লাগিল। বহু সংখ্যক ইহুদী পণ্ডিত নরমেণ্ডীর উইলিয়মের সংগে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সেখানে তাহারা প্রথমতঃ পাথর দ্বারা কতগুলি ঘরবাড়ী নির্মাণ করেন। যেগুলি লিংকন ও সিণ্ট্ এড্মণ্ডসবুরী আজিও বিরাজমান রহিয়াছে। স্পেনের এইসব মুহাজির-গণই অক্সফোর্ডে বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম স্কুল স্থাপন করেন। এই অক্সফোর্ড স্কুলেই উক্ত মুহাজিরদের অধঃস্তন পুরুষগণ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে রোজারবেকন কেবল আরবী ভাষাই শিক্ষালাভ করেন নাই, আরবীয় বিজ্ঞানের সহিতও তিনি এইখানেই পরিচিত হন।

বিদ্বিষ্ট ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের প্রভাবের গুরুত্ব হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রোজার বেকনকে এমন এক উচ্চতর স্থান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন যাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অশোভনীয়। বলা হয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে নীতির পরিবর্তে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপকারী প্রথম ইউরোপীয় গবেষক হইতেছেন এই রোজার বেকন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোজার বেকন এই উপাধি লাভ করার বিন্দুমাত্র অধিকারী হইতে পারেন না। কেননা এই ব্যক্তি ছিলেন মুসলমানদের ছাত্র। তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ করিয়া থাকিলে তাহা শুধু এতটুকুই যে, খৃষ্টান ইউরোপকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আরবদের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল

সমূহের সহিত সর্বপ্রথম পরিচিত করিয়াছেন মাত্র। এই কথাটি তাহার মুখে প্রতিনিয়তই উচ্চারিত হইত যে, "আরবী ভাষা ও আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ কেবল তাঁহার পক্ষেই নহে, তাঁহার সকল খৃষ্টান সমসাময়িক পণ্ডিতদের পক্ষেও প্রকৃত বস্তু জ্ঞান লাভ করার সর্বশেষ উপায়রূপে গণ্য হইয়াছে।" বর্তমান সময় মুসলমানগণ বিজ্ঞান, আধুনিক যাবতীয় বিদ্যা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারেন যে, কর্ডোভা অধিকারের পর খৃষ্টান "মুজাহিদগণ" মুসলিম মণীষীদের মূল্যবান গ্রন্থাবলী হস্তগত করিয়া লয়। ইহারই শত সহস্র সংখ্যক গ্রন্থ আজিও মাদ্রিদ, প্যারিস, লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও রোমের যাদুঘরসমূহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছে। এই গ্রন্থাবলী হইতে তাহারা নিজেরা তো পুরামাত্রায় উপকৃত ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে; কিন্তু মুসলিম মণীষীকে তাহা দেখিবার কিংবা তাহা অধ্যয়ন করিবার অনুমতি মাত্র দেয় নাই। ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞানের নাম আসিলেই ইউরোপ নিজেদের লজ্জা গোপন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ রহস্যজনক আচরণ অবলম্বন করিয়া থাকে।

এ-যুগের ঐতিহাসিকদের অবিচার

বর্তমানকালে ইউরোপের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানের শিক্ষাদান কালে এক বিশেষ ষড়যন্ত্র স্বরূপ উহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্ভাবক মুসলিম মণীষীও গবেষণাকারীদের নাম উহ্য রাখিতেই বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের নেতৃত্ব বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পন্থাসমূহের সূচনা—এই সব কিছুই রোজারবেকন কিংবা তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতদের কৃতিত্ব বলিয়া প্রচার করা হয়। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার প্রসংগে এ্যামালফির ফ্লেভিও জিওজার (Favio Geoja of Amalfi) নাম, আলকোহল প্রসংগে আরনল্ডের নাম ও বারুদ (Gun powder) আবিষ্কারে বেকন কিংবা শাওয়ারজ (Schwartz)-এর উল্লেখ করা হয়—বলা হয় ইঁহারাই এই সব জিনিষের আবিষ্কর্তা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা দ্বারা ইউরোপের রেনেসাঁর সূচনাকে আচ্ছন্ন ও গোপন করিয়া রাখার নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্রের জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র। আরবদের বাস্তব পরীক্ষামূলক কর্মনীতি বেকনের যুগে সমগ্র ইউরোপের কেবল জ্ঞানই ছিল না, বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তদনুযায়ী কাজও করিতেছিলেন। ইডিলার্ড, আলেকজাণ্ডার ভিন্‌সিন্ট্ ও বার্ণার্ড প্লোষ্টার্স প্রমুখ মনীষীগণ এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান বেকনেরও বহু পূর্বে ইউরোপে ছড়াইয়া দিয়াছেন। বার্ণার্ড তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি প্রচার করিয়া দেন এবং সংগে সংগে তোমাস ও আলবার্টস মেগনাসও নিজ নিজ গ্রন্থের সাহায্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই ষড়যন্ত্রের গোপন কথা সর্বত্র প্রচার করিয়া দেন।

আন্দালুসিয়ার ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আশ্চর্যজনক উৎকর্ষ লাভ করে। এই সব চিকিৎসা-বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইহুদীগণ আন্দালুসিয়ার পতনের পর খৃষ্টানদের অমানুষিক অত্যাচার নিষ্পেষনের ভয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ইহারা ইসলামী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে সব সময়ই নিজেদের বুকের সংগে লাগাইয়া রাখিতে অভ্যস্থ ছিল। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচারকারী ছিলেন এই ইহুদীরাই। আরবগণ ঔষধের যে মূল উৎস আবিষ্কার করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে উহার ব্যবহার ও উপকারিতা আজ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। আধুনিক যুগের কয়েকটি কৃত্রিম ঔষধি এবং Argano Therapic Preparation কয়েকটি ব্যতীত আজ পর্যন্ত যে সব ঔষধ জংগলের গাছ-গাছড়া হইতে তৈয়ার করা হইতেছে, তাহাতে সরাসরি আরবদেরই অনুসরণ করা হইতেছে। প্রভৃতি ধরণের সমস্ত ঔষধই—এমনকি আধুনিক কালের ঔষধের তালিকা (প্রেসক্রিপসন) রচনা ও তৈয়ার করণের সহিত খালেছ আরবদের চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। মোন্ট পেলীয়ার-এ ইউরোপের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল কর্ডোভার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এবং মুসলিম মনীষীদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ও আন্দালুসিয়া প্রত্যাগত ইহুদীগণই ছিলেন উহার পর্যবেক্ষক ও উস্তাদ। এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পাদুয়ায় দ্বিতীয় এবং পিলিয়ায় তৃতীয় মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ইহাতে আরবদের খগোল দর্শন ও অংক শাস্ত্রের শিক্ষাদান ব্যতীত ইবনে সীনার প্রখ্যাত গ্রন্থ "আইন" ও আবুল কাসেমের "অস্ত্রোপচার" পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়ানো হইত। এখানে এ-কথাও অপ্রাসংগিক হইবেনা যে, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে এই গ্রন্থদ্বয় চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার শিক্ষা দানের জন্য পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরোল্লিখিত তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল অন্ধকার যুগে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান ও বিস্তার সাধনের প্রাথমিক প্রচেষ্টার বাস্তব প্রতীক। এইখান হইতেই উত্তর কালে ফেলোপিয়াস, ভেসালিয়াস, কার্ডন, হার্ভে, গ্যাস্লেলিও প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মণীষীগণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুত: একাদশ ও দ্বাদশ শতকের মুসলিম মণীষীদের অপূর্ব জ্ঞান শক্তিই বস্তু ও মানসিক জগতের বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সময়ের খগোল, রসায়ন, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত যাবতীয় হয় এবং ইউরোপ তাহা সরাসরিভাবে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে আপন করিয়া গ্রহণ করে। এই সমস্ত বিদ্যা ও বিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে হউক কি আংশিকভাবে হউক সরাসরি ইসলামী সংস্কৃতি, তাহজীব ও তমদ্দুনের এক অমূল্য উপঢৌকন কৃতঘ্ন ইউরোপ তাহা যতই অস্বীকার করুক না কেন, ধরিত্রীর স্থিতি পর্যন্ত তাহার শোকৃরিয়া আদায় করা বাস্তবিকই সম্ভব নহে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের যেখানেই যাহা কিছু বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক কর্ম তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা সবই কোন সংশোধন ও পরিবর্ধন ব্যতিরেকেই ইসলামী জ্ঞান ও তথ্য এবং বিদ্যা সমূহ সঞ্চয় করার উপর নির্ভরশীল ছিল। পর্তুগালের রাজপুত্র হেন্‌রী আরব ও ইহুদী মনীষীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কেপ্‌সেন্ট্‌ ভীন্‌সেন্ট-এ সামুদ্রিক একাডেমীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার ফলে কেবল ভাস্কো ডি গামার জন্যই বিশ্বআবিষ্কারের পথ সুগম হয় নাই, সমগ্র দুনিয়ার সমুদ্রের উপর সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের জন্য রাজপথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে অংক শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহা মূলতঃ লেওনার্ডি ফেবোনাসীর ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকাপোসিও লী ইহার অনুবাদ করেন।

এক কথায় বলা হয়, ইসলামী সংস্কৃতি বিজ্ঞানের অপূর্ব অবদান পেশ করিয়া বর্তমান যুগ-সভ্যতার উপর যে বিপুল অনুগ্রহ করিয়াছে, মানব সভ্যতা চিরদিনই উহার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। এ-কথায় সন্দেহ নাই, মুসলিম মণীষীগণ বাগ্‌দাদ ও কর্ডোভা নগরে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে ক্ষেত রচনা করিয়াছিলেন তাহা খুব বিলম্বেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং উহাতে ফসল ধরিয়াছে আরো অনেক দেরীতে। আজ দুনিয়ার মুসলিমগণ ঠিক তেমনি ধরণেরই চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, ইউরোপে ইস্‌লামের অনুপ্রবেশের পূর্বে আন্দালুসিয়া যেরূপ ছিল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু তাহারা বিজ্ঞানের অন্তরালে যে বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাহাই এক রক্তপিপাসু হিংস্র দানবের রূপে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপকে মূর্খতা, পাশবিকতা, বর্বরতা ও চরম অধ্যাতির গভীর গহ্বর হইতে মুক্তিদানকারী কেবল বিজ্ঞানই নহে, ইস্‌লামী সভ্য সংস্কৃতির আরো অসংখ্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও উহাতে শরীক রহিয়াছে। আর প্রকৃতপক্ষে এই সব কার্যকারণ ও অন্তর্নিহিত কর্মতৎপরতার অনুসন্ধান করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

* [মুহাম্মদ নাযীর রচিত "বিজ্ঞানের অগ্রগতি" নামক গ্রন্থের "মুসলমান আওর সাইন্স" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত]
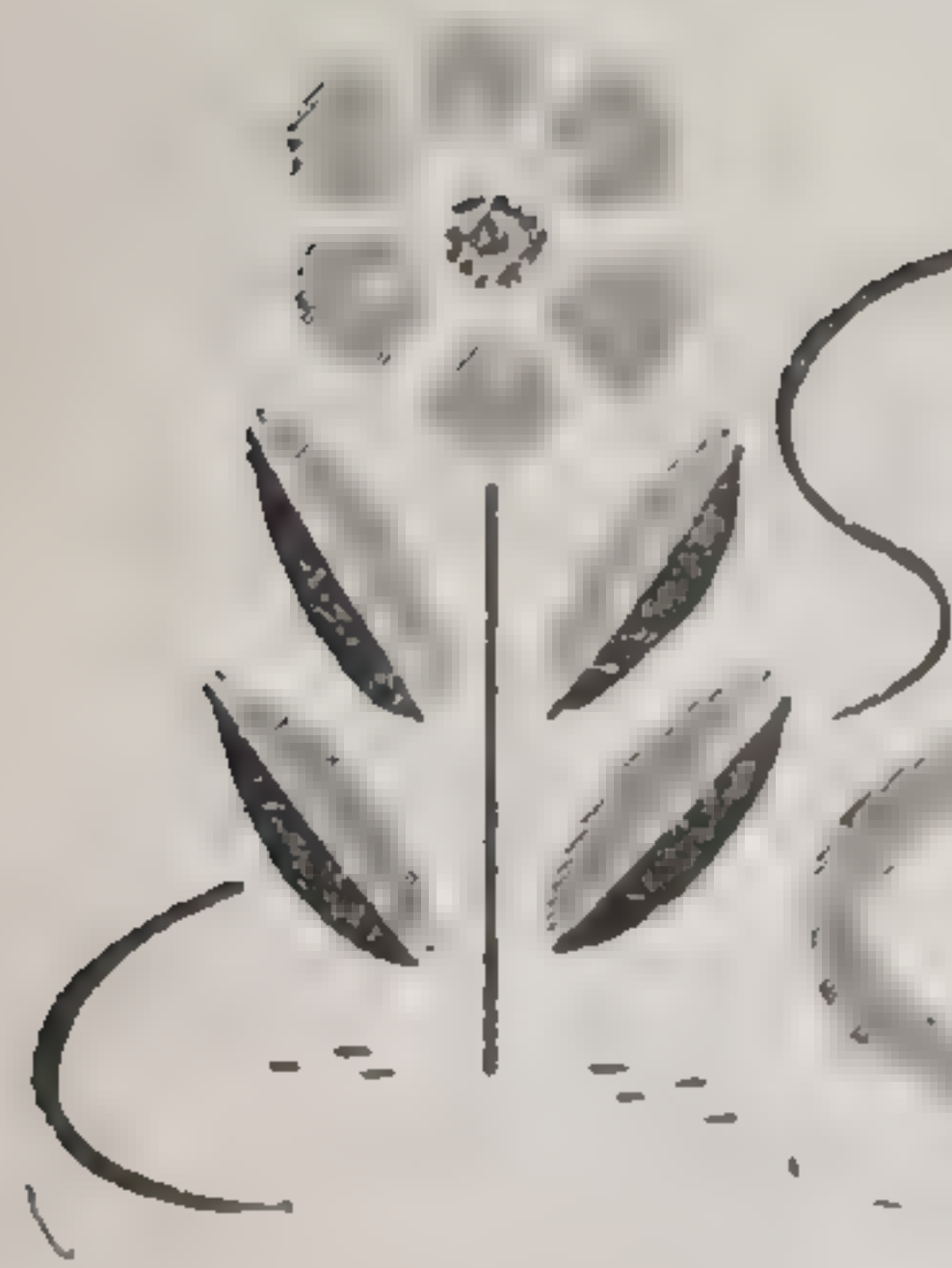
একটি কবিতা

হাবীবুর রহমান

ধরণীর ধূলির শয্যায়
দিনান্তের ঢলে পড়া সূর্য নামে ধীরে,
শঙ্কাকুল শ্রান্তক্লান্ত
আমাদের চলাপথ ঘিরে।
তাপক্লিষ্ট দিবসের
মৌণ ফিকে ম্লান রশ্মি রেখা
মেখে দেয় রাঙারঙে
বাণীশূন্য তার জয়লেখা।
মন্থর রাতের ছায়া এখানে দাঁড়ায় নম্রশিরে,
পুঞ্জিত তারকা গুচ্ছ শ্লথ আঁখি মেলে
চেয়ে চেয়ে দেখে এই ধূসর পৃথ্বীরে।
স্তিমিত আকাশ-পটে দূর আঙ্গিনায়
মলিনাভ চাঁদ ঝরা আলো,
সাইমূম উত্থিত এ-মাটির ধূলায়
কেঁপে উঠে, প্লাবন নামালো।
দুর্দিনের চাপা নিঃশ্বাস
উড়ায়ে উড়ায়ে নেয় সীমাহীন পথে,
ব্যথা-দীর্ণ কাহিনীর একরাশ পাতা—
কারা যেন মাতে আজ জড়ো করা ব্রতে।
রজনী শেষের কা'র বেলালী আজান
উষার ডানায় ভর করে
মখ্‌মল বুটিদার কিংখাব বিছায়
কাঁকর ছড়ানো মাটি 'পরে।
মেহেদী পাতার বুকে রঙীন হারেমে
গোলাপের লাল কচিবাগে
রতন খচিত দীপ্ত ভোরের ইশারা
মনে দোলা লাগে।
দিনের প্রখর সূর্যালোকে ভয়ার্ত স্বপ্নেরা মিশে
যায়,
স্বপ্ন ছাওয়া দীর্ঘপথ রেখা
দেখা দেয় বুকবাঁধা অনেক আশায়।
কতনা দিনের সেই আশায় রাঙানো
পথের উড়ন্ত যত ধূলি,
কত যে বিজয়-বার্তা রেখে গেছে পৃথিবীতে
সাক্ষী তার ধূলিকীর্ণ শত শহীদের শির
খুলি।
কত দরিয়ার পাশ ঘেসে ঘেসে
বেঁকে গেছে ঐ-স্বপ্নিল রেখা,
কত রিক্ত আঁধারের বিয়াবান শেষে
মিলেছে বাঞ্ছিত তার দেখা!

বাঁকে বাঁকে বয়ে যায়

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

(পূর্ব্ব প্রকাশতের পর)

॥ পঁচিশ ॥

মন শুধু হালকা নয়, কেমন যেন আলগা হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বে এত মাধুর্য আছে? হোমায়েরা নিজের মাঝে নিজেকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতেছিল, আর বিস্ময়ে হতবাক হইতেছিল।

শত আনন্দের ধারা সারা বিশ্বের সকল বস্তু হইতে উৎসারিত হইয়া একই সাথে হোমায়েরার মনে আঘাত দিতেছিল। অজানা পুলক বেদনায় সে আপনি মুর্চ্ছিত। কিছুতেই তাহার মন বসিতেছিল না।

ছুটি লইয়া কয়েকটি দিন নিরিবিলি কাটাইয়া দিবে বলিয়া হোমায়েরা ভাবিতেছিল।

হোমায়েরার বাড়ীর সব কয়টি কামরায় কিছুটা রদবদল হইয়াছে। তাহার বেড রুমে তাহার নিজের বড় ছবিখানার সামনে দেওয়ালের খালি জায়গায় অন্য ছবি দেওয়ার কথা বলিয়া জুলি একদিন ধমক খাইয়াছিল। এবার হোমায়েরা নিজেই এ সম্পর্কে কথা পাড়িল। জুলিকে বলিল, এ জায়গাটা বড্ড খালি দেখা যায়, কি বলো জুলি?

জুলি খুশি হইয়া বলিল, আমিও ত তাই বলি, আপা। এতে খারাপ দেখায়।

হোমায়েরা বলিল, তোমার কথাই ঠিক, জুলি।

জুলি বলিল, আপনার ছবির সমান সাইজের একখানা ছবি এখানে দিয়ে দিই, আপা? তাই দাও।

কি ছবি এখানে দেওয়া যায় তাহা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য বলিয়া জুলির মনে হইল। সে একখানা ছবি এনলার্জ করিয়া বাঁধাই করিয়া আনার জন্য পাঠাইয়া দিল। একদিন ফিরিয়া আসিয়া হোমায়েরা দেখিল তাহার ছবির সামনেই জাফর কামালের একখানা বড় ছবি ঝুলিতেছে। জাফর তাহার দিকে চাহিয়া সেই অতি পরিচিত অশোভন মনে হইলেও আপত্তি করা যায় না হাসি হাসিতেছে।

হোমায়েরা জুলিকে ডাকিয়া বলিল, ভারী দুষ্টু হয়েছ তুমি!

হোমায়েরা কোপ প্রকাশ করিলেও তাহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া জুলি হাসিয়া পালাইয়া গেল।

হোমায়েরা ভবিষ্যতের চিত্র যত আঁকিতে লাগিল ততই তাহার লজ্জা করিতেছিল। এ-জন্য সে নিজেও বড় কম অবাক হইতেছিল না। শরমে লাল হইয়া উঠার বয়স তাহার চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার ধারণা। তাহা ছাড়া বিবাহের ব্যাপারে সে ত আর অনভিজ্ঞ নয়। যখন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তখন মুহূর্তে মুহূর্তে পুলকিত আর লজ্জিত হইয়া উঠার কথা ছিল। কিন্তু কৈ, সে সময় ত নিজের সাথে এ-ভাবে তাহার পরিচয় হয় নাই! আজ যেন এক অজানা আনন্দ আর আশঙ্কার পয়গাম লইয়া এক নূতন ব্যক্তি তাহার মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে, যে বয়সে তাহার চেয়ে অনেক ছোট এবং জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

মন ভবিষ্যতের উপর নূতন নূতন রেখা টানিয়া চলিলেও কিছুই যেন স্থির হইয়া উঠিতেছিল না। কয়েক দিন পরে এই বাড়ী এই ঘর কি এই রূপই থাকিবে?

হোমায়েরার যথেষ্ট ভয় রহিয়াছে, জাফর তাহার স্বাতন্ত্র্য মানিতে চাহিবে না। আলাদা বাড়ীতে থাকিতে দিতে জাফর যে কিছুতেই রাজী হইবে না, সে-সম্পর্কে হোমায়েরার সংশয় ছিল না। কিন্তু হোমায়েরা কিছুতেই এ-সম্পর্কে মনস্থির করিতে পারিতেছি না। এ বাড়ী না হয় ভাড়া বাড়ী, হোমায়েরার নিজের বাড়ীর কাজও ত অল্প দিনের মাঝে শুরু হইবে। নিজের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া দিয়া সে কিছুই ভাবিতে পারিতেছিল না।

তা ছাড়া জুলি আছে। জুলির কথা সে না ভাবিয়া পারে না। মনে মনে যে পরিকল্পনা সে করিয়াছে, তাহা সফল হইলে জুলির জন্য দুর্ভাবনা তাহার থাকিবে না। সুপাত্রে জুলিকে সমর্পণ করিতে পারিলেই সে দায়মুক্ত হইবে।

কিন্তু শুধু সুবিধা অসুবিধার কথাই ত নয়, ইহা অপেক্ষা অনেক বড় প্রশ্ন হোমায়েরার মনকে পীড়া দিতেছে। নিজেকে নিজেকে মত করিয়া বাঁচাইয়া রাখার জন্যই এতদিন ধরিয়া সে সকলের বিরুদ্ধে একা যুঝিয়া আসিয়াছে। তাহার আশঙ্কা হইতেছে, নিজের চার পাশের সব সীমানা তুলিয়া দেওয়ারই দাওত আসিয়াছে। কিন্তু এ সমস্যার কি কোন ফয়সালা নাই? দুইটি ধারা যুক্ত হইয়া অবাধগতিতে চলিবে, কিন্তু সূক্ষ্ম ব্যবধানকে কখনও অতিক্রম করিবে না, এমন কি হয় না?

ছুটি নেওয়ার কথা শুনিয়া জাফর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ছুটি নেবে কেন?

হোমায়েরা বলিয়াছিল, বা রে, আমার কি বিশ্রামের দরকার নাই?

জাফর বলিয়াছিল, আমিই ত বলি খুব দরকার আছে। তুমি যতটুকু ভাব তার চেয়েও বেশী দরকার আছে। তাই ত আমি বলছি, তুমি ইস্তেফা দাও।

কিসে ইস্তেফা দেব?

কাজে।

জাফর আবার দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল, কেন নয়? কিসের দুঃখে তুমি চাকুরী করবে?

হোমায়েরা বলিয়াছিল, তা না হলে চলবে কেন?

জাফর তরল ভাবে হাসিয়া বলিয়াছিল, না চলে আমার কোনও একটি ফার্ম্মে তোমাকে চাকুরী দিয়ে দেব।

হোমায়েরা বুঝিয়াছিল, ইহা লইয়া জাফরের সহিত তাহার বুঝাপড়ার প্রয়োজন হইবে। জাফরের অনেক আছে, কাজেই হোমায়েরাকে চাকুরী হইতে সরিয়া আসার জন্য সে বলিতে পারে। কিন্তু জাফরের অনেক আছে বলিয়া হোমায়েরা ত তাহাতে ডুবিতে পারিবে না।

সে সময় এ সব লইয়া জাফরের সহিত তর্ক করিতে তাহার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু জাফরের মত ধনী লোকদের ঘরের গৃহিনীদের কথা স্মরণ করিয়া তাহার গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিয়াছিল।

জগত তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িবে, হোমায়েরা সেটা চিরদিনই কামনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য কোন সহজ পথের ছক কাটিয়া সে রাখে নাই। মেয়েলোক বলিয়া যে বাধা সে পায়ে পায়ে অনুভব করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করার আগ্রহ তাহার বুকে বার বার ফেনাইয়া উঠিয়া থাকে। সে জন্য সে সব করিতে রাজি আছে। কিন্তু ধনী ঘরের গৃহিনীদের ভাগ্যের জন্য সে কখনও ঈর্ষা বোধ করে নাই।

এটা তাহাদের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, তাহাও সে আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ঘরে বাহিরে ইহাদের কোন দায়িত্ব নাই। সংসারে ইহারা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। পুরুষ ইহাদের ভরণপোষণ করে, ভোগের সামগ্রী জোগায়, শুধু মাত্র ভোগ করার জন্য। অন্য কোন কাজেই ইহারা লাগে না।

নিজের জন্য এ-অবস্থা ভাবিতেও হোমায়েরার ঘৃণা হয়। নিজেকে দায়মুক্ত করিয়া নয়, বৃহত্তর দায়িত্ব বহন করিয়াই সে জীবনকে ভোগ করিতে চাহে। তাহার নারীত্ব ও তাহার মনুষ্যত্বকে এক করিয়া তোলার জন্যই ত এতকাল সে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। দায়িত্বহীন ভোগে তাহার চিত্ত সায় দিলে সে পথই সে সন্ধান করিত। কিন্তু বরাবর সে সেই পথ এড়াইয়াই চলিয়াছে।

কিন্তু জাফর যদি তাহাকে বুঝিতে না চায়? এত কাল যে সে অল্পে অল্পে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জাফরের নিকট পরিচিত করাইয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছে। জাফর তাহাকে ভোগের বস্তু হিসাবে কামনা করিবে না, তাহাকে জীবনের সমান অংশীদার সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, ইহাই সে চাহিয়াছে। মন তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আজ আগপিছ ভাবিতেও তাহার কষ্ট হয়। এতদিনের চেষ্টা সবই যদি তাহার ব্যর্থ হইয়া থাকে সে কি করিতে পারে? নিজের মনেই যে আজ সে নিঃস্ব হইতে চলিয়াছে। তাহার গুঞ্জনমুখর চিত্ত কিছুতেই মনের আর্তনাদে সাড়া দিতেছে না।

হোমায়েরার ছুটি নেওয়া হয় নাই। জরুরী কাজে তাহাকে আটকা পড়িয়া যাইতে হইল। ইতিমধ্যে তাহাকে মফঃস্বলও যাইতে হইয়াছিল। সে বুঝিল ইহাতে ভালই হইয়াছে। মনকে একা পাইলে তাহার সহিত বুঝাপড়া করা কঠিন হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ব্যস্ত থাকিলে বুঝাপড়ার দায় থাকে না।

হোমায়েরার মনে ইদানীং মাঝে মাঝে তাহার আব্বা ও ফুফু আম্মার কথা উঠিয়াছে।

কি দরকার ছিল উঁদের সাথে এ-ভাবে আড়ি দিয়ে চলার; সে ভাবিয়াছে।

আবার ভাবিয়াছে, আমি ত আড়ি দেই নাই। উঁহারা আমাকে পছন্দ করেন নাই, আমি সরিয়া আসিয়া আমার নিজের পথে চলিয়াছি। কিন্তু এতদিন ত তাঁদের কথা না ভাবিয়াও চলিয়াছে, আজ তবে ভাবনা আসিতেছে কেন?

দুঃখ একা একা ভোগ করা যায়, দুঃখের কেহ সাথী

নাই, আবার সাথী জুটাইতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আনন্দ সবাইকে লইয়া ভোগ করিতে হয়, সঙ্গী সাথী জুটাইতে না পারিলে আনন্দ আনন্দই থাকে না। অবশ্য হোমায়েরার জীবনটি সুখের কি দুঃখের, তাহা হোমায়েরাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাওয়া বৃথা। আর আজ যে সে খুব আনন্দিত, তাহাও সে স্বীকার করিবে না। কিন্তু কেমন যেন সবাইর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা তাহার মনে মুকুলিত হইয়া চলিয়াছে।

নিজের দিক হইতে যোগাযোগ সৃষ্টি করার সঙ্কোচ হোমায়েরা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হাসান সাহেব এবং রহিমা বেগম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। তাঁহাদের তরফ হইতে আগ্রহ দেখান উচিত।

কিন্তু তাঁহারা যদি আগ্রহ না দেখান ?

তাহা হইলে হোমায়েরা কেন যাইবে তাহাদের কাছে ? কেন ?

তবু হোমায়েরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে জানিত জামাল তখনও দেশের বাড়ীতে। সে দেশের বাড়ীর ঠিকানায় জামালের নামে চিঠি লিখিল। অধীর আগ্রহে সে জামালের জওয়াবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দিন যাইতে লাগিল, চিঠির কোন জওয়াব আসিল না।

হোমায়েরা নিরাশ হইয়া পড়িল। এতদিন হোমায়েরার মনে একটি দর্পিত আত্মতৃপ্তি ছিল যে, সে সবাইকে এড়াইয়া চলিয়াছে, কিন্তু জামালের কাছে লেখা চিঠির জওয়াব না পাওয়ায় এটা অন্যভাবে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল। অন্য কোন সময় হইলে ইহাকে সে তুচ্ছ করিত, কিন্তু আজ তাহার মনে হইল সবাই তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে। তাহার মনের ভিতর পাক খাইয়া উঠিল। সে শুধু মনে মনে বলিল, কি আর হলো এতে আমার ! ওরা আমার কি আর করতে পারে !

কিন্তু হোমায়েরা কিছুতেই নিজের মনকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না। হয় ত জামাল তাহার চিঠি পায় নাই, এই ভাবিয়া সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতেছিল। অবশেষে আবার জামালের কাছে চিঠি লিখিবে বলিয়া সে স্থির করিল।

পরের চিঠিরও জওয়াব আসিল না। তবে এবার হোমায়েরাকে এ-জন্য আর কিছু ভাবিতে হইল না। চিঠি ডাকে দেওয়ার পরই সে খবর পাইয়াছিল, জামাল বাড়ীতে নাই। জামাল ইতিহাসের ছাত্র হইলেও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন আগ্রহ আছে বলিয়া হোমায়েরার জানা ছিল না। ছবি আঁকার সখের কথা হোমায়েরা জানিত। তবে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ছবি আঁকার খেয়াল তাহার ছাড়িয়া গিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর অধ্যাপনায় সে মশগুল হইয়া পড়িয়াছিল। এ-সম্পর্কে অতিরিক্ত কোন আগ্রহ তাহার ছিল না বলিয়াই হোমায়েরা জানিত।

জামালের ছুটি শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে ছুটির মেয়াদ আরও বাড়াইয়া লইয়াছে। নানা জায়গায় ঐতিহাসিক তথ্য সে সন্ধান করিয়া ছুটি কাটাইতেছে। এ সম্পর্কে তাহার থিসিস তৈয়ার করার ইচ্ছা আছে বলিয়া হোমায়েরা শুনিয়াছে।

ইহা শুনিয়া হোমায়েরা আমোদ পাইয়াছিল। জামালকে কাছে পাইলে সে বেশ একটু ঠাট্টা করিয়া নিত বলিয়া হোমায়েরা ভাবিয়াছিল। প্রেমে ব্যর্থতা যদি কর্মপ্রেরণার উৎস হয়, তাহা হইলে এটা তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে !

হোমায়েরার কল্পনা বেশীদূর অগ্রসর না হইলেও সে বুঝিতে পারিল, বনে বাদাড়ে পথে অপথে জামাল দুঃখের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতেছে, এটা ত শুধু নয়া ভিত্তি স্থাপনের জন্য নয়। তাহাকে দুঃখের পথে ঠেলিয়া দিয়া কাহারই বা কি লাভ হইল, সে মীমাংসা হোমায়েরা কোন দিনই কি করিয়া উঠিতে পারিবে ?

বর্তমানে জামাল কোথায় আছে, তাহা জানার জন্য হোমায়েরা অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। সে কিছুতেই তাহার ঠিকানা বাহির করিতে পারিল না।

জাফরের সহিত হোমায়েরার দেখা সাক্ষাৎ কমিয়া আসিয়াছে। হোমায়েরা সহজে আর জাফরকে দেখা দিতে চাহে না, তাহাকে এড়াইয়া চলে। একটি সলাজ কল্পনা তাহার মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এটি তাহার চালাকি। দুইদিন পরে দুইটি জীবন একসূত্রে গাঁথা হইয়া যাইবে। মাঝখানে কয়েক দিন আড়াল রচনা করিয়া, লুকোচুরি খেলিয়া সময়টার স্বাদ কত বেশী আস্বাদন করা যায়, তাহাই সে দেখিতেছে। কৃত্রিম ব্যবধান মিলনের মাধুর্যকে গাঢ় করিয়া তুলিবে। ভাবিতে গিয়া শরম পাইলেও হোমায়েরার ইহা ভাবিতে ভাল লাগে।

বারান্দার একপাশে জুলি দাঁড়াইয়াছিল। কুঞ্জলতা রেলিং জড়াইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ফাঁক দিয়া রাস্তায় লোক চলাচল ছবির মত দেখা যায়। জুলি একমনে তাহাই দেখিতেছিল।

জুলি !

ঠিক কানের কাছে ডাক শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। রহমান যে এখানে আসিতে পারে সে কথা তাহার

কিছুতে মনে হয় নাই। চকিতে তাহার দিকে চাহিয়া জুলি বলিল, আপনি এখানে?

কোন অন্যায় হয়েছে কি, জুলি?

না, না, কিন্তু—

রহমান জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কি, জুলি?

জুলি কথা খুঁজিয়া পাইল না। রহমান আবার বলিল, কি বললে না, জুলি!

গুছাইয়া কথা বলা সম্ভব হইতেছিল না। জুলি শুধু বলিল, আপনি যান।

রহমান সরিয়া গিয়া ভারী গলায় বলিল, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, জুলি?

জুলির মুখের দিকে চাহিয়া রহমান জওয়াবের অপেক্ষা করিয়া রহিল। জুলি বলিল, কৈ? না ত।

রহমান বলিল, যান বললে কি থাকেন বুঝা যায়?

জুলিকে চুপ থাকিতে দেখিয়া রহমান বলিল, জওয়াব দাও।

জুলি বলিল, জানি না।

রহমান জুলির কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, জান না? তুমি ভারী নিষ্ঠুর, জুলি!

জুলি বলিল, যান, বাজে কথা।

রহমান বলিল, নিষ্ঠুর নাত কি? কতদিন হয়ে গেল তুমি আমার ওদিকে একবার ও গেলে না। কেন যাওনি, জুলি?

জুলির চিবুকে হাত দিয়া রহমান তাহার মুখ তুলিয়া ধরিল। জুলি সরিয়া গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রহমান আবার জিজ্ঞাসা করিল, কেন যাও না, জুলি? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

জুলি বলিল, না।

রহমান জিজ্ঞাসা করিল, তবে?

কিছু সময় চিন্তা করিয়া রহমান জিজ্ঞাসা করিল, আপা মানা করেছেন?

জুলি জওয়াব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। রহমান বলিল, কেন মানা করলেন? আপা কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, জুলি?

জুলি সংক্ষেপে বলিল, না।

তা হলে?

রহমানের বিস্মিত কণ্ঠ জুলিকে সচকিত করিয়া তুলিল। সে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে রহমানের দিকে তাকাইয়া পরক্ষণে মাথা নত করিল। জুলির সলজ্জ হাসিটি রহমানের চোখে রঙ মাখাইয়া দিল।

রহমান বলিল, তুমি যে আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুললে, জুলি। তুমি আমার উপর রাগ করো নাই। আপা আমার উপর অসন্তুষ্ট নন। আপা আমাকে স্নেহ করেন। তাঁর স্নেহের অমর্যাদা আমি করি নাই। কোন কালে করবোও না। কিন্তু কেন যে আপা তোমাকে আমার সামনে যেতে নিষেধ করে দিলেন, তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

রহমান বিব্রত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। জুলি চোখ তুলিয়া মৃদু হাসিল।

রহমান বলিল, সত্যি বলছি, জুলি, আপার অসন্তোষের কারণ হয়ে আমি এখানে থাকবো না, সে অসন্তোষ যত সামান্যই হউক না কেন। আমি গরীব। তবে স্নেহের মর্যাদা আমি বুঝি। আপা ফিরে এলেই আমি চলে যাবো।

জুলি বলিল, তা হলে আপা অসন্তুষ্ট হবেন।

রহমান বলিল, তবে তুমি বল, আসল ব্যাপার কি হয়েছে।

জুলি হাসিয়া বলিল, আমি বলবো না।

রহমান বলিল, আমিও না শুনে ছাড়বো না।

জুলি বলিল, ভাল লাগবে না।

রহমান বলিল, তবু!

জুলি বলিল, পুরুষের দিল বড় বেদরদ। পালালে ধরতে আসে, ধরতে গেলে ছুটে যায়।

রহমান বলিল, এটা কে বলে? আপা বুঝি?

হু!

রহমান হাসিয়া বলিল, ঠিক, ঠিক! এতক্ষণে বুঝলাম।

জুলি ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, কি বুঝলেন?

রহমান বলিল, যা বোঝার তাই বুঝলাম। আমার মন যাতে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসে এ-জন্য তোমাকে পালিয়ে থাকতে আপা বলেছেন।

ছাৎ!

রহমান অনুনয় করিয়া বলিল, সত্যি করে বলো না, জুলি, আমি যা বললাম তা সত্যি নয় কি? সাফ করে না শুনলে মন আমার কিছুতেই হালকা হবে না, জুলি।

জুলি বলিল, আপনার দুষ্টুমির কথা আমি আপাকে বলে দেব।

রহমান উৎফুল্ল হইয়া বলিল, তাই বলে দিও, জুলি, তাই বলে দিও। কি করে যে মনের কথা আপাকে বলি তা কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছি না। সাহস হচ্ছে না। তুমি সহায় হলে—

ইস!

জুলির দুই বাহু শক্ত মুঠিতে ধরিয়া রহমান বলিল, ইস্ কেন, জুলি? আমাকে কি তোমার ভাল লাগে না?

জুলি ছটফট করিয়া বলিল, ছাড়েন, ছাড়েন। ভারী দুষ্টু আপনি!

রহমান হাসিয়া বলিল, তুমি বড় ছেলেমানুষ, জুলি। আমার মনের ব্যাকুলতা তুমি বুঝতে পারছো না। কি করলে তুমি বুঝতে পারো, বলো ত।

জুলি বলিল, কাজ নেই আমার আর বুঝে।

রহমান বলিল, কাজ নেই? তা হলে থাক! চলি।

রহমান চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া জুলি ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, শুনেন। আমি কি সত্যিই বললাম!

রহমান ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মিথ্যে করে বললেও মনের কথাই বেরিয়ে যায়।

রহমান যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না। তাহার সামনে আগাইয়া গিয়া জুলি বলিল, রাগ করলেন?

জুলির দিকে না চাহিয়া রহমান উদাস ভাবে বলিল, রাগ করবো কার উপর, তুমি ত আমার কথা শুনতেই চাও না।

জুলি বলিল, কে বললো শুনিনে?

তুমি!

জুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহমান বলিল, আজকাল এত সেজেগুজে থাকো কেন।

জুলি জওয়াব দিল, আপা চান।

কেন?

আমি কি বলবো। আপাকে জিজ্ঞেস করবেন।

দূর, এ কি জিজ্ঞেস করা যায়! সত্যি তুমি বড় সুন্দর জুলি।

জুলি সলজ্জ ভাবে মাথা নত করিয়া বলিল, যা তা বলছেন কেন?

রহমান আগ্রহের সহিত বলিল, যা তা হলো কোথায়। সত্যি কথাই বলছি। রাজরাণীর মত তোমার এত রূপ দেখেই ত আমার সন্দেহ হয়।

কি?

আমার ভয় হয়, জুলি, আপা না অন্য ব্যবস্থা করে বসেন! আপা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তোমার কল্যাণ চান। তবে আমিও যে মেকি নই, সেটা আপাকে বুঝাই কেমন করে, জুলি?

ইচ্ছা থাকলেই হয়।

ইচ্ছা আছে, খুব ইচ্ছা আছে। তুমি যদি সহায় থাকো তা হলে বুঝাতে পারবো। তুমি এমন উদাস হয়ে থেকো না, জুলি।

জুলি মৃদু হাসিয়া বলিল, আপা বুঝবেন।

রহমান সাগ্রহে বলিল, সত্যি বলছো?

মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসার পর হোমায়েরা একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবে, জুলি তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু কাজে তাহার ঠিক উল্টোটি হইল। হোমায়েরা ঘরে বসিতেই চায় না, কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

জুলি কিছু বলিতে পারে না। সাহস করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া ধমক খাইয়াছিল। হোমায়েরা বলিয়াছিল, কতদিকে কত কাজ আছে, তোর এত শত খোঁজে দরকার কি?

জুলি মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হয়। এত কাজ কিসের বাপু! আর কাজ দুইদিন কি বসাইয়া রাখা যায় না? সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

সন্ধ্যা হয় হয় সময় জুলি রেডিওর চাবি ঘুরাইতেছিল, আর নিজের মনে গুণ গুণ করিয়া গানের কলি আওড়াইতেছিল। এমন সময় জাফর আসিয়া ডাকিল, জুলি!

জুলি ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে সঙ্কোচিত কণ্ঠে বলিল, আসুন।

জাফর বলিল, এসেই ত আছি। কিন্তু হোমায়েরা কোথায়?

আপা বাইরে গেছেন।

বাইরে গেছেন? বেশ!

জাফর দপ করিয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

জাফরকে কেমন যেন অবিন্যস্ত, অসুস্থ মনে হইতেছিল। জুলি অবশ্য মনে করিল এটা তাহার নিজেরই দোষ। জাফরকে কেন যেন তাহার কাছে বড় অস্বস্তিকর মনে হয়। কিন্তু এটা তাহার অন্যায়। জাফরের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া তাহার উচিত। আপাকে সে যে সম্মান-শ্রদ্ধা করে, জাফরকেও সেই সম্মান-শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

সে জাফরের কাছে গিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি শরীর ভাল নাই?

জাফর বলিল, আরে না।

জাফরের বলার ভঙ্গীটি জুলিকে ধাক্কা মারিয়া পিছনে ফেলিয়া দিল। সে বলিল, আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আসছি।

কিছু সময় পর জুলি চায়ের পেয়ালা হাতে আসিয়া ঢুকিল। জাফরের সামনে পেয়ালা রাখিয়া দিয়া সে বলিল, নিন।

জাফর আগ্রহের সাথে পেয়ালা টানিয়া নিয়া আবার বিরক্তভাবে ঠেলিয়া দিল। বলিল, ছেত্, চা!

পরেই আবার বলিল, ও! চা দিয়েছ।

সে পেয়ালা টানিয়া নিয়া তাহাতে চুমুক দিল। জুলি হতভম্ব হইয়া তাহার ব্যবহার দেখিতেছিল। জাফরের হাবভাব তাহাকে সঙ্কোচিত করিয়া তোলে।

চা শেষ করিয়া জাফর পেয়ালা নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, হোমায়েরা এখন আসবে না?

প্রশ্নের ধরণ দেখিয়া জুলি বিরক্ত হইল। সে বিরক্তি চাপিয়া জওয়াব দিল, জানি না।

ইয়ার্কি দেওয়ার ভঙ্গীতে মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া জাফর কয়েকবার উচ্চারণ করিল, জানি না, জানি না, জানি না!

জাফর উঠিয়া কয়েকবার ঘরময় পায়চারী করিল। তারপর সশব্দে বসিয়া পড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, হোমায়েরা আসবে কখন্?

জুলি চুপ করিয়া রহিল। জাফর বলিল, বলো!

জুলি বলিল, এই ত বললাম, জানি না।

জাফর বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ত বললে জানি না।

আরও কিছু সময় বসিয়া থাকিয়া জাফর বলিল, আচ্ছা, তা হলে চলি।

জাফর উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজার দিকে আগাইয়া গেল। দরজার বাহিরে পা দিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

জুলি অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জাফর পিছন ফিরিয়া জুলির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, বাহ! ভারী চমৎকার শাড়ী পরেছ ত!

সাড়ীর আঁচল সে হাতে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। আবার সে বলিল, বাঃ ব্লাউজটিও খাসা!

জাফরের রক্তাভ চোখের দিকে চাহিয়া ভয়ে জুলির প্রাণ উড়িয়া গেল। গায়ের সকল শক্তি দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিল, কিন্তু কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে।

জাফরের ঠোঁটে সেই অতি পরিচিত হাসিটি খেলিয়া গেল। সে জুলির চোখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভয় কিসের?

বাহু ধরিয়া কঠিন আকর্ষণে জুলিকে টানিয়া আনিয়া সে বিছানার উপর ছুঁড়িয়া মারিল।

আপা, আপা!—আর্তনাদ করিয়া জুলির চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া গেল। হোমায়েরার বিছানা তাহার পিঠে শত বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল। তাহার চেতনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

হোমায়েরা কখন্ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জাফর টের পায় নাই। বিভ্রান্ত জুলি হোমায়েরার পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

কঠিন দৃষ্টিতে হোমায়েরা একবার জাফর আরেকবার জুলির দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার চোখ হইতে আগুন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দরজার উপর ঝুলানো পাকানো বেতটি হোমায়েরা তুলিয়া লইল। অন্ধ ক্রোধে হোমায়েরা উন্মাদ হইয়া উঠিল।

জাফর পালাইবার পথ খুঁজিতেছিল। দরজা ছাড়া পাইয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বেতের সপাং সপাং শব্দে সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া পড়িল। জুলির গোঙানী আর বেতের সপাং সপাং শব্দ মিশিয়া বাতাসকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। অল্প সময় দাঁড়াইয়া জাফর দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

জুলি আর্তনাদকে প্রাণপণ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। বেত পড়ার ফাঁকে করুণ চোখে হোমায়েরার দিকে চাহিয়া জুলি বলিল, আপা আমাকে মেরে ফেলুন!

হোমায়েরার কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। রাতটি বড় বিশ্রী ও বিদঘুটে মনে হইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া একটি কর্কশ ও কুৎসিত শব্দ আসিতেছিল।

হোমায়েরার খাওয়া হয় নাই। বাবুর্চি ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। হোমায়েরার কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না।

দুই চোখের পাতা জোরে চাপিয়া ধরিয়া হোমায়েরা ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঘুমের নাগাল পাইল না।

এক অস্পষ্ট অশান্তির মত রাত্রি তাহাকে চারদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়াছে। স্নায়ু ঝিম ঝিম করিতেছে। কিন্তু সমুদ্রের কলতানের মত রাত্রির অন্তর হইতে এক অব্যক্ত ধ্বনি ফাটিয়া পড়ার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। হোমায়েরার সারা চেতনায় তাহা মগ্ন হইয়া আছে। ঝড়ের আঘাতে দিগন্ত কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার অন্তরে লীন হইয়া যাইতেছে, অথচ সে কিছুতেই যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। বিনিদ্র রজনীর অসহ আবেগে হোমায়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

পাতলা ঘুমের জাল তাহার চোখে পড়িয়াছিল কি না, সে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না। দুইটি চোখ তাহার জ্বালা করিতে লাগিল। ভীত, কুণ্ঠিত, অশ্রুভরা দুইটি চোখ যেন চার পাশ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার পায়ের কাছে লতাইয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে একটি মূর্তিমতী বেদনা। তাহার পা বেষ্টন করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। কাঁদার অধিকারও তাহার নাই। তাই আঘাতের পর আঘাত প্রাণপণ শক্তিতে সহ্য করিয়া চলিয়াছে। রুদ্ধ কান্না চাপা গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে, আর তাহার দেহ দুলাইতেছে। তীব্র যন্ত্রণায় তাহার শরীর বারবার কুঞ্চিত হইতেছে।

হোমায়েরা নির্মম, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। তাহার হিংস্র চোখের দিকে চাহিয়া দুইটি বেদনাভরা চোখ মিনতি করিতেছে, আমাকে মেরে ফেলুন, আপা, আমাকে মেরে ফেলুন!

হোমায়েরা ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল ইহা তাহার মনের ভুল। সে আবার শুইয়া পড়িল।

কিন্তু হোমায়েরা শুইয়াও থাকিতে পারিতেছিল না। সে আবার উঠিয়া বসিল। পাশের কামরায়ই আছে জুলি। হোমায়েরা ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজার কাছে গেল। দরজায় কান লাগাইয়া শুনিতে লাগিল, ফুঁপাইয়া কাঁদার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। হৃদয়বিদীর্ণ করিয়া হাওয়ায় মিশিয়া যাইতেছে। হোমায়েরা দরজা খুলিয়া কামরায় ঢুকিল।

কামরা অন্ধকার। জানালার গরাদে মাথা রাখিয়া জুলি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। আসমানের পটভূমিকায় তাহা পরিষ্কার দেখা যায়।

হোমায়েরা কাছে গিয়া জুলির পিঠে হাত রাখিল। জুলি ত্বরিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হোমায়েরার বুকে মুখ লুকাইল।

জুলি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমার কোন দোষ নাই, আপা, আমার কোন দোষ নাই।

হোমায়েরা ঘন আলিঙ্গনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আসমানের দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল ঠিক নাই। জুলির কথায় তাহার চৈতন্য হইল। জুলি বলিল, আপা, আমাকে মাফ করুন।

হোমায়েরা কোন কথা না বলিয়া জুলিকে লইয়া নিজের কামরায় আসিল। নিজের বিছানায় জুলিকে শোয়াইয়া দিয়া সে তাহার পাশে শুইয়া পড়িল।

জুলি কখনও হোমায়েরার কাছে শোয় নাই। সে সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া রহিল। হোমায়েরা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নিল।

বেতের আঘাতে জুলির দেহের জায়গায় জায়গায় শিরার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। হোমায়েরা আলগোছে তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

উপনিবেশ

বন্দে আলী মিয়া

নব জন্ম লভিলাম আজি এই জনতার মাঝে
অতীতের কংকালেরা মোর পাশে করিয়াছে ভীড়।
বিদায়ের অশ্রু ক্ষণে বুকে যেথা বিঁধেছিলো তীর
সেথায় আজিও হায় ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা মোর বাজে।

নয়া এক জনপদ সৃষ্টি হলো অচেনা মানবে
গৃহ হারা মানুষেরা তার পাশে করে কোলাহল
আমি আজ রৌদ্র-দগ্ধ—বক্ষে মোর তীব্র হলাহল
বাঁধিবারে চাহি তবু সুন্দরের অমৃত আসবে।

অতীত যৌবন দিনে হেথা ছিলো প্রাণের সম্পদ
ধনে-জনে পূর্ণ গৃহ—পূর্ণ ছিলো একটি হৃদয়,
অনাহত বীণাধ্বনি ছিলো মোর সারা বিশ্বময়
প্রিয়জন প্রীতিচ্ছায়া ভবিষ্যৎ—সুখী, নিরাপদ।

আমার আনন্দ রাতি মুছে গেল একটি পলকে
সে রাতি কাঁদিয়া ফেরে জীবনের দ্বারে দ্বারে আজ,
পথের ধূলায় লোটে যৌবনের রাজ অধিরাজ
দুঃখের তমিস্রা মাঝে ক্ষণপ্রভা নয়নে ঝলকে।

নজরুল কাব্যপ্রতিভা

অধ্যাপক আবদুল গফুর, এম-এ

"তাই আমি মেনে নিই সেই নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্র গামী।"

জীবনের গোধূলি আলোকে বসে কবিগুরু উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন। বাস্তবিক যাঁর কবিতা সুরভি বিশ্ববাসীকে কস্তুরী গন্ধ সম চিরদিন আমোদিত করে রেখেছে, তাঁর কবিমানসকে কখনও বিশেষভাবে দোলা দেয় নাই—কৃষক-মজুর-মেথরের জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার করুণ কাহিনী। এ-প্রসঙ্গে মনীষী বিপিন চন্দ্র পালের জ্ঞানগর্ভ উদ্ধৃতিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতালা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতালা হইতে নামেন নাই। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানিনা; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতনভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ বেশী নাই, আছে লাঙ্গলের গান।...কাজী নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি।" তাঁর কাব্যের আস্বাদন বৈচিত্র মানবীয়তার সুর, ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এক চির শাশ্বত ও চিরমধুর রূপ। কবিবর Byron সম্বন্ধে Peter Quenel বলেছিলেন—His personality is the greatest point obout his poetry. Byron সম্পর্কিত এই বহুশ্রুত মন্তব্যটি নজরুলের কাব্য প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

বাস্তবিকই তিনি ভাবের কল্পনা-লোক হতে নেমে এলেন মাটির জগতে—মাটির মানুষের সংগে সম্পর্ক পাতাতে। শ্রমিক কৃষকদের প্রতি অপরিসীম দরদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও অন্যতম বৈশিষ্ট। তাই বাণীর বরপুত্র 'ছন্দের রাজা' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অমর কবিতাবলী হতে দু'একটি পংতি উদ্ধৃত করবার দুর্বার মোহ হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারলুম না। নিপীড়িত মানবের সুরের সংগে তিনি সুর মিলিয়ে বলেন—

"কে আছে আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে
কেবা যে ক্ষুণ্ণ কেবা বিষন্ন অন্যায় কারাগারে?"

'শূদ্র,' 'মেথর', 'জাতির-পাঁতি' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এক সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। 'মনু'র ধর্ম শীঘ্রই মানবের ধর্মে বিলীন হবে, সেই প্রত্যাশায় কবি কণ্ঠ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে—

"পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে।
জমা হয়েছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্য যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব-হৃদয়
মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়।"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই সাম্যের ও মানবিকতার সুর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় উঠেছে আরও দীপ্ত ও নিঃসংশয়িতভাবে। তিনি বলেন—

"অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই—
ঘৃণা কি করুণা করো না, তাদের শ্রদ্ধা করো,
তা'রা মানুষেরই ভাই।"

মুকুন্দ দাস বলে গিয়েছেন—

"ধন্য দেশের চাষা,
এদের চরণধূলি পড়লে মাথায় আহা—
প্রাণ হয়ে যায় খাসা!
ধন্য দেশের চাষা॥"

কিন্তু নজরুল ইসলামের মানব প্রীতি আরও ব্যাপক, মানবের প্রতি সহানুভূতি তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনের বেদনার রসে সিঞ্চিত। গর্কী সম্বন্ধে মনীষী রঁলা যে কথা কয়েকটি বলেছিলেন, নজরুল সম্পর্কেও তা' আমরা অসঙ্কোচে উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন—"সর্বহারা শ্রেণীর তিনি সংস্কৃতির মধ্যমণি। তাদের সাথে তিনি এক হয়ে মিশে গেছেন। যে মসী- কুলীনের গোষ্ঠী আভিজাত্যের অভিমানে জনজীবন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন, তাঁদের কলঙ্কময় জীবনযাত্রার জবাব দিয়েছেন নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে একমাত্র গোর্কীই—অন্ততঃ ইউরোপে এ-পথে তাঁর সহযাত্রী বড় কেউ নেই।"

নজরুলের 'সর্বহারা' কবিতাগ্রন্থের কবিতারাজিও চিরদিন মানব মনের খোরাক জোগাবে। দুনিয়ার অবহেলিত মানবের রক্ত শোষণ করে, তাদের শ্রমের ন্যায্য প্রাপ্যকে পদদলিত করে যে নন্দন-কানন সদৃশ সাতমহলা

ভবন উর্বশী, মেনকা, রম্ভার-গানে চিরমুখরিত থাকে, তার প্রতিবাদের ঝড় বেগবান হয়ে উঠেছে কবির কবিতায়—

"রাজপথে ঐ চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্পশকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলতো এ-সব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে
লিখা!
তুমি জাননাক কিন্তু পথের প্রতি ধূলি কণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।"

ব্যথিত বুকের সুর আরও প্রকট হয়ে উঠে, যখন তিনি বলেন—

"বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফুলে মহাজন ভূড়ি,
নিরন্নদের ভিটেনাশ করে জমিদার চড়ে গাড়ি।"

অন্ন কেড়ে যারা পতিত মানবের বুকের উপর দিয়ে অত্যাচারের শকট চালিয়ে দেয়, তাদের লক্ষ্য করে কবি বলেন—

"প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি
মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লিখায় তাদের সর্ব্বনাশ।'

মানুষকে মানুষের সন্মান দেওয়ার জন্য তিনি অতন্দ্র সংগ্রামে রত ছিলেন। কারণ, সকল মানুষের ভিতরেই যে এক বিরাট সম্ভাবনার শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সে বিষয়ে তিনি একান্তই আশাবাদী। তিনি বলেন—

"হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈশা,
কে জানে কাহার অন্ত আদি, কে পায় কাহার দিশা।
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারি বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি।
　　…　　…　　…
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি—হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে।
ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব,
ওই হ'তে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই মহাশ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল, কা'ল হ'তে পারে মহাযোগী সম্রাট,
তুমি কা'ল তারে অর্ঘ দানিবে, করিবে নান্দী পাঠ।"

অপমানিত মানব মণ্ডলিকে লক্ষ্য করে কবিগুরু একদিন বলেছিলেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

নজরুলের কবিকণ্ঠে ভাবীকালের উজ্জল আভাস দৃপ্ত হয়ে উঠেছে—

"মহামানবের মহা বেদনার আজি মহা উত্থান,
উর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।"

তিনি মানবের মধ্যে দেবত্ব "Deification of the human spirit"-কেই আমাদের চোখে প্রতিভাত করতে চেয়েছিলেন। নজরুল বলেন—"তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার।" এরূপ সত্যকথা বিংশ শতাব্দীর কোন কবির মুখ দিয়ে বের হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তিনি আমাদের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, তাঁর সেই অমর বাণীর দিকে—

" মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।"

ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তি একদা শেলী ও বায়রণকে রণ-উন্মাদ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই অত্যাচারী ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে শেলীর সাম্য, মৈত্রী ও সাধনার বাণী জগৎবাসীর পক্ষে এক মহা বেদের বাণী। শেলী বলেন—

"I hate thee, fallen tyrant!
Thou shouldst dance and revel on the grave of Liberty."

বিদ্রোহী নজরুলও নিজেকে ছাড়া কারেও কুর্ণিশ করেন নাই। এইখানেই তাঁর চরিত্রের বিরাট তেজপুঞ্জ, অনমনীয় দৃঢ়তা ও স্বাধীনতার স্পৃহা লক্ষিত হয়। নিপীড়িত দেশবাসীর প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—

"বল বীর—,
চির উন্নত মম শির—
শির নেহারি আমারি, নত শির
ওই শিখর হিমাদ্রীর।
　　…　　…　　…
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বলবীর,—
আমি চির উন্নত শির।"

বিদেশী সরকার তাঁর বিপ্লবী মনোভাবকে সহ্য করতে পারে নি, তাই তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু যিনি "জাহান্নামের আগুনে বসিয়া" পুষ্পের হাসি হাসতে পারেন, তার চিরজয়ী মনকে তো বৃটীশ সরকার কারাগারে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। Richard Lorelace-এর কথায় বলতে হয়—

"Stone walls donot a prison make,
No iron bars a cage;
Minds innocent and quiet take
That for a hermitage."

বাংলার সংগীত জগতে কবিকে একচ্ছত্র সম্রাট বলে অভিহিত করলে কিছুই বেশী বলা হয় না। নজরুল প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ তাঁর ঐ অনবদ্য সংগীত রচনায়। দ্বিজেন্দ্র লাল, সুরেন্দ্র নাথ, দিলীপ কুমারের মধ্যে কথা ও সুরের সমন্বয়ে গান রচনার রীতি দেখো গেলেও নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ হলেন সর্ব শ্রেষ্ঠ গীতিশিল্পী। অধ্যাপক আজহার উদ্দিন খান বলেন—"গীতিকার নজরুলের জীবন হচ্ছে যেন একটা বহুরাগ রাগিনী বিশিষ্ট যন্ত্র বিশেষ। কীর্তন, ভাটিয়ালী, মুর্শিদা, রাম প্রসাদী, গজল, জৌনপুরী, ভৈরবী, আশবরী, খাম্বাজ, ছায়ানট, ইমন, ভুপালী প্রভৃতি বহু রকম রাগ রাগিনীর সংযোগে গাণ রচনা করে তিনি যশঃগৌরব লাভ সক্ষম হয়েছেন। প্রাচীন ও নবীনের এমন সম্মিলন আমাদের বাংলাগানে ইতিপূর্ব আর দেখা যায় নাই। বাংলা গানে পৌরুষ ও মার্চিং সুর তিনিই প্রথম এনেছেন।" যেমন—

"টলমল টলমল পদভরে,
বীরদল চলে সমরে।
চল্-চল্-চল্—
অগ্রপথিক হে সেনাদল।"

জাতীয় দুর্দিনে বাংগালী চিরদিন তাঁর এই বিখ্যাত স্বদেশ সংগীত আবৃত্তি করে নিজেদের দৈন্য ভোলবার চেষ্টা করবে। জাতীয় সংগীত হিসাবে এ-তুলনা রহিত।

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাপার—
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

গানের মাঝে মাঝে আমরা তাঁর মিষ্টিক সুরের সংগে পরিচিতি লাভ করি।

"খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে
বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।"

পারস্যের বুলবুল হাফিজের সংগে তাঁর আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। তিনি বলেন—

"ঢাল সুরা সখি! সাজাও পিয়ালা,
শরম আছে কি তায়
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো,
ধরম যাহারা চায়?"

বিদ্রোহীর সুরে শুনি:—

"দোজখ আমার হোক মঞ্জুর
বিদায় বন্ধু লও আদাব,
করুণ কেন অরুণ আঁখি,
দাও গো সাকী, দাও শারাব।"

তাঁর উর্দ্দু-ফারসী মিশ্রিত বাংলা গানগুলিও অনবদ্য।

"আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন
দীল ওঁহি মেরা ফস্ গয়ি
বিনোদ বেণীর জরীণ ফিতায়
আন্ধা এশ্‌ক্ মেরা কস্ গয়ি।"

শিশু সাহিত্যে নজরুল আজিও অপ্রতিদ্বন্দী রয়েছেন। কিশোর মনের মধ্যে থেকে কবি গেয়ে উঠলেন অনবদ্য সুরে—।

"থাক্‌ব না'ক বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎ টাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।"

গোলামীর অভিশাপ যাতে নবীনকে অভিশপ্ত করে তুলতে না পারে সেই উন্মাদনা দেবার জন্য কবি গেয়ে উঠলেন—

"তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর, ফুটিবার আগে
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না
লাগে।"

'মানস সুন্দরী' ও শেলীর 'এপিসাইকিডন' কাব্য-জগতে যে স্থান অধিকার করে আছে, নজরুলের 'পূজারিনীকে' তাদের পাশে বসালে মোটেও অশোভনীয় হ'বে না। শেলী বলেন—

"In many mortal forms I rashly sought
The shadow of my idol of my thought,
And some whe fair but beauty dies away,
Others were wise but honied words betray,
And one was true oh ! why no true to me ?
Then, as a hunted deer that could not flee."

নজরুলের কবিতায় শেলীর অধ্যাত্মবোধ ও ভাব সূক্ষ্মতার অভাব সন্দেহ নেই; কিন্তু নজরুল উচ্ছ্বসিত যৌবনের স্বপ্ন এক মায়ামৃগীর সন্ধানে ছুটে চলছেন অবিরত বেগে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর কবিতা নিতান্ত কম নয়। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে কবির প্রেয়সীর মাধুর্যময়ীরূপ ফুটে উঠ্‌ছে।

"তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল লেখা,
তোমার দেহের মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্‌ঝির্ মর্‌মর্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তাহারি শাড়ীর আঁচল খানি।"

কর্ণফুলি দর্শনে কবির মনে পড়েছে কোন্ অজানা রূপসীর স্মৃতি—

"ওগো ও কর্ণফুলি!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে
'সাম্‌পান্' নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে?
আন্‌মনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলি?"

'প্রকৃতি-চেতনায় নজরুল অনেকটা শেলী-ধর্মী, যদিও তাঁদের কবি মানস ভিন্ন-প্রকৃতির।'

মায়ের জাতিকে তিনি যে মর্যদা দিয়েছেন, তা' সেই মহান নবীর আদর্শকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর কোন

কবি-সাহিত্যিক নারীকে এমন গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি বলেন—

"জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্যলক্ষ্মী নারী
সুষমা লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।

* * *

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা, ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।

* * *

সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর জয়।"

নজরুলের কাব্য সাহিত্যের ধারার একটা আভাস মোটামুটি দেবার চেষ্টা করেছি। তাঁর সাহিত্য যে একেবারে হীরার টুকরা এ-কথা আমরা বলি না। স্বাভাবিকভাবেই নানা দোষ-ত্রুটি এতে আত্মগোপন করে রয়েছে। "এ-সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের অমরাবতীতে অমর তাঁর আসন তিনি অধিকার করে নিয়েছেন, কেননা তাঁর সাহিত্য-সাধনা জাতির জীবনদানেরই সাধনা।"

মাধবী রাতের কবিতা

মুহম্মদ খুরশেদুল ইস্‌লাম

কন্যা, তোমার দু'চোখে নেমেছে আবেগ মধুর কামনা রাত,
স্বপন সেহেলী গুলেবকাওলী কাঁপায় তোমার আকাশ নীল ঃ
মায়াবী বীণার তারে তারে জ্বলে সুরের অগ্নি, জানে না কেউ
সোনার হরিণ কোথায় উধাও—কোন্‌খানে সেই অরণ্যাণী।

মৃগনাভী এক রাতের প্রহরে কার কথা ভেবে পাগল মন
সুরের আকাশ দিগন্তে আজি ফুটায় গানের কুসুম দল,
ফুলে আর ফুলে সাজালে কন্যা বাসর শয্যা নিবিড়তর
কথা কয়ে ওঠে নিঝুম সময় তোমার কাঁকন কিঙ্কিণীতে।

মাধবী রাতের মায়াবী প্রহরে যখন কন্যে, থাকেনা কেউ
রূপালী মেঘের দূত দিয়ে তুমি পাঠাও প্রেমের আমন্ত্রণ,
চাঁদনীর পালে মলয়ার ঢেউ রাত্রি এগোয় নির্বিরোধ
আমার পৃথিবী উন্মনা হয় হঠাৎ তোমার কণ্ঠ শুনে।

কামনা আমার দূরান্তে মিশে—ফাল্গুন আজো এলো না-হায়,
হাজার মনের তিমিরে তবু তো জ্বেলে দিতে চাই তারার দীপ,
ফসল-গন্ধী মাঠের স্বপ্নে তাই যে পোহাই ঝড়ের রাত
মাধবী রাতের কন্যে গো বলো, আমি কি তোমার নায়ক তবু!

ট্রাজেডি

মোহাম্মদ ইউছুফ

—চরিত্র পরিচিতি—

ইয়াকুব	অসুস্থ লোক
জিয়াউন নেসা	ঐ স্ত্রী
রুমু, ফাকু, জলি, স্বপ্না	ঐ ছেলে-মেয়ে
লুৎফু	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
সামছু	ঐ ভৃত্য
ইসমাইল সাহেব, মাজেদা খাতুন	ঐ পিতামাতা
দেবেন, জালাল	ঐ বন্ধু
আজিজ	ঐ বড় ভাই
মহেন্দ্র বাবু	ডাক্তার

দুধওয়ালা, ছাত্রগণ, পুলিশগণ, হাসপাতালের কর্মচারিগণ ইত্যাদি

—পূর্বাভাষ—

চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক ইয়াকুব। কপালের মাঝামাঝি ছোট্ট একটী আঘাতের দাগ আছে। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে এই আঘাত প্রাপ্ত হয়। তারপর থেকে কঠিন এপিলেফসি রোগে ভুগছে। এই অসুস্থতার জন্য তার জীবনের সকল স্বপ্নই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

প্রথম অংশ

এক

স্থান : ইয়াকুবের বাড়ী

সময় : সকাল

দৃশ্যে : ইয়াকুব, জিয়াউন্ নেসা, সামছু, দেবেন, লুৎফু, আজিজ, ইসমাইল সাহেব ও মাজেদা খাতুন।

সকাল বেলা একটী গেঞ্জি গায় ইয়াকুব তার ঘরে ইজি চেয়ারে বসে রয়েছে। স্ত্রী জিয়াউন নেসা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াকুবের শরীর আজ বিশেষ ভাল নয়। কিন্তু সে যে তেলের কলের ম্যানেজার, সেখানে কাজের চাপ বেশী—না গেলে নয়। অথচ শরীরের এ অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য ঠিক হয় না। তাই ভাবছে কি করবে, না করবে। ওদিকে স্ত্রীও যেতে মানা করছে :

জিয়াউন : আমি বলি, শরীরের যখন এ-অবস্থা তখন আজ তোমার মিলে না যাওয়াই ভাল। তেলের কলের কাজ—ঘানি টানার মতই শক্ত।

ইয়াকুব : তোমার বলতে কতক্ষণ। ছোট হোক, বড় হোক একটা প্রতিষ্ঠানের যখন ষোল আনা দায়িত্ব আমার ওপর—তখন আমি কি করে না যেয়ে পারি? আফিস আর গুদাম ঘরের চাবিগুলি পর্যন্ত আমার কাছে রয়েছে। আমি না গেলে কর্মচারীরাও বসে থাকবে।

জিয়াউন : পারলে তুমি যাবে—আমার কি। কিন্তু বলে রাখছি, ঘরে আজ কিছু নেই। বাজার না করলে কাল সকাল থেকে চুলোয় বিল্লি শুয়ে থাকবে।

ইয়াকুব : সেটা আমি জানি জিয়ন, আর সে জন্যই তো বলি, এখন একটু কাজের চাপ আছে, খাটতে পারলে উপরিও পাওয়া যাবে, বেতনের পরিমাণটা বাড়বে।

জিয়াউন : কিন্তু খাটুনী তো তোমার শরীরে সহ্য হয় না।

ইয়াকুব : শরীর যে সহ্য করতে পারে না—পেট তো সে কথা বুঝে না। এই তো এখন বললে, ঘরে কিছু নেই। কিন্তু আমার পকেটও তো রমনার মাঠ। বোধ হয় দু'আনা মাত্র পয়সা আছে। এক কাপ চা আর এক শলা সিগারেটের দাম খালি।

জিয়াউন : কি যে করবে—আর কি করেই বা এই বিরাট জিন্দেগীটা কাটাবে—আমি কিছুই ভেবে স্থির করতে পারি না। আল্লা ছেলে মেয়ে কটাও দিল—এদের ভবিষ্যৎই বা কি!

ইয়াকুব : রোজ রোজ এক কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন ফায়দা নেই। বরাতে যা' আছে—তা-ই হবে। কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। দুঃখে হোক, সুখে হোক কোন রকমে দিন তো চলে যাচ্ছে আর যাবেও। অনর্থক চিন্তা করে স্বাস্থ্য নষ্ট করা বৈ ত নয়।

জিয়াউন : চিন্তা যে আপনা থেকে আসে।

ইয়াকুব : জোর করে দূর করে দিতে হবে। যখন যা' হয় তখন তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লা বিপদ-আপদ দিয়ে তাঁর বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। তাতে যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সে-ই ডুবে যায়। চিন্তার যত বোঝা সব আমার জন্য থাক্—তুমি শুধু আমার আর ছেলে-মেয়েদের আনন্দ যোগাতে চেষ্টা কর।

জিয়াউন : খালি পেটে কি আর আনন্দ করা যায়।

ইয়াকুব : এই তো অনর্থক কথা বল্‌লে। ডা'ল দিয়ে হোক আর মরিচ পুড়ে হোক, এখনও তো দু'মুঠো ভাত পেটে দিতে পারছো। এমনও তো অনেক আছে—যাদের ভাগ্যে ভাতের মাড়ও জুটছে না। আমরা যদি এ কথা বলি, তবে তারা কি বলবে?

(সামছুর প্রবেশ)

সামছু : চাচ'জী, আপনেরে কোন্ একজন লোকে বোলাইতে আছে।

ইয়াকুব : কে আবার এই সাত সকালে বোলাইতে এল?

সামছু : কি জানি আমি তো চিনি না।

ইয়াকুব : আমার যে শরীর খারাপ বলিস্‌নি?

সামছু : কইছি। তবু কয় যে খালি একটা কথা কইবো। বিশেষ দরকারী কথা।

ইয়াকুব : মুস্কিল। আমি যেতে পারবো না', এখানে ডেকে আন্। তুমি ভেতরে যাও জিয়ন। সামছু তুই আগে একটা চেয়ার দিয়ে যা এখানে।

(সামছুর প্রস্থান)

জিয়াউন : যে-ই হোক, বেশী বক্ বক্ করো না কিন্তু। বেশী কথা বল্‌লে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যায়। আর মিলে যদি যাও—ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে হবে, সে কথাও খেয়াল রেখো। কারো সঙ্গে কথা জুড়লে তো তোমার আর দুনিয়া-দারীর কথা খেয়াল থাকে না।

(জিয়াউনের প্রস্থান)

সামছু একটা চেয়ার দিয়ে গেল। ইয়াকুব পার্শ্বস্থ সিগারেটের বাক্স হতে একটী সিগারেট জ্বালিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলো। দেবেন সহ সামছুর পুনঃ প্রবেশ।

ইয়াকুব : আরে দেবেন যে, আস, আস—কি ব্যাপার, এই সকাল বেলা কি মনে করে এলে?

দেবেন : মাঝে মাঝে এসে তোমাদের মত মহারথীদের দর্শন না নিলে...

ইয়াকুব : থাক্, থাক্ ভাই আর বিনয়ের গরজ নেই, যথেষ্ট হয়েছে, এখন কাজের কথাটা বল।

দেবেন : তোমার কাছে একটা নাটকের জন্য এসেছি। আমাদের পাড়ার ছেলেরা নাটক করতে চায়। তোমার লেখা একটা বই আমাদের চয়েচ করে দাও।

ইয়াকুব : আমার বই যদি করতে চাও 'রাজধানীর আতংক' কর। ডিটেকটিভ নাটক আমাদের এখানে আর মঞ্চস্থ হয়নি।

দেবেন : তুমি যেটা ভাল মনে কর সেটাই দাও। তবে আমাদের এ ব্যাপারে তোমাকে সক্রিয় সাহায্য করতে হবে।

ইয়াকুব : আমার আর এখন তেমন সময় কোথায় দেবেন। একে তো নিজে বিশেষ অসুস্থ—তদুপরি সাংসারিক দায়িত্ব আমাকে একেবারে পাজেল্‌ড্ করে দিয়েছে।

দেবেন : অসুখটা বুঝি আর সারাতে পারলে না। সত্যি, তোমার জন্য আমাদের বড় দুঃখ হয়।

ইয়াকুব : দুঃখ আমার জন্য সকলেরই হয়—হয় না শুধু আল্লার। আল্লার দরবারে কি মহাপাপ যে করেছিলুম—দীর্ঘ দিন কঠিন এপিলেফ্‌সিতে ভুগিয়েও তার প্রায়শ্চিত্ত হলো না।

দেবেন : থাক্, ওসব নিয়ে ভেবো না। হয় তো তোমার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।

ইয়াকুব : সে আশাতেই তো আজও বেঁচে আছি ভাই।

দেবেন : নাটক তো অনেকগুলি লিখেছো বলে জানি, দু'একটা করে সেগুলি প্রকাশ করলেই তো পার। রেডিও, সাধারণ মঞ্চেও তোমার অনেক বই-ই তো অভিনীত হয়েছে আর প্রশংসাও লাভ করেছে।

ইয়াকুব : তা করেছে সত্য। কিন্তু সাধারণ্যে সব এক সঙ্গে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার কোথায় ভাই। দু'একটা করে ছাপতে পারলে তবু লোকের মতামত কিছুটা বোঝা যেতো। কিন্তু দু'একখানি ছাপবার সামর্থও তো আমার নেই।

দেবেন : কত বড় বড় পাবলিশার রয়েছে আমাদের দেশে—ওদের সঙ্গে কনট্রাক্ট করলেই তো পার।

ইয়াকুব : ওরা এক একখানি বই নিয়ে যা' দাম দিতে চায়—তার চেয়ে ওগুলো ঘরে রেখে উঁই পোকাকে খাওয়ালেও লাভ আছে ভাই।

দেবেন : এটাই আফসোসের কথা। এ দেশের পাবলি-শাররা আজও এ দেশের লেখকদের উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছে না। এ-জন্য কত লেখকের জীবনই তো ধ্বংস হয়ে গেল। এতে যে একটা জাতি কত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়—এ কথাটা কেউই অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না। (সামছুর চা নিয়ে প্রবেশ)

ইয়াকুব : দেবেন, নাও, চা খাও।

দেবেন : কেন তুমি আবার অনর্থক হাঙ্গামা করলে—চা তো আমি খেয়েই এসেছি।

ইয়াকুব : তবু একটু খাও।

দেবেন : (চা খেতে খেতে) আমাকে এক কপি বই দাও।

ইয়াকুব : বই তো আমার কাছে আছেই মাত্র এক কপি অর্থাৎ মেনাসক্রিপ্ট কপি খালি। দেখো যেন নষ্ট না হয়।

দেবেন : না, না ঠিকমতই তোমাকে ফিরিয়ে এনে

দেবো। আর আমাদের রিহার্সেলে তো তুমি উপস্থিত থাকবেই।

ইয়াকুব : কেন অনর্থক আমাকে শরম দিচ্ছ দেবেন—আমার সময় হবে না। না হলে জান তো নাটকের ব্যাপারে কারো আমাকে অনুরোধ করতে হতো না। আমি যেচেই যেতাম। ইয়ংম্যান্‌স্ ড্রামেটিক ক্লাব, নওজোয়ান নাট্যসংঘ তো আমারই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাংসারিক ঝামেলায় আজ এত বেশী জড়িয়ে পড়েছি যে, ওসবের কথা মনে করবার মত সময়ও হয় না। সামছু, তোর চাচীকে বলে আমার 'রাজধানীর আতংক' নাটকটা আন্ তো। নাও, সিগারেট খাও। (সামছু বই এনে দিল) নাও, বই নাও।

দেবেন : আচ্ছা, এখন উঠি ভাই। সকাল বেলা তোমাকে কষ্ট দিয়ে গেলাম মনে কিছু নিও না।

ইয়াকুব : না, না কষ্ট কিসের। বরঞ্চ তোমাদের মত পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের পেলে কিছুক্ষণের জন্য আমার নিষ্ঠুর বর্তমানকে ভুলে যেতে পারি।

দেবেন : যাই। (দেবেনের প্রস্থান। ইয়াকুব স্ত্রীকে ডাকলো :)

ইয়াকুব : শুনছো—জিয়ন, ও জিয়ন—

নেঃ জিয়াউন : এই যে আসছি। (ছোট মেয়ে স্বপ্নাকে কোলে করে জিয়াউনের প্রবেশ) কি ব্যাপার—কে এসেছিল ?

ইয়াকুব : আমার এক বন্ধু, দেবেন। তারা থিয়েটার করবে। সামছুকে দিয়ে আনিয়েছি যে এই বইটা নিল।

জিয়াউন : এখন নিজেও সেদিকে মত্ত হতে পারবে।

ইয়াকুব : না-না, আমি যেতে পারবো না তাকে বলে দিয়েছি।

জিয়াউন : দেখা যাবে।

ইয়াকুব : দেখো। মেয়েটাকে এমনি করে কোলে ধরে রেখেছো কেন—দাও না আমি একটু কোলে করি।

জিয়াউন : নাও না। আমি তো নিতে মানা করছি না। তোমার মেয়ে তুমি কোলে করবে—আমার কি !

ইয়াকুব : তোমার কিছু না বুঝি ?

জিয়াউন : মেয়েদের বাপের জন্য মায়া হয় বেশী।

ইয়াকুব : ও সেটাই বুঝি তোমার হিংসার কারণ। রুকু ফারুকু স্কুলে গেছে তো ?

জিয়াউন : গেছে।

ইয়াকুব : জলি কোথায় ?

জিয়াউন : খেলছে।

ইয়াকুব : আয়রে স্বপ্না—বাবার বুকে আয়। তোর জন্য আমার বড্ড মায়া হয়। তুই অবিকল আমার মায়ের মতন। আয়...

(মেয়ের জন্য হাত বাড়ালো—এ-মুহূর্তেই তার হাত কেঁপে গেলো। প্রথমতঃ গোঁ গোঁ শব্দ করে পরে বিকট চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।)

জিয়াউন : সামছু, সামছু—ছুটে আয়, তোর চাচার অসুখ উঠেছে। লুৎফুকে ডাক্। (সামছু ছুটে আসতে আসতে চীৎকার করে)

সামছু : ও লুতু ভাই, ধাইয়া আহেন, ধাইয়া আহেন—চাচার অসুখ দেখা দিছে। (সামছুর প্রবেশ) আমি কি করমু চাচী ?

জিয়াউন : আরে বোকা তুই কি করবি—তুই জড়িয়ে ধর্। না হলে পড়ে মাথা ভেঙ্গে ফেলবে। (সামছু তাকে জড়িয়ে ধরলো, ইয়াকুব হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। লুৎফু ছুটে আসতে আসতে)

লুৎফু : চাচার বুঝি আবার অসুখ উঠেছে চাচী আম্মা ?

জিয়াউন : হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি এসে ধর্ তাকে। (লুৎফু প্রবেশ করে চাচাকে ধরলো—জিয়াউন ভেতরে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে স্বামীর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগলো)

লুৎফু : মাথায় পানি দেবো নাকি ?

জিয়াউন : আরও একটু দেখি।

(ছোট্ট মেয়ে জলি খেলা ফেলে ছুটে এসে বললো :)

জলি : মা—আব্বা—অসুখ—

জিয়াউন : হ্যাঁ মা, তোমার আব্বার অসুখ। আল্লার কাছে ভাল করে দিতে বল।

জলি : আল্লা—আব্বা—ভালা—

ইয়াকুব : আ—ল্—লা !

লুৎফু : একটু জ্ঞান আসছে বলে মনে হয়।

জিয়াউন : পা-নি—

লুৎফু : চাচী আম্মা, তাতাতাড়ি করে পানি দিন।

(জিয়াউনের প্রস্থান ও এক গ্লাশ পানি নিয়ে পুনঃ প্রবেশ। পানি স্বামীর মুখের কাছে ধরে বললো :)

জিয়াউন : পানি খাও।

(ইয়াকুব শোয়া অবস্থায় ঘাড় একটু কাৎ করে পানি পান করলো)

ইয়াকুব : আমার কি হয়েছে ?

জিয়াউন : কিছু হয়নি তোমার—এমনি একটু ঘুমিয়ে ছিলে।

ইয়াকুব : কেন মিথ্যা প্রবোধ দিতে চাও জিয়ন। আমার

যে অসুখ করেছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। মাথার বেদনায় মাথা ছিঁড়ে যেতে চাচ্ছে।

জিয়াউন: এখন চুপ কর—কথা বললে মাথা আরও বেশী বেদনা করবে।

(সামছুর এক কাপ গরম দুধ নিয়ে প্রবেশ)

সামছু: দুধ গরম কইর‍্যা আনছি চাচী।

জিয়াউন: এ দিকে দে। (দুধ দিয়ে সামছুর প্রস্থান) নাও দুধটা খাও।

ইয়াকুব: এখন আমি কিছু খেতে পারবো না—খেলেই বমি হবে।

জিয়াউন: একটু না খেলে চলবে কি করে? খাও।

ইয়াকুব: অনর্থক বিরক্ত করছো জিয়ন, দাও।

(দুধের গ্লাশ হাতে নিয়ে দু'এক ঢোক খাওয়ার পর বমির উদ্রেক হলো—বমি করতে লাগলো:)

জিয়াউন: ধর্—ধর্ লুৎফু, তোর চাচার মাথা ধর্।

(লুৎফু ইয়াকুবের মাথা চেপে ধরলো—ইয়াকুব সটান ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লো)

ইয়াকুব: আমি তোমাকে বলিনি জিয়ন—খালি খালি আমাকে কষ্ট দাও।

জিয়াউন: থাক্ আর খেয়ো না—এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।

ইয়াকুব: এখন আর ঘুম আসবে না জিয়ন—আর এখন ঘুমোবোও না। আমি তোমাদের কাছে একটু একটু করে বিস্তারিত বলবো আমার জীবনের এই দুর্ভোগের কাহিনী। ভাল করে শুন তোমরা।

লুৎফু: এখন কথা বল্‌লে তো আপনার ক্ষতি হবে।

ইয়াকুব: হোক ক্ষতি—তবু বলবো।

জিয়াউন: আমরা তো কিছু কিছু জানি—নতুন করে আর কি বলবে।

ইয়াকুব: জানলেও এখন আবার শুনতে হবে।

লুৎফু: থাক চাচী আম্মা—ওঁকে বলতে দিন, বিরক্ত করলে ক্ষতি হবে। বলুন আপনি।

ইয়াকুব: তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। স্কুলে আসা যাওয়া শুরু করেছি। মা-বাপকে তখনও আমাকে জোর করেই পাঠাতে হয়। নিজে ইচ্ছে করে যাই না। সেদিন বাবার আফিসে যাওয়ার সময় মা আমাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে বল্‌লেন। কিন্তু আমার গোঁ উঠেছে—সেদিন আমি যাব না। তবু মা বাবা বলছেন যেতে। উঃ বড্ড ক্লান্তি লাগছে। এক গ্লাশ পানি দাও।

জিয়াউন: (পানি দিতে দিতে) মানা করছি কথা বলো না—তবু বলছো। হয় তো এক্ষুনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

ইয়াকুব: (পানি খেয়ে) চুপ কর।—মা আমাকে এক টুকরো তাল মিছরি দিলেন খেতে—যেন স্কুলে যাই। কিন্তু আমার গোঁ উঠেছে—সে দিন যাবই না। করলুম কি, টুপিটি আর বইগুলি মা বাবার সামনে রেখে আমি দিলাম ভোঁ দৌড়। পালিয়ে গেলাম। বাবার আফিস টাইম হয়েছে—তিনি আফিসের পথে চলে গেলেন। ওদিকে আমি যখন দেখলুম বাবা চলে গেছেন, তখ্‌খুনি ফের দিলাম বাড়ীর দিকে দৌড়। বৈঠকখানা ঘরের আড়ালে সাইকেল আরোহী ভাই দেখ্‌লেন না আমাকে আর আমিও দেখ্‌লুম না তাঁকে। ফলে...

দৃশ্য বদল

পাঁচ বছরের ইয়াকুব উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ করছে। রক্তে তার চারি পাশে ভেসে গেছে। এক পাশে একখানি সাইকেল পড়ে আছে। তার বড় ভাই আজিজ আহমদ পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো—

আজিজ: গেছে—গেছে, ইয়াকুব খুন হয়েছে।

নেঃ মাজেদা: কি হয়েছে আজিজ—এ রকম চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

আজিজ: ছুটে আসুন মা—শীগ্‌গীর আসুন। ইয়াকুবের মাথায় আমার সাইকেলের আঘাত লেগেছে।

নেঃ মাজেদা: এঁ্যা—

নেঃ ইসমাইল: কি হয়েছে—কি হয়েছে রে। আমার চাঁদ বুঝি শেষ হয়ে গেছে রে—(দু'জনের দু'দিক থেকে দৌড়ে প্রবেশ। মা মাটীতে বসে পড়ে পুত্রকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন:

মাজেদা: বাছা আমার চলে গেছেরে (বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে) ও মা'র ইয়াকুব রে—তুই খুন করেছিস্ আজ, বাছা রে আমার তুই খুন করেছিস্। (বুক চাপড়াতে চাপড়াতে) ও বাবা রে...

আজিজ: আমি ওকে দেখিনি মা—ও দৌড়ে এসেই আমার সাইকেলের ওপর পড়েছে। এখন আপনারা হৈ হল্লা আর কান্নাকাটি করে কোন লাভ হবে না। ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে মাথায় পানি ঢালতে থাকুন। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

ইসমাইল: ডাক্তার এসে কিছুই করতে পারবে না—ও আর বাঁচবে না।

আজিজ: তবু চেষ্টা করতে হবে তো। (সাইকেল তুলে নিয়ে প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

জ্ঞান-আলোকের ঝলক

কাজী দীন মোহাম্মদ

আলোর ঝলকের উৎস-শক্তি

ভূতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—অনন্ত শূন্যে ছিল পুঞ্জীভূত নীহারিকার ধুম্রজাল। ধুম্রজালের আগে কী ছিল তাহা আজিও মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। কোটি কোটি বৎসর পরে একদিন সেই ধুম্র-জালের ভিতরে সৃষ্টির কাজ শুরু হইল। তরল, কঠিন, দীপ্ত ও বাষ্পীয় পদার্থকণিকা কিছু কিছু আলাদাভাবে সংগৃহীত অবস্থায় সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং অনন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্যাকাশের বিকাশ ঘটিল। পৃথিবীও একটি গ্রহরূপে আকার নিল। কত কোটি বৎসর ধরিয়া পৃথিবী-সৃষ্টির কাজ চলিয়াছিল তাহাও মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। সেইজন্য, এখনও বলা হয় যে, সৃষ্টির কাল অনাদি। যদি ভবিষ্যতে মানুষ কোনও দিন তাহার জ্ঞান-চক্ষুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ধুম্রজাল সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে তাহা হইলে হয়ত দেখিবে যে, অন্য কোনও প্রকার কোনও কিছু ছিল ধুম্রজালেরও আগে। কিন্তু, এইরূপভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিবার আর কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সব কিছু সৃষ্টির পিছনে কী শক্তি আছে তাহা এখন মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবী আকার নিবার কোটি কোটি বৎসর পরে সেই বন্ধ্যা পৃথিবীর দেহে মহাসমুদ্রের স্নেহ-ধারা ছিল খুবই উষ্ণ—এ কথাও বৈজ্ঞানিকেরা বলেন। কিন্তু, কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া সেই স্নেহধারা ক্রমেই স্নিগ্ধ হইতে লাগিল এবং ক্রমান্বয়ে স্থানে স্থানে মাটির কণা সংগৃহীত হইয়া দ্বীপাদির পত্তন হইল। ইহারও কোটি কোটি বৎসর পরে পৃথিবীর দরিয়ায় এবং স্থলে জাগিল জীবনের স্পন্দন। এইরূপে দুনিয়ায় আসিল প্রাণী, সর্ব্বপ্রথম শেওলা, বৃক্ষলতা, তারপর পক্ষী ও জানোয়ার। এ-ধরার দেহ ইহার পরেও কালে কালে ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বেকার প্রাণীজাতি ধ্বংস হইয়া উন্নত-তর নব নব প্রাণী-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর ভূমিস্তর খনন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন কালের ভূমিস্তরে নূতন নূতন প্রাণী-জাতির সন্ধান পাইয়াছেন এবং এই প্রকার অনুসন্ধানে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, কাল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এ দুনিয়ায় ক্রমেই উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর প্রাণী-জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রকার প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের ফলে সমস্ত প্রাণী জাতির ভিতরে মনুষ্য-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে সর্ব্বশেষে। মানুষ এ-দুনিয়ার সর্ব্ব কনিষ্ঠ এবং সেই কারণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী।

নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীব প্রাণীর সৃষ্টি কী প্রকারে সম্ভব হইয়াছিল; আবার অচল প্রাণী হইতে কী উপায়ে সচল প্রাণীতে প্রাণী-জাতির রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহা মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে আনিবার জন্য এখনও অনুসন্ধান চালান হইতেছে। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, নির্জ্জীব বলিয়া কোনও সময়ে কিছুই ছিল না, আবার অচল বলিয়াও কোন কিছু ছিল না। যদি নির্জ্জীব ও অচল বলিয়া কিছু থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টির ধারায় বিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারিত না। তদুপরি, মানুষ যাহাকে নির্জ্জীব বলিয়া মনে করে—যেমন ধূলিকণা,—সেও সজীব। তাহা না হইলে তাহার দেহের ক্ষয় এবং বৃদ্ধি হয় কী রূপে? আবার ধূলিকণা যদি অচল হইত তাহা হইলে এক স্থান হইতে সরিয়া গিয়া সে অন্যস্থানে জমা হইতেছে কী উপায়ে? তরল পদার্থেরও গতি আছে,—উঁচু স্থান হইতে নীচুস্থানে; বাষ্পীয় পদার্থেরও গতি আছে,—নিম্ন হইতে উচ্চে; দীপ্তি কণারও গতি আছে চতুর্দ্দিকে। অন্য কোনও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে তাহাদের গতি-শীলতা নির্ভর করে। মানুষের গতিও তো সেই প্রকার পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোট কথা, কোটি কোটি বৎসরের সংগৃহীত অশরীরি ও শরীরি চলনশীল শক্তি প্রবাহের সুসংযোজনায় মনুষ্য-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অনাদি ও অনন্ত তমসার মহাশূন্য হইতে অশরীরি ও শরীরি বহুপ্রকার কণিকা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া কোটি কোটি বৎসর পরে মনুষ্য-জীবন সৃষ্টি হইয়াছিল এ-পর্যন্ত মনুষ্যজীবনও বিবর্তিত হইয়াছে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া। মানুষ দিন-রাত ও বৎসর গণনার মাধ্যমে যে কাল গণনার সৃষ্টি করিয়াছে অনাদি ও অনন্তকে সেই কালগণনার গণ্ডির ভিতরে আনা সম্ভবপর হইবে না, গণিতের সংখ্যায় গণনার মাধ্যমেও সে কালকে অঙ্কের সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে না। অশরীরি ও শরীরি এই দুইটি প্রবাহে অনাদি কালের সঞ্চিত কণিকা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মনুষ্য-জীবন গঠিত হইল। আবার এ দুইটি প্রবাহ যেমন নামে বিপরীতার্থক তেমনি কাজেও বিপ-রীতমুখী। দার্শনিকেরা বলেন যে, দেহ এবং আত্মার সংযোগ অনেকটা শত্রুভাবাপন্ন। দৈহিক সম্ভোগ লিপ্সায়

মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া আত্মার অবনতি ঘটায়, দৈহিক শক্তি বিকাশের স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া মানুষ বিচার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। কিন্তু, এই প্রকারের বিপরীতমুখী ও শত্রুভাবাপন্ন দুই প্রবাহ মুখোমুখি বিরুদ্ধাচরণ না করিলে মানুষের বিবেক পরিচালনা করিবার প্রয়োজন হইত না, মানুষ ভাল-মন্দ বাছিয়া লইবার চেষ্টাও করিত না। শারীরিক ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় মানুষ কাজ করিয়া যাইবে, ইন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া আপাততঃ নিজের একটু পরিতুষ্টি অনুভব করিবে; কিন্তু পরে সেই কাজের ফলাফল দেখিয়া মানুষ হয়ত বাকী জীবনভর সন্তুষ্ট থাকিবে, আর না হয়ত বাকী জীবন-ভর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে। এইরূপে মানুষ বুদ্ধি ও জ্ঞান আহরণ করিয়া চলিবে। মানুষের অশরীরি মানসিক প্রবাহে দয়া, মায়া, সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যেমন কতকগুলি প্রবৃত্তি কণিকা আছে, তেমনি সেথানে নির্দয়তা, নির্মমতা, অসহনশীলতা, কৃতঘ্নতা বা ঈর্ষা বলিয়া বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি কণিকাও আছে। শরীরি বা ম্যাটেরিয়াল প্রবাহের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সহিত অশরীরি বা স্পিরিচুয়াল প্রবাহের রিপুগুলি মিলিত হইয়া যে কু-কাজগুলি মানুষকে দিয়া করাইয়া লয় তাহার ফলভোগের সময় মানুষ অন্তর্দাহে জ্বলিতে থাকে। এই পদ্ধতিতে মানুষের বিবেক পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের কাজের ফলাফলে মানুষের মনে যে দুঃখ-কষ্ট বা সুখশান্তির উদ্ভব হয় তাহা হইতেই মানুষ ভাল ও মন্দ বিচার করিবার জ্ঞান আহরণ করে। মানুষের মনের দুঃখ কষ্ট আর সুখ-শান্তির এই দুই বিপরীতমুখী প্রভাব মানুষের মনে ভাল ও মন্দ বিচার করিয়া জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য যে প্রেরণার সৃষ্টি করে তাহাই প্রয়োজনের তাগিদরূপে মানুষের সামাজিক জীবনে প্রকাশ পায়। মানুষ সুখ-শান্তির ভিতরে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং সেই সুখ-শান্তির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়া মানুষ জ্ঞান-লাভ করিতে থাকে। অতএব, প্রয়োজনের তাগিদই জ্ঞান-দীপ্তি বিকাশের উৎস-শক্তি।

সুসংযত মনুষ্য-জীবন গঠনের জন্য যেমন তাহার অশরীরি প্রবাহের সমস্ত কণিকা দুইটি বিপরীতমুখী প্রবাহের সংযোজনায় সুনিয়ন্ত্রিত, তেমনি তাহার শরীরি প্রবাহের সমস্ত কণিকাও দুইটি বিপরীতমুখী প্রবাহের সংযোজনায় সুনিয়ন্ত্রিত। বস্তুতঃ, সৃষ্টি-কাজের সব কিছুর ভিতরেই বিপরীতমুখী দুইটি জোড়া ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অন্ধকার না থাকিলে আলো থাকিত না; ভাল না থাকিলে মন্দ থাকিত না; দিন না থাকলে রাত থাকিত না, দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকিত না; শাস্তি না থাকিলে পুরস্কার থাকিত না; পশুত্ব না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকিত না, ক্ষয় না থাকিলে পুষ্টি থাকিত না, মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকিত না। আবার আলো-অন্ধকার সুসংযুক্ত না হইলে দৃষ্টি থাকিত না, ভাল-মন্দ সুসংযুক্ত না থাকিলে অনুভূতি থাকিত না, দিন-রাত সুসংযুক্ত না থাকিলে সময় থাকিত না, পুরস্কার-শাস্তি না থাকিলে শৃঙ্খলা থাকিত না, পশুত্ব-মনুষ্যত্ব সুসংযুক্ত না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিত না, পুষ্টি-ক্ষয় সুসংযুক্ত না থাকিলে শরীর বা দেহ থাকিত না, জন্ম-মৃত্যু না থাকিলে জীবন কাল থাকিত না। এ-সম্বন্ধে উদাহরণ মালা অফুরন্ত। মোট কথা, সৃষ্টি-ধারার সব ক্ষেত্রে সর্ব্বস্তরে এবং সৃষ্ট সব কিছুর ভিতরে বিপরীতমুখী বা বিপরীতপন্থী দুইটি কণিকা জোড়ায় জোড়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বিরুদ্ধ দিক হইতে তাহারা নিজেরা যে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে তাহাতেই তাহারা নিজেরাই শক্তিশালী হইতেছে এবং তাহারা দুইজনে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সংঘর্ষে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহাও ক্রমেই শক্তিশালী হইতেছে। শরীরি বা দেহ সম্বলিত সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে ক্ষয় ও পুষ্টির সুসংযুক্তে। ক্ষয়ের ধাক্কায় শরীরি সব কিছু ক্ষয় বা মৃত্যুর দিকে প্রবাহিত হয়, আর পুষ্টির জোরে তাহাদের জীবন-কাল বৃদ্ধি পায়। মানুষ তাহার শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া জীবন-কাল বৃদ্ধি করিবার নেশায় মাতিয়া উঠে। শরীর ক্ষয়ের আভাস পায় মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণার মারফতে। এইরূপে, মানুষ উদর-পূরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উদর পূরণের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ খাদ্য ও অখাদ্য বাছিয়া বাহির করিয়া চলিয়াছে। এখানেও প্রয়োজনের তাগিদ জ্ঞান-দীপ্তি বিকাশের উৎস-শক্তি।

মানুষের মনে প্রয়োজনের তাগিদ সুষ্ঠুরূপে সংযোজিত হইয়াছে রোগ, শোক, জরা-মৃত্যু, বিপদ, আপদ, দুঃখ, দুর্দশা প্রভৃতি অস্বস্তি এবং তাহার বিপরীতপন্থী স্বস্তি বোধের ভিতর দিয়া। প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইবার জন্যই মানুষের মনে আসে কর্ম্মস্পৃহা, উৎসাহ এবং নূতন কিছু আবিষ্কারের প্রেরণা। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সব কিছু আবিষ্কার করিতে শিখিয়াছিল। এই সত্য ইংরাজীতে Necessity is the mother of invention—এই কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

মানুষ এ-দুনিয়ার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাহার সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্ব বড় গভীর। এ-দুনিয়ার সর্ব্ব প্রকার জীব জানোয়ার, বৃক্ষলতা প্রভৃতির উপরে আধিপত্য করিবার অধিকার ও ক্ষমতা লইয়া মানুষ শারীরিক গঠনে অত্যন্ত নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় ধরার কোলে জন্ম গ্রহণ করিল। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র একটি স্থানে। অন্যান্য জীব-জন্তুর শারীরিক আয়তনের অনুপাতে তাহাদের মগজ-যতটুকু, মানুষের শারীরিক আয়তনের অনুপাতে তাহার

মগজের পরিমাণ তদপেক্ষা একটু বেশী। জাতিতত্ত্ব (Ethnology), জীব-বিদ্যা (Biology), সমাজ-[illegible] (Sociology), [illegible] (Physiology), [illegible] (Anthropology) প্রভৃতি বিজ্ঞান এই সত্যই আজ জাহির করিতেছে যে, মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর তুলনায় নেহায়েত নিঃস্ব অবস্থায় এ-দুনিয়ায় আসে; কিন্তু তাহার দৈহিক মস্তিকাধার, মানসিক কতকগুলি প্রবৃত্তি এবং সর্ব্বোপরি বিবেক পরিচালনার ক্ষমতার অঙ্কুর মনুষ্যত্বের বিশিষ্ট সওগাত হিসাবে সঙ্গে লইয়া আসে। সমস্ত ধর্ম্মের শিক্ষাও এই যে, স্বয়ম্ভূ বিশ্ব-নিয়ন্তা বা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন মানুষের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এ-দুনিয়ার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানকে এই কয়টি অতুলনীয় এবং অপার্থিব বা বেহেশ্‌তী উপহার সামগ্রীতে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী,—এমন কি গরু-মহিষের মত বৃহদাকার শরীর লইয়া মানুষ এ-পৃথিবীতে আসে নাই; ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক,—এমন কি শৃগাল বা সর্পের মত শিকার ধরিয়া খাইবার সাজ সরঞ্জাম লইয়াও মানুষ এ দুনিয়ায় আসে নাই; অন্যান্য জীব-জন্তুর মত শীত নিবারণের জন্য পশমাবৃত কলেবর লইয়া মানুষ এ দুনিয়ায় আসে নাই; আত্মরক্ষার জন্য হরিণের মত ক্ষিপ্রপদ, গরু-মহিষের মত শিং এবং সাপ কুকুরের মত দাঁত লইয়াও মানুষ এ-দুনিয়ায় আসে নাই। এমন কি অন্যান্য জীব-জন্তু জন্ম গ্রহণ করিবার অল্প দিনের মধ্যেই যেমন নিজেদের পায়ে ভর করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে মানব-শিশু তাহাও পারে না। মানব-শিশুকে পর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় বহু দিন। অথচ, মানব-শিশু চারিদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে।

মনুষ্য-জাতির প্রথম শিশু-জন্মগ্রহণ করিয়াছিল অসংখ্য হিংস্র জীব-জন্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত ধরার বুকে। নিঃসম্বল ও নিঃসহায় মানব শিশু কী উপায়ে এত সব হিংস্র জীব জানোয়ারের কবলে পড়িয়াও বাঁচিয়া রহিল, সে সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক এ-পর্যন্ত বহু প্রকার মতবাদ পোষণ করিয়াছেন। একজন দার্শনিক বলিয়াছিলেন যে, হনুমান, বানর গরিলা প্রভৃতি বানর জাতীয় প্রাণীর পরবর্ত্তী ধাপের উন্নত সৃষ্ট-জীবই মানুষ; এবং যাহার উদর-গর্ভ-হইতে মানুষ প্রথমে ধারায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল সে-ই তাহার সন্তানের যত্ন লইয়াছিল; মনুষ্য-সন্তানকে সে-ই লালন পালন করিয়াছিল। দার্শনিক প্রবর দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, মনুষ্য-জাতি বানর জাতি হইতে উন্নততর এবং অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে বহু বিষয়ে বানর জাতি উন্নততর অথচ মনুষ্য-জাতি হইতে নিম্নতর অন্য কোনও জীব-জন্তু নাই। সৃষ্টির আদি কাল হইতে যে প্রকার পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সৃষ্টির কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া-ই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, বানর জাতিকে ডিঙ্গাইয়া অন্য কোনও নিম্নস্তরের জন্তু মনুষ্যে পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। এই প্রকার একটি সুসংযত ধারায় বিচার করিয়া তিনি তাঁহার এই মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, স্বভাবতঃই তখনকার অধিকাংশ বিদ্বান-ব্যক্তি তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূমিস্তর খনন করিয়া এমন সব কঙ্কাল সংগৃহীত হইয়াছে যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেগুলি বানর জাতীয় জন্তু হইতে উন্নততর জন্তুর কঙ্কাল এবং অনেক দিক দিয়া সেগুলি মানুষের কঙ্কালের সঙ্গে তুলনীয়। অনেকে আবার দুর্গম গিরিশিখরে আরোহন করিয়া এমন সব পদ-চিহ্ন পাইয়াছেন যাহা মানুষের পদ-চিহ্নের সঙ্গে তুলনীয়। গিরি-শিখরে এমন সব জন্তু দূর হইতে মানুষের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে যেগুলি আকৃতিতে বিরাট; কিন্তু, শারীরিক গঠনে মানুষেরই মত। এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার-ধারায় আনিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে-জাতীয় জন্তু পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক মনুষ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল সে জাতীয় জন্তু হয়ত এখন আর এ-দুনিয়ায় নাই। আর না হয়ত আছে; কিন্তু, মানুষের ভয়ে তাহারা মানুষের নাগালের বাহিরে লুকাইয়া আছে। তাহাদের কোলে লালিত-পালিত হইয়া নিঃসহায় ও নিঃসম্বল মনুষ্য-সন্তানগণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিয়া এবং গায়ে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। কেননা, তাহারা মানুষের উদর পূরণের ব্যবস্থার মধ্যে ভাগ বসাইতেছিল, মানুষের খাবার দ্রব্য অনেক কিছুই তাহারা খাইয়া ফেলিতেছিল। এ-ক্ষেত্রেও মানুষ তাহার পূর্ব্বপুরুষকে বিতাড়িত করিয়াছে উদর পূরণের তাগিদে।

জন্ম আর মৃত্যু—এই দুই বিপরীতমুখী প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া মানুষ তাহার জীবনকাল বৃদ্ধি করিবার নেশায় মশ্‌গুল হইল। হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য কিছু করিতে হইবে এই প্রকার প্রয়োজনীয়তা-বোধও তাহার ভিতরে জাগ্রত হইল।

সব কিছু সৃষ্টির মূলে যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি পরিপূর্ণ মনুষ্য-সৃষ্টি সফল হইল বিপরীতমুখী নর ও নারীর সৃষ্টিতে। গাছপালা, লতাপাতা, পশুপক্ষী সব কিছুর বংশ বৃদ্ধির শক্তিতে রহিয়াছে স্ত্রী ও পুরুষ দুইটি বিপরীতমুখী প্রবাহ। মনুষ্য সৃষ্টির মূল দর্শনবাদ অনুসারে ইহাই খাঁটি সত্য যে, নারী ও পুরুষরূপেই আদিম মানুষের সৃষ্টি। ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানদের

বিশ্বাস অনুযায়ী হজরত আদম ও বিবি হাওয়ার সৃষ্টিতেই এ-দুনিয়ার মনুষ্য-সৃষ্টির সূচনা হইয়াছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে হজরত আদম ও বিবি হাওয়ার সম্পর্ক পিতা-কন্যা, ভাই-বোন অথবা মাতাপুত্রের সম্বন্ধ নয়, ইহা আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ। অতএব, মনুষ্য-সৃষ্টির আদিতেই নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক নির্দ্ধারিত ছিল সেই আদি স্বাভাবিক সম্পর্কই সাত্ত্বিক এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ হইতে ঢের বেশী শক্তিশালী ও গরীয়ান। পৃথিবী সভ্যতার যে স্তরেই যখন পৌঁছাক না কেন বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের সর্ব্বস্তরেই পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী রূপ সম্বন্ধ মানুষের অন্যান্য সম্বন্ধকে খর্ব্ব করিয়া মনুষ্য-সমাজে শক্তিশালী হইয়া বিরাজ করিবে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যৌন-তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই কারণে, আধুনিক সমাজে দেখি যে যুবক-যুবতী যেদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ গ্রহণ করে সেই দিন হইতে পিতামাতার স্নেহের বন্ধন শিথিল হইতে থাকে এবং ভ্রাতা-ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সাময়িক সম্বন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, স্বামীর নামের সহিত জড়িত হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশিত হইতে থাকে, স্ত্রীলোকের ভালমন্দ—কাজের সুনাম ও দুর্ণাম স্বামীর জীবন ধারার সহিত যুক্ত হইয়া যায়,—দুইজনে স্বামী-স্ত্রীরূপে বিকশিত হইতে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে যদি কেহ এই প্রাকৃতিক নিয়মকে ভঙ্গ করিয়া অন্য কোনও সম্বন্ধকে বড় করিতে চায় তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রে মনুষ্য-জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়,—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; অনুতাপ ও অন্তর্দাহে মনুষ্য-জীবন জর্জ্জরিত হইয়া যায়, দাবানলে সমাজ জ্বলিয়া উঠে। বংশ বৃদ্ধি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার যে প্রেরণা মানুষের মনে আছে তাহাতেই দাম্পত্য-সম্বন্ধকে এতখানি শক্তিশালী করিয়াছে। যৌন-লিপ্সার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাধ্যমে এই দুই বিপরীতমুখী নর ও নারীকে সুসংযুক্ত ও সুসংযত রাখিয়া এ-ধরার বুকে মনুষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবাহ ছুটিয়াছিল। কিন্তু এই দুই বিপরীতপন্থী নর ও নারীর মনে যেমন যৌন-লিপ্সার আকর্ষণে বা কামাশক্তির টানে মিলনের আকাঙ্খার সৃষ্টি হইত, তেমনি আবার মিলনের কিছুদিন পরেই কোন্দল বিদ্বেষের বিকর্ষণ এবং স্ফুলিঙ্গের আঘাতে তাহাদের দাম্পত্য-জীবনে ভাঙ্গন ধরিত। নর ও নারী কোন্দলে মত্ত; আবার নরগুলি ভোগ-লিপ্সায় মাতিয়া একে অন্যকে হত্যা করিতে উন্মত্ত। সুখ-শান্তি আদিম মানুষের মনে ও সমাজে নানা প্রকারে নষ্ট হইত। শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষ উপায় খুঁজিয়া চলিল। এ-ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ দাম্পত্য-জীবন সুগঠিত করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল।

মানুষের মনে সুস্থ দেহে সুখে বাঁচিয়া থাকিবার প্রেরণা; অথচ, তাহার চতুর্দিকে হিংস্র জীব-জানোয়ার, রোগ-শোক ও অন্যান্য অসংখ্য শত্রু তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সব সময়ে উদ্‌গ্রীব। একটু অসাবধানে থাকিলে অসময়ে তাহার প্রাণহানি ঘটে। শারীরিক গঠনেও সে একেবারে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। এই প্রকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিতরে পড়িয়া মানুষ তাহার মস্তিষ্ক ও বিবেক পরিচালনা করিতে ব্যস্ত হইল। সে তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করিয়া সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া, পরীক্ষা করিয়া বিবেকের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিয়া চলিল। মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদেই জ্ঞানালোকের ঝলক ছুটিল,—প্রয়োজনের তাগিদ-ই জ্ঞানালোকের উৎস-শক্তি। সেই উৎসকে আরও জোরে উৎসাহিত করিল মানুষের নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থা। এ-ধরার বিভিন্ন স্থানে মানুষ ছড়াইয়া পড়িল। কোন স্থানে জ্ঞানালোকের ঝলক ছুটিলেই তাহা অজ্ঞানতার তিমিরাবৃত অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিমিরাবৃত অঞ্চলের মানুষও জ্ঞানালোকের প্রতি আকৃষ্ট হইতে অভ্যস্ত হইল। এইভাবে, আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানালোক সারা পৃথিবীর বুক আলোকিত করিয়া চলিল।

ফজুর মা
হাসিব চৌধুরী

ছোট্ট শহর। স্কুলে মাষ্টারী করি। কয়েকজন শিক্ষক মিলে থাকি একটা বাসায়। শহরের এক প্রান্তে বাসাটা। বাসার পাশ দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে একটা বড়-সড়ক।

একজন প্রৌঢ় গোছের ঝি বাসার-কাজ-কাম করে; রান্না-বান্না করে দেয়। এ-অঞ্চলে ঝি-কে ডাকা হয়-'মামা' ব'লে। আমরাও আমাদের ঝি-কে ডাকি 'মামা'। মামার সঙ্গে আমাদের চাকরাণী-মনিবের সম্পর্ক নয়; বরং অনেকটা আত্মীয়ের। মামার নিজস্ব বাড়ী-ঘর নেই। সে আমাদের বাসায় কাজ-কাম করে। আমাদের বাসায়-ই থাকে। তার কর্ম-তৎপরতায় আমাদের বাসাটা যেন ছোট্ট এক স্বর্গপুরী। সব কিছু সাজানো-গোছানো। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। ছিমছাম। তাকে এক মুহূর্ত বসে থাকতে দেখা যায় না কখনো। একটা না-একটা কাজে সব সময় লেগেই থাকে সে।

মাস ছয়েক হলো এ-বাসায় এসেছি আমরা। আর তখন থেকেই দেখ্‌ছি, কেন জানি না, সবার চেয়ে মামা আমাকেই একটু স্নেহ করে বেশী। আমার রুমটা দিনে পাঁচ-ছয়বার করে ঝাড়ু দেয়। কাপড়-জামা গুলো একটু ময়লা-না হতেই দেয় কেচে। বই খাতাগুলো সব সময় গুছিয়ে রাখে টেবিলের উপর। খাবার বেলাতেও মামা বড় মাছখানা অথবা মাছের মুড়োটা সবার অলক্ষ্যে তুলে দেয় আমার পাতে। শুধু তাই নয়। আমি ঘরে থাকা-কালে কারণে অকারণে বার বার সামনে এসে ঘুরে যায় সে। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। একটা সজাগ স্নেহের দৃষ্টিতে সর্বদা সে যেন আচ্ছন্ন করে রাখতে চায় আমাকে।

বাসার অন্য সবাইকে মামা ডাকে 'সায়েব' বলে। কিন্তু আমাকে ডাকে 'সায়েব বাবা'। এ-নিয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা হাসাহাসি করে। অনেক সময় আমি নিজেও কেমন বিব্রত বোধ করি। ভাবি, মামার এ-এক অদ্ভুত খেয়াল।

একদিনের কথা। সারাদিনের খাটুনির পরিশ্রান্ত-ক্লান্ত মন নিয়ে বিকেলে ফিরেছি বাসায়। তাড়াতাড়ি গরম এক কাপ দুধ হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় মামা। আমার অবসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—

: আপনি কি এ্যাহান থন চইলা যাবেন, সায়েব বাবা ?

: চলে যাব কেন ? বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করি আমি।

: এ্যাহানের-কাম খুব কষ্ট কিনা তাই, জিগাইলাম।

: কষ্ট! কে বললো তোমাকে ?

: এ কি আর কইতে অয়। সারাদিন ভইর‍্যা সোর-গোল কইর‍্যা পোলাপান পড়ান্ কি সওজ! আপনার মুখের দিকে চাইয়্যাই আমি ঠাওর কইরবার পারি।

: তাই না কি। কিন্তু অন্যান্যরাও তো করছে এ কাজ ?

: তা করুক। তারা অনেক কাল ভইরা করত্যাছে। তা'গো অভ্যাস অইয়া গেছে। আপনি অইলেন চ্যাঙরা মানুষ।

আমি হাসি। আস্তে আস্তে দুধের কাপে চুমুক দিতে থাকি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে মামা আবার বলে—

: তা' অ'লে হাছাই আপনি চইল্যা যাবেন, না সায়েব বাবা!

: পাগল! যাব কেন? পোলাপান পড়াতে যে ভাল লাগে আমার।—মামার কথার জবাব দিই আমি।

: কিন্তুক এ-কাম আপনার যে বড় কষ্ট অয়। না, তা' অ'ক। তেমু-যাইবেন না আপনি এ্যাহান থন।—বলতে বলতে খুশি মনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মামা।

আরেক দিনের কথা। সন্ধ্যার পর বাসার অন্যান্য বন্ধুরা ছবি দেখতে গেছে সেকেণ্ড শো'তে। আমি একা আমার থাকবার ঘরটিতে বসে কি একটা বই পড়ছি। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল মামা। আমাকে পাঠে নিমগ্ন দেখে বোধ করি কথা না বলে চুপচাপ বসে পড়ল সামনের চৌকিটায়। ভাবে বুঝলাম, কিছু বক্তব্য আছে মামার। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল। তবু কিছু বলছে না সে। অবশেষে আমিই জিজ্ঞেস করলাম,

: কিছু বলতে চাও, মামা ?

: না। কি আর কইমু।—

: হ্যাঁ বলমু একটা কথা। আমারে মামা বইলা-ডাকবেন না।

: সে-কি। মামা বলে ডাকব না!

: কিন্তু-সবাই তো তোমাকে মামা বলেই ডাকে।—বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিই আমি।

: তা' ডাকুক সবায়। আপনি আমারে মামা কইবেন না।

: তা' হলে কি বলব তোমাকে ?

: ক্যান, আমার কি ব্যাটা-পুত্তুর ছিল না ?

: ব্যাটা পুত্তুর তোমার নেই বলেই জানি। ছিল কিনা তা তো জানি না।

: ছিল! ছিল! আসমানের চাঁদের নাগাল আল্লায় আমায় বেটা দি' ছিল। আল্লা'র মাল আল্লা য় নিয়া গেছে। তা আপনি আমারে ফজুর মা বইলা ডাকবেন'—বলতে বলতে গভীর আবেগে কেঁপে উঠে মামার কণ্ঠস্বর।

মামার মুখের দিকে তাকাই। হঠাৎ যেন তার এক নতুন পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আজ আমার সম্মুখে। সে ঝি নয়; বাসার চাকরাণী নয়। সে নারী; সে জননী। আর তাই একমাত্র মৃত সন্তানের নামের স্মৃতিটুকু অবলম্বন করেই সে বাঁচিয়ে চায় তার নারীত্বের আর মাতৃত্বের হারানো গৌরব।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মামা। সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বিড় বিড় করে কত কি বলে যেতে থাকে।

: চাঁদের নাগাল ব্যাটা। আল্লায় দিছিল। আবার নিয়া গেছে। না-না, মাইনষে তারে বাঁচাইতে দেয় নাই। মাইনষে—

: অমন করে-কি বলছ তুমি। ডেকে জিজ্ঞাসা করি-মামাকে। মামা যেন সম্বিত ফিরে পায়। জবাব দেয়,—

: কি বলতেছি, শুনবেন? বিশ্বাস অইবো আপনার?

: বিশ্বাস হবে না কেন, নিশ্চয়ই হবে!

: তা' অ'লে কই, কই শোনেন। আমার ব্যাটা ছিল। সোয়ামী ছিল। ঘর ছিল। সোনার সংসার ছিল। খেশী-কুটুম, জমি-জমা, টাকা-কড়ি সব ছিল— উদ্‌ভ্রান্তের মত এক দিক থেকে বলে যায় মামা।

: বেশ! কিন্তু কি হলো এ-সব? প্রশ্ন করি আমি।

: কি অইলো? শুনবেন, তা-ও? আচ্ছা কই আপনারে।'—ভূমিকা শেষে শুরু করে মামা—

: এই যে আমাগো বাসার পাশ দিয়া সড়ক চইল্যা গেছে, এই সড়ক ধইর্যা আওগে গেলি একটা সোঁতা— ওপারে একটা গাঁও—সেই গাঁও-এ ছিল আমাগো বাড়ী। আল্লায় অবস্থা দিছিল। বাড়ীত্ ছিল তিন-চাইর হান্ টিনের ঘর। ঘরে বেড়ি ভইর্যা ধান আর চৈতালি; মাচি ভইর্যা থাকত পাট। সোয়ামি তো কাজ-কামের সময় পাইত না। দরবার দিয়্যান কইর্যাই বেড়াইত দিন-রাইত। দুইজন কামলা ছিল তারাই করত সব। রাতের বেলায় পাড়ার মাইনষে আইয়া বাড়ীর উঠানে আসর জমাইত। সুর কইর্যা গান গাইত, শোলোক-সিমাস্থা কইত। আমার হাশুরী তহনও বাঁইচ্যা। সংসারের রান্ধা-বাড়া আর খাওন-দাওন করতেই দিন যাইত তার। আমি আর আর কাম [illegible] দিই। '[illegible]' বাড়ী ভইর্যা যায় ধানে। পাড়ার যত গরীব বেটী গো ডাইক্যা আইন্যা কাম করাই। আর্ধেক রাইত ভইর্যা ধান ঝাইড়্যা দিয়্যা যায় তারা।

বছর হানি পর…।

হাশুরী জ্বরে পইল। সেই জ্বর-ই তার শেষ জ্বর।… সোয়ামী দুই আত ভইর্যা গরীব-মিসকিন গো দান-খয়রাত করল। বড় বড় খাসি মাইর্যা, দই আইন্যা দিল গাঁওয়ালি খাওয়া। দ্যাশ জুইড়্যা নাম নামি অইল সোয়ামির। কিন্তুক তহন-ও কোল খালি আমার। আল্লার কাছে কাঁদাকাটি করি। না অয় কালো-কুচ্ছিত একটা মাইয়্যাও দ্যাও আল্লা!

কতক দিন পর।

বুঝলাম আল্লার দয়া অইছে…। এক পোলা অইল আমার। চান্দের মতন চেহারা। আবার দান-খয়রাত করল সোয়ামী। খাওয়াইল গিরাম-ভর। আল্লার দোওয়ায় তহন আমার সোনার সংসার।'—মামা থামে। কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে। বোধ করি তার মনের পর্দায় ভেসে উঠে সেই হারানো সংসারের অস্পষ্ট স্মৃতি।

মামার দিকে আরও ভাল করে তাকাই আমি। মনে মনে আন্দাজ করি তার বয়সটা। তার আসল বয়সের চেয়ে একটু বেশি সে বুড়িয়ে গেছে। তবু এই 'কুড়িতে বুড়ি'র দেশের মেয়ে হলেও এখনও তার চেহারার দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়, পুরো যৌবনে মামার অটুট স্বাস্থ্য ছিল, রূপ ছিল, জৌলুষ ছিল। মনে হয়, আমার সামনে আজ বসে যে কথা বলছে—সে যেন আমাদের মামা নয়; অন্য কেউ। কোনো সুখী-সমৃদ্ধশালী পরিবারের গৃহিণী সে। তার কথা বলার ভঙ্গী আলাদা। চেহারা আলাদা। চোখে-মুখে তার আভিজাত্যের ছাপ।

'কিন্তুক অদিষ্টের ফের'—পুনরায় শুরু করে মামা। 'আমার ঘরে ঢুকল আইস্যা অভিশাপ। একদিন সোয়ামী মাঠ থন ঘুইর্যা আইয়্যা কইল, জমি লইয়া পাশের গেরামের কাজি গো লগে গোলযোগ বাধছে। আমি কইলাম, কাইজ্যা-ফসাদে কাম নাই। আপোষ কইর্যা ফেল।

সোয়ামী গেল মুনিব বাড়ী। সাঁঝের অক্তে আইয়া কইল, বাবুর লগে যুক্তি কইর্যা আইলাম। হে কইল মামলা করনের লিগে। জোরে তো আর কাজী গো লগে পারন যাইবো!

আমি ফের কইলাম,

: জোর-জবরদস্তি মামলা-মকদ্দমা কইর্যা কাম নাই। যার ঘরে মামলা ঢোকে তার কি ভালা অয়? আল্লা আমারে যে সোনা-মানিক দিছে, হে বাঁইচ্যা থাক্। হে-ই আমার জমি-জমা ধন-দৌলত।

সোয়ামী ধমকাইল, আমারে, কইল—

: তুমি মাইয়্যা মানু, তুমি কি জান? মান-ইজ্জেৎ বড় জিনিস। বাবুর লগে কথা দিয়্যা আইছি। এহন যদি কই, মামলা করুম না তা অইলে হে কইব, মোড়ল তুমি ভীতু! তোমার বুকির পাটা নাই।'

তারপর সোয়ামী নরম অইয়া বুঝাইল আমারে—

: তুমি ভাইবো না কিছু। এ-মামলায় আমরাই জিতুম। বাবু কইছে, হগল তাগাদা-তদবির হে-ই কইর‍্যা দিবো। আমার কিছুই করন লাগবো না।

আমি চুপ কইর‍্যা রইলাম।

শহরে মামলা রুজু অইল। কিন্তুক ট্যাহা?

হাশুরীর মারা যাওনের পর তার 'ফয়তা'য় (ফাতেহা) আর পোলার আকিকায় নগদ ট্যাহা সব খরচ অইয়া গেছে। এ্যাহন মামলা চালাইতে তো ট্যাহা লাগবো? সোয়ামী আমারে না জানাইয়া জমি বন্ধকী থুইয়া বাবুর কাছ থন কিছু ট্যাহা আনল। আস্তে আস্তে হে ট্যাহা গেল হে'ষ অইয়্যা। এবার সোয়ামী ট্যাহার অভাবের কথা কইল আমারে। শুইন্যা আবারও সোয়ামীরে বুঝাইলাম—

: কি অইবো মামলা কইর‍্যা। শেষ কালে ওই একটু হানি জমির লিগে হগল সংসার যাইবো। তুমি আপোষ কইর‍্যা ফেল।

সোয়ামীর মন ভিজল। বাবুর কাছে গেল মামলা আপোষের কথা কইতে। কিন্তু হে কইল তারে,

: মোড়ল, তুমি মামলা ছাইড়্যা দিবা। মাইনষে তোমারে যে ছি ছি করবো। আমরা থাকতি তুমি অপমান অইবা? ট্যাহা না থাকে দিমু আমি। ভাইবনা তুমি, জমি-জমার বন্ধকী লাগবোনা। যহন্ তোমার সুবিধে অয় হেই সুদ্-ই ট্যাহা ফেরত দিয়ো আমারে। তুমি অইলে গে' আমাগো আপনার লোক। তোমার লগে আর কি কথা।

সোয়ামীর মন ঘুইর‍্যা গেল।...মামলা-চলল পরায় বছর চাইরেক। হে'ষকালে আমাগোই হার অইল। এদিক সংসারের অবস্থাও অইয়া গেল অচল।

আমার ফজু তহন ছয় বছরের। সোয়ামী তারে দিয়্যা আইল ইস্কুলে। আমি কইলাম।

: কি অইব পইড়্যা-শুইন্যা। আর আমাগো মইধ্যে কি পড়া মা'নবো। আল্লা ওরে হায়াত্ দিক। ও বাঁইচ্যা থাহুক। গেরস্তের পোলা। গিরস্তির কামই করব। সোয়ামী জওয়াব দিল,

: না-না! ফজুরে আমি গিরস্তির কামে দিমুনা। ওরে আমি পড়া শিখাইমু। মোল্লাগো পোলার নাগাল ওরে বিদ্বেন করমু। ফজু আমার জজ-ম্যাজিস্টের অইবো।

আমি কইলাম,

: কিন্তুক পড়াইতে যে খরচ লাগবো! এত ট্যাহা পাইবা কই? সব-ই তো খোয়াইয়া বইছো।

: তার লিগে চিন্তে করিনে'।

খোদায়-ই জুটাইয়্যা দিব। এত ট্যাহা শুধে শুধি পানিত ঢাল্লাম পরের কথায়।

না-না বাবু আমার ভালোর লি.গই খাট্ছে। আমার-ই নছিবের দোষ।

ফজু ইস্কুলে যায়। মাষ্টরা তার পড়াশোনার তারিফ করে। সোয়ামীর বুক ভইর‍্যা উডে আশায়। পর সন।

আল্লার দোওয়ায় ক্ষে'ত অইলো ভালা। সোয়ামীরে কইলাম,

: ধান-পাট বেইচ্যা-কিন্যা বাবুরে ট্যাহা দিয়া আইও। আমাগো কষ্টে-সিষ্টে আল্লায়-চালাইবো। দিনা থাহন তো ভালা না।

ট্যা'হা নিয়্যা গেল সোয়ামী। কিন্তুক ট্যাহা নিল না বাবু। তারে নাকি কইল,

: আরে, এত তাড়া কিসের মোড়ল। তুমি তো আর পলাইয়্যা যাইবানা। মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার অইয়্যা পড়ছো। জমি-জমার খাজনা-পত্তর বাকি। হে-ই সব শোধ কর এবার। তারপর যহন সুযুগ-সুবিধে পাও, তখন দিয়ো এট্যাহা।

বাবুর দয়ার সুনাম কইর‍্যা ফির‍্যা আইল সোয়ামী। কিন্তুক আমার মনডার মইধ্যে জিনি কেমন সন্ধ অইতে লাগল।

পর পর দুই সন। অজন্মা গেল দেশ। ক্ষেত খোলা অইলনা কিছু। খাইয়্যা-পইর‍্যা বাঁচনই দায়। বাবুর ট্যা'হা আর দে'ওন অইলনা। একদিন সোয়ামীরে ডাইক্যা নিয়্যা কইল বাবু,

: তোমার লগে তো আর গোলযোগ নাই মোড়ল। তা বাঁচন মরণের কথাও তো কওন যায় না। তাই কইত্যাছি, বন্ধকী ট্যাহা ছাড়া যে কয় ট্যাহা লইছ, তার লিগে একটা কিছু লেইখ্যা রাখি। তুমি চিন্তা কইরনা। তোমারে অন্যায় করমু না আমি।'

কি করবো আর সোয়ামী। বাধ্য অইয়্যা'-ঘর-বাড়ী লেইখ্যা দিয়্যা আইল বন্ধকী খাতে। শুইন্যা পরানডা কাঁইপ্যা উঠল আমার। সোয়ামী এবারেও বুঝাইল,

: বাবু ভালা মানু। ট্যাহার সুদ নিবনা, কইছে। সুযুগ মতন আসল ট্যাহা দিলেই চলব।

সংসারের অবস্থা কেরমেই খারাপ। ট্যাহা আর জোটেনা। বাবুর ট্যাহাও দে'ওন অয়না। এমনি কইর‍্যা আরও গেল দুই বচ্ছর। সোয়ামী এহন নিজেই ভাবনায় পড়ে।—

: কিসে কি অয় কওন যায় কিছু! যদি মইর‍্যা যাই,

কি অইবো অবস্থা না-বালক পোলার। ভাবনা-চিন্তায় শরীল ভাইঙ্গ্যা পড়ে তার। তারপর এক দিন।

কপালে আমার মাইমা আছে দুর্যোগ। চিরকালের মত আমারে ছাইড়্যা যায় সোয়ামী।...

মামার কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে আসে। কিছুক্ষণ থেমে অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে পুনরায় শুরু করে মামা: দুঃখে-কষ্টে দিন যায়। ফজু আমার এহন বড় ইস্কুলে পড়ে। পাড়ার মাইনষে নানা জনে নানা-বুদ্ধি দেয়। পোলার পড়া ছাড়াইয়্যা দিতে কয় গিরস্তির কামে।

আমার কিন্তু মনে লয়না এ-কথা। সোয়ামী ওরে পড়তে দিয়্যা গেছে। ওরে পড়ামুই আমি। তাতে যদি পরের বাড়ীর 'বারা' ও বানতে অয় আমার।

মাস ছয়েক পর।

উইড়্যা-ফুইর‍্যা খবর হুনলাম, দেনার দায়ে বাবু নাকি আমাগো জমি-জমা, ঘর-বাড়ী সব ডিক্রী কইর‍্যা নিছে। পরথম কথাডায় বিশ্বেস অইলনা। সোয়ামীরে বাবু যে খাতির করত। তার মইর‍্যা যাওনের লগে-লগেই আমাগো অনিষ্ট করবো হেয়্! না, তাকি অয়? কিন্তু কয়্যাক দিন পরে বুঝলাম, কথাডা মিছানা। পিয়ন আইস্যা নুটিস কইর‍্যা গেল, আমাগো বাড়ী ছাইড়্যা চইল্যা যাইতে অইবো। আমি জিনি আকাশ থন পইলাম। হায় আল্লা! দুইন্যায় আপ্‌নার জন বল্‌তে যার কেউ নাই, ঘর-বাড়ী ছাইড়্যা হে-য় দাঁড়াইবো কই?

পড়শীরা যুক্তি দিল বাবুর লগে দেহা কইর‍্যা আইতে। ফজুরে লইয়্যা গেলাম বাবুর বাড়ীত্। কাঁইন্দা কইলাম,

: বাবু, আমারে সুময় দে'ন। আপনার ট্যাহা শোধ দিয়া দিমু।

বাবু জওয়াব দিল,

: শোধ দিবা, ট্যাহা পাইবা কই মোড়ল-বৌ?

আমি কইলাম,

: যেহান থন্ পারি।

আমার কথা শুইন্যা হাস্যে ফেলল বাবু, কইল,

: কত ট্যাহা, জানোতো মোড়ল-বৌ?

: না, তাতো জানিনে। কইলাম আমি।

: সুদ-আসলে দুই হাজার ট্যাহারও বেশি। পারবে'নি শোধাইতে?

শুইন্যা চমকে উঠলাম। এত ট্যাহা দিমু কই থন। বাবুর পাও জড়াই ধইর‍্যা কইলাম,

: আমরা গরীব মানু। আপনি মুনিব। আপনি তো সুদ নেওনের কথা কইছিলেন না। দয়া কইর‍্যা কিছু ট্যাহা মাপ কইর‍্যা দে'ন।

রাইগ্যা পাও টাইন্যা নিল বাবু। কইল,

: ট্যাহা মাপ করমু! সুদ নিমুনা। আমার কি জ্যাইর‍্যা ট্যাহা নি মোড়ল-বৌ?

আমি কইলাম,

: আপনি আমার জমি-জমা সব নেন। শুধে' বাড়ীডা ছাইড়্যা দেন। না-বালক পোলারে লইয়্যা আমি দাঁড়ামো কোথায়? কিন্তুক পাষাণ গলে তো বাবুর মন গলেনা। আসবার কালে একেবারে সাফ কতা কইয়া দিল, : যাও, যাও কিছু ক'রতে পারমুনা আমি।

ফিরা আইলাম। মনে মনে কইলাম শেষকালে এই ফন্দিই কি ছিল বাবুর মনে?

কয়েক দিনের মইধ্যেই ছাইড়্যা দিতে অইল বাড়ী। কিন্তুক যামু কই? দুইন্যায় আপ্‌নার জন কইতে কেউ নাই। আমার নিজের কাছে ট্যাহা ছিল। তাই দিয়া এক পড়শীর কাছ থন কিছু জমি নিলাম। সেই জমিত্ বানাইলাম ছোট এক হান্ ছনের ঘর। কোন রহম বাস করণের যুগ্য।

বাবু মানু দিয়া আমার আগের বাড়ীর ঘর-দরজা ভাইঙ্গ্যা নিল। কতক জিনিস দিল বেইচ্যা। চাইয়্যা চাইয়্যা সব দেখলাম। কতা কইলাম না। কেবল আল্লার কাছে মুখ বুইজ্যা জানাইলাম ফইর‍্যাদ: তুমিই বিচার কইর আল্লা!

নতুন বাড়ীত্ থাকি। ফজু আগের মতই ইস্কুলে যায়। আমি পাড়ায় পাড়ায় কাজ-কাম করি। পোলার মুখ্ চাইয়্যা সব দুঃখ ভুইল্যা যাই। ফজু আমার মানুষ অইব। সংসার অইব। জমি-জমা অইব। আবার সুদিনের মুখ দেখমু। কিন্তুক এত আশা বুঝি সইলনা আল্লার!

এক সন্ধ্যায় কাজ-কাম কইর‍্যা পাড়া থন আইয়্যা দেখি কঁ্যাতা কাপড় মুড়ি দিয়্যা শুইয়্যা রইছে পোলায়। জ্বরে গাও খান ভাজা ভাজা। ডরে আমার পরানডা উইড়্যা গেল। আস্তে আস্তে কপালে হাত রাইখ্যা ডাকলাম পোলারে,

: বাবা ফজু!

বাবা চোখ মেইল্যা চাইল। কথা কইল,

: মা, আমার শরীলডার মইধ্যে জিনি ক্যামুন ক্যামুন করত্যাছে।

কিসের রান্ধা-বাড়া! কিসের খাওন্-দাওন্! পোলার মাথার কাছে বইস্যে রাত কাটাইলাম। আর আল্লার কাছে কান্দা-কাটি কইর‍্যা দোয়া মাঙ্‌লাম, গরীবের ধন, অন্ধের লাঠি। কাইড়্যা নিওনা আল্লা। পোলার অসুখ সারাইয়্যা দ্যাও। একমাস নফল রোজা করমু আমি। মিস্‌কিন খাওয়ামু।

কয়্যাক দিন পর। পোলার গাও দিয়া বড় বড়

গুটি বাড়াইল। ডাক্তার আনাইলাম। কিন্তু ট্যাহা পামু কই? অষুধির দাম জুট্‌লনা। কতকজনের কাজে আত বাড়াইলাম। কেউ দিল না কিছু। মনে মনে কইলাম। হায় আল্লা! আমার সোয়ামী কতকজনের সাআয্য করছে। আজ তার পোলার চিকিচ্ছের লিগে ট্যাহা জোটেনা। অবশেষ কালে ঘটি-বাটি ঘরে যা ছিল সব বেইচ্যা দিলাম। কিন্তুক তাতেও অষুধির দাম কুলাইলনা। পোলার অবস্থা কেরমেই খারাপ। আমার দিনে রাইতে ঘুম নাই। আল্লার কাছে খালি কান্দাকাটি করি। কিন্তুক আমার নছিব মন্দ। কিছুতেই অইলনা কিছু।

দিন সাতেক পর। শেষবারের মত একবার মা ডাইক্যা পোলা আমার চির-ঘুমে ডইল্যা পইল।'

মামার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে আবার শুরু করে: বুক্‌খান ভাইঙ্গ্যা গেল আমার। পাগল অইয়্যা কাইন্দ্যা-কাইটা বেড়াই। কাজ-কাম করণের ইচ্ছে লয়না। এমনি কইর‍্যা দিন যায়। বছর ঘুইর‍্যা আসে। একদিন পড়শীর কাছে খবর পাইলাম, আমার বাড়ীর হেই ঘর দিয়্যা সঅরে বাবু বাসা বানাইছে। ভাড়া দিছে এক সায়েব্‌রে। বড় সখ অইল আমার, দেখমু হেই বাসা। পরদিন পড়শীর লগে আইলাম সঅরে। হেই বাসায়। দেখি হাচা কইর‍্যাই আমার বাড়ীর হেই ঘর। মায়্‌ দর্‌জা জান্‌লা। ভাড়াইট্যা সায়েব ছিল বড় ভাল মানুষ। তার বাসায় কাম নিলাম আমি। সে আজ বার-চৌদ্দ বছরের কথা।

তারপর হে সায়েব বদল অইয়্যা গেল। আইল আর‍্যোক জন। আমি নতুন জনেরও কাম লইলাম। তারপর হেয়্‌-ও বদল অইয়্যা আর‍্যোক জন আইল। আমি থাইক্যাই গেলাম। হেয়্‌-ও-গেল বদল অইয়্যা। তারপর হঠাৎ থেমে যায় মামা। বলতে ইতঃস্তত: করে।

: কি হোল তারপর? উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

: আইলেন আপনারা। মামা জবাব দেয়।

: আমরা। আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

: জি!

: তা'হলে এই বাসার সব ঘর গুলোই একদিন ছিল তোমাদের।

: জি, হাঁ।

: আর এই বাসার মালিক জমিদার হরিপদ বাবুই কি ছিল তোমাদের মুনিব?

: জি!

: আমরা এ-বাসার ভাড়া নিয়েছি তার ছেলের কাছ থেকে। তবে শুনেছি হরিপদ বাবু নাকি এখনো বেঁচে আছে?

: আছে, দেশের বাড়ীত্‌। ঘরে পইড়্যা', কানা অইয়্যা।

বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। ঘরের চালে তীব্র বাদুড় পাখার ঝাপ্‌টা। চোখ বুঁজে মনে মনে কি যেন ভাবে মামা। হয়ত স্মরণ করে আল্লার হক্‌ বিচারের কথা!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় বারোটা। ও-ঘরে সিনেমা ফেরত বন্ধুরা শোবার জোগাড় করছে। তাদের একজন কি প্রয়োজনে যেন ডাকে মামাকে। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে মামা। দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর কি মনে করে হঠাৎ থেমে যায় আবার। বলে,

: আর একটা কথা কইমু, সায়েব বাবা।

: বল।

: আপনার চেআরায় আমার ফজুর চেআরার ছিট্‌ আছে।

: সত্যি না কি? অবাক বিস্ময়ে বলে উঠি আমি।

দরজা পেরিয়ে উঠোনে নামতে নামতে জবাব দেয় মামা—

: আমারে কিন্তুক ফজুর-মা বইল্যা ডাইকবেন।

বঙ্গানুবাদ পন্দনামাহ্

ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, অনুসন্ধান-বিশারদ

মূল পন্দনামার গ্রন্থকার, পৃথিবী বরেণ্য মহাকবি, সিরাজের বুলবুল্ তাপসশ্রেষ্ঠ, হযরত মওলানা শেখ মুস্লেহ্ উদ্দিন সাদী-সিরাজী। সাদী তাঁহার তখল্লুস্ এবং মুস্লেহ্ উদ্দিন তাঁহার নাম। তিনি গুলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, পন্দনামাহ্ প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া অমর ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন এবং অমর ও অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই ফার্সী ভাষায় বিরচিত।

ফার্সী ভাষায় 'পন্দনামাহ্' নামক আর একখানি হিতোপদেশ পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ আছে। সে গ্রন্থের গ্রন্থকার হইতেছেন, পারশ্য দেশের অন্যতম দরবেশ পুরুষ, হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার। যাহারা হাকিমি ঔষধের পরিচালনা করেন, হাকিমী ডিসপেনসারীর মালিক, তাঁহাদিগকে আত্তার নামে অভিহিত করা হয়। ফরিদ উদ্দিন আত্তার মুসলিম যাহানের কবি ও দরবেশদিগের মধ্যে অন্যতম। ফরিদ উদ্দিন আত্তারের পন্দনামাহ্ সাধারণতঃ 'করিমা' নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পাক ও ভারতী বাংলার মুসলমানেরা উভয় পন্দনামাহ্কে 'করিমা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। পন্দনামাহ্ বা করিমার আর একটি নাম হরুফ্ তাহ্জি। হরুফ্ তাহ্জি ফার্সী ভাষা শিক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত পুস্তক।

'পন্দনামাহ্' বা 'করিমা' বা 'হরুফ্ তাহ্জির' মধ্যে ফার্সী বর্ণমালার ৩৬টি অক্ষরের প্রথম পরিচয় হইয়া থাকে। মহাকবি শেখ সাদীর পন্দনামাহ্ ফার্সী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট অধিক প্রিয়।

পাক-বঙ্গের ও ভারত বঙ্গের মক্তবে সাদী এবং আত্তারের রচিত পন্দনামাহ্ই শিক্ষার্থীদিগকে পড়ান হইত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময় এই পন্দনামাহ্ সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান, অধুনাকালের ভারত বাংলার মুসলমানদিগের বা পাকবঙ্গের মুসলমানদিগের নাই। ফার্সী ভাষাকে এখন মৃত ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

বাল্যকালে আমরা (বহু হিন্দু-মুসলমান ছাত্র) যে পাঠশালা বা মক্তবে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি, সে মক্তবে শিক্ষক ছিলেন তিন জন। তিন জন শিক্ষকই বাংলা, ধারাপাত এবং ফার্সী-উর্দ্দু ভাষা জানিতেন ও শিক্ষা দিতেন। হেড্ পণ্ডিত যাদবচন্দ্র মল্লিক ফার্সী উত্তম জানিতেন। হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমান ছাত্রদিগের সহিত ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিত। সুশীল কুমার ঘোষ নামক আমার জনৈক সহপাঠি, সাদীর কাব্য-কাননের মনোমুগ্ধকর বয়াত, শের, আবিয়াত, নসর, নজম, প্রভৃতি এত উত্তম রূপে আবৃত্তি করিত যাহার তুলনা হয় না।

আমাদের নিজ গ্রামে—খান্পুর গ্রামে কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে কাহারও কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বর ও বরযাত্রী আসিলে, সেই গ্রামের চারি পার্শ্বস্থিত, ছাত্র-ছাত্রিরা গুরু-দক্ষিণা আদায় করিতে যাইত। যে মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীরা বরযাত্রীদিগের প্রশ্নের জওয়াব পারিত তাহারাই গুরু-দক্ষিণা পাইত। প্রশ্নকারীরা অঙ্ক, পন্দনামাহ, গুলেস্তাঁ, বুস্তাঁ, সিকান্দার নামা হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার আমি বঙ্গানুবাদ পন্দনামাহ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। বঙ্গানুবাদ পন্দনামাহ্ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, একখানির অনুবাদ করিয়াছেন উড়িষ্যার তাসখন্দ নিবাসী মুনশী শেখ্ ওয়ারিস্ আহমদ, অপর খানির অনুবাদ করিয়াছেন যশোহর—ছাতিয়ান্তলা নিবাসী মুন্শী মুহাম্মদ মেহের উল্লাহ। উভয় অনুবাদই কাব্যানুবাদ। উভয় অনুবাদই মওলানা শফির পন্দনামার অনুবাদ।

ওয়ারিস আহমদ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পন্দনামার অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল। কলিকাতার শিয়ালদহ হাযী পাড়ার 'সাত্তারিয়া প্রেসে' উহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে,—প্রথমবার মুদ্রিত হওয়ার দুই বৎসর পরে, উক্ত কলিকাতার শিয়ালদহ হাযি পাড়ার 'হবিবি প্রেসে' উহার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং তাহার দুই-বৎসর পরে ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। হবিবি প্রেস হইতে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে ওয়ারিস আহমদ, হবিবি প্রেসের মালিক যনাব আল্লামা মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকীকে উহার কপি রাইট বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছিলেন।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ওয়ারিস আহমদ কর্তৃক পন্দনামার অনুবাদ 'নসিহত নামা' নামে অনুদিত হইয়াছিল এবং উহার কিছু পর সাত্তারিয়া প্রেসে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যার অধিবাসী যাঁহার মাতৃভাষা ছিল উর্দ্দু এবং দেশ ভাষা ছিল উড়িয়া, তিনি মুসলিম বাংলার জন্য যে দরদ দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই।

আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ওয়ারিস আহমদ, তাঁহার অনুদিত পুস্তকের 'নাম পন্দনামা' না রাখিয়া 'নসিহত নামা' রাখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এই কিতাবের নাম নসিহত নামা।
ফারসির পন্দনামা বাংলা তরজমা॥

ওয়ারিস্ আহমদের নসিহত নামার দিবাচা বা ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাঁহারাই ওস্তাদ, উড়িষ্যার বালেশ্বর নিবাসী, অন্যতম কবি-শিল্পী, বহুভাষাবিদ, আল্হায, মওল্ভী আবদুল মযিদ ভূঞা। তিনি দিবাচায় লিখিয়াছিলেন,—

আল্লা কার সাজ য্যায়সা,
আপনার নূরে ক্যায়সা,
জন্মাইলে নবী মুহাম্মদে।
দোস্ত আপনার যেনে,
প্রেম ভরে দো-যাহানে,
সৃজিল যে সব তার বাদে॥
এক হ'তে দুই হৈল,
ফের গোপনেতে রৈল,
আজব কুদ্রত সে আল্লার।
দেখে শুনে দ্বন্দ্ব লাগে,
কাফুরের মত ভাগে,
মানবের বুদ্ধি একেবার॥
এল গেল নবী যদি,
কোথা ফের শেখ সাদী,
যাঁহার রচনা পন্দনামা।
প্রকাশ করিমা বলে,
নাম জারি কালে কালে,
তার আমি কি দিব উপমা॥
বোস্তান গুনে গুলেস্তান,
প্রচলিত সর্ব্ব স্থান,
আরো কত রচিল কিতাব।
যাহাকে পড়িয়া সবে,
লায়েক হয়েন ভবে,
লায়েকীর পায়েন খিতাব॥
এমন যে ব্যক্তি ছিল,
ইয়াদগারী রেখে গেল,
. কি হিসাব রবে আমাদের।
...দুগ্ধ, ঘৃত ছিল,
সে ত নাহি বেঁচে রৈল,
নাম মাত্র সংসারে জাহের॥

তবে তাকে ধন্যবাদ,
করে যেহ অনুবাদ,
আজ কাল সেই গুণবান।
তাহার কবিতাবলী,
অল্পকে অধিক গুণি,
সামান্যকে বলিব প্রধান॥
নসিহত নামে যবে,
ওয়ারিস আহমদ ভবে,
তর্জমা করিয়ে বাঙ্গালাতে।
দেখি আমি সু নজরে
কুবচন ফেলি দূরে,
সহী করি দিনু যোষচিতে॥
বেশী দোষ ছিল নাহি,
অল্পতে হইল সহী,
আর কিছু দোষ যদি থাকে।
পুষ্প মত সাধ মনে,
গুণিগণ দেখে শুনে,
দূরে ফেলি দিবেন কণ্টকে॥
কাঁটা ফুল ছাড়া নাই,
দোষ গুণ লিপ্ত তাই,
পূর্ব্বাপর আল্লার এ-বিধি।
আবদুল মযিদ বলে,
যার হুকুমে...চলে,
তামাম যাহান নিরবধি॥

ওয়ারিস আহমদের নসিহত নামা রয়েল আট পেজ সাইজ, দক্ষিণ দিক হইতে ছাপা। চারি ফর্ম্মায় ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কিতাবের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় অনুবাদক লিখিয়াছেন:—

পারশ্য মুলুক বিচে সিরাজের গ্রামে।
ছিলেন যে শেখ মুস্লেহুদ্দিন নামে॥
তাঁহার ফার্সীকৃত করিমা হইতে।
কোন এক কবি কৈল তর্জমা হিন্দীতে॥
উৎকল ভাষায় ফের আমার ওস্তাদ।
আবদুল মযিদ ভূঞা কৈল অনুবাদ॥
অবশেষে বাঙ্গালাতে আমি দীনহীন।
ভাষান্তর কৈনু পড় সকল মোমিন॥
নানা হিত উপদেশ এতে আছে ভরা।
অপূর্ব্ব, অতুল্য নিয়ামাত গণ পারা॥
পন্দনামা ছিল পূর্ব্বে সাদির কালাম।
নসিহত নামা এবে ছিল এর নাম॥
দুই শত পাঁচ পদ সাইরী পয়ার।
আমিন আমিন বলি করহ শুমার॥

ছেড়ে এ পয়ার পন্থ সমাপ্তি বিষয়।
একে একে কর মুখে অভ্যাস নিশ্চয়॥
ভুলচুক যদি থাকে দোরস্ত করিয়া।
হাতে হাত লও সবে খোশাল হইয়া॥
পুষ্পেতে কণ্টক থাকে কর মনে জ্ঞান।
যে আয়েব আছে খালি রহিম রহমান॥
......ইন্সানের পত্রিক মিরাস।
আদম হইতে হয় আদমী প্রকাশ॥
তবে কি পোতার ঠিক দাদা ত এমন।
জামগাছে আম ভাই ফলে কি কখন?

ওয়ারিস আহমদের নসিহত নামার প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে অনুবাদক স্বয়ং যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ—

উড়িষ্যা নিবাসী ওয়ারিস আহমদ।
মোর বাস তাসখণ্ড গ্রামে শেখ পদ॥
লফজ লফজ করি তর্জমা এমত।
আসল কেতাবে ব্যাখ্যা নকলে তেমত॥
মওলবী ওহাবী ভুঞা আবদুল মযিদ।
সাইরী জবান তাঁর পণ্ডিত সুবিদ॥
তাঁহার কোশেশে এ কেতাব ছাপা হৈল।
মোদামেল মোদাম নাম জানিয়া রহিল॥
কলিকাতা শিবাদহ হাযীপাড়া বিচে।
'হবিবি প্রেস' নামে যে মোৎবা আছে॥
তাতে ছাপা হৈয়া রাজ্যে হউক জাহের।
এলাহী বাঞ্ছা পুরা কর অধমের॥
খেয়াল আমার য্যায়সা বাংলা দেশেতে।
কদর করিবে সবে এলাহী রহমতে॥
তাই মোতবা ওয়ালাকে মুই করিনু আদেশ।
তোমার মোহর এতে ছাপহ বিশেষ॥
তা হলে গাঁহাক সবে তোমার নিকট।
খরিদ করিতে যাবে এ-কেতাব ঝটা॥
আল্লামা গোলাম মওলাকে কেতাবের হক।
বিক্রয় করিয়া আমি হইনু লা-হক॥

ওয়ারিস আহমদের নসিহত নামার খুচরা মূল্য ধার্য্য ছিল দুই আনা এবং মেহের উল্লার পন্দেনামার খুচরা মূল্য ধার্য্য ছিল পাঁচ আনা। মেহের উল্লার পন্দনামা ডিমাই বার পেজী আকারে ছাপা হইত। মেহের উল্লার পন্দনামা কভারিং, টাইটেল, সূচনা ও বিজ্ঞাপন বাদে একাত্তর পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ওয়ারিস আহমদের টাইটেল বাদে পঁচিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

"মুহাম্মদ মেহের উল্লার 'সঠিক ও সানুবাদ পন্দনামার তৃতীয় সংস্করণ সন ১৩১০ বঙ্গাব্দে আমার সম্পাদকতায় ১৪।৩, মাছুয়া বাজার ষ্ট্রীটস্থিত হবিবি প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে আমি লিখিয়াছিলাম,—পন্দে নামায় যিম, জে, জাল, জোয়, জোয়াদ বা দোয়াদ, আয়েন, গা'য়েন, সিন, শিন, সে, সোয়াদ প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে লিপ্যান্তর করা সম্বন্ধে আধুনিক নিয়মানুসারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদন হইয়াছে। তাহা ব্যতীত লিপ্যান্তর দ্বারা মূল ভাষায় ওজন ও উচ্চারণ ঠিক রাখিবার উদ্দেশ্যে শ+ক, ক+ত, খ+ত, ন+শ, ছ+ছ, শ+ত এই ছয়টি যুক্তাক্ষর প্রস্তুত করিতে আমাকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং যুক্তাক্ষরগুলি পুস্তক মধ্যে উপযুক্ত স্থানে মুদ্রিতও হইয়াছে। এক্ষণে দেশবাসী ভ্রাতা-ভগ্নী-গণের নিকট মুনশী সাহেব মরহুমের শ্রেষ্ঠ অবদান এই সঠিক ও সানুবাদ পন্দেনামা আদরের সহিত গৃহীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

সন ১৩১২ বঙ্গাব্দে বাংলার অন্যতম কৃতি সন্তান, বঙ্গের প্রথম ইসলাম প্রচারক, বাগ্মীপ্রবর মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ, শেখ সাদির পন্দনামার অনুবাদ করেন। কলিকাতার ৪৪নং কড়ায়া গোরস্থান লেন হইতে রিয়াজুল ইসলাম প্রেস উহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহাও মনে করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, মেহের উল্লাহ্ উড়িষ্যার তাসখন্দ নিবাসী ওয়ারিস আহমদের নসিহতনামার সংবাদ জানিতেন না।

মুনশী মুহাম্মদ মেহের উল্লাহ তাঁহার পন্দনামার প্রথম মুদ্রনের সময় যে সূচনা লিখিয়াছিলেন, পাঠক-পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রায় সাত শত বৎসর অতিবাহিত হইল পারস্যের তাপস শ্রেষ্ঠ মওলানা মুসলেহউদ্দিন শেখ সাদি সিরাজ নগরে আবির্ভুত হইয়াছিলেন, সভ্য জগতে এমন কোন দেশ নাই, যে-দেশের লোকদিগকে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে। তিনি কঠোর সাধনা ও সুমধুর রচনা বা কবিত্ববলে যাবতীয় মানব মণ্ডলীর সহিত ঈদৃশ এক অভূতপূর্ব্ব আত্মীয়তা ও পবিত্র সম্বন্ধ সংস্থা মনে করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অনন্ত কাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবেক।

তাঁহার রচিত গুলেস্তাঁ, বুস্তাঁ নামক অমূল্য নীতি ও স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ ফার্সী গ্রন্থদ্বয়, সাহিত্য ও কাব্য জগতে অতুলনীয় ও অনুপম রত্ন বিশেষ। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অসংখ্য নর-নারীর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন করিতেছে। করিমা বা পন্দনামায় দুই শত ফার্সী শ্লোক সম্বলিত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিও সেই স্বর্গগত

মহাকবির রচিত। এই গ্রন্থখানি প্রায়ই ফার্সী ভাষা শিক্ষার্থীগণ প্রথমাবস্থায় অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, মানব জীবনের অতি কর্ত্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর-রূপে ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তাঁহাদের প্রাচীন চাণক্য প্রমুখ পণ্ডিতদিগের রচিত কবিতা সমুহের গদ্য, পদ্য ও বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। অতীব ক্ষোভের বিষয় এই যে, এ-সম্বন্ধে বঙ্গীয় মুসলমান বিদ্বানমণ্ডলী একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ।

মুসলমান সাহিত্য এবং শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া হিন্দু ব্রাহ্ম এবং ঈসায়ী (খৃষ্টান) পণ্ডিতগণ বহুবিধ অমূল্য রত্ন লাভ ও স্ব-স্ব সমাজের বিবিধ অভাব পূরণ করিতেছেন, কিন্তু মুসলমান যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সমাজে বিদ্যমান ও উপযুক্ত লোকের সংখ্যাও নিতান্ত বিরল নহে। আশা আছে, অবিলম্বেই তাঁহারা সোৎসাহে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধীরভাবে স্ব স্ব গন্তব্য পথে ধাবিত হইবেন।

আশা ছিল, কোন উপযুক্ত আলেম দ্বারা করিমা গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই অনুবাদিত হইয়া আমাদের দর্শন গোচর হইবে; কিন্তু দেখিতে দেখিতে জীবনের অধিকাংশ সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি হৃদয়ের সেই আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না। তাই সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি হইয়াও প্রাণের দুর্দ্দমনীয় আবেগ সম্বরণে অক্ষম বশতঃই আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।

কোন গ্রন্থ এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিতে হইলে অনুবাদকের উভয় ভাষায় সম্যক জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকা বিশেষ আবশ্যক। আমার তাহা নাই। সুতরাং অনুবাদের বহু স্থানে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

আমি যথাশক্তি মূল বয়েতের ভাবানুবাদ চরণে চরণে পদ্য ছন্দে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র; কিন্তু অনুবাদ নির্ভুল হইয়াছে বলিয়া আমি স্বপ্নেও মনে করিতে পারিনা। মহৎ ব্যক্তিগণ, সেই ভুলগুলি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবগত করাইলে আগামী সংস্করণে তাহা সংশোধন করিতে বাধ্য হইব।

... ...

'সুধাকর' ও 'সোলতান' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও 'ইস্‌লাম প্রচারক' বর্ত্তমান সম্পাদক সমাজ ও সাহিত্য সেবায় জীবনোৎসর্গকারী পরম ভক্তিভাজন যনাব মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ সাহেব ও 'সোলতানের' ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক যনাব মওলবী কাজী নূর আহমদ সাহেব এবং যশোহরের কারামাতিয়া মাদ্রাসার হেড্ মওলবী যনাব মৌলবী মোহাম্মদ আরিফ সাহেব এই অনুবাদের কোন কোন স্থান সংশোধন ও প্রুফ দেখিয়াছেন, তজ্জন্য আমি চির জীবন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

এই পদ্যানুবাদে যদি একটি বয়েতেরও প্রকৃত ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য যদি একটি মাত্র বালকেরও কিছু উপকার দর্শে তবেই আমার শ্রম সার্থক হইল মনে করিয়া কৃতার্থ হইব। ইতি—

ছাতিয়ানওলা
যশোহর
সন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ
পদ্যানুবাদক।

মূল পন্দেনামায় এবং অনুদিত পুস্তক দুইখানিতে সর্ব্ব মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদ স্থান পাইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাদিগের জ্ঞাতার্থে ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। মোনাজাত বা দর্গাহে বারীতায়া'লা। অর্থাৎ আল্লার নিকট প্রার্থনা। ইহাতে তিনটি বয়েত আছে।

২। নায়া'ত সরওয়ারে কায়েনাত। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্লার প্রশংসা। ইহাতে তিনটি বয়েত আছে।

৩। দর্ মদাহকরম। অর্থাৎ অনুগ্রহ বা ক্ষমার কথা। ইহাতে ছয়টী বয়াত আছে।

৪। খিতাব নফস্। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির উপদেশ। ইহাতে তিনটি বয়াত আছে।

৫। দর সিফাতে সাখাওয়াত। অর্থাৎ দাতা ও দানশীলতায় কল্যাণ। ইহাতে পাঁচটি বয়াত আছে।

৬। দরমজমাতে বাখিল। অর্থাৎ কৃপনের প্রতি না হুতনা। ইহাতে সাতটি বয়াত আছে।

৭। দর সিফাতে তওয়াজা। অর্থাৎ বিনয়, শিষ্টতা ও নম্রতার বিষয়। ইহাতে তেরটি বয়াত আছে।

৮। দর মজমাতে তাকাব্বুর। অর্থাৎ গর্ব্ব, দাম্ভি-কতা ও অহঙ্কারে অকল্যাণ। ইহাতে সাতটি বয়াত আছে।

৯। দর ফাজিলাতে ইলম। অর্থাৎ সু-শিক্ষা ও বিদ্যার উপকারিতা। ইহাতে আটটি বয়াত আছে।

১০। দর ইমতেনা অজে সোহব তেজারেল্‌া। অর্থ মূঢ় ও মুর্খ ব্যক্তিদিগের সংশ্রবে অপকার। ইহাতে নয়টি বয়াত আছে।

১১। দর সেফতে আদেল। অর্থাৎ সু-বিচারের জয় ঘোষণা। ইহাতে দশটি বয়াত আছে।

১২। দর মজমতে জুল্‌ম—জালেমের জুলুম, অত্যাচারীর অত্যাচার এবং উৎপীড়কের উৎপীড়ন সম্বন্ধীয় বর্ণনা। ইহাতে আটটি বয়াত আছে।

১৩। দর সিফতে কিনায়াত। অর্থাৎ সহিষ্ণুতা ও অল্পে সন্তুষ্টির প্রশংসা। ইহাতে সাতটি বয়াত আছে।

১৪। দর মতে হের্স। অর্থাৎ লোভের কুফল ও পরিণাম। ইহাতে এগারটি বয়াত আছে।

১৫। দর সিফতে এতওয়াত বা ইবাদাত। অর্থাৎ অর্চ্চনা, আরাধনা ও উপাসনার বিষয়। ইহাতে তেরটি বয়াত আছে।

১৬। দর মজম্মাতে শয়তান। অর্থাৎ পাপ পুরুষ ও পাপাত্মা ইত্যাদি। ইহাতে দশটি বয়াত আছে।

১৭। দর বায়নে শারাব। অর্থাৎ ঐশী প্রেম সুরার বর্ণনা। ইহাতে আটটি বয়াত আছে।

১৮। দর সিফতে অফা। অর্থাৎ অফাই বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার বিষয়। ইহাতে সাতটি বয়াত আছে।

১৯। দর ফজায়েলে শোকর। অর্থাৎ খোদাতায়া'-লার স্তুতিবাদ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের বিষয়। ইহাতে ছয়টি বয়াত আছে।

২০। দর সিফতে রাস্তি। অর্থাৎ সত্যবাদীর প্রশংসা। ইহাতে পাঁচটি বয়াত আছে।

২১। দর মজমতে কেজব। অর্থাৎ ঝুট, মিথ্যা ও অসত্যের বর্ণনা। ইহাতে ছয়টি বয়াত আছে।

২২। দর বয়ানে সবর। অর্থাৎ ধীরতা ও ধৈর্য-শীলতার বিষয়। ইহাতে আটটি বয়াত আছে।

২৩। দরমানাহ উম্মেদ আজ মখলুকাত। অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের নিকট আশা-আকাঙ্খা নিষেধ। ইহাতে দুইটি বয়াত আছে।

২৪। দর না-পায়েদারী দুনিয়া। অর্থাৎ জগৎকে বিশ্বাস না করা ও জগতের নিকট প্রত্যাশা না করা। ইহাতে উনিশটি বয়াত আছে।

২৫। দর সিফতে হক্ তায়ালা। অর্থাৎ খোদাতায়া'-লার মহিমার প্রশংসা। ইহাতে চব্বিশটি বয়াত আছে।

শ্রাবণে

আজিজুর রহমান

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
বাদল ঝরে।
তিমির সঘন
বরষা গগন
অঝোর ধারায়
ব্যাকুল করে॥

ছায়া-ঘন বনে
লাগে শিহরণ
তাল ও তমালে
নিবিড় বেদন
কাহার কাঁদন—
অশ্রু-নিঝর
শাওন মেঘেতে
ঝরিয়া পড়ে॥

অশনির গরজন
চমকিত বনতল,
অশ্রান্ত-বরিষণ—
দিগন্ত উচ্ছল।

শিহরে কেতকী
উতল বাতাস
কতনা স্মৃতির
আনিছে আভাস,
মন যে উদাস—
কার বেদনায়
আঁখি ঝুরে আজ
কিসের তরে॥

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ
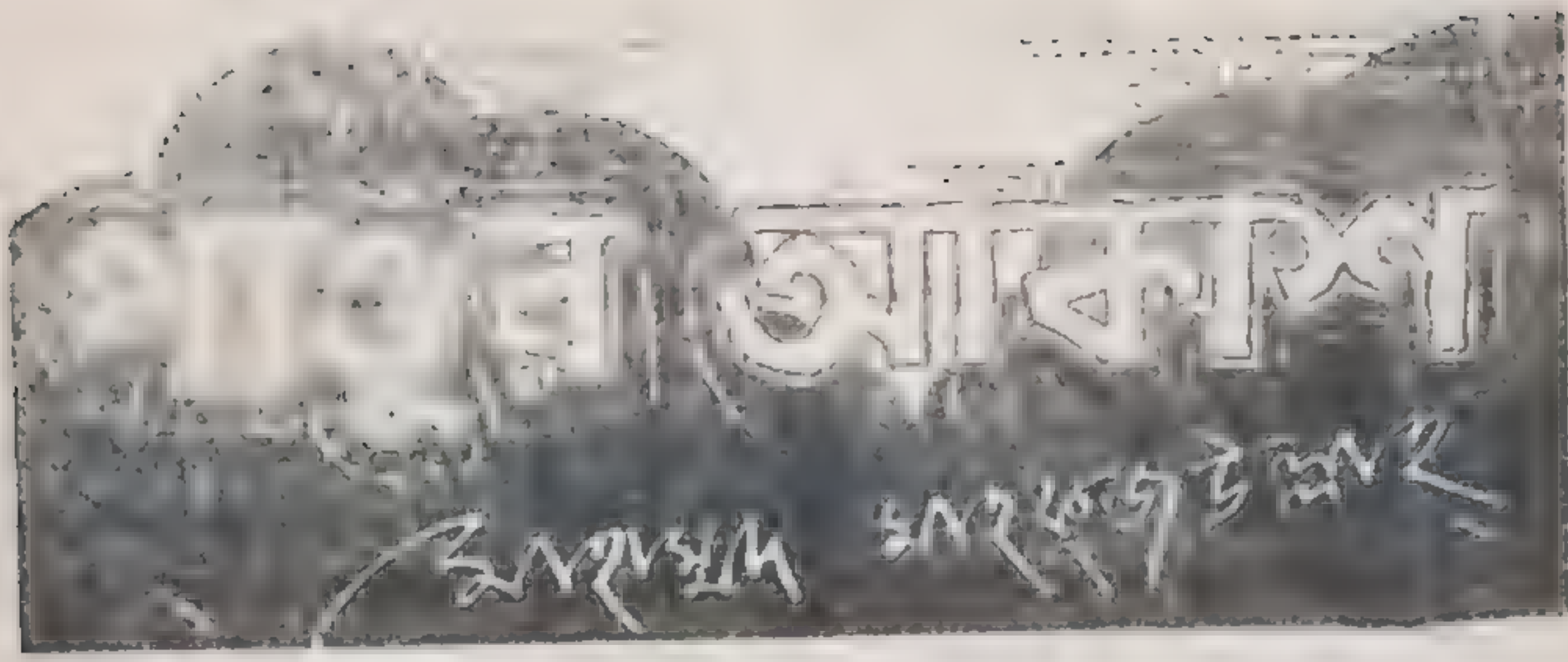
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আজকাল রিজিয়াও যেন আর মামুনের মনের হদিস খুঁজে পায়না। অফিসে যাবার তাড়াটা মাঝে মাঝে রিজিয়ার কাছেও বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। সংসারের আর দশজনও তো অফিস করে, কিন্তু মামুনের মতো তারা সবাই কি এমন অফিসগত প্রাণ! রিজিয়া অনেক ভেবেও প্রশ্নটার তেমন কোন সুরাহা খুঁজে পায়নি। একবার নিতান্ত সাহসে ভর করেই সে প্রশ্নটা ছুঁড়েছিল মামুনের দিকে; বলেছিল, "আচ্ছা, সংসারের আর দু'দশ জনও তো তোমার মতো অফিস-আদালতে কাজ করে খায়, তারা সবাই কি এমন হুলস্থুল বাঁধিয়ে দেয়? ঘড়ির কাঁটাটা সাড়ে আটটার ঘর না পেরুতেই কে যেন তোমার কানে কানে এসে অফিসের মন্ত্র দিয়ে যায়। আশ্চর্য!"

জওয়াবে মামুন বলেছিল, "অফিসের কাজ করেই যখন খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তখন আলসেমী করে লাভ কি? বাপের দু'দশটা জমিদারী কিংবা ব্যাবসা থাকলে না হয় হাত-পা গুটিয়ে বসে দিব্যি আরাম করে খাওয়া যেত। তেমন কপাল নিয়ে যখন জন্মাইনি তখন খেটে-খুটেই তো বেঁচে থাকতে হবে।"

রিজিয়া আর কোন কথা না বাড়িয়ে চোখের পলকে পাক-ঘরে পালিয়ে বাঁচলো। মামুনের খোঁচাটা তখন তার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিলো।

এরি মধ্যে বাজার থেকে মাছ-তরকারী নিয়ে ফিরে এলো মামুন। রান্না-ঘরের মেঝেয় ছালার ব্যাগটা ছুড়ে দিয়ে সে দৌড়ে গেল কুয়ো তলায়। আধ ঘন্টার মধ্যে খাওয়া-গোসল না সারতে পারলে আজকে আবার বড় সায়েবের সামনে গিয়ে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়াতে হবে। ফাইল থেকে চোখ তুলে বড় সায়েব দেওয়ালে ঝুলানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলবেন, "দয়া করে হাত-ঘড়িটার সাথে সময়টা মিলিয়ে নিন। রোজ রোজ এমন দেরী করে এলে কখন যে আবার বারটা বেজে যাবে টেরও পাবেন না।"

নিতান্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক এই আখন্দ সাহেব অর্থাৎ 'অফিসের বড় সায়েব। কথা কম বলেন, আর সে কারণেই কথার ধার এমন তীক্ষ্ণ ও সূঁচালো। সেই সূঁচের হুলফুটানো জ্বালা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না মামুন।

মাথায় আর শরীরে কয়েক মগ পানি ঢেলে কোন রকমে গোসল শেষ করলো মামুন। ভেজা লুঙ্গিটা বদলিয়ে গা মুছতে মুছতে ঘরে এসে দাঁড়ালো। একটা বাসনে গরম ভাত আর ডিমভাজা নিয়ে এলো রিজিয়া, বললো, "এখন খাবার মতো কিছুই নেই, কোন রকমে কয়েক লোকমা খেয়ে যাও। দুপুরের সময় ছুটি নিয়ে না হয় চলে এসো। তখন সবকিছুই রান্না-বান্না হয়ে যাবে।"

মামুন রিজিয়ার কোন কথারই জওয়াব দিল না। গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। রিজিয়া স্পষ্টতঃই বুঝতে পারলো, দুপুর বেলায় কোনক্রমেই আর তাঁর খেতে আসা হবে না। না খেয়ে গেলেও মামুন কোনদিনই দুপুর বেলা খেতে আসে না। রিজিয়া জিজ্ঞেস করলে বলে, "অফিসের কাছেই ভালো রেষ্টুরেণ্ট আছে; ওখানেই খেয়ে নিয়েছি।" কথাটা সত্যি কি মিথ্যা সে শুধু মামুন নিজেই জানে।

ভাত খাওয়া শেষ করে মামুন এসে দাঁড়ালো লতীফ সাহেবের কাছে, বললো, "আমি অফিসে চললাম আব্বা আপনি গোসল করে সকাল সকালই খেয়ে নেবেন। আপনার বৌমার হয়তো খেতে অনেক দেরী হবে, ওদের জন্যে বসে থাকবেন না যেন।"

লতীফ সাহেব বললেন, "আমি বিকেলের গাড়ীতেই চলে যাবো বাবা, তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। একবার সময় করতে পারলে বৌমাকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসো, তোমার আম্মা দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

মামুন বললো, "আপনি এসব কি বলছেন আব্বা, কাল দুপুরে এলেন আর আজকে সন্ধ্যায়ই চলে যাবেন? বাড়ীতে এমন কি কাজ পড়ে আছে যে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হতে হবে? আজ কিছুতেই আপনার যাওয়া হবে না, যেতে হয় কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে যাবেন।"

লতীফ সাহেব বললেন, "না বাবা মামুন আমি আজকের গাড়ীতেই যাবো। একটা দিন থেকে গেলে নানা অসুবিধা হবে। তা' ছাড়া বাড়ীতে কতকগুলি জরুরী কাজও পড়ে রয়েছে। তোমার আম্মা অনবরত তাগাদা দিচ্ছিল বলেই এ সময়ে এত তাড়াহুড়া করে এলাম। নইলে আরো কিছুদিন পরেই আসার ইচ্ছা ছিল।"

মামুন বললো, "আমার অফিসের সময় হয়ে এলো আব্বা, আমি আর দেরী করতে পারছি না। আপনার কিন্তু আজ কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। কথা শেষ করে মামুন অফিসের পথে বেরিয়ে গেল। লতীফ সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ছেলের গমন পথের দিকে।

॥ বার ॥

অফিস থেকে ফিরে এসে মামুন অবাক হয়ে গেল। লতীফ সাহেব সত্যি সত্যি বিকেলের গাড়ীতেই বাড়ী চলে গেছেন। তার শেষ অনুরোধও তিনি রক্ষা করেন নি। ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য ঠেকল মামুনের কাছে। তার আব্বা তো এমন প্রকৃতির লোক ছিলেন না কোন দিন। যে মামুনকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তার শেষ অনুরোধটুকুও আজ রাখতে পারলেন না? হোষ্টেলে থেকে পড়বার সময় তিনি প্রতি মাসেই মামুনকে দেখতে আসতেন। বলতেন, "তোমার চিঠিতে যতটুকু খবর পাই বাবা, তাতে যেন মন ভরে না, তাই নিজের চোখেই দেখতে এলাম। মামুন তার আব্বার পা ছুঁয়ে সালাম করে বলতো, "আপনি না এলে আপনার পায়ের ধূলো কোথায় পাব আব্বা?"

লতীফ সাহেব বলতেন "হোষ্টেলে এসে উঠলে তোমাদের সবারই খুব কষ্ট হয়, তা আমি ভাল করেই টের পাই, তবুও এই কাঙ্গাল মন কিছুতেই যেন সান্ত্বনা পেতে চায় না।"

মামুন বলতো, "সে আর এমন কি, দু'একদিন না হয় কিছু কষ্টই হলো আমাদের। তবুও যে আপনি এসেছেন এতেই আমার আনন্দ।"

দু'চারদিন হোষ্টেলে থেকে প্রাণভরে ছেলেকে দেখে যেতেন লতীফ সাহেব। আর কেবলি ভাবতেন অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু কিছুতেই যেন লতীফ সাহেবের সাধ মিটতো না। দু'দিনের জন্যে এসে চারদিন থেকে যেতেন। ছোটখাটো জিনিষপত্র কিনে দিয়ে যেতেন ছেলেকে। মামুনের রুমমেটরা ঈর্ষা করে বলতো, "বাপের মতো বাপ তোমার, ভাই মামুন; ভদ্রলোকের মনটা যেন মোম দিয়ে তৈরী।" সহপাঠীদের মন্তব্যে আনন্দে আর গর্বে ভরে উঠতো মামুনের মন।

একবার তো এক কাণ্ডই করে বসেছিলেন লতীফ সাহেব। ছেলেকে দেখতে এসে চারদিন ছিলেন হোষ্টেলে। যাবার দিন তাঁর চোখ ভরে এলো কান্নায়, মামুনের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "তোমাকে ফেলে চলে যেতে কিছুতেই মন চাইছে না বাবা, কিন্তু না গেলেও নয়। ছাত্রদের হোষ্টেলে গার্জিয়ানরা আর কয়দিনই বা থাকতে পারেন।"

মামুন বলেছিল, "তাতে কি আছে আব্বা, আমি সুপারেনটেণ্ডেণ্টকে বলে আরো দু'দিনের পারমিশন নিয়ে নেবো। আপনি বরং আজ থেকেই যান।"

লতীফ সাহেব বলেছিলেন, "না বাবা, যেতেই যখন হবে তখন আর দু'দিনের জন্যে সুপারেনটেণ্ডেণ্টকে বলে ফায়দা নেই। আমি বরং চলেই যাই। কিছুদিন পরে না হয় আবার এসে বেড়িয়ে যাবো।

তখনকার মতন লতীফ সাহেব পা বাড়ালেন ষ্টেশনের পথে। বিকেল সাড়ে চারটায় তাঁর যাবার ট্রেন। মামুন তার আব্বাকে ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যাবার জন্য তৈরী, কিন্তু লতীফ সাহেব আপত্তি জানালেন, বললেন, আমি একলাই যেতে পারবো বাবা, তুমি বরং বিকেলটা খেলাধূলা করে কাটাও, ষ্টেশনে যাবার কোন দরকার নেই।" অবশেষে একলাই গেলেন তিনি।

রমনার মাঠ থেকে সন্ধ্যার পর হোষ্টেলে ফিরে এলো মামুন। এসেই দেখলো লতীফ সাহেব বসে আছেন তার কামরায়। রীতিমত অবাক হয়ে গেল মামুন, বললো, "একি আব্বা! আপনি বাড়ী যান নি? ট্রেন ফেল করেছেন বুঝি?

লতীফ সাহেব প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হলেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "ট্রেন ফেল করিনি বাবা। এমনিতেই ফিরে এলাম। মাঝপথে গিয়ে মনটা যেন কেমন হয়ে গেলো, মনে হলো, আরো দু'একদিন থেকেই যাই। কবে আবার তোমাকে দেখতে আসতে পারি কি পারি না, তার কি কোন ঠিক আছে?" লতীফ সাহেবের কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর ঝঙ্কৃত হলো। মামুনও তা সহজেই টের পেল। বললো, "ফিরে এসে ভালোই করেছেন আব্বা। আপনি চলে যাবার পর থেকে আমার মনটাও বড় খারাপ লাগছিল।" —

সেবারে আরো চারদিন হোষ্টেলে থেকে অবশেষে বিদায় নিয়েছিলেন লতীফ সাহেব।

কিন্তু সেদিন আর এদিনে অনেকটা ফারাক মনে মনে হলো মামুনের। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মনও বদলায়, কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসা একেবারে মরে যায় না। পুরানো মাটিতে নতুন ফসলের ফলন হয়, কিন্তু পুরানো মাটির গন্ধ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না, স্তরে স্তরে জমা হয়ে থাকে। লতীফ সাহেবের সেই অতীতের মনটা কি বয়সের সাথে সাথে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নিশ্চয় নয়, নইলে তিনি এমন করে ছুটে আসতেন না, ছেলে আর ছেলে বৌকে দেখতে।

কিন্তু এমন করে তিনি কেন চলে গেলেন? রিজিয়াকে তিনি স্নেহের চোখেই তো দেখেছিলেন, তার গতকালের ব্যবহারকে কি তিনি তা হলে ক্ষমা করতে পারেন নি?

মামুনের কথার প্রতিবাদ করে তিনিই তো বলেছিলেন, "হ্যা, বাবা, বৌমা আমার কাছে বলেই বাইরে গিয়েছে।" আর আজ কিনা তিনি এমন করে বিদায় নিয়ে গেলেন।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে মামুনের মনের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো রিজিয়ার ওপর। কাপড়-জামা ছেড়ে সে রিজিয়াকে ডাকলো। রিজিয়া এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর গলায় বললো, "আব্বা চলে গেলেন কেন?"

রিজিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "আমি কেমন করে বলবো?"

মামুন বললো, "তুমি বলবে না তো কে বলবে?" তার গলা গম্ভীর শোনালো।

রিজিয়া বললো, "বেড়াতে এসেছিলেন, বেড়িয়ে গেলেন, এতে আবার বলাবলির কি আছে।"

মামুন বললো, "এত কথা আমি জানতে চাইনা, আব্বা কেন চলে গেলেন, সেটুকুই শুধু জানতে চেয়েছি।"

রিজিয়া বললো, "তুমিই তো না যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলে, কই তোমার কথা তো তিনি রাখলেন না।"

মামুন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় বললো, "আমি না যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম, আর তুমি তাঁকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে, না!"

এ ধরণের হঠাৎ আক্রমণের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না রিজিয়া, তাই তাল সামলাতে না পেরে একেবারে বেসামাল হয়ে গেলো। গলা চড়িয়ে বললো "যা-তা বলতে তোমার মুখে আজকাল মোটেই বাঁধছেনা দেখছি। পিতৃভক্তির ন্যাকামী আমার কাছে দেখাতে এসো না। তাড়িয়ে যদি দিয়ে থাকি তবে বেশ করেছি।"

মুহূর্তে মামুনের দু'টি চোখ বিদ্যুতের মতো জ্বলসে উঠলো আর বাজ পড়ার মতো সশব্দে একটা চড় পড়লো রিজিয়ার গালে। মামুনের বলিষ্ঠ হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ ফুটে উঠলো সেই গালে। কালসে শিরার মতো তখন তা বসে গিয়েছে।

দু'হাতে চোখ ঢেকে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়লো রিজিয়া। কান্নার কোন সুর শোনা গেল না। গলা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মামুন তখন রাত্রির অন্ধকারে বসে আপন মনে মাঠের দুর্বা ঘাস কুটি কুটি করে ছিঁড়ছিলো। হাত ঘড়িটাতে ঘণ্টার কাঁটা নটার ঘর ছুঁয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। মামুনের দু'চোখে অশ্রুর বন্যা।

॥ তের ॥

সেই থেকেই দু'জনার দাম্পত্য জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার শুরু। নীলাম্বর শাখা রোডের দিনগুলোর কথা রিজিয়া আজো ভুলতে পারে না। তারপর এই কলোনীর জীবন। এরি মধ্যে সময়ের শাখা থেকে কয়েকটি জীর্ণ পাতা পৃথিবীর ধূলায় হারিয়ে গিয়েছে।

দু'বছরের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আজো সেই পুরানো কথাই ভাবে মামুন। পৃথিবীর রং বদলিয়েছে, মানুষও বদলে গিয়েছে, কিন্তু মামুন-রিজিয়ার দাম্পত্য জীবনে কোন পরিবর্তন এলো না। মাঝখানে খোকন এসে দাঁড়িয়েছে, দু'জনের স্নেহে গড়া একটি মোমের পুতুল। কিন্তু কই খোকন ও কি তাদের জীবনে কোন সেতুবন্ধ হয়ে আসতে পারলো?

আজো মাঝে মাঝে লতীফ সাহেবের চিঠি আসে, সাধ্য মতো মামুন তার বাপের সংসারের আর্থিক যোগান দেয়, এ নিয়ে রিজিয়ার সাথে হর হামেশা কথা কাটাকাটি হয়। ভাঙ্গা সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে।

প্রথম যেদিন ওরা এই কলোনীতে এসে উঠেছিলো, তখন যেন কিছুটা নিঃশ্বাস নিয়েছিল রিজিয়া। নীলাম্বর শাখা রোডের সেই দমবন্ধকরা পরিবেশটার কথা মনে হলেই রিজিয়ার শরীর কেমন ঝিমঝিম করে উঠতো।

ছোট বড় তিনখানা কামরা নিয়ে এদের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাতে এক রকম আরামেই কাটছিল দিনগুলি। জায়গার অভাব নেই বলতে গেলে। ছোটখাট পরিবারের সংসার বেশ আরামেই চলতে পারে।

* * *

পূব-পশ্চিমে টানা একটা বিরাট বিল্ডিং। তারি গায়ে আটটি ছোটখাট পরিবারের বসবাস। দূর থেকে কলোনীর ফ্লাটগুলোকে কবুতরের খোপের মতোই মনে হয়। সন্ধ্যায় ফ্লাটে ফ্লাটে অজস্র বাতি জ্বলে, মনে হয় আকাশের এক ঝাক তারা যেন স্থির হয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে

ঢাকা সারা কলোনীটাকে তখন ছায়া ছায়া নিঃসীমতায় কেমন যেন নিরবয়ব বলে মনে হয়।

মামুনের সি-ফ্ল্যাটের পাশে হোসেন চৌধুরীর ডি-ফ্ল্যাট। হোসেন চৌধুরী আদিতে কেরাণীই ছিলেন, এখন প্রমোশন পেয়ে অফিসার হয়েছেন—সেকেণ্ড ক্লাস গেজেটেড অফিসার। তবুও হোসেন চৌধুরী কেরাণীর মতোই চলেন, হাবভাবে অফিসারী মেজাজ প্রকাশ পায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী জমিলা বেগম যেন আরেক জগতের মানুষ। বয়স পঁয়ত্রিশের-গা ছুঁয়েছে, কিন্তু যৌবনের দুরন্তপনা এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। রাসভারী শরীর অহঙ্কারে ভরা, চলনে-বলনে তারি উচ্ছ্বল প্রকাশ কিন্তু কি আশ্চর্য! রিজিয়া এসে সেই রাসভারী মহিলার সাথেই খাতির জমিয়ে বসলো। জমিলা বেগম রিজিয়াকে আপন মেয়ের মতোই দেখতে লাগলেন। স্নেহ-ভালোবাসায় তাকে একেবারে অভিভূত করে দিলেন।

ভর দুপুরে কলোনীটাকে বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। সকাল দশটার পর থেকেই সব কোলাহল ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে থাকে। দু'একটা মোটর গাড়ীর শব্দ, রিকসার টুংটাং শোনা যায় বটে, কিন্তু দুপুরের সেই শূন্যতায় বুদ্বুদের মতোই তা নিমিষে হারিয়ে যায়।

মামুন অফিসে চলে যাবার পর রিজিয়া খোকনকে নিয়ে বসে। রঙচঙের বই দেখিয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়, আদর-সোহাগে মন ভরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ছেলেটা কিছুতেই রিজিয়ার কাছ ঘেঁসতে চায়না। মামুনকে ঘিরেই তার সারাদিনের ছোটখাট কোলাহল।

বিকেলে ফিরে আসে মামুন। খোকন যেন তার পথের দিকেই তাকিয়ে থাকে। দরজায় টোকা পড়তেই দৌড়ে গিয়ে ধাক্কাতে থাকে, আব্বা এসেছে, আব্বা এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠে।

ঘরে ঢুকেই মামুন ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। চুমায় চুমায় তার ছোট্ট সুন্দর মুখটা একেবারে ভরে দিতে থাকে।

অফিস থেকে ফেরবার পথে প্রায় প্রতিদিনই মামুনকে কিছু না কিছু একটা কিনে নিয়ে আসতে হয়। জানে, খোকন কাছে এসেই একটা কিছু চেয়ে বসবে, তখন তাকে ফেরানো যাবে না। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও মামুন খোকনকে বিমুখ করতে পারে না। যেদিন কিছু কিনতে ভুলে যায় সেদিন খোকনকে আদর-আহ্লাদে ভু[illegible] দিতে চায়, কি[illegible] ও কিছুতেই খুশী হয় না। মুখ ভার করে চুপ মেরে থাকে। রিজিয়া বলে, "পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—একটা মাত্র ছেলে, তারো জন্যে তোমার হাতে কিছু উঠলো না? পাঁচটা থাকলে না জানি তুমি কি করতে!"

মামুন সে-কথার কোন জওয়াব দেয় না। জওয়াব না দিয়েই এড়িয়ে যেতে চায়।

জমিলা বেগম আসেন দুপুর বেলা। একলা একলা রিজিয়ারও তখন ভালো লাগে না, মনটা কেমন উদাস লাগে। জমিলা বেগম বলেন, "একলা একলা বাসায় ভালো লাগছিল না মা, তাই তোমার কাছেই ছুটে এলাম।"

রিজিয়া বলে, "ভালোই হলো খালাম্মা, একলা একলা আমারো খুব খারাপ লাগছিল।"

জমিলা বেগম তখন স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হন, বলেন, "কিন্তু মা তোমাদের বয়সে আমাদের এমন খারাপ লাগতো না। মন্টির আব্বা তো প্রায়ই দুপুর বেলা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসতেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "খালি বাসায় তোমার একলা একলা খারাপ লাগবে ভেবেই চলে এলাম। তা' ছাড়া কাজও তেমন কিছু নেই, খালি খালি বসে থেকে লাভ কি?" জমিলা বেগম তার স্বামীর গর্বে তখন ফুলে উঠেন, বলেন, "আমি কিন্তু জানতাম মা, অফিস ফেলে চলে আসতে ওঁ'দের খুবই কষ্ট হতো। বড় সাহেবটা ছিলেন বদমেজাজী, সব সময় ছুটি দিতে চাইতেন না।

রিজিয়া বলে, "খালুজী নিশ্চয় আপনাকে খুব ভালো-বাসতেন?"

জমিলা বেগম চেয়ারটায় আরো নড়েচড়ে বসেন, বলেন, "সে-কথা আর বলোনা মা, সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনও বড় খ'রাপ লাগে। আমাদের কালে দুনিয়া ছিল অন্যরকম। তখন স্বামী-স্ত্রীর সংসার ছিল স্নেহভালোবাসায় ভরা। আর এ-কাল! একালের কথা শুনলে কানে হাত দিয়ে রাখতে হয়। এই তো সেদিন গিয়েছিলাম কামরুণদের বাসায়। দরজায় পা দিয়েই শুনলাম কামরুণ তার স্বামীর সাথে তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। আমাদের চোখের সামনেই বিয়ে হলো মেয়েটার, ছেলে-মেয়ে হয়নি একটিও, অথচ এরি মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

কামরুণের প্রসঙ্গ তুলতেই রিজিয়া কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। রিজিয়া জানে, জমিলা বেগম কোন জায়গায় আঘাত করবেন। কামরুণের কথাটা তিনি রিজিয়াকে লক্ষ্য করেই বলেছেন। মুখরা হলেও জমিলা বেগম রিজিয়াকে সরাসরি আঘাত দিতে চান না। কিন্তু তবুও রিজিয়া ইংগিতটা বেশ সহজেই বুঝতে পারে।

কলোনী-জীবনের প্রথম দিককার কথা। সবে মাত্র রিজিয়ারা এসে উঠেছে এই নতুন ফ্ল্যাটে। আসবাব-পত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। এক দুপুরে জমিলা বেগম এলেন। এসেই গল্প জুড়ে বসলেন। গল্পে গল্পে নানা

কথা উঠলো। জমিলা বেগম বললেন, "আ-ই বলো মা, জিনিষ-পত্র তোমার খুবই কম, এত কম জিনিস-পত্রে কি সংসার চলে?"

রিজিয়া বললো, "সব কিছুই আস্তে আস্তে [illegible] হবে খালা আম্মা। টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে কিনা, তাই অনেক কিছুই কেনা-কাটা সম্ভব হয়নি।"

জমিলা বেগম বললেন, "স্বামী যা বলবে তা-ই মেনে নিয়োনা মা। জোর করে আদায় করতে না পারলে কোন কিছুই হবে না।"

রিজিয়া বললো, "টাকায় না কুলালে জোর করে কি হবে! জমিলা বেগম বললেন, "তোমার সংসার তুমি সাজাবে, তাতে এত ভাবতে যাবে কেন? যখন যা দরকার হয় জোর করে চেয়ে নেবে।"

সেই রাতেই রিজিয়া মামুনের কাছে নানা আব্দার জানিয়েছিল। কিন্তু মামুনের পক্ষে কোন আব্দারেই কান দেওয়া সম্ভব ছিল না। টাকা-পয়সার প্রশ্নটা যেখানে জড়িত সেখানে খালি খালি আশা দিয়ে তো কোন লাভ নেই।

তারপর থেকেই নানা কথা শিখাতেন জমিলা বেগম। রিজিয়াকে এটা সেটা বলে বলে হুঁশিয়ার করে দিতেন। কিন্তু রিজিয়ার কোন আব্দারেই মামুন কান দিতো না, বলতো, "ওসব বাজে খেয়াল রেখে দাও, খেয়ে পরে বাঁচতে পারলেই কৃতার্থ মনে করি।"

মামুনের কথায় ভীষণ বিরক্ত লাগতো রিজিয়ার। কিন্তু রিজিয়া জানতো না যে সেদিনও মামুনকে কর্জ করে টাকা পাঠাতে হয়েছে মল্লিক সাহেবের জন্যে। বাপের আবেদন কেমন করে ফিরিয়ে দেবে মামুন! এ যে তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। পুরানো দিনের সেই স্মৃতি রিজিয়ার মনে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

* * *

গভীর অন্ধকার রাতে একাকী [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] ভাবে রিজিয়া। গত দু'বছরে অনেক অন্ধকার পেরিয়ে সে আজ এসে দাঁড়িয়েছে এই কঠিন অন্ধকারের মুখোমুখী। দিনের পাণ্ডুর আকাশ আর রাতের কঠিন কালো আঁধারের নীচেই তার জীবন। জীবন নয়—যেন অন্ধকারের প্রতিমূর্তি।

দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত গ্লানি সে ভুলতে চায় রাতের অন্ধকারকে বুকে নিয়ে, কিন্তু পারে না। অতীতের সমস্ত স্মৃতি কাঁটার মতো তার বুকে এসে বিঁধে, তাকে ক্ষত-বিক্ষত আর রক্তাক্ত করে দেয়।

পাশের কামরায় ঘুমন্ত মামুন আর খোকনের কথা তার মনে পড়ে। কিন্তু কি হবে আর তাদের কথা ভেবে! জীবনে বিভেদের যে কালোপাহাড়টা তুলে মাথা দাঁড়িয়েছে সময়ের কুঠারাঘাতেও যে তা ভেঙে আর গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেল না।

কলোনীর ওপর তখন শেষ রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। আর সেই অন্ধকারকে বুকে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে রিজিয়া। কিন্তু না, আর বেশীক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। রিজিয়ার মনে হলো তার বুকের ভিতরটায় যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, অনেক [illegible] নিচ্ছিল সর্পটা তখন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। রিজিয়া আর দাঁড়াতে পারলো না। কোন রকমে ঘরে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে কান্নার শেষ আছে কিনা, কে জানে!

॥ সমাপ্ত ॥

রাজশাহীর পল্লীগীতি

মোহসীন আহমদ

আমরা যে অঞ্চলের পল্লীগীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এই সকল গীত মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় পদ্মার তীরবর্তী অনেক স্থানে পাওয়া যায়।

এই সকল গীতগুলি কে বা কাহারা রচনা করিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। তবে এইগুলি শুধু মেয়েরাই গাহিয়া থাকে এবং মেয়েদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতেই অনুমান করা চলে যে, এই গীতগুলি মেয়েদের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। বিবাহ উৎসবাদিতে মেয়েরা এই গীতগুলি গায় এবং যখন তাহারা সুর ধরিয়া সম্মিলিত ভাবে গায় তখন খুবই আনন্দদায়ক হয়। সংগ্রহের অভাবে এইগুলি সাহিত্যে স্থান পায় নাই। পাক বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে এই গীতগুলির যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তা বলা বাহুল্য। কতকগুলি গীত বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। এই গীতগুলি সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকরও শ্রমসাধ্য।

বিবাহের পূর্ব্বদিন বর ও কন্যাকে যে মিষ্টি-মুখ করা হয়, সেই সময় বলা হইতেছে—

"ক্ষীর খা রে আরস ক্ষীর খা—
তোর বাবা দিবে ভরি ভরি দান।"

কন্যাকে মিষ্টি-মুখ করান হইতেছে এবং এই সকল কথা বলা হইতেছে। কন্যার অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন বাইরে লজ্জার খাতিরে মুখ ভার করিয়া থাকাকালীন এই গীত গাওয়া হইতেছে। "ভরি ভরি" অর্থে ভুরি ভুরি অর্থাৎ অনেক। কন্যাকে বলা হইতেছে যে তোমার বাবা অনেক দান দিবেন। "আরস"—কন্যা—বধু—।

বরকে দেখিয়া—কন্যার অন্তর প্রেমে ভরপুর—তাই—

"আম্বু জাম্বুর তলে ছেলে নওশা সিঁদুরের পসার মেলে।
তাহা দেখে সেই না আরস পাছা লেগে আছে
হৈদি আরস দেখ তোমার দাদী বস্যা কাঁদে।
কাঁদে না কেন দাদী—আমি তোমার সঙ্গে যাবো।
তোমার সঙ্গে গেলে আমি সিঁদুরের লাগাল পাবো।
হৈদি দেখ আরস তোমার মা বস্যা কাঁদে
কাঁদে না কেন মা—তোমার সঙ্গে যাবো।
তোমার সঙ্গে গেলে—ব্যাসরের লাগাল পাবো।

আম্বু ও জাম্বু অর্থে আম-জাম।

আম ও জাম গাছের তলায় বর সিঁদুরের দোকান লাগাইয়াছে—তাহা দেখিয়া কন্যা বরের প্রেমে পড়িয়াছে এবং সে তখনই বরের সাথে চলিয়া যাইবে; কিন্তু পৌত্রিকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নয় বলিয়া দাদী কাঁদিতেছে। দাদীর ক্রন্দনে বরের মন গলিয়া গিয়াছে; কিন্তু বরের সিন্দুর ও অন্যান্য মন ভুলানো প্রসাধন দ্রব্য কন্যার মন বরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় সে তখনই বরের সাথে যাইতে চাহিলেও দাদীর ক্রন্দন দেখিয়া বর কন্যাকে সেই সময় লইয়া যাইতে রাজী নয় বলিয়া তাহার দাদীর ক্রন্দনের কথা কন্যাকে বলিতেছে। ইহাতেও যখন বর কন্যার সহিত যাওয়ায় বিরত হইতেছে না তখন বর কন্যার মার ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করিল—বরের সঙ্গে গেলে সে "ব্যাসর" অর্থাৎ নাকের নথ পাইবে। "হৈদি" অর্থ 'ঐ'। তখন বাধ্য হইয়া বর কন্যাকে তখনই নিজ বাটীতে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। স্বামীর সাথে যাইবার সময় কন্যা তার বাপকে সান্ত্বনা দিতেছে—

"টাকা যে লিলা বাবা বাক্স ভরিয়া রে—
তখনি হয়্যাছি পরোঘোরি আরে কে!
কাপড় যে লিলা বাবা বস্তা ভরিয়া রে—
তখনি হয়্যাছি পরোঘোরি আরে কে!
মিষ্টি যে লিলা বাবা হাড়া ভরিয়া রে—
তখনি হয়্যাছি পরোঘোরি আরে কে॥

লিলা—লইলা, পরোঘোরি—পরের ঘরে বাসকারিণী অর্থাৎ স্বামীর গৃহে। হাড়া—হাড়ি।

বাপ, মা, দাদী সকলের কাঁদন উপেক্ষা করিয়া কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরের বাড়ী চলিয়া গেল। স্বামীর বাড়ী গিয়া বাপ মা'র কথা মনে পড়ায় কন্যা কাঁদিতেছে—

"মা গে মা—কোন গ্যাশে বিহ্যা দিলি ক্যাইয়্যা উড়ে না।
বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে—মা কথা মনে পড়ে—মা গে মা—
কোন গ্যাশে বিহা দিলি ক্যাইয়া উড়ে না।

(গ্যাশে—দেশে, বিহ্যা—বিবাহ, ক্যাইয়া—কাক।)

তারপর শ্বশুর বাড়ীতে ভোজের আয়োজন—সকল কুটুম্ব আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কন্যার ননদ জামাই আসে নাই। তাই কন্যা বলিতেছে—

আলো ধানের কালো পিঠা, পূরবী ধানের খৈ;
সব কুটুম্ব আইলো হামার নন্দ কুটুম্ব কৈ?

আলো—আতপ, পূরবী—সরু ও সুগন্ধিযুক্ত, আইল—আসিল, হামার—আমার।

স্ত্রী দূর দেশে বাপের বাড়ী যাইতেছে বলিয়া—স্বামী বলিতেছে:

"বাঁশের পাতা চারল চিরল মনের পাতা হারাইছে
ও আমি কোন্ বা যাবো স্থাশে।
এস নাকিন ওরে কন্যা সাহান বাধা ঘাটে—
হাটু সারি জল ওরে কন্যা হাটু শুদ্ধ কর।

(নাকিন—সম্বোধনসূচক শব্দ অর্থাৎ ওহে।)

গ্রীষ্মের খরায় বাঁশের পাতা চারল চিরল অর্থাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মনের পাতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি কোন্ দেশে গেলে আমার প্রিয়াকে পাইব। তাই স্ত্রীকে বলিতেছে যে, যেন সে তার প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া যায়। সেই জন্য স্ত্রীকে বলিতেছে "তুমি সাহান বাধা ঘাটে নামো—এখানে এক হাঁটু জল আছে—তুমি এখানে নামিয়া তোমার পা শুদ্ধ কর অর্থাৎ পরিষ্কার কর। স্বামী স্ত্রীর বিরহে এত উন্মাদ হইয়া গিয়াছে যে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে তার স্ত্রী নৌকায় চড়িয়া যাইতেছে। স্বামীর মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্ত্রী মাঝিকে ধীরে ধীরে নৌকা চালাইতে বলিতেছে।

স্বামীর কথা শুনার পর স্বামীকে বিবাহ করিতে বলিতেছে—

"গাট্টি ভরা কাপড় রইল ওরে স্বামী—
দোসরা বিবাহ কর।
সুটকেস ভরা অলঙ্কার রইল ওরে স্বামী—
দোসরা বিবাহ কর।

গাট্টি—বস্তা, গাইট

স্বামী পুনরায় বিবাহ করিবে ইহা কোন স্ত্রীই পছন্দ করে না কিন্তু স্বামীর ব্যাকুলতায় তাহাকে বিবাহ করিবার কথা বলিতেছে এবং তাহার যাবতীয় অলঙ্কারপত্রাদিও নূতন স্ত্রীকে দিতে বলিতেছে। একটা সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিবার কথাও বলিতেছে।

প্রেমের আরও অনেক গীত—

"কানটার পিছনে আছে রে ঐ দোরজী ভাইয়ের বাড়ী।
বস্যা বস্যা দোরজী ভাই বুনায় পাটের শাড়ী—
সেই পাটের শাড়ী পিন্ধ্যা—বহু যায় রায়পুরা হাটে রে—
সেই না হাটে আছে রে বহু লাল পেয়াদা বসে রে—
সেই পিয়াদা ধর্যা ল্যায় বহু শাড়ী না রে।
বহুর পুরুষ যায়্যা আনে বহুর শাড়ী ধর্যা।
জ্যাত গেল জ্যাত গ্যাল ছাড় রে পুরুষ বহু
না ছাড়ি না ছাড়ি বহু পিরীত হয়্যাছে খুবি।

বৌ নূতন কাপড় পাইয়া হাটে বেড়াইতে গিয়াছে। সেখানে তার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিলে এবং লোকে স্বামীকে তার স্ত্রী তালাক দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও স্বীয় প্রেমে মুগ্ধ বলিয়া স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়।

আবার দেখা যায়—

আগে সুতায় ভরণা লাল সুতার টানা
সেই না সুতায় বানাইলাম রুমাল না রে।
সেও সুতায় বানাইলাম—গামছা না রে।
গামছা লিয়া গ্যাল রাজশাহীর শহর না রে।
রাজশাহীতে আছে আলাহানী মালাহানী
ধাইয়া ধরনে আমার পকেট ভরা টাকা না রে।
ছেড়ে দাও আমার আলাহানীও মালাহানী না রে।
বাড়ীতে আছে আমার আলাহানী ও মালাহানী—
সেও শুনলে ব্যাজার হৈবে না রে।

স্ত্রী যে সূতা মোটেই ব্যবহৃত হয় নাই বা ছেঁড়া যায় নাই সেই লাল সূতা দিয়া গামছা তৈয়ার করিয়া স্বামীকে দিয়াছে। স্বামী সেই রঙীন সূতার গামছা লইয়া রাজশাহী বেড়াইতে গেলে কোন সুন্দরী মালা পরিহিত অবস্থায় স্বামীকে ভুলাইতে আসিতেছে; কিন্তু স্বামী ভুলিতেছে না—তার সর্ব্বদা মনে জাগিতেছে যে এর মতই বাড়ীতে তার মালা পরিহিত সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে। অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গ কথাবার্তা বলার সংবাদ তার স্ত্রীর কানে গেলে সে বেজার অর্থাৎ অসন্তুষ্ট হইবে।

আলাহানী ও মালাহানী—সুন্দরী মালা পরিহিত স্ত্রী, ধাইয়া ধরনে—অবশ্য।

উল্লিখিত গীতগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় সবগুলি প্রেমপূর্ণ।

মিরাণ্ডা

প্রজেশ কুমার রায়

নগরীর বুকে আমি বাস করি
বিংশ শতাব্দীর,
কর্ম্ম মুখর বিংশ শতাব্দীর ঃ
তুমি থাকো কোন্ অজানা সাগরে,
অজানা দ্বীপের মাঝে,
জঠরের জ্বালা জুড়াতেই শুধু
ঘর্ম্ম আমার ঝরে,
তুমি খেলা কর, হাস, গান গাও
একেলা সকাল-সাঁঝে।
যৌবন এলো তোমার জীবনে,
হেথা বসে ভাবি তাই—
হাতের হাতুড়ি খসে পড়ে যায়,
আপনারে ভুলে যাই।
ফুলেদেরে তুমি ভালবাসো খুব
ভালোবেসে পরো চুলে,
ফুলের চেয়েও সুন্দর তুমি
সে কথা কি গেছো ভুলে ?
শিলাতটে শুয়ে ভেসে যেতে চাও
উচ্ছল কলতানে ?

কে বা শুনে ভাবি কোন্ ভাষা জাগে
উছল তোমার গানে ?
ঘুমায়ে স্বপন দেখো কেবা জানে
কোন্ মায়া-উপবনে,
মায়া-সঙ্গীত ভেসে ভেসে আসে
সমুদ্র-সমীরণে !
নগরীর বুকে আমি করি বাস
বিংশ শতাব্দীর,
ছায়া-মায়া হীন বিংশ শতাব্দীর ঃ
কেবা জানে আর কতো ব্যবধান
তোমার আমার মাঝে ?
আপনারে তুমি না জেনেই বুঝি
ফুটে শুধু যাবে ঝরে,
স্বর্গের সুধা নিয়ে আস্‌বেনা
তিক্ত আমার কাজে ?
—তবু কী মধুর তোমার ভাবনা
তিক্ত শ্রমের মাঝে !

দুইটি স্কেচ

নূরুল ইসলাম খান

॥ শীত ॥

পৃথিবীর ধূসর মাটিতে আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। শীতের সকাল। সীমাহীন শূন্য মাঠ। আর লাজনম্র অন্ধকারে হিমস্তব্ধ গোধূলি আকাশ। সূর্যের সমুদ্রে ডুবে আকাশের মনেও বোধ করি নেশা ধরেছে—হলুদের নেশা। কুয়াশার কুমকুম তখনও মুছেনি শিউলি আর ঝরা পাতার বুক থেকে। দারুণ শীত! তাই বোধকরি জীবনে তীব্র রোদ্দুরের প্রত্যাশায় ছেঁড়া লেপটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছিলুম। দারিদ্র্যের অভিশাপে শীতের ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছি বারবার।

—"কি গো, এবার ওঠো; সাতটা বেজে গেল যে! অফিসে যেতে হবে না?"

ছেঁড়া লেপের ভেতর দিয়েই এক চোখের ইশারা বাইরের দিকে ছুঁড়ে মারলুম। না: শীতের কুজ্ঝটিকা থামিয়ে রোদ্দুরের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী নূরজাহান। এরই মাঝে লক্ষ্য করি প্রেমের তারার কম্পাস তার চোখের ছোট্ট হ্রদে।

লেপের ভেতর থেকেই বললুম—"না: লক্ষ্মীটি, আর একটু ঘুমোতে দাও; ভারী শীত করছে যে!"

সহসা লেপের ঘোমটা খুলে আমার পাশে বসে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললো—"দেখো, আজ আর কোনো কথা শুনবো না; মাইনে পেয়েই আজ তুমি তোমার জন্য একটা সোয়েটার কিনে আনবে…আজকাল তুমি শীতে কত কষ্ট পাও বলো তো? আমার ব্যথা তুমি বুঝবে না জানি…" স্বর ভারী হয়ে এলো তার।

না জবাব না দিয়ে আর পারলুম না।—"দেখো, এক শ টাকা মাইনে পেয়ে ঘর ভাড়া দিয়ে সোয়েটারের জন্য টাকা খরচ করলে বাকী টাকায় সংসার কি করে চালাবো বলো তো?"

ফুঁপিয়ে ওঠে নূরজাহান—"তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, না হয় তার জন্য একটা মাস একটু কষ্টই করলাম, তাই বলে তোমার আর শীতে কষ্ট পেতে দেবো না আমি…"

—"কিন্তু তুমিও তো শীতে কষ্ট পাচ্ছো। তোমারও তো গরম জামা নেই।"

—"আমায় তো আর আপিস করতে হয় না; সারা দিন ঘরেই থাকি—আমার শীত করে না। না: আজ আর কোনো কথা শুনবো না। আজ তোমার একটা সোয়েটার কিনতেই হবে। নইলে…" লক্ষ্য করলুম কথা শেষ করার পূর্বেই যেন ও কিসের একটা তীব্র বেদনায় কুঁকড়ে উঠেছে।

আর কোনো কথা না বলে ওকে বুকের নিবিড় সংস্পর্শে টেনে আনি। মনে হলো নতুন করে প্রেমের শিশুর জন্ম দিলুম শীতের শুভ্র সমুজ্জ্বল সকালে আর একবার। বললুম—"আচ্ছা রাগ করো না; কিনে আনবো তার আগে আজকের এই সোনালী সকালে আর একবার আমরা সবুজ হয়ে যাই, কেমন?" হেসে ফেলি।

শেষে হার মানতেই হলো স্ত্রীর কাছে। এবার আর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলুম না। অফিস থেকে বেরিয়েই মাইনের টাকাটা নিয়েই গেলুম দোকানে। দেখে শুনে পছন্দমত কিনলুম একটা কোট। হ্যাঁ—দামটা অবশ্য একটু বেশীই পড়লো। কারণ এও জানি এর দরুণ মাসের শেষে হাত পাততে হবে ধারের জন্য। ক্ষতি নেই তাতে। ভাবলুম জীবনের সঞ্চয়ের পাতে তো বারোটা মাস অদৃষ্টের অবজ্ঞার দৃষ্টি কুড়িয়ে চলেছি। অতএব, আজকে জীবনের স্বরলিপিতে অসীমের বেহাগের সুরই বাজিয়ে নিই না কেন!

অতএব, সুদৃশ্য প্যাকেটটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকি। ভাবছিলুম সোয়েটারের পরিবর্তে কোট কেনাতে স্ত্রীর রোষে আবার পড়বো না তো! তাকিয়ে দেখি নূরজাহান দাঁড়িয়ে আছে জানালার শিক ধরে দিগন্তের দিকে। আকাশ ঘুমোতে চায় ব্যথার সবুজ সোনালী ডানা মাথায় রেখে। মনে হলো কি জানি হয় তো এমনি অসতর্ক মুহূর্তে স্ত্রীর মনটিও বুঝি জীবনের শ্রান্ত হিয়ার তৃষ্ণাতুর বেদনায় বিক্ষত। তন্ময়!!

চুপি চুপি পেছনে গিয়ে বললুম—"এই নাও—কিনে এনেছি।"

—"কই দেখি;" সহসা অন্তহীন জিজ্ঞাসার মত চমক ভাঙ্গে তার। একি! "এটা তোমায় কে আনতে বললে!" ব্যথার অবচেতনায় ভেঙ্গে পড়লো সে।

বেলুনের মত চুপসে গেলুম আমি—"না, মানে… সোয়েটারই কিনতে গিয়েছিলুম…কোটটা দেখে খুব পছন্দ হলো। ভাবলুম তোমার গায়ে খুব ভাল মানাবে। তা ছাড়া গোলাপী রঙটা তুমি খুব ভালবাস কিনা—তাই নিয়ে এলুম।"

এমব্রয়ডারী করা লেডিস কোটটা হাতে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো নূরজাহান। নির্বাক, নিশ্চল। বুঝলুম

হৃদয়ও তার ঘুমোতে চায় স্নেহের ধূলির জগতে। চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠলো অশ্রুর ছোঁয়ায়।

আমি আরো একটু সরে গিয়ে তাকে বুকে লুকিয়ে অস্ফুটে বলার চেষ্টা করলুম—"রাগ করো না লক্ষীটি। দেহের সাথে যুদ্ধ করে বাঁচবার এটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়; তোমার নিবিড় ভালবাসার আঁচলে আমায় ঢেকে রেখো—তা হলেই কেটে যাবে আমার সারা জীবনের শীত!" আর কিছু বললুম না।

অকস্মাৎ নূরজাহান আমার বুকে ছোট্টো শিশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠলো—কক্ষচ্যুত তারকার মত। নাঃ, এখন আর শীত নেই। গোধূলির বিবর্ণ সূর্য মেলে দিয়েছে গ্রীষ্মের চাদর। বঞ্চিত জীবনে ভীরু পায়ে শীত এসে প্রেমকে করেছে আলিঙ্গন।

আঃ কি গরম!!

॥ স্বৈরিণী ॥

নাগরিক জীবনের বহু কুৎসিত ছবি আঁকার পর ভাবলুম প্রকৃতির বুকে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে রচা সৌন্দর্যের মুঠো মুঠো ঝলকানি আঁকবো। তাই ট্রেণে চলেছি অজানার উদ্দেশে। গাড়ী চলেছে পাহাড়ের বালি ছড়ানো পথ বেয়ে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। আকাশের নিস্তরঙ্গ মেঘে কুমারীর রঙধনু রংয়ের হাসি। এ যেন ঝরে পড়া লোধ্ররেণুর সঙ্গে পাথর চূর্ণের অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বেশ কয়েকটি ষ্টেশন ছাড়িয়ে যেতেই লক্ষ্য করলুম একে একে সবাই নেমে গেল ট্রেণ থেকে। শুধু রইলুম আমি আর জনৈকা অপরিচিতা তরুণী। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি মেয়েটীকে। বিশেষ করে তার অপূর্ব্ব রূপকে। অদ্ভুত দেখতে সে। শিল্পীর তৈরী এক মর্মর পাথরের মত। সূর্য-ছোঁয়া সৌন্দর্য্যের বুকে যেন বনানী স্রোত। টানা টানা দুটি চোখে সকৌতুক চাহনী। ডালিমের মত রঙীন ঠোঁট দুখানি দেখে বুঝি বা কোনো ভ্রমর ভুল করে চপল পাখনা মেলে বসে। মিষ্টি যৌবন তার দেহে গালে যেন তরংগের মত লুটোপুটি খাচ্ছে। তন্ময় হয়ে দেখছিলুম...

তারপর...নিঃসঙ্গতার সুযোগে চললো এলোমেলো কথার আলোচনা। কখনও ভাষায়, কখনও ভাবে। আলাপ জমে উঠলো ক্রমে ক্রমে...

—"যদি কিছু মনে না করেন আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে পারি কি?" প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

—"নিশ্চয়ই। আমি একজন শিল্পী। ছবি আঁকি। কিন্তু আপনি?"

—"আমার পরিচয় নাই বা শুনলেন!" ঠোঁটে তীব্র কটাক্ষ।

—"তবু..."

—"যদি একান্তই শুনতে চান তো শুনুন...রূপোর বদলে রূপ বিক্রি করি আমি। কিনবেন আপনি?"

সহসা ঝটকা খাওয়া পাখীর মত আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে এলো তরুণীর পরিচয় জেনে। করুণামিশ্রিত ঘৃণা হলো ওর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য। মেয়েটীর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আবার প্রশ্ন করলো—"আচ্ছা আপনি তো শিল্পী। দেবেন আমার একটা প্রোট্রেট এঁকে...বেশ সুন্দর।"

—"দেখুন আপনি যত সুন্দর, আপনার প্রোট্রেট ঠিক ততখানি দেখতে কুৎসিত হবে।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম।

—"কেন?"

—"কারণ আর্টের যেটা প্রাণ আপনার মধ্যে তার একান্ত অভাব।"

—"ওঃ।"

বুঝলুম তরুণীর মনে দারুণ আঘাত লেগেছে।

তারপরে কথার স্রোত ধীরে ধীরে কমে এলো। ট্রেণ তখনও চলেছে হু হু করে। দুটি যাত্রী আমরা রাত্রির নিঃসঙ্গতাকে চেপে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই। আমারই সহযাত্রী তরুণী দেহ ব্যবসায়িনীর কাছ থেকে কিছু না কেনার দরুণ ক্ষুব্ধ হলো কিনা জানি না, তবে মনে হলো জীবনে আমার ঐশ্বর্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। সহসা ট্রেণের হুইসেলে ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রদোষের আবছা আলোয় তাকিয়ে দেখি আমারই গন্তব্যস্থানে ট্রেণটী দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি ছবি আঁকার ব্যাগটা কাঁধে ফেলে আর সুটকেশটা হাতে নিয়ে নামবার আয়োজন করি। নামতে যাবো এমন সময় যেন কাঁধের উপর কিসের একটা নরম স্পর্শের মত ঠেকলো। তাকিয়ে দেখি তন্দ্রা জড়ানো অবিন্যস্ত বেশে দাঁড়িয়ে সহযাত্রিনী।

মেয়েটি বললো—"দেখুন, জীবনের যথার্থ সৌন্দর্য হয় তো আমি উপলব্ধি করতে পারবো না; কিন্তু তাই বলে যে তার মূল্য দিতে শিখিনি, এটা আপনি জানলেন কি করে?"

—"তার মানে?" বিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

—"কাল রাতে আপনি যে ভাবে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন সেটা সৌন্দর্য নয়: সৌন্দর্যের আবরণ। যথার্থ সৌন্দর্য মানুষের অসংযমী প্রবৃত্তিতেই আছে: শুধু ধরার ভুল..."

—হুঁস—তাকিয়ে দেখি মেয়েটীর চোখ ছলোছলো।

কেমন যেন দৈন্য এসে ঘিরে ফেললো আমায়। চঞ্চল হয়ে উঠলো নির্বাক মন। খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গেলুম পৃথিবীকে। নিজের মনের অজ্ঞাতেই বলে ফেললুম—"আমার হাত ধরুন।"

শাওন কন্যা

আশরাফউদ্দিন আহমদ

দিগন্ত নীল, রোদ ঝিলমিল, মায়াবী শাওন কন্যা,
তোমার পরশে বরষে বরষে ধরণী হয়েছে ধন্যা।
বিলে বিলে ফোটে কুমুদ-কুমুদী, কমল খুলছে আঁখি
তার ফাঁকে ফাঁকে চরে ঝাঁকে ঝাঁকে কত জলচর
পাখী।
কদম কেয়ার মধুর সুরভি চারিদিকে পড়ে লুটে,
করবী বালার ঘোমটার ফাঁকে
মৃদু হাসি ফোটে ঠোঁটে।
ফুল-সম্ভার নেইকো তোমার, বিধাতা করেনি দান
হয়তো সে-ফুলে রূপালী রূপের করা হত অপমান।
কল্ কল্ কল্ ছল্ ছল্ ছল্ গাহি যৌবন-গীতি
খাল-বিল-ঝিল নদী ও নালায়
খোঁজো কারে নিতি নিতি ?
ওষ্ঠে তোমার ফোটেনাক হাসি, পরণে মলিন বাস,
উড়ায়েছ বায় আকাশের গায় এলোচুল একরাশ।
তোমার বিরহে চাঁদের কপোল কলঙ্ক কালিমায়—
ম্রিয়মান তাই আকাশ প্রদীপ বারে বারে নিভে যায়।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ অবিরল ধারে ঝরে তব আঁখি-লোর,
পাতায় পাতায় বেজে উঠে যেন কি এক করুণ সুর।
কবে কোন্ যুগে প্রিয়তম তব গিয়েছে তোমারে ছাড়ি
খোঁজ কি তাহারে ফিরি দ্বারে দ্বারে,
হে চির বিরহী নারী ?
গিয়েছে যে চলে তারে পাবে বলে তব মন আঙিনায়,
তাই কি গো তুমি দিয়ে যাও পাড়ি
শরতের খেয়া নায় ?

পিয়ারী মোহন রোড

শামসুদ্দীন

হঠাৎ কখনো যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় কোন রাতে,
শয্যার উপরে বসে চোখ দু'টি ওঠে জ্বালা ক'রে.
এতটুটু হাওয়া নেই, অবিরাম শুধু ঘাম ঝরে,
মশার কামড়ে দেহ ফুলে ওঠে—ভয় নেই তাতে।
চুপচাপ দোর খুলে মৃদুপায়ে এসো এই খানে—
যেখানে হাজার তারা জেগে আছে, জেগে আছে চাঁদ,
রূপালী ধারার স্রোত বহে যায়।—মানেনাক বাঁধ ;
খুশির জোয়ার লাগে চারদিকে সুরে আর গানে।

দেখো চেয়ে চোখ তুলি, ঝির ঝির মৃদুল হাওয়ায়
নির্জন মাটির পথ কথা কয় হেসে ওঠে আর
আনন্দ শিহর তুলি ; পড়বেনা আঁখির পলক।
মনে হবে এই ক্ষণ এ-পৃথিবী, চাঁদের আলোক
আরো দীর্ঘ হোক আর আরো দীপ্ত হোক চারিধার।
তোমারো বিরস মন যাবে ভরে খুশির ধারায়।

নজরুল-গীতি

(তেওড়া)

তৌফিক্ দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম জাঁহা পুনঃ হোক আবাদ।
দাও, সেই হারান সাল্তানাত
দাও সেই বাহু সেই দিল্ আজাদ॥
দাও বেদারেগ্ তেগ্ জুল্ ফিকার
খয়বর জয়ী শেরে-খোদা
দাও সেই খলিফা সে হাশ্মত্
দাও সেই মদিনা সে বাগ্দাদ্॥
দাও সে হাম্জা সেই বীর অলিদ
দাও সেই ওমর্ হারুন্-উর্-রশীদ
দাও সেই সালাহুদ্দীন আবার
পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ॥

দাও সেই রুমী সাদী হাফেজ্
সেই জামী খৈয়াম সে তাব্রেজ্
দাও সে আক্বর সেই শাহ্জাহান
সেই তাজমহলের স্বপ্ন সাধ॥
দাও ভাইয়ে ভাইয়ে সে মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্ত মন
হোক বিশ্ব মুসলিম এক জামাত্
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত চাঁদ॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম। স্বরলিপি—বেদার উদ্দীন আহমদ।

```
 ১            ২        ৩        ১           ২         ৩
                                ম
II{ মা মা -মা | মা মা | মা মা | গা- গা পা | মগা রা | রা -রা I
   তও ফি কৃ  | দা ও  | খো দা | ই  স্ লা | মে॰ ॰  | মু স্

                                প
গা -পা পা | ধা -ধা | স'না র'স'া | ধা -ধা পা | মা -(মা | মা -মা) -া | -া -মা II
লি ম্ জাঁ | হা ॰  | পু॰ ন॰    | হো ক্ আ  | বা দ্  | দা ও ॰    | ॰ দ্

                                ম
মা -মা মা | মা -মা | মা -মা | গা -গা পা | মগা -রা | রা -রা I
সে ই হা  | রা ॰  | ন ॰   | সা ল্ তা | না॰ ত্  | দা ও

                                প
গা পা পা | ধা -ধা | স'না র'স'া | ধা -ধা পা | মা -মা | -া -মা } II
সে ই বা | হু ॰  | সে॰ ॰ই    | দি ল্ আ  | জা ॰  | ॰ দ্
```

শেয়র—(তাল ছাড়া, একটু টেনে টেনে গাহিতে হইবে।)

পুস্তক-পরিচয়

মফস্বল সংবাদ (ছোটগল্প সংকলন) : মিন্নত আলী প্রণীত। প্রকাশনায় মজিদ পাবলিশিং হাউস, ১৪।১৫, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। দাম : আড়াই টাকা।

'মফস্বল সংবাদ' মিন্নত আলীর প্রথম গল্প-সংকলন। এতে ১৫টি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলোর রচনা কাল ১৩৫৭-১৩৬০। উল্লিখিত তারিখের পরবর্তীকালে রচিত কোনো গল্পই লেখক এ-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেননি। গত ছয় বছরেও মিন্নত আলীর বেশ কিছু-সংখ্যক ছোটগল্প আমরা ইতস্ততঃ প্রকাশিত হতে দেখেছি। প্রথম সংকলন হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই এতে কিছু দুর্বল গল্প স্থান পেয়েছে, সে দুর্বলতা গল্পের আংগিক-গত যতটা নয়—তার চেয়েও বেশী শিল্পগত। 'মফস্বল সংবাদ' এর সব গল্পই গ্রাম-জীবন ভিত্তিক এবং লেখক গল্পগুলোতে জীবনের নানা জটিল সমস্যা তুলে ধরেছেন। কিন্তু লেখক গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে যতটা সচেতন, প্রকাশ ভঙ্গীর শিল্প সৌকর্য সম্পর্কে হয়তো ততটা নন, তাই গল্পের প্লটটি আমাদের যতটা মুগ্ধ করে, প্রকাশভঙ্গীর দীপ্তি ততটা চমক লাগায় না। এ-মন্তব্য কম-বেশী অধিকাংশ গল্প সম্পর্কেই করা চলে। কিন্তু প্রশংসার কথা এই যে, লেখক জীবনকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং অন্তর দিয়ে পল্লী-মানুষের সুখ-দুঃখ ও বেদনাবোধকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এ-অনুভবে ফাঁকির ভেজাল মেশানো নেই বলেই লেখক 'রূপবানু' গল্পের 'রূপবানু,' 'একটি শুভ-বিবাহ' গল্পের 'মরিয়ম' 'মফস্বল সংবাদ' এর 'জয়গুন' প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এদের সবাই আমাদের গ্রাম-জনপদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র, প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও আবিলতার মধ্যেও প্রাণের সজীবতায় সুন্দর। তাদের দুঃখ-বেদনাও যেন জীবনের সত্যিকার অর্থ বহন করে আনে। কয়েকটি রচনা ঠিক ছোটগল্প নয়, স্কেচ বা নক্শা জাতীয়। 'পরিচয়' গল্পটিকে 'রূপক গল্প' বললেই হয়তো যথার্থ বলা হয়। মিন্নত আলী সমাজ সচেতন শিল্পী; কিন্তু কোনো বিশিষ্ট মতবাদের প্রচারক নন, আর এ-কারণেই তিনি চরিত্রগুলোর মুখে নেপথ্য থেকে কোন বক্তব্য ঠেলে দেননি। এরা নিজেদের ব্যক্তিত্বেই প্রকাশিত হয়েছে। 'চাঁদ' গল্পটিতে বেশ কিছুটা ভাবালুতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এ-কারণেই গল্পটি দানা বাঁধতে পারেনি। 'মিয়া বাড়ীর কোরবানী' গল্পের বক্তব্যটি মামুলি বলেই মনে হলো। এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও গল্পগুলো সুখ পাঠ্য। লেখকের পরবর্তী গ্রন্থে এর চেয়েও সার্থক গল্পের সন্ধান পেলে আমরা সুখী হবো।

ছাপা-বাঁধাই মামুলি. প্রচ্ছদপটটিও আকর্ষণীয় নয়।

—মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্

বৃষ্টিমুখর (কাব্যগ্রন্থ) : আবদুস্ সাত্তার প্রণীত। পরিবেশনায় : রওনক পাবলিকেশান্স, ৫।১, সিমসন রোড্ ঢাকা—১। দাম দুই টাকা।

আবদুস্ সাত্তার পূর্ব পাকিস্তানী তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল কবিদের অন্যতম। বাংলা কাব্যের যে আধুনিক রোমান্টিক ধারাটি ক্রমান্বয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠ্ছে, পূর্ব-পাকিস্তানী তরুণ কবিদের রচনায়ও তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। আবদুস্ সাত্তার এই রোমান্টিক ধারারই অন্তর্গত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টিমুখর'-এ এই রোমান্টিক মনোভঙ্গী এত সুস্পষ্ট যে, তা তাঁর কবিতার শরীরে কোনপ্রকার অস্পষ্ট কুহেলিকা কিম্বা দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেনি। কোন কোন রোমান্টিক কবির রচনায় অনুভূতির কৃত্রিমতা, বোধের অস্পষ্ট পরিমণ্ডল এবং প্রকাশভঙ্গীর জটিলতা এক ধরণের আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে। এই ছায়াচ্ছন্নতার ফলে কবিতার অন্তর্নিহিত প্রেরণার উৎস-সন্ধান পাঠকের পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই ক্লান্তিকর মনে হয়। সুখের বিষয়, 'বৃষ্টিমুখর'-এর কোন কবিতাতেই এই লক্ষণটি প্রকট নয়। অনুভূতির দিক্ থেকে 'বৃষ্টিমুখর'-এর কবিতায় ত্রিশের রোমান্টিক কবিতার আমেজ এবং কবিদের মনো-ভঙ্গীর সমধর্মীতা লক্ষ্য করা গেলেও, প্রকাশভঙ্গীর দিক্ থেকে এর প্রত্যেকটি রচনাই ভিন্ন প্রকৃতির। আবদুস্ সাত্তার তাঁর কবিকর্মে অত্যাধুনিক বাংলা কবিতার ধারাটিকেই অবলম্বন করেছেন। চিত্রকল্প, উপমা, রূপ-কল্প ও শব্দচয়নে এই বিশিষ্ট ভঙ্গীটাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন তরুণ রোমান্টিক কবির কবিতায় ক্লাসিক্ ধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে ক্লাসিকের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রশংসনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত রয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি শুভলক্ষণ, কারণ, ক্লাসিকের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লে রোমান্টিক অনুভূতি শুধুমাত্র তারল্যেরই জন্ম দেয়, কবিতার মহৎ সম্ভাবনা বহণ করে আনে না। আবদুস্

সাত্তারের কবিতায় ক্লাসিকভঙ্গীর সাথে ঘরোয়া-ভঙ্গীর সমন্বয় সাধনের প্রশংসনীয় চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। বলা বাহুল্য, বাংলা কবিতার অতি আধুনিক ধারায় এ-প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বিধৃত হয়ে আছে।

আবদুস্ সাত্তারের কবিতায় রোমান্টিক অনুভূতির সাথে সাম্প্রতিক জীবন ও জগতের নানা জটিলতাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মনের এই জটিল গ্রন্থ উন্মোচনে তিনি অনাবশ্যক তীব্রতা প্রকাশ করেন নি বলেই তাঁর কবিতার শরীরে হতাশাবাদ সুপ্রকট নয়। নাগরিক জীবনের নানা জটিলতা থেকে মুক্ত হবার বাসনায় তিনি গ্রাম-জীবনে ফিরে যাবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু সেই আকাঙ্খাতেও একটি সুস্থ কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন :—

"সেই ভালো ফিরে যাবো গ্রামের নিভৃতে।
যেখানে মোমের মতো শিয়রে মায়ের স্নেহ জ্বলে,
পিতার অনন্ত প্রেম বিস্তৃত মাঠের
শ্যামল শস্যের চারা, দিনে দিনে বাড়ে
ঘাসের সবুজে ঘন আকাশের নীল
আর প্রাণের সুষমা ;
অশেষ শ্রান্তির শেষে প্রিয়ার অমৃত হাত ওঠে
শীতল জলের পিপাসায়, মুখের গভীরে,
সেই ভালো।"
(সেই ভালো—)

আধুনিক নগর-জীবনের যন্ত্রণা-করুণ ছবিটি ফুটেছে 'মেঘ' শীর্ষক কবিতায় :—

"এইখানে এসো মেঘ, বাড়ির দরজা খোলা আছে ;
সবাই জেনেছে আমি বিশুষ্ক মরুর প্রতিনিধি।
এখানে আসেনা কেউ, প্রতিবার যন্ত্রনার বিধি
আমাকে তাড়িয়ে দেয় অনন্তর আগুনের কাছে।"

প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা রচনায় আবদুস্ সাত্তারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। প্রেমের উপলব্ধিকে বিচিত্র মাধ্যমে প্রকাশের নৈপুণ্য 'বৃষ্টি-মুখর'-এর অনেকগুলো কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। 'শালিখ' 'নাম' 'দোসর নেই' 'সে' ইত্যাদি কবিতাগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতি কবির মনে সুস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটিয়েছে, আর এ-কারণেই নদী-নালা পরিবেষ্টিত ছায়া-ঢাকা পূর্ব-পাকিস্তানের নানা জায়গার ছবি আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ল্যাণ্ড্-স্কেপ অঙ্কনে কবির দক্ষতা অপরিসীম। ছবি আঁকার পারদর্শীতায় বিভিন্ন জায়গার রূপ এমন সুস্পষ্ট এবং স্নিগ্ধ ভাবে ফুটেছে যে তা পাঠকের মন স্পর্শ করে যায়। যেমন :—

"কিছুক্ষণ চুপচাপ। অতঃপর দু'চোখ বুজিয়ে
আবার দেখি যে দূর শিরীষ ও সেগুন শাখায়
দুরন্ত ছেলের মতো নরম ডানায়
সাদা সাদা 'ফগ' খেলা করে।
গর্জমান দূরের প্রপাত—
মনে হয় সাদা থান কাপড় ঝুলিয়ে
কে যেন রেখেছে ওই মিশ্-কালো পাহাড়ের গায়।"
(এক দিনের ডায়েরী)

কিংবা—

"এখনি কি ফিরে যাবে ? ঘরে ফিরে তৃপ্তির নুপুর
বাজিয়ো অনেক দিন। রঙিন ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি
কুড়িয়ে আঁচল ভরে ছাখোনা সন্ধ্যার হিমছড়ি
কী আশ্চর্য মনোরম শিল্পীর তুলির টানে আঁকা স্পষ্ট
ছবি।
ঢেউ ভেঙে সাম্পানের মাঝি ফেরে ঘরে।
সমুদ্র কত যে স্নিগ্ধ মেঘমুক্ত শান্ত নভেম্বরে।"
(হিমছড়িতে বিকেল)

কবির মন আধ্যাত্মিকতার দিকেও ঝুঁকেছে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও দার্শনিক উপলব্ধির চেয়ে রোমান্টিকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন :

"হে আকাশ তোমার আড়ালে—
এমন সুন্দর আলো বলো কেবা জ্বালে !
* * * *
এই চিনি, চেনা চেনা, একান্তই চেনা মনে হয় ;
তবুও পাই না কেন তার সে আসল পরিচয় !"
(অন্তরাল)

কিংবা—

"সে অদৃশ্য হাতে আমি খেলার পুতুল হয়ে আছি।"
(সে অদৃশ্য হাত)

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে এই হচ্ছে "বৃষ্টিমুখর" এর কবির মানসিকতা ও কাব্যকৃতির পরিচয়। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করতে গেলে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হতে হবে যে, 'বৃষ্টিমুখর' আমাদের কাব্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোগ। আর এ-কারনেই এ-কাব্যগ্রন্থের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি তেমন উল্লেখ যোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এ-দুর্বলতা প্রধানতই কবিতার আঙ্গিকগত। কিছু কিছু কবিতার পংক্তি বিশেষে, শব্দ প্রয়োগ, উপমা নির্বাচনে, মিল-বিন্যাসে কিছুটা শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। এ দিক থেকে আরো অধিকতর সতর্ক হলে আবদুস্ সাত্তার যে তাঁর প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর এঁকে দিতে পারবেন, এ-কথা দ্বিধাহীন ভাবেই বলা চলে।

গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদ পদটিমনোরম। আমরা এ-কাব্যগ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—নজরুল হক

খেলাধূলা

—খেলোয়াড়

এবোটাবাদে জাতীয় এ্যাথলেটিকস ট্রেনিং ক্যাম্প হইতে প্রত্যাগত পূর্ব্ব-পাকিস্তান মাধ্যমিক স্কুলের এ্যাথলেটগণকে চীফ কোচ মেজর হামিদ ও খাওয়াজা সলিমের সঙ্গে দেখা যাইতেছে।

শীতকালে ফুটবল খেলা—সম্প্রতি ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স ক্লাব নিজ তাঁবুতে জাতীয় ফুটবল কোচিং কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট ব্রিগেডিয়ার সাহেব দাদ খান বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় ফুটবল খেলাকে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালেও প্রচলনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, উহার দ্বারা এই খেলার মানের দ্রুত উন্নয়ন হইবে। জাতীয় ফুটবল কোচিং কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণও নিয়মিতভাবে অনুশীলন ও সাধনা করিয়া এই খেলার মান উন্নয়নে সহায়তা করিতে পারেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ব্রিগেডিয়ার সাহেব দাদ খান এ বৎসর পূর্ব্ব পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি এ সম্পর্কে পূর্ব্ব পাকিস্তান দলকে ঢাকায় ট্রেনিং দানের এবং এক পক্ষকাল পূর্ব্বে পশ্চিম পাকিস্তান প্রেরণ করিয়া সেখানকার শক্ত মাঠে অনুশীলনের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া উল্লেখ করেন। অবশেষে তিনি ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তা ও সদস্যদের তাঁহাকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। ব্রিগেডিয়ার সাহেব দাদ খান উরদুতে বক্তৃতা করেন।

ইতিপূর্ব্বে ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এস, এ, মোহসিন শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিয়া তাহারাই দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নয়নে সহায়তা করিবে বলিয়া উল্লেখ করেন।

কোরান তেলাওয়াত করিয়া অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং চীফ কোচ হাফেজ রশীদ সহ সকল কোচ ও শিক্ষার্থীকে পরিচয় করাইয়া তাহাদের মাল্যভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সকলকে চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।

ঢাকায় ফুটবল ট্রেনিং শেষ—পাকিস্তান স্পোর্টস কনট্রোল বোর্ডের উদ্যোগে প্রায় দুই মাস কাল ঢাকায় দেশের তরুণ ও উদীয়মান ছাত্র খেলোয়াড়দের ট্রেনিং গ্রহণ শেষ হইয়াছে। এখন তাহারা দুইটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার পর ক্যাম্প হইতে নিজ নিজ বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। অনুশীলনের শেষ দিনে ট্রেনিং দেখার জন্য সকাল সাড়ে ছয়টায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুল ও কলেজের প্রায়

৪০ জন এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩৫ জন ছাত্রকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ট্রেনিং গ্রহণ করিতে দেখা যায়। পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী এবং জাতীয় ফুটবল কোচিংয়ের অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রশীদ সি, এস, পি-কেও ছাত্রদের ট্রেনিং দিতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৫ সনে তিনি কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার আন্তরিকতা, অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ঢাকায় ফুটবল কোচিং পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চীফ কোচ হাফেজ রশীদ, জনাব ইলিয়াস উদ্দীন আহমদ ও ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানকেও ট্রেনিং ব্যবস্থা তদারক করিতে দেখা যায়। সহকারী কোচ জনাব ইলিয়াস, জনাব সাত্তার, জনাব ক্ষিতীশ রায়, জনাব নুর হোসেন, জনাব সাহেব আলী ও জনাব খান মজলিসকে বিভিন্ন দলকে খেলার বিভিন্ন বিষয় ট্রেনিং দিতে দেখা যায়। কোচদের ট্রেনিং দানের পদ্ধতি খুবই আধুনিক এবং তাঁহারা শিক্ষার্থীদের শুটিং ও পাসিং, রিসিভিং, ড্রিবলিং, ট্যাকলিং প্রভৃতি বিষয় যেভাবে ট্রেনিং দিতেছেন, তাহাতে নিশ্চিত সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ট্রেনিজ দলের সাফল্য—গত ৪ঠা আগষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল ট্রেনিজ একাদশ বনাম কামাল স্পোর্টিং দলের খেলায় ট্রেনিজ একাদশ ৪-২ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল করেন মোহাম্মদ আলী ২টী, রশীদ ১টী ও মাজহার ১টী। কামাল স্পোর্টিং দলের পক্ষে গউস ও মোবাশ্বর ১টী করিয়া গোল করেন।

খেলোয়াড়দের সাহায্য তহবিল—আজাদী দিবস ফুটবল খেলায় পুরস্কার বিতরণের পর মেজর জেনারেল ওমরাও খান ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন কর্তৃক প্রবীণ খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদদের জন্য এক হাজার টাকা লইয়া এক সাহায্য তহবিল গঠনের বিষয় ঘোষণা করেন। স্পোর্টস ফেডারেশন কর্তৃক প্রবীণ খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদ-দের সাহায্যদানের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

আজাদী দিবস ফুটবল ফাইনাল—গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান আজাদ স্পোর্টিং ও পুলিশ দলের মধ্যে ষ্টেডিয়ামের কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছল মাঠে গত ১৪ই আগষ্ট আজাদী দিবস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলার শেষে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর মেজর জেনারেল ওমরাও খান পুরস্কার বিতরণ করেন। অবিরাম বৃষ্টি-পাতের দরুন ঢাকা ষ্টেডিয়াম মাঠের, বিশেষ করিয়া উত্তরদিকের অবস্থা যে রূপ গ্রহণ করে, তাহাতে প্রথম শ্রেণীর খেলা প্রদর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় দলের খেলোয়াড়গণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যেরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উন্নত ধরণের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রশংসার দাবী রাখে।

আলোচ্য দিনের খেলায় তারতম্য অনুযায়ী পুলিশ দলেরই জয়লাভ করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু ফরোয়ার্ডদের, বিশেষ করিয়া রউফ ও সমীরের ব্যর্থতার জন্য তাহারা একাধিক সুযোগ পাইয়াও গোল করিতে অসমর্থ হয়। পুলিশ দলের রক্ষণভাগে ব্যাক জহীর ও মোহাম্মদ আলী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় ছিলেন। পাকিস্তানী ইন্টার-ন্যাশনাল নবী চৌধুরী অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। প্রবীণ খেলোয়াড় ধনুও ভাল খেলেন। আক্রমণ ভাগে কবীর একাই প্রতি-পক্ষ দলের ভীতির কারণস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত সমঝোতা না থাকায় তাহারা লব্ধ সুযোগের কোনটিরও সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই।

অপর দিকে সেন্ট্রাল ষ্টেশনারীর পাঁচজন, ঢাকেশ্বরী মিলের তিনজন, পাক পি, ডব্লিউ, ডি'র একজন এবং নিজেদের দুইজন বাছাই করা খেলোয়াড় লইয়া আজাদ স্পোর্টিং খুবই শক্তিশালীভাবে দল গঠন করে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা কর্দ্দমাক্ত মাঠের উপযোগী ক্ষীপ্রতার সঙ্গে লম্বা পাসিংয়ের দ্বারা না খেলিয়া শট পাসিংয়ে খেলার চেষ্টা করায় ভুল করে। ফলে পুলিশ দলই অধিকাংশ সময় খেলায় আধিপাত্য বিস্তার করে এবং এই দিনকার খেলায় তাহারাই যোগ্যতর দলরূপে প্রশংসার দাবীদার হয়।

আজাদ স্পোর্টিং দলের পক্ষে গোলরক্ষক তপন, ব্যাক গৌর, ইউজিন ও সেণ্টারহাফ সামাদের খেলাও খুব প্রশংসনীয় হয়। তন্মধ্যে সামাদকে এইদিন আজাদ স্পোর্টিং দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা চলে।

খেলার নির্দ্দিষ্ট সময় কোন ফলাফল না হওয়ায় দশ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়। উহার শেষ মিনিটে কবীর স্বীয় সাবলীল ভঙ্গীতে সকলকে কাটাইয়া গোলে শট মারিতে উদ্যত হইলে ইউজিন তাহা রক্ষা করেন। ফলে পুলিশ দল বিজয়ের গৌরব লাভে বঞ্চিত হয়।

অতঃপর টস করিলে আজাদ স্পোর্টিং জয়লাভ করে এবং মেজর জেনারেল ওমরাও খান দর্শকদের তুমুল করতালির মধ্যে অধিনায়ক মুক্তার হস্তে আজাদী দিবসের শীল্ড অর্পণ করেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও এইদিন

মাঠে বিপুল জনসমাগম হয় এবং সামরিক ব্যাণ্ড পার্টিও দর্শকদের আনন্দদান করে।

আজাদ স্পোর্টিং—তপন; গৌর ও ইউজিন; কাসেম, সামাদ ও ৎফর; বাদশাহ, মুক্তা, নিশীথ, গদাধর ও মঞ্জুর।

পুলিশ—মাসুদ; জহীর ও মোহাম্মদ আলী; লতিফ, নবী চৌধুরী ও ধনু; সমির উদ্দীন, কবীর, রউফ, কফিল ও হাবিবুর রহমান।

রেফারী—ঈসা খান।

আজাদী দিবসে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের গবর্ণর পুরস্কার দান করিতেছেন।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য—সম্প্রতি হেলসিঙ্কিতে আন্তর্জাতিক স্পোর্টস সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি জনাব এ, এইচ, কারদার এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান সরকার কতকগুলি দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্যকে জিয়াইয়া রাখার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতে চাহেন। তিনি সদস্য রাষ্ট্রগুলির নিকট খেলাধূলায় বর্ণ বৈষম্যের নীতি অনুসরণ হইতে বিরত থাকার জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন।

তিনি বিজয়ী ও বিজিতের সঙ্গে মর্য্যাদা জড়িত করার প্রশ্নের বিলুপ্তির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান সরকার ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে "জাতীয় বীর" এবং "তারকা" সৃষ্টির ক্রমবর্দ্ধমান ঝুঁকি সম্পর্কে সাবধান হইতে অনুরোধ জানান। অলিম্পিক ক্রীড়ার বিজয়ের সম্মানের সঙ্গে জাতীয় মর্য্যাদার প্রশ্ন জড়িত করিলে উহাতে খেলাধূলার প্রতি মানবিক সংযোগ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

জনাব কারদার আরো বলেন যে, পাকিস্তান সরকার খেলাধূলাকে তামদ্দুনিক কার্য্যকলাপ হিসাবে গণ্য করেন। পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক সমঝোতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্পোর্টস টিম বিনিময়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত বলিয়া মনে করেন।

কারদার

সম্পাদকীয়
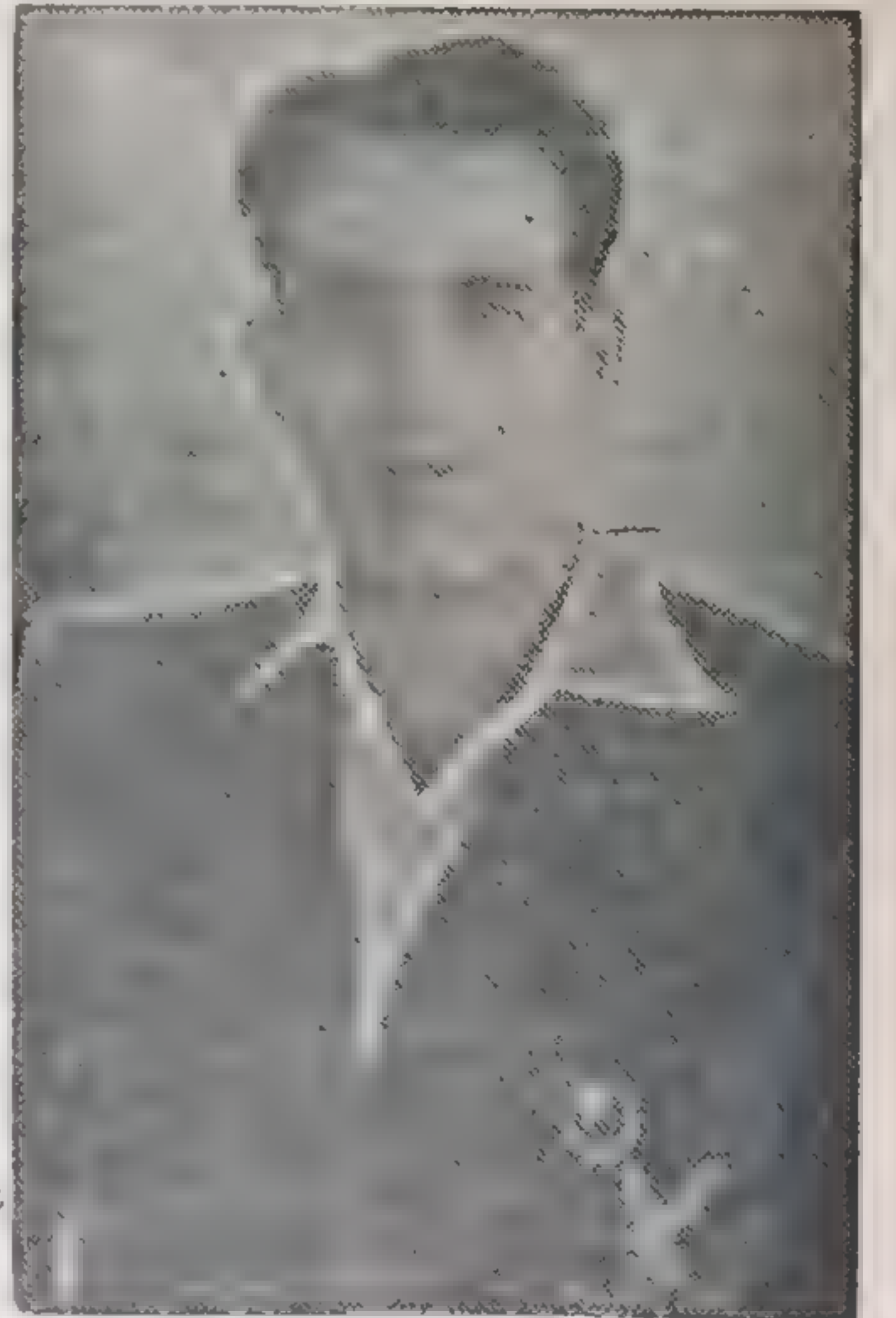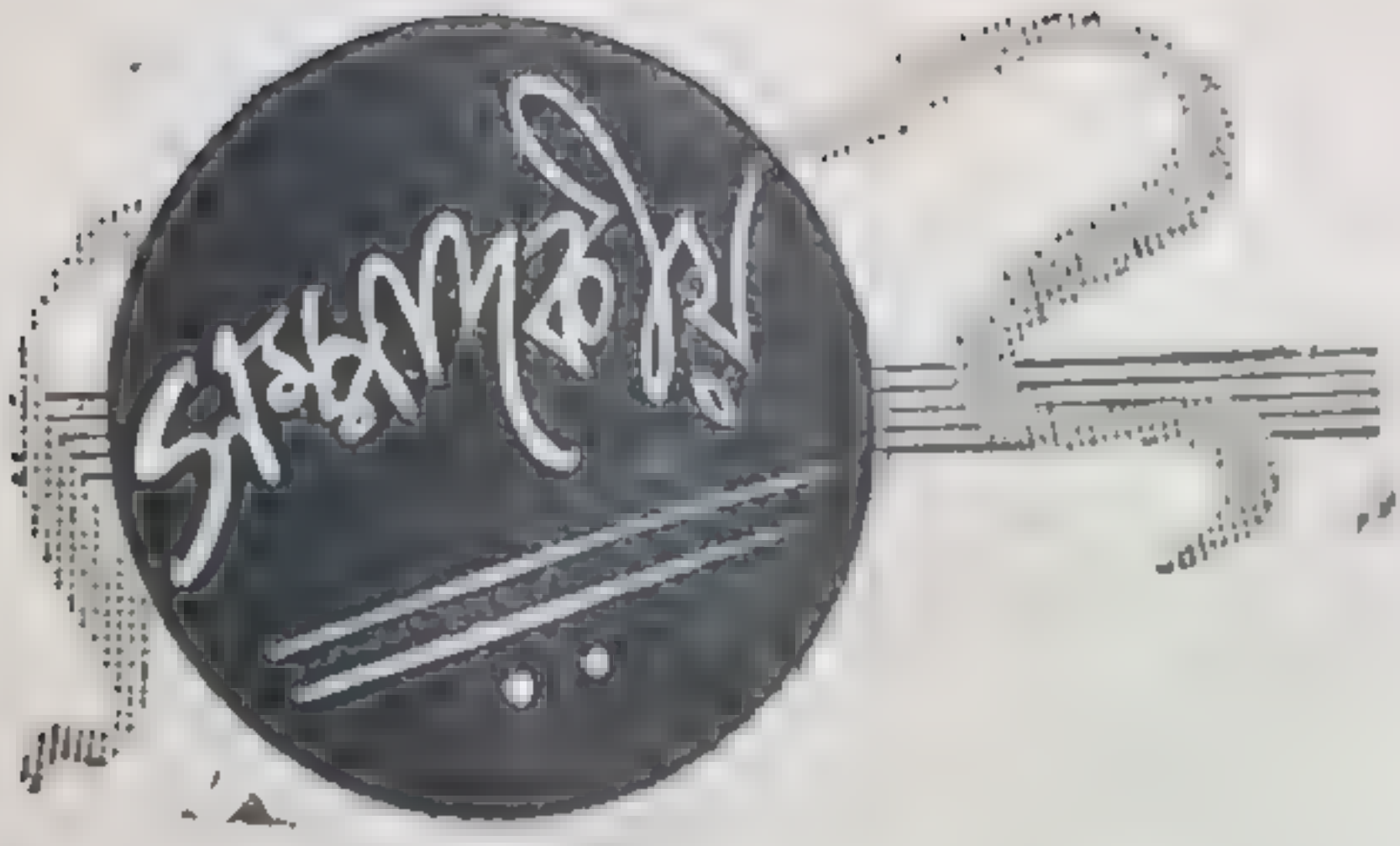
মোহাম্মদ হোসেন খসরু

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়াছে। জনাব খসরু এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। মৃত্যুতে সকলের কণ্ঠই নীরব হয়; কিন্তু এর দরুণ যখন একটি সুরেলা কণ্ঠ নীরব হয়, তখনই তার ব্যথা মানুষের মনে বাজে। খসরুর কণ্ঠ ছিল সত্যই একটি কণ্ঠের মত কণ্ঠ—এক কথায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী। তিনি তাঁর সারা জীবনের সাধনায় ওস্তাদী গানকে দেশবাসীর নিকট জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং এর সৌন্দর্যের প্রতি সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। একদিন ওস্তাদী গান সাধারণ দেশবাসীর নিকট তেমন জনপ্রিয় ছিল না; কিন্তু জনাব খসরু ও তাঁর কয়েকজন অনুসারী মিলিয়া ওস্তাদী গানকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

জনাব খসরু কেবল একজন উঁচুদরের গায়কই ছিলেন না, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর হাত পাকা ছিল। এক কথায় গান-বাজনাই ছিল তাঁর জীবন। তবে গায়ক খসরুর চাইতে মানুষ খসরুও কম বড় ছিলেন না। বহু সৎগুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। জনাব খসরু অত্যন্ত সদালাপী, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তা পূরণ হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানান্তর

বর্তমান কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে টঙ্গীর দক্ষিণে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। এজন্য দুই হাজার একর জমি দখলের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাবটিকে অভিনন্দিত করিতেছি। বর্তমান যে স্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত, সেখানে স্থান খুবই কম। সরকারী অফিস আদালত ও নানা ধরনের আবাসিক এলাকা তার আশে-পাশে গড়িয়া উঠায় স্থানটি ক্রমেই জনাকীর্ণ ও হট্টগোল-পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ফলে শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি কার্যের জন্য যে পরিবেশটি অত্যন্ত দরকার, তা এখানে পাওয়া যাইতেছে না।

ইহা ছাড়া অতীতেও দেখা গিয়াছে যে, এই এলাকা শহরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার দরুন বাহিরের অবাঞ্ছিত প্রভাব এখানে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভূত হয়। রাজনৈতিক প্রভাবে অতীতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার ক্ষতি এখানে যথেষ্ট হইয়াছে। এই সব বিবেচনা করিলে নূতন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়টি সরাইয়া লওয়ার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব নূতন নয়। এর আগেও একাধিকবার এই প্রস্তাব হইয়াছিল। তখন একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরাইয়া জয়দেবপুরে লইয়া যাওয়ার কথা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য অর্থ বরাদ্দও করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় অপসারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া একজন পরিচালকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় অপসারণের অসুবিধা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে তখন কোনো কোনো মহল হইতে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল যে, শহরের মধ্যস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান অনেক শিক্ষার্থীর জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছে। বাহির হইতে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে আসিয়া পড়াশুনা করিতেছে। যদি শহর হইতে দূরে কোথায়ও বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়, তবে অনেক ছাত্রছাত্রী বাহির হইতে আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে না। এই যুক্তিকে আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। এর ফলে ছাত্রছাত্রাদের কিছুটা অসুবিধা হইতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এখান হইতে অন্যত্র গেলে এখানেও কলেজাদি থাকিয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক

এলাকায় যাইয়া যারা পড়াশুনা করিতে পারিবে না, তারা এখানেই পড়াশুনা করার সুযোগ পাইবে।

কিন্তু বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ নানা দিক হইতে সম্প্রসারিত করা দরকার। বর্তমান এলাকায় তার সুযোগ নাই। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন, সে পরিবেশ এখানে নাই। তার শান্তি ও পবিত্রতা এখানে নানা ভাবে বিনষ্ট হওয়ার কারণ আছে। সুতরাং সকল দিক খতাইয়া দেখিলে বর্তমান স্থান হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যত্র সরাইয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

জেলা ও বিভাগের পুনর্বিন্যাস

কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বপাকিস্তানকে ৪টি বিভাগ ও ২৫টি জেলায় বিভক্ত করার কথা চিন্তা করিতেছেন। পূর্ব্বপাকিস্তানের কোনো কোনো জেলার আয়তন অতি মাত্রায় বড় এবং তাদের আয়তন ও সীমানা যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক নয়, তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং জেলা ও তার সাথে বিভাগের সীমানা নূতন করিয়া নির্দেশ করার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক বিভাগ, ভৌগোলিক অবস্থান, শাসন পরিচালন, ইতিহাস, তমদ্দুন ও ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রশ্নও এই সব সীমা-নির্দ্ধারণের সময় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের বহু জেলাই আমাদের গৌরবদীপ্ত অতীত ইতিহাসের স্মৃতির জড়োয়া-জড়িত। ব্রিটিশ আমলের সময় জেলার সীমা নির্দেশের বেলায় এ-সবের প্রতি ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। অনেক জেলার নামকে পর্যন্ত বিকৃত করা হইয়াছিল। আজ নূতন করিয়া এ-সব ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করার সুযোগ আসিয়াছে। আশাকরি, কর্তৃপক্ষ জেলা ও বিভাগের নূতন করিয়া সীমা নির্দ্ধারণ করার সময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে ত্রুটি করিবেন না।

পান ও আঙ্গুর

পান পূর্ব্ব পাকিস্তানের নরম মাটিতে ফলে এবং আঙ্গুর জন্মে পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু আজ মানুষের চেষ্টা ও উদ্যম এর ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে এবং প্রকৃতির উপর জয়-লাভ করিয়া সর্বত্র নব নব সম্ভাবনার লক্ষ্য মুক্ত করিতেছে। কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, কুমিল্লার এক গ্রামে একজন কৃষক তাঁর বাগানে চমৎকার আঙ্গুর ফলাইয়াছেন। তাঁর আঙ্গুরগুলির সর্বত্র বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আঙ্গুরগুলি যেমন বড় হইয়াছিল, তেমনি হইয়াছিল রসাল ও সুস্বাদু। পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব জাকির হোসেন এই আঙ্গুরগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আমাদের ধারণা ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের উষর মাটিতে বাংলার মাটির ফসল ফলাও কঠিন। কিন্তু আমাদের সে ভুল ধারণায়ও আজ আঘাত লাগিয়াছে। খবর পাওয়া গিয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে পান, আনারস, আম ও কলার চাষ সফল হইয়াছে। মীরপুর খাস জেলায় পানের চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেখানে পান উৎপাদন মোটেই কঠিন নয়। কলার ও আনারসের চাষ সেখানে ব্যাপক আকারে হইতে শুরু হইয়াছে। এমন কি, শীঘ্রই পশ্চিম পাকিস্তানের এ সব নবজাত ফসলের ব্যবসায়ও গড়িয়া উঠিবে। আমরা উভয় অঞ্চলে নব নব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের উদ্যোক্তা-দিগকে মোবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া মওসুমের জয় যাত্রা। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাটির সম্পদ জয় করিয়া লওয়ার এই প্রচেষ্টা পাকিস্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আজ অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছে।

আর্থিক লাভ

আমরা যদি সচেষ্ট হই, তবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বহু ফলের চাষ হয়ত এখানে গড়িয়া তুলিতে পারি। আঙ্গুর সর্বত্রই একটি পরম লোভনীয় ফল; কিন্তু আঙ্গুর পূর্ব্ব পাকিস্তানে পাওয়া যায় না। তার ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে "আঙ্গুর ফল টক" বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরঞ্চ এর অভাব একে লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যে কিছু আঙ্গুর এখানে আসে, তা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। কিন্তু আমদানীকৃত এই পচনধর্ম্মী ফলটির বাজার সব সময়ই আগুন থাকে। আজ যদি আমরা এখানে আঙ্গুর ফলাইতে পারি, তবে জনগণের ইহা ক্রয়ক্ষমতার নাগালে আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ঠিক পান সম্বন্ধে পশ্চিম পাকিস্তানেও একই কথা খাটে। সেখানেও পানের বাজার আগুন। কিন্তু পানের খরিদ্দার সেখানে যথেষ্ট। বিমান যোগে এখান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে যে সব পান যায়, তার দাম অত্যন্ত বেশী পড়ে। তাই পশ্চিম পাকিস্তানে মনের আনন্দে পান খাইয়া এবং গান গাইয়া বেড়াইবার কথা কেউ কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের উদ্যোগ ও অধ্যাবসায় পশ্চিম পাকিস্তানে আজ পান জন্মাইবার ব্যাপারে সফল হইতে চলিয়াছে। শুধু পান নয়, কলা, আম, আনারস প্রভৃতিও সেখানে ব্যাপকভাবে অনেকে,

চাষ করার কথা চিন্তা করিতেছেন। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করিতেছি। পূর্ব্ব পাকিস্তানের কয়েকটি চাষী পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করার জন্য যাইতেছেন। আমরা যথা সময়ে এই প্রচেষ্টা অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। কর্তৃপক্ষ যদি যেসব চাষী আম, আনারস, প্রভৃতি জন্মাইতে বেশী অভিজ্ঞ, সেসব চাষীকে সেখানে লইয়া যান, তবে তাঁদের দ্বারাও এসব কাজে প্রচুর সাহায্য হইতে পারে।

মোদ্দা কথা হইল, সরকারকে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে এ-ধরনের কৃষি প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। আমরা জানি, কেউ কেউ এসব প্রচেষ্টাকে পছন্দ করেন না। তাঁরা এর বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি অবতারণা করিয়া থাকেন, সে সব যুক্তি হাস্যকর। তারা বলেন, পাকিস্তানের উৎপাদিত জিনিস দুই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন থাকাই উচিত। এতে দেশের বৈচিত্র্য থাকিবে এবং এক অঞ্চল আর এক অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল থাকিবে। এ-যুক্তির কোনো দাম নাই। দৃষ্টান্ত দিলেই এই যুক্তির অসারতা স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়।

পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে ধানের ও গমের চাষ অল্প বিস্তর হয়। দুই অঞ্চলের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়াইতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানে ধানের এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে গমের চাষ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এই যুক্তি কেউ গ্রহণ করিবে না। এখানে বড় কথা হইল আর্থিক প্রয়োজন। তাছাড়া পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক দূরত্বের দরুন এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলের লোক স্বল্প সময়ে এবং সুবিধাজনক দামে পায় না। সুতরাং পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যথা-সাধ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার নীতিকে অনুসরণ করিয়া চলিতেই হইবে।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad Press Ramna, Dacca (E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী
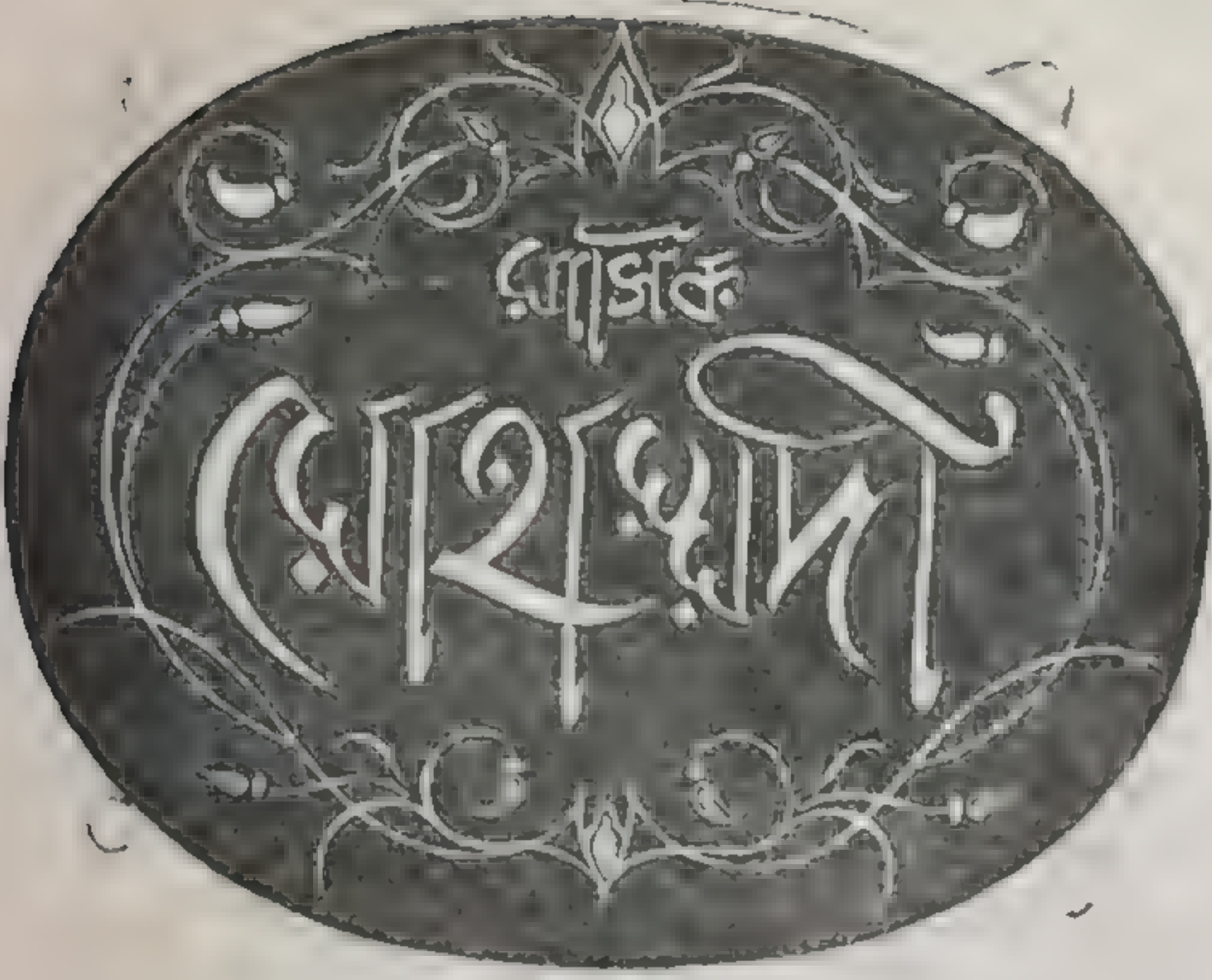
ভাদ্র, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

গজালে নাতীয়া

মুহম্মদ আবুবকর

নিখিল জগৎ দেয় শাহাদৎ তুমিই মুহম্মদ ;
তুমিই খোদার তারীফ জানো—খোদার প্রেমাস্পদ!
সকল নবীর প্রতিশ্রুতি তোমার আবির্ভাব,
সব রসুলের স্বপ্নে রঙীন তোমার চোখের খা'ব ;
তোমার কালাম তাই করেছে সবার কালাম রদ ॥
বিশ্ব-কারণ তুমিই যে খাস মুস্তফা আল্লার ;
খোদার খালিস ইবাদৎ আর তোমার প্রতীক্ষার—
রোজ-আজলে সব নবী তাই নিয়েছে শপথ ॥
তোমার নূরের জহুর জানি ইল্‌ম আদমের,
সিজ্‌দা পেলো তাই ত আদম জ্বিন মলায়েকের ;
তাই পেল সে খিলাফতের সব ছে সেরা পদ ॥
তোমার নূরে দেখ্‌ল কিনার কিশ্‌তী সে নূহের,
কর্‌ল শীতল খলীলুল্লাহ্‌ আতশ নমরূদের ;
প্রাণ দিয়ে তাঁর পুত্র পেলো প্রাণেরি শহদ ॥
ইব্রাহীমে কর্‌লে তুমি সাচ্চা ইব্রাহীম,
(আজ) রূহানী ফরজন্দ তাঁর প্রতিটি মুসলিম ;
'তৌহীদ ও কুরবানী-খৎনা' খান্দানী সনদ ॥
তোমার নূরে জিন্‌ল য়ুসফ হৃদয় জুলেখার,
মুসার 'আসা'য় আভাস দেখি তোমার মোজেজার ;
দাউদ নবীর কণ্ঠে তোমার সুরেরি শহদ্‌ ॥
সুলায়মানের স্বপ্ন তুমি ঈসার সমাচার,
তুমিই দিলে সব মানুষের সমান অধিকার ;
দুঃখের ধরায় তুমিই সুখের নামালে জন্নৎ ॥

উনিশ শতকে মুসলিম ধর্মান্দোলন

মাহমুদ শাহ কোরেশী

"The great object in trying to understand history—political, religious, literary or scientific, is to get behind men and to grasp ideas.
Ideas have a rediation of their own, in which men play the part of god-fathers and god-mothers more than that of legitimate parents."

—Lord Acton

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় নবজাগরণের যুগ—রেনেসাঁর যুগ। "নতুন চিন্তা ও সাধনার উন্মেষ হল এই যুগে। এই চিন্তা সম্পূর্ণ নতুন, কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সামাজিক মানুষ মানুষের ভাবনা ভাবতে শিখলো। এই মানব চেতনা ও সমাজকেন্দ্রিক চিন্তাই নবযুগের, নবজাগরণের উৎস। গতানুগতিকতার মোহজাল ছিন্ন করে নতুন নতুন চেতনা, প্রেরণা ও স্বাতন্ত্র্যের আলো দেখা গেল।" কিন্তু এই আলো সমাজের কন্দরে কন্দরে কী করে অনুপ্রবেশ করলো, কী পরিস্থিতিতেই বা তার বিকাশ লাভ ঘটল—তা অনুধাবন না করলে শুধু এই যুগকে নয়, এই যুগের কোনো আন্দোলনেরও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। তাহলে, আমাদের চলে যেতে হবে ইতিহাসের ধূসর পাতা পেরিয়ে দুশো বছরের আগেকার বাঙলায়। সেদিন বাঙালীর মানে বাঙালী মুসলমানের জীবনে সমস্যা বলতে ছিলো না কিছু। সমৃদ্ধি, প্রাচুর্যে তার জীবন ভরপুর। গোলা ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, সিন্দুক ভরা টাকা, আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র—কোনো কিছুরই তার অভাব ছিলো না। অভাব ছিলো শুধু একটি জিনিসের। ইসলামী মতাদর্শের যে বিপ্লবী শক্তির বলে তারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলো, তারা তা ক্রমেই ভুলে যেতে লাগলো। বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলো। তাই দুর্যোগও এলো ঘনিয়ে। ১৭৫৭! পলাশীর প্রান্তরে তাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের চেতনা ফিরে এলো না, মোহমুক্তি ঘটলো না। পলাশীর যুদ্ধ কেবল তাদের রাজনৈতিক বিপর্যয়ই ঘটায়নি, জাতীয় ও ভাব জীবনে এক চরম সংকট, নিদারুন অবক্ষয়তার সূচনা করলো তা তারা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না। কিন্তু যথার্থ উপলব্ধি করেছিলো ইংরেজ। তাই নিদ্রিত প্রায় এই জাতিকে আরো ভালো করে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা করলো। রাজত্বের ধারা যে ভাবে চলে আসছিলো, সে ভাবেই চলতে লাগলো। আগের মতো মুসলমান বিচার বিভাগে, হিন্দু রাজস্ব বিভাগে বহাল রইলো। এমন কি মুসলমানদের অনুরোধ ক্রমে ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করলো। কিন্তু ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর থেকে শুরু হলো বিপর্যয়। শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়লো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলো ইংরেজ। মুসলিম তাহজিব-তমদ্দুনের যাঁরা ছিলো ধারক, বাহক—এমনি ধারার অনেকগুলো পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং পরবর্তী—Resumption proceedings এর ফলে। দেশের চারভাগের একভাগ জমি ছিলো নিষ্কর। ইংরেজ তা দখল করে নিলো। হিন্দু-মুসলিম ধর্মগুরু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক প্রাচীন ঐতিহ্য-সম্পন্ন পরিবার এতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। ফার্শীর পরিবর্তে রাজভাষা ইংরেজী প্রচলন মুসলমানদের প্রতি আরেক অস্ত্র নিক্ষেপ।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, মুসলমানরা এমন নিক্রিয় হয়ে রইলো কি করে? তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দিলো না কেন? প্রথমত, মুসলমানগণ যখন রাজত্ব হারালো, তখন তাদের চরম পতনদশা। মুসলমানদের সেই পতনের ইতিহাস নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন সৈয়দ গোলাম হোসেন তাঁর 'সিয়ারুল মুতাখখরীণ' গ্রন্থে। মুসলমান সমাজে যে ভালো, উপযুক্ত লোক ছিল না, তা নয়। বিলাতে সাক্ষ্যদান কালে রাজা রামমোহন রায় মুসলিম উচ্চ রাজকর্মচারীদের বিদ্যাবত্তা ও চারিত্রিক সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে—মুসলমানরা যে কতো ব্যাপকভাবে হীন হয়ে পড়েছিল, সে বিষয় অবহিত ছিল না। এমন কি, তারা যে রাজ্য হারিয়েছে, সামগ্রিক ভাবে সে ভাবনাটুকুই ছিল তাদের চেতনা জগতের বাইরে। ডঃ ডব্লু ডব্লু হান্টার এ-সময় বাঙলাদেশে ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এদেশে মুসলমানদের পূর্বাপর অবস্থা পর্যবেক্ষণ, তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রতিকারের উপায় নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বাদ দিলেও মুসলমানদের তদানীন্তন অবস্থার যথাযথ চিত্রন ঘটেছে তাঁর বইয়ে (The Indian Mussalman)। তাতে হান্টার লিখেছেন—If any statesman wishes to make a

sensation in the House of Commons, he has only to truly narrate the history of one of the Muhammadan families of Bengal. তাঁর মতে, কোনো রাজনীতিবিদ যদি হাউস অব কমনস-এ আলোড়ন তুলতে চান, তাহলে বাঙলার কোন একটি মুসলমান পরিবারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই যথেষ্ট। এমন মর্মান্তিক অবস্থা বিশ্ব মুসলিমের ইতিহাসে বোধকরি নজীর পাওয়া যাবেনা। হান্টার আরো লিখেছেন—A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born Musalman of Bengal to become poor ; at present it is almost impossible for him to continue rich. দেড় শো বছর আগে গরীব হওয়া যাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, ধনী হয়ে থাকাই আজ তাদের পক্ষে সম্ভবের বাইরে। হান্টার আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন অন্তরের ঔদার্যে, অমিত বলবিক্রমে, রাজনৈতিক শক্তি-মত্তায় বুদ্ধির প্রাখর্যে যে জাতি স্বল্পকাল আগে সবার শ্রেষ্ঠ ছিল, আজ তারা এমন করে অধঃপাতে পতিত হল কেন? রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক জীবনে মুসলমানদের যে অধঃপতনের সূচনা, শিক্ষার দিকে তা প্রকট হয়ে উঠলো। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি হওয়াতে স্বাভাবিক কারণে মুসলমান সে শিক্ষা বর্জন করল। তাছাড়া নানা আন্দোলন ইত্যাদির জন্য আর মুসলমানদের স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যে ইংরেজরা মুসলমানদের সুনজরে দেখতে পারতো না। তারাও যেমন মুসলমানদের ছেড়ে হিন্দুদের অধিক সুযোগদানে মনোনিবেশ করলো, মুসলমানরাও তেমনি তাদের ছোঁয়া এড়িয়ে দূরে সরেই রইলো। তাদের প্রবর্তিত public instruction এ-অংশ গ্রহণে বিরত রইলো। মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতি ছিল অভিজাত ধরনের। এবং নিঃসন্দেহে তদানীন্তন সব শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের। মিঃ ই, সি, বে'লে, সি, এস, আই স্বীকার করেছেন, মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত তৎকালীন সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতির চাইতে শ্রেষ্ঠ। হান্টারও এই মত সমর্থন করেন। বড় বড় অভিজাত পরিবারে বিদ্যোৎসাহী মধ্যবিত্ত পরিবারে কিংবা সুপণ্ডিত আলেমদের রীতিতে শিক্ষাদানের আয়োজন চলতো। কিন্তু আর্থিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে এগুলো অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য আজো গ্রাম-বাঙলার অভিজাত পরিবারে তার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান।

মুসলিম শিক্ষাপদ্ধতি ও সমাজ বিন্যাস নির্ভর করে ধর্মীয় ভিত্তির উপর। সুতরাং ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, প্রয়োজন বাঙালী মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উনিশ শতকের এইসব ধর্মান্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা। কেননা, আমাদের আজকের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের মূলে ছিল এরই মহান ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য-সাধনার উত্তরাধিকারী হয়ে আমরা এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বিরত হতে পারি না।।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই আন্দোলনগুলো ধর্মীয় অনুভূতি ও জাগৃতি থেকে উদ্বুদ্ধ হলেও বিকাশ লাভ করেছিল সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই তাদের বিচার চলবে না। গোঁড়া, সংকীর্ণ ইত্যাদি অপবাদ থেকে তাই প্রথমেই তাদের অব্যাহতি দিতে হবে। কেননা, ভারতীয় সমাজ জীবনের পটভূমিতে তার প্রয়োজন অস্বীকার করবার উপায় নেই। পাক-ভারত উপমহাদেশের অতীত ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আর্যবিজয়ের কাল থেকে নানা জাতি ভারতবর্ষে এসে হিন্দু সংস্কৃতির কবলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইসলাম শুধু তার ব্যতিক্রম। ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শ, মানবিক সমাজবাদ, অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি তার আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তবে একদিক থেকে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মুসলিম সংস্কৃতির ওপর হিন্দু প্রভাব এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ। মুসলিম সামাজিক পর্বগুলোতে হিন্দুর পূজোর ন্যায় জাঁকজমক, উল্লাস—পীর পূজা, সমুদ্র দেবতার মতো খোয়াজ খিজিরকে মেনে চলা, মহামারীর আবির্ভাবে মা শীতলা, রক্ষাকালীর হাত থেকে পরিত্রানেচ্ছা ইত্যাদি হিন্দু প্রভাবেরই ফল।১ মধ্যযুগের শক্তিশালী মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতানের নবীবংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ হিন্দু দেবতাদের নবী বলে স্বীকৃতি আছে। মুসলমানদের রাজত্ব থাকা কালে এ সব অনৈসলামিক প্রথা ঢুকে পড়ে এবং রাজত্ব হারাবার পর তা বেজে যায়। পরবর্তী কালে আল্লামা ইকবাল তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন, Surely we have out Hindued the Hindu himself ; We are suffering from a double caste system, sectarianism and the soial caste system which we have either learned or inherited from this Hindu. this is one of the quiet ways in which the conquered nations revenge themselves on their conquerors.

এই দুরবস্থা যে শুধু বাঙলার মুসলিম সমাজের তা

(১) এ সম্পর্কে চমৎকার প্রামাণিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে: ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হকের "বঙ্গে সূফীপ্রভাব" এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে

নয়, সারা ভারতে, সারা বিশ্বে মুসলিম জগতের সর্বত্র সেদিন কেমন যেন অবক্ষয়মান পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। মুসলমানদের সেই ব্যাপক মোহ ও নিষ্ক্রিয়তা ভাঙতে আরম্ভ করে ওহাবী আন্দোলন। মওলানা আকরম খাঁ "বাঙলা ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দ" নামে এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে ওহাবী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেছেন এইভাবে: "অহাবী وهابي শাব্দিক অর্থ আল্লাওয়ালা। ইংরেজ শিখদিগের সম্মিলিত আক্রমন হইতে মোছলেম ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য বেরেলীর হজরত সৈয়দ আহমদ, মওলানা এছমাইল শহীদ ও মওলানা বেলায়েত আলী প্রমুখ শিষ্য ও সহকর্মীদের সহযোগীতায় যে জেহাদ আন্দোলন করিয়াছিলেন, ইংরেজরা তাহাকে অহাবী আন্দোলন আখ্যা দেয়। এই হইতে সেই আন্দোলনে যোগদাতাগণকে অহাবী ও সেই মুক্তি সংগ্রামকে অহাবী যুদ্ধ নাম দেওয়া হয়।" (মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫৯ অগ্রহায়ণ) কিন্তু ওহাবী আন্দোলনের জন্ম আরব দেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে নয়, দেখুন, Islam. Belief and Practices by A. S. Tritton, M. A. D. Litt.) মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব শিষ্য হবার জন্যে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পড়াশুনো শুরু করেন। এতে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন এবং সমসাময়িককালে ইসলামের ওপর নানা কুসংস্কারের ছাপ দেখে বিচলিত হন। হজরতের অকৃত্রিম আদর্শে শাশ্বত ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সচেষ্ট হন। ওহাবীদের মতে, যারা সত্যিকারের ইসলামধর্মাবলম্বী তাঁরা পীর পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি করেন না। মসজিদই তাঁদের কাছে সব কিছু। কোরান সবকিছুর সঠিক নির্দেশ। জীবনের সবক্ষেত্রে সরল, সহজ, অকৃত্রিম এবং অনাড়ম্বর ব্যবস্থা অবলম্বনই বিধেয়। স্বর্ণালঙ্কার পরিধান এবং পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া অবশ্য কর্তব্য। এই নামাজ পড়া নিয়ে হাম্বলীদের সাথে ওহাবীদের একটু পার্থক্য আছে। যা হোক, মোটামুটি এই গুলোই হল ওহাবীদের আচরণীয় বিধি। তাঁরা প্রত্যেকে এগুলো পালন করতেন এবং চাইতেন অন্যেও পালন করুক। তাই দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো। সেই দ্বন্দ্বে তাঁরাই জয়ী হলেন। আরব দেশে তাঁদেরই প্রভুত্ব কায়েম হল। এই সাফল্যের দৃষ্টান্তে পাক-ভারত উপমহাদেশে ওহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সমাজ এবং জাতীয় জীবনে দুষ্ট গ্রহের মতো যেসব অনৈসলামিক প্রভাব জাতির মর্মমূলে আঘাত হানছিল, তাদের সমূলে উৎপাটিত করে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সর্বাধিক বেদাত ও শেরেকযুক্ত আদি ও অকৃত্রিম ইসলামের পুনঃপ্রবর্তনের জন্যে একদল ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন দিল্লীর হজরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০২-৬০)। ভারতের (বাঙলারও) সব ক'টি ইসলামিক ধর্মান্দোলন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন খুব উঁচু দরের দার্শনিক এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কোন সুষ্ঠু আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি যাতে ভারতীয় মুসলমানগণের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে উপপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের রায়বেরেলী নিবাসী সৈয়দ আহমদের হাতে তা সম্ভব হলো। "মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম" প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভেদী জ্বালা প্রথম অনুভব করেন শাহ ওয়ালীউল্লাহর প্রশিষ্য প্রখ্যাত ধর্মনেতা সৈয়দ আহমদ (১৭৬-১৮৩১)। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু সংস্কার নয়, সত্যিকার ইসলামী আদর্শে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তাঁর এই বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে কাটান। তাঁর এই মিশনারী কার্যে তিনি অভূতপূর্ব সাড়া পান। পাঞ্জাবে রণজিৎসিং মুসলমানদের নামাজ পড়া, গরু জবেহ্, প্রকাশ্য আজান দে'য়া প্রভৃতি ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি একটি স্বাধীন সরকারও গড়ে তোলেন এবং রণজিৎ সিং-এর সহিত বহু যুদ্ধ করে ১৮৩১ সালে তাঁর বহু ভক্ত শিষ্যের সহিত শাহাদাৎ লাভ করেন। সৈয়দ আহমদের আদর্শবাদের সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি, জাগ্রত চিন্তাশীল মন, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, অদম্য উদ্যম এবং অফুরন্ত সাহস, সর্বোপরি ধর্মে অগাধ ভক্তি তাঁকে ইতিহাসের নায়কের স্থান দিয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন সৈয়দ আহমদ ওহাবী ছিলেন কিনা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন, তিনি ওহাবী। Mr. M. I. Titus তাঁর প্রসিদ্ধ History of Philosophy, Eastern and Weatern গ্রন্থে লিখেছেন: "He was champion of the left-wing wahhabis. হাণ্টারও এই মত সমর্থন করেন।

যতদূর সম্ভব সৈয়দ আহমদই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন অমুসলিম কতৃত্বাধীন ভারতবর্ষ, 'দারুল হরব'। দারুল হরবে—মুসলমানদের জন্যে জেহাদ অনিবার্য।

তবে সৈয়দ আহমদের জীবদ্দশায় ওহাবী আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে নি। মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলামের প্রতিষ্ঠা সৈয়দ আহমদের স্বপ্ন হলেও এবই সঙ্গে শিখ ও পরাক্রান্ত ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না

হয়ে তিনি বুদ্ধিমত্তাই দেখিয়েছেন। পরে, ইংরেজরা পাঞ্জাব জয় করলে সৈয়দ আহমদের অনুবর্তী ওহাবীরা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়; এবং আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহের পরও বছর দশেক বিদ্যমান থাকে। এই জন্য Hunter একে Chronic disaster বলে আখ্যাত করেছেন।

ওহাবী আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে তৎকালীন বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ওহাবীদের প্রবর্তিত 'বিশুদ্ধ' ইসলামিক জীবনধারা বাঙলার সমাজজীবনে বেশ তোলপাড় সৃষ্টি করে; এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আলোড়নের সৃষ্টি করে। বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্যে ধনজন সংগৃহীত হয়। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে বাঙলার অসংখ্য দরিদ্র অশিক্ষিত কৃষক ও নিম্নবিত্ত মুসলমান এ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। ওহাবী আন্দোলন থেকে ঘুমন্ত মুসলিম জাতি শিক্ষা গ্রহণ করে অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাবার। বিশুদ্ধ ইসলামের প্রবর্তনার খাতিরে তাঁরা ইংরেজের সঙ্গে চালিয়ে যান মরণ-পণ অসহযোগ। ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের দেওয়া দাদন (নীলচাষের জন্য) বর্জন করে অসহযোগের প্রথম ইতিহাস সৃষ্টি করেন ওহাবীরা। ওহাবীদের চরিত্র বল, ধর্মযুদ্ধের নামে জীবনসর্বস্ব পণ, জাতি-সমাজ-সংস্কৃতি ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে দারুল হরবে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের আত্মত্যাগ গৌরবোজ্জ্বল, তুলনারহিত।

এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে, যখন আমরা অভিনিবেশ সহকারে বাঙলার ফারাজী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হবো। ফারাজী আন্দোলনকে বলা যায় আসল ওহাবী আন্দোলন। তদানীন্তন পূর্ব বাঙলার ফারাজী নেতা হাজী শরিয়তুল্লা এবং পশ্চিম বাঙলার ফারাজী নেতা হাজী নেসার আলী (তীতুমীর) হজ উপলক্ষ্যে মক্কার ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা স্বদেশে ইসলামের সংস্কার আন্দোলনে পূর্বাপেক্ষা বেশী সচেষ্ট হন। পূর্ব বাঙলার ফারাজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাজী শরীয়তুল্লা। ফরিদপুরের বন্দরখোলায় তাঁর নিবাস। ১৮০৪ সাল থেকে তিনি আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৮২৮ সালে হজ করে আসেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ করেন এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাংলায় তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মতো 'দারুল হরবে' মুসলমানদের জুমা ও ঈদের (বিশেষ খোৎবাযুক্ত) নামাজ পড়া উচিত নয়। দুর্গা পূজার মতো জাঁকজমক-পূর্ণ মহররম পর্বানুষ্ঠান তিনি শরিয়ত বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। খোদার অপছন্দ না হয় এরকম জীবনযাত্রা অবলম্বনের জন্যে তিনি সবসময় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি আর একটা নিয়ম করেন যে, সন্তান জন্মের পর ধাই না কেটে সন্তানের পিতাকে 'নাড়ী' কাটতে হবে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দুধু মিয়া (বা মোহাম্মদ মোহসীন) তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যান। দুধু মিয়া একটু রাজনীতি ঘেঁষা লোক ছিলেন। তিনি প্রত্যেক জেলায় তাঁর সম্প্রদায়ের আস্তানা গাঁড়লেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে এক একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়। তিনি কৃষকদের তাঁর সম্প্রদায়ে যোগদানে বাধ্য করতেন। জোর জবরদস্তি মূলক অবিচার, অত্যাচার হতে দিতেন না। তিনি ঘোষণা করেন যে, মানুষ সব সমান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অাল্লাহতায়ালার। তাই ব্যক্তিগত মালিকানা ও করদান এগুলো কু-প্রথা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং পরে আস্তে আস্তে পূর্ব বঙ্গে ফারাজী আন্দোলনের প্রভাব কমে যায়।

ঠিক একই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে অপ্রতিহত গতিতে এই ফারাজী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন হাজী নিসার আলী ওরফে তীতুমীর। তাঁর সম্পর্কে Imperial Gezetteer (vol xxlv p. 71) এ বলা হয়—Titu belonged to the wahhabi sect of Muhammedan fanatics and was exaited to rebellion in 1831 by beard tax impcsed by Hindu Landholders. তীতুমীর চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমার লোক। কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। পেশাদার মল্লযোদ্ধা হিসেবে এক সময়ে তাঁর খুব নামডাক ছিল। এক ধনী কন্যার পানিগ্রহণ করে তিনি ছোট খাট জমিদারীর মালিক হন। কিন্তু সুখে কালাতিপাত তাঁর পক্ষে হয়ে উঠলো না। কলকাতায় এক মুষ্টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে এসে তিনি দুর্বিপাকে পড়ে কারাভোগ করেন। মুক্তির পর তিনি হজে যান এবং সেখানে হজরত সৈয়দ আহমদের সাক্ষাৎ পান। ১৮২৭ সালে তিনি দেশে ফিরে ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর বিধিনিষেধ প্রায় সবগুলোই হাজী শরীয়তুল্লার অনুরূপ। শীঘ্রই তাঁকে হিন্দু জমিদারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হলো। তীতু জানতেন তাঁর ক্ষমতার কথা। তাই তিনি ইতিপূর্বেই সতর্ক হচ্ছিলেন এবং শক্তিবৃদ্ধি করছিলেন যথাসাধ্য। ১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা পেশোয়ার দখল করলে তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠি হলো নারিকেলবাড়িয়ায়। এতে ইংরেজ সরকার বিচলিত হয়ে ওঠে। বারাসতের

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার তাঁকে দমন করতে গিয়ে বিপর্যস্ত হন। ২৪ পরগনা ও কৃষ্ণনগরের জেলা কর্তৃপক্ষেরও একই বিপর্যয় ঘটে। অবশেষে মেজর স্কটের বিরাট বাহিনীর হাতে বাঁশের কেল্লায় স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধরত তীতুর পরাজয় ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ও তাঁর অনেক সঙ্গী শাহাদাৎ লাভ করেন।

ফারাজী আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, এ-আন্দোলন মুখ্যতঃ ধর্মান্দোলন। রাজনীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেহাত আকস্মিক। তবে ফারাজী আন্দোলন বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার করলো। পরবর্তীকালে সে চেতনা ওহাবীদের মানস-জগতে বিধৃত হয়েছে। স্বাদেশিকতার বীজ ও সর্বপ্রথম অংকুরিত হল এই বাঁশের কেল্লার যুদ্ধে। ধর্মের সঙ্গে জড়িত থাকায় অবশ্য গোঁড়ামীর প্রকাশ ঘটেছে অনেক সময়, তবু বাঙালি মুসলমানের সার্বিক সমাজ জীবনে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। ওহাবী ও ফারাজীদের লক্ষ্য ছিল এক, পদ্ধতি ভিন্ন। উভয়ের লক্ষ্য ধর্মসংস্কার। ইসলামের শাশ্বত মহিমার পুনরুত্থানের জন্যে পূর্বপন্থার অনুসরণ; কিন্তু ওহাবীরা সব সময় জেহাদের জন্যে প্রস্তুত। ফারাজীদেরও বাঁশের কেল্লা গড়ে জেহাদে নামতে পেছপা হয়নি। কিন্তু সে অনন্যোপায় হয়ে। মূলত আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু ওহাবীদের সংগ্রাম আপোষহীন। ওহাবীদের এই বিপ্লবী ঐতিহ্য সমাজের অনুপরমাণুর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই দেখি ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহের' মতো গণঅভ্যুত্থানের উত্থান-পতন দুই-ই ওহাবীদের মতো দীর্ঘকালের সাধনা বিজড়িত নয়। অনেকটা সাময়িক ব্যাপার। 'সিপাহী বিদ্রোহে' ওহাবীরাও গোপনে যোগ দিয়েছিলো। ১৮৬৩ সালে অপর প্রকাশ্য ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলে ইংরেজরা তাঁদের কঠোর ভাবে দমন করলো। ১৮৬৪ সালের 'ওহাবী বিচারে' অমানুষিক দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে ইংরেজ ওহাবীদের বৈপ্লবিক কর্মপন্থার অবসান ঘটায়।

ওহাবীদের আবেগ ও আন্তরিকতা সমালোচনার উর্ধে। বাঙলার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে বাঙালি মুসলমানের মোহনিদ্রা ভঙ্গের সূত্রপাত হয়। তবে আধুনিক কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি ওহাবী আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে হয়, তা হলে অন্ততঃপক্ষে সত্যের খাতিরে এটুকু বলতে হয়, তাঁদের আন্দোলনের কোন সুষ্ঠু কর্মপন্থা ছিল না। যুগপ্রভাব স্বীকার করে তাঁরা আন্দোলনকে প্রগতিশীল পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেননি। তবে তাঁদের আন্দোলনে ছিল living sparkle of revivalist spirit.। সদ্য সুপ্তোত্থিত মুসলিম জনসাধারণ দেখল—আসমুদ্র হিমাচল পাক-ভারতে দারুল ইসলাম ও দারুল হরব নিয়ে এক তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আর এক পক্ষ ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের ও এক পক্ষ বর্জনের পক্ষপাতী। সাধারণ মুসলমান আবার দিশেহারা হয়ে পড়ল। এবার দিশারী হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। বলা বাহুল্য, স্যার সৈয়দ আহমদের আন্দোলন কোনো ধর্মান্দোলন ছিল না, একে বলা যায় মুসলিম জাগৃতির আন্দোলন। কিন্তু তিনি যাঁর অনুপ্রেরণায় উদবুদ্ধ হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁর নাম হল সৈয়দ জামালুদ্দিন আল আফগানী (১৮৩৮:৩৯—১৮৯৭)। ওহাবী আন্দোলনের শিক্ষায় মুসলিম চিন্তানায়কদের ভেতর যে একটা নব জাগৃতি ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হচ্ছিল, জামালুদ্দিন আফগানি তাঁরই শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। তাঁর অনুসারীদের মতে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং শত্রুদের মতে "dangerous agitator"—ভয়ঙ্কর বিশৃংখলাকারী। Dr. A. S. Tritton M.A.D. Litt. তাঁর Islam-belief and practices গ্রন্থে লিখেছেন: He was a mighty force in the liberal and constitutional movements of the time, working undefatigably for the release of Muslim states from European influence and spcliation, the setting up of liberal government and the union of all Muslim states including the Shi'a' to resist Europe.

ভারত থেকে মিশর অবধি প্রতিটি মুসলিম দেশের রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। প্রতিটি দেশে তিনি রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং জনসাধারণের নবজাগরণের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। ধর্মনৈতিক দিক থেকে তিনি কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী। ইসলাম ধর্মের সত্যিকারের রূপের সঙ্গে যে মিথ্যার খোলস জড়িয়ে পড়ছিল তা তিনি উন্মোচন করলেন এবং জাতীয় চেতনার সাথে অনুভব করাতে শেখালেন বহির্বিশ্বের ঘটনাবর্ত্ত ও তার শিক্ষাকে। তাঁর আন্দোলনের নাম দেওয়া হয় Pan-Islamism—প্যান ইসলামবাদ। তিনি লিখেছিলেন—"এ দেশে (ভারতবর্ষে) উর্দু, বাংলা ও মারাঠি ভাষায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বইয়ের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রয়োজনীয় অংশের আত্মস্থ করা।" (মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান কৃত জামালুদ্দিন আফগানী পৃঃ ৬৮-৬৯)

আফগানীর মতাদর্শে এ-দেশে এক ভাব বিপ্লব উপস্থিত

হয়। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। পরে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নব-প্রবুদ্ধ কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিকের একটি দল ইসলামের জয়গানে বাঙলার সাহিত্যাঙ্গণ মুখরিত করে তুললেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ-চতুষ্টয়ের কবি-কর্মের নিদর্শন দিচ্ছি :

মীর মশাররফ হুসেন লিখলেন :

জয় এসলামের জয় সত্য ধর্ম জয়।
পৌত্তলিক পুতুলের বুঝি নাশ হয়॥

মুনশী রিয়াজুদ্দিন লিখলেন :

ডুবিল ইসলাম তরী আকুল পাথারে হায়।
তুমি বিনে কে রক্ষিবে কর প্রভু সদুপায়॥

মুনশী মেহেরুল্লাহ গাইলেন—

গাও রে মোসলেমগণ, নবী গুণ গাও রে।
পরাণ ভরিয়া সবে সল্লেআল্লা গাও রে॥

ইসমাইল হোসেন সিরাজী গাইলেন—

এক আল্ল', এক নবী, একই কোরান।
এক আশা, এক লক্ষ্য, এক উপাসনা॥

ওহাবী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে খৃষ্টানদের প্রচারণা এবং অন্যান্য কারণে মুসলমানদের কিছু অংশে খৃষ্টান হবার প্রবণতা দেখা দেয়। এ-সময় এক জোরদার ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যার নেতৃত্ব করেন কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ। হিন্দু সমাজে রামমোহন রায় যেমন হিন্দুদের তাঁর যুক্তিবাদী প্রচারণা দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন খৃষ্টানী মোহ থেকে, মুসলিম সমাজেও তাই করেছেন মেহেরুল্লাহ। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গ্রাম্য মৌলবী। পাদ্রী জন জমিরুদ্দিনের সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্কের মাধ্যমে তাঁর সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বাঙলার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা ও সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মসচেতন করে তুলছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর সহকারী ছিলেন তর্কে পরাজিত সেই পাদ্রী, পরবর্তীকালে মুন্সী জমিরুদ্দিন। মেহেরুল্লাহের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে মুসলমানদের জাতীয় চেতনামূলক ও ইসলামী কৃষ্টিমূলক সাহিত্য সম্ভারে বাঙলার সাহিত্য কানন সুশোভিত হয়ে উঠে।

কিন্তু এই ধারার পূর্ববর্তী—এবং যে ধারা বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশী জোরদার হয়েছে তা হল আলীগড় আন্দোলনের ধারা। এই আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ ই:কোরআনকেই মুসলিম জীবন বিন্যাসের একমাত্র সূত্র বলে গন্য করেন এবং উনিশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ইসলামের বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এ-জন্যে সনাতন পন্থীরা তাকে কাফের আখ্যা দেয়। তাঁর আন্দোলনের সূত্রপাত শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টায় এবং সাফল্যও সেখানেই। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি তাঁর অক্ষয় কীর্তি। মুসলিম যুবকদের জ্ঞানচর্চা ধর্মীয় শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে সচেষ্ট হলেন। বাংলা দেশে এ-কাজে এগিয়ে এলেন নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর হোসেন প্রমুখ। নতুন আলোকে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার এবং কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে চললেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ-দলের সবাই প্রচণ্ড রাজভক্ত। জনসাধারণকেও তাতে দীক্ষিত করে তোলা তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতার "মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির" সভায় প্রস্তাব পাশ হল, মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কারণ, ইংরেজ মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখছে। এ-বিষয়ে তাঁরা আরো অনেক প্রচারণা চালালেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন বড় বড় মুফতী, মৌলানা সবাই তাঁদের সমর্থন করলেন—এই আন্দোলন সমকালে এবং পরবর্তীকালে সাফল্য অর্জন করলেও সমকালীন সাধারণ মুসলমান সমাজ এ-আন্দোলনের ফলে লাভবান হয় নি। অভিজাত মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনের পথই শুধু সুগম হয়। তবে ইংরেজিতে সৈয়দ আমীর আলী এবং এস, খোদা বকসের ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাখ্যা এবং নওয়াব আবদুল লতীফের সহানুভূতি এবং প্রেরণায় বাংলাভাষার মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারার চর্চায় সাংস্কৃতিক জগতের যে নবজাগৃতির সৃষ্টি হলো, তাই আমাদের দিশারী হয়ে রইল। সেই জাগৃতি রাজনীতির ক্ষেত্রেও সাড়া জাগাল। বিশ শতকের আল্লামা ইকবাল সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমির স্বপ্ন দেখেন। কায়েদে আজম জিন্নার নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করে।

বাতায়ন

ইব্রাহিম খাঁ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ন্যাশনাল স্কুল

আমাদের ন্যাশনাল স্কুলে ছেলের ভীড় কমল না, বাড়ল। মহকুমার সমস্ত স্কুলের ছেলেরাই বেরিয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে এদের মধ্যে বহু ছেলে স্কুলে ফিরে গেল, যারা গেলনা তারা এসে করটীয়া ন্যাশনাল স্কুলে ভীড় জমাতে শুরু করল। আমাদের শিক্ষকেরা কেউ ভয়ে চলে গেলেন না। সবাই পরম উৎসাহে কাজ করে যেতে লাগলেন। চাঁদ মিঞা সাহেব তাঁদের বেতন আগের মতই নিয়মিত ভাবে চালিয়ে গেলেন। আমরা সবাই খদ্দর পরা শুরু করলাম, বাড়ীতে বাড়ীতে, স্কুলের আঙিনার আশে পাশে তুলার গাছ বুনতে লাগলাম। কলকাতায় ইতিমধ্যে কয়েকটা চরকার কারখানা খোলা হয়েছিল। আমি গিয়ে শ খানেক চরকা কিনে আনলাম। কী সুন্দর চেহারা সে চরকার। সেগুন কাঠ, সুন্দর পালিস, পিত্তলের শলা; নিখুঁত গোলাকার চাকা। আমি নিজের জন্য দুটি আলাদা কিনে আনলাম। একটি নিয়ে দিলাম বোনকে : পাড়ার মেয়েরা এসে ভীড় করে চরকা দেখল, দাদীদের কাছে চরকার কাহিনী আর চরকার গান কি কি শুনেছে তা সকলরব বর্ণনা করল, খোদা যে আবারো তাদেরে সেই চরকা দেখাল সেজন্য আমাকে ধন্যবাদ দিল। তারপর পান খেয়ে, আঁচল ধরা ছেলেকে ধমক দিয়ে যার যার বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ীতে বিবি সাহেবকে নিয়ে যে চড়কাটি দিলাম, তার কদর দানীও ঐ রকমই হল, একটুও কম নয়। মেজভাবী সাহেব বল্লেন—'যাক, এখন তুলার মায়ের কাছে থেকে দুই একটা কাপড়ের সুতা পাওয়া যাবে।' তুলার মায়ের মন যে চরকা পেয়ে বিশেষ প্রসন্ন হল তার কোন লক্ষণ দেখলাম না। এত মানুষের মোকাবেলা আমিও জেরা করতে ভরসা পেলাম না। পতিব্রতা নারীর মত তিনি চরকাটি সাবধানে তুলে নিয়ে ফুল চাঙ্গীর উপর পরম যত্নে রেখে দিলেন। অনেক দিন পর দেখলাম, চরকার চাকা দিয়ে করা হয়েছে রুটি বানানের বেলচা, বাকি খানি দিয়ে হয়েছে একটা সুন্দর পিড়ি। ভাবলাম, হক্কের পয়সার জিনিষ, মিছা যাওয়ার উপায় আছে? কেন না কোন কাজে তা নির্ঘাত লাগাবেই।

গান্ধীজী বলেছিলেন, 'গোলাম খানা ছাড়, খদ্দর পর, চরকা কাট, কংগ্রেসের প্রাথমিক মেম্বর হও; দেশের মুক্তি আমি এনে দিচ্ছি!' আমরা এ কয় দফার সব কাজই করলাম। উপরন্তু সময়ে অসময়ে হাটে, ঘাটে মাঠে আল্লাহু আকবর-বন্দে-মাতরম লাগ পর পর চীৎকার করে বলে বলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধন করলাম। গান্ধীজীও আশ্বাস দিলেন যে তাঁর নাকে স্বাধীনতার সুগন্ধ আসা শুরু করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা সত্যি এলনা, শীগগিরই আসবে বলে কোন প্রতিশ্রুতিও দিলনা। আমরা দেশের কাজ ছাড়লাম না; কিন্তু আমাদের মন সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল। স্কুলের ছেলে কমতে লাগল। শিক্ষকেরা কেউ কেউ অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হতে দাওয়াত

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন হচ্ছে, বিভাগে বিভাগে অধ্যাপক নেওয়া শুরু হয়েছে। নিযুক্তির ভার ছিল ষ্টেপল টন সাহেবের উপর। ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনার জন্য আমি একটা পত্র পেলাম : দেখা করে নিযুক্তি পত্র নিতে হবে। পাড়াগাঁয়ের ভাঙ্গন-ধরা ন্যাশনাল স্কুলের মাষ্টার, সেই হবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। মন প্রথমে উল্লাসে দুলে উঠল। পরক্ষণেই মনে করলাম—'না এ-হয়না; দেশের মায়ায় যখন দেশের সুসন্তানেরা সরকারী চাকুরী ছাড়ছে, সেই সময় আমি চাকুরী গ্রহণ করব। এ-হতে পারে না।' গেলাম না, কোন জবাবও দিলাম না। ঢাকায় তখন ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ ইরফান। ইনি ছিলেন আমাদের ম্যানেজার আবদুল সাহেবের দেশের লোক। ইনি ম্যানেজার সাহেবকে লিখলেন আমরা উপযুক্ত মুসলিম অধ্যাপক খুঁজে হয়রান;

তোমাদের ইব্রাহীম খাঁর কোন জবাব নাই কেন? জলদী তাঁকে পাঠাও।' আমাকে ম্যানেজার সাহেব খবর দিলেন। গিয়ে দেখি, সেখানে চাঁদ মিঞা সাহেব, পাদ্রী সাহেব, মাখন মিঞা সাহেব সবাই বসা।

ধর পাকড়

সবাই বল্লেন—'মস্ত সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়; কাজেই যান।' তাদের পরামর্শ মাথায় নিয়ে রওনা হলাম। পোড়াবাড়ী ষ্টিমার ঘাটে টিকেট কিনে অপেক্ষা করছি, এর মধ্যে গায় একটু জ্বর এল। মনটা আবার বিরূপ হয়ে উঠল। টিকিটখানা ছিড়ে যমুনায় ফেলে দিয়ে করটীয়া ফিরলাম। দেশে ধর পাকড় শুরু হয়ে গেল। মওলানা মুহম্মদ আলী, শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, ছয়েফ উদ্দীন কিচলু, মহাত্মা গান্ধী, সি-আর দাস, জে, এল বানর্জী, পীর বাদশা মিঞা, হাজী আবদুর রশীদ খাঁ, তমীজ উদ্দীন খাঁ, আকরম খাঁ, মুজিবর রহমান, জে, এম সেনগুপ্ত, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী—এঁরা সবাই জেলে গেলেন। গোপনে সংবাদ পেলাম গেরেফতারের জন্য টাঙ্গাইল লোক আসছে: ধরবে এখানে তারা চারজনকে—চাঁদ মিঞা, অমর ঘোষ, ইব্রাহীম খাঁ, চারু রায়। আমরা তৈয়ার হলাম, আমার কাছে এম, এন, রায়ের ভ্যানগার্ড পত্রিকা আসত, সেগুলি একত্র করে বেঁধে নিয়ে পানিতে ফেলে দিলাম। মওলানা মুহম্মদ আলীর সেই বিখ্যাত বাজেয়াফত কমরেড সংখ্যা The choice of the Turks আমার কাছে ছিল। এ অমূল্য জিনিষটা নষ্ট করতে ইচ্ছা হলনা; আরো কয়েকটা বইয়ের সঙ্গে বেঁধে পাঠিয়ে দিলাম টাঙ্গাইলের উকীল ইছরাইল খাঁর কাছে। কাপড় গুছিয়ে, যথাস্থানে চিঠিপত্র লিখে রাত বারোটায় শুতে গেলাম। ভোর চারটায় উঠে ওজু করতে বসেছি, এমন সময় খবর এল—চাঁদ মিঞা সাহেবের বাড়ী সিপাইয়ে ঘিরে ফেলেছে। আমি তাড়াতাড়ি ফজরের নামাজ পড়ে নিলাম। কিন্তু আমাকে ধরতে কেউ এলনা। ভোর হল তখনো কেউ না। আমি তখন জমিদার বাড়ী চল্লাম। দেখলাম, জন পঞ্চাশেক পাঞ্জাবী সশস্ত্র পুলিস এসেছে। অন্দর হতে এদের সবার জন্য নাশ্‌তা পাঠানো হয়েছে এবং তাদের খেদমতের জন্য চার পাঁচজন আমলা হাজির আছে। আমি ভিতরে গেলাম। দেখলাম, চাঁদ মিঞা সাহেব কাপড় চোপড় পরে তৈয়ার। সুপরিচিত দুই তিনজন নবাগত তাঁর কাছে বসা। তিনি আমাকে বল্লেন—

'ওরা আমার কাছে লোক পাঠিয়েছে।'

'ওরা মানে?'

'জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তরফ হতে। আমাকে ধরেছে, একটা কাগজে একটু দস্তখত দিয়ে দিলেই ওরা আমাকে রেখে যায়। তাঁদের সঙ্গে বাড়ীর অনেকেই যোগ দিয়েছে।''

'আপনি কি বলেছেন?

'আমার মন উঠছেনা; তাই আপনার জন্য দেরী করছি।'

'আমি জানি এ অপমান জনক প্রস্তাবে আপনার মন উঠবে না—উঠতে পারেনা।'

'তাই, হেড্‌ মাষ্টার সাহেব, তাই। কেদার, ওদেরে বল, আমি যাত্রার জন্য তৈরী। পুলিসের চার্জে যে অফিসার তিনি এসে ছালাম দিয়ে বল্লেন—হুজুর বাইরে পাল্কী হাজির; চাঁদ মিঞা সাহেব অন্দর পার হয়ে গিয়ে পাল্কীতে উঠলেন। বাইরে দশ বারো হাজার লোক তখন জমেছে। তাদেরই মধ্য দিয়ে পাল্কী চল্ল। দুই দিক হতে কেবল আকুল অভিবাদন এল হুজুর, ছালাম—হুজুর ছালাম, হুজুর ছালাম; আর এল অনিরুদ্ধ ক্রন্দন ধ্বনি। তিনি মাঝে মাঝে সেই ক্রন্দন রত জনগণকে বলতে লাগলেন—কেঁদনা, অপেক্ষা কর, সুদিন আসছে। করটীয়া হতে পোড়াবাড়ী ষ্টিমার ঘাট আট মাইল; এই আট মাইল পথেই পাল্কীর দুই দিকে চল্ল জনস্রোত। মুছলমান বাড়ীর কাছ দিয়ে যেতে তারা বল্ল—'আল্লাহ আকবর,' হিন্দু বাড়ীর কাছ দিয়ে যেতে মেয়েরা করল উলুধ্বনি।

আমি আর ম্যানেজার সাহেব চাঁদ মিঞা সাহেবের সঙ্গে চল্লাম। ষ্টিমারে গাড়ীতে একই কামরায় একই সঙ্গে রইলাম। পথে কথাবার্তা হল কেবলই তাদের সম্বন্ধে যারা যুগে যুগে দেশে দেশে আজাদীর জন্য দিয়েছে প্রাণ, ধর্মের জন্য করেছে সর্বস্ব বিসর্জন।

গাড়ী ময়মনসিংহ জেলখানা সোজা গেলে দেখি দুটি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে নিশান উড়াচ্ছে। গাড়ী থামল, ওরা এইখানে চাঁদ মিঞা সাহেবকে চুপে নামিয়ে চষাক্ষেত ভেঙ্গে জেলখানার দিকে চল্ল। পরে শুনলাম, ময়মনসিংহ ষ্টেশনে চাঁদ মিঞার নামে হাজার ত্রিশেক লোক জমা হয়েছিল, তাদের উত্তেজনা দেখে ভয় পেয়ে ওরা এই পথ অবলম্বন করেছিল।

ওঁকে ভিতরে নিয়ে গেল। তিনি লোহার ফটকের ওপাশে দাঁড়ালেন। ম্যানেজার সাহেব—অতবড় গম্ভীর বুড়োমানুষ তিনি কেঁদে ভেঙ্গে পড়লেন। বল্লেন—হুজুর, রাতে আটজন খানসামা লাগে আপনার গা টিপে ঘুম আনতে—সেই আপনি কি করে শোবেন জেলের এই কঠিন বিছানায়। চাঁদ মিঞা সাহেব অকম্পিত স্বরে বল্লেন—ম্যানেজার সাহেব, ভাববেন না, আমাকে খোদা

সব সইবার মত ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি জেলখানায় ভাল থাকব। আমার কোন কষ্ট হবেনা।

আমি এতকাল চাঁদ মিঞা সাহেবের কাছে রইলাম; কোনদিন তাঁকে পা ছুঁয়ে ছালাম করি নাই। ঐ সময় আমার মনে হল—'আহা, ঐ লোহার কবাটটা সামনে না থাকলে আজ ওর সামনে বসে পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরতাম।

ঐ দিন চারু রায় ও অমর ঘোষকে ধরে নিল। আমার নামেও গেরেফতারী পরোয়ানা এসেছিল। কিন্তু টাঙ্গাইলের পুলিস সাহেব তখন ছিলেন মিঃ আমীর আহমদ। তাঁর চাচা মবিন উদ্দীন আহমদ সাহেবের সঙ্গে অনেক সময় আমি সাহিত্যিক আলোচনা করতাম। সেই জন্যই কিনা জানিনা তিনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার নামটা কেটে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ভুলে গেছি। জেলের দুয়ার হতে বিদায়কালে আমি বল্লাম, 'হুজুর', আপনাকে বেশীদিন একেলা থাকতে দিবনা; আমি শীগগিরই আসছি।' তিনি দুই হাত তুলে মানা করে বল্লেন—না, না, হেডমাষ্টার সাহেব আসবে না। সবাই জেলে এলে বাইরে কাজ চালিয়ে যাবে কে?

মুছলিম জগতে সাড়া

জেলেই চাঁদ মিঞা সাহেবের বিচার হয়ে তাঁর দুই বছরের জেল হল, তিনি ময়মনসিংহ হতে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হলেন। বাংলার সমস্ত রত্ন সেই জেলের আকাশে ধক ধক করে জ্বলতে লাগল।

জেলের বাইরে আন্দোলন বন্ধ হলনা; কিন্তু তার গতি ধীর হয়ে এল। ন্যাশনাল স্কুলগুলি একে একে উঠে যেতে লাগল। অভিভাবক মহলে একটা ধারণা জন্মিল যে, গান্ধী অকারণে ছেলেগুলির পড়া মাটি করলেন।

জেলে ছয়মাসকাল থাকার পর চাঁদ মিঞা সাহেবের টাইফয়েড হল। তাঁর জীবনের দীপ শিখা নিভু নিভু হয়ে এল। বেগতিক দেখে সরকার তাঁকে বিনা শর্ত্তে ছেড়ে দিলেন। অনেক দিন চিকিৎসার পর ভাল হয়ে তিনি হাওয়া পরিবর্তনের জন্য রাঁচীর বাড়ী চলে গেলেন।

ভারতের বাইরে মুছলিম জাহান ব্যাপী যে এক নব জীবনের আয়োজন চলা শুরু করেছিল, তা তেমনি চল্ল, তুরস্কের সুলতান যখন মহা যুদ্ধ অন্তে ইংরেজ ফরাসীর কাছে তুর্কের আজাদীকে বিক্রয় করে দেওয়ার আয়োজন করছিলেন, সেই সময় মুস্তাফা কামাল পাশা আঙকারায় এসে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। একে একে নব্য তুর্ক দলের নেতারা তাঁর পতাকা তলে এসে দাঁড়াল। তুর্ক জাতিকে নতুন করে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুস্তাফা কামাল সংগ্রাম শুরু করে দিলেন। ভারতের মুছলমানেরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এ-সংগ্রামে সাহায্য করতে লাগল। আঙকারার সাহায্যের জন্য দেশময় চাঁদা উঠল। আমি করটিয়া সাহায্য তহবিল খুলে ছয় হাজার টাকা তুলে পাঠিয়ে দিলাম।

রীফে আবদুল করীম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আজাদীর জন্য তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। ছোট্ট দেশ রীফ তার ছোট্ট নেতা আবদুল করীম—তারই প্রতাপে যখন ফরাসী সাম্রাজ্য কেঁপে উঠল, তখন সমস্ত জগৎ বিস্ময় শ্রদ্ধায় উত্তর আফ্রিকার দিকে দৃষ্টিপাত করল।

আবদুল আজীজ ইবনে ছউদ আরবে ইংরেজ ও তাঁর আশ্রিত শরীফ হোছেনের বিরুদ্ধে আজাদীর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে শরীফের সৈন্যদল ইবনে ছউদের বিক্রমের সম্মুখে মরুর ধূলায় উধাও হয়ে গেল।

এদিকে রেজা শাহ পাহলবী পারস্যকে ইংরেজ ও রাশিয়ার প্রভাব হতে মুক্ত করার জন্য হুঙ্কার ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন। নজরুল ইসলাম লিখলেন:—

' নও রোস্তম রুখেছে রুশীয়া
ছুকেদ দেউয়েরে দিয়েছে লাজ '।

মিসরেও জেগে উঠেছে একই নব জীবনের স্বপন: তারাও আর পর জাতির প্রভাবের গ্লানি সইতে চায়না।

কবি নজরুল ইসলামের চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি ভারতের মুছলমানদেরে ডেকে বল্লেন—

' দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে
দীনী ইসলামী লাল মশাল;
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে,
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল্।'

রায়ত আন্দোলন

ইতিমধ্যে দেশে রায়ত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ-আন্দোলন প্রধানতঃ ছিল জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ। এ-আন্দোলনে আমি প্রথমেই যোগ দিয়েছিলাম। সরকার ইতিমধ্যে রায়তের দিকে মুখ তুলে চাইল; খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করতে ও কোরফা রায়তদের প্রজাস্বত্ব দিতে রাজী হল। বাংলার জমিদারকুল সংঘবদ্ধ-ভাবে এর প্রতিবাদ শুরু করল। তাঁরা বহু টাকা চাঁদা তুল্ল; পত্রিকার সম্পাদকদেরে বাধ্য করতে ফাঁদ পাতল, দরকার হলে আইন সভার সদস্যদের খরিদ করার যোগাড় যন্ত্রও চলতে লাগল। অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ মিঃ এ, চৌধুরী তখন দেশভক্ত সুসন্তান বলে সর্বত্র আদৃত;

কাজের বেলায় প্রজাদের বিরুদ্ধে তিনিও গোপন আন্দোলনে যোগ দিলেন। হিন্দু সমাজের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার নরেশ সেন রায়তদের পক্ষ হয়ে তাঁর শক্তিমান লেখনী পরিচালন শুরু করলেন।

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত কামারের চর এক গণ্ডগ্রাম। কামারের চরের খোশ মাহমুদ চৌধুরী সাহেব ছিলেন অবস্থাপন্ন জোতদার। এই দরাজ দিল সমাজ দরদীর প্রাণ রায়তের দুঃখে কেঁদে উঠল। তিনি কামারের চরে এক রায়ত কনফারেন্স ডাকলেন। সভাপতি হয়ে গেলেন ছৈয়দ নছীম আলী (পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের জজ)। তাঁর সঙ্গে শরীক হলেন মুছলিম হিতৈষীর সম্পাদক শেখ আবদুর রহীম আর ইছলাম দর্শনের সম্পাদক মৌঃ আবদুল হাকিম।

ছৈয়দ নছীম আলী

ছৈয়দ আলী তখন হাইকোর্টর নামকরা উকিল। তিনি তৎকালীন প্রাদেশিক আইন সভারও মেম্বর ছিলেন। সবল স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, খোশ মেজাজ, নীতিপরায়ণ স্বভাব, ছৈয়দ নছীম আলীকে পরিচিত সবাই শ্রদ্ধা করত। উল্লেখযোগ্য মুছলমানদের মধ্যে তাঁর মত পরিশ্রমশীল নেতা সেকালে কম ছিল। সভায় তিনি আমার বক্তৃতা শুনে বল্লেন—'আপনারা আইন সভায় আসুন না কেন? বাজে লোক দিয়ে আইন সভা ভর্তি হয়ে আছে, তাদেরে নিয়ে কোন কাজ করে সুখ নাই।'

কামারের চরের সভা

সভায় দেখা গেল, সকলেই চায় যে জমিদারের ক্ষমতা খর্ব হোক, খাজনা বৃদ্ধি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাক; কিন্তু কোরফা রায়তদেরে প্রজাস্বত্ব দেওয়ার নামে এক খোশ মাহমুদ চৌধুরী ও আরো দুই তিন জন ছাড়া জামালপুরের বাকি সমস্ত জোতদার ক্ষেপে উঠল। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই কোরফা প্রজা আছে এবং তাদেরে কোন নতুন স্বত্ব দিতে তারা কিছুতেই রাজী নয়। আমি কোরফা প্রজাদের দাবী সমর্থন করে এক প্রস্তাব দিলাম। জোতদাররা আমার কাছে এসে দরবার করলেন যাতে আমি ঐ প্রস্তাব ছেড়ে দেই। আমি রাজী হলাম না। তাঁরা অবশেষে আমাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেওয়ার জন্য তৈয়ার হলেন। আমার সাথে তখন মাত্র সাত জন কর্মী। আমি তাদেরে বল্লাম—আমরা মাত্র সাত জন, ওরা অনেক। কিন্তু মারতে যদি ওরা সত্যি চায়, তবে মার খাব, পিঠ পেতে দিয়ে মার খাব না।' তারা তৈয়ার হল। ইতিমধ্যে কথাটা ছৈয়দ নছীম আলীর কানে গেল। তিনি ওদেরে ডেকে ধমকিয়ে দিলেন; ওরা আর কিছু করতে সাহস পেলনা।

অসহযোগ আন্দোলন দমে গেল। মুস্তফা কামাল পাশা ইস্তাম্বুল উদ্ধার করে নিজেই খিলাফত উঠিয়ে দিলেন। ইবনে ছউদ মক্কা-মদীনা দখল করে তার হেফাজতের ভার নিলেন। কাজেই খিলাফত আন্দোলনের জোর আগের মত আর রইল না। আস্তে আস্তে নেতারা মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন। করটিয়া ন্যাশনাল স্কুল ভেঙ্গে গেল।

ওকালতী শুরু

আমি এতদিনে ল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম এবং ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ময়মনসিংহে গিয়ে ওকালতী শুরু করলাম। আমার আস্তানা হল নয়া বাজারের মোড়ে খাঁ সাহেবের বাসা।

বহু আশা করে ওকালতীতে গেলাম; কিন্তু গিয়ে দেখি হিসাবে ভুল করে ফেলেছি। প্রথম দিন বার লাইব্রেরীতে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল। জিলা কোর্টের উকিল; কিন্তু এরা কি? আমার মনে হল বেশীর ভাগ উকীলের ব্যবহারে সংযম ও সম্ভ্রমের অভাব; প্রায় সমস্তেরই মুখের চামড়া যেন টান করা, তাতে লাবণ্যের মাধুর্য নাই, পবিত্রতার উজ্জ্বলতা নাই। আমি যেন ফাঁপরে পড়ে গেলাম। মাসেক কাল গেল। মন বসাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন বসতে রাজী হলনা। কাগজে কত মহান উকীল ব্যারিষ্টারের কথা পড়েছি—রাসবিহারী ঘোষ, নর্টন, জ্যাকসন, সি-আর দাস, এ, রছুল; কিন্তু এখানে তাঁদের প্রতিনিধি কোথায়? ওকালতীতে বসে দেখি, ওকালতী করতে গেলে দেশের কাজ করা চলেনা; দেশের কাজ করতে গেলে ওকালতী চলেনা। কিছু রোজগার না করলে আমার চলবার নয়, কাজেই ওকালতী আমাকে করতেই হবে। কিন্তু দেশের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে যদি আমাকে ওকালতী করতে হয় তবে আমি রোজগারের অন্য পথ না ধরে এ-জিল্লতীর পথে এলাম কেন?

দিন চল্ল। আমি ওকালতীতে ষোল আনা মন দিতে পারলাম না। কংগ্রেসের সভা, খিলাফতের সভা, প্রজা আন্দোলনের সভা নিয়মিত ভাবে করতে লাগলাম। একদিন ধল্লা জমিদার বাড়ীর কাছে এক সভা করতে গেলাম—জমিদার এক প্রজার উপর জুলুম করেছেন, তারই প্রতিবাদ করতে। ফিরবার সময় সংবাদ পেলাম, পথে আমাদের মারধর করার জন্য জমিদার মহাশয় লাঠিয়াল মোতায়েন করেছেন। অন্য পথে এসে পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচিয়ে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। এদিকে গুপ্ত পুলিশ সেই যে করটীয়া

থাকতে পাছে লেগেছিল, তারা ময়মনসিংহেও লেগেই রইল।

বাসায় আড্ডা

পুলিশের সন্দেহের আরো কারণ হল এই যে আমার বাসা যত মা-তাড়ানো বাপ খেদানো যুবকদের আড্ডা হয়ে উঠল। এরা খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে পড়া ছেড়েছিল, আর স্কুল কলেজে ফিরে নাই; বাপের বাড়ীতেও আদর পেতনা। দেশবন্ধু দাশ এমন হিন্দু যুবকদের জন্য কলকাতা করপোরেশনে দাঁড়াবার জায়গা করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু মুছলমান যুবকদের জন্য অমন ব্যবস্থা কেউ করল না। অনেক বড় বড় মুছলমান নেতাদের কাছে এদের জন্য ঘুরেছি; কিন্তু সকলই নিষ্ফল। তাঁদের কাছে এরা যেন কত মস্ত অপরাধী। এ-জিন্দাদিল অপরাধীদের মধ্যে ছিলেন তখন গুঠাইলের শামছুজ্জোহা, ইছলামপুরের মজহরুল হক খাঁ ও দেওয়ান গঞ্জের গিয়াসুদ্দীন। এঁরা ছাড়া আরো কেউ কেউ মাঝে মাঝে দেখা দিতেন। মৌলভী আবুল মনসুর আহমদ, মৌলভী আবুল কালাম শামসুদ্দীন এঁরা সময় পেলেই মাঝে মাঝে আসতেন। নছীরাবাদ হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলভী আবুল হাশেম ঘন ঘন আসতেন। এর সাহিত্যিক রুচি ছিল। পরবর্তী কালে আমি এঁকে করটীয়া নিয়েছিলাম। সেখানে বসেই তিনি 'কণিকা' নামক সুন্দর কবিতার বইখানি লিখেন। বইয়ের বিষয় বস্তুগুলির বেশীর ভাগই তাঁকে আমি দেই। এর পর তিনি স্কুল সাব ইনসপেক্টর হয়ে অন্যত্র চলে যান। তাঁর মধ্যে সত্যিকার কবি প্রতিভা ছিল; কিন্তু তাঁকে ধাকিয়ে না লিখালে তিনি লিখতেন না। করটীয়া ছেড়ে যাওয়ায় তাঁর সেই ধাক্কার অভাব ঘটল। আমার মনে হয়, প্রধানতঃ এই জন্যই তাঁর প্রতিভা সম্যক বিকাশ হলনা। আবুল মনসুর সাহেব এখন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবও সেই পথে।

শুজার জন্ম সংবাদ

শ্বশুর বাড়ী গেলাম। বিবি সেখানে। পেটে বাচ্চা। বায়না ধরলেন, আমাদের বাড়ী আসবেন। বল্লাম, কেন যেতে চাও? এখানে তোমার আপন ভাই বৌ আছেন, আমার ওখানে কে তোমাকে দেখবে? আমার দিকে করুন দুটি চোখ তুলে বল্লেন—'তবু তো তোমার খানিকটা কাছে থাকতে পারবো!' আমার মন নীরবে চীৎকার করে উঠল! ময়মনসিং থেকে আমার শ্বশুর বাড়ী ৫ মাইল, আমার বাড়ী ৪০ মাইল। কিন্তু আমার বাড়ী হতে ময়মনসিং যেতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে কম সময়ে শ্বশুর বাড়ী হতে ময়মনসিং যাওয়া চলে। কিন্তু এসব কোন হিসাবই তাঁর মনে এলনা; ঐ যে আমার খানিকটা কাছে থাকবেন—সন্তান প্রসবের সেই বিপদময় মুহূর্তে, সেইটাই তাঁর মনে বড় হয়ে দেখা দিল। আমি তখনই রাজী হয়ে তাঁকে বাড়ী নিয়ে রেখে ময়মনসিংহ এলাম।

দিন পনর পরের কথা, কাচারী থেকে বিকাল পাঁচটায় ফিরলাম। দেখি, বাংলা ঘরের টেবিলের উপর লাল কালিতে দাগ দেওয়া একখানা পোষ্টকার্ড। মহরী আগেই সেখানে ছিল; সে চিঠিটা আমার হাতে দিল। চিঠি নিয়ে অন্দরে এসে পড়লাম: একটি বাচ্চা হয়েছে, বাড়ীর এই সংবাদ। মনটা খুশী হল। রাস্তায় একটা ফকীর চীৎকার করে বলছিল—'আল্লার ওয়াস্তে-আল্লার ওয়াস্তে' ইচ্ছা হল ফকীরটাকে কিছু দেই। পকেটে হাত দিলাম—একটাও পয়সা নাই। ঘরে এসে বাক্স খুল্লাম, তাও ঐ রকমই খালি। হঠাৎ মনটা বিষাদে ভরে উঠল। আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার মহরী এসব লক্ষ্য করছিল, সে আগেই পত্র পড়েছিল; সে যেন ফাঁপর হয়ে আমার ঘরে এসে বিছানার কাছে দাঁড়াল; বল্ল, 'সাহেব, এখন শুইলেন কেন? শুভ সংবাদ এসেছে, খুশী করুন। আমি তাকে নীরবে সরে যেতে ইশারা করে শুয়েই রইলাম।

জীবনে পয়সার অভাব এমন তীব্রভাবে আর কখনো অনুভব করি নাই।

নজরুল ইসলামের অনশন

নজরুল ইসলামের বীনার সুরে সুরে যে রক্ত দাহ জেগে উঠল, তাতে বেশী দিন তাঁর পক্ষে বাইরে থাকা সম্ভব হলনা। তিনি শ্রীঘরে গেলেন। আমরা ক্ষুন্ন হলাম না; রবি বাবুর কবিতা মনে পড়ল:

আগুনের পরশ মণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ-জীবন ধন্য কর দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।

ভাবলাম, পুড়ুক; পুড়ে পুড়ে সোনা আরো খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসুক। আগুনের কুণ্ডে না পড়লে ইব্রাহীম আজর-তনয়ই থেকে যেত ইব্রাহীম হতেন না।

কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই হঠাৎ ভয়ের কারণ ঘটে উঠল। নজরুল ইসলাম অনশন শুরু করলেন। অনশন ভাঙলেন না। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। তখন লর্ড লিটন বাংলার লাট, স্যার আবদুর রহিম একসিকিউটীভ মেম্বর, নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী মন্ত্রী। তিন জনকে তিন খানা পত্র লিখলাম। লিটনকে যা লিখলাম তার মর্ম এই: 'যে ক্ষুদ্র দ্বীপ স্বাধীনতার ধাত্রীরূপে জগতে

অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছে তুমি সেই দেশের সুসন্তান। তোমার খান্দানে সাহিত্যিক ঐতিহ্য আছে, তোমার রক্তে আজাদীর অমর নেশা। তোমারই দেশের কবি বায়রণ গ্রীসের স্বাধীনতা সমরে যোগ দিতে গিয়ে নিজে ধন্য হয়েছেন, তোমাদের ধন্য করেছেন। নজরুল ইসলাম কবি, নজরুল ইসলাম আজাদীর উপাসক। আর কেউ না বুঝলেও তুমি তার মর্যাদা বুঝবে। তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তাকে বাঁচাও। স্যার আবদুর রহীম, নওয়াব আলী চৌধুরীকে যা লিখলাম তার মর্ম এই: বহুদিন পর আমাদের এ-কাঙাল সমাজে একটি কবির আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রতিভার ঝলক দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এখন কওমের বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের বড় প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন। তাঁকে ছেড়ে দাও, তাঁকে বাঁচাও

লীটন লাট, আবদুর রহিম বিউরুক্র্যাট, এরা জবাব দিবেন, এ-আশা আমি করি নাই; তবে কবির নামে একটু সাড়া দিবেন এ ভরসা খুবই করেছিলাম। নওয়াব আলী চৌধুরীকে বহুকাল থেকে জানতাম, তার অফিসের অনেক কাজ ছাত্র আমলে করে দিয়েছি, তিনি অন্ততঃ একটা উত্তর দিবেন, এ প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কিছুই হলনা; অন্ততঃ কিছু হল বলে আমি টের পেলাম না। আমার আঙ্গুল বিক্ষত করে টোকার পর টোকা দেওয়াই সার হল, সে নির্মম দুয়ার খুলনা।

এর কয়েক দিন পর কাগজে দেখলাম, কবির জন্য কলেজ স্কোয়ারে সভা হয়েছে। সভাপতিত্ব করেছেন বাংলার ঋষিতুল্য মনীষী আশ্চার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভায় বক্তৃতা করেছেন বাংলার দধীচী দেশবন্ধু দাশ, আর ডাক্তার হাসান সোহরাওয়ার্দী। বক্তৃতায় সবাই বল্লেন—'নজরুল ইসলাম আমাদের জাতির একটা বিপুল সম্পদ; তাঁকে আমরা হেলায় মরতে দিতে পারব না।' তাঁরা সরকারকে চিনতেন; তাই আমার মত সরকারের দুয়ারে ধন্না দিতে গেলেন না; তাঁরা সোজা প্রতিনিধি পাঠালেন নজরুল ইসলামের কাছে—অনশন ভাঙবার জন্য অনুরোধ করে।

কবি অনশন ভাঙলেন

তরুণ বাংলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে গেল। কবি তাদের মধ্যে ফিরে এলেন। আবার শুরু হল তাঁর রুদ্রবীণার জ্বালাময় ঝঙ্কার।

আল-হেলাল সাহিত্য সমিতি

কেবল আদালতে মামলা আর সভায় বক্তৃতা করে তৃপ্তিলাভ করতে পারলাম না। ময়মনসিংহে 'আল-হেলাল সাহিত্য সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করলাম। ইছলামী বিষয় সম্বন্ধে রচনা আমরা স্কুল কলেজের ছাত্রদের তরফ হ'তে আহ্বান করব এবং ভাল লেখকগণকে পুরস্কার দেব, এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা: উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যে ইছলামী ভাব ধারার প্রবর্তন ও তরুণ সাহিত্যিক সৃষ্টিতে প্রেরণা দান।

প্রথম বছর পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করলেন ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লা সাহেব: পুরস্কার যাঁরা পেলেন তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম আজো মনে আছে: সোনার পদক পেলেন মুহম্মদ (এখন ডাক্তার) ইনামুল হক (চাটগাঁ কলেজের ছাত্র), রূপার পদক পেলেন মুহম্মদ মনছুর (হুগলী মাদ্রাসা) আর মুছাম্মাৎ জোবেদা খাতুন (এখন মিসেস রব) বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় ময়মনসিংহ। আমি করটীয়া ফিরে গিয়ে কলেজ সৃষ্টির কাজে এমন মশগুল হয়ে পড়লাম যে, সাহিত্য সমিতির দিকে আর নজর দিতে পারলাম না।

নওগাঁ কনফারেন্স

ময়মনসিংহ থাকা কালে আমার সমাজ-সেবা মূলক কাজে এক বড় লেফট্‌নান্ট ছিলেন গফর গাঁয়ের মৌলভী আবদুস সালাম। বেঁটকদ, শক্ত শরীর, পরিশ্রমী স্বভাব, বক্তৃতায় পারদর্শিতা, সমাজের জন্য দরদ—মৌলভী আবদুস সামাদকে নিয়ে কাজ করায় সুখ ছিল। একবার তিনি এসে ধরলেন—'আসাম যেতে হবে—নওগাঁ জিলায় ময়মনসিংহের বহু লোক গিয়ে বাড়ী ঘর করেছে—তাদের নানা অসুবিধা, 'কনফারেন্স করে সে সব দূর করতে হবে।' কেবল একটি কনফারেন্স করে উপনিবেশিকদের এতগুলি দুরূহ সমস্যার কি করে সমাধান হবে, তা আমার বুঝে এল না। তবে কিছু যে উপকার হবে, একথা বিশ্বাস হল। কত রেল ষ্টেশনে, কত ষ্টিমার ঘাটে, কত নৌকার পারে আসাম যাত্রী আমার দুঃস্থ ভাই বোনদের হৃদয়স্রাবী কান্না শুনেছি; তাদের কথা স্মরণ করলে সেই কান্নার ধ্বনি কানে বেজে উঠত। মনে হল, যাই, এদেরে একটু দেখে আসি।

চল্লাম

অদ্ভুত সুন্দর মনে হল আসামের দৃশ্য। পাহাড় পর্বতের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। এ-পাহাড়ের পাশ দিয়ে ও জঙ্গলের ধার দিয়ে, হিমালয়ের অনন্ত বিথারের দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা চল্লাম। কামাখ্যায় আগেই দেখা হল তার পাণ্ডাদের সঙ্গে। পাণ্ডারা যে যাত্রীর জাণ্ডা নিয়ে টানাটানি করে শুনেছি, এদেরে দেখে তা মনে হল না। পরিচ্ছন্ন বেশ, সুন্দর চেহারা, মার্জিত ব্যবহার বেশ লাগল। আমি বল্লাম, দেখছেন তো, আমি ভীষণ মুছলমান—দাড়ি রাখি, টুপী পরি, আল্লাহ্

আকবর কই।' ওরা বল্লেন—'কুছ পরোয়া নাই; চলুন, আপনাকে সমস্ত মন্দির দেখিয়ে দেব। আমার লোভ ছিল কিন্তু সময় অভাবে যাওয়া হলনা।

গৌহাটির টিলার উপরের বাংলাগুলি ছবির মত সুন্দর মনে হল। ওখানে দাঁড়ালে চোখ পড়ে হিমালয়ের অনন্ত শৃঙ্গমালা, ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বারিরাশি, বন জঙ্গলের অপূর্ব শ্যামলিমা। বাংলোতে যারা থাকে তাদের কারো সাথে দেখা হলনা; উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম—তোমাদেরে আমি হিংসা করি।' বিবেক বল্ল, 'হিংসা করা কি ঠিক?' আমি বল্লাম, 'আরে চুপ—চুপ, তোমার ভয় নাই যে শ্বেতাঙ্গ জীবেরা ওখানে থাকে, তাদের দেহ অভেদ্য, নজর, হিংসা, বিদ্বেষ কিছুই ওদের ও মোষের দেহে লাগে না।

গৌহাটি পার হয়ে চলেছি। একটি তরুণ হিন্দু উকিল গাড়ীতে উঠলেন। নিতান্ত সদালাপী। নানা বিষয়ে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ চল্ল। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

'আপনার বাড়ীটা কোথায়, জিজ্ঞাসা করব?'

'আমার বাড়ী ময়মনসিংহ জিলায়।'

'ময়মনসিংহ জিলায়! ময়মনসিংহের মানুষ হয়ে এত চমৎকার আলাপ করলেন?

'ব্যাপারটা কি?

'আর কোন আসামী আপনার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলে ময়মনসিংহের কথা বলবেন না। ময়মনসিংহের লোকদেরে এরা হয় বলে ময়মনসিঙ্গা নয় বলে চরুয়া। চরুয়াদের নামে আসামের লোকে ঘিন্নায় নাক সিটকায়।

—'কেন, বলুত তো?'

'ময়মনসিংহের লোককে আসামীরা প্রথমে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছিল। কারণ এরা সাহসী আর পরিশ্রমী। অনেক জঙ্গল এরা সাফ করেছে, বাঘ ভালুক তাড়িয়েছে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে, সরকারের রাজস্বের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এরা অন্যায়ও করেছে প্রচুর।

'কি সে সব অন্যায়, একটু বলুন।'

'আসামের মেয়েরা বরাবর মাঠে ঘাটে কাজ করে, এরা সে মেয়েদেরে নিয়ে টানাটানি করেছে। এ নিয়ে অনেক মামলা হয়ে এদের দোষ প্রমাণিত হয়েছে।

'তার পর?

এরা আসার ফলে দেশে মারামারি, ফৌজদারী বহুগুন বেড়ে গেছে। আগে সমস্ত আসামে বছরে গড়ে তিনটা খুন হত, এখন হয় একুশটা।

আমার ভয় হল। ভাবলাম, বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এই ঘৃণা-বিদ্বেষ যদি আসামীদের মধ্যে অবাধে বেড়ে যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আসামের দুয়ার বাঙ্গালীদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

যতদূর মনে হয় সকাল বেলার দিকে নওগাঁ টাউনে তখন মুছলমানদের নেতা হলেন মৌলভী নুরুদ্দীন। ইনি পরে খান বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন ও আসাম আইন সভার সভ্য হয়েছিলেন। আমরা তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠলাম। বুদ্ধিমান, ভদ্র, সমাজ দরদী তার সঙ্গে আলাপ করে তৃপ্তিলাভ করলাম, তিনি হিন্দু উকীলটির কথা সমর্থন করলেন। আরো বল্লেন—ময়মনসিংহের লোকগুলি অসুরের মত খাটে, রোজগারও করে প্রচুর, কিন্তু বড় অপব্যয় করে। শহরে ঢাকাইয়া জুতার দোকান আছে।

একজন গিয়ে বলে—'জুতা চাই, ভাল জুতা। দামের জন্য পরোয়া করবেন না।' দোকানদার বোঝে। সাত টাকার জুতা চৌদ্দ টাকা চায়। তাতেও গ্রাহকের মন উঠেনা। বলে—আরে ডিপুটি কমিশনার সাহেব যে জুতা পায় দেয়, সেই জুতা আছে কিনা? দোকানদার চট করে তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলে। বলে—'মাত্র এক জোড়া জুতা তো আছে; কিন্তু সে-জোড়া ডিপুটি কমিশনার সাহেবের জন্য রিজার্ভ আছে'। গ্রাহক রেগে বলে—'থোও তোমার ডিপুটি কমিশনার। তারই কেবল টাকা আছে, আমাদের বুঝি টাকা নাই? ঐ জোড়াই আমাকে দিতে হবে, দাম যতই লাগুক।'

দোকানদার তখন আর এক জোড়া জুতা বার করে—দাম ঐ পাঁচ সাত টাকা; কিন্তু দাম হাঁকে পঁয়ত্রিশ টাকা। গ্রাহক পরম অবহেলার সাথে দশ টাকার চারখানা নোট টিল দিয়ে ফেলে দিয়ে জুতা নিয়ে হনহনিয়ে চলে যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলদ কিনে এক একটা হয়তো সাতশ টাকায়, ওয়েলার ঘোড়া কিনে এক একটা চৌদ্দশ পনর শ টাকায়। আপনি বলে যান, এরা টাকা জমাক, ভাল বাড়ী-ঘর করুক, ছেলেপেলেকে স্কুলে পাঠাক।

কনফারেন্সের স্থান ছিল আলী টাঙনী ওছমান আলী সদাগরের বাড়ী—নওগাঁ হতে বারো মাইল। সন্ধ্যায় আমাদের জন্য গরুর গাড়ী এল। ছৈ করা বড় গাড়ী, ভিতরে খড়ের গদী পাতা, মস্ত মস্ত বলদ। আমরা রাত্রিতে খেয়ে গাড়ীতে চড়ে ঘুম দিলাম। সকাল বেলায় চেতন পেয়ে দেখি, আলী টাঙনী পৌঁছে গেছি। জীবনে আমার এই প্রথম গরুর গাড়ীতে ওঠন ভালই লাগল।

ঔপনিবেশিকদের চেহারা দেখে চোখ জুড়াল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যা দেখলাম তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল; খেয়ে দেয়ে নাদুশ নুদুশ চেহারা—দেহময় শক্তির বিকাশ, স্বাস্থ্যের দীপ্তি, আনন্দের তরঙ্গ। বড়দের স্বাস্থ্যও ভাল। তারা দেশে ছিল নিতান্ত গরীব; এখানে

এসে সবাই সুখের নাগাল পেয়েছে। তাদের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না। কনফারেন্সে বেশ দুর দুরান্তর হতে লোক এল। ঘোড়া এল ত্রিশ চল্লিশটা—বড় বড় ঘোড়া—সেই তেরশ চৌদ্দশ টাকা দামের। ঘোড়া ও ছওয়ারের পোষাক কৌতুহল জনক। অত দামী ঘোড়া অথচ তার পিঠে কাঁথার গদী, গলায় কড়ি মালা। আরোহীর নিজের গায় ডোনিগাল সিল্কের গলুফ কোট, পায় ডারবী জুতা, ধুতি হাটু পর্যন্ত; হাটু আর টাকনুর মাঝখানে খোলা, মুজা নাই; মাথায় পাঁচ পয়সার গামছার পাগড়ী, মুখে হাওয়া গাড়ী সিগারেট।

বিষয় কমিটীর সভায় অনেকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপিত হল। যথা—লাইন প্রথা উঠিয়ে দিতে হবে, ঔপনিবেশিকদের জন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আলাদা সংরক্ষিত আসন দিতে হবে, ইত্যাদি। আমি এ-জাতীয় একটি প্রস্তাবও সভায় উপস্থিত হতে দিলাম না। বল্লাম—'এসব কথা এখন তুল্লে আসামীরা ভবিষ্যত ভেবে ঘাবড়িয়ে উঠবে। আসামে বাঙ্গালীর আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এখন রাজনীতির কথা নয়, স্বতন্ত্র অধিকারের কথা নয়, লাইন প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার কথা নয়। এখন ঔপনিবেশের স্রোত অবাধভাবে চলতে থাকুক, ঔপনিবেশিকেরা তাদের ব্যবহার মার্জিত করুক। আমার কথা সবাই মেনে নিল।

রাত্রিতে ওছমান আলী সদাগরের সঙ্গে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের কথা হল। বল্লেন—'ছিলাম কিশোরগঞ্জের এক গরীবের ছেলে—ভাতের দুঃখে এলাম এখানে। তখন এ-অঞ্চল কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্যেই বাড়ী করলাম। বাঘের ভয়, সাপের ভয়, হাতীর ভয়, কিছুই পরোয়া করলাম না। একদিন একটা বকরি সাপে গিলে খেল। বকরীর ডাক শুনে কাছে গেলাম; তারপর পালিয়ে এলাম; একটু দেরী করলে হয়তো আমাকেও ধরত। আসামের সাপেরা হাতী পর্যন্ত ধরে খায়। বড় বড় শাল গাছের কাছে সাপ পড়ে থাকে; রং দেখে বোঝা যায় না যে সাপ কি গাছ। কাছ দিয়ে হাতী যেতেই তার একটার এক ঠ্যাং লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরে, দেহের বাকী অংশ দিয়ে কাছের শাল গাছের গোঁড়ায় প্যাঁচ দেয়। হাতী চীৎকার করে কাঁদে ঠ্যাং ছাড়াতে, প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু সব নিষ্ফল। আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে হাতী পড়ে যায়, তার পর দুই এক দিন মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। তখন সাপ হয়তো আগে হাতীর শুড়টা টেনে ছিঁড়ে খায়, তারপর তার কান খায়, লেজ খায়; হাতীটা আধ পচা হয়ে গেলে হয়তো তার নাড়ী ভুড়িও খায়। আগে মাঝে মাঝে জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে দেখা হত। দৌড় দিতাম না; আল্লার পায় জান সোপর্দ করে দিয়ে নিজ পথে চলতাম; বাঘ মুখ তুলে চেয়ে তার পথে চলে যেত। সহায়হীন পরদেশী দেখে বাঘের মনেও বুঝি দয়া হত! এখানে আসার দুই বছর পরের কথা। ছোনের ঘর, ছোনের বেড়া। রাত্রিতে শুয়ে আছি। গভীর রাতে হঠাৎ চেতন পেলাম। মনে হল একটা বিরাট সাপ আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম; আর্তকণ্ঠে ডাকলাম—'আল্লাহ্'! সাপটা ছোনের বেড়া ফাঁক করে বেরিয়ে গেল। আমি মরার মত চুপ করে পড়ে রইলাম। ঘুম চলে গেছে। সাপটা আবার যদি আসে তখন কি করব? এবার আমাকে গিলে খেলনা কেন? সাপটা তো ছোট নয়। বোধ হয় এ-আমাকে খাবে না। পানিতে পড়া মানুষকে কুমীরে খায়না; বিপদে পড়া মানুষকেও বোধ হয় সাপে খায় না। মনে সাহস হল। এমন সময় দেখি, বেড়া ফাঁক করে সাপটা আবার ঘরে ঢুকছে। এবার আর চীৎকার করলাম না, করতে পারলাম না; কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। সাপটা আমার গায়ে এবার তার গা লাগাল না; খানিক উঁচু দিয়ে গিয়ে ধানের বেড়ে গেল। তখন ভাল করে চেয়ে দেখি সাপ তো নয় ওটা হাতীর শুড়। বেড়া ফাঁক করে বেড়ের ধান খাচ্ছে। প্রথমটায় আমি চমকে ওঠায় শুড় টান দিয়ে বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল; ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে আবার শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাতীরা চুরি করে খাওয়ায় ওস্তাদ; আর ওরা যে চুরি করে খাচ্ছে সে কথা জানে বলেই অমন চুপি চুপি আসে। হাতী শুঁড় টান দিয়ে বাইরে নিয়ে যেই ধান মুখে দিয়েছে, অমনি আমি ওঠে বসলাম; ইচ্ছা এক কোণায় গিয়ে পালাই; কি জানি হাতীর মেজাজ যদি খারাপ হয়ে ওঠে। আমার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা সরে গিয়ে উঠানে দাঁড়াল। আমি তখন মনে সাহস পেলাম। আস্তে আস্তে দুয়ার খুলে গিয়ে, দুয়ারের সামনে দাঁড়ালাম; তারপর গলায় কাপড় নিয়ে বল্লাম—"ডাঙ্গরীয়া রে, তোর আল্লার দোহাই, তুই আমার অনিষ্ট করিস না; আমি বড় অসহায় এক পরদেশী।" হাতীটা কান পেতে শুনল; তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল। এর পর হাতী আমার বাড়ীর উপর আর তো আসে নাই, আমার কোন ক্ষেতের শস্যও নষ্ট করে নাই।......আজ আল্লা আমায় বহুত সম্পত্তির মালিক করেছে। দুনিয়ায় কোন অভাবই আমার নাই। কিন্তু যে মা দশ মাস দশ দিন আমাকে জঠরে ধরেছিলেন, আর যে বাপের কাঁধে চড়ে ছোট বেলায় গোছল করতে গেছি, তারা যে আধপেটা খেয়ে খেয়ে দেশে মরল, তাদের মুখে দুই মুঠা ভাত তুলে দেওয়ার বখত তো আমার হল না'।

ওছমান আলী সদাগরের চোখ টলমল।

ফিরবার কালে স্যার ছাদুল্লার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বল্লেন—'আপনি কোনও ঝগড়ার কথা সভায় তুলতে না দিয়ে ভাল করেছেন। বাঙালী মুছলমানেরা কেবল আসুক আর আসুক, তারপর তারা যখন সংখ্যায় বেশী হয়ে যাবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন তাদের হাতে আপনিই এসে পড়বে'।

এর পর বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের পক্ষ হয়ে যে সব নেতা আসামে নানা অধিকারের কথা তুলে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সরল বিশ্বাসী উপনিবেশিকদের দিয়ে জোর করে লাইন প্রথা ভঙ্গ করান, তাঁরা পরিণামে উপনিবেশিকদের সর্বনাশই করেছেন। সে আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে তখনই হিন্দু মহাসভার বহু পাণ্ডা আসামে গিয়ে ওখানকার নেতাদের বুঝিয়ে বলে: 'এই কেবল শুরু পরিণামে এদের জুলুমে তোমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। অতএব এ-বিষ বৃক্ষকে অঙ্কুরেই বিনাশ কর।' সে পরামর্শ আসামীরা অনেকে কানে তুলেছিল। এ পরেও আবার কোন কোন উত্তেজনা-বিলাসী নেতা আসাম বিজয়ের জিগীর তুল্লেন। আসামে বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের কপাল ভাঙ্গল।

—ক্রমশঃ

শেফালী ছড়ালো হাসি

আজিজুর রহমান

রূপালী মেঘের সারি
নীল আকাশে—
পাখীর পাখার মত
ভাসিয়া আসে।

সুদূর বলয় রেখা
শ্যামল বনের লেখা
স্বপনের ছবি যেন
নয়নে ভাসে।

শুভ্র-হীরক সম
ছড়ায় সমীর—
স্নিগ্ধ সবুজ তৃনে
স্বচ্ছ শিশির।

শান্ত নদীর জল
শাপ্‌লা শালুকদল
শেফালী ছড়ায় হাসি
মৃদু সুবাসে।

ময়নামতীর গান

জাহিদুল হুসাইন

১৩৬৫ বাংলার মাঘ মাসের "মাহে-নও"-এ প্রকাশিত "ময়নামতীর গান" নামক প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ বি-এল ডি-লিট সাহেব বলেছেন—"'ময়নামতীর-গান' পড়িয়া হিন্দু ভবানী দাস যে পুস্তকের রচয়িতা নহেন, কিন্তু একজন মুসলমান ইহার রচয়িতা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।"

উক্ত প্রবন্ধের খতমের দিকে তিনি একটি কিম্মতী কথা কয়ে ফেলেছেন—"পুরাতন বাঙ্গালা ও আরবী পারসী জানা না থাকিলে প্রাচীন পুঁথির সম্পাদনে এরূপ ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়।"

হিন্দু ভবানী দাসকে মুসলমান এবং যবন হরিদাসকে হিন্দু করার কোশিশ বাংলা মুল্লুকে মামুলী মামলা; কিন্তু উক্ত পুঁথির মুসলমানী ভাব ও আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগের মুন্সীয়ানার উপর বুনিয়াদ করে তিনি হিন্দু ভবানীকে বঞ্চিত করে উক্ত পুঁথির রচয়িতার মান-ইজ্জত যে একজন মুসলমানকে দেজা দিতে চান, তা মুসলমানের তরফ থেকেও যে মুনাফার কারবার নয়, বরং খেসারতের কাজ, সেদিকে খেয়াল ও তার খতিয়ান করা জায়েজ বলে মনে হয়।

খালি পুঁথিগত পুরাতন বাংলা এবং পুঁথিগত আরবী ফার্সী জানা থাকলেও প্রাচীন পুঁথিসাহিত্য সম্পাদনায় গলদ থাকা আজগুবী নয়। এমন বহু আরবী লফ্জ পাক-বাংলার হিন্দু-মুসলমান আজও ব্যবহার করে, হিন্দু ত দূরের কথা, মুসলমানের পক্ষেও এসব যে আরবী শব্দ মালুম করা সহজ ব্যাপার নয়। পুঁথিগত আরবী লফ্জ যা আমাদের মাদ্রাসা ও ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের কারি-কুলামের কব্জায় হাজির তার বাইরেও সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বহু শব্দ আরবী ভাষায় আছে, যা আমাদের ছেলেদের শিক্ষার বাইরে থেকে যায়। তাই শিক্ষিতদের পক্ষেও পাক-বাংলার পল্লী এলাকায় ব্যবহৃত অনেক আরবী লফজই 'আরবী' বলে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। এর মিছাল মিলে ডক্টর সাহেবের প্রবন্ধেও। তিনি বলেন—"হিন্দু কবির হস্তে উজির, নাজির সিকদারের পরিবর্তে মন্ত্রি-পাত্র-মিত্র কোটাল দেখিতে পাইতাম।" কিন্তু 'কোটাল' শব্দটি কি মন্ত্রি-পাত্র-মিত্রের মতো সংস্কৃত ভাষার ?

'কোটাল' এমন একটি আরবী বা অপভ্রংশ ফার্সী শব্দ, যা' মুসলমানী চেহারায় ধরা পড়েনি। ফলে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তক কুল্লে হিন্দু লেখক বে-মালুম তা' ব্যবহার করেছেন; কিন্তু উজির-নাজির সে-চেহারায় চেনা গেছে বলে লোক-সাহিত্যের আলোচনায় এ-লফজ দুটোকে 'সেলামালিকুম' দিয়ে এরা আমদানী করেছেন মন্ত্রি-পাত্র-মিত্র। আজকের দিনে গণ-তন্ত্রের কল্যাণে 'মন্ত্রি' শব্দটি জনগণের দ্বারে দ্বারে হাজির কিন্তু তিন শত বছর আগে "ময়নামতীর গান" রচনা-কালে দিল্লীতে ও বাংলায় যখন কায়েম ছিল মুসলিম হুকুমত, তখন হয়ত মন্ত্রি শব্দটির কোনো সাহিত্যিক কিম্মতই ছিল না। পাত্র-মিত্রের ত আজও রাজনৈতিক মূল্য হয়ে উঠেনি। সুতরাং ভবানী দাসের পক্ষে লোক-সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে উজির-নাজির-সিকদার ব্যবহার না করে কিই-বা হিল্লা ছিল ?

বিশ-ত্রিশ বছর আগেও পাক-বাংলার পল্লী-এলাকায় দাদা-দাদী এবং ঠাকু দা' ওগারা কিস্সা শুরু করত এই ভাবে—"ফলনা-ফলনা মুল্লুকে এক বাস্সা আছিল—হেই বাস্সার পুত্, উজিরের পুত্, নাজিরের পুত্ কত্তলের পুত্—তারা চারজনের মাঝে বন্দুস্তী আছিল।"

পাক-বাংলার কত্তাল (আরবী কতল বা ফার্সী কোতো-য়াল) গংগা পারে গিয়ে 'কোটাল' হয়ে গেছে। যদি কোতোয়াল 'কোটাল'-এর ছদ্ম-লেবাস না পরত, তা হলে এরও জল্লাদের হাতে জান কব্জ হয়ে যেতো এবং ডক্টর সাহেবও ভবানী দাস 'কোটাল' শব্দটি ব্যবহার করেনি বলে তাকে তার সাহিত্যিক মিরাশ থেকে বেদখল দিতে পারতেন না।

"বাংলা একাডেমী পত্রিকা"র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় একাডেমীর "পরিনিয়ন্তা" (পরিতাপ !) ডক্টর এনামুল হক সাহেবও এমনি আরবী-উর্দুকে সংস্কৃতের গোসালায় বেঁধেছেন মধ্যযুগের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি রহিমুন্নেসার লেখা আলোচনা কালে—যথা—"বলাবাহুল্য-'বাসর' তদভব 'বাসর' L বাসহর L বাসঘর L বাসগৃহ নহে। ইহার অর্থ যে-ঘরে বরকন্যা বিবাহ-রজনী যাপন করে। এইখানে 'দিবস' বা দিন অর্থে মূল সংস্কৃত বাসর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা এই অর্থে এখনও 'বাসর' শব্দ ব্যবহার করি, যেমন—রবিবাসর, শ্রাদ্ধবাসর, বিবাহ-বাসর ইত্যাদি।" অথচ স্বামী স্ত্রীর মিলন অর্থে 'বাসর' শব্দের কি সুসংগত ব্যবহারই না রয়েছে বাঙালী সমাজ এবং কোরআনে—"ফাল্আনা বাসেরু হুন্না।" (সুরা বকর-১৮৭)

সে-যাই হোক, ভবানী দাসকে "ময়নামতীর গানে" আলিস, অলি (ওলি) উজির, নাজীর জোয়াব, মিরাশ, দিন

দুনিয়া', খিনজির, হাওয়াত, ঈর্শাদ (ইরশাদ) কছবী প্রভৃতি আরবী এবং কাক্ (ধাক্—"থাক্" নামে আধুনিক জীবিত এক হিন্দু লেখকের একটা গানও আছে), দিল্, বেগুনা প্রভৃতি ফার্সী শব্দ ব্যবহারের দায়ে তিনি পুঁথি-রচয়িতার সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চান; কিন্তু এরও চেয়ে গুরুতর "মুসলমানী" (?) আরবী শব্দ পাক-বাংলার হিন্দুরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্যবহার আজও করছে বলে ত কেউ এদের মুসলমান বলেনা।

এরও চেয়ে গুরুতর কথা এই যে, পাক-বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় ঐতিহ্যমূলক কিছু সংখ্যক আরবী শব্দ এদের মধ্যে ছদ্ম-লেবাসে আজও হাজির।

কুজাগরী পাক-বাংলার হিন্দুদের একটি লৌকিক ঐতিহ্যমূলক পার্বণ। 'কুজা' আরবী শব্দ—জলের ভাঁড়। পৌত্তলিক আরবদের অন্যতম দেবীর নাম ছিল 'কুজা'। এরিয়ানদের বরুণ যা, সেমিটিকদের কুজাও তাই।

পাক-বাংলার হিন্দুরা দেবতার নামে আজও উৎসর্গ করে না—করে 'মানত'। পৌত্তলিক আরবদের ৩৬০টি দেবীর অন্যতম দেবী 'মানত'-এর ছদ্মনামই 'মানত'। "বিসর্জনে" 'মানত' শব্দ ব্যবহার করেছেন রবি ঠাকুরও।

'জোকার' পাক-বাংলার হিন্দুদের একটি লৌকিক ঐতিহ্যমূলক আচার—সুখে-দুঃখে, পূজা-পার্বণে নবজাত ও মৃতসৎকারে, বিবাহে ও ঋতুস্নানে এরা 'জোকার' দিয়ে থাকে। "জোকার" শব্দটি প্রাচীন হিন্দু কবিরা "ময়মনসিংহ গীতিকায়" সংগৃহীত পালা গানে ব্যবহার করেছেন। 'জোকার' আরবী 'জিকির' শব্দেরই ছদ্মবেশ। এর চেয়ে গুরুতর এই যে, জোকারে যে-ধ্বনি ব্যবহৃত হয়, তা' পাক-ভারতের অন্যান্য এলাকার বৈদিক 'ওম'—'বোম' নয়,—এই ধ্বনি হল 'উলু'। হিব্রু 'এলি', আরবী 'ইলা' এবং 'জোকারের উলু' প্রাচীন আধুনিক আরব জাতির সেই শাশ্বত ইলাহর আলিফ, লাম এবং হে'র উপর হরকতের হেরফের শ্রেফ।

মনসার ভাসান বাংলার হিন্দুদের একটি পার্বণ—এই মনসা যে আসনে অধিষ্ঠিতা, তাকে হিন্দুরা বলে আটন। আরবী 'ওতন'-এরই এ-ছদ্মবেশ। পাক-বাংলার বাতান এবং পশ্চিম বংগের বাথানও তাই।

এরিয়ানরা পুরুষ দেবতার উদ্গাতা—সেমিটিকরা নারী দেবীর। পৌত্তলিক আরবদের তামাম দেবীই ছিল নারী (সুরা নেসা—১১৭)। বাংলার হিন্দুদের পূজিত প্রায় নারী দেবীই লৌকিক—বৈদিক নয়। দুর্গা, মনসা, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী প্রভৃতি দেবীরা বাংলারহিন্দুদেরনিজস্ব বস্তু—পাক-ভারতের অন্যান্য এলাকায় এরা কদাচিত পূজা পাচ্ছে। বৈদেশিক এই আরবীয় নারী দেবীদের এখানকার স্থায়ী হিন্দুদের এবং সেমেটিক ধাতের সাথে গরমিল বৈদিক পুরুষ দেবতাদের এখানকার উপনিবেশিক পৌত্তলিক আরবদের গ্রহণযোগ্য করার তাকিদে যে আন্দোলন হয়েছিল, সেটাই বিধৃত রয়েছে প্রাচীন মঙ্গল ও বিদয় কাব্যগুলোয়। বাল্মিকীর মূল রামায়ণে না থাকলেও কৃত্তিবাস ওঝা (ওজজা—পৌত্তলিক আরবদের অন্যতমা দেবীর নাম) রামকে দিয়ে তাই তার তর্জমায় দুর্গা-পূজা করিয়েছেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ-হেন রূপান্তর ঘটলেও এখানকার অমুসলমান আরবদের সনাক্ত করা আজও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়নি। পাক-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে "কায়েত" বলে আলাদা বুনেদী একটা ফের্কা আজও মওজুদ। এরা না এরিয়ান, না দ্রাবিড় বা সিডিউল কাষ্ট। তের শ' বছর পরেও যদি আরব ভূমি থেকে বিচ্যুত ইহুদিদের ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং ইরান থেকে বহিষ্কৃত পার্সীদের ভারতে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি বাংলার কায়েতদিগকে অন্যান্য বাসিন্দা থেকে ফারাক করা কঠিন নয়। বাংলা দেশে সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ তক কায়েতদের তৎপরতা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি এরা এখানকার সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেকার বাসিন্দা হত, তা' হলে সে-আমলেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অন্ততঃ সাহিত্যিক অবদান কিছু থাকত। এই কায়েতরা বাংলার বুকে সপ্তম শতাব্দীর বা তার পরেকার একটা নতুন ফেনিল রক্তধারা—এ-ধারা ইস্লাম-পূর্ব অমুসলমান পৌত্তলিক আরবী রক্তধারা।

বস্তুতঃ কায়েত (আরবী কায়েদ) একটি সম্মানজনক আরবী শব্দ। বাংলার কায়েতরা যে বাঙ্গালী সমাজে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে তা নিঃসন্দেহ। কায়েতকে কায়স্থ করেও হিন্দু সমাজে নির্দিষ্ট করা যায়নি—বুনিয়াদী ফের্কা হিসাবে আজও এরা আলাদা। ময়নামতীর গান-এর রচয়িতা ভবানী দাসও ছিলো কায়েত সমাজের লোক—যেমনি প্রাচীন সাহিত্যের কৃত্তিবাস ওঝা, কাশিরাম দাস, মালাধর বসু প্রভৃতি কায়েত সমাজের লোক।

এই কায়েতরা পাক-বাংলার লোক বলে এখানে যত কবি-সাহিত্যিক জন্মেছে, দ্রাবিড় অধ্যুষিত পশ্চিম বংগে তার শতাংশের একাংশও জন্মেনি। এমন কি পাক-বাংলার সিডিউল কাষ্ট বা দ্রাবিড়দের মধ্যেও না প্রাচীন আমলে, না হালে কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হচ্ছে।

এই কায়েতেরা আরবেরই লোক—এরা আরব থেকে ইসলামের পূর্ব (সুরা সাবা ১৪-২০) এবং প্রাক্কালে বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে এসে বস্তী স্থাপন করে। দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুকের সময় ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী হয়নি দক্ষিণ আরবের যে-সব গোত্র, তারা সপরিবারে হিজ-

রাত করে। (হিট্টি) ইতিহাসের রায় এই যে, আরব মরুভূমিতে ফি-হাজার-সনের মাথায় পংগপালের মতো জনজমায়েত সয়লাব-প্রবণ হয়ে উঠে। বস্তুতঃ আরবের মরুভূমি অতি প্রাচীন কাল থেকে মানব জাতির সুরক্ষিত বীজাগার—এই বীজাগার থেকে ক্ষুধিত জনবন্যা শস্যহীন আরব মরুভূমির সীমা ডিঙিয়ে নদীমাতৃক শস্যদায়ী জনপদের ঘাড়ে এসে সোয়ার হয়ে যায়। আরবের এই জনবন্যা পশ্চিমে প্রাচীন মিসরীয়, উত্তরে স্পেনীয়, নিকট-পূর্বে বেবিলনীয় এবং পাক-ভারতে প্রাচীন দ্রাবিড় হয়ত হরপপা মহেঞ্জদারো সভ্যতার জন্মদাতা।

আরবে ইসলামের আবির্ভাব-পূর্বে মক্কায় খানে-কাবার কল্যাণে তামাম আরব ভূমি হেজাজীদের হাতে কাবু হয়ে থাকলেও আরবের দক্ষিণ উপকূলের লোকেরাই ছিল তেজারতীতে ওস্তাদ। ভারত মহাসাগরের জলপথ ছিল এদেরই কবজায়। এদের প্রবনতা ছিল তাই পূর্ব দিকে উপনিবেশ স্থাপনের। এদের বাণিজ্যিক নৌবহর আরব সাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ ভারতের অভঙ্গুর উপকূল বেয়ে একমাত্র বাংলায় এসেই তার গভীর ও বিস্তৃত নদনদীর কল্যাণে দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে মালামাল আমদানী ও রফতানী করতে পারত। সুতরাং তখনকার বাংলার হাটঘাট, মাঠ-মোকাম ছিল আরব সওদাগরদের নখদর্পণে। রণ-বিজয়ের চেয়ে বাণিজ্য-বিজয় উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ। সুতরাং ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পূর্ব বাংলায় পৌত্তলিক আরবদের উপনিবেশ স্থাপন অনৈতিহাসিক ব্যাপার নয়। এই সত্যটি ইতিহাসে অবহেলিত হয়েছে বলে বাংলার ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে পর্যবসিত হয়েছে—সামাজিক সত্যের অভাবে এ-ইতিহাস নিরস।

শুধু কায়েতই নয়, আরব বণিকদের নৌবহরে দাঁড়ি-মাঝি-মাল্লা-খালাসী ছিল যে আরবী-ভাষী হাব্‌সীরা, তারাও এইখানে এদের মহাজন ও মনিবদের সাথে বস্তি করে ফেলে।

এদের দেখাদেখি, ওয়াদিয়া বা বাদিয়া বা মরুভূমির বেদুঈনরাও মরুভূমির তাঁবু ত্যাগ করে বাংলায় এসে নদীর বুকে নৌকায় স্থায়ী আস্তানা ফেলে। বাদীয়া আরবী শব্দ—অর্থ মরুভূমি। এককালে মরুভূমির বাসিন্দা ছিল বলে 'বাদিয়া' বা মরুভূমির লোক বলে এরা আজও চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, যেমন আমরা দক্ষিণ দেশের বাসিন্দাকে দক্ষিণা, চরের বাসিন্দাকে চরুয়া বলে থাকি। হিন্দু বাদিয়ারা আজও তাদের সাপ ধর্‌বার মন্ত্রকে আরবী "ইল্‌ম্‌" রূপেই মূল্য দিয়ে থাকে ("নাগিণী কন্যার কাহিনী" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।)

প্রাচীনকালে ইতিহাসের অন্ধকারে যদি ভারত-ভূমিতে আরবেরা উপনিবেশ স্থাপন করে থাকে, খৃষ্টের জন্মের পরে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ও প্রাক্কালে বাংলায় অমুসলমান আরবদের উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভব নয়। প্রাচীন সেমেটিক কপ্‌টিক জাতি থেকে আজকের মিসরের আরব জাতি যেরূপ আলাদা, বাংলায় প্রাচীন সেমেটিক দ্রাবিড় জাত থেকে আজকের আরব জাতের কায়েতেরা সেরূপই আলাদা। বাদীয়া এবং হাবশীরাও।

ইসলামের সাম্যবাদের দৌলতে বাংলায় আগত মুসলমান আরবের তামাম গোত্রের লোকেরা একমাত্র মুসলমানরূপেই পরিচিত; কিন্তু আরব দেশাগত কায়েতেরা আজও তাদের সেই আরবীয় গোত্রিয় ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে। এমন কি কোনো কোনো গোত্রের বেলায় সেই আরবীয় 'ফসিল' আজও বিদ্যমান—সোম (সেমাইট) হোম (হেমাইট) কুণ্ডু (কিলি) সেক (সানার বাসেন্দা বা তাঁবুর যাযাবর) ঘোষ (গাসানাইড), সাহা (সাহ বা আরবের দক্ষিণ উপকূলের বাসেন্দা) ইত্যাদি।

"ময়নামতীর গান" যে পৌরাণিক মধুচক্রকে কেন্দ্র করে রচিত সেই ময়নামতীর খণন কার্যের ফলে জানা গেছে যে, দেব রাজারা ছিলেন সেই শালবনের স্রষ্টা। দেব'রা ছিলেন নিশ্চয়ই কায়েত্‌। ৭ম শতকের চীনা সফরকারী হিউয়েন সাঙ্‌ দেবদের মেঘনার পূব পারের রাজ্য সমতটকে সমুদ্রতীরবর্তী একটি স্যাঁৎস্যাঁতে স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মূল ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন সমুদ্র-তীরবর্তী এই স্থানটি আরব দেশীয় কায়েত্‌ দেবদের দখল করা অসম্ভব। ময়নামতী শব্দটিও আরবী বলে মনে হয়। মঈন-উদ্‌দীন ও মঈন-উল-ইসলামের 'মঈন' শব্দটির সাথে ময়না (স্থানীয় লোকেরা বলে—মঈনামতী) শব্দটির হুবহু মিল রয়েছে। মঈন আরবী লফজ—মানে সাহায্যকারী।

ময়নামতীর বৌদ্ধ চৈত্য-সৌধের পরিকল্পনায় পাক্‌-ভারতীয় অন্যান্য বৌদ্ধ স্তূপের সাথে এক আশ্চর্য্য অনৈক্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার প্রথম যুগের কেন্দ্রীয় স্তূপ ক্রশের নকৃশায় গঠিত। রসুলুল্লার জন্মের প্রাক্কালে দক্ষিণ আরবে খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল—"সুরা ফিল"-এ তার নজীর হাজির। দক্ষিণ আরব থেকে এই ক্রশ-পদ্ধতি ময়নামতীতে আমদানী হয়েছিল বলে মনে হয়। দ্বিতীয় যুগের এখানকার চৈত্যগুলো অয়তাকারের—মনে হয়, আয়তাকারের বাইতুল্লার বা কাবা-গৃহের পরিকল্পনায় এগুলো নির্মিত। কেননা বায়তুল্লাহ পৌত্তলিক আরবদেরও ছিল সাধারণ উপাসনা গৃহ। এছাড়া ময়নামতীর ধ্বংসস্তূপে আব্বাসীয় আমলের (৮ম-১২শ শতক) দুটো রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

মুস্লিম আরবদের প্রভাবও এই চৈত্য-সৌধ নির্মাণে প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব নয়। তখনও বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বাংলা বিজিত হয় নি।

বাংলা দেশে পৌত্তলিক ও মুস্লিম আরবদের উপনিবেশের হারানো সূত্রটিকে আমলে আনা হলো না বলে কি সাহিত্যিক কি পুরাতাত্ত্বিক আলোচনায় অনেক সমস্যাই "হয়ত-হয়ত" করেই খতম করতে দেখা যায়।

১৩৬৫ বাংলার অগ্রহায়ণের "মাহে-নও"-এর সম্পাদকীয় দফতরে "নৃতাত্ত্বিক গবেষণা" সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংগিত করা হয়েছে। হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীন সাহিত্য-বিষয়ক পঞ্চম সেমিনারে জনাব শামসুদ্দীন আবুল কালাম "পূর্ব-বাংলার সমকালীন গল্প-উপন্যাসে সামাজিক রূপায়ন" নামক প্রবন্ধে—"বর্তমানে এই প্রদেশের যারা অধিবাসী, তাঁরা পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমান আগমনের পূর্বে অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু, হিন্দু-সমাজের শ্রেষ্ঠবর্ণ সমাজ-বিধাতাদের দাসেরই তুল্য"—তারই প্রসংগে।

এই সম্পর্কে বিদেশী পণ্ডিতদের বরাত দিয়ে এ-প্রদেশবাসীর উৎপত্তি সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডার অবসান হয়নি বলে দেশী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। পাক-বাংলা ও তার বাসিন্দা, ভাষা ও কালচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বিদেশী তাছিরের মৌলিক মসলা সম্পর্কে নিষ্কলুষ ধারণা থাকা দরকার। স্থলপথে যে বৈদেশিক প্রভাবের আমদানী হয়, তা মধ্যবর্তী দেশসমূহের প্রভাবে অনেকটা বিকৃত আকারে এসে পৌছে কিন্তু জলপথে বৈদেশিক প্রভাব যতদূর থেকেই আসুক না, তা থাকে স্বচ্ছ। স্বচ্ছতা সত্ত্বেও সুদূর আরবীয় প্রভাবের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না বলে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে যা গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে, তা গোবর-গণেশের গবেষণায় ঘুটে হয়ে উঠছে।

আমার বিশ্বাস, পাক-বাংলার কায়েতও মুসলমানের জেয়াদা হিস্‌সাটাই হবে দক্ষিণ আরবের লোক। মুসলমানের বাকী হিস্‌সাটা হবে আরবের অন্যান্য এলাকার লোক ও সাত শ বছরের শাসক সম্প্রদায়ের তুর্কী, পাঠান, বৌদ্ধ, ইরাণী ও মোগল। এখানকার প্রাচীন দ্রাবিড় বা মোংগল জাতির লোক ইস্‌লাম গ্রহণ করেনি। হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে যদি কেউ ইস্‌লাম গ্রহণও করে থাকে, তারা আসলে ছিল অমুসলমান—আরব কায়েত্, হাব্‌শী ও বাদিয়া। গৌড়েশ্বর যদু (পরে জালালুদ্দীন) ও "গাজী কালুর" দক্ষিণা রায়, এরূপ যারা ইস্‌লাম গ্রহণ করেছে তারা মূলতঃ ছিল অমুসলমান আরব। পাক-বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মান্তরের দৌলতে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ উপনিবেশের কল্যাণে। বস্তুতঃ পাক-বাংলা অমুসলমান ও মুসলমান আরবে মিলিয়ে আরব জজিরার বাইরে হালে আরবদের বৃহত্তম উপনিবেশ আরব আদমশুমারীর তরফ থেকে।

আধুনিক কালে ইউরোপের বণিক ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে পাক-ভারতের বুকে যে ক্ষমতার লড়াই হয়েছিল, সেরূপ বাংলার বুকেও তেমনি লড়াই হয়েছিল অমুসলমান ও মুসলমান আরব বণিক ও উপনিবেশিকদের মধ্যে। প্রাচীন সাহিত্যের "গাজীর গানে" এসব কাহিনীই বর্ণিত। এদেশের স্থায়ী অধিবাসীদের সংগে প্রায়ই এসব লড়াই হয়নি—যদিও মংগল বৌদ্ধরা মুস্লিম আরবদের এবং দ্রাবিড় হিন্দুরা অমুসলমান আরবদের করেছিল সমর্থন।

বাংলার ইতিহাসে চারটি ঘটনা বিস্ময়কর—সুদূর কর্ণাট থেকে এসে সহসা সেনদের সিংহাসন-লাভ, সতরো জন সিপাহী নিয়ে বখ্‌তিয়ারের বাংলা-জয়, ক্লাইভ-কর্তৃক বাংলার মসনদ দখল এবং যেখানকার সাহিত্যে পাকিস্তানের কোনো স্বপ্নই নাই, সেখানে পাকিস্তানের হুকুমত্ কায়েম। এই বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর পিছনে রয়েছে জনজীবনে আরব রক্তধারার সাবেক জোশ।

মধ্য এশিয়া থেকে সিন্ধু-নদীর মোহনা দিয়ে যে ছিল প্রাচীন কালের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-পথ, সে-নদী-মুখ বিন-কাসিম কর্তৃক দখলের প্রতিবাদে কর্ণাটের সেনেরা পাক-ভারতের অন্যতম ও বৃহত্তম বহির্বাণিজ্যের নদীপথ বাংলা দখল করে বসল। পাক-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কর্ণাটের সেনদের খোঁজ মিলেনা—বংগ-বিজয়ের এই বার্তা ব্যতীত। বস্তুতঃ সেনেরা ছিল অমুসলমান আরব—সেই দ্রাবিড়িস্তানে আর্য ব্রাহ্মণের রাজত্বলাভের সম্ভাবনা ছিল না। এছাড়া আর্য্য-ভারতে ব্রাহ্মণের সিংহাসন লাভ বৈদিক অনুশাসনের পরিপন্থী। আর্য্য ভিন্ন অন্য জাতি হিন্দু-ধর্মে দাখিল হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবী পেশ করেছিল যারা, তারা মারাঠী, রাজপুত ও কর্ণাটী সেন। দ্রাবিড়েরা কোন দিন ব্রাহ্মণত্বে দাবী পেশ করেন। সেনেরা আরব রক্তের বলেই সিংহাসন, ব্রাহ্মণত্ব ও সংস্কৃতে শাস্ত্রপাঠের দাবী আদায় করেছিল। সেনেরা দ্রাবিড় হলে বাংলার দ্রাবিড়দের দলে টানবার জন্যে সংস্কৃতকে নয়, রাষ্ট্রভাষা করত দ্রাবিড়দের জাতীয় ভাষা তেলেগু।

সুদূর কর্ণাট থেকে নিজ রাজ্য ত্যাগ করে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ দখলে না এনে বাংলা দখলের মূলে ছিল গুরুত্বপূর্ণ মত্‌লব। মুসলমান আরবদের দ্বারা সিন্ধুজয়ের ফলে মাতৃভূমি হতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন অমুসলমান আরবদের পাক-ভারতের উপকূলভাগের বিভিন্ন মোকাম থেকে এককেন্দ্রে জড়ো হয়ে আত্মরক্ষা ও আত্ম-

প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভূত হওয়াতেই শলাপরামর্শক্রমেই সেনেরা বাংলায় রাজ্য স্থাপন করে আরব-সাগরের উপকূল থেকে সুদূরে। সিন্ধুর মতো বাংলার বৌদ্ধরাও মুসলমান আরবদের প্রতি হামদর্দী দেখানোর দরুণ এখানকার দ্রাবিড়দের মদদ্ মুফত্ মিলে গেল অমুসলমান আরবদের। পরবর্তীকালে মুসলমান আরবেরা অমুসলমান আরবদের প্রতিষ্ঠা ধ্বংসের জন্যই বখ্তিয়ারকে ডেকেছিল বলেই সতর জন সিপাহী নিয়ে তাঁর পক্ষে লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়ন হয়েছিল সম্ভব।...ইংরেজ সেরেস্তায় এই কায়েতদের প্রতিপত্তির অসহনীয় সৌভাগ্যের দরুণই স্বপ্নদর্শী না হয়েও পাকিস্তানের হুকুমত্ মেনে নিয়েছে বাংলার মুসলমান।

সেনদের আগমনের পূর্বে বাংলা দেশ প্রস্তর যুগ থেকে বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসেও একমাত্র মানবীয় বা ঐশ্বরিক বই-কিতাবের পরচা-দাখিলা দস্তে এগিয়ে আসেনি।—হোক না সে কিতাব ভুট-চীনা বা দ্রাবিড় ভাষায়। বাংলা দেশে প্রথম সেনেরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত করে—হোক না সংস্কৃত ভাষায়, তবুও সাহিত্য। রেভারেণ্ড লাল বিহারী ও ও সৈয়দ আমীর আলী যে ইংরেজী বই-কিতাব লিখে গেছেন, তা-ও ব্যর্থ হয়ে যায়নি।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে গৌড়ের পাঠান নৃপতিদের একচেটিয়া তারিফ করা হয়েছে বাংলা সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে। এমন নির্জলা মিথ্যাও ইতিহাসে স্থান পেয়ে গেছে বে-মালুম। আসলে গৌড়েশ্বর যদু (পরে জালালুদ্দীন) এবং ছৈয়দ হুসাইন শাহ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহই সর্বপ্রথম বাংলা-সাহিত্য-চর্চার উৎসাহদাতা। এরা ত ছিলেন না পাঠান—ছিলেন আরব উপনিবেশিক। সেই উৎসাহে সাড়া দেয়নি দ্রাবিড়, সাড়া দেয়নি আর্য্য—সাড়া দিয়েছিল আরব ঔপনিবেশিক কায়েত। বস্তুতঃ বাংলা দেশে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য-চর্চায় ও উৎসাহে যারা ছিল জড়িত, তারা ছিল মুসলমান ও অমুসলমান আরব ঔপনিবেশিক ও এদের জন্দান।

এখানকার প্রবাসী আরবদের তিনটি দল—হাব্শী, কায়েত ও মুসলমান পরস্পর হানাহানি করে গৌড়ের তখ্ত কব্জায় আনলেও বহু দিন এরা এদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখ্তে পারেননি। হুসাইন শাহ কর্তৃক দশ হাজার হাবশী হত্যায় এদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। গণেশ ও হুসাইন শাহের বংশ ধ্বংসের পর প্রবাসী মুসলমান ও অমুসলমান আরবেরা ছোট ছোট সাময়িক রাজ্য-গঠন করে—বাংলা ভাষার চর্চা তখন গৌড় থেকে ঐ ছোট ছোট রাজ্য চলে যায়। খুব কম-সংখ্যক পাঠান নৃপতিই বাংলা সাহিত্য-চর্চার উৎসাহ দিয়েছিলেন। মুগল সুবাদারদের মধ্যে এমন দেখা যায়নি। রোসেং রাজ-দরবারে যে মংগল বৌদ্ধ নৃপতি বাংলা সাহিত্যের কদর করেছিলেন, তিনি পিতৃ রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে জালালুদ্দীন ও হুসাইন শা'র দরবারে বহুদিনের সহবতের ফলে সাহিত্য-রসিক হয়ে উঠেন।

সুতরাং বাংলা-ভাষা গঠন ও চর্চার মূলে ছিল আরব প্রবাসীদেরই কল্যাণকর হাত—এখানে ঈশ্বর, বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রেরও প্রবেশ আকস্মিক। কায়েত বা অমুসলমান আরব ও মুসলমান আরবকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্য ফের সপ্তম শতাব্দীতেই প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য।

এহেন অবস্থায়, ভবানী দাসের আরবী শব্দের ব্যবহার অসম্ভবও নয়, বিচিত্রও নয়। পূর্ব বংগের প্রাচীন সাহিত্যের মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেউ খুব বেশী আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেননি—যদিও এদের পূর্ব-পুরুষদের প্রায়ই আরব দেশাগত। সুতরাং "ময়নামতীর-গানের" রচয়িতা মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন পশ্চিম বংগের গরীবুল্লাহ। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যেও পশ্চিম বংগের নজরুলই আরবী-ফার্সী শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন—পূর্ব বংগের কোনো মুসলমান সাহিত্যিক নয়। পূর্ববঙ্গের আধুনিক কায়েত লেখকেরা এখনও তোবা (তওবা), কোয়া (আহ্বান), খতম (শেষ), তদ্বি (শাস্তি) প্রভৃতি আরবী শব্দ ব্যবহার করে যাচ্ছেন পশ্চিম বংগে বসে।

সুতরাং কোনো শব্দকে 'মুসলমানী,' 'হিন্দুয়ানী' বা 'খৃষ্টানী' মার্বল-মারা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে জায়েজ বলা যায় না। শব্দ ভাষার, ধর্মের নহে। আরবী-ফার্সী শব্দগুলোকে ডক্টর সাহেব মুসলমানী বলে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু পস্তু ও তুর্কী ভাষার 'তুন্ত-তুফান' ইত্যাদি শব্দগুলোকে তিনি কি বলতে চান? এ-গুলোও কি মুসলমানী? কোনো কোনো হিন্দু লেখক বিদ্বেষবশতঃ তা-ই বলে গেছেন বলে কি তিনিও তা-ই বলতে চান?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-মত পোষণ করতেন, ডক্টর সাহেবও এই মত পোষণ করেন যে, বাংলা ভাষায় যে-সব আরবী শব্দ এসেছে, সে-গুলো এসেছে এক কালের রাষ্ট্র-ভাষা ফারসীর মারফতে। এই ধারনা তাঁর মনে বদ্ধমূল, ভবানী দাসের আরবী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ তিনি বেহুদা সন্দিহান। বস্তুতঃ ফারসী শব্দের চেয়ে আরবী শব্দগুলো ভবানী দাস ও কায়েতদের ঐতিহ্য সামাজিকতা ও লৌকিক বাহন বলে পুরুষ পরম্পরা শব্দগুলো এদের মনের উপর ছবি এঁকে যাচ্ছে। আরবী ফার্সীতে পণ্ডিত মুসলমান ক'জন লেখকইবা আধুনিক কায়েত্ লেখকদের মতো আরবী শব্দ বাংলায় সুন্দর করে প্রয়োগ করতে পারেন?

একজন হিন্দু কবিকে বেদখল দিয়ে তার স্থানে

একজন মুসলমান কবির নামজারী করলে যতটা না ফায়দা তার চেয়ে জেয়াদা ফায়দা যদি কায়েত্ লেখকরা "মুসলমানী" শব্দতাঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে তাদের সমাজে ব্যবহৃত আরবী ও ফার্সী শব্দগুলো বেমালুম ব্যবহার করে যায়। মুসলমান লেখকদেরও আরবী শব্দ ব্যবহারের হীনমন্যতা তাতে অনেকটা লাঘব হতে পারে। এর চেয়েও বড় লাভ, পাক-বাংলার ধ্বনি, শব্দ ও ভাষাতত্ত্বের উপর বৈদেশিক প্রভাবের মৌলিক সত্যগুলির দিকে নৃতাত্ত্বিক গবেষকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সুযোগ ঘটবে বলে এক মহৎ ঐতিহাসিক তত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘটিত হয়ে যাবে।

বাংলা দেশে এই কায়েত বা অমুসলমান আরব ও মুসলমান আরবের উপনিবেশ স্থাপন এখানকার সামাজিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই কায়েতেরা পৌত্তলিক ছিলেন বলে হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করলেও "শ্রেষ্ঠবর্ণ সমাজ-বিধাতাদের দাসেরই তুল্য" হয়ে যায়নি আরব রক্তের দরুণ। এরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে ঢুকেছে হিন্দুধর্মে—সতীদাহে এদের মেয়েরা আত্মাহুতি দেয়নি, হনুমানজিকে দ্রাবিড়দের মতো দেবতা মানেনি—শাস্ত্রালোচনার বেড়া ডিঙিয়ে এরা ঢুকেছে বেদ-উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারতে—এদের পৈতৃক আরবীয় দেবীদের প্রতিষ্ঠা করেছে বৈদিক দেবতাদের মোকাবিলা—কান্যকুব্জ থেকে আর্য ব্রাহ্মণ এনে এরা নিজেদের মধ্য থেকে তৈরী করেছে ঠাকুর ও আচার্য্য।

নাম-সমস্যা সম্পর্কে ডক্টর সাহেব মন্তব্য করেছেন—"বাঙ্গালার কিছু-সংখ্যক মুসলমান হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে দীক্ষিত। এখনও মুসলমানের মধ্যে কালাচাঁদ, সাতকড়ি, পরাণ, রতন, কানাই, কেদার প্রভৃতি হিন্দু নাম দেখা যায়। আগে বংশগত হিন্দু-প্রভাব বেশী থাকারই কথা।"

হিন্দুদের মধ্যেও এরূপ আরবী ফারশী নাম দু'চারটা দেখা যায়—ফকিরচাঁদ, গীতি, লাতু (আরব-দেবী লাত-এর নামানুসারে) ইত্যাদি।

হালে ইস্কুল-কলেজ পড়ুয়া মুসলমান মেয়েরাও কেহ-কেহ হিন্দু নাম ধারন করেছে মা-বাপের সুতিকাগারের মুসলমানী নাম খারিজ করে—যথা—খাক্, নিশান-সই করে কি ফায়দা ?—কোনো কোনো সাহিত্যিক মেয়েরও এহেন নাম খবরের কাগজেই নজরে আটকে যায়।

সুতরাং নামের উপর নির্ভর করে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে দীক্ষার সিদ্ধান্তে পৌঁছার গুরু ঝুঁকি নেওয়া সংগত মনে হয় না। কেননা তাতে সত্যের অপলাপও হতে পারে। আমার মনে হয়, নামের এই বৈষম্য অনেকটা সামাজিকতা ও ফ্যাশনের উপর নির্ভরশীল।

এছাড়া কাদির যে কেদার, ছা'দ যে চাঁদ বা সাত, মাহতাব যে মাধব, ছোবহান গাজী যে শোভন গাজী (যার নিকট এক কপি "ময়নামতীর গান" পাওয়া গেছে) হয়ে যায়নি তারই বা হাদিস কোন্ রাবী বাত্‌লাবে ?

বাংলার কায়েতদের গোত্রীয় পদবী আজ স্থিতিশীল—প্রাচীন সাহিত্যে এর হেরফের দেখা যায়। নয়, "ময়না-মতীর গান"-এর সম্পাদক নলিনীকান্ত ভট্টশালী ভবানী "দাসকে" ষষ্ঠীধর সেনের পুত্র বলেছেন কেন ?

বাংলা দেশের ঠাকুর, ভট্টশালী, আচার্য্য,শাস্ত্রী, ত্রিবেদী ইত্যাদি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আজ পুরাপুরি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেও চট্টোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়দের সম-দর্জায় উঠেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, "রাধিকার মানভঙ্গ" নামক পুঁথির রচয়িতা "নরোত্তম ঠাকুর" রাজার ছেলে, জাতিতে কায়স্থ !"

হিন্দু কায়স্থ বা কায়েতের ছেলেরই পদবী শুধু "ঠাকুর" নয়—আরব দেশাগত মহি-আসোয়ারের বাংলার লোকেরাও প্রথমে ঠাকুর পদবী গ্রহণ করেছিল—তারপর পাঠান আমলে—'খান'। 'ঠাকুর' সম্ভবতঃ আরবী 'তাগুত্'-এর অপভ্রংশ। মহি আসোয়ার কখন এসেছিলেন তার সঠিক ইতিহাস কোথায় ? তিনি মুসলমান হয়ে এসেছিলেন, না, আরবে ইস্‌লাম প্রচারের পূর্বে পৌত্তলিক হিসাবে এখানে এসেছিলেন, কে জানে ?

বাংলার কায়েত এবং কায়েত-দর্জার ঠাকুররা যে আরব দেশাগত, প্রাচীন সাহিত্যালোচনা করলে তার অনেকটা শুভ ইংগিত পাওয়া যেতে পারে।

আয়েমে জাহেলিয়ার বা ইস্‌লাম-পূর্ব আরব জাতির চারটি ঐতিহ্য—কবিতা, গোত্রীয় কৌলিণ্য, নারী-দেবীর প্রতি দুর্বার নেশা এবং স্রষ্টার একত্ববাদ—বাংলার কায়েত্ ও কায়েত্-দর্জার ঠাকুরদের মধ্যে আজও ষোল আনা মওজুদ—পাক-ভারতের আর কোথাও হিন্দুদের মধ্যে এই চারটি ঐতিহ্যের একাধারে সমাবেশ দেখা যায় না।

বাংলার মুসলমানের মধ্যে যে হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষার দরুণ হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব রয়ে গেছে বলে একটা সাধারণ বিশ্বাস বাংলার হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত, অ বাঙালী পাক-ভারতীয় মুসলমান এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ-দের মধ্যে বিদ্যমান, এর মূলে সত্য নাই এই বলে যে, বৈদিক দেবতা অগ্নি, বরুণ, শিব, গণেশ প্রভৃতি এবং দ্রাবিড়দের জনপ্রিয় সেই মীণাক্ষীর (শিবের সংগে যাকে বিয়ে দিয়ে এর একটা সাংস্কৃতিক সন্ধি করে ফেলেছে) প্রতি বাংলার মুসলমান কোনোদিনই কথায় বা কাব্যে ভক্তি প্রকাশ করেনি। আর্য্যদের মহাকাব্যের দেবতা রাম, সীতা, হনুমানের প্রতি বাংলার মুসলমানই নয়, বাংলার কায়েত ও কায়েত-দর্জার ঠাকুরেরাও পূজা-অর্ঘ্য কোনোদিন দেয়নি, যদিও দক্ষিণ ভারতে হনুমান এবং

উত্তর ভারতে সীতারাম আজকের দিনের তথাকার হিন্দুদের জপমালায় জাজ্জ্বল্যমান স্থান দখল করে আছে।

কুঞ্জাগরী, কাত্যায়নী (সম্ভবতঃ আরবী 'কাহতান' শব্দের ছদ্মবেশ) ব্রত, মনসার ভাসান ও শনি-দুর্গা-লক্ষ্মী-স্বরস্বতীর পূজার মূলে রয়েছে পৌত্তলিক আরবীয় ঐতিহ্য!

বাংলার মুসলমান সাধারণতঃ আর গোত্রীয় বলে আরবীয় দেবীদের মোহ প্রথমতঃ পূরাপূরি কাটিয়ে উঠ্তে পারেনি। এখনও বাংলার মুসলমান মায়েরা ভাল ছেলে-মেয়েকে 'লক্ষ্মী' বলে আদর করে এবং খন্নাস ছেলে-মেয়েদের 'শনি' বলে শাসায়। সুতরাং মনসার ভাসান ও কাত্যায়ণী ব্রতে যোগ দিয়েছিল বা দেয় বলে বাংলার মুসলমানকে নিম্নবর্ণের হিন্দু হতে দীক্ষিত বলা সত্যের অপলাপ। মুসলমানেরা মুষ্টিমেয় হিন্দু সমাজ বিধাতাদের দাসের তুল্য ছিলনা কোনো দিনই। ডক্টর সাহেব "কিছু সংখ্যক" মুসলমান হিন্দু হতে দীক্ষিত বলে উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছেন—কোনো কোনো অতি-ভক্ত মুসলমান গবেষক (নিশ্চয়ই তিনি বাদে) প্রায় সব মুসলমানই নিম্নবর্ণের হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত বলে দাবী করেন; কিন্তু এসব ধারনা মাত্র—এসব কথার পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থন দেখা যায় না। বাংলার মুসলমান নিশ্চিতরূপে আরবী, তুর্কী, পাঠান, ইরাণী ও মোগলদের জন্দান—হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে যদি কেউ ইস্‌লাম গ্রহণ করেও থাকে, তবে সে ছিল পৌত্তলিক আরব উপনিবেশিক।

পাক-বাংলার ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একই আরব দেশের দুটো প্রবাসী ধর্মীয় দলের রয়েছে পারস্পরিক মিলন ও সংযত। সেজন্যেই প্রাচীন কায়েত লেখকগণের কেউ কেউ হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সত্বেও আরব প্রবাসী ইস্‌মাইল গাজী, বরখাঁ গাজীকে করেছিল বন্দনা। সতেরো শতকের কবি সীতা-রাম দাসের উক্তি—

"বন্দো পীর ইস্‌মাইলী গড় মন্দারণে"

ও

"তাহার চরণ বন্দো ভূমে হইয়া লোট।"

অথচ তদানীন্তন পাঠান নৃপতি বরবক শাহ ইসমাইল গাজীকে তাঁর বিজয়ের বিনিময়ে কতল করেন একজন কায়েত ভান্দসী রায়ের প্ররোচণায়।

বাংলা দেশে মুসলমান ও অমুসলমান আরব উপনিবেশিকদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার বিষয় আজও পৃথক করে আলোচিত হয়নি—অমুসলমান আরবেরা পাক-ভারতের বৃহত্তর হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করে মুসলমান আরবের ইস্‌লাম ও অনাবর মুসলমানের রাজ্য জয়ের দুন্দুভি নিনাদ থেকে আত্মরক্ষা করে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর মুসলমান আরবেরা বাণিজ্যহারা হয়ে তুর্কী-পাঠান মোগল মুসলমান বিজয়ীদের সাত শ' বছরের ঐতিহাসিক স্তূপের নীচে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। তাই আরব তৎপরতার ঐতিহাসিক মালমসলাগুলো বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে জ্বলজ্বল করে জ্বললেও এর গুরুত্ব নাই।

সেজন্য যে-সব আরবী শব্দ অমুসলমান আরবদেরও ঐতিহিক সম্পদ, সে-গুলোও 'মুসলমানী' শব্দ বলে খারিজ ক'রে দেওয়া হচ্চে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অমুসলমান আরবেরা ততটা শুদ্ধির পাল্লায় পড়েনি—পড়েনি বলেই ভবানী দাস ঐতিহিক অনুরাগে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর ফার্সী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন সাত শ' বছর ধরে ফার্সী যে রাষ্ট্র ভাষার গদী দখল করে পাক-ভারতীয় সমস্ত ভাষারই উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারই আমলের তিনি কবি বলে।

ভবানী দাস কর্তৃক ব্যবহৃত "মহিম" (আরবী শব্দ—অর্থ—গুরুতর কাজ—তথা যুদ্ধ) শব্দের মানে মালুম করতে না পেরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী কক্ষণে যাত্রা করেছেন বলে ডক্টর সাহেব নিজেই ঘনরামের ধর্ম-মঙ্গলের বরাত দিয়েছেন। ঘনরামও কি 'মহিম' শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে ধর্ম-মংগল রচয়িতার সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন? অথচ 'মহিম' শব্দটি আজো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থে ময়নামতীর চতুর্দিকে হিন্দু-মুসলমান উম্মি লোকেরা দেদার ব্যবহার করছে।

ডক্টর সাহেব আফসোস্ করেছেন এই বলে যে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী "মূল প্রথম পুঁথিতে কয়েকটি মুসলমানী ও বৈষ্ণবী ঘোষা যে বেশী ছিল," সেগুলো তিনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন তাঁর সম্পাদিত পুঁথিতে। মুসলমানী ঘোষাগুলো আসলে ছিল আরব প্রবাসী কায়েত ও মুসলমানের মিলিত ঐতিহিক ঘোষা। সম্ভবতঃ ঘোষা শব্দটি আরবী 'ঘাষিয়া' (Over whelming) শব্দটির ছদ্মবেশ। বেহুলার পালায়ও আদি কালে ইমাম হাসান হুসাইনের 'মাতম-জারী' যুক্ত ছিল।

পুঁথি সাহিত্য সম্পাদনায় ও সমালোচনায় এই হেরফের করা হচ্চে বলে শব্দ, ভাষা ও নৃতত্ত্ব সম্পৃক্তীয় বহু মৌলিক সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব নিখোঁজ হতে চলছে। কুমতলবে যা করা হচ্চে, তা বাদ দিলেও সুমতলবে যা করা হচ্চে, তারও গুরুত্ব কম নয়। এখানে আমরা একটা মিছাল পেশ করছি।

নরোত্তম ঠাকুরের (যিনি আসল জাতিতে কায়েত বা কায়স্থ) "রাধিকার মানভঙ্গ" নামক পুঁথি সম্পাদনা প্রসংগে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব বলেছেন—"এখন আমরা যে-সকল শব্দে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি, সে-

সকল শব্দেও এখানে ("রাধিকার মানভঙ্গ") চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থেও একটা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার হয় নাই। বহু শব্দে অকারণে 'ও'-কার যোগ দেখা যায়। যেমন—রসোবতী (রসবতী) মতো, বলো, ইত্যাদি। ক্রিয়ার অনুজ্ঞা স্থলেও 'ও'-কার যোগ একরূপ সাধারণ। যেমন-দেবো করো ইত্যাদি।...সাধারণ বর্ণশুদ্ধি করিয়া আমি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। পুঁথিতে প্রায় সর্ব্বত্রই 'কমা' 'যেই' 'আমি' 'আসি' 'দ্রব্য' এই সাধারণ শব্দগুলি 'কতা' 'জই' 'যামী' 'আমি বা যাসী' 'দর্ব্ব' লিখিত আছে। আমি কেবল সেরূপ ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছি।"

সাহিত্য-বিশারদ সাহেব যে-সব বর্ণশুদ্ধি করে পুঁথিটা সম্পাদন করেছেন, তাতে হালে পঠনের সুবিধা হলেও ধ্বনি, শব্দ, ভাষা ও নৃত ত্ত্ব 'ফসিল' যা প্রাচীন সাহিত্যে রয়েছে, তা নির্খোজ হতে চলছে। "রাধিকার মানভঙ্গ" এর আজকের নজরের গলদ বানান একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যের ইংগীত বহন করে। নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন সংস্কৃতে সু-পণ্ডিত—তাঁর সংস্কৃত শব্দগুলোর এহেন বিকৃত বানানের পেছনে তাঁর পাঠক সমাজ দাঁড়িয়েছিল নিশ্চয়ই তাঁকে সমর্থন করে। আরবীতে চন্দ্রবিন্দু নাই, আরবীতে "অ" বলে স্বরচিহ্ন বা স্বরবর্ণ নাই, আরবীতে দ্বিত্ব বর্ণ নাই (আরবীতে 'কথা' লেখা চলবে না,—লেখ্ তে হবে 'কতা'), আরবীতে এক রকম হরফের তসদিদ (বা যুক্ত) হলেও দু'রকম হরফের যুক্ত হয় না (আরবীতে 'দ্রব্য' লেখা যাবে না—লেখ্ তে হবে দরবু, দুর্ব্ব)—আরবী ভাষার এই মৌলিক কানুনগুলো নরোত্তম ঠাকুরের বাংলা "রাধিকার মানভঙ্গ"-এর খাঁজে-খাঁজে ভাঁজে-ভাঁজে মিলে যায়। সুতরাং নরোত্তম ঠাকুর ও তাঁর পাঠকেরা যে ছিলেন আরবীয় উপনিবেশিক, সে-কথা বল্লে নৃতাত্ত্বিক সত্যের দিকেই এগিয়ে যাওয়া হবে। আরবী হরফে প্রাচীন কালে যে বাংলা পুঁথি সাহিত্য লেখা হত, তার সংগে সর্বোতোভাবে "রাধিকার মানভঙ্গ" এর বাংলা হরফের পুঁথিও মিলে যায়। যথা—

কিন্তু মাত্ রো পাপো জানো তাহ্ হাতে নিসসয়ে
মুফসেদেরো কুতা এবে কুরো ওবুদান (আরবী হরফে বাংলা)
(কিন্তু মাত্র পাপ জান তাহাতে নিশ্চয়।
মুফসেদের কথা এবে কর অবধান।) (বর্তমান বাংলা বানান)

এহেন মিল থেকে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, নরোত্তম ঠাকুর মূল মুসাবিদাটা তাঁর পৈতৃক আরবী হরফে তৈরী করে পরে তাঁর মাতৃ হরফ বা ধর্মীয় হরফ নাগরীতে (তথাকথিত বাংলা হরফে) 'অ' রূপান্তরিত করেছিলেন—তবে জনগণের আরবী ধনিতত্ত্বের উপর নজর রেখে তা বাংলায়ও বজায় রেখেছিল। উপরের 'আরবী হরফে বাংলা' উচ্চারণের নমুনাই বলে দেয় যে, কেন নরোত্তম ঠাকুরের "বহু শব্দে অকারণ 'ও' কার যোগ দেখা যায়।"

এ-ছাড়া এসব পুঁথি ও লোক সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাও ছিলেন প্রায়ই আরব উপনিবেশিক। ময়নামতী (আরবী-মঈন), আয়নামতী (আইনুন-চক্ষু), বেহুলা (বাহলুসাহ), লখীনদর (লখ্ দীম), চাঁদ (সা'দ), সওদাগর, হুমরা (আরবী-রক্তবর্ণ), বেদে (বাদিয়া) প্রভৃতি নামগুলো খাস বা মিশ্রিত বা অপভ্রংশ আরবী শব্দ বলে যতটা মনে হয়, সংস্কৃত, তেলেগু বা মংগল শব্দ বলে মনে হয় না।

বস্তুতঃ প্রাক আজাদী আমলের হিন্দুস্তানী আলেমদের ওয়াজ-নসিহতের ফলে বাংলার আরব উপনিবেশিক মুসলমান অনেক গর-ইস্‌লামী আরবী রেওয়াজ বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু অমুসলমান আরবগণ এই হেদায়েতের বাইরে ছিল বলে এদের মধ্যে অনেক প্রাচীন আরবী রেওয়াজ আজও বিদ্যমান। প্রাচীন কালের আরবদের মতো এদের মেয়েদের এখনও ট্যাকুরীর (ঠাকুরী-তাগুত) ও জিনের আছর হয়, ওঝা-বদ্দি (আরবী-ওঝা ও বাদিয়া) এনে তবে তা দূর করতে হয়—কৃতকার্যের জন্য পুনর্জন্মের চেয়ে মৃত্যুর পরে জগৎস্বামীর কাছ জবাবদিহি হতে হবে বলে অধিকতর বিশ্বাস করে এরা—বিধবাদের বিবাহের জন্য বৈষ্ণবী পন্থায় কার্য্যকরীভাবে এরা আরবীয় ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে—বৈষ্ণবদের একাধিক বিধবা মেয়েকে বৈষ্ণবী হিসাবে গ্রহণ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—এমন কি, দক্ষিণ আরবের সেই সুপ্রাচীন রীতিও কোনো বৈষ্ণবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়!

আজ হতে তিন শ' বছর পূর্বে ভবানী দাস যখন "ময়নামতীর গান" লেখেন তখন এখনকার চেয়ে আরবীয় ঐতিহ্য কায়েতদের মধ্যে নিশ্চয়ই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। মুসলমান যেমন হিন্দুস্তানী আলেমের হেদায়তের দরুণ পৌত্তলিক আরবী রেওয়াজ বিসর্জন দিয়েছে, তেমনি গয়াকাশীর আর্য্য গুরুজীদের প্রচারণায় এখানকার কায়েতেরাও অনেক আরবী রেওয়াজ, শব্দ ও হরফ ত্যাগ করেছে। পুল-সেরাত, বহুবিবাহ, পরলোকে জবাবদিহি, জিনপরী ইত্যাদি ইসলামে অনুষ্ঠিত নতুন আবিষ্কার নয়—বস্তুতঃ এগুলো প্রাচীন আরবীয় রেওয়াজ বা বিশ্বাস—কোনটার ইস্‌লাম সমর্থন দিয়েছে, কোনটার দেয় নাই আর কোনটা বা করেছে 'কন্ট্রোল'।

অসম্পূর্ণ

চৌধুরী আব্বাস উদ্-দীন

সুন্দর মুখের একটি মানুষ। পদ্মার মত ফুটফুটে চেহারা। দুধে আলতার রঙ্। গোলাপের পাপড়ির মত সুকোমল ও রাঙা দুটি ওষ্ঠ। মাথা ভরা এক রাশ নিবিড় কালো চুল। ঝুমরু আজো ভুলে নাই,—ভুলতে পারেনি সেই সুন্দর মুখের মানুষটিকে।

পদ্মার বুকে ছোট্ট একটা জেলে ডিঙ্গি। পদ্মার উত্তাল পানিতে জাল বিছানো হয়েছে। ঝুমরু নৌকো দিয়ে টইল দিচ্ছে। এই ওর কাজ। চিরদিন এই কাজই সে করে আসছে। আজো মাঝে মাঝে সেই সুমধুর হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিটি তাকে আনমনা করে তোলে। বিস্ময় চকিত দৃষ্টি মেলে সে চেতনা হারা হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। আপন অজ্ঞাতেই হাল ছেড়ে দেয় সে। ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে থাকে নৌকো। সংগে সংগে দুলতে থাকে ঝুমরুর সারা মন। আবর্ত জাগে পানিতে! ক'বার পাক খেতেই ঝুমরু নৌকোর হালটাকে চেপে ধরে। স্মৃতি-সিক্ত অপরূপ মুখখানি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আসে। ঝুমরু আবার বিমনা হয়ে পড়ে। মন চলে যায় পেছনে। হারিয়ে যাওয়া অতীতের রোমাঞ্চকর কাহিনীটা বেদনাসিক্ত স্মৃতি নিয়ে বর্তমান হয়ে ভেসে ওঠে ওর মনে। ঝুমরুর ঠিক ঠিক মনে আসে সবই।

সুন্দর একটি সকাল।

পূব-আকাশ তখনো সোনার রঙ্ গায়ে মাখেনি।

সবে মাত্র পাখিরা নীড় ছেড়ে বেরুচ্ছে।

পদ্মা তখন কানায় কানায় ভরা। পরিপূর্ণ যুবতীর রূপ তার সারা দেহে। তাই সে আরো চঞ্চলা-আরো উদ্দাম। কোন বাধা বিপত্তিকেই সে মানে না। তার কল্‌কল্‌ হাসির ধ্বনিতে ঝুমরু আত্মহারা। ঘরের বাঁধন তাকে কোনমতেই আটকে রাখতে পারে না। তাই প্রয়োজন না পড়লেও একটু সকাল সকালই পদ্মার বুকে সে নৌকো ভাসায়। সুন্দরী তরুণী হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে কোন তরুণকে। সে আহ্বানকে এড়িয়ে চলবার কোন উপায় তার জানা নেই। পদ্মার রূপ সেই সুন্দরী তরুণীর হাতছানির মতই আকৃষ্ট করেছে ঝুমরুকে। ঝুমরু ভালবাসে পদ্মাকে। পদ্মাই তার জীবন।

কিন্তু আজো কি ঝুমরু পদ্মাকে ভালবাসে?

তাই বা হবে কেমন করে!

তবে কেন ঝুমরু এমন আনমনা হয়ে পড়ে?

আজ আর সে পদ্মাকে ভালবাসে না···ভালবাসে না নয়। ভালবাসতে পারে না। পদ্মার বুক থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে তার ভালবাসাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এলোমেলো করে দিয়েছে ঝুমরুর শান্তিময় জীবনকে।

ঝির ঝির করে বাতাস বইছিল। ঝুমরু বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। বাতাসের দমকায় ওর শরীরের শক্ত মাংস-পেশীগুলো ক্ষুধার্তের মত জেগে উঠল। ঝুমরুর ডিঙ্গি দুলছে···সেই সংগে নাচছে ঝুমরু নয়—ঝুমরুর সারা মন। পদ্মার মতই ওর বুকেও ডাকছে বান। ঝুমরু জাল পাহারা দিচ্ছে নয়—ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা পদ্মাতে। মনের সুখে গান ধরেছিল ঝুমরু।

এমন সময়!

সহসা দূরে কি একটা বস্তু ঝুমরুর দৃষ্টিগোচর হলো। সংগে সংগে রুদ্ধ হয়ে গেল আবেগে টেনে আসা গানের কলিগুলো। ঝুমরুর চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। দাড় বেয়ে চলল সে ক্ষিপ্রহস্তে। কাছে আসতেই নজর পড়ল তার গোলাপী রঙের বহুদামী একটি শাড়ীর আঁচল। পানির মধ্যে যেন জলকেলি করছে।

ঝুমরুর মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো।

একটা অজানা শঙ্কায় ওর শরীর কেঁপে উঠল। শক্ত-মাংশ পেশীর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা তাজা রক্তগুলো টগবগিয়ে ফুটে উঠল। তারপর একটা মুহূর্ত মাত্র। পরণের লুঙ্গিটিকে দৃঢ় করে শরীরের সাথে জড়িয়ে ঝুমরু ঝাঁপিয়ে পড়ল পদ্মার উত্তাল তরঙ্গে। পর মুহূর্তেই শাড়ীটাকে লক্ষ্য করে একটা ডুব দিল।

ডুব দিয়ে কোথায় গেল, কি হলো তা' ভাল করে মনে নেই ঝুমরুর। তবে যখন সে পানির উপর গলা ভাসাল, তখন সে আশ্চর্য হয়ে দেখল, ওর হাতে আবদ্ধ একটি তরুণীর অচেতন দেহ।

উঃ। ঝুমরুর জীবনে সে এক আশ্চর্য মুহূর্ত। কোথা হতে এক রাজ্যের শক্তি এসে যেন ওর শরীরে জমা হলো। কি ভাবে সেদিন সে তরুণীর দেহটিকে আঁকড়ে ধরে নৌকোয় তুলেছিল, তা' ভেবে ভেবে কোন দিশকূল পায় না ঝুমরু। শুধু সেই স্মৃতিটা ওকে উত্তেজনায় বিহ্বল করে তোলে। সেই আশ্চর্য মুহূর্তটিই ওর জীবনে পরম সম্পদ হয়ে রইল।

নৌকোয় তুলে তাড়াতাড়ি সিক্ত কাপড়টি দিয়ে মেয়েটির অদ্ভুত সুন্দর দেহটিকে ঢেকে দিল। তখন আরো চমৎকার দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। ভেজা কাপড় ভেদ করে ওর প্রতিটি অঙ্গই ফুটে বেরিয়েছিল। মেয়েটির মুখ-খানি যেন অসম্ভব ক্লান্ত। বিষণ্ণ ও পাণ্ডুর ঝুমরু সেদিন

মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিল, মানুষ কি কখনো এত সুন্দর হতে পারে?

পানির মানুষ ঝুমরু ওর সারা জনমের অভিজ্ঞতা হতে বুঝতে পেরেছিল, মেয়েটির দেহে এখনো জীবনের স্পন্দন আছে। চেষ্টা করলে এখনো ওকে বাঁচানো যেতে পারে। এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুমরু মেয়েটির পেটে চাপ দিল। গল গল করে বেরিয়ে এলো পেটের মধ্যে অবাঞ্ছিতভাবে প্রবেশ করা পানি। তারপরেই সে শক্ত হাতে হাল ধরল। ছলাত্ ছলাত্ করে পানিতে ঘন ঘন দাড় পড়ল। ঝুমরু মেয়েটিকে নিয়ে ওর বাড়ীতে পৌঁছাল।

লোকজনহীন পদ্মার পাড়ে গোল পাতার ছাউনি দিয়ে একখানি কুটির। ঝুমরুর বাসগৃহ। সযত্নে মেয়েটিকে এনে শুয়ে দিল সে। কবিরাজের ঔষধে এবং ঝুমরুর আপ্রাণ চেষ্টায় মৃত্যুপথ যাত্রী মেয়েটি বেঁচে উঠল।

: আমি কোথায়—জ্ঞান হওয়ার পর মেয়েটি প্রথম কথা বলল।

: তুমি নিরাপদ স্থানেই আছো—ঝুমরু খুশীমনে জবাব দিল।

: তুমি—মেয়েটি অবাক চোখে তাকাল, তুমি কে?

: আমিই তো তোমাকে বাঁচিয়েছি—ঝুমরু নিজের বলিষ্ঠ শরীরের পানে চোখ বুলিয়ে বলল, তুমি আমার বাড়ীত আছো।

: কেন, কেন তুমি আমাকে বাঁচালে—মেয়েটি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগে ভেঙ্গে পড়ল, আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?

ঝুমরু বোকা বনল। এ কি কথা। মরে যাচ্ছিল সে বাঁচিয়েছে,—এ তো আনন্দের কথা। তবে মেয়েটি কাঁদছে কেন? ওঃ—ঝুমরু ভাবল, মেয়েটি তাকে ভয় করেছে। ভাবছে বুঝি এখান থেকে আর ফিরতে পারবে না। ঝুমরু একটা বেদনা অনুভব করল। মেয়েটির আরো একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বলল, তোমার বাড়ী কোথায় বল, আমি পৌঁছে দেবো তোমাকে।

ঝুমরুর অভয় বাণীতে মেয়েটি বুঝি ভয় পেল আরো বেশী। নয়ত ও কথা শুনে আরো ফুঁপিয়ে কাঁদবে কেন সে?

ঝুমরুর কথা শুনে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, কে বাড়ী যেতে চাচ্ছে? আমি বাড়ী যাবো না। আমার কোন বাড়ী নেই।

আচ্ছা বিপদে পড়ল ঝুমরু। কি করবে ভেবে পেল না সে। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পাছে মেয়েটির ক্ষত স্থান আঘাত করে বসে, সে ভয়ে চুপি চুপি সরে গেল ঝুমরু।

ঝুমরু সরে গেল; কিন্তু মেয়েটি আর গেল না কোথাও, রয়ে গেল তখনকার মত ঝুমরুর শূন্য বাস গৃহখানিতেই। এরপর মেয়েটির বাড়ী যাওয়ার কথা এবং পদ্মাতে ডুবার কাহিনী সে আর জানতে চায় নি। তবু যখন মাঝে মাঝে ওর মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠতো কোন মতেই যখন সে মনকে দমিয়ে রাখতে পারত না, তখন কথায় কথায় সে জিগ্গেস করত, তোমার বাড়ী কোথায়?

মেয়েটি চুপ করে থাকত।

ঝুমরুও বুঝে শুনে আর কোন প্রশ্ন করত না।

একটা দিনের কথা সুন্দরভাবে মনে পড়ল ঝুমরুর। খেয়েদেয়ে একটু আরামের জন্যেই ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে ছিল সে। ঘুম লাগেনি চোখে, এসেছিল তন্দ্রার আমেজ।

এমন সময় ভীতা হরিণীর মত ছুটে এল মেয়েটি। ঝুমরুর গায়ে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে বলল, আমাকে বাঁচাও।

ধড়ফড় করে উঠে বসল ঝুমরু। চারদিক চেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলো সে। মেয়েটি ওকে উঠতে দেখে বলল, ওরা আসছে। আমাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাবে।

: কোথায়—ঝুমরু যেন হুঙ্কার ছাড়ল।

: ঐ ত—মেয়েটি বেড়ার ফাঁক দিয়ে পদ্মার দিকে আঙ্গুল বাড়াল।

পদ্মার বুকে ছোট একটা মোটর লঞ্চ। ঝুমরু অবাক হলো। চোখ দুটো রগড়ে আবার তাকাল। কই, কেউ নেই তো? বিস্মিত কণ্ঠে ওর মুখ হতে বেরুল কে, কে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে?

: ঐ যে মোটর লঞ্চে করে ওরা আসছে। মেয়েটি ভয় ভয় কণ্ঠে বলল, এবার আমি আর পালাতে পারব না।

: তোমার ভয় নেই—ঝুমরু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে ওরা তোমার গায়ে হাত লাগাতে পারবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মেয়েটির আশঙ্কা ভিত্তিহীন। লঞ্চটি অন্যপথে পাড়ি জমাল।

মেয়েটি সসম্মানে আরো কিছুদিন ছিল ঝুমরুর ওখানে। ঝুমরু ওর থাকবার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল। গঞ্জে গিয়ে দু'তিনখানা পরনের শাড়ীও এনে দিয়েছিল। আর আর দরকারী এটা ওটাও এনেছিল। সে সব আজ মেয়েটির জ্বালাময় স্মৃতি নিয়ে ঝুমরুর শূন্য গৃহেই পড়ে আছে।

একদিন!

ঝুমরু সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে প্রশ্ন করল, তুমি মোটর লঞ্চ দেখে সেদিন ওমন ভয় পেয়েছিলে কেন?

মেয়েটি নীরব। কেমন যেন চিন্তান্বিত মনে হোল ওকে। ঝুমরু নিজেই আবার বলল, আপত্তি থাকে তো থাক্।

দু'তিন বার চোখের পাতা কাঁপল মেয়েটির। একটু

ভেজা ভেজাও হয়ে এলো। একটা দীর্ঘ চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে, শুনবে সেকথা? একান্তই শুনতে চাও?

ঝুমরু মুখে কোন কথা না বলে শুধু মাথা দোলাল।

: শোন তবে—ঝুমরুর মনে হচ্ছে কথাগুলো যেন আজ আবার পদ্মার বুক থেকে উঠে আসছে, আমি একটি ছেলেকে ভালবাসতাম গোপনে গোপনে। আমার ভালবাসার কথা কেউ জানত না। অনেকদিন এইভাবে কাটল। একদিন আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমারই অসতর্কে। সবাই আমাকে ছিঃ ছিঃ দিল। বাবা তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় আমার বিয়ে দে'য়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। আমি যে ছেলেটিকে ভালবাসতাম তার বড় অপরাধ সে ছিল গরীব। সমাজের উঁচু আসনে মানুষ আমরা, নীচুস্তরে নেমে যাই কি করে? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আমার জন্যে না হলেও বাবার টাকার জন্যে সমাজের মাথাগুলো ছুটে এলো আমাকে বিয়ে করবার জন্যে।

ঝুমরু চারদিক তাকাল। কে কথা কইছে? কই কেউ তো নেই। কাকেও দেখছে না ঝুমরু। তবে সে কার কথা শুনছে?

: পাত্র ঠিক হয়ে গেল। বংশের সাথে বংশ। টাকার সাথে টাকা। আমি কত কাঁদলাম বাবার পা জড়িয়ে। কিন্তু না, পাষাণ মনে বেদনার হাওয়া লাগল না। বাবার মন টললো না। কালেমা পড়িয়ে বিয়ে দিলেন আমার।

: তারপর—সেদিনের মত আজও পদ্মার পানে চেয়ে প্রশ্ন করল ঝুমরু।

: বিয়ের পর বরযাত্রীদের সাথে একটা যন্ত্রের মত আমাকেও তুলে দিল। ট্রেনের রাস্তা পার হয়ে আমরা লঞ্চে উঠলাম। নির্জন লঞ্চের কামরাতে স্বামী এলো আমার কাছে। আলতো আলতোভাবে সুন্দর সুন্দর কথা বলতে লাগল। সহ্য করতে পারলাম না আমি। সবার অলক্ষ্যে চলন্ত লঞ্চ হতে পদ্মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান হতেই তোমার কাছে নিজেকে দেখতে পেলাম।

ঝুমরুর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরুল। সে আজো ভাবে, কেন এমন হয়? খোদার তৈরী মানুষের এ দুনিয়াতে মানুষ কেন মানুষকে দুঃখ দেয়। টাকা-পয়সার জন্যে মানুষ কেন মানুষের জীবনকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয়? ভালবাসা কি টাকা-পয়সা দিয়ে খরিদ করবার জিনিষ? এসব কথার কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব আজো খুঁজে পায় না ঝুমরু।

: তুমি কি আর কোথাও যাবে না—ঝুমরুর কণ্ঠে প্রশ্ন বেজেছিল।

: যদি কোনদিন আমার মনের মানুষটির দেখা পাই, তবেই ফিরব। নয়ত আর কোথাও তো যাবার জায়গা আমার নেই।

এরপর থেকে ঝুমরুর ব্যবহারে কেমন যেন পরিবর্তন আসে। খানিকক্ষন মেয়েটির সুন্দর মুখখানি না দেখলে যেন তার পৃথিবী অচল হয়ে যেতে চায়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েটি যেন তাকে যাদু মন্ত্রের মত টেনে নিয়ে যায়। কেমন করে ধীরে ধীরে ওর মনে মেয়েটি আসন পেতে বসল, আজও ভেবে ভেবে কোন হদিস পায় না ঝুমরু। কতবার চেষ্টা করেছে সে, মেয়েটিকে ভুলে থাকতে, কিন্তু পারে নি। চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয়ে পদ্মার বুক হতে ছুটে গেছে সে মেয়েটির কাছে। দুরন্ত ঝড়ের মত ঐ রূপসী মেয়েটি এসে ঝুমরুর জীবনকে এলোমেলো করে দিল। ঝুমরুর দিন আর রাত একাকার হয়ে গেল মেয়েটির জন্যে। ক্রমে ক্রমে মেয়েটিই সব হয়ে উঠল ওর জীবনের। ঝুমরু নিজেকে হারিয়ে ফেলল,—তলিয়ে গেল মেয়েটির মধ্যে।

কিন্তু ঝুমরু একদিন তার ভুল বুঝতে পারল। পদ্মা হতে ফিরে এসে মেয়েটিকে সে আর কোথাও দেখতে পেল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। ঝুমরু খুঁজল অনেক। সবই বৃথা হলো।

পদ্মার পানিতে ভেসে ওঠা সুন্দর মুখখানির পানে তাকিয়ে ভাবছে ঝুমরু, মেয়েটি সত্যিই ওর মনের মানুষটিকে খুঁজে পেয়ে চলে গেছে, না ওর আচরণে ভয় পেয়ে পালিয়েছে?

ঝুমরুর মনে আরো প্রশ্ন জাগে, একজন মানুষকে আর একজনের এমনভাবে ভাল লাগার অর্থ যদি ভালবাসাই হয়, তবে কি ঝুমরু মেয়েটিকে ভালবেসেছিল?

আমাদের মিস মেয়ো

খাজা

সে অনেক দিন আগের কথা। মিস মেয়ো ভারত ঘুরে গিয়ে ভারতের ধর্ম ও সমাজে যত কিছু মন্দ আছে কেবল তারই ক্লেদাক্ত বর্ণনা দিয়ে লিখেন 'মাদার ইণ্ডিয়া।' তাঁর একটা সার্থক পরিচয় দেন গান্ধীজী। তিনি বলেন, 'মিস মেয়ো হচ্ছেন নর্দমার দারোগা। তিনি এ-দেশের ভাল কিছুর পানে নজর দেন নাই, খুঁজে খুঁজে দেখছেন কেবল তার নর্দমার গলিজ।'

সেদিন একটা সমালোচনা পড়ে মনে হল, আমাদের মধ্যেও একটি মিস মেয়ো আছেন, তবে তিনি পুরুষ—মিস নন।

কথাটা খোলাসা করে বলি।

কয়েকদিন আগে একদিন সকাল বেলায় বৈঠকখানায় বসে চায়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছি; জানালা পথে দখিন হাওয়া ঢুকে ঘামে ঘিন্ ঘিন্ রাতের ক্লান্ত গ্লানিকে স্নিগ্ধ পরশে দেহ হতে মুছে নিচ্ছে; মেঘ-ভাঙা আকাশের ফাঁকে ফাঁকে এসে প্রভাতী আলো মাঠ ঘাট ছেয়ে ফেলেছে; পোষা বিড়ালটা পায়ের চার পাশে ঘুরে ঘুরে—মাঝে মাঝে তার লোমশ গা আমার পায়ে ঠেকিয়ে মাথা লেজ উভয় উঁচু করে সংক্ষেপে বলছে—'মিউ': অর্থাৎ হে জীবশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান, জাতিপুঞ্জ বিঘোষিত এ-মহাসাম্যের যুগে তুমি পেয়ালাটা একেলা নিঃশেষ না করে আমার হিস্যাটা রেখে দিয়ো।' এই প্রস্তাবিত মহাসাম্য অনুশীলনের আসন্ন সুযোগ সম্ভাবনায় আমার দিল্ খোশ হয়ে উঠেছে; এমন সময় টেবিলে শায়িত রেডিয়ো অফিসের একখানা পত্রের উপর নজর পড়ল।

খাম খুলে দেখলাম: 'পুস্তক সমালোচনা: ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, হেড্ অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।'

ভাবলাম, চমৎকার! একটা সুন্দর লেখা পড়ে আজকের এই সুন্দর সকালটা সার্থক হবে। আর এমন পরম বিদ্বান ব্যক্তি যখন এগিয়ে এসেছেন, তখন আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান দৈন্য আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না।

সমালোচনাটা আশান্বিত চিত্তে পড়লাম। একটা পরম জ্ঞান লাভ হল: পর্বত যে সত্যি মূষিক প্রসব করতে পারে, তার একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ পেলাম।

ডক্টর সাহেবের কথা পাঠকের সামনে উপস্থাপিত না করে তার সমালোচনা করলে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। তাই আমরা ক্ষমাশীল পাঠকের অনুমতি নিয়ে তাঁর সমালোচনার সবটুকুই এখানে উদ্ধৃত করছি।

তিনি রেডিয়োতে বলেছেন:

(১) 'আজকের দ্বিতীয় বইটি একটি উপন্যাস; নাম বৌ-বেগম। প্রকাশক পূর্বাচল প্রকাশনী। দাম সাড়ে তিন টাকা। লেখক খাজা। খাজা কারও ছদ্ম নাম। ছদ্ম নাম ব্যবহারের মধ্যে লেখক যতটা শালীনতা ও সংযম বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর রচনায় তার কিঞ্চিৎ আভাস থাকলেও উপন্যাসটি পড়বার যোগ্য হত। ১৯৫৮ সালের রচনা, কাহিনীর পটভূমি পূর্ব পাকিস্তান। অথচ আগাগোড়া লেখক যে অদ্ভুত বাস্তবতা বর্জিত ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করে গেছেন, তা আরব্য উপন্যাসের মানানসই হবে কিনা সন্দেহ। গল্পটি সংক্ষেপে এই:

(২) মোগল পাড়ার তরুণ জমিদার ওমর বেগ নিঃসন্তান। তাঁর সুন্দরী স্ত্রী লায়লা—ইনি হচ্ছেন বৌ-বেগম—তাঁকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ওমর বেগ লায়লার মনে আঘাত দেবার কথা ভাবতে পারেননি। সন্তানের চিন্তা তাঁকে ক্রমশঃই বিমর্ষ করে তোলে। অবশেষে মায়ের অনুযোগ ও অনুরোধে তিনি আবার বিয়ে করতে রাজী হন। তখন লায়লা মনক্ষুণ্ণ হয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে যান। তখনও তিনি মনে মনে ওমর বেগকে ভালবাসেন এবং যখন শুনতে পান যে ওমর বেগের দ্বিতীয়া স্ত্রী মাসুমার গর্ভে একটি ছেলে হয়েছে, তাঁর মনে আহ্লাদের সীমা থাকে না। এদিকে নিজের বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে লায়লা নিজের যৎসামান্য তালুকের তত্ত্বাবধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে প্রজাদের মধ্যে তাঁর অসামান্য রূপ ও গুণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি স্কুল পাঠশালা স্থাপন করেন এবং দেশে নতুন জীবনের গোড়া পত্তনের স্বপন দেখেন।

(৩) ওমর বেগের দ্বিতীয়া স্ত্রী মাসুমা ও ওমর বেগের জননী বৌ-বেগমকে ফিরিয়ে নিতে আসেন; কিন্তু তাঁর অভিমান তখন শেষ হয়নি। যখন তিনি শুনতে পান যে সম্পত্তি হাত করবার উদ্দেশ্যে মাসুমার বাবা মাসুমার ছেলেটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে তখন বৌ-বেগম মোগল পাড়ায় এসে ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য পণ্ড করেন এবং ওমর বেগের জমিদারী রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন।

(৪) হঠাৎ একদিন বৌ-বেগম মোগলপাড়া ছেড়ে ফিরে আসেন তাঁর নিজের জমিদারীতে। আবার কিছু

দিন পর যখন ওমর বেগ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী, তখন ফেরেশতার মত মোগল পাড়ায় তাঁর আবির্ভাব হল। ওমর বেগের তত্ত্বাবধানের ভার নিজে নিয়ে তাঁকে মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং কিছুদিন পর একদিন তিনি মোগল পাড়া ছেড়ে চলে আসেন এবং ওমর বেগকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি আর মোগল পাড়ায় ফিরবেন না।

(৫) মোটামুটি গল্পটি এই। বলা বাহুল্য অনেক ঘটনা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। উপন্যাস হিসাবে বইটির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এতে কার্যকারণের মধ্যে কোন পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়তে ভাল লাগে তার কারণ সেখানে শিল্পী যে জগতের চিত্র এঁকেছেন সেটি বিশিষ্ট নিয়ম মেনে চলে; সেখানে মানুষ, পশুপক্ষী, দৈত্য-দানব একই নিয়মের অধীন। তাই অদ্ভুত ও অবাস্তব ঘটনাকে আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু সাধারণ উপন্যাস আলাদা জিনিস। এখানে বাস্তব আর অবাস্তবের গোঁজামিল দিতে গেলে রচনা রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। বৌ-বেগমের ত্রুটিও তাই।

(৬) একটা নমুনা শুনুন। ওমর বেগ যখন শুনলেন যে তাঁর শ্বশুর তাঁর ছেলেকে বিষ খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন স্বভাবতঃই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি হুকুম দিলেন, তাঁর শ্বশুরকে হাতী দিয়ে পিষিয়ে মারা হোক। ঘটনা ১৯৪৭ সালের পরের। ১৯৪৭ সালের পরও কোন জমিদার হাতী দিয়ে লোক খুন করতে পারত, এ-খবর অনেকেরই জানা না থাকবার কথা। আরও মজার কথা এই যে, উপন্যাসের চরিত্রেরা সবাই প্রায় এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। অবশ্য বৌ-বেগম শেষ পর্যন্ত ওমর বেগের শ্বশুরের প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ঘটনাটি এমনি অবাস্তব যে ওমর বেগের ক্রোধে অভিভূত হওয়া দূরের কথা, পাঠকের মনে শুধু কৌতুকের সৃষ্টি হয়।

(৭) বৌ-বেগমের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। এর ভাবালুতা ইত্যাদির কথা না বলাই ভাল, কারণ একে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলতে কেউ রাজী হবেন বলে মনে হয় না। উপন্যাস তো এটি নিশ্চয়ই নয়। এ-ধরণের লেখা যে এ-দেশে এখনো ছাপা হয়, এ-কথা মনে করলেই আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যের কথা মনে পড়ে।

উপরোক্ত সমালোচনা হতে দেখা যায়, ডক্টর সাহেব বৌ-বেগম সম্বন্ধে যে সব রায় দিয়েছেন, তা এই:

(১) বইখানিতে শালীনতা ও সংযম বোধের কিঞ্চিৎ আভাসও নাই। অতএব বইটা পড়ার অযোগ্য।

লক্ষ্যনীয়: বইটিতে যে কেবল শালীনতা ও সংযম বোধ নাই, তা নয়; অমন বোধের আভাসও নাই। আবার কেবল যে আভাস নাই, তা নয়, কিঞ্চিৎ আভাসও নাই। আবার, বইখানি পড়ার তেমন যোগ্য নয়, বা সকলে পড়ে খুশী হবেন না, তেমন কোন কথাই নয়—বইটি পড়ার একদম অযোগ্য।

লেখকের প্রতি সমালোচকের এ রায় চরম রায়—ফাঁসীর হুকুমের শামিল। পাঁচ টাকা জরিমানা করতে হাকিম সাক্ষী প্রমাণের তেমন পরোয়া করেন না। কিন্তু ফাঁসীর হুকুম দেওয়ার আগে তিনি সাক্ষী প্রমাণ ও আইন একবারের জায়গায় দশবার তন্ন তন্ন করে বিবেচনা করেন, গালে হাত দিয়ে ভাবেন, তারপরও জুরী ডেকে তাদের মতামত শোনেন; তার পর তাঁর রায়ে সে সবের বিস্তৃত আলোচনার পর তবে তাঁর হুকুম জারী করেন।

ডক্টর সাহেব তাঁর সমালোচনায় বৌ-বেগমের যে চুম্বক দিয়েছেন, তাতে শালীনতা ও সংযম বোধের অভাবের প্রমাণ নাই। অন্ততঃ যে পরিমাণ প্রমাণ পেলে ফাঁসীর রায় দেওয়া চলে সে পরিমাণ প্রমাণ তো নাই-ই।

(২) ডক্টর সাহেবের দ্বিতীয় রায়: 'আগাগোড়া লেখক যে অদ্ভুত বাস্তবতা বর্জিত ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করে গেছেন তা আরব্য উপন্যাসের মানানসই হবে কিনা সন্দেহ।'

এখানেও লক্ষ্যনীয়: শুধু বাস্তবতা বর্জিত নয়, অদ্ভুত বাস্তবতা বর্জিত। অর্থাৎ ফের চরম রায়—ফাঁসীর হুকুম।

বৌ-বেগমে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহের যে সারাংশ তিনি নিজে দিয়েছেন, তাতে কোন্ কোন্ ঘটনা অদ্ভুত বাস্তবতা বর্জিত, তা তিনি নিজ মুখে বলেন নাই, তাঁর বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ হতেও বোঝা যায় না। যে পরিমাণ প্রমাণ পেলে ফাঁসী বা কালা পানির হুকুম দেওয়া চলে তা তো নাই-ই।

(৩) ডক্টর সাহেবের তৃতীয় রায়: 'এতে কার্যকারণের মধ্যে কোন পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই'। কেমন করে পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই, তিনি বই হতে তার কোন দলীল পেশ করেন নাই। অথচ রায় দেওয়া কালে তিনি চরম রায় দিয়েছেন: অর্থাৎ রেখে ঢেকে এমন কোন কথা বলেন নাই যে বইয়ের সর্বত্র পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই' সুস্পষ্ট আপোশহীন রায়—'কোন পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই।'

(৪) ডক্টর সাহেবের চতুর্থ রায় এই: 'বৌ-বেগমের দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা বৃথা—এর ভাবালুতার কথা না বলাই ভাল। উপন্যাস এটি নিশ্চয়ই নয়।' অর্থাৎ হাকিম বলছেন, 'আসামী এমনই খারাপ লোক যে তার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সাক্ষ্য নেওয়া ও আলোচনা করা

বৃথা। তার গলায় চটপট একটা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দাও।

(৫) ডক্টর সাহেবের পঞ্চম কথা : এ-ধরণের লেখা এ-প্রদেশে ছাপা হওয়াই উচিত হয় নাই। অর্থাৎ হাকিম আসামীকে ফাঁসী দিয়ে তুষ্ট নন। তিনি উপরন্তু রায় দিচ্ছেন যে ব্যাটাকে জন্মাতে দেওয়াটাই অন্যায় হয়েছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটীর ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের হেড্ ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব হাকিমের গদীতে কিছুক্ষণ বসেই যে ধরণের রায় দিয়েছেন, তা দেখে অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

ভিস্তী নিজামুদ্দীন হুমায়ুনের মেহেরবাণীতে যখন কিছু কালের জন্য শাহী তখতে বসলেন, তখন বিচারের জন্য তাঁর সামনে কতকগুলি আসামী এনে হাজির করা হল। তিনি সাক্ষী প্রমাণের কিছু না শুনেই টপাটপ কোতলের হুকুম দিয়ে যেতে লাগলেন। উজীর হন্তদন্ত হয়ে আরজ করলেন : 'জাঁহাপনা, এদের অপরাধ সম্বন্ধে প্রমাণ নিয়ে বিচার করে তবে যে রায় দিতে হবে?' বাদশা রুখে উঠলেন। বল্লেন : 'বাপু, এই সব বাজে লোকের ব্যাপারে সাক্ষী সাবুদ নিয়েই যদি দিন কাবার করে দেই, তবে বাদশাহী করব কখন্?'

মোগল বাদশারা যে বয়সে বাদশাই করতেন, ফিল হকিকত আমাদের ডক্টর সাহেব সে বয়স পার হয়ে যান নাই। তা ছাড়া তাঁর ভবিষ্যতে মোগলাই মেজাজে যে দুঃসহ বু বিগুমান, তাতে তাঁকে বাদশাই করার কিঞ্চিৎ ফুরছৎ দেওয়া আমাদের পক্ষে ইনছাফের কাজই হবে। কিন্তু ইনছাফের খাতিরে ডক্টর সাহেবের পক্ষে বলতে হয় যে তিনি ষোল আনা নিজামুদ্দীন পন্থী নন। কারণ তাঁর মতে বৌ-বেগমে যে বাস্তব অবাস্তব গোঁজামিল আছে তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি হাতীর পায়ের তলে পিষিয়ে মারার হুকুমের উল্লেখ করেছেন (সমালোচনার ষষ্ঠ প্যারা)। তাঁর মুদ্দা কথা এই যে, ১৯৪৭ সালের পরও কোন জমিদার হাতী দিয়ে লোক খুন করতে পারে, এ-নিতান্ত গোঁজামিলের কথা।

অর্থাৎ—

তের শ বছর আগে হজরত ওমরকে ছুরিকাঘাতে আহত করা হয়েছিল বলে ১৯৪৭ সালের পরও যে ডাক্তার খান সাহেব ছুরিকাঘাতে আহত হলেন, এ নিতান্ত অবিশ্বাস্য গোঁজামিলের কথা। আফগানের রাষ্ট্র নেতা নাদির শা'কে গুপ্তঘাতক গুলী করে মেরেছিল বলে ১৯৪৭ সনের পরও পাকিস্তানের রাষ্ট্র নেতা কায়েদে মিল্লাতকে গুপ্তঘাতক গুলী করে মারবে, এ-একান্ত অবিশ্বাস্য গোঁজামিলের কথা। বৃটীশ আমলে দিল্লী কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বলে ১৯৪৭ সালের পরও ঢাকা কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটবে, এ একান্ত অবিশ্বাস্য গোঁজামিলের কথা। এখন হতে পঞ্চাশ বছর আগে এ-দেশের জালিম জমিদারদের কেউ কেউ হাতী দিয়ে মানুষ মেরেছে বলে ১৯৪৭ সালের পরও তাদের কোন বংশধর তাঁর একমাত্র সন্তানকে যে নরাধম পরম আত্মীয় হয়েও বিষ দিতে গিয়েছিল তাকে অন্ধ রাগের মুহূর্তে হাতী দিয়ে মারার হুকুম দিয়েছে, এ-আলবৎ একান্ত অবিশ্বাস্য গোঁজামিলের কথা।

দোষের পরিমাণ বেশী আছে বলে যে বইকে সমালোচক জাহান্নামে পাঠাতে চান, সে বইয়ের দুই একটা গুণের কথা তিনি সাধারণতঃ বলে থাকেন। কিন্তু এই ডক্টর সমালোচক বইয়ের ভিতরের কথা দূরে থাক, বইয়ের কাগজ, মলাট, বাঁধাই, ছাপা, প্রচ্ছদপট, দাম ইত্যাদির একটা বিষয় সম্বন্ধেও এক হরফ ভাল কথা বলার অবকাশ পান নাই।

আসল কথা, নর্দমার দারোগার পক্ষে নর্দমা দেখা ছাড়া শহরের আর কিছু দেখার অবকাশও নাই, আবশ্যকতাও নাই, রুচিও নাই। আমরা এজন্য আমাদের মিস মেয়োকে সত্যি কোন দোষ দিতে পারি না।

আরও একটা কথা। বন্ধ্যা বিদ্বানের স্বাভাবিক বিপদ আছে। তাঁদের সকলের পক্ষে পরের মানস-সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

যাঁরা যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া অন্যকে শালীনতা ও সংযম বোধ বর্জিত বলে ফতোয়া দেন, তাঁদেরে লোকে বলে সৌজন্য জ্ঞানে দেউলিয়া। কিন্তু ডক্টর সাহেবকে আমরা তা বলব না; কারণ তিনি নিজে যা-ই হোন, তিনি যে সমুন্নত সাহিত্যের নামে ডক্টরেট লাভ করেছেন, সে সাহিত্য সৌজন্য প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ইজ্জতের পানে নজর রাখা আমাদের কর্তব্য। তিনি যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া বার বার চরম শাস্তির রায় দিয়েছেন; কিন্তু তবু আমরা তাঁকে বিচারবুদ্ধিহীন বলব না; কারণ তিনি একটা মস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত বিভাগের মাথা এবং মাথা বলতে আমরা ধরে নেই যে ভিতরে মগজ আছে।

ডক্টর সাহেবের খেদমতে আমাদের একটি বিনীত আরজ : তিনি যদি ফের এমন ক্লেদাক্ত কিছু লিখতে চান, তবে মেহেরবাণী করে ছদ্ম নামে লিখবেন; তাতে তাঁর বিদ্যার দাবী ও পেশার দাবী উভয়েরই আবরু ইজ্জত রক্ষা পাবে।

আমিতো ঘুমায়েছিনু

সিরাজউদ্দীন চৌধুরী

আমিতো ঘুমায়েছিনু—বারিহীন বরষার রাতে
চাঁদ জেগেছিল নীলিমাতে।
অকারণে খোলা ছিল দখিনের ছোট বাতায়ন,
সোঁদাল-কেয়ার বাস মাখি, বহি মৃদু সমীরণ
নয়নে রচিয়াছিল সেকি এক স্বপন মধুর
যুগে যুগে বিরহ বিধুর!

নিখিল বিরহী আসি বুকে মোর মনো-কপতীর—
হেরিলাম করিয়াছে ভিড়।
হা-হুতাশে পুড়ে গেছে ফাগ-রাঙা আমার আকাশ
গুমরি গুমরি বহে ব্যথা-ভারে বাউল বাতাস,
তারি মাঝে আমি জাগি মিটি মিটি তারা-দীপ জ্বালি
যেন তার ব্যথার দীপালী!

সহসা দেখিনু চাহি শিল্পী এক টানিছে আমায়
যেথা তার প্রেয়সী ঘুমায়।
শিঁরির মূরতি গড়ি, ফরহাদ আজো কাল গুণে,
পাষাণের বুক ফেটে ফুল ফোটে প্রেমেরি আগুনে,
চিত্রপট বক্ষে ধরি, প্রাণবন্ত মৃত শিলাস্তুপ ;
মরি মরি পেল এত রূপ!

উন্মাদ ঝড়ের মত ছুটে এলে সম্মুখে আমার
আহা এক রাজার কুমার।
পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, রুক্ষকেশ, মলিন বদন
বঙ্কিম নয়নে তার অপরূপ অশ্রু আলিম্পন,
লায়লার তরে চুমে সারমেয় প্রেমিক কায়েস
নাহি তার জীবনে আয়েস।

ইউসুফের তরে আজো সকরুণ করিছে আকাশ
জুলেখার দীঘল নিশাস।

ডাগর নয়নে তার এখনও সে-রূপের নেশা,
পেলব বুকের চাক ভরা-মধু যেন-ঘুন-পেষা,
কামনা কালিয়দহে তার কামনার কালকেয়
মরে নাই, আজিও অজেয়।

ওকে বালা গৃহ-দ্বারে বসে আছে সব পাশরিয়া
নত মুখে গালে হাত দিয়া।
আলবালে জল নাই, মৃগ শিশু পানে চায় কেবা,
মনের মানুষ চাহে আজি বুঝি তার মন-সেবা,
অতিথি ফিরিয়া যায় কোথা তার ক্ষণ-অবসর
বিরচিয়া মনের বাসর।

সহসা পথের বাঁকে হ'ল মোর কার সনে দেখা
চোখে তার চারু চিত্র-লেখা
প্রিয়াহারা শাজাহান কেঁদে ফিরে সকলের চিতে
আজো তার তাজ-রচা হয় নাই শেষ ধরনীতে।
সকলের সাথে সাথে সেও দেখে দিবানিশি তাজ,
ভাঙ্গে গড়ে নানাভাবে আজ।

প্রিয়াহীন পরূরবা রূপময়ী উর্বসীর লাগি,
রহিয়াছে দিবা নিশি জাগি।
অতন্দ্র নয়নে তার নীলিমার নীল-হলাহল,
বিরহের তীব্র সুরা পানে রাঙাহৃদি শতদল,
রাজ্য-পাট ডুবে গেছে বেদনার কুলছাপাবানে
বেখেয়াল প্রিয়ার ধেয়ানে।

অকস্মাৎ তন্দ্রামোর গেল টুটে, চেয়ে দেখি তাই—
সাথীহীন...প্রিয়া কাছে নাই।
নীল নভো ভেসে গেছে কুলছাপা চাঁদের কিরণে
সোঁদাল কেয়ার গন্ধ আসে ধীরে, বসি বাতায়নে
অতন্দ্র নয়নে জাগি প্রিয়া মোর ধ্যান-মৌনা হায়,
কার তরে কিবা পেতে চায়?

ট্রাজেডি

মোহাম্মদ ইউছুফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ দুই ॥

স্থান : সরকারী হাসপাতাল

সময় : সকাল

দৃশ্যে : ইয়াকুব, আজিজ, ইসমাইল, মাজেদা, মহেন্দ্র বাবু ও বেয়ারাগণ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইয়াকুব সরকারী হাসপাতালের একটি বেডের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এ রুমে আর অন্য কোন রোগী নেই। রোগীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু তার মাথার নিকটস্থ হাসপাতালের ছোট্ট টেবিলের ওপর রয়েছে। ইয়াকুবের মা-বাপ দু'জনই তার বিছানায় উপবিষ্ট। মহেন্দ্র বাবু পার্শ্ববর্তী একখানি চেয়ারে বসে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছেন :

মাজেদা : আপনাকে আমি ধর্মতঃ বাপ ডাকছি বাবা—আপনি আমার দেশী মানুষ। আমাদের প্রতি আপনার সহানুভূতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমার ছেলের ভালমন্দ সবকিছুর খোঁজ আনা দায়িত্ব এখন আপনার।

মহেন্দ্র : আমাকে আর আপনাদের কোন কিছু বলতে হবে না। আমার সাধ্যানুযায়ী আমি করবো। আপনাদের জন্য আলাদা এ রুমটার ব্যবস্থা করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

ইসমাইল : বড় ডাক্তার সাহেবদের সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়—তাঁরা কি বলেন ?

মহেন্দ্র : প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ায় তাঁরা সকলে তো এখন ভাল আশা পোষণ করেন। বাকী ভগবানের কৃপা।

ইসমাইল : অ্যাকসিডেন্টের পর চার পাঁচদিন অনবরত রক্তক্ষরণ আর অজ্ঞান থাকায় আমি ছেলের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

মহেন্দ্র : আমিও তো তার অবস্থা দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। সে জন্যই তো তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। বাস্তবিক পক্ষে হাসপাতালে আনয়ন বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে।

ইসমাইল : আজ যে অপারেশন করতে চাচ্ছেন—ছেলে তা' সহ্য করতে পারবে তো ?

মহেন্দ্র : নিশ্চয়ই পারবে। এখন তার সে শক্তি হয়েছে।

মাজেদা : না বাবা, আমার ছেলের মাথায় কাটা ছিঁড়া করতে আমি দেবো না। কাটলে ছিঁড়লে এ ছেলে বাঁচবে না।

মহেন্দ্র : এই তো ভুল করছেন মা—এই কাটা ছেঁড়া তার ভালর জন্যই হবে। এখন কেটে ভেতরে যে হাড় ভেঙ্গেছে তা' বের না করলে তো সে বাঁচবেই না।

মাজেদা : মা হয়ে আমি কি করে বাবা নিজের বাচ্চাকে নিজে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবো ?

মহেন্দ্র : আপনার ধারণা ভুল। এটা মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া নয়—বরং মৃত্যুর পথ থেকে তাকে বাঁচার রাস্তায় টেনে আনার চেষ্টাই হচ্ছে এ-অপারেশন।

ইসমাইল : সে ভরসা যে আপনি দিচ্ছেন মহেন্দ্র বাবু—এ জাতীয় অপারেশনে তো অধিকাংশ রোগীই মারা যায়।

মহেন্দ্র : তা' যায় আমিও স্বীকার করি। তবে ইয়াকুবের বেলায় সে ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি তো বলছি আপনাদের—তার এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তি হয়েছে। আর মৃত্যুর কথা যে বলছেন, মাথার ভেতরের এই ভাঙ্গা হাড় গোড় বের না করলে তো ক'দিন বাদে সে এমনিই মরে যাবে। ভাঙ্গা হাড়ের টুকরোগুলো মস্তিষ্কের সঙ্গে লেগে থেকে…

মাজেদা : উঃ থাক্ বাবা, এ সব কথা বলবেন না—আমি সহ্য করতে পারি না। বাচা রে আমার আল্লা কি কষ্ট যে দিতে আছে।

মহেন্দ্র : আপনারা অনর্থক এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—আপনারা শুধু তার জন্য ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করুন, মা-বাপের করুণ আবেদন পাষাণও গলাতে পারে (পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে) ইসমাইল সাহেব এখানে একটা দস্তখত করুন।

ইসমাইল : কি এটা ?

মহেন্দ্র : পড়ে দেখুন।

ইসমাইল : (পড়ে) না মহেন্দ্র বাবু—এখানে আমি সহি করবো না। এটা তো নিজের হাতে নিজের পুত্রের মৃত্যু সমন সহি করা।

মহেন্দ্র : আপনি জ্ঞানী মানুষ হয়েও ভুল করছেন কেন ইসমাইল সাহেব ? এটা সাধারণ একটা নিয়ম আছে। রোগীকে অজ্ঞান করে অপারেশন করতে হলে নাদাবী পত্রে হয় তো রোগীর, না হয় রোগীর

অভিভাবকের দস্তখত নিতে হয়। দস্তখত করলেই বুঝি মৃত্যুসমন হয়ে যায়।

ইসমাইল : মহেন্দ্র বাবু, সজ্ঞানে আমি এই দস্তখত দিতে পারবো না—দরকার হলে আমাকেও অজ্ঞান করে দস্তখত নিন। আপনি কি ছেলে মেয়ের বাপ নন মহেন্দ্র বাবু ?—কি করে আপনি আমাকে এই নিষ্ঠুর অনুরোধ করেন !

মহেন্দ্র : আপনারা এত অধৈর্য্য হলে কি করে চলবে। আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তার কিছুই হবে না। বরঞ্চ এ-অপারেশনে তার ভালই হবে।

ইসমাইল : আপনি যখন এতই নাছোড়বান্দা, তখন নিন। তবে কিন্তু আমি দেখে সহি করতে পারবো না।

মহেন্দ্র : করুন আপনার যেমনি খুশী—আমার শুধু সহি একটা হলেই চলবে। (ইসমাইল সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সহি করলেন)

মাজেদা : দিলে—দিলে তুমি সহি ! এত নিষ্ঠুর তুমি ! না, না আমি আমার ছেলেকে নিতে দেবো না। মরে যাক সে—তবু তো ক'দিন পরে মরবে। আরও ক'দিন তো মা তার কচি মুখ দেখতে পাব। তার মুখের মা ডাক শুনতে পাব।

(ইয়াকুবের ঘুম ভাঙলো। সে ডাকলো)

ইয়াকুব : মা—

মাজেদা : বাবা—বাবা কি চাও বাবা ?

ইয়াকুব : আমাকে একটু পানি।

মাজেদা : একটু দুধ খাবে বাবা ?

ইয়াকুব : না, পানি। (মা ছেলের মুখে পানি দিলেন। ষ্ট্রেচার নিয়ে বেয়ারাদের প্রবেশ) ওরা কেন আসছে মা—ওদের সঙ্গে আমি যাব না। ওরা শুধু আমাকে নিয়ে ব্যথা দেয়।

মহেন্দ্র : না, আজ তোমাকে কোন ব্যথা দেবে না। বাইরে থেকে একটু ঘুরিয়ে আনবে।

ইয়াকুব : না, আমি যাব না।

ইসমাইল : যাও বাবা, কি করবে, তুমি বরাতে করে এই দুঃখ এনেছ !

(বেয়ারাগণ তাকে ষ্ট্রেচারে উঠিয়ে নিল—সে কেঁদে বললো)

ইয়াকুব : মা—মা—আমি যাব না মা।

মাজেদা : বাবা—বাবা—

ইসমাইল : ধৈর্য্য ধর আজিজের মা—ধৈর্য্য ধর।

(বেয়ারাগণ তাকে নিয়ে চলে গেল। পেছনে পেছনে মহেন্দ্র বাবুও গেলেন। নেপথ্য থেকেও ইয়াকুবের "মা, মা" কান্না শোনা যাচ্ছে।)

মাজেদা : আজকের এই অপারেশনে ছেলের কি হয়—আল্লা জানে।

ইসমাইল : অপারেশন না করতে দিলে তো ওকে আর হাসপাতালেও রাখতো না। চিন্তা করে দেখলুম তো, অপারেশন ছাড়া উপায়ও নেই।

মাজেদা : আমি দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বো।

আজিজ : (দৌড়ে প্রবেশ করতে করতে) আব্বা-আম্মা, ইয়াকুবের অপারেশন খোদার রহমতে 'সাকসেসফুল' হয়েছে। তার মাথার ভেতর থেকে এই হাড় ভাঙ্গা-গুলো বেরিয়েছে। ওই যে বেয়ারাগণ তাকে নিয়ে আসছে।

মাজেদা : কই, দেখি হাড়ের টুকরোগুলো (আজিজ হাড়ের টুকরোগুলি মায়ের হাতে দিল)

ইসমাইল : শোকর, শোকর তোমার দরবারে, হে রহমানুর রহিম—আমিন !

॥ তিন ॥

স্থান : ইয়াকুবের বাড়ী।

সময় : পূর্বাহ্ন

দৃশ্যে : ইয়াকুব, জিয়াউননেছা, লুৎফু, সামছু, জালাল, অসুস্থ ইয়াকুব ইজি চেয়ারে শায়িত অবস্থায় নিজের জীবন কথা বর্ণনা করে চলছে। কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে—তবু সে বলছে। পার্শ্বে পানির গ্লাস আছে—মাঝে মাঝে পানি খায়। লুৎফু চেয়ারে বসে রয়েছে—জিয়াউন পেছনে দাঁড়িয়ে মাথায় বাতাস করছে।

ইয়াকুব : তারপর আরও তিন চার মাস ছিলাম হাসপাতালে। এ ক'মাস তারা আমার খুব যত্ন নিয়েছে। শেষে একদিন ডাক্তাররা আমাকে বাড়ীতে যাবার অনুমতি দিলেন। সেদিন কি আনন্দ আমার ! যেন একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল আমার বুক থেকে। বাড়ীতে এসে আবার পূর্বের জীবন ফিরে পেলাম। গত অতীতের কথা সব ভুলে গিয়ে আবার দৌড়-ঝাঁপ খেলাধূলায় মত্ত হয়ে পড়লাম। (একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো) আমাকে পানির গ্লাসটি দাও। (লুৎফু গ্লাসটি দিলে দু'তিন ঢোক পানি খেল)

জিয়াউন : এবার চুপ কর।

ইয়াকুব : তুমি আমার চুপ করা নিয়ে এত ব্যস্ত হলে কেন ?

জিয়াউন : কথা বললে যে তোমার ক্ষতি হয়।

ইয়াকুব : হোক ক্ষতি—ক্ষতির ভয়ে কি আমি সারা জীবন বোবা হয়ে থাকবো নাকি ?

জিয়াউন : সারা জীবনের কথা তো হচ্ছে না—এখনকার এই অসুস্থতার সময়ের কথাই বলছি। খোদার মেহেরবাণীতে পরে যখন ভাল হয়ে যাবে—তখন সারা দিন বক্ বক্ করো—আমরা কেউ মানা করবো না।

লুৎফু : বাস্তবিক আপনি এখন একটু চুপ করুন কাকা, এ সময় কথা বললে আপনার মাথা ধরা আর মাথা বেদনা বেড়ে যাবে।

ইয়াকুব : এবার তুমিও উপদেশ দিতে শুরু করলে, তোমাদের জ্বালায় আমি বাড়ী ঘর সব ছেড়ে পালিয়ে যাব।

লুৎফু : আপনি বিরক্ত হবেন না—আপনার যত খুশী বলুন, আমরা শুনবো, (স্কুল ফেরৎ সাত বছরের রুকু ও পাঁচ বছরের ফাকুর প্রবেশ। তারা ঝগড়া করতে করতেই আসছে। রুকু বলছে :)

রুকু : মা, তোমার ছেলে নাকি কাল থেকে আমাকে ফেলে চলে আসবে।

ফাকু : না গো মা ওর মিথ্যে কথা। ও আমাকে যাওয়ার সময় চিমটি কাটায় আমি দুষ্টুমি করে এ-কথা বলেছি।

রুকু : আমি কি শুধু শুধু তোকে চিমটী কেটেছি—তুই আমাকে ধাক্কা দিয়েছিলি কেন ?

ফাকু : তুই আমার আগে যেতে চাস্ কেন ? আমি ব্যাটা ছেলে—আমি আগে যাব।

রুকু : ইস্ ভারি ব্যাটা ছেলে ; রাত্তিরে যে ভয়ে মার কোল ছাড়া শোয় না, সে আবার ব্যাটা ছেলের দাবী করে। আর ব্যাটা ছেলে হলেই বা কি হয়েছে, আমি তো তোর বড়।

জিয়াউন : তোরা তো দেখছি আপোষের ঝগড়া শুরু করলি। দেখছিস্ না তোদের বাপের অসুখ। মাথার ওপর গোলমাল করিস্‌নে। বইপুস্তক রেখে হাত মুখ ধুয়ে ভাত খেতে যা'।

রুকু : আজ আবার কখন্ আব্বার অসুখ উঠেছে মা ?

জীয়াউন : তোরা স্কুলে যাওয়ার পর।

রুকু : আব্বার খালি অসুখ হয়। চল্‌রে ফাকু—
(উভয়ের প্রস্থান)

ইয়াকুব : কেন ওদের থামিয়ে দিলে জীয়ন—আমার কাছে ভারি সুন্দর লাগছিল ওদের ঝগড়া।

জিয়াউন : যত বাজে কিছুই তো তোমার সুন্দর লাগে !
– (সামছু প্রবেশ করে বললো)

সামছু : জালাল সাহেব চাচারে দেখতে আইছেন।

ইয়াকুব : কে এসেছেন ?

সামছু : জালাল সাহেব।

ইয়াকুব : ওকে এখানে আসতে বল্। (সামছুর প্রস্থান) জীয়ন যাও, তুমি হাত মুখ ধুয়ে এ-অবসরে চাটি খেয়ে নাও। লুৎফুও আপাততঃ যাও—পরে প্রয়োজন হলে ডাকবো।

জিয়াউন : তুমি এখন কি খাবে ? (লুৎফুর প্রস্থান)

ইয়াকুব : কোন কিছু খাওয়ার রুচি এখন আমার নেই।

জিয়াউন : একেবারে কিছু না খেলে চলবে কি করে ? সাগু একটু খেয়ো, আমি রেঁধে আনি। (জিয়াউন চলে গেল। জালালের প্রবেশ। ইয়াকুব অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে মাথাটা নেড়ে বললো)

ইয়াকুব : আচ্ছালামো আলাইকুম—আসুন জালাল ভাই। এই অবেলায় কোত্থেকে এলেন ?

জালাল : আপনার অসুখের কথা শুনে বাড়ী থেকেই এসেছি। (জালাল বসলো)

ইয়াকুব : আমার অসুখের কথা শুনে কেন কষ্ট করে আসেন আপনারা—এ তো আমার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তকৃদিরের লিখন—ভুগতেই হবে।

জালাল : তকদির তো বটেই। তবে তকদিরের পরিবর্তনের জন্য তদবিরেরও প্রয়োজন আছে। ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করালে হয় তো তকদির ফিরতেও পারে।

ইয়াকুব : আমার সাধ্য পরিমাণ ব্যবস্থা আমি করেছি ভাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য, অসুখ তো মোটেই কমছে না বরঞ্চ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

জালাল : শোকর করুন আল্লার দরবারে।

ইয়াকুব : এখন শোকরই তো সম্বল—এ ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই।

জালাল : আজ কখন্ আবার অসুখ উঠলো ?

ইয়াকুব : সকালে।

জালাল : ডাক্তার ডাকেননি ?

ইয়াকুব : ডাক্তার আমার ব্যারামের কিছু করতে পারে না ভাই। সারা জীবন ওষধ খেয়ে খেয়ে এখন ওষুধের কথা শুনলেও বিরক্তি লাগে।

জালাল : হুঁ, আচ্ছা যাক, এখন ওষুধের কথা বাদ দেন। এসব আলোচনাও ক্ষতিকর—মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সাহিত্য মজলিস সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবো।

ইয়াকুব : বলুন।

জালাল : মজলিসের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

ইয়াকুব : করতে হয় করুন। কিন্তু আপনাকে কোন রকম সাহায্য করবার ক্ষমতা যে বর্তমানে আমার নেই—তা' তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন।

জালাল : তা' তো দেখ্‌ছি আর দেখে চিন্তা করছি, আপনার নিকট থেকে যে অকৃত্রিম সহযোগিতা আমি পেয়েছিলাম, অপর কারো নিকট থেকে তো ততটুকুন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন কি করে আমি একা এই গুরুদায়িত্ব বহন করবো।

ইয়াকুব : সে জন্য আপনি ভাবিত হবেন না জালাল ভাই—আমার মত আরও বহু 'আপনি' আপনা-আপনি যোগাড় হয়ে যাবে। হয়তো আপাততঃ একটু কষ্ট হতে পারে। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি ভাই, যে করেই হোক এ প্রতিষ্ঠানকে আপনি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, একটা জাতি শুধু তার সাহিত্যের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু সে দিকে তো আমরা বড় পশ্চাদপদ। আমাদের সমাজের যাঁরা নেতৃস্থানীয়—তাঁদের যদি এদিকে একটু খেয়াল থাকতো, তবে হয়তো আজ আমাদের এ অধঃপতন হতো না।—সামছু, জালাল ভাইয়ের জন্য পান আন্। কথা বলতে বড় হয়রাণ লাগে ভাই। (গ্লাস থেকে পানি খান)

জালাল : থাক্ আপনি অতিরিক্ত কথা বলবেন না।

ইয়াকুব : কথা না বললে তো শান্তিও পাই না।—জালাল ভাই, এসব চিন্তা করলে মনে বড় দুঃখ হয়। ইচ্ছে করে, সকল সময় শুধু কাগজ কলম আর বই পুস্তকের ভেতর ডুবে থাকি। খালি এই একটি মাত্র বিষয়ই আমাকে শান্তি দিতে আর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করতে পারে। কিন্তু আমি তো একা নই—পরিবার পরিজনই এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। শুধু আমাকে নিয়ে আমি মত্ত হলে তো চলবে না, ওদের দায়িত্বও ষোল আনা আমার। আর এ দেশে তো শুধু সাহিত্য করে ভাতও মেলে না। এ কথা যখন মনে জাগে তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। (সামছু পান নিয়ে প্রবেশ করলো) পান নিন জালাল ভাই।

জালাল : (পান নিতে নিতে) বড় মূল্যবান কথা বলেছেন। অভাব-অনটনের দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের আনাচে কানাচে শত শত প্রতিভা অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—কে তার খোঁজ করে! এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

ইয়াকুব : আছে ভাই—প্রতিকার আছে। আপনারা যারা সাহিত্যসেবী আছেন শুধু তাদের অক্লান্ত চেষ্টা আর অকৃত্রিম সাধনার মাধ্যমেই প্রতিকার হতে পারে। (হঠাৎ জালালের একখানি হাত ধরে) জালাল ভাই, তুমি আমার সাথে ওয়াদা করে যাও ভাই, আমাদের এই বিপন্ন সাহিত্য আর সাহিত্যিক সমাজকে তোমরা বাঁচাবার চেষ্টা করবে। এমন কোন পন্থা তোমরা উদ্ভাবন করতে চেষ্টা কর—যাতে এ দেশের প্রতিটি কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী শুধু সাধনাই করে যেতে পারে—আর্থিক অসুবিধায় যেন তাকে জীবন নষ্ট না করতে হয়। আমি হয়তো মরে যাবো বন্ধু—কিন্তু আমার এই অনুরোধ তুমি আর তোমার পরবর্ত্তী সাহিত্যসেবীদের জন্য রেখে যাচ্ছি। হয়তো তোমাদের সাধনার দ্বারা আমার আশা পূর্ণ হবে (নিজের চোখ মুছলো)

জালাল : ওকি, আপনি কেঁদে ফেললেন!

ইয়াকুব : এসব কথা চিন্তা করলে ভাই শুধু কান্না নয়—দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে চায়।

জালাল : থাক্ আপনি অধৈর্য্য হবেন না। আমরা এখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক—নিশ্চয়ই আমাদের এই দুঃসময় একদিন কেটে যাবে।

ইয়াকুব : সেই সুদিনের কথা কল্পনা করে করে তো আজও আশায় বুক বেঁধে রয়েছি। আমি তার ফল ভোগ করতে পারি আর না পারি—শুধু দেখে যেতে পারলেও আমার অতৃপ্ত আত্মা পরম তৃপ্তি লাভ করতো।

জালাল : হয়তো আপনিও তার ফল ভোগ করতে পারেন। আমাদের বর্তমান সরকার কবি, সাহিতি-ক-দের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য কিছুটা চেষ্টা করছেন বলে শুনলাম। তবে করতে হয়তো কিছু সময় লাগতে পারে—দু'শতাব্দীর গলদ দূর করা সোজা কথা নয়।

ইয়াকুব : তাঁরা যে চেষ্টা করছেন—একথা শুনেও প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। আল্লা তাঁদের কৃতকার্য্য করুন। উদ্যম প্রশংসনীয়।

জালাল : আমাদের স্থানীয় সাহিত্য মজলিশকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলবার ওয়াদা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।

ইয়াকুব : মারহাবা!

জালাল : আচ্ছা এখন আমি আসি। সময় সময় শারীরিক অবস্থা জানাতে চেষ্টা করবেন। (দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বের করে ইয়াকুবের হাতে গুঁজে দিয়ে বললো) রেখে দিন। কোন কথা বলবেন না। আচ্ছালামো আলাইকুম। (জালালের প্রস্থান। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ইয়াকুব বললো)

ইয়াকুব : আল্লা, এই একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর চলার পথকে তুমি কণ্টকমুক্ত কর আর কর তাকে সহায়তা। তোমার বান্দা, এই রুগ্ন, অক্ষম সাহিত্যসেবী তোমার দরবারে শুধু এই আরজ করছে। (একটু চুপ থেকে ডাকলো) জিয়ন…

নেঃ জীয়াউন : কেন ?

ইয়াকুব : এদিকে আস। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে—আমাকে একটু শুইয়ে দাও। (জিয়াউনের প্রবেশ)

জিয়াউন : একটু সাগু খাবে ?

ইয়াকুব : না, এখন নয়। আগে আমাকে শোয়াও—বড্ড অস্থির লাগছে।

জিয়াউন : মাথায় পানি দেবে ?

ইয়াকুব : দিতে হলে শুলে পর দিও। ধর। (জালালের দেওয়া টাকা স্ত্রীকে দিল)

জিয়াউন : (স্বামীকে ধরে তুললো—স্বামী তার কাঁধে মাথা রেখে আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে পা বাড়ালো) টাকা কোথায় পেলে ?

ইয়াকুব : জালাল দিয়ে গেছে।

নাবিকের চিঠি

এম. গোলাম রহমান

শ্রাবনের মেঘমুক্ত কোন ঝলোমলো
আলোর সকালে
চিঠি পাই—
কোন এক নাবিকের,
একখানি নীল চিঠি
সুনীল খামের পুরু আবরণে ঢাকা।

প্রবাসের দূর দেশ হ'তে
কোন এক বন্দরের ছাপ নিয়ে খামে,
চিঠি এলো আজ গাঁয়ে ;
চিঠি এলো—
অনামিকা প্রেয়সীর নামে।

(মনে হলো যেন সেই পড়ন্ত বেলায়
অতলান্ত সমুদ্রের পানে চেয়ে চেয়ে
কি যেন ভাব্‌লো সেই সমুদ্র-নাবিক
আজিকার কথা দিয়ে মানসীকে চিঠি দেবে বলে।)

.........এ চলার পথে রাত্রি-দিন
জমেছিলো কতো কালো মেঘ
বিক্ষুব্ধ হাওয়ার সাথে, উত্তাল ঢেউয়েরা মিলে
কতো দিন তুলেছিলো ঝড়,
এ-সাগর, এ-আকাশ, আর এই
পৃথিবী জুড়ে।

* * *

জাহাজ আমার আজ
সুশান্ত সাগর তীরে
জীবনের কোলাহলে মুখরিত
কোন এক বন্দরের পথে॥

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইস্‌লাম

মোহম্মদ আবদুর রহীম

বর্তমান সভ্যতা মানব-ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সংযোজন করিয়াছে। চিন্তা ও গবেষণার ফল-হিসাবে খোদার অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হইয়াছে। খোদার আইন ও বিধান এবং ইসলামী নৈতিকতার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করা হইয়াছে এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমাজ ব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতাও তমদ্দুন গড়িয়া তোলা হইয়াছে সম্পূর্ণ নাস্তিক্যবাদের উপর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপনেরও ভিত্তি আজ সর্বক্ষেত্রে নাস্তিকতার উপর স্থাপিত। এইসব ঘটনা বর্তমান সভ্যতার যে এক অভিনব অবদান তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা নাস্তিকতার এই সর্বাত্মক রূপ মানব জাতির অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একেবারেই দুর্লভ। বর্তমানে এই সভ্যতার ফল চূড়ান্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার পূর্ণ রূপই আজ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর গোড়ার কথা

ইউরোপীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় জাতিসমূহ মধ্যযুগের গভীর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ-জায়গীরদারী ব্যবস্থা গীর্জা ও ধর্মযাজকদের নিরংকুশ প্রাধান্য তদানীন্তন মানব সমাজকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা-সম্রাটের সর্বগ্রাসী শাসনই ছিল সেযুগের রাজনীতি। অর্থনীতি বলিতে বুঝাইত সার্বিক রূপে প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদ ও জায়গীরদারী ব্যবস্থা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মপালনের ক্ষেত্রে গীর্জা ও পাদ্রী-পুরোহিতদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এক কথায় বলিতে গেলে এই যুগের সমগ্র ইউরোপীয় জাতিই ছিল চরম মানসিক, আদর্শিক ও চৈন্তিক গোলামী-রজ্জুতে বন্দী। পরবর্তীকালে তাহাদের মন মগজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়, তাহার ফলেই তাহারা মধ্যযুগীয় তমিস্রার অক্টোপাশ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হয়। মুক্তি প্রাপ্তির এই ঘটনাই ইতিহাসে রেনেসাঁ (Renaissance) নামে অভিহিত। যে চেতনা ও তেজপূর্ণ ভাবধারা সৃষ্টির ফলে ইউরোপীয় জাতিসমূহ শতাব্দীকালের অন্ধকুসংস্কার, মানসিক গোলামী ও সামাজিক বিপর্যয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহা ইউরোপ বিজয়ী মুসলিমদের সাংস্কৃতিক প্রভাবেরই অনিবার্য ফল। অন্ততঃ মুসলিমদের পাশ্চাত্য দুনিয়ায় অনুপ্রবেশের পূর্বে যে তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহও নাই।

বস্তুতঃ মুসলমানগণ যদিও উত্তর কালে তাহাদের মুল দায়িত্ব, কর্তব্য, জাতীয় মর্যাদা ও গুণ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, বিস্মৃত হইয়াছিল তাহাদের জীবন-লক্ষ্য এবং যে মহান জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাহাদের উত্থান হইয়াছিল তাহা যদিও তাহাদেরই জীবন ও চরিত্র হইতে নিশ্চিহ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; তবুও ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় তাহারাই নব্যচিন্তার এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চরম অন্ধত্বের পরিবর্তে বুদ্ধিবাদের প্রয়োগ তাহাদের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতারণা করিয়াছিল গভীর সুক্ষ্ম গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিমগণই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল গণঅধিকার ও সমাজ-পরিবারে স্থাপিত করিয়াছিল প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। এই কারণে তাহারা ইউরোপকে নিজেদের জীবন-ব্যবস্থার ধারক ও উহার প্রতি বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে না পারিলেও তাহাদিগকে ও তাহাদের ইতিহাসকে যে তাহারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর মূলে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। সেই সংগে এ-কথাও অকপটে স্বীকার করিতে হয় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নাস্তিক্যবাদী জীবন-দর্শনের ও খোদাহীন মতবাদের প্রভাব হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

নাস্তিক্যবাদের গোড়াপত্তন

ইউরোপে রেনেসাঁ-উন্মেষের সংগে সংগে সমাজ-জীবনে এক নিদারুন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সূচনা হয়। জনগণের মধ্যে রাজতন্ত্র, পেপিবাদ, জায়গীরদারী-সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ঘৃনা ও সমালোচনা প্রতিবাদের প্রবল তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়। তখন জালেম ও শোষক শক্তি সমূহ নিতান্ত অন্যায় ভাবে নিজেদের স্বার্থকে শক্ত করিয়া আকড়িয়া ধরিয়াছিল। তাহাদের জীবনে, চরিত্রে ও আচরণে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন স্বীকার করিতে তাহারা আদৌ প্রস্তুত ছিলনা। ফলে মনোমালিন্য ও দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাচীনপন্থীগণ প্রত্যেক নূতন শ্লোগানকেই অংকুরে বিনষ্ট করার জন্য

পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নব্যপন্থীগণ 'সবকিছুপুরাতন' চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত হয়। এইভাবে পনেরো ও ষোল শতকের আধুনিকতাবাদীগণ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের প্রবল উত্তেজনায় সরাসরি নাস্তিক্যবাদের গভীর পংকে অবগাহন করিতে বাধ্য হয়। ইহার পরই পাশ্চাত্য সমাজে নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার উৎপত্তি ও জয়জয়কার সূচিত হয়।

নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার কর্ণধারগণ প্রকৃতির বুকে সৃষ্টিকর্তার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এবং মানব প্রকৃতিতে উহার প্রতি দেশকুণ্ঠ সুস্পষ্ট স্বকৃতি রহিয়াছে, তাহা সব কিছু ধামাচাপা দিয়া বস্তুবাদী ও খোদাহীন দর্শনের উপর জীবনের গোটা ইমারতই সংস্থাপন করে। তাহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, এই বিরাট বিশাল সৃষ্টি একমাত্র বস্তুরই অবদান এবং কোন সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকেই ইহা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা স্বয়ম্ভু, স্বচালিত, ও স্বয়ংক্রিয়; কোন পরিচালক আইন-বিধানদাতা ইহার নাই। এই দর্শনকে ভিত্তি করিয়া নব সভ্যতার ধারকগণ মানবীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মূল; উহার যাবতীয় শাখাপ্রশাখা পুনপ্রণয়ন ও পুনগঠন করে। প্রত্যেকটি বিষয়েই গবেষণা শুরু হইয়া গেল খোদাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া, খোদার ইলহামী হেদায়েত মানিয়া লইতে ও তদনুযায়ী জীবন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতে তাহারা প্রস্তুত হইল না। যাবতীয় কাজের মূল্য-মান (Value) নির্ধারণ করা হইল নিতান্ত বৈষয়িক দৃষ্টিতে, পরকালীন জীবনের সভ্যতার প্রতি তাহাদের কোন আস্থাই থাকিল না। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা করা হইয়াছে নাস্তিক্যবাদকে এক সত্য ও নির্ভুল মতাদর্শ মনে করিয়া এবং ইহারই উপর গোটা মানব-সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, পথ ভ্রষ্ট হওয়া, নীতি-বিচ্যুতি ঘটা এবং খোদায়ী হেদায়েত বিস্মৃত হওয়া মানুষের ইতিহাসে কোন অভিনব ও অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। কিন্তু নিছক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও গবেষণার ফল স্বরূপ খোদাকে অস্বীকার করিয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সমস্ত বিভাগ পুনর্গঠনের এই ব্যাপার মানবেতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে কোন সভ্যতা গড়িয়া তোলা ও শেষ পর্যন্ত উহার আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কোন দৃষ্টান্ত প্রাচীন ইতিহাসে একেবারেই দুর্লভ। অথচ বর্তমানে এই সভ্যতাই সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে।

নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার উপাদান

চিন্তা ও মানস চর্চার জন্য নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা যে মূলনীতি গ্রহণ করিয়াছে, এক কথায় তাহাকে বলা যায় লিবারেলিজ্‌ম্ (Liberalism) সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চিন্তার সূচনায় ও কোন বিষয়ে চূড়ান্ত মত-নির্ধারণ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা, ভয়-ভীতি ও বাধা-বন্ধন হইতে নিজেকে ও চিন্তাশক্তিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া লইতে হইবে; ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধান সব কিছুই অস্বীকার ও অমান্য করিতে হইবে, সকল লোকাতীত শক্তির প্রভাব আধিপত্য হইতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। জীবন-সমস্যার সমাধান-সন্ধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে চরম রক্ষণশীলতা ও নিতান্ত গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু প্রাচীন পন্থা ও পদ্ধতি যতই সত্য সনাতন, কল্যাণ ও সার্থকতা সমন্বিত হউক না কেন তাহা সবই বর্জন করা এবং সকল প্রকার অভিনব চিন্তা, আনকোরা মতবাদ ও নীতিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করাই এই প্রগতিবাদের লক্ষণ। ইহার ফলে সমাজের চিন্তা ও মানসিকতার ক্ষেত্রে এক প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং তাহার আঘাতে সমস্ত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ,—জীবন বিধান চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। পরিণতিতে মানববুদ্ধি সকল প্রকার নৈতিক বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া পাশবিকতার এক শক্তি-শালী হাতিয়ারের মর্যাদা লাভ করে।

নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার দ্বিতীয় উপাদান হইতেছে জড়বাদ বা বস্তবাদ (Matarialism)। বাস্তব-অতীত ও বস্তুর উর্ধ্বের সকল প্রকার চিন্তা বিশ্বাস ও মতবাদ নির্মূল করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার ফলে মানুষ বাস্তব ও ব্যক্তিগত স্বার্থলাভকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় একমাত্র উহারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গী-কৃত হয় মানুষের সকল চিন্তা ও কল্পনা এবং চেষ্টা ও সাধনা। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন জিনিষের জন্যই মানুষ নিজের মন-মগজ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করিতে আদৌ প্রস্তুত হয় না। আর প্রত্যেক কাজেরই মূল্যমান, ক্ষতি উপকার, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়—নির্ধারণ করা হয় একমাত্র জড়ভিত্তিক বৈষয়িকতার মানদণ্ডে।

বস্তুবাদী মতবাদের তীব্র প্রভাব দেখা দেয় মানুষের নৈতিক চরিত্রের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। মানুষ জঘন্য রূপে স্বার্থপর, স্বার্থবাদী ও সুবিধা শিকারী হইয়া উঠে। অধিকতর কম কষ্ট করিয়া অধিকতর বেশী সুখ সম্ভোগ ও সার্থকতা লাভকেই ন্যায় কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ইহার বিপরীত হইলে মূলতঃ তাহা যত পুণ্যের কাজই হউক না কেন, তাহা পাপের কাজ বলিয়া অভিহিত হয়। ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নির্ধারিত হওয়ার ফলে মানুষের সমস্ত কর্ম তৎপরতা

কয়েকটি পাশবিক লালসা-বাসনাকে কেন্দ্র করিয়া চরিতার্থ হইতে শুরু করে।

নাস্তিক্যবাদের চতুর্থ উপাদান হইতেছে গণ-সার্বভৌমত্ব (Soveriegnty of the people)। লিবারেলিজম্‌ যখন জাতীয় ও সামগ্রিক পর্যায়ে কাজ করিতে শুরু করে তখন গণ-প্রভুত্ব বা সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের রূপধারন করে। ইহার প্রভাবে এক-একটি জাতির জনগণে নিজদের লালসা কামনা এবং মতবাদ চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিরংকুশ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অবাধ সুযোগ লাভ করে। সংখ্যাধিক্যের জোরে তাহারা যে কোন জিনিষকে নিজেদের জন্য বৈধ কিংবা অবৈধ নির্ধারণ করার অবাধ অধিকার ইহারই মাধ্যমে লাভ করে। তাহাদের এই চরম স্বেচ্ছাচারিতার পথে দ্বীন ও ঈমানকে প্রতিবন্ধক হইবার সুযোগ দিতে এবং দ্বীন ও ঈমানের অনুকূলে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করিতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত নহে। গণ-ইচ্ছাই হয় তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র মাপকাঠি। বাসনা ও কামনার ঊর্ধে কোন সার্বভৌম শক্তিকে স্বীকৃতি দান করিতে তাহারা একেবারেই নারাজ। সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের এই মতবাদ মানুষকে লালসার নিকৃষ্টতম দাস ও জড়বাদের অন্ধপূজারী বানাইয়া দিয়াছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার রূপ অত্যন্ত বীভৎস। শিল্প বিপ্লবের পরেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থার অবসান ও শিল্প বিপ্লব সূচনার সন্ধিক্ষণে জনগণ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। মনে হয়, তাহারা এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত সমুদ্রে নিপতিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কেবল হাবুডুবু খাইতেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। শিল্প বিপ্লব বাষ্প করায়ত্ত করিয়া বিরাটকায় যন্ত্র চালনা করার এবং তাহা হইতে তড়িৎগতিতে বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের উপায় করিয়া দিয়াছে। তাহার ফলে সহস্র-সংখ্যক হস্ত শিল্পী ও হাতকারিগরকে বেকারত্বের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করে। তখন খাদ্য সমস্যাই হইয়া পড়ে সকল চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য।

শিল্পবিপ্লব সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আনিয়া দিল। ইহার ফলে অসংখ্য মানুষের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। উৎপাদন-উপায়ের প্রতিযোগিতায় শিল্প কৃষিকে অতিক্রম করিয়া গেল। জনতা গ্রাম হইতে উৎপাটিত হইয়া ধাবিত হইল শহরের দিকে। বেকার সমস্যা এতদূর তীব্র হইয়া দেখা দিল যে, তাহার ফলে মানুষ দেশত্যাগ করিতে ও স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং শ্রমের অপর্যাপ্ত মূল্যমান ব্যয় বহুল নাগরিক জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিল। ইহার ফলে পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তামদ্দুনিক গ্রন্থি শিথিল হইয়া গেল। এইভাবে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ঘাত-প্রতিঘাত সমাজ জীবনের চরম অনিশ্চয়তার সহিত মিলিয়া যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিল, তাহা নৈতিকতা ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে খান খান করিয়া দিল। বস্তুতঃ শিল্প বিপ্লব সম্পূর্ণ অলক্ষিত মানুষকে এক মুষ্টি অন্নের বেদীমূলে গোটা মনুষ্যত্বকে বলিদান করবার জন্য বাধ্য করিল। অতঃপর মানুষকে মনে করা হইতে লাগিল নিছক একটি যন্ত্র, তাহার দৈহিক ও আংগিক অবয়বের ন্যায় তাহার মনস্তাত্বিক ও নৈতিক জীবনেরও বিশ্লেষণ হইতে লাগিল নিতান্ত যান্ত্রিক দৃষ্টিতে মানুষের এই যান্ত্রিক বিশ্লেষণের কায়ায় জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্যমানের আত্মক্ষণিকের তবেও টিকিয়া থাকিতে পারে না।

ইহারই পরবর্তী পরিণতি স্বরূপ নাস্তিক্যবাদী সভ্যতায় দেখা দিল পাশবিক যৌনদর্শনের মতবাদ। ইহা নৈতিক মূল্যমানের ধ্বংস সাধন ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূল চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ব্যাপারে আর কিছুই অবশিষ্ট রাখিল না। শিল্প বিপ্লবের ধাক্কা যখন নারীকে তাহার ঘরের নিরাপদ আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া জন-মঞ্চে উপস্থিত করিয়া দিল, তখন উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চীৎকার মুখর কণ্ঠ-রুদ্ধ করিবার জন্য এক শ্রেণীর মতলববাজ দার্শনিক নারী-পুরুষের সাম্যের মনগড়া দর্শন প্রচার করিতে শুরু করিল। বিরুদ্ধবাদীদিগকে তাহারা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল যে, নারীর জন্মই হইয়াছে পুরুষের পার্শ্বচর, সারথী ও সহকর্মিনী হইবার জন্য। অতএব, প্রত্যেকটি কাজে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করাই নারীর কর্তব্য। এই-তথা-কথিত দার্শনিক মতবাদের ফলে তালাক, ব্যভিচার ও কুমারীমাতৃত্বের প্রবল স্রোত সর্বপ্লাবী হইয়া দেখা দিল। তখন প্রগতিবাদী মতাদর্শ এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, অবাধ প্রেম ও যৌন নৈরাজ্য তথা উচ্ছৃংখলতা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়—আর বিবাহ ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা কৃত্রিমই শুধু নয়। অতীতের অন্ধকার যুগের প্রতীক মাত্র। ইহার পর অবাধ যৌন সম্ভোগ-নীতির ফলে সন্তান প্রজননের দায়িত্ব বহন করা কঠিন মনে হইতে লাগিল, তখন পূর্বোক্ত দার্শনিক মতই জন্ম নিরোধের মন্ত্র পড়াইল এবং এই প্রসংগে লোকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল অকাট্য তামদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি। কিন্তু জন্ম নিরোধ প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত অবৈধ সন্তানের জন্ম বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইল। তখন অবৈধ সন্তানকে বৈধ সন্তানের সমান মর্যাদা দান করার এবং

তাহাদিগকে ও সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইল। এই ভাবে সর্বগ্রাসী-সামাজিক বিপর্যয় নৈতিকতার সমগ্র মূল্যমান ধ্বংস করিয়া দিল।

নাস্তিক্যবাদের সর্বশেষ বিষাক্ত সন্তান হইতেছে জাতীয়তাবাদ। মধ্যযুগে গীর্জাই ছিল ইউরোপীয় জনগণের শক্তির উৎস। কিন্তু নাস্তিকতার প্রবল আঘাতে উহা যখন চুরমার হইয়া গেল, তখন এই কঠিন প্রশ্ন দেখা দিল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে ও জাতি-অধ্যুষিত ইউরোপের শক্তি কেন্দ্র কি হইবে, উন্নতি লাভ করিতে ও সকল প্রকার দুঃখ বিপদ ও বাধাপ্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণা দান করিবে কে? নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা ইহারই উত্তর স্বরূপ উপস্থাপিত করিল জাতীয়বাদকে। বস্তুতঃ খোদাকে অস্বীকার করার পর মানবজীবনে যে মহা শূন্যতার উদ্ভব হয় তাহা পূরণ করার জন্য জাতীয়তাবাদ প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে 'জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করার ভাবধারা' জাগ্রত করিতে চেষ্টা করে। জাতির স্বার্থরক্ষা ও জাতির উন্নতি বিধানকেই প্রত্যেকের জীবন-লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিবার জন্য ইহা প্রবল উৎসাহ-দান করে।

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের অনিবার্য-পরিণতি হিসাবে যখন হিংসা, বিদ্বেষ, লুণ্ঠতরাজ ও যুদ্ধসংঘর্ষের সৃষ্টি হইল, তখন উহার প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের জন্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহ মিলিত হইয়া লীগ্ অব নেশন্স-এর ভিত্তি স্থাপন করিল। কিন্তু খোদাকে অস্বীকার করার ফলে মানুষের সামগ্রিক জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা পূরণ করা ছিল লীগ্ অব্ নেশান্সের সাধ্যাতীত। এইজন্য অংকুরেই উহার বিনাশ প্রাপ্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বর্তমানে ইহারই প্রেতাত্মা 'জাতি সংঘের' দেহাবরণে নূতন পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। কিন্তু উহাও উদ্দেশ্য সাধনে চরমভাবে ব্যর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নাস্তিক্যবাদের উপরোক্ত উপদান সমূহ মানুষের নৈতিকতা ও মননশীলতাকে যতখানি ধ্বংস করিয়াছে, ক্রমবিকাশবাদ (Theory of Evolution) করিয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। এখন উহার জীবতাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে কিছু বলা হইতেছে না—সে প্রসংগও ইহা নয়; ক্রমবিকাশবাদের যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছে, এখানে শুধু তাহাই আলোচ্য। এই মতাদর্শই মানব সমাজে ক্রমবর্ধমান ধোকা-প্রতারণা, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, নির্লজ্জতা-নগ্নতা, উদর-পূজা ও অন্যান্য পাশবিক বৃত্তি সমূহকে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে সমর্থন দান করে। বিশ্বচরাচর ও স্বয়ং-মানব ইতিহাসকে একটি সংগ্রাম ক্ষেত্ররূপে পেশ করে, যেন জীবন কেবল দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও শক্তি পরীক্ষার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে শক্তিমান দুর্বলকে পর্যুদস্ত করিবে, দুর্বল শক্তিমানের পদতলে নিষ্পিষ্ট হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই সব কিছুই নির্দয় স্বভাবের দুর্দম প্রচণ্ডতার কারণেই সংঘটিত হইতেছে। কাজেই এই সব ক্ষেত্রেই নৈতিকতার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম অপরিহার্য, পরাক্রমশালী তাহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দুর্বলদের উপর প্রয়োগ করিবে, ইহা ও অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই দার্শনিক মতাদর্শ ব্যক্তিগণের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহানুভূতিকেই চূর্ণ করে নাই, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনাকেই খতম করে নাই, সেই সঙ্গে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ন্যায় মানবতা বিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদকে যুক্তির ভিত্তি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে এবং দুর্বল জাতি সমূহের উপর পরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ জাতিসমূহের প্রবল জুলুম পীড়নকে যুক্তি সংগত প্রমাণ করার স্পর্ধা দেখাইয়াছে।

নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার ব্যর্থতা

উপরে উল্লেখিত উপাদান সমূহের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা। ইহা মানবতার কতখানি কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্য উল্লেখিত উপাদান সমূহ এবং উহাদের সমন্বয় পদ্ধতির পর্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ আধুনিক সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত আশাবাদী; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুই তিন শতাব্দীকালের দীর্ঘ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহার প্রতি মানুষের সকল আশা-ভরসা নিছক মরীচিকা মাত্র।

বর্তমান সভ্যতার অবদান সম্পর্কে একথা অনস্বীকার্য্য যে, এখন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফুরন্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়াছে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্তূপ রচিত হইয়াছে, কৃষি ও শিল্পোৎপাদন অভাবিতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানবীয় প্রয়োজন পূরণার্থে কত নিত্য নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবনীর কাজ সম্পন্ন হইয়াছে এবং কত নব নব উপায়-উপাদান ও দ্রব্যসামগ্রী মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করা সত্যই কঠিন ব্যাপার। সমাজ ব্যবস্থার নব নব রূপ, প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও দেশ শাসনের অসংখ্য কাঠামো এবং আভ্যন্তরীণ শোষণ-শৃংখলা স্থাপনের কত যে নিদর্শন বর্তমান সভ্যতার দৌলতে লাভ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার গণনা সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ এই সব কিছুই মানুষের মন-মগজের শ্রম-সাধনা, অর্থব্যয়, কায়িক কষ্ট স্বীকার ও প্রাণ উৎসর্গ করার ফলেই সম্ভব হইয়াছে,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্যে বহু মানুষকে রক্তাক্ত বিপ্লবের স্রোতধারায় অবগাহন করিতে হইয়াছে, লড়াই-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইয়াছে ও আত্মত্যাগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইয়াছে; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও গোটা দুনিয়া, প্রত্যেকটি জাতি, জনপদ ও এক একটি ব্যক্তিকে যাচাই করিলে মর্মান্তিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, বিশ্বমানবতা আজ কিছুমাত্র সুখী নহে। বরং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি ও বিপর্যয় আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। পরন্তু দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপাদান ও অপরিমেয় দ্রব্য-সামগ্রী মানুষের সমস্যার সমাধান করিতেও মানুষকে কিছুমাত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীতে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ কিছুমাত্র কম নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষ ক্ষুধার্ত ও অনশনক্লিষ্ট। দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও উহার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের কোনই অভাব নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষ আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণা-ধারা চতুর্দিকে উদ্দামগতিতে প্রবাহিত; কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা-মূর্খতা আজিও ঘুচে নাই। আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগের উপায়-উপাদান অপরিমেয়; কিন্তু মানুষের বঞ্চনা পূর্বাপেক্ষা কম নহে। ফলকথা, তিন-চারটি শতাব্দীকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ যে জিনিষের সন্ধানে ও আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছিল, তাহা হাতের নাগালের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া ও খোদায়ী হেদায়েত হইতে মুক্ত ও আযাদ হইয়া নিজেদের খেয়াল খুশীমত জীবন পরিচালনার পরিণতি কোথাও কল্যাণময় হইতে পারে নাই। আজ এ-কথা একটি অন্ধবিশ্বাস নহে, ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণতি ও উহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে উহার গর্ভ হইতে উদ্ভূত মতবাদসমূহের পর্যালোচনা অপরিহার্য। এখানে কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাইতেছে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র

নাস্তিকতাবাদী সভ্যতার গণ আন্দোলনমূলক ভাবধারার প্রথম সন্তান হইতেছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র। ইউরোপে নব্যযুগের সূচনায় সামাজিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শক্তিসমূহের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত ছিল। রাজতন্ত্র, গীর্জা ও জায়গীরদারী-সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত লড়াই সম্পন্ন করিল জনসাধারণ, রক্তদান করিল দেশের নির্বিশেষ জনতা; কিন্তু উহার পরিণতিস্বরূপ লব্ধ সবটুকু মধু শুষিয়া লইল একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী। শিল্প-বিপ্লব ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূলে জনগণেরই কোরবানী থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহার কোন ফলই ভোগ করার সুযোগ পাইল না, তাহার সবকিছু কাড়িয়া লইল সমাজের বুর্জোয়া দল। আর ইহারই ফলে সৃষ্ট হইয়াছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সরকারকে জনগণের আস্থা-ভাজন হইতে হয় ও সরকার পরিচালকগণকে অনিবার্য রূপে হইতে হয় জনগণের প্রতিনিধি। উপরন্তু জনমতের আনুকূল্য থাকা পর্যন্তই তাহারা পদাধিকারী হইয়া থাকিতে পারে, যখনি এই অবস্থা বিলুপ্ত হয় তখনি তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়, গণতন্ত্রের ইহাই মৌলিক ভাবধারা। সেখানকার সরকার-ব্যবস্থা, আইন, শাসন-শৃংখলা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির পরিবর্তনও জনমতের ভিত্তিতেই হইতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদী গণতন্ত্রের বাহ্যিক পোষাক যতই চাকচিক্যপূর্ণ হউক না কেন, উহার অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের মৌলিক ভাবধারার কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন ও অন্যান্য বুর্জোয়া-প্রধান দেশসমূহে ইহার বাস্তব প্রমাণ সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সব দেশে গণতন্ত্রের নামে প্রতারণার নাটকই অভিনীত হইতেছে, প্রকৃত গণতন্ত্র কোথায়ও বাস্তবায়িত হইতে দেখা যায় না।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্রের বাস্তবায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উহার আরম্ভিকা, মূলনীতি ও ধারাসমূহ বিশেষ একটি শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ ও মনোবৃত্তির প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। ফলে ইহা দেশের অধিবাসীদের উপর এক জগদ্দল পাথর হইয়া চিরদিনের তরে চাপিয়া বসে।

দ্বিতীয়তঃ জনমত গঠন করার যত প্রকার উপায়-উপাদান সম্ভব, ধনশালী লোকেরাই তাহা সব দখল করিয়া বসে। বিশেষতঃ প্রেস ও সংবাদপত্রের উপর কেবলমাত্র তাহাদেরই আধিপত্য স্থাপিত হয়। ফলে দেশের জনমত নিজেদের অনুকূলে রাখিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে, যাবতীয় সরকারী উপায়-উপাদান নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদেরই স্বার্থে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করে। এই সব দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় পত্রিকা সমূহের যে ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে ঘৃণার্হ। এই সব কারণে সেখানকার জনগণ নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামত জানাইবার বাস্তবিকই কোন সুযোগ পায় না। আমেরিকার নিগ্রো কাগজ-কলমে শ্বেতাংগদের সমান মর্যাদার অধিকারী হইয়াও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা প্রায় সকল মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে মাত্র একজন নিগ্রোই মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত

হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই নমুনা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

আধুনিক নির্বাচন-পদ্ধতি নাস্তিকতাবাদী গণতন্ত্রের বিশেষ অবদান। ইহার দ্বারা প্রকৃত জনমতের অভিব্যক্তি হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দেহ। প্রথমতঃ উপযুক্ত প্রার্থীরই যথেষ্ট অভাব থাকে, ফলে অসংখ্য ভোট অব্যবহৃতই থাকিয়া যায়। অসংখ্য ভোট কম যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রার্থীদের নামে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে নিষ্ফল হইয়া যায়; অপর দিকে বর্থ প্রার্থীদের নামে ব্যবহৃত ভোটগুলি একেবারেই অর্থহীন হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র শতকরা ত্রিশ জনের ভোটই রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; আর এই ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই হইয়া থাকে গোটা রাষ্ট্রের কর্ণধার। এক কথায় বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সংখ্যাগুরু জনতার আস্থাপ্রাপ্ত ও সংখ্যাগুরু লোকদের শাসিত দেশ হয় না, হয় সংখ্যালঘু লোকদেব করগত।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার অবাধ সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হয়; কিন্তু যাচাই করিলে প্রমাণিত হয় যে, এই সমাজে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা বরদাশ্‌ত্‌ করা যায়, যতক্ষণ পুঁজিদারদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। আর যখনি তাহাতে আঘাত লাগে, তখন এই গণতান্ত্রিক সরকারই ফাঁসীবাদী হইয়া পড়ে। আমেরিকার পুঁজিবাদী সরকারের পরিবর্তন কামনাকে 'শত্রুদের তৎপরতা' বলিয়া অভিহিত করা হয় ও তাহাদের উৎসাদনের জন্য পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করা হয়। এই কাজে কোন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর বিন্দুমাত্র গাফলতী বা ঔদাসিন্য পরিলক্ষিত হইলে কিংবা এইরূপ কাজে কাহারো নিযুক্ত থাকা সম্পর্কে সন্দেহ হইলে অবিলম্বে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়।

বস্তুতঃ নাস্তিকতাবাদী সভ্যতার আওতায় গড়িয়া ওঠা নীতিহীন মানুষ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন হইতে প্রস্তুত হয় না। ফলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সরকার ও জনগণ, রাষ্ট্র প্রধান ও পার্লামেণ্ট প্রতিনিধি ও ভোটদাতা—ইহারা প্রত্যেকেই অপরের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। ইহার ফলে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাহা অনেকক্ষেত্রে দুরতিক্রম্য হইয়া পড়ে।

পুঁজিবাদীগণতন্ত্রের অর্থব্যবস্থা

পাশ্চাত্য দেশসমূহে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হওয়ার সংগে সংগে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ফলে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার সীমাহীন ও নিরংকুশ হইয়া দাঁড়ায়। যে কোন সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করা ও অধিক মুনাফা লাভের জন্য তাহা নিয়োগ করার পথে কোন বাধাই সেখানে থাকিতে পারে না। উপার্জন ও সঞ্চয় উভয়ই সেখানে অবাধ ও নিরংকুশ। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোন বাধাই আরোপ করা যাইতে পারে না। এই কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ ও মুনাফা লুণ্ঠন-স্পৃহাই হয় সেখানকার লোকদের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিব্রত হইয়া পরকে বঞ্চিত করিয়া, অপরকে পরাজিত করিয়া নিজকে বড় করিয়া তোলাই হয় সেখানকার লোকদের একমাত্র চেষ্টা।

মজুর ও মালিকের স্বার্থ মর্যাদা ও অধিকারে সেখানে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। ইহারা কার্যতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মালিক পক্ষ সাধারণতঃ কম মজুরীর-বিনিময়ে কাজ সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে, ইহার প্রতিক্রিয়ায় মজুরগণও মালিক পক্ষকে ঠকাইতে ও কাজে ফাঁকি দিয়া হয়রান-পেরেশান করিয়া তুলিতেই চেষ্টিত হয়। এই মারাত্মক টানাহেঁচড়ায় সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নীরব ভূমিকা অবলম্বন করে। ইহার ফলে শ্রমজীবি ও মালিকগণ এবং সাধারণভাবে সমগ্র জনতা নিজদের জৈবিক নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠে।

সমাজতন্ত্র

এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় মানব সমাজে যে মতাদর্শের সৃষ্টি হয়, তাহা সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম নামে অভিহিত হয়। গণতন্ত্রের সহিত সমাজ-তন্ত্রের যতই বিরোধ থাকুক না কেন, উহার স্বভাব-প্রকৃতি মেজাজ ও ভাবধারা, উহার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তস্রোত নাস্তিক্যবাদী গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদেরই অনুরূপ। মূলতঃ ইহা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহা মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নাস্তিকতাবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসে উত্থিত হয় নাই। এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দেওয়াই উহার লক্ষ্য।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের দোহাই পাড়িয়া মানবীয় আযাদী চিরতরে খতম করার সংকল্প করিয়াছে। উহা মানুষের উপর এক ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপাইয়া দেয় ও ব্যক্তির মালিকানা অধিকার হরণ করিয়া মুষ্টিমেয় লোক সব কিছুর উপর একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া বসে।

সমাজতন্ত্র মতবাদ হিসাবে দুইটি শাখায় বিভক্ত। একটি হইতেছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) এবং দ্বিতীয় হইতেছে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র

(Revolutionary Socialism)। প্রথমটি নিজের আদর্শ ক্রমিক ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মনীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক আর দ্বিতীয়টির কর্মনীতি হইতেছে বিপ্লবাত্মক, ধ্বংসাত্মক ও রক্তাক্ত পথ।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নিয়মানুগ কর্ম পদ্ধতির যত অভিজ্ঞতাই অর্জন করা হইয়াছে, তাহা কিছুমাত্র সফলতার দাবী করিতে পারেনা। গ্রেটবৃটেনের লেবার-পার্টির অর্জিত অভিজ্ঞতা ইহার বাস্তব প্রমাণ। সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদন-উপায় জাতীয়করণের সহিত নিয়মতান্ত্রিক কর্মনীতির কোন সামঞ্জস্যই থাকিতে পারে না, পরন্ত দেশের শিল্প সম্পদ জাতীয়করণ করা হইলে গোটা-দেশকে বাহির দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। কেননা উৎপাদন, মজুরী ও দ্রব্যমূল্যের পরিমাণের দিক দিয়া অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করার কোন সুযোগ থাকিলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মরীচিকা মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইতে বাধ্য। এই জন্য প্রত্যেক সমাজ তান্ত্রিক দেশই চতুর্দিকে লৌহ প্রাচীর স্থাপন করিতে বাধ্য হয়।

তবে উহার বিপ্লবাত্মক ভূমিকা—বলপ্রয়োগ পূর্বক ক্ষমতা দখলের কর্মপন্থা কার্যকরী হইয়াছে বলা যাইতে পারে। রাশিয়ার রক্তাক্ত ভূমিতে ইহা সফলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই রক্তাক্ত বিপ্লবের পরিণাম মানবতার পক্ষে কিছু মাত্র কল্যাণকর কিনা তাহা এক কঠিন প্রশ্ন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার চল্লিশ বৎসর কালীন সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার সকল দিক পর্যালোচনা করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে :

(১) রাশিয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানা হরণ করা হইয়াছে। সম্পর্ক ও উৎপাদন উপায় হইতে লব্ধ মুনাফা ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারে হস্তগত হয়।

(২) দেশের গোটা অর্থব্যবস্থাই সরকারের করতলগত হওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষের নিজ ইচ্ছা মত পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

(৩) কর্ম সংস্থানের ব্যাপকতর সুযোগ লাভ হইয়াছে।

(৪) মোট মুনাফার একটি অংশ সামাজিক নিরাপত্তাদানের খাতে ব্যয়িত হইতে পড়িতেছে।

কিন্তু সেই সংগে মোট জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ সামরিক উন্নয়ন ও সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের কাজে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষা কৃত অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের ভূঁড়ি স্ফীত করিতেছে।

কমিউনিষ্ট-বিপ্লবের পশ্চাতে রাশিয়ার আপামর জনগণের বিরাট কোরবানী রহিয়াছে। প্রায় উনিশ লক্ষ মানুষ নিহত হইয়াছে, বিশ লক্ষ মানুষকে কঠিন ও কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। সমবায় ভূমি চাষ চালু করার জন্য ছোট ও মধ্যমশ্রেণীর ভূস্বামীদের উপর যে নির্মম অত্যাচার চালানো হইয়াছে, তাহার কাহিনী পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত করে।

রুশ সমাজের গভীর তলদেশে ধর্ম বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের যে শিকড় সম্প্রসারিত ছিল, তাহা উৎপাটন কারীর জন্য কঠিন শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। জনগণকে ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জন করিতে প্রবল শক্তিতে বাধ্য করা হইয়াছে, সেই সংগে দুর্নীতির প্লাবন সারাটি দেশকে রসাতলে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে। দেশে সংবাদদাতা ও গোয়েন্দা কর্মচারীর এক শক্ত জাল সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জনগণ এখানে খাদ্য-পোষাক বাসস্থানের হয়ত বা নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে ; কিন্তু উহার বিনিময়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমস্ত অধিকারই উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সেখানকার নির্বাচন নিরংকুশ দলবাদের অট্টহাস্য মাত্র। কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া সেখানে যেমন অন্য কোন পার্টিরই অস্তিত্ব নাই, উক্ত পার্টির নাম নিশান ব্যতীত অপর কাহারো ভোট প্রার্থী হওয়ারও তেমনি কোন অধিকার নাই।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের সাফল্য দুইটি জিনিষের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। একটি হইতেছে মুষ্টিমেয় লোকের নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে কর্মক্ষম জনগণকে নিতান্ত কাঁচামালের মত যথেষ্ট ব্যবহার ও কর্মে নিয়োগের স্বাধীনতা। বিরুদ্ধতা, মতবৈষম্য ও সংস্কৃতি—গানবাজনা, থিয়েটার ও বিচিত্রানুষ্ঠান—সব কিছুর উপরই মুষ্টিমেয় শাসকদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের গোলামী আর কিছুই হইতে পারেনা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার যে ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়, তাহার দৃষ্টিতে ইহাকে এক নূতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বলিয়া অনায়াসেই অভিহিত করা চলে। মনে হয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের বার্ধক্য লাভের পর এই নূতন সাম্রাজ্যবাদের লাল সূর্যের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। পর-রাজ্যলোলুপতা ও বিদেশীজাতিকে গোলামীর নাগপাশে বন্দী করার কূটষড়যন্ত্রের ব্যাপারে লাল-শ্বেত-পীত সাম্রাজ্যবাদে কোন মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান নাই। শবদেহ লইয়া একশ্রেনীর ইতর-প্রাণীর মধ্যে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, দুনিয়ার দুর্বল দেশসমূহ লইয়া এই সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে অনুরূপ হিংস্রপ্রতিযোগীতাই চলিতে দেখা যায় এবং এই ক্ষেত্রে কাহাকেও এক-বিন্দু পশ্চাদপদ হইতে দেখা যায় না।

ফ্যাসীবাদ

খোদা বিবর্জিত পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ভ হইতে তৃতীয় নম্বরে যে সন্তান লাভ হইয়াছে, তাহাকে বলা হয় ফ্যাসবাদ। ইহা একাধারে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া মাত্র। পূর্ববর্তী দুইটি মতাদর্শের ক্ষতিকর পরিণতি হইতে মুক্তি লাভের আশায় একশ্রেণীর মানুষ ইহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যদিও ইহার পরিণতি উক্ত আদর্শদ্বয়ের পরিণতি হইতেও অধিক মারাত্মক।

ফ্যাসীবাদকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদ (State controlled capitalism) বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার পরও সেখানে রাষ্ট্রই হয় সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক ও হর্তাকর্তা-বিধাতা। উহার প্রতিটি ধমনীতে পুঁজিবাদী ভাবধারার শোণিত স্রোতই প্রবাহিত হয়।

ফ্যাসীবাদী সমাজে গণতন্ত্র বলিতে কিছুই নাই। মুষ্টিমেয় লোকই দেশের কোটী কোটী জনতার উপর নিরংকুশভাবে কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। মূলতঃ তাহাদের এই কার্যক্রম গোটা জাতির বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র বিশেষ। ইহারা প্রথমে নিজদিগকে কোন রাজনৈতিক দলের নামে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধরূপে গড়িয়া তোলে এবং বিপ্লব করিয়া যে সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করে, তাহাতে নাগরিকগণ কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন চলিতে ও জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয়। হিট্লারের জার্মানী ও মুসোলিনীর ইটালীই ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি দুইটি মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম, ফ্যাসিষ্ট্ রাষ্ট্রের জনগণ মুষ্টিমেয় শাসকদের নির্মম হস্তে নিষ্প্রাণ কাঁচামালের মত ব্যবহৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উহার কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক তৎপরতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অপেক্ষা ফ্যাসীবাদী নাৎসীবাদী শাসনের কুফল অনতিবিলম্বে দুনিয়ার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য মানুষ স্বভাবতঃই ফ্যাসিষ্ট্ আন্দোলন ও ফ্যাসিষ্ট্ রাষ্ট্রব্যবস্থা বরদাশত্ করতে প্রস্তুত হয়না।

সামগ্রিক দৃষ্টিপাত

নাস্তিকতাবাদী সভ্যতার মতাদর্শ ও আন্দোলনে একবিন্দু কল্যাণ নিহিত নাই, এ-কথা বলাই আমাদের লক্ষ্য নয়। কেননা এই বিশ্বপ্রকৃতির বুকে নিরবচ্ছিন্ন বাতিলের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কাজেই নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা এবং তদদ্ভূত মতবাদ ও আন্দোলন সমূহেও কল্যাণের কিছু অংশ অবশ্যই নিহিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে দোষ নাই। আর কেবলমাত্র এই কারণেই কল্যাণ-সন্ধানী মানুষ এই মতাদর্শের দিকে প্রথমে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে উহার অন্তর্নিহিত বিরাট ও ব্যাপক ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াই নবতর মুক্তিপথের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানবতার ইতিহাসে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ফাঁসীবাদ প্রভৃতির বাস্তব অভিজ্ঞতা এইভাবেই সম্ভব হইয়াছে। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বিশ্বমানবতাকে এই শিক্ষাই দেয় যে, এই সব মতবাদ ও আন্দোলনে শ্লোগান প্রচারণা যতই থাকুক, প্রকৃত কল্যাণের কোনই অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু এইখানেই একটি প্রশ্ন তীব্র হইয়া দেখা দেয়। নাস্তিকতাবাদী সভ্যতাই মানবতার চূড়ান্ত মন্‌জিল, ইহাই কি মানবতার ভাগ্যলিপি, না এতদ্ব্যতীত মুক্তি ও কল্যাণের আরো কোন পথ—অন্য কোন উপায়ও বর্তমান আছে, যাহার মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা যাইতে পারে?

এক শ্রেণীর আধুনিক চিন্তাবিদ ইহার উত্তরস্বরূপ বলিয়াছেন যে, মানবতার মুক্তির জন্য নাস্তিক্যবাদী জীবন-দর্শন ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন পথই বর্তমান নাই, কাজেই ইহার বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করাই হইতেছে বিশ্বমানবতার একমাত্র কর্তব্য।

কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলিব। আমরা স্পষ্টকণ্ঠে বলিতে চাই যে, নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা-বৃক্ষের এই বিষময় ফলই মানবতার চূড়ান্ত অদৃষ্ট নহে, উহার মুক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথেই নিহিত রহিয়াছে। নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা বৃক্ষের শেষ পত্র-পল্লব এবং উহার সর্বশেষ ফুল ও ফল চূড়ান্তভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর ইহা হইতে আর কোন ফুল ফল ও পত্র পল্লব নির্গত হইবে না। ইহার মূল হইতে নবতর কোন মতাদর্শ ও আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে না। বর্তমান সময়ে মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে মানুষকে একদিকে যেমন দীর্ঘ অতিক্রান্ত পথের গতি-প্রবাহ যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক, অনুরূপ ভাবে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভবিতব্যের বক্ষদীর্ণ করিয়া ইস্‌লামী সভ্যতা ও আন্দোলনের যে স্বর্ণ-সূর্যের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে, তাহাকেও আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে হইবে।

ইস্‌লামী জীবনাদর্শ

নাস্তিক্যবাদী-সভ্যতার ব্যর্থতার পর ইস্‌লামী জীবন-

ব্যবস্থা ও ইস্‌লামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। কিন্তু ইস্‌লামী জীবনাদর্শ ও সভ্যতা বলিতে কি বুঝায়? এখানে ইহার পরিচয় দান প্রসংগে কয়েকটি মৌলিক ও জরুরী কথা পেশ করা যাইতেছে।

(১) ইস্‌লামী জীবন-আদর্শ হইতেছে কতিপয় মূলনীতি ভিত্তিক একটি আন্দোলন। সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধারনা অনুযায়ী ইহা কোন 'ধর্ম' নহে। নিছক রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কোন হাতিয়ারও ইহা নয়। মূলতঃ ইহা একটি জীবন-দর্শন, মানুষের জীবন-লক্ষ্য ও জীবন-উদ্দেশ্য। ইহার স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট মূলনীতি সমূহ মানবজীবনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব সহকারে প্রযোগ্য। মানুষের সামগ্রিক জীবন ক্ষেত্রে এক সর্বজয়ী ও সর্বাত্মক আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই হইতেছে ইহার ঐকান্তিক দাবী। কোনরূপ সংশোধন আরোপ করাই ইহার লক্ষ্য নহে। মানুষের নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংগঠন, ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য, আইন ও বিচার ; দেশ-শাসন ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সব কিছুই নিজস্ব ভাবধারা ও স্থায়ীমূলনীতি অনুযায়ী গড়িয়া তোলা ইহার একমাত্র দায়িত্ব। এক কথায় এক সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মারফতে মানবতার জীবন সংগঠন ও সর্বিক কল্যাণ বিধানই হইতেছে ইহার চুড়ান্ত লক্ষ্য।

(২) খোদার সার্বভৌম প্রভুত্ব অস্বীকার এবং ব্যক্তি-গত ও সমষ্টিগত জীবনে তাঁহার আইন অমান্য করাই হইতেছে মানব সমাজের সকল প্রকার ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ। এই জন্য ইস্‌লামী আদর্শের দাবী এই যে, এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক যিনি, যাঁহার একচ্ছত্র প্রভুত্ব ও আধিপত্য স্থাপিত আছে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির উপর, মানুষও একমাত্র তাঁহারই অনুগত্য করিতে এবং প্রভুত্ব ও আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য। মানুষের আইনদাতা ও প্রভু তিনিই। মানুষ একমাত্র তাঁহারই বান্দাহ্ ও অনুগত। অতএব নিঃসংশয় ও অকুন্ঠিত চিত্তে খোদার প্রভুত্ব ও অনুগত্যের নিকট নিজকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করিয়া দেওয়াই নিহিত রহিয়াছে মানুষের চিরন্তন কল্যাণ। মানুষের নিকট সত্য ও নির্ভুল তাহাই, যাহা সৃষ্টিকর্তা ও তাঁহার বিশেষ প্রতিনিধি—রসূল—সত্য ও নির্ভুল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর মিথ্যা ও বাতিল তাহাই, যাহা খোদা রসূল কর্তৃক মিথ্যা ও বাতিল ঘোষিত হইয়াছে। উপরন্তু মানুষ এই সব কথা মানিয়া সঠিক রূপে জীবন যাপন করিল কিনা, সেজন্য পরকালে মানুষকে খোদার নিকট জওয়াব দিহি করতে হইবে।

(৩) ইস্‌লামী আদর্শ মানুষকে সমস্ত অ-খোদার দাসত্ব ও আনুগত্য হইতে মুক্তিদান করে। যে সব দর্শন-বিজ্ঞান, মতবাদ-মতাদর্শ, আইন-কানুন, সরকার ও রাষ্ট্র মানুষকে খোদার দাস বানাইবার সুযোগ না দিয়া নিজেরই একান্ত গোলাম বানাইতে চাহে, তাহা সব কিছু অমান্য অস্বীকার করার জন্য ইস্‌লামের সুস্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান।

(৪) ইস্‌লামী-আদর্শে জাতিপূজা, বংশপূজা, দেশপূজা ও শ্রেণী বাদের কোন স্থান নাই। বিশেষ কোন দেশ, জাতি, বংশ কিংবা শ্রেণীর কল্যাণ সাধন উহার কাম্য নহে, উহার সম্মুখে রহিয়াছে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ। উহার দৃষ্টিতে যাহা সত্য, তাহাই মানবতার জন্য কল্যাণকর, যাহা বাতিল ও অন্যায় তাহা কোন দিনই মানবতার একবিন্দু কল্যাণ করিতে সমর্থ নহে। প্রত্যেক শ্রেণী ও মর্যাদার লোকের প্রতি ইস্‌লামের আমন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে সমান ও নির্বিশেষ। কোন একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডে উহা যে পরিবর্তন সূচিত করার চেষ্টা করে, উহার সীমা বহির্ভূত অন্যান্য দেশ ও সমাজের চিরন্তন কল্যাণ ও কেবলমাত্র তাহাতেই নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই উহার বিশ্বাস। সেই জন্য সেই সব ক্ষেত্রেও অনুরূপ জিনিষ রূপায়িত করার জন্য ইস্‌লামের প্রচেষ্টা উদ্দাম ও অশ্রান্ত। বস্তুতঃ এই মতাদর্শ মানবতার কল্যাণের সহিত গভীর ভাবে জড়িত, যে-ই অগ্রসর হইয়া ইহা গ্রহণ করিবে।' সে-ই প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ লাভ করার অধিকারী হইবে।

(৫) মানব-জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ—গোটা মানব-সভ্যতাকেই মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্যমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ইস্‌লাম বদ্ধপরিকর। খোদার প্রেরিত নবীগণ উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া এ সম্পর্কীয় যাবতীয় শোবা সন্দেহের চূড়ান্ত অবসান করিয়া দিয়াছেন। এইজন ইহাকে মানুষের উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা মানব-প্রকৃতির সহিত সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যশীল। ইস্‌লামী জীবন-আদর্শের প্রভাবে যে লোক গড়িয়া উঠে, তাহারা না নাস্তিক্যবাদী হয়, না হয় ধর্মনিরপেক্ষবাদী। বরং তাহারা হয় তওহীদবাদী পবিত্র চরিত্রবিশেষ উন্নত ধরণের মানুষ, উহার দৃষ্টিতে ক্ষমতার হস্তান্তরেই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, হয় নীতি আদর্শ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণে।

(৬) মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইস্‌লাম আদর্শ রূপায়ণ এবং উহার ভিত্তিতে গোটা জীবন, সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনই হইতেছে একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য নিখুঁত নীতি ও পন্থা গ্রহণও এক অপরিহার্য ব্যাপার। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

যেমন সৎ ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক, উহার বাস্তবায়ণের নীতি-পদ্ধতিও হইতে হইবে পবিত্র ও সৎ প্রকৃতির।

গণতন্ত্রের নূতন রূপ

ইসলামী আদর্শের রাজনৈতিক কর্মনীতি ও রাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। ইসলামে সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) একমাত্র উৎস ও অধিকারী হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দিক দিয়াই নহে, রাজনৈতিক ও আইনের প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্বও একমাত্র তাঁহারই। অতএব খোদার মোকাবিলায় ব্যক্তির সমষ্টি, পার্লামেণ্ট—তথা জাতি, সার্বভৌমত্বের ব্যাপারেও ইহাদের কাহারও একবিন্দু অধিকার থাকিতে পারে না। খোদার আইন অস্বীকার কি উপেক্ষা করিয়া কোন আইন-বিধান রচনা করার কাহারও কোন অধিকার নাই।

ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থা আবশ্যক। এই রাষ্ট্র কখনও খোদার বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত ও আযাদ হইয়া কোন প্রকার 'পলিসি' নির্ধারণ করিবে না। সেখানে জনগণ ও শাসক উভয়ই সমান ভাবে খোদার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া উহার অধীন হইয়া থাকিবে এবং খোদার প্রতিনিধি হিসাবে খোদায়ী বিধান কার্যকরী করাই হইবে উহার একমাত্র দায়িত্ব। ইসলামপন্থী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন উহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। জনগণের মধ্য হইতে সর্বাধিক সৎ-সদিচ্ছা, সততা ও যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকেরাই হইবে উহার নির্বাচিত শাসক।

ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী আইনের মূল উৎস হইবে কোরআন এবং সুন্নাহ্। এই রাষ্ট্র একদিকে যেমন জনগণের স্বার্থ পুরাপুরি রক্ষা করিবে, অনুরূপভাবে খোদার মর্জি কার্যকরী করার দায়িত্ব হইতে উহা মুহূর্তের তরেও গাফিল হইবে না।

ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী কিংবা বংশ ভিত্তিক নয়। উহার মূলনীতিতে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই উহার দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত। উহার দৃষ্টিতে জাতি বা বংশ অপেক্ষা নীতি ও আদর্শের মূল্য ও গুরুত্ব সর্বাধিক। কাজেই আদর্শ ত্যাগ করিতে উহা কস্মিনকালেও রাজী হইতে পারে না।

নবতর অর্থব্যবস্থা

ইসলামের অর্থব্যবস্থাও সম্পূর্ণ অভিনব। উহাতে দুনিয়ার প্রচলিত আদর্শসমূহের অন্তর্নিহিত দোষত্রুটির কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তাহাতে পুরাপুরিভাবে বর্তমান। ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানার পূর্ণ সুযোগ তাহাতে রহিয়াছে বটে ; কিন্তু ইহার সুযোগে মানুষকে শোষণ ও বঞ্চিত করার কোন অধিকারই কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে এখানে প্রতিযোগিতা সমর্থনীয়, অবশ্য যদি তাহা দুর্বল, পংগু ও উপার্জনে অক্ষম লোকদিগকে বঞ্চিত না করে ও তাহাদের সবকিছু লুটিয়া লওয়ার কোন সুযোগ না হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই নিজের জন্য দায়ী; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা করার অধিকার দেওয়া হয় না, অসহায়-নিরাশ্রয় করিয়াও সেখানে কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। সেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্যই সামাজিক নিরাপত্তা বিদ্যমান। প্রত্যেকটি নাগরিক প্রত্যেকের জন্য দরদী, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হইয়া থাকে। ফলে এখানে শ্রেণীসংগ্রাম কখনই মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির কোন সুযোগ সেখানে নাই, শ্রেণীসমূহের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান ও ইনছাফ কায়েম করা ইসলামী রাষ্ট্রের এক বিশেষ কর্তব্য। ইহার কারণে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ও বৈষম্য কখনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারেনা। রাষ্ট্র কাহারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না—ইহা পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি হইলেও হইতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র কখনো এই নীতি স্বীকার করে না। গোটা রাষ্ট্র ও সমাজের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ক্ষেত্রে—দিকে ও বিভাগেই ইসলামী জীবন-ধারা রূপায়ণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র দায়ী। কাজেই কোন একটি দিককে ব্যক্তিগত দিক বলিয়া উহার আওতার বাহিরে রাখা যাইতে পারে না।

নূতন সমাজ

ইসলামী আদর্শ সমাজব্যবস্থার যে নূতন বুনিয়াদ স্থাপন করিয়াছে, পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার সহিত তাহার একবিন্দু সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। পরিবার হইতেছে এই সমাজের প্রথম ভিত্তী। কেননা পরিবার মানবতার জন্য কেবল প্রেম, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসারই আকর হয়না, নূতন বংশের উৎপাদন অত্যন্ত পবিত্র পরিবেশের মধ্যে হওয়াও সম্ভব করিয়া দেয়। এই জন্য ইসলামী সমাজে বিবাহ অত্যন্ত সহজসাধ্য কাজ, ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সমস্ত দ্বারই সেখানে রুদ্ধ। নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও গুণ পার্থক্যের দৃষ্টিতে দায়িত্ব ও কর্তব্যেও পার্থক্য সূচিত হইয়াছে এবং উভয়ের কর্মক্ষেত্রও সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে নারী-

পুরুষের অবাধ মেলামেশার সেখানে কোন সুযোগই পাওয়া যাইতে পারে না।

আন্তর্জাতিক ভূমিকা

ইস্‌লামী রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক ভূমিকা রহিয়াছে। এই রাষ্ট্র যেহেতু কোন জাতীয় রাষ্ট্র নহে, কোন বৈষয়িক স্বার্থের ভিত্তিতেও ইহা পরিচালিত হয়না, ইহা হয় খোদার বিশ্বাসী ও মানবতার কল্যাণকামী রাষ্ট্র; তাই বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সৃষ্টি করা উহার নীতি নহে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় উহা কোন ধোঁকা ও প্রতারণার ভূমিকা গ্রহণ করে না। সাম্রাজ্য জাল বিস্তার করিয়া দেশাধিকারের উদগ্র ক্ষুধা চরিতার্থ করাও উহার কাজ নহে। প্রকৃতপক্ষে ইস্‌লামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র হইবে মানবতাবাদী মূলনীতি ও কল্যাণকর সভ্যতার ধারক ও বাহক। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি, রাষ্ট্র ও প্রত্যেকটি নাগরিক পর্যন্ত ইস্‌লামের পবিত্র পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সেজন্য প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার আধুনিকতম উপায়-উপমা-দান প্রয়োগ করাই উহার দায়িত্ব। সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে অ-খোদা শক্তির দাসত্ব-শৃংখল হইতে মুক্তিদান করিয়া মনুষ্যত্বের উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করাই উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ খোদায় বিশ্বাসী ও তওহীদবাদী জাতি এবং রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে একটি ঐক্যজোট গঠন করাও খোদাহীন—খোদা-বিরোধী শক্তিসমূহ চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দেওয়া উহার স্থায়ী কার্যসূচীর মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে।

শেষ কথা

নাস্তিকতাবাদী সভ্যতা এবং তদ্ভুত মতবাদসমূহের সহিত ইস্‌লামী আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম। এই আলোচনা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদগ্ধ সমাজের নিকট এ-কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, নাস্তিকতাবাদী মতবাদসমূহ প্রকৃত পক্ষে মানবতার কোন মৌলিক কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। উপরন্তু খোদাহীন সভ্যতাই হইতেছে সকল প্রকার অশান্তি, জুলুম-নিষ্পেষণ, ব্যভিচার-অবিচার এবং ব্যাপক যুদ্ধবিগ্রহের মূলীভূত কারণ। যতদিন পর্যন্ত এই সভ্যতার বিষদাঁত চুর্ণ করা না যাইবে, উহার নাস্তিকতাবাদী ভাবধারা সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত ইস্‌লামী আদর্শের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব না হইবে, ততদিন পর্যন্ত মানবতার প্রকৃত মুক্তি বিধান অসম্ভবই থাকিয়া যাইবে, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ নাই।

শুকতারার জন্যে

[কায়েদে আযম স্মরণে]

আবদুল মজিদ

মুক্তির প্রত্যূষে এক সূর্যজ্বলা দিনের ইংগিত
দিয়ে তুমি ঝরে গেলে শুকতারা, এক যুগ আগে ;
আলোর জোয়ার মাঝে সেই স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয় জাগে,
সন্তান-বিয়োগ ব্যথা এ-মাটীর কমেনি কিঞ্চিৎ।

সে দুঃখে প্রতীকধর্ম্মী জাতীয় পতাকা অর্ধ নত,
এহেন আঘাত কেউ ভুলবে কি ? ভুলেনি জনতা—
সময় চক্রায়মান, দেশজোড়া প্রাণে কৃতজ্ঞতা
এ-দিনের আবির্ভাবে জেগে ওঠে আহত, চকিত।

যে স্বপ্ন জীবন পণে রূপায়িত স্বীকৃত বাস্তবে
সশ্রদ্ধ নিয়েছি মোরা তার পূর্ণ বিকাশের ভার ;
দেহের অতীতে গিয়ে আত্মা যদি বিনাশের ধার
এড়িয়ে অক্ষয় থাকে—আশীর্বাদ করো তুমি তবে।
মৃত্যুর শীতল হস্ত ব্যর্থ করে কীর্তি মহীয়ান—
তোমার জীবন কথা ইতিবৃত্তে আলোর আখ্যান ॥

সংগম তীর্থ

নূরুল ইসলাম খান

ঘন জঙ্গলটাকে দুপাশে রেখে তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছি। পাহাড়ী জঙ্গল। নিবিড় ঝোপঝাড়ে পূর্ণ। লালমাটীর সরুপথ। ফৌজী সড়ক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের জন্য তৈরী হয়েছিল। এখন দেশ স্বাধীন হবার পর মেরামত চলছে সরকারী প্রচেষ্টায়। নতুন রূপ নিবে একদিন। পথের দুধারে বাঁশঝাড়ই বেশী। খানিকদূর উপরে উঠে বেঁকে গিয়ে রাস্তার উপরে এসে পড়েছে নুয়ে বাঁশের ডগাগুলো। অনেকটা বাঁকা ধনুকের মত। আর মাঝে মাঝে দুচারটে পাইন, দেবদারু, দারুচিনি আর শাল মাথা তুলে পাহারা দিচ্ছে জঙ্গলটাকে। নিতান্ত কাঠফাটা রদ্দুরেও এ-পথে চললে বসন্তের মিষ্টি বাতাস গায়ে আমেজের প্রলেপ বুলিয়ে যায়। বেশ লাগে। কয়েকদিন একটানা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ একটু অবসর পেতেই বেরিয়েছিলাম পথে। সঙ্গে এলসেসিয়ান কুকুরটা। লালমাটীর গন্ধ শুঁকে এগিয়ে চলেছে।

বেশ অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। ওদিকে সূর্য্য হেলে পড়েছে। আকাশের পেঁজা তুলোর মত নরম মেঘে কে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকটা ধর্ষিতা কুমারীর মত শুদ্ধ প্রকৃতি। আঁধারের প্রত্যাশী। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্য জঙ্গলের পরিচিত সর্টকাট পথে পা বাড়াই। আধো আলো, আধো আঁধার। আধো সূর্য্যের চেয়ে দেখা। মন্দ লাগছিলো না পথ চলতে।

খস্‌-খস্‌-খস্‌। ঝরে পড়া বাঁশ পাতার স্থানচ্যুত হওয়ার আলতো আভাস। চমকে উঠি। কুকুরটার কানদুটো খাড়া হয়ে ওঠে। আবার চলতে থাকি। এবার যেন আরও একটু কাছে। বোধকরি দুপায়ের শব্দ। কেজানে আমারই মত নীড় ফেরা ক্লান্ত পথিক হয়তো। ভরসা পাই মনে। চোখের উৎসুক দৃষ্টিটা বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে লেন্সের মত দূরে নিক্ষেপ করি। অনুমান অমূলক নয়। পথিক কিন্তু একটি তরুনী। চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে। মনে হলো ভীরু চোখের তারাদুটো এদিক ওদিক কিসের সন্ধানে উন্মত্ত। হয়তো ভয় পেয়েছে। কৌতূহলী হয়ে অনুসরণ করি। অনেকটা ব্যবধান রেখে। গাছের আড়ালে আড়ালে। চলতে চলতে পাশ দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়লো শাড়ীর আঁচলে কি যেন লুকিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি। সন্দেহ হলো ওর পথ চলার অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে। আরও একটু এগিয়ে যাই।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। একটা পুকুরের বাঁধানো ঘাটের সামনে। জঙ্গলের পাশের গ্রামের লোকেরাই সরকারের কাছ থেকে খানিকটে জমি নিয়ে তৈরী করেছে পুকুরটা। মেয়েটার কার্যকলাপ স্পষ্ট দেখতে পাবো এই আশায় একটি দেবদারু গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। সচেতন দৃষ্টি মেলে ধরলাম ওর দিকে। মেয়েটা চারিদিক একবার ভাল করে দেখে দিল। নাঃ কেউ নেই। ছোট্ট একটা পুটুলী—হ্যাঁ, কাপড়ই জড়ানো; আঁচল থেকে বের করে মাটীতে রাখলো। কাপড়টা একটু যেন নড়ে উঠলো—এদিক থেকে ওদিক। কিসের একটা শব্দও মনে হলো যেন। কঁকিয়ে ওঠা। খুব মিহি অথচ করুণ।

রীতিমত বিস্ময়। মেয়েটির মুখ এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে। সহসা বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে। এই বিশাল অরণ্য সমুদ্রে যেন পলকের জন্য দিকভ্রষ্ট হলাম। কাকে দেখছি! হ্যাঁ সে মুখ, সেই দুটি বড় বড় আয়তন চোখ, ঘন ভ্রু, পাতলা ঠোঁট, কোকড়ানো চুল। মেয়েটি এবার ঝুঁকে পড়লো কাপড়ের পুটলীর উপরে। হাঁটুদুটো মাটীতে ঠেকিয়ে বসলো। মুখটা নামাল। কয়েকটা চুল কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো মুখে। কাকে যেন চুমু খেল। হ্যাঁ, ঐ যে চুম্বনের আস্বাদ এখনও সে অনুভব করছে আর ম্লান ঠোঁটে আর করুণ চোখে।

শিশু! রক্তে ঢেউ খেলে যায় আমার।

বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগে। গায়ে চিমটি কাটি। নাঃ চেতনা তার উদ্ধত ফনা তুলে সজাগ রয়েছে। একি চেতনার বিস্মৃতি না আমারই আত্মবিস্মৃতি! ভাবি মনে।

কতক্ষণ এ-ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক নেই। টাইগারের চীৎকারে জ্ঞান ফিরলো। তাকিয়ে দেখি মেয়েটি নেই। চারদিক ফাঁকা। কোথায় গেল। কাপড় জড়ানো শিশুটা কিন্তু ঠিকই আছে। হ্যাঁ ঐ…ঐযে কেমন সুন্দর হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। কাকে খোঁজে? গায়ের রোমগুলো শির টেনে ধরে। তাড়াতাড়ি ছুটে যাই শিশুটির কাছে। অদ্ভুত সুন্দর তালপাকানো এক-টুকরো মাংসপিণ্ড। খুব ছোটো। মাথার ইঁদুরটা লাফাচ্ছে দপ্‌ দপ্‌ করে। ভাল করে চোখও মেলতে শেখেনি। গলায় কি যেন চক্‌ চক্‌ করছে। হাতে নিয়ে দেখি একটা লকেট। লকেটে একটি ছবি। শিউরে উঠি। সেই মুখ—এই একটু আগে যে ফেলে দিয়ে গেল

ছেলেটাকে। তারই সংশয় জাগলো—মেয়েটাকে চিনি শুধু চিনিই না ভালভাবে জানি। কিন্তু এই নবজাতটি কে? মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? এখানে ফেলে দিয়ে গেল কেন? একের পর এক প্রশ্ন এসে চেতনায় আঘাত হানতে লাগলো। ভাল করে তাকাই ছেলেটির দিকে। নাঃ এবার কোনো সংশয় নেই। সেই চোখ, সেই নাক, ভ্রূর সেই প্রাথমিক আভাস। যে ছবিটা তার...বুকে ওটা শুধু ছবিই নয়: এই ছবিটা যার প্রতিকৃতি তার রক্ত, মাংস তার স্নেহ সব আলোর কুচির মত জড়িয়ে আছে শিশুটির অন্তরে—বাইরে। একাকীত্বের গভীর অজানা মহাসমুদ্রে ঐ ছবিটাই শিশুটির একমাত্র পাথেয়।...

রহস্যের পর রহস্যের বেড়াজালে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো। কোনো শব্দ না করে আলতোভাবে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরি। মেয়েটিকে খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম শুধু ক্ষণিকের জন্য পেয়ে হারিয়ে যাওয়ার তীব্র বেদনা—আজ যা শিশুটার জীবনের চরম সম্বল।

শিশুটাকে বুকের কোরকে মুড়ে বাংলোয় ফিরি। পাহাড়ের টীলার উপরে মনের মত সাজানো সরকারী বাংলো। পেছনে এলো কুকুরটা অনুসরণ করে। সূর্যে আলো ততক্ষণ তার সংযম হারিয়ে মাটির বুকে আঁধারের ছাউনি ফেলেছে। আঁধার—চারদিক আঁধার। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঘরের দরজায় পা দিয়েই ডেকে উঠি—"কাঞ্চী, কাঞ্চী, শীগগির আয় এখানে।"

বছর সতেরের একটি অমমিয়া মেয়ে ছুটে এলো একটি পায়রার ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে। এই ছোট্ট বাংলোটাতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী বলতে ঐ কাঞ্চী। আদিবাসী মেয়ে। গৃহিণীও। রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে মায় আমাকে পরিচর্য্যার ভার ওর হাতে। চঞ্চল, উচ্ছল।

আমার ডাকে ছুটে এসে প্রশ্ন করলো—"বাবুজী আমাকে বুলালে কেনো?"

ইশারায় ঘরে ডেকে নিয়ে বলি—"ত্যাখ ত্যাখ তোর জন্য কি এনেছি। তুই না পরের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করিস—এই নে এবার খুশী হলি তো?"

কাঞ্চী যেন আকাশ থেকে পড়লো। চোখদুটো কাঁপিয়ে বললো—"একি বাবুজী জিন্দা লেড়কা। লেকিন তুমি কাঁহাসে লি আইলে বাবুজী? বলো না কার লেড়কা?"

ঘুমন্ত ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—"নারে না কোনো ভয় নেই। ও আমার এক বন্ধুর ছেলে। ও পেটে থাকতেই ওর বাবা মারা যায়—আর আজ দুদিন হলো ওর মা মরে গিয়েছে। ওর এ-সাংসারে বোধ করি আর কেউ নেই এক আমি ছাড়া। আচ্ছা কাঞ্চী, তোর তো মা হবার খুব সখ না রে?" স্মিত হেসে বলি।

—"ধ্যেৎ! বাবুজী তুম বহুত বেশরম আছো!" কাঞ্চী মুখটা নীচু করে লজ্জায় আরক্ত হয়ে বললো।

—"আরে না না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে। তোর বিয়ে হলে এদ্দিনে তুই দু' ছেলের মা হতিস—তাই না? আচ্ছা যাক...এই নে ছেলেটাকে এবার থেকে মানুষ করবি তুই। খরচ যা লাগে আমি দোব। ঠিক মায়ের মত কেমন?"

কচি বাচ্চাটীকে বুকের নিবিড় সংস্পর্শে টেনে অদ্ভুত স্বরে বললো—"না না তার জন্য তুমি কুচ্ছু শোচো না বাবুজী...আমি একে মায়ের পেয়ার দিয়ে মানুষ করবে।"

—"আর ত্যাখ, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তবে বলবি ও আমার ছেলে—ওর মা মরে গেছে তাই দেশে গিয়ে নিয়ে এসেছে...বুঝলি?"

—"আচ্ছা।" মাথা নেড়ে উত্তর দিল কাঞ্চী।

॥ দুই ॥

প্রায় দু'বছর আগে এ-অঞ্চলেই কাঞ্চীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। পুরনো মরচে পড়া গ্যাসের আলোয় ওকে দেখেছিলাম। নির্বাক চোখের ভাষাতেই সেদিন বুঝে নিয়েছিলাম ও যা চায় আমি তা কখনো দিতে পারবো না। আমি পালাতে চেয়েছিলাম। ও প[illegible] আটকে দাঁড়াল। ও জাতে আসামী। ধর্মে খৃষ্টান। ভাষা হিন্দুস্থানী। আমি বাঙ্গালী, মুসলমান। তবুও ওকে বুকে টেনে নিয়েছি। আর এক ধর্মের প্রেরণায়: মহান এক সত্যের আহ্বানে: যেটা শাশ্বত, চিরন্তন—আদিম।

ও একটা রেস্তোঁরার সামনে দাঁড়িয়েছিল। পুরনো এক ল্যাম্প পোষ্টের নীচে। অনেক ক্ষয়ে যাওয়া আলোর মাঝে। শীতের সন্ধ্যা। পাহাড়ী জায়গা। কনকনে শীত গায়ে বরফের কুচি দিয়ে বারবার চাবুক মেরে উঠছে। সরকারী কাজে সিলেট সহরে আসতে হয়েছিল। গাটাকে গরম রাখার জন্যে চা খেয়ে সবেমাত্র রাস্তায় পা দিয়েছি চোখে পড়লো মেয়েটীকে। গায়ে আধ ময়লা ছেঁড়া ব্লাউজ আর এক টুকরো শাড়ী। কোন রকমে লজ্জাটাকে বন্দী করে রেখেছে। ছেঁড়া ব্লাউজ আর শাড়ীর ফাঁক দিয়ে উদ্ধত যৌবন কটাক্ষ হেনে হাতছানি দেয় পুরুষকে। ফুটে ওঠা মহুয়ার মত স্ফিত বুকের মাতাল গন্ধ আবেদন জানায় পুরুষের আদিম রিপুকে। বুঝলাম ওর নিঃসঙ্গ অবস্থায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণটুকু। কাছে গিয়ে বললাম—"এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? গলায় ক্রস ঝুলিয়ে এসব করতে লজ্জা করে না!"

আর বেশী কিছু বলার সুযোগ দিল না সে। গলায় বন্দী করা ক্রসটাকে দুহাতে চেপে ঝর ঝর করে বর্ষার ফল্গুধারার মত কেঁদে ফেললো। চোখে মুখে সাহায্যের ইঙ্গিত।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। কেমন যেন করুনা হলো মেয়েটীর প্রতি। সস্নেহে বললাম—"চাকরী পেলে এ-পথ ছেড়ে দেবে তুমি? ভদ্র চাকরী।"

অসহায় মেয়েটী অকস্মাৎ আমার হাতটী ধরে বললো—"তুমি হামকো দেবে বাবুজী? মেরা ইজ্জত বাঁচাবে তুমি?"

সংক্ষেপে বললাম—"যদি বিশ্বাস হয় আমার সঙ্গে এসো।"

মেয়েটী তারপর আর কোনো কথা বলেনি। নিঃশব্দে আমায় অনুসরণ করলো। সেই থেকে ওকে নিজের কাছেই আশ্রয় দিয়েছি। বিয়ে হলে বা ভালবাসলে হয়তো ওকে স্ত্রীর অধিকার দিতাম। কিন্তু তা দিইনি। তবুও ও আমার চাকরাণী নয়। আরও কিছু।

দিন কয়েক পরে একদিন স্বাভাবিক আগ্রহ নিয়ে ওর সম্পর্কে খোঁজ নিই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে অনেক কথাই বলেছিল সেদিন।

ওর বাবা ভারতীয় খৃষ্টান, মা আদিবাসী অসমীয়া। আসাম তখনও জন্তু জানোয়ারের দেশ। এলো মিশনারী, এলেন গলায় ক্রস ঝুলিয়ে যীশুর মূর্তি হাতে পাদ্রী। প্রচার হলো ঈশ্বর পুত্রের মহিমা। একটু অল্প শিক্ষিত আসামীরা স্বধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করলো। কাঞ্চীর বাবাও তীর ধনুক ছেড়ে ক্রস নিল হাতে। বিনিময়ে চাকরী পেল চা বাগানে। দিন মজুর। এখানেই সন্ধান পেল কাঞ্চীর মায়ের। বন্য মোহ। বিয়ে করলো তাকে। চায়ের বাগানে কুলিগিরি করে দিন কেটে যেতো ওদের। লোকটার নেশা ছিল মদের। মজুরী থেকে চোলাই করা ধেনো মদ গিলতো গ্লাসের পর গ্লাস। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো কাঞ্চীর মায়ের কোলে, সমস্ত বুক জুড়ে। এমনি একদিন মদের নেশায় সেই যে জ্ঞান হারালো আর ফেরেনি। কাঞ্চীর বয়স তখন পনেরো। উজ্জ্বল যৌবন নিয়ে সে আপন খেলায় মত্ত। সকলেরই চোখ পড়লো কাঞ্চীর উপর। দেখতে সুন্দর ছিল সে। ভারতীয় মেয়ের মতই তার নাক, তার রূপ, তার ঠোঁট। চায়ের বাগানে সে। জন্মেছিল গোলাপের পাপড়ি নিয়ে। অবশেষে একদিন তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। বন্ধু জুটলো কাঞ্চীর বিধবা মায়ের। ম্যানেজার থেকে কুলি পর্য্যন্ত। আর জুটলো তার অবৈধ প্রণয়ী। একদিকে মায়ের অস্তগামী যৌবন আর একদিক বন্যার পলাশ বনে ফুল ফোটার মতই না জানিয়ে যৌবনের নিমন্ত্রন। মা পালালো কুলির সঙ্গে। মেয়ে হলো পদ্মের মহিমা নিয়ে পাঁকের মাঝে।

আশ্রয় জোটে। রূপ আর দেহের বিনিময়ে। পদ্মমনা কাঞ্চীর মন তাতে চা পাতার সোঁদা গন্ধে দম আটকে আসে। ভুললো না তাতে। পথে বেরিয়ে পড়লো যৌবন আর লোভাতুর দেহের বোঝা বয়ে। আশ্রয়ের খোঁজে।

তারপর?

—"হাম কভী আপনা ইজ্জত বেচিনি বাবুজী। তুমিই মেরা উসদিন ইজ্জত বাঁচিয়ে দিলে। হাম তুমকো ছোড়কে কভী যাবে না...ইয়ে দুনিয়া বড় লালচী আছে বাবুজী।"

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—"না না ভয় নেই, তোকে আর কোথাও যেতে হবে না।"

শেষের কথাগুলো বোধ হয় মুখ দিয়ে সত্যি সত্যিই উচ্চারণ করেছিলাম। কারণ অতীত স্মৃতির রোমন্থনে খেয়ালই ছিল না যে আমি নিজেরই ঘরে আঙ্ঠির সামনে বসে পাইপ টানছি। বাইরের পৃথিবীতে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বরফের বৃষ্টি হচ্ছে। চেতনা ফিরে পেলাম কাঞ্চীর কথায়। তাকিয়ে দেখি দরজার কাছে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে।

ঘরে ঢুকে বললো—"বাবুজী, তুম একেলে কার সঙ্গে বাতচিৎ করছো? কিসকো রোকবে তুমি?"

হেসে বললাম—"না রে, কিছুই না, একটা পুরনো কথা মনে পড়লো—অনেকদিনের।"

কাঞ্চী চুপ করে গেল। ছেলেকে কোলে নিয়ে আগুনের সামনে মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লো। গমগমে আগুনের লাল চ আভায় ওর ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠলো। বসেই হাতের ফিডিং বোতলটা পাশে রেখে ছেলেকে আঁচল চাপা দিয়ে স্তন মুখে দেবার চেষ্টা করলো। এক রত্তি ছেলে। মায়ের বুকের আস্বাদ পেয়ে আরও গভীর ভাবে মিশে গেল কাঞ্চীর দেহের সঙ্গে। নিজের স্তনে একটা নরম ঠোঁটের উষ্ণতার পরশ পেয়ে নিজেই কেঁপে উঠলো কাঞ্চী। বর্ষণক্লান্ত পৃথিবীর এক কোণে এক কুমারী কন্যার মা হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় হাসলাম। আর ছেলেটা! বোঁটায় মুখ লাগিয়েও দুধ পাবে না জানি—কাঞ্চীও জানে তা। কিন্তু ঐ নরম চামড়ার আবরণের মধ্য হতে সে যে অমৃতের সন্ধান পাবে তাতে তার গলা ভিজবে না—ভিজবে বুক আর ভিজবে কাঞ্চীর দুটো চোখ!!

ছেলেটাকে আঁচল চাপা দিয়েই কাঞ্চী উঠে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে মেঝেতে বসলো। তারপর ভ্রু দুটো

কাঁপিয়ে বললো—"আচ্ছা বাবুজী, আমি একটা সওয়াল করবো—তার জবাব দেবে তুমি? গোস্বা করবে না বলো?"

—"না না রাগ করবো কেন? তুই কি জানতে চাস বল্?"

—"আচ্ছা বাবুজী তুম জিসদিন সে খোকা বাবুকে লিয়ে এসেছো উসদিন সে ভাল করে বাতচিৎ ভি করো না—কেন বাবুজী? খোকা বাবুকে আমার বুকে দিয়ে সোয়াস্তী পাও না বুঝি?"

গলার স্বর ভারী হয়ে আসে কাঞ্চীর।

—"না না তা নয় কাঞ্চী তা নয়—তুই মন ভাঙ্গিস না। তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে।"

—"ফির বাবুজী?"

—"ছাখ কাঞ্চী, তোর কাছে আমার লুকোবার কিছুই নেই। তবে ছেলেটাকে দেখলেই আমার অতীত জীবনের কয়েকটা কথা মনে পড়ে—তখন আর কিছু ভাল লাগে না।"

—"কি কথা বাবুজী—বলো না।"

—"শুনতে চাস, না?"

কাঞ্চী সোৎসাহে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

॥ তিন ॥

নাম সুরাইয়া।

আকাশের লক্ষ তারার মধ্যে একটী তারার নাম। চাঁদের জ্যোৎস্না আর মুঠো মুঠো মেঘের মাঝেই যার বিকাশ পৃথিবীর ধূলো বালি তার গায়ে সইবে কেন। তারাগুলো যেমন ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে—অনেক উর্দ্ধে—সুরাইয়াও তেমনি ছিল স্পর্শের অতীত। বড়লোকের একই সন্তান। মা মরে গিয়েছিল কোন্ ছোট বেলায়। তবুও আদর যতটুকু পেয়েছিল বাপের কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী পেয়েছিল সে রূপপ্রকৃতির কাছ থেকে। একই কলেজে পড়তাম আমরা। ওর বয়স তখন উনিশ। এই বয়সেই সে ছিল অপরূপ মোহময়ী। দুধে আলতা মেশানো ওর ফর্সা রঙে চোখ ঝলসাতো সবারই। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ছিল মেয়েটীর দুটো চোখ। ছোট্ট কপালে কাজল পরা চোখ দুটো জল জল করতো আকুতি ভরা দৃষ্টিতে। তুলির আঁচড়ে আঁকা ভ্রু দুটো কাঁপতো সব সময়েই। নবজাত শিশু চাঁদের মত বাঁকা। ঘন কালো। অপরূপ মুখখানাকে আরও সুন্দর, আরও গভীর করেছিল ওর মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো। মেঘের পাহাড়ের মত যেন থাকে থাকে সাজানো। ওকে দেখলে মনে হতো প্রকৃতির রূপের পসরা আর জীবনের স্বপ্নালুতা নিয়েই জন্মেছে ও। ওর পাতলা ঠোঁট দুটোতে ভুল করে কোনো চপল ভ্রমর তার কৃষ্ণ পক্ষরাজি নিয়ে বসলেও আশ্চর্য্যের বিষয় হতো না। ও ছিল প্রকৃতির মেকআপ করা একটুকরো আলোর ফুলকী। তাই এক এক সময় মনে হতো ওর স্থান আকাশে লক্ষ তারার মাঝেই।

হ্যাঁ···এই অপরূপ মেয়েটীর সঙ্গেই একদিন ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম একটী কবিতাকে কেন্দ্র করে।

আমি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। আর সুরাইয়া পড়তো ফার্স্ট ইয়ারে। ক্লাসে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তবুও ওকে দেখতে পেলাম আমরা সবাই টিফিন পিরিয়ডে কলেজের বাগানে পাম গাছটীর নীচে। হয়তো গল্প করতো বান্ধবীদের সঙ্গে কিংবা নখ খুটতো। কোনদিকে চোখ তুলে তাকাতো না। কারণ ও জানতো চোখ তুললেই কারও না কারও আবেশ জড়ানো চোখের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে।

সেই দুটো ঘন পাপড়ি ভুল করে বুঝিই আমার তারার সঙ্গে মিলে গেল।

প্রতি বছরের মতই কলেজ ম্যাগাজিন বের করার তোড়জোড় চলছিল তখন। ছোটবেলা থেকেই আর্টের চর্চ্চা করতাম একটু আধটু। তাই এক রকম ঝোঁকের মাথায়ই একটা কবিতা লিখে ফেললাম ম্যাগাজিনের জন্য। আমার প্রেরণা ছিল সুরাইয়ার লাজনম্র রূপ। তাই ইচ্ছে করেই কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম 'একটী তারার নাম সুরাইয়া'। রূপের বর্ণচ্ছটা। সবাই বুঝল কবির মানসী কে? কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে সাহস করে কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। রাতারাতি কলেজে খ্যাতি লাভ করলাম। বাংলার অধ্যাপক ডেকে পাঠালেন। উৎসাহ দিলেন পিঠ চাপড়ে। বললেন: অমন সুন্দর বাস্তব সৌন্দর্য্যের গভীর আধ্যাত্মিক রূপায়ন নাকি হয়না। বুকটা গর্ব্বে ফুলে উঠলো। আমি অবশ্য নিছক তারুণ্যের জোয়ারে ভেসে গিয়েই লিখেছিলাম কবিতাটা।

নিজের লেখনীর প্রতি মমতা বেড়ে গেল।

দিন কয়েক পরে আর সব ঘটনার মতই শান্ত হয়ে এলো প্রশংসার মুখরতা। সবাই জানলো আমি কবি জীবনের, কবি সুন্দরের। কিন্তু বড়ো চাপা। একদিন কলেজ থেকে বেড়িয়ে গুন গুন করতে এগিয়ে চলেছি ফুটপাথ ধরে—এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকলো। মিষ্টি গলা—"শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

তাকিয়ে দেখি সুরাইয়া। আমি এখন কবি। পৃথিবীর কোনো আহ্বানই এখন আমার কাছে অস্বাভা-

বিক নয়। তাই বেশ গম্ভীর হয়েই বললাম—“আমার সঙ্গে, কি কথা বলুন ?”

চোখের ভ্রু দু'টো আলতো ভাবে বাঁকিয়ে বললো,—“এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা সম্ভব নয়—আসুন ঐ পার্কে।

—“বেশ চলুন।” মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর কথার জবাব দিয়ে সেদিন কলেজের অদূরে একটা পার্কে গেলাম। বসলাম একটা শূন্য বেঞ্চিতে পাশাপাশি। মুখোমুখি হয়ে।

সুরাইয়া বসেই বেশ খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গীতে চাপা গলায় আমাদের ম্যাগাজিনটা দেখিয়ে বললো—“দেখুন ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে একজন অপরিচিতা মেয়েকে অপমান করার আপনার কি অধিকার আছে—তাও কবিতার মাধ্যমে ?”

—“তার মানে ?” ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করি।

আমার লেখা কবিতাটী দেখিয়ে বললো—“এটা কবিতা না উন্মাদের প্রলাপ ?”

—“বিচার যখন আপনিই করছেন, সিদ্ধান্তটাও জানিয়ে দিন।” হেসে বললাম।

—“দেখুন রসিকতা করবেন না।” রুক্ষ শোনালো ওর গলা।

দমে গেলাম এক মুহূর্তে।

একটু থেমে আবার বললো—“আচ্ছা আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো! কবিতা লিখতে পারেন বলেই আর্টের আশ্রয় নিয়ে যাকে তাকে অপমান করবেন ?”

—“অন্ততঃ আমার কবিতায় তা করিনি।” গম্ভীর হয়ে বললাম।

—“করেন নি মানে ? এই কবিতাটী আপনি আমাকে কেন্দ্র করে লেখেন নি বলুন ? এগুলো অপমানকর উক্তি নয়তো কি ?”

লাল পেন্সিলের আঁচড় কাটা দুটো লাইন আমার চোখের সামনে তুলে ধরলো। লাইন দুটো আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে কাঞ্চী ;—

চাঁদের কলঙ্কে তাই,
প্রিয়ার ব্যভিচারের গোপন সত্যটী খুঁজে পাই।”

বুঝলাম সুরাইয়ার ব্যথা কোন্ খানে।

ওকে শান্ত করার জন্য বললাম—“আপনি ভুল বুঝবেন না। এই পৃথিবীতে কোনো চরম সত্যই পুরোপুরি সত্য নয়। Something is left behiud it, that may be either beauty or ugly। সত্য নিজেই তার কোনো না কোনো অংশে রিক্ত। কবিতাটি আপনি পড়ছেন বলে মনে হচ্ছে এটা আপনাকেই ইঙ্গিত করে লেখা হয়েছে। কিন্তু যারা আপনাকে কখনো দেখেনি তাদের কাছে নিশ্চয়ই কবিতাটির উদ্দেশ্য আপনি নন বরং এর আবেদন সার্ব্বজনীন—তাই নয় ?”

—“কিন্তু...”

—“সত্যকে চিনতে আপনি ভুল করেছেন। পৃথিবীর যেটা সবচেয়ে বড়ো পরম সত্য ; তারও প্রকাশ মানুষের জীবনের চরম দীনতায়, গ্লানিকর পরিবেশে। ব্যভিচারই সৌন্দর্য্যের মূল কথা। সৌন্দর্য্যকে তাই বেশী ঘাটাঘাটি করতে নেই, নইলে হয়তো তার ভেতর থেকেও কুৎসিত বেরিয়ে পড়তে পারে। অন্ততঃ কবিতাটিতে আমি সে কথাই বলতে চেয়েছি—আপনাকে অপমান করিনি।”

কি জানি কেন সহসা আমার কথায় মেয়েটির গলার স্বর নরম হয়ে এলো। মুখখানা শান্ত আর থমথমে ভাব। নেল পলিশ মাখা আঙ্গুলের নখ খুটতে খুটতে মিহি গলায় বললো—“দেখুন আপনি কবিতাটিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লিখেছেন, আমার বান্ধবীরা তো আর তা ভাববে না। আপনার লেখাকে কেন্দ্র করে আমার বান্ধবীদের কাছে আমাকে উপহাস শুনতে হচ্ছে ; আপনাকে আমাকে কেন্দ্র করে ওরা...আমি এসব কি করে সহ্য করতে পারি বলুন ?” লজ্জায় আরক্ত সুরাইয়া।

লজ্জিত হয়ে বললাম—“তার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। আগে এ-ধারণা থাকলে নিশ্চয়ই কবিতাটি লিখতাম না।”

—“না না আপনি লিখবেন না কেন। প্রতিভা আছে তার আত্মপ্রকাশও চাই..কিন্তু পাজীগুলো তো আর তা বোঝে না।” ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসি। দুষ্টুমী জড়ানো।

—“এখন কি আর করবেন বলুন। অন্ততঃ আমার অন্যায়ের জন্য আপনাকে কিছুদিন এ-শাস্তি ভোগ করতে হবে হয়তো।” হেসে বললাম।

সুরাইয়া কয়েক মুহূর্ত আর কোনো কথা বললো না। ক্লান্ত ভীরু পাখীর মত পাখনা বন্ধ করে কি ভাবছিলো ওই জানে। তারপর চোখে লজ্জা এনে অস্ফুট স্বরে বললো—“যাক আপনি মনে কোনো দুঃখ নেবেন না। আচ্ছা আপনি একদিন আসুন না আমাদের বাড়ীতে। কবি মানুষ আপনি, আর্ট নিয়ে আলোচনা করবেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ২৮ নম্বর বন্দর রোড। আসবেন তো ?” বোবা চোখের আবেদন।

অস্বীকার করতে পারলাম না—“নিশ্চয়ই আসবো।”

—“আচ্ছা তাহলে আজ যাই সন্ধ্যে হয়ে এলো।” বাতাসে আঁচলের শিহরণ জাগিয়ে যেতে যেতে আবার বললো—“মনে থাকে যেন ২৮ নম্বর বন্দর রোড।”

আমি বসেই রইলাম। ওর স্পর্শ এখনও অনুভব

করছি শূন্য বেঞ্চীটাতে। ভীরু হিয়ার আধেক পরিচয়ঃ আর বোবা চোখে চেয়ে দেখা। অদ্ভুত লাগছিলো সঙ্কোচটুকু।

সহসা কাঞ্চীর কথায় যেন চেতনার সুপ্তি ভাঙ্গে—"তুমি থোড়া রুক যাও বাবুজী। খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ঘুমিয়ে দিয়ে আসি।"

ছেলেকে কোলে তুলেই কাঞ্চী নিজের ঘরে চলে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। নাঃ, আকাশ পরিষ্কার। ঝিল্লীর ডাকে অন্ধকার কাঁপছে মৃদু আভাষে। কাঞ্চী আবার এলো। একটা পাতলা র‍্যাপার জড়িয়ে। শীত করছে আমারও। এসে আমার আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে প্রশ্ন করলো—"ফির কি হলো বাবুজী?"

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটা নিঃশ্বাস উদ্গীরণ করে বললাম—"কি আর হবে কাঞ্চী। যে তারাটা ছিল আকাশের এক কোণে, মেঘের ঘাগরা পরে যে লুকিয়ে রাখতো: যার অস্তিত্ব ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে—সেই সুরাইয়াকেই পেলাম এবারে আমার অনেক কাছে; একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে। ওর বাড়ী যেতাম, ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম: ও আসতো আমার হোষ্টেল। ভালবাসলাম তাকে। কিন্তু ও আমায় সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল কিনা—না, আমার সঙ্গে ছিল ওর একটা সামাজিক বন্ধুত্ব সেটা আমি আজও সঠিক বলতে পারবো না কাঞ্চী। কারণ আমার মত আরও অনেক যুবকই ওকে ভালবাসতো। ওর ও অনেক বড় লোক বন্ধু ছিল। সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে কিনা জানিনা—সবার সঙ্গেই ও খোলাখুলি ভাবে মিশতো। কোনো দ্বিধা ছিল না, কোনো সঙ্কোচ ছিল না। বুঝতে পারতাম না এটা উদারতা, না উগ্র আধুনিকতা, না আরও কিছু? হয়তো ওকে একান্ত আপনার করে পেতে চেয়েছিলাম তাই বুঝতে পারতাম না কাকে ভালবাসে। কিন্তু ওর এত বন্ধুর মাঝে ও একটা জিনিষ সুরাইয়া আমায় দিয়েছিল—সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধার আসন। বন্ধু হলেও ও আমাকে সব চাইতে বেশী শ্রদ্ধা করতো, সমীহ করতো—কিন্তু কেন বুঝিনি। তাছাড়া ওর সম্পর্কে আমার একটা ধারনা ঠিকই ছিল। ও আমার সান্নিধ্য পেলে সবচেয়ে বেশী খুশী হতো। তার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে প্রতীক্ষা করতে দেখেছি। প্রতীক্ষার এমনি টানা পোড়েনের মাঝেই ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে আমি বি, এ পাশ করলাম আর সুরাইয়া করলো আই, এ পাশ। আর সব যুবক প্রেমিকেরই মতোই ভাবলাম সুরাইয়াকে বিয়ে করবো। তাড়া ছিল না; তবুও ধৈর্য্য মানেনি। অবশ্য এ-বিয়েতে আমার অভিভাবকের অমত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কারণ আমার বাবাও সরকারী উচ্চ পদস্থ অফিসার। অর্থে, প্রতিপত্তিতে, সম্মানে কোনো অংশেই সুরাইয়াদের চাইতে কম নয়। তাই যে মন এতদিন আমার কাছে ছিল ধোঁয়াটে অস্পষ্ট; তাকেই স্পষ্ট আলোয় আনাবার জন্যে গেলাম সুরাইয়ার কাছে। ভর দুপুরে।

ও দাঁড়িয়েছিল জানালার শিক ধরে। হয়তো কিছু ভাবছিলো। কিংবা হয়তো দেখছিলো কেমন করে পাশের বকুল গাছটায় মধ্যাহ্নের ঘুঘুর কাকলি রুদ্দুরের চুম্বনে বাচ্চাদের ক্লান্ত চোখে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিংবা একটা স্বপ্ন। মোহময়। আমার পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকায় সে। কঠিন মুখের মাংসপিণ্ড। আমি হতবাক হলাম ওর চাহনী দেখে। দৃষ্টি ওর বিষণ্ণ অথচ করুন। মুখে থমথমে ভাব। মাথার চুল অবিন্যস্ত। কেমন যেন চিন্তার এলোমেলো। ভাবলাম একটা কিছু হয়েছে। অন্যদিন হলে হেসে কথা বলতো। আজ নির্বাক রইলো। শীতে জমা বরফের মত।

পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য হেসে বললাম—"সুরাইয়া, আমার সঙ্গে কথা বলবে না? রাগ করেছো বুঝি?"

—"মানুষের সঙ্গে রাগ করলে সন্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে রাগ করলে পরিনতি কি হয় জানো?" বিদ্যুতের মত বললো কথাটা।

—"কেন হাত টাত দেখিয়েছো নাকি?"

—"হাতের রেখা সবাই দেখতে পায়—তুমিও পাও, কিন্তু আমি দেখেছি জীবনের সেই কুৎসিত রেখাগুলো যা সবার চোখে ধরা পড়ে না কিন্তু আমি পেয়েছি।"

—"কেন দিব্যদৃষ্টি পেলে নাকি?"

—"দিব্যদৃষ্টি দিয়ে মানুষ খোদাকে পায়ঃ আমি পেয়েছি লোভী শয়তানকে।"

সুরাইয়ার কথাগুলো ক্রমশঃ হেঁয়ালী হয়ে উঠছে দেখে প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করি।

—"সুরাইয়া, আজ কতদিন ভাবছি কথাটা তোমায় স্পষ্ট করেই বলি কিন্তু বলি বলি করেও পারিনি এতদিন বলতে।"

সুরাইয়া কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকাল আমার দিকে। যেন ভয়ানক অপরাধ করেছি কথাটি বলে। তারপর বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে বললো—"আমি জানি কি বলবে। আমাকে বিয়ে করতে চাও তো? এরজন্য এতদিন প্রস্তুত হচ্ছিলে তাই না?" শ্লেষের মত শোনালো কথাগুলো।

আমি বিস্ময়ে আহত—"তোমায় ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়ে অন্যায় করেছি কি?"

আগুনের মত ঝলসে উঠলো কথাগুলো—"না

তোমরা পুরুষরা কোনো অন্যায় করো না—আর ভালবাসার মর্ম শুধু তোমরাই বোঝো : এই কথাই বলতে চাও তো ? না কবীর না, তোমরা আমাকে কেউ ভালবাস না···তোমরা ভালবাস শুধু আমার রূপকে, আমার দেহের ঐশ্বর্য্যকে—আমাকে না···না না আমাকে তোমরা কেউ পাবে না···কেউ না···তুমিও না।"

বজ্রাহতের মতই তখন চীৎকার করে উঠেছিলাম—"সুরাইয়া !!"

—"না না, আমি তোমাদের কাউকে বিয়ে করবো না। তোমরা সৌন্দর্যের পূজারী নও···তোমরা তার ব্যবসাদার। পারতে, আমি কুৎসিত হলে তোমরা আমাকে এমনি করে ভালবাসতে ? যদি সে প্রত্যয় কোনোদিন আমার মনে জন্মাতে পারো সেদিন এসো—আজ না, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

বিস্ময়সূচক করুন ধ্বনি করে বললাম—"সুরাইয়া আমায় ভুল বুঝনা, কি হয়েছে বলো ? অপরাধীকে তার অপরাধটুকু জানতে দাও।"

—"না না না, আমি কোনো কথা শুনতে চাইনা—চলে যাও এখান থেকে ! ফুলকে ছিঁড়ে শুধু তার গন্ধই পেতে চাও, তার মৃত্যু যন্ত্রনায় করুনা হয়না তোমাদের ? চলে যাও এখান থেকে।"

সুরাইয়ার গলার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে ঝড়ের মত কথাগুলো। বুঝলাম তার জীবনে, অন্তরে ক্ষোভের কারণ না থাকলে, ব্যতিক্রম না হলে এ-অঘনট ঘটতো না। মানসিক জগতে যে ছিল এতদিন নিষ্ক্রিয় আজ বাহ্যিক জগতে সে সক্রিয়, চঞ্চল আর ক্ষুব্ধ।

চোখের সামনে পৃথিবী ঘুরছিল আমার। চেতনা যেন ঘূর্ণীপাকে পড়ে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল। নির্লিপ্ত বেদনায় ভরে উঠলো মন। সব শূন্য, সব স্বপ্ন। কি ভেবেছিলাম, কি পেলাম। বুঝলাম আকাশের তারা উল্কার মত খসে একবার মাটীতে পড়ে আবার মিলিয়ে গেল অসীমে, একান্তে, শূন্যে।

ওকে পাবোনা : ভাবতেই টনটন করে উঠলো বুকটা। আজও আমি একথা ভেবে উঠতে পারিনি কাঞ্চী, যে কি করে ওকে বোঝাবো যে আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি। ওর রূপের উৎস দিয়ে আমার জীবনের প্রেমের যে ফল্গুধারা বয়ে চলেছিল—কি করে প্রমাণ দিয়ে তাকে বেঁধে রাখি বল ? জীবনে এমন অনেক সত্য আছে যেটা প্রমাণ সাপেক্ষ নয় : অনুভূতি, বিশ্বাস আর অন্তর দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হয়।

এতবড় সত্যকে প্রমাণ করতে পারবো না বলেই সেদিন হতে ওর কাছ থেকে দূরে এলাম। ভাবলাম হৃদয় দিয়ে যাকে পাইনি, প্রমাণ দিয়ে তাকে পেতে চাই না। তাই ইচ্ছে করেই তোদের এই অঞ্চলের ফরেষ্ট অফিসারের চাকরীটা নিয়ে নিলাম। বাড়ীর কারও ওজর-আপত্তি সেদিন শুনিনি। বাবা বিয়ে ঠিক করে ছিলেন, বিয়ে দিলাম ভেঙ্গে। মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবো, প্রমাণের জন্য তাগিদ আসবে না—এই আশায় ছুটে এলাম এখানে। কিন্তু জানিস কাঞ্চী, এই জন জঙ্গলে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের কাছ থেকে অন্ততঃ এটুকু শিখেছি যে ওরাও জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রমাণ চায় না, চায় অন্তর, চায় বিশ্বাস।

তারপর ?···তারপর এ-পর্য্যন্ত দেখা করিনি সুরাইয়ার সঙ্গে। এই সেদিন হঠাৎ জঙ্গলে তোর খোকাবাবুর সঙ্গে দেখা পেলাম ওকে। কিন্তু আমার ভাগ্য ছেলেকে পেলাম তার মাকে পেলাম না !!"

সহসা কাঞ্চী প্রশ্ন করে বসলো—"তব বাবুজী, খোকাবাবু ওরই লেড়কা—লেকিন ও জঙ্গলমে ফেলে দিয়ে গেলো ক্যান ?"

—"কি করে বলবো কাঞ্চী। আমার কাছে তো সবই রহস্য বলে মনে হচ্ছে। সুরাইয়াকে আমি যতদূর জানি ও বড়ো জেদী আর সেন্টিমেন্টাল—কোথায় কি করে বসে আছে কে জানে ?"

স্মৃতির নিরবচ্ছিন্ন রোমন্থনের ক্লান্তিতে হাঁফিয়ে পড়লাম। মানসিক দৃষ্টি ঝাপসা হলো, চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলাম। চেতনার সমারোহে সব গেল ভেঙ্গে, সব গেল মিলিয়ে। শুদ্ধ ঘর, নীরব আমি, নির্বাক কাঞ্চী। যেন সহসা প্রবল বন্যাস্রোতে মিশে গেল, হারিয়ে গেল অতীত সীমাহীন সমুদ্রের মাঝে।

নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো কাঞ্চী—"লেকিন বাবুজী, খোকাবাবুর অব কেয়া হবে ?"

—"কি আর হবে। যদি কোনো দিন পারি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করবো যার আমানত তাকে।" নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম।

কাঞ্চী জবাব দিল না কিছু।

ইজিচেয়ারটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললাম—"যাঃ এবার অনেক রাত হলো। তোর খোকাবাবু একা রয়েছে।"

কাঞ্চী গায়ের র‍্যাপারটা জড়াতে জড়াতে উঠে দাঁড়াল।

—"একটা কথা কি জানিস কাঞ্চী—সুরাইয়া প্রমাণ চেয়েছিল আমার ভালবাসার। তা এখন আমি পেয়েছি।"

—"কাঁহা বাবুজী ?"

স্মিত হেসে বললাম—"ও ঘরে, তোর খোকাবাবু।"

॥ চার ॥

প্রেম।

দু'অক্ষরের নামটি শুনলেই পুলক জাগে মনে। শিহরণ জাগে রোমে রোমে। বিধাতা কবে যে এই বস্তুটিকে সৃষ্টি করেছিলেন জানিনা। হয়তো বা পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে আদম যখন প্রথম হাওয়াকে দেখেছিলেন কিংবা আরও অতীতে যখন বিধাতাই ছিলেন প্রেমের স্বরূপ—হয়তো সে সময়। প্রেম শুধু নারীর সান্নিধ্য পেয়েই সন্তুষ্ট নয়। সে আরও চায়। চায় জীবন, যৌবন, চায় দেহ। আরও চায় পৃথিবী, চায় প্রকৃতি। অথচ দেহের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তার কত বন্ধুত্ব, কত সৌহার্দ কতই না মাখামাখি। মায়ের বুকে সে একরূপ, প্রিয়ার বুকে আর। জীবনে সে কত ব্যাপক, হৃদয়ে সে কত ছোটো। জীবনে সে নিঃশ্বাস, প্রিয়ার চোখের অশ্রু। দেহে সে সান্ত্বনা, প্রকৃতিতে গভীর। তার অন্ত নেই, আছে আদি। মৃত্যু নেই আছে জীবন। তবুও প্রেমকে জানিনা, চিনিনা, বুঝিনা। তাই বার বার বলতে ইচ্ছে হয় Love itself is the mystery of Love. প্রেমই, প্রেমের পারচয়।

এ-কথাই কতবার বুঝিয়েছিলাম সুরাইয়াকে কাব্য আলোচনার নাম করে। কিন্তু সে যে বোঝেনি তার প্রমাণ ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ। আমি চেয়েছিলাম বিশ্বাস ও চেয়েছিল প্রমাণ। ও ছিল আকাশের তারা। গ্রহের আবর্তনে ছিটকে নেমে এসেছিল মাটিতে নীচে। আমি ছিলাম নীচে ধূলির উপরে। হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আবার বিচ্ছেদ হলো।

কাঞ্চীর খোকাবাবু আজ আড়াই বছরের। এই দীর্ঘ সময় ধরে ঐ ছোট্ট প্রমাণের বোঝা নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সুরাইয়ার দেখা পেলাম না আজও। কোথায় আছে কে জানে। এরই মাঝে কয়েকবার খোঁজ নিয়েছি করাচীতে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি কয়েকটি। কিন্তু সবগুলোই ফেরত এসেছে আমার কাছে। ও বেঁচে আছে এই পৃথিবীর বুকে কোথাও না কোথাও—এই আশ্বাস নিয়েই ছেলেটিকে মানুষ করছি। আমি যোগাই অর্থ। কাঞ্চী দেয় মমতা। ছেলেটা তার মাঝে পা পা করে বড় হয়ে ওঠে। আমারও সময় কেটে যায় আগের মতোই পা ফেলে ফেলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে।

—"বাব্বারে বাবা, কি দুষ্টু হয়েছে তোমার ঐ খোকাবাবু।"

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো কাঞ্চী। এই আড়াই বছরে ওরও পরিবর্তন হয়েছে। গায়ের ফর্সা রঙে ঔজ্জ্বল্যের ছাপ পড়েছে। আগের চাইতে একটু লম্বা হয়েছে, একটু মোটা। দেহের চাঞ্চল্য কমে গিয়ে শান্ত হয়েছে মনে ও মননে। উদ্ধত এবং স্তিমিত যৌবনের যুগ সন্ধিক্ষণ ফুটে উঠেছে চোখে, মুখে আর দেহে। ভাল বাংলা বলতে শিখেছে।

—"কেন হলো কি আবার?" চোখ তুলে প্রশ্ন করে।

—"হবে আবার কি। যা দুষ্টু হয়েছে···কোত্থেকে একটা কুত্তীর গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। ছেড়ে দিতে বললুম বলে—এই দেখো শাড়ী ছিঁড়ে দিয়েছে।

হেসে ফেলি কাঞ্চীর ব্যাকুলতায়—"তা ছেলে মানুষ একটু আধটু দুষ্টুমী করবে বৈকী।"

—"না বাবা না, আমার তো ভয় করে। কোথায় জঙ্গলে গিয়ে কুকুর ধরতে গিয়ে অন্য জানোয়ার ধরবে—আর অমনি কামড়ে দেবে—"

—"তা খোকাকে একটু সামনে রাখিস্—তাহলেই তো হয়।"

কাঞ্চী দমে গেল। বুঝলাম স্নেহের দুর্বলতার অহঙ্কার ছেয়ে গিয়েছে ওর মন। অফিসিয়াল কতকগুলো অসমাপ্ত ফাইলে আবার ডুবে যাই।

অকস্মাৎ চাঞ্চল্য শোনা গেল বাংলোর বাইরে। খোকার দুষ্টুমীর কথা মনে পড়তেই ফাইল ছেড়ে উঠে আসি ঘরের বারান্দায়। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম আমারই অধীনস্থ কয়েকটী কুলি কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। বোধ করি অচেতন কোনো দেহ। আশঙ্কায় ছুটে গিয়ে দেহটীর দিকে তাকাতেই চোখ ঝলসে যায় আমার।

সুরাইয়া!

পৃথিবী ঘুরছিল চক্রাকারে। হয়তো পায়ের তলা থেকে মাটী ফসকে যাচ্ছিল। কাঠের পুতুলের মত নির্ব্বাক হয়ে চেতনাহীন দেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—"হুজুর, আমরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে মেয়েটীকে পেলাম। তখনও অজ্ঞান হয়নি মেয়েটী। দুএকটা কথায় বুঝলাম বাঙ্গালী মেয়ে। তাই জঙ্গলে কার কাছে নিয়ে যাবো ভেবে আপনার কাছেই নিয়ে এলাম। পথে আনতে আনতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মেয়েটী।" চমক ভাঙ্গে ওদের কথায়।

—"ও, তা একে নিয়ে এসো আমার ঘরে।"

ওরা ধরাধরি করে সুরাইয়াকে আমার ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিল। তাল পাকানো দেহটী কাৎ হয়ে পড়ে রইলো বিছানায়। ইশারায় একজন কুলিকে ডাক্তার ডেকে আনতে বললাম। বাকী সবাই চলে গেল। ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ সোরগোল শুনে কাঞ্চী কোথাকে ছুটে এলো। মেয়েটীকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

—"কি হলো বাবুজী? মেয়েটী কে?"

বললাম—"পরে বলবো, যা শীগগির খানিকটা পানি

গরম করে একটা শাড়ী নিয়ে আয়। জলদি যা—মেয়েটীকে বাঁচাতে হবে।"

কাঞ্চী ছুটলো রান্নাঘরের দিকে।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ওর চাঞ্চল্য-হীন মুখের মাংসপিণ্ডটা। না, জৌলুস এখনও কমেনি। তবে রঙ বদলেছে। গাছের বোঁটা থেকে ফুটন্ত রক্ত গোলাপকে ছেঁড়বার পরই হাতের মৃদু স্পর্শে যেমন তার পাপড়ির রঙ একটু বদলে যায়—গন্ধ তার ঠিকই থাকে অমনি দেখতে হয়েছে সুরাইয়া। ঠোঁট দুটো রক্তের মত টকটকে লাল রয়েছে কৃত্রিম রঙে। ওর স্খলিত বসন আর স্থানচ্যুত ব্লাউজ দেখে শঙ্কায় আর সন্দেহে কেঁপে উঠি। কে জানে, মেয়েটী কোথায় কি করে বসে আছে। মায়া হলো, করুনা হলো; সহানুভূতিতে ভরে উঠলো মন। বোবা চোখ মেলে ভাবতে থাকি ওর কথা।

কাঞ্চী ফিরে এলো পানি আর শাড়ী নিয়ে।

—"মনে হচ্ছে, কাঞ্চী মেয়েটা কোনো লোভী শয়তানের কবলে পড়েছিল—কিন্তু ইজ্জতটা বোধ করি বেঁচে গেছে। তুই এক কাজ কর—একটা কাপড় গরম পানিতে ভিজিয়ে ওর গাটা মুছে দে, আর শাড়ীটা কোন রকমে জড়িয়ে দে গায়ে।"

আমি বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম। ধোঁয়াগুলো চক্রাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিকেলের রোদটা এসে পড়েছে সামনের পাইন আর শালবনের উপর। সামনের বাগানের গাছে গাছে রঙ বেরঙের ফুলগুলো সন্ধ্যের আগমনে অস্থির হয়ে উঠেছে মৃত্যু যন্ত্রনায়। এক্ষুনি ঝরে পড়বে। আবার সকালে কুঁড়ি হবে। ফুটবে। তার মন মাতানো গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে দূর দিগন্তে, বন ছাড়িয়ে লোকালয়ে। আসবে বুলবুলি, পাপিয়া, দোয়েল আর আসবে কাল ওড়না গায়ে ভ্রমর। তারপর ঠোঁট বোলাবে এ-ফুল থেকে ওফুলে। রঙ থেকে বেরঙে। রস যাবে ফুরিয়ে, ফুল যাবে ঝরে। তবুও ফুটবে। ফোটার জন্যই ফুটবে।

কখন যে কাঞ্চী পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করিনি।

—"মেয়েটা কে বললে না তো বাবুজী? কে মেয়েটা?"

—"এতদিন ধরে যার প্রতীক্ষা করছি এ সেই অপরিচিতা মেয়েটী।"

—"মানে, তোমার সুরাইয়া?" গলার স্বরটা কেঁপে উঠলো কাঞ্চীর।

—"হ্যাঁ।"

লক্ষ্য করলাম কাঞ্চীর চোখ দুটো ঝাপসা। চোখের দুকোলে দুফোঁটা কি যেন লেগে রয়েছে। হ্যাঁ, অশ্রুই টলটল করছে মুক্তার মত। তবে আমার আর সুরাইয়ার প্রতি সহানুভূতির না দৃষ্টির বাইরের আরও কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। কারণ দৃষ্টিটা বোঝার আগেই ও বারান্দা দিয়ে নেমে গেল।

ডাক্তার এলো প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বাইসাইকেলে চেপে। সুরাইয়ার বুক, পিঠ, নাড়ী ভাল করে পরীক্ষা করে একটা ইনজেকসন দিলেন হাতে। আর একটা প্রেসক্রিপশন্ লিখি দিয়ে ওষুধ আনতে বললেন চেম্বার থেকে। সুরাইয়ার জ্ঞান ফেরেনি তখনও। ডাক্তার আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"ভয়ের কোন কারণ নেই। ফিজিক্যাল টায়ার্ডনেসের জন্য জ্ঞান হারিয়েছে। ইনজেকশন দিয়ে দিলাম। চেম্বার থেকে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্ঞান ফিরলে এক ঘণ্টা অন্তর এক দাগ খাইয়ে দিবেন। আর দেখুন পেশেন্টের একটু নার্সিং দরকার। She is so weak. আচ্ছা চলি।"

ডাক্তার চলে গেলেন। আমিও বেরিয়ে গেলাম ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই। অফিসের একটা জরুরী কাজের জন্যই ছুটতে হলো। যাবার সময় বলে গেলাম কাঞ্চীকে সুরাইয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে।

* * * *

ফিরলাম বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে সাতটায়। ওয়াটার প্রুফের গায়ে একরাশ বরফের কুচির বোঝা নিয়ে। বিকেল থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যে হতেই বৃষ্টি আরম্ভ হলো। লক্ষ তারা একবার হামাগুড়ি দিয়েই মেঘে মুখ লুকালো। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কড়্ কড়্ কড়্। বাতাস বইছে শোঁ শোঁ শোঁ।

বাংলোয় উঠি শীতের আমেজ নিয়ে। তাড়াতাড়ি এক কাপ গরম কফি খেয়ে ঘরে ঢুকে দেখি সুরাইয়া নেই। শিউরে উঠি। চারিদিক ভালকরে চোখ বোলাতেই নজর পড়লো বারান্দার দিকের একটি জানালায়। কাঞ্চীর দেওয়া শাড়ী পরে দাড়িয়ে সে। জানালা খোলা। বরফের কুচি মেশানো বাতাস ঘরে ঢুকছে দমকা মেরে। চাদরখানা হাতে করে ওভার কোটটা গায়ে দিয়ে ওর পেছনে দাঁড়াই।

—"ওকি, এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভিজে গেলে যে।"

ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তারপর তাকাল নিজের দিকে। বুকের খানিকটা ভেজা। মুখে শিশির পড়ার মত বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি। ম্লান একটু হাসলো। নিজের হাতেই জানালার কাঁচটা বন্ধ করে দিই। ওর হাতে চাদরখানা দিয়ে বললাম—"এটা গায়ে দিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে এসে বসো, শীতটা কেটে যাবে—এসো।"

সুরাইয়া আবার হাসলো। ঠোঁট দুটো বন্ধ করে। বললো না কিছুই। ঝিমিয়ে পড়া আগুনটাকে উত্তেজিত করার জন্য আরও কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে দিলাম তাতে। আগুন জলছে দাউ দাউ করে। বাইরে, অন্তরে।

হাত দুটোকেই সেঁকে নিয়ে প্রথম কথা বললো সুরাইয়া—"মনে পড়ে কবীর? এমনি এক বর্ষার রাতে তুমি ভিজতে ভিজতে এসেছিলে আমার বাড়ীতে। তোমায় বসিয়ে রেখে আমি চা করতে গিয়েছিলাম। আর তুমি সেই সময় টুকুর মধ্যে লিখেছিলে মাত্র চার লাইনের একটী কবিতা—মাত্র কয়েকটী অক্ষরের ভেতরে সেদিন তুমি চেয়েছিলে কোনো এক মহাজীবনের একটুখানি পরশ, একটুখানি আশ্রয়—পড়ে মনে?"

—"পড়ে।" দৃষ্টিটা অতীতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

—"আর আজ?"

ওকে স্বাভাবিক করার জন্য হেসে বললাম—"আজ তুমি বরং কবিতা লেখ, আমি না হয় চা করে নিয়ে আসি।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো সুরাইয়া—"না কবীর তা হয় না। সে রাতের সঙ্গে এ রাতের তুলনা হয় না। সেদিন তুমি ছিলে ক্লান্ত পথিক। আশ্রয়ের সন্ধানই ছিল তোমার কাম্য। আর আজ আমি—আশ্রয় হীনা। পথই আমার সম্বল, আশ্রয় আমি চাইনে।"

বুঝলাম কোথায় যেন একটা বেদনার সুর রয়েছে সুরাইয়ার কথাগুলোতে। অসংলগ্ন। হয়তো বা শব্দ-হীন চাপা ক্রন্দন। ভারী পাথর চাপা। তুলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। সাহায্য চায়।

প্রতিশ্রুতি দিলাম—"একটা কথা জিজ্ঞেস করি সুরাইয়া—কিছু মনে করো না। তুমি এখানে এলে কি করে?"

হেসে উঠলো সে খিলখিল করে। ওর উচ্ছল হাসিতে আমি চমকে উঠি। পাগল হলো নাকি। সংশয় জাগে।

—"কি করে এলাম জানতে চাও? দুটো কুকুর তাড়া করেছিল কামড়াবে বলে। কিন্তু আমি চাইনি যে ওরা আমাকে কামড়াক। জানো কবীর, অনেক কুকুরই কামড়েছে আমায়– তবে ওরা দেখতে ভাল, জাতে ভাল। কিন্তু এদুটোকে আমি সহ্য করতে পারিনি। তাই ওদের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি জঙ্গলে; তারপর থেকে বোধ করি তোমারই এখানে—তোমারই সামনে..."

হেঁয়ালী। সব হেঁয়েলী। বুঝতে পারলাম না কিছুই।

অনুরোধ করি—"কাইওলী একটু খুলে বলো।"

আবার হেসে উঠলো সে—"বুঝলে না? ওরা কুকুর নয়তো কি। দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ থাকলেই যদি মানুষ হওয়া যেতো তাহলে বন মানুষগুলোও তো তোমাদের স্বজাতি—তাই না?"

রহস্যের পর রহস্যের সৃষ্টি। হারিয়ে ফেলি নিজেকে।

—"তোমার কোনো কথাই বুঝলাম না সুরাইয়া।"

—"জানি তুমি বুঝবে না—কোন দিনই বুঝবে না। মনে পড়ে তোমার, তোমাকে প্রত্যাখ্যানের সময় বলে-ছিলাম তোমরা সৌন্দর্যের ব্যবসাদার!"

—"হ্যাঁ"

—"ভুলিনি, কোনোদিনই ভুলবো না সেকথা। আজ সেটা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আজ বিক্রিত পণ্য। এখান থেকে ওখানে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে পার্থক্য—স্বেচ্ছায় হাত বদল হই, কেউ করে না।"

বুঝলাম সুরাইয়া যা বলতে চায় হোক সে রহস্য তবু সে সত্য—চরম সত্য। মনে হলো ঝড় উঠেছে ওর মনে। অনেক পুরনো ঝড়। যে ঝড়ে একদিন গাছটা উপড়ে গিয়েছিল। শেকড়টা ছিল মাটির নীচে। এঁকে বেঁকে—গভীরে। আজ তাতে নতুন স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। বলতে চায় প্রকৃতিকে। শোনাতে চায় অরণ্যকে তার সংকেত। কেমন সে ঝড়! কেমন তার বেদনা!!

—"জানো কবীর, সব ভুলবো, ভুলেছিও। কিন্তু কোনদিন ভুলতে পারবো না তোমার দেয়া সেই চাঁদের কলঙ্ককে। যখনই ভুল করে আকাশের দিকে তাকাই মনে হয় বুঝি সব মিথ্যে, আমি, তুমি, এজগত.. এ পৃথিবীটা কি দিয়ে তৈরী জানো? আকাশ, বাতাস, জল, আর মাটি দিয়ে নয়—ওগুলো এর বাইরের প্রকাশ। ভেতরটা হচ্ছে এর অভিশাপের মহাসত্তায় পূর্ণ। যেটা তোমরা জাননা—আমি জানি—

একদিন জীবনটাকে দেখেছিলাম আমি তোমাদের মত চোখ দিয়ে নয়; অন্তর দিয়ে। তোমরা বাইরের চোখ দিয়ে দেখো তাই জীবনটা তোমাদের কাছে রূপ যৌবন আর দেহের অস্থিমজ্জায় তৈরী। ভোগ করার প্রবৃত্তি না থাকলে যেন তোমরা জীবনকে ভাল বাসতেই পারো না। তাই ভাবো প্রথম মন পেয়েই বুঝি সব হারালাম। নারী দেহ দেখলেই তাই তোমাদের লিপ্সা জাগে। ফুল দেখলে তাই ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তোমরা ভুলে যাও ফুল ফোটে তোমার মনকে গন্ধে গন্ধে ভরপূর করে দেবার জন্যই। তাঁকে ছিঁড়লেও সে তোমাদের তার গন্ধের নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত করবে না। তবুও তোমরা ছিঁড়বে—মৃত্যু যন্ত্রনা দিয়ে তাকেঁ শুঁষে নেবে তার ঐশ্বর্যের শেষ বিন্দুটুকু। ফুলেরই মত তাই তোমরা চাও নারী দেহের লালিত্য তার সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যকে ধ্বংস করতে। ভোগেই তোমাদের আত্মা তৃপ্তি; সাধনায় নয়। কিন্তু তোমরা জাননা যে ফুল ফুটলেই

যেমন তার গন্ধের নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে তেমনি মন পেলেই দেহ এগিয়ে আসে সবার জনান্তিকে নিমন্ত্রণ না দিয়ে। তবুও তোমাদের সহ্য হয় না। তোমরা চাও ভোগের বিনিময়ে ভালবাসাকে কায়েম করতে। জীবনকে বাঁধতে চাও পূজার ডালি দিয়ে নয়; কামনার রক্ত দিয়ে। তাই দিকে দিকে পৌরুষের এত হাহাকার। এক টুকরো নির্জীব মাংসপিণ্ডের দিকে তোমাদের লোভ। তোমরা আমাদের ভালবাসতে জানো না, জানো না কি করে দেহকে পূজা করতে হয়, জানো না জীবনকে ভালবাসতে...”

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম ওর কথাগুলো। বুকের নিঃশ্বাসটা যেন ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বারবার। পাথরের মত আবিষ্ট হয়ে গেলাম। একটু থেমে সুরাইয়া গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে আবার বললো—“আরও শুনবে? সবে আরম্ভ, পরিণতি জানিনা। সুন্দরী ছিলাম বলে আমার কোন দিনই অহংবোধ ছিলনা, আজও নেই। আমার রূপে তোমরা অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলে, পাখা পুড়তে চেয়েছিলে রূপের আগুনে; তাতে আমার অসহ্য বোধ হতো। তোমাদের যতটুকু পোড়াতাম তার চাইতে অনেক বেশী পুড়তাম নিজে—অন্তরে অন্তরে।...সত্যিই তো? কি এমন চেয়েছিলাম আমি? কোনো সুন্দর পুরুষকে কামনা করিনি, অর্থ না, সম্মান না—তবে? হ্যাঁ চেয়েছিলাম; একটি ছোট্ট মন নিজের মনের বিনিময়ে। দেহের বিনিময়ে নয়, সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে নয়। জানো কবীর, যেদিন তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সেদিন থেকেই আমার সৌন্দর্য্যের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। সৌন্দর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই তোমাকে হারিয়েছি—কিন্তু তাতেও কি রেহাই পেলাম? না পাইনি; বাবা মারা গেলেন তোমাকে হারাবার মাস চারেকের মধ্যেই। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে দাঁড়ালাম এক রাতেই। রূপ, যৌবন, অর্থ, সম্মান সব পেলাম। তাই তোমাদের মত আর সব পুরুষেরা সুযোগ পেল। মাথার উপরে অভিভাবক নেই। জমালো তবু একের পর এক। কেউ দেয় উপদেশ, কেউ দেয় সাহায্য, কেউ করে ইঙ্গিত। তবে একটা কথা কি জানো? এরা বাইরের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও একটা বিষয়ে মিল ছিল ওদের। ওরা নিজেদের একান্ত করে সমর্পন করতে চাইতো আমার কাছে।' আমার সঙ্গে একটি রাত কাটাতে পারলেই যেন ওরা জীবনে চরম সুখী। সবাইকে ফিরিয়ে দিলেও পারিনি একটি কুকুরের দংশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে। সমাজ আর উগ্র আধুনিকতার খাতিরে লোভীটাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম সন্ধ্যের কয়েকটী মুহূর্ত। কিন্তু এই কয়েকটী মুহূর্তই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। শয়তানটা চায়ের সঙ্গে কি মিশিয়ে দিয়েছিল জানিনা... অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম ওরই কোলে...আর যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলাম ও আমার পাশে শুয়ে...।”

সুরাইয়া নির্ব্বাক হয়ে গেল পলকে। পলকও বোধ করি পড়লো না।

বাইরের ভেজা বাতাসে আমার চোখ দুটো ভিজিয়ে দিল। বললাম—“কাঁদছো তুমি?”

—“না কাঁদছি না। জীবনে শুধু একবার কেঁদেছিলাম চীৎকার করে; সেই রাতেই। তারপর থেকে কাঁদতে ভুলে গিয়েছি। কোনো অভিযোগ নেই, কোনো সংঘাত নেই।”

লক্ষ্য করলাম সত্যিই কাঁদেনি ও। চোখ দুটো কঠিন পাথরের মত। নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো—“তারপর কি হলো জানো? যে সৌন্দর্যকে তুমি ভালবাসতে, সেই সৌন্দর্য্যের মাঝেই নিজেকে কবর দিলাম। বেরিয়ে এলো আর এক মানুষ। জীবনের প্রতি যার কোন আসক্তি নেই, সৌন্দর্য্যের প্রতি যার কোনো অনুভূতি নেই। যে সৌন্দর্য্য মানুষকে শুধু দুঃখই দেয়, যে দেহ শুধু লালসার প্রবৃত্তিই জন্মায়—তাকে জীবনের কঠোর পাহাড়া দিয়ে কি লাভ? চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম পুরুষের এই কদর্য, ঘৃণ্য আসক্তির সঙ্গে। মানুষ মাত্রই নারীর কাছ থেকে যা চায় স্বেচ্ছায় তাই দিতে বদ্ধপরিকর হলাম। সেই থেকে দেহ বিলিয়ে বেড়াচ্ছি...নগ্নদেহ...।”

—“সুরাইয়া!” সাপের ছোবলের মত চীৎকার করে উঠে।

—“না কোনো খেদ নেই মনে, কোনো ব্যথা বেদনা নেই। তোমরা যা চাও তাই তো দিচ্ছি। আমি সন্ধি করেছি তোমাদের লালসার সঙ্গে। আর এ-সন্ধিপত্রে এ পর্য্যন্ত অনেকেই সই করেছে। তোমাদের মত লেখক, অফিসার, কুলি মজুর—এমন কি বড় বড় রাজনীতিবিদ পর্যন্ত। ঘরের মেয়েরা যাদের ফিরিয়ে দেয়—আমি দিয়েছি তাদের সান্ত্বনা। এরা কেউই দেহকে পূজা করেনা—সবাই ভোগ করতে চায়—”

—“সুরাইয়া, তুমিও...” আবার চীৎকার করে উঠি।

—“না আমি পতিতা নই। সমাজের নানা চাপে পড়ে একদিন মেয়েরা পতিতা হয়। আমি তা নই। এ-পথে স্বেচ্ছায় নেমেছি। শুধু একটা চ্যালেঞ্জ; জীবনের সঙ্গে...।”

—“মানুষ চ্যালেঞ্জ করে একটি শক্তির আশ্রয় নিয়ে: কিন্তু তুমি তো আশ্রয় হীনা।”

—“সত্যিই, তবে কি জানো? তোমাদের মত লোভী

কাপুরুষদের নিজের বুকে আশ্রয় দিতে দিতে নিজের শেষ আশ্রয়টুকু পর্য্যন্ত হারিয়েছি।”

পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম—“যে আশ্রয় তুমি হারিয়েছো বলছো সেটা এখনও হারায়নি সুরাইয়া। ফিরে এসো আবার অতীত জীবনে। শান্ত হও।”

—“কোথায় আসবো ফিরে, কোথায় সেই আশ্রয় কবীর?” করুণ শোনালো তার গলা।

—“কেন আমারই কাছে।”

—“না কবীর তা হয় না। তুমিও তো সেই আগুন যে আগুনে আমায় পুড়িয়েছে, আমার ধর্ম, বিশ্বাস, অন্তর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছো।”

—“না সুরাইয়া, এ-পৃথিবীতে সব আগুনেরই দাহন শক্তি থাকে না। জগতে ব্যতিক্রম বলে একটি শব্দ আছে। সত্যটা তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। পৃথিবীর বহু খনিজ পদার্থ কালো হলেই কয়লা হয়না : যেটা ব্যতিক্রম সেটাই হীরে। তাকে বেছে নিতে হয়।”

—“হীরে বাছবার ব্রতই তো গ্রহণ করেছি কবীর। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তো একটাও পেলাম না, সবই কয়লা।”

সুরাইয়া উঠে দাঁড়াল। ধীর শান্ত পদক্ষেপে গিয়ে আবার সেই জানালাটি খুলে দিল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আকাশ পরিষ্কার। মাঝে মাঝে একটা দুটো তারা। রাত্রির অভিসারিকা। তার মাঝে কক্ষচ্যুত উল্কার মত সুরাইয়া কোন্ দূর দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে—কে জানে।

—“তুমি অসুস্থ। যতদিন সুস্থ না হও আমার অনুরোধ এখানেই থেকো।” সমবেদনা সঞ্চারের চেষ্টা করলাম।

চোখের উপর বোবা দৃষ্টি মেলে সুরাইয়া কি বললো ওই জানে। আমি চলে এলাম পাশের ঘরে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

তার প্রেম

আখতার জাহান

অথচ দেখিনি যারে তারে কেনো লাগে এত ভালো
জানিনা সে-কথা আমি, কি অবাক তার শিহরণে
সহসা শিহরি উঠি মনে হয় ছুঁয়ে বুঝি গেল
নিজেই হারিয়ে যাই সুগোপন চেতনার বনে।
নির্বাক হৃদয় মোর সুরে সুরে তার কথা কয়
অথচ পাইনি যার এখনো যে কোনো পরিচয়
দুর্বোধ্য কামনা নিয়ে এ-হৃদয় স্বপ্ন দেখে তার
স্বপ্ন আর স্বপ্ন শুধু মনে মনে তার প্রতীক্ষার।

চিরদিন এ-জীবন স্বপ্ন দেখে যদি কেটে যেত
এ-জীবনে এই ভালো চাইনা কিছুই—
কেননা পেয়েছি আমি জীবনের সুধা অভিপ্রেত
স্বপন মুখর মনে ফুটেছে তো সুগোপনে কামনার যুঁই

সেই তো দিয়েছে মোর হৃদয়ের সবটুকু ভরে
রঙ ধনু রঙে রঙে রেঙে গেছে মনের আকাশ
সেই তো এঁকেছে মোর হৃদয়ের বাসনার চরে
ফুলে ফুলে কী সুন্দর কুসুমের মাস!

আমার মনের বন বসন্তের রঙে রাঙা হয়
যেন তার স্পর্শ পেয়ে মধুর প্রেমের ;
কী আশ্চর্য ভালোলাগা জীবনের এ-মধু সময়
প্রেমের প্রবাল ঘেঁটে পেয়েছি তো দেখা আজ মুক্তো ঝিনুকের।

শাহ্ আব্দুল লতিফ ভীটায়ী

জগ্লুল হায়দর আফ্রিক

তদানীন্তন সিন্ধুর প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে শাহ্ লতিফ সর্বশ্রেষ্ঠ। আজো তাঁর আসন সকলের উর্ধে। তাঁর মত জনপ্রিয় কবি সে-দেশে তখনো ছিল না, এখনো নেই। তাঁর পূর্ববর্তী শাহ্ ইনায়িত ও পরবর্তী 'সচল সরমস্ত' উভয়েই খ্যাতিমান সিন্ধী কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ শাহ্ লতিফের সমকক্ষ ছিলেন না। শাহ্ লতিফের কাব্য-কলা সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। তাঁর সকল শ্রেণীর কবিতার উৎস—আধ্যাত্মিকতা ও 'ইশ্কিয়া তসব্বফ্'। তাঁর এ-তসব্বফের সাথে প্রচলিত ফিলোসফির কোন সম্পর্ক নেই। আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণিত 'প্রেম-মহব্বত্' ঐহিক মনে হলেও, তা ঐহিক নয়; 'আল্মে আর্ওয়াহি' ও আধ্যাত্মিক। তাঁর কবিতায় তসব্বফ্-লহরীর অগ্র-পশ্চাতে শরিয়ত-ধারা প্রবাহিত। 'দোহা' হোক্ কিংবা 'কাফিয়া', 'বন্দ্' আর 'বয়াত' সর্বত্রই শাহ্র 'ইশ্কিয়া দাস্তান'। আদি, অনন্ত তথা অমর প্রেমের সন্ধান।

শাহ্ লতিফের সঠিক জন্ম-মৃত্যু-তারিখ কারো জানা নেই। এ-দেশী ও বিদেশী গবেষকরা ১৪ই সফর, ১১০৩ হিজরী (১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ) জন্ম-তারিখ নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ১৬৮৯ সালে 'হালা হাবিলী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ হবিবুল্লাহ্। হবিবুল্লাহ্র পূর্ব-পুরুষরা হিরাতের অধিবাসী ছিলেন। মধ্য এশিয়ায় তৈমুরী আক্রমণ যুগে তাঁরা সিন্ধু দেশে আগমন করেন। বাসস্থান নির্দ্ধারিহত হয় 'হালা হাবিলী' (তহ্সীল 'হালা'; যিলা হায়দরাবাদ)।

শাহ্র জন্মের বৎসরাধিক কাল পর হবিবুল্লাহ্ কোটরীতে বাসস্থান স্থাপন করেন। শাহ্ লতিফ এখানেই যৌবনে পদার্পণ করেন। কথিত আছে, শৈশবে তাঁকে মশ্হুর ওস্তাদ আখুন্দ্ সাহিবের মক্তবে প্রেরণ করা হয়। আখুন্দ্ সাহিব আরবী 'কায়িদা' খুলে বল্লেন, 'আলিফ'; শাহ্ লতিফও বল্লেন, 'আলিফ'। তারপর আখুন্দ সাহিব যখন বল্লেন 'বে', তখন শাহ্ লতিফ বল্লেন; আলিফের আগে তো আর কিছু নেই!

রওয়ায়িত মুতাবিক জানতে পারা যায় যে, শাহ্ পুরা-দস্তুর আরবী, ফারসী, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি সব সময় তাঁর নিকট 'কুর্আন মজীদ', 'মস্নবী-ই-মৌলানা রুমী' ও 'রিসালা-ই-শাহ্ করিম' রাখ্তেন। যৌবনে শাহ্ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর সেই প্রেমের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শাহ্ ভবঘুরে জীবন যাপন করতে থাকেন। কখন জঙ্গল-বিয়াবনে সাধক সাহচর্যে, কখন 'সহ্রা ও রিগস্তানে' সন্ন্যাসী-আশ্রমে সময় অতিবাহিত করেছেন। এমনি ভবঘুরে জীবনে তিনি গুজরাট, কাঠিয়াওয়ার, কচ্ছ, বেল্লা, লাস্বেল্লা প্রভৃতি ভূখণ্ড ভ্রমণ করেন। ভীরুমল মেহের চান্দ্ তাঁর গ্রন্থে শাহ্র ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ভ্রমণ মাধ্যমেই তিনি নানা জাতি ও বিভিন্ন প্রকারের জনসাধারণের সংস্পর্শে আস্তে সক্ষম হন। তিনি মানব জীবনের অন্ধকার ও আলোকিত উভয় অংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর সুর 'সসূঈ' ও সুর 'সুরঠৈ' মানব জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি গীত হয়।

তাঁর জীবদ্দশায় সিন্ধু দেশে বহুমুখী রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। নানারূপ পরিবর্তনের সংস্পর্শে এসেও শাহ ছিলেন অপরিবর্তিত। তাঁর বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন সম্রাট আওরঙজেব পরলোকগমন করেন। কুল্হড়হ্ গোত্র তখন শক্তি সঞ্চয় কর্ছিল। নাদির শাহ্র ভারত আক্রমণের ফলে সিন্ধু ইরাণী কর্তৃত্বাধীনে আসে। এরপর সিন্ধুর একাংশে কুল্হড়হ্ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আহ্মদ শাহ্ আবদালির আক্রমণে দিল্লীর শাহান্শাহি শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সিন্ধু তখন আফগান কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। শাহ্ লতিফ যখন পরলোকগমন করেন (১৭৫২ খৃষ্টাব্দ), তখন সিন্ধুর আনাচে কানাচে শ্বেতাঙ্গ বণিকরা দোকান খুলে বস্তে শুরু করেছিল।

শাহ্ লতিফের শায়িরীর প্রারম্ভ হয় কোটরীতে—'দোহার' মাধ্যমে। সকল শ্রেণীর নর-নারী তাঁর কাব্য-কাকলিতে আকৃষ্ট হতে লাগ্লো। কোটরী ক্রমে ক্রমে কাব্য-মহ্ফিল তথা কাব্য-মেলায় পরিণত হলো। কিন্তু কাব্য-মহ্ফিলের জন্য যেরূপ মুক্তপরিবেশের দরকার, সেরূপ মুক্ত পরিবেশ কোটরীর ছিল না। তাই শাহ্ কোটরী পরিত্যাগ করে 'ভীট্'-এ আস্তানা স্থাপন কর্লেন। 'ভীট্' শব্দের অর্থ বালুকাস্তূপ। এস্থানে তখন বালুকাস্তূপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।—এই 'ভীট' থেকেই শাহ লতীফ 'ভীটায়ী' নামে অভিহিত। এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং এখানেই তাঁর কবিতা ও তসব্বফ্ পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। তিনি লক্ষাধিক মুরিদান ও ভক্ত রেখে ১৭৫২ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৭৫৪ সালে সিন্ধুর কুল্হড়হ্ শাসনকর্তা গোলাম শাহ্ তাঁর মাযার মুবারক নির্মাণ

করান। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবারে তাঁর মাযারগাহে মহ্ফিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ভক্তের দল বাদ্যযন্ত্র সহযোগে লোক-গীত, ইশ্কিয়া কাহিনী, দোহা, কাফি, খিয়াল প্রভৃতি গীত-সংগীতে মত্ত হয়ে উঠেন। শাহ প্রবর্তিত রাগরাগিণীতে ভীট্-এর আকাশবাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠে ঃ

হাতছানি দেয় প্রিয়ার প্রীতি
মত্ত নদীর মদির-গীতি
ব্যাকুল আমি আকাশ পানে বাই।

শাহ্ লতিফই প্রথম সিন্ধী কবি যিনি সিন্ধীভাষা ও সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার সম্মুখীন করেন। তাঁর ভাষা ও ভাবধারার বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। তিনি কুর্আন, ইস্লামী কিয়াস, ফল্সফ ; কাযিস, মতমক্কী, রুমী, নিযামী, হাফিয ও বোস্তামীর সাহায্য গ্রহণ করেছেন বহু ক্ষেত্রে কিন্তু তা এমনভাবে স্বকীয় করে ফেলেছেন যে, তীব্র উপলব্ধি শক্তি না থাকলে অনুধাবন করা যায় না। সিন্ধী ছিল তার প্রাণের ভাষা এ-ভাষার প্রত্যেক ধারা ও তরঙ্গের সাথে ছিল তাঁর প্রগাঢ় মিতালী তাই তিনি প্রতিটি কবিতায় সিন্ধীভাষী নর-নারীর অন্তরের গোপন অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেই জন্যই তিনি সিন্ধু বাসীর প্রাণের কবি—হাদী ও মুর্শিদ।

শাহ্ লতিফের কালাম সংগ্রাহক গ্রন্থের নাম 'শাহ-জোরসালো' এতে তাঁর সকল শ্রেণীর কালাম আছে। তাঁর এ-সব কালাম বিভিন্ন সুর ও ধুন্ এ গীত হতো ; সেই জন্য কালামগুলিও বিভিন্ন সুর ও ধুন্-এর অধীনে লিখিত হয়েছে। পাক-ভারতী সুর ও রাগ-রাগিনীর ওস্তাদ আমীর খসরু। আমীর খসরু প্রবর্তিত সুরগুলি পরবর্তী-কালে প্রাদেশিক রূপ লাভ করে। সেই সব সুরের সিন্ধী প্রাদেশিক রূপের সামান্য তারতম্য ঘটিয়ে শাহ্ লতিফ তাঁর কালামের উপযোগী সুর প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত নিম্নলিখিত সুরগুলির মাধ্যমে 'ওয়' 'আবি-য়াত' প্রভৃতি গীত হয় ঃ কল্যাণ, এমন কল্যাণ, খাম্বাত (খাম্বাজ), শ্রীরাগ, সোহ্নী, সামুন্ডী, কোহ্ইয়ারী, হুসয়নী, লায়লা-চন্সীর, মোমেল-রাহ্ন, মারুয়ী, সুরাঠ্, খাতু, কেডারু, সারঙ, আশা, রূপ, বরুয়-সিন্ধী, রামকলি, কাপাহতী (কপোতী), বালাওল ও প্রভাতী (কারো কারো মতে তাঁর প্রবর্তিত সুরের সংখ্যা ৩০)। সচল সরমস্ত্ (সিন্ধুর আর একজন খ্যাতনামা কবি)-এর কালাম যে সব সুর ও রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে গীত হয়, সে গুলি শাহ্ লতিফ প্রবর্তিত সুর ও রাগ রাগিণীর অনুরূপ নয় ; বেশ খানিকটা ব্যবধান ও পার্থক্য রয়েছে।

শাহ্ লতিফের কালাম সমুহ আসলরূপে সংগৃহীত হয়নি। তাঁর ভক্ত ও শাগরিদদের সাহায্যে সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং এমন অনেক 'বয়াত'ও 'দোহা' 'শাহ-জোরসালো'তে স্থান লাভ করে থাকবে, যা শাহ্ লতিফের কালাম নয়। তাঁর কালামের প্রথম সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৭৯০ সালে ; দ্বিতীয় বার অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে ; তৃতীয় বার খ্যাতনামা সিন্ধী কবি (হিজ হাইনেস) মীর আবদুল হুসয়ন সাঙগি ১৮৬০ সালে কালামের পরিবর্দ্ধিত সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সংগ্রহের কালাম বৈদেশিক ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এরপর অনেকেই কালাম সংগ্রহের কাজ করেছেন ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ মীরযা কলিচ বেগের।

শাহ্ লতিফের কালাম সমষ্টি মোটামুটিভাবে চার-ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ প্রাকৃতিক ও সামাজিক কবিতা, ইশ্কিয়া তসব্বফ্ ও সুফীয়ানা কবিতা, প্রেমগীত ও লোক-কাহিনী এবং লোরী (মা-বোনদের ঘুম পড়ান-গীতি।)

স্বাভাবিক ভাবেই শাহ্ আবদুল লতিফ ভীটায়ীর কালামে আরবী, ফারসী, বালুচি ও উরদু কাব্য সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান। সিন্ধী ভাষায় কিন্তু আরবীর চাইতে ফারসীর প্রভাব অধিক। শাহ লতিফের কালামেও আরবী কাব্য সাহিত্যের চাইতে ফারসী কাব্য সাহিত্যের প্রভাব অধিক।...মনসুরাহ ও মুলতানে আরব-হুকুমত তিন শ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তী কালে মুলতানের আরব-হুকুমতের ওপর ইরাণী প্রভাব ছিল যথেষ্ট। আরব-হুকুমতের অবসানে সিন্ধু দেশে আরবীর চর্চা হ্রাস পায়। প্রতিবেশী ইরাণী ভাষার অনুশীলন ব্যাহত হয়নি কোন দিন।

শাহ্ লতীফের জন্ম হয়েছিল মুগল মহাসম্রাট আওরঙ জেবের যমানায়। কিন্তু আওরঙ জেবের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীরা সাম্রাজ্য রক্ষায় সমর্থ হলেন না। শিখ, মারাঠা ও বহিরাগত ইংরাজরা ধীরে ধীরে মুগল সাম্রাজ্য গ্রাস করতে লাগলো। সিন্ধু দেশে কুল্হুড়হ্ গোত্রও স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করলো। মুগল দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিল ; তারা তাজ ও তখত্ হারিয়েছিল সত্য, পক্ষান্তরে তাদের কৃষ্টি, বৈশিষ্ট, তহ্-জিব, তমদ্দুন, ভাষা ও ভাবধারা তখনো এ-দেশে বর্তমান ছিল। সিন্ধু দেশের রাজভাষা তখনো ফারসী। ফারসীর এই পাক ভারত ব্যাপী প্রভাব ১৮৫৭ সালের পরও বিদ্যমান ছিল। শুধু সিন্ধীই নয়, পঞ্জাবী, উরদু ও বাঙলা কাব্য-সাহিত্যেও ছিল ফারসীর উল্লেখযোগ্য প্রভাব। তাই শাহ্ লতীফ ফারসীর প্রভাব মুক্ত হয়ে নিছক সিন্ধীতে তাঁর কালাম রচনা করতে পারেন নি।

প্রকৃতপক্ষে শাহ্ লতিফ ছিলেন সুফী কবি। পক্ষান্তরে সুফীয়ানা রূপের উৎস হলেন পারস্যের সুফী কবি : জামী, নিযামী, হাফিয, সা'দী, আত্তার, বোস্তামী ও আবুল খয়র। এঁদের প্রভাবের ফলেই শাহ্ লতিফ সুফীয়ানারূপের গভীরতায় পৌঁছ্‌তে সক্ষম হয়েছিলেন। সিন্ধুর জনসাধারণ সুফীয়ানা ঢঙ-এর পক্ষপাতী ; সুতরাং সুফীয়ানা ঢঙ-এর প্রবর্তন করেন শাহ্ লতিফ অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ইশ্‌কিয়া তাসাওফ ও সুফীয়ানা কালাম শরিয়ত সুধাবিন্দুতে সিক্ত ; তাই সচল সরমস্ত তাঁর সমকক্ষতা করতে পারেন নি। কবি হিসাবে সচল সরমস্ত উচ্চাসনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শরিয়ত বিরোধীতার কারণে তাঁর অবনতি ঘটেছিল।

শাহ্ লতিফের কালামে ফারসী সুফী কবিদের মত অতি উচ্চ ভাবধারা না থাকলেও তা হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। তিনি পতিত জমির ওপর বাদল-বর্ষণের চিত্র অঙ্কিত করে তার দ্বারা খুদার রহমতের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, সত্যই তা অনবদ্য। বালুচি কাব্য-সাহিত্যেরও প্রভাব আছে তাঁর কালামে। সহজ, সরল প্রকাশভংগি বালুচি কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ-বৈশিষ্ট্য আছে শাহ্ লতিফের কালামে। শাহ্ লতিফের কালাম আলিম, জাহিল, সভ্য শিক্ষিত সকলের নিকট সমানভাবে হৃদয়গ্রাহী। কারণ তাঁর কালামে দোলনার দোল থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর মর্সিয়া অবধি মানব-জীবনের সকল রকম সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সময়-দুঃসময়-এর মনোজ্ঞ দৃশ্যাবলী চিত্রিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শাহ লতিফের কালাম বিভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত। 'সসসী-পুন্নু', 'ওমর-মারুয়ী', 'লায়লা-চনসীর', 'মোমেল-রানু' ও 'সুরথ-রায়ডিয়াচ' তাঁর ইশ্‌কিয়া কাহিনী-কালামের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমরা তাঁর মর্সিয়া কালামের কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদান করছি :

মুহররম্ প্রত্যাবর্তন করলো,
পক্ষান্তরে 'শাহজাদা-ই-উম্মত'
প্রত্যাগমন করলেন না ;
এ-ই কি তকদির বিধান,
এ-ই কি খুদার মরযি-রহস্য !

তিনি মদিনা থেকে কারবালা অভিমুখে গমন করলেন,
সেই খুনী কারবালা ভূমিও তাঁকে স্মরণ করে ;
হুসয়নী কাফিলা মরুভূর যে-পথে গমন করেছিল,
আজ সে-পথও তাঁর নাম তিলাওত করে ;
এ-দৃশ্য পুনরায় দেখবার সৌভাগ্য হয়নি মদিনাবাসীদের,
(কারণ) মদিনার সেই মুসাফির মদিনায়
প্রত্যাবর্তন করেন নি !
মুহররম্ ফিরে এলো,
ফিরলেন না শুধু উম্মতের শাহ্‌জাদা।

বহু বিবাহের কারণ ও বর্ত্তমান মনোভাব

মোহাম্মদ মোর্ত্তজা

বহু বিবাহকে কোন প্রকারে কোন অবস্থায় গ্রহণ করা চলে কিনা, অথবা পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনুকরনে নিরংকুশ এক বিবাহকে একমাত্র আইনসিদ্ধ বিবাহ পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে কিনা, অন্য কথায় বহু বিবাহ-কারীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিবার আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রশ্নটী মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহে বর্ত্তমানেও কখনও কখনও বিশেষ চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া মুসলমান প্রধান দেশসমূহে ইহার একটা নিস্পত্তি এখনও হয় নাই।

বহু বিবাহ কথাটীর প্রয়োগ ইহার সম্পূর্ণার্থে করা হয় না। একজন পুরুষ কর্ত্তৃক একই সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং একজন স্ত্রী কর্ত্তৃক একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ এই উভয়ার্থেই বহু বিবাহ শব্দটী প্রযুক্ত হইতে পারে। শেষোক্তটী যদিও এখন একটা সমস্যা নয় তবুও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বহু স্বামী প্রথা পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, মালয়, তিব্বত, আসাম কাশ্মীর পর্য্যন্ত হিমালয়ের পাদ-দেশে অবস্থিত অঞ্চল সমূহে; কোচিনে, দক্ষিণ ভারতের মালাবার, ত্রিবাংকুর প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রচলন অব্যাহত ছিল এবং সেটা বেশী দিনের কথা নহে। সিংহলে এই প্রথা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক বেআইনী ঘোষিত হয়।

এই প্রথার মধ্যে কোথাও কোথাও কিছুটা বৈশিষ্ট ছিল। এই একাধিক স্বামী যে সম্পূর্ণ পৃথক অথবা দূরাঞ্চল হইতে গৃহীত হইত এবং তাহারা একই স্ত্রীর সৌজন্যে একত্রে বসবাস করিত, তাহা নহে। স্পষ্টতঃই তেমন অবস্থার মধ্যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইতে বাধ্য। সেই জন্য কোথাও কোথাও (বিশেষ করিয়া তিব্বতে) স্বামীগণ হইত ভাইয়েরা। এক ভাই বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীর উপর অন্যান্য ভাইদেরও স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল যে, স্বামীদের মধ্যে একজন প্রধানের সম্মান প্রাপ্ত হইত। ভাই হইলে সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠজন, না হইলে সাধারণতঃ প্রথম স্বামী, প্রধান হইয়া একটু বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। কোথাও কোথাও (যেমন নিকোহিভাতে) আবার সহকারী স্বামী-প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামী যুদ্ধ, ব্যবসা অথবা অন্য কোন কোন কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে গমন করিলে স্ত্রীকে একা রাখিয়া যাইত না। তাহার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একজন পুরুষকে নিয়োগ করা হইত। এই পুরুষটী কেবল রক্ষা-কর্ত্তা নহে, স্বামীর সব অধিকার সে ভোগ করিত। অবশ্য এই শর্ত্তে যে পূর্ব স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

এই সব প্রথার প্রচলন কেন ছিল, প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া বলা হয় যে প্রথমতঃ ইহার ফলে পারিবারিক সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া কমিয়া যাইত না। সাধারণ স্ত্রী থাকার ফলে ভাইয়েরা একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিত। ভাইদের মধ্যে একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইত। (পঞ্চপাণ্ডবদের সম্পর্কের দৃঢ়তায় দ্রৌপদীর অবদান লক্ষ্য করিবার বিষয়।) দ্বিতীয়তঃ ইহাতে জনসংখ্যা অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এবং সহকারী স্বামী সম্পর্কে বলা হয় যে তখনকার সামাজিক অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলিয়া অন্যত্র গমন সম্ভব ছিল না বলিয়া তাহাকে সহকারী স্বামীরূপে এক-জনের হেফাজতে রাখিয়া যাওয়া হইত।

এই সব খুব জোরালো নয়। সম্পত্তিকে একত্রিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে রুখিবার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী আর কখনও ছিল না। এখনও স্ত্রীকে ফেলিয়া অন্যত্র গমনে স্বামীচিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু বহু স্বামী অথবা সহকারী স্বামী প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান অভাবনীয়।

সম্পত্তির একত্রিত রাখিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং নেহাত অসুবিধা না থাকিলে বরং ঘরে ঘরে বিবাহ দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইবার জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত জন্মরোধ ব্যবস্থার প্রচলন করা হইয়াছে। স্ত্রীকে কাছে কাছে রাখিবার জন্য এখানকার স্বামীগণ প্রাণপাত করিয়া থাকেন। (স্ত্রীকে কাছে রাখিবার ক্ষমতা অর্জন না করা পর্য্যন্ত অনেকে বিবাহই করেন না) এবং নিতান্ত অসমর্থ হইলে তাহাদের অনুশোচনার সীমা থাকে না। কিন্তু স্থায়ী বা অস্থায়ীরূপে অন্য কোন পুরুষকে কোনরূপ অধিকার দেওয়া কল্পনাতীত।

একটা প্রচলিত প্রথার এহেন বিলুপ্তি ঘটিল কেন?

যে সমস্ত স্থানে বহু স্বামী প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বলা হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে যাহাদিগকে আদিম, অসভ্য, অনুন্নত, উপজাতি প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়, তাহাদেরই কাহারো কাহারো মধ্যে এরূপ ঘটিত। অর্থাৎ ইউরোপ ও

আমেরিকার বর্ত্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষদের কথা বাদ পড়িয়া যায়। এমন কথা চিন্তা করিবার কিন্তু কারণ নাই। এসব সত্য যাঁহারা সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহারা বর্ত্তমানের সভ্য ও উন্নত ইউরোপীয় ও আমেরিকার জাতিভুক্ত পুরুষ। এমন দোষ না দিলেও চলিতে পারে যে এই প্রথা অসভ্য ও ঘৃণ্য বলিয়া এই সব তথ্যসরবরাহকারীগণ ইচ্ছা করিয়া এশীয় অনার্য্যদের ঘাড়ে ইহা চাপিয়া দিয়াছেন। মানুষের সামাজিক ইতিহাস খুব অল্প সময়ের। সামাজিক বিবর্ত্তন পাশ্চাত্যে অগ্রে সম্পন্ন হইয়াছে। সেইজন্য বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত সমাজভুক্ত ব্যক্তি বলিয়া এবং তদীয় সমাজের পূর্ব ইতিহাস ভালো করিয়া জানিবার সম্ভাবনা না থাকার ফলে এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দেওয়া দুরূহ। কারণ ইতিহাস সংকলন মানুষের বিশেষ মানসিক উন্মেষের ফল এবং ইহাও সামাজিক বিবর্ত্তনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইবসেন যখন ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জঘন্য অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন (প্রায় এক শতকের কথা) তখনকার ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা বর্ত্তমান কালের এশীয় সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। তাহার পর তাহাদের অবস্থায় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে ; এবং আমাদের সবেমাত্র আসিতে শুরু করিয়াছে। এই তথ্য না জানিয়া অথবা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছা করিয়া যদি কোন ইউরোপীয় লেখক এ-কথা বুঝাইতে চাহেন যে নারীর বর্ত্তমান সামাজিক হীনাবস্থা কেবল এশিয়ার বৈশিষ্ট্য, তবে তাহাকে আমরা ভ্রান্ত বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারি। কিন্তু বহু স্বামী প্রথা সম্পর্কে এমন কথা বলা চলে না।

মর্গান সাহেবের "মানবজন্মের একত্ব" (ধর্মেও যাহা সমর্থিত) প্রমাণ করে যে মানব সমাজের কোন না কোন স্তরে বহু স্বামীপ্রথা কোন না কোন ভাবে প্রচলিত ছিল ; দলীয় বিবাহ পদ্ধতি যদি সম্ভব হয় তবে বহু স্বামীপ্রথা সম্ভব নয় কেন? যে মানসিকতার স্তরে গোত্রভুক্ত যে কোন স্ত্রীলোক সেই গোত্রভুক্ত যে কোন পুরুষের সহিত শয্যাগ্রহণ করিত এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান গোত্রের সামগ্রিক জনসংখ্যার সহিত নির্বিশেষে মিশিয়া যাইতে পারিত (প্লেটোর রিপাবলিকের শাসক সম্প্রদায়ের ন্যায়) সেই সময়ে অথবা তাহার পরবর্ত্তী বিবর্ত্তিত স্তরে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বীকৃত স্বামী থাকিতে পারে না কেন? ইহা সম্ভব এবং ছিল। বর্তমান কালেও আইনগত কড়াকড়ি আরোপ করা হউক না কেন স্ত্রীদের ব্যবহার অনেক সময় বহু স্বামীর প্রতি গুপ্তভাবে সমর্থনশীল। তাহাকে আজ আমরা পতি না বলিয়া উপপতি বলি। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানের জিজ্ঞাসা হইতেছে বহুস্বামীপ্রথার প্রতি সাধারণ ঘৃণা এত ব্যাপক হইয়া উঠিল কেন?

তাহার পর আসে বহুস্ত্রী প্রথার কথা। পূর্বে বলিয়াছি ইহা মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহের একটি বিশেষ সমস্যা। উপরন্তু এখন বহুবিবাহ বলিতে বহুস্ত্রী গ্রহণই বুঝান হইয়া থাকে। স্পষ্টতঃই এই অর্থ আংশিক। তবুও ইহাই প্রচলিত হওয়ার কারণ বহু স্বামীপ্রথা এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় দিক বিবেচনার কারণ হইতেছে উভয়েরই বিলুপ্তির পশ্চাতে একই সামঞ্জস্যশীল মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য বিদ্যমান। মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহে ইহার সমাধান না হইলেও অন্য প্রায় সকল ধর্মভক্ত সমাজই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ইহার সমাধান করিয়া দিয়াছে অথবা সমাজই করিয়া লইয়াছে। এবং এই সমাধান হইতেছে ব্যতিক্রমহীন এক বিবাহ।

বহুস্ত্রী প্রথাও বহুস্বামী প্রথার ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বৃটন ও গ্রীকদের মধ্যে ইহা চালু ছিল। গ্রীকবীর মার্ক দ্বিতীয় (সম সময়ে) স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল। সম্রাট থিওগেসিয়ান সাম্রাজ্যে বহু বিবাহ নিষি করিয়া আইন করেন কিন্তু পরে আবার ইহার প্রবর্ত্তন করা হয় (প্রথম ভ্যালেন্টিয়ানের সময়)। তাহারও পরে ইহা দ্বিতীয় ও শেষবারের মত নিষিদ্ধ হইয়া যায়। প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্মনেতা মার্টিন লুথার একই সময়ে দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণ সমর্থন করেন। ইংলণ্ডে মাত্র প্রথম জেমসের (১৫৬৬ ১৬২৫ খৃঃ) সময় বহু বিবাহ মৃত্যুদণ্ড সাপেক্ষে রহিত করা হয়। আমেরিকার মর্মনদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন ছিল; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট উডরাফ ইহা বন্ধ করিয়া দেন। চীন ও জাপানে ইহার সহজ প্রচলন ছিল। জাপানে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। প্রাচীন মিশরে রাজরাজাদের মধ্যে ইহা চলিত। ব্যাবিলনিয়াতে স্ত্রী বন্ধ্যা অথবা রুগ্না হইলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ আইনসিদ্ধ ছিল। ইহুদীদের মধ্যে বহু বিবাহের অবাধ অধিকার স্বীকার করা হইয়া থাকে। স্লাভ, টিউটন ও আইরিশ জাতিগুলির মধ্যেও ইহার প্রচলন ছিল। ষষ্ঠ শতকের আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজা ভারমাইটের দুই স্ত্রী ও দুইজন রক্ষিতা ছিল। হিন্দু ধর্মে স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যায় কোন বিধি নিষেধ নাই ; বিশেষ করিয়া কুলীনদের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "বহু বিবাহ -হিত হওয়া উচিত কিনা"য় ইহার ব্যাপকতা বিশেষ করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপে ফ্রাঙ্কিন কেষ্টাগ ও নুরেমবুর্গে দুই স্ত্রী গ্রহণ আইন সিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইসলামে চারিজন স্ত্রী গ্রহণ আইন সিদ্ধ। ইত্যাদি।

বহু স্ত্রী গ্রহণের হিসাবে যেগুলি বলা হয় তাহা হইতেছে:

১। বিবাহ যোগ্য স্ত্রীলোকের তুলনামূলক সংখ্যাধিক্য।

২। স্ত্রীর হায়েজ, গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে স্বামীর বাধ্যতামূলক যৌনবিরতি।

৩। নারীর যৌবন ও সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের আকর্ষণজনিত লোলুপতা।

৪। পুরুষ মনের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যপ্রিয়তা।

৫। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

৬। অধিকসংখ্যক স্ত্রী থাকিলে অধিক সন্তান হইবে; অধিক সন্তান হইলে ক্ষমতা বাড়িবে—ক্ষমতা বৃদ্ধির এই সম্ভাবনা।

৭। শ্রমিক হিসাবে স্ত্রীর মূল্য।

৮। অধিক স্ত্রী থাকিলে প্রভুত্বকামী পুরুষ তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ লিপ্সা আরও ভালোভাবে চরিতার্থ করিতে পারে।

৯। ক্রান্তিয় অঞ্চলসমূহে বিশেষ করিয়া, স্ত্রীগণ অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্তা হয় এবং অল্প বয়সেই বিগত যৌবনা হইয়া পড়ে; কিন্তু পুরুষ আরও অধিককাল ধরিয়া যৌনক্ষমতার অধিকারী থাকে।—জন লাবক।

১০। বয়স্কা ও বিবাহযোগ্যা কন্যাদায়গ্রস্ত উৎকণ্ঠিত পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে এবং কন্যাকে যেখানে সেখানে দেওয়া চলে না এই বাছবিচারে অনেক সময় অভিভাবকগণই অগ্রনী হইয়া কন্যাকে সপত্নী হিসাবে সম্প্রাদান করেন।

১১। দুইজন বরের কথা বিবেচনা করুন। পুরুষ হিসাবে ইহাদের দুইজনের মধ্যে সর্ববিষয়ে মিল আছে। কিন্তু একজনের সম্পদ ও সামাজিক অবস্থান এবং তাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিয়া রক্ষা ও পালন করিবার সুবিধা অপরজন অপেক্ষা বেশী। একজন কনেকে পছন্দ করিতে বলা হইলে সে প্রথমজনকেই পছন্দ করিবে, তাহার অপর স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলেও। (বর্ত্তমান কনেদের মানসিকতায় কিছুটা উনিশ-বিশ থাকিতে পারে, অন্ততঃ বাহ্যতঃ)।

১২। ধর্মে বহুবিবাহকে সমর্থন দান।

এখন বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিবাহযোগ্য স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। কোথাও কোথাও (যুদ্ধোত্তর কালে) মারাত্মকভাবে বেশী। কিন্তু যেখানে যতবেশী সেই সব দেশে বহুবিবাহ তত বেশী ঘৃণিত। জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এক বিবাহের ব্যতিক্রম অসম্ভব। সেখানে রক্ষিতার প্রতিরূপ মিসট্রেস রাখা চলে কিন্তু সেই মিসট্রেসকে স্ত্রীর মর্য্যাদায় উন্নীত করা অভাবনীয়।

স্ত্রীর বিশেষ অবস্থায় স্বামীর অবশ্যম্ভাবী যৌনবিরতি এখনও ঘটে কিন্তু তাহার পরিপূরক হিসাবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ আর ঘটেনা। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের গভীরতর উপলব্ধি, পারস্পরিক সহযোগীতার মনোভাব স্বামীকে দিয়া এই বিরতি নীরবে এবং আনন্দের সহিত সহ্য করাইয়া লয়। যাহারা পারে না তাহারা অন্য পথ খোঁজে। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ সর্বাবস্থায় অভাবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে যাহারা সজাগ তাহাদের অধিকাংশ বর্ত্তমানে সন্তান লাভ নিয়ন্ত্রিত করিয়া হ্রাস করিবার ফলে এই ধরণের বিরতি কিছুটা কমিয়া গিয়াছে।

নারীর যৌবন ও সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষমনের লোলুপতা বহুবিবাহের কারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু পুরুষের যৌবন ও শক্তির প্রতি নারীমনের লোলুপতাকেও ছোট করিয়া দেখা চলে না। প্রথমটী যদি বহু স্ত্রী গ্রহণের কারণ হয় তবে দ্বিতীয়টী বহু স্বামী গ্রহণের কারণ হইতে বাধ্য। কিন্তু বিবাহ নিয়ন্ত্রণের শক্তি পুরুষের একচেটিয়া বলিয়া নারীর এই মনোভাব প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায় না (গুপ্তদ্বার ব্যতিরেকে)। টলষ্টয়ের এ্যানা ক্যারেনিনা যখন ভ্রঁস্কির সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল তখন ভ্রঁস্কি অল্প বয়স্ক যৌবন শক্তিতে উদ্দীপ্ত সামরিক কর্মচারী। সৌন্দর্য্য ও শক্তি চর্চা বর্ত্তমানে বহুগুণে বাড়িয়াছে কিন্তু আকর্ষণকে তৃপ্ত করিবার সম্মুখদ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ।

বৈচিত্র্যপ্রিয়তাও পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। লক্ষ্য করা যায় যে বিপরীত জাতির যৌবনের প্রতি আকর্ষণ ও বৈচিত্র্যপ্রিয়তা এখনও মানবমনের একটা বৈশিষ্ট্য এবং সেই হিসাবে বহুবিবাহের কারণরূপে ইহার মূল্য এখনও আছে কিন্তু বহুবিবাহ আর সংঘটিত হয় না। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে যদি দৃঢ়তার অভাব থাকে তবে ভিন্নভাবে এই মানসিকতা প্রকাশ পায়। ভিন্নপ্রকাশ হইতেছে, একই সময়ে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া জীবনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের ব্যাপকতা। ফলে একই সময়ে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকেনা বটে কিন্তু সারা জীবনের ইতিহাস একসঙ্গে বিচার করিলে দেখা যায়, একাধিক স্বামী বা স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-জীবন ইহারা যাপন করিয়াছে। ইহাকে আমরা "প্রকারান্তর বহুবিবাহ" বলিতে পারি, ইনগ্রিড বার্গম্যান, রিটা হেওয়ার্থ প্রমুখ মহিলাদের জীবনচরিত এই বৈচিত্র প্রিয়তার প্রতিচ্ছবি হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। পুরুষের

উপমা আপনার আশে পাশেই দেখিতে পাইবেন। আমাদের দেশেও স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে আমাদের দেশে এখনও নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও বহুবিবাহ এখনও সংঘটিত হয় এবং বিবাহবিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধিকারে বলিয়া স্ত্রীগণ এখনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। সামাজিক বিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে ইহা ঘটিবে। অনেকে ইহা নারী সাধীনতার কুফলতার বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহা হইলে প্রতিপক্ষে ইহা পুরুষ স্বাধীনতার কুফলও বটে। এবং এই কুফলের ভীতি আমাদিগকে কতখানি পাইয়া বসিয়াছে তাহা যে কোন কাবিননামার শর্ত্তাবলীর দিকে তাকাইলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এই সমস্ত শর্ত্তাবলী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া আরোপ করা হয় কেননা স্বামীই বিবাহ বিচ্ছেদের কর্ত্তৃকারক। এই সব শর্ত্তাবলীর বহর দেখিয়া বোঝা যায় যে আমাদের বিবাহানুষ্ঠানের পদতল হইতে মাটী সরিয়া যাইতেছে। কাজেই পুরুষ-স্বাধীনতার কুফল প্রচণ্ড হইয়া বিরাজ করিতেছে; বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখা হইলেও। এবং সেই জন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার পর যদি কোন কোন নারী বার বার স্বামী পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকারান্তর বহু বিবাহের মধ্যে বৈচিত্রের আস্বাদ পাইতে চেষ্টা করে তাহাকেই এককভাবে দোষী করা চলে না। বরং ইহা করিয়া পুরুষেরই শীল-নোড়া দিয়া তাহারই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার কারণ ইহাদের আছে বৈ কি? কিন্তু এতসব কাণ্ডকারখানার মধ্যেও বহু বিবাহ অভাবনীয়।

স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বে স্বামীর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কারন হিসাবে প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। স্ত্রী চিররুগ্না হইলেও এই অধিকার স্বীকার করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আরও আছে যে স্ত্রী মৃতপুত্র অথবা কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে স্বামী স্ববর্ণে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, অবশ্য অসবর্ণের ক্ষেত্রে কোন বাছবিচার নাই। নারীকে হীনভাবে গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট। কোন দম্পতির সন্তান না হইলে স্ত্রীর ঘাড়েই দোষ চাপাইবার প্রবৃত্তি সার্বজনীন। অন্ততঃ এমনটা ছিল। ইহা অজ্ঞানতা এবং সেই জন্য কুসংস্কারমূলক। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিসংখ্যায় দেখা যায় যে সন্তানহীন দম্পতিসমূহের এক তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী স্ত্রী, এক তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী স্বামী এবং অপর তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী উভয়েই। অতএব সন্তান না হইলেই স্বামীকে আবার বিবাহ করিতে বলা মূর্খতা। অবশ্য যখন এই আইন চালু ছিল তখন বন্ধ্যাত্বের কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ঘাটিত হয় নাই। কিন্তু আইনের মধ্যে বিনয়ের অভাবে নারী বিদ্বেষ ও পুরুষ প্রীতি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামে এই সমস্যাকে পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল না।

এখনও অনেক সন্তানহীন দম্পতি এই সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ন্যায্য আবেদন থাকা সত্ত্বেও বহু বিবাহ অভাবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার ধারানুযায়ী বহুবিবাহ সর্বপ্রকারে অসভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের মতানুযায়ী বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ (স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই) চলিতে পারে কিন্তু বহুবিবাহ চলিতে পারে না।

আমাদের দেশে স্ত্রীকে দায়ী করিয়া দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিবার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান থাকিলেও দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। বর্তমান অবস্থায় তেমন সন্তানহীন দম্পতি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। একেবারে নির্মূল না হইলেও স্বামী তাড়াতাড়ি আবার বিবাহ করিয়া বসে না। যদি রোগনির্ণয়ান্তে তাহার প্রতিকার অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় তবে যদি উভয়ই দায়ী হয় তবে কোন সমস্যা নাই। কিন্তু কেবল স্ত্রী দায়ী হইলে অধিকাংশ স্বামী আবার বিবাহ করে। এবং নিতান্ত অসামর্থ না থাকিলে অথবা মানসিক কারণ বিদ্যমান না থাকিলে প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করিয়াই করিয়া থাকে। স্ত্রীটির পক্ষে এ ক্ষেত্রে স্বামীর যে কোন ব্যবহারকে মাথা পাতিয়া লওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। দোষ স্বামীর হইলে অধিকাংশ স্ত্রী কেবল সন্তান লাভের জন্য স্বামী ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে না। (স্বামী ত্যাগ না করিয়া করা অভাবনীয়।) একটা লজ্জা তাহাদিগকে এমন ব্যবহার করিতে বাধা দেয়। অনেক স্বামীও অবশ্য অনেক সময় দ্বিতীয় বিবাহ হইতে বিরত থাকে; আমাদের দেশে তেমন স্বামীর সংখ্যা নগণ্য। প্রথম স্ত্রীর কথা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় বিবাহে তাহাদের মন সরে না। তবে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন যদি প্রচণ্ড হয় তবে এমন ধরণের মানসিকতাকে যেমন করিয়া হউক ঠেলিয়া ফেলা হয়।

এই ধরণের দম্পতি, যাহারা সন্তানহীন অথচ দ্বিতীয় বিবাহ করে না, সংখ্যায় বাড়িতেছে ক্রমাগত অধিক হারে। এই প্রবণতার মানসিক কারণ বা মর্য্যাদাবোধ যাহাই হউক না কেন একবিবাহের প্রতি সাধারণ মনোভাবের ইহা সমর্থনশীল। বহুবিবাহের এই কারণটী জীবন্ত থাকা সত্ত্বেও বহুবিবাহ ঘটাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। ইরাণের শাহের উত্তরাধিকার সমস্যাসম্ভূত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে বন্ধ্যাত্ব ও যৌন অক্ষমতার মধ্যকার পার্থক্যের কথা আসিয়া পড়ে। যৌন অসামর্থ প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করে কিন্তু বন্ধ্যাত্ব যৌন ক্ষমতার অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই।

স্বামী পুরুষত্বহীন হইতে স্ত্রীর পক্ষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু কেবল বন্ধ্যা হইলে নহে। এই আইন নিঃসন্দেহে পুরুষের প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে নানাভাবে স্বীকৃত কিন্তু তাহার যৌন অসামর্থ থাকিলে কি হইবে বলা হয় না। এ বিষয়ে চুপ থাকিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে স্ত্রী যৌন অসমর্থ হইতে পারে এমনটা সম্ভব নহে, আইন প্রণয়ন-কারীদের ইহা অজ্ঞতা। ইহা সত্য। যৌন মিলনে, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের নারীর ভূমিকা হইতেছে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। পুরুষের পক্ষে রবারের পুতুল এমন কি মৃতবৎ নারীদেহের সহিত সংসর্গেও সন্তুষ্টিলাভ সম্ভব। সেইজন্য সমস্যাটী উপেক্ষিক হইয়াছে। কিন্তু তেমন স্ত্রীর সহিত দাম্পত্যজীবন যাপনে অস্বীকার করিলে স্বামীকে দোষ দেওয়া চলে না।

স্ত্রী বা স্বামীর এই ধরণের অসামর্থ থাকিলে তাহাদের দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি কেন? এবং এই দ্বিতীয় বিবাহ করিতে হইলে প্রথমজনকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে তাহারই বা কারণ কি? পুরুষের কথা বলিনা কারণ সব দেশেই এমতাবস্থায় তাহারা একটা ব্যবস্থা করিয়া লয়। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে উপায়ান্তর প্রায়ই থাকে না। লরেন্সের "লেডি চ্যাটার্লীর প্রেমিক"এর কথা ধরুন। লর্ড চ্যাটার্লী পুরুষত্বহীন ছিলেন। তিনি সমস্ত মানসিক গ্লানি ঠেলিয়া ফেলিয়া স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন যে তিনি যেন অন্য পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সন্তান লাভ করেন। এবং সেই সন্তানকে লর্ড চ্যাটার্লী নিজের সন্তানের ন্যায় মানুষ করিবেন। লেডি চ্যাটার্লীর পিপাসার্ত হৃদয় ও দেহ তাঁহাদেরই একজন চৌকিদারের পৌরুষের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইল। তাঁহার গর্ভ সঞ্চার ঘটিল কিন্তু তিনি ফিরিতে পারিলেন না। চৌকিদার তাহার পৌরুষকে এই ভাবে কেবল কামনা নিবৃত্তির উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে দিতে অস্বীকার করিলে লেডি চ্যাটার্লী লর্ড চ্যাটার্লীকে পরিত্যাগ করিয়া চৌকিদারের ঘরকন্না বাছিয়া লন। গল্পটী অন্য উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও লর্ড চ্যাটার্লীর ব্যবহার এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তিনি শর্ত আরোপ করিলেন যে গর্ভ সঞ্চারের পর লেডীকে একাকিনী ফিরিয়া আসিতে হইবে। অপরপক্ষে শর্ত হইতেছে "আমার পৌরুষকে সুবিধা মতো ব্যবহার করিয়া তুমি চলিয়া যাইবে, তাহা হইবে না।" আপাত-দৃষ্টিতে লর্ড চ্যাটার্লীর শর্তেও যুক্তি পাওয়া যাইবে এবং চৌকিদারের শর্তেও যুক্তি পাওয়া যাইবে; কিন্তু যদি বলা হয় যে চৌকিদার লেডী চ্যাটার্লীর দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে একত্র বাস করিবে তবে তাহার পশ্চাতে কি কোন যুক্তি নাই? সে ক্ষেত্রে একই স্ত্রীর দুই স্বামী হিসাবে লর্ড চ্যাটার্লী ও চৌকিদার (চৌকিদারের সামাজিক নিকৃষ্টতা আপত্তিকর হইলে কোন উন্নত স্তরের পুরুষ ইহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে।) পরস্পরের আত্মীয় হইয়া উঠিবেন। একই স্বামীর দুইজন স্ত্রী যেমন সপত্নী, তেমন একই স্ত্রীর দুইজন স্বামী সপতী। এবং নিজেরই স্ত্রীর গর্ভে সপতীর ঔরষজাত সন্তানকে লইয়া লর্ড চ্যাটালী স্বীয় বন্ধ্যাত্বের জ্বালা কিছুটা হইলেও নিবারিত করিতে পারিতেন। যেমন সতীনের গর্ভজাত সন্তানকে লইয়া অনেক বন্ধ্যা প্রথমা স্ত্রী কিছুটা সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মানসিকতা লর্ড চ্যাটার্লীর ছিল না, চৌকিদারের (বা অন্য কোন পুরুষের) ছিল না, আমাদেরও নাই। কিন্তু সে অবস্থায় হতভাগ্য লর্ড চ্যাটার্লীর প্রতি যে সহানুভূতি দেখান হইত তাহার মূল্য কি কম? ইহাতে কি অধিকতর মানবতাবোধের পরিচয় মিলিত না? কিন্তু সে সব অভাবনীয়।

বহু স্ত্রী গ্রহণের বিরুদ্ধে ঠিক এই ধরনের মানসিকতা বর্তমানে কার্য্যকরী। এখানে বুঝিয়া দেখিবার ইচ্ছা নাই, যুক্তি দিয়া বিচার করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা ধরিয়া লইয়াছি "তেকেহ পি দিবসা গতা:"—সে একদিন গত হইয়াছে।

সন্তান বৃদ্ধির ফলে পিতার ক্ষমতা এখন আর বাড়েনা। এমন একদিন ছিল যখন ঔরষজাত সন্তানসন্ততির উপর পিতার অপ্রতিহত অধিকার প্রযুক্ত হইত। এবং এই অধিকার প্রয়োগ ক্ষমতার পরিমান বৃদ্ধিতে সাহায্য করিত। নবী দাউদ প্রায় একশত পত্নীগ্রহণ করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের গর্ভে তাঁহার যে সকল পুত্র জন্মিবে তাহাদের সাহায্যে তিনি জেহাদ করিবেন। (যদিও অহংকারের শাস্তিস্বরূপ তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়)। বর্তমানে শিল্পায়িত অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠার ফলে পিতার এই সুবিধা ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। এখন সন্তান-সন্ততি পিতার উপর বোঝা স্বরূপ হইয়া দাঁড়িয়াছে। ইহাতে দায়িত্ব বাড়িয়া যায় এবং সেই দায়িত্ব পালন করিয়া সন্তানকে উন্নত করিতে পারার মধ্যে সন্তুষ্টি আছে কিন্তু ক্ষমতাবৃদ্ধি নাই। সন্তান পিতার পুত্র বা কন্যা অপেক্ষা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইতেছে ক্রমাগত অধিক পর্য্যায়ে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে এই ব্যবস্থা প্রায় পুরাপুরি চালু করা হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছি। রাষ্ট্র এখনও অতটা ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে নাই বলিয়া এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতে সময় লাগিবে। আমাদের দেশে পিতারূপ প্রভুর করচ্ছায়ায় একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার যে ঠাট এখনও বজায় আছে তাহার মধ্যেই পিতা ও পুত্রের মানসিক সংঘর্ষ ক্রমাগত প্রকট

হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ ইহা কোন একটী পিতা ও পুত্রের সংঘর্ষ নহে, ইহা পিতার সমকালীন পুরাতনের সহিত সন্তানের সমকালীন নূতনের সংঘর্ষ। জীবনকে গ্রহণ করিবার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের ফলে এই সংঘর্ষ। এই পার্থক্যের কারণ রাষ্ট্র পুত্রদের উপর যেভাবে তাহার প্রভাব প্রয়োগ করিতেছে তদীয় পিতাদের বেলায় তেমনটা হয় নাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অথবা তদনুরূপ কোন আইন প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্য্য কিন্তু ইহা রাষ্ট্র কর্তৃক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে নাক গলানো ছাড়া আর কিছু নহে। সন্তানের জন্মে পিতার ক্ষমতাবৃদ্ধির যে ক্ষীণ সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান তাহা এই ভাবে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যাইবে। অধিক সংখ্যক সন্তানলাভের ভয়ে এখনই আমরা বহু বিবাহের কথা কেবল চিন্তা করি না তাহা নহে বরং এক বিবাহেও যাহাতে বেশী সংখ্যক সন্তান না জন্মে তাহার জন্য বিশেষ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উৎকণ্ঠিত।

সেই জন্য বহু বিবাহের এই কারণটি হয় মৃত নয়ত মুমূর্ষ।

শ্রমিক হিসাবে স্ত্রীর মূল্য ছিল, আছে এবং থাকিবে। কিন্তু শ্রমিক বিশেষণটীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সাদা কথায় যে শ্রম করে সেই শ্রমিক। রান্নাকরা, ঘরঝাঁট দেওয়া গোছানো, শিশুপালন করা ইত্যাদি দস্তরমতো শ্রমসাপেক্ষ কিন্তু যে গৃহিনী এই সব কাজের মধ্যে দিন কাটান তিনি কিন্তু শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃত হন না। শ্রমিক হিসাবে তাহার মূল্য হয় আমরা অস্বীকার করি, নয়ত তাহার স্বামী প্রকারান্তরে স্বীকার করে। ফ্রেডারিক এন্‌জেলসের ভাষায় শ্রমিক বলতে যাহারা "সামাজিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে" (Social Productive Labour) সরাসরি কাজ করে তাহাদিগকে বোঝায়। যে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ আসে তাহাতে নিয়োজিত ব্যক্তিকে শ্রমিক বলা হয়। কর্ম সমাপনান্তে দু'দশ টাকা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিলে সে শ্রমিকের মর্য্যাদা পায়।

কিন্তু বহু বিবাহের কারণ হিসাবে স্ত্রীর যে শ্রমের কথা বলা হইয়াছে তাহা অন্য ধরনের। সেখানে স্ত্রীর শ্রম স্বামীর সংসারের (হয়ত বলিবেন তাহারও) এবং কেবল-মাত্র তাহারই সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, অন্য সম্ভাবনা নাই। কৃষি নির্ভর পরিবারে এই অবস্থা এখনও অনেক-খানি বজায় আছে। জনৈক দরিদ্র সাহাবীর পেট চলে না শুনিয়া রসুলুল্লাহ তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। পেট চলা আরও কঠিন হইয়া উঠিল ; লোকে অবাক হইল। কষ্ট বাড়িয়াছে জানিয়া তিনি তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন। একজনের অচল সংসারে তিনজনের চলাচলতি অভাবনীয়। দুর্দশা বাড়িয়া গেল ; লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইল, কষ্ট আরও বাড়িয়াছে শুনিয়া তিনি তাহার তৃতীয়বার বিবাহ দিলেন। লোকে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কিন্তু এই তৃতীয় স্ত্রীটী বসিয়া বসিয়া হাহুতাশ করা অপেক্ষা গম পিষিয়া ময়দা তৈরীর কাজে লাগিয়া গেল। পরে অবস্থা দাঁড়াইল এই যে ইহারা তিন সতীনে মিলিয়া ময়দা তৈয়ার করে এবং স্বামীটী বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করে। এইভাবে সাংসারিক অনটনের লাঘব ঘটিল। লোকে বাহবা দিল।

রসুলুল্লাহর এই কার্য্যের মধ্যে দুইটী প্রস্তাবনা আছে। তিনি বুঝাইতে চাহেন যে জীবিকা নির্বাহের কোন না কোন উপায় প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই করিতে পারে ; পারে না কেবল তখন যখন সে অলস, গা ঝাড়া দিয়া শরীরকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার মানসিক ক্ষমতা যখন তাহার লোপ পায়। এবং আঘাত করিয়া রস বাহির করিবার ব্যাপারে যখন সে ঔৎসুক্যবিহীন। এমতাবস্থায় যদি তাহাকে ক্রমাগতভাবে একান্ত বেপরোয়া অবস্থার মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছিলে তাহার অলসতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। শরীর মনকে চাঙ্গা করিয়া সে বাহির হইবে এবং বাঁচিয়া থাকিবার ন্যূনতম দাবী সে আদায় করিতে শিখিবে। সেই জন্য একার অচল সংসারে যখন আরও তিনজন স্ত্রীলোকের সমাগমে অবস্থা চরমে পৌঁছিল তখন বাঁচিয়া থাকিবার প্রচণ্ড তাগিদে তাহারা সংসার চালাইবার একটা উপায় খুঁজিয়া পাইল। (অবশ্য এমন অবস্থায় ইহাও ঘটিতে পারিত যে মানুষটী সম্পূর্ণ-রূপে হাল ছাড়িয়া দিবে। তখন আর উপায় থাকে না। সেই জন্য এমন কার্য্যক্রম অবশ্যই খুব ঝুঁকির ব্যাপার। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে পয়গম্বরের ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপ কার্য্যকরী বলিয়া সে সম্ভাবনা কম ছিল। অন্ততঃ তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সাফল্য সম্পর্কে ধারনা করা কঠিন ছিল না।)

ইহার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা এই যে যাহার কোনরূপ সংস্থান নাই, তাহার পক্ষে অল্প পুঁজিতে কাঁচামাল কিনিয়া, তাহার উপর কিছুটা পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে পারিলে লাভের যে সম্ভাবনা সৃষ্ট হয় তাহা কার্যকরী করিতে হইলে অন্তত পক্ষে তিন চার জন শ্রমিকের প্রয়োজন। যে কোন চারিজন শ্রমিক হইলেই অবশ্য চলে কিন্তু এক্ষেত্রে সমগ্র পরিকল্পনাটী একটী সংসার-কেন্দ্রিক এবং সেইজন্য বিশিষ্ট ধরনের। ইহারা কেবল শ্রমিকমাত্র নহে, তাহারা একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত নিবিড়-ভাবে একাত্মিক সভ্য ও সভ্যা। অর্থাৎ এখানে কেবল পেশীর সঞ্চালনে শ্রমের সমাপ্তি নহে, অন্তরের উৎকণ্ঠা যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে কাজ ভালো হইবে। তদুপরি

তখনকার অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা দৃষ্টিকটু ঠেকিত না; কাজেই সম্ভব হইয়াছিল কেননা এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্ত্রী দুর্দশাগ্রস্ত সংসারে আসিয়া তাহাদের অদৃষ্টের পরিহাসে ব্যাকুল হইয়া যদি অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করিত তাহা হইলে প্রতিকারের উপায় থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। অথচ বর্ত্তমানের কোন স্ত্রীলোকের নিকট এমন প্রস্তাব করিলে প্রত্যাখ্যান অনিবার্য্য।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে স্ত্রীর শ্রমমূল্য সমধিক। বিশেষ করিয়া যে কৃষক ক্ষেত খামারে কাজ করে তাহার পক্ষে তাহার কার্য্যে সাহায্যে স্ত্রীর শ্রম অতি এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। অধিক সংখ্যক সন্তানের কথা বাদ দিলেও একাধিক স্ত্রী এই সব কৃষকের অনেকেরই নানা সুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে শিল্পায়িত অর্থনীতিতেও এমনটা সম্ভব; তবে প্রকার ভেদে। এখন স্ত্রীর শ্রমমূল্য স্বামীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আর নাই। এখন তাহারা কাজ করে বাহিরে, এবং আর্থিক মূল্যে তাহার প্রতিদান পায়। এই শ্রমের মর্য্যাদা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ার ফলে শ্রমিক হিসাবে নারীর একটা স্বতন্ত্র সত্তা সৃষ্ট হইয়াছে। কম্যুনিষ্টগণ এই শ্রমকে মানুষের সর্বোচ্চ পবিত্র জিনিস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ("মানুষ পবিত্র—পবিত্র তার শ্রম"—গোর্কি)

এখন ধরুন কোন স্ত্রী অর্থোপার্জন করে এবং তাহাতে সংসারের টানাটানি কিছুটা কমে। (বর্ত্তমানে এমন অনেক ঘটিতেছে)। এমন অবস্থায় যদি কোন স্বামী যদি হিসাব করিতে বসে, তাহার কয়জন স্ত্রী থাকিলে কত আয় হইবে এবং সেই প্ল্যানে কাজ করিতে চাহে তবে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াইবে? বস্তুতঃ এই ধরনের উপর্জনক্ষম স্ত্রীগণই বহু বিবাহের ঘোর ও প্রথম শত্রু।

কাজেই শ্রমিক হিসাবে স্ত্রীর মূল্য পূর্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে, ভবিষ্যতে বাড়িবে বই কমিবে না। তবে তাহার মর্য্যাদা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্বে তাহার শ্রম ছিল স্বামীনিয়ন্ত্রিত, এখন তাহার শ্রম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। পূর্বে যে শ্রম তাহার স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণে প্রবুদ্ধ করিত; এখন সেই শ্রম তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন (পরিবর্ত্তিত সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে) ঘটাইয়া বহু বিবাহকে অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে। পূর্বে স্ত্রীর শ্রমলব্ধ অর্থ সরাসরি স্বামীর অধিকারে আসিত অথবা স্ত্রী তাহার হাতে তুলিয়া দিত; এখন স্ত্রী নিজেই তার উপার্জিত ধনের সর্বময় কর্ত্রী। অতএব যে কারণে বহু বিবাহ পূর্বে সাংসারিক স্বচ্ছলতায় সাহায্য করিত এখনও সেই একই কারণে (একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া) অনেক অনটনের সংসারে স্বচ্ছলতা আনিতে পারিত; কিন্তু এখন তাহাকে আমরা বর্বরতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি।

ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের অতি সাধারণ। ইহা পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। কিন্তু সমাজে পুরুষের বিশিষ্ট অবস্থানের ফলে এই প্রবৃত্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ ও সন্তুষ্ট করিবার অধিকতর সুযোগ সে পায়। ক্ষমতা প্রয়োগ লিপ্সা চরিতার্থ করিবার সুযোগ নারীরও আছে তবে তাহা কেবল সংসার ও পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যদিও পুরুষের সহিত প্রতিযোগীতায় এখানেও সে পরাজিত। পুরুষ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে পৃথিবীর সর্বত্র। রাষ্ট্র ক্ষমতায়, অর্থোপার্জনে, প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাকে দাসে পরিণত করিয়া, পাহাড় ভাঙ্গিয়া, সমুদ্র সিঞ্চন করিয়া, ধ্বংস করিবার প্রচণ্ড শক্তি করায়ত্ত করিয়া, ইত্যাদি প্রত্যেকটী কর্মক্ষেত্রে পুরুষ এই কামনা কোন না কোন-রূপে চরিতার্থ করিতেছে। এতসব বৈচিত্রের কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ একটী ক্ষেত্রে প্রত্যেকটী পুরুষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার নিরংকুশভাবে লাভ করে। সেটা তাহার পরিবারে। পুরুষ তাহার পরিবারকে একটা রাজত্ব কল্পনা করে এবং সে তাহার রাজা। এই রাজ্যের প্রত্যেকটী প্রজা তাহারই অঙ্গুলি হেলনে ওঠে বসে ইহাতে পুলকিত হইবার কারণ আছে বৈকি? সেইজন্য একাধিক বিবাহ করিলে প্রজাসংখ্যা বাড়ে এবং এই বর্দ্ধিত প্রজা-সংখ্যার উপর কর্ত্তৃত্বও সেইজন্য সম্প্রসারিত হয়।

পুরুষের এই প্রভুত্বকামী মনোবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু ইহা বহু বিবাহের কারণ হিসাবে আর কার্য্যকরী নহে। ইহার প্রথম কারণ বর্ত্তমানের শিল্পায়িত অর্থ-নীতির প্রতিযোগীতা মূলক পৃথিবীতে পুরুষের ক্ষমতালিপ্সা তাহার পরিবার হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নানাস্থানে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। পুরুষকে নিয়োজিত রাখিবার এত সব বহিঃ-কেন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছে যাহা পূর্ব অভাবনীয় ছিল। দ্বিতীয় কারণ পরিবার বৃদ্ধি পূর্বে যতটা সহজ ছিল এখন অতটা নাই। পূর্বে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল সহজ, গতানুগতিক ধারার পুনরাবৃত্তি মাত্র। সম্পর্কটা রাজা-প্রজা বা প্রভু-ভৃত্য যে পর্য্যায়ের হউক না কেন যেমন চলিবার তেমনি চলিত। সকলেই জানিত তাহার পরিবারকে কেমন করিয়া চালাইতে সে সমর্থ। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কে নানা বহিঃশক্তির প্রভাবের ফলে এবং অর্থনৈতিক জটিলতায় পরিবার বৃদ্ধি একটা ঝুঁকি, অনেক সময় বিপদ-সৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া আসে। সেইজন্য সাবধানতা অবলম্বন না করিয়া উপায় থাকে না। এই সাবধানতার আশু ফল হইতেছে বিবাহ সংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি; পরবর্ত্তী ফল সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

তৃতীয় কারণ, কেবল নারী নহে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষও বহু বিবাহকে অমানবীয় বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে।

ইহা করিতে উদ্যোগী হইলে বাহির হইতে নানা প্রত্যক্ষ বাধা আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। এই বাধার প্রকৃতি ও উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে নারীর যৌবনের উন্মেষ ও নিঃশেষ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে এই অঞ্চলে পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতে চাহে বলিয়া জন লাবক যেমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। কেন না এই সমস্যা শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও বিদ্যমান। আমাদিগকে এক্ষেত্রে পুরুষের ও নারীর গড়পড়তা আয়ুষ্কাল পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। একজন ক্রান্তীয় স্ত্রীলোকের যৌবনোন্মেষ ঘটে গড়পড়তা এগার কি বারো বছর বয়সে এবং শেষ হয় চল্লিশ বছর বয়সে। তাহার স্বামী ধরুন বাঁচিবে ষাট্ বছর বয়স পর্য্যন্ত। যদি ইহাদের সমান সমান বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে (যাহা সাধারণতঃ হয় না) তবে শেষের কুড়ি বৎসর স্বামীর যৌনজীবন একটা সমস্যার সৃষ্টি করে। এবং ইহাকে বহু বিবাহের কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে। এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়াই অধিকাংশ বিবাহে বরের বয়স কনের বয়স অপেক্ষা অল্পবিস্তর বেশীই থাকে। এই ব্যবস্থা অসুবিধার সময়কাল কমাইয়া আনে। অন্ততঃ সেই প্রচেষ্টা ইহার ভিত্তি। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশের একজন স্ত্রীলোক সতেরো কি আঠোরো বৎসর বয়সে যৌবন আরম্ভ করিয়া পঁয়তাল্লিশ (কম বেশী) বৎসর বয়সে শেষ করে। তাহার স্বামী সত্তর, আশি অথবা আরও বেশী বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিবাহের সময় ইহাদের বয়স যদি সমান থাকিয়া থাকে তবে শেষের কুড়ি ত্রিশ বৎসরের যৌনসমস্যা এক্ষেত্রে সমানভাবে বিদ্যমান। এই সব স্থানেও বিবাহের সময় অধিকাংশক্ষেত্রে স্বামীর বয়স বেশী থাকে। এবং এমতাবস্থায় দাম্পত্যজীবন অ-সুখের হয়, এমন মনে করিবার কারণ নাই। চার্লি-চ্যাপলিনের বর্ত্তমান স্ত্রীর বয়স অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন অ-সুখের নহে। জীবনকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতার উপর সব কিছু নির্ভর করে।

সহজ কথা হইতেছে কোন অঞ্চলের জলবায়ু কেবল সেখানকার স্ত্রীলোকদিগকে প্রভাবান্বিত করে না, পুরুষকেও সমানভাবে করে। রাজনীতি সুলভ মনোবৃত্তি যে জলবায়ুর নাই, একথা বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। অথচ জন লাবক ঠিক এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

অতএব ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্য নহে কারণ সেই একই সমস্যা ঠিক সেই ভাবে (কেবল সংখ্যাতত্ত্বের পার্থক্যে সকল অঞ্চলে বর্ত্তমান। সেই জন্য ইহা যদি ক্রান্তীয় অঞ্চলে বহু বিবাহের কারণ হয় তবে সেই একই কারণে শীতপ্রধান দেশেও বহু বিবাহ সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় না। শীতপ্রধান দেশে এই কারণ থাকা সত্ত্বেও বহুস্ত্রী গ্রহণ বহুপূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে কেন ? (পূর্বে ঘটিত) আবার কেনই বা কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই প্রথা চালু ছিল সেখানে ইহা বিলুপ্ত হইতেছে ?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

নজরুল-গীতি

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা
আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা
বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙারি' শীতল শান্তি-ধারা
উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙ্গি' দিল
সবারে বক্ষ পাতি'।
আমরা সেই সে জাতি॥

কেবল মুসলমানের লাগিয়া
আসেনিক ইসলাম,
সত্য যে চায় আল্লায় মানে
মুসলিম তারি নাম।
আমীর-ফকিরে ভেদ নাই সব
ভাই সব এক সাথী—
আমরা সেই সে জাতি॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নরসম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার।
আঁধার রাতির বোরকা উতারি'
এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম। স্বরলিপি—মফিজুল ইসলাম।

II IIজ্ঞা -া জ্ঞা | সা সা পা I পা -া পা | -া পা -া I
ধ র্ মে র্ প থে শ হী দ্ যা হা রা

দা পা মা | জ্ঞা সা সা I জ্ঞা পা -া | -া -া -া I
আ ম রা সেই ॰ সে জা তি ॰ ॰ ॰ ॰

র্সা র্সা ণা | দা পা মা I ণা ণা দা | পা মা জ্ঞা I
সা ম্ ম্য মৈ ঐত্ রী এ নে ছি আ ম রা

দা পা মা | জ্ঞা মা পা I সা -া -া | -া -া -া I
বি শ্ শে ক রে ছি জ্ঞা তি ॰ ॰ ॰ ॰

সা জ্ঞা রা | মা জ্ঞা মা I পা -া -া | -া -া -া II
আ ম রা সে ই সে জা তি ॰ ॰ ॰ ॰

পা ধা না | ণা ণা ধা I পা ধা ণা | ণা ণা ধা I
পা প বি দ গ্ ধ তৃ ষি ত ধ রা র্

র্সা ণা দা | দা দা দা I -া -া -া | -া -া -া I
লা গি য়া আ নি ল যা ॰ ॰ রা ॰ ॰

দা -া -া | -া -া -া I ণা পা পা | -া পা পা I
ম রু র্ ত প্ ত ব ক্ ষো নি ঙা রি

সা রা জ্ঞা | মা পা দা I পা -া -া | -া -া -া I
শী ত ল শা ন্ তি ধা ॰ ॰ রা ॰ ॰

পা পা -া | পা -া -া I পা -া -া | -া -া -া I
উ চ্ চো নী চে র্ ভে দ্ ভা ঙি' দি ল

সা রা জ্ঞা | মা পা ধা I দা -া -া | -া -া -া I
স বা রে ব কৃ খো পা তি • • • •

দা পা মা | জ্ঞা -া সা I জ্ঞা পা -া | -া -া -া II II
আ ম রা সেই • সে জা তি • • • •

র্রা র্রা রা | র্সা র্সা র্সা I পা ণা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
কে ব ল্ মু স ল মা নে র্ লা গি য়া

দা দা দা | দা ণা র্সা I পা -া -া | -া -া -া I
আ সে নি কো ই স্ লা • • য্ • •

দা -া দা | -া দা পা I ণা ণা পা | পা মা মা I
স ত তো যে চা য়্ আ ল্ লা য়্ মা নে

সা রা জ্ঞা | মা পা দা I পা -া -া | -া -া -া I
মু স্ লি ম্ ভা রি না • • য্ • •

{ণা ণা ণা | ধা ণা ণা I পা দা ণা | দা (পা -া) | -া পা -া} I
{আ মী র্ ফ কি রে ভে দ্ না ই • • • স ব}

সা রা জ্ঞা | মা পা দা I দা দা -া | -া -া -া I
ভা ই স ব এ ক্ সা থী • • • •

দা পা মা | জ্ঞা সা সা I জ্ঞা পা -া | -া -া -া II II
আ ম রা সেই • সে জা তি • • • •

II র্রা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্সা I পা ণা র্সা | র্সা -া র্সা I
না রী তে প্র থ ম দি য়া ছি মু কৃ তি

দা দা দা | দা ণা র্সা I পা -া -া | -া -া -া I
ন র স অ ধি কা • • • • র্ •

পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা র্সা I
মা নু সে র্ গ ড়া প্রা চী • র্ ভা ঙি য়া

পা দা ণা | র্সা সর্জ্ঞা র্ঋা I র্সা -া -া | -া -া -া I
ক রি য়া ছি এ • কা কা • • র্ • •

র্সা র্ঋা র্সা | ণা র্সা ণা I দা ণা দা | পা দা পা I
আঁ ধা র রা তি র বো র কা উ তা রি

সা রা জ্ঞা | মা পা ধা I দা দা -া | -া -া -া I
এ নে ছি আ শা র ভা তি • • • •

দা পা মা | জ্ঞা -া সা I জ্ঞা পা -া | -া -া -া I
আ ম রা সেই • সে জা তি • • • •

খেলাধূলা

—খেলোয়াড়

জাকির হোসেন [illegible] ঢাকা পুলিশ দলের ক্যাপ্টেনকে শীল্ড দিতে এবং [illegible] জাকির হোসেনকে [illegible] সারদা ট্রেনিং স্কুলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করিতে দেখা যাইতেছে।

ঢাকা পুলিশের জাকির হোসেন শীল্ড লাভ

সম্প্রতি ঢাকা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাকির হোসেন শীল্ড ফাইনাল খেলায় ঢাকা পুলিশ দল সারদা ট্রেনিং স্কুল দলকে ৭—১ গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছে। খেলার শেষে মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটার মেজর জেনারেল ওমরাও খান পুরস্কার বিতরণ করেন। গবর্ণর জনাব জাকির হোসেনও খেলা দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রজেনের পঞ্চম স্থান লাভ

বীর সাঁতারু জনাব ব্রজেন দাস এ বৎসর ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে, গত বৎসর তিনি এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাকিস্তানের মুখোজ্জ্বল করেন। এ বৎসর এই প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনার ২৮ বৎসর বয়স্ক সাঁতারু আলফ্রেডো ক্যাবেরো ১১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ২৬ সেকেণ্ডে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। হল্যাণ্ডের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু ২৬ বৎসর বয়স্ক হর্ম্যান উইসমেন ১২ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডে চ্যানেল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পর্তুগালের ৩৮ বৎসর বয়স্ক সাঁতারু জোয়াকুই পেরেরা তৃতীয় স্থান এবং ডেনমার্কের হজ জোন্সেন চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

পাকিস্তানের দুরপাল্লার সাঁতারু ব্রজেন দাস ১৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছেন। গত বৎসর এই চ্যানেল অতিক্রম করিতে তাঁহার ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। এশিয়ার মধ্যে ব্রজেন দাসই সর্বপ্রথমে এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেন। গত বৎসর তিনি আমেরিকার মিসেস গ্রেটা এণ্ডার্সনের নিকট পরাজিত হইয়া মূল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মিসেস গ্রেটা এণ্ডার্সন গত দুই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এবার তিনি এই প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এ বৎসর মোট ২৩টী দেশের ৩৬ জন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন কিন্তু পরে মাত্র ২৫ জন সাঁতারে অংশ গ্রহণ করেন। ব্রজেন দাস স্থান দখলের দিক দিয়া গত

বৎসরের তুলনায় কিছুটা পশ্চাদবর্ত্তী হইলেও সময়ের দিক দিয়া প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন। তিনি গত বৎসর ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে যে দুরত্ব অতিক্রম করিয়া মূল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন, এ বৎসর ১৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে সেই দুরত্ব অতিক্রম করিয়া পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান ক্রিকেট

আসন্ন পাকিস্তান বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেষ্ট সিরিজে ফাষ্ট বোলার জনাব ফজল মাহমুদ অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছেন

ফজল মাহমুদ

এবং উইকেট রক্ষক জনাব এমতেয়াজ আহমদ সহকারী অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছেন। জনাব ফিদা হোসেনকে চেয়ারম্যান করিয়া তিন ব্যক্তিবিশিষ্ট একটি নির্ব্বাচন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত কার্য্যনিবাহক কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন। কমিটির অপর দুইজন সদস্য হইতেছেন ডাঃ দেলওয়ার হোসেন ও স্কোয়াড্রন লিডার এম, ই, জেড, গাজালী। ২৫ জন সম্ভাব্য খেলোয়াড় লইয়া ১৫ই অক্টোবর হইতে ২ সপ্তাহ ব্যাপী অনুশীলনী শিবির খুলিবারও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ফজল মাহমুদের উপর উক্ত শিবির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। আগামী ৩০শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তান দলের সমস্ত খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হইবে এবং ১৩ই নবেম্বর তারিখে ঢাকায় যে প্রথম টেষ্টম্যাচ আরম্ভ হইবে তাহার দশ দিন পূর্ব্ব হইতে ঢাকার ষ্টেডিয়ামে প্রাকটিসের জন্য পাকিস্তান দল করাচী হইতে ঢাকা রওয়ানা হইবে। ট্রেনিং গ্রহণকারীদের নাম পরে জানান হইবে বলিয়া ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী প্রকাশ করেন। জনাব ফিদা হোসেন, জনাব কফিলুদ্দিন আহমদ, ডাঃ দেলওয়ার হোসেন, জনাব এম, আই, মার্চেণ্ট এবং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ হোসেন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাক-ভারত ফুটবল টেষ্ট

জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে প্রতি বৎসর ফুটবল টেষ্ট সিরিজ অনুষ্ঠানের চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করিয়া উইং কমাণ্ডার এ, এইচ, সুফি এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এই প্রস্তাব সম্পর্কে সেখানে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ পঙ্কজ গুপ্তের সহিত প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন। দুই দেশের ফুটবল ফেডারেশনের অনুমোদনসাপেক্ষে পাকিস্তানেই প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পাঁচটি ম্যাচের টেষ্ট সিরিজের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটি এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানে দুইটি টেষ্ট খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, পঙ্কজ গুপ্ত এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে আগামী নবেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসেই প্রথম পাকিস্তান-ভারত ফুটবল টেষ্ট সিরিজের খেলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

পরলোকে কলি স্মিথ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়েষ্টইণ্ডিজের আন্তর্জাতিক

কলি স্মীথ

খ্যাতিসম্পন্ন ২৫ বৎসর বয়স্ক টেষ্ট খেলোয়াড় কলি স্মিথ লণ্ডনের এক হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক মোটর দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হইয়া তিনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হন।

কলি স্মীথের অকাল মৃত্যুতে পাকিস্তানের শোক

পাকিস্তান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলোয়াড় কলি স্মীথের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়া কলি স্মিথ হাসপাতালে নীত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তুরস্ক ফুটবল টীমের ঢাকা আগমন

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, তুরস্ক জাতীয় ফুটবল টীম আগামী জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান সফরে আসিবে। তাহারা পাকিস্তান সফর কালে জাতীয় টীমের সঙ্গে টেষ্ট ম্যাচ ও অন্যান্য আঞ্চলিক খেলায়ও যোগদান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। তুরস্ক জাতীয় ফুটবল টীম ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল টীমের সঙ্গে একটী টেষ্ট এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান দলের সহিত একটী আঞ্চলিক ম্যাচ খেলিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আগামী ১০ই জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে ঢাকায় এই দুইটী খেলা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বিশ্বসামরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে পাকিস্তান দল

আগামী অক্টোবর মাসে ইতালীতে আন্তর্জ্জাতিক সামরিক এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশীপে পাকিস্তানী এ্যাথলেটদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে পাকিস্তান সার্ভিসেস স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডকে ১৫ হাজার টাকা সাহায্য মনজুর করা হইয়াছে। সম্প্রতি করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রচার ও বেতার সচিব জনাব হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহ কমিটির এক সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সন হইতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাছাই এ্যাথলেটগণ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক সামরিক এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশীপে যোগদান করিতেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে রেকর্ড করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

'স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের' কার্য্যনির্ব্বাহ কমিটী আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর কলম্বোয় প্রথম আন্তর্জ্জাতিক ত্রিদলীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য পাকিস্তান বাস্কেট বল ফেডারেশনকে ইরাণে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশীপে একটী কুস্তিগীর দল প্রেরণে সহায়তা করার জন্য স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহ কমিটী পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

সভায় গলফ্ খেলার মান উন্নয়নের জন্য রাওয়ালপিণ্ডি গলফ্ ক্লাবকে ১৫ হাজার টাকা সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

সম্পাদকীয়
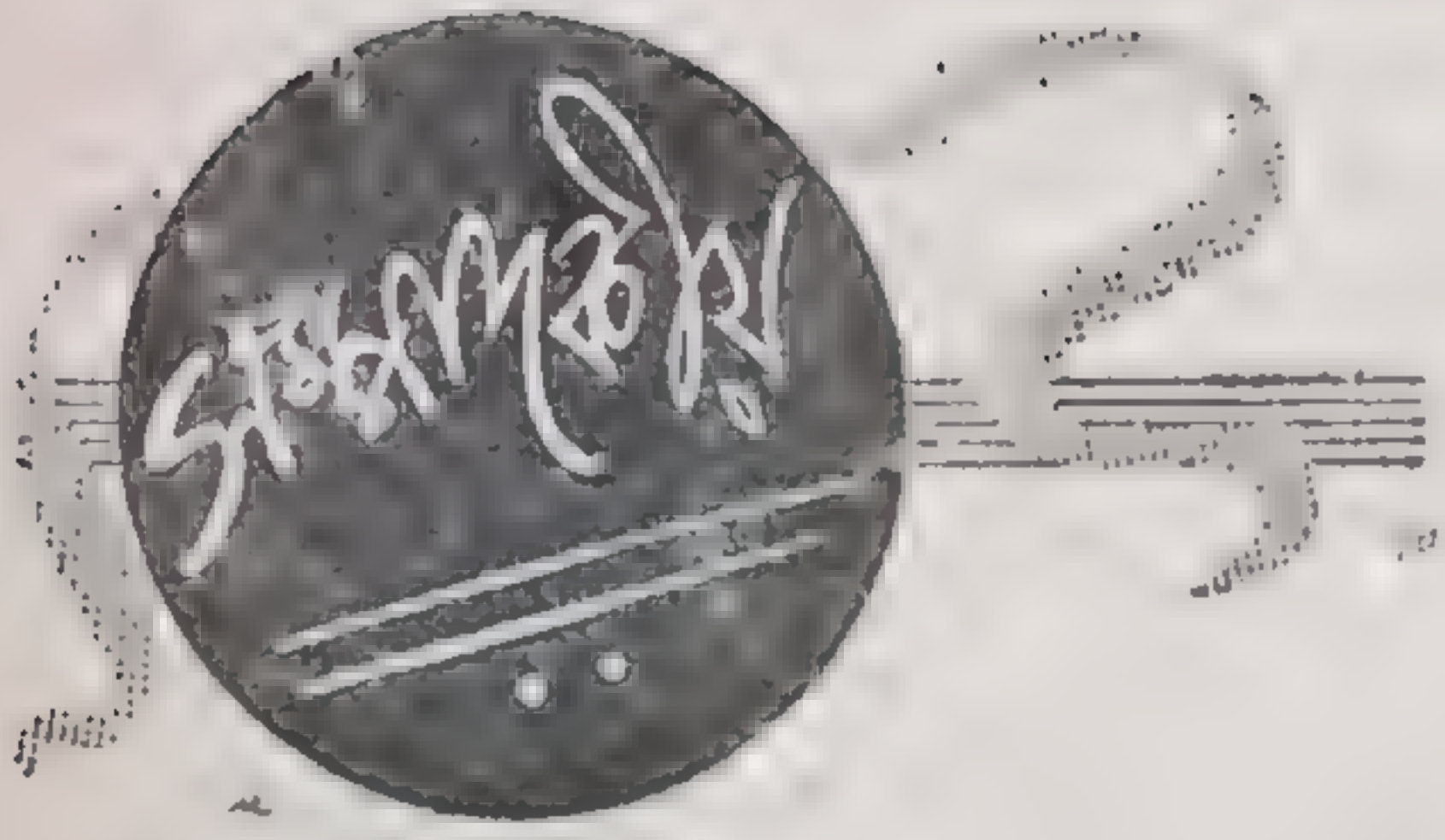
মরহুম রজীবুদ্দীন তরফদার

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকায় জনাব রজিবুদ্দীন তরফদার এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে...... রাজেউন)। তিনি সাবেক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। মরহুম রজীবুদ্দীন তরফদার অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করিয়া বহু নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজা আন্দোলনের ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান নেতা ও নিরলস কর্ম্মী। সারা জীবন তিনি প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করার সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মৃত্যুতে পূর্ব্বপাকিস্তান একজন আদর্শবাদী ও শক্তিশালী জননেতা এবং মানুষকে হারাইল। তাঁর অভাব সহজে পূরণ হইবে না। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

অক্সফোর্ড অভিধান

অক্সফোর্ড অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে পাকিস্তান সরকার বাজেয়াফত করিয়াছেন। এর কারণ, উক্ত অভিধানে পাকিস্তানের অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ইহাকে ভারতের অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়া যথারীতি সংশোধন দাবী করা হয়। কিন্তু উক্ত অভিধানের কর্ত্তৃপক্ষ তা গ্রাহ্য করেন নাই। সুতরাং পাকিস্তানের পক্ষ হইতে এরূপ নির্দ্দেশ জারী করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। দেশবাসীর পক্ষ হইতেও ইহা দাবী করা হইয়াছিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে সুচিন্তিত বলিয়া মানিয়া লইতেই হইবে।

শাহ আবদুল লতীফ

শাহ আবদুল লতীফ ভিট্টির স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে একটি তামদ্দুনিক উৎসবের উদ্বোধন করিতে যাইয়া পাকিস্তানের সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে যদি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুভ বুদ্ধির জাগরণ না হয়, তবে পৃথিবী একদিন আনবিক ও হাইড্রোজেন বোমার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। মানুষের সমাজ, সভ্যতা এমন কি গোটা পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে। সুফী কবি শাহ আবদুল লতীফের রচনায় মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এছলামী মূল্যবোধের সাথে তাদের মিল ও অভিন্নতাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মানুষের নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য চাই আল্লার প্রতি ভয়, সমবেদনা, সরলতা এবং খেদমতের আদর্শ। সুফী কবি লতীফের রচনায় তাদের সাথে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হই। পাকিস্তানকে এই জাতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অনুযায়ী হইতে হইবে। সুতরাং শাহ লতীফের বাণী সর্ব্বত্র প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

শাহ আবদুল লতীফের বাণী প্রচার

সদর শাহ লতীফের বাণী প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানের সকল ভাষায় তার কবিতার অনুবাদ হওয়া দরকার। তিনি জানান যে উর্দু জবানে তাঁর কবিতার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি অন্যান্য পাকিস্তানী জবানে বিশেষ করিয়া বাংলা জবানে শাহ লতীফের কবিতার অনুবাদ করার জন্য সুধী এবং সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে, এজন্য তিনি নিজে ও পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগ সকলকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

শাহ লতীফ ও পূর্ব্ব পাকিস্তান

পূর্ব্ব পাকিস্তানের শাহ আবদুল লতীফের কবিতা ও তাঁর জীবন-কথা প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা কেউ

অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষায় তাঁর কবিতার যদি অনুবাদ হয়, তবে একটা কাজের মত কাজ হইবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পূর্ব্ব পাকিস্তানে শাহ আবদুল লতীফের কবিতার মোটেই প্রচার হয় নাই। শুধু শাহ লতীফ কেন, মহাকবি ইকবালের কবিতা ছাড়া উর্দু, হিন্দী, পশ্‌তু ভাষার মূল্যবান সম্পদকে পাক-বাংলা জবানে প্রচারের জন্য তেমন কোনো নিয়মিত এবং সার্থক চেষ্টা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্যের সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ইহার প্রয়োজন যেমন অনস্বীকার্য্য, তেমনই দুই পাকিস্তানের জানাজানির জন্যও ইহার তাগিদ অনুভূত হইতেছে। শাহ লতীফের স্মৃতি বার্ষিকী পূর্ব্ব পাকিস্তানেও পালিত হওয়া উচিত ছিল। আগামী বৎসর এখানকার সাহিত্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা ইহার আয়োজন হইতে দেখিলে আমরা খুশী হইব।

একটি প্রস্তাব

এ ব্যাপারে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় সাহিত্যিক, সুফী, পীর, মনীষীদের জীবন-কথা ও বানী যেমন পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রচার করার প্রয়োজন আছে, তেমনই পশ্চিম পাকিস্তানেও এই শ্রেনীর বুজর্গ ব্যক্তিদের কথা প্রচারের আবশ্যকতা রহিয়াছে। পীর শাহ জালালের জন্ম বার্ষিকী পশ্চিম পাকিস্তানেও উদ্‌যাপিত হইতে পারে। এর ফলে দুই অঞ্চলের মন ও আধ্যাত্মিক সম্পদের জানাজানি গভীরতর হইবে। ইহা আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ়তর করিবে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাতে মিলিতভাবে এ ধরণের জাতিগঠনমূলক কাজে আজ সহায়তা করার দরকার।

আজাদী দিবসে সাহিত্যানুষ্ঠান

আজাদী উৎসব উপলক্ষে পাকিস্তানের সর্ব্বত্র নানারূপ তামদ্দুনিক ও সাহিত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই তা হয়। এবারও তা হইয়াছিল। ১৪ই আগষ্ট হইতে শুরু করিয়া তিন দিন যাবৎ ঢাকাতেও এরূপ সাহিত্য ও তামদ্দুনিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এ-সময় এ-ধরণের অনুষ্ঠান হওয়ার যে যৌক্তিকতা রহিয়াছে, তা অস্বীকার করা যায় না। যেসব প্রতিষ্ঠান এই সব উৎসব অনুষ্ঠান এবং সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁদিগকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

"ক্ষুধিত পাষাণ"

তবে আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করিয়াছি যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এই দিনের জাতীয় মর্য্যাদা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয় এবং আজাদী দিবস উপলক্ষ্যে এমন সব কাণ্ড করে যা বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক। একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকায় এই উপলক্ষ্যে "ক্ষুধিত পাষাণে"র অভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" মোগলদের গ্লানিপূর্ণ ব্যাপারের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। মোগল নারীদের কামনা-বাসনা এবং তাদের তপ্তশ্বাস-বিজড়িত এর আখ্যানভাগ। মোগলদের কাল্পনিক কলঙ্ক-কাহিনীই এর আখ্যানভাগ রহিয়াছে। সুতরাং আজাদী দিবসের অনুষ্ঠানে "ক্ষুধিত পাষাণে"র অভিনয় অত্যন্ত আপত্তিজনক। আশাকরি, এ-ধরণের উৎসব-অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি ঢাকায় আর হইবে না, এজন্য আমাদের সাহিত্যিক ও তমদ্দুন-সেবীদের সচেতন ও সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad Press Ramna, Dacca, E. Pakistan)

মাসিক মোহাম্মদী
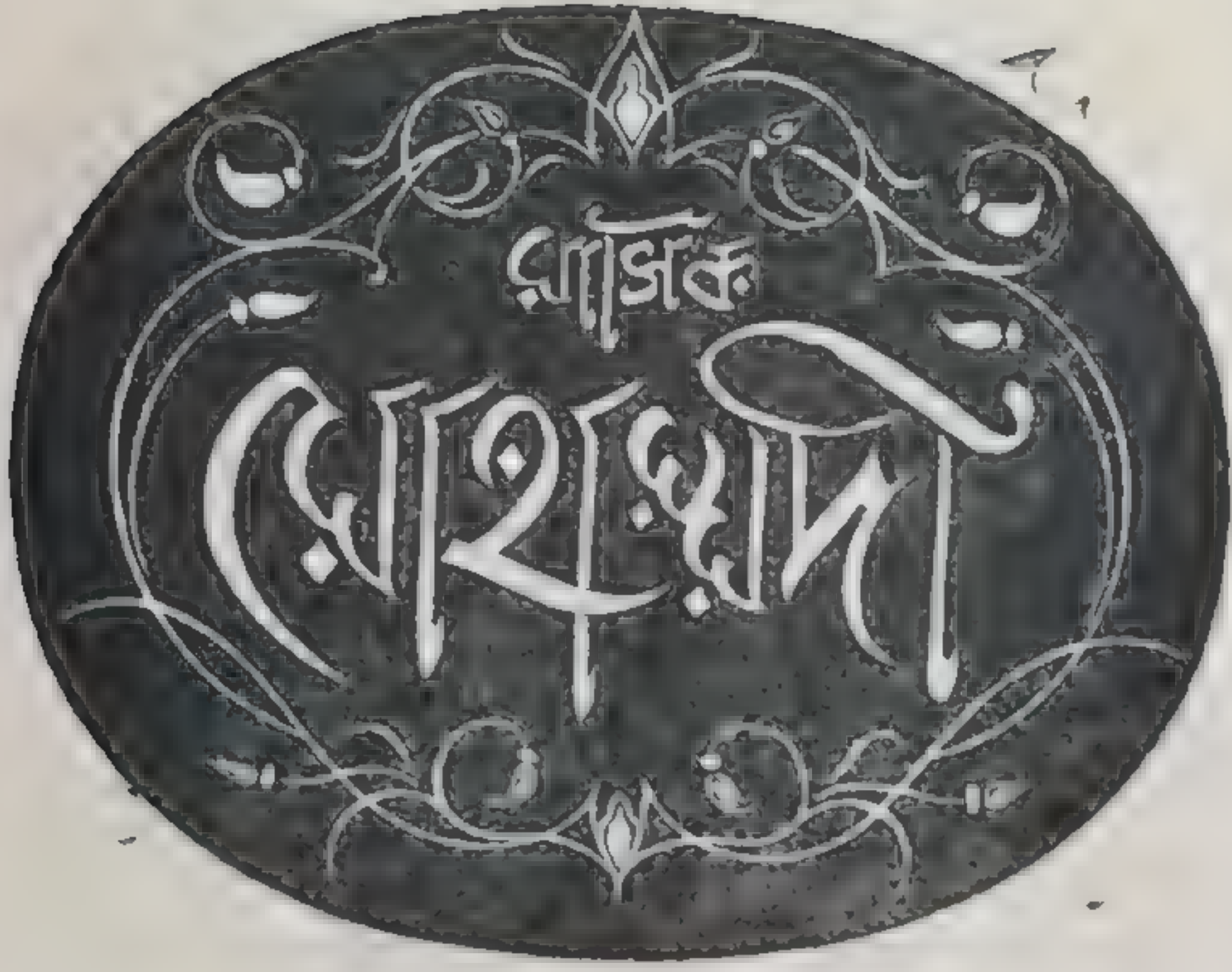
আশ্বিন, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

বাকেরগঞ্জের কথা

মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী

দুঃসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থার দরুণই বাহিরের লোকেরা নিম্নভাটির এ-বিরাট অঞ্চলের সহিত সবিশেষ পরিচিত নন। তাহারা মনে করেন যে সমগ্র জিলাটা নদী-নালা, সমুদ্র ও অরণ্য-বেষ্টিত এক অনগ্রসর ভূ-খণ্ড বই আর কিছুই নয়। আসলে তাহাদের এ-জাতীয় ধারণা অজ্ঞতা ও ভুলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ-অঞ্চলের এক বিরাট ও গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে—আছে হিন্দু-মুসলিম অতীত কীর্তির সহস্র নিদর্শন

সুদূর অতীতে এ-সমগ্র অঞ্চলই দক্ষিণের সমুদ্র এবং জিলার পশ্চিম-মধ্য ভাগে প্রবাহিত সুন্ধা বা সুগন্ধা নামক বৃহৎ নদীর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বহিত পলিমাটির দ্বারা ক্রমান্বয়ে এ-ভূ-ভাগের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

কখন কি ভাবে যে এই নিম্নাঞ্চলে মানুষের বসতি বিস্তার হয় তা সঠিক বলা যায় না। প্রাচীনতর অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা এ-অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা তাহাও আমরা বলিতে পারি না। ডাঃ জেমস ওয়াইজ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে জালো ও মালো প্রভৃতি কৈবর্ত জাতীয় লোকেরা নাকি পূর্ব-বাঙলার অন্যতম আদিম জাতি। এ-অভিমত সত্য হইলে এখানকার হালিয়া দাস, জালিয়া দাস এবং নমোশূদ্রদের পূর্ব-পুরুষ-গণকেই আমরা এই নিম্নদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। দ্রাবিড়, আর্য অথবা তৎপূর্ববর্তী কোনো সভ্যতর জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া খৃষ্ট-পূর্ব জামানাতেই হয়তো তাহারা তৎকালীন এ-অরণ্যাঞ্চলে হিজরত করিয়া থাকিবে।

কাহারা যে এখানে সর্বপ্রথম উন্নততর সভ্যতার প্রচার করেন তাহাও সঠিক নির্ণয় করা যাইতেছে না। ফা-হিয়েন ও হিউ-এন্-স্যাং প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণী হইতেও আমরা প্রদেশের এ-অঞ্চল সম্পর্কে কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না। তাহারা যে প্রাচীন সমতট বা পূর্ব-বাঙলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই বুঝাইতেছে না। প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অথবা পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য লেখকগণও এসম্পর্কে আলোকপাত করিতে পারেন নাই। ঈশায়ী নবম কি দশম শতকে চাটগাঁও অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন ঐতিহাসিক সত্য হইলেও প্রাচীন বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের কোথাও আরবেরা অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা এইমাত্র অনুমান করিতে পারি যে ঈশায়ী দশম ও একাদশ শতকে বাঙলার বৌদ্ধ শাসন যুগে জিলার উত্তরাঞ্চলে উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকিবে। পরবর্তীকালে সোনারগাঁয়ে সেন রাজাদের শাসনকালেই এই সভ্যতা দক্ষিণে সমুদ্র তীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এ-জিলার কাশীপুর, শিকারপুর ও সোনাবালিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পীঠস্থান ও মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাকালও এ-সময়ই।

ঈশায়ী ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বিন বখ্‌তিয়ার

কর্তৃক গৌড়-বঙ্গ বিজয়ের পর সেনরাজাগণ বিক্রমপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু নবাগত ইস্‌লাম ও মুস্‌লিম শক্তির দ্রুত বিস্তৃতি আশঙ্কা করিয়া এখানেও তাহারা উদ্বেগ বোধ করিতে থাকেন। তাই এই ক্ষীয়মান রাজাবংশের জনৈক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জিলার নিম্ন-দক্ষিণে এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্‌লাম ও মুসলিম সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ এড়াইয়া নিরাপদ দূরে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার সবল সংরক্ষণই ছিল রাজকুমার দনুজমর্দ্দন এবং রাজগুরু চন্দ্রশেখরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। রাজপুরোহিত চন্দ্রশেখরের নামানুসারেই এই প্রাচীন রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইয়া থাকিবে। মুগল আমলে ইহা ইস্‌মাঈলপুর বা সরকার বাকৃলা নামে অভিহিত হয়। বর্তমান বাউফল থানা এলাকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে তেতুলিয়া তীরবর্তী কচুয়া নামক স্থানে এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজধানীকে বাকৃলা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঈসায়ী ১৫৮৬ সনে ইংরাজ ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ ফিস (Ralph Fitch) রাজধানী বাকৃলা পরিদর্শন করেন। তাহার বর্ণনায় জানা যায় যে বাকৃলা রাজ্য তখন ফুল-ফসল এবং সূতী ও রেশমি বস্ত্রাদিতে ভরপুর ছিল। ঈসায়ী ১৫৮৪ সনের প্লাবনে রাজ্যের প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া আইন-ই-আকবরী নামক প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

এভাবে দক্ষিণাঞ্চলে একটি হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এখানে ক্রমান্বয়ে উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ আগমন করিতে থাকেন। রাজধানী বাকৃলাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ সমাদৃত হইতেন। তৎকালে বাকৃলার পণ্ডিতদের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। রাজধানী বাকৃলা নগরী দীর্ঘদিন পূর্বেই তেতুলিয়া নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে আজো পুরাতন ইট-পাথর এবং ভগ্ন ইমারতাদির নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। এখানকার 'কমলার-দীঘি' আজো কায়স্থ রাজকুমারী কমলার জনকল্যাণকর কীর্তি কথা ঘোষণা করিয়া বিরাজিত। এছাড়াও তৎকালীন হিন্দু সভ্যতার স্বাক্ষর আঁকা রহিয়াছে জিলার সর্বত্র। এই কায়স্থ রাজবংশীয়গণ আজো উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীকালীন রাজধানী মাধব পাশাতে অতিশয় দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন।

এ-অঞ্চলে কখন যে সর্বপ্রথম মুসলমানেরা আগমন করেন তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করিতেও আমরা অক্ষম। অনেকে অনুমান করেন যে বখ্‌তিয়ার-পূর্ব জামানাতেই জিলার উত্তরাঞ্চলে ইস্‌লাম-প্রচারক দরবেশগণ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ-অনুমানের সমর্থনে আজো কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ-অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন মসজিদ, মাজার ও সড়কাদি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে নির্মিত হইয়াছে বলিয়াই বরং প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মশ্‌হুর মুসাফীর ইব্‌নেবতুতা এবং পর্তুগীজ ভ্রমনকারী বার্বোসার সফরনামায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে মুস্‌লিম প্রাধান্যের উল্লেখ থাকিলেও উহার দ্বারা প্রাচীন বাকৃলা বা বাকেরগঞ্জ এলাকার কোনো স্থানকে অবশ্যই বুঝাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে গৌড়বঙ্গে তুর্কী সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই এ-অঞ্চলে ইস্‌লামের বিস্তৃতি ঘটে। ঈসায়ী চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে আগত দরবেশ স্যইয়েদুল-আরেফীন সাহেবই সর্ব প্রথম এই নিম্নাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইস্‌লাম প্রচার করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মধ্য এশিয়া হইতে আগত ভারত-আক্রমণকারী বীর তৈমুর লঙ্গ কর্তৃকই তিনি এ অঞ্চলে প্রেরিত হন। জিলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কালিশুরী নামক স্থানে আজো তাঁহার দরগাহ্‌ বাড়ী বিদ্যমান।

ঈসায়ী ১৪৬৫ সনে বাকৃলা রাজ্যের সর্ব-দক্ষিণে বর্তমান মসজিদ বাড়ী নামক স্থানের প্রাচীন ও বৃহদাকার মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে বলিয়া সংলগ্ন শিলালিপি পাঠে জানা যাইতেছে। আরো জানা যাইতেছে যে তৎকালীন গৌড়াধিপতি আবুল মোজাফফর বারবেক শাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া খান মোয়াজ্জেম ওয়াজিয়াল খাঁ কর্তৃক উহা নির্মিত হয়। বস্তুতঃ ঈসায়ী চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের উৎসাহ এবং অর্থানুকূল্যে বহু পীর-দরবেশ নিম্ন ভাটির বহু স্থানে ইস্‌লাম প্রচার করেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খুলনা বাগেরহাট অঞ্চলে সমাহিত পীর খাঁ জাহান আলী, ফরিদপুরের ফরিদ শাহ, সিলেটের পীর শাহ্‌ জালাল এবং সন্দ্বীপে সমাহিত পীর বখ্‌তিয়ার মৈশুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ-সময়কারই ইস্‌লাম প্রচারক ছিলেন। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বাকৃলা রাজ্য বা প্রাচীন বাকেরগঞ্জের সর্বত্রই যে এ-সময় মধ্যে ইস্‌লামের বিস্তার হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

এ-সকল পীর-দরবেশগণের সহিত তাহাদের অনুরক্ত বাহিরের বহু মুসলমানও এ-সময় এ-অঞ্চলে আগমন করিয়া থাকিবেন। তাহাদের এবং স্থানীয় নবদীক্ষিতদের বসবাস এবং জীবিকার ব্যবস্থাও এ-সকল দরবেশগণই করিয়া দিতেন। ফলে এ-সময় হইতে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নিত্য নতুন জমি চাষে আনিবার কার্যও অগ্রসর হয়। প্রকাশ, পীর খাঁ জাহান আলি নাকি ভাটি এলাকার

জঙ্গল কাটিবার জন্য এককালীন ৬০ হাজার লোক নিয়োগ করিয়াছিলেন। এদেশে ইস্‌লাম বিস্তৃতির অন্যবিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও এ-সকল পীর-দরবেশদের বিরামহীন প্রচেষ্টায়ই উহা সর্বাধিক ব্যাপকতা লাভ করে ফলে এই প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে আজ লাখ লাখ মুসলমানের বাস। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার পাশাপাশি আজ দেখিতে পাই ইস্‌লাম ও মুস্‌লিম সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারা এ-অঞ্চলে ঈসায়ী ধর্মের প্রচার শুরু হয়। ঈসায়ী প্রচারকগণ আজো এব্যাপারে তৎপর আছেন। আজ এ-জিলায় শিক্ষা প্রচার ও সমাজ সেবার ব্যাপারে তাহাদের দান আমরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এ-জিলার নিম্নভাগে কয়েক হাজার বৌদ্ধ বা মগ অধিবাসী বাস করিতেছেন। প্রাচীন কালে আরাকানী মগ দস্যুগণ এদেশে লুট-পাট করিয়া বেড়াইত। তাই অনেকে অনুমান করেন যে বর্তমান মগ অধিবাসীগণ ঐ সকল দস্যু-তস্করদেরই বংশধর। কিন্তু এরূপ ধারণার মূলে কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না। বরং ইংরাজ আমলে নিম্নভূমির জঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ করিবার জন্যই যে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহারই বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহারা নিম্নাঞ্চলের সরল ও পরিশ্রমী চাষী।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা জিলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় চলিয়া যাইব। ঈসায়ী ১৫৭৪ সনে মুগল সেনানায়ক মুরাদ খাঁ এই প্রাচীন কায়স্থ রাজ্যটি অধিকার করেন। তখন ইহা সুবে বাঙলার অন্যতম সরকার রূপে মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও দেশ শাসনের ভার স্থানীয় রাজার হাতেই ন্যস্ত থাকে। ঈসায়ী সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই সুযোগে আরাকানী মগেরা এদেশ অধিকার করে। বালক রাজা রামচন্দ্র এ-সময় তাহার শ্বশুর যশোর-পতি রাজা প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বয়োঃ-প্রাপ্ত হইয়া পরে তিনি স্বীয়রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর রাজ শক্তি আবার দুর্বল হইতে থাকে। ফলে মগ এবং সন্দ্বীপে অবস্থিত ফিরিঙ্গী দস্যুগণ দেশ মধ্যে বে-পরোয়া জুলুম আরম্ভ করিয়া দেয়। তাই সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা শূজাকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গী দমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

শাহ্‌জাদা শূজা দীর্ঘ দিন এ-অঞ্চলে অবস্থান করেন। ইতঃপূর্বে অন্য কোনো মুগল শাহজাদা সুবাদার বা উচ্চ-রাজ কর্মচারী বাকলা বা প্রাচীন বাকেরগঞ্জ এলাকায় এরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া অবস্থান করেন নাই। বাকেরগঞ্জের মূল ভূখণ্ড হইতে দস্যুদলকে তাড়াইয়া তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে বহু রাস্তা ঘাট, সৈন্য ছাউনী ও কিল্লাদি নির্মাণ করেন। এ-জিলার শূজাবাদ মৌজা এবং ঐ নামীয় বৃহত কিল্লা আজো এই মুগল শাহ্‌জাদার বীরত্বের প্রতীক বহিয়া বিদ্যমান। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে অদূরে অবস্থিত মানপাশা কাজীবাড়ীর প্রাচীন মস্‌জিদটি এ-সময় তাঁহারই আদেশে নির্মিত হইয়াছিল।

অতঃপর পীড়িত সম্রাট শাহ্‌জাহানের শেষ জীবনে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কর্তৃক শূজা বাঙলা দেশ হইতে বিতাড়িত হন। সাম্রাজ্যিক অন্তর্বিপ্লবকালীন এ-সময়টাতে অন্যান্য স্থানের ন্যায় সরকার বাক্‌লাতেও মুগল শাসন শিথিল হইয়া পড়ে। ফলে পঙ্গপালের ন্যায় মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যু দল আবার ভাটি বাক্‌লার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সময় সময় তাহারা রাজধানী জাহাঁগীর নগর পর্যন্ত ধাওয়া করিত। এ-ব্যাপারে সম্রাট আওরঙ্গ-জেব উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা নওয়াব শায়েস্তা খাঁকে অবিলম্বে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৬ ঈসায়ী সনে নৌসেনা-পতি ইব্‌নে হোসেন বেগের নেতৃত্বে দক্ষিণ মেঘনায় নৌ অভিযান প্রেরিত হইল। স্থলবাহিনীর ভার অর্পিত হইল শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজর্গ উমেদ খাঁর প্রতি। মেঘনার যুদ্ধে সন্দ্বীপ মুগলদের হস্তগত হয় এবং উভয় বাহিনী সম্মিলিত হইয়া চাঁটগাও অধিকার করে। এভাবে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ভাটি বাক্‌লার মগ ও ফিরিঙ্গি জুলুম স্তব্ধ হইয়া যায়। যথাক্রমে সম্রাট, সুবাদার, এবং সুবাদার পুত্রের নামানুসারে এ-জিলার আওরঙ্গ পুর, শায়েস্তাবাদ ও বুজর্গ উমেদপুর পরগণাত্রয়ের নাম করা হইয়াছে। মেঘনা বিজয়ী নৌ সেনাপতির নামে কোনো স্থানের নামকরণ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে এ-জিলায় হোসেনপুর নামে কয়েকটি মৌজা দৃষ্ট হইতেছে।

জিলার বাকেরগঞ্জ নামকরণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালেই হইয়াছিল। নওয়াব আলীবর্দীর শাসন আমলে আগা বাকের খাঁ নামক এক পরাক্রমশীল ব্যক্তি ভাটি অঞ্চলে বৃহত জমিদারী লাভ করেন। বর্তমান বাকেরগঞ্জ বন্দরটি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এখানকার প্রাচীন মসজিদ, জলাশয় ও অন্যান্য পুরাতন নিদর্শনাদি হইতে অনুমিত হয় যে এককালে এখানে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বসবাস ছিল। নওয়াব আলীবর্দীর শেষ জীবনে মুর্শীদাবাদের

অন্তর্বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া আগা বাকের খাঁ ঢাকাতে নিহত হন। ফলে তাঁহার বিরাট জমিদারী ধূর্ত রাজবল্লভ গ্রাস করিয়া লইলেন। এই বাকেরগঞ্জ বন্দরেই বহুদিন ধরিয়া জিলা-সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঈসায়ী ১৮০১ সনে জিলা-সদর বরিশাল নামক তৎকালীন ক্ষুদ্র বন্দরে আনীত হয়। বলা বাহুল্য যে, আগা বাকের প্রতিষ্ঠিত বাকেরগঞ্জ বন্দর হইতেই জিলার এরূপ নামোৎপত্তি হইয়াছে।

নদীতীরবর্তী বরিশাল বন্দরটিও পুরাতন। প্রাচীন-কালে ইহা লবন ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থলরূপে বিবেচিত হইত। তখন ইহাকে 'গিদে'-বন্দর' বা বন্দর-এলাকা বলা হইত। শহরতলীর আমানতগঞ্জ, কাউনিয়া, কাশীপুর, শাপানিয়া ও পুরাণপাড়া প্রভৃতি স্থানের পুরাতন মস্জিদ, মাজার ও মন্দিরগুলি এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফকিরবাড়ীর সুদৃশ্য মস্জিদটি প্রাচীন কালেই নির্মিত হইয়াছিল। 'বিবির মহল্লা' ও 'বিবির তালাব' পুরাতনেরই স্মৃতি।

বহুমুখী বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ইংরাজ কোম্পানী দেশের শাসন ভার হাতে নিয়েছিল। মগ-ফিরিঙ্গীর জুলুম এবং বানবন্যার ফলে এ অঞ্চল প্রায় জনমানবহীন হইয়া পড়িয়া-ছিল। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ভাষাপরিবর্তন, সূর্যাস্ত আইন, লাখারাজ বাজেয়াপ্তী এবং প্রজাপীড়ক ভূমিস্বত্ববিধির পরিণাম এ জিলাকে স্পর্শ করিয়াছিল। নীলকর, লবণকর এবং জমিদারী জুলুমকে কেন্দ্র করিয়া এ অঞ্চলে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় ওহাবী বিপ্লবের বিদ্রোহ তরঙ্গও এ জিলায় প্রকাশ পাইয়াছিল। এদেশে ইহা ফরাইজী আন্দোলন নামে খ্যাতিলাভ করে। হাজী শরীয়াতুল্লার নেতৃত্বে এ-আন্দোলন প্রথমতঃ জিলার উত্তরাঞ্চলে আরম্ভ হয় এবং পরে অন্যান্য অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়।

অতঃপর বিশ শতকের প্রথম দিকে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে 'স্বদেশী ও বয়কট' আন্দোলন এ-জিলাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। ঈসায়ী ১৯০৮ সনে মিঃ এ, রসুলের সভাপতিত্বে এখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ১৯১৬ সনে এখানে প্রাদেশিক মুস্লিম শিক্ষা ও সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। পুনরায় ১৯২১ সনে এখানে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন বসে এবং ১৯২৭ সনে স্যর আবদুর রহিমের সভা নেতৃত্বে আহুত হয় প্রাদেশিক মুসলিম সম্মেলন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন, জনাব ফজলুল হকের প্রজা আন্দোলন এবং মুস্লিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন এ-জিলাকে এক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

ছায়া-ঢাকা পাখী ডাকা নদী-বেষ্টিত বিচ্ছিন্ন বাকের-গঞ্জ একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী। এ-দেশের মেঘ্‌না, তেতুলিয়া, বিশখালি, বলেশ্বর ও কালাবদরের কলকল্লোল মানুষের কবি প্রতিভাকে ফুটাইয়া তোলে। দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, ফুল-ফসলের মেলা—হোগলাবন, কাশবন, তাল-নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষের সারি ভাবুক মনে আরো ভাবালুতার ছোঁয়াচ লাগায়। তাই পনেরো শতকের কবি বিজয়গুপ্ত হইতে শুরু করিয়া আজিকার সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, জয়নুল আবেদীন এবং আরো বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক এ জিলার এক বিশেষ সৃষ্টি। চারণ কবি, মুকুন্দ দাস এবং পুঁথি ও জারীর বয়াতী আলম, আকবর এবং হাল জামানার আবদুল গনির নাম প্রদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত। বরিশালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এক সময় বিদ্রোহী কবি নজরুল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বরিশাল শহরকে 'বাঙলার ভেনিস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখানকার সবুজ শ্যামলিমায় বিভোর হইয়া গান গাহিয়া-ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

ব্রজমোহন কলেজ ও বিদ্যালয়, আসমত আলী খাঁ ইনষ্টিটিউশন, শর্ষীণা মাদ্রাসা ও লাইব্রেরী, শায়েস্তাবাদ কুতুবখানা, শঙ্কর মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, আন্‌জুমনে হেমায়েত ইস্লাম, বিভিন্ন খৃষ্টান মিশন এবং সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সেবা মজ্‌লিস এ দেশের ধর্ম, শিক্ষা ও তামদ্দু-নিক উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছে। নদী, সমুদ্র ও অরণ্য প্রকৃতির হিংস্রতা অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হইলেও তাহা আদৌ অ-গৌরবের নয়। যুগ যুগ ধরিয়া বান-বন্যার ধ্বংসলীলার মুখে আজো জিলাবাসী টিকিয়া আছে। অতীতে মগ ও ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তাহারা বীরত্বের স্বাক্ষর আঁকিয়া গিয়াছে ভীমভয়াল মেঘনার সীমাহীন বুকে। তাহারা শীশ দিয়া সাঁতার কাটিয়া পারাপার হয় তেতুলিয়া, কালাবদর, বিশখালি ও বলেশ্বর। বাঘ ও কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই তাহারা এ দেশ আবাদ করিয়াছে। ফলে এ-অঞ্চল আজ প্রদেশের শস্যভাণ্ডাররূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বিগত দুই দুইটা বিশ্ব-যুদ্ধে এ-জিলার হাজার হাজার নওজোয়ান বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, আরব, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন লড়াই ময়দানে।

যাযাবর পাখি

আ, ন, ম, বজলুর রশীদ

শুচিস্মিতা কাছে এসো এমন নির্জন বেলা
শরতের সস্নেহ দুপুর।
তোমার শ্যামল ছবি রেখান্বিতা তন্বীতনু
একখানি রোদে-ভেজা সুর
মন্থর-মধুর। আহা অলজ্জিতা তুমি এই
পৃথিবীর নও,
নির্বাক, তবুও কোন্ নক্ষত্রের স্বপ্ন দিয়ে
কালো চোখে কত কথা কও।
কাছে এসো কথা বলি। তোমাকে দেখেই মন
অকস্মাৎ হয়েছে উধাও
সে কোন্ গ্রহের পথে, উন্মনা উল্কারা
আর অসংখ্য তারাও
চঞ্চল বেদনা-ত্রস্ত। জানো শুচিস্মিতা
আমিও তাদের মতো কেমন অশান্ত যেন।
তুমি সংযমিতা
মাটিতে বেঁধেছ নীড় তাই তুমি মূর্তিমতী
সীমিত রেখায়
একখানি স্বপ্নচ্ছবি এই তৃণে
আর শান্ত নীলের লেখায়
একান্তে অনন্য মনা। সাধ ছিল বাসা বাঁধি
এই পৃথিবীতে
একটু আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ও উষ্ণতায়
ঘর ভরে দিতে।
সে স্বপ্ন ভেঙেছি কবে উদাসী নির্মম মুক্ত
নির্লিপ্ত হেলায়
দূরের মানুষ আমি। এখন উঠেছে চাঁদ
নির্জন সন্ধ্যায়
তোমাকে যায় না দেখা, অস্পষ্ট বনের রেখা
রূপালী আবেশ,
তোমার কুটীরে দীপ জ্বলে ওঠে, চেয়ে দেখি
পরিশ্রান্ত তোমাদের দেশ
কেমন ঘুমিয়ে পড়ে। হাত দিয়ে ছুঁতে পারি
এই রাত—মোমের মতন
নরম-কোমল। শোনো শুচিস্মিতা এসেছে লগন
এখন মেলবো পাখা জানিনে কোথায়, তাই
তোমাদের জন্য প্রীতি রাখি
এখানে। হয়ত আর এ-পথে হবে না আসা,
উড়ে যাবো যাযাবর পাখি।

পলাশপুরের ইতিকথা

আল্‌বেরুনী

খালটা রূপোর চন্দ্রহারের মতো চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে গাঁয়ের কোমরটাকে। এ খাল ছাড়া যেমন একটা দিনও চলার উপায় নেই গাঁয়ের, তেমনি গাঁ না হলেও কোনো অর্থ হয় না খালটা থাকার। গাঁয়ের প্রাচীনতম বুড়ো মারা গেলেন যিনি এই সেদিন, ফকিরের টিলার ফকির সাহেব, বয়সের যাঁর গাছ পাথর নেই তাঁরাও বল্‌তে পারেন না এ খাল কাটা হয়েছিলো কবে।

কিংবদন্তী আছে যে অনেক বছর আগে গভীর অরণ্যময় ছিল এ-অঞ্চল। হিংস্র শ্বাপদ বাঘ ভালুক ভূত পেত্নী আর দস্যুতস্করদের নিরাপদ রাজধানী। ডাকাতদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে সামনে এসে দাঁড়ায় ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের দল। হায়াতের জোরে যদি অব্যাহতি পাওয়া যায় এদের কবল থেকে তবে মিছিল করে ছুটে আস্‌বে ভূত আর পেত্নীরা। হাড় মাংসগুলো টেনে ছিঁড়ে খাবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে। নানী আর দাদীদের মুখে এ-কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে কোলের ভেতর আঁৎকে ওঠে আজো গাঁয়ের একান্ত দুরন্ত মিনুরা পর্যন্ত। কচিলতার মতো বাহু দু'টো দিয়ে জড়িয়ে ধরে তারা বুড়ীদের সেকেলে সনাতন কংকালগুলো।

ঈসা খাঁ মসনদ আলী প্রত্যাবর্তন করছিলেন রাজধানীতে। পরাজিত করে এসেছেন তিনি মুঘল সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহকে। তাঁবু ফেল্‌লেন এখানে এই অরণ্যের ছায়ায়। নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নটা কাটাবেন প্রকৃতির বুকে। দূর করবেন রণশ্রান্তি।

দলে দলে প্রজারা আসে চারদিকের গাঁ থেকে। ফরিয়াদ জানিয়ে বলে ডাকাতদের অত্যাচারের কথা। দিনের আলোতে মাঠ থেকে গরু বাছুর ধরে নেয়ার কাহিনী। অগণিত বানর আর বন্যশূকরের ফসল বিনষ্টের সংবাদ।

শ্রান্তি আর দূর করা হয় না। ধূসর আরবীয় অশ্বের লাগাম টেনে ধরেন ঈসা খাঁ। ইস্পাতের ঝক্‌ঝকে তলোয়ারটা কোষমুক্ত করেন সশব্দে। সূর্যের তেজে ঝল্‌সে ওঠে একবার। এর আঘাতেই দু'টুকরো করে এসেছেন মুঘল সেনাপতির তরবারী। হ্রেষাধ্বনি আর ক্ষুরধূলি পুড়ে থাকে পশ্চাতে। প্রবেশ করেন তিনি দিনের আলোয় অন্ধকার অরণ্যে।

অনেক অনুসন্ধানের পর সন্ধান পান দস্যুদের গোপন আড্ডার। সংগে সংগে ঘিরে ফেল্‌তে চেষ্টা করে তারা তাঁকে চারদিক থেকে। তারপর হিংস্র পশু আর নিরীহ হরিণ শিশুদেরে সচকিত করে শুধু অসির ঝন্‌ঝন্‌।

ফিরে যখন আসেন তাঁবুতে পশ্চিমের আকাশ তখন কারবালার ময়দান। গ্রীষ্মের হাল্‌কা মেঘের সাদা টুক্‌রোগুলো লাল হ'য়ে গেছে সখীনার উড়নীর মতো। ক্ষত বিক্ষত দেহে অমূল্য জরীর পোষাক রক্তাক্ত। দিগন্তের পারে ঢলে পড়া ক্লান্ত সূর্য্যের মতোই শ্রান্ত তিনি তখন ক্ষুৎপিপাসায়।

পরে দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই দেখা যায় হাজার হাজার সৈনিক লেগেছে জংগল পরিষ্কারে। অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ করে বেষ্টন করেছে অরণ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরে। চল্লিশজন ডাকাতের পালাতে পারেনি কেউ। কিন্তু প্রাণ দিয়েছে তারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে। মৃত্যুর আগে আপন বর্শার আঘাতে হত্যা করে গেছে বিশ্বস্ত ক্ষতজর্জরিত অশ্বগুলো পর্যন্ত। তারপর হিংস্র বাঘ, বন্য বরাহ, ভীরু হরিণ, সুচতুর বানর, বিষাক্ত শ্বাপদ। শুধু পরিত্রাণ পায় অশরীরী ভূত পেত্নীরা হাওয়ার রথে পালিয়ে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের ধ্বংস থেকে বেরিয়ে আসে এক প্রাচীন রক্ষা কালীর মন্দির। অভ্যন্তরে কৃষ্ণ পাথরে তৈরী লোলজিহ্বা নৃমুণ্ডমালিণীর ভয়ংকর মূর্তি। বেদী থেকে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। উপরে এক ছিন্ন শির শিশু। ছিন্ন মস্তার পাদমূল ধরে ভূমি তলে অন্ধকার গুহা। মধ্যাহ্ন সূর্যে সূচীভেদ্য। মশালের আলো ঠিক্‌রে পড়তেই চক্‌চক্‌ করে ওঠে স্তরে স্তরে সাজানো পেতলের ঘড়াগুলো। আকণ্ঠপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা আর সুদৃশ্য মোহরে। মহারাজ অশোক থেকে মহামতি হর্ষবর্ধন, বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খল্‌জী, গৌড়েশ্বর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌, দিল্লীশ্বর মুহম্মদ বিন তুঘলক, ভারতেশ্বর শাহেনশাহ্‌ আকবর। এ যেনো আরব্য উপন্যাসের আর এক অধ্যায়। কড়া প্রহরায় পাঠিয়ে দে'য়া হয় সব সুবর্ণগ্রামের খাজাঞ্চীখানায়।

তারপর সুন্দর আবাদী জমি। জুড়িয়ে যায় সিপাহীদের চোখ। হত্যা নয় সৃষ্টির উন্মাদনা ওদের রক্তে। অসির ঝন্‌ঝনানি ভুলে কংকন-কিংকিণীর জন্য উদাস হয় মন। ফিরে যেতে পারে না আর ফৌজে। জংগী লেবাস আর কোষবদ্ধ তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে আসে সিপাহসালারের তোপখানায়। ঘোড়াগুলো ঘোড়াশালে। নতুন করে সৃষ্টি করে তারা আরেক জনপদের।

সংবাদ পেয়ে হাতীর পিঠে সোনার হাওদায় বেড়াতে

আসেন বারো ভুঁইয়ার সরদার বাবর জং ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী। চাষীরা করজোড়ে জানায় পানির অভাবের কথা। একুশ দিনে পাঁচ মাইল দীর্ঘ খাল মিশে যায় ভরা ব্রহ্মপুত্রের বুকে। পিতার মতো স্নেহময় ভূস্বামীর নামকে জুড়ে দেয় তারা মা'র মতো মাটির নামের সংগে। এক হ'য়ে যায় ভূমি আর ভূস্বামী। গাঁয়ের নাম হয় ঈসাপুর।

যুগ যুগ ধরে দস্যুদের লুণ্ঠিত সম্পদে খালের পাড়ে তৈরী হয় বিরাট সৌধ। স্বর্ণাভ নয়, স্বর্ণের পুষ্পপত্রে করা হয় প্রাসাদের গাত্রের নক্সা। স্থাপত্যশিল্পের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। আর তারি পার্শ্বে মস্‌জিদ আর মুসাফিরখানা।

এলেন দিল্লীর দরবার থেকে মুলুকে হিন্দের কাজী-উল-কোজাত। উদ্বোধন হ'লো স্বুবর্ণপ্রাসাদের। তাঁর সম্মুখে নতজানু হ'য়ে এক হাতে ঐশী অনুশাসন আর অন্য হাতে রাজদণ্ড নিয়ে স্রষ্টা আর সৃষ্টির নামে ন্যায়বিচারের শপথ করলেন নতুন কাজী। সগৌরবে সমাসীন হ'লেন স্বুবর্ণপ্রাসাদে।

বাৎসরিক রাজ্যপরিক্রমায় এলেন ঈসা খাঁ। যতো দৃষ্টি যায় মাঠ ভরা পাকা ধান। বাতাসে দুলছে না যেনো নৃত্যের ছন্দে কুর্নিশ জানাচ্ছে তাঁকে। তৃপ্তি মেটে না আর। স্বুবর্ণ প্রাসাদের আংগিনায় দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে এই স্বুবর্ণ পলাশের ছায়ায় স্বুবর্ণ প্রাসাদ, শান্তি রক্ষার স্বুবর্ণ মুকুট বিচারপতি, প্রহরায় স্বুবর্ণ শিরস্ত্রাণ সিপাহী আর সম্মুখে প্রান্তর ভরা স্বুবর্ণ শস্য। আমার স্বুবর্ণগ্রামের নাম সার্থক হ'লো আজ।

তারপর লোকে সুঃখ মিশে, রোদে মেঘে কেটে গেছে অনেক দিন। বহু বছর। যুগ। শতাব্দী। মহাকালের নির্মম আঘাত উপেক্ষা করে বেঁচে আছে শুধু ঈসাপুর। নেই স্বুবর্ণ প্রাসাদ আর সেদিনের মানুষ। বংশধরেরা তাদের ভুলে গেছে এ কাহিনী।

আসে বিলিতি সায়েবের দল। দুর্বোধ্য তাদের ভাষা, সুবোধ্য তাদের ভাব—টাকা চাই। দুধের মতো শাদা গায়ের রং। কে জানে হয়তো বা ফেরেশ্‌তার জাত হ'বে এরা। খালের পানিতে কলসী ডুবিয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে গাঁয়ের বউ ঝিরা। ঘাটে জটলা পাকিয়ে আলাপে আলাপে ভুলে যায় সময়ের কথা। ইউসুফ নবী কী সুন্দর ছিলেন এর চেয়েও বেশী? আশ্চর্য হ'তে গিয়ে মনে থাকে না পড়ে যায় কখন মাথার ঘোমটা। সরে যায় কখন্ গায়ের আঁচল। একেবারে বেলাজ বেশরম। দু'দিন না যেতেই তারপর কেঁপে ওঠে তাদের অন্তর। চোখ ঠেরে শিস্ দিতে দিতে অবসরবিনোদন করে সায়েবরা অনবসর সময়ে। ঘেন্নায় কুচকে ওঠে ওদের নাকের ডগা। বুঝ্‌তে বাকী থাকে না এরা ফেরেশ্‌তার নয় বংশধর ইবলিসের। লাজে ভয়ে কুলবধুরা আত্মগোপন করে খালের পানিতে।

শুরু করে সায়েবেরা নীলের চাষ। তাদের অকথ্য অত্যাচারে ক্রন্দনের রোল ওঠে ঈসাপুরে। নিরীহ চাষীদের ঘরে ঘরে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে রুখে দাঁড়ায় সোহরাব শেখ। অবাধ্য কৃষাণের বুকের রক্তে লাল হ'য়ে যায় খালের পানি। ফোরাতের পানির মতো।

সোহরাবকে ধরতে এসে ম্যাকারটি সায়েবের নজর পড়ে তার সুন্দরী তরুণী বউর ওপর। জানায়, যদি সে তার বউকে আজ রাতে ভেট পাঠায় সায়েবের কুঠিতে তবে মার্জনা পাবে কৃত অপরাধের। সোহ্‌রাবের ধমনীতে শির উঁচু করে দাঁড়ায় তার পিতৃপুরুষের রক্তের কণিকা-গুলো। পাচনা হাতেই ছিলো। দৃঢ় হয় শুধু মুষ্টিতে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে আঘাত করে সে সায়েবের মাথায়। ফিন্‌কি দেয়া লোহুতে লাল হ'য়ে যায় তার দেহ। যেনো শ্বেত মর্মর প্রস্তরে রক্তের আল্‌পনা। ম্যাকারটি আর জ্ঞান ফিরে পায় না বটে কিন্তু সোহ্‌রাবকেও প্রাণ দিতে হয় সেখানে তার অনুচরদের পিস্তলের গুলীতে।

এ কাহিনীর কোনো লেখা ইতিহাস নেই। ইতিহাসের পাতা তাদের নয়। ঈসাপুরের মানুষ একদিন তাই ভুলে যায় সোহ্‌রাব আর 'মারকুটি' সায়েবের কথাও। কৃশ্চিয়ান সায়েবেরা শুধু 'কেরাসীন' সায়েব হ'য়ে বেঁচে থাকে কিছুদিন বুড়ো বুড়ীদের মুখে। জুজুর ভয় হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় সাঁঝের পরে ঘুম না আসা ছেলের মনে। কিন্তু যাবার আগে সোনার গাঁয়ের সোনার গা থেকে শেষ অলংকারটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয় তারা। রাজরাণী ভিখিরিনী হ'য়ে দাঁড়ায় রাজপথে।

তখন খালের পূব পাড় ধরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য পলাশ ফুলের গাছ। শীতের শেষে তাদের ঘুম ভাংলে বদলে যায় গাঁয়ের রূপ। রাংগা চেলীতে বিয়ের কনের মতো। পূব পাড়ে পলাশপুর আর ঈসাপুর পশ্চিম পাড়ে। কে এর পাড়ে রোপন করছিলো এ রাংগা কিংসুঃকর বনানী আর কেইবা করেছিলো গাঁয়ের এ নামকরণ, পলাশপুরের মানুষ সে কথাও ভুলে গেছে আজ। আজকের গাঁয়ের মানুষের কাছে তাদের পিতৃপুরুষের সব ইতিহাস মৃত। সেদিনের কোনো প্রশ্নই আর উঁকি দেয়না তাদের মনে।

পলাশপুর, ঈসাপুর। খালের এপাড় ওপার দু'গাঁ; কিন্তু দূরত্ব তাদের যোজন পথের। ভেতরে বাইরে এতো ব্যবধান বুঝিবা একটা অতলান্তিক মহাসাগর সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে দু'টো মহাদেশকে। ঈসাপুরের সৌভাগ্যে পলাশপুর বিমর্ষ। পলাশপুরের উন্নতিতে

ঈর্ষাকাতর ঈসাপুর। ইতিহাসের অতি বড়ো গবেষকও তাই নিরংকুশ মনে স্বীকার করতে পারেন না এককালে এক ছিলো এ দু'টো গাঁয়ের দেহ আর মন। তাদের পিতৃপুরুষেরাই একদিন বিষাক্ত শ্বাপদ আর হিংস্র জন্তুর আক্রমণকে তুচ্ছ করে সৃষ্টি করেছিলো এ-জনপদের। বানরকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে যেমন চেনা যায় না আজ আর হিংসা বিদ্বেষে এরা তেমনি এতো দূরে সরে গেছে একে অপরের কাছ থেকে যে, চিনতে পর্যন্ত পারে না কেউ কাউকে। এ-দু'গাঁয়ের জীবনে এ অভিশাপ কার—কে দেবে এ-প্রশ্নের উত্তর! ঐতিহাসিকেরা তত্ত্বের ঝড় তোলেন ইতিহাসের পাতায় আর তথ্যের ভীড় জমান যাদুঘরে—সুবর্ণগ্রামের স্থান নির্ণয় নিয়ে। মারামারি কাটাকাটি করেন বংগের দ্বাদশ ভূস্বামীর সর্দার বাবর জং ঈসা খাঁ। মসনদ-ই-আলীর রাজধানী খিজিরপুরের অস্তিত্ব আবিষ্কারে। খিজিরপুর—ঈসাপুর—পলাশপুর কি অভিন্ন। এ-প্রশ্ন মীমাংসিত নয় আজো।

পলাশপুরের ইতিকথা শুনে স্মৃতির পর্দায় হয়তো বা ছায়া ফেলে যাবে কারো বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। ছায়াচিত্রের রূপোলী পর্দার ছবির মতো।

ভূস্বর্গ নয়। প্রমোদ ভ্রমণেরও নেই কোনো উপকরণ। ইতিহাস বন্দিনী হয়নি সেখানে অজন্তার গুহা বা লাল কিল্লার অভ্যন্তরে। আছে প্রাগৈতিহাসিক মাটি আর ঐতিহাসিক মানুষ। সোনা ভরা প্রান্তর, পেট ভরা ক্ষুধা। আর পলাশের ছায়ায় সুদূরের পানে তাকিয়ে থাকা কৃষাণী বধুর সজল উদাস নয়ন। হিমেল রাতে চাঁদের দিকে চেয়ে নিশির শিশির সিক্ত কুমুদিনীর মতো। কথা না বলে অতীত এ কাহিনী লেখে তার ভাষাহীন লিপি দিয়ে। ইতিবৃত্ত তাই বেঁচে থাকে এর ইতিকথা হ'য়ে।

তবু যদি কেউ নির্বোধ হয় এতোটুকু। মাটি করতে চায় একটা সাপ্তাহিক বিশ্রামের পুরো ছুটি। দেখতে চায় "ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।"

অসুবিধে অবিশ্যি পোয়াতে হ'বে না খুব বেশী। ঘোড়াশাল ফ্লাগ ষ্টেশনে নেমে পয়লাই চোখে পড়বে জামতলায় নজু মিয়ার ষ্টল। চা। চিনির হ'লে পে'লায় দু'আনা। গুড়ের খেলে গেলাস ছ'পয়সা। বলতে হ'বে না কিছু। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে তাকাবে সে শুধু একবার মুখের দিকে। তারপর অব্যর্থ নির্দেশ দেবে চাকর ছেলেটাকে পে'লায় না গেলাসে। মানুষ চিনতে ভুল হয় না কখনো নজু মিয়ার।

বাঁ দিকে মুখ করে বসলে হাতে গরম চা আর সামনে শীতলক্ষা। কিন্তু সাবধান, ভদ্রলোকের জন্য নির্দেশিত দক্ষিণের বেতের চেয়ারে নয়। ওটা একটা ছারপোকার কলোনী। কলোনীর ফ্লাট বাড়ীর মেয়েরা জানালা ধরে যেভাবে তাকিয়ে থাকে ড্যাব ড্যাব করে রাস্তায় বেহায়ার মতো, ছারপোকাগুলো ঠিক তেমনি তাকাবে বেতের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে দিয়ে। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু এখানে কয়েক সেকেণ্ডেই অস্থির হ'য়ে বলেছিলেন একবার, মেয়ে আর মৎকুন দু'টোই নরখাদক। রক্তপায়ী। আবৃত্তি করেছিলেন মহাপুরুষ কবীরের কথামৃত—দিনমে মোহিনী, রাতকো বাঘিনী পলক্ পলক্ লুহ চোষে। হাসতে গিয়ে গরম চা পড়ে গিয়েছিলো আমার পায়জামায়। সে দাগ আর ওঠেনি কোনো দিন। যতোই কেনো বলুক না লোকে পানটা কিন্তু ভালো বানায় নজু মিয়া। বাড়ীতে শিখেছে তার মা'র কাছ থেকে। বরাত ভালো হ'লে সিগারেট্ কাপেসটেনই মিলে যেতে পারে।

তারপর শীতলক্ষার বাঁকে বাঁকে সোজা পুবে। চরসিন্দুরের সড়ক ধরে। পেছনে ফেলে আম কাঁঠাল আর গাবের বন। জিজ্ঞেস করতে হ'বে না কাউকে কিছু। পথ দেখাবে নদী। পাড়ে পায়ের স্পর্শ পড়লেই চেনে সে যাত্রীকে—পরিচিত না অপরিচিত। তাছাড়া ওসবের সময়ই বা কই। আদাপ ছালাম নিয়ে গন্তব্য স্থান আর আগমনের হেতু বলতে বলতেই ঘেমে যাবে শরীর। এর মাঝে কেউবা জানতে চাবে পিতা পিতামহের পরিচয়ে নিবাস।

মাইল চারেক হাঁটলে পরেই বাবরী কাটা চুলের মতো ঘন পাতায় ছাওয়া বিরাট একটা নিম গাছ। তারি তলে ছোট্ট একটা চালা মসজিদ। রোদ আর পথশ্রান্তিতে শরীর তখন ক্লান্ত। সুপরি গাছের থাগ দিয়ে তৈরী বসবার জায়গা আছে নিমতলায়। আসন নয় আবেষ্টনীটা আরামের জিরোবার। ঘামে ভেজা দেহ আর শীতলক্ষার সিরসিরে শীতল বাতাস। নিশার শিশির না থাকলেও শরীর জুড়োতে গিয়ে মনে পড়বে ছেলে বেলার কবিতা। হয়তো বা ঘুমের একটু মিষ্টি ছোঁয়াও লেগে যাবে চোখে।

কুয়োটা মাটির বটে কিন্তু পানিটা ডালিমের রসের মতো। শুধু সাদৃশ্যে নয় স্বাদেও। ঠাণ্ডায় বরফগলা। হাত মুখ ধোয়া শেষ হ'তে না হ'তেই এগিয়ে আসবেন মসজিদের ঈমাম সাহেব। দেশী পাটের আঁশের মতো সাদা ধবধবে দাড়ি। লম্বিত আবক্ষ। পরহেজগার মন শুধু রসিকও বটেন। যুদ্ধের সময় যখন পাটের দাম বেড়ে গেছিলো খুব তখন দাঁড়িগুলো ধরে বলতেন, খোদাকা নূর, মাৎ লাগাও ক্ষুর, না অইলে বেইছাই ফালাইতাম বেপারীগর কাছে। হাংগামও চুকৃত, পইসাও অইত। রোজার মাস ছাড়া পানহীন মুখে দেখেছে তাঁকে বলতে পারবে না কেউ।

হাতে একটা কাঁচের গ্লাস। ওজন আর পানি ধরার ক্ষমতা যার সমান। পুরো এক সের করে। মাপের পাথরের অভাবে দাড়ি পাল্লায়ও ব্যবহার হয় এর। বংশানুক্রমিক ভাবে ঈমাম সাহেবেরা ভোগ দখল করছেন ওটার। বিয়ের সময়ে তাঁর দাদাজী, সে সিপাহী বিপ্লবের অনেক আগের কথা, কিনেছিলেন গ্লাসটা। তারপর গতো সোয়া শ' বছর ধরে বহু সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সাক্ষী সে। কাঁচ পাত্রে শিল্পীদের ক্লাসিক্যাল কারুকার্যের মধ্যযুগীয় নিদর্শন রয়েছে এতে। ঐতিহাসিক মূল্য যার নির্ণয়ের অপেক্ষা রাখে যাদু ঘর আর গবেষণাগার নিয়ে। গৃহিণী—সুগৃহিণী ঈমাম সাহেবের। কোনো দিন ময়লা লাগ্‌তে দেন না ওটাতে এতোটুকু। চূণ আর খয়েরের রংয়ে মরচে পড়া দাঁতগুলো তামার মতো। হেসে বল্‌বেন একগাল, পানি খাইবেন বুঝি সায়েব?

মানুষ তিনি বড়ো শান্ত আর সরল। আল্লার নাম উচ্চারণ করেন প্রত্যেক বাক্যের আদিতে ও অন্তে। কিন্তু ঠিক তেমনি হতভাগ্য আবার আলীমুদ্দীন হাফেজ। কলেরা হ'য়ে মারা গেছে সে-বছর দুই দুইটা যোয়ান ছেলে। নির্ঝর অশ্রুতে শুভ্র শ্মশ্রু সিক্ত করে বল্‌বেন, ইন্নাল্লাহা মায়াস্‌সবেরীণ। কোরানে পাকে আল্লাতায়লা কইছেন, সব কামকাইজের মাইঝেই তাঁর কাছে সবর মানা উচিত। যাঁর মাল তাইন লইয়া গেছেন কাইন্দা কাইট্টা আর কি করমু। হাজার শুকুর। এমন করুণ ভাবে কথাগুলো বল্‌বেন তিনি শ্রোতার চোখ পর্যন্ত পারবে না বাষ্পাকুল না হ'য়ে।

হয়তো বা শেষ কামনা অপূর্ণই থেকে যাবে এ-অজাত শত্রুর। হজ্ তিনি পারবেন না করতে। অভিলাষ গতো চল্লিশ বছরের। দু'কুড়ি বছরের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিলো প্রায় পাঁচ শ' টাকা। বছর তিনেক আগে কাল বোশেখী তার নির্মম স্বাক্ষর রেখে যায় নিরীহ মস্‌জিদটার উপর। পুনর্নির্মাণ সম্পর্কিত গাঁয়ের লোকের দরবার ভেংগে যায় তিনদিন। এমন কি দু'দলের মধ্যে হাত থাকতে মুখে কেনো নীতির অভিনয় হ'য়ে গেছে একবার।

অতো মাথা ব্যথা নেই গাঁয়ের লোকের। অবশেষে হজের টাকায় মস্‌জিদ করতে হয় ঈমাম সাহেবকেই। নামাজান্তে হাত উঠিয়ে বল্‌লেন দুনিয়াতে কাল বোশেখী দাতার কাছে, আল্লা তোমার ঘর দেখ্‌তে পারলাম না কিন্তুক তোমার ঘর বানাইয়া গেলাম একটা...মাবুদ... আমীন।

বিশ্রামের বরাদ্দ হয়তো বা ছিলো মাত্র পনেরো মিনিট এখানে। কিন্তু দেখা যাবে ঘড়ির দিকে তাকালে, সাড়ে দশটা নয় সাড়ে এগারোটা। চট্ করে কানের কাছে ধরতে হ'বে না ওটাকে। ঠিকই দিচ্ছে সময়। এক ঘণ্টা উৎরে গেছে এক ঘণ্টা আগে। সম্মোহিনী শক্তি আছে আলীমুদ্দীন হাফেজের কথায়।

আরো মাইল তিনেক এগুলে সামনে পড়বে পালেদের বিরাট পুষ্করিণীটা। স্বপ্ন দেখে পরে রঘু পাল কাটিয়েছিলেন এ পুকুর। সে অনেক কাহিনী। আজ থাক্। লিচু গাছের ছায়ায় বাঁধানো ঘাটে স্থায়ী ছক আছে ষোলো ঘুঁটি খেলার। দ্রৌপদী নয়। পূজোর ছুটীতে বেড়াতে আসা সহপাঠী পীযুষের সংগে বাজী রেখেছিলো বিমল বোন্ নির্মলাকে এখানে। হেরেছিলো। সব শুনে বলেছিলেন বাপ, মরদের বাত আর হাতীর দাঁত। পালের কথার নড়চড় হয় না। হয়নি শেষ পর্যন্ত। পূজোর আর বিয়ের বাদ্যের ব্যবধান ছিলো অল্প দিনের।

পালেরা বড়ো বেশী নেই আর কেউ। চলে গেছে হিন্দুস্তান। যেতে পারেননি শুধু বৃদ্ধ গোবিন্দ পাল। চাকুরে ছেলে, প্রতিষ্ঠিত মেয়ের জামাই আর দুশ্চিন্ত্য আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপরোধের বন্যা—চলে এসো। তাঁর সেই এক কথা, যাগর লগে সুখে দুঃখে জীবনের সত্তুরটা বছর কাডাইলাম, এহন এই শেষ বয়সে ক্যামনে ছাইড়া যামু এগরে। এরা মাইরা ফালাইলে মইরা যামু। কপালে যদি ভাই বেরাদরের হাতের মরণ থাইক্যা থাকে তয় এইডা কি আর ছাড়াইবার উপায় আছে? মা'র পেট থাইক্যা যেই দ্যাশের মাটিতে পড়ছিলাম শ্মশানও সেই দ্যাশের গাংগের পাড়ে বানামু। সপ্তাহান্তে খোঁজ নিয়ে জানছে শুভার্থীরা, ভয় তাদের অমূলক। মনোক্ষুণ্ণ হয়েছেন গাঁয়ের লোকের ওপর সংশয় তাদের মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ায়। না, পাকিস্তানীরা কতোল করেনি এখনো তাঁকে।

লিচু গাছের তলে দাঁড়িয়ে মাইল দুই পশ্চিমে চোখে পড়বে বিরাট একটা কাছারী ঘর। এটা একদুয়ারিয়ার রায়দের পরিত্যক্ত আদালত। যেখানে হুকুম আর হাকিম ছিলেন একই ব্যক্তি। যাঁদের দাপটে হিন্দু-মুসলমান গোছল করতো না এক পুকুরে। কয়েক পুরুষ ধরে এই আদালতে বসে বিচারের রায় দিয়ে গেছেন রায়েরা। যার জের মেটেনি আজো বহু জনের জীবনে। অবশেষে ঠোকর লাগে পাশের ইউনিয়নের মণ্ডলা চৌধুরীর সংগে। উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন দু'জনই, একবচন বাপের বেটা তাঁরা। একজন বল্‌লেন, জান দেবো, মান নয়। প্রতিপক্ষ জানালেন, শির দেগা নাহি দেগা আমামা।

পাঁচ মাইল হেঁটে সুরেশ রায়ের কাছে গিয়ে বলে-ছিলেন মাহ্‌মুদ পণ্ডিত, মান লইয়া ঝগড়া করবেন আপনারা কিন্তু জানত' যাইবে উলুখড়ের। সিগারেটের

ধুঁয়ো ছেড়ে আদ্দির পান্‌জাবীর সোনার একটা বোতাম নাড়তে নাড়তে হাস্‌লেন রায় মহাশয়। এটা নিশ্চয়ই চৌধুরীর দূত মুখে সন্ধির প্রস্তাব। সুতরাং প্রত্যাখ্যান।

অনুরোধ জানালেন পণ্ডিত মণ্ডলা চৌধুরীর কাছে, ইজ্জত লইয়া তোমাগর শিল পাটার ঠোক্করেত' পিষ্যা মরবে সব মরিচের দল। বিসপিল হাসি খেলে যায় গুড়গুড়ির নল হাতে তাকিয়া হেলান দে'য়া চৌধুরী সাহেবের ঠোঁটে। সন্দেহ নেই বিরোধী শিবিরের কাসেদের মুখে এটা সন্ধির কূটনীতি। অতএব, প্রত্যাখ্যান।

মরিচ অনেক পেষা হয়। প্রাণ দেয় বহু উলুখড়। দাংগা হিন্দু মুসলমানে। গভীর রাত্তিরে অকস্মাৎ শুরু হয় বহ্নি উৎসব। আর্তক্রন্দনে ভেংগে যায় গাঁয়ের নিদ্রার প্রশান্তি। শেয়াল শকুনীর আনন্দ কলরব শ্মশানে গোরে। শান্তিতে ঘুমুতে পারেনি মানুষ পুরো দু'টি মাস। মুসলমানেরা বয়কট করাতে ভেংগে যায় রায়পুরার হাট। হিন্দু শিক্ষক চলে যাওয়াতে উঠে যায় পলাশপুরের ইস্কুল।

নতুনত্ব নেই কিছু এসব খবরে। কাগজে বেরিয়েছে দিনের পর দিন ফলাও হয়ে। আহত নিহতের সংখ্যা সর্বদা শতকের হিসেবে। যার ফলে আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে, নানা গাঁয়ে। শহরে বন্দরে। পত্রিকা হাতে চোখের পানি মুছে বল্‌তেন মাহমুদ পণ্ডিত, অথচ তাঁরা দোয়াতের পানিতে নিভাতে পারতেন এই আগুন। মসির আঘাতে ভোঁতা করতে পারতেন অসির ধার।

ঝগড়ার মূল কারণ জান্‌তে দরকার নেই কোনো ঐতিহাসিক গবেষণার। পলাশপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মণ্ডলা চৌধুরীর দফাদার গিয়েছিলো সরকারী কাজে রায়পুরা ইউনিয়নের অধিকর্তা সুরেশ রায়ের সমীপে। মুসলমান বলে রাজদূত পেলোনা রাজ সম্মান। রায় মহাশয় ফরাসে নয় দূরে বস্‌তে দিলেন তাঁকে পিঁড়িতে। ফরসীর বদলে নারকেলের ডাবা দিয়ে নিজের হাতে বলেছিলেন তামাক সেজে খেতে।

সব শুনে বলেছিলেন মণ্ডলা বাপের বেডা অইলে দেইখ্যা লমু।

দেখেছিলেন তিনি। অবরুদ্ধ পথের উল্টো দিকে সাত মাইল দূরে মেথিকান্দা ষ্টেশনে গাড়ীর কামরায় বসে শুনেছিলেন সুরেশ রায় সপরিবারে, আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনির রেশ। নৈশ আকাশে দেখেছিলেন ধূমকেতুর মতো স্বচ্ছ আগুনের হল্‌কা। রায় বাড়ীতে তখন অগ্নোৎসব।

এসব থাক এখন। বল্‌ছিলাম লিচু গাছের ছায়ায় দাঁড়ালে রায়েদের ওই আদালতের কথা। যে ঘরের পুরনো নথিপত্র আছে আজো বহু চাষীর নিগৃহীত ও দেশান্তরিত হওয়ার করুন কাহিনী। খাজনা, বকেয়া, নজরানা আর সুদ, তস্যসুদ, তমসুকী ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মারপ্যাঁচে যে ভাবে তাঁরা দিনের পর দিন জোঁকের মতো শুষে খেয়েছেন মানুষের দেহের রক্ত, তার ইতিহাস আছে ভাঁজ করা বাঁধানো মহাজনী খাতার লম্বা পাতায় পাতায়, কালো হরফের হরফে। উঁই আর কীটেরা পাতাগুলোকে যে ভাবে নির্ভয়ে ঝাঁঝরা করছে আজ ঠিক তেমনি শক্তি আর শোষণের ধারালো ছুরিতে রায়েরা সেদিন চাষীদের বুকগুলোকে করেছিলেন ক্ষত বিক্ষত।

ছেলের বিয়ের বয়স হয়েছে অথচ ওদিকে খেয়াল নেই বাবর আলীর। ডেকে দু'চার কথা একদিন শুনিয়ে দিলেন রায় মশাই। সান্তনা দিয়ে বল্‌লেন পরিশেষে, তুই কবছস্ টাকার চিন্তা, আরে গর্দভ, ঠেকা বেঠেকায় কাজে না লাগ্‌লে আমরা গাঁয়ে আছি কিসের জন্য শুনি?

সামান্য একটা টিপ সই। বাবু মা বাপ। দিয়ে দিলেন গুনে পঞ্চাশটি টাকা। তারপর বিশ বছর ধরে দু'নয়নের পানিতে কতো পঞ্চাশ যে দিয়েছে জানেনা সে তার হিসেব। কিন্তু আসল ঠিক থেকেও অংকের পরিমান বেড়ে গেছে বছরের পর বছর। অবশেষে একদিন অস্থাবর—চাল চুলো আর শেষ দিন স্থাবর—জমি পাথর। সেই একই খাতায় লিখে দিলেন বাবু আর একটা টিপ সইয়ের বদলে। রেজিষ্ট্রী সে হ'বে পরে। বাবর আলী তো আর তাঁর পর নয়। দেশ ছেড়ে আসামের জংগলে পাড়ি দেবার দিন বলেছিলো সে আল্লা, আমার ঘরে যেয় আগুন দিছে তার ঘরে তুমি দোজখের আগুন দিও।

ছোট্ট একটা ব্যাপার। গাঁয়ের লোকে ভোলেনি এখনো। বিয়ের তারিখ হুবহু করছে সেজো বাবুর মেজো মেয়ের। যে কোনো দিন স্থির হ'তে পারে শুভ কার্যের শুভ দিন। অথচ গরীব নওয়াজ কিনা বলা নেই কওয়া নেই বেচে দিলো পালের বড় খাসীটা। সংবাদ পেয়ে পাইক এলো সমন নিয়ে। তারপর কাছারী ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসে সে পিঠের চামড়া উঠে গিয়ে এখানে সেখানে লেগে আছে ফোটা ফোটা রক্তের দাগ। নরখাদকের যুগ থাকলে নাকি অতিথি সৎকারের জন্য পাঁঠার ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'তো তাকে শুভদিনে।

তখন পূজো। অনুরোধ নিয়ে মসজিদের অশীতিপ্রায় ঈমাম সাহেব গেলেন স্বয়ং রায় মহাশয়ের কাছে। সানুনয়ে জানালেন, মগ্‌রেবের নামাজের সময় বাদ্য বাজনাটা একটু বন্ধ রাখলে উপকার হয় যার পর নাই। কৃতজ্ঞ থাকবেন তিনি তাতে কেয়ামত তক্। ফিরে এলেন বৃদ্ধ ঘর ভরতি লোকের অট্টহাসির মধ্যে মাটিতে নাকে খৎ দিয়ে। দাঁড়িতে ত্রাস করে বাবুর পাম্পসু। প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁর অমার্জনীয় ধৃষ্টতার। পরদিন

ফজরের নামাজের সময় আজান না শুনে বিস্মিত হয় গাঁয়ের লোক। তরুণেরা বল্‌তে পারেনা ব্যতিক্রম এটা আজ কতো বছর পরে। নামাজ পড়তে এসে আঁৎকে ওঠেন মুসুল্লীরা। প্রায় অন্ধকার ঘরের কড়িকাঠে ঝুলন্ত কার লাশ! ধব্‌ ধব্‌ করছে সফেন লেবাস্ আর শ্বেত শ্মশ্রুগুচ্ছে।

কেমন করে ভুল্‌বে গাঁয়ের মানুষ এসব কথা। ছেলের অসুখ। অবস্থা এখন তখন। ডাক্তার ডাকতে ছোটে জনাব আলী দৌড়ের ষাঁড়ের মতো। পুকুর থেকে চান করে ফিরছে তখন রায়ের বিধবা বোন। সিক্ত বসনা। মুসলমানের ছায়া পড়ে গিয়ে তার গায়ে। তলব এসে যায় ঘণ্টা না পেরোতেই। মুমূর্ষ ছেলের কাছ থেকে উঠিয়ে আনা হয় তাকে পাঁচ দোলা করে। রায় মহাশয় বন্য জানোয়ারটার দু'গালে দশটি করে পাদুকার ঘা দিলেন স্বহস্তে। ঘরেও ফিরতে পারেনি জনাব আলী। কাঁপুনি দিয়ে জর আসে পথেই। ওখানেই শুন্‌তে পায় ছেলের মৃত্যু সংবাদ। তারপর মাস খানেক ভুগে সে জ্বরে জ্বরেই সে-ও পরিত্রাণ পায় ইহলোক থেকে।

কাছারী ঘরটার পশ্চিম কোন থেকেই মোড় নিতে হবে বাঁ দিকে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে ইউনিয়ন বোর্ডের সরু সড়ক। কুমোর পাড়ার ঠিক মধ্যখান দিয়ে। এগুতে হবে এবার বাঁশ ঝাঁড়ের ভেতর দিয়ে, সুপুরী বনের পাশ দিয়ে, আর কলাবাগের মাঝ দিয়ে। খানিক দূর গেলেই শুনা যাবে শের মাহমুদ পণ্ডিতের পাঠশালায় শিক্ষার্থীদের নামতা পাঠ। কোরাস সুরের চীৎকার, দুই দ—শ দুই যো—গে বাই—শ হয়, বাইশে—র দুই না—মে হাতে—দুই র—য় ; দুই দ—শ তি—ন যো—গে ইত্যাদি। মাহ্‌মুদ পণ্ডিতের পাঠশালা পলাশপুরে।

ফকিরের টিলার ফকির সাহেব ছাড়া গাঁয়ে যেমন বুড়ো বলতে বড়ো বেশী নেই কেউ আজ আর একটা, তেমনি খালের পাড়ের বুড়ো পলাশ গাছগুলোও মরে গেছে এক এক করে অনেক। যারা আছে তারাও যেনো পিতৃপুরুষের নাম মাত্র প্রতিনিধিত্ব করছে। ফুল আর আর ফোটেনা তেমন। প্রায় পাতাহিনী শাখায় যে দু'চারটে ফোটে সে-ও যেনো বড্ডো গতানুগতিক। আজীবন দান করতে করতে ভাণ্ডার শূন্য হলে পরেও দাতা যেমন হাত দেন ওখানে ভুলে, তেমনি গাছগুলোরও এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায়ও পারেনা তারা চঞ্চল না হয়ে। সাড়া পড়ে যায় ফুল ফোটার। লাল আঁচলের ইশারায় জানায় বসন্তের আগমনী সংবাদ। ভুল্‌তে পারেনা বংশানুক্রমিক সনাতন অভ্যাস। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার উৎসবের মতো। সাধ আছে সাধ্য নেই।

বছর দশেক আগেও সৈদের গাঁও ইস্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে দেখেছি আমরা, গাঁয়ের মাথায় কে যেনো পরিয়ে দিয়েছে লাল পাগড়ী। পাঁচ মাইল দূর থেকে আংগুল তুলে দেখাতো লোকে, অই যে আগুনের শীষটার মতো দেহা যায়, অইটাই পলাশপুর।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

মীর আবুল হোসেন

সাহিত্যে অশ্লীলতা বল্‌তে কি বুঝি—এক কথায় আমরা এর জবাব দিতে পারিনে। সাহিত্যে অশ্লীলতা কথাটা ব্যাপক এবং কিছুটা অস্পষ্টও বটে। এই অস্পষ্টতার জাল ছিন্ন করে আমরা যে ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হই তা এই যে—যে বর্ণনা বা বর্ণিত ঘটনার মাঝে পাশব প্রবৃত্তি, কুৎসিৎ যৌন আলোচনা, নিষিদ্ধ সমাজ বিগর্হিত আচরণ, নরনারীর উৎকট লালসার নগ্ন প্রকাশ ঘটে—তাই অশ্লীল। কিন্তু এ-ধরণের অশ্লীলতার ধারণা সর্বজনগ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ এই ভিত্তিতে সাহিত্যে অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা দাঁড় করালে তা সকলদেশে, সকল সমাজে, সর্বযুগে গ্রহনীয় হবেনা। তাই অশ্লীলতার ধারণা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল ধারণার একমাত্র কারণ মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি। মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরে নৈতিক জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা মানুষের মনে ছিল। এক স্তরে যে আচার-ব্যবহার সহজ স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হত—পরবর্তী স্তরে তাই হয়ে পড়েছে ঘৃণ্য ও হেয়।

সাহিত্য মানব জীবন ও সমাজের দর্পণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং বিভিন্ন যুগের আচার ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। কিন্তু এক স্তরের সাহিত্যাদর্শ পরবর্তীকালের উন্নততর মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারেনি। আগের যুগে যা মানুষকে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে—তাই পরবর্তীকালের সমাজের নৈতিক মানদণ্ডে হয়েছে অশ্লীল ও বর্জনীয়।

এই বিচার পদ্ধতির পরিবর্তন ও গ্রহন বর্জনের পালা এ-যুগেও চল্‌ছে পুরোদমে। তাই এক দেশে যাকে অশ্লীল বলা হচ্ছে, অন্য দেশে তা সাদরে গৃহীত হচ্ছে। এমন কি একই দেশে একই সময়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শ্লীলতা অশ্লীলতার ধারণার পার্থক্য মেনে নিলে সাহিত্যে অশ্লীলতার বিচার সম্পূর্ণ ব্যক্তি-রুচির ওপর ছেড়ে দিতে হয়। এবং তা করতে গেলে প্রশ্ন ওঠে—সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা দেঁয়া কি সম্পূর্ণই অসম্ভব? আমার মনে হয় অসম্ভব নয়। কারণ যতই মতের পার্থক্য থাকুনা কেন—সাহিত্যে অশ্লীলতা আছে এবং তা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। সাহিত্যে ভালমন্দ কথাটা যখন আছে—তখন শ্লীলতা অশ্লীলতাও আছে। তবে সে অশ্লীলতা যতখানি কোন রচনার মৌলিক কাঠামোতে না আছে, তার চেয়ে বেশি আছে তার পরিবেশ ও পরিবেশনের মধ্যে। বিভিন্ন পরিবেশে একই রকমের ঘটনা শ্লীল-অশ্লীল দুই হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ দুখানির কথা বলা যায়। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের এবং বিদ্যা-সুন্দরের প্রেম ও পরিণতি মূলতঃ এক। কিন্তু কেবলমাত্র পরিবেশ ও উপস্থাপনার সামান্য পার্থক্য থাকার জন্যে দুটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে আমাদের সামনে এসেছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম-কাহিনীকে কেউ অশ্লীল বলবে না—কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর অশ্লীলতা সর্বজন-স্বীকৃত।

পরিবেশ ও পরিবেশন ছাড়া অনেক সময় শব্দ প্রয়োগের দোষেও রচনায় অশ্লীলতা দোষ এসেছে। সেকস্‌পিয়ারের ওথেলো নাটক, ডেমডিমোনার চরিত্র সম্বন্ধে ওথেলোর মনে সন্দেহ উদ্রেক করবার জন্যে ইয়াগো অনেক কথা বলেছে—অনেক ইংগিত করেছে—কিন্তু কোন স্থানে অশ্লীল কিছু বলেনি। কিন্তু নাটকের গোড়ার দিকে ব্রাবোনসিওর নিকট রডারিগোর একটিমাত্র মন্তব্য—Your daughter and the moor are making beast by back—চূড়ান্তভাবে অশ্লীল কিন্তু নাটকখানি সমগ্রভাবে অশ্লীল নয়।

পরিবেশ, পরিবেশন ও শব্দ প্রয়োগের ওপর অশ্লীলতা অনেকটা নির্ভরশীল বলে অনেকেই সমগ্রভাবে কোন রচনাকে অশ্লীল বলে বাতিল করে দিতে চান না। অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন—There is no such thing as a moral or immoral book. Books are well written or badly written. That is all.

তার অর্থ তিনি বল্‌তে চান—নৈতিক বা দুর্নীতি যুক্ত রচনা বলে কিছু নেই। রচনা ভঙ্গী ভাল কি মন্দ, সেইটাই আসল কথা। এক কথায় বলা যায় বিষয়বস্তুটা বড় কথা নয়—প্রকাশ ভঙ্গীটাই আসল।

তা ছাড়া প্রাচীনকাল হতেই অশ্লীলতা কমবেশি সব সাহিত্য রচিত হয়েছে। কারণ সাহিত্য যদি মানব জীবনের রূপায়নই হয়—তাহলে তার মহান দিকগুলো যেমন তাতে প্রতিফলিত হবে—তেমনি তার স্খলন-পতন ত্রুটি বিচ্যুতি, দুর্বলতাও সমপরিমানেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে।

বাংলা সাহিত্যেও এই অশ্লীলতার নিদর্শন অনেক আছে। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অশ্লীলতা বিরল নয়।

পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় আলাওল পদ্মাবতীর বিভিন্ন অঙ্গের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে কবি তার শিল্পকুশলতার চূড়ান্ত করেও, চূড়ান্ত অশ্লীলতা দোষ হতে রেহাই পাননি।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে রিয়ালিষ্ট সাহিত্যের জন্ম হয়েছে—তাকে অনেকেই অশ্লীলতার পর্যায়ে ফেলতে চান। রিয়ালিষ্ট সাহিত্যিকগণ মানুষের জীবনে আদর্শ ও কল্পনার প্রয়োজন স্বীকার করেন না। বাস্তব সত্যই তাদের সাহিত্যের উপাদান। বাস্তবের যে কঠিন রূপ, যে সমস্যার আমরা নিত্যসম্মুখিন হচ্ছি তাকে এড়িয়ে না গিয়ে তার রূপায়নই সাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক। এটা বাস্তব সত্য সুন্দর নাও হতে পারে। সুতরাং তাকে যে সুন্দর করেই প্রকাশ করতে হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যেও এই রিয়ালিজম আজ জুড়ে বসেছে। বাংলা সাহিত্যেও এই বাস্তবতার প্রতি নিষ্ঠা এক শ্রেণীর লেখকের মধ্য দেখা যায়। এরা যদি অভিযোগের সম্মুখীন হন তাহলে—এরা বাস্তবতার নামে দুর্নীতপরায়ণতা, যৌন আকর্ষণের অসঙ্কোচ প্রকাশ ও অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা পূর্ণ সাহিত্যের সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করান। অবশ্য আধুনিক সাহিত্যে যে যৌনবিকার ও যৌন আকর্ষনের চিত্র পাওয়া যায় তা অনেক সময় লালসার উদ্রেক করে না বরং পাঠকের মনে ঘৃণারই উদ্রেক করে। মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা বৃত্তি আছে তাকে কল্পনার রঙ্গীন আভরণে আকর্ষনীয় না করে তার নগ্নরূপ চোখের সামনে তুলে ধরা। এ-মনোভাব যদি সক্রিয় থাকে তা হলে তাকে অশ্লীল বলা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। যৌন আলোচনা থাকলেই যে সাহিত্য অশ্লীল হবে, এ-কথা যেন আমরা না ভাবি।

দেখতে হবে সে রচনা কতখানি মানুষের কল্যাণ কামী। কেবল মাত্র নৈতিকতার জয়গান করলেই তা সাহিত্য হয় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ হল—সবকিছু ধারণ করেও সে হবে অমলিন—চিরন্তন। ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি তার মহনিয়তা নষ্ট করতে পারবে না।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই। রুশ সাহিত্যিক ডয়ভাস্কির বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট"-এ লেখক সোনিয়া নামে একটা মেয়ের ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ-ভাবে একটা জীবনের কাহিনী বলাই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। একজায়গায় সোনিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—I bow not to thee, but to the saffering humanity in you.

সাহিত্যে অশ্লীলতা বিচারের মাপকাঠি এটাই হওয়া উচিত। মানবজীবনের কল্যাণকামী না হয়ে যে সাহিত্য কেবলমাত্র যৌন আকর্ষণ, যৌন বিবাহের চিত্র উদ্ঘাটন করবে—সে সাহিত্য অবশ্যই অশ্লীল—তা বর্জনীয়।
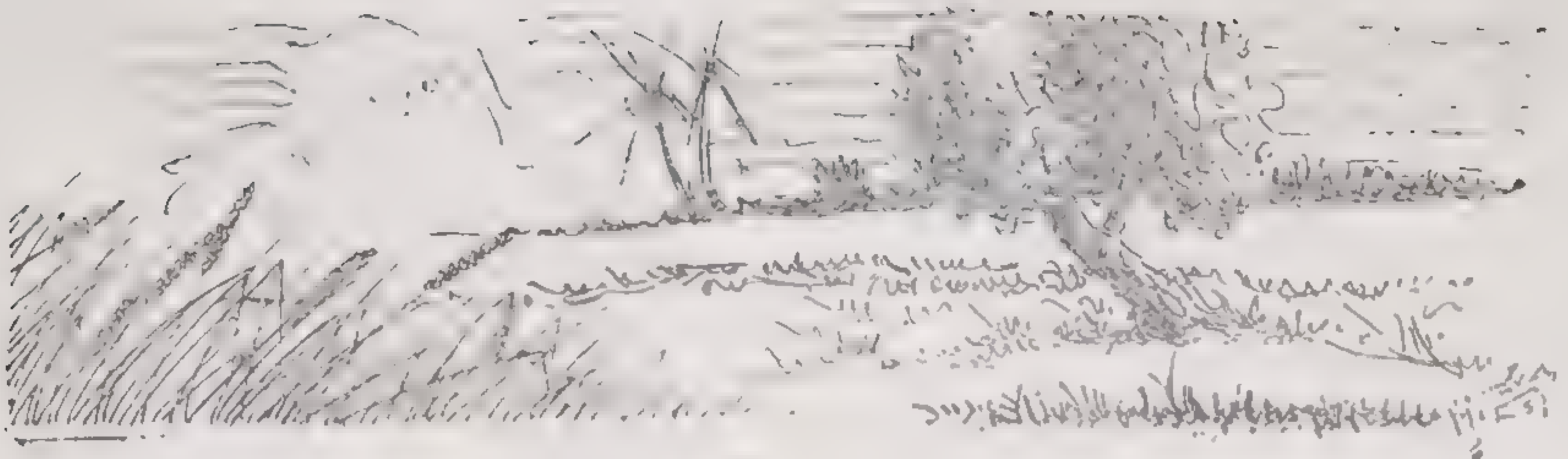
যোগাযোগ

আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ

জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম !
ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ,
নীরব সবুজ মাঠ।
কোথাও ছায়া নেই। এক টুক্‌রো—
মেঘেরও ছায়া নেই। নীরব জলধারা।
সেদিনের সেই মেয়েটা,
কপালে ঝিঁ ঝিঁ পোকার টিপ্‌ পরে
সবুজ শাড়ী-গলায় জড়িয়ে
কচুরী পানার মালা হাতে নিয়ে
হাসি হাসি মুখে ঃ
আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল।
তুমি যেন আজ এই নির্জন দুপুরে
পিঠ উপুড় করে চুল শুকাচ্ছো···
তোমায় বিরক্ত কর্‌ব না।

কুৎসা রটানো সহজ কাজ—
মেয়েদের নামে কুৎসা রটানো আরো সোজা
যে রটায়, সে বড় দুর্বল,
জীবনের সব ক্ষেত্রে তার পরাজয়।
আমায় দুর্বল করোনা···
ক্ষমতা দখলের লড়াই এটা নয় ;
বরং ঘোলা পানিকে পরিষ্কার করে
তোলার চেষ্টা কর। যৌবন-দিন অপগত প্রায় !
পৃথিবীর গভীর থেকে ঃ

তুমি বেরিয়ে এসেছ। কোন নোংরা
নেই তোমার বুকে।
নোংরা-টুকু অনেক আগেই
পৃথিবীর মাটি টেনে নিয়েছে
নিজের মধ্যে। তুমি ঝরনা-ধারা !
আমার কাছে তুমি মেয়ে নও ;
তুমি আমার যোগাযোগ ঃ কাব্য-কলা····
পৃথিবীর মাটির মত তুমি আমার—
দুঃখ কষ্টকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছ
অন্তরের গভীর থেকে সহানুভূতির
এক নির্মল ধারাকে উৎসারিত করেছ,
হে সাথী আমার !

পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি মানুষ তুমি
যাকে কষ্ট দিব, ঝগ্‌ড়া কর্‌ব যার সাথে।
আদর করব যাকে। বরং সম্ভব হলে—
তোমার জয়ের নিশান উড়িয়ে দাও ঃ
তোমার ঐ শাড়ীর আঁচল্‌ খানা
জীবনের মাঝখানে আর দাঁড়াব না।

বাতায়ন

ইব্রাহীম খাঁ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

নির্বাসনের প্রস্তাব

আমার উপর পুলিশের নজর খরতর হয়ে উঠল। ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন তখন সুরেশ ঘোষ। মস্ত বড় কর্মী ও বিপ্লবী নেতা বলে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। তাঁর কংগ্রেস অফিসে মাঝে মাঝে যেতাম, কংগ্রেসের সভায় যোগ দিতাম, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতাম। তিনি আমায় সন্ত্রাসবাদের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করলেন; আমি রাজী হলাম না। তারপর তিনি আমার পাছে লাগালেন ক্ষিতীশ বসু নামক আর একজন সন্ত্রাসবাদীকে। ক্ষিতীশ বসুর বাড়ী ছিল নারাইন্দা—আমাদের বাড়ীর কাছে। তাঁরা দুই ভাই তখন কংগ্রেসে। সন্ত্রাসবাদীদের নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে আলাপ করতে করতে একদিন ক্ষিতীশ বাবু বল্লেন—'শুনুন তবে আমাদের নিজেদের একটি কথা। আমরা তিন সহোদর ছিলাম বোমা-পিস্তলের দলে। কিছুদিন পর আমাদের পার্টি সন্দেহ করল যে আমার ছোট ভাই পুলিশের কাছে আমাদের খবর সরবরাহ করছে। পার্টির গোপন সভা বসল। তারা অবশেষে ঠিক করল: 'আমার ছোট ভাইকে হত্যা করতে হবে, এবং সে হত্যা আমার হাত দিয়েই করতে হবে; আমার মেজ ভাই থাকবে সে হত্যায় শরীক'। দলের আদেশ শিরোধার্য্য করে নিলাম। একদিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বেড়াতে চল্লাম। বেড়াতে বেড়াতে সাহেব পল্লী পার হয়ে উত্তরে সরে গেলাম। তারপর আমি হঠাৎ আমার ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার কপালে গুলী করলাম। এক গুলীতেই সব শেষ হয়ে গেল। আমার মেজ ভাই ছাড়া আরো তিনজন আমার সাথী ছিল। আমরা পাঁচজন তখন ছুরি নিয়ে বসে গেলাম। ভাইয়ের সমস্ত শরীর টুকরা টুকরা করে কেটে অনেকগুলি থলিয়ার মধ্যে পাথরসহ ভরে ব্রহ্মপুত্রের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দিলাম।

কিছুদিন পরের কথা। রাত্রি অনুমান দশটা। আমি ও মৌলভী আহছান উল্লা আমার ভিতরের ঘরে বসে 'ইছলাম সোপানে'র পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করছি। আমাদের চার পাশে বিছানায় ছড়ানো রয়েছে কোরানের বিভিন্ন তফছীর, হাদীছের বিভিন্ন কেতাব। এমন সময় সেখানে অতর্কিতে গিয়ে হাজির হলেন ছৈয়দ এমদাদ আলী। বহুকালের পুরানো সাহিত্যিক, তখন গুপ্ত পুলিসে কাজ করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—

'এমন অসময়ে এত বড় মেহম্যন কেন?

'অসময়ে নয়, সুসময়ে। বোমার বই লেখেন, না ধর্মের বই লেখেন, তা দেখার সুযোগ হল।

'কিন্তু কখন্ এসে পৌঁছলেন? খাওয়ার কি করব?

'খাওয়ার কিছুই করতে হবে না। পাঁচ দিন হয় ময়মনসিংহ এসেছি, আর এ কয়দিন আপনার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।

'মানে?

'বলি, ময়মনসিংহ হতে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীকে নির্বাসনে পাঠান হবে কথা হয়, তার মধ্যে একজন আপনি।

'বাঃ রে! তা হলে সত্যি বড় হয়ে গেলাম আমি?

'না, বড় হতে পারলেন না। রিপোর্ট এখান থেকে গিয়েছে দুটি; তার একটিতে আপনি সন্ত্রাসবাদী, আর একটীতে নন।

'তারপর?

'এ নিয়ে কলকাতার হেড্ অফিসে অনেক আলোচনা হয়। অবশেষে ঠিক হয় আমি এসে স্থানিক অনুসন্ধান করে আসল কথা বের করি।

'আসল কথা কি পেলেন?

'বহু অনুসন্ধান করলাম। আপনাকে কংগ্রেসী পেলাম, খেলাফতী পেলাম, রায়তী পেলাম, আল-হেলালী পেলাম; কিন্তু সন্ত্রাসবাদী পেলাম না।

'অতএব?

'অতএব, বাঁধ নীড়, থাক সুখে। বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ আমরা আপনাকে দিলাম না।

সন্ত্রাসবাদী আমি সত্যি নই; তবু বার বার বন্দী জীবনের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি দুঃখিত'।

এর কয়েকদিন পর সুরেন ঘোষ ও ক্ষিতীশ বসুকে ওরা ধরে মান্দালয় পাঠিয়ে দিল। যতদূর মনে পড়ে সুভাষ বসুও ঐ সময় মান্দালয় গেলেন।

আমার দিন চল্ল। তবে বড় ধীরে।

শান্তির অভাব

পশার বাড়ল। মাসে শ দুই টাকা পেতে লাগলাম।

তুলার মাকে বাসায় নিয়ে এলাম; সাথে তুলা আর শুজা। তখনকার সস্তা বাজার—আমার ছোট্ট সংসার, বাইরে অভাব রইল না। কিন্তু মনের অভাব রয়েই গেল। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের বিরুদ্ধে একটা দেওয়ানী আপীল পেলাম। অপর পক্ষে দাঁড়ালেন ময়মনসিংহের অপ্রতিদ্বন্দী উকীল সারদা ঘোষ। মামলায় জিতলাম। যাঁরা জানলেন তাঁরা বাহবা দিলেন। একটা খুনী মামলা পেলাম। এত অল্প দিনের ওকালতীতে খুনী মামলা মিলে না। আমি ভাগ্যগুণে পেলাম; ভাগ্যগুণে জিতেও গেলাম। আবার এক প্রস্থ বাহবা পেলাম। কিন্তু মনে পরিপূর্ণ শান্তি পেলাম না। খুনী আসামীর মামু মামলার তদ্বির করতেন। মুনশী মানুষ—সাদা দিল। আমি চুপকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলাম না। কি জানি, যদি বলেন যে সত্যি খুন করেছে, তখন আসামীর পক্ষে জোরে কিছু বলতে পারব কিনা কে জানে? আসামী খালাস হলে জিজ্ঞাসা করলাম। বল্লেন—'খুন সত্যি করেছিল। তবে খুন করার সঙ্গত কারণ ছিল। আসামী চাকরী করত রেঙ্গুনে, স্ত্রী থাকত বাড়ীতে। অনেক দিন পর বাড়ী এসে দেখে ·····। আমি ভাবলাম, সব রকম খুন দোষের নয়, এ-সত্যি; কিন্তু কোন্ খুনীকে ন্যায়ত বাঁচাতে চেষ্টা করব, আর কাকে করব না, তা ঠিক করা কি সহজ? যদি সহজ না হয়, তবে সঙ্গত সন্দেহ স্থলেও কি তাকে সত্য বলে চালিয়ে নিতে হবে?

এহ্‌দেনা ছেরাতুল মুস্তাকিম
প্রভু!
এহ্‌দেনা ছেরাতুল মুস্তাকিম।

একটা নিদারুণ প্রশ্ন

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। করাচী থেকে বিকালে ফিরেছি। সেদিন কুড়িটা টাকা পেয়েছিলাম। তুলার মার হাতে টাকা কয়টি দিয়ে বল্লাম—'আলাদা রেখে দাও ঐ দিয়ে শুজার আকিকা করো।' টাকা কয়টি হাতে নিয়ে তুলার মা আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন, তারপর শান্ত মৃদু কণ্ঠে বাস্তব তীর বুক পার হয়ে কলিজার গোড়ে গিয়ে বিঁধলে কেমন লাগে জানিনা; কিন্তু কথার তীর বুক ভেদ করে কলিজায় গিয়ে বিঁধলে কেমন লাগে তা সেদিন অনুভব করলাম। মর্মন্তুদ ব্যথার সঙ্গে ডাকলাম—'আমার সহধর্মিণী দুনিয়ার সব চেয়ে আমার আপন—তাকে হালাল রুজী খাওয়ানের প্রতিজ্ঞা করে গ্রহণ করেছি—তারো মনের গহীন কোণে এ-নিষ্ঠুর সন্দেহ জেগে আছে যে আমি তাকে হালাল রুজী খাওয়াচ্ছি, না হারাম রুজী খাওয়াচ্ছি। সে-কথা মুখ ফুটে এত দিন কয় নাই; কি বা জবাব দেই হয়তো সেই ডরে কইতেই সাহস পায় নাই। আজ একটা ধর্ম কাজের মুখোমুখি হয়ে আর আত্মগোপন করতে পারে নাই'। গম্ভীরভাবে বল্লাম—'আমি এখনো মিছা কথা শুরু করি নাই; আর মামলাটা মিছে এ-কথা আগে জানলে যে আমি মামলা নেইনা। টাকা রাখ; ও আমার হালাল রুজী, ওতে আকিকা হবে'। আমার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস; নীরবে উঠে গিয়ে টাকা রেখে দিলেন। কিন্তু আমার কানে বার বার ধ্বনিত হতে লাগল সেই করুণ কণ্ঠের নিদারুণ জিজ্ঞাসা: 'ওকালতীর টাকায় আকিকা চলবে তো'?

নতুন অধ্যায়ের সূচনা

১৯২৫ সনের ডিসেম্বর। বড় দিনের ছুটি। আমি করটিয়ার অন্যতম উকীল ছিলাম। কি একটু কাজ ছিল মনে নাই, তাই নিয়ে করটিয়া গেলাম। চাঁদ মিঞা সাহেব তাঁর ওখানে রাতে খেতে আমাকে দাওয়াত করলেন। ছেলেকে ডেকে বল্লেন—'নওয়াব' তুমি এস্কেন্দর মিঞাকে নিয়ে আলাদা বসে খাও, আমরা দুজন আজ আলাদা বসব'।

খেতে বসে আলাপ শুরু করলাম। খিলাফত আন্দোলনের পরিণতি, অসহযোগের ফলাফল, দেশের ভবিষ্যত ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চল্ল। খাওয়া শেষ হওয়ার পরও ঘণ্টা দুই আমরা ঐ আলাপেই মশগুল রইলাম। বাইরে সমস্ত প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ; কেবল আকাশে তারারা জেগে আছে। আর ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় পাতায় ভিজা জোছনা চিক মিক করছে। এই পরিবেশের মধ্যে আমরা বসা। উর্ধের চাঁদের টানে নিম্নের চাঁদের চিত্ত সাগরে বুঝি সেদিন জোয়ার জেগে উঠল। আমি দেশ বিদেশের মানব-হিতৈষী মহাপ্রাণদের কথা বলে চল্লাম; তিনি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি ধরা গলায় বলে উঠলেন—'হেডমাষ্টার সাহেব (আমি তাঁর কাছে তখনও হেডমাষ্টার সাহেব) ঘরের লাখ লাখ টাকা শরীকী মামলায় উড়িয়ে দিলাম; তার পরো পরিশোধ করলাম পনর লাখ টাকার ঋণ! ওহ্! যদি দেশের কাজে এই টাকাগুলি দান করতাম'। তিনি কেঁদে ফেল্লেন।

অনেক রাতে বিদায় হলাম। বল্লেন—'কাল ভোরে আসবেন, এক সঙ্গে চা খাব'।

ভোরে চা খেতে বসে আবার সেই আলাপ—দেশের সেবা, ধর্মের সেবা, কওমের খেদমত, মুছলিম জগতের ভবিষ্যৎ।

হঠাৎ তিনি বল্লেন। হেড মাষ্টার সাহেব, দেশে শিক্ষ

না হলে তো চলবে না। হাই স্কুলটা চলে গেছে। ইতিমধ্যে একটা মাদ্রাছার পত্তন হয়েছে। মাদ্রাছা বেঁচে থাক, কিন্তু হাই স্কুলটা আবার চাই।

'আমি হুজুরের এ-মত সমর্থন করি।

'বেশ, তবে স্কুলটা করার ভার আপনি নিন।

'তা নিতে রাজী আছি। দিন পনর বিশেকের মধ্যে আমি সব ঠিক ঠাক করে দিয়ে যেতে পারব।

'আবার যাবেন কোথায় ?

'কেন, ময়মনসিংহ ?

'আমি যে আপনাকে এখানে স্থায়ীভাবে চাই। আপনি আবার হেডমাষ্টার হয়ে এখানে থাকুন।

'সে হয়না, হুজুর ; তা পারিনা।

'কেন পারেন না ? কত আপনার ওখানে রোজগার ? কত বেতন দিলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে আসতে পারেন ?

বেতনের কথা তো এখানে বড় কথা নয়। হুজুর ; আসল ব্যাপার হল এই যে হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী নিয়ে আমি তৃপ্ত থাকতে পারি না। এখানে যে তখন মাষ্টারী নিয়েছিলাম সে তো নিতান্ত সাময়িক ভাবে।

'তবে কি ভাবে আপনাকে আমি এখানে পেতে পারি ?

'একটা কলেজ যদি করেন, তবে আমি আসতে পারি।

'বলেন কি, কলেজ ?

'হ্যাঁ, কলেজ !

'এই পাড়া গাঁয় কলেজ হতে পারবে ?

'হুজুর খরচের ভার নিন, আমি কলেজ করে দেওয়ার ভার নেই। যদি কলেজ করতে পারি, আমি কলেজে চলে যাব, যদি তা না পারি তবে আমি স্কুল নিয়েই তুষ্ট থাকব।

'বেশ আমি খরচের ভার নিচ্ছি।

'আমিও কলেজ করে দেওয়ার ভার নিলাম।

ম্যানেজার সাহেব ও ছৈয়দ সাহেবকে ডাকিয়ে চাঁদ-মিঞা সাহেব আমাদের কল্পনার কথা বল্লেন। ম্যানেজার সাহেব চমকে উঠলেন। মাথা ঝেঁকে বল্লেন—'হুজুর ঋণের শেষ কিস্তিটা এই মাত্র দিলাম, আবার এখনি এই শ্বেত হস্তীর ভার নিতে আমি ভরসা পাইনা। এতে বিপদ হবে।' ছৈয়দ সাহেব বল্লেন 'আমি হেড মাষ্টার সাহেবের সাথে আলাপ করে তারপর বলি' তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। বল্লেন—'আমাকে বুঝিয়ে বলুন এই অদ্ভুত পরিকল্পনার কথা'। আমি তাঁকে বল্লাম। অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলাম যে বছর হাজার দশেক টাকা হলেই কলেজ চলবে। তিনি আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বল্লেন—'পারব, হুজুর, কলেজ চালাতে পারব। চাঁদ মিঞা সাহেব বল্লেন—'ম্যানেজার সাহেব, আমরা একটা মহৎ কাজের হাউস করেছি, আপনি এতে বাধা দিবেন না'। ম্যানেজার সাহেব বল্লেন—'আচ্ছা হুজুর, আমিও কলেজের পেছনে ষোল আনা খাটব'।

'আল হামদুলিল্লাহ্'

সেই দিনই স্কুলের পুরাতন শিক্ষকগণকে তার করে দিলাম আমি এসেছি—হাই স্কুল, ২রা জানুয়ারী খুলছে—আপনারা এসে কাজে যোগ দিন।' প্রায় সকলেই কাজে এলেন। স্কুল চালিয়ে দিলাম—হেড মাষ্টার আমি। কয়েক দিন পর আমি আর ম্যানেজার সাহেব কলকাতা চল্লাম—কলেজের তদ্বিরের জন্য। আমার পরিবার ময়মনসিংহই রয়ে গেল।

কলকাতা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে খুব উৎসাহ পেলাম। ফিরে এসে ময়মনসিংহ গেলাম—বিদায় হয়ে আসতে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বাধা দিলেন। বল্লেন—'কেন তুমি যাও ? ময়মনসিংহের ভবিষ্যৎ নেতা তুমি', পাবলিক প্রসিকিউটার, ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান, আঞ্জুমনের সেক্রেটারী—মৌলভী ইছমাইলের পর তো এ-সব পদ একচেটিয়া তোমার।' তাঁদের আন্তরিকতার জন্য চোখে পানি নিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের দোওয়া চাইলাম। টাঙ্গাইল দিয়ে চলেছি, অমর ঘোষ ডেকে বল্লেন—'কেন এমন করে পায় কুড়াল দিচ্ছ ? জমিদারের সখ গড়ে তিন বছরের বেশী টিকেনা ; তারপর মন অন্য পথে যায়। কলেজের এ শখের দশা তাই-ই হবে'। আমি বল্লাম—দাদা আশীর্বাদ করুন আমি এ সম্ভাবিত বিপদ মনে মনে বরন করেই এসেছি। আমি চেষ্টা করে দেখব।

পরিবার বাড়ীরেখে স্থায়ীভাবে করটীয়া চলে এলাম। জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হল।

আবার করটিয়ায়

কিছুদিন আগে যে মাদ্রাছাটি আরম্ভ হয়েছিল, তাকে রোকেয়া নাম দিয়ে হাই মাদ্রাছা করা হল। হাই স্কুল সুন্দর ভাবে চল্ল। কলেজের আয়োজনে আমরা মন প্রাণ ঢেলে দিলাম।

চাঁদ মিঞা সাহেব যেন এক নব জীবনের মন্ত্রে মেতে উঠেছেন। যখনই দেখা হয়, স্কুল কলেজ মাদ্রাসার আলাপ। আমিও তার কাছে বড় বড় ত্যাগ, বড় বড় আদর্শের কথা বলে তাঁর এই কল্যাণ অভিসারী প্রেরণাকে সঞ্জীবিত করে তুল্লাম। তাঁর কাছে বল্লাম মুহম্মদ মুহছীনের বিরাট ত্যাগের কথা, স্যার রাস বিহারী ঘোষ, স্যার পি, সি, রায়, স্যার টি পালিতের মহান দানের কথা, স্যার ছৈয়দ আহমদের আমরণ সাধনার কথা।

একদিন তিনি বল্লেন—'আমার সম্পত্তিটা ওয়াকফ

করে দিতে চাই। আমাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি দলীলটা করে নিন'। ম্যানেজার সাহেব, ছৈয়দ সাহেব আর আমি দলীলের মুসাবিদায় লেগে গেলাম। শেষ দেখে দিলেন জাষ্টিস নছীম আলী।

ছাদত কলেজ

জুলাই মাসে কলেজের উদ্বোধন হল। তাঁর দাদার নাম ছিল ছাদত আলী খাঁ। কলেজের নাম দেওয়া হল ছাদত কলেজ। সেই সঙ্গে চাঁদ মিঞা সাহেবের ওয়াকৃফ সম্পত্তির দলীল ও সম্পাদিত হল। সর্ব প্রকার খরচ বাদ দিয়ে সম্পত্তির বার্ষিক নেট উদ্বৃত পাওয়া গেল আশী-হাজার টাকা। এই আশী হাজারের বিশ হাজার রাখা হল চাঁদ মিঞা সাহেব ও তার ওয়ারীসানের প্রতি পোষের জন্য, আর সিকি বরাদ্দ করা হল স্কুল কলেজ মাদ্রাছা ডাক্তার খানা মসজিদ ও অন্যান্য প্রকার সব কাজের জন্য। আর অর্ধেক দিয়ে নতুন সম্পত্তি কিনে তারও আয় জনহিত কর কাজে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হল। সে ওয়াকৃফ দলীলের দরবারে টাঙ্গাইল টাউন ও আশে পাশের সমস্ত গণ্য মান্যগণকে দাওয়াত করা হয়েছিল। আজো মনে আছে সে দরবারে কি বিপুল আনন্দ উল্লাসের সঞ্চার হয়েছিল। প্রত্যেকের চোখে সেদিন ভাসছিল এক নতুন ভবিষ্যতের পুলকময় ছায়া। স্কুল কলেজ ও মাদ্রাছার তরফ হতে চাঁদ মিঞা সাহেবকে আমরা একটা অভিনন্দন পত্র দিলাম। রচনা করলাম আমি। রচনা চাতুর্যের জন্য নয়, কি ভাব সেদিন আমাদের বুকে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তারই কিঞ্চিৎ পরিচয়ের জন্য তার অনুলিপি নীচে দেওয়া গেল :

মনে পড়ে
দাঁড়াইয়া আজি
তের শত বৎসরের অস্ত গিরি পরে
মনে পড়ে!
মনে পড়ে যুগান্তের করুন কাহিনী
তখনো মহিতে ছিল পাপের বাহিনী
অনর্গল
ধরাতল।
নিভেছিল মিসরের আলো
হিন্দুর হোমাগ্নি শিখা হয়েছিল কালো
বিতণ্ডার ধূম্র জালে
গিরীশ বোমের ভালে
জ্ঞানের তিলক লেখা গিয়েছিল মিশি
অন্ধ দশ দিশি!
সহসা সে পুঞ্জীভূত তমসারে নাশি
দাঁড়াইলা আসি
মানবের মুক্তি-বাহী ঋষি
জ্ঞানের তপন হাতে
সেই সাথে
পোহাইল জগতের দীর্ঘ অমানিশি।
আজ
জাগে মন মাঝ
দামেস্কের কথা
বোখারা, বাগদাদ, কায়রো, গ্রানাডা কর্ডোভা
যথা তথা
ইছলামের শান্ত ছায়া তলে
দলে দলে
মিলিল কোবিদকুল, সুধীজন সভা।
মনে পড়ে
ইছলামের অভিজাত পরে
জ্ঞানের অতৃপ্ত প্রীতি
নিতি;
আজো কানে বাজে
তার সভা মাঝে
শাস্ত্রের বচন সুধা গজলের গীতি।
তার পর
যত অভিজাত ঘর
কি কুক্ষণে
কে বা জানে?
ভুলিল জ্ঞানের তৃষা।
কেহবা বিলাস স্রোতে দেহ দিল ঢালি
স্বীয়
কীর্তি কিরীট ছাড়ি উপাধির ডালি
ধরিল মস্তকে কেহ
পরকীয়।
অহর্নিশ
ঝংকৃত মজলিস
হল খালি
ধীরে
লিল ঘিরে
তমসার ছায়া, বঙ্গে এল অমানিশা।
হায়
দিন যায়!
কতজন জাগে
ছুটে চলে আগে,
বক্ষ কতই উঠিল আকুলি আশা বেদনার ঘায়!
শূন্য গোলাব বাগে
বুলবুল-গীতি কবে বা সহসা কর্ণে আসিয়া লাগে

দীপকের নব রাগে
এ-ঘোর তমসা হায়!
কবে বা কাটিয়া যায়!

খোশ আ-মাদ।
ওকি উল্লাস নাদ?
ওরে আয় আটীয়ার চাঁদ
ওই বুঝি দেখা যায়
গগনের গায়!
দীর্ঘ উপ্ত সাধ
আজি বুঝি তোর ফুল হয়ে ফোটে মন্দ মলয় বায়!
ওঠ
ওরে ওঠ!
বাংলায় আজি নওরোজ তোরা
দলে দলে এসে জোট,
উৎসব ঘর মুক্ত হোথায়
হল্লা করিয়া ছোট।
তারপর দুই হাত
তুলিয়া আজিকে আল্লার কাছে
কর এই মোনাজাত:
রহীমের রহমান
আটীয়ার চাঁদ অক্ষয় হোক
অম্লান যশ মান।
সফল হউক সাধনা তাহার
দেহ বিভু এই বর,
করটীয়া বুকে জাগিয়া উঠুক
বঙ্গের আলীগড়।
রাব্বুল আলামিন
তাই হোক, প্রভু, তাই হোক
আমিন।

কেরানী নওসের মিঞা

স্কুল ছেড়ে প্রিন্সিপাল হয়ে কলেজে গেলাম। যাওয়া কালে স্কুলের তিনজন বায়না ধরল, আমার সঙ্গে কলেজে যাবে। তাদেরে নিলাম। তারা ছিল—একজন কেরানী নওসের আলী মিঞা। অসাধারণ তাঁর স্মৃতি শক্তি। অসাধারণ তাঁর শ্রম শক্তি। অসাধারণ তাঁর কর্তব্য পরায়ণতা। বহু বৎসর পর্যন্ত ইঁনি কলেজ অফিসের কাজ চালিয়েছেন; কোন দিন এমন ভাষায় নালিশ করেন নাই যে এ অতোলা বোঝা আর বইতে পারি না। অথচ বোঝা তাঁর মাঝে মাঝে সত্যি অতোলা হয়ে উঠত। কলেজের হিসাব ময়মনসিংহ হতে লোক নিয়ে অডিট করাতাম; সে অডিটারের মুখে কোন দিন কেরানীর হিসাবের নিন্দা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। ক্ষুদ্র বেতনের ক্ষুদ্র কেরানী; কিন্তু করটিয়া কলেজের গঠন কাজে তাঁর দান ক্ষুদ্র নয়। আজো তাঁকে কৃতজ্ঞ প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি।

দ্বিতীয় জন দফতরী মীর নওসের আলী। ভদ্র ঘরের ছেলে, ভদ্র চেহারা, ভদ্র ব্যবহার, তাঁর সৌজন্যের অভাব সম্বন্ধে কোন দিন কোন নালিস আমার কানে আসে নাই। তার মত একজন বিচিত্র কর্মী আমার চোখে বেশী পড়ে নাই। কলেজের কাজ ছিল তার অনিন্দ্যনীয়। এর উপর বন্দুক শিকারে, বড়শী শিকারে সে ছিল ওস্তাদ সঙ্গী। বন্দুক ছাফ করা, পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে শিকারের পাখি ধরা, বড়শী পছন্দমত খরিদ, সূতা তৈয়ার, ছিপ বানান, চার প্রস্তুত, বড়শীতে আটকানো মাছ তোলা—নওসের মিঞার দৌলতে করটিয়া থাকা কালে এ সবের জন্য আমাকে কোন দিন ভাবতে হয় নাই।

কলেজকে নওসের মিঞা বোধ হয় জানের চেয়ে ভাল বাসত। নওসের মিঞার কঠিন অসুখ; জোর করে সবেতনে ছুটি দিয়েছি, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেছি, অথচ দেখি, নওসের মিঞা চুপে চুপে কলেজে এসে হাজির। হঠাৎ সামনে পড়েছে, ধমক দিয়েছি—'কেন বাড়ীতে বিশ্রাম না করে এখানে আস?' টলমল করুণ চোখ তুলে বলেছে: 'হুজুর, পারিনা যে এখানে না এসে। আমাকে দৈনিক একটা বার এখানে আসার অনুমতি দিন, নইলে আমি বাঁচবনা।'

নওসের মিঞা সত্যি বলেছিল।

তৃতীয়জন রক্কু। পশ্চিমা বেহারা—বিরাট জোয়ান আগে পালকী বইত। এখন বুড়ো—পারে না; স্কুলে পানি দিত, কলেজেও সেই কাজে আসে। আমি ছাড়া স্কুল কলেজের আর কাউকে সে পরোয়া করতনা। বয়স আশীর উপর, কাজের ত্রুটি মাঝে মাঝেই হত। কিন্তু অধ্যাপকেরা সেজন্য কিছু বললে সোজা জওয়াব দিত, 'হুজুর, হামি চাঁদ মিঞা সাহেবের মায়ের বিয়া দৈছি; হামি ম্যানেজার সাহেবকে করটিয়া আনছি' অর্থাৎ ঐ সময় সে তাঁদের পাল্কী বয়েছিল। রক্কুর একটি নাতি ছিল, নাম গত। আমার উৎসাহে সে গতকে স্কুলে পড়তে দিয়েছিল। আমি যখন কলেজে আসি সে তখন প্রাইমারী ক্লাশে পড়ে। রক্কু আমার কাছে এসে বল্ল—'হুজুর যখন কলেজে যাইহন, গতও তবে কলেজে ভর্তি হয়ে যাক।' সকলে শুনে হাসল। আমি হাসতে পারলাম না। আমার উপর এই যে তার অটল অবুঝ বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে মনে মনে ছালাম জানালাম। মনে পড়ল এমনি আর একটি ঘটনার কথা। এক পশ্চিমা বেহারা বিহার

হতে পার্শ্বী বইতে এসেছে। বাড়ী টাকা পাঠাবে। মনি অর্ডারের ফরম হাতে নিয়ে এসে হাজির, আমাকে দিয়ে লেখাবে। এক, দুই, তিন, চারজন শিক্ষক তাকে খোশামুদী করেছেন: 'দাও, আমরা লিখে দেই, উনি এখন কাজে ব্যস্ত।' সে বলেছে 'উনি এখন ব্যস্ত থাকেন। দেরী করব, কিন্তু লেখাব ওঁকে দিয়েই; নইলে আমার টাকা ঠিকমত যাবে কেন?

বাবুর্চী

আমি স্কুল ছেড়ে এলে সেখানে হেড-মাষ্টার হলেন আবুল খায়ের চৌধুরী। মাদ্রাছার সুপারিন্‌টেনডেন্ট হয়ে এলেন খোন্দকার তজম্মুল হোসেন। আমরা তিন জন আর মৌলভী আহছানুল্লা মিলে এক মেস করে খেতে লাগলাম। আমরা একটি বিচিত্র বাবুর্চী পেলাম। পাতলা, কালো, বেটে নাক—কোন কথার উত্তর দিতে তার এক সেকেণ্ড দেরী হত না। হয়তো বলতাম: 'হাকিম, ডালে এত ঝাল কেন? তৎক্ষনাৎ উত্তর আসত—'হুঁজুর, মোটে দুইটা মরিচ দিয়েছি। মরিচগুলা বেঁহদ্দ ঝাল।' বল্লাম—'হাকিম, ভাতে যে চাল আছে?' উত্তর—'হুঁজুর, চাঁলগুলা ভারী খারাপ—জাল দিয়ে দিয়ে হয়রান।' আমরা তার টেকনিক বুঝে নিলাম। এরপর ডালে নুন বেশী হলে বলতাম, 'হাকিম, ডালে নুন হয় নাই কেন?' হুঁজুর, তিন তিন বার নুন দিলাম। হুঁজুর, ওদের নুনে অর্ধেক নুন অর্ধেক বালু। হাকিম একদিন বছর আটেকের একটি ছেলে সাথে নিয়ে এল। বল্লাম—'হাকিম, এ আবার কে?' 'হুঁজুরে গরে গোলাম। ওর মায়না লাগবেনা; মসলাটা বেটে দিবে; ভাত যদি বেঁচে যায়, তবে দুটু খাবে।' কয়েক দিন পর দেখি সাথে তার একটি মেয়ে—বছর দুয়েকের। সে আমাদের সম্পূর্ণ অভয় দিয়ে বল্ল যে মেয়েটিরও কোন বেতন লাগবেনা; সে তরকারীটা কুটে দিবে, ভাত খাবে, নয় খাবে না। আর কয়দিন পর হাকিম বাবুর্চী নিয়ে এল তার গাই। বুঝিয়ে বল্ল—'ভাতের ফেনটা ফালানি যায়, গাইটা তাই খাবে।' হিংসুকেরা বলত, অতঃপর ফেনের সাথে কেমন করে ভাতও চলে যেত!

মেট শুকরা

হাকিম একা পারেনা। তার একটি মেট রেখে দিলাম। বিরাট তার দেহ। মাথা তার সেই অনুপাতেই ছোট। খড়ি ফাড়ে, বাজার আনে, গোছলের পানি দেয়, মসলা বাটে, আমাদের তামাক সাজে। আমরা কেউ ডাক দিলে 'হুজুর' বলে হুঙকার দিয়ে উঠে, তারপর এমন দৌড় যে সামনে হাড়ি-পাতিল পড়লে তা চুরমার হয়ে যায়। পায়ে লেগে বদনা দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে। একদিন খবর এল, বাবুর্চীর জ্বর, শুকরাকে রান্না করতে বল্লাম। খেতে বসে দেখি খাওয়ার একেবারে অযোগ্য। ঠাট্টা করে বল্লাম—'শুকরা মিঞার রান্নাতো আল্লার ফজলে ভাল হয়েছে।' পরদিন খবর এল বাবুর্চীর অসুখ যায় নাই। কিন্তু শুকরা কৈ? তাকে ডেকে পাঠালাম। দেখা গেল সে ছহীছালামতে বাড়ীতে বসে আছে। ডাকার উত্তরে বল্ল: 'আমি যে রান্না ভাল করি তা তো কাল বড় সাহেব বলেছেনই। এখন আমার মায়না বাড়িয়ে বাবুর্চী করে না দিলে আমি কিছুতেই ও দিকে পা বাড়াব না।'

ঠেকা পদে

এমন ঠেকা হলে মৌলভী সাহেব বাজার করতেন, সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব বাজার করতেন। আমি সালুন চেখে দেখতাম, হেড্‌মাষ্টার সাহেব পাহারায় থাকতেন যাতে আমি সালুনের পাতিল উজাড় না করি। বাবুর্চী তাঁর কাছে একদিন দুর্নাম করেছিল যে, আমি চাখতে চাখতে নাকি একা একসের খাসীর গোশ্‌ত কাবার করে ফেলেছিলাম। হেড্‌মাষ্টার সাহেব চৌধুরী মানুষ তো, তাই চৌদিক রক্ষা করে পাহারা দেওয়ার জন্য তাঁর একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল। এক দিনের কথা। তিন দিন জ্বরে ভুগে উঠেছি: পেটে নিদারুণ ক্ষিদে, ডাক্তার ভাত পথ্যের অনুমতি দিয়েছেন। মেসে সেদিন খাসীর গোশ্‌ত আছে, কিন্তু নিষ্ঠুর হেড্‌মাষ্টার হুকুম হেঁকেছেন, করল্লা আর বেতের আগা ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে হবে। করুণ নয়নে তাঁর দিকে চেয়েও সে বেরহম দিলে দাগ কাটতে পারি নাই। অগত্যা স্বীকার করেছি। একবার পাকের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম; তিনি আড়ি দিয়ে দাঁড়ালেন। হাকিমকে ডেকে বলে দিলেন—'খবরদার, এক টুকরা গোশ্‌ত যেন ওঁকে না দেওয়া হয়'। হাকিম হেসে হুকুম তামিলে রাজী হয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আমার ভয়ানক পেশাব পেল। বদনা হাতে বের হলাম। হেড্‌মাষ্টার চেয়ে রইলেন, আমি কোন্ দিকে যাই, রান্না ঘরের একদম উল্টা দিকে খানিক দূর গিয়ে বসলাম। হেড্‌মাষ্টার সাহেব নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে নিজ আসনে ঠাঁই নিলেন। আমি তখন এদিক ওদিক চেয়ে পাকের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। গোশ্‌ত পাকানো ছিল; শুরু করলাম। হাকিম ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে রইল; বল্ল—'হুজুর, আঁমাঁর দোঁষ নাঁই।' আমি বল্লাম—'খেতে বাধা না দিলে আর তোমার দোষ হবে কেন, বাবা'? আমার দেরী দেখে হেড্‌মাষ্টার সাহেব বেরিয়ে পড়েছেন। খুঁজে দেখেন, শিকার স্বস্থানে নাই। তিনি পাকের ঘরে এসে

হাজির হলেন। আমি তখন পাতিলের পোয়া আড়াই গোশ্‌ত দিয়ে পেটের কেবল তও দিয়েছি মাত্র।

জম্বু গার্ড

কলেজের পাহারায় নিযুক্ত হল জম্বু: পশ্চিমা হিন্দু, পেটাও শরীর, শাঁই জোয়ান, বয়স বছর বাইশেক। সে যখন হাক ছাড়ে, তখন আশ পাশের লোক ঘুম থেকে চমকে ওঠে। কিন্তু রাত বারোটার পর জম্বুর হাঁক ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অবশেষে একদম ঘুমিয়ে পড়ে। নালিস আসে। জম্বুকে ডাকি। ধমক দেই। স্বীকার করে। কিন্তু বয়েসকে সে পরাজয় মানাতে পারে না। যত ধমক দেই, তার চেয়ে বেশী কীরা কসম করে, আর গাফলাতী করবে না; তারপর ঘুমায় আরো বেশী। অবশেষে বল্লাম—'জম্বু, তুমি বিদায় হও, তোমার মায়নায় দুইজন দেশী বুড়ো মানুষ রাখি, তারা পালাক্রমে সারারাত জেগে পাহারা দিবে'। জম্বু অবলীলাক্রমে স্বীকার করল—'হুজুরের যা হুকুম'। অফিস হতে মায়না নিয়ে সে আমার কাছে বিদায় হতে এল। বিদায় দিলাম। আমার কাছ থেকে হাত বারো দূর গিয়ে তার সেই লম্বা লাঠীর উপর ভর করে জম্বু লাফ দিল। বোধ হয় হাত ছয়েক উপরে উঠল। তারপর মাটিতে পড়ে কি একটা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। বুঝলাম, এটা তার মুক্তির গান। চাকরী গেল বলে আজাদীর আনন্দে নাচে, এ আর কখনো দেখি নাই। অথচ নিতান্ত গরীব। চাকরীই ছিল তার একমাত্র সম্বল। জম্বুর পাছে পাছে একটা নীরব ছালাম পাঠিয়ে দিলাম।

ময়না ধোপা

করটীয়ার অন্যতম কৌতুহল উদ্দীপক চরিত্র ছিল ময়না ধোপা। ওদের আসল বাড়ী ছিল গোরক্ষপুর জিলায়। চাঁদ মিঞা সাহেব জায়গা দিয়েছিলেন; তারই উপর ওর বাপ বাসা করে এবং দুটি ছেলে রেখে এই করটীয়ারই নদীর পারে ওর পিতা চিতায় চড়ে। ময়না দুইয়ের মধ্যে বড়। ধীর, প্রশান্ত, কম বুদ্ধি, সুন্দর চেহারা, মূর্তিমান সৌজন্য। হয়তো আমি বাইরের ঘরে বসে লিখছি; ময়না এসে হাজির। দুয়ারে দাঁড়িয়ে নিতান্ত বিনয়ের সঙ্গে মাথা নামিয়ে বলছে: "হুজুর আদাব।" আমি মাথা তুলে চেয়ে দেখি; বলি 'চুপ'। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা হয়তো দুই ঘণ্টা চলে যায়। আমি লেখা হতে মুখ তুলে দেখি, ময়না ধোপা তেমনি বা-আদব দাঁড়িয়ে আছে। বলি, ময়না, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ? মাথা ঝুঁকে আদাব করে বলে—'হুজুর'। আমি বলি, কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ অমনি দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে স্নিগ্ধ হেসে তেমনি অমায়িক সুরে বলে—'হুজুর যে চুপ থাকতে বলেছেন?' আমি রেগে বলি—হতভাগা, তাই তুমি নিজ কাজ ফেলে কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে? ময়না জবাব দেয় না, ভয়ও পায় না, কেবল মুচকি হেসে মুখ নামিয়ে রাখে। তার মস্তিষ্কের শক্তি কম, হৃদয়ের শক্তি কম নয়, সে তার হৃদয় দিয়ে অনায়াসে আমার হৃদয়ের ভাষা বোঝে।

ময়নাকে কোন দিন আমি কাপড় ধোয়ার পয়সা চাইতে শুনি নাই; হিসাবও সে কোন দিন দেয় নাই! বলি, 'ময়না' কতখানা কাপড় ধুয়েছিলে'? উত্তরে বলে—আমি জানিনা'। বলি, 'তবে কে জানে?' অবলীলাক্রমে সে উত্তরে বলে—'হুজুর জানেন'। রেগে উঠি; বলি 'উল্লুকা—দাম খাখতা, আমি কি তোমার কেরাণী? সে নীরবে হেসে বলে—'হুজুর, না, না লিখেই তো হুজুরের সব মনে থাকে'। একদিন ওকে কাপড়ের আজুরা সব বুঝিয়ে দিলাম। নিয়ে রওনা হল। খানিক দূর গেলে ডেকে আনলাম। বল্লাম—ভুলে বিশটা কাপড়ের আজুরা দেই নাই। দাঁড়াও তা দিয়ে দিচ্ছি। সে আস্তে বলে—'হুজুর। 'আচ্ছা, 'আচ্ছা, ময়না, এতগুলি কাপড়ের দাম কম পেলে, তোমায় ভয় হলনা, বল্ল—'হুজুর, না' বল্লাম কেন? সে বল্ল—'ভাবলাম, ভুল হয়ে থাকলে হুজুরই ডেকে বাকি পয়সাটা দিয়ে দিবেন'। দেখলাম ইমানের জোরে ময়না আমাকে অনায়াসে হার মানিয়ে গেছে। ময়নার কাপড় ধোয়া চমৎকার ছিল। কলেজ দেখতে গভর্নর সাহেব এসেছেন। সমস্ত বিহান বেলা কলেজে ছিলাম—কাগজ-পত্র, লাইব্রেরী, গেট সাজান ইত্যাদি দেখতে। বাসায় এসে চারটি খেয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি। আচকান পরতে গিয়ে দেখি তার দুটো বুতাম নাই, পায়জামা পড়তে গিয়ে দেখি বন্দ্‌টা ছিঁড়ে আছে। মনে হল, তখনি ছুটে গিয়ে ময়নাকে আচ্ছামত মার দেই। কিন্তু তখন মারবার সময় ছিলনা। ভীষণ রেগে প্রতিজ্ঞা করলাম, ওকে অবসর মত ভাল রকমে শিক্ষা দিতেই হবে। দুদিন পর ময়না কাপড় নিতে এল। তার মুখে সেই নিরীহ 'স্নিগ্ধ হাসি'। তার সেই বা-আদাব ছালাম, তার সেই সৌজন্য সুন্দর 'হুজুর'—সব রাগ পানি হয়ে গেল। তবু অনেক কষ্টে দিলটাকে ফের গরম করলাম; বল্লাম—'হতভাগা' তুই কি মন্তর জানিস? সে স্নিগ্ধ হেসে মাথা নুয়ে সবিনয়ে বল্ল—'হুজুর' এবার সত্যি খানিকটা রাগ হল; বল্লাম, 'তুমি বোকাইরাম 'হুজুর' কওন ছাড়া আর কিছুই জাননা'। সে তেমনি সুরে বল্ল—'হুজুর, জানিনা'। হার মেনে চুপ রইলাম।

কুলকুমারী

করটীয়া আমার প্রতিবেশিনীদের মধ্যে একজন ছিল

ফুলকুমারী। পাটনা অঞ্চলে আগে বাড়ী ছিল, পরে কটীয়াতেই স্বামী পুত্র নিয়ে থাকত। স্বামী কুলী মজুরের কাজ করত; বিবি স্বামীর সঙ্গে কখনো খোয়া ভাঙত, কখনো ঝগড়া করত। স্বামীটি নিরীহ ছিল; কাজেই ঝগড়ায় জুত বাঁধত না। ফুলকুমারীর প্রতিভা ফুটে উঠত অন্যদের সাথে কোন্দলে। তার দাপটে তারা অল্পক্ষন মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে যেত। ফুলকুমারী বকরী পালত, ভুট্টার আবাদ করত, বাজারে তোলা তুলত; বৈশাখের ঝড়ে আম কুড়াত। গায়ের রং ছিল তার পাথর কয়লার মত; রাগলে সে পাথর কয়লার মতই জল জল জলে উঠত। আর দশ জন অভাবী মানুষের মধ্যে যে যে লক্ষন দেখা যায়, তা ফুলকুমারীরও ছিল। তবে সে ব্যবসায়ী চোর ছিল না।

সে আম কুড়াতে জমিদার বাড়ীর বাগানে যেত; আশে পাশে কেউ না থাকলে মাটির আমের সাথে দুই চারটা ডালের আমও কুড়িয়ে নিত। আমার বাসার মধ্যে একটা ভাল আমের গাছ ছিল। একদা অনেক রাতে বাসায় মনে হল আম গাছে একটু শব্দ শুনলাম। এগিয়ে গেলাম। দেখি, একটি লোক গাছের সাথে গা মিশিয়ে আত্ম গোপনের চেষ্টায় আছে। জোছনা রাত—চিনলাম, ফুলকুমারী। চুপকে চলে এলাম। পরিচয় হলে সে শরম পাবে, আমিও শরম পাব। তাছাড়া এ আম নিয়ে ফুলকুমারী বেচবে না, ছেলে পেলেকে নিয়ে খাবে। এত বড় আম বাগান। তার মধ্যে ফুলকুমারীর বাসা; তা ফুলকুমারীকে দুই দশটা আম না দিয়ে জমিদার বাড়ীর লোকে যদি সব পেড়ে নিয়ে যায়, তবে ফুলকুমারী নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করে নিবেনা কেন? কথা বার্তায় ফুলকুমারীর আদবের অন্ত ছিল না। সেলাম নিয়ম মতই দিত, আম্মা, হুজুর নিয়ম মতই বলত। বকরী দিয়ে পালান খাইয়ে নিয়ম মতই মাফ চাইত। একদিন শুনি ফুলকুমারী বাসায় এসে বলছে, আম্মা এ-বাড়ীতে এসব কি? বিবি সাহেব বল্লেন—আত্মীয় বাড়ী থেকে কই মাগুর মাছ পাঠিয়েছে, তাই জিয়িয়ে রেখেছি'। ফুলকুমারী মাছ দেখল, বল্ল – 'বেশ—বেশ। পরদিন সকালে দেখা গেল, বাড়ী হতে অর্ধেক মাছ উধাও হয়ে গেছে। ভাবলাম ফুলকুমারী একেবারে বেমায়া নয়, আমাদের জন্যও রেখে গেছে। গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন—"এ কাজ ঐ শয়তানী ফুলকুমারীর।" প্রকাশ্যে বলতে সাহস পেলাম না, মনে মনে বল্লাম, কাল ওকে দুই দশটা মাছ দিয়ে দিলেই তো আর এ বিভ্রাট হতো না।'

কেদনের মা

আমার অন্য প্রতিবেশী ছিল বেপারী পাড়ার কেদনের মা। বুড়ো মানুষ, বিধবা, ফুট ছয়েক লম্বা, গরীব। ঘরে ব্যাটা ছিল, কিন্তু বেটার বৌ ও ছিল এবং সনাতন শাশুরীর মত ব্যাটার বৌয়ের বিরুদ্ধে তার নালিসের অন্ত ছিলনা। 'সাত খোয়ারী' বৌ মাঝে মাঝে তাকে ভাত কম দিত; কে কোন্দল করে বদদোয়া দিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ত, আর মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় এসে হাজির হত। সে আমার বিবি সাহেবার বসওয়েল ছিল; বিবি সাহেবাও তাকে পিয়ার করতেন। সে দেউড়ীতে পা দিয়েই বলত:

'আম্মাকে দেখতে এলাম; এই তিন দিন না দেখে মনটা আই ঢাই করছিল

'ওরে আছী, ও কর্পূলী, কেদনের মাকে একটা পিড়ি দে।

'আম্মা গাই দুইটা কেমন আছে? কেমন দুধ হয়?

'গাইয়ের কথা বলোনা; এত যত্ন করে খাওয়াই, তা রাত্রে সাপ এসে দুধটুকু খেয়ে যায়।

'ওর ঔষধ আছে, আম্মা; সে ঔষধ দিলে সাপ ঘরের কাছ দিয়েও ঘেসবেনা।

'ওরে ও আছী, কেদনের মাকে একটা পান বানিয়ে দে।

'কোথায় পাওয়া যায় সে ঔষধ, কেদনের মা? উনি তো এ-সব কথা আমলেই আনেন না। তা তুমি ঔষধটা এনে দিতে পার?

'নিশ্চয় পারি, আম্মা; আমি কালই যাব সে ঔষধের জন্য।

'ওরে, ও কর্পূলী, গাছ থেকে গণ্ডা চারেক পান পেড়ে নিয়ে আয় কেদনের মার জন্য, বুঝলি?

'আম্মার মত একটা দয়ার মানুষ হয়না; পাড়ার গরীব দুঃখীর মা।

'হ্যাঁ, কেদনের মা, তোমার মুখ শুকনো দেখছি, পান খাওয়ার আগে দুটো মুড়ি মুখে দিয়ে নেবে?

'তা আম্মার হাতের জিনিষ—কখনো না বলতে পারি?

কেদনের মা পাড়ার গেজেট ছিল। পাড়াময় ঘুরে ঘুরে সব খবর সংগ্রহ করত আর পাত্র ভেদে তা পরিবেশন করত।

কেদনের মা মধ্যে মধ্যে জরুরী খবর এনে দিত। দেশ বিভাগের আগে আগে কলকাতা যে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তার কয়েক দিন পরের কথা। কেদনের মা এসে বিবি সাহেবাকে বল্ল।

'আম্মা, সাহেবকে একলা বাইরে যেতে দিবেন না। রাতে তো নয়ই।

'কেন, কেদনের মা?

'পাড়ায় নানান রকমের মানুষই তো আছে? তারা

কতকে চায়, একটা মারামারি বেঁধে যাক ; তারা হিন্দুর কিছু বাড়ী ঘর লুঠ করুক।

'কিন্তু তাতে ওঁর ডর কি ? ওরা বলে, প্রিন্সিপাল সাব হিন্দুর কাছে থেকে অনেক টাকা ঘুষ পেয়েছেন ; নইলে উনি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগা ঠেকিয়ে রেখেছেন কেন ?

'তার পর ?

'কিন্তু তাদের মধ্যে কতকে রুখে উঠল। বল্ল 'বিনা প্রমাণে এত বড় একটা অন্যায় কাজে হাত দিতে পারব না।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তার পর ?

'প্রথম দল বল্ল, 'উনি যদি টাকা না খেয়ে থাকবেন, তবে স্বয়ং···সাহেব বাহাদুর এ-কথা বলেন কেন ?

'দ্বিতীয় বল্ল—'আরে আগে খোঁজ নিয়ে দেখ স্বয়ং··· সাহেবের লুঠপাটের মালের খছিলতদারীর ইচ্ছা আছে কি না ?

'তার পর ?

'এই রকম অনেক তকাতর্কির পর সবাই উঠে গেল।

খবর নিয়ে জানলাম, কেদনের মা মিথ্যা সংবাদ দেয় নাই। কয়েক দিন একটু হুঁশিয়ার হয়েই চল্লাম।

(ক্রমশঃ)

একটি অনুভূতি

দীল্ আফরোজ আহমদ্

সুরমার দুই তীরে এই বন বটের ছায়ায়
কারা যেনো এসেছিলো গেয়েছিলো জীবনের গান
তারা সব গেছে কোথা থেমে গেছে সুরের বয়ণ
নির্জন দু'পুর কাঁপে এখানে সময় বড় একা
মনে হয় এইখানে আম যেনো কোথা ডুবে গেছি।

স্মৃতির দুয়ার খুলে আজ দেখি জমা কিছু নেই
তুমি কবে এসেছিলে সেই কথা পড়েনাক মনে
হয়ত বা এসেছিলে হয়ত বা আস নাই কভু
আজকে হৃদয় দেখি ধূ-ধূ এক বালুকার চর
চারিদিকে ওড়ে ধূলি এলোমেলো বহিছে বাতাস
এখন সময় কই খুটি নাটি হিসাব কষার।

হয়ত বা ছিলো প্রেম ছিলো কিছু স্বপনের নেশা
আলেফ লায়লা রাত হয়ত বা চোখে দিত ঘুম
এ-ত বহু আগেকার, এখন কী সে সময় আছে !
সারাটা পরাণ দিয়ে আজ শুধু অনুভব করি'
কারা যেনো টেনে জোর নামাইল মাটীতে আমায়
দিয়ে গেল অজানিতে-অভাবিত বনেলা আবেগ ঃ
সমুখে চলার এক দুর্বার গতির প্রবাহ
বহু দিন পরে আজ জীবনের বাঁক ঘুরে গেলো।

আজ তাই সাধ জাগে ঃ এই মাটী এই মন নিয়ে
একখানি ঘর বাঁধি, পাতি এক মাটীর সংসার
মাঠে মাঠে হাল চষি' ক্ষেত ভরে বুনে যাই ধান
জীবনের চারিপাশে ফসলের সমারোহ আনি'
সেই সব মরা গাঙে দেখে যাই প্রাণের জোয়ার।

একেই কি বলে ইতিহাস ?

আকবার আলী খান

॥ ১ ॥

গজনীর রাজা সুলতান মাহমুদের নাম কে না জানে ? পাক-ভারতের ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন তাঁর নাম। আর জানেন মাহমুদের ধর্ম দ্ধতার কাহিনী, অন্যায় ভাবে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কাহিনী আর ফিরদৌসীর সহিত মাহ্মুদের বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিশ্ববিশ্রুত কাহিনী। তাই ইতিহাসের প্রতিটী পাঠকই মাহ্মুদ আর তার কার্য্যকলাপকে ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকেন।

কিন্তু যদি বলি মাহ্মুদ ছিলেন দশম এবং একাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিজেতা ও সুশাসক ও এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি—তাহা হইলে বোধ হয় প্রত্যেকেই বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। তাই না ? তবে চলুন দেখা যাক কার উক্তি কতটুকু সত্য। নিরপেক্ষ মন নিয়া মাহ্মুদকে নিয়া সুষ্ঠু বিচার করা হউক।

মাহ্মুদের বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান—

(ক) মাহ্মুদ ধর্ম প্রচারের বেসাতি করিয়া লুণ্ঠনের জন্য ভারত অভিযান করেন।

(খ) মাহ্মুদ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া ইসলাম ধর্ম বিগর্হিত কাজ করিয়াছেন।

(গ) মাহ্মুদ হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের পরিপন্থী কাজ করিয়াছেন।

(ঘ) ফিরদৌসীর সহিত মাহ্মুদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার হীনমন্যতারই পরিচায়ক।

॥ ২ ॥

এখন মাহ্মুদের বিরুদ্ধে যেটি সর্ব্বাধিক গুরুতর অভিযোগ, তাহা আলোচনা করা যাক। মাহ্মুদের বিরুদ্ধে যে প্রথম অভিযোগটি আনা হইয়াছে, তাহাই তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক গুরুতর অভিযোগ। প্রচলিত ইতিহাস সমূহের মতে দেখা যায় যে মাহ্মুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর বাগদাদের খলীফা তাহাকে খিলাত দেন,—ইহাতে তাহার ধর্মভাব বৃদ্ধি পায়। এই ধর্মভাবই তাহাকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আর তাহার সাথে সাথে পাক-ভারতের বিপুল ধন রাশি তাহাকে প্রলুব্ধ করে। এরই জন্য তিনি ধর্ম-প্রচারের জন্য সতর বার পাক-ভারত আক্রমণ করেন।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাহ্মুদের ভারত অভিযানের কারণ কখনও ধর্মীয় বা লুণ্ঠনজনিত নহে। মাহ্মুদের ভারত অভিযানের কারণ হইল মূলতঃ রাজনৈতিক।

পাক-ভারতের ইতিহাসের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর তদীয় ক্রীতদাস এবং জামাতা সবুক্তগীন ৯৭৭ সালে গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। আর সবুক্তগীন ছিলেন মাহ্মুদের পিতা। আর ইহাও সর্ব্বজনসম্মত সত্য যে, উত্তর পশ্চিম পাক-ভারতের উদ্ভ বা উদভাণ্ডপুরের রাজা জয়পাল তাহার সমসাময়িক ছিল। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ মোটেও ভাল ছিল না। ফলে সবুক্তগীনকে জয়পালের বিরুদ্ধে দুই দুই বার অভিযান করিতে হয়। সবুক্তগীনের মৃত্যুর পরও জয়পাল জীবিত ছিলেন।

তাই মাহ্মুদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাহার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী জয়পালকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিতে পান।

একথা প্রতিটি যুক্তিশীল মানুষ মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রতিবেশী রাজা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে রাজ্যের ভিত্তি সাধারণতঃ মজবুত হয় না। তাই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য মাহ্মুদ জয়পাল এবং তাহার বংশধরদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মাহ্মুদের ভারত অভিযানের মধ্যে প্রায় ৬টিই প্রেরিত হয় জয়পাল, তদীয় পুত্র আনন্দপাল এবং আনন্দপালের পুত্র ভীমপালের বিরুদ্ধে। মাহমুদের অপর দুইটি অভিযান প্রেরিত হয় মুলতানের মুসলিম রাজার বিরুদ্ধে। তাই এই অভিযানগুলিকে কিছুতেই ধর্মীয় বলা যাইতে পারে না। সুতরাং মাহ্মুদের ৮টি অভিযানকে নিশ্চিতরূপে রাজনৈতিক বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হয়।

বাকী ৯টির মূলেও রহিয়াছে রাজনৈতিক কারণ। একথা সর্ব্বজনসম্মত সত্য যে, আনন্দপালকে রক্ষার জন্য পাক-ভারতীয় সমস্ত হিন্দু শক্তি মাহ্মুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। মাহ্মুদ তাই বুঝিয়াছিলেন যে, শুধু জয়পালের রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিলেই চলিবে না—সমগ্র পশ্চিম ভারতকে বিপর্য্যস্ত করার প্রয়োজন

রহিয়াছে। এরই ফলে মাহমুদ পার্শ্ববর্তী হিন্দু সাম্রাজ্যে বিপর্য্যয় সৃষ্টির জন্য তাঁহার অন্যান্য অভিযানগুলি পরিচালনা করেন।

শুধু তাহাই নহে, মাহমুদের সমগ্র মধ্য এশিয়া ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রবল আকাঙ্খা ছিল। এই জন্য পার্শ্ববর্তী হিন্দু সাম্রাজ্য সমূহে আর্থিক শূন্যতা সৃষ্টি করিয়া সেই বিপর্য্যয়কে আরো গভীর করিবার জন্য মাহমুদ প্রতিটী অভিযানের সময় বহু ধন রত্ন লইয়া যান। উপরন্তু যুদ্ধে বিজিতদের পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করার রেওয়াজ অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। তাই মাহমুদের ভারত অভিযান সমূহকে লুণ্ঠনজনিত বলাও অন্যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ ধর্মীয়ও নয়, লুণ্ঠনমানসও নয়। আর ধর্মের দোহাই দিয়া লুণ্ঠন করার যে অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে করা হইয়াছে তাহা কতটুকু কাল্পনিক তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অনেকে মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ ধর্মীয় প্রতিপন্ন করার জন্য সমসাময়িক ঐতিহাসিক উতবার নিম্নোক্ত উক্তিটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাহমুদের প্রথম অভিযান সম্বন্ধে উতবা বলেন, "ধর্ম্মের গৌরব, সত্যতার প্রসার এবং ন্যায়পরায়ণতার শক্তি বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করা হয়।" তবে একথাও সুবিদিত সত্য যে, জয়পাল শুধু আল্লাহর শত্রুই ছিলেন না—গজনীর রাজ্যের তথা মাহমুদেরও ছিলেন পরম্পরা বংশের শত্রু। আর ইহারই ফলে মাহমুদের ভারত অভিযান শুরু হয়।

বস্তুতঃ মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা বাগাড়ম্বর করিতে যাইয়া অনেক ঘটনার সত্যতা ও গভীরতা বিচার না করিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই উতবার এই উক্তি গ্রহণ করিতে হইলে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা দরকার।

॥ ৩ ॥

এখন মাহমুদের বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় অভিযোগটি করা হইয়াছে তা বিবেচনা করা হউক। ইসলাম ধর্ম পরধর্মে বিদ্বেষী নহে। ইসলামের নির্দ্দেশ এই যে, "লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।" এবং "লা ইকরা ফিদ্দিন।" মাহমুদ একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি এই সব জানিতেন। তবু কেন মাহমুদ হিন্দু ধ্বংস করিয়াছেন—এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগে। নিম্নে তার সমাধান দেওয়া হইল।

মাহমুদের ভারত অভিযান সম্পর্কে আলোকপাত করিতে গিয়া ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ টোপা বলেন,

"It may also be observed that the temples of India which Mahmud invaded were the storehouses of enormous and untold wealth and some of these were political centres also."

(Politics in pre-Moghul-Times)
P P-46-47

পূর্ব্বেই বারবার এই কথা বলা হইয়াছে যে, মাহমুদ ছিলেন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তাই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই সকল মন্দির তাহার রাজ্যের জন্য ক্ষতিপ্রদ। এই জন্যই তিনি এইগুলি ধ্বংস করান। তাই ইসলাম ধর্মবিগর্হিত কাজ করার কোন সওয়ালই উঠিতে পারেনা।

॥ ৪ ॥

এখন মাহমুদের বিরুদ্ধে যে তৃতীয় অভিযোগটি করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা হউক। এই অভিযোগটির চেয়ে জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম পাওয়া যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

মাহমুদের শাসন ব্যবস্থা ইসলামের উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কখনও কোন হিন্দুকে ধর্মত্যাগের জন্য অত্যাচার করেন নাই। সুলতান মাহমুদের রাজত্বকালে হিন্দুগণ অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইত। তাহাদের মধ্যে তিলক রায়, হাজারি রায়, সোমাই প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

মাহমুদের ধর্মীয় উদারতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক Elphinstone বলেন, "It is no where arrested that he ever put any Hindu to death except in battle or storming of a fort"

Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-ভারতের ইতিহাসের সম্পাদক W, Haig মাহমুদের ধর্মীয় উদারতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, "Under Sultan Mahmud the Hindus enjoyed perfect religious freedom."

(Cambridge history of India pp 45)

তাই দেখা যাইতেছে যে মাহমুদের বিরুদ্ধে হিন্দু অত্যাচারের অভিযোগই মিথ্যা আর ইসলাম ধর্ম প্রচারের পরিপন্থী কাজ করার কল্পনা কতটুকু মিথ্যা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

॥ ৫ ॥

এখন "ফিরদৌসী-মাহমুদ" সংক্রান্ত জগতবিখ্যাত রূপকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হউক। ফিরদৌসী সম্পর্কে মাহমুদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ নিম্নরূপ :—

"মাহমুদের সভা-কবি ছিলেন ফিরদৌসী। মাহমুদ ফিরদৌসীকে পারস্যের প্রাচীন উপাখ্যান নিয়া একখানি কাব্য রচনার আদেশ দেন এবং প্রত্যেক শ্লোকের জন্য একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ষাট হাজার শ্লোকে উপাখ্যানখানি রচিত হওয়ার পর মাহমুদ ফিরদৌসীকে উক্ত অর্থ প্রদানে অস্বীকার করেন। মর্মাহত কবি ফিরদৌসীর অমর আত্মা ইহ'তে ধরাধাম ত্যাগ করিল। মাহমুদ পরে নিজের ভুল বুঝিয়া যখন ফিরদৌসীর নিকট প্রতিশ্রুত অর্থ পাঠাইলেন, তখন বাহকেরা গিয়া দেখিল মহাকবি আর ইহজগতে নাই।

কিন্তু আমি প্রথমেই ইহাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করিতে চাই। নিম্নে উহার কারণসমূহ প্রদত্ত হইল।

(১) মাহমুদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক Aini তাহার তীব্র সমালোচক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে পর্যন্ত ফিরদৌসীর এই কাহিনীর উল্লেখ নাই।

(২) মাহমুদের মৃত্যুর ১৫০ বৎসর পরে "Chahar makala" নামক বইয়ে সর্বপ্রথম এই অভিযোগ দেখা যায়। কিন্তু "চাহার মাকালা" বইয়ের কোন শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাইতেছে না। উপরন্তু ইহার লেখক নিয়া পর্যন্ত গোলমাল রহিয়াছে।

(৩) ফিরদৌসী তাঁহার পুস্তকে বলেন যে, তিনি ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শাহনামা রচনা শুরু করেন ও ৩৫ বৎসরে উহা শেষ করেন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মাহমুদ ৯৯৭ সালে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাই মাহমুদের আদেশে শাহনামা রচিত হইয়াছে ইহা বলা ভুল।

(৪) তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া নেই যে, মাহমুদের সিংহাসন আরোহণের পরই শাহনামা রচনা শুরু হয় তবু ইহা অসত্য প্রতিপন্ন হইবে। কেননা মাহমুদ রাজত্ব করেন ৩৩ বৎসর আর ফিরদৌসী বই লেখেন ৩৫ বৎসরে।

সুতরাং "মাহমুদ-ফিরদৌসী কাহিনী একটি ডাহা মিথ্যা রটনা।

॥ ৬ ॥

প্রকৃতপক্ষে মাহমুদ হইলেন দশম এবং একাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, প্রচলিত ইতিহাসসমূহে মাহমুদকে কল্পনাতীতভাবে বিকৃত করা হইয়াছে। তাই যুক্তিবাদীমাত্রই আমার প্রতিধ্বনি করিয়া প্রচলিত ইতিহাস সম্পর্কে বলিতে বাধ্য হইবেন—"একেই কি বলে ইতিহাস?"

আশা করি, পাক-ভারতের মুসলিম রাজত্ব কালের ইচ্ছাকৃত বিকৃত চরিত্রগুলি উদ্ধারের জন্য দেশের সুধীবৃন্দ অগ্রসর হইবেন। পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি এই দিক দিয়া পূর্ণ কামিয়াবী লাভ করুক, ইহাই কামনা।
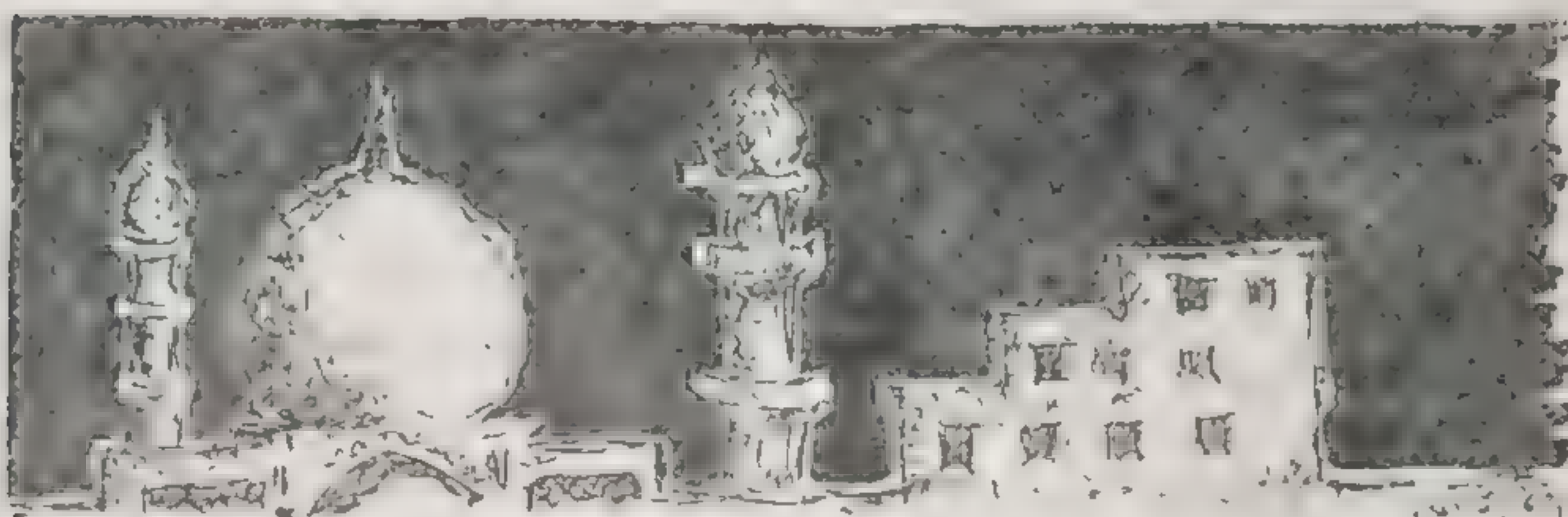
সাহিত্য ও জাতীয়তা

অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন আহমদ

"সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি" একথাটা আমরা অসংখ্যবার শুনেছি, তার চেয়েও বেশীবার হয়ত বলেছি। কিন্তু কথাটার মধ্যে যে মহৎ তত্ত্ব নিহিত আছে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা কতটুকু করেছি তার জীবন্ত স্বাক্ষর রয়েছে আমাদের আধুনিক কালের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। কথাটার ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, জাতির আশা আকাংক্ষা, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলোর সমাধানের ইঙ্গিত সাহিত্যের মধ্যেই রূপ লাভ করে। কাজেই দেখা যায়, জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণ এবং রূপায়ন প্রধানতঃ সাহিত্যিকের প্রাজ্ঞতা, মনীষা, নিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রাণতার উপর নির্ভর করে। জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যিকের এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ইতিহাস শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে। প্রতিভাশালী ও নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক তাই কালজয়ী অমরতা লাভ করেন।

আমাদের দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সৃষ্টিতে পাকিস্তানী জাতীয়তা কতটা সার্থকতার সংগে রূপলাভ করেছে তা আমি এখনই বলতে চাই না. তবে কি করে আমাদের সমস্যা সংকুল জাতীয় জীবনের বিবিধ আশা-আকাংক্ষা সাহিত্যের অংগীভূত হতে পারে, সে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত কয়েকটি কথা বলার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এসেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। তাই বলে আমাদের জাতীয় জীবনের আয়ুও এত অল্প, এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। পাকিস্তান অর্জনের জন্য পাক-ভারতের মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করতে কায়েদে আজম এবং তৎপূর্ববর্তী হাজী শরীয়তউল্লা, তীতু মীর, স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, আল্লামা ইকবাল এবং বহু মনীষী যে সংগ্রাম, যে আত্মত্যাগ করে গেছেন, তা এ দেশবাসী কোন দিন ভুলতে পারবে না।

পাক-ভারতের মুসলমান অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতা হারিয়ে শাসক ইংরেজ এবং জাত্যাভিমানী বর্ণ হিন্দুদের চাপে নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিয়ে একেবারে নির্জীব হোতে চলেছিল। এ নিষ্প্রাণ জাতিকে সংঘবদ্ধ করতে গিয়ে প্রথমেই তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হয়েছিল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে চলল সে সাধনা। ধীরে ধীরে মুসলিম মানস নব শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠতে লাগল। হতাশা এবং ব্যর্থতার গ্লানি থেকে তারা মুক্ত হতে লাগল। তারা বুঝতে পারল যে তারাও মানুষ, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার তাদেরও রয়েছে। তারা ভুঁইফোড় জাতি নয়, তাদের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। নিজেদের ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে তারা বিশ্বের কোন জাতির চেয়ে হীন নয়। তাদের পূর্ব পুরুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অর্দ্ধ পৃথিবী শাসন করেছে। বিশ্বকে দিয়েছে এক অভিনব সাম্যের দর্শন, করেছে জ্ঞানের সাধনা, বিশ্ব শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ওদের দিকে। তারা হীন নয়, হেয় নয়। আত্ম-অবিশ্বাসের অভিশাপ কাটিয়ে সুপ্তোত্থিত মুসলিম মানস জেগে উঠল। জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে ওরা হয়ে উঠল সচেতন। দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে তাদের মনে এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্যে কত মনীষী নিজেদের জীবনে তিল তিল নিঃশেষ করে গেছেন। ১৯৪০ সালে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলমান দৃপ্তকণ্ঠে জানাল তার স্বকীয় আবাস ভূমির দাবী। পাক-ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হল তাদের বজ্র কণ্ঠের এ বজ্রনাদ। শত বাধা-বিপত্তি এ বজ্রনির্ঘোষ-ঘোষিত সত্যবাণীর সামনে তুচ্ছ হয়ে পড়ল। মুসলমান পেল তার আজাদী, প্রতিষ্ঠিত হল পাকিস্তান। কাজেই আমাদের জাতীয় জীবনের যাত্রাপথ যে কত দীর্ঘ তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সীমারেখা এখানে না টেনে নির্দ্বিধায় আমরা আরও প্রায় হাজার বছর পেছনে চলে যেতে পারি। কিন্তু জাতীয়তা কথাটার মধ্যে দেশ সম্পর্কে গভীর বোধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। তাই বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের গৌরবময় বোধকে জাতীয়তার চেয়েও বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর দৃষ্টিভংগিতে আমরা গ্রহণ করব। আমাদের পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধ রস আহরণ করবে, উৎসাহ-উদ্দীপনা সংগ্রহ করবে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বোধ থেকে।

সাহিত্য কি এবং সাহিত্যের সংগে জাতীয়তাবোধের সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। রস সৃষ্টিই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সাহিত্য বললেই যে তা প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির সহায়ক হবে তা নয়। তবে চিন্তাশীল এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষী যে কোন রসোত্তীর্ণ সাহিত্য থেকে

জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করতে পারেন। আর একটা কথা এখানে না বলে পারছি না। রস সৃষ্টি বিভিন্ন প্রকারের সন্দেহ নেই। কিন্তু রস পরিবেশনের নামে বাংলায় প্রচলিত অনেক সাময়িক পত্র, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতিতে যে নগ্ন এবং উৎকট দেহ বিলাসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, সেগুলোকে আমরা কিছুতেই সাহিত্যরূপে গ্রহণ করতে পারি না। সাহিত্যিকের গুরুদায়িত্বের কথা আমি আগেই বলেছি। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের ইংগিত এবং সেই সংগে জাতীয় জীবন গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্যে উন্নত রুচী, উন্নত চিন্তাধারা প্রভৃতির সার্থক রসরূপায়ণের দায়িত্ব সাহিত্যিকের। কাজেই সাহিত্যিক যদি সে দায়িত্ব রক্ষার পরিবর্তে বিকৃত রুচী, নিকৃষ্ট চিন্তাধারা এবং জাতীয় জীবনের পরিপন্থি ভাবধারা সাহিত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেন, তবে তাকে আমরা সাহিত্যিক কিছুতেই বলব না। এই প্রসংগে আরও একটা কথা বলতে হয়—ছাপার অক্ষরে একটা কিছু আত্মপ্রকাশ করলেই যে সাহিত্য হয় না, তা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কাজেই রস পরিবেশনের নামে অবাঞ্ছিত নোংরামীকে সাহিত্যের আসরে কিছুতেই স্থান দেওয়া যায় না।

রস সৃষ্টি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু নিছক রস সৃষ্টিতেই কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আবেদন নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে না। রস সৃষ্টির ঊর্দ্ধেও সাহিত্যের আর একটি উদ্দেশ্য না থেকেই পারে না—যাকে বলব কল্যাণসাধন। রস সৃষ্টিতেই যে সাহিত্যের আবেদন ফুরিয়ে যায় তাকে কিছুতেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা দিতে পারি না। কল্যাণ সাধনের মহান আদর্শের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে জাতীয়তাবোধ, জাতির যথার্থ রূপ, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের ইংগিত। এ ক্ষেত্রে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন বোধ করছি। কেউ যদি জনকল্যাণের নামে নিছক প্রচার চালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন, তবে তাকেও আমরা সাহিত্য বলব না। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, রস সৃষ্টি ব্যতিরেকে সাহিত্য হতে পারে না। রস সৃষ্টি ও মহান জন কল্যাণের আদর্শ নিহিত থাকে সার্থক সাহিত্যের মধ্যে। অনেকের কাছে ব্যাপারটা বেশ সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। জাতীয় জীবনের যে-কোন একটা সমস্যাকে সাহিত্যের কেমন এক শাখার আংগিকের ভেতর ফেলে একটা কিছু দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু তা পাঠকের মনে কতটুকু সাড়া জাগাবে, তা মূলতঃ নির্ভর করে সাহিত্যিকের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সৃজনী প্রতিভার উপর। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। আমরা এখানে বংকিম চন্দ্রের নাম করব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই উভয়ের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে একজন পথ প্রদর্শক। সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম নতুন রস পরিবেশন করেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে রস সৃষ্টির ঊর্দ্ধেও আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর সচেতন মনের সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। সে হচ্ছে "হিন্দু জাতীয়তা" বোধের উদ্বোধন। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে নিষ্ঠাবান হিন্দু। হিন্দুত্বের আদর্শ তাঁর অস্থি মজ্জার সংগে মিশে ছিল। তিনি হিন্দু জাতীয়তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। কাজেই একটা জিনিষ অত্যন্ত স্পষ্ট বোঝা গেল সাহিত্যে জাতীয়তার উদ্বোধন করতে হলে সেই জাতীয়তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে। এ গ্রহণ কেবল লোক দেখান বা হুজুগ গ্রহণ নয়।

আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছে দীর্ঘকাল আগে। কিন্তু জাতীয়তাবোধের যথার্থ অর্থটি এখনও আমরা আয়ত্ত করে নিতে পারিনি।

তাই একথা অপ্রিয় হলেও বলতে হয় যে আজাদী লাভের পরেও আমাদের সাহিত্যিকগণ হৃদয়াবেগকেই সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি রূপে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য যথার্থ স্থিতিশীল সাহিত্য-রস সৃষ্টি করতে পারছে না, জাতীয়তাবোধকেও যথার্থ ভাবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অবশ্য দু'একজন সাহিত্যিকের লেখা যে যথার্থ জাতীয়তাগঠনের পরিপোষক রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়নি, তা নয়, তবে সেগুলোর সংখ্যা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এখন আমাদের প্রয়োজন উচ্ছাসপ্রবণ হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে স্থির মস্তিষ্কে আমাদের জাতীয়তা বোধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি চেষ্টা করা এবং পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে তাকে আগ্রহ করে নেওয়া। আমাদের সকল প্রকার চিন্তা ভাবনায় আমাদের জাতীয়তাবোধ যেন সচেতন এবং সক্রিয় হয়ে বিরাজ করে। তারপর প্রয়োজন সৃষ্টি-প্রতিভার, যেই প্রতিভাশালী সাহিত্যিক যখন আবেগের প্রবল উচ্ছাসকে সংহত করে জাতীয়তাবোধকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ

করে নিতে পারবেন, তখনই হবে আমাদের ইপ্সিত সাহিত্যের সৃষ্টি।

প্রকৃতির নিয়মই এই যে যখন যেখানে যার প্রয়োজন, আপনি সেখানে তা জন্মগ্রহণ করে। আমরা দেখেছি পৃথিবীর ইতিহাসে—যখন যে দেশে কবির অভাব অনুভূত হয়েছে তখনই সে দেশের জনগণের মধ্য থেকেই কবি আবির্ভূত হয়েছেন. প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলা কাব্য গগনে বিদ্রোহী কবির আবির্ভাব এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেদিন সারা দেশের উন্মুখ অধীর আকাংক্ষার দাবী মিটিয়ে দিলেন নজরুল। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে প্রকৃতির নিয়ম সফল হয়ে উঠার জন্যেও একটা ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন আছে। বিদ্রোহী কবির বুকে সেদিন বিদেশী শাসনের অভিশাপ, মুসলমানদের চরম অসহায়তা এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রতি যে বহ্নিজ্বালার সৃষ্টি করেছিল, তাই তাঁকে করে তুলেছিল বিদ্রোহী এবং দেশ তাঁকে পেয়েছিল তার প্রাণের কবিরূপে। একটা বিশেষ আদর্শকে তিনি মনপ্রাণে অকপটে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি দেশের দাবী এবং যুগের দাবী মিটিয়ে জাতীয় কবি হবার সম্মান লাভ করেছিলেন।

আজকেও ঠিক সেই আগ্রহ ও অধীরতা নিয়ে সারা দেশ অপেক্ষা করেছে কবি এবং সাহিত্যিকের জন্যে। বিস্তৃত আমাদের দেশ, এর আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশাল জনগোষ্ঠির বিচিত্র জীবন সাহিত্যের উপাদান হবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, এখন প্রয়োজন শুধু সৃষ্টিধর প্রতিভা, যিনি আমাদের জাতীয়তাবোধকে পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে গ্রহণ করেছেন এবং বিরামহীন সৃষ্টির সাধনায় যিনি থাকবেন আপনি মগ্ন।

সাহিত্য আমাদের সত্যই দীন, অথচ সাহিত্য সৃষ্টির অভূতপূর্ব সম্ভাবনা আমাদের আছে। শুধুমাত্র যথার্থ প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের অকৃত্রিম সহানুভূতি, অকপট নিষ্ঠা ও বিস্ময়কর মনীষার স্পর্শে গড়ে উঠবে আমাদের সাহিত্য, যা বিশ্বের দরবারে দাবী করবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন, যাতে আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটবে যথার্থ রসরূপায়ণ। ফলে জীবন আমাদের মনস্বিত হয়ে উঠবে সৃষ্টির আবেগে।
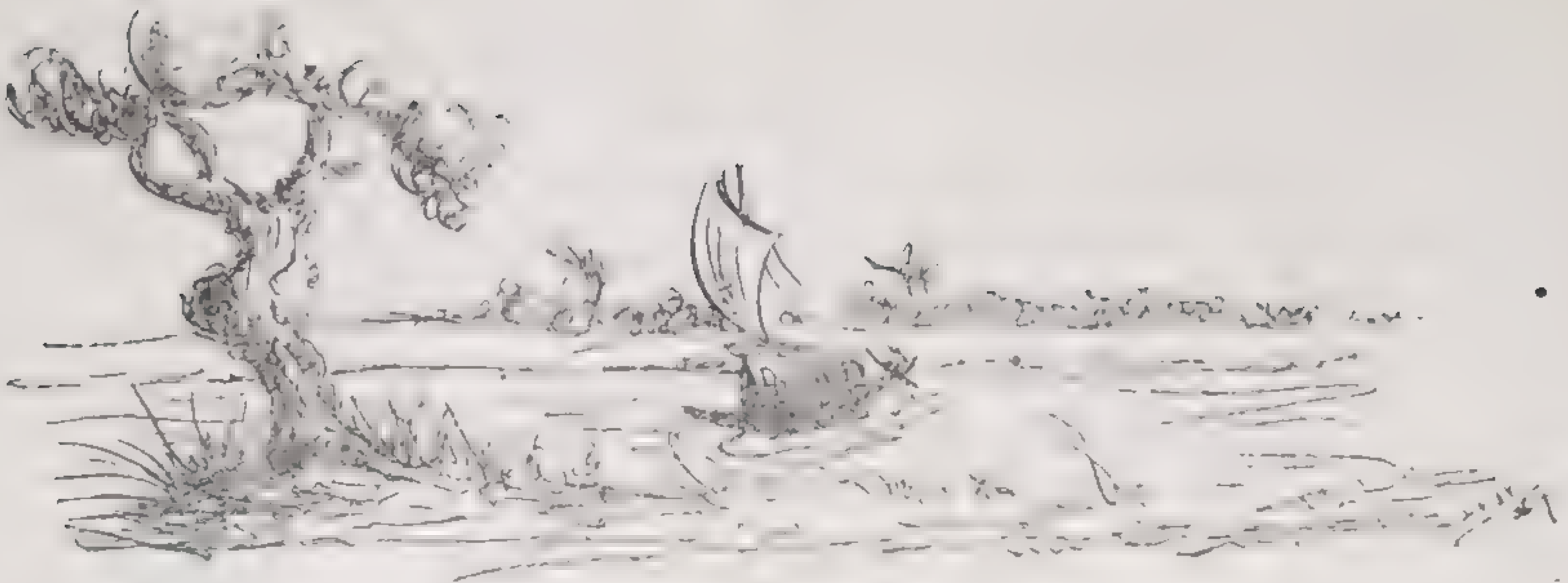
মেঘ ও মাটি

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্ত্তী

দিগন্ত বিসারী অথৈ পানি আর সবুজ কচি ঘাসের বন। আদিগন্ত বিলের কালো পানির ঢেউ আকাশের নীল প্রান্ত ছুঁই ছুঁই করে। দূরে ঝুমকা নদীর মৃদু স্রোতের সাথে গিয়ে মিশেছে বিলের স্থির স্বচ্ছ জল। কালো বিলের ঢেউগুলি বাতাসের রিন্ রিন্ শব্দের সাথে সুর মিশিয়ে কাঁপতে থাকে। জলের নীচে কচি ঘাসের বুকে প্রাণের সাড়া জাগে। সরু-লম্বা ঘাস পাতা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে থাকে। বিলের ধারে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বাবলা ও ঝাউ, হিজল ও শ্যাওড়া গাছের সারি। জলো হাওয়া হু হু করে বয়ে-যায় গাছগুলোর ওপর দিয়ে। ঘন পাতায় ছাওয়া সবুজ গাছগুলো দূর আকাশের নীলে মিশে যাওয়া অশান্ত দিগন্ত-জোড়া ঢেউ শিশুদের হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। উত্তর আসে কল্ কল্ কল—কলাৎ—কলাৎ।

ভোর—সূর্যের কাঁচা সোনার আলোর বন্যায় কালো বিলের ছোট্ট ঢেউগুলি থির থির করে কাঁপতে থাকে। একটা বোবা প্রশান্তি ঘিরে থাকে সারা বিলটিতে। তারপর এক সময় বিলের স্বপ্নিল ঢেউয়ের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে ছোট্ট ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসে নিতাই, ভোলা, চরণ, ইসহাক ও আরো অনেকে। বিল ওদের কাছে স্বপ্ন। বিল ওদেরকে এনে দেয় বেঁচে থাকার জন্য রসদ আর সেই রসদের সন্ধান। বিলের বুক চষে বেড়ায় ওদের ডিঙ্গি, জাল ও কোঁচ। নিশ্চুপ হয়ে থাকে সারা বিল। কিন্তু দিনের বিল আর রাত্রির বিলে অনেক তফাৎ। দিনের বিল ওদের দেয় জীবন। রাত্রির বিলে জেগে ওঠে মৃত্যুর জয়গান। সে গানের অর্থ বোঝে ওরা। ছোট্ট ছোট্ট ডিঙ্গি ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে যায়। বলিষ্ঠ হাতের স্পর্দ্ধিত শক্তিতে ওরা বিলে বুকে হেনে চলে মারণাস্ত্র। মাছ ধরে, মাছ মারে। কালো বিল কিছুক্ষণ রক্তে লাল হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রির কালো আকাশকে ওরা ভয় পায়। ভয় পায় বিলের মাতাল ঢেউকে। ভিন্‌দেশী কোন মাঝি যদি যাত্রী নিয়ে বিলের বুক বেয়ে রাতের বেলায় এগিয়ে যায় আর তখন যদি একখণ্ড কালো মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায় তা'হলে আর রক্ষা নেই। প্রেতের মত দাঁত বের করে হেসে উঠবে কালো মেঘ-খণ্ড। চোখ ঝলসানো একটা বিদ্যুতের চাবুক লিক্ লিক্ করে দাঁড়িয়ে পড়বে সারা আকাশে। কালো মেঘভরা আকাশটা হুমড়ি খেয়ে ঝাপিয়ে পড়বে বিলের ওপর। একটানা ঘম ঘম আওয়াজে বিলের নীচে ঘাসের বুক থেকে একে একে জেগে ওঠবে ঘুমন্ত প্রেতের দল। অট্টহাসিতে সারা বিল ভরে যাবে। আর প্রচণ্ড ও দুরন্ত ঢেউয়ের মুখে ছোট্ট তরী মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। একটা দীর্ণ আর্ত্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে যাবে। যাত্রীরা আশ্রয় নেবে বিলের নীচে ঘাস বনের সবুজ বুকে। এক সময় আকাশ পরিষ্কার হয়ে প্রসন্ন হাসিতে ভেসে যায়। বিলের শান্ত জল দেখে কেউ বুঝতে পারে না যে গভীর রাতের বুকে এখানে আশ্রয় নিয়েছে ভিন্‌দেশী কয়েকটা নিরপরাধ মানুষ। দিনের আলোয় বিলের জলে সোনার স্বপ্নের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত খেলে যায়। শুধু ঢেউ শিশুগুলি রাতের বিভীষিকাময় নৃশংস দৃশ্য স্মরণ করে কেঁদে উঠে ছল্-ছল্-ছলাৎ। প্রভাত রবির মিষ্টিঝরা আলোর পরশে আর ঝাউ ও হিজলের সবুজ পাতা ছুঁয়ে আসা বাতাসে সান্ত্বনার সুর খুঁজে পায় কালো ঢেউয়ের দল। দু' একটা শঙ্খ চিল এমনি সময় উড়তে থাকে বিলের বুক বেয়ে। জীবন্ত কয়েকটা মানুষের আলাপ আলোচনায় মৃত্যুমুখর বিলে আবার জীবনের সাড়া জাগে।

লগি আর বৈঠা দিয়ে পানি ঠেলে ঠেলে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসে কয়েকটা নৌকা। আর বিলের জলে পরিপুষ্ট কয়েকটা মানুষের সবল দেহ।

বৈঠাটা পানি আর হাটুর সমান্তরাল করে নিতাই বলে, "ইসাক ভাই, কাইল কিন্তুক জবড় তুফান অইছে। বিলের ভাবডাই অন্য রহম।"

ইসহাক আঁজলা ভরে পানি নেয়। কিছু পানি মুখ থেকে কুলকুলি করে ফেলে দিল। অদ্ভুত মানুষ ইসহাক। হঠাৎ কোন কথার জবাব দেয় না। এটা ওটা করে তারপর যা বলবার বলে। অথচ বিপদে আপদে সেই ছুটে যাবে সবার আগে। বিলের ঢেউয়ের সাথে মিতালী পেতে কালো মেঘ ভরা আকাশটা ঘন ঘন কেঁপে উঠতে থাকে, একটানা ঘম্ ঘম্ আওয়াজে চারিদিকে যখন একটা প্রলয়ের ইশারা দিয়ে যায়, ইসহাকের গম্ভীর গলার আওয়াজ খান্ খান্ করে ভেঙ্গে পড়ে চারিদিকে। বলিষ্ঠ হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠে, চোখ দুটো গোল হয়ে ভাটার মত জ্বলতে থাকে; আর গলার পেশীগুলো ফুলিয়ে সে চীৎকার করে ওঠে, "সামাল, সামাল! হুঁসিয়ার হো!" ওপারের হিজল আর বাবলার সবুজ ডালগুলো কালো হয়ে দুর্দ্দান্ত ঝরকে প্রেতিনীর মত আহ্বান জানায়, "আয়, আয়, আয়।" অনেক লোক মরে, ইন্ধন জোগায় কালো প্রেতিনীর হিংসা বুভুক্ষায়।

কিন্তু ওরা অপরাজেয়। ইসহাক আর ওদের দলকে কালো বিলের মাতাল ঢেউ পরাজিত করতে পারে না। বলিষ্ঠ হাতের স্পর্দ্ধিত শক্তিতে ওরা প্রতিরোধ করে দুরন্ত শত্রুকে।

নিতাই আবার জিজ্ঞেস করে, "কি ভাই, ভাবতাছ কি।"

ইস্‌হাক উত্তর দেয়, "নতুন কইরা আর কি কওনের আছে। কুন্‌দিন যে আমরাই তলাইয়া যাইয়াম কেডা জানে। এই বিলেরে বিশ্বাস নাই।"

এবার চরন বলে ওঠে, "আমার কি মনে হয় জান ইসহাক ভাই। তুমরার লগে থাকলে আর ভয় নাই। তুমি আছ; নেতাই আছে। হের বাঁশী শুনলে ত বুঝাই যায় না কই আছি। লাঠি ধরলে কেড' আইব সামনে।"

বৈঠাটা নামিয়ে পানি কেটে কতখানি এগিয়ে যায় ইসহাকের নৌকা।

চরনের কথার উত্তর দেয় সে, "বিল তো আর মাইয়া না যে বাঁশী দিয়া ভুলাইব, পুরুষও না যে লাঠি দিয়া মাথা ফাটাইয়া দিব। হুদাই বক্ বক্ কর কেরে।"

এক যোগে এক ঝলক হাসির ঢেউ উছলে পড়ে। কতগুলো কাক বিকট শব্দ করতে করতে ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। নিতাইর নৌকার ধার ঘেষে কয়েকটা চেলা মাছ চোখ পিট পিট করে চলে যায়। নিতাই বলে ওঠে, "কি ভাই, আইজ কি গল্পই করবা? শরীরডা ঝাড়া দেও।'

ভোলা এতক্ষণ চুপ করে ওদের গল্প শুনছিল। এবার সে মুখ খোলে, "ঠিক কইছ। হেই লিয়া জাল ফেলাও।"

নৌকাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে জড়িয়ে পড়ে। ঝপ ঝপ করে জাল পড়তে থাকে।

এক ফাঁকে ইসহাক বলে, "নেতাই, বাঁশীডা দেখা যায় একজনের লাইগ্যাই রাইখ্যা দিছ। আমরারেও কিছু কিছু হুনাইও।"

নিতাই রসিকতা করে, "আর লাঠিডা কার লাইগ্যা রাখতাম। কেউ আছ?"

ভোলা আমস দেয়না। "না ভাই, তুমি বাঁশী না বাজাইলে কেমন জানি উৎসাহ পাই না। আইজ বাজাইবা নাহি। হেই মাইয়াডারে হুনাইয়া বুঝি আমরারে হুনানি যায় না।"

রূপালি মাছ ভরা জালটা নৌকায় তুলতে তুলতে চরণ বলে ওঠে, "তুমারে যে কি যাদু করছে, তুমারে বাঁশী দিয়া অহন মায়া ঝরে।

মায়া ঝরে নিতাইর বাঁশীর মোহন সুরে। লাঠি দিয়ে আগুন ঠিকরে বেড়িয়ে আসে। নিতাইর সামনে লাঠি নিয়ে কেউ আসতে সাহস করে না। হাতের লাঠিটা ভাঙ্গার সাথে সাথে মাথাটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে। লাঠিয়াল হিসাবে গ্রামান্তরে পরিচয় পড়েছে নিতাইর সুনাম। এখন আর কেউ পরখ করতে আসে না। তাই সন্ধ্যার মায়া আর হিজল-বাবলার কোমল হাওয়ায় যখন সন্ধ্যার পরিবেশ বেভুল হয়ে যায় তখন বাঁশীটা তুলে নেয় নিতাই। কিছু দূরে কালো বিলের ছোট্ট ঢেউগুলো কাল কেউটের ফনার মত নাচতে থাকে। হিজলের সবুজ পাতার মত নিতাইর চোখে নামে সবুজের স্বপ্ন ঘন দৃষ্টি। আর তখনই লাল রঙের মাটির কলসী নিয়ে একটী ছাতিম গাছের নীচে চমৎকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্গা। বর্ষার ঢলের মত ওর সারা শরীর থেকে যৌবন যেন উপচে পড়ে। বাবলা আর ঝাউয়ের সবুজ কচি পাতাগুলো সলজ্জভাবে ওদের দিকে চেয়ে চোখ বুঁজে। সন্ধ্যার নিঝুম অন্ধকারে নিতাইর বাঁশী সপ্তগ্রামে চড়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। আর দুর্গার সুন্দর মুখে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। অধীর আবেগে রাঙা ঠোঁটে সাদা দাতে কামড়ে ধরে। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময় হয়ে কেমন যেন নিদ্রালু হয়ে আসে। তারপর একসময় নিতাই দুর্গার কাছে এগিয়ে আসে। গভীর আবেশে নিতাইর বুকে মুখ লুকায় দুর্গা। ছাতিম গাছটায় একটা আচ্ছন্নতা নেমে আসে। ছায়া জড়ানো গাছটা দমবন্ধ করে যেন ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রহর গুণে। নিতাইর হাতে আবেগ-ভরা একটা চাপ দিয়ে দুর্গা চলে যায়। ছাতিম গাছের লম্বমান ছায়াটা পেছনে রেখে নিতাই এগোয়।

ওরা যখন মাছ ধরে ফিরে এলো তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে সারা গাঁয়ে একটা ক্লান্তিভাব। কতগুলো মাছ দুর্গাদের দাওয়ায় রেখে নিতাই ডাকে, "এই দুগ্‌গি, এই গইন্যা মাছডি ভাইজ্যা দেও।" একটা পিড়ি টেনে নিয়ে বসে গামছা দিয়ে বাতাস করতে থাকে নিতাই। দুর্গা বেরিয়ে আসে। পেছন পেছন ওর মা। ঘর থেকে রামদাস বলে, "নেতাই নাহিরে।"

"হ কাহা। ভাবলাম এই বেলায় মাছ রাইন্দা খাইতে পারতাম না। বেইল অইয়া যাইব। অহন দুগ্‌গি যদি দয়া করে।

দুর্গা হেসে ওঠে। "ইঃ, তুমার লাইগ্যা আবার অহন রানতাম যাই। মাছ ভাজনের লাইগ্যা তেল লাগতনা।"

নিতাই বিব্রত বোধ করে। দুর্গা এতক্ষণে মাছগুলো নিয়ে চলে গিয়েছে। মা হাসে। রামদাস হাসে।

দুর্গা ডাক দেয়। "ও নেতাই দা, ভাজা অইয়া গেছে, আইয়া খাও। অতডি মাছ খাইবা কেমনে হেইডাই কই।"

নিতাই রান্না ঘরে আসে। আগুনের তাপে দুর্গার সুন্দর মুখ ডালিম রাঙা হয়ে উঠেছে। নাকের ডগায়

বিন্দু বিন্দু ঘাম। উনুনের ধোঁয়ায় চোখের কোণে জল জমেছে।

নিতাই চুপি চুপি বলে, "একটু সামলাইয়া বও। তুমার দিগে তো আর চাওন যায়না। তুমার আগুনেই মাছ ভাজা অইয়া যাইত।"

কপট-ক্রোধে খুন্তি তুলে ভয় দেখায় দুর্গা। "এই দেহ বেশী বকর বকর করলে এই ডা লাগাইয়া দিয়াম। মাতবরী করন লাগব না। আগুন কেডা নিজে বুঝ না।"

নিতাই বলে ওঠে, "তোমারে দেখলে আর খাওনের ইচ্ছা করে না। কি করতাম কওছে।"

দুর্গার বুকের ঢেউ মুখে এসে প্রতিহত হয়। অবুঝ আবেগে ওর মুখটা আরও যেন টকটকে হয়ে যায়। নাক দিয়ে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস বের হয়।

অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে দুর্গা বলে, "তুমারে ডাকলাম মাছ নেওনের লাইগ্যা তুমি এইখানে বক্ বক্ করতাছ। এত দেরী করলে তবে লা কি লচন করব। তুমারে কইয়া দিলাম, এই রকম কথা যেইখানে সেইখানে কইও না।" নিতাই আমতা আমতা করতে থাকে। দুর্গার কথাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে এসে নিতাইর কানে বাজে, "এই নিতাই দা, দুইল্যা খাইয়া যাও। বাড়ীতে গিয়া ভাত কুন্ সময় রানবা। সাথি লারে কইয়া আয়ি।"

নিতাই বাধা দেয়, "দুর বাড়ীতে গিয়ে রানবাম। তাড়াতাড়ি দেও।

একটা কলা পাতায় কয়েকটি ভাজা নিয়ে নিতাই বাইরে পা বাড়ায়। আর বেড়ার দরজাটা ধরে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে অব্যক্ত বেদনায় দুর্গার মুখটা কালো হয়ে যায়।

দুঃস্বপ্নের মতই ওদের কাছে খবরটা পৌঁছল। পূবের আকাশ তখন উদয় রবির রঙ্গিন আলোর বন্যায় ভেসে গিয়েছে। কাঁচা রোদের কমল স্পর্শে হিজল বাবলার ঘন সবুজ পাতায় যেন প্রথম প্রেমের শিহরণ। রাত্রির ঘন কুয়াশার আস্তরণ তখনও ঘোলাটে হয়ে পাতলা পর্দার মত বিলের বুক ঢেকেছিল। আর দূরের শিমুল গাছটা পুষ্প স্তবকের রক্তমুকুট পরে আড়মোড়া ভেঙ্গে সবেমাত্র অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছিল সিঁদুর ছড়িয়ে দেওয়া পূবের আকাশটাকে।

ইসহাক এসে ধাক্কা দেয় নিতাইর দরজায়। কয়েকটা ডাক দিতে নিতাই সাড়া দেয়। দরজা খুলে বলে, "বও আইয়া ঘরে। এই বিয়ানে কের ল্যাইগ্যা আইছ। কাইল অনেক রাইতে ঘুমাইছি, হের লাইগ্যাই অতক্ষণ ঘুমাইছিলাম।"

ইস্হাক বলে ওঠে, "আরে, তুমার কাছে আইছি জরুরী কামে। জবর খবর আছে। পূব গায়ের কয়েকটি লোক বিলে মাছ ধরতাছে। কেডা জানি মানা করছিল। হেরা কইয়া দিছে কুন বেডা শালারে হেরা ভয় পায় না। মাছ হেরা নিবই। অহন তুমার লাডির ভরসাই আমরা ঠিকঠাক হইতাছি।"

মুহূর্তে নিতাইর পেশীবহুল সবল দেহটা লোহার মত শক্ত হয়ে যায়। চোখ দু'টো জ্বলতে থাকে। দাঁতে দাঁত রেখে সে বলে, নিতাইর অঙ্গে এক ফুডা রক্ত থাকতে কুন বাপের পূত মাছ ধরে দেইখ্যা দিয়াম। তুমরা সবেই ঠিকঠাক অও। আমি লাডি লইয়া আইতাছি।" ইস্হাক দ্রুত বেরিয়ে গেল।

হাতের মোটা লাঠিটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে হন্ হন করে হাটতে থাকে নিতাই। গাঁয়ের ওপর দিয়ে একটা ভীতির বন্যা বয়ে গেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিতাইর সবল উদ্ধত দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। শক্তি, সাহস আর উত্তেজনা মিলে নিতাইর বাঁধানো দেহটা অপূর্ব্ব করে তোলে। উদয় সূর্য্যের রক্তিম আলো গায়ে থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে নিতাই।

একটা জলপাই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল দুর্গা। নিতাই দেখতে পায়নি। দুর্গা কাঁপা কাঁপা গলায় ডাক দেয়, "নেতাই দা।"

নিতাই চমকে পেছন দিকে চায়। অশ্রু ছলছল চোখে মূর্ত্তিমতী বিপদের মত দাড়িয়ে আছে দুর্গা। নিতাই এগিয়ে আসে। দুর্গার সামনে এসে গম্ভীর গলায় বলে কি, তুমি এইহানে কি করতাছ। তাড়াতাড়ি কও কি কওনের।

দুর্গা কথা বলতে পারে না। নিতাইর বা হাতটা কাছে এনে অঝোর ঝরে কাঁদতে থাকে। অস্ফুট একটা কথা বেরিয়ে আসে, "নেতাই দা।"

নিতাই হাসতে চেষ্টা করে। "আরে তুমরার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। আমি না গেলে এই গায়ের ইজ্জত থাকত না। মাইনষে কি কইব। ছাইড়া দেও, যাই।"

দুর্গা কাঁদতে-ই থাকে। "না, তুমি যাইতে পারতা না। তুমারে আমি ছাড়তাম না। একটা মাইয়ার কষ্টের কথা তুমরা কুনদিন বুঝ না।"

নিতাই ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নেয়। "আইজ আমাকে মাপ কইরা দেও। আইজ না গেলে লজ্জার সীমা থাকব না।" নেতাইর হাতের পেশীগুলি আবার কিলবিলিয়ে ওঠে। বুকের আর পিঠের মাংসপেশীগুলি লাফাতে থাকে। দুর্গা আর দাড়াতে পারে না। পাগুলো অবশ হয়ে আসে। ওর কপোল বেয়ে নেমে আসে শ্রাবণের জল।

শির শির করে একটা শীতল হাওয়া বিলের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। হিজল গাছের নীচে কয়েকটা নৌকায় ওরা বসেছিল নিতাইর অপেক্ষায়। উত্তেজনামুখর ক্ষণ

বয়ে যাচ্ছিল। আর ওদের শক্ত হাতে ধরা মোটা মোটা লাঠি-সড়কিগুলো মৃত্যুর ইঙ্গিতে ঝলসে উঠছিল যেন। নিতাই এসে নৌকায় ওঠে। ওরা নৌকা ছেড়ে দেয়।

শান্ত নিথর বিলের পানি দুর থেকে দেখা যায় কয়েকটা ছায়া ছায়া মূর্ত্তি বিলের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোলা হাত তুলে দেখায়, ওই যে বেডারা অহনও মাছ ধরতাছে। পরাণে ভয় ডর নাই।

নিতাই কথা বলে না। ওর দৃষ্টি দিগন্ত-ঘেষা বিলির দুর কোণে স্থির নিবদ্ধ হয়ে আছে। ছপ্ ছপ্ ছপ্ করতে করতে ওদের নৌকাগুলো এগুতে থাকে। ছায়া-মূর্ত্তিগুলি এবার স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

ইসহাক বলে ওঠে, "হেরা টের পাইছে আমরা যে আইতাছি। হেই দেহ, হেরাও লাডি লইয়া আমরার লাইগ্যা খাড়াইয়া রইছে।"

তিক্ত কণ্ঠে নিতাই বলে, "প্যাট প্যাট কইর না। তুমরারে কইলাম তুমরার কিছু করণ লাগত না। চুপ কইরা বইয়া থাহ। নিতাইর লাডির শক্তি কতখানি আইজ দেহাইয়া দিয়াম।"

দু'দল স্পষ্টই দু'দলকে দেখতে পায়। শাঁ করে নিতাইর নৌকাটা এগিয়ে গেল ওদের দিকে। আর নিতাইর লাডির বন্ বন্ শব্দের সাথে ভাদ্রের তালের মত বিলের জলে রক্তের ঢেউ তুলে তলিয়ে যেতে থাকে ওরা। বরণ ইস্‌হাকের চোখের বিস্ময়ের সামনে কয়েকটা লোক প্রাণরক্ষার প্রয়াস না পেয়ে সবুজ ঘাসের শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নিল। ওদের খালি নৌকাটা দুলতে দুলতে কিছুদুর এগিয়ে যায়।

রক্তস্নাত নিতাই বলে, "এই চরণ, নৌকা চালা।"

ইসহাকের চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। সে তখনও পরিশ্রান্ত নিতাইর চওড়া বুকের উঠা-নামা দেখছিল। শরীরের কয়েক জায়গায় রক্ত চাপ চাপ হয়ে আছে।

ইসহাক বলে ওঠে, "এই ডা কি দেখলাম। মনে হইতেছে অতক্ষণ খোয়াব দেখছি। তুমার সঙ্গে বইতে আমার ত ভয়ই করতাছে।"

বিলের জলে গা থেকে রক্তের দাগ তুলতে তুলতে নিতাই বলে, "হেরা আমার নাম তা ভুইল্যা গেছিল। নেতাই যে অহনও মরছে না হেইডাই টের পাওয়াইয়া দিলাম।"

গল্প করতে করতে ওরা এগোয়। হিজল গাছের গুড়িতে নৌকা বেঁধে ওরা পাড়ে উঠে আসে।

চরণ যাওয়ার সময় বলে যায়, "নেতাই, আইজ আমার বাড়ীতে খাইয়া যাইছ।"

দু'টো বন করবী আর গাব গাছে জড়াজড়ি করে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে অপেক্ষা করছিল দুর্গা। গাব গাছ থেকে কয়েকটা শালিক কর্কশ শব্দ করতে থাকে। একটা বাচ্চা শালিক গাছ থেকে পড়ে গিয়ে এক পাখা ঝাপটা দিচ্ছে। নেতাই এই পথেই বাড়ী যাবে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে দুর্গা। কিছুদূরে লেবু গাছটার নীচে একটা বিড়াল অতক্ষণ বসে বসে দুর্গাকে দেখছিল। কি মনে করে উঠে গেল!

একটা নরম হাত দুর্গার চোখ দুটো পেছন থেকে চেপে ধরে। ভীষণ ভাবে চমকে ওঠে দুর্গা। আর তখনই ওর নিতান্ত পরিচিত মানুষের কথা শোনে।

"কার লাইগ্যা কইন্যা তুমি
অধীর অইয়া যাও,
মনের মানুষ আইল অহন
নয়ন তুইল্যা চাও।"

হাত দিয়ে চোখ ছাড়িয়ে দুর্গা বলে, "নয়ন বন্ধ কইরা কইতাছ নয়ন তুইল্যা চাও। তুমরার ও হেই ডাই। মাইয়া মানুষের মন কাইড়া নিয়া পরে যেইটা ইচ্ছা হেই-ডাই কর।"

নিতাই হাসে। "বিল খাইক্যা হেই বেডারে সড়াইয়া দিলাম তুমিত কিছু জিজ্ঞাসাও করলা না। আমার লাইগ্যা তুমার কি রহম টান সাজে বুঝাই যায়।"

দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। "ইঃ, নিজে গুণ্ডামি করব, হের লাইগ্যা চিন্তা করব আরেক জন।"

নিতাই সহসা বলে ফেলে, "তাহলে কান্ ছিলা কেরে?"

আবার কেঁদে ফেলে দুর্গা। আষাঢ়ের বিকালে—মাথা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মত টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়তে থাকে দুর্গার। সে বলে ওঠে, "ফের লাইগ্যা গেলা তুমি। কুন্‌হানে বাড়ি লাগছে। এই তা না করলে তুমার ভাত হজম অয় না?"

অসহ আবেগে দুর্গার সুন্দর যৌবনের ঢল-নামা দেহটা নিজের কাছে টেনে আনে নিতাই। "আরে নেতাইর গায় লাডি তুলব এই রহম বেডা পয়দা অইছে? তুমি তো আচ্ছা পাগল।" দুর্গা কাঁদতেই থাকে। নিতাই ফিস্ ফিসিয়ে বলে, "এই, অহন বাড়ীত যাও। কন্ সময় কেডা আইয়া পড়ব লজ্জাত পড়ন লাগব।" দুর্গা ধীরে ধীরে নিতাইকে ছেড়ে দেয়। কোন সময় যে সূর্য্যের অবাধ্য অসভ্য রশ্মিগুলি ওদের গায়ে গায়ে মিশে গিয়েছিল ওরা টের পায় নি।

চরণের বাড়ী থেকে খেয়ে যখন নিতাই বাড়ীর পথ ধরে সারা গায়ের ওপর নেমে এসেছে তখন একটা ক্লান্ত ছায়াচ্ছন্ন ভাব। ঝাউ আর বাবলা, হিজল আর শ্যাওড়ার গাছের ওপর কেমন যেন একটা ঝিম ধরা ঘুম ঘুম ভাব।

দূর থেকে শোনা গানের কলির মত শোনা যাচ্ছে ডাহুক পাখীর সকরুণ কণ্ঠস্বর। ক্লান্ত সুরের রেশ কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বিলের বুকে ছায়া ঘেসে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হিজলের বোবা দেহ।

একটা সুন্দর প্রজাপতি নিতাইর কাঁধে এসে বসে। হো হো করে একাই হেসে ওঠে নিতাই। আপন মনে বলে ওঠে, "বিয়া ডা তাইলে এদ্দিনে এই বো দেহা যায়।" হিজলের ডাল থেকে ডাহক-ডাহুকা এক সাথে ডেকে উঠছে। নিতাই উল্টো পথে হাটতে শুরু করে। ছাতিম গাছটাকে পেছনে ফেলে বন-করবী আর গাব গাছটাকে ডাইনে রেখে সে এগিয়ে যায়।

দুর্গাদের কলা বাগানটা পার হয়ে সে এসে হাঁক দেয়। "কাহা আছ পাহি গো।" একটা বেড়ার জানালা ওপর দিকে উঠে যায়। সুন্দর একটি মুখ উঁকি দেয়। মুখে দুষ্ট হাসির ঝিলিক। চোখের মাঝে রাজ্যের দুষ্টুমী এসে জমা হয়েছে। চোখের ইশারায় নিতাইকে ডাক দেয় দুর্গা। চারিদিকে একটা শান্ত নিস্তব্ধতা। নিতাই কাছে যায়। বলে, "এই দুগ্‌গি, ঘুষ দিবা।"

দুষ্টুমি ভরা চোখ বড় বড় করে দুর্গা কপট ভয়ে বলে, "কি অপরাধ করলাম।"

নিতাই এক মুহূর্ত্ত ভাবে। বলে ওঠে, "অপরাধ করছ এই ভাই তুমি উই সোন্দর মুখটা বাড়াইয়া রাখছিলা কেবে?"

দুর্গা অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করে। "কি আমার গোপাল গো! খোকা ডু ডু খাবা?"

নিতাই চাপা গর্জ্জন করে ওঠে, "এই দুগ্‌গি।"

রামদাস সাড়া দেয়, "গল্প করে কেডা, কি রে দুগ্‌গি?"

চকিতে দুর্গার মুখটা ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। দুর্গার কণ্ঠ শোনা যায়, "নেতাই যে আইছে, জিগাইতেছিল তুমি বাড়ীতে আছ নাহি।"

নিতাই এতক্ষণে দাওয়ায় উঠে পড়েছে। "কাহা, তুমার লগে কয়ডা কথা আছে।"

রামদাস আহ্বান জানায়। "আয়, ঘরে আয়।"

নিতাই যখন দুর্গাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো, সামনের পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তার দৃষ্টি থেকে তখন সরে গিয়েছে। ওর দৃষ্টি তখন গোলাটে ঝাপসা কুয়াশার সৃষ্টি করেছে। বিলের মাতলা ঢেউ ফুঁসে সারা গাঁ গ্রাস করে তলিয়ে দিতে আসছে। হিজল ঝাউয়ের সবুজিমা সরে গিয়ে কালো বিভস ঢেকে দিয়েছে ওদের। টলতে টলতে পথ চলে নিতাই। মাথার মাঝে হাজার সাপের দংশন। উঃ। অস্ফুট চীৎকার করে উঠে নিতাই। কেন লাঠির আঘাতে চড়িয়ে দিতে পারল না? বোবা একটা কান্না উশড়ে ওঠে।

নিতাই দুর্গাকে বিয়ে করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল রামদাসের কাছে। নিতাইর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রামদাস এ বিয়েতে অসম্মত হতে পারে না। কিন্তু নির্জ্জন আকাশের বুক চিরে লক্ লক্ করে বয়ে গেল বিজলীর রঙিন ছটা। খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল বজ্রের ঘন নির্ঘোষ। রামদাস বললো এ বিয়ে হতে পারে না, যে লাঠিয়াল তার জীবনের কোনই মূল্য নেই। ঝাউয়ের পাতার মতই ওর জীবনের স্থিতি। কালো বিলের নীচের সবুজ ঘাসের শীতল বুকে কোন্ দিন যে নিতাইর উদ্ধত দেহ গড়িয়ে পড়বে কে জানে। লাঠিয়ালের কাছে একমাত্র মেয়েকে বিসর্জ্জন দিতে রামদাস পারবে না। এতদিন যদি সে এ-আশা পোষণ করে থাকে তা হলে সেটা ভুল। যে সুন্দরী যুবতীর দেহ আর মন নিয়ে নিতাই তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল কল্পনার ইমারত, একটি মাত্র কথার আঘাতে সে ইমারত ধ্বসে পড়ল উই ঢিবির মত।

দূর গ্রামে এক গৃহস্থের সাথে বিয়ে হয়ে গেল। নিতাইর জীবনে নেমে এলো অমাবস্যার ঘন কালো রেখা। দুর্গাদের নৌকা যখন বিল পার হয়ে ঝুমকা নদীতে গিয়ে পড়ছিল নিতাই তখন শিমুল গাছটার গুড়িতে বসে একমনে চেয়ে দেখছিল তার অতি প্রিয় বাঁশের বাঁশীটিকে। দুর্গা অনেক আশায় চেয়ে দেখছিল যদি নিতাইকে দেখা যায়। শুধু একটা শুষ্ক হাওয়া বয়ে গিয়েছিল ওদের নৌকার ওপর দিয়ে। থেকে থেকে হিজল ফুলের ডাঁটাগুলো মাথা নেড়ে নেড়ে ওকে বিদায় জানাচ্ছিল। ঝুমকার স্বচ্ছ কালো জলে নৌকা পড়লো। সাদা পাল উড়ল ওদের নৌকার ওপর।

মাস যায়। বর্ষ আসে। শিমুল পাতা ঝরে গিয়ে সত্তর বছরের বুড়ির মত ধুকতে থাকে। কয়েকটা কাক বৃথাই ঝগড়া করতে করতে আরও পাতা ঝরিয়ে যায়। তারপর আবার ওদের দেহে সোনার যৌবন ফিরে আসে। লাল শিমুলের নব যৌবনের রক্তরাগ। হিজলের ডাঁটা ফুলে লাল হয়ে থাকে। রঙিন সোনা-ঝরা স্বপ্ন নিয়ে প্রকৃতি দেখা দেয়।

রাতের গভীরে বোবা প্রহরগুলো যখন মিছিল করে রাত্রি শেষের পানে অভিযান করে, বিলের ওপরে ছোট্ট নৌকায় ভূতুড়ে ছায়ার মত নিতাই ঘুরতে থাকে। তারপর এক সময় একমাত্র সহচর প্রাণের বাঁশীটিকে তুলে নেয়। বাঁশীর কান্না-ঝরা মোহন সুর গুমরে বিলের জলে মিশে যায়। একটা বেদনার দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায় বাতাসের স্তরে স্তরে। রাত্রির আকাশ আর বাতাস উৎকর্ণ হয়ে

শুনতে থাকে বেদনা-ভরা সুরের মর্ম্ম বিলাপ। ঝাউ বাবলার কাছে এসে নিতাই বাঁশীতে শেষ ফুঁ দেয়। রাত দুপুরে জেগে থাকা প্রহরীরা স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে বুক-চেরা না বলা কথার ব্যথার আলাপ। ছাতিম গাছের ছায়ার আঁধারে মিশে যায় নিতাইর দীর্ঘ সবল দেহ।

এমনি একদিন। শৃগালেরা রাত্রির প্রহর ঘোষণা করে চুপ হয়েছে অনেকক্ষণ। হিজলের আকড়া লম্বা দেহগুলো ছায়া ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। থেকে থেকে বিলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দ শন শনানি। নিতাইর ডিঙ্গি ঢেউয়ের তালে তালে ঘুম পাড়ানি দোল দিয়ে যাচ্ছে। নিতাই সবেমাত্র হাত বাড়িয়ে বাঁশীটা নিতে যাচ্ছে, বিশ্রী এক ভয়-জাগানো কলরবে সে চমকে উঠল। কিছু দূরেই একটি নৌকা ঘিরে মশাল জ্বলছে। একটানা 'রে রে' শব্দের সাথে থেকে থেকে ভেসে আসছে নারী কণ্ঠের আর্ত্ত বিলাপ। লাঠিয়াল নিতাই জেগে ওঠলো বাঁশীটা পাশে রেখে সে হাত বাড়িয়ে লাঠিটা নেয়। তীর বেগে নিতাইর নৌকা ডাকাতদের মাঝে এসে পড়ে। হতচকিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ডাকাতদের কয়েকজন কিছু বুঝবার আগেই বিলের নীচে ঘাসের বনে লুটিয়ে পড়লো। রুখে দাঁড়াল কয়েকজন। চাপা গর্জ্জন করে ওঠে নিতাই। একটি কালো রেখায় বাতাসে একটি শব্দ করে তুলে নিতাইর লগি পড়ে। অস্ফুট আর্তনাদে আরেকজন ডাকাত লুটিয়ে পড়ে। বিদ্যুতের মত ঘুরতে থাকে নিতাইর লগি। ডাকাতেরা নিঃশেষে হয়ে শীতল ঘাসের মরণ আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে।

নৌকার ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না গুমরে ওঠে। নিতাই বলে "আপনে চিন্তা করুইন নাযে। ডাকাইতেরা মরেছে।"

কান্না থামে না। নিতাই আবার বলে, "আপনে বাইরে আইয়া কইন কই যাওন লাগব। আপনার লগে কেউ নাই?

ক্রন্দনরতা নারী ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

নিতাই বলে, "কই যাওন......"

একটা বিস্ময়ের রূপ নিয়ে নারী মূর্ত্তির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অস্ফুট একটা কথা "নিতাই দা।" নিতাইর পা টলে ওঠে। নারী মূর্ত্তি আবার বলে, "নিতাই দা তুমি।"

"দুগ্‌গি।" একটা চীৎকারের মত শোনা যায় নিতাইর কণ্ঠ।

"তুমার জামাই কই? কার লগে আইছ।" গম্ভীর হয়ে নিতাই বলে।

"তুমি খাওনের আগেই ডাহাইতরার হাতের লাডি খাইয়া জলের নীচে পড়ছে।"

নিতাই নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়। "কও তুমি কই যাইবা। পৌছাইয়া দেই।"

অদ্ভুত শোনা যায় দুর্গার কথাগুলি। এ যেন সেই এক মুহূর্ত্ত আগের দুর্গা নয়। এ যেন নিতাইর কল্পনা ইমারতের চিরন্তন সৌন্দর্য্য প্রতিস্থার অনুরূপ।

দুর্গা বলে ওঠে, 'ফল ডা কি অইব ভাবছ। তুমি আমারে লইয়া গেলে মাইনষে ভাবব তুমি আমার সোয়ামীরে মাইরা আমারে পাইতে চাও। বাহাদুরী দেখানির লাইগ্যা বাড়ীতে পৌছাইতে গেছ।"

দুর্গার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে নিতাই ওর পানে অবাক—বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

নিরুপায়ের মত নিতাই বলে, "তাইলে অহন কি করতাম?"

দুর্গার অধীর কণ্ঠ শোনা যায়। "হেইডাও আমার কওন লাগব? মরন আমার লাগবই। কেরে তুমি আমারে বাচাইলা? এইডার লাইগ্যা?"

নিতাই বলে ওঠে, "দুগ্‌গি। যে লাডির লাইগ্যা তুমারে হারাইছিলাম, হের জোরেই তুমারে পাইলাম। চল আমরা যাইগ্যা এইহান থাইক্যা।"

গভীর আবেগের সাথে দুর্গা বলে, "তুমি যেইডা কও।"

দুর্গার সুন্দর মায়াময় দেহটা কাছে টেনে এনে নিতাই কি যেন পরখ করতে চায়।

এক সময় নিতাইদের নৌকা ঝুমকার মৃদু স্রোতে গা ভাসিয়ে এগিয়ে চলে।

রক্ত পলাশের লালিমায় নূতন জীবনের উজ্জ্বল দিনের ইশারা। হিজলের লাল ফুলের কাঁটাগুলো মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকে। উদয় সূর্য্যের সন্নি গোলক স্বচ্ছ জলের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পরে।

মতীয়র রহমান খাঁর রসরচনা

মঈনুদ্দীন

বাঙলা সাহিত্যের যে যুগের সাধারণ সৈনিক বলে আমরা দাবী করি, সে হচ্ছে নজরুলী যুগ। এই যুগের এক যুগ আগের কথা। রবীন্দ্র যুগ তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাইকেল বংকিম যুগকে পেছনে ফেলে রবীন্দ্র যুগ তার স্বীয় মহিমা ঘোষণা করে চলেছে। মুসলিম সাহিত্যসেবীদের অধিকাংশের মনে রবীন্দ্র যুগ তখনো বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মাইকেল-বংকিম যুগের সৃষ্টি মুসলিম বিদ্বেষমূলক রচনার প্রতিবাদে তাঁরা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। এজন্য এঁদের ভাষা হয়ে উঠেছিল সংস্কৃতবহুল শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ। কিন্তু বিষয়বস্তু প্রতিবাদ-মূলক আর লুপ্তকৃত মুসলিম শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনীতে সমুজ্জল। সম্ভবতঃ এই যুগের শেষ পুরুষ মতীয়র রহমান খান।

মতীয়র রহমান খানের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ-কথাই মনে হয়, কী বিপুল অধ্যবসায়, কী বিরাট পাণ্ডিত্য থাকলে এ ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, রসরচনা লিখেছেন, কাব্য লিখেছেন, আর লিখেছেন অসংখ্য কবিতা। মিথ্যা বাগাড়ম্বরে নিজেকে যাহীর করার প্রয়াস তাঁর ছিল না। ধ্যানমগ্ন তাপসের মতো নীরবে তিনি শুধুমাত্র সাহিত্যের সাধনা করেছেন। তাঁর লেখাগুলো এতো দিন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি তা' সংগ্রহ করে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর পুত্রদিগের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাকারে তা' ছাপা হচ্ছে। সম্ভবতঃ দু'তিন মাসের মধ্যেই এই সংগ্রহগ্রন্থ বেরিয়ে যাবে। এ-বই বাজারে বের হলে আশা করা যায় মতীয়র রহমম খাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণের একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে। এখানে আমি তাঁর রসরচনা সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করবার চেষ্টা করছি।

গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ছাড়াও মতীয়র রহমান খানের রসরচনা কম নয়। যতগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এবং গ্রন্থাবলীতে যা দেয়া হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এই: ১। প্রগূঢ়তত্ত্ব, ২। গুপ্তসভা, ৩। গাঁজাখুরী, ৪। ভুখা হুঁ, ৫। ন্যাজ-প্রসঙ্গ, ৬। Stop Yur ব্যাস-দেব, ৭। হংস রহা, ৮। চালিয়াতির বিপদ।

এই লেখাগুলোয় তিনি তৎকালীন দেশ ও সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-কটাক্ষ করেছেন। যদিও তিনি ইংরাজের অধীনে সরকারী কর্মচারী ছিলেন, সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তবু তিনি 'সাহেব লোগ'দেরও বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। অবশ্য লেখাগুলো তিনি শ্রীশ্রী দু' কান কাটা, উচিত বক্তা, ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি ছদ্ম নামে লিখেছেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলো তিনি নিজের নামেই প্রকাশ করেছেন। এবং প্রত্যেকটি লেখায় তাঁর অপূর্ব মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি লেখা এরূপও আছে যে তা তিনি শুধু রসিকতার জন্যই রসিকতা করেছেন। এ ধরণের লেখাগুলো বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্যতা রাখে।

'গূঢ়তত্ত্ব' লেখাটিতে তিনি তথাকথিত পত্রিক সম্পাদকদিগের প্রতি বক্র কটাক্ষ করেছেন। কি উপায়ে এবং সহজ পন্থায় সম্পাদক হিসেবে সস্তা বাহবা পাওয়া যেতে পারে, তার কতকগুলি নোসখা বাৎলে দিয়েছেন তিনি তাঁর এই 'গূঢ়তত্ত্ব' রচনায়।

'গুপ্তসভা' লিখেছেন তিনি উগ্র স্বাধীনতাকামী এবং সমাজে বিশৃংখলা আনয়নকারী তথাকথিত নারী স্বাধীনতার উপাসিকা নারীদের একটি সভাকে ব্যঙ্গ করে। বাড়ীর পরিচারিকা তার সাহেবকে তাড়াতাড়ি খানা শেষ করতে অনুরোধ জানালো। কারণ তাকে একটি গুপ্ত সভায় যোগ দিতে যেতে হবে। এ-সংবাদ অবগত হয়ে সাহেব তথ্য সংগ্রহ করতে নিজেই নারী সেজে সভাকক্ষের দরওয়াযার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভলান্টিয়ার-প্রহরী সযতনে দ্বার রক্ষা করছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনার পরিচয়টা জানিতে পারি কি?"

(ভলান্টিয়ার-প্রহরীবেশী) রমনী বলিল: "আমি মিস্ পদ্মাবতী বোস, বি, এ; জিমনাষ্টিকে প্রথম হইয়া মেডেল পাইয়াছি, স্যাণ্ডোর সহিত বলপরীক্ষার্থ শীঘ্রই জার্ম্মেণী যাইব।"

সাহেব মনে মনে ভাবিলেন: "বাবা, এ মেয়ে নয়, এ পুরুষের বাবা।"

বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নারীবেশী সাহেব সভা-কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পেলেন। সভার অনেকগুলি প্রস্তাব তিনি সংগ্রহ করলেন। তার একটি প্রস্তাব এই:—

"এই সভার প্রত্যেক সভ্যা স্ব স্ব পুরুষকে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন এবং কোন পুরুষ সহজে উল্লিখিত মতে কার্য্য

করিতে অস্বীকার করিলে, প্রথমে চোখরাঙানী, পরে ভিন্ন গৃহে স্থান দান এবং অবশেষে 'শতমুখী' নামক জগৎবিখ্যাত অস্ত্রের সদ্ব্যবহারে তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিবেন।"

রসরচনায় জনাব মতীয়র রহমান খান 'গাঁজাখুরী' গল্পে বেশ রস সৃষ্টি করেছেন। গোয়ালিনী দুধে পানি দিয়েছে। এজন্য গল্পের নায়ক গোয়ালিনীকে ধমকাচ্ছেন এইভাবে:

"খবরদার, আর দুধে জল দিস্ না, এবার জল দিলে তোর নামে সংবাদপত্রে লিখব। কেউ আর তোর দুধ নিবে না।"

ধমক খেয়ে গোয়ালিনী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তা দেখে নায়ক তাকে উপদেশ বর্ষণ শুরু করলেন। তারপর মিলএর লজিক বোঝানোর চেষ্টায় মেতে উঠলেন। বললেন: দেখ্ গোয়ালিনী, তোর বুদ্ধি এই সম্মুখস্থ কুড়ালের বাঁটের মত মোটা। এই সামান্য কথাটার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলি না।... আমার মতে মিলের লজিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মিল যে পড়ে নাই, সে মানুষের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। মিলের লজিক সায়রের জল, অপরের লজিক পচা পুকুরের পানা। ব্যস্ত হস্ না, সিলোজিজমটা বুঝাইয়া দিই:

নো হিউম্যান বিং ইজ পার্ফেক্ট।
গোয়ালিনী ইজ হিউম্যান বিং।
দেয়ার ফোর গোয়ালিনী ইজ নট পার্ফেক্ট।

নায়ক আরো বল্লেন: "মিল একথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তর্ক চলিবে না। তুই আমার নিকট প্রথম 'প্রিলিমিনারী লেসন্স ইন লজিক' পড়িতে আরম্ভ কর। তারপর এসব কথা জলের মত বুঝিতে পারিবি।"

গোয়ালিনী দুঃখব্যঞ্জক স্বরে কহিল: "আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকিয়াছে, আমার কি আর পড়িবার বয়স আছে বাবা। আর ক'দিন, তারপর মাটির দেহ মটিতে মিশিয়া যাইবে।

নায়ক উৎসাহে চীৎকার করে উঠলেন—ফ্যালাসি, ফ্যালাসি—ইহারই নাম লজিক্যাল ফ্যালাসি।'

সস্তায় নাম কেনার জন্য জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মুকুট ধারণ উৎসব উপলক্ষে পঞ্চাশ হাযার টাকা দান করলেন। কথা হলো: দরিদ্রের ভেতরে এই টাকা বিতরণ করা হবে। এতে যে ভোজ দেওয়া হলো, তাতে জাতিবৈষম্য কিরূপ মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছিল, তা মতীয়র রহমান খাঁ সাহেব তাঁর 'ভুকা হু" রচনায় ব্যঙ্গ করেছেন। এজন্য তিনি খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার মিঃ আর, মিত্রের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ-ব্যঙ্গ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি নির্ভীকতায় পূর্ণ।

নামের মোহে মানুষ পাগল। কি করে নিজের নামটি একটু বেশী করে ফাটবে, শুধু সেই চিন্তায়ই যে সে ব্যস্ত তা' নয়, নিজের দু'অক্ষরের নামটিকে কি কি বিশেষণ লাগালে দেড় গজি একটা নাম তৈরী করা যায়, তা' নিয়ে মতীয়র রহমান খান লিখেছেন—'আমার ন্যাজ বেরিয়েছে'। নাম বৃদ্ধির মোহে তখন প্রায় সকলকেই পেয়ে বসেছিল। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় এই মোহ প্রায় সবারই কেটে গেছে।

'Stop your ব্যাস দেব'—মিঃ ক্রীগ নামক কোনো ধনী ইংরাজের প্রতি বক্রোক্তি মূলক ব্যঙ্গ রচনা।

'হংস রহা'—রূপকের সাহায্যে উপদেশ মূলক ব্যঙ্গ রচনা।

'চালিয়াতির বিপদ' লেখাটি পড়ে মনে হয় তিনি নিজের বাস্তব জীবনে যে-সকল হাস্যরসাত্মক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা-ই তিনি এই লেখাটিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। হাসির গল্পগুলোতে সাধারণতঃ থাকে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন ঘটনা।

'চালিয়াতির বিপদে' তা নেই। তবু এতে রস আছে' আছে রসিকতা।

রসাত্মক গদ্য রচনা ছাড়াও ছন্দোবদ্ধ কবিতায় তিনি রস ছড়িয়েছেন অনেক। বাঙালীর ভীরুতা প্রবাদ বাক্যের মতো ছড়িয়ে আছে, দেশের আনাচে-কানাচে। এক ব্যঙ্গ করে তিনি বাঙালীকে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

তাঁর ব্যঙ্গের নমুনা:

"কে বলিল শক্তিহীন নির্জ্জীব বাঙ্গালী
ভীরু, কাপুরুষ আখ্যা কে দিল তাহারে?

* * * *

কাণ্ডজ্ঞান বিরহিত পাষণ্ড সে জন
হেন পাপ কথা যেবা উচ্চারিল মুখে।
সম্মুখে পাইলে তারে, গালাগালি দিয়া
যথোচিত, লইতাম প্রতিশোধ তার।

* * * *

ভেদিব কলঙ্ক ব্যূহ তর্ক শরজালে।
দেখাইব জগতের জনে, দেখাইব
তন্নতন্ন করি' বাঙ্গালী নির্জ্জীব নহে;
হায়রে ধুনন যন্ত্রে ধুনারী যেমন
তন্নতন্ন করে তুলা রাশি। কে বলিল
বাঙ্গালীতে বীরত্ব অভাব? সে দিনের
কথা—স্ত্রীসহ হইল কলহ। আমি
ডরিনু কি তারে? যা বলিল দিনু তার
সমান উত্তর। উত্তপ্ত শোনিত ক্রমে
বীরমদে হৃদি শেষে উঠেল মাতিয়া;

লইলাম করে ভীষণ দর্শন এক
দীর্ঘ বংশ যষ্টি, হানিলাম শিরোদেশে।
অব্যর্থ আমার লক্ষ্য, হ'ল ভূপতিত,
হায়রে যেমন ছিন্ন মূল কলা গাছ
পড়ে ভূতলে। বিপক্ষে জিনিয়া রণে
(কে পারে জিনিতে মোরে ভুবন মণ্ডলে ?)
বসিলাম বাহিরেতে গোঁফ ফুলাইয়া
একে একে পোড়াইনু নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
তামাকু চিলিমত্রয়। স্বহস্তে রন্ধন
করিলাম একবেলা ; তবু না সাধিনু
পায়ে ধরে তারে। কে বলিল বাঙ্গালীর
নাহি সহিষ্ণুতা ? সহিয়াছি অকাতরে
শ্বেতাঙ্গের সবল সবুট পদাঘাত
বিচলিত হই নাই তাহে, টু' শব্দটী
করি নাই মুখে—ক্ষমাগুণে সেই দণ্ডে
করেছি মার্জ্জনা। এভব মাঝারে আর
কোন্ জাতি সহিষ্ণু সে বাঙ্গালীর চেয়ে ?
এখন নীরব কেন, দাও না উত্তর ?"

আমার সাথে জনাব মতীয়র রহমান খান সাহেবের যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি দীর্ঘ শ্মশ্রু বিলম্বিত পক্ককেশ বিশিষ্ট ভারিক্কী গোছের ভদ্রলোক। যদিও আমরা একই মহকুমা ও থানার অধিবাসী, তবু তাঁর সাথে এর আগে আমার দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। কারণ সরকারী কাজে তিনি প্রায়ই থাকতেন বিদেশে, আর আমার তখন সবে মাত্র সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করার কসরৎ চলছে। এমতাবস্থায় তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফের অন্তরালে যে একটি বিরাট রসিক পুরুষ লুকিয়ে আছে, তা কি আর তখন জানতে পেরেছিলাম ? তাঁর লেখাগুলো অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হলো 'বধূ' শীর্ষক একটি কবিতা। এতে তিনি যে রস পরিবেশন করেছেন, বিশেষ ভাবে তা' উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী-স্তোত্র তিনি লিখেছেন এই ভাবে :

প্রণমামি দেবীরূপী শ্বশুর নন্দিনী।
এ ভব সাগরে মাত্র আশার তরণী॥
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা কারে নাহি চাই।
যদি চরণের প্রান্তে কণা স্থান পাই॥

প্রণমামি নৎনেড়ে উপদেশ দায়িনী।
বিধু-মুখে হেসে ভব ভয় বারিনী॥
অধম পুরুষ তব পদতলে পড়ে।
শক্তি স্বরূপিণী তুমি নাচ বক্ষোপরে॥

নমামি ইঙ্গিতে আছি যোড় করে খাড়া।
লেখা পাঠ ভুলে যাব দিও নাকো তাড়া॥
"বোকা ছেলে" আমি, তুমি গুরু মহাশয়।
ভয়ে ভয়ে কেঁপে সারা, কি হয় কি হয়॥

নমামি খোকার মা আমার গৃহিনী।
রান্নাঘরে সুপকার শর্য্যার সঙ্গিনী॥
খাওয়া পরা বাবা জানে, আমি জানি তোরে।
কলুর বলদ আমি, তোল কানে ধরে॥

নমামি নোলক নাকে সুখের ফোয়ারা।
ধরেছ লাগাম তুমি, আমি টাট্টু ঘোড়া॥
পৃষ্ঠে চড়, মার এড়ি, তেজ কদমে ছুটি
আমি যে গোলাম তব শ্বশুরের বেটি॥

দাম্পত্য প্রেমের এ এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মতীয়র রহমান খান, তাঁর রসে রসায়িত লেখনীর সাহায্যে। এ রসিকতায় আছে লংকার ঝাল, চিনির মিষ্টতা আর অম্বলের অম্লতা। সাহিত্যের অঙ্গনে তা বেঁচে থাকবে—দেখন হাসি, মুচকি হাসি আর হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হিঃ হাসির অপরূপ মাধুর্য নিয়ে।
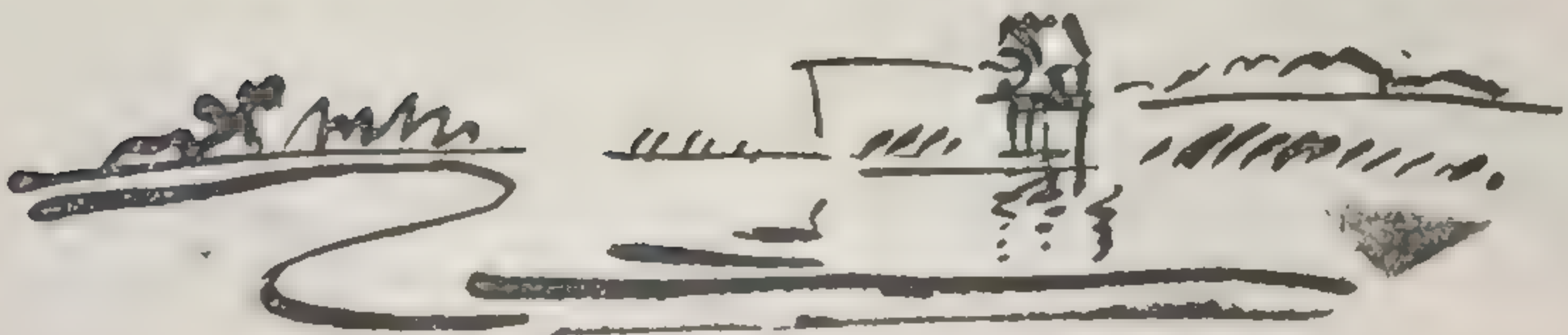
সংগম তীর্থ

নূরুল ইসলাম খান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

। পাঁচ)

শালবনে ফুল ফুটেছে। মহুয়া বনে মহুয়া। সূর্য্যের স্নিগ্ধ রঙটা জড়িয়ে পড়েছে দূর বনের পাতায় পাতায়। গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এসেছে রোদ পোহাতে মাছরাঙা, এসেছে হলুদ আস্তরণ গায়ে দিয়ে প্রজাপতি। এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে দূরত্বের ব্যবধান কমিয়ে দিচ্ছে বুলবুলি মাথায় ঝুঁটি পরে। ঝর্ণা বইছে অদূরে। ছল্ ছল্ ছলাৎ। অদ্ভুত শিহরণ লেগেছে সুরাইয়ার দেহমনে। তাকিয়ে ছিল জানালা ধরে আকাশ ছোঁয়া নীলান্তের দিকে। আমের অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই রয়ে গিয়েছে।

দৃষ্টি পড়লো অদূরে একটা টীলার উপর। খোকা ফড়িং ধরছিল। লাল, হলদে, শাদা, সবুজ। অতি আলতোভাবে অপটু হাতে ধরতে চায় সে; অমনি উড়ে যায় আর এক পাতার আড়ালে। বেচারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বুঝি। কি সুন্দর ছেলেটা তাই না। এক ঝাঁকড়া চুল, কাজলপরা বড়ো বড়ো চোখ, কেমন স্বাস্থ্য। বুকে নিলেও বুকে ধরবে না। আর কি দুষ্টু। ফড়িং-গুলোর কোনো মায়া নেই; খালি উড়ে পালায়। খোকার সঙ্গে ভাবে আর একজন। পারবে না ধরতে তবুও জেতা চাই। পেছনে হটবে না তবু। করুণা হলো, মায়া হলো। হোক তার বুক প্রণয়ক্লান্ত; তবুও পারবে সে ঐ ছেলেটাকে বুকে সজোরে চেপে ধরতে।

আঃ বুকের কোণটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

সুরাইয়া আস্তে আস্তে নেমে গেল বারান্দা দিয়ে। চুপি চুপি টীলার উপর গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ খোকা ধরেছে বটে; কিন্তু লাল নয়—ও লাল চায়: রক্তরাঙা। শিশুমন নিস্তেজ হয়ে আসে।

খোকা ফিরে তাকাতেই দেখলো সুরাইয়াকে। আধ ফোটা মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—"একটা লাল ফলিং ধলে দেবে? ঐ যে...ঐ যে..." ছোট একটা নরম আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে সে।

আঃ ছেলেটা শুধু ফড়িং চায় কেন। সুরাইয়া তার এত বড় দেহটাকে কুঁচকে এতটুকু ছোট্ট করে ঐ শিশুর মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। ও পারে তার উদ্ধত বুকে ঐটুকু ছেলেকে আশ্রয় দিতে—মমতা দিয়ে ঘেরা তা। কিন্তু ও কি নেবে? না: ছেলেটা ফড়িং চায়। শুধু একটা লাল পাখনা মেলা ফড়িং। যে কেবলই লাফায় এ পাতা থেকে ও পাতা। সুরাইয়ার চোখ দুটো ভিজে আসে।

—"একটাই ফড়িং নেবে তো?" বললো সুরাইয়া।

—"না না দুটো।" খোকা তার অপরিচিতা শিকারীর ক্ষমতা বুঝে দাবী বাড়িয়ে দিল।

—"আচ্ছা।"

অনেক কষ্ট করে লাফিয়ে লাফিয়ে সুরাইয়া ফড়িং ধরলো দুটো নয়—গোটা কয়েক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত। খোকা ভারী খুশী। এতদিনে একটা নয় চার চারটে ফড়িং জব্দ হয়েছে তার কাছে। বন্ধুত্ব হয়ে গেল দুজনে। সেই সুযোগে সুরাইয়ার কোলে বসার স্বীকৃতি পেল সে। আঃ। কি তৃপ্তি।। অনেকদিন ধরে এমন শিহরণ সে পায়নি।

খোকা বললো—"আমার মা কিন্তু ফলিং ধলে দেয় না।" বুকে মাথা ঠেকিয়ে বললো সে।

ছোট চিবুকটী নেড়ে বললো সুরাইয়া—"কেন দেন না?"

—"মা বলেন ফলিং ধললে পাপ হয়—আচ্ছা পাপ কি গো, বলো না?"

স্মৃতির বিষণ্ণতায় সুরাইয়া উত্তর খুঁজে পায় না। তবুও বলে—"পাপ ..পাপ...মানে...মানে আমিই খোকা।"

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে প্রশ্ন করলো—"তিন্তু তুমি যে ফলিং ধললে? তোমার তো কিন্তু হলো না... দানো, তবে আমিও পাপ..."

—"না না তুমি না"—অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুরাইয়া।

—"না বাবা তুমি কিন্তু দানো না। আমি মাকে না লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক ফলিং ধলেছি।" বিস্ময় প্রকাশ করে খোকা।

মায়ের অলক্ষ্যে খোকার ফড়িং ধরার বীরত্বে সুরাইয়ার গাল দুটো একবার হাসিতে উপচে পড়লো। খোকাকে বুকের আরও একটু সান্নিধ্যে টেনে এনে বললো—"আচ্ছা খোকা, তোমরা কোথায় থাকো?"

—"ঐ...ঐ...ওখানেই।" কোমল হাত দিয়ে বাংলোটা দেখিয়ে দেয়।

—"মানে...ঐ...ঐ...ওখানে?" কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে সুরাইয়া।

মাথা নেড়ে জবাব দেয় খোকা।

খোকার সঙ্গে সবে মাত্র আলাপ জমে উঠেছে। এমনি

সময়ে কাঞ্চী সহসা এসে পড়ে। খোকাকে দূর থেকে দেখেই ও চমকে ওঠে। সুরাইয়া ওকে কোলের উপর বসিয়ে তীব্র উন্মাদনায় ওর মসৃণ গাল দুটো চুম্বনের পর চুম্বনে ভরে দিচ্ছে। কাঞ্চী ভয় পায়। বুকটা ওর থা থা করতে থাকে। মনে হয় সুরাইয়ার চুম্বনে ওর বুকের ভেতরে একটার পর একটা কালশিরার মত চিহ্ন বসে যাচ্ছে, কে যেন আত্মসাৎ করতে চায় খোকাকে ওর কাছ থেকে। ভয় পায়। দারুণ ভয়।

ছুটে আসে খোকার কাছে। সুরাইয়ার বিব্রত মুখে লজ্জার পুলক জাগে।

—"খোকা, তোকে না আমি কখন থেকে খুঁজে মরছি—শীগগির দুধ খাবি আয়।"

খোকা সুরাইয়ার বুকে আরও একটু মিশে গিয়ে বললো—"না আমি দুদু খাবো না।"

—"আয় বাবা; লক্ষ্মী আমার।"

সুরাইয়া খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে বললো—যাও খোকা, ভাল ছেলেদের জিদ করতে নেই।"

এবার ভাল ছেলের মতই কোল থেকে নেমে পা ফেলে ফেলে কাঞ্চীর কাছ থেকে দূরে গিয়েই ছুটলো। পা পা করে। যেতে যেতে বললো—"না আমি খাবো না...আমি খাবো না..."

কাঞ্চী সুরাইয়ার দিকে চেয়ে বললো—"দেখেন ছেলের কাণ্ড! রোজ খাবার সময় হলেই এমনি করবে।"

শূন্য বুক থেকে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো—"ছেলেটা বুঝি আপনারই?"

উত্তর দিতে গিয়ে হোঁচট খায় কাঞ্চী। বুকটা দমে আসে। বিবর্ণ হয়ে যায় গলার স্বর। ঠোঁট দুটো কেঁপে ফসকে বেরিয়ে আসে মুখ থেকে—"হ্যাঁ।"

—"দুষ্টুমী করলেও ভারী লক্ষ্মী ছেলে আপনার।"

পাণ্ডুর মুখখানা ব্যথায় টন টন করে উঠে কাঞ্চীর। শুধু চেয়ে থাকে সুরাইয়ার মুখের দিকে। আকুতিভরা।

—"আপনিও আসুন না, কিছু খেয়ে নিন। বাবুজীর আসতে দেরী হবে।"

—"চলুন।"

সুরাইয়া তখনও ভাবছে; মাত্র দু' মিনিটের মধ্যেই ছেলেটা তার সমস্ত চেতনা নাড়া দিয়ে গেল। জাগিয়ে তুললো সুপ্ত মাতৃস্নেহকে। কাঞ্চী ভাবছে; মমতাই বুঝি শেষ সত্য নয়: আরও আছে। আছে অধিকার, আছে জীবনের সঙ্গে নাড়ীর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। আশ্চর্য্য!

॥ ছয় ॥

অফিসের কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সেরেই বাড়ী ফিরি। মনে সংশয় ছিল, এখনও আছে। কি জানি মেয়েটা আছে কি নেই। সুরাইয়া জেদী শুধু জেদী, নয়—একরোখা। হৃদয়ে পবিত্র আলোক সন্ধানী সুরাইয়া, আজ জীবনের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে প্রকট করতে চায়; জীবন আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ফুটে উঠা আলোর তপস্যাকে গ্রাস করতে চায় এক লহমায়, হত্যা করতে চায় নিজেকে, নিজের সত্তাকে।

তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরলাম।

এসে দেখি কাঞ্চী নেই। খোকা খেলছে সুরাইয়ার সঙ্গে। গাড়ী, ঘোড়া, পুতুল নিয়ে।

অপলক দৃষ্টি আমার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সুরাইয়ার মুখের দিকে তাকালাম, তাকালাম খোকার দিকে। রক্তের স্রোত। স্রোত বড়ো ভয়ঙ্কর। জীবনের বদ্বীপে এই স্রোত উত্তাল নয়। বড়ো শান্ত, বড়ো স্নিগ্ধ। তাই এই মহাসাগরেই বোধকরি ও তলিয়ে গেছে অনেক গভীরে—নিজের অজ্ঞাতে। মনে হলো মমতার সবচেয়ে করুণ ট্রাজেডী তার আত্মপ্রবঞ্চনায়।

নিজেকে সামলে নিলাম।

খোকা আমাকে দেখেই 'বাবা বাবা' বলে হাত তালি দিয়ে উঠলো। ওকে কোলে নিয়ে আদর করে পকেট থেকে এক মুঠো লজেন্স বের করে ওর হাতে দিলাম। খোকা নেমে গেল।

—"কেমন আছো?" সুরাইয়াকে প্রশ্ন করি।

—"কোনো অসুবিধে নেই। আচ্ছা কবীর, বিয়ে করলে, খোকা তোমার ছেলে কই, একথা তো একবারও বললে না।" স্মিত হেসে প্রশ্ন করে সুরাইয়া।

—"বিয়ের মত পবিত্র সম্পর্ক হলেই যে সন্তানের জন্ম—একথা তোমায় কে বললে সুরাইয়া?"

—"অন্ততঃ সংসারের যা নিয়ম তাতে তো তাই মনে হয়।"

—"তুমি কি সংসারের সব নিয়মই মেনে চলছো সুরাইয়া?"

—"একদিন মানতাম কবীর—কিন্তু আজ নয়। আজ আমি সব নিয়মের উর্দ্ধে। একটা উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতু—যে সব নিয়মের বাইরে থেকে সবার চোখ ঝলসে দেয়। যাক গে, তোমার ছেলেটা কিন্তু খুব লক্ষ্মী"

—"কেন, ওর মাঝে তোমাদের জীবনের কোনো সত্য খুঁজে পেলে নাকি?" কটাক্ষ হানি।

নিষ্প্রভ উদাস দৃষ্টিতে বললো সুরাইয়া—"তা জানিনে কবীর, তবে তোমার ছেলেটাকে দেখলে সত্যিই মায়া লাগে।"

—"তা মায়া লাগার কারণও আছে। পথে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, সবার কাছেই স্নেহের আশ্রয় খোঁজে।"

—"পথে কুড়িয়ে পাওয়া মানে ?" বিস্ময়ে প্রশ্ন করে সুরাইয়া।

—"ও আমার ছেলে নয় সুরাইয়া, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে। ওর যখন ছ মাস বয়স তখন ওর বাবা মারা যায়। তারপর সংসারের আর সব উচ্ছৃঙ্খল মায়ের মতই আমার তরুণী বন্ধু-পত্নী স্থানীয় এক কুলির সঙ্গে ছেলে রেখে পালায়। বন্ধুর ছেলে। দায়িত্ব এড়াতে পারলাম না। কাঞ্চীরও একান্ত অনুরোধ। তাই নিয়ে এলাম ঘরে। সেই থেকে মানুষ হচ্ছে। কাঞ্চীকে মা বলে আমাকে বলে বাবা। কাঞ্চী ওকে ছেলের মতই স্নেহ করে।"

কথাগুলো তীরের মতই বিঁধলো সুরাইয়াকে। অস্ফুটে বললো—"ওঃ, তা ওর মায়ের আর কোনো খবর পাওনি ?',

—"না পেয়েছি। তবে মেয়েটা আর ছেলেটাকে চিনতে পারেনি…যদি কোনো দিন পারে রক্তের মূল্য দিতে ; ফেরত দোব সেদিন।" চোখের রেখায় সত্য গোপনের চেষ্টা করি।

—"তা তুমি চাও না কি ছেলেটাকে ? চাইলে নিয়ে যেতে পারো।"

নিশ্বাস ছেড়ে বললো সে—"না কবীর, মন চাইলেও ওকে নিয়ে যাবো না। কারণ আমার চ্যালেঞ্জের পথে বাধা আসুক এ কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারবো না।"

—"না সুরাইয়া, মানুষ চেষ্টা করলে অতি উঁচু পর্ব্বতকেও অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু জীবনে এমন অনেক বাধা আছে যাকে মানুষ কোনো শক্তি দিয়েই অতিক্রম করতে পারে না।"

—"অতিক্রম করতে না পারি কবীর ; কিন্তু সম্মুখীন হতে ক্ষতি কি ?"

—"না ফিরে এসো তুমি। এখনও সময় আছে। মিছেমিছি জীবনটাকে নষ্ট করো না।"

—জীবন আমার নেই কবীর। শুধু এই দেহ আছে : আর এটাও তো একদিন বিলীন হয়ে যাবে ;—"

উভয়েই নির্ব্বাক।

—চ্যালেঞ্জ, শুধু একটি মাত্র চ্যালেঞ্জের জন্যই বেঁচে আছি কবীর। যাক গে, তোমার সময় আছে ?"

—"না থাকলেও করে নিতে পারবো। বলো কি দরকার ?"

—"আমার সঙ্গে যাবে ?"

—"কোথায় ?"

—"যেখানে পুরুষ জয়ী হতে যায়, পরাজয়ের গ্লানি মেখে আসে।"

—"তার মানে ?"

কাঠ হাসি হেসে বললো—"তোমার কোনো ভয় নেই কবীর, তুমি শুধু দর্শক হিসেবে যাবে। যুদ্ধ তোমায় করতে হবে না। আমার অনুরোধ, যাবে তুমি ?"

—"কিন্তু কোথায় বলবে তো ?"

—"এখন বলবো না, গেলেই বুঝতে পারবে। রাখবে আমার অনুরোধ ?"

—"বেশ চলো।" বোবার মত বললাম।

—"যেতে হবে অনেক দূরে, সিলেটে—যাবে ?"

—"তা যাবো, যুদ্ধক্ষেত্র যত দূরেই হোক সৈনিককে তো যেতেই হবে।" হাসলাম।

* * * *

বনের ভেতর দিয়ে চলছিলাম আমরা দুজনে। কিছু-দূর গেলেই পাকা সড়ক। সেখানে বাস। বাসে করে সিলেট টাউনে। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। প্রায় একটা বাজে। ভাবছিলাম সুরাইয়ার কথা। আজ ও তামসী। অন্ধকারেই ওর বিস্তৃতি। ও আলো চায় এই বিকট অন্ধকারেই, আলোর অভাবে নয় : অন্ধকারকে ভাল-বাসে বলে। একদিন এই মসীলিপ্ত রাত্রিকে ভয় করতো। আজ ঝিঁঝির ডাকে রোমাঞ্চ জাগে। যত ভয় আজ এক মুঠো আলোর ঝলকেই।

সহসা সুরাইয়া থমকে দাঁড়াল সেই পুকুরের সামনে, যেখানে একদিন সে এসেছিল কারও জন্মের ইতিহাসের উৎস মুখ চাপা দিতে। নিজের হাতেই। ছলছল করে উঠলো ওর চোখ দুটো।

সব বুঝেও বোবার ভান করলাম—"থমকে দাঁড়ালে কেন, এসো।"

—"একটা সত্য তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম কবীর। এ সেই জায়গা যেখানে বুকের এক ফোঁটা কলুষ রক্ত নিঙড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমার চ্যালেঞ্জের পথে একটা বাধা এসেছিল—ছোট্ট একটা শিশু। হত্যা করতে পারিনি ; তাই মাটির পুতুলকে মাটিতেই ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি বড় নিষ্ঠুর—কিন্তু কেন হলাম কবীর ?"

যেন কিছু হয়নি এমনি ভেবে বললাম—"তুমি যে পথে নেমেছো তাতে এ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। নারী মানুষকে জন্ম দেয়। তাই মনুষ্যত্বের পরিচয় এ পর্য্যন্ত নারীকেই বহন করতে হয়েছে। একের মধ্যে তাই নারীর বিকাশ : কিন্তু তোমার মধ্যে অনেকের সুরাইয়া। এসো।"

আবার পথ চলতে থাকি দুজনে।

* * * *

এলাম সিলেটে। উঠলাম ছোটো দোতলা একটা বাড়ীতে। সুরাইয়াই পথ চিনিয়ে নিয়ে এলো আমায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে চোখে পড়লো দু একটা মুখ। কচি, শুকনো। তাজা ফুলকে মালা গেঁথে গলায় পরলে

যেমন দেখায়। ক্ষত বিক্ষত অথচ উদ্ধত। দমকা হাওয়ার মত সন্দেহ এসে জমতে লাগলো মনের ভেতর। সুরাইয়া সোজা আমায় নিয়ে গেল ছোটো একটী কামরায়। গোছানো। মাঝে একটা পালং। তার উপর ফরাস পাতা বিছানা। নরম পালকের মত। এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে একটা ড্রেসিং টেবিল। তার পাশে ছোট্ট একটা টুলে অর্দ্ধনগ্ন নারী আকৃতি; ফুলদানীতে রজনীগন্ধা। তারই মৃদু গন্ধের কুয়াশায় বাতাসে শিথিল সঞ্চালন। জানালায় রেশমী পর্দা। উঁকি মারলে দেখা যায় অস্পষ্ট একটা পাহাড়। ঝাপসা মেঘের মত। দেয়ালে কয়েকটী ছবি। অর্দ্ধনগ্ন নর-নারীর। মিথুনরত। যুক্তরঞ্জনক।

চোখের পাতা কুঁচকে এলো ঘৃণায়।

বললাম—"এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে সুরাইয়া ?"

হেসে বললো—"কেন, এ সেই যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে পুরুষ জয়ী হতে আসে আর পরাজয়ের গ্লানি মেখে যায়।"

চমকে উঠি—"তুমি কি এখানেই থাকো ?"

—"না আমি থাকি না। আমার পরিচিতা এক অভাগী বান্ধবী থাকে।"

—"এরা কি সবাই— ?"

—"হ্যাঁ সবাই দেহ বিক্রি করে। তোমরা সৌন্দর্য্যের ব্যবসাদার। কিনতে আস, এরা বিক্রি করে।"

—"না সুরাইয়া, দেহটা খোদার জীবন্ত ঘর, তার আমানত—তাকে তোমরা এভাবে নষ্ট করতে পারো না।" বেদনায় কুঁকড়ে উঠি।

—"খোদা। খিল খিল করে হেসে উঠে সুরাইয়া ;" ঠিক বলেছো কবীর ; তাই বোধকরি খোদাকে নিয়েই তোমরা এখানে আস আমাদের ভোগ করতে ; প্রকারান্তরে খোদাকেই তোমরা ভোগ করো, তাই না ?

—"সুরাইয়া !" কানে আঙ্গুল দিলাম আমি।

—"না না ভয় পেয়ো না, খোদা আমাদের নেই। হয়তো এক সময় ছিল। কিন্তু এখন এই বাড়ীর ত্রিসীমানায় খোদা ঢুকতে সাহস পান না। তোমরা তাকে হত্যা করেছো, নিশ্চিহ্ন করেছো এই বাড়ীর ভেতরে। এখানে শুধু পুরুষ আর নারী : মদ আর মাৎসর্য্যের রাজত্ব।"

—"না সুরাইয়া যেখানে পাপ সেখানেই খোদা। তুমি তাকে দেখতে পাবে না। খোদা সব সময়েই তোমাদের সতর্ক করছে তোমাদেরই বিবেক দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, তোমাদেরই অনুভূতি দিয়ে।"

—"হয়তো অন্য কোথাও আছে কবীর, কিন্তু এখানে সে মৃত। বিশ্বাস না হয় এ বাড়ীর প্রতিটী মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ : খোদা পচছে তাদের মধ্যে, পচে পচে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে ওদের দেহ থেকে। খোদার মসজিদ থেকে... তোমাদের খোদা আজ এখানে বন্দী। কিন্তু কে করেছে বলতে পারো ?"

—"খোদা বন্দী নয় সুরাইয়া খোদা মুক্ত। অন্ধকারে তার মহিমার প্রকাশ ঘটে, আলোতে ব্যাপ্তি।"

—"আর সেই আলোতেই বুঝি তোমাদের চোখে ধরা পড়ে শুধু নারীর দেহটা, তার বাইরের সৌন্দর্য্য— তাই না ?"

—"জীবন আর যৌবন দুটিই ভোগ করারই জন্য সুরাইয়া। তুমি কি চাওনা তোমার জীবনে ভ্রমর আসুক : বীজ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফলে পরিণত হোক তোমার জীবন ?"

—"আমি কেন, হয়তো পৃথিবী শুদ্ধ লোকই তো চায়। তবে মানুষের জীবনে একটা মস্তবড় ট্রাজেডী কি জানো ? মানুষ নিজের কাছে নিজেকে ঠিকমত বিলিয়ে দিতে পারে না। কোরআন আমি বুঝি না কবীর,—তবুও একটা কথা মনে পড়ছে ; 'আল্লাহো নূরস্‌সামাওয়াতে অল্ আরদ্।' তোমার আমার সবারই দেহ নাকি এই নূরের আগুনে সৃষ্টি। এই আগুনকে ভোগে আনতে হলে তার প্রতি মানুষের সংযম থাকা দরকার। যে আগুনে প্রদীপ জ্বলে তোমার ঘর আলোকিত হয়, সেই আগুনেরই শিখায় এই বিশ্ব সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। কেন বলতে পারো ? ভোগের পথে সংযমের অভাবে। আমাদের দেহে আগুন জ্বলছে, তাকে তোমরা ভাল বাসতে পারোনি, ভোগ করতে চেয়েছো : সংযমী হতে চাওনি। তাই বলছিলাম কবীর, আমাদের দেহের মসজিদে যে খোদাটী আছে সে আজ একটা মমির মতই বোবা নিষ্প্রাণ। তোমাদের কামনার শেষ বিন্দুটুকু তাই প্রকারান্তরে গিয়ে পৌঁছোয় তোমারই খোদার কাছে—"

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম ওর কথাগুলো। কে বলছে, সুরাইয়া। না ওর ভেতরের, অন্তরের গভীরতম সত্তার সুপ্ত মানুষটা যে আকস্মাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেহে মনে বিচিত্র একটা অনুভূতির প্রস্রবণ বয়ে চললো। মনে হলো অবশ হয়ে গিয়েছি। মনের দিক থেকেও। মূক বোবা।

তবুও বললাম—"থাক ওসব কথা সুরাইয়া, হৃদয়ের ভাবাবেগে নিজের জীবনটা নষ্ট করো না। ফিরে এসো।"

—"ফিরে যাবো, কোথায়, কার কাছে—তুমি আশ্রয় দেবে ? কিন্তু কেন, কি চাও—আমার দেহ ? সেটা এক্ষুণি নিতে পারো।"

কানে আঙ্গুল দিলাম আমি।

—"তোমার দেহ নিয়ে কি করবো। তুমি আমায়

না পারো পৃথিবীর আর কাউকে গ্রহণ করে সুখী হও। তবুও ফিরে এসো এ জীবন থেকে…”

—“না কবীর তা হয় না। চ্যালেঞ্জ, শুধু একটা চ্যালেঞ্জ—আমার মধ্যে আগুন জ্বলছে।”

—“সুরাইয়া, এই পৃথিবীতে কম করেও প্রায় তিন শ কোটী লোকের বাস। তার মধ্যে কমপক্ষে অর্দ্ধেক পুরুষ। পারবে তুমি এই দেড় শ' কোটী পুরুষের কামনার ক্ষুধা মেটাতে—পারবে ?”

—সংখ্যার দিক থেকে এটা সম্ভব কিনা জানি না। তবে পথ চলতে চলতে যদি কোনো দিন মুখ থুবড়ে পড়ি দোষ আমি কাউকে দেবো না। যে আগুন দিয়ে আমি-তুমি সবাই তৈরী সেই আগুনকেই তো আমার ভেতরে চাপা দিয়েছি। কবর দিয়েছি আমার আত্মাকে।”

—“তবে কি তুমি ফিরে আসবে না ?”

—“না”

—“সত্যিই ?”

—“না।”

—“তবে একটা কথা মনে রেখো সুরাইয়া। মানুষের ক্ষুধা অসীম, অনন্ত। তার মৃত্যু নেই। এই ক্ষুধার পৃথিবীতে পুরুষ তার বাইরের আবরণ নিয়েই ব্যস্ত। সে চায় পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর-অসুন্দর; ভাল-মন্দ সব কিছুকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়মের বাইরে এনে এক লহমায় পান করতে। আর নারী অন্তর-তাপসী। বাইরের আলোয় চোখ ঝলসে অন্তরের পবিত্রতার দিকে পুরুষকে আকর্ষণ করাই নারীর ধর্ম। পুরুষ এ ক্ষেত্রে অন্ধ। তাই নারীকেই সক্রিয় হয়ে পুরুষের হাত ধরে কাঁটা বাঁচিয়ে পথ চলতে হয়। যে মেয়ে তা পারে সেইই একমাত্র জানে পুরুষের সাহচর্য্য কত মধুর: আর যে পুরুষ এমনি ভাবে হাতে হাত মিলিয়ে পথ চলতে জানে সেও অনুভব করে জৈবীক সৌন্দর্য্যের অন্তরালে আরও একটা জগত আছে—যার নাম সংযম।”

নিশ্বাস নিয়ে আবার বললাম—“আমি জানি সুরাইয়া, একদিন না একদিন তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বেই। আর সেদিন তুমি নতুনভাবে বাঁচবার অবলম্বন খুঁজবে—নিশ্চাই খুঁজবে। তাই আজকের সন্ধ্যায় আমার একটি অনুরোধ মনে রেখো—যদি কোনোদিন সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ো, আমার অনুরোধ, আমার বাংলোয় ফিরে এসো। নতুন জীবন আরম্ভ করার একটা অবলম্বন খুঁজে দেবো। আমাকে দিয়ে নয়, একটা উপহার দিয়ে।”

সুরাইয়া হেসে বললো—“বেশ তোমার অনুরোধ মনে থাকবে। কিন্তু মৃত্যুর সময় কি উপহার দেবে শুনি ?”

—“আবেহায়াৎ। যেটা খেয়ে তুমি যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকবে পৃথিবীর বুকে।” স্মিত হাসলাম।

—“আচ্ছা চলি এবার…” উঠে দাঁড়াই।

—“এক্ষুনি যাবে ? আর একটু বসো না।” করুণ আকুতি।

—“না সময় নেই। আবার আসবো।”

—“আবার এলে হয়তো আমার নাও পেতে পারো কবীর, আমি এখানে থাকবো না।”

—“ও”

—“আচ্ছা চলো তোমায় খানিকদুর এগিয়ে দিয়ে আসি।”

—“তাই চলো।”

॥ সাত ॥

রক্ত-মাংসের এই দেহটাকে ধারণ করার জন্যই তো সৃষ্টির আদি মানবীকে নিষিদ্ধ ফল খেতে হয়েছিল। এবং আদি পিতাও নারীর এই রূপে, ছলনায়, মোহে প্রলুব্ধ হয়ে প্রথমে স্পর্শ, তারপর আলিঙ্গন শেষে সম্ভোগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। দেহ সম্ভোগের কার্য্যে শয্যাতেই তো প্রথমে আসে একটি ভ্রুণ, ক্রমান্বয়ে শিশু তারপর বড় হয়ে চেতনার উপলব্ধিতে পরিণতিতে সেও চায় নারী, নারী চায় পুরুষ। এর বিরাম নেই। ভোগের পথই সৃষ্টির: পথ, নিজেকে জানার পথ। নইলে সব ব্যর্থ: তুমি, আমি, সৃষ্টি।

সুরাইয়ার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর অনেকদিন ভেবেছি কথাগুলো। ভেবে ভেবে ক্লান্তি বোধ করেছি নিজের মনে কিন্তু সঠিক কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। তারপরে ও ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে খসে গিয়াছে আটটি মাস। বয়স যত কমেছে পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ তত বেড়েছে। তবুও ওর স্মৃতি মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম মন থেকে। কিন্তু পারিনি। যতবার চেয়েছি মুছে ফেলতে হৃদয় থেকে ততবারই যেন আরও গভীর ভাবে দাগ কেটে গিয়েছে আমার চেতনায়। ছেলেটাকে সুরাইয়াকেই ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সব খুলে বলবো। কিন্তু পারিনি ওর মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে। সুরাইয়া সেই ধরনের নারী যারা পুরুষের বুকে শুয়েও কথা বলে না, শুধু নিজের স্পর্শ দিয়েই জানাতে চায় জীবনের যত ব্যথা-বেদনা, যত জড়িমা। সত্যকে পেয়েও যারা সত্যের পেছনে মরীচিকার মত ছুটে মরে,-জীবনের সব আদর্শই যাদের কাছে চরম, কোনো ঘটনাই শুধু কার্য্যকারণ মাত্র নয়।

ও আসবে একদিন এই আশা ছিল কিন্তু প্রত্যয় ছিল না। তাই ছেলেটার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেই ওকে মানুষ করছিলাম। কাঞ্চীও বোধকরি আমার বাসনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। তাই খোকার বিচ্ছেদটা

ওর বুকে বড়ো বেশী জমতো। তবুও মাঝে মাঝে কাঞ্চীর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে দুঃখ অনুভব করতাম। বিচিত্র অদৃষ্ট। বেচারী জীবনের কোনো স্বাদই গ্রহণ করতে পারলো না। ওর নিজের গন্ধ হরিণীরই মত নিজেরেই জীবনের চারদিকে উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা—কে জানে। ওকে এভাবে বন্দী করে রাখায় নিজেকে তাই বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল। সেদিন তাই কাঞ্চীকে ডেকে বলছিল—"কাঞ্চী, তুই আর এমনি কতকাল থাকবি। জীবনের কোনো আনন্দই তো তুই পেলি না তোর বিয়ে আমি ঠিক করে দিচ্ছি—কেমন?"

কথাটা শুনে কাঞ্চী ফুঁপিয়ে উঠেছিল সেদিন চীৎকার করে কাঁদেনি। ভয়ে, লজ্জায়। তবুও কিসের একটা তীব্র যন্ত্রণায় মরিয়া হয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করেছিল—"বাবুজী, তুমি যেদিনই বলবে সেদিনই তোমার ঘর ছেড়ে চলে যাবো, আর আসবো না।"

আমি অপ্রতিভ—"না না আমি তা ভেবে বলিনি কাঞ্চী..."

—"তবে...তবে কেন বললে ওকথা...কেন, কেন?"

মুখে শাড়ীর আঁচল গুঁজে ছুটে পালিয়েছিল সেদিন। কথা বলেনি তারপর দুদিন। অবুঝ স্নেহাকাঙ্খী মেয়ের মত অভিমান ভাঙ্গতে হয়েছিল আমাকেই। তারপর থেকেই কাঞ্চীর ভাবিষ্যৎটাও এসে যোগ হলো খোকার ভাগ্যের সঙ্গে।

বুঝতে লাগলাম আমি একা। দুটো ভাগ্যের সঙ্গে। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম সুরাইয়ার। অনেক দুঃখের পর। অনেক আঘাতের পর। তুমি বলেছিলে নতুন জীবন আরম্ভ করতে। কিন্তু ভেবে দেখলাম এ পৃথিবীতে কোনো বস্তুই নতুন নয়; সবই পুরানো সবই আদিম। বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে এ পর্য্যন্ত অনেকেই জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে। নতুন সত্য বের করার চেষ্টা করেছে তার মধ্যে থেকে। কিন্তু পেরেছে কি নতুন আলোর সন্ধান দিতে? না পারেনি। সবই রোমন্থন। জীবনের যে দিক থেকেই বিচার করো না কেন—সেই অনাদিকালের প্রেম, স্নেহ, আদর্শ আর মদ-মাৎসর্য্য। এ সবেতেই তো মানুষের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে আসতে বাধ্য। পৃথিবীতে নতুন সত্যের আমদানী বন্ধ হয়েছে যেদিন থেকে মানুষ নিজের পরিচয় জানতে পেরেছে। আমার নিজের পরিচয়—আমি দেহ-ব্যবসাপিনী। এও কি নতুন? না—সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে নতুন পরিচয়ই আমার। তবুও সরে এলাম ও পথ থেকে। স্বেচ্ছায়। বলবে আমার ক্লান্ত জীবনের অবসাদ। না তা নয়। ঘটনাটা অতি স্বাভাবিক। সংসারের প্রতি ঘরে ঘরে এ ঘটনা ঘটে থাকে। তথাপি এই সাধারণ সত্যই আমার মনকে ঠকাল। আমাকে নির্লজ্জ কদর্য্যের পথ থেকে সরিয়ে আনলো। তোমাকে বিদায় দেবার পর মাত্র দু'দিন ছিলাম সিলেটে। তারপরেই চলে আসি কুমিল্লায়। ক্ষুধার্ত সৈনিকদের ক্ষুধা মেটাতে। দেশকে যারা দু'হাতে আগলে ধরে, রক্তের প্রতি যাদের একটা আকর্ষণ—এসে নিজের বুক দিয়ে আগলে ধরলাম ওদের পৌরুষকে। রক্তের নেশা ছুটে গেল; আমার নেশায় ওরা পাগল। এখানে নাচালাম অনেককে, পাগল করলাম বেশী। যে কটাকে বশ করতে পেরেছিলাম দূর থেকে হিংসার ইন্ধন জুগিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তুললাম। পাড়া হাওয়ার মত দমকা মেরে একে অপরের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। আমি চলে এলাম নিজেকে বাঁচিয়ে, ওদেরকে মারামারি করার সুযোগ দিয়ে। এলাম চট্টগ্রামে। আড্ডা নিলাম সমুদ্রের তীর ঘেঁষে কক্সবাজারে। বড় বড় শিকার ধরে সাগরের বেলাভূমিতে এনে আছড়ে সর্ব্বস্বান্ত করে দিতাম। সামনে নীল সমুদ্র। তবুও পিপাসায় ওরা আকুল। তৃষ্ণার পানি দিতাম কণ্ঠনালী কেটে। এখানেই পেলাম পনের ষোলো বছরের এক কিশোরকে। বুঝলাম ছেলেটার মন আমার দিকেই ঝুঁকেছে বেশী। বন্য, হিংস্র। বোধকরি মায়ের গর্ভ থেকেই সিদ্ধহাত এ সব কাজে। অপক্ক চোখে লোভাতুর দৃষ্টি। দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। আবার এলো। অপমান করলাম যাচ্ছে-তাই করে। কটাক্ষ হেনে চলে গেল। অপমান বোধ করলাম নিজে নিজে। শৈশবে বিয়ে হলে হয়তো ঐ বয়সেরই ছেলে থাকতো আমার। যে বয়সের ছেলেকে বুকে টেনে নিতে পারি অম্লান বদনে, গর্ভের কোষে কোষে যাদের রক্তের অণুপরমাণু জড়ানো, মাতৃত্বের আবেগে যাদের ঠোঁট দুটি ভরে দিতে পারি পবিত্র চুম্বনে—সেই মানুষের কাছ থেকে প্রিয়ার সম্ভাষণ—ধিক্কার এলো নিজের মাতৃগর্ভের উপর। তারপর দুদিন আর দেখা পেলাম না ছেলেটার। ভাবলাম বিপদ গেছে। কিন্তু ওর ছায়ার স্পষ্ট আভাষ দেখতে পেলাম চারিদিকে। তার পরের দিন এলো। সঙ্গে আর একটী ছেলে। রাগে, ঘৃণায় জ্বলে উঠলাম। ভয় দেখালাম। অপমান করলাম। কিন্তু তাতেও ছেলেটা দমলো না। বরং বিকৃত হেসে বললো—"রাগ দেহাও কারে? তোমার মত বেশ্যা অনেক দেখছি। দাম নিবা সওদা দিবা। তুমি তো আর আমার মা-বইন না যে তোমারে রহিয়া কথা কমু...হুঁ...কি আমার সাধুরে।" বিশ্বাস করবে না, সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে গেল ছেলেটার কথায়। ইচ্ছে হচ্ছিলো সেই মুহূর্তে নিজের দেহটা টুকরো টুকরো করে সামনে সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়ে দিই। অর্দ্ধোন্মাদের মত হয়ে গেলাম। আমার জীবনের সমস্ত অণুগুলো যেন

ষ্টিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল দেহ থেকে। কুৎসিত! পুরুষের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আমি এই কি পেলাম? দেহ লালসার পরিবর্তে নতুন জীবনের নতুন সত্যকে। শুধু দেহের ব্যবসায়, না ব্যবসা নয়, পুরুষের প্রতি করুণাই করেছিলাম এতদিন। নারী হয়ে নারীত্বের, মাতৃত্বের অবমাননা করিনি। তাই এ লাঞ্ছনা সইতে পারলাম না। মুখ থুবড়ে পড়লাম পথে। যে মাথা নত হয়েছে তাকে তুলে ধরবার মত ক্ষমতা আমার আজ নেই কবীর। আজও আমি ভাবতে পারছিনা কোন্‌টা সত্য—ছেলেটা পুরুষ না আমি নারী? যাই হোক ছেড়ে দিলাম ও পথ। আমার প্রতিজ্ঞা অসম্পূর্ণ রইলো: আর রইলো মানুষের আদিম ক্ষুধা। তার পরেই সোজা চলে এলাম আবার এখানে। তোমার সেই যুদ্ধক্ষেত্রে—মৃতের সঙ্গে প্রেম করতে। জীবনের যুদ্ধে আমি আজ মানসিক ক্লান্ত। আমার অসুখ হয়েছে। খারাপ অসুখ। এপথের মেয়েদের যা হয়। ডাক্তার দেখাইনি। দেখাবোও না। চেয়েছিলাম বাঁচতে, এখন চাই মরতে। তথাপি তোমার অনুরোধটা মনে রেখেই চিঠিখানা লিখলাম। ভালবাসার পাত্রকে ঠকাতে পারলম না। খোকাকে আর তোমার কাঞ্চীকে দেখতে মন চাইছে। ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসো। যত শীগগির পারো। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে।

তোমার সুরাইয়া

নীড়ে ডানা ভাঙ্গা পাখী যেমন উড়তে গিয়ে মাথা গুঁজে পড়ে মাটীতে তেমনি আমি হলাম আহত। চেতনা শক্তি শিথিল হয়ে এলো। বিস্ময়াবিষ্ট।

—"অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছো বাবুজী—কার চিঠি?"

বাস্তবে ফিরে এলাম কাঞ্চীর কথায়।

—"সুরাইয়া লিখেছে। ওর খুব অসুখ। ও ভাল হয়ে গেছে কাঞ্চী। তোকে আর খোকাকে দেখতে চায়—যাবি?" ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারলাম না কথাগুলো। একটার সঙ্গে আর একটা অসংলগ্ন।

মুহূর্ত কয়েক কি ভেবে বললো কাঞ্চী—"যাবো না কেন বাবুজী। তবে তুমি বরং ওকে এখানেই নিয়ে এসো। ওর সেবার দরকার। এখানে তুমি আছো আমি আছি। ও নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। তাছাড়া খোকাকে পেলে ও ভারী খুশী হবে।"

—"তুই ঠিকই বলেছিস কাঞ্চী। সুরাইয়াকে ওখানে দেখাশুনার কোনো লোক নেই। আমি ওকে এখনই আনতে যাচ্ছি।"

বেরিয়ে পড়লাম তখনই।

* * * * *

চিঠিটা পেয়েছিলাম সকালের প্রথম ডাকেই। কাজেই অতি তাড়াতাড়ি করেও সিলেট পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা ১২টা হয়ে গেছে। কঠিন দ্বিপ্রহর। মাথার উপর সূর্য্যের চাঁদোয়া। মনে নানা দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করতে লাগলো। দমে গেলাম। অতীতের এক দীর্ঘ তামসীর পর আজ সুরাইয়া আলোর সন্ধান পেয়েছে। হোক তা বিকৃত জীবনে, যৌবনে: তবু তো জন্মান্তর। ভাবতেই আত্মহারা হলাম।

তীরবেগে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুকি। সুরাইয়া শুয়ে আছে একটা খাটে। সেই পুরনো তার যুদ্ধক্ষেত্র। পাশে মাথার কাছে একটা মেয়ে। প্রথম যখন এসেছিলাম এখানে জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখেছিলাম মেয়েটীকে। ঘরের হাল্কা রদ্দুরের আলোতে যেন দুটি গোলাপ ফুল। একটি বৃন্তে একটি মাটিতে। আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটী উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। যেন স্বপ্ন দেখছে। আমি এগিয়ে গেলাম সুরাইয়ার কাছে। ওর মুদ্রিত চোখ দুটোতে বেদনা টলমল করছে।

মেয়েটীকে প্রশ্ন করলাম—"কেমন আছে?"

—"এখন একটু ভাল। কাল অবস্থাটা খুব খারাপ ছিল। প্রায় ১০৬° ডিগ্রীর মত জ্বর ছিল গায়ে। কি করি বলুন? ও কিছুতেই ডাক্তার দেখাবে না। তবুও জোর করে কাল ডাক্তার এনেছিলাম।"

—"কি বললেন ডাক্তার?"

—"বললেন ওর অসুখটা খুব সিরিয়াস না হলেও হার্ট নাকি খুবই দুর্বল। যে-কোনো মুহূর্তে ফেল করতে পারে।"

নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম—"দেখুন আমি ওকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই…আপনি একটু সাহায্য করবেন?"

—"মাফ করবেন। ওকে এ অবস্থায় আপনার অতদূর নিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না। ডাক্তার ওকে বিছানা থেকে উঠতে মানা করে দিয়েছেন। কাজেই এ-অবস্থায় ওকে নিয়ে যাওয়াটা ..তার চাইতে বরং আপনি ওর এখানেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন।"

দম নিয়ে বললাম—"বেশ তাই করুন।"

—"আচ্ছা আপনি তাহলে ওর মতটা জেনে নিন্‌ আমি আসছি।"

কথাটা শেষ করেই মেয়েটি চলে গেল।

আমি বসলাম ওর মাথার কাছে। অপরূপ মুখখানা বিবর্ণ, অত্যাচারে ঝলসে গিয়েছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। বোধকরি ব্যর্থতার। ম্লান ঠোঁট দুটো শুকনো। মুখের উপর থেকে বিস্রাস্ত কয়েকটা চুল সরাতেই

চোখ মেলে তাকালো সুরাইয়া। হতাশার ভঙ্গীতে। উঠে বসার চেষ্টা করলো। আমি দুহাতে ধরে খাটের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম। শুকনো হাসি হেসে বললো—"এসেছো তাহলে। কিন্তু খোকা আর কাঞ্চীকে নিয়ে এলে না ?"

—"না। ভেবেছিলাম তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কিন্তু তোমার এখন যা অবস্থা…" একটু থেমে আবার বললাম—"আচ্ছা আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?"

—"কি অনুরোধ বলো ?"

—"তোমায় এখানে একটা ভাল হাসপাতালে ভর্তি করে দিই। তুমি আবার সেরে উঠবে…"

বোধকরি নতুন আলোর জন্য রক্ত একবার দোল খেল তার ; ঠোঁট দুটো আলতো কাঁপিয়ে বললো—"তুমি এখনও আমায় পেতে চাও ?"

—"যাকে ভালবাসি তার গ্লানি যদি বুকে না মাখতে পারি সুরাইয়া তবে আর ভালবাসলাম কাকে ? মানুষ চিরকালই পবিত্র। জীবনের দীনতা, জীর্ণতা খোদার কাছে পৌঁছোবার এক একটা ধাপ…তুমি পবিত্র…"

অস্পষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল ঘরের মধ্যে—"বেশ তুমি যা চাও তাই হবে…তবে আমি জানি কবীর, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে…"

মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম—"না না তুমি সেরে উঠবে—নিশ্চয়ই।"

—"এমন তো মনে হয় না।"

—"আচ্ছা সুরাইয়া, তুমি তোমার ছেলেকে দেখতে চাও ?"

—"তোমার খোকাকে ?"

—"না তোমার ছেলেকে।"

—"আমার ছেলে !" বিস্ময়ের তরঙ্গে দোল খায় সে ; "কোথায় পাবে তুমি তাকে ? ওকে যে হারিয়ে ফেলেছি আমি !"

—"না, পৃথিবীর কোনো বস্তুই একেবারের জন্য হারিয়ে যায় না সুরাইয়া। শুধু খানিকক্ষণের জন্য চোখের আড়াল হয়। তোমার ছেলেকেও তুমি নিশ্চয়ই পাবে…"

—"ওকে ফিরে পাবো, তুমি ঠিক বলছো ! না না ওকে আমি ফিরে পেতে চাই না ; ওকে শুধু গর্ভে ধরেছি… ও এসেছে পাপের বোঝা নিয়ে…না…না…" অসংলগ্ন কথার প্রলাপে উন্মত্ত সে।

—"না সুরাইয়া, ও এসেছে সেই সনাতন পথ ধরে, যে পথে ধর্ম এসেছে, তুমি এসেছো, আমি এসেছি। অতীত যা তাই পাপ, বর্তমানই সত্য। তুমি সেই নিষ্পাপ সত্যকে বুকে গ্রহণ করবে না ?"

উন্মত্তের মত আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরাইয়া ফুঁপিয়ে উঠলো—"নিশ্চয়ই করবো কবীর। আমার বুকের দিকে চেয়ে দেখো—আজ তিনটা বছর ধরে ক্ষুধার্ত। ও যে আমার বুকের রক্ত। কিন্তু তুমি ওকে কোথায় পাবে—বলো, বলো কবীর ?" স্নেহের করুণ উত্তেজনায় ব্যথিত সে।

চোখের অশ্রু ওরই শাড়ীর আঁচলে মুছে দিয়ে বললাম—"অতটা উতলা হয়োনা তুমি। তোমার ছেলে আমারই কাছে · খোকাবাবুই তোমার ছেলে…"

—"তুমি, তুমি কি বলছো না কবীর !" "শিরা ছেঁড়া রক্তের মত চমকায় সে।

—"ঘটনাটা একটু আকস্মিকই। তুমি যেদিন ছেলেটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিলে, আমি তোমার কাছেই ছিলাম। দেখতে পাওনি আমায়। তারপর কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে গেল…যখন কাছে গেলাম, ছেলেটাকে পেলাম, তোমায় পেলাম না। অনেক খুঁজেছিলাম তখন, কিন্তু কোথায় যেন হারিয়ে গেলে। তারপর থেকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছি। এক আমি আর কাঞ্চী ছাড়া একথা কেউ জানে না।"

সুরাইয়ার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো ব্যথার নেশায়—"তুমি ঠিকই বলেছো কবীর। তোমার খোকারও আমারই মত সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ—আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে নিয়ে এলেনা কেন ?"

—"ভেবেছিলাম তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।"

বুকে মাথা রেখে এবার কেঁদে উঠলো সুরাইয়া—"না কবীর, মনে হয় এ-জীবনে ওকে আর হয়তো দেখতে পাবো না।"

—না না তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।"

—"আচ্ছা, তুমি ওদেরকে এখন আমার কাছে নিয়ে আসবে ?"

—"এক্ষুণি ?"

—"হ্যাঁ এখনই। তোমায় জীবনে আর কোনো অনুরোধ করবো না। শুধু এই অনুরোধটা রাখবে—যাবে তুমি ওদের আনতে ?"

—"কিন্তু তোমায় একটা ব্যবস্থা…"

"—না আগে তুমি ওদেরে নিয়ে এসো। তারপর আমি হাসতে হাসতে হাসপাতালে চলে যাবো।"

—"বেশ শুনবে না যখন—যাই।"

সময় অল্প তাই উঠে পড়লাম। সহসা সুরাইয়া আমার হাতটা চেপে ধরলো—"ফিরবে কখন ?"

—"তা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে ?"

—"একটু তাড়াতাড়িই এসো। খোকা কিন্তু আজ রাতে আমার বুকেই থাকবে।"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। সুরাইয়া তাকিয়ে রইলো আমার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। আসবার আগে সেই মেয়েটাকে ডেকে সুরাইয়ার দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে বললাম।

*　　*　　*

বাংলোয় ফিরেই মুহূর্ত্ত দেরী না করে কাঞ্চীকে এক নিশ্বাসে সব কথা বলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললাম। মিনিট কয়েকের মধ্যেই কাঞ্চী খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কোনো কিছু ভাববার সময় পেলাম না। খোকাকে পাবার পর থেকে সুরাইয়ার জন্য মনটা এ দিকে এত ব্যস্ত ছিল যে, পৃথিবীর আর সব ঘটনা অতি সহজে চোখে পড়তো না। আজও পড়ছে না। কেন? সুরাইয়া যা দিতে পারে ইচ্ছে করলে কি কাঞ্চীর কাছ থেকে তা নিতে পারতাম না? মাকড়সার জালের মত এলোমেলো চিন্তার গ্রন্থিতে জড়িয়ে পড়ি।

সিলেটে যখন পৌঁছোলাম ওদের নিয়ে তখন প্রায় সন্ধ্যা। উদয়াস্ত দুই পৃথিবীর তটে যেন সুন্দর একমুঠো অন্ধকার কে জড়িয়ে দিয়েছে। দৃষ্টির সম্মুখে আঁধারের স্রোত। মনে হলো রাত্রির নিকষে না জানি কত জীবন হারিয়ে যায়; কত সোনা হয় মিছে। তবুও সন্ধ্যারতি লগ্নে ভাল লাগে তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখি। অদ্ভুত এই অন্ধকার।

অন্ধকার ভেদ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বাধা পেলাম সেই মেয়েটার সঙ্গে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললো—"এসেছেন বুঝি। ঘরে যান। সুরাইয়া বোধকরি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

এলাম ঘরে। অস্পষ্ট নীলচে আলোর কুয়াশায় চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে সে। হাত দুটো বুকের উপর। মুখের গোলাপী রঙে সোনার রেখার মত অবসাদ ছেয়ে রয়েছে। বহু আঘাত, বহু বেদনার পর হয়তো আজ নিবিড় ঘুমের বুকে স্থান পেয়েছে। আঃ কি তৃপ্তি! ঘুম ভাঙ্গাবার ইচ্ছে ছিলনা। তবুও বাধ্য হলাম।

কাঞ্চি এগিয়ে এলো কাছে। একেবারে সুরাইয়ার মুখের সামনে। স্তব্ধ চিত্তে দুপা পেছনে সরে থমকে দাঁড়াল। কি দেখলো ঐ জানে হাতটা বুকের কাছে, তারপর নাকের কাছে নিয়ে যেতেই থর থর করে কেঁপে উঠলো—"কাকে ডাকছো বাবুজী, সুরাইয়া যে আর বেঁচে নেই।

—"না না, এ হতে পারে না...না না...ও মরেনি কাঞ্চী..."

পাথর হয়ে গেলাম। দেহের কোষে কোষে যেন যন্ত্রনার স্রোত বয়ে চলেছে। আঁধারের উর্দ্ধলোকে চেয়ে থাকি উন্মাদের মত। নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন বেজে চলেছে আকাশের বিপুল ক্রন্দন। আমার হাতের প্রদীপ হাতেই নিবে গেছে। স্থির অবিচলিত আমি।

—"তুমি কেঁদোনা বাবুজী। তুমি কাঁদলে আমি মনে বড়ো ব্যথা পাই।" মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাত বুলোতে থাকে। সস্নেহে, মমতায়।

সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাঝেও কাঞ্চীর সান্ত্বনায় যেন ভেঙ্গে পড়লাম। খোকার দিকে তাকালাম। লক্ষীছাড়া ছেলে এসেছিল মাকে মুক্তি দিতে: কিন্তু দিয়ে গেল তার অব্যক্ত জ্যোতির্লোকে বহ্নিময় একমুঠো বেদনা।

আর সুরাইয়া! আকাশের তারা হয়েও পৃথিবীতে এসেছিলো আপন আলোর বিচ্ছুরণে নিজেকে দেখতে। এসেছিল পৃথিবীর বুকে রূপে, রসে, গন্ধে বিভোর হয়ে আলোকের বর্ণে বর্ণে ফুটে উঠতে। দেহের সংগমতীর্থে যে অপরকে দিয়েছে মুক্তি নিজেকে বঞ্চিত করে করে আজ মৃত্যুর সাগর সঙ্গমে সে কি পাবে জানি না। হয়তো পাবে মুক্তির সংগমতীর্থে তার হারানো ঈশ্বরকে নব রূপায়ণে, নব জীবনে পূজার ডালি হাতে। আলো যার জীবন মুক্তির সঙ্গীতে সে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে তার দেহের, সৌন্দর্য্যের পূজারীকে জীবনের সংগমতীর্থে। কিন্তু যা নিশ্চয় করে পেয়েছে এই বুকে তা বেঁচে থাকার চরম এক সত্য।

—"একি এখনও কাঁদছো বাবুজী! কেঁদোনা... কেঁদে আর কি হবে। না না কেঁদোনা, ওঠ, ওকে কবর দেবার ব্যবস্থা করো।"

কুয়াশার মত নীলিম আলোতে সুরাইয়ার দেহটাকে একটা সাদা চাদর দিয়ে মোমের মত ঢেকে দিলাম।

সকালে

জুলফিকার মতিন

তারপর ভেজা চাঁদ ডুবেছে কখন—
নীলিম সৌন্দর্য্য ভরা আকাশের রং
ফিকে হয়ে এলো বুঝি ভোরের আকাশ,
ছড়ায় ফুলের ঘ্রাণ মদির বাতাস
আদিগন্ত কেঁপে গেল নব চেতনায়
নীল নদী বাঁকে বাঁকে ধীরে বয়ে যায়,
জেগে থাকে কাশবন

কল্পনায় ভরে গেল মন।
ঘাসের নরম ডালে ব্যথার শিশির
ঝরে পড়ে অবহেলে। হৃদয় অধীর,
না বলা বাণীর মতো। কচি রোদ হাসে
কারা যেন কথা কয় চুপি চুপি বসে মোর পাশে।

এখানে নদীর তীরে অরণ্যের ধারে,
আলো ছায়া লুকোচুরি খেলে বারে বারে
পাহাড়ী মেয়ের মতো নৃত্য গীতিকায়,
অরণ্যের ঘুম ভেঙে আলোক ফোটায়,
আধো আলো আধো কালো তারার কুসুম
সকালের উপকূলে দিয়ে যায় চুম।

একটি নীলাভ ভোর পাখী ডেকে ওঠে,
গাছে গাছে ফুল ফোটে—
শোনা যায় পুলকিত সুর,
চির চেনা বাঁশী বাজে—চলে যায় বহু বহু দূর।
অপূর্ব সোনালী রোদ এসে পড়ে দরজার পাশে,
সারা মন হাসে।
নিবিড় মমতা নিয়ে দিন এলো ফের
দুপুর বিকেল এর
টেনে চলে জের॥

বহু বিবাহের কারণ ও বর্ত্তমান মনোভাব

মোহাম্মদ মোর্ত্তজা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বিবাযোগ্য নরনারী যখন নিজেরা উদ্যোগী হইয়া তাহাদের সম্পর্কের আরম্ভ এবং স্থির করে না, অথবা করিতে পারে না, তখন দায়িত্বটী অবশ্যই অভিভাবকের। দায়িত্বটী সামাজিক রীতিনীতি অথবা আচারানুযায়ী কিংবা অন্য কোন অসাধারণ অবস্থায় যখন অভিভাবকের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে তখন তাহার পক্ষে ঠেলিয়া ফেলা চলে না। যেখানে এমন অবস্থা বিদ্যমান সেখানে (যেমন আমাদের দেশে) অভিভাবকগণ এই দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে খুশী হওয়ার পরিবর্তে ক্ষুণ্ণ হন। অনেক সময় অপমানিত বোধ করিয়া বিরোধিতা করেন। ইহার মানসিক পশ্চাদভূমি স্বচ্ছ। কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করিবার আকাংখা হইতে যে অহংভাবের সৃষ্টি হয়, তাহাই ইহার পশ্চাদভূমি। অভিভাবকের এই ব্যবহারের ফলে অনেক অঘটনও ঘটে।

বর্তমানে 'বরে'র ক্ষেত্রে এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হইয়াছে (অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া) কিন্তু 'ক'নে'র বেলায় এখনও নিয়মটী পুরাপুরি কার্যকরী।

যেভাবে এবং যে অবস্থায় হউক অভিভাবককে যখন এই দায়িত্ব পালন করিতে হয় তখন তাহাকে দুইটী পরস্পরবিরোধী শক্তির সহিত সামনাসামনি মোকাবেলা করিতে হয়। ইহার একটী হইতেছে কন্যাদায়মুক্ত হওয়ার তাগিদ এবং অপরটী হইতেছে এই মুক্তি যাহাতে সৎপাত্রে সাধিত হয় সে জন্য সাবধানতা। এই তাগিদ ও বাছ-বিচারের টানাহেঁচড়ায় অভিভাবককে অনেক সময় হিম্‌সিম খাইতে হয় এবং উপযুক্ত কারণ বশতঃই তাহারা অনেক সময় তাল রাখিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে দায়িত্ব তাহার একার নহে।

হিন্দু শাস্ত্রে বিষয়টী অত্যন্ত প্রকট। কন্যাকে যথা-সময়ে সম্প্রদান করিবার ব্যাপারে শাস্ত্রীয় আদেশ অত্যন্ত কঠোর। "স্তন প্রকাশের পূর্বে কন্যাদান করিবেক"—পৈঠীনসী। "অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে রজঃস্বলা হইলে পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে পাপী হয়"—কাশ্যপ। "যে ব্যক্তির দোষে কোন কুমারী ঋতুদর্শন করে, উক্ত কুমারী তদবস্থায় যতবার ঋতুমতী হয়, সেই ব্যক্তি ততবার ভ্রূণ-হত্যা পাপে লিপ্ত হয়"—ব্যাস। ইত্যাদি ধরণের আদেশ আরও আছে। কিন্তু এই আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া কোন পিতা যদি কন্যার বিবাহ দানে সচেষ্ট হয় তবে তাহা কি সহজে হইবার? সেদিকে আছে অজস্র বাধা। হিন্দুদের মধ্যে এই বাধা পৃথিবীর অন্য সকল সম্প্রদায় হইতে একটু বিশিষ্ট ধরণের; কারণ তাহাদের অবশ্য-পালনীয় কঠিন ভেদাভেদ। সবর্ণ ও অসবর্ণ লইয়া বাছবিচারের অন্ত নাই। এই ভেদাভেদের প্রতিক্রিয়া হইতেছে বিবাহসমস্যা সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে সমানভাবে বিস্তৃতিলাভ না করিয়া কোন একটী ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। সমস্যার সমাধান সেইজন্য কঠিনতর হইয়া ওঠে। তদুপরি আছে উচ্চবর্ণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সম্মানিত হইবার লোভ। ব্রাহ্মণের স্থান সর্বোচ্চে এবং তাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলে যে কোন অব্রাহ্মণ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। (এই মনোভাব বর্তমানে অতটা উৎকট না হইলেও বিদ্যমান)। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যেকোন ধরণের ব্রাহ্মণ পুরুষকে কন্যাদান করা হয় (অথবা হইত।) এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পুরুষটীর বয়স, তাহার পুর্বতন স্ত্রী অথবা স্ত্রীদের সংখ্যা ইত্যাদী কিছুরই বাছবিচার করা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না" পুস্তকে যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, জনৈক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৫৫ বৎসর বয়সে ৮০ জন স্ত্রীর স্বামী। এই হিসাব সম্পূর্ণ নহে। এই পত্নীদের মধ্যে কতজন সবর্ণ এবং কতজন অসবর্ণ সে হিসাব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় হইতেছে ভদ্র মহোদয় অতগুলি বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে যতই দোষারোপ করা হউক না কেন, যে অভিভাবকগণ কন্যাদিগকে এমন অবস্থায় সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের দায়িত্বকে কোনক্রমে ছোট করিয়া দেখা চলে না। এবং তাহারাই বা এমনটি করিয়াছে কেন? কারণ কন্যাকে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বিবাহ না দিলেই চলে না এই বাধ্যবাধকতা এবং ইহা করিতে গিয়া যথাসম্ভব উপরে ওঠা যায়, অন্ততঃপক্ষে নিচে নামিতে না হয়, সে সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা। এই বাধ্যবাধকতা ও উৎকণ্ঠা অভিভাবককে এমন ভাবে পিষিতে থাকে যে বরের বর্তমান পত্নী-সংখ্যার হিসাব-নিকাশ গৌণ হইয়া পড়ে। এই বাধ্যবাধকতা অনেক সময় এত প্রচণ্ড যে কন্যাকে "বিবাহিতা" করিবার জন্য অল্প সময়ের জন্য কোন বরকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইত এবং পরে সেই স্বামীর সহিত বধুর আর কখনও সাক্ষাৎকার ঘটিত না। কন্যার জীবনের ব্যর্থতা

যতই ভয়াবহ হউক, অভিভাবকের ইহাতে কুলমান বাঁচে, ধর্ম-রক্ষা হয়, স্বর্গারোহণের রাস্তায় ঝাঁটা পড়ে। বর্ত্তমানের মনোভাবের কাছে ইহা যতই দৃষ্টিকটু মনে হউক না কেন, তখনকার মানবচিত্ত ইহাকে সত্য বলিয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিল। সেইজন্য বহু বিবাহের কারণ হিসাবে ইহার যথার্থতা অনস্বীকার্য্য।

হিন্দু শাস্ত্রের কথা বিশেষ করিয়া বলার উদ্দেশ্য হইতেছে তথায় অবস্থাটি অত্যন্ত প্রকট বলিয়া সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর কোন অঞ্চলের বা বিশ্বাসের মানুষ এই অবস্থা হইতে মুক্ত নহে। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী ইত্যাদীর কথা বাদ দিয়া মুসলমানদের কথা ধরুন। ইসলামে মানুষের সমান মর্য্যাদা (আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় বিচারে) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে। খোদার বান্দার সমতাকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য অনুষ্ঠানাদির প্রচুর ব্যবস্থা আছে এবং মুসলমানগণ তাহা পালনও করে।

কিন্তু তবুও মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাব যে নাই তাহা নহে। মৌলভী ও মাওলানা সাহেবগণ ইসলাম কর্ত্তৃক বহু বিবাহের অধিকার দানের আইনটি বেশী কাজে লাগান বলিয়া অনেকে দোষারোপ করেন। কিন্তু তাহারা এত সহজে দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন কি ভাবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এখানে মৌলভী সাহেবদের সহিত সম্পর্ক পাতাইবার একটা লোভ এই সব কন্যার অভিভাবকদের মধ্যে কার্য্যকরী। ব্রাহ্মণদের প্রতি অব্রাহ্মণদের যে একটা বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধাভাব বিদ্যমান, মৌলভী, মাওলানা, শাহ, পীর ইত্যাদীর প্রতি তেমনি একটা ভাব অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপ্ত এবং সেইজন্য এই সব পুরুষের পক্ষে একাধিক পত্নীগ্রহণ সহজ এবং অনেক সময় অনুরুদ্ধ হইতে হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পাশ্চাত্যে ও এই ধরনের অবস্থা বিদ্যমান কিন্তু বহু স্ত্রীগ্রহণ সেখানে আইনতঃ নিষিদ্ধ। হিন্দুদের মধ্যে কারণ বিলুপ্ত হয় নাই কিন্তু বহু বিবাহ যাইতে বসিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে কারণ প্রায় পূর্ব্ববৎ কিন্তু বহু বিবাহ তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন।

ধরুন কন্যার ইচ্ছায় কাজ হইবে। (বর্ত্তমানে ইহার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে।) একজন কনেকে যদি বর পছন্দ করিতে বলা হয় তবে তিনি ভাবী-স্বামীর কোন্ কোন্ গুণাবলী পরীক্ষা করিবেন? অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে সয়ম্বরার মান কি? এ ব্যাপারে কি কোন চিরন্তন বিশ্ব-নিয়ম আছে? বিচার বিবেচনার প্রধান বিষয়সমূহ হইতেছে শৌর্য্য, বীর্য্য, যশ, সামাজিক অবস্থান, আয়ত্তাধীন অসাধারণ কৌশল, শিল্পকলা, সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তি, অন্যান্য ধরণের ক্ষমতা ইত্যাদী। পূর্বকালে শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতি মানুষ সম্ভ্রমে মাথানত করিত, কনেগণও সম্মুখ দ্বৈতসমরে যে জয়লাভ করিত তাহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিত। সেই স্বামীর অন্য স্ত্রী থাকিলেও সে এই পছন্দের জন্য অনুশোচনা করিত না। ইহাকেই নিয়ম মনে করিয়া হৃষ্টমনে ঘরকন্যা করিত। এখন মানুষের সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয় বুদ্ধির উৎকর্ষে, সামজিক অবস্থানে, ঐশ্বর্য্যের অধিকার ইত্যাদিতে। এই ধরনের পুরুষ নারী-চিত্তের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্র আইন করিয়া বহু বিবাহ বন্ধ না করিলে এবং সাধারণ ভাবে বাধা দিবার চেষ্টা না হইলে এখনও অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত বহু বিবাহ ঘটিবে।

পাকিস্তানের জনৈক প্রধান মন্ত্রী প্রথম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলে সমগ্র পাকিস্তানের প্রভাবশালী মহলে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল সেটা বিবেচনা করুন। মন্ত্রী সাহেব অন্যায় করিয়াছেন, ধরিয়া লইলাম তাহা সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী স্বেচ্ছায় এই বিবাহে রাজি হইয়াছেন ইহাও সত্য। মনে রাখিতে হইবে যে এই মহিলা মতামতহীনা অবলা নারী নহেন; পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া তিনি ইহাতে মত দিতে বাধ্য হন নাই; তাহাকে ফুসলাইয়া লওয়া হয় নাই।

তিনি রাজি হইয়াছেন কেন? যাহারা ইহার বিরুদ্ধে গলাবাজি করিতেছে তাহাদের মধ্যে কি এমন একজনও নাই যাহাকে কোন বিখ্যাত ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের দ্বিতীয় পক্ষ হইতে বলা হইলে অন্ততঃ "ভেবে দেখি" বলিয়া সময় লইবেন না? প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতির ধারা যেখানে প্রবর্ত্তিত হয় নাই (বলিয়া রাখা ভালো যে সমাজতন্ত্র কোথাও এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোথাও কোথাও চেষ্টা চলিতেছে মাত্র) সেখানকার পারিবারিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে স্বামীর উপর "ভর" করিতে হয়। সেই জন্য যে কোন বুদ্ধিমতি নারী স্বামীর এই ভার বহন করিবার ক্ষমতা কতখানি তাহার পরিমাণ করিতে অবশ্যই চাহিবেন। এখন যদি সয়ম্বরার মানসমূহ বিচার করা যায় তবে লক্ষ্য করা যায়, 'ফলে' সব সময় স্ত্রীকে রক্ষা ও পালন করিবার ব্যাপারে বরের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়াছে। যুগে যুগে এই ক্ষমতার প্রকৃতিতে বিভিন্নতা আসিয়াছে, সেইজন্য কখনও তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। পূর্বকালে অসি চালনায় যিনি পারদর্শী হইতেন, স্ত্রীকে পালন করিবার ক্ষমতাবলে তিনি বলীয়ান বলিয়া বিবেচিত হইতেন—বরমাল্য তাঁহার কণ্ঠে ঝুলিত। এখন অসির দিন গত হইয়াছে—আসিয়াছে ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতির যুগ—বরমাল্য সেইজন্য তাহাদেরই কণ্ঠ খুঁজিয়া বেড়ায়। বহু বিবাহের

বিরুদ্ধে সাধারণ মত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এখনও ইহা ঘটিতেছে। অপেক্ষাকৃত কম হইলেও ইহাতে প্রমাণিত হয় এই কারণটি এখনও জীবন্ত। কিন্তু তবুও পূর্বে যেমন নিঃসংকোচে কোন রমণী দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে স্বামীগৃহে বসবাস করিত এখন আর তাহা সম্ভব হইতেছে না। এই বিরোধিতার উৎপত্তিস্থল কোথায়?

এতদসত্ত্বেও ধর্ম যদি বহুবিবাহ সমর্থন না করিত তবে হাজার কারণ সত্ত্বেও ইহা ঘটিত না। (অবশ্য ধর্ম সব সময় সমকালীন জনচিত্তের বৈশিষ্ট্যের সহিত তাল রাখিয়া চলে।) বর্তমানে মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহ প্রণালী হইতে ধর্মের প্রভাব ক্রমাগত অপসারিত অথবা অন্যভাবে পরিবর্তিত হইতেছে। মানুষ নিজের বিবেচনা মতো চলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ধর্মই মানুষের সব অস্তিত্বের দিগদর্শক হিসাবে কাজ করিত। ধর্ম ও রাষ্ট্রে তখন বিভেদ ছিলনা, এখন তাহারা সতীনের ঘর করিতেছে, বাহ্যপ্রকাশ না থাকিলেও। বহুবিবাহের প্রতি সমর্থনশীল মানুষ ধর্মের পাতায় সমর্থন পাইয়া সংকোচহীন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। হিন্দু ও ইহুদী শাস্ত্রে স্ত্রীসংখ্যার কোন সীমারেখা নাই এবং স্বামী কেবল ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির জন্য যে কোন সংখ্যক (হিন্দুদের বেলায় অনুলোমক্রমে) বিবাহ করিতে পারে। অন্যান্য ধর্মেও বহুবিবাহ সমর্থিত কিন্তু একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। উপরিউক্ত ধর্মদ্বয় পুরাতন এবং সেইজন্যই সম্ভবতঃ এমনটা হইয়াছে। নবতর ধর্মসমূহ ইহার স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে সাবধান হইয়া সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। অতএব ধর্মীয় সমর্থনই বহুবিবাহের সংঘটনাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল, নচেৎ কারণসমূহ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কখনই ইহা ঘটিতে দিত না। বলা হয় যে, ধর্মনেতাগণ পুরুষ বলিয়া তাঁহারা স্বজাতির সুবিধার দিকে নজর রাখিয়া এমন আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা কঠিন।

ধর্ম কিন্তু মরিয়া যায় নাই। এখনও ইহার নির্দেশাবলী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হয়। ধারাবাহিকভাবে পঠিতও হয়। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্মের প্রতি বিরূপতা প্রসার লাভ করিলেও বর্তমানে "ধর্মের পুনর্জীবন লাভ" স্লোগানে ইহা আবার সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এমন কি ধর্মের যম বলিয়া কথিত কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার কর্ণধার নিকিতা ক্রুশ্চেভ সাহেবও বলিয়াছেন (১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে) যে তাঁহার দেশে ধর্ম আইনতঃ নিষিদ্ধ নহে; তবে রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। আত্মগত ভাবে যে কেউ ধর্মপালন করিতে পারে।

কিন্তু ধর্মকে লইয়া আবার মাতামাতি করিলেও তাহার বহুবিবাহের নির্দেশাবলী সম্পর্কে আমরা আর উচ্চবাচ্য করিতে চাহি না। অনেকে আবার ধর্ম যে সত্যই বহুবিবাহ চায় নাই, একবিবাহই তাহার আসল উদ্দেশ্য, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কষ্ট করিয়া থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুদের মধ্যে অন্যতম। খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় আইন ইহাকে অলংঘনীয় করিয়া তুলিয়াছে। জাষ্টিস আমীর আলী ইসলামী-আইন সম্পর্কে এই ধরণের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাবখানা হইতেছে, ধর্ম অবশ্যই মানিতে হইবে কিন্তু বহুবিবাহকে বাদ দিয়া। আপনি যদি বলেন, "কিন্তু লেখা রয়েছে যে?" তখন বলা হইবে "লেখা থাকলে কি হবে? আসলে ওর মানে এই রকম। ওটা তুমি ঠিক বোঝ নি।" অর্থাৎ যুক্তি দিয়া হোক কিংবা অন্যভাবে হোক বহুবিবাহ সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

যে কারণগুলির আলোচনা করা হইল বহুবিবাহ ঘটাইবার ব্যাপারে তাহাদের প্রভাবকে একত্রে বিচার করিতে হইবে। তাহারা পৃথক পৃথকভাবে কার্য্যকরী ছিল না।

আলোচনায় যে বিষয়টি তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইতেছে তাহা হইতেছে পূর্বকালে যখন বহুবিবাহ ঘটিত তখন যে সমস্ত সম্ভাব্য কারণসমূহের কথা আমরা চিন্তা করি তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটি কোন-না-কোন রূপে এখনও বর্তমান কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রকৃতপক্ষে বহুবিবাহ আর ঘটিতেছে না অথবা ঘটিতে না দিবার জন্য সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। আমি প্রশ্ন করিয়াছি কেন এমন হইল? মানব মনের কোন পরিবর্তনের ফলে বহুবিবাহের প্রতি এমন বিরূপভাব জন্মিল? প্রশ্নটীর উত্তর আমি উন্মুক্ত রাখিয়াছি।

কিন্তু তাহার পূর্বে বহুবিবাহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নযর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম। বহুবিবাহ যে করিতেই হইবে এমন কথা কিন্তু কোন শাস্ত্রে লেখা নাই। ধর্মে আদেশের ভঙ্গীতে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও বলা হয় নাই। একবিবাহই নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তবে বলা হইয়াছে যে, ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহ করিলে করিতে পার। এক বিবাহ নিয়ম, বহুবিবাহ সমর্থিত মাত্র। কোন্-অবস্থায় এই বহুবিবাহ সমর্থিত তাহা নির্দিষ্ট করণের ব্যাপারে অবশ্য পার্থক্য আছে। বলা হইয়াছে, হিন্দু ও ইহুদীদের সংখ্যার সীমা নাই। ইসলামে চারিটি। মার্টিন লুথার দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। চার্লস দি গ্রেটের এককালে ছয়জন মহিষী ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে পুরুষ ইচ্ছামত যাহা খুশী করিতে পারে। ইসলামে স্বামীকে পূর্ব স্ত্রীর মত যাচাই করে করিতে হয় (যদিও ব্যবহারিক মূল্য নগণ্য;

অন্ততঃ তাহাই আমাদের অভিজ্ঞতা।) অন্যান্য বিধি-নিষেধ ও আছে কিন্তু সেগুলির কার্য্যকারিতা নাই বলিলেই চলে। স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃত পুত্র, কন্যা মাত্র প্রসবিনী, ব্যাভিচারিণী, ইত্যাদি হইলে দ্বিতীয় বিবাহে স্বামীর নীতিগত অধিকার জন্মে। সেইজন্য শর্ত্তাবলীর উল্লেখ না থাকিলেও বহুবিবাহ করিতে হইবে এমন ভাব প্রকাশ করা হয় নাই কোথাও। কথাটি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, সর্বাবস্থায় একবিবাহকে বহুবিবাহের উচ্চে স্থান দিয়া তবে বিষয়টির বিবেচনা করা হইয়াছে। এই সত্যটির দিকে বিশেষ নযর না দিলে সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

দ্বিতীয়। যেখানে বহু বিবাহ প্রচলিত তেমন যে-কোন একটী মানব গোষ্ঠীর বিচার করুন। সেই গোষ্ঠীতে এক বিবাহ ও বহু বিবাহের পারস্পরিক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে বহু বিবাহের সংখ্যা একবিবাহের তুলনায় নিতান্তই কম। গড়পড়তা সাধারণভাবে এক হাজার বিবাহের মধ্যে নয়শত-নিরানবুইটী একবিবাহ। বহু বিবাহের হার হাজার প্রতি এক হইতে বড় জোর দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিচারক আমীর আলী ভারতীয় (তৎকালীন) মুসলমানদের বহু-বিবাহের হার সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন। তিনি অবশ্য পাশ্চাত্যের জনসাধারণকে এই সংবাদ পরিবেশন করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে 'তোমরা বিষয়টীকে যেমন ঘৃণ্য ও ভয়াবহ বলিয়া মনে কর আসলে সেটা তেমন কিছু নয়।' তিনি বলিয়াছেন শতকরা ৯৮ জন মুসলমান এক বিবাহ করিয়া থাকে। (কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব নাই।)

তৃতীয়। বহু বিবাহ সব সময় সমাজের মধ্যে যাহারা গণ্যমান্য এবং উচ্চে অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। সাধারণ মানুষ একাধিক বিবাহ সাধারণতঃ করে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় একাধিক স্ত্রী থাকাটা অধিকতর সম্মান ও মর্য্যাদার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কাহাকে উচ্চ বলিয়া মনে করা হইবে সে সম্বন্ধে এক রকমের নিয়ম নাই। ঐশ্বর্য্যশালী, সম্মানিত, ধর্মপ্রচারকগণ এযাবৎ বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন; হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্বোচ্চে এই ধরনের অভিজাত বলিয়া কথিত পুরুষদের মধ্যেই বহু বিবাহ কমবেশী সীমাবদ্ধ। জনসাধারণ দুর হইতে দেখিয়া এবং আলোচনা করিয়া তাহাদের অনুশোচনা, সম্মান, লোভ, ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মাত্র ক্ষান্ত হয়।

চতুর্থ। স্ত্রীগণের মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট জন সব সময় অন্য সকলের মধ্যে প্রধানা হইয়া ওঠে। ইনি সাধারণতঃ প্রথমা। কিন্তু ইহাই সার্বজনীন নহে। যে স্ত্রী সন্তানবতী, বিশেষ করিয়া পুত্রবতী হয় সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। হিন্দুদের যে সবর্ণা সেই ধর্মকার্য্যে স্বামীর সঙ্গীনী, মুখ্য। এমন ধরনের কোন সুষ্ঠু কারণ না থাকিলেও দেখা যায় স্বামী স্ত্রীগণের মধ্যে কোন একজনের প্রতি একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। সপত্নীদের মধ্যে মনোমালিন্যের ইহা একটা প্রধান কারণ নর নারীর যৌন সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী কিন্তু এমনটাই হওয়া উচিত। সেই হিস'বে প্রকৃত বহু বিবাহের মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রকৃত বহু বিবাহ বলিতে বোঝায় স্বামী সকল স্ত্রীকে সমান চক্ষে দেখিবে। ইহার অর্থ কেবল সময়ের বাটোয়ারা, অর্থপ্রদান, শয়নকক্ষ, আসবাবপত্র, শাড়ী-চুড়ি-গহনাগাটী ইত্যাদীর সমান সমান ভাগ করা নহে; সকলকে হৃদয়ের সমান কাছাকাছি টানিয়া রাখিতে হইবে

ইসলামে এই বিষয়ে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে পুরুষ সকল স্ত্রীকে সংসারে এবং মহব্বতে সমপর্য্যায়ে না রাখিতে পারিবে বহু বিবাহে তাহার অধিকার থাকে না। কিন্তু আমরা দেখিয়া থাকি এই সাবধানতার মূল্য প্রকৃত প্রস্তাবে নাই বলিলেই চলে। আমরা দেখি স্বামী যদি পুংখানুপুংখরূপে বিচার করিয়া প্রত্যেক স্ত্রীকে তাহার প্রাপ্য দিয়াও দেয়, তবুও মন ঠিক সমানভাগে বিভক্ত হয় না; একভাগে একটু বেশী পড়ে। এবং এই অবস্থা যদি চলিতে থাকে তবে স্বামী হয়ত-বা তাহার অজ্ঞাতসারেই অধিকতর প্রীত স্ত্রীটিকে লইয়া একটু বেশী মাতিয়া উঠিবে। তেমন অবস্থায় অন্যান্য ব্যাপারে সমতা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

কিন্তু সাংসারিক অথবা মানসিক কোন পর্য্যায়ে হের-ফের ঘটিলে তাহাকে আর প্রকৃত বহু বিবাহ বলা চলে না। সে ক্ষেত্রে বঞ্চিতা স্ত্রী অপমানিতাও বটে। দাম্পত্য সম্পর্কের মর্য্যাদার ও হানি ঘটে। সেই হিসাবে প্রকৃত বহু বিবাহ পৃথিবীতে খুব কমই ঘটিয়া থাকে। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে সামাজিক অনুষ্ঠানই যথেষ্ট।

পঞ্চম। এই অবস্থার চরম প্রকাশে একজনকে স্ত্রী এবং অপর সকলকে রক্ষিতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। চীনদেশে ইহা অনেকটা নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইত। মুসলমানগণ চারিজন স্ত্রী ছাড়াও লেউণ্ডী রাখিবার অধিকারী ছিল। এই লেউণ্ডী প্রথার বিলুপ্তির (প্রায়) কারণ হইতেছে নারীর ক্রয় বিক্রয় (বাজারের পণ্য দ্রব্যের ন্যায়) এবং যুদ্ধান্তে গনিমতের মাল হিসাবে নারীপ্রাপ্তি এখন আর ঘটে না। লেউণ্ডী প্রথাকে আমরা বর্ত্তমানের রক্ষিতা কিংবা মিসট্রেসের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি। স্ত্রী ও রক্ষিতার ভাবগত পার্থক্য হইতেছে স্ত্রীর সম্মান আছে, মর্য্যাদা আছে, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকাশ্য স্বীকৃতির

পবিত্রতা আছে। রক্ষিতার এসব কিছুই নাই, সে কোন পুরুষ প্রভুর ইন্দ্রিয় পরিচর্চ্চার যন্ত্র মাত্র। সেইজন্য সম্রাট নবাব, মহারাজা, রাজা, মায় জমিদার ও ধনশালীদের অন্দর মহলে অনেক রক্ষিতা থাকিত (ক্ষমতানুযায়ী।) এখনও আছে তবে অনেকস্থানে ইহার প্রকারভেদ ঘটিয়াছে। কোন একটি রক্ষিতা পুত্রবতী হইলে নবাবগন অনেক সময় তাহাকে মহিষীর পর্য্যায়ে উঠাইয়া লইতেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এ সমস্তই একটি বিশেষ ক্ষুদ্র শ্রেনীর মধ্যে কমবেশী সীমাবদ্ধ। সমগ্র জনসমষ্টিকে ইহা কখনও প্রভাবান্বিত করে নাই। এবং এক্ষেত্রে যদিও একজন পুরুষের সহিত একাধিক নারীর দৈহিক সম্পর্ক বর্ত্তমান তবুও ইহা কোনক্রমে বহু বিবাহ নহে।

ষষ্ঠ। পূর্বে বলা হইয়াছে, এক ভাই বিবাহ করিলে তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণও সেই বধুর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভ করিত। বিপরীত পক্ষে কোন ভগ্নীর বিবাহ হইলে অন্যান্য ভগ্নীগণও সেই স্বামীর উপর স্ত্রীত্বের অধিকার প্রাপ্ত হইত। নেপালে এই অবস্থার প্রচলন ছিল সেটা বেশী দিনের কথা নয়। বর্ত্তমানে শালী-ভগ্নিপতি এবং ভাবী-দেবরের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা পূর্বকালীন উক্ত আচারের অপভ্রংশ যে নহে একথা জোর করিয়া বলা চলে না।

তবে বুঝিতে পারা যায়, কোন দুইজন নরনারীর বিবাহের পরে তাহাদের উভয়েরই সমপর্য্যায়ভুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে সম্পর্কে বেশ খানিকটা শিথিলতা আসিয়া পড়ে। ইহা আত্মীয়তার করচ্ছায়ায় বহু বিবাহের মনস্তত্ত্বের প্রতি সমর্থনশীল।

অতএব দেখা যায়, বহু বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিয়া যেগুলির সমালোচনা করা হয় তাহার সবগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে বহু বিবাহ নহে, বাহ্যতঃ মনে হইলেও। ইহা একটি বিশেষ ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে মোটামুটি সীমাবদ্ধ। এবং কোন জনসমষ্টির মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও উহার সামগ্রিক সংখ্যা এক বিবাহের সামগ্রিক সংখ্যার নিতান্ত নগণ্য। নগণ্য সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও ইহা এত প্রতিবাদের সম্মুখীন কেন? কারণ প্রশ্নটি নীতিগত।

বহু বিবাহের ফলে কয়েকজন নারীর জীবনে অশেষ কষ্ট নামিয়া আসে, তাহারা অপমানকর অবস্থায় বাস করিতে হয় বলিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতিতে গদ গদ হইয়া আমরা এমন করি না। কেন না আমাদের সমাজে নারীর যে অবস্থা তাহাতে কেবল বহু বিবাহের মধ্যেই বা কতজন স্ত্রী সম্মান ও সন্তুষ্টচিত্তে বাস করে? বহু বিবাহের জন্য যদি দশজন স্ত্রীলোক কষ্ট ও গ্লানিমগ্ন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় তবে এক বিবাহের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ শত জন কোন না কোনরূপ হীনাবস্থার মধ্যে বাস করিতে বাধ্য। সুখী হওয়ার সর্বপ্রকার অপরিহার্য্য শর্ত্ত যে ব্যক্তি মর্য্যাদাবোধ—নিজের এবং অপরের পারস্পরিক সেই বোধ সৃষ্টির কোন চেষ্টা আমরা করি না। আমাদের অবস্থায় ইহা এখনও ধারণার অতীত রহিয়াছে। সেইজন্য নর-নারীকে—বিশেষ করিয়া নারীকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা লইয়া কাজ করিতে হইলে আমাদিগকে অন্যত্র হাত দিতে হইবে। বহু বিবাহকে আক্রমণ করাটা প্রাথমিক নহে। কেন না প্রথাটি যতই ঘৃণ্য মনে হউক, ইহা একটা ব্যাপক সামাজিক সমস্যা হিসাবে কখনও দেখা দেয় নাই, এখনও নয়। এতদসত্ত্বেও প্রতিবাদের তীব্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, ইহার নীতিগত প্রকৃতিকে বড় করিয়া দেখা হয়। ইহাকে স্বীকার করা হইবে কি না ইহাই প্রশ্ন। বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে সর্বাগ্রে হাত না দিয়া এই নীতিগত প্রশ্ন লইয়া এত মাথাব্যথা কেন?

বিপ্রলব্ধা
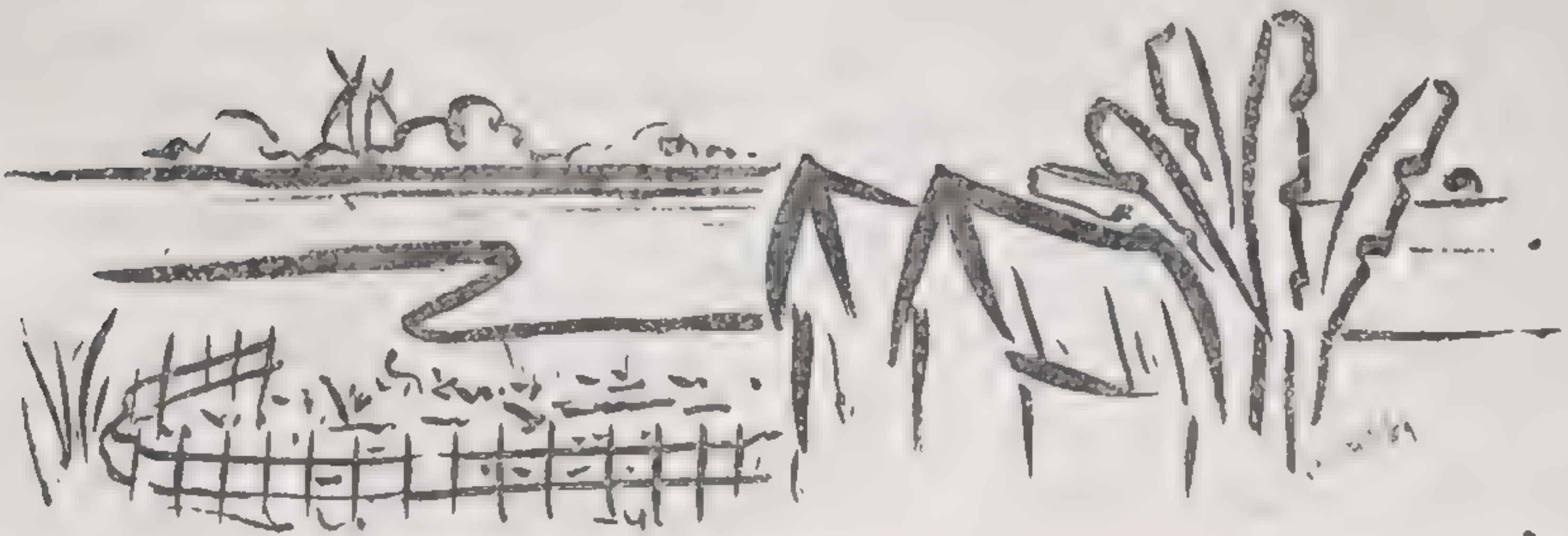
হাসিব চৌধুরী

এতদিন ধরে যা' ছিল সন্দেহের কুয়াশায় ঢাকা, আজ তা' অত্যন্ত সত্য বলেই মনে হোল সাজেদার কাছে। ফারুক নিশ্চয়ই অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসে। আর সেজন্যই তাকে সে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে আসছে এ ক'মাস ধরে। আগে তার কাছে চিঠি লিখলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন উত্তর পেতে দেরি হয় অনেক। চার পাঁচখানার পর একখানা। তা-ও অত্যন্ত সংক্ষেপ। তাতে ভাষা থাকে, কিন্তু ভাব থাকে না; কথা থাকে কিন্তু থাকে না সুরের ঝংকার।

প্রায় পনের দিন হোল কি একটা কাজে ঢাকায় এসেছে ফারুক। উঠেছে সাজেদাদের বাসাতেই। বোধ হয় অন্য কোথাও উঠলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হতো ব্যাপারটা, তাই। এর আগেও ঢাকা আসলে সে তাদের বাসাতেই উঠত। তারপর যে কয়দিন থাকত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কেটে যেতো তাদের প্রতিটি মুহূর্ত। কিন্তু এবার যেন একটা কেমন-কেমন ভাব। তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে সে যেন আর মিশতে চায় না তার সঙ্গে। সারা দিন তো বাইরে-বাইরে ঘুরে। যখন বাসায় ফেরে, আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যায় সাজেদা তার সঙ্গে কথা বলতে। ফারুক কথা বলে। কিন্তু কথা বলতে বলতে সেই আগের মত আর আনন্দ-মুখর হয়ে উঠে না সে।

ফারুক বলে, চিঠি লেখার অভ্যাস নাকি তার কমে গেছে অনেক। কিন্তু সাজেদা লক্ষ্য করেছে, এই পনের দিন হোল ঢাকায় এসে হাসিনা নাম্নী কোন এক মেয়ের কাছে তিন তিনখানা চিঠি লিখেছে সে। একখানা চিঠির জবাবও এসেছে আজ। সাজেদার হাতেই পড়েছে চিঠিটা। অনেক চেষ্টা করেও চিঠিটা পড়বার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি সে। কিন্তু বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি তার থেকে। কাঁচা হাতের লেখা। মামুলি সংবাদ আদান-প্রদান। তবু মনে হয়েছে সাজেদার কি যেন অস্পষ্ট ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে চিঠিখানার ভিতর।

কিন্তু হাসিনা মেয়েটি কে? কার মেয়ে? দেখতে কেমন? তার চেয়ে ভাল নাকি? আগামীকালই ফিরে যাবে ফারুক; তার আগেই সংবাদটা নিয়ে নিতে হবে। ভাবে সাজেদা।

সন্ধ্যায় জিজ্ঞাস করল সাজেদা,

: আচ্ছা ফারুক ভাই, ওই যে হাসিনা মেয়েটি, যার কাছে চিঠি লিখ তুমি, সে তোমার কি হয়?

: কি আর হবে আমার। ও আমার লজিং মাষ্টার করিম সাহেবের মেয়ে।—জবাব দেয় ফারুক।

: ও তাই! পড়ে কোন ক্লাসে?

: সেভেন।

: বয়স কত? দেখতে কেমন?

: বয়স সাড়ে তের কি চৌদ্দ। দেখতে মন্দ নয়।

: আমার চেয়েও ভাল নাকি?

: না-না তোমার চেয়ে ভাল হবে কোত্থেকে! কিন্তু এসব কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন বল তো?

খিল-খিল করে হেসে উঠে সাজেদা বলে,

: ন', এমনি।

তারপর প্রশ্ন করে,

: তোমার লজিং-মাষ্টার কি করেন?

: কি আর করবেন। বিজ্‌নেস। বাজারে একটা কাপড়ের দোকান।—জবাব দেয় ফারুক।

মনে মনে মুখস্থ করে রাখে সাজেদা—হাসিনা—করিম সাহেব—ক্লথ মার্চেন্ট।

পরদিনই রওয়ানা হয় ফারুক। কিন্তু সাজেদাকে কথা দিয়ে যেতে হয়, তার প্রত্যেক চিঠির নিশ্চয়ই উত্তর দেবে সে।

বছর চারেক আগের কথা। সাজেদার আব্বা ছিলেন তখন ফরিদপুর সদরের এস, ডি, ও। সাজেদা তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। পড়ত ওখানকারই বালিকা বিদ্যালয়ে। সাজেদার ভাই মহসিন পড়ত জেলা স্কুলে—নবম শ্রেণীতে। একদিন মহসিন স্কুল থেকে এসে বলল ওর আম্মাকে,

: মা, আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ে। খুব গরীব। কিন্তু পড়াশোনায় খুবই ভাল। ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। এতদিন থাকত একটা লজিং-এ। কিন্তু তাদের নাকি কি অসুবিধে। তাই আর রাখছে না ওকে। বেচারা অন্য কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না থাকবার জায়গা। তা' আমাদের তো মা সাজুর মাষ্টারের দরকার। ও থাকনা আমাদের বাসায়। আমারও সুবিধে হবে।

আম্মা বললেন: নিয়ে আসিস সঙ্গে করে।

পরদিনই ফারুক এসে আশ্রয় নিল সাজেদাদের বাসায়।

দু'বছর কেটে গেল। ফারুক আর মহসিন দু'জনই পাশ করল ম্যাট্রিক। দু'জনই ফার্ষ্ট ডিভিসন। সাজেদার আব্বা সাজেদার ভাই মহসিনকে পাঠিয়ে দিল ঢাকা গভর্ণমেন্ট কলেজে। ফারুক ভর্তি হোল স্থানীয় রাজেন্দ্র

কলেজে। পূর্বের মত সাজেদাদের বাসায়ই রয়ে গেল সে। সাজেদা তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ভোরের আলোর মত ভারী চঞ্চল। হাসি-খেলা আর ছুটাছুটি তার কাজ। মাঝে-মাঝে এটা-সেটা কত-কি প্রশ্ন করে ফারুককে যেন অতিষ্ঠ করে তোলে সে।

ফারুক কবিতা লেখে। গোপনে। একদিন আবিষ্কার করল সাজেদা। খাতাখানা হঠাৎ পেয়ে গেল সে। ফারুক ভাই কবি! আনন্দে নেচে উঠে সাজেদার মন।

সেদিনই আব্দার ধরে সাজেদা,

: আমাকে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে ফারুক ভাই!

ফারুক গোপন করতে চায় ওর কবিতা লেখার কথা। বলে: বলছ কি! আমি কবিতা লিখে দেব! কেমন করে?

: কেন, আমি বুঝি জানি না। আপনি বুঝি কবিতা লিখেন না! সাজেদার উত্তর।

: কে বলল তোমাকে আমি কবিতা লিখি—।

: খাতাখানা বুঝি দেখিনি আমি!—জবাব দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে সাজেদা।

সাজেদার এই দুষ্টুমি-ভরা হাসি খুব ভাল লাগে ফারুকের। শুধু এই হাসিটিই নয়, সাজেদার সব কথা, তার নৃত্যের তালে হেঁটে-চলা সব কিছুই যেন মদির স্বপ্ন ছড়ায় ফারুকের মনে।

সাজেদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ফারুক। তারপর জিজ্ঞাসা করে,

: খাতাখানা দেখেছ, আচ্ছা! কিন্তু কি কবিতা লিখে দেবো তোমাকে?

: কবিতা লিখবেন আপনি! আমি কি জানি তার! জবাব দিতে দিতে পুনর্বার হেসে উঠে সাজেদা।

: আচ্ছা ঠিক আছে। কাল সকালে—রাত্রে লিখে রাখব।—কথা দেয় ফারুক।

পরদিন সাজেদার হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বলে ফারুক: এই নাও তোমার কবিতা।

কাগজখানা হাতে নেয় সাজেদা। নাড়া-চাড়া করে দেখে। তারপর আবার ফারুকের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে বলে,—

: পড়ে শোনাতে হবে।

ফারুক ইতস্তত: করে। কিন্তু অবশেষে রাজী হতে হয় তাকে। ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে শোনায় কবিতাটি:

: যান! আপনি ভারি দুষ্টু!—বলতে বলতে হঠাৎ ছোঁ মেরে ফারুকের হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে ছুটে পালায় সাজেদা।

কয়েকদিন পর। দুপুরে বসে পড়ছিল ফারুক। সন্তর্পণে পেছন থেকে এসে হঠাৎ তার চোখ দুটো চেপে ধরল সাজেদা।

: কে? সাজেদা? ছেড়ে দাও লক্ষীটি,
এখন পড়ছি,—দুষ্টুমি ক'রো না।—
অনুরোধ জানায় ফারুক।

সাজেদা অনড়। চোখ চেপে ধরেই দাঁড়িয়ে হাসতে-থাকে মিটি-মিটি। উপায়ান্তর না দেখে ফারুক জোর করে চোখ থেকে তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়। অতঃপর সামনে দাঁড় করিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বলে সে—

: আম্মাকে যদি বলে দিই।

: কি হবে আমার।—তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জবাব দেয় সাজেদা।

: কি হবে! তোমাকে শাস্তি না দিইয়েই ছাড়ছিনে আজ।

: ইঃ! ঘোড়ার ডিম করাবেন উনি!—

ফারুকের মুখের দিকে সহাস্য তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকায় সাজেদা। হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে যায় দু'জনের। ফারুকের সারা দেহের রক্তপ্রবাহে যেন খেলে যায় বিদ্যুৎ-গতি।

কিছুদিনের মধ্যেই সাজেদার আব্বা বদলী হয়ে এলেন ঢাকায়। সাজেদার আম্মা অনুরোধ করেছিলেন ফারুককে তাদের সঙ্গে আসতে। কিন্তু রাজী হয়নি ফারুক। ফরিদপুর থেকেই নাকি পড়াশুনা তার পক্ষে সুবিধে। সাজেদা কেঁদেছিল। কিন্তু ফারুক তাকে আশ্বস্ত করে ছিল, প্রতি সপ্তাহে সে তাকে একখানা করে চিঠি লিখবে বলে'।...

দু'মাস হোল ঢাকা থেকে গেছে ফারুক। এরমধ্যে খান-চারেক চিঠি লিখেছে সাজেদা। প্রথম একখানা চিঠির উত্তর পেয়েছিল সে। কিন্তু আর কোন চিঠি-উত্তর আসেনি তার কাছ থেকে। ভেবে কূল পায় না সাজেদা। মাত্র দু'মাস। এরই মধ্যে ফারুক ভুলে গেল তার প্রতিজ্ঞা। অনেক ভেবে-চিন্তে সেদিন আবার একখানা চিঠি লিখল সে।

প্রিয় ফারুক ভাই,

আমার ভালবাসা গ্রহণ করো। তোমার হাতের একখানা চিঠি পাবার জন্য আমি যে কি আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করি, তোমাকে তা বলে বোঝাতে পারব না। আমার মনে হয় হাসিনাকেই তুমি ভালবাস। কিন্তু আমি বলি, হাসিনা কি আমার চেয়ে ভাল? তুমিই বলেছ, হাসিনা আমার চেয়ে সুন্দরী নয়। তবে কি তার গুণ বেশী? নিশ্চয়ই তা' নয়। তবে কেন তুমি আমাকে অমন অবহেলা করছ না! না! না! আমাকে কিছুতেই তুমি অবহেলা করতে পারবে না! তোমাকে

যে আমার চাই-ই। তোমাকে না-হ'লে যে বাঁচব না আমি। যেমন করেই হোক, হাসিনাকে ভুলতেই হবে তোমায়।

ইতি—
তোমারই
সাজেদা

এবার চিঠির জবাব এল ফারুকের কাছ থেকে। সে লিখেছে :

প্রিয় সাজেদা—

তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি উত্তর চাও। কিন্তু কি যে উত্তর দিই, ঠিক করে ভেবে উঠতে পারিনে যে!

একটা কথা বলি-বলি করেও এতদিন বলা হয়নি তোমাকে। কিন্তু দেখ্‌ছি সেটা আর এখন না বললেই নয়।

একথা হয়ত ভাল করে জানা নেই তোমার যে, আমি সাধারণ গরীব ঘরের ছেলে। আমার বাবা কৃষক। বাড়ীতে খান দুই মেটে ঘর আমাদের। একরকম কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলে। এমত অবস্থায় তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মোটেই। তুমি ভাবতে পার, লেখা-পড়া শিখে বড় চাকরী করে অবস্থা ভাল করতে পারব আমি। কিন্তু সে ভরসাও মিছে। আই-এ-টা পাশ করেই বোধ হয় পড়া শোনায় ইস্তাফা দিতে হচ্ছে আমাকে। কারণ সংসার অচল। সুতরাং তোমাকে আমি অনুরোধ করব, আমার কথা ভুলে যেতে। তুমি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার বাবা বড় লোক—বড় চাকুরে। যে-কোন ভাল জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে তোমার। আমার বাড়ীর মোটা ভাত আর মোটা কাপড়, এ পরিবেশে বাঁচতে পারবে না তুমি। একথা আজ হয়ত তুমি চাইবে না বুঝতে। কিন্তু আমি বলছি, তোমার ভাল হবে। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে ভুলে যেতে চাই আমি। তুমি ভুলে যেও আমাকে।

হ্যাঁ তুমি অভিযোগ জানিয়েছ, হাসিনাকে ভালবাসি আমি। সে অভিযোগ সত্য কিনা জানিনে। এতে একথা ঠিক—সুন্দর শান্ত মেয়েটি হাসিনা—ওকে আমি স্নেহ করি।

পুনর্বার বলছি, তুমি আমাকে ভুলে যেও। আমার কাছে যেন চিঠি-পত্র লিখো না আর। ইতি—

ফারুক।

চিঠিটা বার কয়েক পড়ল সাজেদা। সবকিছুই কেমন যেন রহস্যময় মনে হোল তার কাছে। ফারুককে ভুলে যাবে সে! তা' কি সম্ভব! আর ফারুকই বা কি করে ভুলে যেতে পারে তাকে। না—না ভুল আছে কোথাও। নিশ্চয়ই ফারুক ভুল বুঝেছে তাকে। ভেঙ্গে দিতে হবে তার সে ভুল। জীবনে সুখ-শান্তির চেয়ে ভালবাসার মর্যাদা তার কাছে অনেক বেশী।

সাজেদা পুনরায় চিঠি লিখল ফারুককে :

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ ফারুক-ভাই। স্বার্থপরতার অনেক উর্ধে আমার ভালবাসা। তোমাকে পেয়ে মোটা ভাত আর মোটা কাপড় প'রেও যদি কাটাতে হয় জীবন, তবু সেই হবে আমার পরম শান্তি। তুমি ভেবেছ, দুঃখ-কষ্ট সইতে পারব না আমি। সে ধারণা তোমার ভুল। তোমাকে কাছে পেলে কোন দুঃখই দুঃখ বলে মনে হবে না আমার।

তা' ছাড়া আমি থাকতে তোমার এমন দারিদ্র্যই বা কিসের! পড়াশোনাই বা বন্ধ করতে হবে কেন তোমাকে? অসুবিধে হলে আমাদের এখানে এসেই পড়াশোনা করতে পারবে তুমি।

তুমি হয়তো ভাবতে পার, আমার আব্বা-আম্মা রাজী হবেন না এ বিয়েতে। বলছি, তাদের রাজী করানোর ভার আমার। তুমি তো জান বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে আমি। আমার আবদার তাঁরা রক্ষা না করে পারবেন না কিছুতেই।...

আমাকে তুমি আঘাত দিয়ো না আর। তোমাকে যে আমি চাই-ই!

এ চিঠির উত্তরে লিখে পাঠাল ফারুক :

আমার কথা আমি জানিয়েছি তোমাকে। তোমার বাবা-মা রাজী হলেও আমার বাবা-মা হয়ত চাইবেন না রাজী হতে। কারণ, আত্মীয়তার বনি-বনার প্রশ্ন তো আছে নিশ্চয়ই।

আবার বলছি, তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমাকে ক্ষমা করো।

চিঠিখানা পড়ে সারা অন্তর ব্যর্থতার হাহাকার করে উঠল সাজেদার। তা হলে পাওয়া যাবে না ফারুককে! এতদিন ধরে যে স্বপ্ন রচেছে সে তা' কি আজ এমনি করেই যাবে ভেঙে! অনেক হিসেব-নিকেশ করে দেখে সাজেদা। চারিদিকে ধূ-ধূ মহাশূন্যতা। শুধু সামনে ওই হাসিনা। তার আশার পথে বিরাট বাধার পাহাড় হয়ে আছে দাঁড়িয়ে। ওকে সরাতে হবে। ওদের ওই রাক্ষুসে পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে ফারুককে। যেমন করেই হোক! সে প্রয়োগ করবে তার শেষ অস্ত্র। সাজেদা মরিয়া হইয়া উঠে।

এবার চিঠি লিখল সাজেদা। ফারুককে নয়। হাসিনার আব্বাকে। ঠিকানাটা মনে আছে তার। করিম সাহেব। ক্লথ মার্চেন্ট। বাজার। শংকায় ভরে উঠে মন—কিন্তু?

না, এ ছাড়া যে উপায় নেই তার। কথাগুলো আর একবার মনে মনে আওড়ে নিয়ে লিখে যায় সে।—

জনাবেষু—

আপনাকে কোন ব্যাপারে সাবধান করে দেবার জন্য লিখছি এ চিঠিখানা। আমি অপনার অপরিচিতা তবু আশা করি অবিশ্বাস করবেন না আমাকে।

আপনার বাসায় ফারুক নামে একটি ছেলে থাকে ছেলেটি চরিত্রহীন। আমি জানি বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে সে। হয়তো আপনার মেয়ে হাসিনার প্রতিও লোভ আছে তার। সম্ভব হলে বাসায় আর রাখবেন না তাকে। আপনার ভালোর জন্যেই জানিয়ে রাখলাম কথাটা।

ইতি—
অপরিচিতা।

চিঠিটা পেয়ে সন্দেহ দোলায় দুলে উঠল করিম সাহেবের মন। তাই তো, কিছুদিন ধরে মেয়েটার সঙ্গে মাষ্টার ছোকরাটার মাখামাখি একটু বেশী রকমেরই মনে হচ্ছে। চিঠিটার কথা মিথ্যে নয় তা'হলে। আর মিথ্যে হলে লিখবেই বা কেন তাকে! সেদিনই বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এলে ফারুক, বললেন, তিনি : তোমাকে আর রাখতে পারব না।

আজকেই সন্ধ্যের আগে আমার বাসা ছেড়ে চলে যাবে তুমি।

ফারুক যেন আকাশ থেকে পড়ে। যে করিম সাহেব তাকে স্নেহ করেন এত, তার মুখে এই কথা! প্রথম কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারে না সে। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে,

: কিন্তু আমার অপরাধ!

: অপরাধ! চরিত্রহীন ছেলে তুমি। তোমাকে ঠাঁই দিতে পারবনা বাসায়।—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে জবাব দেন করিম সাহেব।

: আমি চরিত্রহীন! একি বলছেন আপনি!

: হ্যাঁ-হ্যাঁ! ঠিক বলেছি। চরিত্রহীন। তুমি—মানে তোমরা। আজকালকার সব ছোকরারা!—বলতে বলতে ছুঁড়ে দেন সাজেদার চিঠিখানা। নীচেয় নাম নেই। কিন্তু হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারে ফারুক। আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে চিঠিখানা।

: শেষ পর্যন্ত সাজেদা লিখল এই চিঠি!—বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে আপন মনে বলে উঠে সে।

: লিখবে না! ও-মেয়েটিরও বুঝি সর্বনাশ করতে ছাড়নি তুমি।—মুখ খিঁচিয়ে জবাব দেন করিম সাহেব। তারপর বিকৃত-কণ্ঠে বলে উঠেন পুনরায়,—

: যাও—যাও, বলছি, এখনি বেরিয়ে যাও আমার বাসা থেকে।

সন্ধ্যার আগেই ফারুক আপাততঃ গিয়ে আশ্রয় নিল তার এক বন্ধুর বাড়ী। মনটা বিদ্বেষে ভরে উঠল তার। কি হিংস্র, কুটিলতায় ভরা এ পৃথিবী। সাজেদার ভালোই তো চেয়ে ছিল সে। সে তাকে করল এমন ভাবে অপমান? তার চরিত্রে ছড়িয়ে দিল সীমা-হীন কলংকের কালি? মানুষের মাঝে কি করে আর মুখ দেখাবে সে? হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল ফারুক। সেদিনই চিঠি লিখল-সাজেদাকে।

সাজেদা, তুমি হীন, তুমি স্বার্থপর। আমার জীবনটা পঙ্গু করে দিয়েছ তুমি। কলংকের অতল-সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছ আমাকে। তুমি ঘৃণ্য। তোমাকে ঘৃণা-করব—চিরদিন ঘৃণা করব। তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক আজ থেকে ছেদ হয়ে গেল আমার। মনে রেখো, এই আমার শেষ চিঠি।

বজ্রাঘাত হলেও বোধ হয় এমন স্থবির হয়ে যেতোনা সাজেদা। ফারুকের চিঠিখানা পড়ে মনে হোল তার, এ জগতে সে আর নেই বুঝি! মরা মানুষের মত সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ। করিম সাহেবের কাছে লেখা চিঠির পরিণাম যে এতদূর গড়াতে পারে সে তা' ভাবতেই পারেনি। মনে তার অনুশোচনা জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে সে। ফারুকের ক্ষতি করতে তো চায় নি সে! সেতো শুধু চেয়েছিল তাকে কাছে পেতে। করিম সাহেবের বাসায় ঠাঁই না হলে হয়তো সে ফিরে আসবে তার কাছে। এই তো ছিল তার অনুমান। চিঠিটা আরও দুয়েকবার পড়ল সাজেদা। কয়েকবার উচ্চারণ করল মনে মনে,—হীন-স্বার্থপর। কদর্য গালা-গালি। হঠাৎ জেগে উঠে সাজেদার সুপ্ত আত্মসম্মান। ফারুক ভদ্রতা জানেনা—জানেনা ভালবাসার মর্যাদা। সে ভুল করেছে। হ্যাঁ, ফারুককে ভাল বেসে সে ভুল-ই করেছে। ফারুক তাকে ভুলে যেতে চায়। সে-ও ভুলে যাবে তাকে। যেমন করেই হোক, ভুলে যাবেই। কিসের অভাব তার। ইচ্ছে করলেই কি ফারুকের চেয়ে হাজার গুণ ভাল স্বামী পেতে পারে না সে? তবে? হয়তো একটু দুঃখ। আর দুঃখই বা কিসের। কিন্তু তার আগে ফারুককে জানিয়ে দেবে সে, করিম সাহেবের কাছে চিঠি-লিখবার কি ছিল তার উদ্দেশ্য? করিম সাহেবকে জানাবে আসল কথা। তাকে জানাতে লজ্জা! সত্য কথা বলবে সে, তাতে লজ্জা করবে কেন?

দুপুরের নিস্তব্ধ আসরে চিঠি লিখতে বসল সাজেদা। প্রথম চিঠি করিম সাহেবকে। তার কাছে ক্ষমা চাইল—জানাল ফারুক নিরপরাধ। সে চরিত্রহীন নয়। ফারুককে

ভালবাসতো সে। কিন্তু তার সন্দেহ হয়েছিল ফারুক হয়তো অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসে। বিশেষ করে তার কন্যা হাসিনাকে। ফারুককে পাবার জন্যই তাই ও-ভাবে চিঠি লিখেছিল সে। ফারুককে যেন ক্ষমা করে তিনি।

দ্বিতীয় চিঠি ফারুককে। আজ তাকে সম্বোধন করল 'সাজেদা প্রাণ-প্রিয় ফারুক-ভাই' বলে। সব জানিয়ে অতঃপর লিখল সে:

তোমাকে আমি ভালবাসতাম এবং প্রাণ দিয়েই ভালবাসতাম। সে ভালবাসার মর্যাদা তুমি দাওনি আমায়। যে কদর্য ভাষায় আমাকে গালি দিয়েছ তুমি তা' ভদ্রতার সীমার বাইরে। তুমি আমাকে ভুলে যেতে চেয়েছ; আমিও বলছি, আমিও ভুলে যাব তোমাকে।

হ্যাঁ, করিম সাহেবকে সব জানিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি আমি। স্বীকার করেছি আমার অপরাধ। সে আর ভুল বুঝবে না তোমাকে।

তোমার কাছে আমারও এই শেষ চিঠি। সাজেদা আর কোন দিন চিঠি লিখে বিরক্ত করবে না তোমায়।

তোমাকে ভুললাম। চির-জীবনের জন্য ভুললাম।

চিঠি দুটো ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ কাঁদল সাজেদা।

পল্লী সাহিত্যে প্রেম

মীর আলতাফ আলী

ছায়া ঢাকা, পাখী ডাকা পল্লী পথের বাঁকে বাঁকে যে সব চাষী আপন মনে গান ধরে, যে সব মাঝি ঢেউ-এর সাথে খেলে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তথাকথিত তাদের দেশের সংগেই পরিচয় নেই। কৃষকের মুখে যিনি আমির হামজা বা জৈগুনের কাহিনী শোনেন নি, বাউল বা গাজী গানের আসরে যিনি যান নি, পল্লী বিরহিনীদের মনোব্যথা যিনি অনুভব করেন নি, সেই সব পল্লীবাসীর মননধারার সংগে সত্যিকারের যোগ নেই। পল্লীর আনন্দরাশি থেকে বঞ্চিত। নানা রকমের সাহিত্য পল্লীবাসীদের মুখ থেকে শিউলি ফুলের মত দৈনিন্দন ফুটছে।

সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের কথা। অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির মধ্যে প্রেমের স্থান সকলের উপরে। সংস্কৃত সাহিত্যে তার নাম—'আদিরস'। সত্যিকারের প্রেমই সাহিত্যকলাকে সঞ্জীবিত রেখেছে। এই জন্য কাব্যসাহিত্যে প্রেমের ছড়াছড়ি।

পরিবর্ত্তনশীল জগত। তাই কত পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে জগতে। কিন্তু হৃদয়ের প্রেম-উৎসের শেষ আজো হয়নি। প্রেম স্থান কালের ভেদাভেদের বহু উপরে। চিরজয়ী। তাই আমরা ওডেসী টেম্পেষ্ট, শেষের কবিতা পড়ে আনন্দ পাই, লাইলী-মজনু, এণ্টনি, ক্লিওপেট্রার প্রেমে সহানুভূতি দেখাই।

পল্লী সাহিত্যেও প্রেম থাকা স্বাভাবিক। পল্লী সাহিত্যে গীতিকা, বাউল গান, মারফতি গান ইত্যাদিতে প্রেম রসের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এখানে আবার দু'রকম প্রেম দেখা যায়—মানবীয় প্রেম এবং ঐশিক প্রেম। পল্লী সাহিত্য বাউল, মারফতি, ফকিরদের ভগবত প্রেমে ভরপুর। আবার তাতে অনেক ক্ষেত্রে মানবীয় প্রেমকে বহু উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে।

পল্লী সাহিত্যে আছে মানবীয় প্রেমের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা। সোনাবান, জৈগুন, সুর্যউজ্জাল বিবি ইত্যাদি পুথির কাহিনী এবং 'মহুয়া', 'দেওয়ান মদিনা', 'নুরুন্নেছা কবর' ইত্যাদিতে অপূর্ব রসের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে পরিবেশিত রস হতে কম নয়। পল্লী সাহিত্যে প্রত্যেকটি নরনারী এক একটি আদর্শ নায়ক-নায়িকা। রোঁমা, রোঁলা, এলেন, ডক্টর সিলভা লেভীর মত মনীষীরা পল্লী সাহিত্যের অনুবাদ পড়ে উচ্ছসিত প্রসংসা করেছেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যে যাকে রোমাণ্টিক প্রেম বলে আমাদের পল্লী সাহিত্যে প্রচুর মেলে। গাথা ও গীতিকা ইত্যাদিতে যে রোমাণ্টিক প্রেমের বর্ণনা দেখা যায়, তা অপূর্ব্ব ও উচ্চশ্রেণীর। পল্লীর শ্যামল প্রান্তর, নদী-সৈকত, পথের বাঁকে গোধূলী লগ্নে মাঠ প্রান্তে নায়ক-নায়িকার দর্শন হয়—প্রেমের খেলা চলে।

মুকুট রায়ের গীতিকায় আছে—রাজকুমার মুকুট রায় নির্জ্জন বনে এক পাহাড়ী কন্যার দেখা পান। প্রথম দর্শনেই এই কন্যা মুকুট রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। দীনেশ বাবুর কথায় কিশোরী অস্তগামী সূর্য্য দেখল, আর দেখল প্রেমমুগ্ধ তরুণ সওদাগর। কোন কথাই তাদের মধ্যে হ'ল না। কিন্তু নয়নে নয়নে যে কথা হ'ল তা হৃদয় অন্তর্যামী জানলেন। পল্লী সাহিত্যে প্রেমকে বিরহ অপেক্ষা মিলনকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সাহিত্যে মিলন অপেক্ষা বিরহের স্থান উচ্চে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ হল মিলনে প্রেম নষ্ট হয়ে যায়। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিরহের জয় ঘোষণা করেছেন। শিক্ষিত সাহিত্যের প্রেমে শ্রান্তি আসে, লজ্জা আসে, মৃত্যু আসে। কিন্তু পল্লী সাহিত্যের মানবীয় প্রেমে এর বিপরীতটাই হয়। 'মিলনে' প্রেম উদ্বেল গতিতে চিরন্তন ধারায় বইতে থাকে। পল্লী সাহিত্যে মানবীয় প্রেম শুধু চোখের ইঙ্গিত, ঠোঁটের চুম্বন, হাতের কোমল পরশে ভরপুর নয়—আছে হৃদয়ের আদান প্রদান। নায়ক-নায়িকার প্রেম যে কত নিঃস্বার্থ, কত দেহাতীত, কত ইন্দ্রিয়াতীত তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সিলেটের 'হীরাধর বানিয়ার' পল্লী গীতিতে। নায়িকা উধব বালীকে আলু থালু কেশে স্নানের ঘাটে দেখে মুগ্ধ হন হীরাধর। প্রেম নিবেদন করেন তার নিকট। তন্মধ্যে নায়িকার সতিত্ব ও সহৃদয়তার পরিচয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিবাহিতা নায়িকা বলে তোমায় হাজার টাকা দিচ্ছি, বিয়ে করে সংসার কর। আমায় ভুলে যাও। নায়ক বলে, আমি বিয়ে করব না—চিরজীবন অবিবাহিত থাকব। হৃদয় গলে গেল নায়িকার। নায়িকা বলল—দক্ষিণের চাপাই নগরে আমার শ্বশুর বাড়ী পশারী সেজে যেয়ো। কতটুকু প্রাণের দরদ রয়েছে তাদের ভিতর। এই প্রেম জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ, সাগরের মত বিশাল, আকাশের মত উদার। ফরাসী মহিলা সমালোচক পল্লী সাহিত্যের নায়িকাদের সম্বন্ধে বলেছেন—"Oh ! All these Plucky women ! They ought to be known like the women in Shakespeare and Racine."

পল্লী সাহিত্যের নারী শুধু প্রেয়সি নয়। সে বীর রমণী। পুরুষের সুখ-দুঃখে সহযাত্রিনী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রণরাঙ্গিনী সুফিয়া বলা যায়।

বাল্য প্রেমকে কবিজন অস্বীকার করেন নি। তাই একজন পল্লী কবি একজন প্রেমিকের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন :—

ছোটকালের পীরিতরে ভাই কাঠালের আঠা
ছাড়লে না ছাড়া যায় এমনি বিষম লেঠা,
ছোটকালের পীরিতিরে কোকিলের রা,
উত্তরি উত্তরি উঠে কলজেতে মারে ঘা।
ছোটকালের পীরিতিরে নারিকেলের তৈল,
জমিয়াছিল শীতের রাতে রৈদে উনাই গেল।"

যদিও উপমাগুলি সাধারণ কিন্তু গভীর ভাবপূর্ণ। খেলা-ধুলার মাধ্যমে বালক বালিকাদের মধ্যে যে স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠে—ভবিষ্যৎ জীবনে তা কাঠালের আঠার ন্যায়ই বটে। বাল্য প্রেমে—প্রেমিককে অথবা প্রেমিকাকে উদ্বেল করে তোলে তার হৃদয়কে আহত করে।

পল্লী সাহিত্যে বিরহের ছবিও চমৎকার ফুটছে। পল্লী রমনীরা কতখানি ত্যাগ, কতখানি কষ্ট সহ্য করতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে বারমাসীগুলিতে। 'মাখব জালুয়ার বারমাসী' নামক সিলেটের একটি বারমাসীর বর্ণনা নিম্ন রূপ :—

"জালুয়ারে ও হায়রে জালুয়া
ও তোমার মাছ ধরার কপালে ছাই—
ও তুমি ঘরে আওরে।
কাতিক মাসে নয়া বধু ঘরেতে থুইয়া।
মাছ ধরার গেলায় জালুয়া জাল দড়ি লইয়া।
দিনে দিনে মাসটা গেল হইয়া পূরণ ?
ঘরে না আইলায় তুমি কিসের কারণ ?
এইত মাসেতে জালুয়া গাছে গোয়া বাতি
কেমনে একেলা নারী পুষাইমু রাতি।

*

আগ্রণ মাসেতে জালুয়া সবে নয়া খায়,
অভাগিণীর নয়ন জলে বুক ভাসিয়া যায়।

*

পৌষ মাসেতে জালুয়া খোয়া পড়ে মোর,
মলিন হইল বালির শিষের সিন্দুর।

*

মাঘনা মাসেতে জালুয়া শীতের জোয়ানী
দারুণ মাঘিনা শীতে কলিজা হৈল পানী।

*

ফাগুন মাসেতে জালুয়া বসন্তের বাও,
কাজল বরণ পাখীর ডাকে জ্বলে সর্ব গাও।

*

আইল ত চৈত্রল মাস ধুপের বড় জ্বালা।
দারুণ রবির তাপে শরীর হইল কালা।

*

বৈশাখ মাসেতে সাধু বিয়ান ছিটায় বিছ,
মনে হয় মরিয়া যাইতাম খাইয়া গরল বিষ।

*

জ্যৈষ্ঠ মাসে পোনা মাছ খায় সর্বজন,
আমি ভাবি নারীর সাধু আইবার কখন।
এই মাসে সর্বজন নানা ফল খায়,
অভাগীর যৌবন কাল বিফলেতে যায়।

*

দারুণ বিরহ তাপে জ্বলে মোর গাও,
আষাঢ়িয়া ভাসা জলে ঘাটে নাই মোর নাও।

*

হাওন মাসেতে সাধু বরিষার জোর,
তুমি-ঘরে আইলে মোর কলিজা হইত পোর।

*

ভাদ্রল মাসেতে জালুয়া গাছে পাকে তাল,
এ লাখের যৌবন আমি রাখি কত কাল।

*

আও আওরে প্রাণপতি ঘরেতে ফিরিয়া
বার মাস কাটাইলাম পন্থপানে চাইয়া।

পরিবর্তনশীল জগত। তাই পল্লী সাহিত্যেরও পরিবর্তন স্বাভাবিক। অনেকেই পরিহাস করে বলেন, পল্লী সাহিত্য একটা খিচুড়ী। কিন্তু আমি তাদের জানিয়ে দিতে চাই যে পল্লী সাহিত্য খিচুড়ী নয়। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, দর্শন, হাস্যরস সব কিছুই আছে পল্লী সাহিত্যে। খাটী বাংলার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পল্লী সাহিত্যে ধরা পড়ে। Literature যদি criticism of Life হয় তাহলে পল্লী সাহিত্য তারই পরিপূরক।

ভৌতিক

আমিনুল ইসলাম

অবশেষে আশ্বস্থ হলুম। পেছনে তাকিয়ে দেখি রোকলিকে চেহারার একটি বালক ভিখারী। জিজ্ঞাসা করলুম, "এত বাচ্চা মানুষ ভিক্ষে করিস কেন?"

"আমার মা-বাবা নেই, কি করবো সাব ভিক্ষা না করে চল্‌তে পারি না তো।" ছেলেটি সভয়ে জবাব দেয়।

তোর বাবা-মা কি হয়েছে—মারা গেছে? আবার প্রশ্ন করি।

"বাবা মারা গেছে সাপের কামড়ে, আর মাকে খেয়েছে ভূতে।" মাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় ভিখারী ছেলেটি। নাম-ধাম জেনে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় দেই। ওর মুখে ভূতের কথা শুনে মনটা যেন কেমন করে ওঠে।

* * *

ভিখারী ছেলেটির বাড়ী চরপাড়া। আমাদের গাঁ হতে ছ'মাইল পশ্চিমে। গ্রামখানি বেশ প্রাচীন। বনিয়াদী দু'এক ঘর লোক ছাড়া বাকী সব চাষীদের বাস। লেখাপড়া কেউই জানে না বললেই চলে। দু'চার ঘর হিন্দুর বসতি যা ছিল তারাও চলে গেছে সীমান্তের পারে। সামান্য লেখাপড়ায় ২।১ জন ছোটখাটো চাকুরী করে—তারা থাকে গ্রাম থেকে দূরে।

গ্রামে ঘেঁষাঘেষি বসতি। চাষীদের অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয়। সামান্য জোত জমি চষে, দু' চারটি গরু পুষে তার দুধ বিক্রি করে কোনহালে দিন কাটে। পার্শ্বের গ্রামে ছোট্ট হাট। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। সেখানেই সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সবাই ক্রয় করে।

জঙ্গলা গ্রাম। পাতলা বসতি। মাঝে মাঝে দু' একখানা ভিটে বাড়ী আর তাতে ছোট ছোট ছোনের ঘর। গ্রামে পচা ডোবা, কচুরী পানায় ভরপুর। আজে-বাজে গাছ-গাছড়া, বেতের ঝাড়, লতা-পাতা, বটগাছ এ সব মিলে এক জমকালো চেহারা ধারণ করেছে গাঁখানি। অসুখ বিসুখ সব মানুষের লেগেই আছে। ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের আড্ডা। প্রায় লোকেরই পেট বড়...গায়ে পায়ে শক্তি কম।

অসুখ বিসুখে ঔষুধ নেই। গাঁয়ের একমাত্র পুরাতন কোবরেজ জসিম শেখ। অসুখ বিসুখে তারই ডাক পড়ে। গ্রাম থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে ননী ডাক্তারের বাড়ী। তার ভিজিট বেশী। আর তাছাড়া ডাক্তারী ঔষধে ব্যারামও সহজে সারে না—টাকাও লাগে ঢের। এ ঔষধে তাই তেমন আস্থা নেই। ডাক্তাররা ঔষধের চেয়ে পথ্যের যে ব্যবস্থা দেয় তা মেলে না গ্রামে। শহর তো নেই-ই কাছে।

শহরের সাথে সম্পর্ক নেই।—দু' একজন নেহায়েত দায়ে ঠেকে মামলা মোকদ্দমা করতে যায় শহরে। শহর থেকে ফিরে এসে গ্রামে চলে শহরের গল্প। ঘোড়ায় গাড়ী টানে, মোটর চলে, রেকশা চলে, হোটেলে ভাত খায়, সাহেবরা চা খায়, মিষ্টি পান বেচে...এ-সব কত কি শহরের আজগুবি ব্যাপার। গ্রামের বালক-বৃদ্ধ দল বেঁধে বসে গভীর মনোযোগের সাথে শোনে সে কাহিনী, আর ছিলিমের পর ছিলিম তামাকের করে সদ্ব্যবহার। ছেলেরা গল্প শোনে আর ক্ষুধার্তের মত গেলে, বুড়োরা চমকে যায়, যুবকেরা প্রশ্ন করে করে আবার শোনে। বায়স্কোপের কথা শুনে তো নওসের পরামানিক ভেবেই পায়না যে ছবি আবার কি করে কথা বলতে পারে। সে বলে "চোখে না দেখলে এ কথা বিশ্বাস করি না।"

গ্রামবাসীরা খুব সরল ও অনাড়ম্বর। গ্রামে ঝোপ জঙ্গল, বট গাছ, বাঁশ ঝাড়, বেত প্রভৃতিতে বোঝাই। যেখানে বেশী জঙ্গল ঐখানে আছে একটি বড় বট গাছ। ওখানে ভূত থাকে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। দু' গাছে দু' পা দিয়ে চুল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হি হি করে বিকট হাসি...এ গুলো কেউ না দেখলেও গল্প শুনেছে ঢের। সে বৎসর কাজেম সরদারের বড় মেয়ের অসুখ হোল। অসুখ কি ভূতে ধরলে—কেননা কাউকে দেখলে লজ্জা করে না, মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে. কাপড় চোপড় গায় রাখেনা, আর রাত্রে আসে প্রবল কাঁপুনিসহ জ্বর। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। মাঝে মাঝে নির্জীবের মত পড়ে থাকে। অসুখ যখন বেড়েই চললো তখন ডাকা হোল জসিম কোবরেজকে। কোবরেজ সাহেব এসে রুগী দেখেই তো ভড়কে গেলেন। একে তো অল্প বয়স। তার উপর ভূত এমন ভাবে কাবেজ করে বসেছে যে ভূত ছাড়াতে বহুত ঝামেলা আছে। কোবরেজ সাহেবও আজকাল ভূতের রোগী দেখতে চান না। কেননা সন্ধ্যার পরে পথে একা একা হাঁটা যায় না। গা ছম ছম করে। তাছাড়া মাঝে মাঝেই ভূতেরা কোবরেজকে শাসায়। এ সব কথা বলে যায় জসিম কোবরেজ অনর্গল।

কিন্তু কাজেম সরদার ছাড়বার পাত্র নয়। ধরে বসলো কোবরেজকে, "আমরা গরীব মানুষ দেখে কি চিকিৎসা অভাবে মারা যাবো।" শেখ সাহেব বলে সরদারকে। হাত এড়াতে না পেরে কোবরেজ রাজী হয়ে যায়। রোগী-

রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করা হোল। দাঁত লেগে পড়ে থাকে, বড় বড় করে তাকায়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, মাঝে মাঝে জিহ্বা কামড়ায়। কোবরেজ সাহেব বললেন, "কালী বাড়ীর বট গাছে যে জটওয়ালী পেত্নীটি থাকে সেইটেই ভর করেছে।"

ঝাড়া পোছা চলে নিয়মিত। একলা ঘরে বন্ধ করে ধুপ ধুনা জালিয়ে খুব করে সশব্দে ঝাড়া হয়। বিধি-ব্যবস্থা চলে, পানি পড়া, গলায় হাতে তাবিজ, পুরানো অব্যবহৃত মোল্লা ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করা, তার পর এ গুলো ধোয়া পানি দিয়ে গোসল করানো। দিন সাতেক পুরোদমে চললো চিকিৎসা কিন্তু ভূত আর ছাড়েনা।

রোগীনীর বয়স ২২ বৎসর। বিয়ে হ'বার পর বৎসর চারেকের মধ্যে দু'টি ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে আজ প্রায় এক বৎসর। স্বামীর মৃত্যুর পর কত বড় শোক পেলো তা কোন অসুখ-বিসুখ দেখা দিল না। অথচ কবে কোন কৃষ্ণপক্ষের শনিবারে অসময়ে খালি চুলে দাঁড়িয়ে কাপড়ের আঁচলটি মাটীতে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইরের উঠানে আর অমনি এসে ভর করেছে পেত্নী। কোবরেজ সাহেব বলেন, "মেয়ে মানুষের অসুখ বিসুখ বিপদ আপদ সব পদে পদে। একটু অসাবধান হোলে তো আর রক্ষা নেই।"

অসুখ আর ভাল হয়না। হতভাগিনীকে দৈনিক মোথা ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করা হয়, গাছান্ত ঔষধ দেওয়া হয় বোঝা বোঝা, আর কোবরেজ সাহেব সেই সব গাছ-গাছড়ার বড়ি তৈরী করবার অজুহাতে মসলাপত্রের দাম নেয় অন্ততঃ ২।৩ টাকা। ডাক্তারী ঔষধে খরচ তাই কোবরেজী ঔষধেরই উপর ভরসা।

কাজেম সরদার গরীব মানুষ। ক্ষেতের ফসলে সারা বৎসরের খোরাক হয় না। মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে চলে যায় ভিন গাঁয়ে কামলা বিক্রি করতে। কামলা বিক্রি করে নিয়ে আসেন কিছু টাকা। তাতে কোন রকমে দিন যায়। মেয়ের অসুখে কোবরেজকে টাকা দেওয়া তার হয়ে উঠলো দুঃসাধ্য। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী হয়ে পড়লো।

এত ক্ষয় খরচা করেও রোগীনীর অসুখ ভাল করা সম্ভব হোলনা। শরীর ক্রমশঃ ভেংগে পড়তে শুরু করলে। শরীরের উপর যে অত্যাচার চলতে লাগলো সে তো এক ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ ভূত ছাড়াতে যে মারধর করা হয় সে মার তো আর ওর গায় লাগেনা—লাগে ভূতের শরীরে। এক সময় শরীরের বেদনায় কেঁদে ওঠে। তার ক্রন্দন দেখে সবাই দাঁত বের করে হাসে কেননা এ যে মানুষের কান্না নয়—ভূতের কান্না। মেয়েটাই আস্ত একটা ভূতে পরিণত হয়েছে।

* * *

সপ্তাহ দুই কেটে গেল। ভুতুড়ে ভাব ছেড়ে গেছে। এখন আর তেমন করে চোখও বড় বড় করে না, দাঁত বের করে হাসেও না, কাপড় চোপড় টেনে ছেঁড়ে না—শুধু চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে থাকে। কেউ ডাকলে বহুক্ষণ পর একবার চোখ মেলে চায়—আবার পরক্ষণেই বোজে। চোখ দু'টো জবা ফুলের মত লাল টকটকে। মাথার চুল রুক্ষ-জটা—পরিধানে ময়লা জীর্ণ শীর্ণ একখানা শাড়ি। ছেলেটি আর মেয়েটি মাকে ঘিরে কান্না করে সব সময়ই। পাড়ার অন্য সবাই জোর করে ছিনিয়ে নেয় তাদেরকে আর বলে, "শেষ পর্য্যন্ত ভূত ওর মাকে ছেড়ে ছেলেমেয়েকেও ধরতে পারে। কচি কচি ছোট ছেলে-পুলের উপরই ভূতের বেশী আক্রোশ। কচি বাচ্চারা যে আঁতুড় ঘরে দুধ ছেড়ে মারা যায়—সেতো ভূতেরই প্রভাবে। তাদের দেহের কচি রক্ত পান করে তৃপ্তি পায় পেত্নীগুলো।"

দু'দিন হয় ঘন ঘন পায়খানা হচ্ছে রোগীনীর। পাতলা পায়খানা। উঠে বসতে পারে না। কথা বলতে জিহ্বা সরে না। হাত পা টান ধরে আসে। ভূতে ধরার পর থেকে তো তেমন খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই। কেননা রীতিমত খেতে পেলে তো ভূত ছাড়বে না—বরং আরো জাঁকাল হয়ে বসবে।

* * *

গ্রামের রহমান চাকুরী করে পিওনের, থাকে শহরে। মায়ের অসুখের চিঠি পেয়ে বাড়ী এসে শুনতে পেলো কাজেম সরদারের মেয়ের ভূতে ধরেছে। বাড়ী থেকে যাবার দিন সকালে সে দেখতে গেলো মেয়েটিকে। দেখে সরদারকে পরামর্শ দিলে ডাক্তার ডাকতে। ভূতে ধরে নাই—বরং কলেরা হয়েছে এখন। কোবরেজী চিকিৎসায় ভাল হবে না। ভূতের অছিলায় এর উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, তাতে এর বাঁচাই ভার। গ্রাম থেকে দু' ক্রোশ দূরের ননী ডাক্তারকে ডাকার পরামর্শ দিয়ে সে বিদায় হোল। রোগীনীর পার্শ্বে দাঁড়িয়েই সে কথাগুলো বলতেছিলো। বেচারী একবার চোখ মেলে লোকটিকে দেখলে। কি করুণ সে চাহনি। দু'চোখ বোঝাই অশ্রু-জল যে বাঁধ ভেংগে গড়িয়ে পড়তে চায়।

সেদিন মঙ্গলবার। বিকেলে অসুখ বেশী হলো। ডাক্তার তো ডাকা হবেই না—কেননা ডাক্তাররা কি ভূতের চিকিৎসা করতে পারে? আর এতো কলেরা নয়—ভূতই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধরে হাজির হয়। বিকেলে কোবরেজ সাহেব এসে ঝেড়ে পুছে সেলামী নিয়ে বিদায় হলেন আর বললেন আজকালের মধ্যেই ভূত ছেড়ে যাবে।

রাত দুপুর। গভীর কালো রাত। কালো ভূত যেন ডানা মেলে ধরেছে সবখানে। সরদার বাড়ী থেকে

ভেসে আসতে লাগলো কান্নার আওয়াজ। মরা কান্না। ছেলেমেয়ে দু'টি ডুকরে কাঁদছে, চাচা চাচিও কেঁদে অস্থির ভূতের কাণ্ড দেখে। সরদার সাহেব হতবাক। শোকে কাতর। আজ ভূত সত্যিই ছাড়লো—তবে দু'একদিনের জন্য নয়—সারা জীবনের মত।

পরের দিন গ্রামে রাষ্ট্র হোল যে সরদারের মেয়েকে এমন ভূতই ধরেছিলো যে জসিম কোবরেজের মত পুরানো ওস্তাদ কবিরাজও সে ভূত ছাড়াতে পারলো না।

সকলেই বললে "কাজী বাড়ীর পেত্নী—যাকে ধরে তাকে ছেড়ে যায় না।"

ভেজা কান্না

আলমগীর জলীল

আজকে ভোরের ভেজা চোখের পাতা
ডাক দিয়েছে পদ্ম পুকুর পাড়ে
বাঁশের ঝোপে ডাহুক বেদনাতে
ডাক দিয়েছে সোনার অশ্রুজলে
　　: কেমন করে বলি।

তবুও বলি থাকনা পড়ে কাজ
জীবনটা তো আয়ুর বিলাস শুধু
গোবি কিংবা অন্য মরুর ধূ ধূ
আজকে বাঁধো মধ্য রাতের গান।

কান্নাভেজা দুপুর এলো কাছে—
রাত দুপুরে, বিবস অনেক সাঁঝে
মেঘের চূড়ে ফাগ্ লিখেছে কেবা
তারেই বলি বলব রঙের রেখা
কণ্ঠে বাজুক গানের দুটো কলি

বুঝুকে এবার তাহার ব্যথা কত
মানুষ-জীবন কান্না-ভেজা যত
আকাশ নীলায় যায় না ভেসে কেউ
মাটির 'পরে ডাকবে কত কেউ
ফানুস-বিহীন মনের অলিগলি।

খেলাধূলা

—খেলোয়াড়

স্পোর্টস ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত অফিস লীগ খেলায় এবৎসরের চ্যাম্পিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান দল

অফিস লীগ বিজয়ী ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দল—

ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন এবৎসর ঢাকা অফিস ফুটবল লীগ খেলারও ব্যবস্থা করেন। ফলে বিভিন্ন অফিস দলগুলিকে ঢাকার নামজাদা খেলোয়াড়দের চাকুরী দিয়া নিজেদের দলের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে দেখা যায়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, এলবার্ট ডেভিড, ওয়ার্কস এণ্ড হাউজিং, পি, আই, ডি, সি, এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের খেলিতে দেখা যায়। সেণ্ট্রাল জেল দলও ভালই খেলে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারা অফিস লীগে রাণার্স-আপ হইয়াছে। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান দল অপরাজিত থাকিয়া ঢাকা অফিস লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

ঢাকা মোহাঃ স্পোর্টিং-এর গোল্ড কাপ বিজয়—

এবৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং দল আগা খান গোল্ড কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত-বৎসর হইতে এই গোল্ড কাপের খেলা শুরু হয় এবং করাচী কিকার্স দল প্রথম বর্ষে এই প্রতিযোগিতায় যোগ্যতর দল হিসাবে গোল্ড কাপ বিজয়ের সম্মান অর্জ্জন করে। এবৎসর ফাইনালে মোহামেডান স্পোর্টিং দল করাচী মিউনিসিপাল কর্পোরেশন দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তান দলগুলির মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম এই বিখ্যাত নক-আউট কাপ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করিল। অনুষ্ঠানে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্ত্তা

মেজর জেনারেল ওমরাও খান পুরস্কার বিতরণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম দিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার

আশরাফ

দর্শকের উপস্থিতিতে খেলা শুরু হওয়ার পর মোহামেডান স্পোর্টিং ৩-০ গোলে অগ্রগামী থাকা কালে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য খেলা পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর একদিন পর খেলার তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু সেদিনও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ খেলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। পরদিবস প্রায় পনের হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই খেলা আরম্ভ হয়। ই-পি-আর-এর ব্যাণ্ড পার্টি উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ বর্দ্ধন করে। খেলার পূর্ব্বে ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট জনাব সাহেবদাদ খান ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ফরিদ আহমদ মেজর জেনারেল ওমরাও খানকে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। ঢাকা লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং দল সর্ব্বাংশে উন্নততর ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিয়া যোগ্যতর দল হিসাবে এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী করাচী মিউনিসিপাল কর্পোরেশন দলও এই দিন উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করায় খেলাটি বেশ উপভোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। বিজয়ী দলের গোলরক্ষক রণজিত এইদিন নিজের উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া ধীর মস্তিকে খেলিতে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সমাগত সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ব্যাকদ্বয় গজনবী ও হাবিব সকল সময় অটল থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করেন। হাফে আবিদ লৌহপ্রাচীরের ন্যায় নিজ দলের শক্তিস্তম্ভ স্বরূপ থাকিয়া দলের প্রেরণা যোগাইতে থাকেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপর দুইজন কামরু ও ইমাম বখশও তাহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। ফরওয়ার্ডে অধিনায়ক আশরাফ আর একবার যোগ্য নেতৃত্ব দান করিয়া স্বীয় দলকে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। তরুণ খেলোয়াড় বশীর এবং মদনও স্বভাবসুলভ ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন।

অপর পক্ষে করাচী দলের গোলরক্ষক নিজের উপর আস্থা রাখিয়া খেলিতে সমর্থ হন নাই। তাহাছাড়া তিনি প্রতিপক্ষ দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড আশরাফকে যে ভাবে চার্জ্জ করিয়াছিলেন তাহা খুবই দৃষ্টিকটু হয় এবং সেজন্য রেফারী তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন। রক্ষণ ভাগে সালেহ, গোলাম ও গফুরের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়। সেণ্টার ফরওয়ার্ড আব্বাস সকল সময় প্রতিপক্ষের ভীতির কারণ হইলেও ইনদ্বয়ের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মোহাঃ স্পোর্টিং :—রণজিত ; হাবিব ও গজনবী ; কামরু, আবিদ হোসেন ও ইমাম বখশ ; আমান, বশীর, আশরাফ, মদন ও শাহ আলম।

কে, এম, সি :—গোলাম হোসেন ; খোদাবখশ, গফুর ও ইয়ার মোহাম্মদ ; সালেহ ও গোলাম ; রসুল বখশ, হারুণ, আব্বাস, আবদুল্লা ও ইউসুফ।

রেফারী—মাহ্‌বুর রহমান।

ব্রজেন দাস

ব্রজেনের পাল্টা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম—

পাকিস্তানের বীর সাঁতারু ব্রজেন দাস বিপরীত দিক

হইতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের কেপ গ্রীজনেস-এ পৌঁছান। তিনি এবৎসর ১৪ ঘন্টার সামান্য অধিক সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। এবৎসর আন্তর্জ্জাতিক দীর্ঘ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ব্রজেন দাসের ইহা তৃতীয় সাফল্য। ইতিপূর্ব্বে তিনি ক্যাপ্রি ও ইংলিশ চ্যানেল প্রতিযোগিতায় গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে সমর্থ হন। এসিয়াবাসীদের মধ্যে ব্রজেন দাসই প্রথম দুই দিক হইতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক হকি খেলায় পাক আম্পায়ার—

করাচী হকি আম্পায়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও ভূতপূর্ব্ব অলিম্পিক খেলোয়াড় মিঃ পি, পি, ফারনাণ্ডেজ মিউনিকে যে আন্তর্জ্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপের খেলা অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে আম্পায়ার মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই চ্যাম্পিয়নশীপে প্রতিযোগিতা করার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, পশ্চিম-জার্মাণী, বেলজিয়াম ও কতিপয় দুরপ্রাচ্যের দেশ অংশ গ্রহণ করিবে।

সম্পাদকীয়
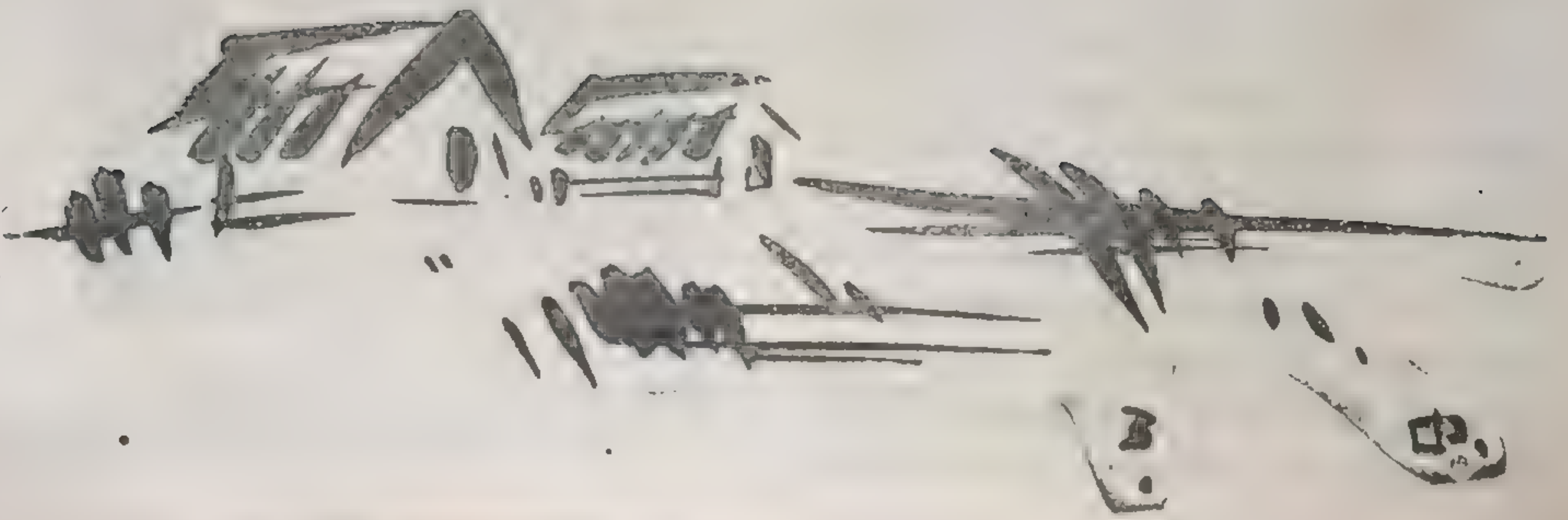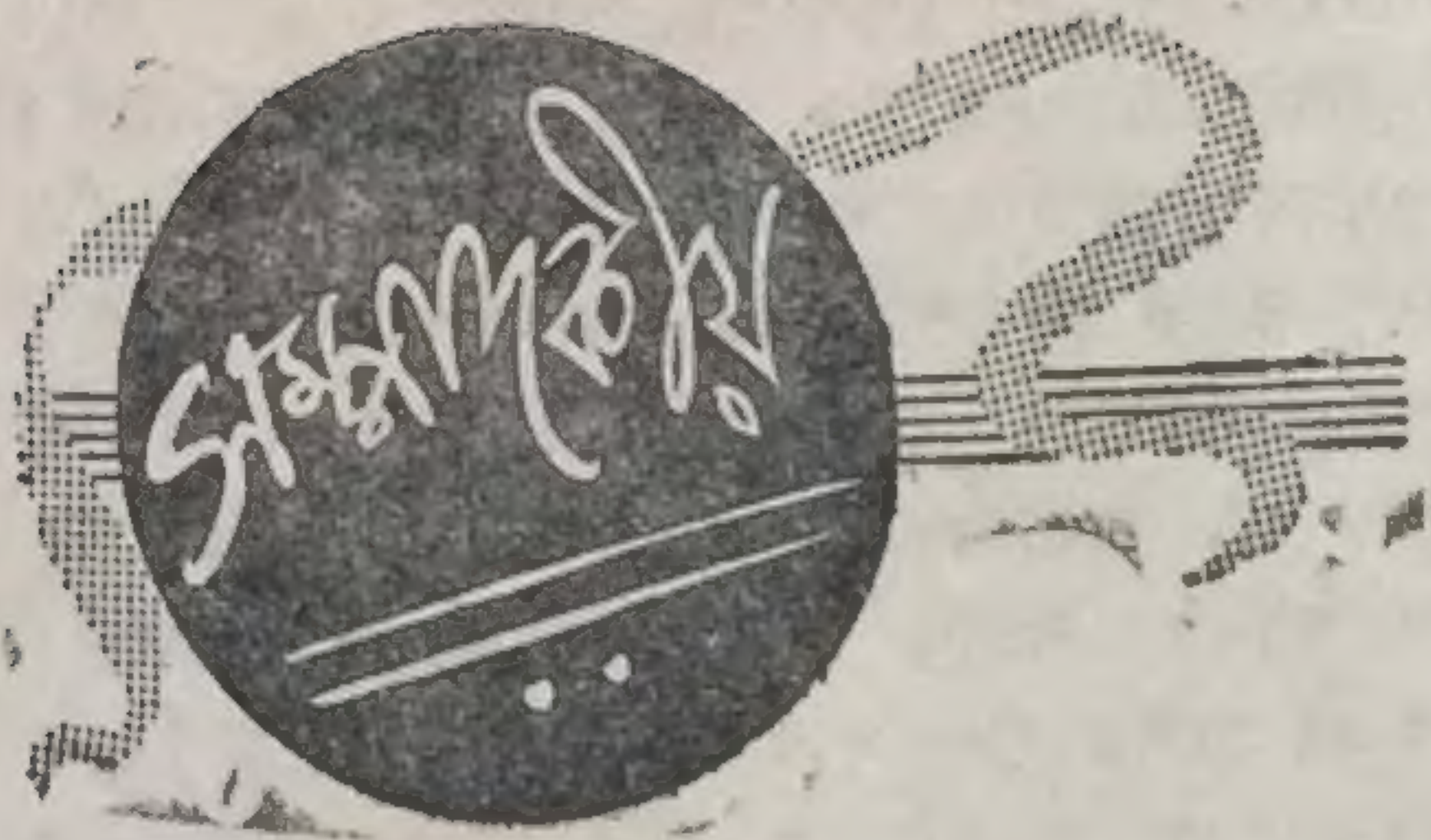
নবীদিবস

যথারীতি সারা দেশে নবীদিবস পালিত হইয়াছে। পাকিস্তানে সর্ব্বত্র বহু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং মর্য্যাদাবান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবসে মহানবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে। এবারের অনুষ্ঠানের ব্যাপকতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু মসজিদে মসজিদে নয়, বাড়ীতে বাড়ীতে, মহল্লায় মহল্লায় এবং বিভিন্ন তামদ্দুনিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিলাদ ও নবিজীর চরিতকথা আলোচিত হইয়াছে। মানুষের মত মানুষ এবং দুনিয়ার সেরা মানুষ মহানবী হজরত মোহাম্মদের প্রতি মানুষ যতই বেশী করিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতে শিখিবে, ততই নৈতিক পথে মানুষের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইবে।

পাকিস্তানে মহানবী হজরত মোহাম্মদের জীবনকথা যত আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। পাকিস্তান এছলামী আদর্শে মানুষের জন্য এক নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চায়। সুতরাং এজন্য চাই আদর্শ। এছলামের বাণীকে কর্ম্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন মহানবী। তাঁর জীবন ছিল তারই বাস্তব রূপায়ণ। আমরা এছলামী আদর্শ ও ভাবধারাকে যদি জীবনে ও কর্ম্মে রূপ দিতে চাই, তবে মহানবীর জীবনকে পড়িতে হইবে, জানিতে হইবে এবং অন্তর দিয়া ভালবাসিতে হইবে; তাঁর জীবনের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হইতে প্রেরণা লাভ করিতে হইবে। এ কারণেই নবীশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মোহাম্মদের জীবনী লইয়া আজ আলোচনা এখানে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

মহানবীর আদর্শকে প্রচারের জন্য যদি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায়, তবে অনেক মহৎ কাজ হইতে পারে। সকল পাকিস্তানী জবানে সকলের উপযোগী করিয়া মহানবীর প্রামাণ্য জীবনকথা রচনা প্রকাশ করা উচিত। শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবা এবং প্রবীণের উপযোগী করিয়া নানাভাবে তাঁর চরিতকথা রচিত ও প্রচারিত হওয়া দরকার। তা ছাড়া বিদেশী ভাষায়ও এ দিক হইতে হজরতের জীবনী এবং হাদিসের প্রচার হইলে দুনিয়ার সকল দেশের এবং সকল জাতির মানুষ লাভবান হইবে। তা ছাড়া এছলাম ও মহানবীর জীবন-কথা সম্পর্কে বহু দেশের লোকের ভুল ধারণা রহিয়াছে। এসব ভুল দূর করিতে হইবে। সুতরাং সারা পাকিস্তানের ভিত্তিতে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা সুধী ও আ'লেম সমাজ চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা খুশী হইব।

এছলামী গবেষণাগার

পাকিস্তান সরকার এছলামী তাহজীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ আরো প্রতিষ্ঠান ঢাকা এবং লাহোরে গড়িয়া উঠিবে। ইকবাল একাডেমীও তার সাথে যুক্ত হইয়া কাজ করিবে। আশা করি, উপযুক্ত ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ও আলেমগণের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে এছলামী তাহজীব এবং তমদ্দুন সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনার ক্ষেত্রে এক নবযুগ আনয়ন করিবে।

পাক বাংলার পরিভাষা

বাংলা একাডেমী পরিভাষা সম্পর্কে যে সব পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন, সে-সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। আমরা তাঁদের পয়লা কিস্তিতে প্রকাশিত পুস্তিকাটির গৃহীত মূলনীতি এবং শব্দ তালিকার ভুল-ত্রুটির উপর আলোকপাত করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁদের গৃহীত মূলনীতির সাথে আমরা একমত হইতে পারি নাই এবং তাদের শব্দ-তালিকাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। বাংলা একাডেমী পরিভাষার একটি মূলনীতিতে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়াছেন, ইহা ঠিক হয় নাই। আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা আমাদের জাতীয় তমদ্দুনের ভাষা। তা ছাড়া এ ভাষার শব্দ ও পরিভাষার সাথে এ দেশের ইতিহাস বিশেষভাবে যুক্ত রহিয়াছে। আরব, তুর্ক-আফগান, মোগল আমলে

যে পরিভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার অনেকগুলি প্রচলিত এবং ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে তাদের সাথে এখনও আমাদের পরিচয় ঘটে। পাকিস্তান এবং পাক-বাংলায় সে শব্দ যথাসাধ্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং যথাসাধ্য সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি শব্দ নূতনভাবে আমদানী না করার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। বাংলা একাডেমীর "পরিভাষা কমিটি" তা করেন নাই।

আরো একটি কথা কমিটি ইয়াদ রাখেন নাই। ভাষা ও পরিভাষার মধ্যে যে সারা দেশের তামদ্দুনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত, তা তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তানের পরিভাষায় অর্থাৎ বাংলা, উর্দ্দু, সিন্ধী, পশতু প্রভৃতির মধ্যে যতখানি যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভব, ততখানি যোগসূত্র রক্ষা করা উচিত। এ ব্যাপারে পরিভাষা বেশ কিছুদূর পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারে। দুই অঞ্চলের মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, ভাববিনিময় ও জানাজানির পথ ইহা দ্বারা অনেকখানি প্রশস্ত হইবে। এর ব্যবহারিক গুরুত্বও উপেক্ষা করা যায় না।

"রওনক" ও পরিভাষা

এ ব্যাপারে দেশের সুধী, সাহিত্যিক ও তমদ্দুনসেবী অধিকতর আগ্রহ দেখাইলে আমরা খুশী হইতে পারিতাম। "রওনকে"র মাসিক সাহিত্য সভায় ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। রওনকও পরিভাষা রচনায় জাতীয় ঐতিহ্য ও তমদ্দুনের প্রতি মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীকে অবহিত করার জন্যও তারা অনুরোধ জানাইয়াছেন। আশা করি, বাংলা একাডেমী পরিভাষা সম্পর্কে চূড়ান্ত নীতি ও তালিকা নির্দ্ধারণের সময় এসব আলোচনা এবং সমালোচনার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবে। তা না করিলে তাঁরা পাক বাংলার পরিভাষা সম্পদের উন্নতি করিতে যাইয়া তার অনিষ্টই করিবেন বেশী।

আইয়ুব-নেহরু মোলাকাত

দিল্লীতে অইয়ুব-নেহরুর মোলাকাতকে পাকিস্তান এবং ভারতের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই অভিনন্দিত করিয়াছেন। যদিও এই সাক্ষাতকার স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তবু আলোচনা অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অগ্রসর হয়। এসম্পর্কে যে যুক্ত এশতেহার প্রকাশিত হইয়াছে, তার মধ্যেও দুই দেশের বন্ধুত্ব ও সম্প্রাতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এর বাস্তব লাভ হইল যে, দুই দেশের বিরোধগুলি মিটাইয়া ফেলার জন্য উর্দ্ধতন স্তরে বৈঠকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কেও নীতিগত ভাবে সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ এবং জনাব জওয়াহেরলাল নেহরু অনেক বিষয়ে একমত হইয়াছেন। সদর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ এসম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাতে এই দুই দেশের একযোগে কাজ করার আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অতীতে এই উপমহাদেশের বৈদেশিক ব্যাপারে অনৈক্য অনেক ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার কথাই তিনি বলিয়াছেন। সদরের এই কথাগুলির বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হইলেই সুখী হইব।

পাকিস্তান ভারতের বন্ধুত্বই কামনা করে। অতীতেও পাকিস্তান উদ্যোগী হইয়া দুই দেশের মধ্যে শান্তি, বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশিত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পাকিস্তানের সদরও পুনরায় এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। এতেই পাকিস্তানের শান্তি ও বন্ধুত্বকামী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মৌলিক গণতন্ত্র

ঢাকায় গভর্ণর সম্মেলনে মৌলিক গণতন্ত্রের খসড়ার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এসম্পর্কে শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার কথা। বর্ত্তমান সরকার মৌলিক গণতন্ত্রের উপর যে বিশেষ জোর দিয়াছেন, তা তাঁদের বহু বিবৃতি, বক্তৃতা ও আলোচনার মারফত প্রকাশ পাইয়াছে। এই মৌলিক গণতন্ত্রে দেশবাসীর হাতে গণতন্ত্রের সত্যিকারের অধিকার দানের পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই দেশবাসী নীতিগতভাবে ইহাকে সমর্থন জানাইয়াছে। এর বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে এ-সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত, দেওয়ার সুযোগ আসিবে। তবে মৌলিক গণতন্ত্রের বিস্তারিত পারিকল্পনাও যে জনগণের কল্যাণার্থে আসিতেছে এবং জনমত একে সমর্থনই জানাইবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

চাঁদ ও মানুষ

মহাশূন্য জয় করিয়া গ্রহে, উপগ্রহে ও বিভিন্ন নক্ষত্রে যাওয়ার চেষ্টা ও জল্পনা-কল্পনার আজ অন্ত নাই। গত কয়েক মাসের মধ্যে শূন্যলোক জয় করার জন্য রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা তুমুল প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন, তার খবর প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। ফলে অনেকগুলি উপগ্রহ ও রকেট শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে বহুদূর পর্য্যন্ত জয় করিয়া ইতিমধ্যে কয়েকটি উপগ্রহ ও

রকেট শূন্যচারী হইয়াছে। এরই মধ্যে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাশিয়া কর্তৃক নিক্ষিপ্ত রকেটটি চাঁদে অবতরণ করিয়াছে এবং সেখানে সোভিয়েট পতাকা স্থাপন করিয়াছে। এর পূর্বে এই পৃথিবী হইতে মানুষ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কোনো কিছু চন্দ্রে যাইয়া পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু এবার তাও সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং এখবরটিতে যেমন রাশিয়ার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তেমনই শূন্য-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নূতন অগ্রগতির অধ্যায়ও সূচিত হইয়াছে। এরপর আসিবে পৃথিবী হইতে কোনো প্রাণী চাঁদে প্রেরণের পালা। রাশিয়া যদি তা পাঠায়, তবে সে হয়ত কুকুর পাঠাইবে এবং আমেরিকা কোনো প্রাণী চাঁদে পাঠাইলে তা হয়ত হইবে বানর। এই প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয়, তবে চূড়ান্ত স্তরে মানুষ হয়ত চাঁদে যাইয়া পৌঁছিবে। একদিন চাঁদে পৌঁছার কথা ছিল জল্পনা-কল্পনা মাত্র। এখন হইতে তা বাস্তব রূপ নিতে আরম্ভ করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের অভিযান চন্দ্রলোক বিজয়ে শীঘ্রই কামিয়াবি লাভ করিবে। শূন্যের পথে নব নব জানাজানি ও দিগ্বিজয়ের তোরণদ্বারে আজ যে পৃথিবীর মানুষ উপনীত হইয়াছে, এসংবাদটি তারই প্রমাণ বহন করিতেছে।

Printed and Published by Abdul Hakim Khan from the "Azad Press, Ramna, Dacca (E. Pakistan)